॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

৩৪ বর্ষ ১৩৭৪

(৪০শ সংখ্যা হইতে ৫১শ সংখ্যা পর্যন্ত)

— অ

— আ —

— ই —

— উ —

— এ —

— ও —

— ক —

— খ —

— গ —

— ঘ —

— চ —

— ছ —

— জ —

— ট —

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীমতী উমা দাস

"মা, মা,
এই ত'
বিনাকা"
CIBA

প্রভাত
সূর্যের
চেয়েও
দীপ্তিমান।
মফতলাল
গ্রুপ
প্রিণ্টেড পপলিন
টেরিন, কটন, প্রিন্টেড পপলিন
রকমারি টেবিলাইজড এবং
ফিনাইজড কাপড়
LPE-Aiyars M. 155 BN

তিন দুয়ারী ঘর ॥ কণিষ্ক

মৃত্যুমুখী পশ্চিমী সংস্কৃতির বুলি মুখস্থ করে স্বচ্ছল জীবনযাত্রার গণ্ডির ভিতরে থেকে আধুনিক ভাঁড়ামিতে মজে ছিল সমীর। কিন্তু জীবনের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে উপস্থিত হল বৃদ্ধা আইভি ব্যারেট; ভেসে উঠল সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের নিঃসঙ্গ এমিলি: স্বপ্নের নগ্নতা নিয়ে এলো রুক্মিণী স্বামীনাথন। সমীর খুঁজে পেল তার নষ্ট দৃশ্যপট। তিন দুয়ারী ঘর সৎ ও বিবেকবান আধুনিক মানুষের আত্ম-আবিষ্কারের নির্মোহ কাহিনী॥ ৮·০০

লোপামুদ্রা ॥ নির্মলচন্দ্র মৈত্র

এই উপন্যাসের নায়ক একবার এক মহামহোপাধ্যায়ের পাঠাগারে কল্যাণমল্লের অনঙ্গরঙ্গ, মোহমুদ্গর আর বেদান্তের টিকা একসঙ্গে বাঁধাই অবস্থায় আবিষ্কার করেছিলেন। পাঠকও তাই আবিষ্কার করবেন এই বিচিত্র উপন্যাসে। কামনাবাসনায় কুণ্ঠিত, শিক্ষিত উচ্চকোটির কয়েকটি নরনারী এসে মিলেছেন কুলু উপত্যকায়। ঘটনাকাল পাঁচদিনের। পাঁচদিনের মন্থনে যে-অমৃত উত্থিত হয়েছে তা যেমন ঝাঁঝালো তেমনি তীব্র। ১০·০০

বাদশাসিক্রিগড় ॥ শীতাংশুবিকাশ সেনগুপ্ত

প্রেম শুধু—মধুরে নয়, কঠিনে; সরলে নয় কুটিলে; ললিতে নয় ভীষণে; মোহনে নয় দহনে। প্রেমের জন্যে প্রতারণাও প্রেম। আর প্রতিহিংসা তো প্রেমেরই শেষ পাত্রের রক্তিম নৈবেদ্য। প্রেম উদয়ে রক্তিম, প্রয়াণে রক্তিম। সেই প্রেম, প্রতারণা ও প্রতিহিংসার অনন্য উপন্যাস—বাদশাসিক্রিগড় ॥ ১০·০০

মহাভারতের চরিতাবলী ॥ সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ

মহাভারতের অমৃত কাহিনী। পঞ্চাশটি চরিত্রের আলোচনার মাধ্যমে তৎকালীন রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, সামাজিক আচার-ব্যবহার এবং জানা-অজানা বহু প্রেমোপাখ্যান বিধৃত ॥ ১৪·০০

প্রাণকুমারের স্মৃতিচারণ ॥ প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

আশী বছর আগের কলকাতা! তার আচার ব্যবহার, সামাজিক ব্যবস্থা। আর্ট স্কুল, শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। বাল্যবিবাহ, শ্বশুর শাশুড়ী জামাই বেয়াই বেয়ান সম্পর্ক। কুম্ভমেলা, প্রবাসী বাঙালীদের বিশিষ্ট পদাধিকার। বিস্ময়ে মননে, দৃশ্যপটে বর্ণালো বিন্যাসে—বিচিত্র হতে বিচিত্রতর ॥ ১৪·০০

যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ ॥ দিলীপকুমার রায়

মুনি, জ্ঞানী, প্রেমী, যোগী, গুরু, ঋষি ও কবি — এই সাতটি অধ্যায়ের মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন ও কাব্য প্রতিভার প্রদীপ্ত আলোচনা। অরবিন্দ জিজ্ঞাসুদের পক্ষে অপরিহার্য গ্রন্থ এবং দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি ॥ ১০·০০

উদ্যত খড়্গ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

জ্বলন্ত যৌবনমূর্তি সুভাষচন্দ্রের প্রদীপ্ত জীবনকথা। পরাধীন দেশকে স্বাধীনতায় উত্তীর্ণ করার তপস্যায় যিনি যৌবনেই সর্বস্ব পণ করেছিলেন, বীরশ্রেষ্ঠ সেই সুভাষচন্দ্রের জীবনী প্রত্যেক বাঙালীর হৃদয়ে এক উদাত্ত জাগরণ ॥ ১ম খণ্ড : ৬·৫০ — ২য় খণ্ড : ৭·০০

আনন্দধারা প্রকাশন ॥ ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪০
শনিবার ১৯ শ্রাবণ ১৩৭৪

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা-১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫·০০
ষাণ্মাসিক	১২·৫০
ত্রৈমাসিক	৬·২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭·০০
ষাণ্মাসিক „	১৪·০০
ত্রৈমাসিক „	৭·০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭·০০
ষাণ্মাসিক „	১৪·০০
ত্রৈমাসিক „	৭·০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪৬·০০
ষাণ্মাসিক „	২৩·০০
ত্রৈমাসিক „	১১·৫০

আসাম-অঞ্চলে
(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১·০০
ষাণ্মাসিক	১৬·০০
ত্রৈমাসিক	৮·০০

*

দাম ৫০ পয়সা
আসামে বিমান মাসুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday, Aug. 5, 1967

ছাত্র ভর্তির সমস্যা

কলেজের নতুন মরসুম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ভর্তির সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যাটি নতুন কিছু নয়; কলকাতা এবং শহরতলিতে যাঁরা বসবাস করেন তাঁরা জানেন জানুআরির গোড়ায় স্কুলের এবং জুলাইয়ে কলেজের দোরে দোরে ছেলেমেয়ের হাত ধরে ঘুরে বেড়ানো তাঁদের ললাট-লিখন। এ দুর্ভোগ সহ্য করেন না এমন অভিভাবক যদি থাকেন তবে তাঁর অশেষ সৌভাগ্য বলতে হবে। একালের সরস্বতী ঠাকুরনের বাৎসরিক বাজেটে এতই ঘাটতি থাকে যে তাঁর ছিটে-ফোঁটা কৃপাও অধিকাংশের কপালে জোটে না। কলকাতা শহরেই শিক্ষা-যোগ্য ছেলেমেয়ের সংখ্যা যত-তার অনুপাতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ বোধ হয়। অনেকদিন আগে একটি বেসরকারী সার্ভে-রিপোর্টে এ ধরনের কোনো হিসেব আমরা লক্ষ করেছিলাম। সামান্য ভুলচুক হয়ত আমাদের হিসেবে হতে পারে, তবে অবস্থাটা মোটামুটি এই রকম। যে কোনো সভ্য দেশের পক্ষে সাধারণের শিক্ষার প্রতি এতটা অবহেলা অপরাধ বলে গণ্য হবে।

কলেজেরও সেই একই অবস্থা। স্কুলের গণ্ডি ডিঙিয়ে যারা চলে আসে তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ উচ্চশিক্ষার এলাকায় ঢুকতে পারে না; সে সুযোগ-সুবিধে, আর্থিক ক্ষমতা অনেকের থাকে না। বাকি ছেলেমেয়েরাও সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় এসে ধরনা দেয় না আজকাল, ছেলেদের অনেকেই টেকনিক্যাল স্কুলে চলে যায়, মেয়েদের সে সুযোগও নেই। বস্তুত বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ মাড়াতে আসে একটি অংশমাত্র। কিন্তু এই অংশও আনুপাতিক হারে ক্ষুদ্র হলেও, সংখ্যায় কম নয়; আমাদের কলেজের তুলনায় অত্যন্ত বেশি; ফলে কলেজের সীমিত সামর্থ্যে ছাত্রছাত্রীদের ঠাঁই দেওয়া সম্ভব হয় না।

মেধাবী ছাত্রের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা—এই নীতিটি আমাদের অবস্থায় নানা কারণে কার্যকর করা সম্ভব নয়। সাধারণ ছাত্রদের জীবিকা বা বৃত্তির বিকল্প সুযোগ যখন যথেষ্ট নেই তখন সাধারণ ছাত্রও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটুকু নিতে আসবে। অন্তত এই শিক্ষা তার পরবর্তী জীবনে জীবিকার অবলম্বন হবে। দুঃখের বিষয়, সমস্যাটি পুরোপুরি অনুভব করেও শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ বা সরকার কিছুই করতে পারছেন না, কোনো রকমে পুরোনো কাঠামোটি বজায় রেখে বসে আছেন।

পরীক্ষার ভাল ফল দেখালে কিছু সুযোগ-সুবিধা আছে, অন্তত কলকাতার সরকারী ও নামী কলেজে ছাত্রদের পক্ষে মাথা গলানো সম্ভব হয়। কিন্তু পরীক্ষায় ভাল ফল শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীর ব্যক্তিগত চেষ্টার ওপর নির্ভর করে না, স্কুলের শৃঙ্খলা এবং পড়াশোনার ওপরও নির্ভর করে। আজকাল ছেলেমেয়েরা কদাচিৎ সে সুযোগ পায়। স্কুলের নামে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যে বাড়ছে তাও একেবারে মিথ্যা নয়। আমাদের বিবেচনায়, সাধারণ ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কিছুটা সুযোগ থাকা দরকার। কেননা আমরা সাধারণদের জন্যে অন্য ব্যবস্থা করতে পারি নি।

কলকাতার কলেজগুলিতে আজ যে ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই রব—এর জন্যে আমরা কলেজকে দায়ি করতে পারি না। বিশ বছর আগে যে-কলেজে মাত্র দুপুরে পড়ানো হত এখন সেখানে সকাল দুপুর রাত তিন শিফটে পড়ানো হচ্ছে। ক্লাসে ছাত্র সংখ্যাও যথেষ্ট। নতুন কলেজও কয়েকটি হয়েছে। কাজেই পুরোনো কলেজগুলির ওপর ছাত্রসংখ্যার চাপ সৃষ্টি করেই এ-সমস্যার সমাধান হবে না। তাতে পরিণাম আরও ভয়াবহ হবে।

আপাতত দেখা যাচ্ছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য [illegible] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলিতে শতকরা পনেরোটি আসন বাড়াবার অনুমতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছ থেকে পেয়েছেন। রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীর কথাতে দেখা যায়, কলকাতা ও শহরতলির সাতটি স্পনসরড কলেজে বিজ্ঞান কলা ও বাণিজ্য বিভাগের জন্যে তেরোশো অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মফস্বল কলেজে বিজ্ঞানে অনার্স কোর্স খোলবারও চেষ্টা করা হচ্ছে। যাই হোক, এর ফলে ছাত্রসমাজের ঠিক কতটা উপকার হবে জানি না—তবে যতটুকু হয় ততটুকুই মঙ্গল।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার মফস্বলের কলেজগুলির ওপর যদি একটু বেশি নজর দেওয়া যায় এবং শহরতলি ও বাইরে নতুন কলেজ খোলার সুযোগ সুবিধে বিবেচনা করে দেখা হয় তবে কলকাতার কলেজগুলির ওপর এই যে প্রচণ্ড চাপ এর অনেকটা কমবে। অবশ্য ছাত্র ভর্তির চাপে শিক্ষার ন্যূনতম মানটি নষ্ট হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়।
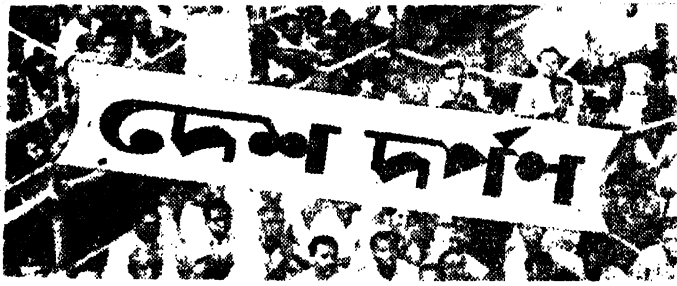
রাগ করলে চলবে কেন। কথাটা প্রায় আবদারের সুরেই যেন বলা। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কথাটা। খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ-এর পদত্যাগ-প্রসঙ্গে। বোধ হয় সবটা বলা হয়নি। পদত্যাগের কথাটা। হয়ত বলার ইচ্ছেও ছিল; কিন্তু বিশেষ কারণ নিশ্চয়ই ছিল, যেজন্য ইচ্ছে থাকলেও বলতে পারেনি 'আপনি সরে দাঁড়ান'। তাই যেদিন বিধানসভার সামনে মিছিল নিয়ে গেল মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি সেদিন সারা দিন ধরে একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল মার্ক্সিস্ট মহলে। বিধানসভার সামনে মিছিল আসার কথা বিকেলে। আর সকালেই বিধানসভার লবিতে রটে গেল কথাটা। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পদত্যাগ করছেন। যাঁরা ভিতরের খবর রাখেন তাঁরা জানেন, কথাটা নিছক গুজব নয়। কংগ্রেসী রটনাও নয়। ডঃ ঘোষ তাঁর স্থির সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েও দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জিকে। ওইদিন সকালে মন্ত্রিসভার মিটিং ছিল, ডঃ ঘোষ যাননি। এমনকি তিনি স্থিরও করে ফেলেছিলেন বিধানসভায় বিবৃতি দিয়ে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে সরে দাঁড়াবেন।

কথাটা জানা ছিল যুক্তফ্রন্টের সকল সদস্যের। জানা ছিল উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর, রাজস্বমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার-এর। কারণটাও যে না জানতেন, তা নয়। রাজনৈতিক কারণটা পুরোনো এবং এটা প্রায় সকলেরই জানা ছিল। কারণ, বেশ কিছুদিন ধরে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে নানা বিবৃতি প্রচার করা হয়েছে, কেবলমাত্র খাদ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও। এই সব বিবৃতি দিয়েছেন মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা, শ্রীসুন্দরাইয়া, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত। এঁদের বিবৃতির বা সমালোচনার মূল কথা ছিল, খাদ্যনীতিতে দারুণ দুর্বলতা প্রকাশ করা হয়েছে, বিশেষ করে চালের মুনাফাখোর এবং মজুতদারদের সম্বন্ধে। ডঃ ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে, তাঁর দুর্বল নীতির জন্যই মুনাফাখোর এবং মজুতদারদের জব্দ করা যাচ্ছে না, মজুত ধান-চাল উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না, জেলায় জেলায় যে সব খাদ্য ও ত্রাণ কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে যুক্তফ্রন্ট দলগুলোর সদস্যদের নিয়ে তারা ঠিকমত কাজ করতে পারছে না। এই দুর্বল নীতির ফলেই পশ্চিম বাংলায় আজ হাহাকার দেখা দিয়েছে, চাল অগ্নিমূল্য হয়ে উঠেছে, মানুষের জীবনধারণ দুষ্কর হয়েছে। কাজেই দাবি উঠল ঃ জবাব দিন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মজুতদার, মুনাফাখোরদের নিবারক নিরোধ আইনে ধরা হবে। সমাজের শত্রুদের শায়েস্তা করা হবে গ্রেফতার করে। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের অভিযোগ ঃ এ সব কিছুই করা হয়নি। এমনকি যাদের ধরা হয়েছে তাদেরও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কেন?—জবাব দিন।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নকশালবাড়ি নিয়ে। মার্ক্সিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বলা হল, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তগুলো উপেক্ষা করা হয়েছে। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত সাংবাদিকদের বুঝিয়ে বললেন ঃ মন্ত্রীমণ্ডলী থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ভূমিবণ্টন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে কৃষকদের প্রতি অবিচার রোধ করবে। কাকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে নকশালবাড়ির সমস্যা মেটাবার জন্য। এই সঙ্গে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশবাহিনী টহল দেওয়া জোরদার করবে এবং পুলিশ-ক্যাম্প বৃদ্ধি করা হবে। আন্দোলনের নেতাদের কৃষকসাধারণের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে হবে। কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলীর নির্দেশ ছিল, এই কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে পুলিশ কোনরূপ ব্যাপক তল্লাসী চালাবে না এবং কৃষকদের উপর অত্যাচার করবে না। শ্রীদাশগুপ্তের মতে, পুলিশ এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছে এবং লঙ্ঘন করেছে। তা ছাড়া, পুলিশ নকশালবাড়িতে কৃষকদের গ্রেপ্তার করতে গিয়ে তাদের উপর অত্যাচার করেছে; বেয়নেট দিয়ে বৃদ্ধ কৃষককে অকারণ হত্যা করেছে। কাজেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি ঃ জবাব দিন। কৃষকদের গ্রেফতার করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে না, অথচ মজুতদার ও মুনাফাখোরদের গ্রেফতারের পর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। কেন?—জবাব দিন।

মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, পুলিশ বহু প্ররোচনা সত্ত্বেও অত্যন্ত ধৈর্যের সংগে কাজ করেছে। তা ছাড়া, এ অভিযোগও সত্য নয় যে, পুলিশ নির্দেশ অমান্য করে কোন কাজ এ-পর্যন্ত করেছে। এও সত্য নয় যে, মুনাফাখোর এবং মজুতদারদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না। প্রতিদিন তিনি বহু গ্রেফতারি হুকুম সই করছেন। খাদ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ বিধান পরিষদকে জানিয়েছেন যে, এ পর্যন্ত ৪৮৬ জনকে নিবারক নিরোধ আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২২৯ জন উৎপাদক, ১১৪ জন ব্যবসায়ী, ১১৪ জন সমাজবিরোধী লোক, এবং ১১ জন চালকল মালিক। খাদ্য-আইন লঙ্ঘন করার জন্য ২,২০০ জনেরও বেশি ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।

তবু দাবি করা হয়েছে ঃ জবাব দিন। এই দাবিকে জোরদার করার জন্যই বিধানসভার সামনে মিছিল নিয়ে আসা হয়েছিল মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে। কিন্তু নিছক জবাব দিন দাবি করার জন্যই যে মিছিল আনা হয়েছিল এ সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ কোন কোন মহলে সেদিন দেখা দিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রীর যে সন্দেহ ছিল না, এ কথা মনে করার কোন হেতু নেই। এটাও তাই সেদিন বিধানসভায় জানা হয়ে গিয়েছিল যে, মিছিল থেকে যদি আওয়াজ ওঠে 'পদত্যাগ করুন' তাহলে যুক্তফ্রন্টের চার মাসের সরকার হয়ত নাও থাকতে পারে। তাই সেদিন দেখা দিয়েছিল চাঞ্চল্য ও ব্যস্ততা মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট সদস্যদের মহলে। বিধানসভা থেকে টেলিফোনে তাই নির্দেশ দিয়েছিল পার্টি-অফিসে ঃ পদত্যাগ দাবি করার কোন ধ্বনি যেন না শোনা যায় মিছিলের কোন অংশ থেকে। হয়ত এই কারণেই বিরাট মিছিল যখন বিধানসভার সামনে এল তখন "জবাব দিন" ছাড়া আর কোন ধ্বনি শোনা যায়নি। হয়ত এই কারণেই শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার নিজে এই মিছিলের দায়িত্ব নিয়ে ঝামেলাটা মিটিয়ে নিয়েছিলেন অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে। সন্ধ্যার আগেই দেখা গেল মিছিল ফিরে গিয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে।

অত্যন্ত পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায়, একটা উৎকণ্ঠা ছিল মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট মহলে। খাদ্যনীতির সমালোচনার মূলেও ছিল এই উৎকণ্ঠা। পার্টিকে সরকারী নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার ব্যস্ততা। যে খাদ্যনীতির ফলে ধান-চালের দর বৃদ্ধি পায়, গ্রামে-গঞ্জে সংকট দেখা দেয়, সে নীতির সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ঝুঁকি অনেক বেশি। হয়ত সে কারণেই আওয়াজ তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল: যুক্তফ্রন্ট সরকারকে "ঠিক পথে পরিচালনা" করতে, ভেঙে দিতে নয়। মার্ক্সিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেবার দায়িত্ব যে

নিতে চায় না, এ কথাটা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তও স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, সমালোচনা নিশ্চয়ই করব, কিন্তু ফ্রন্ট ছাড়ব না।

তবু ডঃ ঘোষের পদত্যাগের সিদ্ধান্তের পিছনে মার্কিস্ট কম্যুনিস্টদের দায়িত্ব জড়িয়ে পড়েছিল। খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে ডঃ ঘোষের নিশ্চয়ই অভিযোগ থাকতে পারে মার্কিস্ট কম্যুনিস্টদের সমালোচনা সম্বন্ধে। সে কারণেই হয়ত তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, কোন মিছিল করে বা আওয়াজ তুলে খাদ্যের সংকট সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, তিনি যথেষ্ট সচেতন খাদ্যসংকট সম্বন্ধে। তিনি সচেতন আছেন বলেই শ্রীসুন্দরাইয়ার সমালোচনার তীব্রতা অনেকটা "লোমহর্ষক" বলে মনে হয়েছে তাঁর কাছে।

অপর কারণ যেটা ঘটেছিল সেটাও একজন মার্কিস্ট কম্যুনিস্ট সদস্যকে উপলক্ষ করে। এটা পার্টির বিধানসভার লবিতে, যেদিন তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার আগের দিন সন্ধ্যায়। ডঃ ঘোষ বিধানসভার অধিবেশনের শেষে অন্য এক মন্ত্রী শ্রীচারুমিহির সরকারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিজের কক্ষে যান। সেই সময় একজন মার্কিস্ট কম্যুনিস্ট সদস্যও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। শোনা যায়, এর কিছু পরেই মার্কিস্ট কম্যুনিস্ট সদস্য উত্তেজিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। অনেকের ধারণা, এই সদস্যের সঙ্গে ডঃ ঘোষের যে কথা-কাটাকাটি হয়, তার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসাবেই তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ঠিক এমনি সময় যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্বন্ধে একটা উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। এই উদ্বেগ সম্বন্ধে কংগ্রেস মহলেও ঔৎসুক্য কম ছিল না। তবু এই অবস্থার জন্য কংগ্রেসের কোন দায়িত্বও হয়ত ছিল না। কারণ, দেখা গিয়েছিল গোপন ব্যালট-ভোটে ফলাফল যাই হোক না কেন প্রত্যক্ষ ভোটগ্রহণের সময় কংগ্রেসের মোট শক্তি ১০২-কে কোন সময় ছাড়িয়ে যায়নি।

সেটা উপলব্ধি করে বলেই মার্কিস্ট কমিউনিস্ট পার্টিকে একটা সমঝে চলতে হয়েছিল সেদিন। কারণ, মার্কিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেবার দায়িত্ব নিতে কোনক্রমেই রাজী নয়। কারণ, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মার্কিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান অভিযোগ, কংগ্রেস চক্রান্ত করছে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেবার জন্য। এই চক্রান্তকে সামনে রেখেই যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক এবং বিশেষ করে মার্কিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এই রাজনৈতিক চাপটা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হবার আশংকা থাকে, যদি যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেবার প্রত্যক্ষ দায়িত্বটা চেপে যায় মার্কিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির উপর।

অথচ একই সঙ্গে মার্কিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে একটা কথা চালু করা হচ্ছে পশ্চিমবাংলায় অন্তর্বর্তিকালীন নির্বাচন হোক। অন্তর্বর্তিকালীন নির্বাচনের জন্য সংবিধানে কতকগুলি স্পষ্ট নির্দেশ ও বিধান আছে। যে-কোনো সময় যে-কোনো কারণে অন্তর্বর্তিকালীন নির্বাচন দাবি করা যায় না। অন্তর্বর্তিকালীন নির্বাচনের প্রধান নির্দেশক হবে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে কিনা। অর্থাৎ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দিলে এবং সংবিধানসম্মত সরকারের পক্ষে কাজ চালানো অসম্ভব মনে হলেই অন্তর্বর্তিকালীন নির্বাচন করা সম্ভব। এটা মার্কিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির কাছেও অজানা নেই। পার্টির নেতারাও জানেন যে, অন্তর্বর্তিকালীন নির্বাচনের অর্থই হল রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা চালু করা। সেটা তখনই সম্ভব হয় যখন যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লোপ পায়। এ অবস্থা এখন পর্যন্ত হয়নি এবং অদূর ভবিষ্যতে হবে কিনা তা-ও জানা নেই বা হবে বলে মনে করার প্রত্যক্ষ কোন কারণও হয়ত নেই। সে অবস্থায় অন্তর্বর্তিকালীন নির্বাচন দাবি করলে রাজনৈতিক মহলে কিছুটা বিস্ময় দেখা দেবেই।

কিন্তু যুক্তফ্রন্টের অন্য কয়েক শরিকের রাজনৈতিক মনোভাব লক্ষ করলে হয়ত এই বিস্ময়টা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। বিশেষ করে নকশালবাড়ির ঘটনার পর থেকেই এই অবস্থাটার সৃষ্টি হয়েছে। নকশালবাড়ি এলাকায় মার্কিস্ট কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির সংঘর্ষটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে ঘটেছে। এই সংঘর্ষের জের ছড়িয়ে পড়েছে অন্যান্য এলাকায়, বিশেষ করে শ্রমিক-আন্দোলনের ক্ষেত্রে। বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় শ্রমিক-আন্দোলনের চেহারাটা দেখলে বোঝা যাবে, একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে কম্যুনিস্ট পরিচালিত শ্রমিক-সংস্থার সঙ্গে অ-কম্যুনিস্ট সমর্থিত সংগঠনের। প্রতিটি শ্রমিক-এলাকায় এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরোধিতার আকারেও দেখা দিয়েছে। আজ তাই প্রকাশ্যেই সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি এবং প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি কম্যুনিস্টদের এবং বিশেষ করে মার্কসবাদীদের বিরোধিতা করছে। এই বিরোধিতা যে বিধান পরিষদের দুটি আসনের নির্বাচনেও দেখা দেয়নি এটা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। বিরোধিতা হয়ত আরও তীব্র হবে অদূর ভবিষ্যতে, কারণ কার্যত দেখা যাচ্ছে, কম্যুনিস্ট-সমর্থিত শ্রমিক-সংগঠনের সঙ্গে অ-কম্যুনিস্ট সংস্থাগুলো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এঁটে উঠতে পারছে না। তাই রাজনৈতিক ব্যর্থতা দেখা দিচ্ছে যুক্তফ্রন্টের অ-কম্যুনিস্ট শরিকদের মধ্যে।

এই ব্যর্থতা যে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কখনও স্পর্শ করবে না, এটা জোর দিয়ে বলা যায় না। হয়ত সে কারণেই পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করছেন, যুক্তফ্রন্ট থেকে কম্যুনিস্টদের পৃথক করে দেবার কথা। কংগ্রেস নেতৃত্বের এই অংশ হয়ত মনে করেন যে, কম্যুনিস্ট প্রভাবমুক্ত যুক্তফ্রন্ট সরকার সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেও কংগ্রেস তাকে সমর্থন জানিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। কথাটা অযৌক্তিক মনে হবার কোন কারণ নেই, বিশেষ করে এই রকম সংখ্যালঘু সরকার গঠনের নজির যখন আছে। কিন্তু সে নজির বিচার করলেও দেখা যাবে, সংখ্যালঘু দল নিয়ে সরকার গঠনের পরীক্ষা সফল হয় না।

তা ছাড়া রাজনৈতিক চেহারা বিভিন্ন রাজ্যে দ্রুত বদলে যাচ্ছে। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ থেকে সংবাদ আসছে, কংগ্রেস-দলত্যাগীরা অ-কংগ্রেসী দলে যোগ দিচ্ছে। সংবিধানগত সংকট দেখা দিচ্ছে। এ সব ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মধ্যপ্রদেশে, কথা উঠেছে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসান ঘটাবার জন্য অন্তর্বর্তিকালীন নির্বাচন অনুষ্ঠান করা উচিত হবে কি না। কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা এখনও জানা যায়নি; কিন্তু অন্তর্বর্তিকালীন নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিলে তা নজির হয়ে থাকবে পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে। পশ্চিমবাংলায় অন্তর্বর্তিকালীন নির্বাচন হলে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, তার ফলাফল প্রচণ্ডভাবে আঘাত করবে কংগ্রেস সংগঠনকে এবং হয়ত আরও সম্ভব হবে যুক্তফ্রন্টের ছোটখাট দলগুলিকে বিধানসভা থেকে সরিয়ে দেওয়া।

অন্তর্বর্তিকালীন নির্বাচনের এই চেহারাটা সামনে রেখেই মার্কিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি আজ এই আওয়াজকে জোরদার করে তুলেছে। সাগ্রহে অপেক্ষা করছে মধ্যপ্রদেশ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কি সিদ্ধান্ত নেয়। এই চেহারাটা উপলব্ধি করেন বলেই কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ স্পষ্ট ভাষায় পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস কর্মীদের বলেছেন জনসাধারণের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। জনসাধারণের সুখদুঃখের খবর নেয়নি বলে কংগ্রেস আজ ব্যর্থতার মধ্যে ডুবে গিয়েছে। শ্রীঘোষ কংগ্রেসকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে বলেছেন, জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা লাঘব করার চেষ্টা করতে বলেছেন। কারণ, যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বিব্রত করার অর্থই হবে মার্কিস্ট কম্যুনিস্টদের অন্তর্বর্তিকালীন নির্বাচনের দাবিকে জোরদার করা।

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যুক্তফ্রন্ট সরকারের মধ্যে
সুখে নেই।
কিন্তু সরকার ছেড়ে আসতেও
সাহস পাচ্ছেন না।
ইউ এল এফ
'৬৬-'৬৭ সালের বার্ষিক পরিকল্পনা
প্রকাশ করা
হয়েছে।
বেলুন নিয়ে
খেলা।
পরিকল্পনা
আমেরিকার নিগ্রোরা বিদ্রোহ করেছে।
মার্কিন 'নকসাল বাড়ি'।
আমেরিকার নিগ্রো

মধ্য শ্রাবণ

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

বহু দূরে চলে গিয়ে উদাসীন পথিকের মতো
এই অবেলায়
আবার হঠাৎ ফিরে-আসা,
কেমন সহজে জুড়ে অভিমানী হৃদয়ের ক্ষত
ঝরে পড়ে সহস্র ধারায়
মধ্য শ্রাবণের নীল শুশ্রূষার ভাষা।

এমন সহজ, কথা ছিল না; তবে কি
পথ তার গভীর আড়াল
রেখেছে আড়াল করে, খোলে নি তোরণ,
সমস্ত সকাল তা হলে কি
একেলা কেটেছে দূর পথের বাহির পথে-পথে।
এখন সমস্ত মুছে, অভিমানী হৃদয়ের রং,
শুশ্রূষার মতো ঝরে সকরুণার ক্ষতে
মধ্য শ্রাবণের মায়াজাল।

জলের ওপারে আলো

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

জলের ওপারে আলো অতিদূর বাসনা কুহক।
পাছে ঠাণ্ডা লাগে, তাই মুছে ফেলে পায়ের শিশির
অচিহ্নিত ঘরে ফিরি। কতগুলো অভিশপ্ত নখ
আকাশটা আঁচড়ায়, যেন দুঃসহ প্রদর্শনীর

বিনিপয়সার আমি একাকী দর্শক। অকিঞ্চন;
সবার তফাতে থাকি; ভ্রষ্ট সব শৈশব কুসুম;
ছদ্মবেশে অপ্রস্তুত; বিকৃতার জীবনযাপন;
আমার ঘরের পাশে সারা রাত অরুন্তুদ ঘুম

আত্মদান করে কেন? নাকি শুধু দুঃস্বপ্ন জাগর?
নাকি সত্যি ঘরে ঘরে রাহাজানি চলেছে দারুণ?
প্রকৃতই লুপ্ত হবে বিভঙ্গ দর্পণে আত্মপর,
বরাদ্দ আমারও জন্যে লেলিহান নারকী আগুন?

নিজেই জানি না আমি কী করেছি ভয়ংকর পাপ।
যেহেতু বধির কাল, বৃথা শোক শোচনা সন্তাপ॥

ঘরে ফেরা

কবিরুল ইসলাম

কতো ভাগ্যে কবিতার মুখ দেখি। চোখে
মুখের আঁচল উড়ছে। এক যুগ পরে
আমি যেন ঘরে ফিরছি। ঘরে তোমরা কে কে আছো, কই
এবং কেমন আছো? তোমাদের মুখের আদল
কুয়াশায় মুছে গেছে। কণ্ঠের আলাপও।
কতোদিন তোমাদের দেখি না শুনি না।

এই অন্ধকারে তোমরা কই, কে কে আছো?
কে কে আসবে? ভালোবাসবে, আলো জ্বালবে কে কে?
আলো খুব ভালোবাসি। বস্তুত রক্তের
স্বধর্মই ভালোবাসা : স্বরাজ্যে সম্রাট।
অথচ আশ্চর্য আমি এই অন্ধকারে
যার সঙ্গে ঘর করি তার মুখ কখনও দেখিনি!

এক যুগ পরে আমি ঘরে ফিরছি যেন
ঘরে তোমরা কে কে আছো, কই
এবং কেমন আছো? কবিতার মুখে
তোমাদের মুখের আদল আমি দেখেছি এবং
শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ কুশল সংলাপে
করধৃত গোলাপ কোটায়।

সংসারে সৌষ্ঠব কই? এই অন্ধকারে কে কে আসবে?
ভালোবাসবে? আলো জ্বালবে কে কে
আলো খুব ভালোবাসি। বস্তুত রক্তের
স্বধর্মই ভালোবাসা। অতএব উভয়ত শ্রেয়
স্বধর্মে নিধনও। তোমরা কে কে আসবে, কই,

কবিতার মুখে আমি তোমাদের মুখের আদল
দেখেছি এবং দেখে মুখস্থ মুদ্রায়
এক যুগ পরে আমি ঘরে ফিরছি যেন।

সেই রাত

মনোরমা সিংহ রায়

ঘাগরা দুলিয়ে ফুলের মালায় সেজে
মেয়েটি কেমন নাচছিলো দেখেছো!
আলো, আলো, চারিদিকে আলো, বাজনা বাজছিলো
লোকেরা হাসছিলো, হাততালি দিচ্ছিলো,
নাচতেও চাইছিলো কেউ কেউ।
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম নূপুর বাজছিলো আর বাজছিলো॥

এখন অনেক রাত।
মেয়েটি তার শাদা চাদরখানি গায়ের উপর টেনে
কী সুন্দর ঘুমিয়ে পড়েছে দ্যাখো।

মাছের কাঁটা হয়তো গলায় ঝুলিয়ে নিলেন —তাই দেখে বিমুগ্ধ হলেন সুন্দরী 'লেক্ লেডী'রা, এবং তারপর থেকে সব তরুণেরা মাছের কাঁটায় বিভূষিত হতে থাকলেন। এই ভাবেই ফ্যাশানের জন্ম। ইনভেনশ্যান এবং অনুকরণ—নতুনতর ইনভেনশ্যান এবং নবতর অনুসরণ—চিরকালের ইতিহাস এই ভাবেই চলে আসছে। কালিদাসের কালেও বিশ্বসেন-বসুভূতি এবং মালবিকা-চিত্র লেখারা ফ্যাশানেবল ছিলেন—আজকের ছেলেমেয়েরাও ফ্যাশানের ডাইনামিজমে বিবর্তিত হচ্ছেন। আজ যে বাঁকা সিঁথিধারী এবং লম্বিত কোঁচা প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ঝাঁকড়া চুল আর কাউ-বয় পোশাক দেখে অন্তর্জ্বালা বোধ করছেন—তিনিই সোজা সিঁথি কাটেন নি এবং কোঁচা দুলিয়েছেন বলে একদা পণ্ডিত মশাইয়ের কর্ণমর্দন সহ্য করেছিলেন —এ কথা আর তাঁর মনেও পড়ে না।

নিজেকে সুন্দরতর করা যাক—কোনো কালে এইটেই হয়তো ফ্যাশানের ইনস্পিরেশান ছিল। তারপরে সুন্দর হওয়ার ধারণাই গেল বদলে। ওটাও তো আপেক্ষিক। ম্যানগ্রোভের বিষাক্ত কাঁটায় পিঠ ক্ষত-বিক্ষত করে সেখানে কতগুলো কদাকার মাংসপিণ্ড গজিয়ে তোলা কারো কারো পক্ষে সৌন্দর্যের চরম, লোহার জুতো পরিয়ে মেয়েদের পা দুটোকে কতটা বিকৃত করা যায়—কারো কারো পক্ষে সেইটেই ছিল সৌন্দর্যের মাপকাঠি। সুতরাং সৌন্দর্যের প্রশ্ন আর রইল না—মনে আকুলতা জাগল, কী করে অদ্বিতীয় হওয়া যায়।

কিন্তু ফ্যাশানের মুশকিল এই যে, কখনোই অদ্বিতীয় থাকা যায় না। অচিরাৎ দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং 'আরো অনেকে' এসে দাঁড়িয়ে যায়। ইনডিভিজুয়াল কলেক্টিভ্ হয়ে ওঠে। ফ্যাশানের সিংহাসনে কেউ অসপত্ন থাকতে পারে না।

লিখতে লিখতে মনে পড়ল, ফ্যাশানের মূলে শুধু ইনভেনশ্যান নেই—অ্যাক্সিডেণ্টও আছে। আর কে না জানে—অ্যাক্সিডেণ্ট থেকে কত মহৎ ব্যাপারের জন্ম চিরকাল ঘটে আসছে।

একবার কোনো মেডিক্যাল হস্টেলের একটি শৌখিন ছাত্র—খুব সম্ভব খুশকির জ্বালাতেই—মাথাটা সম্পূর্ণ নাড়া করে ফেলেছিল। অন্যান্য উদ্যোগী ছাত্ররা ভাবল নিশ্চয় এটা কোনো নিদারুণ ফ্যাশান—অতএব পাইকারী হারে হস্টেলসুদ্ধ ছেলে নাড়া হয়ে গেল। প্রোফেসারেরা প্রথমে সমবেদনায় বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন—এতগুলো ছেলের একসঙ্গে [illegible] ? ছাত্রেরা জবাব দিয়ে বলে, 'কষ্ট পাবেন না স্যর—ওসব কিছু নয়, এইটেই লেটেস্ট!'

লেটেস্ট সেই বাঙালী ঘরের জার্মান [illegible] খাওয়ার টেবিলে [illegible] পরম যত্নে বিছানো হয়েছে।

[illegible] বাড়ো [illegible] জানো [illegible] বেড়াতে এসেছিলেন। [illegible] এলেন। [illegible] চেনেন না —[illegible] টেবিল-[illegible] সেটিকে [illegible] টেবিলে বিছিয়ে ফেলেছেন। অতঃপর নীচে [illegible] এবং উপরে [illegible] [illegible] এবং [illegible]। [illegible] প্রথমে চমকে উঠেছিলেন, তারপরে ভাবলেন কী আর হবে—[illegible] জাত তো গেছেই।

এখন [illegible] সেই জার্মান-বধূর [illegible] এই লেটেস্ট ফ্যাশানের টেবিল-ক্লথটি প্রাণপণে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

'বন্দরের কাল হল শেষ'

আবু সয়ীদ আইয়ুব

কালের দিক থেকে বলাকা গীতাঞ্জলি পর্বের অব্যবহিত পরে, কতকটা সমসাময়িকও বটে। বলাকার কবিতা লেখা যখন আরম্ভ হয়ে গেছে, গীতালির গান লেখা তখনো শেষ হয়নি। অথচ ভাবের দিক থেকে ব্যবধান অনেকখানি। বলাকা ছন্দের নূতনত্ব শুধু ছন্দ নিয়ে পরীক্ষার ফল নয়, নতুন প্রাণের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল নতুন কলেবরের। কাব্যের আঙ্গিক-বদল সব সময়ে হার্দ্য পরিবর্তনের তাগিদেই যে ঘটে তা নয়—এমন কি রবীন্দ্রকাব্যেও না। উদাহরণত, পুনশ্চ-এর গদ্যকবিতা ভাবের দিক দিয়ে খুব অভিনব নয়। শেষ পর্ব নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র-কাব্যের এক নতুন পর্ব, কিন্তু সে নূতনত্বের স্বাক্ষর পত্রপুট-এর নিয়মানুগ ছন্দেই সুস্পষ্ট, গদ্যকবিতায় তা নূতনতর হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অবশ্য ছিল সুদূরপ্রসারী : 'অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস, এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।' শেষ দশকের কবিতায় কাব্যের অধিকারকে তিনি অনেক দূরে প্রসারিত করেছিলেন নিশ্চয়ই, তবে তা ছন্দ ভাঙার অপেক্ষা রাখে নি। বলাকা কাব্যে কিন্তু নতুন কালের করাঘাতে ছন্দের মুক্তি ও ভাবের উন্মোচন একই সঙ্গে ঘটে।

গীতাঞ্জলি-তে কাল তার গতিধর্ম হারিয়ে এক নিস্তরঙ্গ নিঃশব্দ অকাল সরোবরে পরিণত হয়েছিল। বলাকাতে পশ্চিমী গতিবেগের সোৎসাহিত চাঞ্চল্য দেখা যায়, এবং সাম্প্রতিক কালের বিক্ষোভ। আমরা অবিরাম শব্দ শুনি পাড়-ভেঙে-চলা স্রোতস্বিনীর। ৮ সংখ্যক কবিতায় কবি স্বয়ং এই উপমা ব্যবহার করেছেন; আর-কবিতাটিতে কালের উন্মাদনা আরো মনোগ্রাহী চিত্ররূপে অভিব্যক্ত।

প্রসঙ্গত, লক্ষ্য করবার বিষয় যে কাল-চেতনা কর্মচেতনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ভক্তি কালাতীত ব্যাপার, এমন কি তাতে ইহকাল-পরকালের ভেদ পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, কর্মব্রতী মানুষের একটি চোখ থাকে উপস্থিত কালের উপর নিবদ্ধ, আর একটি চোখ প্রসারিত হয় অনুপস্থিত কিন্তু ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে। সে চায় অবস্থার পরিবর্তন—কখনো সংস্কারের পথে, কখনো বা বিপ্লবের। কাজেই কালের গতিশীলতা সে ভুলতে পারে না।

গীতাঞ্জলির কবি ছিলেন সমাজ থেকে বেশ একটু দূরে, আপন পরাণ-সখার সঙ্গে একান্তে আসীন, বা এক তরীতে কূলহারা কিন্তু প্রশান্ত—কানে-কানে গান শোনানো যায় এতটা প্রশান্ত—সমুদ্রের মাঝখানে ভেসে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল। বলাকার কবি সারা পৃথিবীর দুঃখ ও পাপের ভারে নিপীড়িত। আমরা জানি প্রথম মহাযুদ্ধের প্রকাশ্য ধ্বংসলীলা আরম্ভ হবার কিছু আগেই মানবজাতির কোনো অজ্ঞাত মহাবিনাশ আসন্ন জেনে তাঁর মন কী রকম ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। যখন যুদ্ধ বাধল, মৃত্যুর গর্জন কবির কানে এসে পৌঁছল, তখন তা শুধু বেদনাবোধই জাগ্রত করল না তাঁর, কর্মেও উদ্বুদ্ধ করল। মানসী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল'; বলাকা সম্বন্ধে লিখতে পারতেন, 'কবির সঙ্গে যেন একজন কর্মী এসে যোগ দিল।' এই কর্মীপুরুষকে আমরা আগের কোনো কোনো কাব্যেও দেখেছি, বিশেষত নৈবেদ্য-এ। কিন্তু এখানে সমাজ-সচেতন, অন্যায়-পীড়িত, দেশ বিদেশের দুঃখ ও পাপ নিয়ে কর্তব্য-ভাবনায় কর্মীপুরুষের আবির্ভাব ইতিপূর্বে অনুদ্ঘাটিত ছিল। গীতাঞ্জলিতে তিনি সহজ মনে বলতে পেরেছিলেন—

> কথার পাকে কাজের ঘোরে
> ভুলিয়ে রাখে কে আর মোরে
> তোর স্মরণের বরমালা
> গাঁথি বসে গোপন কোণে—

বলাকায় এসে তাঁর মনে পড়ল বিধাতা তাঁর উপর কেবল বাঁশি বাজাবার দায়িত্ব অর্পণ করেন নি। অকস্মাৎ যেন ভাবের ঘোর কেটে গেল, মাটির দিকে চেয়ে দেখলেন—তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে আছে। পূর্ববর্তী ভক্তিপর্বের উপশান্ত আত্মনিমজ্জিত ভাবটাকে লক্ষ্য করেই বোধ হয় বললেন :

> চলেছিলেম পূজার ঘরে
> সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য
> খুঁজি সারাদিনের পরে
> কোথায় শান্তি-স্বর্গ।
> এবার আমার হৃদয়ক্ষত
> ভেবেছিলেম হবে গত
> ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
> হব নিষ্কলঙ্ক।
> পথে দেখি ধুলায় নত
> তোমার মহাশঙ্খ।

অতএব শান্তি-স্বর্গ খোঁজা আর হল না, পূজার ঘরে কুলুপ লাগিয়ে বেরিয়ে আসতে হল আঘাত-সংঘাত-মুখর জনসমাজে। এই কবিতার গদ্য-ব্যাখ্যায় কবি বলেছেন, 'সে সময় পূজোকেই একমাত্র কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু অন্তরে একটা দাবী এল, হঠাৎ মনে হল মানুষকে আহ্বান করবার শাঁখ যে বাজাতে হবে বিশ্ববিধাতার নামে মানুষকে ছোটো গণ্ডি থেকে বড়ো রাস্তায় বের করতে হবে।'

'ঐ এল সর্বনেশে গো/বেদনায় যে বাণ ডেকেছে' কিংবা 'এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে/পরাও রণসজ্জা' যখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন (৫ই ও ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১), তখন সর্বনাশা মহাযুদ্ধ এসে পৌঁছয় নি, তবে বিপুল সমারোহে ও বিকট দম্ভে আটঘাট বাঁধা হচ্ছিল ভিয়েনায়, বার্লিনে, প্যারিসে, লণ্ডনে; প্রস্তুতি পর্ব প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। যুদ্ধের খবর পেয়ে লিখলেন বলাকার ৫ সংখ্যক কবিতা। লক্ষণীয় যে এত

ঝড় সর্বনাশের খবর পেয়ে যে-কথাটা প্রথমে তাঁর মনে এল সেটা এই নয় যে সর্বশক্তিমান মঙ্গলময়ের বিধানে এমন দুঃসহ দুঃখ কোটি কোটি মানুষকে সইতে হবে কেন? মনে এল—

> মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে
> ঐ যে আমার নেয়ে।
> ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
> আসছে তরী বেয়ে।

ঝড় যত ভয়ানক হোক, যত কোটি মানুষই ডুবে মরুক, তবু কবির মনে সন্দেহ নেই যে তাঁর মেয়ে, মানবেতিহাসের নেয়ে, কাল-সাগর পাড়ি দিয়ে আসছেন; প্রশ্ন শুধু এই —কোন্ সম্পদ নিয়ে আসছেন তিনি এবং কোন ভাগ্যবান দেশের জন্য :

> নাহি জানি পূর্ণ ক'রে কোন রতনের বোঝা
> আসছে তরী বেয়ে।

....

> কার গলাতে নবীন প্রাতে পরিয়ে দেবে হার
> নবীন আমার নেয়ে?

—আশ্চর্য প্রশ্ন এবং আশ্চর্য তার মূলীভূত প্রত্যয় ('যুদ্ধের সমুদ্র পার হয়ে নাবিক আসছেন')। কিন্তু প্রত্যয়ান্তরের সূচনাও বলাকাতেই পরিলক্ষ্য।

মহাযুদ্ধের অভিঘাত অনেক বেশি স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে উঠেছে বছর খানেক পরে লেখা ৩৭ সংখ্যক কবিতায় :

> দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন
> ওরে উদাসীন—
> ওই ক্রন্দনের কলরোল,
> লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।
> বহ্নিবন্যাতরঙ্গের বেগ
> বিষশ্বাসঝটিকার মেঘ
> ভূতল-গগন-
> মূর্চ্ছিত-বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন।

মহাযুদ্ধের বীভৎসতা এই 'উদাসীন' কবির চিত্তে নতুন চেতনার উদ্রেক করল, বিশ্ববিধান ও বিধানকর্তা সম্বন্ধে তাঁর এত-দিনকার কুসুমাস্তীর্ণ বিশ্বাস-ভূমি ধীরে ধীরে প্রশ্ন-কণ্টকিত হয়ে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন পুরানো সত্যের পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে, গীতাঞ্জলির যে-বন্দরে এতকাল তাঁর ভাবের তরী অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল সেখান থেকে নোঙর তুলতে হবে, এই বিশ্বঝটিকার মাঝখানে তরী বেয়ে চলতে হবে তাঁকে।—

> বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,
> পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা-
> কেনা
> আর চলিবে না।
> বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,
> কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি—
> 'তুফানের মাঝখানে
> নূতন সমুদ্রতীর-পানে
> দিতে হবে পাড়ি'।

কিন্তু যে-নতুন মানসভূমির দিকে তরী চলেছে তার ভূ-প্রকৃতি, তার তটরেখা, এমন কি তার সঠিক অবস্থান সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের মনে কোনো ধারণা ছিল না তখন। শুধু জানতেন :

> অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ—
> সেথাকার লাগি
> উঠিয়াছে জাগি
> ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।

ক্রান্তিকালীন ভাববিপ্লবের এই প্রতিধ্বনিত স্তবকে স্মরণীয় একটি সঙ্কোচ এবং শাস্ত্রীয় আত্মপ্রত্যয়—'বন্দরের কাল হল শেষ'।

এই পর্যন্ত কবিতাটি সুন্দর; এর পর থেকে তার কাব্যপ্রাণ কতকটা চাপা পড়েছে তত্ত্বকথা আর উপদেশবাণীর ভারে। নৈবেদ্য-এ উল্লিখিত বোয়ার যুদ্ধের চেয়ে এই বিশ্বযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের মনের আরও অনেক গভীরে নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু এবারেও অন্তত প্রথম দফায় তিনি সমস্ত ব্যাপারটাকে পশ্চিমের কয়েকটি বলদৃপ্ত রাষ্ট্রের উৎকট স্বাজাত্যাভিমান ও হিংস্র সাম্রাজ্যলিপ্সা এবং সেই মহাপাপের প্রচণ্ড শাস্তি রূপেই দেখেছিলেন। কিন্তু এ দেখা একপেশে; সমাজ-সংস্কারকের পক্ষে হয়তো স্বাভাবিক, কিন্তু কবির পক্ষে ক্ষতিকর। আগেই বলেছি, গীতগুলিতে যিনি ছিলেন নিছক প্রেমভক্তিরসের কবি, বলাকায় তিনি মানুষকে কঠিন কর্তব্যের পথে আহ্বান করার শঙ্খ হাতে তুলে নিলেন। তবে এ কথা ভুললে চলবে না যে কর্মপ্রেরণা কোনো কবির বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের মতো কবির— যিনি আধুনিক ও বৈদিক উভয় অর্থে কবি—মূল প্রেরণা হতে পারে না। তাই মহাযুদ্ধের প্রতি তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া ধর্মনীতির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রইল না বেশিদিন, কবির সংবেদনী চিত্ত ধর্মোপদেষ্টার নীতিবাক্যকে ছাপিয়ে উঠল।

দুঃখকষ্টের দুই প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় প্রাচীন ধর্মমতে। এদেশীয় ব্যাখ্যা হল —মানুষের দুঃখ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ন্যায়-সংগত এবং জাগতিক নিয়মানুগ, ইহজন্মের বা পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল। কর্মভোগ সমাপ্ত হলে এবং এ-জন্মের পাপ-পুণ্যের খাতিয়ানে পুণ্যের পাল্লাটা ভারি থাকলে পরজন্মে উন্নতি এবং সুখলাভ অবধারিত। সেমিটিক ধর্মের শিক্ষা অন্যপ্রকার। মানুষের পার্থিব পরমায়ু তার অনন্ত জীবনের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র। ঐহিক দুঃখ-কষ্টের কষ্টিপাথরে যাচাই করা হয় ঈশ্বরে বিশ্বাস আর ধর্মে মতি তার খাঁটি এবং টেঁকসই কি না। যদি পরীক্ষায় সে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয় তবে ইহজীবনে না হোক পরকালে অক্ষয় আনন্দের দ্বারা তার স্বল্পকালীন ঐহিক যন্ত্রণার বহুগুণীকৃত ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। আর যদি পরীক্ষায় তার আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক অযোগ্যতা প্রতিপন্ন হয়, তবে ঐহিক এবং পারত্রিক সমূহ দুর্ভোগ আছে তার কপালে। অবশেষে যথাবিহিত নরক-যন্ত্রণার পর তার পাপক্ষালন হবে, সে গৃহীত হবে ঈশ্বরের অপার করুণায় ও প্রেমে।

মানুষের ঐহিক দুঃখভোগের এ সব প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও সাফাই রবীন্দ্রনাথের যুক্তিনির্ভর মন গ্রহণ করতে

পারে নি। পারে নি ব'লে তার এক অভিনব স্বকীয় ব্যাখ্যা তৈরি করলেন তিনি। 'ঐ সময়ে শান্তিনিকেতন মন্দিরে প্রদত্ত একটি অভিভাষণ 'পাপের মার্জনা'য় তার মূল কথাটা পাওয়া যাবে। এই যুদ্ধ যে-অসহ্য দুঃখ-কষ্ট বহন ক'রে নিয়ে আসছে 'তার সমস্ত বেদনা কোনখানে গিয়ে লাগছে? কত পিতামাতা তাদের একমাত্র ধনকে হারাচ্ছে, কত স্ত্রী স্বামীকে হারাচ্ছে।' অগণ্য নিরীহ মানুষের উপর এমন নিষ্ঠুর আঘাত কেন? —দুঃসাহসিক প্রশ্ন, কিন্তু সহজেই তার সমাধান খুঁজে পেলেন রবীন্দ্রনাথ। বললেন: 'যেখানে পাপ সেখানে কেন শাস্তি হয় না। সমস্ত বিশ্বে কেন পাপের বেদনা কম্পিত হয়ে ওঠে? কিন্তু এই কথা জেনো যে, মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ এক। সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়'।

তথ্যের দিক থেকে কথাগুলি নির্ভুল। পিতার ব্যভিচারের ফলে পুত্র সিফিলিস্ রোগে অন্ধ হয়, রাজা বা রাষ্ট্রপতি দুর্নীতিপরায়ণ হলে প্রজাবর্গের কপালে অশেষ যন্ত্রণা থাকে, নাৎসীদের জঘন্য জাতিবিদ্বেষের ফলে ষাট লক্ষ নিরপরাধ ইহুদি প্রাণ হারায়। এমনটা হয়ে থাকে কিন্তু এমনটাই কি হওয়া উচিত? এই সব নির্দোষ মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা দেখে কি আমাদের বিবেক পীড়িত হয় না, ন্যায়-নীতিবোধ বিদ্রোহ ক'রে ওঠে না? পাপ যে করবে তার গায়ে আঁচড়টি লাগবে না, আর যে নিষ্পাপ সেই পাপের মার খেয়ে মরবে—এ প্রকৃতির অন্ধ নিয়ম হতে পারে, বিধাতার মঙ্গলবিধান হতেই পারে না। কোনো পিতা যদি জ্যেষ্ঠ পুত্রের অপরাধের শাস্তি দেয় কনিষ্ঠ পুত্রকে প্রহার ক'রে যেহেতু তাকেই হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে আমরা বলবই—অত্যন্ত অন্যায়ভাবে এই শাস্তি দেওয়া হল। আমাদের পরম পিতা যদি প্রবলের পাপের শাস্তি দুর্বলকে দেন, তবে কি বলব না তিনি ততোধিক অন্যায় করেছেন? রবীন্দ্রনাথ এই ব'লে তার সমর্থন করতে পারেন না যে 'অতীতে ভবিষ্যতে, দূরে দূরান্তরে, হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ যে পরস্পর গাঁথা হয়ে আছে।'

একটি জীবদেহে যেমন বহুকোটি জীবকোষ তাদের স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে এক বৃহত্তর যৌগিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে যায়, কোনো মনুষ্য-সমাজের অন্তর্ভুক্ত বহু লক্ষ মানুষ তেমন ক'রে তাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে সমাজদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গমাত্র হয়ে যায় না। সমাজসেবার উদ্দেশ্যও ব্যক্তির আত্মস্ফুরণ, আত্মবিলোপ নয়; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব, মৌমাছিতন্ত্রে নয়। চরিত্রনীতির ক্ষেত্রে এই মানবিক বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব সর্বাধিক। পাপ-পুণ্য অপরাধ-শাস্তি একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। মনুষ্যসমাজ পাপচিন্তা ও পাপাচরণ করে না, এক বা একাধিক ব্যক্তিই করে। পাপ যারা করে আর শাস্তি যারা পায় তারা যদি ভিন্ন হয়, তবে তা বিশ্ববিধানের ত্রুটি। কার্যকারণ শৃঙ্খলা তাতে অটুট থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মনীতি থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ এসব কথা তখন ভাবেন নি, বরঞ্চ গদ্যের আবেগপূর্ণ ভাষায় ব্যক্তির পাপ ও শাস্তিকে সমাজের পাপ ও শাস্তির সঙ্গে

আরও ঘনিষ্ঠভাবে এক করে দেখিয়েছেন :

হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত
ওরে ভাই, কার নিন্দা করো তুমি? মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়।

পৃথিবীর এক স্থানে তাপবৃদ্ধির ফলে ঝড় ওঠার সঙ্গে সমাজের এক স্থানে পাপ জমে ওঠার ফলে সামাজিক ঝড়ের তুলনা বলাকার অন্য একটি কবিতার গদ্য ব্যাখ্যায় সবিস্তারে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বায়ুমণ্ডলের কোনো এক অংশ যদি উত্তপ্ত হয়ে তনুত্ব প্রাপ্ত হতে থাকে তা হলে অনেকক্ষণ তার কোনো ফল দেখা দেয় না। তার পরে হঠাৎ এক সময়ে ভীষণ ঝড় ওঠে, হাজার হাজার ক্রোশ জুড়ে বনপ্রান্তের লোকালয় সব ছারখার করে দেয়। তেমনি সমাজের কোনো এক অংশে পাপ জমতে জমতে যখন একটা মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন বিধাতার শাস্তি নেমে আসে ভয়ংকর রূপে, অনেক সময় মহাযুদ্ধ রূপেই। কিছুকাল পরে পাপক্ষালন হলে, সমাজ শুদ্ধ হলে, শান্তির দেবতা ফিরে আসে আবার আসে শান্তি, স্বস্তি আশীর্বাদ।

কবিজনোচিত সুন্দর উপমা, কিন্তু উপমামাত্র। পাপ ও তজ্জনিত দুঃখের এই ধরণের সরল কাব্যিক ব্যাখ্যার একটা চারিত্রনৈতিক ফাঁকি আছে সেটা রবীন্দ্রনাথের সুষ্ঠু সুসম বিচারশক্তির কাছে ধরা না পড়ে পারে না। বছর পনেরো পর যখন বিহারের নিদারুণ ভূমিকম্পকে গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা-পাপের ভগবৎকৃত শাস্তি বলে ঘোষণা করলেন তখন রবীন্দ্রনাথই প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁর একটা বড়ো যুক্তি ছিল যে—এ পাপের প্রধান পাপী তো সেই উচ্চবর্ণ হিন্দুরাই, অথচ তাদের মধ্যে অনেকেই পাকা দালান-কোঠায় বাস করত বলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। অপরপক্ষে অচ্ছুৎেরা বেশির ভাগই বাস করত মাটির ঘরে, তাদেরই সর্বনাশ হল। অর্থাৎ পাপের মার যারা খেয়েছিল, শাস্তির মারও পড়ল তাদের পিঠে। মহাযুদ্ধের বেলায়ও তাই ঘটেছিল। যে-অল্পসংখ্যক ক্ষমতামদমত্তদের সাম্রাজ্যলিপ্সা ও ধনলোলুপতা ঐ যুদ্ধ বাধিয়ে তুলল, তারা তো দিব্যি বহাল তবিয়তে রইল, উপরন্তু, দুই হাতে মুনাফা লুটল। আর তাদেরই দুষ্কৃতির ফলস্বরূপ লক্ষ লক্ষ নিরীহ সাধারণ মানুষ নিহত হল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারাল, সবদিক দিয়ে সর্বস্বান্ত হল।

প্রচলিত বা তাঁর স্বকীয় ধর্মতত্ত্ব যাই বলুক, কবির সংবেদনশীল ও ব্যথিত হৃদয় উপলব্ধি করল যে, কোনো ধর্মোপদেশ বা নীতিবাক্যের দ্বারা এতগুলো মানুষের এত বড়ো দুঃখ-দুর্দশাকে ঢাকা যায় না। 'য়ুরোপের দম্ভ ও লোভ সর্বজাতির কল্যাণযাত্রার পথ রুদ্ধ করে জগদ্দল পাথরের মতো সবার বুকের উপর চেপে থাকবে—এটা কখনো বিধাতার অভিপ্রায় হতে পারে না।'—এ কথা যেমন ভাবুক রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ঙ্গম করলেন, তেমনি কবির সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, 'উপরিতলের রাজনীতিওয়ালাদের ক্ষমতার কাড়াকাড়ি'র পরিণামে য়ুরোপের তথা সারা দুনিয়ার নিম্নতলের কোটি কোটি নিরীহ অসহায় মানুষের সর্বনাশ ঘটুক—এটাও বিধাতার অভিপ্রায় হতে পারে না।

অথচ সর্বনাশ তো ঘটলো। এ এক নতুন উপলব্ধি। বস্তুত এত বিরাট, এত ভয়াবহ, এত দুর্বিষহ ও দুর্বোধ্য আকারে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ ও পাপের চেহারা ইতিপূর্বে কখনো দেখেন নি, কল্পনার চক্ষেও না। এর ফলে তাঁর ধর্মচিন্তা, জীবনবোধ, অধ্যাত্মানুভূতির প্রণালি, কাব্যরচনার ধারা—সবই বদলে গেল। একটু তলিয়ে দেখলে এই নতুন কবির পরিচয় বলাকাতেও আমরা পেতে পারি; তবে তার অব্যর্থ স্বাক্ষর শেষ পর্বের (অর্থাৎ পরিশেষ ও তৎপরবর্তী) কাব্যেই পরিলক্ষ্য।

পূর্বে উদ্ধৃত ৩৭ সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যদিও 'নিখিলের হাহাকার' শুনেও তরী বেয়ে চলেছেন 'চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন', দুঃখ ও পাপের 'অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ'-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'তোরে নাহি করি ভয়', বলছেন, 'শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক', কিন্তু বিশ্বাসের ইমারত ঠিক আগের মত মজবুত নয় আর, সংশয়ের ফাটল এবং সে ফাটলকে পলেস্তারা দিয়ে ঢাকার চেষ্টা দেখা যায়। কবি যেন নিজের সঙ্গে তর্ক করছেন, নিজেকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন, 'দেবতার অমর মহিমা' সাময়িকভাবে ঝাপসা হয়েছে মাত্র, মহাযুদ্ধের ঘন কুজ্ঝটিকা কেটে গেলে আবার পূর্ণ জ্যোতিতে ভাস্বর হবে। কিন্তু আশ্বাসবাক্যে অন্য এক ইঙ্গিত ধরা পড়ে, ধরা পড়ে "মানুষের ধর্ম"-রচয়িতার পূর্বাভাস।

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

কবিতার উপান্ত প্রশ্নের প্রত্যাশিত উত্তর অবশ্যই 'হ্যাঁ', কিন্তু কাব্যটি প্রশ্নেই শেষ হয়। এবং উহ্য উত্তরের পিছনে আরো কিছু উহ্য থাকে। মানুষ অযুত নিযুত বৎসর

contradictory হয় তবে জগতে এই ভয়ানক অসামঞ্জস্যের ভার, এই প্রবঞ্চনা, থেকে যেত; তবে তার সৌন্দর্যের মধ্যে ক্রূরতার চিহ্ন দেখতাম। কিন্তু তা তো কোথাও দেখি না। তবে এ দুই সত্যের মিল কোথায়? এর উত্তর কবিতায় নেই।' দুটি অসমঞ্জস অথচ অনস্বীকার্য সত্য কোথায় কেমন করে কাটায় কাটায় মিলেছে তার বিবরণ কবিতায় থাকার কথা নয়। কিন্তু মিলেছে কি? যেখানেই হোক, যেমন ভাবেই হোক, সম্পূর্ণ মিলেছে—সে প্রত্যয়ও তো এই কবিতায় দানা বাঁধতে পারে নি। বরঞ্চ কবিতা শেষ হয় একটি দুর্বল অনুমানে, দর্শনের পরিভাষায় অর্থাপত্তিতেঃ

এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে
আছে কোনো মিল;
নহিলে নিখিল
এত বড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে সহিতে পারিত না—
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে
যেত কালো।

উহা প্রতিজ্ঞা—নিখিলের সব আলো কালো হয়ে যায় নি, অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতি সুন্দর; অতএব মিল আছে কোনোখানে। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য মানুষের সৌভাগ্যের যথোপযুক্ত প্রমাণ নয়। দুর্বল হোক, সবল হোক, কবিতা যখন যুক্তিতে এসে ঠেকে তখন বুঝতে হবে কবির উপলব্ধির কোনো পর্বে ভাঁটা পড়েছে।

তবু সমগ্র কবিতাটি দুর্বল নয়। তার কারণ কবিতার আপাত বক্তব্যের অন্তরালে রয়েছে তার গভীরতর ব্যঞ্জনা। আপাতত মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যেন পাটিগণিতের অংক মেলাবার মতো ক'রে দেখিয়ে দিতে চান জীবন ও মৃত্যু পরস্পর বিরোধী নয়, কোথাও নিশ্চয়ই মিলেছে তারা। কিন্তু কবিতার গূঢ় ব্যঞ্জনা তা নয়। ব্যঞ্জনা—ঐ বিরোধের ভয়াবহতা, এবং কোনো পূর্ণ সামঞ্জস্যের জন্য কবির আকুলতা ও উৎকণ্ঠা। এই ব্যঞ্জনাই কবিতাটিকে রসোত্তীর্ণ করেছে।

বলাকার আর একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়। 'এই সব দারুণ নীচতা ও ভণ্ডামির অন্তরালেও শিব সক্রিয় আছেন'—এ বিশ্বাস তাঁর অটুট রইল, কিন্তু এই লীলাময় দেবতার সঙ্গে নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলির প্রেম-করুণাময় ভগবানের তফাৎ অনেক। ১১ সংখ্যক কবিতায় এই দেবতাকে কখনো 'হে মোর সুন্দর' ব'লে সম্বোধন করা হচ্ছে কখনো 'হে রুদ্র আমার'; তাঁর স্বভাবে ভয়ংকর কঠোরতা ও জননীসুলভ কোমলতা সমমাত্রায় বিদ্যমান। উপরন্তু এই লীলাময়ের বিচারালয় থেকে মানুষের 'উগ্রতা 'পরে' কখন যে 'জননীর স্নেহ-অশ্রুর মতো তাঁর বিচার ঝরবে, কখন আবার 'গর্জমান-বজ্রাগ্নি-শিখার' মতো, তা ঠাহর করা আমাদের মানুষী বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়-বোধের সাধ্যাতীত। বরঞ্চ আমাদের অনুবুদ্ধিমত আমরা যখন জননীর স্নেহ প্রত্যাশা করি তাঁর কাছ থেকে, ঠিক তখনই বজ্রাগ্নি ঝরে; আর যেখানে মনে হয় দেবতার কঠোরতম শাস্তি অনুপযুক্ত, সেখানেই তাঁর করুণা নেমে আসে।

ক্রন্দন আঘাত যবে প্রেমের সর্বাঙ্গে বাজে,
সহিতে সে পারি না যে;
অশ্রু-আঁখি
তোমারে কাঁদিয়া ডাকি—
খড়্গ ধরো প্রেমিক আমার
করো গো বিচার।
তার পরে দেখি
এ কী,
কোথা তব বিচার-আগার।
জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে
তাদের উগ্রতা-'পরে।

পক্ষান্তরে যারা মূঢ়, যারা কোনো দুর্বল মুহূর্তে প্রলুব্ধ হয়ে 'সিঁধ কেটে করে চুরি তোমার ভাণ্ডার', তারা আপন পাপের ভারে আপনিই ভেঙে পড়ছে। তাদের হয়ে কবি কেঁদে বলেন, 'এদের মার্জনা করো, হে রুদ্র আমার'। কিন্তু রুদ্রের এ কী অদ্ভুত বিচার—

মার্জনা তোমার
গর্জমান-বজ্রাগ্নি-শিখায়,
সূর্যাস্তের প্রলয়-লিখায়
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।

দুঃখ ও দুঃখের দেবতা বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন উপলব্ধির ফলে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হল সেই ভক্তিরসধারা যা নৈবেদ্য থেকে গীতালি পর্যন্ত উচ্ছল ছিল। শুভ ও সুন্দরের দিকে পিঠ ফেরালেন না রবীন্দ্রনাথ; বরঞ্চ শুভ ও সুন্দরের চেতনা তাঁর মনে আরও গভীর ও সুপরিণত হল। তবে তাঁর চরম মূল্যবোধের স্থানাঙ্কগুলো (Co-ordinates) গেল পাল্টে। এই নতুন কো-অর্ডিনেট ফ্রেম সম্বন্ধে অবহিত না হলে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কাব্যের রসগ্রহণ ব্যাহত হবে। এই পর্বে বিবৃতির প্রাধান্য যতটুকু ঘটেছে তা এইজন্য যে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বুঝতে চাইছেন, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে নিতে চাইছেন; তাঁর বিশ্বনিরীক্ষার যে-একটা বিপ্লব ঘটে গেছে সেটা মানতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে, সেটাকে ক্রমবিবর্তন বলেই দেখতে এবং দেখাতে চেষ্টা করছেন। পুরোনো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নতুন রবীন্দ্রনাথের বোঝাপড়া কিন্তু শেষ অবধি খণ্ডিতই রয়ে গেল। সেই আংশিক ব্যর্থতা শেষ পর্বের কাব্যকে অভূতপূর্ব সার্থকতা দান করেছে। বোঝাপড়া সন্তোষজনক হ'লে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠতেন দার্শনিক, কবিকর্ম হত তাঁর পক্ষে গৌণকর্ম। রবীন্দ্রনাথের দর্শন শ্রদ্ধেয়, কিন্তু আরও অনেক ঊর্ধ্বে তাঁর দার্শনিক অপূর্ণতা-ও অতৃপ্তি- সম্ভূত গীতিকাব্যের স্থান।

যে তিনি সন্তুষ্ট হন নাই, এই কথা স্বীকার করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও দ্বিধা ছিল না। আমি তাঁহার দুই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিব। ১৮৯২ সনের জুন মাসে (৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯) লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলিতেছেন,—

"এমনি আমি স্বভাবত অসভ্য—মানুষের ঘনিষ্ঠতা আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ। অনেকখানি ফাঁকা চতুর্দিকে না পেলে আমি আমার মনটিকে সম্পূর্ণ unpack করে বেশ হাত পা ছড়িয়ে গুছিয়ে নিতে পারিনে। আশীর্বাদ করি মনুষ্যজাতির কল্যাণ হোক, কিন্তু আমাকে তারা ঠেসে না ধরেন।......বোধ হয় আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিলেও মনুষ্যসাধারণ ভালো ভালো সদালাপী খুঁজে পেতে পারবেন। তাঁদের সান্ত্বনার অভাব হবে না।"

একাকী থাকিয়া তিনি কি করিতে চান সে-বিষয়েও তাঁহার খুবই স্পষ্ট ধারণা ছিল। ১৮৯৩ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের একটি চিঠিতে তিনি বলিতেছেন,—

"আমার মনটা ভিতরে ভিতরে এমনই অশ্রান্তভাবে কাজ করতে চায়, লোকজনের ভিড়ের মধ্যে তার কর্মোদ্যম এমনই পদে পদে প্রতিহত হতে থাকে যে, সে অস্থির হয়ে ওঠে—খাঁচার ভিতর থেকে আমাকে কেবলই যেন আঘাত করতে থাকে। একটু নিরালা পেলে সে বেশ সাধ মিটিয়ে ভাবতে পারে, চারদিকে চেয়ে দেখতে পারে, ভাবগুলিকে খুব মনের মতো ইনিয়েবিনিয়ে প্রকাশ করতে পারে।"

নিজের লেখকবৃত্তি সম্বন্ধে তাই তিনি ঐ চিঠিটিতেই লিখিয়াছিলেন,

"সৃষ্টিকর্তা আপনার সৃষ্টির মধ্যে যেমন একাকী সে (তাঁহার মন) আপনার ভাব-রাজ্যের মধ্যখানে তেমনিই একলা বিরাজ করতে চায়। নইলে যেন তার সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত আনন্দ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।"

তিন

এইবার বিদেশ, বিদেশী, বিদেশী সমাজ ও বিদেশী জীবনযাত্রা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে কি মনে করিতেন, তাহার একটু পরিচয় লওয়া যাক। তিনি বিদেশ, বিশেষ করিয়া বিলাত সহ্য করিতে পারিতেন না বলিলেই চলে। পড়াশোনার জন্য বিলাত গিয়া সেই প্রবাস পীড়াদায়ক হওয়াতে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। দ্বিতীয়বার বিলাত গিয়াও তাঁহার ভাল লাগে নাই। তিনি একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন,—

"আমি এদেশে টিকতে পারব না...আর এক-দণ্ড এখানে টিকতে ইচ্ছে করছিল না.... কি সুখে লণ্ডনে আছি কে জানে......কিছু ভাল লাগছে না......মেজদাদা (সত্যেন্দ্র-নাথের) কেন এদেশ ভাল লাগে আমি ত কিছুই বুঝতে পারিনে......আদবে ভাল লাগচে না।"......ইত্যাদি

যে-লেখক বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন, তাঁহার রচনায় ইংলণ্ডের অসাধারণ নৈসর্গিক ঐশ্বর্যের কোনও বর্ণনাই নাই, এমন কি উল্লেখ পর্যন্ত নাই বলিলেই চলে। আমি সেদিনও বিলাতে নির্জন পাহাড়, বন, নদীর ধার, মাঠ ও গ্রামের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে ভাবিয়াছি,—এই যে দেশ, যাহা ঘুমন্ত রাজ-কন্যার পুরীর মত মায়াময়, তাহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এত উদাসীন কি করিয়া হইলেন? বাংলাদেশ সম্বন্ধে অনুভূতির এই তীব্রতা ও ইংলণ্ড সম্বন্ধে সেই অনুভূতিরই এত অসাড়তা কি করিয়া আসিল?

তেমনই ইংরেজী জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও তাঁহার কোনও আগ্রহ ছিল না, এমন কি আসলে বিরাগই ছিল। তাঁহার বিলাত-প্রবাসের কাহিনীতে উহার আভাস আছে। অন্যত্র তিনি এ-বিষয়ে স্পষ্ট উক্তি করিয়াছেন। একদিন এদেশেই তিনি এক উচ্চ-পদস্থ ইংরেজের বাড়িতে ডিনারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, উহার বিবরণ পরদিন একটা চিঠিতে দিয়াছিলেন। তাহা হইতে দুই-একটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি।—

"চোখের সামনে ইভনিং-ড্রেস-পরা মেম সাহেব এবং কানের কাছে ইংলিশ হাস্য-লাপের ... এমনই অসঙ্গত। আমাদের চিরকালের ভারতবর্ষ আমার কাছে কতখানি সত্য আর এই ডিনার-টেবিলের বিলিতি সিভিলিটি—ইংরেজী শিষ্টাচার আমাদের পক্ষে কত ফাঁকা, কত ফাঁকি, কি সুগভীর মিথ্যে।"

কথাটা সত্য নয়। ইংরেজী সামাজিক জীবনের এতটুকু অন্তত অভিজ্ঞতা আমার আছে, যাহার জোরে আমি বলিতে পারি—সে-সমাজে স্ত্রী-পুরুষের আচারব্যবহারে যে ভদ্রতা, বৈদগ্ধ্য, আন্তরিকতা ও মাধুর্য দেখিয়াছি, যে উদারতা ও যে প্রীতি, যে সারল্য ও যে সত্যপরায়ণতা দেখিয়াছি, তাহা আমি আমার দেশবাসীর ইদানীন্তন ব্যবহারে দেখি নাই। কিন্তু আমি ইহাও বলিব রবীন্দ্রনাথের পক্ষে আর কিছু মনে করা সম্ভব ছিল না। সব সুর সকলের কানে সমান মিষ্ট লাগে না, তিনি দেশী সুরের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাই এই চিঠিতেই ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লিখিয়াছিলেন—

"মেয়েরা যখন মৃদুমিষ্টি সাধা গলায় কথা কচ্ছিল, তখন আমার ভারতবর্ষের ধন তোদের আমি মনে করছিলুম। তোরা ত এই ভারতবর্ষের।"

মনের ভাবটা আরও পরিষ্কার করিয়া একটু আগেও লিখিয়াছিলেন,

"যখন ড্রয়িংরুমের এক কোণে এসে বসলুম আমার চোখে সমস্ত ছায়ার মত ঠেকছিল—আমি যেন আমার চোখের সামনে সমস্ত বৃহৎ ভারতবর্ষ বিস্তৃত দেখতে পাচ্ছিলুম, আমাদের এই গৌরবহীন বিষণ্ণ হতভাগ্য জন্মভূমির ঠিক শিয়রের কাছে আমি যেন বসেছিলুম—এমন একটা বিপুল বিষাদ আমার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল সে আর কি বলব।"

এই ধরনের কথা তিনি একটি মাত্র সন্ধ্যার সাময়িক ঝোঁকের বশে লেখেন নাই। দেশেই তাঁহার স্থান, বিদেশে তাঁহার কিছুই নাই এই বিশ্বাস তাঁহার বদ্ধমূল ছিল। ১৮৯০ সনের ৩রা অক্টোবর তারিখে তাই তিনি লণ্ডন হইতে লিখিয়াছিলেন,—

"এ দেশে এসে আমাদের সেই হতভাগ্য বেচারা ভারতভূমিকে সত্যি সত্যি আমার মা বলে মনে হয়। এ দেশের মতো তার এত ক্ষমতা নেই, এত ঐশ্বর্য নেই, কিন্তু আমা-দের ভালোবাসে। আমার আজন্মকালের যা কিছু ভালোবাসা, যা কিছু সুখ, সমস্তই তার কোলের উপর আছে। এখানকার আকর্ষণ চাকচিক্য আমাকে কখনোই ভোলাতে পারবে না—আমি তার কাছে যেতে পারলে বাঁচি।"

ইহার পর তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, উহাকে রবীন্দ্রনাথের নিভৃত, একান্ত ও সত্যকার জীবনের মূলমন্ত্র বলা যাইতে পারে।—

"সমস্ত সভ্যসমাজের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে আমি যদি তারই এক কোণে বসে মৌমাছির মতো আপনার মৌচাকটি ভরে ভালোবাসা সঞ্চয় করতে পারি তা হলেই আর কিছু চাইনে।"

চার

এই রবীন্দ্রনাথ, দেশী ও বাঙালী রবীন্দ্র-নাথ যখন নোবেল-প্রাইজ পাইলেন, তখন তিনি এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত সম্মানের মোহে একটা বড় রকমের ভুল করিয়া বসিলেন। এই বিদেশী পুরস্কার রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সাধনার পক্ষে যে কল্যাণকর না হইতে পারে, তাহা বিদেশী সুপারিশের মোহে অভিভূত বাঙালী শিক্ষিতসাধারণ বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি দিবার সময়ে ইংরেজ বড়লাট লর্ড হার্ডিং এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত ভদ্রভাবে কথাটা ঘুরাইয়া বলিয়া-ছিলেন—

"Upon the modest brow of the last of these, the Nobel Prize has but lately set the Laurels of a world-wide recognition, and I can only hope that the retiring disposition of our Bengali poet will forgive us for thus dragging him
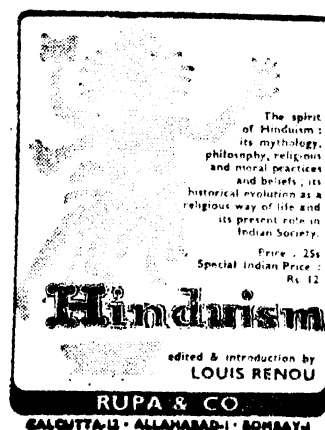
into publicity once more and recognise with due recognition that he must endure the penalties of greatness."

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই এই penaltyকে পুরস্কার বলিয়া মনে করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই ভুল হইতেই, যাঁহাকে আমি দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ বলিতেছি, তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। এই রবীন্দ্রনাথ প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ১৯১৩ সনের ২৩শে নভেম্বর শান্তিনিকেতনে। সেদিন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য অভিনন্দন জানাইবার উদ্দেশ্যে প্রায় পাঁচশত বাঙালী (নরনারী) স্পেশ্যাল ট্রেনে করিয়া বোলপুরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই অভিনন্দন প্রত্যাখ্যান করেন এবং স্পষ্ট ভাষায় জানান যে, তিনি দেশবাসীর সমাদর গ্রহণ করিতে অক্ষম।

তাঁহার বক্তৃতাটি পুরোপুরি কখনই প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু কয়েকটা অংশ সঞ্জীবনীতে ছাপা হইয়াছিল। তাহা হইতে আমার বক্তব্যের পক্ষে যেটুকু প্রাসঙ্গিক তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।—

> "দেশের লোকের হাত থেকে যে অপযশ ও অপমান আমার ভাগ্যে পৌঁচেছে, তার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয়নি এবং এতকাল আমি তা নিঃশব্দে বহন করে এসেছি। এমন সময় কি জন্য যে বিদেশ হতে আমি সম্মান লাভ করলুম তা এখন পর্যন্ত আমি নিজেই ভালো করে উপলব্ধি করতে পারিনি। আমি সমুদ্রের পূর্বতীরে বসে যাঁকে পূজার অঞ্জলি দিয়েছিলেম, তিনিই সমুদ্রের পশ্চিম তীরে সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করবার জন্য যে তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করেছিলেন, সে কথা আমি জানতেম না। তাঁর সেই প্রসাদ আমি লাভ করেছি—এই আমার সত্য লাভ।"

যে-রবীন্দ্রনাথ, যে বাঙালী রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী শিষ্টালাপ, মিষ্ট হাসি ও সাধুবাদকে ফাঁকা, ফাঁকি ও মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এই বক্তৃতার রবীন্দ্রনাথ কি সেই রবীন্দ্রনাথ? নিশ্চয়ই নন। সুতরাং এই বক্তৃতার পর হইতে দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ দেখা দিল।

কিন্তু এতদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য শিষ্টাচারের মোহ হইতে মুক্ত থাকিবার পর হঠাৎ সেই শিষ্টাচারের মোহেই অভিভূত হইয়া রবীন্দ্রনাথ যে ভুল করিয়া বসিলেন, তাহার চেয়েও বড় ভুল করিলেন নোবেল পুরস্কারের মূল্য ও অর্থবিচারের বেলাতে। বাঙালী অভিনন্দনকারীদের তিনি বলিলেন বটে যে, নোবেল পুরস্কারের যদি কোনও মূল্য থাকে, 'আমাদের দেশের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই; নোবেল প্রাইজের দ্বারা কোনো রচনার গুণ বা রস বৃদ্ধি হতে পারে না।' কিন্তু নিজের মনে তিনি অন্যরকম ধারণা করিলেন। উহার প্রমাণ তাঁহার সেই বক্তৃতাতেই এই কয়টি কথায়

পাওয়া গিয়াছিল—"আমি সমুদ্রের পূর্ব-তীরে বসে যাঁকে পূজার অঞ্জলি দিয়েছিলেম, তিনিই সমুদ্রের পশ্চিম তীরে সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করবার জন্য যে তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করেছিলেন, সে কথা আমি জানতুম না। তাঁর সেই প্রসাদ আমি লাভ করেছি—এই আমার সত্য লাভ।"

'সত্য লাভ' মোটেই নয়, উহা সম্পূর্ণ অলীক, কল্পিত লাভ। তাঁহার ধারণা যে একান্তভাবে ভ্রান্ত, রবীন্দ্রনাথ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। পশ্চিমের যে-দেবতা তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সাহিত্যের দেবতা ন'ন, আসলে তিনি ফ্যাশনের দেবতা। নোবেল প্রাইজ তাঁহাকে যে কারণেই দেওয়া হইয়া থাকুক, সাহিত্যিক কীর্তির জন্য দেওয়া হয় নাই, এই সোজা কথাটা রবীন্দ্রনাথ কেন উপলব্ধি করেন নাই, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি না।

আমার বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কীর্তি কম। বরঞ্চ আমি জোর গলায় এই কথাই বলিব যে, ১৯০১ সন হইতে ১৯১২ সন পর্যন্ত যে তেরো-জন পাশ্চাত্ত্য লেখক নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন, সাহিত্যিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের স্থান তাঁহাদের সকলেরই উপরে। কিন্তু তাঁহার রচনার মূল্য নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা না ছিল সুয়েডিশ অ্যাকাডেমির, না ছিল ইয়েটসের, কারণ, উহার জন্য বাংলা ভাষা জানার প্রয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে ইংরেজী বই-এর জোরে পুরস্কারটা পাইয়াছিলেন, সেটিকে বই না বলিয়া পুস্তিকা বলা উচিত; আর যে ইংরেজীতে বইখানা লিখিয়াছিলেন উহা স্বাভাবিক ইংরেজী নয়, খেয়াল, শখ বা খেলার ইংরেজী মাত্র। এতটুকু একখানা বই বা এই ধরনের ভাষার জোরে যে কাহারও স্থায়ী সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না, উহা রবীন্দ্রনাথ হিসাব করিয়া দেখেন নাই। তিনি ধারণা করিয়া বসিলেন যে, তাঁহার সাহিত্য-সাধনার সার্থকতা পাশ্চাত্ত্যে হইয়াছে।

এই গুরুতর ভ্রমের জন্য নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর হইতে তাঁহার জীবন দ্বিতীয় একটা খাতে বহিতে আরম্ভ করিল—বলা যাইতে পারে, পুরাতন ভাগীরথীর খাত এক দিকে রাখিয়া কীর্তিনাশা পদ্মার খাতে সমুদ্রের দিকে ছুটিল। মধুসূদন পাশ্চাত্ত্যের মোহাবিষ্ট হইলেও এই আক্ষেপ অনুভব করিয়াছিলেন—

"আশার ছলনে ভুলি, কি ফল লভিনু, হায়।
জীবন প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে!
রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে......"

রবীন্দ্রনাথের মনে এই সন্দেহও স্পষ্ট হয় নাই।

পাঁচ

অন্য কেহও তাঁহাকে ভগীরথের মত শঙ্খ বাজাইয়া ভুল পথ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে ডাকে নাই। বরঞ্চ বাহবা বা আরও গালি দিয়া সেই স্রোতেই বহিতে আরও [illegible] করিয়াছিল। ইহার ফল কি দাঁড়াইল, উহা আলোচনা করিবার আগে রবীন্দ্রনাথ কেন ভুলটা প্রথমত করিলেন ও কেন পরেও উহা সংশোধন করিতে পারিলেন না, তাহার আলোচনা করা দরকার।

তাঁহার ভুলের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তাঁহার দেশবাসী, অর্থাৎ বাঙালী ভদ্র-সমাজ। উহাদের একদল তাঁহাকে গালি দিয়া অপমান করিয়া তিক্তবিরক্ত করিয়াছিল, অন্যেরা তাঁহাকে রক্ষা করিবার কোনও চেষ্টাই করে নাই। বাঙালী সমাজে আত্মীয় বন্ধুদের যে একটা বিশেষ আচরণ আছে, তাহা যে-বাঙালীরই গালি খাইবার দুর্ভাগ্য হইয়াছে, সে-ই জানে। ইহারা যেখানে যা কিছু নিন্দা ও কটূক্তি শোনে বা পড়ে, তাহা তৎক্ষণাৎ আসিয়া মহোৎসাহে হতভাগার কানে তুলিয়া দেয়, তাহার কতটুকু মানসিক যন্ত্রণা হইতে পারে, সে কথা ভাবেও না। এইরূপ অভিজ্ঞতার কথা রবীন্দ্রনাথ গল্পচ্ছলে বলিয়াছেন।

"একদিন দেখা গেল আমাদের আহিরগ্রাম-প্রকাশ জমিদারকে ছাড়িয়া আমাকে লইয়া পড়িয়াছে। গোটাকতক অত্যন্ত কুৎসিত কথা লিখিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা একে একে সকলেই কাগজখানা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে শুনাইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, ইহার বিষয়টা যেমনই হউক, ভাষার বাহাদুরী আছে।"

ইহা ১৮৯৩ সনে রবীন্দ্রনাথের বত্রিশ বৎসর বয়সে লেখা। সুতরাং জ্বালা জীবন-প্রভাতেই ধরিয়াছিল।

গালি অবশ্য পরিমাণ বা তীব্রতা, কোনটাতেই কম হয় নাই। আর যাঁহারা গালি দিতেন, তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগরের মত চুনোপুঁটি হইতে আরম্ভ করিয়া কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সুরেশ সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি সাহিত্যিক মহারথীরাও ছিলেন। এই অবিরত নিন্দার ফলে রবীন্দ্রনাথের মন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিব।

১৯১২-১৩ সনে বিলাত প্রবাসকালে তাঁহার প্রাণ দেশে ফিরিবার জন্য উতলা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি নিন্দার কথা স্মরণ করিয়া ভয় পাইতেছিলেন। তাই ১৯১৩ সনের ৬ মে তারিখে তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখিয়াছিলেন—

"এখন ভেবে দেখি দেশে ফিরে গিয়ে চারিদিক থেকে কত ছোট কথাই শুনতে হবে, কত বিরোধ বিদ্বেষ, কত নিন্দা-গ্লানি,—তখন মনে মনে ভাবি আরও কিছুদিন থাক, যতদিন পারি এই সমস্ত [illegible] থেকে দূরে থাকি।"

নিন্দার বেদনা পরেও তিনি গল্পচ্ছলে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯১৪ সনে লিখিত 'বোষ্টমী' গল্পে পাই—

"আমার [illegible] দেখিয়া বেনী চক্রবর্তী হাসিয়া বলিল, 'পাগলি, কাকে ভক্তি করিস তুই! [illegible] দেয়।'"

লেখকের উক্তি—

"কেবল এক মুহূর্তের [illegible] হইয়া গেল। [illegible]"

বাঙালীরা এত নিন্দাপরায়ণ যে নিন্দা সম্বন্ধে তাহাদের নিজেদেরও একটা সহিষ্ণুতাও গড়িয়া উঠিয়াছে। মিথ্যা নিন্দা শুনিলে যে কাহারও মনে তপ্ত লোহার শলাকার দাগার মত দাগ লাগিতে পারে উহা কাহারও মনে জাগে না। এই নিষ্ঠুর নিন্দা রবীন্দ্রনাথকে কি পরিমাণ জর্জরিত করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ হিসাবে শুধু আর চারিটি উক্তি তাঁহার চিঠিপত্র হইতে উদ্ধৃত করিব।

(ক) ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০ সন। "একেবারে নাড়ী না ছাড়লে দেশের লোক ক্ষমা করেন না, কিন্তু এমনই ভাগ্য, যমের দূত আসে হুবহু, রথ আসে না—তাই স্মরণ সভায় যাঁরা বিলাপ করতেন, সাহিত্য-সভায় তাঁরা কটূক্তি করবেন।"

(খ) ২১শে অক্টোবর, ১৯৩১ সন। "তোমার পূর্বপত্রে একটা প্রশ্ন ছিল নিজের খ্যাতি বিস্তার করবার জন্যে আমি মাইনে দিয়ে লোক রেখেছি কিনা। এ রকম সন্দেহ কেবল বাংলা দেশেই সম্ভব। এই দেশেই লোকে কানাকানি করে যে কোনো বিশেষ কৌশলে আমি নোবেল প্রাইজ পেয়েছি এবং আমার যে ইংরেজী রচনা খ্যাতি পেয়েছে,

সেগুলো কোনো ইংরেজকে দিয়ে লেখা।"
(গ) ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সন। "যেটা যথার্থ ক্ষোভের বিষয় সেটা এই যে, আমার দেশে আমার নিন্দার ব্যবসায়ে জীবিকা ভালো চলে, বুঝতে পারি আমার সম্বন্ধে তীব্র বিদ্বেষ কতদূর পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আমার দেশে। আমার প্রতি আঘাতে আমাকে অবমাননা দেশের লোককে কতই কম বেদনা দেয়। তা যদি না হোত তাহলে আমার বিরুদ্ধে নিন্দার পণ্য এত লাভজনক হোত না।"

(ঘ) ৫ই জুলাই, ১৯৩৯ সন। "আমার বাঙালী জন্ম প্রায় শেষ করে এনেছি, আজ আমার ক্লান্ত আয়ুর অন্তিম নিবেদন এই যে, যদি জন্মান্তর থাকে, তবে যেন বাংলা দেশে আমার জন্ম না হয়—এই পুণ্যভূমিতে পুণ্যবানেরাই জন্মে জন্মে লীলা করতে থাকুন—আমি ব্রাত্য, আমার গতি হোক সেই দেশে যেখানে আচার শাস্ত্রসম্মত নয়, কিন্তু বিচার ধর্মসঙ্গত।"

এই সব উক্তি পড়িলে সহজেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ কেন দেশবাসীর প্রতি বিমুখ হইয়া বিদেশের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে গালি পাড়িয়া ঘরের বাহির করা হইয়াছিল।

ছয়

বহু বৎসর রবীন্দ্রনাথ ভুল করিয়াছিলেন। নিন্দা ও অকারণ অপবাদ হইতে নিজের স্বভাবের পথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া ও দেশের প্রতি বিমুখ এবং বিদেশমুখিন হওয়া তাঁহার পক্ষে সমীচীন হয় নাই। ইহাতে তাঁহার নিজের এবং বাংলা দেশের—উভয়েরই ক্ষতি হইয়াছে।

কিন্তু তাঁহার দিক হইতে একটা কৈফিয়ত দেওয়া যাইতে পারে। তিনি এই নিন্দার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের হিন্দুদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, অজ্ঞানে মুক্তি নাই, জ্ঞানেই মুক্তি। এই সূত্র ধরিয়া বলিব, গালি অগ্রাহ্য করিবার জন্যও জ্ঞানের আবশ্যক। আমি এই জ্ঞান দায়ে পড়িয়া অর্জন করিয়াছি। আমার ভাগ্যেও লেখক ও ব্যক্তি-হিসাবে বহু গালি জুটিয়াছে, জুটিতেছে ও জুটিবে। প্রথমে এই নিন্দায় ক্ষোভ অনুভব করিতাম। পরে বুঝিলাম যদি তাহা করি, তাহা হইলে তামসিক গ্লানির মহাপঙ্কে ডুবিয়া মরিব। তাই গালি সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিলাম। উহার ফলে বর্তমানে গালি ঝাড়িয়া ফেলিবার শক্তি জন্মিয়াছে। হয়ত অন্যের উপকার হইতে পারে, তাই আমার এই সম্বোধির একটু আভাস দিব। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে উহা বলাও আবশ্যকই।

প্রথম কথা এই যে বাঙালী সমাজে অকারণ নিন্দা ও গালি বরাবরই ছিল। উহা বাঙালী জীবনের একটি ধারা। উহা কলিকাতায় আবার আরও প্রবল। এই সম্বন্ধে ১৮২৩ সনে প্রকাশিত একটি বাংলা বই হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিব।

"ওহে ভাই, শুন। এ বাংলা দেশ এক্ষণে বড় কঠিন, তাহার মধ্যে বিশেষত কলিকাতা। এখানে কোন অংশে লোকের অনুরোগ পাওয়া ভার।

"যেহেতু যদি কোন ব্যক্তি অধিক দান করেন, তবে তাহাকে কহে—অমুক খোয়াইয়া গেল, ইহার কি বিষয় হইবেক; এ-প্রকার দান করিয়া কত লোক দরিদ্র হইয়াছে—তাহার সাক্ষী অমুক হালদার প্রভৃতি গিয়াছেন।

বাঙালী ভদ্রসমাজের চরিত্র বিশ্লেষণ আবশ্যক। আমি একটু আঁচ মাত্র দিতেছি।

বাঙালী ভদ্রসমাজ আচরণের দিক হইতে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে অর্ধেক বাঙালী ভদ্রলোক। তাঁহারা সাতেও নাই পাঁচেও নাই। স্বচ্ছল বা কোন প্রকারে জীবনযাপন করিয়া যাইতে পারিলেই সন্তুষ্ট। তাঁহারা অবশ্য খবরের কাগজ, সাপ্তাহিক পত্রিকা বা মাসিক পত্র পড়ে—কিন্তু তাহা নিছকই সময় কাটাইবার জন্য, অনেক সময়ে ঘুম আনিবার জন্যেও বটে। এই সব কাগজে ঝগড়াঝাটি, খেউড় ইত্যাদি থাকিলে উঁহারা আমোদ পায়, কিন্তু উঁহারা কোন পক্ষই নয়। দুই ব্যক্তিকে ঝগড়া করিতে দেখিলে সাধারণ লোকে যেমন চারিদিকে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখে ও 'লেগে যা, লেগে যা' বলে, ইহাদের আচরণও সেই রকম। সুতরাং রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বা অন্য কাহারও নিন্দা ইহাদের কাছে মানসিক চাটনী মাত্র। ইহাদের উপর রাগ করা চলে না।

দ্বিতীয় ভাগে চার আনা ভদ্রলোক। ইহাদের ভাল জিনিস ভাল লাগে, ইহাদের কাছে অসামান্য ব্যক্তি অসামান্য বলিয়াই মান্য হয়, মহৎ কাজ বা মহৎ ব্যক্তির প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাও ইহাদের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু ইহারা সকলেই ভাল মানুষ, দার্শনিক গোছের। শ্রদ্ধা বা ভক্তির পাত্রকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার প্রবৃত্তিকে উঁহারা গোঁড়ামি বলিয়া মনে করে। উঁহারা বলে, যেখানে মহাপুরুষেরা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, [illegible] দিবেন, নাকি উঁহারা আমাদিগকে তাঁহাদের রক্ষী হইতে বলেন? ইহা ছাড়া এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিজের নিজের বিচারের উপর খুব বেশী আস্থা নাই। [illegible] মুখে ঝাল খাইবার [illegible] উঁহারা বিদেশ হইতে সার্টিফিকেট না আসা পর্যন্ত দেশবাসীর কৃতিত্ব বা গুণ স্বীকার করিতে পারে না। সুতরাং ইহাদের কাছ হইতেও নিন্দাপরায়ণ বাঙালীর আক্রমণ হইতে সহায়তা পাইবার উপায় নাই।

এইবার বাকী চার আনা ভদ্রলোকের কথা। ইহাদের মত দুর্নীতিপরায়ণ, পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপরায়ণ, অনিষ্টকারী [illegible] বাঙালী হাড়ে বজ্জাত ও ছোটলোক অন্যত্র খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। একটা লক্ষ করিবার বিষয় এই যে এই দুষ্ট প্রকৃতি যে কেবল যাহারা চুরি-চামারি করিয়া বড় হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দেখা যায় তাহাই নয়, অতি নিঃস্ব, খাইতে পায় না তাহাদের মধ্যেও সমানই দেখা যায়। এই দুষ্টামি অভাবে বা ঐশ্বর্যে হয় না, স্বভাবে হয়। তবে বিত্তবান ও বিত্তহীন নিন্দুকের মধ্যে প্রভেদ এই যে বিত্তবানেরা নেকড়ে বাঘের মত, বিত্তহীনেরা পাগলা কুকুরের মত। সুতরাং বিত্তহীন নিন্দুকেরাই বেশী বিপজ্জনক। উহাদের বিরুদ্ধে মোট চোদ্দটা মাত্র নয়, প্রতিদিন ইঞ্জেকশন না লইলে অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মরা অবশ্যম্ভাবী। দুর্ভাগ্যক্রমে ধনী বা দরিদ্র যাহাই হউক, এই শ্রেণীর বাঙালীই বাঙালী সমাজে সর্বাপেক্ষা সক্রিয়—অন্যেরা জড়ভরত।

মেকলে এই তৃতীয় শ্রেণীর বাঙালী দেখিয়াই বাঙালীর নিন্দা করিয়াছিলেন। আমরা বাকী ধর্মনিষ্ঠ বাঙালীরা উহা বুঝি নাই, তাই নিরর্থক মেকলের উপর রাগ করিয়াছি, যাহারা আমাদিগকে বিনা দোষে নিন্দা-ভাজন করিয়াছে তাহাদের কিছুই বলি নাই। আমি এই ভুল করি না সুতরাং স্বভাবনিন্দুকের নিন্দাতে স্থির থাকিতে পারি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে কেন এই হিসাবটা করেন নাই, তাহা আমার কাছে আশ্চর্য মনে হয়। হিসাবটা করিলে তাঁহার মনে এত যন্ত্রণা হইত না, এত বার্ধক্যের গ্লানি আসিত না।

বাঙালী ভদ্রসমাজে যাহারা [illegible], যাহারা ন্যায় ও সত্যের পক্ষে দাঁড়াইতে প্রস্তুত, অন্যায়ের বিরোধ যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ নয়, উন্নতির জন্য উদ্যমশীল, তাহাদের লইয়া চতুর্থ একটা শ্রেণী আছে বলিতে পারিলে সুখী হইতাম। আমাদের মহাপুরুষদের ভাব, চিন্তা ও কর্মের যতটুকু সার্থকতা দেখা গিয়াছে, তাহা ইহাদেরই সহযোগিতায় হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অন্য তিন শ্রেণীর তুলনায় এত কম যে, ইহাদিগকে 'শ্রেণী' বলা চলে না, 'ব্যক্তি-সমষ্টি' মাত্র বলা যায়। এই সংখ্যাল্পিষ্ঠতার জন্য ইহারাও মহাপুরুষদের মতই প্রথম দুই শ্রেণীর উদাসীনতা ও তৃতীয় শ্রেণীর দুষ্টতায় তিক্তবিরক্ত হইয়াছে, এবং সময়ে সময়ে নিরুৎসাহ হইয়াছে। আজ ত ইহারা একেবারেই নিরাশ।

শান্ত

সে যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথ যখন 'ক্ষমাঘেন্না' করিয়া দুষ্ট বাঙালীর নিন্দা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই ভাল মানুষ বাঙালীর নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধেও অভিমান ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তখন তাঁহার পক্ষে দেশবাসীর প্রতি উদাসীন হইয়া বিদেশকে তাঁহার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র ও বিদেশীকে তাঁহার প্রকৃত সমানধর্মা মনে করা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু বাঙালী ছাড়া আর কিছু হইবার ক্ষমতা

তাহার ছিল না, সুতরাং বিদেশ ও বিদেশীর জন্য তিনি যাহা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার সমস্তটাই কৃত্রিম হইয়া দাঁড়াইল। এই কাজে নিযুক্ত রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অভিনেতা ভিন্ন আর কিছু হইবার উপায় রহিল না।

আগেই বলিয়াছি, ইহার ফলে বাঙালী রবীন্দ্রনাথ যে তিরোহিত হইলেন তাহা নয়, কিন্তু দেশ ও বিদেশের উজ্জ্বলিত নাট্যমঞ্চে যে অভিনেতা দেখা দিলেন তাহার কাছে সত্যকার রবীন্দ্রনাথ ম্লান হইয়া গেলেন। বিশ্বমানবতা প্রচার, সুপরিসর আলখাল্লা পরিয়া বিদেশে ভ্রমণ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা, শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা, বিদেশ হইতে ভারতীয় কালচারের বিদেশী ফিরিওয়ালা আনিয়া শান্তিনিকেতনে ইউরোপীয় চিড়িয়াখানা স্থাপন, উডকাট বাটিক প্রভৃতির ব্যতিক, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি সবই অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের কাজ, সত্যকার রবীন্দ্রনাথের নয়।

এই প্রসঙ্গে ছবি আঁকার উল্লেখে অনেকে আশ্চর্য হইতে পারেন, তাই 'চিত্রাঙ্কন কেন 'অভিনেতা' রবীন্দ্রনাথের কাজ সত্যকার রবীন্দ্রনাথের কাজ নয়, তাহার একটু ব্যাখ্যা করিব। এ-বিষয়ে অনেক দিন ধরিয়া, বস্তুত যেদিন রবীন্দ্রনাথের ছবি প্রথম দেখিলাম, সেদিন হইতেই আমার একটা থিওরী আছে। সেটা উপস্থাপিত করিব। অন্যেরা উহার যুক্তিযুক্ততা বিচার করিবেন।

১৯২৬ সনে প্যারিসে কবি ভিক্টর হ্যুগোর (ইংরেজী উচ্চারণ দিলাম) ছবির একখানা বই প্রকাশিত হয় তখন আমার অর্থাভাব থাকিলেও বেশী দাম দিয়া বইখানা কিনিয়াছিলাম। উহাতে হ্যুগোর ছবি আঁকিবার ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। পরজীবনে প্লাস দে ভোজে (Place des vosges) মুক্তাগুলি দেখিয়া সেই মনোভাবের পরিবর্তন হয় না। যতদিন না ছাপার উৎকর্ষ উপযুক্ত হয়, ততদিন এই চিত্রগুলি বই আকারে প্রকাশ করিতে হ্যুগোর নিষেধ ছিল। কিন্তু ১৯২৬ সনে ছাপার যথেষ্ট উন্নতি হওয়াতে এই নিষেধ বলবৎ রাখা হয় নাই। ১৯২৭ সনে আমি জানিতে পাই যে, শান্তিনিকেতনেও এই বইখানা আসিয়াছে।

সকলেই জানেন, ১৯২৮ সন হইতে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকিতে আরম্ভ করেন, ইহার আগে তিনি শুধু শ্রীছাঁদ করিয়া লেখার কাটাকুটি করিতেন। ১৯৩০ সনে আমি তাঁহার ছবি প্রথম দেখি। তৎক্ষণাৎ আমার মনে হইল—এই রে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ভিক্টর হ্যুগোর চিত্র সম্বন্ধে বইখানা দেখিয়াছেন ও ভাবিয়াছেন, কবি ভিক্টর হ্যুগো যদি চিত্রকর হইতে পারিলেন,

আমি কবি রবীন্দ্রনাথও চিরকর হইব না কেন?

বলা বাহুল্য, ইহাতে আমি একটু কৌতুক অনুভব করিয়াছিলাম এবং ১৯৩০ সনে (বা কাছাকাছি) মডার্ন রিভিউ-এর সহকারী সম্পাদক হিসাবে কঁতেস্ দ্য নোয়াই-এর প্রশংসা ছাপিবার সময়েও এই কৌতুক অযৌক্তিক মনে করি নাই। মাদাম দ্য নোয়াই বিখ্যাত লেখিকা, বিখ্যাত 'গ্র্যাঁদ দাম', প্যারিসের লেখক ও বিদগ্ধ সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অপরিসীম। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল, এবং তিনি প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের চিত্রের 'শ্যাপেরোন'ও হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার এই সুপারিশে অভিভূত হইয়া পড়ি নাই।

এই মহিলার লেখাটি পড়িবার সময়ই মনে হইয়াছিল, উহার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন তামাশা আছে। আমি এই জাতীয় ফরাসী মহিলার কথা বহু পড়িয়াছি, দুই একটিকে নিজেও দেখিয়াছি। ইঁহারা শিকারী চিতার মত। ইঁহারা অতি শোভন, শালীন ও বিদগ্ধভাবে দজ্জাল। একবার ইঁহাদের খপ্পরে পড়িলে শুধু 'কল্যাণীয়াসু' পাঠে চিঠি লিখিয়া পার পাইবার উপায় নাই, 'দাসখত লিখে দিলাম শ্রীচরণে' বলিয়াও নিষ্কৃতি নাই—ইঁহারা লেখকদের ভালুক বা বানরের মত নাচাইতে চান। বাঙালী রবীন্দ্রনাথ এত ঝানু ছিলেন না যে, এই ধরনের মহিলার আওতায় আসিয়া খেলার পুতুল না হইয়া পারেন। সুতরাং আরও উঠিয়া পড়িয়া ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিলেন। হাততালিরও অভাব ঘটিল না।

রবীন্দ্রনাথের ওই সব রকমের কার্যকলাপ সম্বন্ধেই বলিব—Vanitas Vanitatum, Omnia Vanitas (মোহের মায়ার মধ্যে আরও মোহমায়া, সবই মোহের মায়া)। অভিনেতা হিসাবে বিশ্বের দরবারে লেডি-ড্রেস পরিয়া থাকার ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবনে ব্যর্থতা ভিন্ন পূর্ণতা আসে নাই। ইহার সংক্ষিপ্ত হিসাব দিব।

প্রথমত, ইংরেজী লিখিয়া তাঁহার সত্যকার প্রতিষ্ঠা ও স্থায়ী খ্যাতি হয় নাই।

দ্বিতীয়ত, তিনি নোবেল প্রাইজের সূত্রে বিদেশের যাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও সহিত তাঁহার সত্যকার একাত্মতা হয় নাই—অনেকেরই সহিত পরজীবনে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। ইহার কারণ পাশ্চাত্য জীবন ও মনের সহিত তাঁহার সমান ধর্মিত্বের অভাব।

তৃতীয়ত, এদেশের যাঁহাদিগকে তিনি ভক্ত হিসাবে পাইলেন, তাঁহাদের কাহাকেও তাঁহার পক্ষে সেবক ভিন্ন অন্য কিছু মনে করা সম্ভব হয় নাই, শ্রদ্ধা করা ত দূরের কথা। ভক্তের ভক্তি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিতে হইলে যে ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধার প্রয়োজন হয়, তা আপনাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না।

চতুর্থত, রবিবাবু বা রবি-ঠাকুর নামে রক্তমাংসের জীব না থাকিয়া তাঁহাকে 'কবি' 'গুরুদেব' ইত্যাদি আখ্যায় বিগ্রহে পরিণত হইতে হইল। কোনও বাঙালী ভদ্রলোক যদি কাহাকেও 'কবি' বা 'গুরুদেব' বলিয়া উল্লেখ করে, তাহা হইলে যে বাঙালীর উহা অসহ্য ন্যাকামি ও ঢং বলিয়া মনে না হয়, তাহাকেও ন্যাকা এবং সং বলিতে হইবে। এই ডাকাডাকির প্রভাবে আমরা ভুলিয়াই গেলাম যে এককালে তাঁহার ভাগিনেয়ী বালিকা বয়স্কা সরলা দেবী দার্জিলিং-এ রেলে যাইবার সময় ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—"ও মা কি চমৎকার; রবি-মামা, দেখো দেখো!" রবিঠাকুর রবিবাবু, রবিকাকা, রবিমামা, রবিদাদা বলিয়া ডাকা প্রায় অশ্লীল হইয়া দাঁড়াইল। অথচ আমরা বাঙালীরা যদি এইভাবে কাহাকেও ডাকিতে না পারি, তাহা হইলে ডাকারই অর্থ হয় না। 'কবি' বা 'গুরুদেব' বলিলে খড়ের পুতুলকে বুকে টানিবার মত হয়।

পঞ্চমত, তিনি বিশ্বভারতীতে যে প্রতিষ্ঠান গড়িতে গিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ত হয়ই নাই, পক্ষান্তরে উহাকে চালাইবার জন্য তাঁহাকে অপরিসীম দুশ্চিন্তা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। শেষ জীবনে বিশ্বভারতীর জন্য টাকা তুলিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে যখন বার বার রঙ্গমঞ্চে উঠিতে হইয়াছিল, তখন শ্রীযুক্ত বিড়লা যে তাঁহাকে এই পরিশ্রম হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই জানা আছে।

ইহা ছাড়া প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অন্য কথাও আছে। বাংলা দেশে কোনও প্রতিষ্ঠান যতদিন লাভজনক না হয়, ততদিন উহাতে আদর্শপরায়ণতা বজায় থাকে। লাভজনক হইবা মাত্র উহা কতকগুলি বৈষয়িক লোকের 'গেড়োকলে' পরিণত হয়। বিশ্বভারতী যে আর রবীন্দ্রনাথের আদর্শে পরিচালিত নয়, উহা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইহার জন্য এত কষ্ট একটা পরিহাস।

হিসাব আরও দীর্ঘ করিতে পারিতাম। রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, তাঁহার শেষ জীবনের নিরাশা, যন্ত্রণা এবং তিক্ততা।

অথচ এই অভিনেতা রবীন্দ্রনাথকেই আমরা আজ পূজার রবীন্দ্রনাথ বলিয়া মানিয়াছি, সত্যকার রবীন্দ্রনাথকে অবহেলা করিতেছি। সেই রবীন্দ্রনাথকে ফিরাইয়া না আনা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে বাঙালী জাতির ঋণ শোধ হইবে না। কিন্তু আজিকার বাঙালীর সেই আত্মপ্রত্যয়, আন্তরিকতা, সত্যপরায়ণতা ও নিষ্ঠা আছে কি?

১২
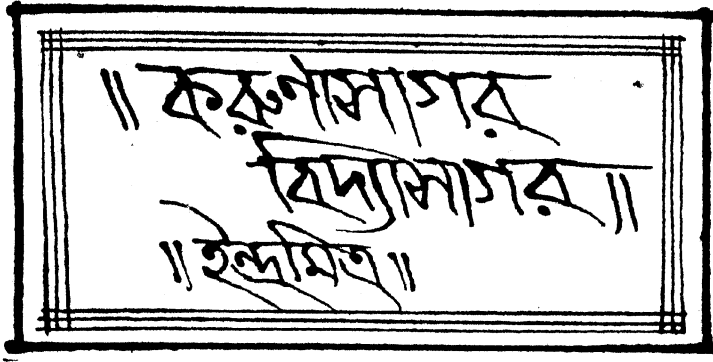
সংস্কৃত কলেজ থেকে লেখাপড়া সাঙ্গ করে বেরোনোর অল্প দিন পরেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদার পদপ্রার্থী হলেন বিদ্যাসাগর। মার্শাল সাহেব তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারী। ১৮৪১ সালের ২৭ ডিসেম্বর মার্শাল সাহেব বাঙলা গভর্নমেন্টের সেক্রেটারীকে একখানা চিঠি লিখেছেন, চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি:

"I beg to recommend, for the situation of Bengali Sheristadar, Ishwarchandra Vidyasagar whose acquirements are similar to those of the late Sheristadar as appears by the undermentioned certificates which he holds, viz:--

1st a certificate from the Government Sanskrit College of very good proficiency in every branch of literature taught at that institution.

[Dated 4th December 1841]

2nd one from the Hindu Law Committee of eminent knowledge of Hindu law and qualification to hold the situation of Law Pandit in any of the Court of Judicature, and

3rd one from the Examinees of the College of Fort William of qualification to instruct the students in the Sanskrit and Bengali.

Iswarchandra possesses also a moderate knowledge of English of which he acquired the rudiments in the English class of the Sanskrit College but he was unable conveniently to improve his knowledge after the abolition of that class. He bears a high character for respectability of conduct and far industrious habits."

বিদ্যাসাগর চাকরি পেলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে। ১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর থেকে বিদ্যাসাগর হলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙলা বিভাগের সেরেস্তাদার, কিংবা বাংলা প্রথম পণ্ডিত। পঞ্চাশ টাকা মাইনে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়তেন সাহেবেরা। বিলেত থেকে তাঁরা এ দেশে বড়ো-বড়ো চাকরি করতে আসতেন। চাকরিতে বহাল হতে হলে তাঁদের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিখতে হত এদেশী ভাষা—যেমন বাঙলা, হিন্দী ইত্যাদি। পরীক্ষা দিতে হত তাঁদের এদেশী ভাষায়। পরীক্ষায় পাস না করতে পারলে বিলেতের ছেলেকে আবার বিলেতে ফিরে যেতে হত।

মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে ভালো করে ইংরেজী আর হিন্দী শেখার পরামর্শ দিলেন।

ভালো পরামর্শ।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি করতে-করতে বিদ্যাসাগর ভালোরকম ইংরেজী শিখেছেন, হিন্দী শিখেছেন। দিনের পর দিন উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে ইংরেজী শিখেছেন। প্রথমে কিছু দিন বিদ্যাসাগরকে ইংরেজী শিখিয়েছেন দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর ইংরেজী শিখিয়েছেন নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ

যৌবন বয়সে বিদ্যাসাগর

গ্ৰেত। আর হিন্দী শিখিয়েছেন একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত। এ ছাড়া সংস্কৃতের চর্চা তো আছেই।

[পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর আরও কারো-কারো কাছে ইংরেজি শিখেছেন।

১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন, তখনও দেখা গেছে বিদ্যাসাগর ভালো-ভাবে ইংরেজী শেখায় আগ্রহী। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "(বিদ্যাসাগর) ভালরূপ ইংরাজী-ভাষা শিক্ষার জন্য প্রত্যহ প্রাতে বহুবাজারের পঞ্চাননতলার বাসা হইতে সভাবাজারস্থ রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে, রাজার জামাতা বাবু অমৃতলাল মিত্র ও অপর জামাতা বাবু শ্রীনাথচন্দ্র বসুর নিকট যাইতেন এবং আগ্রহাতিশয়-সহকারে ইংরাজী-ভাষার অনুশীলনে প্রবৃত্ত ছিলেন।"

বিহারীলাল সরকার লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয়......আনন্দকৃষ্ণ (বসু) বাবুর নিকট সেক্সপীয়র পড়িতেন। সেক্সপীয়র পড়িবার জন্য প্রায়ই তিনি সোভাবাজার রাজবাটীতে যাতায়াত করিতেন।"

রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন: "ইংরেজী ১৮৪৯ সালের মে মাসে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় ইংরেজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হই।......আমি কেবল সংস্কৃত কলেজের বালকদিগকে ইংরেজী শিখাইতাম এমত নহে। অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আমার নিকট অল্প-বিস্তর ইংরেজী পড়িয়া-ছিলেন। মহামান্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন।]

বিদ্যাসাগরের কাজকর্ম দেখে মার্শাল সাহেব খুব খুশি।

কিন্তু এক ব্যাপারে বিদ্যাসাগর বড়ো নির্দয়। পরীক্ষার ব্যাপারে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পরীক্ষায় যাঁরা পাশ করতে না পারেন তাঁদের সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে বিলেতে ফিরে যেতে হয়। তাই মার্শাল সাহেব একদিন বিদ্যাসাগরকে পরীক্ষার আঁটাআঁটা ভাবটা একটু কম করতে বললেন।

অর্থাৎ যাদের পাশ করার যোগ্যতা নেই, তাঁদেরও পাশ করিয়ে দিতে হবে। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে দিয়ে তা হবার নয়। বিদ্যাসাগর মার্শাল সাহেবকে বললেন—ওটি আমাকে দিয়ে হবে না। বরং চাকরি ছেড়ে দেব, তবু অন্যায়ের প্রশ্রয় দেব না।

উত্তরকালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন: "বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিভিলিয়ানদিগকে বাঙ্গালা পড়াইতেন, তখন তাঁহাকে 'বিদ্যাসুন্দর' পড়াইতে হইত। 'বিদ্যাসুন্দরের' খেউড় অংশ পড়াইবার সময় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত ভাব প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু এক-একজন য়ুরোপীয় তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন, 'কেন তুমি কুণ্ঠমান্ড করিতেছ? আমাদের ভাষাতে কি সেক্সপীয়রের Venus and Adonis, Rape of Luceece, এবং পোপের January and May, এই সকল বহি নাই? আর আমরা কি ঐ সকল বহি আদপে পড়ি না; শিকায় তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছি? অতএব ইহাতে আর লজ্জার বিষয় কি?"

১৮৪২ সালে রবার্ট কস্ট নামে একজন সিভিলিয়ান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়তেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তিনি

[illegible] বিদ্যাসাগর।

একদিন তিনি বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করলেন—আমার বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক রচনা করে দিলে আমি খুব খুশী হই।

রবার্ট কস্টকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললেন বিদ্যাসাগর। তারপর তাঁকে দুটি শ্লোক লিখে দিলেন:

শ্রীমান্ রবার্ট কষ্টেহধুনা বিদ্যালয়মুপাগতঃ।
সৌজন্যপূর্ণৈরালাপৈর্নিতরাং সামতোষয়ৎ॥
॥ ১॥
স হি সদ্গুণসম্পন্নঃ সদাচাররতঃ সদা।
প্রসন্নবদনো নিত্যং জীবত্বনন্ততং সুখী॥
॥ ২॥

শ্লোক নিয়ে খুশী হয়ে চলে গেলেন রবার্ট কস্ট।

পরীক্ষায় পাশ করে রবার্ট কস্ট পাঞ্জাব অঞ্চলে নিযুক্ত হয়েছেন। বহু বছর কাজ করেছেন, তারপর স্বদেশে ফিরে যাবার পালা। যাবার আগে একদিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বললেন—আমি স্বদেশে যাচ্ছি, আর এ দেশে আসব না; সুতরাং তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর রবার্ট কস্ট বিদ্যাসাগরকে বললেন—যদি তোমার আগের মতো শ্লোক রচনার অভ্যাস থাকে, তা হলে আমার বিষয়ে কাল কয়েকটি শ্লোক পাঠালে, আমি খুব খুশী হব।

বিদ্যাসাগর পাঁচটি শ্লোক লিখে রবার্ট কস্টকে পাঠিয়ে দিয়েছেন:

দোষৈর্বিনাকৃতঃ সর্বৈঃ
সর্বৈরাসেবিতো গুণৈঃ।
কৃতী সর্বাসু বিদ্যাসু
জীয়াৎ কস্টো মহামতিঃ॥
॥ ১॥
দয়াদাক্ষিণ্যমাধুর্যগাম্ভীর্যপ্রমুখা গুণাঃ।
নয়বর্ত্মরতে নূনং রমন্তেঽস্মিন্
নিরন্তরম্ ॥ ২॥
সদা সদালাপরতো নিত্যং
সর্বত্র সমদর্শিনঃ।
সর্বলোকপ্রিয়স্যাস্য
সম্পদস্তু সদা স্থিরা ॥ ৩॥
অস্য প্রশান্তচিত্তস্য
সর্বত্র সম দর্শিনঃ।
সর্বধর্মপ্রবীণস্য কীর্তির্বাঢ়ং
বর্ধতাম ॥ ৪॥
বিদ্যাবিবেকবিনয়াদিগুণৈরুদারৈ—
র্নিঃশেষলোকপরিতোষকরশ্চিরায়।
দূরং নিরস্তখলদুর্বচনাবকাশঃ
শ্রীমান্ সদা বিজয়তাং নু রবার্ট কস্টঃ॥
॥ ৫॥

[illegible] ঠাকুরদাস [illegible] চাকরি ছেড়ে দিলেন। [illegible] চাকরি ছাড়তে রাজী হলেন ঠাকুরদাস, কিন্তু বিদ্যাসাগর মনিবকে এমনভাবে বলতে লাগলেন যে, শেষ পর্যন্ত আর রাজী না হয়ে উপায় রইল না।

মনিব ঠাকুরদাসকে বললেন—ছেলে-মানুষের কথায় চাকরি ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। ওই ছেলে যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে তোমাকে সাহায্য না করে, তখন কি আবার চাকরি করতে আসবে?

ঠাকুরদাস মনিবকে বললেন—আমার পুত্র সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠিরের মতো ধর্মশীল, আমাকে দেবতার মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তার কথা অবহেলা করতে পারব না। যদি তাকে অধার্মিক ও দুশ্চরিত্র জানতাম, তা হলে, কখনোই চাকরি ছাড়তাম না।

বিদ্যাসাগর ঠাকুরদাসকে মাসে-মাসে দরকার মতো টাকা পাঠিয়ে দিতেন। তারপর বাকী টাকায় কলকাতার বাসা-খরচ চালাতেন। কলকাতার বাসায় লোক-সংখ্যা তখন নিতান্ত অল্প নয়। আর-সকলের সঙ্গে বিদ্যাসাগরকেও বাসায় পালা করে রান্নাবান্নার কাজ করতে হত।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "যে সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, সেই সময়ে তাঁহার তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার জননী তাঁহাকে বাটী যাইতে আদেশ করিয়া পাঠান। বিদ্যাসাগর মহাশয় কালেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবের নিকট ছুটি চাহিলেন। কিন্তু সে সময়ে এত বেশী কাজ যে, বিশৃঙ্খলাভয়ে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিদায় দিতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং তাঁহার আর বাটী যাওয়া হইল না। কলিকাতার বাসার সকলেই চলিয়া গিয়াছেন, কেবল তিনিই আছেন। সহোদরের বিবাহ, জননী গৃহে যাইতে বলিয়াছেন, তিনি ছুটি পাইলেন না, জননীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে না পারিয়া মনে দারুণ ক্লেশের সঞ্চার হইল। বর্ষার ঘন মেঘাচ্ছন্ন রজনীর অন্ধকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়াকাশও গভীর বিষাদ-মেঘে আবৃত হইল। অন্তর্দাহ ও উৎকণ্ঠা তাঁহাকে বড়ই অধীর করিয়া তুলিল। তিনি অনিদ্রায় বহু কষ্টে রাত্রি যাপন করিয়া শেষে মার্শাল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আমার মা আমাকে বাড়ি যাইতে বলিয়াছিলেন, আমাকে বাড়ি যাইতেই হইবে। যদি বিদায় না দেন, আমি কর্ম পরিত্যাগ করিলাম, মঞ্জুর করুন, আমি বাড়ি যাইব।" সাহেব মাতৃভক্তির এই স্বর্গীয় দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমাকে কর্ম ত্যাগ করিতে

হইবে না, আমি বিদায় দিতেছি, তুমি বাড়ি যাও।” তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় হৃষ্টচিত্তে বাসায় আসিয়া আহারাদির আয়োজন করিলেন। আহারের পর ভৃত্য শ্রীরামকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। সে সময়ে প্রবল বর্ষাসমাগমে পথ অতি দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে, বহু কষ্টে এক-এক পা অগ্রসর হইতে হইতেছে, এইরূপ ক্লেশে কতক দূর অগ্রসর হইয়া সেদিন তারকেশ্বরের নিকট রাত্রি যাপন করিতে হইল। পরদিন শ্রীরামকে পথ চলিতে অসমর্থ দেখিয়া পথে ফলার করাইয়া ও কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। শ্রীরামের বাড়ি সেখান হইতে নিকটে, সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভুর আদেশমত বাড়ি গেল। ঈশ্বরচন্দ্রকে সেদিন যে-কোন উপায়ে হউক বাটী পৌঁছিতেই হইবে। সেই দিন বিবাহ। তিনি জানিতেন, তিনি বাড়ি না গেলে, জননীর আর দুঃখের সীমা থাকিবে না। এই ভাবনার তাড়নায় তিনি ত্বরিতগমনে পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই ভীষণ কলেবর দামোদর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দামোদরে বর্ষায় ঢল নামিয়াছে, একগাছি তৃণ পড়িলে শত খণ্ড হইয়া যায়। দুকূল ভাসাইয়া, প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া, জলরাশি নৃত্য করিতে করিতে তীরবেগে ছুটিয়াছে। পারের নৌকা পরপারে, নৌকা আসিয়া তাঁহাকে লইয়া না গেলে সেদিন আর গৃহে যাওয়া হয় না। কেবল পার হওয়া হইবে মাত্র, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর কি করিলেন; পাঠক! শুনিতে চাও, ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে, ভয়ে হাত-পা পেটের ভিতর প্রবেশ করে, উপন্যাসে, কবি-কল্পনায় এরূপ ঘটনার অবতারণা সম্ভব হয়, কিন্তু সত্যসত্যই যে মানুষ এরূপ করিতে পারে, তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় আবদারে মায়ের আদেশ পালনের জন্য বর্ষার ভরা দামোদরের জলোচ্ছ্বাসে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। যাহারা পারে যাইবে বলিয়া বসিয়াছিল, তাহারা অনেকে নিষেধ করিল, কেহ কেহ বাধাও দিল, কিন্তু মাতৃআজ্ঞা পালনে বদ্ধপরিকর ঈশ্বরচন্দ্র কোন বাধাই মানিলেন না। সবলদেহ বীরপুরুষ দামোদরের তরঙ্গ-সংগ্রামে জয়ী হইয়া পরপারে উঠিলেন। যাহারা তাঁহার আয়োজন দেখিয়া তাঁহাকে বাতুল বলিয়া মনে করিতেছিল, তাঁহার শমন-দমন সন্নিকট ভাবিয়া আকুল হইয়াছিল, তাহারা তাঁহার সাহস ও শক্তিসামর্থ্য দেখিয়া বিস্মিত হইল ও শতপ্রকারে তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিল। পথে, পাতুলে জননীর মাতুলালয়ে মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া সমাপন করিয়া আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। অপরাহ্ণে দারকেশ্বর নদও পূর্ববৎ পার হইয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে মাঠের মধ্যে সন্ধ্যা হইল। যেখানে সন্ধ্যা হইল, সেখানে আবার দস্যুভয়। সুবিধামত কোন পথিককে একাকী পাইলে প্রায় গৃহে ফিরিতে দেয় না। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার ইষ্টদেবতা মাতৃপদ স্মরণ করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রায় প্রহরার্ধ রাত্রি অতীত হইয়াছে, এমন সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় গৃহে পৌঁছিলেন। সেই সিক্ত বস্ত্রে ও ক্লান্ত শরীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া “মা—মা, আমি আসিয়াছি” বলিয়া মাকে ডাকিতে লাগিলেন। (বিদ্যাসাগর, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৮৬—৮৮)।

বিদ্যাসাগরের বর্ষায় ভরা দামোদর সাঁতার কেটে পার হওয়ার কথা চণ্ডীচরণের আগে আর কেউ লেখেননি। চণ্ডীচরণের পরে অবশ্য অনেকেই লিখেছেন।
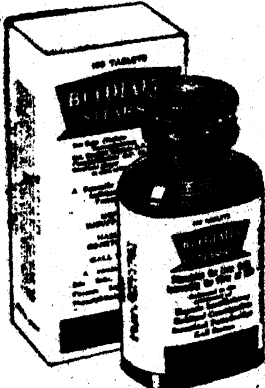
১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর থেকে ১৮৪৬ সালের ৩ এপ্রিল পর্যন্ত বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার ছিলেন; চণ্ডীচরণের কথামতো এই সময়ের মধ্যেই বিদ্যাসাগর একদিন (সেজোভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহের দিন) বর্ষার ভীষণ দামোদর সাঁতার কেটে পার হয়েছিলেন।

অথচ স্বয়ং শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রতিবাদ করে লিখেছেন:

"চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ তারকেশ্বরের নিকট দিয়া আমাদের বাটী যাইবার পথ নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল একবার অতি শৈশবকালে পিতার সহিত কলিকাতায় আসিবার সময় তারকেশ্বরের নিকট রামনগর গ্রামে পিসীবাটী বলিয়া ঐ দিক দিয়া আসিয়াছিলেন।

চণ্ডীবাবু কিছুই না জানিয়া লিখিয়াছেন। সাতান্ন বা আটান্ন বৎসর পূর্বে যখন আমরা কলিকাতায় অধ্যয়নার্থ গতিবিধি করিতাম, তখন এখনকার মত তারকেশ্বর রেলওয়ে হয় নাই; ঘাটাল দিয়া যাইবার স্টীমার ছিল না। তৎকালে আমরা কলিকাতা হইতে পদব্রজে বাটী যাইতাম। হাটখোলার ঘাটে পার হইয়া শালিখার বাঁধা রাস্তায় মোসাট নামক গ্রাম পর্যন্ত যাইয়া, ঐ বাঁধা রাস্তা ত্যাগ করিয়া মাঠের পথে বরাবর পশ্চিম মুখে রাজবলহাট নামক গ্রামে উপস্থিত হইতাম। পরে দামোদর পার হইয়া প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ যাইলে পর পাতুল নামক গ্রামে উপস্থিত হইতাম। তথা হইতে বীরসিংহা ছয় বা সাত ক্রোশ পশ্চিম।

কয়েক মাস অতীত হইল, চণ্ডীবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণবাবুর সহিত স্টীমারে রানীচক নামক স্থানে যান, তথা হইতে নৌকা করিয়া ঘাটাল গমন করেন এবং তথা হইতে তিন ক্রোশ অন্তর বীরসিংহায় পৌঁছেন। চণ্ডীবাবু শালিখার পথে কখনও ঐ দেশ পদব্রজে গমন করিলে ওরূপ লিখিতেন না।

দ্বিতীয়ত, এক অসম্ভব কথা এই লিখিয়াছেন যে, "তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় হুন্টীচক্রে বাসায় আসিয়া আহারাদির আয়োজন করিলেন। আহারের পর ভৃত্য শ্রীরামকে সংগে লইয়া যাত্রা করিলেন।"

কলিকাতা বহুবাজার হইতে প্রায় সতের-আঠার ক্রোশ পথ অন্তরে তারকেশ্বর। বর্ষাকালে আফিসের ফেরত অপরাহ্নে সতের-আঠার ক্রোশ পথ কেহ যাইতে পারে?

প্রকৃত কথা এই যে, সাহেবের নিকট বিদায় হইয়া চারটার পর কলিকাতা হইতে জনাই গ্রামের নিকট চণ্ডীতলা নামক গ্রামে সন্ধ্যাইকে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন।...

চণ্ডীবাবু বর্ষাকালে ভরা দামোদর সাঁতরাইয়া পার হওয়ার কথা যে লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। বোধ করি, চণ্ডীবাবু বর্ষাকালে রাজবলহাট গ্রামের সন্নিকটে দামোদর নদের অতি ভীষণমূর্তি কখনও স্বচক্ষে দেখেন নাই; তজ্জন্যই এরূপ অসম্ভব কথা লিখিয়াছেন। এরূপ মিথ্যা ও অসঙ্গত কথা লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করার আবশ্যক কি? বন্যার সময় দামোদরের এত জল বৃদ্ধি হয় যে, ঐ নদের পশ্চিমে প্রায় চারি ক্রোশ পর্যন্ত মাঠ জলমগ্ন থাকে।...

..শ্রীরামের বাটী সেখান হইতে নিকট নহে, তাহার বাটী পাতুল গ্রাম, পাতুল দামোদর পার হইয়া প্রায় পাঁচ ক্রোশ যাইতে হইবে। প্রকৃত কথা, শ্রীরাম পাতুল পর্যন্ত একত্র গিয়াছিল সেদিন নিজ বাটী পাতুল গ্রামে রহিল। বিদ্যাসাগর তথা হইতে একা বাটী গেলেন।" (ভ্রমনিরাস, পৃঃ ১৬—১৯)

এই প্রতিবাদের উত্তরে চণ্ডীচরণ লিখেছেন: "সেকালের দামোদরে আর একালের দামোদরে অনেক প্রভেদ। ১৮৫৬ খৃঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে খোলা হইলে পর, সহসা দামোদরের অত্যধিক জল বৃদ্ধির আশঙ্কাজনিত বিপদ নিবারণের জন্য পূর্বপারে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। সেই জন্য পশ্চিম পারে ৪।৫ ক্রোশ ভাসিয়া যায়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বন্যার জল দৈবাৎ নদের কূল অতিক্রম করিত। আমার বর্ণিত ঘটনা রেলওয়ে হইবার অনেক পূর্বে ঘটিয়াছিল।" (বিদ্যাসাগর, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৯১)

'১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বন্যার জল দৈবাৎ নদের কূল অতিক্রম করিত'—চণ্ডীচরণের এ উক্তি সম্পূর্ণ অসত্য। ১৮৫৬ সালের আগেও বন্যার জল দামোদরের কূল অতিক্রম করত, এবং সে ঘটনা নিতান্ত দৈবাৎ নয়। ১৮৫৬ সালের আগে থেকেই দামোদরের দক্ষিণ পাড়ে বাঁধ ছিল। ১৮৫১ সাল থেকে দামোদরের বাঁ-পাড়ে বাঁধ দেবার কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু এসব বাঁধের সঙ্গে রেলওয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। ১৮৫২ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে দামোদরের বন্যা ও বাঁধ সম্পর্কে রীতিমতো সরকারী অনুসন্ধান। প্রমাণের জন্য দ্রষ্টব্য: **Selections from the records of the Bengal Govt. containing papers from 23rd January 1852 to 18th May, 1863 relating to the Damodar floods and embankments, Vol. I, Calcutta, 1916.**

১৮৪০ সালে দামোদরের যে বন্যা হয় তাতে হুগলী জেলায় **a discharge of about 6 lakhs cubic feet per second was recorded'.**

১৮৫৬ সালে প্রকাশিত Beadle সাহেবের মানচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে দামোদর গড়ে আধমাইল চওড়া, তীরভূমি গড়ে দশ ফুট উঁচু, **'the floods rise from 14 to 16 feet above the level of dry weather stream'.**

১৮৬৫ সালে দামোদরের বদলে মুণ্ডেশ্বরী নদী মুখ্যপ্রবাহমুখ হওয়ার ফলে দামোদরের চরিত্র অনেক শান্ত হয়ে যায়। তার আগে অন্তত শ-খানেক বছরের মধ্যে দামোদরের চরিত্রে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এবং সেই চরিত্রের পরিচয় আছে Beadle সাহেবের মানচিত্রে।"

চণ্ডীচরণের উত্তর একেবারেই সন্তোষজনক নয়। এখানে স্বীকার করা উচিত, শম্ভুচন্দ্রের কোনো-কোনো প্রতিবাদের চণ্ডীচরণ সদুত্তর দিয়েছেন। কিন্তু আলোচ্য প্রতিবাদের উত্তর দেখে হতাশ হতে হয়।

চণ্ডীচরণ প্রত্যক্ষদর্শী নন; বিদ্যাসাগর বর্ষার ভরা দামোদর সাঁতার কেটে পার হয়েছেন, একথা চণ্ডীচরণ নিশ্চয় কারো কাছে শুনেছেন। কিন্তু কার কাছে শুনেছেন? যাঁর কাছে শুনেছেন চণ্ডীচরণ তাঁর নামোল্লেখ করলে বিচার করে দেখা যেত সে কথা বিশ্বাসযোগ্য কিনা। শম্ভুচন্দ্রের একাধিক প্রতিবাদের উত্তরে চণ্ডীচরণ উপযুক্ত ব্যক্তির নামোল্লেখ করে সংশয় দূর করেছেন, কিন্তু এক্ষেত্রে চণ্ডীচরণ সে রকম কিছু করেননি।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, বিদ্যাসাগর বর্ষার ভরা দামোদর সাঁতার কেটে পার হয়েছেন একথা চণ্ডীচরণ কার কাছে শুনেছেন?

চণ্ডীচরণের কথা মতো 'বিদ্যাসাগর' রচনায় বিদ্যাসাগরের দুজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় চণ্ডীচরণকে সাহায্য করেছেন—নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

প্রথম সংস্করণ 'বিদ্যাসাগরে'র ভূমিকায় চণ্ডীচরণ লিখেছেন: "তিনি (নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন) যেরূপ আগ্রহ ও আকিঞ্চনের সহিত তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের জীবনী-বিষয়ক উপকরণাদির দ্বারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন...।" (বিদ্যাসাগর, পৃ ৵০)

তাহলে কি নারায়ণচন্দ্রের কাছেই শুনেছেন?

নারায়ণচন্দ্রের জন্ম হয়েছে বাঙলা ১২৫৬ সনের ৩০-কার্তিক। অর্থাৎ শম্ভুচন্দ্রের বিবাহের অনেক পরে। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন: "অগ্রজ মহাশয়ের প্রায় ৩০ বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র নারায়ণবাবু বীরসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যাবধি প্রায় ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত বীরসিংহ বিদ্যালয়েই বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাভ্যাসের জন্য প্রবেশ করেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ কারণে কালেজ ছাড়িয়া আবার বীরসিংহে গমন করেন। পিতা পুত্রে তাদৃশ সদ্ভাব না থাকায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শেষ জীবনেরও যাবতীয় ঘটনা নারায়ণবাবুকে পরমুখেই অবগত হইতে হইয়াছে।...চণ্ডীবাবুকে নারায়ণবাবু বিশেষ সাহায্য করিলেও চণ্ডীবাবুর ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা নিরাকৃত হয় নাই।" (ভ্রমনিরাস, 'বিজ্ঞাপন', পৃ ৵০)

এই অবস্থায়, অন্য সাক্ষী-প্রমাণের অভাবে, নারায়ণচন্দ্র বললেও শম্ভুচন্দ্রের উক্তিই মেনে নিতে হয়।

প্রথম সংস্করণ 'বিদ্যাসাগরে'র ভূমিকায় চণ্ডীচরণ লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র 'সাহিত্য'-সম্পাদক আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি গ্রন্থের সূচনা হইতে শেষ পর্যন্ত নানাবিধ পরামর্শ দ্বারা এবং বিশেষভাবে পারিবারিক জীবনীবিষয়ক উপকরণাদির দ্বারা বিবিধ প্রকারে সহায়তা করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।" (বিদ্যাসাগর, পৃ ৵০)

তাহলে চণ্ডীচরণ কি সুরেশচন্দ্রের কাছেই শুনেছেন?

না। না।

শম্ভুচন্দ্রের 'ভ্রমনিরাস' প্রকাশিত হওয়ার পর ক্ষীরোদচন্দ্র রায় 'বিদ্যাসাগর' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন: "বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল সরকার উভয়েই বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তের অনেক ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন। পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র, বাবু নারায়ণচন্দ্র ও বাবু সুরেশচন্দ্রের নিকট ইঁহারা সকলেই যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র ভ্রমনিরাস নামক গ্রন্থে যে মৎসরতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাঁহাকে বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন। বিদ্যাসাগর জীবিত থাকিলে অন্যান্য ব্যবহারের ন্যায় ভ্রাতার ভ্রমনিরাস ব্যবহারে সন্তাপিত হইতেন। এরূপ বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে চণ্ডীবাবু কয়েকটি সামান্য ভ্রমে পতিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত হই নাই; সুখী হইয়াছি যে, ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক ভ্রম তাঁহার ঘটে নাই।" ('নব্যভারত', মাঘ, ১৩০৯, পৃ ৫৩১-৩২)।

তদুত্তরে স্বয়ং সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন: "...শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের "বিদ্যাসাগর"। উক্ত প্রবন্ধের এক স্থলে লেখক বলিতেছেন,—"পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র,

বাবু নারায়ণচন্দ্র ও বাবু সুরেশচন্দ্রের নিকট ইঁহারা সকলেই যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছেন।" আমি বিদ্যাসাগরের জীবনী-লেখকদের বিশেষ কোনও উপকার করিতে পারি নাই। বিদ্যাসাগরের একজন জীবন-চরিত লেখক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত জীবন-চরিতের ভূমিকায় আমার নাম দেখিয়া আমি বিস্মিত হই, এবং চণ্ডী বাবুকে আমার নাম তুলিয়া দিতে বলি। চণ্ডী বাবু আমার সাক্ষাতে এ বিষয়ে সম্মত হইয়াছিলেন কিন্তু দেখিতেছি, এ পর্যন্ত তিনি আমার অনুরোধ পালন করেন নাই। মান্যবর ক্ষীরোদ বাবুর প্রস্তাবে ইহার পুনরুল্লেখ দেখিয়া আত্মরক্ষার্থ আমায় প্রকাশ্যভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতে হইল। ক্ষীরোদ বাবু ইহার পরেই বলিতেছেন,—"দুঃখের বিষয়, পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র ভ্রমনিরাস নামক গ্রন্থে যে মৎসরতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাঁহাকে বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন।" কথাটা বড় কঠিন, —'ভ্রমনিরাস' লিখিয়াই কি শম্ভুচন্দ্র পতিত হইলেন? ভ্রমনিরাসের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আমার এক বর্ণও বক্তব্য নাই—প্রতিবাদ সত্য হউক, মিথ্যা হউক—প্রমাণ দেখিয়া সাধারণে তাহার বিচার করিবেন।—কিন্তু প্রতিবাদ করিয়া তিনি "মৎসরতার" পরিচয় দিয়াছেন—এবং এই পাপে সরাসরি বিচারে বিদ্যাসাগরের সহিত সম্বন্ধসূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত হইবেন। ইহা কাজির বিচারের অপেক্ষাও অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়। মৎসরতা শব্দের অর্থ,—'অন্য শুভদ্বেষ'। ক্ষীরোদ বাবু যদি এই অর্থে মৎসরতা শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি তাহার বন্ধু চণ্ডী বাবুর উপকারার্থ শম্ভুচন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ও অবিচার করিয়াছেন। চণ্ডী বাবু পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্রের গ্রন্থ হইতে অনেক উপকরণ আহরণ করিয়াছেন; শম্ভুচন্দ্র তাহার নিবারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি চণ্ডী বাবুর শুভকামনায় তাঁহার উপকরণ রক্ষায় প্রবৃত্ত হন নাই—ইহাতে বরং তাঁহার অন্য-শুভাকাঙ্ক্ষার প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায়। ভ্রান্ত হউক বা অভ্রান্ত হউক, একজন যাহা সত্য বলিয়া জানেন, তাহা প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইয়া যদি মৎসরতা-পরবশ বলিয়া পরিচিত হন, তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?" ('সাহিত্য', চৈত্র, ১৩০২, পৃ ৮৩৩-৩৪)।

স্পষ্ট জানা যাচ্ছে, সুরেশচন্দ্রের মুখে চণ্ডীচরণ ওকথা শোনেননি। সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ, অন্তত আলোচ্য বিষয়ে, চণ্ডীচরণের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। এ অবস্থায় শম্ভুচন্দ্রের উক্তিই অবশ্যমান্য। শম্ভুচন্দ্রের বিবাহের দিন বিদ্যাসাগর বর্ষার ভরা দামোদর সাঁতার কেটে পার হননি। ওকথা চণ্ডীচরণের রটনা।

কিন্তু সমস্ত রটনার মূলেই কিছু-না-কিছু ঘটনা আছে। হয়তো চণ্ডীচরণের এই রটনার মূলেও আছে। তা এ রকম একটা গল্প আছে বটে। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী লিখেছেন: "জেঠা মহাশয় (প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী) ও বিদ্যাসাগর মহাশয় হাঁটিয়া এই পথে কখনও কখনও কলিকাতা হইতে রাধানগরে যাইতেন; রাত্রে বামুনপাড়ায় থাকিতেন। গল্প শুনিয়াছি—একবার ঘাটে নৌকা না পাওয়ায় তাঁহারা সাঁতরাইয়া দামোদর পার হইয়াছিলেন।" (স্মৃতি-রেখা, পৃ ৫৩)

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর শোনা গল্প সত্য হলেও হতে পারে। কিন্তু তাহলেও চণ্ডীচরণের বিবরণ সত্য হয়ে ওঠে না। সত্য না হলেও চণ্ডীচরণের এই বিবরণ বাঙলাদেশে বহু প্রচারিত। এবং সেই প্রচারের সমস্ত কৃতিত্ব অথবা অকৃতিত্ব চণ্ডীচরণের।

শম্ভুচন্দ্রের ভাষা কেড়ে এনে বলতে ইচ্ছা করে: ধন্য রে দেশ! ধন্য রে মিথ্যার প্রভাব! * ধন্য চণ্ডীবাবু!

ক্রমশ

আফ্রিকার সমাজজীবনে যে প্রচণ্ড ভাঙ্গাগড়া, যে অশান্ত আলোড়ন চলছে তার দু একটা ছিটেফোঁটা নমুনা আমরা দেশে বসে খবরের কাগজ মারফত পাই। কঙ্গোর আঞ্চলিক সংঘাত ও লুমুম্বার নৃশংস হত্যা, জাঞ্জিবরে আরব প্রভুত্বের অবসান, সুদানে উত্তর-দক্ষিণে বিরোধ, ঘানার নক্রুমাবিরোধী সামরিক অভ্যুত্থান, আর কয়েক সপ্তাহ আগে বিআফ্রার স্বাধীনতা ঘোষণা। উদাহরণগুলির সবকটি ঘটেছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। স্পষ্টত এদের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা এমন ঘটনাপ্রবাহ নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে চাঞ্চল্যকর। বন্ধ, স্থাণু বাঙ্গালী মধ্যবিত্তজীবনে এরা উত্তেজনার খোরাক যোগায়। তাই খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রিকাগুলি এদের কথা বড় হরফে ছাপায়। এদের উল্লেখ করে টীকাকারেরা বলেন, আফ্রিকায় আজ বইছে 'উইন্ড অব চেঞ্জ', পরিবর্তনের হাওয়া। আরো উৎসাহী পর্যবেক্ষকরা ভাঙ্গাগড়ার উদ্দামতা ও গতিবেগ লক্ষ করে ওপরের টিপ্পনী একটু বদলে বলেন : 'উইন্ড' নয়, 'স্টর্ম অফ চেঞ্জ'— অর্থাৎ পরিবর্তনের ঝড়। কিন্তু রয়টার, এ পি কি আজাঁস ফ্রাঁস প্রেসের কৃপণ সংবাদ পরিবেশনে এইসব রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের পটভূমিকার পরিচয় অনুক্ত থাকে। আফ্রিকার সামাজিক অর্থনৈতিক রূপান্তর যে কত সুদূরপ্রসারী, তাদের প্রভাব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে কত গভীরে শেকড় গাড়তে পারে, সে খবর আমরা পাইনা বা রাখি না। আমাদের অজ্ঞতার বিরাটত্ব এ দিকটির গুরুত্বের সঙ্গে যেন পাল্লা দেয়।

আফ্রিকার সামাজিক রূপান্তরের একটা দিক হল নরনারীর সম্পর্কের পরিবর্তন। এর যথার্থ চরিত্র বুঝতে হলে দেখতে হবে সনাতন সমাজে নারীর স্থান কী ছিল। অনেক পাশ্চাত্য 'পণ্ডিত' বলেছেন, আফ্রিকানরা নারীকে দাসীর মত দেখে, বা গৃহপালিত পশুর সম্মান তার প্রাপ্য, গবাদি জন্তুর মত তার মালিকানা বদল হয়। প্রমাণ স্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে আফ্রিকার অনেকাংশে প্রচলিত কন্যাপণ প্রথা। কিন্তু কন্যাপণ কিছু কন্যামূল্য নয়, যেমন হিন্দু সমাজে উচ্চবর্ণের বিবাহের অন্যতম অঙ্গ বরপণ আর যৌতুক দিয়ে কিছু জামাই খরিদ করা হয় না। আসলে মুসলিম এলাকা ছাড়া আফ্রিকান সমাজে, নারীর স্থান পুরুষের চেয়ে এমন কিছু নীচে নয়। জনৈক কামেরুনীয়ের ভাষায় : "মেয়েরা হলো ভগবানের সমান। ভগবানের মত তারা সৃষ্টি করে মানুষকে।" আফ্রিকার অমুসলিম সমাজে পরদাপ্রথা নেই। এমন কি মুসলমানদের মধ্যেও বোরখার প্রচলন দেখা যায় না (আরব ছাড়া)। মেয়েরা স্বাধীন জেনানা, অসূর্যম্পশ্যা পরভৃতা নয়। ঘরের কাজে ঘরনী, আবার বাইরের কাজেও পিছিয়ে নেই। অবশ্যই মেয়ে পুরুষে শ্রম বিভাগ আছে। তবে কঠোর বা শ্রমসাধ্য কাজ (যথা জঙ্গল কেটে সাফ করা, সমুদ্রে মাছ-ধরা প্রভৃতি) পুরুষের ভাগে পড়ে। কিন্তু পশ্চিম আফ্রিকায় দেখেছি ধোঁয়ায় বা রোদে মাছ শুকোনো, চাষবাস, দোকান-হাটে ক্রয়-বিক্রয় এসব হল মেয়েদের এক্তিয়ারে। সত্যি কথা বলতে কী এসব দেশের বাজারগুলি ছোটখাট প্রমীলারাজ্য। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বাইরেও মেয়েদের ভূমিকা নগণ্য নয়। আকানদের পুরোহিতরা অধিকাংশই মেয়ে। অনেক সমাজে পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও পাল্লা দিয়ে পরিবার ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর কর্তৃত্বভার নেয়। কোন কোন প্রাচীন রাজ্যে রাজার পাশাপাশি রাজ-মাতারও গুরুত্বপূর্ণ দায় ও অধিকার আছে। কোথাও কোথাও দেখেছি উপ-জাতিপ্রধানের পদও মেয়েদের আয়ত্তের বাইরে নয়। সর্বোপরি অনেক সমাজে মেয়েরা রণসাজ পরতেও ছাড়েনি। ফান্টিদের লড়াকু আসাফো কোম্পানীতে মেয়েরাও ক্যাপ্টেন হতে পারে। প্রাচীন দাহোমে রাজ্যে তো এক দুর্ধর্ষ নারীবাহিনী রীতিমত যুদ্ধে অংশ নিত এবং অনেক যুদ্ধে শৌর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে একাধিক নরবাহিনীকে তারা পর্যুদস্ত করেছে।

মেয়েদের ভূমিকা অবশ্য সনাতন সমাজ কাঠামোয় বিধৃত ছিল। নারী ও পুরুষ সেখানে বৃহত্তর সমাজের বিচ্ছিন্ন একক নয়। তাঁদের জীবন ও কাজ জ্ঞাতিগোষ্ঠীর আওতায় ছড়িয়ে থাকত। তাদের পৃথক ব্যষ্টিভিত্তিক সত্তা হত অস্বীকৃত। তাই অন্যবন্ধনমুক্ত হয়ে নরনারীর মূল সম্পর্কের প্রশ্নটি সেক্ষেত্রে বড় হয়ে ধরা পড়ত না।

তারপর অনেকদিন পার হয়ে গেছে। আফ্রিকার সনাতন জীবন আজ অনেকাংশে বিপর্যস্ত। জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও যৌথ পরিবার এখনও টিঁকে থাকলেও শহরাঞ্চলে ভিড় করেছে শিকড়হীন একধরনের নারী ও পুরুষ, যাদের কাছে স্ত্রী বা স্বামীর মূল্যায়ন শুধুমাত্র পরিবারের মধ্যে তাদের ভূমিকার দিক থেকে সম্পূর্ণ নয়—নারী-পুরুষের দায় ও অধিকার, দেনা ও পাওনার মানদণ্ডেও বিচার্য। ব্যাপারটি আরও জটিল হয়েছে, কারণ ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে নারীর কাছ থেকে

পুরুষের কী কাম্য এ বিষয়ে পুরুষের মনোভাব বদলে গেছে, যেমন বদলেছে পুরুষের কাছ থেকে নারীর প্রত্যাশা।

সম্প্রতিকালে তাই আফ্রিকার শিক্ষিত মহলে নারীর অর্থনৈতিক ও যৌন-স্বাধীনতা, আদর্শ স্বামী বা স্ত্রীর মডেল, প্রেম বনাম অর্থ প্রভৃতি প্রশ্ন আলোড়ন তুলেছে। জনপ্রিয় পত্রপত্রিকাগুলি পাঠক-পাঠিকাদের (বিশেষত তরুণ-তরুণীদের) 'সুপথে' চালনার জন্য খুলেছে প্রশ্নোত্তরের পাতা। সেখানে যে কেউ তার ব্যক্তিগত সমস্যা তুলে 'আন্টি ডলি' 'মামে কমফর্ট' 'মাদাম লুলু' প্রভৃতির কাছ থেকে বিনামূল্যে উপদেশ পেতে পারে। নাইজেরিয়ার 'স্পীয়ার' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রতি সংখ্যায় আধুনিক জীবনের নানা সমস্যার আলোচনা চালায়। কিছুদিন আগে লণ্ডন থেকে জনৈক নাইজেরীয় মহিলা এই পত্রিকায় একটি চিঠি লেখেন। তাতে তিনি ইওরোপীয় পুরুষের নারীর প্রতি ব্যবহারের সঙ্গে নাইজেরীয় পুরুষের নারীর প্রতি ব্যবহারের তুলনা করেন। চিঠিটির সারমর্ম উদ্ধৃত হল :

আফ্রিকান সমাজে নারী শেখে পুরুষকে সম্মান করতে। কিন্তু পুরুষেরা নারীর প্রাপ্য সম্মান তাকে দেয় না। ইওরোপে নারীর প্রতি পুরুষের ভদ্র ব্যবহারের প্রমাণ সর্বত্র। ঘরের বাইরে খাবার সময় ইওরোপীয় পুরুষ মেয়েদের জন্য দরজা খুলে দেয়, ট্রেনে বাসে নিজে দাঁড়িয়ে মেয়েদের জন্য বসবার জায়গা করে দেয়। আর আফ্রিকায় পুরুষেরা মেয়েদের ঠেলে-ফেলে দিয়ে বাসে বা ট্রেনে বসবার আসন দখল করে। অনেক আফ্রিকান দেশে মেয়েদের একলা বাইরে বেরোতে দেওয়া হয় না। স্বামীর বন্ধু এলে স্ত্রীকে পাঠানো হয় অন্তঃপুরে। আর ইওরোপে স্ত্রী স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে গল্পগুজবে যোগ দেয়। ইওরোপে মেয়েরা সন্ধ্যে কাজে বেরোয়। অনেক আফ্রিকান নারীও তাই করতে চায়। কিন্তু পুরুষপ্রভাবিত সমাজ তাদের উৎসাহ যোগায় না।

লেখিকার উপসংহার কটু মন্তব্যে ভরা :

"বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এইসব অজ্ঞ আফ্রিকান পুরুষ চায় না, আমরা মেয়েরা তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামি। তাদের চেয়ে বেশি শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করার কথা তারা স্বপ্নেও ভাববে না। লোকে মনে করে, শিক্ষা ও বিদেশ ভ্রমণে আফ্রিকান পুরুষ আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু আসলে তারা যে তিমিরে সেই তিমিরে রয়ে গেছে।"

চিঠিটি যেন মৌচাকে ঢিল ছুঁড়ল। প্রকাশের পর কয়েক সংখ্যায় গণ্ডায় গণ্ডায় পুরুষ পাল্টা জবাব দিল। এক ভদ্রলোক লিখলেন, 'আমাদের দেশে যদি কোন পুরুষ কোন মেয়েকে বাসে সিট ছেড়ে দেন, তবে ভদ্রমহিলা তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে ইনি আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন।' আর একজন লেখিকাকে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন দেশে না ফিরে লণ্ডনেই থেকে যান, কারণ আসলে তিনি ইওরোপীয় বনে গেছেন। ক্রুদ্ধ অন্য এক পুরুষ বল্লেন, পত্রলেখিকার উচিত এখন থেকে ইওরোপীয় স্বামীর খোঁজে লেগে থাওয়া, কারণ তাঁর মত আলোকপ্রাপ্তার পক্ষে দেশে ফিরে জংলী স্বামীর ঘর করা মুশকিল হবে। আর একজন উদারচেতা যুবক পুরুষ জাতির সম্মান রক্ষায় আত্মত্যাগে ব্রতী হয়ে জানালেন, পত্রলেখিকা যদি বিবাহিতা না হন, তবে তিনি তাঁর পাণিপ্রার্থী। আর তাঁর নিজের বিদ্যে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত পত্রলেখিকা এই আত্মবিসর্জনকামীকে বিয়ে করেছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু এই বিতর্ক আধুনিক আফ্রিকান সমাজে নর-নারী সম্পর্কের কয়েকটি দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রথমত আফ্রিকান আধুনিকা আজ নিজেকে শুধুমাত্র সমষ্টির অংগ হিসাবে দেখে সন্তুষ্ট নয়। সমষ্টির অতিরিক্ত তার ব্যষ্টি সত্তা সম্পর্কেও সে সচেতন, যেমন সচেতন সে নিজের নারীত্ব সম্পর্কে। তার চৈতন্যের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন ধারণা ও কামনায় মূর্ত। ব্যক্তি হিসাবে তার এক-ধরণের প্রত্যয় ও প্রত্যাশা, যার সঙ্গে তার নারীত্বের অনুভূতির মিল কমই থাকতে পারে। আফ্রিকান নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিযানে দুটি প্রধান ফ্রণ্ট : অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও যৌন স্বাধীনতা। অন্য অনেক ক্ষেত্রের মত এখানেও আফ্রিকান আধুনিকা ইউরোপীয় অভিজ্ঞতায় তার পথ খুঁজে নিতে চায়। এ ছাড়া ইওরোপীয় ভবাদর্শ আমদানিও তার কাম্য। ইওরোপের শিভ্যালরির ফুলগাছ আফ্রিকার মাটিতে শেকড় গাড়বে কিনা এ প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা অনেক সময় হয় অবজ্ঞাত। পুরুষ পত্র-লেখকদের জবাবে বিশেষ করে এই দিকটায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তবু এরা কেউই নারীজাগরণকে অস্বীকার করেন নি। কেউ করতে পারেনও না। কারণ নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিফলন পড়ছে আফ্রিকার প্রায় সর্বত্র। নক্রুমা যুগে জনৈক মহিলা ঘানা মন্ত্রিসভার সদস্যা হন। আজ এদেশে দুর্নীতিবিরোধী যেসব কমিশন কর্মরত তার একটির তত্ত্বাবধায়িকা হলেন এক নারী। নাইজেরিয়ায় মেয়েরা ডাক্তার ও ব্যারিস্টার হয়ে নিজেদের পশার জমিয়ে তুলেছে। সম্প্রতি সে দেশে এক মেয়ে বক্সারের কথাও শোনা গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও টানজানিয়ায় একাধিক জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব এসেছে মেয়েদের কাছ থেকে। সর্বত্রই সংগ্রামমুখী জাতীয়তা-বাদী ও বামপন্থী দলগুলি বন্ধনমুক্ত নারীদের সংঘবদ্ধ করছে। এক কথায় আফ্রিকায় রাজনৈতিক আলোড়নের আড়ালে অংশত কাজ করছে নারী আন্দোলন।

অংশু দত্ত

পাবো তারে

কালকূট

কত যে জলহাস মন্তভাব স্রোতের টানে ভেসে চলেছিল আমার দু পাশ দিয়ে, তার হিসাব করতে পারিনি। নিশি ঘোর কাটে নি আমার। যেন অগাধ অসীম অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ভেসে চলেছিলাম। কখনো সোজা, কখনো এঁকেবেঁকে, কুটির ইমারত মন্দিরের পাশ দিয়ে। পথে পথে, আমার চলার স্রোতে মানুষ। আমার উজানেও অনেক। যে যার আপন পথে চলেছিল। সেই কালো রাত্রে কারুর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। সকলই অস্পষ্ট, ছায়া ছায়া। যেন আমরা কেউ মর্তভূমে নেই। যেন অন্য কোথাও কোন দূর লোকে। কালের ওপারে, সময় যেখানে বন্দী হয়ে পড়েছে। বাঁধা পড়েছে ঢাকের উন্দাম দগরের ঝম্ ঝম্ ঝন ঝন কম্পনে।

কেবল মাঝে মাঝে এক একটা আলোকিত দ্বীপ ভেসে উঠছিল। যেখানে শ্রবণ ফেটে যাওয়া ঢাকের শব্দ। ফুলঝুরি রঙমশাল দুম্ দুম্ বাজী, মানুষের ভিড় আর সেই কালীর প্রতিমা, যার সঙ্গে কেবলই চোখা-চোখি, যে-দিকেই চোখ ফেরাই। আলোর দ্বীপগুলো এক একটা পুজা বাড়ি। কারা যেন কথা বলেছিলেন। কারা যেন সামাজিকতা করেছিলেন, এইস হে, বইস হে। হয় তো বসেছিলাম, হয় তো দুই চারি কুশল বার্তা বিনিময় হয়েছিল। কিন্তু মনে নেই কিছু। কোথায় যেন আরো কিছু গাঢ়, আরো গূঢ় কিছু ছিল, মনুটির সেই অজ্ঞেয় সীমায় চলে গিয়েছিলাম।

পুজো বাড়ি সকল ছাড়িয়ে এলেই আবার অন্ধকার। ঘোর করাল সেই রাত্রি। উন্দাম উন্মত্ত নিশা। কানে আসছিল কত বিচিত্র বচন। কেউ হাসে খিলখিল, খলখল কেউ। কেউ হাঁকে রুদ্র গলায়, কেউ কাঁদে ফুঁপিয়ে। তারা কে, দেখতে পাই নি কাউকে। তারা কোন নারী, কোন পুরুষ, কাউকে চিনি নি।

তার সঙ্গে, কোথা থেকে এসেছিল বাতাস, কে জানে। রাজমহলের পাহাড় থেকে, নাকি বঙ্গোপসাগর থেকে, বুঝতে পারি নি। তালের পাতায় পাতায়, অসিধারে খান খান, সেই বাতাসে শুনেছিলাম চাপা গোঙানি গর্ গর্। পাতায় পাতায় ঝাপটা। সব মিলিয়ে যেন শাসানি গোঙানি প্রহার। কিন্তু সাবধান হে, অন্ধকারে পা পড়ে গিয়েছিল কার গায়ে। মেয়ে গলায় শুনেছিলাম অস্ফুট আর্তনাদ, 'উহ্!'

যেন অবশ হয়েছিল পা। কালো ডাগরী মেয়েটির আঢাকা বুক মুখ বাহু কেমন করে চোখে পড়েছিল জানি না। কালো চোখ দুটিতে যেন ব্যথার তরাস। আমি ত্রাসে লজ্জায় বিমূঢ়। সঙ্গের সঙ্গী হেঁকে উঠেছিল, 'পথের উপর শুয়ে রইছিস। সরে শুবি ত!'

তখন, লক্ষ পড়েছিল, কেবল যাতায়াত না। মনুটির পথে-পথে মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। মন্দিরের ধারে, কুটিরের পাশে, ইমারতের দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে। মেয়ে পুরুষ শিশু, সপরিবারে সাঁওতাল প্রজারা এসেছে রাজার গ্রামে। পুজায় এসেছে। যে যেখানে পেরেছে, পেতেছে রাতের আস্তানা। মন্ত্র পুজা যা কিছু, আর্য নিয়মের পার, তাদের উৎসব। তখন সেই প্রতীক্ষা।

[illegible] কারুর বিলাজ বাঁশী। কেউ বাজাচ্ছিল, কেউ মাদল বুকে ধরে নুয়ে কাঁদছে। তারই মধ্যে কোন মেয়ের গলায় গুনগুনানি। পুরুষের [illegible] খাওয়া মন্দা পায়রার বক-বকম্। আর বাঁশ থেকে থেকে, হঠাৎ কারুর হাতের কেরোসিনের টিমটিম [illegible] আলো ভেসে উঠছিল, তখন [illegible] অলৌকিক। জীবন্ত নরনারী, আর [illegible] আলোয় কাঁপা কাঁপা মন্দিরের [illegible] দেবতারা, সকলই যেন একাকার [illegible] উঠছিল।

[illegible] দাউড়িল। কখন এক [illegible] সারির

নিচে, বাবলা বনের ধারে, এক মন্দিরের কালো জমাট মূর্তির পাশ দিয়ে, সহসা ভেসে উঠেছিল আগুনের লেলিহান শিখা। কাছে না, দূরে—এক উৎরাইয়ের মন্থর ঢালুর ওপারে, প্রান্তরে। সারি সারি চিতার মত, পাশাপাশি, আগুনের কুণ্ড। কালো আকাশের তারায় হাতবাড়ানো শিখা। দু একটা কালো ছোট ছোট মানুষের মূর্তি, সেখানে ভেসে ভেসে উঠছিল।

ওখানে কী। ওরা কারা। কী করে।

এই যখন মনে মনে জিজ্ঞাসা, সঙ্গের সঙ্গীরা নিজেরাই বলে উঠেছিল, 'উয়ারা রস জ্বাল দিচ্ছে। পচুই রস সব চোলাই হচ্ছে, কালকের জন্যে।'

তারপরেই যেন একটা স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। তাই, কী বইলব হে, অমন নিঝুম নিশ্চুপে কেউ সোজা খাড়া থাকতে পারে না। ঢাকের দগরে কম্পন থেমে গিয়েছিল। এত নিশ্চুপ, ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা গিয়েছিল। পাখীর স্খলিত গলা। যেন ভুলে ডেকে উঠে থেমে গিয়েছিল। কিন্তু সেই নিশ্চুপ স্তব্ধতায় যেন আমার শিরদাড়ায় কাঁপুনি লেগে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, কী যেন ঘটতে চলেছে। একটা ভয়ংকর কিছু। তারই পূর্বমূহূর্তের নিশ্চুপ নিশ্চলতায় সব কিছু থমকে গিয়েছিল। সর্বচরাচর।

নিজের, সঙ্গীদের পায়ের শব্দে শব্দে কখন ফিরতে আরম্ভ করেছিলাম, জানি না। হঠাৎ, আচমকা ছুরি বেঁধার মত একটা আর্ত চীৎকার উঠেছিল। অসহায় পশুর চীৎকার। তখন আমি এক আলোকের দ্বীপে, পুজোবাড়িতে। কোন বাড়ি, কোন রাজার, কিছুই বুঝতে পারিনি। তাকিয়ে দেখার কথা মনে ছিল না।

কেবল দেখেছিলাম, জলে ভেজানো কালো চকচকে একটা প্রকাণ্ড মূর্তি পাক দিয়ে ফিরছে। চক্ষু তার আরক্ত, চাহনি ক্ষ্যাপা। সে একবার এদিকে ছুটে যায়, আবার ওদিকে। ছোটরা তার চোখের সামনে ফুল-ঝুরি রংমশাল জ্বালিয়ে ধরছিল। কেউ শব্দ করছিল পটকার। কেউ টেনে ধরছিল তার ল্যাজ। কালো মূর্তি ভয়ে রাগে তার নাতিদীর্ঘ শিং নিয়ে ঢুঁ মারতে আসছিল। নয় তো পালাতে চাইছিল। কিন্তু খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছিল সে।

তারপরেই তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যূপকাষ্ঠের কাছে। সেই কালো মূর্তির অন্ধকার প্রাণে কী ভাব এসেছিল, কে জানে। যমের বাহন সে মহিষ, আপন ঈশ্বরের কথা হয়েছিল নাকি। কার দুটো বলিষ্ঠ হাত যূপকাষ্ঠের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিয়েছিল তার গর্দান। আর এক জোড়া ঘিয়ে ডোবানো হাত এগিয়ে এসে, তার গলায় মর্দন করতে আরম্ভ করেছিল। তখন একজন সামনের দড়ি ধরে টানছিল। আর একজন পিছন থেকে। আর কেবলই, মর্দন-মর্দন।

অই, কী অন্ধকার হে, ধূর্জটি, তুমি আমার বুকের নিশ্বাস যেন বন্ধ করে দিয়েছিলে। আমার দৃষ্টিকে অসহায় করে তুলেছিলে। ঢাকের পিঠে সহস্র কাঠির সজোর শব্দে দগর উঠেছিল। আবার সেই কম্পন। সেও যেন এক স্তব্ধতা। মহা-কালকে বন্দী করে রাখা।

তারপরেই খাঁড়া উঠেছিল শূন্যে। শাণিত উজ্জ্বল ধারে দেখেছিলাম, দুটি চোখ আঁকা খাঁড়া। আমার দৃষ্টি চকিতে একবার ছুটেছিল প্রতিমার দিকে। সেই চোখ! সেই চক্ষু! আমার অংগেই যেন তখনো তার চোখাচোখি। পরমূহূর্তেই কী ঘটে গিয়েছিল। খাঁড়া একবার ঝিলিক হেনে নেমে গিয়েছিল নিঃশব্দে।

যমের বাহন তখন ছিন্ন। কালো এক বিশাল ধড়, আকুঞ্চিত, অস্থির বেগে থরথর

পাশাপাশি। কিন্তু, তার কণ্ঠনালী থেকে নির্গত প্রথম রক্তের ফোঁটা লাগিয়ে দিয়েছিল পুরোহিতের মধ্যম আঙুলে। প্রতিটি কপালে কপালে লাগিয়ে দিয়েছিল নিহতের রক্তের ফোঁটা।

কখন এক সময়ে, সেই আঙুল ছুঁয়ে দিয়েছিল আমার কপাল। তখনো রক্ত ঠাণ্ডা হয়নি। কপালে একটা উষ্ণ স্পর্শের মত লেগেছিল। আমার গায়ের মধ্যে শিউরে উঠেছিল। বুকের মধ্যে একটা আর্তধ্বনি শুনতে পেয়েছিলাম যেন। তখনই কালো কাঁচ নখর আর একটি জীব তুলে দেওয়া হয়েছিল যূপকাষ্ঠে। আমি চোখ বুজে ফেলেছিলাম। আমার সেই নিশির ঘোর, আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল আলোর বাইরে। অন্ধকারে কোথায় চলেছিলাম জানি না। কেবল সেই দোতলার ঘরটির সন্ধানে চলেছিলাম।

অই, কী অন্ধকার হে! চারদিকে ঢাকের পটহ ধ্বনি, পশুর চীৎকার, মানুষের উল্লাস। আরো, আরো কিছু, চারপাশে, বিহ্বল কুহর, শীৎকার, কাঁচ রুপোর চুড়ির নিক্কণ। কুথা হে, সেই ঘরখানি!

আমার প্রথম বার দেখা, বিচিত্রের সন্ধানে ফেরা, কী বিচিত্র দেখেছিলাম। কার খোঁজে ঘুরে ফিরি, কিসের সন্ধানে, এদিনে যেমন জানি না, সেদিনেও না। যখন যা পেয়েছি, নিয়েছি মন ভরে। কিছু গিয়েছে উপছে, কিছু পুরোণ ঝোলার ছিদ্রে গিয়েছে ঝরে। যা কিছু থেকে গিয়েছে, সে-ই আমার অচিনে ফেরার অধরা কি না জানি না। যদি তাই, তবে সেই আমার মলুটির এক রাত্রি, এক দিনের স্মৃতি। নির্বাকে, যেখানে কেবল, বুকের কাছে হাত জড়ো করে, দু চোখ মেলে তাকিয়েছিলাম।

এ কথা বলব না, আমার অনুভূতির গোচরে কিছু ধরা দিয়েছিল। এ কথা বলব, পৃথিবীর এক ঠাঁই, মানুষের এক লীলা দেখেছিলাম।

অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে, কেমন করে আমার নিমন্ত্রণের বাড়ি এসেছিলাম, জানি

না। সেখানেও সেই ঢাকের নিরন্তর বাজনা, পশুর চীৎকার, মানুষের উল্লাস। কালো কালী ধলা ধলী রাঙারাঙী কতেক নারী-পুরুষ, প্রতিমা আর যূপকাষ্ঠ ঘিরে। কী আশ্চর্য হে, বড়বায় যেন কেমন আচ্ছন্ন। কাছে দাঁড়িয়ে তিনি আমাকে চিনতে পারেন নি। ছোটরায়ও না। তাঁদের রাঙা মুখে তখন যেন কিসের ঘোর।

আমি বাড়ির মধ্যে গিয়েছিলাম। সেখানে তখন একটি মাত্র আলো, এক দাওয়ার কাছে টিমটিম করছিল। যেন সেখানে উৎসব বৃত্তিতে হাহাকার। উঠোন পেরিয়ে, দীপ্ৃণের দাওয়ায় উঠে, ডান দিকে ফিরে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। আবার থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল।

কে যেন কোথায় বলছিল, 'না না না।'

মেয়েলি স্বরে কান্নার আভাস। তারপরে পুরুষের গলা, 'এ্যাই তোর পায়ে ধরি, অন্যায় হয়ে গেছে, মাইরি।'

যেন আর এক জগত। রক্তের উৎসব থেকে, মুরলী ধ্বনি বলে, 'দেহি পদপল্লব-মুদারম্।' গলা চিনতে ভুল করিনি।

সেই ডাকা আর ডাকিনী, ধন্দু আর ত্রিপদ্। কিন্তু কোথায়, আওয়াজ বোঝে কোথা থেকে।
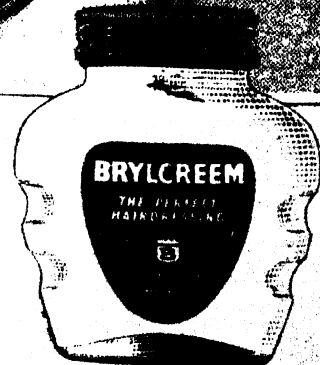
তারপরে ত্রস্ত রোষ, 'এই বইলছি, পায়ে হাত দিও না। আমি যাব না পূজা দেখতে।'

'ছিপ্‌, তু নক্‌কী মেয়ে, কথা শুনিবি না।'

তাই, ওহে পুরুষ, তুমদিগে চিনতে বাকী নাই। তাই কান্না ঝাঁজানো গলায় বেজেছিল, 'না না না। কানে, লজ্জা করে না, মুখ দেখবে না বইলছিলে। মুখে থাপপড় মারবে।'

ওরে পুরুষ, তখন কী ধনে ধনী হয়ে অমন বুলি বলেছিলি, মনে ছিল না। আর তোষবার সময় বলছিল, 'মাইরি বইলছি, অন্যায় হয়ে গেছে, আাই শোন্‌ ছিপ্‌—।'

মানভঞ্জনের পালা, আর কিছু শোনবার ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়েছিলাম। এক কোণে একটি টিমটিমে বাতি ছিল। সেই আলোয় জামা খুলে, পাতা বিছানায় লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম। বারান্দার দরজার কাছ থেকে সুষির গলা জেগে উঠেছিল, 'খাবেন না?'

একটু চমক খেতে হয়েছিল। কিন্তু মলুটির নিশিঘোর আমার মন মস্তিষ্কের সীমায় সীমায়। সেই ঘোরে একটু চমক লেগেছিল। সুষি এখানে কেন, এই অন্ধকারে, নিরালা নিজর্নে, উৎসবের আসর ছেড়ে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি পূজার ওখানে যাও নি?'

'না।'

ছোট জবাব, কিন্তু ছোট না। স্বর এসেছিল যেন অনেক দূর থেকে। কী একটা সুরে ছিল, ধরতে পারি নি। যেন কিসের ভারে চাপ খাওয়া সুরের মত। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন।'

'ভাল লাগে না।'

কার্তিকের চতুর্দশী মহানিশায়, মলুটিতে নতুন কথা! নতুন সুর, নতুন ভাব। ভাল লাগে না! টিমটিমে অস্পষ্ট আলোয় দেখেছিলাম, সুষির মাথা নিচু। কোন এক অবসরে, খোঁপা বাঁধবার সময় হয়েছিল ওর। সেই খোঁপাটি, নত মাথায় বড় হয়ে জেগেছিল। একটু বুঝি সাজতেও হয়েছিল। কিছু রঙ্গীন বসন, কিছু চাকচিক্য।

আস্তে আস্তে মাথা তুলেছিল। দেখেছিলাম, কপালে একটি টিপ। যেন দু চোখে দুই তারা, কপালে আর এক। সেখানে হাসির ঝিলিক না, উৎসবের উল্লাস না। নির্বাক বিস্ময়াহত বিমর্ষ মুখ। তার চেয়ে বেশী, যেন ভিতরে প্লাবন বহে, বাইরে থম্‌থম্‌।

আমার জিজ্ঞাসু মুখের দিকে, একটু চেয়ে থেকে, আবার বলেছিল, 'আমি দেখতে পারি না।'

কী দেখতে পারে না, সে কথা আর জিজ্ঞেস করিনি। হঠাৎ দেখেছিলাম, কালো টিপপরা ত্রিনয়নী মেয়েটির চোখের কোণে জল জমে উঠেছে। আবার বলেছিল, 'আমি পারি না।'

বলেই সুষি পিছন ফিরে, বারান্দার কোল আঁধারে সরে গিয়েছিল। আমি চুপ করে বসেছিলাম। বাইরে পূজা দালানে, উল্লাস বাজনা পশুর চীৎকার। ঘরের নিচে, অন্ধকারে 'দেহিপদপল্লব মুদারম্‌'-এর সুর, ওপরে 'শ্রীমতী নামে সে দাসী' রক্তের ধুলোয় যে অহিংসার সাহসে কাঁদে।

মনে হয়েছিল, পথ চলার, এমন বিচিত্র ছবি আর কবে দেখেছি। বারে বারে বুকের কাছে হাত এনে, কাকে যে নমস্কার করতে চেয়েছিলাম, জানি না। কেবল, প্রার্থনা করেছিলাম আমার মনকে স্পন্দিত রাখতে দাও, আমার চোখ খোলা রাখো।

একটু পরেই আবার সুষি দরজায় ভেসে উঠেছিল। তখন তার দৃষ্টিতে ও গলায় সচ্ছতা। বলেছিল, 'আপনি চলে এলেন কেন?'

মন খুলেই বলেছিলাম, 'তোমাদের এই মলুটির এক নিশির ঘোর লেগেছে আমার। আমি যেন ঠিক কিছুই বুঝতে পারছি না। অথচ পারছি।'

সুষি এক মুহূর্ত, তিন চোখে অপলক চেয়েছিল আমার দিকে। দৃষ্টিতে অনুসন্ধিৎসা, কিছু বা বিস্ময়। হঠাৎ চোখ নামিয়ে আবার তাকিয়েছিল। তখন যেন ওর কালো মুখে হাসি ফুটেছিল একটু। বলেছিল, 'যাদের সঙ্গে গেছলেন, তারা কোথায়?'

'জানি না।'

'ওদের সঙ্গে যদি একটু মেতে যেতেন, তা হলে সব ঠিক লাগত।'

কথাটা ঠিক হৃদয়ংগম হয় নি। তা-ই অবাক চোখে তাকিয়েছিলাম।

সুষি যেন একটু লজ্জা পেয়ে হেসেছিল। বলেছিল, যেমন ঠাকুরের যেমন পুজো। জানেন তো, কারণবারি ছাড়া এ পুজো হয় না।'

বলেও সুষি আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আর বেশী বলবার দরকার ছিল না। সেইটুকু ইংগিতেই বুঝতে পেরেছিলাম, ওর বক্তব্য কী। কিন্তু সুষির একটু বুঝতে ভুল হয়েছিল। আমি মেতেছিলাম ঠিকই। সে-মাতনের চেহারাটা অন্যরকম। আমার সমগ্র অনুভূতি জুড়ে তার খেলা। এমনি তার প্রাণ ধাঁধানো ঝলক, অসীম বিস্ময়, প্রায় এক অলৌকিকের রহস্যে যেন বিবশ হয়েছিলাম। তার চেয়ে বলি, আমার ঘোর লেগেছিল, মাতনের ঘোর। বলেছিলাম, 'তার দরকার নেই। বৈঠিক আমার লাগেনি কিছুই। এমন আর কখনো দেখিনি।'

সুষি তাড়াতাড়ি দু পা এগিয়ে এসেছিল। অবাক ত্রস্ত গলায় বলেছিল, 'রাগ করলেন নাকি।'

হেসে বলেছিলাম, 'না।'

তারপর সুষির চোখের দিকে এক পলক দেখে, জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মলুটির পুজো কি এই তোমার প্রথম দেখা?'

সুষি ভুরু তুলে বলেছিল, 'না না ছেলেবেলা থেকেই দেখছি।'

'তবে তুমি দেখতে পার না কেন?'

সুষি একটু চুপ করেছিল। মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল টিমটিমে আলোটার দিকে। দৃষ্টি দেখে মনে হয়েছিল, সে-ঘর থেকে ও যেন অন্য কোথায় চলে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে বলেছিল, 'ছেলেবেলায় বেশ ভাল লাগত। তারপরে যত বড় হতে লাগলাম, আর ভাল লাগত না। বাবা মারা যাবার পর, বলি দেখতে আর কখনো যাই না।'

দেখেছিলাম, এক হরিণী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। সংসার যাকে অসহায় করেছে। ব্যাধভীতা হরিণী করেছে। পিতৃহীনা

একটি মেয়ে, যে তার চারপাশে দেখেছে অনেক উদ্যত খড়গের ভিড়। যে তার নিজের বুকে কান পেতে শুনেছে অসহায়ের আর্তনাদ। চারদিকে তার অনেক যূপকাষ্ঠ, ক্ষুধা-অসম্মান-অনিরাপত্তা অপ্রতিষ্ঠা।

বাইরে বাজনা উল্লাস আর্তনাদ। ঘরের মধ্যে তখন, সুষির দিকে তাকিয়ে, আমার ঘোরের মধ্যেও এক নিবিড় মমতা স্পন্দিত হচ্ছিল। ইচ্ছা করেছিল, মেয়েটিকে কাছে ডেকে একটু স্নেহ করি। অনেক কথা ও বলে নি। কয়েকটি কথার মধ্যে ওর ভিতরের পুরো ছবিটা ভাসছিল।

'আপনাকে খেতে দিই?'

কথা শুনে চমক ভেঙেছিল। চোখ ফেরাতে ভুলেছিলাম। পুরুষের অপলক চোখের সামনে, কখন লজ্জায় সংকোচে কুঁকড়ে উঠেছিল সুষি। ঘোর ভাঙাবার জন্যেই, ডেকে কথা বলেছিল। আবার বলেছিল, 'জেঠি বলেছে, আপনি ফিরে এলে খেতে দিতে। রাত কিন্তু দুটো বেজে গেছে।'

দুটো! হাত তুলে ঘড়ি দেখেছিলাম। দুটো না, তার চেয়ে আধঘণ্টা বেশী। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আর সবাই খাবে কখন?'

সুষি বলেছিল, 'তার কোন ঠিক নেই।'

ক্ষুধার অনুভূতি আমার একটুও ছিল না। মলুটির নিশি ঘোরের মধ্যে, স্নায়ুতন্ত্রে কেমন একটা শৈথিল্যের আচ্ছন্নতা নিবিড় হয়ে এসেছিল। বলেছিলাম, 'খাবার ইচ্ছা একটুও নেই। তার চেয়ে একটু শুয়ে থাকি।'

শরীর এলিয়ে দিয়েছিলাম। সুষি বলেছিল, 'তবে বাতিটা একেবারে নিভিয়ে দিই।'

ঘরটা অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি কী করবে এখন?'

অন্ধকারের মধ্যে সুষির গলা শোনা গিয়েছিল, 'বারান্দায় বসে থাকব।'

'শুতে পার তো।'

'আমার ঘুম আসবে না।'

আমি চুপ করেছিলাম। টের পাইনি, সুষি বারান্দায় গিয়েছে কিনা। সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, বুঝতে পারিনি। নিকষ অন্ধকারে, আমার চোখের সামনে, তবু সুষির মুখটিই ভাসছিল। আর ওর অকপট করুণ স্বর, শ্রবণে বাজছিল, 'আমার ঘুম আসবে না।'...বাইরে বলির উৎসব তেমনিই চলছিল। আমার চেতনা কখন হারিয়ে গিয়েছিল, জানতে পারিনি।

সহসা কানের কাছে যেন ঢাকের দগর বেজে উঠেছিল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেছিলাম, দিনের আলো। আমার সারা গায়ে ঘাম। নিচে নেমে, থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। উঠান ভরে রক্ত। গলি দিয়ে চোখে পড়েছিল, পুজো মণ্ডপে তেমনি ভিড়। সেই বাজনা, সেই উল্লাস, সেই আর্তনাদ।

রোদের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম, বেলা কম হয়নি। বলি তখনো থামেনি। গলিটা রক্তে ভাসছিল। কখন যে হাতমুখ ধুয়েছিলাম, সুষির কাছ থেকে চা খেয়েছিলাম, এখন মনে করতেও পারি না। মলুটির নিশি আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

দেখেছিলাম, মলুটির পথে পথে রক্তের স্রোত। মুণ্ডহীন রক্তাক্ত বলির দেহ নিয়ে, শূন্যে ছুঁড়ে লোফালুফি। হাত দিয়ে, ছাল ছাড়িয়ে, দগদগে ধড় কাঁধে করে মত্ত কুর্দন নর্তন। অই কী বইলব হে, রক্ত নিয়ে গায়ে ছোঁড়াছুঁড়ি, রক্ত ছিটিয়ে খেলা। গত রাত্রির রক্তপাত, দিনের বেলাও সমানে চলছিল। মলুটির লাল মাটিতে, রক্তে রক্তে দইকাদা।

তার সঙ্গে, রসের অনুপান। সাঁওতাল মেয়ে পুরুষেরা, পাত্র উজাড় করা মত্ততায়, কলকল ঢলঢল। ঢাকীদেরও সেই দশা। ঢুকুঢুকু রসের ধারায়, হাতে তাদের অসুর শক্তি। থামতে ভুলে গিয়েছিল। দাঁড়াতে ভুলে গিয়েছিল। ছুটে ছুটে, পাক দিয়ে দিয়ে শূন্যে লম্ফ নাচ। রক্ত চোখে মত্ত দৃষ্টি, মাতাল মুখে রসের ঝলক।

যেন চতুর্দশীর অমানিশা তখনো শেষ হয়নি। ঢাকের বাজনায়, রক্তে, নৃত্যে, উল্লাসে, সময় সেখানে বাঁধা পড়েছিল। ভদ্রাভদ্র, সকলের এক দশা। বড়রায় ছোটরায়, সবাই উল্লাসের ঘোরে। তবু তার মধ্যেই পুছাপুছি কাজকর্ম সবই চলছিল।

কেমন করে যে দুপুরের, স্নানহার মিটেছিল, সেই স্মৃতি অস্পষ্ট। দেখেছিলাম, মলুটির পথে পথে কোথা থেকে এসেছিল মনোহারির দোকানদার। ঘণ্টা বাজানো মিঠাইওয়ালা। আর এসেছিল, ঝাঁপি মাথায় মেয়ে পুরুষ সাপুড়ে।

তারা ঝাঁপি খুলে, সাপ ছড়িয়ে দিয়েছিল পুজো বাড়ির উঠানে। খেলিয়েছিল মলুটির ক্ষ্যাপা ভিড়ের পথে পথে। 'অইগ, ই দেখে লাও চন্দ্রবোরা। লীলেতে সনার চক্কর। আসমানে তারা হে!' বলে আবার মেয়ে সাপুড়ে, তার ক্ষীণ কটি গুরুনিতম্বে, চন্দ্রবোরা জড়িয়ে পাছাবাহার দেখিয়েছিল। কোমর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেচেছিল। কেউটে নিয়ে সোহাগ করে বুকের উপর ছেড়ে দিয়ে চাপড়ে চাপড়ে বলেছিল, 'লেটো করে থাক রে নাগ, ঘুম যা।'

আর সাপুড়ে গলায় ঝুলিয়ে অজগর, দুধ গোখরোর ফণা গিলেছিল হাঁ করে। অই হে, তোমার গায়ে কাটা দিলে, কী হবে। ই দাখ গ, নাগিনীর চুমা কেমন লাগে। সাপুড়েকে শব্দ করে চুমো খেয়েছিল। সাপিনী তার লকলকে জিভ দিয়ে, সাপুড়ের মুখের ভিতর চেটেছিল। মাতাল সাঁওতালী মেয়েরা তখন গুনগুনিয়ে গান গেয়ে উঠেছিল। তাদের চোখে মুখে রসের ঝলকে, রসের গলন।

মলুটিতে না গেলে, অমন সাপ খেলাও দেখতে পেতাম না। ক্রমশ

অভিনব তাপমান যন্ত্রের মাঝখানে ছোট্ট কালো রঙের গুলিটি হচ্ছে নকল হীরা
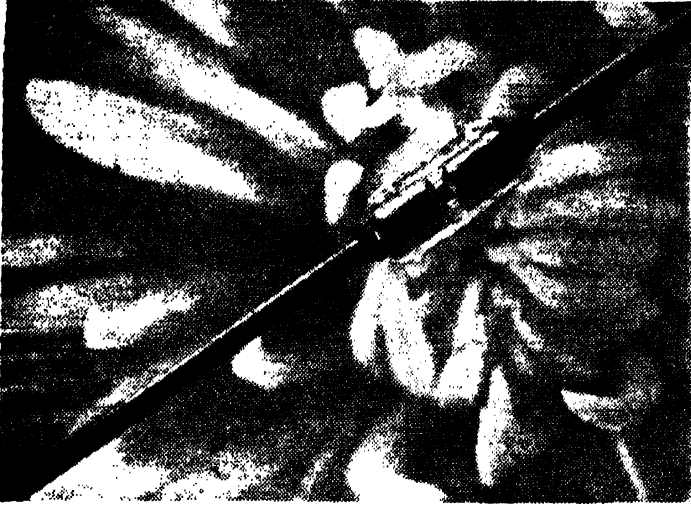
সংবাদ চয়নিকা

একটি অনুমান প্রমাণিত

এন্টার্টিকায় এমন এলাকাও আছে যেখানে সব সময় তুষার থাকে না। ভিকটোরিয়া ল্যাণ্ডের দক্ষিণ ভাগে সেইরকম এক তুষারবিহীন উপত্যকার ৭০ মাইল পূবে আমেরিকার ম্যাকমার্ডো মেরু গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত। সেই উপত্যকায় আজ ৬০ বছর হয়ে গেল বহু সীল মাছের কংকাল ও ১২০০ বছরের পুরানো মমীভূত দেহ পাওয়া যাচ্ছে। সমুদ্র থেকে ৩৫ মাইল দূরে ৬০০০ ফুট উচ্চতায় ঐ জীবগুলির দেহাবশেষ এল কি করে তাই নিয়ে বিজ্ঞানীরা এতদিন মাথা ঘামিয়ে আসছেন। তাঁদের ধারণা যে মাঝে মাঝে কোন কোন সীল এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে বহু দূরে চলে গিয়ে পথ হারিয়ে ক্লান্ত হয়ে না খেয়ে মারা যেত।

এই ধারণা যে ভিত্তিহীন নয় তার প্রমাণের জন্য তাঁরা জল থেকে ঐ রকম দূরে কোন জীবন্ত বা সদ্যমৃত সীল পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করে দেখছিলেন। হালে আমেরিকার ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশনের ডঃ ওয়েকফীল্ড ডর্ট জুনিয়ার (কানাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক) এবং ব্রিটেনের এডোয়ার্ড ডার্বিশায়ার (কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের) দক্ষিণ মেরু গবেষণায় গিয়ে সমুদ্র থেকে বহু দূরে একটি হালে মৃত সীলের সন্ধান পান যার ফলে এতদিনকার ধারণাটি সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সেই সীলের বাচ্ছাটির জন্ম হয়েছিল অনুমান ১৯৬৬ সালে। সেটি পাওয়া যায় জল থেকে ২০ মাইল দূরে ১৫০০ ফুট উচ্চতায়।

চান্দ্র ভূতত্ত্ব

ভূতত্ত্ব শব্দটি ভূ অর্থাৎ পৃথিবীকে নিয়েই তৈরি। কিন্তু অন্য গ্রহের ক্ষেত্রেও আজকাল শব্দটি প্রয়োগ করা হচ্ছে। যেমন হালে বিজ্ঞানের রাজ্যে আবির্ভূত হয়েছে নূতনতম এক শাখা—চান্দ্র ভূতত্ত্ব। পৃথিবীতে ভূতত্ত্বের কাজ হচ্ছে ভূত্বক নিয়ে। তেমনি চান্দ্র ভূতত্ত্বের কাজ হবে চন্দ্রত্বকের গঠন পরীক্ষা করা।

রুশ ও মার্কিন চন্দ্রগামীযানগুলির কল্যাণেই বিজ্ঞানের এই নতুন শাখাটির জন্ম হলো। সার্ভেয়ার-৩ মহাকাশযানের খন্তা চাঁদের জমি খুঁড়ে মাটি তুলেছে, অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা "দেখেছে" ও "অনুভব" করেছে সে সম্পর্কে সংকেত পাঠিয়েছে, টেলিভিশন ক্যামেরা পাঠিয়েছে ছবি। তার আগে অর্বিটার-২ একটি ৩০ ফুট ব্যাসের পাথরের যে ছবি তুলে পাঠায় বৈজ্ঞানিকরা সেটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। অর্বিটারের একটি কর্তব্য ছিল ভাবী চন্দ্রলোকের যাত্রীদের জন্য চাঁদে নামবার উপযুক্ত জায়গা বার করা এবং মহাকাশযানটি ১৬ ফুট চওড়া ২২৪০ ফুট লম্বা একটি সমতল পথের সন্ধান পায় যেটি চাঁদের শান্তি সাগরে অবস্থিত।

বৈজ্ঞানিকরা মনে করছেন যে চাঁদের অধিকাংশ পাথর পতিত উল্কার আঘাতে গহ্বর থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়।

খনি বিস্ফোরণ সম্পর্কে নতুন তথ্য

মার্কিন খনি গবেষণা ব্যুরো কয়লাখনিতে বিস্ফোরণ সম্পর্কে হালে কিছু নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ব্যুরোর গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন যে কয়লার ধুলো বা মেথেন গ্যাস বায়ুর সংস্পর্শে এলে যতটা বিস্ফোরক হয় তার চেয়েও অনেক বেশি বিস্ফোরক হয় সে দুটি যদি পরস্পরের সঙ্গে মেশে। দুটি বস্তুর আলাদা আলাদা প্রতিক্রিয়ার যোগফলের চেয়ে সেই দুটির যুগপৎ প্রতিক্রিয়ার মান যদি বেশি হয় তাকে রসায়ন বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় "সিনার্জিজম্।" কয়লার গুঁড়া ও মেথেন মিশলে সেই ব্যাপার ঘটে।

মেথেন বা 'ফায়ার ড্যাম্প' কয়লাখনির এক দাহ্য গ্যাস। গবেষকরা বলছেন যে খনিতে যে সব বিস্ফোরণের দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে কয়লার গুঁড়ো ও মেথেন মিশবার ফলে ঘটে। প্রথমে কোন একটি জায়গায় মেথেন থেকে যে কোন কারণে এক ঝলক আগুন জ্বলে ওঠে। তারই ধাক্কা কয়লা গুঁড়োগুলিকে নাড়াচড়া দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেই মিশ্র পদার্থ থেকে বিস্ফোরণ ঘটে।

পিটসবুর্গ গবেষণাগারে গবেষকরা নির্ধারণ করেছেন।যে খনি থেকে কতটা মেথেন বাদ দিয়ে, কতটা কয়লার গুঁড়ো যোগ

করলে বিপদ নিবারিত হতে পারে।

বৃষ্টি গবেষণা

ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হান্স প্রুপাচার ও মরিস নিয়েবুর্গার নামে দুজন আবহ-বৈজ্ঞানিক মেঘ থেকে বৃষ্টির উৎপত্তি নিয়ে গবেষণা করছেন এক অভিনব "মেঘ সুড়ঙ্গের" সাহায্য নিয়ে। প্রকৃতিতে কি ভাবে বৃষ্টি, তুষার ও শিলার উৎপত্তি হয়, এই হচ্ছে তাঁদের গবেষণার বিষয়।

১০ ফুট উঁচু সুড়ঙ্গটি ঠিক মেঘের মত। মেঘের মধ্যে দিয়ে যেমন বায়ু প্রবাহ চলে এই কৃত্রিম মেঘের মধ্যে দিয়েও ঠিক সেই রকম বায়ু প্রবাহিত করা হয়। সেই বায়ু প্রবাহের উপর ভেসে বেড়ায় পিং পং বলের মত জলবিন্দু ও বরফের কেলাস। সেইসব ছোট ছোট জলবিন্দু কিভাবে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটায় রূপান্তরিত হয় বৈজ্ঞানিকরা সেই প্রক্রিয়ার সিনেক্যামেরায় ছবি তুলছেন। এই গবেষণা আবহ নিয়ন্ত্রণের সহায় হবে।

মাছ মারা ওষুধ

প্রায় ২০ বছর গবেষণার পর উইস্কনসিনের বৈজ্ঞানিক মিঃ ফ্র্যাংক স্নীং এমন এক ওষুধ বার করেছেন যা পুকুরে ও হ্রদে অবাঞ্ছিত জাতীয় মাছ মেরে ফেলতে পারে। অন্য মাছ বা জীবের কিন্তু ঐ ওষুধে কোন ক্ষতি হবে না। ওষুধটির নাম অ্যান্টি-মাইসিন। ওষুধটি খুব পাংলা করে জলে মিশিয়ে দিলে ঐসব বিশেষ জাতীয় মাছের কানকোয় শোষিত হয়ে তাদের শ্বাসক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। কোন মাছ মরবে সেটা ওষুধটি কত পাংলা করা হলো তার উপর নির্ভর করে।

অভিনব তাপমান যন্ত্র

আমেরিকায় হালে এক অভিনব তাপমান যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে যা শূন্যে ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের ১৯৮ ডিগ্রী নিচে এবং ৬৪৯ ডিগ্রী উপরে পর্যন্ত তাপ পরিমাপ করতে পারে। যন্ত্রটির মানদণ্ড হচ্ছে একটি নকল হীরা যা ঐ কাজের জন্য বিশেষ ভাবে নির্মিত। হীরাটির ধর্ম সেমিকণ্ডাকটার বস্তুর মত অর্থাৎ অপরিবাহক বস্তুর চেয়ে ভাল ভাবে এবং ধাতুর চেয়ে খারাপ ভাবে বিদ্যুৎ পরিবহণ করে। তাপমাত্রা যত কম হয় হীরাটি তত বেশি বিদ্যুৎ পরিবহণ করে, আর তাপমাত্রা যত বেশি হয় তত কম বিদ্যুৎ পরিবহণ করে। সুতরাং সময় বিশেষে তার পরিবাহকতার মাত্রা হিসাব করে নির্ভুল ভাবে তাপমাত্রা নির্ধারণ করা যায়।

যে রকম ঠাণ্ডায় বাষ্পীয় পদার্থ তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয় এবং যে রকম প্রচণ্ড তাপে কঠিন পদার্থ রক্তাভ হয়ে ওঠে সেইরকম তাপমাত্রা নির্ণয় করার জন্য এই তাপমানযন্ত্র উপযোগী। তার মানে শিল্প বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মহাকাশযাত্রার কল কৌশল নির্মাণে এই যন্ত্র কাজে লাগবে।

উল্কার উৎস

আজ থেকে ন্যূনাধিক ৬৫ কোটি বছর আগে মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষপথের মধ্যবর্তী এলাকায় দুটি গ্রহাণুর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে সে দুটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। মার্কিন পার্ডিউ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মাইকেল লিপস্যুৎজ বলেছেন যে, সেই গ্রহাণু দুটির খণ্ডগুলি আজও উল্কা হয়ে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ছে। তাঁর মতে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত উল্কা পড়েছে তার অর্ধেকেরও বেশি নাকি সেই ঘটনাজাত। সেগুলির পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে বহু লক্ষ বছর লেগেছে।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

দিনরাতের খেলা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

দশ
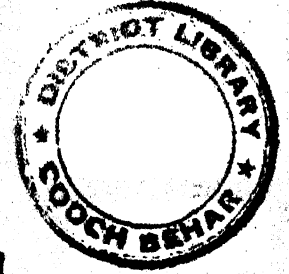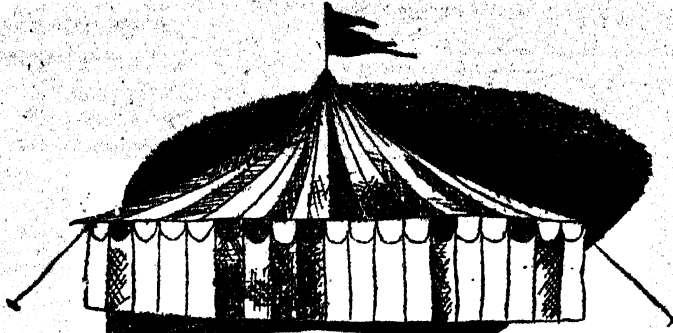
বাঘের খাঁচার ওপর এখন রোদের টাটকা আভা খেলে যাচ্ছে। এদিকে ঘাস নেই। চাকার ঘষা খেতে খেতে সব ঘাস মরে গেছে। মাটি নরম বলে খাঁচার চাকার আঁকাবাঁকা দাগ এখনো স্পষ্ট।

একদিকে মাটি পোড়া-পোড়া। ইটের ভাঙাচোরা একটা উনুনও আছে। বাঘ-সিংহর খাঁচার পিছনেই খুব পুরনো পাঁচিল, কোথাও কোথাও বড় বড় ফুটো। ছোট বড় ছেলেমেয়েরা সেখানে চোখ রেখে সার্কাসের জন্তু-জানোয়ার টিকিট না কেটেই দেখে যায়।

পাঁচিলের গায়ে একটা বটগাছও আছে। হাওয়া উঠলে খাঁচার ওপর পাতা কিম্বা ছোট ছোট ফল মাঝে মাঝে খসে পড়ে। রিং মাস্টারের সহকারীরা বাঘ-সিংহর পরিচর্যা করতে এসে কখনো কখনো বাসি রুটির টুকরো আর ডিমের খোলাও দেখতে পায়—কাকের মুখ থেকে পড়েছে।

একদিকে বাঘ-সিংহ-ভাল্লুকের খাঁচা, কিছু দূরে বাঁধা আছে হাতি উট আর বাচ্চা একটা ঘোড়া। ওদের মাথার ওপর কিছু নেই, ঝড়ে জলে রোদে ওরা এমন করেই দাঁড়িয়ে থাকে। উটের জন্যে জমা করা আছে প্রচুর নিমপাতা। হাতি সারাদিন ধরে চাল রুটি কলাপাতা চিবোয়। ঘোড়ার জন্যে তো ঘাস আছেই।

বাঘ-সিংহর খরচ অনেক। রোজ চোদ্দ-পনেরো কিলো মাংস, ওদের শরীর ঠান্ডা রাখবার জন্যে সপ্তাহে একদিন মাংসের বদলে শুধু দুধ খাওয়ান হয়। ভাল্লুকও খায় দুধ ভাত। ফলও খাওয়াতে পারলে আরও ভাল হয়—কিন্তু তার খরচ অনেক। জুয়েল সার্কাসের ভাল্লুক ফল খেতে পায় না এখন।

হাতির প্রকৃতি খুব ঠান্ডা হলেও মাহুত কিংবা রিং মাস্টারকে এক সময় বড় সতর্ক থাকতে হয়। একরকম রস গড়ায় তখন হাতির চোখ থেকে—কথা শোনে না, শাসন মানে না, ক্ষেপে থাকে। এ সময় খেলা দেখাবার চেষ্টা করলে সব লন্ডভন্ড করে দেয় হাতি। মাহুত কিম্বা রিং মাস্টারকেও শুঁড়ে জড়িয়ে আছাড় মারে—পায়ের চাপে পিষে দেয়।

যদিও তেমন কোন দুর্ঘটনা এখনো ঘটেনি জুয়েল সার্কাসে। একমাত্র সিংহীই মাঝে মাঝে রিং মাস্টারকে থাবা মেরে মাংস খাবলে নেবার চেষ্টা করে—কিন্তু চাবুকের কী জোর মদনমোহনের। সিংহী শুধু আস্ফালনই করে, আর কিছু করার সাধ্য থাকে না তার।

এক জোড়া শান্ত চিতা বাঘ, এক জোড়া সিংহ, ভাল্লুক হাতি উট আর বাচ্চা একটা ঘোড়া—এতদিন জুয়েল সার্কাসের চিড়িয়াখানায় এরাই শুধু ছিল, এখন এল দুটো রয়েল বেঙ্গল—সুরথ আর চাঁদনী।

চাঁদনী ঝিমোচ্ছিল। সুরথ বড় অস্থির। তন্দ্রাকাতর চাঁদনীকে প্রহরীর মতন পাহারা দিচ্ছে—এদিক-ওদিক ঘুরছে। খাঁচার মধ্যে টাটকা দুধ ঢেলে দেয়া হয়েছিল, এখন খালি গামলা পড়ে আছে। এক-একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখছে সুরথ, কখনো গামলায় তার পা পড়ছে।

"কীরকম দেখছেন মদনবাবু?" রয়েল বেঙ্গলের বড় খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে গর্ব প্রকাশ করার মতন রিং মাস্টারকে জিজ্ঞেস করল বদ্রীনাথ।

খাঁচার আরও কিছু কাছে এগিয়ে এল মদনমোহন। তার হাতে এখন চাবুক নেই, কিন্তু মুখ বড় অপ্রসন্ন। দুটো নতুন বাঘকে সে চুপচাপ দেখল কিছু সময়।

বাঘের গলায় বকলেস বাঁধা—লোহার শেকল চামড়ার কাজ করে এঁটে দেয়া হয়েছে। বকলেসের রিং-এ ইংরেজি 'ডি'র মতন লোহার একটা অক্ষর ঝুলছে।

বাঘের ট্রেনিং-এর সময় শেকল আর লম্বা দড়ি এক সঙ্গে জুড়ে বাঁধা হবে আর একটা 'ডি'র মতন অক্ষরে এবং তা বাঘের গলার 'ডি'র সঙ্গে আটকে দেয়া হবে, 'ডি—টাইট'।

রিং মাস্টার মদনমোহন সুরথ আর চাঁদনীকে দেখতে দেখতে বলল, "বড় তেজী বাঘ বাবু।"
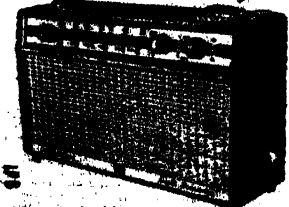
"রয়েল বেঙ্গল তেজী হবে না? বড় দরাদরি করতে হল! এখন তাড়াতাড়ি খরচা ওঠাতে না পারলে খুব মুশকিল হবে। আপনি জলদি-জলদি করবেন মদনবাবু।"

আবার পিছনে সরে এল মদনমোহন, একটু ইতস্তত করে শুকনো স্বরে বলল, "টাইম লাগবে।"

"খুব টাইম লাগিয়ে দিলে আমার চলবে না", বিরক্তির একটা ঝাঁজ জমে উঠছিল রঘুনাথের গলায়, "আরও তিন হাজার টাকা দাম দিতে হবে, চোদ্দ-পনেরো কিলো মাংসের খরচ বাড়ল, দুধ কত বেশি লাগবে!"

রঘুনাথের পাশে হারকু সাহেবও দাঁড়িয়েছিল। নতুন বাঘের কাছে আরও অনেকে ভিড় করেছে। একদিকে ছিল নবীন সহদেব বাহাদুর, মদনমোহনের দু'জন সহকারী কাশী আর জোসেফও আছে। রিং বয়রাও এসে জুটেছে—বাচ্চু মাইলা অনন্ত নরেন্দ্র ছট্টু শম্ভু।

খাঁচার দরজার নিচেই গর্তের মতন ফাঁক। সেখান দিয়েই দুধের গামলা ভেতরে রাখা হয়েছিল, এখন জোসেফ একটা লাঠি দিয়ে ঠেলে খালি গামলা বের করে আনল। খাঁচার ভেতর গুঁড়ো হলুদ ছড়ানো হয়েছে অনেক। সুরথের খাবার হলুদের ছাপ, চাঁদনীর গায়েও আবীরের মতন হলুদ পড়েছে—বাঘের রং-এর সঙ্গে হলুদের রং প্রায় মিশে এসেছে।

নবীন খাঁচার অনেকটা কাছে এসে পড়েছিল, হারকু সাহেব দেখল চাঁদনী তার দিকে চোখ রেখেছে শিকারের মতন। রয়েল বেঙ্গলের জোড়া দেখতে দেখতে হাসছিল নবীন, খাঁচার মধ্যে কেন হলুদ ছড়ানো হয় সেকথা তার জানবার ইচ্ছা হচ্ছিল।

নবীনকে টেনে দূরে সরিয়ে দিল হারকু সাহেব, "খাঁচার অত কাছে যাবি না নবীন, থাপটা মারতে পারে—"

নবীনের খেয়াল ছিল না যে সে প্রায় বাঘের মুখে গিয়ে পড়েছে। রয়েল বেঙ্গলের পিঙ্গল চোখ, গায়ে ডোরাকাটা দাগ এবং লম্বা ও নিচু শরীর দেখতে দেখতে প্রচণ্ড বিক্রমের কথাই ভাবছিল নবীন—সে নিজেকে তাদের একজন বলে ভাববার চেষ্টা করছিল।

"মদনবাবু, মেজাজ বুঝলেন কিছু?" সুরথ আর চাঁদনীকে দেখতে দেখতেই হারকুসাহেব বলল।

"খাঁচার থেকে বাইরে না নামালে জানোয়ারের মেজাজ কিছু বুঝা যাবে না—"

রিং মাস্টারের কথা শুনে হারকু সাহেব হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠল এবং ঝাঁজ প্রকাশ করে বলল, "দো-তিনদিন হয়ে গেল বাবু বাঘ আনল—আপনি কিছু খেয়াল করলেন না, চুপচাপ বসে আছেন—"

"বলেন কী করব?" রঘুনাথের সামনে একটু রূঢ় স্বরেই হারকু সাহেবের কথার মাঝে বলে উঠল রিং মাস্টার মদনমোহন।

হারকু সাহেব মুখের একটা বিকৃত ভঙ্গি করলেও রঘুনাথ সামনে ছিল বলে উত্তেজনা এখন দমন করে নিল এবং রিং মাস্টারের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে শুধু বলল, "এই ক্যাম্পের খেলা পরশুদিন শেষ হয়ে যাবে, তার চার-পাঁচ রোজ বাদ আমরা টালিগঞ্জে খেলব পুরা একমাস—শুনেছেন মদনবাবু? এই টাইমের ভিতরে আপনি বাঘ দুটোকে খেলার জন্যে তৈয়ার করে দিবেন। টালিগঞ্জে ট্র্যাপিজ হবে, দোসরা ক্যাম্পে রয়েল বেঙ্গল খেলবে। ব্যস, আউর কোই বাত নেই—" হারকুসাহেব বড় তাড়াতাড়ি এসব বলল এবং কথা শেষ করে রঘুনাথের সমর্থন পাবার আশায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

"হাঁ, এই রকম করবেন মদনবাবু।"

বাঘের খাঁচার কাছ থেকে সরে এল মদনমোহন। রঘুনাথ ও হারকুসাহেবের কথা সে রাখতে পারবে কিনা তা তার মুখ দেখে বোঝা গেল না। একটা উৎকট গন্ধ বার হচ্ছিল বাঘের গা থেকে, কিন্তু মদনমোহন ছাড়া সে গন্ধ সম্ভবত আর কারুর নাকে যাচ্ছিল না। মদনমোহন দূরে সরে এসে নাক কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকল।

তার চেহারা দেখে এখন রঘুনাথও বিরক্ত হল। মদনমোহনের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে হারকু সাহেবকে বলল, "হারকু সাহেব মদনবাবুর মুখ দেখলেন? আমার নয়া বাঘের গন্ধ তার মেজাজ বিগড়ে দিল।"

হা হা করে হেসে উঠল হারকুসাহেব। অনেক দিন থেকেই মদনবাবুর ওপর সে প্রসন্ন ছিল না, আজ সুযোগ যখন এসেছে তখন তাকে কঠিন শাসন করবার জন্যে
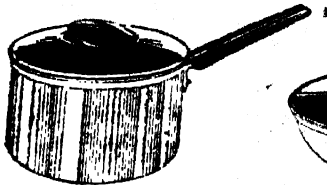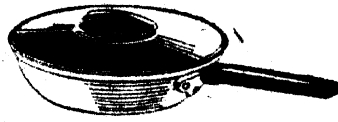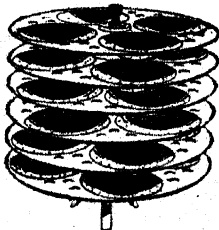
মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিল এবং প্রথমে হাসতে হাসতেই বলল, "এমন মানুষ জুয়েল সার্কাসের রিং মাস্টার!"

হারকুসাহেবের হাসি শুনে চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সুরথ। চাঁদনী নিষ্ঠুর একটা ডাক ছেড়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল। এবং ঠিক সেই সময় পাশের খাঁচায় ক্ষতর যন্ত্রণায় অস্থির সিংহ আর একবার আর্তনাদ করে উঠল।

রঘুনাথ বলল, "মদনবাবু, এই রকম মুখ করে দূরে সরে যদি থাকেন, তবে জানোয়ার কেন আপনাকে জলদি জলদি মানবে বলেন? আপনি শুধু বলবেন, টাইম লাগবে—আর আমার কোম্পানীর লোকসান চলতে থাকবে।"

আর্তনাদ শুনে সকলেই এখন সিংহের খাঁচার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। গলার কাছে গর্তের মতন একটা ক্ষত হয়েছে সিংহের, খুব রোগা হয়ে গেছে, হাড়-জিরজিরে শরীর—যন্ত্রণায় হাঁপাচ্ছে। মদন-মোহনকে খাঁচার সামনে দেখে তার চোখ দুটো আরও করুণ হয়ে উঠল।

রিং মাস্টার মদনমোহন এত লোকের সামনে রঘুনাথ ও হারকুসাহেবের কাটা কাটা কথা শুনে মনে মনে জ্বলে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা জেদের বশে বেপরোয়া হয়ে বলে উঠল, "আমাকে কী করতে হবে, অর্ডার দেন?"

হারকুসাহেব মাটিতে পা ঘষে বলল, "অর্ডার মানেন আপনি?"

"না মানলে নোকরি থাকবে কেন?" কথা বলতে বলতে কয়েক পা পিছিয়ে মদনমোহন আবার রয়েল বেঙ্গলের খাঁচার কাছে এসে বলল, "আমি আজ রাতের বেলা এ দু-টা বাঘকে রিং-এ বার করব—টাইমের কথা বলে আমাকে গালাগাল করবেন না, আপনারা সকলে রাতের বেলা বাঘের মেজাজ বুঝে দেখবেন।"

"আপনার মেজাজ তো আগে বুঝে দেখতে হবে মদনবাবু", চিৎকার করে কথা বলছিল রঘুনাথ। দুটো রয়েল বেঙ্গলের কথা ভেবে সে বড় প্রসন্ন হয়েছিল কয়েক দিন, এখন বুঝল রিং মাস্টার তাদের কোন যত্ন করবে না এবং তার খেয়াল-খুশি মতন অত্যাচার করে খেলা শেখাবার চেষ্টা করবে। এসব ভাবতে ভাবতে খুব রুক্ষ স্বরে মদনমোহনকে রঘুনাথ পুরনো কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল, "পানামা সার্কাস থেকে যখন রাতের বেলা লাথি মেরে হাঁকিয়ে দিল আপনাকে, তিনদিন আপনি না খেয়ে রইলেন—তখন এমন টেম্পার কোথায় ছিল আপনার? এখন মুখে বড় বড় বাত ছুটাচ্ছেন!"

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল মদনমোহন। কারুর ওপর এই মুহূর্তে চাবুক চালাতে পারছিল না বলে একটা নিষ্ফল আক্রোশ তার রক্তের মধ্যে জ্বলে উঠছিল এবং সে হঠাৎ বড় অসুস্থ বোধ করছিল।

এত পরে মদনমোহনকে স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেল হারকুসাহেব, সে খুব কড়া স্বরে বলল, "কয়টা জানোয়ার শেষ করলেন পানামা সার্কাসে? সব খবর আমি জানলাম মদনবাবু। জানোয়ারকে ঠিক মতন ছোকরারা খেতে দিল কিনা—আপনি কুছ খবর করেন না—"

হারকুসাহেব হাত তুলে সিংহকে দেখাল, "বাবু দেখেন, ভোলার কী হাল হল!"

"ভোলার ঘায়ের কথা আমি আপনাকে বলেছিলাম—"

"ঝুট বাত বলবেন না মদনবাবু। আমি আপনাকে পুছলাম যখন—আপনি বললেন, এই রকম ঘা ওদের হয়। একটা ডাক্তারকে খবর দেবার ফুরসং আপনার হল না কেন বলেন?"

এখন চুপ করে থাকা যায় না। একটা কিছু বলতেই হবে বলে মদনমোহন আস্তে বলল, "আমি ডাক্তারকে চিনি না।"

আর একবার জোরে হাসল হারকু সাহেব এবং পরেই চুপ হয়ে গেল। আরও পরে থুতু ফেলার মতন উচ্চারণ করল, "বুদ্ধু! ডাক্তারের সাথে জান-পয়চান কার থাকে! আপনি রিং মাস্টারের কাজ ছাড়েন। আপনার মতন বুদ্ধু জানোয়ারের জীবন বেশি দিন রাখতে পারবে না। আপনি আমার কোম্পানীর সব জানোয়ার একদম খতম করে দিবেন।"

শুধু মদনমোহনকে শাসন করেই চুপ থাকল না হারকুসাহেব, একে একে প্রত্যেক খাঁচার সামনে টেনে আনল রঘুনাথকে, আঙুল তুলে হাতি ঘোড়া আর উটও দেখাল এবং তাকে বুঝিয়ে দিল যে সব জানোয়ারই অযত্নে ও অনাদরে শেষ হয়ে যেতে বসেছে। সব দোষ রিং মাস্টারেরই। সে একটা অপরাধ"।

রঘুনাথের মুখ গম্ভীর, দৃষ্টি তিক্ত। হারকুসাহেবের সব কথা সে বিশ্বাস করছিল এবং তার মনে লোকসানের একটা আশঙ্কা জাগছিল বলে সেও হারকুসাহেবের মতন উঁচু গলায় মদনমোহনের সঙ্গে কথা বলল, "মানুষ মরলে আমার কোম্পানীর বেশি লোকসান হবে না মদনবাবু—মানুষ অনেক আছে। জানোয়ার তো মাত্র এই কয়টা। তাদের দামের কথা আপনি জানেন! আপনি ঠিক মতন কাজ করতে পারলে করবেন—না পারলে চলে যাবেন। আমার নিমক খেয়ে কোম্পানীর লোকসান করবেন না।"

একটা কাক ডাকছিল বটের শাখায়। মদনমোহন তার কর্কশ ডাক শুনছিল। যদিও সে খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়েছিল তা হলেও এখন খুশি মতন চলাফেরা করার কথা ভাবতে পারল না। শরীর ও মনের জড়তা কাটিয়ে নেওয়ার জন্যে নিচু হয়ে একটা ঢিল তুলে, নিল মদনমোহন. কাককে লক্ষ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাকে নিচু হতে দেখেই কর্কশ স্বর বন্ধ হয়ে গেছে। উড়ে পালিয়েছে কাক।

হারকুসাহেব রঘুনাথকে আগলে আগলে রাখল সারা সকাল, যা বলবার বলল। এখন সে তাকে তার তাঁবুতে পৌঁছে দিয়ে গেল। জুয়েল সার্কাসের প্রোপ্রাইটারের তাঁবু সবচেয়ে বড়। বাক্সপ্যাঁটরা অনেক বলে জিনিসও বেশি। তা ছাড়া গাড়িও আছে সার্কাসের। দরকার মতন ডিপো থেকে আরও জিনিস নিয়ে আসে ড্রাইভার, এখান থেকে নিয়েও যায়।

এত সময় রিং মাস্টারের সঙ্গে বকাবকি করে মেজাজ ভাল ছিল না রঘুনাথের, এখন আরও খারাপ হয়ে গেল। ক্যাম্পখাটের

ওপর গা এলিয়ে আছে যশোদা, কোম্পানীর মেয়ে মঞ্জু তার পা টিপে দিচ্ছে।

রাণী আর কিশোরীকেও দেখতে পেল রঘুনাথ। একজন টিউবওয়েল থেকে জলের বড় বালতি ভরে আনছে, আর একজন কাপড়ের বস্তা নিয়ে বসেছে কলের কাছে, সাবান ঘষে ঘষে যশোদার ছেলেমেয়েদের কাপড় কাচছে।

এসব দেখে রঘুনাথ স্থির থাকতে পারল না, তাঁবুতে ঢুকেই রাগ প্রকাশ করল, "এটা কী হচ্ছে যশো?"

রঘুনাথের গলা শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল মঞ্জু, নিজের কাজ ভুলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তখন এক লাথি মেরে যশোদা তাকে তার কাজের কথা মনে করিয়ে দিল এবং রঘুনাথের কথা বুঝতে না পেরে চোখের একটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গি করে খুব জোরে বলে উঠল, "কী, বলছ কী?"

যশোদার স্বভাবের পরিচয় যদিও সার্কাসের প্রত্যেক মানুষেরই জানা তা হলেও তাঁবুর বাইরে তাকিয়ে দেখল রঘুনাথ অনেকটা দূরে, হারকুসাহেব চলে গেছে কিনা। কেননা, স্ত্রীর এমন গলার স্বর ও ভঙ্গি তাকে বড় লজ্জা দিচ্ছিল।

"যশো, এটা ভাল না। আমার কোম্পানীর মেয়েদের ফের তুমি খাটাতে থাকলে—"

"কেন?" উঠে বসল যশোদা, মাথা নাচিয়ে নাচিয়ে কথা বলতে থাকল, "তারা বুঝি শুধু রাতে শোবে তোমার সাথে?"

"ছি ছি ছি যশো, এটা তুমি কী বল—" দু আঙুলে কানের মধ্যে ঢুকিয়ে রঘুনাথ থেমে থেমে বলল, "তুমি জুয়েল সার্কাসের মালিকানী—এই সব ছোট ছোট মেয়েদের এই রকম খাটাতে থাকলে মানুষ তোমাকে খারাপ বলবে—"

"উঃ, দরদ কত!" যশোদা ঝপ করে খাট থেকে নেমে কোমরে দু হাত ঠেকিয়ে রঘুনাথের মুখের সামনে এসে দাঁড়াল, "আর বড় বড় মেয়েদের ডাক দিয়ে খাটালে হত কী? ছি ছি, হু হু হাসাহাসি হত, না? বুঝেছি, বুঝেছি। বেলা আর শান্তার ওপর নজর তোমার চিরকালের। ওদের বাপ এলে নিজে ছুটে যাওয়া হয় রসুইয়ে, ভাল ভাল তরকারি বানাবার হুকুম দেওয়া হয়। আমার দাদায় টাকায় বদমাশি!"

যশোদার কথা বলবার ধরনই এমন। কোম্পানীর মেয়েদের সামনে এসব শুনতে ভাল লাগল না রঘুনাথের। সে মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এই, যা এবার!"

"না", তার চুল ধরে তাকে কাছে টেনে রাখল যশোদা, "আমার কাজ শেষ না করে যাবি তো—"

রঘুনাথ বলল, "ওরা সকালবেলা প্র্যাকটিস করে, বড় পরিশ্রম হয়। এখন ফের আমার তাঁবুতে ওরা খাটতে আসবে না। যশো, ওদের বাবা এসব শুনলে, আমি তাদের কী বলব?"

এত সময় যশোদা রঘুনাথের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। মঞ্জুর চুল এখনো ছিল তার হাতের মধ্যে। হঠাৎ তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল যশোদা, একটা বালিশ ছুঁড়ে মারল রঘুনাথের দিকে, "শাসন করা হচ্ছে আমাকে—দরদের বুলি শোনানো হচ্ছে ছুঁড়িগুলোকে? আসুক এবার দাদা, তোমার চরিত্তিরের কথা—"

যশোদা চুপ করছিল না বলে বড় অস্বস্তি হচ্ছিল রঘুনাথের। সে ভাবল, কখনো কোন ক্যাম্পে তাকে আর নিয়ে যাবে না। একটা ঝি কিংবা চাকর যশোদা কেন ক্যাম্পে এনে রাখে না সে কথা বুঝতে পারে না রঘুনাথ। সার্কাসের মেয়েদের এমন করে খাটিয়ে নেওয়া সে অন্যায় মনে করে বলেই যশোদার সঙ্গে সার্কাসের তাঁবুতে তার সম্পর্ক বড় অদ্ভুত হয়ে ওঠে। এবং যশোদাও ধরে নেয় বেলা আর শান্তার ওপর চোখ পড়েছে রঘুনাথের—সেই কারণে তার মুখের ওপর কথা বলতে সে সাহস পায়।

"চুপ থাক যশো", রঘুনাথ শার্ট খুলল, গেঞ্জি দড়িতে ঝুলিয়ে রাখল আর যশোদাকে এড়িয়ে যাবার জন্যেই ধুতি ছেড়ে গামছা জড়িয়ে নিল। আজ একটু আগেই কলের তলায় গিয়ে বসবে সে—স্নান সেরে নেবে।

"উঃ, হুকুম করছেন বাবু! আমি যেন ওনার সার্কাসের মেয়ে! আজ যদি দাদা থাকত এখানে—" শেষ কথা বার হল না যশোদার মুখ থেকে। হঠাৎ সে ঘোমটা টেনে ঘরে দাঁড়াল। তাঁবুর বাইরে শিবনাথ এসে দাঁড়িয়েছে।

শিবনাথ ডাকল, "বাবু?"

সে রাগ মনে চেপে রেখেছিল রঘুনাথ—যশোদার সামনে প্রকাশ করবার সাহস ছিল না, এখন শিবনাথকে দেখে তা ফুটে উঠল তার চোখে, ছায়া ফেলল মুখের ওপর। গামছা পরেই রঘুনাথ তাঁবুর বাইরে এসে শিবনাথের কাছে দাঁড়াল।

"সকাল বেলা কোথা গেছিলেন শিববাবু?" জেরা করবার মতন স্বর রঘুনাথের। নিমের একটা ডাল হাতে নিয়ে সে জোরে জোরে দাঁত ঘষছিল।

রঘুনাথের রূঢ় প্রশ্ন এবং তার কণ্ঠস্বর শিবনাথ শুনল, সে সব বুঝতেও পারল। যদিও একটা চমক খেলে গিয়েছিল তার মনে, তা হলেও সে রঘুনাথকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল না। নিজের হয়ে কথা বলতে এখন বাধল শিবনাথের।

সে রঘুনাথকে বলল, "বাবু, আমি আর আপনার কোম্পানীতে চাকরি করতে পারব না।"

শিবনাথের কথা শুনে রঘুনাথ চমকাল না, অবাকও হল না। নিমের ডাল হাতে ধরে মুখ ফিরিয়ে থুতু ফেলে বলল, "সকাল

বেলা কাজের ধান্দায় বাইরে গেছিলেন?"

শিবনাথ রঘুনাথের দিকে কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। সে যতই কঠোর হওয়ার চেষ্টা করুক, তার মনে একটা কোমল বিশ্বাস গাঁথা ছিল যে, হঠাৎ চাকরি ছাড়বার কথা বললে কিছু বিচলিত হয়ে পড়বে রঘুনাথ এবং তার অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু রঘুনাথের প্রশ্ন আঘাতের মতন শিবনাথের মনে বাজল।

সে বলল, "না। আমি অন্য কাজে গিয়েছিলাম।"

"ভাল কথা। যেখানে আপনার খুশি আপনি যাবেন। তবে আমার লোকসানের কথাটা একটু মনে রাখবেন—"

"কিসের লোকসান?"

রঘুনাথ ঘস ঘস করে দাঁতে নিমের ডাল ঘষল, পরে সেটা চিবোতে চিবোতে বলল, "হ্যান্ডবিলে আপনার নাম ছাপা হতে গেল—নতুন ক্যাম্পের কথা পাকা হল, এখন ইচ্ছা হলে আপনি যাবেন—" কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে হঠাৎ শিবনাথকে জিজ্ঞেস করল, "যমুনাও যাচ্ছে নাকি আপনার সাথে?"

রঘুনাথের প্রশ্নের উত্তর দিল না শিবনাথ—অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে খুব জোরে বলে উঠল, "শালার মুখ আমি ছিঁড়ে ফেলব বাবু—"

রঘুনাথ বিরক্ত হয়ে বলল, "এই রকম গাল আপনি কাকে দিলেন শিববাবু?"

"যে আমার নামে আপনাকে লাগিয়েছে, সে ব্যাটার জন্মের ঠিক নেই, ওকে আমি—"

"চুপ, শিববাবু চুপ", রঘুনাথ ধমক দেওয়ার মতন বলল, "আপনি রাতের বেলা যমুনার ঘরে চুপে চুপে যাবেন, হাসি-তামাশা করবেন, আর কেউ কিছু বললে তার উপর রাগ হবেন—তাকে গালাগাল করবেন—এটা কী রকম কথা হল?"

উত্তেজনায় শিবনাথের শরীর ঘামছিল, "বাবু, আপনি জানেন যমুনার তাম্বুতে আমার যাওয়া-আসা আছে—"

"রাতের বেলা সেখানে কেন গেলেন আপনি? আর গেলেন যদি, আপনি একটা পারমিট নিলেন না কেন?"

"আপনি তখন এখানে ছিলেন না বাবু।"

"হারকু সাহেব তো ছিল—"

"ও লোকের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না—"

নিমের ডাল ফেলে দিয়েছিল রঘুনাথ। তার গায়ে এক খণ্ড গামছা ছাড়া আর কোন বস্ত্র ছিল না। রোগা রোগা হাত-পা রঘুনাথের। দুর্বল শরীর। কিন্তু এখন তার স্বল্প বস্ত্র ও ঘন কালো গোঁফ তাকে এক নিষ্ঠুর মানুষের মতন করে তুলেছিল।

রঘুনাথ বলল, "শিববাবু, হারকু সাহেব আমার সার্কাসের জেনারেল ম্যানেজার। আপনি এখানে কাজ যদি করবেন তবে তাকে আপনার মানতেই হবে—এই কথাটা মনে রাখবেন—"

"রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না রঘুনাথের, সে তাঁবুর মধ্যে গিয়ে পেতলের বড় একটা ঘটি তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে কলের দিকে এগিয়ে গেল।

আজ তার স্নানের বড় দেরি হয়ে গেছে। রঘুনাথ ঘরে যাবার পরেও শিবনাথ কিছু সময় সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। তার মুখ এখন গোল একটা কুমড়োর মতন ঠাণ্ডা, খালি-খালি চোখ, দেহের পেশীও শিথিল। হতাশার ম্লান একটা ছায়া আস্তে আস্তে তাকে আচ্ছন্ন করে তুলছিল।

কেন রঘুনাথের জুয়েল সার্কাসে প্রথম এসেছিল শিবনাথ? সে তার নষ্ট তার

বিক্রমের প্রমাণ অন্যভাবেও মানুষকে দিতে পারত—তার গুরু বলেছিল যে সে একদিন জগদ্বিখ্যাত হবেই। জুয়েল সার্কাসে শিবনাথ অর্থ কিম্বা যশের জন্যে আসেনি, সে এসেছিল রঘুনাথের জন্যেই।

একটা ছোট সার্কাস আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে, বড় হচ্ছে। শিবনাথের মতন কোন মানুষ তখন জুয়েল সার্কাসে ছিল না। শ্রীরামপুরে রথের মেলায় এক প্রদর্শনীতে তাকে সার্কাসে চলে আসবার জন্যে জোর করল রঘুনাথ—কতকটা তার কৃপা ভিক্ষা করবার মতন।

"আপনার মতন মানুষ এলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। আমি গরিব লোক আমার সার্কাসটাকে আপনি একটু দয়া করেন—"

রঘুনাথের কাতর মিনতি শিবনাথের মনে প্রথম একটা আশ্চর্য বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিল। রঘুনাথের তাকে প্রয়োজন—সে ইচ্ছে করলে একটা ছোট সার্কাসকে বড় করে তুলতে পারে। নিজের সম্পর্কে একটা অস্ফুট দম্ভ এবং সচেতনতা শিবনাথকে নিয়ে এল জুয়েল সার্কাসে।

শ্রীরামপুরে না, শিবনাথ সার্কাস-আর্টিস্ট হয়ে প্রথম এল তারকেশ্বরে তখন শেষ চৈত্র হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে ফুলে উঠছে, থেকে থেকে ফানেলে ফুঁ দেয়ার মতন হাওয়ার শব্দ খেলছে। নিজের তাঁবুতে বসে শিবনাথ হাতপাখা নিয়ে জোরে জোরে হাওয়া খাচ্ছিল। পাখা কখনো-কখনো তার গালে মাথায় এবং কপালে আঘাত করছিল। রঘুনাথ বড় যত্ন করেছে তাকে, সার্কাসের সব চাকর মালিকের আদেশ মতন তার কী কী দরকার তা জানবার জন্যে বার বার আসছিল।

হারকু সাহেব বেরিয়েছিল, ফিরে এসে শুনল শিবনাথ এসেছে। হারকু সাহেবও শিবনাথের তাঁবুতে তাকে দেখতে এল, "এই যে শিববাবু, সেলাম!"

হারকু সাহেবের চেহারা দেখে শিবনাথ ভাবল সে-ও জুয়েল সার্কাসের আর একজন চাকর, তার তেষ্টা পেয়েছিল বলে সে হেসে বলল, "এক গেলাস পানি পিলাও।"

হারকু সাহেবের মুখের চামড়া টান টান হয়ে উঠেছিল। শিবনাথের পাশে ঝপ করে সে বসে পড়ল এবং কিছু পরে তার গায়ে গা ঠেকিয়ে উদ্ধত স্বরে বলল, "আপনি লিখা-পড়া জানা ভদ্দর লোক। আমার সার্কাসে খেলতে এসে পয়লা দিন পানি কেন খাবেন? রাম জিন হুইস্কি—বলেন, কী ফরমাশ?"

শিবনাথ এসব শুনে বিব্রত হয়ে পড়েছিল, হারকু সাহেবকে পাখার হাওয়া দিতে-দিতে আস্তে জিজ্ঞেস করেছিল, "আপ কৌন হ্যায়?"

"আমি আপনার নোকর—এই সার্কাসের জেনারেল ম্যানেজার—"

"আরে, আপনিই হারকু সাহেব? হাত চলছিল না শিবনাথের, সে তার পায়ের ওপর তালপাতার পাখা ঠেকিয়ে রেখেছিল।

"হাঁ-হাঁ, আমার নাম জে. হারকিউলেস।"

যে বিস্ময় শিবনাথের মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তা মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে করতে সে শুকনো হাসল, "রঘুনাথ বাবু আমাকে জুয়েল সার্কাসে নিয়ে এল—"

"হাঁ-হাঁ, শুনেছি।" হারকু সাহেব জিজ্ঞেস করল, "আগে কোন সার্কাসে খেলে এলেন আপনি?"

"কোথাও না।"

"তবে বাবু কেন নিয়ে এল আপনাকে? একদম নবিস্ আছেন—রুপেয়া কত নিবেন?"

শিবনাথের গলা ও কপাল ঘামে ভিজে গিয়েছিল। সে পাখা নাড়তে নাড়তে প্রথম দিনই চিৎকার করে বলে উঠেছিল, "সে কথা আপনাদের মালিককে জিজ্ঞেস করবেন হারকু সাহেব, রুপেয়ার জন্যে আমি সার্কাসে খেলতে আসিনি—বুঝলেন?"

"তবে কিসের জন্যে এলেন?"

"আপনার মালিক আমাকে পায়ে ধরে নিয়ে এল—"

হঠাৎ হাসতে শুরু করে দিয়েছিল হারকু সাহেব। শিবনাথের হাত থেকে পাখা কেড়ে নিয়ে তাকে বাতাস দিতে দিতে বলেছিল, "আমি বালতি-বালতি ঠান্ডা পানি ঢালি মাথায়—আপনিও ঢালবেন।"

হারকু সাহেব হাসতে থাকলেও বিদ্রূপের একটা কর্কশ ধ্বনি খেলে যাচ্ছিল তার হাসিতে যা শিবনাথকে খোঁচা মারছিল। প্রথম দিন থেকেই দুজনের সম্পর্ক এমন তেতো-তেতো ও ঈর্ষার হয়ে উঠল যে আজও ওরা পরস্পরকে আঘাত করবার জন্যে সব সময় তৈরি হয়ে থাকে।

এখন শিবনাথকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে হারকু সাহেব।

রঘুনাথের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে এসব কথা ভাবতে ভাবতে প্রতিহিংসার একটা অমানুষিক আকাঙ্ক্ষা শিবনাথের রক্তের মধ্যে সরীসৃপের মতন কিলবিল করে উঠছিল। তখন রাধানাথবাবুর তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে যমুনা—হাতছানি দিয়ে ডাকছে শিবনাথকে।

ক্রমশ

অভিনয়ে মূল্যায়ণ—বর্তমান ও অতীত

বার্লিনের চলচ্চিত্র উৎসবে "স্বর্ণ ভল্লুক" "রৌপ্য ভল্লুক" পুরস্কারের বৃত্তান্ত পড়ছিলুম। উৎসব হলেও এটি যে প্রতিযোগিতা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বস্তুত নাচ, গান, নাটক নিয়ে প্রতিযোগিতা আয়োজন বেশ ভালভাবেই হচ্ছে। চলচ্চিত্র যখন হয়নি তখনও প্রতিযোগিতা ছিল। বস্তুত নাচ, গান, নাটক নিয়ে প্রতিযোগিতা বহুকালের। নিধুবাবুর জীবন চরিতে ঈশ্বর গুপ্ত লিখছেন—"আখড়াই গীতের উত্তর প্রত্যুত্তর নাই, যাঁহারদিগের সুর ও গাহনা ভাল হইত, তাঁহারাই জয়-পতাকা প্রাপ্ত হইয়া ঢোল বাঁধিয়া আনন্দপূর্বক গমন করিতেন।" এই জয় পতাকা পাওয়ার ইতিহাসও কম দিনের নয় হিন্দুযুগেও প্রতিযোগিতায় নাট্যশিল্পীদের পতাকা দিয়ে সম্মান প্রদান করা হত এমন প্রমাণ আছে। আজকাল চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় বিচারকগণ কোন কোন আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা করেন আমার জানা নেই, কিন্তু যোগ্যতা বিচারের অনেকগুলি মাপকাঠি নিশ্চয়ই আছে। সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় আমরা সুর, তাল, কণ্ঠ, উচ্চারণ প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয় বিবেচনা করে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করি। এই রকম বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন বিচার প্রণালী নির্ধারিত আছে। আর্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ ছিল নাট্যকে এবং এই নাট্য প্রতিযোগিতায় বিচারকদের কী কী ভূমিকা ছিল তা নিয়ে আলোচনা কমই হয়েছে, এমন কি তার খবরও খুব কম লোকই রাখেন। আজকের যুগের অভিনয়মূলক প্রতিযোগিতার বৃত্তান্ত পড়তে পড়তে যদি দেড় হাজার বছরের অতীতের নাট্য প্রতিযোগিতার কথা মনে পড়ে যায় তাহলে সেটা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্তু ট্র্যাডিশনটা কত সুদূর অতীতের এবং কত চিত্তাকর্ষক সেটা ভাবলেও বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

সে যুগেও সিদ্ধি বা Success-এর নিক্তি ভেবেই নাটক মঞ্চস্থ করা হত। লোকগ্রাহ্য না হলে কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই সার্থক বলে বিবেচিত হত না। লোকেই ছিল সব বিষয়ের মাপকাঠি। অবশ্য "লোক" যে কি রকম হওয়া উচিত ছিল তারও বর্ণনা আছে। কিন্তু আজকালকার মত মিশ্র দর্শকের সমাবেশ সে যুগেও হত, গোলমালের চেষ্টাও হত, ঈর্ষা, দলাদলির ফলে অনুষ্ঠান পণ্ডও হত কম নয়। তথাপি লোক সমর্থনই ছিল সার্থকতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। শাস্ত্র বলছেন—

লোকসিদ্ধং ভবেৎ সিদ্ধং নাট্যং
লোকস্বভাবজম্।
তস্মান্নাট্যপ্রয়োগে তু প্রমাণং লোক ঈষ্যতে॥

লোকপ্রকৃতির প্রতিবিম্বই তো নাটক। সেই নাটক যদি লোকসিদ্ধ হয় তাহলে তা সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়। সেই কারণে নাট্য-প্রয়োগে লোকপ্রমাণই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কিন্তু এর অর্থ আরও ব্যাপক। এটি যে কেবল নাটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন নয়—সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এ যুগের মত শত শত বৎসরের অতীত যুগেও দর্শকরা একইভাবে হর্ষ, উল্লাস এবং বিরক্তি প্রকাশ করতেন। কখনও কখনও প্রেক্ষাগৃহ নির্বাকবিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য উপভোগ করত। এই স্তব্ধতাই ছিল শ্রেষ্ঠ উপভোগ। শাস্ত্রকার একেই বলেছেন—দৈবী সিদ্ধি। আবার শত্রুতাও কম ছিল না। চিৎকার, তালিকাপাত, গোময়-লোষ্ট্র-উপল-বিক্ষেপ—এইসবও প্রায়ই দেখা যেত। অনেক সময় ঘুষ দিয়ে শিল্পী ভাঙিয়ে নেওয়া বা নানারকম বিপত্তির চক্রান্তও করা হত। আজকের প্রযোজকরা যেমন এইসব উৎপাতে চিন্তিত হন তখনকার প্রযোজকরাও ঠিক এইভাবেই চিন্তিত হতেন। অতএব লোক সব সময় একই ধরনের তথাপি এই লোকই রাষ্ট্রচালনা থেকে রঙ্গমঞ্চ পর্যন্ত সব কিছুরই ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করে আসছে।

প্রতিযোগিতার ব্যাপারটাও বেশ গণ-তান্ত্রিক উপায়ে নির্ধারিত হত। এই প্রতিযোগিতাকে বলা হত "সঙ্ঘর্ষ"। সাধারণতঃ বিচারক থাকতেন দশজন। এঁদের বলা হত "প্রাশ্নিক"। এঁরা নাট্যে যাঁরা অংশ গ্রহণ করতেন তাঁদের প্রশ্ন করতেন কিনা বলা যায় না তবে নাটকের ভাবৎ

দোষগুণে লিপিবদ্ধ করতেন। বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ যাঁরা বিচারের জন্য আমন্ত্রিত হতেন তাঁদের মধ্যে থাকতেন স্বয়ং রাজা, একজন রাজকর্মচারী, যজ্ঞবিৎ, ছন্দোবিৎ, চিত্রবিৎ, শব্দবিৎ, গান্ধর্ববিদ্যাবিশারদ, ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী (ইষ্বাসবিৎ), নর্তক এবং বেশ্যা। তখনকার নাটক আজকালকার মত সামাজিক ছিল না, পুরাণ এবং ইতিহাসের বৃত্তান্ত অবলম্বন করেই নাটক রচিত হত। অতএব যাগ, যজ্ঞ, অনুষ্ঠানাদির অনেক কিছুই নাটকে দেখান হত। এইসব অনুষ্ঠান ঠিক হচ্ছে কিনা তার বিচার করতেন যজ্ঞবিৎ। রাজা নিজে বিচার করতেন রাজকীয় ব্যক্তিত্ব ঠিক ফুটে উঠছে কিনা এবং রাজকর্মচারী দেখতেন রাজকীয় বিধিগুলি যথাযথভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে কিনা। সংস্কৃত নাটকে যেসব শ্লোক পাঠ করা হত সেগুলির বিচার করতেন ছন্দোবিৎ। পাঠ্যের দিকটা বিচার করতেন শব্দবিৎ। বস্ত্র বা আভরণের যোজনা, প্রণামাদি আচরণ এবং সাজসজ্জা—এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির বিচার করতেন চিত্রবিৎ। স্বর, তাল, গান, বাজনার ব্যাপারটা বিচার করতেন গান্ধর্ব। কামোপচার সম্বন্ধে মত প্রকাশের অধিকারিণী ছিলেন বেশ্যা; যদিচ প্রকাশ্যে কামাচার খুব সংযতভাবেই অনুষ্ঠিত হত। এ বিষয়ে বেশ কড়া শাস্ত্র-নির্দেশ ছিল। আর্টের জগতে তখন বেশ্যাদেরও একটা সম্মানজনক পদ ছিল কারণ বহু বিষয় তাদের আচার্যের কাছে শিখতে হত। কিন্তু রাজ অন্তঃপুরের অভিনয় বিচার করতেন রাজা স্বয়ং। অন্তঃপুরিকাদের আচরণ সম্বন্ধেও বেশ্যার কাছ থেকে কোন নির্দেশ চাওয়া হত না। ধনুর্বিদ বিচার করতেন সৌষ্ঠব অথবা কপট শস্ত্রমোক্ষণের সময় দেহাবস্থান ঠিক হচ্ছে কিনা। এই দশজনের বিচার ছিল প্রয়োগসম্পর্কীয় সাধারণ বিচার। এ ছাড়াও নিছক শাস্ত্রীয় বিধি নিয়েও বিতর্ক হত এবং তখন বড় বড় আচার্যেরা শাস্ত্র প্রমাণ দাখিল করতেন। ঠিক এইভাবেই একক অভিনয়েরও বিচার হত। অভিনেতৃসমাজে প্রতিযোগিতার মনোভাব চিরকালই প্রবল। অর্থপুরস্কার বা জয় পতাকা লাভের জন্য তাঁরাও সংঘর্ষ আহবান করতে পশ্চাদপদ হতেন না। অপক্ষপাত বিচারে যিনি জয়ী হতেন তিনিই লাভ করতেন পতাকা। এ বিষয়ে প্রাশ্নিকদের সঙ্গে বিবাদ চলত না। প্রাশ্নিকগণ দোষগুণ লিপিবদ্ধ করবার পর সেগুলিকে মিলিয়ে কতভাগ দোষ, কত ভাগ গুণ এইগুলি নির্ণয় করবার জন্য গণক নিযুক্ত হতেন। এই দশজনের বিচার থেকে শ্রেণী বিভাগ করবার জন্য বেশখানিকটা হিসাবের দরকার হত এবং এই কেরাণীর কাজটা করতেন গণক।

এই বিচারে অনেক সময় মুশকিল হত যখন প্রতিদ্বন্দ্বীরা সমান সমান নম্বর পেতেন। এই বিচারটা রাজার হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর বিচারই চরম বলে মনে নেওয়া হত। এই পতাকাটাই ছিল তখনকার "স্বর্ণ ভল্লুক"।

বিচারের পদ্ধতি যেখানে এত ব্যাপক সেখানে প্রযোক্তাদেরও জানতে হত কম নয়। তাঁদের নাটকের সমতারক্ষার জন্য যেসব বস্তুর প্রয়োজন সেগুলিতো জানতে হতই, এ ছাড়া পাঠ্যবিষয়ের উৎকর্ষ, বিভিন্ন ভূমিকার উপযোগিতা, গান, বাদ্য, সাজসজ্জা সব বিষয়েই বিচক্ষণ হতে হত। পরাজয় বরণ করলে দোষটা এসে পড়ত তাঁদেরই ঘাড়ে—অতএব পাণ্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতা না থাকলে সে যুগে প্রযোক্তা হওয়া সম্ভব হত না।

নাটকের মূল তিনটি গুণকে স্বীকার করা হয়েছে। একটি হচ্ছে সামগ্রিক প্রচেষ্টা যাতে নাটকটি সব দিক থেকে রসোত্তীর্ণ হয়। এর পারিভাষিক নাম—"সমুদয়" (সম্যকভাবে উদয় বা সার্থকতা)। দ্বিতীয়টি হচ্ছে "প্রয়োগ"। প্রয়োগ বলতে সুবাদ্যতা, সুগানত্ব, সুপাঠ্যত্ব এবং শাস্ত্র নির্ধারিত বিধিগুলির সমাবেশ বোঝায়। তৃতীয়টি হচ্ছে "সমৃদ্ধি"। বেশভূষা, সাজসজ্জা, অঙ্গরচনা এইগুলিই হচ্ছে সমৃদ্ধি। এই সবগুলি যখন উৎকৃষ্টভাবে মিলিত হত তখন তাকেই অলঙ্কার বলে স্বীকার করা হয়েছে; অর্থাৎ তখনই নাট্যানুষ্ঠান পরম সার্থকতা অর্জন করত।

আজও নাটক বা চলচ্চিত্র সম্বন্ধে এই তিনটি মৌলিক গুণই প্রধান। এর সঙ্গে অবশ্যই আরও বহু বিষয় এবং বহু টেকনিক যোজিত হয়েছে কিন্তু সাধারণ প্রোডাকশন সম্বন্ধে ভাবধারাটা একই রকম। সেকালেও খুব বৃহৎ পটভূমিকায় অভিনয়ের নানা সম্পূর্ণতা, অসম্পূর্ণতা বিচার করেই একটি উত্তম নাটক মঞ্চস্থ করা হত। তাই বলছিলাম আজকের পরিপ্রেক্ষিতে বহু শত বৎসরের পুরাতন নাট্যচিন্তা বা নাট্য-পরিকল্পনার বৃত্তান্তও কম চিত্তাকর্ষক নয়।

শার্ঙ্গদেব

ভ্রমসংশোধন

গত সংখ্যায় ভ্রমবশত "গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী"র স্থলে "গিরিজাশঙ্কর রায়-চৌধুরী" লেখা হয়ে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য শ্রীসুনীল বসু মহাশয় "সঙ্গীতাচার্য" গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন।

মদন গোপাল

॥ ২ ॥

প্রাত্যহিক জীবনের অসংখ্য টানাপোড়েন, অস্বাচ্ছন্দ্য ও অশান্তি সত্ত্বেও মুন্সী প্রেমচাঁদ ছিলেন অসামান্য ব্রতনিষ্ঠ। কখনো বা অত্যন্ত একগুঁয়ে বা জেদী। সংকল্পের রূপায়ণে যত দুরূহতার সম্মুখীনই হতে হোক না কেন, সর্বত্র তাঁকে অচঞ্চল ও নির্ভীক রূপে দেখি। মাঝে মাঝে সতীর্থ ও সমজীবীদের জোরালো ঘটনা ও কুৎসার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে, কিন্তু চারিত্রিক সম্পদে সর্বত্রই তিনি অকুতোভয়। এক দিকে দেশপ্রেম, অন্যদিকে তৎকালীন সমাজ-পতিদের অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ তাঁকে যুগপৎ শাসক সম্প্রদায় ও সমাজের শত্রু প্রতিপন্ন করেছে—কিন্তু নিজের বিশ্বাসের অঙ্গন থেকে কোনদিন তিনি এক পা নড়েন নি। এই দুরূহ ব্রত সম্পাদনে বন্ধু হিসেবে কমজনকেই পেয়েছেন; কিন্তু নিজের সাহিত্যিক সত্তার প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল অগাধ। ফলে, আমৃত্যু সংগ্রাম করে যেতে হলেও শেষ পর্যন্ত শিল্প-গরিমাই তাঁকে অজেয় করে রেখেছে। হিন্দী ও উর্দু সাহিত্যে আজও তিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, আজও তিনি "উপন্যাস-সম্রাট" নামে সর্বত্র পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্যিক প্রেমচাঁদের যাবতীয় রচনায় ব্যক্তি প্রেমচাঁদেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

১৯০৩ সনে লেখা তাঁর প্রথম উপন্যাস "আসরার-ই-মাবিদ" ছিল অসম্পূর্ণ। ১৯৩৬ সনে মৃত্যুর কারণ তাঁর শেষ উপন্যাস "মঙ্গলসূত্র"-ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মধ্যবর্তী আনুমানিক তেত্রিশ বছরে তিনি অসংখ্য লিখেছেন। প্রায় ১২টি উপন্যাস তো আছেই, গল্পও লিখেছেন প্রায় ২৭০টি। তৎসহ নানা নিবন্ধ ও হালকা রচনা। জীবনব্যাপী তাঁর বিরাট সাহিত্যকর্মের সঠিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য বিরাট পটভূমিকার প্রয়োজন; এখানে সে সুযোগ নেই। তবু লক্ষ করলে দেখা যাবে, নিছক কল্পনা-ভিত্তিক সৃষ্টিশীলতার তিনি ছিলেন বিশেষ পরিপন্থী। বস্তুত, তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কর্মই জীবন ও সমাজভিত্তিক, তাঁর অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত চিন্তায় সমৃদ্ধ।

তাঁর প্রথম দুটি উপন্যাস "প্রেম" ও "কৃষ্ণা"। প্রথমটির সমস্যা বিধবাদের পুনর্বিবাহ; দ্বিতীয়টির মেয়েদের অন্ধ অলঙ্কার-প্রীতি। আগেই বলা হয়েছে, যে পরিবেশে প্রেমচাঁদের বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে, সেখানে তাঁদের পৈতৃক ভিটের কয়েকজন আশ্রিতা বিধবা ছিলেন। তাঁদের দুঃখ, দৈন্য, দুর্দশা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর পুন-র্বিবাহ করেছিলেন তিনি এমনই একজনকে, শৈশবেই যিনি বিধবা হয়েছিলেন। দ্বিতীয় উপন্যাসটির সমস্যা তত জোরাল না হলেও, বলা যায়, প্রেমচাঁদ ছিলেন মেয়েদের অলঙ্কার-প্রীতির ঘোরতর বিরোধী। বস্তুত, তিনি মনে করতেন যে, অলঙ্কার-প্রীতি হেতু মেয়েদের চিত্তের স্বাভাবিক বিকাশ বিঘ্নিত হয়।

এর পরেই প্রকাশিত হয় তাঁর "বরদান" এবং "সেবাসদন"। "সেবাসদন"-ই তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম, যে উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রেমচাঁদের প্রথম পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। এই উপন্যাসটি পতিতাবৃত্তির সমস্যা নিয়ে রচিত। এবং নগর-কেন্দ্রিক। লক্ষণীয়, প্রেমচাঁদের পরবর্তী উপন্যাসসমূহের পটভূমি হিসেবে নগর খুব কমই ব্যবহৃত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হবার পর গ্রামোন্নয়ন ও গ্রাম্য সমাজের সংস্কারের দিকে মনোযোগ দেন তিনি। গ্রামের বহুবিধ সমস্যার প্রতিও তখন থেকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। "প্রেমাশ্রম" উপন্যাসে উৎকট জমিদারী ব্যবস্থা, দরিদ্র কৃষকদের অবস্থার সুযোগ নিয়ে জমিদার, পুলিস ও ধনী সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারিতার কাহিনী বর্ণিত। আরো কিছুকাল পরে রচিত 'কায়াকল্প' উপন্যাসটির পটভূমি সাম্প্রদায়িক কলহ। মনে রাখা দরকার, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে তখন জাতীয় জাগরণের সূত্র কেবল ছড়িয়ে পড়লেও সাম্প্রদায়িক বিরোধে কি হিন্দু, কি মুসলমান কেউই নিবৃত্ত হননি। এই ব্যাপারটি প্রেমচাঁদকে খুবই পীড়িত করেছিল; এবং একদা যে তিনি এক জাতি-ভিত্তিক দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার উৎসে সাম্প্রদায়িক বিরোধের ভূমিকাও নগণ্য ছিল না। "কর্মভূমি" উপন্যাসের পটভূমি স্বদেশী আন্দোলন; ধর্মান্ধ সমাজপতিদের হাতে হরিজন সম্প্রদায়ের নিগ্রহ এই উপন্যাসে পার্শ্বকাহিনীরূপে স্থান পেয়েছে।

"গোদান" সম্ভবত প্রেমচাঁদের সর্বাধিক পঠিত ও সবচেয়ে পরিচিত উপন্যাস। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এই উপন্যাসের
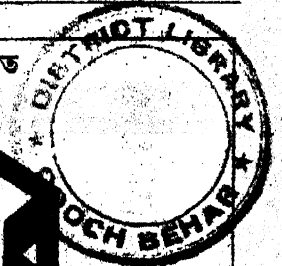
অনুবাদ হয়েছে। এর বাংলা অনুবাদও বহুজনপঠিত। ইউ এন এস কো-র ক্লাসিক সিরিজে এই গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত। পণ্ডিত সমালোচকদের মতে, অদ্যাবধি এটি হিন্দী ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বিরাট পটভূমি, কাহিনীর বিস্তার, সমসাময়িক সমাজের নিখুঁত বর্ণনা ও চরিত্রচিত্রণের অনন্যতায় "গোদান" সত্যিই স্মৃতিধার্য সাহিত্যকর্ম। অর্থলিপ্সু কুসীদজীবী সম্প্রদায় এর এক দিকে, অন্য দিকে ঋণের ভারে দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকসম্প্রদায়। কাহিনীর উন্মোচনে প্রেমচাঁদ কোথাও ফাঁক রাখেন নি, চরিত্রগুলি সবই তাঁর নিজের চোখে দেখা, ফলে তারা রক্ত-মাংস দুঃখ-যন্ত্রণার সর্বজনীনতা নিয়ে উপস্থিত হতে পেরেছে। দিনযাপনের কঠিন গ্লানি দারিদ্র চাষীসম্প্রদায়কে বাধ্য করে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করতে। আসলের চার গুণ সুদ দিতে বাধ্য হয় তারা; কিন্তু, ঋণ কোনদিনই শোধ হয় না। চরম দারিদ্র্যের অতলে ক্রমশ আরো তলিয়ে যায়। "গোদান" উপন্যাসের সমগ্র কাহিনী যেন অসহায় মানুষের নরকবাসের বিবরণ।

"আমাদের বেঁচে থাকা অর্থহীন।" গোদান-এর অন্যতম চরিত্র হরি বলছে: "আমরা রাজ্যপাট চাই না, সিংহাসন চাই না, এমন কি সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যও চাই না। চাই দু মুঠো অন্ন, এক টুকরো কাপড়। আর, নিজেদের সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে। এই সামান্য চাওয়াতেও আমাদের কোন অধিকার নেই।" ঋণের দায়ে হরির চাষের জমি যায়, ভিটে বিক্রি করতে হয়, বলদ জোড়া কেড়ে নেওয়া হয়। হতভাগ্য চাষীকে তখন নামতে হয় পথে, দিনমজুরি করে অন্ন জোটাতে। অনাহারে, শারীরিক ক্লেশে নিঃশেষিত হতে হতে একদিন পথের মধ্যেই মৃত্যু হয় তার।

শুধু উপন্যাসেই নয়, কৃষকদের দুরবস্থা ও সমাজের বিবিধ আচারের অব্যবহিত কুফল নিয়ে বহু গল্পও লিখে গেছেন প্রেমচাঁদ। প্রতিটি গল্পেই তাঁর অনন্য লিপিকুশলতার পরিচয় মেলে।

প্রেমচাঁদের সাহিত্যভাবনা ও সাহিত্যের বিষয়কে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক, জনগণকে জাতীয় চেতনা ও স্বদেশীয়ানায় উদ্বুদ্ধ করা—ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা ও এক জাতিভিত্তিক দেশ গঠন। দুই, জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ সাধন জমিদার, জোতদার, কুসীদজীবী ও ধর্মান্ধ সমাজপতিদের বিবিধ অত্যাচার ও নিগ্রহ থেকে দরিদ্র কৃষক ও হরিজনসম্প্রদায়কে রক্ষা করা। তিন, অসংগতিপূর্ণ বিবাহের বিরোধিতা ও বিধবাবিবাহের সমর্থন, বৈষম্যমূলক সামাজিক আচারবিধি থেকে নারীজাতির মুক্তি ঘটানো। প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষে, প্রেমচাঁদের সমগ্র সাহিত্য-কর্মে, কি উপন্যাসে, কি গল্পে, উপর্যুক্ত তিনটি বিষয়ের প্রবেশ ঘটেছে।

স্বীকার করতে হবে যে, বিশ শতকের প্রথম পাদে প্রেমচাঁদের সমস্ত চিন্তাই ছিল বৈপ্লবিক। একই সময় বৃহত্তর বিশ্বে পুরাতন সমাজব্যবস্থার দ্রুত বিলুপ্তি ঘটছে। এইসব ঘটনাবলীর সূত্র ও পরিণতি সম্পর্কে প্রেমচাঁদ সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। 'প্রেমাশরম' উপন্যাসে ক্ষমতা-লোভী ও ক্রোধান্ধ জমিদারের অত্যাচারের নগ্ন ও নিখুঁত চিত্র রূপায়িত হতে দেখি—তাদের প্রতিহিংসাপরায়ণতার ফলে দরিদ্র চাষীদের কুঁড়ে ঘর একের পর এক আগুনে ভস্মীভূত হচ্ছে, জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে তাদের গরু-বাছুর, পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, ইত্যাদি। এর পরেই প্রবল হয়ে ওঠে দুঃস্থসম্প্রদায়ের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ। এই উপন্যাসে পূর্ব ইওরোপের ও রুশ বিপ্লবের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি শোনা যায়। নায়ক প্রেমশংকর আসলে প্রেমচাঁদেরই মানসপুত্র। জমিদারদের অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার বক্তব্য দ্ব্যর্থহীন। সে বলেছে, জমি তারই যে জমি চাষ করে, ফসল ফলায়। প্রেমশংকরের ভ্রাতুষ্পুত্র তার জমিদারী খেতাব বর্জন করে বলে: "কৃষকদের উচ্ছেদ সাধনের কোন অধিকার আমার নেই। এই অপরাধ নৈতিক, কাপুরুষতার শামিল। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমি আমার আদর্শের বিরোধিতা করতে পারব না।...পুরুষানুক্রমে আর সমাজবিধির ফলে আমি যা অধিকার করেছি, আজ সব অধিকারই আমি ত্যাগ করলাম। আমার প্রজারা এখন থেকে মুক্ত। আজ থেকে তারাই তাদের জমির মালিক"

"প্রেমাশরম" উপন্যাসে দরিদ্র ও ভূমিহীন চাষীরা বিদ্রোহ করেছে জমিদারদের বিরুদ্ধে। "রঙ্গভূমি" উপন্যাসে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে পুঁজিবাদী শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে।। তেমনি, এবং অনুরূপভাবে "কর্মভূমি" উপন্যাসে জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে আঞ্চলিক ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। "গোদান" উপন্যাসে কুসীদ-জীবীদের বর্বরতার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রেমচাঁদের সাহিত্য-কর্মের আগাগোড়াই প্রচলিত ব্যবস্থা, নীতি এবং কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বিবরণ খুঁজে পাওয়া সহজ। এবং খুঁজে পাওয়া যায় সেই জীর্ণস্বাস্থ্য মানুষটিকে, জীবনযাপনের প্রতিটি মুহূর্তে—কৈশোর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত, যাঁকে সহ্য করতে হয়েছে অবর্ণনীয় ক্লেশ ও প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু, প্রতি মুহূর্তের প্রতিটি আঘাতকেই তিনি শেষাবধি অমূল্য সঞ্চয়ে পরিণত করেছেন।

সাহিত্যিক সততা ও অনমনীয় প্রগতি-শীল দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য প্রেমচাঁদ সতীর্থ ও সমজীবীদের দ্বারাও কম উপহসিত হন নি। প্রায় ধারাবাহিকভাবে তাঁকে নানা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এর আরো একটি কারণ ছিল। তৎকালীন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণের নামে নানা শঠতা ও প্রবঞ্চনা তিনি কোনদিনই সুনজরে দেখতে পারেন নি। তাঁর গল্প, উপন্যাসে বিভিন্ন কাহিনী-সূত্রে কোন-না-কোন ব্রাহ্মণের চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে এবং প্রেমচাঁদ তাঁর নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বর্ণনায় গড়ে [illegible]

অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন বর্ণাশ্রম প্রথার বিরোধী।

কিন্তু ব্রাহ্মণ-বিরোধিতার ফলও তাঁকে কম ভোগ করতে হয় নি। ১৯২৮ সনে "মাধুরী" পত্রিকায় "মোতায়রাম শাস্ত্রী" নামে তাঁর এক গল্প প্রকাশিত হয়। একটি ব্যঙ্গ গল্প। মোতায়রাম নামে জনৈক পণ্ডিত ছাত্র পড়িয়ে কোনরকমে জীবিকা নির্বাহ করত। হঠাৎ তার শখ হল বড়লোক হবার। ফলে, রাতারাতি ভোল পাল্টিয়ে সে হাতুড়ে ডাক্তারে পরিণত করল নিজেকে। চিকিৎসাবিদ্যার বা আয়ুর্বেদশাস্ত্রের কানাকড়িও সে জানে না। কিন্তু লোক ঠকিয়ে ক্রমশ পসার ও প্রতিপত্তি জমিয়ে ফেলে। একদিন এক মহিলার চিকিৎসা করার অজুহাতে লোভী, রিরংসু মোতায়রাম কুকাজে লিপ্ত হয় ও হাতে-নাতে ধরা পড়ে। প্রচণ্ড প্রহারের ফলে সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। পরদিন থেকে তাকে আর সে তল্লাটে দেখা যায় না।

ছাপার অক্ষরে গল্পটি চোখে পড়ে লখনৌর জনৈক বৈদ্যর। নাম শালিগ্রাম শাস্ত্রী। ভদ্রলোকের সাহিত্যিক মহলে কিছু খাতির ছিল; একদা নিজেও তিনি হিন্দীতে কিঞ্চিৎ সাহিত্যচর্চা করেছিলেন। প্রেমচাঁদের গল্পের চরিত্রে নিজের ছায়া দেখে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে লেখক ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেন তিনি। তখনকার সাহিত্যিক ও পাঠক মহলে এই মামলা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। লখনৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কয়েকজন সুখ্যাত অধ্যাপকসহ দু-একজন সাহিত্যসেবীও এই মামলায় প্রেমচাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। কিন্তু, শেষ বিচারে মামলা দাঁড়ায় না।

এই ঘটনার পরেও প্রেমচাঁদের কঠিন কঠোর সমালোচনাও যেমন থামে না, তেমনি তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচকের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এমন কি, তাঁর সমালোচকদের অনেকেই তাঁর প্রধান প্রধান সাহিত্যকর্ম-গুলিকে বিদেশী সাহিত্য থেকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। তাতেও ঘটনার শেষ হয় না। প্রেমচাঁদ নিজে ছিলেন কায়স্থ। বর্ণবিদ্বেষী ব্রাহ্মণদের কাছে এটাই আরো অসহনীয় হয়ে ওঠে। হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের এক ব্রাহ্মণ সদস্য এরই ফলস্বরূপ তাঁকে বিচ্যুত করার পরামর্শ দেন।

বিষয়টি ক্রমশ জটিল রূপ ধারণ করছে দেখে কলকাতাস্থ "বিশাল ভারত" পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক বি ডি চতুর্বেদী মধ্যস্থতা করার জন্য এগিয়ে আসেন। এই মর্মে ১৯৩৪ সনের জানুয়ারী মাসে প্রেমচাঁদকে তিনি এক পত্র লেখেন। তাঁর উত্তরে প্রেমচাঁদ স্পষ্ট ভাষায় নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা করেন। ইংরিজীতে লেখা সেই চিঠির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

"....Mr. (x) has accused me of impugning Brahmin's as a class simply because I have ridiculed some of the hypocrites of these priests, mahants and religious loafers. He calls them Brahmins, little thinking how much they are discrediting decent Brahmins. My ideal of Brahmin is sacrifice and service, whoever he may be. Hypocrisy and dogmatism and playing upon the credibility of simple Hindu folk, these pujaris and pandas I regard as curse on Hindu society and responsible for our degradation. They are only good for ridicule, and this is what I have done. These (Messers so and so) and others of his ilk, although parading as nationalists, are at heart imbued with all the failings of the priestly classes and cursing us who are trying to bring in better state of things.."

যাই হোক, এই বিরোধের শেষ হয় নি। ১৯৩৬ সনে প্রেমচাঁদের মৃত্যুর পরই শুধু বিরোধের অবসান ঘটে। মোতায়রাম তার সৃষ্টিকর্তার সমান আয়ু ভোগ করে গেছে। বস্তুত, হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত প্রেমচাঁদের চেয়ে বড় মানহানির মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি আর জন্মান নি।

প্রেমচাঁদের জীবন এক বিরাট সংগ্রামের কাহিনী। এর শুরু তাঁর জীবনের প্রারম্ভে, শেষ তাঁর মৃত্যুতে। উভয়ের মধ্যবর্তী পর্বে কোন বিরাম নেই। তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে যা উল্লেখযোগ্য তা হল তাঁর জীবনের ঘটনাবহুলতা, তাঁর চরিত্রের বিপরীত-মুখী বিভিন্নতা। যা কোথাও কঠোর, কোথাও কোমল, কোথাও উত্তেজিত, কোথাও ক্রন্দনশীল, কোথাও বা অগ্নিগর্ভ ও বৈপ্লবিক। তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন গুণাবলীর মধ্যে কোনটি প্রধান তা নির্ণয়ের জন্য বিরাট পরিসরের প্রয়োজন। কিন্তু, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, শুধু সাহিত্যিক নয়, শুধু সমাজ-সংস্কারক নয় —একই মানুষের মধ্যে এমন বহুমুখী ব্যাপকতা দুর্লভ।

মৃত্যুর আগে পূর্বোক্ত বি ডি চতুর্বেদীকে একটি চিঠিতে প্রেমচাঁদ লেখেন : 'আমার আকাঙ্ক্ষা খুবই কম। এই মুহূর্তের আকাঙ্ক্ষা হল, আমরা যেন স্বাধীনতার লড়াইয়ে বিজয়ী হই। আমি ধন চাই না, যশ চাই না। যা পেয়েছি, তাই আমার কাছে অনেক। অবশ্য আজও আমি ভালো কিছু বই লিখতে চাই। কিন্তু, সে-সব লেখাও যেন আমাদের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে।"

রোদন-প্রাচীর—ক্লাগে-মাউয়ার

প্রাচীরটা যে প্রাচীন সেটা দেখা মাত্রই বোঝা যায়। কত প্রাচীন, সেটা অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ঐতিহাসিক গবেষণা না করে বলতে যাওয়াটা অবিবেচকের কর্ম হবে। তবে এ নগরে যারা বাস করে তারা ছেলেবেলা থেকেই চতুর্দিকের এত সব প্রাচীন দিনের ভগ্নাবশেষ দেখে আসছে যে তাদের চোখ যেন বসে গেছে; আপন অজানতেই অবচেতন মন জরাজীর্ণ পাষাণ-স্তূপের একটার সঙ্গে আরেকটা তুলনা করে করে যেন প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের কতগুলো সাদামাটা কাঁচা-পাকা সূত্র নির্ণয় করে ফেলে। এমন কি যে বিদেশী প্রাচীন ভগ্নস্তূপ অতি অল্পই দেখেছে—যেমন ধরুন মামুলি মারকিন—সে পর্যন্ত এখানে কিছুদিন থাকার পর এটা ওটার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বেশ কিছুটা ওয়াকিফ-হাল হয়ে যায়—অবশ্য যদি 'গাইয়া' মারকিনের মত চোখে ফেটা কানে তুলো মেরে 'টুরিজম' কর্ম না করে।

মোটা, দড়, ভারিক্কি প্রাচীর। প্রায় বিশ গজ উঁচু, অন্তত পঞ্চাশ পঞ্চান্ন গজ লম্বা। রোদে জলে পাথরের চাঁই তার মসৃণতা হারিয়ে খোওয়া-খাওয়া হয়ে গিয়েছে কিন্তু পাথরে পাথরে যে জোড়া লাগানো আছে সেটা আজো যেন প্রথমদিনের মত মোক্কম। রঙ প্রায় কালো।

কিন্তু আশ্চর্য, এ প্রাচীর যে এখানে কি করতে আছে সেটা কিছুতেই অনুমান করতে পারলুম না। অন্য প্রাচীরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সে কোনো চত্বর বা বাড়ির বেষ্টনী নির্মাণ করেনি। শহরের মাঝখানে না হয়ে যদি ফাঁকা মাঠে এটা দেখতুম তবে হয় তো বলতুম, এটা চাঁদমারির (টারগেট শুটিঙের) দেয়াল। এখানে এটার—স্থাপত্যে যাকে বলে আরকিটেচরল ফংশন কি?

একটি প্রৌঢ়া মহিলা—সর্বাঙ্গ লম্বা ভারী কালো জোব্বায় ঢাকা, মাথায় কপাল পর্যন্ত অবগুণ্ঠন, শুধু মুখের লালচে হলুদ রঙের আভা দূরে থেকে দেখা যাচ্ছে—একহাত উপরে তুলে দেয়ালে রেখেছেন, দেয়ালে হেলান দিয়ে, মাথাটিও দেয়ালের উপর কাৎ করে রেখে যেন কোনো গতিকে দাঁড়িয়ে আছেন। খানিকটে এগিয়ে যেতে দেখি, তাঁর দু চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে, আর ঠোঁট দুটি অল্প অল্প কাঁপছে, যেন, কেমন যেন মনে হল, মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। কোনো প্রিয়জনের স্মরণে? কিন্তু কই, কাছে-পিঠে কোথাও তো কোনো গোরস্তান নেই। আমি আর এগোলুম না। রোদ চড়তে আরম্ভ করেছে। বাঁদিকে মোড় নিয়ে হেরড গেটের কাছে ভারতীয় ধর্মশালার দিকে রওয়ানা হলুম।

একটা ছোট বাজারের ভিতর দিয়ে যেতে হয়।

প্রায়ান্ধকার রাস্তা—হাত ছয় চওড়া। দুদিকে দোকানের সারি—আর রাস্তার উপরটাও ঢাকা বলে মনে হয় গোধূলির অন্ধকার যেন নেমে আসছে। তবু ফলের দোকানে কী রঙের বাহার! সবচেয়ে চোখে পড়ে আমাদের কমলানেবুর তিনগুণ সাইজের জাফা অরেন্জ্। মধুর মত মিষ্টি রসে টইটম্বুর। দুপুরে একটা খেলে সে-বেলা আর যেন অন্নে রুচি হয় না। দুটো খেলে গা বিড়োয়।

একটা কিউরিওর দোকান। টুকিটাকি অলঙ্কার, তাবিজ, তসবী, রেকাবি, গেলাশ, তীর, ধনু আরো কত কি! কোনোটা নাকি পাঁচশ, কোনোটা নাকি পাঁচ হাজার বছরের পুরনো! আমি অবশ্য জানতুম, এগুলোর ৯৯% কাইরোর কারখানায় তৈরি হয়। কোনো কোনোটাতে এস্তেক সরকারী ক্ষুদে সীলমারা আছে: সরকারী মিউজিয়াম গ্যারান্টি দিচ্ছেন, এটা প্রাচীন দিনের কোনো পিরামিডে বা গোর খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে। বলে আর কি হবে, মাল যেমন জাল, সীলও তেমনি।

সামনে দাঁড়িয়ে সেই জরমন টুরিস্ট ছোকরা। পরশুদিন আমি এদেশে এসেছি—ছোকরা বেশ কয়েক সপ্তাহ হল। আলাপ হয়েছে কাল সকালে, খৃষ্টের সমাধিসৌধে অর্থাৎ হোলি সেপালকর-এ। অবাক হয়ে বললুম, 'এ কি ভায়া, এসব যে বিলকুল ডাড্—জাল মাল।'

এক গাল হেসে বললে, 'আমার নোটও জাল।'

এক সঙ্গে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলুম।

খানিকক্ষণ পরে আমি সেই দেয়ালের ধারের মহিলাটির কথা পাড়লুম।

বললে, 'সে তো ক্লাগে-মাউয়ার।'

জর্মন ভাষায় 'ক্লাগে' অর্থ 'লেমেন-টেশন' অর্থাৎ 'বিলাপ'; 'মাউয়ার' অর্থ 'প্রাচীর'। বিলাপ করার প্রাচীর। আমি বললুম, খুলে বলো।

পরম তাচ্ছিল্য ভরে ঘোঁৎ করে উঠলো,

ইহুদিদের কি যেন একটা কী! আমার ও নিয়ে কোনো শিরঃপীড়া নেই। ঐ যে, কে এক হিটলার, সে শিখেছে ইহুদিদের কাছ থেকে একটা মারাত্মক তত্ত্ব—ইহুদিরাই এ-পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বলে তারা বিশ্বেশ্বর য়াহভের 'নির্বাচিত সর্বোৎকৃষ্ট জাতি'—অন্যেরা বলতো 'আ মা র' ঈশ্বরের নির্বাচিত প্রিয় জাতি আমরা। ওনরা খি ব্বে শ্ব রে র! হিটলার ওদেরই কাছ থেকে এই অদ্ভুত, প্রলংকরী, জাতে জাতে রক্তাক্ত সংগ্রামসৃষ্টিকারী বীজমন্ত্র শিখে নিয়ে বললে "বটে! এত বড় মিথ্যে কথা! সার সত্য কিন্তু, হে বিশ্বজন, জেনে নাওঃ—আমরা, আর্যরা, এবং তাদের ভিতরও নীল চোখ, সোনালী চুলওলা নর্ডিকরা ত্রিলোকের সর্বোকৃষ্ট জাত।" এবং এই খানেই হিটলার থামলো না; বললো "এবং ইহুদিরা এ-জগতে কাফরী নীগ্রোর মত উনটের মেন্শ (মানব পর্যায়ের নিম্নস্তরের সৃষ্টি)ও নয়। তারা ভার্মিন, নরকের কীট!" যথেষ্ট হয়েছে; আমি ওসব কোঁদলে নেই।'

*

নিরপেক্ষ ইতিহাস বলেন, হেরড দ গ্রেট খৃষ্টজন্মের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে জেরুসলমে যে বিরাট বিচিত্র য়াহভের মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করেন সেটা আকারে প্রকারে সর্বভাবে হাজার বছর পূর্বেকার সুলেমানের টেমপলের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল।১ রোমানরা এ-মন্দির ৭০ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে।

'পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ বিনষ্ট' করেনি। বিরাট মন্দির-চত্বরের চতুর্দিকে যে প্রাচীর একে পরিবেষ্টন করেছিল তার একটি ক্ষুদ্র অংশ, কি কারণে জানি না, আজ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে—এরই বর্ণনা দিয়ে এ-লেখন আরম্ভ করছি।

কবে এ প্রথা, অনুষ্ঠান বা আচারটা আরম্ভ হয় সেটা বলা কঠিন। অন্তত ষোলশ বছর তো হবে।

প্রতি শুক্রবারের বিকালে দেড়/দুই হাজার বছর ধরে ইহুদিরা এই দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে বিলাপ রোদন করছেন। অনেকক্ষণ ধরে যে দীর্ঘ মন্ত্রোচ্চারণ করেন সেটিতে বার বার যে ধুয়া আসে (আমার যত দূর স্মরণে আসছে তারই উপর নির্ভর করে বলছি, কারণ বহু চেষ্টা করেও এই সুন্দর 'কিনোৎ'=ইংরিজি 'এলিজি' মন্ত্রটি যোগাড় করতে পারিনি) তার নির্যাস 'আমাদের সর্বগৌরব-মহিমার যে মন্দির ধ্বংস হয়েছে আমরা তারই স্মরণে এই বিজনে রোদন করি।'

যত দূর মনে পড়ছে রাব্বি—পুরোহিত সে 'গৌরব-মহিমার' কিছুটা বর্ণনা দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আর সবাই উপরের ধুয়াটি বলে। ফের রাব্বি আরো খানিকটা বর্ণনা দেন, ফের উপাসক-মণ্ডলী ঐ ধুয়ার পুনরাবৃত্তি করে। বিলাপের সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রুধারা বয়।

প্রতি শুক্রবারের বিকালে ইহুদিরা এই প্রাচীরের দিকে মুখ করে এই 'কিনোৎ' বিলাপ করেন। অন্যান্যদিনও যে কোনো সময়ে দু' একজনাকে কাঁদতে দেখা যায়। আমি যে মহিলাটিকে দেখছিলুম ইনি তাঁদেরই একজন। আর ইহুদি পঞ্জিকা অনুসারে তাঁদের 'আব্' মাসের ৯ তারিখ মন্দির ধ্বংসের সাম্বাৎসরিক কিনোৎ।

প্রাচীন জেরুসলমের যে অংশে এই প্রাচীরটি পড়েছে সেটি মন্দির ধ্বংসের বহু পূর্ব থেকে গত জুন মাস পর্যন্ত ছিল হয় রোমান না হয় খৃষ্টান নয় আরবদের অধীনে। গত জুন মাসে আরব-ইসরাএল যুদ্ধের সময় আরব শাসনকর্তা ও প্রজাকুল নগর ত্যাগ করে জরডন নদীর পূর্ব পারে চলে যায়।

বিজয়ী ইহুদি প্রধান সেনাপতি দয়ান ও পুরোহিত বংশজাত (লেভি) প্রধানমন্ত্রী এশকল্ দুই/আড়াই হাজার বছরের পরাধীনতার পর 'বিলাপ প্রাচীর'-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে হাজার হাজার ইহুদি। অতিশয় পরিতাপের বিষয়, যে-মহোৎসব সমাধিত হল তার খবর এসেছে মাত্র কয়েক ছত্রে।

আমার মনে প্রশ্ন জাগে : এশকল্ দয়ান এরা কি সেই প্রাচীন দিনের কিনোৎ-বিলাপ করেছিলেন? করার কি প্রয়োজন? সুলেমান হেরডের মন্দির যেখানে ছিল সেখানে নূতন মন্দির গড়ে তুলে সর্ব গৌরব-মহিমা ফিরিয়ে আনলেই হয়—তাহলে অবশ্য শত শত শতাব্দীর প্রাচীন 'কিনোৎ' পরবটি মারা যায়। আজ যদি ভারতে সর্পকুল লোপ পায় তবে কি মনসা পুজো বন্ধ হয়ে যাবে?

কিন্তু যে-জায়গায় প্রাচীন মন্দির ছিল সেখানে তেরশ বছর ধরে যে মসজিদ।

হজরৎ মুহম্মদের পরলোকগমনের পর আরবদের দ্বিতীয় খলীফা হজরৎ ওমরের সময় ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বাইজেনটাইন খৃষ্টান-দের হারিয়ে স্বয়ং ওমর জেরুসলেমে প্রবেশ করেই প্রশ্ন করলেন, নবী সুলেমানের মন্দির ছিল কোথায়? সেখানে তখন শহরের তাবৎ ময়লা-আবর্জনা ভর্তি ভগ্ন-স্তূপ। খলীফা স্বয়ং স্বহস্তে ময়লা আর পাথর সাফ করতে লাগলেন। দেখাদেখি তাঁর সেনাপতিরা ও সৈন্যদল সে-কাজে যোগ দিল। অত্যল্প সময়েই কর্ম সমাধান হলে পর ওমর সেখানে একটি মসজিদ গড়ার হুকুম দিলেন। কারণ মুসলমান শাস্ত্রানুযায়ী মক্কার কাবার পরই এ স্থানটি দ্বিতীয় পুণ্যভূমি। এরই নাম হরমশরীফ এবং এরই কাছে যেখানে মসজিদ উল্-আক্সা ২ সেটিও অতিশয় পুণ্যভূমি কারণ হজরৎ মুহম্মদকে তাঁর জীবিতাবস্থায় দেবদূতে আল্লার কাছে যখন নিশাভাগে নিয়ে যাওয়া হয় (সশরীর না শুধু আত্মা এ নিয়ে মতভেদ আছে) তখন তাঁকে আরব-দেশ থেকে প্রথম এই মসজিদ উল্-আকসা ভূমিতে নিয়ে আসা হয়েছিল।

৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ওমর যে সাদামাটা মসজিদ নির্মাণ করেন তার পরিবর্তে খলীফা আব্দুল মালিক আনুমানিক ৭০০ খৃষ্টাব্দে যে মসজিদ সেখানে নির্মাণ করলেন সেটি সত্যই অতুলনীয়। বিশ্ব-বিখ্যাত স্থপতিদের মতে পৃথিবীর আটটি স্থাপত্যকলার নিদর্শন উল্লেখ করতে হলে এটিকে বাদ দেওয়া যায় না। তবে এটি ঠিক মসজিদ নয়, এটাকে 'পুণ্যসৌধ' বলা চলে—আরবীতে এর নাম কুব্বৎ উস্-সখরা (ডোম্ অব্ দ রক্)।

এ-দুটি না ভেঙে তো সুলেমানের টেম্পল্ গড়া যায় না।

ইতিমধ্যে খবর এসেছে ইহুদিরা জেরুসলেমে প্রবেশ করেই মসজিদ উল্-আকসার উপর ইহুদি পতাকা তুলে পূর্ণ এক দিবস সেটা সেখানে রাখে। অনেকেই এই ঝাণ্ডা ওড়ানোটাকে ইহুদির আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন স্বত্বাধিকার দাবি করার পূর্বাভাস মনে করে শঙ্কিত হয়েছেন। খৃষ্টান উইলসন শঙ্কিত হন নি, এবং

---

(১) নির্মাণ আরম্ভ খৃঃ পূঃ ২০; নির্মাণ শেষ খৃষ্টাব্দ (খৃষ্টের পর) ৬২। কী ট্র্যাজেডি! যে-মন্দির গড়তে লাগলো প্রায় ৮২ বৎসর সেটা ভাঙতে (প্রধানত লুট করতে—কারণ ইহুদি মন্দিরে তাদের 'কোষাকুষি', হয় বিরাট আকারের ও নিরেট সোনায় তৈরি) ৮২ ঘণ্টাও লাগেনি! প্রফেট নোআ-র (আরবী বাঙলায় নূহ্) আরক্ বা নৌকা তুলনীয়।

(২) বছর চল্লিশেক পূর্বে হায়দরাবাদের নিজাম প্রায় পাঁচ লক্ষ (পাকা অঙ্কটি কেউ আমাকে বলতে পারেনি) মুদ্রা ব্যয় করে মসজিদটির আমূল সংস্কার করেন।

খৃস্টান জনসন তো ইহুদির পিছনে রয়েছেনই। যা শত্রু পরে পরে। লেগেছে শাইলককে লড়াই।

কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে ইহুদিরা চালে করলে একটা ভুল। দয়ান-এশকল্ সম্প্রদায়ের জাতবৈরী অন্য এক ইহুদি সম্প্রদায়ের নাম স্যামারিটান। তাদেরও আড়াই হাজার বছরের পুরনো একটা ভাঙা মন্দির পড়ে আছে একটা টিলার উপর। ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইন বিভাগের সময় স্যামারিটানরা কিছুতেই দয়ান হিস্যায় পড়তে চায়নি। তারা জরডনের আরব হিস্যাতে যেতে চেয়েছিল এবং যায়। জুন মাসে আরব সেখান থেকে পালালে পর এ মন্দিরের দয়ানরা 'দাবি'র ঝান্ডা ওড়াতে গেলে হাতাহাতির উপক্রম হয়—যদ্যপি সে স্থলে মাত্র তিন/চার শ' স্যামারিটান বাস করে (তাবৎ দুনিয়ায় এ সম্প্রদায়ের সাকুল্য সংখ্যাই মাত্র তিন থেকে পাঁচ শ'), তবু তারা সাহস করে এ 'গুন্ডামি' রোকতে যায়।

তখন খুৎউগুৎ—মাইনাস জনসন—শান্তিকত্র হল।

জেরুসালেমে যে রয়েছে প্রভু যীশুর সমাধি মন্দির—এবং গণ্ডায় গণ্ডায় গির্জে। ক্যাথলিক, গ্রীক অর্থোডক্স, আরমেনিয়ান, কপ্ট্, হাবশী, সীরিয়ান, লুথেরিয়ান আরো কত জাতবেজাতের (মুসলমানদের তো মাত্র দুটো—হরম শরীফ আর অকসা)। আজ ঝান্ডা ওড়েনি বটে কিন্তু মুসলমানদের দুটো দখল করার পর ইহুদির হিম্মৎ বেড়ে যাওয়াতে যদি সে খৃস্টানদের ও—?

পোপ শান্ত হন সর্বপ্রথম। তারপর উ থান্ট। তিনি হুঙ্কার ছাড়েন, 'বেরিয়ে যাও, প্রাচীন জেরুসালেম থেকে!' দয়ান উড়িয়ে দিলেন, 'ইয়ারকি পায়া হৈ? যব না।'

সাবাস্ উ থান্ট চুপ-চাপ!!

মন্দার আশংকা ও সরকারী ব্যয়

এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, উপাদান-রাশির সুষ্ঠু বন্টন এবং অগ্রাধিকারের সঠিক ক্রম নির্ণয় হয়নি বলে দেশে অতিরিক্ত অথবা ভুল ক্ষেত্রে মূলধন খাটানো হয়েছে। সমস্যা ঘোরালো করেছে পর পর দু' বছর কৃষির অবনতি এবং চতুর্থ যোজনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অস্বাভাবিক বিলম্ব। সন্দেহ নেই, আর্থিক ব্যবস্থার কয়েকটি অংশ, যেমন কয়লা ও রেল পরিবহণের সম্প্রসারণকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতিকে বর্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী করা উচিত হবে না; কেননা, কৃষি ও শিল্প অংশের কাজ-কর্ম নিম্নস্তরে থাকা সত্ত্বেও গত ব্যস্ত মরসুমে অর্থ-সম্প্রসারণ চূড়া স্পর্শ করেছিল। আসলে, ঋণদান বা মুদ্রাসৃষ্টি দ্বারা কৃষিজাত অথবা আমদানিলব্ধ প্রকৃত দ্রব্যসামগ্রীর অনটন দূর করা যায় না। রেলযোগে পাঠাবার মালের বহর এখন কমে গেছে; এদিকে ওয়াগন কেনা বন্ধ না করলেও সেগুলি মজুত করে রাখার একটা সীমা আছে। আবার, বাজেটে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা রক্ষার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে সমস্যা দেখা দিয়েছে, এ কথাও ঠিক নয়। বস্তুত, বাজেটে ঘাটতি পরিহার করার নীতি সবেমাত্র প্রবর্তন করা হয়েছে।

প্রধানত পরিকল্পনা-সংক্রান্ত খরচ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে ইস্পাতের মতো উপকরণ, যন্ত্রপাতির মতো মূলধন দ্রব্যের চাহিদা মন্দীভূত হয়ে এসেছে। বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে তাই উৎপাদন-ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহৃত হতে পারছে না। উৎপাদনশক্তির অপূর্ণ নিয়োগের মানে হচ্ছে উন্নয়নের মূল্যবান সম্ভাবনাকে নষ্ট করা।

মন্দার যে লক্ষণ এখন দেখা দিয়েছে, তা ঠেকাতে গেলে সরকারী ও বেসরকারী উভয় অংশের নির্বাচিত ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগ বাড়িয়ে দিতে হবে। নির্বাচন যত্নের সঙ্গে করা হলে অতিরিক্ত ব্যয়ের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সমস্যা জটিল হবে না। অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এবং ভোগদ্রব্যের উপর অর্থব্যয় যেমন ভালোরকম ছেঁটে ফেলতে হবে, সেই সঙ্গে দ্রুত ফল দেয় এমন ক্ষেত্রে বেশী মূলধন খাটানো দরকার।

অগ্রিম ব্যবস্থা অবলম্বন

ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের বর্তমান অনিশ্চয়তা দূর করার উদ্দেশ্যে আগামী বছরে আবশ্যক রেলওয়ে সরঞ্জাম কেনার অগ্রিম ব্যবস্থা করা হবে, স্থির হয়েছে। বলা হয়েছে, ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে নির্বাচনমূলকভাবে উদারতা অবলম্বন করা হবে। বয়নশিল্পের যন্ত্রপাতি তৈরি করার স্বদেশী কারখানাগুলি থেকে অগ্রিম কেনার একটা পরিকল্পনা রচনা করা হবে: চিনিশিল্পের সম্প্রসারণের জন্য আবশ্যক সরঞ্জাম আগে থেকে কেনার কথাও হচ্ছে। যাতে ধাতব ও ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য রপ্তানি করা হয়, সেজন্য সুবিধাজনক কড়ারে ঋণ দেওয়ার বন্দোবস্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক করছে। পরে দাম পাওয়ার ভিত্তিতে মূলধন সরঞ্জাম বিদেশে ও দেশের ভিতর যাতে বিক্রি করা যায় এবং ট্রাক, কলের লাঙ্গল বা ট্রাক্টর ও মাত্র ধরবার ট্রলার যাতে ধার করে কেনার শর্তে বেচা সম্ভব হয়, সেজন্য অর্থসাহায্য দেওয়া যায় কিনা, তা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পরীক্ষা করে দেখছে। এতদিন ছিল বিক্রেতাদের বাজার, যেখানে উৎকর্ষ ও মূল্য সম্বন্ধে মাথা ঘামানো হত না। এখন উৎপাদন-ব্যয়, গঠনতান্ত্রিক পুনর্বিন্যাস, সংরক্ষিত আভ্যন্তরিক বাজারের বদলে বিদেশে বিক্রির কৌশল অর্জনের দিকে মনোযোগ দেবার দরকার হবে।

পরিকল্পনা-সংক্রান্ত ব্যয়

১৯৬৭-৬৮ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় (সরকারী অংশে) ২,২৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। গত এক বছরের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ধরলে বোঝা যাবে যে, মূলধন নিয়োগের প্রকৃত পরিমাণ আগের বছরের চাইতে হ্রাস পেয়েছে। বলা হয়েছে, চতুর্থ যোজনার প্রথম দু' বছরের ভেতর অগ্রাধিকার অংশগুলির আর্থিক প্রয়োজন সন্তোষ-জনকভাবে মেটানো যাবে। ১৯৬৭-৬৮ সাল শেষ হলে দেখা যাবে যে, পুরো পাঁচ বছরে প্রস্তাবিত মোট খরচের শতকরা ৩০ ভাগের মতো (প্রথম দু' বছরে) ব্যয় হয়েছে। পিছনে পড়ে আছে যে অংশ-গুলি—শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবামূলক কাজ—সেগুলির উপর খরচ প্রথম দু' বছরে শতকরা মাত্র ২০ ভাগে দাঁড়াবে। ঐ ক্ষেত্রগুলির পরিকল্পনা-নির্ধারিত লক্ষ্যে পাঁচ বছরের মধ্যে কি করে পৌঁছানো যাবে, বোঝা যাচ্ছে না।

অর্থসংস্থানের সমস্যা

এ বছর ফসল ভালো হলে মূল্যস্থিতি অর্জন করা যাবে, এই আশার ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, অনুকূল অবস্থায় খাদ্য ও সারের জন্য সরকারী অর্থসাহায্য লাগবে না এবং ১৯৬৭-৬৮ সালের পরিকল্পনায় অধিকতর মূলধন নিয়োগের উদ্দেশ্যে বাড়তি অর্থসঙ্গতি যোগাড় করা সম্ভব হবে। পরিকল্পনার জন্য অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করবার আরো কয়েকটি উপায়ের দিকে কমিশন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে: সরকার ও সমবায় সমিতিগুলি কর্তৃক ভূমি রাজস্ব, অন্য কর ও ঋণ বাবদ বকেয়া পাওনা আদায়; যেসব সামগ্রীর ভোগ বেড়ে যাচ্ছে তাদের উপর আবগারি শুল্ক আরোপ; জেলাস্তরে যাতে সরকারের চলতি ঘাটতি দূর করার জন্য জলকরের বৃদ্ধি (নিজলিঙ্গাপ্পা কমিটি যা সুপারিশ করেছে); বড় আকারের জমির উপর উচ্চ হারে কর বসানো; ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে লোককে উৎসাহিত করা এবং জমি বন্ধকী (উন্নয়ন) ব্যাঙ্কের দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র ও সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ার মূলধনে যাতে গ্রাম অঞ্চলের লোকে অর্থ নিয়োগ করে তার জন্য প্রচেষ্টা। প্রাগুক্ত পন্থাগুলির মাধ্যমে পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থানের কাজ এগোলে মূলধন নিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া যাবে। বৈষয়িক উদ্যোগের গতিবেগ, এমন কি শিথিল আর্থিক ব্যবস্থায় কাজকর্মের বহর বজায় রাখার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন এখন জরুরী।

শান্তিকুমার ঘোষ

ক্লান্ত আনুনাসিক সুরে কুকুরটা আবার ডেকে উঠল। এতক্ষণ দেখেনি কামিনী. এখন দেখল। লাল লাল ডেঁয়ো পিঁপড়েগুলো সার বেঁধে এগিয়ে আসছে। দেওয়াল ফুঁড়ে কোথ্ থেকে যেন বের হয়ে লম্বা একটা জলের ধারার মত গড়িয়ে এসেছে। ঘাড়টা নিচু করে কামিনী হারুর বাপের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল—কতকগুলো কানের মধ্যে, কতকগুলো ঠোঁটের রক্তমাখা শুকনো গ্যাঁজলা বেয়ে হাঁ-করা মুখে, দাঁতের ফাঁকে, মাড়ির তলে, কতকগুলো দু' চোখের কোণে কোণে। বাকিগুলো পোঁ পোঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছুটো-ছুটির অন্ত নেই।

লণ্ঠনের আলো ঢিমে, পলতে পুড়ে শেষ নেই বললেই চলে। দপদপ করে আগুনটা জ্বলছে, ফাটা চিমনিতে মুঠো মুঠো ভুসো। একটু একটু কমে আসছে আলোর শীষ, আর অল্প-ক্ষণ, তারপরই দপ করে নিবে যাবে লণ্ঠনটা। দাওয়ার বাইরে মিশকালো অন্ধকার আরও ঘুরঘুটি হয়ে নামবে, কামিনী তখন কিছু দেখতে পাবে না, জগৎ চরাচর দৃষ্টির অগোচরে চলে যাবে। আচ্ছা, পিঁপড়েগুলো কি তখন দেখতে পাবে?—কামিনী ভাবল।—যদি না পায়? যদি পিলপিল করে উঠে এসে কামিনীর গায়ে মাথায় আঙুলের ফাঁকে, বগলের তলায়, ঊরুর খাঁজে, নাকের ফুটিতে, কানের ফুটোয় ঢুকে কুটুসকুটু কামড়াতে থাকে? মাংস কুরে কুরে খায়? কি করবে তখন কামিনী? কি করবে!

হারুর বাপকে ওগো বলে চেঁচিয়ে কেঁদে ডাকতে গেল কামিনী, যেমন রাত-বিরেতে ভয় পেয়ে ডাকত। গলা বসা-বসা ফাটা তলতা বাঁশের মত এক ধরনের ফ্যাসফেঁসে আওয়াজ উঠল, শব্দটা স্পষ্ট হল না। আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে কামিনী, কোলে মানুষটার মাথা, বাঁ

কান্না রেখে সাদা দুধের মত ধবধবে দাঁতের পাটিটা পান-লাল রক্তের ছোপ মেখে খড়মের মত খটখট শব্দ তুলে হাসতে হাসতে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

তার ওপর এই মচ্ছব উকুন. চুলকিয়ে চুলকিয়ে মাথা খস্ক হয়ে যায় জ্বালা করে। হারুর বাপটা হাটে গেলে দুপুরে মাথা ঘষেছে কামিনী রোদে মেলে শুকিয়েছে। এখন এই শেষ বিকেলে দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে কামিনী মনের সুখে উকুন বাছছিল। সনের মত শুকনো খরো চুল হাওয়ায় উড়ছে। সুতোয় গাঁথা সার-সার পুঁতির মালা যেন নুখে খোলটানা স-স-স শব্দ তুলে নখে নখে ঘষছিল কামিনী. পোস্ত-দানার মত গুঁড়ি গুঁড়ি উকুনগুলো টুকটুক করে ঝরে ঝরে পড়ছিল। কামিনী সেগুলো ধরে নখের ওপর নখ রেখে টিপে টিপে মারছে. পুটপুট শব্দে ফেটে যাচ্ছে উকুন-গুলো।

হারু থাকলে নিশ্চয়ই গলা জড়িয়ে ধরত. বলত—দেখ মা. কি রকম শব্দ হচ্ছে!

হবে না। কামিনী বলত—ফেটে যাচ্ছে যে। মরণে বড় জ্বালা রে।

দূরে টিলার ওধারে শাল আর শেয়াকুলের জঙ্গলে আঁধার ঘন হয়ে নামছে। অল্প আগেও ওদের ছাড়া-ছাড়া একা-একা দেখা যাচ্ছিল. এখন এ ওর গায়ে হেলান দেওয়া. জড়াজড়ি করে সব যেন দাঁড়িয়ে আছে। কামিনী চোখ টেনে টেনে দেখল, কিছুটা দেখল, বাকিটা আন্দাজে বুঝল। বাতাস এলোমেলো। মাঝে-মাঝে দমকা হাওয়া থমকে দাঁড়িয়ে কালো আকাশের সঙ্গে চুপিচুপি ফিসফাস কথা কইছে। এক-আধবার তাদের শলাপরামর্শ সনসন্ শব্দে উড়ে আসছিল. আবার চুপ—সব নিস্তব্ধ. ক্বচিৎ দু-একটা ব্যাঙের ডাক ছাড়া কোথাও কিছু শোনা যাচ্ছিল না।

তোর যেমন. হারুর বাপ রেগেমেগে বলেছিল. দিলি তো ছেলেকে পাঠিয়ে। এখন কি করে সময় কাটে বল দিকিনি?

আমি দিইচি? কামিনী বলেছিল. নিজেই গোঁ-গোঁ করে নিয়ে গেল। আহা রে! মরে যাই! একেবারে ছেলে-অন্ত প্রাণ!

না, ছেলে-অন্ত হবে না। তোর মত ঠ্যাকারে মাগীর পোঁ ধরা হবে! হারুর বাপ হাটে যেতে যেতে বলেছিল. আজ না পারি, কালই যাব. ঘর-দোর এমন খালি-খালি ঠেকছে।

সত্যিই ভীষণ খালি-খালি লাগছে। কি যে মুখপুড়ি করেছে। —কামিনী ভাবল। অন্ধকার ঘন হয়ে নামল. ঝড় উঠবে-উঠবে বোধ হচ্ছে। কামিনী উতলা হল. হাটবারে কত তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরে মানুষটা। তবে কি, কামিনী ভাবল, হারুর মাসীর বাড়ি গিয়েছে ছেলেকে আনবে বলে! ছেলেটাও যে বড় ন্যাওটা ওর।

তুলসীতলায় সন্ধ্যে দেখিয়ে দাওয়ার বাতা-ঘেরা কোণে কাঠের উনুনটা জ্বালল কামিনী। তাড়াতাড়ি দুটো ভাত ফুটিয়ে নিতে হবে। মানুষটা সেই দুপুরে বের হয়েছে, তিন কোশ পথ আসতে-যেতে। তার ওপর যদি ছেলেটাকে নিয়ে আসে। কামিনী ভাবল, সারা দিন খাটাখাটুনির পর একটু জিরিয়ে বসে খেতে চাইলেই খেতে দিতে হবে, নইলে রেগে কাঁই হয়ে যাবে। একেই বলে রাগী মানুষ।

ভাতের হাঁড়িটা চাপিয়ে বাতার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকল কামিনী। আলো জ্বালেনি কামিনী. উনানের ধোঁয়া-মেশা অনুজ্জ্বল আভা একটা আলোর বৃত্ত গড়েছে। আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে কামিনীকে।—মানুষটা এখনও এলো না, এখনও এলো না! কামিনী ভাবল। আজ ক'দিন ধরে মনটা ভাল নিচ্ছে না, কেমন যেন অলক্ষণ কুলক্ষণ দেখছে। পুষিটা চালের বাতার ওপর চলে-ফিরে বেড়াবার সময় দিনরাত ম্যাও-ম্যাও করে কাঁদে। ভুলোটারও যেন কি হয়েছে! চোপরদিন ছাই-গাদায় শুয়ে থাকে. শুয়ে শুয়ে ধোঁকে. কিছুই খায় না, খেলেও বমি করে। আর রাতে যেন ভূতে পায় ভুলোকে। দেখতা-না-দেখতা, দুদ্দাড় ছুটে যায়, পিছনের পায়ে ভর দিয়ে সামনের দিকে মুখটা বাড়িয়ে ভোঁ-ভোঁ-ও-ও-ও করে ডেকে ওঠে। কামিনীর রাগ হয়, হাতের কাছে যা পায় ছুঁড়ে মারে,

কখনও লাগে, কখনও লাগে না। লাগলে লেজ গ্নুটিয়ে খ্যাই কুঁই করে ছ্নুটে পালায়, না লাগলে অন্ধকারে ভেউ ভেউ শব্দে তেড়ে যায়।

কামিনী ঝ্নুঁকে পড়ে দেখতে লাগল, কি রকম যেন ছমছম করছে মনটা, পেটের মধ্যে ওটাও থলবল করছে, যেন অস্থির হয়ে উঠেছে। এ সময়ে সাবধানে, সামলে-স্নুমলে থাকতে হয়, নইলে দোষ পায়। সামলাবে কি কামিনী, মনটাই যে স্থির হচ্ছে না। হার্নুটা থাকলে ঠিক বলত—মা রে, মা! বাবা এখন এল্নুনি!

কি জানি। কেন যে এত দেরি করে মান্নুষটা!

হার্নু মায়ের কোলে চেপে গালে গাল রেখে হাসতো।—দের তো হবেই। ঝগড়্নু পণ্ডিতের বাড়ি বসে বসে গাঁজা খেলে দের হবেনি।

কামিনী রাগত।—তোকে বলেচে। ইঁচড়ে-পাকা ছেলে কোথাকার। অত বড় পণ্ডিত লোক, কত রামায়ণ মহাভারত গায়, কথকতা করে, সে ব্নুঝি গাঁজা খায়!

মাইরি বলচি মা। তোকে মিছে বলেচে বাবা। বাবাও খায়, পণ্ডিতও খায়।

খায় তো খাক। জোর কি? কামিনী ভাবতে ভাবতে ভাবল, ঐ এক দোষ হারুর বাপের। আর এক দোষ রাগ। রাগলে জ্ঞানগম্যি থাকে না মানুষটার। কামিনীর মনে পড়ল, একবার রেগে লাথি মেরেছিল মানুষটা। কামিনী তখন পোয়াতি। সে কি রক্তস্রাব! কিন্তু যাই বলো আর তাই বলো, তিন দিন তিন রাত দু চোখের পাতা এক করেনি, পায়ের গোড়ায় বসে কামিনীর সেবা করে গিয়েছে। একটু ভাল হলে কামিনী গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে, জীবনে আর রাগও করবে না, গাঁজাও খাবে না। কিন্তু কথা রাখতে পারেনি, হারুর বাপ। তা, বেটাছেলের একটু আধটু এদিক ওদিক হয়ে থাকে। এ ছাড়া অন্য কোন দোষ নেই। অন্য মেয়েদের সোয়ামিগুলো হাড়নচ্ছার, গাছেরও খাবে, তলারও কুড়ুবে। ঘরের বউ ফেলে ভাড়া-করা বাড়ির মাগী-গুলোর কোল কেঁড়ে পড়ে থাকবে। হারুর বাপের ওসব দোষ নেই, যা করবে এই কামিনী দাসী। কামিনী-অন্ত মন, কামিনী-অন্ত প্রাণ। জেগে থাকলে কথা নেই, বুকের ওপর ফেলে সোহাগে যেন গেলে মারবে। কেমন যে জাড়িয়ে শোবে, কামিনী পাশ ফিরতে পারে না, পাছে ঘুম ভেঙে যায় লোকটার।

কামিনী এক-একদিন হাসে, রাগ করে বলে, তুমি এমন করে জড়িয়ে ঘুমোও না, যাইরি বলছি, তুমি ভাব বুঝি, আমি পালিয়ে যাব।

হারুর বাপ হাসে।—মেয়েমানুষকে বিশ্বাস নেই বাবা। ওরা সব পারে। এই আছে, এই ফুড়ুত করে পালাল।

তুমি অমন ভাবলে সত্যি সত্যি একদিন পালিয়ে যাব কিন্তু।

যাস দেখি, হারুর বাপের চোখ দুটো ভাঁটার মত ঘোরে, কত বড় সাধ্যি। তোর আর তোর নাঙের মাথা এক সঙ্গে চিবিয়ে খাব। যমও হলে রেহাই পাবে না।

আচ্ছা গো আচ্ছা! কামিনী ওর গায়ে ঢলে পড়ে, দেখব কত সাহস, কেমন বেটা-ছেলে তুমি! যমের সামনে রুখে দাঁড়াও কত জোর! কত শক্তি!

হু হু করে জলের ধারা কামিনীর চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। এমন তো কথা ছিল না। ডুকরে কেঁদে উঠল কামিনী, এমন তো কথা ছিল না। লোকটাই চলে গেল, আর কামিনী পড়ে রইল মড়া মুণ্ডটা কোলে নিয়ে, এক গণ্ডুষ জলও দিতে পারল না মুখে।

বাতাস জোরে বইছিল, থেকে থেকে হাওয়ার দাপটে ঘরের বাতা নড়ে-চড়ে উঠছে। গাছের ডালগুলো সপাং সপাং এ ওর গায়ে লাগছে, পাতাগুলো হাওয়ায় হাত-পা মেলে, ঝরঝর শব্দ হচ্ছিল। গোয়ালঘরে বুধিটা হাম্বা হাম্বা শব্দে ডেকে উঠল, হাঁস-মুরগির খোঁয়াড়ে শিয়াল পড়লে যেমন পাখা ঝটাপটি আর সকাতর ডাক ওঠে, তেমনি আওয়াজ উঠল। কামিনী ঠিক খেয়াল করেনি, এখন কড়কড় শব্দে বাজ পড়তে সব আলোয় ঝলসে উঠল। কখন যে গুটি গুটি মেঘ এসে জমেছে, কামিনী দেখেনি, সে নিজের ভাবনা নিয়ে মত্ত ছিল।

অন্ধকার আর ঝাপসা বৃষ্টিতে তার দৃষ্টি বেশী দূরে চলছিল না, কেবল বিদ্যুতের আলোয় যখন পথঘাট বনবাদাড় ঝলসে উঠছিল, তখন অনেকখানি দেখতে পাচ্ছিল কামিনী। টোপ টোপ বৃষ্টি দমকা বাতাসে এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে পড়ছে, ওপাশের ভাংগা টিন আর গোলপাতায় চড়বড় চড়বড় শব্দ উঠছে। কামিনী বোধ করল, গলার কাছটা শুকিয়ে আসছে যেন।

উঠানের আধা-ভিজে আধা-শুকনো পাতার মধ্যে কি একটা সরসর করে চলে গেল। কামিনীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। লোকটা এখনও এলো না...এখনও এলো না...এখনও এলো না! জোর ছোটা রেল-গাড়ির কাঁপা কামরার মত মনটা ঘটাংঘট শব্দ তুলে ভাবতে ভাবতে ছুটেছে। আচমকা ভুলো দাওয়া থেকে লাফিয়ে মাটিতে নামল। মাটিতে নাক রেখে শুঁকতে শুঁকতে গেল কিছু দূর, শেষে পোঁ-পোঁ ছুটে গাছটা ঘিরে একটা চক্কর কাটল। মাটিতে নখ আঁচড়ানোর খস্‌খস্‌ আওয়াজ হল, রাগে গরগর করে ফুলতে লাগল ভুলোটা। ঘাড় লম্বা, নাক কুঁচকে বার কয়েক বাতাস শুঁকে শুঁকে কাঁকিয়ে কেঁদে উঠল। কামিনীর মনে হল, সরসর শব্দটা খোড়ানিম গাছতলা ছেড়ে আশশ্যাওড়া জঙ্গলের পাশ দিয়ে চলন পথের ঘাসে ঢাকা তরল সবুজের মধ্যে মিলিয়ে গেল। চাপা ভয় আর রাগে কামিনী যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।—মর। মর! কামিনী বলল।

কামিনী রে! বিকট একটা চিৎকারের শব্দ উঠল যেন, যমে খেয়েছে।—কা-মি-নী-রে! অনেক দূরে থেকে কে যেন কামিনীর নাম ধরে ডাকছে। প্রতিধ্বনির ওম্‌ ওম্‌ সুরেলা ঝংকার তরল অন্ধকারে ভেসে ভেসে কামিনীর কানে বিবশ ঝাপটার মত শোনাল। কামিনীর বুকের মধ্যে ফাটা বাঁশ দিয়ে কে যেন ডলছে, মাথাটা শোলার মত হালকা। চোখের পাতা চোখে আপনা থেকেই লেগে লেগে যাচ্ছে। আঙুলে আঙুল বেড় দিয়ে দাওয়ার খুঁটি ধরেছিল কামিনী। কামিনী বুঝল, পা দুটোর কোন জোর নেই, আধ-কাটা কচুগাছের মত লতপত লতপত করছে। দাঁতে দাঁতি লেগে আসছে, শরীর অবশ। পিঠটা ধনুকের মত বেঁকে গেল, আস্তে আস্তে হাত দুটো সড়সড় করে নিচে নামছে। অনেকগুলো আলোর বৃত্তের

পর একটুখানি ঝলকানি। তারপরই ঘন অন্ধকার। মাটিতে গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল কামিনী, শুনল, কে যেন আর্তস্বরে ডাকছে, কা-মি-নী-রে!

কামিনী যখন উঠে দাঁড়াল, তখন লণ্ঠন জ্বালা। হারুর বাপ মাটিতে চিত হয়ে পড়ে। হাতের লাঠি উঠানে, হাটকাবারী চালডাল মসলাপাতি দাওয়ায় ছড়ান। চোখের কোল ফেটে রক্ত বের হচ্ছে, মুখে অল্প অল্প গ্যাঁজলা, সঙ্গে রক্তের ছিটে। দম নিতে বড় কষ্ট হচ্ছে। হাঁ করে ভিজে বাতাসটুকু বুকের ভেতর পুরে নিতে চাইছে লোকটা, পারছে না, হাঁফিয়ে উঠছে, চোখ উল্টে উল্টে যাচ্ছে, অসহ্য যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে কেতরে কাতরে উঠছে।

দমফাটা চিৎকারে কামিনী চেঁচিয়ে উঠল। —ওগো! আমার এ কি সব্বনাশ হল রে! হারুর বাপ যেন শুনতে পেল, রক্তমাখা চোখ দুটো ঘুরে ঘুরে কামিনীর মুখের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়াল।—গ্-গ্-গ্-গ্। কি যেন বলছে লোকটা, কামিনী ধরতে পারছে না। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাপড়ের খুঁট দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে দিল কামিনী।—জল। অস্পষ্ট শব্দটা ভস্ করে বের হয়ে এল।

ঘটিতে জল এনে কোলে মাথা তুলে কামিনী মুখে জল দিতে গেল। গ্যাঁজলা উঠে আবার মুখটা ভরে এসেছে। কামিনী আবার পরিষ্কার করল। ভক্ ভক্ ভক। আবার খানিক গ্যাঁজলা উঠল, সঙ্গে রক্ত। কামিনীর হাত কাঁপছে, কাঁপা-কাঁপা হাতে জল ঢালছে কামিনী। মুখে চোখে গড়িয়ে পড়ল জল। বেঁকে বেঁকে উঠছে হারুর বাপ। বুকে রাখা কামিনীর বাঁ হাতের আঙুলগুলো, আঙুলে আঙুলে পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরল লোকটা, কামিনীর মনে হল, এখনই বুঝি মটমট্ করে ভেঙে যাবে আঙুল। তাগা-বাঁধা পাটা একটু একটু করে উপর দিকে উঠে গেল, বুকটা হাপরের মত ফুলে ফুলে উঠল বার দুচ্চার। মুখের কষ বেয়ে, চোখের কোণ দিয়ে ভলকে ভলকে আরও খানিক রক্ত ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ওপরে ওঠা পা চটাং করে মাটিতে পড়ে গেল, বাঁ কান দোমড়ান বুক পিঠ ধীরে ধীরে মাটিসমান হয়ে এল। বাবা গো! সেই সঙ্গে মুখ থুবড়ে ঘুরে পড়ল কামিনী।

বৃষ্টি কখন ধরে এসেছে। চালের বাতা দিয়ে টোপা টোপা বৃষ্টির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে। নিচে উঠানে কোথায় যেন জল জমেছে, বাতার জল পড়ে টুংটাং শব্দ উঠছিল। এক কোণে কোথায় শুয়ে ভুলোটা যেন কুঁইকুঁই করে কাঁপছে। ওধারে চৌকাঠের দিকে চটের থলের পেটের ওপর ঘাড় বেঁকিয়ে মাথা গুঁজে পুষি ঘুমোচ্ছে। ঘরে রাখা কৌটোবাটার কাছে কিছু যেন একটা নড়ছে, কুটকুট শব্দ উঠছে। কামিনী জেগে না ঘুমিয়ে, জ্ঞানে না অজ্ঞানে, কামিনী ঠিক বুঝছিল না। কেমন একটা ভাম-ভাম ভাব, সিদ্ধি খেলে যেমন হয়। কামিনী যেন নেশা করেছে। চোখ ঢুলে ঢুলে আসছে, মাথাটা টিলটিল করছে, কিছু বুঝছিল, কিছু যেন বুঝছিল না সে। বুকের ভেতর পুড়ে যাচ্ছে সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা, গোমরান কান্নার ঢেউ বারে বারে চলকে চলকে উঠছে, কিন্তু কিছুতেই যেন শব্দ হয়ে ফুটে খইয়ের মত চড়বড়িয়ে উঠছে না। কামিনী কান পেতে শুনল খুটুসকুট শব্দ উঠছে।—ইঁদুর নাকি? কামিনী ভাবল। পুষির কানটা চিঁড়িং চিঁড়িং করে নড়ে উঠল। তারপর লাফ মারল পুষি। পুষির গা লেগে কয়েকটা কৌটোবাটা ঝড়ঝড় শব্দে পড়ে গেল। ফর ফর করে কয়েকটা তেলাপোকা উড়ে এল। কামিনী সভয়ে দেখল তেলে-ভেজা কুলের মত রঙ, লম্বা লম্বা শুঁড়।

ঘাড়টা ঘুরে ঘুরে হারুর বাপের মুখে এসে আটকে গেল। ভয়ে চোখ সরিয়ে নিল কামিনী। ভুসো-পড়া লণ্ঠনের আলো আর দেখা যাচ্ছে না, কেবল ন্যাবার মত একটা হলদে আভা ছিটিয়ে আছে। কামিনী হাই তুলল, উঠে যেতে চাইল, কিন্তু পা সরাতে পারল না। ফ্যাকাশে বোবা চোখে চাইল কামিনী, লাল লাল ডেঁয়ো পিঁপড়েগুলো আর ডেঁয়ো পিঁপড়ে নয়, আরশুলার মত বড় বড় পেটমোটা হয়ে উঠেছে, লম্বা লম্বা দাড়া দিয়ে চোখ দুটো খুবলে খুবলে খাচ্ছে। মুখের ভেতর ফরফর করে উড়ছে, কানে কটকট করে কামড়াচ্ছে। কখন যেন ওরা দাওয়ার ওপর উঠে এসেছে, সার-সার প্রদীপের মত জ্বল-জ্বলে চোখ। কামিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে হি-হি হাসতে হাসতে ওরা যেন সমস্বরে ডেকে উঠল।

রাগ হলে ঘুরে শুতো। হারুটাকে মাঝে দিয়ে ওপাশের কোণের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকত। এমনি কিছু বলত না হারুর বাপ, কিন্তু যেদিন খেয়াল হত সেদিন অন্য মূর্তি। পাঁজাকোলা করে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে দু হাতে চেপে ধরত। বড় যে গরম হয়েছে! এখন কি করবি র!

দু হাতের চাপের মধ্যে পড়ে কামিনী একেবারে নড়তে-চড়তে পারত না। পা ছুড়বে, তাও সাধ্যি নেই, পায়ের ওপর গেড়ে বসে আছে লোকটা। শুধু মুখটা খোলা। মুখে বলত—দস্যি! দস্যি! রাক্ষস খাথাকার!

হারুর বাপ হা-হা করে হেসে উঠত।—ক কড়ার মুরোদ নেই, কুলোপানা চক্কর। বলব, শুনবি, নইলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব। দ' মেরে পড়ে থাকবি।

তাই দাও। তোমার ঘর করার চেয়ে যাওয়াও ভাল।

মোষ-কালো দেহটা কামিনীর বুকে ... ডাল করে আসত। জাঁতিকলে পড়া ইঁদুরের মত চিঁচিঁ করত কামিনী। লোকটা আকাশ কাঁপিয়ে হাসত।—মরবি! রে মর।

টাগরার কাছে এসে সভয় চিৎকারটা ভেতরে বোবা হয়ে আটকে রইল। কামিনীর পাল বেয়ে দরদর করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে, পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে কুলকুল করে নামছে। সুড়সুড় করছে পিঠ। হাতটা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে কামিনী প্রাণপণে টানল। নগলের হাড়ে খট করে একটা শব্দ উঠল, কামিনী চমকে গেল, কনুইটা খুলে গেল বুঝি। গোল-গোল চোখে তাকাল কামিনী, হারুর বাপটা যেন হাসছে। এবড়োখেবড়ো শিলপাথরের মত কালচে দাঁত বের করে হাসছে আর ডাকছে—আয়! আয়! আসবি না কামিনী!

কামিনীর পেটকাপড়ে বুঝি একটা বিছে ঢুকেছে। কিলবিলিয়ে খরখর করে হাঁটছে। কামিনী ভয়ে চোখ বুজে কাঁপিয়ে উঠল। চোখ খুলে দেখল, হারুর বাপটা একটা কাঁকড়া হয়ে গিয়েছে। দুটো হাত দুটো বড়ো বড়ো দাড়া। খোবলান দুটো চোখের গলা গলা মণি দুটো কাঁকড়ার চোখের মত কোটর থেকে ঝুলে আছে। পাঁজরার হাড়-গুলো পা। খড়মড় খড়মড় করে হাঁটছে
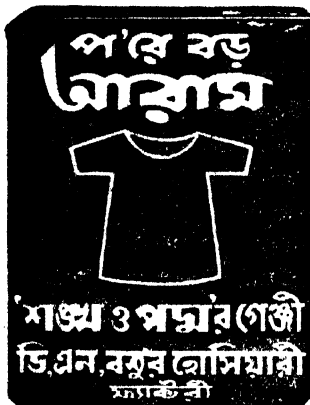
যেন কাঁকড়াটা। কামিনীর হাতের আঙুল ধরে টানছে। চওড়া হাঁ মুখে ফসফাসে জলো জলো কথা বলছে—আয়! আয় কামিনী, আয়!

না। না। আমি যাবো না। কামিনী চিৎকার করে উঠল—তুমি আমাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলবে।

আমি না খাই, কাঁকড়াটা হেসে উঠল, অন্য কেউ খাবে।

না। আমি লুকিয়ে থাকব। পালিয়ে বেড়াব।

স-স্-স্-স্! মুখ দিয়ে জল কাটার মত শব্দ করল কাঁকড়াটা। গলগল করে গ্যাঁজলা উঠল।—পালিয়ে বেড়াবি? খাবি কি? তোর হারু কি খাবে?

কেন? রোজগার করব। ঝিগিরি!

তাতে সুখ কি? কাঁকড়াটা আবার হাসল।—আয়! আমি মরেছি। তুই মর। দুজনে সুখে যমের ঘরে ঘর বাঁধি।

আমার হারুর কি হবে? কামিনী যেন বলল।

সে কথা তোকে ভাবতে হবে না। ওর ভগবান দেখবে।

ভগবান? কামিনী বলল—ভগবান কোথায় থাকে?

ঐ আকাশে।

বাজে কথা। তুমি আমায় ছাড়। আমি যাই।

যাবি কোথায়? কাঁকড়াটা রেগে গেল যেন। দাড়া, পা-সব খড়মড় করে উঠল—না এলে দাড়া দিয়ে চিপে মেরে ফেলবে।

না। কামিনী সভয়ে চিৎকার করে উঠল, আমি যাব না।

হাঁ, যাবি।

না, যাব না।

তবে রে! কাঁকড়াটা দাড়া দুটো আরও জোরে চিপে ধরল। কামিনীর বুকে ফেটে গোঙানি বের হয়ে আসছে। আবার হাত ধরে টান মারল কামিনী। টানের চোটে মাটি থেকে একটু একটু যেন উঠে পড়ছে কাঁকড়াটা, মাটি ছেঁচড়ে ঘষটাবার আওয়াজ হচ্ছে। কামিনীর আঙুল জ্বলছে, ছাল চামড়া গুটিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে যাচ্ছে। কামিনী বুঝল, রক্ত পড়ছে। কামিনী হাত ধরে টানল, জোরে, আরও জোরে।

বাইরে বাজ পড়ল কোথাও। কামিনী আলোয় ঝলসে দেখল, কাঁকড়াটা চিত হয়ে পড়ে আকাশের দিকে দাড়া আর পা নাড়তে নাড়তে থিতিয়ে আসছে। একটু একটু করে কাঁকড়ার মুখটা হারুর বাপের মত হয়ে উঠছে। ফাঁকা দাওয়া, মেঘে-ঢাকা অল্প চাঁদ, কামিনী দেখল, সে শুধু একা জেগে। কামিনী কুলকুল করে ঘামছে। একটা অশরীরী ভয় পিলপিল করে পায়ের নখের তলা থেকে শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে।

কোঁত কোঁত করে দম গিলল কামিনী, হা-হা হাফাল।

তুমি মরে গেছ।...মরে গেছ।...মরা আর জ্যান্ত লোকে অনেক তফাত।...আমি পালাব।...আমি পালাব।...আমি বাঁচবো। দুপুর-রোদে খোলা মাঠে সনসনে হাওয়ার মত তীরবেগে কামিনীর মনের ভাবনা উড়ে চলল...আমি বাঁচতে চাই।...বাঁচতে চাই। আঙুল দিয়ে দেওয়াল খিমচে ধরল কামিনী। হাড়মাস যেন নরম-নরম থসথসে। জোর পাচ্ছে না কিছুতেই। চোখ দুটো কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে বোধ হয়, টিকটিকির নখের মত আঙুলের নখ দিয়ে জোর আরও জোরে কামিনী দেওয়াল আঁকড়ে ধরল। নখে মাটি ঢুকে যাচ্ছে, একটা সূচিমুখ কাঠের কুচো নখের ফাঁকে। সারা শরীর ঝনঝনিয়ে জেগে উঠল কামিনী। অসহ্য শ্রান্তিতে দীর্ঘশ্বাসের মত ভেঙে পড়ল। কামিনী বুঝল, তার হাত-পা, শরীর মাংস নাড়ি, চর্বি, দাঁত, নখ চুল চোখ সব কাঁপছে। চোখে ধাঁধার মত দেখছে। দাঁতে দাঁত চিপে ঠকঠক করে কাঁপা শরীরের কাঁপুনি থামাতে চাইল কামিনী। মাটি ছুঁয়ে হামা-গুড়ি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘরের এক কোণে কেন্নোর মত পাকিয়ে গোল হয়ে শুয়ে পড়ল। কতদিন বাদে মাকে যেন মনে পড়ল। কান্না-ভেজা ক্লান্ত স্বরে কামিনী ডাকল।—মা! মা গো।

ছবিগুলো যেন পুতুলনাচের মত একে-একে চোখের ওপর ভাসতে থাকল, তারপর মিলিয়ে গেল। সুখের আস্বাদ যেন মুখে লেগে আছে এখনও। কত সুখ! কত আনন্দ! হারু, হারুর বাপ, ছুলো, পুষি, বুধিগাই, ঝগড়ু পণ্ডিত...। সবই তো ছিল কামিনীর, আজ এই মুহূর্তে কিছু নেই, শুধু বিরাট একটা শূন্যতা কামিনীকে ঘিরে আছে। কামিনীর আজ নেই, আগামীকাল একটা অনিশ্চিত অন্ধকার।—কি হবে হারুর? কামিনী ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু ভাবনাটা দানা বাঁধল না, কেমন যেন গোলা কাদার মত অবয়বহীন আকারে ছড়িয়ে পড়ল। প্রেম, ভালোবাসা, মায়া, মমতা, স্নেহ, সব যেন কথার কথা। কোন মানে নেই, কোন মানে নেই, খাওয়ার শেষে পাত-কুড়ানো এঁটো-কাঁটার মত আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়। এরই মধ্যে হারুর বাপকে ভুলতে শুরু করেছে কামিনী। ভয়ে পাংশু কাঠ হয়ে পালিয়ে আসছে কামিনী। যে লোকটার বুকে ঘামের মত লেপ্টে থাকত, হাতের বাঁধনে অভয় পেত, সে যেন আজ শনি, তার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে আসতে পারলে যেন কামিনী বাঁচে।—তবে কি মৃত্যুর চেয়ে বড়ো কিছু নেই? মৃত্যুই কি জীবনের শেষ? মৃত্যু কি ভগবান?

ঝগড়ু পণ্ডিত কথকতা কইছে। স্বপ্নের মত বেহুলার গল্পটা মনে পড়ল কামিনীর। লখিন্দর চিৎকার করে উঠেছে—তোরে পাইল কালঘুমে, মোরে খাইল কি!—চ্যাংমুড়ি কানি!—কলার মান্দাসে ভেসে ভেসে সাত-সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে যমপুরী। কালো অন্ধকারের সুড়ঙ্গ একটা।...কালো অন্ধকারের সুড়ঙ্গ।...আর একটা সুড়ঙ্গ... অন্ধকার।...অন্ধকার।...কালো অন্ধকার। ছাতার কাপড়ের মত কালো, কালো অন্ধকারের কাপড় একটা যেন কামিনীকে ঢেকে ফেলেছে। বেড়ালবাচ্চাকে বস্তাবন্দী করে নেওয়ার মত পুরে ফেলেছে। কামিনী নিশ্বাস নিতে পারছে না, দম বন্ধ হয়ে আসছে, বাতাস গরম। কামিনী যেন নদীর অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। কামিনী চিৎকার করতে চাইছে, বলছে—না, না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি আমায় ছাড়। আমায় বাঁচতে দাও। তোমায় আমি ভালবাসি না, ভালবাসি না, ভালবাসি না।

খ্যাঁক! খ্যাঁক! খ্যাঁক! ক্ষুধার্ত জন্তুগুলোর তীক্ষ্ণ চিৎকার গুমোট বাতাসটাকে ফালা ফালা করে চিরে ফেলল। নাকের নিচে গোঁফ শিঙ্গিমাছের কাঁটার মত, ঝকঝকে বাঁকান দাঁত, প্রদীপের মত জ্বলজ্বলে চোখ। কামিনী দেখতে পেল, হিড়হিড় করে টানছে মানুষটাকে, হেঁচড়ে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।—হারু! হারু নাকি রে? কামিনী বলল। অন্ধকারে হাত দিয়ে দিয়ে হাতড়ে বেড়াল—কোথায় গেলি?—হারু! বাপ আমার।

কি যেন হয়েছে কামিনীর, হারুকে খুঁজে পাচ্ছে না কামিনী।—হারু! কামিনীর কান্না পেল। অন্ধের লাঠির মত হাতের কাছে হারুকে না পেয়ে কাঁদতে লাগল কামিনী। আকুলিবিকুলি কাঁদতে কাঁদতে ঘরের মেঝেয় মুখ ঘষে ঘষে পশুর মত কাতরাতে থাকল।

পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠছে। দু হাতে পেট টিপে ঢোঁক তুলছে কামিনী। গলার ভেতর হাত ঢুকিয়ে কেউ যেন বুকের ধুকধুকিটা ছিঁড়ে উপড়ে আনছে। যন্ত্রণা, ভীষণ যন্ত্রণা! পেট টিপে ঘরের মেঝেয় শুয়ে পড়ল কামিনী। শুয়ে শুয়ে অস্পষ্ট মনে হল, কে যেন মাথার শিয়রে।—কে? মা! কামিনী বলল।

আমি।—কেমন যেন মিষ্টি কিশোরী মেয়ের মত গলার স্বর। স্বরে বিচিত্র নিটোল পূর্ণতা। ভয় করে না, বিহ্বলতা ধরায়। কামিনী চোখ মেলে দেখতে চাইল, কাল কষ্টিপাথরের মত চেহারা, তেঁতুল মাজা তামার কলসির মত চকচকে উজ্জ্বল। কান অবধি টানা-টানা চোখ, হাঁটু ছাড়িয়ে চুল। কামিনী ভাবল, কোন বাউরি মেয়ে টেয়ে হবে, কোন ফাঁকে ঘরে ঢুকেছে।—কে তুমি? কামিনী আবার প্রশ্ন করল।

মরণ! আমাকে চিনতে পারছো না। মেয়েটি কেমন একটা ছমছমে সুরে কথা কয়ে উঠল। সময় হলে আমি যে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাই।

কামিনী উঠে দাঁড়াতে গেল। বলল—চল। না, না। তোমার এখনও সময় হয়নি। আমি অন্য কিছু চাই।—হা-হা হেসে উঠল মেয়েটি। দাঁতের ঝনঝনে ঠাণ্ডা বাতাসের মত সে হাসির ঘায়ে কামিনী জমে গেল। একটু একটু বদলে যাচ্ছে মেয়েটি। চেহারা আগুনের মত লাল, দাউদাউ শীষ উঠছে, সব যেন পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। টানা-টানা চোখ দুটো ভাঁটির মত গোল হয়ে চাকার মত ঘুরছে। জিভ লকলক করছে, টোপা টোপা লাল পড়ছে। মাথার চুল এ্যাঁকেবেঁকে চলছে, চলতে চলতে ঝাঁটার মত পাকিয়ে খাড়া। কামিনী তাকিয়ে আছে। উলঙ্গ মেয়েটি। নিটোল-নিটোল হাত-পাগুলো শুকিয়ে হাড়ের মত খটখটে হয়ে উঠল। লম্বা লম্বা প্যাঁকাটির মত আঙুলে গজালের মত বড় বড় নখ। মেয়েটি হাসছে, পাগলের মত হাসছে। কানে তালা ধরে গেল কামিনীর। দু হাতে কান চেপে কামিনী তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠল—হাসি থামাও।
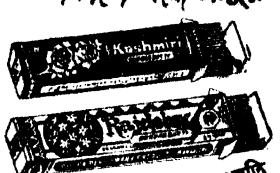
খলখল হাসিতে গড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। কামিনী দেখল, মেয়েটির শরীরের চামড়া মাংস খসে খসে যাচ্ছে, নিদারুণ অন্ধকারে সাদা কঙ্কালটা খড়ির মত চকচক করছে। আর ঐ হাসির শেষ রেশটুকু নিভন্ত চোয়ালের হাড়ে সাপের চোখের মত জ্বলছে। মেয়েটি যেন এগিয়ে আসছে। হাড়ের শব্দ উঠছে, ঠক্ ঠক্ ঠক্। লোহা লোহা-আঙুলের নখগুলো কামিনীর পেটের দিকে উঁচান, যেন পেটটাকে ফালা ফালা চিরে ফেলতে চাইছে মেয়েটি।

কামিনী বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল। চোখ ঘুরছে। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সবই ঘুরছে। পা মুড়িভাজা খোলার মত আগুন, গরমে পুড়ে যাচ্ছে। কেঁদোঠাসা বিড়ালের মত কামিনী দেখছে, ঐ আসছে, ঐ আসছে, ঐ আসছে। গায়ে নিশ্বাসের স্পর্শ। কামিনী লাফ দিয়ে উঠল। ঐ তো সড়ক, বাগদী, তারপর উঠোন, ঘোড়ানিম গাছ, আশ-শ্যাওড়ার বন, তারপর ফাঁকা মাঠ, দূরে শ্মশান আর শেয়ালকুলের জঙ্গল। কামিনী ছুটছে, ছুটছে, ছুটছে। কি যেন একটা পায়ে লাগল কামিনীর। কামিনী চিৎকার করে উঠল। সে চিৎকারের সঙ্গে শিয়ালগুলো যেন শেষ প্রহরের ডাক ডাকল। কামিনীর চিৎকারটা নিশ্বাসের মত ফিসফিস শোনাল। কামিনী বলল—ভগবান।

চেতনাবিহীন অচেতনা এক বায়ুস্তরে কামিনীর মনটা ভাসছিল। সে মন ভাবল, —ভগবান যেন একটা ইতর গালাগাল। ভগবান, না শয়তান!

জ্ঞান হলে কামিনী দেখল, কামিনী পড়ে আছে, একটা রক্তাক্ত দলদলে দলা দু পায়ের ফাঁকে, পা চুঁইয়ে রক্ত ঝরছে। দূরে বনান্তচূড়া ফিকে আলোয় ভরা। পাখি ডাকছে। কামিনী চোখ বুজে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। আর ঈশ্বরের আকাশ, পৃথিবী একটু একটু করে ফর্সা হতে থাকল।
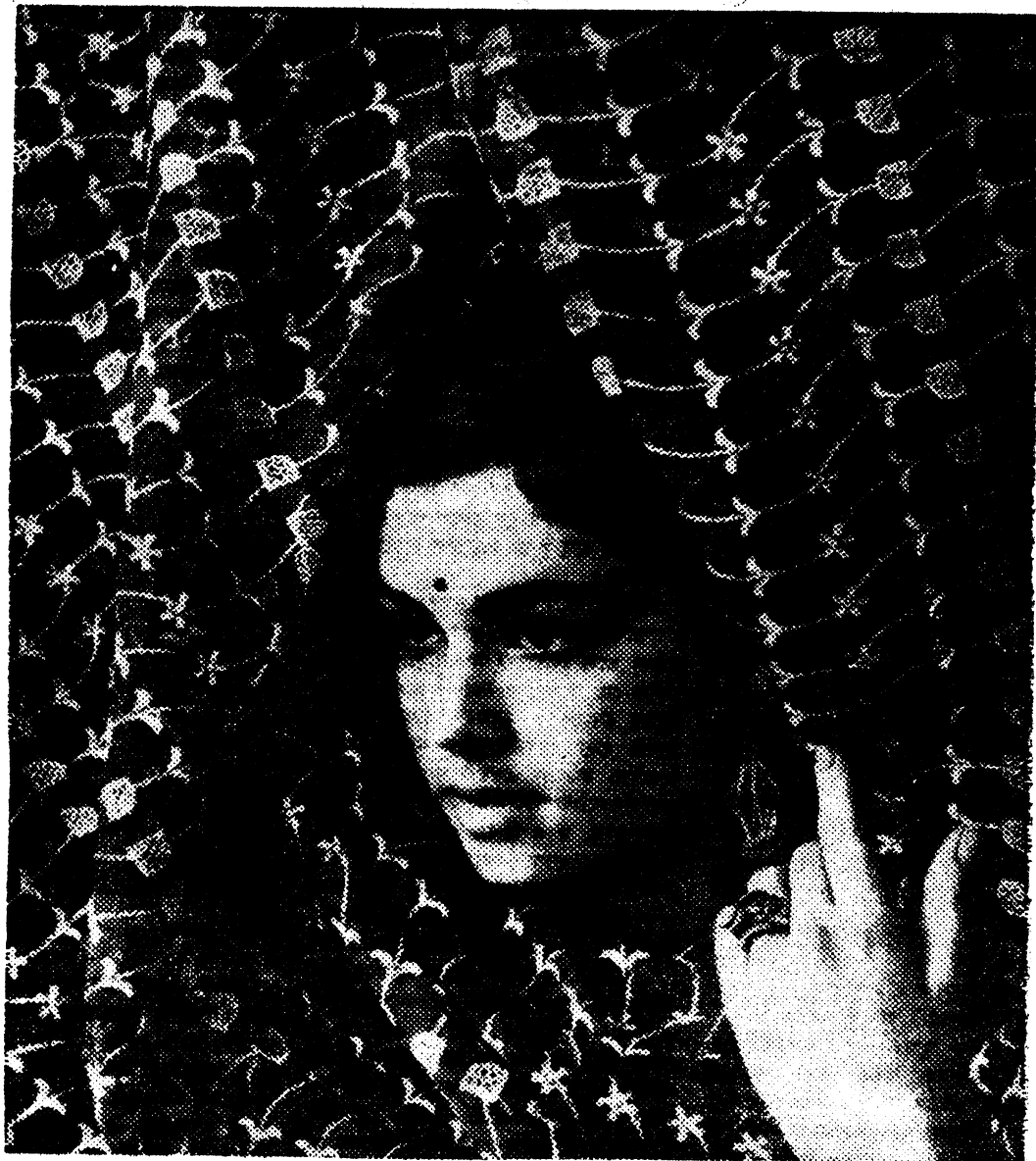
চিত্রপ্রদর্শনী

ভাস্কর্যের প্রদর্শনী : মোনালিসা গ্যালারী

ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিস্ট ইউনিয়নের উদ্যোগে সম্প্রতি মোনালিসা গ্যালারীতে একটি ভাস্কর্য প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। সাগর সরকার ও মাণিক তালুকদার রচিত

প্রতিকৃতি —সাগর সরকার

মোট নয়টি নিদর্শন এটিতে পেশ করা হয়। সব কয়টিই পোর্ট্রেট অর্থাৎ প্রতিকৃতি।

ছোট হলেও পৃথকভাবে ভাস্কর্যকলার প্রদর্শনী ব্যবস্থা করার জন্য প্রথমেই উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই। চিত্রপ্রদর্শনীর চাপে ভাস্কর্যকলা যেন আপন বৈশিষ্ট্যটুকু হারাতে বসেছিল। সাধারণত চিত্রপ্রদর্শনীর এক কোণে অথবা স্বল্প পরিমিত কোনও স্থানে কয়েকটি ভাস্কর্যের নিদর্শন রেখে দেওয়া হয়। ফলে একটি বিশিষ্ট ও সাবলীল প্রকাশমাধ্যম যেন অবজ্ঞা ও অবহেলার গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ও নির্যাতিত হয়ে পড়ে থাকে। পৃথকভাবে প্রদর্শনী ব্যবস্থার ফলে দেশের ভাস্করশিল্পী যে প্রেরণালাভ করবেন ও আপন আপন নিদর্শন দেখাবার জন্য অধিকতর ব্যগ্র হয়ে উঠবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দুই ভাস্করই প্লাস্টার মাধ্যমে কাজ করেছেন এবং উভয়ের রচনারীতি বাস্তবানুগ। উভয়েই বিভিন্ন মডেলের মুখের প্রতিকৃতি তৈরি করেছেন, যদিও দুজনেরই কাজের ধারা ও পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। সাগর সরকার যে চারটি নিদর্শন পেশ করেন সেগুলির প্রত্যেকটিই সুস্থ ও সবল যুবকের মুখের প্রতিকৃতি। যুবোজনিত মুখের গঠন ও আকৃতি ও আপন আপন বৈশিষ্ট্য প্রতিকৃতির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। তার ওপর আয়তনিক সমতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে স্বভাবের দৃঢ়তাটুকুও প্রকাশ পেয়েছে। ১নং প্রতিকৃতি সম্ভবত কোনও অবাঙ্গালী যুবকের—মাধ্যম ব্যবহারের কৌশল ও দক্ষতার জন্য প্রতিকৃতির মধ্য দিয়ে। ডেলের সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্যটুকু চোখে পড়ে। ৩নং প্রতিকৃতির মধ্য দিয়ে মডেলের চরিত্রও যেন বোঝা যায়।

মানিক তালুকদার সবসুদ্ধ পাঁচটি প্রতিকৃতি পেশ করেন এবং এঁর নিদর্শনগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই ভাস্করের কাজের মধ্যে বিভিন্ন বয়সের নরনারীর মুখের পরিচয় পাই—বিশেষ করে ছোট মেয়ে, বয়ঃসন্ধিক্ষণের উপনীতা বালিকা এবং বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতিগুলিই সকলের চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে ৫, ৮ ও ৯ নং প্রতিকৃতির উল্লেখ করা যায়। সরল, সুন্দর ও অপাপবিদ্ধ চাহনী ও মনোভাব প্রকাশের জন্য ৫ ও ৮নং প্রতিকৃতি দুটি সকলের মনে থাকবে। উদ্বেগ ও চিন্তাভারে জর্জরিত রেখাবহুল ৯নং প্রতিকৃতির মধ্য দিয়ে ভাস্কর এক বয়স্কা নারীর মনোভাবটুকু সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। হয়ত এই ছোট প্রদর্শনীটি কয়েকজনের ভাল লেগেছে, তা হলেও এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি: প্রদর্শনীটি বোধ হয় ঠিক যুগোপযোগী হয়নি। সকলেই জানেন যে চিত্রকলার মত ভাস্কর্যকলাও প্রগতিশীল। বর্তমান যুগে যদি রিয়ালিস্টিক পদ্ধতিতে রচিত ছবির কোনও সার্থকতা না থাকে তাহলে এ যুগে বাস্তবানুগ ভাস্কর্যসৃষ্টিরই বা মূল্য কতটুকু? সাগর সরকার ও মানিক তালুকদার উভয়ের মধ্যেই প্রতিভার ছাপ আছে। আশা করি, ব্যয়সাধ্য হলেও তাঁরা কাঠ, পাথর ও ব্রোঞ্জ মাধ্যমে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করে যুগোপযোগী নূতন আঙ্গিকে নূতনতর সৃষ্টির চেষ্টা করবেন।

সাহিত্যিক তারাশঙ্করের চিত্রের প্রদর্শনী

ভারতীয় জ্ঞানপীঠের পুরস্কারলাভের জন্য স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আকাদেমি অব ফাইন আর্টস-এর পক্ষ থেকে সেদিন অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। এই উপলক্ষে আকাদেমি তারাশঙ্কর অঙ্কিত ছবির এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। বিখ্যাত ভাস্কর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে সভাপতি চিত্রকলা ও চিত্রকলাসৃষ্টির প্রেরণাপাদের ব্যাখ্যা করেন এবং তারাশঙ্করের সাহিত্যকীর্তির উল্লেখ করে বলেন যে, তারাশঙ্কর পীড়িত মন সুস্থ করার জন্যই ছবি এঁকেছেন। উত্তরে তারাশঙ্কর আকাদেমির কর্তৃপক্ষ তথা উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে কৃতজ্ঞতা জানান ও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘাত-

প্রতিকৃতি —মাণিক তালুকদার

প্রতিঘাত ও শোকতাপের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, জনসাধারণের কাছ থেকে তাঁর যতটুকু প্রাপ্য তিনি যেন সেটুকুই পান। যা তাঁর প্রাপ্য নয় তার জন্য তিনি যেন লালায়িত না হন। প্রদর্শনীতে প্রাকৃতিক দৃশ্য, রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন নরনারীর ছবি ছিল। তারাশঙ্করের মতে সেগুলির মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের নানা বিচিত্র চরিত্রকে রূপদান করার চেষ্টা করেছেন।

—চিত্রপ্রিয়
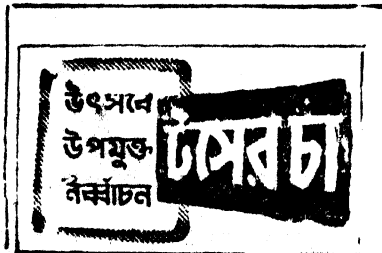
কলকাতার ডায়েরি

ইংরেজ বর্জিত ভারতের ইস্কুলগুলোতে আমরা যখন 'দিদিমণি'দের তাড়িয়ে দিয়ে 'আনটি'দের পাকাপাকি বসানোর তোড়জোড় প্রায় শেষ করে ফেলেছি, ঠিক তখনই 'এ কী কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে।' অর্থাৎ কিনা, ভারত সরকারের শিক্ষা দফতর উদ্যোগী হয়েছেন মাতৃভাষাকে আগাপাস্তোলা শিক্ষার বাহন করে তুলবেন।

প্রস্তাবটি মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে কলকাতা শহরে। একদল লোক প্রস্তাবের পক্ষে, অন্য দল ঘোরতর বিরোধী। প্রথম দলের বক্তব্য, তাতে শিক্ষার প্রসার ঘটবে দ্রুত এবং অনায়াসে। দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য, আমাদের মাতৃভাষাগুলি এখনও উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত হয় নি, তাছাড়া এই ফাঁকে হিন্দীর 'অনুপ্রবেশ' ঘটবে।

—"হিন্দী হলে আপত্তি কী?"

—"কী যে বলেন, ইংরেজীর সঙ্গে হিন্দীর তুলনা। কোথায় শেকসপিয়ার, শেলি কীটস বার্নার্ড শ, এলিয়ট, আর—"

—"সবই বুঝলুম, কিন্তু আপনি কি চান না একটা স্বদেশী ভাষা সর্বত্র চালু হোক।"

—"চাই, তবে হিন্দী চালু হলে একটা বিশেষ গোষ্ঠী বিশেষ সুবিধাভোগী হয়ে যাবে যে।"

—"কিন্তু এখনও তো আপনি ইংরেজী জানেন বলে বিশেষ সুবিধা পাচ্ছেন। আপনার পাশের বাড়ির তর্কপঞ্চানন মশাই ন্যায় সাহিত্য ও কাব্যে অসাধারণ পণ্ডিত। তিনি ইংরেজী জানেন না বলে একটি ছাপাখানায় দেড় শ' টাকা মাইনের প্রুফ রীডার, আর আপনার ভাগনে কমপার্টমেণ্টালে বি এ পাশ করেও ওই ছাপাখানাতেই সাড়ে পাঁচ শ' টাকা মাইনের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। এটাও তো এক ধরনের সুবিধাভোগ।"

—"আর একটি প্রশ্ন আছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যদি হিন্দীতে হয়, আমরা হিন্দীওয়ালাদের সঙ্গে পারব কী করে?"

—"তা গোড়ার দিকে একটু অসুবিধা হবে বই কী! তবে এটাও তো ঠিক যে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মাতৃভাষা ইংরেজী হওয়া সত্ত্বেও ও'রা আমাদের সঙ্গে কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পারে নি। হিন্দী শিখে নিলেই গোড়ার এই অসুবিধা কেটে যাবে।"

—"তা হয়ত ঠিক, কিন্তু ইংরেজীর স্থান হিন্দী নিতে পারে না। বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের পথ তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে।"

—"তা কি সত্যিই ঠিক? জাপান কি বিশ্বের বাইরে? আর তাছাড়া একটি ভারতীয় ভাষা সরকারী ভাষা হিসেবে গ্রহণ করলে যদি বিশেষ একটি গোষ্ঠী সুবিধা পায় তাহলে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে, দেশের রাজধানী যে-শহরে হবে, সেখানকার ও আশেপাশের লোকেরাও বিশেষ বিশেষ সুবিধা পাবে। এবং আপনার যুক্তি অনুসারে ভারতের রাজধানী দিল্লি থেকে সরিয়ে লণ্ডনে বা ওয়াশিংটনে বসানো উচিত। তাহলে হিন্দীওয়ালাদের মতই দিল্লিওয়ালারাও কোন সুবিধে পাবে না।"

—"ওসব বাজে তর্ক রাখুন, আসলে হিন্দী বলা আমাদের ধাতে পোষায় না মশাই।"

—"আচ্ছা, আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। ধরুন, আপনি শিলং শহরে গেলেন; সেখানকার বাজারে গিয়ে একটি খাসিয়া মেয়ের কাছ থেকে কোন জিনিস কিনতে চাইলেন। আপনার ভাষা বাংলা, ওর ভাষা খাসিয়া। আপনি কোন ভাষায় কথা বলবেন মেয়েটির সঙ্গে?"

—"কেন, ভাঙা হিন্দীতে—"

"ব্যস, আমার আর কোন বক্তব্য নেই। আচ্ছা নমস্কার?"

এই ধরনের নানা আলোচনা চলছে শহরের আড্ডায় আড্ডায় তার একটিমাত্র নমুনা তুলে দিলাম, তবে হ্যাঁ, এই যুক্তি-তর্কের অন্য দিকও আছে।

✻

রাজ্য পরিবহণ কর্তৃপক্ষের কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে। তাঁরা যেন দয়া করে স্টেট বাসের মহিলা আসনগুলির পুনর্বিন্যাস করেন। কিছু আসন সামনের দিকে রাখুন, কিছু পিছনে। তাহলে গোটা বাসের ভারসাম্য বজায় থাকবে বিশেষ করে সামনের দিকে বাঁয়ের চাকার টায়ার ভিড়ের চাপে এত তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যাবে না।

বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ লাইনে যেমন ভিড়ের সময়ও সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে জায়গা পাওয়া যায়, তেমনি স্টেট বাসগুলোতে পিছনের দরজা দিয়ে ওঠা তত কঠিন হয় না। আর সামনের দরজা! ওরে বাবা, যত ঠেলাঠেলি কনুই মারামারির ওই একটি আগমন নির্গমন দ্বারে! আবার কেউ কেউ যদিও বা পিছনের

দরজা দিয়ে ঢোকেন, তৎক্ষণাৎ গুঁতোগুঁতি করে এগিয়ে যান, সামনের দিকে। ফলে বাসটা হয়ে পড়ে বেসামাল, মহিলাদেরও অসুবিধার অন্ত নেই।

সেদিন ছয় নম্বর বাসে চৌরঙ্গির দিকে আসছিলাম। প্রতি স্টপে সামনের দরজায় ভিড়ের বহর দেখে পেছনের ফাঁকা দরজার পা দানিতে দাঁড়ানো রসিক কনডাকটার চেঁচিয়ে উঠলেন—"ও দাদারা এদিকে দু'-চারজন আসুন না, পেছনের দরজাও কিন্তু হাওড়া স্টেশন যাবে।"

*

ফেলিকস ইউরলফ অল্প দিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন কলকাতা শহরের নানা মহলে। তার কারণ শুধু তাঁর অমায়িক ব্যবহার নয়, তিনি বাংলা ভাষাও জানতেন। কোন অবাঙালী বা অভারতীয় যদি বলে 'কলকাতা ভারতের প্রাণ কেন্দ্র', বলে 'রসগোল্লার মত মিষ্টি ভূ-ভারতে নেই' এবং 'রবীন্দ্র সংগীত অতুলনীয়', তাহলে তাঁর স্থান তৎক্ষণাৎ গৌড়জনের হৃদয়কেন্দ্রে। তদুপরি যদি সে ওই সব অত্যুৎকৃষ্ট বাক্য-গুলি বঙ্গভাষায় উচ্চারণ করে তাহলে তো কথাই নেই, বাঙালী তাঁকে মাথায় তুলে নিয়ে নাচবে।

ইউরলফ বাংলা বলতে পারেন অনর্গল। চার বছর ছিলেন কলকাতায় রুশ দূতাবাসের সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রধান হয়ে। না, কলকাতায় এসে বঙ্গভাষাবিদ তিনি হন নি এদেশে আসার আগেই মস্কোর ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে বাংলা ভাষা সড়গড় করে এসেছেন। তাঁর মুখে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি শুনেছি, শুনে মুগ্ধ হয়েছি।

তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী ইউরলোভাও স্বামীর মত কলকাতা প্রেমিক, রুশ ভাষার শিক্ষিকা হিসেবে তিনি বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন। ইউরলফ-দম্পতি মস্কো রওনা হলেন। কলকাতাবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁদের দু'-জনকে রুশীতে বলি—"দাসভিদানিয়া।" অর্থাৎ পুনর্দর্শনায় চ।

*

শ্রীমতী ইরমা রুস বিশ্ব পর্যটনের পথে গত সপ্তাহে এসেছিলেন কলকাতায়। ব্যাংকক থেকে। শ্রীমতী রুস আমেরিকার সাউথ ওয়েস্ট টেকসাস স্টেট কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর, সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। শ্রীমতী রুসের ছাত্রছাত্রী আমেরিকায় ছড়ানো, তাঁদের মধ্যে উজ্জ্বল রত্ন প্রেসিডেন্ট লিনডন জনসন। জনসন তাঁর কাছে পড়তেন সমাজবিদ্যা।

জনসন কেমন ছাত্র ছিলেন?—তার জবাবে শ্রীমতী রুস বলেন, বেশ মেধাবী ছিল এল-বি-জে, কলেজের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'দি কলেজ স্টার'-এর সম্পাদকও ছিল ও।

রুস জানান : প্রেসিডেন্ট হবার পরও লিনডন তাঁর কলেজকে ভোলে নি। ছুটি পেলেই যখন টেকসাসে আসে, কলেজটি ঘুরে যেতেও ভোলে না। কলেজ হস্টেলের যে ঘরটিতে সে ছিল, সেখানে এখন 'জনসন লাইব্রেরি' হয়েছে।

রুস সগর্বে আরও জানালেন, "কিছুদিন আগে আমি যখন অধ্যাপনা থেকে অবসর নিলাম, লিনডন আমাকে একটা চিঠি লিখে শ্রদ্ধা জানায়। চিঠি পড়ে আমি অভিভূত হয়েছি। এই চিঠি আমার অধ্যাপনা জীবনে শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞানপত্র।"

*

নরেনদার 'পাঠশালা'-র ছাত্র আমিও। বছর পঁচিশ আগে দূর মফস্বলের এক অপরিণতবুদ্ধি কিশোরের কবিতা রচনা প্রয়াসের অভিভাবক ছিলেন তিনি। অপরিচয় সত্ত্বেও চিঠি লিখে জানিয়েছেন রচনাটি কেন কবিতা হয় নি এবং প্রকাশ-যোগ্য হলে নিজের হাতে সংশোধন করে 'পাঠশালা'-য় ছাপিয়েছেন। শুধু ওই কিশোরটি নয়, আরও অনেক সাহিত্য-যশোলিপ্সুর হাতে খড়ি হয়েছে নরেনদা-র সেই 'পাঠশালা'তে।

সেই নরেনদা অর্থাৎ কবি নরেন্দ্রদেবের সঙ্গে যোগাযোগ তারপর থেকে আর ছিন্ন হল না। আমাদের পিতৃতুল্যদের কাছে তিনি যেমন নরেনদা আমাদের কাছেও তাই। জলধর সেনের পর এমন সর্বজনীন দাদা বাংলা দেশে আর কেউ হন নি।

নরেন-দার আশী বছর বয়স হল সম্প্রতি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সুস্থদেহে শতবর্ষ তিনি পূর্ণ করুন এবং বার্ধক্যের দোরগোড়ায় পা দিয়ে আমরা সেই পঁচিশ বছর আগেকারের কিশোরের দল যেন তখনও তাঁর কণ্ঠের সেই অতিপরিচিত 'এই যে ভায়া' ডাক শুনতে পাই।

*

কবি-প্রাবন্ধিক বিষ্ণু দের নতুন বই 'মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা।' একটি প্রবন্ধে তিনি লিখছেন—

"আজ পশ্চিমে দুটি দেশ বা দুটি সভ্যতা মাত্র বাস্তব—মার্কিন, সোভিএত। এবং শেষ অবধি একটা জায়গায় এর পূরবী ওর বিভাসকে আলিঙ্গন করবেই।"

প্রবন্ধটির শেষে একটি পাদটিকাও আছে। কবি জানাচ্ছেন "প্রবন্ধটি প্রায় এক যুগ আগে লেখা, ভিয়েতনামের যুদ্ধের বহু আগের মার্কিন সাহিত্যের স্বরূপ পরিচয়ের ভিত্তিতে।"

অন্যান্য প্রবন্ধও "স্বরূপ পরিচয়ের ভিত্তিতে" লেখা কিনা লেখক অবশ্য তা জানান নি।

—চাণক্য
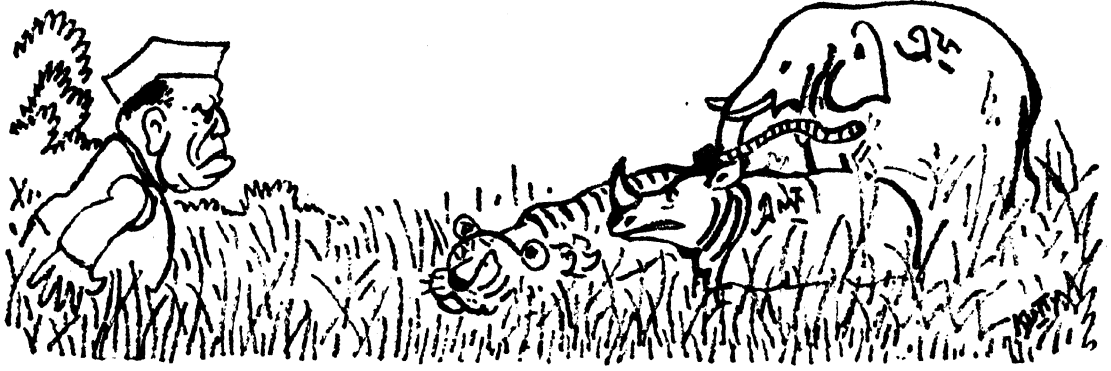
দিল্লির ডায়েরি

বহু নজরে ও দীর্ঘ নজরে, সুনজরে ও কুনজরে পশ্চিমবঙ্গকে আমরা অনেকে দেখেছি, দেখে থাকিও। কিন্তু এক নজরে দেখার সৌভাগ্য ক'জনের আর হয়? এখানে আমাদের কারোর কারোর সেই সৌভাগ্য হল সেদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগের কৃপায়।

ওই বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর শ্রীঅজিত গুপ্ত অকস্মাৎ এসে হাজির। তাঁর বগলে দুটো রঙিন চলচ্চিত্র, একটি হল "এক নজরে পশ্চিমবঙ্গ" ('গ্লিমপসেস অব ওয়েস্ট বেংগল') অন্যটি "কলকাতা"। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের আছে একটি কোনোমতে কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো একটি ছোট প্রেক্ষাগৃহ মহাদেব রোডে। প্রজেক্টর বাজে, তা সত্ত্বেও কাজের জিনিস একটি আমরা দেখলাম ওখানেই।

যেটি এখানে সকলের প্রশংসা পেয়েছে তা হল বংশী চন্দ্রগুপ্তের পরিচালনায় তোলা, যাকে আমি বলছি "এক নজরে পশ্চিমবঙ্গ"। কেন্দ্রীয় পর্যটন বিভাগের কর্তারাও এতে পেয়েছেন (তাঁদের অভিমতে) পর্যটনীয় প্রামাণ্য চলচ্চিত্রে এক নতুন ইংগিত, শৈলী ও শিল্প। প্রামাণ্য ছবির নাম শুনলেই সাধারণত যে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, এটি তা সার্থকভাবে বিনষ্ট করেছে। "বেশ লাগল", ছবি দেখে এই হয় প্রতিক্রিয়া।

ছোট ছোটভাবে এল অনেক সুন্দর দৃশ্য ও আকর্ষণীয় বস্তুর সমাবেশ। হঠাৎ মনে হল, তাই তো, ভারতে পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য, যার আছে সমুদ্র সৈকত আর তুষারমৌলী পর্বতসংকুল হিমালয়, দীঘা আর দার্জিলিং। কলকাতার ঠাকুরবাড়ি, হুগলি নদী, আনন্দ-পরিবেষক হোটেল আর ক্যাবারে, ময়দান আর ঘোড়দৌড়, মার্বেল প্যালেস, মিউজিয়াম ইত্যাদি, শান্তিনিকেতন, কেঁদুলির মেলা, বিষ্ণুপুরের মন্দির, জলদাপাড়ার পশু-সংরক্ষণী। কোথাও আতিশয্য নেই। যতটুকু দেখার পর আরো একটু-দেখি বাসনাটা থাকে ঠিক সেই জায়গায় বদলে যায় দৃশ্য, চলে যায় আবার অন্য স্থানের মনোরমত্বে।

সত্যজিৎ রায়ের অবেক্ষণ ও সংগীত এবং তাঁর অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত বংশীবাবু ও ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু রায় ও পূর্ণেন্দু বোসের প্রচেষ্টাতেই অতো চমৎকারভাবে উৎরেছে ছবিখানি। পাঁচজন ব্যক্তির চেষ্টায় কলকাতায় ১৯৬৫ সনে সংগঠিত হয়েছে "গ্রাফিক ডকুমেন্টারিজ"; বংশী চন্দ্রগুপ্ত, সৌমেন্দু রায়, অনিল চৌধুরী, সুজিত সরকার ও নৃপেন গাঙ্গুলী। প্রথম পদক্ষেপ "এক নজরে পশ্চিমবঙ্গ"। চমৎকার ভাষ্য-রচনা (ইংরিজী) করেছেন টাটার আর. পি. গুপ্ত (আটুল) এবং বলেছেন, ওয়ালটার টমসনের সুভাষ ঘোষাল।

আমরা শুনে আনন্দিত যে, পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রন্ট সরকারের তথ্য-প্রচারমন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী (যিনি নিজে সাহিত্যিক ও সুরসিক) প্রামাণ্য চিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করছেন। গত মে মাস থেকে এই অবধি পশ্চিমবঙ্গকে রাজধানী কী নজরে দেখে আসছে, তা প্রকাশ পাচ্ছে আমাদের কার্টুনিস্ট কুট্টির আঁকা ছবিটায়। বাংলার চারুময়তা যেন রাজনৈতিক ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। লোকের মনে শুধু নকশালবাড়ি, ঘেরাও, তীরধনুর ভীতিপ্রদ রূপ, খাদ্যসংকট, মিছিল, খুনখারাপি, বেল আটক, জমি দখল, প্রচার ও অপপ্রচারের কুৎসিতত্বে আসল বাংলা যেন অতলে তলিয়ে গেল। তাই যেন বেশি করে ভাল লাগল দুটো ছবি, বিশেষত এক-নজরটি। অবাঙালী ভারতীয় ও বিদেশীরাও যেন নতুন চোখে দেখল পশ্চিমবঙ্গকে।

বংশীবাবু আসলে পাঞ্জাবী, জন্মস্থান শিয়ালকোটে। বাবা-মা মারা যান বংশী যখন ছোট, বড় হলেন মামার কাছে জম্মু-কাশ্মীরে, সেখানে মামা কাজ করতেন সরকারের ন্যায় বিভাগে। মামা এক সময়ে জম্মুর গভর্নর হয়েছিলেন। কলেজে পড়তে পড়তে হঠাৎ জীবনের মোড় ঘুরে গেল শুভ ঠাকুরের ছবি দেখে। চাঁদা আদায় করতে বেরিয়েছিল বংশী শ্রীনগরে, এবং একজন ইঞ্জিনিয়ারের বৈঠকখানায় শুভ ঠাকুরের আঁকা ছবি দেখে তাঁর শিষ্যত্ব নিয়ে ছবি-আঁকা শিখল কিছুকাল, মামারবাড়ির আপত্তি অগ্রাহ্য করে।

দু' বছর পরে শান্তিনিকেতনে এল ভরতি হতে কলাভবনে। ভরতি হতে না পেরে কপর্দকহীনভাবে এল কলকাতায় ১৯৪৪ সনে। শুভ ঠাকুরের সহায়তায় গোপাল ঘোষ, প্রদোষ দাশগুপ্ত, রথীন মৈত্র ইত্যাদির বন্ধুত্বের ভিতর দিয়ে সাউথ অ্যাভিন্যুর একটি স্টুডিয়োতে ছবি এঁকে চলল বংশী, এবং কালক্রমে পরিচালক হেমেন গুপ্ত মহাশয়ের অধীনে সেট্ ডিজাইনের কাজ পেয়ে গেল।

"বটু সেন হঠাৎ অসুস্থ হন, হেমেন গুপ্ত বললেন, 'কী বংশি, পারবে?' বললাম পারব। কিন্তু জানেন, দু' বছর তেমন কোনো আর কাজ ছিল না হাতে। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটিতে ছিলাম গোড়া থেকে। সেখানেই জানলাম সত্যজিৎ রায় ও চিদানন্দ দাশগুপ্তকে।"

বিখ্যাত ফরাসী পরিচালক জাঁ রানোয়ারের ১৯৪৯-এ কলকাতায় এসে "রিভার" ছবি তোলা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ওই সময়ে তাঁর সম্পর্কে আসেন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির সত্যজিৎ-সহ অনেকে। রানোয়ার রেখে গেছেন যে-প্রভাব তাই দিয়েছে বাংলার চলচ্চিত্র-জগতে নতুন অধ্যায়, যা আজ দাঁড়িয়েছে সত্যজিতের হাতে পৃথিবীর চলচ্চিত্র-জগতের নতুন অধ্যায়।

বংশীও ছিল রানোয়ারের সঙ্গে "রিভার" ছবিতে এবং "আমি অনেক শিখলাম ইউজিন লুরির কাছে (বিখ্যাত ডিজাইনার)। আবার বছর দুয়েক কাজকর্ম তেমন নেই। আমার নিজস্ব শৈলীতে কাজ করার সুযোগ পেলাম সত্যেন বোসের 'ভোর হয়ে এল' ছবিতে। সেট্‌কে শুধু বাস্তবতার দৃষ্টিতে আমি দেখিনি। আমি চেষ্টা করলাম যাতে দর্শকরাও তাতে পায় চরিত্র-সন্ধান, চরিত্রগুলোর সঙ্গে তারাও যেন একাত্ম, তাদেরও আছে অনুভূতি", বংশী বলল।

তারপর? তারপর সত্যজিৎ রায়। সেই ১৯৫২ থেকে তাঁর সঙ্গে। বড়াল গ্রামে প্রাকৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে বংশীর হাতে নতুন কাজ "পথের পাঁচালী" ছবির। সেট্ ডিজাইন-কাজ স্টুডিয়ো ছেড়ে এল গ্রামের গাছ-গাছড়া ঝোপ-ঝাড় পুকুর-প্রান্তরে, গল্পের ও ছবির সঙ্গে একাত্মীভূত। এই হল নতুন ডাইমেনশন।

তাঁর হাতে "এক নজর" উৎরেছে সন্দেহ নেই। এক বছরে একশো ২২ হাজার ফুট ফিল্ম এরা তুলল, তা থেকে এডিট করে বেরুল সাড়ে তিন হাজার ফুটের ছবি, দেখাতে সময় নেয় ৩৮ মিনিট।

গ্রাফিক ডকুমেন্টারির কুশলী পরিবেশন। তাদের শৈলীতে বাংলার নিজস্ব স্বাক্ষর। ভারত সরকারের প্রচার মন্ত্রণালয় শুধু ফিল্ম ডিভিশনের উপর নির্ভর না করে এই ধরনের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর কাজের ভার দিলে ভাল হবে, দেখা উচিত।

"[illegible]" ছবিটির পরিচালক হচ্ছেন জ্যোতির্ময় রায়। বিদেশীদের জন্যই প্রধানত তৈরি মনে হল। সংগীতরচনা নির্মলেন্দু চৌধুরীর, বেশ ভাল।

বাংলা ছবি দেখার সুযোগ আমাদের খুব কম। রাজধানী শহরের দেশবাসীদের সামনে প্রকৃষ্টভাবে পশ্চিমবঙ্গকে নানাভাবে উপস্থিত করার প্রয়োজন খুব বেশি। রাজধানীতে তথ্যকেন্দ্রটি পুরোপুরি একটি কেন্দ্র হিসাবে উন্নীত করে, উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারীর উপর দায়িত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পরিচিতি দিন। সোমনাথবাবুর কাছে এটাই আমাদের বক্তব্য।

খগেন দে সরকার

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি সকল জেলা শাসকদের ও পুলিস-সুপারদের নিকট এক সারকুলারে এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, লাঠি, তীর, ধনুক, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সারাপশ্চিমবঙ্গে মিছিল বাহির করার অনুমতি দেওয়া

হইবে না। বিশুখুড়ো বলিলেন, "আমরা ধিক বলং ক্ষত্রিয় বলং নীতিতে বিশ্বাস করি, অস্ত্রশস্ত্রকে কোন আমল দিই না, তবু সবিনয়ে বলি, তীর ধনুকের সঙ্গে সোডার বোতল এবং ইটপাটকেলকেও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা উচিত ছিল।"

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীচন্দ্রশেখর নাকি বলিয়াছেন যে তন্দুরী মুরগী আর শিককাবাব ভক্ষণে কোনটি রোগের ভয় নাই। সহযাত্রী বলিলেন—"এতটাই যখন বললেন, তখন তন্দুরী আর শিককাবাবের জন্য উইথ মাসট্ হ্যাভ সামথিং টু পালফ্ এবং তাতেও কোন রোগের ভয় নাই, টেকচাঁদ কমিটি যা-ই বলুন!!"

শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক হওয়া উচিত একথা অনেকেই বলিতেছেন। "এবং মধুর সম্পর্ক আছেও, একে অন্যকে মনে মনে বড় কুটুম বলেই মনে করেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

সংবাদে শুনিলাম সারাদেশের ভাষাকে দেবনাগরী হরফে চালাই করার চালাও প্রস্তাব চলিতেছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"প্রস্তাবকর্তা সংহতির ভাসানের সহজ পন্থাটি আবিষ্কার করেছেন: বলানো যখন গেল না তখন লেখানো দিয়েই যথা লাভ হোক।"

মাদ্রাজের পঞ্চায়েৎ ও সমবায় উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী বলেন: এই রাজ্যে ৫০৬ জন 'গ্রামলক্ষ্মী' আছেন, তাঁরা গ্রাম-সেবকদের কাজে সহায়তা করেন। সহযাত্রী বলিলেন—"কোন কালে গৃহসেবকদের তাঁরা কোন মদৎ দেবেন কিনা সে প্রশ্ন অনেকেই করছেন, আমরা অবশ্য জবাব দিতে পারিনি!!"

শ্রীমোরারজী দেশাই নাকি পুনরায় আংশিক স্বর্ণনিয়ন্ত্রণের কথা চিন্তা করিতেছেন। "এবার হয়ত সাত ক্যারেট চালু হবে"—মন্তব্য করিয়াই সহযাত্রী গান ধরিলেন—ভুলি কেমনে, আজও যে মনে বেদনা সনে—।

খাদ্যের দাবিতে মহিলারা সম্প্রতি কলিকাতার রাজপথে একটি মিছিল বাহির করিয়াছিলেন। শ্যামলাল বলিল—

"স্বামীকুল স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়বেন এই মনে করে যে 'ভাত কাপড় প্রদানং'-এর দায়িত্ব এখন সরকারে বর্তেছে!!"

নিগ্রো কৌতুক শিল্পী ডিক গ্রেগরি নাকি প্যাসিফিস্ট হিসাবে আগামী বৎসর মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন। খুড়ো বলিলেন—"হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী নিশ্চয়ই প্যাসিফিস্টের এই কৌতুক প্রাণভরে উপভোগ করবেন!!"

গয়া জিলার কোন এক স্থানে একটি ভেজাল সিমেণ্ট প্রস্তুতের কারখানা আবিষ্কার করা হইয়াছে। "গংগা-মাটি মিশ্রিত সিমেণ্ট আবিষ্কার করে সিমেণ্টের গংগাযাত্রা আগেই হয়েছে এবারে গয়ায় পিণ্ডদান"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান বাতিলের প্রস্তাব উঠিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। সহযাত্রী বলিলেন—"পিতৃ-দায় থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা পূর্ব থেকে করে রাখাই পিণ্ডাধিকারীর পক্ষে উচিত হবে!!"

বম্বে হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, জনৈক খেয়ালী, আত্মম্ভরি, ভণ্ড, গোমরাস্বভাব, অপদার্থ, অস্থিরমতি, উগ্র-প্রেমিক বিশেষণে বিশিষ্ট জনৈক ব্যক্তি 'পাত্রী চাই' বলিয়া একটি বিজ্ঞাপন দিয়া-

ছেন। "পাত্রীপক্ষ থেকে কোন সাড়া মিলেছে কিনা তা এখনো জানা যায়নি; এত গুণের পাত্রেরও যদি পাত্রী মেলে তাহলে অনেকে এবং এসব গুণ অনেকেরই আছে—পঞ্চাশের আগেই 'ধনং' ব্রজেৎ করতে রাজী হবেন"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

নেপাল নাকি গংগা নদী দিয়া বংগোপ-সাগর পর্যন্ত একটি জলপথের জন্য ভারতের নিকট আবেদন জানাইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত কী হবে জানিনে এবং জলপথে কুমীরের গমনাগমনের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে তা আরো জানিনে!!"

উৎসবে লৌকিকতার বিরুদ্ধে একটা স্পষ্ট অভিমত নাকি ক্রমেই দানা বাঁধিতেছে। "আমরা আগেও বলেছি, আবারও বলি, শুধু অতিথি নিয়ন্ত্রণ নয়, গোটা নিমন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ না করলে লৌকিকতা বরাবরই এক সংগে লোক হাসাবে আর কাঁদাবে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

চিনির অভাবের কথা আজকাল সকলেরই মুখে মুখে ফিরিতেছে। এই প্রসংগে সহযাত্রী একটি ইংরেজী গান শুনাইলেন—"হোয়েন লাভিং সুসি সীটস বাই মি, আই ওয়াণ্ট নো সুগার ইন মাই টি" এবং বলিলেন—সুসিদের সন্ধান যাঁরা জানেন না তাঁদের পক্ষে সেকারিনই শেষ গতি।

অন্য এক ক্রীড়ারসিক সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা আগেও বলে-ছিলাম, এবার দেখছি মা সত্যিই সুপ্রসন্না হয়েছেন, ইস্ট বেংগল কালীঘাটের সংগে ড্র করেছে। লীগের খেলা যেভাবে মোড় নিচ্ছে তাতে ভবিষ্যৎবাণী করা খুবই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে; তবে ইস্ট বেংগল জয়ী হলেও সমর্থকদের দুঃখের সীমা থাকবে না গাঙেগর ইলিশ দুষ্প্রাপ্য তো বটেই, দুর্মূল্যতাটা আরো ভয়াবহ!!"

কার্ল স্যান্ডবার্গ

গত ২২শে জুলাই কার্ল স্যান্ডবার্গের মৃত্যু হয়েছে। বয়েস হয়েছিল ৮৯, একজন কবির পক্ষে বেশ দীর্ঘজীবন. গত দু' তিন বছর ধরে তিনি কঠিন পীড়ায় ভুগছিলেন. কলম ও কণ্ঠ প্রায় থেমে ছিল. সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে ক্ষোভের বিশেষ কিছু নেই, মরজীবন সাঙ্গ করে তিনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেছেন।

মৃত্যুর পর শোক সংবাদে, সাধারণত সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করাই প্রথা। স্যান্ডবার্গের জীবনের সকল ঘটনা আমার জানা নেই সংগ্রহ করাও এর মধ্যে সম্ভব হয়নি, শুধু এই বহিরেখাগুলি আমাদের জানা, তিনি ১৮৭৮ সালে জন্মে ছিলেন আমেরিকার মিড ওয়েস্ট এলাকার ইলিনয় প্রদেশে। দু'বার পুলিটজার পুরস্কার পেয়েছিলেন, তার মধ্যে প্রথমবারের পুরস্কার খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে তিনি এব্রাহাম লিংকনের একটি বিশাল জীবনী প্রণয়ন করেছিলেন, সেই বই পুলিটজার পুরস্কার কমিটির সামনে আসে—যে বছর, সম্ভবত ১৯৪০এ, তার চেয়ে ভালো জীবনী গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু পুলিটজার প্রাইজের যিনি প্রতিষ্ঠাতা—সেই জোসেফ পুলিটজার কোনো এক দুর্বোধ্য কারণে বলে গিয়েছিলেন, জীবনী শাখায় ওয়াশিংটন এবং লিংকনের জীবনী কখনো গণ্য হবে না। শেষ পর্যন্ত স্যান্ডবার্গের বইটিকে জাতীয় ইতিহাস অভিধা দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। দ্বিতীয়বার পুরস্কার পেয়েছেন. তাঁর কাব্য সঞ্চয়নের জন্য।

তাঁর স্ত্রী, সংসার এবং কার্যাবলীর নির্ঘণ্ট এখানে উপস্থিত করতে পারছি না বটে, কিন্তু স্যান্ডবার্গ নিজেই মজা করে নিজের একটি অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছিলেন। তাঁর কমপ্লিট পোয়েমস্-এর ভূমিকা থেকে সেই জীবনীর কিছু অংশ এখানে আমি তুলে দিচ্ছি—যাঁদের চোখে পড়েনি, তাঁদের কাছে নিশ্চিত আকর্ষণযোগ্য মনে হবে।

"আমার ছ'বছর বয়েসে, যখন আমার আঙুলে ঠিক মতো অক্ষর লিখতে শেখে, তখনই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি লেখক হবো। দশ বছর বয়েসে, আমি সব জায়গায় লিখতুম শ্লেটে, কাগজে, বাক্সের ওপর, দেয়ালে, তখন আমার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, বড় হয়ে সাইনবোর্ড পেন্টার হবো। কুড়ি বছর বয়েসে আমি আমেরিকান সৈন্য-বাহিনীতে যোগ দিয়ে পোরটু রিকো-য় গিয়েছিলাম, সেখান থেকে আমার নিজের শহরের কাগজে চিঠি পাঠাতাম, ছাপাও হতো। একুশ বছর বয়েসে, আমি কিছু-দিনের জন্য স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম—সেখানে আমার সহপাঠী ছিল ডগলাস ম্যাক আর্থার এবং ইউলিসিস গ্রান্ট (তৃতীয়), কিন্তু সপ্তাহ দুয়েক বাদেই ফিরে আসতে হলো—আমি বানান, ভূগোল, ইতিহাসে পাশ করলেও, অংক আর ব্যাকরণে ফেল। তেইশ বছর বয়েসে আমি একটা কলেজ ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেছি, সেখানে বেশ কিছু লিখেছিলাম—আজ পঞ্চাশ বছর পরও সেগুলো হাস্যকর মনে হয়। পরের বছর যে 'কলেজ ইয়ার বুক' আমি সম্পাদনা করেছিলাম—সে সম্পর্কেও ঐ কথা খাটে। এর পরের বেশ কয়েক বছরে আমি অনেক ধরনের লেখা লিখেছি, দু'খানি চটি বইও বেরিয়েছিল, কিন্তু সেগুলো আর পুনর্মুদ্রণের যোগ্য নয়। তার পরের ছ' বছরে আমার চারখানা কবিতার বই বেরুলো—সবগুলোই নানা-রকম ভুলে ভরা, ও বইগুলোর ব্যর্থতা ও

সিঁধির কথা আমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না। এই সময়ে আমি বাচ্চাদের জন্যও দু'খানা বই লিখেছি, খেত-খামার অঞ্চলের বহু প্রচলিত গল্পের সংগ্রহ, তার মধ্যে একটা গল্প ছিল, "দুটো আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি ঠিক করলো, তাদের একটা ছেলে হওয়া দরকার।" যখন আমার বয়েস পঞ্চাশ—তখন আমি দু'খণ্ড জবনী লিখেছি, এবং 'আমেরিকান সংব্যাগ' নামের সংকলন—সেই সময় সমালোচকদের মধ্যে আমাকে নিয়ে একটা ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছিল, আমি ঠিক কি, কবি না জীবনীলেখক-? নাকি গীটার হাতে ভ্রাম্যমান ত্রুবাদুর (স্যান্ডবার্গ আমেরিকার পল্লীগাথা সংগ্রহ করে নিজেই গীটারে সুর তুলে সেগুলো গাইতেন। যাঁরা তাঁর আবৃত্তির রেকর্ড শুনেছেন, তাঁরা জানেন, তিনি নিজের কবিতাও অনেক সময় আবৃত্তি করতেন গীটার বাজিয়ে)—কিংবা মিড-ওয়েস্টের হানস্ ক্রিশ্চান অ্যান্ডারসন অথবা সাম্প্রতিক ঘটনার বিবরণকারী যাঁর খবরের কাগজের লেখা ফিচার বই হয়ে 'শিকাগো বর্ণদাঙ্গা' নামে বেরিয়েছে!...আমি এখনও ক্রিয়াপদ সম্পর্কে এবং বিশেষ্যর সংগে তাদের রহস্যময় যোগাযোগ সম্পর্কে পড়া-শুনো করি, বিশেষণ সম্পর্কে এমন সন্দেহ ও সংশয় আমি সারাজীবনে বোধ করিনি। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে লেখা আমার গোটা তিরিশেক কবিতার মানে আমি নিজেই এখন ভুলে গেছি।...সারাজীবন ধরে আমি চেষ্টা করেছি পড়ার, দেখার, শোনার এবং লেখার।"

স্যান্ডবার্গের মনে একটা ক্ষোভ ছিল। হুইটম্যানের উত্তরসূরী এই কবি জীবনে কখনো মুক্ত ছন্দে ছাড়া সুললিত কবিতা লেখেন নি, তাঁর কবিতা কর্কশ, রুক্ষ, বিদ্রূপ ও বেদনাময়, নাগরিক, অবিকল মুখের ভাষার প্রকরণ। তাঁর ভিতরে একটা চারণশক্তি লুকিয়েছিল কিন্তু সে নগর সভ্যতার চারণ। কিন্তু সভ্যতা যতই এগিয়ে যাক মানুষ যতই সফিস্টিকেটেড হোক, তবু কবিতার কাছে এখনো তার দাবি সরলতার, গ্রাম্য প্রকৃতি বন্দনার, ভাবালু দর্শনের। এই জন্যই বৃহত্তর পাঠক সমাজ স্যান্ডবার্গকে আধুনিক এবং বিশেষ ধরনের কবি আখ্যা দিয়ে মহত্তর কবি বলেছে রবার্ট ফ্রস্টকে। সুইডিস ইমি-গ্রান্টসদের বংশধর স্যান্ডবার্গ নবগঠিত আমেরিকায় দেখেছিলেন যন্ত্র ও নগর সভ্যতার উত্থান, শিকাগোর মতন বিস্ময়কর ও নিষ্ঠুর শহরের ছায়ায় লালিত হয়ে তিনি মানুষকে দেখেছিলেন পরিবেশের তুলনায় বামন হিসেবে, অহংকারী কিন্তু আত্ম-অবমাননায় পূর্ণ। ওদিকে গ্রাম ও গোলা-বাড়ির ঋষি রবার্ট ফ্রস্ট পেলেন আমেরিকায় সেইসব মানুষেরই অভিনন্দন। কিন্তু সব কবিরই কোনো না কোনো ক্ষোভ থাকে। রবার্ট ফ্রস্টেরও এক সময় ক্ষোভ ছিল, কেন ইউরোপে তাঁর তুলনায় ডব্লু বি ইয়েটস্-এর বেশী সম্মান!

এখন স্যান্ডবার্গ শান্ত হয়ে কবরে শুয়ে আছেন। মনে পড়ে তাঁর 'ঠাণ্ডা কবর' কবিতার শেষ কয়েক লাইনঃ

"Take any streetful of people buying cloths and groceries, cheering a hero or throwing confetti and blowing tin horns.... tell me if the lovers are losers ....tell me if any get more than the lovers....in the dust ....in the cool tombs."

সনাতন পাঠক

বাংলার ইতিহাস

বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী। শ্রীফকির-নারায়ণ কর্মকার। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ঐতিহ্যময় স্থান বিষ্ণুপুর। বঙ্গদেশের গৌরব। আজ সে-স্থান বাঁকুড়া জেলার সামান্য একটি মহকুমার পরিচয় বহন করলেও বিষ্ণুপুর বলতে বোঝায় "বাংলার মুকুটমণি, বাঙ্গালী বীরের সৌর্য-বীর্যের লীলাভূমি, পূর্ব ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মল্লভূম। পূর্বে বর্তমান বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর, হুগলীর আরামবাগ হয়ে হাওড়া, পশ্চিমে ছোটনাপুর, দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর, তমলুক ও উত্তরে দামোদর নদ—আসানসোল পর্যন্ত এই মল্লভূম রাজ্যের বিস্তৃতি। এই রাজ্যের রাজধানী বিষ্ণুপুর নামেই এই রাজ্যের প্রসিদ্ধি।"

পৃথিবীর যে কোনো ভৌগোলিক খণ্ডের উন্নতির জন্যে তথাকার জনসাধারণ যেমন দায়ী, ততোধিক দায়ী সেখানকার জন-নায়কেরা তথা নরপতিগণ। ইতিহাসে তাই দেখি যুগে যুগে কালে কালে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নরপতি, সেই সেই দেশ ও মানুষকে এক অপূর্ব মহিমামণ্ডিত করেছেন। বিষ্ণুপুরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতায় হয়নি। এখানকার মল্লরাজগণ পৃথিবীর যে কোনো আদর্শ নৃপতির সমকক্ষতার দাবি করতে পারেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে তার ধ্বংসকাল পর্যন্ত বিষ্ণুপুর রাজাদের ইতিহাস গৌরব ও মহিমায় উজ্জ্বল।

এই বিষ্ণুপুর, তার নরপতিদের এবং এখানকার মানুষের এক প্রামাণ্য ইতিহাস লেখার প্রয়াস পেয়েছেন লেখক। বিষ্ণুপুর ও তার রাজবংশ সম্পর্কে বহু ভুল তথ্যের যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানিয়েছেন, ঐতিহাসিক বিভিন্ন উপাদান থেকে এই গৌরবময় অঞ্চলের এক তথ্যপূর্ণ, সামগ্রিক রূপ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। শুধু রাজবংশ, রাজপরিবারের কাহিনীই নয়, বিষ্ণুপুর রাজ্যের রাষ্ট্রনীতি, শাসনব্যবস্থা প্রতিরক্ষা, রাজস্ব আদায় ইত্যাদি, সমাজব্যবস্থা, ধর্ম, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদি থেকে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মন্দির, কামান প্রভৃতি সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন লেখক।

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। এই বই পাঠ করলে সে তার পুরোনো গৌরবের ছিটে-ফোঁটা লাভ করে ধন্য হবে। "আমাদের বাঙ্গালীদের এই হিসাবে দুর্ভাগ্য—কাশী বা মাদুরা, জয়পুর বা আগরার মতো একটি কলা নগরী বাংলা দেশে গড়িয়া উঠিল না। এইরূপ একটি মাত্র নগরী সারা বাংলা দেশের মধ্যে দেখা যায়, সেটি হইতেছে বিষ্ণুপুর, বিষ্ণুপুর প্রাচীন মন্দিরে ও নানাবিধ শিল্পকার্যে বাংলা দেশের সমস্ত নগরগুলির শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু এই বিষ্ণুপুরকে বাঙ্গালী জনসাধারণ চিনিল না, দেখিল না, আদর করিতে শিখিল না।..." ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টো-পাধ্যায়ের এই আক্ষেপ অনেকাংশে দূরীভূত হবে যদি বাঙ্গালী পাঠকসাধারণ এই বই—যা বর্তমান বিষ্ণুপুর রাজের কথায় "নিখুঁত ঐতিহাসিক তথ্যে ভরা"—পাঠ করে বিষ্ণু-পুর সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহী হন এবং এই ঐতিহ্যবাহী স্থান সম্পর্কে অধিকতর অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণায় প্রয়াসী হন।

(১৬১।৬৭)

উপন্যাস

একই বৃন্ত। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গো-পাধ্যায়। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। ছ টাকা।

নিবারণ মল্লিকের স্বপ্ন। গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু। ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা—৬। চার টাকা।

রচনারীতির দিক থেকে স্বর্গত উপেন্দ্র-নাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্রের স্কুলের পরিধিভুক্ত বলা চলে। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই কাহিনী ও ঘটনাপ্রধান। কৌতুক স্নিগ্ধ লাবণ্য ও চরিত্রাবলীর প্রতি অপার সহানুভূতি উপেন্দ্রনাথের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'একই বৃন্ত' তাঁর পুরাতন রচনার নবপ্রকাশিত সংস্করণ। মুখ্যত প্রেমের কাহিনী হলেও এই উপন্যাসের

বিস্তার রাজনৈতিক মতাদর্শকে আশ্রয় ক'রে। নায়ক বিজয়েশ কংগ্রেসকর্মী, অনীতা কম্যুনিস্ট সংঘনেত্রী। দুজনেরই লক্ষ্য মাতৃভূমির সেবা। কিন্তু মত ও পথ ভিন্ন। মতবাদের ভিন্নতা সত্ত্বেও তারা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বোধ না করে পারে নি। কিন্তু পরস্পরের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার জন্যই তারা মিলিত হতে পারল না। কারণ, কেউই অপরকে তার আদর্শ থেকে চ্যুত অবস্থায় পেতে চায় নি। কাহিনীর পরিসমাপ্তি বিজয়েশের মৃত্যু ও অনীতার স্বেচ্ছাবৈধব্যবরণের করুণ রঙীন পরিস্থিতিতে।

উপেন্দ্রনাথের সহজাত কৌতুকপ্রসন্ন রচনারীতি উপন্যাসের গতিবেগ বৃদ্ধি করেছে, সন্দেহ নেই। রাজনীতির তর্ক প্রাসঙ্গিক বিষয় হলেও সুখপাঠ্যতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। এটি উপেন্দ্রনাথের ক্ষমতার বিশেষ পরিচায়ক।

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর বইটি একটি কাহিনীপ্রধান থ্রীলার। নিবারণ মল্লিকের জীবন শেষ হয়েছিল হাবিলদার রূপে। তার স্বপ্ন ছিল, বংশধরেরা কেউ ভারতীয় সেনা-বাহিনীর 'জেনারেল' হবে। দুই ছেলে মেজর পর্যন্ত উঠেছিল। পৌত্র যশোবন্ত মল্লিককে কেন্দ্র করে আলোচ্য গ্রন্থটি রচিত। অল্প বয়সে 'মেজর' যশোবন্ত হয়তো পারত নিবারণ মল্লিকের স্বপ্ন সার্থক করে তুলতে। কিন্তু সে-ও কিভাবে ব্যর্থ হল তাই গ্রন্থান্তর্গত কাহিনী। ব্যভিচার, ডিভোর্স, খুন, আত্মহত্যা, চাতুর্যের জাল, মানসিক ব্যাধি—এ-সমস্ত ছাড়াও শেষ অধ্যায়ে অতিরিক্ত উপহার একটি স্টান্ট। থ্রীলার পাঠককে খুশী করার কোনো চেষ্টাই বাকি নেই, এ-কথা নিঃসংশয়ে স্বীকার্য।

১০১।৬৭, ১৩৫।৬৫

জ্যোতিষ শাস্ত্র

জ্যোতিষে মেয়েদের ভাগ্য। শ্রীভাস্কর। আনন্দধারা প্রকাশন, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। ছয় টাকা।

জ্যোতিষী সম্পর্কে বোধ হয় প্রতিটি মানুষেরই কিছু না কিছু উৎসাহ থাকে। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ বিশেষ এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই শাস্ত্রের চর্চার অধিকার বর্তমান থাকায় শাস্ত্রটি কূপমণ্ডুকের মত বিশেষ এক গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমান যুগে ছাপাখানার কল্যাণে অত্যন্ত সাধারণ লোকের কাছেও এই বিরাট এবং প্রাচীন শাস্ত্রটির কিছু কিছু রহস্য প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। এবং অবসর বিনোদনের পক্ষে এই জাতীয় গ্রন্থের সমাদর যে যথেষ্টভাবে বেড়েছে তা বলাই বাহুল্য।

জ্যোতিষে মেয়েদের ভাগ্য জ্যোতিষ সম্পর্কীয় একটি গ্রন্থ। এখানে সহজ ও সুখপাঠ্যভাবে লেখক গ্রহ নক্ষত্র রাশি প্রভৃতির প্রভাব ও ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছেন। মুখ্যত মেয়েদের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করলেও পুরুষরাও মেয়েদের ভাগ্য সম্পর্কে অনুৎসাহী নন, ফলে বইটি সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছেই সমাদর লাভ করা উচিত। ৪১৮।৬৬

বিবিধ

ট্রেড ইউনিয়ন দেশে ও বিদেশে। শ্রীসুখেন চট্টোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান: এন কে ব্যানার্জি, ২বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫। মূল্য: দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সহিত বাঙালী পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যই এই বইটি লিখিত। বৃটিশ ও সোভিয়েট রাশিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ছাড়া ভারতে বিভিন্ন যুগে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনাও এই পুস্তকে স্থান পেয়েছে। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিক-আন্দোলন সম্পর্কেও অনেক তথ্য এই বইয়ে পাওয়া যাবে। ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনে, শ্রীশশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের অবদানও আলোচিত হয়েছে। ভাষা ঝরঝরে। শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বইটি পড়া উচিত।

পত্রিকা

বিচিত্রা। দ্বিতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা। ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৭৩। সম্পাদক—নলিনী-

কুমার চক্রবর্তী। সুব্রত রাহা ও জীবন ভৌমিক। মূল্য—এক টাকা।

বর্তমান সংখ্যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯৪৯ সনের "দিনলিপি" ছাড়া ১৯৬৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী "সামুয়েল যোসেফ অ্যাগনন" সম্পর্কে শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে। শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়ের "সাহিত্যিক রোজনামচা"ও তথ্যসমৃদ্ধ। কবিতাগুলিও সুনির্বাচিত। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত উত্তর ভিয়েতনামের দুটি কবিতাও এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। মানফ্রেড ফেল্ডসিপারের লেখা গটফ্রীড বেন সম্পর্কে একটি লেখাও ছাপা হয়েছে। বছর দশেক আগে অধুনালুপ্ত 'কবিতা' পত্রিকায় শ্রীজ্যোতির্ময় দত্ত এই জার্মান কবির কবিতা সম্পর্কে একটি মূল্যবান আলোচনা করেছিলেন। সেই প্রবন্ধের তুলনায় বর্তমান প্রবন্ধটি একেবারেই কাঁচা হাতের লেখা বলে মনে হয়।

মুদ্রাঙ্কন। সম্পাদক : দেবীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। ৬৭ গাঙ্গুলী বাগান রোড, রিষড়া। প্রতি সংখ্যা : ১·০০।

বর্তমানে মুদ্রণ একটি বিশিষ্ট আবশ্যিক শিল্পে পরিণত হলেও এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের উপায় আমাদের দেশে সীমাবদ্ধ। মুদ্রণশিল্প সম্পর্কে কয়েকখানি ইংরাজী সাময়িক পত্রিকা থাকলেও সাধারণ লোকের মধ্যে তার প্রচার বলতে নেই। মুদ্রাঙ্কন সেই অভাবটি অপনোদনে সক্ষম হবে আশা করা যায়। দ্বি-মাসিক এই পত্রিকাখানি বাংলা ভাষায় মুদ্রণ-সম্পর্কিত প্রথম সাময়িকী। মুদ্রণশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের কাছে পত্রিকাখানি সমাদৃত হবে।

গঙ্গোত্রী : ত্রৈমাসিক কবিতা সংকলন। চতুর্থ বর্ষ ১ম। কার্যকরী সম্পাদক শান্তনু দাস, গৌতম গুহ। ৪।১, আফতাব মস্ক লেন, কলি-২৭। দাম ৬০ পয়সা।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে দীর্ঘ কয়েক মাস 'গঙ্গোত্রী'র অনুপস্থিতির ত্রুটি স্বীকার করে বর্তমান সংখ্যা অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত পত্র; মূল্যবান কয়েকটি প্রবন্ধ, লিখেছেন—সঞ্জয় ভট্টাচার্য, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সুনির্বাচিত ৪০টি কবিতার মধ্যে সজনীকান্ত দাস, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, দিনেশ দাস, মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সুনীল বসু, দক্ষিণারঞ্জন বসু, দুর্গাদাস সরকার ইত্যাদি। তরুণ কবিদের চোখে সাম্প্রতিক কাব্য প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন শান্তনু দাস, গৌতম গুহ, বিশ্বনাথ বয়াল মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ে।

পুনশ্চ : বৈশাখ-আষাঢ় ৫ম বর্ষ। সম্পাদক—মৃণাল দত্ত আশিস সান্যাল। ২৪এ রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, কলি-৯। দাম—এক টাকা।

চিন্তায়, ধ্যান ধারণায়, অভিনবত্বে ষাটের কবিরা যে একটি নতুন রূপান্তর ঘটাতে চলেছে এ অনশ্বর সত্য সম্পাদক সোচ্চারে বলেছেন এবং নিজেই প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম পাতা অলঙ্কৃত করেছেন। অন্যান্য পাতায় তরুণ থেকে তরুণতম কবিদের একাধিক কবিতার মধ্যে শান্তনু দাস, আশিস সান্যাল, রত্নেশ্বর হাজরা, বেলাল চৌধুরী, পরেশ মণ্ডল, গণেশ বসু, গৌতম গুহ, মৃণাল বসুচৌধুরীর নাম চোখে পড়ে। তরুণ কবিদের কাব্যগ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হলেও এ সংখ্যায় ষাটের কবিদের কাব্যগ্রন্থের আলোচনা প্রয়োজন ছিল।

সীমান্ত : দ্বিতীয় বর্ষ—১ম সংকলন : পি. ৩৮৮ বাঁশদ্রোণী পার্ক, ২৪ পরগণা। সম্পাদক—মৃগাঙ্ক রায়, তরুণ সান্যাল, প্রসূন বসু। দাম—এক টাকা।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে প্রচুর, কিন্তু রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিক কবিদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভালো লাগে কিনা, তাঁর কবিতা আধুনিক কিনা এই নিয়ে প্রবীন-নবীন ১৫ জন কবির কবিতা ও বিস্তৃত আলোচনা নিঃসন্দেহে তথ্যবহুল। এ প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, মনীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ্য। এ ছাড়া কবিতা আছে যুগান্তর চক্রবর্তী চিত্ত ঘোষ, প্রসূন বসু, গণেশ বসু, তরুণ সান্যাল এবং শান্তনু দাসের।

প্রাপ্তি স্বীকার

কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট পার্টি। পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী। কালান্তর প্রকাশনী : ১৯ শরৎ ব্যানার্জী রোড কলিকাতা-২৯। মূল্য ০/৫০।

ভিয়েতনাম। সৌরীন সেন। নবভারতী : ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১২·০০।

প্রোফেসর ইন্দ্রাণী সান্যাল। শ্রীননীমাধব চৌধুরী। মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিমিটেড : ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·০০।

প্রভু নিত্যানন্দ। ভবেশ দত্ত। ভোলানাথ প্রকাশনী : ৩৭/১১ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·০০।

ভারতের সাধক। শঙ্করনাথ রায়। প্রাচী পাবলিকেশনস : ৬৩বি ন্যাশনাল প্রেস, বাকসাড়া, হাওড়া। মূল্য ৮·০০।

শ্রীমায়ের মানস কন্যা। বি বেটা। শ্রীবিমল পাল : ২৭/১ এফ জীবনকৃষ্ণ মিত্র রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য ৩·৫০।

সৈকত সুন্দরী ও বহু পুরুষ। অজিতকৃষ্ণ বসু। রূপরেখা : ১২৪·১এ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য ৪·০০।

প্রিয়নেতা অজয়কুমার। সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমীরা বিশ্বাস। সাহিত্য কেন্দ্র : সি১১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·০০।

অমানুষ। শক্তিব্রত চৌধুরী। দেবব্রত চৌধুরী : ২ বিহারী প্রামাণিক লেন, হাওড়া। মূল্য ১·০০।

বীর সাভারকর। মণি বাগচি। শিক্ষা ভারতী : ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৫·০০।

এবার প্রিয়ংবদা। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড : ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৬·০০।

অনন্ত সংলাপ। শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস : ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য ৬·০০।

আরোগ্যলাভের পর উত্তমকুমার শুটিংয়ে যোগ দেন—গত সপ্তাহে চলচ্চিত্র ভারতীর "কখনো মেঘ" (পরিচালনা ঃ অগ্রদূত) ছবির সেটে একটি দৃশ্যের অভিনয়ের মুহূর্তে অঞ্জনা ভৌমিক ও উত্তমকুমার ফটো—দেশ
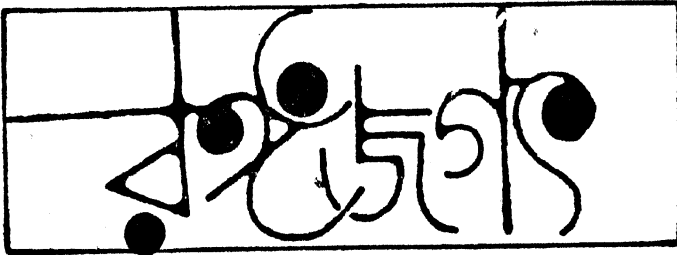
সোফিয়া লোরেন, কারলো পন্তি ও একটি বাসনা

সোফিয়া লোরেনের বয়স এখন ৩২। চলচ্চিত্রে প্রথম তিনি এসেছিলেন ১৫ বৎসর বয়সে, 'এক্‌স্ট্রা'-র ভূমিকায়। নেপলস-এর এক বস্তি থেকে। আজ চলচ্চিত্রলোকে সোফিয়া লোরেনের অপ্রাপ্য কিছুই নেই। প্রভূত অর্থ ও খ্যাতি তাঁর করতলগত। তাঁর শিল্পী-মন এতে বুঝি সন্তুষ্ট নয়। সম্প্রতি মঞ্চে অভিনয় করার বাসনা তিনি প্রকাশ করেছেন। ক্লাসিক্যাল ড্রামার প্রয়োজন তাঁর নেই। ইটালিয়ান নাটকও নয়। এ-পি'র সংবাদদাতাকে সোফিয়া লোরেন বলেছেন, "আধুনিক আমেরিকান থিয়েটার অনেক বেশী 'রেলেভেন্ট', অন্ততঃ ইটালিতে এখন যা হচ্ছে তার চেয়ে বেশী।" শ্রীমতী লোরেন যেখানে মঞ্চশিল্পী, সেখানে টেনেসি উইলিয়ামসের চেয়ে বড় নাট্যকার কেউ হতে পারে না। এর কারণ, শ্রীমতী লোরেন বলেছেন, "তিনি মেয়েদের জন্য বাস্তব চরিত্র সৃষ্টি করেন। তাঁর নাটকে মেয়েরা অনেকটা সম্পূর্ণ এবং সত্যিকারের চরিত্র।"

"এডওয়ার্ড অ্যালবিকেও আমি পছন্দ করি। আমি হুজ অ্যাফ্রেড অব ভার্জিনিয়া উলফ দেখেছি। ওই নাটকের পার্ট এত বেশী আমেরিকান যা আমার পক্ষে অভিনয় করা অসম্ভব। এলিজাবেথ টেলরকে নেপলসের বিবাহিতা রমণীর চরিত্রে অভিনয় করতে বললে যা দাঁড়ায় আর কী!

"টেনেসি উইলিয়ামসের সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি। উনি হয়ত আমার নামটাও জানেন না। তবে স্টেজে যদি অভিনয় করি তবে তাঁর নাটকের চরিত্রেই করব।

"সিনেমার শিল্পীরা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত মঞ্চে যেতে চান, এবং মঞ্চের শিল্পীরাও বুঝি একবার সিনেমা পরখ করতে ব্যগ্র হন। এটাই স্বাভাবিক।"

শ্রীমতী লোরেনের জীবনযাপন অনাড়ম্বর। রোমের অদূরে মারিনোতে নিজেদের ভিলায় শ্রীমতী লোরেন ও তাঁর স্বামী কারলো পন্তি বাস করেন। দম্পতি প্রায় নির্জনেই থাকেন। শ্রীপন্তির সঙ্গে কাজে বেরোনো ছাড়া শ্রীমতী লোরেন বাড়ি থেকে বের হন না বললেই চলে। যদি না ছবির কাজ থাকে।

"প্যারিসে অবশ্য মাঝে মাঝে আমরা নাইট ক্লাবে যাই। কিন্তু রোমে কখনও নয়। কারলো মিলানের লোক। কাজের চেয়ে বড় তাঁর কাছে কিছু নেই। যখন কাজ করি না তখন আমরা বাড়িতেই থাকি।

"আমি 'সেক্সপট' হতে চাই না। 'সেক্সপট' রূপে অন্য মেয়েদের দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ভেবেছি, আমি আরও বেশী কিছু করতে পারি। কিন্তু বরাবরই আমি সত্যিকারের অভিনেত্রী হতে চেয়েছি। এবং হয়েছি।"

শ্রীমতী লোরেনের জীবনে একটি জায়গায় গভীর শূন্যতা। তিনি নিঃসন্তান। একাধিকবার সন্তানসম্ভবা হবার পরেও তিনি জননী হতে পারেননি। ডাক্তাররা বলেছেন, জননী হবার সম্ভাবনা এখনও আছে। "যতদিন তাঁরা (ডাক্তাররা) এ কথা

সোফিয়া লোরেন ও কার্লো পন্টি

বলেন ততদিন আমি আমার সন্তানের আশাতেই থাকব। এমন কথা রটেছে যে, আমি দত্তক নিতে চাই। তা সত্যি নয়। আমার মা হবার সম্ভাবনা যতদিন আছে ততদিন পরের ছেলে দত্তক নেবার কথা আমি ভাবি না।"

চিত্র-সমালোচনা

খেয়া

অমিশ্র কমেডি নয়। তথাকথিত রোমান্টিক উপকাহিনী না থাকলেও প্রেম আছে। নাটকীয় উপকরণের মধ্যে রয়েছে আবেগ, দ্বন্দ্ব, মহত্ত্ব এবং নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃপ্রেম। ক্লাইমও বাদ যায় নি। এই সব কিছু নিয়েই "খেয়া" (রূপছায়া চিত্র), কান্না-হাসির দরিয়ায় যার পারাপার। এক কথায়, জন-মনোরঞ্জনের একটি আন্তরিক তথা সফল প্রয়াসে চিহ্নিত "খেয়া"। প্রথমার্ধ তো খুবই উপভোগ্য, কমেডির উপাদানে পরিপূর্ণ। অকৃতদার, নারীবিদ্বেষী দুই অগ্রজ তাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কেমন করে স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে থেকে দূরে রাখবার জন্য সদা সচেষ্ট তার মধ্যে হাসির উপকরণ যথেষ্ট। কৌতুক বেশ জমে ওঠে যখন তিন ভাইয়ের সংসারে প্রথমে একটি কুড়িয়ে পাওয়া শিশুকন্যা এবং পরে এক তরুণী ডাক্তারের আগমন ঘটে। রঙ্গরসের এই পরিস্থিতি-গুলি যখন একের পর এক ঘটতে থাকে তখন প্রেক্ষাগৃহ ঘন ঘন হাসির রোলে ফেটে পড়ে।

কমেডির অন্তরালে রয়েছে নিঃস্বার্থ ও অন্ধ ভ্রাতৃপ্রেম। যার অযৌক্তিক দাবি ও পীড়ন আরও কৌতুকপ্রদ। বড় ভাইরা বিয়ে করেনি পাছে তাদের ঘরণীরা ছোট ভাইকে অবজ্ঞা করে। কমেডির স্বার্থে বড় ভাইদের স্নেহের প্রকাশ ও আত্মত্যাগ যতই অস্বাভাবিক হোক, তার মধ্যে এমন একটা মহত্ত্বের পরিচয় আছে যা আজকের দিনে দুর্লভ বলেই দর্শকের মন স্পর্শ করে। আচার-আচরণ ও কথাবার্তার দিক থেকে বড় দুই ভাই কমিক চরিত্র। সুতরাং তাদের কার্যকলাপ বাস্তবের কষ্টিপাথরে বিচার না করাই যুক্তিসংগত।

দ্বিতীয়ার্ধে ছবির সুর 'সীরিয়স', নাট্যাবেগ বেশী, ক্লাইমও রয়েছে (গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারকে কেন্দ্র করে)। হাল্কা কমেডি এবং নাট্যাবেগ ও পাপাচারের এই অসবর্ণ যোগে—যার পরিণাম মেলোড্রামায় —সমালোচনা করার মত বৈসাদৃশ্য অনেক আছে। কাহিনীও (নীতা সেন) এই অংশে অতি দুর্বল, কক্ষচ্যুত। গ্রামের ডাক্তারকে শেষ দৃশ্যে অকারণে অপ্রকৃতিস্থ করা হয়েছে। জোলো মেলোড্রামার এই সংক্রমণ থেকে ছবিটিকে অনায়াসে বাঁচানো যেত। স্ত্রীর সঙ্গে যে একটি দৃশ্যে ডাক্তারকে দেখা গেছে তা দাম্পত্য সুখের সাক্ষ্য দেয় না মোটেই। তা ছাড়া, দুর্বৃত্তের হাত থেকে তরুণী ডাক্তার যে-ভাবে প্রাণ বাঁচিয়ে চলে এসেছে, ডাক্তারের স্ত্রীও কি তা পারত না? তার পাল্কিতে গিয়ে বসবার কী প্রয়োজন ছিল? কমেডি ছবিতে কেন এই মৃত্যু, এই অনর্থক বিষাদ-যোগ? এই ঘটনা ছবিতে করুণ রস নিয়ে আসতে পারলে অবশ্য ক্ষতি ছিল না। সে যাই হোক, এইসব ত্রুটি সত্ত্বেও শেষার্ধ দর্শককে নাট্য কৌতূহল ও রোমাঞ্চে আচ্ছন্ন করে রাখে। অর্থাৎ যুক্তির বিচারে কিছু ঘটনা অসার মনে হলেও এ-সবের একটা তাৎক্ষণিক উপভোগ্যতা আছে। এবং ছবির আমোদ-মূল্য বেড়েছে সুষ্ঠু পরি-চালনার গুণে। ছবিতে কোন ঘটনাই অতি-বিস্তারিত বা অতি-বিন্যস্ত নয়। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে ছবির গতি অব্যাহত। এ ক্ষেত্রে চিত্র-সম্পাদনার (অনিল সরকার-কৃত) বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। এবং সর্বোপরি সাধুবাদ দিতে হয় চিত্রনাট্যকার-পরিচালক রূপক-গোষ্ঠীকে তাঁদের চমৎকার প্রয়োগ-কর্মের জন্য। প্রযোজক-সুরকার শ্যামল মিত্রর ছবিতে দর্শকরা নতুন কিছু আশা করতে অভ্যস্ত। এই ছবিও সে আশা পূর্ণ করবে, চিত্তবিনোদনের নতুন শর্তে। দর্শককে নিছক আনন্দ দেওয়া ছাড়া ছবিতে অন্য কোন ভণিতা প্রযোজক রাখেন নি বলেই তিনি আরও ধন্যবাদার্হ।

প্রধান শিল্পীরা সকলেই উঁচুদরের অভিনয় করেছেন। নায়িকা মাধবী মুখো-পাধ্যায়ের গ্ল্যামার এ ছবিতে অনেক বেশী প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর অনুভূতিদীপ্ত অভিনয়ও কম চিত্তাকর্ষক নয়। নায়ক অনুপকুমারের অভিনয়ও খুব প্রাণবন্ত। বড় ভাইদের স্নেহের অত্যাচারের মধ্যে তাঁর অসহায় ভাব দেখবার মত। কমিক রীতিতে অতি উঁচুদরের চরিত্রচিত্রণের জন্য তরুণ-কুমার ও বঙ্কিম ঘোষ (দুই বড় ভাই) ভূয়সী প্রশংসা পাবেন। ভৃত্যবেশী ভানু বন্দ্যো-পাধ্যায়ও কারো চেয়ে কম কৃতিত্ব দেখান নি। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের ভৃত্য একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রসৃষ্টি। হতাশা-জর্জরিত ও কুচক্রী গ্রাম্য ডাক্তারের চরিত্রে বিকাশ রায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়ে-ছেন। বিশেষ চরিত্রে প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গীতা দে, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সুঅভিনয় করেছেন।

দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ফটোগ্রাফি —বিশেষ করে আউটডোরে—ছবিতে সুন্দর শিল্পশোভনতা এনে দিয়েছে। কয়েকটি

প্রিয়া ফিল্মস-এর "আনন্দ সংবাদ"-এ অভিনয়ের জন্য চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন উত্তমকুমার—পাশে প্রযোজক অসীম দত্ত

শটের অ্যাংগেল—উপর থেকে নেওয়া—চমৎকার। তাঁর ক্যামেরায় শিল্পীদের বিশেষ করে নায়িকাকে, বেশ সুন্দর দেখিয়েছে।

শ্যামল মিত্রর ছবিতে গানের আকর্ষণ থাকবেই। এবং আছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্রর গান সুরের মাধুর্য ও গাওয়ার গুণে অবশ্যই জনপ্রিয় হবে। একটি ধুমপাড়ানি গান গেয়েছেন নীতা সেন। আবহসুর পরিমিত, এবং পরিবেশানুগ। গ্রাম্য ডাক্তার যেখানে নিজেকে 'হাতুড়ে' বলে মনের রোষ প্রকাশ করছে, ওই মুহূর্তে দূরে হাতুড়ির 'এফেক্ট সাউন্ড' সুকল্পিত।

"প্রস্তর স্বাক্ষর" (পরিচালনা: সলিল দত্ত) এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—ছবির দুটি দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায় এবং (নিচে) গীতালি রায়, দিলীপ রায় ও অনুপকুমার

ছবির পর ছবি

আনন্দ সংবাদ প্রিয়া ফিল্মস-এর "আনন্দ সংবাদ"-এ অভিনয় করার জন্য উত্তমকুমার চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। রাজ কাপুর ছবির অন্যতম প্রধান অভিনেতা। "আনন্দ সংবাদ" স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে পরিচালনা করবেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়।

মৃগয়া অরুন্ধতী দেবীর পরবর্তী প্রয়াস "মৃগয়া"। বনফুলের এই কাহিনীর চিত্ররূপে অরুন্ধতী দেবী অভিনয় করবেন জানা গেল। প্রধান পুরুষচরিত্রে থাকবেন অশোককুমার, চিত্রপরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্ব অরুন্ধতী দেবীর।

চৈতালী আর ডি বনসাল পর পর কয়েকটি বাংলা ছবি প্রযোজনা করছেন। প্রথমে [illegible] হচ্ছে "চৈতালী"। শচীন দেববর্মণের সুর[illegible] পরিচালনায় ছবির গান আগেই রেকর্ড করা হয়েছে। উত্তমকুমার ও তনুজা ছবির নায়ক-নায়িকা। সুধীর মুখোপাধ্যায় চিত্রপরিচালক। "চৈতালী"র সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমুখোপাধ্যায় আর একটি ছবির কাজে হাত দেবেন। নামঃ "কলঙ্কজ"। তা ছাড়া শ্রীবনসাল রবীন্দ্রনাথের "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসের চিত্ররূপও প্রযোজনা করছেন। এবং অজিত চট্টোপাধ্যায় রচিত "নাচন হাতির জন সাহেব" গল্পের চিত্রস্বত্ব কিনেছেন। শ্রীবনসাল প্রযোজিত "ঝুক গয়া আসমান" (রাজেন্দ্রকুমার ও সায়রা বানু অভিনীত) তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে।

পরিশোধ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রেমকাহিনীর চিত্ররূপ "পরিশোধ" (ইকনমিক প্রোডাকশন্স) অনতিবিলম্বেই মুক্তি পাচ্ছে। অর্ধেন্দু [illegible] ছবিটি পরিচালনা করেছেন। এর বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, দিলীপ রায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, জহর রায় ও মলিনা দেবী। দীর্ঘদিন পর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অবতরণ করেছেন নরেশ মিত্র। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংগীতপরিচালক।

লালবাঈ রমাপদ চৌধুরীর বহুপঠিত উপন্যাস "লালবাঈ" নিয়ে ছবি তৈরি হচ্ছে। প্রযোজনা করছেন জয়শঙ্কর প্রোডাকশন্স। গত সপ্তাহে ছবির মহরত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মহরতের শিল্পী ছিলেন চন্দ্রপ্রভার চরিত্রের রূপসজ্জায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত বসু চিত্রপরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

মহরত অনুষ্ঠানে "সুইচ-অন" করেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্ল্যাপস্টিক দেন শ্রীসাগরময় ঘোষ।

বিজয় বসুর পরিচালনায় অরোরার "আরোগ্য নিকেতন"-এর শুটিং শেষ।

আরোগ্য নিকেতন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপে প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়, সন্ধ্যা রায়, ছায়া দেবী, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহ-ঠাকুরতা, দিলীপ রায়, রবি ঘোষ, জহর গাঙ্গুলি প্রভৃতি। রবীন চট্টোপাধ্যায় সংগীত পরিচালক।

প্রযোজক-পরিচালক ভি শান্তারামের ছবি "বুঁদ জো বন গয়ী মোতী"-র শুটিং প্রায় শেষ হয়ে

বুঁদ জো বন গয়ী মোতী এসেছে। মমতাজ ছবির নায়িকা। এক পাহাড়ী মেয়ের চরিত্রে তাঁকে দেখা যাবে। জিতেন্দ্র নায়ক। সতীশ ভাটিয়া সংগীত পরিচালনা করেছেন।

চলচ্চিত্রভারতীর "কখনো মেঘ" ছবির ইন্ডোর শুটিং গত সপ্তাহে সম্পন্ন হয়েছে। কিছুকাল অসুস্থ থাকার পর উত্তমকুমার শুটিং-এ যোগ দিয়েছেন। অঞ্জনা

কখনো মেঘ ভৌমিক, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, বংকিম ঘোষ, তরুণকুমার প্রভৃতি বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে রয়েছেন। সুধীন দাশগুপ্ত সংগীত পরিচালক। প্রশান্ত দেবের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন অগ্রদূত।

"প্রস্তরস্বাক্ষর"-এর পর সলিল দত্ত যে ছবিটি পরিচালনা করবেন তার নাম "কলংকিত নায়ক"। ডাঃ বিশ্ব-

কলংকিত নায়ক নাথ রায় রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচিত।

এ-আর-সি প্রোডাকশন্সের প্রথম ছবি "অদ্বিতীয়া"। সম্প্রতি ছবির মহরত সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী।

অদ্বিতীয়া পৌরোহিত্য করেন শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষ। নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় চিত্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। "অদ্বিতীয়া"র নায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায়, নায়ক হলেন সর্বেন্দু। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরকার।

হীরেন নাগের পরিচালনায় চিত্রঙ্গার "সুয়োরানীর সাধ"-এর শুটিং নিয়মিত চলছে। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী

অবলম্বনে শ্রীনাগ নিজেই চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল, ছায়া দেবী, বিকাশ রায়, অজয় গাঙ্গুলী, জহর রায়, বিদ্যা রাও, অমর মল্লিক, বঙ্কিম ঘোষ প্রভৃতি।

সুয়োরানীর সাধ

চিড়িয়াখানা

সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ক্রাইম ছবি "চিড়িয়াখানা"-র শুটিং চলার সময়ে উত্তমকুমার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। আরোগ্যলাভের পর "চিড়িয়াখানা"-র শুটিং-এ তিনি প্রথম যোগ দেন। ছবিটির কাজ প্রায় শেষ। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনীর ভিত্তিতে শ্রীরায় "চিড়িয়াখানা" তৈরি করছেন। উত্তমকুমার ছাড়া এর প্রধান চরিত্রগুলিতে রয়েছেন সুশীল মজুমদার, জহর গাঙ্গুলী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষাল, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, গীতালি

জয়শঙ্কর প্রোডাকশন্স-এর "লালবাঈ" ছবির মহরৎ অনুষ্ঠানে চন্দ্রপ্রভার চরিত্রের শিল্পী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

"আমন" হিন্দী চিত্রে রাজেন্দ্রকুমার ও সায়রা বানু

রায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। সংগীতপরিচালনার দায়িত্ব শ্রীরায় নিজেই নিয়েছেন।

নল-দময়ন্তী

জে এস প্রোডাকশন্স-এর "নল-দময়ন্তী" ছবির শুটিং প্রায় শেষ। শ্রীমণি বর্মা রচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন এক সুখ্যাত কলাকুশলী গোষ্ঠী। ছবিটি সংগীতবহুল হবে বলে শোনা গেছে। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও অসীমকুমার দুটি মুখ্য চরিত্রের শিল্পী।

"আমন" আগামী সপ্তাহে

বহু অর্থ ব্যয়ে তৈরি এম কে প্রোডাকশন্স-এর "আমন" আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। মোহনকুমার প্রযোজিত-পরিচালিত বক্তব্যধর্মী এই ছবিতে দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেলকে দেখা যাবে। বিশ্বশান্তির আদর্শ ছবির কাহিনীতে প্রকাশ করা হয়েছে। রাজেন্দ্রকুমার ও সায়রা বানু নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় রয়েছেন। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে আছেন বলরাজ সাহনী, চেতন আনন্দ, সুরেশ, ডেভিড প্রভৃতি। ছবির বেশ কিছু দৃশ্য জাপানে তোলা হয়। শঙ্কর জয়কিষণ সুরকার।

মস্কো উৎসবের ফলাফল

গত সংখ্যায় প্রকাশিত মস্কো উৎসবের ফলাফলে সামান্য ভুল ছিল। উৎসবের সর্বোচ্চ পুরস্কার গ্রাঁ প্রি যুগ্মভাবে পেয়েছে সোভিয়েট চিত্র "জার্নালিস্ট" এবং হাঙ্গেরির ছবি "ফাদার"। বুলগেরিয়ার ছবি "ডিভিয়েশন" বিশেষ স্বর্ণপুরস্কার পেয়েছে। আন্তর্জাতিক সমালোচকদের সংস্থা (ফিপরেসকি) "ডিভিয়েশন"-কে উৎসবের শ্রেষ্ঠ চিত্রের মর্যাদা দিয়েছে।

"এন্টনি কবিয়াল" (পরিচালনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবিতে উত্তমকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

ফটো—দেশ

রৌপ্য পুরস্কার লাভ করেছে তিনটি ছবি—"রোমান্স ফর দি ক্ল্যারিনেট" (চেকোস্লোভাকিয়া), "ওয়েস্টারপ্লাট" (পোলান্ড) এবং "আন্ডার ওয়ার্ল্ডশিপ" (যুগোস্লাভিয়া)।

অল্পদৈর্ঘ্যের শিশুচিত্র হিসাবে পুরস্কৃত "দি ফিউজিটিভ" (জাপান ও রাশিয়ার যুগ্ম প্রচেষ্টা)। কয়েকটি সোভিয়েট সংস্থা ও সাময়িক পত্রের পুরস্কারও উৎসবে দেওয়া হয়। পুরস্কার-প্রাপ্ত ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে "তিসরী কসম", "অপারেশন স্যান-জেনারো" (ইটালি), "এ লয়েল সোলজার অব পাঞ্চো ভিলা" (মেক্সিকো), "এ ওয়ার্কার্স ডায়েরি" (ফিনল্যান্ড), "দি এনচ্যান্টেড ফরেস্ট" (ক্যাম্বোডিয়া), "দি বিগ হোয়াইট টাওয়ার" (জাপান), এবং "নো স্টার্স ইন দি জেলভ" (পেরু)। পুরস্কার বিতরণের সময় নার্গিস (শিশুচিত্রের জুরী বোর্ডের সদস্যা) এবং লেজলি ক্যারন (কাহিনীচিত্রের জুরী বোর্ডের সদস্যা) মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

বিবিধপ্রসঙ্গ

আপনার প্রিয় লেখক কারা?

চেকভ, মপাসাঁ ও ডস্টয়েভস্কি।

প্রিয় শিল্পী?

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি।

আপনার 'হবি' কি?

আমার সন্তানদের দেখাশোনা করা।

আপনার প্রিয় রঙ, শব্দ এবং গন্ধ কি?

সাদা রঙ, পাখির গান এবং যুঁইয়ের গন্ধ।

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবের পত্রিকা "স্পুটনিক"-এর সংবাদদাতা নার্গিসের 'ইন্টারভিউ' নেন।

সাংবাদিকের কয়েকটি প্রশ্ন ও নার্গিসের উত্তর উপরে দেওয়া হল।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ ভান্ডারের সাহায্যার্থে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ভারতীয় পরীক্ষামূলক ছবি "ইয়াদিনে"র এক সাহায্য প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন চিত্রতারকা নার্গিস ও তাঁর অভিনেতা-প্রযোজক স্বামী সুনীল দত্ত। ইন্ডিয়ান ফিল্ম সোসাইটির অতিথিরূপে এঁরা দুজন ব্রিটেন সফর করেন। এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় চিত্রাভিনেত্রী মীনাকুমারী ও ওয়াহিদা রেহমানও উপস্থিত ছিলেন।

প্রযোজক, পরিচালক, সম্পাদক, ক্যামেরাম্যান, চিত্রনাট্যকার ও অন্যান্য কলা-কুশলীদের শিক্ষাদানের জন্য ব্রিটেনে একটি জাতীয় ফিল্ম স্কুল স্থাপিত হতে পারে। অধ্যাপক লর্ড লয়েডের নেতৃত্বে ১৯৬৫ সালে সরকার এরূপ একটি স্কুলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে দেখার জন্য যে কমিটি গঠন করেন, সেই কমিটি এই স্কুল স্থাপনের পক্ষে সুপারিশ করেছেন।

দি ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভস অব ইন্ডিয়া তাঁদের "ফ্রি ডিপোজিট স্কিম" অনুযায়ী র‍্যাঙ্ক ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর কাছ থেকে কয়েকটি বিদেশী ছবি পেয়েছেন। ভারতে ছবিগুলির ব্যবসায়িক প্রদর্শনী শেষ হয়েছে। ছবিগুলির মধ্যে টনি রিচার্ডসনের "দি এন্টারটেনার", গাই গ্রীনের "দি অ্যাংরি সায়লেন্স", মরিস ইভানের "ম্যাকবেথ" উল্লেখযোগ্য।
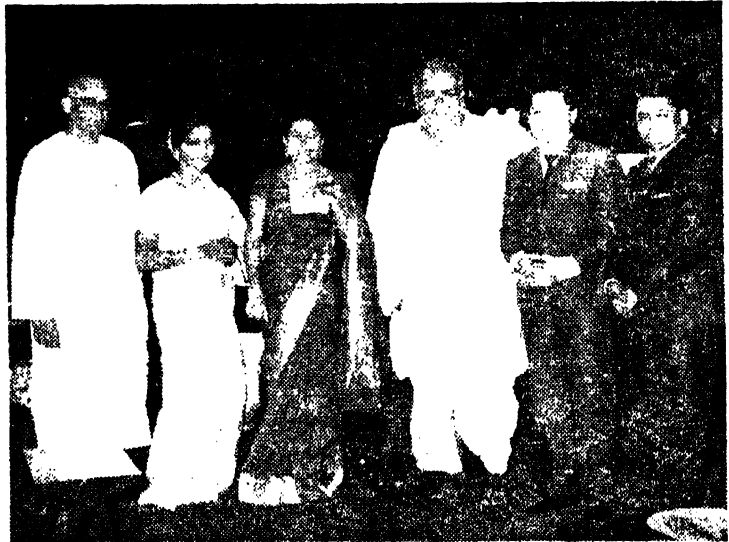
সংগীত পরিচালকদ্বয় লক্ষ্মীকান্ত ও প্যারেলাল সম্প্রতি বিবাহ করেছেন; নব দম্পতিদের সম্মানার্থে বোম্বাইয়ে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র প্রযোজক তারাচাঁদ বারজাতিয়া (বাঁয়ে) প্রদত্ত পার্টিতে শ্রীমতী প্যারেলাল, শ্রীমতী লক্ষ্মীকান্ত, পৃথ্বীরাজ কাপুর, লক্ষ্মীকান্ত ও প্যারেলাল

অরণ্যদেব
লী ফক্‌

শত শত বছর ধরে আমরা এই সোনা-বেলার মালিক। আমাদের রাজ পরিবারের লোক ছাড়া আর কেউ কখনও এই বেলাভূমিতে পদার্পণ করেনি। শাস্ত্রীর কথা— অবশ্য আলাদা।
এখানে অনধিকার প্রবেশের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। বাইরের লোকের মধ্যে একমাত্র তুমিই এখানে ঢুকবার অনুমতি পেলে।
জেড-পাথরের বাড়ি।
ও-বাড়ি আমি বানিয়েছি আমার স্ত্রী এবং টৈম্পার রানী শিবার জন্যে।

সোনা-বেলার উপরে অরণ্যদেবের পূর্বপুরুষ ও সম্রাট জুনকর.....
বিবাহের রাত্রি আমি এই বাড়িতে কাটাব। তুমি তো আমার বন্ধু। তোমার যখন বিয়ে হবে, তখন তুমিও এখানে এসে নিশিযাপন করে যেও।
2/19

'ঘণ্টা কয়েক বাদে... সোনা-বেলা থেকে আমরা প্রাসাদে ফিরবার পর...'
বিয়ের দিনে তুমিই হবে— নিতবর-....
সে তো আমার সৌভাগ্য!
মহারাজ...

টৈম্পার রানী শিবাকে মাঝপথে জলদস্যুরা আটক করেছে! তারা মুক্তিপণ চায়!
এই লোকটা বুঝি জলদস্যুদের চর?
হাঁ, মহারাজ। মুক্তিপণ পেলেই আমরা রানীকে ছেড়ে দেব।

মুক্তিপণ চাস? এত বড় সাহস? আমি তোকে এইখানেই শেষ করব।
আমি যদি মরি, রানীও আহলে বাঁচবেন না!
ছেড়ে দাও জুনকর। আগে ওর কথা শোনো।
'বারুদের উপরে খাঁচা বানিয়ে তার মধ্যে শিবাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে আমাদের জাহাজে। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগোন, শিবাকে তাহলে জ্যান্ত অবস্থায় পাবেন না।'
মুক্তিপণ হিসেবে আমরা একঘর ভর্তি সোনা আর সলিমুল্লো চাই।
অর্থাৎ আমাকে পথের ভিখারী করে ছাড়তে চাও। বেশ, তাই হবে।
দাঁড়াও জুনকর।
জুলুমের কাছে নতিস্বীকার করা চলবে না।
তা ছাড়া আর উপায় কী?
সত্যিই তো ওয়াকার কাকা, উপায় কী?
এখন ঘুমোতে দিন, কাল বাকীটা বলব।
কেন!
১০

মণিপুর অঞ্চলে বৈরী নাগা, মিজো ও কুকিদের সঙ্গে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর সংঘর্ষ আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইমফল-তামেংলং রোডের একস্থানে ২৪ জুলাই ভারতীয় সশস্ত্র-বাহিনীর সঙ্গে বৈরী কুকিদলের একটি বড় রকমের সংঘর্ষে সেনাদলের একজন মেজর সহ আঠারো জন নিহত হয়েছেন। এক পক্ষকাল আগে এই এলাকাতেই বৈরীদের দু' দফা চোরাগোপ্তা হানায় রিজার্ভ পুলিসের চব্বিশ জন নিহত হয়েছিলেন। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বর্তমানে নাগা, মিজো, কুকি এই তিনটি দুষ্ট গ্রহের সমাবেশ ঘটেছে। বৈরী নাগাদের দৌরাত্ম্য চলেছে প্রায় দশ বছর। তার পরে আবির্ভাব ঘটেছে মিজোদের। সম্প্রতি কুকিরা নাগা ও মিজোদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এই তিন বৈরীর দলবদ্ধ আক্রমণ খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার। এদের হাতে প্রচুর অটোমেটিক অস্ত্রশস্ত্র আছে বলে জানা গিয়েছে। এরা কিভাবে কোথা থেকে এসব সংগ্রহ করেছে তাও অনুমান করা সহজ। পাকিস্তান মিজোদের শিক্ষা-শিবির ও আশ্রয়স্থল। উপদ্রুত অঞ্চলগুলি অত্যন্ত দুর্গম বলে এই বিদ্রোহ দমন করা খুব সহজ-সাধ্য বলে মনে করবার কোন কারণ নেই। মিজো-হাঙ্গামার মীমাংসা-কল্পে খৃষ্টান চার্চগুলি সরকারের কাছে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেছে।

দেশী সংবাদ

২৪ **জুলাই**—সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও অর্থ-মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ লোকসভায় কয়েকটি ক্ষেত্রে উৎপাদন শুল্ক হ্রাসের কথা ঘোষণা করেছেন। এর ফলে ভারত সরকারের চলতি আর্থিক বছরে মোট ১১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা এবং পুরো বছরে মোট ১৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব হ্রাস পাবে। এ ছাড়া প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রেও সামান্য কিছু রদবদল করা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ পরিস্থিতি নিয়ে দেড় ঘণ্টা আলোচনার পর কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ডের রায় : রাজ্যের বাজেট নিয়ে আলোচনার জন্য বিধানসভা অবিলম্বে ডাকা হোক। পরবর্তী ইতি-কর্তব্য নির্ধারণের ভার রইল ডি পি মিশ্রের উপর, এই শর্তে যে, তিনি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজের সঙ্গে পরামর্শ করে চলবেন।

২৫ **জুলাই**—গতকাল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেটের দফাওয়ারী আলোচনার সমাপ্তি ঘটে। ভোটগণনার দাবি উঠলে সরকার পক্ষ টিঁকবেন কি না এরূপ একটা আশঙ্কা এবং উদ্বেগ ছিল। সরকার পক্ষের দলীয় নেতাদের মধ্যে ব্যস্ততার অন্ত ছিল না। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে ভোটগণনার দাবি উঠলে দেখা যায় সরকার পক্ষ জয়ী হয়েছেন। একবার ১৮ ভোটে, আর একবার ১৭ ভোটে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সকল জেলাশাসক ও পুলিস সুপারের নিকট এক সার্কুলারে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন যে, লাঠি, তীর-ধনুক, বর্শা এবং এ ধরনের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মিছিল বের করতে অনুমতি দেওয়া হবে না।

২৬ **জুলাই**—আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জগতে পর পর যে কয়টি ঘটনা ঘটে—তার মধ্যে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেন, সরকারী দলের কয়েকজন প্রতিনিধি কংগ্রেস নেতাদের জানিয়ে দেন যে, "ফ্রন্ট-সদস্য সরিয়ে নিয়ে" সরকারের পতন ঘটালে সমগ্র মন্ত্রিসভা একযোগে অন্তর্বর্তিকালীন নির্বাচন দাবি করবেন এবং কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতৃত্ব স্থির করেন, এখনই চরম শক্তি-পরীক্ষায় নামা হবে না।

গতকাল গয়ার (বিহার) মহকুমা হাকিমের দফতরের স্ট্রং রুম থেকে চাঞ্চল্যকর এক চিনির চোরাকারবারের মামলার সমস্ত নথিপত্র উধাও হয়েছে। এই মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন দুজন ব্যবসায়ী আর অফিসার।

২৭ **জুলাই**—কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে একটি বিল সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করতে বলেছেন। সাময়িকভাবে বরখাস্ত কর্মীদের জীবনধারণের উপযোগী ভাতা দেবার আইন প্রণয়নের জন্যই ওই বিলটি। বিলে বলা হয়েছে, কর্মীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় বা ফৌজদারী ব্যবস্থা চলাকালে সংশ্লিষ্ট কর্মী জীবনধারণোপযোগী ভাতা পাবেন।

উত্তরপ্রদেশের সংযুক্ত বিধায়ক দলের চার মাস স্থায়ী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের তরফ থেকে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল, আজ তা বিধানসভায় ২০টি ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হয়ে গিয়েছে। বিরোধী দলের নেতা শ্রী সি বি গুপ্ত প্রস্তাবটি পেশ করেন। এর পক্ষে ২০০টি আর বিপক্ষে ২২০টি ভোট পড়ে।

২৮ **জুলাই**—আজ কলকাতার পৌরসভার অধিবেশনে মেয়রের এক বিবৃতিতে বিক্ষুব্ধ ইউ সি সি সদস্যগণ মেয়রকে ঘেরাও করে ওই বিবৃতির অনুলিপি-সহ সভার অন্যান্য নথি-পত্রে বহ্ন্যুৎসব করেন। বিবৃতিটি ছিল পৌর-সভা বাতিল করার সম্ভাবনা নিয়ে।

আজ হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর রেল ইয়ার্ডে লরি বোঝাই বালি মিশ্রিত এক হাজার বস্তা এবং নিকটবর্তী একটি গুদাম থেকে ওইরূপে বহু বস্তা গম উদ্ধার করা হয়। ইয়ার্ডে ওই ধরনের আরও সাতশ' বস্তা পড়ে থাকতে দেখা যায়। এ সম্পর্কে সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বস্তাগুলির মালিকের হদিস মেলে নি।

২৯ **জুলাই**—মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আজ অধিক রাত্রে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন। মধ্যপ্রদেশে শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ মিশ্রের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস মন্ত্রিসভার আজ পতন ঘটল। সংযুক্ত বিধায়ক দলের কাছে তাঁর মন্ত্রিসভা ১৩৭—১৫৩ ভোটে পরাস্ত হয়ে গেল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার লণ্ডনে ট্রাম কোম্পানীর অফিসের খরচ চালাতে পারবেন না। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোম্পানীর লণ্ডন অফিসে চিঠি দিয়ে ওই মর্মে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোম্পানীর লণ্ডন অফিসের ব্যয়ভার বহনের জন্য কলকাতা থেকে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা পাঠানো হত।

৩০ **জুলাই**—আজ রাজভবনে এক সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে শ্রীগোবিন্দনারায়ণ সিংহ মধ্যপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন। রাজ্যপাল এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। শ্রীসিংহ সংযুক্ত বিধায়ক দল মন্ত্রিসভার নেতা হবেন এবং গোয়ালিয়রের রাজমাতা বিধানসভায় নেতৃত্ব করবেন।

বিদেশী সংবাদ

২৫ **জুলাই**—টি শোম্বে এখন আলজিয়ার্সে একটি কারাগারে কড়া প্রহরায় আছেন। কংগো সরকার শোম্বেকে ফেরত পাঠাবার জন্য যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন আলজেরিয়ার সুপ্রীম কোর্ট তার অনুকূলে রায় দিয়েছে। কেঃ বুমেদিন ব্যক্তিগতভাবে রায় অনুমোদন করেছেন।

২৬ **জুলাই**—বর্ণবিদ্বেষের দাঙ্গার মোকাবিলা করার জন্য সাঁজোয়া গাড়িগুলি মেশিনগানের গোলা ছুঁড়তে থাকলে এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মার্কিন ছত্রীসেনা পাঠানোর ফলে ডেট্রয়েট নগর আজ যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে। গত তিন দিনের কালো-সাদার দাঙ্গা-হাঙ্গামায় এই শহরে নিহতের সংখ্যা ৩৩।

২৭ **জুলাই**—গতকাল রাত্রে পূর্ব তুরস্কের এরজিনকাল ও তুনসেলি প্রদেশে আর একবার প্রবল ভূকম্পন হয়। আজ সকালে সেখানে দ্বিতীয়বার ভূমিকম্প হয়। সাংবাদিকদের মতে এখানে মৃতের সংখ্যা ১০০ জন। দু' হাজার থেকে তিন হাজার বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে।

২৮ **জুলাই**—প্রেসিডেণ্ট জনসন গতকাল রাত্রে বিশেষ উপদেষ্টা কমিশন নিয়োগ করেছেন। কমিশন বড় বড় শহরে দাঙ্গার কারণ সম্পর্কে তদন্ত করবেন। তিনি আগামী রবিবার শান্তির জন্য প্রার্থনা দিবস ঘোষণা করেছেন।

২৯ **জুলাই**—মার্কিন নৌবহরের তৃতীয় বৃহত্তম ৭৬ হাজার টনী বিমানবাহী জাহাজ 'ফরেস্টাল'-এর বোমা-ভরতি বিমানগুলিতে বিস্ফোরণ ঘটায় আগুন ফ্লাইট ডেকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে অন্তত ২৬ জন মার্কিন নাবিক নিহত ও বহু আহত হয়েছে। তা ছাড়া, আগুনের হলকার হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্য অসংখ্য ব্যক্তি ডেক থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিস্ফোরণে ২৯টি বিমান ধ্বংস বা জখম হয়েছে।

৩০ **জুলাই**—আজ বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়েছে—রাষ্ট্রপুঞ্জ ইজরায়েল ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রকে এই মর্মে অনুরোধ করেছে যে, তারা যেন অন্তত এক মাসকাল সুয়েজ খাল দিয়ে জাহাজ পাঠাবার চেষ্টা না করে।

আর
পারা
যায়
না!

হরলিক্স
খেয়ে

Horlicks

সূচীপত্র

স্মরণীয় ৭ই
অ্যাসোসিয়েটেড-এর
গ্রন্থতিথি

স্থানীয় এজেন্টঃ

পি. পি. অ্যান্ড কোম্পানী, ফ্ল্যাট নং ৬ ব্লক নং ই. ১৫, বেচুলা রোড, কলিকাতা-১৪। ক্যাশ রসিদ এন্‌ট্রি করম এবং লিটকুইজ উইকলী নিন।

LitQuiz No.21

FIRST PRIZE	RUNNERS-UP (UPTO 4 ERRORS)	MINIQUIZ (UPTO 2 ERRORS)
Rs. 12,500	Rs. 7,000	Rs. 4,500

FAMINE RELIEF FUND : Rs. 1000

২১ লিটকুইজের সরকারী ভর্তি ফর্ম

ADDRESS

LITQUIZ NO. 21, ALANKAR, BALARAM ST., BOMBAY-7 (WB)

দ্রষ্টব্যঃ—(১) প্রত্যেক কলমে, আপনার বাতিলকরা শব্দটি কালি দিয়ে কেটে দিন, (২) আপনি যদি শুধুমাত্র একটি কুপন পাঠান, তাহলে দ্বিতীয় কুপনটি বাতিল করে দিন, (৩) আপনি যদি **মানি অর্ডার**যোগে এন্‌ট্রি ফী পাঠান, তাহলে এই এন্‌ট্রি ফর্মের সংগে, ডাকঘর থেকে পাওয়া মানি অর্ডার রসিদটি **অবশ্যই** পাঠাবেন। মানি অর্ডার রসিদ ছাড়া এন্‌ট্রি বাতিল করা হবে। (৪) আই-পি-ও ক্রস করবেন না। লিট্‌কুইজ নং - ২১ বোম্বাই - ৭-এর টাকা পাঠান।

1	Re.1		2	Re.1	
1	AGITATION	EDUCATION	1	AGITATION	EDUCATION
2	CONTENTMENT	DETACHMENT	2	CONTENTMENT	DETACHMENT
3	DESIRES	PLEASURES	3	DESIRES	PLEASURES
4	DIVINE	FEMININE	4	DIVINE	FEMININE
5	ECONOMY	POLITY	5	ECONOMY	POLITY
6	FREEDOM	WISDOM	6	FREEDOM	WISDOM
7	FREELY	TRULY	7	FREELY	TRULY
8	HAPPY	HIMSELF	8	HAPPY	HIMSELF
9	MATERIAL	ORIGINAL	9	MATERIAL	ORIGINAL
10	PEOPLE	RELIGION	10	PEOPLE	RELIGION
11	PERSONAL	POLITICAL	11	PERSONAL	POLITICAL
12	PROSPERITY	STABILITY	12	PROSPERITY	STABILITY
13	RACIAL	RELIGIOUS	13	RACIAL	RELIGIOUS
14	RUINS	RULES	14	RUINS	RULES
15	SPIRITUAL	UNIVERSAL	15	SPIRITUAL	UNIVERSAL
16	VALUES	WAYS	16	VALUES	WAYS
17	WANT	WITHIN	17	WANT	WITHIN

21 SEND THESE 2 COUPONS & ENTER MINIQUIZ FREE

MiniQuiz

10 CLUES FREE COUPON

AGITATION	EDUCATION	HAPPY	HIMSELF
CONTENTMENT	DETACHMENT	RACIAL	RELIGIOUS
ECONOMY	POLITY	SPIRITUAL	UNIVERSAL
FREEDOM	WISDOM	VALUES	WAYS
FREELY	TRULY	WANT	WITHIN

২১

দেশ

এই কুইজে যোগদান করবার জন্য আমি নিয়ম ও সর্তাবলী পালন করতে রাজী এবং প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার চূড়ান্তভাবে ও আইনতঃ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করলাম। প্রত্যেক কুপনের জন্য ভর্তি ফী : ১, টাকা। এই সম্পূর্ণ ফর্মের (২ কুপনের) জন্য ভর্তি ফী : ২, টাকা। আমি এম-ও রসিদ/আই-পি-ও/লিটকুইজ ক্যাশ রসিদ/প্রাইজ কার্ড ও তার নম্বর.................পাঠালাম।

CAPITAL LETTERS

NAME ....

ADDRESS ....

....

এখানে কাটুন ও এই পুরো ফর্মটি পাঠান—

৩,৩৮,৫০০ টাকা ১নং হইতে ২০নং লিটকুইজে পুরস্কার হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে

প্রধান বৈশিষ্ট্য

লিটকুইজ নিঃসন্দেহে সাহিত্য সম্পর্কিত ও **চাতুর্যপূর্ণ প্রতিযোগিতা।** লিটকুইজের উত্তর নির্ধারিত। আমাদের সংকলক এগুলি নির্ধারিত করেন নাই। এগুলি তিনি বদলাইতেও পারেন না। এগুলি ঠিক করার জন্য কোন সালিশী কমিটি নাই। রচয়িতার ব্যবহৃত শব্দই প্রত্যেকটি সমাধানের সঠিক উত্তর। কাজেই, লিটকুইজে সাফল্য ভাগ্যের উপর নির্ভর করে না। আপনার দক্ষতা, জ্ঞান চেতনা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করুন, আপনিও নিশ্চিত সাফল্য লাভ করিবেন।

বন্ধের শেষ তারিখ

ডাকে প্রেরিত সকল প্রবেশপত্র : ৭-৯-৬৭

ভারতজ্যোতিতে সমাধান : ১০-৯-৬৭

আপনি আপনার প্রবেশপত্র পাঠাইতে পারেন বুধবার, ৬-৯-৬৭ তারিখে, কিন্তু উহা **এক্সপ্রেস ডেলিভারীতে** পাঠান।

সমাধান ফেরৎ পাইবার জন্য আপনার প্রবেশপত্রসহ নিজ ঠিকানা লিখিত ৬ পয়সার পোষ্টকার্ড পাঠান।

১, টাকা পাঠান এবং **লিট্‌কুইজ উইকলির** ৫টি সংখ্যা লাভ করুন।

17 CLUES

1. Election time is obviously a time of intense political and mass **Agitation Education.**
2. **Contentment Detachment** is the real fountain of happiness.
3. Our **Desires Pleasures** are always changing.
4. Devotion, Love and Service are **Divine Feminine** terms. They are the attributes of the Divine Mother of the universe.
5. The central problem of the Indian **Economy Polity** is the problem of poverty.
6. Democrats cannot afford to regard themselves as sole custodians of **Freedom Wisdom.**
7. It is the basis of Democracy that everybody functions **Freely Truly** within the law.
8. Wherever a man is, in whatever condition he is placed, he wants to be **Happy Himself.**
9. It is impossible to be absolutely **Material Original** in this age when a vast amount of knowledge has accumulated.
10. The early beginnings of practically every **People Religion** on earth are shrouded in myth and mystery.
11. Good education brings freedom from fear, which is essential to make the nation courageous, and helps to realise the value of **Personal Political** freedom.
12. Social **Prosperity Stability** is not attained by dividing society, setting up one against the other, with political motives.
13. **Racial Religious** feeling is one of the most combustible elements in the life of the masses
14. Ours is a country of historic **Ruins Rules.**
15. If a religion is not **Spiritual Universal,** it cannot be eternal.
16. In all ages new ideas, new thought, new **Values Ways** of life have been introduced into our society, though usually subject to the maintenance of some basic principles.
17. All activity presupposes restlessness, and restlessness comes from **Want Within.**

দ্রষ্টব্যঃ—ওপরের ধাঁধাগুলি বিভিন্ন লেখকের লেখা থেকে নেওয়া কয়েকটি প্রশ্ন। এগুলি সব সম্পূর্ণ বাক্য ও নিজস্ব সম্পূর্ণ অর্থ বহন করে। লেখক/প্রবন্ধকারের নাম ও তাঁহাদের রচনার নাম, সরকারীভাবে সমাধানের সঙ্গে **লিট্‌কুইজ** উইকলিতে প্রকাশ করা হবে।

সূচীপত্র

বিনামূল্যে

প্রত্যেকটি সিনথল সাবানের সঙ্গে পাবেন একটি কুপন যা দিয়ে

সিনথল টয়লেট পাউডার কিনলে আপনার

৩৫ পয়সা

সাশ্রয় হবে

"অন্য যে কোন পাউডারের কৌটোর চেয়ে এতে বেশি পাউডার থাকে"
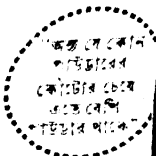
প্রত্যেকটি দুর্গন্ধনাশক ও ত্বক উজ্জ্বলকারী সিনথল সাবানের মোড়কের মধ্যে একটি বিশেষ কুপন আছে— এবং সিনথল টয়লেট পাউডারের যে কোন একটি কৌটো ([illegible], ফ্যামিলি বা ইকনমি সাইজ) কেনবার সময় এই কুপন দিলে আপনার ৩৫ পয়সা বাঁচবে।

স্নিগ্ধ সুরভিভরা সিনথল সাবান ও টয়লেট পাউডারে রয়েছে জি-১১ (হেক্সাক্লোরোফিন) যা ঘামাচি দূর করে এবং ছোটখাট চর্মরোগ সারিয়ে তোলে— আপনার শরীরকে দুর্গন্ধদূষিত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

সিনথল সাবান ও টয়লেট পাউডার দুটোই ব্যবহার করে নিশ্চিন্তভাবে ঝরঝরে ও তাজা বোধ করুন— এবং ৩৫ পয়সা সাশ্রয়ও করুন।

INTERPUB GC/ 6 BN

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীশ্যামল ঘোষ

বিশ বছর পরে

ভারতের স্বাধীনতার কুড়িটি বছর পূর্ণ হল। এই কুড়ি বছরের হিসেবনিকেশ করলে মন স্বভাবতই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না; একটি নৈরাশ্যের ছবিই ফুটে ওঠে। গোটা দেশ জুড়ে আজ যে অবস্থা তাতে মনে হয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক উভয় দিক থেকেই একটা চরম সংকট ঘনিয়ে এসেছে; কখন, কি ভাবে যে আমরা সেই সংকটের চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছব তা কেউ জানি না। তবু এই নৈরাশ্যের মধ্যেও একটি জিনিস লক্ষণীয়: যুদ্ধোত্তরকালে যেসব দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে তাদের অধিকাংশের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্থিরতা নেই, এবং বিশৃংখলা ও বিপর্যয়ে দেশের ক্ষয়ক্ষতি, অশান্তি চরম পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। সে-তুলনায় ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস শান্ত, কোনো অভাবিত বিশৃংখলা বা বিপর্যয় এযাবৎ ঘটেনি। এর অন্যতম কারণ ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা। বোধ করি ভারতীয় মানসিকতাও কিছু পরিমাণে এর কারণ হতে পারে।

প্রধানত এদেশের মানুষের মনে আজ যে নৈরাশ্য তা বাস্তব কয়েকটি কারণের জন্যে যেমন খাদ্যাভাব, কর্মসংস্থান ও উন্নত জীবনযাপনের সুযোগের অভাব ইত্যাদি। ভারতের মতন সুবৃহৎ ও জনসংখ্যা-স্ফীত একটি দেশের পক্ষে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় অভাবগুলি পূরণ করা সহজসাধ্য নয় এমন কি আংশিকভাবে পূরণ করাও কষ্টকর। সেদিক থেকে আজ বিশ বছরে লোকত্রুটি সত্ত্বেও ভারতের কর্মপ্রচেষ্টা একেবারে নস্যাৎ করার মতন নয়। কৃষি উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে, কলকারখানা বহুলাংশে বেড়েছে, জীবনযাপনের মানের অপেক্ষাকৃত উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত উন্নতি বা অগ্রগতি সর্বাংশে উল্লেখযোগ্য নয়। বিশেষত গত পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতকে কয়েকটি অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়েছে, যেমন দুটি যুদ্ধ এবং গত দু বছরের খরা। আপাত-দৃষ্টিতে আমাদের চোখে যা পড়ছে [illegible] নিয়মগুলি ভারতের সম্পূর্ণতার পথে কিছুটা বাধার মতন এসেছে। বলা বাহুল্য, এসব বিপত্তি সত্ত্বেও ভারতের পক্ষে যা করার ছিল তা করা হয়নি, এবং তার জন্যে আমাদের প্রশাসনিক ব্যর্থতাকেই দায়ী করা যায়।

বিশ্বরাজনীতিতেও ভারতের এখন কিছুটা কোণঠাসা অবস্থা। সাহায্যের অংক ক্রমশই কমে আসছে। বৈদেশিক মুদ্রার প্রচণ্ড টান। বৈদেশিক বিষয়ে ভারতের নীতিগুলির ওপর কোনো বিদেশী রাষ্ট্রই আর তেমন আস্থা রাখে না। আমেরিকা ও বৃটেনই শুধু নয়, অন্যান্য রাষ্ট্রও বোধ করি ভারতের ব্যাপারে নৈরাশ্য বোধ করছে। রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বটা এখনও টিকে আছে এই যা ভরসা।

গত নির্বাচনের পর ভারতের যে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে তাও আমাদের মনে রাখতে হবে। পুরোনো কংগ্রেস এখন প্রায় ক্ষয়গ্রস্ত, তার একচ্ছত্র ক্ষমতা নষ্ট হতে চলেছে। নতুন যারা ক্ষমতায় আসছে তাদের যোগ্যতার পরীক্ষা এখনও হয়নি, তবে সন্দেহ হয়, তাদের যোগ্যতাও সীমাবদ্ধ হবে। কংগ্রেসী শাসন যতটা ত্রুটিপূর্ণ ছিল যদি তার সংশোধন না ঘটে তবে অকংগ্রেসী শাসনেও এদেশের ভাগ্য পালটাবে না। তবে একটা কথা মনে হয়, ভারতীয় জনসাধারণ হয়ত এইভাবে, একটি মনোমত রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে।

দেশের মধ্যে আপাতত আমরা যা দেখছি তাতে শংকিত না হয়ে পারি না। মানুষের মধ্যে ক্রমশই একটা অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতার মাত্রা বাড়ছে, বিশৃংখলা সৃষ্টির দিকে ঝোঁক পড়েছে, হিংসার আবহাওয়া প্রকট হয়ে উঠেছে। শুধু যে অন্নের অভাবে এতটা হয়, হয়ত তা নয়; সমস্ত দিক থেকেই মানুষের চিত্তে হতাশা ও আক্রোশ সৃষ্টি হয়েছে। এর পরিণাম কি হবে এখনই বলা যায় না, তবে কখনও দলগত, কখনও আঞ্চলিক, কখনও সম্প্রদায়গত স্বার্থে আমাদের হানাহানি যত প্রকট হবে, ততই ভারতীয় সংহতির বিনাশ ঘটবে। ঐক্য ছিন্ন হলে এদেশের ভাগ্যে যে পরিণতি ঘটতে পারে তা ভয়াবহ। অশান্ত, অস্থির, রক্তাক্ত অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্রের মতন আমাদের দেশেরও সেই আগামী ইতিহাস বেদনা-দায়ক হোক এ আমরা চাই না। কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে নিজ দোষে দুষ্ট করে ভবিষ্যতকে আরও দুঃসহ করায় লাভ নেই। বরং সুস্থ মনে ও বিবেচনায় এই স্বাধীনতাকে সফল করার মধ্যেই আমাদের কৃতিত্ব।

কয়েকদিন আগে সাংবাদিকদের সামনে ভূমি রাজস্বমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার মন্তব্য করেছিলেন 'অবস্থাটা অসহনীয়'। কথাটা বোধ হয় মর্মান্তিকভাবে সত্য। শ্রীকোঙার অবশ্য মন্তব্যটা করেছিলেন বিশেষভাবে ভূমি সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে। মন্ত্রী হবার পর তিনি পদে পদে অনুভব করেছেন, যা তাঁর করা উচিত তা তিনি করতে পারছেন না। ভূমি সংস্কার দূরে থাক, জমির স্বত্ব বা বিলি ব্যবস্থা নিয়ে যে-সব সিদ্ধান্ত তিনি চালু করতে চান তা-ও সম্ভব হচ্ছে না। প্রতি পদে তাঁকে আইনের বেড়াজাল ঘিরে ধরে; এমন কি হাইকোর্টের আদেশে অনেক ব্যবস্থা অব্যবস্থায় ফেলে রাখতে হয়।

মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বলেই শ্রীকোঙার আইনের বাধানিষেধ উপলব্ধি করছেন। মন্ত্রীত্ব গ্রহণের আগে পর্যন্ত এই উপলব্ধি তাঁর হয়নি। পার্টির নির্দেশে তাঁকে বিশ্বাস করতে হত যে, মন্ত্রী যদি ইচ্ছে করেন তাহলেই যেকোন ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করতে পারেন। আজ আর ইচ্ছে থাকলেও পারেন না, পারা যায় না এটা বুঝতে পারছেন। আইনের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক বলে সব সময় হয়ত আইনের সংশোধন করেও এই অসহায় অবস্থার নিরসন করা সম্ভব নয়। এটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বোঝেন বলেই ভূমি সংক্রান্ত নানা আইনের সংশোধন তিনি চিন্তা করছেন। কিন্তু সেটাও সব অবস্থায় সহজ হয় না, কারণ সংবিধান আছে। সংবিধানের পরিপন্থী কোন আইন চালু করা সম্ভব নয়, তাতে সেই আইনের আওতায় পড়তে হয়।

হয়ত সে-কারণেই মধ্যে মধ্যে শোনা যায়, সংবিধানের আওতায় কোন কল্যাণকর কাজ করা সম্ভব নয়। এটা আজ যদি সম্ভব না হয়, আগেও হত না। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা সংবিধান বিরোধী বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভের চেহারাটা কোন বিশেষ বাঁধা ধরা পথে প্রকাশ পায়নি। দেখা যাচ্ছে নানাভাবে, নানা পদ্ধতিতে এই সংবিধান বিরোধী বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করছে। এই বিভিন্নমুখী বিক্ষোভটা আরও প্রকাশ পাবার সুযোগ পেয়েছে বর্তমান রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা যুক্তফ্রণ্টের ভিতরে বাইরে দেখা দিয়েছে বলে। এই সুযোগটা হয়ত ত্বরান্বিত হয়েছে পশ্চিম বাংলার খাদ্যাবস্থার অবনতি ঘটার ফলে।

বর্তমান বৎসরের কোন সময়ই খাদ্যের অবস্থা ভাল ছিল না। ভাল ছিল না বলেই খাদ্য সম্বন্ধে যে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল হয়ত সরকার তা করেন নি। এমন কি যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হবার পরেও যে হয়নি তা বর্তমান খাদ্য-সংকটের দিকে নজর করলেই বোঝা যায়। খাদ্য নীতিতে ত্রুটি নিশ্চয়ই ছিল এবং সে কারণেই হয়ত যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে এতটা অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। কিন্তু এটাও ঠিক পশ্চিমবাংলার খাদ্যাবস্থা কেন্দ্রের কাছে বিশেষ সুবিচার পায়নি। এটা বোঝা যায়, কেন্দ্রের কাছ থেকে পাওনা খাদ্যশস্য না পাওয়ার পরিমাণটা বিচার করলে। কেন্দ্রের পক্ষে শস্য সংগ্রহের পথে অসুবিধা যে নেই এ-কথা অস্বীকার না করেও পাওনা পরিমাণটা না পাঠালে পশ্চিম বাংলায় খাদ্যাবস্থার যে অবনতি ঘটতে বাধ্য এটা বলা চলে। শস্য পাওয়া যায়নি বলে সরকারকে সংগৃহীত ভান্ডার থেকে খরচ করতে হয়েছে রেশনিং ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য। ফলে, আজ যখন শস্য বাজার থেকে উধাও, দাম ক্রয় ক্ষমতার সীমার বাইরে চলে গেছে, তখন চারদিকে যে অশান্তি দেখা দেবে তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না।

হয়ত এই কারণেই প্রতিদিন আটক করা হচ্ছে ট্রেন চলাচল। বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে কলকাতার সরবরাহ পথগুলো। তেলের সরবরাহ সকল অবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধাবস্থায় সবচাইতে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় তেল সরবরাহের উপর। তেল সরবরাহও বিচ্ছিন্ন করে দেবার চেষ্টা হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলে সংগঠিত করা হচ্ছে গণ-অভিযান, পুলিস থানা ঘেরাও ইত্যাদি। এই গোলযোগের পিছনে দেখা যাবে রাজনৈতিক চেহারায় বিভিন্ন রূপ। মার্কিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি আওয়াজ তুলেছে কেন্দ্রের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে "গণ-আন্দোলন" গড়ে তোলার জন্য। প্রকাশ্যভাবে এটা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পার্টির রাজ্য কমিটির বৈঠকে। এই পার্টির আন্দোলনের একদিকের আক্রমণটা পুলিসের উপর। কারণ, এদের মতে পুলিস কায়েমী স্বার্থ যারা যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন ঘটাবার জন্য ব্যগ্র তাদের শায়েস্তা করার চেষ্টা করছে না। বলা হয়েছে, মূল্যমানের স্থিতি, খাদ্য সংগ্রহ, জমি বণ্টন, উচ্ছেদ প্রতিরোধ সম্পর্কে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত গুলো দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের যোগ-সাজসে বানচাল করার মাধ্যমে এরা রাজনীতিগতভাবে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে হেয় করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। অনুরূপ ভাবেই পুলিস বিভাগের কর্তৃপক্ষ জনগণের সহযোগিতা সংগ্রহ করতে এবং ন্যায্য ও আশু দাবিগুলো আদায়ের জন্য জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

তাই দেখা যাচ্ছে একদিকে যেমন চলেছে গণ-অভিযান খাদ্যের দাবিতে, অপরদিকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিস, পুলিসের ফাঁড়ি ও থানা। রাজ্য কমিটি মনে করে যে, এই দুটি বিভাগের উৎপীড়নের ফলেই কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব হয়েছে; কাজেই এই দুটি বিভাগের কর্মধারা অবিলম্বে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এই পরিবর্তনের দাবিটা প্রত্যক্ষভাবে মুখ্য-মন্ত্রীর কাছে। তাঁর কাছে এই দাবি তুলে ধরার পিছনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে তা অনস্বীকার্য। এই উদ্দেশ্যে পুলিসকে অভিযুক্ত করে বিব্রত করে মুখ্যমন্ত্রীর

জনৈতিক চেহারাটা ভিন্নরূপে জনসমক্ষে ল ধরা। কিন্তু সর্বশেষ উদ্দেশ্য নয়; রণ, এই আন্দোলনের সংগে জুড়ে দেওয়া য়েছে 'পুনর্নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক ভযান'। এই অভিযান চালাবার পক্ষে যুক্তি দেখান হয়েছে তাতে বলা হয়েছেঃ র উদ্দেশ্য হল জনসাধারণের জীবন-ার মানোন্নয়নের জন্য সজীব নীতি সরণ করতে পারে এমন একটি স্থায়ী কার গঠন"।

এই উদ্দেশ্য বর্ণনার থেকে দুটো প্রশ্ন রিত হয়ে ওঠে। এক, যুক্তফ্রন্ট সরকার য়ী সরকার নয় এবং দুই, যুক্তফ্রন্ট কার "মানোন্নয়নের জন্য সজীব নীতি" সরণ করছে না। প্রথম প্রশ্নটা অনুমান তে অসুবিধা হয় না। কারণ যুক্তফ্রন্ট ক কিছু সদস্য বেরিয়ে যাবার পর থেকে ইত্বের সংকটা বার বার দেখা দিয়েছে। , মার্কসিস্ট কম্যুনিস্টদের মতানুসারে দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক স্থা (যেমন, বিধানসভা থেকে পদত্যাগ দি) গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এটা হয়ত ব হতে পারে পুনর্নির্বাচনের মধ্যে। দ্বিতীয় প্রশ্নটাই হয়ত বেশী ত্বপূর্ণ। কারণ, 'মানোন্নয়নের সজীব ি' গ্রহণ করাই যদি পুনর্নির্বাচনের তম উদ্দেশ্য তাহলে এটা যুক্তফ্রন্টের ার স্বীকৃতি বলেই ধরে নিতে হবে। এটা নিশ্চয়ই আত্মসমালোচনার দৃষ্টি বলা হয়নি। হয়ত বলা হয়েছে ষ করে মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য ম্যুনিস্ট দলের মন্ত্রীসদস্যদের শ্যে। তাই গণ-আন্দোলনের একটা এমন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে ন্ত্রীর পুলিস বিভাগের বিরুদ্ধে। শের অত্যাচার নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য কিন্তু তারই ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ লন করে পুলিসকে সক্রিয় করে একটাই উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর যে প্রত্যক্ষ আছে তাকে খর্ব করা, বিকৃত করা।

াই দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েও লনের গতিকে পুলিসের বিরুদ্ধে করা হয়েছে। কিন্তু আরও একটা লন দেখা দিয়েছে। সেটা কেবল-মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেই নয়, সমগ্রভাবে ট সরকারের বিরুদ্ধে। এই লনটাই রূপ নিয়েছে পথ অবরোধ ট্রেন আটকের মধ্যে। এই আন্দোলন ধীরে কলকাতার জীবনকে পংগু দেবার চেষ্টা করছে। ট্রেন আটকের প্রতিদিন বহু যাত্রী কলকাতায় পারছে না। ফলে, বহু অফিসের র্ম শ্লথ হয়ে পড়ছে। পথ অবরোধের ফলে আসতে পারছে না, কলকাতার জীবনে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। যেটুকু আসছে, তা-ও চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। প্রত্যক্ষ-ভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছে। এটা অনুভব করেই হয়ত মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, এই আন্দোলন কংগ্রেস এবং যুক্তফ্রন্টের কয়েকটি অ-কম্যুনিস্ট দলের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট সদস্যরা এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে নিগৃহীতও হয়েছে। তাই অনেকের অনুমান, হয়ত মার্কসিস্ট কম্যুনিস্টদের অভিযোগ নিতান্ত অমূলক নয়। কিংবা হয়ত উগ্রপন্থীরাও এর সুযোগ নিয়েছে, জড়িয়ে পড়েছে।

এই বিভিন্ন প্রকৃতির আন্দোলনের ভিতর থেকে যে রাজনৈতিক চেহারাটা ফুটে উঠেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই এই ভিন্ন প্রকৃতির আন্দোলনের মধ্যে ফুটে উঠেছে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বিভিন্ন দলের মধ্যে। এই দ্বন্দ্ব নিছক কম্যুনিস্ট এবং কংগ্রেসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিকরাও এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। হয়ত এই আন্দোলন-গুলোই এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে এত তীব্র করে তোলেনি। অন্যান্য কারণও নিশ্চয় আছে। যেমন, দেখা যাচ্ছে ভূমি আন্দোলনের মধ্যে। চব্বিশ পরগনা এবং অন্যান্য কয়েকটি জেলায় যে ধরনের কৃষক আন্দোলন দেখা গিয়েছে তা আগে কখনও দেখা যায়নি। এই আন্দোলনকে নিছক জমি দখলের আন্দোলন বললে হয়ত একে লঘু করে দেওয়া হবে। কারণ, এটা আর অবিদিত নেই যে, পশ্চিমবাংলার বহুক্ষেত্রে কৃষি জমি সরকারের হাতে যা আসা উচিত ছিল তা আসেনি। নানাভাবে এই সব জমি গোপন করে রাখা হয়েছিল। বহু ক্ষেত্রে কৃষি জমিকে ভিন্নরূপে দেখান হয়েছে, এবং সে-সব জমি থেকে কৃষকের উচ্ছেদ রোধ করা কখনও সম্ভব হয়নি। জমি সম্বন্ধে বহু বে-আইনী কাজ যে হয়েছে সেটা অনস্বীকার্য। হয়ত সে কারণেই এবারের কৃষক আন্দোলন বিভিন্ন জায়গায় এত জোরদার করে তোলা হয়েছিল। সফল যে হয়নি এটা বলা যায় না। এবং ভূমি রাজস্বমন্ত্রীর মতে, আইনের বিধান লংঘন করার বিরুদ্ধেই এই আন্দোলন তীব্র করা হয়েছিল।

হয়ত তাই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এই আন্দোলনের ফলেও কিছু কিছু রাজনৈতিক দল যুক্তফ্রন্টের মধ্যে থেকেও সরকারী নীতির বিরোধিতা করার জন্য সংগঠিত হয়েছে। এই বিরোধিতা প্রত্যক্ষভাবে কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে। কিন্তু রাজনৈতিক-ভাবে, এই আন্দোলন-বিরোধী আন্দোলন বা সংগঠন পরোক্ষভাবে দুই কম্যুনিস্ট পার্টি, আর-এস-পি এবং এস-ইউ-সির বিরুদ্ধে। কারণ, এই চারটি দলই বর্তমান কৃষক আন্দোলনের সংগে সংযুক্ত।

এই সব দলের বিরোধী দলরাও যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমর্থক এবং মন্ত্রীসভার সংগে সংযুক্ত। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তফ্রন্টের ভিতরে এই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অযৌক্তিক মনে হতে পারে; কিন্তু নানা কারণে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে এই অন্তর্বিরোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। এ সম্বন্ধে কম্যুনিস্ট পার্টি এবং দলের সদস্যরা যাঁরা মন্ত্রিসভায় আছেন, তাঁদের কোন দায়িত্ব বা হাত নেই একথা গ্রহণযোগ্য নয়। বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে এই রাজনৈতিক বিবাদ তীব্র হবার সুযোগ পেয়েছে।

সুযোগ পেয়েছে বলেই আজ জনসমক্ষে যুক্তফ্রন্টের সংঘবদ্ধতা বিশৃংখলার আকারে দেখা দিয়েছে। এই বিশৃংখলা প্রশমিত করার কোন প্রচেষ্টা কোনপক্ষ থেকেই করা হয়নি। তাই মন্ত্রিসভার ভিতরের বিরোধ বাইরে এমন স্থূলভাবে প্রচারিত হচ্ছে। তাই মন্ত্রিসভাকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে ভোটের মাধ্যমে। ভারতীয় সংবিধানেই নয়, গণতান্ত্রিক সংবিধানমাত্রই এটা স্বীকার করে নিয়েছে যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত মন্ত্রিসভার দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে যৌথ দায়িত্ব। মন্ত্রিসভার এই যৌথ দায়িত্ব গণতান্ত্রিক কাঠামোয় স্বীকৃত বলেই সরকারী কাঠামোকে উচ্ছৃংখলতার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়। মন্ত্রীরা যেমন নিজ নিজ দপ্তরের কার্য পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করে, মন্ত্রিসভা তেমনি সমগ্রভাবে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেয়।

সরকারী কর্মচারীদের জন্য পে কমিশন গঠন এবং তার সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার দায়িত্ব সমগ্রভাবে সরকারের। তাই মন্ত্রিসভাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সম্পর্কে। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত যদি ভোটের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহলে তার মধ্যে বিরোধিতার অংশটুকুও থেকে যায়। সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। মন্ত্রিসভার অধিবেশনের পরে শ্রীবসু বলেছেন, পে-কমিশন সম্বন্ধে তাঁর বিভাগের আর কোন দায়দায়িত্ব নেই। এটা কোন সরকারের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু এই নীতির কথা অনুল্লেখ রাখলে রাজনীতির কথা এসে পড়ে। সংবিধানের কথা এসে পড়ে। সেদিক থেকে বিচার করলে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তকে বর্তমান রাজনৈতিক প্রকৃতির প্রতিকৃতি বলা যায়। বাইরের দ্বন্দ্বটা ভিতরে এসে ফুটে উঠেছে। নিঃসন্দেহে এটা অসহনীয় অবস্থা। জনজীবনের বিপর্যয়ের গোড়ার কথা।

কমিশন গঠন প্রসঙ্গে অজয়বাবুর কাছে
জ্যোতি বসুর নতি স্বীকার
কাগুজে বাঘ!
একটি মাত্র ভোটের জোরে
গুজরাট বিধান সভায়
কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায়।
বাঁচাও, আমায় বাঁচাও!!
অ-কংগ্রেসী রাজ্যে সংযুক্ত দলগুলিতে
ফাটল দেখা দিয়েছে।
আজকালকার দিনে
দলে বড্ড বেশী
ভেজাল।
BIHAR DAL
PUNJAB DAL
MP DAL
UP DAL
HARYANA DAL
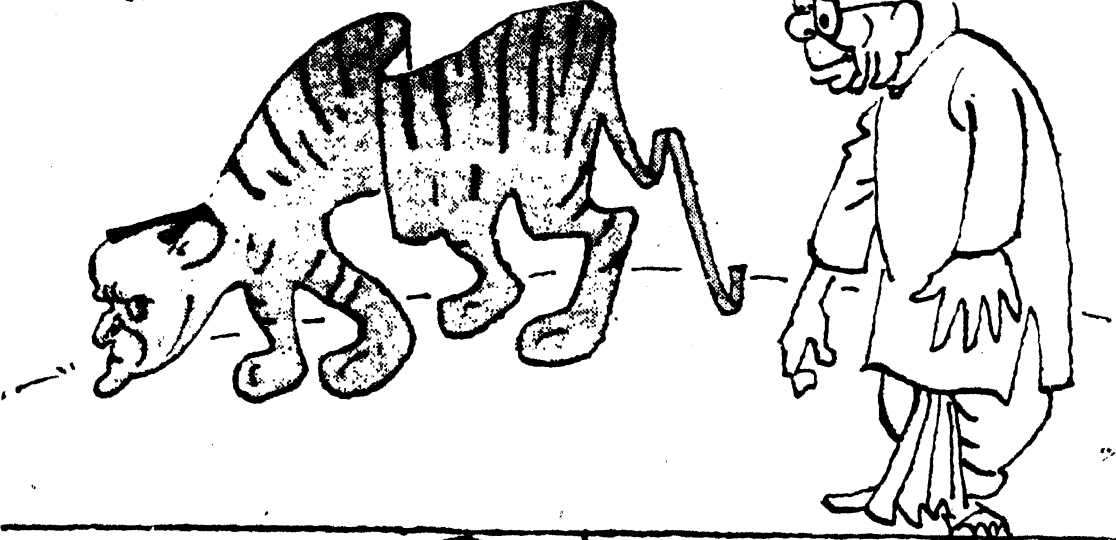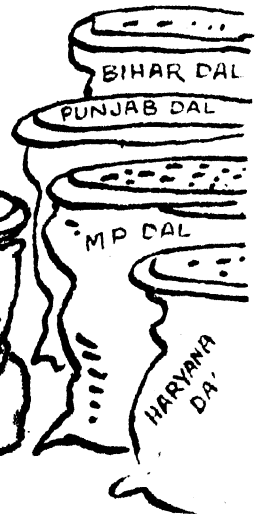
দুঃসময়

বছরের এই সময়টা বড় রকম যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয়ের পক্ষে প্রশস্ত। অন্তত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে মোটামুটি হিসাব তাই। ভিয়েতনামে লড়াই-এর পাল্লা আরও এক ধাপ উঁচুতে উঠল। উত্তর ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ-সড়ক মার্কিন বোমাবর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যুদ্ধের একটা বাহু এখন চীন-সীমান্তের দশ মাইলের কাছাকাছি। তার চেয়ে বড় কথা, রাশিয়া এবং চীন থেকে উত্তর ভিয়েতনামে স্থলপথে সামরিক রসদ-পত্র সরবরাহের রাস্তা মার্কিন বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত হল। ভিয়েতনামের যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসনের উপর মার্কিন কংগ্রেস সম্প্রতি চাপ বাড়িয়েছেন। অতএব উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণের এই পরিধি-বিস্তার। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডীন রাস্ক এর আগে বলে রেখেছেন, উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করটা ভাল দেখায় না, কারণ তাতে বৃথা নিন্দার বোঝা বাড়ানো। তা ছাড়া আজকাল রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা কোন্ দেশ বা করে? যুদ্ধটা যখন জ্বলন্ত সত্য তখন সেটা ঘোষণার দরকারই বা কী? এখন চীন কী করবে, রাশিয়া কী করতে পারে, এসব প্রশ্ন নিয়ে জল্পনা-কল্পনা, সন্দেহ নাই, আরও প্রখর হবে।

কোরিয়ার যুদ্ধের সঙ্গে ভিয়েতনামের যুদ্ধের এই পর্বের বিস্তর তফাৎ। কোরিয়ার যুদ্ধ চলবার সময় চীন স্পষ্ট জানিয়ে রেখেছিল মার্কিন বাহিনী ইয়ালু নদী পেরিয়ে চীন-সীমান্তের কাছাকাছি এলে চীন চুপ করে থাকবে না। থাকেও নি, কোরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে চীনা কম্যুনিস্ট "স্বেচ্ছা"-সৈন্যরা বন্যার মত নেমে এসেছিল। কিন্তু তখন রাশিয়ায় স্টালিন সর্বেসর্বা। রাশিয়ার ক্রুশ্চেভ আর চীনের "ক্রুশ্চেভ" নিয়ে রুশ-চীন সম্পর্কে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধেনি। এখন দুই কম্যুনিস্ট শরিকের মধ্যে একেবারে ছাড়াছাড়ি, প্রায় যুদ্ধাবস্থা। রাশিয়ার জাহাজ চীনের বন্দরে আটক হয়েছিল ঠিক সেই সময়ে যখন কি না উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণের পাল্লা আরও সম্প্রসারিত। হ্যানয়ের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ-সড়ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে স্থলপথে উত্তর ভিয়েতনামকে সাহায্য করা এখন অসম্ভব মনে হচ্ছে। জলপথে হাইফং বন্দরে রুশ-জাহাজের আসা-যাওয়াও সহজ হতে পারে না, চীনের বন্দরে রুশ জাহাজ যদি বারবার মার খায়।

চীনের ঘরোয়া যুদ্ধ কোথায় পৌঁছেচে সেটাই রুশ-চীন-ভিয়েতনাম সপর্কে দুরূহ প্রশ্ন। মাও-পন্থী "সাংস্কৃতিক বিপ্লব" চীনের জনজীবনে, রাজনৈতিক এবং সামরিক নেতত্বেও ফাটল সৃষ্টি করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বর্ষ-পূর্তি এই আগস্ট মাসে। মাও-এর পুরনো সহকর্মী প্রথম সারির কম্যুনিস্ট নেতারা, যেমন লিউ শাও চি, তেংসিয়াও পিং, তাও চু, এ'রা মাও-ভক্তদের ঠেলায় পর্দার আড়ালে গেলেও হতবীর্য হননি। উহানে লাল-ফৌজের আঞ্চলিক অধিকর্তা চেন যাই তাও-এর বিদ্রোহ মাও-এর দলবলের পক্ষে বিপত্তি-সূচক। চেন যাই তাও "লং মারচ" আমলের নেতা, লিউ শাও চি, তেং সিয়াও পিং-এর প্রতি অনুরাগী। লাল ফৌজের মধ্যেই মাও-পন্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রবল হয়েছে মনে করা যায়; যে কারণে বৃদ্ধ মার্শাল চু তে-কে মাও সে-তুং আবার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে বাধ্য হয়েছেন। চীনের বড় বড় শহরে, অনেকগুলি শিল্প-সমৃদ্ধ অঞ্চলে মাও-বাদীদের বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভ প্রবল। একদলীয় রাষ্ট্রের চূড়ায় অবতার-সদৃশ মহানায়কের প্রতিপত্তি যতই হোক, দলীয় সংগঠন ছাড়া মহানায়কের হুকুমমত ঠিকমত কাজে লাগাতে পারা কঠিন। সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টি ছিল স্টালিনের শক্ত হাতের মুঠোয়। চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির উপর মাও সে-তুং-এর দখল এখন খুবই অনিশ্চিত।

গৃহযুদ্ধ বিস্তৃত হলে কোন্ পক্ষ জিতবে মাও-পন্থীরা, না মাও-বিরোধীরা, তার কোন স্থিরতা নেই। এর মধ্যে তাইওয়ান থেকে তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাবও ঘটতে পারে। সারা চীনের উপর কেন্দ্রীয় শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল কম্যুনিস্টরাই। সে কর্তৃত্বে ভাঙনের লক্ষণ এখন স্পষ্ট। বলশেভিক বিপ্লবের পর প্রথম পর্বে রাশিয়াতেও গৃহযুদ্ধ চলেছিল, কিন্তু সে গৃহযুদ্ধ বলশেভিকদের সঙ্গে বলশেভিক-বিরোধীদের। চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও পার্টিকে ভাঙতে আসরে নামিয়েছেন লাল রক্ষী ছোকরাদের। মাও-এর প্রধান পাণ্ডারা পর্যন্ত এখন এই "সাংস্কৃতিক" যোদ্ধাদের সামাল দিতে পারছেন না। শেষ রক্ষার চেষ্টায় মাও হয় তো ঘরের গোলমাল ঘুরিয়ে বাইরে ঠেলে দিতে পারেন—"মুক্তি যুদ্ধের" ধুয়া তুলে। তবু বুঝতে পারা শক্ত সারা পৃথিবীর অকম্যুনিস্ট, কম্যুনিস্ট প্রায় সব দেশের সঙ্গে শত্রুতা বাড়িয়ে মাও-পন্থীরা কী করে "মুক্তিযুদ্ধ" সত্যিই চালাতে পারে।

চীনের ভিতরে এত গোলমাল, তবু সে পারমাণবিক বোমা তৈরী করছে, মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ভারত মহাসাগরের দিকে ছাড়বার তোড়জোড় চালাচ্ছে; এ সব দেখে কোন কোন মহল সহজেই ধরে নিতে চান, চীনের গৃহ-বিরোধ তেমন কিছু গুরুতর নয়, তা না হলে পারমাণবিক অস্ত্র-সামর্থ্যে চীন এগিয়ে যাচ্ছে কী করে? স্টালিনের রাশিয়া সম্পর্কেও এক সময় ওই রকম সংশয় ও জিজ্ঞাসা অনেকের মনে ছিল। একনায়ক-তন্ত্রে সামরিক সামর্থ্যের উপর আস্থা অসাধারণ। রাজনীতিক, শিল্পী-সাহিত্যিক এবং সাধারণ মানুষকে স্টালিন প্রচণ্ডভাবে নির্যাতন করেছেন। বিজ্ঞানীদের, বিশেষ করে যন্ত্রবিদ কারিগরী বিজ্ঞানীদের, স্বচ্ছন্দে কাজকর্ম চালানোর সুযোগ স্টালিন বড় একটা খর্ব করেননি। সোভিয়েট বিজ্ঞান হয়েছিল প্রতিভাবানদের নিরাপদ আশ্রয়। স্পুটনিকের যুগান্তকারী আবির্ভাব ক্রুশ্চেভের আমলে, কিন্তু স্টালিনের প্রচণ্ড সন্ত্রাসের আবহাওয়ার মধ্যে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফল এটি। পরমাণু বিজ্ঞানে, ক্ষেপণাস্ত্র তৈরীতে চীনের অগ্রগতিও অনেকটা এইভাবে সম্ভব হয়েছে। মাও-এর সর্বসিদ্ধিদাতা লাল-কেতাব চীনা বিজ্ঞানীরা হয় তো পকেটে রাখেন নিরাপত্তার জন্য; পারমাণবিক গবেষণায় অবশ্যই মাও-চিন্তা-সূত্র শরণ করেন না।

চীনের গৃহ-বিরোধ আর সোভিয়েটের সঙ্গে রেষারেষি ভিয়েতনাম যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করবে অনেকখানি। ভিয়েতনামের যুদ্ধে চীন প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেবে না, প্রেসিডেন্ট জনসন নাকি সেরকম আশ্বাস পেয়েছেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন তো ভিয়েতনাম যুদ্ধের আপস-নিষ্পত্তির পক্ষপাতী, কিন্তু সেটা স্পষ্ট স্বীকার করলে প্রতিপত্তি হানি, পিকিং-এর গঞ্জনায় ভয়। অথচ চীনের সহযোগিতা ছাড়া উত্তর ভিয়েত-নামের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া রাশিয়ার দিক থেকে অন্তত ভৌগোলিক কারণেই অসম্ভব। তবু মনে রাখা ভালো বছরের এই সময়টা অগ্নিগর্ভ।

১৪।৮।৬৭

অবান্তর

সরোজ আচার্য

সবাই অস্থাবর,
এই দেহ, মন,
চেনা মুখ, ভালো লাগা, ভালোবাসা,
হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ,
অথবা বিয়োগ,
পর্বে পর্বে স্তম্ভিত কৌতুক,
ভুলে যাওয়া, ফিরে পাওয়া,
টান-টান বুক-ভরা আশা,
কালের তরঙ্গভঙ্গে ওঠা-নামা, ঊর্ধ্বশ্বাস যত দুঃখ-সুখ,
বয়সের বাঁকে বাঁকে খসে-পড়া,
ফেলে-আসা
ঝিমন্ত ভাবনা,
মোম-গলা বিস্মৃতির শুভ্র আস্তরণে
অসামান্য দেনা—
সবই অবান্তর।
বিশ্বাসে না মিলয়ে আশ্বাস
নব নব আলোকের দেশে।
কারণ সে-আত্মার আশ্রয় দীর্ণ,
ছিন্ন দগ্ধ ভস্ম নির্বিশেষে।

জামশেদপুরে : দি রিভার্‌স্‌ মীট

উমা দেবী

সন্ধ্যাবেলা—সারাক্ষণ বৃষ্টিঝরা দিন।
একটু আগে ছিল এক অবসন্ন বিষণ্ন বৈকাল।
"বিশালঃ শাল্মলী তরুঃ" বলতে পারি যাকে
এই যে চৌদিকে দীর্ঘ ঋজু বৃক্ষবীথী—
কে জানে কী নাম তার!! বিভূতিভূষণ
হয়তো ওদের নাম বলতেও পারতেন।
কিংবা বাণভট্ট কবি—অরণ্যের অমিত উদা
প্রশ্নয়ে বর্দ্ধিত যাঁর মন।
জানতেন সমস্ত দীর্ঘ বৃক্ষের নিবাস
নাম গোত্র পতন স্খলন
কুলজি আর পংক্তির সম্মান।
আমার নিকটে এরা এক বস্তু—
শাখা-কান্ড-পত্র-পুষ্প-পল্লব-সম্ভারে।
এরা সকলেই বৃষ্টি-পতনের তালে
নামিয়ে মাথার টুপি—শাখার ঝুরির যষ্টি
বিধিমতে নমস্কার ক'রে
আমাকেও জানালো সম্মান—
অভিবাসনের ছলে—পবন প্রহত হয়ে।
—"এটা হচ্ছে দুই নদীর সঙ্গমের স্থল—
'দি রিভারস্‌ মীট্‌' যার নাম"—
হাওয়ারা জানালো নাম—ফিস্‌ফিসিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে।
—"কোথা থেকে আসে?"
—"জানা নেই ভৌগোলিক বিবরণ তার।"
তবু তারা আসে—মানুষেরা আসবার আগেই—
ঐতিহ্য সভ্যতা ভদ্র সৌজন্যের বালাই ফেলেই-
টলটলে স্রোতের দুই ধারার আবেগে।
—"দু' ধারা কি এক হয়? কিংবা, মিলে গিয়ে—
আবার দু'পথে চলে?"—
এ সব জিজ্ঞাসা—মনে মনে ওঠবার আগেই
বৃষ্টি নামে জোরে।
ধোঁয়ার মতন এক পাঠি যে নামায়
তার নাম—ঋষিরা গেছেন বলে—"প্রাক্তনের কর্মফল?'
নদীরা মিলিয়ে যায়—
তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে বালির স্তূপেই
পা হড়কে পতন হয়।
—"কোথায়—কোথায়?"—
চৌদিকে চকচকে চোখে দীপ্তি হানে।
আমি বলি—"এ প্রশ্নের প্রয়োজনই নেই।
পতন—পতন মাত্র—পদস্খলন
হোক না তা গুহা-অন্ধকারে—
কিংবা কোনো পরিচ্ছন্ন সূর্যালোকে।
হয়তো বা আমার পতন—নিবিড় বোধের তলে,
অন্ধকারে গুহায় যেখানে
দু' নদীর প্রাণ কাঁদে।"
সারাক্ষণ বৃষ্টি-ঝরা দিন,
এই একটু আগেও ছিল অবসন্ন বিষণ্ন বৈকাল।
দুই নদী মেলেনি কখনো—
ইতিহাসে নেই সে নজির।
আত্মার বধূরা যত ফিরে যাও—
এসো না এ সঙ্গমের তীরে।
মিথ্যেই এখানে আসা—ভরা ঘট খালি করে-
ঘট ভরে নিতে—ঐতিহ্য যেখানে পলাতক।

সুনন্দর জার্নাল

'চল্লিশোর্ধ্বের একটি ট্র্যাজিডী'

পরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বার বার মনে হচ্ছিল, কাথায় যেন কী একটা ঘটেছে; অর্থাৎ তিনি ত্নিই বটে, অথচ ঠিক তিনি নন। বার য়েক সন্দিগ্ধভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে ষ পর্যন্ত বলে ফেললুম, 'আপনি াথাও একটু বদলেছেন বলে মনে হচ্ছে।'

তিনি উত্তরে মিটমিট করে হাসলেন।

'বদলেছি নাকি?'

'সেইরকমই সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু ঠিক তে পারছি না।'

এবার হাসিটা তাঁর সশব্দ হল। তিনি ক খিক করে আওয়াজ তুললেন একটু।

'কী ব্যাপারটা বলুন তো?'

আবার সেই রহস্যময় হাসি।

আমি খুব মনোযোগ দিয়ে তাঁকে র্যবেক্ষণ করতে লাগলুম। বেশ চকচকে ণ মুখ, এইমাত্র দাড়ি কামিয়ে এসেছেন ল বোধ হচ্ছে—কানের পাশে একটু াও লেগে আছে যেন—হ্যাঁ, ধরেছি!

আবিষ্কারের আনন্দে চকিত হয়ে আমি লুম, 'গোঁফ ফেলে দিয়েছেন—তাই না?'

তাঁর মুখে এবার মহিলাসুলভ একটি বিড় ব্রীড়া প্রকাশ পেলো। রুমাল বের র একবার মুখটা মুছে ফেললেন—যেন ম্ফবিনির্মুক্ত ওষ্ঠটিকে একটু আড়াল র নিতে চাইলেন।

আমি বললুম, 'ফেললেন কেন হঠাৎ? ণ তো ছিল।'

ছটফট করে উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক লেন, 'একটু কাজ আছে, আজ আসি।'

এই লোকটিকে অন্তত পনেরো বছর দেখে আসছি—বেশ বাক্পটু, চলতি লায় যাকে বলে মুখফোড়। সাহিত্য-নীতি-সিনেমা-সমাজ এবং পরচর্চায় দা উৎসাহী—খুব কঠিন কঠিন বিদ্রূপ ত্তে পারেন—অন্যের ঠাট্টায় কখনো তাঁকে একবিন্দু বিচলিত হতে দেখা যায়নি। কিন্তু গোঁফ কামানোর প্রসঙ্গে তিনি এমন-ভাবেই পালালেন যে দাদুর রসিকতায় পলাতকা কিশোরীর কথা আমার মনে পড়ে গেল। সন্দেহ নেই—আপাতত খুব ভাল্‌নারেবল্ হয়ে পড়েছেন।

কী কারণ? কেন তাঁর এই চিত্ত-বিকার? এবং তাঁর সেই চমৎকার গোঁফটি —অনতিলম্বিত অথচ দু'পাশে বেশ সুন্দর করে পাকানো, অতি যত্নে ছাঁটাই করা—সেটিকে অকস্মাৎ তিনি সমূলে উপড়ে ফেললেন কেন? নতুন করে কারো প্রেমে-ট্রেমে পড়লেন নাকি? ভাবতেই আমি মনে মনে জিভ কাটলুম। আরে রামো—রামো, এই বয়েসে? আর তা ছাড়া অতি পত্নী-বৎসল লোক তিনি—তাঁর সম্পর্কে এরকম চিন্তা করাই পাপ।

তৎক্ষণাৎ একটি দৈবী-প্রেরণায় আমার চিত্ত উদ্ভাসিত হল। বুঝেছি—গোঁফ পাকতে শুরু করেছিল। দু-চারটে মধ্যে মধ্যে টেনে তুললেও সেই স্বাভাবিক বিপর্যয় রোধ করা যায়নি; শেষকালে যখন সেই দুর্জয় শুভ্রতা ল্যানড্-স্লাইডের মতো নেমে এসেছে, তখন একেবারে ঝাড়ে-বংশে নির্মূল করা ছাড়া উপায় ছিল না।

অনুষঙ্গের সুতোয় টান পড়তে লাগল—চোখের সামনে দেখা দিতে লাগলেন তিনি, উনি, ইনি এবং আরো অনেকে। এরা প্রত্যেকেই সগুম্ফ ছিলেন, কিন্তু কেউ চল্লিশ, কেউ পঁয়তাল্লিশ আবার কেউ বা পঞ্চাশ পেরিয়ে এক নির্গোঁফ প্রশান্তিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। গোঁফ বিদায় করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ব্যক্তিত্ব হারিয়েছেন—কিন্তু একেবারে মুখের ওপর বার্ধক্যের জয়ধ্বজা তুলে ঘুরে বেড়াতে কারই বা ভালো লাগে? হলই বা কিঞ্চিৎ ব্যক্তিত্বের অপঘাত, কিন্তু একেবারে নিজেরই নাকের সামনে জরার কেতন উড়তে থাকবে—এই ট্র্যাজিডীই কি সহ্য করা যায়?

চুলের জন্যে কলপ আছে, দু-চারটিতে পাক ধরলে ছেলেমেয়েদের ঘুষ দিয়েও তাদের উৎপাটিত করা চলে। তা ছাড়া এরকম আশা রাখা যায় যে কালো চুলের নিবিড় বিন্যাসের ভেতর এক-আধটা 'ব্ল্যাক-শীপ' (থুড়ি—'হোয়াইট শীপ') কারো নজরে না পড়লেও পড়তে পারে। কিন্তু গোঁফ? একালের গোঁফ তো প্রাচীনদের মতো সুবৃহৎ স্থূলতায় বিকশিত নয়—তা সংক্ষিপ্ত এবং সুমার্জিত। সেখানে পাক ধরলে আর উপায় নেই। একেবারে সমূলে সংহার করতে হয়।

অথচ শিশুকালে এই গোঁফের জন্যে কী আকুলতায় অন্তর ভরে থাকে! গোঁফ ওঠার মানেই হল পৌরুষের প্রথম স্বীকৃতি —তখন পথে অচেনা লোকে আর 'খোকা' বলে ডাকে না—'আপনি' বলে সম্বোধন করে। তখন স্কুল ছাড়িয়ে কলেজে পা পড়ে, একা খেলা দেখবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখবার অনুমতি পাওয়া যায়, আলমারি থেকে উপন্যাস বের করে নিলে বাবা একবার আড়চোখে চেয়ে দেখেন মাত্র। সেই স্বর্ণদিনের জন্যে কী কাতর-ভাবেই না আমরা প্রতীক্ষা করতে থাকি! কালি দিয়ে নিজের মুখে গোঁফ এঁকে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াই—মনে হয় বেশ ভালো দেখাচ্ছে। এমন কি, গুম্ফলাভের আকাঙ্ক্ষা কখনো কখনো অবোধ বালিকা-দের মধ্যে পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়ে যায়। আমার একটি পাঁচ বছরের মেয়ের কথা মনে পড়ছে। সে বাড়ির নিড়াল-শিশুটির দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার বান্ধবীকে বলেছিল, 'দ্যাখ্—বাচ্চাটা আমার চেয়ে কত ছোট, এই তো সেদিন জন্মেছে, অথচ কত বড়ো বড়ো গোঁফ ওর মুখে। আর আমার এখনো একটাও গজালো না।'

একদিন যা এত বাঞ্ছিত, চল্লিশোর্ধ্বে সে কী নিদারুণ বিশ্বাসঘাতক! এমন কি, চুল ধূসর হওয়ার আগেই সে পাকতে আরম্ভ করে। রবীন্দ্রনাথের রসিক অবশ্য এর একটা চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন, 'কারো কারো মাথা পাকবার আগেই মুখটা পাকে।' উইট-টা ভালো, কিন্তু মন তাতে সান্ত্বনা পায় না।

তা হলে—বহুদিনের, বহু সমাদরের গোঁফটিকে একদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বর্জন করতে হয় মাত্র একটি কারণেই। সেই কারণটি চিরন্তন। বিলীয়মান যৌবনকে আঁকড়ে রাখবার সকরুণ সাধনা। কায়াকল্প এবং কলপ, ভেরোনফস্ গ্ল্যান্ড আর

গোঁপের আমি গোঁপের তুমি গোঁপ দিয়ে যায় চেনা

লোভো-ভিটা টনিক। সব কটি রাস্তা এক রোমের অভিমুখেই প্রসারিত।

কী লাভ, এ প্রশ্ন তোলাই অর্থহীন। লটারীর টিকেট কিনে কী লাভ হয়? দশ লাখের মধ্যে একজনের অন্তত কপাল ফেরে। চল্লিশ পেরিয়ে গিয়ে—নির্গোঁফ হয়ে—লাখের একজনও যদি আবার তরুণের দলে ভিড়ে পড়তে পারেন, তবে না মন্দ কী? আর সেই একজন যে আপনি আমি হবো না—এ কথাই বা জোর করে কে বলবে?

আমার ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী উপন্যাসের নায়কদের কথা মনে পড়ছে। অতীতে যেমন ঘন চাপদাড়ি ছাড়া কলোনিস্ট ইংরেজকে ভাবা যেত না, তেমনি সেদিনের নির্গোঁফ ফরাসী হিরোও কল্পনাতীত ছিলেন। জানতে ইচ্ছে করছে, সেই নায়কেরা কি চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ পেরুলেই গোঁফ ফেলে দিতেন?

সাহিত্যে ও জীবনে কাহিনী

হিত্যে ও জীবনে কাহিনীর স্থান ঃ বিচারের বিষয়টিকে অন্যভাবে বলা —কাহিনীর দার্শনিক নির্ণয়। আর্ট তথা কলার দর্শন আছে, ইতিহাসের দর্শন ছে, সামাজিক জীবনের সংস্কার ও তিরও দর্শন আছে। তেমনই কাহিনীরও কোন দর্শন থাকতে পারে? প্রশ্নটি নতুন কিছু নয়। কিন্তু একথাও বলা না যে, প্রশ্নটি প্রাচীনকালের চিন্তা ও ধার কাছে যথাযোগ্য স্বীকৃতি পেয়ে-। ভারতের বিখ্যাত পঞ্চতন্ত্র ও তারই গামী হিতোপদেশ, উভয়ই কথাশিল্পে ভারতীয় কৃতিত্বের বিস্ময়কর র্শন। কাহিনীর মনোরম সৌষ্ঠবের ক প্রকরণ এই পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ লেরই সুধীজনের বিচারে নীতিশাস্ত্র পেয়েছিল। কাহিনীর রচয়িতা যিনি, নিজেও বলেছেন যে, তিনি নীতি- রচনা করেছেন। বস্তুতে অসুবিধে এবং ধারণা করলেও ভুল হবে না যে, ত্র প্রাচীনের ওই অভিমত এক বে ও সামান্যভাবে কাহিনীর নিক বিচারের মন্তব্য। হতে পারে, নীকারের মন মানবীয় জীবনের একটি ক অবয়বের রূপ কল্পনা করে তারই য় বিচিত্র ঘটনার আভরণে সাজিয়ে লোকমানসের হিতার্থে ও শিক্ষার পরিবেশন করেছেন। যদি তাই হবে তবে এই সত্যও স্বীকার করতে হবে নীতির বোধ এবং তত্ত্বের প্রচার ীয় জীবনের যে প্রয়োজনে যে-কাজ চায়, কাহিনীও ঠিক সেই প্রয়োজনে কাজ করতে পারে। প্রাচীন চিন্তার ীর দার্শনিক নির্ণয়ের অথবা নর যে-প্রমাণ পাওয়া যায়, সেটা ত উপলব্ধির ঘটনা নয়, সংকেত মাত্র। অভিযোগ আছে, প্রাচীন মনীষার হল ও জিজ্ঞাসার কাছে কাহিনীর ক নির্ণয় ঠিক সে-রকম বিচারের হয়ে ওঠেনি, যে-রকম বিচারের বিষয় ভাবজীবনের অন্য অনেক সৃষ্টি। নয়, যেখানে গান, সেখানে আমি -সঙ্গীতের উদ্দেশে ভগবান বিকরে হেন অভ্যর্থনার বাণীও ধ্বনিত । অন্য রম্যকলার সম্পর্কেও দার্শনিক বিচারের ও সন্ধানের অনেক নিষ্ঠা ও অনেক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যের ছন্দ রস ও অলংকার নিয়ে যে শাস্ত্র গড়ে উঠেছে, তাকে কাব্যের দার্শনিক নির্ণয়ের একটি সার্থক প্রয়াস বলা যায়।

কিন্তু কাহিনীরও কি ছন্দ রস ও অলংকার নেই? প্রাচীন জিজ্ঞাসুর মনে এই প্রশ্ন অথবা এ রকমের কোন প্রশ্ন কি কোন বৃহৎ আগ্রহ কিংবা একটি উদার সন্দেহও জাগিয়ে তুলেছিল? প্রমাণ পাওয়া যায় না বলেই ধারণা করতে হয় যে, প্রাচীন বিদগ্ধ-চিত্তের আসরে এ-রকম কোন প্রশ্ন কখনও তর্ক ও আলোচনার প্রশস্ত সমাদর পায়নি। হতে পারে, প্রশ্নটি অবান্তর কৌতূহলের মত নেপথ্যের আড়ালে থেকে ও উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে তর্ক-বিচারের বড় আসরের দিকে কচিৎ কখনও তাকিয়েছে, কিন্তু কাছে এগিয়ে যায়নি। কাহিনীর কাল্পনিক রূপের কাহিনীর নাটকীয় রূপের দার্শনিক বিচার অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু সে-সব বিচার ঠিক কাহিনীর দার্শনিক বিচার নয়। ফুলের একান্ত আপন রূপটির হেতু ও উদ্ভবের গূঢ় রহস্যের বিচার নয়, মাল্যশোভার বিচার। কাহিনীর বিশেষ বিশেষ প্রকারের বিচার। অথচ কোন সন্দেহ নেই যে, কাহিনীর একটি একান্ত-আপন পরিচয় আছে, তার আত্মিক পরিচয়।

কাহিনীর দার্শনিক নির্ণয় সম্বন্ধে প্রাচীন চিন্তার সবচেয়ে স্পষ্ট উপলব্ধির কথা বলে স্বীকৃত ও অভিনন্দিত হতে পারে, এমন একটি উক্তির সাক্ষাৎ মহাভারতে পাওয়া যায়। মহাভারতের ভূমিকায় ব্যাস-দেব ব্রহ্মার কাছে নিবেদন করেছেন—আমি অনেক কিছুই বর্ণনা করবো কিন্তু সব বর্ণনার মধ্যে শুধু সেই একটি বস্তুকেই প্রতিপাদিত করবো, যে বস্তু সকলের মধ্যে নিহিত আছে—যত্তু সর্বগতং বস্তু তচ্চৈব প্রতিপাদিতম্। পাঠভেদে উল্লেখ আছে— —যচ্চৈব সর্বগং বস্তু তচ্চৈব প্রতি-পাদিতম্। ব্যাসদেবের বক্তব্য ঃ তিনি যে জাতিবিশেষ ও লোকযাত্রা বিধান বর্ণনা করেছেন, শাস্ত্র ও ভাগবত তত্ত্বের বর্ণনা করেছেন, চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্র গ্রাম-নগর ও নদী-পর্বতের বর্ণনা করেছেন, মৃত্যু জরা ব্যাধি ভাব ও অভাবের বর্ণনা করেছেন, সবই একটি পরম বস্তুর সন্ধান।

কবি আরেস্টোফানিসের একটি নাটকে* ইউরিপিডিসকে জিজ্ঞাসা করেছেন ইসকাইলাস—অনুরোধ করি, বলুন আমাকে, কবি তাঁর কোন্ বিশেষ গুণের কারণে প্রশস্তি দাবি করতে পারেন? বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায়, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য এই রকমের, কিন্তু আরও বড় জিজ্ঞাসার একটি অর্থগূঢ় উত্তর মৈত্রেয়ীকে শোনাচ্ছেন। জাগতিক কোন বিত্ত ও বস্তু তাদের বিত্ততা অথবা বস্তুতার জন্য প্রিয় হয় না; আত্মনস্তু কামায়, আত্মার কামনার জন্যই প্রিয় হয়ে থাকে।

গ্রীক প্রশ্নটির বয়স প্রায় আড়াই হাজার বছর। ভারতীয় উপনিষদের উক্তিটিও বয়সে কম প্রাচীন নয়। বিশেষজ্ঞ গবেষক বলতে পারেন, আরিস্টোফানিসের কতকাল আগে কথা বলেছেন উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য। যাই হোক, কাহিনীর দার্শনিক নির্ণয়ের জন্যও এই দুই প্রাচীন জিজ্ঞাসাকে আহ্বান করা যায়—কোন্ বিশেষ গুণের কারণে কাহিনী প্রশস্তি দাবি করতে পারে? আর, কিসের কারণে কাহিনী প্রিয় হয়ে থাকে?

---

* নাটকের ইংরেজী নাম—ফ্রগ।

আধুনিককালের জিজ্ঞাসা অবশ্য নানা প্রয়োজনের দিক দিয়ে কাহিনীর ভিতর থেকে নানা তথ্যের সন্ধান শুরু করেছে। পুরাণ-কথার ভিতর বাস্তব ইতিহাসের তথ্য সন্ধান করা হয়। রূপকথার মধ্যে অবচেতন মনের বিচিত্র রহস্যের কীর্তি আবিষ্কার করা হয়। উপকথার মধ্যে আদিমকালীন জীবনের স্মৃতি, অতি-অতীতের হর্ষ আনন্দ ভয় ও বিস্ময়ের খণ্ড খণ্ড ছায়া ও মায়ার রূপ লক্ষ্য করা হয়। এই সবই কাহিনীর সাত্ত্বিক সমগ্রতার এক-একটি আংশিক রূপের সন্ধান। কাহিনীর দার্শনিক নির্ণয়ের ভিন্ন-ভিন্ন তাত্ত্বিক উপাদানের সন্ধানও বলা চলে।

কী এবং কেন, দার্শনিক জিজ্ঞাসার এই দুটি মূল কথার সঙ্গে আরও দুটি কথা উপমূলের মত যুক্ত হয়ে আছে—কোথা হতে ও কেমন করে? বিশেষভাবে বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসার কথা হয়েও এই দুটি কথা বস্তুত দার্শনিক জিজ্ঞাসারই সাধারণ কথা। বিশ্বের জড় ও প্রাণের বিচিত্রতার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত মানুষের মন প্রশ্ন করেছে—কুতো ইয়ং বিসৃষ্টি? কেনোপনিষদ জানতে চেয়েছে—কেনেষিতং প্রাণ প্রথমা প্রৈতি যুক্তঃ, কার দ্বারা এই প্রাণ প্রথম প্রীতিযুক্ত হলো? ঠিক এই প্রশ্ন ও এই কৌতূহল মানুষের সাংস্কৃতিক আগ্রহের প্রত্যেকটি ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আচরণ ও সৃষ্টির হেতু সন্ধান করেছে। ত্রিশ হাজার বছর আগেকার মানুষ কেন গুহার গায়ে ছবি এঁকেছিল এবং সে ছবি কিসের ছবি? সাংস্কৃতিক জীবনের প্রত্যেকটি অবলম্বন এবং আর্টের উদ্ভব ও অভিব্যক্তির সম্পর্কে দার্শনিকের জিজ্ঞাসা যে-ভাবে তত্ত্বের সন্ধান করেছে, ঠিক সেভাবে কাহিনীর উদ্ভব ও অভিব্যক্তির সম্পর্কেও তত্ত্বের সন্ধান অবশ্যই সম্ভব। এবং এই সন্ধানের প্রয়োজনও আছে। কারণ কাহিনীর এই তত্ত্বের নির্ণয় যদি সম্ভব হয়, তবে তার প্রভাবে কাহিনীর পক্ষে ভুল অনুশীলনের ভয় থেকে, মিথ্যা অলংকারের ছলনা থেকে, এবং আঙ্গিক সৌষ্ঠবের বিকার থেকে মুক্ত হয়ে থাকবার সুযোগ অবশ্যই প্রশস্ত হবে। সেটা হবে কাহিনীর পক্ষে নির্মাণের সেই আধ্যাত্মিক প্রস্থান, যার সঙ্গে সামঞ্জস্যের গুণে কাহিনী তার কাম্য গুণিত্ব লাভ করে।

ইতিহাসের স্মৃতি ও শ্রুতি, উভয়ের কেউই বলে না, এবং বলতেও পারে না, ঠিক কবে ও কেন মানুষের আদিম গুহাস্থলীর জীবনে, ছায়াচ্ছন্ন আরণ্য প্রাঙ্গণের একটি নিভৃতে বসে উৎসুক নরনারীর সমাবেশ প্রথম বক্তার মুখ থেকে প্রথম গল্পটি শুনেছিল ও মুগ্ধ হয়েছিল। গুহার গায়ে স্থূল আঁচড়ের দাগের মত আদিম অপটু পটুয়ার প্রাচীনতম চিত্রলেখার যে সামান্য চিহ্ন আজও দেখা যায়, প্রাচীনতম গল্পটির সে-রকম একটা সামান্য ও অস্পষ্ট চিহ্ন আজ আর কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু অনুমান করলে নিশ্চয় ভুল হবে না যে, দূর অতীতের আদিম জীবনের সেই রিক্ত মানুষটি তার মনের যে আগ্রহের তাগিদে গুহার গায়ে স্থূলে আঁচড়ের মত দাগ টেনে টেনে ছবি এঁকেছিল, সেই একই আগ্রহের তাগিদে সে তার প্রথম গল্পটিও বলেছিল। মুনি বাল্মীকির জীবনের একটি ঘটনা থেকে ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের প্রথম-উদ্‌গীতি আবির্ভাবের কথা শুনতে পাওয়া যায়। ক্রৌঞ্চ-মিথুনের একটিকে হত্যা করেছিল নিষাদ। মুনির মনের অনুভূত বেদনার আবেগ তাই শ্লোকে মুখরিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কাহিনীর প্রথম আবির্ভাবের ঘটনা সম্বন্ধে এ-রকম কোন কাহিনী আছে বলে শোনা যায় না। নেই বলেই মনে হয়। কিন্তু কাহিনীও নিশ্চয় অনুভূত আবেগের আত্মপ্রকাশের কীর্তি।

প্রশ্ন করা চলে, ভাষা যেদিন ছিল না, সেদিনও কি কাহিনী ছিল? আদিমকালীন জীবনের তথ্য সন্ধান করতে গিয়ে অনেক চিন্তা ও গবেষণা করেছেন, এমন অনেক মনীষী এই ধারণা করেছেন যে, অতি-অতীতের সেই ভাষাহীন মূক মানুষও অনুভূত আবেগের সমষ্টিকে কাহিনীর রূপ দিয়ে প্রকাশ করেছিল। সে কাহিনী ছিল অকথিত কাহিনী। সে কাহিনীর মধ্যে ভাষা ছিল না, যদিও রব ছিল। আর ছিল, অঙ্গের অন্দোলিত ভঙ্গী। মনোবিজ্ঞানের কৌতূহল আরও অগ্রসর হয়ে এই তথ্যের সন্ধান পেয়েছে যে, বিগত ঘটনার স্মৃতি ব্যক্তির মনের বদ্ধ দুয়ারের আগল ভেঙে
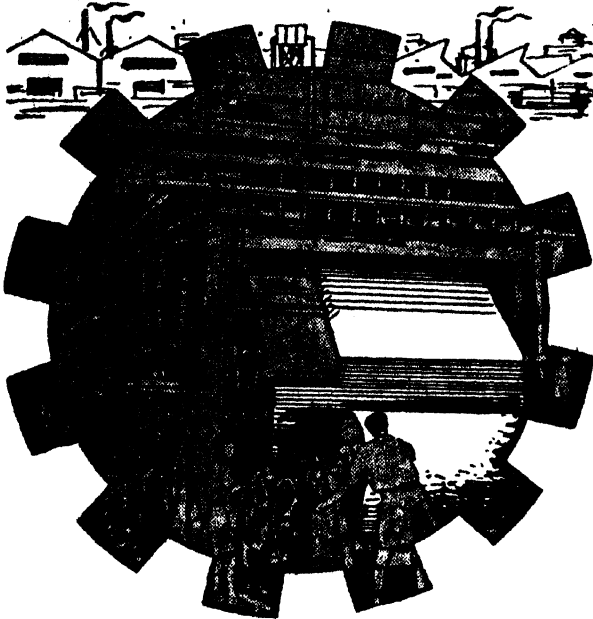
বাহিরের ও অপরের গোচরীভূত হবার চেষ্টায় অঙ্গভঙ্গিময় একটি কাহিনী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মনে হতে পারে, আজকের যে শিল্পী মূকাভিনয়ের দ্বারা নাটকের কাহিনীকে রূপায়িত করেন, তিনি যেন সেই আদিমকালীন অকথিত কাহিনীরই আঙ্গিকের ঐতিহ্য অনুসরণ করেন।

কাহিনীর লিখিত রূপের যে পুরাতন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, তার বয়সও একটি বিস্ময়। আসিরীয় রাজা আসুরবানিপালের যে পুঁথিঘর মরুভূমির নিভৃতে ধ্বংসীভূত সভ্যতার মৃৎ-স্তূপের মধ্যে মুখ লুকিয়ে পড়েছিল, তার আবিষ্কারে লিখিত কাহিনীর প্রাচীনতম পুঁথিটিকে পাওয়া গিয়েছে। মাটির পুঁথি, শুকনো কাদার তক্তির উপরে কিউনিফর্ম অর্থাৎ কীলক-চিহ্নের অক্ষর দিয়ে চার হাজার বছর আগের ভাষায়িত কাহিনীকে লেখা হয়েছে। সেই ভাষা কবেই লুপ্ত হয়েছে, সেই লিপিও কবেই অচল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু একথা বলা চলে না যে, সেই কাহিনীও অচল হয়ে গিয়েছে। ঐতিহাসিকেরা জানেন, সে কাহিনী কীভাবে ও কীরূপে যুগ হতে যুগে উত্তরিত হয়েছে। এবং কীভাবে ও কীরূপে আজকের জাগ্রত সভ্যতার ভাষাতে সচল হয়ে রয়েছে। আসিরিয়া বাবিলনের অতি প্রাচীনকালের ভাষা, যার নাম আক্কাদীয় ভাষা, খৃঃ পূঃ প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে যে-ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই ভাষাতে লেখা মৃৎ-পুঁথির একটি কাহিনীকে নমুনা হিসাবে ধরা যেতে পারে—রাজা সারগনের কাহিনী। সারগনের জন্ম হওয়া মাত্র তাঁর মা তাঁকে একটি ডোঙাতে তুলে দিয়ে ও আলকাতরা দিয়ে ঢেকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন। দূর হতে দূরান্তরে ভেসে চলে গেল ডোঙা। একদিন আক্কি নামের এক জলসেচক চাষী সেই ভাসমান ডোঙার শিশুকে উদ্ধার করে ঘরে নিয়ে গেল। বড় হলো শিশু, আক্কির বাগানের মালী হলো। তারপর দেবী ইশতার-এর কৃপাবলে দেশের রাজা হলো সারগন।

হিব্রু-কাহিনীর মুসা, ভারতীয় কাহিনীর কর্ণ, রোমক কাহিনীর রমুলাস, এরা বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন জাতির কল্পিত কাহিনীর কিংবা অর্ধ-ঐতিহাসিক ঘটনার নায়ক। কিন্তু দেখা যায়, প্রত্যেকেই জন্মলাভের পর মাতার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছেন। মায়ের কোল হতে ডোঙার কোলে নিক্ষিপ্ত এক-একটি পরিচয়-হারা শিশু-প্রাণ-নদীর জলে ভেসে-ভেসে উধাও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে দূরের ও পরের ঘরের স্নেহে লালিত হয়েছে ও বড় হয়েছে। আর প্রত্যেকেই শেষে রাজা হয়েছে।

ভারতীয় পৌরাণিকা সাবিত্রী, আর মিশরীয় পৌরাণিকা আসেসিতসের জীবন একই রকমের ঘটনার আঘাতকে একই সংকল্পের বলে পরাভূত করে জয়ী হয়েছে। দুজনেই যমের ঘর থেকে মৃত স্বামীকে উদ্ধার করে বাঁচিয়েছেন। গ্রীক-পুরানের টাইটান প্রমিথিয়ুস স্বজাতির সুখের জন্য স্বর্গের পবিত্র অগ্নি আহরণ

করে নিয়ে এসেছেন। তেমনই ঋগ্বেদের মাতরিশ্বাও এই কাজ করেছেন। তিনি আকাশ হতে অগ্নি আহরণ করে ভৃগু বংশকে দান করেছেন।

তবে কি ধারণা করতে হবে যে, হাজার বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও বিভিন্ন যুগের মানবীয় জীবনের একই অভিজ্ঞতায় ও একই অনুভূত আবেগের কারণে এইসব একই সাদৃশ্যবহুল গল্প সৃষ্টি হয়েছিল? কিংবা বুঝতে হবে যে, বিশেষ এক দেশের ও এক যুগের গল্প যাযাবর হয়ে দেশে-দেশে ও যুগে-যুগে বিচরণ করেছে এবং লালিত হয়েছে? যা-ই হোক না কেন, সারাগন-কাহিনী দুটি সত্যের নিঃসংশয় প্রমাণ বহন করে—প্রথম, কাহিনীর অতি-প্রাচীনতা। দ্বিতীয়, কাহিনীর প্রাণশক্তি ও আয়ুষ্কালের বিশালতা। অন্বেষণ করলে কাহিনীর ঐতিহাসিক গতি ও প্রকৃতির আরও যে-সব বিশিষ্ট পরিচয় সহজেই পাওয়া যায়, সে-সব পরিচয়ও কাহিনীর দার্শনিক নির্ণয়ের বিভিন্ন প্রয়োজনের উপাদান।

ব্যাসদেবের শিষ্য রোমহর্ষণ ঋষির এই পরিচয় পুরাণে পাওয়া যায়: তিনি ছিলেন ইতিহাস-বক্তা; সুন্দর বাক্য-বিন্যাসের দ্বারা তিনি কাহিনীকে পুলকাঞ্চিত করে, শ্রোতার রোমহর্ষ ঘটাতেন। মনে হতে পারে, আধুনিক কালের যে থ্রিল ও পিকারেস্ক কাহিনী অনেকেরই বিশেষ সমাদরের সম্পদ, ঋষি রোমহর্ষণ ছিলেন সেই ধরনেরই কাহিনীর স্রষ্টা ও বক্তা। লোমশ মুনিরও একটি কাজ ছিল, গল্প বলা। পাণ্ডবেরা তাঁর কাছে গল্প শুনতেন।

গল্প বলা ও গল্প শোনা, দুই-ই যেন মানবীয় মনোলোকের এক পরমা প্রথমজা বেদনার ক্রিয়া এবং সৃষ্টি। ফিনিশিয়ার নাবিক তার দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার একঘেয়ে জীবনের দিনগুলিকে গপ-বলা ও গল্প-শোনা আনন্দের স্পর্শ দিয়ে প্রসন্ন করে রাখতো। আসিরিয়ার পশু-পালকের মরুচর জীবনের ক্লেশ ও ক্লান্তির মধ্যে গল্প-বলাই ছিল তার মনের ও প্রাণের সব চেয়ে বড় বিনোদ ও বিশ্রাম। রাতের আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে সে কতই না গল্প রচনা করেছে। আজকের পেশোয়ার শহরেও একটি বাজার আছে, যার নাম কিস্‌সা খানি বাজার। কিস্‌সা কহানী কথাটা বিকৃত হয়ে কিস্‌সা খানি হয়েছে। অর্থাৎ গল্প-বলার বাজার। গল্প শুনতে উৎসুক মানুষ এখানে পয়সা দিয়ে গল্প শুনতো। তার মানে, এখানে পেশাদার গল্প-বলিয়ে বক্তারা গল্প বিক্রী করতেন। দেখতে পাই, এক বাঙালী সন্ন্যাসী তাঁর শৈশবের স্মৃতি-কথায় লিখেছেন—তাঁর গ্রামের জনপ্রিয় গল্পিক ঈশানবাবু গল্প বলবার ও শোনাবার জন্য দূরের গ্রাম ও নানা জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ পেতেন।*

প্রসঙ্গেরই প্রয়োজনে এইবার বাংলার বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক শ্রীশশাঙ্কমোহন সেনের কয়েকটি মন্তব্যের কথা স্মরণ করতে হয়। পশ্চিমের উপলব্ধির আর্ট-তত্ত্ব এবং ভারতীয় উপলব্ধি রস-তত্ত্ব, উভয়েরই বক্তব্য বিচার করে তিনি মানুষের ব্যক্তিত্বের একটি সহজ চারিত্রিক সত্যের পরিচয় পেয়েছেন। "মানুষের অধ্যাত্মক্ষেত্রে অবাস্তব ও কল্পনিক পদার্থই ফলতঃ সর্বাধিক বাস্তব-শক্তি।...জীবমাত্র নিজের অতর্কিতে ঈশ্বর ও অসীম হইতে চাহিতেছে। এই অতর্কিত বোধি হইতেই কবিত্ব। উহার প্রতিপক্ষে বাধা হইতে আবার ভাবে উচ্ছ্বাস ও হতাশা; তাহাও কবিত্ব। সকল কাব্যপ্রেরণার মুখ্য হেতুই অনন্তের জন্য জীবাত্মার আকুতি।"

মনীষীর অভিমতের কথাগুলিকে বর্ণে বর্ণে কাহিনীর দার্শনিক নির্ণয়ের কাজেও ব্যবহার করা যায়। ব্যক্তিত্ব নিজেকে পূর্ণতর করে প্রকাশ করবার জন্যই কাহিনী রচনা করেছে, করে থাকে। ঘটনা ফুরিয়ে যায়; কিন্তু কাহিনী তাকে ভাবরূপ ও ভাষারূপ দিয়ে ধরে রাখে। বলতে পারা যায়, কাহিনীও অন্যান্য রসকলার মত সেই শক্তির বিগ্রহ, কালের শাসন ও সীমাকে অতিক্রম করবার আনন্দ যার একটি বড় তৃপ্তি। অথবা কাহিনী যেন মানবীয় জীবনের একটি দ্বিতীয় বিশ্ব, এখানে কাল্পনিক মানুষই হলো স্রষ্টা বিশ্বকর্মা। সন্দেহ নেই, এ এক অবাস্তব অস্তিত্বের জন্য, যার কায়া প্রত্যক্ষ ঘটনার পাথর দিয়ে রচিত নয়, কিন্তু এই 'অবাস্তব ও

*আমার জীবন—স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী।
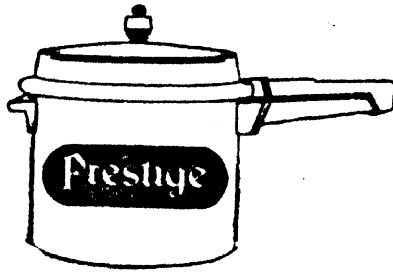
কাল্পনিক পদার্থেই ফলতঃ তার সর্বাধিক বাস্তব-শক্তি।' এই অবাস্তব কাহিনীর বিশ্বেও দিগ্বলয় রঙীন করে দিয়ে সূর্যোদয়ের আভা জাগে, শেষরাতের আকাশকে বিষণ্ণ করে দিয়ে চাঁদ ডুবে যায়। এখানেও আশা ও আনন্দ হাসে, দুঃখ ও বিষাদ কাঁদে। শোক ও বিরহ যেমন আছে, মিলন ও সান্ত্বনাও তেমনইআছে। সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের সত্য এই যে, বাস্তব সংসারের মানুষের মন ও প্রাণের কাছে এই অবাস্তব কাহিনী-বিশ্বের দুঃখ ও আনন্দের কোন কিছুই অসত্যের ছলনা নয়। বরং দেখা যায়, বাস্তব জগতের ঘটনার অকারণ আঘাতে যে মানুষ উৎপীড়িত হয়েছে, সে মানুষ এই অবাস্তব কাহিনী-জগতেরই একটি মমতার কাছ থেকে সান্ত্বনা লাভ করে শান্ত হয়েছে।

জিজ্ঞাসার সূত্র ধরে এগিয়ে যেতে হলে প্রথমেই জানতে ইচ্ছে করবে, কাহিনী কেন ও কেমন করে গড়ে ওঠে। বাস্তবতার বিশ্বে বস্তু ও ঘটনার পরিচয় যে প্রকাশ করে, তার নাম তথ্য। যার নাম কাহিনী, সে অবশ্য তথ্যকে অস্বীকার করে না, কিন্তু বস্তু ও ঘটনার যে পরিচয় সে সৃষ্টি করে অথবা প্রকাশ করে, সে পরিচয় তথ্যের শাসনে ও একটা সীমার বাঁধনে বাঁধা নয়। অন্বেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে, আমাদের এই আধুনিক কালেই বস্তু ও ঘটনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কীভাবে কেমনতর কাহিনী গড়ে উঠছে। এই প্রক্রিয়ার কয়েকটি নমুনা দেখে কিছুটা ধারণা করতেও পারা যাবে, কীভাবে ও কেমন করে সেই অতি-অতীতের মানবীয় মনসলোকের আদিম বসন্তের প্রাতঃকালে কাহিনীর ফুল ফুটেছিল। নৃতাত্ত্বিক ভেরিয়ের এলউইন আধুনিক ভারতের আদিবাসী সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের তথ্য হিসাবে একটি গল্পের কথাও উল্লেখ করেছেন। তামাকের গল্প। নেফার উপজাতীয় জনসমাজের বিশেষ প্রিয় বস্তু এই তামাকের সৃষ্টি সম্পর্কে তাদের কল্পনা একটি গল্প সৃষ্টি করেছে। এক যে ছিল মেয়ে, বেশ কুশ্রী মেয়ে, সে এক এক করে কত ছেলেকেই না বিয়ে করতে চাইল। কিন্তু কেউ তাকে বিয়ে করতে রাজি হলো না। হতাশ ও ব্যথিত সেই কুশ্রী মেয়ে বিধাতার কাছে মিনতি করে, আমি যেন মরি; আর পরজন্মে যেন এমন কিছু হই, যাকে সব পুরুষ-মানুষ ভালবাসবে। বিধাতা ওই মিনতির কথা শুনে বর দিলেন, হ্যাঁ, তাই হবে। তারপর কুশ্রী মেয়ের মৃত্যু হলো। আর নিষ্প্রাণ মেয়ের সেই দেহ, সপ্রাণ দশাতেও যে-দেহ কোন পুরুষের কাছে প্রিয় বলে বোধ হয়নি, সেই দেহ থেকেই একটি উদ্ভিদ উদ্গত হয়ে বড় বড় পাতা দোলাতে শুরু করে [illegible]. এই [illegible] নাম তামাক।

বিখ্যাত শিক্ষক রায় রসময় মিত্র বাহাদুরের নাম আজও অনেকে ভুলে যাননি। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে শৈশবের বিশেষ একটি ঘটনার কথা লিখেছেন : "একদিন আমি সন্ধ্যাকালে বাবার নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময়ে ঝড় উঠিল। আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা, ঝড় হয় কেন? সে-কালে পল্লীগ্রামে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চর্চা প্রবেশ করে নাই; করিলেও পঞ্চম বর্ষের বালককে বায়ু-প্রবাহের কারণ বুঝাইয়া দেওয়া সহজ ছিল না। বাবা বলিলেন, তোর মামাদের গাঁয়ের ধর্মঠাকুরের পূজা দেখিয়াছিস? তাহার দেয়াশীর (পূজকের) মাথায় জটা আছে তাহা জানিস? যখন ঢাক বাজিতে থাকে, দেয়াশী তখন লম্বা লম্বা জটা দোলাইয়া দোলাইয়া নাচিতে থাকে; আর অমনি ঝড় ওঠে। এই উত্তর শুনিয়া আমার আনন্দের সীমা রহিল না।"

সম্প্রতি এক বাঙালী লেখিকা তাঁর স্মৃতি-কথার একটি গ্রন্থে * সুন্দরবনের নদী ও পাখীর প্রসঙ্গে সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কল্পনা দিয়ে গড়া একটি গল্পের কথা লিখেছেন—নদীর ধারে জোয়ারী পাখী ডাকে—পুত্ত পুত্ত। শুনতে খুব ভালো লাগে। প্রবাদ আছে : নদীর কিনারায় পাখী তার ছেলেকে ভাঁটির সময় শুইয়ে রেখে কী করছিল; জোয়ার এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তার ছেলেটিকে। পাখি তো মানুষ ছিল তখন, শোকে পাখি হয়ে ও গাছে কোল দিয়ে তাই সে সেই থেকে ডাকছে—ভাঁটিতে রাখলাম পুত্ত জোয়ারে নিয়ে গেল পুত, পুত্ত পুত্ত। ওর ডাকের সঙ্গে কথাগুলি মিলিয়ে দেখলে মনে হবে, সত্যি যেন তাই।

তিনটি নমুনা যথেষ্ট। এর মধ্যে গল্পের গঠনবিধির যেমন কয়েকটি ক্রম দেখতে পাওয়া যায়; তেমনই দেখতে পাওয়া যায়, গল্পের সেই কারণ-স্বরূপ, যার সঞ্চারিত প্রেরণা ভাষায় মুখরিত হয়ে এবং দ্বিতীয় একটি অনুভবের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তৃপ্তি লাভ করে। রূপকথা উপকথা ও আষাঢ়ে-গল্প যেভাবে ও যে কারণে হাজার বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল, সেভাবে ও সে কারণে আজও সৃষ্টি হয়ে চলেছে। ঠাকুরমার ঝুলির কিছু সম্বল যদি বা হারিয়ে যায়, তবু একেবারে ফুরিয়ে যেতে পারে না। কারণ গল্প সৃষ্টি করা মানুষের মনের একটি সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়া, এবং সেই ক্রিয়ার মধ্যে আত্মিক পিপাসার তৃপ্তি নিহিত আছে। ঢাক বাজে, ধর্মঠাকুরের দেয়াশীর লম্বা লম্বা জটার দোলার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় জেগে ওঠে, গল্প এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ঘটনার হেতুটিকে যে ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়েছে, সে ব্যাখ্যা শুনে বিজ্ঞানের তত্ত্ব নিশ্চয় হেসে ফেলবে, স্পেনসার যেমন নায়েগ্রার জলপ্রপাত সম্বন্ধে কবির লেখা একটি কবিতা পাঠ করে হেসে ফেলেছিলেন। কিন্তু স্বীকার করতে হবে, গল্পটি মানবীয় মনের সেই স্বভাবজ আগ্রহের একটি শক্তিরই কীর্তি, যে আগ্রহ জ্ঞান-বুদ্ধির দুর্ভিক্ষের মধ্যেও উপোষী হয়ে শুকিয়ে যায় না। যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—জ্ঞানের সাধক যে দুরূহ অজ্ঞেয়তার ব্যাপার দেখে সতর্ক হয়ে যান ও মুখর হতে পারেন

* জলবনের কাব্য—সরলা বসু।

না, সেই অজ্ঞেয়তার কাছে মানুষের গল্প-বলা আগ্রহ কিন্তু পরাভব স্বীকার করতে চায় না, বরং মুখর হতে চায়। বস্তু ও ঘটনার সব বৈচিত্র্যকে বুঝতেই হবে, মানুষের চিৎ-প্রবৃত্তির এই এক অদ্ভুত অহংকার, এবং তারই প্রথম পরিণাম গল্প। গল্পও অধরা রহস্যকে ধরবার চেষ্টা, না-বোঝা সত্যকে বোঝবার চেষ্টা। শুধু এক মহাভারতে ছোট-ছোট কাহিনীর অজস্রতা লক্ষ্য করে বিস্মিত হতে হয়। সেগুলি যেন বস্তু ও ঘটনার যাবতীয় রহস্য ও বৈচিত্র্যকে বোঝবার জন্য বিপুলে এক কৌতূহলের মত আকুলতার সৃষ্টি। কী না বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে। জ্বর কেন এল পৃথিবীতে? পর্বতের উৎপত্তির কারণ কি? মানুষ হাই তোলে কেন? সাপের জিহ্বা বিভক্ত কেন? দাবানল কোথা থেকে এল? শুকপক্ষী কেন কথা বলতে পারে? সব জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে গল্প গড়ে উঠেছে। গল্পেই বলা হয়েছে, মৃত্যু হলেন এক সুন্দরী, তাঁর প্রাণে বড়ই করুণা, মানুষকে সংহার করতে হবে শুনে তাঁর দুই চোখ জলে ভরে গেল। মৃত্যুর এই চোখের জলই হলো ব্যাধি। মানুষের প্রাণ হরণ করে ব্যাধি, সুন্দরী মৃত্যুকে আর নিজের হাতে প্রাণ হরণের অকরুণ কাজটি করতে হয় না। আজ আমরা দেখতে পাই, বিশেষ এক ধরনের কাহিনী গড়ে উঠেছে, যার নাম সায়েন্স-ফিকশন। সভ্যজীবনের শৈশব ও কৈশোরকের চিন্তা ও কল্পনার শক্তিতে যে বিশেষ এক ধরনের কাহিনী গড়ে উঠেছিল, তারা যেন ফিকশন-সায়েন্স। মনে হয়, মহাভারতে বর্ণিত ওই সব গল্প তাদেরই সামান্য স্মৃতি-স্বরূপের সঙ্কলন।

আধুনিক কালের এক বাঙালী পিতার মুখে স্ফুরিত-রচিত ওই ছেলে-ভুলানো গল্পটি, যে-গল্প ঢাকের শব্দের তালের সঙ্গে দেয়াশীর জটা দুলিয়ে দিয়ে ঝড়ের উৎপত্তির রহস্য বুঝিয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গে পৌরাণিক কল্পনার রচিত ওইসব গল্পের প্রকৃতিগত মিল আছে। এবং তার মধ্যে সাংস্কৃতিক জীবনের একটি ঐতিহাসিক সত্যের প্রমাণ নিহিত আছে। বিজ্ঞানবুদ্ধির দীনদশার যুগে কাহিনীই যে বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের সৃষ্টির কাজ করেছে, তারই প্রমাণ। বলতে পারা যায়, গল্পগুলি যেন বিজ্ঞান-বাসনার অতিশৈশবের কলরব; শুনতে মিষ্টি, ভাবতে মনোরম, আর বলতে অবচেতন মনের ঘর থেকে ছাড়া-পাওয়া একটি সাধের তৃপ্তি, বিশেষ একটি কামনার সুখকর মুক্তি। সে কামনা আত্মিক জীবনেরই কামনা।

দেয়াশীর জটার দোলায় আকাশের বুকে ঝড় জাগে, এই গল্প আধুনিককালের বালকের মনে যে আনন্দ এনে দিয়েছে, সেটা প্রত্যয় লাভের আনন্দ। অনুভূতি ও উপলব্ধির যেখানে শূন্যতা ছিল, সেখানে পূর্ণতা চলে এল। অতিদূর অতীতে মানুষ জাতির মনের প্রকৃতিও আজকের শিশুর মত শুধু বিস্মিত হবার সুখেই তার কৌতূহলের তৃপ্তি বোধ করতো, আনন্দের জন্যই একটা প্রত্যয় পাওয়া তার প্রয়োজন ছিল, এবং সেদিনের ব্যক্তির মন কাহিনী সৃষ্টি করেই সেই প্রত্যয়ের সন্ধান করেছিল। কাহিনী রচনা করা প্রত্যয় সন্ধানেরই প্রয়াস ছিল।

কিন্তু সুন্দরবনের পাখির বিষণ্ণ-করুণ পুত পুত ডাক যে গল্পটিকে ডেকে এনেছে, সে-গল্পও কি একটা আনন্দকর প্রত্যয়ের সন্ধান? অবশ্যই নয়। গল্প মানুষের মনের কত বিচিত্র ও বিভিন্ন স্বভাব-ক্রিয়ার পরিণাম হয়ে গড়ে ওঠে, তার কিছু প্রমাণ এই গল্পে পাওয়া যায়। এই গল্প পুত্রহারা পিতার শোকাতুর প্রাণের ব্যথাকে যেন বিশ্বময় এক সহানুভূতির কাছে সঁপে দেবার চেষ্টা। এই গল্প শুনে সুখে-বেঁচে থাকা সন্তানের সুখী পিতা-মাতার প্রাণও এমন এক দুঃখের বোধে দুঃখী হয়ে যাবে, যেটা তাদের ব্যক্তিক জীবনের কোন বাস্তব সত্য অথবা ঘটনা নয়। কিন্তু এই গল্প যেন বৃহত্তর মমতার

সম্বল দিয়ে ব্যক্তিত্বকে পূর্ণতর করবার জন্য উদাত্ত এক আকাঙ্ক্ষার রচনা। যদুনাথ মজুমদারের সুবিখ্যাত উক্তি প্রতিধ্বনিত করে বলা যায়—আমিত্বের প্রসার। শশাংক-মোহনের মন্তব্য অনুসরণ করে বলা যায়, ব্যক্তির পক্ষে তার একান্ত স্বার্থভূত মমতার ছোট পরিমণ্ডলের সীমা ছাড়িয়ে অসীমতার সঙ্গে একাত্ম হওয়া। কাহিনী এক্ষেত্রে ছোট্ট একটি রূপকথার মত মমতার যে কুহক রচনা করেছে, জীবনের পরিচর্যায় সেটা কিন্তু বাস্তব প্রয়োজনের উপহারের মত সত্য ও সার্থক। এইবার এবং এই পর্যন্ত এসে কাহিনীর মর্মগত সত্যের এই ব্যাখ্যার মুখ ঘুরিয়ে দিলেই একটি সিদ্ধান্তের কাছে এগিয়ে যাওয়া যায়। সেই সিদ্ধান্ত এই যে, ব্যক্তি তার আমিত্বের প্রসারের জন্য, বৃহত্তর মমতার সাযুজ্য লাভ করবার জন্য, কাহিনী রচনা করেছে।

এই সিদ্ধান্তের মধ্যে কিন্তু আরও একটি প্রশ্নের ছায়া মিশে আছে। কাহিনী কি তবে ধার্মিক আচরণের অনুরূপ কোন অনুষ্ঠান, কোন দিব্যভাবের পরিতুষ্টির আঙ্গিক? নৃতাত্ত্বিকের অভিমতে বলে, হ্যাঁ, অতি-প্রাচীন মানুষের জীবনে ধর্মাচার ও ভজন-পূজনের সব অনুষ্ঠান ছিল বিচিত্র এক জাদুর ক্রিয়াচার। গুহার গায়ে আঁকা আদিম ছবিটির মত আদিম গল্পটিও নিশ্চয় সেদিনের জাদুর ক্রিয়াচারের কীর্তি। সভ্যতর অবস্থায় উপনীত হবার পর, মানুষের মনে ধর্মবোধের উন্মেষ আরও স্পষ্ট ও পরিণত রূপ নেবার পর, দেবতাকে স্তবে সঙ্গীতে ও প্রার্থনায় তুষ্ট করার প্রথা দেখা দিয়েছে; কিন্তু তার আগে গল্পকে দিয়েই ওই কাজটি করানো হতো। টোটেম-পূজার আনুষ্ঠানিক নানা ক্রিয়াচারের মধ্যে গল্প-বলাও যে একটি ক্রিয়াচার ছিল, তার প্রমাণের অনেক স্পষ্ট-অস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান কালেরও জনজীবনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেখতে পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়ার আদিম জাতির মানুষ যারা আজও প্রস্তর-যুগের দশা পার হতে পারেনি, তাদের টোটেম-পূজার মন্ত্রগুলি যেন ছোট-ছোট ও ছিন্ন-ভিন্ন গল্পের সমষ্টি। তার মধ্যে হর্ষ বিস্ময় বিষাদ আনন্দ, আতঙ্ক আশা ও বিলাপের যত উৎফুল্ল এবং করুণ ধ্বনির সমাবেশ। অতি-প্রাচীন জীবনের গল্প-বলা ওই জাদু-ক্রিয়াচার, আর একেবারে আধুনিক কালের গল্প-বলা ব্রতাচার, উভয়ের মধ্যে হাজার-হাজার বছরের কাল-ব্যবধান, উভয়ের মধ্যে ভাব ভাষা ও সৌষ্ঠবের বিরাট প্রভেদ। তবু স্বীকার না করে উপায় নেই যে, প্রকৃতিতে উভয়ই গল্প-বলা সেই ধার্মিক অনুষ্ঠান, যার দান হলো জৈব অস্তিত্ব-চিন্তার অতিরিক্ত একটি দিব্যভাবনার পরিতুষ্টি, যদিও এ ধরনের গল্প-বলা ক্রিয়াচারের সঙ্গে সাধারণ ভোগ-সুখেরও অনেক দাবির মিনতিময় মুখরতা আছে।

নেফার উপজাতীয় কল্পনার সৃষ্টি ওই তামাকের কাহিনীর মর্মও খুব স্পষ্ট ও সরল, চিনতে ও বুঝতে কোন আবছায়ার বাধা নেই। বলা যেতে পারে, গল্পটি যেন অসহায় আশাহীন ও উপেক্ষিত জীবনের সান্ত্বনা। 'যার কেহ নাই, তুমি আছ তার'। কুশ্রী মেয়ের দুঃখিত জীবনের অভিমানই শেষ-পর্যন্ত জয়ী হয়েছে, ভাগ্যের কাছে সুবিচার পেয়েছে। তামাক নামে পরিচিত এক উদ্ভিদের উৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে গল্পটি আসলে মানুষের জীবনেরই কথা বলেছে। সুতরাং ধারণা করবার আরও যুক্তি পাওয়া যায় যে, গল্প বস্তুত মানুষের জীবনের একটি আত্মিক আকুলতার সৃষ্টি। গল্পের বিষয়টা ঠিক তামাক নয়। তামাক একটা অজুহাত মাত্র, যার উৎপত্তির রহস্য আবিষ্কার করবার চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের একটা বিকল্প প্রত্যয় তৈরী ক'রেও গল্প মানুষের জীবনের যাতনা ক্ষমা ও সান্ত্বনার রহস্যকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছে। সব গল্পেরই মর্ম আছে, বক্তব্য হিসাবে কথাটা নূতন কিছু নয়! বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় শুধু এই যে, দশ বছরও বয়স হয়নি, উপজাতীয় মানুষের কল্পনা থেকে উদ্ভূত এই নমুনা-গল্পের মর্ম বিশ্লেষণ করলে কাহিনীর দার্শনিক নির্ণয়ের একটি সুস্পষ্ট সংকেত পাওয়া যায়। গল্প কী ও কেন, মূল প্রশ্নের আংশিক সদুত্তর এই গল্পেরই দ্বিতীয় মর্ম হয়ে ফুটে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই বিষবৃক্ষ উপন্যাসের প্রকাশ শুরু হয়েছিল বলেই বঙ্গদর্শন বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ১৯৬১ সালের লণ্ডনে একদিন দেখা গেল যে, এক সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের ছবি গাড়িতে চড়ে ও সারা শহর ছুটোছুটি করে জানিয়ে দিচ্ছে—প্রত্যহ প্রতিসংখ্যায় একটি করে গল্প। এই দুই ঘটনাকে ভুল সন্দেহে ভুল বুঝবার ভয় আছে। লোকে বাস্তব ঘটনার তথ্য তত্ত্ব নিবন্ধ ও সংবাদের চেয়ে কাল্পনিকতার সৃষ্টি ওই গল্পকে বেশি প্রয়োজনের সামগ্রী বলে মনে করে, একথা বললে ঠিক বলা হবে না। বরং বলা উচিত যে, বাস্তব ঘটনার তথ্য তত্ত্ব ও সংবাদের গাল্পিক রূপটিই লোকচিত্তের কাছে বেশি পছন্দের ও বেশি প্রিয়তার আস্পদ। খুব সরল করে বলা যায়, গল্পও অন্য রম্যকলার প্রসাদের মত মানুষের আত্মিক ক্ষুধার খোরাক, যাকে না পেলে প্রাণ ভরে না। বাস্তব ঘটনার বিবৃত তথ্য ও সংবাদে প্রাত্যহিক কৌতূহলের পেট ভরে ঠিকই, কিন্তু জৈব অস্তিত্বের রক্ষক স্থূল প্রাণের অতিরিক্ত যে বিশেষ একটি সূক্ষ্ম-প্রাণ প্রতি মানুষের রসিক ও ভাবুক অস্তিত্বের রক্ষক হয়ে রয়েছে, তারই তৃপ্তির জন্য তথ্য তত্ত্ব ও সংবাদকে কাহিনীর রূপ গ্রহণ করতে হয়। কাহিনীর জন্য লোক-অভিরুচির সাগ্রহ ব্যস্ততা নিশ্চয়ই তথ্য ও ঘটনার বাস্তবতাকে তুচ্ছ করা নয়। কাহিনী বাস্তবজীবনের সব সত্যকেই পরিবেশন করতে পারে এবং করেও থাকে; কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেরই বিশেষ একটি রূপ ও ভঙ্গীর গুণে, শকুন্তলার প্রতি ঋষি মারীচের আশীর্বাদের মত 'উভয় লোকানুগ্রহ শ্লাঘনীয়' হয়ে অতিরিক্ত একটি প্রিয়তা ও রম্যতা লাভ ক'রে লোক-চিত্তের পক্ষে অতিরিক্ত একটি তৃপ্তির অঙ্গীকার হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি আর লণ্ডনীয় সংবাদপত্রের ওই বিজ্ঞাপন: দুইই বস্তুত একই অভিজ্ঞাত সত্যের স্বীকৃতি। কাহিনী না হলে জৈব অস্তিত্বের আর জ্ঞান ও বুদ্ধির লালন-পালন এবং রক্ষা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু আত্মিক অস্তিত্বের সুরক্ষা ও সুতৃপ্তির কোনটিই সম্ভব হতে পারে না।

চৈতন্য চরিতামৃতের উক্তি—সালংকার হৈলে অর্থ করে ঝলমল। বলা চলে, গল্প বস্তুত তথ্যেরই একটি সালংকার রূপ কিংবা প্রকাশ, তাই তার অর্থ ঝলমল করে। আদালতের মামলার তথ্য নিতান্ত তথ্যরূপে বিবৃত হয় বলেই তার অর্থ ঝলমল করে না। নীরবিন্দু দূর্বাদলে,

নিত্য কি রে ঝলমলে? না, [illegible] নীরবিন্দু শুধু তখনই ঝলমল করে, যখন তার বুকে সূর্যকিরণের আভার ছোঁয়া লাগে। জীবনের যত বাস্তব সত্যের, আশা আনন্দ পাপ পুণ্য ক্ষমা করুণা স্নেহ ও স্বপ্নের তথ্য হলেও আদালতের মামলার বিবরণীকে দলিলের [illegible] বলে মনে হবে। কাহিনীর খণ্ড-খণ্ড ও অমনোরম স্তূপের সমাবেশ বলেও মনে হতে পারে। কিংবা মনে হবে, 'ফুটিতে পারিত তবু ফুটিল না সে'। কাহিনীরই যত অস্ফুট অথবা অপস্ফুট অবস্থার চেহারা। আসল সত্য এই যে, তথ্যের ভিড় ঘটিয়ে 'ডুমসুডে বুক' রচিত হতে পারে, রামায়ণ রচিত হতে পারে না।

'অনিপুণা বাণী আপনি নাচিতে না জানে'—কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তিটি আঙ্গিকের জটিল তত্ত্বের একটি সরল সত্যার্থ প্রকাশ। এই উক্তির দুটি অর্থ হতে পারে, এবং দুই অর্থেই উক্তিটি আঙ্গিক সম্বন্ধে একটি সুবিচারিত সত্যের ঘোষণা। বাণী যদি অনিপুণা হয় তবে তার পক্ষে আনন্দের প্রকাশ নৃত্যায়িত করা সম্ভব নয়। ঠিক কথা। কিন্তু বাণী যে নিজেই অনিপুণা, একা এবং শুধু নিজের গুণে আনন্দ নৃত্যায়িত করবার শক্তি তার নেই। অন্য একটি অনুভবের জগৎ থেকে বিশেষ একটি আবেগ বাণীতে সঞ্চারিত হলে তবেই সেই বাণী নৃত্যায়িত হয়, নইলে হয় না।

কিন্তু কী সেই অলংকার, যাকে গায়ে তুলে নিলে এবং কী সেই আবেগ যাকে বুকে ভরে নিলে বাস্তবতার তথ্যের বিবরণ একটি অর্থ-ঝলমল কাহিনী হয়ে উঠতে পারে? বলবার বিশেষ ভঙ্গীই কি এই অলংকার, যাকে বলা হয় টেকনিক? বিশেষ কোন সৌষ্ঠব অথবা সুচারুতাই কি এই অলংকার? কোন সন্দেহ নেই, এবং বিদগ্ধজনের অভিমতে স্বীকৃতিরও অভাব নেই যে, ভঙ্গীর সৌষ্ঠব কাহিনীর শরীর সুষমার একটি বড় ঐশ্বর্য। কিন্তু ভঙ্গীর এই সৌষ্ঠব সেই অলংকার নয় যার স্পর্শ দ্যুতিময় এক মায়ার স্পর্শ হয়ে বৃত্তান্তের বিশেষ একটি আন্তরিক অর্থ ও নিগূঢ় অর্থ ফুটিয়ে তুলতে পারে। ভঙ্গীর প্রজাপতি সোনালী রোদের প্রলেপ গায়ে মেখে নিয়ে ডানা কাঁপাতে পারে; এই স্ফূর্তি দেখতে সুন্দরও ঘটে। কিন্তু নিছক এই স্ফূর্তিটিই সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি নয়। ভঙ্গীর প্রজাপতিকে কখনও ফুলের বুকে লুটিয়ে পড়ে, কখনও বা পদ্মবনের বাতাসে উড়ে বড়ে পরাগ কুড়োতে হয়। নইলে শুধু তার ডানার কাঁপুনিতে ফুল ফোটাবার আশা সফল হয় না। কাহিনীর নির্মাণে ভঙ্গী নিজে একটা সৃষ্টিগুণ নয়; সৃষ্টিগুণের ধারক বাহক ও সহায়ক মাত্র। নিখিল জীবনের রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শের সেই পরাগ চাই, যাকে একটা মায়াবস্তু বলা চলে, অনুভূত জগতের আত্মিক সত্তাও বলা চলে। অভিজ্ঞতার অজস্র বৈচিত্র্যের ভাবচ্ছবি বললেও ভুল বলা হবে না। যেভাবে বলা হোক, এবং যা-ই বলা হোক না কেন, এই অলংকার বস্তুত একটি কামনার রূপময় আবেগ। সেই আবেগ ঘটনার তথ্য ও বিবরণের স্থূলদেহে সঞ্চারিত হলে তবেই সেই দেহ প্রাণ পায়, এবং শুধু তখনই তাকে কাহিনী বলে চিনতে বুঝতে ও উপভোগ করতে পারা যায়। প্রাণের প্রতিষ্ঠা ভঙ্গীর কাজ নয়; সেই ভঙ্গী যতই বিচিত্র ও চমৎকার হোক না কেন। পিগম্যালিয়ন তার নিজের হাতে গড়া আইভরীর রূপসীকে নিষ্প্রাণ রিক্ততারই একটি চমৎকার মূর্তি বলে বুঝেছিল। তার কামনার আবেদন আইভরীর রূপসীর বুকে সঞ্চারিত হবার পর প্রাণ পেয়েছিল ও সাড়া দিয়েছিল আইভরীর প্রাণহীনা প্রতিমা গ্যালেশিয়া।*

[ক্রমশ]

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীসুবোধ ঘোষের শরৎ স্মৃতি বক্তৃতার প্রথম অংশ।

নতুন ফর্মুলায় তৈরী গয়া। আপনার
কল্পলোকের মনোমোহিনী ট্যাল্‌কম্।
কুয়াশার মত মিহি-মৃদুল,
অন্য যেকোনো ট্যাল্‌কমের চেয়ে
ঢের বেশী সুচারু, ঢের বেশী
লঘুভার।
গয়া-র শিল্পীদের সৃষ্টি
এই মধুগন্ধ পাউডার
আপনাকে সারাদিন সুরভিত
সারাদিন তাজা রাখবে।
ভিন্‌দেশী **ব্ল্যাক রোজ,**
টাটকা ফুলেল **গার্ডেনিয়া**
আর মনমাতানো **পাসপোর্ট—**
যেটা ইচ্ছে বেছে নিন।
মনে রাখবেন, তিন রকম পাউডারই
পাবেন নতুন দীর্ঘাকার আধারে।
এগুলি বেশীদিন চলবে।

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিঃ
(ইংলণ্ডে সন্মিলিতবদ্ধ)

নতুন দীর্ঘাকার
আধারে
নতুন ফর্মুলায়
মিহি-মৃদুল ট্যাল্‌কম

সুবাসিত ট্যাল্‌কম প্রস্তুতকারক

কলকাতার

ডায়েরি

গণপতিবাবু সেদিন এসে হাজির তাঁর 'নবতম অবদান' নিয়ে। তাঁর বক্তব্য এদেশে বেকার সমস্যা নেই। আন্তার অন্যর. এই বক্তব্যে বিস্মিত হলেও আমি হই নি। কেননা আমি গণপতিবাবুকে অনেক দিন থেকে চিনি। চিনি বলেই জানি 'বৃহত্তর বহত্তর সমস্যা কীভাবে অবলীলাক্রমে তিনি জলবৎ সরল করে থাকেন। এবং এও বুঝতে পারলাম, অধুনা তিনি বঙ্গদেশের বেকার উচ্ছেদে উঠে পড়ে লেগেছেন।

গণপতিবাবু বললেন, "বুঝলে ভাই, খবরের কাগজে আর লোকের মুখে মুখে লাখ লাখ বেকারের কথা শুনে হঠাৎ অকর্মা-উদ্ধারের বাসনা জাগল, কিন্তু কী বলব তোমাদের, একটাও বেকার খুঁজে পাচ্ছি না।—"

"বলেন কী"—আমরা কোরাসে চিৎকার পাড়ি।

"হ্যাঁ তাই"—গণপতিবাবু নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দেন—"প্রথমে খোঁজ করলাম আমার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেউ বেকার আছে কি না। পেলাম না। সবাই একটা কিছু কাজ করছে। তারপর চেনাশোনা অনেককে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে কেউ বেকার এনে দিতে পারে কিনা। প্রস্তাবটা শুনে গোড়ায় দু'-চার জন বলল নিশ্চয়, নিশ্চয়, কত চান? তারপর নামধাম জিজ্ঞেস করতে ওরা আমতা আমতা করে এবং শেষে, দু-চার জনের নামও বলে। কিন্তু দেখলাম আসলে কেউউ বেকার না।"

"বাজে কথা, বাজে কথা"—আমরা চেঁচিয়ে উঠি,—"বেকারের অভাব আছে নাকি এ দেশে! কত চান?"

"সেই একই উত্তর 'কত চান', এখন চটপট একজনের নাম বলুন তো"—গণপতিবাবু তৎক্ষণাৎ জানতে চান।

"এই তো আমার মেজ ভাগনে বি-এ পাশ করে তিন বছর আমার অন্ন ধ্বংস করছে, দিন না ওকে একটা চাকরি"— পরমেশবাবু চ্যালেঞ্জের সুরে বলেন।

"কাল সকাল দশটায় আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, দুপুর নাগাদ এপয়েন্টমেণ্ট লেটার দিয়ে দেব। স্কুল ফাইন্যাল পাশ অষ্ট এ পাশ ও বি-এ পাশদের জন্যে আলাদা আলাদা অনেক চাকরি আমার কাছে আছে" —গণপতিবাবু এমনভাবে কথাগুলো বলেন যেন চাকরির ব্যাপারটা ডাল-ভাতের সমান (থুড়ি ডাল-ভাতের সমান কথাটা আজকাল আর খাটে না. এইটে যোগাড় করাই তো এখন সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার।)

"ঠিক আছে, পাঠিয়ে দেব"—পরমেশবাবু বলেন—"কিন্তু চাকরিটা কোথায়? কত মাইনে?"

"মাইনে ভালই। বি-এ পাশ যখন, শ' দেড়েক পাবে তবে জায়গাটা একটু দূরে। ভুটানে। সেখানে অনেক ইস্কুল মাস্টার চাইছে। তবে হ্যাঁ দূরে হলেও থাকার বন্দোবস্ত করবে ওরা"—গণপতিবাবু বলতে বলতে তাকিয়ায় হেলান দেন।

এদিকে পরমেশবাবু খেপে উঠেছেন, একটু চড়াসুরেই বলেন "এই আপনার চাকরি? কোথায় কোন ভুটানের জঙ্গলে আমার ভাগনেকে পাঠাবেন। বাঙালির আপনাকে আমি ভাবলাম, বুঝি কলকাতার কাছাকাছি কোথাও চাকরি খালি আছে। আর আপনি কিনা ভুটিয়াদের পাঠশালার কথা পাড়লেন। দূর দূর, তার চেয়ে বেকার থাকা ভাল।"

"এই হল গিয়ে ব্যাপার"—গণপতিবাবু তাকিয়া ঠেলে ফেলে আবার উঠে বসেন— "বেকার আছে অনেক কিন্তু এঁরা কলকাতা আর বাংলা দেশ ছেড়ে দিতে নারাজ। ভুটানের ইস্কুল মাস্টারের মত কত চাকরি খালি আছে ওড়িশায় কেরলে গুজরাটে। কেউ যাবে না। এমন কি দিনহাটায় এক ঠিকাদারের সঙ্গে কাজ করার কথা বলেছিলাম স্কুল ফাইন্যাল ফেল এক ছোকরাকে।

রাজি হল না। সেও কলকাতা ছাড়তে নারাজ। হিসেব নিয়ে দেখেছি, যাদের নিয়ে আমরা মাতামাতি করি তাদের মধ্যে দুটি ভাগ। একদল মনোমত চাকরি না পেয়ে বেকার, অন্যদল কলকাতা প্রেমিক বেকার। আর কলকাতা ছাড়া এক পাও নড়ব না। আর ডালহৌসি স্কোয়ার এলাকায় পেলে তো কথাই নেই। কুমায়ুন হিলসের কাছে আই-এ প্যাশ একটি ছেলেকে এক শ' তিরিশ টাকা মাইনের এক চাকরির কথা বলেছিলাম। সে প্রথমেই জানতে চাইল, ওখানে ইলেকট্রিসিটি আছে কিনা, সিনেমা হাউস আছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি না বলতেই বেকার ছেলেটি 'পরে দেখা করব' বলে পালাল। আর একটি ছেলেকে এক শ' টাকা মাইনের চাকরি 'অফার' করামাত্র বললে—'ওই সামান্য টাকায় আমার চলবে না।' বললাম এখন তো এক পয়সাও রোজগার কর না, নেই মামার চেয়ে কানা মামা তো ভাল।' ছেলেটি তবু রাজি হল না, বলল, মা আছেন, দুটি ভাই আছে, এতদূরে যাওয়া পোষাবে না, তার চেয়ে দেখি কলকাতার কাছাকাছি কিছু পাই কি না। তৃতীয় এক ভদ্রলোককে তার ছেলের জন্যে নেফায় একটি চাকরির কথা বলতেই উনি তো রেগে আগুন, বলেন, ঠাট্টা করছেন আমার সঙ্গে? আমার ছেলে কোনদিন ওর মাকে ছেড়ে থাকে নি, আর আপনি কিনা নেফার জঙ্গলে ওকে পাঠাতে চাইছেন। নেভার নেভার। তার চেয়ে যে উপোস করে মরা ভাল। হাল না ছেড়ে আরও কয়েক জনের কাছে গেলাম, সবারই মুখে এক কথা, এত কম মাইনেয় বাংলাদেশের বাইরে যাওয়ার কোন মানে হয় না। বুঝি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের পক্ষে বাংলা দেশের বাইরে যাওয়ার অসুবিধে অনেক কিন্তু বুঝি না, কম মাইনে আর দূরের দোহাই দিয়ে ওরা সমাজের বোঝা হয়ে থাকতে পারে কী করে? তাছাড়া কলকাতা বা বাংলা দেশের পক্ষে সব বেকারকে চাকরি যুগিয়ে দেওয়াও যে অসম্ভব ব্যাপার। আরও মজার কথা, এমনই অদ্ভুত দেশ আমাদের, কলকাতায় ডাক্তারদের ছড়াছড়ি, ওড়িশা ডেকে ডেকেও কলকাতার ডাক্তার নিতে পারে না, কলকাতা শহরের স্কুলে কলেজে বি-এ পাশ এম-এ পাশদের উমেদারি, আর অন্য দিকে বাংলা দেশের গ্রামের ইস্কুলগুলো মাস্টারের অভাবে বিপদে পড়ে। এই যখন অবস্থা, তাহলে বেকার সমস্যা দূর করার সাধ্যি কারও নেই।"

গণপতিবাবু এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা গড় গড় করে বলার পর আমরা বলি, "কিন্তু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ তো মিথ্যে কথা বলতে পারে না। সেখান থেকে তো মাসে মাসে বেকারদের ফিরিস্তি বের হয়।"

গণপতিবাবুর জবাব—"এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জও মিথ্যে কথা বলে হে। ওখানে যারা নাম লেখায় তাদের সবাই বেকার নয়। যেমন ধর একটি ছেলে এম-এস-সি পাশ করে বলরামপুরের ইস্কুলে মাস্টারি করে। চাকরিটি তার পছন্দ নয়, সে তালে আছে অন্যত্র চলে যাবার। মাস্টারির চাকরি গোপন রেখে সেও নাম লেখায় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের খাতায়। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল আর একজন 'চাকরি করা বেকার।' আর একদল আছে যারা সত্যিকারের বেকার হয়ে হয়তো নাম লেখানোর মাস খানেকের মধ্যে চাকরি যোগাড় করল অন্য ভাবে। বেকারত্ব ঘুচল অথচ তাদের নাম বেকার হয়েই পড়ে রইল এক্সচেঞ্জের খাতায়। এইভাবেই বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। আমাদের দেশে বেকার সমস্যা নেই আমি বলি না। বেকার নিশ্চয়ই অনেক আছে, কিন্তু সমস্যাটা আনএমপ্লয়মেণ্টের যতটা, তারচেয়ে বেশী আণ্ডার এমপ্লয়মেণ্টের। চাকরি একটা করছি বটে, তবে তা পছন্দমত নয়, মাইনেও প্রাপ্যের চেয়ে কম। অর্থাৎ ঠিক যে-চাকরি চাই, তা পাচ্ছি না। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার এই সমস্যার জন্যে আমাদের সমাজব্যবস্থাও দায়ী। গতরে খাটার কাজের চেয়ে কলম-পেষার দিকে বেশীর ভাগ লোকের নজর। কেননা কায়িক পরিশ্রমের সম্মান এখনও আমাদের দেশে তেমন নেই। আমার বি-এ পাশ এক ভাই যদি তিন শ' টাকা মাইনের আপার ডিভিশন ক্লার্ক হয়, তার পরিচয় দেব সগর্বে, আর বি-এ ফেল অন্য ভাই যদি ওভারটাইম নিয়ে মাসে সাড়ে চার শ' টাকার মজুর হয় কোন কারখানায়, চেপে যাব তার পরিচয়টা, বলব, 'কী যেন করে ঠিক জানি না।' আমাদের বোনের বা মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ এলে হোক না কম রোজগেরে, ওই মজুরের চেয়ে কেরানিবাবুকেই হবে বেশী পছন্দ। তাই চাকরি খালি থাকলেও ওসব লাইনে যেতে সাধারণ লোকের এত অনিচ্ছা। হত অন্য দেশ, ডাণ্ডা মেরে পাঠাত সরকারের পছন্দমত চাকরিতে। ভুটানের জংগল আর কুমায়ুনের পাহাড় কোন কিছুই বাধা হত না। আমার হাতে একবার এই ভারটা দিয়ে কেউ দেখুক না, এক বছরের মধ্যে সব সমস্যার সমাধান করে দিতাম।"

"ভাগ্যিস আপনাকে কেউ এ ভারটা দেয় নি" আমি বলি—"দিলে দেশের দুর্গতি বাড়ত বই কমত না। এত বড় একটা জলজ্যান্ত সমস্যাকে যে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চায়, তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ভাল চাকরি পেলে কেউ বাংলাদেশ ছেড়ে কোথাও যাবে না, আমি তা বিশ্বাস করি না যত সব বাজে কথা।"

"ওই তো"—গণপতিবাবু তবু হাল ছাড়েন না, বলেন—"ও, চাকরির আগে 'ভাল' কথাটি থাকা চাই, তবেই যাবে!"

"নিশ্চয়ই"—আমার জবাব—"ভাল না হলে সেটাকে চাকরি-ই বলা যায় না।"

"তাহলে তোমাদের ওই তথাকথিত বেকার সমস্যারও কোনদিন সুরাহা হবে না!"—গণপতিবাবু কথাটা রেগেমেগেই বলেন।

"এই কথাটা বলতে পারেন বাইরে দাঁড়িয়ে?"—আমি বলি।

"না বাবা, ওটা পারব না। বাইরে বললে আমাকে লোকে তেড়ে মারতে আসবে, বলবে 'দালাল', প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্রাজ্যবাদীর চর ইত্যাদি ইত্যাদি।"

তাই বলা উচিত—আমার স্বগতোক্তি।

—চাণক্য

বর্তমান পরিস্থিতি

দেশে এবার ঠিক সময়ে বেশ বৃষ্টি হওয়ায় (এমন কি বিহারেও অল্প বৃষ্টি হয়েছে) ফসল ভালো হবে আশা করা যায়। কিন্তু এখন যে বীজ বোনা হচ্ছে তা শস্য হয়ে বিক্রির জন্য বাজারে আসতে কয়েক মাস লাগবে। পর পর তিন বছর খরা বা অজন্মা হওয়ার সম্ভাবনা কমই ছিল। এ বছর প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য সরবরাহ ১ কোটি ৪০ লক্ষ টন কম পড়বে হিসাব করা হয়েছে। খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ এ পর্যন্ত মোট ৭০ লক্ষ টনে দাঁড়িয়েছে। অন্য রাষ্ট্রগুলি নগদ অথবা প্রকৃত আকারে ১৫ লক্ষ টন শস্য দিলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ১৫ লক্ষ টন শস্য সরবরাহ করবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আগামী এক মাসের ভেতর অন্তত ৩০ লক্ষ টন শস্য না পাওয়া গেলে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী খাদ্য আমদানি বন্ধ হয়ে যাবে।

১০ লক্ষ অথবা বেশি লোকসংখ্যার নগরগুলি এবং আসানসোল ও কোইম্বাটোরের মত শিল্প কেন্দ্রের জন্য ৩০ লক্ষ টন শস্য যোগাড় করতে হবে। তা ছাড়া, কেরালার মত বড়ো রকমের ঘাটতি রাজ্যের প্রয়োজন মেটাতে আরো ১০ লক্ষ টন লাগবে। বস্তুত, র‍্যাশন ও ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সনের ভেতর যেখানে ৪০ লক্ষ টন শস্য বণ্টন করা হয়েছে ১৯৬৬ সালে সেখানে ঐ পরিমাণ ১ কোটি ৪০ লক্ষ টনে দাঁড়ায় এবং এ বছর ১ কোটি ২০ লক্ষ টনে নেমে আসে।

জনসাধারণের জন্য শস্য বণ্টন ব্যবস্থা অতীতে কেন্দ্রীয় সরকার চালু রাখতে পেরেছে আমদানির উপর বেশি নির্ভর করে। বিশ্বের খাদ্য উদ্বৃত্ত কমে যাওয়ায় ভারত ভবিষ্যতে আর আমদানি সম্বন্ধে আগের মতো নিশ্চিন্ত হতে পারে না। আমদানি হ্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে শস্যের আভ্যন্তরিক সংগ্রহের গুরুত্ব স্বভাবত বেড়ে গেছে। সংগ্রহ যত কম হবে, অনটন অথবা মূল্যবৃদ্ধি থেকে ক্রেতাদের রক্ষা করা অথবা খোলা বাজারের লেনদেন নিয়ন্ত্রণ ততই কঠিন কাজ হয়ে পড়বে।

মধ্য প্রাচ্য সংকটের তাৎপর্য

মধ্য প্রাচ্য সংকটের ফলে জাহাজে করে খাদ্য নিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়েছে। ২৫০,০০০ টন বোঝা নিয়ে যে জাহাজগুলির সারা জুন মাস ধরে ভারতীয় বন্দরসমূহে পৌঁছবার কথা ছিল সেগুলিকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আসতে হচ্ছে। সমান পরিমাণের খাদ্যশস্যের অনটন এ মাসে দেখা দেবে মনে হয় এবং সেই আশঙ্কায় সমস্ত রাজ্যগুলির (এমন কি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বিহারের) খাদ্যের বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে, ভারতের জাহাজে করে মাল নিয়ে আসার খরচ গেছে বেড়ে।

বৈষয়িক উদ্যোগ আরম্ভ হবার পর দ্রব্যমূল্য সবচেয়ে বেশি বেড়েছে ১৯৬৬-৬৭ সালে—বার্ষিক শতকরা ১৫·৭ ভাগ। না বললেও চলে, দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত বৃদ্ধি বাঁধা আয়ের লোকদের প্রকৃত আয়ের ক্ষয় ঘটিয়েছে। কৃষি বা শিল্প উৎপাদনের ঝুঁকিবহুল ক্ষেত্রে মূলধন খাটানোর চাইতে ফটকা লাভের আশায় জিনিসপত্র মজুত করে রাখা আকর্ষণযোগ্য হয়ে উঠেছে। সঞ্চয়ের হার ১৯৬৬-৬৭ সালে জাতীয় আয়ের শতকরা ১০ ভাগ থেকে বর্তমান বছরে প্রায় শতকরা ৮ ভাগে নেমে এসেছে। ১৯৭৬ সালের ভেতর জাতীয় আয়ের শতকরা ২০ ভাগ সঞ্চয় করার যে সংকল্প গোড়ায় নেওয়া হয়েছিল তা আজ দুঃসাধ্য মনে হতে পারে। অর্থ সম্প্রসারণ দ্বারা বাজেটের ঘাটতি পূরণ করার ঝোঁক বন্ধ না করলে মূল্যস্ফীতি অব্যাহত থাকবে। শিল্পের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে চলবে এবং মূল্যস্তর উঠে যাবে উপরের দিকে। তাতে আভ্যন্তরিক বাজারে ক্রেতাদের দিক থেকে যেমন বাধা আসবে, সেই রকম, ভারতীয় দ্রব্য রপ্তানির বাজারে মূল্য প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে না।

পশ্চিমের দেশগুলিকে বয়কট করার ফলে আরব রাষ্ট্রপুঞ্জের বহির্বাণিজ্যে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে ভারত তার সুযোগ নিতে চেষ্টা করছে। আমাদের দেশ সম্প্রতি মিশরকে ৬০ লক্ষ পাউন্ড ঋণ দেবার প্রস্তাব করেছে। সেখানকার বাজারে ভারত বিক্রি করতে চেষ্টা করছে রেলওয়ে সরঞ্জাম, ট্রাক, ওষুধপত্র, হাসপাতালের জিনিসপত্র, টায়ার; এ সব সামগ্রী রপ্তানি করতে তাকে আগে বেগ পেতে হয়েছে। সন্দেহ নেই, যে সময় বেশ কয়েকটি ভারতীয় শিল্পে মন্দার লক্ষণ দেখা দেওয়ায় রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত পাওয়া যাচ্ছে তখন মিশরের বাজারে বিক্রি বাড়াবার নীতি বৈষয়িক দিক থেকে সমর্থনযোগ্য।

দেশের ভিতর সহজে বিক্রির সুবিধা আছে বলে বেশির ভাগ ভারতীয় শিল্প বিদেশের বাজারে বিক্রির সম্ভাবনা [illegible] পরীক্ষা করে দেখেনি। বাইরে আমাদের দেশ সম্বন্ধে যে ছবি গড়ে উঠেছে তা হল ভারত একটা কৃষিনির্ভর দেশ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতের শিল্পোৎপাদনের একটা দৃঢ় ভিত্তি আছে। এটা বাইরে জানিয়ে দেওয়া দরকার। এবং তা করবার একটা উপায় হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে উৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য দেখানো। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং তার উৎকর্ষের বৃদ্ধিসাধন দেশের রপ্তানি সম্প্রসারণের আবশ্যিক শর্ত।

কেনেডি-রাউণ্ড আলোচনা

উন্নয়নশীল দেশগুলির বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অবস্থার উন্নতি এবং তাদের বৈষয়িক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে সম্প্রতি আলাপ-আলোচনা হয়ে গেল। বাণিজ্য শুল্ক-সংক্রান্ত কেনেডি চক্র আলোচনার ফলে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে উচ্চ-প্রধান দেশের (চীন ছাড়া) সব দ্রব্যসামগ্রী অবাধে বিক্রি করতে পারবে; পাট শিল্প দ্রব্য রপ্তানি করার ব্যাপারেও সুবিধা পাওয়া গেছে। এখানে উল্লেখ্য, আলোচনার ভিত্তির বছর ১৯৬৪-৬৫ সাল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ছিল ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার। ঐ বছর ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায়ের বাজারে ভারতের রপ্তানির মোট মূল্য ছিল ৫৭ কোটি টাকা। আশার কথা, এই অঞ্চলে কার্পাস বস্ত্র বিক্রির জন্য যে অংশ নির্ধারিত হয়েছে তার পরিমাণ হতে পারে প্রায় ৮০,০০০ টন। ১৯৬৪-৬৫ সনে ব্রিটেনে ভারতের মোট রপ্তানির মূল্য দাঁড়িয়েছিল ১৬৫ কোটি টাকায়। তার ভেতর ৪৫ কোটি টাকা মূল্যের রপ্তানির প্রতি আর পক্ষপাত দেখানো হবে না, কেনেডি-রাউণ্ড আলোচনায় স্থির হয়েছে। আক্ষেপের বিষয়, উন্নয়নশীল দেশগুলির রপ্তানির পথে শুল্ক ছাড়া অন্যান্য বাধা-নিষেধ সরিয়ে নেওয়ার দিকে আলোচনা এগোয় নি।

অর্থ সাহায্য নয়, অবাধ রপ্তানি

উন্নয়নকামী দেশগুলি যাতে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য সমৃদ্ধ দেশের বাজারে বিক্রি করতে পারে, অগ্রসর দেশসমূহের সেদিকে চেষ্টা করা উচিত। ঋণ অথবা অর্থ সাহায্য করার চাইতে, দরিদ্র দেশগুলির রপ্তানি বাড়াবার সুযোগ করে দেওয়া এখন একান্ত দরকার। না হলে, ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যকার ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার সংকল্প ও সদিচ্ছা, এমন কি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা কাগজে-কলমে অথবা কল্পনায় থেকে যাবে।

শান্তিকুমার ঘোষ

দোকানের পরিবেশটি
স্নিগ্ধ, আরামপ্রদ ক'রে তুলুন

জি.ই.সি-র আধুনিকতম কারিগরী উৎকর্ষ দ্বারা নির্মিত "এভারেস্ট" সর্বাপেক্ষা সুদৃশ্য সিলিং ফ্যান, যাহা আপনি কিনিবেন।

জি.ই.সি-র ষ্ট্রীম লাইন করা ও নির্ভুল কোণে স্থাপিত-ব্লেড যুক্ত "এভারেস্ট" নিঃশব্দ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়া আপনার প্রয়োজনীয় বায়ু সঞ্চালন দ্বারা শান্ত ও সৌম্য পরিবেশ সৃষ্টি করিবে। আপনি যেখানে যেভাবেই থাকুন না কেন, জি.ই.সি-র এভারেস্ট পাখা টাঙাইয়া আরাম উপভোগ করুন।

দীর্ঘকাল ধরিয়া বহুতর বছরে নির্ঝঞ্ঝাটে আপনাকে সেবা করিবার জন্য বিশেষ ভাবে পরিকল্পিত জি.ই.সি-র তৈয়ারী "এভারেস্ট" পাখার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বছরের পর বছর অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

এভারেষ্ট সিলিং ফ্যান

আপনার গ্যারান্টী

TRADE MARK AND PERMITTED USER—THE GENERAL ELECTRIC COMPANY OF INDIA PRIVATE LIMITED

জি ই সি সিলিং ফ্যানের অনুমোদিত ডিলারগণ

কলিকাতা : মেসার্স শ্রীনরসিংসহায় মদনগোপাল ইলেকট্রিক কোং প্রাইভেট লিঃ, ৫৫ এজরা ষ্ট্রীট; মেসার্স জে এন ইলেকট্রিক কোং, ৫০ এজরা ষ্ট্রীট, মেসার্স খান্না ইলেকট্রিক কোং, ৩৪ এজরা ষ্ট্রীট; মেসার্স এস বি ইলেকট্রিক মার্ট (পি) লিঃ, ২২ ব্রেবোর্ন রোড; মেসার্স চ্যাটার্জি ব্রাদার্স, ৭ পোলক ষ্ট্রীট; মেসার্স কন্টিনেন্টাল ইলেকট্রিক অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি, ২৬/১ পোলক ষ্ট্রীট; মেসার্স টি মদন অ্যান্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ, ১২ লোয়ার চিৎপুর রোড; মেসার্স এস খৈতান অ্যান্ড কোং, ৬বি বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট; মেসার্স ইলেকট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউটার্স, ৩ ম্যাঙ্গো লেন; মেসার্স ইস্টার্ন ট্রেডিং কোং, ২০ ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট; মেসার্স প্রকাশ কমার্শিয়াল কোং, ১৮ রবীন্দ্র সরণী (১৮নং দোকান); মেসার্স কে সি মোহন্তা, ১১ এজরা ষ্ট্রীট; মেসার্স সি সি সাহা লিমিটেড, ১৭০ ধর্মতলা ষ্ট্রীট; বৈজনাথ চৌবে অ্যান্ড কোং, ৩৭-৩৯ এজরা ষ্ট্রীট, **আসানসোল :** মেসার্স রামস্বরূপ আগরওয়াল, লেটন ষ্ট্রীট; **মেদিনীপুর :** মেসার্স এস এন কুণ্ডু অ্যান্ড সন্স, শিববাজার; **দুর্গাপুর :** মেসার্স লাইটহাউস, বেনাচিটি; **বাঁকুড়া :** মেসার্স গোয়েঙ্কা ষ্টোর্স, সুভাষ রোড; **চন্দননগর :** শঙ্কর ইলেকট্রিক ষ্টোর্স, লক্ষ্মীগঞ্জ বাজার; **শিলিগুড়ি :** মেসার্স সুলোক অ্যান্ড কোম্পানি, শ্রীভবন; **মালদহ :** রেডিও ইলেকট্রনিকস কর্পোরেশন, নেতাজী সুভাষ রোড; **ওড়িশা, ভুবনেশ্বর :** মেসার্স ইলেকট্রিক্যাল সেলস অ্যান্ড সার্ভিস, বুদ্ধনগর; **কটক :** এস বি ইলেকট্রিক মার্ট; কে সি মোহন্তা, বক্সিবাজার; পরশুরাম ফোটোগ্রাফিক ষ্টোর্স, মেইন রোড, জয়পুর, কোরাপুট জেলা; **সম্বলপুর :** মেসার্স কেদারমল, লক্ষ্মী টকীজ রোড; **আসাম :** মেসার্স জেমস ওয়ারেন অ্যান্ড কোং, গৌহাটি ও ডিব্রুগড়।
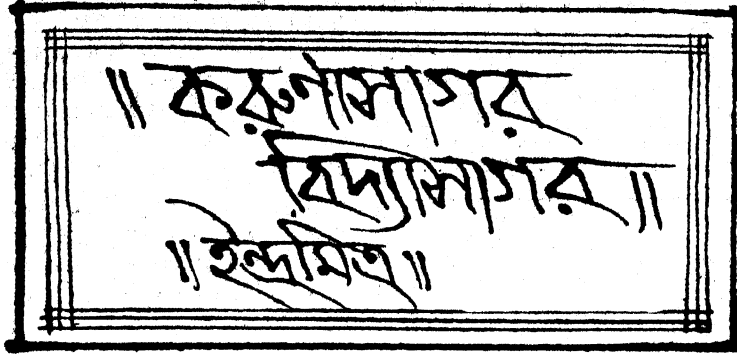
১৪

আবার চাকরি নিলেন বিদ্যাসাগর। পাঁচ হাজার টাকা জামিন দিয়ে ১৮৪৯ সালের ১ মার্চ বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ হলেন। আশি টাকা মাইনে।

কিন্তু পুরোপুরি দু বছরও কাটল না সেখানে।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৮৪৬ সালের ২৭ জুন। ১৮৫০ সালের নভেম্বরে মদনমোহন জজ-পণ্ডিত হয়ে মুর্শিদাবাদে চলে গেলেন। অতঃপর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য শ্রেণীর অধ্যাপক কে হবেন? বিদ্যাসাগর। অন্তত ময়েট সাহেবের সেইরকম ইচ্ছা। ময়েট সাহেব কাউন্সিল অব এডুকেশনের সেক্রেটারি।

বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ। নানা কারণে তিনি তখন সাহিত্য শ্রেণীর অধ্যাপক হয়ে সংস্কৃত কলেজে আসতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু ময়েট সাহেবের একান্ত ইচ্ছা যে, বিদ্যাসাগর সাহিত্য শ্রেণীর অধ্যাপক হয়ে সংস্কৃত কলেজে আসেন।

বিদ্যাসাগর জানিয়ে দিলেন যে, কাউন্সিল অব এডুকেশন তাঁকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দিলে তিনি সংস্কৃত কলেজে আসতে রাজী আছেন। ময়েট সাহেবের কথায় বিদ্যাসাগর এই মর্মে একখানা চিঠিও লিখে দিয়েছেন।

১৮৫০ সালের ৫ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। নব্বুই টাকা মাইনে।

সাব্যস্ত হল, সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর একটি বিস্তারিত রিপোর্ট দাখিল করবেন।

একটি বিস্তারিত রিপোর্ট রচনা করেছেন বিদ্যাসাগর। রিপোর্টে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে বিধি-ব্যবস্থার নানা পরিবর্তন প্রস্তাব করেছেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হলে, বিদ্যাসাগরের নিশ্চিত আশা, সংস্কৃত কলেজ প্রকৃত সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান হবে, সংস্কৃত কলেজ উন্নত ধারার স্বদেশী সাহিত্যের উৎসস্থল হবে এবং এই কলেজের ছাত্ররাই উপযুক্ত হয়ে উত্তরকালে স্বদেশবাসীদের মধ্যে সেই সাহিত্যের সুফল ব্যাপ্ত করে দেবে। রিপোর্টের শেষাংশে বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"In conclusion. I beg leave to observe, that the chances now proposed by me in the system of the college all the results of a long and anxious consideration of the subject. They are all extensive, but I have endeavoured to select only those which are absolutely necessary for the efficiency of the institution, and which are quite practicable."

সাহিত্যের অধ্যাপক তো রইলেনই, উপরন্তু, ১৮৫১ সালের ৫ জানুয়ারি থেকে বিদ্যাসাগর হলেন সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সেক্রেটারি।

এদিকে প্রস্তাব হল—সংস্কৃত কলেজে আর কোনো সেক্রেটারি বা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি থাকবেন না, তার বদলে থাকবেন একজন প্রিন্সিপাল। কে প্রিন্সিপাল হবেন?

১৮৫১ সালের ৪ জানুয়ারি ময়েট সাহেব একখানা চিঠিতে বাঙলা গবর্নমেণ্টকে লিখেছেন :
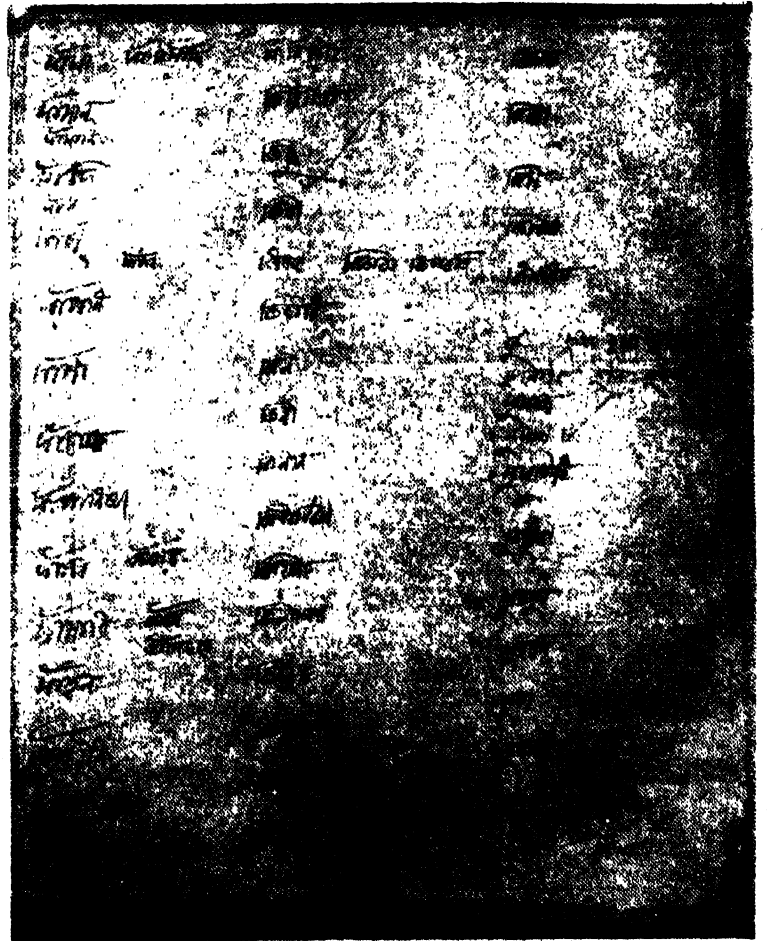
বিদ্যাসাগর কৃত শব্দ-মঞ্জরীর পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। পাণ্ডুলিপিটি বর্তমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে

"For the office of principal by far the fittest person known to the Council, as to those well acquainted with the subject whom they have consulted, is Pandit Ishwarchandra Sharma who has been recently appointed to the Professorship of Sahitya. He is not only a first rate Sanskrit Scholar, but is well acquainted with English, and is considered the most elegant Bengali scholar in the Presidency . . . . . .

He is, in addition, a man of an amount of decision and energy of character rarely met with in a native of Bengal—qualities essential to the proper discharge of the functions of a Principal . . . ."

১৮৫১ সালের ২২ জানুয়ারি থেকে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হলেন বিদ্যাসাগর। দেড় শো টাকা মাইনে।

আগে বিদ্যাসাগর এক দিনে পায়ে হেঁটে কলকাতা থেকে বীরসিংহে যেতেন, এক দিনে বীরসিংহ থেকে কলকাতায় আসতেন। পথের মধ্যে কেবল মসাট নামে এক জায়গায় একবার দাঁড়াতেন, একটা ডাব খেতেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি করার সময় প্রায়ই বীরসিংহে যাওয়া-আসা করতেন। কিন্তু সংস্কৃত কলেজে চাকরি করার সময় তত ঘন ঘন বীরসিংহে যাওয়া হয়ে উঠত না।

সংস্কৃত কলেজের যখন প্রিন্সিপাল, তখনও তিনি প্রায়ই হেঁটে বীরসিংহে যেতেন। সঙ্গীদের কারো কাছে ভারী মালপত্র থাকলে বিদ্যাসাগর খানিক মালপত্র নিজে নিতেন, মাথায় নিয়ে হাটতেন। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল বিদ্যাসাগর মাথায় মালপত্র চাপিয়ে পায়ে হেঁটে পথ পাড়ি দিচ্ছেন!

একবার একটা কাণ্ড হয়ে গেল।

মাথায় মালপত্র নিয়ে বিদ্যাসাগর তো চলেছেন। কলেজের দুজন দারোয়ানের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পথে। কলেজের প্রিন্সিপালকে সেই অবস্থায় দেখে ওরা তাঁর কাছ থেকে মালপত্র নেবার বিস্তর চেষ্টা করল। কিন্তু বিদ্যাসাগর কিছুতেই রাজী হলেন না। মিষ্টি কথায় ওদের বিদায় দিয়ে বিদ্যাসাগর মাথায় মালপত্র নিয়ে যেমন যাচ্ছিলেন হেঁটে চললেন।

আরেকবার। সেবার বিদ্যাসাগর বীরসিংহ থেকে কলকাতায় আসছেন। হ্যাঁ, হেঁটেই আসছেন। পথে দেখলেন, একটা মাঠের মধ্যে একজন বুড়ো চাষা মাথায় মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হয়েছে কি?

এ একজন জোয়ান ছেলের কাণ্ড। ওই বুড়োর গুণধর ছেলে। জোয়ান ছেলে বুড়ো বাপের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু চলবার শক্তি নেই বুড়োর, তাই সে অমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

জোয়ান ছেলের কথা শুনে আর বুড়ো বাপের অবস্থা দেখে বিদ্যাসাগরের দু চোখ জলে ভরে উঠল। বুড়োর মাথা থেকে মালপত্র নিয়ে বিদ্যাসাগর নিজের মাথায় তুললেন। বুড়োর বাড়ি সেখান থেকে দু-তিন ক্রোশ দূরে। নিজের মাথায় মালপত্র নিয়ে বুড়োকে সেই বাড়িতে পোঁছে দিয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর। তারপর আবার হাঁটতে হাঁটতে কলকাতায় চলে এলেন।

হেঁটে বিদ্যাসাগর কখনো ক্লান্ত হননি। জীবনের শেষ অবস্থায় যখন কিছুই খেয়ে হজম করতে পারতেন না, বিদ্যাসাগর ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করলেন—কী করলে খেয়ে হজম করা যায়?

ডাক্তারেরা বললেন—খুব হাঁটিতে আরম্ভ করুন।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—কতক্ষণ ধরে হাঁটিব।

—যতক্ষণ না ক্লান্তি বোধ করেন।

—তা হলে তো দিনরাত হাঁটতে হয়, কারণ হেঁটে আমি কখনো ক্লান্তি বোধ করি না।

প্রিন্সিপাল হয়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের বিধি-ব্যবস্থার আমূল অদল-বদল করেছেন।

সংস্কৃত কলেজে নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ছিল না। ছাত্রেরা তো দূরের কথা, অধ্যাপকেরা পর্যন্ত যখন খুশি কলেজে আসেন, বড়ো দেরি করে আসেন।

বিদ্যাসাগরের একান্ত ইচ্ছা, অধ্যাপকেরা ঠিক সময়ে কলেজে আসেন। কিন্তু সে কথা অধ্যাপকদের মুখ ফুটে বলবার উপায় নেই। এ'দের প্রায় সকলের কাছেই বিদ্যাসাগর এককালে পড়েছেন। এককালে যাঁদের ছাত্র ছিলেন, আজ প্রিন্সিপাল হয়ে কেমন করে তাঁদের মুখ ফুটে ঠিক সময়ে কলেজে আসতে বলবেন।

ভেবে-চিন্তে একটা উপায় বের করলেন বিদ্যাসাগর। যখনই দেখেন একজন অধ্যাপক দেরি করে কলেজে আসেন, বিদ্যাসাগর তাড়াতাড়ি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ান, বলেন—এই এলেন নাকি?

কোনো রাগ নয়, কোনো হুকুম নয়, সামান্য একটি জিজ্ঞাসা। কিন্তু তাতেই আশ্চর্য সুফল হল। দিন কয়েকের মধ্যেই দেখা গেল, অধ্যাপকেরা সময়মতো কলেজে আসছেন।

তবে একজন অধ্যাপক—নাম জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—কিছুতেই সময়মতো আসেন

না। সবচেয়ে দেরি করে আসেন তিনি। তাঁকে কিছুই বলতে পারেন না বিদ্যাসাগর। 'এই এলেন নাকি?'—এটুকুও নয়।

তাঁর জন্য অতএব আরেক ব্যবস্থা। জয়নারায়ণের অপেক্ষায় বিদ্যাসাগর চুপচাপ কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। জয়নারায়ণ দেরি করে আসেন, বিদ্যাসাগরের সামনে দিয়ে চলে যান, বিদ্যাসাগর চুপ। দিনের পর দিন এইরকম চলল। শেষ পর্যন্ত একদিন জয়নারায়ণ রাগ করে বিদ্যাসাগরকে বললেন—তুমি যে কিছু বলো না, এতেই সর্বনাশ করলে। কিছু বললে একটা জবাব দিতে পারতাম। কেন দেরি হয়, তাও বলতে পারতাম। এমন করে জব্দ করলে আর উপায় কি। আচ্ছা, মরি আর বাঁচি, কাল থেকে ঠিক সময়ে আসব।

একজন অধ্যাপক একবার বলেছেন—যদিও বিদ্যাসাগর আমার ছাত্র, তবু তার সংগে কথাবার্তা কইতে আমার ভয় হয়।

ছাত্রেরা যখন খুশি কলেজে আসত, যখন খুশি চলে যেত। সেসব অনিয়ম বিদ্যাসাগর বন্ধ করে দিলেন।

হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন সেকালের সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। উত্তরকালে তিনি লিখেছেন :

"আমি কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, ১০॥টা হইতে ৪॥টা পর্যন্ত কলেজের কার্য হয়। বিদ্যাসাগর নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন যে, ১০॥টা হইতে ১টা পর্যন্ত রোজ পড়া হইবে। তৎপরে ১টা হইতে ২টা পর্যন্ত খেলিবার ছুটি। তৎপরে ২টা হইতে ৪॥টা পর্যন্ত সংস্কৃত পাঠনা হইবে। এই নিয়ম অনুসারে প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক মহাশয়দিগকে (ন্যায়, স্মৃতি ও অলংকার—এই তিন শ্রেণীর অধ্যাপকদিগকে) প্রায় বৈকালে আসিতে হইত। এই নিয়ম অনেক দিন চলিয়াছিল। পরে খেলিবার ছুটি আধ ঘণ্টা হওয়াতে ৪টার পর কলেজ বন্ধ হইতে লাগিল।

"আমরা দেখিয়াছি—বিদ্যাসাগর মহাশয় ১০॥টার ঘণ্টা বাজিলে একবার প্রত্যেক গৃহে শিক্ষক আসিয়াছেন কিনা দেখিয়া যাইতেন। খেলিবার ছুটির পর আর একবার প্রত্যেক গৃহে আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। ফলতঃ কলেজটি যেন তাঁহার নিজের সংসার ছিল।"

যতক্ষণ কলেজে ততক্ষণ বিদ্যাসাগরের গম্ভীর, কঠিন মূর্তি। তাঁর সামনে মাথা তুলে উঁচু গলায় কথা বলবে, এমন সাহস কারো নেই।

কলেজে যখন গোলমাল হত, দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর এমন গলায় 'আস্তে' বলে উঠতেন, সমস্ত কলেজ মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যেত।

কিন্তু কলেজের বাইরে ছাত্রদের কাছে বিদ্যাসাগরের আবার আরেক রকম চেহারা। যেন তিনি কলেজের প্রিন্সিপাল নন, যেন তিনি নিজেও কলেজের একজন ছাত্র।

কী একটা জরুরী কাজে কোথায় একদিন দেরি হয়ে গেল। সেখান থেকে বাড়িতে এসে খাওয়া-দাওয়া করে যেতে গেলে কিছুতেই ঠিক সময়ে কলেজে পৌঁছনো যাবে না।

বিদ্যাসাগর তাই আর বাড়ি গেলেন না। পথে ছাত্রদের বোর্ডিং। সেখানেই ঢুকে পড়লেন। একখানা ভিজে কাপড় পরে কুয়ো থেকে কয়েক ঘটি জল তুলে মাথায় ঢাললেন। ছাত্রেরা খেতে বসেছে, তাদেরই সংগে বসে গেলেন। মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই কত গল্প করলেন, কত হাসিঠাট্টা করলেন। ছাত্রদের মহা আনন্দ।

সকলের পাত থেকে এক এক থাবা ভাত

নিয়ে খাওয়া শেষ করলেন বিদ্যাসাগর। সকলের আগে উঠে পড়লেন, সকলের আগে গিয়ে কলেজে হাজির হলেন।

এই ঘটনার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে এখানে আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করা যেতে পারে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তখন ছেলেমানুষ। হরপ্রসাদের বাড়ি নৈহাটিতে। সকালবেলা বাড়ির মেয়েমহলে একদিন মস্ত শোরগোল উঠল— ও মা, এমন তো কখনো শুনিনি, বামুনের ছেলে অমৃতলাল মিত্তিরের পাত থেকে রুইমাছের মুড়োটা কেড়ে খেয়েছে!

পাঁচজন পাঁচরকম কথা কইতে লাগলেন: ঘোর কলি! সব একাকার হয়ে যাবে! জাতজন্ম আর থাকবে না!

একজন মিত্তিরের পাত থেকে রুইমাছের মুড়ো কেড়ে খেয়েছে—কে সেই বামুনের ছেলে? হরপ্রসাদের জানতে ইচ্ছা হল।

—কে কেড়ে খেয়েছে?

হরপ্রসাদের মা বললেন—জানিস নি? বিদ্যাসাগর।

—তিনি কি এখানে এসেছেন?

হরপ্রসাদের মা বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ—কাল থেকে এসেছেন।

আবার সংস্কৃত কলেজের কথায় ফিরে আসা যাক।

বিদ্যাসাগর একদিন দেখলেন, একজন অধ্যাপক ক্লাসের ছেলেদের দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। অধ্যাপককে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর। বললেন—কি হে! তুমি যাত্রার দল খুলেছ নাকি? তাই ছোকরাদের তালিম দিচ্ছ? তুমি বুঝি দূতী সাজবে?

আরেকদিন দেখলেন, একজন অধ্যাপকের টেবিলে একখানা বেত পড়ে আছে। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—বেত কেন হে?

অধ্যাপক বললেন—মানচিত্র দেখানোর সুবিধা হয়।

বিদ্যাসাগর বললেন—রথ দেখা আর কলা বেচা দুইই হয়। ম্যাপ দেখানোও হয়, ছেলেদের পিঠেও পড়ে।

বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা নয় যে, অধ্যাপকেরা ছাত্রদের মারপিট করেন। কিন্তু ছাত্রেরা যদি নিজেদের মধ্যে মারামারি করে?

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের প্রায়ই তো ঝগড়া-বিবাদ হত, মারামারি হত। নেহাৎ খালি হাতে মারামারি নয়, মারামারির সময় ইট-পাটকেলও ছোঁড়া হত।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা তেতলার ছাদে ইট-পাটকেল যোগাড় করে রাখত, মারামারির সময় উপর থেকে ছুঁড়ে মারত সেসব। বিদ্যাসাগর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন, কোন্ পক্ষের জিত হয়, কোন পক্ষের হার হয়।

সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া আর কেউ ভর্তি হতে পারত না। ১৮৫১ সালের ৯ জুলাই থেকে বিদ্যাসাগর নিয়ম করলেন, কায়স্থেরাও সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হতে পারবে। অষ্টমী ও প্রতিপদ তিথিতে সংস্কৃত কলেজ বন্ধ থাকত। ১৮৫১ সালের ২৬ জুলাই থেকে বিদ্যাসাগর নিয়ম করলেন, অষ্টমী বা প্রতিপদে নয়, কেবলমাত্র রবিবার সংস্কৃত কলেজ বন্ধ থাকবে। ১৮৫১ সালের ডিসেম্বরে নিয়ম হল, যে-কোনো সম্ভ্রান্ত হিন্দুসন্তান সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হতে পারবে।

১৮৫২ সালের ১২ এপ্রিল বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে 'Notes on the Sanscrit College' শীর্ষক আরেকটি পরিকল্পনা দাখিল করেছেন। এই পরিকল্পনা প্রসঙ্গে হ্যালিডে ১৮৫২ সালের ৩০ জুন, লিখেছেন:

"The accompanying paper has been drawn up by the Principal of the Sanscrit college at my request.

It is the result of several consultations I have held with the Principal and I lay it before the Council as deserving, in my humble judgment, of very careful consideration."

সংস্কৃত কলেজের জন্ম ১৮২৪ সালে। সেই সময় থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ছাত্রেরা এই কলেজে বিনা মাইনেয় পড়েছে, ভর্তি হতেও পয়সা লাগেনি। কিন্তু তার ফল সব সময় ভালো হয়নি। হয়তো কেউ ভর্তি হয়ে চলে গেছে, দিনের পর দিন যাচ্ছে, সেই ছাত্রের আর দেখা নেই। অনেক দিন পর হাজিরাখাতা থেকে নাম কাটা গেল, তখন হয়তো ছাত্রটি এসে উপস্থিত। আবার ভর্তি হতে এসেছে। পয়সা-কড়ি যখন লাগে না, তখন আর বাধা কোথায়।

তা এভাবে চললে কলেজে শৃঙ্খলা থাকে না।

১৮৫২ সালের আগস্ট মাস থেকে বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় নিয়ম হল, সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হতে দু টাকা লাগবে। হাজিরাখাতা থেকে একবার নাম কাটা গেলে আবার ভর্তি হতে আবার ওই দু টাকা দিতে হবে। শুধু ভর্তি-ফি নয়, ১৮৫৪ সালের জুন মাস থেকে নিয়ম হল, সংস্কৃত কলেজে আর বিনা মাইনেয় পড়া যাবে না, এক টাকা মাইনে দিয়ে পড়তে হবে।

তারপর লেখাপড়ার কথা।

যাতে অল্প সময়ে ছাত্রেরা মোটামুটি সংস্কৃত শিখতে পারে, সেজন্য বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনার রীতিনীতি নতুন রকম করে দিলেন।

আগেই বলা হয়েছে, ১৮২৭ সালের মে মাসে সংস্কৃত কলেজে একটি ইংরেজী শ্রেণী খোলা হয়েছিল। আট বছর বাদে সেটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবার সেটি খোলা হয় ১৮৪২ সালের অক্টোবরে। কিন্তু সেবারেও তেমন সুফল পাওয়া যায়নি।

বিদ্যাসাগরের বদ্ধমূল বিশ্বাস, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের একই সঙ্গে সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠা দরকার। সেরকম ব্যবস্থা করতে হলে সংস্কৃত কলেজ নতুন করে গড়ে তুলতে হয়, আরো টাকা চাই। এই বিষয়ে বিদ্যাসাগর ১৮৫৩ সালের ১৬ জুলাই কাউন্সিল অব এডুকেশনকে একখানা চিঠি লিখেছেন।

কলকাতার সংস্কৃত কলেজকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ করে যাচ্ছেন বিদ্যাসাগর, এই সময়ে কাউন্সিল অব এডুকেশনের আমন্ত্রণে কলকাতার সংস্কৃত

কলেজ পরিদর্শন করতে এলেন ১৮৫৩ সালের মাঝামাঝি কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ জে আর ব্যালান্টাইন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ হল ব্যালান্টাইনের। আলাপে আনন্দিত হলেন ব্যালান্টাইন।

কলকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে ব্যালান্টাইন একটি রিপোর্ট দাখিল করলেন কাউন্সিল অব এডুকেশনে। রিপোর্টে ব্যালান্টাইন কলকাতার সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর যেসব ব্যবস্থা করেছেন সেসবের কিছু কিছু অদল-বদল করার পরামর্শ দিয়েছেন।

১৮৫৩ সালের ২৯ আগস্ট কাউন্সিল অব এডুকেশন ব্যালান্টাইনের রিপোর্টটি বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠিয়ে দিল। বিদ্যাসাগর তদুত্তরে আপন বক্তব্য সবিস্তারে জানিয়েছেন। ব্যালান্টাইনের রিপোর্টের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারেননি বিদ্যাসাগর।

সব দিক বিবেচনা করে কাউন্সিল অব এডুকেশন ব্যালান্টাইনের মতেই সায় দিল এবং তদনুসারে ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিল বিদ্যাসাগরকে। আর কাউন্সিল অব এডুকেশনের ইচ্ছা, সংস্কৃত কলেজের পাঠোন্নতি সম্পর্কে বিদ্যাসাগর যেন ঘন ঘন ব্যালান্টাইনের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি করেন।

কিন্তু কাউন্সিল অব এডুকেশনের এই নির্দেশ মেনে নিতে রাজী হলেন না বিদ্যাসাগর। ১৮৫৩ সালের ৫ অক্টোবর বিদ্যাসাগর একখানা আধা-সরকারী চিঠিতে কাউন্সিল অব এডুকেশনের ময়েট সাহেবকে সে কথা স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দিলেন।

এই চিঠিতে সুফল পাওয়া গেল। নিজের বিবেচনার ওপর নির্ভর করে কাজ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা পেলেন বিদ্যাসাগর। কলকাতার সংস্কৃত কলেজকে তিনি নিজের ইচ্ছেমতো গড়ে তুলতে লাগলেন। ১৮৫৩ সালের নভেম্বরে কলকাতা সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী শ্রেণীর জন্য নতুন, বিস্তৃত ও নিপুণ নিয়মাবলী রচিত হল। ইংরেজী হয়ে উঠল অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়। আগে অংক শেখানো হত সংস্কৃতে, পড়ানো হত ভাস্করাচার্যের 'লীলাবতী' ও 'বীজগণিত'। বিদ্যাসাগর সে ব্যবস্থা লুপ্ত করে দিলেন, অতঃপর ইংরেজীতেই অংক শেখানো হতে লাগল।

নতুন ব্যবস্থা বিফল হয়নি। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রসংখ্যা বেড়ে গেল। কাউন্সিল অব এডুকেশন তুষ্ট হল। ১৮৫৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বিদ্যাসাগরের মাইনে বেড়ে গেল। তিন শো টাকা মাইনে হল।

আরেকটা খবর বলা যেতে পারে এখানে। ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ ভেঙে গেল। তার বদলে ১৮৫৭ সালের জানুয়ারিতে হল বোর্ড অব একজামিনার্স। ওই বোর্ডের একজন সদস্য করে নেওয়া হল বিদ্যাসাগরকে। ১৮৬০ সালের মে মাসে বিদ্যাসাগর সেখানে ইস্তফা দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ "তিনি (বিদ্যাসাগর) পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতুস্বরূপ হয়েছিলেন।..... তিনি যা কিছু পাশ্চাত্ত্য তাকে অশুচি বলে অপমান করেননি। তিনি জানতেন, বিদ্যার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের দিগবিরোধ নেই। তিনি নিজে সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন অথচ তিনিই বর্তমান য়ুরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করবার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন......।"

সরকারী কর্মচারীরা বিদ্যাসাগরকে সম্মান করে চলতেন। শিক্ষা বিষয়ের কাজ-কর্মে তাঁরা বিদ্যাসাগরের পরামর্শ নিতেন।

কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে য়ুনিভার্সিটি খোলার জন্য একটা কমিটি হয়েছে। বিদ্যাসাগর সেই কমিটির একজন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। কলকাতা য়ুনিভার্সিটি হওয়ার পর বিদ্যাসাগর এই য়ুনিভার্সিটির একজন 'ফেলো' মনোনীত হয়েছেন। ১৮৮০ সালে বিদ্যাসাগর পঞ্জাব য়ুনিভার্সিটির 'ফেলো' মনোনীত হয়েছেন।

আরেকটা আশ্চর্য খবর, সংস্কৃত কলেজে একটা কুস্তির আড্ডা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন লিখেছেন: "সংস্কৃত কলেজের ঈশান কোণে একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলানো ছিল। ঐ ঘণ্টা বাজিলে বিদ্যাসাগরের কার্য আরম্ভ হইত। ঐ ঘণ্টা-গৃহের পূর্ব দিকে একটি মালীর ঘর ছিল। ঐ ঘরে অধ্যাপক মহাশয়গণ বিশ্রাম করিতেন ও কেহ কেহ তামাক খাইতেন। ঐ গৃহের পূর্ব দিকে আর-একটি বৃহৎ 'হল্' ঘর ছিল। ঐটিতে 'পণ্ডিতগণ' কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়াম করিতেন। আমি 'পণ্ডিতগণ' বলিলাম, তাহার কারণ, ঊর্ধ্বতন অধ্যাপক-মহাশয়-চতুষ্টয় অর্থাৎ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় ঐ কুস্তির আড্ডায় যোগ দিতেন না। অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ পণ্ডিতগণ অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মদনমোহন তর্কালংকার, এবং হরাশংকর তর্করত্ন—এই কয়েকজন কুস্তির আড্ডায় যোগ দিতেন......। এই ব্যায়াম-কার্য বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থাপিত করেন এবং এ কার্যে তাঁহার খুব উৎসাহ ছিল। এই ব্যায়াম করাতে পণ্ডিত মহাশয়গণ সকলেই খুব স্বাস্থ্যশরীর ছিলেন এবং প্রায় রোগে পড়িতেন না।......বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব সুস্থ শরীর ছিলেন।"

বিদ্যাসাগর একবার কিছু দিনের জন্য সংস্কৃত কলেজের কোনো একটা ক্লাসে ইংরেজী পড়াতে দিলেন কালীচরণ ঘোষকে। কালীচরণের গুণ-যোগ্যতা আছে।

কিন্তু কালীচরণের বয়স অল্প। সেই ক্লাসের ছাত্রদের তাই কালীচরণকে পছন্দ হয়নি। এমন অল্পবয়সী মাস্টারের কাছে আবার পড়া কিসের? কয়েকজন ছাত্র দল বেঁধে অপদস্থ করার চেষ্টা করতে লাগল কালীচরণকে। কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য উঠে-পড়ে লাগল।

বিদ্যাসাগর বিরক্ত হলেন। খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন, কোন কোন ছাত্র কালীচরণের বিরুদ্ধে লেগেছে।

কিন্তু কাউকে ধরা যাচ্ছে না। কোন ছাত্র দোষ কবুল করছে না। দোষী কেউ কেউ নিশ্চয়ই আছে এই ক্লাসে, অথচ সত্য বলার সাহস নেই কারো। মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদী। বিদ্যাসাগর কোনো মিথ্যা সহ্য করার মানুষ নন। তিনি তখন ওই ক্লাসের সব ছাত্রকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

ছাত্রেরা দল বেঁধে নালিশ করল কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে। বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে নালিশের দরখাস্ত দিল। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য জানতে চাইল।

সেই ক্লাসের ছাত্রদের মহাফূর্তি। এবার নির্ঘাত বিদ্যাসাগরের চাকরি যাবে। আনন্দে দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল তারা, বলাবলি করতে লাগল—এবার চাকরি তো যায়, উপায় কি হবে? দাঁড়িপাল্লা ধরতে হবে যে!

অর্থাৎ, চাকরি যাবার পর অবশ্যই বিদ্যাসাগরকে মুদিখানা খুলে পেট চালাতে হবে।

এদিকে বিদ্যাসাগর কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন—কলেজের ভিতরে ছোটোখাটো বিষয় সম্পর্কে প্রিন্সিপালের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকা দরকার। এসব ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ যদি ছাত্রদের নালিশ করার সুযোগ দেয় তো ছাত্রেরা প্রশ্রয় পেয়ে যাবে, ওদের আর শাসনে রাখা যাবে না।

খাঁটি কথা। বিদ্যাসাগরের কথা মেনে নিল কর্তৃপক্ষ। ছাত্রদের দরখাস্ত-টরখাস্ত পাঠিয়ে দিল বিদ্যাসাগরের কাছে। ওই ছাত্রদের কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল—এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর যা করবেন, তাই হবে।

সর্বনাশ হল তা হলে। বিদ্যাসাগর দাঁড়িপাল্লা ধরবেন কিনা, সে তো বহু দূরের কথা, এখন এদের কি উপায় হবে।

না, বিদ্যাসাগরের পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

কিন্তু, কোন ছাত্র প্রথম এগিয়ে যাবে? প্রথম গিয়ে বিদ্যাসাগরের পায়ে পড়বে? কারো সাহস হয় না।

ক্রমশ ছাত্রদের অভিভাবকেরাও জানতে পারলেন ঘটনা। সমস্ত সমস্যার যাতে একটা সুষ্ঠু সমাধান হয়, সেজন্য কয়েকজন অভিভাবক এলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর বলে দিলেন—ছাত্রদের কালীচরণের কাছে পাঠান।

কালীচরণের কাছে গেল ছাত্রের দল। দোষ স্বীকার করল, ক্ষমা চাইল। ছাত্রদের নিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে চলে এলেন কালীচরণ।

দলের দু-একজন পাণ্ডাকে বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—কি রে, দাঁড়িপাল্লা কে ধরবে? তোরা, না আমি?

পাণ্ডারা চুপ।

বিদ্যাসাগর কালীচরণকে বললেন—কেমন, এরা তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে তো?

কালীচরণ বললেন—আমি আসতে রাজী হইনি। এরা অনেক অনুনয়-বিনয় করেছে, নিজেদের দোষ কবুল করেছে। তাই সঙ্গে এসেছি। এখন আপনার যা ইচ্ছে হয়, করুন।

বিদ্যাসাগর কালীচরণকে বললেন—তুমি মাফ করতে বললে এদের মাফ করব, নয়তো করব না।

ভেবে-চিন্তে কালীচরণ বললেন—এরা আমার কাছে যতখানি অপরাধ করেছে, তার চেয়ে ঢের বেশী অপরাধ করেছে আপনার কাছে। আপনি যা ইচ্ছে করুন। আমাকে ভার দেবেন না।

ছাত্রেরা বিদ্যাসাগরের পায়ে ধরে কাঁদতে লাগল—আর কখনো এমন কাজ করব না। আমাদের ক্ষমা করুন।

ক্ষমা চাইলে বিদ্যাসাগর বিমুখ হতে পারেন না। বললেন—যা, পা ছেড়ে দে। কলেজে যাস।

ক্রমশ

একটুও দেরী করবার সময় নেই

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার
ব্যথা-বেদনা তাড়াতাড়ি দূর করবার আধুনিক উপায়

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা। 'অ্যাসপ্রো' রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায়!

মাইক্রোফাইণ্ড বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'-তে মেশানো হয়, তা ৩০ গুণ বেশী সূক্ষ্ম করা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। এর ফলে বেদনা নাশ করার শক্তি দ্বিগুণেরও বেশী সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

মুহূর্তের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যায়—অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র ব্যথা দূর করার সক্রিয় উপাদানটি অতি সহজেই এবং খুব শিগ্গির শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেই-জন্যেই মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা বের ক'রে দেয় এবং তার ফল অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

নিম্নোক্ত প্রকারের যন্ত্রণায় নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' খাবেন: ব্যথা-বেদনা • মাথাধরা • গা-ব্যথা • দাঁতব্যথা • গাঁটে-বেদনা • জ্বর-জ্বর ভাব • ফ্লু • ডেঙ্গু জ্বর • গলাব্যথা।

মাত্রা: প্রাপ্তবয়স্ক: দুইটি ট্যাবলেট। প্রয়োজন হলে আবার খাবেন। শিশুদের জন্য: একটি ট্যাবলেট বা আপনার ডাক্তারের নির্দেশমত।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার সর্বাধুনিক উপায়।

নতুন
মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'
তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে

IAS 1467 B.

দুই দিক

এক

সান্ধ্যকালে স্যাকারিন দিয়ে চিনিবিহীন চায়ের পর্ব সমাধা করে সবেমাত্র রেশন-লব্ধ চালের থালাখানা নিয়ে কাঁকর বাছতে বসেছি আর মনে মনে হিসাব করছি, সারা দিনের "মেনু"কে কত সস্তা আর সংক্ষেপ করা যায় এমন সময় হুড়মুড় করে আমার খুড়তুতো বোন খেঁদি এসে উপস্থিত। নিত্য খবরের কাগজের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী কপচাতে কপচাতে দুর্গন্ধ মোটা চালের ছটাকের সঙ্গে আটার রুটি সংযোগ করে পরিবেশন করি আর আপন-জনকে বোঝাই, সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনা লাভও করি যে, দুর্গতির মাত্রা এমন আর কি বেশী হয়েছে। নিজেকে নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক লড়াই চালিয়ে যখন অবসন্ন তখন খেঁদির মত বড়লোক আত্মীয়কে আমার মোটেই ভাল লাগে না। ভোর না হতেই সাপের প্যাঁচ দিয়ে খোঁপা করেছে, তাতে আবার চুনি-পান্না বসানো সোনার ফুল, দুর্দান্ত গরমে জরিদার রেশমী শাড়ি, ভরা পেটের হাঁস-ফাঁসানি আর কণ্টশ্বাসে তার উত্তেজিত অবস্থাকে আরও উদ্দীপিত করেছে। মিনিট পাঁচেক তো কথা আরম্ভ করতেই কেটে গেল।

ব্যাপারটা যা বুঝলাম তাতে তো আমার হতবাক হবার পালা। দিন কয়েক আগে খেঁদির দেওরের বিয়ে গেছে। খেঁদির শ্বশুরবাড়ির এক অংশ থাকেন বর্ধমানে। সেখানে তাঁদের ক্রমবর্ধমান বিত্ত, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, আপামর সাধারণের গদগদ প্রীতি ভালবাসা সবই আছে। অথচ কলকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলে মস্ত শৌখীন বাড়ি করে শ্বশুর মশাই আভিজাত্যের আর এক ধাপ এগিয়েছেন। খেঁদির স্বামী সেখানে কায়েম হয়েছে। তা ছাড়া আত্মীয়স্বজন, শত্রুমিত্র, স্তাবক অনেক আছে কলকাতায় তাঁদের। কাজেই বউভাতের আয়োজন হয়েছিল দুই শহরে। বর্ধমানে অনুগ্রহসিক্ত লোকজন কিছু কিছু বউ দর্শন করেছেন, দর্শনীও দিয়েছেন। কিন্তু আয়োজনের অনুপাতে অল্প ছিল সংখ্যায়। তবে প্রাসাদোপম গৃহের দাসদাসী আর তাদের পোষ্য ইত্যাদির মধ্যে বাড়তি মেঠাই মণ্ডা বিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। দিন দুই পরে কলকাতার দ্বিতীয় উৎসবের পালায় গিয়ে হলো বিপন্ন। বেছে বেছে মাত্র হাজার খানেক লোকের

'সাপের প্যাঁচ দিয়ে খোপা করেছে'

নেমন্তন্ন হয়েছিল। তার শতকরা পাঁচজনও আসেনি। ঘর বোঝাই পান্তুয়া রসগোল্লা লুচি মাংস মাছ সব ভ্যাপসা গরমে পচে গলে উঠছে। ক্যানেস্তারা বোঝাই ঘি আর বস্তা বস্তা ময়দা বেঁচে যাওয়ার পরও এই অবস্থা। ব্যাপারটা আইন ফাঁকি দিয়ে কেরামতি করার কায়দায় কেমন যেন জট পাকিয়ে গেছে। মন খুলে গরীব কাঙালী ডেকে খাওয়াবার সাহস নেই। এমন কি, আশেপাশে ডাস্টবিনে ফেলবার ভরসাও কেউ পাচ্ছে না। খুন করে লাশ লুকোবার মত অবস্থা প্রায়। ঐশ্বর্যের কি নিদারুণ পরিহাস। খেঁদি থেকে আরম্ভ করে খোদ কর্তা পর্যন্ত তটস্থ। ধরা পড়বার আগে পাচার করা প্রয়োজন।

তাই খেঁদি ছুটে এসেছে। গোপনে গস্তি করে এনেছে বিশেষভাবে বায়না দেওয়া আর নানা কসরত করে পাওয়া সব উপাদেয় আহার্য। আমাদের বড় সংসার, হয়তো বা তার সমস্যার শতকরা সিকিটুকু শেষ হবে। খাটের উপর বসে ইনিয়ে-বিনিয়ে নাকী সুরে খেঁদি খবর বলতে শুরু করেছে। "এই যে পোলাও-এর চাল, তা আনতেই কি কম কায়দা করতে হয়েছে! খাস দেরাদুনের বাসমতী। দোকানী গ্যারাণ্টি দিয়েছিল, এর চেয়ে ভাল কোথাও মিলবে না। গরমের গোড়ায় খেঁদির খুড়শাশুড়ী গিয়েছিলেন মুসৌরী পাহাড়ে। সেখানকার স্যাভয় হোটেলের বেয়ারা থেকে নিয়ে নামবার সময় দেরাদুন স্টেশনের কুলিটিকে পর্যন্ত ঘুষ কবুল করা ছিল। প্রাণ হাতে করে পদে পদে সর্পের বিষাক্ত ফণা কাটিয়ে তবে এল সেই বাসমতী। কলকাতায় অবশ্য খুড়শাশুড়ীর খাস বেয়ারা পুলিস-টুলিস সামলে রেখে-ছিল। কিসমিস বাদাম এলাচ দারুচিনির ছড়াছড়ি গেছে সে বাসমতীর ভাঁজে ভাঁজে, তার কি দুর্গতি! কথা বলতে বলতে খেঁদি তো ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলো। চিনির জন্য টাকা দেওয়া ছিল এদিক-ওদিক। যে যা পেরেছে। যে দামে এসেছে তাই সংগ্রহ করেছে। তবে না কারিগর সব রাজী হয়েছে ভিয়েনে ভিড়তে। বাইরে থেকে কুলুপ এঁটে, দরওয়ান পাহারা বসিয়ে ডবল মজুরি দিয়ে তৈরী হয়েছে পান্তুয়া সন্দেশ। ছানা ক্ষীর এসেছে দূর দূরে থেকে। রামাবামার ভুর-

ছুর গন্ধ ভিন্ন বাইরে কোনও প্রকাশ ছিল না। আমাদের শাসনব্যবস্থার ঘ্রাণশক্তি কম বলে গন্ধ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। কিন্তু এখন কি হবে?

বহুক্ষণ চুপ করে শুনছিলাম। আর না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম 'কেন এভাবে এই খাদ্য সংকটে এসব করা হলো? আইন-ই তো সব নয়। আইন তোমরা যদি বা গ্রহ-প্রভাবে এড়িয়ে গেলে কিন্তু যে অপচয় হলো তার কি হবে?'

খেঁদি দমবার পাত্র নয়। সে কি কথা দিদি! লোকে বলবে কি? অমুকের ছেলের বউভাতে পাঁচ-সাত শ' লোক পাতা পেড়েছে। সেও তো তোমার এইসব পোড়া আইন হবার পর। আমার শাশুড়ীর এটি ছোট ছেলে। সাধ আহ্লাদ আছে, মান ইজ্জত আছে। নেমন্তন্ন যাদের করা হয়েছিল তারা এমন করে জব্দ করবে তা কে জানতো। যেখানে যেটি সেরা একত্র করে আমরা ভেবেছিলাম দেখিয়ে দেবো মিত্তিরবাড়ির মান। আইন আইন করে যারা সরায় করে কাজ সারে তারা বুঝবে, ইচ্ছে থাকলে আইন কিছুই নয়। আজ পর্যন্ত জন্মদিন অন্ন-প্রাশনে শ' শ' পাতা উঠেছে। এ তো যজ্ঞি ব্যাপার। বড়লোকের ছোট ছেলের বিয়ে। আলো বাতি আর ফুল সাজাতেই হাজার দশেক নেমে গেছে।

ধনসম্পত্তি বিভবের অলৌকিক শক্তি আছে। সেই ক্লান্ত কাকুতিভরা ফুলো ফুলো

মণিমাসীমা পাড়ার মাসীমা

মুখখানা খেঁদির আবার যেন জ্বলে উঠলো। গরীবের কাছে দান এনেছিল এমন একটা ভাব করে সে উঠে দাঁড়ালো। আমার মনও যেন পাক খেয়ে উঠেছিল। নিতে পারলাম না অন্যায় অবিচারলব্ধ অযাচিত অনুগ্রহ। বিড়বিড় করে বকতে বকতে খেঁদি তার বিরাট মোটরে উঠে আর কোনও কুটুম্বিনীর সন্ধানেই গেল মনে হয়। তবে শেষ পর্যন্ত শুনেছিলাম, 'রাতের আঁধারে রসের আধার সব মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছিল

দুই

সকালের ব্যাপারটায় মন যেন ভার ভার হয়েছিল। আইন করে দেশের কতটুকু উপকার হয়, কে জানে। আইন করার সঙ্গে সঙ্গে আইন ভঙ্গ করা যেন প্রতিপত্তি আর প্রভাবের মাপকাঠি হয়ে উঠছে। কেউ বা আইনকে বজায় রাখার অভিনয় মাত্র করছে। দিনের পর দিন একই উৎসব উপলক্ষে খানা-পিনা চলছে। সংখ্যায় দৈনিক যা নিমন্ত্রিত সজ্জন আসছেন, তা হয়তো আইনের আওতার বাইরে যায় না, কিন্তু অপচয়ের কাল দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে থাকে। কখনও বা 'পূর্বাহ্নে রেশন পাঠাইয়া দিবার।' অনুরোধসহ চিঠি ছাপা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত তো কেউ রেশন পাঠিয়েছে বলে শুনিনি। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে বেলা গড়িয়ে এল। এমন সময় মণিমাসীমা এসে বসলেন। মণিমাসীমা পাড়ার মাসীমা। প্রৌঢ়া মণিমাসীমাকে সবাই ভালবাসে। কারও কোন অসুবিধায় এমন করে প্রাণ দিয়ে করতে কেউ পারে না। মণিমাসীমা নিষ্ঠাবতী বিধবা। আজ ক-দিন ধরে আলু-সিদ্ধ খেয়ে কাটাচ্ছেন। আতপ চাল পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু ছেলের সংসারের অভাব অনটন তাঁকে পীড়া দেয়। গুটিকয়েক কাচ্চাবাচ্চা। তাদের খাওয়াপরা স্কুল করতেই অল্প আয় প্রায় নিঃশেষ হয় যায়। বাকি যা থাকে তাতে সংসার চলে না। মণিমাসীমা উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন। বউটিও ভাল। তবু তাদের অভাবের সংসারে দিন যেন কাটতে চায় না। সবচেয়ে বিপদ হয় কুটুম্বিতা রক্ষা করা। আত্মীয়স্বজন অনেকেই বেশ অবস্থাপন্ন। মণিমাসীমাদের বিপদে আপদে কেউ না এলেও লক্ষ করেছি, উৎসব আয়োজনে এই গরীব আত্মীয়দের তাঁরা ভোলেন না। আজ বিয়ে, কাল বউভাত লেগেই আছে। প্রথম প্রথম দেখতাম মণিমাসীমা তাঁর টুকিটাকি গহনার ছিটে ফোঁটা দিয়ে মান রক্ষা করতেন। তারপরের অধ্যায় বউয়ের টুকিটাকি দিয়ে সারা হতো। কিন্তু এখন সব টুকি-টাকির শেষে কি হবে? ধার করে হলেও মান রাখতে হবে ঘটিবাটি বেচলেও কুটুম্বের
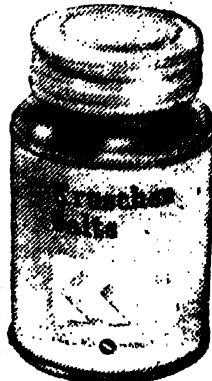
কাছে ইজ্জত হারাতে পারবেন না। বাচ্চা-দের দুধের বরাদ্দ কমিয়ে, বাজারের খরচা কেটে যা হোক কিছু হাতে করে যেতে হবেই। লোকলজ্জা বড় ভয়। গরীবের বেলায় আরও বেশী। সবাই ফিসফাস করবে, আহা উঁহু করবে তাও কি সহ্য করা যায়?

মণিমাসীর পুত্রবধূ আবার খেঁদির শ্বশুরকুলের সংগে সম্পর্কিত। কথায় কথায় সকালের ব্যাপারটা বলতেই মণি-মাসিমা যেন কেমন ম্লান হয়ে গেলেন। নাঃ, খেঁদিরা হৃদয়হীন নয়। সপরিবারে এবার সনির্বন্ধ অনুরোধ করে নেমন্তন্ন করতে এসেছিলেন। মাসের শেষ। হাতে একটি কড়িও নেই। মান রাখা না-রাখার মন-কষাকষিতে বাড়িতে কিছু অসন্তোষ কিছু তর্কবিতর্কও হলো। শেষ পর্যন্ত বড় নাতির অন্নপ্রাশনে মণিমাসীমা যে কাঁসার থালা-খানা দিয়েছিলেন, সেটি বেচে গুটি পাঁচেক টাকা পাওয়া গেল। পাঁচ টাকায় কিই বা হয়? মণিমাসীমা সারা বাজার খুঁজে কিছুই সংগ্রহ করতে পারলেন না। খেঁদিরা বড়-লোক। তাদের ঘরে হয়তো পাঁচ টাকার জিনিস দাসদাসীকে দেওয়া হয়। মণি-মাসীমার ছেলে অফিস ফেরত নিয়ে এল টসটসে কাচের রংকরা গ্লাস আর জগ। আজকাল রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিবাহ ইত্যাদিতে উপহার দেবার জন্য বিশেষ ধরনের, বিশেষ গড়নের সব জিনিসের দোকান হয়েছে। সহকর্মী একজন এমনি একটি দোকানের সন্ধান দেওয়াতে সমস্যার সমাধান হলো। চকচকে কাগজের মোড়কে খড়কুটো দিয়ে প্যাক করা পার্সেলটি বেশ দেখাচ্ছিল। সবসুদ্ধ নেমন্তন্ন রক্ষার সাজ-পোশাক, যানবাহন নানা সরঞ্জামের অভাবে বেলাবেলি মণিমাসীমা গেলেন নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। বিয়ে-বাড়ির কাজকর্মে সবাই ব্যস্ত। কোন কোণা দিয়ে সসংকোচে শান্ত এই মানুষটি গিয়ে দাঁড়িয়েছে, দেখবার কারও সময় নেই। কিন্তু উপহারকক্ষের ভারপ্রাপ্ত মহিলাটির চোখে পড়েছে মাসিমার হাতের দিকে। দোকানদার যেমন করে দিনের প্রথম বিক্রয়কে বউনী বা বর্ধনী হিসাবে সমাদরে গ্রহণ করে, মহিলাটি ঠিক সেইভাবে ঘরে নিয়ে গেলেন মাসীমাকে। হাতের উপহার সযত্নে খুলে রাখতে গেলেন সারি সারি সাজাবার জন্য রাখা টেবিলের একটিতে। কিন্তু ও কি! খুলতেই মানিনীর মুখ থম-থমে হয়ে গেল। এ কি বউনি! এ তো সাজাবার যোগ্যই নয়। মণিমাসীমা যেন কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। অন্ন-প্রাশনের থালাখানা বড় খোকার ভারি প্রিয় ছিল। তা দিয়ে তিনি আজ এসেছেন ধনীর ঘরে মান বজায় রাখতে? কি দাম এ মানের? কি মূল্য এ লৌকিকতার? ঘর-ভরা মিষ্টির এক টুকরোও কেউ তাঁকে খেতে অনুরোধ করেনি। যেমন অলক্ষ্যে প্রবেশ করেছিলেন,

মাসিমার সেই বিয়ের উপহার

তেমনি অলক্ষ্যে বাইরে চলে গেলেন। দরওয়ান বসে খৈইনি টিপছিল আর তার দেশের শাদির এক সুর ভাঁজছিল। গাড়ী করে আনাগোনা যারা করে না, দরওয়ানজী তাদের জন্য বিব্রত হন না। কাজেই মাসীমা বাইরে এসে খোলা হাওয়ায় গভীর এক প্রাণ-ভরা নিঃশ্বাস নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

বাড়িতে সেদিন উপহার দেবার আর অভ্যর্থনার কথাটি পুরোপুরি চেপে গিয়ে-ছিলেন বলে অবসর পেয়ে ছুটে এসেছিলেন আমার কাছে। ছেলে বউ তাঁকে কুটুম্বিতা করতে মানা করেছিল। তাদের বলা চলে না। অথচ না বলা পর্যন্ত মনে যেন কিসের দারুণ বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন। মাসীমার উপহার দেবার গল্প শেষ হবার আগেই আমি ওদের খাবার নষ্ট হবার কাহিনী তুললাম।

স্বল্পভাষিণী, সংযতস্বভাব মাসীমার এত আনন্দ উচ্ছ্বাস আগে কখনও দেখিনি। ছোট মেয়ের মত হাততালি দিয়ে উঠলেন। বেশ হয়েছে। আমি বোকা তাই খোকার থালা বেচে উপহার কিনেছিলাম। অন্য নিমন্ত্রিত সবাই বোধ হয় উপহার দেবার ভয়েই দেমাকে মিত্তিরবাড়ির বিয়ে বর্জন করেছে। প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স। এমনি করেই উপহার দেওয়া প্রথা উঠে যাবে।

আপনজনে ভালবেসে যেখানে উপহার আনে সে কথা আলাদা, কিন্তু সমাজের সংস্কার হিসাবে সর্বস্ব পণ করে মান রক্ষার

এই অর্থহীন ব্যবস্থা পণপ্রথা, যৌতুক ইত্যাদির মতই নিতান্ত হৃদয়হীন ব্যবস্থা।

আজও যে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সে প্রথাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে, এটাই আশ্চর্যের বিষয়। সময়ের পরিবর্তনে শ্যাওলা-ধরা সব সামাজিক ব্যবস্থা বদলে যাবে, একটা জীবন্ত সমাজের কাছে এতটুকু আশা করা কি অন্যায়?

পরিশিষ্ট

এ ঘটনার দিন কয়েক পরে নিলামী দোকানে গিয়েছিলাম একটা সস্তা বই-এর আলমারির খোঁজে। মেয়েমানুষ ভোগ্যপণ্যের পসরার মাঝে যা কিনবার তাও দেখে, যা কিনবার নয় তাতেও চোখ বুলিয়ে নেয়। বাসনকোসনের দিকে তাকিয়ে দেখি, রাশি রাশি কাঁচের বাসনের মধ্যে মাসিমার সেই বিয়ের উপহারের মত একটি লেমনেড সেট। এগিয়ে গেলাম। অমন সেট তো আর একটি তৈরী হয়নি। কিন্তু এক খণ্ড কাগজ জাগের হাতল ধরে ঝুলছে। ঠাহর করে দেখলাম—লেখা "মণিমাসীর আশীর্বাদ!" অবশ্য এ কথাটি আমি আর মাসীমাকে জানাইনি।

শ্রীমতী

বার

এখন ব্যথা নেই, শুধু ঠোঁট কালো হয়ে আছে—হঠাৎ আগুনের ছেঁকা লেগে পুড়ে যাওয়ার মতন। হেমলতা ছোট একটা আয়না মুখের খুব কাছে এনে নিজের ঠোঁট দেখছিল। দিনে তিন বার মলম লাগাবার কথা. কিন্তু এখন ওসব কিছু করবার ইচ্ছে হল না হেমলতার।

বিছানা গুটিয়ে নেয়া হয়েছে, দড়ি দিয়ে বাঁধা। তার ওপর বিষণ্ণ হয়ে হেমলতা বসেছিল। একটু দূরে উপুড় হয়ে পড়ে চোখা একটা কঞ্চি দিয়ে মাটিতে দাগ টানছিল শ্রীধরন এবং এক-একবার মুখ তুলে হেমলতাকে দেখছিল। তাকে দেখতে দেখতে এক চরিতার্থ কিশোর আপন মনে গানও গাইছিল।

একটা সাজান আসর এখন লন্ডভন্ড, বিশৃঙ্খল। ছোট ছোট তাঁবু খোলা কিম্বা আধখোলা—ঝড়ে ঝুলে পড়ার মতন। এক-একদিকে জিনিসের স্তূপ। মানুষের সংখ্যা অনেক কম। বাঘ সিংহর খাঁচাও নেই। যেখানে হাতি বাঁধা ছিল—বাঁধান শানের ওপর হলুদ হয়ে আসা একটা কলাপাতা হাওয়ায় থেকে থেকে কাঁপছে।

কাল থেকেই প্রস্থানের তোড়জোড় শুরু হয়েছিল, বড় তাঁবু খোলা হল কিছু আগে। এক-একটা রঙ করা পোল বড় রাস্তার আলোর থামের মতন—এখন তা মাটি থেকে উপড়ে নেয়া হচ্ছে। তারই আওয়াজ মানুষের গলার সঙ্গে মিশে একটা ভয়ংকর ব্যস্ততা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

খিদিরপুরে অঞ্চলে কাল রাতে জুয়েল সার্কাসের শেষ খেলা হয়ে গেছে। এখন যত তাড়াতাড়ি এখানকার সব ভেঙে চুরে নতুন জায়গায় তুলে নিয়ে যাওয়া যায়। যেমন করে জুয়েল সার্কাস হঠাৎ একটা শহর বহন করে নিয়ে এসেছিল এখানে—পোড়ো জমি খুঁড়ে-খুঁড়ে, আগাছা সাফ করে মানুষ ও জানোয়ারের সাময়িক বসবাসের জায়গা করে নিয়েছিল, ঠিক তেমন করেই রাতারাতি আবার অন্য জায়গায় রূপ ফেরাবে।

এরা চলে যাওয়ার পরেও একবালপুর রোডের জমিতে অনেক দিন থাকবে রিং-এর দাগ, যেখানে-যেখানে খুঁটি পোতা হয়েছিল সেই সব গর্ত, রসড়ার কাছে পোড়া-পোড়া কালো ঘাস, ডিমের খোলা, আলু-পেঁয়াজের খোসা আর দড়ির দু-একটা টুকরো। চিল উড়বে, কাকও জটলা করবে ফাঁকা জমিতে। রাস্তার কুকুর মাটি শুঁকে-শুঁকে এদিক থেকে ওদিকে যাবে।

কাল বিকেল থেকেই কিছু-কিছু সরঞ্জাম পাঠান হচ্ছিল টালিগঞ্জে। রাত বারোটার পর হাতি আর উটকে হাঁটিয়ে-হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, জন্তু-জানোয়ারের খাঁচাও গেছে তখন। অনেক লোকও গেছে। নতুন ক্যাম্প সাজিয়ে খেলা শুরু করতে তিন-চার দিন দেরি। কেউ-কেউ ছুটি নিয়ে বাইরে গেছে।

শাসন শৃঙ্খলা সার্কাসের সব কড়াকড়ি এ সময় বড় শিথিল। যার-যার জিনিসপত্র গুছিয়ে চুপচাপ একদিকে বসে থাকা নিয়ম। সময় মতন ট্রাকে গিয়ে উঠতে হবে। কাকে কখন ট্রাকে চড়ে নতুন জায়গায় যেতে হবে ঠিক নেই কিন্তু তৈরি হয়ে থাকতে হবে সকাল থেকেই— ডাক আসবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্র নিয়ে লাফিয়ে ট্রাকে উঠতে হবে। দেরি হলে জায়গা হবে না, অন্য কেউ উঠে পড়বে।

এ সময় খেলা নেই, প্র্যাকটিসও বন্ধ। বিশ্রামে অনভ্যস্ত শ্রীধরন মাটিতে কঞ্চির খোঁচা মেরে-মেরে দাগ কাটছিল এবং রাঘবন ছিল না বলে নির্ভয়ে হেমলতার দিকে তাকাতে পারছিল। তার ট্রুপের সব জিনিস

আর ছেলেমেয়ে নিয়ে একবারে যেতে পারে নি রাঘবন। কিছু জিনিস পড়ে আছে, সেসব পাহারা দেয়ার জন্যে সে রেখে গেছে শ্রীধরন আর হেমলতাকে। রাঘবন তাঁবু নিয়ে ট্রাকে চড়েছে, আমিনা রেবতী আর নলিনী তার সঙ্গে গেছে।

আয়নার নিজের কালো ঠোঁট দেখতে দেখতে কয়েক মুহূর্তের জন্যে অনামনস্ক হয়ে গিয়েছিল হেমলতা। এক সময় তার হাত থেকে ছোট আয়নাটা মাটিতে পড়ে গেল। আর দরকার ছিল না, আয়না পড়েই থাকল। হেমলতা নিচু হয়ে সেটা আর তুলে নিল না।

কড়া রোদ পড়েছিল হেমলতার মাথার ওপর, তাঁবু নেই। কিছু দূরে কলের জল পড়ে যাচ্ছে, স্নান করবার ইচ্ছে হলেও সে তা করতে পারল না, হঠাৎ ট্রাক এসে পড়তে পারে। ক্ষিধেও পেয়েছিল তার। অন্যান্য দিন প্র্যাকটিসের পর শুকনো একটা রুটি পাওয়া যায়, আজ রাঘবন রান্না করতে দেয় নি। সে কখন খেতে পাবে, জানে না। হেমলতা তার মা-বাবার কথা ভাবছিল।

বাবা বলেছিল, কোন না কোন ক্যাম্পে তার সঙ্গে একবার দেখা করতে আসবে। এখনো আসে নি। ছোট একটা বোন আছে হেমলতার, সে কত বড় হল এতদিনে! হেমলতা যখন প্রথম সার্কাসে আসে তখন তার বোন ভাল করে কথা বলতে পারত না, বেড়ালের বাচ্চার মতন শব্দ করত—ঝাঁপিয়ে আসত তার কোলে।

ঠোঁটে আস্তে আঙুল বুলিয়ে নিতে-নিতে হেমলতা ভাবল, সে সার্কাসে চলে আসবার পর প্রথম প্রথম তাকে না দেখতে পেয়ে হয়তো খুব কেঁদেছিল তার বোন। কেননা তার জন্মের সময় থেকেই মা-র অসুখ, হেমলতাই দেখত তার মা আর বোনকে—বাবাকেও।

হেমলতার বাবা শখ করে তাকে সার্কাসে দেয় নি। শখ করে কেউ মেয়েকে দেয় না সার্কাসে। কাপড়ের যে-তাঁতে কাজ করত তার বাবা, তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। আর কোথাও কাজ নেই। মার অসুখ, আর একটা ছোট বোন—এত লোক খাবে কী! এমন সময় গিয়ে পড়ল রাঘবন।

হেমলতার হাত থেকে আয়না পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনেছিল শ্রীধরন। এখন সে উঠে দাঁড়াল। হাত প্যান্টে ঘষে-ঘষে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করে আয়নাটা তুলতে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কিছু সময় হেমলতার ঈষৎ ফোলা কালো ঠোঁট দেখল।

"এ হেম?" শ্রীধরন হেমলতার গায়ের কাছে এসে আস্তে ডাকল।

"উঁ?"

"কাঁদছিস?"

হেমলতা জানত মা বাড়ির কথা ভাবতে-ভাবতে তার দু-চোখে জল টসটস করছিল, এখন শ্রীধরনের কথা শুনে আধ-ময়লা ঘাগরার একাংশ তুলে সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল, "দূর! তুই অন্ধ হয়ে গেলি নাকি শ্রীধরন?"

শ্রীধরন হাসল। মিথ্যা কথা বলছে হেমলতা। শ্রীধরন জানে হেমলতার স্বভাবই এমন। মাস্টারের কাছে মার খাওয়ার সময় মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় চিৎকার করলেও পরে সে একটা কথাও আর বলে না। যতই কষ্ট হোক তার, তা স্বীকার করতে চায় না।

"তোর ঠোঁটে এখনো জ্বালা আছে, না রে?"

"না-না, কবে সেরে গেছে", পা নাচাতে-নাচাতে হেমলতা বলল, "মাস্টার মলম এনে দিয়েছিল, খুব ভাল মলম—একদম জ্বালা নেই", সে শ্রীধরনের দিকে তাকিয়ে একটা আঙুল তুলে তার ঠোঁট দেখাল, "দেখ না?"

হেমলতার ঠোঁট দেখতে-দেখতে তার পায়ের কাছে ছোট আয়নাটা আর একবার দেখল শ্রীধরন। আয়নায় আকাশের ছায়া—সাদা এবং নীল রঙ। শ্রীধরন হেমলতার কালো ঠোঁট দেখতে পারল না, পায়ের কাছে আকাশের অংশ দেখতে দেখতে বলল, "ঠোঁটে মলম লাগাসনি আজ?"

"না, কৌটো হারিয়ে গেছে।"

"না রে, হারায় নি", প্যান্টের পকেট থেকে মলমের ছোট কৌটো বের করে হেমলতার মুখের সামনে তুলে ধরে শ্রীধরন বলল, "এই দেখ, আনলোডিং-এর সময় তুই কোথায় হারিয়ে ফেলবি, তাই আমি আমার কাছে রেখে দিয়েছিলাম—"

শ্রীধরন ভেবেছিল তার কথা শুনে খুব খুশী হবে হেমলতা, হাত বাড়িয়ে মলমের কৌটো চাইবে কিন্তু সে একটা কথাও বলল না, নিচু হয়ে আয়না তুলে নিল, উল্টো করে সেটা তার কোলের ওপর রেখে ট্রাকের শব্দ শোনবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে থাকল।

"এ হেম?"

"উ"", অন্য দিকে তাকিয়ে যন্ত্রণার মতন অস্ফুট শব্দ করল হেমলতা, শ্রীধরনের দিকে ফিরে তাকাতে তার বড় কষ্ট হচ্ছিল এবং ভয়ও লাগছিল। একদিন খেলা করে হেমলতার চুল টেনে ছিল শ্রীধরন, কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল, এভি।

সেদিনও শ্রীধরনের মুখে প্রিয়া ডাক শুনে চমকে উঠেছিল হেমলতা, ভয় পেয়েছিল কেননা এসব জানতে পারলে লোহা গরম করে দুজনের হাতে-পায়ে ছেঁকা দেবে রাঘবন—হেমলতার চেয়ে বেশী যন্ত্রণা দেবে শ্রীধরনকে। সেসব ভেবে এখনো তার ভয় লাগছিল।

নারকেলের দড়ি দিয়ে বাঁধা হাতির পিঠের মতন যে বিছানার ওপর চুপচাপ বসেছিল হেমলতা, এখন শ্রীধরনও সেখানে বসল এবং কৌটো খুলে কিছু মলম তুলে নিল ডান হাতের আঙুলে, "মলম লাগাবি না হেম?"

"না, দরকার নেই।"

"আর, আমি লাগিয়ে দি", হেমলতার দিকে ফিরে তার ঠোঁটের কাছে মলম-মাখা আঙুল নিয়ে এসে বড় অন্তরঙ্গ স্বরে শ্রীধরন বলল।

"এই, কী করিস? না-না—" ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে হেমলতা। এদিক-ওদিক দেখছে। হাসাহাসি করছে বাহাদুর আর সহদেব। কলের তলায় বালতি রেখে ঘটি-ঘটি জল মাথায় ঢেলে গা ঘষে-ঘষে স্নান করছে হাসি। একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টানতে টানতে মোহনলাল হাসিকে দেখছে।

একটু দূরে টুনি মাসির তাঁবু—এখনো খোলা হয় নি। বাইরে জড়ো করা অনেক জিনিস। কাঞ্চী বেলা শান্তা কিশোরী বাণী মঞ্জু টুনি মাসির কাছাকাছি আছে। বাজার মাস্টার শ্যামসুন্দর হাত নেড়ে ডাকছে টুনি মাসিকে।

লোহার ওপর জোরে-জোরে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। বড় তাঁবুর এক-একটা পোল জোর করে হাত করে দিচ্ছে অনেক মানুষ। ট্রাক আসছে হুড়মুড় করে। সুবলবাবু সহদেব আর সার্কাসের যত রিং-বয় গুনে-গুনে গাড়িতে জিনিস তুলে দিচ্ছে।

শ্রীধরন কোন শব্দ শুনল না, কারুর দিকে তাকিয়ে দেখল না—অসংখ্য মানুষের সামনে সার্কাস দেখাবার মতন অসঙ্কোচে হাত ধরল হেমলতার, "মলম না লাগালে মাস্টারকে বলে দেব। এই হেম, বস এখানে—"

শ্রীধরন হাত ধরে টানলেও এত মানুষের সামনে তার পাশে আর বসবার সাহস হল না হেমলতার। কোন দোষ না করলেও তার মনে হচ্ছিল শিমুল তুলোর মতন শ্রীধরনের ছোট্ট একটা অনিয়ম হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে রাঘবনের কাছে। যে-কোন মুহূর্তে একটা ট্রাকে এখানেই ফিরে আসবে সে—ভাঙা সসার আবার ঘষে দেবে তার ঠোঁটে, লাঠি মারবে শ্রীধরনের মাথায়। নিজের কথা যত না ভাবছিল হেমলতা, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবছিল শ্রীধরনের কথা। এবং একটা ভয় তার মনে সিরসির করে উঠছিল।

"মাস্টার কী করবে আমায়", হাওয়ার ঝাপটায় ঘাগরা অনেকটা উঠে যাচ্ছিল বলে হাত দিয়ে তা নামিয়ে নিতে-নিতে বিরস মুখে কথা বলল হেমলতা, "মাস্টার তোকেই মারবে—দেখিস!"

"কেন?"

"আমার ঠোঁটে আঙুল ঘষলে, মারবে না?"

"মারুক, মার খেতে-খেতে মরেই যাব—"

হেমলতা হেসে বলল, "মরে যাবি কী রে? বড় হবি না? কী বলেছিলি আমাকে মনে নেই?"

"হুঁ, মনে আছে", মাটিতে জোরে-জোরে পা ঘষল শ্রীধরন, আঙুলে মাখনের মতন সবুজ মলম দেখতে দেখতে ছেড়ে-ছেড়ে এক-একটি ভারী শপথ উচ্চারণ করতে থাকল, "আমি সব খেলা শিখব, সেরা খেলোয়াড় হব, দু হাজার টাকা মাইনে পাব—"

"হুঁ হুঁ, বল না তারপর?" কৌতুকের আমেজ চমকে উঠছিল হেমলতার কথায়। এখন তার ভয় মুছে গিয়েছিল। হাসির পাতলা একটা আভা তার বিক্ষত ঠোঁটও সুন্দর এবং যন্ত্রণামুক্ত করে তুলেছিল।

"তারপর জেমিনির মতন বড় একটা সার্কাস পার্টি বানিয়ে ফেলব। আমিই মালিক। বিশটা হাতি কিনব। শিম্পাঞ্জি কিনব। চার-পাঁচটা রিং-মাস্টার থাকবে—"

"বল না?" শুধু শ্রীধরনের ঝকঝকে ভবিষ্যতের কথা নয়, তার মুখে নিজের কথাও শুনতে চাচ্ছিল হেমলতা, তাকে যে কথা সুযোগ পেলেই সাহস করে বারবার সে শোনায়, আজও তা বলবে, হেমলতা জানত।

"আর তুই হবি তখন আমার সার্কাসের মালিকানি—আমার বউ", শ্রীধরন দুষ্টু ছেলের মতন হেসে বলল, "এভি—প্রিয়া পেট্টা!"

অন্য দিন এত কথা হেমলতা শোনে না, অল্প ইঙ্গিত পেলেই ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় শ্রীধরনকে। আজ তার সব কথা শুনল সে। রোদে তার মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল, লজ্জার মতন। কিন্তু আজ কোন লজ্জা ছিল না হেমলতার, সার্কাস শেষের লণ্ড-ভণ্ড বিশৃঙ্খল জমির ওপর দাঁড়িয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবার সময় তার মনে বেদনার একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছিল।

"এ শ্রীধরন—" যা বলতে চেয়েছিল হেমলতা তা বলবার সময় ইতস্তত করল, হঠাৎ বলতে পারল না। এক

আঙুল দিয়ে সে তার আর এক আঙুলে খোঁচা মারতে থাকল।

"কী রে?"

হেমলতা মাটির দিকে তাকিয়ে, ঘাসে জোরে-জোরে পা ঘষে-ঘষে বড় করুণ করে বলল, "আমাকে আর একটা তাম্বু দিবি, তুই যখন সার্কাস বানাবি—তখন?"

"হ্যাঁ, দেব", বিমূঢ়ের মতন হেমলতার দিকে তাকিয়ে শ্রীধরন জিজ্ঞেস করল, "কার জন্যে তোর তাম্বুর দরকার হেম?"

"আমার মা-বাবা আছে না? তাদের ছেড়ে থাকতে আমার বড় কষ্ট হয় রে—" হেমলতা একবার আকাশ দেখল, পরে মাটি দেখতে দেখতে ধরা গলায় বলল, "আমার একটা ছোট বোন আছে রে শ্রীধরন—তার কথা মনে হলে আর কিছু আমার ভাল লাগে না, খালি-খালি কান্না পায়—"

হেমলতার কান্না-কান্না মুখ দেখতে দেখতে এবং তার ভিজে ও ভারী গলার স্বর শুনতে শুনতে বড় অস্থির হয়ে শ্রীধরন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "খুব বড় তাম্বু তোর মা-বাবার জন্যে আমি বানিয়ে দেব—হাঁ-হাঁ, ঠিক। আর তোর বোন আমার

সার্কাসে খেলা দেখাবে—তাকে রাজার অনেক মাইনে দেব—"
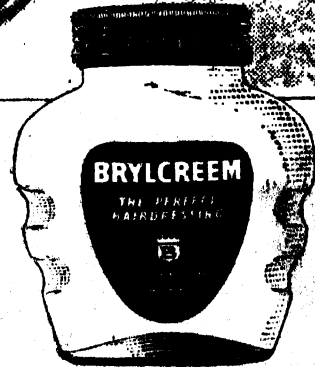
হেমলতা জোরে-জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "না, কখনো না। আমার বোনকে আমি সার্কাসে কখনো খেলতে দেব না।"

"কেন রে?"

"ছোট বাচ্চা, মাস্টার মারলে খুব কাঁদবে, ভয় পেয়ে মরে যাবে—তখন আমি কী করব রে শ্রীধরন?"

এত পরে, হেমলতার কথা শুনে জড়িয়ে গেল শ্রীধরন। তার আঙুলে তখনো সবুজ মলম সূর্যের আলোয় চিকচিক করছিল—সে তা দেখল। মা বাবা ভাই বোন, হেমলতার মতন কেউ ছিল না শ্রীধরনের। সে তার বুড়ি ঠাকুরমার মুখে শুনেছে, তার যখন মোটে কয়েক মাস বয়েস তখন জোর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল কুথুপারাম্বা গ্রামে—সে-বছর না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরেছে শ্রীধরনের বাপ-মা। তার ঠাকুরমা বেঁচেছিল অনেক দিন। তাকে রাঘবনের কাছে অল্প টাকায় বিক্রি করে খুব অল্পদিন আগে বুড়ি মরেছে।

এত কথা কখনো মনে হয় না শ্রীধরনের, ঠাকুরমার কথাও সে ভাবে না। আজ হেমলতার বাড়ির কথা শুনতে শুনতে কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে উদাস হয়ে থাকল। একটা থুড়থুড়ে বুড়ি, যে তাকে ভালবাসত মায়ের মতন— শ্রীধরন তার কথা ভাবল।

যেখানে রাঘবনের ফেলে যাওয়া জিনিস পাহারা দিতে-দিতে কথা বলে যাচ্ছিল, হেমলতা আর শ্রীধরন, সেখান থেকে অনেক দূরে—সার্কাসের ভাঙা-ভাঙা রিং-এর ওপারে ফাল্গুনের হাওয়ার ঝলক ছোট একটা প্রজাপতি ভাসিয়ে নিয়ে এসেছিল। হেমলতা প্রথম দেখল। এবং সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা ভাবান্তর ফুটে উঠল তার চেহারায়। হেমলতার কাঁচা মনের সব দুঃখ ও যন্ত্রণা বাসি ফুলের পাপড়ির মতন থরথর করে ঝরে পড়ল।

"এ শ্রীধরন, দেখ ওই—" প্রজাপতির দিকে আঙুল দেখিয়ে খুশিতে চিৎকার করে বলে উঠল হেমলতা, "চল, ধরি?"

শ্রীধরন কিছু দেখতে পেল না, সে বুঝতে পারল না হঠাৎ কী দেখে এত খুশি হয়ে উঠল হেমলতা, কিন্তু সে-ও হাসল। হেমলতার সঙ্গে পাশাপাশি চলতে চলতে শ্রীধরন তাকে কিছু পরে জিজ্ঞেস করল, "কী ধরবি রে?"

যেখানে বাঘ সিংহের খাঁচা ছিল, বট গাছের নিচে, চাকার আঁকাবাঁকা দাগ মাড়িয়ে সেখানে এসে দাঁড়াল হেমলতা। এদিক-ওদিক খুঁজল। হাওয়া দূরে ঠেলে নিয়ে গেছে প্রজাপতিকে, এখানে কোথাও নেই। শ্রীধরনকে সে কিছু বলতে পারল না এখন। বাঘ সিংহ নেই কিন্তু এখনো একটা উৎকট গন্ধ লেগে আছে এখানকার মাটিতে।

মুখ নিচু করে হেমলতা আস্তে ডাকল, "শ্রীধরন?"

"কী রে? এখানে এলি কেন, বল না?"

হেমলতা যে প্রজাপতি দেখতে পেয়ে এদিকে ছুটে এসেছিল সেকথা বলল না শ্রীধরনকে। সে হঠাৎ হেসে বলল, "কৌটো থেকে আঙুলে মলম তুলে নিয়েছিলি কখন! শুকিয়ে গেল যে! আমার ঠোঁটে লাগিয়ে দিবি না? উঃ, এখন বড় জ্বালা করছে রে!"

"হুঁ হুঁ, আয়—" এত সময় যে মলম আঙুলে মাখিয়ে রেখেছিল শ্রীধরন, এখন তা সাবধানে লাগিয়ে দিল হেমলতার ঠোঁটে এবং পরে প্যান্টে আঙুল ঘষে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। রাঘবনের ওপর রাগ হচ্ছিল শ্রীধরনের।

"আমি যখন বড় হব, এ হেম শুনলি? এক রাতে আমি মাস্টারকে খুন করব—"

"এই চুপ! এসব বললে আমি তোর সাথে কথা বলব না। মাস্টার না থাকলে কে খেলা শেখাবে তোকে? কে খেতে দেবে?" খাওয়ার কথা বলতেই গলা শুকিয়ে এল হেমলতার, বমি ঠেলে আসতে চাইল। শ্রীধরন কিছু করতে পারবে না জেনেও সে তাকে বলল, "বড় খিদে লেগেছে আমার।"

শ্রীধরনেরও খিদে পেয়েছিল, কিন্তু এখন খিদে মেটাবার জন্যে কিছুই করতে পারে না ওরা। রসড়াও এখন ফাঁকা। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবার দিন যা-তা করে কাজ সারে শ্যামসুন্দর, তাড়াতাড়ি সকলকে খাইয়ে দেয়, রসড়ায় কিছু নেই এখন।

রসড়ায় রান্না হলেও সেদিকে যেতে পারে না হেমলতা আর শ্রীধরন—কেউ তাদের একটুকরো আলুও খেতে দেবে না। তারা রাঘবনের গ্রুপের ছেলেমেয়ে। আজ হয়তো রাঘবন তাদের না খাইয়ে রাখবে। কতবার এমন হয়েছে।

হেমলতার কথা শুনে ভাঙা রসড়ার দিকে তাকাল শ্রীধরন, রাধানাথবাবুর তাঁবুও দেখল। দূর থেকেই। শ্রীধরনের মনে হল উনুনের কাছে বসে আছে যমুনা—হয় তো রান্না করছে। ওরা খাওয়া শেষ করে তবে যাবে এখান থেকে।

"হেম, আমি ওই তাম্বুতে যাই—" রাধানাথবাবুর তাঁবু দেখতে দেখতে শ্রীধরন বলল, "তোর জন্যে কিছু তরকারি চুরি করে নিয়ে আসি?"

হেমলতা শুকনো মুখে বলল, "ওরা খুব চালাক। তোকে ধরে ফেলবে—মাস্টারকে বলবে। ওদিকে যাস না।"

"তবে কোন দিকে যাব?" শ্রীধরন বলল, "আজ কিছু খেতে দিল না মাস্টার! নয়া ক্যাম্পে নন্দিনী কিছু তরকারি বানাবে কি-না জানিস?"

"জানি না।"

"ওই দিকে চল", শিবনাথের তাঁবু তখনো খোলা হয় নি, সে এখন আছে কি-না কে জানে, হেমলতার সঙ্গে তার তাঁবুর দিকেই এগিয়ে যেতে লাগল শ্রীধরন।

প্রথমবার নয়, আগেও কয়েকবার হেমলতা এসেছে শিবনাথের তাঁবুতে। যেদিন-যেদিন শাস্তি দিয়েছে রাঘবন, রাগ করে কিছু খেতে দেয় নি সেদিন। খিদের জ্বালায় অন্ধকারে লুকিয়ে-লুকিয়ে শিবনাথের তাঁবুতে এসেছে হেমলতা—রুটি তুলে নিয়েছে, মাংস চুরি করে খেয়েছে। শ্রীধরনও কয়েকবার এমন করেছে।

"নাঃ, আজ কিছু নেই", শিবনাথের তাঁবুর মধ্যে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতন হেমলতাকে বলল শ্রীধরন, "চল, তাড়াতাড়ি পালাই এখান থেকে। ওই দেখ, সহদেব দেখছে আমাদের—মাস্টারের কাছে লাগিয়ে দিলে—"

শুধু শিবনাথের তাঁবুর মধ্যে হেমলতা আর শ্রীধরনকে এখন দেখল না নবীনের সহকারী ক্যাশিয়ার সহদেব, জিনিসপত্র গুনে-গুনে ট্রাকে তোলার ফাঁকে-ফাঁকে এবং অন্য কাজ করতে-করতে সে অনেক আগে থেকেই তাদের লক্ষ করছিল।

হেমলতা আর শ্রীধরন নিজেদের জায়গায় ফিরে যেতে পারল না, তার আগেই সহদেব এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। চতুরের মতন চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে সে হাসল এবং হেমলতার হাত টানল, "চল আমার সাথে?"

আর এক রাতেও হেমলতার হাত টেনেছিল সহদেব, গাল টিপে দিয়েছিল। শ্রীধরনও জানত না। খুব ভয় পেয়েছিল হেমলতা। রাঘবনকেও এসব বলতে তার সাহস হয় নি।

এখন রাত নয়। তাজা রোদ ঝলসাচ্ছে। শ্রীধরনও আছে তার পাশে তাহলেও অন্ধকার-অন্ধকার লাগছিল হেমলতার—ভয়ে তার দেহ শক্ত হয়ে এসেছিল।

সহদেব কী বলতে চায় তা বুঝতে পারে নি শ্রীধরন। সে-ও ভয় পেয়েছিল। কেননা শ্রীধরন ভাবছিল শিবনাথের তাঁবুতে তারা খাবার চুরি করে খেতে এসেছে বলে সহদেব তাদের দুজনকে হারকু সাহেবের কাছে এখন ধরে নিয়ে যাবে—মার খাওয়াবে।

শ্রীধরন হাত জোড় করল, করুণ স্বরে বলল, "এমন আর কখনো করব না, এবারে ছেড়ে দাও—"

"তুই থাম বদমাশ ছোকরা", হাত তুলে শ্রীধরনকে মারতে উঠল সহদেব, "যা, ভাগ এখান থেকে!"

"চলে আয় হেম—"

"এই, ও কোথায় যাবে?"

সহদেব হেমলতার হাত টানতে-টানতে বলল, "ও এখন আমার সাথে আমার তাম্বুতে যাবে—"

"কেন?" শ্রীধরনের স্বর কান্নার মতন। সে হেমলতাকে একা মার খেতে দেবে না, সে-ও যাবে সহদেবের সঙ্গে।

হেমলতা কেঁদে বলল, "হাত ছেড়ে দাও, আমি যাব না।"

"এই চল জলদি—" জানোয়ারের মতন উগ্র হয়ে উঠল সহদেব, "যাবি না মানে? এই ছোকরার সাথে কী করছিলি ওই গাছের তলায়? যদি আমার সাথে এখন আমার তাম্বুতে না যাবি তো আমি তোদের মাস্টারকে সব বলব।"

শ্রীধরন বলল, "ও কী করেছিল গাছের তলায়?"

"শালা কিছু জানিস না? তুই চুমা খাসনি ওকে— ঠোঁটে হাত দিস নি? আমি সব দেখেছি।"

একটা বিস্ময় ও বেদনা শ্রীধরনের নিষ্পাপ কচি মুখ থেকে সব রক্ত শুষে নিচ্ছিল। তার শক্তি নেই। শিবনাথের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে সে তার মতন শক্তিমান হয়ে উঠে সহদেবের কথার প্রতিবাদ করতে চাচ্ছিল। কেননা এখন শ্রীধরন কিছু-কিছু বুঝতে পারছিল সহদেব কেন তার তাঁবুতে হেমলতাকে একা টেনে নিয়ে যেতে চায়।

যে কথা বলল সহদেব তা শুনে কান্না থেমে গিয়েছিল হেমলতার, হাত ছাড়াবার কোন চেষ্টাও সে আর করল না। নিজের কথা সে এবারেও ভাবল না। রাঘবনের কঠোর শাসন থেকে শ্রীধরনকে রক্ষা করতে পারবে বলে সহদেবের তাঁবুতে যাবার জন্যে হেমলতা হঠাৎ যেন মনে প্রস্তুত হয়ে থাকল।

সেই সময় একটা ট্রাক এসে দাঁড়াল কিছু দূরে। ওরা দেখল, অনেক সময় ইতস্তত করে স্থূল রাঘবন লাফ দিয়ে নামছে। হেমলতার হাত ছেড়ে সরে গেল সহদেব।

ঘোরের মতন মনে হচ্ছিল হেমলতার, শ্রীধরনেরও। রাঘবনকে আসতে দেখলেও তারা তার আগে নিজেদের জায়গায় ফিরে যেতে পারল না। যখন গেল, তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে রাঘবনের রুক্ষ চোখ তাদের খুঁজছে।

"এই, সব জিনিসপত্তর ফেলে কোথায় গিয়েছিলি?" শ্রীধরনের চুল ধরে তার মাথা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে রাঘবন জিজ্ঞেস করল।

রাঘবনের কাছে অনেকবার মার খেয়েছে শ্রীধরন, মারের ভয় তার ছিল না— সহদেব অল্প আগে যা বলে শাসিয়েছিল তা এখনো ভুলতে পারছিল না বলে সে খুব দুর্বল ও ভীরু হয়ে পড়ছিল।

"বল কেন আমার কথা শুনিস নি? কোথায় গিয়েছিলি?"

"আমি যাই নি—" শ্রীধরন বলল, "হেম আমাকে ওই দিকে—গাছের নিচে যেতে বলল—"

"হেম!" রাঘবনের শক্ত হাত হেমলতার নরম গালে খুব জোরে পড়ল, "খেলা করতে এসেছিস এখানে? একটা জিনিস যদি হারায় আমি তোদের মাটিতে পুঁতে রেখে যাব—" খাটি বালতি ট্রাঙ্ক বিছানা একে-একে গুনে দেখল রাঘবন। কিছু হারায় নি। সব ঠিক আছে।

"নে, এসব তোল! চল এবার!"

যত জিনিস পড়েছিল, সব বয়ে নিয়ে চলল হেমলতা আর শ্রীধরন—ট্রাকে গিয়ে উঠল।

একেবারে চুপ হয়ে গেছে হেমলতা। বড় রাস্তা দিয়ে ট্রাক যাচ্ছিল। কাছেই টালিগঞ্জ। এক-একবার ট্রাকের ঝাঁকানিতে হেমলতার গায়ে গা ঠেকছিল শ্রীধরনের, তখন আরও সরে বসবার চেষ্টা করছিল সে।

যে-রক্ত তার ঠোঁটে লাগিয়ে দিয়েছিল শ্রীধরন, এখন হেমলতা তা আঙুল ঘষে-ঘষে তুলে ফেলল।

ক্রমশ

রবীন্দ্রনাথ রচিত চিত্রের প্রদর্শনী

রবীন্দ্রনাথের ২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য সঙ্গীত ও ললিতকলা আকাডেমি এবং আকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর উদ্যোগে ২২শে শ্রাবণ ক্যাথিড্রাল রোডস্থিত আকাডেমি ভবনে রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত চিত্রের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রথমেই বলে রাখি যে এত ছোট প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্ররচনা প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয় এবং উদ্যোক্তাদেরও বোধ হয় ঠিক সেই উদ্দেশ্য ছিল না। কবির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করাই ছিল তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং সেজন্য রাজ্য ললিতকলা আকাডেমি নিজস্ব সংগ্রহশালা থেকে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ২৬খানি ছবি প্রদর্শনীতে পেশ করেন। তবে একথা বলা অবশ্য প্রয়োজন যে, মনোনয়ন ব্যাপারে রাজ্য আকাডেমি বোধ হয় অধিকতর সচেতন হতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথের চিত্র রচনাসম্ভার যেন তাঁর বিকশিত প্রতিভাপদ্মের মাত্র কয়েকটি পাপড়ি। রবীন্দ্র-সাহিত্য ও সঙ্গীতের সৌরভ প্রভাবে যেন এই কয়টি পত্র মলিন ও নিস্তেজ হয়ে এক পাশে পড়ে আছে। তাই কবির সাহিত্য ও সঙ্গীতের সঙ্গে দেশবাসী অধিক পরিচিত; বিভিন্ন রবীন্দ্র অনুষ্ঠানেই তাই শুরু হয় রবীন্দ্র-সঙ্গীত মাধ্যমে, আলোচনা হয় রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার ও অবদানের ও পরিসমাপ্তিও ঘটে আবার রবীন্দ্র-সঙ্গীত সহকারে। কবি অঙ্কিত বিভিন্ন চিত্রাবলী ও তার রচনা পদ্ধতি বিষয়ে কোথাও কোনও নিয়মিত ও গভীরভাবে আলোচনা হয়েছে বলে শুনিনি।

রবীন্দ্রনাথ চিত্ররচনা শুরু করেন পরিণত বয়সে। অধিকাংশই রচিত হয় ১৯২৮ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে। তাঁর চিত্র প্রদর্শনীর প্রথম উদ্বোধন হয় প্যারী শহরে, ১৯৩০ সালে। পরে সেই প্রদর্শনী ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয় এবং সব স্থানেই সমাদর লাভ করে। অথচ দেশে তাঁর চিত্র প্রদর্শনীর সর্বপ্রথম অনুষ্ঠান হয় কলিকাতায়, ১৯৩১ সালে, অর্থাৎ কবির তিরোধানের মাত্র দশ বৎসর পূর্বে। এর পরে একেবারে ১৯৫৪ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের উদ্যোগে দিল্লীতে নিখিল ভারত শিল্প ও চারুকলা সমিতি (AIFACS) হলে রবীন্দ্রনাথের এক বিরাট চিত্র প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়—উদ্বোধন করেন স্বয়ং জওহরলাল নেহরু। অর্থাৎ সুদীর্ঘ ২৪ বৎসর যাবত কবি-জীবনের এত বড় একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সঙ্গে দেশবাসীর পরিচিত হবার কোনও সুযোগ মেলেনি। লজ্জার কথা, সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের চিত্র রচনার পটভূমিকা, উৎস ও পদ্ধতি ক্রমানুসার ধারা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা ও গবেষণা করার অবকাশ আছে, এই ছোট নিবন্ধে সেটা সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে সে বিষয়ে কিছু বলার চেষ্টা করব।

প্রধানত রবীন্দ্র চিত্রাবলী তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম, সাবলীল রেখাছন্দের মধ্য দিয়ে কল্পনা ও অনুভূতির প্রকাশ; দ্বিতীয়, নিসর্গের বিভিন্ন রূপের আলেখ্য ও তৃতীয়, মানবমূর্তি ও প্রতিকৃতি।

বাংলা বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষরের যে একটি বিশিষ্ট ছন্দোময় রূপ আছে সেটা সর্বপ্রথম কবি নিজ হস্তলিপি মাধ্যমেই প্রমাণ করলেন। পাণ্ডুলিপি রচনাকালে বিভিন্ন রেখা সহযোগে তিনি যে সংশোধন, পরিবর্ধন অথবা পরিবর্জন করতেন সে-গুলিই কবির জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এক একটি বিশেষ আকারের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠত। সুতরাং এগুলি আকারভিত্তিক, এবং অনেক স্থলেই, বিমূর্ত রচনা। কাব্যধর্মী সাবলীল ছন্দ, রেখাসৌষ্ঠব, বলিষ্ঠ গতিবেগ ও প্রকাশভঙ্গীমার লালিত্যগুণে এ শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেক রচনাই স্বসম্পূর্ণ এবং বিশ্ব-চিত্রকলা দরবারে এগুলি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। চিত্রকলা ক্ষেত্রে যাঁরা নূতন পদার্পণ করেছেন, বিশেষ করে যাঁরা উৎপ্রেরণা লাভের জন্য পিকাসো-ক্যান্ডিনসকি - সাদারল্যান্ড - ক্লী-মিরোর স্মরণস্থ হন তাঁরা যেন একটু কষ্ট স্বীকার করে কবির এই রচনাগুলি বিচার করে দেখেন। আমার স্থির বিশ্বাস, তাঁরা নূতন জগতের সন্ধান পাবেন। প্রকৃতপক্ষে এহেন রচনা অনুভূতির বস্তু, কেবলমাত্র দর্শনগ্রাহ্য নয়। অবশ্য প্রদর্শনীতে এই শ্রেণীর নিদর্শন অল্পই আছে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃতির পূজারী তার ওপর তাঁর ছিল শিল্পীসুলভ রূপ-সন্ধানী চোখ। তাই সাধারণ দৃশ্যের মধ্যেই তিনি অসাধারণের পরিচয় পেয়েছেন। ঈষদুচ্চ এক শিলাখণ্ডের ওপর কয়েকটি সাধারণ গাছ সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, পশ্চাৎদিকে পশ্চিম আকাশ সূর্যাস্তের রঙীন আলোয়

উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে: অথবা বসন্ত সমাগমে কোন গ্রামপ্রান্তে দুটি গাছ নবপত্র-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে অপরিচিত সরল কোনও গ্রাম্য যুবতীর মত লজ্জায় নত হয়ে পড়েছে—কবির কাছে এ দৃশ্যগুলি ধরা পড়েছে ও বিভিন্ন মাধ্যম ও অংকনরীতির মধ্য দিয়ে তিনি সেগুলি রূপায়িত করেছেন।

কেবলমাত্র কালিকলমের সূক্ষ্ম ও সরল রেখা সহযোগে প্রতিকৃতির মধ্য দিয়ে কিভাবে মনোভাব ও চরিত্রগত বিশিষ্ট রূপটুকু প্রকাশ করা যায় তার পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের আঁকা মূর্তি ও প্রতিকৃতি-গুলিতে। বস্তুত কয়েকটিকে অপরূপ বললে অত্যুক্তি হয় না। প্রথমেই বলেছি যে এই প্রদর্শনীটি ছোট ও অসম্পূর্ণ—এখানে উল্লেখযোগ্য ছবি কমই দেখলাম। তাহলেও কবি অংকিত কয়েকটি প্রতিকৃতি ইতিপূর্বে দেখার সুযোগ হয়েছে যেগুলি মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। এবং এই প্রসংগে সে-গুলির উল্লেখ করা বোধ হয় দূষণীয় হবে না। হয়ত কোনও রমণী দাঁড়িয়ে আছেন, দুটি চোখের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে এক চিরন্তন প্রশ্ন যার সদুত্তর আজও কেউ দিতে পারেন নি; অপর কোনও রমণী হয়ত আঁখি প্রদীপ দুটি তুলে ধরেছে তারই স্বল্প ও স্নিগ্ধ আলোকে মুখখানি ভরে উঠেছে; আবার হয়ত অন্য কোনও নারীর আয়ত চোখ দুটির মধ্য দিয়ে অতীন্দ্রিয় এক জগতের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। যাঁরা এই শ্রেণীর অধিকাংশ ছবি দেখেছেন তাঁরাই আমার বক্তব্যটুকু বুঝতে পারবেন।

সবচেয়ে বড় কথা অংকনরীতিতে রবীন্দ্র-নাথ প্রথাগত কোনও অনুশাসনই মেনে চলেন নি এবং বিশেষ কোনও মাধ্যম ও রীতিও অনুসরণ করেন নি। স্রষ্টা হিসাবে স্বাধীনভাবে আপনার খুশীমত রস সৃষ্টি করে গেছেন। লেখার সাধারণ কালি, গাঢ় (opaque) রঙ, সাধারণ তুলি ও সাধারণ কলম, এমন কি প্রয়োজনবোধে তুলি বা কলমের অপরদিক ব্যবহার করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। অথচ বিভিন্ন রঙের পরিপূর্ণ পাত্র ব্যবহার করে যেখানে অনেক শিল্পীই কোনও রস সৃষ্টি করতে পারেন নি, রবীন্দ্রনাথ সেখানে মাত্র কালিকলম, স্বল্প রঙ ও সহজ ও সাবলীল পদ্ধতিতে রচনা করে রসের সমুদ্র সৃষ্টি করে গেছেন। সুতরাং সে হিসাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন রীতি ও মাধ্যমে রচনা করলেও রবীন্দ্রনাথ কোনও বিশেষ গন্ডীর মধ্যে পড়েন না।

যে আধুনিক চিত্রকলা নিয়ে এককালে বাদানুবাদের অন্ত ছিল না, এক হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে সেই হিসাবে নূতন রীতির পথপ্রদর্শক বলা যেতে পারে—যদিও তাঁর রচনাকালের পূর্বেই গগনেন্দ্রনাথ কিউবি-জমের প্রবর্তন করেন। কথাটি হয়ত অনেকেরই মনঃপূত হবে না জানি, কিন্তু সত্য সন্দেহ নেই। তাহলেও রবীন্দ্রনাথ জটিল বা দুর্বোধ্য নন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে দেশের জনসাধারণ তাঁর রচনা দেখে সম্ভবত আনন্দলাভ করবেন। সেজন্যই হয়ত তিনি তাঁর কোনও ছবির পরিচয়লিপি দেন নি। এবং সম্ভবত সেজন্যই তাঁর চিত্র-রচনা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : "লোকে প্রায়ই আমার কাছে আমার ছবির অর্থ জানতে চায়। আমার ছবির মত আমিও চুপ করে থাকি—কারণ আমার ছবির উদ্দেশ্য হল শুধু প্রকাশ করা—ব্যাখ্যা করা নয়।"

পথে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী

জওহরলাল নেহরু রোড (চৌরঙ্গী) ও সাদার স্ট্রীটের সংযোগস্থলে, যাদুঘরের রেলিং-এর ওপর স্বঅংকিত কয়েকখানি ছবি ঝুলিয়ে রেখে শিল্পী চুনিলাল ভট্টাচার্য সম্প্রতি এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।

রাস্তার ওপর চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এই

প্রথম নয়। ইতিপূর্বে অনেকে করেছেন, কলকাতা এবং অন্য শহরেও। তবে শহরের জনপথ আজকাল বোধ হয় কেবল পথচলার জন্য নয়। বর্তমান বিক্ষুব্ধ ও সমস্যা-জর্জরিত যুগে শহরের, বিশেষ করে কলকাতার, জনপথ অনেককেই জীবিকার সন্ধান দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সমাজের বহু হতভাগ্যকে আশ্রয় পর্যন্ত দিয়েছে। সুতরাং পথপার্শ্বে চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার জন্য শিল্পীকে বলার কিছুই নেই। তবে তাঁর জানা উচিত ছিল যে, পথচারী-দের সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভের আশা করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয় নিজস্ব কোনও মূলধনের। এবং বলা বাহুল্য যে, শিল্পীর ক্ষেত্রে এই মূলধন হল তাঁর রচনানৈপুণ্য ও নিজস্ব বক্তব্য। দুঃখের বিষয় চুনিলাল ভট্টাচার্যের ছবিগুলির মধ্যে সে পরিচয় পাওয়া যায় নি। খবরের কাগজের ওপরে আঁকা কয়েকটি স্কেচ ও লঘু রঙের কয়েকটি ছবি তিনি রাস্তার ওপর সর্ব-সমক্ষে পেশ করেন। স্কেচগুলি অতি সাধারণ এবং রচনাগুলি কাঁচা হাতের—কোনটিই ছবির পর্যায়ে পড়ে না। বস্তুত এই নগণ্য মূলধন নিয়ে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করা যুক্তিসংগত হয় নি। শিল্পীর মুখে শুনলাম দশ বৎসর পূর্বে তিনি ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল থেকে ডিপ্লোমা লাভ করেন। কাজ দেখে মনে হয় না যে দীর্ঘকাল চিত্রকলার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল। আশা করি, ভবিষ্যতে অধিকতর প্রস্তুত হয়ে তিনি জনসাধারণের কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন, নতুবা এহেন নিদর্শন দেখে দেশের চিত্রকলা ও বিশেষভাবে তিনি যে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন, সে সম্পর্কে জন-সাধারণের অন্য ধারণা হবে।

রণজিৎ রায়ের চিত্র-প্রদর্শনী

ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিস্টস ইউনিয়নের উদ্যোগে দক্ষিণ কলকাতায় মোনালিসা গ্যালা-রীতে শিল্পী রণজিৎ রায়ের যে প্রদর্শনীর আয়োজন হয় সেটি দেখে সকলেই আনন্দ-লাভ করেন। শ্রীরায় সবসুদ্ধ ১৬খানি নিদর্শন পেশ করেন। অধিকাংশই কালি-কলম ও ওয়াশ রীতিতে আঁকা স্কেচ, যদিও বিমূর্ত রচনার কয়েকটি নমুনাও ছিল। স্কেচগুলি দেখে মনে হয় এই শিল্পীকে জন্তু-জানোয়ার, বিশেষভাবে বন্য বরাহ ও ধাবমান অশ্ব মুগ্ধ করেছে এবং তাদেরই বিভিন্ন রূপ তিনি কালি-কলমের দ্রুত স্কেচের মধ্যে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। জু পিওন, ও স্যার আলফ্রেড মানিংস অঙ্কিত অশ্বের বিভিন্ন রূপের সঙ্গে চিত্র-রসিকবর্গ সুপরিচিত। জন্তু-জানোয়ারের স্কেচ প্রসঙ্গে পূর্বসূরীদের মধ্যে অবনী সেনের কথা স্বভাবতই মনে আসে

অশ্বমুণ্ড —রণজিৎ রায়

—তাঁর আঁকা বাহনের বিভিন্ন বলিষ্ঠ স্কেচ অনেকেরই মনে আছে। সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে নিখিল বিশ্বাস ও সুনীল দাশের কথাও সকলের মনে পড়বে। সমকালীন চিত্রকলা-ধারার দিক দিয়ে বিচার করলে হয়ত বস্তুবাদীগণ এই স্কেচগুলি কয়েকজনের কাছে পুরাতনপন্থী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু শিল্পীর বলিষ্ঠ অঙ্কনরীতির জন্য এগুলি অনেকেই পছন্দ করবেন। সবচেয়ে বড় কথা, অতি অল্প সময়ে ও মাত্র কয়েকটি রেখা-মাধ্যমে তিনি ধাবমান অশ্বের গতিবেগ ও বিশিষ্ট রূপটিকু ফুটিয়ে তুলেছেন। এই শ্রেণীর নয়খানি ছবির মধ্যে ৬ ও ৭ নং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্রুশের ওপর রক্তাক্ত দেহে মহামানব যীশু খৃষ্টের আত্মদান বহু শিল্পীকেই অনুপ্রাণিত করেছে এবং এই প্রসঙ্গে দেশের সমকালীন নিদর্শনের মধ্যে অরুণ দাশের "যীশু খৃষ্ট"-র কথা মনে পড়ে যায়। এই শিল্পীও যে সেই মানবপ্রেমিকের আত্মাহুতির রূপ-টুকু ফোটাতে চেয়েছেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। একটি ছোট স্কেচে মাত্র ইঙ্গিত ও ইশারার মধ্য দিয়ে শিল্পী এই যুগাবতারের আত্মদানের করুণ রূপ প্রকাশ করেছেন, তবে এটি এক বৃহত্তর পরি-প্রেক্ষিতে রচনা করলেই বোধ হয় তিনি ভাল করতেন। বস্তুত এই ছোট ছবিখানির মধ্যে বিরাট সম্ভাবনার বীজ নিহিত আছে এবং আমার বিশ্বাস শিল্পী যদি গভীরভাবে চিন্তা করে এটিকে বৃহত্তর ক্যানভাসে রঙের মাধ্যমে রূপায়িত করেন তাহলে তিনি লাভবান হবেন। শিল্পীর বিমূর্ত রচনায় কোনও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর কাজের মধ্যে "আদরে ওয়ার্ল্ড"-এর নাম করা যেতে পারে।

সূচিশিল্প প্রদর্শনী

নানা রঙের সূতোয় কাজকরা রুমাল টিপয় ও টেবলক্লথ, শাড়ি ও স্কার্ফ এবং সেই সঙ্গে রঙীন সূতোয় বোনা নানা পূর্ণাঙ্গ ছবি—এক কথায় যেন শৌখীন সূচিশিল্পের স্বপ্নরাজ্য। বাস্তবিক, জওয়াহার দেবী বিড়লা ইনস্টিটিউট অব হোম সায়েন্স-এ অনুষ্ঠিত ভারতের সূচিশিল্প প্রদর্শনীতে পদার্পণ করে সেদিন সর্বপ্রথম এই কথাই মনে হয়েছিল।

আমাদের দেশের নারীর কাছে সূচিকার্য অতি পুরাতন ও পরিচিত শিল্পকলা। বাংলা দেশের কাঁথা, বিহারের কাশিদা এ উত্তরপ্রদেশের আপ্লিক-এর কাজ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই সূচিশিল্পকে অধিকতর জনপ্রিয় করার জন্য আংকর সূতো প্রস্তুত-কারী কোটস কোম্পানী ১৯৬৬ সালে এক সূচিশিল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নারী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রায় ১১,০০০ নিদর্শন হস্তগত হয়। যাঁদের কাজ শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয় তাঁদের ২,০০০ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হয়। বিভিন্ন নিদর্শনের মধ্য থেকে নির্বাচিত কয়েকটি সূচিশিল্পের কাজ তিনটি ঘরে পেশ করা হয়। প্রদর্শনীতে কলে ও হাতে তোলা দুই রকম কাজেরই নমুনা ছিল এবং সেগুলি থেকে সুরুচি ও সূচিকার্যকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তা হলেও, যথার্থ ভারতীয় কোন সূক্ষ্ম ও মৌলিক প্রতীকের সন্ধান পেলে হয়ত প্রদর্শনীটি আরও সার্থক হয়ে উঠত। সূচিশিল্পের মাধ্যমে যে কয়েকজন প্রতিযোগী ছবি রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে ওয়ালচাঁদ রতনচাঁদ কোথাড়িয়া, নিপানি ("গায়ক"), কুমারী শীলা কার্নে, পুণা ("সানসেট"), কুমারী বীণা দাস, কলকাতা, ("নারীর মুখ"), কুমারী ভি শ্রীনিবাসন, মাদ্রাজ ("আধুনিক ইমারত"), ও কুমারী বিজয়মালা পেণ্টার, কোলাপুর ("টিবেটান গার্ল") সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রুমাল ও টেবল ক্লথের উপর সূক্ষ্ম সূচি-কার্যের জন্য মাদার সুপিরিয়র, হোলি কনভেণ্ট, মাদ্রাজ ও কুমারী গার্টরুড ডিসুজা, বেলগম, দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করেন।

—চিত্রপ্রিয়

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

সাঁইত্রিশ

মনে হল, রেলগাড়ির তাবত লোক, গাড়ির ঘর খালি করে নেমে এল। কেউ আর কোথাও যাবে না। সকলেরই যেন বোলপুরে গন্তব্য, গতি। যত এ-বোল বোলা, সব হেথাতে। ঝোলাঝুলি নিয়ে আমিও তখন ইস্টিশনের দাওয়ায়। কিন্তু মলুটির ঘোর তখনো মনে। আমার প্রথম দেখা রাঢ়ের কীর্তন, তখনো যেন আখরের পৌনঃপুনিক বোলে বাজছে। মনের নজর পড়ে আছে মৌলীক্ষার মাঠে। সেই সূর্য ডোবা, আলোছায়া প্রান্তরে, যেখানে অরূপের খেলা খেলে, নরনারী জীবন্ত মিথুন মূর্তিতে, বন্ধকাম লীলায়।

তারপরেও মলুটিতে বারেক গিয়েছি। দেখেছি সব, তবু প্রথমের তুলনা যেন নেই। সেই দেখা, সেই এক দেখা, যখন বিচার ছিল না আচরণ দর্শনে। তারপরে যা দেখেছি, শুধু দেখেছি। প্রথম যা দেখেছিলাম, সেই স্বপ্ন আঁকা চোখে। দেখেছি কি দেখিনি, সত্য না মিথ্যা, বিস্ময়ের আবেগে দেখা, সেই দেখাটা সত্য হয়ে আছে আজও। অনুসন্ধিৎসা বিচার বিশ্লেষণ, যত প্রকার প্রকরণে দেখা, তার কোন দাগ নেই মনে।

'ওদিকে না, এদিকে আসুন। ওপারে যেতে হবে সুসার পোল পেরিয়ে।'

তখনো সিরাজদ্দৌলা, ভিড়ে হারিয়ে যায়নি, ছেড়েও যায়নি। বরং আবার হাত বাড়িয়ে বলে, 'দিন না, একটা কিছু আমার হাতে দিন।'

না না, তা-ই কি কখনো হয়। বটে, আমার হাতে বোঝা, কাঁধে বোঝা। বোঝা সকলই আপন। বাহক না পেলে তা আপনিই নেব, সিরাজের ঘাড়ে তা চাপাতে পারি না। বলি, 'না না, চলুন, ঠিক আছে। কুলি টুলি—।'

আহ্, যা বলছে, তাই শুনুন না কেন সুসার। মিছে প্যাচাল কেন। এতো আর লুট কাড়াকাড়ি না। যে যেখানে যার বাজনদার, তাকে সেখানে তাই বাজাতে দাও।

অতুলদাস কিলিমার সিরাজ তেমনি করে হেসে বলে, 'কুলি টুলি মেলাই আছে, কিন্তু প্যাসেনজার দেখেছেন কত। কলকাতার গাড়িও তো এসেছে ওপারে। দিন, একটা দিন আমাকে।'

হ্যাঁ সুসার, না দেন তো, এমনি করেই নেব। বাঁধানো বাঙলার মসনদখানি আলখাল্লা সদৃশ গরম কোটের যে পকেটে ঢুকেছে, সেটিকে বলতে পার, হাত ভর এক গর্ত। এখন সেই পোশাকটির সকল বোতাম খোলা। দেখতে যদি বা মনে হয়, তবু মনে করো না, যেন সঙের ঝালঝোপ্পা। লম্বা লম্বা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া আতেলা চুলে ঝাঁকানি দিয়ে, একটা ঝোলা হাত থেকে টেনে নেয় সে। পা বাড়িয়ে দেয়, লাইন পেরনো পোলের সিঁড়ির ধাপে। তার পাশেতেই, সীমানা পাঁচিলের ধারে, সাইকেল রিকশাওয়ালাদের ডাকাডাকি। আমাদের দরকার নেই, আমরা যাব ওপারে।

বোঝা খালাসে যে স্বস্তি পাইনি, এমন কথা বললে জিভ খসে যাবে। আর একথাও ঠিক, কলকাতার গাড়িও ইস্টিশনের ভিন্ দাওয়াতে দাঁড়িয়ে। সেই কারণেই লোকে লোকারণ্য দেখেছিলাম। ইতিমধ্যে অতুলদাসের স্বর বদলেছে, হাসির রকমখানিও ভিন জাতের। পোলের ওপর যাওয়া আসার ভিড়। তার মধ্যেই সে বলে, 'দেখুন সংসার, মানুষের ধর্ম হল মানুষকে দেখা, না কী বলেন।'

'তাতো বটেই।'

'আপনার বাকসোটা আমি একটু হাতে করে বয়ে দিলে, হাতে তো আমার আর ফোস্কা পড়ে যাবে না।'

সেইজন্যেই মানুষের ধর্মের কথা। তবে আর আপনি এত লজ্জায় পড়েন কেন সংসার। তা না হয় পড়ব না, তবে পোলের এই এত ভিড়ে, যেখানে গোঁত্তা দিয়ে, কাত হয়ে ঠেলে চলতে হচ্ছে, সেখানে মানুষের ধর্মের বচন ঠাওরানো একটু কষ্টসাধ্য, এই আর কি। তা হোক, তবু শুনুন, 'সময়ে আপনারটা আমি নেব, আমারটা আপনি, না কী বলেন।'

বটেই তো। কিন্তু সেই তো ব্যাজ, অতুল-

দাসের মতন অমন উদার নজর পেলাম কোথায়। হাত বাড়িয়ে যে পরের বোঝা নেব, হাতে মনে তেমন তাগদ পাইনি। তাই লম্বা কোট পরা ঝালঝোপ্পার ঠেলে চলা সিরাজের চলায় চালখানি দেখলাম। তোমার ঠোঁটের কোণে একটু হাসির বাঁক লাগতে পারে। কিন্তু দেখেছে, যেন ঘাড় সোজা, মাথা তোলা, দরবারের পায়চারির চাল।

হয় তো আরো কিছু বলতো, তার আগেই এক হাঁক শোনা গেল, 'এই যে ওস্তাদ, এ গাড়িতে এলি?'

ওপারে সিঁড়ির রেলিঙের বাইরে, একরাশ মানুষ। হাত বাড়িয়ে ডাক দিচ্ছিল, 'রিকশা চাই নাকি বাবু। এই যে বাবু, আমি বলেছি, আমি।'

সেই ভিড়ের মাঝখান থেকে ওস্তাদ ডাকের হাঁক বেজেছে। তারপরেই দেখ, অতুলদাসের মুখে হাসি। যার সঙ্গে হাসাহাসি, তাকেও দেখ। বীরভূমের মফস্বল শহরে খেটে খাওয়া যোবার মতন চেহারাখানি। গায়ে একখানি জামা, বুকের বোতাম খোলা। শীত লাগে না বুঝি! পরনের ময়লা কাপড়খানি হাঁটুর ওপরে তোলা। হাসির বেবাকটুকুই বন্ধু দরশনে খুশি। অতুলদাসের তা না। হাসির ধাচ ধোচ ঘোচ ঘাচ একটু ভিন জাতের। সেই দরবারি দরবারি। সেইভাবেই, একটু ঘাড় নেড়ে জানান দেওয়া, 'হ্যাঁ, ওস্তাদেই বটে, এ গাড়িতেই এল।' আওয়াজ দেয় অন্য কথায়, 'তোর গাড়ি আছে নাকি রে নিতাই।'

নিতাই জবাব দেয়, 'আছে'

তার আগেই, ভিড় করা তিন চাকার গাড়ি চালকদের মধ্যে একজন পুছ করে 'ক্যানে, তুই যাবি নাকি?'

পুছ করার সঙ্গে সঙ্গেই দু চার গলায় হাসির রোল বাজে। ব্যাপারটা যেন একটু কেমন কেমন। অতুলদাসের দিকে একবার আড় নজরে চাই। না, এত সহজ নয় হে, হাজার হাজার লোকের সামনে আসরে পালা করি। অমন দু চার চিপটেনিতে আমাকে ঘায়েল করা যায় না। জবাব দেয়, 'না, এই ইনি যাবেন।'

ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখিয়ে, রেলিঙের ওপর দিয়েই আমার চামড়ার বাক্সো এগিয়ে দিয়ে বলে, 'এটা নেরে নিতাই, বাবুকে নিয়ে যাবি।'

ভিড়ের ভিতর থেকে নিতাইয়ের হাত এগিয়ে আসে। আমার ঝোলা চলে যায় তার হাতে। তারপরে অতুলদাস আমার কাঁধের ঝোলাটার দিকেও হাত বাড়িয়ে বলে, 'দিন সুসার, ওকে দিয়ে দিই।'

তা দেব কিন্তু অই দেখ হে, নগর কুটিল মন আমার। ভাবি, ঝোলাবুলি বে-হাত করে কার হাতে দিই, কিছু তো জানি না। মলে হাভাত হব না তো। জিজ্ঞেস করি, 'ওর গাড়ি কোথায়?'

অতুলদাস অনায়াসে হাসে। বলে, 'আছে, বাইরে ভিড়ের মধ্যে আছে, দিয়ে দিন না।'

আমি নাবাবার আগেই সে কাঁধ থেকে ঝোলাটা নিয়ে বাড়িয়ে দেয় নিতাইয়ের দিকে। তখন আবার একজনের গলা শোনা যায়, 'নেতাইয়ের কপাল ভাল, ওস্তাদে প্যাসেনজার ধরিয়ে দিল। আমাদিগের এক আধটো হবে না হে।'

আবার একটু হাসির রোল বাজে। তা বলে তুমি হেস না হে। মনে মনে বল, 'লোকগুলো বড় ব্যাদরা তো।' তবে কিনা, তেমন বিষ গরলের ঝাঁজ নেই যেন। মজাখোরদের মজা। তার মধ্যে যেটুকু তেতোর আভাস, সেটুকু রসের তিক্ততা। অতুলদাস হেসে বলে, 'কত লিবি, লে না ক্যানে, প্যাসেনজার তো মেলাই। আমার দিতে লাগবে না।'

হ্যাঁ, এত সহজে মচকাতে পারবে না। তবে যতক্ষণে বলা, ঘটনা ততক্ষণ না। ঠেলা বাঁচিয়ে কোনরকমে ঝোলা চালান দিতে যতক্ষণ। তারপরেই ধাক্কায় ধাক্কায় একেবারে সিঁড়ির নিচে। তখন এদিকে চাপ, ওদিকে চাপ। যাবে কোথায় যাদু, দাঁড়াও। এর নাম ছাতিমতলার মেলা।

কিন্তু ই কী রকম মেলার যাত্রী হে! এতখানে এত মেলা দেখে এলে, এমনটা তো কোথাও দেখনি। এমন নগর ছানিয়া, নাগরিয়া চালের যাত্রী, আর কোথায় দেখা যায়। অই যে সেই কী বলে, সড়কের নাম চৌরঙ্গী, কলকেতায় বুকের হারের লকেট, যাত্রীবৃন্দ অনেক যেন সেই লকেটের খুলে পড়া ঝিকিমিকি পাথর গ। ইঙ্গবঙ্গ মিল মেশানো, মাথাতে টুপি, মুখেতে চুরুট, কোট পাতলুনের ছড়াছড়ি। গলায় গলায়, সেই কী ভাষায় বলে 'কণ্ঠলেঙ্গটি' তার নানাপ্রকার বাহার। তার সঙ্গে মেলাই, দিশী ধুতি চাদর চোগা চাপকানও আছে। কিন্তু দেখ, সেথাও বেজায় নগর ঝলকানো ঝলক। মুখেতে ধূমপানের নল, হাসির জাত আলাদা, ভাষাতে দিশী বিদেশী চিবিয়ে ছাড়া বাত।

ছাতিমতলার মেলায় এত ঝলক, এই

দূরের রাঢ়ে, রাজধানী ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে! না, এমন মেলার যাত্রী আর কোথাও দেখিনি।

কেবল কি যাত্রী নাকি, যাত্রিনীরা? দেখ এসে, রঙ বাহার কাকে বলে। ধলীর মাথায় মীনারের মতন খোঁপা, কালীর চুল ঘাড় ছাটা, ঝাঁপিয়ে দোলে বাতাসে। এমন ঝলক দেওয়া কাঁচ স্বচ্ছ শাড়ি, তার ওপরে গরম জামার কী চোখ ভোলানো শ্রীছন্দ। চোখের কালো ঠুলি যদি খোলা পাও, দেখ কাকে বলে কাজল আঁকা, নয়ন প্রসাধন। কাকে বলে বিম্বোষ্ঠা, রঙে রাঙিয়ে। তার সঙ্গে চলন বলন হাসি, ঝকঝকানো মেয়ে-খোকার দোল্‌দোলানি, ই বাবা গ, চল সব ছাতিমতলায় যাই। না জানি সে মেলা কেমন!

তবে কি না, এর সঙ্গে সর্বপ্রকার পাবে। দেখ, এদিক ওদিক, দু চার দশ ইস্টিশন টপকে আসা স্থানীয় মানুষ, নরনারী, তাদের দেখলে চেনা যায়। ঘর গৃহস্থির ছাপ, জামা কাপড়ে, চোখে মুখে, কথায় বার্তায়। আগামীকাল সাতুই পৌষ, এদের আগাম আগমন। এরাও মেলার যাত্রী, কিন্তু মেলার আগেই মেলা দর্শন করে দূর নগরের নাগরিক নাগরিকাদের দেখে। যেন অবাক কৌতূহলে, অচিন দেখা দেখছে।

এদের মধ্যেই দেখলে চিনবে মেলার দোকানদারদের। কুলিদের মাথায় মাল চাপিয়ে চলেছে কেউ। কেউ আপন হাতে মাথায় পশরা নিয়েছে। হয়তো কেউ আসে বর্ধমান থেকে এক গাড়িতে, কেউ শিউড়ি থেকে আর এক গাড়িতে। তাদের বড় ব্যস্ত ত্রস্ত ভাব। সময় নেই, সময় নেই। পশরা নিয়ে বসবার একটা জায়গা চাই তো। তার একটা বিলি ব্যবস্থা আছে তো। এদিক ওদিক ছড়ানো ছিটানো দুই চারি রাঙা মাটি রঙ আলখাল্লা পরা না পাবে, এমন না। কারুর আছে বাঁয়া একতারা, কারুর দোতারা গলে। কারুর মাথায় রাঙা পাগড়ি, কারুর কেশে বাঁধা চূড়া। এরা বৈষ্ণব না বাউল, কে জানে। গাজীর কথা মনে পড়ে যায়। আরো পড়ে, কেন কি না, এক দুই পিরিতিও চোখে পড়ে যে। অর্থাৎ প্রকৃতি। গেরুয়া ছোপানো কাপড় তাদেরও আগে। ভিড়ের মধ্যে আরো আছে, সাঁওতালী আদিবাসী নরনারী। দেখে মনে হয়, সকলেই মেলায় যায়।

ইস্টিশনের দাওয়ার খাঁচা থেকে যখন কোনরকমে বেরিয়ে এলাম, দেখি অতুলদাস আমার হাত ধরে আছে। ভিড় ঠেলে ঠেলে নিয়ে যায়। তিন চাকার যান কিন্তুর। আমি চাই নিতাইকে। যার কাছে আমার সব। তবে ভয় নেই, তোমার নজরে পড়বার আগেই, ডাক শোনা যায়, 'এই যে, এদিকে।'

অতুলদাস আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'কার বাড়িতে কোথায় যাবেন বললে তো।'

বন্ধুর নাম করি। নিতাই বলে ওঠে, 'আর বলতে হবে না, আপনি উঠেন, সে-বাবু আমার জানা শোনা।'

না হওয়াটাই তো আশ্চর্য। আমি উঠে বসি। অতুলদাস বলে, 'ভাড়া যেন বেশী লিস না নিতাই।'

নিতাই তারে বাড়া। হেসে বলে, 'সে

তোকে বলতে হবে না। মেলার সময় বাবুরা এসেছেন। মেলার মতন দেবেন।'

বলে আমার দিকে চেয়ে হাসে। অতুলও হাসে। বলে, 'তা হলে সংসার আসবেন কিন্তু। মঙ্গলবার আমাদের যাত্রা।'

'নিশ্চয়ই আসব।'

নিতাই গাড়ি ঠেলে। অতুল তার ঝাল-ঝোপ্পার হাতা সুদ্ধ হাত তোলে। বিদায় দেয়। আমিও হাসি। কিছু বলি না, কিন্তু সিরাজদ্দৌলাকে মনে হয়, ভাঙাচোরা মুখ একখানি, চোখের কোল বসা, ধুলো মাখা আলখাল্লা পরা একজন বাউল, এই সকল হাসি কথার মাঝখানে, ওর চোখে কোথায় যেন একটা পরম খোঁজার আর্তি। যে-আর্তি যেমন গানে ভঙ্গিতে ঢাকা পড়ে থাকে, হঠাৎ চোখে পড়ে না, সেই মত। জানি না, সে কিলিনারের সংসার জীবনের অসহায়তা, না কি শিল্পীর হাহাকার। সব মিলিয়ে, কেমন একটা প্রাণ উদাসী নিশ্বাস পড়ে। করুণা করব, তেমন সাহস নেই। মমতা বোধে বাধা কী। আর মনে হয়, কত না কিঞ্চিৎ আমি। কারুর জন্যে কিছু করতে পারি না। তা-ই কেবল ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে থাকি। অতুলদাস হারিয়ে যায়, রিকশার মিছিলের আড়ালে।

মিছিল ছাড়া বলব না। সামনে পিছনে অগুনতি রিকশা। তার মধ্যে আছে বোল-পুর শহরের অন্যান্য যানবাহন। লরী বাস গরু মহিষের গাড়ি। দেখে বোঝা যায়, ঘোড়াকেনার বাজার ছোট না। দূরান্তের মানুষের আনাগোনা এখানে। শহরের মানুষেরা দেখছে দূরের মেলার যাত্রীদের। সব থেকে বেশী, নগর যাত্রী যাত্রিণীদের, যাদের ছাটে কাটে বেশভূষাতে, পৃথিবীর বাজারে প্রকাশ, গতকালের প্রথম নমুনা। অঙ্গরাগে প্রসাধনেও তাই। বল, দূর রাঢ়ের চোখে, হাঁ করে অবাক হয়ে দেখবার বস্তু কি না!

তুমি দেখ, তা বলে সে কি দেখে। সে যায় ছাতিমতলার অঙ্গনে। কে জানে, সাধকের পীঠভূমিতে সে কেন যায়। কেন চলে সেই মরমীয়ার ঠাঁই। যেখানে গান বেজেছে ধ্যান থেকে। প্রাণের জন্ম হয়েছে কাব্যের তপস্যায়। যেখানে 'আলো আলো' ডাক ভারী আঁধার যাতনায়। হয় তো কেবল উৎসবে, তোমার মতন। কেবল নয়নে, কৌতূহলের অবাক বানের ঢেউ খেলাতে।

ঠেক খেতে খেতে, কিছু উত্তরে আসার পর, একটু ফাঁকা। তবু নগর চালের কোঠা বাড়ি, বায়স্কোপের ঘর পাবে। আবার লাল মাটিতে গোড়া রাঙানো ছোট-খাটো বেণুবন, অন্যান্য গাছপালা, মাটির কুটির, মাঠ, জলাশয়, দু পাশে ছড়ানো ছিটানো। তারপরে ডাইনে, পূবের প্রাঙ্গণে দেখ, মেলার সাজগোজ। অস্থায়ী চালাঘরের চালবেড়া, নানাখানে নানা রঙের সামিয়ানা, বড় বড় ঘেরাটোপে ঘেরা, কী যেন ব্যবস্থা সেথা। খেলা কি শিল্প, কে জানে। তবে মেলায় সেই যে, নানা যাদু, সাপ পশু পাখীর খেলা, চোঙা মুখে ডাকা-ডাকি, যন্ত্রে বাজানো গানের তারস্বর, তাও শোনা যায়। নীল আকাশের গায়ে দেখ নাগরদোলা এখনো কেন ঠেক খেয়ে আছে। তবু যেন কলরবের মাঝে, বাজে তালপাতার বাঁশী। রিকশা বেঁকে যায় বাঁয়ে, এক লৌহ দরজার খোলা পাল্লার ভিতর দিয়ে।

যেন রঙ বদলে যায়, ভাব বদলে যায়। মনের মধ্যে সুর বদলে যায়, দৃষ্টিতে এক চমক খাওয়া চমকে, সহসা নতুন কাজল মাখা নিবিড়তায় স্বপ্নবৎ লাগে। রাঙা পথের দু ধারে, গাছের নিবিড় ছায়া। রোদ এসেছে তার ফাঁকে ফাঁকে পশ্চিমের ঢলে যাওয়া বেলা থেকে। যতই কেন না চিনি তবু আমজাম শাল জারুল চিনি। তারা সকলে মেশামিশি করে, কোথাও যে এমন রমণীয় হয়ে ওঠে, দেখিনি। অরণ্য দেখেছি। তার রূপ আলাদা। কিন্তু ছাতিমতলার সীমানায়, বাঁ দিকে মোড় খেয়ে, যেন এলাম এক স্বপ্ন রাজ্যে। আপন ভোলা এক গভীর গহনে। চোখ ফিরিয়ে যেখানে আমলকীর চিরল চিরল পাতা চিনতে ভুল হয় না। যেখানে মেলার কোলাহল দূরে, স্তিমিত; মানুষের ভিড় আরো দূরতর, এই শীতের অবেলায়, শুনিয়ে দিল হঠাৎ ময়ূরের কেকা। রূপ কথার দেশ নাকি! পাখী ডাকে চিকচিক পিক পিক। এই মৃদুতর শীতের বাতাসে কোন্ পাখী শিস দেয়। আর এতক্ষণের সকল ধুলো ধোঁয়ার গন্ধ ছাড়িয়ে, নিশ্বাসে নিশ্বাসে যেন কী এক বিচিত্র গভীর গন্ধ। প্রকৃতির গন্ধ, শিরায় শিরায় প্রবাহে দেয় নিবিড় স্নিগ্ধ মদিরতা।

পথ কোথা দিয়ে বেঁকে যায়। ছায়া নিবিড়তা ঘনিয়ে আসে আরো। বন যেন নিবিড়তর, প্রকৃতির গন্ধ হয়ে আসে ঘন। কামিনী বকুল যত অ-ফুলে গাছ, শীতে যত অমুকুলিত বন, যেন শীত সীৎকারে ডেকে ডেকে বলে, 'মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল, তাহা/বুঝিতে পারো তুমি ?/শোননি কানে, হঠাৎ গানে কহিল, 'আহা আহা'/ সকল বনভূমি ?'

আর আমার বুকে বেজে যায় :

দুলিয়ে দিল সুখের রাশি,
লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি,
দুলিয়ে দিল জনম ভরা
ব্যথা অতলা।

কেন বলি, তা জানি না। কেন ফিরি পথে পথে, কিসের সন্ধানে, সেই অচিনের নাম জানি না। ওহে, আমি তেমনি, জানি না, সাধকের ধ্যানস্থানে, মরমীয়ার লীলা-ভূমে, কেন আমার সুখ দুলে ওঠে। লুকানো হাসি হাসতে, জনমভরা ব্যথা বেজে যায় কেন।

মনে হল, ছাতিমতলায় দীক্ষা দিনের যে মেলা দেখতে এসেছি, তার প্রথম মেলা এই দেখা। এই গাছপালা বন আকাশ, রাঙা মাটি ছায়া নিবিড়, পাখি ডাক, এই প্রকৃতি মেলা। কেন হে, এই ভাবি মনে, ঋষি কেন এই ঠাঁই বেছে নিয়েছিলেন। এই ঠাঁইয়ে কেন পেতে-ছিলেন আসন, নমস্কারে নত, আর উচ্চারণ,

'আনন্দং, অনন্তং, শুভং।'...এই প্রকৃতির মধ্যে কি দেখা মিলেছিল নিরবয়ব-এর, নির্বিকার-এর, একমাত্র-এর। কোন পাতার শ্যাম চিকনে ছিলেন ঋষির 'সর্বব্যাপী।' কোন ফুলেতে ছিলেন সেই 'নিত্য।' এই আকাশেই দেখে-ছিলেন নাকি 'অনন্ত-স্বরূপ।' যখন সকল তর্ক শেষ, যখন যুক্তি যুক্তিহীন, সকল ব্যাখ্যা অসীমে হারানো, তখন কি তা-ই এই ঠাঁই সেই ধ্যানে বসা 'জিন প্রেমরস চাখা নহী', অমৃতরস পিয়া তো ক্যায়া হুয়া?' তখনই কি এখানে এসে সেই প্রেম বন্দনা, 'যে প্রেম রস চাখেনি, সে অমৃত রস খেলেই বা কী।' প্রেম দাও, 'ঋষির' যবে এই ডাকাডাকি, প্রেম দাও, তখন কি তা-ই 'মহর্ষি'!'

যেন মনে হয়, সেই প্রেম থেকে শুরু মরমীয়ার। মরমীয়ার সৃষ্টি যত, সব প্রেমে বেজেছে।

'এই যে বাড়ি বাবু।'

সামনে বাগান, শীতের নানান ফুল। খানে খানে ঘাস, খানে রাঙা মাটি। মাধবী বিতান আর আর টগরের ঝাড়, যুঁইয়ের লতানো কেয়ারি, পাশে হাসনুহানা। জামের ছায়ার নিবিড়, শালের ছায়ায় ঢাকা। ডাক দেবার আগেই বন্ধুর সাড়া। তিনি একজন শান্তিনিকেতনের কর্মী। তবে যে একাল-সেকালের গুরুচণ্ডালী নিয়ে ভাববে, এমন নিবিড় নিকেতনে, মনোহর ঠাঁইটিতে ঝোলাঝুলি নিয়ে একলা ঠাঁই নেবে, সে গুড়ে বালি। কেন হে, তুমি কি একলা বন্ধু। দেখ, দরজা খুলে দিয়েছে। বাসাখানি যাত্রীতে ভরপুর। নরনারী, ভরাভরি, হাসি গানে সবাই আকুল। আমাকে দেখে সবাই যেন অনেকদিনের চেনা, এমনি করে ডাক দিল, 'আসুন আসুন।'

তার ভিতর থেকে বন্ধু, পত্নী মিষ্টভাবে ডাক দেন, 'ভিতরে আসুন।'

তা যাব। মুহূর্তে মনে হল, মেলা লেগেছে, হেথা সবখানে বনে বনে, বনের নিকেতনেও।

ক্রমশ

শিল্পীসমাজ ও স্বীকৃতি

যে সংগীত জগৎকে আমরা স্বীকার করি তার পরিধি খুব বিস্তৃত নয়। বস্তুত রেডিও এবং গ্রামোফোনের বাইরে যে একটা বৃহত্তর সংগীতসমাজ রয়েছে তার স্বীকৃতি প্রদান করতে আমরা কুণ্ঠিত। অথচ মাঝে মাঝেই বিভিন্ন আসরে এমন কিছু শিল্পীর পরিচয় পাই যাঁরা প্রতিভাসম্পন্ন কিন্তু তাঁদের প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ নেই। যে শিল্পী রেডিওতে অনুষ্ঠান পাননা বা যাঁর গ্রামোফোন রেকর্ড নেই তিনি মর্যাদালাভে আদৌ সমর্থ নন। অনেক সময় তাঁর ভাগ্যে নিষ্করুণ অবহেলা জোটে। বহুবার এই রকম ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার দুর্ভাগ্য হয়েছে কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের কোনও উপায় খুঁজে পাইনি। যার সংগীতে অসামান্য সম্ভাবনা ছিল সে অভিমানে সামান্য চাকরি সম্বল করে কেরানিগিরিতে বা ফ্যাকটারিতে আত্মোৎসর্গ করেছে আর তার শিল্পী-সত্তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। এমন লোক খুবই কম যে প্রচার চায় না, প্রশংসা চায় না—কেবল নিজের সাধনা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে। আর এমন লোককে স্বাভাবিক বলেও ভাবতে পারি না। অথচ বিষয়টা নিয়ে আমরা তেমন ভাবি না, আলোচনাও করি না। নতুন প্রতিভাকে যদি সুযোগ না দেওয়া যায় তাহলে একটা প্রাণবন্ত সংগীতসমাজ গড়ে উঠতে পারে না। রেডিও খুললেই মনে হয় একটা নির্জীব একঘেয়েমি যেন অচলায়তনে মাথা কুটে মরছে। কনফারেন্স-গুলি ক্রমেই নীরস ঠেকছে। সেখানেও একই অবস্থা। অগ্নিমূল্যে যাদের আজও ডেকে আনা হচ্ছে তাদের আর তেমন আবেদন নেই, অথচ নতুনরা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। সারা ভারতবর্ষে প্রতিভার অভাব ঘটেছে এটা বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। আসল কথা একটা বড় রকমের পরিবর্তন দরকার এবং সংগীত সম্বন্ধে আমাদের চিরাচরিত ধারণারও পরিবর্তন ঘটা বিশেষ প্রয়োজন।

সংগীতে আজ আমরা যে একঘেয়েমি অনুভব করছি তার প্রধান কারণ বছরের পর বছর একই শিল্পীদের একই ধরনের অনুষ্ঠান। তাঁদের সবাইকে এই কারণেই ছাঁটাই করে দেওয়া হোক এটা অবশ্যই আমাদের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু শিল্পী-দের একটি বৃত্তই অতি দীর্ঘকাল আবর্তিত হতে থাকবে এটাও তো সংগত রীতি নয়। আমার মনে হয় আকাশবাণীর সম্প্রসারণের একটা অভিনব পদ্ধতি দরকার। তাঁদের নির্বাচন রীতি, চুক্তির ব্যাপার এমনই জটিল এবং কোনও নতুন পরিকল্পনায় এতই দুস্তর বাধা যে নতুন কিছু তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করাই দুরাশা। অথচ একটা সাহসী অভিযানে অবতীর্ণ না হলে দেশের ব্যাপক সংগীত সমাজের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হবে না এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারেও তাঁদের পেছিয়ে থাকতে হবে। শিল্পীরা তাঁদের কাছে আসবে, সুবিধামত তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে তারপরে তাঁদেরই সুবিধামত অনুষ্ঠান দেওয়া হবে—এটা আমার মনে হয় খুব পুরোনো আমলের রীতি। এটাকে একেবারে উল্টে ফেলে শিল্পীদের সমাবেশে তাঁদেরই যাওয়া দরকার এবং সেখানে যেসব প্রতিভাবান শিল্পীদের দেখা পাওয়া যাবে তাদের সাহায্যে অনুষ্ঠান প্রস্তুত করতে হবে। বর্তমানে এইটাই প্রয়োজন। কেন—তা বলছি।

কলকাতার জনসংখ্যা কত তা জানিনা, শুনেছি চল্লিশ লক্ষেরও বেশী। এর মধ্যে অন্তত কয়েক হাজার শিল্পী আছেন যাঁদের মান বেশ উন্নত। এ ছাড়া বাইরের বাংলাদেশ তো রয়েইছে। এঁদের সকলকার অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে প্রচার করা বর্তমান পদ্ধতিতে অসম্ভব। অতএব এমন একটি পদ্ধতি নির্ণয় করা দরকার যাতে যতটা পারা যায় উদীয়মান শিল্পীদের সমাবেশ ঘটানো যায় এবং সমগ্র দেশের সঙ্গে আকাশবাণী যোগস্থাপন করতে পারেন। লোকসংগীত এবং আঞ্চলিক-সংগীত নির্ভেজালরূপে পেতে হলেও এই রকম রীতিই অবলম্বন করা দরকার। অবশ্য বাইরের কোনও কোনও জায়গা থেকে যে আকাশবাণী বিভিন্ন অনুষ্ঠান রেকর্ড করে আনেন না এমন নয়, কিন্তু সেগুলি তেমন যত্ন নিয়ে করা হয় বলে মনে হয় না এবং শিল্পপ্রচারের উদ্দেশ্যেও যে এগুলি করা হয় তা নয়। এই সব রেকর্ড যদি ভালভাবে তৈরি হয় তাহলে শ্রোতারা নূতনের আস্বাদ পেয়ে পুলকিত হবেন। সংবাদ প্রতিষ্ঠান যেভাবে সংবাদ সংগ্রহ করেন এবং সংবাদপত্র যেভাবে সংবাদ প্রচার করেন আকাশবাণীর রীতিটাও আমার মনে হয় অনেকটা সেই রকমের হওয়া দরকার নইলে সমগ্র দেশের সংগে তাঁদের যোগ থাকবে না। আমরা ডেমক্রেসী বলে হাজার চিৎকার করলেও আসলে যেটা অবলম্বন করেছি সেটা অটোক্রেসী এবং তার সহচর ব্যুরক্রেসী। নইলে গুণীব্যক্তিদের মাথা নিচু করে বার বার সরকারী প্রতিষ্ঠানে হাজির হতে হবে কেন আর কেনই বা তাদের সেই নিচু মাথা নিয়েই বেরিয়ে আসতে হবে? সেখানেও কত বাধা বিপত্তি দেখুন। যিনি প্রথমে পরীক্ষা নিলেন তাঁর মতের সঙ্গে উপরওয়ালার মত মিলল না। আবার এখানকার উপরওয়ালার মতের সঙ্গে হয়ত দিল্লীর বড় কর্তাদের মতের মিল হল না। এমনি হ্যাঁ-না-র মধ্যে পড়ে কারুর কোন লাভই হল না কেবল গোলযোগই সার হল। অতএব এ পথে শ্রেয়লাভ হতে পারে না। তার চেয়ে আকাশবাণীই আসুন শিল্পীদের মহলে, বেছে নিন কেমন অনুষ্ঠান তাঁদের চাই—প্রচার করুন জীবন্ত অনুষ্ঠান যা প্রতিদিন নব উৎসাহ নিয়ে আয়োজিত হচ্ছে। এই কারণে যদি আকাশ-বাণীতে কিছু বাড়তি লোকের দরকার হয় বৃহত্তর স্বার্থে তাও নিয়োগ করা দরকার।

কিন্তু সে এমন কিছু বেশী হবে বলে আমাদের মনে হয় না। সংবাদপত্রের কর্মীরা যেমন গুরুত্ব অনুসারে প্রতিদিনকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন তেমনি আকাশ-বাণীর কর্মীদেরও নানা বিচিত্র অনুষ্ঠানে যোগদান করা দরকার এবং সেখান থেকে, যদি সুবিধা হয়, অনুষ্ঠান টেপ করে আনা যেতে পারে অথবা নির্বাচিত শিল্পীদের ডেকে এনে স্টুডিওতে টেপ করে নেওয়া যায়। সংবাদপত্রের যেমন বাইরের রিপোর্টার থাকেন এঁদেরও তেমন জেলা শহরগুলিতে প্রতিনিধি থাকা উচিত। তাঁরা সে সব স্থানের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সমগ্র বাংলার শ্রোতাদের উপহার দিতে পারবেন। এতে বৈচিত্র্য যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি শ্রোতারা বহু বিষয় জানবারও সুযোগ পাবেন। বর্তমানে অডিশন বা কনট্রাকট-এর যে পুরাতন পদ্ধতি প্রচলিত আছে তা এত প্রলম্বিত এবং নিষ্ফল (ইংরেজীতে থাকে *Infructuous* বলা হয়) যে এই রীতি অবলম্বন করে পড়ে থাকলে সারবান কোন কিছুই করা যাবে না। সমগ্র সিস্টেম বা পদ্ধতিকেই সরল করে আনা দরকার। কয়েকজন সুনির্বাচিত শিল্পীর একটা লিস্টি আবহমান কাল ধরে রক্ষিত থাকবে এবং অনুষ্ঠান কেবলমাত্র তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে—এটা প্রগতির লক্ষণ নয়। আর যেভাবে বর্তমানে অডিশন নেওয়া হয় তাও নির্বাচনের প্রকৃষ্ট রীতি নয়। কোনও একটি অধিবেশনে যদি একটি শিল্পীর অনুষ্ঠান ভাল লাগে তাহলে সেইখানেই তো নির্বাচন হয়ে গেল—তাকে আহ্বান করতে বা অনুষ্ঠানটি টেপ করতে আপত্তি কি? অবশ্য এসব বিষয়ে অসুবিধা যে থাকে না বা মতানৈক্য যে ঘটতে পারে না তা নয় কিন্তু মীমাংসার একটা সহজ উপায় বের করা দরকার।

দেশের সঙ্গীত সংস্কৃতিকে যদি প্রেরণা দিতে হয় তাহলে গতির সঙ্গে সমতা রাখতে হয় এবং যে মুহূর্তে একটি ভাল অনুষ্ঠান সম্পাদিত হচ্ছে সেই মুহূর্তেই তার প্রচার হওয়া দরকার অথবা যে সময়ে একটি উদীয়মান শিল্প-প্রতিভার বিকাশ হচ্ছে সেই সময়েই তার উৎসাহের প্রয়োজন। আমার মনে হয় আকাশবাণী যদি সংবাদ প্রতিষ্ঠানের নিয়মে তাঁদের কর্মপন্থা অবলম্বন করেন এবং দেশের সর্বত্র তাঁদের উপস্থিতি এবং প্রচারধর্মিতাকে সজীব রাখতে পারেন তাহলেই তাঁরা সবচেয়ে ভাল কাজ করতে পারবেন এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। স্বীকৃতিই হচ্ছে শিল্পীদের সবচেয়ে বড় প্রেরণা এবং উৎকৃষ্টতর কর্মপ্রচেষ্টার সুযোগ। সেটা তাঁরা যাতে যথাসময়ে পান তাই কি আকাশবাণীর অথবা আমাদের সবাইকার কাম্য নয়?

সরোদ শিল্পী শ্রীবুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

আমার মনে হয় ছোটখাটো আসরে শিল্পীদের বুঝতে সুবিধা হয় এবং তাঁরাও প্রাণ খুলে গাইতে বা বাজাতে পারেন। সম্প্রতি "সুরেলা" নামক একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের ছোট ঘরোয়া আসরে শ্রীবুদ্ধদেব দাশগুপ্তের সরোদ শুনলুম। তিনি গৌড়মল্লার বাজালেন। উদীয়মান যন্ত্রীদের মধ্যে বুদ্ধদেববাবু নিঃসংশয়েই একজন শ্রেষ্ঠ কলাকার। তাঁর ছোট ছোট কাজগুলিতে যেন যাদু আছে। ভারি মনোরম লাগে এই কাজ-গুলি। এ ছাড়া তাঁর বাজনার মধ্যে একটি সুশিক্ষিত এবং সুসংস্কৃত মনের পরিচয় পাওয়া যায় যা অনেক ক্ষেত্রে দুর্লভ। খাঁ সাহেব এবং পণ্ডিতজীদের অনেকের মধ্যেই কৌশল অনেক দেখা যায় কিন্তু সাংস্কৃতিক মানসের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই যে একটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্গীত বর্ধিত হচ্ছে এটি আশা এবং ভরসার কথা। গৌড়মল্লার এমনিতেই অতিমধুর রাগ। বুদ্ধদেববাবু বাজালেনও প্রচুর মাধুর্য দিয়ে কিন্তু ছন্দের দিকেই একটু যেন বেশী ঝুঁকেছিলেন, রাগালাপ আর একটু বিস্তৃত হলে আরও ভাল লাগত। তাঁর মধ্যে পরিণতি দেখা যাচ্ছে এবং গঠন পারিপাট্যেরও বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যাচ্ছে। আশা করি ভবিষ্যতে তাঁকে বাংলার একজন প্রতিনিধি-স্থানীয় যন্ত্রীর পর্যায়ে দেখতে পাওয়া যাবে। আফাক হোসেনের তবলাসঙ্গত খুবই সুন্দর এবং সঙ্গীতানুগ। অধিবেশনের প্রারম্ভে শ্রীমতী গৌরী দে শুদ্ধকল্যাণ এবং কেদারায় খেয়াল গান করেন এবং পরে একটি ঠুংরী গেয়ে শোনান। তাঁর অনুষ্ঠানটিও শ্রোতাদের তৃপ্তি দিয়েছে।

—শার্ঙ্গদেব

গাছের 'ডিজাইন'

যে মোটরগাড়ি ইন্ধন মিতব্যয় করে ঠিকমত কাজে লাগায়, ইঞ্জিনে উৎপন্ন যন্ত্রবল চাকায় স্থানান্তরিত করে এবং বিভিন্ন অবস্থায় কিভাবে সে আচরণ করবে তা বোঝা যায়, তা হোল ভাল মোটরগাড়ি। তেমনি গাছও হচ্ছে এমন এক যন্ত্র যা আলোক সংশ্লেষের সাহায্যে খাদ্য উৎপাদন করে। আমরা চাই, যে কোন অন্য যন্ত্রের মত গাছও ভালভাবে কাজ করে যতখানি সম্ভব খাদ্য উৎপন্ন করুক। আজ কিন্তু সেই আশা আর দুরাশা নয়; কারণ, গাছের কাজকর্ম সম্পর্কে এখন অনেক কিছু আমরা জানতে পেরেছি, জানতে পেরেছি কি-ভাবে সেগুলির অদল বদল করা যায়। সোজা কথায় বলতে গেলে, আমাদের চাহিদা-মত আমরা গাছের ডিজাইন করতে পারি যাতে সে প্রাপ্য উপায় উপকরণের যতদূর সম্ভব সদ্ব্যবহার করতে পারে, আলোক সংশ্লেষের দ্বারা উৎপন্ন খাদ্য ব্যবহার করে নানারকম কাজ করতে পারে। যেসব গাছ থেকে আমরা ফসল (যেমন চাল, গম ইত্যাদি) পাই সেগুলির মধ্যে এই ধরনের অনেক গুণ তৈরী হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আধুনিক গবেষণার দৌলতে সেগুলির আরো উন্নতি সাধন করা সম্ভব।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ডিজাইনের সঙ্গে উৎপাদনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকাটা আবশ্যিক এবং ফসলের গাছের নীলনকশা বিজ্ঞানের কল্পকথার রাজ্যে থাকলে চলবে না, প্রজননকারীর হাতে তুলে দিতে হবে।

ভাল জাতের গাছ বলতে কি বোঝায়? ভাল গাছের পাতা জলের অপচয় না করে কাজ করবে। সে যে কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন করবে তার কিছুটা কোষের সেলুলোজ হিসাবে খোয়া না গিয়ে সবটুকুই যেন কাজে হয়। সেই গাছে যে বিকিরণ ধরা পড়ে তার মধ্যে সমস্ত দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের আলো থাকবে এবং সেক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতা থাকবে না। এটা অবশ্য এখনই সম্ভব নয় যদিও এটাই হচ্ছে আদর্শ। তবে যেদিন পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে আমরা চিনি ও প্রোটিন উৎপন্ন করতে পারব সেদিন হয়ত ক্লোরোফিল ও গাছের প্রয়োজনও কমে যাবে। কিন্তু তার এখনো অনেক দেরি এবং যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন গাছের সাহায্যে খাদ্য উৎপাদনের মৌলিক ব্যাপারটা মেনে নিয়েই আমাদের কাজ করতে হবে এবং তার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হতে হবে।

আলো, জল, অঙ্গারক বাষ্প ও খনিজ পদার্থ, এইগুলি হচ্ছে গাছের কাঁচামাল। এমন গাছ আমরা কি করে তৈরি করব যা এই সব জিনিস আরো ভাল করে কাজে লাগাতে পারে? গাছ আলো আর পুষ্টিকর পদার্থগুলির এখনো ঠিকমত সদ্ব্যবহার করতে পারে না বলে আমাদের কাজটা প্রধানত ঠিক এইগুলি নিয়ে।

গাছের পাতা আলোকশক্তিকে রাসায়নিক শক্তি বা খাদ্যে রূপান্তরিত করে। সেগুলি
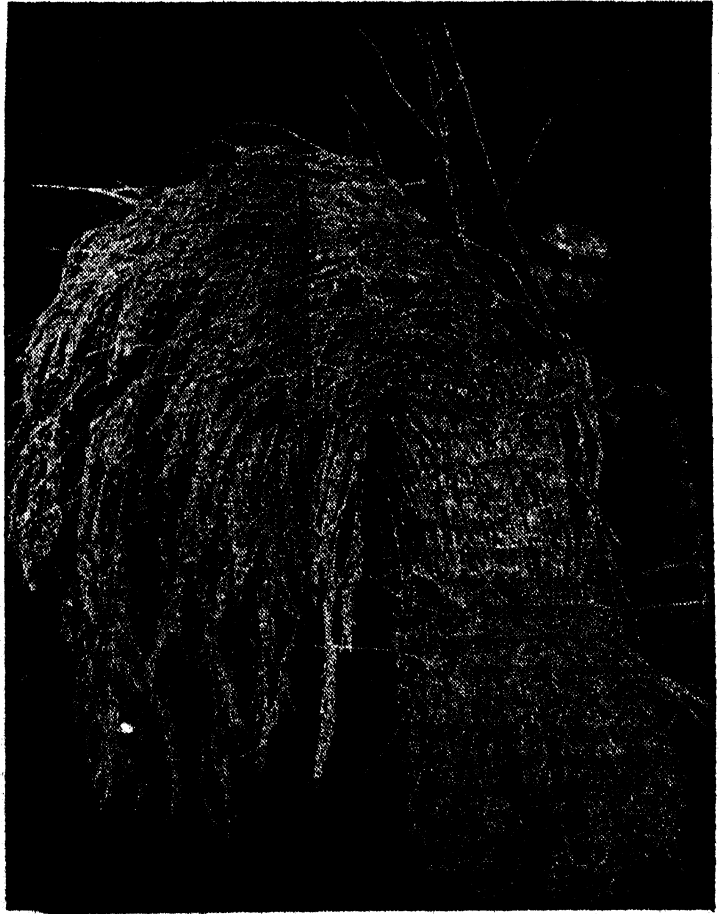
এই উজবেক ধানের চালে বেশি কার্বোহাইড্রেট থাকে

বিজ্ঞানাচার্য ভ্যালেন্তিন লুক্যানিন অনাবাদী উষর অঞ্চলের চাষের উপযুক্ত গম প্রজনন করেছেন

আলোকে আটকে দিয়ে ব্যবহার করে আলোক সংশ্লেষের জন্য বছরের নির্দিষ্ট সময়ে। কিন্তু এখন আমরা যেসব ফসল ব্যবহার করি সেগুলি এই কাজ খুব ভাল করতে পারে না। এখানে প্রশ্নটা প্রতিটি গাছের পাতাগুলি মিলিয়ে মোট কতটা জায়গা নিচ্ছে তা নয়, জমির একক প্রতি পাতা কতটা জায়গা নিচ্ছে সেটাই আসল কথা। একই জমিতে বেশি সংখ্যায় গাছ লাগালে বেশি পাতা বেশি আলো আটকাবে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও বাধা আছে। ঘেঁষাঘেঁষি করে বেশি গাছ বুনলে এক পাতা অন্য পাতার উপর ছায়া ফেলে অর্থাৎ আলো বাধা পায়। সুতরাং এমন গাছের ডিজাইন চাই যাতে পাতাগুলির কোণ (অ্যাঙ্গেল) একরকম না হয়। খাড়া খাড়া ছোট ছোট পাতা হলে ছায়া কম হয় এবং সেজন্য আলো বাধা পায় না। যেসব জাতের গম ফলন বেশি দেয় সেগুলির পাতা সরু ও খাড়া হয়ে থাকে।

সূর্যমুখী ফুলের পাপড়িগুলি যেমন সৌররশ্মি গ্রহণের জন্য দিক পরিবর্তন করে গাছের পাতারও সেই রকম পারা দরকার। তাছাড়া বছরের যেসব মাসে সূর্যের আলো বেশি আসে সেইসব মাসে গাছে পাতার সংখ্যা বেশি হওয়া দরকার যদিও অনেক ক্ষেত্রেই তা হয় না। উদাহরণ হিসাবে বীট ও আলুর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বীট ও আলু গাছে বেশি পাতা ধরে জুন মাসের অনেক পরে। অথচ জুন মাসে বেশি পাতা হলে ফলন অনেক বেশি হোত। পাতার উপর যতটা আলো পড়ে তার শতকরা মাত্র কয়েক ভাগ চিনি উৎপাদনের কাজে ব্যবহার হয়। অথচ লেবরেটরীতে যখন অ্যালজি 'কালচার' করা হয় তখন ব্যবহার হয় শতকরা ৪০ ভাগ আলোক শক্তি। সেই-জন্য গাছের আলোক সংশ্লেষের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনে প্রচুর সুযোগ-সম্ভাবনা রয়েছে।

যে গাছ পুষ্টিকর জিনিসগুলি ভাল করে কাজে লাগায় তার চাষ করায় খরচ কম; কারণ, সেক্ষেত্রে সার পরিমাণে কম লাগে। তাছাড়া ব্যবহৃত সার গাছ যাতে আরো ভাল করে কাজে লাগাতে পারে সে দিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

অঙ্গারক বাষ্প ও জল নিয়ে অনেক সমস্যা। অঙ্গারক বাষ্প নিতে হবে আবহমণ্ডল থেকে, আর জল নিতে হবে জমি থেকে। প্রথমত অধিকাংশ জায়গায় বছরের সব সময় জল পাওয়া যায় না। তারপর পাতার গায়ের যে ফুটো (স্টোমাটা) দিয়ে অঙ্গারক বাষ্প ভিতরে যায় তাই দিয়েই আবার ভিতরের জল বাইরে বেরিয়ে যায় বাষ্প হিসাবে। সুতরাং জলীয় বাষ্প বার হওয়া কমাতে গেলে অঙ্গারক বাষ্প গ্রহণও কমে যাবে। মরু বা উষর অঞ্চলে যেসব গাছপালা হয় সেগুলি অবশ্য রন্ধ্রে

কিরিঘিজ বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিতে গাছের উন্নতি সম্পর্কে গবেষণা

শ্বাসক্রিয়ার সাহায্যে অঙ্গারক বাষ্প জৈব যৌগিকরূপে সঞ্চয় করে রাখে দিনের বেলা আলোক সংশ্লেষের কাজে ব্যবহার করার জন্য। যাই হোক অঙ্গারক বাষ্প ও জলের সমস্যা নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা মাথা ঘামিয়ে যাচ্ছেন।

গাছের সবটুকু আমরা খাই না, খাই সামান্য একটু অংশমাত্র। অতবড় আপেল, ন্যাসপাতি বা আমগাছের শুধু ফলটুকু আমরা খাই, ধান বা গম গাছের খাই শুধু দানা। সুতরাং কর্তব্য হচ্ছে ফল ও দানা বেশি ফলানো সৌরশক্তি কাজে লাগিয়ে। অর্থাৎ গাছের সংখ্যা বাড়িয়ে ফলন বাড়ানো নয়, প্রতিটি গাছে বেশি ফলন ফলানো।

সেই হচ্ছে আদর্শ গাছ যার কোন শত্রু নেই। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে তেমন গাছ পাওয়া কঠিন। রোগ ও কীটপতঙ্গ দুনিয়ায় গাছের উৎপন্ন দ্রব্যের শতকরা অন্তত ২০ ভাগ খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। এই সমস্যা নিয়ে অবশ্য বহু কাজের মত কাজ হয়েছে। রোগ নির্মূল করা যাচ্ছে কিংবা গাছকে রোগ সইয়ে দেওয়া যাচ্ছে এবং এই শেষের গুণটিই বৈজ্ঞানিকরা বেশি পছন্দ করছেন। তাঁরা গাছকে বিভিন্ন রোগের টিকা দিতে শুরু করেছেন। ভবিষ্যতে এটাই হয়ত হবে প্রধান রোগ-প্রতিষেধক উপায়। শুধু তাই নয়। খেত-খামারে দানাশস্য গাছের পাশে পাশে যে আগাছা পরগাছা জন্মায় সেগুলিকে যখন ওষুধ ছিটিয়ে মারতে হয় তখন সেই ওষুধ শস্যের গাছেরও ক্ষতি করতে পারে। বৈজ্ঞানিকরা আশা করছেন যে ভাল গাছকে ঐ সব বিষ ওষুধ সহ্য করতে অভ্যাস করানো অসম্ভব নাও হতে পারে অর্থাৎ এমন গাছ প্রজনন করা যেতে পারে যেগুলির ঐ সব ওষুধে কোন ক্ষতি হবে না।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

নিখিলচন্দ্র সরকার

স্কুল থেকে ফিরে বইখাতা রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি কলঘরে গেল দীপক। চৌবাচ্চা থেকে মগে করে জল নিয়ে চোখে-মুখে ভাল করে ছিটোলো। হাতমুখ ধুয়ে ঘরে এসে প্যান্টটা দ্রুত বদলে নিয়েছে। গায়ে জামাটা গলিয়ে দিয়ে বোতাম লাগাতে লাগাতে এসে খাবার টেবিলে বসল। কিরণময়ী ইতিমধ্যে খাবারের প্লেট রেখে গেছে টেবিলের ওপর। জল আনার জন্যে রান্নাঘরে গেল আর একবার। পুবের জানলাটা খোলা। জানলার গায়ে একটা চড়ুই এসে বসল হঠাৎ। ছটফট করে ভীরু চোখে চারদিক দেখে নিয়ে আবার উড়ে গেল পলকে। এই জানলা দিয়ে আগে মাঠের নরম স্নিগ্ধ আলো ঢুকতো ঘরে। দূরের গাছ পাখি আকাশ দেখা যেত সোজাসুজি। কাছেই একটা চালতে গাছ ছিল। তার ঘন পাতার ঘরে এসে অনেক পাখি জিরোত। ওর পাশেই একটা কামরাঙা গাছ। ওই গাছের কোঠর থেকে একবার একটা দোয়েল ছানা আনতে গিয়ে খুব বিপদে পড়েছিল ওরা। আর একটু হলেই সাপে কাটত নির্মলকে। গর্তে হাত দিতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা সাপ মুখ বাড়িয়েছিল। কোন রকমে বেঁচে গেছে সেবার। সামান্য দূরে আরো অনেক গাছ বন ছিল। বাঁ দিকে একটা হরিতকি গাছও ছিল। বিভিন্ন সময়ে কত বিচিত্র ধরনের পাখি আসত এই দিগন্ত বিস্তৃত নির্জন ঘাস মাটি গাছ গাছালির সংসারে। কেউ কেউ বর্ষার মুখে আসত, শীতের শুরুতে পালাত। কেউ বা আবার দেড় দু মাস থেকে উড়ে যেত ভিন্ন দিকে। ঝাঁক বেঁধে উড়ন্ত পাখিগুলোর দিকে চেয়ে কতদিন অবাক হয়ে ভেবেছে দীপক, এরা কোথায় থাকে, কেন এখানে আসে, আবার চলে যায়ই বা কেন? কোন কোন পাখি শরতের মুখটায় প্রতি বছরই আসে, কেউ তিন চার বছর অন্তরও। আর এক ধরনের পাখি এসেছিল একবার। দিন সাত ছিল। আর আসে নি কখনো। এজন্যে দীপকের মনে এখনও একটা বেদনা আছে। এখন সব জঙ্গল মাঠ গাছ নষ্ট হয়ে গেছে। একসময় প্রকৃতির এই অকৃপণ অনাবৃত মনোরম রূপরাশিকে আশপাশের বড় বড় বাড়িগুলো এসে কেড়ে নিল। এ পরিবর্তনটা বড় আকস্মিক, অভাবিত। দীপক যখন ফোর-এ পড়ে তখন এসেছে এখানে, আজ টেন-এ উঠেছে। এই পরিমিত সময়ের ব্যবধানে বিরাট এক সাম্রাজ্যের অবিশ্বাস্য ভাঙা গড়া যেন।

খেতেও তর সইছিল না দীপকের। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে আজ। শেষ ক্লাসটা অনাদিবাবুর ছিল। অংকের ক্লাস। ভাল লাগে! একদিকে ক্ষিধে, তার ওপর বিকেলের মাঠের দুরন্ত টান। মনটা তখন ছুটির ঘণ্টার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে। মাথায় আর তখন যেতে চায় না কিছু। কেমন যেন ঝিমঝিম করে সব। সকলের দৃষ্টি তখন দেয়ালের ওপর স্থির। কে কার আগে ছুটবে সেজন্যে সকলের মধ্যেই একটা

গোপন অস্থিরতা। এমনিতেই এক পিরিয়ড পরে ছুটি হয় তাদের স্কুলে। বাড়ি এসে মুখে কিছু দিয়ে, মাঠে যেতে যেতে অনেক দেরি হয়ে যায়। বিকেলের রোদ তখন নির্জীব ম্লান হয়ে আসে। একবার মাঠে না গেলে সন্ধ্যেবেলায় আর পড়তে ইচ্ছে করে না। মনটা কেমন স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে থাকে। আগে বাড়ির কাছেই ছিল তাদের মাঠ। সবাই ঠেলতে ঠেলতে এখন অনেক দূরে নিয়ে ফেলেছে তাদের। সকলের দৃষ্টি তখন জড়াজড়ি করে দেয়ালের ওপর অচঞ্চল। ক্রমশই অস্থিরতা বাড়ছিল। অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সাদা দেয়ালে লাল পেন্সিল দিয়ে একটা দাগ টেনে দিয়েছে ওরা। ঘুলঘুলি দিয়ে কখন ওই দাগটায় আলোটা এসে পৌঁছোবে। যত এগিয়ে আসছে আলোর বিন্দুটা ততই ওদের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন, উৎসাহ ও সজীবতা ছড়িয়ে পড়ছিল। সারা দিনের হইহই ক্লান্তি অবসাদ ঝেড়ে ফেলে চাঙ্গা হয়ে উঠছে। বইখাতাগুলো গুছিয়ে নিল। আর সামান্য বাকী। এই গেঁরে ফেলল, না, আর একটু রয়েছে এখনও। একটা নেশা পেয়ে বসে যেন তখন। আর ঠিক এ সময়ই চারটে পঞ্চান্নর ট্রেনটা ছুটতে ছুটতে এখানে এসে হাঁপাতে আরম্ভ করে। একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়বে। ঘণ্টা পড়ে যাওয়ার পরও আরো কয়েক মিনিট বেশি ক্লাস নিয়েছেন অনাদিবাবু। ওদের সমস্ত চেহারায় তখন একটা অক্ষম আক্রোশ ও বিতৃষ্ণা ফুটে উঠেছে।

স্টেশনের গায়েই তাদের বিরাট স্কুল বাড়িটা। বারান্দায় দাঁড়ালে রেল লাইন, দক্ষিণ দিকের কেবিনঘর, দূরের সিগনাল-পোস্ট, গাছ-গাছালি মাঠ ঝিল সব একসঙ্গে চোখে পড়বে। একটু দূরে ওদের পাড়ার বড় বটগাছটার ঝাঁকড়া মাথাটা চোখে পড়ে। প্রথম প্রথম অনেক বড় বড় গাছ লতা ঝোপ, কিছু পুকুর ছিল। পথের দু পাশে ছায়া বিছোনো থাকত। পাখির গান, লুটোপুটি আরো সুন্দর ও রমণীয় করে তুলত জায়গাটাকে। সেই পথের ওপর প্রকৃতির অজস্র স্নেহ, অকলঙ্ক ভালবাসা ও নিবিড় স্পর্শ ছড়ানো ছিল একদিন। কত সকাল সন্ধ্যে এই ঐশ্বর্য মুঠো মুঠো কুড়িয়ে নিতে নিতে এখান দিয়ে হেঁটে গেছে দীপক। আস্তে আস্তে এই ক' বছরে সব কেমন বদলে গেল। সময় যেন পুরনো সব কিছুকে দ্রুত লুকিয়ে ফেলছে। লোকজনে ভরে গেল জায়গাটা। একটার পর একটা বাড়ি উঠছে এখনও। প্রথম যখন ওরা এখানে এসেছিল, তখন সন্ধ্যের মুখেই জায়গাটা নীরব হয়ে যেত। অল্প ক' ঘরের মাত্র বসতি। ক' দিন পর আরো কিছু বাড়ি উঠল। বড় বড় নারকেল গাছের মাথায় তখন টিয়াপাখির ঝাঁক আসত। ঘাস দূর্বোয় ঢাকা ছিল চলার ফালি পথ। ঘাস-ফড়িং উড়ে বেড়াত। নয়ন-জুড়ানো প্রজাপতির দল পাতায় পাতায় ডালে ডালে ঘুরত। কয়েকজন ছেলে তখন সামনের মাঠটায় খেলত। ওখানেও একদিন বাড়ির মাপ দিয়ে গেল। পরে আরও দূরে বড় ঝিলটার পাশে ওরা খেলার মাঠ তৈরি করে নিয়েছে একদিন। ওদের দলে তখন আরো কিছু নতুন ছেলে এসেছে।

ঝিলের কাছেই একটা বাঁশ ঝাড়। বাঁশ-বনের পাশে বড় একটা গাব গাছ। ওর ডালে একটু দূরের এক গয়লা বউ এসে গলায় দড়ি দিয়েছিল। সন্ধ্যে নামার আগেই খেলা বন্ধ করে দিয়ে ওরা চলে আসত প্রথম ক'দিন। কি ভয় করত! এক রহস্য ছমছম করত জায়গাটা ঘিরে। ওই পথটুকু পেরিয়ে আসবার সময় মনে মনে বলত : ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি, রামলক্ষণ বুকে আছে করবে আমার কি। এরপর অনেক দিন ভেবেছে দীপক, কি এমন কষ্ট ছিল গয়লা বউয়ের, যে, এভাবে সে গলায় দড়ি-দিল।

লোকজনের ভিড়ে এ রহস্যও মরে গেল একদিন। ওরা ততদিনে আরো দূরে সরে গিয়েছে। লোকালয়ের এক প্রান্তে। তারপর বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে পানায় ভরা বিল। একটা পচা উগ্র গন্ধ দিনরাত এই চত্বরে অতন্দ্র পাহারা দিচ্ছে। একদিন এখানেও মানুষের জটলা হবে। কে ভেবেছিল, তাদের ওখানেও তরুলতার নম্র নীরব মাধুর্য মানুষের কোলাহল এসে একদিন চুরি করবে! অনেক বড় বড় অতি আধুনিক সব বাড়ি উঠবে? পাড়ার বহু ছেলেদেরই এখন চেনে না দীপক। নতুন নতুন লোক আসছে অনবরত। অপরিচয়ের অনাত্মীয় জগৎটা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কেমন পাঁচমিশেলী হয়ে উঠছে পাড়াটা। ভাল কাজে অনুৎসাহ, আড্ডা ইয়ার্কি এগুলো বেড়ে গেছে। সংক্রামক ব্যাধির মতন ছোটদেরও স্পর্শ করেছে নোংরামি, ছোটখাটো ইতরতা।

এত অস্থির ও বিরক্তিভরে খেতে দেখে কিরণময়ী পাশে দাঁড়িয়ে শুধলো, 'এত তাড়াহুড়ো করছিস কেন?'

'ইস্, বড্ড দেরি হয়ে গেল।' কেমন উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে দীপক।

'আগে খেয়ে নে তো তুই।' সস্নেহ ধমক দিল কিরণময়ী।

'তুমি বুঝতে পারছ না, আমাদের ক্লাবের আজ জরুরী একটা মিটিং আছে।'

'থাক।' একটু থেমে ওর চোখে চোখে চেয়ে সহাস্যমুখে বলল, 'এই তো চেহারা, তার ওপর খালি পেটে খেলা, বাঁচবি কি করে।'

'এত খাওয়া যায় এখন? আমি কি রাক্ষস?' দীপক অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে ক্রমশ।

'আর সামান্য তো বাকি, খেয়ে নে। এ বয়েসে এটুকু না খেলে চলবি কি দিয়ে?'

আর কথা না বাড়িয়ে অবশিষ্ট খাদ্য শেষ করে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ মন নিয়ে যখন বাইরে এল দীপক তখন পড়ন্ত বিকেল। অনেকখানি পথ হাঁটতে হবে তাকে। ঝিলটা ডান পাশে রেখে আরো এগিয়ে যেতে হবে। ওর কাছে কাছে এখনও কিছু নারকেল ও তেঁতুল গাছ অবশিষ্ট আছে। নরম শ্লান ছায়া পড়েছে আকাশের কোলে। ওদের বাড়ির সামান্য দূরে একটা দাওয়ায় কিছু ছেলে বসে বসে জটলা ও হল্লা করছিল। ইয়ার্কি ঠাট্টা-মসকরায় কেমন বাচাল হয়ে উঠেছে ছেলেগুলো। কয়েক জনকে চেনে দীপক। নির্মলও ওদের দলে এসে বসে কিছুদিন ধরে। ওকেও এখানে বসার জন্যে কদিন টানাটানি করেছিল। দেখল, আরো কয়েকটি পরিচিত মুখ তাকে দেখে কি যেন বলাবলি করছে। একবার চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে দীপক। স্বপন অমল ওরা একসময় দিনরাতের সঙ্গী ছিল তার। কত সময় গাছে গাছে, বনে-বাদাড়ে পাখির সন্ধানে ফিরেছে ওরা। প্রজাপতি ধরেছে, ফড়িংয়ের পেছনে ছোটাছুটি করেছে। দূরে মাঠ হওয়ায় আর যায় না খেলতে। একটু অন্যমনস্ক ছিল দীপক। হঠাৎ মনে হলো, কে যেন তাকে কি একটা বলছে। চেয়ে দেখে মীরাদি। নীরেনের দিদি। নীরেন ওর সঙ্গেই পড়ে। অন্য সেকসানে। তার দিকে চেয়ে হাসছিল মীরাদি। হাসিমুখেই শুধলো, 'কি অত ভাবছিলে?'

'বড্ড দেরি হয়ে গেছে মাঠে যেতে।' দীপকও হাসি হাসি মুখে বলল।

'হ্যাঁ, কি ব্যাপার বলত, নীরেনও হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল?'

'মাঠের ব্যাপারে বোধ হয় কোন গণ্ডগোল হয়েছে।'

'ওসব গণ্ডগোলের মধ্যে যেয়ো না; নীরেনটা আবার যা গোঁয়ার। মারামারির একটু গন্ধ পেলেই হলো। আমার ভীষণ ভয় করে এসবে।' একটু থেমে আবার বলল, 'দেখলে না সেদিন, কি থেকে কি হয়ে গেল, মাঝখান থেকে প্রবীর ছুরি খেল, বিজনটার মাথা ফাটল।'

বিজন মীরাদিদের সামনের বাড়িতে থাকে। কলেজে পড়ে। বিজনের এক বোন সেদিন এদিক দিয়ে যাচ্ছিল। নাম শেলী। শুনেছে সামনেরবার পরীক্ষা দেবে। ও গেলেই ছেলেগুলো ইতর রসিকতা শুরু করে। দীপকের সামনেই একদিন একটা ছেলে বলে উঠেছিল, 'আহা, যেন লাটখাওয়া পায়রা রে!' একজন অকারণ খুশিতে গান ধরেছিল, 'বোল রাধা বোল...।' ছেলে দুটোকে চেনে না দীপক। নতুন এসেছে। স্বপন এসে ওখানে সবে বসেছে। নির্মল অমলরা আসে নি তখনও। দীপকের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হতেই ইশারায় ওদের ধমক দিয়েছে স্বপন।

সেদিনও বুঝি কি রসিকতা করেছিল। শেলী বাড়ি এসে ওর ভাইকে জানিয়েছিল। এর আগেও বহুবার এরকম অভিযোগ শুনেছে বিজন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সে। উত্তেজনার মুখে ছুটে এসেছে। ওরাও তখন খেলার মাঠ থেকে পাড়ায় ফিরেছে। ভিড় ও কথা কাটাকাটি শুনে এগিয়ে এসেছে। বিজন কাঁপছিল রাগে। ওরা পাঁচ-ছজন তখনও হাসছিল। কয়েকজনকে থামতে দেখে ওদের একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'কি দেখছেন, সত্ত?'

'যান যান বাড়ি যান।' অন্য একজন চড়া গলায় বলল।

বিজন ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'কি রে, তোদের জন্যে কি পাড়ায় মেয়ে বউ বেরোতে পারবে না?'

'দেখো, আজেবাজে কথা বলো না কিন্তু বিজনদা।' পণ্টু জবাব দিল।

'রাখ, এখানে বসে রাতদিন মেয়ের পেছনে লাগবি, আবার কথা বলছিস, বাড়িতে কি মা-বোন নেই তোদের?'

'মাইরি, ভাল হবে না বলছি।' ক্রমশ যেন উত্তেজিত হচ্ছিল দলটা।

'যা যা তোদের আবার মান ইজ্জত।'

'কি আমার ভদ্দরলোক এলো রে।' অমল টিপ্পনী কেটে হাসল।

'যত বদ আর ইতরের আড্ডা হয়েছে এখনে।'

'মুখ সামলে কথা বলো বলে দিচ্ছি।' একজন এগিয়ে এলো চোখ বড় করে।

'তোরাও যে ভদ্দর বনে গেলি রে, দে না মুখের জিওগ্রাফিটা একটু পালিশ করে দে

ঝাল্লাধনের।' অন্য একজন হাসতে হাসতে বলল।

এমন সময় একজন এসে দাঁড়াল ওদের সামনে।' দীপকরা আর অপেক্ষা করল না। বিজনের পাশে আরো কয়েকজন যুবক এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটি এ পাড়ার নামকরা একজন গুন্ডা। এত ভিড় দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে রে পণ্টা?'

'না গুরু, তেমন কিছু নয়।'

'বুঝলে গুরু, আমরা না মাইরি নিজেদের মধ্যে কথা চালাচালি করছি, আর কে এক মেয়েছেলে নিজের গায়ে সেই কথা মেখে নিল মাইরি?'

'সাহস থাকে তো বল না কি বলেছিস।' বিজন সরোষে বলল।

'কি রে, সব যে ভেড়া বনে গেলি।'

'সে কি গুরু, তোমার চেলারা ভেড়া? কভি নেহি।'

'এত ফ্যাচ ফ্যাচ করছিস কেন, দে না শালার পেটে গজটা একবার ঢুকিয়ে দে, দেখবি ভড়পানি খতম হয়ে যাবে।' পাশে থেকে একজন বলে উঠল। অমল নির্মলরা আস্তে আস্তে সরে পড়েছে এখান থেকে।

'কি এতবড় সাহস, পাড়ায় বসে মস্তানি!' বিজনের পাশের ছেলেটি ক্ষিপ্র হাতে একটা বাঁশ তুলে নিল। বিজনও ছুটে গিয়ে আর একটা তুলে নিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে একটা খণ্ড যুদ্ধ। ওদের হাতের একটা লাঠির ঘা বিজনের মাথায় পড়েছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। আর একটি ছেলেকে ছুরি মেরেছে ওরা। পর পর কয়েকটা বোমা ফাটাল। চোখের পলকে এত সব ঘটে গেল।

এরপর কয়েক দিন আর ওরা বসে নি রকে। দিন পাঁচ-সাত বেশ উত্তেজনা গুঞ্জন চলল ঘরে ঘরে। আবার একদিন তা শান্ত ও স্তিমিত হয়ে এলো।

দীপক মীরাদির চোখের দিকে তাকাল একবার। হেসে হেসে বলল, 'না, সেরকম কোন কিছু না।' তারপর হঠাৎ কি একটা মনে পড়ায় বলল, 'ইস্, দেখলে মীরাদি কি ভুল হয়ে গেল! যেদিন তাড়াতাড়ি দরকার, সেদিনই দেরি হবে।' বলে দ্রুত পায়ে বাড়ি এলো আবার।

অল্প সময়ের মধ্যে কাজটুকু সেরে আবার চলে এলো দীপক। আসবার সময় দেখল ওদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য ছড়িয়ে রয়েছে। একটু আগে মীরাদি এ পথে গিয়েছে। ও কাছে আসতে অমল রগড় করে বলল, 'আজকাল বুঝি এসব হচ্ছে?'

'কি?' দীপক অবাক হয়ে তাকাল একবার।

'আহা, কিছুই যেন বোঝে না; চাঁদ আমার।' অন্য একটি ছেলে হাসল বলে।

'নীরেনের দিদি কি বলল তোকে এতক্ষণ?' অমল ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকল খানিকক্ষণ।

দু' মুহূর্ত নীরব থাকল দীপক। পরে একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'তোর সাথে তো ওর দিদির আলাপ আছে, জিজ্ঞেস করিস না!' বলে আর দাঁড়াল না সেখানে। এক পা এগিয়ে যেতেই মনে হলো, সকলে একসঙ্গে হেসে উঠেছে। এতক্ষণ যেন হাসিগুলোকে প্রাণপণে আটকে রেখেছিল। এখন আর পারল না। সব এক সঙ্গে ছাড়া পেয়েছে। এতক্ষণ ওরা যে বিষয় নিয়ে চেঁচামেচি করছিল, মীরাদি এসে যেন মুহূর্তে সব কেমন নিস্তেজ করে দিল। মীরাদি চলে যাবার পরও সম্বিত ফিরতে কিছুক্ষণ সময় নিয়েছে যেন ওদের। একজন বলে উঠল, 'কি রে, হঠাৎ যে বড় চুপসে গেলি?'

'এই দেখেই মাইরি ঘাবড়ে গেলি?'

'আস্তে বল শালা, এটা তোদের পাড়া নয়। সেদিনের কথা মনে নেই?'

'আলবত মনে আছে। কিন্তু কোন্ শালাকে পরোয়া করি আমি!' বলে চারদিকটা একবার দেখে নিল হীরালাল।

'বেপাড়ায় এসে অত খাপ খুলতে হবে না চাঁদ।' নির্মল একটু ঠাট্টার সুরে বলল।

'আমাদের আবার পাড়া বেপাড়া কি রে।'

দীপক তাড়াতাড়ি পা চালাল। বড়জনদের সামনেই এমন সব নির্লজ্জ ইয়ার্কি ঠাট্টা তামাশা করে যে কোন কান্ডজ্ঞান থাকে না। এ সময়টায় কি আর কিছু করার নেই ওদের? নিরঞ্জনের গলা শোনা গেল, 'আহা, এ কি দেখিলাম, যদি দেখিলামই তবে মজিলাম কেন, যদি মজিলামই তবে... তবে...?' বলে তাকাল সবার মুখের দিকে।

অমল সহাস্যে বলল, 'পাইলাম না কেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছিস, পাইলাম না কেন? কি আমার স্বভাব কবি রে!' বলে ওর থুতনি ধরে রসিকতা করল নিরঞ্জন। আবার একসঙ্গে একটা জমাট হাসি ছড়িয়ে পড়ল প্রচণ্ড বেগে। সবাই যেন চমকে উঠেছে।

'এই দেখেই পাইলাম না কেন, ফুঃ!' রালালের কণ্ঠে ঈষৎ ঠাট্টা।

'এসবের তুমি কি বুঝবে বাপু, বুদ্ধি। ছাতুখাওয়ার!'

'আমাদের পাড়ায় যাবি, দেখিয়ে দেবো।' রপর সকলের দিকে চেয়ে সগর্বে বলল, চুন এসেছে বুঝলি, রিয়েল কুইন।' বলে দল হীরালাল।

'তোর তো শালা সবই রিয়েল কুইন। থেকে ওই একটি ইংরেজী বুকনী শিখে খেছিস।'

'বিশ্বাস কর, হনুমানজীর দিব্যি কোনো লা মিথ্যে কথা বলে।'

দীপকের মনে হলো, এখন আরো কিছু ন মুখ বেড়েছে ওদের মধ্যে। আবার না গণ্ডগোল বাধে। অশালীন রসিকতা, চরণ আবার যেন কদিন ধরে সজীব হয়ে ঠছে। এদের দৌরাত্ম্য ও ইতরতা ক্রমশই ড়ে চলেছে যেন। অমলরাও যে শেষ পর্যন্ত দর দলে ভিড়বে এটা জানত না আগে। মন অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল প্রথমে। কষ্ট হয়েছিল ভাবতে। অবশ্য কিছুদিন ধরেই লের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করেছে। ক্লাস উঁচুতে পড়ত ও। গত বছর পাশ তে পারে নি অমল। আজকাল ক্লাসে সা একেবারেই কমিয়ে দিয়েছে ও। খাতায় নেই। এলেও টিফিনের সময় লিয়েছে। চেহারা রুক্ষ ও অমার্জিত য়ে। ওর দলে আরো কটি ছেলে ভিড়েছে মন। লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খায় , সিনেমায় যায়। ক্লাসে এসে ফিসফিস র সেসব গল্প শোনায় অন্যদের। দীপকও নেছে। সেও প্রলুব্ধ হয়েছে এক সময়। দিন শিবকিঙ্করবাবুর ক্লাসেও সন্তর্পণে মিহিসুরে গল্প করছিল অমল। দীপক ঘাড়়া করে শুনছিল সব। এক সময় দকে দৃষ্টি পড়তে শিবকিঙ্করবাবু লেন। অমলের ওপর তাঁর দৃষ্টি স্থির। ছেলেরা কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। অমল নত ভঙ্গিতে বসে আছে। একটু সময় রব থেকে শিবকিঙ্করবাবু বললেন, 'এাঁ ছিল আজ!, একটু থেমে চশমাটা রুমালে তে মুছতে আবার বললেন, 'তারপর, কি করে অমল?'

অমল উঠে দাঁড়াল। একবার তাকিয়ে চোখ ময়ে নিয়েছে। 'তুমি নাকি আজকাল বেশ তিমান পুরুষ হয়ে উঠেছো।' চশমাটা র নিলেন আবার শিবকিঙ্করবাবু।

অমল তখনও নতমুখে দাঁড়ালো। কিছু লের মুখে চাপা হাসি। 'তোমার তো জকাল অনেক সুখ্যাতি। স্কুলে আসার করে বাড়ি থেকে বেরোনো, সিনেমায় নি দেওয়া ধোঁয়া ছাড়ার পাকাপোক্ত শ্যা, আর পাড়ায় ছোটখাটো বীরত্ব খানো।' আস্তে আস্তে একটু টেনে টেনে বের সংগে কথাগুলো বললেন তিনি। ওর চোখের ওপর জোরালো দৃষ্টি রাখলেন, শুধোলেন, 'কি হে, ঠিক নয়?'

অমল কিছুই বলল না। সে আগের মতনই শান্ত অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। চেহারার অবিনীত রুক্ষ ভাবটা এখন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শিবকিঙ্করবাবু সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে কি ভাবলেন মনে মনে। তারপর সামান্য হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি যা শুনেছি, সব ভুল।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'ঘুম থেকে উঠে কি কর তুমি?'

'কি করবো, বাজার যাই, তারপর এসে পড়তে বসি।' গলার স্বর রূঢ় ও কর্কশ শোনাল।

'কটা অবধি পড়?'

'সাড়ে নটা।'

'তারপর?'

অমল জবাব না দিয়ে শান্ত হয়ে থাকল। শিবকিঙ্করবাবু দু-একবার ধমক দিলেন। কিন্তু কোন কথা বের করতে পারলেন না। একটু ভেবে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বিকেলে কি কর?'

'কিছুই না।'

'খেলাধুলো কর না?'

'আগে করতাম এখন আর করি না।'

'কেন?'

'ভাল লাগে না।'

শিবকিঙ্করবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'বসো।' কি ভেবে একটা নিশ্বাস ছাড়লেন দীর্ঘ করে। পরে বললেন, 'শুধু অমলই যে এ রকম তা নয়, তোমরা আরো অনেকেই এ-দলে আছ। আশ্চর্য! এ বয়েসে তোমাদের পড়াশুনো ভাল লাগে না, তার না হয় একটা

বুঝলাম, কিন্তু খেলাধুলো ভাল লাগে না, এ কি রকম কথা! হুঁ, ভাববার বিষয়। খেলাধুলোয় অরুচি, অনাগ্রহ, এ বড় তাজ্জব ব্যাপার! আমি তো ভাবতেই পারি না, একটা ছেলের, তোমাদের মতন যার বয়েস, এসবে উৎসাহ নেই, উৎসাহটা তবে কিসে? না না এ একধরনের অসুখ, আগে এর চিকিৎসা করা দরকার, তারপর তো পড়াশুনো। অথচ এ ব্যাপারে কারো যদি মাথাব্যথা থাকত!' আবেগ ও উত্তেজনা অনুভব করছিলেন তিনি। ঘণ্টা পড়ে যাওয়ায় চলে গেলেন।

এ ঘটনার পর আর ক্লাসে আসে নি অমল।

ঝিলের কাছে এসে পড়েছে দীপক। আর কিছুটা যেতে হবে। একটা মাদার গাছের ওপর হঠাৎ চোখ পড়ল তার। একটা বাঁশপাতি পাখি এসে বসেছে ডালে। অনেকদিন পরে আবার পাখিটাকে দেখল আজ। মনের কোণে গোপনে সংরক্ষিত শৈশব-স্মৃতির ছবিটা পলকে উঁকি দিয়ে মুখ সরিয়ে নিয়েছে। বিকেলের মলিন আলোর ছায়া পড়েছে ঝিলের বুকে ঘাস মাটির অঙ্গনে। দ্রুত পায়ে ঝিলের রাস্তাটা পেরিয়ে গেল দীপক। উদ্বিগ্ন ও অস্থির দেখাচ্ছিল তাকে।

মাঠে এসে দেখে, এক কোণে সভা চলছে। আরো একটা দৃশ্য তার নজরে পড়ল। মুহূর্তে বিদ্যুৎ স্পর্শের মতন একটা তীব্র অনুভূতি তাকে আহত করল। আচমকা আঘাতে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মাঠের কোণে একটা বুড়ো অশত্থ গাছ ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়ে রয়েছে। প্রাচীনকালের বহু চিহ্ন ছিল ওর সর্বাঙ্গে। নিষ্ঠুরের মতন কারা যেন তাকে খুন করে গেল আজ। সন্ধ্যের মুখে অনেক বক এসে বসত এর ডালে। রাত্রিবাসের পর আবার চলে যেত দল বেঁধে। শ্রান্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে এল দীপক। নীরেন ইশারায় কাছে ডাকল তাকে। প্রশান্তদা, ক্লাবের সেক্রেটারী, তখন কথা বলছিলেন। দীপককে দেখে বললেন, 'দেরি করে ফেলেছো। এখন তো শেষ হতে চলল।'

একটু পরে সভা শেষ হলো। সবার মুখ কেমন কাতর ও ম্লান দেখাচ্ছে। প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আজ। এখানকার স্থানীয় কাউন্সিলার ও এম এল এ-র কাছে ওরা একটা দাবি নিয়ে যাবে। ছেলেদের জন্যে খেলার একটা ভাল মাঠ চাই। ঠিক হয়েছে, প্রশান্তদার সঙ্গে দীপক আর বিজন যাবে। আর কাল থেকে তাদের জন্যে এ-মাঠ বন্ধ। মাঠের এক দিকে ইঁট বালি এনে জড়ো করা হয়েছে। আপাতত এ ছাড়া আর কিছু করার নেই তাদের। নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। লোকজন আসবে। কিছুই পতিত থাকবে না। ভাল কথা, কিন্তু তাদের জন্যে খেলাধুলোর কোন ব্যবস্থা থাকবে না; এ সম্পর্কে কোন ভাবনাও নেই অভিভাবকদের। কেমন নির্বিকার, উদাসীন। আস্তে আস্তে আহত ও বেজার মন নিয়ে চলে গেল অনেকে। প্রশান্তদা চলে গেছেন।

এই মুহূর্তে বাড়ি যেতে ইচ্ছে হলো না দীপকের। কেমন রাগ ও ঘৃণা হচ্ছিল এ-পাড়ার লোকগুলোর ওপর। মাথার ওপর দিয়ে কিছু বিতাড়িত বক উড়ে গেল এ সময়। আস্তে আস্তে হেঁটে বিলের কাছে এল। সঙ্গে নীরেনও রয়েছে। দীপক অন্যমনস্ক ছিল।

দিন শেষ হয়ে আসছে। শেষবারের মতন ঘোলা চোখ দিয়ে যেন দেখে নিচ্ছিল সবকিছু। অন্তিম মুহূর্তের কথা ভেবে নিস্তেজ আলোর কণাগুলো ছটফট করছিল। পশ্চিম আকাশ বিষণ্ণ ও করুণ হয়ে উঠেছে। সেদিকে উভয়েই কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মতন চেয়ে থাকল। পরে ঘাস দেখে বিলের ধারে বসল। কটা ঘাস-ফড়িং উড়ে গেল। পানা, কলমী ও শাপলায় ভরা ছিল বিলটা। দূরে কিছু পাতিহাঁস।

এই নির্জন স্তব্ধ প্রান্তরে হঠাৎ তাদের চমক ভাঙল একটা পরিচিত আর্তনাদ শুনে। দুজনই চকিতে তাকাল। দেখল সেই লোকটি। নাম জানে না দীপকরা। তাদের পাড়ার সবচেয়ে মনোহর বড় বাড়িটাই ওদের। সঙ্গে একটা চাকর। তার হাতে ধরা রয়েছে একটা পোষা তেজী কুকুর। লোকটার মুখে চুরুট। হাতে একটা বন্দুক। পাড়া দিয়ে যাবার সময় অনেকবার উঁকি দিয়েছে লোহার ফটকের এ-পার থেকে। কেমন যেন একটা রহস্য এ-বাড়ির ইঁটকাঠে। মাঝে মাঝে কুকুরের চিৎকারও শুনেছে। কিন্তু এই ফাঁকায় ডাকটা আরো বীভৎস লোমহর্ষক মনে হলো। শুনেছে, কিসের একটা ব্যবসা আছে লোকটির। মাঝে মাঝে এদিকে আসে। পাখি হাঁস শিকার করে আবার চলে যায়। আগেও দেখেছে দু' একবার। কেন যেন তার ভাল লাগে না লোকটাকে।

চাকরটিকে দাঁড় করিয়ে রেখে সন্তর্পণে এগিয়ে এল লোকটি। সঙ্গে একটা দুটো ছোট ছেলেও জুটেছে। মজা দেখার জন্যে। একটু পরেই বন্দুকের একটা শব্দ হলো। একটা ভীত করুণ অসহায় কান্না যেন মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল বিলের বুকে। নিস্তরঙ্গ জলের বুকে ঢেউ উঠল। কিছু পাতিহাঁস আতঙ্কে উড়ে গেল। কুকুরটার চিৎকার আরো বেড়েছে এখন। একটা ছেলে পয়সার লোভে জলে নেমে পড়েছে ততক্ষণে। একটু পরে ছেলেটি উঠে এল। সারা গায়ে

লের কণা। বিন্দু বিন্দু ঘামের মতন
ড়চ্ছিল। লোকটির মুখে উল্লাস। চার
হাঁস তার মুঠিতে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে
ুকে পায়ে সর্বত্র। সূর্যের লাল আভা
ছেলেটির মুখে, শরীরে। বড়
দেখাচ্ছিল ছেলেটিকে।

চলে যাওয়ার পরও একটা আতংক
থাকল এই নিঃসংগ প্রান্তর ও বিলে।
ুবে গেছে ততক্ষণে। অস্পষ্ট মিহি
গঁড়ো গঁড়ো ছড়ানো ছিল চার-
বিলের জলটা তখনও কাঁপছে। দীপক
ক চেয়ে আছে সেদিকে। নীরেনও চুপ
ক ভাবছিল। একটু পরে শুধলো,
কাল থেকে কি করবো আমরা?'

ক তাকাল নীরেনের মুখের দিকে।
াথেমুখে চিন্তার রেখা ফুটে রয়েছে।
ই কথাই ভাবছিল, কাল থেকে তারা
টটুকু কিভাবে কাটাবে। ধীরে ধীরে
বলল, 'কি আর করবো, এখানে এসে
বসে থাকবো, না হয় ঘুরবো
লর মতন।' বলে হাসল দীপক।
পর?'
পর আর জানি না।'

আকাশে চাঁদ উঠছিল তখন। গোল
মতন চাঁদের গায়ে রক্তের ফুটিফুটি
সদিকে চেয়ে থাকল খানিকক্ষণ। পরে
ণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'আজ পূর্ণিমা
র?'
রা দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।'

ত আস্তে চাঁদের গা থেকে রক্তের
না মুছে গেল। উজ্জ্বল ও শুভ্র
ল এখন। চাঁদের আলোয় দেখতে
সব ভিজে গেল। বরফের মতন সাদা
ায় সবকিছু নজরে পড়ছিল। সামান্য
ঘেঁটু ঝোপের তলা থেকে একটা
ন্ধ আসছে। পানায় মরা বিলের
পুরনো গন্ধটা ছিল অনাহুতভাবে।
পাড়াটাও দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। দিগন্ত
জ্যোৎস্নার এমন ব্যাপ্ত নেশাগ্রস্ত
অনেকদিন পর যেন অনুভব করছিল
ন অল্প বসতি ছিল, তখন দেখেছে
তার ঘরের জানলা ডিঙিয়ে মাঠ ঘাস
বনলতার ঝোপের পাশ দিয়ে চুপি-
তার ঘরে শংখ-সাদা আলো এসে
। তার ঘরের পাশেই ছিল বড় বড়
ছ। একদিন মাঝরাতে কি একটা
ুম ভেঙে গিয়েছিল তার। জেগে
খে, আদিগন্ত বিস্তৃত জ্যোৎস্নার
সামনের গাছ মাঠ ঘাস মাটি সব
ছে এই জোয়ারে। শান্ত স্তব্ধ
তার ঘরও ভিজে গেছে সেই
। কি একটা যেন সেদিন সে গভীর-
নুভব করেছিল। বহুক্ষণ আচ্ছ-
মতন তাকিয়ে ছিল সামনের
বৃত্ত বেহুঁশ মাঠের দিকে। কি এক
ত রহস্য ছিল সর্বত্র। সেদিন এই
আচ্ছন্নকরা নেশাতুর চন্দ্রালোকে অবগাহন
করে যে অপরিমিত আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ
করেছিল, তা কাউকে কোনদিন বোঝাতে
পারে নি, বলতে পারে নি। অথচ তার
স্বাদ সে এরপরও বহুদিন পেয়েছে। সবার
অলক্ষে সংগোপনে সূক্ষ্মভাবে মনের ভেতরে
তার বুনন চলেছে।

এই প্লাবিত জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে
আজ আবার যেন শৈশবের অস্ফুট অব্যক্ত
একটি বিশেষ অনুভূতি এই মুহূর্তে প্রত্যক্ষ
হয়ে উঠছিল। কতগুলো পাখি উড়ে গেল
একটা ঝোপের ভেতর থেকে। আরো
কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর নীরেন
বলল, 'আর কতক্ষণ বসে থাকবি এখানে?'

'হুঁ।' দীপকের অন্যমনস্কতা ভাঙল।
সে নীরেনের চোখে চোখে চেয়ে আছে
নির্নিমেষে।

'বাড়ির লোক এত দেরি দেখে ভাবচে।'

'ভাবুক, এই একদিনই তো ভাববে।'
কেমন ম্লান ও বিমর্ষ মনে হলো কণ্ঠস্বর।

'আমার কিন্তু এভাবে চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগছে না।'

'আমারই কি লাগছে ভাবছিস, কিন্তু কি করবো, আজকের কথাটা ভাবলেই খারাপ লাগছে।' বলে একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়ল।

'এবার ভাবছি, ছেড়েই দেবো খেলাধূলো।'

'এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি?' দীপক তাকাল ওর চোখের দিকে।

'হ্যাঁ, একে একে সবই তো খসে পড়ল।'

'বোধ হয় আমরাই বাকী ছিলাম। পুরনোদের ভেতর তো তুই আর আমি।'

'আর যা সব আসছে এখন, মেশা যায় ওদের সঙ্গে?'

'ঠিক বলেছিস। আচ্ছা, একটা জিনিস তুই লক্ষ করেছিস, আমরাই এখন পাড়ায় কেমন অপরিচিত হয়ে পড়েছি?'

'হ্যাঁ, এখন দেখছি অমলরাই দিব্যি আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব ছিল না দীপক। নীরবে বসে থেকে আরো খানিকক্ষণ কি ভাবল যেন। একটু পরে জলের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, 'হ্যাঁ, বেশ মজায় আছে ওরা!' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। একটু থেমে আবার বলল 'অমল কিন্তু এ রকম ছিল না আগে। তুই এখানে আসিস নি তখনও। অমল নির্মল ওরা যে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল একসময় কে বলবে আজ! অমল আর আমি একবার ফুলের একটা বাগান করেছিলাম। আমাদের তখন নেশায় পেয়েছে। যেখানে পাই, সেখান থেকেই ফুলের চারা নিয়ে আসি। অনেক গাছ এভাবে যোগাড় করেছি আমরা। দুজনই তখন স্বপ্ন দেখতাম, এই বাগানটাকে আমরা সেরা একটা বাগান করবো।' ধীরে ধীরে টেনে টেনে কথাগুলো বলল দীপক। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। পুরনো দিনের স্বাদ নিতে নিতে আবার বলল, 'অমলই নষ্ট করে দিল বাগানটা।' কেমন বিষণ্ণ ক্লান্ত শোনাল স্বর।

আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে এক সময় বলল, 'চল, এবার উঠি।'

'হ্যাঁ, ওঠা যাক।' বলে আর অপেক্ষা না করে উঠে দাঁড়াল নীরেন। সে অস্থির ও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। দীপকও উঠল।

জ্যোৎস্নাসিক্ত পথটুকু নিঃশব্দে ধীরে ধীরে পেরিয়ে এল ওরা। ক্লান্ত ও মলিন দেখাচ্ছিল দীপককে। নীরেনও চুপচাপ তার সঙ্গে পা ফেলে এগোচ্ছে। এক সময় পাড়ায় ঢুকল আড়ষ্ট শিথিল পায়ে। একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। কুকুরের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ আগের দৃশ্যটা মনে পড়ায় আবার যেন একটা অস্বস্তি ঘুলিয়ে উঠল। প্রচণ্ড আক্রোশ ও বিতৃষ্ণা দিয়ে বাড়িটা দেখে চলে এল ওখান থেকে। নীরেন চলে গেছে একসময়।

দীপক অন্যমনস্কভাবে পথ চলছে। আসতে আসতে এক সময় দেখল, যেখানে ছেলেগুলো বসে প্রতিদিন অশালীন আচার-আচরণ করে, সে জায়গাটা এখন শান্ত পরিত্যক্ত। যাবার সময়ও দেখেছিল ওদের মুহূর্তে মনে হলো, আজ অনেক দেরি করে বাড়ি ফিরছে সে। সবাই হয়ত ভাবছে তার জন্যে। ওরা চলে গেলেও অকস্মাৎ মনে হলো তার, এতক্ষণ ধরে নোংরা বাচাল কথাগুলো যেন উন্মত্ত নেশায় মেতে উঠেছিল এখন একে একে সব ঢুকছে। ক্লান্তিতে অবসাদে ঝিমিয়ে পড়েছে অপেক্ষা করে করে। দীপককে দেখে আবার যেন একবার তারা সজীব ও মুখর হয়ে উঠতে চাইল ওর পা থেমে গিয়েছে। আর চলতে পারছে না। কেমন ভারী ও আড়ষ্ট মনে হলো। এর কি আগে থেকেই ষড়যন্ত্র করেছে, এ পথে তাকে আটকাবে? এতক্ষণ কি তারই প্রতীক্ষায় ছিল? নেশাচ্ছন্ন চোখ তুলে একবার দেখবার চেষ্টা করল তাকে। নেশার টানে পরক্ষণেই চোখ বুজে ফেলেছে তারা এই মুহূর্তে প্রশান্তদার কথা মনে পড়ে আবার। এখনকার কাউন্সিলারের কাছে যাবেন। এম এল এ-র সঙ্গে দেখা করবেন পাড়ার কিছু উৎসাহীর কাছেও যাবেন। তাদের জন্যে ঘাস দূর্বো আচ্ছাদিত একটা মাঠ চাই। কিন্তু তা কতদিনে? আদৌ মিলবে কি? গর্বিত লোকগুলো কি তাদের কথায় কান দেবে কখনো? ততদিনে তারা কি করবে? কোথায় পেঁছবে? সবই তো কেড়ে নিল তাদের কাছ থেকে। আর কি রইল সম্বল? আর ভাবতে পারছিল না দীপক। কপালের রগ-দুটো ছিঁড়ে পড়বে বুঝি। ভাবতে ভাবতে আচ্ছন্নের মতন কখন যে এক সময় সেই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘৃণিত রকটার ওপর এসে বসল, টেরও পেল না সে। অদৃশ্য হাতছানিতে যেন এখানে এসে বসে পড়েছে। এবারে কেঁদে ফেলল দীপক।

মগরায় এক লক্ষ একর জমিতে উন্নত ধরনের ফরমোজা ধানের চাষ হইবে এবং আশা করা যাইতেছে ইহাতে সাত লক্ষ টন বেশি ধান উৎপাদন করা সম্ভব হইবে।
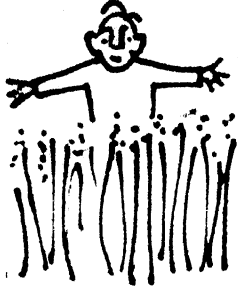
শ্যামলাল বলে—"ভালো কথা, কিন্তু বাড়তি ধান নৌকোয় বা ট্রেনে বহন করা চলবে তো?"

সংবাদে প্রকাশ তৃতীয় যোজনায় মাথা পিছু আয় এক পয়সাও বাড়ে নাই। —"ভালো কথা, এর জন্য সংবাদ পড়বার প্রয়োজন ছিল না, যেমন কথায় বলে—হাতের আঙুল আরশি দিয়ে দেখতে হয় না। তবে হাঁ, আয় না বাড়ুক, মাথা পিছু বোঝা বেড়েছে এবং আমরা ভাগ্যবান নই বলে সেই বোঝা ভগবানের বদলে নিজেরাই বয়ে থাকি" —মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

সংবাদে প্রকাশ, সংসদের বেসরকারী পরামর্শদাতার এক কমিটি বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ বন্ধ করার উপায় নির্ধারণ করিতেছেন। সহযাত্রী বলিলেন—"কিন্তু পরামর্শের কোন প্রয়োজন হয়ত আর হবে না। যে-হারে ট্রেন আটক হচ্ছে তাতে বিনা টিকিটে কেন, টিকিট নিয়ে ভ্রমণও সম্ভব হয়ত আর হবে না।"

সংবাদে শুনিলাম, বিদেশী মিশনারি-দের ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"মিশনারিরা নিশ্চয়ই জানেন যে, প্রথমে মিশনারি, দ্বিতীয়ে মারচেনট এবং তৃতীয়ে মেশিনগানের ভাঁওতা অনেক আগেই ফাঁস হয়ে গিয়েছে।"

শরৎ স্মৃতি বক্তৃতামালার প্রথম দিনে এই বছরের বক্তা প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক শ্রীসুবোধ ঘোষ বলেন,—যেদিন মানুষের ভাষা ছিল না সেদিনও তার গল্প ছিল—সে অঙ্গভঙ্গীর অভিব্যক্তিতে বলা কাহিনী। বিশু খুড়ো বলিলেন—"ভাগ্যিস সেদিন পূজা-সংখ্যা ছিল না, থাকলে সম্পাদকমণ্ডলী মাথায় হাত দিয়ে বসতেন!!"

সংবাদে শুনিলাম, কোন কোন স্থানে চালের কিলো পাঁচ টাকায় উঠিয়াছে। —"কিন্তু কোন ভয় নেই, মন্বন্তরে মরিনি আমরা। 'হস্তুকী বাঁচাও' আন্দোলন করুন এবং সেই হস্তুকীকে ঢেলে পাকাবার গবেষণা করুন; যদি কপাল ভালো হয়, তাহকে বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দেখাতে কতক্ষণ"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম, জার্মানী পাকিস্তানকে কোনরূপে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিবেন না —বলিয়াছেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচাগলা। সহযাত্রী বলিলেন—"সংবাদ শুনে স্বস্তি বোধ করছি। কিন্তু চাবি মার্কা "বেকস্" সরবরাহ করবেন তো, তাহলেই হলো।"

মহাকরণে সম্প্রতি জনতার উচ্ছৃংখল আচরণে অনেকেই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং এমন নজীর ইতিহাসে বিরল বলিয়াও অনেকে বলাবলি করিতেছেন। সহযাত্রী

বলিলেন—"এতে বিক্ষুব্ধ হবার কিছু নেই।" মহাকরণকে মহারণ ক্ষেত্রে পরিণত করার রায় যদি 'সুপ্রিম কোর্ট' দিয়েই থাকেন তবে তা মেনে নিতে হবে বইকি!!

বিজ্ঞানীরা জীবন-সম্ভাবনাহীন যে পৃথিবীর পরিচয় এতদিন জানিয়া আসিয়াছেন, সেই বৃহস্পতিগ্রহ এখন জীবন-সৃষ্টির আদি পরমাণু গড়ার কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে, এই আবিষ্কারও তাঁরাই করিয়াছেন।—"অথচ বৃহস্পতিকে বিশুদ্ধ করার কত উৎসাহ আমাদের এই আবগারি বিভাগের"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, মধ্যপ্রদেশে ১৮টি জিলায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা হইয়াছে।—"কিন্তু অন্য এক সংবাদে যা

শুনলাম তাতে মনে হয় মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রীর দুর্ভিক্ষ এখনও হয়নি"—বলেন খুড়ো।

সংবাদে শুনিলাম, মদ্যপানের শখ মিটাইতে মাদ্রাজে কতকজন পানাসক্ত বার্নিশ এবং ফ্রেনচ পালিশ খাইয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। সহযাত্রী বলিলেন—"এটা নিশ্চয়ই ব্যঙ্গ রসিকতার আওতায় আসে না, তবু আমরা বলব—মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি করে দাও মোরে—কিন্তু বলবেন না শুধু শ্রীমোরারজী দেশাই এবং টেকচাঁদ কমিটি!!"

আমেরিকা হইতে একদল মহিলা টুরিস্ট বিলাতে আসিয়াছেন, তাঁদের আগমনের হেতু : স্বামী-ধরা। সংবাদে প্রকাশ, তাঁদের বয়স কারো ৬০-এর ওপর কারো কারো ৭০-এর ওপরে।—"বুঝলাম, বিয়ের ব্যাপারে বয়স কোন বাধাই নয়। কিন্তু সে কথা থাক, ভারত সরকারের টুরিস্ট ব্যুরো কাশ্মীর আর অজন্তা দর্শনের কথা না বলে, এবার স্বামী-দর্শনের কথা বলে টুরিস্টদের কৌতূহলের সঞ্চার করতে পারেন; হয়ত ভারতের স্বামীরা আমেরিকার মহিলা টুরিস্টদের পছন্দসই হবে না, কিন্তু ৬০ বা ৭০ বৎসরের কুমারীরা নিশ্চয় বিশ্বাস করেন—এ্যানি পোর্ট ইন এ স্টরম"—বলেন বৃদ্ধ বিশু খুড়ো।

পাকিস্তান বনাম ইংলণ্ডের দ্বিতীয় টেস্টের সংবাদে পাকিস্তানের ব্যাটিং বিপর্যয়ের কথা পড়িলাম—"এবং মনে করলাম, আমরা একই নৌকোয় ভ্রমণ করছি, অথচ শুধু শুধু ভাগীরথী এবং বুড়ীগঙ্গা নিয়ে আমাদের ঝগড়ার অন্ত নেই"—মন্তব্য করেন জনৈক ক্রীড়া রসিক সহযাত্রী।

প্রসঙ্গত ভারতের স্কুল বয়েজদের খেলার কথা মনে পড়ল।—"এবং বলতে ইচ্ছে হল, পতৌদি, শিখুন এবং শেখান, এক ইজ নো বার"—বলেন অন্য এক ক্রিকেট রসিক সহযাত্রী।
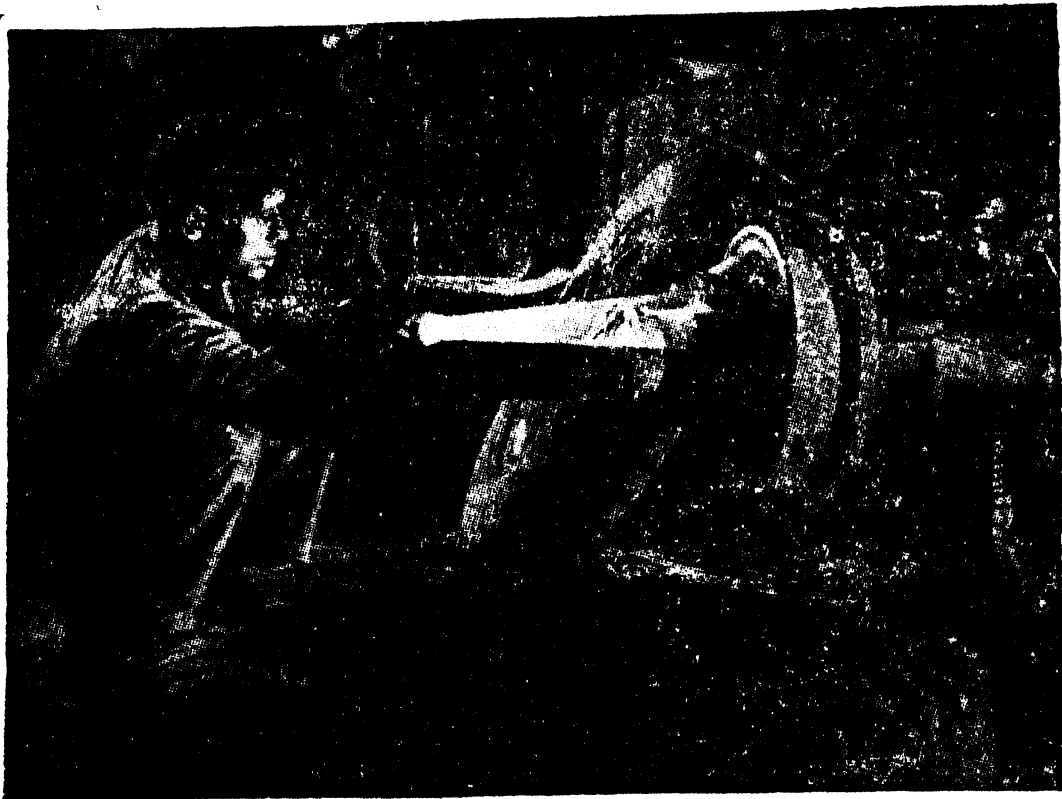
১

দুই রবীন্দ্রনাথ

১৯ শ্রাবণ ১৩৭৪ (বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ৪০) 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী লিখিত "দুই রবীন্দ্রনাথ" রচনাটি পড়িয়া প্রথমেই এই কথা মনে হইল যে, "মানুষ দোষে-গুণে মানুষ পারব না তা ভুলতে"—বাংলা দেশের একজন কবি এ কথা লিখিয়াছেন, এবং ইহা সর্বজনগ্রাহ্য। রবীন্দ্রনাথও মানুষ, তাঁহার গুণাবলীর সহিত কিছু-কিঞ্চিৎ দোষও অবশ্যই মিশ্রিত ছিল, নহিলে তিনি মানুষ হইয়া উঠিতে পারিতেন না। মানুষ ছাড়াও জগতে কীটপতঙ্গ-আদি বহু প্রকার জীব আছে: নীরদচন্দ্র কোন্ প্রকার জীব তাহাই ভাবিতেছি। ইঁহার হাতে কলম আছে, এবং কোনো কর্ম করিতে হয় না বলিয়া প্রচুর অলস অবকাশ আছে, সেই অবকাশ তিনি কলম দিয়া কলঙ্কিত করিতেছেন। কিন্তু ইঁহাকে তিরস্কার করিয়া লাভ নাই, কারণ তাহা ইঁহার গায়ে লাগিবে না, কেননা, ইনি স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন যে ইনি প্রচুর "জ্ঞানী" হইয়াছেন, লিখিয়াছেন—

> গালি অগ্রাহ্য করিবার জন্যও জ্ঞানের আবশ্যক। আমি এই জ্ঞান দায়ে পড়িয়া অর্জন করিয়াছি। পৃ. ৩১

সুতরাং তিরস্কার করিয়া লাভ নাই। কঠোর ভাষায় নিন্দা করিবারও প্রয়োজন বোধ করিতেছি না।

কেবল বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—

> তুমি লজ্জাহীন
> তোমারে কি লজ্জা দিব,
> সম তব মান-অপমান।

আসল কথা হইতেছে এই যে, কলমবাজী করা আমাদের কাজ নহে। কলমের মুখে দরকার-মত কথা তাই কিছুতেই আনিতে পারিতেছি না। অভিধান দেখিয়া বাছিয়া-বাছিয়া কয়েকটি কঠোর বিশেষণ এখানে বসাইয়া দিব ভাবিতেছিলাম, কিন্তু থাক।

নীরদচন্দ্র "জ্ঞান" অর্জন করিয়াছেন তিনি সম্ভবত "কষ্ট"ও বর্জন করিয়াছেন· তাহার চৈতনা নিশ্চয়ই ভোঁতা হইয়া গিয়াছে, গাত্রচর্মে নিশ্চয়ই সাড় নাই। নহিলে রবীন্দ্রনাথকে অশ্রদ্ধা করিতে তাঁহার কষ্ট হইল না, অর্থাৎ কষ্টের বোধ জাগ্রত হইল না। কাহাকেও শ্রদ্ধা করিতে যদি না শিখিলাম তাহা হইলে জীবন কতটা বিষময় ঠেকে, তাহা নীরদচন্দ্রের ন্যায় ব্যক্তির বোঝা অসাধ্য। এখানে কেবল ইনি রবীন্দ্রনাথকে নস্যাৎ করিয়াছেন, ভারতবাসী ও বঙ্গবাসীকেও তিনি একদা নস্যাৎ করিয়া দাস মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাঁহার গ্রন্থে। সে কথায় পরে আসিতেছি।

অপমান অগ্রাহ্য করিবার "জ্ঞান" অর্জন করিয়াই তিনি খুশি আছেন। প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে—যাহাকে বলে এলেম, তাহার আবশ্যক। সুতরাং তিনি সে পথে যান নাই। তাহার নমুনা—

> মধুসূদন পাশ্চাত্যের মোহাবিষ্ট হইলেও এই আক্ষেপ অন্তত করিয়াছিলেন—
> আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
> জীবনপ্রবাহ বহি .
> রবীন্দ্রনাথের মনে এই সন্দেহও স্পর্শ হয় নাই। পৃ. ৩০

পাশ্চাত্ত্যের মোহ ভঙ্গ হওয়ার ফলে কি মধুসূদন ঐ কথা লেখেন! কি আর বিলাপ করিব। ঐ রচনাটি যে মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ', উহার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের কোনো সম্পর্ক নাই। মধুসূদনের সে রচনা হইতেছে—

> হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
> তা সবে, অবোধ আমি, অবহেলা করি
> পরধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
> পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি
> কাটাইনু বহুকাল সুখ পরিহরি
> অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায়-মন।
> মজিনু বিফলতপে অবরণ্যে বরি
> কেলিনু শৈবালে ভুলি কমল-কানন

'আত্মবিলাপ' রচনায় এক স্থলে মধুসূদন লিখিয়াছেন—

> এই কি লভিলি লাভ অনাহারে অনিদ্রায়!

সুতরাং অনিদ্রা আর অনাহার উভয় ক্ষেত্রে থাকায় নীরদচন্দ্র উধোর পিণ্ডি আর বুধোর পিণ্ডি একাকার করিয়া ফেলিলেন। 'জ্ঞানী' না হইলে এমন হইবে কেন।

এই জ্ঞানের জাহাজে চাপিয়া রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এক সমুদ্র পাড়ি দিবার বাসনা দেখিয়া নীরদচন্দ্রের সাহসের তারিফ করিতে হয়। তিনি সত্যই বলিয়াছেন—

> সত্যকার রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ করিতে হইলে সাহসের প্রয়োজন আছে। পৃ. ২৭

সাহসের পরিচয় দিয়া অনেকেই নানাভাবে পুরস্কৃত হইতেছেন দেখিতে পাই। আমাদের হাতে ক্ষমতা থাকিলে নীরদচন্দ্রের এই সাহসের জন্য আমরা তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিতাম।

(সত্য মিথ্যা জানি না, লোক-পরম্পরা শুনিয়াছি একজন স্টেনোগ্রাফার এইরূপ এক অর্বাচীনকে নাকি পেপার-ওয়েট ছুঁড়িয়া দিব্য গায়ের ঝাল ঝাড়িয়াছিলেন।)

"দুই রবীন্দ্রনাথ" লিখিতে বসিয়া নীরদচন্দ্র তাঁর রচনায় বাঙালী-জাতিকে নানাভাবে বিচার করিয়া লইয়াছেন—

> ১। বাঙালীর কুৎসাপরায়ণতা আসিয়াছে একদিকে তাহার বুদ্ধি ও অন্যদিকে তাহার অলসতা হইতে। পৃ. ৩২
>
> ২। যে বাঙালীর বুদ্ধি যত বেশি, অলস হইলে তাহার ঈর্ষা ও নিন্দাপরায়ণতাও তত বেশি হয়। তখন সে মুখে নিন্দা করে, পত্রিকায় আর্টিকেল লিখিয়া নিন্দা করে। পৃ. ৩২

এই ১ ও ২ দফায় নীরদচন্দ্র নিজের কথাই বলিতেছেন নিশ্চয়। যেমন নিজের 'জ্ঞানে'র কথা বলিয়াছেন। তিনি স্বয়ং কুৎসাপরায়ণতার চরম দৃষ্টান্ত; এবং বুদ্ধি তাঁহার আছে বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয়, এবং কর্মও বিশেষ নাই, সুতরাং কলমবাজি করিয়া "পত্রিকায় আর্টিকেল লিখিয়া নিন্দা" করাই তাঁহার কাজ। যেমন আলোচ্য রচনা।

সঠিক জানি না, কিন্তু শুনিয়াছি কলমবাজিই নাকি নীরদচন্দ্রের জীবিকা। তাহা হইলে তাঁহাকে বিত্তবান বলা বোধ হয় ঠিক হইবে না। অবশ্য উনানে হাঁড়ি চাপাইয়া তিনি অর্থান্বেষণে কলম পিষিতেছেন, এমন নাও হইতে পারে; তবুও বিত্তবান বলা হয়তো চলে না। বাঙালী চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া অবশেষে তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা মনোযোগ দিয়া পাঠ করা প্রয়োজন, কেননা, ইহার মধ্যে নীরদচন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত, তিনি বলিতেছেন—

> এইবার বাকী চার আনা ভদ্র বাঙালীর কথা। ইহাদের মত দুর্জন, পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপরায়ণ, অনিষ্টকারী—সহজ বাংলায় হাড়ে বজ্জাত ও হারামজাদা পৃথিবীর অনত্র খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।...এই দুষ্টামি অভাবে বা ঐশ্বর্যে হয় না, স্বভাবে হয়। তবে বিত্তবান ও বিত্তহীন নিন্দুকের মধ্যে প্রভেদ এই যে বিত্তবানেরা নেকড়ে বাঘের মত, বিত্তহীনেরা পাগলা কুকুরের মত। পৃ. ৩৩

নিম্নরেখা আমাদের। এ সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বাঙালীর দাস-মনোবৃত্তি প্রসংগে নীরদ-চন্দ্র বলিতেছেন যে, আমরা যে রবীন্দ্র পূজা করি তাহা

> আমাদের দাস-মনোবৃত্তি। স্বাধীন হইয়াও আমরা ইউরোপীয় জাতির মুখে ঝাল খাওয়ার পুরোনো অভ্যাস ছাড়িতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথকে ইউরোপীয়েরা এক সময়ে সমাদর করিয়াছিল, সেজন্য তিনি পূজার্হ। পৃ ২৭

ঠিক কথা। দাস-মনোবৃত্তিটা কাজের কথা নহে। দাস-মনোবৃত্তির বিপক্ষে তাঁহার এই মন্তব্যে চমক লাগিল। তাঁহার Autobiography of an unknown Indian গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার পর আমাদের পরিচিত দু'-একজন বইটির বিস্তর প্রশংসা করেন। বইটিতে বঙ্গদেশ তথা ভারত-বর্ষের বিরুদ্ধে প্রচুর কথা লেখা হইয়াছে, ইংরেজ আমাদের আচার-আচরণ সাহিত্য সংস্কৃতির কত উন্নতি সাধন করিয়া দিয়াছে, ইংরেজ নহিলে আমাদের কোনো গতি নাই—ইত্যাদি বিস্তর কথা নাকি আছে। এবং আরও শুনিয়াছিলাম যে, অপূর্ব ইংরেজী, চোস্ত ইংরেজী, চরম ইংরেজী, ইংরেজী ভাষায় আশ্চর্য দখলের এটা নাকি একটি নজির। আমাদের পক্ষে ইংরেজী ভাষা বিচার করা অসাধ্য, তাই চুপ করিয়া গিয়াছি। সুখের অথবা দুঃখের বিষয় বলিতে পারিব না—বইটি পড়ি নাই। কিন্তু বইটির একটি দীর্ঘ সমালোচনা হঠাৎ পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। সমালোচনাটি লিখিয়াছিলেন একজন ইংরেজ ভদ্রলোক। তাঁহার নাম আর্থার মুর, স্টেটসম্যান পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। একে ইংরেজ, তাহার উপর পত্রিকার সম্পাদক, তাঁহার অভিমতটা জানার কৌতূহল হইল। ইংরেজ জাতির ও সমাজের বিস্তর প্রশংসা থাকা সত্ত্বেও ঐ ইংরেজ ভদ্রলোক গ্রন্থকারের বিশেষ প্রশংসা করিতে পারেন নাই। তাঁহার দুটি মন্তব্যের কথা স্পষ্ট মনে আছে, প্রথম মন্তব্য—slave mentality; দ্বিতীয় মন্তব্য—bad English, un-English।

এই slave mentality কথার বাংলা অনুবাদ অবশ্যই দাস-মনোবৃত্তি? এবং কত চোস্ত ইংরেজি তিনি লিখিয়াছেন তাহার প্রমাণ একজন খানদানী ইংরেজের ঐ মন্তব্য।

তিনি বলিয়াছেন—

> বিশ্বমানবতা প্রচার, সুপরিসর আলখাল্লা পরিয়া বিদেশে ভ্রমণ, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা, শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা, বিদেশ হইতে ভারতীয় কালচারের বিদেশী ফিরিওয়ালা আনিয়া শান্তিনিকেতনে ইউরোপীয় চিড়িয়াখানা স্থাপন, উডকাট বাটিক প্রভৃতির বাতিক, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি সবই অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের কাজ। পৃঃ ৩৪

ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না। এগুলি অভিনয়ের পর্যায়ে কিভাবে পড়িল, তাহা নীরদচন্দ্র খোলসা করিয়া বলিলে ভালো করিতেন। নহিলে তাঁহার এই উক্তি নির্জলা ভাঁড়ামির মত লাগিতেছে।

ভিক্টর হুগোর (আমরাও ইংরেজি উচ্চারণ দিলাম) আঁকা ছবি দেখিয়া রবীন্দ্র-নাথের যদি ছবি আঁকিবার বাসনা জাগিয়াই থাকে তাহাতে ক্ষতি কোথায়? তিনি যাহা অংকন করিয়াছেন তাহা চিত্র হইয়াছে কিনা তাহাই বিচার্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথকে খাটো করিবার এই ব্যাকুল ব্যর্থ প্রয়াস দেখিয়া লেখকের প্রতি মায়া হয়।

নীরদচন্দ্রও বলিয়াছেন, আমাদেরও মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ যদি কতকগুলি ব্যাপারে অন্তত নীরদচন্দ্রের নিকট তালিম লইতেন তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের কল্যাণ হইত। নীরদচন্দ্র যাহা পারিতেছেন, রবীন্দ্রনাথ কেন তাহা পারিলেন না?

> আমি এই ভুল করি না......রবীন্দ্রনাথ যে কেন এই হিসাবটা করেন নাই তাহা আমার কাছে আশ্চর্য মনে হয়। পৃ ৩৩

বটেই তো, এমন "জ্ঞানী" লোকের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ কিছু শিখিয়া লইলে পারিতেন। কিন্তু সেই হেনস্তার হাত হইতে রবীন্দ্রনাথ যে আগে-ভাগে মরিয়া গিয়া বাঁচিয়া গিয়াছেন, ইহা পৃথিবীবাসীর পক্ষে মঙ্গলই হইয়াছে। তাহা না হইলে সবই খর্ব হইয়া যাইত। সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত কতকগুলি বামন কতকগুলি লিলিপুট।

নীরদচন্দ্র যে ফরাসী দেশ ঘুরিয়া আসিয়া হুগোর মূল চিত্র দর্শন করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া ভালো করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সেইসব চিত্রের চিত্রত্ব সম্বন্ধে কিছু বুঝিয়াছেন কিনা তাহা উল্লেখ করেন নাই। ফরাসী মহিলাদের সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যও বেশ মসলাদার।

বিদেশে অনেকেই যায়, বিদেশে যাওয়াটা কিছু একটা বড় কথা নহে। তিনি তো 'জ্ঞান' অর্জন করিয়াছেন, কিন্তু বিদেশ হইতে কিছু অর্জন করিয়া আসিতে পারিয়াছেন কিনা, সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলে ভালো হইত। চট্টগ্রামের খালাসিরাও বহু দেশ পর্যটন করিয়াছে, অনেক বন্দর তাহারা দেখিয়াছে। সুতরাং দেশ পর্যটন ব্যাপারটাকে খুব বড় করিয়া দেখিবার কিছু নাই।

জগতে অনেক প্রকারের প্রাণী আছে। তাহার মধ্যে দুইটির কথা বলি। সে দুইটি হইতেছে মৌমাছি ও মাকড়শা। ফুলে মধুও আছে, বিষও আছে। মৌমাছি আহরণ করে মধু, আর মাকড়শা শুষিয়া লইয়া আসে বিষ।

নীরদচন্দ্রের অদ্ভুত প্রতিভা, তিনি বিষ সংগ্রহে পরম ওস্তাদ। রবীন্দ্রনাথকে ভাঙিয়া তিনি দুই রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করিলেন। কেন, আরও টুকরা-টুকরা করা কি যাইত না? সহস্র রবীন্দ্রনাথ কি আবিষ্কার করা এতই কঠিন?

নীরদচন্দ্রও তো তাঁহার এক-মুখে বহুতর কথা বলিয়া থাকেন। স্বদেশের নিন্দায় তিনি পঞ্চমুখ, বিদেশের প্রশংসায় দশানন।

আবার সেই মুখেই বিদেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের ধুয়া তুলিয়া ভিন্ন সুরে কথা কহেন। ইনি নাম করিতে চান। কিন্তু সৎ কাজ করিয়া নাম করা বড় কঠিন কাজ। তাই সহজ পথের যাত্রী হইয়া তিনি নটোরিয়াস হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহার সে ইচ্ছা কিছুটা পূরণ হইয়াছে স্বীকার করিতেই হইবে।

হাউই-এর মত তিনি তারকার মুখে ছাই দিয়া আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। তাঁহার যা দশা হইবে তাহা ঐ হাউই-এর দশাই। ইহাই আমাদের বক্তব্য।

শ্রীকাজল গুপ্ত
দুর্গাপুর

২

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী লিখিত 'দুই রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি স্বাধীন চিন্তা ও মননশীলতার একটি সার্থক প্রকাশ। যখন চলন্ত ট্রেনের কামরা হতে আরম্ভ করে বাসে বা রাস্তায় রাখা খোলা ট্রাকের ওপর

অর্থাৎ পথে, ঘাটে, হাটে মাঠে যেখানে সম্ভব 'রবীন্দ্র জয়ন্তীর' অনুষ্ঠান করে বাঙ্গালী একটা 'মহাকর্তব্য' পালনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করছে তখন এই সুলিখিত প্রবন্ধটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কতকটা সহজ ও স্বাভাবিক করতে সাহায্য করবে এটা আশা করা বোধহয় অন্যায় হবে না। শ্রীনীরদ চৌধুরীর বর্তমান প্রবন্ধটি সমগ্র রবীন্দ্র জীবনের ওপর এক নতুন আলোকপাত করেছে আর সে দিক হতে রবীন্দ্রনাথকে সঠিক বুঝবার পক্ষে এটি যথেষ্ট সাহায্য করবে এ আশা নিশ্চয়ই করা যায়। তবে, কথা এই যে, নীরদবাবুর মতেই বলা যায় যে আজকের বাঙ্গালী সমাজে সত্য কথা বলতে বা সেইমত কাজ করতে ভয় পায় না এমন লোকের সংখ্যা নগণ্য। এটা আমাদের প্রগতিশীলতার একটা লক্ষণ বা 'বুর্জোয়া মানসিকতার' বিরুদ্ধে মেহনতী মানুষের অমোঘ হাতিয়ার কিংবা অন্য পক্ষে কর্তাভজা মার্কা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশের একমাত্র উপায় হতে পারে, কিন্তু এটা যে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থার চিহ্ন নয় সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। নীরদবাবুর প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠতে পারে তার আশঙ্কা করেই এই কথাগুলো বলছি। বাস্তবিক, ভারতবর্ষ যখন পরাধীন ছিল তখন এখানে অনেক 'স্বাধীন' লোকের পরিচয় পাওয়া যেত কিন্তু স্বাধীন ভারতে সেই 'স্বাধীন' লোকদের সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় শূন্যের ঘরে এসে পৌঁছেছে। তা হোক, তবুও চৌধুরী মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বলব, তাঁর নিখুঁত বিশ্লেষণ স্পষ্ট ভাষণ আর তীক্ষ্ণ মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের কাছে দিগ্‌দর্শনের কাজ করবে।

শ্রীবিমলকান্তি মৈত্র
বিরলাপুর

৩

"দেশ"-এর (৫-৮-৬৭) সংখ্যায় বিখ্যাত "অজ্ঞাত ভারতীয়" শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের লেখা "দুই রবীন্দ্রনাথ" সম্পর্কে কিছু মন্তব্য না করিয়া পারিতেছি না।

লেখার এক জায়গায় কৃতী বাঙালী সম্পর্কে অন্য বাঙালীর মনোভাব বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন "কেহ পরিশ্রম করিয়া কৃতিত্ব, অর্থ বা যশ অর্জন করিলে এই জাতীয় বাঙালীর মনে হয় যে, সেই ব্যক্তি তাহার পৈতৃক সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছে।" তাই হতভাগ্য কৃতী বাঙালীর ভাগ্যে জুটে নিন্দাবাদ।

বিগত পাক্-ভারত যুদ্ধের পর বাঙালী জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরীর কৃতিত্বকে নীরদবাবু কীভাবে লঘু করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানি। এখন "দুই রবীন্দ্রনাথে" আমাদের শ্রেষ্ঠ কবির "স্বরূপ" নতুন করিয়া দেখিবার দুর্ভাগ্যও হইল।

তাই নীরদবাবুরই ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হইতেছে: "চার আনা ভদ্র বাঙালীর কথা। ইহাদের মত দুর্জন, পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপরায়ণ, অনিষ্টকারী—সহজ বাংলায় হাড়ে বজ্জাত ও হারামজাদা পৃথিবীর অন্যত্র খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।"

কেশব চৌধুরী
কলিকাতা-৮

৪

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীনীরদ চৌধুরী মহাশয়ের 'দুই রবীন্দ্রনাথ' পড়ে খুবই হতাশ হয়েছি। মনে হয়েছে তিনি কবিগুরু সম্বন্ধে কিছু ভুল তথা বিভ্রান্তিমূলক যুক্তির অবতারণা করেছেন। প্রবন্ধের অন্যাংশ বাদ দিয়ে যেখানে রবীন্দ্রনাথকে চিত্রশিল্পীর ভূমিকায় অভিনেতা হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন আমি তার প্রতিবাদে কিছু বলতে চাই।

নীরদবাবু লিখেছেন, '১৯২৬ সনে প্যারিসে কবি ভিক্টর হ্যুগোর ছবির একখানি বই ছাপা হয়। ১৯২৭ সনে আমি জানিতে পারি যে শান্তিনিকেতনে এই বইখানি আসিয়াছে। সকলেই জানেন ১৯২৮ সন হইতে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকিতে আরম্ভ করেন। ইহার আগে শুধু প্রীছাঁদ করিয়া লেখার কাটাকুটি করিতেন। ১৯৩০ সনে আমি তাঁহার প্রথম ছবি দেখি। তৎক্ষণাৎ আমার মনে হইল—এইরে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চই ভিক্টর হ্যুগোর চিত্র সম্বন্ধে বইখানা দেখিয়াছেন ও ভাবিয়াছেন কবি ভিক্টর হ্যুগো যদি চিত্রকর হইতে পারিলেন আমি কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রকর হইব না কেন?' বিস্ময়ের কথা এমনি এক শিশুসুলভ ধারণা সেদিন নীরদবাবুর মাথায় কি করে উদয় হয়েছিল। কারণ এ কথা অনস্বীকার্য যে পরপ্রতিভাকাতরতা অথবা প্রচেষ্টার দ্বারা কখনই কোন সৃজনীক্ষমতা লাভ করা সম্ভব নয়। প্রতিভা মানুষ সঙ্গে নিয়ে জন্মায়। তবে অধ্যবসায়, পরিপার্শ্বিক আবহাওয়া অথবা ঘটনার যোগাযোগ সুপ্ত প্রতিভা স্ফুরণে সহায়তা করে। তা হলে ধরে নেওয়া চলে ভিক্টোর হ্যুগোর চিত্র-পুস্তকটি রবীন্দ্রনাথের সুপ্ত শিল্প প্রতিভা স্ফুরণে সহায়তা করেছিল। তাতে কিন্তু রবীন্দ্র শিল্প প্রতিভা একটুকুও ক্ষুন্ন হয় নি। হত যদি তাঁর চিত্রাবলীতে হ্যুগোর অংকন প্রণালীর বিন্দুমাত্র ছাপ বা ছায়া দেখা যেত। কিন্তু তাঁর অংকন ধারা ও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সুদূরপ্রসারী। প্যারিসে তাঁর চিত্র প্রদর্শনী দেখে দুজন গুণী যে মন্তব্য করেছিলেন তা তুলে দিলাম।

'ডাঃ টেগোর, আমরা এখন সবেমাত্র যা ভাবতে শুরু করেছি, আমাদের দেশের

এই সব বিচিত্র আন্দোলনের তলায় তলায় নতুনকে পাবার যে প্রচেষ্টা লুকোনো রয়েছে, আপনি কি করে এতো সহজে সেই জিনিসকে চোখের সামনে এনে ধরলেন। আপনার এই অত্যাশ্চর্য কীর্তি যে কত বড়, তা হয়তো এখন মানুষের বোধগম্য হবে না—সংস্কৃতির উৎকর্ষের সংগে মানুষের চিন্তাশক্তি যতই বিকশিত হবে, এই চিত্রগুলির কথা ততই তারা বুঝতে পারবে।

(বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা)

নীরদবাবু লিখেছেন ১৯২৮ সনে হ্যুগোর চিত্র-পুস্তকখানি দেখে রবীন্দ্রনাথ অংকনে ব্রতী হন। তাঁর এ ধারণা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। জীবন স্মৃতিতে দেখা যায় ১৮৮৫ সনে তিনি ছবি আঁকায় ব্রতী ছিলেন তবে, "সে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তা নহে, সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা করা।" তারও প্রায় দশ বছর পরে তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন, "চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে, তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি—কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়েস চলে গেছে।" অর্থাৎ অংকন কলাকে আয়ত্ত করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাঁর বহু কালের। ১৯০০ সনে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে যে চিঠি লেখেন তার পত্রাংশ তুলে দিলাম,—"শুনে আশ্চর্য হবেন, Sketch Book নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকছি। কিন্তু কুৎসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব স্নেহ জন্মে, তেমনি যে বিদ্যেটা ভাল আসে না, সেইটের ওপরই অন্তরের টান থাকে......"

কাজেই 'কবি ভিক্টোর হ্যুগো যদি চিত্রকর হইতে পারিলেন, আমি কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রকর হইব না কেন?'এ ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে যে রবীন্দ্রনাথ চিত্রাংকনে ব্রতী হন নি এ কথা অতি সহজেই অনুমেয়।

তিলোত্তমা দেবী
কলকাতা-৫০

৫

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর রচনায় একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ আছে। অনেকে তাঁর সংগে একমত না হতে পারে কিন্তু নীরদচন্দ্র নিশ্চিতরূপে সেই বিরল লেখকদের অন্যতম যাঁদের লেখা তীর্যক বিশ্লেষণ নৈপুণ্যে হৃদয়বত্তায় অনুরঞ্জিত।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী "দুই রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে একটি সুসম্পাত আক্ষেপ করেছেন : "অভিনেতা রবীন্দ্রনাথকেই আমরা আজ পূজায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়া মানিয়াছি, সত্যকার রবীন্দ্রনাথকেই অবহেলা করিতেছি। সেই রবীন্দ্রনাথকে ফিরাইয়া না আনা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে বাঙালী জাতির ঋণ শোধ হইবে না।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন প্রয়াসকে অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের কাজ সত্যকার রবীন্দ্রনাথের কাজ নয় বললে রবীন্দ্রনাথের ওপর অবিচার করা হয়। নীরদচন্দ্রের মতে ১৯২৭ সনে ভিক্টর হ্যুগোর আঁকা ছবির বই শান্তি নিকেতনে আসে। রবীন্দ্রনাথ ভাবলেন কবি ভিক্টর হ্যুগো যদি চিত্রকর হতে পারলেন তাহলে আমি কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রকর হব না কেন, তাই কালক্ষেপ না করে ১৯২৮ সন থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন। আকস্মিক ঘটনা পারম্পর্য থেকে সত্য নিরূপণের পদ্ধতিটি অতি বিচিত্র!

এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, "অতি শোভন শালীন ও বিদগ্ধভাবে দক্ষজাল" কোন বিদেশীনীর তামশা থেকে পৃথক করেও রবীন্দ্র চিত্রাবলীর মূল্যায়ন করা সম্ভব। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ভ্যানগগ বা পিকাশোর মত শিল্পী ছিলেন না। একটা কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাংকন তাৎক্ষণিক প্রেরণা প্রসূত। তা ছাড়া চিত্রাংকনের কোন মামুলী শিক্ষাও তাঁর ছিল না।

"চিত্রাংকণের সময় তিনি তুলিকা ব্যবহার করতেন না। তিনি কলম দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতেন আর রঙ দেবার সময় তুলির বদলে তাঁর ঢিলে আলখাল্লার মত জামা-ই যথেষ্ট ছিল। তারই একটা কোণ ডুবিয়ে ছবির উপর ঘষে ঘষে রঙ ফুটিয়ে তুলতেন।" ["শিল্পী রবীন্দ্রনাথ"—নন্দলাল বসু] ছবি আঁকা তাঁর কাছে একটা খামখেয়ালী খেলা ছিল। তাই হয়তো নন্দলাল বসু বলেছেন "চিত্রশিল্পে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির স্থান অনেকটা কাব্য সাহিত্যে ছড়ার স্থানের মত।"

তবুও রবীন্দ্র চিত্রাবলী বিশিষ্টতায় চিহ্নিত। এক অপরিচিত নতুন রবীন্দ্রনাথ যদিও, যাঁর সংগে তাঁর কবিতা গল্প উপন্যাস ও সংগীতের মাধ্যমে এতকাল আমাদের কোন পরিচয়ই ছিল না। যেখানে উপনিষদের আদর্শ নেই, বিশ্বমানবতা বোধ নেই, এমন কি নিয়ত আত্ম সচেতন শিল্পীও অনুপস্থিত, ঐতিহ্য বিচ্যুত এমন একজন বিমর্ষ একাকী রবীন্দ্রনাথকে হয়তো তাঁর চিত্রাবলীর মধ্যেই আবিষ্কার করা যায়। সেই শিল্পীকে নীরদচন্দ্র অভিনেতা বলে অবহেলা করলেন কী করে?

প্রণব নাগ
কলিকাতা-২৯

দিল্লির ডায়েরি

না, মধুর সঙ্গে পরিচয় নেই, ভারতীয় সংবাদপত্র পাঠকদের ভিতর এমন লোক নেই। মধু লিমায়ে, সংযুক্ত সমাজবাদী নেতা, রক্তে মহারাষ্ট্রের দুর্বার স্পন্দন; চমৎকার চেহারা, গৌরবর্ণ, পরিষ্কার চোয়াল

কুট্টির রেখায় মধু [illegible]

রেখা, উঁচুর কপাল আর এক মাথা কালো চুল। বয়স আজ পঁয়তাল্লিশ।

জন্মদিনটা লক্ষ্য করবার, পারেনা যে, অর্থাৎ সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ ও সমাজতন্ত্র-বিশ্বাসীদের যে দিবস, শ্রমিকদের আত্ম-প্রত্যাপন দিবস। মধু লিমায়ের গোটা জীবনও ঐ দিবসের ডাক নিয়ে যেন গড়ে উঠেছে।

প্রায় ৩০ বৎসর আগে একদিন পুণার ফার্গুসন কলেজে পাঁচটি কিশোর প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল যে, তারা চাকুরিজীবী হবে না, তারা দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে সমস্ত জীবন। তাদেরই একজন মধু লিমায়ে।—আর অন্য চারজন? প্রশ্ন করেছিলাম।—"না, আমরা কেউ আমাদের প্রতিজ্ঞা ভাঙিনি। কেশব গোরে মারা গেছে। বিনায়ক কুলকারনি এখন মহারাষ্ট্রের সংযুক্ত সমাজবাদী দলের বিধায়ক কমিটির চেয়ারম্যান; ওগলে আর সানে, দুজনেই শ্রমিক নেতা মহারাষ্ট্রে। আর এই তো আমি।"

আমাদের আলাপ হচ্ছিল মধুর বাসায়, ছ নম্বর রেকাবগঞ্জ রোডে। খালি গায়ে একটা খাটিয়ায় শুয়ে মধু, তেল দিয়ে একজন লোক হাত-পা শরীর দলাই-মলাই, মানে মাসাজ করছিল। তার সঙ্গেও জড়িত একটি ঘটনা এই বছরের গোড়ার দিকের। সাধারণ নির্বাচনের তখন চলছে অভিযান, মধুও তা চালাচ্ছিল নিজের ও দলের জন্যে বিহারের মুঙ্গের অঞ্চলে, যেখান থেকে উনি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন লোকসভায়। সভা করে ফেরার পথে গুণ্ডারা বেদম প্রহার করেছিল মধুকে। মৃতপ্রায় ভেবে ফেলে গেছল। তার জের এখনো হাতে-পায়ে ও গায়। মাসাজ চিকিৎসা এখনো চলছে।

গত লোকসভায় ইনি প্রথম এলেন ১৯৬৪ সনের ডিসেম্বরে। অল্প কয়েকটি মাসের মধ্যেই সমস্ত বিরোধী সভ্যদের ভিতর প্রথম শ্রেণীর সংসদীয় নেতৃত্ব লাভ করতে সফল হন। কারণ তিনটি। প্রথম, সংসদীয় আইনকানুন নখদর্পণে রাখা। ("এমন দিন গেছে আমি বারো ঘণ্টা কি আরো বেশি পড়াশুনো করেছি সংসদের লাইব্রেরিতে ও বাসায়।"); দ্বিতীয়, দাঁত-কামড়ে নাছোড়বান্দা হয়ে পড়ে থাকা যে কোনো প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়ে। তুমি ভাল বল কি খারাপ বল, আসে যায় না, যতক্ষণ কার্য সিদ্ধ না হচ্ছে ততক্ষণ চালাতে হবে, একবারে না হয় অন্যবারে, প্রয়োজন হলে বারেবারে। তৃতীয় কারণটি অত্যন্ত সহায়ক। সেটি হলো দরাজ গলা। ঐ শক্ত চোয়ালের মতই শক্তিশালী বক্তার গলা, যা কিনা অতি সহজে ছাপিয়ে ওঠে অন্য সকলের উপরে, মাইক্রোফোন থাকুক কি না-থাকুক।

অনেক নিন্দাবাদ সইতে হয়েছে অনেক বাধা এসেছে কংগ্রেস দল থেকে, কিন্তু মধুকে টলাতে পারেনি। এ-বিষয়ে মধু হল ডক্টর লোহিয়ার সমকক্ষ। যা কিছু অন্যায় মনে হবে, তাকে করো তুলোধনো। রাজনীতি নিশ্চয়ই আছে তা না হলে এরা রাজনৈতিক দল করে হইচই করবে কেন? কিন্তু গলাবাজি করে কাজ হাসিল হয় না, অন্তত লোকসভায়। ওখানকার গলাবাজির পেছনে থাকতে হবে সংসদীয় কৌশল ও তথ্যের ভিত্তি। মধু লিমায়ে এই দুটো জিনিস সাধারণত অগ্রাহ্য করে না, এবং করে না বলেই অল্প সময়ের মধ্যে সে প্রথম শ্রেণীর নেতৃত্বে আসতে পেরেছে।

আইন-কানুনের মারপ্যাঁচের কথা শুনে অনেকে মনে করেছে যে মধু লিমায়ে নিশ্চয়ই উকিল ব্যারিস্টার হবেন। মোটেই তা নয়। ফার্গুসন কলেজে বি-এ পড়তে পড়তে (ইতিহাস ও ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে)

সে জড়িয়ে গেল স্বাধীনতা সংগ্রামে, জেল হল ১৯৪০—৪১, পড়াও আর হয়ে উঠল না।

"কিন্তু আসল পড়া পড়েছি জেলে বসে। প্রথম গেল ১৯৪০—৪১; তারপর ১৯৪৩—৪৬ ব্রিটিশ রাজের জেলে। রোজ পড়তাম প্রায় তিনশো পাতা করে। রাজনীতি নিয়ে ক্লাস করতাম, আর আদর্শ নিয়ে চলতো অশেষ তর্কবিতর্ক। তৃতীয়বার জেল হল পর্তুগীজের গোয়ায় ১৯৫৫ সনে। সাজা হয়েছিল ১২ বৎসরের। কী কারণে জানি না, মুক্তি পেয়ে গেলাম ১৯৫৭-তে। তা না হলে ছাড়া পেতাম এই ১৯৬৭ সনে।"

পনেরো বছরে ম্যাট্রিক দিয়ে মধু এল ফার্গুসন্ কলেজে। সেই থেকে মুক্তি আন্দোলনে, ভারত, গোয়া, আর এখন হয়তো বলা যেতে পারে সামাজিক শোষণ শক্তি থেকে মুক্তির আন্দোলন। প্রথম থেকেই টেনেছে সমাজতন্ত্রের আন্দোলন। "প্রথম যেদিন পড়লাম মার্কসের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, প্রবল আলোড়ন এনেছিল আমার মনে", মধু বলল। "তারপর পড়েছি মার্কসের আরো বই, লেনিন, অ্যাংগেলস। রাশিয়ার বিপ্লব দিয়েছিল আমাদের একটা আদর্শের নমুনা। কিন্তু পরে সোভিয়েট রাশিয়ার স্টালিন-নীতি মানতে পারিনি। বিশেষত, বুখারিনের শাস্তির পর। স্টালিন-পন্থীদের অসহিষ্ণুতা আমাদের ভাল লাগেনি, এবং সেদিনকার ভারতীয় কমিউনিস্টদেরও তাই আমরা পছন্দ করিনি। তাদের জনযুদ্ধ-নীতি, ১৯৪২-এর নীতি কোনোটাই আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। আমি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, কিন্তু সমালোচনার অধিকার থাকবে না কেন? তাই তো আমার তীক্ষ্ন সমালোচক দৃষ্টি।"

মধুর জীবনের প্রথম দিকে যাঁরা প্রভাবিত করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন জওহরলাল, নেতাজী সুভাষ, মেহের আলী, এস-এম-জোশী (সংযুক্ত সমাজবাদী দলের অধুনা চেয়ারম্যান) এবং এখানকার স্বতন্ত্র নেতা ও প্রাক্তন সোস্যালিস্ট শ্রীমাসানি।" কিন্তু আজ মাসানির অন্ধতাও আমি গ্রহণ করতে পারি না, যেমনি পারি না কমিউনিস্টদের অসহিষ্ণুতা, মধু কাত ফিরে বসল, আর মাসাজওয়ালা হাতে তেল মেখে কাঁধ আর পিঠে চালালো তার দুই হাত।

তার জীবনের কয়েকটা সন : ১৯৪৮ সোস্যালিস্ট পার্টির বৈদেশিক কমিটির সচিব; ১৯৪৯-৫৪...সোস্যালিস্ট পার্টি ও প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির সচিব; ১৯৫৩...সচিব, এশিয়ান সোস্যালিস্ট কনফারেন্স; ১৯৫৫...বারো বছরের কারাবাস গোয়ায়; ১৯৫৮...চেয়ারম্যান, সোস্যালিস্ট পার্টি; ১৯৬৫-৬৭...চেয়ারম্যান, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট সংসদীয় বোর্ড, বিদেশভ্রমণ : ১৯৪৭-৪৮...হোলাণ্ডে সোস্যালিস্ট সম্মেলন; ১৯৫৩...প্যারিসে সমাজবাদী সম্মেলন; ১৯৬৫...পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়া দর্শন।

নেতা-হওয়ার জীবন কি খুব সুখের? "জানেন, অতো সব ভাল লাগে না। রাজনীতিতে যেন একেবারে যন্ত্র হয়ে গেছি। আইন-কানুন, সংবিধান—আর যেন ভাল লাগে না। ফেড আপ। বোম্বাই-এ অনেক সময় পেতাম। পড়তাম, থিয়েটারে যেতাম। খুব ভাল লাগে আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীত, রবীশংকরের সেতার, আলী আকবরের সরোদ, ভীমসেন যোশীর গান, বড়ে গোলাম আলী, খুব ভাল লাগে। কিন্তু হায়! আজ আর সময় কই? এই তো আপনাকে আসতে বললাম যখন আমার মাসাজ হয়। এই একটু সময়। তাও তো দেখছেন, অনুকের টেলিফোন, এটাসেটা।"

বিয়ে করেছেন। স্ত্রী কলেজের প্রফেসর; বান্দ্রা কলেজে সংস্কৃত ও মারাঠী বিভাগের প্রধান। একটি ছেলে, অনিরুদ্ধ, বোম্বাই-এ পড়ছে, এবার ক্লাস টেন। পিতা রামচন্দ্র ছিলেন মাস্টার, মা শান্তাবাঈ। পাঁচ ভাই, দুই বোন। ভাইদের একজন ডাক্তার, দুজন কলেজের লেকচারার একজন ইস্কুলে শিক্ষক। মধু দ্বিতীয় সন্তান। দুই ভগিনীর বিয়ে হয়ে গেছে।

দাড়ির ছবি দেখে মনে করবেন না, মধু বুঝি ভয়াবহ একটা কিছু। চমৎকার হাসতে জানেন, অত্যন্ত বন্ধুবৎসল। কালো ঘন ভুরুর নিচে দুটো চোখে জ্বলে বিদেশ্য যেন আলো। দুটো চোয়াল যেন দুটো মুষ্টিবদ্ধ হাত।

খগেন দে সরকার

মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতি ঃ

'রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।' কিন্তু কবির মনে সংশয়, কত উত্থান পতন গেল জীবনে, সর্বজন কি চিরকাল মনের মন্দিরে তাঁকে স্থান দেবে? 'কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে হেন অমরতা আমি'? 'তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষে গুণ ধর,' তা হলে, পৃথিবীর সব কবির মতনই মাইকেলের প্রার্থনা, 'ফুটি যেন স্মৃতি জলে, মানসে, মা, যথা ফলে মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে'!

কিন্তু, মাইকেলের মনস্কাম পূর্ণ হয়েছে, তিনি বাংলা দেশের স্মৃতিতে স্থান পেয়েছেন। দুর্ধর্ষ নাটকীয় জীবন এবং দুঃখে-হতাশায় মৃত্যু—মাইকেলের ছবিটিকে বাংলায় চিরস্থায়ী করেছে, এবং নানান্ দোষ থাকা সত্ত্বেও তাঁর কবিতায় এক ধরনের প্রবল বন্য আবেগ ও শব্দঝঙ্কার আছে, যার ফলাফলে আজ এমন শিক্ষিত বাঙালী একজনও নেই, যিনি দু'চার লাইন মাইকেল মুখস্থ না বলতে পারেন। শিক্ষালয়-গুলিতেও তাঁকে নিয়ে তুমুল পড়াশুনো চলেছে।

গত মাসে ফরাসী দেশের ভার্সেই শহরে মাইকেলের স্মরণে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপলক্ষ, ঐ শহরে মাইকেলের তিন বছর প্রবাস জীবনের স্মরণে একটি স্মৃতি ফলক স্থাপন। এই ব্যাপারের পরিকল্পনা পর্বে, ফরাসী দেশের ভারতীয় দূতাবাস এবং আমাদের বৈদেশিক দপ্তর কী কী মূঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খগেন দে সরকারের রচনা থেকে পাঠকরা তা নিশ্চিত জেনেছেন। কুকর্ম নিয়ে বেশী আলোচনাও একটি কুকর্ম, আমরা তাই সে সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হচ্ছি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ হয়েছিল, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ব্রঞ্জের স্মৃতি ফলকটি ভার্সেই নগরীর উপ-পৌরপতি মঁসিও আদ্রে কাদোরে-র হাতে তুলে দেন।

বিদেশী সংস্কৃতি সম্পর্কে ফরাসীদের সাধারণভাবে অনাসক্তির অখ্যাতি আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে, বাংলাদেশের কবিকে সম্মান জানাতে তাঁরা দ্বিধা করেন নি। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অধ্যাপক মঁসিও ফিলিবেয়ার সেই অনুষ্ঠানে মাইকেলের কাব্য পরিচয় জানিয়ে ইউরোপীয়দের অনুরোধ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অন্য বাঙালী কবিদের প্রতি মনোযোগ দিতে। উপ-পৌরপ্রধান টাউন হলের ঐ সভায় জানিয়েছেন, মাইকেল সে শহরে বাস করে-ছিলেন এ জন্য তাঁরা গর্বিত এবং মাইকেলকে তাঁরা সম্মানিত নাগরিকত্ব প্রদান করেছেন। একশো বছর আগে মাইকেল রু দে সাঁতিয়ের-এর যে ১২ নম্বর বাড়িটিতে থাকতেন (এখন ঠিকানা বদলেছে)—সেই বাড়ির গায় স্মৃতি ফলকটি বসানো হবে। এই চমৎকার ব্যাপারটি সম্ভব হতে পারল প্রধানত রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এবং লোকনাথ ভট্টাচার্যের চেষ্টায়, ওঁদের আমরা ধন্যবাদ জানাই।

ঐ বাড়িটিতে বসেই মাইকেল তাঁর সনেটগুলি লিখেছিলেন। ফরাসী স্ত্রী আঁরিয়েত্তা এবং তিনটি বাচ্চা সঙ্গে, অন্যান্য সঙ্গী ছিল হতাশা ও দারিদ্র্য। তবু ভার্সেই নগরীর অমল সৌন্দর্য ও নাগরিক-দের আন্তরিক ব্যবহার তাঁকে শান্তি দিয়েছিল। কৃতজ্ঞ কবি ভার্সেই সম্পর্কে একটি সনেটও লিখেছিলেন ঃ

কত যে কি কি খেলা তুই খেলিস ভুবনে
রে কাল! ভুলিতে কে তা পারে এই স্থলে।
কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছা বলে
বৈজয়ন্ত সম ধাম এ মর্ত্যে নন্দনে—
শোভিল? হরিল কে সে নরাপ্সরা দলে
নিত্য যারা নৃত্যগীতে এ সুখ সদনে
মজাইত রাজ-মন, কাম কুতুহলে?......
(ভরসেলস্ নগরে রাজপুরী ও উদ্যান)

একটি চিঠিতেও তিনি লিখেছিলেন, ভার্সাই নগরীই এই ভূমণ্ডলে সবচেয়ে ভালো জায়গা। আমাদের প্রাচীন বিশ্বাসের অমরাবতী—সে তো এই জায়গাই, এখানে উচ্চ-নীচ যে-কোনো মানুষ তোমাকেও মানুষ হিসেবে স্বীকার করছে।

দান্তে সম্পর্কে কবিতা লিখে তিনি এই বাড়ির ঠিকানা থেকেই সেই কবিতা ইটালীর সম্রাট সমীপে পাঠিয়েছিলেন।

নব কবি-কুল-পিতা তুমি, মহামতি!
ব্রহ্মাণ্ডের এ সুখণ্ডে। তোমার সেবনে
পরিহরি নিদ্রা পুন জাগিলা ভারতী।
দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে
সে বিষম দ্বার দিয়া আঁধার নরকে...
(কবিগুরু দান্তে)

অন্যান্য কবিদের সম্পর্কে তিনি এখানে বসে যা লিখেছেন, তাতে তাঁর নিজের সম্পর্কে আশাই বার বার প্রকাশ পেয়েছে। ১৮৬৩ থেকে ৬৬, সে সময়ে তিনি বাংলা দেশে কবি হিসেবে খ্যাতিমান, অথচ কুহকের টানে প্রবাসে এসে অনটন দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন, সর্বক্ষণ সংশয়, হঠাৎ যদি সেই মহাবিপদ আসে, তা হলে সবই কি মুছে যাবে? নিজের সম্পর্কে লিখেছেন, 'লিখিনু কি নাম মোর, বিফল যতনে, বালিতে, রে কাল!'—সেই সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাকিয়ে দেখেছেন অন্য কবিদের অমরত্ব, তখন সান্ত্বনা পেয়েছেন। ভিকটর হুগো সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ

...হে ভিকটর! জয়ী তুমি এই নর-কুলে
আসে যবে যম, তুমি হাসো হে সাহসে।
অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে
তব জন্ম দেশ-বনে, কহিনু তোমারে;
(ভবিষ্যদ্বক্তা কবি সতত এ ভবে,
এ শক্তি ভারতী সতী প্রদানেন তারে)
প্রস্তরের স্তম্ভ যবে গলে, মাটি হবে,
শোভিবে অন্দরে তুমি মনের সংসারে।
(কবিবর ভিকটর হুগো)

বিদ্যাসাগরকে চিঠি এবং বিদ্যাসাগর-প্রণতি লেখাও এখানেই। এই শহরে থাকার সময়েই তিনি টাকা ধার নিয়ে ঠিক সময়ে শোধ দিতে না পারার অপরাধে জেলে যেতে বসেছিলেন, দু'একদিনের জন্য হাজতবাসও নাকি হয়েছিল। কারাবাসের লজ্জা থেকে তাঁকে বাঁচান এক ফরাসী তরুণী, একদিন ট্রেনে যাবার সময় সেই রূপসী কমনীয়া মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মাইকেলের, তারপর থেকে সেই মেয়েটি ঐ দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারটিকে বারবার দুঃখে সান্ত্বনা ও অভাবে অর্থসাহায্য করেছে। মাইকেল সেই মেয়েটিকে একটি কবিতাও উৎসর্গ করে-

ছিলেন, এ কথা জানিয়েছেন রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত (কোন্ কবিতা?)।

অধিকাংশ সময়েই ভালোবাসার স্বীকৃতি মেলে না। ভার্সেই নগরীকে এত ভালোবেসেছিলেন মাইকেল, ভার্সেই নগরী যে তাঁর সেই ভালোবাসার স্বীকৃতি জানিয়েছে, তা জেনে খুশী লাগে।

✻

এই উপলক্ষে মাইকেলের সনেটগুলি আবার পড়লুম। মাইকেলের সনেটগুলো তেমন ভালো না। এগুলো যখন লিখেছিলেন, তখন তাঁর তেজ ও কবিত্ব প্রায় নিঃশেষ। ততদিনে মেঘনাদ ও বীরাঙ্গনা লেখা হয়ে গেছে, সনেটগুলি লিখছেন অনেকটা নতুনত্বের ঝোঁকে। এগুলি বড় বেশী পুনরুক্তিতে ভরা। মাঝে মাঝেই 'রে কাল!' বলে ক্ষুদ্র গর্জন করেছেন। এ ছাড়া সনেট লেখার যা বিপদ—সে বিপদ তিনি একেবারেই এড়াতে পারেন নি। সনেটের আঁটো ছন্দ মিল বজায় রাখতে গিয়ে অধিকাংশ মাঝারি কবিই কবিতা না লিখে কবিতার ব্যায়াম শুরু করেন। মাইকেলের সনেটগুলিতেও সেই কৃত্রিমতা এসেছে। রে, হে, হায়, সে, তার—এগুলোর ব্যবহার হয়েছে অধিকাংশ জায়গাতেই মাত্রা ভরাবার জন্য, কবিতার অমোঘ প্রয়োজনে নয়। শব্দ বিন্যাসেও যথেষ্ট অযত্ন। আর পড়লেই মনে হয়, কবিতার কোনো একটা বিষয় বা নাম ভেবে নিয়ে সেই সম্পর্কে ১৪ লাইন টানা লেখা হয়েছে। ফলে, কবিতার আসল গুণ খুব সংক্ষেপে যাকে বলি রহস্য বা সংস্কৃত মতে ব্যঞ্জনা, তা অনুপস্থিত। অবশ্য, আরকেইক গুণের জন্য, কিছু কিছু শব্দ আবার এখন নতুন করে ভালো লাগে, যেমন 'লো যুবতী', দাস, বঙ্গ, মন্দমতি ইত্যাদি।

মাইকেলের সনেটগুলির ঐতিহাসিক মূল্য নিশ্চিত আছে, চিরকাল থাকবে। কিন্তু কবিত্বের বিচার আলাদা। তবুও, এর অনেকগুলিই অচেনা শব্দঝংকারের জন্য এখনও এক একবার পড়তে ভালোই লাগে এবং কোনোরূপ চেষ্টা ব্যতীতই বেশ কিছু লাইন সহজেই মুখস্থ হয়ে যায়।

সনাতন পাঠক

বিশ্বকোষ

ছোটদের বিশ্বকোষ। প্রথম খণ্ড। সম্পাদক, অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। বারো টাকা।

এনসাইক্লোপিডিয়ার বাংলা প্রতিশব্দ রূপে 'বিশ্বকোষ' কথাটি ব্যবহার করে উপরিউক্ত গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে 'ছোটদের বিশ্বকোষ'। এনসাইক্লোপিডিয়া পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলিতে অত্যন্ত সমাদরণীয় গ্রন্থ। কোন কোন ভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থের একাধিক সংকলনও দেখা যায়। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের জ্ঞানার্জনের যাবতীয় শাখা-গুলির অতীত ও বর্তমান নিয়ে এই সব গ্রন্থে সরসভাবে আলোচনা করা হয়ে থাকে। ফলে পাঠকের কাছে মানবসভ্যতার সমস্ত দিক সম্পর্কেই মোটামুটি একটা ধারণা জন্মাবার অবকাশ ঘটে। ছোটদের এনসাই-ক্লোপিডিয়া বা ছোটদের বিশ্বকোষ মূলতঃ ছোটদের মনের দিকে তাকিয়েই লেখা হয়, ফলে পাঠ্য পুস্তকের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের গণ্ডিকে প্রসারিত করবার পক্ষে এই বিশ্ব-কোষ একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিতে পারে। সেই অর্থে বাঙালী কিশোর-কিশোরীদের জন্য বাংলা ভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ উৎসাহিত হওয়ার মতই ঘটনা। যদিও বাংলা ভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থের পথিকৃৎ বোধ করি শিশুসাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তবু বর্তমান গ্রন্থটি যে অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং স্বকীয়তায় অভিনব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভূমিকাতে স্পষ্ট, মোট চারটি খণ্ডে এই গ্রন্থমালার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এবং আলোচ্য গ্রন্থটি সেই গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড। এই সংকলনে বিজ্ঞান, অংকশাস্ত্র, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, ধর্ম, খেলাধূলা, শরীর-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অত্যন্ত মনোরমভাবে আলোচনা করা হয়েছে। লেখকরা সকলেই কম-বেশী নিজের নিজের শাখায় বিশেষজ্ঞ এবং শিশু সাহিত্যের দক্ষ-লেখক। শিল্প সম্পাদক হিসাবে শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন থাকে। সংকলনটির পাতায় পাতায় ছবি, কিছু অমূল্য ফটোগ্রাফ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থটি সমগ্র শ্রেণীর পাঠকের কাছেই বিশেষ ভাবে সমাদৃত হবে সন্দেহ নেই। এই জাতীয় গ্রন্থ পরিকল্পনা ও প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সম্পাদক ও প্রকাশক উভয়েই ধন্যবাদার্হ হবেন। এর অপরাপর খণ্ডগুলির প্রতি পাঠকের আগ্রহ অবশ্যই বজায় থাকবে।

১৩৪।৬৭

ধর্ম

বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম। ডঃ অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়: কলিকাতা। মূল্য ৬·০০।

দৈবকে উপেক্ষা করে আত্মশক্তির বিকাশের মধ্য দিয়ে মানুষ যে চরম উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারে,, সেই পথেরই নির্দেশক ভগবান বুদ্ধ। বুদ্ধ প্রবর্তিত পন্থা অনুসরণ করে ভারতীয় জনসাধারণ বেশ কিছু শতাব্দী এমন এক আদর্শের বাহক হয়ে উঠেছিল যার প্রভাব দূর ও মধ্য প্রাচ্যের প্রতিটি ভূখণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়। তারপর বহুতর বিপর্যয় ঘটেছে যার ফলে বুদ্ধের আদর্শ মানুষ আজ ভুলতে বসেছে। জাতির এই সংকটময় কালের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক বুদ্ধের সেই আত্মনির্ভর পন্থাকে পুনঃ-প্রচারে ব্রতী হয়েছেন। গ্রন্থে লেখক বৌদ্ধ ধর্মের সারমর্মটি সরলভাবে প্রকাশ করেছেন। এই সঙ্গে আছে বৌদ্ধ সংঘের ইতিহাস ও বৌদ্ধ ধর্মের মূল তত্ত্ব। 'বৌদ্ধ সম্প্রদায়' অধ্যায়ে পাওয়া যায় এই ধর্মটি পরবর্তীকালে কিভাবে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত
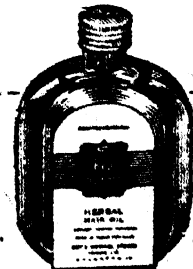
হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি সামগ্রিক পরিচয় দান প্রসঙ্গে লেখক গৃহীবৌদ্ধ সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। বৌদ্ধ সাহিত্য ও শিক্ষা ব্যবস্থারও একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলিপ্সু পাঠক গ্রন্থখানি পাঠে উপকৃত হবেন।

২১৩।৬৭

অনুবাদ সাহিত্য

দূরে দূরে। গোপাল হালদার সম্পাদিত। শ্রীগোপাল প্রকাশনী, কলিকাতা-৩৩। ছয় টাকা।

দেয়া এবং নেয়ার মধ্য দিয়েই সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটে, বলেছেন সম্পাদক। বলেছেন, পশ্চিমী সাহিত্যের উপর আমাদের অনন্য নির্ভরতার ফল ভালো যায় নি, কেননা পশ্চিমী সভ্যতা আজ ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত, অবক্ষয়ের শিকার। আরো বলেছেন, এই পৃথিবীরই এক তৃতীয়াংশে মানুষ আজ এক নতুন সভ্যতা গড়ে তুলেছে—নানা ভুল-ভ্রান্তি এমন কি অপরাধ সত্ত্বেও তার সাফল্য বিস্ময়কর। এই সংকলনের দুই তৃতীয়াংশ গল্পই, তাই, সমাজতান্ত্রিক ও সদ্য স্বাধীন দেশের সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে আহরিত হয়েছে।

পাঁচটি মহাদেশের একুশটি দেশের একুশটি গল্পের এই অনুবাদ সংকলনে তাই সচরাচর যে-সব দেশের কথাসাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে না তার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি হলো। মঙ্গোলিয়া, ভিয়েতনাম, আরব, ঘানা, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, চীন, মেক্সিকো, বুলগেরিয়া, হাঙ্গারি, চেকোস্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশের প্রায়-অজানা লেখকদের ছোটো গল্পের যে-পরিচয় পেলাম, উৎকর্ষের বিচারে তারা যাই হোক, বৈচিত্র্যে তা রমণীয়। অবশ্য অবক্ষয়ী পশ্চিমী সমাজের বারট্রান্ড রাসেল (ইংলণ্ড), গিসেপ্পি বাতো (ইটালি), আঁদ্রে মিশেল (ফ্রান্স), আর্নল্ড ওসোয়াইন (জর্মানী) ইত্যাদির রচনার মুনশীয়ানা পাঠককে আকর্ষণ না করে পারে না। সোভিয়েট ইউনিয়নের ছোটো গল্পটির লেখক শলোকফ। তবে, সংকলনের সেরা গল্প, সম্পাদক যেমন বলেছেন, ঘানার গল্পটিই।

এ ধরনের গল্প সংকলনের জনপ্রিয় হওয়া উচিত। অনুবাদ যেন।

(১১৪।৬৭)

কাহিনী

প্রজ্ঞাপারমিতা। শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দশ টাকা।

প্রজ্ঞাপারমিতাকে কী বলবো ব্যঙ্গ উপন্যাস? পাঠক বলবেন, সে আবার কী বস্তু! আহা, সোনার পাথরবাটি না হয় অবাস্তব, সোনায় মোড়া পাথরবাটি তো সম্ভব। আগাগোড়া ব্যঙ্গে মোড়া দীর্ঘ কাহিনীকে তাই যদি ব্যঙ্গোপন্যাস বলি, দোষটা কোথায়?

বইখানাকে যদি একটা বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে প্রজ্ঞাপারমিতা নামক মেয়েটি

তার কেন্দ্রবিন্দু। জ্যামিতিক বিন্দু যেমন একটি কল্পনামাত্র, প্রজ্ঞাপারমিতা-ও তা-ই। ধনপতি নামক এক ব্যক্তি ঐ বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটি বৃত্ত অংকন করেছেন। জ্যামিতির সাহায্য ছেড়ে পাটীগণিতে নেমে বলি—"প্রজ্ঞাপারমিতা" কাহিনী যেন একটি 'সরল' অংক : বন্ধনী, রেখাবন্ধনী, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ইত্যাদির সমবায়ে গঠিত এক বিশাল জটিলতা, যার উত্তর গিয়ে দাঁড়ায় শূন্যে।

"তবু শূন্য শূন্য নয়,
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে-গগন।"

এবং লেখকের বক্তব্য বোধহয়

"একা একা সে-অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।"

(১০৩।৬৭)

পত্রিকা

কথাসাহিত্য। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ও শ্রীসুমথনাথ ঘোষ। ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ০·৬৫ পয়সা।

সাহিত্যসেবায় 'কথাসাহিত্য' একটা মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের রচনা প্রকাশেই শুধু নয়, বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের জীবনী ও সাহিত্য-কর্ম নিয়ে ক্রোড়পত্র সন্নিবেশিত করাও পত্রিকাখানির একটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য সংখ্যাখানিতে (শ্রাবণ, ১৩৭৪) রবীন্দ্রজীবন ভাষ্যকার প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে একটি ক্রোড়পত্র সংযোজিত করে। এই ক্রোড়পত্রে প্রভাতকুমারের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ডঃ প্রবোধচন্দ্র সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ বিশী। প্রভাতকুমারের নিজের লেখা 'শান্তিনিকেতন স্মৃতির এক অধ্যায়' এই আদর্শ মানুষটিকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ দিয়েছে। বাণী বসু কৃত প্রভাতকুমারের রচনাবলীর পূর্ণ তালিকা এবং বর্ষপঞ্জী ক্রোড়পত্রকে পূর্ণাঙ্গ করেছে। সুসম্পাদিত সংখ্যাখানি সংগ্রহ করে রাখার যোগ্য।

প্রাপ্তি স্বীকার

শরৎ সাহিত্যে নারী। শ্রীক্ষীরোদ দত্ত। কল্লোল প্রকাশনী : এ ১৩৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৫·৫০।

কাগজের নৌকা। শচীন ভট্টাচার্য। প্রিয়া পাবলিশিং হাউস : ২৮এ সেরাং লেন, কলিকাতা-১৪। মূল্য ৩·০০।

Bhumij Dhan Sol. Investigation, Tabulation & First Draft by Gour Chandra Bagchi; Editing & Final Draft by Sukumar Sinha. The Manager of Publications: Civil Lines, Delhi. Price Rs 6.25.

কেমন হয়ে গেল। দীপক দে। ৭১ পর্বত-ডাঙ্গা, কলিকাতা-৪৯। মূল্য ২·৫০।

হারিয়ে যাবার নেই মানা। শ্রীপারাবত। অনুলেখা : ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·৫০।

এক যে ছিল। ভূপতিনাথ কর। অনুলেখা : ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·০০।

আগামী পথের যাত্রী। চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। যুগসাহিত্য মন্দির : ৩৭ কুটিঘাট রোড, কলিকাতা-৩৬। মূল্য ২·০০।

অন্য কোন সুখ। শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য : ১৮ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য ২·০০।

শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌ গীতা। ডাঃ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ৬ ডোভার লেন, কলিকাতা-২৯। মূল্য ৮·০০।

Security in the Middle Age by J. K. Ray. Allied Publishers : 17, Chittaranjan Avenue, Calcutta-13. Price Rs 10.00

খেলার মাঠে

অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিলের সুপারিশ এবং অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতের প্রধান প্রধান ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা এ বছর থেকে ৭০ মিনিটের বদলে ৯০ মিনিট ধরে খেলানো হবে। এ সম্বন্ধে আগেও কিছু মন্তব্য করেছিলাম। দেখছি, ইণ্ডিয়ার যে-কোন সংস্থার উঁচু আসনে যাঁরা আছেন, আন্তর্জাতিকতার অনুকরণ তাঁদের পেয়ে বসেছে। ভালমন্দ ভালভাবে বিচার না করে, সেই প্রথা আমাদের দেশের সাথে খাপ খায় কিনা তা না দেখে বিদেশী প্রথা আমদানি করা এক রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে। ৯০ মিনিট ফুটবল খেলার ব্যবস্থা সেই পর্যায়েরই এক [illegible] [illegible]।

এই ৯০ মিনিটের খেলা যাঁরা চালু করবার আদেশ দিয়েছেন, তাঁরা সম্ভবতঃ ইংলণ্ডে [illegible] দিন কাটান। তাঁদের কাজ [illegible] ও [illegible] খেলোয়াড়দের জন্যে নীতি নির্ধারণ করা। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন চোখ বুজে। বাস্তব অবস্থাটা উপলব্ধি করেন না। ফুটবলের আন্তর্জাতিক আইনে খেলার সময় অবশ্য ৯০ মিনিট। কিন্তু যেসব দেশের অনুকরণে এ সিদ্ধান্ত আরোপ করা হচ্ছে—তাদের বেশির ভাগ দেশই শীতপ্রধান। এবং খেলোয়াড়দের কাঠামো আমাদের ছেলেদের চাইতে অনেক ভাল। পরিশ্রম করার ক্ষমতাও বেশী। তবুও এই-সকল দেশের খেলোয়াড়েরা আমাদের দেশের আবহাওয়ায় ৫০ থেকে ৬০ মিনিট খেলেই বিশেষ ক্লান্তি বোধ করেন। এমন কি, বিশ্রাম-সময়ে [illegible] [illegible] চালাতেও পিছপা হন না।

আমাদের শৌখিন ফুটবল বৃত্তিতে ৯০ মিনিটের চাপ সহ্য করা বেশ কঠিন। অধিকাংশ ফুটবলারই চাকুরে। তা ছাড়া এঁদের সপ্তাহে প্রায় তিন দিন প্রতিযোগিতা-মূলক খেলায় নামতে হয়। সময় সময় তাঁদের সপ্তাহের খেলার সংখ্যা চার-পাঁচটিতেও দাঁড়ায়। সব দিক বজায় রেখে খেলার মাঠে পারদর্শিতা দেখানো প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফুটবল-জীবনের আয়ুও কমে আসে।

এ দেশে ৭০ মিনিটের খেলা চালু হয়েছে প্রায় তিন বছর। ছোট বড় প্রত্যেকটি খেলায়ই দেখা গেছে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে মাত্র ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট। তারপরেই এলোমেলো আসর। এ সময়ে একটা প্রথম ডিভিসন টিমকে তৃতীয় বা চতুর্থ ডিভিসনের মত উদ্দেশ্যহীন খেলায় সন্তুষ্ট থাকতে দেখা গেছে।

অন্য দিকে ৭০ মিনিট খেলার সাথে সাথে বহু ক্লাব ৩ বা ৪ ব্যাক প্রথায় টিম সাজিয়েছেন। খেলার সময় পদ্ধতি কিন্তু সেই মান্ধাতা আমলের। এঁদের ক্রীড়া নমুনা দুই ব্যাকেই সীমাবদ্ধ। কোন স্টপারই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বিপক্ষের আক্রমণধারা ব্যাহত করতে সক্ষম নয়। আর সেন্টার ফরোয়ার্ডের সারা মাঠে ছোটাছুটি সার।

খেলোয়াড়েরা ব্যাক পাস বা কোণাকুণি পাসের প্রকরণ প্রয়োগ করেন ঠিকই। কিন্তু বড় দেরিতে। যতক্ষণ না নিজে অপারগ হন ততক্ষণ এ পদ্ধতিতে খেলতে সময় সময় তাঁদের দ্বিধা করতেও দেখা যায়। এ ছাড়া আছে গোলের মুখে দিশাহারা হওয়ার দোষ। এ মজ্জাগত স্বভাব আমাদের

মোহনবাগান ও এরিয়ান ক্লাবের ফিরতি লীগের খেলায় এরিয়ান গোলকিপার বলাই দে চুনী গোস্বামীর পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি নিশ্চিত গোল বাঁচাচ্ছেন

কলেজ স্কোয়ার পুকুরে শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল সুইমিং ক্লাবের সাঁতার প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করছেন রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর (বাঁদিকে)। ডানদিকে সাঁতার শুরুর দৃশ্য

খেলোয়াড়রা আজও কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আত্মবিশ্বাসী পটু ফরোয়ার্ড আর চোখে পড়ে না।

যাঁরা আইন আরোপ করছেন তাঁরা আইন করেই নিজেদের দায়িত্ব থেকে খালাস হলেন, এ কথা যেন কখনও মনে না করেন। যাঁদের ওপর আইনের বোঝা পড়ছে তাঁদের বহনক্ষমতা কতটুকু সেটা বিচার করাই একান্ত দরকার। বহনক্ষমতার নানা দিক। খেলার মাঠে এবং খেলার পরে খেলোয়াড়ের আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রত্যেকটি বিষয়েই খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন। এই সুখ-সুবিধার কোন ঘাটতি দেখলেই তা পূরণ করবার বন্দোবস্ত করে তবে আইন চাপানো উচিত। অন্যথায় বিষয়ে ফল ও গতানুগতিক অবস্থায় পড়ে থাকা ছাড়া কোন উন্নতি বিধান সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা, কি খেয়ে আমরা খেলছি, খেলোয়াড়দের খাবার ব্যাপারে কতটুকু সুবিধা দিচ্ছি সেটাও ভাবা দরকার।

৯০ মিনিট খেলার ব্যবস্থা করার অর্থ শুধু ৯০ মিনিট খেলা নয়। বিশেষ করে নক-আউটে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খেলার জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হলে আরও সময় খেলার প্রয়োজন হবে এবং পর পর ড্র হতে থাকলে প্রয়োজন হবে অতিরিক্ত সময় সমেত পর পর প্রতি দিন, অর্থাৎ দুই দিন বা তিন দিন পর পর খেলার। ৯০ মিনিট খেলার যাঁরা বিধান দিয়েছেন তাঁরা কি এ কথাগুলো ভেবে দেখেছেন?

আরও একটি কথা। প্রথম ডিভিসনের খেলোয়াড়রা স্বভাবতই দ্বিতীয় তৃতীয় ডিভিসনের খেলোয়াড় বা জেলার খেলোয়াড়দের চেয়ে বেশী শ্রমশীল। কিন্তু এত প্রতিযোগিতা তো শুধু প্রথম ডিভিসনের খেলোয়াড়দের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়। সেখানে দ্বিতীয়, তৃতীয় ডিভিসনের খেলোয়াড় এবং জেলার খেলোয়াড়রা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকেন। ৯০ মিনিটের ধকল তাঁরা কি কাটিয়ে উঠতে পারবেন? কাটিয়ে হয়তো উঠবেন, কিন্তু তাঁদের উপকার হবে কতটুকু?

নক-আউটে নয়, ৯০ মিনিটের খেলা চালু করতে হলে প্রথম ডিভিসনের লীগেই সে নিয়ম প্রথম চালু করা উচিত ছিল। সেখানে খেলার সংখ্যা অবশ্য বেশী। কিন্তু ড্র খেলায় অতিরিক্ত সময় খেলার বা পর পর খেলার ভয় ছিল না। প্রথম ডিভিসনে দলের সংখ্যা এবং খেলার সংখ্যা কমিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে এ নিয়ম চালু করা যেত। তারপর প্রতিক্রিয়া পাকাপাকি ব্যবস্থায় সুফলের চেয়ে কুফলের সম্ভাবনাই ৭০ মিনিটের জায়গায় ৯০ মিনিট খেলায় বেশী।

❊

মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা থেকে খেলোয়াড়রা ফিরে না আসা পর্যন্ত এবং আই এফ এ শীল্ডের খেলা আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত কলকাতা ময়দানের ফুটবল ঢিমেতালেই চলতে থাকবে। সুতরাং কলকাতার মাঠে খেলার এখন মন্দা বাজার। তবে কলকাতার জলে কিছুটা তোলপাড় আরম্ভ হয়েছে। সাঁতারের মরসুম শুরু হয়েছে। মরসুম অবশ্য আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে। গত সপ্তাহ থেকে বিভিন্ন পুকুরে আরম্ভ হয়েছে সাঁতার প্রতিযোগিতা।

কলকাতায় সাঁতারের মান আগের চেয়ে কিছুটা উন্নত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রমাণ প্রতি বছরই কিছু না কিছু রেকর্ড ভাঙে। এবারও হয়তো ভাঙবে। কিন্তু এখন দেখা যাক, অন্যান্য দেশের তুলনায় অগ্রগতির মাপটা কোথায়? অন্যান্য দেশের, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, হাঙ্গেরী, জাপান প্রভৃতি দেশের চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলেমেয়েরা যেভাবে দিনের পর দিন রেকর্ড ভেঙে তছনছ করছে সেভাবে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা কি কিছু করতে পারছে? এক হকি ছাড়া আমাদের সব খেলার মানই অনেক নীচুতে। তবু অ্যাথলেটিক বা অন্যান্য খেলার মান যতটুকু, সাঁতারে ততটুকুও নয়। আন্তর্জাতিক সাঁতার-ক্ষেত্রে আমরা এখনো হামাগুড়ি দিচ্ছি। গত অলিম্পিকে মেয়েদের রেকর্ডও আমাদের দেশের ছেলেদের রেকর্ডের চেয়ে অনেক উন্নত। অথচ আমাদের দেশে সাঁতারের কোচিং এবং সাঁতারের শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে অনেক বছর আগে থেকে। শিক্ষার সুফল কোথায়?

❊

বিশাল দেশ ভারত। খেলোয়াড়ের সংখ্যাও অগণিত। এদের জন্য মাস্টারমশাই দরকার, প্রস্তাব হল। রূপ নিল চিন্তাটা। জন্ম হল ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টসের। সেটা ছিল ১৯৬১ সাল। আর আজ ছ' বছর পার হতে চলেছে। খরচ হয়েছে টাকার অঙ্কে প্রায় কোটির কাছাকাছি। ফল—মাত্র দুজন অ্যাথলীট। একজন মিলখা সিং, যদিও মিলখা অনেক আগের সৃষ্টি। সদ্য হইচই আরম্ভ হয়েছে পারভীন কুমারকে নিয়ে। সবচেয়ে হাসির কথা—পারভীন এখন বিপদে পড়েছে। হাঁ—এত দিনেও তাঁর কোচ ঠিক পথ বাতলাতে পারেননি। তাই পারভীনের ত্রিশঙ্কুর অবস্থা।

পারভীন অ্যাথলীটের দুটি বিষয়ে স্পেশ্যাল। হ্যামার ও ডিসকাস। গত লস অ্যাঞ্জেলসে যুক্তরাষ্ট্র ও কমনওয়েলথের দ্বৈত আসরেও সে ওই দুটি বিষয়েই প্রতিযোগিতায় নামে। আমেরিকার দুই অ্যাথলীট বিশারদ জিম বুশ ও ডাকি ড্রেক পারভীনের চেহারায় বিশেষ মুগ্ধ হন। হওয়ারই কথা—কারণ, লম্বায় ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি, সেই পরিমাণে বিরাট বপুর অধিকারী। ওর ভঙ্গি লক্ষ করে মত দেন—আগামী মেক্সিকো অলিম্পিকে পারভীনের শট্ পাটে নাম দেওয়া উচিত। হাতুড়ি ও চাকতি ছোঁড়ায় সে খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না লোহার বল তাঁর উপযুক্ত বিষয়।

রঙ্গজগৎ

শিশু চিত্র তৈরির সমস্যা

ভারতের শিশুচিত্রের মান আশানুরূপ উন্নত নয়। সম্প্রতি মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব থেকে ফিরে এসে শ্রীমতী নার্গিস এই মন্তব্য করেন। তিনি উৎসবে শিশুচিত্রের জুরী বিভাগের সদস্যা ছিলেন।

উৎসবে প্রদর্শিত শিশুচিত্রগুলি বয়স্ক ব্যক্তিরাও খুব উপভোগ করেছেন। শ্রীমতী নার্গিস এই প্রসঙ্গে [illegible] করে বলেন, [illegible] শিশুচিত্রে শিক্ষা এবং [illegible] একটা [illegible]। [illegible] তিনি কয়েকটি ছবি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

"[illegible]" ছবির [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] ও [illegible] তৈরী এই ছবি [illegible] পুরস্কার পেয়েছে। [illegible] —শ্রীমতী নার্গিস বলেন। [illegible] কেউ [illegible] করেনি।

আমেরিকার শিশুচিত্র "কাপ ফিভার" দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ফুটবল খেলা নিয়ে তৈরী। ব্রিটেনের ছবি ছিল, "ফ্ল্যাশ, দি শিপ ডগ"। এই ছবির শিশুনায়ক শহরে গিয়ে একটি কুকুর পেলো। কুকুরটির নাম ফ্ল্যাশ। আরেকটি দুষ্টু ছেলেরও কুকুর আছে। ফ্ল্যাশকে নিয়েই তার যত হিংসা। ফ্ল্যাশ প্রতিযোগিতায় ওই কুকুরটিকে কীভাবে হারিয়ে দেয় তা নিয়েই ছবিটির যত মজা।

শিশুমনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে এই ছবিগুলিতে। রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশে শিশুচিত্র তৈরির আলাদা স্টুডিও আছে। আমাদের দেশে এমন কোন সুবিধা নেই। এই মন্তব্য করে শ্রীমতী নার্গিস বলেন তবু উন্নত শিশুচিত্র এ দেশে তৈরি করা সম্ভব। প্রথমত, শিশুচিত্রে ভাল গল্প থাকা চাই। শিশুচিত্র হলেই তা পুতুল-চিত্র বা কার্টুন চিত্র হবে এমন কোন কথা নেই। বিভিন্ন বয়সের শিশুদের জন্য ভাল গল্প লেখা যেতে পারে। বয়ঃসন্ধি-কালের যৌনসমস্যা এবং এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের কল্যাণকর পথে চলার শিক্ষা সংক্রান্ত ছবি তৈরী হতে পারে। আলোচনার শেষে শ্রীমতী নার্গিস বলেন, শিশুচিত্র নির্মাণের ইচ্ছা তাঁর আছে।

"মিস প্রিয়ংবদা" চিত্রে লিলি চক্রবর্তী ও তরুণকুমার

সত্যজিৎ রায়ের নতুন সম্মান লাভ

আর্ট হিসাবে চলচ্চিত্রের আপসহীন অনুশীলন এবং বাংলা সাহিত্য থেকে কথাবস্তু আহরণ করে ফিল্মে ভারতের "ইমেজ" নিখুঁতভাবে রচনার জন্য শ্রীসত্যজিৎ রায় ম্যাগসেসে পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। চলচ্চিত্রে যোগদানের পর বহু আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পুরস্কার তাঁর হাতে এসেছে। কিন্তু তাঁর ম্যাগসেসে পুরস্কার লাভ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ সাক্ষাৎকারে 'দেশ'-এর প্রতিনিধিকে শ্রীরায় বলেন, আমি যত দূর জানি, এর আগে একমাত্র জাপানের চিত্রপরিচালক আকিরা কুরোসাওয়া এই পুরস্কার পেয়েছেন।

গত সপ্তাহে শ্রীরায় পুরস্কার লাভের সংবাদ পান। তখন তিনি 'চিড়িয়াখানা' ছবির একটানা শুটিং-এ ব্যস্ত। তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্য বহু ব্যক্তি স্টুডিওতে এসে সমবেত হয়েছিলেন। শ্রীরায়কে পৌর সংবর্ধনা জ্ঞাপনের প্রস্তাবও হয়েছে।

ম্যাগসেসে পুরস্কার তাঁকে সম্মান এবং অর্থ দুই-ই এনে দিয়েছে। পুরস্কার হিসাবে তিনি পাবেন পঁচিশ হাজার টাকা।

ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড ফাউন্ডেশন তাঁদের ঘোষণায় বলেন,

"Unlike the vast majority of Indian films, which are escapist, he strives for emotional integrity of relationships".

আয়ান

[illegible]
কাহিনীর সম্বন্ধে [illegible]
পরিচালিত "আয়ান" এর [illegible]

বি কে প্রোডাকশন্স-এর "মহাশ্বেতা" ছবিতে (পরিচালনা : পিনাকী মুখোপাধ্যায়) অঞ্জনা ভৌমিক ও কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ফটো—দেশ

"আমন" অর্থ শান্তি। নামকরণ থেকেই বোঝা যায় ছবিটি বক্তব্যপ্রধান। এবং তা হল বিশ্বশান্তির আদর্শ। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে একদা যে ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি ঘটে গিয়েছিল, প্রযোজক-পরিচালক দর্শকদের সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এবং স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আণবিক অস্ত্র নির্মাণের সর্বনাশা নেশা যত দিন মানুষ ছাড়তে না পারছে তত দিন বিশ্বশান্তির আশা সুদূরপরাহত। এক কথায়, আর যেন যুদ্ধ না হয় এই আবেদন, এবং তার বিরুদ্ধে এখন থেকেই নৈতিক জেহাদের আহ্বান ছবিটিতে উচ্চারিত।

এই সমসাময়িক সমস্যা এবং বক্তব্য একটি গল্পের (রচনা : রঞ্জন বসু) মাধ্যমে বিন্যস্ত। গল্পের নায়ক ডাঃ গৌতম ছোটবেলায় তার মাকে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে) বোমাবর্ষণে মরতে দেখেছে। বর্মা থেকে পায়ে হেঁটে বাবা-মা ও বহু শরণার্থীর সঙ্গে সে ভারতে আসছিল। তখন থেকেই গৌতম মনে মনে তার জীবনের আদর্শ বেছে নিয়েছিল। বড় হবার পর তা আরও দৃঢ় হল। বিলেতে ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেও সে আর দশজনের মত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার কোন বাসনা মনে স্থান দেয়নি। বিলেতে দার্শনিক লর্ড বারট্রান্ড রাসেলের সঙ্গে দেখা করে (ছবিতে এই বিশ্ববিখ্যাত চিন্তানায়ককে একটি দৃশ্যে দেখা গেছে) তাঁর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ নিয়ে চলে এসেছে দিল্লিতে, তারপর হিরোশিমায়। আণবিক বোমার প্রতিক্রিয়ার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত দুর্গত মানুষদের চিকিৎসায় সে আত্মনিয়োগ করল।

জাপানে আর্তের সেবার ফাঁকে ফাঁকে, এবং আণবিক 'র‍্যাডিয়েশন'-জনিত ব্যাধির হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার এক অমূল্য ওষুধ আবিষ্কারের পর আদর্শবাদী গৌতম আর যা কিছু করেছে তা একমাত্র হিন্দী চিত্রের নায়কের পক্ষেই সম্ভব। সেখানে সে মিনোডা নামে এক জাপানী মেয়ের প্রেমে পড়েছে। মিনোডা হয়েছেন সায়রা বানু। হিন্দী ছবির আর সব নায়ক-নায়িকার মতই গৌতম ও মিনোডা গান গেয়েছে। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে ও প্রেমের কথা বলেছে। যেহেতু নায়িকা সায়রা বানুকে দিয়ে হিন্দী বলানো দরকার তাই বোধ হয় জানানো হয়েছে যে, ভারতেই মিনোডার প্রথম জীবন কেটেছে, শান্তিনিকেতনে। মিনোডার বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিকৃতি। সে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতিও অনুরক্ত। কিন্তু শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন জাপানী ছাত্রীটি যে গান নায়ককে শুনিয়েছে তার সুর শঙ্কর-জয়কিষণের দেওয়া। গানের কথা কী তা উল্লেখ করে আর লাভ নেই।

নায়িকা মিনোডা ভাল হিন্দী বলতে পারে, ভারতের মেয়ের মতই তার চলাফেরা—এ সব কিছুই না হয় মেনে নিলাম। কারণ সে ভারতে ছিল। কিন্তু তার চেহারা? সায়রা বানুকে জাপানী মিনোডা বলে কি ভাবা যায়? তা ছাড়া, হিরোশিমার হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে রয়েছেন ওম প্রকাশ, চাঁদ উসমানি, সজ্জন প্রভৃতি। পরিচিত শিল্পীদের হিরোশিমার হাসপাতালে হয়ত করুণ মেলোড্রামার প্রয়োজনেই রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই অতিনাটকীয়তা মনে মোটেই রেখাপাত করে না।

শেষ পর্যন্ত যে প্রযোজক-পরিচালক নায়কের মৃত্যু দেখাতে সাহস করেছেন সে-জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। এমন আদর্শবাদী জীবনের পরিণতি ট্র্যাজেডি ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। "রেডিও অ্যাকটিভ" রশ্মির বিষক্রিয়াতেই নায়ক প্রাণ হারিয়েছে। আণবিক বোমা পরীক্ষার দরুন সমুদ্রে দ্বীপে কয়েকজন জেলের জীবন বিপন্ন হয়। তাদের বাঁচাতে গিয়ে নায়ক নিজেও রেহাই পায়নি। যে-ভাবে নায়ক তাদের

"প্রতিদান" চিত্রে কাজল গুপ্ত ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

উদ্ধার করে নিয়ে আসে তাতে রোমান্সের উপকরণ যথেষ্ট।

কাহিনীর শেষে দেখি, পালাম বিমান-বন্দরে নায়কের মৃতদেহ এনে নামানো হয়েছে। নায়কের বৃদ্ধ পিতা (বলরাজ সাহনী) এসে দাঁড়িয়েছেন শবাধারের সামনে। পাশে বিধবার বেশে মিনোতা (মৃত্যুপথগামী প্রেমাস্পদকে সে স্বামীরূপে আগেই বরণ করে নিয়েছিল—হিন্দু নারীর মত গৌতমের হাতেই সিঁথিতে সিঁদুর পরে নিয়েছে)। পালাম বন্দর থেকে গৌতমের মৃতদেহ নিয়ে যে বিরাট শবযাত্রা দেখানো হয়েছে তা একমাত্র জাতির নেতার মৃত্যুর পরেই সম্ভব।

মামুলী প্রেম ও গান, অবাস্তবতা ও নাটকীয়তা সত্ত্বেও বলব, "আমন" চিত্রটি সৎসাহসের পরিচয় বহন করে। একটি আধুনিক আন্তর্জাতিক সমস্যার ভিত্তিতে হিন্দী ছবি তৈরির মধ্যে বলিষ্ঠতা নিশ্চয়ই আছে।

নায়ক রাজেন্দ্রকুমার ও তাঁর পিতার ভূমিকায় বলরাজ সাহনীর অভিনয় প্রশংসনীয়। সায়রা বানুকে ভাল দেখিয়েছে। নায়িকার বাবার চরিত্রে চেতন আনন্দের অভিনয়ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ।

সরস্বতী চিত্রম-এর "রক্তরেখা" (পরিচালনাঃ উমাপ্রসাদ মৈত্র) ছবিতে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও বোম্বাইয়ের বিজয়া

"পদ্মাবতী জয়দেব" ছবির গান রেকর্ডিংঃ আরতি মুখোপাধ্যায়, সংগীতপরিচালক বিজন পাল, গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মান্না দে ফটো—দেশ

এই রঙিন ছবির সব চাইতে বড় সম্পদ সম্ভবত ফটোগ্রাফি—যার জন্য রাধু কর্মকার সাধুবাদ পাবেন।

"মিস প্রিয়ংবদা" এ-সপ্তাহে

ইউনাইটেড টেকনিশিয়ানস্-এর কমেডি ছবি "মিস্ প্রিয়ংবদা" এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। রবি বসু ও দুষ্মন্ত চৌধুরী ছবিটি পরিচালনা করেছেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, তরুণকুমার, জহর রায়, দীপিকা দাস, হরিধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ছবির বিশিষ্ট শিল্পী। সংগীত পরি-চালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সুবীর সেন ও আজাদ রহমান।

মুক্তির প্রতীক্ষায়

এম বি প্রোডাকশন্স-এর "প্রতিদান" অনতিবিলম্বেই মুক্তি পাচ্ছে। আজত গাঙ্গুলি স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন। ছবিটির মুখ্যচরিত্ররাজির রূপ দিয়েছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, কাজল গুপ্ত, জহর গাঙ্গুলি মলিনা দেবী, অনুভা গুপ্ত, রমা গুহঠাকুরতা, জহর রায়, সুখেন দাস, গীতা দে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী চক্রবর্তী ও নবাগতা সুচেতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করেছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

নবগঠিত চিত্রসংগঠন সংস্থার প্রথম উপহার "পান্না"র মুক্তিরও বিলম্ব নেই। তিনটি কিশোর-কিশোরীর অভিযানের কাহিনী ছবিটিতে রূপায়িত। অমিত মৈত্র পরিচালিত এ ছবিতে একটি নতুন ধরণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন শম্ভু মিত্র। নাম-ভূমিকায় দেখা যাবে নতুন কিশোর অভিনেতা রমাপ্রসাদকে। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় রয়েছেন তরুণকুমার, পঙ্কজ মিত্র, শিখা ভট্টাচার্য, আরতি কুণ্ডু, কৃষ্ণকলি, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ভি বালসারা সংগীত পরিচালক।

রবিতীর্থর "শাপমোচন"

প্রতি বছরেই প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে রবিতীর্থ একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। এবার তাঁরা উপহার দেন "শাপমোচন"। গত ৬ আগস্ট রবীন্দ্র-সদনে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।

রবিতীর্থের "শাপমোচন" যাঁরা দেখেছিলেন তাঁদের চোখে-মুখে তৃপ্তির ভাবটুকু থেকেই নৃত্যনাট্যটির সাফল্য অনুধাবন করা গিয়েছিল। প্রযোজনাটির সবচেয়ে বড় গুণ ছিল এই যে, তাতে নাটকের রস ও ভাব, নৃত্য এবং গানের এক অদ্ভুত ঐকতান গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ নৃত্যনাট্য পরিবেশনের কোন মুহূর্তেই একটি দিক উজ্জ্বল, অপর দিক ম্লান—এ কথা একবারও মনে হয়নি। নৃত্য, সংগীত ও ভাবনার একটি ছন্দোবদ্ধ রসসৃষ্টি হিসাবে রবিতীর্থর "শাপমোচন"-এর কথা দর্শকদের অনেক দিন মনে থাকবে।

দেবব্রত বিশ্বাস (অরুণেশ্বর) এবং সুচিত্রা মিত্র (কমলিকা) চমৎকার গান নৃত্য-নাট্যটিতে ভাবসঞ্চার করেছিল। প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে নৃত্য। নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অলকানন্দা চাকলাদার (উর্বশী), সাধন গুহ (সৌরসেন), পলি গুহ (মধুশ্রী) এবং শম্ভু নাগ ও জয়শ্রী লাহিড়ী, যথাক্রমে অরুণেশ্বর ও কমলিকার চরিত্রে। সখী ও সখাদের গান সুন্দর গেয়েছিলেন পূর্বা সিংহ, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, অশোক বসু, অমর রায়, অশোক গুহ, দেবযানী সেন ও মঞ্জুলা বসু প্রভৃতি। সংলাপ এবং বাক্য ব্যঞ্জনায়

সব্যসাচী, তুষার ভঞ্জ ও সুমিত্রা মিত্রর কণ্ঠে উচ্চারিত।

রবিরশ্মির "শ্রাবণ-সন্ধ্যা"
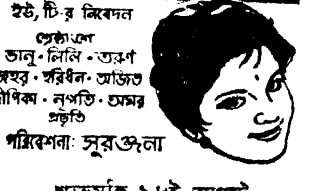
রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্যনাট্য অনুশীলনের ক্ষেত্রে রবিরশ্মির নাম আজ সুবিদিত। ইতিপূর্বে তাঁরা একাধিক নৃত্য-গীত বিচিত্রা উপহার দিয়ে রসিকজনের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। গত সপ্তাহে রবিরশ্মি মঞ্চস্থ করেন "শ্রাবণ সন্ধ্যা" (বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে)।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা থেকে কথা আহরণ করে এবং তাঁর বর্ষার গানের সঙ্গে গেঁথে দিয়ে রচিত হয় "শ্রাবণ সন্ধ্যা"। "শ্রাবণ সন্ধ্যা" যখন মঞ্চে, বাইরে তখন অবিশ্রান্ত বারিধারা। সন্ধ্যায় ওই শ্রাবণের ধারা "শ্রাবণ সন্ধ্যা"-র একটি সুন্দর, স্বাভাবিক পরিবেশ রচনা করেছিল। তারই মধ্যে একের পর এক বর্ষার গান শ্রোতার মনকেও চঞ্চল করে তোলে। একক গানগুলি অদ্ভুত দরদের সঙ্গে গেয়েছিলেন কমলা বসু, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, সাগর সেন, বাণী ঠাকুর ও কানাই মুখোপাধ্যায়। নৃত্যে মঞ্জুলিকা দাশ, মঞ্জরী চৌধুরী, মিতালী দাশগুপ্ত, শুভ্রা ঘোষ, মঞ্জুষা মুখোপাধ্যায়, জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দ্রাণী রায়চৌধুরী কৃতিত্বের পরিচয় দেন। "কেন পান্থ এ চঞ্চলতা" গানের সঙ্গে মঞ্জুলিকার (নৃত্য পরিচালনার দায়িত্বও তাঁর) একক নৃত্য বিশেষ প্রশংসনীয়। মীনাক্ষী গোস্বামী, ভাস্কর বসু ও দিলীপ ঘোষের আবৃত্তি এবং নেপথ্য ভাষণ মর্মস্পর্শী ছিল। সব মিলে "শ্রাবণ সন্ধ্যা" রবিরশ্মির একটি সুখভোগ্য সৃষ্টি, যা দর্শকদের মন ভরিয়ে দিয়েছিল। সাগর সেনের সংগীত পরিচালনা এই নৃত্য-গীত বিচিত্রার আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। শ্বারকা চট্টোপাধ্যায়ের মঞ্চসজ্জাও ছিল চমৎকার।

পি সি সরকারের ইন্দ্রজাল

কয়েকটি নতুন খেলা নিয়ে জাদুকর পি সি সরকার এবার দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর 'ইন্দ্রজাল' শুরু হয়েছে গত সপ্তাহে, নিউ এম্পায়ারে।

ইন্দ্রজাল-এর নতুন আকর্ষণ : মিশরের ভাসমান মমি, বাদক সহ পিয়ানো উধাও, পতঙ্গের প্রেম, একটি মেয়ে : জ্বলন্ত কামানের মুখ থেকে ইলেকট্রিক বাল্‌বে প্রভৃতি। শ্রীসরকারের নতুন এবং পুরনো সব খেলাই দর্শকদের রোমাঞ্চিত করে। বিখ্যাত পুরনো জাদুখেলার মধ্যে রয়েছে "এক্সরে আইজ", "ইন দি অ্যানিমাল কিংডম" ইলেকট্রিক করাতে একটি মেয়েকে দু ভাগে কেটে আবার জোড়া দেওয়া এবং আরও অনেক কিছু।

শ্রীসরকারের জাদু প্রদর্শনের জাঁকজমক বা 'শোম্যানশিপ' দর্শকদের বরাবরই আকৃষ্ট করেছে। এবার খেলা দেখানোর বাহার যেন আরও বেশী। তা ছাড়া সংগীত এবং দ্রুতগতিতে খেলা দেখানোর চাতুর্য কম চিত্তাকর্ষক নয়। এক কথায়, ইন্দ্রজাল দর্শককে যেন অলৌকিক জগতের সমীপে নিয়ে আসে, সে অবস্থায় বিস্ময়ে ডুবে যাওয়া ছাড়া তাঁর অন্য কোন গতি থাকে না। খেলা শেষে জাতীয় সংগীতের সময় পিছনে দশভুজার প্রতিকৃতি দর্শক মনে ভক্তিভাবের সঞ্চার করে।

আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব

শিশু চলচ্চিত্র পর্ষৎ আয়োজিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ও প্রদর্শনী পূর্বে ঘোষিত তারিখ ১লা আগস্টের পরিবর্তে ১৯ই নভেম্বর শুরু হবে এবং সমগ্র পূর্ব ভারত জুড়ে ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত চলবে। এবারকার উৎসবকে প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তা-ছাড়া বাংলা ও বিহারের খরাক্লিষ্ট অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে কর্তৃপক্ষ উৎসবের সময় পিছিয়ে দিয়েছেন।

শ্যাম চক্রবর্তী পরিচালিত "দুষ্টু প্রজাপতি" ছবিতে সবিতা চট্টোপাধ্যায় ও কিশোরকুমার

পাঠকের চোখে

ভিভিয়েন লে

৩০ আষাঢ়ের "দেশে" ভিভিয়েন লে সম্পর্কে লেখা হয়েছে—"শ্রীমতী ভিভিয়েন সহ এ পর্যন্ত পাঁচজন অভিনেত্রী দু'বার 'অস্কার' পেয়েছেন।" এ কথা ঠিক নয়। আমার যত দূর মনে আছে, "এ পর্যন্ত" ছ'জন অভিনেত্রী দুবার করে অস্কার পেয়েছেন। এ'দের তালিকা দিলাম—(১) বেটি ডেভিস : 'ডেঞ্জারাস্' (১৯৩৫) ও 'জেজেবেল' (১৯৩৮)। (২) লুইসি রেনার : 'দি গ্রেট্ জিগ্‌ফিল্ড' (১৯৩৬) ও 'দি গুড্ আর্থ' (১৯৩৭)। (৩) ভিভিয়েন লে : 'গন উইথ দি উইন্ড' (১৯৩৯) ও 'এ স্ট্রিটকার নেমড্ ডিজায়ার' (১৯৫১)। (৪) ইনগ্রিড্ বার্গম্যান : 'গ্যাস্‌লাইট' (১৯৪৪) ও 'অ্যানাস্টাসিয়া' (১৯৫৬)। (৫) অলিভিয়া ডি-হ্যাভিল্যান্ড : 'টু ইচ্ হিজ ওন্' (১৯৪৬) ও 'দি এয়ারেস' (১৯৪৯) এবং (৬) এলিজাবেথ টেলর : 'বাটারফিল্ড এইট্' (১৯৬০) 'ও হুজ অ্যাফ্রেড্ অব ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্' (১৯৬৬)।

ওই লেখাটিরই আর এক জায়গায় আছে —শ্রীমতী ভিভিয়েন অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : "দি স্কিন্ অব অওয়ার টীথ্ (১৯৪৫)"। এটাও ঠিক নয়। কারণ, এটা 'ছবি' নয়, 'নাটক'। ছবি কখনও হয়েছে বলে শুনিনি। থর্নটন ওয়াইল্ডারের পুলিটজার পুরস্কার (১৯৪২) পাওয়া নাটক "দি স্কিন অব আওয়ার টিথ্" ওয়েস্ট এন্ডের ফিনিক্স্ থিয়েটারে (মে, ১৯৪৫) অভিনীত হলে ভিভিয়েন এতে স্যাবিনার ভূমিকায় নামেন। ভিভিয়েনের জীবনী থেকে জানতে পারি—

"After several less successful films, Miss Leigh achieved new importance as an actress in 1945 London Stage production of 'The skin of our teeth', directed

নির্মল মিত্র'র পরিচালনায় নির্মীয়মাণ "প্রথম বসন্ত" ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

by her husband Lawrence Olivier."

হ্যারল্ড্ হব্‌সনও বিলেতের 'টাইমস' কাগজে লিখেছেন—

"The outrageous provocativeness of her Sabina in "The skin of our teeth" in 1945 was one of the first heavy pleasures of the post-war theatre."

"দি স্কিন অব আওয়ার টিথ" প্রথম অভিনীত হয় আমেরিকায় (১৮ই নভেম্বর ১৯৪২)। তাতে স্যাবিনার ভূমিকা করেছিলেন টালুলা ব্যাংকহেড্। পরবর্তী কালের অতিখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা মণ্টগোমারি ক্লিফ্‌ট এতেই হেনররীর ভূমিকায় সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

রচনাটি শেষ হয়েছে "শিপ্ অভ ফুলস"-এ ভিভিয়েনের "স্মরণীয় অভিনয়ের" কথাটি বলে। এ প্রসঙ্গে আরও একটু জানানো যেতে পরে ১৯৬৬ সালে ফ্রেঞ্চ ফিল্ম অ্যাকাডেমি 'শিপ অব ফুলস'-এ অভিনয়ের জন্যে ভিভিয়েন লেকে বছরের শ্রেষ্ঠ বিদেশিনী অভিনেত্রী বলে উল্লেখ করেছেন।

অরুণকুমার মিত্র,
কলিকাতা-৬।

"গৌরীমা" চিত্রে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপ্তি রায় ফটো—দেশ

অরণ্যদেব
লী ফক

ভোরের মধ্যে যদি না জাহাজে ফিরি, আমার সঙ্গীরা তাহলে শীবাকে হত্যা করবে!
ভোরের মধ্যেই শীবাকে আমরা ফিরিয়ে আনব, আর মুক্তি মরবে হতভাগা!

তোমার চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, শীবাকে তাহলে জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া যাবে না।
আমার চেষ্টা ব্যর্থ হবে না, জুনকর।

সপ্তদশ শতাব্দীর এক আশ্চর্য কাহিনী
শীবাকে উদ্ধার করবার জন্যে আমি একটা ফন্দি এঁটেছি। দুঃসাহসিক ফন্দি।

'জুনকরের ক্রোধ থেকে যাকে আমি বাঁচিয়েছিলুম তার নাম বললি। পাকা সাঁতারু। আগুনের পাত্র জলে ভাসিয়ে সে সাঁতরে এগোতে লাগল জাহাজের দিকে .....'

'জলদস্যুদের জাহাজে একটা খাঁচার মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বন্দী শীবাকে। খাঁচার নীচে বারুদ .....'
??
আরে দ্যাখো দ্যাখো!
কী ওটা?

রাত্রির অন্ধকারে শুধু আগুনই তারা দেখতে পেল
আগুন!
জলে আগুন ভাসছে?
এ কী কাণ্ড!

'বলি ডুব-সাঁতার কাটছিল। তাকে তারা দেখতে পেল না ...'

'জলদস্যুরা তখন মহা উত্তেজিত।'
যে ওই আগুনে গুলি লাগাতে পারবে, তাকে এক মোহর দেব!

'জলদস্যুদের দৃষ্টি যখন আগুনের দিকে, তখন রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আমরা জাহাজে উঠতে লাগলুম। দলে আমরা অনেক কম, কিন্তু তাতে কী। শুধু সংখ্যা দিয়ে কি আর লড়াই জিতে করা যায় ...'
শ শ শ

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীমিলন মুখোপাধ্যায

POSTER
COLOUR

হ্যামার মাস্টার
পোক্ত থাকে
যখন হুটোপাটি একেবারে
চরমে ওঠে!
মডেল-রোজ
প্রাণভরে হুটোপাটি চালিয়ে যাও। হ্যামার মাস্টার পরোয়া করবেনা। হ্যামার মাস্টারের ওপর তুমি নির্ভর করতে পারো কারণ যেমনতেমন ভাবে নাড়াচাড়া খাবার ধকল সহ্য করার মত করেই একে বিশেষভাবে গড়া হয়েছে।
তুমি পেয়ে যাবে একটা
হ্যামার মাস্টার
LPE - Alyars HM 3

স্থানীয় এজেন্ট:
পি. পি. অ্যান্ড কোম্পানী, ফ্ল্যাট নং ৬ ব্লক নং ই. ১৫, বেচুলা রোড, কলিকাতা-১৪। ক্যাশ রসিদ এন্ট্রি ফরম এবং লিটকুইজ উইকলী নিন।

FIRST PRIZE	RUNNERS-UP (UPTO 4 ERRORS)	MINIQUIZ (UPTO 2 ERRORS)
Rs. 12,500	Rs. 7,000	Rs. 4,500

FAMINE RELIEF FUND: Rs. 1000

২১ লিটকুইজের সরকারী ভর্তি ফর্ম

ADDRESS
LITQUIZ NO. 21, ALANKAR, L. LARAM ST., BOMBAY-7 (WB)

দ্রষ্টব্য:—১) প্রত্যেক কলমে, আপনার বাছিয়ে নেওয়া শব্দটি কালি দিয়ে কেটে দিন, (২) আপনি যদি শুধুমাত্র একটি কুপন পাঠান, তাহলে দ্বিতীয় কুপনটি বাতিল করে দিন, (৩) আপনি যদি **মানি অর্ডারযোগে** এন্ট্রি ফী পাঠান তাহলে এই এন্ট্রি ফর্মের সাথে, ডাকঘর থেকে পাওয়া মানি অর্ডার রসিদটি **অবশ্যই** পাঠাবেন। মানি অর্ডার রসিদ ছাড়া এন্ট্রি বাতিল করা হবে। (৪) আই-পি-ও ক্রস করবেন না। লিটকুইজ নং-২১ দেশকে-৭-এর জন্য পাঠান।

1	Re. 1		2	Re. 1	
1	AGITATION	EDUCATION	1	AGITATION	EDUCATION
2	CONTENTMENT	DETACHMENT	2	CONTENTMENT	DETACHMENT
3	DESIRES	PLEASURES	3	DESIRES	PLEASURES
4	DIVINE	FEMININE	4	DIVINE	FEMININE
5	ECONOMY	POLITY	5	ECONOMY	POLITY
6	FREEDOM	WISDOM	6	FREEDOM	WISDOM
7	FREELY	TRULY	7	FREELY	TRULY
8	HAPPY	HIMSELF	8	HAPPY	HIMSELF
9	MATERIAL	ORIGINAL	9	MATERIAL	ORIGINAL
10	PEOPLE	RELIGION	10	PEOPLE	RELIGION
11	PERSONAL	POLITICAL	11	PERSONAL	POLITICAL
12	PROSPERITY	STABILITY	12	PROSPERITY	STABILITY
13	RACIAL	RELIGIOUS	13	RACIAL	RELIGIOUS
14	RUINS	RULES	14	RUINS	RULES
15	SPIRITUAL	UNIVERSAL	15	SPIRITUAL	UNIVERSAL
16	VALUES	WAYS	16	VALUES	WAYS
17	WANT	WITHIN	17	WANT	WITHIN

21 SEND THESE 2 COUPONS & ENTER MINIQUIZ FREE

Miniquiz

10 CLUES FREE COUPON

AGITATION	EDUCATION	HAPPY	HIMSELF
CONTENTMENT	DETACHMENT	RACIAL	RELIGIOUS
ECONOMY	POLITY	SPIRITUAL	UNIVERSAL
FREEDOM	WISDOM	VALUES	WAYS
FREELY	TRULY	WANT	WITHIN

২১ দেশ

এই কুইজে যোগদান করবার জন্য আমি নিয়ম ও সর্তাবলী পালন করতে রাজী এবং প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার চূড়ান্ত ও আইনতঃ বাধ্যতামূলক বলে গ্রহণ করলাম। প্রত্যেক কুপনের জন্য ভর্তি ফী: ১, টাকা। এই সম্পূর্ণ ফর্মের (২ কুপনের) জন্য ভর্তি ফী: ২, টাকা। আই.পি.ও/মানি অর্ডার রসিদ/আই পি-ও/লিটকুইজ ক্যাশ রসিদ/প্রাইজ কার্ড ও তার নম্বর............... পাঠালাম।

CAPITAL LETTERS

NAME ....

ADDRESS ....

এখানে কাটুন ও এই পুরো ফর্মটি পাঠান—

৩,৩৮,৫০০ টাকা ১নং হইতে ২০নং লিটকুইজে পুরস্কার হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে

প্রধান বৈশিষ্ট্য

লিটকুইজ নিঃসন্দেহে সাহিত্য সম্পর্কিত ও চাতুর্যপূর্ণ প্রতিযোগিতা। লিটকুইজের উত্তর নির্ধারিত। আমাদের সঙ্কলক এগুলি নির্ধারিত করেন নাই। এগুলি তিনি বদলাইতেও পারেন না। এগুলি ঠিক করার জন্য কোন সালিশী কমিটি নাই। রচয়িতার ব্যবহৃত শব্দই প্রত্যেকটি সমাধানের সঠিক উত্তর। কাজেই লিটকুইজে সাফল্য ভাগ্যের উপর নির্ভর করে না। আপনার দক্ষতা, জ্ঞান চেতনা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করুন, আপনিও নিশ্চিত সাফল্য লাভ করিবেন।

বন্ধের শেষ তারিখ

ডাকে প্রেরিত সকল প্রবেশপত্র: ৭-৯-৬৭
তারকাল্যাজিতে সমাধান: ১০-৯-৬৭

আপনি আপনার প্রবেশপত্র পাঠাইতে পারেন বুধবার, ৬-৯-৬৭ তারিখে, কিন্তু উহা এক্সপ্রেস ডেলিভারীতে পাঠান।

সমাধান ফেরৎ পাইবার জন্য আপনার প্রবেশপত্রসহ নিজ ঠিকানা লিখিত ৬ পয়সার পোস্টকার্ড পাঠান।

১, টাকা পাঠান এবং **লিটকুইজ উইকলির** ৫টি সংখ্যা লাভ করুন।

17 CLUES

1. Election time is obviously a time of intense political and mass **Agitation Education.**
2. **Contentment Detachment** is the real fountain of happiness.
3. Our **Desires Pleasures** are always changing.
4. Devotion, Love and Service are **Divine Feminine** terms. They are the attributes of the **Divine Mother of the** universe.
5. The central problem of the Indian **Economy Polity** is the problem of poverty.
6. Democrats cannot afford to regard themselves as sole custodians of **Freedom Wisdom.**
7. It is the basis of Democracy that everybody functions **Freely Truly** within the law.
8. Wherever a man is, in whatever condition he is placed, he wants to be **Happy Himself.**
9. It is impossible to be absolutely **Material Original** in this age when a vast amount of knowledge has accumulated.
10. The early beginnings of practically every **People Religion** on earth are shrouded in myth and mystery.
11. Good education brings freedom from fear, which is essential to make the nation courageous, and helps to realise the value of **Personal Political** freedom.
12. Social **Prosperity Stability** is not attained by dividing society, setting up one against the other, with political motives.
13. **Racial Religious** feeling is one of the most combustible elements in the life of the masses.
14. Italy is a country of historic **Ruins Rules.**
15. If a religion is not **Spiritual Universal,** it cannot be eternal.
16. In all ages new ideas, new thought, new **Values Ways** of life have been introduced into our society, though usually subject to the maintenance of some basic principles.
17. All activity presupposes restlessness, and restlessness comes from **Want Within.**

দ্রষ্টব্য:—উপরের ইঙ্গিতগুলি বিভিন্ন লেখকের লেখা থেকে নেওয়া কয়েকটি শব্দ। এগুলি সব সম্পূর্ণ বাক্য ও নিজস্ব সম্পূর্ণ অর্থ বহন করে। লেখক/গ্রন্থকারের নাম ও তাঁহাদের রচনার নাম সরকারীভাবে সমাধানের সঙ্গে লিটকুইজ উইকলিতে প্রকাশ করা হবে।

পশ্চিমবাংলার খাদ্য সংকট

পশ্চিম বাংলার সর্বত্রই তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে কিছুকাল পূর্বেই, এখন তার চরম অবস্থা। মোটামুটিভাবে, জুলাই-আগস্টের দিকে বাজারে চালের টান হয়, মূল্য বৃদ্ধিও ঘটে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় যেখানে এই দু মাস অন্ন সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত কষ্টকর হবার কথা সেখানে অস্বাভাবিক অবস্থায় যে চাল দুষ্প্রাপ্য হবে তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমান বছরে এই দুটি মাসে যে চালের তীব্র অনটন সৃষ্টি হবে একথা পূর্বেই সন্দেহ করা হয়েছিল। যাই হোক, আপাতত আমরা পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জায়গার যে সংবাদ পাচ্ছি তাতে দেখি, মফস্বলের শহর ও বাংলার গ্রামগুলিতে চালের হাহাকার। পল্লী অঞ্চলে খোলাখুলিভাবে কোথাও চাল নেই, মফস্বলেও সেই অবস্থা। গোপনে যে ছিটেফোঁটা চাল সংগ্রহ করা সম্ভব তার দাম তিন টাকা থেকে চার টাকা কে জি; অর্থাৎ সহজ হিসেবে চালের মণ এখন একশো কুড়ি পঁচিশ টাকারও ওপর। এই চাল দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্তদের পক্ষে সংগ্রহ করা যে সম্ভব নয় তা সহজেই অনুমান করা যায়। গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ও চালের দর এতটা উঠেছে কিনা সন্দেহ।

তীব্র খাদ্য সংকটের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে বিশৃঙ্খলা, লুঠতরাজ, অখাদ্য খেয়ে জীবন ধারণের চেষ্টা। চুরি, ডাকাতি, ধান চাল লুঠ—এসব তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন ও ঘেরাও ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি নিয়মিত বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে স্বাস্থ্যহানির এবং রোগ বিস্তারের সংবাদও চোখে পড়ে।

এই নিদারুণ খাদ্যাভাব সামলে ওঠার আপাতত কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। চাল নেই বলে অন্যান্য খাদ্যবস্তুও যে পাওয়া যাচ্ছে তা নয়। শাকসবজি, তরি-তরকারি ইত্যাদির দাম অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে; গমও সুলভ নয়, জলের আটা খেয়ে সাধারণ মানুষ পীড়িত হচ্ছে। সরকারকে নানা জায়গায় লঙ্গরখানা খোলার জন্যে চাপ দেওয়া সত্ত্বেও সরকারের পক্ষে সর্বত্র তা সম্ভব হচ্ছে না।

যুক্তফ্রন্ট সরকার খাদ্য সংকটের বিষয়ে অবহিত নন, এমন কথা বলি না; কিন্তু তাঁদের পক্ষে দিল্লিকে দোষ দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। প্রথমত এবারে ফসল ভাল হয়নি, দ্বিতীয়ত যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ধান সংগ্রহেও ত্রুটি থেকে গেছে। কংগ্রেস পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গত বছরের তুলনায় এ-বছরের ধান সংগ্রহের পরিমাণ আশাতীত কম, গত বছর যেখানে ৩·০৫, ৯৮৯ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ হয়েছিল—মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে, সেখানে এ-বছরে এ যাবৎ মাত্র ৬৭৯১৮ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ হয়েছে। এই হিসেব আমরা বিশ্বাস করি আর না করি একথা সত্য যে, এরকম তীব্র খাদ্যাভাব গত বছরেও দেখা যায়নি।

যাই হোক, আপাতত শোনা যাচ্ছে খাদ্যের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীরা রাজধানীতে গিয়ে ধরনা দেবেন; হয়ত সেটা আগস্টের শেষ কিংবা সেপ্টেম্বরের প্রথমে হতে পারে। খাদ্যশস্যের ঘাটতি ও সংকট মোচনের জন্যেই ধরনা দেওয়া হবে। যুক্তফ্রন্টের শরিকেরা মনে করেন পশ্চিম বাংলাকে তার প্রাপ্য খাদ্য দেওয়া হচ্ছে না। ওদিকে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম রাজ্যসভায় স্পষ্টই বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দ খাদ্য কমানো তো হয়ই নি, বরং বাড়ানো হয়েছে। কাজেই দিল্লিতে মন্ত্রীদের ধরনা দেবার পরিণতি হিসেবে আমরা আর কতটা খাদ্য পেতে পারি তা সন্দেহের বিষয়।

এদিকে, কলকাতায় একটি গুজব খুবই রটে গেছে যে, মফস্বল ও গ্রাম বাংলার মানুষ নিদারুণ খাদ্যাভাবের মধ্যে আজ মনে করছে, কলকাতা শহরকে খাইয়ে পরিয়ে সরকার খুশী রাখার চেষ্টা করছেন। স্বভাবতই সেই ক্রোধে কলকাতার সঙ্গে সমস্ত রকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেবার একটা প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে এদের মধ্যে। ট্রেন আটক করা হচ্ছে, রাস্তাঘাট বন্ধ করার চেষ্টা চলছে। অর্থাৎ কলকাতার বাইরে একটা বড় রকমের খাদ্য আন্দোলন গড়ে ওঠার এটা ভূমিকা।

অবশ্য আমরা মনে করি সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি থেকে খাদ্যাবস্থার এই তীব্র সংকটের কিঞ্চিৎ সুরাহা হবে। নতুন ধান উঠেছে। আগামী শীতে হয়ত খাদ্যের সংকট আরও কমে যাবে, কেননা এবারে মোটামুটি এ-যাবৎ বৃষ্টি খারাপ নয়, আমনের ফসলও ভাল হলে দুঃখ দুর্ভোগ কমারই কথা।

একটা খবর রটেছিল নক্সালবাড়ির প্রধান নেতা শ্রীকানু সান্যাল কলকাতায় এসেছিলেন। আত্মগোপন করার উদ্দেশ্যে। আত্মগোপন করার যে কয়টি জায়গার উল্লেখ ছিল, তার মধ্যে একটি উত্তর কলকাতার থিয়েটার। এই থিয়েটার যে-গোষ্ঠীর কব্জায় তাদের মূল সংযোগ ছিল মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে। কিন্তু যুক্ত ফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর পার্টির মধ্যে যে আদর্শগত ও নীতিগত মতবিরোধ দেখা দেয়, তার মধ্যে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে এই থিয়েটার গোষ্ঠী। সাম্প্রতিককালে এই গোষ্ঠী অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে মত ও পথ স্পষ্টভাবে প্রচার করেছে নক্সালবাড়ির কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে। এবং হয়ত মূল আনুগত্যের বিরুদ্ধে।

এই প্রচারের উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট না হলেও অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না। কয়েকদিন আগে 'নক্সালবাড়ি দিবস' উদযাপনের জন্য ঐ থিয়েটারে একটি 'সাংস্কৃতিক' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা ছিল সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা। এই অনুষ্ঠানের প্রধান নেতা ছিলেন কমরেড মাও-সে তুঙ। অবশ্য সশরীরে তিনি উপস্থিত ছিলেন না; কিন্তু সমগ্র অনুষ্ঠানটি জুড়ে ছিল কমরেড মাও-সে তুঙ-এর বিরাট প্রতিকৃতি। সৈনিকের বেশে মাও-সে তুঙের প্রতিকৃতি গোটা স্টেজ জুড়ে দাঁড়িয়েছিল; আর ছিল বড় বড় হরফে লেখা মাও-সে তুঙের বাণীর উদ্ধৃতি "রাইফেলই শক্তির উৎস"।

মাও-সে তুঙের প্রতিকৃতি ও তাঁর বাণী থেকে উদ্ধৃতি সামনে রাখা হয়েছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে। সমগ্র নক্সালবাড়ির ঘটনাকে মাও-সে তুঙের বাণী দিয়ে মুড়ে দেওয়াই ছিল মুখ্য ও প্রকাশ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এইটুকু বললেই হয়ত সবটুকু বলা হয় না। কারণ, যে কয়টি ছোট ছোট নাটিকা ও নৃত্যনাট্য এই অনুষ্ঠানে সংযোজিত করা হয়েছিল, সব কয়টিই কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত। এই অনুষ্ঠানগুলির ফাঁকে ফাঁকে প্রচারিত হয়েছিল কমরেড মাও-সে তুঙের "হুনান কৃষক আন্দোলনের তদন্ত রিপোর্ট" এবং "স্ফুলিঙ্গ দাবানলে পরিণত হবে"। আর দর্শকদের সামনে সযত্নে যেটা তুলে ধরা হয়েছিল তা হল রাইফেল ও লালঝাণ্ডা।

নিঃসন্দেহে বলা চলে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল। এই আয়োজনের পিছনে রাজনৈতিক চিন্তাধারাটাই কাজ করেছে বেশী। এই চিন্তাধারাকেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বার বার বলা হয়েছে সঙ্কীর্ণতাবাদের ঝোঁক। পার্টির পক্ষ থেকে এই ঝোঁককে যেভাবেই সমালোচনা করা হোক না কেন, উগ্রপন্থী মার্ক্সিস্টদের প্রচেষ্টা চলেছে নক্সালবাড়ির কৃষক আন্দোলনকে কমরেড মাও-সে তুঙের পোশাকে মুড়ে দিয়ে উগ্রনীতিকে সংঘবদ্ধ করা। প্রসারিত করা। তাই উগ্রপন্থীদের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানকে বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের এক অভূতপূর্ব ঘটনা বলে অভিনন্দিত করা হয়েছে, বিপ্লবী রাজনীতি ও বিপ্লবী সংস্কৃতির সংমিশ্রণ বলে জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছে।

এই স্বীকৃতির পিছনে রাইফেল-এর রাজনীতিটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই ফুটে ওঠে। আর সেই সঙ্গে উদ্দেশ্যটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কমরেড মাও-সে তুঙের অনুপ্রেরণা নিয়ে উগ্রপন্থী দল "জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের" পথে অগ্রসর হবার পরিকল্পনা করছে। হয়ত সে কারণেই উগ্রপন্থীদের মুখপত্রে 'গৃহযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যদি শত্রুপক্ষ 'গৃহযুদ্ধ' বাধাতে চায় "তোমরাও সংগঠিত ও সুসজ্জিতভাবে তাকে প্রতিরোধ করো।" ঘোষণা করা হয়েছে যুক্তফ্রন্টের অধিকাংশ শরিকই জোতদার-মজুতদারদের স্বার্থরক্ষার রাজনীতিতে বিশ্বাসী, "অতএব তাদের বিরুদ্ধেও শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা আছে।" এই রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেবার জন্য ঘোষণা করা হয়েছে যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার নবদ্বীপের দাবানল নেবাতে পারছে না, কারণ পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক জোয়ারের মুখে প্রবেশ করেছে। আক্ষেপ করে বলেছে যে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব আকণ্ঠ সংশোধনবাদী পঙ্কে নিমজ্জিত বলেই নবদ্বীপের বিক্ষোভকে কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। বিদ্রূপ করা হয়েছে যুক্তফ্রন্ট সরকারের দিল্লি অভিযানের সিদ্ধান্তকে।

অন্যদিকে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রতিদিন আওয়াজ তোলা হচ্ছে কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য ব্যাপক আন্দোলন চাই। মন্ত্রীদের নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসগৃহের সামনে ধরনা দেবার সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করা হয়েছে। আর সেই সঙ্গে উগ্রপন্থীদের "জুডাস" বলে অভিহিত করা হয়েছে। 'কুচক্রী' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকাই পার্টির ধ্রুবতারা হয়ে থাকবে এবং জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথেই চলবে তার বিজয় অভিযান। নবদ্বীপের বিক্ষোভকেও কংগ্রেসীদের প্ররোচনায় যুক্তফ্রন্ট সরকার বিরোধী অভিযান বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের বর্তমান লড়াইটা অত্যন্ত তীব্র মনে হতে পারে। কিন্তু বিচার করে দেখা যাবে যে, দুই পক্ষের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সরু সুতোর ব্যবধান। হয়ত যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধান শরিক হিসাবে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে উগ্রপন্থীদের মত প্রকাশ্যভাবে কমরেড মাও-সে তুঙের প্রতিকৃতি সামনে রেখে বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে রাইফেলকে সকলের সামনে তুলে ধরা সম্ভব নয়। হয়ত দুপক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া হবার সম্ভাবনা অদূরভবিষ্যতে দেখা যাবে না; কিন্তু 'বৈপ্লবিক' নীতি সম্বন্ধে কোন পক্ষেই উৎসাহের অভাব দেখা যাচ্ছে না।

তবু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে, দুপক্ষের

রাজনীতির লড়াইটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন মহলে। যেমন ছড়িয়ে পড়েছে ছাত্র-সংগঠনে। ছাত্র সংগঠনের মধ্যে মত-সংঘর্ষ কোন অভিনব ব্যাপার নয়। বহুদিন ধরে নানা আকারে এই সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে ছাত্রসংগঠনে। যার ফলে, ভিন্ন ভিন্ন ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক কারণে। ছাত্রদের রাজনীতি কোনদিনই অপ্রকাশিত ছিল না, আজও নেই। সেই রাজনীতির সংঘাতে ছাত্রসংগঠন ও আন্দোলন বহুবার দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। কিন্তু উগ্রপন্থীদের সঙ্গে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের যে লড়াই চলেছে তার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব সমর্থিত ছাত্র ফেডারেশনের মধ্যে।

ইতিমধ্যে সংঘর্ষও ঘটে গিয়েছে দুই ছাত্র দলের মধ্যে। ছাত্র ফেডারেশনের প্রাদেশিক সম্মেলনকে উপলক্ষ করে দুই দলে হাতাহাতিও হয়ে গেছে বেশ কয়েকবার। উগ্রপন্থী ছাত্রদল নক্সালবাড়ীকে সামনে রেখে শ্লোগান দিচ্ছে ফেডারেশনের বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। বলা হয়েছে, 'অত্যন্ত অগণতান্ত্রিকভাবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি এবং কলকাতার বিভিন্ন কলেজ ইউনিট এবং বিভিন্ন জেলার আঞ্চলিক কমিটিগুলোকে কার্যত বাতিল করা হয়েছে।' আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, সাধারণ কর্মীদের পাইকারী হারে সংগঠন থেকে বহিষ্কারের পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে।

এখানেও মতাদর্শের সংঘর্ষ। এখানেও অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ। এখানেও মার্ক্সবাদের লড়াই। বহিষ্কার ও কমিটি বাতিল করার পদ্ধতি দিয়ে বিপক্ষকে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। এই দ্বন্দ্ব ছাত্রমহলেই নয়, সাংস্কৃতিক মহলেও দেখা দিয়েছে। গণনাট্য সংঘের পশ্চিম বংগ রাজ্য শাখা সম্মেলনেও এই কথাটাই উচ্চারিত হ'তে শোনা গিয়েছে। এই সম্মেলনের মতে, গণনাট্য সংঘ একদিকে যেমন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির কাছে ভীতির সৃষ্টি করেছে, তেমনি হঠকারী উগ্রপন্থীদেরও শঙ্কিত করে তুলেছে। আরও উল্লেখযোগ্য যে, এই সম্মেলন বসেছে দশ বছর পর।

ছাত্র মহলে এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এই ধরনের রাজনৈতিক লড়াই বিসদৃশ মনে হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, রাজনীতিকে গণ্ডি টেনে এই-সব মহলের বাইরে আবদ্ধ রাখার তর্ক বহুদিনের পুরোনো। সাম্প্রতিক কালে এই কথাটা নূতন ক'রে তোলা হয়েছে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ান সম্পর্কে। যাঁরা মনে করেন, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ানের সঙ্গে কংগ্রেসের কোন রাজনৈতিক সম্পর্ক থাকবে না, তাঁরাও সংগঠনকে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে বাঁচাতে পারেননি। এমনকি তাঁদের প্রচেষ্টার ফলে ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনও দ্বিধাবিভক্ত হ'য়ে গিয়েছে।

কাজেই রাজনীতির প্রভাবমুক্ত থাকা কোন মহলের সংগঠনের পক্ষেই আর সম্ভব হচ্ছে না। বরং, বাইরের রাজনৈতিক সংঘর্ষ যত প্রকট হ'য়ে উঠছে এই সব মহলে রাজনীতির প্রভাব ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ তাই ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকে রাজনৈতিক মতাদর্শের ছাপ নিয়ে চলতে হচ্ছে। কর্মপন্থা নির্ধারিত করতে হচ্ছে। যে-ভাবেই বিচার করা যাক, দেখা যাবে যুক্তফ্রণ্টের ভিতরের মতবিরোধ বাইরের সংগঠনে ছড়িয়ে পড়ছে বেশী, প্রভাবিত করছে প্রত্যক্ষ ভাবে। বরং এই দ্বন্দ্বকে আরও তীব্র ক'রে দিচ্ছে ছাত্র ও সাংস্কৃতিক মহলে।

তাই দেখা যাচ্ছে, উত্তর কলকাতার থিয়েটারে কমরেড মাও-সেতুঙের প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে, তার "রাইফেলের" বাণীকে উচ্চকিত ক'রে রাজনৈতিক আসর মাতিয়ে তোলার চেষ্টা। দেখা যাচ্ছে উগ্রপন্থীদের সংগঠন, নক্সালবাড়ী ও কৃষক সংগ্রাম সহায়ক সমিতির ডাকে অনুষ্ঠিত জনসভায় কমরেড মাও-সেতুঙের বাণীকে সফল করার আহ্বান দিচ্ছেন নট, নাট্যকার যিনি থিয়েটার জগতে ইতিহাসকে বিকৃত করার অভিযোগে অভিযুক্ত। নাট্যশিল্পী কমরেড বলছেন, চীনের মূল শিক্ষা, বিপ্লবী যুগে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে কৃষি বিপ্লব সংগঠিত করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হ'তে হবে। তিনি মনে করেন, নক্সালবাড়ী যে আলো জ্বালিয়েছে তা সারা ভারতকে পথ দেখাবে।

কিসের পথ দেখাবে? কোন পথ দেখাবে? কমরেড মাও-সে তুঙের পথ? প্রশ্ন অনেক আছে। প্রশ্ন অনেক উঠেছে, আরও উঠবে। কারণ, উগ্রপন্থীরা মনে করেন, নক্সালবাড়ীর আন্দোলন চলছে এবং চলবে। কারণ, নক্সালবাড়ীর আন্দোলন ক্ষমতা দখলের লড়াই। অপরদিকে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির বক্তব্যও সুস্পষ্ট। যুক্তফ্রণ্ট গঠনের পর পশ্চিম বাংলায় বুর্জোয়া-জমিদার চক্র "আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে নক্সালবাড়ী থেকে ঘেরাও পর্যন্ত সমস্ত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে তাদের আক্রমণ পরিচালিত করছে।" অর্থাৎ "নক্সালবাড়ী থেকে ঘেরাও" সব আন্দোলনের সঙ্গেই পার্টির বক্তব্য ও যোগাযোগ অত্যন্ত স্পষ্ট।

এই স্পষ্ট কথাটা মেনে নিলে রাজনীতির লড়াইটা অবান্তর মনে হবেই। আরও অবাস্তব মনে হবে যখন দেখা যায়, এই পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়, পার্টি যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভাকে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে মনে করে এবং আগামী দিনে সমগ্র দেশ দৃঢ় সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করবে। এটা নিঃসন্দেহে সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি।

প্রতিশ্রুতিটা কি আকারে দেখা দেবে এখনই তা অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সংগ্রামের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে প্রতিটি সংগঠিত মহল থেকে। তাই নিঃসংকোচে প্রচার করা হচ্ছে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে কমরেড মাও-সে তুঙের বাণী 'রাইফেলই শক্তির উৎস'। আওয়াজ উঠছে সরকারকে আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার। আওয়াজ উঠছে কংগ্রেস, পি-এস-পি, এস-এস-পির মন্ত্রীসভাকে বানচাল করার চক্রান্ত ভেঙে দিতে হবে।

সমগ্রভাবে আওয়াজ উঠছে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাকে ব্যাপকতর করার জন্য।

চীন ভারত সীমান্ত লঙ্ঘন করেই আণবিক ক্ষেপনাস্ত্র ছাড়বে ॥
প্রতিরোধের জন্য আমাদেরও কাগজিক ক্ষেপণাস্ত্র আছে ॥
প্রতিবাদ পত্র
সুন্দরায়ার সহসা কেরালায় আবির্ভাবে মহা গণ্ডগোল ॥
হনুমানের উৎপাত ॥
কেরালা
শিক্ষা পরিকল্পনা
প্রিগুণা সেন
'এ শুধু মরীচিকা, মিলাইবে পিছে ॥'
Kutty
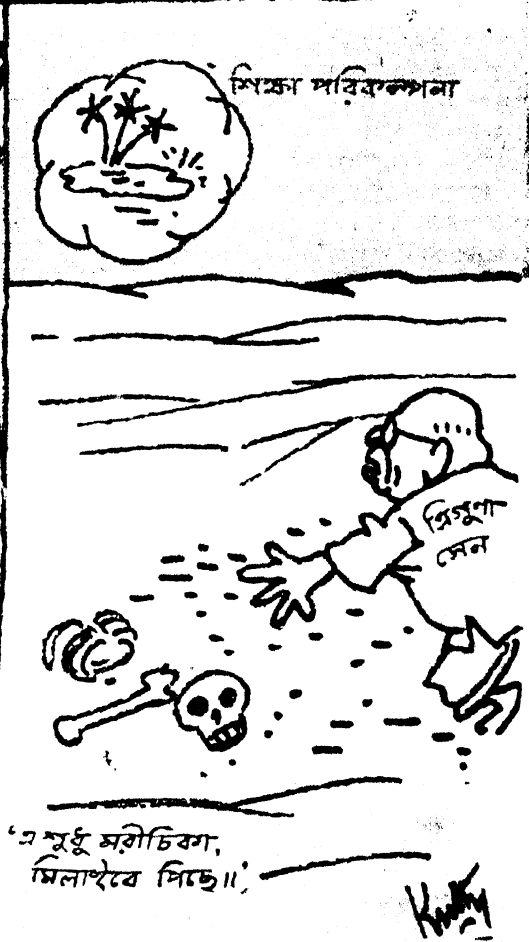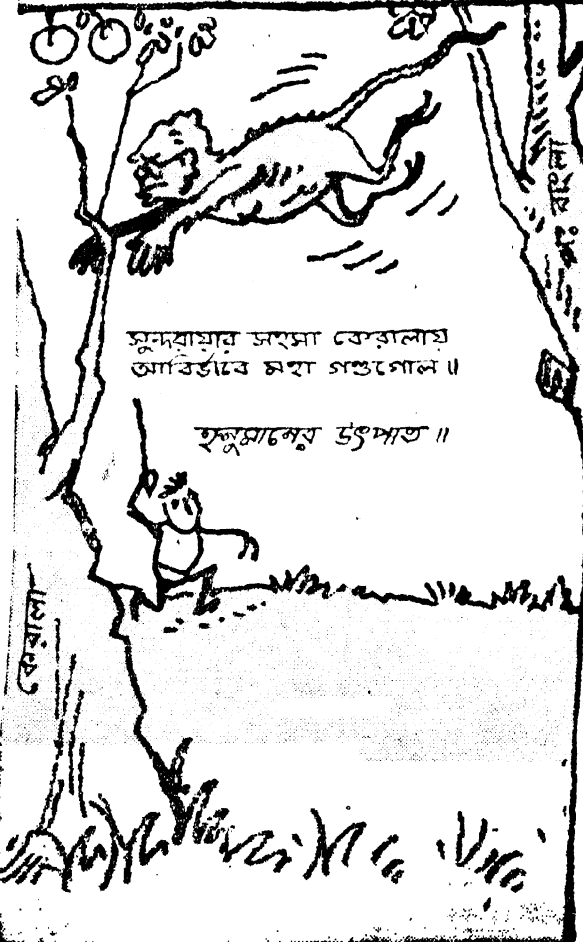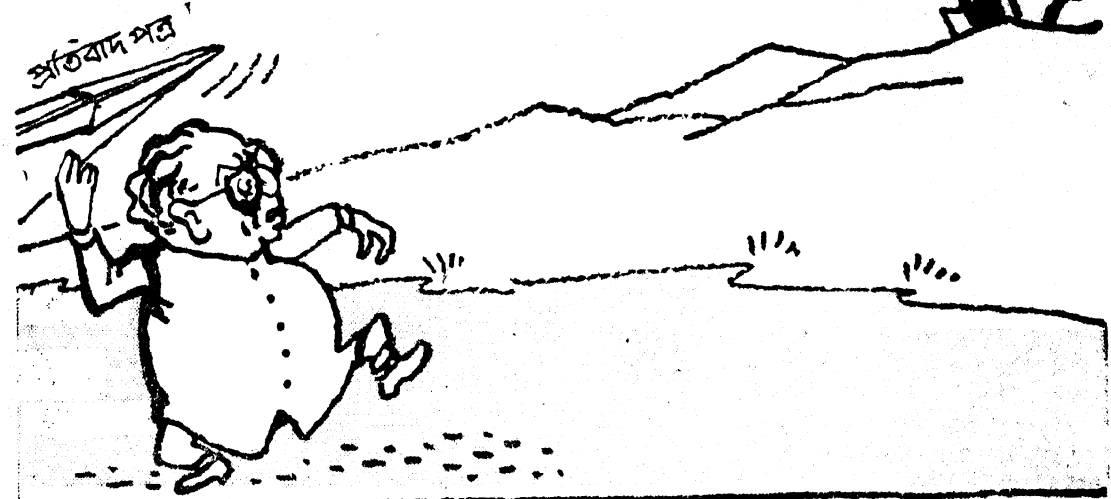
সার শিউসাগর রামগুলাম

সার শিউসাগর রামগুলাম নামটার মনোরম ভারতীয় ছাঁদ, পুরোভাগের ওই সার-টাই যা বিদেশী। সার শিউসাগর আমাদের কাছে একাধারে দেশী ও বিলিতী। তবু ভাবতে আনন্দ, এই যুদ্ধ-বিগ্রহ, হই হট্টগোলের মাঝে বিদেশে, তবে খুব বেশী দূরে নয়, ভারত মহাসাগরের বুকে ছোট্ট একটি দ্বীপ-রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই শ্রীযুক্ত শিউসাগর রামগুলাম। তাঁর পূর্বপুরুষের পিতৃভূমি ভারতবর্ষেও তিনি এসেছিলেন দু-এক বছরের মধ্যে তাঁর জন্মভূমি মরিশাস দ্বীপ থেকে। কোন ভারতীয় ভাষা তাঁর জানা না থাকাই সম্ভব। মরিশাসের সরকারী ভাষা ইংরেজী এবং ফরাসী। ফরাসী আছে কারণ এই দ্বীপের দখল ছিল ফ্রান্সের ১৮১৪ সন পর্যন্ত, তারপর থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত। মিশ্র ফরাসী-নিগ্রো জাতের "ক্রিওল" অধিবাসীও আছে মরিশাসে; আছে আরব গোষ্ঠীর মুসলমানও লাখখানেক। তবে মরিশাসে ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিন্দুরাই গরিষ্ঠ, তাদেরই নেতা প্রধানমন্ত্রী সার শিউসাগর রামগুলাম। সম্প্রতি সাধারণ নির্বাচনে সার শিউসাগরের কোয়ালিশন জয়ী হয়েছে। তার চেয়ে বড় কথা, এই নির্বাচনের রায় অনুযায়ী চলতি বছরেই মরিশাসের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ব্যবস্থা।

ভারত মহাসাগরের ছোট একটি দ্বীপ আর তার আশেপাশে ছড়ানো-ছিটানো বিন্দুপ্রমাণ কতকগুলি আশ্রয় মহাসাগরের বুকে—এই নিয়ে মরিশস-রাষ্ট্র। ব্রিটেনের এখন ছাড়বার পালা, যতটা সম্ভব নিজের দায়-দায়িত্ব গুটিয়ে আনা। মরিশাসকে তাই স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য খুব বেশী ঝক্কি পোয়াতে হয়নি। মরিশাস স্বাধীন হলেও তাকে নানারকম প্রয়োজনে ব্রিটেনের সাহায্যের উপর ভরসা করতে হবে। সার শিউসাগর অবশ্য ভারতের কাছেও আশা করেন অনেক কিছু, মরিশীয়-হিন্দুদের পূর্বপুরুষের পিতৃভূমি যদি মরিশাসে কলকারখানা গড়বার কাজে সহযোগিতা করে তবে তাতে তারা খুশীই হবে, বিদেশী আধিপত্যের দুঃস্বপ্ন দেখবে না। মরিশাসে যাতায়াতের সুবিধার জন্য এয়ার-ইণ্ডিয়ার নতুন সার্ভিস সে-দিক দিয়ে শুভ সূচনাই মনে করা যেতে পারে।

রাজনীতির হিসাব-নিকাশ অবশ্য কোন দেশেই একেবারে পাকা হয় না, মরিশাসেও না। ছোট্ট দ্বীপ, মাত্র আট লক্ষ লোক; তার মধ্যে হিন্দুরা গরিষ্ঠ কিন্তু মোট জনসংখ্যার ৫২ ভাগ মাত্র। বাকী ৪৮ ভাগের মধ্যে আছে মিশ্র ইউরোপীয় নিগ্রো, ইন্দো-মরিশীয় মুসলমান এবং সামান্য কিছু চীনাও। সার শিউসাগরের দল লেবার পার্টি মরিশীয় হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করে। হিন্দু মানে এখানে ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়-সম্ভূত। এক সময় গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উত্তরপ্রদেশ, বিহারের বহু হিন্দু চাষী পরিবারের জোয়ানরা চলে যায় —ঠিক চলে যায় বলা উচিত নয়—তাদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে ইংরেজের আড়কাঠিরা নিয়ে যায়—মরিশাস, ফিজি, গিয়ানা, ট্রিনিডড প্রভৃতি ব্রিটিশ উপনিবেশে ক্ষেত-খামারে মজুরীর জন্য। পৃথিবীর দূর-দূরান্তে তাই এখনও ভারতীয় বংশোদ্ভূত বহু হিন্দু, কিছু কিছু মসলমানের বসতি। ধর্মে হিন্দু এরা এখন অনেকেই হয়তো নয়, ভারতীয় ভাষাও স্বভাবতই বিস্মৃত, কেবল সামাজিক আচার আচরণে নামকরণে ভারতীয়ত্ব এখনও সজীব। হিন্দু ধর্মাচরণের অভ্যাসও একেবারে লুপ্ত হয়নি, বরঞ্চ ভারতের জাতীয় জাগরণের ঢেউ মহাসমুদ্র পেরিয়ে মরিশাস, ফিজি, গিয়ানায় হিন্দুত্বকে অল্পবিস্তর পুনরুজ্জীবিত করেছে। নাইপলের কোন কোন উপন্যাসে পাওয়া যায়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের উপনিবেশগুলিতে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্যে হিন্দু রীতিনীতির বর্ণনা।

সে যাই হোক, মরিশাসের শতকরা ৫২ জন হিন্দু অধিবাসী সার শিউসাগর রামগুলামের লেবার পার্টির নেতৃত্বে রাজনৈতিক ক্ষমতায় একেবারে সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। কারণ মিশ্র ইউরোপীয় নিগ্রো যারা সংখ্যায় নিতান্ত নগণ্য নয়, শতকরা ৩৮ ভাগ, তারাও ক্ষমতার দাবিদার। কাজেই জোটবন্ধন, কোয়ালিশন। মরিশাসে আবার একটা রাজনৈতিক দলের নাম ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফরওয়ার্ড ব্লক। তারপর মুসলিম কমিটি অব অ্যাকশন। একটা সুলক্ষণ, মরিশাসের মুসলমানরা হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে জিগীর তোলে নি, তাদের বেশীর ভাগ ভোট দিয়েছে সার শিউসাগর রামগুলামের কোয়ালিশন, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ পার্টিকে—এই পার্টি অর্থাৎ কোয়ালিশনের সামিল সার শিউসাগরের লেবার পার্টি, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ ফরওয়ার্ড ব্লক আর মুসলিম কমিটি অব অ্যাকশন। বিরোধী দল মরিশীয় সোস্যাল ডেমক্র্যাট পার্টির সমর্থক হল মিশ্র ইউরোপীয়-নিগ্রোরা। সার শিউসাগরের কোয়ালিশন জিতেছে ৩৯টি আসনে, বিরোধীপক্ষ ২৩টিতে।

মরিশাসে সাধারণ নির্বাচনের মূল বিচার্য বিষয় ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা, না ব্রিটেনের সঙ্গে পরস্পর দায়-দায়িত্বে সহযোগিতার সুদৃঢ় বন্ধন। সার শিউসাগরের কোয়ালিশন পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে, বিরোধী দল চেয়েছে ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগী-রাষ্ট্র সম্পর্ক, কতকটা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ছোট ছোট দ্বীপ-রাজ্যগুলির মত। মরিশীয় জনতার রায় পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে। প্রধানমন্ত্রী সার শিউসাগর মরিশাসের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব সম্ভবত এ-বছরেই পেয়ে যাবেন। কিন্তু তাছাড়া, ব্রিটেনের কাছ থেকে তাঁর আরও কিছু পাওয়ার আশা, পাওয়ার প্রয়োজনও জরুরী। ছোট্ট মরিশাসের জনসংখ্যা ঘন প্রতি বর্গমাইলে এক হাজার লোক। সম্পদ বলতে আখের ক্ষেত (রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৯৮ ভাগই চিনি), আর কিছু চা ও তামাক। শতকরা কুড়িজন সক্ষম লোক বেকার। রপ্তানি চিনির বাজার ওঠা-নামার সঙ্গে মরিশীয়দের ভাগ্যচক্রের আবর্তন। সার শিউসাগরের আশা ব্রিটেন বিমুখ হবে না, মরিশাসের চিনি সম্পর্কে সুবিধাজনক চুক্তি-ব্যবস্থা চালু রাখবে এবং স্বাধীন মরিশাসের বৈষয়িক উন্নয়নে সাহায্য দেবে। পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকার সাহায্য থেকেও স্বাধীন মরিশাস বঞ্চিত হতে পারে না।

মরিশাস স্বাধীনতা লাভের জন্য যে প্রস্তুত হয়েছে সেটাই আনন্দের। স্বাধীনতার দায়-দায়িত্ব সমস্যা ইত্যাদির ভাবনা পরের কথা। প্রতিরক্ষার ভাবনা মরিশাসের মত ছোট একটি দ্বীপ-রাষ্ট্রের নয়। সে-ভাবনার ভার ব্রিটেন আমেরিকার সহযোগিতায় আগেই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। ব্রিটেনের নতুনতম পত্তন ভারত মহাসাগরীয় রাজ্যখণ্ডে সেই প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে বা আয়োজনে বিমান এবং নৌঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতঃপর একমাত্র কাজ যা বাকী সেটি হল ব্রিটেনের সঙ্গে মরিশাসের প্রতিরক্ষা চুক্তি এবং অবশ্যই যথারীতি মরিশাসকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণার ব্যবস্থা।

২১।৮।৬৭

লক্ষ্মী রাজা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

রাজা, তোমার বাড়ির সামনে প্রকান্ড গেট
ঢুকতে গেলে থমকে দাঁড়াই : মাথাটা হেঁট—
দুই দারোয়ান প্রশ্ন করে—কোথায় যাবি?
জানি, তোমার দরজা খোলার মতন চাবি
নেই, তবু তো ইচ্ছে করে, রাজার কাছে
গিয়ে দাঁড়াই, বলি—অনেক কথা আছে,
যে-কথা কেউ তোমার সঙ্গে সাহস করে
বলতে চায় না; রাজা, নিত্য তিন প্রহরে
তিন শো ভৃত্য শাসন করো, চতুর্থটি
যেমন কাটাও, একলা শুয়ে?...একটি নটী
কিংবা সখা থাকলে তোমার নির্জনতা দুর্বিষহ
লাগতো না গো! রাগ করলে?...

লক্ষ্মী রাজা, বেরিয়ে এসো
বেরিয়ে উচ্চকণ্ঠে কহো—
'এই ভিখারীর সঙ্গে আমার অনেক কথা
গোপন কথা ছিল, তোমরা পথ ছাড়ো, যাও,
এই ভিখারীর সঙ্গে আমার নির্জনতা—
প্রাসাদ ভর্তি ভৃত্য, আমায় এক-মুহূর্তে স্বাধীনতা
ফিরিয়ে দাও।'

তবুও শোনে রাত্রিদিনে, ঊর্ধ্বমুখ

বিজয়া দাশগুপ্ত

আলগা হাঁটে এদিক ওদিক কোঁকড়া চুল
ফ্যাকাশে চোখ চোকো কপাল, চক্ষুশূল-
চিকন হাসি ছড়ানো ঠোঁট তুলোর হাত
মলিন অঙ্গ, ধুলোর বাক্সে জলপ্রপাত
বলল এসে সপ্রতিভ সটান বুক—
'তুমি আমার, তুমি আমার দুঃখসুখ।'

কোন্ ভরসায় সাহস করে পাহাড় ছুঁতে
শ্যাওলাপানায় ময়লা ডোবা ওই নিচুতে
আটকে আছে, মাঝে মধ্যে ফুটকি ওঠে
কালেভদ্রে একটা দুটো শালুক ফোটে
শরৎকালে, শ্যাওলা ডোবা ওই নিচুতে
কোন্ ভরসায় সাহস করে পাহাড় ছুঁতে।

অটুট পাহাড় সেই উঁচুতে অংশুমান
ছড়ায় আলো মেঘকুয়াশার মেহেরবান
দৃপ্ত হাসি স্পর্ধিত শির স্থির চিবুক,
তবুও শোনে রাত্রিদিনে, ঊর্ধ্বমুখে,
আকাশ ভরা—'তুমি আমার, দুঃখসুখ।'

শিকারী কুকুরের সঙ্গে

তারাপদ রায়

জঙ্গলের ধারে বাড়ি, কুকুর ও বন্দুক,
ছিলো আমার-ও স্বপ্ন।
ঝোপের ভিতরে বাঘ, পোড়া বারুদের গন্ধ
দ্রুত ছুটে যাওয়া পলাতক রক্তের ফোঁটায়
ছিলো স্বপ্নে আমার-ও চঞ্চলতা।

শুধু বিশেষ বাধা এই
ট্রিগার না ছুঁয়ে থাকলেও
আমার হাত এমনি-এমনিই কাঁপে
সে তুমিও ভালভাবে জানো।

তবু বারবার কেন জঙ্গলের গল্পে ফিরে যাও।
বন্দুকের নল, রক্তের ফোঁটা,
কেন আমাকে শিকারী কুকুরের সঙ্গে
কেন ছুটতে বলো?

এক পোশাকের মধ্যে দুজন

মঞ্জু মিত্র

এক পোশাকের মধ্যে দুজন
বারান্দা নেই—
আমার আঠারো ওনার আশি
এক পোশাকের মধ্যে দুজন
এক ডালেতেই করছি কুজন
এক উনোনেই
সর্বসমেত একটি হাঁড়ি
কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীসরা
আড়াআড়ি টাঙিয়ে রাখি
খাঁচার পাখি।

এ-কূল রাখি ও-কূল রাখি
কখন টাটকা কখন বাসী
আমার আঠারো ওনার আশি
এক পোশাকের মধ্যে দুজন
আসলে আমরা ভালোই বাসি॥

সহজলভ্য ভেজিটেবল একমাত্র ঘাস

সুনন্দর জার্নাল

'নেতি-নাস্তি—'

ভাইপো এসে বললে, 'পাঁউরুটি পাওয়া গেল না।'

'গেল না?'

'না।'

আমি মনে মনে এক ধরনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করলুম। প্রত্যেকদিন এত জিনিস পাওয়া যায় না এবং না পেতে পেতে না-পাওয়ার এমন একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে যে হঠাৎ একটা কিছু অবলীলাক্রমে পেয়ে গেলে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয়—যেন কেউ বোকা বানিয়ে দিয়েছে এই জাতীয় একটা আত্মগ্লানি জেগে ওঠে। মনস্তত্ত্বে একে কী বলে জানি না, কিন্তু একেবারে ব্রহ্ম-চিন্তায় পেয়ে বসে আমাকে। ব্রহ্ম মানেই 'নেতি—নেতি'—কিন্তু হঠাৎ তিনি 'ইতি' হয়ে গেলে ধাক্কাটা সামলানো শক্ত।

তবু আমি নিয়মমাফিক উত্তেজিত হয়ে উঠলুম, কারণ এ সব ক্ষেত্রে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের কিছু চটে-যাওয়া উচিত। বললুম, 'ঈস, দেশটা একেবারে চোরে-জোচ্চোরে ছেয়ে গেল।'

ভাইপো বললে, 'হুঁ।'

'তা হলে চার পয়সার মুড়িই নিয়ে আয়। আমাদের সনাতন জাতীয় খাদ্য।'

ভাই পো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'কী হল? দাঁড়িয়ে আছিস যে?'

'মুড়ি আনতে হলে চার আনার আনতে হয়। চার পয়সায় তো তোমার—'

চার পয়সার (মানে নতুন ছ' পয়সার) মুড়ির স্বল্পতা কিংবা আমার উদারিকতা—কোনটা যে ওর লক্ষ্য সেটা ভালো বুঝতে না পেরে আমি আরো চটে গেলুম। কুড়িটা নয়া পয়সা ওর দিকে প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে বললুম, 'দাস্ ফার অ্যান্ড—! যা, নিয়ে আয়। যা হয়, ওতেই হবে।'

আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন, কোন্ মানসিক কুটিলতার ফলে জানি না, আজকাল কিন্তু আমার বেশ লাগছে। 'খরচ বাড়ছে—আর পারা যায় না—' এই আর্তনাদটা রাত-দিন কানের কাছে শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আমি তো দেখছি কম-খরচের এমন শুভ-যোগ আর আসে নি। মোরারজী আমাদের প্রায় নির্ধূম করে ছেড়ে দিয়েছেন—দু-একটা সিগ্রেট যা জোটে অত্যন্ত হিসেব করে খাই, এবং কোনো বন্ধুর এখন আর এমন 'গাট্‌স্' নেই যে ফস করে বলে বসতে পারে: 'এই, একটা সিগ্রেট দে তো!' এ যেন সেই ওয়ার-টাইম ব্রিটেনের অবস্থা—কাউকে উপযাচক হয়ে সিগ্রেট দিতে গেলে এই অকল্পনীয় বদান্যতায় সে স্তম্ভিত হয়ে যেত, সন্দেহ করত—লোকটা জার্মান-স্পাই কি না! এক জোড়া জুতোয় আমি এতদিন চালাতে পারি এবং পাড়ার চেনা বুড়ো মুচি যে 'আলিবাবা'র 'বাবা মুস্তাফা'র মতো টুকরো টুকরো শরীরকেও জোড়া দিতে সিদ্ধহস্ত—এ-সব তথ্যই বা এর আগে অবগত হওয়া যেতো কী করে।

আমি সব চাইতে পুলকিত বোধ করি বাজারে গেলে। এমনিতেই নেই—নেই, তার ওপর যখন-তখন যত্রতত্র ট্রেন আটক, রাস্তায় ব্যারিকেড। অতএব বাজার এক-একদিন ব্রহ্মের মতো শূন্যতায় ব্যাপৃত হয়ে থাকে। পটোল নেই, ঝিঙে নেই, ঢ্যাঁড়শ নেই—এমন কি বাঙালীর চিরন্তন 'অ্যাপেটাইজার' পুঁই-ডাঁটা পর্যন্ত নিরুদ্দেশ। কেবল এক টাকা কুড়ি কিলোর আলু চোখ পাকিয়ে বসে থাকে আর তৃতীয়ার চাঁদের মতো এক-এক ফালি করুণ কুমড়ো মিটমিট করে তাকায়। আমার আত্মপ্রসাদ বোধ হয় দুটো

চিনিতে ডায়েবিটিস

ভাতে আলস্য ও মেদবৃদ্ধি

পুঁই শাকে শ্লেষ্মাবৃদ্ধি

ফেরে। বাজারের টাকা প্রায় ইনট্যাক্ট ফিরে আসে, আর পাড়ার সেই ভদ্রলোক—যিনি সতেরো শো টাকা মাইনে পেয়েও নিজের হাতে বাজার করতে ভালোবাসেন—তিনি অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। মনে মনে বলি, 'পথে এসো। পকেটে টাকা থাকলে কী হয়, তোমার টাকা এখন সেই কুয়োমিনটাং ডলারের মতো—এক বস্তা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেলেও একটা বিড়ি জোটাতে পারবে না। টাকায় কী-ই না হয়? না—কিছুই হয় না, তোমাকেও আজ আমার মতো কলমী শাকের ঝোল আর কুমড়োর ঘন্ট খেয়ে থাকতে হবে।'

নেই-নেই-নেই।

না-থাকার সুবিধেটা সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে বুঝতে পারছি এখন। বিকেলে হয় তো একদল আত্মীয়-আত্মীয়া চলে এলেন বেড়াতে। কেন যে আসেন কে জানে—হয়তো বাড়ির চায়ের খরচটা বাঁচাতে চান, এমনও হতে পারে। তাঁদের শুধু স্যাকারিন-মধুর (এর মধ্যে একটা দীর্ঘমেয়াদী লাভজনক ব্যাপার আছে, স্যাকারিন আর রুটির কল্যাণে দেশ থেকে ডায়াবেটিজ লুপ্ত হল বলে) চা খাওয়ালেই তো হয় না—একটু মিষ্টি-ফিষ্টিও খাওয়াতে হয়। ভাইপোকে টাকা দিয়ে দোকানে পাঠাই, সে এসে জানায় —'কোনো মিষ্টিই পাওয়া গেল না—চিনি নেই, দু' দিন ট্রেনের গণ্ডগোলে ছানাও আসে নি।' হৃদয় একেবারে পুলকে ময়ূরের মতো নাচতে থাকে, মুখ যথাসম্ভব বিষণ্ণ করে বলি, 'দেখলেন কাণ্ডটা। আপনাদের জন্যে যে একটু মিষ্টি আনিয়ে দেব—' তাঁরা শুকনো হাসি হেসে বলেন, 'কী দরকার, চা-ই তো যথেষ্ট।' হয়তো মনে মনে ভাবেন, বাস ভাওটাই বরবাদ হয়ে গেল।

বেশ সুখে আছি মশাই, এই 'নেতি'র অবদানে। বাড়ির গৃহিণীরা বেরুবার মুখেই এক-একটা ফর্দ ধরিয়ে দেন, ওটা তাঁদের দৈনন্দিন বিলাস। ইচ্ছে করেই ভুলি কিংবা অবস্থাচক্রেই ভুলে যাই—বাড়িতে ফিরে একটা সরল এবং দ্বিধাহীন কৈফিয়ত দিলেই চলে—'বাজারে নেই, পাওয়া গেল না।' গৃহিণীরা সন্দিগ্ধ হতেও সাহস পান না—কারণ এত জিনিস পাওয়া যায় না এবং এত জিনিস যখন-তখন উধাও হয়ে যায় যে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁরা বলেন, 'উঃ! —এ হচ্ছে কী? মানুষ বাঁচবে কী করে?' উত্তরে পরম জ্ঞানের বাক্যটি শুনিয়ে দিলেই চলে : 'বেঁচে থাকবার দরকারটাই বা কী? রোজই তো কত লোক মারা যাচ্ছে। আর একবার মারা যেতে পারলে কোনো ভাবনাই নেই—কোনো জিনিসই তখন আর—'

আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরতে রাত হলে তখনো এই মনোরম সাফাই।

'মানে—একজন বলছিল আড়াই কিলোর মতো চিনি যোগাড় করে দিতে পারে, তাই—'

'পাওয়া গেল?'—উৎসাহে গৃহিণীর চোখ উজ্জ্বল। ঘড়ির কাঁটা তখন নেপথ্যে।

'পাওয়া যেতে পারে। তবে দু'-একদিন হয়তো দেরি হবে।'

আর এই দু-একদিনে এত অঘটন ঘটে যায়, এত পাওয়া যায় না এবং এত এমন আকস্মিকভাবে পাওয়া যায় যে তার শকে গৃহিণীর আর চিনির কথা মনেও থাকে না।

ভাইপো মুড়ি নিয়ে এল। চিবুতে চিবুতে ঠোঙাটার দিকে নজর পড়ল আমার। বেশ মনোরম জ্ঞানগর্ভ বাক্য সব। ঠোঙাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমি সেগুলোর পাঠোদ্ধার করতে লাগলুম।

—"কহিলেন, ত্যাগ করিবে। ত্যাগের অপেক্ষা সুখ নাই। মহাত্মা হরিশ্চন্দ্রের কথা স্মরণ কর। সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া শ্মশানে চণ্ডাল হইলেন। তাঁহার রাজৈশ্বর্য গেল কিন্তু আত্মার যে ঐশ্বর্য—"

চোখ বুজে, মুড়ি চিবোতে চিবোতে আমি সেই আত্মার ঐশ্বর্য অনুভব করতে লাগলুম॥

সাহিত্যে ও জীবনে কাহিনী

সুবোধ ঘোষ

দ্বাদশ শতকের কাশ্মীরী কলহন তাঁর ইতিহাস-গ্রন্থ 'রাজতরঙ্গিণী'র প্রথম তরঙ্গের আরম্ভেই এমন একটি মন্তব্য করেছেন, যাকে বলা চলে, ইতিহাস রচনার একটি নীতিবিধান। 'সৌন্দর্যের স্রষ্টা প্রজাপতি-সদৃশ কবি ভিন্ন আর কে অতীতকে প্রত্যক্ষের বিষয় করে তুলতে পারে?' কলহনের মতে, কবিত্ব অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি থাকা চাই, তবে প্রকৃত ইতিহাসের রচনা সম্ভব হতে পারে। তবে তো বলতে হবেই যে, কাহিনীই প্রকৃত ইতিহাস, কারণ কাহিনী ছাড়া আর কে অতীতের রূপটিকে প্রত্যক্ষের বিষয় করে তুলতে পেরেছে? আধুনিক কালেরও কোন কোন সাহিত্য-সমালোচকের মুখে এমন অভিমতের কথা শুনতে পাওয়া গিয়েছে যে, কাহিনী বস্তুত ইতিহাস। কেউ কেউ বলেন, কাহিনী বস্তুত বাইওগ্রাফী, জীবনচরিত। হ্যাঁ, প্রকৃতিতে ও কৃতিত্বে কাহিনী তাই বটে। সেই সঙ্গে এই সত্যটুকুও বুঝে নিতে হবে যে, জীবনের রূপ প্রকাশ ও পরিবেশন করে যে ইতিহাস, কাহিনী হলো সেই ইতিহাস। এবং, যদি জীবনচরিত বলতে হয়, তবে বলতে হবে, কাহিনী হলো মানবতার জীবনচরিত। মহিলা কবি তরুদত্তকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি এত বেশি নভেল পড়েন কেন? তরুদত্ত বলেছিলেন—হ্যাঁ নভেল পড়ি, তার মানে আমি মানুষের জীবনের ইতিহাস পাঠ করি। মন্তব্যটি যেন এই উপলব্ধিরই স্বীকৃতি যে, কাহিনী হলো ইতিহাস ও জীবনচরিতের রূপময় সমন্বয়, কিংবা সমন্বিত রূপ।

ঐতিহাসিক কলহন যাকে কবিত্ব ও দিব্যদৃষ্টি বলেছেন, সরল অর্থে তাকে কল্পনাশক্তিও বলা চলে। শিল্পকলার ইতিহাসে এমন ঘটনা ও অভিজ্ঞতার অভাব নেই, যাতে দেখা গিয়েছে, কল্পনাশক্তির দীনতা নিয়ে আঙ্গিক ও কারুতা চমৎকৃত করবার খুব নিষ্ঠাশীল প্রয়াসও কোন মনোরম, এমন কি নয়নরম্য রূপও সৃষ্টি করতে পারেনি। বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব যেখানে শিল্পীর আগ্রহের প্রধান সেবা হয়েছে, সেখানে সৃষ্টিও উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে। যথা, স্থাপত্যের বারোক এবং রোকোকো। কাহিনীর ইতিহাসেও দেখা যায় যে অনেক মুখর বারোক ও রোকোকো মানুষেরই ভুল অভিরুচির অভ্যর্থনায় ক্ষণকালের জয়টিকা কপালে অঙ্কিত করেছে, তারপর কঠোর উপেক্ষায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

বাৎসায়নের কথিত চিত্রষড়ঙ্গের পাঁচটি অঙ্গ বস্তুত কারুক্রিয়া, চিত্রকে নয়নরম্য চমৎকারিতায় বিভূষিত করা। রূপভেদ ভাব প্রমাণ সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ; শিক্ষা পেলে সকলেই এই কাজ করতে পারে, করেও থাকে। আরও যে একটি অঙ্গ আছে, তাকে বলা হয়েছে লাবণ্যযোজনা। চিত্রকে মনোরম পরিণামে পৌঁছে দিতে পারে যে, সে এই লাবণ্য-যোজনা। বাৎসায়নের মতে লাবণ্য-যোজনাও একটি আঙ্গিক কৃতিত্ব বলে অভিহিত হয়েছে বটে, কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, লাবণ্য-যোজনা নামে এই আঙ্গিকই হলো রূপের আসল আত্মিক। কোন গুরুমহাশয় লাবণ্য-যোজনা শিখিয়ে দিতে পারবেন না। কাহিনীর সার্থক নির্মাণেও এই লাবণ্য-যোজনা সব চেয়ে বড় কাজ। শিল্পীর ভাবময় সম্বোধি হতে উদ্ভূত কল্পনা ছাড়া আর কারও পক্ষে রূপের লাবণ্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। জ্ঞান ভাল বুদ্ধিও ভাল। কিন্তু নিতান্ত / এই দুই ভাল সমন্বিত হয়েও কাহিনীর কাম্য ভাল সৃষ্টি করতে পারে না। রামপ্রসাদের ভাষা অনুসরণ করে বলা যায়—'মনোময় মাণিক্য জেলে' কাহিনীর প্রাণের আরতি করতে হয়। বনমাঝে কি মনোমাঝে! যে বাঁশির স্বর বনমাঝে বেজেও মনোমাঝে বাজে; সেই বাঁশিই প্রকৃত গুণীর বাঁশি।

বিষয়টিকে আরও একটু স্পষ্ট করে বলবার ও বুঝবার সুযোগ আছে। মুনি বাল্মীকির রামায়ণ হলো কাব্য করে বলা কাহিনী। দেখা যায় কোন কোন ভক্ত কবি এই কাহিনীকে নতুন করে লিখে কাহিনীর নাম দিয়েছেন—রাম-রসায়ন। নামকরণের ব্যাপার বটে, কিন্তু নিছক নামকরণ নয়। বরং বুঝতে হয় যে, ভক্ত-কবি যেন কাহিনীর একটি দার্শনিক নির্ণয় ঘোষণা করে দিয়েছেন। জীবনের বিপুল বৈচিত্র্য ও বাস্তবতার তথ্য যদি রসিত হতে না পারে, তবে সেটা কাহিনী হয়ে উঠতে পারে না। ভঙ্গীর সৌষ্ঠব ও কারুতা চমৎকার হয়েও এই রসায়ন সম্ভব করতে পারে না। যে পারে, তার নাম কল্পনা। মধুকরী কল্পনাই নিখিল জীবনের রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শের পরাগ আহরণ করে, অনুভূত জগতের মায়িক সত্যের স্বরূপ সংগ্রহ করে, অভিজ্ঞতার সংসারের যত কামনার রূপময় আবেগ সঞ্চয় করে; এবং তাই দিয়ে নিষ্প্রাণ তথ্যের

রূপসীকে প্রাণময়ী কাহিনীতে পরিণত করে।

দেবী মিনার্ভার নক্সী কাঁথাতে রঙীন সূতোর কারুকাজে সমুদ্রের জলের ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস এমনই নিখুঁত বাস্তবতায় মূর্ত হয়েছিল যে, দর্শকা নারীর দল ভয় পেয়ে দূরে সরে যেত; ভেসে যাবার ভয়ে। ইন্দ্রপ্রস্থের প্রাসাদেও স্থপতি ময়দানবের কৃতিত্বে এইরকম চমৎকার ছলনা সৃষ্টি করা হয়েছিল। স্ফটিকের চত্বরকে সরোবর বলে ভুল করেছিলেন দুর্যোধন। কাহিনীতেও কারুতার কৌশলে এবং কৃতিত্বে এধরনের চমৎকার ছলনার, বাস্তবতার নিখুঁত প্রতিচ্ছবির নির্মাণ সম্ভব। কাহিনীর বহিরঙ্গে এধরনের কঠিন কায়দার বিস্ময় ও চমৎকার বিভ্রমের স্থান থাকতে পারে; কিন্তু কাহিনীর অন্তরঙ্গে এসবের কোন স্থান নেই। এসবের প্রভাবে ও কৃতিত্বে লাবণ্যযোজনার কোন অঙ্গীকার নেই। এরা খুব বাস্তবিক সত্যের রূপ বটে, কিন্তু মায়িক সত্যের রূপ নয়।

কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণ কাহিনীতে রত্নপালঙ্কে শয়ান লঙ্কেশ্বর রাবণকে চামরের বাতাস দিয়ে সেবা করছে যে-সব ধাতুনির্মিতা কিংকরী, তারাই কি তবে মায়িক সত্য? কখনই নয়। তারা রোবোট নারী, তাদের ব্যক্তিত্ব নেই। তাদের লজ্জা-ভয়-অভিমান নেই। তারা সত্যের ব্যঙ্গ-মূর্তি। এধরনের নিদারুণ বাস্তবানুগ কৃত্রিমতার রূপও মায়িক সত্যের রূপ নয়।

বিখ্যাত বাঙালী সাহিত্যিক শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কাহিনীর এই প্রাণ-সম্বলের পরিচয় আর একভাবে বুঝিয়েছেন। তাঁরই অভিমতের কথা: "শাস্ত্র তিন রকমে সাধকগণের সহিত কথা কহিয়া থাকেন। প্রথম—রাজবাণী। যথা বেদ ও খৃহাসূত্র। এখানে কেবল হুকুম, কেবল আদেশ। দ্বিতীয়—মিত্রবাণী। যথা দর্শনশাস্ত্র। মিত্রের সহিত কথা কহিতে হইলে যেমন যুক্তিতর্কের অবতারণা করিতে হয়, তেমনই দর্শনশাস্ত্রে কেবল বিচার; কেবল তর্ক আছে। রাজাদেশের ন্যায় কোন আদেশ দর্শনশাস্ত্র

করে না। 'আমি বলিতেছি' বলিয়া কোন কথা মান্য ও গ্রাহ্য করিতে কাহাকেও বলে না। তৃতীয়—কান্তাবাণী। যথা পুরাণেতিহাস। স্ত্রীকে কোন কথা বুঝাইতে হইলে যেমন গল্পগাছা করিয়া বুঝাইতে হয়, যেমন কাহারও তুলনা দিয়া বলিতে ও বুঝাইতে হয়, পুরাণ শাস্ত্রও তেমনই বেদ এবং তর্কশাস্ত্রের সিদ্ধান্তসকল আখ্যায়িকা ও উপখ্যানের সাহায্যে জনসাধারণকে বুঝাইয়া থাকেন।"

পৌরাণিক কাহিনীকে বলা হয়েছে, কান্তাবাণী। এই মন্তব্যের সূত্র ধরে আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলা যায়, কাহিনী মাত্রই কান্তাবাণী। এবং এই 'কান্তাবাণী' কথাটির মধ্যেই প্রশ্নের সদুত্তর নিহিত আছে, কিসের সম্বন্ধে তথ্য তত্ত্ব ও বিবরণ রমিত এবং রসিত হয়ে, এবং প্রাণ পেয়ে কাহিনী হয়ে ওঠে। যুক্তি তর্ক বিচার এবং ভঙ্গীর সৌষ্ঠব কান্তাবাণীর কাছে গুরুতর প্রয়োজনের সম্পদ নয়। 'কাহারও তুলনা দিয়া বলিতে ও বুঝাইতে হয়'—এই হলো কান্তাবাণীর কাজের প্রকৃতি। সরল করে বলতে গিয়ে যাকে 'তুলনা' বলা হয়েছে, সেটা একান্তভাবে কল্পনারই গুণ ক্রিয়া ও শক্তির কাজ। হ্যাঁ, তুলনা। কিন্তু কান্তাবাণী যে তুলনা সম্পন্ন করে, সেটা বস্তুত বৃহৎ একটি সম্বন্ধ রচনার কাজ। একটি শোকের ঘটনার তথ্যকে কাহিনী করে গড়ে তুলতে হলে অনুভূত ও অভিজ্ঞাত জগতের বৃহত্তর শোক-বেদনার সঙ্গে এই ঘটনার একটি সম্বন্ধ রচনা করতে হয়। এই সম্বন্ধের রচনায় কল্পনা যেমন বাস্তবতাকে তেমনই অবাস্তবতাকেও ডাক দিয়ে কাজ করে। সেই ডাকে হতভাগ্য এক কাঠুরিয়ার দুঃখের ক্রন্দনের সঙ্গে বনের বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ মিশে যায়, যদিও এ সত্য সবারই জানা আছে যে, বনের বাতাস মানুষ নয়, এবং তার কোন দীর্ঘশ্বাস নেই।

আধুনিক কালের মুখে একটি বিড়ম্বিত বিস্ময়ের প্রশ্ন মাঝে মাঝে শোনা যায়। এই প্রশ্নের সঙ্গে যেন একটি অভিযোগের কণ্ঠস্বর মিশে আছে। পৌরাণিক কাহিনীতে এত অবাস্তবতার সমারোহ কেন? একজন মুনি মানুষ সমুদ্রকে পান করে ফেলেন, পর্বত আকাশে উড়ে বেড়ায় আর দুর্ভাগের আঘাতে ডানাভাঙ্গা হয়ে সমুদ্রের জলে ডুবে যায়। হরিণীর গর্ভে ঋষিকুমার জন্মলাভ করেন। কোন রাজার পুত্রের সংখ্যা ষাট হাজার। কেন?

থিওরী কান্তাবাণী কিন্তু প্রশ্নের মুখের উপরেই জবাব দিয়ে ও প্রতিবাদ করে বলবে, এই অবাস্তবতাই একটি বাস্তব অলংকার। কাহিনী নদীকে দিয়ে অভিশাপের কথা বলিয়ে, রাজার ছেলের প্রণয়ভাগিনী ঋষিকুমারীকে হরিণী করে দিয়ে, আর রাজার ছেলেকে দিয়েই ভুলক্রমে সেই হরিণীকে শরবিদ্ধ করিয়ে এমন এক করুণতার সৃষ্টি সম্ভব করতে পারে, যে করুণতা বিশুদ্ধ ও বাস্তব করুণতা। সুতরাং কাহিনীও এখানে কাহিনী হিসাবে সার্থক ও সফল।

দার্শনিক সান্টায়ানা, রূপতত্ত্বের একজন বিশেষজ্ঞ ও সমালোচক বলে যিনি বিখ্যাত, তাঁরই একটি ধারণার উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে। তিনি বলেন, বাইবেলের ভারজিন মেরির কাহিনী বৈজ্ঞানিকভাবে নিতান্ত অসত্য; কিন্তু কাব্যিকভাবে খুবই সত্য। আমাদের বাঙালী কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কবিতায় যে কথা বলা হয়েছে, তাও স্মরণ করা চলে: 'হে কবি-কল্পনা মায়া, সত্যের সোনালী ছায়া'। সন্দেহ করে ও অভিযোগ করে যাকে পৌরাণিক কাহিনীর অবাস্তবতা বলা হয়, তার উপর একটু শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, এহেন অবাস্তব বস্তুও এক ধরনের মায়াবস্তু, কাহিনীর প্রাণের উপাদান। এই মায়াবস্তু সত্যেরই সোনালী ছায়া, কোন অসত্যের ছায়া নয়। কাহিনীর ইতিহাসে বিফল প্রয়াসের এমন বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে, যাতে দেখা যায় যে, ঘটনার বিশুদ্ধ চেহারা ও নগ্ন বাস্তবতার রূপ প্রকট করেও কাহিনী ঠিক কাহিনী হতে পারেনি। সে কাহিনী ঘটনা ও তথ্যের শুধু স্থূল ও সীমিত রূপটিকেই প্রকট করেছে। বলা যায়, কাহিনীতে বাস্তবতার মায়িক প্রতিভাস

সৃষ্টি করা হয়নি। সে কাহিনী অজস্র বাচনিক সৌকর্যের আভরণে ঝংকৃত হয়েও বড়জোর একটি শ্রুতিসুখকর সোরগোলের মত কুতূহলী মনের বহির্বাটির বৈঠকখানাকে খুশী করতে পারে; অন্তঃপুরের তৃপ্তি সম্ভব করা তার সাধ্য নয়।

একটা পাল্টা জিজ্ঞাসা এখানে বাধা দিয়ে বলতে পারে, আধুনিক কালের কাহিনীতে এমন কোন কল্পিত দৃশ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে কি, যাতে দেখা যাবে যে, কোন মহাবীর এক লাফে সাগর ডিঙিয়ে গেলেন? এই জিজ্ঞাসারও একটি সার্থক উত্তর আছে। পৌরাণিক কাল্পনিকেরা কাহিনী সৃষ্টি করতে গিয়ে যে প্রকারের অবাস্তবতাকে মনোরম অলংকার বলে বুঝেছিলেন, সেই প্রকারটা চিরকালীন সত্য অথবা অজরামর নিত্য বস্তু নয়। উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন একই আছে; বদলেছে ও বদলে যায় শুধু ওই প্রকার। বিস্ময়ের আবেশ নিগূঢ় করে তোলবার জন্যে আধুনিক গল্পের আলাদিনের হাতে সত্যি করে কোন জাদু-প্রদীপ ধরিয়ে দিতে হয় না, আর, প্রয়োজনের ক্ষণে সেই জাদু-প্রদীপের ঘষার সাহায্যের এক মহাকর্মা দৈত্যকে মুহূর্তের মধ্যে হুজুরে হাজির করিয়ে দিতে হয় না। তার বদলে অভাবিত একটি প্রীতিকে, স্মৃতির অগোচরে পড়ে থাকা কোন মমতাকে, কোন ভয়াবহ চরিত্রের বিশাল ক্ষমতাকে চকিত ঘটনার চমক দিয়ে সুন্দর একটি সমবেদনাময় সৌহার্দ্যে পরিণত করে, ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে কারও অসহায় ভাগ্যের কাছে পৌঁছে দিলেই চলে। ফলে, কাহিনীর বিস্ময় আরও বিলসিত হয়। বিস্ময়ের আবেশ নিগূঢ় করে তোলবার এও একটি প্রকার, যার কারণে তথ্যবস্তু রসিত হয়, আরও হৃদয়সংবেদ্য হয়। সুতরাং বলতে হবে, অলংকারের রূপ বদলেছে, কিন্তু অলংকার ধারণ করবার পদ্ধতিটি ঠিকই আছে। যে উদ্দেশে পৌরাণিকের পছন্দসই অলংকার পরেছিল কাহিনী, সেই একই উদ্দেশে আজকের কাহিনী নূতন পছন্দের অলংকার পরে।

পৌরাণিক কাহিনী ও আধুনিক কাহিনী, উভয়ের নির্মাণের মধ্যে যে আলংকারিক প্রকারভেদ দেখা যায়, সেটাই বা কি রকমের ভেদ? যাকে এতক্ষণ পৌরাণিক কাহিনীর অবাস্তবতা বলা হয়েছে, সেটা কি অবস্তুতা? যা কখনও জাগতিক সংসারের কোন বস্তু হতেই পারে না, তাকেই বস্তু বলে কল্পনা করা হয়েছে, যেমন দানব হয়গ্রীব অথবা দেবতা গজানন। জাগতিক সংসারে যেটা কোন ঘটনাই হতে পারে না, তাকেও ঘটনা বলে কল্পনা করা হয়েছে; যেমন অগস্ত্য ঋষির এক গণ্ডূষে সমুদ্র-শোষণ। কল্পনা যেন অবাধ স্বেচ্ছাচারের সুখে নিজের পছন্দমত অজস্র অপূর্ব অদ্ভুত মূর্তি তৈরি করে নিয়েছে। কিন্তু কল্পনার এই ক্রিয়া অবস্তুতার উপাসনা নয়; নতুন বস্তুরূপের উদ্ভাবনা। নতুন মূর্তি গড়ে নেওয়া। আধুনিক কাহিনীও মূর্তির উপাসনা, কিন্তু নিছক বস্তুতার উপাসনা নয়। বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায় বলা যায়—এই আইডেলাট্রি বস্তুত আইডিয়ালোট্রি। বস্তুতার সীমা অতিক্রম করে, রূপ হতে ভাবে এবং ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা।

প্রাচীন হোক কিংবা আধুনিক হোক, নিছক বস্তুতার সীমা ও বন্ধন অতিক্রম করে যাওয়াই কাহিনীর প্রকৃতিনিহিত একটি আগ্রহ। কারণ, কাহিনীর উদ্দেশ্য হলো ঘটনা ও তথ্যের একটি অতিরিক্ত ও বিশেষ অর্থ প্রকাশ করা। ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতার পিটার বেল বস্তুর মধ্যে শুধু বস্তুই দেখতে পায়। আর কিছুই দেখতে পায় না। বস্তুধের ওই প্রত্যক্ষ ও নিরেট রূপের অতিরিক্ত কোন রূপ তার চোখে পড়ে না।

'এ প্রিমরোজ বাই দি রিভার্স' ব্রিম
এ ইয়েলো প্রিমরোজ ওয়াজ টু হিম।"

নদীর কিনারায় যে গোলাপ ফুটে রয়েছে, তাকে দেখে পিটার বেল শুধু এইটুকুই বুঝতে পারে যে, ওটা একটা হলদে গোলাপ। পৃথিবীর কোন পিটার বেলের পক্ষে কাহিনী সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, কারণ তার উপলব্ধি ও অনুভবের চোখ বস্তুর মধ্যে বস্তুরূপের অতিরিক্ত সেই মায়িক রূপটি দেখতে পায় না।

সেই মায়িক রূপের জগতে যে বাতাস বয়, যে আলোছায়া খেলা করে, তারা কিন্তু মানুষের জীবনে একেবারে খাঁটি বাস্তবতাময় অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে থাকে। একদিন ঘরের দরজার পর্দা নড়ে উঠতেই ইবসেন তাঁর স্ত্রীকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন—দেখ তো, বোধ হয় নোরা এসেছে। একথা শুনে ইবসেন-পত্নী চমকে উঠেছিলেন। কারণ নোরা কেমন করে সেখানে আসবে? নোরা তো ইবসেনের 'পুতুলের ঘর' নাটকের নায়িকা। ইবসেন নিজেও সেটা জানতেন। কিন্তু অনুভবের জগতে ক্ষণকালের আবেগের ফুলছড়ানো পথে সত্যিই যে প্রীতমের আওন-কি-আওয়াজ শোনা যায়। ওই কল্পিতা নোরাই কত স্পষ্ট একটি বাস্তব সত্য। ডিকেন্সও তাঁর উপন্যাসে লিট্‌ল্‌ নেলের মৃত্যু ঘটিয়ে কেঁদে আকুল হয়েছিলেন। কল্পিত একটি কাহিনীর মধ্যে কল্পিত একটি শিশুর মৃত্যু, সবই মায়িক সৃষ্টি, কিন্তু বেদনা দেবার শক্তিতে কত বাস্তবিক।
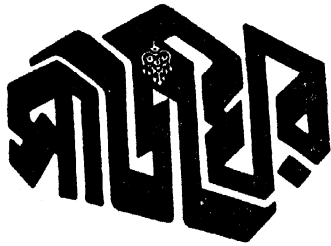
কাহিনীর [illegible]

অবশ্যই কাহিনীর ঐতিহাসিক পরিচয়ের অজস্র বিচিত্রতার দিকে দৃষ্টিপাত করবার দরকার হয়। নৃতাত্ত্বিকেরা মানুষের মাথার খুলির গঠনভঙ্গীর মধ্যে অতীতের এক বিচিত্র ইতিহাসের স্মৃতিলিপি পাঠ করেন। এবং কিছু প্রমাণে এবং কিছু অনুমানে বুঝতে পারেন যে, সেই অতিদূর অতীতে মানুষের ধমনীর শোণিতকণিকা যেন যাযাবর হয়ে বিশ্বভ্রমণ করেছে, দেশ হতে দেশান্তরে গিয়েছে, নূতন জনদেহের ধমনীতে সঞ্চারিত হয়েছে। কাহিনীর যাযাবরতাও কম বিচিত্র নয়, এবং সেটা এমন কিছু কম পুরাতন অতীতের ঘটনাও নয়। অধ্যাপক টনি কথা সরিৎসাগরের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় অতিপুরাতন কালে কাহিনীর যাযাবরতার অনেক ঘটনা প্রমাণ ও তথ্যের আলোচনা করেছেন। সহস্র রজনীর আরব্য কাহিনীতে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। স্কান্ডিনেভীয় উপকথার মধ্যে এশিয়া মহাদেশের নানা জাতির প্রাচীন কাহিনীর মিলন ও মিশ্রনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কে জানে, ভারতীয় বৃহৎকথার বিপুল অবয়ব থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে কত কাহিনী দেশান্তরের কিংবদন্তী ও কাহিনী হয়ে গিয়েছে। শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত আর্য-ভারতীয় তথা বৈদিক ভারতীয়ের দেবতা-কল্পনার প্রত্নতত্ত্ব বিচার করেছেন। হিব্রু গ্রীক ও প্রাচীন পারসীকের দেবতা-কল্পনা ও আর্যভারতীয়ের দেবতা-কল্পনার মধ্যে বিস্ময়কর এক আত্মীয়তার পরিচয়ও তিনি আবিষ্কার করেছেন। ঋগ্বেদের ঊষা পূষা গায়ত্রী অর্যমা ইন্দ্র বরুণ রিভুগণ ও আদিত্যগণ, এবং আরও অনেক দেবতাকে প্রাচীন হিব্রু গ্রীক পারসীক ও টিউটনের গাথা এবং পুরাণের মধ্যে প্রায় একই রূপে, এবং কখনও বা একই নামে দেখতে পাওয়া যায়। এইচ জি ওয়েলস তাঁর বিশ্ব-ইতিহাসে দার্শনিক পরিভাষার একটি কথাকে একটু ভিন্নতর অর্থে ব্যবহার করেছেন—থিওক্রেসিয়া। প্রাচীন মিশরীয় দেবতা ওসিরিস একদিন হেলেনীয়ের কাছে দেবতা সেরাপিস হয়ে গেলেন। এক জাতির ও এক কালের দেবতা নামে ও রূপে কিছু ঘষামাজা অথবা কাটাছাঁটা হয়ে অন্য জাতির ও অন্য কালের দেবতা হয়ে গিয়েছেন। এক জাতির দেবতা আবার অন্য জাতির দেবতার সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছেন। যেমন রমেশচন্দ্র দত্ত তেমনই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও এই তথাকথিত থিওক্রেসিয়ার অনেক আলোচনা করেছেন। সায়ণের মতে ঋগ্বেদের বরুণ হলেন নৈশ আকাশ। গ্রীক কবি হেসিয়ড যে 'উরানস' দেবতার কথা লিখেছেন, তিনিও রাত্রি সৃষ্টি করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ভারতের পৌরাণিক দেব দানব ও মানবের কথা বেশি আলোচনা করেছেন। বৃত্র নামে পরিচিত ভারতীয় পৌরাণিক অসুরটিকে অন্য দেশের পুরাণেও দেখতে পাওয়া যায়। হিব্রুর হেরড ভারতীয় কংসেরই মত শিশুর প্রাণের শত্রু। দেবতা-কল্পনার এত প্রত্ন-সন্ধান ও আলোচনার মধ্যে যে বিশেষ একটি সিদ্ধান্তের সংকেত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার পরিচয় রামেন্দ্রসুন্দরের একটি উক্তিতে আরও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। "ভারতবর্ষের বাহান্ন পীঠের কথা মনে পড়ে কি? কাহিনীটি ভারতে ও মিশরে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। সেখানে স্ত্রী স্বামীর দেহের খন্ডাংশগুলি অন্বেষণ করিতেছেন, এখানে ঠিক তাহার বিপরীত। সঙ্গীহীনা আইসিস দেবী একাকিনী আপন মায়াপ্রভাবে একটি পুত্র প্রসব করিলেন। এবং সেই শিশুটিকে শরবনে স্তন্য পান করাইলেন। একদিন সেই পুত্র তাঁহার

পিতৃহন্তারক টাইফন দৈত্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। আমাদের দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র জন্মকথা মনে পড়িয়া যায় না কি?"

পারসীক কাহিনীর সোরাবে ও রুস্তমে পিতায় ও পুত্রে যুদ্ধ হয়েছে। কেউ কাউকে চিনতে পারেনি। ভারতীয় কাহিনীতে পিতা অর্জুন ও পুত্র বভ্রুবাহনের যুদ্ধ হয়েছে, কেউ কাউকে চিনতে পারেনি। ভারতীয় পুরাণের গন্ধর্বকন্যা সুন্দরী মদালসাকে দানব পাতালকেতু অপহরণ করে ও পাতালপুরে নিয়ে গিয়ে বন্দিনী করে রেখেছে। গ্রীক-পুরাণের রোমক কথানকে দেখা যায়, শস্যদেবী সিরিসের সুন্দরী কন্যা প্রোসারপাইনিকে চুরি করেছে প্লুটো আর পাতালপুরে নিয়ে গিয়ে বন্দিনী করে রেখেছে। ভারতীয়া অহল্যা পাষাণী হয়ে গিয়েছিলেন। থিবসের রানী নিওবি শ্বেত-পাথরের মূর্তি হয়ে গিয়েছেন। মহাভারতের বকরাক্ষসের সংগে গ্রামবাসীর চুক্তি ছিল, প্রতিদিন একটি পরিবার থেকে একটি মানুষ তার ভোজ্য হবে। ক্রীটের রাজার সংগে দানব মিনোটরের চুক্তি হয়েছিল, প্রতিদিন রাজ্যের সাতজন তরুণ-তরুণী তার ভোজ্য হবে।

পৌরাণিক মানব দানব ও দেবতাদের বিশ্বময় আনাগোনার এই ব্যাপারটি মূলত ও বস্তুত কাহিনীরই বিশ্বময় আনাগোনার একটি ঐতিহাসিক ক্রিয়া। কিন্তু দেবতাদের সংগে সংগে অথবা পিছু-পিছু যাযাবর হয়ে কাহিনী দেশ হতে দেশান্তরে গিয়েছে, ঐতিহাসিক ক্রিয়াটি ঠিক এভাবে নিষ্পন্ন হয়েছিল বলে মনে না করে বরং এটাই মনে করবার বেশি যুক্তি আছে যে, কাহিনীই আগে গিয়েছে, পরে দেবতা। অন্যভাবে বলা যায়, দেবতারা বিশ্বপথিক কাহিনীর অনুসরণ করেছেন। এইভাবে সাংস্কৃতিক চিন্তা ও অভিরুচির বিশ্বজনীন সম্বন্ধ রচনার প্রথম ঐতিহাসিক কাজটি কাহিনীই প্রথম ও সবার আগে করেছে। মানুষের আদিম মন প্রাগৈতিহাসিক মন ও পৌরাণিক মন সবারই কাছে কাহিনীই ছিল আগ্রহ ও অভ্যর্থনার প্রথম এবং প্রধান আস্পদ। কাহিনীর মনোরম গুণে দেবতারা মনোরম হয়েছেন। কালক্রমে এই মনোরম দেবতারাই ধ্যানরম হয়ে ধর্মধারণার বিগ্রহ হয়েছেন। ধর্মবোধের আদি উন্মেষের সব আবেগের ভার প্রথম ধারণ করেছে কাহিনী। কাহিনী স্বয়ং নিবেদন ও নৈবেদ্য। কাহিনী সৃষ্টি করেই মানুষের মন তার স্পিরিচুয়াল তথা আত্মিক আগ্রহের প্রথম পিপাসা তৃপ্ত করেছে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন কালের কাহিনীতে রূপ চরিত্র ও ঘটনার এইসব মিল ও সদৃশতার সবই কি যাযাবর কাহিনীর আনাগোনা ও মেলামেশার পরিণাম? কিংবা আদান-প্রদানের ও গ্রহণ-প্রেরণের পরিণাম? সবই ঐতিহাসিক লেন-দেনের ক্রিয়াফল নয়। বরং অনুমান করবার ও সেই সংগে বিশ্বাস করবার অনেক যুক্তি আছে যে, দুই দেশের দুই কালের কাহিনীতে সদৃশতার সব কিছুই জানাজানির ফল নয়। পরস্পরের সংগে জানাজানির কোন সম্পর্ক ছিল না এমন দুই দেশের দুইটি একক কল্পনার সৃষ্টি। যাদের কল্পনা গন্ধর্বকন্যা মদালসাকে পাতালকেতুর বন্দিনী করেছে, তারা হয়তো প্লুটো-প্রোসারপাইনির কাহিনী কোনদিনও শোনেনি। হতে পারে, মাদালসা ও প্রোসারপাইনি, দুই ভিন্ন দেশের দুই নিজস্ব কল্পনার সৃষ্টি। দুই কাহিনীর বিস্তার লক্ষ করলে অবশ্য অনেক অমিল চোখে পড়বে। কিন্তু দুই কাহিনীর একই 'মোতিফ'; এবং বিস্ময়কর সত্যটি এই যে, যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের একই তত্ত্ব দুই ভিন্ন দেশের চিন্তায়, পরস্পরের অজানা ও একান্তভাবে নিজেরই প্রতিভায় আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত হতে দেখা গিয়াছে, তেমনই কাহিনীরও একই মোতিফ দুই ভিন্ন দেশের স্বতন্ত্র ও একক কল্পনার গুণে নির্মিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের মনীষায় উপলব্ধির বাণী ধ্বনিত হয়েছে—আত্মানং বিদ্ধি, নিজেকে জান। গ্রীক মনীষী সক্রেটিসও বলেছেন—নিজেকে জান।*

দুই দেশের দুই মনীষার কেউ কারও কাছ থেকে ওই তত্ত্ব-কথাটিকে ধার করেছে, এরকম ধারণা না করবারই বেশি যুক্তি আছে। কাহিনীর একই 'মোতিফ' এইভাবে দুই ভিন্ন দেশের ও দুই ভিন্ন কালের নিজস্ব ও একক কল্পনার সৃষ্টি হয়ে এই সত্যই প্রমাণিত করে যে, কাহিনী সৃষ্টি করে যে কল্পনা, সে কল্পনা প্রজ্ঞারই মত আবিষ্কারকুশল একটি শক্তি। প্রজ্ঞার মত কল্পনাও অন্তর্লোকের একটি আকাশ,

* রোমক অক্ষরে গ্রীক উক্তিটি—Gnothi Seauton।

বহির্মানসের একটা স্ফূর্তির বাতাস নয়।

সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তথ্য নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁদের বুঝতে দেরি হয়নি যে, রম্যকলার পদ্ধতিও যাযাবর হয়ে দেশান্তরে যায়। সঙ্গীতের সুর, নাচের ভঙ্গী, বাজনার তাল ও ছেলে-ভুলানো ছড়ার ছন্দ বিশ্বভ্রমণ করেছে ও করে থাকে। সংস্কৃতির বিশ্বজনীন সম্বন্ধের রচনাও একটি স্বাভাবিক ঐতিহাসিক ক্রিয়া। সাংস্কৃতিক গবেষকের বৈদগ্ধ্য যদি এই ঐতিহাসিক ক্রিয়ার প্রথম শুভসূচনার সন্ধান পেতে চায়, তবে দূর অতীতের দিকে তাকিয়েই দেখতে পাবে যে, এই ভাগীরথী ধারার শুরুতে আছে সেই গঙ্গোত্রীর শীকর-নির্ঝর, যার নাম কাহিনী। অন্য সব রম্যকথার আগে কাহিনীই দেশ হতে দেশান্তরে গিয়ে ও অতিথি হয়ে জাতি ও জনতার আন্তরিক জীবনের দুয়ারে পেঁছেছিল। এবং মুক্তকপাট অভ্যর্থনা ও সমাদরও পেয়েছিল। আরও একটি বিষয় বুঝে দেখবার দরকার হয়। অন্য সব রম্যকলার একটি স্থূল শরীর আছে, তারা চোখের ও কানের প্রত্যক্ষ অনুভবের বস্তু। ছবির ও নাচের দৃশ্যশরীর আছে। সুরের শ্রাব্য শরীর আছে। এইসব রম্যকলার তুলনায় কাহিনীকে বলা চলে—অতনু। নিতান্ত ভাবনা দিয়ে গড়া এক অশরীরী রামধনু, যার বর্ণালীর শোভা ও আবেদন শুধু মন দিয়েই অনুভব করতে হয়, অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যের দরকার হয় না। সুতরাং, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে বলতে পারা যায়, অন্য সব রম্যকলার তুলনায় কাহিনী যে তার ওই অতনুতা সত্ত্বেও মানুষের সাংস্কৃতিক সত্তার প্রথম অবলম্বন ও প্রথম তৃপ্তি হতে পেরেছে, সেটা একান্তভাবে কাহিনীরই একটি বিশেষ ও নিজস্ব শক্তির সত্যতা প্রমাণিত করে। অন্য কোন রম্যকলার এই শক্তি নেই।

একটা প্রশ্ন অবশ্য আপত্তি তুলে তর্ক করতে পারে, কাহিনীকে কি নিতান্ত অতনু বলা চলে? কাহিনী কি একটি ভাষিত আর্ট নয়? ঠিক কথা, গানের মত কাহিনীরও ভাষিত প্রকাশ আছে। তাই বলতে পারা যায়, কাহিনীরও শ্রাব্য রূপ আছে। কিন্তু কাহিনীই একমাত্র আর্ট যার ভাষণ শুধু কান দিয়ে নয়, মন দিয়ে শোনা যায়। লিখিত অক্ষর নামে সাংকেতিক চিহ্নগুলির দিকে তাকিয়েই কাহিনীর রূপ দেখতে ও কাহিনীকে শুনতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া, গান শুধু তার বাণীর কারণে গান হয় না। কাহিনীও শুধু তার ভাষিত প্রকাশের কোন চমৎকারিতার কারণে চমৎকার কাহিনী হয় না। ভাষিত রূপটি হল নিতান্ত কায়কল্প, ভাবকল্প নয়। সোনার পালকি রূপকুমারীকে বহন করে

বলে পালকিটই রূপকুমারীর আসল পরিচয় নয়।

দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের একটি মন্তব্য—কুইনইনের উপকারিতা সম্বন্ধে ভাল ভাষায় ও ভাল ছন্দে অতি চমৎকার স্তোত্র রচিত হলেও সেটা কবিতা হবে না। এবং ঈশ্বরচন্দ্রের সাংখ্যকারিকা শ্লোকে রচিত বলেই সেটা কাব্য হয়ে যায়নি। এই মন্তব্যের কাছে নিয়ে এসে দাঁড় করালে গানের বাণীরও আসল মূল্যটির হিসাব হয়ে যায়। যে কথা নিতান্তই কথা, বস্তুর ঘটনার ও তত্ত্বের শাব্দিক ও বাক্যিক বিবৃতি মাত্র, গানকে রম্যতায় অনুরঞ্জিত করা তার সাধ্য নয়। এমন বাণীর গান, সুরের শত বৈভব নিয়েও, শুধু কোন না কোন কুতূহলী বুদ্ধির পিপাসা মিটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু মর্মলোকের সাগরজলের শুক্তিকে সেই স্বাতীবারি দিতে পারে না, যার স্পর্শ আনন্দের মুক্তা ফুটিয়ে তোলে। যে গান কাহিনীকে সুরান্বিত করে, সেই গানই হল হৃদয়সংবেদ্য সৃষ্টি, আত্মিক আমোদ-নিদান। নিছক তত্ত্বের কথা সংগীতিত হলে সেটা হবে জ্ঞান অথবা বুদ্ধির একটা সুরেলা কোলাহল। মান-অভিমানের কথা, বিরহের বেদনা ও মিলনের সুখের কথা, করুণ বিষাদ ও পুলকিত বিস্ময়ের কথা; এরা বস্তুত খণ্ড খণ্ড কাহিনী, রসিত অনুভবের এক একটি বাঙ্ময় ছবি। এরা যেন এক একটি মূর্ত ব্যক্তিত্ব, যারা অনুভূত জগতের এক মহানাটের কুশীলব হয়ে কথা বলে। এরা যদি গানের মধ্যে থেকে কথা বলে, তবেই সেই গান হবে জীবনের গান, নইলে হবে না।

সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচর্যায় নিযুক্ত আছে ও নিয়োজিত হয়ে থাকে এমন অনেক কৃতিত্বের অনুষ্ঠান বস্তুত কাহিনীরই রূপায়ণ। মহাকাব্য নিশ্চয় এক মহাকাহিনীর কাব্যিক রূপণা। কাহিনীরই অভিনীত রূপ, নাটক। সংগীতিত রূপ, অপেরা। নৃত্যায়িত রূপ, ব্যালে। চলচ্চিত্রিত রূপ, সিনেমা। কাহিনীর সংগে না থাকলে এরা শুধু ভংগীর উৎসব; কারুতার সুচারু ঘটা।

সংস্কৃতির পরিচর্যায় কাহিনীর ঐতিহাসিক ভূমিকার আরও একটি দিক আছে। জ্ঞানের ও ধর্মের তত্ত্বকে সহজে বোধগম্য করবার কাজে, সামাজিক জীবনের আগ্রহকে উৎসবে প্রমোদিত করবার কাজে, এমন কি কোলের শিশুকে ঘুম পাড়াবার কাজেও কাহিনীকে আহ্বান করতে হয়েছে। দেখা যায়, হেঁয়ালির ছড়া ও খেলার ছড়ার মধ্যে কাহিনীর ছোঁয়া লেগেছে। প্রাচীন ঋষির উপনিষদ কাহিনীকে কাজে লাগিয়েছে। দ্বো সুপর্ণা সযুজা...... দুই পাখির কাহিনী অদ্বৈতবাদের তত্ত্বটিকে বুঝিয়ে দিতে সাহায্য করেছে। ভারতের সাহিত্যিক যোগ্যতার একটি বড় সম্বল যে প্রবাদ, তাও কাহিনীর দান। জাতক ও বাইবেল অজস্র কাহিনীর সাহায্য নিয়েই নৈতিক সত্যের পরিচয় আর সেই সংগে দিব্য বিশ্বাসের সেই মহান্ সংবিধান রচনা করেছে, যার নাম ধর্ম। কাহিনী লৌকিক জীবনের একটি সামান্য গৃহস্থালীর দুঃখ ও রিক্ততাকেও সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করে। দৃষ্টান্ত বাংলার মেয়েলী ব্রতকথা।

বাংলাদেশের মেয়েলী ব্রতকথার অংশ ভাষা ও আবেদন যদি বিশ্লেষণ করা হয়, তবে সামাজিক চিন্তা ও ঘটনার এক বিচিত্র ইতিহাসের রূপ প্রকট হয়ে পড়বে। মনে হবে, ব্রতকথা যেন সুদূরাতীত মাতৃতান্ত্রিক সমাজজীবনের ক্ষীণস্মৃতির কলরব। সামাজিক ভাগ্য নিজের হাতে গড়ে তোলবার অধিকার যেদিন নারীর হাতে ছিল, সুন্দরী ব্রতকথা তার এলোচুলে সেদিনেরই স্মৃতির পরিমল বহন করে চলেছে। ব্রতকথার বনদুর্গা মনে পড়িয়ে দেয় যে, মানবীয় জীবনের গৃহস্থালী একদিন বনবাসী ছিল। সর্বজয়া ব্রতকথা আরও স্পষ্ট একটি দৃষ্টান্ত, ক্ষমতায় ও অধিকারে গৃহ-সংসারে সর্বেশ্বরী হবার জন্য নারীর স্পষ্টভাষিত কামনার কথা। ক্ষমতার অভিলিপ্সায় দেবী অধিরানী হয়ে থাকবার সেই প্রতিষ্ঠা থেকে সরে ও নেমে গিয়ে নারীর ভাগ্য যেদিন পৌরুষের শাসন মেনে নিতে বাধ্য হলো, সেদিনের নারী জীবনের উদ্বেগ দশার করুণ দীর্ঘশ্বাসের শব্দও বহন করছে ব্রতকথা। যথা সেঁজুতি ব্রতের কথা। সতীনের মৃত্যুর জন্য ব্যাকুল প্রার্থনার কথা। বাল দুর্গার কাছে নিবেদন—কুষ্ঠ-রোগের ভয় দূর কর। নাটাই চণ্ডীর কাছে আবেদন—হারানো গরু খুঁজে দাও। জয়-মঙ্গলের কাছে প্রার্থনা—আঘাত হতে রক্ষা কর। ক্ষেত্রব্রতের কথা প্রমাণিত করে, গৃহীর জীবন ও গৃহসুখ একদিন মাটির কত কাছাকাছি ছিল। ভূমি ও কৃষির জন্য ভক্তির উৎসর্গ ও অংগীকার একটি ব্রত হয়ে কথা বলছে। সন্তানকে অকালমৃত্যুর অভিশাপ হতে রক্ষা করবার আশায় নীলষষ্ঠীর করুণা, এমন কি অবৈধ সন্তানের, সামাজিক সম্মান কামনা করে কুলুইমঙ্গল-চণ্ডীর করুণা আহ্বান করেছে যে ব্রতকথা, তার মধ্যে নারীপ্রকৃতির মর্মকথার ছবি ফুটে উঠেছে। 'হাপুতির পুত দিতে' ও 'আঘাটায় ঘাট দিতে', সৌভাগ্যের কাছে কতই না মিনতি করা হয়েছে। রূপসী হবার কামনাকে কত না ভরসা দিয়ে খুশি করেছে ব্রতকথার রূপহলুদ। আবার জীবন-সত্যের এমন নিবিড় রহস্যের কথাও বলেছে, যাকে গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা বলা যায়। যেমন, হরিষমঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা। হরিষ-মঙ্গলচণ্ডী, যিনি সকল সুখে সুখিনী, যিনি সুস্মিত প্রফুল্লতার দেবী, যাঁকে কখনও চোখের জল ফেলতে হয় না, তিনিই বলছেন—কাঁদতে চাই, নইলে প্রাণের তৃপ্তি পূর্ণ হতে পারছে না। এই ব্রতকথা খুব স্পষ্ট

আর বেশি দৃষ্টান্তের দরকার হয় না। মানুষের সামাজিক জীবনের ও লৌকিক আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজনে কী কাজ ও কত কাজ করেছে কাহিনী, ইতিহাসের কত স্মৃতির ধারক ও বাহক হতে পারে কাহিনী, তার অজস্র প্রমাণ এই মেয়েলী ব্রতকথায় ছড়িয়ে রয়েছে। আরও প্রমাণিত হয় যে, কাহিনী বস্তুত ঐতিহাসিক তথ্যের জাদুঘর। কিন্তু মূক নয়, সবাক্ জাদুঘর, যার ভিতরে নানা-কালের ইতিহাসের যত বিগত ও বিস্মৃত তথ্য মুখর হয়ে কথা বলে। ব্রতকথার এইসব কাহিনী ভঙ্গিগুণে ও নির্মাণে অবশ্যই সুষ্ঠু স্থাপত্যের মন্দিরময় খাজুরাহো নয়। তার রূপে অলংকৃত সৌষ্ঠবের সমারোহ নেই। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, এই ব্রতকথা নানা কালের কল্পনাকলার এক ধূলিমলিন দেউলডাঙ্গা। জরা ধরেছে, তাই সরে গিয়েছে ও ঝরে পড়েছে তার অনেক রূপ। তবু তার বুকে নানাকালের ঘণ্টাধ্বনি বাজে, তার আরতির ভাষা শুনতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় সত্য এই যে, প্রত্নতত্ত্বের গবেষক মহাশয়েরা হঠাৎ-ভাগ্যে কুড়িয়ে-পাওয়া রসেটা পাথরের লিপি পাঠ করে ঐতিহাসিক অতীতের যে তথ্য পেয়ে থাকেন, তার চেয়ে বেশি না হোক, এমন-কিছু কম তথ্যও তিনি পাবেন না, যদি পুরাণ ও উপপুরাণের কাহিনীকে ও ব্রতকথাকে একটু কান পেতে শোনেন। শুধু তথ্য নয়, সেই অতীতের কিছু রূপের পরিচয়ও তিনি পাবেন, যদি ঐতিহাসিক কলহনের মত তিনি অতীতের শুধু তথ্যের সন্ধান নয়, রূপের সন্ধানের কাজটাকেও তাঁরও চেষ্টা চিন্তা ও কৌতূহলের কাজ বলে মনে করেন। কিন্তু যেটা প্রাগৈতিহাসিক অতীত, যার জীবনের তথ্য ও রূপের পরিচয় নিয়ে রসেটা পাথরের মত কোন লিপিময় পাথর কোথাও পড়ে থাকে না, তাকে অজস্রভাবে রূপকথা উপকথা ও আষাঢ়ে গল্পে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি টোটেম পূজার যত অভিচারের বচনে ও বাচনে, আর ভূত-তাড়ানো ও রোগ-সারানো জাদুক্রিয়া তুকতাক ও ঝাড়ফুঁকের বাণীতেও পাওয়া যায়, যার মধ্যে আদিম অভিজ্ঞতার ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাঙা-ভাঙা ধ্বনিময় কাহিনী আজও কথা বলছে।

মানুষের জিজ্ঞাসায় জীবনে কাহিনী কী ধরনের ও কত প্রকারের প্রয়োজনে কাজ করেছে ও করে থাকে, তার বিচিত্র-বহুল পরিচয় পেতে হলে কিংবদন্তী ও প্রবাদেরও হেতুতত্ত্বের একটা দিক্‌নির্ণয় দরকার হয়। নীলদর্পণ অথবা টমকাকার কুটীরের মত লিখিত কাহিনী, যারা সাহিত্যের কীর্তি বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, তাদের কৃতিত্বের কথা খুব বেশি ব্যাখ্যা না করলেও চলে। সকলেই জানেন, এ ধরনের কাহিনী সমাজের জীবনে কত বিদ্রোহ বিপ্লব ও পরিবর্তনের প্রেরণা সঞ্চারিত করেছে। যেহেতু কাহিনী মানুষের মানসিক সত্তার সৃষ্টি, সেহেতু অবস্থা ও পরিবেশের কঠোর নিগড় এবং ভ্রূকুটির শাসন তুচ্ছ করবার একটি সহজ দুঃসাহসিক প্রবৃত্তি কাহিনীর আছে। ফরাসী লেখক এমিল জোলা তাঁর কাহিনীর ক্লেদাক্ত বিচিত্রতা সমর্থন করে বলেছেন—যুগ যখন ক্লিন্ন, তখন কাহিনীও ক্লিন্ন হবে। খুবই ভুল উক্তি। এহেন ধারণার বিবৃতি বস্তুত অক্ষম প্রতিভার অজুহাতনামা। মনুষ্যত্বের প্রকৃতি ডায়নামিক। পরিবেশের দাস হতে চায় না মানুষের মন, পরিবেশের প্রভু হতে চায়। ক্লেদাক্ত বাস্তবতার পীড়নে মানুষ ব্যথিত হয়, কুৎসিতও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাতে মনুষ্যত্ব ভীত হয় না। কাহিনী বস্তুত মনুষ্যত্বের এই শক্তির সৃষ্টি। এবং এই শক্তির শ্বাস তালুকে বসত করে বলেই মনের মানুষ তথা শিল্পী মানুষ বাস্তব পরিবেশের রূঢ় শাসনের নিগড় ছিন্ন করে হতাশ জীবনে আশা, ভীরু জীবনে দুঃসাহস, অবমানিত জীবনে বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান সম্ভব করতে চায়, করেও থাকে। ফরাসী এমিল জোলা নয়, বরং মনে হয়, ফরাসী আলবেয়ার কামু'র মন্তব্যের কথাটিই একটি প্রায়-নির্ভুল সদুক্তি। কামু বলেছেন —মানুষে আমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু মনুষ্যত্বে আমার বিশ্বাস আছে।

রাজা রামচন্দ্র তপস্বী শূদ্র শম্বুককে হত্যা করেছিলেন। মহাকাব্য যাঁকে হিরো করেছে, ভক্ত সাধক যাঁকে অবতার বলে বন্দনা করেছে, সেই রামচন্দ্রকে কিন্তু ক্ষুদ্র একটি কিংবদন্তীর কাছ থেকে ভর্ৎসনা পেতে হয়েছে। কিংবদন্তী বলে, ওই যে রামগিরি, আজ যার নাম রামটেক, তারই গায়ের কোন মাটিমাখা শুকনো পাথর সরিয়ে একটুখানি খুঁড়লেই দেখা যাবে যে, ভিতরের মাটি কাঁচা কাঁচা লাল রঙে রঙীন হয়ে রয়েছে। শম্বুকের রক্ত আজও শুকিয়ে যায়নি। এই কিংবদন্তী রামচন্দ্রের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে নিদারুণ এক প্রতিবাদ। কাব্য শাস্ত্র ও ভক্ত-সাধকের স্তোত্র শতযুগ ধরে রাম-চন্দ্রের মহত্ত্বের প্রশস্তি করেও সরল মনুষ্যত্বের প্রশ্নটিকে ভয় পাইয়ে চুপ করিয়ে দিতে পারেনি। কাহিনী সত্যাসত্যের একেবারে মূলে গিয়ে বিচার করতে পারে। সমাজ ও শাস্ত্র, ঐতিহ্য ও প্রচলিত সংস্কার অনেক সময়ে ও অনেক বিষয়ে এমন অনেক বিশ্বাস দীপ্ত করে রাখে, যাকে সত্যই চিরকালের জীবনসত্যের একটি পবিত্র দীপ বলে মনে হয়। ব্যক্তিও তার চিন্তা ও আচরণে অনেক নিষ্ঠা নিয়ে সেই বিশ্বাসের সেবা করে। বিচার নীরব হয়, যুক্তি নেপথ্যে সরে যায়, আর সন্দেহ যেন গোপন অপরাধের মত ভীরু হয়ে মুখ লুকোয়। এই অবস্থায় সমাজের মানুষ সত্যই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারে যে, অন্ত্যজের স্পর্শে ও ছায়াতে সত্যই কলুষ আছে। তাকে ঘৃণা করে দূরে সরে থাকাই মহৎ ও সহজ মনুষ্যত্বের কাজ। কিন্তু, এহেন সমাজেরই মর্মলোকের জিজ্ঞাসা কাহিনী রচনা করতে দেরি করে না, এবং দেখা যায় যে, সেই কাহিনীতে চণ্ডালের মেয়ের সঙ্গে ক্ষত্রিয় কোটালের ছেলের গোপন প্রণয়ের ফলে যে সন্তান জন্ম নিল, তারই হাতের স্পর্শ একদিন সর্পাঘাতে মৃত কোটালের কপালে লাগতেই বেঁচে উঠলেন কোটাল। ভুল স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিবেকের সব মিথ্যা ধরিয়ে দিয়েছে এই উপকথা। কাহিনী কখনও কোন প্রচলিত ও তথাকথিত বৈধী সংস্কারের স্তাবক ও সেবক হতে পারে না। কাহিনী কখনও কোন প্রবলপ্রতাপ নৈতিক শার্লিমানের হোলি রোমান এম্পায়ার হয়নি, হতে পারেও না।*

(ক্রমশ)

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীসুবোধ ঘোষের শরৎ-স্মৃতি বক্তৃতার দ্বিতীয় অংশ।

দুই রবীন্দ্রনাথ

গত ১৯শে শ্রাবণ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর 'দুই রবীন্দ্রনাথ' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-ভক্ত ও বাঙালী জাতিকে যে আক্রমণ করেছেন, তার প্রায় প্রতিটি কথাই অসার, অসত্য ও আপত্তিকর।

নীরদবাবুর প্রবন্ধের মূল কথা হল—রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগে পর্যন্ত ছিলেন ঘরমুখী, কিন্তু নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর থেকেই হন বিদেশ অর্থাৎ ইউরোপমুখী। এইটা মূল কথা হলেও এই প্রবন্ধে তিনি অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথাও বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর প্রতি বিমুখ হয়ে কেন বিদেশের দিকে চেয়েছিলেন, এই বলে নীরদবাবু রবীন্দ্রনাথের যে-চিঠির উল্লেখ করেছেন, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে, একজন মানুষ সাময়িক নিন্দায় বা আঘাতে ক্ষুব্ধ হয়ে কারও কাছে মনের কথা তখন বলতে পারেন, কিন্তু একটু পরেই সেই মানুষই আবার তাঁর সাময়িক ক্ষোভ ও অভিমান ভুলে পূর্বের মানসিক অবস্থায় ফিরে আসেন। এও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল তাই। তিনি যদি দেশকে ভুলে বিদেশের দিকেই চাইবেন, তবে তিনি কি করে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর থেকে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত দেশের পক্ষ নিয়ে অসংখ্য বক্তৃতা, বিবৃতি ও লেখায় এবং কাজেও ইংরাজ তথা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। আর তাঁর সাহিত্যে 'ইংলণ্ডের অসাধারণ নৈসর্গিক ঐশ্বর্যের উল্লেখ পর্যন্তই বা করলেন না কেন'?

নীরদবাবু বলেছেন—গালি অগ্রাহ্য করবার শক্তি রবীন্দ্রনাথের আদৌ ছিল না।

নীরদবাবুর এ কথা ঠিক নয়। এ সম্বন্ধে 'সুনন্দ-ভবনের' শ্রীমতী...সেনকে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি চিঠি থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি। শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—"একখানা মাসিকপত্রে তখন রবীন্দ্রনাথকে এবং তাঁর ভক্তশিষ্য বলে আমাকেও মাসের পর মাস আক্রমণ চলছে; গালি-গালাজ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অবধি নেই—তার ভাষাও যেমন নিষ্ঠুর, অধ্যবসায়ও তেমনি দুর্দাম। কিন্তু কবি নীরব। আমি উত্যক্ত হয়ে একদিন অভিযোগ করায় শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন—উপায় কি! যেঅস্ত্র দিয়ে ওরা লড়াই করে, সে অস্ত্র স্পর্শ করাও যে আমার চলে না। আর একদিন এমনিই কি একটা কথার উত্তরে বলেছিলেন—যাকে সুখ্যাতি করতে পারিনে, তার নিন্দে করতেও আমার লজ্জাবোধ হয়।

তাঁর কাছে অনেক কিছু শিখেছি—কিন্তু সবচেয়ে বড় এ-দুটি আর ভুলিনি।"

রবীন্দ্রনাথ এক সময় এই শরৎচন্দ্রেরই তীব্র আক্রমণ কিভাবে সহ্য করেছিলেন, তারও একটা উদাহরণ দিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ তখন শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন—"শরৎ,... তুমি আমাকে বার বার তীব্র ভাষাতে আক্রমণ করেছ—আমি কোনদিন তার প্রতিবাদ করিনি, এবং কখনই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে তোমাকে নিন্দা করে শোধ তুলিনি। এবারও সেই ফর্দে আর একটি সংখ্যা বাড়ল। আমার বিজয়ার অভিবাদন। ইতি—"

এই গালির প্রসঙ্গেই নীরদবাবু লিখেছেন—"অকারণ নিন্দা ও গালি বাঙালী জীবনের একটি ধারা। ...রবীন্দ্রনাথ বুঝেন নাই যে, উহা কোন দোষ বা অপরাধের অপেক্ষা রাখে না, কোন প্রতিস্পর্ধিতা বা শত্রুতাপ্রসূত নয়, উহা সম্পূর্ণ অহেতুক ও নিষ্কাম। রবীন্দ্রনাথের বোঝা উচিত ছিল, বাংলা দেশে জন্মে তিনি যেমন বাঙালী হয়েছেন, তেমনি বাঙালীর নিন্দার লক্ষ্যও হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি নব্য হিন্দু-আন্দোলনের কয়েকজন নেতার সঙ্গে মসীযুদ্ধে নেমেছিলেন। সেই কারণে তখন সুরেশ সমাজপতি প্রভৃতি কয়েকজন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। কিন্তু এঁরাই আবার অনত্র রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাও করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরিতে' অস্পষ্টতার ও 'চিত্রাঙ্গদায়' দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন। আর তিনি যেমন 'আনন্দ বিদায়' (১৯১২) লিখেছিলেন, তেমনি পরে অনুতপ্তও হয়েছিলেন। এই দ্বিজেন্দ্রলালই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবাদ চলাকালেই 'গোরা' উপন্যাসের একটি সপ্রশংস আলোচনাও (কার্তিক, ১৩১৭) প্রকাশ করেছিলেন। আবার এই দ্বিজেন্দ্রলালই বলেছিলেন (আষাঢ়, ১৩২০)—'আমাদের শাসনকর্তারা যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে...রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।'

সাহিত্যিক মহলে এ ধরনের বাদানুবাদ প্রধানত রুচিবোধের জন্য, কখনও বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যও হয়ে থাকে। এ শুধু আজ বলে বা বাঙালী বলেই নয়, সর্বকালে ও সর্বদেশেই আছে এবং ছিলও। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে মহাকবি ভবভূতি 'মহাবীরচরিত' নাটকেরও তীব্র সমালোচনা হয়েছিল। তাই তিনি এর জবাবে তাঁর পরবর্তী নাটক 'মালতী-মাধবের' প্রথমেই লিখেছিলেন—

উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।

আর বিলাতেই বা কি! ব্রাউনিং ওয়ার্ডসোয়ার্থকে এবং ওয়ার্ডসোয়ার্থ, শেলী ও বায়রনকে আক্রমণ করেছিলেন। কোলরিজ স্কটের উপন্যাসের বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। এমন কি শেক্সপীয়র, মিলটনও বিরূপ সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাননি। ডঃ জনসন মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্টের' প্রশংসা করতে পারেননি। কবি ও নাট্যকার ড্রাইডেন শেক্সপীয়রের নাটকে কাহিনীতে, বাক্য গঠনে, এমন কি অর্থ-প্রকাশেও কোথাও কোথাও ত্রুটি আছে বলে মতপ্রকাশ করেছেন।

নীরদবাবু তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন—'রবীন্দ্রনাথকে গাল পেড়ে ঘরের বার করা হয়েছিল।' —এই নীরদবাবুই আবার লিখেছেন—'আমরা মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখি না, তাকে মরবার পরে ত বটেই, এমনকি মরবার আগেই মহাত্মা, অবতার, ঋষি ইত্যাদিতে পরিণত করি। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে, বরং বেশী করেই ঘটেছে। —নীরদবাবুর এই উক্তি দুটি কি পরস্পরবিরোধী হ'ল না!

এ সম্বন্ধে আসল কথা হ'ল, আমরা মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখি। তবে কোন মানুষের মধ্যে যদি কিছু অসাধারণত্বের পরিচয় পাই তখন তাঁর সেই অসাধারণত্বের জন্য ঋষি মহাত্মা ইত্যাদিতে তাঁকে অভিহিত করি। এটা ত তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধারই একটা প্রকাশ। এরকম ব্যক্তিপূজা প্রকারভেদে সকল দেশেই আছে। Hero-worship কি ইউরোপে নেই! আর একটা কথা, আমরা যাঁদের ঋষি, মহাত্মা ইত্যাদি বলি, তাঁদের কারোর ত্রুটি দেখলে আমরা চুপ করে থাকি না। তারও প্রতিবাদ করি।

নীরদবাবু বলেছেন—ইউরোপীয়রা এক সময় রবীন্দ্রনাথকে সমাদর করে ছিল বলেই আমরা রবীন্দ্রনাথের সমাদর করি। —নীরদবাবু আবার নিজেই বলেছেন—আমি জোর গলায় বলছি, ১৯০১ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত যে পাশ্চাত্য লেখকরা নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, সাহিত্যিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের স্থান তাঁদের সবারই উপরে। রবীন্দ্রনাথের এই যে সাহিত্য-প্রতিভা, নিজের মাতৃভাষায় পড়েও কোন বাঙালী কি তা বুঝতে পারে নি? ইউরোপীয়রা সমাদর করাতেই তবে বুঝেছিল?

ইউরোপীয়রা সমাদর করার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসীর কাছ থেকে সমাদর লাভ করেছিলেন। তাঁর 'সন্ধ্যা-সংগীত' পড়েই বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কণ্ঠের মালা রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ৫০ বছর বয়সের সময় তাঁর সাহিত্য সাধনার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলকাতায় টাউন হলে এক বিরাট সভায় তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বিদ্যাসাগরের জীবনী-লেখক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে তা প্রত্যক্ষ করে চিত্তরঞ্জন দাশ (পরে দেশবন্ধু) সম্পাদিত 'নারায়ণ' কাগজের ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যায় লিখেছিলেন—"জেনারেল এসেম্ব্রির (বর্তমান নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ) হলে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ শ্রবণের প্রলোভন-তাড়িত জনমণ্ডলীর মজলিসে বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতি। সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র সবেমাত্র রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সভা-সমিতিতে যাতায়াত তাঁহার বড় অভ্যাস ছিল না। বিশেষত, সেকালের রবীন্দ্র-সম্মেলন যে কি বিরাট ব্যাপারে পরিণত হইত, তাহা তাঁহার জানা ছিল না। যাহা হউক, দারুণ গ্রীষ্মে কণ্ঠাগত-প্রাণ সেই বিরাট জনমণ্ডলীর সম্মুখে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতির কার্য সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। ...সেদিন গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে জেনারেল এসেম্ব্রির স্বল্পায়তন হলে লোকে লোকারণ্য। বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের শিক্ষিত গণ্যমান্য সাহিত্যিকগণ উপস্থিত। সেই সভায় বহু লোক অতিকষ্টে কেবল দাঁড়াইবার স্থান পাইয়া কৃতার্থ।" .

চণ্ডীবাবুর বর্ণিত এই ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার বিশ বছরেরও আগের।

নীরদবাবুর মতে, রবীন্দ্রনাথ একক, অন্তর্মুখীন ও কুনো ছিলেন বলেই স্কুলে পড়তে পারেননি এবং কলকাতার পৈতৃক বাড়িতেও বেশী দিন বাস করতে পারেননি। অথচ স্কুলে পড়তে না পারার জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখেছেন—'যেবিদ্যালয় চারিদিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাসপাতাল জাতীয় একটা নির্মম বিভীষিকা তাহার নিত্য আবর্তিত ঘানির সঙ্গে কোনমতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।'

আর কলকাতা ছাড়া সম্বন্ধে রবীন্দ্র-

পর ঠাকুর তাঁর পিতৃদেবের আদেশ শিলাইদহ-পতিসর গোড়াতেই আমার পিতা মহর্ষি দেবের কাছ থেকে কঠিন দায়িত্বপূর্ণ একটি অবস্থায় পেলেন। মহর্ষি আদেশ করলেন, তাঁকে জমিদারি চালাতে হবে। ...এই কাজের ভার পেয়ে বাবাকে কলকাতা ছাড়তে হ'ল। তিনি চলে গেলেন শিলাইদহে।'

সকলেই জানেন, এর পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ জমিদারিতে পল্লী-উন্নয়নের কাজে এবং শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের কাজে জড়িয়ে পড়ার তাঁর পক্ষে কলকাতায় আর মধ্যবরের জন্য বসে থাকা সম্ভব হয়নি।

নীরদবাবু লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই জনসমাজে মিশবার উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন না।

জনসমাজে মিশবার লোক না হলে তিনি জমিদারিতে পল্লী-উন্নয়নের কাজ নিয়ে প্রজাদের সংগে অত মিশেছিলেন কি করে? এক সময় তিনি তাঁর জমিদারিতে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে প্রবল উৎসাহে নানা প্রকার গ্রাম্য ছড়া, ব্রতকথা, বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতি লোকসংগীত সংগ্রহ করেছিলেন। মেয়েলী ছড়া সংগ্রহের সময় তিনি গ্রামের মেয়েদের কাছে গিয়ে তাদের মুখ থেকেও ছড়া শুনেছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন নিজে এই সংগ্রহের কাজে নেমে আরও কয়েকজন অনুরাগীকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিলেন।

নীরদবাবু দেশবাসীর রবীন্দ্র-উৎসব পালন সম্বন্ধে বলেছেন—'এই উৎসবে 'দ্বিজ-নৃপ-গণিকার' শুভাগমন হয়ে থাকে।'

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, নৃত্য ও সংগীত শিক্ষালয়, সাধারণ পাঠাগার এবং কোন কোন সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান—এঁরাই সাধারণত রবীন্দ্র--উৎসব করে থাকেন। এইসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী ও সভ্য-সভ্যারা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে, তাঁর সংগীত পরিবেশন করে এবং কোথাও বা তাঁরই নাটক অভিনয় করে গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজো করেন। এজন্য দ্বিজ-নৃপ-গণিকার শুভাগমন কোথাও হয় নাই। সভার সভাপতিকে দ্বিজ এবং সভার উদ্যোক্তাদের কোন ধনী ব্যক্তিকে নৃপ বলেই যদি নীরদবাবু বুঝে থাকেন, তা হলে তিনি 'গণিকা' কাদের বুঝেছেন। বিদ্যালয় ছাড়া কচিৎ কোন রবীন্দ্র-উৎসব প্রতিষ্ঠান এমন দু-একজন শিল্পীকে অবশ্য আনেন, যাঁরা বাঙালীর স্বাভাবিক বা গোঁড়া সমাজ ও পরিবারের বাইরের। কিন্তু তাই বলে তাঁরা মোটেই প্রচলিত অর্থের 'গণিকা' নন। এই দিক থেকে এবং এইভাবের ব্যতিক্রমকে সাধারণ

অন্যায় তো বটেই, নীরদবাবুর এই কথা অত্যন্ত আপত্তিকর।

বাঙালী রবীন্দ্র-উৎসব করে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই। তবে রবীন্দ্র-উৎসবে গান, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে বলে সময় সময় উদ্যোক্তাদের রবীন্দ্র-ভক্তির চেয়ে আনন্দ-উৎসবটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। এর জন্য তাঁরা দেশের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে সমালোচনাও শুনে থাকেন। কিন্তু তাই বলে তাঁরা অ-বাঙালীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে বা নিজেদের বংশমর্যাদা বজায় রাখতে রবীন্দ্রনাথকে ভাঙিয়ে উৎসব করেন না। আর মন্দিরের পাণ্ডা বা মসজিদ-দরগার খাদিমের ন্যায় কোন বৈষয়িক স্বার্থেও রবীন্দ্র-উৎসব করেন না।

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, তিনি মোটেই অসামাজিক ছিলেন না। কি পারিবারিক সংস্কার, কি লোকের সঙ্গে কথাবার্তায় বা ব্যবহারে সর্বদাই তাঁর একটা অতি ভদ্র ও সুরুচির ছাপ ছিল। আর তিনি যে একেবারেই বৈষয়িক ছিলেন না, তাও বলা যায় না। দীর্ঘকাল তিনি দক্ষতার সঙ্গেই জমিদারি পরিচালনা করেছেন। পরে জমিদারি ভাগ হয়ে গেলে শিলাইদহ যখন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগে পড়ে, সেই সময় শিলাইদহের প্রজারা একবার কিছুদিন ধরে জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে। সুরেনবাবু তখন কোন উপায় স্থির করতে না পেরে অবশেষে রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করেন।

রবীন্দ্রনাথ গিয়ে এমন সুন্দরভাবে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়েছিলেন যে, সকল প্রজা ও জমিদার সবাই খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শিলাইদহের ঠাকুর এস্টেটের তৎকালীন কর্মচারী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর 'রবীন্দ্র মানসের উৎস সন্ধানে' গ্রন্থে এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন।

নীরদবাবু লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির মূল্য নির্ধারণ করবার ক্ষমতা না ছিল সুয়েডিস অ্যাকাডেমির, না ছিল ইয়েটসের, কারণ, উহার জন্য বাংলা ভাষা জানার প্রয়োজন ছিল। আর যে ইংরাজীতে রবীন্দ্রনাথ বইখানা লিখেছিলেন তা স্বাভাবিক ইংরাজী নয়, খেয়াল, শখ বা খেলার ইংরাজী মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও শিল্পী রোটেনস্টাইনের আমন্ত্রণে গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ নিয়ে ইংলণ্ডে যান। সেখানে একদিন সন্ধ্যায় রোটেনস্টাইনের বাড়িতে কয়েকজন জ্ঞানীগুণী ও কাব্য-রসিকের কাছে গীতাঞ্জলি পড়া হয়। কবিতা শুনে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই পাঠ সভায় মিস সিনক্লেয়ার উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন—'সেদিন সন্ধ্যায় কবি ইয়েটস প্রায় বারজন শ্রোতার সামনে কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনালেন, সেই অবৃত্তি যেন সেই সন্ধ্যায় বৈঠকখানা ঘরটিকে মন্দিরে পরিণত করল।'

ইয়েটস এমনি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি বহুবার বলেছেন—'আমি আমাদের যুগের এমন কোন মানুষের কথাই জানি না, যিনি ইংরাজী ভাষায় এমন কিছু লিখেছেন, যা রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।'

রোটেনস্টাইন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—'যদিও আপাতদৃষ্টিতে দেখলে অনুবাদের ইংরাজী অতি সরল, তবু এই কাব্য এক শিল্পী ও সুরকারের রচনা, যিনি আমাদের সংগীতের চেয়ে সূক্ষ্মতর সুরের সঙ্গে পরিচিত।'

এখানে দেখা যাচ্ছে, এঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের 'রচনার মূল্য নির্ধারণ' করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বীকার করি, এঁরা বাঙলা জানলে মূল কবিতা পড়ে হয়ত আরও মূল্য নির্ধারণ করতে পারতেন, কিন্তু তাই বলে এঁরা যে কবিতার মূল্য নির্ধারণ করতে পারেননি, তা-ও নয়।

কোন গ্রন্থ যে ভাষায় রচিত হয়েছে, সে ভাষা না জেনেও, অন্য ভাষায় অনুবাদ পড়েও পণ্ডিত ব্যক্তিরা সে গ্রন্থের রসাস্বাদন করতে পারেন। যেমন—মনীষী রোমাঁ রোলাঁ শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'র ইটালী ভাষায় অনুবাদ পড়েই সে গ্রন্থের মূল্য নির্ধারণ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

আর রেটেনস্টাইনের স্মৃতিকথা থেকে এও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, গতাঞ্জলির ইংরাজী অতি সরল ছিল, কিন্তু তাই বলে সেটা অস্বাভাবিক, খেয়াল, শখ বা খেলার ইংরাজী ছিল না।

নীরদবাবু লিখেছেন—'রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ বয়সের আঁকা ছবি দেখে তখনই তিনি মনে করেছিলেন এই যে, রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ভিক্টর হ্যুগোর চিত্র সম্বন্ধে বই-খানা দেখে ভেবেছেন, ভিক্টর হ্যুগো যদি চিত্রকর হতে পারলেন, তবে আমি কবি রবীন্দ্রনাথও চিত্রকর হব না কেন?

এর পরে প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের চিত্রের 'শ্যাপেরোন' কঁতেস্ দ্য নোয়াই রবীন্দ্র-নাথের ছবির প্রশংসা করলে রবীন্দ্রনাথ উঠে পড়ে ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন। মাদাম দ্য নোয়াইএর লেখাতে প্রশংসার যে প্রচ্ছন্ন তামাশা ছিল, নীরদবাবু তা পড়েই বুঝেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেননি।

কঁতেস্ দ্য নোয়াই বিখ্যাত লেখিকা, প্যারিসের লেখক ও বিদগ্ধ সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। এই জাতীয় ফরাসী মহিলারা শিকারী চিতার মত। এঁরা অতি শোভন, শালীন ও বিদগ্ধভাবে সজ্জাল। একবার এঁদের খপ্পরে পড়লে শুধু 'কল্যাণীয়াসু' পাঠে চিঠি লিখে পার পাবার উপায় নেই, 'দাসখত লিখে দিলাম শ্রীচরণে' বলেও নিষ্কৃতি নেই—এঁরা লেখকদের ভালুক বা বানরের মত নাচাতে চান। বাঙালী রবীন্দ্রনাথ এত খানু ছিলেন না যে, এই ধরনের মহিলার আওতায় এসে খেলার পুতুল না হয়ে পারেন।'

রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা সম্বন্ধে নন্দলাল বসু তাঁর 'গুরুদেবের ছবি আঁকা' প্রবন্ধে লিখেছেন—'গুরুদেবের ছবি আঁকার তথ্যানুসন্ধানে দেখতে পাই—তরুণ বয়স থেকেই এদিকে তাঁর আগ্রহ ও কৌতূহল ছিল—সেই প্রথম দিকের কাজও হয়ত কোথাও সঞ্চিত আছে। কিন্তু প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে এদিকে তাঁর একাগ্র চেষ্টার সূচনা হল।'

রবীন্দ্রনাথ ভিক্টর হ্যুগোর ছবির বই দেখেই যে ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন, এ থেকে তা বলা যায় না। আর তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ যদিই হ্যুগোর ছবি আঁকা থেকে ছবি আঁকার প্রেরণা পেয়ে থাকেন তাতে ক্ষতিই বা কি? আসলে সেগুলো ছবি হল কি না, সেইটাই বিচার্য। হারম্যান হেসও তো বৃদ্ধ বয়সে ছবি আঁকতে শুরু করেছিলেন।

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, আঁদ্রে কারপেলেস ও কঁতেস্ দ্য নোয়াই এইরূপ কয়েকজন শিল্পী ও শিল্প-রসিকের সাহায্যে প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রথম প্রদর্শনী হয়েছিল। পরে ড্রেসডেন, বার্লিন এবং মিউনিকেও তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়। রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে ড্রেসডেনের আর্ট অ্যাসোসিয়েশন লিখেছিল—'ঠাকুরের ছবি তাঁর কবিতা ও গানের মতই তাঁর আত্মার এক-একটি কণা। ...এর মধ্যে অতি স্বাভাবিক ছন্দে মনের রূপ নিঃসৃত হয়ে এসেছে।'

এর পরে রাশিয়া, ইংলণ্ড এবং আমেরিকাতেও রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল এবং সর্বত্রই বিশিষ্ট কলাবিশারদরা রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রশংসাই করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রশংসায় মাদাম দ্য নোয়াই-এর যদি প্রচ্ছন্ন তামাশাই ছিল, তা এঁরা তাঁর ছবি দেখে প্রশংসা করলেন কি করে?

আর মাদাম দ্য নোয়াই যতই শিকারী চিতার মতন হউন না কেন, রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর 'শিকার' হন নি, তারও একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এ সম্বন্ধে মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর 'বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লিখেছেন—

"কোঁমতেস দ্য নোয়াই ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ কবি, গ্রীক বংশোদ্ভবা, বিখ্যাত দ্য নোয়াই বংশে বিবাহিতা। তাঁর সঙ্গে কবির প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯২১ সালে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর Edges of Time গ্রন্থে সে কথা উল্লেখ করেছেন। সেই সময় অর্থাৎ প্রথম যেদিন তিনি কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন, তখন সেখানে আঁদ্রে কারপেলেসের কনিষ্ঠা ভগ্নী সুসান কারপেলেস সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সুসান তখন স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে কবির সেক্রেটারীর কাজ করছিলেন। তাঁর কাছে ঐ সাক্ষাতের বর্ণনা যেরূপ শুনেছি, তার যথাযথ বিবরণ এখানে লিখছি:—

গ্রীক বংশোদ্ভবা কোঁমতেস দ্য নোয়াই অপূর্ব রূপসী।...তাঁর বঙ্কিম কটাক্ষে বহু বীর পরাভূত।...কোঁমতেস অপূর্ব ভূষণে সজ্জিতা হয়ে এসেছেন।...কবির সামনে বসে সেই লাবণ্যময়ী হাস্যকৌতুকে লাস্যময়ী হয়ে উঠলেন...মনোহারিণীর ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণা হলেন। কোঁমতেস যতই চঞ্চলা বিলাসলাবণ্যমুখরা হয়ে রূপচ্ছটা বিকীর্ণ করতে লাগলেন—কবি ততই গম্ভীর, সুদূর অনালভ্য হয়ে গেলেন, তাঁর দুই হাত কোলের উপর সম্বদ্ধ, মূর্তি স্থির, চক্ষু নিম্ননিবদ্ধ, অর্ধমুদিত, দেবমূর্তির মত দুর্জ্ঞেয়। যতই তাঁর সামনে মোহের জাল ছড়িয়ে পড়ছিল, ততই তিনি যেন ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বে চলে গেলেন, সমস্ত তুচ্ছতা অতিক্রম করে অনধিগম্য গভীরতায়। অবশেষে কিছু পরে তাঁর ধ্যানবদ্ধ দৃষ্টি ঈষৎ উত্থিত করে, স্নিগ্ধ মৃদু হাস্যে বললেন Let us not forget that we are both poets— মুহূর্তে বুদ্ধিমতী রমণীর কাছে ধরা পড়ল ভ্রম...তিনিও কবি, নিঃসংশয়ে সেই তাঁরও সত্যরূপ, মোহময়ী নারীর ভূমিকা তুচ্ছ খেলামাত্র।"

নীরদবাবু লিখেছেনঃ—অভিনেতা হিসাবে বিশ্বের দরবারে লেডি-ড্রেস পরে থাকার ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবনে ব্যর্থতা ভিন্ন পূর্ণতা আসে নাই।

কোন মানুষের জীবনে ব্যর্থতা বা পূর্ণতা তার পোশাকের জন্য আসবে কেন? গান্ধীজী তো একরূপ পোশাক না পরেই, 'অর্ধ উলঙ্গ' হয়ে বিশ্বের কত বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেছেন, কিন্তু সেজন্য তাঁর জীবনে পূর্ণতা আসে নি, এ কথা তো কেউ বলে নি।

রবীন্দ্রনাথ কখন কখন ধুতি-পাঞ্জাবি পরলেও অধিকাংশ সময়ই পায়জামা, ঢিলে পাঞ্জাবি বা আলখাল্লা পরতেন। এই ড্রেসটা লেডি-ড্রেস হতে যাবে কেন, বরং এটা মুসলমানী ড্রেস। রবীন্দ্রনাথ কেন এইরূপ পোশাক পরেন, এ সম্বন্ধে বিশ্বভারতীর এক সময়ের অধ্যাপক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত তাঁকে প্রশ্ন করলে, তিনি বলেছিলেনঃ—

মজরে পড়ল, একটা সুপুরী গাছের গলার কাছে, প্রায় আকাশের কাছে বলা যায়, কাঠঠোকরা দিব্যি বসে আছে, মাঝে মাঝে ঘাড় নিচু করে আমাকে দেখছে, এবং দেখা শেষ করেই প্রচণ্ড ঠক ঠক আওয়াজ তুলে কাঠ ঠোকরাচ্ছে, অর্থাৎ আমাকে ঠাট্টা করছে।

কিন্তু তবু নিজের ওপর ধিক্কার জন্মাল না। বরং ছুরিটা উদ্ধার করতে নির্লজ্জের মতন লম্বা পা ফেলে জারুল গাছটার দিকে এগোতে লাগলাম।

তাই বলছিলাম, আমার স্বভাব। অথচ চতুষ্পার্শ্বে তো বটেই, ঊর্ধ্ব অধঃ ঈষাণ নৈঋত—সব মিলিয়ে, বলতে গেলে আমার দশদিকেই চোখ জুড়ানো ছবির ছড়াছড়ি তখন। মাথার ওপর বিকেলের জাফরানী আকাশ, পায়ের তলায় নধর শ্যাম দূর্বাদল, বাঁয়ে মাদারের ঝোপ, থোকা থোকা লাল ফুলে ওধারটা রীতিমত রক্তাক্ত হয়ে আছে; ডাইনে আনারসের জঙ্গল, আমার তো একটা ছুরি, ওই জঙ্গলের দিকে তাকালে মনে হবে হাজারটা ছুরির ফলা উঁচিয়ে ধরে কেউ বুঝি আকাশটাকে ফালাফালা করে দিতে চাইছে। কিন্তু তা তো আর হয় না, আনারসের পাতার ছুরিতে হিংসার লেশমাত্র নেই, আক্রোশ নেই, এদের কাজ সবুজ লাবণ্য ছড়ানো, মাটির রস টেনে নিয়ে রৌদ্র শুষে নিয়ে রসাল ফল ফলানো। এই জন্যই এরা বনের সম্পদ, প্রকৃতির শোভা। হুঁ, ডাইনে আনারসের জঙ্গল, বাঁয়ে মাদারের ঝোপ, সামনে জারুল জিয়ল জামের বন বন। যতদূর চোখ যায় মাথার ওপর সবুজ পাতার ঝালর ঝুলেছে। ফাঁকে ফাঁকে চিকচিক করছে বিকেলের জাফরান রঙের রোদ। এক এক সময় ভ্রম হয় কেউ বুঝি সোনার রঙের সব বর্শা পাতার ভিতর দিয়ে বনের ভিতর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে।

পিছনের দৃশ্যপটও সুন্দর। চোখ ফেরালেই হাঁটু-উঁচু বিশাল ভাঁটার জঙ্গল। যেন আকাশের ওদিকে গিয়ে ঠেকেছে সাদা ফুলের ঢেউ। যত ফুল তত ভ্রমর। ভাঁটফুলের গন্ধে পাগল হয়ে সব ছুটে এসেছে।

ওরা ফুলের গন্ধে পাগল। আমি মেতে আছি আমার ছুরি নিয়ে। জারুলের মোটা বাকল থেকে ছুরিটা টেনে বার করে নিয়ে সন্তর্পণে জাম গাছটার দিকে এগোতে থাকি। বয়ে গেল কাঠঠোকরা উড়ে গেছে দুঃখ নেই। যেন এবার অধিকতর নিষ্ঠা নিয়ে আক্রোশ নিয়ে ক্রুরতা নিয়ে লেজফুলো ধুমসো একটা কাঠবিড়ালকে কাবু করব বলে শক্ত মুঠোয় ছুরিটা বাগিয়ে ধরলাম।

অথচ ফাল্গুনের চমৎকার বৈকালিক রোদ গায়ে মেখে পাখিরা মনের সুখে তখন কলরব করছিল, যেমন ভাঁটের জঙ্গলে ভ্রমরের ঝাঁক ওড়াওড়ি করছিল, যেমন আনারসের ঝোপে প্রজাপতি কীড়র এবং আরো কত কি পতঙ্গ পাখা ছড়িয়ে নেচেকুঁদে অস্থির।

আমার দিকে কেউ তাকাচ্ছিল না।

অথবা আমায় দেখে ঘৃণায় সবাই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল। ঠাট্টা করছিল কেউ, হয়তো ধিক্কারও দিচ্ছিল। কাঠঠোকরাটা তো তাই করছিল। ওরা বুঝে গিয়েছিল, আমি এখানকার কেউ না।

না-ই তো। শহরের বেওয়ারিশ মানুষ। শহর আমাকে উগরে ফেলে দিয়েছে। তাই একতাল শহুরে ক্লেদ নিয়ে, হিংসা ও নোংরামি নিয়ে একটা ছুরি হাতে আমি মমারম এখানে চলে এসেছি।

কাজেই এই বন, বনের পশু পক্ষী পতঙ্গ আমাকে সহ্য করবে কেমন করে। বন সহ্য করতে পারছে না, ওদিকে শহরও আমায় জীর্ণ করতে পারল না। এই জন্য সময় সময় নিজের কাছেই মনে হয়েছে, আমি একটা কিম্ভূতকিমার জীব।

শহর যাদের জীর্ণ করেছে তারা এখন ওডিকোলন গায়ে ছড়িয়ে ট্যালকম পাউডার মেখে ফাল্গুনের মিষ্টি গরমে ঘরে বসে ফ্যানের হাওয়া খাচ্ছে, অথবা বন্ধুর সঙ্গে প্রণয়ীর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছে। বা গাড়ি জোগাড় করতে পারলে কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে। আর এই জঙ্গলে লজ্জার মাথা খেয়ে আমি যাচ্ছি ছুরি নিয়ে কাঠ-বিড়াল মারতে। জিনিসটা হাস্যকর বটে।

কিন্তু জামতলায় পেঁছে থমকে গেলাম। গুঁড়িমোটা প্রকাণ্ড গাছ। তা-ও আবার দু ধারে যজ্ঞডুমুরের চারা গজাতে আরম্ভ করে ওপাশটা বেড়ার মতন ঘিরে ফেলেছে, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তা হলেও শব্দ শুনে যাকে বলে কানের আন্দাজে ডুমুর ঝোপের ভিতর দিয়েই ছুরিটা ছুড়ে মারতে ইচ্ছা করল। প্রথমটায় মনে হল সুন্দর এক জোড়া হরিণ-টরিন বুঝি পথ ভুলে ঘাস খেতে এদিকে চলে এসেছে। কাঠবিড়াল কি কাঠঠোকরা মারার চেয়ে হরিণ মারার উত্তেজনা যে অনেক বেশি সবাই তা স্বীকার করবে। কিন্তু পরক্ষণে মনে হল, হরিণ না, মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সমস্ত রক্ত তড়াক করে মাথায় উঠে গেল। তাই তো, শহরের মানুষ জঙ্গলে বেড়াতে এসেছে। ভাবনার সঙ্গে শরীরটা মৃগী রুগীর মতন কাঁপতে লাগল, গলার কাছে খানিকটা তেতো জল উঠে এল, হাতের মুঠ শিথিল হয়ে ছুরিটা টুপ করে নিচে শুকনো জামপাতার ওপর ছিটকে পড়ল, চোখে ঝাপসা দেখতে লাগলাম, নিশ্বাসের পরিবর্তে নাকের ছিদ্র দিয়ে গরম বাষ্প বেরোতে আরম্ভ করল। দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব ছিল না। পায়ের কাছে একটা শুকনো জামের গুঁড়ি দেখে পড়তে ধপ করে সেটার ওপর বসে পড়লাম।

তা হলে এখানে একটা না, দুটো জাম গাছ ছিল, একটা কে কবে কেটে নিয়ে গেছে, অথবা কোনো এক বৈশাখের ঝড়ে ভেঙে পড়েছিল, শুকনো গুঁড়িটা পড়ে আছে—অনেক কিছুই তখন চিন্তা করতে পারতাম। অথবা গুঁড়ির নিচের অংশে যেখানে কাঠ পচে গেছে, তলায় ঘাস হলদে হয়ে আছে, সেখানে কুড়ি দু কুড়ি ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে। ওপাশে থোকা থোকা সাদা ঘাস ফুল বসন্তের মৃদুমন্দ হাওয়ায় কেমন চমৎকার থিরথির করে কাঁপছিল। অবাক হয়ে এসব জিনিস লক্ষ করা যেত। কিন্তু অন্য কোনো দিকে মন দেবার মতন নজর দেবার মতন মনের অবস্থা আমার ছিল না। ভুমুরের বেড়ার ওপাশের শব্দ নিয়ে তখন মাথা গরম। পশুর মতন হোক কি পাগলের মতন হোক, মানুষ বলতে একলা আমিই এই জঙ্গলে বিচরণ করছি। হঠাৎ এখানে মানুষ এল কারা। যেন এক জোড়া মানুষের গলার শব্দই কানে আসছিল। ভয় বিস্ময় ক্রোধ কৌতূহল—তরঙ্গের পর তরঙ্গ আমার মনের ওপর দিয়ে খেলা করে যেতে লাগল, ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না এই অবস্থায় কি করা উচিত—প্রায় দু মিনিট কাটল, তারপর একটা প্রকাণ্ড ঢেউ, কেন বুঝতে পারলাম না, তবে এটা যে উল্লাসের তরঙ্গ বুঝতে কষ্ট হল না, পাহাড়ের মতন উঁচু হয়ে কোথা থেকে ছুটে এসে আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর ইতস্তত না করে ছুরিটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে ডুমুর ঝোপের ভিতর মাথাটা গুঁজে দিলাম। ডাল পাতা সরে গিয়ে খানিকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে একটা জানালা তৈরী হয়ে গেল। জানালা দিয়ে পরিষ্কার সব দেখা গেল। এবার হতাশ হলাম, উল্লাসটা স্তিমিত হয়ে গেল, আক্রোশ নিবে গেল।

ছুরিটা আর মুঠোর মধ্যে ধরে না রেখে কোলের ওপর শুইয়ে রাখলাম। কাপড়ের খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছলাম।

এক কথায় আমার মেজাজ তখন ঠাণ্ডা জল। মন শান্ত।

মাথার ওপর সম্ভবত জাম গাছে একটা টিয়া টি-টি করে ডাকছিল। রোদটা আর একটু পেকে উঠে, আর একটু গাঢ় হয়ে জাফরান রং ছেড়ে কমলা রং ধরতে আরম্ভ করেছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল জোরে পিঠ এলিয়ে দেবার মতন আয়েস করে বসি। দৃশ্যটা ভাল করে উপভোগ করা যাবে। কিন্তু গাছের গুঁড়ির ওপর সেই সুবিধা ছিল না। অগত্যা পা দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে শরীরটাকে একটু ঢিলে করে দিলাম। তারপর, একটু আগে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে দুই চোখ অবাক আবেগ নিয়ে যেমন [illegible]

তোমরা ইত্যাদি দেখছিলাম, তেমনি ডুমুর পাতার ফাঁক দিয়ে যুবতীকে দেখতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে পর পর দুটো গাঢ় নিশ্বাস ফেললাম। লিপস্টিক ঘষে নয়, এমনিতে লাল টুকটুক করছে ঠোঁট, ওটাই ওর ঠোঁটের স্বাভাবিক রং। আর মনে হচ্ছিল, সব সময় মনে ভিজে আছে অধরোষ্ঠ, কথা বলতে সুধা ঝরে, হাসির সঙ্গে মধু। প্রচুর কথা বলছিল সে, হাসছিলও।

কি কথা বলছিল, কি নিয়ে হাসছিল, আমার জানবার কথা নয়। জানার অধিকারও ছিল না, যেমন আটোসাঁটো যৌবনপুষ্ট শরীরটার ওপর লোভ করার আমার এক ফোঁটা অধিকার ছিল না।

অস্বীকার করব না, একটা উগ্র কামভাব ভিতরে জাগছিল। ঝোপের ভিতর দিয়ে যত দেখছিলাম, জিভে জল আসছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাছে ধমক খেয়েছি। তুমি লোভ করবার কে হে, সঙ্গে পুরুষ আছে যে, দেখতে পাচ্ছ না ঘরের বউ? পাড়া গাঁ-র মেয়ে, সিঁথিতে সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে।

তাই দেখছিলাম, যেন মাথার ওই সিঁদুরের ফোঁটাটি সবচেয়ে বড় প্রসাধন, চোখের কিনারে সামান্য যা একটু কাজলের পোঁছ, পায়ে আলতার ছিটে। তা-ও ধুলো-টুলো লেগে আলতার লাল ধূসর হয়ে গেছে। কাঁচ কলাপাতা রং সস্তা তাঁতের শাড়ি ও একটা লাল বুটিদার সুতীর ব্লাউজ নিয়ে সংক্ষিপ্ত বেশবাস।

কিন্তু সে তো কথা নয়, আদরে সোহাগে কেমন ডগমগ হয়ে ভুরু নাচিয়ে চোখের কালো ঝিলিক তুলে যুবতী অনর্গল কথা বলছিল, কথার ফাঁকে ফাঁকে মুঠো মুঠো হাসির যুঁইফুল ছিটিয়ে দিচ্ছিল চুপ করে তাই দেখছিলাম। চোখের কালো বলতে, আমার তো মনে হল, ওই ভাঁটফুলের বন থেকেই এক জোড়া ভোমরা উড়ে এসে ভুরু দুটোর নিচে বাসা বেঁধেছিল। মাথার ঘোমটা খসে খসে পড়ছিল, তা ওই নিরালা তেজ-পাতা গাছটার নিচে যেখানে কেবল ঘাস, চারদিকে কাঁটার জঙ্গল, প্রাণী বলতে কটা ফুরফুরে নরুন পাখি আর এক ঝাঁক লাল ফড়িং, সেখানে ঘোমটার বাড়াবাড়ি না থাকারই কথা। সঙ্গের ওই মানুষটি যদি স্বামী হয় তো কথাই নেই। স্বামীর সামনে কিসের আব্রু কিসের লজ্জা। স্বামী না হয়ে অন্য কেউ হবে সেরকম কোন যুক্তিও কি হাতের কাছে খুঁজে পাচ্ছিলাম। ছিটের পিরান গায়ে, হাতে-কাচা একখানা ধুতি পরনে। তা-ও কি আর পায়ের পাতায় কোঁচা লুটোচ্ছে, ঠিক হাঁটুর কাছে না হলেও হাঁটুর নিচে এসেই ধুতির বহর থেমে গেছে। মনে হচ্ছিল মানুষটি সাদাসিধে, ঘোর-প্যাঁচ কম বোঝে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, নাকখানাও সরু। এই ব্যক্তি যাত্রার দলে থেকে বেহালা বাজায় যদি কেউ বলত তো অবিশ্বাস করার কিছু ছিল না, আবার যদি শুনতাম যে ফরসা জামা কাপড় ছেড়ে ফেলে এই মানুষই এক সময় সড়কি হাতে বোয়াল মাছ শোল মাছ ধরতে খালে বিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তো তা-ও মেনে নেওয়া শক্ত ছিল না, বা—কারো বলার দরকার ছিল কি, যেন আমি কল্পনা করতে পারছিলাম, উদোম গা হয়ে তিন হাত একখানা গামছা কোমরে জড়িয়ে ক্ষেতীর কাজে নেমে যেতেও মানুষটার উৎসাহ কম যায় না, চড়া রোদে জলে পোড় খাওয়া শক্ত সমর্থ মরদ। তা মরদের কি জামাকাপড় পরে বৌকে নিয়ে এক আধদিন বেড়াতে বেরোতে দোষ আছে। এমনও হতে পারে, ভাবলাম, বৌকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছে জোয়ান। পায়ে হাঁটা পথ। অনেকটা হেঁটে এসেছে আরো হাঁটতে হবে। তার কাটাচেরা গোড়ালি থেকে আরম্ভ করে হাঁটু পর্যন্ত ধুলোর প্রলেপ। যেমন বউয়ের আলতা-পরা নরম পায়েও একগাদা ধুলো জমে আছে। শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে কি সেখান থেকে বউকে আনতে গিয়েছিল, এখন দুটিতে মিলে আবার ঘরে ফিরে যাচ্ছে তা-ই বা কে জানে। মোটের ওপর তারা যে হাঁটাপথে আসছিল সন্দেহ ছিল না। যেন এখানে মোলায়েম ঘাস দেখে ঠাণ্ডা ছায়া দেখে জিরিয়ে নিচ্ছিল। এক পাশে নামিয়ে রাখা লতাফুল আঁকা চমৎকার রঙদার টিনের সুটকেসটা চোখে পড়ল। ক'দিনের জন্য কোথাও যাচ্ছে, কোথাও ক'দিন থেকে এসেছে, তার সব রকম চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিলাম। অথবা, মনে হল, বিয়ে মুখে-ভাত কি সীমন্তোন্নয়নের নেমন্তন্ন খেতে স্বামী-স্ত্রী কুটুমবাড়ি যাচ্ছে। তার মানে জোয়ানের কাজকর্ম এখন ক'দিন বন্ধ থাকবে। একটা ছুটির আমেজ নিয়ে বউকে সঙ্গে করে বেড়াতে যাচ্ছে। হুঁ, যদি ক্ষেতীর কাজ করে তো লাঙল-বলদের কথা একেবারে ভুলে আছে, যদি মাছধরা পেশা হয় তো খালবিল সড়কি বল্লম একবারও তার মনে পড়ছে না। ঘরামীর কাজ করলেও বেত-বাঁশ টিন-টালি তার মন থেকে এখন অনেক দূরে। আর যদি যাত্রার দলের বেহালা বাজিয়ে হয়? অসম্ভব না। বেহালাই হয়তো সে বাজায়, বা ফ্লুট। গাট্টাগোট্টা জনমুনিষের চেহারা, তবু কেন জানি গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল মানুষটার মধ্যে একটি শিল্পী লুকিয়ে আছে। বাঁশীর মতন নাক ও মাথায় ঝাঁকড়া চুল দেখে এটা মনে হয়েছিল কিনা বলতে পারব না। যাই হোক, বেহালা বা ফ্লুট বাজিয়ে হলেও পালাগানের কথা যে এখন সে বেমালুম ভুলে আছে চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। তা বলে বেহালা বাঁশী ভোলেনি। এমন রূপসী বউ যার তার মনের মধ্যে নিশ্চয় সারাক্ষণ বেহালা বাজে, বাঁশী বাজে। আর তো কথাই নেই—দুনিয়ার কাজকর্ম শিকেয় ঝুলছে। বউয়ের সঙ্গে কুটুমবাড়ি বেড়াতে যাচ্ছে মরদ। মন একেবারে রঙিন হয়ে আছে।

হুঁ, বলছিলাম, সোয়ামীর সামনে কি আবার একটা আব্রু, কিসের লজ্জা, ঘোমটা খসে খসে পড়ছিল—বা যেন নিজেই এক-সময় হাত দিয়ে যুবতী মাথার ঢাকনা ফেলে দিল। অবাক হলাম খোঁপা দেখে। আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। বোঝা যায় কত চুল মাথায়। তাই টেনেটুনে পরিপাটি করে বেঁধে ওই পাহাড়-উঁচু মেঘকালো কবরী।

বুকের ভিতর থমথম করতে লাগল। কোলের ওপর ছুরিটা ছিল। আড়চোখে একবার সেটা দেখলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ হোঁচট খেলাম। শহরের চাঁছাছোলা মেয়ে নয়, খরভাষিণী কেউ নয়, পাড়াগাঁর মেয়ে—বউ, স্বামী সোহাগিনী, জামরুলের মতন রসাল, মিষ্টি।

তাই ছুরির কথা ভুলে গিয়ে যে-চোখ দিয়ে মানুষ ভাঁটবনে ফুলের ঢেউ দেখে, জারুলের মাথায় জাফরান রঙের চিকচিকে রোদ দেখে, আনারস জঙ্গলে প্রজাপতি দেখে সেই চোখ দিয়ে আমি রূপসীকে দেখতে লাগলাম। যেন মনে হচ্ছিল স্নো-ক্রিম-

পাউডার-অডিকোলন না মেখেও তার শরীর থেকে একটা সুঘ্রাণ উঠে আসছে, যেমন ফাল্গুন মাসে আমের বোল ফুটতে আরম্ভ করে সুগন্ধ ছড়ায়, যেমন পাকা ধানের মঞ্জরী থেকে একটা সুবাস উঠে আসে, অর্থাৎ ওই জাতীয় কোনো ফুল ফল বা শস্যের গন্ধের সঙ্গে তার শরীরের গন্ধের মিল আছে।

আর গায়ের রঙ! নিরালা বন পেয়ে মনের মতন পুরুষ পেয়ে, ঘোমটার মতন ক্ষণে ক্ষণে তার অঙ্গের বাস যদি সরে যায়, তবে কি তা দোষের। আমার তো মনে হয় সেটাই সুন্দর, মানানসই। আর তখনি আমার চোখে পড়ছিল পেট, কোমর, বাহু ও গলার উজ্জ্বল অনবদ্য সব অংশ। আপেল আঙুরের সঙ্গে তুলনা দিলে ভুল হত। বরং বলা যায় নূতন কাটা খড়ের, সোনালী হলুদ আভা ছড়িয়ে ছিল যুবতীর গায়ের চামড়ায়, সেই পরিচিত বিশুদ্ধ লাবণ্য।

হ্যাঁ, উচ্ছ্বসিত লাবণ্যও আছে, অপরের ব্যবহৃত শরীর নিয়ে বেঁচে আছে এমন যুবতী গৃহিণী আমার জানা আছে, চোখে দেখেছি। অথচ সেখানে সাবানের ছড়াছড়ি, ঠাণ্ডা জলে স্নান, গরম জলে অবগাহন, শাওয়ার বাথ, চৌবাচ্চায় গা ডুবিয়ে রাখা —অনেক রকম। এবেলা-ওবেলা অঙ্গ মার্জনা। অবশ্য সে সব কথা এখানে আসে না। অবান্তর।

তবে আর হাত থেকে ছুরিটা নামিয়ে রাখব কেন।

ঝুমুর পাতার জানালা দিয়ে এখন যাকে দেখছি। দেখছিলাম একটা পানাপুকুর, চার পাড়ে আসশেওড়া ও কচুর জঙ্গল, জলে শামুক গুগলি শ্যাওলার গন্ধ, হাঁসের গায়ের গন্ধ। গাঁয়ের বৌ গলাজলে নেমে স্নান করছে। কেন, বাড়ির কাছেই প্রকাণ্ড দীঘি থাকতে ক্ষতি কি, বর্ষায় সাপলা ফোটে, শরতে পদ্ম? অথবা মিঠাজল নিয়ে একটা ঠাণ্ডা কুলকুলু নদী? বিকেলের নরম আলোয় গা ধুয়ে ভরা কলসী কাঁখে ঘরে ফেরা। চোখের সামনে সেই রমণীয় দৃশ্য ফুটে উঠল। কাজকর্ম চুকিয়ে জোয়ান ঘরে ফিরেছে। বৃষ্টি ধোয়া সদ্য ফোটা টগরের মতন বৌ এসে হেসে সামনে দাঁড়ায়, হাতে পাখা, কিন্তু মিষ্টি হাতের বাতাস খাবার আগেই জোয়ান বৌয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে মিষ্টি মুখে একটা চুমু খেয়ে নেয়।

ঘরের ছবি। বনের ছবি আরও রঙিন আরও সুন্দর। এখন আর সেবা সোহাগ ভক্তি প্রেম ও গুরুগম্ভীর স্নেহই সব নয়, দাম্পত্য জীবনের নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাই শেষ কথা নয়, যেন তার অতিরিক্ত কিছু একজন আর একজনের কাছে পেতে চায়, যেন তারা আর স্বামী-স্ত্রী নয়, দুটি বন্ধু, প্রণয়ী প্রণয়িনী।

তাই তো হবে। মনে মনে ভাবলাম, ঘরের আস্বাদ ও বনের আস্বাদ এক হবে কেমন করে। মাথার ওপর এত বড় একটা আকাশ, এ-পিঠে মিষ্টি ছায়া ওপিঠে ফুরফুরে কমলা রং রোদ, পাতার ঝিলিমিলি, টুকটাক নরুন পাখির ডাক, জোড়া-লাগা ফড়িং-এর নৃত্য, ফাল্গুনের হাওয়ার হাইতোলা আলসেমী। আমারই কেমন মাথা ঝিমঝিম করছিল, কাঠখোট্টা শরীরটা ঘামছিল, ছুরির ধার মজে গিয়ে মন কামরসে সিক্ত হয়ে উঠেছিল টের পেলাম —আর ওরা কিনা দুজন। পুরুষ নারী।

যেন নূতন করে একজন আর একজনকে কাছে পেয়েছে। তাই দেখছিলাম বিমলীর এত হাসির ঝলক, চোখের ঝিলিক, টিপটিপ কথার বৃষ্টি। যেন আজ আর সাধ্বী স্ত্রী হয়ে নেই, চটুলা কোনো স্বৈরিণী। ঝাঁকড়া চুল বাঁশী নাক পুরুষের চোখেও যেন সেই সর্বনাশা নেশা। যেন পরনারীকে কাছে পেয়ে আদর করছে, তার শরীর হাসছে।

প্রথমটায় অবশ্য নিয়ম মাফিক কাজগুলি হয়ে যায়। কিছু অস্বাভাবিক ঠেকে না। যেমন জোয়ান কাপড়ের খুঁট দিয়ে বৌয়ের

টুকটুকে লাল পাড়ের বাম কপাল ও নাকের ডগা মুছে দেয়। আবার কাপড়ের খুঁট দিয়েই রাঙা পায়ের ধুলো ঝেড়ে দেয়। যুবতীও চুপ করে বসে থাকল না, শাড়ির আঁচল দিয়ে মরদের মুখ গলা মুছে দিল, পায়ের দিকে হাত বাড়াতে গিয়েছিল, শক্ত মুঠোয় নরম হাতটা চেপে ধরল পুরুষ। কি ব্যাপার? বৌকে পা ছুঁতে দিতে আপত্তি? সে সব তো শহুরে কায়দাকানুন। পতি পরম গুরু কথাটা বাতাসের গলায় ঝুলিয়ে দাও। আমি সখা তুমি সখী। পায়ে হাতটাত কিছু না, হাতে হাত রাখ, বুকে বুক রাখ, ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাও। সেখানে আনন্দ সেটাই সুখ।

তা না হয় শহরের মানুষেরা সুখে আছে। কিন্তু এখানে যে এখনো কাঠ-ঠোকরার শব্দে বন কাঁপে। ভাঁটফুলের গন্ধে মৌমাছি দিশেহারা। আনারস ঝোপে সবুজ রোদ, বাতাসে করমচা কুঁড়ির গন্ধ। বন শেষ হয়ে গাঁয়ের পথ। পথ তো নয়, আঁকাবাঁকা ধুলোর নদী। আধক্রোশ হেঁটে যাও, হাঁটু পর্যন্ত সাদা হয়ে যাবে। তাতে কি, ঘরে মানুষ আছে না পায়ের ধুলো ঝেড়ে মুছে দিতে? তবে আর বলে কেন পতির পায়ে সতীর ঠাঁই?

কাজেই কেমন খটকা লাগছিল।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা অনুমান করতে পারলাম। ফিসফিস কথা। সব কানে আসছিল না। রকম সকম দেখে বুঝতে পারলাম অমন টুকটুকে ধানরঙ শাড়িটা নোংরা হতে দিতে জোয়ানের ভয়ানক আপত্তি। কিছুতেই শাড়ি দিয়ে সে তার পায়ের ধুলো মুছতে দেবে না। আঁচল-সুদ্ধ ফরসা হাতটা বুকের কাছে চেপে ধরে ঝাঁকড়া মাথা নেড়ে বৌকে যেন তাই বোঝাতে লাগল। কিন্তু সতী মেয়ে কি সে কথা শোনে। জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চাইছে। রাগ করছে জেদ করছে, যেন এক সময় অভিমান করে রাঙা ঠোঁট ফুলিয়ে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখল। তাই তো, শাড়িজামা পরে সেজেগুজে থেকে গাঁয়ের বৌয়ের মন ওঠে কখনো? প্রাণ বল্লভের পদসেবা করবে না?

এবার জোয়ান উঠে পড়ে লেগে গেল প্রেয়সীর মান ভাঙাতে। তেজপাতার ফাঁক দিয়ে ছিটা ছিটা লাল রোদ এসে পড়েছে যুবতীর গালে গলায়। মান ভাঙাতে গিয়ে মরদ হঠাৎ ফ্যালফ্যাল করে তাই দেখে। আমার বুকের ভিতর কে যেন হাতুড়ি পিটতে আরম্ভ করল। বুঝতে পারছিলাম, ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে। চোখের নিমেষে তাই ঘটল।

কুমড়োর বেড়ার এধার থেকে খাঁচার বাঘের মতন ছটফট করতে লাগলাম। যেন চোখের সামনে মধুর হরিণ দেখছি। কিন্তু আমার হাত বাড়াবার গলা বাড়াবার উপায় ছিল না। অবশ্য হরিণের প্রকৃত মালিকই হরিণকে উপভোগ করল। বৌকে জড়িয়ে ধরে একশটা চুমু খেল। লাল রোদের ছিটা লাগা অংশগুলিতে যেন বেশি চুমু খেল। আর সেসব জায়গার চামড়া আলতার মতন টুকটুকে হয়ে গেল। স্বাভাবিক।

একটা আপসরফা হল। যুবতীর মান ভাঙল। তা না হলে ঝলক দিয়ে মুখে হাসি ফুটত না। আর জোয়ানও তৎক্ষণাৎ এক গাল হেসে পকেট থেকে একটা নকশা-পাড় হলদে রুমাল বার করে বৌয়ের হাতে দিল। রুমাল দেখে কি মেয়ে অবাক হল। মোটেই না। ক্ষেতীর কাজ করলে মরামীর কাজ করলে কি পকেটে রুমাল থাকতে দোষ আছে। ধোয়া জামা কাপড় পরে বৌকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি কি কুটুমবাড়ি বেড়াতে যাচ্ছে, পকেটে এক আধখানা রঙিন নকশা-প্যাড় রুমাল থাকবেই। যুবতী খুশি হয়ে রুমাল দিয়ে মরদের পায়ের ধুলো ঝেড়ে মুছে দিল। পা মোছা হয়ে যেতে ভাল করে রুমালটা বাতাসের গায়ে কয়েকবার ঝেড়ে ধুলোটা আলগা করে নিয়ে আবার সুন্দর করে, যেমনটি ছিল, তার ভাঁজ করে নিজের হাতেই সেটা মরদের পকেটে ঢুকিয়ে দিল।

পা মোছামুছির হাঙ্গামা একভাবে চুকল। আমিও নিশ্চিন্ত হলাম।

হুঁ, যা বলছিলাম, একটার পর একটা নিয়মমত কাজগুলি সারা হচ্ছিল। ঘামটায় মজে গিয়ে শরীর যে ততক্ষণে একেবারে ঝরঝরে হয়ে উঠেছে দুজনের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তেজপাতার মিঠা হাওয়া লেগে মনও নূতন করে চাঙ্গা হয়ে উঠল। আর ওদিকে দেখতে দেখতে কমলা রং রোদ গাঢ় হয়ে খয়েরী ছোপ ধরতে আরম্ভ করেছে তখন। ঘাসের ওপর আঁটসাঁট হয়ে বসে গিন্নী আঁচলের চাবি ঘুরিয়ে সুট-কেশের ডালা খুলল। ভিতর থেকে খাবার ঠোঙ্গা বেরোল, বোতলে জল। বোঝা গেল গোছালো মেয়ে। দূরের পথে যাচ্ছে কি দূর থেকে আসছে, রাস্তায় ক্ষুধা তেষ্টা পেলে মাঠঘাট জঙ্গলের মধ্যে কোথায় জল কোথায় খাবার, তাই যা হোক কিছু সঙ্গে নিয়ে আসা।

বেশ লাগছিল দেখতে, মুখোমুখি হয়ে বসে গল্প করে দুজন খাচ্ছিল। জোয়ানই

বেশি খেল, প্রায় সব কটা গজা জিলিপি বুঝি একলাই সাবাড় করে ফেলল, যুবতীর খাওয়া যেন আর একজনের মন রক্ষার জন্য খাওয়া, টুকটাক পাখির খাওয়া, এটার একটু ভেঙে মুখে দেওয়া বা ওটার একটু ভেঙে মুখে তোলার আগে হাতে নিয়ে শুধু নাচাড়া করা। মনে মনে হাসলাম, একদিক থেকে শহরের যুবতী গাঁয়ের যুবতী মিলে যায়, যুবতীরা খায় কম। শহরে না হয় শরীর শুকনো রাখার জন্য, মাজা সরু করার জন্য খাওয়ার কড়াকড়ি, এখানে? না কি জন্মলগ্নেই বিধাতা সব মেয়ের কানে কানে মন্ত্রটা বলে দেয়, বেশি খেও না সুন্দরী, বেতডগার মতন চিকন ছিলছিলে শরীর না হলে পুরুষের মন পাবে না।

বোতলের ছিপি খুলে জোয়ান ঢকঢক করে জল খায়, তার কণ্ঠনালীর তেকোনা হাড়, যাকে বলে আদমের আপেল, চমৎকার ওঠানামা করে। হাঁ করে যুবতী তাকিয়ে তাকিয়ে জিনিসটা দেখে। কে জানি বলেছিল, পুরুষের টুঁটির ওই উঁচু হাড় নড়াচড়া করছে দেখলে মেয়েছেলের কামোত্তেজনা হয়।

জানি না কথাটা কতদূর সত্য।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম রূপসীর কাঁধের নরম রেখা গলার বাঁক চিবুকের ডৌল। জোয়ান এবার বৌয়ের মুখের কাছে বোতলটা কাত করে ধরল, শাঁখের গর্তের মতন ছোট একটা হাঁ নিলে যুবতী ঢকঢক করে খানিকটা জল খেল, কশ বেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ল খানিকটা বুক ভিজল জামা ভিজল। জামার ভিতর থেকে চোখের মনির মতন স্তনের বোঁটার একটা আবছা ছবি ফুটে উঠল।

তখন থেকে থেকে অনিয়মের শুরু।

অনিয়মটা অবশ্য আমার চোখে, ওরা ওদের নিয়মে কাজ করে যাচ্ছিল। ঘরের বাইরে এসে বাইরেটাকে যদি তারা ঘরের মতন করে দেখে, ঘরের বিছানা ক্রমাগত বাসি হতে হতে [illegible] বিস্বাদ হয়ে গেছে ঘরে [illegible] তেজপাতা তলায় বসে তারা [illegible] বিছানা পাতত, কেবল বিছানা বলছি কেন, যদি দুজনে মনে করে থাকে ঘরের বিয়েটাও বাকি ছিল, একটা ছেলেমানুষী খেলা, ওটা কিছু নয়, ওতে বিয়ের রং গন্ধ ছিল না, আজ এখানে তাদের আসল বিয়ে, কনাই তাদের বাসর হবে তো জোয়ান আর তার যুবতী বৌকে বাধা দিত কে।

বাধা দেবার কেউ ছিলও না।

চমকে চমকে উঠছিল দুজন ঠিকই, যেমন একটা পাখি আর একটা পাখির সঙ্গে যখন ঝগড়া করছিল, যখন শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কাঠবিড়াল কি গিরগিটি চলাফেরা করছিল, বা কখনো একটু দমকা হাওয়া উঠে পাতার সরসর শব্দ হচ্ছিল। এসব শব্দ শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখছিল তারা। যত দেখছিল তত নিশ্চিন্ত হচ্ছিল, কেবল গাছগাছালি কেবল তো পাখি, কাঠবিড়াল, নয়তো গিরগিটি এক আধটা। মানুষ নেই। মানুষই মানুষের সব কিছু দেখে বোঝে কিনা, মানুষকেই মানুষের সবচেয়ে বেশি আপত্তি।

কাজেই তারা বুঝতে পারছিল, তাদের সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে বাধা নিষেধ বলতে কিছু নেই।

আমি ছিলাম যদিও, কিন্তু আমি তো আর মানুষ ছিলাম না। ডুমুরে ঝোপের এধারে, এইমাত্র যা বলছিলাম, ব্যাঙের ছাতা গজানো কাঠের টুকরোটার ওপর আর এক খণ্ড কাঠ হয়ে আগাগোড়া বসে আছি। শ্বাস ফেলছি না পর্যন্ত, কি জানি, পাছে ওরা টের পায়।

কিন্তু ক্রমেই এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে দুজন যে, আমায় দেখতে পেলেও শেষ পর্যন্ত মানুষ বলে চিনতে পারত না, মরা গাছের গুঁড়িটুড়ি মনে করে বা উঁইয়ের ঢিপি ধরে নিয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকত। নিজেদের নিয়ে তারা দারুণ ব্যস্ত।

না, ঘরে নির্জনতা পেয়েছে, অন্ধকার পেয়েছে, থমথমে রাত পেয়েছে, পেলে হবে কি—সেখানে ঘরের পাশে ঘর, ঘরে ঘরে মানুষ, পাড়াপড়শী। এখানে চিৎকার করলেও মানুষ সাড়া দিত না। এই নির্জনতার স্বাদ আলাদা। অথচ পরিষ্কার দিনের বেলা। গাছের মাথায় খয়েরী ছোপ ধরা ঘন রোদ সরের মতন জমে আছে। হাতের রেখার মতন পাতার শিরগুলি তখনও একটা একটা করে গোনা যেত। এমন চমৎকার আলোয় একজন আর একজনকে খুঁটিয়ে দেখতে ছেড়ে দিত! যেখানে দুটি পুরুষ-নারী? তার ওপর চড়া ছাঁট ফুলের গন্ধ, মলয়ের উচ্ছ্বাস, পাখির গান।

[illegible] জল খাইয়ে বোতলের মুখের ছিপিটা আবার ভাল করে এঁটে দিয়ে জোয়ান এবার নিজেই ছোট্ট বাক্সের ভিতর ঢোকাল, তারপর বৌয়ের আঁচলের চাবি টেনে নিয়ে বাক্সের ডালা বন্ধ করল। কাজটা করছিল মরদ, চোখ দুটো কিন্তু ছিল বরা-বর বৌয়ের দিকে, বৌয়ের বুকের সেই ভেজা অংশটার দিকে, কালো পুরু ঠোঁট দুটো চেপে রেখে কেমন যেন গুজগুজ করে মরদ খুব হাসছিলও তখন। অথচ তার পরিচিত জিনিস। কিন্তু এমন জুলজুল করে সে তাকাচ্ছিল যেন বৌয়ের জামা ভিজে যেতে নূতন কিছু সে সেখানে দেখতে পেল, এই প্রথম দেখল। আর যুবতীও হঠাৎ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে লাল হয়ে উঠে চোখ নামিয়ে বুকের দিকে তাকাল, তারপর এমন কটমট করে মরদকে দেখল যেন সে ঘরের মানুষ না, পরপুরুষ। ভোমরা কালো চোখে সেই ভর্ৎসনা সেই ঘৃণা, তেমন একটা দপদপে আগুন জ্বলে উঠতে দেখা গেল। কিন্তু দেখতে দেখতে দেখলাম চোখের আগুনটা নিভেও গেল, ধমক দিতে গিয়ে যুবতী ফিক করে হেসে ফেলল, তারপর, যেন আগের চেয়ে চতুর্গুণ লাল হয়ে উঠে চোখ আড় করে আবার গায়ের ভিজে জামাটা দেখে নিল, দেখা শেষ করে আবার পুরুষের দিকে তাকাল। চোখে আগুন জ্বলছিল না আর সত্য, এদিকে ঠোঁটের হাসিটাও নিভতে দিচ্ছিল না। কিন্তু, তবু, যেন কত রেগে আছে, বিরক্ত, তাই ভুরু কুঁচকে—আমি অবশ্য এটা অনুমান করলাম, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যুবতীরা যা বলে থাকে এবং গাঁয়ের যুবতীদেরও সেই মন্ত্র অজানা ছিল না নিশ্চয়—থুথু ছিটানোর মতন হাসির রসে ভিজিয়ে নিয়ে পাতলা ঠোঁট দুটো একত্র করে ছুঁচলো করে রূপসী গিন্নী যেন সেই অমোঘ শব্দটাই ছুঁড়ে মারল পুরুষকে—'অসভ্য!'

বস্, দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠল। তিন অক্ষরের ঐ একরত্তি শব্দটা একটা দেশলাইয়ের কাঠি। অসামান্য শক্তি এর। দরকার হলে দাবানল সৃষ্টি করতে পারে। মিষ্টি হেসে কাউকে অসভ্য গাল দেওয়ার অর্থই হল অসভ্য হতে বলা। তাই দেখলাম। যেন উপোসী বাঘ সারাদিনের পর এই প্রথম হরিণীর দেখা পেল, উত্তেজনায় আনন্দে চোখ দুটো জ্বলে উঠল, হালুম শব্দ করে বৌয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মরদ। তারপর চলল চুম্বন মর্দনের মুষলধারা বৃষ্টি।

তাই হত, নিজের মনকে সান্ত্বনা দিলাম, তা না হলে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়া কেন, হাঁটা পথে আসছিল, পথের ধারে যে-কোন একটা গাছতলা বেছে নিয়ে সেখানে বসে [illegible] জিরিয়ে নেওয়া যেত, পেট ভরে গঙ্গা [illegible] খেয়ে, ধারে কাছে পুকুর ছিল না থাক, ছিপি আঁটা বোতলের জল গলায় ঢেলে গপগপ করে তারপর আবার ধুধু ধুলোর পথে নেমে যেত দুজন। কিন্তু এই রস সেখানে জমত কি। শহুরে রাস্তার মতন লোক গিজগিজ করে না ঠিকই, তা হলেও তো হটর হটর গোরুর গাড়িটা মোষের গাড়িটা যাচ্ছে আসছে, এই গাছতলায় না হোক আর একটা গাছের নিচে রাখালছেলে বসে বাঁশী বাজাচ্ছে, হাটে চলেছে গাঁয়ের মানুষ—। কাজেই ঝুমুর ঝোপে ঘেরা এই নিরালা তেজপাতা তলা।

উঁহু, তৃতীয় ব্যক্তি এখানে উঁকি দিতে আসছে না। অথচ ফটফটে দিনের আলো, অফুরান পাখির গান। দেখবার মধ্যে কাঠঠোকরাটা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল দেখুক, কাঠঠোকরা মানুষ না, তাজ্জব বনে যাওয়ার মতন কিছু ঘটছিল বলে কাঠবিড়ালটা পিটপিট করে তাকাচ্ছিল, তাকাক, কাঠবিড়ালও কিছু মানুষ না।

মানুষ বলতে তুমি আর আমি।

আমি তোমায় দেখব তুমি আমায় দেখবে। ভাবলাম কথাটা মিথ্যা কি এমন একটা চমৎকার জায়গায় নূতন করে একজন আর একজনকে দেখবে, এই লোভ এই রোমাঞ্চ তারা ছেড়ে দিত কোন দুঃখে! আবার কবে কুটুম বাড়ি যাবে, কি সেখান থেকে ফিরবে, মাঝপথে এতটা নিরিবিল এমন সুন্দর ঝোপঝাড় পাওয়া যাবে কি যাবে না তার ঠিক আছে কিছু।

মরদ ফ্যাক্যা করে হাসছিল, হাতে গুলতি তুলে দিলে অল্প বয়সের ছেলে যেমন হাসে। কিন্তু অনেক বেশি হাসছিল যুবতী। থরথর করে কাঁপছিল। বৃষ্টির ছিটা লাগছিল টগরফুলের গায়ে। বৃষ্টিই তো। খুশির বৃষ্টি। নূতন করে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ঘামের ঢল নামল। অথচ চোখ বুজে থাকব সাধ্য কি। উঁহু পুরুষকে দেখবার দরকার নেই, আমিও পুরুষ, এই শরীর আমার মুখস্ত। যে জিনিস দেখবার কোটি বার দেখেও পুরোনো হয় না, চোখ দুটো পাথর করে রেখে তাই দেখতে থাকলাম। ঢোক গিলতে পারছিলাম না—এমন। যেন তাতেও সময় নষ্ট হত আর ইতিমধ্যে মূল্যবান কোনো দৃশ্য লোভনীয় ছবি চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যেত। না, এখন আর রং কি যতক্ষণ বসন, ঢাকাঢাকি ততক্ষণ রং লাবণ্য, হাত পা গলা গাল শরীরের যেটুকু বেরিয়ে রইল চোখে দেখা গেল তাই নিয়ে মাতামাতি। কখনো মনে হয় বুঝি দুধে আলতায়, পরক্ষণে মনে হয় অবিকল পাকা খয়ের রং।

এখন সবটাই ঝলক। তাই তো হয়, উলঙ্গ অসি—খাপখোলা তলোয়ারের ঝলসানি ছাড়া আর কি রং থাকে! চক্ষু জ্বালা করে উঠল। কিন্তু চোখ আমার ঠিকই রইল, বরং উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালাম। পাতার জানালাটা নিচে পড়ে গেছে। কোমর বেঁকিয়ে ঘাড় নুইয়ে অসীম ধৈর্য সহকারে দৃষ্টিটা সেখানে ধরে রাখলাম। যুবতীর কোমর জড়িয়ে ধরেছে মরদ। তার দুই কাঁধে যুবতীর দুটো হাত। না, এখন আর সেই হাত নেই, কেউ বলবে না মৃণালভুজ বাহুবল্লরী মনে হবে ইস্পাতের কঠিন বেড়ি দিয়ে পুরুষের কাঁধগলা আঁকড়ে ধরে তার

আব্যটা জন্মাগত সে যুবকের কাছে টানছে। এই অবস্থায় একজন আর একজনের চোখের দিকে তাকিয়ে। যেন পরস্পরের চোখের মণির রং দেখছিল তারা। ছায়ামাতলার দৃষ্টি বিনিময়ের কথা মনে হতে পারত। কিন্তু তা আর কি করে হত; ভাবলাম, এই বয়সে চোখে সেই লজ্জা সেই কোমলতা থাকে না, দুজনের দৃষ্টি এখন সাবালক, দুটো চোখই এখন ক্ষুধা আগুনে আর অভিজ্ঞতার নানা রং নিয়ে জ্বলছে।

পরক্ষণে তারা চুম্বনরত হল।

এবার আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। অবশ্য একটু আগেও এক পশলা হয়ে গেছে। কিন্তু এমন আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায়—

যেন কি [illegible] হয়ে, হাতের [illegible] ছিল, ওটাই জড়িয়ে [illegible] আমি, এতটা [illegible] আষ্টেপৃষ্ঠে [illegible] করছিল একবার [illegible] করলাম না, জড়িয়ে ধরে

[illegible] এই [illegible] যৌবনা এই আমার যুবতী স্ত্রী, [illegible] মৃদু হেসে [illegible] লাগলাম। একটু [illegible] [illegible] পরিচয় করার জন্য টের পেয়েছি, ঠোঁট দুখ দুক—পর্যন্ত [illegible] কুন্ডলীর মতন ঢাকা ঢাকা হয়ে [illegible] উঠেছিল, [illegible] অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়। কিন্তু শুঁয়ো-পোকার [illegible] জন্য গ্রাহ্য করব কি, তখন সেই দুঃখ আমার ছিল না, তৎক্ষণাৎ আমার ডুমুরঝোপের ভিতর মুখটা গুঁজে দিয়ে ওধারের দুখী মানুষ দুটিকে দেখতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে দুজন খেলতে আরম্ভ করেছিল। এখানে 'খেলা' শব্দটাই প্রয়োগ করলাম। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কথা স্মরণ করে আমি যদি কামকেলি রতি-ক্রীড়া বিহার ইত্যাদি ভাষা ব্যবহার করতাম তো 'অশ্লীল' রব তুলে আপনারা আমাকে তেড়ে মারতে আসতেন। অথচ এরা স্বামী-স্ত্রী, গাঁয়ের একটি বৌ আর তার জোয়ান পুরুষ। যা খুশি করার অধিকার তাদের ছিল এবং তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে আমি যদি তার উল্লেখও করি তো কিছুই দোষের হত না। হ্যাঁ, তবে পার্থক্য এই—ঘরের বিছানা ছেড়ে নূতনত্বের স্বাদ পেতে দুজন গাছতলায় চলে এসেছিল।

যাই হোক, খেলা কথাটাই ভাল। নিরীহ নিরাপদ এবং সুন্দরও বটে। কিন্তু এমন খেলা আমি জীবনে দেখিনি। কোনদিন ভুলব না। আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রায় থেমে গেল। অদ্ভুত ধরন, আশ্চর্য ভঙ্গি নিয়ে এই আনন্দ-মিলন। পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে তাক লাগিয়ে দেবার মতন। দেখছিলাম এখানে নারীই সব, পুরুষ কিছু না, নিষ্ক্রিয়। সে যন্ত্র, বৌ যন্ত্রী। তাই সবটুকু উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে মুখে নিয়ে যুবতী, কাব্যের ভাষায় একেবারে সমুজ্জ্বল, সেই তুলনায় জোয়ান নিষ্প্রভ, মনে হচ্ছিল একটা বোবা পাথর শুয়ে আছে। উপমাটা এখন এভাবেই মনে এসেছিল। আর সেই পাথরের ওপর তরঙ্গোচ্ছ্বাস হয়ে যুবতী বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ছিল।

তা হলেও একটা সময় এল যখন আমাকে দাঁত চোখ বুজতে হল। আমি বৌটির নিন্দা করছি না, কিন্তু কেমন যেন দৃশ্যটা আর সহ্য করতে পারছিলাম না। শহরের কড়া কড়া জিনিস দেখেছি অস্বীকার করব না। তবু মনে হচ্ছিল এই নারী সবাইকে হার মানাতে পারত।

পাতার জানালা থেকে চোখ সরিয়ে আনতে দেখলাম রোদ্দুরের রং কালো হয়ে গেছে। মাথার ওপর আর তখন একটা না, এক ঝাঁক টিয়া এসে জুটে চেঁচামেচি শুরু করেছিল। ভাঁটফুলের গন্ধটা চাপা পড়ে গিয়ে অন্য একটা উগ্র গন্ধ নাকে লাগছিল। ঘাড় ঘোরাতে হঠাৎ চোখে পড়ল ঐ-[illegible] কোণার দিকে, বুনো-ওলের ঝোপের ভিতর লাল দগদগে—ঠিক লালও না, আগুনে রঙের একটা ফুল ফুটে রয়েছে, যেন এই মাত্র ফুটেছে, ফুটেই তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ বাতাসে ছড়াতে আরও করেছে। ঝোপের ভিতরটা অন্ধকার হয়ে আসায় দূরে চড়া রং চড়া গন্ধ নিয়ে ফুলটা যেন কেমন চোখ পাকিয়ে আছে মনে হচ্ছিল। কারো কারো এমন একটা উপমাই মনে হতে পারত। আমার কিন্তু কেবল পাকানো চোখ, না, গোটা মানুষটাকেই মনে হচ্ছিল, এই মাত্র যাকে দেখলাম, এমন উগ্র এমন চোখ ঝলসানো, গায়ের গন্ধও এতটা চড়া হবে ধরে নিতে কষ্ট হল না। আমের মুকুল কি পাকা ধানের গন্ধের মতন গন্ধ নয়। এভাবে কিছুক্ষণ ওলের ফুলটাকে দেখলাম। তারপর চোখ তুলে, জামের ডালে পাখির বাসা ছিল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেটা দেখলাম। বাসার ভিতর একটা পোয়াতি পাখি আছে অনেকক্ষণ আগেই টের পেয়েছিলাম, ডানার ঝাপটায় শুকনো খড়কুটো টুকটাক নিচে ছিটকে পড়ছিল। মরদ পাখিটা ঘুরে ফিরে কয়েকবার পোয়াতি বৌকে এসে উঁকি দিয়ে দেখে গেছে তা-ও লক্ষ্য করছিলাম। পাখির বাসা দেখা শেষ করে চোখ নামিয়ে দূরের আনারস ঝোপটা দেখলাম। রোদ ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভোমরাগুলি পালিয়ে গিয়েছিল।

অর্থাৎ এদিক ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে এটা ওটা লক্ষ করছিলাম তেজপাতা তলার মানুষ দুটিকে সময় দেবার জন্য। ওদের খেলা শেষ হোক, কাপড়চোপড় পরে নিক।

তারপর ডুমুর পাতার ভিতর মুখ গুঁজে দিলাম। দেখলাম আমার অনুমান ঠিকই হয়েছে, দুজন চুপ করে বসে আছে। যেন তখন স্বেদ কম্পনের পালা চলেছে। মরদ জামাকাপড় ঠিক করেছে। যুবতীর গায়েও ছিটের লাল ব্লাউজ, কচি কলাপাতা রং শাড়িটা সুন্দর করে জড়িয়ে নিয়েছে। কেবল তাই না। কান খোঁপা ঢেকে মাথার আধখানায় ঘোমটা তুলে দিয়াছে। কেমন যেন অবাক লাগছিল দেখতে। কে বলবে একটু আগের রণরঙ্গিণী মূর্তি, নরমনরম আদুরে তুলতুলে মুখখানা, সতীলক্ষ্মী বৌ। ঘষাঘষির দরুণ কপালের সিঁদুর মুছে গিয়েছিল, নূতন করে সিঁদুর পরা হয়েছে। একটা বিড়ি খেয়ে শেষ করে মরদ হাত বাড়িয়ে টিনের সুটকেসটা টেনে নিল। বুঝলাম, এবার উঠবার পালা। তাই তো, বসে কিছু রাত কাটাতে আসা হয়নি। হাটুরে পথের মানুষ, ঘামে ধুলোয় মাখামাখি হয়ে ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে একটু জিরিয়ে নিল, আবার হাঁটা আরম্ভ হবে।

যাত্রা হাতে বুলিয়ে জোয়ান উঠে দাঁড়ায়। যুবতীও উঠল। যেন যাবার আগে অন্ধকার থমথমে ভুমুর ঝোপটা আর একবার দেখল দুজন, তেজপাতা গাছটা ভাল করে দেখল, যেন জায়গাটা চিনে রাখল, পরে যদি আবার কোনদিন আসা হয়। বন দেখা শেষ করে এ ওর মুখের দিকে চেয়ে ঠোঁট টেপাটেপি করে একটু হেসে নিয়ে আস্তে আস্তে বন থেকে বেরিয়ে গেল।

বন তো খালি হল না, আমার বুকের ভিতরটা শূন্য করে দিয়ে গেল কেউ। শুঁয়োপোকার বিষের যন্ত্রণা ভাল করে টের পাচ্ছিলাম। ছুরিটা কোল থেকে পিছলে নিচে পড়ে গিয়েছিল, হাত বাড়িয়ে তুলে নিলাম। পাখির কিচিরমিচির থেমে গিয়ে ঝিঁঝির বাজনা আরম্ভ হল। জঙ্গলের ওদিকটায় চোখ পড়তে মনে হল কোথাও আগুন লেগেছে। বুঝলাম চাঁদ উঠবে। কিন্তু তাতে উৎসাহবোধ করলাম না। চাঁদের আলো দিয়ে কি হবে এখন, একশটা চাঁদ উঠলেও বনের অন্ধকার দূর হত না। অর্থাৎ আমার মনের ভাব এইরকম হয়েছিল, এতটা আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম যুবতী চলে যাবার পর। স্বামী সঙ্গে ছিল যদিও।

কিন্তু আমি তো গায়ে হাত দিইনি, পাড়া-গাঁয়ের টুকটুকে বৌ, কুলবধূ, সতীত্ব নষ্ট করব এমন ইচ্ছা আমার ছিল না, লোভ থাকলেও পারতাম না, সাহস পেতাম না। আড়ালে থেকে যতটা দেখবার দেখেছি, এই আমার যথেষ্ট পাওয়া, অনেক পেয়েছি। কাজেই আফসোস ছিল না।

হ্যাঁ, তবে জ্যোৎস্না উঠলে দুজনের হাঁটতে সুবিধা হবে। কাজেই চাঁদ উঠছিল বলে অখুশি হলাম না। জামতলা ছেড়ে, আমার যেটা প্রিয় জায়গা, জারুল গাছের নিচে, যেখানে একটাও আগাছা ছিল না, গদির মতন উঁচু হয়ে কেবল মোলায়েম ঘাস, সেই চমৎকার ঘেসো জমিতে চলে এলাম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে বসে মাজা ধরে গিয়েছিল। ভাবলাম এবার শরীর টান করে শুয়ে পড়ব। শুয়ে শুয়ে ছবিটা দেখব। চাঁদের আলোর মেঠো পথ ধরে দুজন হাঁটছে। কুটুমবাড়ি যাচ্ছে, কি শ্বশুরবাড়ি। বা শ্বশুরবাড়ি কুটুমবাড়ি বেড়ানো সেরে তারা বাড়ি ফিরছে। ঝাঁকড়া চুল বাঁশি নাক জোয়ান আর তার রূপসী বৌ। চমৎকার গড়ন যুবতীর। গড়ন চলন বলন। তেমনি অন্ন ধরনধারণও আমার দেখা হয়ে গেছে। অর্থাৎ চোখে দেখা সবগুলি ছবি এবার একত্র করে মনে মনে দেখব, মনে মনে দেখার অন্য একটা স্বাদ আছে জানতাম কিনা। ইচ্ছাটা পূরণ হল না। যেন ওদিক থেকে, আনারাস ঝোপের ভিতর থেকে খচমচ শব্দ করে শেয়ালের মতন কিছু একটা সামনে এসে দাঁড়াল। ছুরিটা প্রায় কাঁপিয়ে ধরেছিলাম, কিন্তু দেখলাম মানুষ, কালো রোগা লিকলিকে, পুরুষই বটে, আর এক মরদ, গোঁফ দাড়ির জঙ্গল মুখে, কাঁপছিল, ভয়ে কি উত্তেজনায়, না কি ছুটে আসায় দমদুম হাঁপাচ্ছিল ঈশ্বর জানে। মাথাটা গরম হয়ে গেল। কেননা এই জঙ্গলে আমি রয়েছি, একলা আমারই বিচরণ করার কথা। দৈবাৎ যদি কেউ আসে, বেড়াতে আসে, বিশ্রাম করতে আসে—বিশ্রাম করে, আনন্দ করে, আবার চলে যায়। কিন্তু দেখছি জঙ্গলে আর একজন আছে, আস্তানা গেড়েছে এখানে বা গাড়বে এই মতলব, না হলে এমন মূর্তি, নেংটি পরা, গায়ে ময়লা, মাথায় মুখে চুলের ঝুপোড়ি। আমি অবশ্য নেংটি পরে নেই, তা হলেও তো পেন্টুলনটা ছিঁড়ে গেছে, জামাটা ফালা ফালা হয়ে গেছে, গায়ে ময়লা পড়েছে, কতদিন গোঁফ দাড়ি কামাই না। কাজেই তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম—বেটা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, আমার মতন চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গিয়ে জ্বলছে, না খেয়ে না ঘুমিয়ে আমার যেমন অবস্থা, কাকলাস হতে

[illegible]। ওষুধে অবশ্য ছুরি নেই, কিন্তু এই জিনিসেরও তার দরকার তখনি বুঝলাম। দাও, ওটা দাও—ছুটে এসে আমার মুখের কাছে দু হাত বাড়িয়ে দিল হতভাগা, যেন ভিক্ষা চাইছিল। দুটো হাতই থরথর করে কাঁপছিল, পা কাঁপছিল, গলায় স্বরেও একটা কাঁপুনি লক্ষ করলাম। দাও, ওটা দাও—যেন তর সইছিল না তার। এই, কি চাইছিস—জোরে ধমক লাগালাম। তুই কে, তুই এখানে কি করিস?

ধমক খেয়ে থমকে গেল মানুষটা, হাত গুটিয়ে নিল ঠিকই, কিন্তু ভয় পেয়েছে মনে হল না, চোখ দুটো জ্বলছিল, তেমনি ঘন ঘন শ্বাস ফেলছিল, ঘাড় ঘুরিয়ে তেজপাতা গাছটা দেখল একবার।

—কি চাইছিস, তুই কে! আর একটা ধমক দিতে আবার সে আমাকে দেখল, আমার মুখের কাছে হাত বাড়িয়ে দিল, ভিক্ষে চাওয়ার মতন চোখে মুখে সেই কাকুতি, অস্থিরতা।

—দাও, ছুরিখানা দাও, এখনো বেশি দূর যায়নি, দৌড়ে গেলে ঠিক নাগাল পেয়ে যাব।

—কার নাগাল পাবি, কার বুকে ছুরি বসাবি? প্রশ্ন করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলাম। মনে হল গলার স্বরটা পরিচিত, মুখটাও কি চেনা চেনা? অন্ধকারে মালুম হচ্ছিল না, তার আবার চুলদাড়িতে বোঝাই হয়ে আছে, গলা বাড়িয়ে তার মুখের কাছে চোখ দুটো নিয়ে গলাম। চিনতে পেরে হাসলাম। বনমালী। গ্যাসট্রিক আলসারের রুগী। এককালে অনেক ওষুধ খেয়েছে আমার।

কিন্তু বনমালী তার ডাক্তারবাবুকে চিনছে না তো! কি করে চিনবে। কোথায় আমার সেই ঝকঝকে টাই স্যুট, ব্যাক ব্রাস চুল। শহরের দামী চেম্বার ছেড়ে এসে গায়ে মাথায় ময়লা নিয়ে ছেঁড়া পোশাক পরে জঙ্গলে বসে আছি।

—দাও, ছুরিটা দাও, এখনো দৌড়ে গেলে নাগাল পাই।

তাই তো, 'তুমি' করেই তো সে আমাকে বলবে এখন। তার দোষ কি। একদিন হাত জোড় করে আমার সামনে গিয়ে সে দাঁড়াত, কুণ্ঠিত চেহারা নিয়ে একগাদা রোগীর মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছে, কখন তার দিকে চোখ তুলে তাকাব, তার সঙ্গে কথা বলব। আজ সে তার মতন কাউকে দেখছে এখানে, হাড়সার চেহারা, কোটরগত চক্ষু, জীর্ণ বেশ, বিধ্বস্ত কোনো মানুষ অথবা পাগলটাগল কিছু।

—তুই আমায় চিনতে পারলি না বনমালী? একবার ভাল করে মুখের দিকে তাকা।

—দাও, ছুরিটা দাও।

না, তার কোনো দোষ নেই, নিশ্চয় এদিকেও এক আধদিন ওষুধ আনতে শহরে গিয়ে সে দেখে এসেছে ডাক্তারবাবু নেই, চেম্বারটা উঠে গেছে, সাইনবোর্ডটা খুলে নেওয়া হয়েছে, নিশ্চয় সে জেনে এসেছে ডাক্তারবাবুর চারতলার জমকালো ফ্ল্যাট অন্য মানুষ ভাড়া নিয়েছে, গাড়িটা বেচে দেওয়া হয়েছে, ডাক্তারবাবু কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছে কেউ বলতে পারে না।

বনমালী আমায় ভুলে গেছে বলে তার ওপর রাগ করতে পারলাম না। বরং তার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছিল।

—দাও, তোমার ওই অস্তরটা দাও, এখনো ছুটে গেলে ধরতে পারি। এখনো বড় মাঠ পার হয়নি।

—শোন্, বনমালী! যেন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম, যেন আদর করে ছোটভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তুই না খেতির কাজ নিয়ে থাকতিস, বলেছিলি তোর ক' বিঘা চাষের জমি আছে, বাগান আছে, পুকুর আছে?

—ধুৎ, কেন আজেবাজে বকছো! হাতের ওটা দাও, আমি ছুটে যাই।

—বলেছিলি তোর পুকুরে অনেক মাছ আছে, বাগানে মেলা সুপুরি ফলে, নারকেলের ফলনও চমৎকার।

—অ্যাঁ! হতাশ হয়ে সে ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়ল। ফ্যালফ্যাল করে অন্ধকারে আমার মুখটা দেখল। সে বুঝতে পারল তার হাতে অস্ত্র তুলে দিতে আমি নারাজ। কেবল কথাই বলছি।

—বলেছিলি তোর একটা গাই পাঁচ সের দুধ দিত, সেবার পাটের টাকা পেয়ে কিছু সোনা কিনতে পেরেছিলি। তাই না বনমালী?

—দাও, ছুরিটা দাও। যেন তার গলা দিয়ে আর আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। শ্বাস ফেলার মতন, দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতন একটা অস্পষ্ট করুণ শব্দ করে সে আমার কাছে অস্ত্র ভিক্ষা চাইছিল, কঙ্কালসার হাতটা আমার দিকে তুলে ধরেছিল।

তাই তো, কতদিন অনাহারে থাকলে, কত রাত অনিদ্রায় ভুগলে—কেবল অসুখে ভুগলে এমন হয় না, কতটা মনস্তাপ পেলে একটা মানুষ এত জীর্ণ নিস্তেজ হতে পারে ডাক্তার হয়ে আমি বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু বনমালী আমাকে বুঝতে পারছিল না। তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললাম —বলেছিলি ঘরে তোর রাঙা টুকটুকে বৌ আছে, পাট বেচার সোনা দিয়ে বৌকে ভাল ভাল গয়না তৈরী করিয়ে দিয়েছিলি। তাই না বনমালী?

—নেই, নেই, কিছু নেই আমার। যেন মুমূর্ষু দীপশিখা শেষবারের মতন জ্বলে উঠল। চিৎকার করে বনমালী কেঁদে উঠল। তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে জঙ্গলে ভরতি মাথাটা ঝাঁকাতে শুরু করল।—দাও, ওটা আমায় দাও, এখনো দৌড়ে গেলে—

তার কাঁধে হাত রাখলাম, যেন বনমালীকে আরো ভাল বুঝতে পেরেছি আমি তখন। তাই একটু হেসে, শ্মশানে দাঁড়িয়ে মানুষ যেমন করে হাসে, হেসে ভাই ভাইকে বোঝায়, বন্ধু বন্ধুকে বোঝায়, তেমন করে তাকে বুঝিয়ে বললাম—ওই জাতকে মেরে লাভ নেই বনমালী, মশা মেরে হাত কালো করতে হয় না।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে ফ্যালফ্যাল করে আবার সে আমাকে দেখল। তখন অল্প জ্যোৎস্না উঠেছে। আমার মুখের রেখা চোখের রং তার কাছে যে আর অস্পষ্ট হিজিবিজি ছায়াময় হয়ে নেই তার চোখ দেখে আমি বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু আমার কথাগুলি তার কাছে তখনও হেঁয়ালি ঠেকছিল।

—আর একটু দ্যাখ্ আমাকে, তার একটা

হাত কোলে টেনে নিলাম। আর একটু ভাল করে আমার দিকে তাকা, তোর ভেতরের অস্থিরতা থাকবে না, মন শান্ত হবে।

—তবে তুমি ছুরি নিয়ে কি করছ, ওটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরছ কেন। বনমালী প্রশ্ন করল।

—কাঠবিড়াল মারছি, কাঠঠোকরা দেখলে তাড়া করছি। হি—হি করে হাসলাম।

বনমালী চুপ থেকে তেজপাতাতলার ওদিকের ঝোপটা দেখতে লাগল। দুবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম, ধীরে ধীরে তার ভিতর একটা লোভ, একটা উল্লাসের জন্ম নিচ্ছিল।

একটা তক্ষক ডেকে উঠল।

—আমি তক্ষক মারব, ফিসফিস করে বলল বনমালী। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে তার হাতে ছুরিটা তুলে দিলাম।

১৫
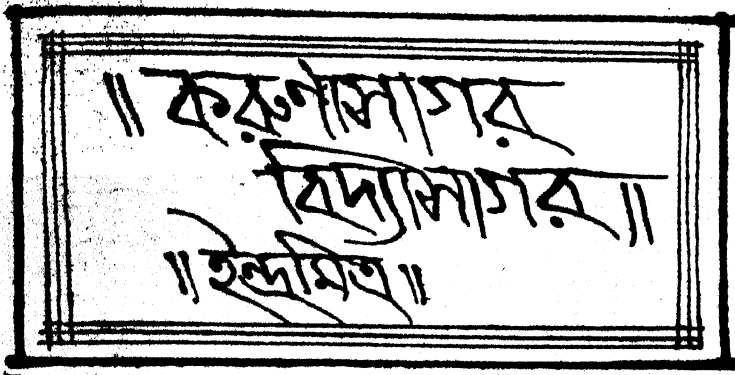
এ কথা নিশ্চিত যে জনশিক্ষার প্রধান উপায় মাতৃভাষা। কিন্তু গবর্নমেন্ট সেদিকে, বলতে গেলে, উদাসীন। গবর্নমেন্টের সমস্ত উদ্যম তখন ইংরেজি শিক্ষা প্রচারেই নিযুক্ত।

দেশীয় ভাষার মাধ্যমে এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রথম প্রচেষ্টা হয়েছে বড়লাট স্যর হেনরি হার্ডিঞ্জের আমলে (১৮৪৪-৪৮)। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নানা অঞ্চলে তিনি ১০১টি পাঠশালা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। সরকারী নথিপত্রে এই পাঠশালাগুলির নাম 'হার্ডিঞ্জ স্কুল'। বাঙলাদেশে এই পাঠশালাগুলি 'বঙ্গ-বিদ্যালয়' নামে পরিচিত। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। এই পাঠশালাগুলির উন্নতির জন্য শিক্ষক নির্বাচন করে দিয়েছেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মার্শাল ও বিদ্যাসাগর।

বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার নানা বিভাগে সাকুল্যে ১০১টি পাঠশালা স্থাপিত হয়েছে: মুর্শিদাবাদ বিভাগে সতেরোটি; ঢাকা বিভাগে পনেরোটি; ভাগলপুর বিভাগে সতেরোটি; পাটনা বিভাগে চোদ্দটি; যশোহর বিভাগে উনিশটি; চট্টগ্রাম বিভাগে আটটি এবং কটক বিভাগে এগারোটি।

এই পাঠশালাগুলির ভার নিল 'সদর বোর্ড অফ রেভিনিউ'। কিন্তু কোনো সুফল দেখা গেল না। চার বছর যেতে-না-যেতেই 'বোর্ড অফ রেভিনিউ' মন্তব্য করেছে: সাফল্য অসম্ভব, বাঙলা পাঠশালা-গুলির আর কোনো আশা নেই।

১৮৫২ সালের ১১ এপ্রিল এই পাঠশালাগুলি 'সদর বোর্ড অফ রেভিনিউ'র কাছ থেকে কাউন্সিল অফ এডুকেশনের অধীনে চলে আসে। এই পাঠশালাগুলি সম্পর্কে কাউন্সিল অফ এডুকেশনের ১৮৫১-৫২ সালের রিপোর্টে লেখা আছে: "most of the schools appear to be in a languishing state, and not to have fulfilled the expectations formed on their establishment."

এদিকে হার্ডিঞ্জ স্কুলগুলির এই দীনদশা, ওদিকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কতগুলি নির্বাচিত জেলায় দেশীয় ভাষার শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তিত করেছেন ছোটলাট টোমাসন। সেই শিক্ষা-প্রণালী সফল হয়েছে। ১৮৫৩ সালের গোড়ার দিকে বড়োলাট সে-বিষয়ে রিপোর্ট পেলেন। বড়োলাট অতঃপর কোর্ট অব ডিরেক্টরদের বিশেষভাবে জানালেন: বাঙলা ও বিহারেও উক্ত শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো আদেশ আসার আগেই বড়োলাট, ১৮৫৩ সালের ৪ নভেম্বর, বাঙলা গবর্নমেন্টকে আলোচ্য বিষয়ে আপন মতামত ব্যক্ত করার অনুরোধ জানালেন।

বাঙলা গবর্নমেন্ট, ১৮৫৩ সালের ১১ নভেম্বর, কাউন্সিল অফ এডুকেশনকে বাঙলা শিক্ষা সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রচনার নির্দেশ দিল।

ফ্রেডারিক জে হ্যালিডে তখন কাউন্সিল অব এডুকেশনের একজন সদস্য। অন্যান্য সদস্যদের মতো তিনিও বাঙলার শিক্ষা সম্পর্কে একটি মিনিট লিখে দিয়েছেন। হ্যালিডের লেখা ওই মিনিটের তারিখ: ২৪-মার্চ, ১৮৫৪ সাল। সমস্ত সদস্যের মিনিটগুলি, ১৮৫৪ সালের ১-সেপ্টেম্বর, কাউন্সিল অব এডুকেশন বাঙলা গবর্নমেন্টকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু, এই ঘটনার কিছুদিন আগেই, ১৮৫৪ সালের ১-মে, হ্যালিডে বাঙলা-দেশের ছোটোলাট হয়েছেন। হ্যালিডেই বাঙলাদেশের প্রথম ছোটোলাট।

হ্যালিডের মিনিটের উৎসমূলে কিন্তু বিদ্যাসাগর আছেন। যা হোক, সমস্ত কাগজপত্র দেখেশুনে হ্যালিডে সাব্যস্ত করলেন যে, মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রচার সম্বন্ধে তাঁর পূর্বনির্ধারিত প্রণালীই সর্বোৎকৃষ্ট। ১৮৫৪ সালের ১৬ নভেম্বর হ্যালিডে আপন মিনিটটিই বড়োলাটের কাছে পাঠালেন। সেই মিনিটের সঙ্গে পাঠালেন বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনাটি। এ-বিষয়ে হ্যালিডে লিখেছেন:

"I append a memorandum on the subject, drawn up by the energetic and able principal of the Sanskrit College who, as is well-known has long been zealous in the cause of vernacular education, and has done much to promote it, both by his improved system in the Sanskrit College and by elementary works which he has published for the use of schools.

I approve generally of the plan which is contained in the Principal's memorandum, and would wish to see it carried into effect."

বিদ্যাসাগরের ওই পরিকল্পনাটির নিচে

বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়ি
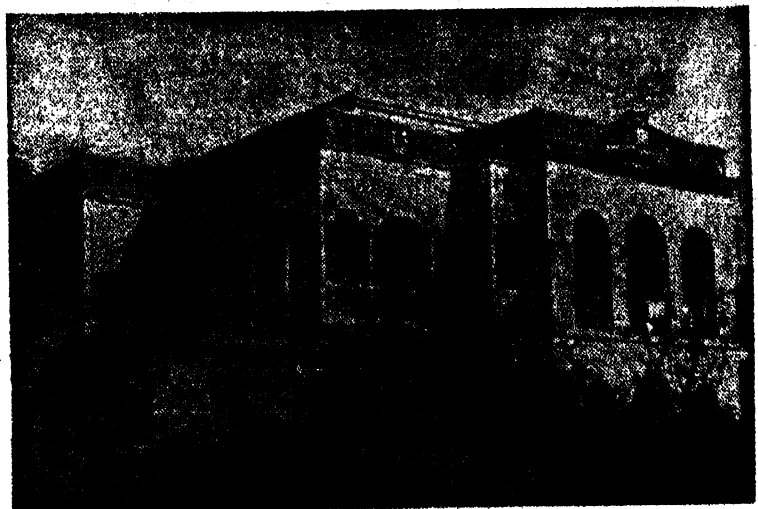
তারিখ দেওয়া আছে: ৭-ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৪ সাল। বলা দরকার, বিদ্যাসাগরের এই পরিকল্পনা উত্তরকালে প্রায় সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। আপন পরিকল্পনার দ্বাদশ ধারায় তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন: নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়গুলির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হবেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, কিন্তু সে জন্য তাঁকে অতিরিক্ত কোনো দক্ষিণা দিতে হবে না, তাঁকে কেবলমাত্র যাতায়াতের খরচ (বছরে তিনশো টাকার বেশি লাগবে না) দিলেই চলে যাবে।

এবং বিদ্যাসাগর সম্পর্কে স্বয়ং হ্যালিডে মন্তব্য করেছেন:

"Pandit Ishwarchandra Sharma is an uncommon man, who has shown great energy and zeal in this matter, and I should be well pleased to let him try an experiment, in the result of which he is greatly interested, and which I really think will succeed in his hands."

বিদ্যাসাগর আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়গুলির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হবেন, কাউন্সিল অব এডুকেশনের অনেক সদস্যই এ-প্রস্তাবে সম্মত হননি। বিদ্যাসাগরের যোগ্যতা সম্পর্কে কারো মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু কারো-কারো মনে প্রশ্ন এল: বিদ্যাসাগর তো সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, সেই গুরুভারের সঙ্গে আবার আদর্শ বঙ্গ-বিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধান?

এ-বিষয়ে সকলে একমত যে কিছুতেই বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজ থেকে ছাড়া যায় না। সাব্যস্ত হল: এই মহৎ আন্দোলনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যুক্ত থাকা উচিত। আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে নানা বিষয়ে তাঁর পরামর্শ অত্যন্ত মূল্যবান হবে।

কিন্তু হ্যালিডে কারো কথায় কান দিলেন না। তিনি প্রস্তাবিত আদর্শ বঙ্গ-বিদ্যালয়গুলি স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনের ভার দিলেন বিদ্যাসাগরকে।

১৮৫৪ সালের কথা। ২১ মে থেকে ১১ জুন—সংস্কৃত কলেজ তখন ছুটি—বিদ্যাসাগর ঘুরে এলেন গ্রাম-গ্রামান্তর: শিয়াখালা; রাধানগর; কৃষ্ণনগর; ক্ষীরপাই; চন্দ্রকোণা; শ্রীপুর; কামারপুকুর; রামজীবন-পুর; মায়াপুর; মলয়পুর; কেশবপুর; পাঁতিহাল। এসব গ্রামের মানুষজন আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়ের জন্য, দেখা গেল, যথেষ্ট আগ্রহী। ও'রা আপন খরচে বিদ্যালয়ের জন্য বাড়ি তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দিলেন।

ওদিকে সংস্কৃত কলেজের ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। বিদ্যাসাগরকে ফিরে আসতে হল। অনেক গ্রামে যেতে পারেননি, কিন্তু না গেলেও বিদ্যাসাগর অনেক সংবাদ নিয়ে এসেছেন। ১৮৫৪ সালের ৩-জুলাই বিদ্যাসাগর বাঙলা ছোটোলাটের প্রাইভেট সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন এইচ সি জেমসকে একখানা দীর্ঘ চিঠিতে এ-বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ জানালেন।

কিছুদিন পরেই সরকারী শিক্ষাবিভাগে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। কাউন্সিল অব এডুকেশন উঠে গেল। নিযুক্ত হলেন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন। সরকারী নিয়মে বাঙলা শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত করা যায় না বিদ্যাসাগরকে। সেকাজের ভার নেবেন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন এবং তাঁর অধীনস্থ ইনস্পেক্টর। তবে বিদ্যাসাগর, সংস্কৃত কলেজের কাজের

কোনো ক্ষতি না হলে, মাঝে-মাঝে আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের জন্য যেতে পারেন—এ-বিষয়ে বড়োলাটের কোনো আপত্তি নেই।

কিন্তু ছোটোলাট হ্যালিডের বদ্ধমূল বিশ্বাস, বিদ্যাসাগরের মতো মানুষের সাহায্য ছাড়া এদেশে বাঙলা শিক্ষা ব্যবস্থার সাফল্যের আশা সুদূরপরাহত। ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনকে সে কথা জানিয়ে দেওয়া হল।

ডিরেক্টর তখন প্রস্তাব করলেন: অস্থায়ীভাবে বিদ্যাসাগর ইনস্পেক্টর অব স্কুলস নিযুক্ত হতে পারেন, কিন্তু প্র্যাট সাহেব এলেই বিদ্যাসাগরকে চলে যেতে হবে।

স্বয়ং ছোটোলাট সে-বিষয়ে লিখেছেন:

"I should not anticipate any advantage from a merely temporary employment of Pandit Ishwarchandra.

He is a man of very decided character who has formed and expressed strong views on the subject of vernacular education which, if permitted, he will no doubt endeavour to carry into effect with energy and intelligence according to the scheme approved of.

But I do not see that he could be expected to effect if temporarily employed, and left to understand that any time three weeks or three months hence he is to retire from the work on the appearance of Mr. Pratt as inspector...."

শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ-বাঙলার বিদ্যালয়-সমূহের সহকারী ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হলেন বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে যা মাইনে তা তো আছেই, উপরন্তু ১৮৫৫ সালের ১ মে থেকে আলাদা কাজের জন্য দুশো টাকা মাইনে সাব্যস্ত হল।

দক্ষিণ - বাঙলার বিদ্যালয়সমূহের সহকারী ইনস্পেক্টর হয়েই বিদ্যাসাগর চারজন সাব-ইনস্পেক্টর বেছে নিলেন: হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র গোস্বামী, তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য ও দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন। প্রত্যেকের মাইনে একশো টাকা। তাছাড়া পথ-খরচা আছে। যা হোক, আদর্শ বঙ্গ-বিদ্যালয় স্থাপনের উপযুক্ত অঞ্চল নির্বাচনের জন্য বিদ্যাসাগর সাব-ইনস্পেক্টর-দের মফস্বলে পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর প্রস্তাবিত আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়-গুলির জন্য শিক্ষক নির্বাচনের পালা।

একটা মজার গল্প আছে।

কী একটা গ্রামে বিদ্যাসাগর একবার একটা স্কুলে গিয়েছেন। কথাবার্তা বলে দেখলেন, স্কুলের ছেলেরা অঙ্ক আর বাঙলা ভালোই শিখেছে। কিন্তু উঁচু ক্লাসের ছেলেদের ভূগোলের বিদ্যা পরখ করতে গিয়েই বিদ্যাসাগর হতাশ হলেন।

—পৃথিবীর ক-রকম গতি আছে? কোন গতির জন্য পৃথিবীর কত সময় লাগে?

ছেলেরা জবাব দিল—পৃথিবীর কোনো গতি নেই। পৃথিবী স্থির হয়ে আছে। সূর্যই বরং পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সব ছেলেই যখন একরকম ভুল জবাব দিচ্ছে, বিদ্যাসাগর ভাবলেন, নিশ্চয়ই পণ্ডিতমশাই ভুল শিখিয়েছেন।

পণ্ডিতমশায়ের দিকে তাকালেন বিদ্যাসাগর। জিজ্ঞেস করলেন—ছেলেরা এসব কী বলছে? পৃথিবী কি সূর্যের চারদিকে ঘোরে না?

যেন কোনো আশ্চর্য কথা শুনছেন, এমনিভাবে তাকালেন পণ্ডিতমশাই। বললেন—সত্যি-সত্যি পৃথিবী ঘোরে নাকি? আমি ভাবতাম পৃথিবী এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে।

—না।—বিদ্যাসাগর বললেন—দু-রকম গতি আছে পৃথিবীর—আহ্নিক গতি আর বার্ষিক গতি। আহ্নিক গতির জন্য পৃথিবীতে দিনরাত্রি হয়। আপন মেরুরেখার চারদিকে পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় একবার ঘোরে; তার নাম আহ্নিক গতি। আর বার্ষিক গতির জন্য পৃথিবীতে দিনরাত্রি ছোটো-বড়ো হয়, পৃথিবীতে ঋতুবদল হয়। আপন মেরুরেখার চারদিকে ঘুরতে-ঘুরতে পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট পথে প্রায় তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে; তার নাম বার্ষিক গতি। পৃথিবী সত্যি-সত্যি ঘোরে।

পণ্ডিতমশাই বললেন—ঘুরুক তাহলে পৃথিবী। যেমন ঘুরছে তেমনি ঘুরুক চিরকাল। পৃথিবীর ঘোরাঘুরি নিয়ে কে মাথা ঘামায়?

বাঙলা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি সফল করে তুলতে হয় তো অবশ্যই প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষক। ১৮৫৫ সালের মে মাসে বিদ্যাসাগর নোটিশ দিলেন: শিক্ষক নির্বাচনের জন্য সংস্কৃত কলেজে একটি পরীক্ষা হবে।

প্রার্থীর সংখ্যা দুশো ছাড়িয়ে গেল। পরীক্ষা হল। দেখা গেল, অধিকাংশই উপযুক্ত নন। অবশ্য, আরো কিছু শিক্ষিত হলে এঁরাই আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়গুলির ভার নিতে পারবেন।

একটা নর্মাল স্কুল দরকার। নর্মাল স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষক গড়ে তোলা যাবে।

হিন্দু কলেজের সঙ্গে একটি বাঙলা পাঠশালা আছে। সেই পাঠশালাটিকে আপন তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসতে চাইলেন বিদ্যাসাগর। ওই পাঠশালাটি থাকলে নর্মাল স্কুলে শিক্ষক গড়ে তোলার কাজ

নুন্দর হবে, ওই পাঠশালা থেকেই ভাবী শিক্ষকেরা শিক্ষকতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন। এবং বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে থাকলে ওই পাঠশালাটি ক্রমশ আদর্শ বিদ্যালয় হয়ে উঠতে পারে।

১৮৫৫ সালের ২ জুলাই বিদ্যাসাগর একখানা চিঠি লিখেছেন ডিরেক্টরকে। সেই চিঠিতে বিদ্যাসাগর প্রস্তাব করেছেন যে, মাসিক পাঁচশো টাকা খরচ করলে ছ-মাস অন্তর বাটজন উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাবে।

মাসিক পাঁচশো টাকা খরচে ছ-মাস অন্তর বাটজন উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাবে, সামান্য কথা নয়। বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব অনুমোদিত হল।

১৮৫৫ সালের ১৭-জুলাই বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে একটি নর্মাল স্কুল খোলা হল। নর্মাল স্কুল বসত সকালে, দু-ঘণ্টা, সংস্কৃত কলেজে। নর্মাল স্কুলে দুই শ্রেণী : উচ্চশ্রেণী আর নিম্নশ্রেণী। উচ্চশ্রেণীর দায়িত্ব নিয়েছেন প্রধান শিক্ষক অক্ষয়কুমার দত্ত। নিম্নশ্রেণীর দায়িত্ব নিয়েছেন দ্বিতীয় শিক্ষক মধুসূদন বাচস্পতি। পয়তাল্লিশ বছরের বেশি কিংবা

আঠারো বছরের কম বয়সী কোনো ছাত্রকে ভর্তি করা হত না নর্মাল স্কুলে। জাতি-বিচারে উচ্চবর্ণ না হলে গোড়ার দিকে কেউ নর্মাল স্কুলে ভর্তি হতে পারেনি। ৭১টি ছাত্র নিয়ে প্রথম নর্মাল স্কুল খোলা হয়; ৬০ জনের জন্য ছিল মাসিক পাঁচটাকা বৃত্তির ব্যবস্থা। মাসে-মাসে পরীক্ষা দিতে হয়। অমনোযোগী ছাত্রদের নর্মাল স্কুল ছেড়ে চলে যেতে হয়। আর যাঁরা যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন তাঁরা শিক্ষকের কাজ পেয়ে যান।

১৮৫৫ সালের ২২ আগস্ট থেকে ১৮৫৬ সালের ১৪ জানুয়ারি, এই সময়ের মধ্যে বিদ্যাসাগর স্থাপন করেছেন সাকুল্যে কুড়িটি আদর্শ বিদ্যালয়। চার জেলা নিয়ে এলাকাঃ নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর। প্রত্যেক জেলায় পাঁচটি বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের খরচ দিয়েছিল গ্রামের মানুষজন। একেকটি বিদ্যালয় চালাতে মাসে-মাসে পঞ্চাশ টাকা খরচ। ছ-মাস পর্যন্ত কোনো মাইনে লাগবে না, ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন নির্দেশ দিয়েছেন, পরে সম্ভব হলে মাইনে আদায় করতে হবে।

বাঙলা শিক্ষা প্রচলনে আপন প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিদ্যাসাগর, ১৮৫৫ সালের ৮ অক্টোবর, একখানা চিঠিতে ডিরেক্টরের কাছে সুদীর্ঘ বিবরণ দাখিল করেছেন।

এতদিন বিদ্যাসাগর ছিলেন 'সহকারী ইনস্পেক্টর', ভারত সরকারের নির্দেশে, ১৮৫৬ সালের নভেম্বর থেকে, তিনি হলেন 'স্পেশ্যাল ইনস্পেক্টর'। মানে মতুনত্ব দেখা গেল।

আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়গুলি যাতে সফল হয়ে ওঠে সেজন্য বিদ্যাসাগর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এবং বিদ্যাসাগরের পরিশ্রম ব্যর্থ হয়নি, সার্থক হয়েছে আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়গুলি। আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়-গুলি প্রতিষ্ঠার বছর তিনেক বাদে দেখা গেল ছাত্রেরা যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে, সর্বত্র এই বিদ্যালয়গুলি সমাদৃত হচ্ছে। এই বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে যথাসময়ে বিদ্যাসাগর একটি রিপোর্ট দাখিল করেছেন। অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি:

"It is now about three years since our operations commenced and the Model vernacular schools have been established. During this short period, the progress of these institutions has really been very satisfactory. The pupils have gone through all the vernacular books suited to such institutions and may be said to have acquired a thorough knowledge of the language and to have made respectable progress in several branches of useful studies.

At the commencement of our operations, doubts were entertained in several quarters as to whether the Model schools could be duly appreciated by the people in the interior. These doubts, I am happy to state, have long since been fully removed by the almost complete success of those institutions. The people of the villages in which they are located, as well as those of contiguous places who are also benefited by them, look upon the schools as great blessings and feel grateful to Government for them. That the institutions are highly prized is evident from the number of pupils attending each of them."

একাধিক বিদ্যালয়ের মূলে বিদ্যাসাগরের নাম অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত আছে। একটি যেমন—কাঁদির ইংরেজী-সংস্কৃত স্কুল পাইকপাড়ার রাজারা স্থাপন করেছেন ১৮৫৯ সালের ১ এপ্রিল। বিদ্যাসাগর কিছুদিন এই স্কুলের অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। মেদিনীপুর ঘাটাল অঞ্চলে 'এনট্রান্স পরীক্ষার পাঠোপযোগী এক সংস্কৃত সহিত ইংরেজী স্কুল' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও বিদ্যাসাগর সাহায্য করেছিলেন।

স্বগ্রামে ছেলেদের জন্য বিদ্যাসাগর ১৮৫৩ সালে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন।

স্কুল খোলার আগে, না বললেও চলে নিশ্চয়ই, স্কুলের জন্য জমি কিনেছেন। আগাছা-টাগাছায় জমিতে জঙ্গল হয়ে আছে, পরিষ্কার করা দরকার, কিন্তু মজুর পাওয়া গেল না সেদিন। বিদ্যাসাগর নিজেই তখন কোদাল হাতে নিয়ে, ভাইদের সঙ্গে, জমিতে নেমে পড়লেন। জঙ্গল সাফ করতে লেগে গেলেন। জঙ্গল সাফ হয়ে গেল।

তারপর স্কুলের জন্য বাড়ি। কলকাতায় যেবার আসে সেজন্য বাবার হাতে হাজার টাকার উপরে দিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর। এই বিদ্যালয়টি সম্পর্কে, ১৮৫৯ সালের ২০-মে, ইনস্পেক্টর অব স্কুলস (সাউথ বেঙ্গল) লজ সাহেব লিখেছেন:

"Birsingha school.—This school has been established and entirely supported by the well-known Pandit Ishwarchandra Vidyasagar. In mere justice to that noble philanthropist, I feel it my duty to observe that he has erected a beautiful bungalow for the school in a very convenient locality, pays some six or seven teachers from his own private resources, the boys are educated free and supplied with all sorts of books, and what is still more to be admired, the poorer students about 30 in number, are constantly boarded and lodged in his family mansion and now and then supplied with clothes, etc., when considered necessary, careful medical attendance is also secured for them, and they are all taken care of as if they were so many members of his family...."

আসল কথা, বাঙলা শিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দান অসামান্য। কিন্তু

তাঁর এই অসামান্য দান সম্পর্কে তাঁর স্বদেশবাসীরা হয়তো এখনো সম্পূর্ণ সচেতন নন। উত্তরকালে যদুনাথ সরকার দুঃখ করে বলেছেন: "এই ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দান আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী আজিও ভোগ করিতেছে, যদিও তাহারা তাহাদের দাতার নাম জানে না।"

১৮৪৯ সালের ৭ মে বেথুন সাহেব কলকাতায় একটা বালিকা-বিদ্যালয় খুললেন। ১৮৫০ সালের ১ এপ্রিল ডালহাউসি লিখেছেন:

"Mr. Bethune has, in my humble opinion, done a great work in the first successful introduction of Native Female Education in India, on a sound and solid foundation; and has earned a right not only the gratitude of the Government but to its frank and cordial support."

১৮৫০ সালের ডিসেম্বরে বিদ্যাসাগর ওই বালিকা-বিদ্যালয়ের অনারারি সেক্রেটারি হলেন। বিদ্যালয়ের বালিকাদের গাড়ির দু-পাশে বিদ্যাসাগর মনুসংহিতার একটি শ্লোকাংশ খোদিত করে দেবার ব্যবস্থা করেছেন: কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

যা হোক, বেথুন সাহেব বালিকা-বিদ্যালয় খুলবার পর কলকাতায় একটা তুমুল হই-হল্লা পড়ে গেল। একদল মেয়েদের জন্য স্কুলের পক্ষে, আরেক দল বিপক্ষে। মেয়েদের স্কুল নিয়ে এন্তার কথা কাটাকাটি, বিস্তর লেখালেখি হল। সে সময়ে কারো-কারো ধারণা, লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা মুখরা হবে, অহঙ্কারী হবে, বিধবা হবে।

বিদ্যাসাগরের বিশ্বাস, মেয়েরা লেখাপড়া না শিখলে দেশের উন্নতি হবে না।

১৮৫১ সালের ১২-আগস্ট বেথুন সাহেব মারা গেলেন। অক্টোবর মাস থেকে বেথুনের বালিকা বিদ্যালয়ের সব খরচ চালাতে লাগলেন লর্ড ডালহাউসি। ১৯৫৬ সালের মার্চে ডালহাউসি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তারপর থেকে ওই স্কুলের খরচ চালাতে লাগল গবর্নমেন্ট। বাঙলার ছোটোলাট ওই স্কুলটিকে সিসিল বীডনের তত্ত্বাবধানে এনে দিলেন।

এই স্কুলটি সম্পর্কে ১৮৫৬ সালের ১২ আগস্ট বীডন সাহেব একখানা চিঠি লিখেছেন গবর্নমেন্টকে। চিঠিতে ওই স্কুলের জন্য একটি কমিটি করার প্রস্তাব আছে, বিদ্যাসাগরকে ওই কমিটির সেক্রেটারি করার প্রস্তাব আছে। চিঠি থেকে একটি বাক্য তুলে দিচ্ছি:

"It may be thought by His Honour no less than justly due to the past services and distinguished position of Pandit Ishwarchandra Sharma to appoint him secretary to the committee."

বীডনের প্রস্তাবে রাজি হল গবর্নমেন্ট। স্কুলের জন্য একটি কমিটি হল। বিদ্যাসাগর সেই কমিটির সেক্রেটারি হলেন।

মাঝে মাঝে হ্যালিডে সাহেবের বাড়িতে যেতেন বিদ্যাসাগর। যেতেন নিজস্ব পোশাকে। পরনে থানধুতি, গায়ে চাদর, পায়ে তালতলার চটি।

কিন্তু হ্যালিডে সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর আরেক রকম পোশাকেও তাঁর কাছে গিয়েছেন। ধুতি-চাদরের বদলে পেন্টুলুন, চোগা-চাপকান, পাগড়ি। ওরকম পোশাক পরে বিদ্যাসাগরের মনে হত যেন তিনি সঙ সেজেছেন, যেন তিনি চুরি করেছেন। ওই পোশাকে সকলের চোখ এড়িয়ে চুপচাপ তিনি ছোটোলাটের বাড়িতে গিয়েছেন। কিন্তু দু-তিনবারের বেশি ওভাবে যেতে পারেননি।

ওই পোশাকে একদিন বিদ্যাসাগর হ্যালিডে সাহেবকে বললেন—এই আপনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

হ্যালিডে সাহেব চমকে উঠলেন। বললেন—কেন পণ্ডিত, কি হয়েছে যে আর দেখা হবে না?

বিদ্যাসাগর হাসতে-হাসতে বললেন—এভাবে সঙ সেজে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব।

হ্যালিডে সাহেব [illegible] তারপর বললেন—[illegible] যে-পোশাকে [illegible] আপনার সুবিধে হয়, [illegible] পোশাকেই আসবেন।

কেন যে বিদ্যাসাগর ধুতি-চাদরের বদলে অন্য পোশাক পরতে রাজি হননি, সে-বিষয়ে চমৎকার একটা গল্প আছে।

সেদিন বিদ্যাসাগর রাস্তায় হাঁটিতে-হাঁটিতে ভাবছেন, লাটের দরবারে যাবার সময় অন্য পোশাক পরবেন কি না। ভাবছেন, কিন্তু কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছেন না।

বিদ্যাসাগরের সামনে তখন একজন মোগলাই পোশাক পরা মোটাসোটা ভদ্রলোক। আস্তে-সুস্থে তিনি নবাবী কায়দায় হাঁটছেন। কে একজন ছুটে এল ওই ভদ্রলোকের কাছে: বলল—হুজুর, আপনার বাড়িতে আগুন লেগেছে।

এই দারুণ দুঃসংবাদ শুনেও হুজুর কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। যেমন আস্তে-সুস্থে যাচ্ছিলেন, তেমনি নবাবী কায়দায় যেতে লাগলেন। যেন কিছুই হয়নি, যেন তাঁর বাড়িতে আগুন লাগেনি।

কিন্তু খবর নিয়ে যে এসেছে সে কেমন করে স্থির থাকে। ভদ্রলোকের ঘরবাড়ি বোধ হয় এতক্ষণে ভস্ম হয়ে গেল। অস্থির হয়ে উঠল লোকটি।

—হুজুর, একটু তাড়াতাড়ি চলুন।

তাড়াতাড়ি চলা দূরের কথা, হুজুর ধমকে উঠলেন—বেকুব কোথাকার! ঘরের কয়েকখানা বাঁশ-বাখারি পুড়ে যাচ্ছে বলে আমি কি বাপ-দাদার চাল-চলন ছেড়ে দিয়ে হুড়মুড় করে ছুটব?

না, ঘরবাড়ি পুড়ে গেলেও বাপ-দাদার চাল-চলন ছাড়া চলবে না। বিদ্যাসাগর সেই মুহূর্তে সাব্যস্ত করলেন, যাই হোক, কিছুতেই ধুতি-চাদর ছেড়ে কোট-পেন্টুলুন পরবেন না, কিছুতেই না।

উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতি-চাদর পরিয়া সর্বত্র সম্মানলাভ করেন, বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশ, তখন তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেই সঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। সাদা ধুতি ও সাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে-গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে-গৌরব দিতে পারি না; বরঞ্চ এই কৃষ্ণচর্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না।" (ক্রমশ)
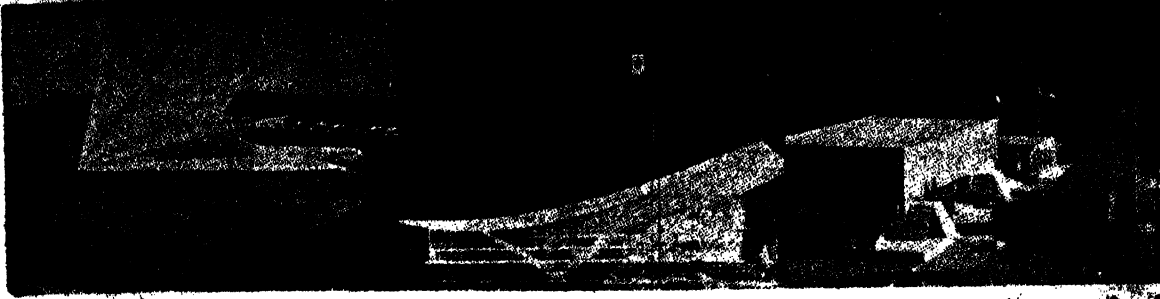
ক্যানাডার চিঠি

ক্যানাডা কনফেডারেশনের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ-বছরটা এদেশে উৎসবের বছর। সারা বছর ধরে সারা দেশ জুড়ে নানারকম উৎসব ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, খরচ করা হয়েছে কোটি কোটি ডলার। ক্যানাডার জাতীয় প্রতীক মেপ্‌ল পাতা আর এক্সপো '৬৭-এর প্রতীকচিহ্ন সর্বত্র এবং যত্রতত্র দৃশ্যমান। এই সমস্ত জাঁকজমক আর আড়ম্বরের পিছনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রয়াস অবশ্য খুবই স্পষ্ট লক্ষ্য। উদ্দেশ্যটা মহৎ সন্দেহ নেই, তবে সেইসঙ্গে কিছুটা করুণ ও হাস্যকরও। ক্যানাডার জাতীয়তাবাদ যে একটি অতি অস্পষ্ট ধারণা, এ-দেশের যে-কোনো সুস্পষ্ট জাতীয় স্বরূপ বা চরিত্র এখনও নিরস্তিত্ব, এই উপলব্ধি এখানকার প্রধানত সরকারী ও কিছু কিছু বেসরকারী মহলকে খুব পীড়িত করে। একটি নিজস্ব জাতীয় সত্তা অর্জন করার জন্য এবং এ-দেশের অধিকাংশত নিরুৎসুক জনসাধারণকে তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করার জন্য এঁরা উঠে পড়ে লেগেছেন। প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে এঁদের জাতীয় সত্তা অন্বেষণের অবিরাম প্রয়াস দেখে কৌতুক বোধ না করে উপায় থাকে না। এক্সপো '৬৭-র আড়ম্বরও প্রধানত এই প্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য এ-দেশের লোকেদের অভাববোধটাও বোধগম্য। আচারে-ব্যবহারে-পোশাকে-খাদ্যরুচিতে অবকাশ-যাপনে, এককথায় জীবনযাপনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই মার্কিন সমাজ ও সংস্কৃতি দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এদের সনাতন ইংরেজ ঐতিহ্যবোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কথাভাষা পুরোপুরি মার্কিন হলেও, অন্তত কোনো কোনো ক্ষেত্রে লিখিত ভাষায় এরা বিশুদ্ধ ইংরিজী বানান ও বাক্যব্যবহারের পক্ষপাতী। এদের ইংরেজ সত্তা সবচেয়ে প্রকট রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যে। সিনেমার শেষে 'গড্ সেইভ দ্য কুইন' সংগীতকে সম্মান প্রদর্শন করা থেকে শুরু করে রানীর ছবি দিয়ে দেয়াল অলঙ্কৃত করা পর্যন্ত বহুবিধ ক্ষেত্রেই এদের রাজানুগত্য লক্ষণীয়। অন্য দিকে কিছুটা অর্থনৈতিক নির্ভরতার কারণে, কিছুটা তুলনামূলক বিচারে হীনতাবোধে ও কিছুটা মার্কিন সমাজের সর্বগ্রাসী প্রভাবে আচ্ছন্ন হবার ফলে মার্কিন দেশ সম্পর্কেও এদের মনোভাব খুব অনুকূল নয়। এশিয়া, আফ্রিকা, এমন কি ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে এই মার্কিন 'সাংস্কৃতিক' আক্রমণ ও অনুপ্রবেশ ও 'মস্তিষ্ক-নির্গমন' সম্পর্কে যে প্রায় তিক্ত প্রতিক্রিয়া ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে, কম মাত্রায় হলেও ক্যানাডাও তার অংশীদার। এই ধরনের নানা বৈপরীত্য ও পরস্পরবিরোধী চরিত্রলক্ষণের ডামাডোলে এমনিতেই নিজস্ব জাতীয় সত্তা ব্যাপারটা খুব গোলমেলে হয়ে দাঁড়ায়, তদুপরি যদি একটি দ্বিভাষী দেশের দুই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংঘর্ষ প্রকট হয়ে ওঠে তাহলে তো কথাই নেই। এ-দেশের ফরাসী ও ইংরিজীভাষীদের মধ্যে বিদ্বেষ ও তিক্ততা যেভাবে ক্রমবর্ধমান তাতে এক ও ঐক্যবদ্ধ একটি 'ক্যানেডিয়ান ন্যাশনাল আইডেনটিটি'-র বহুবিজ্ঞাপিত ধারণাটি নিতান্তই কষ্টকল্পনা বলে বোধ হয়।

কিন্তু সব সত্ত্বেও এদের প্রয়াসে যে কোনো ফাঁক নেই, মন্ট্রিয়লে এক্সপো '৬৭-র মেলা দেখে এটা স্বীকার করতেই হয়। যে-পরিমাণ সময়, সামর্থ্য ও অর্থ এই মেলার পিছনে ঢালা হয়েছে এবং যে-ভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে বহুদিন ধরে এর বিজ্ঞাপন ও প্রচার চালানো হয়েছে তা থেকে অবশ্য এটা অনুমান করাই গিয়েছিলো যে, 'পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম বিশ্বমেলা'র আয়োজনের কোনো ত্রুটি থাকবে না। এবং প্রত্যক্ষদর্শনে এই আয়োজনের বিপুলতা, বৈচিত্র্য ও আড়ম্বর প্রত্যাশাকে ক্ষুণ্ণ করে না। মন্ট্রিয়ল এমনিতেই অতি আধুনিক, ঝকঝকে শহর, এক্সপো উপলক্ষ্যে সমস্ত শহরটাকে আরও সুশ্রী ও সুগম করা হয়েছে। শহর থেকে মেলায় এবং মেলা-প্রাঙ্গণের (অর্থাৎ তিনটি নাতিবৃহৎ দ্বীপ)

মধ্যে যানবাহনের ব্যবস্থা ত্রুটিহীন। কম্প্যুটারের প্রাথমিক হিসেব অনুসারে ছ মাসব্যাপী এই মেলায় আগত দর্শকের মোট সংখ্যা অনুমিত হয়েছিলো সাড়ে তিন কোটি। কিন্তু কম্প্যুটার-বর্ণিত প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে প্রতিদিনই আগত জনসংখ্যা যেভাবে অস্বাভাবিক হারে ক্রমবর্ধমান তাতে প্রাথমিক হিসেবের দ্বিগুণ সংখ্যক লোক এক্সপো-দর্শনে হাজির হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই অপ্রত্যাশিত জনস্রোত সত্ত্বেও 'পার্কিং স্পেস' নামক এ-দেশের অন্যতম মৌলিক সমস্যা থেকে শুরু করে দর্শনকামী জনতার নানাবিধ প্রয়োজন ও সুবিধের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য এদের প্রয়াস প্রশংসা-যোগ্য। অবশ্য প্রদর্শনকেন্দ্রগুলির দ্বার ছাড়া আর সব কিছুই বেশ অর্থসাপেক্ষ। উদাহরণ-স্বরূপ, খাদ্যদ্রব্যের অতিরিক্ত চড়া দাম নিয়ে ইতিমধ্যেই বহু অভিযোগ ও বাদানুবাদ শোনা যাচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের ও যাবতীয় রুচির খাদ্যদ্রব্য এখানে পাওয়া গেলেও তা এতই দুর্মূল্য যে, অধিকাংশ লোকেরই আয়ত্তের বাইরে। অর্থাৎ প্রচার, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি ছাড়াও এক্সপো '৬৭-র ব্যবসায়িক ভিত্তিটা নিতান্ত গৌণ নয়।

পর্যাপ্ত অর্থব্যয়ে যাঁরা সক্ষম, তাঁদের পক্ষে এক্সপো অবশ্য নন্দনকানন। অংশ-গ্রহণকারী বাষট্টিটা দেশের নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় আমোদপ্রমোদ খেলাধুলো ও ফুর্তির এরকম একত্র সমাবেশ ইতিপূর্বে কখনো আয়োজিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর সেরা সেরা নাটক, চলচ্চিত্র, অপেরা, অর্কেস্ট্রা, ব্যালে, নৃত্য-গীত তো বটেই কার্নিভ্যাল, নানাবিধ খেলা-ধুলো ও প্রমোদের ব্যবস্থা এমনই সর্বাঙ্গীণ যে প্রত্যেকেরই রুচি ও ইচ্ছে অনুসারে নির্বাচনের অবাধ সুযোগ আছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুাজিয়মগুলি থেকে সংগৃহীত চিত্র, ভাস্কর্য ও নানা শিল্প উপকরণের একত্র উপস্থিতিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (ফরাসী প্রদর্শনকেন্দ্রে তো প্রায় লুভরকে তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে)। বিভিন্ন দেশের নিজস্ব প্রদর্শনকেন্দ্র ছাড়াও এ মেলায় সতেরোটা 'থীম প্যাভিলিয়নে'র মধ্যে দিয়ে 'মানুষ ও তার পৃথিবী'কে উপস্থাপিত করা হয়েছে। মানুষের সভ্যতা, প্রগতি ও জ্ঞানবিজ্ঞান-শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক এই প্রদর্শনকেন্দ্রগুলির উপজীব্য। আরও নানা প্রদর্শনকেন্দ্রে নানাবিধ তথ্য, শিক্ষা ও কল্পনার চিত্তাকর্ষক উপকরণ পরিবেশন করা হয়েছে;—উদাহরণ স্বরূপ, আধুনিক পৃথিবীতে ব্যক্তি জীবনের রূপক "ল্যাবিরিন্থ" উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া হোভারক্রাফ্ট্ থেকে শুরু করে রুশ প্রদর্শনকেন্দ্রের 'কস্মোস্ হল'-এ মহাশূন্যে যাত্রার অভিজ্ঞতা অর্জনের বিরল সুযোগ পর্যন্ত কোনো কিছুরই অভাব নেই। অধুনাতম স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে আছে হ্যাবিট্যাট '৬৭। প্রসঙ্গত বিভিন্ন প্রদর্শন-কেন্দ্রের স্থাপত্য ও পরিকল্পনার অভিনবত্ব মনে রাখবার মতো; এর মধ্যে রুশ, মার্কিন, পশ্চিম জার্মান ও ব্রিটিশ প্রদর্শনকেন্দ্র বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সর্বোপরি, চলচ্চিত্রের অধুনাতম কলা-কৌশল ও পরীক্ষামূলক প্রকরণের অজস্র উদাহরণে বিস্মিত ও চমৎকৃত হতে হয়। পঞ্চাশটি দেশের প্রদর্শনকেন্দ্র, প্রায় প্রত্যেকটি 'থীম প্যাভিলিয়নে' এবং আরও নানা প্রদর্শনকেন্দ্রে চলচ্চিত্রকে কি বিচিত্র-ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা না দেখলে

ধারণা করা শক্ত। শুধুমাত্র দৃশ্যবস্তু ও বিষয়বৈচিত্র্যেই নয়, উপস্থাপনের অভিনবত্বে ও প্রকরণবৈচিত্র্যে এক্সপোতে চলচ্চিত্র-শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ঐতিহাসিক সূত্রপাত হয়েছে বললে খুব ভুল বলা হবে না। এক পর্দার বদলে বহু পর্দা এমন কি পর্দাও নয়, কাঁচের গোলক প্লাস্টিকের বস্তুর প্যাটার্ন বিচিত্র জ্যামিতিক দৃশ্যপট। এক দৃশ্য নয়, বহু দৃশ্য; উপরে নিচে ডাইনে বাঁয়ে অস্থির পটপরিবর্তন। শুধু ছবিই চলমান নয়, ত্রিমাত্রিক দৃশ্যপটও খোপে খোপে বিভক্ত হয়ে উঠে, নেমে, সরে দৃশ্যকে এক গতিময় রূপ দিচ্ছে; বিমূর্ত, সচল চিত্রময়তাকে বস্তু-অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করছে; পরিচিত বস্তু বিষয়-ঘটনার মধ্যে রূপকথার রহস্য সঞ্চারিত করছে। এককথায়, চলচ্চিত্রের চেনা পরিধির বাইরে চিত্রময়তার যে ভিন্ন জগৎ এখানে অন্বিষ্ট তা বর্ণনার বিষয় নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র। ত্রিমাত্রিক চলচ্চিত্রের চরমতম অভিব্যক্তি হিসেবে আছে ওয়াল্ট ডিজনে উদ্ভাবিত 'সার্কল ভিশন' (বেল টেলিফোন প্রদর্শনকেন্দ্রের সৌজন্যে উপস্থাপিত); প্রায় আক্ষরিক অর্থে চলচ্চিত্রের অংশ হয়ে যাওয়ার বোধ থেকে চেষ্টা করেও এখানে নিজেকে মুক্ত রাখা সম্ভব নয়।

কিন্তু তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। এক্সপো '৬৭-তে চক্ষুকর্ণের তুষ্টিবিধানের জন্য যে বিচিত্র ও বিশাল আয়োজন করা হয়েছে তার ফর্দ দাখিল করা অসম্ভব।

সমস্ত দেশের প্রদর্শনকেন্দ্রের মধ্যে চেক কেন্দ্রটি ব্যক্তিগতভাবে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে। সুরুচি, সৌন্দর্যবোধ ও আধুনিক চেক শিল্পসংস্কৃতির বিশেষ করে চলচ্চিত্রশিল্পের — নিদর্শনে প্রদর্শনকেন্দ্রটি সবাইকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার বিশাল প্রদর্শনকেন্দ্রটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক সোভিয়েটের অগ্রগতির একটি প্রামাণ্য পরিচয় দেয়। ব্রিটেনের প্রদর্শনকেন্দ্রটিও উত্তম। ইংরেজ ঐতিহ্য বিষয়ে আত্মসচেতনতার পাশাপাশি নিজেকে নিয়ে পরিহাস করার মিশ্রণে ইংরেজ রসবোধ বেশ উপভোগ্য। ভারতীয় প্রদর্শনকেন্দ্রটি সাদামাটা। বিদেশী বন্ধুদের মতে, ভারতীয় প্রদর্শনকেন্দ্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী হলো এখানকার মেয়েরা; অতিথি আপ্যায়নের জন্য যে-মহিলাবৃন্দ এখানে সমাবিষ্ট সৌন্দর্যে তাঁদের জুড়ি নাকি আর কোনো প্রদর্শনকেন্দ্রে মেলে না।

ভারতীয় প্রদর্শনকেন্দ্রে ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে এক্সপো-ভাষণ শেষ করবো। প্রদর্শনকেন্দ্রের অন্যতমা নারী কর্মী শ্রীমতী মমতা মাক্‌রার সঙ্গে কথা বলছিলাম। হঠাৎ দুটি মার্কিন যুবক শ্রীমতী মাক্‌রাকে সম্বোধন করে জানালেন যে, প্রদর্শনকেন্দ্রটির সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন যদিও প্রশংসাযোগ্য, কিন্তু প্রদর্শনকেন্দ্রটি নিতান্তই পক্ষপাতদুষ্ট ও অসম্পূর্ণ; কেননা, ভারতীয় দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, কুসংস্কার, জাতিভেদ, ধর্মান্ধতা ইত্যাদি বহুবিধ বাস্তব অবস্থার পরিচয় এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাঁদের মন্তব্যের উত্তরে শ্রীমতী মাক্‌রা যা বললেন, তার মর্মার্থ হলো: তোমাদের মতামত প্রণিধানযোগ্য; কিন্তু তোমাদের, অর্থাৎ মার্কিন প্রদর্শনকেন্দ্রটি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। প্রদর্শনকেন্দ্রটির প্রায় অর্ধেক অংশ জুড়ে হলিউডের চিত্রতারকাদের বিশাল বিশাল আলোকচিত্র শোভা পাচ্ছে। হলিউডই যদি তোমাদের সাংস্কৃতির সবচেয়ে বড় পীঠস্থান হয়, তাহলে বলার কিছু নেই। কিন্তু বাকি অংশও আমি ঘুরে দেখেছি—সেখানে হার্লেমের চিহ্ন নেই, বর্ণবিদ্বেষের শিকার নিগ্রোদের দারিদ্র্য, যন্ত্রণা আর অসম্মানের কোনো ছবি নেই, ভিয়েৎনামে তোমাদের 'শান্তি' ও 'স্বাধীনতা'র যুদ্ধপ্রসূত বারুদের গন্ধ আর নাপামে-পোড়া শিশুর আর্তনাদের সামান্যতম ইঙ্গিত সেখানে অনুপস্থিত। আমাদের প্রদর্শনকেন্দ্রের অসম্পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য, কিন্তু আশা করবো যে, তোমাদের নিজেদের প্রদর্শনকেন্দ্রের অসম্পূর্ণতা বিষয়েও তোমরা অসচেতন থাকবে না।

ছেলেদুটি কাষ্ঠ-হেসে আমতা আমতা করে পিঠটান দিলো। আমি সারাক্ষণ নিশ্চুপ ছিলাম; শ্রীমতী মাক্‌রার উত্তরের উপরে আর বলার বিশেষ কিছু ছিলও না। শুধু ভারতীয় কুসংস্কারের প্রসঙ্গে হঠাৎ একটা মজার কথা মনে হয়েছিল। নিউ ইয়র্কের মতো অতি-আধুনিক আন্তর্জাতিক শহরের বহুতল 'অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং'গুলিতে কখনও তেরোতলা খুঁজে পাবেন না। এলি-ভেটরে দেখবেন সর্বদা বারোর পরেই চোদ্দ!

সত্যজিৎ দত্ত

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

আটত্রিশ

বন্ধু-নিকেতনের জম-জমাটি আসরে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা মনে ছিল না। বিশ্রাম তো পরের কথা। আমার মতন কেবল যে বাইরের লোকেরা এসেছেন, তা না। এবার যাঁরা স্নাতকোত্তর, সেই ছেলেমেয়েদের ভিড়ও কম না। আশ্রমের দীক্ষান্তে, শিক্ষান্তে এবার যাঁরা বিদায় নেবেন, যাবেন জীবনের পথে, সেইসব নবীন-নবীনারা এসেছেন কেউ কেউ। যাঁরা বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর ঘনিষ্ঠ সীমায় নিবিড় হয়ে ছিলেন এতকাল। বন্ধুর কর্ম এখানে এক দপ্তরে, তদীয় পত্নীর এক শিল্প-শিক্ষাভবনে। বিদায়ীদের এতকালের নিবিড়তা, সেই কারণে না। হেথা কারণের নাম প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালবাসা। তাই বিদায়ের সময় যত ঘনিয়ে আসে, মোচড় দিচ্ছে তত। কোথায় দিচ্ছে, তাই ভাব মনে।

এখন এই পড়ন্ত বেলায়, পৌষ মাসের ছ তারিখে বিদায় নিতে আসে নি কেউ। এ হল বিদায়ের পূর্ব পর্ব সকল। গানে গল্পে কেবল স্মৃতিচারণ। অনেক দিনের অনেক কথা। অচিন মানুষ, কান পেতে শুনি তার মধ্যে অনেক সুখদুঃখের বারতা। কবে কোন চড়ুইভাতির আসরে কত হাস্যকর ঘটনা ঘটেছিল, কবে খোয়াই ধরে এগিয়ে কোপাইয়ের কলকল ধারায় বেলাশেষের ভ্রমণে কতটুকু সুখ দুলেছিল, ব্যথা বেজেছিল, সেইসব স্মৃতিচারণ। কবে কঙ্কালীতলার পথে কী মজা লেগেছিল, কবে অজয় দর্শনে গিয়ে কী বিপদ ঘটেছিল, সেইসব স্মৃতিচারণ। বন্ধুদ্বয়ের মেলায়, এক ধারে বিদায়ীদের এমনি স্মৃতিচারণের মেলা। [illegible]।

আর এক দিকে, আমার মতন বহিরাগতের আগমন। তারা কেউ বাজে হাসে, কেউ হাঁকে। বন্ধু ও বন্ধুপত্নী অভ্যর্থনা করেন, আসুন, আসুন। সব কিছু আছে। তবে, ওহে ছাতিমতলার যাত্রী, এক দিকেতে শিকড় নামিও না, খানে খানে ছড়াও। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়। নইলে, ফাঁকি পড়ে যাবে অনেক কিছু। মেলার এক দিকে দেখে কি চোখ ভরে, না মন ভরে! তবু সেই কোন্ দূর উত্তর-পশ্চিমের দেশ পাঞ্জাবের বিদায়ী মেয়েটিকে তার বন্ধুরা সবাই যখন গান গাইবার জন্যে ধরে, তখন অবাক মানি তার মুখে মরমীয়ার বাংলা গানের সুরে, 'তবু মনে রেখ...।'

গৌরী মেয়ে, টিকলো নাক, বড় বড় ফাঁদের নীল নীল ভাবের চোখ, একটু যেন রাঙা রাঙা ছোপের খোলা চুল দেখলে মনেতে আন্দাজ পাবে, সে মেয়ে বাংলার না। অথচ গান শুনে, সুরে স্বরে উচ্চারণে আন্দাজ পাবে না, সে মেয়ে কোন্ সীমার। তখন তোমার মন আওয়াজ দেবে, রূপে যাই হোক, অরূপে তার খেল্। সেখান থেকে দেখলে মনে করবে, সে মেয়ের বুঝি জন্ম কর্ম সকলই বাংলায়। তাই সে সীমার ধরায় নেই, সে অসীমা।

কিন্তু, তাই কি সব কথা গান দিয়ে শেষ করতে পারে। দেখ, হঠাৎ গান থেমে যায় গলার কাছে, সুর বেধে যায় বুকের কাছে। সহসা, সবার মাঝে চোখ হয়ে যায় দরিয়া। কান্নার বেগে গান হরণ। বাকী বিদায়ীদের মধ্যেও যেন হঠাৎ তারই ছোঁয়া লাগার আশঙ্কা। সবাই চুপ, স্তব্ধ।

আহ্, অমন করলে কী হয়! বন্ধু অমনি হেঁকে ডেকে ওঠেন, 'আহা, কী ছেলেমানুষ দেখ, গানটাকে মাটি করলে। এমন সুন্দর ধরেছিলে। কেউ তো পালিয়ে যাচ্ছে না। আবার যখন খুশি, তখনই তো আমাদের দেখা হতে পারবে।'

বলে গলা খুলে হাসি।

তাই বুঝি! অই মশায়, দাঁড়ান গ. আওয়াজেই মালুম পাওয়া যাচ্ছে, হাসিটা তেমন যেন প্রাণের ঝরায় ঝরছে না। টুকুস কাষ্ঠ-কাষ্ঠ লাগছে। শুধু তাই না, হাসতে গিয়ে পত্নীর দিকে তাকানোর লক্ষণটিও তেমন ঝরঝরানো না। একটু যেন বিষাদ-ছায়া-ছায়া।

পত্নী যেতে চাইলেন তার ওপর দিয়ে। মেয়েটির গায়ে হাত দিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে হেসে প্রায় ধমকের সুরে বলেন, 'কী পাগল মেয়ে রে বাবা। ওরকম করলে কিন্তু আমি খুব রাগ করব। চোখ মোছ, গানটা আবার ধর, আমি আসছি।'

বলতে বলতে সরে গিয়ে পর্দা তুলে পাশের ঘরে যান। হ্যাঁ, একটু জলদে যান, নইলে আপনার চোখের জল ধরা পড়ে যাবে। আপনার চোখের কাজল ধোয়া সকলের চোখে পড়ে যাবে। তখন আপনার পাগলামি কে দেখবে। আপনার ওপর কে রাগ করবে।

কিন্তু তেমন হাওয়া বেশীক্ষণ থাকে না। থাকলে চলে না। তাই হাওয়া ঘোরাবার দল নতুন সুরে নতুন গান জুড়ে দেয় গুনগুনিয়ে। গৃহকর্তা অতিথির পরিচর্যায় ব্যস্ত হন। হোক পড়ন্ত বেলা। এসব নিয়ে এখনই বসে পড়লে হবে না। স্নানাহার, তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ ক্লান্তি মোচন চাই। অতএব বন্ধুর নির্দেশে আমাকে যেতে হয় গৃহের অন্য সীমানায়। স্নানাহার ক্লান্তি মোচনের সীমানায়।

সেখান থেকে শুনতে পাই, অন্য ঘরে হাসি বেজে উঠেছে। তবু, গলায় ঠেক খাওয়া, গান থেমে যাওয়া ছোট ঘটনাটি ভুলতে পারি না। হয়তো এই আশ্রমে ওরা এসেছিল কাঁদতে কাঁদতে, আজ যাবেও তাই। আসার সময় হয়তো মনে হয়েছিল, চলেছে নির্বাসনে, অচেনা অপরিচয়ে, ভয়ে সংশয়ে। হয়তো ছেড়ে কিছু যায় না, নিয়েই যায় কিছু। তবু আজ ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে ভেসে ওঠে অনেক কিছু। অনেক মুখ, অনেক আলো কালো দিন, প্রকৃতির বিচিত্র লীলা। ছাতিমতলায় যে প্রকৃতিকে এই মাত্র দেখে এলাম, এক মুহূর্তে। এখানে কেবলই কি অধ্যয়ন, কেবলই শিক্ষা কী! আর কি কিছু না। আর একটি জন্মের কাহিনী, ইতিহাস কি নেই। আর একটি মনের, আর একটি প্রাণের জন্মের, যার সঙ্গে জড়ানো রয়েছে নানা ঘর, নানা লোক, বন-বনান্তরের স্মৃতি!

হয়তো আজ শান্তিনিকেতনের ঘরে ঘরে এই পূর্ব পর্বের পালা চলেছে। এক দেখেই বহুকে চেনা যায়। তবেই বল, মেলা কেবল ঝলকে না, অলখেও বটে, যাকে বলে অলক্ষ্যে। ছাতিমতলার মেলায়, এও এক মেলা।

কিন্তু স্নানাহার যদি বা সারা গেল, ক্লান্তি মোচনে অরুচি। যা নেই, তা মোচনের কী কথা। বন্ধু জিজ্ঞেস করেন, 'তবে, ঘরে, না বাইরে?'

বলি, 'হাতছানিটা তো বাইরেই দেখছি।'

'আমিও সে কথাই ভাবছিলাম। বেলা এখনো একটু আছে, চলুন এ বেলাতেই বেরিয়ে পড়া যাক। আপনার সাধ ছিল এখানকার গুণিজন দর্শনের। মেলার কাজে অনেকেই ব্যস্ত, তবু দেখা যাক, কতজনের দেখা মেলে।'

এমন উৎসাহী বন্ধু পেলে উৎসাহ বাড়ে। অতএব, তৎক্ষণাৎ বাইরে। পথে পা দিয়ে আবার চোখের রঙ বদলে যায়, মন ভুলে যায়। শীতের বিকাল সোনালী বলে জানি। শান্তিনিকেতনের সেই সোনালীতে আরো যেন কী মিশেছে। ব্যাখ্যা করতে পারব না। ছায়াতে রহস্য থাকে। আলোতেও এমন রহস্য আর দেখি নি। মাটিতে আকাশের প্রতিবিম্ব, নাকি আকাশে মাটির, ধরতে পারি না। সকলেই যেন সোনায় সোনায় মাখানো। শালের পাতায় যত লালের আভা, সে জানবে, শীতে। নতুনের পথ ছেড়ে দিতে, এখন তার ধুলোয় যাবার দিন। তাই দেখি, লাল হয়ে আসা শালের পাতায় পাতায়, একেবারে নিষ্পত্র গোলকচাঁপার ডাল-পালায়, সবখানে সোনা মাখামাখি। শুকিয়ে আসা আমের পাতায়, জাম আমলকী স্বর্ণ-চাঁপার পাতায় পাতায় সোনালী ঝিলিক। একেবারে সোনালী বলব না, এ সোনায় রাঙা রাঙা ছায়া। এ যেন ব্যথার খেলা রাঙিয়ে দিয়ে যাওয়া। যে যাওয়াতে লাজে লাজানো সুখের বালাই। কেবল যেন নিশ্চুপ অপলক চোখে ব্যথায় চেয়ে থাকা। সহসা বেজে ওঠা ব্যথায় যেমন, নির্বাক মুখে লাগে, ব্যথায় রক্তাভা। সব মিলিয়ে এ শুধু শীতের এক মায়ের সোনায় মাখামাখি

বিকেল না। কেবলমাত্র এক রাতের বিকালও না। এর নাম ছাতিমতলার বিকাল। আর একটু এগিয়ে বলি, শান্তিনিকেতনের বিকাল।

বন্ধু এদিকে দেখান চীনাভবন, ওদিকে হিন্দী। বলেন, নানা ভবনের কাছাকাছি আছে পিয়ারসন পল্লী, এন্ড্রুজ পল্লী।

মরমীয়ার প্রাণে যবে 'বলাকা'-র পাখা মেলেছিল; ফাল্গুনী-র ছন্দে বেজেছিল দোলা, তখন আর এক স্বপন কর্মযজ্ঞের সাধনায় রূপ নিতে চেয়েছিল, তার নাম বিশ্বভারতী। রূপ নিতে চায় নি কেবল, সৃষ্টিঘরের ঘণ্টায় তখন যুগের এক নতুন তাল বেজে উঠেছিল। রূপ পেতে চলেছিল। আর অরূপ ধরার দুই প্রবাহে মরমীয়া যেন ভেসে চলেছিলেন, যে প্রবাহের এক নাম মানুষ, আর এক নাম ঈশ্বর। টান লেগেছিল যেন দুই স্রোতের ধারায়। সেই দুয়েতে কোথায় যে এক বাঁধাবাঁধির খেলা, চাওয়া পাওয়া, ভালবাসাবাসি, প্রেম পীরিতি, ছোঁয়াছুঁয়ির লীলা, পারাপারের সেই সাঁকোটাই নানা রূপে দেখেছিলেন তিনি। দেখেছিলেন বনের সবুজে, আকাশের নীলে, রোদ্রে মেঘে, ফুলে ফুলে, ফলে আর শস্যের মাঠে, পাখিপাখালির ডাকাডাকিতে, পতঙ্গের রহস্যগুঞ্জনে। সেই সাঁকোর নাম প্রকৃতি। তার ঈশ্বর, মানুষ। দুই ধারাতে পায়ায় পায়ায় প্রকৃতির সাঁকো ধরে।

দুই প্রবাহের টানে তাঁর চলনও সেই সাঁকোতে। মরমীয়ার সাধ, তিনি যাবেন মহাসাগরে। যেখানে সকলের মিলে মিলন-লীলা। এইখানে দাঁড়িয়ে মনে হয়, রয়েছি সেই মহাসাগরের এক উপকূলে। শান্তি-নিকেতনে সেই বিশ্বভারতের মিলমিশের মেলা। এখানে সকল ভুবন ভবনের নামে নামে; কানে কানে। গাঁয়ের নামের স্মৃতিতে।

রাস্তা চলে গিয়েছে পূবে পশ্চিমে। লাল সড়কে বাঁক লেগেছে পশ্চিমে, সোজা-সুজি সবুজ মাঠ শেষ রোদের সোনায় মোড়া। পুবেতে লোহার ফটক, যে পথ দিয়ে এসেছিলাম। তার ওপারে মেলা। এখানে ওখানে, সব পথে লোকচলাচলের বাড়া-বাড়ি। মেলা জমতে শুরু করেছে।

রাস্তা পেরিয়ে বন্ধু নিয়ে চললেন নানা কাননের মাঝে। দু পাশে আমলকীর সারি। দেখি, লাল পথের ওপর ফল পড়ে আছে। নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে তুলে নেব না, তেমন নির্লোভ হতে শিখি নি। সামনে এক নানা রঙের, ঝিকিমিকি ঝলক ছায়া গৃহ। ফটক পেরিয়ে চোখে পড়ে টালির ছাদ। নানা রঙের কাচের চৌকায় সাজানো দেওয়াল। নানা ছাঁদে লোহার ফ্রেমের নানা কারুমিস্তি। তার [illegible] লাগানো, আর এক দিকে, দূর থেকে [illegible] দেখি রথের মত চূড়া নিয়ে উঠেছে এক [illegible]। বন্ধু বলেন, উপাসনার মন্দির।

[illegible] ছাতিমতলায়, যেখানে

পাথরের বেদী পাতা রয়েছে। ধ্যানী যেখানে আসন পেতেছিলেন, যে আসনের গায়ে লেখা আছে মন্ত্রের বাণী। দুই মুখে ছাতিম, তাদের ঘিরে পাকা আসন পাতা। এইখান থেকে শান্তিনিকেতনের শুরু। এইখানে বসে, 'আগে চাখি প্রেম, পরে অমৃত' এই সাধনার শুরু। যার অলখ দুয়ার থেকে, সেই মহাসাগরের প্রেম-দুয়ারে যাত্রা।

দেখি, ছাতিমের পাতায় পাতায় লাল-সোনার প্রলেপ। তার ছায়ার কোলে কোথায় তারা কী যেন কথা বলে। কথা বুঝি না, ডাক শুনি, পিক্ পিক্, কিচির কিচির। এমন না যে, সবাই মিলে সমবেতে গায়। যেন একা একা, আচমকা, ক্ষণে ক্ষণে কী বলে ওঠে। হেথা হোথা দু-একটি শুকনো পাতা ঝরে পড়ে। ছাতিমের গোড়ার দিকে চেয়ে, কী বলব হে, হঠাৎ যেন শিরায় শিরায় কিসের এক শিহরন খেলে যায়। স্থির নিস্তরঙ্গ প্রাণ কেমন ছলছলিয়ে যায় তরঙ্গে। সহসা এক ছবি ভেসে ওঠে চোখে। এই ছাতিমের মত প্রাচীন গম্ভীর এক মানুষ যেন ধ্যানে বসে আছেন। যাঁর দৃষ্টি বন্ধ না। যেন ছলছল দু চোখ ভরা বিস্ময়, মুগ্ধতা, আনন্দে টলটল করে। সে ঋষির সকল কিছুতেই ধ্যানের রূপ দেখা।

সেখান থেকে আমবাগানের পথ ধরে যাই সেই পুরনো দোতলা বাড়ির সামনে। বল, তপোবনের সেই প্রথম কুটির। ঋষির নিবাস। লাল উঠোনের মাঝখানে শিল্পীর বিচিত্র ভাস্কর্য। উত্তর দিকে লাল কাঁকর ছড়ানো পথের দু পাশে গাছ। দেখি, তার মধ্যে আমলকীই শুধু। ফিরতে গিয়ে, আমগাছের এক নিচু ডালে দেখি, তিনি বসে আছেন, একেবারে ছুঁয়েতে পুচ্ছ ঠেকিয়ে। কণ্ঠের মাথায় বার খোঁড়া, সেই শিখিপুচ্ছে ধলো হে। কিন্তু কিছু বলতে পারবে না, আপন পুচ্ছ নিয়ে কর্তা যা খুশি তাই করবেন। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ, তেমন একটা ভয়-চকিত চাহনি না। তবে, কে-ক্ বলে ডাকটি না শুনিয়ে ছাড়বে না।

বুঝতে পারি, আশ্রমের সীমানায় ঢুকে প্রথম কোথা থেকে এই ধ্বনি বেজেছিল। ইনিই বাজিয়েছিলেন। কেন, এই শীতে কি বর্ষার তপস্যা। যবে এই রাঙা মাটি ভিজবে, গাছে গাছে ঘাসে ঘাসে ঝিরিঝিরি ঝরবে, আর আকাশ জুড়ে কালো মেঘে সৌদামিনীর হাসি হানবে। ময়ূরের চোখেতেও সেই দিনের ধ্যান নাকি।

তবে বর্ষা না পড়লেও এ পাখি ডাকে। মনে পড়ে যায়, ছোটনাগপুরের সারণ্ডার গভীর অরণ্যে, আগুন জ্বালানো শীতের রাত্রে সারা রাত কেকাধ্বনি শুনেছি। দিনের বেলা দেখেছি, নির্ভীক বনময়ূরের চলাফেরা।

ঘুরে ঘুরে বন্ধু দেখান সেই ছোট বাড়িখানি, যেখানি মরমীয়া নিজের বাসা করেছিলেন। এখন কোনটাই আর বাসগৃহ না, কাজের ঘর। দেখতে দেখতে নানা কথা শুনি। বন্ধু পুরনো দিনের কথা বলেন। [illegible] হয়তো [illegible] জায়গা নিয়ে প্রথম করে [illegible] এসেছিলেন। ছাতিমতলায় দুটিকে ঘিরেই প্রথম শুরু। ওই যে দক্ষিণে, যেখানে নিচু খাড়াই, আরো পরে জলাশয়, তার ওপারে ভুবনডাঙা গ্রাম। সেই গ্রামে থাকত তখন শুধু ডাকাতদল। অমন সুন্দর নাম, কিন্তু গ্রামের অধিবাসীরা সব ডাকাত। সেই কথাটিই বোঝ তা হলে, নামে কামে অমিল বড়। যেমন তেমন ডাকাত না। তাদের যে সর্দার ছিল, তার হাতে নাকি লাঠি তলোয়ার সমান চালে খেলত। রন-পা চড়ে এক রাতের মধ্যে সে-ই বর্ধমান গিয়ে ডাকাতি করে নাকি ভোররাত্রে ঘরে এসে শুয়ে পড়ত।

তবে সে-ই শেষ না। সেই সর্দার ডাকাতি করে ধরা পড়েনি। ধরা পড়েছিল ধ্যানীর কাছে। যে ধরাতে শান্তিস্তর থেকে আনন্দ বেশী। ঋষিবাক্যে কেবল ডাকাতি ছাড়েনি, সারা জীবনটা তারপরে ভুবনডাঙার ডাকাত সর্দার এই নিকেতনের নানান কাজে থেকেছে। শুধু সর্দার না, ভুবনডাঙার সব ডাকাত ডাকাতি ছেড়ে মাঠে নেমেছিলেন হাল বলদ নিয়ে। ডাকাত তখন কৃষক।

বন্ধু দেখিয়েছিলেন উত্তরায়ণ গৃহ। তার উত্তরে শ্যামলী। উত্তরায়ণের পিছনের বাগানে গাছের ডালে নানান কলাকৌশলের কারুমিতি। যে গাছের কথা ছিল আকাশ-উঁচে হাত বাড়ানোর, সে তার দেহ নিয়ে ডাইনে বাঁয়ে সমান্তরাল। নানা জাতের, নানা গাছে, ডালপালাতে জড়াজড়ি। আম-পেয়ারায় মেশামিশি, তার চেহারা আলাদা, পাতাও যেন অন্যরকম। সে ফলের নাম কি, কে জানে। আমপেয়ারা নাকি! সেখানে ছোট জলাশয়, তাকে ঘিরে বিচিত্র বীথি ও কুঞ্জ। তার পাশে নতুন ভবন, বিচিত্রা। বন্ধুর কথা শুনে বুঝতে পারি, কেবল বিচিত্রা না, রবীন্দ্র বিচিত্রা। মরমীয়ার যত কিছু হাতে ছোঁয়া বস্তু, তাঁর যত কর্ম, যত ঘরে-বাইরের পরিচয়, সব কিছুর মেলা সেথায়। আশা আছে, দেখতে পাব পরে।

বেলা যখন পড়ে যায়, সোনালী চলে যায়, শালের ওপর ছায়ায় আঁধার পড়ে নীল গাঢ়তর হয়, তখন খেয়াল পড়ে, আমরা গুণিজন দর্শনে বেরিয়েছিলাম। সেই গুণি-জন, যাঁরা মরমীয়ার ঠাঁইয়ে থেকে মরমীয়ার ধ্যানের অংশে নিজেদের প্রকাশ করে।

তা দর্শন কম মেলেনি। গায়ক, চিত্রকর, ভাস্কর, শিক্ষক, সাহিত্যিক। যত ঘরে গেলাম, সকল ঘরেই অতিথির ভিড়, আমার বন্ধুর বাড়ির মতই। সব ঘরেতেই মেলা।

সেদিন রাত্রি হয়ে যায় অনেক। মেলা দেখব পরের দিন। রাত পোহালেই পরেই প্রথম যাত্রা ছাতিমতলায়। প্রথম উপাসনা, প্রার্থনা, তারপরে অন্য কিছু।

(ক্রমশ)

আমরা চিত্রকলার আলোচনায় এমন একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে পৌঁচেছি এখন, যেখানে চিত্রোপলব্ধি যোগাযোগ করা ক্রমশ কঠিনতর হয়ে উঠেছে। আসলে বলতে চাইছি, বিশ শতকের চিত্র সম্পূর্ণ বিমূর্ত রূপ ধারণ করায় বহু জনের কাছেই তা সম্পূর্ণ হিজিবিজি বলে ঠেকে, 'অর্থহীন রঙরেখা', 'পাগলামি', 'এরকম তো যে কেউই করতে পারে', এই সব কথা শুনতে পাওয়া যায়। এমন অনেককে দেখেছি যাঁরা হয়তো সাহিত্যে পারদর্শী, এক্সপ্রেশনিস্টদের পূর্ববর্তী পর্যায় পর্যন্ত চিত্রকলার জগৎ যাঁদের কাছে বহু পরিচিত, গানের আসরে বিভোর হয়ে গান শোনেন, সর্বোপরি চোখ মন খোলা, এরকম মানুষকেও একই অভিযোগ আনতে শুনেছি বিশ শতকের চিত্রকলা সম্পর্কে—দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করছেন এগুলো হল ফাজলামো, অর্থহীন প্রলাপ, রঙ এবং কাগজের শ্রাদ্ধ, অক্ষমের চাতুরী। আমি ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ বিমূর্ত শিল্পের পক্ষপাতী বলে আমাকে প্রায়শই নানা আক্রমণ সহ্য করতে হয় এই জাতীয় —হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই খুলে ধরল হয়তো কোনো বন্ধু, ফ্রানৎস আরপ বা ধর্শিয়ান, 'কী মানে এর বোঝাও'। কেউবা মিরোর ছবির দিকে আমার মুখ্যনের অবলোকন করে বলে বসল, 'আমার বাড়ি এস, আমার পুত্রটি এই এইরকম বহু ছবি সারা দেয়াল ভরে এঁকে রেখেছে।' কোনো এক ইংরিজীর অধ্যাপককে সেদিন বলতে শুনেছিলুম, ইলেকট্রনিক মিউজিকের মত অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট আসলে এক ধরনের হুজুগ।

আমি কিন্তু এঁদের অভিযোগ অবহেলা করব না। এমন কি এ কথাও বলব না যাঁরা এ প্রশ্ন তোলেন তাঁদের দ্বারা ছবি বোঝা সম্ভব নয়—এতটাও বলতে প্রস্তুত, এ অভিযোগ প্রণিধানযোগ্য এবং যথাযোগ্য সম্মান সহকারে আমাদের আলোচনা করা উচিত এই আপত্তি। এবং নিজেদের কাছেও বোধ হয় প্রশ্ন করা উচিত, সত্যিই কি বিশ শতকের সমগ্র চিত্রকলার ইতিহাসের পরি-প্রেক্ষিতে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ আসন রয়েছে? আজকের নিবন্ধে কোনো বিশেষ চিত্রকর বিষয়ে আলোচনা না করে কয়েকটি কথা আমি সাধারণভাবে বলতে চাইছি।

সংগীত এবং চিত্র সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় নির্ভর চিত্র মাধ্যম—অর্থাৎ বধির কখনো সংগীতের স্বাদ পাবে না, যেমন পাবে না অন্ধ চিত্র-কলার। কবিতা বা সাহিত্য সব ইন্দ্রিয়গুলিই ব্যবহার করে এবং সর্বোপরি এবং সর্বাপেক্ষা বুদ্ধির ভূমিকা আছে এই মাধ্যমে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বিভিন্ন শিল্প-মাধ্যমের কি প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ভূমি রয়েছে (অর্থাৎ কবিতা যা দিতে পারে, গান তা পারে না; আবার গান যা দেবে, ছবি দেবে সম্পূর্ণ তা থেকে আলাদা উপলব্ধি) নাকি যে কোনো উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি এর যে-কোনো একটি মাধ্যমে সমভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম; অর্থাৎ 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতা সেতারেও বাজানো যেত, তুলিতেও আঁকা সম্ভব সমভাবে। আসলে এই দ্বিতীয় ধারণায় যাঁরা বিশ্বাসী, অর্থাৎ বলতে চান শিল্প-মাধ্যম শুধু আধার মাত্র তার পরিবর্তনে অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির পরিবর্তন হয় না, তাঁদের সবচেয়ে বড় ভুল হল তাঁরা শিল্পকে বস্তু এবং আধারে বড় স্থূলভাবে ভাগ করবার কথা ভাবছেন। শিল্পের বক্তব্য প্রবন্ধের বক্তব্য নয়, শিল্পের বক্তব্য মন্ত্রীর ভাষণ নয়, শিল্প প্রকাশ করে, কিংবা পাঠক বা দর্শকের মনে জন্ম দেয়, অভিজ্ঞতা। শিল্পের অভিজ্ঞতা?—এক অজ্ঞের আনন্দের বা দুঃখের—যে উপলব্ধি প্রকৃতি বা মানুষের পৃথিবীর কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতি প্রকাশে সক্ষম নয়। ধ্রুপদীরা বলতেন এই আবেগ যা সংক্রমণ করেন শিল্পী তার দর্শক বা পাঠকের মধ্যে তা প্রবাহিত হয় শিল্প কর্মটির ফর্মের মধ্য দিয়ে; রোমান্টিকরা বলতেন শিল্পীর ঐশ্বরীক উচ্ছ্বাসই আসল, ফর্ম গৌণ। আসলে দু'

মনেরই ছোটো একটা ভুল রয়েছে দৃষ্টি-ভঙ্গিতে—শিল্পকর্ম ফর্ম এবং বিষয়ের মিলনে একটি সম্পূর্ণ মৌলিক পদার্থ, একবার এই মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি হলে কোনো মতেই আর তাকে পৃথক করা সম্ভব নয়।—অতএব ফর্ম এবং বিষয়, এই আলোচনা অর্থহীন।

যদি আমরা আরম্ভ করি এই ধারণা নিয়ে যে, ফর্ম এবং বিষয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, দুয়ের মিলনে এক, এবং এক হয়ে গেলে আর দুই হবে না, তাহলে অত্যন্ত গাণিতিক-ভাবে প্রমাণ করা যায় যে কবিতা, সংগীত এবং চিত্রকলার আসলে সম্পূর্ণ পৃথক-পৃথক সত্তা রয়েছে। যদি কবিতাকে আমরা ফর্ম ১ বলি, চিত্রকলাকে ফর্ম ২ এবং সংগীত ফর্ম ৩, তাহলে দেখা যাবে ফর্ম ১ বিষয়বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করল তা ফর্ম ২ এবং বিষয়-বস্তুর পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, যেমন এই দুই-ই পৃথক ফর্ম ৩ এবং বিষয়বস্তুর মৌলিক সত্তা থেকে।

উপরোক্ত তিনটি মৌলিক সত্তা—এই তিন শিল্প মাধ্যম, পরস্পরের থেকে যেহেতু সম্পূর্ণ পৃথক, এদের প্রভাব, বিচরণভূমি এবং দর্শক এবং পাঠকের মনে উপলব্ধি পুরোপুরি ভিন্ন। অতএব একটি কবিতা কখনো ছবি হতে পারে না, একটি ছবি পারে না সংগীত হতে, সংগীত পারে না কবিতা বা ছবির আবেগকে প্রকাশ করতে। সুতরাং একটি ছবির দিকে যখন তাকাব তখন সাহিত্য বা সংগীত আমাদের সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে।

যদি আমরা এই কথা মেনে নিই তাহলে কী ঘটছে তলিয়ে ভাবা যাক। আমার সামনে একটি ক্যানভাস যেই মুহূর্তে রাখা হল আমি চিত্রটি দেখলুম, গান বাজলে যেমন সম্পূর্ণ শিল্প উপলব্ধি আমরা কর্ণ ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করি তেমনি চোখ দিয়ে ক্যানভাসের দৃশ্য অভিজ্ঞতা পুরোপুরি আমি শুষে নিলুম। এর ফলে আমার ভেতরে যে আবেগ সঞ্চার হল তাই এই ক্যানভাস।—কিন্তু যদি চোখের ওপর নির্ভর না-করে আমি সাহিত্যিক দিক থেকে বুদ্ধি দিয়ে কবিতার মনে মনে ছবিটিকে অনুবাদ করবার চেষ্টা করি, তারপর ছবি ভুলে সেই মনের মধ্যে রচিত ভাষায় অনূদিত কবিতাটিকে বিশ্লেষণ করে ছবিটিতে ফিরে এসে বলি চিত্রটির অর্থ এই, তাহলে এক প্রচণ্ড ভুল করব। যখন আমরা বিলায়েত খাঁর সেতার শুনি তখন কি আমরা ভাবি সাহিত্যপাঠের কায়দা অনুসরণ করে, এই শব্দে উনি কী বললেন, ওই অন্তরার সিম্বল কী, এই সব?—তাহলে কেন ছবির ব্যাপারেই শুধু আমরা দৃশ্য অভিজ্ঞতা গৌণ রেখে সাহিত্যিক ব্যাখ্যাটিতে তা বিচার করব?

ছবির বিষয়ে যাঁরা বলেন বুঝতে পারছি না তাঁরা আসলে ভাবেন ছবি চোখ দিয়ে দেখার নয়, অভিধান দিয়ে পড়ার—এবং বিশ শতকের ছবি যেহেতু সম্পূর্ণভাবে ক্রমশ ভুলে যাচ্ছে তার সাহিত্যের অংশ, তাই সবার কাছে তা হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ অর্থহীন, হিজিবিজি। চিত্র আসলে দৃশ্য অভিজ্ঞতা, যেমন গান শ্রবণযোগ্য—অতএব দেখতে কেমন আমাকে সেটাই জানান।

সুশীল বসু

মহাবিশ্বের বয়স কত

মহাবিশ্ব আজও আমাদের কাছে এক মহারহস্য হয়ে আছে। তার সম্পর্কে এখনো কতটুকুই বা আমরা জানি? আমরা আজও জানি না, মহাবিশ্বের কোন আরম্ভ-কাল ছিল কিনা। যদি থেকে থাকে তো কবে, তাও আমরা জানি না। অতীতে কোন একসময়ে কি তার সৃষ্টি হয়েছিল, নাকি সে বরাবরই আমরা যেমন দেখছি তেমনি আকারে রয়েছে? এই প্রশ্নের অবশ্য আংশিক জবাব আমরা পাচ্ছি। আজ আমরা জানি যে, মহাবিশ্বের চেহারা বিবর্তনের পথে অনেক পাল্টে গিয়েছে, যাচ্ছে ও যাবে। কিন্তু সেই বিবর্তনের শেষ কোথায়, তাও আমরা বলতে পারি না।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, বড় বড় দূরবীন নির্মাণই জ্যোতির্বিজ্ঞানে অগ্রগতির একমাত্র পথ। মার্কিন জ্যোতির্বেত্তা জর্জ এলারী হেলের সেইরকম ধারণা ছিল। শিকাগো শহরের কাছে ইয়েকস্ মানমন্দিরে তিনি একটি ৪০ ইঞ্চ দূরবীন বসিয়ে কাজ শুরু করেন। তারপর ১৯০৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসনে তিনি একটি ৬০ ইঞ্চ প্রতিফলক বসান। ক্রমে ১৯১৯ সালে সেখানে একটি ১০০ ইঞ্চ প্রতিফলক এবং যুদ্ধের পরে ১৯৪৯ সালে পালোমার নামে ২০০ ইঞ্চ প্রতিফলকের এক বিশাল দূরবীন বসানো হয়। এইসব দূরবীন মহাবিশ্বকে চিনতে জানতে বড় কম সাহায্য করেনি।

সুপ্রাচীন কালে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, সূর্যই মহাবিশ্বের কেন্দ্র। পরে সেই ধারণার বিরুদ্ধে দাঁড়ান গ্যালিলিও প্রমুখ মনীষীরা। কিন্তু শক্তিশালী দূরবীন ছাড়া তাঁদের বক্তব্য প্রমাণ করার কোন উপায় ছিল না। ১৯১৫ সালে জ্যোতির্বেত্তা হার্লো শেপলী মাউন্ট উইলসনের ৬০ ইঞ্চ দূরবীনের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, সূর্য মহাবিশ্বের মধ্যমণি নয়। তিনি দেখান যে, গ্রহ উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ ও ধূমকেতুগুলি নিয়ে এই যে আমাদের সূর্য—এ হচ্ছে ঘূর্ণায়মান আবর্তনশীল ছায়াপথের বহু কোটি তারার মধ্যে একটি তারা মাত্র। ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে সূর্যের দূরত্ব ৩০ হাজার আলোক-বর্ষ।

কিন্তু তা হলে ছায়াপথই কি মহাবিশ্বের কেন্দ্র এবং তার বাইরে কি আর কিছু আছে?

১৯২৪ সালের বহু আগে থেকেই জ্যোতির্বেত্তারা নীহারিকার অস্তিত্বের কথা জানতেন, সেগুলির চেহারা [illegible]। অনেকের ধারণা ছিল যে, সেগুলির অবস্থিতি ছায়াপথের বাইরে। অন্যেরা মনে করতেন যে, সেগুলি ছায়াপথের ভিতরেই বাষ্পমেঘপুঞ্জ। কিন্তু ১৯২৪ সালের আগে প্রশ্নটির নিশ্চিত সমাধান করার কোন উপায় ছিল না।

১৯২৪ সালে মাউন্ট উইলসনের ১০০ ইঞ্চ প্রতিফলকটি ব্যবহার করে জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হুবল দেখতে পান যে, অ্যান্ড্রোমেদা নীহারিকার অবস্থিতি আমাদের ছায়াপথ থেকে বহু দূরে। পরে দেখা যায় যে, অন্য নীহারিকাগুলির ক্ষেত্রেও একই

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও দূরবীন
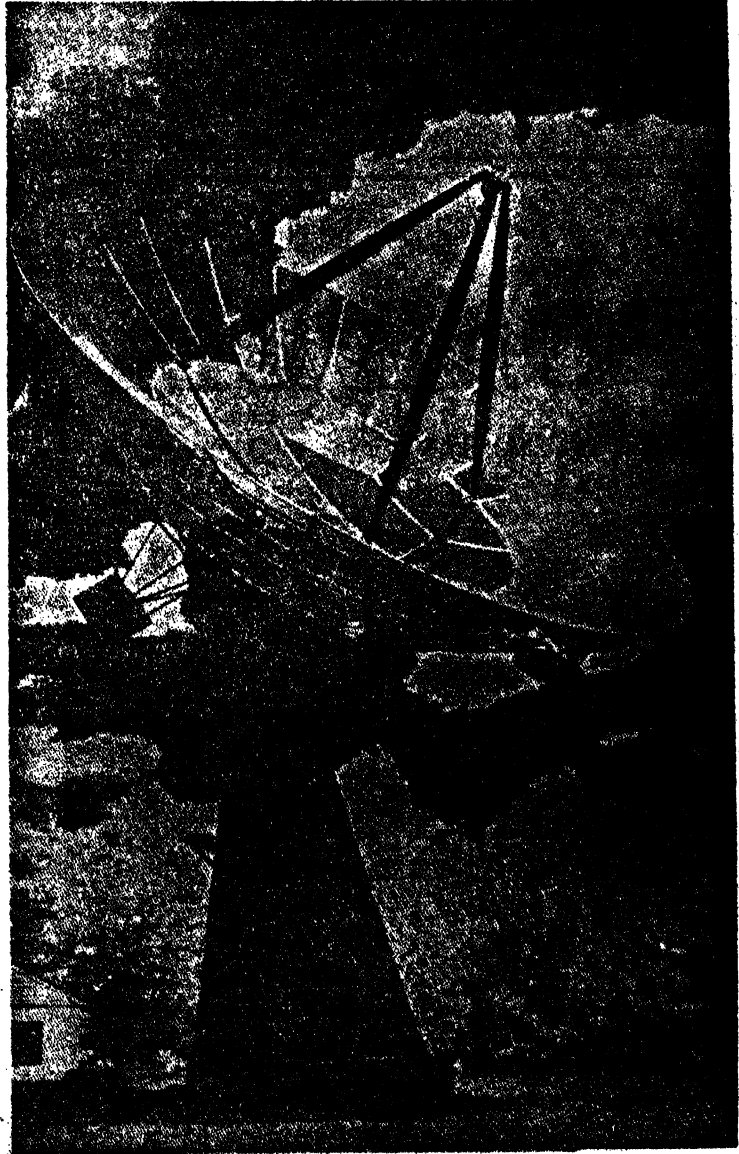
কথা প্রয়োজন। পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নীহারিকাগুলি অসংখ্য নক্ষত্রের এক একটি সমষ্টি এবং সেগুলি নিয়েই মহাবিশ্ব গঠিত। এইভাবেই ৭০০ বছরের গবেষণাকে হুবল্ সাফল্যমণ্ডিত করেন।

কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী বিস্ময়কর এক সত্য হুবল্ আবিষ্কার করেন ১৯২৯ সালে। সেটি হচ্ছে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ অর্থাৎ নীহারিকাগুলি প্রচণ্ড বেগে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এমন এক ধরনের গতিতে, যা দেখে মনে হয় যে, অতীতে কোন একসময়ে সমস্ত পদার্থ এক জায়গাতেই ছিল। সেই গতিবেগ অবশ্য প্রথম পরিমাপ করেছিলেন ভেস্তো মেলভিন শ্লিফার ১৯১২ সালে আরিজোনার লোয়েল মানমন্দিরের স্পেকট্রোগ্রাফে।

যে-কোন নীহারিকা বা ছায়াপথের বর্ণচ্ছত্র ল্যাবরেটরীতে ধরা যেতে পারে। সেই বর্ণচ্ছত্রে গাঢ় নীল থেকে সবুজ, হলদে, লাল ও গাঢ় লাল রং পর পর সাজানো থাকে। কোন নক্ষত্রপুঞ্জ বা নীহারিকা যদি আমাদের ছায়াপথ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তা হলে ল্যাবরেটরীতে দেখা যাবে যে, ঐসব রঙের ব্যাণ্ডগুলি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে লালের দিকে যাচ্ছে। আর যদি সেই নীহারিকা দূরে সরে না গিয়ে ছায়াপথের কাছে আসতে থাকে তা হলে সেগুলি নীলের দিকে যায়। শ্লিফার দেখান যে, সমস্ত নীহারিকার ক্ষেত্রেই রংগুলি লালের দিকে যাচ্ছে এবং হুবল্ দেখেন যে, সেই লালের দিকে সরাটা নীহারিকার দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। হাইড্রা নক্ষত্রপুঞ্জের ক্ষেত্রে তিনি দেখেন যে, তার অপসারণ বেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে ৬০ হাজার কিলোমিটার। বর্ণচ্ছত্রের রংগুলির লালের দিকে যাওয়ার বেগ এ ক্ষেত্রে আলোকের বেগের ১০ ভাগের ২ ভাগ। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এই অপসারণের গতিবেগ থেকেই হয়ত একদিন জানা যাবে, সমস্ত পদার্থ কবে এক জায়গায় ছিল।

বেলজিয়ান ধর্মযাজক-বৈজ্ঞানিক অ্যাবে লেমেটার ১৯২৮ সালে এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলেই মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ আরম্ভ হয়। তিনি হুবলের আগেই এই সম্প্রসারণের কথা বলেছিলেন। যাই হোক, এই ধারণা যদি সত্য হয় তা হলে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে, সেই বিস্ফোরণ ঘটেছিল ১০ শত কোটি বছরের মত আগে। এই তত্ত্বটি "বিশাল বিস্ফোরণ তত্ত্ব" নামে পরিচিত।

আর একটি তত্ত্ব আছে, যা বিস্ফোরণ তত্ত্বের ঠিক বিপরীত। তাকে বলা হয় "স্থির অবস্থা তত্ত্ব"। এই তত্ত্ব অনুসারে মহাবিশ্বের আরম্ভের কোন সময় নেই, অনাদি অনন্তকাল ধরে সে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে এবং নীহারিকাগুলির অপসরণের ফলে যে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে আপনা থেকেই নতুন বস্তুর উদ্ভব হচ্ছে।

১৯৫৭ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আকাশে রেডিও নিঃসরণের কতকগুলি উৎসের সন্ধান পান। রেডিও দূরবীনের সাহায্যে সেগুলিকে আজকাল চিনতে জানতে পারা যায়। সেগুলির মধ্যে কতকগুলি হচ্ছে বহু দূরে অবস্থিত নীহারিকা বা নক্ষত্রপুঞ্জ, অন্যগুলিকে বলা হয় 'কোয়াসার' (কোয়াসি-স্টেলার সোর্সেস)। ১৯৬০ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা রেডিও উৎসগুলিতে নক্ষত্র ধরনের কতকগুলি প্রতিকৃতি দেখেন। সেগুলিকে প্রথমে নক্ষত্রই ভাবা হয়েছিল এবং মনে করা গিয়েছিল যে, সেগুলি ছায়াপথের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, সেগুলির বর্ণচ্ছত্রে অন্য রংগুলি লাল রঙের দিকে যাচ্ছে। তখন বোঝা গেল যে, সেগুলি নিশ্চয়ই ছায়াপথের বাইরে। শুধু তাই নয়, সেগুলি থেকে নিঃসৃত আলো ও রেডিও শব্দ উজ্জ্বলতম নক্ষত্রপুঞ্জের চেয়েও ১০ থেকে ১০০ গুণ বেশী শক্তিশালী। সেগুলিই হচ্ছে কোয়াসার। হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে, সেগুলির বয়স ৮০০ কোটি থেকে আরো বহু কোটি বছর বেশী। সেইভাবে ছায়াপথের প্রাচীনতম নক্ষত্রগুলির বয়সও মোটামুটি হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে, সেই বয়স ৯০০ থেকে ১০০০ কোটি বছর হবে।

ভূত্বকে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি যেসব আদিম তেজস্ক্রিয় ধাতু আছে সেগুলিরও বয়স হবে ৭০০ থেকে ১২০০ কোটি বছর।

বিশাল বিস্ফোরণ তত্ত্ব, স্থির অবস্থা তত্ত্ব এবং আদিম তেজস্ক্রিয় ধাতু, এই তিনটি মানদণ্ডের বিচারে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে, কোন একটি ঘটনা থেকেই মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়েছিল হাজার কোটি বছর আগে।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

তের
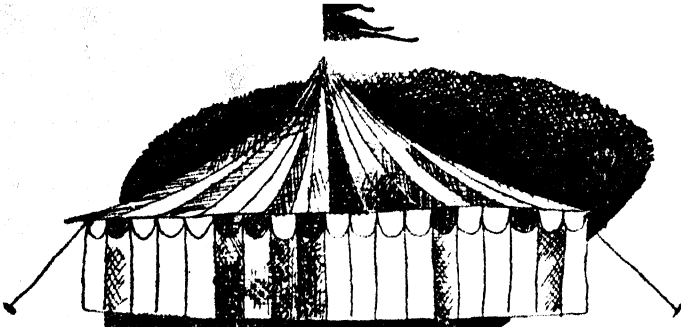
এতদিন খণ্ড খণ্ড ধোঁয়াটে মেঘের মতন এক-একটি তাঁবু আচ্ছন্ন করে রেখেছিল খিদিরপুর অঞ্চলের একটা বৃহৎ ভূমিকে, এখন সব পরিষ্কার। চারপাশ অবারিত। স্পষ্ট, ধু ধু। শুধু আহ্লাদী রোদ আপন-মনে খেলছে।

কিন্তু এখনো একটি তাঁবু থেকে গেছে। তা গুটিয়ে নেওয়া হবে ,আরও পরে। সব শেষে ট্রাকে চড়ে নতুন ক্যাম্পে যাবে এক ভদ্র পরিবার—রাধানাথবাবু আর তার দুই মেয়ে হাসি, যমুনা।

আরও একটি মানুষ আছে এখানে। ব্যাণ্ডের আর সব লোক, হীরু, শ্যামল, মণিবাবু চলে গেছে অনেক আগে, মোহন-লাল যায়নি। সে যাবে রাধানাথবাবুর সঙ্গে একই ট্রাকে। প্রত্যেকবার এক ক্যাম্প থেকে আর এক ক্যাম্পে যাবার সময় এমন করেই পুরনো জায়গায় শেষ অবধি পড়ে থাকে মোহনলাল।

কলের জল পড়ে যাচ্ছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে উপরে উঠছে বালতি। এখনো স্নান করছে হাসি, ঘটি ঘটি জল মাথায় ঢালছে। বালতি ভাঙা, পুরনো—একদিকে কাত হয়ে আছে। নিচু হয়ে জল তুলে নেওয়ার সময় হাসির ভিজে শাড়ি অনেকটা সরে যাচ্ছে। সে এখন অসাবধান, এ সব তার খেয়াল নেই।

হাসির দেহের অনাবৃত অংশ দেখতে দেখতে কিছু দূরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক-বার ধৈর্য থাকল না মোহনলালের। এদিকটা ছায়া-ছায়া পিঁপড়ের গর্ত আছে কোথাও। তার পায়ে পিনের মতন পিঁপড়ে খোঁচা মারছিল। এক পা দিয়ে সে চেপে চেপে আর এক পা ঘষছিল।

হাসির দেহ কলের জলে ভিজছে, নরম রোদে ঝকমক করছে। বড় অদ্ভুত। সময় না নিয়ে হঠাৎ বেশী করে ফুটে ওঠার মতন। এক-একবার সে-ও মোহনলালের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। তার চুল থেকে ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে।

নির্জন পরিত্যক্ত একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে জুয়েল সার্কাসের গীটার বাদক মোহনলাল বুভুক্ষু একটা মানুষের মতন হাসির বুক দেখল, সম্মুখ ও পিছন দেখল, পাহাড়ী প্রস্রবণের মতন জলের শব্দও শুনল এবং পিঁপড়ের কামড়ে অস্থির হয়ে আঙুল তুলে ইশারায় হাসিকে বলল, "যাব ওখানে ?"

মুখে জল ভরে কয়েক মুহূর্ত গাল ফুলিয়ে রাখল হাসি, কিছু পরে সে গাছের দিকে তাকিয়ে পিচকিরির মতন মুখের জল নিঃশেষ করল এবং আরও পরে আঙুল খেলাতে খেলাতে সে-ও বলল, "কেন ?"

মোহনলাল প্রথমে বুকে হাত রাখল, পরে তা শূন্যে মেলে দিয়ে হাসল, "যাচ্ছি—" সে এগিয়ে যেতে লাগল জলের কলের দিকে থেমে-থেমে, তার পায়ে এখনো যে পিঁপড়ে সেঁটেছিল তা ঘষতে ঘষতে।

শাড়ি নিঙড়ে-নিঙড়ে জল ঝরাচ্ছিল হাসি। তার দেহ অল্প বেঁকেছে, বাঁ দিকে হেলে আছে বৃন্তের পরে ছোট একটা গাছের মতন। মোহনলালকে এ সময় তার দিকে

এগিয়ে আসতে দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে মুখের ওপর থেকে ভিজে চুল সরিয়ে দিল হাসি, "এখানে না, দূরে! তাঁবুতে যেতে পারেন না?"

মোহনলালের পা জ্বলছিল, রবারের চটির ওপর থেকে পা তুলে নিয়ে সে মুখ নিচু করে বলল, "তাঁবুতে যমুনা আছে না, রাধানাথবাবু আছে না?"

"তো কী হয়েছে?" চুলে গামছার আছাড় মারছিল হাসি, মোহনলালের মুখেও জল ছিটকে যাচ্ছিল। থেকে থেকে সে চোখ বন্ধ করছিল। তাকে দেখে একটা কৌতুক অনুভব করতে করতে হাসি বলল, "তারা কি বাঘ? কামড় দেবে আপনাকে?"

মোহনলাল হেসে বলল, "দিতে পারে, কে জানে!"

"না-না, দূর! দিদি খুব ভক্তি করে আপনাকে। বাবাও আপনার কথা কত বলে!"

"কী বলে?"

"দিদি বলে, খাঁটি মানুষ। বাবা বলে, অনেক গুণ আছে আপনার—"

"কী গুণ?"

"বা রে, আমি তা কেমন করে জানব?" সাবানের ছোট লাল একটা বাক্স মাটিতে পড়েছিল, তা-ও জলে ভিজেছে। সেদিকে তাকিয়ে হাসি বলল, "আপনি বাজনা-টাজনা বাজান তো, সেসব ভেবেই বাবা হয়তো বলে—"

হাসির লাল সাবানের বাক্স তুলে নিল মোহনলাল, নাকের কাছে নিয়ে এল। বাক্সর মধ্যে অল্প জল ছিল, সাবান চেপে ধরে সে তা ফেলতে ফেলতে বলল, "বাজনা শোনে কে? বাঘ সিংহ হাতি ভাল্লুক? হুঃ—" বিরক্তির ছোট একটা শব্দ উচ্চারণ করে মোহনলাল বলল, "আর ভাল লাগে না!"

"তবে কেন পড়ে আছেন সার্কাসে?"

"জান না?"

ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছিল হাসির, সে চলে যেতেও পারছিল না। মোহনলালের শিরশিরে ঠান্ডা হাওয়ার মতন তার গায়ে শিরশির করে উঠল। কিছু দূরে তাঁবু। হাসি এখন সেদিকেও তাকাতে পারল না।

মোহনলাল আবার বলল, "তোমার জন্যেই তো পড়ে আছি এখানে। নইলে আর থাকব নাকি?"

"যাঃ!"

"সত্যি বলছি হাসি, তোমার কথা ভেবেই নড়তে পারি না—" হাসির সাবানের গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে মোহনলাল বলল, "কে বুঝবে আমার কদর এখানে? আমি রেডিওতে বাজাব, থিয়েটার-সিনেমায় বাজাব—" একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে কথা বলে যেতে লাগল সে, "নাম হবে, পয়সা হবে—সব হবে—"

হাসির ভিজে দেহের ওপর মোহনলালের ছায়া পড়েছিল, কয়েক পা সরে গেল হাসি—রোদে দাঁড়িয়ে বলল, "কত পয়সা হবে—অনেক?"

মোহনলাল নিচু হয়ে পা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "এখানে যা পাই তার চেয়ে বেশী পয়সা তো পাব। তোমার জন্যেই কিছু করতে পারি না—"

হাসি মোহনলালের হাত থেকে আস্তে সাবানের বাক্স টেনে নিল, তা বন্ধ করতে করতে বলল, "আমি কী করব।"

"আমার সাথে বিয়ে হবে তোমার, তারপর এখান থেকে পালাব—তুমি আমার মায়ের কাছে থাকবে।"

হাসি তার ভিজে বুকে গামছা জড়াতে জড়াতে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তার আরও কাছে সরে এসেছিল মোহনলাল, আবার তার ছায়া পড়েছিল। হাসির বুক কমকন করছিল, কাশি আসছিল।

সে বলল, "পাকা বাড়ি তো আপনাদের, না?"

"হ্যাঁ, কাছেই—কোন্নগরে।"

"সেখানে কে আছে, মা-বাপ?"

"বাবা নেই," কথা বলতে বলতে মোহনলাল এক-একবার হাসির ভিজে শাড়ি স্পর্শ করছিল, এখন তার বুকের ওপর থেকে পলকে গামছা তুলে নিয়ে নিজের গালে-মুখে ঘষল, "বাবা মরেছে আমার ছোট বয়সে। দাদা আছে, তার বউও আছে—"

"আপনার দাদাও বাজনা বাজায়?"

"না, পাঠশালায় পড়ায়—মাস্টার। তারা জানে না আমি সার্কাসে ঢুকেছি, জানতে পারলে—"

"কী হবে?" হাসির মুখ নিভে এল, যে গামছা তার কাছ থেকে নিয়েছিল মোহনলাল, সে তা আবার টেনে নিয়ে বুক ঢাকল।

"হবে আবার কী, শুধু অবাক হয়ে যাবে—" মোহনলালের সিগ্রেটে পোড়া কালো কালো ঠোঁটে শুকনো হাসি ফুটে

উঠল, "আপনার মতন ভালোর মনে একেবারে রাজপ্রাসাদে থাকবে, নিজের থাকা খাওয়ার খরচ নিজেই চালিয়ে দেব—"

"তা তো চালিয়ে নিচ্ছেন।"

"দূর, এমন করে বেশীদিন চলে না, আমার এসব অভ্যেস নেই" বৌদিকে এখনো রিং-এর জমি স্তূপের মতন হয়ে ছিল সেদিকে তাকিয়ে মোহনলাল ঠান্ডা গলায় বলল, "এখানে থেকে কিছু যে চেষ্টা করব তা-ও হয় না—"

"কেন?"

"একটু খোসামুদী করতে হবে, ধরাধরি করা দরকার—কখন করব? ঠিকানা কোথাকার দেব? চিঠি-চাপটা যে লিখব মানুষকে তার জবাব তারা দেবে কোথায়!"

"আপনার বাড়ির ঠিকানা দেবেন—"

"আরে না না", মোহনলাল অপ্রস্তুতের মতন বলল, "বাড়ি-টাড়ি আমি তো যাই না এখন, একেবারে বউ নিয়ে যাব—" সে এখনই হাসিকে সতর্ক করবার জন্যে রাধানাথবাবুর তাঁবুর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আস্তে বলল, "সার্কাসের কথাটা আমার মা দাদা-বউদিকে বল না হাসি, চেপে যেও—আমি যেমন বলব, ওরা কিছু জিজ্ঞেস করলে তুমিও তেমন বলবে।"

সার্কাস করার মধ্যে যে কোন গৌরব নেই, এ জীবন মানুষ বেছে নেয় নিরুপায় হয়েই, হাসি তা জানে। পাকা বাড়ি বিক্রি করে রাধানাথবাবু তাদের তাঁবুর নিচে নিয়ে এসেছে বলে যমুনা তাকে বাপের সম্মান করতে পারে না— গাল দেয়, তুচ্ছ করে। তবে এখানে খারাপ লাগে না হাসির, রাধানাথবাবুকেও তার ভাল লাগে। কিন্তু এসব কথা যমুনাকে বলতে তার সাহস হয় না।

মোহনলাল কেন তার মা-দাদার কাছে সার্কাসের কথা লুকিয়ে যেতে চায় হাসি তা বুঝল এবং কিছু পরে বলল, "জানেন, উলুবেড়েতে আমাদেরও পাকা বাড়ি ছিল—"

"জানি, এখানে তোমাদের থাকতে খুব কষ্ট হয় তা-ও বুঝি—"

মোহনলাল হাসির পায়ে বুড়ো আঙুলের খোঁচা মেরে বলল, "আমি তোমাকে পাকা

বাড়িতে নিয়ে তুলব ঠিক, টালিগঞ্জের ক্যাম্পে সব ব্যবস্থা করে ফেলি? আর নয় তো চল না রাতের বেলা পালিয়ে যাই, পথে সিঁদুর কিনে বিয়ে সাধি হবে এখন—"

"নয়, আমি ওসব পারব না, আমার ভয় লাগে—" মোহনলালের মুখের দিকে হাসি দেখল না, সাবানের ছোট লাল বাক্স জোরে চেপে ধরে মৃদু ভর্ৎসনার মতন বলল, "এ সব কথা বলবেন না।"

মোহনলাল হেসে উঠল, "আরে না না, মিছিমিছি বলছিলাম—" হাসিকে আশ্বাস দেওয়ার জন্যে অবজ্ঞার একটা কঠিন ভঙ্গি করে সে বলল, "আমি কি সার্কাসের লোক যে মেয়েমানুষ নিয়ে রাতের বেলা ভেগে পড়ব!" একটু থামল মোহনলাল, হাসির ভিজে শাড়ি টানল এবং কিছু অধীরতা প্রকাশ করে আরও বলল, "তোমার মত থাকলে রাধানাথবাবুকে বলব, ভদ্রলোকে বলব—এখানেই বিয়ে হবে, হইচই হবে। ব্যস, তারপর সোজা চলে যাব কোন্নগরে। পাকা বাড়ি, পাকা ঘর—তুমি বউ আমি বর—" মোহনলালের গলায় সুর খেলছিল, সে কথা বলল গানের মতন।

"যাঃ, অসভ্য", হাসি সাবানের বাক্সর লাল রং দেখল কিছু সময়, তার ওপর আঙুল ঘষতে ঘষতে নিচু গলায় বলল, "বাবা মত দেবে না—"

মোহনলালের গলা থেকে চমকের মতন একটা ছোট শব্দ উঠল, "কেন?"

"রাজি হবে না, দেখবেন—" স্নানের পরেই হাসির খাওয়ার অভ্যাস, এখন তার খুব খিদে পাচ্ছিল। ভিজে শাড়ি গায়ে সপসপ করছে, তা ছেড়ে ফেলার জন্যে সে অস্থির হচ্ছিল। চলে যাচ্ছিল হাসি।

"যাও কেন?" হাসির ম্লান মুখ, তার করুণ কথা বিমূঢ় করে দিয়েছিল মোহনলালকে। এখনো কলের জল পড়ে যাচ্ছে, মোহনলালের ধুতিতে কাদার ছোট ছোট দাগ, তার এক পাটি চটিও জলের ঝাপটায় কিছু ভিজেছে।

সে বলল, "কিছু আগে বললে না যে রাধানাথবাবু আমার গুণের কথা বলে?"

"বলে তো।"

"তবে তার মত হবে না কেন?"

রাধানাথবাবু কেন খুশী হবে না, হাসির বিয়ে সমর্থন করবে না তার কারণ হাসি এখন মোহনলালকে বলতে পারল না। তার ভিজে পায়ে কিছু শুকনো ঘাস লেগেছিল, কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ঘষে ঘষে তা পরিষ্কার করে সে বলল, "পাকা বাড়িতে থাকা আমার কপালে নেই, তাঁবু ছেড়ে যাওয়া-টাওয়া আমার চলবে না, মোহনবাবু—বুঝলেন!"

"চিরকাল তোমার সার্কাসে থাকার ইচ্ছে?" মোহনলাল ঈষৎ বিরক্ত হয়ে হাসিকে খোঁচা মেরে কথা বলল, "এখানে খুব মজা, না? এক রাতে কেউ যখন জোর করে তাঁবুতে টেনে নিয়ে গিয়ে ফুর্তি করবে—তখন?"

হাসি মোহনলালের কথা শুনে থামল। তার বুকের ওপর থেকে গামছা পড়ে গিয়েছিল, পা দিয়ে তা তুলে নিয়ে চেপে চেপে সে বলল, "আপনার খালি ঐ এক কথা, মন্দ দিকটাই দেখেন মানুষের। কিন্তু আমার বাপ আছে না, তার কথা ভাবেন কিছু? ফুর্তি করার ইচ্ছা তো আপনারই দেখি বেশী—"

"রাধানাথবাবুর কথা আমি কী ভাবব, ছাই!"

হাসি ইতস্তত না করে মোহনলালের কথার ওপর বলল, "বাবাকে ফেলতে পারি না। আমি আপনার সাথে পাকা বাড়িতে চলে গেলে মানুষটা যাবে কোথায়—" একটা শর্ত জুড়ে দেওয়ার মতন হাসি বলে ফেলল, "আমি যেখানে থাকব, আমার বাপও সেখানে থাকবে!"

কথা বলেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল হাসি। যদিও সে জানত এখন চুপ থাকবে মোহনলাল, বিয়ের কথা হঠাৎ আর তুলতে পারবে না। তা হলেও পা চলছিল না হাসির—মোহনলালের কথা শোনবার জন্যে সে উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

রোদ এখন আরও প্রখর। সূর্য ঠিক মোহনলালের মাথার ওপরে ছিল। চোখ কট কট করছিল তার। চারপাশ আঁধার—আঁধার। হাসির শর্তের মতন কথা তাকে বোবার মতন করে রাখল।

কিছু আগে স্নানরতা হাসিকে দেখতে দেখতে যে বাসনা মোহনলালের মনের মধ্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল এবং এই রুক্ষ কঠোর স্থান থেকে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ভিন্ন আর এক জগতে তা হঠাৎ ভাবনা-চিন্তার ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ল। এবং অনেক সময় কথা এল না গীটার বাদক মোহনলালের মুখে।

যদিও হাসির শর্ত খুব কঠিন মনে হল না মোহনলালের—মাথায় ঘটি-ঘটি জল ঢেলে স্নান করার মতনই তা সহজ। কোন্নগরের পাকা বাড়িতে হাসির সঙ্গে রাধানাথবাবুকেও টেনে তোলবার একটা অস্ফুট ইচ্ছা মোহনলালের মনে জোনাকির মতন সবুজ আলোর ফুলকি কাটতে থাকল।

কিন্তু পাকা বাড়ির সামান্য অংশও মোহনলালের নামে এখন আর নেই। গোটা বাড়িটাই তার দাদার। আর কোথাও যাবার জায়গা নেই বলেই দাদা-বউদির সংসারে পড়ে আছে। এখনো আশা আছে তার, মোহনলাল শেষ বয়সে তাকে দেখবে—তার বউ এসে যত্ন করবে।

কিন্তু মার কাছে ফিরে যাবার কথা এখনো মোহনলালের মনে আসে না। টাকা-পয়সা তার কিছু হয় নি এখনো। নামও হয়নি। মাসে তিরিশ টাকা হিসেবে রোজ তার পাওনা এক টাকা করে—বিড়ি-সিগ্রেট, চা সিঙাড়া খেতেই তা খরচ হয়ে যায়।

ইস্কুলে বেশীদিন থাকতে পারে নি মোহনলাল, লেখাপড়ায় তার মনও ছিল না। সিনেমা-থিয়েটারে অভিনয় করবার ঝোঁক ছিল প্রথম প্রথম, গানবাজনার শখ ছিল। মার জন্যেই কোন্নগরের বাড়ি ছেড়ে সে চলে যেতে পারেনি, মা না থাকলে কবে সেখান থেকে পালিয়ে যেত।

পরে কিছুই হল না। বড় অভাব, হাতে একটাও পয়সা থাকে না মোহনলালের। দাদা চুপচাপ থাকলেও বউদি কড়া কথা শোনায়—একটা জোয়ান মানুষ দাদার সংসারে বসে বসে কেমন করে দিনের পর দিন খেয়ে যায়—আশ্চর্য।

"তোকে কেউ কথা শোনালে আমার বুক জ্বলে যে মোহন—বুঝিস না?"

একদিন খুব করুণ করে মোহনলালের মা বলেছিল, "একটা কাজ-টাজ খুঁজে নে না বাবা, আমার কথা শোন—"

"কাজ কোথায় পাব", মার শুকনো মুখ দেখতে দেখতে বুকের মধ্যে একটা জ্বালা অনুভব করেছিল মোহনলাল, "কিছু টাকা পেলে একবার চেষ্টা করে দেখতাম।"

"কী করবি? কত টাকা? বল না?"

আগে, কোন্নগরেই এক শিক্ষকের বাড়িতে লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে কিছুদিন গীটার বাজাতে শিখেছিল মোহনলাল। খুব ভাল তার হাত। মাস্টার বলেছিল, সে নাম করবে—একটা গীটার কিনে তাকে আরও বেশী সময় বাজাবার কথাও বলেছিল।

মোহনলাল গীটার কিনতে পারে নি, তার টাকা ছিল না। যে দু গাছা চুড়ি মা তার বউ-এর জন্যে যত্ন করে তুলে রেখেছিল মোহনলালের ইচ্ছার কথা শুনে তা বের করে দিয়েছিল তাকে, "এই নে মোহন, এগুলো বেচে দে। বাজনা একটা কিনে নে—বায়স্কোপ-থিয়েটার যা হয় কিছু করে দুটো পয়সা উপায় কর—"

"মা, আমি কাল কলকাতায় যাব, সেখানে মেসে-টেসে থাকব কিছুদিন। তারপর ফিলিমে বাজাব—" সেদিন তার মাকে আন্তরিক আশ্বাস দিতে পেরেছিল মোহনলাল, "ফিলিমওলাদের কত টাকা! তাদের নজরে পড়লে, বুঝলে মা, ভাবনা থাকবে না কোন। মাসে মাসে এত্ত টাকা পাঠাব তোমাকে—"

দাদা-বউদিকে নিজে কিছু বলেনি মোহনলাল, তার মা বলেছিল, "মোহন বায়স্কোপ করতে কলকাতায় গেছে। মাস্টার বলেছে, খুব নাম-ডাক হবে তার—টাকা-পয়সা হবে।"

চুড়ি বিক্রি করে অল্প যা টাকা পেয়েছিল মোহনলাল, কলকাতার মেসের খরচ দিতে দিতে খুব কম সময়ের মধ্যেই তা শেষ হয়ে গেল। গীটার কেনবার কথা সে তখন আর ভাবল না, কেমন করে নিজের খরচ চালাবে সারাদিন সে কথা ভেবে ভেবেই অস্থির হল।

ব্যাণ্ডের দলের হীরু তাকে নিয়ে এসেছে জুয়েল সার্কাসে—বাঁচিয়ে দিয়েছে। হীরুর এক আত্মীয় থাকত মোহনলালের মেসে, সে-ই যোগাযোগ করে দিয়েছিল। এখন যে ইলেকট্রিক গীটারে মোহনলালের আঙুল চলে তা নিজের নয়, জুয়েল সার্কাসের।

হীরুর সংগে সার্কাসে ঢুকলেও প্রথম দিন থেকেই স্থির করে রেখেছিল মোহন-লাল, এখানে বেশীদিন সে থাকবে না—তার মাকে সে যেমন আশ্বাস দিয়ে এসেছে তা-ই করবে। সিনেমায় বাজিয়ে টাকা-পয়সা আর নাম হলে চিঠি লিখবে মাকে, তাকে টাকাও পাঠাবে। এবং তার আগে তাকে কোন খবর দেবে না সে।

বেশ কিছুদিন কাটল। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—তাঁবুতে বসে বসে সব ঋতুর স্বাদ গ্রহণ করল মোহনলাল। তার স্থায়ী কোন ঠিকানা নেই। তার জগৎ এখন একেবারেই আলাদা। বাইরের মানুষের সংগে কোন সম্পর্ক থাকল না।

অস্থির মোহনলাল, বড় বিষণ্ণ। যে স্বপ্ন তখনো বুকের মধ্যে সে বহন করছিল, খুব অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামে শহরে ও শিল্পাঞ্চলে একদল মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের সংগে যন্ত্রের মতন ঘুরতে ঘুরতে তা মরে আসছিল এবং মোহন-লালেরও মনে হচ্ছিল তার বেঁচে থাকার দিন শেষ হয়ে গেছে।

সার্কাসের তাঁবুতে যখন এমন মৃতপ্রায় মোহনলাল, এক-একটি দিন ধূসর ক্লান্ত ও নির্জীব সেই সময় তার সামনে এসে দাঁড়াল রাধানাথবাবু, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "ফাইন বাজাও হে। বড় মিঠে হাত তোমার। শুনতে শুনতে নাচতে ইচ্ছে করে মাইরি—"

মণিবাবু শুয়ে-শুয়ে বিশ্রাম করছিল, রাধানাথবাবুর কথা শুনে অন্য পাশ ফিরে হাসল। হীরু ছিল না। শ্যামল বসে-বসে বিড়ি টানছিল, তা ফেলল না। মোহনলাল খালি গায়ে ছিল, রাধানাথ-বাবুকে দেখে একটা শার্ট টানতে-টানতে বলল, "বসুন।"

রাধানাথবাবু বসল না, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বলল। নতুন ক্যাম্প পড়েছিল তখন দক্ষিণেশ্বরে। গ্রীষ্মের কড়া দুপুর। থেকে থেকে গলা শুকিয়ে আসছিল মোহন-লালের। রাধানাথবাবুর প্রথম কয়েকটা কথা জলের ঠাণ্ডা ফোঁটার মতন টপটপ করে পড়ল মোহনলালের শুকনো গলায় এবং অদ্ভুত অনুভূতি তার দুর্বল ও নিস্তেজ শিরা-স্নায়ু সতেজ করে তুলল।

"না হে বসব না", মোহনলালের কাঁধে দু-হাত রেখে রাধানাথবাবু তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এল, "মরতে সার্কাসে এলে কেন হে? এটা জায়গা নাকি তোমার?"

মণিবাবু হালকা গলায় বলে উঠল, "ভাল জায়গা-টায়গা জানা আছে আপনার? দিন না সেখানে পাঠিয়ে—"

"দেব বৈকি, আলবাত দেব! এখানে বসে-বসে ফিনিশ হয়ে যাবে একটা গুণী লোক, আর আমি বসে-বসে তা দেখব?" মোহনলালের কাঁধ জোরে-জোরে ঝাঁকাতে থাকল রাধানাথবাবু, "শোন হে ছোকরা, এখান থেকে যদি না যাও তাহলে আমি তোমায় গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব, মনে রেখ হে!"

মোহনলাল হাসছিল। রাধানাথবাবুর মুখে মদের উৎকট গন্ধ। মাথার চুল সাদা। খুব ফর্সা গায়ের রং। রোগা, লম্বা শরীর। মোহনলালের সংগে কথা বলবার সময় থেকে থেকে জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিচ্ছিল রাধানাথবাবু।

"চল হে আমার তাঁবুতে। নাও না গীটারটা তুলে, একটু বাজনা-টাজনা শুনি। মেয়েরাও শুনবে'খন। বড় ভাল মেয়ে সব। কুস্তির প্যাঁচ শিখতে-শিখতেই শেষ হয়ে গেল। গানবাজনা আর শিখবে কখন—" নিজের কপালে জোরে হাতের আঘাত করে রাধানাথবাবু বলল, "কপাল! বুঝলে হে, এখানে যা লেখা থাকে তা খণ্ডন করার সাধ্য কার!"

প্রথমদিনই রাধানাথবাবু মোহনলালকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তার তাঁবুতে। যমুনা তাকায়নি, অপ্রসন্ন মুখে আস্তে কিছু বলেছিল রাধানাথবাবুকে—হাসি মোহন-লালের কাছে এসে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল।

মোহনলাল হঠাৎ বিব্রত হয়ে হাসিকে তুলে ধরেছিল, "থাক, থাক!"

"আহা, থাকবে কেন", রাধানাথবাবু চিৎকার করে উঠেছিল, "গুণী লোককে একটু ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে না? কে আছে হে তোমার মতন এখানে? সকলেই তো সার্জেন্ট ক্লাশ—"

সেদিন গীটার নিয়ে যায়নি রাধানাথ-বাবুর তাঁবুতে মোহনলাল, পরে হাসির খেলার সময় গলা উঁচু করে তার দিকে দেখতে দেখতে এক-একদিন এক-একটা সুর বাজিয়েছে, বিয়ের কথা ভেবেছে, ঘর-সংসারের কথাও তার মনে হয়েছে। এবং কোন কোন অন্ধকারে তাঁবুর পিছনে দাঁড়িয়ে হাসির ফুটন্ত দেহের এক-এক অংশ স্পর্শ করতে করতে তার সব দৈন্য অসুবিধা ও জটিলতার কথাও এতদিন মোহনলাল ভুলেছিল। তার শুধু মনে হয়েছিল কোন্নগরের পাকা বাড়িতে মা এখনো আছে, সেখানে যে-কোন সময় হাসিকে নিয়ে ওঠা যায়।

শীতের পর দুপুরের প্রথম রোদ স্নান করিয়ে দিচ্ছিল মোহনলালকে এবং হাসির পাশে দাঁড়িয়ে তার মনের সব রং ধুয়ে যাচ্ছিল—সুখের মৃদু কল্পনা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যাচ্ছিল। আশ্রয়হীন এক অনাথ বালকের মতন চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল মোহন-লাল, পিঁপড়ের কামড়ে পা জ্বললেও তার চুলকোবার কিংবা পায়ে পা ঘষবার আর উৎসাহ ছিল না।

মোহনলালের মনে হল হাসিকে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে গেলেও তার ওঠবার কোন জায়গাই নেই। তাছাড়া একা যাবে না হাসি, রাধানাথবাবুও যাবে। তার সঙ্গে থাকতে কোনই আপত্তি হওয়ার কথা নয় মোহনলালের, কিন্তু থাকবে কোথায়! কোন্নগরের পাকা বাড়ির কথা, কলকাতার ছোট মেসের কথা এবং সব- শেষে সার্কাসের স্বল্প পরিসর তাঁবুর কথা ভাবতে ভাবতে খালি-খালি চোখে মোহন-লাল জলের শব্দ শুনছিল। মাটি ভিজছে —হঠাৎ হাওয়ার ঝাপটায় তার নাকে এক-একবার ভিজে মাটির গন্ধও লাগছিল।

আরও পরে চাপা স্বরে কথা বলার মতন মোহনলাল বলল, "রাধানাথবাবু যমুনার সাথে থাকবে, তার ভাবনা তুমি কেন কর?"

"কার সাথে, দিদির সাথে?" অল্প হাসল হাসি, "দিদির সাথে শিবুদার বিয়ে হবে—তখন?"

"থাকবে তাদের সাথে। শিববাবু সার্কাস ছেড়ে যাবে না তো—"

"দিদিও যাবে না।"

"ভালই হবে। থাকার ভাবনা কী তবে রাধানাথবাবুর—"

"দূর দূর—" মোহনলালের কথা শেষ হওয়ার আগেই হেসে উঠল হাসি, "বাবা এক তাঁবুতে ওদের সাথে থাকবে নাকি?"

ভিজে শাড়ির প্রান্ত ঠোঁটে বুলিয়ে নিয়ে সে বলল, "তারা রাজি হবে কেন, লজ্জা-শরম আছে না?"

"তোমার লজ্জা-শরম নেই?"

"বা রে", হাসি প্রতিবাদ করার মতন বলল, "আপনি সার্কাস ছেড়ে চলে যাবেন তো, বায়স্কোপে বাজনা বাজাবেন—আমাকে পাকা বাড়িতে নিয়ে তুলবেন বললেন যে—"

"যদি সার্কাসেই বাজাই?"

"তবে বিয়ের ব্যাপারে মত হবে না বাবার", হাসির ঠাণ্ডা নিশ্বাসের শব্দ উঠল, "তার মাথা গোঁজবার একটা ঠাঁই-এর দরকার না? মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে আলাদা আর একটা তাঁবু কে তাকে দেবে।"

মোহনলাল এত পরে বুঝল কেন অল্প আগে হাসি তাকে বলেছিল যে তার বিয়েতে মত দেবে না রাধানাথবাবু। মত দিলেও এই মুহূর্তে মোহনলালের করবার কিছু ছিল না। তাহলেও হাসির দেহ, তার সিক্ত শাড়ির প্রান্ত এখনো বিভ্রান্ত করে তুলছিল মোহনলালকে এবং সে একটা নির্জন আশ্রয়ের কথা ভাবছিল।

হাসি বলল, "দিদি বাবার কথা একটুও ভাবে না, জানেন? বাবার ওপর তার কোন টান নেই।"

মোহনলাল অন্যমনস্কের মতন বলল, "হু"।

"বাবা যা-ই করুক, হাজার হোক বাপ তো বটে! নিজে সুখে থাকব আর যে মানুষটা জন্ম দিল সে রাস্তায় পড়ে ধুঁকবে—তা হয় না মোহনবাবু!"

"তা বটে।"

বুকে গামছা চেপে ধরে হাসি হাঁটছিল। তার সঙ্গে গেল না মোহনলাল, দাঁড়িয়ে থাকল। পকেট থেকে সস্তা সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে মোহনলাল দেখল, খালি। সে তা ছুঁড়ে মারল হাসিকে লক্ষ করে। তার গায়ে লাগল না, পায়ের কাছে পড়ল।

হাসি মোহনলালের দিকে ফিরে হাসল, "স্নান হয়েছে?"

"না।"

"করবেন না?"

"এখন না।"

"আসুন না, তাঁবুতে। খিদে লাগেনি?"

যেখানে দাঁড়িয়েছিল মোহনলাল, সেখানেই থাকল। আর কিছু সময় যাক। ভিজে কাপড় ছাড়ুক হাসি, চুল আঁচড়ে নিক। পরে যাবে মোহনলাল। এ সময় গেলে যমুনা আর রাধানাথবাবু তাকেও খাওয়ার কথা বলবে। এখন তাদের তাঁবুতে যাবে কিনা, মোহনলাল তা-ও ভাবল।

এখানে সে স্নান করবে না। তার বাক্স-বিছানা কাপড় বাজনা—সব নিয়ে টালিগঞ্জে গেছে হীরু, শ্যামল আর মণিবাবু। মোহনলাল সেখানে পেৌঁছে স্নান করবে সন্ধ্যার আগে-আগে। নতুন এক প্যাকেট সিগ্রেট কেনবার জন্যে সে ভাঙা গেটের দিকে যাচ্ছিল। কাছাকাছি অনেক সিগ্রেটের দোকান।

"ও মোহনবাবু, শিগগির আসুন! দিদি খুন করে ফেলল যে বাবাকে—"

হঠাৎ হাসির ভয়ার্ত চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মোহনলাল।

গলা চেপে ধরে ঠেলতে-ঠেলতে রাধানাথবাবুকে তাঁবুর বাইরে নিয়ে এসেছে যমুনা, জোরে-জোরে বলছে, "বেরিয়ে যাও! তোমার সাথে থাকি তো আমি এক বাপের বেটি না—চোর কোথাকার!"

"মাইরি বলছি", যমুনার শক্ত হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে-করতে কাতর স্বরে বলছে রাধানাথবাবু, "আমি না, আমি চুরি করিনি! উঃ, লাগে, মরে গেলাম যে!"

"না, তুমি চুরি করনি! আমি চিনি না তোমাকে! আমার সুমুখ থেকে দূর হয়ে না গেলে আজ খুন করে ফেলব আমি তোমাকে—" যমুনা রাধানাথবাবুর গলায় আরও জোরে চাপ দিতে দিতে ভাঙা কর্কশ স্বরে বলতে থাকল। শাড়ি খুলে এসেছে তার। চোখ দপদপ করছে। হাঁপাচ্ছিল যমুনা।

মোহনলাল ছুটে এল।

ক্রমশ

ল্যান্ডস্কেপ —টি সিংহ

ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিস্ট ইউনিয়নের দুটি প্রদর্শনী

ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিস্টস ইউনিয়ন সম্প্রতি দুটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। একটি মোনালিসা গ্যালারীতে—এখানে শিল্পী টি সিংহের আঁকা ছবি পেশ করা হয়। অপরটি অনুষ্ঠিত হয় চিত্রম গ্যালারীতে—কুমারী সুনন্দা সেনগুপ্ত এখানে তাঁর বাতিক নকশার নিদর্শন পেশ করেন।

শিল্পী টি সিংহ শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করেন এবং বর্তমানে দিল্লীর এক সরকারী সংস্থায় কাজ করছেন। কলকাতায় এটি তাঁর প্রথম প্রদর্শনী। এই শিল্পীর কাজে বিশিষ্ট কোন অঙ্কনরীতির সন্ধান পাওয়া যায় না, সুতরাং এঁকে বিশেষ কোনও গণ্ডির মধ্যে ফেলা চলে না। কয়েকটি কাজে প্রথাগত রচনার ছাপ থাকলেও অন্যগুলিতে আবার আধুনিক চিত্রকলার প্রভাব দেখা যায়। অর্থাৎ, অঙ্কনপদ্ধতি ও প্রকাশভঙ্গীমা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে শিল্পী সমকালীন চিত্রকলা-ধারা সম্বন্ধে সচেতন। তাই ভারতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হলেও রচনাগুলি অনেক স্থলে আধুনিকপন্থাশ্রয়ী হয়ে পড়েছে এবং সেটা কৃতিত্বের কথা। যেমন "এমব্রেসিং।" ভারতের প্রাচীন ও পরিচিত ভাস্কর্য নিদর্শনকে ভিত্তি করে জলরঙে আঁকা এই ছবিখানি সমকালীন সজ্জায় সজ্জিত হয়ে উঠেছে। শিল্পী অতি সহজ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কয়েকটি ছবিতে গ্রাফিকের লালিত্য ও সূক্ষ্মতা ফুটিয়ে তুলেছেন। স্বচ্ছ কাচের ওপর সাধারণ জল রঙে ছবি এঁকে সেটিরই প্রতিলিপি তিনি কাগজে তুলে নিয়েছেন। অবশ্য পরীক্ষা

বাতিকের কাজ —সুনন্দা সেনগুপ্ত

হিসাবে ঐ প্রক্রিয়া প্রতিলিপির সবকটি ভালই —যদিও সব স্থলে এগুলি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়নি। তবে যে ক্ষেত্রে তিনি প্রতিলিপির ওপর তুলি সহকারে সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন সেই ক্ষেত্রেই এগুলি এক বিশেষ রূপে সম্মুখ হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে "রেড ট্রি নং ২" সকলের চোখে পড়ে। কালিকলম মাধ্যমে তিনি কয়েকটি রেখাজালের সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলি আমার বিশেষ ভাল লেগেছে। সংক্ষেপ মাধ্যমে বক্তব্যটুকু প্রকাশ করাই এহেন রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ও এখানে নন্দলাল ও ক্লীর স্পষ্ট প্রভাবও লক্ষ করা যায়। যেমন "ঘোড়া" ও বিশেষভাবে ল্যান্ডস্কেপ নং ২" যদিও দ্বিতীয় ছবিটিতে বাঁ দিকের কয়েকটি মোটা রেখায় আঁচড় না থাকলে এটি অধিকতর সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠত। অন্যান্য ছবির মধ্যে "কক অ্যান্ড হেন"-এর নাম করা যায়। জলরঙে আঁকা হলেও রচনারীতি দেখে এটিকে তেলরঙের কাজ বলে ভুল হয়। প্রদর্শনীতে উডকাট ও কাঠখোদাইয়ের দুই-একটি অতি সাধারণ নমুনাও ছিল।

কুমারী সুনন্দা সেনগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। বাতিক ও চিত্র-রচনায় এঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল, সেজন্য স্নাতকত্ব লাভ করার পরে ইনি সরকারী আর্ট কলেজের শিক্ষক শ্রীবৈদ্যনাথ সেন-গুপ্তের কাছে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর এই প্রথম প্রদর্শনীতে তিনি বিভিন্ন নকশা সম্বলিত চাদর, টেবিলক্লথ, রুমাল, নেকটাই, ল্যাম্পস্ট্যান্ড ও শাড়ি পেশ করেন। প্রদর্শনীটি কিন্তু তিনি কোনও বৃহত্তর গ্যালারীতে আয়োজন করলেই ভাল করতেন —কারণ তাতে দর্শকদের নিদর্শনগুলি দূর থেকে দেখার সুযোগ মিলত। স্থানাভাব ও অল্পদূরত্বের জন্য নিদর্শনগুলির রূপ ও লালিত্য যেন একটু ম্লান হয়ে যায়।

প্রক্রিয়া কষ্টসাধ্য হলেও বাতিকের প্রধান আকর্ষণ নূতন প্রতীক ও প্যাটার্ন এবং সকলেই জানেন যে এর জন্য প্রয়োজন রূপ-সন্ধানী মন ও নিত্য নূতন প্রতীক উদ্ভাবন করার ক্ষমতা। এই শিল্পী অধিকাংশ স্থলেই সুন্দর, প্রাচীন ও পরিচিত ভারতীয় লতাপাতা, আলপনা ও ফুলের প্রতীক ব্যবহার করেছেন এবং অনেক স্থলে যে সেগুলি শাড়ি বা ঐ জাতীয় জিনিসের রূপ ও লালিত্য বাড়িয়ে দিয়েছে সন্দেহ নেই। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নকশা ব্যবহার করার ফলে কয়েকটি নিদর্শন অযথা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ সজ্জা ও শূন্যস্থানের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি কিছুটা সচেতন হলে ভাল করতেন। খয়েরী রঙের শাড়িটিতে তিনি

সমকালীন মাত্র দুটি প্রতীক প্রয়োজনমত ব্যবহার করে কল্পনা ও সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন। কুমারী সুনন্দা যত্নসহকারে বাতিকের কাজ শিখেছেন এবং তাঁর কাজে ধৈর্য ও নিষ্ঠারও পরিচয় পাওয়া যায়। সব চেয়ে বড় কথা, বাতিকের মধ্যে তিনি নীল ও সবুজ রঙ ব্যবহার করেছেন। এই রঙ দুটি যদি স্থায়ী হয় তাহলে শিল্পী যে সত্যিই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আশা করি সমকালীন রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী নূতন কয়েকটি প্রতীক সৃষ্টি করে এই শিল্পী তাঁর বাতিক রচনাক্ষেত্র অধিকতর সুন্দর ও বিচিত্র করে তুলবেন।

শিক্ষার্থীদের চিত্র প্রদর্শনী

বার থেকে ১৬।১৭ বছরের যে সব ছেলেমেয়ে আকাডেমি অব ফাইন আর্টস স্টুডিওতে শিক্ষালাভ করে তাদের আঁকা কয়েকখানি ছবি আকাডেমি ভবনে এক প্রদর্শনীতে সম্প্রতি পেশ করা হয়। সাধারণত এ সব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে এখানেও সেটা চোখে পড়ল—অর্থাৎ অল্পবয়স্ক এই শিল্পীদের উৎসাহ দেবার অভিলায় উদ্যোক্তাগণ কয়েকখানি অবাঞ্ছনীয় ছবিও প্রদর্শনীতে রেখে দিয়েছেন। অবশ্য সকলেই যে শিক্ষার্থী সে কথা সত্য—তাহলেও মনোনীত ছবির সংখ্যা কিছু কমালে এই প্রদর্শনীটির মান আরও উন্নত হত।

অধিকাংশ শিক্ষার্থীই জলরঙ মাধ্যমে এ'কেছে, যদিও কালিকলম ও প্যাস্টেলেরও কয়েকটি নিদর্শন ছিল। অঙ্কনপদ্ধতি ও প্রকাশনৈপুণ্য দেখে মনে হয় কয়েকজন বেশ নিষ্ঠাসহকারে শিক্ষালাভ করছে। উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থী শিল্পীদের মধ্যে এই কয়েকজনের নাম করা যায় : প্রদীপ চ্যাটার্জী (বয়স ১৭), শীলা বসু (বঃ ১৫), কুসুম শিবস্বামী (বঃ ১৫), মৃণ্ময় মুখার্জী (বঃ ১৭), অমিত সাহা (বঃ ১৫) ও রমা ব্যানার্জী (বঃ ১৫)।

বৈকালে গ্যালারীতে আলোর প্রয়োজন হয়। আশা করি আকাডেমি কর্তৃপক্ষগণ এ কথাটি স্মরণ রাখবেন।

চিত্রপ্রিয়

প্রতিবাদ

'দেশ' (সংখ্যা ৪০) 'চিত্র প্রদর্শনী' বিভাগে 'সাহিত্যিক তারাশংকরের চিত্রের প্রদর্শনী' শীর্ষক সংবাদটিতে কয়েকটা তথ্যগত ভুল চোখে পড়ল।

চিত্রসমালোচক লিখেছেন—

(১) "ভারতীয় জ্ঞানপীঠের পুরস্কার লাভের জন্য স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে.....অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।"

(২) ".....শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অ্যাকাদেমী অব ফাইন আর্টস-এর পক্ষ থেকে সেদিন অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।"

আমি জানাচ্ছি—এই অনুষ্ঠান আমাদের "কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি জয়ন্তী সমিতি" (১৪ মাকড়দহ রোড, হাওড়া-১) কর্তৃক আয়োজিত মহাজাতি সদনের মূল সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের একটি অংশ মাত্র। রবিবার ২৩এ জুলাই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে শ্রীতারাশঙ্করের একটি চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করেন লেডী রাণু মুখার্জী। ঐ অনুষ্ঠানে শিল্পী হিসেবে শ্রীতারাশঙ্করকে আহ্বান করা হয়েছিল তাঁরই প্রদর্শনী ব্যবস্থায় উপস্থিত থাকার জন্য। জ্ঞানপীঠের সঙ্গে আমাদের আয়োজিত অনুষ্ঠানের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি আরো জানাচ্ছি—আকাদেমী অব ফাইন আর্টস সেদিন অভিনন্দন জানানোর কোনো ব্যবস্থাই করেনি।

জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের জন্য তারাশংকরকে আমরা সম্বর্ধনা জানাইনি—জানিয়েছি তিনি সত্তর বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছেন বলে।

ছায়া ভট্টাচার্য
সহ সম্পাদিকা তারাশঙ্কর জয়ন্তী সমিতি

অগ্রগতির হিসাব

বৈষয়িক উদ্যোগ গত ষোলো-সতেরো বছরে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার কি উন্নতি ঘটাতে পেরেছে, তা বিচার করে দেখার সময় এসেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনায় (১৯৫১—১৯৫৬) সরকারী অংশে ১৯৬০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ব্যবস্থায় ১৮০০ কোটি টাকা খরচ করা হয়। এই পরিকল্পনাকালে কৃষি-উৎপাদন শতকরা ২২ ভাগ, শিল্প-উৎপাদন শতকরা ৩৯ ভাগ এবং জাতীয় আয় শতকরা ১৮·৪ ভাগ বেড়েছিল। দ্বিতীয় যোজনা আকারে প্রথম পরিকল্পনার দুগুণ বড়ো ছিল এবং তাতে কৃষি-উৎপাদন আরো শতকরা ২০ ভাগ, শিল্প-উৎপাদন শতকরা ৪১ ভাগ এবং জাতীয় আয় শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনা আয়তনে দ্বিতীয় যোজনার প্রায় দুগুণ হলেও পরিকল্পনার দ্বিতীয় ও চতুর্থ বছরে বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং পাঁচ বছরের ভেতর তিন বছরে প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন কৃষির উৎপাদন হ্রাস এই দুই প্রধান কারণে জাতীয় আয়ের পূর্ব-নির্ধারিত সম্প্রসারণ ঘটাতে পারেনি। ১৯৬৪-৬৫ সালের পর থেকে উৎপাদন শোচনীয়ভাবে কমে গেছে। বস্তুত, তৃতীয় যোজনায় মাথাপিছু কোনো লাভ হয়নি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সব প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত পরিকল্পিত মাথাপিছু আয়ের অগ্রগতিকে প্রায় অর্ধেকে পরিণত করেছে।

কৃষি অংশের উন্নয়ন

১৯৪৯-৫০ সালকে গোড়ার বছর ধরলে দেখা যায় যে, কৃষি-উৎপাদন—সবচেয়ে ভালো বছর ১৯৬৪-৬৫ সালে ১৫৭·৬ হয়েছে : পনেরো বছরে বৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা ৫৭·৬ ভাগ। খাদ্যশস্য উৎপাদন ১৯৫০ সনে ৫·৪৪ কোটি টন থেকে বেড়ে—সবচেয়ে খারাপ বছর ১৯৬৬-তে ৭·২৩ কোটি টনে পৌঁছেছে। স্পষ্টত, আমাদের উৎপাদন এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজনের (জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে যে চাহিদা বৃদ্ধি ঘটে, সে কথা ছেড়ে দিয়ে) মধ্যে বিরাট বৈষম্য রয়ে গেছে। তিনটি পরিকল্পনায় একটা বড়ো ভুল হল যে, উপযুক্ত পরিমাণ নায় উৎপাদন করা হয়নি। ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা, বলতে গেলে, খাদ্য-মূল্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত : খাদ্য অনটন তাই আর্থিক সংকটের মুখ্য কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাঁচামালের অভাবও দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

এখানে উল্লেখ করতে হয়, কৃষিক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগতি হয়েছে পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজে। পাঞ্জাবে কৃষিকর্মকে ব্যবসায়ের ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র লাভবান হয়েছে কাঁচা তুলোর মতো বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদন করে—ঐ দ্রব্য-গুলির বাজার গত দশকে কৃষকদের অনুকূল এবং মূল্য ক্রমবর্ধমান ছিল। পল্লী অঞ্চলের বিদ্যুৎকরণে মাদ্রাজ সবচেয়ে এগিয়ে আছে : গ্রামগুলির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগে জলসেচ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা গেছে।

মানতে হয়, অজ আমাদের লোহা ও ইস্পাত, ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং, বৈদ্যুতিক, যন্ত্র-নির্মাণ, তৈল নিষ্কাশন ও পরি-শোধনের মতো মৌল শিল্পগুলির একটা সুপরিসর অংশ আছে। ১৯৫০ সনের ৩৪ লক্ষ টাকার তুলনায় এখন আমরা ২৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের কলকব্জা তৈরি করি। আক্ষেপের বিষয়, খরা ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য জাতীয় আয় ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে কমে যাওয়ার ফলে সঞ্চয় ও মূলধন নিয়োগ হ্রাস পেয়েছে। মূলধন খাটানোর বহর ১৯৬৪-৬৫ সালের স্তরে বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে বেশী পরিমাণের (১৯৬৬-৬৭ সনে প্রায় ২০০ কোটি এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে ১০০ কোটি টাকা বেশী) বৈদেশিক সম্পদের সহায়তায়।

দেশে অর্থনৈতিক কাজকর্ম পিছিয়ে পড়ার দরুন সামাজিক কার্যাবলীর উপর খরচ কমিয়ে দিতে হয়েছে। কেননা, কৃষি, জলসেচ এবং শক্তির প্রয়োজনগুলির আগে পূরণ করার জন্য সব রকমের চেষ্টা করা হচ্ছে। তার উপর, মূলধনদ্রব্য শিল্পে মন্দার সূচনা দেখা দিয়েছে। ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং, যন্ত্রনির্মাণ এবং ভারী বৈদ্যুতিক শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা যাতে কাজে লাগানো যায়, সে উদ্দেশ্যে ঐ শিল্প-সমূহের উৎপন্ন দ্রব্য অগ্রিম কেনার ব্যবস্থা অবলম্বন জরুরী।

কলকারখানা, বাণিজ্য ও শহরের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আগে যে-সব পল্লী অঞ্চলে বিনিময় ব্যবসা অথবা প্রকৃত দ্রব্যের আকারে লেনদেন চালু ছিল, সেখানে জিনিসপত্র কেনাবেচায় নগদ টাকার প্রবর্তন হয়েছে। ভালো কথা পল্লী অংশের ঋণভার কমে গেছে দুটো কারণে—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে যুদ্ধ-পূর্ব কর্জের প্রকৃত বোঝা হ্রাস পেয়েছে এবং কৃষিজাত দ্রব্যের উচ্চমূল্য থেকে যে উদ্বৃত্ত পাওয়া গেছে, তা দিয়ে পুরানো দেনা শোধ করা সহজ হয়েছে।

আয় বণ্টনে অসাম্য

মূল্যবৃদ্ধি ও অনটনের সময় জমিহীন শ্রমিকের অবস্থা গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে অসহায় হয়ে ওঠে। তেমনি, শহর অংশের অল্প আয় সম্প্রদায়ের দুর্দশার কারণ হল তাদের বাঁধা উপার্জনের প্রকৃত মূল্যের অবক্ষয়। পরিকল্পনামূলক আর্থিক উদ্যোগের সবচেয়ে অনভিপ্রেত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্ন বণ্টনে অধিকতর অসাম্য। গত কয়েক বছরে দেখা গেল যে, বণিক ও দোকানীরা বাজার নিয়ন্ত্রণ, সব জিনিস-পত্র মজুত এবং তার থেকে লাভ করতে পেরেছে। দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য যোগানের ব্যবস্থা করতে পারে, এমন বণিক শ্রেণী হয়েছে প্রভূত বিত্ত ও ক্ষমতার অধিকারী। কেনা-বেচা থেকে অনুপার্জিত লাভ ও অনির্ণেয় উৎসের টাকা আয় এবং সামাজিক অসাম্যের সমস্যাকে ঘোরালো করেছে। জাতীয় অথবা মাথাপিছু আয়ের পরি-সংখ্যান থেকে এইসব বিবিধ শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত বোঝা যায় না।

বৈদেশিক ঋণের সমস্যা

অন্য দিকে, অতীতে গৃহীত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের বোঝা উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। তৃতীয় যোজনার শেষ বছরে কর্জ শোধ ঐ বছরের মোট বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ৩০ ভাগে দাঁড়িয়েছে। যে-সব প্রকল্পের জন্য ঋণ নেওয়া হয়, সেগুলি যাতে সময়মতো উৎপাদনক্ষম হয় এবং দেয় মূলধন এবং সুদ পরিশোধে সাহায্য করে, তা দেখতে হবে। অবশ্য ১৯৫১ ও ১৯৬৪ সালের ভেতর ভারত পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে কম বার্ষিক মাথাপিছু সাহায্য পেয়েছে (পাকিস্তান কর্তৃক প্রাপ্ত সাহায্যের প্রায় অর্ধেক)। কিন্তু টাকার বিনিময়মূল্য হ্রাসের পর ভারতের কর্জ শোধের বোঝা গেছে বেড়ে। বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের হারও সন্তোষজনক নয়—দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রতিশ্রুত মোট পরিমাণের যথাক্রমে শতকরা ৫২ এবং ৬৪ ভাগ। তৃতীয় যোজনার শেষে শক্তি, ইস্পাত, বন্দর ও কৃষির মতো গুরুত্বপূর্ণ অংশে সাহায্যের শতকরা ৫০ ভাগেরও কম কাজে লাগানো হয়েছে।

শান্তিকুমার ঘোষ

কলকাতার ডায়েরি

বছর পঁচিশ আগেও আমাদের পূর্ব বাংলার মফস্বল শহরে কলকাতা-ফেরত বাবুদের আলাদা খাতির ছিল। সবিস্তারে তিনি বর্ণনা করতেন ট্রামে চড়ার কথা, ছাদ-ওয়ালা প্ল্যাটফরমের ভিতর ট্রেন ঢোকার কথা, গ্র্যান্ড হোটেলের পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা। আমরা, মুগ্ধ কিশোরের দল সবিস্ময়ে সব শুনতাম, স্বপ্ন দেখতাম, ভাবতাম আলোর শহর কলকাতায় কবে যাব।

তেহি নো দিবসাঃ গতাঃ, কলকাতা দূরে থাক, বিলেত পাড়ি দিয়ে ফিরে এলেও কেউ এখন ফিরে তাকায় না। যেমন যতীনবাবুর সঙ্গে রোজ বাজারে দেখা হয়, সাত দিন দেখা নেই। 'এতদিন কোথায় ছিলেন'—জিজ্ঞেস করতেই জবাব দেন, "আর বলবেন না মশাই হঠাৎ একটা কাজে ফ্রাংকফুর্ট যেতে হয়েছিল। রোম আর কায়রো হয়ে ফিরলাম কাল।"—কোন বিস্ময় নেই, কোন বিশেষ প্রশ্ন নেই, প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা দু' জনেই আবার মন দেন আলু-পটল রুই-কাতলার দিকে। জেটের কল্যাণে পৃথিবী যেখানে হাতের মুঠোয়, দূর নিকট, সেখানে কলকাতার জন্যে আলাদা খাতির বরাদ্দ থাকে কী করে?

তবে হ্যাঁ একেবারেই যে নেই, তাই বা বলি কী করে। নয়া কলকাত্তা আনেওয়ালা দু'-চার জন দেশোয়ালী ভাইদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি 'ভারী শহর' কলকাতা এখনও তাদের চমক লাগে। দেশবিভাগের পর ঘোড়ার গাড়ির ট্রেডটাকে এরাই এখন বাঁচিয়ে রেখেছে, দল বেঁধে ওরা আসে আরা, বালিয়া, দারভাঙ্গা, ভাগলপুর থেকে, এবং যথাপূর্বং জাদুঘর চিড়িয়াখানা, কালীমাঈ, পরেশ-নাথজীর মন্দির দেখে 'মুলুক' ফিরে যায়। আসাম, বিহার, ত্রিপুরা বা গ্রাম-বাংলা থেকে যাঁরা এখন আসেন, তাঁরা কিন্তু একটু অন্য রকম। ভিড় আর ট্রাম ছাড়া তাঁদের কাছে বিস্ময়ের কিছু আজকাল যেন আর নেই। এমন কি রাতের চৌরঙ্গিও তেমন জমকালো মনে হয় না। এমন একদিন ছিল, যখন অনেক বাঙালী বালক প্রথম বিজলি বাতি দেখেছে, রেডিও শুনেছে এই কলকাতায় এসে। আর এখন? মফস্বল-শহর বাদ দিই গ্রামে গ্রামে বিজলি বাতি, ঘরে ঘরে রেডিও।

কলকাতায় যারা এখন নতুন বেড়াতে আসাম থেকে আসেন, তাঁদের এক নমুনা-তদন্ত আমি করেছি। তার কিছু বিবরণ আপনাদের শোনাই।

আসামের যেসব তীর্থযাত্রী উত্তর ভারত সফরে বেরোন তাদের আগে কলকাতার মুড়ি ছুঁয়ে যেতে হত। এখন রেলের কল্যাণে তাঁদের অনেকে কলকাতা বাদ দিয়েই হিল্লি-দিল্লি ঘুরে আসেন। তবুও তীর্থ-যাত্রীদের কিছু কিছু তাঁদের সফরসূচীতে কলকাতাকে রাখেন। এঁরা চৌরঙ্গি-পার্ক স্ট্রীট নিয়ে মাথা ঘামান না, কালিঘাট দক্ষিণেশ্বর বেলুড় ঘুরে এবং গঙ্গাস্নান সেরে রেলের টিকিট কাটেন। কেউ কেউ শ্যামবাজার বা ভবানীপুরের ঠাণ্ডা হলে বাংলা সিনেমাও দেখেন।

পনের বা তিরিশ দিনের স্রেফ ছুটি কাটাতে যাঁরা মিরজাপুর স্ট্রীটের হোটেলে নতুন এসে ওঠেন, তাঁদের মধ্যে চিড়িয়াখানা হাওড়ার পুল দক্ষিণেশ্বর-বেলুড়, পরেশ-নাথের মন্দির, চৌরঙ্গি পাড়ায় একটি ইংরেজী সিনেমা দেখা, ট্যাক্সিতে চড়া, রেস্টুরেন্টের পরদাঢাকা কেবিনে বসে কাটলেট খাওয়া, কিছু না কিনে নিউ মারকেটে চক্কর মারা ইত্যাদি সফরসূচীতে থাকে। জাদুঘর দেখার শখ আগের চেয়ে কম বাঙালীর মধ্যে। মফস্বলের বালকদের আগ্রহ বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম এবং বিড়লা টেকনিক্যাল মিউজিয়াম দেখার দিকে, যুবক-দের আগ্রহ ফুটবল খেলা দেখার দিকে এবং বয়স্কা মহিলা ও প্রবীণদের এখনও নামবার ওয়ান দ্রষ্টব্য কালিঘাট। তৃতীয় একদল আসেন নিজের বা কোন আত্মীয়ের চিকিৎসা করাতে কিংবা কলেজে ছেলে ভরতি করাতে। ব্যবসাদার বাদ দিলে ইদানীং এই শ্রেণীর লোকেরই ভিড় বেশী। এঁরা কলকাতা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না, নিজের ধান্ধাতেই ঘোরেন এবং কাজ হয়ে গেলেই বোঁচকা বাঁধেন।

করিমগঞ্জের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করছিলাম মিরজাপুর স্ট্রীটের এক হোটেলে বসে। ভদ্রলোক এই প্রথম কলকাতায় এসেছেন। অনেক দিন থাকার শখ ছিল তাঁর, কিন্তু ট্রাম-বাসে পথেঘাটে লোকের ভিড় দেখে বললেন, "দূর মশাই ভদ্রলোকেরা থাকে কী করে এই বোগাস শহরে? কত গল্প শুনেছিলাম ছোটবেলা থেকে, এসে দেখছি তেমন কিছু না। আচ্ছা মশাই, ফিল্ম স্টাররা কোথায় থাকে বলতে পারেন, দু'-চার জনের সঙ্গে দেখা করা যায় না?"

ফিল্ম স্টারদের চাক্ষুষ দেখার আগ্রহ নতুন আগন্তুকদের মধ্যে এখন আগের চেয়ে আরও প্রবল। আলাপ করে দেখেছি, আসাম উত্তরবঙ্গ, এবং গ্রামবাংলার বহু লোকের ধারণা কলকাতার পথেঘাটে ফিল্ম স্টাররা ঘুরে বেড়ায়, একবার ওখানে গিয়ে পৌঁছলে ওদের দর্শনে নয়নমন তৃপ্ত হতে পারে।

একটি বিষয়ে দেখলাম এখনকার লোকেদের ধারণা আগেকার মতই। ছোট-বেলায় আমরা কলকাতার ট্রামের মতই কলকাতার ঠগদের নানা কাহিনী শুনতাম, কলকাতায় পৌঁছানোমাত্র পকেট সামলে রাখার নানা পন্থাও গুরুজনরা শিখিয়ে দিতেন। আজকালও দেখি মফস্বলের বাঙালী পর্যটকেরা কলকাতার চোর জোচ্চোর সম্পর্কে বড় সাবধান। পকেটমার যাতে না হয়, ঠগের পাল্লায় যাতে না পড়েন; সেই সম্পর্কে হুঁশিয়ার হয়ে চলতে চলতে তাঁদের ভ্রমণের আনন্দ অনেকখানি মাটি হয়। কলকাতায় দীর্ঘকাল থাকা, কোন পরিচিতের সাহায্য বা সঙ্গ ছাড়া কোন জিনিস কিনতে তাঁরা সাহস করেন না। তেজপুরের এক ভদ্রলোক বললেন, "বড় সাংঘাতিক মশাই কলকাতার লোকেরা, সেদিন রাত্রে কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাতে

আড়াই টাকার বদলে একটা পুরোনো গেঞ্জি আমায় গছিয়ে দিল।"

ডিবরুগড়ের আর এক বাঙালীর মন্তব্য —"যে-যাই বলুক কলকাতার তুলনা হয় না. খাওয়া-দাওয়ার সুখ, ফুর্তি করার ঢালাও বন্দোবস্ত আর ঘুরে-ফিরে দেখার কত জিনিস। শিলচরের একজন জানান, কলকাতা সাত দিনের পক্ষে ভাল, সারা জীবন থাকতে গেলে গেছি।"

তবে কি কলকাতার আকর্ষণ কমেছে, কলকাতা কি স্বপ্নের শহর আর নেই? আছে, তবে প্রধানত ছাত্রদের মধ্যে। মফস্বলের প্রত্যেক কিশোরের এখনও স্বপ্ন কলকাতার কলেজে পড়ার। একেবারে পঁচিশ-ত্রিশ, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার মতই। ট্রাম এবং তেরো-চৌদ্দতলা বাড়ি ছাড়া অন্য কোন কিছু বিস্ময় ঘটায় না বটে, কিন্তু পড়তে যদি বা না পাই, বড় হলে কলকাতায় এসে চাকরি করার স্বপ্ন মফস্বলের অধিকাংশ বাঙালী ছেলে এখনও দেখে। চাকরিতে চাকরিতে যাঁদের জীবন দূরে দূরে কাটল তাঁরাও কিন্তু এখনও রিটায়ার করার পর কলকাতার আশেপাশে কোথাও জমি কিনে বাড়ি করার বাসনা রাখেন। এত জায়গা থাকতে কলকাতার কেন? তার উত্তরে প্রায় সবাই বলেন, ছেলে-মেয়েদের পড়ানোর, অসুখবিসুখে ভাল চিকিৎসা করানোর সুযোগ কলকাতা ছাড়া আর কোথায় আছে বলুন? আর এখানে এলে রোজ বাড়তি রোজগারের ভাবনাও নেই, কলকাতার পথেঘাটে এখনও টাকা ছড়ানো। একটু বুদ্ধি থাকলে আর খাটলে টাকাগুলো ঘরে তুলতে কতক্ষণ।"

অর্থাৎ কলকাতা আগের মত চমক লাগাক আর না লাগাক, বিশ্বভুবনের সব বাঙালীই কলকাতাকে কেন্দ্র করেই বেঁচে আছে, তার আকর্ষণ কমে নি। কলকাতা যার ভাল লাগে না, কলকাতায় যার বাড়ি করার সামর্থ্য নেই, সেও ঘুরে ফিরে আবার কলকাতায় আসে, আসতে না পারলে অনেক আগে আসার স্মৃতি নিয়ে রোমন্থন করে। পূর্ব পাকিস্তানের অনেক বাঙালীও ঢাকা-রাজশাহী যথেষ্ট মনে করে না, কলকাতার জন্যে তাদেরও মন কেমন করে। দেশবিভাগের পর যাদের জন্ম, তারাও মা-বাবার কাছে গল্প শুনে শুনে কলকাতায় যাওয়ার অছিলা খোঁজে। বিদেশে পূর্ব পাকিস্তানের এক বন্ধু আমায় কয়েক বছর আগে বলেছিলেন, তার ছেলেদুটি লণ্ডন-নিউ ইয়র্ক দেখল, অথচ কলকাতা এখনও দেখল না, এটা তাঁর কাছে বড় আপসোসের। কেননা, তাঁর নিজের বাল্য আর কৈশোর যে কলকাতাতেই কেটেছে। ভিসা পাসপোর্টের কড়াকড়ি, তাই কলকাতার গল্প ছেলেদের বলে বলে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটান।

এতো গেল অন্যদের কথা, আমরা যারা কলকাতায় থাকি, তাদের মনের কথাটা কী অন্নদাতা এই শহর সম্পর্কে? অন্যদের কথা জানিনা, নিজের কথা বলতে পারি।— 'জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।'

—চাণক্য

নারকেলের দড়ি পাকাচ্ছে মেয়েরা

অর্থনৈতিক পশ্চাদপসরণে মহিলা সমাজের ক্ষতি

কেরালায় নাকি খাদ্য সংকটের সঙ্গে সঙ্গে দু'একটি বিশেষ ব্যবসায়ে দারুণ সংকট উপস্থিত হয়েছে। তার মধ্যে কাজু বাদাম ও নারকেল ছোবড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাজু বাদাম যদিও মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আদিম অধিবাসী, কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে তার পরিচয় বড় অল্পদিনের নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজ মিশনারীরা আমেরিকার ফলের সঙ্গে বাদামটি দেখেই চালান করলেন চারদিকে। সব দেশের মাটি হাওয়ায় ফল ফললো না। তবে আফ্রিকার কোথাও কোথাও আর ভারতবর্ষের আর্দ্র ও গরম আবহাওয়ার ভরা স্থানগুলিতে নূতন করে কাজু কায়েম হলো। তাই কেরলকূলের সিক্ত, সজল, ভিজে বাতাসে আর সাগর সৈকতের নরম মাটিতে কাজু বাদাম হয়ে উঠলো প্রধান উৎপাদনগুলির একটি। এমন কি কেরল-বাসীর বৈদেশিক মুদ্রা লাভের সহায় হলো কাজু বাদাম। কাজুর কারখানা গড়ে উঠলো। তাতে কাজ পেয়ে গেল হাজার হাজার মানুষ। মেয়েদের পক্ষে এই [illegible] [illegible] [illegible] বিশেষ একটি উপার্জনের পথ। যে যুগে মেয়েরা আজকের মত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়ে নেমে আসেনি, সেদিনও উপার্জনশীল মেয়েদের তালিকায় কাজু উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছিল। মার্কিন দেশে কাজু বাদামের দারুণ কাটতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই তারা ৫০,০০০,০০০ পাউণ্ড কাজু বিদেশ থেকে আমদানী করতে আরম্ভ করেছিল। তার মধ্যে নাকি শতকরা ৯৭ ভাগ ছিল ভারতবর্ষের অর্থাৎ প্রধানত কেরালার। কাজু বাদামটি কাজু ফলের তলায় থাকে। এই ফলও অনেক সময় খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয়। কাজেই কাজুর কমতি সেখানেও বাধা সৃষ্টি করবে।

নারকেল ছোবড়া অথবা coir ব্যবসায়ও মেয়েদের জন্য প্রচুর সুযোগ এনেছিল। মালয় শব্দ 'কায়ার' থেকে coir কথাটি এসেছে। মালয় ভাষাতে 'কায়ার' মানে পাকানো, যেমন দড়ি পাকানো। নারকেল-এর দেশ কেরালা। নারকেল গাছ বা কের বৃক্ষ থেকে তার নাম কেরালা। কেরল-বাসীর প্রাণ নারকেল। তাঁরা বলেন, নারকেল গাছের চারাটিকে যত্ন কর, বড় হয়ে সে তোমায় যত্ন করবে। শীতল ছায়া দেবে, তৃষ্ণার জল দেবে, এমন কি খাদ্য পর্যন্ত দেবে। শুধু এই 'কয়ার' উৎপাদন ও ব্যবসায়কে বেশ ভালভাবে সংগঠিত করা হয়েছে কয়েক বছর আগে। কিন্তু সেই সংগঠন সার্থক হয়েছিল। কারণ তার জন্য বিরাট কলকারখানা, যন্ত্রপাতি কোটি কোটি অর্থব্যয় প্রয়োজন হয়নি। কয়েক মাস আগেও কেরালার পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখেছি পল্লী অঞ্চলে অল্প দূরে দূরে coir-এর কারখানা। কারখানা বললে অবশ্য ঠিক বলা হবে না। প্রায় কুটির শিল্প। আয়োজন সামান্য কিন্তু দিকে দিকে ছড়ানো। মাথায় করে মেয়েরা আনে রাশি রাশি নারকেল ছোবড়া। বেশী দূরে যেতে হয় না। কাজেই ঘরের কাজের ক্ষতি কমই হয়। তারপর দড়ি পাকানো হয়। দড়ি আবার যায় আর কোথাও। তা দিয়ে হয় আরও কত কিছু। দরজার সামনে রাখার পাপোশ থেকে নিয়ে বহু কিছু। রং-বেরং-এর কার্পেটের মত গৃহসজ্জার উপকরণ পর্যন্ত নারকেল দড়ি থেকে হয়।

এমনি করে শিল্পপণ্যোৎপাদনে বাধা যেখানে মেয়েদের আঘাত দেয়, সেটা আমাদের প্রাণে বাজে আরও বেশী। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও তার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আশংকার কারণ হয়ে উঠছে বলে সুধী সজ্জন ও বিশেষজ্ঞরা বিশেষ চিন্তিত। আশা করি তাঁরা চিন্তার চতুর্দিক ভাবতে গিয়ে যে সব ব্যবসায়ে বা শ্রমশিল্পে মহিলারা অল্পবিস্তর উপজীবিকার সন্ধান পেয়েছেন সেগুলিকে ভুলে যাবেন না। অন্নের অন্বেষণ যেমন সামাজিকভাবে এখনও মুখ্যত পুরুষের দায়িত্ব, তেমনই মেয়েরা যখন সংসারের শত কাজের মধ্যে উপার্জনের সন্ধানে ফেরে তখন তার প্রয়োজন সামলানো সম্ভব হয় না বলেই সে ঘরের বাইরে যায়। কাজু বাদাম বা কয়ার হয়তো সে সন্ধানের সামান্য অংশমাত্র পূর্ণ করেছিল। কিন্তু আরও দশটা ক্ষেত্রও যদি এভাবেই দুয়ার রুদ্ধ করে দেয়, তবে মহিলা সমাজেও বেকারী কি ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে ও সংসারে, সমাজে তার কি বিষময় পরিণাম হবে ভাবতে আতঙ্ক হয়। যেখানে মেয়েদের জন্য নূতন উপার্জনের পথ পাওয়া প্রয়োজন, সেখানে পুরোনোও বাদ সাধছে!

কাজু বা কয়ারশিল্পের সংবাদ আমার আরও বিশেষ করে চোখে ঠেকলো, কারণ কেরলপল্লীতে দেখেছিলাম কেমন করে নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থ কন্যা ও গৃহস্থবধূ ঘরের কাজ গুছিয়ে চলে যায় কারখানা-গুলিতে। মাস ছয়েক আগেই লক্ষ করে-

ছিলাম কাজুর কারখানায় অনেকগুলি বন্ধ। কোচিন থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা কারখানায় দেবকী আম্মা কাজ করতো। দেবকী আম্মার ছোট ছোট বাচ্চা আছে। মনুমক্কয়মের নিয়ম কাটিয়ে সে স্বামীর সঙ্গেই বাস করে। পল্লীর প্রান্তে স্বচ্ছল গৃহস্থের আঙিনার এক কোণে একখানা ঘর। মাটির ঘর। অন্ধকার, অপরিসর। সম্পত্তির মধ্যে রান্নার দু-একটা বাসন। স্বামীর দারুণ যক্ষারোগের প্রথম লক্ষণগুলি প্রবল হয়ে তাকে অক্ষম করে তুলেছে। শিশুগুলি কঙ্কালসার। স্বচ্ছল গৃহস্থ সব খবর জানলে হয়তো সরে যেতেই বলতেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের অবসর কম। দেবকী আম্মা তাদের বাসন মাজে, কাপড় কাচে, পালাপার্বনে চাল কুটে দেয় সেই সুবাদে ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। আর্থিক উপার্জন ছিল কাজু বাদামের কারখানার আয়টুকু। দেবকী আম্মার দিন কারখানা বন্ধ হবার পর থেকে কেমন করে কাটছে জিজ্ঞাসা করার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। দিন কয়েক আগের সংবাদপত্রের ছোট্ট খবরটুকু দেখে তাকে মনে পড়লো আর সংগে সংগে মনে পড়লো দেবকী আম্মার মত হাজার হাজার মেয়ের হয়তো ঐ একই রকম অবস্থা।

অভাব অনটন আর দুঃখের দুনিয়ায় কেরল আর বাংলা, বিহার আর রাজস্থান সব একাকার। বিশেষ করে মেয়েদের জন্য। অভুক্ত শিশুসন্তান, রুগ্ন স্বামী, নিরন্ন নিরুপায় মা ও পত্নীর কাছে একইরূপে আসে। কাজেই আমাদের অর্থনীতির কর্ণধারেরা যেন তাদের ভোলেন না। যতটুকু পথ খোলা আছে, দুর্দশা তার চেয়ে অনেক বেশী একথা মনে রাখা দরকার হয়ে উঠেছে। বড় বড় প্ল্যান

পরিকল্পনা অর্থনৈতিক মেয়েদের যেমন আপনারাও বোঝেন, আমাদের এখানে মোদিনী-পুরের মোক্ষদাদিদিও বোঝেন। তবে প্ল্যানের কাগজ নিয়ে তর্কবিতর্ক করা বরং সহজ, নিরন্ন পরিবারের মুখোমুখি হওয়া সহজ নয়।

দুটি সস্তা সহজ আটপৌরে রান্না

চিচিঙ্গে বর্ষাকালের অনাদরের সবজি। মোষের শিং ইত্যাদি সব অনাদরের নামের তার অভাব নেই। অথচ যত্ন করে রান্না চিচিঙ্গে অতি সুস্বাদু ব্যঞ্জন। তারই দুটি সাধারণ প্রণালী দিচ্ছি।

সরষে বাটার সংগে চিচিংগেঃ উপকরণ
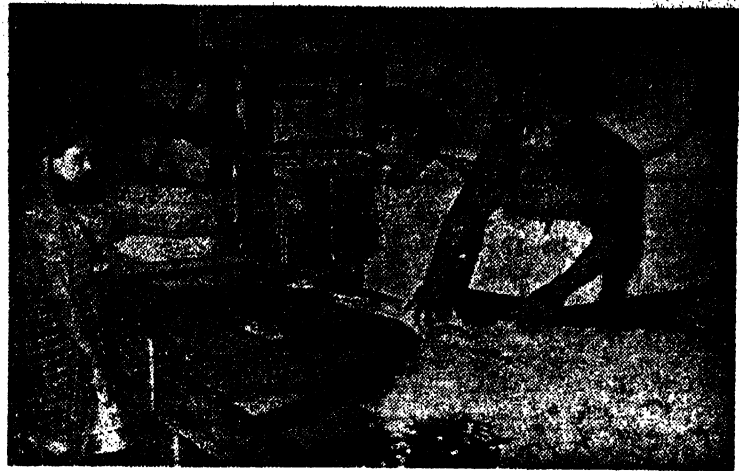
কাজ বাবামের কাজে মেয়েরা

বর্ষাকালে লেবু প্রচুর মেলে। চিনির অভাবে লেমন স্কোয়াশ করা প্রায় অসম্ভব। তবু যদি মন শক্ত করে কেউ র‍্যাশনের চিনি সামান্যও বাঁচাতে পারেন, তবে যতটা লেবুর রস, ততটা জল, এবং লেবুর রসের দ্বিগুণ চিনি দিয়ে চমৎকার লেমন স্কোয়াস করতে পারেন। চিনি ও জল দিয়ে ফুটিয়ে রস করে ছেঁকে নেবেন। তাতে লেবুর রস মিশিয়ে Potassium metabisulphate (KMS) ১½ গ্রাম মিশিয়ে দেবেন। চমৎকার পানীয় হবে। চিনির অভাবে যদি সময়কালে ব্যবহারের জন্য লেবুর রস বোতলে ভরে রাখতে চান, তবে রস করে, ছেঁকে ২½ গ্রাম Potassium metabisulphate দিতে পারেন। যে কাজের জন্যই লেবুর রস দরকার, সে কাজই এর দুচার ফোঁটায় হবে।

লাগবে চিচিংগে, সামান্য একটু কুমড়ো, নারকেল কোরা অল্প একটু, কাঁচালঙ্কা, লবণ সরষের তেল ও সামান্য ময়দা। অবশ্য সরষে তো থাকবেই।

১। চিচিঙ্গে কুচি কুচি করে কেটে নুন মেখে রেখে দিন। জল বের হলে সেটা থেকে চিচিঙ্গে চিপে তুলে নেবেন।

২। কুমড়ো কুচি করে,

৩। সরষে লঙ্কা বাটা, কাঁচা লঙ্কা, লবণ, নারকেল ও সরষের তেল চিচিঙ্গে ও কুমড়োর সংগে একত্র করে মাখুন।

৪। তারপর আন্দাজ মত ময়দা দিন যেন একটু বাঁধ হয়।

৫। আধ ইঞ্চিটেক পুরু করে গোল করে তাওয়ার উপর অল্প আঁচে সেঁকে নেবেন। কিনারগুলি বেশ লালচে হয়ে উঠলে উল্টে আবার ভাজা ভাজা ভাব হলে নামিয়ে পরিবেশন করবেন।

চিচিঙ্গের ঘণ্ট—উ প ক র ণ লাগবেঃ চিচিঙ্গে এবং ঘণ্টের মসলা যেমন হিং, জিরে, ধনে, আদা, লঙ্কা, লবণ, গরম মশলা ও ইচ্ছা মত আলুর কুচি, বড়ি, ভিজে ছোলা ইত্যাদি।

১। হিং জিরে ফোড়ন দিয়ে

২। চিচিঙ্গে ও আলুর কুচি দিন ও বড়ি ভেঙে বা ভিজে ছোলা দিন।

৩। মশলা দিন ও মাখা মাখা হলে নামাবেন।

টুকিটাকি

রান্নার আগে চাল, ডাল, শাকসবজি বার বার না ধুয়ে একবার ভাল করে ধুয়ে নিলে ভাল হয়। তাতে ভিটামিন বা খনিজ পদার্থ ধুয়ে যাবার ভয় কম থাকে। ডাল যদি একাধিক বার ধুতে হয়, তবে ময়লা কেটে যাবার পর যে জল থাকবে তাতেই ডাল রান্না করবেন।

তরকারি কুটে জলে ডুবিয়ে রাখবেন না। অনেক ভিটামিন জলে গলে যায়। শাক সবজি অল্প জলে রান্না করবেন। কখনও জলসা সবজি থেকে বেশী জল বের হলে আঁচে রেখে জল মারবেন না। তাতে অত্যধিক পাক হয়ে গুণ নষ্ট হয়। বরং সেই জল সরিয়ে ডাল ইত্যাদিতে ঢেলে দিতে পারেন।

বর্ষার সবজির মধ্যে অনেক সবজি অত্যন্ত জলসা হয়। যেমন ধরুন চিচিঙ্গে। চিচিঙ্গের জল বের করে রান্না করলে সুবিধা হয়। কেটে লবণ মেখে রেখে দেবেন। সেই জল বের করে চিচিঙ্গে রাঁধবেন, কিন্তু জল ফেলে না দিয়ে ডাল অথবা যেখানে ঐ জল কাজে লাগে এমন ব্যঞ্জনে ব্যবহার করবেন।

আমরা অনেক সময় রান্না শেষ করে চুলার চার পাশে সাজিয়ে রাখি যাতে গরম থাকে। এতেও খাদ্যপ্রাণের ক্ষতি হয়। বার বার গরম করলেও সেই একই ব্যাপার দাঁড়ায়। কাজেই সম্ভব স্থলে রান্না ও পরিবেশনের মাঝে সময় সংক্ষেপ করা ভাল। দৈনন্দিন রান্নার অনেক পদ পরিবেশন না করে বরং খেতে দেবার সময় হিসাব করে মোটামুটি খাদ্যতালিকা তৈরি করে রান্নাঘরের কাজ আরম্ভ করবেন।

দুধের বেলায়ও একই কথা মনে রাখবেন। বেশ ভাল আঁচে দুধ বসিয়ে ফুটিয়ে নেবেন। তাতে কম সময় উত্তাপে রাখা হবে।

ডিম বেশীক্ষণ সিদ্ধ হলে যে তার কেবল গুণই নষ্ট হয় তা নয়, বেশী সিদ্ধ করা ডিম হজম করা কঠিন।

ডিম সিদ্ধ করার জলে সামান্য লবণ দিলে খোসা সহজে ছাড়ানো যায়। খুব টাটকা ডিম অথবা যে মুরগীর খাদ্যে ক্যালসিয়মের অভাব হয়েছে সেই মুরগীর ডিম-এর খোসাও খুব পাতলা থাকে এবং ছাড়াতে অসুবিধা হয়। অনেক সময় ডিম-এর গায়ে এখানে ওখানে মৃদু আঘাতে ভাঙা ভাঙা করে নিলে বাকিটা ছাড়াতে বেশী বেগ পেতে হয় না।

কাঁচের গ্লাসে গরম জল ঢালবার আগে একটি চামচ রেখে নিলে গ্লাস ভাঙবার ভয় কম থাকবে।

আলু সিদ্ধ করবার সময়ে যে পাত্রে খোসা সমেত আলু গরম জলে দেবেন তাকে কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে দেবেন। আলু অল্প সময়ে সিদ্ধ হবে।

শ্রীমতী

কামরূপ জিলায় একটি বিপণন সমিতির গুদামে ২১ কুইণ্টাল চিনি ইঁদুরে খাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। সহযাত্রী বলিলেন—"একদিন গান শুনে ছিলাম—ছিল ধান

গোলাভরা শ্বেত ইঁদুরে করল সারা, চোখের ঐ চশমা জোড়া দোষ না বাদ খুলে। কামরূপের চিনি সাবাড় করা ইঁদুর কী রঙের তা কি অনুসন্ধান করে দেখা হয়েছে?"

বিশুখুড়ো কহিলেন: "সম্প্রতি আমরা স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করেছি, এবং এই দিবসটিকে 'যার মনে যা লয়' করে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ দিবস নামকরণ করেছি, দল নির্বিশেষে পরস্পর পরস্পরের গায় কর্দম নিক্ষেপ করেছি এবং তাতেও জুত হলো না মনে করে, কর্দমের চাপড়ায় বাঁধাই সংস্করণ অর্থাৎ থান ইটও ব্যবহার করেছি। এত সব ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যেও গান্ধীঘাটে জাতির পিতার সপিণ্ডীকরণ যথারীতিই পালন করেছি!!"

বিশুখুড়ো কথিত দিবসটির বিভিন্ন নামকরণ প্রসঙ্গে আমাদের জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"আমরাও স্বাধীনতা দিবসকে 'মদ্যপান বর্জন দিবস' নামকরণ করেছি; তবে আমাদের কোন প্ল্যাটফরম নেই বলে সে কথা কেউ জানলেন না, শুনলেন না!!"

আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"এবারকার স্বাধীনতা দিবস সার্থক হয়েছে কি না বলতে পারব না, তবে এই দিনে আমরা যে স্লোগান তুলেছি তা সর্বকালের মোক্ষম স্লোগান বলে গণ্য হবে, —আমরা ধ্বনি তুলেছি বিনা টিকিট কি চলনেবালে জিন্দাবাদ।"

পরবর্তী এক সংবাদে শুনিলাম ১৫ আগস্ট তারিখে ময়দানের মনুমেন্টের নাম পরিবর্তনের দাবি জানান হইয়াছে। অকটারলনির পরিবর্তে ইহাকে 'নকশালবাড়ি ও দমদম কৃষক মজদুর শহীদ মিনার' নাম রাখার প্রস্তাব করা হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু আমরা নামকরণে সংক্ষিপ্ততার পক্ষপাতী—তাতে 'সোল অব উইট' না থাকলেও আমরা বি পি সি সি, সি পি আই, আর এস পি ইত্যাদি—এগুলি বলতে সহজ, মনে রাখা সহজ। তাই বলি এত দীর্ঘ নামটিকে "নদকৃমশমি" রাখলে কেমন হয় তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেন ভেবে দেখেন।"

সংবাদে প্রকাশ যুক্ত ফ্রণ্ট কমিটি অর্থাৎ সুপারক্যাবিনেট নাকি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, এখন পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে শক্তিশালী দল হইল: "স্মাগলার্স পার্টি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল"। তাদের প্রধান লক্ষ্য: বিনা বাধায় চালের চোরাই ব্যবসা চালানো। খুড়ো বলিলেন—"তাই যদি হয়, তবে দল কর্তৃপক্ষ যেন দলটিকে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত করার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, দল-ধরা দল নজদিক হ্যায়!!"

লায়ন্স ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে যোগদান করার কথায় জনৈক সাংবাদিক মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জীকে বলিলেন—ওটা

লায়ন্সের ব্যাপার—হাসিয়া বলিলেন—আমিও লায়ন, তবে সব সময় গর্জাই না।—"তাঁর রসিকতা পাঠ করে আমরাও হাসছি, তবে এই প্রশ্নটিও সবিনয়ে করতে চাই—মুরগীর ডাকে সিংহের আতঙ্কিত হবার না-হক স্বভাব (ঈশপের গল্প দ্রষ্টব্য) অজয়বাবু কাটিয়ে উঠেছেন তো"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি এক সমাবেশে বলিয়াছেন,—আমরা সকলেই আদি, মধ্য, অন্ত, ভারতীয়।—"হবেও বা। কিন্তু মনে পড়ে গেল সেই গান, মেরা জুতা হ্যায় জাপানী। জুতো হয়ত এখন মার্কিনী হয়েছে, জামা হয়েছে পিকিনী, লিখতে জানলে নূতন ধরনের গানটি লিখেই সুর করে শোনাতাম"—বলেন সহযাত্রী।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং লোকসভায় একটি প্রশ্নের লিখিত জবাবে জানান: ১৯৬৬-৬৭ সালে ৮৮ লক্ষ টাকার মতো বরফে জমানো ব্যাঙের মাংস রপ্তানি করা হইয়াছে। শ্যামলাল সংক্ষেপে মন্তব্য করিল—"অর্থাৎ যাকে সাদামাটা বাংলায় বলে—লাভে ব্যাঙ, লোকসানে ঠ্যাং"।

এক সংবাদে শুনিলাম, পঃ বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর নাকি বাংলা

শিখিতেছেন। খুড়ো বলিলেন "খুবই ভাল কথা, কিন্তু চার্জশীটেড হবেন না তো!!"

ডোমজুড় হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেল, সেখানে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যে-সব রোগী ভর্তি হইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাদিগকে চাল বা আটা সঙ্গে করিয়া আনার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।—"নিমন্ত্রণে বাড়িতে রেশন পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধের কথা শুনেছি কিন্তু সেটা নেহাত লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ-এর মতোই ভাঁওতা মাত্র। কিন্তু স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কথাটা সত্যিই বুঝলাম না, চাল বা আটার অভাবেই যাঁরা স্বাস্থ্য হারিয়েছেন তাঁরা কি শূন্য হাঁড়িটি নিয়ে গিয়ে ভর্তি হবেন"—

ভারতে অবস্থিত পাক হাইকমিশনার ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পাক-প্রেসিডেণ্ট জনাব আয়ুবের একটি ইচ্ছার কথা জানাইয়াছেন, জনাব আয়ুব বলেন, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে শান্তিতে বাস করিতে চায়। সহযাত্রী বলিলেন—"চমৎকার কথা, কিন্তু বড় দেরিতে বুঝলেন হুজুর-এ-আলা, এখন এক সঙ্গে বাস করতে হলে যে সঙ্গে রেশন আনতে বলতে হয়, সেটা যে বড়ই শরমের কথা"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

বাম কমিউনিস্ট আয়োজিত আন্দোলন শীঘ্রই শুরু হইবে পাঞ্জাবে। খুড়ো বলিলেন—"এবং অতঃপর সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গে!!"

ঊনবিংশ শতকের ব্যঙ্গচিত্রে মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ

কমল সরকার

আধুনিক ভারতীয় কার্টুনের ইতিহাস দীর্ঘকালের। সময়ের হিসেবে বলা যেতে পারে যে, ভারত থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রে কার্টুনের প্রচলন শতবর্ষেরও আগে। এবং ভারতে আধুনিক কার্টুনের ভিত্তির মূলে বিদেশী ইংরেজদের চিন্তাধারা ও অনুপ্রেরণা উনবিংশ শতক থেকে সক্রিয়।

ভারতীয় পরিবেশে যে আদিম সাময়িক-পত্রগুলি কার্টুনকে অবলম্বন করে এদেশের রাজনীতি ও সমাজের ব্যঙ্গ বিশ্লেষণে অগ্রণী, তা ইংরেজী ভাষার পত্রিকা। যদিও সে বিশ্লেষণে পক্ষপাতিত্বের প্রবল প্রাধান্য তথাপি আধুনিক ভারতীয় কার্টুনের অনু-প্রেরণার মূলে যে ঐ পত্রিকাগুলি একথা অস্বীকারের উপায় নেই। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত সাময়িক কার্টুনের যে সূচনা, বিগত একশ বছরের সুবিস্তৃত অধ্যায়ে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার পত্র-পত্রিকায় তা পল্লবিত হয় ঐ ইংরেজী পত্রিকাগুলির আদর্শে।

শতবর্ষব্যাপী ভারতীয় কার্টুনের বিস্তৃতি বা ক্রমবিবর্তনের এ ইতিহাস ব্যাপক এবং বৈচিত্র্যময়। বিগত যুগের ব্যক্তি, সমাজ ও রাজনীতি এই কার্টুনে চিত্রায়িত হবার ফলে আধুনিক মানুষের কাছে অতীত আজ সুস্পষ্ট। এদিক থেকে এক শতাব্দীর কার্টুনে অতীতের ভারতীয় রাজনীতি এবং সমাজের প্রতিচ্ছবিও সহজ-লভ্য।

ভারতের প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গ মাসিক 'দিল্লি স্কেচ বুক' দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়। লর্ড ডালহৌসী তখন এদেশে গভর্নর জেনারেল। দিল্লির 'দিল্লি গেজেট' প্রেস থেকে 'দিল্লি স্কেচ বুকের' আবির্ভাব ১৮৫০-এর মে মাসে।

শতাধিক বছর আগে ১৮৫০ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত সাত বছরের জীবনে ভারত ও বিশ্বের বহু স্মরণীয় ঘটনার প্রত্যক্ষ-দর্শী 'দিল্লি স্কেচ বুক'। অষ্টাদশ শতকের না হোক, উনবিংশ শতকের অনারেবল জন কোম্পানীর সেই ফৌজী অতীতকে সাহাসে নিরীক্ষণ করেছে সে। নিরীক্ষণ করেছে ভারতের একাধিক অঙ্গরাজ্যের উত্থান ও পতন, জন্ম ও মৃত্যু। প্রত্যক্ষ করেছে বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্যগুলির দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতার স্বপ্ন। এ অবলোকনের প্রতিফলনও ঘটেছে তার দেহে। ফলে কোথাও ব্যঙ্গ, কোথাও কটাক্ষ। কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 'দিল্লি স্কেচ বুক' সেদিন পরোক্ষে ইন্ধনও জুগিয়েছে; কখনও লেখায়, কখনও

'ইণ্ডিয়ান পাঞ্চ'-এর কার্টুনে মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ

কার্টুনে। কোথাও হেসেছে, কোথাও হাসিয়েছে। সঙ্গে দেখেছে ক্রিমিয়া, দেখেছে বর্মা। কোথাও সমর্থন কোথাও আস্ফালন।

এবারডীন থেকে পামারস্টোন, জার প্রথম নিকোলাস থেকে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার। লুই ফিলিপ্পের উত্তর-পুরুষ তৃতীয় নেপোলিয়ন, কোম্পানীর ডালহৌসী থেকে এম্পায়ারের ক্যানিং, সকলকেই 'দিল্লি স্কেচ বুক' ধরে রেখেছে নিজের দেহে। ভারতের মহাবিপ্লব ১৮৫৭-কেও নিরীক্ষণ করেছে সে। সঙ্গে সঙ্গে ভীত ত্রস্ত 'স্কেচ বুক' সে বিদ্রোহ বিনাশের বুদ্ধিও দিয়েছিল। কিন্তু সেই শেষ। কোম্পানীর হাত থেকে ক্রাউনের হাতে ভারত-হস্তান্তর দেখা হয়নি 'দিল্লির'। তার আগেই চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায় তার অট্টরোল। সেকথা সাত বছর পরের ঘটনা। এর পর আর পরিহাসপ্রিয় বিদেশী পাঠকের হাতে 'স্কেচ বুক' দেখা যায় নি। ১৮৫৭-এর মে সংখ্যাই 'স্কেচ বুকের' অন্তিম সংখ্যা।

১৮৫৭-এর ইতিহাসে ২৬শে ফেব্রুয়ারি বহরমপুরে ১৯ নম্বর বেঙ্গল ইনফ্যানট্রির মধ্যে যে অসন্তোষের সূত্রপাত, ব্যারাকপুরে তার ঢেউ এসে লাগে মার্চে। ক্রমশ সে অসন্তোষের আগুন ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ভারতে। আম্বালা ও মীরাটে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে সে অসন্তোষের প্রকাশ নানা নাশকতামূলক কাজে। সঙ্গে লক্ষ্ণৌয় সিপাহীরা যোগ দিল এ বিক্ষোভে। বাদ ছিল দিল্লি, সেখানেও ৫৪, ৭৪ এবং ৩৮তম পদাতিক বাহিনীর সিপাহীরা সক্রিয় হয়ে উঠল বহিরাগত বিপ্লবীদের সঙ্গে। শুরু হল বিপ্লবের তাণ্ডব। সে তাণ্ডবের ক্রোধাগ্নিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল দিল্লির ইংরেজদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। নিষ্কৃতি পেল না ইংরেজদের পরিচালিত 'দিল্লি গেজেটের' প্রেস ও অফিস।

সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রথম উল্লেখ্য কার্টুন পত্রিকা 'দিল্লি স্কেচ বুকের' উপরে নেমে এল অবলুপ্তির কালো যবনিকা। শতবর্ষের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ আর পরা-ধীনতার গ্লানিজর্জরিত বিপ্লবীদের আক্রমণে 'স্কেচ বুকের' সলিলসমাধি হল স্রোতস্বিনী যমুনার কালগর্ভে। কারণ 'দিল্লি গেজেট প্রেস' থেকেই মুদ্রিত হত 'দিল্লি স্কেচ বুক' আর ঐ বাড়িতেই ছিল তার কার্যালয়। 'দিল্লি গেজেটের' অব-লুপ্তির সঙ্গে 'স্কেচ বুকও' অস্তমিত হল সাতান্নর বিদ্রোহে। পরে সংবাদপত্র 'দিল্লি গেজেট' পুনরায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু 'স্কেচ বুক' কখনও নয়।

১৮৫৭-এর ফেব্রুয়ারিতে বহরমপুরে যে বিপ্লবের সূত্রপাত, ১৮৫৮-এর সেপ্টেম্বরে ঘটে তার সমাপ্তি। দেড় বছরের লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেরিলী, ঝাঁসী, আম্বালা, মীরাট আর দিল্লি শান্ত হয়ে এল ক্রমশঃ। শুরু হল স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। সে স্বাভাবিক জীবনকে আরও সহজ করে তুলল ক্লিমেন্সী ক্যানিং-এর ঘোষণা। এক হাবাবে ভাইসরয় ক্যানিং-এর ঘোষণায় ভিক্টোরিয়ার হাতে ভারত-হস্তান্তরের সংবাদে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ফৌজী ইংরেজরা। তাই বোধ হয় তারা আবার নতুন করে হাসতে চাইল। নতুন করে ফিরে পেতে চাইল যমুনার জলে তলিয়ে যাওয়া ব্যঙ্গ সাময়িক 'দিল্লি স্কেচ বুকের' হারানো পৃষ্ঠাগুলি।

ক্যানিং-এর ঘোষণার ঠিক দু মাস পরে (জানুয়ারি ১৮৫৯) দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজ-পরিচালিত ভারতের উল্লেখ্য দ্বিতীয় কার্টুন পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান পাঞ্চ'। অতএব বিদ্রোহের বিস্মৃতিকে ছাপিয়ে যাওয়া 'স্কেচ বুকের' কার্টুনিস্টরা আবার ফিরে এলেন 'ইণ্ডিয়ান পাঞ্চের' পৃষ্ঠায়। ভারতীয়

রাজনীতি, সমাজ ও সাহিত্যের অনেক ঘটনা ও অনেক কথাকে তাঁরা ব্যঙ্গের আবরণে তুলে ধরলেন ইংরেজী ভাষাপ্রধান সমাজের সামনে। পরিণামে 'ইণ্ডিয়ান পাঞ্চ' ইংরেজী পঠনক্ষম সমাজে বিশেষত, সামরিক মহলে, প্রিয় সাময়িকীরূপে চিহ্নিত হয়ে গেল অচিরে।

পত্রিকার আকৃতি, আয়তন ও নীতিতে 'স্কেচ বুক' এবং 'ইণ্ডিয়ান পাঞ্চের' মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। পূর্বসূরী 'স্কেচ বুকের' মত 'ইণ্ডিয়ান পাঞ্চের' প্রকাশন শুরু হল সম্পাদক ও লেখকগোষ্ঠীর নাম গোপন রেখে। এ ছাড়া এদের ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী ও লিথোগ্রাফাররা যে একই ব্যক্তি তার প্রমাণও পাওয়া গেল কার্টুনের স্বাক্ষরে।

প্রিনটার্স লাইনে প্রকাশক পি এ ইলিয়াস ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রতিনিধিকে প্রকাশ্যে হাজির করে নি 'ইণ্ডিয়ান পাঞ্চ'। ইলিয়াসের অন্তর্ধানের পর জনৈক দেবী সহায়কে প্রকাশক হিসাবে দেখা যায়। অনুমান, এরা দুজনেই ছাপাখানার অধস্তন কর্মচারী।

১৮৫৯ থেকে ১৮৬৪ পর্যন্ত 'ইণ্ডিয়ান পাঞ্চের' প্রকাশন অব্যাহত ছিল। প্রথমে এটি ছিল মাসিক, কিন্তু ১৮৬১ থেকে নব-পর্যায়ের 'ইণ্ডিয়ান পাঞ্চ' পাক্ষিক।

১লা এপ্রিল, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের সংখ্যায় দিল্লির 'ইণ্ডিয়ান পাঞ্চ'-এ প্রখ্যাত বাঙালী মহাত্মা রামগোপাল ঘোষকে (১৮১৫—১৮৬৮) ব্যঙ্গ করা হয়েছিল এক পূর্ণপৃষ্ঠা কার্টুনে। উনিশ শতকের বঙ্গ-সমাজের অন্যতম অগ্রণী জননায়ক রাম-গোপাল ঘোষ সুবক্তা হিসেবেও সুপরিচিত। অনন্যসাধারণ বাগ্মিতার জন্য 'ইংলিশম্যান' ওঁকে 'ইণ্ডিয়ান ডেমস্থিনিস' বলে অভি-হিত করেছিল। লণ্ডনে 'টাইমস' তাঁর এক বক্তৃতাকে বলেছিল : "এ মাস্টারপিস অব অরেটরি।"

ডিভিয়ান ডিরোজিও-র ছাত্র রাম-গোপাল সেকালের বহু বিদ্বজ্জনের বাল্য-বন্ধু। "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দেশীয় সভ্য" রামগোপাল 'ইণ্ডিয়ান স্পেক-টেটার'-এর অন্যতম পরিচালক ছিলেন।

রামগোপালের অন্যতম উল্লেখ্য কাজ জন এলিয়ট ড্রিঙ্ক-ওয়াটার বেথুনের সহ-যোগিতা। এ দেশের মেয়েদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে বেথুনের স্কুল স্থাপিত হয় ৬ই নভেম্বর, ১৮৫০। কিন্তু তার আগে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে বেথুনের স্কুলের গোড়াপত্তন মাত্র নয়টি বালিকাকে সম্বল করে। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন বেথুনের সেই স্কুলে। সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল শম্ভুনাথ পণ্ডিত (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি) নিজের কন্যা মালতীকে এঁদের সঙ্গে স্কুলে পাঠিয়েছিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও শম্ভুনাথ পণ্ডিতের কন্যাদের সঙ্গে নিজের মেয়ে হেমলতার হাত ধরে সেদিন রাম-গোপাল ঘোষও এগিয়ে গিয়েছিলেন বেথুনের স্কুলে।

'কালা আইন' বা 'ব্ল্যাক অ্যাক্টের' পরি-প্রেক্ষিতে (১৮৪৯) রামগোপালের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ সংস্কারক, সুবক্তা, সাংবাদিক ও জননায়ক রামগোপাল বাঙলার আদিমতম 'স্টেটসম্যান' বা রাজ-নৈতিক। রামগোপালকে দীনবন্ধু মিত্র চির-স্মরণীয় করে রেখেছেন তাঁর 'সুরধুনী কাব্যে'। রামগোপালের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্ব দীনবন্ধু মিত্রের লেখনীতে উজ্জ্বল। 'সুরধুনীতে' দীনবন্ধু রামগোপালের উদ্দেশে লিখেছেন :

"প্রবল-রসনা রামগোপাল গম্ভীর,
স্বদেশ-রক্ষার ভীম, সদা উচ্চশির,
অসম সাহসে-ভরা, অন্যায়ের অরি,
সভ্যতার সেনাপতি, কল্যাণ কেশরী।"

১৮৬২ থেকে ১৮৬৪, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন রাম-গোপাল। এ সময়ে (২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৪) কলকাতার মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ নিমতলা শ্মশান থেকে শবদাহের ব্যবস্থা অন্যত্র অপসারণের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। কলকাতা মিউনিসিপালিটির এ পরি-কল্পনার নেপথ্যে সরকারের নির্দেশ ছিল। নিমতলা থেকে শ্মশান অন্যত্র অপসারণের চেষ্টায় ধর্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেই বিরক্ত বোধ করেন। কারণ, ভাগীরথীতীর চিরকালই মৃতদেহ সংকারের পক্ষে পুণ্যস্থান। কিন্তু পৌরসভা তথা সরকারের পরিকল্পনায় যদি শ্মশান অন্যত্র অপসারিত হয় তবে ভাগী-রথীর পুণ্য স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হবে সকলে। ফলে কলকাতার হিন্দু সমাজে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

সঠিক খবর জানতে অনেক ধর্মপ্রাণ হিন্দু ব্যবস্থাপক সভার সদস্য রাম-গোপালের স্মরণাপন্ন হন। ফলে রাম-গোপাল সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ব্যবস্থাপক সভায়। 'কলিকাতা নিমতলা ঘাট হইতে শবদাহ উঠাইবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁহার বক্তৃতা সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। বাঙ্গালী ঐ বক্তৃতা জীবনে ভুলিবে না।' ব্যবস্থাপক সভায় রামগোপাল নানা যুক্তি-তর্কের সাহায্যে শ্মশানঘাট স্থানান্তরের বিরোধিতা করেন এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপে নিজের এক অভিজ্ঞতার বিষয় বর্ণনা করেন। সভায় তিনি বলেন যে, আজ সকালে দুজন প্রবীণ ব্রাহ্মণ তাঁর বাড়িতে এসে জানতে চান যে, প্রকৃতই সরকার শ্মশানঘাট অপসারিত করবেন কি না। উত্তরে রামগোপাল গভর্নমেন্টের পরি-কল্পনার সত্যতা স্বীকার করেন। রাম-গোপালের উত্তর শুনে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে যান।

রামগোপালের এ বক্তৃতার সারাংশ যথা-রীতি রাজধানী কলকাতার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং কাউন্সিলের সেই বক্তৃতার প্রেক্ষাপটে সুদূর দিল্লির 'ইণ্ডিয়ান পাঞ্চ' রামগোপালকে ব্যঙ্গ করে এক পূর্ণ-পৃষ্ঠা কার্টুনে। সেই 'অফুল ক্যাটাস্ট্রোফ ইন ক্যালকাটা' কার্টুনের নীচে বিদ্রূপ করে লেখা হয়েছিল :

"An aged Hindoo hearing that he was not to be roasted on the banks of Hooghly fainted right off in Ram Gopaul Ghost's arms.'

কার্টুনের মন্তব্যে লক্ষণীয়, মৃতদেহ সংকারকে 'ইণ্ডিয়ান পাঞ্চ' 'রোস্টেড' বলে বিদ্রূপ করেছে। ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যে রাম-গোপালের পারিবারিক উপাধি ঘোষ বিকৃত করে করা হয়েছে 'ঘোস্ট'। দিল্লি থেকে প্রকাশিত রামগোপালের এ ব্যঙ্গচিত্র ইংরেজদের ভারতবিদ্বেষের এক আদিম দলিল।

রামগোপালের এ কার্টুন যখন প্রকাশিত হয় তখন ভারতের কোন সংবাদপত্রেই কার্টুনের প্রচলন হয় নি। যে দুটি একটি ব্যঙ্গ সাময়িক প্রকাশিত হত তার পরি-চালকবাও ছিলেন ইংরেজ। স্বভাবতই ঐ পত্রিকাগুলিতে ইংরেজ বড়লাট, ছোটলাট, তাঁদের পারিষদবর্গ এবং সামরিক বাহিনীর উচ্চস্তরের কর্তাদের উপলক্ষ করে কার্টুন আঁকা হত। কদাচিৎ কোন ভারতীয়ের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হত এবং সে ভারতীয়-দের মধ্যে দেশীয় রাজন্যবর্গদের স্থানই ছিল সর্বাগ্রে। এদিক থেকে রামগোপালই বোধ হয় একমাত্র ভারতীয় যাঁর ব্যঙ্গচিত্র ইংরেজ-পরিচালিত সাময়িকে স্থান পায়।

দ্বিতীয়ত, নিমতলা শ্মশানঘাট অপ-সারণের প্রেক্ষাপটে রামগোপালের বক্তৃতা কতটা কার্যকর হয়েছিল তার স্বাক্ষর এ কার্টুন। এবং রামগোপালের বাগ্মিতার জন্যেই নিমতলা আজও যথাস্থানে অবস্থিত।

যদিও এ কার্টুন হিন্দুর রীতি ও রাম-গোপালের অনমনীয় ভূমিকার তীব্র বিরোধী তবুও স্বীকার করতে হবে যে, রামগোপালের ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করার ক্ষমতা শাসক ইংরেজদের ছিল না। কার্টুন, তা আক্রমণাত্মক বা প্রশংসাপূর্ণ যাই হোক না কেন, যখন আঁকা হয় তখন স্বীকৃত এবং সর্বজনবিদিত ব্যক্তিকে উপলক্ষ করেই আঁকা হয়। অকিঞ্চিৎকর ঘটনা বা গুরুত্ব-হীন ব্যক্তির স্থান কার্টুনে নেই।

(প্রবন্ধে ব্যবহৃত ব্যঙ্গচিত্রটি জাতীয় গ্রন্থাগারের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

দিল্লির ডায়েরি

সেদিন এখানকার প্রেস ক্লাবে খুব ভিড়, সন্ধ্যের পর। শকুন্তলা দেবী আসছেন, মস্তিষ্ক-চালনায় পৃথিবীবিখ্যাত, ইউরোপ-আমেরিকায় যাঁর নাম দেওয়া হয়েছে "হিউম্যান্ কম্পিউটার"।

যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ, তা যত বড় করেই সাজান না কেন—নস্যি। মুহূর্তে পেয়ে যাবেন উত্তর, এবং ঠিক উত্তর। তাঁর বিশেষ ক্ষেত্র হল কিউব্ রুট ইত্যাদির জটিল অংক, কিন্তু শকুন্তলা দেবী অতি অনায়াসে করেন সমাধান। কিছুদিন আগে এখানকার ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে তাঁর পাশাপাশি রাখা হয়েছিল বিখ্যাত আমেরিকান কোম্পানি আটচিসম্-এর দ্রুত গণনাকারী যন্ত্র। প্রতিযোগিতায় যন্ত্র মানুষকে সেদিন হারাতে পারেনি, যেমনি পারেনি লেবাননের রাজধানী বেইরুটে কয়েক বছর আগে। সেদিন শকুন্তলা দেবীর দুপাশে রাখা হয়েছিল দুটো গণনাকারী-যন্ত্র। সেই বিস্ময়কর ফল।

সন ১৯৫০ থেকে এই জীবন্ত যন্ত্র বৈজ্ঞানিক ও গণিতজ্ঞদের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে লণ্ডনে, নিউইয়র্কে, রোম, সিডনি, টোকিও পৃথিবীর অনেক শহরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিছুদিন হল উনি ফিরেছেন দূর প্রাচ্যের দেশগুলো থেকে।

উনি প্রচুর উপার্জন করছেন বিদেশ থেকে এবং মহীশূরে যিনি একদা ছিলেন একটি অনাথ দরিদ্র বালিকা, আজ সেই শকুন্তলা দেবী শুধু টাকাপয়সা করেছেন তা নয়, খ্যাতনামাও বটেন। বাংগালোরে একটি বাড়ি করেছেন, এবং তাঁর ইচ্ছা কোনো একদিন ঐ বাড়িতেই জীবনের শেষকাল কাটাবেন।

তাঁর একটি বাড়ি আছে লণ্ডনে। সেটি ভাড়া নিয়েছে ভারতীয় হাই কমিশন। একটি ফ্ল্যাটবাড়ি আছে বোম্বাই শহরে। আমাদের এক বন্ধু তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "তোমার অত টাকাপয়সা ইত্যাদি, কী করবে ওসব দিয়ে?"

উনি বললেন, আমি একটা উইল করেছি। আমার সবকিছু দিয়ে বাংগালোরে হবে একটি আধুনিক অনাথ আশ্রম। অনাথ বালকবালিকারা যাতে মানুষ হতে পারে, আমার মতো কষ্ট যেন তারা না পায়।

এখনো বিয়ে-থা করেন নি। মেয়েদের বয়েস নাকি জিজ্ঞেস করতে নেই, তবে মনে হয় ৩০ থেকে ৩৫-এর ভিতর। সন্দেহ নেই, এই বয়সে মানুষ চায়, বিশেষত মেয়েরা, পরিবার ঘরবাড়ি। শকুন্তলা দেবী বলেনঃ কত দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি, কত লোকের সংগে আলাপ পরিচয়। কিন্তু আর যেন ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে না। অনেক সময় নিজেকে অত্যন্ত নিঃসংগী বলে মনে হয়।

তিনি জানান, আমেরিকায় ইউরোপে অনেকে ওঁকে বিবাহের প্রস্তাব করেছেন কিন্তু উনি সম্মতি দেননি। তাঁর মত এই যে, ভারতীয় নারীদের উচিত ভারতীয়দের বিবাহ করা।

কার্টুনিস্ট কুট্টির চোখে
শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী

অনেকেই প্রশ্ন করে : "কী করে এত কঠিন গণনা করেন, আর অত তাড়াতাড়ি?"

উনি বলেন, "কোনো ম্যাজিক অথবা কারসাজি নেই। আবার স্রেফ্ 'ইনটুইশনও' নয়। সংখ্যাগুলো দেখার সংগে আমার মনে অতি দ্রুতভাবে গণনা করার পদ্ধতিগুলো যেন আপনি আপনি চালু হয়ে যায়। মানসিক পদ্ধতি বাদ দিয়ে গণনা নয়। বলতে পারেন, তার সংগে একটা অন্তর্দৃষ্টিও আছে, ইন্সাইট্।"

তিন বৎসরের অনাথা মেয়েটি খেলাচ্ছলে সংগীসাথীদের মনে মনে অংক করে শুনাত। এবং ছয় বৎসর বয়সে প্রথম তাঁর পারদর্শিতা দেখান মহীশূরে বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইস্কুল কলেজে পড়াশোনা করেননি। নিজের পড়াতে যতটুকু হয়। বিদেশ পর্যটনের মাধ্যমেও অবশ্য অনেক কিছু শিখেছেন। বর্তমানে তাই শকুন্তলা দেবীর খুব ইচ্ছা একটু ভাল করে পড়াশোনা করার। ভারতের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে উনি এবার দিল্লি এসেছেন, এবং মন্ত্রণালয়ের যদি একটু কৃপা হয়, তা হলে হয়তো উনি কিছুটা সময় করতে পারবেন তাঁর ঐ বাসনা পূর্ণ করার দিকে। "তা না [illegible] এবার যাব রাশিয়ায়।"

এই দিল্লিতেই একদা সাইকেলে চড়ে অফিসে কাজ করতে যেতেন, যুদ্ধের পর পর। তখন নাকি ছিলেন খুব রোগাটে। মৃদুলা সারাভাই, শোনা যায়, ওঁর দেখাশোনা করেছেন, এবং খুব সম্ভবত উনিই তাঁকে প্রথম বিলেত যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেন। এবং একবার ইউরোপে নাম হলে যা হয়। বিদেশে তো বটেই দেশেও নাম ছড়িয়ে পড়ল।

নাটক নভেল পড়তে ভালবাসেন শকুন্তলা দেবী। সমারসেট্ মম্ আর টলস্টয় খুব প্রিয়। নিজের মাতৃভাষা হল কান্নাড়া।

চমৎকার রান্না করতে শিখেছেন। বিদেশের অনেক রান্না প্রকরণে হাত পাকিয়েছেন, এবং পাঞ্জাবি ও ইতালীয় খানায় নাকি একেবারে দ্রৌপদী। তাঁর অন্য একটা শখ হল ছোট গল্প ও পর্যটন কাহিনী লেখা। বাংগালোরে কয়েকটি কাগজে লেখা বেরিয়েছে।

কলকাতায় আমাদের কাগজের অফিসে একবার এসেছিলেন। রিপোর্টাররা সেদিন অবাক হয়েছিল শকুন্তলা দেবীর পারদর্শিতা দেখে। প্রশ্ন করুন, ১৮৫৭ সনের ১৮ই আগস্ট কী বার ছিল? উত্তরের জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।

মুশকিল শকুন্তলা দেবীর নয়। মুশকিল আসলে প্রশ্নকারীদের। কারণ বড় বড় অংকগুলো আগে থেকে করে নিতে হবে তো, এবং সঠিকভাবে!

খগেন দে সরকার

ব্রিটিশদের ও আমাদের বই পড়ার অভ্যাস

সব দেশেই উপন্যাস পাঠের আগ্রহ সবচেয়ে বেশী। ব্রিটেনের পাঠকদেরও কিছুদিন আগে লন্ডনের 'সোসাইটি অব ইয়ং পাবলিশার্স' একটি অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন, তাতে দেখা গেছে, পাঠক-পাঠিকাদের আগ্রহ অনুযায়ী, উপন্যাসের স্থান প্রথম। উপন্যাসের পরেই স্থান, যুদ্ধ, অ্যাডভেঞ্চার বা আজকালকার ডিটেকটিভ কিংবা গুপ্তচরদের কাহিনীগুলির। জীবনী, স্মৃতিকথা, ভ্রমণ-বিবরণ ইত্যাদির স্থান এর পরপর। ষষ্ঠ স্থান, হাসির গল্প বা রসিকতার সংকলনের। সপ্তম, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব।

এর উল্টোপিঠটা এবার দেখা যাক। বেশী লোক নভেল পড়ে, তাই নভেলের বেশী কপি ছাপা হয়। কিন্তু তা বলে, দেশ জুড়ে শুধু উপন্যাস ছাপার কৃত্রিম উত্তেজনা শুরু হয়নি। গত বছর ব্রিটেনে বই ছাপা হয়েছে ২৮ হাজার ৮ শো ৮৩ খানা। তার মধ্যে, 'সাহিত্য' জাতীয় গ্রন্থ মাত্র ৯১২ খানা—এর মধ্যেই উপন্যাস, রহস্য, ভ্রমণ ইত্যাদি সব কিছু পড়ছে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে ছাপা হয়েছে ১ হাজার ২ শো ২৬ খানা বই; ১৩১৯টি ছাপা হয়েছে ধর্ম ও অধ্যাত্ম দর্শনের বই, রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কিত বই ১৭২০টি।

এর সঙ্গে তুলনা করুন বাংলা দেশের অবস্থা। উপন্যাস, উপন্যাস আর উপন্যাস—এ ছাড়া কোনো কথা নেই। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান কিংবা ইতিহাস সম্পর্কে (স্কুল-কলেজ পাঠ্য বাদ দিলে) কোনো বই ছাপতে গেলে আজ যে-কোনো বাঙালী লোককে প্রাণান্ত হতে হবে, কিংবা নির্ঘাৎ নিজের প্রভিডেন্ট ফান্ড কিংবা স্ত্রীর অলঙ্কার জলাঞ্জলি দিতে হবে। যে-কোনো প্রখ্যাত প্রকাশকের গ্রন্থ তালিকা দেখুন, উপন্যাস ছাড়া অন্য প্রকার বই কখানা আছে! এর বিষময় ফল, বাংলা ভাষা যাঁরা লিখতে জানেন—তাঁরা সবাই উপন্যাস লিখতে ঝুঁকেছেন। সমালোচক এখন নিজস্ব কাজ ছেড়ে সমালোচনার অযোগ্য উপন্যাস লিখছেন, কবিরা কবিতা লেখা ছেড়ে উপন্যাস লেখার অপচেষ্টা করে সময় ক্ষয় করছেন, যাঁর লেখার কথা ভ্রমণ কাহিনী তিনি লিখছেন ভ্রমণ-উপন্যাস, আদালত কিংবা জেলখানার কেস হিসট্রিগুলোকেও শুধু কেস হিসট্রি হিসেবে লিখলে চলে না, উপন্যাস বানাতে হয়। ডাক্তাররা পর্যন্ত রোগী রোগিণীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন উপন্যাস লিখে।

ও দেশের সঙ্গে আমাদের এই তফাতের কারণ বই পড়ার অভ্যেসের তফাৎ। ব্রিটেনে যাঁরা বেশী উপন্যাস পড়েন, তাঁরা যে শুধুই উপন্যাস পড়েন—তা নয়। সময় পেলেই কিছু একটা পড়া ও'দের মজ্জাগত স্বভাব। ট্রেনে, বাসে, কারুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অপেক্ষা করার সময়, এমনকি দাঁত তোলার আগে ওয়েটিং রুমে— কিছু-না-কিছু পড়া একটা জাতীয় স্বভাব এইজন্য খবরের কাগজগুলির বিক্রী অসাধারণ, একজন অপরের কাছে 'একটা শীট দিন তো স্যার' বলেন না। ছুটির দিনগুলো উপন্যাস পড়ার জন্য ধার্য, দূরে যাবার ট্রেনে রহস্য কাহিনী, এইভাবে কিছু কিছু অন্যান্য বই পড়ারও সময় হয়ে যায়। যে-উপন্যাস পড়ে, সে দেশের কবিতা বা বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে কিছুই জানে না—এগুলো অস্বাভাবিক। লাইব্রেরী থেকে বই আনার অভ্যেস প্রায় সকলেরই। অন্যদিকে, আমাদের দেশের শিক্ষিত পুরুষদের লাইব্রেরীর সঙ্গে যোগাযোগ খুব কম। বহু শিক্ষিত পরিবারে মাসের পর মাস একটিও বই আসে না। অনেক ক্ষেত্রেই লাইব্রেরী থেকে চাকর বা বাড়ির ছেলেদের দিয়ে বই আনান বাড়ির মেয়েরা, দুপুরের জন্য, যে-কোনো বই, অর্থাৎ যে-কোনো উপন্যাস বা টানা গল্প, এমনকি ছোট গল্প দেখেও তাঁরা বিরক্ত হন, ইতিহাস বা দর্শনের কথা দূরে অস্তু। এই সব গৃহস্থ বধূ কিন্তু আগেকার সেই বৃত্তি পরীক্ষা পর্যন্ত পড়া মেয়েরা নন, ভিলাই-দুর্গাপুরে-রাউরকেল্লা-সিন্দ্রী-কলকাতার হাজার হাজার অফিসারদের স্ত্রীরা আজকাল অন্তত সিনিয়ার কেম্ব্রিজ বা স্কুল ফাইন্যাল পাস, তাঁরা সবাই ইংরাজী সিনেমা দেখেন, এবং অন্তত খানদশেক রবীন্দ্র সঙ্গীত জানেন, তাঁরা সবাই আধুনিকা, এমন কি 'ওয়োম্যান অ্যান্ড হোম' জাতীয় ম্যাগাজিন দেখে তাঁরা ঘর সাজান, কিন্তু বই ছোঁন না, ছুঁলেও শুধু উপন্যাস। তাঁদের স্বামীরা ক্লাবে বা তাসের আড্ডায় কোনো হাল্কা মাসিক পত্রিকা উল্টেই বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে যান। এ'রাই যখন কোনো অবাঙালী বন্ধুর সঙ্গে গল্প করবেন, তখন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে গদগদ হয়ে উঠে ঘোষণা করবেন, বাংলা সাহিত্য এখনো ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ, এমনকি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ, আওয়ার পোয়েট টেগোর—ইত্যাদি। অথচ লাইব্রেরীগুলোর দুর্দশা চোখে দেখা যায় না।

ব্রিটেন অতটুকু দেশ, জনসংখ্যা আমাদের চেয়ে কত কম। কিন্তু সে দেশে ১ কোটি ৮০ লক্ষ লোক নিয়মিত লাইব্রেরী থেকে বই আনেন পড়তে। লাইব্রেরীতে সমগ্র বইয়ের সংখ্যা ৮ কোটি। দূর গ্রামাঞ্চলের জন্যও ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী আছে ৩৫০টা। প্রত্যেকটি স্কুলে লাইব্রেরী থাকা আবশ্যিক। এ ছাড়া ব্যক্তিগত সংগ্রহ, বই কেনা এবং

উপহার দেওয়া—সামাজিকভাবে বেঁচে থাকার অঙ্গ।

বই পড়ার অভ্যেসেরও পাঠকের অবস্থা অনুযায়ী তারতম্য আছে। যাঁরা ১৬ বছর বয়েসের আগেই স্কুল ও লেখাপড়া ছেড়েছেন, ব্রিটেনে যাঁদের প্রায় অশিক্ষিতই বলা যায়, যাঁদের শখের তালিকায় বই পড়ার স্থান চতুর্থ এবং উপন্যাসই বেশী পড়েন। যাঁরা ১৯ বছরেরও পড়ে কলেজে যাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে এই পড়ার অভ্যেস অনেক বেশী, এবং এ'রা মোটামুটিভাবে দর্শন, ধর্ম, কবিতা এবং নাটকের বইয়ের সম্পর্কে খবর রাখেন।

তুলনা করুন, আমাদের দেশের বি এ পাস ছেলেমেয়েদের সঙ্গে—স্কুল কলেজের বাইরে ক'জন ওসব বিষয়ে আলাদা বই পড়েছেন? এমন কি, শিক্ষক-অধ্যাপকদের অবস্থাও জানি, ইংরেজির শিক্ষক খবর রাখেন না বাংলা সাহিত্যের, ভূগোলের শিক্ষক পড়েন না ভ্রমণ কাহিনী, ইতিহাসের শিক্ষকও পাঠ্যবই ছাড়া অন্য ইতিহাসের বই পড়া অবান্তর মনে করেন। বিজ্ঞানের শিক্ষকদের কথা তো সাধারণভাবে বাদই দিচ্ছি। পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ছিলেন সাহিত্যে আসক্ত, আর এখন বিজ্ঞানের ছাত্র কিংবা অধ্যাপকদের কাছে সাহিত্য অস্পৃশ্য। আমার কোনো বন্ধু—এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের অধ্যাপক, তিনি একদিন "সঞ্চয়িতার" পাতা ওল্টাচ্ছিলেন, আমি প্রশ্ন করেছিলুম, কি রে, কি বই পড়ছিস? তিনি গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, আর্টসের বই পড়ছি।

বই পড়ার অভ্যেস প্রসঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। দুঃখ-দুর্দশার দিনেই মানুষের বেশী বই পড়তে ইচ্ছে হবার কথা। সামর্থ্য? মাসে আট আনা চাঁদা দিলে যে কোনো লাইব্রেরী থেকে প্রতিদিন একখানা বই পাওয়া যায়। প্রতি পরিবারে যদি একজন দু'জন লাইব্রেরীর সদস্য হতেন, তাহলে বাংলা দেশের লাইব্রেরীগুলো এবং পুস্তক প্রকাশনার রূপ অনারকম হতো।

ভ্রমণ কাহিনী সম্পর্কে রুচির ব্যবধানটাও কৌতুহলজনক। আমাদের দেশের ভ্রমণ কাহিনীগুলো কেন এখন ভেজালে ভর্তি, হিমালয়ের চূড়াতেও কেন বালিগঞ্জের সংলাপ এবং তরুণী মেয়ের ন্যাকামির রগরগে গল্প থাকছে, আর কেন ওদের ভ্রমণ-কাহিনীগুলো এখনো অমলিন ও সরস। আমাদের দেশের পাঠক ভ্রমণকাহিনীতে চাইছেন অবরুদ্ধ বাসনা মেটাতে, যে-খানে নিজের কোনোদিন যাবার সাধ্য নেই, গ্রন্থের মধ্য দিয়ে সেখানে ঘুরছেন—সুতরাং লেখকও পঙ্গু পাঠকের কল্পনার জন্য সব-কিছুর ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, কী সুন্দর প্রকৃতি, আর সুন্দরী মেয়েদের ফটাফট প্রেম। কিন্তু, ওরা ভ্রমণকাহিনী লেখেন—সত্যি সত্যি অপরকে সে-দেশে বা অঞ্চলে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করার জন্য। তাই বিবরণ হয় যথাযথ। ও দেশে সাধারণত তরুণ-তরুণীরাই ভ্রমণকাহিনী বেশী পড়েন, যখন তখন যাঁরা দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তে পারেন, এবং ধনী ব্যক্তিরা। ৬৫ বছর পার হয়ে গেলে আর সাধারণত ও'রা কেউ ভ্রমণকাহিনী পড়তে চান না।

"(বিশেষ গোপনীয়)

লেখার জনপ্রিয়তা বাড়াইবার জন্য কি কি করিবেন।

(ক) একটি গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক ঘটনা গল্পের ভিতর ঢুকাইয়া দিবেন।

(খ) খানিকটা রাজনীতি (ফিকা গোছের) গল্পের ভিতর যেন স্থান পায়।

(গ) সাধারণ-বুদ্ধিতে অবিশ্বাস্য বা অসম্ভাব্য মনে হইলেও স্থূলে নাটকীয় উপাদান বহুল পরিমাণে গল্পের ভিতর দিতে ভুলিবেন না।

(ঘ) শোষক ও শোষিতের সংঘর্ষের কথা যেমন করিয়া হউক গল্পের ভিতর আনিতে চেষ্টা করিবেন।"

প্রশ্ন : পাঠক বলুন তো, কোন্ বিখ্যাত বাঙালী লেখকের একটি বইয়ের শেষ পাতায় এই কথাগুলো আছে?

সূত্র : এই কথাগুলো কৌতুক করে লিখেছিলেন এমন একজন বাঙালী লেখক, যিনি নিজে সারা জীবনে নিজের রচনায় এর একটিও ব্যবহার করেন নি, যিনি জনপ্রিয়তার যে-কোনো সুলভ প্রচেষ্টা থেকে চিরকাল দূরে ছিলেন।

এটা ধাঁধা নয়, সুতরাং উত্তর পাঠাবার কোনো দরকার নেই। যিনি জানেন, তাঁর পক্ষে মনে মনেই জেনে রাখা ভালো।

সনাতন পাঠক

একটি আবেদন

সবিনয় নিবেদন,

নিম্নলিখিত অনুরোধটি আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে পাঠক সাধারণের গোচর করলে বিশেষ উপকৃত হব।

আমার মাতামহ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য পত্রিকায় ও গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথের যে সব লেখা ছড়িয়ে আছে, অথবা অবনীন্দ্র-লিখিত কোনো চিঠি যদি কারো কাছে থাকে, তা নকল করে আমার ঠিকানায় পাঠালে তা রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করে সুখী হব।

বিনীত

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

গুপ্ত নিবাস

বেলঘরিয়া

কলিকাতা—৫৬

সংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য

530 Questions on the subjects Requiring investigation in the social condition of the people of India. Reverend James Long, Edited by Mahadeva Prasad Saha. Indian Publications, 3, British Indian Street, Cal.1. Price Rs. 10.50; $ 2.75 13 sh. ..

A Comparative Study of a Bengal Folk-tale. Dipl. Theol. Ralph Troger. Indian Publications Calcutta-1. Price Rs. 14.50; $5.

New India: Raiharan Chakrabarti, 124/1, B. L. Saha Road, New Alipore, Calcutta-53. Price 2.00

জেমস লঙের বইটি ১৮৬২ সালে বেথুন সোসাইটির উদ্যোগে বার হয়েছিল। বাংলার সংস্কৃতি চর্চায় বেথুন সোসাইটির উদ্যম স্মরণীয়। ভারতবাসীর সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটনে যে বিভিন্ন প্রশ্নের সামনে আসতে হয় সেগুলির একটি বিস্তৃত তালিকা জেমস লঙ প্রস্তুত করেছিলেন। বিদ্যাচর্চায় আগ্রহ এবং কৌতূহল অনেকেরই থাকে। কিন্তু এই চর্চা কোন পথে অগ্রসর হলে ফলপ্রদ হতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা অনেকেই অবহিত নই। সেদিক থেকে লঙ-এর এই প্রশ্নাবলী সংস্কৃতি চর্চায় অগ্রসর হবার একটা উপায় রূপে গৃহীত হতে পারে। 'ভূমিকাতে পাচ্ছি, *It would shew them that natives can talk and think of other subjects besides rupees, while on the otherhand the natives would see that the Sahibs are not mere indigo, tea and coffee producing machine,—then the asperities arising from antagonism of race would be softened* প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করবার সময় লঙ এরকম [illegible] হয়েছিলেন। যে সকল প্রশ্ন তিনি তৈরী করেছিলেন তা যেমনি ব্যাপক তেমনি তার দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। দেশ ও দেশকে জানবার যে আগ্রহ উনিশ শতকে [illegible] বাঙালীর চিত্তে দেখা দিয়েছিল [illegible] বহুক্ষেত্রে প্রণালী লঙ নির্দিষ্ট করে দিলেন। আদিবাসীদের জীবনযাত্রা থেকে দেশীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে কৌতূহল পর্যন্ত মোট আটচল্লিশটি অংশে বিভক্ত করে জেমস লঙ ৫০০টি প্রশ্ন তৈরী করেছিলেন। বলা বাহুল্য এ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেলে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির বিপুল ঐশ্বর্য প্রকাশিত হতে পারে। বিশেষত ভারতবর্ষের জীবনযাত্রা এখন দ্রুত পরিবর্তনমুখী। এই পরিবর্তনের ফলে অতীত জীবনযাত্রা বিলুপ্তপ্রায়। সে ইতিহাস উদ্ধারের প্রয়োজন এখন গুরুতর। এ কাজে বেথুন সোসাইটি অগ্রসর হয়েছিল। সেকালে আরও অনেক জ্ঞানী গুণীও একাজে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় লঙ-প্রণীত প্রশ্নের উত্তর এখন পর্যাপ্ত পাওয়া যায় নি। তথাপি অনুসন্ধানের যে প্রণালী জেমস লঙ বেঁধে দিয়েছিলেন তার কিছু পরিবর্তন কিছু পরিবর্ধন সাপেক্ষে এখনও যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণের দাবি রাখে। গ্রীয়ারসন যখন কাজে নেমেছিলেন তিনিও তখন এলোমেলো ভাবে না এগিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। আমরা লঙের কাছ থেকে সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি লাভ করেছিলাম। মহাদেব প্রসাদ সাহা জেমস লঙের সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবিষ্ট করে এই 'বড়ো ইংরেজের' পরিচয় দিয়েছেন। Introduction অংশটি উন্নত মানের পরিচায়ক নয়। বাংলার সংস্কৃতি চর্চায় যাঁরা মূল্যবান অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে Introduction-এর লেখক পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ ত্রুটি পীড়াদায়ক।

লোক সাহিত্য সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীর কৌতূহল খুব বেশী দিনের নয়। কিন্তু [illegible] এই শাখা উপেক্ষিত হলেও [illegible] বিচ্ছিন্ন গ্রন্থ সাম্প্রতিক কালে [illegible]। প্রধানত সংগ্রহ কাজে গবেষকরা এখন মনোনিবেশ করেছেন। একথা ঠিকই, এখন লোককথা, গাথা, ছড়া, গান, প্রবাদ প্রবচন সংগ্রহ করা আমাদের [illegible] দায়িত্ব। সেক্ষেত্রে যে পরিমাণ [illegible] নিষ্ঠা ও অর্থের প্রয়োজন তা ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। কোনো প্রতিষ্ঠানের মারফৎ সেকাজ চলতে পারে। সরকারী সাহায্যও বাঞ্ছনীয়। Ralph Troger-এর আলোচনা গ্রন্থ পড়ে এই কথাগুলি মনে হল। Ralph Troger জার্মান পণ্ডিত। কিন্তু তিনি বাংলার সুখু দুখু গল্পটির যে তুলনামূলক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তা যেমনি প্রণালীর দিক থেকে বিস্ময়কর তেমনি নানা লোককথার সঙ্গে এই গল্পটির সাদৃশ্য আবিষ্কারে চমকপ্রদ। পৃথিবীর লোককথাগুলি কোনটি আগে সৃষ্ট কোনটি পরে সে বাদানুবাদে প্রবেশ না করেও একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে, লোককথাগুলি যে Motive থেকে জাত তা জনসাধারণের সম্পত্তি। অনেক সময়েই তা দেশকালাতীত। অবশ্য আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে থাকবেই। Ralph Troger-এর তথ্যভূয়িষ্ঠ আলোচনা একটা বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে যে লোক-সাহিত্য আলোচনায় উন্নততর গবেষণার মান সৃষ্টির প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে আমাদের সচেতন হবার প্রয়োজন আছে। নানা কারণে বাংলা রচনায় (সব আলোচনা নিশ্চয়ই নয়) উচ্ছ্বাসের মাত্রা কিঞ্চিৎ বেশী, পল্লবগ্রাহী মনোবৃত্তি দুর্লক্ষ্য নয়। এসব ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে গেলে যে পরিমাণ মিতভাষণের প্রয়োজনতা Ralph Troger-এর গ্রন্থে লভ্য। এ আমাদের অনুকরণের বিষয়। জার্মান পণ্ডিতবর্গ বৈদিক সাহিত্য

সম্বন্ধে যে গবেষণা করেছেন আজও তা আমদের কাছে ভাষান্তরিত না হওয়ার ফলে প্রায় অজ্ঞাত। কিন্তু সুখের বিষয় Indian Folklore Society এই জার্মান গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশ করে ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছে। এই বইটি পড়ে তরুণ বাঙালী গবেষকবৃন্দ যদি উৎসাহিত হন তবেই প্রকাশকের শ্রম সার্থকতায় মণ্ডিত হবে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতবাসীর সুবিপুল আশা কিছুটা সার্থকতা লাভ করেছে। নবীন ভারতবর্ষের গতি ও লক্ষ্য কোন পথে তা স্পষ্ট না হলেও বিভিন্ন চিন্তানায়কের মতামতকে সমীহ করেই ভারতের অগ্রগতি সূচিত হচ্ছে। রাইহরণ চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে ভারতবর্ষের কয়েকটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। শ্রমিক সমস্যা, অস্পৃশ্যতা, গ্রামব্যবস্থা এগুলি তার মধ্যে অন্যতম। গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের কথাও সংক্ষেপে লেখক বিবৃত করেছেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী সমস্যাগুলির গভীরে প্রবেশ করবার প্রয়াস পেয়েছেন এবং নিজস্ব সমাধানও দিয়েছেন। লেখক আদর্শবাদী। লেখায় তথ্যবিবৃতি বিশেষ নেই। সেজন্য সমস্যাগুলিরও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ নেই। লেখাতে আবেগ-উচ্ছ্বাস ঈষৎ পীড়া দেয়।

৫।৬৭, ৪।৬৭, ৩০২।৬৫

পত্রিকা

মানব মন। (জুলাই ১৯৬৭)। সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রতি সংখ্যা ১·০০ টাকা।

মনস্তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের আধুনিক ধারা পরিচায়ক এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশন বাংলা দেশে মনস্তত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্ব চর্চার একটা মস্তবড় অভাবকে দূর করতে সচেষ্ট হয়েছে। নবেন্দু চক্রবর্তীর লেখা আধুনিক বাংলা কবিতায় বিচ্ছিন্নতা, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের লোকগাথার মনস্তত্ত্ব এবং ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অস্তিবাদ ও স্কিসজোফ্রেনিয়া এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। আমরা এই পত্রিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রাপ্তি স্বীকার

রবীন্দ্রনাথের রাজা। শ্রীসুবোধ ভট্টাচার্য। সাহিত্য প্রকাশ ঃ ৪৭/২ রামেন্দ্রপ্রসাদ মজুমদার লেন, হাওড়া। মূল্য ৪·০০।

রাত্রির বিলাপ। আবদুর রউফ। বুলবুল ঃ দেবকুণ্ডু, মুর্শিদাবাদ। মূল্য ২·০০।

জীবন সমুদ্র। সুশীলকুমার সরকার। বিষ্ণুপদ সরকার ঃ ২৯ হজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪। মূল্য ২·০০।

সমর্পিতা। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়। প্রফুল্ল গ্রন্থাগার ঃ ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·০০।

আর্লিন পার্কের রাত্রি। দেবদূত। প্রফুল্ল গ্রন্থাগার ঃ ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·০০।

মানুষ যখন পশু হয়। বীরু চট্টোপাধ্যায়। প্রফুল্ল গ্রন্থাগার ঃ ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৪·৫০।

মুকুল ও বকুল। শ্রীগোষ্ঠবিহারী রাণা। সুভাষপল্লী জনকল্যাণ বিদ্যায়তন ঃ খড়্গপুর, মেদিনীপুর। মূল্য ২·০০।

অতলান্তি। গৌতম ঘোষ। বাণী বীথি ঃ ৯৯ হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য ৭·০০।

বিষ হয়নি ক' অমৃতে। অলকেন্দুশেখর পত্রী। সাহিত্যশ্রী ঃ ১৮ টেমার লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য ৬·০০।

জন্মমাটি। আশাপূর্ণা দেবী। মুখো অ্যান্ড কোম্পানী ঃ ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৬·৫০।

পায়ে পায়ে বাঁকা। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। ডি এম লাইব্রেরী ঃ ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১০·০০।

খোলা মন ও খোলা দরজা। অন্নদাশঙ্কর রায়। ডি এম লাইব্রেরী ঃ ৪২ কর্ণ-

ওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৮·০০।

অবগুণ্ঠিতা। আশাপূর্ণা দেবী। ডি এম লাইব্রেরী : ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৫·৫০।

অপরিচিতের নাম। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডি এম লাইব্রেরী : ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৪·৫০।

জন্মমৃত্যু (২য় খণ্ড)। শ্রীকৃষ্ণ সংঘ : পি ৪৮১ কেয়াতলা, কলিকাতা-২৯। মূল্য ৪·০০।

শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ। শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ। শ্রীকৃষ্ণ সংঘ : পি ৪৮১ কেয়াতলা, কলিকাতা-২৯। মূল্য ৬·০০।

এতটুকু ভুল। দিব্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড : ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য ৩·০০

বিবেকানন্দের বিজ্ঞান চেতনা। ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী : ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৬·০০।
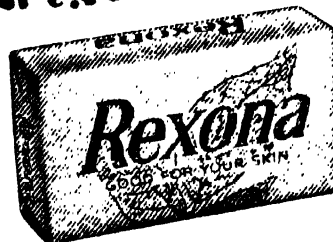
মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার গ্রুপ লীগের খেলা থেকে ভারতকে বিদায় নিতে হলেও অস্বীকার করবার উপায় নেই, ভারত আশাতিরিক্ত ভাল খেলে বিদায় নিয়েছে। আশাতিরিক্ত বলছি এই কারণে যে, যেভাবে ভারতের দল গড়া হয়েছিল তাতে এ ফলাফল আশা করা যায় নি। নিঃসন্দেহে এর চেয়ে শক্তিশালী করে দল গড়া যেত। বেশীর ভাগ নবীন খেলোয়াড় নিয়ে গড়া দল যে ভাল খেলেছে এবং ভাগ্য একটু সহায় থাকলে এই দল অন্তত সেমি-ফাইনালে খেলতে পারত—এ কথা অনস্বীকার্য।

দুই ভাগে বিভক্ত ১১টি দলের গ্রুপ লীগে ভারতকে ৬টি দলের 'এ' গ্রুপে খেলতে হয়। ফলে ভারতকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় পাঁচটি খেলায়। থাইল্যাণ্ডের সংগে ভারতের প্রথম খেলা ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। দ্বিতীয় খেলায় ভারত ৩—১ গোলে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াকে এবং তৃতীয় খেলায় হংকংকে ৪—০ গোলে পরাজিত করে। মালয়েশিয়ার সংগে চতুর্থ খেলাটি গোলশূন্য থাকে। শেষ খেলায় গতবারের মারডেকা বিজয়ী দক্ষিণ ভিয়েতনামের কাছে ভারতকে ১—০ গোলে হার স্বীকার করতে হয়। এখানে বলা যেতে পারে, গত বছরের মারডেকা প্রতিযোগিতার গ্রুপ লীগে ভারত দক্ষিণ ভিয়েতনামকে পরাজিত করেছিল এবং প্রতিযোগিতায় পেয়েছিল তৃতীয় স্থান।

'এ' গ্রুপের ছয়টি দলের মধ্যে সেমি-ফাইন্যালে খেলার সুযোগপ্রাপ্ত দক্ষিণ ভিয়েতনাম এবং মালয়েশিয়া অবশ্যই দুটি শক্তিশালী দল। কিন্তু মজার ব্যাপার এই, দুটি দলের সংগে খেলাতেই ভারতের খেলোয়াড়রা যথেষ্ট প্রাধান্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং ভাগ্যের বঞ্চনায় বিজয়ী হতে পারেন নি।

ভাল খেলে পরাজয় স্বীকার কথাটা কানে কটু শোনায়। কিন্তু খেলার বিবরণ বলে, ভারত সত্যিই দক্ষিণ ভিয়েতনামের সংগে ভাল খেলে হেরে গিয়েছে। খেলার বিবরণ থেকে আরও পাচ্ছি, ইন্দার সিং ও অশোক চ্যাটার্জীর দ্বারা রচিত একটি সংঘবদ্ধ সুন্দর আক্রমণ দক্ষিণ ভিয়েতনামের খেলোয়াড়রা পেনালটি সীমার মধ্যে অবৈধ-ভাবে আটকিয়ে দিলেও রেফারি পেনালটির নির্দেশ দেন নি, আর ভিয়েতনামের সেণ্টার ফরোয়ার্ড গুয়েন ভ্যান চিউ দুইজন ভারতীয় ব্যাকের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় বরমার রেফারি ভারতের বিরুদ্ধে পেনালটির নির্দেশ দিয়েছেন। এবং সেই পেনালটি থেকেই ভিয়েতনাম জয়সূচক গোল করেছে।

পেনালটি গোলে জয় নিশ্চয়ই বিজয়ী দলের গৌরব খর্ব করে না। কারণ, পেনালটি খেলারই আইন। এমনও হতে পারে, রেফারি যোগ্য কারণে ভারতের পক্ষে পেনালটির নির্দেশ দেন নি, ভিয়েতনামের সপক্ষে দিয়েছেন। তবে রেফারির পরিচালনায় ভারতের খেলোয়াড়রা এবং সমর্থকগণ যে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, পাঁচ মিনিট খেলা বন্ধ থাকা এবং খেলার পরে পুলিসের সাহায্যে রেফারিকে মাঠ থেকে বার করার ঘটনায় সে কথা প্রমাণিত।

শুধু দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে নয়।

মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের ইন্দার সিং পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গোল করছেন। বলটি হেড করবার জন্য পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ব্যাকের ব্যর্থ প্রচেষ্টা

শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাবের সাঁতার

(বাম দিক থেকে) সুস্মিতা পাল, অপু ব্যানার্জি ও স্বাতী দত্ত ॥

রাজ্যপাল হরিনারায়ণ দাসের গলায় পদক পরিয়ে দিচ্ছেন ॥

রাজ্যপালকে মালা পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ॥

ক্রীড়াকীর্তি

লিজেল ওয়াটারম্যান

না ম লিজেল ওয়াটারম্যান। নামের পদবী দেখে মনে হতে পারে পুরুষমানুষ। চেহারাও সেই সাক্ষ্য দেয়। একটু বড় চুল বিট্‌লেদের ছাঁটে কাটা বলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী পশ্চিম জার্মানীর এই ডিসকাস ছুঁড়িয়ে কিন্তু বাইশ বছর বয়সী এক মেয়ে।

কী সুন্দর স্বাস্থ্য, পেশীর বাঁধুনি! দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। যেন শ্বেত মর্মরে তৈরী গ্রীক ভাস্কর্যের এক জীবন্ত মূর্তি। তুলে এনে কোন পার্কে বসিয়ে দিলে পার্কের শোভা বাড়ে. মানুষের সৌন্দর্যসত্তাকে আলোড়িত করে।

কিন্তু সৌন্দর্যের চেয়ে সুনাম অর্জনেই আগ্রহ বেশী পশ্চিম জার্মানীর এই রমণীয় ক্রীড়াপটু রমণীর। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন। এখন ডিসকাস ছোঁড়ায় পৃথিবীর প্রথম রমণীর সম্মান পাবার সাধনায় মগ্ন। যদিও বিশ্ব রেকর্ড এখনও ও'র অনায়ত্ত, তবু বর্তমানে ডিসকাস ছোঁড়ায় ও'র স্থানই সবার উপরে। ক্রমপর্যায়-তালিকায় শীর্ষস্থান।

ফেডারেল রিপাবলিক চ্যাম্পিয়নশিপে চারবার ডিসকাস ছুঁড়েছেন ৫৭ মিটারের (১৮৭ ফুট ১ ইঞ্চি) উপরে। বুদাপেস্টে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ১৮৮ ফুট ৭ ইঞ্চি দূরে ডিসকাস ছুঁড়ে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন। ইন্টার কন্টিনেন্টাল অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় যোগ্যতার পরীক্ষার জন্য আয়োজিত ইস্ট বার্লিনের প্রথম প্রতিযোগিতায় ডিসকাস ছুঁড়েছিলেন ১৯০ ফুট ৩ ইঞ্চি দূরে। কলোন, কিয়েভ, মস্কো, মন্ট্রিল, হাঙ্গেরী, ডর্টমুন্ড—কোন জায়গাতেই লিজেল ওয়াটারম্যানের ডিসকাসের দূরত্ব আন্তর্জাতিক মানের নীচে নামেনি এবং প্রায় সব জায়গাতেই ও'র প্রথম স্থান। আশা করা যায়, টোকিওতে যে বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিকসের আসর বসছে ওখানেও লিজেলের গলাতেই উঠবে স্বর্ণপদক।

লিজেল গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। ওখানে সাধারণ শিক্ষা এবং ফিজিক্যাল এডুকেশন দুই বিভাগেই ও'র ক্লাস। পরীক্ষার পড়াশুনোয় ব্যস্ত থাকায় গত বছর ভাল অনুশীলন না করেও এ বছর এত ভাল

ফলাফল করছেন কিভাবে, লিজেল নিজে তার কোন কারণ বলতে পারেন না।

'সম্ভবত শুধু ডিসকাসকে আঁকড়ে ধরে না থেকে জিমন্যাস্টিকসের চর্চাই আমার সফল্যের কারণ'—লিজেলের উত্তর।

লিজেল আরও বলেছেন, 'আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শক্ত-সমর্থ করার দিকে বেশী দৃষ্টি না দিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোমলতার দিকে দৃষ্টি দিলে আরও ভাল ফল পাওয়া যায়। বোধ হয় জিমন্যাস্টিকটা ভালভাবে করেছিলাম বলেই আমি ডিসকাস ছোঁড়ায় এখন আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। গোড়া থেকে আমি গতির দিকেও নজর রেখেছি।'

খেলাধুলার যে-কোন বিষয়ে সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে জিমন্যাস্টিকস যে কত প্রয়োজন, লিজেল এখন মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। তাই তাঁর ইচ্ছা, ভবিষ্যতে জিমন্যাস্টিকসের মিস্ট্রেস হবেন।

লিজেল ওয়াটারম্যানের বাবা ও কাকা ছিলেন নামকরা অ্যাথলীট। তাঁদের অনুপ্রেরণায় ও'র খেলাধুলায় চর্চা। টি এস ভি সুলিঙ্গেন ক্লাবে প্রথম শিক্ষা। পরে পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত ক্লাব হ্যানোভার ৯৬-এ যোগদান।

ডিসকাস ছোঁড়ায় সর্বকালের শ্রেষ্ঠা সোভিয়েট রাশিয়ার তামারা প্রেস হচ্ছেন লিজেলের আদর্শ। ১৯৬০ থেকে আরম্ভ করে রাশিয়ার এই শক্তিময়ী নারী ৬ বার লিজেলের চেয়ে বেশী দূরে ডিসকাস ছুঁড়ে-নিজের বিশ্ব রেকর্ড উন্নত করেছেন। তিনি যখন প্রথম বিশ্ব রেকর্ড করেন তখন তাঁর ডিসকাসের দূরত্ব ছিল ১৮৭ ফুট ৬ ইঞ্চি। আর এখন তাঁর বিশ্ব রেকর্ড ১৯৫ ফুট ১১ ইঞ্চি (৫৯·৭ মিটার)।

তামারা প্রেস ছাড়া আর মাত্র দুজন লিজেলের চেয়ে বেশি দূরে ডিসকাস ছুঁড়েছেন। লিজেল ইতিমধ্যেই ১৯০ ফুটের গণ্ডি ডিঙিয়েছেন। আসর যদি আন্তর্জাতিক হয়, সঙ্গে যদি সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিনী থাকে, তবে লিজেল ডিসকাস ছোঁড়ায় আরও বেশী উৎসাহ পান। এবং হিসাব নিয়ে দেখা গিয়েছে, ছোট আসর এবং সাধারণ ধরনের প্রতিযোগীর বিরুদ্ধের চেয়ে বড় আসর এবং বিশ্ববরেণ্যাদের বিরুদ্ধে ও'র সাফল্য অনেক বেশী।

লিজেল মনে করেন, ভাগ্যের একটু সহায়তা, বাতাসের একটু আনুকূল্য এবং বেশ কিছুটা আত্মবিশ্বাস বজায় রেখে প্রতিযোগিতা করতে পারলে মহিলাদের পক্ষে ডিসকাস ছোঁড়ায় ৬০ মিটারের বেড়া ভাঙা সম্ভব। ৬০ মিটারের বেড়া ভাঙায় লিজেল ওয়াটারম্যানই পৃথিবীর প্রথম মহিলা?

অভিজ্ঞতা অর্জন এবং অনুশীলনের রেওয়াজ বজায় রাখার জন্য প্রতি আন্তর্জাতিক আসরের ডাকে সাড়া দিলেও লিজেলের এখন দিন-রাতের স্বপ্ন আগামী মেক্সিকো অলিম্পিক। কাল্পনিক দ্বন্দ্ব তামারা প্রেসের রেকর্ড ভাঙার জন্য মনে মনে রঙীন কল্পনা।

মুকুল

রঙ্গজগৎ

মেনুহিন ও রবিশঙ্কর

আমেরিকায় রবিশঙ্কর

আমেরিকায় পণ্ডিত রবিশঙ্করের শিষ্য-শিষ্যার সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। তাঁদের মধ্যে খ্যাতিমান ব্যক্তিরাও রয়েছেন। যেমন, জাজশিল্পী ডি ব্রুবেক এবং বিটল-শিল্পী জর্জ হ্যারিসন।

বিদেশে রবিশঙ্করের সব চাইতে বড় গুণগ্রাহী সম্ভবত বিখ্যাত বেহালা-বাদক ইহুদি মেনুহিন। গত বছর মেনুহিনের আগ্রহে রবিশঙ্কর বিলাতে বাথ ফেস্টিভ্যালে বাজান। সেটি ছিল উভয়ের যুগলবন্দী বাজনা। বাজনার আগে দু দিন ধরে মেনুহিন রাগের তালিম নেন রবিশঙ্করের কাছে। শিল্পীদ্বয় এই যুগলবন্দী বাজনাকে বলেছেন "এক্সপেরিমেন্ট"। এঁদের সেতার-বেহালা বাজনা রেকর্ড করা হয়। আমেরিকায় এই রেকর্ড পৌঁছেছে। প্রথম ছয় সপ্তাহে পনেরো হাজার কপি রেকর্ড বিক্রি হয়েছে। এ থেকেই আমেরিকায় রবিশঙ্করের জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায়। আমেরিকা থেকে প্রেরিত নীচের লেখাটিতে ওই দেশে রবিশঙ্করের প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির পরিচয় পাওয়া যাবে।

অগ্রদূতের "কখনো মেঘ" ছবিতে উত্তমকুমার

*

এগারো বছর আগে রবিশংকর যখন চতুরলালের সঙ্গে প্রথম এ-দেশে সেতার বাজাতে এসেছিলেন, তখন ওঁর মনে অনেক দ্বিধা এবং অনিশ্চয়তা ছিল। ওয়াশিংটন ডি সি-তে তখন রবিশংকরের সঙ্গে এ-দেশে ভারতীয় সংগীতের সম্ভাব্য জনপ্রিয়তা আলোচনা করে মনে হয়নি, আগামী দশ এগারো বছরের মধ্যে রবিশঙ্কর এ-দেশে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। কিন্তু আজ সে সন্দেহ বা দ্বিধা আর নেই। ধীরে ধীরে রবিশঙ্কর তাঁর স্থান করে নিয়েছেন। গত দশ বছরে আমেরিকার যুব-সমাজের মধ্যেও এসেছে বিরাট পরিবর্তন। রক্ অ্যান্ড রোল্ এসেছে, আবার চলে গেছে। এলভিস্ প্রেস্লীর স্থান নিয়েছে রোলিং স্টোন ও বিটল্‌স। অস্থির, চঞ্চল যুবসমাজের এক বিরাট অংশ অজানার অন্বেষণে এগিয়ে চলেছে। এল এস ডি এবং চরস জাতীয় পদার্থের বিভীষিকা নিয়ে এদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। এরা কি চায়—সঠিক কেউ বলতে পারে না। এদের সঙ্গে রবিশংকরের যোগাযোগ কোথায়? রবিশংকরের সেতারের মাধ্যমে ভারতীয় রাগ-রাগিণীর মাঝে নাকি এরা আশ্রয় খুঁজে পায়।

লস্ এঞ্জেলসের এক প্রান্তে রবিশঙ্করের কিন্নর সংগীত বিদ্যালয় সেদিন দেখতে গিয়েছিলাম। আল্লারাখা তবলা বাজানো শেখাচ্ছেন দশ বারোজন ছাত্রকে। কমলা চক্রবর্তী (বম্বের সিনেমা-জগতের খ্যাতনামা অমিয় চক্রবর্তীর স্ত্রী) শেখাচ্ছেন কণ্ঠ-সংগীত। রবিশংকর শেখাচ্ছেন সেতার। সন্ধ্যা

"চারণকবি মুকুন্দদাস" (পরিচালনা : নির্মল চৌধুরী) চিত্রে বিজু ভাওয়াল, সবিতাব্রত দত্ত (নামভূমিকার শিল্পী) ও তৃপ্তি মিত্র ফটো—দেশ

সহকারী আছেন। ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত কম বয়সের। তবে উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব নেই। যেখানে বসে রবিশংকর সেতার শেখাচ্ছেন, সেদিককার দেয়ালে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের ছবি রয়েছে। নিচে লেখা রয়েছে গুরুবন্দনা। অন্যান্য দেয়ালে রয়েছে ভারতীয় রাগ-রাগিণীর পরিচয়লিপি। প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার এই ক্লাস নিয়মিত বসে। প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার রবিশংকর ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে বক্তৃতা দেন।

লস্ এঞ্জেলসের এই শিক্ষায়তন আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত চলবে। সেপ্টেম্বর মাস থেকে নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজে ভারতীয় সংগীতের অধ্যাপনার কাজ করবেন রবিশংকর। আগামী বছরের মার্চে দেশে ফিরবেন। জিজ্ঞেস করলাম—আবার আগামী বছর আসবার কোন পরিকল্পনা আছে কি? বললেন, হ্যাঁ। এরা যদি সত্যি শিখতে চায়, তা হলে সারা বছর এরকম স্কুল খোলা রাখা যায় কিনা—ভেবে দেখব। আশা করি, ভারতে ও আমেরিকায় দুই জায়গাতেই রবিশংকর তাঁর শিক্ষায়তন চালু রাখতে পারবেন; কারণ, দেশে যাঁরা সংগীতপিপাসু, তাঁদের সঙ্গে এ-দেশের যুবসমাজের হুজুগপ্রিয়দের তুলনা করব না। বিটলসরা যেভাবে এ-দেশের ডলার দুই হাত ভরে লুঠে নিয়ে গেছে, তাতে রানীর খেতাব মিলতে তাঁদের দেরি হয়নি। রবিশংকরের মাধ্যমে যদি আমাদের দেশেরও কিছু ডলার আয় হয়, তা হলে বলব—রবি শঙ্কর হোন্। ভারতের নাম আবার এ-দেশের লোক জানুক। শুধু একটি ভয়। আজকের জনপ্রিয়তার জন্য রবিশংকর যদি স্বদেশের কথা ভুলে যান, তা হলে আক্ষেপের কারণ থাকবে। আজকের এই হিপিদের ভারতীয় সংগীতের প্রতি আকর্ষণ দেখে রবিশংকর যদি বছরের বারো মাসের মধ্যে দশ মাস বিদেশে থাকেন তা হলে অদূর ভবিষ্যতে দেশে রবিশংকরের সেতার শুনতে হলে রেকর্ড বাজাতে হবে। এ কথা লস্ এঞ্জেলসের জীন মেয়ো নামে এক ভদ্রমহিলাকে বলেছিলাম। ইনি "The Psychedelic Experience" নামে একটি ছবি তুলেছিলেন এবং ১৯৬৪ সালে সান ফ্রান্সিসকো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এ পুরস্কৃত হয়েছিলেন। ছবিটির বিষয়বস্তু হল এল-এস-ডি জাতীয় বস্তুর প্রভাবে কীভাবে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী সরল ও সহজ হয়। ছবিটিতে সুর দিয়েছেন রবিশংকর। শ্রীমতী মেয়ো খুব জোরের সঙ্গেই বললেন, রবিশংকর এল-এস-ডি জাতীয় পদার্থ ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধী। তবে এই ছবিতে তিনি যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন তা নাকি সংগীতের মাধ্যমে রবিশংকরও অনুভব করেছেন। এখানেই নাকি রবিশংকরের সংগীতের সঙ্গে এ-দেশের হিপিদের যোগাযোগ। তিনি আরও বললেন, রবিশংকরের সংগীতের প্রভাবে অনেক হিপি নাকি সুপথে চালিত হচ্ছে এবং হবে। ইনি যদিও রবিশংকরের ছাত্রী নন, ইনি রবিশংকরের সংগীতের মাধ্যমে নাকি নতুনের আস্বাদ পেয়েছেন।

গত ৪ আগস্ট হলিউডের বিখ্যাত Bowl-এ ভারতীয় সংগীতের এক অপূর্ব জলসার আয়োজন হয়েছিল। অনুষ্ঠান শুরু হল বিসমিল্লা খানের শানাই দিয়ে। আলি আকবর খান ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র আশিস খান সরোদ বাজালেন। রবিশংকর সবার শেষে সেতার বাজালেন। লোক হয়েছিল প্রচুর। বলা বাহুল্য, অধিকাংশই হিপি স্থানীয়। একজন সাংবাদিক বললেন, হলিউড Bowl-এ এ-রকম অনুষ্ঠান বহুদিন হয়নি। অনেক কমবয়সী মেয়ে দেখলাম শাড়ি পরে চটি পায়ে এসেছে, কিন্তু কোন ব্লাউজ পরেনি। হয়ত ভুলে গেছে বা জানে না শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ পরবার দরকার হয়। জিজ্ঞেস করতে সাহস হয়নি। অনেকে এসেছে হাতে ধূপ-কাঠি নিয়ে। রবিশংকর যখন বাজাতে শুরু করলেন, তাঁর মুখ-বন্দনায় সবাইকে ধূম-পান করতে বারণ করলেন। যদিও অধিকাংশ ব্যক্তি সে অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। এক-জন বললেন, "আমি ত ভারতীয় সংগীত শুনতে এসেছিলাম Hollywood Bowl-এর আনন্দ পাবার জন্য। আমি ও'র ছাত্র নই। অনিচ্ছুক সাধারণ দর্শকদের উপর কারুর ইচ্ছা এভাবে চাপানো উচিত নয়।" এটা একজনের ব্যক্তিগত মন্তব্য হলেও ভাবার মত। Hollywood Bowl-এর অনুষ্ঠানে যোগদান করবার জন্য রবিশংকরের ছাত্র অন্যতম বিটল জর্জ হ্যারিসন এসেছিলেন লণ্ডন থেকে। রাত প্রায় একটার সময় অনুষ্ঠান শেষ হল। রবিশংকর খুবই ভাল বাজিয়েছিলেন সেদিন। এ-দেশের দর্শক ও শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য অধিকাংশ স্থানেই রবিশংকরকে ছোট ছোট স্বল্প-স্থায়ী তালে বাজাতে দেখেছি। কিন্তু সেদিন মনে হল, রবিশংকর যেন কোন ভারতীয় জলসায় বাজাচ্ছেন। বহু ভারতীয় রবিশংকরের এই পরিবর্তনের প্রশংসা করলেন।

অরুণকুমার চৌধুরী

বোম্বাইয়ে "অদ্বিতীয়া"র গান রেকর্ডিং: সংগীতপরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও লতা মঙ্গেশকর

'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' (পরিচালনা : দীপক গুপ্ত) চিত্রে শমিতা বিশ্বাস

চিত্র-সমালোচনা

মিস প্রিয়ংবদা

পুরুষের মহিলাবেশ ধারণ হামেশাই দেখা যায় হিন্দী চিত্রে, কমেডির অংগ হিসাবে। বাংলা কমেডি চিত্র "মিস প্রিয়ংবদা"-র (ইউনাইটেড টেকনিসিয়ান্স) পরিচালকরা (রবি বসু ও দুষ্মন্ত চৌধুরী) ওই স্থূল কৌতুক উপকরণের উপরই আস্থাবান। তাঁরা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নার্স মিস প্রিয়ংবদা সাজিয়েছেন, নায়িকার বৃদ্ধ অভিভাবক হরিধন মুখোপাধ্যায়কে বানিয়েছেন প্রিয়ংবদার প্রেমিক, তাদের বিয়েও হয়েছে এবং বাসরঘরে ঢোকবার আগেই প্রিয়ংবদা তার প্রেমিকার (দীপিকা দাস) হাত ধরে পালিয়েছে।

নার্স মিস প্রিয়ংবদার প্রয়োজন ছিল কাহিনীর রোমান্টিক নায়ক-নায়িকার (তরুণকুমার ও লিলি চক্রবর্তী) মিলনের সুবিধার জন্য। রোমান্টিক নায়ক বিপাকে পড়লে তার বন্ধুরা এসে পাশে দাঁড়ায়। নানা কৌশলে তাকে সাহায্য করে। এই গতানুগতিক রীতিই ছবিটিতে অনুসৃত। তবে বন্ধুদের কার্যকলাপ নিয়ে নানা মজার ঘটনা তৈরি করা যেত। পরিচালকরা সেই কল্পনাশক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। চিত্রকাহিনী যেমন অকিঞ্চিৎকর (কমেডি হিসাবেও), তেমনি দুর্বল এর বিন্যাস। টেকনিক্যাল কাজও কাঁচা। তার উপর সারা ছবিতে, সংলাপে এবং নানা ঘটনায় (এমন কি বাড়ির চাকরও জানালা দিয়ে পাশের বাড়ির মেয়েকে দেখবার জন্য পাগল) কেমন যেন একটা বিশ্রী আবহাওয়া, যা রুচিবান দর্শকদের মোটেই ভাল লাগবার কথা নয়।

তবে প্রধান চরিত্রগুলিতে কৃতী শিল্পীরা রয়েছেন। তাঁরা উদ্ভট ব্যাপারের মধ্যেও কিছু কৌতুকমুহূর্ত উপহার দিয়েছেন। মহিলাবেশী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাবভাব, তাকানো ও কথা বলার ধরন দেখে খুব হাসি পায়। জহর রায়ও বেশ হাসিয়েছেন, বিশেষ করে দরোয়ানের বেশে। হরিধন মুখোপাধ্যায়ের কৌতুকাভিনয়ও চমৎকার। নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, অমর বিশ্বাস প্রভৃতি নানা বাধা কাটিয়ে উঠে দর্শকদের কিছু আনন্দ দিয়েছেন।

তরুণকুমার ও লিলি চক্রবর্তী বেশ স্মার্ট, প্রেমিক-প্রেমিকা রূপে তাঁদের বেশ ভালই লেগেছে। দীপিকা দাসও সু-অভিনয়ের প্রশংসা পাবেন। ছবির উপভোগ্যতা বলে যদি কিছু থাকে তবে তা শিল্পীদের অভিনয়ের জন্য, চিত্রনাট্যের দুর্বলতা যা চাপা দিতে পারেনি।

গানের প্রয়োগও সুবিধার নয়। তবে গানগুলি শুনতে মন্দ লাগে না। গেয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরতি মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনার কৃতিত্ব সুধীর সেন ও আজাদ রহমানের।

স্বাধীনতা দিবসে নতুন ছবির শুভ-সূচনা

স্বাধীনতা দিবসে (১৫ আগস্ট) চারটি বাংলা ছবির মহরত-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। ছবিগুলি হল : 'শেষ থেকে শুরু', 'মাস্টারদা', 'অন্ধ পৃথিবী' ও 'আশাবরী'।

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় নাটক শেষ থেকে শুরু। এর চলচ্চিত্ররূপে 'ইঙ্গিত' শিল্পিগোষ্ঠী এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সবিতাব্রত দত্ত অভিনয় করবেন। সাহা চিত্রপীঠের এই প্রয়াসটি পরিচালনা করবেন চিত্রসাথী। ছবির মহরতে ক্ল্যাপস্টিক দেন উত্তমকুমার। শিল্পী ছিলেন শ্যা

অরোরার "আরোগ্য নিকেতন" (পরিচালনা : বিজয় বসু) ছবিতে বিকাশ রায়, ছন্দা ও নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বন্দ্যোপাধ্যায়। অনিল বাগচী ও নচিকেতা ঘোষ সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

আর্ট প্রোডিউসার্স-এর "আন্টারদা" ছবির শুভ-সূচনা হয়েছে গান রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে। মন্টু মুখোপাধ্যায়ের সংগীত-পরিচালনায় ছবির গানে কণ্ঠদান করেছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও মাধুরী চট্টোপাধ্যায়। ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। বিশ্বকর্মা ছদ্মনামের অন্তরালে কয়েকজন বিশিষ্ট কলাকুশলী ছবিটি পরিচালনা করছেন। নাম-ভূমিকায় সম্ভবত সবিতাব্রত দত্তকে দেখা যাবে।

সুজাতা প্রোডাকশন্স-এর অন্ধ পৃথিবী-র

"অজনা শপথ" (পরিচালনা ঃ সলিল সেন) ছবিতে সৌমেন চক্রবর্তী ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

মহরত-শটের শিল্পী ছিলেন সন্ধ্যারানী। ক্ল্যাপস্টিক দেন পাহাড়ী সান্যাল। মণি বর্মা রচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন চিত্ত বসু। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংগীত-পরিচালক।

বাণীছন্দের **আশাবরী** ছবির মহরতের শিল্পী ছিলেন কবিতা সরকার। চিত্তরঞ্জন ঘোষ চিত্রপরিচালক।

"চিড়িয়াখানা"-য় উত্তমকুমারের নানা মেক-আপ

সত্যজিৎ রায়ের "চিড়িয়াখানা" ছবির শুটিং শেষ। আগস্ট মাসের প্রথম দিকে উত্তমকুমার ও অন্যান্য শিল্পীদের নিয়ে কলকাতার পথে. এবং শহরতলিতে শ্রীরায় ছবির অনেক দৃশ্য গ্রহণ করেছেন। ওই সব শুটিং-এ উত্তমকুমারকে কখনও জাপানী ভদ্রলোক, কখনও বা কাবুলিওয়ালার বেশে দেখা গিয়েছে। জাপানী মেক-আপের দরুনে শহরতলির রেল-স্টেশনে উত্তমকুমারকে কেউ চিনতে পারেন নি। তাঁর কাবুলিওয়ালার রূপসজ্জাও কলকাতার পথচারীদের বঞ্চনা করেছে। পার্ক স্ট্রীটে জনৈক কাবুলিওয়ালা নাকি কাবুলিওয়ালা-বেশী উত্তমকুমারকে স্বজাতি ভেবে কথা বলবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন।

উত্তমকুমার ছাড়া ছবির বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন সুশীল মজুমদার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, গীতালি রায়, শ্যামল ঘোষাল নীলোৎপল দে, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। সংগীত-পরিচালনা করেছেন শ্রীরায়। সত্যজিৎ রায় তাঁর এই প্রথম ক্রাইম ছবিটি সম্পর্কে বলেন, অপরাধের সূত্র আবিষ্কারের পন্থাগুলি সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে ভেবেছি।

মহরৎ, প্রস্তুতি ও আশু মুক্তি

এ-বি-এম প্রোডাকশন্স-এর প্রথম প্রয়াস "দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা"-র মহরত সম্পন্ন হয়েছে গত সপ্তাহে। ওইদিনই চিত্রগ্রহণ শুরু হয়। ছবির প্রধান দু'টি চরিত্রে অভিনয় করছেন অন্তী ভট্টাচার্য ও অনীতা গুহ। ক্যামেরাম্যান বিভূতি চক্রবর্তী চিত্র-পরিচালক। মহাকবি কালিদাসের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। কালীপদ সেন সংগীত-পরিচালক।

এ-আর-সি প্রোডাকশন্স-এর **অদ্বিতীয়া** ছবিতে অভিনয়ের জন্য বোম্বাইয়ের জেহাঙ্গ ইরানী চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। তাঁকে ছবিতে এক বাঈজির ভূমিকায় দেখা যাবে। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে "অদ্বিতীয়া"-র কয়েকটি গান হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সংগীত-পরিচালনায় রেকর্ড করা হয়েছে। গানগুলি গেয়েছেন মান্না দে, লতা মঙ্গেশকার এবং সংগীত-পরিচালক স্বয়ং। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন মনোজেন্দু চট্টোপাধ্যায়। বিকাশ রায়, মাধবী মুখোপাধ্যায় ও সর্বেন্দু ছবির তিন প্রধান শিল্পী।

সানলাইন পিকচার্স-এর "পদ্মাবতী জয়দেব"-এর মুক্তি আসন্ন। দেবনারায়ণ গুপ্ত ছবির সংলাপ রচনা করেছেন। চিত্রদূত চিত্রপরিচালক। বিজন পালের পরিচালনায় ছবির চোদ্দটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। গানগুলি গেয়েছেন মান্না দে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

তপন সিংহের পরবর্তী ছবি "আপনজন"

অরবিন্দ গুহর "আপনজন" গল্প অবলম্বনে তপন সিংহ তাঁর পরবর্তী ছবির স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। নতুন ধরনের বিষয়-বস্তুর ভিত্তিতে শ্রীসিংহের এই আগামী ছবিতে পরিচিত ও নবাগত শিল্পীদের দেখা যাবে। সংগীত-পরিচালনা শ্রীসিংহ নিজেই করবেন।

এডিনবরায় "ছুটি"

গত সপ্তাহে 'ছুটি'র পরিচালিকা শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী, প্রযোজক শ্রীনেপাল দত্ত এবং পূর্ণিমা পিকচার্স-এর শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত এডিনবরা রওনা হয়েছেন। এডিনবরা চলচ্চিত্র-উৎসবে ২৬ আগস্ট 'ছুটি' দেখানো হচ্ছে।

রবীন্দ্র সদনে নাট্যোৎসব

নবগঠিত এন-বি এণ্টারপ্রাইজ সংস্থা রবীন্দ্র সদনে ৪ সেপ্টেম্বর থেকে চার দিন-ব্যাপী যে নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন তার উদ্বোধন করবেন মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসনে থাকবেন যথাক্রমে কলকাতা হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী ডি এন সিংহ এবং শ্রীঅশোককুমার সরকার।

প্রথম দিন মহিলা শিল্পী মহল অভিনয় করবেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কবি"। কানন দেবীর তত্ত্বাবধানে এই নাটকে বাংলা চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের বিশিষ্ট মহিলা শিল্পীরা অভিনয় করবেন। দ্বিতীয় দিনে নরেশ মিত্রর পরিচালনায় (তিনি নাম-ভূমিকায়ও অভিনয় করবেন) আর্টিস্টস অব বেঙ্গল উপহার দেবেন দ্বিজেন্দ্রলালের "সাজাহান"। পরে দিন শৌভনিকের শিল্পীরা অভিনয় করবেন রবীন্দ্রনাথের "গোরা"। শেষ দিনের আকর্ষণ লোক-ভারতীর গীতিনাট্য "মলুয়া" (নির্মলেন্দু চৌধুরীর পরিচালনায়) এবং মণিপুরী নৃত্যকলা মন্দিরের "খাম্বা" (বালকৃষ্ণ মেনন ও বসন্ত সিংহের পরিচালনায়)। অভিনেতা শ্রীনিমু ভৌমিক এই উৎসবের ব্যবস্থাপক।
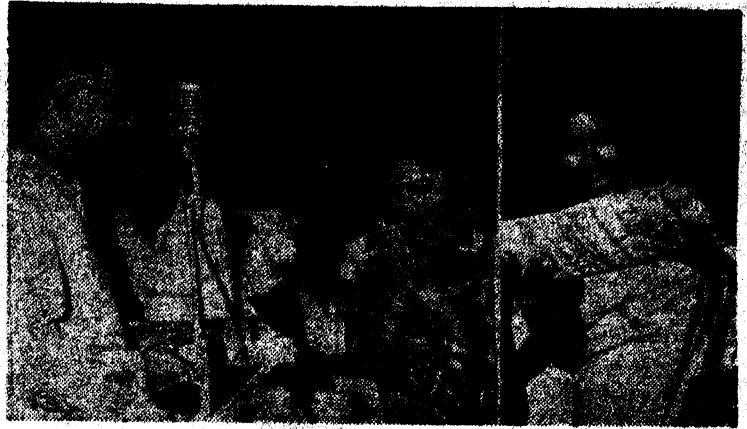
"ছুটি"র সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে শ্রীঅশোককুমার সরকারের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন চিত্রপরিচালিকা অরুন্ধতী দেবী ও শিল্পী রোমি চৌধুরী ফটো—দেশ

"ছুটি"-র সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান

পূর্ণিমা পিকচার্স-এর "ছুটি"-র সুবর্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠান গত ১৫ আগস্ট বিজলী সিনেমায় সম্পন্ন হয়। ছবির সাফল্য উপলক্ষে প্রযোজক শ্রীনেপাল দত্ত চিত্র-পরিচালিকা, শিল্পী, কলাকুশলী ও কর্মীদের পুরস্কৃত করেন। অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি শ্রীঅশোককুমার সরকার। শিল্পী ও কলা-কুশলীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার আগে শ্রীসরকার তাঁর ভাষণে বলেন, স্টার সিস্টেম ছাড়াও যে ছবি চলে, "ছুটি"-ই তার বড় প্রমাণ। "ছুটি"-র অসামান্য সাফল্য এই কথাই প্রমাণ করেছে যে, সুন্দর গল্প, সুপরিচালনা ও সুঅভিনয় যদি কোন

"পদ্মাবতী জয়দেব" ছবিতে গোপীকৃষ্ণ

"অন্য পৃথিবী" ছবির মহরতে ক্ল্যাপস্টিক দেন পাহাড়ী সান্যাল, শিল্পী সন্ধ্যারাণী

ছবিতে থাকে তবে চলচ্চিত্রের সাফল্য সম্পর্কে আশঙ্কার কারণ থাকে না। প্রসঙ্গত শ্রীসরকার "ছুটি"-র কাহিনীকার শ্রীবিমল করের সাহিত্যরচনার উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন, বাংলা ছবির সংকটের কথা প্রায়ই শুনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে "ছুটি"-র সাফল্য চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীদের মনে আশার সঞ্চার করবে। পরিশেষে তিনি "ছুটি"-র পরিচালিকা শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবীকে অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষ। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ট্র্যাজেডির সুখ কী তা "ছুটি" দেখে অনুভব করলাম। এই ছবি দর্শকের মনে গভীর রেখাপাত না করে পারে না। এবং "ছুটি" যে দর্শকের কাছে আদরণীয় হয়েছে, ছবির সাফল্য দেখেই তা বোঝা যায়। তিনি এই ছবির শিল্পীদের সুঅভিনয় এবং পরি-চালিকার কৃতিত্বের কথা বলেন।

"নল-দময়ন্তী" : দীপিকা দাস ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। ফটো—দেশ

"ছোট্ট জিজ্ঞাসা" : প্রসেনজিৎ।

"তিন অধ্যায়" : সুপ্রিয়া চৌধুরী ও অজয় গাঙ্গুলী।

"ছুটি"-র সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানটি ছিল সংক্ষিপ্ত ও বৈচিত্র্যহীন। শুধু বক্তৃতা ও পুরস্কার বিতরণ নিয়েই ছিল কর্মসূচী। প্রারম্ভে সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে মাল্যভূষিত করেন ছবির অন্যতম শিল্পী শ্রীমতী রোমি চৌধুরী। পরে প্রযোজকের তরফ থেকে সকলকে ধন্যবাদ দেন শ্রীশৈলেন মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানশেষে "ছুটি"-র বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

দিল্লিতে নান্দীকারের নাটক

কলকাতার নান্দীকার নাট্যসংস্থা "নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র" এবং "শের আফগান" নাটক দু'টি দিল্লিতে আইফ্যাক্স হলে অভিনয় করবেন। দু'টি নাটকের মোট পাঁচটি অভিনয় হবে, ২৪ আগস্ট থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত।

পরলোকে সুধীরেন্দ্র সান্যাল

প্রবীণ চলচ্চিত্র-সাংবাদিক ও প্রচারবিদ্ শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল গত বৃহস্পতিবার রাত্রে ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। আইনের স্নাতক হয়েও তিনি চিত্র-সাংবাদিক হিসাবেই কর্মজীবন শুরু করেন। বাংলা ছবির প্রথম যুগ থেকেই তিনি এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। চিত্র-সাংবাদিক হিসাবে তিনি প্রথম কাজ শুরু করেন "বায়োস্কোপ" নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপে। তারপর তিনি ইংরেজী "দীপালি"-র প্রথম সম্পাদক এবং "নেশন"-এর চিত্র-সম্পাদক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। প্রচার-পরিচালক হিসাবে নিউ থিয়েটার্স এবং অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। "পথ ও পথিক" "মডার্ন গৌরী" নামে দু'টি উপন্যাস রচনা করেন।

দুই বছর আগে তাঁর স্ত্রী মারা যান। এবং গত বছর তাঁর দুই পুত্রই পরলোকগমন করেন। তাঁদের একজন সাংবাদিক-সাহিত্যিক দীপেন্দ্র সান্যাল।

অরণ্যদেব

লী ফক

অসীম দুশ্চিন্তা নিয়ে অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছেন সম্রাট সুলতান-----
কিছুই দেখতে পাচ্ছি না! কী হচ্ছে কে জানে!
শীবার যদি কিছু হয় তো নিজের হাতে আমি জেকে টুকরো টুকরো করে কাটব!
জলদস্যুদের অনুচর-----

ওদিকে তখন-----
শীবা নিশ্চয়ই বেঁচে গেলেন, তাই না?
ওকে বলতে দে, রাজা!

'বারুদের উপরে খাঁচা, তার মধ্যে শীবা বন্দিনী। তাঁকে তাক করে কামান বসিয়ে রাখা হয়েছে...'
?
জলের উপরে আগুন! গুলি করো!

'শীবার দিকে জলদস্যুদের তখন নজর নেই। তারা আগুন তাক করে গুলি চালাচ্ছে-----'

'তাদের অসতর্কতার সুযোগে আমরা জাহাজে উঠে পড়লুম...'
লালদাড়ি, তুমি ওদের আটকে রাখো! আমি রানীকে উদ্ধার করে আনছি!
কুছ পরোয়া নেই! আমি ওদের রুখছি!
3/12

'আমার সঙ্গীরা জলদস্যুদের আটকে রাখল..'
ডাকাতগুলোকে আজ যমের বাড়ি পাঠাব!

'মাস্তুল বেয়ে আমি খাঁচার কাছে গিয়ে পৌঁছলুম...'

'রানী শীবাকে তখন সব কথা খুলে বলবার সময় নেই।'
কে তুমি?
আমাকে বিশ্বাস করো। আমি সুলতানের বন্ধু।

'রানীকে সেই খাঁচার থেকে বার করে নিয়ে আমি অন্ধকার সমুদ্রে ঝাঁপ দিলুম। পরমুহূর্তেই একটা প্রবল বিস্ফোরণ এসে ধাক্কা লাগল।'
!!

বিদেশী খ্রীষ্টান মিশনারীদের সম্পর্কে ভারত সরকারের বাহিষ্কার আদেশ এই সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য বিষয়। ভিসার মেয়াদ ফুরোলেই বিদেশী খ্রীষ্টান মিশনারীদের সবাইকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সম্প্রতি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে জানানো হয়েছে, বিদেশী মিশনারীদের ভিসার মেয়াদ আর বাড়ানো হবে না। তা হলে ভারতে থাকার ভিসার মেয়াদ শেষ হতেই তাঁদের ভারত ত্যাগ করতে হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতীয় মিশনারীরা কিছুদিন ধরে বলে আসছেন—তাঁরা নিজেরাই ভারতে খ্রীষ্টান মিশনগুলির কাজ চালাতে পারেন। স্বেচ্ছায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ সমেত যে-কোন ধর্মীয় কাজে ভারত সরকার কোন বাধা-নিষেধ আরোপ করেন নি। ভারতে এখন বিদেশী মিশনারীদের সংখ্যা ৫০২০। তাঁদের মধ্যে ভারত ছাড়া অন্য সব কমনওয়েলথ দেশ থেকে এসেছেন মোট ১১০৫ জন। ১৯৫১ সালে ভারতে খ্রীষ্টান ছিলেন মোট ৮৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৩৮ জন। তারপর দশ বছরে ১৯৬১ সালে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ কোটি ৭ লক্ষ ২৬ হাজার ৩৫০ জন। কমনওয়েলথের বাইরের দেশগুলি থেকে আগত মিশনারীদের মধ্যে ৫৯৬ জন মাদ্রাজে, ৩৯৪ জন মহারাষ্ট্রে, ৩৩৮ জন উত্তরপ্রদেশে ২৫০ জন পশ্চিমবঙ্গে, ২৯০ জন মহীশূরে, ২৩৪ জন মধ্যপ্রদেশে, ৩৭০ জন অন্ধ্রপ্রদেশে, ২১৪ জন আসামে, নাগাভূমিতে ৬ জন এবং কেরলে আছেন ২১৮ জন।

দেশী সংবাদ

১৪ আগস্ট—জাতির উদ্দেশে প্রাক-স্বাধীনতা দিবসের চিরাচরিত বেতার ভাষণে রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন আজ দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির উল্লেখ করে বলেন "লক্ষ্যের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।" গত সাধারণ নির্বাচনের ফলে বিভিন্ন রাজ্যে স্থাপিত "নানান রাজনৈতিক মতবাদের সরকার" প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন: জনগণের মঙ্গল সাধনই প্রত্যেক সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য বলে কেন্দ্রের সঙ্গে কোন রাজ্যের বা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিরোধের কোন কারণ নেই।

আজ নবদ্বীপে তেমন কোন বড় রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এদিন পর্যন্ত গত তিন দিনের হাঙ্গামায় মোট মৃতসংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচ। এর মধ্যে পুলিসের গুলিতে দুজন নিহত হন। বাকি তিনজন লাঠির আঘাতে নিহত হয়েছেন, তাঁরা হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৩ আগস্ট—আজ পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের সদর দফতরে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, গতকাল রাতে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের [illegible]-কাটিহার সেকশনে মকশোয়া ও [illegible] স্টেশনের মধ্যে আউন অবোধ্য-বিহুত মেল ট্রেনের ছাদে উপবিষ্ট ২৩ জন লোক নিহত এবং ২৫ জন গুরুতররূপে আহত হয়েছেন। চলন্ত ট্রেনটি একটি সাইডিং-এর তলা দিয়ে যাওয়ার সময় গাছের ডালের আঘাতে যাত্রীরা ট্রেনের ছাদের উপর থেকে ছিটকে পড়ে যান। যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগদান করতে যাচ্ছিলেন।

কেন্দ্রীয় সরকার চিনি আংশিক বিনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত করেছেন বলে আজ খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম রাজ্যসভায় ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন যে চিনির উৎপাদন অত্যন্ত হ্রাস পাওয়ায় এই ব্যবস্থা অবলম্বন ত হবেই।

১৭ আগস্ট—একটি মাত্র প্রশ্ন—প্রশ্নোত্তরকালের পুরো সময়টা ব্যয় করে রাজ্যসভা আজ নজির স্থাপন করেছে। বিড়লা-বাড়ির বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ ও জাল-জুয়াচুরির" অভিযোগ তদন্ত করে দেখার জন্য অবিলম্বে একটি কমিশন গঠনের দাবিতে সকল দলের সদস্যরা সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

১৮ আগস্ট—শিল্পোন্নয়নমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদ আজ রাজ্যসভায় একচেটিয়া ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি বিল পেশ করলে সকল দলের সদস্যরা তাঁকে সমস্বরে তারিফ করেন। বিলের নাম—'একচেটিয়া ব্যবসা ও ব্যবসা কুক্ষিগতকরণ নিয়ন্ত্রণ বিল।'

মজঃফরপুরে সরকারীসূত্রে প্রাপ্ত সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, মজঃফরপুর জেলার সদর ও সীতামারি মহকুমায় বাড়িগণ্ডক, বাগমতী লখনদেই ও অন্যান্য নদীতে সাম্প্রতিক বন্যার ফলে ৫২৩ বর্গমাইলব্যাপী এলাকা জুড়ে ৩০৯টি গ্রামে প্রায় ৮৮ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই জেলায় ৯১·০৫ বর্গমাইল শস্যক্ষেত্র এখনও জলমগ্ন হয়ে রয়েছে।

১৯ আগস্ট—অবিলম্বে রাজ্য বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন আহ্বানের অনুরোধ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পরিষদ দলের পক্ষে বিরোধী দল নেতা শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত আজ রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের কাছে এক পত্র দিয়েছেন। এই পত্রে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দশ দফা অভিযোগ আনা হয়েছে। অবশ্য এ দিন এ-সম্পর্কে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের পরিষদীয় ও তথ্যমন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী বলেন, এখনই বিধানসভা ডাকার সরকারী কোন পরিকল্পনা নেই।

এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকার যা তথ্য-প্রমাণাদি পেয়েছেন, তাতে নবদ্বীপে পুলিসী বাড়াবাড়ি সম্পর্কে বিচার-বিভাগীয় তদন্তের কোন প্রয়োজন আছে বলে তাঁরা মনে করেন না। নবদ্বীপে 'পুলিসী অত্যাচার' সম্পর্কে গতকাল কংগ্রেস পরিষদ দল বিচার-বিভাগীয় তদন্তের যে দাবি জানিয়েছিলেন আজ তথ্যমন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী সাংবাদিকদের কাছে সে-সম্পর্কে এই মন্তব্য করেন।

২০ আগস্ট—পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকারকে অপসারিত করে অকমিউনিস্ট কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য কংগ্রেসের স্বারস্থ হওয়া ঠিক নয়—পি এস পি-র পশ্চিমবঙ্গ শাখার এই অভিমত দলের জাতীয় কর্মপরিষদ সমর্থন করেছেন। প্রাদেশিক সম্পাদক শ্রীসমর গুহ এম পি আজ কর্মপরিষদে রাজ্য শাখার প্রতিবেদন পেশ করেন।

বিদেশী সংবাদ

১৪ আগস্ট—চীনা কমিউনিস্ট পার্টি নেতা মাও সে তুং-এর শত্রুরা উত্তর ভিয়েতনামের জন্য পাঠানো দু' জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নিয়েছে। হংকং-এর সংবাদপত্রগুলিতে আজ এই খবর দেওয়া হয়। তাঁরা লাল চীন থেকে আসা পর্যটকদের কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, চীনের বৃহত্তম শহর সাংহাই-এর ৭০ লক্ষ অধিবাসী হত্যালীলা ও উন্মত্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েছে।

১৬ আগস্ট—বিদ্রোহী চীনা প্রদেশ জেচুয়ান ও চীনের কেন্দ্রীয় শাসনের মধ্যে গত রাত্রে তীব্র সংঘর্ষ হওয়ার সংবাদ সোভিয়েট সংবাদ সংস্থা টাস প্রচার করেছেন। সংবাদে বলা হয়েছে, জেচুয়ান প্রদেশের বিদ্রোহীরা সংঘর্ষকালে কামান ও ট্যাঙ্ক ব্যবহার করেন। আট কোটি লোকের বাসভূমি জেচুয়ান চীনের বৃহত্তম প্রদেশ।

১৭ আগস্ট—একটি কমিউনিস্ট-বিরোধী পত্রিকা আজ খবর দিয়েছে যে, চীনের বৃহত্তম শহর সাংহাই-এ মাও-এর সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে হাতাহাতি লড়াই চলছে। চীনা ভাষার পত্রিকাটি জানিয়েছে যে, মাও বিরোধীরা এই বন্দর নগরীতে আবার তাদের আধিপত্য ফিরে পেয়েছে।

১৮ আগস্ট—যুদ্ধকালীন চীনের রাজধানী চুংকিংয়ের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে মাও-বিরোধীরা এখন এগিয়ে রয়েছে। এ খবর চীনের জাতীয়তাবাদী গোয়েন্দাসূত্র থেকে পাওয়া গিয়েছে বলে জানা যায়। রিপোর্টে চুংকিং এবং দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের সমৃদ্ধ ও জনবসতিবহুল স্থানগুলিতে গৃহযুদ্ধের কথা স্বীকার করা হয়েছে।

১৯ আগস্ট—সোভিয়েট সংবাদপত্রে আজ অভিযোগ করা হয়েছে যে, পিকিং-এর লালরক্ষী বাহিনী কয়েকজন সোভিয়েট কূটনীতিককে "গুরুতররূপে আহত" করেছে। তারা সোভিয়েট দূতাবাস জ্বালিয়ে দেবে বলেও শাসিয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র "প্রাভদা" অভিযোগ করেছেন, কয়েকজন বাছাই-করা দুর্বৃত্ত এই সপ্তাহে দুইবার সোভিয়েট দূতাবাসে ঢুকে আসবাব ও কাগজপত্র পুড়িয়ে দেয় এবং তারা সোভিয়েট দূতাবাসে মাও সে তুং-এর প্রতিকৃতি টাঙানোর চেষ্টা করে।

২০ আগস্ট—হাজার হাজার মাওপন্থী সৈন্য আজ ক্যান্টনের দিকে এগিয়ে চলেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। ক্যান্টনের বিমান ঘাঁটিটি এখনও বিদ্রোহীদের কবলে। কোয়াংটাং প্রদেশের অন্যান্য এলাকায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। হংকং-এর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী শ্রীচু এন লাই-এর মিটমাটের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

একমাত্র ৫০১ স্পেশাল সাবান এমন ধবধবে সাদা ক'রে কাচতে পারে!

টাটার তৈরী

একমাত্র ৫০১ স্পেশাল সাবান বেশী ময়লা কলার ও কাফ এমন ধবধবে সাদা ক'রে কাচতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই ওর প্রচুর ফেনায় আপনার সব কাপড়চোপড়ই সাদা, ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে! আপনার বাড়ির কাচার বেলাতে বিশেষভাবে সব পরিষ্কার হয়ে ওঠে, সেইজন্যে সবসময় তাজা সাবান সুগন্ধযুক্ত ৫০১ স্পেশাল ব্যবহার করবেন

৫০১ স্পেশাল— কাগজে মোড়ানো একমাত্র কাপড় কাচবার সাবান যা সত্যিই স্পেশাল নামের যোগ্য!

742 A Ben

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীঅলোক ধর

চুল উঠে যাওয়ার জন্য বিব্রত?

আজ থেকে সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চুলের পুনর্জীবন ফিরিয়ে আনুন

বিপদের এই সব সঙ্কেত অবহেলা করবেন না

চুল উঠে যাওয়া। মাথার তালুতে চুলকানি। নির্জীব শুকনো চুল। এই সব লক্ষণ থেকেই বুঝা যায় যে আপনার চুল বেড়ে ওঠার জন্য যে জীবনদায়ী খাদ্যের প্রয়োজন তার অভাব হচ্ছে। এর ফলে অকালে আপনার মাথায় টাক পড়তে পারে। তাই এই সব লক্ষণ দেখা দিলেই বুঝতে হবে আপনার চাই—সিলভিক্রিন—যেটি চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য।

সিলভিক্রিন কি ভাবে কাজ করে?

চুলের গঠনের জন্য যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, প্রকৃতি তা জোগায়। একমাত্র সিলভিক্রিনেই রয়েছে সেইসব অ্যামিনো অ্যাসিডের মূলতত্ত্বের নির্যাস। এটি চুলের গোড়ায় গিয়ে তাকে খাদ্য জোগায় ও শক্তিশালী করে তোলে ও সুস্থ চুল বেড়ে ওঠায় সাহায্য করে।

ব্যবহার-বিধি

প্রত্যহ ৫মিনিট করে মাথার তালুতে পিওর সিলভিক্রিন মালিশ করুন। চুলের অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চলুন। একবার চুলের স্বাস্থ্য ফিরে এলে তাকে অটুট রাখবার জন্য নিয়মিতভাবে সিলভিক্রিন হেয়ারড্রেসিং মাখুন—এটি পিওর সিলভিক্রিন মেশানো একটি অয়েল বেস্।

বিনামূল্যে 'অল অ্যাবাউট হেয়ার' শীর্ষক পুস্তিকার জন্য এই ঠিকানায় লিখুন—ডিপার্টমেন্ট D-7, পোস্টবক্স ১২৭, বোম্বাই-১।

সিলভিক্রিন উৎপাদন পুরুষ ও মহিলা সকলেরই ব্যবহার উপযোগী।

সিলভিক্রিন

চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য

LPE-Aiyars S. I BEN

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৪
শনিবার ১৬ ভাদ্র ১৩৭৪

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে [illegible]
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮০৪১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়
বার্ষিক ২৫.০০
ষাণ্মাসিক ১২.৫০
ত্রৈমাসিক ৬.২৫

ভারতে
বার্ষিক সডাক ২৭.০০
ষাণ্মাসিক ,, ১৪.০০
ত্রৈমাসিক ,, ৭.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক ২৭.০০
ষাণ্মাসিক ,, ১৪.০০
ত্রৈমাসিক ,, ৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)
বার্ষিক সডাক [illegible]
ষাণ্মাসিক ,, [illegible]
ত্রৈমাসিক ,, [illegible]

[illegible]
(বিমান-ডাকে)
বার্ষিক [illegible]
ষাণ্মাসিক [illegible]
ত্রৈমাসিক [illegible]

*

দাম [illegible] পয়সা
[illegible] ২ পয়সা

*

DESH

Saturday 2 Sept 1967

হরতাল

গত বৃহস্পতিবার, চব্বিশে আগস্ট, পশ্চিমবঙ্গে সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হয়েছে। এইদিন, আমাদের জ্ঞাত যে সংবাদ তাতে দেখি, পশ্চিমবাংলার শহর, শহরতলি, গ্রাম, গঞ্জ সবই ছিল কর্মহীন, নীরব, নিষ্প্রাণ। কলকাতা এবং আশেপাশে নিতান্ত ছোটখাটো একটি-দুটি ঘটনার কথা শোনা গেছে, তার মধ্যে অবশ্য শিল্প-এলাকায় শ্রমিক-সংঘর্ষের দু-একটি ঘটনা কিঞ্চিৎ গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় এইদিন কলকাতা ও শহরতলি ছিল সম্পূর্ণ স্তব্ধ। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, দোকানপাট, যানবাহনের পুরোপুরি হরতাল। ট্রেনের চাকা নড়ে নি, বিমান ওড়ে নি। এত বড় একটি রাজ্যের সবরকম কর্মমুখরতা স্তব্ধ ও চাঞ্চল্য শান্ত হয়ে থাকলেও কোথাও কোনো অশান্তি ঘটে নি। এর জন্যে জনসাধারণকে প্রশংসা করতে হয়।

যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে এই যে হরতালের ডাক এতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমর্থন ছিল। সরকারীভাবে হরতাল সমর্থন কিছুটা নতুন। ইতিপূর্বে পশ্চিমবাংলায় আরও দুটি হরতালের পিছনেও সরকারী সমর্থন ছিল এবং তা তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের ঃ তার মধ্যে একটি ছিল আসামে বাঙালী নির্যাতনের প্রতিবাদে, ও অন্যটি ছিল গোয়ায় পর্তুগীজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে। তবু, বোধ হয় আগের দুটি হরতালের সঙ্গে এবারের হরতালের একটি অনৈক্য আছে। আগের দুটি প্রত্যক্ষভাবে যতটা নৈতিক ততটা রাজনৈতিক নয়। এবারের হরতালের রাজনৈতিক কারণটি মুখ্য। প্রধানত পশ্চিমবাংলায় যেরকম তীব্র খাদ্যসংকট চলেছে তাতে সেই সংকটের সুরাহার জন্যে কেন্দ্রকে চাপ দেবার উদ্দেশ্যেই এই হরতাল। অবশ্য হরতালের আহ্বায়করা আরও কিছু উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন, যেমন মজুতদার, কালোবাজারী, মুনাফাদার, কংগ্রেস দল প্রভৃতির কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদজ্ঞাপন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। বলা বাহুল্য, যুক্তফ্রন্ট সরকার যেখানে শাসনক্ষমতায় রয়েছেন সেখানে মজুতদার ও কালোবাজারীদের দমন না করে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্যে হরতালের ডাক দেওয়াটা কেমন অদ্ভুত শোনায় হাস্যকর ঠেকে। কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধেও বা এটা হবে কেন? বিরোধী দলের বিরুদ্ধে বা তাদের কাজকর্মের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন দল প্রতিবাদ জানাবার জন্যে হরতাল ডাকবে কেন? বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন হয় কেন? বেআইনী সব কাজের জন্যে আইন তো আছেই। এ-সব আমরা গৌণ কারণ ধরতে পারি। মূল কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর খাদ্যের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করা।

কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবাংলার এই হরতাল বাস্তবিক কি চোখে দেখেছেন তা আমরা সঠিক জানি না। তবে, হরতালের আগেই পশ্চিমবাংলার ছ'জন মন্ত্রীর ধরনা স্থগিত রয়েছিল দিল্লির আশ্বাসে। প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, কেন্দ্র পশ্চিমবাংলাকে আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ১ লক্ষ ৫ হাজার টন করে গম, মাইলো ও যব এবং প্রতি মাসে ১৫ হাজার টন করে চাল সরবরাহ করবেন। এই আশ্বাস পাবার পরও হরতাল ডাকা হয়েছে।

যাই হোক, আলোচ্য হরতাল যে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এবং শান্তিপূর্ণভাবেই ঘটেছে তাতে সকলকেই ধন্যবাদ জানাতে হয়। কিন্তু পুনরায় হরতালের যে গুজবটি শোনা যাচ্ছে তাতে আমাদের পক্ষে কিছু উদ্বেগ বোধের কারণ রয়েছে। সকলেই জানেন, হরতাল জাতীয় জীবনে একটি ক্ষতির অঙ্ক রেখে যায়। আপাতদৃষ্টিতে হরতাল যতই নিরীহ হোক এর ক্ষতির অঙ্ক অতটা নিরীহ নয়। সাধারণ একটি হিসেবে শুধুমাত্র এই একদিনে এই রাজ্যে শিল্প উৎপাদন বাবদ পাঁচ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে, এ ছাড়া রেল, বিমান, ডাক ইত্যাদির ক্ষতির হিসেব আছে, আছে কর্মশক্তির অপচয়ের হিসেব, আছে কেনাবেচা, দিনমজুরীর ক্ষয়ক্ষতির কথা। পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক অনটনের সময় এই ক্ষয়ক্ষতি বারংবার বর্ধিত করা বিবেচনার কাজ নয়। তাছাড়া সামনে পুজো। পুজোর মুখে হরতাল বাঞ্ছনীয় নয়। আশা করি, হরতালের আহ্বায়করা এই বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। এবারের হরতালে সংবাদপত্রকেও কর্মবিরত থাকতে হয়েছে। সংবাদপত্র সম্পর্কে এমন বিরূপ মনোভাব যুক্তফ্রন্টের না থাকাই উচিত ছিল। কেননা সংবাদপত্র একালের সমাজ-জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয়; যাঁরা হরতাল ডাকেন—তাঁরাও জানেন তাঁদের প্রয়োজনেও সংবাদপত্র প্রকাশ জরুরী।

প্রতিক্রিয়াশীল বলে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। পিকিং বেতার থেকে বলা হচ্ছে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পুঁজিপতি জোতদার, মজুতদার, কালোবাজারিদেরই শক্তিবৃদ্ধি করছে। পিকিং-এর মতে যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসকমণ্ডলগুলিরই সহায়ক। তাই, পিকিং-এর কাছে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি নয়া-সংশোধনবাদে দুষ্ট।

এই প্রত্যক্ষ আক্রমণ রাজনৈতিক দল হিসাবে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে সহ্য করে যাওয়া খুব সহজ কথা নয়। আরও অসহ্য মনে হবে, যখন অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না যে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক যোগাযোগটা পিকিং-এর সঙ্গে, মস্কোর সঙ্গে নয়। কাজেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিকে এই আক্রমণ কাটিয়ে উঠতে হলে সংশোধনবাদের চিহ্নটা মুছে ফেলতে হবে। এটা তখনই সম্ভব হয়, যখন যুক্তফ্রণ্ট সরকারের মধ্যে থেকেও একটা নিজস্ব রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য জনসমক্ষে তুলে ধরা যায়। এই নিজস্ব এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক চেহারাটা তুলে ধরতে হলে বৈপ্লবিক প্রোগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তাই পার্টির নেতা হিসাবে, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তকে বলতে হবে যুক্তফ্রণ্ট সরকার জোতদার, মজুতদারদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তিনি তাঁর ভাষায় সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পুলিসের প্রতি ভূমি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে।

তেমনি মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে আক্রমণ করা হয়েছে খাদ্য-নীতিকে। কারণ, খাদ্যাবস্থা যেভাবে সংকটের মুখে চলে যাচ্ছে, তাতে পার্টির পক্ষ থেকে সরকারী খাদ্যনীতির সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাওয়া রাজনৈতিক নিবুদ্ধিতারই পরিচায়ক হবে। তাই পার্টিকে সরিয়ে নিতে হল নক্সালবাড়ী নীতি থেকে, খাদ্যনীতি থেকে। খাদ্যনীতির মূল কথা যদি জোতদার, মজুতদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাহলে, অভিযোগ করা হল, তা করা হয়নি। তাই আওয়াজ তুলতে হল, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোল। আওয়াজ উঠল, দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর বাসগৃহের সামনে ধরনা দাও; কারণ, বলা হল, যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে জনগণআন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

এই সুনির্দিষ্ট পথটাই আজ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে মুখ্যত মার্ক্সিস্ট পার্টির সঙ্গে উগ্রপন্থীদের রাজনৈতিক লড়াইয়ে। যুক্তফ্রণ্ট সরকার জড়িয়ে পড়েছে এই রাজনীতির লড়াইয়ে।

জড়িয়ে পড়েছে অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে। তাই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে সাধারণ ধর্মঘটের। সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে তীব্রতর করার। শুধু কোন গণতান্ত্রিক সরকারের ইতিহাসে এমন নজির আর পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এ-নজিরের একমাত্র অর্থ হল সরকারের সকল দায় দায়িত্ব অস্বীকার করা, অন্তত-পক্ষে একদিনের জন্য। তাই মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে সরকারী কর্মচারীদের এমন কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি, যার ফলে রাইটার্স বিল্ডিং-এর কাছাকাছি যারা থাকেন তাদের অফিসে আসতে বাধ্য করা যেতে পারে। তাই পুলিসকে এমন কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি যার ফলে নাগরিক জীবনে কোন অশুভ অশান্তি দমন করা যেতে পারে। বরং, পুলিসকে এটাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, তাদের উপস্থিতি যেন নজরে না আসে।

এই নজিরের একটাই রাজনৈতিক অর্থ করা সম্ভব। জনসাধারণের হাতে আইন ও শৃঙ্খলার ভার তুলে দেওয়া। যে রাজনীতির মূল লক্ষ্যস্থল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, সে-নীতির দিক থেকে বিচার করলে হয়ত এই নজিরের উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু যে ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়ে মন্ত্রীসভা ক্ষমতাসীন হয়েছে, সেই সংবিধানকে অমর্যাদার গ্লানি থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। সাধারণ ধর্মঘটের সঙ্গে মন্ত্রিসভা জড়িয়ে পড়েছে বলেই সংবিধানের মর্যাদার প্রশ্নটা বিশেষ-ভাবে ওঠে।

সংবিধানের নির্দেশ আছে যে, মুখ্যমন্ত্রী কেবলমাত্র মন্ত্রিসভার নেতৃত্বই করবেন না, রাজ্যপালকে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার ব্যাপারে পরামর্শ দেবেন এবং সাহায্য করবেন। জানা নেই বর্তমান পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে কি কি পরামর্শ দিয়েছিলেন সাধারণ ধর্মঘটের দিন আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য। কারণ, কার্যত দেখা যাচ্ছে, প্রচলিত রীতি অনুসারে সৈন্যকে প্রস্তুত থাকার জন্য কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

আরও একটা প্রশ্ন আছে। রাজ্যপাল রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার জন্য মুখ্যত দায়ী। রাজ্যপাল যে কোন অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করেননি, তা বোঝা যায় তাঁর দিল্লী সফর থেকে। সাধারণ ধর্মঘট এবং ধরনা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত মন্ত্রীসভা নিয়েছিল, তা অবশ্যই রাজ্যপালকে জানান হয়েছিল। কারণ, সংবিধানের নির্দেশ আছে মন্ত্রিসভার সকল সিদ্ধান্ত রাজ্যপালকে অবশ্যই জানাতে হবে। তা ছাড়া, দিল্লীতে ধরনার খরচ হিসাবে মন্ত্রীদের জন্য কিছু টাকাও মন্ত্রিসভা থেকে অনুমোদন করা হয়েছিল।

কাজেই, রাজ্যপালের পক্ষে একটা রাজনৈতিক পথই খোলা ছিল। দিল্লীতে এসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পশ্চিমবঙ্গের দাবি মেটাবার একটা পথ খুঁজে বের করা। তাঁর দিল্লী মিশন যে অসফল হয়নি, তা বোঝা যায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের বিবৃতি থেকে। পশ্চিমবাংলার খাদ্য দাবি মেটাবার অঙ্গীকারটা বিশেষ অবস্থায় চলেই দেওয়া হয়েছিল সেটা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। এ-চাপটা 'ধরনা'র প্রস্তাবের মধ্যে যেমন ছিল, রাজ্যপালের দিল্লী মিশনের মধ্যেও ছিল না তা বলা যায় না।

হয়ত রাজনৈতিক মহলের ধারণা ছিল, ধরনাটা বাতিল হলে সাধারণ ধর্মঘটের ডাকটাও তুলে নেওয়া হবে। অন্ততপক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জির ইচ্ছাটা প্রায় সেইরকমই ছিল। কিন্তু তাঁর সদিচ্ছাটা গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি যুক্তফ্রণ্টের প্রধান শরিকদের কাছে, বিশেষ করে কম্যুনিস্ট সদস্যদের কাছে। এটাই যুক্তফ্রণ্টের রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভোটের জোরে হরতালের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে; কিন্তু এর আগে যে দুবার ভোট নিয়ে সিদ্ধান্ত করতে হয়েছিল, সে-দুবারই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। কারণ, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরা মার্ক্সিস্টদের বিরুদ্ধেই ভোটটা দিয়েছিলেন। এবার তাঁরা ভোট দিয়েছেন মার্ক্সিস্টদের পক্ষে।

রাজনৈতিক পরিবর্তন হিসাবে এটা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ, শুধু নক্সালবাড়ীতেই নয়, অন্যান্য অঞ্চলেও শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি এবং শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার একজোটে কাজ করেছেন কৃষক আন্দোলনের মধ্যে। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক আন্দোলনের ভূমিকা নূতন রূপ নিয়েছে নিঃসন্দেহে। হয়ত তাই আজ আর অসুবিধা হচ্ছে না ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ও মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে একজোটে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে। বিশেষ করে এমন একটা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে, যে-সিদ্ধান্তের একমাত্র রাজনৈতিক অর্থ হল যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে জনগণআন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা।

বর্তমান সাধারণ ধর্মঘটে এই হাতিয়ারটাই ব্যবহার করা হয়েছে সব চাইতে বেশী। তাই দুই কম্যুনিস্ট পার্টির ভোটের জোটটা নিঃসন্দেহে ইঙ্গিতপূর্ণ। কারণ, যে কয়টি দল ধর্মঘটের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, তাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে দক্ষিণপন্থীদের দলে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তটা তাই এত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলা বন্ধ—
কাদের কাছে ?
বাংলা
কংগ্রেস

ক্রূর নীতি

চীন, পাকিস্তানে বিদেশী কূটনৈতিকদের লাঞ্ছনা আন্তর্জাতিক কূটনীতির ইতিহাসে নতুন রেকর্ড। এ-ধারণার পৈশাচিক ব্যবহারের কোন সোজাসুজি যুক্তিগত ব্যাখ্যা নেই, পুরনো নজীরও বড় একটা পাওয়া যায় না। পিকিং এ-ব্যাপারে অগ্রণী, পিণ্ডি তার পদাঙ্ক অনুসারী। পিকিং-এর দৌরাত্ম্যের তবু কতকগুলি কারণ দেখা যায়। এক-বছর ধরে চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তাণ্ডব চলেছে, মাও-পন্থীরা ঘরে বাইরে সর্বত্রই মারমুখী। পিকিং-এ বিদেশী কূটনীতিকদের ওপর লাল রক্ষীদের হামলা চীনের সেই সর্বগ্রাসী মত্তিচ্ছন্নতার একটা খণ্ড-দৃশ্য। পাকিস্তানের পিণ্ডিতে ভারতীয় কূটনীতিকরা নিগৃহীত হয়েছেন, দৈহিক পীড়ন সয়েছেন পদস্থ পাক-পুলিশ কর্মচারীদের হাতে। পিকিং-এ লাল রক্ষী ছোকরাদের কাণ্ড থেকে পিণ্ডির এই ঘটনার ধরণ আলাদা। বিদেশী কূটনীতিকদের ওপর লাল রক্ষীদের হামলার পিছনে চীনা কম্যুনিস্ট গভর্নমেণ্টের উস্কানি অথবা সায় অনেকখানি আছে বা থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নয়। চীনে এখন গভর্নমেণ্টের কোন্ কোন্ কাজকর্ম কারা চালাচ্ছে তারই স্থিরতা নেই। মাও সে তুং, মাও-গিন্নী চিয়াং ছিং, মাও-এর খাসমুন্সী চেন পো তা, এঁরাই লাল রক্ষীদের চালাচ্ছেন এবং সম্ভবত এখন নিজেরাই উল্টো চালের চোটে লাল রক্ষীদের সামাল দিতে পারছেন না। সে যাই হোক, মাও-গিন্নী আর মাও-এর খাসমুন্সী যতক্ষণ মাও-এর উপর ভর করে আছেন, লাল রক্ষীদের যেখানে-সেখানে লেলিয়ে দিতে পারছেন ততক্ষণ এঁরাই কার্যত চীনের গভর্নমেণ্ট—যাকে বলা যায় প্রায় 'পেটিকোট গভর্নমেণ্ট'—যার দাপটে প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই, পররাষ্ট্রমন্ত্রী চেন-ই পর্যন্ত অসহায়। পাকিস্তানে আয়ুবশাহীর অবস্থা সে-রকম নয়, সে-কারণেই বলি পিণ্ডিতে ভারতীয় কূটনীতিকদের ওপর অত্যাচার কেবল পৈশাচিক নয়, সুপরিকল্পিত সরকারী উদ্যোগে অনুষ্ঠিত।

এর আগেও ভারতীয় কূটনীতিকরা এবং তাঁদের পরিবারবর্গ পাক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পেয়েছেন করাচিতে ভারত পাক যুদ্ধের সময়। সেটাও আপত্তিকর, তবু সে-ঘটনা, না-এর যুদ্ধের উত্তেজনার সঙ্গে জড়িত করে দেখা যায়। পিণ্ডিতে সম্প্রতি ভারতীয় কূটনীতিকদের জোর করে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে দৈহিক পীড়নের ঘটনার সাফাই করে পাক-সরকার কোন রকম বিশ্বাসযোগ্য কারণ বা যুক্তিই দেখাতে পারেন না। এ-ঘটনা একেবারে চীনী কায়দায়, কিন্তু তার চেয়েও জঘন্য। কোন বিদেশী কূটনীতিক আপত্তিকর কাজে লিপ্ত এমন সন্দেহ ঘটলে তার প্রতিবাদ ও প্রতিকারের ভদ্র আন্তর্জাতিক কূটনীতি-সম্মত উপায় আছে। সে রকম ক্ষেত্রে ঠিক একই পদ্ধতিতে "বদলা" পর্যন্ত কূটনৈতিক বিধিমত চলে ও চলতে পারে। মার্কিন কূটনীতিক যদি কোন কারণে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে বহিষ্কৃত হন তাহলে 'বদলা' হিসেবে আমেরিকাও একজন সোভিয়েট কূটনীতিককে পত্রপাঠ বিদায় করতে পারে, প্রায়ই করেও। কড়া সুরে কথা কাটাকাটিও চলে, বিদেশী কূটনীতিককে ধরে বেধড়ক পিটুনী চলে না, চালানো হয় না। ইদানীং অবশ্য চলছে, চালিয়েছে সবচেয়ে বেশী এবং সাংঘাতিকভাবে প্রথমত পিকিং; তবে তারও বহু আগে ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় দূতাবাসে হামলা চলে, সেটাও যতদূর সম্ভব পিকিং-এর প্ররোচনায়। দক্ষিণ ভিয়েতনামে দিয়েম-এর আমলে ভারতীয় দূতাবাসের ওপর আক্রমণ আবার সম্পূর্ণ উল্টো কারণে।

মোটকথা, বিদেশী কূটনীতিকদের ফুটবলের মত 'কিক' করার ক্রূর নীতিটা একেবারে হাল আমলের। যে-সব রাষ্ট্রের কূটনীতি একেবারে দেউলিয়া, বুদ্ধিবলে আস্থাহীন, সেই সব রাষ্ট্রের কর্তারাই অসহায় বিদেশী কূটনীতিকদের ওপর বাহুবল খাটিয়ে আক্রোশ মিটিয়ে নিচ্ছেন। অন্য দেশের ঘৃণা এবং ধিক্কার কুড়িয়ে বাড়িয়ে যদি চীন পাকিস্তানের কোন গূঢ় অভিসন্ধি পূরণের আশা থাকে তবে সে-আলাদা কথা। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রবল বিরোধ থাকে, যুদ্ধও হয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে সেটা অভাবনীয় নয়, কিন্তু যুদ্ধের সময়েও বিদেশী কূটনীতিকদের, তাঁদের পরিবারবর্গকে ভদ্রভাবে নির্বিঘ্নে দেশে ফিরে যেতে দেওয়া হয়, এর ব্যতিক্রম দুর্ধর্ষ হিটলার মুসোলিনী ঘটান নি, স্টালিনও না। পিকিং এবং পিণ্ডির পিশাচ-নীতিই এ-ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে একেবারে সৃষ্টিছাড়া।

আয়ুবশাহই চরিত্রে দুনিয়ায় একমাত্র জঙ্গী নায়ক নন, জঙ্গী শাসকের জবরদস্ত রাজত্ব চলছে আরও বহু দেশে, ল্যাটিন আমেরিকায়, আফ্রিকায়, এশিয়াতেও। সে-সব দেশে তো কূটনীতিকে ক্রূর পিশাচ নীতিতে পরিণত করা হয় নি। ধরে নেওয়া যায়, আয়ুবশাহীর এই বিকারটা ঘটেছে পিকিং-এর সংসর্গ-গুণে। জিন্না লিয়াকত আলী, ফিরোজ খাঁ, নুন, সুরাবর্দী, ইস্কান্দার মির্জা, এঁরাও ভারতের ওপর কখনও প্রসন্ন ছিলেন না, কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে, সে-রাষ্ট্রের কূটনীতিকদের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁরা সাধারণ সৌজন্য এবং শিষ্টাচারের মান বজায় রেখেছিলেন, আয়ুবশাহ এ-ব্যাপারে তাঁর পূর্বতন পাক-রাষ্ট্রকর্তাদের নাক তো কেটেছেন-ই, তার উপর দুনিয়ার আর সব জঙ্গী শাসকদের লজ্জা দিয়েছেন। আয়ুবশাহীর এ-কাণ্ডের সবটাই চীনী শিক্ষার ফল সম্ভবত নয়। চীনের পৈশাচিক কাণ্ড কারখানার অন্তত একটা কারণ এই যে তার গভর্নমেণ্ট এখন প্রায় কেন্দ্র-চ্যুত, নানা বিপরীত শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে এলোমেলো-ভাবে চালিত। আয়ুবশাহের জঙ্গী নায়কত্ব তো অপ্রতিদ্বন্দ্বী; ভারতের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, ভারতীয় কূটনীতিকদের নিগ্রহ, যা কিছু ঘটছে সবই আয়ুবশাহীর অখণ্ড লীলা।

আয়ুবশাহীর পৈশাচিক আচরণের প্রতিকার কীভাবে কতখানি সম্ভব, এ-প্রশ্নের সহজ কোনও সমাধান পাওয়া যায় না। পিকিং-এ একাদিক্রমে ফরাসী, সোভিয়েট এবং ব্রিটিশ কূটনীতিকদের চরম লাঞ্ছনা হয়েছে; পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ফ্রান্সে, রাশিয়ায় কিম্বা ব্রিটেনে চীনা কূটনীতিকদের অনুরূপ লাঞ্ছনা করা হয় নি। ব্রিটেনে চীনা কূটনীতিকদের গতিবিধি এবং খবরা-খবর আদান-প্রদানে কতকগুলি কড়াকড়ি ব্যবস্থা মাত্র হয়েছে। এর পর চরম ব্যবস্থা হিসেবে আর যা সম্ভব সে হল চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদন। ব্রিটেনের পক্ষে অতদূর যাওয়া কঠিন, তার কারণ হংকং। চীনের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না, সম্পর্ক এখন তো কেবল পিকিং-এর ক্রমাগত গালাগালি আর কখন কখন যুসবর খাওয়া। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদনের সমস্যা একটু জটিল, তার একটা কারণ আবার তাসখন্দ চুক্তির ফাঁস। যাই হোক না কেন, ভারতে চীনা এবং পাকিস্তানী কূটনীতিকদের গতিবিধি ইত্যাদি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অন্তত ভারত সরকার করতে পারেন, অনেক আগেই সেটা করা উচিত ছিল। পাক এবং চীনা কূটনীতিকদের যত্রতত্র বিহারের স্বাধীনতা ভারত সরকার এখনও কেন যে, কীসের ভয়ে বা আশায়, দিচ্ছেন সেটা বুঝতে পারা যায় না।

২৬।৮।৬৭

‘ঠোঙা’

আগের জার্নালে একটি মুড়ির ঠোঙার জ্ঞানগর্ভ উপদেশে পৌঁছে আমার চিত্ত অতীব প্রশান্তি লাভ করেছিল। সেই ব্রহ্মানন্দেই আমি কিছুদিন ধরে মগ্ন হয়ে আছি। এবং এই তথ্যও আবিষ্কার করেছি যে, কেবল মুড়ি নয়, চিঁড়ে, ছোলা, শুকনো

লেখক আবিষ্কার করেন তাঁরই গ্রন্থের ছেঁড়াপাতা

লঙ্কা (এই ঠোঙাটা একটু সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়, যাকে বলে ‘হ্যাণ্ডল উইথ কেয়ার’—কারণ, একটু অসতর্ক হলে নাকে জ্বালা ধরিয়ে এবং হাঁচিয়ে দিতে পারে), হলুদ, ডাল কিংবা এবংবিধ অগণিত ঠোঙা আমাদের জ্ঞানলাভে প্রভূত সহায়তা করতে সক্ষম। এক কথায়, ঠোঙার মতো সুপাঠ্য এবং এন্‌সাইক্লোপিডিক সামগ্রী পৃথিবীর আর কুত্রাপি পাওয়া যাবে না।

জীবন স্বল্প এবং ‘বহবশ্চ বিঘ্নাঃ সুতরাং প্রাজ্ঞেরা বলেছেন যে, হাঁস যেমন নীরের মধ্য থেকে ক্ষীর বেছে নেয়, তেমনিই জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের হংসব্রত গ্রহণ করা উচিত। উপদেশটি মূল্যবান হলেও তাকে কাজে লাগানো শক্ত। ‘এ শর্ট হিস্ট্রি অভ’ অমুকের ‘শর্ট’ বিশেষণটি দেখে আকৃষ্ট হওয়া গেল, সংগ্রহ করে দেখি সেই ‘শর্ট’নেস’ ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে সাড়ে আট শো পৃষ্ঠা পর্যন্ত দৌড় মেরেছে। পণ্ডিতদের পক্ষে যা শর্টকাট, আমাদের কাছে তা ‘দ্য লংগেস্ট জার্নি’—এ-রকম খান পাঁচ-সাত ‘শর্ট’কে আয়ত্ত করতে গেলেই ইহজন্ম শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু নীরের ভেতর থেকে ক্ষীরটি তো চাই-ই। নইলে, ‘এমন মানব-জনম রইল পতিত’—সোনা ফলা তো দূরের কথা, এক মুঠো দূর্বাঘাসও সেখানে গজাবে না। কাজেই অনেক দিন ধরে বিশ্ব-প্রজ্ঞার যে শর্ট-কাট আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, এই মুহূর্তে হাতের কাছে আমি তা পেয়ে গেছি। আশ্চর্য, এই অমূল্য রত্নগুলোকে এতদিন বাড়ির বাচ্চারা ফুলিয়ে ফুলিয়ে পটকার মতো ফাটাচ্ছিল আর ঝাঁটার মুখে এরা বিদেয় হচ্ছিল। আমার রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ে গেল—‘খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে’ ইত্যাদি ইত্যাদি।

মোটা মোটা পণ্ডিতী বইয়ের সফিস্টিকেশান ছেড়ে একবার ঠোঙার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। দেশের শিক্ষা কীভাবে চলছে, সন্ধান চান? দেখবেন, অংক-ইংরিজী-ভূগোলের খাতার খণ্ডাংশ লাল-কালি এবং পেনসিলে চিহ্নিত হয়ে ঠোঙার মধ্য দিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছে, তা থেকে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যার স্ট্যাণ্ডার্ড মুহূর্তে আপনার বোধগম্য হবে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্যে যদি আপনি ব্যাকুলিত থাকেন, অনেক ডেবিট-ক্রেডিট, অনেক শেয়ার, অনেক তেজী-মন্দীর রহস্যময় আভাস আপনি ঠোঙা থেকে লাভ করতে

পরীক্ষার নিখোঁজ খাতার হদিস মেলে

পারবেন। অকালে আহারত যে ঢাকের জন্যে আপনি সুগভীর মর্মপীড়া বোধ করছেন, হয়তো ঠোঙায় জলন্ধর কি অমৃতসরের পোস্টবক্সে এমন একটা অব্যর্থ ওষুধের পুরো বিজ্ঞাপন পেয়ে যাবেন যে, সাময়িকভাবে আপনার অন্তরাত্মা নেচে উঠবে।

কর্তার প্রেমপত্তর

খবরের কাগজে সবটা আমরা পড়ার সময় পাই না—সব কাগজ পড়াও কারো পক্ষে সম্ভব হয় না, কিন্তু ঠোঙা থেকে আপনি জানতে পারবেন কোন্ এক তেইশে জুন তারিখে বর্ধমানের কোনো গ্রামে এক ভদ্রলোকের কুমড়ো মাচায় কুমড়ো আর লাউ একসঙ্গে ফলেছে—‘দলে দলে লোক এই আশ্চর্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উপস্থিত হইতেছে।’

হবে, এবং নিতান্ত জীবিকা ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টাতেই তিনি উগো-কে কবিতা উৎসর্গ করতেন, বার-বার কাতর পত্রাঘাত করতেন মোড়-খুড়োকে। কিন্তু নিজের (ও কবির) যে-চিত্রকল্প তিনি রচনা ক'রে দিয়েছিলেন তা গর্বিত, উদাসীন, নিঃসঙ্গ, আভিজাত্যের সর্বলক্ষণসম্পন্ন সন্ন্যাসীর, তাই হয়তো আজকের দিনের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি দেখে সত্যি তিনি সন্ত্রস্ত হ'য়ে দূরে সরে যেতেন। অন্তত, তাঁর বন্ধু নাদার-এর তোলা যে-আলোকচিত্রটি এখানে মুদ্রিত হ'লো, তার দিকে তাকিয়ে দেখলে আমরাও যেন তাঁকে মানিয়ে নিতে পারি না তাঁর আজকের দিনের খাতির সঙ্গে। ঐ শীর্ণ, নির্বেদ মুখ, রেখাঙ্কিত, মেধাদীপ্ত প্রশস্ত কপাল, নাকের দু-পাশে গাঢ় দুই ক্লিষ্ট রেখা, বেদনায় ও বিদ্রূপে সংবদ্ধ ক্ষীণ ওষ্ঠাধর, আর ঐ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চক্ষু—যার দৃষ্টিতে ছড়িত হচ্ছে অভিমান, ক্রোধ, আর্তি—যেন, পাছে চোখ ফেটে জল আসে, তাই অপ্রাণ চেষ্টায় সেখানে সংহত করেছেন তাঁর জীবনব্যাপী নিতৃষ্ণা—যা তাঁর জীবনব্যাপী প্রেমেরই নামান্তর—ঐ মুখের সামনে ধূপ জ্বালাতে, মালাচন্দন সাজাতে কার না লজ্জা করবে? কিন্তু আমাদের এই অর্ঘ্যদান তাঁর জন্য নয়—তাঁর কিছুই এসে যায় না এতে, তিনি অনেক আগেই অমরতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন—তা আমাদেরই আত্মশোধনের জন্য, আমাদেরই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন। —বু ব]

সাত বুড়ো

উৎসর্গ: ভিক্তর উগো

নগর, বল্মীকপুঞ্জ, স্বপ্নে ভরা এ-মহানগর,
স্পষ্ট দিনে-দুপুরে যেখানে হানা দেয় প্রেত, এবং ছড়ায়
সর্বত্র, মজ্জার মতো রহস্যেরা—গোপন, প্রখর,
ভীমবল দানবের অতি সূক্ষ্ম অসংখ্য শিরায়।

সেদিন প্রভাত ছিলো, রাস্তা ছিলো বিমর্ষ, ধূসর,
উচ্চতায় বেড়ে গেছে বাড়িগুলি ব্যাপ্ত কুয়াশায়,
যেন জীর্ণ নদীতটে তক্তাপাতা যুগল বন্দর—
আর, এই রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট সযত্নে সাজাতে,

হলদে নোংরা কুয়াশায় সব দিক যখন প্লাবিত,
আমি চলেছিলুম বীরের মতো দাঁতে দাঁত চেপে
অতি ক্লান্ত আমার আত্মার সঙ্গে তর্কে নিরালি : —
এদিকে যানের শব্দে আশে-পাশে রাস্তা ওঠে কেঁপে—

অকস্মাৎ দেখা দিলো এক বৃদ্ধ—হলদে, তালি-মারা,
বৃষ্টি-পড়া আকাশেরই বর্ণ তার ধূসর বসনে,
দেখামাত্র ভিক্ষার বর্ষণ হ'তো, এমন চেহারা,
যদি না দু-চোখ তার উগ্র হ'তো হিংসার জ্বলনে।

সে যেখানে দৃষ্টি রাখে, তীক্ষ্ণতর সেখানে তুহিন,
চক্ষু বেয়ে ঝ'রে পড়ে প্রকুপিত পিত্তের নির্যাস,
আলম্বিত শ্মশ্রু যেন তলোয়ার উদ্ধত, কঠিন,
অঙ্গ, ভঙ্গি, দাড়ি নিয়ে মূর্তিমান দ্বিতীয় জুডাস।

যায়নি সে বেঁকে, শুধু ভেঙে গেছে। তার শিরদাঁড়া
অবিকল সমকোণে যুক্ত হ'য়ে রয়েছে কোমরে,
এবং, পূর্ণতা যাতে পায় তার অদ্ভুত চেহারা,
চলে লাঠি ঠুকে-ঠুকে, গতিভঙ্গে অক্ষম, নড়বড়ে—

যেন খঞ্জ চতুষ্পদ, কিংবা কোনো তেপেয়ে য়িহুদি।
হেঁটে যায় বেতালা, বরফ-গলা কাদায় পা ডোবে,
উদাসীন নয়—এই পৃথিবীর শত্রু, বিসংবাদী,
জুতোর তলায় যেন মৃতদের পিণ্ড ক'রে দেবে।

দোসর চলেছে পিছে: ন্যাকড়া, দাড়ি, লাঠি, পিঠ, চোখ
কিছুতে পার্থক্য নেই, জন্ম একই নরকের তলে;
এই শতবর্ষীয় যমজ মূর্তি—ভয়াল, বারোক,
অজানা লক্ষ্যের দিকে সহযাত্রী, সমান পা ফেলে।

এ কোন অকথ্য ষড়যন্ত্রজাল? কোন দুষ্ট শনি
আমার সত্তার গর্ব ক'রে নিলো নিঃশেষে হরণ?
বুড়োরা সংখ্যায় শুধু বেড়ে চলে;—যতবার গুনি,
ততবার ধরা পড়ে এক নয়, ওরা সাতজন!

আমার এ-দুর্বিপাকে ব্যঙ্গ ক'রে হাসে যদি কেউ,
না জাগে হৃদয়ে যদি, ভ্রাতৃভাবে, সমান কম্পন,
তাকে বলি: পিশাচেরা, ভয়াবহ বার্ধক্য সত্ত্বেও,
সে-মুহূর্তে আমাকে কাঁপিয়েছিলো, তারা চিরন্তন।

মৃত্যু হ'তো আমার—দৈবাৎ যদি অষ্টম জাতক
দেখা দিতো, ক্ষমাহীন, মর্মান্তিক, বিদ্রূপে বিকৃত,
জঘন্য ফীনিক্স-বংশ, পরম্পর পুত্র ও জনক!
—কিন্তু সেই নারকীয় দৃশ্য ছেড়ে আমি অপসৃত।

ক্রুদ্ধ, যেন মাতাল, দৃষ্টিতে যার বিকট বিভ্রম,
ঘরে ফিরে অসুস্থ আতঙ্কে আমি রুদ্ধ করি দ্বার
জ্বর, জ্বালা, আত্মায় দারুণ শীত, নেই উপশম,
অসম্ভব এ-রহস্য কখনো কি দেবে না নিস্তার?

বৃথাই আমার বুদ্ধি হ'তে চায় ঋজু কর্ণধার,
ঝড়ের উন্মাদ খেলা সব চেষ্টা দেয় পণ্ড ক'রে,
পুরোনো জাহাজ যেন—দোলে, দোলে হৃদয় আমার,
মাস্তুলবিহীন, এক আদিগন্ত অকূল সাগরে।

জুডাস (ইস্কারিয়ট): যীশুর বারোজন শিষ্যের অন্যতম, ইনিই শেষ সান্ধ্য-ভোজের পরবর্তী প্রভাতে যীশুকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দেন। 'জুডাস' শব্দের অর্থ তাই দাঁড়িয়ে গেছে—প্রতারক। বারোক (baroque): স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্পকলার একটি শৈলী, ষোলো শতকের শেষভাগে ইটালিতে উদ্ভূত হ'য়ে আঠারো শতক পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে বলবৎ ছিলো। এর লক্ষণ অলংকরণের আতিশয্য, বাহুল্য ও অদ্ভুতের প্রতি আকর্ষণ। ফীনিক্স: মিশরী পুরাণোক্ত পাখি, পাঁচশো বছর আরব্য মরুভূমিতে বাঁচার পরে আগুনে আত্মাহুতি দেয়, কিন্তু তারই ভস্ম থেকে উঠে আসে তার বংশধর বা তার নিজেরই নবীভূত দেহ। মৃত্যুর পুনরুত্থান ও অমরত্বের প্রতীক।

ছোটো বৃদ্ধারা

উৎসর্গ: ভিক্তর উগো

১

পুরোনো শহর, যার আঁকাবাঁকা আনাচে-কানাচে
সব যেন মায়াস্পৃষ্ট, কুশ্রীতাও মনোমুগ্ধকর,
মনোজ্ঞ, অদ্ভুত আর ভাঙাচোরা কোথায় কী আছে
(মারাত্মক এই মর্জি), আমি তারই সন্ধানে তৎপর।

এই জীর্ণ বিকটীরা, কোনোকালে এরা ছিলো নারী,
লাইস বা এপোনীন! কুঁজো পিঠে ত্রিভঙ্গ, দোমড়ানো,
ঠাণ্ডা, ছেঁড়া বেশবাস—এসো প্রেম জানাই এদেরই,
কংকালের অন্তরালে মানবাত্মা রয়েছে এখনো।

দ্যাখো, এরা কুঁকড়ে চলে, বাতাসের চাবুকে নাকাল,
ওম্নিবাসের অট্টরোলে কম্পমান, আঁকড়ে ধ'রে হাতে
ছোটো-ছোটো বটুয়া, স্মরণচিহ্ন—কালের কাঙাল—
ফুল বা উদ্ভটশ্লোক অতি যত্নে আঁকা আছে যাতে।

হাঁটি-হাঁটি পা-পা, যেন সারবন্দী যান্ত্রিক খেলেনা,
কিংবা বিকলাঙ্গ পশু, ছেঁচড়ে টেনে কোনোমতে হাঁটে,
যদিও অনিচ্ছা, তবু নৃত্য থেকে নিস্তার মেলে না:
হায় ঘণ্টা—আন্দোলিত নিষ্করুণ দানোর দাপটে!

ধ্বস্ত এরা, তবু চোখ সূচীতীক্ষ্ণ, যেন দ্যুতিময়
পুষ্করিণী, যাতে জল রাত্রি ভ'রে নিদ্রালীন থাকে,
সেই বালিকার চক্ষু, যাতে ভাসে স্বর্গীয় বিস্ময়
এবং অমল হাসি সর্ববিধ উজ্জ্বলতা দেখে।

বৃদ্ধারা যখন মরে (আপনি তো লক্ষ করেছেন?)
কফিনের ক্ষুদ্রতায় শিশুদের হয় তুলনীয়,
মহাজ্ঞানী মৃত্যু দুই সমরূপ ভাণ্ডে ভ'রে দেন
রুচির প্রতীক তাঁর, উৎকট এবং রমণীয়:

এবং যখন এই ছায়ামূর্তি, দুর্বল, পাণ্ডুর,
প্যারিসের বল্মীকসংকুল পথ পার হ'য়ে যায়,
আমার কল্পনা জাগে—কোনো সত্তা, অতীব ভঙ্গুর,
শান্ত পায়ে চলেছে আশ্রয় নিতে দ্বিতীয় দোলনায়:

যদি না কখনো ভাবি—এষণায় জ্যামিতিনির্ভর—
বিভিন্ন দৃষ্টান্ত নিয়ে বহুরূপী অঙ্গবিকৃতির,
বাক্সের গড়ন তবে কতবার বদলাবে ছুতোর,
যাতে ঠিক মাপেজোকে ধ'রে যাবে প্রত্যেক শরীর!

ঐ সব চক্ষু যেন অগণ্য অশ্রুতে ভরা কুয়ো,
অথবা গলনপাত্র, ঠাণ্ডা ধাতু যার আস্তরণ;
রহস্যে আপ্লুত চক্ষু, রম্যতায় দুর্বার, অজেয়,
কঠিন দুর্ভাগ্য যাকে মাতৃস্নেহে করেছে লালন।

২

অবলুপ্ত গ্রাস্কাটিতে কামনায় বিহ্বল ভেস্টাল,
থালিয়ার পূজারিণী, যার নাম জানে কোনো মৃত
নেপথ্যপাঠক শুধু: —খ্যাতনাম্নী, হিল্লোলে উত্তাল
যে ছিলো পুষ্পল দিনে টিভলির ছায়ায় আশ্রিত—

সকলেই আমাকে আবিষ্ট করে! কিন্তু কেউ-কেউ
সব কষ্ট থেকে মধু ছে'কে নিয়ে, জানায় ভক্তিকে,
'বলীয়ান হে জটায়ু, দাও দৃপ্ত পাখা আমাকেও,
যাতে পারি উত্তোলিত হ'তে ঐ আকাশের দিকে!'

কোনো-একজন, যাকে মাতৃভূমি দিয়েছে যন্ত্রণা,
অন্য কেউ, সয়েছিলো স্বামীর অকথ্য উৎপীড়ন,
আর ইনি, সন্তানের ক্রুশে বিদ্ধ দুঃখিনী মাদোনা—
সকলের কান্না মিলে ব'য়ে যাবে নদীর প্লাবন!

৩

এদের নিয়েছি দেখে কতবার আমি ইতস্তত!
বিশেষত একজনে: সূর্যাস্তের উজ্জ্বল শোণিতে
যখন আকাশে ফোটে রক্তবর্ণ জ্বালাময় ক্ষত,
ব'সে থাকে চিন্তামগ্ন, সঙ্গহীন, কোণের বেঞ্চিতে,

কান রেখে কনসার্টের কাংস্যময় প্রখর নিনাদে,
যা দিয়ে সৈন্যের দল, সঞ্জীবনী সোনালি সন্ধ্যায়,
মাঝে মাঝে উদ্যানে নামায় বন্যা, বীর্যের আস্বাদে
ভীরু সব গৃহস্থের সাবধানী চিত্ত ভ'রে দেয়।

ব'সে রয় গরবিনী, খাড়া পিঠ, নিশ্বাস চঞ্চল,
শুষে নেয় উন্মুখর রণবাদ্য, অতৃপ্ত, উদ্বেল,
বিস্ফারিত করে চক্ষু, যেন কোনো প্রাচীন ঈগল,
মর্মরললাটে তার নেমে আসে অদৃশ্য লরেল!'

৪

এইমতো তোমরা, বিলাপহীন, স্থির, নির্বিকার,
পার হ'য়ে চ'লে যাও শহরের জীবন্ত ঝঞ্ঝনা,
সতী, বেশ্যা, আর মাতা—বুক ফেটে রক্ত ঝরে যার,
অন্য কালে যাদের নামের শব্দ জাগাতো বন্দনা।

তোমরা, একদা যারা কান্তিময়ী গরীয়সী ছিলে,
অধুনা চেনে না কেউ তোমাদের! বর্বর মাতাল
অশ্লীল বিদ্রূপ হেনে মিশে যায় রাস্তার মিছিলে,
চ্যাংড়া ছোঁড়া পায়ে-পায়ে নৃত্য করে, কুৎসিত, বেতাল।

বিশীর্ণ ছায়ার পুঞ্জে, বেঁচে আছো ব'লেই লজ্জিত,
কখনো করে না কেউ সম্ভাষণ—নিয়তি অদ্ভুত!
দেয়ালের প্রান্ত ঘেঁষে হেঁটে যাও সংকুচিত, ভীত,
পার্থিব জঞ্জাল, কিন্তু শাশ্বতের উদ্দেশে প্রস্তুত!

আমি কিন্তু দূরে থেকে চেয়ে দেখি, সস্নেহ, উৎসুক,
তোমাদের টলমান পদক্ষেপ, জানাই সান্ত্বনা:
মনে হয় তোমাদের পিতা আমি, ভ'রে ওঠে বুক,
খুঁজে পাই গোপন সুখের স্বাদ, তোমরা জানো না।

দেখি আমি তোমাদের কৈশোরের অস্ফুট প্রণয়,
ফিরে বাঁচি তোমাদের লুপ্ত দিন—ঋদ্ধ বা হতাশ,
তোমাদের দুষ্ট সুখে পরিস্ফীত আমার হৃদয়,
আমার আত্মায় জ্বলে তোমাদের পুণ্যের উদ্ভাস।

ধ্বংসস্তূপ! আমার আত্মীয়গোষ্ঠী! ভাব-সহোদর!
অশীতিবর্ষীয়া ঈভা, প্রতি রাত্রে জানাই বিদায়;
ঈশ্বরের করাল নখর-তলে বিদীর্ণ তোমরা
কে জানে আগামীকাল অকস্মাৎ হারাবে কোথায়!

[illegible]

[illegible] মত রোচনার [illegible] পারনি। ফরাসী উপন্যাস-লেখিকা জর্জ স্যান্ডের সম্পর্কে অনেক সমালোচকের অভিমত এই যে, তিনি যে সব উপন্যাস লিখেছেন সেগুলি মনোরম কাহিনী হতে পারেনি; কিন্তু তাঁর প্রেমপত্র-গুলিতে মনোরম কাহিনীর স্বাদ আছে। [illegible] সাহিত্যে এমন অনেক ক্ষেত্র [illegible] সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে, যার মধ্যে [illegible] ও প্রকৃতিতে কাহিনী নয়, [illegible]।

ইতিহাস যদি [illegible] মনে হয়, তবে স্বীকার করতে হবে যে সে কাহিনী [illegible] এক কিছুও দৃষ্টি পাওয়া যাবে [illegible]। কিন্তু তথ্যের ইতিহাস যদি রূপের [illegible] পরিণত হয়, তবে [illegible] রসের [illegible]। [illegible] রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একদিন ভারত-চন্দ্রের [illegible] দেখেছিলেন, [illegible] উঠেছিলেন— [illegible]

[illegible] কাহিনীর [illegible] সব [illegible] উপকরণ। এই [illegible] কাহিনীর চেয়ে সক্ষম ও দক্ষ [illegible] অধিকার অন্য কোনো [illegible] নেই। কাহিনীতে যারা কল্পনায় শরীরিত, কোন কোন শিল্পী ও দক্ষ ভাস্কর তাদেরই রূপ মূর্তিতে শরীরিত করতে গিয়ে বুঝেছেন আকাশগঙ্গা যেন গঙ্গোত্রী হয়ে গেল। একটি কাহিনীতে যাকে বহুরূপে দেখবার সুযোগ আছে, একটি মূর্তি তাকে শুধু একরূপে ধরে রেখে দেয়। বহু ভিন্ন রূপে দেখাতে হলে অনেক বহু ভিন্ন মূর্তি গড়তে হয়। কিন্তু একই কাহিনীর একই ম্যাডোনাকে চিত্রকলার কত শিল্পী কত রূপেই না এঁকেছেন। দেখা যায় কাহিনীরই আধারে কল্পনা সবচেয়ে বেশি প্রাণময় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি ও সঞ্চয় সম্ভব করে থাকে। একই রূপকে বৈচিত্র্যে বহুতর করে দেখিয়ে দেবার শক্তি একান্তভাবে না হোক, নিতান্ত-ভাবে কাহিনীতে আধারিত কল্পনারই আছে। কাহিনীর সব শ্রোতা অথবা সব পাঠকের কাছে কাহিনীর রূপধারা ঠিক একই ও একটি মাত্র রূপ নয়; কাহিনীর রূপধারার কাছ থেকে পাঠকের অনুভব যে রূপের স্বাদ পেয়ে প্রসন্ন হয়, তার বৈচিত্র্য সীমাবাঁধা নয়। কিন্তু রূপধারায় মন্দির যেন সব দর্শকের চোখের কাছে সব সময়েই একই ছাঁচে গড়া একটি রূপের মূর্ত আয়তন। যদি বলা হয়, এবং বলায় যুক্তিও আছে যে, সব আর্টই প্রকৃতিতে কল্পতরুর মত; তবু স্বীকার করতে হবে যে, কল্পতরুতার গুণে কাহিনীই সবচেয়ে বড় গুণী। রূপ সবচেয়ে বেশি বন্ধনহীন হয়ে, অসীম হবার জন্য উৎসুক হয়ে, কাহিনীর মর্মলোকে বিচরণ করে। কাহিনীর সঙ্গে অন্য সব আর্টের গুণিত্বের এই তুলনা বড়-মহত্ত্ব ও ছোট-মহত্ত্বের তুলনা বলে মনে করলে ভুল করা হবে। মনে করা উচিত, বৈশিষ্ট্যের তুলনা। প্রত্যেক আর্ট বস্তুত এক-একটি খণ্ড-বৈচিত্র্যের প্রত্যাচার, যদিও একই ভাবের মানত, একটি পূর্ণতার বোধ লক্ষিত করা। প্রত্যেক কলাকলা যেন বিশাল জীবনভবনের এক-একটি বিশেষ বিশেষ ও ভিন্ন ভিন্ন ঘরের উৎসব। কোন ঘরে গীতস্বর, কোন ঘরে নৃত্যায়িত নূপুর নিক্কণ, কোন ঘরে মূর্তি ও চিত্রের বর্ণোজ্জ্বলিত কান্তি। কাহিনীর কিন্তু এরকম কোন ঘর নেই। কাহিনী সব ঘরেই আছে। জীবনের সমগ্রতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাহিনী তার সৃষ্টির কাজ করে যায়। জীবনের সব কিছুই থাকে কাহিনীতে; দেবালয় থেকে শুরু করে আস্তাবল, কাহিনীর কাছে পবিত্র ও অপবিত্র সব বাস্তবতাই তার ব্রতের উপচার। কারণ, কোন বস্তু ঘটনা ভাবনা ও আবেগের একলা-

অস্তিত্বের চেহারাটাই তার রূপ নয়। সবার সঙ্গে, এমন কি বিপরীতের সঙ্গে তার এক বৃহৎ সম্বন্ধের মধ্যে তার রূপ ফুটে ওঠে। কাহিনীতে ডাস্টবিনও দুঃখের একটি করুণ রূপ হয়ে দেখা দিতে পারে, এবং সেই রূপ একটুও অপবিত্র নয়। বরং তাকে নোংরা দেবালয়ের চেয়ে বেশি পবিত্র বলেই মনে হবে। এই সম্বন্ধ রচনা করা ও আবিষ্কার করা কাহিনীর একটি প্রিয় কাজ।

কাহিনী যে মায়িক জগৎ সৃষ্টি করে, সেটা প্রকৃতিতে নিশ্চয়ই ছল-জগৎ নয়। কাহিনীতে শকুন্তলার স্বামিগৃহে যাত্রার কালে আশ্রমপিতা কণ্বমুনির যে চোখ ছলছল করে, গুণে ও ধর্মে সেই চোখ এই বাস্তব সংসারেরই একজন কন্যাবৎসল পিতার চোখ। এবং কাহিনীতে কণ্বমুনিকে অশ্রুসিক্ত হতে দেখে বাস্তব সংসারের একজন স্নেহহীন কঠিন মানুষেরও শুকনো চোখ করুণ হয়ে যেতে পারে। একেবারে বাস্তব জগতের অনুরূপ দ্বিতীয় একটি জগৎ নির্মাণের এই শক্তিতে ও গুণেই কাহিনী অন্য রম্যকলার তুলনায় সবচেয়ে বেশি বিশিষ্ট। গীত নৃত্য চিত্র ও মূর্তি যদি মানুষকে হাসাতে কাঁদাতে ও শত অনুভবে ভরে দিতে চায়, তবে তাদের পক্ষে একটি কাহিনীকে রূপায়িত না করা ছাড়া উপায় নেই। কোন মূর্তি শুধু তার আঙ্গিক মূর্ততার প্রভাবে দর্শককে হাসাতে বা কাঁদাতে পারে না। ব্যঙ্গমূর্তি অবশ্য হাসাতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে হাসিটা স্বাভাবিক ক্রীড়া মাত্র, কোন গাঢ় অনুভবের সুস্মিত প্রকাশ নয়। লক্ষ্য করার বিষয়, মূর্তি কখনও কাউকে কাঁদাতে পারে না, যদি তার রূপের মধ্যে কোন কাহিনী মূর্ত না হয়। দেবী অ্যাথিনি, যিনি যুদ্ধের দেবী, গ্রীসের পার্থেননে তাঁর মূর্তিটিকে দেখা যায় যে, শাণিত বর্শা হাতে ধরে রেখেও দেবী একটু বিষণ্ণ হয়ে আর মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। মূর্তির মুখের ও ভঙ্গির এই বিষাদ দর্শকের মনেও বিষাদ সঞ্চারিত করে। কিন্তু দেবী অ্যাথিনির ওই মূর্তিকে যদি নিতান্ত একজন মোহিনী নারীর মূর্তি বলে মনে করা হয়, দর্শক তবে মূর্তির মুখে ও ভঙ্গীতে বিষাদের কোন ব্যঞ্জনা দেখতে ও বুঝতে পারবে কিনা সন্দেহ। বরং মনে হতে পারে যে, ওটা একটা কারিগরী ত্রুটি; মূর্তির নির্মাণে একটা ভুল করেছেন শিল্পী। যদি বা বিষাদের ব্যঞ্জনা বলে মনে হয়, তবু বুঝতে অসুবিধে হবে, কিসের বিষাদ? ভালবাসার আশা শূন্য হয়ে গেলে ব্যথিতের চোখমুখের ভাবেও বিষাদ ব্যঞ্জিত হয়। কিন্তু অ্যাথিনির মূর্তিতে ওই বিষাদ কী সেই বিষাদ? নয় নিশ্চয়। যদি জানা থাকে যে, মূর্তিটি নিতান্ত এক মোহিনী নারীর মূর্তি নয়, দেবী অ্যাথিনির মূর্তি, একটি কাহিনীর মূর্তি, তবে বুঝে নিতে ও চিনে নিতে এক মুহূর্তও দেরি হবে না যে, যুদ্ধের দেবী নিজেই যুদ্ধের ভয়াল অকরুণতায় ব্যথিত ও বিষণ্ণ হয়েছেন, ক্লান্তির ভারে তাঁর মাথাটি ঝুঁকে পড়েছে। মূর্তির বিষাদ বিশেষ একটি রূপে ও তাৎপর্যে সত্য হয়ে দর্শকের বোধগত হয়, যদি জানা থাকে যে, কোন্ কাহিনীর, কোন্ ঘটনার, কিসের রূপ কিংবা কার রূপ মূর্ত করা হয়েছে। তেমনই মিলো দ্বীপের ভেনাস মূর্তিকে শুধু এক মোহিনীর মূর্তি বলে মনে করলে তাকে নিতান্ত এক সুঠাম রূপ ও যৌবনের মূর্তি বলে বোধ হবে। সেটা হবে মূর্তির মধ্যে কারিগরী দক্ষতার একটি পরিচয়ের উপলব্ধি। সেটাও একরকমের রসের উপভোগ হবে বটে, তবে খুবই সীমিত উপভোগ। কিন্তু মূর্তির ওই রূপশ্রী আরও বৃহৎ ও আরও মহৎ অর্থ নিয়ে সীমাহারা আকাশের জ্যোৎস্নারিত মাধুরীর মত রসামৃতে স্বাদু হয়ে দর্শকের অনুভবের কাছে একটি পরম উপভোগের সত্য হয়ে ধরা দেবে, যদি জানা থাকে যে, মূর্তিটি হলো সেই কাহিনীর ভেনাসেরই মূর্তি। সাগরের সেই সেখানে, যেখানে যুদ্ধে নিহত এক দেবতার রক্তে রঙীন হয়ে গিয়েছে সাগরজল, সেখানে এক দৈব মুহূর্তে ফেনপুঞ্জের বুকে আন্দোলিত হয়ে জন্ম নিলেন ভেনাস। অপরূপ যৌবনে পরিপূর্ণা এক সুন্দরী মোহিনী হয়ে নবীনা ফেনপুঞ্জেরই বুকের উপরে দাঁড়ালেন। সেই মুহূর্তে বিরাট এক ঝিনুকের খোলা তাঁর পায়ের কাছে সাগর জলের উপর ভেসে উঠলো। ভেনাস তখন ওই সাধের তরণীতে উঠলেন, আর পশ্চিম বায়ুর দেবতা জেফিরাস এই রূপসী ভেনাসের প্রেমিক হয়ে সেই তরণীকে মৃদু স্পর্শে চালিত করে সাইপ্রাস দ্বীপের তটে নিয়ে এলেন। সাগরের কন্যা রূপসী এই ভেনাসকে ভুলে গিয়ে মূর্তিটিকে যদি নিতান্ত পাথরে গড়া এক রূপসী বলে মনে করা হয়, তবে সেই মুহূর্তে রূপসীর অনেক মায়া-লাবণ্য ধুলো হয়ে ঝরে পড়ে যাবে।

গানের সেই গুণ আছে, ভাব সৃষ্টি করে একটি প্রভাব হয়ে যাবার গুণ। মানুষকে বিহ্বল করে কাঁদাতে পারে গান। কিন্তু কোন্ গান? কিসের গান? গানের মানুষ তাঁর প্রিয় সুরের তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে অবশ্যই বলতে পারেন, বৈরাগ্যের বেহাগ আছে, ভক্তির ভূপালী আছে। কোন সন্দেহ নেই, বাণীহীন গান কোন কথা না বলে শুধু তার সুরের গুণে অনেক কথা বলে দিতে পারে। বাণীহীন গানও সুনাদের আবেশ রচনা করতে পারে, এবং সেই আবেশ ভক্তির কিংবা বৈরাগ্যের ভাবের সঙ্গে একটি মিলও রক্ষা করতে পারে। কিন্তু এই মাত্র, এর বেশি কিছু নয়। বৈরাগ্যের ভাবময় একটি আবেশ সৃষ্টি করতে পারে শুধু সেই গান,

যে-গান কাহিনীর বাণী বহন করে। নিছক সুর ও স্বরের প্রভাব সে আবেশ সৃষ্টি করতে পারে না। পারে, সুর যদি বাণীময় হয় আর সেই বাণীতে কাহিনী থাকে। কাহিনী বহন করে না এমন বাণী খুব ভাল করে সংগীতিত হলে তার ফলে বড়জোর শ্রুতিরমণীয় চমৎকারিতার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু এই পর্যন্ত। গুণীজন গাওত রাগ হাম্বীর, লক্ষণ সংগীতের বাণীতে সুর শেখাবার ব্যাকরণ আছে; কোন কাহিনী নেই। এই গান যদি খুব ভাল করেও গাওয়া হয়, তবে তার ফলে সুরের একটি চমৎকার হাম্বীরতা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না।

একথা সত্য যে, না-বোঝা একটা মন্ত্র-ধ্বনি শুনে অথবা সংগীতিত একটি স্তবের ধ্বনি শুনে বহুজনের মনে আবেশের সঞ্চার হয়। এটা নিশ্চয় সুর ও ধ্বনির কৃতিত্ব নয়। কৃতিত্ব হলো শ্রোতা ব্যক্তির সেই মানসিক আধারের, যে আধার আগে থেকেই আবিষ্ট হবার সব ভাব ও আবেগ সঞ্চিত করে রেখেছে। সাধারণ সত্য এই যে, সুরের সুরধ্বনীতে যদি কাহিনীর কল্লোল থাকে, তবেই সেই সুর একটি মহৎ প্রভাব হয়ে কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিতে পারে। এবং সেই দিব্য তৃপ্তি সম্ভব করতে পারে, যে তৃপ্তি সম্ভব করা সব রম্যকলার শ্রেষ্ঠ সাধনা ও সিদ্ধি।

এখন প্রশ্ন করা চলে, কাহিনীর যে দান গ্রহণ করে অন্য সব রম্যকলা গুণান্বিত হয়, সেটাই বা কেমন দান? উত্তর দিতে হলে পুনরুক্তি করে সেই কথাই বলতে হয়, কাহিনী ব্যক্তিত্ব দান করে। অন্যভাবে বলা যায়, কাহিনীর স্পর্শে প্রত্যেক রম্যকলার সৃষ্টি বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তিত্ব লাভ করে। পশ্চিম বায়ুর দেবতা জেফিরাসের দয়িতা হয়েছেন যিনি, সেই ভেনাসের সুন্দর দেহের উপর নিশ্চয় বিশেষ একটি ব্যক্তিত্বের মায়াময় প্রক্ষেপ পড়েছে। তাই নিতান্ত রূপসী ভেনাসকে দেখা, আর জেফিরাসের প্রণয়ভাগিনী ভেনাসকে দেখা একই অনুভবের আবেশ ও উপভোগ সৃষ্টি করে না।

বাংলা উপন্যাসের কাহিনীতেও ঘটনা পাওয়া যাবেঃ শিলংয়ের গলফ-কোর্সের দিকে বেড়াতে যাবার পথে সেই অপরিচিতা মেয়েকে রোজই দেখতে পায় বিকাশ, যে-মেয়ে পার্কের পাইন গাছের ছায়াতে চুপ করে বসে থাকে। সে মেয়ের নাম শীলা, শুধু এই পরিচয় ছাড়া তার আর-কোন পরিচয় জানে না বিকাশ। একদিন হঠাৎ জানতে হলো, ওই শীলা দার্জিলিং-এর পরিমলের ভালবাসা-পাওয়া মেয়ে, ওদের বিয়ে হতে আর বেশিদিন বাকি নেই। এই জানার পর, কী আশ্চর্য, শীলাকে দেখতে কেমন-যেন নতুন রকমের লাগে। সেই বেণী, সেই চোখ-মুখ-চিবুক, গায়ে সেই নীল পশমের স্কার্ফ; তবু মনে হয়, আজকের এই শীলা ঠিক কালকের সেই শীলা নয়। কেন এমনটি মনে হলো? এই প্রশ্নের একটি মাত্র জবাব হতে পারে; এতদিনে জানা গেল যে, শীলা একটি কাহিনীর মেয়ে। শীলার ব্যক্তিত্বের একটি পরিচয় এতদিনে জানা গেল বলেই তাকে দেখতে এখন নতুন রকমের লাগছে। ব্যক্তিত্বের প্রলেপ পড়েছে, তাই তার রূপ নতুন অর্থ পেয়েছে। একই রূপকে ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তিত্বে বিভূষিত করে বহুতর ভিন্ন-ভিন্ন রূপের বৈভব সৃষ্টি করা, 'অভিনবনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞার' এই কীর্তি কাহিনীই সহজে সম্ভব করতে পারে, এবং করে থাকে।

সাহিত্যের সমালোচক ই এম ফর্স্টারের একটি মন্তব্য ঃ 'ফিকশন ইতিহাসের চেয়ে বেশি সত্য, কারণ ফিকশন প্রত্যক্ষের সীমা ছাড়িয়ে যায়।' মন্তব্যটিকে একটু বিস্তারিত করে বলা যায়—ইতিহাসের আক্ষরিক বৃত্তান্তের তুলনায় কাহিনীই বেশি সত্য। এবং আমাদের কবির কথা একটু পাল্টে নিয়ে বলা যায়—অয়ি ইতিবৃত্ত কথা, ওগো সীমাময়ী। রূপ সৃষ্টি করবার শক্তি হিসাবে কাহিনী কিন্তু কবির কথার একটুকুও নড়চড় না করে তার নিজের পরিচয় বলে দিতে পারে—মোর সুকুমার ললাটফলকে লেখা অসীমের তত্ত্ব। তথ্যে ও ঘটনায় যে রূপ নিতান্ত অপ্রত্যক্ষ, কাহিনীর কৃতিত্বে সেই রূপ প্রত্যক্ষ হয়। রূপকথা হিসাবে কাহিনী অন্য আর্টের মত তার সুকৃতি ও সিদ্ধির জন্য একই রীতি-নীতির অনুশাসন মেনে চলে বটে, কিন্তু কাহিনীর আবার এমন অনেক ও বিশেষ রীতিনীতি আছে, যাদের মেনে চলবার ও ভাবে দেহে ও প্রাণে গ্রহণ করবার সহজ যোগ্যতা অন্য আর্টের নেই। কারণ, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হিসাবে কাহিনী সবচেয়ে বেশি পুরাতন, এবং অন্য সব আর্টের তুলনায় পরিণামের পথে অনেক বেশি এগিয়ে যেতেও পেরেছে। দ্বিতীয় কথা, জীবনের এমন অনেক জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করে থাকে কাহিনী, যাদের পরিতৃপ্ত করবার মত কোন সম্বল অন্য আর্টের নেই।

ই এম ফর্স্টার কাহিনীর আখ্যান ও প্লটের পরিচয়, এবং দুই পরিচয়ের প্রভেদ বোঝাতে গিয়ে লিখেছেন ঃ রাজার মৃত্যু হলো, তারপর রাণীর মৃত্যু হলো—এটা হলো আখ্যান। আর, রাজার মৃত্যু হলো, তারপর সেই দুঃখে রাণীর মৃত্যু হলো—এটা হলো প্লট। মনে হয় এর চেয়ে সুষ্ঠু বিচার হবে, যদি বলা হয় যে, এই দুই বিবৃতির প্রথমটি হলো তথ্য, দ্বিতীয়টি কাহিনী। দ্বিতীয়টিকে কাহিনী বলতে হয় এই কারণে যে, এখানে তথ্যের উপর একটি বিশেষ বেদনার সম্পাত ঘটেছে, বিশেষ একটি ভাবে অনুভাবিত হয়েছে তথ্য। 'সেই দুঃখে'—এই কথায় পতিপ্রেমের একটি করুণ-করুণ মায়িক রূপচ্ছায়া তথ্যের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় কোন যাস্ক যদি শব্দের নিরুক্তের মত কাহিনীরও নিরুক্ত সন্ধান করেন, বিজ্ঞানী যেমন সন্ধান করে পদার্থের নিরুক্ত স্বরূপ পরমাণুকে পেয়েছেন, তবে তিনি তা অবশ্যই পেয়ে যাবেন। কথা মূর্তি ছবি ও গীতের মধ্যে যদি কোন ভাবের রূপ ও ভঙ্গী দেখা যায়, সেই রূপ যদি শিশিরকণিকার মত ক্ষুদ্র এবং সেই ভঙ্গী যদি অস্ফুট আভাসের একটা সামান্য স্পন্দনও হয়, তবু দার্শনিক অর্থে তাকেই বলা চলে—কাহিনী। আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর—এটি তথ্য। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধুলার তলে—এটি কাহিনী।

ইংরাজ চিত্রশিল্পী টার্নার সূর্যাস্তের ছবি আঁকতে খুবই নিপুণ ছিলেন। টার্নারের আঁকা সূর্যাস্তের একটি ছবি দেখে জনৈকা মহিলা অভিযোগ করেছিলেন—আকাশে যে এরকমের অদ্ভুত সূর্যাস্ত কখনও দেখা যায় না। শিল্পী টার্নার বলেছিলেন—ইয়েস ম্যাডাম, আকাশে এরকম সূর্যাস্ত কোনদিনই দেখতে পাবেন না। বুঝতে পারা যায়, শিল্পী কী বলতে চেয়েছেন। শিল্পী যে ছবি আঁকতে চান, সেটা বস্তুর প্রতিচ্ছবি নয়। তিনি তাঁর মনের আকাশে ফুটে ওঠা সূর্যাস্তের ছবিটিকে আঁকতে চাইবেন। এই ছবিও রূপ হিসাবে একটি বাস্তবতা, যদিও প্রত্যক্ষ বস্তুরূপের সঙ্গে তার যথেষ্ট অমিল আছে। এখন প্রশ্ন, চিত্রকলার এই টার্নারীয় রীতি কি কাহিনীকলারও একটি রীতি হতে পারে? কাহিনী অবশ্যই বস্তু ও ঘটনার সীমিত রূপের অতিরিক্ত একটি রূপ সৃষ্টি করতে পারে; করেও থাকে। এই সৃষ্টিকে অ-বাস্তব না বলে পরা-বাস্তব বলাই ভাল। পৌরাণিকেরা অবশ্য কাহিনীর বিশেষ একটি আলংকারিক বৈচিত্র্যের প্রয়োজন হিসাবে বস্তু ও ঘটনার অনেক অপূর্ব অদ্ভুত মূর্তি কল্পনা করেছিলেন। বাস্তবতা অবাস্তবতা অবস্তুতা ও পরা-বাস্তবতা, কাহিনী রাজ্যের উদার গণতন্ত্রে এরা সকলেই প্রজা, যদিও এদের যোগ্যতার ছোটবড় প্রভেদ আছে। প্রশ্ন নয় যে, সেখানে কোন ঠাঁই নেই যার, তার নাম অপ-বস্তুতা। পৌরাণিকের সেই অবস্তুতাও ঠিক অপ-বস্তুতা ছিল না। তাঁরা বস্তুতার রূপ সীমাছাড়া করে বাড়িয়ে তুলতেন। বস্তুতাকে রূপছাড়া করতেন না। সাধারণ সত্য এই যে, কাহিনীর ভাবকল্পে বস্তু ও ঘটনার প্রত্যক্ষ রূপের কোন ব্যত্যয় অথবা বিকার সহ্য হয় না। কাহিনীর বিমূর্ত শরীরের নির্মাণেও বস্তুর অপ্রাকৃত রূপ প্রযুক্ত হলে কাহিনীকে একটি মুখর অসত্য বলে মনে হতে পারে। ছবিতে শালবনের শ্যামশোভাকে লালরঙে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা যদি হয় তো হোক; কিন্তু গল্পের শালবনের শোভাকে সবুজ হতেই হবে। গল্প যদি সদাগর অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণীকে আপিসে বসিয়ে কাজ করাতে চায়, তবে তাকে প্লাস-ফোর পোশাকে সাজিয়ে ও মখমলে মোড়া সোফার উপরে বসিয়ে জমা-খরচের হিসাব লেখানো চলে না। কাহিনীর রূপে চিত্রধর্মিতা থাকতে পারে, কিন্তু কাহিনীর নির্মাণের নীতি চিত্রকলার রীতির অনুরূপ না হতেও পারে। কাহিনী বাস্তব জাগতিক সত্যের যে যে মায়িক প্রতিভাস রচনা করে, তার প্রত্যক্ষ রূপ অপবস্তুর রূপ নয়। তার মধ্যে শালবনের শোভা সবুজই হয়ে থাকে। কাহিনীতে শালবনের শোভাকে যদি লালরঙে চিত্রিত করা হয়, তবে সেটা হবে অপ-বস্তুতার চিত্রণ। জেনোফন অভিযোগ করেছিলেন—হোমারের দেবতারা বড় বেশি মানুষের মত। বুঝতে হয়, কল্পিত দেবতারও বিশেষ একটি বস্তু-স্বরূপ আছে। সেই বস্তু-স্বরূপের অভাব হলে কাহিনীর দেবতাকেও অপদেবতা হয়ে যেতে হয়; অথবা দেবতার কাহিনীটি না-দেবতা ও না-মানুষের কাহিনী হয়ে যায়।

এই অপ-বস্তুতার অপর নাম অপ-বাস্তবতাও হতে পারে। বহু দৃষ্টান্ত আছে, যাতে দেখা দিয়েছে যে, কাহিনীর চিত্রনে আত্যন্তিক বাস্তবতার নামে এমন বর্ণবিন্যাস করা হয়েছে, যেটা বাস্তবতার বিকার, অপ-বাস্তবতা। প্রয়োজন হয় না, তবু অজস্র বর্ণবিক্ষেপ, এটাও অপ-বাস্তবতা। জীবনের ও রূপের সৃষ্টির প্রয়োজনে দেহজ আসক্তি ও প্রবৃত্তির রূপ

গুণে ও ক্রিয়া অন্য কোন আগ্রহের তুলনায় কম সুন্দর নয়। এই আসক্তিরও একটি সহজ শ্রী অর্থাৎ একটি শুদ্ধ বস্তু-স্বরূপ আছে। আসক্তির এই শুদ্ধ বস্তু-স্বরূপের বিকার কাহিনীর চিত্রনে প্রশ্রয় পেলে সেটা হবে নিতান্ত একটি মিথ্যা রূপের প্রকাশ। এবং তার পরিণামও এই হবে যে, তাতে আসক্তিই স্ফূর্ত ও সঞ্চারিত হবে না। এই ব্যর্থতাই প্রমাণিত করে দেয়, বাস্তবতাও অপ-বাস্তবতার প্রভেদ কিসে ও কোথায়? কাহিনীতে ঘটনার রূপের এই অপ-বাস্তবতাই সেই অশ্লীলতা, যেটা বস্তুত রম্যতারই হানির একটি নিদারুণ হেতু, তাতে দৈবী নীতি রুচি ও সংস্কারের কোন হানির হেতু থাকুক বা না থাকুক।

আমরা রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শের একটি প্রত্যক্ষ জগতে বাস করি। আমরা রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শের একটি মায়িক জগতেও বাস করি, কাহিনীর জগৎ। ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি মুহূর্তের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা কাহিনী হয়ে তার চিন্তা ও অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে চলছে। কোন ঘটনাকে স্মরণ করার অর্থই কাহিনীর জগতে প্রবেশ করা। এই কাহিনীজগৎ পথিক মানুষের কাছে সংসার-বিদেশ নয়; এবং পথিক মানুষও এখানে নিজেকে প্রবাসী বলে মনে করে না। মাতার স্নেহ, প্রিয়ার প্রীতি, উৎসবের হর্ষ, দুঃখের অশ্রু, এখানে সবই সে পায়। কিশোর বালক সকাল বেলা ঘর থেকে বের হয়ে তার দূরে গাঁয়ের মাঠের মেলা দেখা সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে এল। তার সারা-দিনের দেখাশোনার সমস্ত অভিজ্ঞতা কিন্তু একটি কাহিনী হয়ে তার চেতনার অন্তর্লোকে থেকে গেল। বলা যায়, মানুষের একটি দিনের জীবন অতীত হয়ে গিয়েও কাহিনী হয়ে বেঁচে রইল। যখনই ইচ্ছা হবে ও দরকার হবে, এই কাহিনীর কাছ থেকেই সে তার অতীত জীবনের একটি দিনকে চেয়ে নিতে ও দেখে নিতে পারবে।

কাহিনী কেন এবং কীভাবে ব্যক্তিত্বের তৃপ্তি ও সিদ্ধি সম্ভব করে, তার এই সামান্য-ব্যাখ্যাত পরিচয়ের মধ্যেই কিন্তু একটি বড় সিদ্ধান্তের ভূমিকা পাওয়া যায়। তত্ত্ব হিসাবে কাহিনী দ্বৈতভাবনার সৃষ্টি রূপ ও পরিণাম। চিনি হতে চাওয়া নয়, চিনি খেতে চাওয়া। রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শের দ্বিতীয় একটি জগৎ সৃষ্টি করে তাকে উপভোগ করা। শুষ্ক বৈরাগ্যের নির্লেপ কাহিনীকে সৃষ্টি করেনি, করেও না। কাহিনী মানবীয় জীবনের রাগানুগা ভক্তির সৃষ্টি।

জাগতিক রহস্য ও পূর্ণ সত্যের নির্ণয় লাভ করবার জন্য মানুষের জীবনের 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়ার' তত্ত্বের সন্ধান চলছে। বাড়িয়ে বলা হবে না, যদি বলা হয় যে, কাহিনীরও জন্য মানুষের নিঃশ্বাসে ও শোণিতে যেন একটি স্বাভাবিকী তৃষ্ণাবল ক্রিয়ায় রূপের সন্ধান চলছে। কোথায় না আছে কাহিনী? কোথায় না কাহিনীকে সন্ধান করা হয়? এবং কোন্ শূন্যতাকে না কাহিনীর মায়িক রূপ দিয়ে পূর্ণ করা হয়? হিমালয়ের নিভৃতে শিলারন্ধ্র থেকে যে উষ্ণজলের ফোয়ারা উৎসারিত হচ্ছে, তার জলে সাদা সোহাগার গুঁড়ো দেখতে পাওয়া যায়। কাহিনী কিন্তু বলেই বলে দিয়েছে —এগুলি ভস্মাসুরের অস্থিভস্মের রেণু। আকাশের ওই সব তারা—রোহিণী মৃগশিরা ও কালপুরুষ, ওরা সকলেই এক-একটি কাহিনীর নায়ক ও নায়িকা। কাহিনী জড়িয়ে আছে ভূধর সলিলে কাননে। কাহিনী আছে জঙ্গলের গায়, বিটপী লতায়, শশিতারকায় তপনে।

ব্যক্তি মানুষের জীবনে শেষের সেদিনের পর তাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তার বিদেহ একটি অস্তিত্ব তখনও থাকে এবং কিছুকাল অথবা অনেককাল পর্যন্ত থাকে। সে অস্তিত্ব সহজে শ্মশানের ছাই কিংবা সমাধির মাটি হয়ে যায় না। লোকে তার কথা বলে। সে তখন একটি কাহিনী। প্রিয় পরিজন ও প্রতিবেশীর স্মৃতির ও দুঃখের একটি গল্প। বিশ্বাস করলে ভুল হবে না, আমরা প্রত্যেকেই এক-একটি পথিক-কাহিনী; যেমন জীবনে, তেমনই মৃত্যুর পরেও।*

[সমাপ্ত]

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীসুবোধ ঘোষের শরৎ স্মৃতি বক্তৃতার তৃতীয় ও শেষ অংশ।

নিরাময় হতে কার সাধ না যায়? কিন্তু ব্যাধির বীজকে নির্মূল না করে, শরীরের গোপন কলকব্জার নেপথ্যে তাকে পুষে রেখে দিলে কি নিরাময় সম্ভব?

ঘরের দরজায় সর্বনাশা ঝড়, আর উঠোনের বেড়ায় সর্বগ্রাসী আগুন দেখতে দেখতে এই প্রশ্ন আমার মনে এল।

ডেট্রয়েট, নেওয়ার্ক, কেম্ব্রিজ, ছোটো আকারে এই ওয়াশিংটনেও দাঙ্গা হয়ে গেছে। দোকানপাট পুড়েছে, গুলি চলেছে। যাদের অনেক ছিল, কিছু গিয়েও এখনো তাদের অনেক আছে। যাদের কিছুই ছিল না, তারা দলে আরো ভারী হয়েছে। যাদের হাতে শান্তি-শৃঙ্খলার ভার, তাদের অনেক পুলিশ, অনেক সময়, অনেক প্রেস্টিজ খরচ হয়েছে। যারা শান্তি জলাঞ্জলি দিয়েছে, শৃঙ্খলা ভেঙেছে, প্রেস্টিজে ধুলো দিয়েছে, তাদেরও খরচ হয়েছে, কিছু প্রাণ। কোন্ পক্ষে কতটা ক্ষতি হয়েছে, কিসের দাম বেশী, তা ঠিক জানি না।

দাঙ্গা বাধিয়েছে কালোরা। মরেছে তারাই বেশী। কোনো বিবেচনাশীল ব্যক্তি এ দাঙ্গার পিছনে থাকতে পারেন না। এর থেকে কেউ কোনো শুভ ফল আশা করতে পারে না। কালোদের মধ্যে যাঁরা শান্তিপ্রয়াসী চিন্তানায়ক, বিশ্ব সুদ্ধ সবাই জানে, এই বীভৎস হিংসা, এই উগ্র মরণকামিতা তাঁদের নীতি নয়। তা আমরাও জানি।

অতীতে যা হয়েছে তা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার এখন আদাজল খেয়ে লেগেছেন বর্ণবৈষম্যের মূলোচ্ছেদ করতে। সেনেটে নিগ্রো সদস্য, সুপ্রীম কোর্টে নিগ্রো বিচারপতি ইত্যাদি গৌরবজনক ও ঐতিহাসিক কীর্তি বর্তমান প্রশাসনের আমলে ঘটেছে। এ একটা যুগান্তের শুভসূচনা, এতে দ্বিরুক্তি করবে কে?

গত জুন মাসের গোড়ার দিকে প্রেসিডেণ্ট জনসন কংগ্রেসে যে পরিকল্পনা পেশ করেছেন, তাতে রাজধানী ওয়াশিংটনকে স্বায়ত্তশাসন দেবার সুপারিশ করে কংগ্রেসের কাছে স্পষ্টাস্পষ্টি 'হ্যাঁ' কি 'না' মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে। এ প্রস্তাবের কোনো সংশোধন চলবে না। একে হয় গ্রহণ করতে হবে, নয় বর্জন করতে হবে।

এই স্বায়ত্তশাসন বা হোমরুল বিল অতীতে পাঁচ-পাঁচবার সেনেটের মঞ্জুরি পেয়েছে। কিন্তু আটকে গেছে প্রতিনিধি পরিষদে; সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট কমিটি এ বিল পাস হতে দেন নি। যাঁরা নৈরাশ্যবাদী, তাঁরা বলছেন, এবারেও একই হাল হবে। কিন্তু কেন?

গোটা যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশটি রাজ্যে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা। দেশের অন্যান্য বড় বড় শহরে পৌর প্রশাসনের হাতে অঢেল শাসনক্ষমতা। কেবল রাজধানী নগরীতে এর ব্যতিক্রম কেন?

এর কারণ খুঁজতে হবে গত শতাব্দীর নথিপত্রে। একসময় ওয়াশিংটনেও হোমরুল কায়েম ছিল। ১৮০২ সালে মার্কিন রাজধানী উঠে গিয়েছিল ফিলাডেলফিয়া শহরে। এর পরের বছর থেকে নিয়ে টানা ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত (একটি রেকর্ডে দেখলুম ১৮২০—১৮৬০) ওয়াশিংটন স্বয়ংশাসিত হবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছিল। কিন্তু ঘুচলো কেন? পৌর প্রশাসনের সঙ্গে তৎকালীন কংগ্রেসের কোঁদল বেধে যাওয়ায়। প্রশাসনিক খিটিমিটি ছিলই। কংগ্রেসের কাছ থেকে বরাদ্দ আর্থিক সাহায্য নগর সরকারকে নিতে হত। তা যে পয়সা দেবে, সে বাঁশিতে ফুঁ দেবার তালে থাকবেই। তাতে টাঁ-ফোঁ করতে গেলেই লাগবে। লাগছিল। গৃহযুদ্ধের পর থেকে বর্ণগত সমস্যার একটা জোরালো প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল রাজধানীর ওপর। দলে দলে কৃষ্ণকায় দাস শ্রেণীর লোক এসে এই শহরে আশ্রয় নিতে লাগল। তাদের শিক্ষা, পুনর্বাসন ইত্যাদির বন্দোবস্ত কে করবে—এই নিয়েও বিরোধ বাধল কংগ্রেস আর নগরকর্তাদের ভেতর। তারপর কংগ্রেস কালোদের ভোটাধিকার দিতে চাওয়ায় ভেতরে-বাইরে সাদাদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জিত হল।

অবস্থা সবচেয়ে ঘোরালো হল তখন, যখন পৌর প্রশাসন তার আয়ের সীমা ছাড়িয়ে অতিরিক্ত খরচা করে দেউলে হয়ে পড়ল। তখন ঋণগ্রস্ত পৌরশাসনকে জামিনে খালাস করে এনে কংগ্রেস সিটি-গভর্নমেণ্ট ভেঙে দিয়ে ক্ষমতা করায়ত্ত করল। সেই থেকে আর আজ পর্যন্ত কংগ্রেসের মুঠো আলগা হয় নি।

বর্তমানে এই শহরের বোর্ড অব কমিশনার আছে। বোর্ডের তিনজন সদস্য; তাঁরা সবাই মার্কিন প্রেসিডেণ্টের বহাল করা লোক। বোর্ড পৌর পরিষদের কাজ চালায়। মেয়র নেই, প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং সেই ভূমিকায় দ্বৈত অভিনয় করে থাকেন। শহরের আইন-

কানুন, খাজনা ট্যাকসো, খরচ-খরচা সবই কংগ্রেসের হাতে। কংগ্রেসের উভয় ভবনেই বিশেষ কমিটি রয়েছে—রাজধানীর বিধি-রচনায়।

এমনি একটি কমিটি হল প্রতিনিধি পরিষদের ডিসট্রিক্ট কমিটি। সেখানে মাথা হয়ে বসে আছেন ম্যাকমিলান সায়েবের মতন লোক। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ ক্যারোলাইনার ফ্লোরেন্সে। ঘোর দক্ষিণ-নিবাসী, ঘোরতর দক্ষিণপন্থী, আর বিধাতার দাক্ষিণ্যভোগী ঘোরতম শ্বেতাঙ্গ।

রাজধানী ওয়াশিংটনকে হোমরুল দেওয়ায় এ'দের আপত্তি বা অনিচ্ছে কী? না, তা যুক্তি এ'দের হাতে প্রচুর মজুত আছে। অকাট্য যুক্তি সব।

ওয়াশিংটনের একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা (হোমরুলের প্রতিপক্ষ মনে করেন) এর চরিত্র, অর্থাৎ এর রাজধানীত্ব। দেবদাসীর আবার বিবাহের অধিকার কোথায়? পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্য, প্রত্যেকেই এর ভর্তা। তার ওপর আছেন খোদ কেন্দ্রীয় অভিভাবক: ফেডারেল সরকার। বিদেশের অতিথসুজন আসছেন যাচ্ছেন; তাঁদের খাতির করার জন্যেও তো সর্বসময়ের নটী দরকার। কাজেই, এ'দের আশঙ্কা, রাজধানীতে হোমরুল হলে পাছে এর "কেন্দ্রীয় চরিত্র" নষ্ট হয়।

যদিও প্রেসিডেন্ট জনসন বলেছেন তিনি হোরমুলে বিশ্বাসী, যদিও তিনি এমন পাকা বন্দোবস্ত করতে চান যাতে পরবর্তী সরকার ওয়াশিংটনে স্বায়ত্তশাসন কায়েম করতে সক্ষম হতে পারেন, যদিও ডেমোক্রেটিক এবং রিপাবলিকান উভয় দলই জাতীয় নীতি হিসেবে হোমরুল গ্রহণ করেছেন, তবুও এর বিপরীতবাদীরা আশঙ্কা (!) করছেন, কংগ্রেস থেকে বর্তমানে যে সাহায্য মিলছে, সেটা খোয়া যাবে।

অবিশ্যি এখানে একটা কথা বলার আছে। প্রতিপক্ষরা যতই মতলব নিয়ে কথা বলুন, যতই ছদ্মসমস্যার কথা তুলে ধরুন, সত্যিকার কয়েকটা জটিল সমস্যা আছে। যেমন—আর্থিক আয়ের সমস্যা। এ শহরের শতকরা তেতাল্লিশ ভাগ জমিই কেন্দ্রীয় সরকারের দখলে। বিদেশী দূতাবাসগুলোও কম জায়গা জুড়ে নেই। তা ছাড়া আছে ধর্মীয়, দাতব্য, শিক্ষা বিভাগীয় ইত্যাদি সব প্রতিষ্ঠান। সব মিলিয়ে রাজধানীর মোট ষোলো হাজার ছ' শো বিয়াল্লিশ একর জমি খাস-দখল। সে বাবদ বছরে এই শহরের প্রাপ্য পাঁচ কোটি তিরিশ লক্ষ ডলার ডাহা লোকসান যায়। অবিশ্যি, কেন্দ্রীয় সরকার একটা চাঁদা ধরে দেন, যা বছরে পৌনে চার কোটি ডলারের মত হবে।

আয়করের সমস্যা আছে। কলকাতার মতোই শহরের বাসিন্দা নয় এমন হাজার হাজার লোক বাইরে থেকে রুজি-রোজগারে আসে। বেশীর ভাগই মোটরগাড়ির আরোহী। রাজধানী ওয়াশিংটনে প্রতি বর্গ মাইলে যত ঘন গাড়ি চলাচল করে, গোটা যুক্তরাষ্ট্রের কোথাও তত চলে না। এ শহরে সাবওয়ে বা মাটির তলায় রেলের ব্যবস্থা নেই। কাজেই সড়ক আর সেতুর ওপর ভীষণ খরচ হয়। অথচ যাত্রীরা শহরের বাইরের অন্য অঙ্গরাজ্যের এলাকার বাসিন্দা।

তাদের কাছ থেকে রাজ্য আয়কর আদায় করার উপায় নেই ওয়াশিংটনের।

সমস্যা আরো অনেক। অবৈধ শিশু-জন্মের হার এখানে সবচেয়ে বেশী। সর্বাধিক যৌন ব্যাধির প্রকোপ এখানে।

এখন বেশীর ভাগ শহরে এসব সমস্যার সমাধান করা যায়—শহরের বিস্তার ঘটিয়ে, শহরতলি এলাকার উন্নয়ন করে। তাতে ট্যাক্সের ঘাটি বাড়ে। যারা শহরের বাইরে গিয়ে ট্যাক্সের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে-ছিল, তখন রূপসী নগরী তার কুহকসজ্জা নিয়ে নিজে এগিয়ে এসে তার দোরগোড়ায় দাঁড়াতে পারে, নজরানা দাবি করতে পারে।

কিন্তু ওয়াশিংটনের সে উপায় নেই। কেন্দ্রীয় আইনবলে উনসত্তর বর্গ মাইলের আঁটো গণ্ডীতে এ শহরের পুরো আয়তন বাঁধা। তার হেরফের হবার নয়। এ কোনো অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে যুক্ত নয়। তাই, সাহায্যের জন্যে কোনো রাজ্যের স্বারস্থ হওয়াও চলবে না।

আচ্ছা ধরে নেওয়া যাক, কেন্দ্রীয় সরকার তথা কংগ্রেসের শক্ত হস্তক্ষেপে এসব সমস্যার আর্থিক সুরাহা সম্ভব হল। তা হলেই কি হোমরুল-বিরোধী শক্তি ক্ষান্ত দেবেন? স্বায়ত্তশাসনের যৌক্তিকতা মেনে নেবেন?

প্রশস্ত করা, কিংবা পাগলা গারদের সংখ্যা বাড়ানো। আর যদি মনের কোণে ওদের জন্যে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নিয়ে চিন্তা করেন, যদি ওদের ধমনীতে সদ্য-সুপ্তোত্থিত কৃষ্ণ আফ্রিকার আদিম আরণ্য রক্তের কল-স্রোতের সম্ভাবনা আপনি দেখে থাকেন, তা হলে আপনার নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ, এই সর্বধ্বংসী পরিকল্পনার ব্লু-প্রিণ্ট অত্যন্ত দুর্বোধ্য। কারণ, এর পেছনে কোনো দাঁও মারার অভিসন্ধি নেই।

"...সং বিবেচনা ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সুস্থমনা মানুষ হিসেবে আমরা কেউই এমন কোনো কর্মসূচী সমর্থন করতে পারি না, যাতে সুচিন্তিত নীতি হিসেবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অগ্নিসংযোগ, জীবননাশ, সম্পত্তি-হানি ইত্যাদি গৃহীত হয়েছে।

"আমরা চাই ধৈর্যনিষ্ঠ বিবেকসম্পন্ন গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের গঠনমূলক কর্মসূচীর সুষ্ঠু রূপায়ণ..."

অহিংসাপন্থী নিগ্রোদের প্রতিনিধিত্ব-মূলক সংগঠন N. A. A. C. P. বা জাতীয় কৃষ্ণাঙ্গ প্রগতি সমাজের চাঁই নেতাদের কয়েকজনের মুখে কিছু দিন আগে এক

সৌরকলংক, আবহ ও ধোঁয়াশা

সৌরতন্ত্রের একটি রহস্যজালে আবৃত ব্যাপার হচ্ছে সৌরকলংক। সৌর-কলংকগুলির একাদশ বার্ষিক চক্র সম্পর্কে এখনো কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব খাড়া করা যায়নি এবং সেগুলি যে কোন্ কোন্ সৌর-ব্যাপারের প্রতিনিধি তাও নিশ্চিতরূপে বলা সম্ভব হয়নি। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, সৌরকলংক সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কিছুই জানেন না। তাঁরা এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, উপভোগ্য আবহাওয়া ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সঙ্গে সৌর-কলংকের আসা-যাওয়ার একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। আমরা এই প্রবন্ধে বিশিষ্ট ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক মিঃ ই এন লরেন্সের সৌরকলংক গবেষণা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

হালে মিঃ লরেন্স আবহমণ্ডলের কতকগুলি ব্যাপারকে যেভাবে সৌরকলংকের প্রভাবের দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন সে রকম এর আগে আর কেউ করেন নি। মিঃ লরেন্সের অনুমিতি সম্পর্কে কেউ কোন আপত্তি তোলেন নি বলেই আশা করা যায় যে, তাঁর গবেষণার কল্যাণে আবহতাত্ত্বিকরা হয়ত তাঁদের অনুসন্ধানের এক নতুন ফলপ্রসূ রাস্তা খুঁজে পেলেন, যে রাস্তা তাঁদের আবহপ্রক্রিয়াকে জানতে-বুঝতে সাহায্য করবে।

বার্কশায়ারের ব্র্যাকনেল শহরে অবস্থিত আবহ দপ্তরের মিঃ লরেন্স একজন কর্মী। তাঁর অনুমিতি তিনি রয়াল মিটিওরোলজিক্যাল সোসাইটির মাসিক মুখপত্র 'ওয়েদার'-এ প্রকাশ করেছেন।

বহু বৎসর যাবত আবহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মিঃ লরেন্স এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, আবহমণ্ডলের ওজোন বাষ্পের উপর সৌরকলংকের প্রভাব আবহাওয়ার উপর গিয়ে পড়ে। ওজোন পাওয়া যায় কোথায়? পাওয়া যায় আবহমণ্ডলের উচ্চস্তরে। সেখানে সৌরবিকিরণের প্রভাবে ওজোন উৎপন্ন হয়, যা হচ্ছে অক্সিজেনেরই এমন একটা রূপ যাতে প্রতিটি অণুতে তিনটি করে অক্সিজেন পরমাণু থাকে। মিঃ লরেন্স বলছেন যে, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের যে 'ব্যান্ড'গুলি ওজোন উৎপন্ন করে সৌর-কলংকের সংখ্যা কমলে সেগুলি বাড়ে।

সৌরকলংকের যাতায়াত চক্রে কলংকের সংখ্যা যখন সবচেয়ে কমে যায় তার দেড় থেকে দুই বছর আগে আবহমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি ওজোন উৎপন্ন হয়। সমশীতোষ্ণ অঞ্চলের উপর সৌরক্রিয়ার ফলে আবহের স্তরীভূতমণ্ডলের বায়ু সৌরতাপে তপ্ত হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে বইতে থাকে এবং ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সমশীতোষ্ণ অঞ্চলে বায়ুচাপ কমে যেতে থাকে। সৌর-কলংকের সংখ্যা যত কমে যাবে ততই সূর্য থেকে বেশি তাপ পৃথিবীর আবহমণ্ডলে এসে পড়বে এবং বায়ুচাপ দুর্বল হতে থাকবে। তেমনি কলংকের সংখ্যা বাড়লে বায়ুচাপও বাড়তে বাধ্য। সৌরকলংক ও আবহমণ্ডলে বায়ুচাপের এই সম্পর্কের দিকে মিঃ লরেন্স আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন।

যখন উচ্চচাপযুক্ত বলয় উত্তরে ও দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়বে, উপরের দিকের অক্ষরেখায় আবহমণ্ডলের পশ্চিমমুখী গতি ব্যাহত হয়। ব্রিটেনের মত দ্বীপে, যেখানে আবহাওয়া সাগরীয় এবং যার সমুদ্রের পূর্বদিকে অবস্থিতি সেখানে এই রকম ব্যাপার ঘটলে বৃষ্টিপাত কমে যাবে কারণ সেখানে বৃষ্টি নিয়ে আসে পশ্চিমী বায়ু।

সৌরকলংক যখন চরমে পৌঁছায় তার দেড় থেকে দুই বছর আগে আবহমণ্ডলে ওজোন সবচেয়ে কমে যায়। তখনই আবহমণ্ডলের উচ্চচাপযুক্ত বলয় হয় সবচেয়ে শক্তিশালী। তখন পশ্চিমী বায়ু ও বাণিজ্যবায়ু বাড়ে যার ফলে চাপ কমে এবং বৃষ্টি বাড়ে সমশীতোষ্ণ মণ্ডলে ও বিষুবৈখিক এলাকায়। কিন্তু ভূমণ্ডলের মধ্যভাগে অক্ষরেখাগুলিতে মাঝামাঝি চাপ ও ওজোনের প্রভাবে শুষ্ক গ্রীষ্মের আবির্ভাব হয়।

অবশ্য সৌরকলংক যে প্রতিটি চক্রে একই রকম থাকে তা নয়। কোনবার সেগুলি কম হয়, কোনবার বা বেশি। কাজেই ফলাফলের তারতম্য ঘটে।

মিঃ লরেন্স মনে করেন যে, এই ব্যাপারের ফলে সমশীতোষ্ণ অঞ্চলের প্রথমটা উচ্চচাপ দেখা দিতে পারে এবং তারপর আসে নিম্নচাপ। তখন নামে বৃষ্টি। মিঃ লরেন্স বলছেন যে এইভাবে সৌরকলংকের পরি-

কয়েকটি সৌর কলঙ্ক
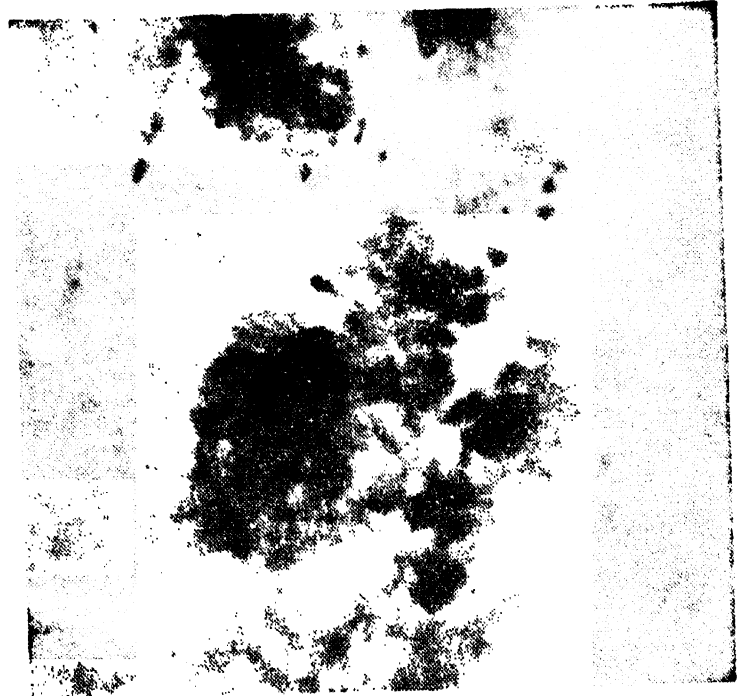
বর্তনের ফলে সৌরকলংক ও আবহের সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে যেজন্য সময়সময় মামুলী আবহ পূর্বাভাসে গলদ থেকে যায়।

সৌরচক্রের অন্যান্য ব্যাপারের সংগেও পৃথিবীর আবহাওয়ার সম্পর্ক আছে, যেমন সৌরকলংকের ত্রিকোণ ছায়া (আম্ব্রা), সৌরকলংকের স্থানবিশেষে অবস্থিতি এবং সূর্যের অগ্ন্যুদ্গার।

মিঃ লরেন্স সৌরকলংকের সংগে আবহের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করতে বসে ধোঁয়াশার সংগে সৌরকলংকের কোন সম্পর্ক আছে কিনা তাই নিয়ে কাজ করেছেন। ধোঁয়াশা ব্যাপারটা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়, বিশেষ করে বড় বড় শহরের ক্ষেত্রে। ১৯৫২ এবং ১৯৬২ সালে লন্ডন শহরে প্রচন্ড ধোঁয়াশা হয়েছিল। দুনিয়ার অন্যান্য শহরেও ঐধরনের ধোঁয়াশা হয়েছে। ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকরা ১৯৫২ সালের ধোঁয়াশা পরীক্ষা
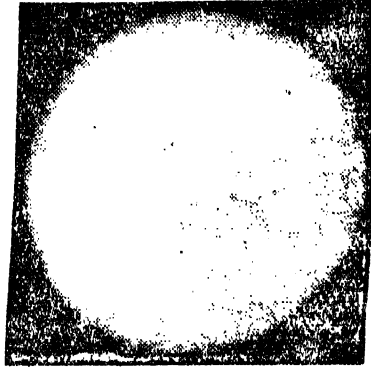
একাদশ বার্ষিক চক্রের চরম পর্যায়ে কয়েকটি সুগঠিত সৌর কলংক

নিরীক্ষা করে, ধোঁয়াশার সমস্ত রাসায়নিক উপাদানগুলি সম্পর্কে সঠিক জানতে না পারলেও এটুকু সম্পর্কে একমত হন যে ধোঁয়াশার ধোঁয়া ও সালফার ডায়ক্সাইডের সংগে দৈনিক মৃত্যুর হারের একটা যোগাযোগ আছে।

মিঃ লরেন্স দেখিয়েছেন যে, সৌরকলংক যখন সবচেয়ে কমে যায় তার দুই বছর আগে ধোঁয়াশা সবচেয়ে বেশি হয়। রিচমন্ডের সারে শহরের কিউ মানমন্দিরের পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে যে চরম ধোঁয়াশা হয়েছিল ১৯২২, ১৯৩২, ১৯৪২, ১৯৫২ এবং ১৯৬২ সালে। অবশ্য এটাও ঠিক যে ১৯৫৬ সালে লন্ডনে বিশুদ্ধ বাতাস আইন প্রবর্তনের পর ধোঁয়াশা কিছুটা কমানো গিয়েছে। কিন্তু সালফার ডায়ক্সাইড সম্পর্কে বিশেষ কিছু করা যায়নি। যাই হোক মিঃ লরেন্স দেখেছেন যে, সৌরকলংকের মাত্রানুযায়ী একাদশ বার্ষিক চক্রে বায়ুমণ্ডলের উর্ধস্তরে যখন ওজোন সবচেয়ে বেশি জমা হয় তখনই শহরের উপর বায়ু দূষিত হয় সবচেয়ে বেশি।

সেই সময় ইউরোপে ঠান্ডা পশ্চিম-ঘূর্ণিবাতের আধিক্য ঘটে। সেই ঠান্ডায় ধোঁয়াশা বেশি হয় কারণ বায়ুর আলোড়ন কমে গেলে ধোঁয়াশার উপাদানগুলি জমা হতে থাকে। লন্ডনে ঠিক এই ব্যাপার ঘটতে দেখা গিয়েছে।

মিঃ লরেন্স মনে করেন যে, সৌরকলংক যত বেশি হবে ধোঁয়াশাও হবে তত গাঢ়। প্রমাণ হিসাবে তিনি বলছেন যে, ১৭৭৮ সালের সৌরকলংকের চরম আধিক্যের পরবর্তী কালে যে দুটি বড় রকমের আধিক্য ঘটে তারপরেই ঘটেছিল ১৯৫২ ও ১৯৬২ সালের মারাত্মক ধোঁয়াশা। তিনি বলছেন যে, ধোঁয়াশার জন্য চাই আবহ-মণ্ডলে স্থায়িত্ব, হাল্কা বায়ু এবং নিম্নতাপ। সৌরকলংকের সংখ্যা সবচেয়ে কমার বছর-দুই আগে এইসব অবস্থার সৃষ্টি হয়।

মিঃ লরেন্স ব্রিটেনের গ্রীষ্মকালের সঙ্গে সৌরকলংকের সম্পর্ক নিয়েও গবেষণা করেছেন। ব্রিটেনের গ্রীষ্মকাল খুবই চঞ্চল এবং তার খুব বদনাম আছে। মিঃ লরেন্স এগারোটি গ্রীষ্মকাল বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে তার মধ্যে ৮টিতে খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল এবং সেগুলি সৌরকলংক চরমে ওঠার দুই তিন বছর আগে ঘটেছিল।

মিঃ লরেন্সের থিসিসে খৃষ্টপূর্ব ৫৫ শতকের গ্রীষ্মকালের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, সেই বছর জুলিয়াস সীজারের ব্রিটেন আক্রমণ প্রচন্ড ঝড়ে বাধা পেয়েছিল। তারপর ১৫৮৮ সালে স্প্যানিশ আর্মাডার পরাজয়ের একটি কারণ ছিল প্রচন্ড ঝোড়ো আবহাওয়া। এইরকম আরো কতকগুলি গ্রীষ্মের উল্লেখ আছে যেগুলিতে প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল এবং সেগুলির সবই সৌরকলংকের চরম বৃদ্ধির কিছু পরে ঘটে।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

laundry starch খাবার নেশা নিয়ে। অন্তঃসত্ত্বা মেয়েরাই বাক্সের পর বাক্স ধোয়া কাপড়ে লাগাবার মাড় খান। আমাদের মত ভাতের ফ্যানটুকু নয়। তা হলে নেশায় নাকাল হবার ভয় থাকতো না। যদিও খাদ্য হিসাবে বিষাক্ত নয় কারণ বেশীর ভাগ ঘন কঠিন করা মাড় তৈরী হয় সেখানে ভুট্টা থেকে। কিন্তু বিষাক্রিয়া না হয়েও ক্ষতির ভয় থাকে। অপুষ্টিজনিত রক্তহীনতা মা এবং শিশুর জীবন শঙ্কাজনক করে রাখে।

ডাক্তাররা ভয় পেয়েই নিরস্ত হন নি। নানা গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। আমাদের দেশে অন্তঃসত্ত্বা মেয়ে বা ছোট শিশুকে কখনও কখনও মাটি বা দেওয়াল খুঁটে চুনের চাপড়া, চক খেতে দেখা যায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন কোনও অভাব বা ঘাটতি শরীরে থাকে বলে এইসব উপসর্গ হয়। অবচেতনের প্রেরণা নিজের অজ্ঞাতে তাদের টেনে নিয়ে যায়। জানি না ঠিক এই একই কারণে কিনা, কিন্তু টাইম বলছেন যে, এক-কালে মার্কিন নিগ্রোদের মেয়েরা গর্ভবতী হলে মাটি খেতেন। কোথাও বা দক্ষিণী মেয়েরা উত্তরে গেলে তাদের নামে পার্শেল আসতো মাটির তাল। সেই মাটিকে বলা হতো Missisipi mud। সেই মাটি খাওয়ার বদলে এখন হয়েছে কলপ খাওয়া। কলপ খেতে নাকি মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়ার মত আর তার সঙ্গে একটা পেপারমিন্ট লজেন্সের অনুভূতিও জিভে ঠেকে। স্টার্চবিলাসিনীরা বলেন, একটুকরো চীনাবাদাম চিবিয়ে যেমন মন ভরে না, আর এক মুঠোর দিকে মন টেনে নেয় ঠিক তেমন ভাবে কলপ খেয়ে আর সাধ মেটে না। এক বাক্স খেলে গলায় যেন আটকে থাকে। তখন ঢক ঢক করে এক গ্লাস জলেই নেমে যায় দলাপাকানো পিণ্ড। তখনই আবার ইচ্ছা হয় আর এক ডেলা খাবার। কেউ বা আবার মশলা মিশিয়ে, নুন গোলমরিচ ছড়িয়ে নিয়ে খান, কেউ বা বরফের কুচি সহযোগে কেউ বা কোক কোলার বোতল নিয়ে বসেন।

যদিও স্টার্চ তৈরী করার প্রতিষ্ঠানগুলি জোর করেই বলেন ভুট্টার স্টার্চ খেলে ক্ষতি কি? স্যুপ ঘন হয় ভুট্টার ময়দার আরও নানা খাদ্যে এ ময়দার সংযোগ করা হয়। কাজেই অখাদ্য তো কিছুতেই বলা যায় না। কিন্তু ডাক্তাররা বলেন সে তো সামান্য পরিমাণ মাত্র ব্যবহার হয়। এত স্টার্চ শরীরে গেলে পুষ্টির পথ রোধ হয়, নানা ধরনের শারীরিক ক্রিয়ায় অসময়ে সন্তান প্রসব ও রক্তস্রাব হবার ভয় থাকে।

গর্ভবতীরাই যে কেবল কলপ খান তাও ঠিক নয়। মানসিক উত্তেজনা বা অশান্তি, চিন্তা ভাবনার সময় সামান্য একটু কলপের টুকরো নিগ্রো মেয়েরা চিবিয়ে নেন। এক-রকম মনকে শান্ত করার উপায় হিসাবে চিবোন। কাজেই নিগ্রোরা যে মনে করেন গর্ভাবস্থায় স্টার্চ খেলে বমিভাব কমে সেও হয়তো পুরোপুরি মানসিক। মানসিক অবস্থার চিকিৎসায় যেমন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়, তেমন এই অভ্যাসটি একটি সহজ ও সস্তা মানসিক লক্ষণ শান্ত করার চিকিৎসা। মানুষ টিনের পর টিন সিগারেট যদি খেতে পারে, মাদক নেশায় মত্ত হতে পারে, মন শান্ত করার বড়ি খেতে পারে, ঘুম পাড়ানি গুলি গলায় দিয়ে শুতে পারে তবে এই বা এমন একটা কি আশ্চর্যজনক ব্যাপার।
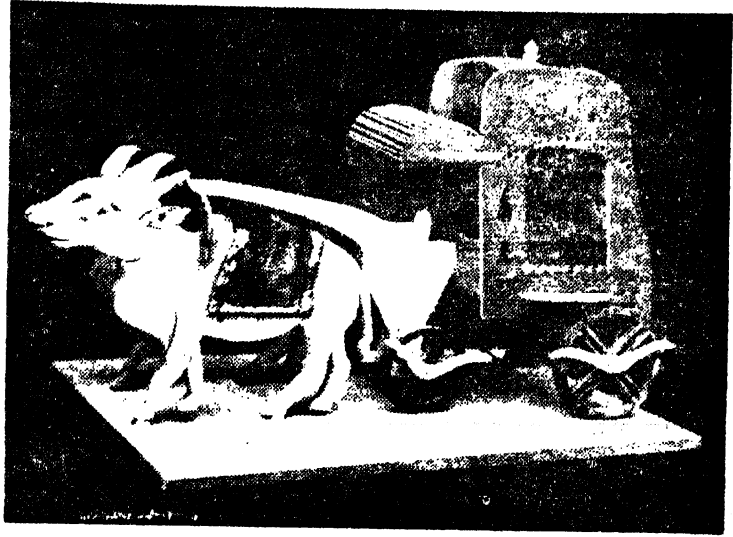
৫নং চিত্র

টুকিটাকি

বিশেষজ্ঞরা বলেন পাতিলেবুতে যা খাদ্য-প্রাণ আছে তাতে দুটি পাতিলেবু সারা দিনের ফলের অভাব অনেকটা মিটিয়ে দিতে পারে। পাতিলেবুর অশেষ গুণের কথা অনেকবার আমরা আলোচনা করেছি। ঘরে দুটো পাতিলেবু থাকলে কতই না কাজে লাগে। রান্নার দাগ তোলায় সব কিছুতেই তার ক্ষমতা অসীম।

আর পাঁচটা গুণের সঙ্গে সস্তা সহজ সৌন্দর্য রক্ষার উপায় হিসাবে পাতিলেবু অতুলনীয়। মধু ও পাতিলেবু মিশিয়ে মুখে মেখে শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলবেন। চমৎকার ফেস মাস্ক। যাঁদের ত্বকে তেল দরকার তাঁরা এই মাস্কের সঙ্গে দু ফোঁটা তেল দেবেন।

ডিমের কুসুম, লেবুর রস ও দু ফোঁটা তেল মাস্ক হিসাবে একইভাবে ব্যবহার করা যায়। ডিমের কুসুমে রস মিশিয়ে মেখে শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলবেন।

মুখে যাঁদের লোমকূপ নজরে ঠেকে এত

বড়, তাঁরা কাঠিতে তুলো জড়িয়ে তাতে লেবুর রস লাগিয়ে মুখের লোমকূপে ঠেকিয়ে যাবেন। কিছুক্ষণ পরে ধুয়ে ফেলবেন।

লেবুর খোসা হাতের বিবর্ণ কনুই, পায়ের গোড়ালিতে ঘষলে উপকার পাবেন। লেবু চিপে নেবার পর খোসাতে যতটুকু রস থাকে তাতেই যথেষ্ট হবে।

মুখে হাতে কোনও ছোপ থাকলে, কোথাও ত্বকের বিবর্ণতা লক্ষ্য করলে লেবুর রস জলে মিলিয়ে লাগাবেন। লেবুর রস বর্ণ পরিষ্কার করে। স্নানের পর সামান্য লেবুর রস জল দিয়ে মুখ ঘষলে কদিনেই পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন।

বাজকরা হাতের রুক্ষ ভাব, রংধরা দাগ নিয়মিত লেবুর ব্যবহারে কমনীয় থাকবে।

মাথা ঘষলে, স্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে দু ফোঁটা লেবুর রস মেশানো জলে ধুয়ে নেবেন। চুল চকচক করবে, সতেজ সুন্দর দেখাবে।

সকালে আর কিছু খাবার আগে লেবুর রস গরম জলে মিশিয়ে খেলে মেদ কমে, রক্ত পরিষ্কার হয়, বর্ণ উজ্জ্বল হয়।

শ্রীমতী

১৬
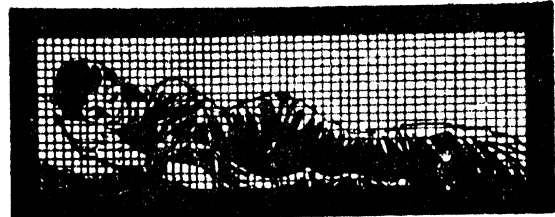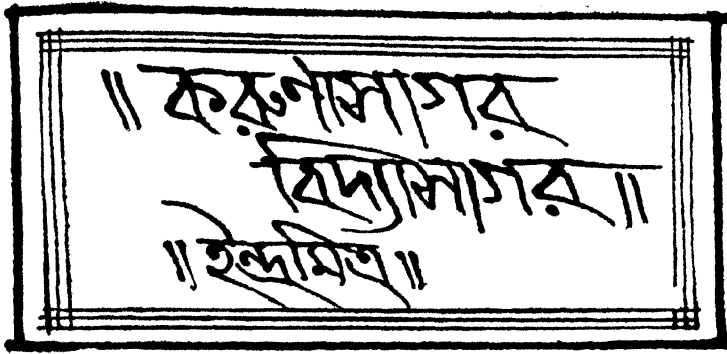
বিদ্যাসাগর খবর পেলেন, তাঁর নাম 'প্রাইভেট এন্ট্রির ফর্দে' ঢুকে গেছে। 'প্রাইভেট এন্ট্রি'র ফর্দে নাম থাকলে কী হয়? অনেকের কাছেই ও একটা মস্ত সৌভাগ্যের কথা। ওই ফর্দে যাঁদের নাম ওঠে, লাটসাহেবের সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করতে পারেন তাঁরা।

যা বলছিলাম, বিদ্যাসাগরের নাম উঠে গেল সেই ফর্দে। খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছে এসে উপস্থিত। লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারিও একজন পুরোপাক্কা সাহেব। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে তাঁর। 'প্রাইভেট এন্ট্রি'র ফর্দটা দেখতে চাইলেন বিদ্যাসাগর।

ফর্দে নাম দেখে নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগর খুশী হবেন। আবার, হয়তো বিদ্যাসাগর 'প্রাইভেট এন্ট্রি'র ফর্দে কোনো বন্ধু-বান্ধবের নাম দেবার কথা বলবেন।

বিদ্যাসাগর তাঁকে বললেন—কথা দিন, আপনি আমার একটা অনুরোধ রাখবেন।

প্রাইভেট সেক্রেটারি বললেন—কথা দিলাম, আপনার একটা অনুরোধ রাখব।

সাহেব যেমন ভেবেছিলেন তেমনি কিছু হল না। একটা উল্টো কাণ্ড করে বসলেন বিদ্যাসাগর। এক টানে নিজের নামটি কেটে দিলেন ফর্দ থেকে। তারপর সাহেবকে বললেন—আমার অনুরোধ, আপনি রাগ করবেন না। কথা দিয়েছেন, অতএব আমার অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে। আমাকে আর কিছু বলবেন না।

নিজে যা ভালো বুঝেছেন তাই বলেছেন বিদ্যাসাগর, তাই করেছেন বিদ্যাসাগর। দরকার হলে এগিয়ে গিয়েছেন, দরকার হলে পিছিয়ে পর্যন্ত এসেছেন।

বিদ্যাসাগরের বাড়িতে ডাকাতি হল একবার। রাত্রে একসঙ্গে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশজন ডাকাত সামনের দরজায় এসে উপস্থিত। একলা এদের সামনে দাঁড়ালে বিদ্যাসাগরকে প্রাণটি বিসর্জন দিতে হবে নিশ্চয়ই।

মা-বাবা এবং আর সকলকে নিয়ে বিদ্যাসাগর পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন। নিজে প্রাণে বাঁচলেন। আর সকলকে প্রাণে বাঁচালেন। ঘরের জিনিসপত্র নিয়ে উধাও হয়ে গেল ডাকাতের দল।

সেই রাত্রেই বিদ্যাসাগর থানায় খবর দিলেন। দারোগাসাহেব পরদিন যথারীতি তদন্তে এলেন। এবং যথারীতি বিদ্যাসাগরের বাবার কাছে দক্ষিণা দাবি করলেন।

বিদ্যাসাগরের বাবা দারোগাসাহেবকে বললেন—না, দারোগা বলে আপনাকে আমি কিছু দিতে পারব না। তবে যদি বামুনের ছেলে বলে কিছু নেন তো দিতে পারি।

বলে বিদ্যাসাগরের বাবা নির্ভয়ে বেরিয়ে গেলেন। ডাকাতেরা ঘটি-বাটি সব নিয়ে গেছে, সেসব কিছু কিছু কিনে আনতে হবে।

দারোগাসাহেব অবাক হয়ে ভাবলেন, এই বামুনের এত তেজ কিসের।

দারোগাসাহেব বিদ্যাসাগরকে চেনেন না। বিদ্যাসাগর তখন বাড়ির উঠোনে ছেলেদের সঙ্গে তন্ময় হয়ে কপাটি খেলছেন।

দারোগাসাহেব বিদ্যাসাগরের দিকে আঙুল তুলে বললেন—আর ওই ছোঁড়াটা! আশ্চর্য কাণ্ড, কাল বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে, ছোঁড়াটা কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে কপাটি খেলছে দেখ।

একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন দারোগাসাহেবের সঙ্গে। তিনি দারোগাসাহেবকে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে দু-চারটি খবর শোনালেন। বললেন—আজ্ঞে, উনি সামান্য লোক নন। জাহানাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এখানে এসে ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে কৃতার্থ হয়ে যান। শোনা যায়,

ছোটোলাট-বড়োলাটের সঙ্গে ও'র বন্ধুত্ব আছে।

খবর শুনে দারোগাসাহেব ঠান্ডা হয়ে গেলেন। আর কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না তিনি।

এই ঘটনার কিছুকাল পরের কথা।

হ্যালিডে সাহেব তখন ছোটোলাট। কথায় কথায় তিনি একদিন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে ডাকাতির খবর শুনলেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে বললেন—আপনি শেষ পর্যন্ত পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন! এ যে ভয়ানক কাপুরুষতা।

বিদ্যাসাগর বললেন—যদি না পালিয়ে চল্লিশজন ডাকাতের সামনে এগিয়ে প্রাণ দিতাম তো বলতেন, লোকটা আহাম্মক। মিছিমিছি চল্লিশজন ডাকাতের সামনে একলা এগিয়ে প্রাণটা দিল। আপনাদের খুশী করা খুব শক্ত। এগিয়ে গেলেও দোষ, পিছিয়ে এলেও দোষ।

বাংলা দেশের মেয়েরা যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে, ১৮৫৭ সালের গোড়ার দিকে হ্যালিডে সে-বিষয়ে উদ্যোগী হলেন। আলাপ-আলোচনা করলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। বিদ্যাসাগরের এ ব্যাপারে অসামান্য উৎসাহ। ১৮৫৭ সালেই বিদ্যাসাগর বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় খুললেন। ১৮৫৭ সালের ৩০ মের একখানা চিঠিতে বিদ্যাসাগর ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনকে ওই বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিত সমাচার জানিয়েছেন। ওই বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক বত্রিশ টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হল।

বিদ্যাসাগরের মনে হল, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে গবর্নমেন্টের সমর্থন আছে। যদি আরো বালিকা বিদ্যালয় খোলা যায়, নিশ্চয়ই ন্যায্য সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে।

পরম উৎসাহে বিদ্যাসাগর একের পর আরেক বালিকা বিদ্যালয় খুলে চললেন।

১৮৫৭ সালের ২৪ নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের ১৫ মে—এই সময়ের মধ্যে বিদ্যাসাগর স্থাপন করেছেন সাকুল্যে পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয়। চার জেলা নিয়ে এলাকা: হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, নদীয়া। স্থাপিত হয়েছে হুগলী জেলায় কুড়িটি বালিকা বিদ্যালয়, বর্ধমান জেলায় এগারোটি বালিকা বিদ্যালয়, মেদিনীপুর জেলায় তিনটি বালিকা বিদ্যালয় এবং নদীয়া জেলায় একটি বালিকা বিদ্যালয়।

ওই পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একুনে মাসিক খরচ ৮৪৫, টাকা এবং ওই পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয়ে সাকুল্যে প্রায় তেরো শো ছাত্রী। বালিকা বিদ্যালয়গুলোর জন্য বিদ্যাসাগর সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন করলেন।

কিন্তু, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ভারত সরকার বিমুখ। বালিকা বিদ্যালয়গুলোর জন্য কোনো সাহায্য মঞ্জুর হল না। অবশ্য বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়গুলো খোলার আগে গবর্নমেন্টের অনুমতি নেন নি; কিন্তু এ ব্যাপারে গবর্নমেন্ট অনিচ্ছুক নয়, গবর্নমেন্ট থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়গুলো খুলে ফেলেছেন।

আরো একটা সমস্যা। বালিকা বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকেরা আরম্ভ থেকে মাইনে পাননি। ১৮৫৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত হিসেব ধরলে তাঁদের পাওনা দাঁড়াচ্ছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা। সে টাকা কে দেবে? যদি গবর্নমেন্ট না দেয় তো অবশ্যই বিদ্যাসাগরকে দিতে হবে।

এই নিয়ে ১৮৫৮ সালের ২৪ জুন বিদ্যাসাগর ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনকে একখানা চিঠিতে আপন বক্তব্য জানালেন। বিদ্যাসাগরের বক্তব্য বাংলা গবর্নমেন্টের গোচরে আনলেন ডিরেক্টর। ডিরেক্টরের বিবেচনায় কর্তৃপক্ষের সাহায্য ও সহানুভূতি বিদ্যাসাগরের প্রাপ্য।

১৮৫৮ সালের ২২ জুলাই ছোটোলাট ভারত সরকারকে সমস্ত বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানালেন।

ভারত সরকার জানতে চাইল : কেন বিদ্যাসাগর ধরে নিলেন যে, সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে? লিখিত সরকারী আদেশ ছাড়া বিদ্যাসাগর একের পর আরেক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, এই কর্মের জন্য দায়ী কে?

ভারত সরকারের জিজ্ঞাসার উত্তরে বিদ্যাসাগর ১৮৫৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনকে একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা থেকে তুলে দিচ্ছি :

"I have the honour to state that as some female schools on this footing had already been established with the sanction of the government, I believed that the plan was generally approved. I invariably reported to your office the establishment of every new school, and usually in the month succeeding that in which it was opened. My several applications for the establishments required in these schools were always entertained by you though no orders were even passed, and

during a period of several months I was not in any way discouraged in the course I was taking, which is believed to be in accordance with the wishes of the Government."

১৮৫৮ সালের ৪ অক্টোবর ডিরেক্টর বিদ্যাসাগরের চিঠিখানা আপন মন্তব্য সমেত বাংলা গবর্নমেন্টের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সন্দেহ নেই, ছোটোলাট থেকে আরম্ভ করে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত সকলেই একটি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করেছেন। ১৮৫৮ সালের ২৭ নবেম্বর ছোটোলাট ভারত সরকারকে আদ্যন্ত ঘটনা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

ভারত সরকার বালিকা বিদ্যালয়গুলোর জন্য কোনো মাসিক সাহায্য মঞ্জুর করে নি, কিন্তু ওই প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা মঞ্জুর করেছে। ভারত সরকার লিখেছে :

"It is to be regretted that the Pandit's scheme of opening female schools on a plan opposed to the orders of the Hon'ble Court, but in the name of the Government and in anticipation of sanction, should not have been discouraged at once. As it is evident, however, that the Pandit acted in good faith, and with the encouragement and approbation of his superiors. His Honour in Council is pleased under all circumstances, to relieve him from responsibility for the sum of Rs. 3,439-3-3 actually expended on these schools, and to direct that it be paid by the Government.."

গবর্নমেন্ট মাসিক সাহায্য দিল না, বিদ্যাসাগর তবু নিরস্ত হলেন না। বালিকা বিদ্যালয়গুলো চালানোর জন্য তিনি একটি নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার খুললেন; তাতে নিয়মিত চাঁদা দিতে লাগলেন কয়েকজন মান্যগণ্য ভদ্রলোক। সেই চাঁদার টাকায় বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়গুলো বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। এবং ব্যর্থ হননি। এ বিষয়ে স্যর বার্টল ফ্রিয়ারকে লেখা বিদ্যাসাগরের ১৮৬৩ সালের ১১ অক্টোবরের একখানা চিঠি থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

"You will no doubt be glad to hear that the mufussil female schools, to the support of which

you so kindly contributed, are progressing satisfactorily. Female education has begun to be gradually appreciated by the people of districts contiguous to Calcutta, and schools are being opened from time to time."

বিদ্যাসাগর মনে-প্রাণে চেয়েছেন, এ-দেশের মেয়েরা শিক্ষিতা হয়ে উঠুক। মনে-প্রাণে যা চেয়েছেন তা সফল করার জন্যে বিদ্যাসাগর চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি।

আগেই বলা হয়েছে, ১৮৫৬ সালের শেষার্ধে বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুল কমিটির সেক্রেটারি হয়েছেন। ১৮৬২ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর বাংলা গবর্নমেণ্টকে বেথুন স্কুল সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন।

১৮৬৪ সালের জানুআরিতে বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুল কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

১৮৬৬ সালের শেষাশেষি মিস মেরী কার্পেণ্টার কলকাতায় এলেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা, ভারতবর্ষের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার হোক। তিনি ভারতবর্ষের একজন বন্ধু।

কলকাতায় এসেই মিস মেরী কার্পেণ্টার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

১৮৬৬ সালের ২৭ নবেম্বর অ্যাটকিনসন সাহেব (ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন) বিদ্যাসাগরকে এ বিষয়ে একখানা চিঠি লিখেছেন। তারপর বেথুন স্কুলে অ্যাটকিন-সন সাহেব মিস মেরী কার্পেণ্টারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের আলাপ করিয়ে দিলেন। প্রথম আলাপেই দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

মিস মেরী কার্পেণ্টার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কলকাতার কাছাকাছি কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় দেখে এলেন।

মিস মেরী কার্পেণ্টার প্রস্তাব করলেন, একদল দিশী শিক্ষয়িত্রী গড়ে তোলার জন্যে আপাতত বেথুন স্কুলে একটি মহিলা নর্মাল স্কুল খোলা হোক। মিস কার্পেণ্টারের ওই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এম এম ঘোষ এবং আরো কেউ কেউ। ১৮৬৬ সালের ১ ডিসেম্বর তাঁরা ব্রাহ্মসমাজে একটি সভার আয়োজন করলেন। মিস কার্পেণ্টারের সঙ্গে তাঁর প্রস্তাব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হবে সভায়। বিদ্যাসাগরকেও সভায় ডাকা হল।

সেই সভায় একটি কমিটি তৈরি হল। বিদ্যাসাগর সেই কমিটির একজন সভ্য নির্বাচিত হলেন। ঠিক হল, মহিলা নর্মাল স্কুল সম্পর্কে সেই কমিটি গবর্নমেণ্টের কাছে আবেদন করবে।

সভার কাজকর্মে বিদ্যাসাগর সন্তুষ্ট হলেন না। কমিটিতেও নিজের নাম রাখতে রাজী হলেন না। সভায় অবশ্য বিদ্যাসাগর কিছুই বললেন না। দু' দিন পরে—১৮৬৬ সালের ৩ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর চিঠি লিখে আপন বক্তব্য জানিয়ে দিলেন।

ওদিকে বেথুন স্কুলে ছাত্রী কমে গেছে। বেথুন স্কুলে আরো এমন কিছু কারণ দেখা যাচ্ছে, যার ফলে বেথুন স্কুল কমিটির ১৮৬৭ সালের মাঝামাঝি বিশ্বাস হল, বেথুন স্কুলে বিশেষ অনুসন্ধানের দরকার। ১৮৬৭ সালের জুলাই মাসে কমিটির একটা জরুরী বৈঠক বসল। বৈঠকে একটা সাব-কমিটি হল। সাব-কমিটিতে রইলেন বিদ্যাসাগর, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব আর প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী। অনুসন্ধান করে ১৮৬৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর সাব-কমিটি একটা রিপোর্ট দাখিল করল। রিপোর্ট দেখেশুনে বেথুন স্কুল কমিটি সিদ্ধান্ত করল, বেথুন স্কুলের হেডমিস্ট্রেস মিস পিগটকে না সরালে উন্নতির আশা নেই। কমিটির সিদ্ধান্ত কমিটি গবর্নমেণ্টকে জানিয়ে দিল।

মিস কার্পেণ্টারের প্রস্তাব নিয়ে কথা হচ্ছিল। বেথুন স্কুলেই একটি মহিলা নর্মাল স্কুল খোলার কথা। মহিলা নর্মাল স্কুল আর বেথুন স্কুল সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতামত চেয়ে ১৮৬৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলার ছোটোলাট স্যার উইলিয়াম গ্রে মস্ত একখানা চিঠি লিখেছেন বিদ্যাসাগরকে।

উত্তরে বিদ্যাসাগর ১৮৬৭ সালের ১ অক্টোবর ছোটোলাটকে একখানা চিঠি লিখেছেন। ওই চিঠিতে বিদ্যাসাগর প্রস্তাবিত মহিলা নর্মাল স্কুল সম্পর্কে লিখেছেন:

"I regret to say that I see no reason to alter my opinion as regards the difficulty of practically carrying out Miss Carpenter's scheme of rearing a body of Native Female Teachers either in connection with the Bethune School or independently such as may be acceptable to the bulk of

the Hindu community and worthy of their confidence. Indeed, the more I think about it the more am I convinced that I cannot conscientiously advise the Government to take the direct responsibility of setting in motion a project which, in the present state of the native society and native feeling, I feel satisfied, will be attended with failure . . . ."

মহিলা নর্মাল স্কুল সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের কথা শুনল না গবর্নমেন্ট। মিস কার্পেণ্টারের পরামর্শই গবর্নমেন্টের পছন্দ হল।

আগেই বলা হয়েছে, বেথুন স্কুল কমিটি গবর্নমেন্টকে জানিয়ে দিয়েছে যে, বেথুন স্কুলের হেডমিস্ট্রেস মিস পিগটকে না সরালে বেথুন স্কুলের উন্নতির আশা নেই। মিস পিগটকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিতে রাজী হল গবর্নমেন্ট।

১৮৬৮ সালের ৩ মার্চ গবর্নমেন্ট বেথুন স্কুল কমিটিকে জানাল :

". . . It will be desirable to bring the whole institution into more close and direct connection with the Education Department than it is at present. The Lieutenant-Governor will be glad to know if in this event the committee of native gentlemen who have hitherto, with an English President, conducted the affairs of the Bethune School, would be willing to act as a consultative committee in co-operation with the Divisional Inspector of Schools."

কিন্তু সেভাবে কাজ করতে রাজী হল না বেথুন স্কুল কমিটি।

গবর্নমেন্ট তারপর বেথুন স্কুলের সঙ্গেই জুড়ে দিল একটি মহিলা নর্মাল স্কুল। বেথুন আর নর্মাল স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে এলেন মিসেস ব্রিটশে। বেথুন স্কুল কমিটি ভেঙে গেল।

এই নতুন ব্যবস্থার ফল কি খুব ভালো হবে? বিদ্যাসাগর সেরকম আশা করেন না। বিদ্যাসাগরের পরামর্শ গবর্নমেন্ট শোনে নি; তবু, এই নতুন ব্যবস্থায়ও কর্তৃপক্ষ যখনই সাহায্য চেয়েছে, বিদ্যাসাগর সাহায্য করেছেন।

মহিলা নর্মাল স্কুলের কাজ আরম্ভ হতে দেরি হতে লাগল। দেরির অন্যতম কারণ : মেয়েদের গাড়ি চালানোর জন্য মেয়েমানুষ পাওয়া যাচ্ছে না। ১২৭৬ সালের ভাদ্র মাসে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' লিখেছে : "আমাদিগের কলিকাতার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের কার্য কত দিনে আরম্ভ হইবে? ঐ বিদ্যালয়ের ভারগ্রাহী উড্রো সাহেব কি শকটচালনের জন্য দুইজন ইউরোপীয় স্ত্রীলোক এবার বিলাত হইতে সঙ্গে করিয়া আনিবেন? তাহা হইলে তবু একপ্রকার আশাপথে চেয়ে থাকা যায়। নতুবা ভারতবর্ষে শকট-চালক স্ত্রীলোক প্রস্তুত করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ করিতে গেলে এ যুগে হওয়া সম্ভব নয়।"

শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিদ্যাসাগরের কথাই অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। তিন বছর যেতে-না-যেতেই ১৮৭২ সালের গোড়ার দিকে বেথুন স্কুলের সঙ্গের মহিলা নর্মাল স্কুলটি গবর্নমেন্টকে বন্ধ করে দিতে হল।

ক্রমে ক্রমে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারিত হয়েছে, কিন্তু নির্বিঘ্নে হয়নি। দীর্ঘকাল নিন্দুকদের বিরুদ্ধে কাগজে-কলমে বাক্যব্যয় প্রয়োজন হয়েছে। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থায়' কৈলাসবাসিনী দেবী লিখেছেন : "কেহ কেহ বলেন, নারীগণ বিদ্যা শিখিলে বিধবা হয়। কেহ বলেন, ইহারা বিদ্যা রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলে আর সাংসারিক কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। কোনো কোনো মহাত্মারা বলেন, স্ত্রীগণ বিদ্যা শিক্ষা করিলে তাহাদিগের চিত্ত চঞ্চল হইবে, আর সেই চাপল্যহেতু তাহারা স্বীয় স্বামীকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিবে, এবং মনোমত কাহাকে পরম্পরা আমন্ত্রণ করত উপপতিত্বে বরণ করিবে। কেহ বলেন, ইহারা বিদ্যাভ্যাস করিলে বুদ্ধিবল প্রাপ্ত হইয়া পুরুষবৎ

ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে আমাদিগের মানসম্ভ্রম একেবারে খর্ব হইবে। হায়! বিদ্যা শিখিলে বিধবা হইবে? বিদ্যার কি পতিঘাতিনী শক্তি আছে, যে তদ্দ্বারা নারীগণ পতিরত্নে বঞ্চিতা হইবে?...নারীগণ বিদ্যাভ্যাস করিলে যে স্বৈচারিণী হইবে ও সাংসারিক কার্যে উপেক্ষা করিবে তাহার প্রমাণ কি? বিদ্যা কি নিকৃষ্ট পদার্থ যে, তৎসংস্পর্শে নারীগণ নিকৃষ্টমার্গে পদার্পণ করিবে?"

১৮৭৭ সালের ৩ জুন 'সাধারণী' লিখেছে : "সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা বালিকাগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে অধিকারিণী বলিয়া স্থির করায়, বঙ্গসমাজের কোন কোন স্থলে মহা হুলস্থূলে পড়িয়া গিয়াছে। এখনকার অর্ধশিক্ষিত বাঙ্গালীর লক্ষণ এই যে, তাঁহাদিগের সকল বিষয়েই উপহাস করা আছে।...আজিকার কালে তুমি যদি সকল বিষয়ে, সমান উপহাস করিয়া, টিপিটিপি হাসিতে পার, তবেই তুমি একজন চতুর রসিক পুরুষ।...বাঙ্গালার সর্বত্রই অর্ধশিক্ষিত লোকের প্রকৃতি ও বৃত্তি এইরূপ; বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে তাঁহারা এবার তাঁহাদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছেন। কেহই আপন আপন কন্যা ভগিনীর দুরবস্থার কথা স্মরণ করেন না; তবে চারুমুখী বি এল দিয়া শামলা মাথায় কিরূপে বক্তৃতা করিবে, জজসাহেব তাহাতে কি মনে করিবেন—এই সকল অতি আবশ্যক বিষয়ের সমাধা জন্য সকলেই ব্যস্ত; কেবল ব্যস্ত নয়, অনেকে উন্মত্ত; কেননা যখন তাঁহারা নারীজড়িত বিষয়ে সুরস আন্দোলন করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের চৌদ্দপুরুষের মধ্যে কেহ কখন যে রমণী জঠরে বাস করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায় না।"

মেয়েদের মধ্যে চন্দ্রমুখী বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম এম-এ পাস করেছেন। খুব খুশী হয়েছেন বিদ্যাসাগর। চন্দ্রমুখীকে চিঠি লিখেছেন :

"শ্রীহরিঃ
শরণম্

বৎসে চন্দ্রমুখি—

সে দিন তোমায় দেখিয়া ও তোমার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া, আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। তুমি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবিনী হইয়া সুখে কালহরণ কর, এবং স্বদেশের অনেক দায়িনী ও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাভাজন হও, এই আমার আন্তরিক অভিলাষ ও ঐকান্তিক প্রার্থনা।

এই সমভিব্যাহারে শেক্সপিয়রের উপহার (Shakespeare's Works) প্রেরিত হইতেছে, পরিগৃহীত হইলে নিরতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইব। কলিকাতা ১০ অগ্রহায়ণ ১২৯১ সাল

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

হ্যাঁ, চিঠির সঙ্গে উপহার এসেছে একপ্রস্থ শেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী। বিদ্যাসাগর লিখে দিয়েছেন :

SRIMATI
KUMARI CHANDRAMUKHI BASU
The first Bengali Lady,
who has obtained the Degree of
Master of Arts,
OF THE CALCUTTA
UNIVERSITY.
From her sincere well-wisher
ISVARCHANDRA SARMA.

যা ছিল স্বপ্নেরও অগোচর, তাই ক্রমশ সত্য হয়ে উঠেছে। সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে স্ত্রীশিক্ষার আশাতীত উন্নতি হয়েছে বাংলা দেশে। কিন্তু বেথুন সাহেব সেসব কিছুই দেখে যেতে পারেন নি। ১৮৯১ সালের সেপ্টেম্বরে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' লিখেছে : "স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে বেথুন কলেজ দেখিয়া আসিয়া সমস্ত দিন কাঁদিয়াছিলেন, কোনও বন্ধু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছিলেন, "মেয়েরা এত উন্নতি করিয়াছে, যে তাহা স্বপ্নেরও অতীত, কিন্তু যে বেথুন এত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া স্কুল স্থাপন করিল, সে ইহা দেখিতে পাইল না—এই দুঃখে হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।"..."

(ক্রমশ)

গানের আসর

ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ : সুরেশ সংগীত সংসদ প্রদত্ত সম্বর্ধনা

বছর ছয়েক আগে অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে এসেছিলেন হাফিজ আলী তাঁর ছোট ছেলে আমজাদকে নিয়ে। আমজাদ বোধ হয় সেই প্রথম কলকাতার সংগীত জগতে অবতীর্ণ হলেন। হাফিজ আলী ছেলের সঙ্গে বাজিয়েছিলেন দরবারী কানাড়া। তিনি বেশী বাজাননি। ছেলেকে পরিচিত করবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মত কিছু কিছু বাজিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে, একটি পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন হাফিজ আলী গা লাগিয়ে বাজাননি প্রায় সেতার ছলেই কিছু কিছু টোকা দিয়ে গেছেন। রিপোর্টটি হাফিজ আলীর কানে উঠতে পরদিন সন্ধ্যায় তিনি কনফারেন্সে এসে খোঁজ নিলেন কাগজের পক্ষ থেকে কারা এসেছেন। এই সব কনফারেন্সে বেশ খানিকটা রাত না হলে শ্রোতার ভীড় হয় না। কাগজের লোকও তখন কেউ আসেননি। একজন এসে লেখককে ধরে নিয়ে গেলেন হাফিজ আলীর কাছে। হাফিজ আলী ব্যথিত চিত্তে বললেন কাগজের লোক তাঁর বাজনার উদ্দেশ্য ঠিক ধরতে পারেননি— শুধু তাঁর ছেলেকে বাজাবার সব সুযোগ তিনি দিয়েছিলেন তথাপি দরবারী কানাড়ার বিশেষ উপাদানগুলি তিনি স্বর সহকারে বাজিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কাগজে এই বিশেষ প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। দরবারী কানাড়া একটি মিশ্র রাগ। এর মধ্যে যেসব রাগের ছায়াপাত ঘটেছে সেগুলি দেখিয়ে দেওয়া এবং মিশ্রণটি কিভাবে সাধিত হয়েছে সেটিও শ্রোতাদের বুঝিয়ে দেওয়া তাঁর কর্তব্য। তাঁর বিশ্বাস তিনি সেটুকু ভালভাবেই করে গেছেন। ওদিকে তখন আসরে অনুষ্ঠান চলেছে। জনান্তিকে কথাবার্তা বেশী দূর এগুলো না। তিনি লেখককে বললেন পরদিন যেন একবার কালু মসজিদের উল্টোদিকে রয়েল হোটেলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয়, তাহলে তিনি সব জিনিসটা বাজিয়ে দেখিয়ে দেবেন এবং তাঁর বক্তব্যও আরও পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু পরদিন বিশেষ কারণে দেখা করা হয়ে উঠল না এবং সেবারে আর হাফিজ আলীর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগও হল না। বলা বাহুল্য মনটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল কেননা যে সুযোগ সহজে আসে না তাকে হারানো খুবই কষ্টকর। পরের কয়েকটা বছর কেটে গেল হাফিজ আলী আর আসরে অবতীর্ণ হননি। দীর্ঘ ছ' বছর পরে সুরেশ সংগীত সংসদের আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় ওস্তাদ হাফিজ
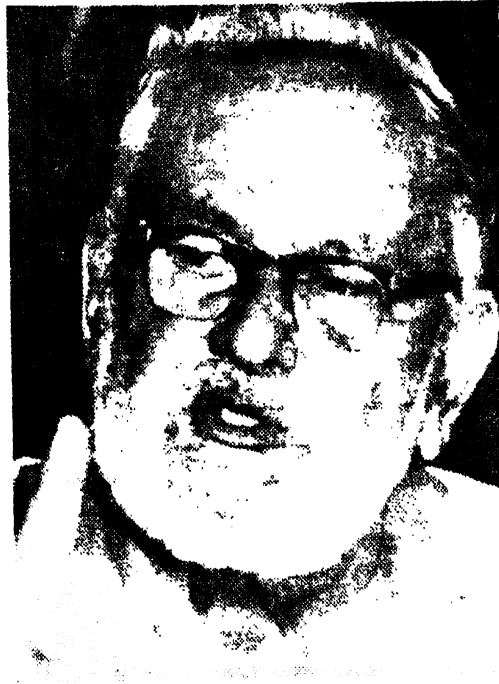
ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ

আলী খাঁকে আবার দেখলুম। ওস্তাদ বয়সের ভারে স্থবির। সেই দীর্ঘ কেশগুচ্ছ যা নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে শোভা বর্ধন করত তা ছেঁটে ফেলা হয়েছে। শ্রবণ শক্তি কমে গেছে। কাতরভাবে বাঁ হাতটা দেখিয়ে বললেন এ হাত বেকার হয়ে গেছে। সরোদটা কোনরকমে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে ছবি নেওয়া হল। আবার দেখা করবার বিষয়ে প্রায় নিরাশ হলুম। অনুশোচনা হল কেন সেবার যে করে হোক দেখা করিনি। কিন্তু এবার বিধাতা সদয় ছিলেন। কয়েক-দিনের মধ্যে দেখা করবার একটা সুযোগ ঘটে গেল। গত ২৫ই আগস্ট সন্ধ্যায় নিউ আলীপুরের লাহিড়ী ভবনে ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ আমাদের বহু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সুখী করেছেন। তাঁর হৃদ্যতা, পরিহাস-প্রিয়তা এখনও আগের মতই আছে। তিনি সেদিন বেশ সুস্থ ছিলেন এবং আমাদের নানা প্রশ্নের উত্তরে স্মৃতিচারণে আনন্দ পাচ্ছিলেন। এই সন্ধ্যার কথা আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

ইতিহাসে আমার কৌতূহল কিছু বেশী। শুনেছিলাম "সরোদ" যন্ত্রটি হাফিজ আলীর পরিবারেই সংগঠিত এবং বর্ধিত হয়েছে। এই কারণে আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল—"সরোদ" শব্দটি এল কোথা থেকে। প্রশ্নটির সদুত্তর মিলল না। ওস্তাদ বললেন ফার্সীতে এই রকম নাম ছিল। কিন্তু আমার জানবার কৌতূহল ছিল তাঁর পরিবারের কে এই নামটি দিয়েছিলেন এবং কেন দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে ওস্তাদ তাঁদের পারিবারিক ইতিবৃত্ত আমা-দের গোচর করলেন। তাঁর প্রপিতামহ গোলাম বন্দেগী খাঁ বঙ্গাশ আফগানিস্তান থেকে ভারতে ঘোড়া বিক্রি করতে এসেছিলেন। তিনি রবাব বাজাতেন এবং নিশ্চয়ই ভাল বাজাতেন নতুবা বাজনা শুনে রেওয়ার মহারাজ খুশী হতেন না। রবাবী বন্দেগী খাঁ মহা-রাজের সভাসদ হয়ে ভারতে রয়ে গেলেন। তাঁর ছেলে গোলাম আলী খাঁ যন্ত্রটির পরিবর্তন করেন এবং সম্ভবত "সরোদ" নামটিও তাঁরই সময় যোগ করা হয়। গোলাম আলী খাঁ কিন্তু তাঁদের তন্ত্রীতেই এই যন্ত্রটি বাজাতেন। তাঁর চার ছেলে জুম্মা খাঁ, হোসেন খাঁ, মুরাদ আলী খাঁ এবং নান্নে খাঁ। এঁদের মধ্যে জুম্মা খাঁ কাবুলে ফিরে গিয়েছিলেন। মুরাদ আলী যন্ত্রটিকে বর্তমানে সরোদে পরিণত করেন: অর্থাৎ এতে স্টীলের তার এবং প্লেট যোগ করেন। নান্নে খাঁ হচ্ছেন হাফিজ আলীর পিতা। নান্নে খাঁর আরও তিন ছেলে ছিলেন। দুজন সংগীত চর্চা করেননি। রহমৎ আলী এবং হাফিজ আলীই তাঁদের ধারা বজায় রেখেছিলেন। হাফিজ আলীর তিন ছেলের মধ্যে মুবারক আলী ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যালয়ের শিক্ষক, দ্বিতীয় পুত্র রহমৎ আলী ক্যানাডায় আছেন এবং তৃতীয় পুত্র হচ্ছেন বর্তমানে সুবিদিত আমজাদ

আমজাদ আলী

এইসব কাজে অনেককেই পটু হতে দেখা যাচ্ছে।

তাঁর সমরকার বহু আসরের কথা তিনি স্মরণ করলেন। কলকাতায় তৎকালীন বিদগ্ধ শ্রোতাদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুব উঁচু। তাঁর বয়সকালে যাঁরা ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ ছিলেন তাঁদের সকলের সংগেই তাঁর পরিচয় ছিল, সবাইকার সম্বন্ধেই শ্রদ্ধার সংগে বললেন। বর্তমানে কলকাতায় শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে তিনি রবাব বা এই জাতীয় বাদ্যের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য শিল্পী বলে মনে করেন। ওস্তাদ আলাউদ্দীনকে তিনি শ্রেষ্ঠ বাদকরূপে স্বীকার করেন। রাইচাঁদ বড়াল মহাশয়ের নাম বারবার উল্লেখ করলেন। অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয়ের কথা উঠতে শুধোলেন কি করে ডাক্তারবাবুর সংগে দেখা করা যায়। কলকাতায় তাঁর ঘরের একমাত্র প্রতিনিধি যে শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র একথা তিনি এর আগে সম্বর্ধনা সভাতেই বলেছিলেন।

গান বাজনার আসরে কোন ঘটনা তাঁর মনে সর্বাপেক্ষা গভীর রেখাপাত করেছে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বিখ্যাত তবলিয়া দর্শন সিং-এর মৃত্যুর বৃত্তান্ত স্মরণ করলেন। তিনি বললেন লোহাপটিতে এক আসরে তিনি বাজাতে গিয়েছিলেন। সেখানে বেচাবাবু (বেচাচন্দ্র?), ননীবাবু (ননীগোপাল মতিলাল?), অক্ষয়বাবু (?) প্রভৃতি তাঁকে উত্তেজিত করেন এবং দ্রুত-বাদনে তাঁর ক্ষমতা যাচাই করতে চান। তিনি কোনরকম বিরুদ্ধ মনোভাব নিয়ে বাননি কিন্তু এঁদের কথায় উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ ছিল। বললেন—"হম্ ভি পাল্লার মেল চালা দিয়া" বৃদ্ধ এবং দুর্বল দর্শন সিং বাজনার শেষ মুহূর্তে বাঁয়া তবলার ওপরেই ঢলে পড়লেন এবং সংগে সংগেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই আসরে তিনি বাজিয়েছিলেন হেমকল্যাণ, কল্যাণ, খাম্বাজ প্রভৃতি কয়েকটি রাগ। তাঁর মতনুর মনে পড়ে এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টার বেশী তিনি বাজাননি। দর্শন সিং সম্বন্ধে তাঁর কোনরকম অশ্রদ্ধার ভাব দেখলাম না বরঞ্চ তাঁকে দুর্ভাগাই মনে হল। বেচারী দর্শন সিং ভবিষ্যৎ বাদনপদ্ধতি কী হবে তা জানতেন না। স্পষ্ট ঠেকা দিতে গিয়েই তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হল। আজকের আসর হলে ব্যাপারটা অনেক "মেড ইজি"-তে শেষ হতে পারত এবং বেচাবাবুরাও এইভাবে ক্ষমতার পরিচয় নিতে চাইতেন না। হায় আদর্শবাদী যুগ! যাই হোক, এই দুঃখজনক ঘটনার পর থেকেই বোধ হয় ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ বেশীক্ষণ বাজানো বা দ্রুত বাদন থেকে নিবৃত্ত হয়েছেন। এঁর কথাবার্তায় কোনও হিংসার ভাব নেই, আমুদে এবং সেণ্ট পারসেণ্ট আর্টিস্ট মানুষ। তাঁর ধারণা বেশী বাজানো মানেই পুনরাবৃত্তি এবং এক-ঘেয়েমীর প্রশ্রয় দেওয়া।

কনিষ্ঠ পুত্র আমজাদ সম্পর্কে ওস্তাদ খুবই আশান্বিত। তিনি তাঁকে ধ্রুপদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং পোনোটি রাগও ভাল করে শিখিয়েছেন। সম্বর্ধনার আসরে তাঁর মিয়াঁ-মল্লারের আলাপ আমাদের খুব ভাল লেগেছে। গৎ যে পর্যন্ত শুনেছি ভালই লেগেছে—শান্তাপ্রসাদের সংগতও উপভোগ্য হয়েছে। আমজাদ যে তাঁর পিতার ধারাতেই বাজিয়েছেন এমন কথা বলা যাবে না, তবে মীড়ের কাজে এবং কয়েকটি ছোটখাটো কর্তব্যে তাঁর পিতার স্টাইলটা ধরা যায়। আমজাদ আধুনিক যুগের বাদনপ্রথার সংগে মানিয়ে নিয়েছেন।

বিদায় নিয়ে আসবার সময় অশীতি-উত্তীর্ণ ওস্তাদের মধুর হাস্য এবং বিনীত অভিবাদন আমাদের স্মরণে রইল। একটি নির্মল অন্তরের পরিচয় পেলাম যা শিল্পীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং বিশুদ্ধ সঙ্গীতের রসে পরিপ্লুত। সুরেশ সংগীত সংসদ এই শিল্পীকে সম্বর্ধিত করে একটি মহৎ কর্তব্য পালন করেছেন।

সব শেষে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরদাসী মল্লারের খেয়াল আমাদের ভাল লেগেছে কিন্তু বাংলা খেয়াল মনে রেখাপাত করেনি। প্রথমত রচনা খুবই

পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ

কাঁচা। "গরজায়ে" শব্দের সংগে "দরজায়" শব্দের মিল কষ্টকল্পিত। কাব্যাংশ ভাল না হলে বাংলা গানের কোন আবেদন থাকে না। দ্বিতীয়ত নিছক হিন্দী খেয়ালের ছকে ফেলা বাংলা খেয়াল একেবারেই বৈশিষ্ট্যহীন। খেয়াল বা যে কোনও গানই হোক রাগ-

সঙ্গীতে বাংলার একটা স্বকীয়তা না থাকলে তা বাংলাখেয়াল পদবাচ্য হয় না, হয় হিন্দী খেয়ালের কার্বন কপি। সেটাতে উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য কতটা সিদ্ধ হবে বলা কঠিন।

হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর সম্বর্ধনা

"জলসাঘর" নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ১৪ই আগস্ট প্রখ্যাত তবলিয়া শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয়কে একটি মানপত্র প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে অনেক তরুণ বাদক উপস্থিত ছিলেন। হীরেন্দ্রবাবু এই উপলক্ষ্যে তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন এবং বাদকদেরও আদর্শ এবং নিষ্ঠা বজায় রেখে চলবার উপদেশ দেন। অনুষ্ঠানে শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীকে উপস্থিত সকলের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সম্বর্ধিত করেন। শ্রীঅমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং তাঁর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন শ্রীশ্যামল বসু।

—শার্ঙ্গদেব

রেকর্ড সঙ্গীত

ইদানীং 'গানের আসরে' রেকর্ড সঙ্গীতের আলোচনা দেখি না। অথচ কিছুদিন আগে, আমাদের মতো বহু সংগ্রাহক শ্রোতার অনুভবগুলিই প্রতিধ্বনিত হতে দেখেছিলাম 'দেশে'র পাতায়, যখন আপনারই সর্বপ্রথম পূর্বসূরী কালজয়ী সঙ্গীত কীর্তিগুলির পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন গ্রামোফোন কোম্পানীকে।

সত্য বলতে কি, গ্রামোফোন কোম্পানীর সাম্প্রতিক প্রকাশনাগুলির মান এমনই অধোমুখী যে আমার মত বহু শ্রোতাই আতঙ্কিত হবেন সেই ধরনের যে কোনও প্রচেষ্টাকে। এ কথা আরও বেশি করে প্রযোজ্য রবীন্দ্র সঙ্গীতানুরাগীদের সম্পর্কে। পল্লী অন্যান্য কাব্য সঙ্গীতগুলোকে আমরা এ প্রস্তাবের বাইরে রাখতে চাই না। বর্তমানে এল পি ও ই পি রেকর্ড প্রচলিত হওয়ায় পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের কাজ সহজতর হয়েছে বলেই মনে হয়। অথচ অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে এ ব্যাপারে কোনও আন্তরিক আগ্রহ গ্রামোফোন কোম্পানীর তরফে এখনও দেখা গেল না, এমন কেন হোলো।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রথিতযশা শিল্পী শ্রীমতী কনক দাশ একদা অজস্র অনন্য সম্ভব সঙ্গীত কীর্তি রচনা করেছিলেন এই গ্রামোফোন কোম্পানীরই ডিসকে, অথচ এ যাবৎকাল তার মধ্য হতে বারোটি কি কম পক্ষে চারটি গানও বেছে নিয়ে কোম্পানী উপহার দিতে পারেলেন না তাঁর উত্তর প্রজন্মকে। বেশি নয় মাত্র চারটি অসাধারণ গান গেয়েছিলেন শ্রীমতী মালতী ঘোষাল এইচ এম ভি রেকর্ডে। তার মধ্যে দুটি (কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ও যদি প্রেম দিলে না) বহুদিন যাবৎ দুষ্প্রাপ্য; পুরানো সংগ্রহে কারো কারো বাড়িতে এখনও শোনা যেতে পারে। অথচ সহজেই তাঁর চারটি গান একত্রিত করে কোম্পানী একটি অমূল্য ই পি আমাদের হাতে তুলে দিতে পারতেন। শ্রীযুক্ত দেবব্রত বিশ্বাসের প্রথম যুগের কিছু আশ্চর্য গান (যেমন, 'আজো আকাশ পানে তুলে মাথা' এ শুধু অলস মায়া' 'আমি চঞ্চল হে' ইত্যাদি) গ্রামোফোন কোম্পানীর অবহেলায় পড়ে। তাঁর দুটি চলতি স্ট্যাণ্ডার্ড রেকর্ডের গান কোম্পানী ই পি ভুক্ত করতে পারলেন; অথচ প্রচণ্ড চাহিদা সত্ত্বেও এগুলিকে গুদামজাত করে রাখার কী অর্থ আছে জানি না। অনুরূপভাবে আমরা চাই শ্রীমতী কনকের গানগুলি পুনরুদ্ধৃত হোক ইপি বা এল পি রেকর্ডে। দুজনের কথা মাত্র উল্লেখ করলাম। আরও বহু শিল্পী রয়েছেন, যাঁরা তত প্রখ্যাত না হয়েও স্মরণীয় গৌরবের অধিকারী। সাম্প্রতিককালে দুটি এল পি রেকর্ডে দুজন খ্যাতনামা রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পীর কিছু উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। সেটা আনন্দের কথা। কিন্তু আমরা কোম্পানীকে আরও সচেতন ভাবে অবহিত হতে বলি রসিকজনের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে। পুরানো বহুশ্রুত গানের রিরেকর্ডিং হোক; তবে পূর্বসূরীদের অন্যান্য সঙ্গীত কীর্তিগুলিও চালু থাকুক, স্ট্যান্ডার্ড না হোক বড় ডিস্কে। কোম্পানী তার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে সহজেই রবীন্দ্র সঙ্গীতে পূর্বসূরীদের কিছু গান একত্রিত করে একটি এল পি প্রকাশ করতে পারেন, যা শিক্ষার্থী, রসিক নির্বিশেষে সকলের কাছেই একটি অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। হবে নাকি?

এই প্রসঙ্গ ধরেই কাব্য সঙ্গীতের অন্যান্য বিভাগ সম্পর্কেও অনুরূপ বক্তব্য প্রযোজ্য।

প্রদ্যুম্ন মিত্র
ইংরেজি বিভাগ
মৌলানা আজাদ কলেজ
কলকাতা

চোদ্দ
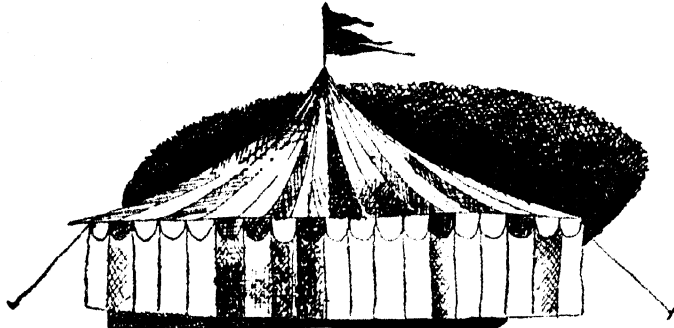
"আরে, ছাড় ছাড়, কী কর—" রাধানাথবাবুর গলা থেকে যমুনার শক্ত হাত আলগা করে নিতে খুব পরিশ্রম হচ্ছিল মোহনলালের। অপ্রকৃতিস্থের মতন হয়ে উঠেছে যমুনা।

"হল কী রাধানাথবাবু?"

"আমি চোর, চুরি করেছি—" যমুনার শক্ত হাতের চাপে কাহিল হয়ে পড়েছিল রাধানাথবাবু, এখন গলায় হাত বুলোতে-বুলোতে ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলল, "পুলিস ডাক, আমাকে ধরিয়ে দাও।"

যমুনা বিকৃত মুখ করল, "সরে হও!"

"আরে ছি-ছি যমুনা, এমন মাথা গরম করা ঠিক না। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও", কাছাকাছি আর কোন মানুষ আছে কি-না, এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল মোহনলাল, "গোছগাছ সব শেষ তো?"

কথা বলল না যমুনা, তাঁবুর মধ্যে মাটিতে বসে দু হাতে মুখ ঢাকল। অল্প অল্প করে পিছিয়ে যাচ্ছিল রাধানাথবাবু, এক সময় গেটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সকলকে শুনিয়ে জোরে বলে উঠল, "মুখে লাথি! মরুক এবার! এই আমি চললাম—"

"কোথায় যান? শুনুন শুনুন, ও রাধানাথবাবু—" মোহনলাল তার হাত ধরতে যাচ্ছিল, রাধানাথবাবু থামল না, ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দিয়ে আরও জোরে হাঁটতে থাকল।

"ও মোহনবাবু, বাবাকে আটকান—" কান্না-কান্না গলায় বলল হাসি, "চলে যাচ্ছে যে।"

"থাম তুই!" এখনো যমুনার গলায় ঝাঁজ ছিল, "মদ খাবার পয়সায় দরকার নেই? যাবে কোথায়?"

তাঁবুর মধ্যে একটা বোলতা ঘুরছিল, তা দেখেও যমুনাকে কিছু বলল না হাসি। একটা অসন্তোষ তারও মনে বোলতার মতন হুল ফুটিয়ে যাচ্ছিল। সে দেখল, কিছু দূরে রাধানাথবাবুর হাত ধরে তাকে থামিয়েছে মোহনলাল—তাঁবুতে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে।

একটা শুকনো কাপড় টেনে নিয়ে ভিজে শাড়ি ছাড়তে-ছাড়তে হাসি বলল, "দিদি, তুই বাবাকে মারলি!"

"খুন করে ফেলি নি, তার ভাগ্য।"

"বাবার গায়ে হাত তুললি, মোহনবাবু দেখল যে!"

"দেখুক", মুখ থেকে হাত সরিয়ে যমুনা বসে যাচ্ছিল, "খালি নিজের সুবিধা দেখবে, নিজের ভাল বুঝবে। বাপ না ছাই, বোঝা

মালিক, তার ম্যানেজার—সব শালা সমান।"

ভয় পেয়ে গেল যমুনা। খুব উঁচু স্বর শিবনাথের। রাধানাথবাবু বসে আছে তাঁবুতে, তার কথা শুনল কি-না কে জানে। যমুনা উঁকি মেরে রাধানাথবাবুকে দেখল এবং কিছু পরে একটু দূরে সরে গিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করল, "হল কী শিববাবু, হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন কেন?"

শিবনাথ বলল, "বাবু, স্পষ্টই বলে দিল, এখানে থাকতে গেলে জেনারেল ম্যানেজারকে মেনে চলতেই হবে। আমি কারুর বাপের চাকর নই—চলে যাব এখান থেকে—"

"কোথায় যাবেন?" থমথমে করছিল যমুনার মুখ, গলার স্বর ঈষৎ উষ্ণ। শিব-নাথের কথা সে মেনে নিতে পারছিল না।

"কেন, সার্কাস ছাড়া আর জায়গা নেই এ দুনিয়ায়—"

"পালিয়ে যাবেন?"

"আমি মেরে যাব, জ্বালিয়ে দিয়ে যাব—"

শিবনাথের কথা ফাঁকা-ফাঁকা, এসব শুনতে শুনতে অপ্রসন্ন হয়ে উঠছিল যমুনা। তার মনে হল, অল্পেই মাথা গরম হয়ে ওঠে শিবনাথের, শপথের কথা ভুলে যায়। যমুনা তাকে আবার সব মনে করিয়ে দিতে চাইল।

"আমাকে কী কথা দিয়েছিলেন, ভুলে গেলেন?" যমুনা উদাত্ত স্বরে শিবনাথকে শাসন করার মতন বলল, "কথা না রাখতে পারলে দেন কেন, পুরুষ মানুষ আপনি!"

শিবনাথ যমুনাকে দেখল এবং তার শাসন আত্মসাৎ করে নিয়ে নরম গলায় বলল, "তুমিও ছেড়ে দাও এ সার্কাস, চল আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।"

"আমি পালিয়ে যাবার মানুষ নই শিব-বাবু", চেপে চেপে কথা বলছিল যমুনা, "কোথায় নিয়ে যাবেন? কোথায় নিয়ে গেলে জেনারেল ম্যানেজারের হুকুম মানতে হবে না শুনি? তারপর আবার কোথায় পালাবেন?"

যমুনার আঘাত সহ্য করতে করতে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল শিবনাথ, হঠাৎ রূঢ়স্বরে বলল, "তোমার জন্যেই আমার কথা শুনতে হল। [illegible] দিয়েছিলাম।"

"[illegible] কথা শোনাল [illegible] না যে আমি [illegible] আপনাকে।"

"[illegible] বললে বদনাম হবে না তোমার?"

"[illegible] আমি বুঝেছি।" শিবনাথের [illegible] মনে ভেসে যাচ্ছিল যমুনা। কেউ কেউ আড়ালে দেখছে, হয় তো তাদের সাহেবের কানে খবর পৌঁছে যাবে কিন্তু এসব [illegible] না করে শিবনাথের মুখের ওপর যমুনা বলল, "আর আপনি চলে গেলে লোকে আমাকে দুষবে না? এত সব নিয়ে কথা বললেন আমাকে? কিছু বলবার [illegible] নেই সেকথা বললেই তো হয়। আমি আশা করে বসে থাকতাম না—"

শিবনাথ যমুনার কথার উত্তর দেয় নি। কিছু সময় দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ। তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল। রাতে লণ্ঠনের মৃদু আলোয় যে-দম্ভের প্রকাশ ছিল তার চোখে-মুখে, উচ্চারণে যে-দৃঢ়তা ছিল, সূর্যের আলোয় তার কোন চিহ্ন খুঁজে পেল না যমুনা।

রাধানাথবাবুর নেমন্তন্ন রাখতে হারকু সাহেব এল কিছু পরে। কাগজে মোড়া একটা বড় বোতল ছিল তার হাতে। সে তা বাড়িয়ে দিল রাধানাথবাবুর দিকে। মোড়ক খোলবার আগেই যমুনা বুঝল, মদের বোতল।

যমুনা ভেবেছিল রাধানাথবাবু বোতল

কাজকর্মের শিথিল অবস্থা

দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত স্ফীতি এবং মন্দার আশঙ্কা আর্থিক ব্যবস্থায় দুটো পাশাপাশি থাকা বিচিত্র, সন্দেহ নেই। খাদ্যের নিদারুণ অনটন হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের অনবরত বৃদ্ধির জন্য দায়ী। চলতি বছরে ভারতের প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানির দরকার। কিন্তু ৯০ লক্ষ টনের বেশি পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। মোট চাহিদার শতকরা প্রায় ৬ ভাগ মাত্র হলেও, এই ফাঁক বা বৈষম্য থাকার ফলে দেশের কয়েকটি অংশে যোগান-ব্যবস্থা ভেঙে পড়বার মতো হয়েছে। শেষোক্ত অঞ্চলসমূহে দাম আরো বাড়বে এই আশায় উৎপাদনকারী ও কারবারীরা শস্য সরিয়ে মজুত করে রেখেছে। তার উপর, অর্থ সম্প্রসারণ দ্বারা বাজেটের ঘাটতি পূরণ করার দরুন টাকার যোগান শতকরা ৮ ভাগের কাছাকাছি বেড়ে গেছে। এবং তা ঘটেছে ঠিক সেই বছর যখন জাতীয় আয় ছিল খরার আগের বছরের স্তরের নীচে।
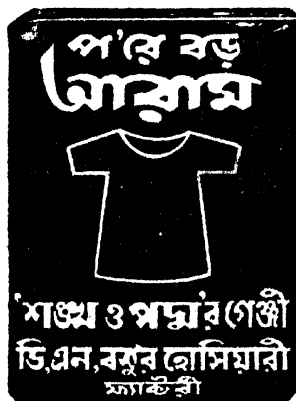
মূল্যস্থিতির প্রয়োজনীয়তা

দ্রব্যমূল্য খানিকটা স্থিতি অর্জন করলেই সরকারী মূলধন নিয়োগের বহর বাড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে। খাদ্যই মূল্য পরিস্থিতি মোটামুটি নির্ধারণ করে বলে খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিবারণ আগে দরকার। আমদানি একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার করে থাকে এই কারণে খাদ্য সরবরাহ ব্যাপারে কেন্দ্রের দায়িত্ব চূড়ান্ত। কিন্তু দেশের বাইরে থেকে খাদ্যশস্য কিনতে আমাদের পরিমিত অর্থ সংগতি ব্যয় করা বেশি দিন সম্ভব নয়। আমদানি কমাতে হলে উৎপন্ন শস্যের আভ্যন্তরিক সংগ্রহ বাড়িয়ে তোলা ছাড়া উপায় নেই। আপাতত চাষীদের, বিশেষ করে সম্পন্ন কৃষকদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে শস্য আদায় করে সরকারী ভাণ্ডার ভরে তুলতে হবে। চাহিদা ও যোগানের মধ্যে খানিকটা সাম্য এলে এবং অনটনের আবহাওয়া কেটে গেলে খোলা বাজারে ক্রয় অথবা শস্যের বিনিময়ে সার যোগান প্রভৃতি পন্থার মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ করা যাবে।

দ্রব্যমূল্য স্ফীতি সরকারকে দ্বিতীয় বছরেও বাধ্য করেছে সর্বত্র মূলধন নিয়োগের বহর ছেঁটে ফেলতে। এদিকে খাদ্যের জন্য চড়া দাম দেবার পর শহরের ভোগকারীদের খরচ করবার মতো টাকা কম থাকছে বলে শিল্পগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সরকারী পরিসংখ্যানে তালিকাভুক্ত ৪০০ শিল্পের ভেতর ১৩৩টিতে গত বছর উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে এবং তার পর থেকে অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। এপ্রিলে শিল্প উৎপাদনের সূচক ডিসেম্বরের চাইতে শতকরা ৫ ভাগ নেমে এসেছিল।

মন্দার সম্মুখীন শিল্পসমূহে

সবচেয়ে বিপন্ন হয়েছে সরকারী চাহিদার উপর নির্ভরশীল শিল্পগুলি। বৈষয়িক উন্নয়ন-সংক্রান্ত কাজকর্ম পিছিয়ে দেওয়ায় সরকারের ক্রয় কমে গেছে : ফলে শিল্প-ব্যবসা, বিশেষ করে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, রেলওয়ে ওয়াগনের উৎপাদন ১৯৬৬ সনে একের তিন ভাগ কমে গেছে যার ফলে ঐ শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতার শতকরা ৩৫ ভাগ অথবা তার বেশি কাজে লাগানো যায় নি। নির্মাণ কর্মের সরঞ্জাম উৎপাদনকারীদের অবস্থা আরো খারাপ।

স্থায়ী ভোগ্যপণ্য (যেমন রেফ্রিজারেটর, বাইসাইকেল, মোটর গাড়ি)-র উপর অভিঘাত অপেক্ষাকৃত কম দেখা গেছে, কেননা ঐগুলির জন্য ক্রেতাদের অপেক্ষার চাহিদা অনেক দিন ধরে জমে ছিল। কিন্তু সেলাই কল অবিক্রিত থাকায় জমে উঠছে এবং উৎপাদন কমিয়ে দিতে হয়েছে।

রেলওয়ে সরঞ্জাম শিল্পকে আগামী মার্চ পর্যন্ত বছরের জন্য অগ্রিম কেনার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তেমনি বয়ন যন্ত্রের শিল্প যাতে আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা প্রবর্তন করতে উৎসাহী হয় সেই উদ্দেশ্যে ঐ শিল্পকে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে উদারতা অবলম্বন করার কথা হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের যান বা শকট ধারে কেনার শর্তগুলি সেই রকম শিথিল করে দেওয়া হচ্ছে। শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক সম্প্রতি কৃষি ও রপ্তানির মতো অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পকে আরো অর্থ সাহায্য দেবার সংকল্প ঘোষণা করেছে।

অনটন ভারতের আর্থিক ব্যবস্থাকে বেশ কিছু কাল ধরে দুর্দশাগ্রস্ত করেছে। এই সব অভাব-অনটন উন্নয়নশীল দেশের একটি মৌল অভাব অর্থাৎ মূলধনের অনটনের প্রতিফলন। মুদ্রা স্ফীতির চাইতে বরং মন্দাকে শিল্পগুলিকে নির্বাচনমূলকভাবে ঋণ দান মন্দার সম্মুখীন বিশেষ-বিশেষ শিল্পের পুনরুজ্জীবনের সহায়ক হবে মনে হয়। সন্দেহ নেই, উৎকর্ষ ও উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে ভারতীয় শিল্পের উৎসাহী ও সচেতন হবার সময় এসেছে।

মন্দার আশঙ্কা দেখা দিলেও, যে সব শিল্প কৃষির উপকরণ যোগান দেয় সেগুলির সমৃদ্ধি ঘটছে। অন্তত তিনটি সারের কারখানা নির্মাণের জন্য এখন কথাবার্তা চলছে ভারতীয় ও বিদেশী ব্যবসায়ীদের যৌথ দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।

মূলধনের ব্যবহার

আসলে, যথার্থ অগ্রাধিকার অনুযায়ী দেশের পরিমিত মূলধন ব্যবহার করা হয় নি। বলতে গেলে, প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় সবচেয়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে মূলধন কাজে লাগানো হয়েছিল : অবশ্য অনেকখানি সুবিধা হয়েছিল ১৯৫৩-৫৪ এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে কৃষির উৎপাদন উত্তম হওয়ায়। কিন্তু প্রথম যোজনার মূলধন : উৎপাদন অনুপাত (প্রায় ২·২ : ১) নিম্ন থাকা সত্ত্বেও তাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমান আয় বৃদ্ধি অর্জন করা গেছে, যদিও শেষোক্ত পরিকল্পনায় দ্বিগুণ খরচ করা হয়েছিল। এদিক থেকে তৃতীয় যোজনা ছিল আরো অসার্থক—৬ : ১ মূলধন : উৎপাদন অনুপাতের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত পরিমাণের সব মূলধন খরচ করা হয়; কিন্তু পরিকল্পিত উৎপাদনের মাত্র অর্ধেক অর্জিত হয়েছে। চতুর্থ যোজনার চূড়ান্ত রূপ নিরূপণে আশা করা যায় অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে পাঠ গ্রহণ করা হবে।

শান্তিকুমার ঘোষ

সমকালীন চিত্রকলাধারার নিদর্শন দেখা যায়। এ গ্যালারীতে তিনজন শিল্পীর কাজ সকলের চোখে পড়ে। প্রথম, প্রকাশ কর্মকারের "লুনার মিউজিক"—যেটির মধ্যে শিল্পী বিশেষ চিন্তা করে লাল রেখাজালের সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয় গণেশ হালুই-এর "মিউরাল ডিজাইন"—এই ছবিতে শিল্পী নীল ও অন্যান্য গাঢ় রঙের টোনের তারতম্য মাধ্যমে বিশেষ এক প্যাটার্ন তৈরী করেছেন এবং তৃতীয় সমরেন্দ্র রায়ের "কম্পোজিশন"। মুখ্যত নীল, হলদে ও সবুজ রঙের ব্যবহার ও মিশ্রণের ফলে শিল্পী ছবিটির মধ্যে রহস্যের এক রঙীন মায়াজালের সৃষ্টি করেছেন—অনেকটা যেন গত যুগের অসূর্যম্পশ্যা যুবতীর মুখঢাকা রঙীন আবরণ বা ওড়না—যা অনুচ্চারিত অনেক কথাই প্রকাশ করতে চায় অথচ করে না। সুনীলমাধব সেনের কাজ ভাল লাগে তাঁর রচনা রীতির জন্য নয়—তাঁর রূপসন্ধানী মনের জন্য; তাই আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরী হলেও তাঁর কাজটি শুভ্র সুন্দর সোনার কারুকার্য বলে ভুল হয়। নীরেন ঘোষের "কম্পোজিশন" দেখে রঙীন কাচের (Stained glass) কথা মনে পড়ে যায়। অন্যান্য ছবির মধ্যে "ফরেস্ট শেড" (অনীতা রায় চৌধুরী), মর্নিং (শ্যামলী জান), "কম্পোজিশন" (অঞ্জু চৌধুরী), "ইয়েলো স্কাই" (টিনা মেহ্তা) ও "আদম ও ঈভ" (সানু লাহিড়ী) উল্লেখযোগ্য। এ গ্যালারীতে যে তিনটি ভাস্কর্যের নিদর্শন ছিল তার মধ্যে সূক্ষ্ম কারুকার্যের জন্য মীরা মুখার্জীর "কজেজ গার্ল"-এর নাম করা যায়।

সেলিম মুন্সীর ছবি

শিল্পী সেলিম মুন্সী ১৭ খানি ছবি পেশ করেন প্রিয়দর্শিনী গ্যালারীতে। বর্তমান কালে প্রাকৃতিক বা নিছক প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি সচরাচর দেখা যায় না। অতএব আধুনিক যুগের দুরূহ জীবনযাত্রা, অভাব-অভিযোগ ও নানা জটিল সমস্যার কথা ভুলে গিয়ে যাঁরা শহর থেকে দূরে গ্রামপ্রান্তে নির্জন কোনও নদীতীরে বসে প্রকৃতিদেবীর ধ্যান বা তাঁর রূপ উপলব্ধি করতে চান তাঁদের সংখ্যা আজ অল্প এবং সেই অল্প কয়েকজনের মধ্যে শিল্পী সেলিম মুন্সী একজন। এই শিল্পী শান্তি নিকেতনের শিক্ষক, সুতরাং মুখ্যত প্রকৃতির পূজারী—তাই নদীতীর ও পল্লীপ্রান্তর, গ্রাম্য কুটীর ও গ্রাম্য নরনারী এক বিশিষ্ট রূপ নিয়ে তাঁর ছবির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। আগেই বলেছি চিত্রকলাজগতে নিসর্গদৃশ্যের নিদর্শন আজকাল প্রায় দুর্লভ। একমাত্র শিল্পী এস এস যোশী ব্যতিক্রম—তাই সেলিম মুন্সীর কাজ দেখলেই যোশীর কথা মনে পড়ে।

সেলিম মুন্সী প্রধানত জল রঙ মাধ্যমে আঁকেন এবং তাঁর হাত পাকা। প্রাকৃতিক দৃশ্য রচনায় যে শূন্যস্থানের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে সেকথা তিনি ভালভাবেই জানেন ও সেজন্য তাঁর প্রায় প্রত্যেক ছবিতে শূন্য স্থান ও প্রয়োজনমত বিরাট পরিপ্রেক্ষিতের পরিচয় পাই। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম রাগে পশ্চিম আকাশ রঞ্জিত হয়ে উঠেছে ও কয়েকটি গরু রাখালের সাথে দ্রুতগতিতে ঘরে ফিরছে— সন্ধ্যাকালীন এই অতি পরিচিত পল্লী দৃশ্যটি শিল্পীর অপূর্ব প্রকাশনৈপুণ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে (ল্যান্ড স্কেপ ৭)। একটি রঙ ও তুলির সহযোগে তিনি যে কয়টি স্কেচ এঁকেছেন তার মধ্যে দু একটি চোখে পড়ে। যেমন "আফটার রেন।" স্কেচগুলির মধ্যে ১৪ ও ১৬ নং উল্লেখযোগ্য।

তাপস বসুর ছবি

শিল্পী তাপস বসুর প্রদর্শনীর আয়োজন হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিস্টস ইউনিয়নের উদ্যোগে, মোনালিসা গ্যালারীতে। ইনি ২৮ খানি ছবি পেশ করেন।

এই শিল্পী এককালে স্থানীয় সরকারী আর্ট কলেজের ছাত্র ছিলেন কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেন নি। শিল্পীর কাছে শুনলাম কলেজ ছাড়ার পরেও তিনি নিয়মিতভাবে চিত্রকলার চর্চা করেন ও কয়েকটি প্রদর্শনীতে নিজের কাজও পেশ করেন।

জল রঙের মিশ্র শ্রেণীর কাজগুলি দেখে এঁকে কোনও বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে ফেলা যায় না। অন্তর্মুখী এই শিল্পীর ছবি দেখে মনে হয় ইনি এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। এঁর অনুভূতি ও চিন্তাশক্তি আছে—নিজস্ব বক্তব্যটুকু প্রকাশ করার মত ভাষাটি আয়ত্ত করলেই তিনি সফলতা লাভ করবেন সন্দেহ নেই। তাঁর ৪ ও ১২ নং ছবির নাম করা যায়।

—চিত্রপ্রিয়

এক এক সময় মনে হয় লালন ফকির বোধ হয় ভবিষ্যতের কলকাতার বাস-যাত্রীদের কথা ভেবেই লিখেছিলেন, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়। আর লালন শাহ যতই বিস্মিত হোন, বাস নামক খাঁচার ভিতরে কঠিন [illegible] 'অচিন পাখিদের' কিন্তু নিত্য যাতায়াত রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইদানীং তাঁরাও আর পারছেন না। হাতের কড়ে আঙুলে জানালার রড ধরে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে পাদানি কিংবা অন্য সহযাত্রীর জুতোর উপর চেপে কীভাবে যেতে হয়, তাঁরা ভাল করেই জানেন এবং বিন্দুমাত্র অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না; তবে ট্রাম-রাস্তার উপর দিয়ে বাস ছুটলে পেটের নাড়িভুঁড়ি কীভাবে যথাস্থানে রেখে কীভাবে অফিস কিংবা বাড়ি পাড়ি দিতে হয়, সে কায়দা এখনও তাঁরা জানেন না। বাসের বাইরে থাকলে হেডশেক হয় পাশের প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে এবং ভিতরে থাকলে [illegible] [illegible] বড় [illegible] [illegible] [illegible] করে বাসের সমতল ছাদে মাথা ঠুকতে ঠুকতে কচ্ছপের পিঠ [illegible] যাত্রী সাধারণের। ট্রাম লাইনের পাতগুলোকে '[illegible] খোঁড়া' বললে ভুল হয়, আসলে গোটা শহর জুড়ে ট্রাম-লাইন বেদিক পানে গিয়েছে, তার সব জায়গাতেই বিরাট বিরাট কুয়ো খুঁড়ে রাখা হয়েছে।

সরকারের হাতে ট্রাম চলাচল যাবার পর ভেবেছিলাম, এবার রাস্তাগুলোর একটা হিল্লে হবে, কিন্তু হা অদৃষ্ট, অবস্থা এখন আগের চেয়েও খারাপ। 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী'—এই পঙ্‌ক্তিটি যে কত সত্য, কত বাস্তব, একবার ওই ট্রাম-রাস্তার উপর দিয়ে বাসে বা ট্যাক্সিতে গেলে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়।

১৯৪৯ সালে বোলপুর-শান্তিনিকেতনের রাস্তা পাকা হওয়ার আগে 'রাঙা মাটির পথের' খানাখন্দ এড়াতে বিশ্বভারতীর বাস সদর রাস্তা ছেড়ে পাশের মাঠ দিয়ে এগোত, তাতে বাস এবং বাসযাত্রী দুয়েরই দেহ অক্ষত থাকত। ঠিক সেইভাবে ফুটপাথ-গুলো একটু চওড়া করে দিয়ে সেখানেই বাস ট্যাক্সি ইত্যাদি চালানোর ব্যবস্থা হোক না। ট্রাম যখন শহরে থাকবেই এবং ট্রাম-রাস্তাও মেরামত করা হবে না, তখন এ ছাড়া আর উপায় কী? কলকাতার ফুটপাথ-গুলো এমনিতেই বড় সদাশয়, পথযাত্রী ছাড়াও তারা দোকানপাট, শিল্পীর স্টুডিও, দিনমজুরের রান্নাঘর, দারোয়ানদের শোবার ঘর, অকর্মাদের আড্ডা মারার বৈঠকখানা ঘর, কলতলা, গোয়ালঘর ইত্যাদি অনেক কিছুরই ব্যবস্থা করতে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে, তার সঙ্গে কিছু বাস ট্যাক্সি প্রাইভেট কারকেও নিশ্চয়ই আশ্রয় দেবে। অতঃপর পাশে সদর রাস্তার উপর প্রবল প্রতাপান্বিত ট্রাম গাড়ি একাই গজেন্দ্রগমনে অনবরত চলবেন এবং তার যাত্রাপথ মসৃণ হল কিনা, তাই নিয়ে আমরা আর চিৎকার চেঁচামেচি করব না। করে কোন লাভ নেই।

এমন সত্যভাষণ কদাচিৎ শোনা যায়। নিজের কবিতাকে "কিচ্ছু হয় নি" বলা আর যাই হোক, আধুনিক কবিসুলভ নয়। শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রতি মাসে একখানা করে কবিতার পুঁথি ছাপান, নিজেই বিক্রি করেন এবং প্রতিবারই বলেন, "আমি নিজেই জানি, এই কবিতাগুলো ছাপার যোগ্য নয়, তবু কী করব, পেটের জ্বালায় দুয়ারে দুয়ারে কবিতা ফিরি করতে হয়।"

এমন অদ্ভুত লোক আমি আর আগে দেখিনি। সেদিন অফিসে বসে আছি। আরও দশজনের মত ভদ্রলোক এসে হাজির। এসেই বিনা ভণিতায় বললেন, "এই হচ্ছে আমার কবিতার বই, একখানা কিনুন, দাম আট আনা, এক টাকা দু টাকাও দিতে পারেন। জানি, পড়ে ভাল লাগবে না, চোখ বুলিয়ে ফেলে দেবেন।"

ভদ্রলোককে বসতে বললাম। উনি জানালেন, ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখার শখ, লিখেছেন প্রচুর, কাগজে কাগজে ছাপার জন্যে পাঠিয়েছেনও নিয়মিত। কেউ ছাপান নি, অবশেষে এই পন্থা নিয়েছেন। চাকরি করতেন এক জায়গায়। ইদানীং চাকরি ছেড়ে দিয়ে কবিতার ব্যবসা ধরেছেন, তাতে চাকরির চেয়ে রোজগার বেশী।

ব্যাপারটা সরল। মন যা চায়, তিনি লিখে ফেললেন, মিল এসে গেলে উত্তম, না এলে ক্ষতি নেই, ছন্দের বাঁধুনি আলগা হলেও কলম থামে না, এবং সাত আট পৃষ্ঠার ফুলস্কেপ সাইজের একটা কবিতার বই বেরিয়ে গেল। মলাটের বালাই নেই, "শোভন প্রচ্ছদপটের" প্রয়োজন নেই, সাধারণ ছাপাখানায় পর পর একটানা ছাপিয়ে গেলেই হল। শ' পাঁচেক কপি ছাপাতে খরচ পড়ে গোটা পঞ্চাশ টাকা। চার শ' কপি বিক্রি করতে পারলেই খরচ বাদ দিয়ে দেড় শ' টাকা নীট লাভ। কেউ কেউ আবার কপিপিছু এক টাকা দু টাকাও দিয়ে দেন। এই চলছে, গত তিন বছর থেকে।

মাঝারি বয়সের ভদ্রলোক। ফর্সা রঙ, ফিটফাট চেহারা। প্রথমে ভেবেছিলাম মাথায় ছিট আছে, পরে টের পেলাম শুধু 'কাব্য প্রতিভা' নয়, ব্যবসা-বুদ্ধিতে চট্টোপাধ্যায়-মশাই পাকা।

আট আনা দিয়ে এক কপি কিনলাম, একগাল হেসে ভদ্রলোক বিদায় নিলেন, যাবার আগে শাসিয়ে গেলেন, সামনের মাসে আবার আসবেন। সবাই সহযোগিতা না করলে তাঁর পেট চলবে কী করে?

নগদ আট আনা দিয়ে কেনা চার পাতা কবিতার কাগজখানা হাতে নিয়ে কবিতার শিরোনামাগুলো দেখলাম। নাম 'মাধুকরী', তার মধ্যে আলাদা আলাদা অনেক কবিতা, বিষয়-বৈচিত্র্যে অভিনব। প্রথম কবিতাটির নাম 'ক্ষুধা'; সারমর্ম—"জিব আর কপাল জীবনের দুই মহাকাল, লোভ আর ভাগ্যের প্রতীক।" তারপরেই রয়েছে আরোগ্যোত্তর, শেয়ালদা ('মফস্বলের প্রাত্যহিক যাত্রীর থলি, বাজারে ভর্তি আছে ট্রেনের নাগরালী'), গণিকা ('ভাবতে ভাবতে এক সময় মনে হয় কিন্তু, মানুষগুলি বোধ হয় সবাই এক একটা জন্তু।'), টাক ('বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে টাক অম্লান।'), সাইরেন ('সাইরেনের নীচু করুণ সুর, বেহালার তারে ছড়ি বাথাতুর'), শরৎ, শীত, মন, যৌবন, আধুনিকা চির-রাত্রি, ক্ষণকাল, টেলিফোন, কবরী, রেডিও হোটেল লাইব্রেরি ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাঁচ মিনিটেই কবিতা পাঠ শেষ। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, যে-সব উঠতি আধুনিক কবি, তাঁদের কবিতার বই ছাপা হয় না বা ছাপা হলেও বিক্রি হয় না বলে আপসোস করেন, তাঁরা কেন এই পন্থায় যুগপৎ কবিতা প্রচার ও অর্থ উপার্জনে অগ্রসর হন না? কমপ্লিমেন্টারি কপি পেলে বই না পড়ার সম্ভাবনা থাকে, নগদ পয়সায় কিনলে তা হয় না। না পড়লে দাম উশুল হবে না যে।

চাণক্য

পিয়েত মণ্ড্রিয়ান

কান্ডিনস্কির মতে শিল্পসৃষ্টির আরম্ভ হয় শিল্পীর মনের এক অন্তর্লীন আবেগের প্রকাশ বাসনা থেকে। শিল্পী এই আবেগ উপলব্ধি করলে তার প্রকাশ মাধ্যম খুঁজতে শুরু করেন দৃশ্য-প্রতীকের মধ্য থেকে। এই আবেগের প্রতীক কোন দৃশ্য তা তিনি জানেন না, তবে এই আবেগটুকু সম্বন্ধে যে কোনো বিশেষ ফর্মের বিশেষ কর্ম রয়েছে। যেমন, কান্ডিনস্কির মতে, ত্রিকোণের মধ্যে অনুরণিত আছে 'আধ্যাত্মিক নিনাদ'।

সমস্ত ছবিতে দেখা যাবে কান্ডিনস্কির উপযুক্ত বিশ্বাস প্রভৃতি, শিল্পী নিজের অন্তর্লীন যে আবেগ সৃষ্টি হয় তার প্রকাশ-দৃশ্যের কোনো সংজ্ঞা নেই। অর্থাৎ রঙ এবং ফর্মের মিলিত এক বিশেষ অবস্থায় সেটা প্রকাশ হয়ে যায়, আগে থেকে কিছু বলা যাবে না। তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে, শুধুমাত্র রঙ এবং ফর্মের এই ক্ষমতা আছে (বিষয়ের উপস্থিতি ছাড়াও) যাতে করে সমগ্র আবেগকে সে শরীর দিতে পারে। এখন এই যদি সত্যি হয় তাহলে শিল্পীর কী প্রয়োজন স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ অন্তরে নিজের মধ্যে। বরঞ্চ তিনি দর্শকের মনে সচেতনভাবে রঙ এবং ফর্মের কোনো বিশেষ নকশা এঁকে বিশেষ কোনো আবেগ আনতে পারেন। যেহেতু ফর্ম এবং রঙের মিলিত নির্যাস আবেগ বা মূর্ত প্রকাশে সক্ষম সেহেতু ফর্ম এবং রঙই বিষয়। অর্থাৎ বস্তু-প্রতীকের তো কোনো প্রয়োজনই নেই। তাছাড়া 'অন্তর্লীন প্রয়োজন-এর ওপর নির্ভর করবার দরকার নেই, পরবর্তী শিল্পীরা বললেন। তাতে ছবি বড় বেশী ব্যক্তি কেন্দ্রিক হ'য়ে যেতে পারে। নির্ভেজাল শিল্প হ'তে হবে তারার মত, সবার চেয়েই সমান দূরে বা সমান কাছে সে। অতএব 'অন্তর্লীন প্রয়োজনের' চেয়ে বহির্বিশ্বের প্রয়োজনে ছবি আঁকা হ'ক—ব্যক্তি মিশে যাক বিশ্বে।

*

'সাবজেক্টিভ' বিমূর্ত শিল্পের থেকে 'অবজেক্টিভ' বিমূর্ত শিল্পের চিন্তাধারার সাঁকোটি কী কী প্রধান যুক্তির ধাপ দিয়ে নির্মিত তা মোটামুটি বর্ণনা করবার প্রয়োজন হ'ল কান্ডিনস্কি থেকে মণ্ড্রিয়ানে শিল্পধারার গতি বর্ণনা করতে গিয়ে। মণ্ড্রিয়ান 'অবজেক্টিভ' বিমূর্ত শিল্পের পুরোধা বলা যায়—আজকে তার বিষয়েই আলোচনা।

হল্যান্ডের আমার্সফোর্ট শহরে ১৮৭২ সালে পিয়েট মণ্ড্রিয়ানের জন্ম; মৃত্যু নিউইয়র্কে ১৯৪৪এ। শিশুকাল থেকে চিত্ররচনার ঝোঁক, যথারীতি আকাদমি শিক্ষা হয় কিশোর বয়সে। আকাদমির বাস্তবধর্মী শিল্প থেকে ইম্প্রেশনিজম্,

যেখানে তিনি ঘনিষ্ঠ রূপে সেইসব পারিবারিক ছবি। যার ভিতর দিয়ে এই দর্শকের চোখে আর মনে থেকে যায় গভীর বিস্ময়, পরম কৌতূহল। হয়তো আগেও অনেক দেখেছি, আবারও দেখি আর বিস্ময় আর কৌতূহলে এই কারণে বারেবারেই দেখি, যখন ভাবি এই মানুষে সেই মানুষ ছিল। এই রূপেতে সেই অরূপ ছিল, লক্ষ্যেতে অলেখ। দেহরূপের এই খাঁচাতেই সেই অচিন পাখির যাওয়া আসা ছিল। যে পাখির নাম প্রাণপাখি না, কেবল অচিন পাখি। যে পাখি অলেখেতে ঝলক দেয়, তার নাম সাধকের সাধন, যার প্রসাদ নিয়ে ফিরি আমরা, নানান উপচারে, চারু কারু একাকারে।

আমি তাঁর সাধনে সাধতে চেয়েছি। আমার মত এই জগতের অনেকে চেয়েছে। যারা চেয়েছে, তারা সবাই আমার মতন এমনি করে চেয়ে থাকবে মরমীয়ার দিকে, যাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এমনি পরম কৌতূহলে আর বিস্ময়ে।

বিচিত্রা থেকে বেরিয়ে এবার মেলায়। বন্ধু হাতে-বাঁধা সময়ের কাঁটা দেখিয়ে বলেন,

'বেলা অনেক হয়েছে, এবার ঘরে ফেরা যাক। শীতের বেলা, এমনিতেই তো ছোট।'

সেইজন্যেই ঘরে যাব না। শীতের এই সোনার বেলা বড় সে ছোট। মেলায় মানুষের উৎসব, শীতের ছোট দিনে রোদের উৎসব। আমি যাব না যাব না যাব না ঘরে। কিন্তু বন্ধুকে আটকাতে চাই না। আমি তাঁর একলা অতিথি না। অভ্যাগত আরো আছেন গৃহে তদুপরি গৃহিণী আছেন সেথায়। রোদ্রে আর মানুষের মাখামাখি করে ঘুরে বেড়াতে বলতে পারি না তাঁকে। বলি, 'আপনি ঘরে যান, আমি একটু মেলা ঘুরে আসি।'

বন্ধুর তা ইচ্ছা নয়, বাধা দিতেও সংকোচ। জিজ্ঞেস করেন, 'পথ চিনে ফিরতে পারবেন তো?'

সামান্য তো পথ, রাস্তার এপার-ওপার মাত্র। একবার দেখলে ভুল হবার কোন কারণ নেই। হেসে বলি, 'তা পারব।'

বন্ধুও সেটা আন্দাজ করতে পারেন। তা-ই হেসে বলেন, 'পথ তেমন দূরের নয়, বাঁকাচোরাও খুব বেশী নয়, তবে নতুন তো।'

কেবল বন্ধুর কথার সুরে না, কাচে ঢাকা চোখের দৃষ্টিতে অস্পষ্ট এক ইঙ্গিতের ঠাট্টা। জবাব দিই, 'নতুনকে চিনে নিতে চেষ্টা করব।'

ভিন্ন পথে হাঁটা শুরু করে মনে মনে ভাবি, ঠিক ঠিকানায় চলতে পেরেছি কবে। ভুল ঠিকানায় আনাগোনা চিরদিন, ঘুরপথে ঘুরে মরছি সেই শুরু থেকে। আসলে, ঠিকানার গোলমাল কোন গোলমাল না। ঠিকের সন্ধান, তার খোঁজে ফেরা। যদি জানা থাকত, ঠিকানা মিলত আপনি আপনি।

মেলার পথ চিনিয়ে দিতে হয় না। মেলাই পথ চিনিয়ে নিয়ে যায়। লোক চলার ঢল দেখলে বোঝা যায়, মোহানা কোথায়। লোক সাগরের ঢেউ কোথায় খেলছে। কিন্তু এ তোমার সেই মেলা না হে। প্রথম দর্শনেই ঠেক খেতে হয়। এ মেলার রকম সকম আলাদা। ছাতিমতলার মেলা বলেই বোধ হয়। দেখ, চারদিকেতে শহুরে সাজগোজের ভিড়। সে-ই যাদের দেখেছিলাম ইস্টিশনে, তাদের মতন নরনারী, নানা সাজে ঘোরা ফেরা করছে। তবে মন গুণে ধন। দেখ, এই বিচিত্র দেখেও মনে রঙ লেগে যায়। সাজেতেই কেবল মানুষ না, কাজেতে তার চিন পরিচয়। সবাই যে এই দূর রাঢ়ের মেলায় বেশ প্রাণের ভেলায় ভাসছে, হাসছে, তা বোঝা যায়।

কেবল তো তাদের দেখলে হবে না। এমন পসরা সাজিয়ে বসা পসারী পসারিনী বা কোথায় দেখেছ। এই যে দেখ, ডাগর চোখো, ধুতিপাঞ্জাবি-পরা যুবা দোকানদার আপন হাতে বিকোয় বসে আপন হাতে গড়া পুতুল। এই পুতুল গড়ার, শিক্ষা তার, এই আশ্রমেই, শিল্প ভবনে। ওই যে তন্বী মেয়ে তাকে ক্রেতার চোখে চেয়ে,—যাটিকের চোখ জড়ানো কাপড় দেখিয়ে, সেও আধুনিক সওদাগর। কেবল যে সব আধুনিক সওদাগর পসরা সাজানো চারদিকে, তা না। বাইরের থেকেও অনেক পসরা নিয়ে এসে বসেছে, এমন অনেক পসারী পসারিনী। নানা মেলা নানা রাজ্যের, বিচিত্র কারুকলা শিল্প, প্রবীণ, প্রাচীন, অতীতের ভুলে যাওয়া নানান বস্তু। কার্পাস রেশম শন, সেলাইয়ের নানা কারুকীর্তি, পুতুল মুখোশ শঙ্খ, মাদুরের সূক্ষ্ম বোনা নানা জিনিস তারই মধ্যে পিতল কাঁসার বিবিধ কারিগরি, কাঠের বিচিত্র শিল্প, সবই সাজানো থরে থরে।

ক্রেতা-ক্রেত্রীদের চোখ দেখলে বুঝবে, সব কিছু হাত ভরে নিয়ে নিতে চায়। কেবল তো এ রাজ্যের মানুষ না, ভারতের নানা রাজ্যের মানুষ। নানা ভাষা ভাষে নানা বেশ। কেবল ভারতের নাকি। নজর করলে দেখবে, সাত সমুদ্রের ওপারের নরনারীও মেলায় এসেছে। গোরা গৌরীরাও মেলার নানা পসরার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হাত ভরে, ঝোলা ভরে কিনছে নিচ্ছে।

শের আফগানের একটি দৃশ্য

দিল্লির ডায়েরি

মনে সংশয় ছিল, ছিল আশঙ্কা। অনেকেই শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন কর্মীদের ও অভিনেত্রীদের মধ্যে, বাঙলায় রূপান্তর-করা বিদেশী নাটক, অত্যন্ত অসাধারণ নাম, কী হবে কে জানে। অবশ্য "নান্দীকার" কলকাতার সুনামী অ্যামেচার গোষ্ঠীদের একটি, আশা ছিল তাই এখানে।

দিল্লিবাসী আমরা আজ দু'হাত তুলে অভিনন্দন জানাই নান্দীকারকে। প্রবাসী বাঙালীদের মনে অবচেতনভাবে জমাট থাকে একটা শিল্প-ক্ষুধা যার অনেকটা নিবৃত্তি হয় কলকাতার নাট্যসমাজের অভিনয়ে। এবং নিবৃত্তি হওয়ার বেলাতেই বুঝতে পারি কতো ক্ষুধাই না জড়ো হয়েছিল ভিতরে ভিতরে। এবং মনে পড়ে তখন, আমরা গোটা আর্ট মুভমেন্ট থেকে কতো দূরে।

শিল্পের ক্ষেত্রে কলকাতার সঙ্গে রাজধানীর সংযোগ সাধন অত্যন্ত প্রয়োজন, বাঙালী ও অবাঙালীর জন্যে, বিদেশীদের জন্যেও। এবারকার সংযোগ সাধনের জন্যে ধন্যবাদার্হ স্থানীয় একটি ক্লাব, নাম তার যুব সম্প্রদায়। নান্দীকার এখানে এল এই প্রথম। দুটি নাটক নিয়ে—নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র, এবং শের আফগান। ডিরেক্টর অজিতেশ ব্যানার্জি এবং লেখক অভিনেতা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত মশায়ের সঙ্গে আলাপে জানলাম যে, চরিত্র ও নাটকের সন্ধানে তারা ব্যাপৃত আছেন আজ ৬।৭ বৎসর, এবং নানা দেশের নাট্যকারদের কোষাগার থেকে এনেছেন হীরে জহরত।

অজিতেশ গোড়ায় ছিলেন আই পি টি এ-তে, দমদমে হিন্দু বিদ্যাপীঠে ইস্কুল মাস্টার ছিলেন, বয়েস এখন ৩৬। সাত বৎসর আগে মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের সহপাঠী অসিত ব্যানার্জিকে নিয়ে ৭।৮ জনের দল একটি নাট্যগোষ্ঠী ২৯শে জুন ইবসেনের "বিদেহী" (ঘোস্ট) নাটক মঞ্চস্থ করে। আজ নান্দীকারের সভ্যসংখ্যা ২২, গত জুলাই মাসের শেষ অবধি নাটক মঞ্চস্থ করেছে ৩০১ বার।

নানা পেশার ২২জন মানুষ নাট্যশিল্পের প্রভাবে একত্রিত। রুদ্রপ্রসাদ হলেন কেশবচন্দ্র কলেজে ইংরিজীর অধ্যাপক। বাঙলায় রূপায়িত করেছেন পিরানদেলো, স্ট্রিনডবার্গ। ক্লেমেন্স ডেইন, মার্গারিট ডুরাস, বেকেট এবং ওয়েসকারের নাটক।

আরো দেখুন : অসিত ব্যানার্জি চাকরিতে এখন সাব-রেজিস্ট্রার। গুণী অভিনেতা, নান্দীকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট। বিয়ে করেছেন, একটি পুত্র সন্তান আছে। রাধারমণ তপাদার : পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফে ডেসপ্যাচ সার্ভিসে কাজ করেন, অভিনয়পটু, সেট ডিজাইন করেন, নান্দীকারের সচিব। বরুণ সেন : রাইটার্স বিল্ডিং-এ কেরানী-বাবু, অভিনয়ে ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। পশুপতি বসু : সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজিয়েট স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষক। পবিত্র সরকার : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী সন্তান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলার অধ্যাপক। আনন্দ চক্রবর্তী হলেন দোকানদার, জামা কাপড় ও শেলাইয়ের দোকান। অরুণ চ্যাটার্জি জেসপের কেরানী-বাবু। সুবীর দত্ত কারখানার শ্রমিক।

মেয়েদের ভিতর আছেন লীলা ব্যানার্জি, অজিতেশের স্ত্রী, নান্দীকারের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। কেয়া চক্রবর্তী : স্কটিশ চার্চ কলেজে ইংরিজীর অধ্যাপিকা। শেলী পাল, দীপালি চক্রবর্তী ও জনা মজুমদার আছেন অভিনয়ে। জনা মজুমদার কলকাতার আর্ট কলেজে আঁকা শিখেছেন।

অজিতেশ ও রুদ্রপ্রসাদ নাটকে এনেছেন নতুন নতুন রূপ, এনেছেন মননশীলতা, ভাবাবেগ এবং বাস্তবতা—অনেক ক্ষেত্রে সবগুলোই এক সঙ্গে। তারা বলছিলেন : "আমরা নানা দেশের সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে নাটক এনেছি বাঙলার নাট্যজগত ও মঞ্চকে সমৃদ্ধশালী করতে। আমরা যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তার উপর নির্ভর করে আমরা মূল নাটকও লিখছি। ইচ্ছা আছে, এবার সংস্কৃত নাটক মুদ্রারাক্ষসকে নতুনভাবে বাঙলায় রূপায়িত করার।"

এইভাবে এসেছে নান্দীকারের : ১৯৬০ সালে বিদেহী (ইবসেন), প্রস্তাব (শেখভ্), দাও ফিরে সে অরণ্য (চিত্তরঞ্জন ঘোষ); ১৯৬১ সালে নাট্যকারের সন্ধানে... (পিরানদেলো), সেতুবন্ধন (অজিতেশ), চার অধ্যায় (রবীন্দ্রনাথ), এবং পরবর্তী বৎসরগুলোতে : বামনাম (রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে), নানা রঙের দিন (শেখভ্), পরিণীতা (শরৎচন্দ্র), উইল সেক্সপীয়র (ক্লেমেন্স ডেইন), একটি কল্পনা, মঞ্জরী আমের মঞ্জরী (শেখভ্), শের আফগান, রাত্রি, নাম নিয়ে, ওলট-পালট, যখন একা, নব স্বয়ম্বর, ফুলে ফুটুক না ফুটুক ইত্যাদি।

"এখনো আমাদের সভ্য-সভ্যা কাউকে একটি পয়সা দিতে পারি না। অর্থ সমস্যায় খাই নাকানি-চুবানি। কোনো বইয়ে দুটো পয়সা হয়, কোনোটায় ক্ষতি। মফস্বলে গেলে দুটো পয়সা আসে, আবার নতুন বই নামাতে গিয়ে সব খরচা হয়ে যায়। আগে তো সবাই ট্রাম-বাসে করে আসতো অভিনয় করতে। এখন আমরা ট্যাক্সি ভাড়াটা মাত্র দিতে পারি", বললেন অজিতেশ।

কলকাতার থিয়েটার মুভমেণ্ট যে-কোনো আধুনিক (বিদেশী, বিশেষত আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড এবং জার্মানী) মুভমেণ্টের সমকক্ষ। বহুরূপী, লিটল থিয়েটার, রূপকার, শৌভনিক, প্রান্তিক, মাস থিয়েটার,

নান্দীকার, আরো কতো যাদের আমরা দেখিনি। আমরা ট্যাক্সো দিয়ে খাড়া করেছি কতো মন্ত্রণালয়, সংগীত-নাটক আকাদেমি ইত্যাদি। তারা এদের ভালভাবে অর্থ সাহায্য কেন করেন না? আমাদের সদস্যরাই বা এদের কথা কেন তোলেন না লোক সভায়, রাজ্য সভায় এবং রাজ্য বিধানমণ্ডলীতে?

ছোটোখাটো ভাবে দিল্লিতেও বাঙালী-অবাঙালীদের অনেক ক্লাব হয়েছে থিয়েটার মুভমেণ্টে সরিক হওয়ার। এমনি একটি দল যুব সম্প্রদায়। এরা থিয়েটার করেন, রবীন্দ্র উৎসব, বিজয়া সম্মিলনী ইত্যাদি করেন। কিন্তু নিজেদের ঘর বাড়ি নেই। ডক্টর সেনের বাড়িতেই (২৯ সি প্রেস রোড) দরদুয়ার। যুবক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, ডাক্তার সরকারী কর্মচারী সকলেই আছেন যুব সম্প্রদায়ে যার প্রতিষ্ঠা নান্দীকারের মতো এই ১৯৬০ সালে। গেল বছর এরা চারটে পারিতোষিক পেয়েছেন। একটা লাইব্রেরি করতে চাইছেন, কিন্তু টাকা পয়সা নেই।

এদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন উপমন্ত্রী শ্রীগিরি। উনি তেলেগু লোক হলেও বাংলা ভাষার প্রেমিক, বাংলা ভালবাসেন, বলেন। এবং সম্প্রদায়ের প্রাণ-স্বরূপ হলেন কয়েক-জন লোক: সভাপতি বিমল ব্যানার্জি, সাধারণ সচিব মৃণাল মুখার্জি, সুশান্ত মিত্র, প্রশান্ত মিত্র এবং সুনীল দত্ত (সবাই যুগ্ম সচিব), রবী সেন এবং বিকাশেন্দু ঘোষ। ওরা জানালেন যে, নান্দীকারকে দিল্লি আনার বিষয়ে প্রচুর সাহায্য করেছেন বীরেন মুখার্জি।

—খগেন দে সরকার

দুই রবীন্দ্রনাথ

১৯শে শ্রাবণের দেশে শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর দুই রবীন্দ্রনাথ নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। লেখাটির ভঙ্গীর মধ্যে একটা উন্নাসিকতা আছে, অশোভন দম্ভ আছে কিন্তু প্রত্যাশিত যুক্তি নেই, সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গচ্যুত উদ্ধৃতির দ্বারা নিজের [illegible] ধারণা সমর্থনের চেষ্টা আছে। যে ভাষা লেখক স্থানে স্থানে ব্যবহার করেছেন তা যেমন অশালীন তেমনি [illegible] এবং আমাদের বিশ্বাস সত্য কথনের চেষ্টা [illegible] অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকলে এই [illegible] ভাষা ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় [illegible] নীরদবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়। যে বই থেকে তিনি যে উদ্ধৃতি [illegible] নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী তার বিচার করবেন। নীরদবাবু সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে সেগুলি দেশ পত্রিকার সম্পাদক ও পাঠকদের কাছে নিবেদন করতে চাই।

লেখকের মূল বক্তব্য এই যে, ১৯১৩ সালের নোবেল প্রাইজ রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক পরিবর্তন আনে। ঐ তারিখের আগে তিনি বাঙালী ও দেশী, বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি তীব্র ইংলণ্ড সম্বন্ধে অসাড়; তাঁর ধারণা ছিল দেশেই তাঁর স্থান, বিদেশে তাঁর কিছুই নেই। একদিকে নোবেল প্রাইজ অন্যদিকে দেশবাসীর বিরূপ সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজের সত্যকার পথ থেকে ভ্রষ্ট হলেন, দেশের প্রতি বিমুখ এবং বিদেশ-মুখী হলেন। এই দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ অভিনেতা। সর্বশেষে লেখক রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি ব্যর্থতার হিসাব দিয়েছেন এবং লিখেছেন 'অভিনেতা হিসাবে বিশ্বের দরবারে লেডি ড্রেস পরিয়া থাকার ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবনে ব্যর্থতা ভিন্ন পূর্ণতা আসে নাই।"

রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাবার আগে দেশী ও বাঙালী ছিলেন একথা প্রমাণ করতে শ্রীনীরদ চৌধুরী 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' এবং 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী' থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলেছেন। সে উক্তিগুলির মূল বক্তব্য এই যে, য়ুরোপের জীবন অত্যন্ত বিলাসী, ভাসাভাসা ভারতের জীবনের শান্তি গভীরতা মাধুর্য তার মধ্যে নেই। তিনি কেবলই বিরাগ ও বিরক্তিভরে ভারতে ফিরতে চাইছেন ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডের মেম-সাহেবদের সমাজ তাঁর ভাল লাগছে না। এটা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের তখনকার মনো-ভাবের একটা দিক। আর একটা দিক পাশাপাশি চলছে। সেখানে ইংলণ্ডের এবং য়ুরোপের অনেক জিনিস তাঁর ভাল লাগছে এবং বাংলাদেশ সম্পর্কেও মন তিক্ত ক্রোধে পূর্ণ হচ্ছে। নীরদবাবু হয় এই রচনাগুলি মন দিয়ে লক্ষ করেননি, নয় [illegible] গোপন করে গেছেন। তিনি এও বলেছেন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ইংলণ্ডের জীবনের [illegible] দেখা সম্ভব হয়নি কিন্তু তিনি (নীরদবাবু) দেখেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের দেখা যে সত্য নয় তা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে [illegible] পারেন। এই [illegible] উক্তির বিরুদ্ধে বিলাতী সমাজ-অভিজ্ঞ লেখককে জানাতে চাই যে রবীন্দ্রনাথও এ সব খবর রাখতেন এবং ঐ য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র নামক গ্রন্থেই তার উল্লেখ করেছেন যা নীরদবাবু খোলা মনে ওই বইটি আগাগোড়া পড়লে দেখতে পেতেন। শতবার্ষিকী সংস্করণ থেকে, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রের উদ্ধৃতি দিচ্ছি, পাঠকেরা নীরদবাবুর উদ্ধৃতির পাশাপাশি পড়ে মিলিয়ে নেবেন—

(১) Fashionable মেয়ে ছাড়া বিলেতে আরও অনেক রকম মেয়ে আছে, নইলে বিলেতে সংসার চলত না। (পৃ ৩৪)

(২) এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গিন্নীরা এইরকম সাধাসিদে, যদিও তাঁরা ভাল করে লেখাপড়া শেখেননি, তবু তাঁরা অনেক বিষয়ে জানেন এবং তাঁদের বুদ্ধি যথেষ্ট পরিষ্কার। এ দেশে কথাবার্তায় জ্ঞানলাভ করা যায়। তাঁরা অন্তঃপুরে বদ্ধ নন; বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্তা কন, আত্মীয় সভায় কোন উচ্চবিষয় নিয়ে চর্চা হলে তাঁরা শোনেন ও নিজের বক্তব্য বলতে পারেন। (পৃ ১৩৬-৩৭)

(৩) ইংরাজ পরিবারের মধ্যে এমন কত শত বালিকা (আমাদের দেশের পূর্ণ যৌবনা) দেখা যায় যারা সরলতার প্রতিমা, যারা তুষারের মতো, নিজের শুভ্র ললাটের মতো নিষ্কলঙ্ক; নিষ্কলঙ্ক অর্থে শুধু কান্তি নিষ্কলঙ্ক নয়, তাদের মন বিশুদ্ধ, ছেলেবেলা থেকে তাদের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস স্ফূর্তি পেয়েছে।...উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা যদি বল তবে তা ইংলণ্ডে যেমন আছে এমন অন্যত্র সচরাচর পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। (পৃ ১৭১)

এই জাতীয় উক্তি আরও অনেক উৎসাহী পাঠক খুঁজে পাবেন—নীরদবাবু কিন্তু পাননি। তিনি কি আদ্যোপান্ত পড়ে তাঁর সিদ্ধান্ত গড়েছেন, না মনগড়া পূর্ব-সিদ্ধান্তের জন্য ইচ্ছামত উক্তি সংগ্রহ করেছেন।

এ কথাও বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রচুর বর্ণনা করেছেন, ইংলণ্ডের বা পাশ্চাত্যদেশের অসাধারণ নৈসর্গিক রূপের কোন বর্ণনাই তাঁর লেখায় নেই। কথাটি সত্য নয়, ওদেশের প্রকৃতির বর্ণনা শতবার্ষিকী সংস্করণ য়ুরোপ যাত্রীর ডায়রীর ৯৪,১৫০,২১৯ পাতায় পাওয়া যাবে। [illegible] প্রথম য়ুরোপ যাত্রাকালে লেখা—তাতে সমুদ্র-বর্ণনা আছে—এ কথা রবীন্দ্র-পাঠকেরা জানেন।

মেমসাহেবদের মৃদু মিষ্টি কথায় এবং ড্রইংরুমের কোণে বসেই রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপকে দেখেছেন এবং ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব মনে প্রাণে বুঝেছেন, ব্যাপারটা ঠিক এই পরিমাণ সহজ নয়। কারণ ওদের দেশকে ওরা কি পরিমাণ ভালবাসে আর আমরা আমাদের দেশকে কি পরিমাণ অবজ্ঞা করি, সে সম্বন্ধে য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারীতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"এ দেশের লোকেরা যে আপনার দেশকে ভালবাসবে তার আর কিছু আশ্চর্য নেই। এরা আপনার দেশকে আপনার যত্নে আপনার করে নিয়েছে। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুকাল থেকে একটা বোঝা-পড়া হয়ে আসছে, উভয়ের মধ্যে ক্রমিক আদান প্রদান চলছে, তারা পরস্পর সুপরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ; একদিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতি উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে আর একদিকে বৈরাগ্যবৃদ্ধ মানব উদাসীনভাবে শুয়ে—য়ুরোপের সে ভাব নয়। এদের এই সুন্দরীভূমি এদের একান্ত সাধনার ধন, একে এরা নিয়ত বহু আদর করে রেখেছে, এর জন্য যদি প্রাণ না দেবে তো কিসের জন্যে দেবে।"

য়ুরোপ সম্বন্ধে এই কথা বলে অবহেলিত বাংলার প্রকৃতি ও ম্যালেরিয়া জর্জরিত অদৃষ্টবাদী ওলাবিবির পূজারত নিজেদের ধিক্কার দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

॥ ২ ॥

"দেশ" পত্রিকার আলোচনা বিভাগে শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী লিখিত "দুই রবীন্দ্রনাথ" সম্বন্ধে প্রকাশিত পত্রগুচ্ছ দেখলাম। নীরদচন্দ্রের লেখা সব সময়েই, আর কিছু না হোক, বিতর্কমূলক এবং এগুলির অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণও অনস্বীকার্য। এঁর লেখার রস মূলত রাজসিক, যদিও তা অনেক সময় নতুন করে চিন্তা করতেও বাধ্য করে।

শ্রীনীরদচন্দ্রের "দুই রবীন্দ্রনাথ" পড়ে স্বভাবতঃ "দুই নীরদচন্দ্রের" কথা মনে হল। শ্রীনীরদচন্দ্রের যৌবনকালের অন্তরঙ্গ কিছু বাঙালী লেখকের লেখায় যে নীরদচন্দ্রের পরিচয় পাই তার সঙ্গে নীরদচন্দ্র বর্ণিত প্রথম রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্যজনক মিল দেখতে পেলাম। যাঁরা শ্রীপরিমল গোস্বামীর "স্মৃতিচিত্রণ" পড়েছেন তাঁরা এ কথার নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন। নীরদচন্দ্র বর্ণিত দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এখনকার নীরদচন্দ্রের মতো মিল, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ততটা নয়। এই নীরদচন্দ্র একাধারে সমসাময়িকের লেখক, পাশ্চাত্যের প্রশংসালাভে উৎসুক, কণ্ঠ সংগৃহীত অন্যদের উক্তির সাহায্যে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে উন্মুখ এবং "দেশের লোকের নিন্দা ও অবজ্ঞার অধীরতা" উদ্ভূত paranoiae দৃষ্টিতে নিজেকে "জ্ঞানী" মনে করলেও, এঁর দেশের লোকের ওপর ক্ষোভ এঁর ভদ্র বাঙালীর বর্ণীকরণ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান।

নীরদচন্দ্রের "দুই রবীন্দ্রনাথ" অনেকের ইতিদর্শন মনে করিয়ে দেয়। দুই কেন, সহস্র রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের

লেখার, চিত্রকলা ও অন্যান্য কর্মে বিভিন্ন রবীন্দ্রনাথের একত্র সমন্বয় আমাদের "জ্ঞানী" বুদ্ধিতে হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে সেজন্য রবীন্দ্রনাথকে দোষ দেব কেন? উত্তরকালের রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর নিজস্ব সম্পত্তি থাকেন নাই এবং সেই দিক থেকে বাঙালী কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত (?) হয়েছে একথা কারও মনে হলে দোষের কিছু নেই, কিন্তু সেটাকে অভিনব মনে করা নিশ্চয়ই জ্ঞানের পরিচয় দেয় না। বিশ্বের নানাদেশ ভ্রমণ, নানা মনীষীর সংস্পর্শ এবং সে যুগের প্রচলিত এক বিশ্বের চিন্তাধারার সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের এ পরিবর্তন না হওয়াই অস্বাভাবিক হত। বিশ্বের আর কোন কবিকে আমরা এই বিরাট পটভূমিকায় বিচরণ করতে দেখেছি?

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে আমাদের দেশের অনেকের নানা সন্দেহ আছে। এর আগে শ্রীশিবনারায়ণ রায়ের রবীন্দ্রচিত্র-বিশ্লেষণ পড়েছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আচার্য নন্দলালের উক্তিটি মনে রাখলে অহেতুক শ্রদ্ধা বা অমূলক বিশ্লেষণের ভ্রান্তি থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি।

আসলে নীরদচন্দ্রজাতীয় লেখকদের ইদানীন্তন রবীন্দ্র সমালোচনা দাসমনোভাব-প্রসূত। যেহেতু আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে রবীন্দ্রনাথ পূর্বে যুগের মত আকর্ষণীয় নন, সেহেতু রবীন্দ্রনাথকে তুচ্ছ করার মনোভাব ইদানীংকালের অনেক বাংলা সাহিত্য সমালোচকের মধ্যে দেখতে পাই। এই হীনমন্যতার কোনও কারণ থাকে না, যদি এই সমালোচকেরা মনে রাখেন যে অনুবাদের সাহায্যে রবীন্দ্রসাহিত্য মূল্যায়ন পাশ্চাত্যের পক্ষে কোনও দিনই সম্ভবপর নয়। শেক্সপীয়র বা গেটের লেখার কি মূল্যায়ন বাংলা অনুবাদের সাহায্যে বাঙালী পাঠক করবে? সেজন্য কোনও ইংরাজ বা জার্মান সমালোচক মাথা ঘামায় না।

নীরদচন্দ্রের লেখাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ মনে করলেই এ সম্বন্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। আসলে এগুলি রকো (রক-প্রসূত) মন্তব্য—এতে আছে বাঙালীর চিরন্তন আড্ডার রস, যে আড্ডায় বাঙালী রাজা মারে, উজীর মারে। আড্ডা জমানোর জন্য মাঝে মাঝে দু-একটা দায়িত্বহীন, অগভীর উক্তির প্রয়োজন হয় এবং তাতে "দেশের" "আলোচনার" আসর ভরে ওঠে। পাকা আড্ডাবাজের মত শ্রীনীরদচন্দ্র আড্ডার আসর তাতিয়ে দিয়ে মজা উপভোগ করতে ভালবাসেন—পণ্ডিতের মত নিজের মতের সমর্থনে পুনঃ পুনঃ এগিয়ে আসেন না।

নিন্দার রস রবীন্দ্রনাথ উপভোগ করতেন সহজভাবেই—নিন্দুককেও তিনি আর্টিস্ট বলে মানতেন। এজন্য তাঁকে জ্ঞানের ভেক পরতে হয় নাই। "গল্পসল্পের" "চণ্ডী" গল্পটি পড়লে একথা জানা যায়। তার থেকেই কিছুটা শ্রীনীরদচন্দ্রের উদ্দেশ্যে নিবেদন করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

> "আলো যার মিটিমিটি
> স্বল্পই মিটিমিটি
> বড়োকে করিতে চায় ছোটো
> সব ছবি ভুষো মেজে
> কালো করে নিজেকে যে
> মনে করে ওস্তাদ গোটো।"

শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
পাটনা-৫

॥ ৩ ॥

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর 'দুই রবীন্দ্রনাথ' পড়ে গভীর আনন্দ পেলাম। বাঙালী চরিত্রের (দেশ) চরিত্রে শিল্পী, কবি, গুরু প্রবণতা, রবীন্দ্রনাথের ভুলভ্রান্তি মোহ, বাঙালীর বিসর্জন, বিশ্ব নাগরিকের গ্রহণ প্রভৃতি সম্পর্কে শ্রীচৌধুরী মহাশয়ের নির্ভীক (দুঃ) সাহসিক সত্য যথার্থ ভাষণের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

সাম্প্রতিককালে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বড় বেশী (ভুল?) বোঝাবুঝি হয়েছে। 'রবীন্দ্র দর্শন' সম্পর্কিত মোটা মোটা গ্রন্থ 'রবীন্দ্র দর্শন' প্রায় অসম্ভব। অসংখ্য সুধী প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ করেন তিনি উপনিষদের বিশ্ব-বোধ সম্পন্ন এবং আশ্চর্য জ্যোতির্ময় পুরুষ না হলে। (উপনিষদের ঋষিরা কিন্তু উপনিষদে আধ্যাত্মিক রসাস্বাদের চর্চিত নতুন হিসাবেই লিখেছেন।)

একদল সম্প্রতি মুনিঋষি হয় সাহিত্যের (অ) জ্ঞান পাপী অধ্যাপকদের মত উপাদান স্থূল করেন রবীন্দ্র দর্শন গ্রন্থাবলী এবং প্রবীণ অধ্যাপকদের মাধ্যমে রবীন্দ্র দর্শন করে প্রবেশ আবার ছাত্রছাত্রীদের 'রবীন্দ্র দর্শন' করান। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা যদি অভিভাবকের হয়, এঁদের ভূমিকা যাদুকরের। রবীন্দ্রনাথ পড়াতে গিয়ে লেকচারের টুপির ভিতর থেকে এক এক করে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতা, নৈর্ব্যক্তিক ভাবকল্পনা, অতীন্দ্রিয় প্রেম চেতনা, abstract সৌন্দর্য চেতনা ইত্যাদি ইত্যাদির লালনীল পতাকা ছাত্রছাত্রীদের সামনে এঁরা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। showmanship-এর নৈপুণ্যে সম্মোহনী কবি মুকুন্দের মত অধ্যাপকেরা বিস্ময়কর হয়ে যান। ছাত্রছাত্রীদের চোখের সামনে (সার্কাসের মত) লালনীল পতাকাগুলি আরও রহস্যময় হয়ে ভেসে বেড়াতে থাকে। বলা বাহুল্য যাদুকরের শ্রেষ্ঠ showmanship-এর উপর নির্ভরশীল।

এই তো (দুঃ) অবস্থা। এই দুরবস্থায় 'দুই রবীন্দ্রনাথ' জাতীয় প্রবন্ধের প্রয়োজন ছিল এবং আছে। এই জাতীয় আরও প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ দরকার যার মধ্যে দিয়ে 'রবীন্দ্র দর্শন' নয়, সত্যিকারের 'রবীন্দ্র দর্শন' হয়। যথার্থ সত্য দৃষ্টিসম্পন্ন রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ (বিশেষ অজ্ঞ নয়) লেখকগণ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি দিলে চেষ্টাকৃত রহস্যময় 'রবীন্দ্র-ধোঁয়াশা'র ভিতর থেকে যথার্থ রবিকবিকে পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

মিলন দত্ত
অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা

॥ ৪ ॥

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর "দুই রবীন্দ্রনাথ" (দেশ—৫ আগস্ট, '৬৭) একটি বিস্ফোরক প্রবন্ধ। শ্রী চৌধুরীর পঠন-সমৃদ্ধি প্রবাদখ্যাত, সাহিত্যিকখ্যাতি বিদেশবিস্তৃত। ইংরাজী রচনায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সত্ত্বেও তিনি যে বাংলায় মত একটি ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায়, অধুনা ইউরোপবিস্মৃত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমন একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ আমাদের উপহার দিয়েছেন, সে-জন্য অবশ্যই তিনি ধন্যবাদার্হ। এই প্রবন্ধে তিনি অনেক সত্য ও নূতন কথা শুনাইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যেটুকু সত্য, তাহা নূতন নহে, যাহা নূতন, তাহা সত্য নহে। বক্তা বিদগ্ধ যাহাই হউক, এ ধরনের রচনায় ভাষার যে সংযম-শালীনতা, দৃষ্টির যে পরিচ্ছন্নতা ও মনের যে শুচিতার প্রয়োজন হয়, আলোচ্য প্রবন্ধে তাহা শোচনীয়ভাবে অনুপস্থিত। তাহা বাংলা, বিশ্ব বাঙালী কবি, তাহাই বোধ হয় ইংরাজী-পণ্ডিতের অসহনীয়তার কারণ। ইহার প্রতিবাদ করিলে শ্রী চৌধুরীর সাহিত্য গবেষণাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, আবার প্রতিবাদ না করিলে উপেক্ষাকে প্রশ্রয়-জ্ঞান করিয়া তিনি সোৎসাহে আরও বিপজ্জনক বিস্ফোরক প্রয়োগ করিতে পারেন।

ইংরাজী জীবনযাত্রা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একদা-অনাগ্রহ প্রমাণ করিতে গিয়া শ্রী চৌধুরী যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহার শেষাংশ হইতেছে—"ইংরেজী শিষ্টালাপ আমাদের পক্ষে কত ফাঁকা, কত ফাঁকি, কি সুগভীর মিথ্যে!" অমনি চৌধুরী মহাশয়ের মন্তব্য, "কথাটা সত্য নয়।" কেন? না, তিনি অনেক ডিনার খাইয়াছেন, এবং তাঁহার অভিজ্ঞতায় বিলাতী ডিনার ভদ্রতা, দৈন্য, আন্তরিকতা, মাধুর্য উদারতা ও প্রীতির প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তাহাতে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি মিথ্যা হইয়া যায় কী করিয়া?

নানা উদ্ধৃতি সহযোগে শ্রী চৌধুরী দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ভারত-আত্মসম্মানী রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইয়া এবং সেই সূত্রে ইউরোপীয় সমাদরের মোহে কেমন করিয়া রাতারাতি ইউরোপ-ঘেঁষা হইয়া পড়িলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবমনের ক্রমবিকাশের

ধারাটিকে শ্রী চৌধুরী হয় বুঝিতে পারেন নাই, নয় বুঝিয়াও নস্যাৎ করিতে চাহিয়াছেন। ইউরোপের এটিকেট-সর্বস্ব ধনবিলাসীদের চটকদার কৃত্রিম জীবনযাত্রা, ডিনার যাহার অপরিহার্য অঙ্গ, পরবর্তী কালেও রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করে নাই। কিন্তু ইউরোপের যে-আত্মা অনেক দুঃখ সহিবার প্রচণ্ড জীবনীশক্তিতে ইউরোপের মানুষকে উজ্জীবিত করিয়াছে, তাহাকে তিনি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগেও যেমন পরেও তেমনি প্রণাম জানাইয়াছেন। 'পথের সঞ্চয়' প্রবন্ধ-গ্রন্থে তাহার অজস্র অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আছে।

বাঙালীর নিন্দা অসূয়ায় জর্জরিত রবীন্দ্রনাথের উক্তিগুলি কি প্রমাণ করে তিনি দেশবাসীর প্রতি বিমুখ হইয়া বিদেশের দিকে চাহিয়াছিলেন? নিন্দার প্রকৃত তাৎপর্য শ্রী চৌধুরীর মত অতটা না বুঝিলেও রবীন্দ্রনাথ খানিকটা বুঝিয়াছিলেন, এবং বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই দুঃসহ হইলেও উত্তেজনা প্রকাশ করেন নাই, মূলত কবি বলিয়াই তিনি স্পর্শকাতর ছিলেন, অভিমান প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই।

নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরেই যে-রবীন্দ্রনাথের গঠনমূলক কাজের আরম্ভ, তাহার প্রধান কারণ পুরস্কারের অর্থমূল্য তাঁহাকে অর্থচিন্তা হইতে তখনকার মত মুক্ত করিয়াছিল। তিনি তখন যাহা কার্যত শুরু করিলেন, তাহার মানসিক প্রস্তুতি অনেক পূর্ব হইতেই ছিল। সুতরাং বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডকে অভিনেতার কাজ বলিয়া মন্তব্য করা কী শালীনতাবিরুদ্ধ নহে?

রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পে আত্মনিয়োগ সম্পর্কে চৌধুরী মহাশয়ের থিওরী সর্বাপেক্ষা হাস্যকর ও সর্বাংশে মানহানি-কর। শ্রেষ্ঠ চিত্রদর্শন যাহার মধ্যে শিল্প-বোধ আছে তাহাকেই অনুপ্রাণিত করিতে পারে। হ্যুগোর অঙ্কিত চিত্রাবলী দেখিয়া যদি রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনের কথা মনে হইয়াও থাকে, তাহাতে আঁতকাইয়া উঠিবার কী আছে! হ্যুগো কবি বলিয়াই কী এই অনুমান? ভাল ছবি রবীন্দ্রনাথ আগেও দেখিয়াছেন,, অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্র তাঁহার ঘরের ছেলে, সুতরাং চিত্রশিল্পে হাত দিবার সঙ্কল্পের জন্য হ্যুগো পর্যন্ত যাইতে হইবে কেন? রবীন্দ্রনাথ বাঙালী হইয়াও ইংরাজী লিখিয়া নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন বলিয়া কোন বাঙালী ইংরাজী রচনায় হাত দিলেই কি বলিতে হইবে, 'এই রে! নিশ্চয়ই অমুকে ভাবিয়াছে ইত্যাদি?'

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রায় প্রতিটি রচনা সম্পর্কে চিঠিপত্রে কিছু-না-কিছু আলোচনা করিয়াছেন, বা ইঙ্গিত দিয়াছেন। শিল্পের একটি সম্পূর্ণ নূতন শাখায় হাত দিতেছেন, অথচ কোন পত্র বা রচনায় হ্যুগোর অনুপ্রেরণার বা চিত্রাঙ্কন-প্রসঙ্গে হ্যুগোর নামের উল্লেখ পর্যন্ত নাই, ইহাও আশ্চর্য!

আচরণের দিক হইতে বাঙালী ভদ্র-সমাজকে চৌধুরী মহাশয় প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন, গৌরবে প্রথম শ্রেণী অবশ্যই তাঁহার প্রাপ্য। সুতরাং অভিনেতা দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার তাঁহার 'মানসিক চাটনি মাত্র।' নাকি ইহাও এক ধরনের পার্ভারশন? রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আধুনিক বাঙালীর সযত্নলালিত সংস্কারে কালাপাহাড়ী রীতিতে এমন প্রচণ্ড আঘাত করিব যে, মগজে ঝাঁকি লাগিবে, পাঠকদের তাক্ লাগিয়া যাইবে। প্রতিবাদপত্র ছাপা হইবে, আর ফাইলে তাহার কাটিং সযত্নে সাঁটিতে এই ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিব,—আহা! এত নিন্দা, এত গালিও কি আমাকে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি আনিয়া দিবে না?

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
হুগলি

॥ ৫ ॥

নীরদবাবু অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি 'দুই রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে যা বলতে চেয়েছেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এটা ভেবে দেখবার বিষয়, সত্যিই কবি বা গুরুদেবের অন্তরালে আমরা প্রকৃত রবীন্দ্রনাথকে বিসর্জন দিয়েছি কিনা।

কিন্তু এই কথাটা অতি সহজে ভদ্রভাবে বলা যায়। আমি এর আগেও লক্ষ করেছি, নীরদবাবুর প্রবন্ধের প্রকাশভঙ্গিতে এমন একটা অশালীনতা উঁকি মারে যে, (হয়ত এটা নীরদবাবুর ন্যাকামি বা সংপনা বলে বোধ হবে) তাঁর বক্তব্যগুলি মাঠে মারা যায়। কোন ব্যক্তির দোষত্রুটি ভুল ইত্যাদি দেখাবার জন্য তাঁকে গালমন্দ না করে কটু ভাষা প্রয়োগ না করেও সেটা করা যায়। নীরদবাবু যদি এ কথা মনে রাখেন তাহলে তাঁর মতো অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তির মতামত সহজে লক্ষ্য ভেদ করবে।

নীরদবাবুর পড়াশুনা প্রচুর, সুতরাং সবিনয়ে বলতে চাই তিনি অনুমান নির্ভর কিছু যেন না বলেন, আর সেই সঙ্গে বলি, [যদিও নীরদবাবুকে জ্ঞানদান করার স্পর্ধা রাখি না] নীরদবাবু নিশ্চয় ছিন্নপত্রাবলী, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, পল্লীপ্রকৃতি ইত্যাদি প্রবন্ধমালা ও আত্মপরিচয় গ্রন্থ পড়েছেন, তবু তার পরেও তিনি কেন সাময়িক ক্ষোভে, দুঃখে বা ক্রোধে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন সেটাকেই বড় করে দেখে, দেশবাসীকে দেখাতে চাইছেন? নীরদবাবুর মত পণ্ডিত ব্যক্তি বাংলাদেশে বেশী নেই সত্যি, কিন্তু অনেকে আছেন যাঁরা রবীন্দ্র-মোহগ্রস্ত না হয়েও রবীন্দ্রচর্চা করে থাকেন, তাঁরা কিছুই বোঝেন না সেকথা বিশ্বাস করি কি করে? সুতরাং নীরদবাবুই সকলের ভ্রম সংশোধন করতে পারেন, তিনিই সব বুঝেছেন এই রকম আত্মাভিমান তাঁর মত পণ্ডিতের কি থাকা উচিত? আর ইদানীং নীরদবাবু যে একে একে সকলের মান্য এমন ব্যক্তিদের নিন্দা কার্যে ও নিজ প্রশংসায় উদ্যত লেখনী হয়েছেন, তাঁর হাতে রাজনীতি, রণ-নীতি, সাহিত্য সামাজিক আচার-ব্যবহার পোশাক-পরিচ্ছদ কিছুই বাদ পড়ছে না—এটা একদিকে খুবই আশার কথা সন্দেহ নেই এবং সকল বাঙালী এই কাজে উদ্যত হলে ফলটা ঘরে বাইরে কি দাঁড়াবে একবার ভাবা প্রয়োজন বলে মনে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র কখনো স্বীকার করেন নি দুর্গেশনন্দিনী লেখার আগে আইভ্যান হো পড়েছিলেন কিনা—একথা বিশ্বাস করলেও বা না করলেও তা। এতে বঙ্কিমচন্দ্রের মহত্ত্বের হানি হয় না এবং স্কটেরও মহত্ত্ব কমে না। সুতরাং ভিক্টর হ্যুগোদ্বারা অনু-প্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যদি ছবি এঁকেই থাকেন তাতে রবীন্দ্রনাথ বা হ্যুগোর স্বাতন্ত্র্য বা মহত্ত্ব কিছু কমে কি?

সর্বশেষে বলি, নীরদবাবু হয়ত জানেন না যে ২৫শে বৈশাখ যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে পুজো করে কর্তব্য সারেন তাঁরা কিন্তু কেউ রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলেন না— শান্তি-নিকেতনের লোকরাই গুরুদেব বলে থাকেন। আর রবীন্দ্রনাথকে কবি বলায় কি ন্যাকামি বা সংপনা দেখানো হয় জানিনা। রবিদাদা, রবি মামা, রবি কাকা বললে কি আন্তরিকতা প্রকাশ পেত জানি না। আত্মীয়স্বজনরা এ সব ত বলেই থাকেন। হঠাৎ জনসাধারণ এক জনের সঙ্গে এই ঘরোয়া অন্তরঙ্গ ডাক পাতাতে যাবে কেন? জনসাধারণ সকলে ন্যাকামি ও সংপনা না করার প্রতিবাদে আত্মীয় সম্পর্ক পাতিয়ে ন্যাকাও সং সাজবে এইটেই কি নীরদবাবু সুস্থতার লক্ষণ বলে মনে করেন?

রিক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা ২৯

॥ ৩ ॥

সুপণ্ডিত বলে কথিত শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সম্প্রতি বাঙালী ও বাংলার প্রতি কর্তব্য-বশত ("হাড়ে বজ্জাত ও হারামজাদা" শ্রেণীর বাঙালীর সৌভাগ্য) কিছু চিন্তা উদ্রেকী প্রবন্ধ প্রকাশ করছেন, বাঙালী মাত্রেরই সেজন্য নিজেদের কৃতার্থ বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু "দুই রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটির বক্তব্য পরিবেশনে যে রূঢ় ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে এবং বক্তব্যও স্থানে স্থানে এমন অযথার্থ সিদ্ধান্ত ভিত্তিক যে পাঠক মাত্রই সেই ভাষাতেই প্রতিবাদ করতে অনুপ্রাণিত হবেন। স্বীকার করি, তা হওয়া উচিত নয়।

প্রবন্ধটি পাঠ করতে করতে রবীন্দ্রনাথেরই একটি গান মনে পড়ছিল :

"তোমার পূজার ছলে তোমায়...।"

সৌভাগ্য, আমি রবীন্দ্র মন্দির বা মসজিদ দরগার পাণ্ডা বা খাদিম নই। তাই নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথ মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আড়াল করে রেখেছেন অনেকখানি। এবং এ কথাও সত্য, আমরা ঠাকুর পূজোয় মত্ত, তাঁর সৃষ্টি থেকে বা ব্যক্তি জীবন থেকে কোন অনুপ্রেরণা লাভে বঞ্চিত রাখছি নিজেদের—স্বেচ্ছায় বা অক্ষমতায়।

শ্রীযুক্ত চৌধুরীর প্রবন্ধের এ দুটি বক্তব্য কিছু নতুন নয়, ইতিপূর্বে অনেকে এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের এতাবৎকাল অনাবিষ্কৃত নতুন ভূমিকা, বিদেশী কল্প সমালোচকের হাতের ক্রীড়নক রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ব্যর্থতার কারণসমূহ ও এ জাতীয় কয়েকটি অনির্মল সিদ্ধান্ত বিস্ময় ও ক্ষোভের উদ্রেক করে।

যে বিপুল কর্মশক্তি, শিক্ষাদর্শ, মহৎ বিশ্বাস এবং আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা শরিচিত্রতর মাধ্যমকে অবলম্বন করে রশ্মির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল—বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন, রবীন্দ্রনাথের ছবি সেগুলির এক একটি উদাহরণ।

বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রই জানেন। এ দুর্ভাগা দেশে এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে অভিনয় করতে হয়েছিলো বইকি রবীন্দ্রনাথকে, কিন্তু সে অন্য অর্থে—হ্যাঁ, অর্থের জন্যই।

এর পেছনে যে নিষ্ঠা, শিক্ষা-চিন্তার বৈশিষ্ট্যকে কাজে রূপ দেবার ঐকান্তিকতা ছিল তা কি মিথ্যা রবীন্দ্রনাথের? শ্রীচৌধুরীর মতে সত্যকার রবীন্দ্রনাথের নয়।

আমাদের কৌতূহল, সত্যকার রবীন্দ্রনাথের তবে কি পরিচয়, আর সেই দুর্গটি জানার কি কোন উপায় আছে—শ্রীচৌধুরী তার কোন হদিস দেননি।

তারপর, শুধুমাত্র "বাঙালী" না হবার অপরাধে অসাধারণ সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মনীষী রবীন্দ্রনাথ বিদেশী লোভন, স্বাধীন ও বিদগ্ধভাবে সমকাল রহিলার ক্রীড়নক হয়েছিলেন—শ্রীচৌধুরীর এই সিদ্ধান্ত আমাদেরও "একটু কৌতুক" উদ্রেক করে। চিত্র শিল্প যাঁরা সামান্যও বোঝেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ছবির মধ্যে মোহগ্রস্ত ব্যক্তির তুলি চালনার অস্তিত্ব টের পান না—আত্মপ্রকাশের একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রবল অভিব্যক্তিকেই প্রত্যক্ষ করেন। হতে পারে, তা চিত্রবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে সৃষ্ট নয়, কিন্তু সব সৃষ্টি কি সর্বদা ও সর্বথা নিয়ম মেনে চলে? আর হ্যুগোর ছবি দেখে তাঁর চিত্রকর হবার সাধ হয়েছিলো—এ সিদ্ধান্ত কৌতুককর নয় কি!

"বাঙালী ছাড়া আর কিছু হইবার সমস্যা তাঁহার ছিল না"—এই সিদ্ধান্ত আমাদের চিন্তিত করে এই কারণে যে, কথাটা পড়ার সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথের একটি বাক্য মনে পড়ে 'রেখেছো বাঙালী করে মানুষ করনি!' ইত্যাদি। তাহলে? কোনটা হওয়া অপরাধ—বাঙালী অথবা মনুষ্যত্বের সাধনায় অগ্রসর হওয়া? কথাটি হাল্কাভাবে বলা গেল, বিচক্ষণ ব্যক্তি এর অন্তর্নিহিত বক্তব্য নিশ্চয় অনুধাবন করতে পারবেন। তাছাড়া, যেসব কাজ করেছেন বলে তিনি বাঙালী ছাড়া অন্য কিছু হতে চেয়েছিলেন, সেই কাজগুলি না করলেই কি তিনি বাঙালী হতেন, আর যদি বা কেটে ছেঁটে বাঙালী করা গেল তাঁকে—তাতে বাঙালী হিসেবে ঢাক পেটানর সুবিধে ছাড়া আর কি লাভ হতো? বা হবে?

রবীন্দ্রনাথকে এক শ্রেণীর বাঙালীর তীব্র নিন্দা ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো এবং "দায়ে পড়ে জ্ঞানী" হতে পারেননি বলে সে আঘাতকে ক্ষমা ঘেন্না করতে পারেননি ফলে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন—কথাটি অবিশ্বাস্য। বিচলিত তিনি হয়েছিলেন একথা ঠিক, তা কিছু অপরাধ নয়, "কণ্টক যত ক্ষুদ্রই হউক, তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা থাকে"—কথাটি তাঁরই, কিন্তু সকল কাঁটা ধন্য করে ফুল ফোটানর খেলা কি বন্ধ করেছিলেন? অসামান্য মানসিক শক্তি ছাড়া এ কি সম্ভব! আর কোন দেশে কোন স্রষ্টাকে এ সব সহ্য করতে হয়নি? রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আঘাত আরও তীব্র ছিল, কিন্তু পরিণামে কৃত্রিম কাজে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, অমূলক সন্দেহ ছাড়া একথা বিশ্বাস করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই।

রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থতার যে তালিকা নিবেদন করেছেন তিনি তা মেনে নিলেও একটা প্রশ্ন থেকেই যায়—শেষ জীবনের বেদনা, নৈরাশ্য, তিক্ততাই কি ব্যর্থতার একমাত্র প্রমাণ! পৃথিবীতে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সমগোত্রীয় তাঁরা সকলেই কি এসবের শিকার নন? এ অভিজ্ঞতা কি বাংলা দেশের রবীন্দ্রনাথের? এগুলোই জীবনের সার্থকতা পরিমাপের একমাত্র কি মাপকাঠি!

বাংলা দেশের এবং রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্য, তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর জন্য বাঙালীর মাপমতো খাটো পোশাকের ব্যবস্থা করা হচ্ছে—"সুপরিসর আলখাল্লা" পরার অপরাধের এই কি প্রায়শ্চিত্ত!

বিশ্বাস করি, প্রবন্ধে বর্ণিত তিন শ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে শ্রীযুক্ত চৌধুরী নিশ্চয় তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নন—কাজেই তাঁর কাছ থেকে ভাষার শালীনতা আশা করা কি অন্যায়!

পাণ্ডিত্য শ্রদ্ধেয়, কিন্তু পাণ্ডিত্যের অহংকার তার বিপরীত।

উৎপল চক্রবর্তী
বাণীপুর

আয়ুর্বেদীয় দৃষ্টিভঙ্গির সারকথা

বিগত ২২।৭।৬৭ তারিখের (৫ই শ্রাবণ, ১৩৭৪) দেশ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মাধবেন্দ্রনাথ পালের 'আয়ুর্বেদীয় দৃষ্টিভঙ্গির সারকথা' প্রবন্ধটি পড়ে আনন্দ লাভ করলাম। লেখক এই নিবন্ধে ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে মহর্ষি চরক ও সুশ্রুত এবং মহামতি বাগ্‌ভটের (এই তিন মনস্বী আমাদের দেশে বৃদ্ধত্রয়ী নামে পরিচিত), তথা বৌদ্ধ-তান্ত্রিক নাগার্জুন, মনীষী চক্রপাণি দত্ত ও 'ভাবপ্রকাশের' রচয়িতা ভাবমিশ্রের দানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি মাধব করের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'নিদানের' অথবা 'রসেন্দ্র-সার-সংগ্রহ' প্রভৃতি রসশাস্ত্র বিষয়ক কোনো গ্রন্থের (Treatise on Hindu Chemistry) উল্লেখ করেন নি। অথচ এ দেশের একটি প্রচলিত বচন অনুসারে নিদানে মাধব শ্রেষ্ঠ, শারীরস্থানে (Anatomy and Physiology) সুশ্রুত, চিকিৎসিতস্থানে (Treatment of Diseases) চরক ও সূত্রস্থানে (Principles of Ayurveda, Ayurvedic Organon) বাগ্‌ভট শ্রেষ্ঠ।

আমার মনে হয়, লেখক তাঁর প্রবন্ধের যে নামকরণ করেছেন, তা বিভ্রান্তিকর। কারণ, আয়ুর্বেদ সম্পর্কে তিনি যে আলোচনা করেছেন, তা বহিরঙ্গ আলোচনা। আয়ুর্বেদীয় দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই কিন্তু সর্ব প্রথমে 'অগ্নিবেশ সংহিতা' বা 'চরক সংহিতার' মর্মে প্রবেশ করতে হয়। চরকসংহিতা বা চরক-প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশ-সংহিতা হচ্ছে একাধারে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা-শাস্ত্র, দার্শনিক সিদ্ধান্ত গ্রন্থ, নীতিশাস্ত্র (Ethics), সমাজ-দর্শন (Social Philosophy), মনোবিদ্যা ও ধর্মশাস্ত্র,—তাই মহামতি চরক বলেছেন

[illegible], মনো-ব্যাধি ও জ্বররোগের চিকিৎসক। চরক-সংহিতার মতো গ্রন্থ অন্য কোনো দেশে বা কালে রচিত হয়েছে বলে তো আমাদের জানা নেই। মহামতি চরক বলেছেন—বায়ু, পিত্ত ও কফই হচ্ছে শারীর ব্যাধির কারণ, আর রজোগুণ ও তমোগুণ হচ্ছে মানস ব্যাধির মূল। যুক্তিযুক্ত ঔষধ বা দৈব ঔষধের দ্বারা শারীর ব্যাধির উপশম হয়। আর জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য, স্মৃতি ও সমাধির সাহায্যে মানস ব্যাধির হস্ত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এখানে 'জ্ঞান' হচ্ছে শাস্ত্রজ্ঞান, 'বিজ্ঞান' হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান, আর স্মৃতি হচ্ছে আত্মস্বরূপের চেতনা।

মহামতি চরক বলেছেন, যে চিকিৎসক জ্ঞানবুদ্ধির প্রদীপ দ্বারা রোগীর অন্তরাত্মাতে বা অন্তঃশরীরে প্রবেশ করতে না পারেন, তিনি রোগের যথার্থ চিকিৎসা করতে পারেন না। তিনি আরও বলেন, চিকিৎসার অর্থই হচ্ছে রোগীর ধাতুসাম্য-বিধান, অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের সমতা রক্ষা। যিনি রোগীর এই ধাতুসাম্যকে নষ্ট করেন, যিনি রোগীকে একটি ব্যাধি থেকে মুক্ত করার জন্যে তার দেহে অপর ব্যাধি উৎপন্ন করেন, তিনি চিকিৎসক নন। চিকিৎসার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশোধন, তবে বাহ্য ব্যাধির ক্ষেত্রে সংশমনের (Palliative treatment) প্রয়োজন আছে। মহামুনি চরক আর একটি কথা বলেছেন যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, অনেক সময়ে আমাদের ব্যাধির মূলে থাকে প্রজ্ঞাপরাধ, বুদ্ধিভ্রংশ বা জ্ঞানকৃত পাপ। বাস্তবিক আমরা যে অনেক সময়ে আহার, বিহার প্রভৃতি ব্যাপারে মাত্রালঙ্ঘনের ফলেই ব্যাধিগ্রস্ত হই, এ কথা কে না স্বীকার করবেন? আমাদের বুদ্ধিভ্রংশ বা পাপাচরণই যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাধির কারণ, মনস্বী ট্রাইন In Tune with the Infinite গ্রন্থে সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, প্রাচীন ঋষিরা বায়ু বলতে বুঝেছেন functions of the central and sympathetic nervous system আর পিত্ত ও শ্লেষ্মার দ্বারা তাঁরা বুঝেছেন process of metabolism।

আয়ুর্বেদের আর একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ পথ্যাপথ্যের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, রোগী যদি পথ্যসেবী হন, তবে বিনা ঔষধেও তিনি রোগ থেকে মুক্ত হতে পারেন। আর যিনি পথ্য সেবন করেন না, শত ঔষধেও তিনি রোগমুক্ত হতে পারেন না।

[illegible]

মহর্ষি চরকও বলেছেন—যাঁর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভ করতে চাও, তবে মাত্রাশী হবে অর্থাৎ ভুক্ত আহার জীর্ণ হলে মাত্রা অনুসারে আহার করবে, আর পথ্যাশী হবে অর্থাৎ হিতকর খাদ্য গ্রহণ করবে, যা অপথ্য, তা বর্জন করবে। অন্যত্র তিনি বলেছেন, আহার সম্পর্কে দশটি বিধি আমাদের পালনীয়, যেমন—'নাতিদ্রুতমশ্নীয়াৎ', অতি দ্রুত ভোজন করবে না, 'নাতিবিলম্বিতম অশ্নীয়াৎ', অত্যন্ত মন্থর গতিতে ভোজন করবে না, 'অজল্পন্ অহসন্ তন্মনা ভুঞ্জীত', কথা না বলে, হাস্য বর্জন করে একাগ্র মনে আহার করবে ইত্যাদি।

নাগার্জুন-প্রতিসংস্কৃত সুশ্রুত-সংহিতা ভারতীয় মনীষার আর একটি অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ। সুশ্রুতের সম্পর্কে দুটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি হচ্ছে, ভারতবর্ষে যে শব-ব্যবচ্ছেদের (Dissection) নিজস্ব পদ্ধতি ছিল, সুশ্রুত-সংহিতা পাঠে তা জানা যায়। দ্বিতীয়ত, গঠনক্ষম শল্যতন্ত্র বা প্লাস্টিক সার্জারিও যে প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত ছিল না, সুশ্রুত-সংহিতায় তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। মনস্বী ম্যাকডোনেল গ্রন্থের সঙ্গে এ বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে কিন্তু কোথাও এই দুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ নাই।

মহামতি বাগ্‌ভট যে আয়ুর্বেদের প্রতিটি বিভাগে সমান দক্ষ ছিলেন, তাঁর রচিত গ্রন্থেই তার প্রমাণ আছে। আয়ুর্বেদে তাঁর নিজস্ব দানও আছে। একটি ছোট দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। চক্রপাণি দত্ত লিখেছেন—

'সদ্যোভুক্তস্য বা জাতে জ্বরে
সন্তর্পণোত্থিতে।
বমনং বমনার্হস্য শস্তমিত্যাহ বাগভটঃ'॥

যদি আহারের পরেই কেহ জ্বরের দ্বারা আক্রান্ত হয় বা অতিমাত্রায় পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের ফলে যদি কারো জ্বররোগ উৎপন্ন হয় আর রোগী যদি বমনযোগ্য হয় (শিশু, বৃদ্ধ, দুর্বল বা গর্ভিণী না হয়), তবে সেই রোগীকে বমনকারক দ্রব্যের দ্বারা বমন করাবে।

লেখক বলেছেন, আচার্য ভাবমিশ্র তাঁর গ্রন্থে অনেক ইউনানী ঔষধের গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন, আর এ ব্যাপারে তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমরা তাঁর গ্রন্থে নূতন বা আগন্তুক ব্যাধির আলোচনাও দেখতে পাই। ভাবমিশ্রই তাঁর সংকলন-গ্রন্থে সর্বপ্রথম বিদেশী পর্তুগীজদের দ্বারা এ দেশে আনীত ফিরঙ্গরোগের (Syphilis) উল্লেখ করেছেন। (নিদানের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত।) ভাবমিশ্র লিখেছেন—

'ফিরঙ্গসংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব যদ্ভবেৎ।
তস্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধির্ব্যাধি-
বিশারদৈঃ॥
গন্ধ রোগঃ ফিরঙ্গোঽয়ং জায়তে
দেহিনাং ধ্রুবং।
ফিরঙ্গিণোঽঙ্গসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যা
প্রসঙ্গতঃ'॥

এই রোগ ফিরঙ্গসংজ্ঞক দেশে বহুলরূপে দৃষ্ট হয়, এই জন্যে ব্যাধিবিশারদগণ (নিপুণ চিকিৎসকগণ) এই রোগের নামকরণ করেছেন 'ফিরঙ্গরোগ'। এই রোগের নামান্তর গন্ধরোগ। এই রোগগ্রস্ত কোনো পুরুষের সঙ্গে অঙ্গসংস্পর্শ ঘটলে কিংবা কোনো নারীর সাহচর্য ঘটলে নিশ্চয়ই এই রোগ উৎপন্ন হয়ে থাকে।

আমাদের মনে হয়, আয়ুর্বেদকে যদি আবার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তবে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণকে সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে গ্রহণশীল হতে হবে কিন্তু তাঁরা যেন ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূল নীতি বা নিজস্ব ধারা বিসর্জন না দেন কেননা, তা হলে আয়ুর্বেদেরই অপমৃত্যু ঘটবে।

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন
কলিকাতা-১৬

বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর এবং লেখকরা

এই শরতে রুশ বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর পূর্তির স্মারক উৎসব হবে যথেষ্ট আড়ম্বরের সংগে। সার্থক বিপ্লবের পর পঞ্চাশ বছর পার হওয়া এবং দেশের বিপুল উন্নতি—সুতরাং এই উৎসব রাশিয়ার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উৎসবে লেখকদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। রুশ নেতারা আশা করেন, দেশের সমস্ত লেখক এতে সহযোগিতা করবেন এবং এই সময় নতুন কোনো আন্দোলনের ধুয়ো তুলবেন না।

কিন্তু লেখকদের মধ্যে খুব একটা উৎসাহ এখনো দেখা যাচ্ছে না। সাহিত্য সম্পর্কে সরকারী মনোভাবের বিরুদ্ধে অসন্তোষ নানা ধরনের লেখকদের মধ্যে ক্রমশ বাড়ছে। বিপ্লবের প্রধান ফসল স্বাধীনতা। লেখকরাও স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, কিন্তু রাশিয়ার নিষ্ঠুর সেনসরশীপ লেখকদের এখনো সেই স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ এনে দেয়নি।

বিদ্রোহের সুর আবার চড়া ভাবে তুলেছেন তরুণ কবি আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি। মাস দু' এক আগে, নিউ ইয়র্কে লিনকন সেণ্টার সামার ফেস্টিভ্যালে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তিনি। সেই আমন্ত্রণের জবাব তিনি দিতে পারেন নি, দিয়েছিল সোভিয়েট লেখক সংঘের কর্তৃপক্ষ। সোভিয়েট লেখক সংঘ জানিয়ে দিয়েছিল, ভজনেসেনস্কি যেতে পারবেন না, কারণ তিনি 'অসুস্থ'। অসুস্থ? ভজনেসেনস্কি অবাক হয়েছিলেন, 'আমার নিজের অসুখ অথচ আমি নিজে জানি না?' ঠিক সেই সময়েই তিনি রাশিয়ায় নানা প্রকাশ্য জনসভায় কবিতা পাঠ ও বক্তৃতা করছিলেন। সুতরাং, সোভিয়েট লেখক সংঘের এই অদ্ভুত ব্যবহারের প্রতিবাদে ভজনেসেনস্কি 'প্রাভদা' পত্রিকার সম্পাদকের কাছে এক ক্রুদ্ধ চিঠি পাঠিয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য, সে চিঠি ছাপা হয়নি, চেপে রাখা হয়। কিন্তু পক্ষকাল আগে, আঁটসাঁট বিধিনিষেধের কর্তৃপক্ষকে হতচকিত করে দিয়ে, সেই চিঠির পূর্ণ বয়ান ছাপা হয় ফরাসী দেশের 'ল্য মদ' পত্রিকায়।

'আমি একজন সোভিয়েট লেখক, একজন রক্ত মাংসের মানুষ, সুতোয় বাঁধা নাচের পুতুল নয়!' সোভিয়েট লেখক সংঘের বিরুদ্ধে এই প্রচণ্ড অভিযোগ এনেছেন তিনি। তাঁর কণ্ঠ ঘৃণা ও অভিমানে ভরপুর। "এ শুধু আমার একার ব্যাপার নয়, কিন্তু বহির্বিশ্বে সমগ্র সোভিয়েট সাহিত্যের পরিচয় ও সম্মানও এর সংগে জড়িত। আর কতকাল আমরা নিজেদের কাদার মধ্য দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবো? আর কতকাল সোভিয়েট লেখক সংঘ এই ধরনের ব্যবহার চালিয়ে যাবে?...আমাদের এলাকাটা মিথ্যে দিয়ে এখনো ঘেরা—মিথ্যে, মিথ্যে, অভদ্র ব্যবহার এবং মিথ্যে!"

ভজনেসেনস্কি এখানেই থামেন নি। তাঁর প্রতি অত্যাচারও থামেনি। মস্কোর টাগাংকা থিয়েটারে ভজনেসেনস্কির নাটক "অ্যানটি-ওয়ার্লডস" অভিনীত হচ্ছিল। দ্বিশততম অভিনয়ের শেষে, তখনও দর্শকরা আসন ছেড়ে ওঠেনি, একজন অভিনেতা পাদপ্রদীপের সামনে এসে জানালেন, "সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ২০০ বার চেষ্টা করেছেন এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করতে, আমরা শুধু ২০০ বারই তার প্রতিরোধ করেছি। দর্শকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যিনি সন্দেহ করেন - দু' হাজার রাত আমরা এই অভিনয় চালাতে পারবো না?" একজন দর্শকও সন্দেহ প্রকাশ করেননি। তারপর এলেন নাট্যকার স্বয়ং, অজস্র হাততালি তাঁকে অভিনন্দন জানালো।

সেখানে ভজনেসেনস্কি তাঁর লেখা নতুন কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনালেন। এই কবিতাগুলিতেও তাঁর সাম্প্রতিক রাগ এবং সেনসরশীপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ফুটে বেরুচ্ছে। একটি কবিতার কয়েকটি লাইন এইরকম:

'...যেমনভাবে অ্যাপেনডিক্স অপারেশন হয়
তেমনভাবে ওরা আমাদের
লাজলজ্জার অনুভূতি কেটে নিচ্ছে
কি নির্লজ্জভাবে আমরা আজও
মুখ বুজে আছি
অথবা, বড় জোর বিড়বিড় বা গুঞ্জন করছি—
আমি একদিন নিজে যা লিখেছিলাম
তার জন্য আমার লজ্জা হয়।'

সোভিয়েট কর্তৃপক্ষও যে এসব অভিযোগ মুখ বুজে সহ্য করলেন না, তাও জানা কথা। কিছু আগে, অপর ক্রুদ্ধ কবি ইয়েফটুশেংকো যখন খুব তোলপাড় তুলেছিলেন, তাঁকে তখন ধমকে দেওয়া হয়। তারপর থেকে ইয়েফটুশেংকো বেশ খানিকটা চুপ মেরে গেছেন। সোভিয়েট লেখক সংঘ ভজনেসেনস্কি-কেও ডেকে পাঠিয়ে প্রকাশ্যে তাঁর সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করতে বলেছিলেন। যতদূর জানা গেছে, ভজনেসেনস্কি তা মানেন নি, বরং অভিযোগের পুনরুক্তি করেছেন। ফলে, তাঁকে সোভিয়েট লেখক সংঘের সদস্যপদ থেকে বিচ্যুত করার ভয় দেখানো হয়েছে। এই হুমকির গুরুত্ব অনেকখানি। এটা কার্যকর হলে, রাশিয়ায় ভজনেসেনস্কির কবিতা ছাপাই বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু ততদূর বোধ হয় কর্তৃপক্ষ এগোবেন না। কারণ, প্রতিবাদ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। কিছুদিন আগে, ঔপন্যাসিক আলেকসান্দর সোলঝেনিতসিন ('ইভান দেনিসোভিচের জীবনের একদিন' বইটির লেখক—বাংলায় এই বইটি অনুবাদ করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়)—সরকারী সেনসরশীপ প্রথার বিরুদ্ধে এক কড়া চিঠি ছাপিয়েছেন। ড্যানিয়েল এবং সিনিয়াভস্কি নামে যে দুজন লেখক দেশদ্রোহের অভিযোগে কারারুদ্ধ হয়েছেন—বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁদের মুক্তি দেবার জন্যও দাবি জানিয়েছেন বহু সাহিত্যিক।

সেনসরশীপের বিরুদ্ধে রুশ লেখকদের এই প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে যথাযথ সময়ে। কারণ, মহান বিপ্লবের অর্ধশতাব্দী স্মারক হিসাবে রুশ কর্তৃপক্ষ অনেকগুলি সাহিত্য অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছেন অকটোবর মাসে। তার মধ্যে আছে মস্কোয় আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব, সোভিয়েট ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির লেখক সভা, সোভিয়েট ও চেকোশ্লোভাক নাট্যকারদের সম্মেলন—এ ছাড়া আফ্রিকা-এশিয়ার লেখকদের আহ্বান করেও কয়েকটি বিশেষ সাহিত্য অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা আছে। এই সব অনুষ্ঠানে সোভিয়েটের সর্বস্তরের লেখকরা যদি যোগ না দেন—তবে তা রাশিয়ার পক্ষে গৌরব হানিকর হবে বিশ্বের চোখে। এখনও লেখকদের মনোভাব এ সম্পর্কে বেশ উদাসীন ধরনের। সুতরাং, বিপ্লব-স্মরণী উৎসব সফল করার জন্য, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ হয়তো সেনসরশীপ প্রথার কড়াকড়ি হ্রাস করে লেখকদের খানিকটা স্বাধীন ও উৎফুল্ল করার চেষ্টা করবেন।

সনাতন পাঠক

বিবিধ

তারা পীঠের সাধক—ভবেশ দত্ত প্রণীত। ভোলানাথ প্রকাশনী, ৩৭।১১ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

তারা পীঠের সিদ্ধ সাধক বামাক্ষেপার সম্বন্ধে আলোচনা। জীবনী নহে, সিদ্ধ সাধকের জীবনের কতকগুলি ঘটনা অবলম্বনে ভক্তিসম্পৃক্ত শ্রদ্ধার প্রণতি বা স্তুতি। গ্রন্থকারের অনুধ্যানের সার কথাটি হইল প্রপত্তি বা শরণাগতি। বামাক্ষেপার জীবনের আলোচনায় সাধক চিত্তের এই শরণাগতি বা প্রপত্তিতে মায়ের সন্তান মাধুর্য প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, সিদ্ধ সাধকের মনোবিশ্বাসে মায়ের লীলা চাতুর্য অলৌকিক রূপের বিলাস-বৈচিত্র্য উন্মুক্ত হইয়াছে। ভক্ত রস-পিপাসু ব্যক্তিরা পুস্তকখানি পাঠে উপকৃত হইবেন এবং আনন্দ পাইবেন।

পত্রিকা

আন্তর্জাতিক আঙ্গিক। সম্পাদক রাণা সরকার। আন্তর্জাতিক আঙ্গিক সোসাইটি : ১২০ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬। দাম ৭৫ পয়সা।

চলচ্চিত্র আজ যাঁদের কাছে শুধুই রূপ-কথার দেশ বা চিত্তবিনোদনের মাধ্যম নয়, জীবনের একটি অঙ্গ—যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা-অনুশীলন চলে, তাঁদের কাছে "আন্তর্জাতিক আঙ্গিক"-এর এই সংখ্যাটি আদরণীয় হবে। সংখ্যাটিতে একাধিক চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ আছে যাতে চলচ্চিত্রের স্বরূপ ও শিল্পগত ভূমিকা বিশ্লেষিত। সত্যজিৎ রায়ের একটি ইংরেজী রচনার বাংলা অনুবাদ "অগ্নিগর্ভ প্রশান্তি" এর বিশেষ আকর্ষণ। তা-ছাড়া বিমল মিত্র, ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রবন্ধ খুবই সুপাঠ্য কবিতা এবং ইংরেজী রচনাও সংখ্যাটিতে আছে। বার্গম্যান সম্বন্ধে একটি লেখা সুচিন্তিত।

দর্শক (১৫ আগস্ট, ১৯৬৭)। সম্পাদক: রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ০·৫০ পয়সা।

এবারের স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশিত সংখ্যাখানি 'চলচ্চিত্র বিশেষ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত হয়েছে। শিল্পকলা বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব সমন্বিত নিবন্ধ প্রকাশ করে পত্রিকাখানি নিজস্ব যে একটা ঐতিহ্য গড়ে নিতে সক্ষম হয়েছে—আলোচ্য সংখ্যাখানিতে তা বজায় আছে। চলচ্চিত্র বিষয়ে চিন্তাশীল পাঠক এ সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রামাণ্য চিত্রের কুড়ি বছর', 'চলচ্চিত্রের ভাষা', চ্যাপলিনের 'কমেডি আমার মুক্তি', 'ফিল্ম সংরক্ষণালয়', 'চিত্রকলা ও চলচ্চিত্র', 'ফরাসী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নূতন সৃষ্টি' নিবন্ধগুলি পাঠে বহু তথ্য আহরণে সক্ষম হবেন।

অনুষ্টুপ (১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)। সম্পাদক: অনিল আচার্য। ১৫৭, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭। মূল্য ১·০০।

কবিতা ও কবিতা বিষয়ক আলোচনা সমন্বিত এই বিশেষ সংখ্যাখানি কাব্যরসিকদের ভাল লাগবে। এই সংখ্যার জন্য বিশেষভাবে কবিতা যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিষ্ণু দে, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মনীন্দ্র রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, রাজলক্ষ্মী দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শংকর চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সুনীল বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, আলোক সরকার এবং এখনকার নামকরা ও উঠতি বহু কবি। 'আধুনিক কবিতার রূপকল্প', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'উটপাখী', 'হারানো অর্কিড প্রসঙ্গ' বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন যথাক্রমে শান্তিকুমার ঘোষ, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও প্রণবেন্দু দাসগুপ্ত।

প্রাপ্তি স্বীকার

নারী রহস্যময়ী। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী : ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৫·০০।

ছোটদের ভৌতিক গল্প। সম্পাদনা : গীতা দাশ। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী: ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·৫০।

অরণ্যদেব ✫ লী ফক

ক্যাপিটল ফিল্মস-এর "দুরন্ত চড়াই" (পরিচালনা : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়) ছবিতে অনুপকুমার ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

সর্বত্র তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে) বোম্বাইয়ে এসে নিজের একমাত্র কন্যার (রাজশ্রী) জন্য পাত্র (রাজ কাপুর) নির্বাচন করে যান। এবং ভাবী জামাতাকে বিদেশে যাবার আমন্ত্রণ জানান। নায়ক প্রথম যায় টোকিওতে, তারপর হনলুলু এবং সেখান থেকেই নানা ঘটনাচক্রে তার দুনিয়া-সফর। নায়ক শেষ পর্যন্ত জানতে পেরেছে তার হয়রানির মূলে ওই কোটিপতিরই কুচক্রী কর্মচারী, যার নজর নায়িকার উপর। পরিণামে যথাবিহিত খলনায়কের পতন এবং নায়ক-নায়িকার মিলন। নায়ক কীভাবে বেহায়ার মত নায়িকার প্রেমলাভের জন্য কসরৎ করে তা অবশ্য হিন্দীচিত্রের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী বিন্যস্ত। ক্রাইম ও প্রেমের হিন্দীছবি যেমন জমজমাট হয় এ-ছবি তা-ও নয়। থাকবার মধ্যে এতে আছে নানা দেশের নাচ গান ও সুন্দর দৃশ্য। এই দেখে যাঁদের আনন্দ তাঁদের কাছে "অ্যারাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড"-এর আকর্ষণ থাকতে পারে।

শংকর-জয়কিষণ সুরারোপিত গান বিদেশের নানা জায়গায় নায়ক-নায়িকার মুখে ধ্বনিত।

"শেকসপীয়ারওয়ালা" এ সপ্তাহে

মার্চেন্ট-আইভরি প্রোডাকশন-এর "শেকস্পীয়ারওয়ালা" এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। জেমস আইভরি ছবিটি পরিচালনা করেছেন। ভারতে সফররত বিলাতের এক ভ্রাম্যমাণ শেক্সপীয়ার নাট্যদলকে ঘিরে ছবির কাহিনী (রচনা : আর পি ঝাভাওয়ালা)। ইতিপূর্বে ভারতীয় প্রযোজক ইসমাইল মার্চেন্ট ও পরিচালক জেমস আইভরির "হাউস-হোল্ডার" ছবি দেশ-বিদেশের দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। "শেক্সপীয়ারওয়ালা" তাঁদের দ্বিতীয় ইংরেজী ছবি। এর সংগীত পরিচালনা করেছেন সত্যজিৎ রায়। আলোকচিত্রগ্রহণে রয়েছেন সুব্রত মিত্র। ছবির শিল্পী মধুর জাফরে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে অভিনয়ের পুরস্কার লাভের পর ছবিটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে। এর বিভিন্ন প্রধান চরিত্রের শিল্পী শশী কাপুর, ফেলিসিটি কেন্ডেল, জেনিফার কাপুর, উৎপল দত্ত প্রভৃতি।

অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত "বিবাহ বিভ্রাট" ছবিতে অনুপকুমার ও লিলি চক্রবর্তী

সত্যজিৎ রায়ের 'চিড়িয়াখানা' ছবিতে উত্তমকুমার ও কণিকা মজুমদার
ফটো—দেশ

বাংলা ছবিতে রাজেন্দ্রকুমার

অভিনেত্রী প্রণতি ভট্টাচার্য "পাড়ি"-র পর প্রযোজনা করছেন "নটী বিনোদিনী"। বাংলা রঙ্গমঞ্চের বিখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনীর জীবনকাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি তৈরী হবে। এতে রাজেন্দ্রকুমার প্রধান পুরুষ-চরিত্রে অভিনয় করবেন জানা গেল।

ছবির পর ছবি

দুষ্টু প্রজাপতি

ললিত চিত্রমের "দুষ্টু প্রজাপতি"-র মুক্তি আসন্ন। বিধায়ক ভট্টাচার্যের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন শ্যাম চক্রবর্তী। কিশোর-কুমার, অনুভা, সবিতা চ্যাটার্জি, তরুণকুমার, কানু রায়, কেষ্ট মুখার্জি, পদ্মা দেবী, ভারতী দেবী প্রভৃতি ছবির বিশিষ্ট শিল্পী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিচালক।

দুরন্ত চড়াই

ক্যাপিটল ফিল্মস-এর "দুরন্ত চড়াই"-এর চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সমরেশ বসুর ওই নামের বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য তাঁরই রচনা। সংগীত পরিচালনা করছেন শ্যামল মিত্র। বিভিন্ন চরিত্রের রূপদানে রয়েছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, সোমেন চক্রবর্তী, জহর রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা চ্যাটার্জি প্রভৃতি।

নতুন ছবির মহরত

সপ্তক প্রোডাকশনস-এর প্রথম বাংলা ছবি "অসংখ্য জোনাকি"-র মহরত আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উত্তমকুমার ছবির নায়ক। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্যামল মিত্র।

বি ডি প্রোডাকশন্স-এর প্রথম প্রতিশ্রুতি-র মহরত জন্মাষ্টমীর দিন সম্পন্ন হয়েছে। রবি বসু চিত্র পরিচালক। সংগীত পরিচালনায় আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

জ্যোতি সিনেমায়
"ডিপ-কারভ স্ক্রীন"

গত শুক্রবার (২৫ আগস্ট) থেকে জ্যোতি সিনেমায় বৃহদায়তন "ডিপ-কারভ স্ক্রীন"-এ ছবি দেখানো শুরু হয়েছে। আধুনিকতম সরঞ্জামের জন্য জ্যোতি চিত্রগৃহের খ্যাতি যথেষ্ট। শব্দ-প্রক্ষেপণের চমকপ্রদ ব্যবস্থা (মালটিপল-ট্র্যাক অডিও সিস্টেম) এই সিনেমা হলে আগে থেকেই ছিল। পশ্চিমবঙ্গে ৭০ মিলিমিটারের ছবি প্রদর্শন এই হলেও প্রথম শুরু হয়। এখন এসেছে "ডিপ-কারভ স্ক্রীন"।

চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কার

১৯৬৬ সনের চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কারের জন্য (পূর্বনাম রাষ্ট্রীয় পুরস্কার) আঞ্চলিক অ্যাওয়ার্ড কমিটি এ সপ্তাহের প্রথম ভাগে ছবি দেখা শেষ করেছেন। মোট নয়টি ছবি তাঁরা দেখেছেন। তার মধ্যে বাংলা ছবি ছয়টি, ওড়িয়া দুটি এবং অসমীয়া একটি। ছয়টি বাংলা ছবি হল : ছুটি, নায়ক, বালিকা বধূ, গল্প হলেও সত্যি, সুভাষচন্দ্র এবং কাল তুমি আলেয়া। দুটি ওড়িয়া ছবির মধ্যে একটি মৃণাল সেন-কৃত "মাটির মনিষ"। ভূপেন হাজারিকার "লটি-ঘটি" একমাত্র অসমীয়া চিত্র।

সোভিয়েট চিত্রের আমদানি

ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স এক্সপোর্ট করপোরেশন এবং সোভেক্সপোর্টফিল্ম-এর মধ্যে চলচ্চিত্র আদান-প্রদানের যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেই অনুযায়ী ২০টি কাহিনীচিত্র, ২০টি তথ্যচিত্র ও ২০টি কার্টুন চিত্র বর্তমান ইংরেজী বছর শেষ হবার আগে ভারতে আমদানি করা হবে।

যে ছবিগুলি ভারতে আসছে তার মধ্যে স্লিপিং বিউটি, সিক্রেট অব সাকসেস, নো ওয়ান ওয়ান্টেড টু ডাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনের সুবিধা থাকলে "ওয়ার অ্যান্ড পিস" ছবিটিও আমদানি করা যেতে পারে।

সোভেক্সপোর্টফিল্ম-এর প্রতিনিধি বলেছেন, অচিরেই ভারতের প্রধান শহরগুলিতে সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজনের ইচ্ছা

গীতছন্দম-এর 'হংসমিথুন' (পরিচালনা : পার্থপ্রতিম চৌধুরী) ছবিতে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেন

ফটো—দেশ

তাঁদের আছে। ভারতের স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে রাশিয়ার প্রধান শহরগুলিতে সম্প্রতি ভারতীয় চিত্রের উৎসবের ব্যবস্থা হয়েছিল।

সংবাদ-কণা

ভারতভূষণ আবার সিনেমায় নিয়মিত অভিনয় শুরু করেছেন। কেবল পি কাপুরের "বিশ্বাস" হিন্দী চিত্রে তিনি কামিনী কৌশলের স্বামী সেজেছেন। এই ছবির নায়িকা অপর্ণা সেন (অপর্ণা দাশগুপ্ত)। নায়ক জিতেন্দ্র। সংবাদে প্রকাশ, ভারতভূষণ জরাসন্ধর "ন্যায়দণ্ড"-র হিন্দী চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন। এবং এতে কলকাতার একজন নাম-করা অভিনেত্রীকে দেখা যাবে।

পরলোকে পল মুনি

বিশ্ববিখ্যাত চিত্রাভিনেতা পল মুনি গত ২৫ আগস্ট কিছুকাল রোগভোগের পর পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে শিল্পীর বয়স হয়েছিল ৭১। অস্ট্রিয়াতে তাঁর জন্ম। কিন্তু ১৯১২ সনে তিনি আমেরিকার নাগরিক হন।

বহু জীবনীচিত্রের নাম-ভূমিকায় তাঁর অসাধারণ অভিনয় দর্শকদের চিরকাল মনে থাকবে। "লুই পাস্তুর"-এ অভিনয়ের জন্য তিনি অস্কার লাভ করেন। "গুড আর্থ"-এর পল মুনিকেও ভোলা যায় না। তাঁর অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে দি লাইফ অব এমিল জোলা", "এ সং টু রিমেমবার" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

"অম্বিতীয়া" : মাধবী মুখোপাধ্যায়

ফিল্ম সেন্সর

কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ড ১৯৬৬ সনে ২,৬১৬টি ছবি দেখেন। তার মধ্যে ৫০টি ছবি পুনর্বিবেচনার জন্য "রিভাইসিং কমিটি"-র নিকট পাঠানো হয়। বিদেশী ছবির ক্ষেত্রে সর্বজনীন প্রদর্শনের জন্য ১,২৫১টি ছবিকে 'ইউ' সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। প্রাপ্তবয়স্কের জন্য চিহ্নিত হয় ১৭৫টি ছবি। ভারতীয় চিত্রের মধ্যে ১,৯৫১টি ছবি সর্বজনীন প্রদর্শনীর সার্টিফিকেট পায়। প্রাপ্তবয়স্কের জন্য সার্টিফিকেট দেওয়া হয় ১৩টি ছবিকে। ৩৬টি বিদেশী ছবি ও ২টি ভারতীয় চিত্র সার্টিফিকেট পায় নি। ২৮৪টি ছবি প্রধানত শিক্ষামূলক বলে বোর্ড অভিমত প্রকাশ করেন।

দশ বছর আগে সেন্সর করা হয়েছিল এমন ৪১৪টি ছবিকে নতুন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। তার মধ্যে ১১টি প্রাপ্তবয়স্কের জন্য চিহ্নিত হয়।

সেন্সর বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পাঁচটি কাহিনীচিত্রের ক্ষেত্রে সরকারের নিকট আপিল করা হয়। তার মধ্যে একটি ছবির ক্ষেত্রে আর্জি মঞ্জুর হয়।

১৯৬৬ সনে ৩১৮টি ভারতীয় কাহিনী-চিত্রকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। হিন্দী—৯৮, ভোজপুরী—২, উর্দু—৮, ডোগরি—১, নেপালী—১, মারাঠী—১২, পাঞ্জাবী—৪, তামিল—৬০, তেলুগু—৪১, কানাড়া—২১, মালয়ালম—৩২, বাংলা—৩১, অসমীয়া—২, ওড়িয়া—২, সিন্ধী—১, এবং গুজরাটী—২।
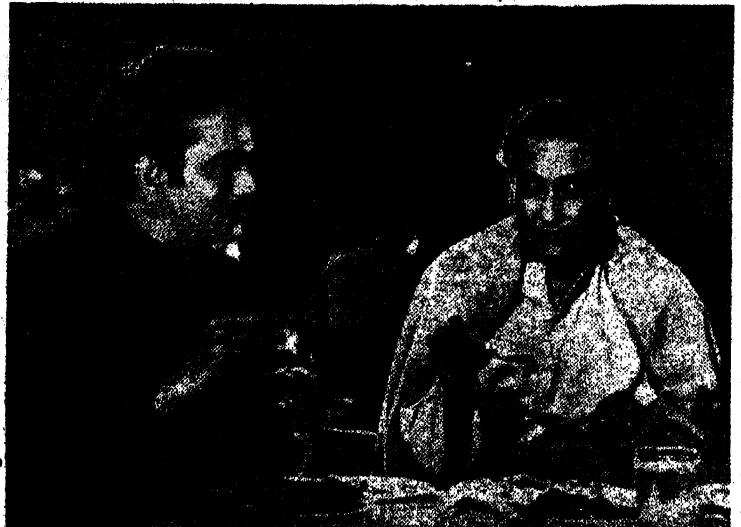
ফিল্ম ইনস্টিটিউট

১৯৬৬ সনের ১লা জুলাই পুণার ফিল্ম ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ায় ষষ্ঠ শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও দিল্লিতে প্রাথমিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ৫৬জন ছাত্র ভর্তি করানো হয়। ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন কোর্সে মোট ৭০জন ছাত্রের সীটের ব্যবস্থা আছে। প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে বারোজন বিদেশী ছাত্র শিক্ষালাভ করছেন।

আলোচ্য বছরে ছাত্ররা ২০টি ছবি তৈরি করেন। শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয়ের স্টাফ "সেলফ পোরট্রেইট" নামে একটি ছবি তৈরি করেন। সেটি এবং দুটি ডিপ্লোমা ফিল্ম সিনেমা হলে প্রদর্শনীর জন্য ফিল্ম অ্যাডভাইসরি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

ফিল্ম আরকাইভ

ন্যাশনাল ফিল্ম আরকাইভ-এ মোট ৫৮টি ভারতীয় কাহিনীচিত্র এবং ব্রিটিশ সরকারের সেন্ট্রাল অফিস অব ইনফরমেশন থেকে যুদ্ধের সময়ের ভারতীয় নিউজ-রীল ও তথ্যচিত্রের ৫৭টি 'টাইটেল' সংগৃহীত। তা ছাড়া ফিল্ম ইনডাস্ট্রির কাছ থেকে বিনা "রয়েলটি"-তে পুরনো ছবির "মাস্টার প্রোজিটিভ প্রিন্ট" নেওয়ার অনুমতি পেয়েছেন আরকাইভ। ফলে আরকাইভে প্রমথেশ বড়ুয়া, হিমাংশু রায়, দেবকী বসু, নীতিন বসু, ভি শান্তারাম প্রভৃতি চলচ্চিত্রকারের ছবি রাখায় সুবিধা হয়েছে।

তপন সিংহ পরিচালিত "হাটে-বাজারে" ছবিতে অভিনয়রত বৈজয়ন্তীমালা ও অশোক-কুমার ফটো—দেশ

"ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ফিল্মোগ্রাফি" সংকলনের পরিকল্পনা আরকাইভের আছে। দুটি খণ্ডে তা প্রকাশ করা হবে। একটিতে থাকবে নির্বাক যুগের সকল ছবির পরিচয়, অপরটিতে সবাক যুগের ছবির সম্পর্কে বৃত্তান্ত। কাহিনীচিত্র ও তথ্যচিত্রের অব্যবসায়িক প্রদর্শনীর অনুমতি আরকাইভ পেয়েছেন। এর ফলে আরকাইভের "ডিস্ট্রিবিউশন লাইব্রেরি" পরিকল্পনার ভিত্তি গড়ে উঠবে।

চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি

দি চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি সাতটি ছবি তৈরি করেছেন। ছবিগুলি হল : জ্যায়েন্ট কো ভেইসা, (রঙিন কার্টুনচিত্র), অনমল মোতি (পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র), শরারত (অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি), আকবর (রঙিন কাহিনীচিত্র), বাঁদর সেরা সাথী, কার্তিক, এবং চঞ্চল কা সপনা। তৈরি হচ্ছে "জবাব আয়েগা", "একধানিকা", "ইচ্ছাপূরণ", "রো অ্যান্ড দি স্নেক" ও "বেলারডুটেড"।

৩৫ মিলিমিটারে সোসাইটির ছবির ৫১৩টি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারা ভারতে ১৯৬৬ সনে নভেম্বরে সোসাইটি "চিলড্রেন্স ফিল্ম উইক"-এর আয়োজন করেন। উৎসবে উল্লেখযোগ্য বিদেশী শিশু-চিত্র দেখানো হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

অভিনেত্রী কিম নোভাক গত বছর আগস্ট মাসে মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন।

সরস্বতী ফিল্ম-এর "রক্তরেখা" (পরিচালনা : উমাপ্রসাদ মৈত্র) ছবিতে ললিতা চ্যাটার্জি

তিনি নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। গাড়ির একটি চাকা হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে আসে। দুর্ঘটনার তিন দিন আগে গাড়িতে চাকা লাগানো হয়েছিল। যে টায়ার কোম্পানি চাকা লাগিয়েছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে হলিউডের অভিনেত্রী সম্প্রতি দশ লক্ষ ডলার ক্ষতি-পূরণ দাবি করে মামলা রুজু করেছেন। তাঁর অভিযোগ, চাকা লাগানোর ব্যাপারে অসাবধানতা ছিল।

ডেভিড ম্যাককালাম ও ক্যাথারিন কারপেনটার আগামী সেপ্টেম্বরে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন। তাঁদের বিয়ের পর এম-জি-এম ম্যাককালামকে মধুচন্দ্রিমার জন্য কিছু দিনের ছুটি দেবেন। শিল্পী এখন এম-জি-এম-এর একটি ছবিতে অভিনয় করছেন। এম-জি-এম-এর এই ছুটি মঞ্জুর উল্লেখযোগ্য। কারণ, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিযোগ, বিয়ের পর দিনই তাঁদের শুটিং-এ যোগ দিতে হয়।

১৯৬৫ সনের ৯ নভেম্বর রাতে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে **গ্রান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনে হঠাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহের গোলযোগের দরুন সারা অঞ্চলে অন্ধকার নেমে আসে। প্রায় বছর দুই আগের ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে** সেদিন। অবশ্য অপ্রদীপ দুর্ঘটনাজনিত নয়, সাজানো হয়েছিল। এম-জি-এম-এর "হোয়্যার ওয়্যার ইউ হোয়েন লাইটস ওয়েন্ট আউট" কমেডি ছবির শুটিং-এর জন্য। ওই দৃশ্যের জন্য পাঁচ শত এক্সট্রার দরকার হয়েছিল।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সারাদিন স্নিগ্ধ ও ঝরঝরে রাখবে···
পণ্ড্‌স
ড্রিমফ্লাওয়ার
ট্যাল্‌ক
পণ্ড্‌স ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক বাড়ির ছেলেবুড়ো সবাই বছরে বারোমাসই মাখতে পারবেন। শরীর জুড়োয়, মন তাজা রাখে···যেমন মোলায়েম, তেমনি আরামদায়ক···প্রচণ্ড গরমে, ভ্যাপসা আবহাওয়ায় ঘাম শুষে নিতে অদ্বিতীয়। পণ্ড্‌স ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যালক ব্যবহার করুন, এর মিষ্টি গন্ধ বহুক্ষণ গায়ে লেগে থাকবে···সারাদিন শরীর-মন ঝরঝরে রাখবে।
Pond's
Dreamflower talc
Dreamflower talc
সব পরিবারের পক্ষেই
সুলভ সুন্দর
সুবাসিত ট্যালক
চীজব্রো-পণ্ড্‌স ইন্‌ক
(সীমাবদ্ধ দায়ে যুক্তরাষ্ট্রে সমিতিবদ্ধ)
P-5603

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীযুধাজিৎ সেনগুপ্ত

কিং-সাইজ স্থলভ মূল্য গোলাপের গন্ধযুক্ত
আপনার জগৎকে
গোলাপী
ক'রে তুলুন
No 1
গোদরেজ নং ১
সাবান সদ্যফোটা তাজা
গোলাপী সুগন্ধের ডালি

স্থানীয় এজেন্ট:
পি. পি. অ্যাণ্ড কোম্পানী, ফ্ল্যাট নং ৬ ব্লক নং ই, ১৫, বেচুলাল রোড, কলিকাতা-১৪। ক্যাশ রসিদ এনট্রি ফরম এবং লিটকুইজ উইকলী নিন।

২২ লিটকুইজের সরকারী ভর্তি ফর্ম

ADDRESS

LITQUIZ NO. 22. ALANKAR BALARAM ST., BOMBAY-7 (WB)

দ্রষ্টব্য:—(১) প্রত্যেক কলমে, আপনার [illegible] কালি দিয়ে ক্রেটি দিন, (২) আপনি যদি [illegible] একটি কুপন পাঠান, তাহলে দ্বিতীয় কুপনটি বাতিল করে দিন, (৩) আপনি যদি মানি অর্ডারযোগে এনট্রি ফী পাঠান, তাহলে এই এনট্রি ফর্মের সঙ্গে, ডাকঘর থেকে [illegible] **অবশ্যই** পাঠাবেন। [illegible] রসিদ ছাড়া এনট্রি [illegible]। (৪) [illegible] কম করবেন না। লিটকুইজ ২২ - ২৯ সপ্তাহ - ৭ এর টিকা পাঠান।

1	Re. 1		2	Re. 1	
1	ART	RELIGION	1	ART	RELIGION
2	CREATES	EXISTS	2	CREATES	EXISTS
3	CREATIVE	IMITATIVE	3	CREATIVE	IMITATIVE
4	CULTURAL	MENTAL	4	CULTURAL	MENTAL
5	CURIOUS	RELIGIOUS	5	CURIOUS	RELIGIOUS
6	DEMOCRACY	LIBERTY	6	DEMOCRACY	LIBERTY
7	ENTITY	REALITY	7	ENTITY	REALITY
8	EQUALITY	UNITY	8	EQUALITY	UNITY
9	HELPLESSNESS	HOLLOWNESS	9	HELPLESSNESS	HOLLOWNESS
10	HUMILITY	SINCERITY	10	HUMILITY	SINCERITY
11	IDEAL	SOUL	11	IDEAL	SOUL
12	IDEALS	VALUES	12	IDEALS	VALUES
13	MORALITY	PHILOSOPHY	13	MORALITY	PHILOSOPHY
14	PENANCE	SILENCE	14	PENANCE	SILENCE
15	POLITICAL	SOCIAL	15	POLITICAL	SOCIAL
16	PROGRESS	SUCCESS	16	PROGRESS	SUCCESS
17	RACES	RULES	17	RACES	RULES

SEND THESE 2 COUPONS & ENTER MINIQUIZ FREE 22

MiniQuiz

10 Clues FREE Coupon

ART	RELIGION	IDEAL	SOUL
CREATIVE	IMITATIVE	IDEALS	VALUES
CURIOUS	RELIGIOUS	MORALITY	PHILOSOPHY
DEMOCRACY	LIBERTY	POLITICAL	SOCIAL
ENTITY	REALITY	RACES	RULES

২২
দেশ

এই লিটকুইজে যোগদান করিবার জন্য আমি নিয়ম ও সর্তাবলী পালন করিতে রাজী এবং প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার চূড়ান্ত বলিয়া ও আইনতঃ [illegible] গ্রহণ করিলাম। প্রত্যেক কুপনের জন্য ভর্তি ফী ১ টাকা। এই সঙ্গে [illegible] (২ কুপনের) জন্য ভর্তি ফী ২ টাকা। আমি [illegible]/[illegible]/লিটকুইজ [illegible] রসিদ/পোষ্টাল কার্ড ও [illegible]............পাঠাইলাম।

CAPITAL LETTERS

NAME ....

ADDRESS ....

....

এখানে কাটুন ও এই পুরো ফর্মটি পাঠান—

৩৮ লক্ষেরও বেশী টাকা পুরস্কার হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রধান বৈশিষ্ট্য

লিটকুইজ নিঃসন্দেহে সাহিত্য সম্পর্কিত ও চতুর্ভুজ প্রতিযোগিতা। লিটকুইজের উত্তর নির্ধারিত। আমাদের সংকলক এগুলি নির্ধারণে জানেন নাই। এগুলি তিনি বদলাইতেও পারেন না। এগুলি ঠিক করার জন্য কোন সালিশী কমিটি নাই। ক্লুগুলিতে ব্যবহৃত শব্দই প্রত্যেকটি সমাধানের সঠিক উত্তর। কাজেই, লিটকুইজে সাফল্য ভাগ্যের উপর নির্ভর করে না। আপনার দক্ষতা, জ্ঞান, চেতনা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করুন, আপনিও নিশ্চিত সাফল্য লাভ করিবেন।

বন্ধের শেষ তারিখ

ডাকযোগে সকল প্রবেশপত্র : ২১-৯-৬০

ভারতজ্যোতিতে সমাধান : ২৫-৯-৬৭

আপনি আপনার প্রবেশপত্র পাঠাইতে পারেন বুধবার, ২০-৯-৬৭ তারিখে, কিন্তু উহা **এক্সপ্রেস ডেলিভারীতে** পাঠান।

সমাধান ফেরৎ পাইবার জন্য আপনার প্রবেশপত্রের সঙ্গে ঠিকানা লিখিত ৬ পয়সার পোষ্টকার্ড দিবেন।

১ টাকা পাঠান এবং **লিটকুইজ উইকলির** ফ্রি সংখ্যা লাভ করুন।

17 CLUES

1. It is a sad commentary on our present system of education that **Art/Religion** has either no place or plays a very minor role in our general education.
2. For us, to question why the absolute **Creates/Exists** is as meaningless as to question why the world is as it is.
3. We are **Creative/Imitative** by nature.
4. The history of civilisation shows that even **Cultural/Mental and** [illegible] development rests on a material basis and presupposes economic activity and progress.
5. The more the scientists gain knowledge about the expanding universe the more they are filled with wonder and appreciation about the universe and the more **Curious/Religious** they become.
6. **Democracy/Liberty** does not believe in suppression of thought.
7. What science does is to see and observe but the **Entity/Reality** remains unknown.
8. The spirit of the **age is** in favour of **Equality/Unity,** though practice denies it almost everywhere.
9. If you will **analyse** your own life you will find its utter **Helplessness/Hollowness.**
10. **Humility/Sincerity** especially is indispensable to the spiritual endeavour and crookedness a constant obstacle.
11. Space divides, but the **Ideal/Soul** unites!
12. The essence of all **existence** is evolution or a constant realisation of new **Ideals/Values.**
13. If there were no thinking beings in the world, there would be no **Morality/Philosophy.**
14. Sages always **glorify** the power of **Penance/Silence,** too difficult to be appreciated by the westerner.
15. Discords, both economic and **Political/Social,** can end only if the importance of Ethics is recognised and practised by the people.
16. Holy men, even **more** than famous captains, **discoverers** or inventors, show us the way to the **Progress/Success** that matters.
17. No people, no **Races/Rules** remain unchanged.

দ্রষ্টব্য:—[illegible] [illegible] থেকে [illegible] একটি [illegible]। এগুলি সব [illegible] ও [illegible] সম্পূর্ণ [illegible]। [illegible]/[illegible] [illegible] ও [illegible] সরকারীভাবে [illegible] **সাপ্তাহিক লিটকুইজ** উইকলিতে প্রকাশ করা হবে।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৫
শনিবার ২৩ ভাদ্র ১৩৭৪

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
*
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
*
টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১
*
চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক ,,	১৪.০০
ত্রৈমাসিক ,,	৭.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক ,,	১৪.০০
ত্রৈমাসিক ,,	৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪৬.০০
ষাণ্মাসিক ,,	২৩.০০
ত্রৈমাসিক ,,	১১.৫০

আন্দামান-অঞ্চলে
(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১.০০
ষাণ্মাসিক	১৬.০০
ত্রৈমাসিক	৮.০০

*
দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাসুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা
*
DESH

Saturday, 9 Sept., 1967

ভাষা ও জাতীয় সংহতি

হিন্দীভাষী অঞ্চলে ইংরেজী ভাষাটাকে নাককান-কাটা করে তাড়াবার জন্যে প্রচুর উৎসাহ দেখা দিয়েছে। বিহারের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে হিন্দীকে প্রায় অপদস্থ করে তাড়ানোর ব্যবস্থা হল। তার দেখাদেখি উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের স্কুল কলেজেও ইংরেজীর যাই যাই অবস্থা। শোনা যাচ্ছে, স্কুলের শেষ পরীক্ষায় ইংরেজীতে পাস করার আর কোনো প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষা। অর্থাৎ হিন্দীভাষী রাজ্যগুলিতে ইংরেজীর কোনো গুরুত্ব স্বীকার করা তো হচ্ছেই না, উপরন্তু মনোভাবের দিক থেকে একটি বিদ্বেষকে প্রকারান্তরে উগ্র করে তোলা হচ্ছে। এ কাজটি করছেন কারা? বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা, না রাজনীতিকরা? বলা বাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষার ব্যাপারে যাঁদের গরজ তাঁরা ঠিক এভাবে ইংরেজী-বর্জনের পক্ষে নয়, এর সমর্থন রয়েছে রাজনীতিকদের মধ্যেই, হিন্দীভাষী রাজনীতিক অবশ্য।

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারী হিন্দীভাষীদের এরকম কাণ্ডজ্ঞানহীনতা দেখে একটি প্রশ্ন তুলেছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তো বটেই, এমন কি শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপারে বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ রাজাজীর একটি মর্যাদা আছে। তাঁর কথা উপেক্ষা করার মতন নয়। রাজাজী যা বলতে চেয়েছেন, সোজা কথায় তা হল: ইংরেজীকে ছেঁটে ফেললে আমাদের জাতীয় সংহতিও ভেঙে পড়বে।

জাতীয় সংহতি, জাতীয় ঐক্য—এই ধরনের কথাগুলি যে আমরা হামেশাই বলে থাকি তাতে সন্দেহ নেই। যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁদের মুখে সর্বদাই কথাগুলো শোনা যায়। হিন্দীভাষী রাজনীতিকরা তো আরও আবেগের সঙ্গে কথাটি ঘোষণা করে থাকেন। এবং তাঁরা প্রকাশ্যেই বলতে চান, হিন্দী ভাষাকে সাধারণের লিঙ্ক ও একমাত্র সরকারী ভাষা করা হলে আমাদের জাতীয় সংহতি অনিবার্য হবে। দুঃখের বিষয় তাঁদের কথাবার্তা স্বার্থগন্ধময়।

রাজাজী যে যুক্তি দেখিয়েছেন আমরা তা সমর্থন করি। তাঁর মতে, ইংরেজীকে বিদায় দিয়ে আঞ্চলিক ভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করলে দেশের বিদ্বৎসমাজ নানা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। কথাটা বাহুল্য মাত্র নয়। বাস্তবিকই এদেশের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার সুযোগ ও সুবিধা স্বল্প। যদি এমন হয়, শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা কেবল আঞ্চলিক ভাষাতেই করা হচ্ছে তা হলে দক্ষিণের একজন উদ্ভিদবিদ আর বাংলা দেশের এক উদ্ভিদবিদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটা প্রায় অসম্ভব হবে। অঞ্চল বিশেষে এক একটি আঞ্চলিক বিদ্বৎসমাজ গড়ে উঠবে এবং সেই আঞ্চলিক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য আঞ্চলিক গোষ্ঠীর যোগাযোগ থাকবে না। আঞ্চলিক সাহিত্য সৃষ্টির বেলায় এমনটি যে হয় তা আমরা দেখছি; কিন্তু আঞ্চলিক সাহিত্য সৃষ্টি হল 'মনের ভাষা'-র, তাকে 'কাজের ভাষা' হতে হয় না। শিক্ষিতসমাজ দেশের সর্বত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে আলোক ছড়াবেন, সে-আলোক স্বতন্ত্র, প্রকৃতপক্ষে সে দায়িত্ব হবে দেশের মধ্যে জ্ঞানচর্চার স্রোতকে স্বচ্ছন্দ ও উন্নত করা। যদি এমন হয় যে, চোদ্দটি ভারতীয় ভাষায় চোদ্দটি বিদ্বৎসমাজ গঠিত হয়েছে, এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান বিনিময়ের কোনো সুযোগ নেই, তবে এই সমাজগুলিই শুধু মরবে না, সাথে সাথে ভারতীয় জীবন থেকে উন্নত মানের জ্ঞানচর্চারও বিনাশ ঘটবে। আর এই ধরনের আঞ্চলিক, খণ্ডিত গোষ্ঠী সৃষ্টি হতে হতে জাতীয় সংহতির কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

একটা সাধারণ কথা আমরা বুঝি না। পৃথিবীর সব দেশেই দেখা গেছে, জ্ঞানচর্চা যাঁদের ব্রত হয় বা পেশা হয় তাঁরা মাতৃভাষা বাদেও অন্যান্য ভাষা সযত্নে শিক্ষা করেন। করার উদ্দেশ্য, অন্য দেশের, অন্য জাতির মনন ও জ্ঞানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। এই যোগাযোগ আজকের জগতে কত প্রয়োজনীয় তা সকলেই জানেন। এ দেশের জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীরাও এই অভ্যাস পালন করেন। কিন্তু সাধারণভাবে আমাদের দেশে নিশ্চয় এমন একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটি যোগাযোগ থাকে। সেই ব্যবস্থাটি নিশ্চয় ইংরেজী ভাষা হবে। ইংরেজীর মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের মধ্যে যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করা যাবে তা অন্যভাবে হবার নয়। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হোক তাতে কারও আপত্তি নেই, কিন্তু এই মাতৃভাষাকে এ-কালের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উপযুক্ত হতে হবে, এবং ইংরেজীকে রাখতে হবে পারস্পরিক যোগাযোগের জন্যে, বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যেও। আমরা ইংরেজীকে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে বিদায় দিতে পারি না।

ভিয়েতনাম-মঙ্গল

দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল ভ্যান থিউ গত রবিবার সাধারণ নির্বাচনে দশজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে হারিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামে গণতান্ত্রিক শাসনের এই প্রথম হাতে-খড়ি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসন আগেই জানিয়ে রেখেছেন, দক্ষিণ ভিয়েতনামে গণতন্ত্রের এই প্রথম পাঠে দোষত্রুটি খুঁত থাকলেও, সেগুলি ধর্তব্য নয়; একে নতুন স্বাধীন দেশ তায় যুদ্ধে লিপ্ত, ভিয়েৎকং গেরিলাদের উৎপাত—এমন অবস্থায় নাবালককে নিয়ে এক লাফে গণতান্ত্রিক সাফল্যের চূড়ায় ওঠা যায় না, সে-রকম আশা করা অন্যায়। কথাটা অযৌক্তিক নয়; এখন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জেনারেল ভ্যান থিউ আর তাঁর উপরাষ্ট্রপতি আকাশ মার্শাল কাও কী ঠিকমত চালাতে পারলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভাবনা কী? জরুরী ভাবনা অবশ্য ভিয়েৎকং গেরিলাদের নিশ্চিহ্ন অথবা নিষ্ক্রিয় করা। রাষ্ট্রপতি ভ্যান থিউ আর তাঁর উপরাষ্ট্রপতি দুজনেই শক্তসামর্থ অভিজ্ঞ, স্বাধীন দুনিয়ার আদর্শে নিষ্ঠাবান। জেনারেল ভ্যান থিউ নাকি ছিলেন ইন্দোচীনে ফরাসী সৈন্য বাহিনীর সুদক্ষ অফিসার, ফরাসীরা বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত তিনি তাদের পক্ষেই লড়াই করেছেন, এটা নিয়মনিষ্ঠা এবং কর্তব্যপরায়ণতার প্রশংসনীয় নিদর্শন। কী-ও সাহসী, স্পষ্টভাষী; ভিয়েৎকং কম্যুনিস্ট গেরিলাদের [illegible] দমনের জন্য একবার ভাইস মার্শাল কী ঘোষণা করেছিলেন, গ্রামে গ্রামে তিনি এক একজন হিটলারের মত জবরদস্ত নেতা চান।

ভিয়েৎকং গেরিলাদের স্পর্ধা কম নয়, দক্ষিণ ভিয়েতনামে যখন কিনা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের কাজ চলেছে, তখনও তারা উৎপাত চালিয়েছে, অসামরিক জনসাধারণকে ভয় দেখিয়েছে, খুন-জখম করেছে। মার্কিন বোমা বর্ষণেও অবশ্য দক্ষিণ ভিয়েতনামে অসামরিক লোকজন মরেছে, মাঝে মাঝে মারা যায়। সেটা কখন কখন নিতান্ত ভুলক্রমে, আর অনেক সময় ভিয়েৎকং গেরিলাদের উৎখাত করতেও দক্ষিণ ভিয়েতনামের গ্রাম, জঙ্গল জ্বালিয়ে দেওয়ার দরকার হয়। এটা স্রেফ যুদ্ধের প্রয়োজন। যুদ্ধে কোন্ পক্ষ ন্যায়ের দিকে সেটাই তো আসল কথা। ও-পক্ষে ভিয়েৎকং কম্যুনিস্ট গেরিলা, উত্তর ভিয়েতনামের কম্যুনিস্টরা, তাদের পিছনে আবার কম্যুনিস্ট চীন; এ-পক্ষে দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বাধীনতা রক্ষায় ভ্যান থিউ কী-র (এখন) গণতান্ত্রিক গভর্নমেন্ট, তার সমর্থনে মার্কিন বাহিনী, নৌবহর, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া এবং আর কয়েকটি দেশের সৈন্যদল। অতএব আন্তর্জাতিক ন্যায়নীতির পাল্লা কোনদিকে ভারী সেটা বুঝে নেওয়া চাই।

মুশকিল কী যে, শ্রীমোরারজী দেশাই-এর মত সাবধানী বিচক্ষণ ব্যক্তিও যেন এই ন্যায়নীতির ব্যাপারটা সোজাসুজি বুঝতে নারাজ। নামজাদা মার্কিন মুরুব্বীও বহু মান্যগণ্য সেনেটর। তবে তাঁদের কথা আলাদা। তাঁদের কিন্তু তাঁদের দেশকে তো "[illegible] থেকে বাঁচাও" গোছের [illegible] নির্ভর করতে হয় না। টোকিওতে জনৈক মার্কিন সাংবাদিকের সঙ্গে বিতর্কে শ্রীদেশাই বলে ফেলেন, কাশ্মীরে ভারতের ভূমিকার সঙ্গে ভিয়েতনামে আমেরিকার উপস্থিতির তুলনা চলতে পারে না, কারণ ভিয়েতনাম থেকে আমেরিকার দূরত্ব ছ-হাজার মাইল। দূরত্বের যুক্তিটা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে খুব টেকসই নয়। ভিয়েতনাম থেকে আমেরিকা দূরে, কিন্তু কম্যুনিস্ট চীন তো কাছেই আছে। অবশ্য শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের উক্তিটা প্রেসিডেন্ট জনসনের মনোমত না হওয়া সম্ভব। ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় সেলিগ হ্যারিসন লিখছেন, আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ভারত সরকারের বড় বেশী স্বাধীন ভঙ্গী বর্তমান অবস্থায় বেমানান, সাহায্যদাতারা এতে রুষ্ট হন। যথা, উত্তর ভিয়েতনামের কম্যুনিস্ট প্রেসিডেন্ট ডঃ হো চি মিনের জন্মবার্ষিকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সম্ভাষণ-বার্তা পাঠানোর কী দরকার ছিল? প্রেসিডেন্ট জনসন নাকি এজন্য বিরক্ত। ভিয়েতনামের মঙ্গল-অমঙ্গল সম্পর্কে ভারত সরকারের মুখপাত্রদের এখন একেবারে "স্পীকিটি নট" থাকাই বিচক্ষণ নীতি!

দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভাবনা দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের এবং আমেরিকার। মার্কিন রাষ্ট্রকর্তারা তো আশ্বাস দিয়েই রেখেছেন, আগে যুদ্ধের হেস্ত-নেস্ত, তারপর দক্ষিণ ভিয়েতনামের গ্রামে জঙ্গলে জোঁকের মত লেগে-থাকা ভিয়েৎকংদের সাফ করা এবং আরও বছর কুড়ি মার্কিন উপস্থিতিতে দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের গণতান্ত্রিক রীতি-নীতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এ-সব কাজ কতদূর কীভাবে হচ্ছে বা হবে সে-বিষয়ে কিন্তু মার্কিন বিশেষজ্ঞ মহলে নানা রকম মত। মুশকিল সেখানেই। মার্কিন গণতন্ত্রের ওই একটা বিশিষ্ট গুণ, যার ফলে দক্ষিণ ভিয়েতনামে গণতন্ত্রের প্রথম পাঠ, উত্তর ভিয়েতনামে মাসে চার হাজার দফা বোমা-বর্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে মান্যগণ্য মার্কিন রাজনীতিকরাও অনেকে বেয়াড়া, বেফাঁস কথাবার্তা বলেন, প্রেসিডেন্ট জনসন বিব্রত অপদস্থ হন, ভিয়েৎকং গেরিলাদের কাণ্ড-কারখানার চেয়ে মার্কিন বোমাবর্ষণ ইত্যাদির নিন্দা হয় বেশী। ভিয়েতনাম-মঙ্গল-কাব্যে এই বিষম বেসুর, যে-জন্য শ্রীমোরারজী দেশাই-এর মত সাবধানী বিচক্ষণ ব্যক্তিও এমন কথা বলে বসেন যা মার্কিন রাষ্ট্রকর্তাদের শ্রুতিমধুর নয়।

ভিয়েতনাম-মঙ্গল কাব্যের উল্টোপাল্টা ধরন প্রেসিডেন্ট কেনেডীর আমল থেকে। কেনেডীর নির্দেশে ১৯৬৩ সনে মার্কিন সমরদপ্তরের জেনারেল ক্রুলাক এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের বিশেষজ্ঞ মেণ্ডেনহল ভিয়েতনাম-পরিস্থিতি তদন্ত করে এসে রিপোর্ট দেন—দুজনের দুরকম রিপোর্ট—জেনারেল ক্রুলাক বললেন, "সব ঠিক হ্যায়, যুদ্ধে জয় হবে নির্ঘাৎ"; মেণ্ডেনহল বলেন, "অবস্থা সঙ্গীণ, দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজত্ব ভেঙে পড়ছে।" তখন প্রেসিডেন্ট কেনেডীর তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, "আপনারা দুজন একই দেশে গিয়েছিলেন তো?" তখনও পাঁচ লাখ মার্কিন সৈন্য ভিয়েতনামের লড়াই-এ নামে নি। এখন সব মিলিয়ে ভিয়েতনাম-মঙ্গল কাব্য জমজমাট; যুদ্ধসম্পর্কে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ম্যাকনামারা বারবার ভরসা দিয়েছেন, "অন্যই শেষ রজনী।" এ-কাব্যের শেষ তবু দেখা যাচ্ছে না; কারণ নাকি ভিয়েৎকং-গেরিলাদের, উত্তর ভিয়েতনামীদের বেয়াড়া একগুঁয়েমি।

৪।৯।৬৭

রাঁচী সংবাদ

হিন্দী এবং উর্দু নিয়ে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব—রাঁচীর দুঃসংবাদ। প্রথমটায় মনে হয়েছিল, রাঁচীর অদূরে কাঁকে নামে প্রাকৃতিক রমণীয় পরিবেশে ঘেরা যে মনোরম স্থানটি আছে, এই দাঙ্গার কেন্দ্র বোধ হয় সেখানেই। তারপরেই বোঝা গেল, আমাদের এই দেশে—এই ভারত-পাকিস্তানে কাঁকে শুধু একটি জায়গাতেই সীমাবদ্ধ নয়—যেদিকে তাকানো যায়—একেবারে বিন্দু সরোবর। সাম্প্রদায়িকতার টিকি-দাড়ি বেমার সিপাইদের মতো সদা-প্রস্তুত, একটি দেশলাইয়ের কাঠি ছুঁইয়ে দিলেই যথেষ্ট।

কিংবা দেশলাইয়ের কাঠিই বা কী দরকার, সাম্প্রদায়িকতার নিউক্লিয়ার থেকে আগুন ধরিয়ে দেবার মতো অলৌকিক শক্তিও আমাদের আছে। রাঁচীর দাঙ্গার দৈবী প্রেরণা হল বিহারে উর্দুর দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবি। অতএব শোভা-যাত্রা, এবং তারপরেই খুনোখুনি—ভূতের তাণ্ডব! এই কাণ্ডগুলো এতই কদর্য যে ঘৃণা করতেও খারাপ লাগে, সকালের খবরের কাগজ সমস্ত দিনটাকে বিষাক্ত করে দেয়।

আমার স্মৃতিতে আর এক রাঁচী স্বপ্নের মতো জেগে আছে। পুরুলিয়া রোডের দুধারে গাছপালার শান্ত গভীর ছায়া, নামকুমে সুবর্ণরেখার ওপর সোনালী নির্জন সন্ধ্যা, মোরাবাদী পাহাড়ের স্তব্ধ মগ্নতা, গৌতমধারার পথের ধারে সেই নিঃসঙ্গ বুদ্ধমূর্তিটি, হুড্রুর বড়ো বড়ো পাথরের আড়ালে বসে ছোট একটু পিকনিক, তারপর আরো দূরে রাজরাপ্পা-নেতারহাটের ডাক। সেই রাঁচী এখন ইনডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপের মহিমায় আর এক পৃথিবী—এখন সেখানে হিন্দী আর উর্দু নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধতে পারে। সবটাই কেমন অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

দার্শনিক রুসো এ সম্বন্ধে একটা সহজ ব্যাখ্যা দিতে পারতেন, কিন্তু ভল্টেয়ারের বিখ্যাত বর্ণনাটি আমার মনে আছে, 'কাঁদিদ' উপন্যাসের সেই নিষ্ঠুর ব্যঙ্গও আমি ভুলিনি। অতএব রাঁচীর [illegible] নিয়ে আমি রোমান্টিক কবিদের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলব না; সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাত্রেই বীভৎস, তবু অস্বীকার করব না, রাঁচীর পটভূমিতে সেটা বীভৎসতর ঠেকছে।

ভাষা হিসেবে হিন্দীর গরিষ্ঠতা-বরিষ্ঠতা যা-ই থাক, সবিনয়ে জানানো যাক, তার অসহিষ্ণুতাও অদ্বিতীয়। এ নিয়ে গত কয়েক বছরে অহিন্দীভাষী অঞ্চলগুলোতে যে বিরক্তি আর তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে, তা আর স্মরণ করবার দরকার নেই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, হিন্দীর ব্যাপারে বিহারের উৎসাহই ছিল সব চাইতে বেশি। বাংলা-ভাষাকে তো এর আগে নানা কৌশলে অর্ধচন্দ্র দেওয়া হয়েছে—এবার উর্দুকে ঠাণ্ডা করতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

দূরে থেকে এ কথা নিশ্চয় বলব না যে, এক হাতে তালি বেজেছে। দোষ দুপক্ষেরই নিশ্চয় আছে। কিন্তু হিন্দীর আত্মসংহিতার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হচ্ছে, ব্যাপারের সিংহভাগটা খুব সম্ভব হিন্দী-ওলাদেরই। এমনিতেই তো আমরা পরম সুখে দিন-যাপন করছি—এখন সন্দেহ হচ্ছে, দেশটাকে একেবারে রসাতলে না পাঠানো পর্যন্ত হিন্দী-প্রেমের সোয়াস্তি আসবে না। এমন কি, হিন্দীর একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে রাজস্থানে পর্যন্ত 'রাজস্থানী' ভাষার গুঞ্জন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে, এই খবরটুকু ছোট হলেও এর তাৎপর্য লক্ষ করবার মতো।

হিন্দী আর উর্দু নিয়ে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধতে পারে, স্বাভাবিক মস্তিষ্কে এই ব্যাপারটা ভেবে ওঠাই শক্ত। বিহারে উর্দু দ্বিতীয় রাজ্যভাষা হতে পারে কি না, সেটা ঠিক করবার জন্যে একটা নিরপেক্ষ পরিসংখ্যানই যথেষ্ট—ছোরাছুরির খুনোখুনি তার রাস্তা নয়। তা ছাড়া, ভাষার দিক থেকে যারা রাজ্যের সংখ্যালঘু, তাদের নিরাপত্তার একটা গ্যারান্টিও বোধ করি আমাদের সংবিধানে আছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাই যাদের লক্ষ্য, তাদের এ-সব কথা ভাববার দরকার পড়ে না, ভাববার

হাসির বাজনা

সুনীল বসু

সবুজ হাসিকে পিতল কাঁসার মতন বাজিয়ে
বাজিয়ে বাজিয়ে
ছুঁড়ে ফেলে দিলো মেয়েটি দারুণ লাল গোধূলিতে
এক সার ঘোড়া কেঁপে ছুটে গেল ধুলোকে উড়িয়ে
যেন ডুগডুগি জোরে বেজে গেল মরুর বালিতে

অন্ধকারের ধাক্কায় ধুলো ছাই-রঙ ফুল—
দিগন্তে হল, বিশাল মাঠের মধ্যে মেয়েটি
হা হা করে হাসে পিতল-কাঁসার শব্দ ফুটিয়ে
শেষ রোদে তার দেহ ঝলসালো, অস্ত্র যেমন

দস্যু তাতার খোঁপার ঝাঁপির সাপগুলো ক্রোধে
মুঠো করে ধরে ছিনিমিনি খেলে ছেড়ে দিল তার
পিঠের উঠোনে, তখনো মেয়েটি হাসির গমকে
গমকে গমকে—
বিদ্রোহ তার আছড়ে দিচ্ছে দস্যুর কানে

চোখের মধ্যে ধ্বক্ করে এক আগুন ফুটলো,
লুঠ করা দেহে
মেখে যেতে থাকে বিষে নীল হাসি, মুচড়ে মুচড়ে
মেয়েটি ঘুমের ঢাকনা খুলল, ভিতরে পাতাল
তাতার দস্যু তখনো শুনছে হাসির বাজনা
হা হা হা হা হাহা হাসির বাজনা

হাসির আঘাতে ভেঙে চুরমার, মৃত্যুর হাসি
পিতল কাঁসার মতন মেয়েটি হাসলো চুটিয়ে
তাতার দস্যু বোকা বনে গেছে, ভেড়া বনে গেছে
মেয়েটি উধাও—
হাসির অস্ত্র সশব্দ ক্রোধে বাজিয়ে বাজিয়ে
বাজিয়ে বাজিয়ে—

মানুষ আমি

বিনোদ বেরা

কটি কোমল ছবি ভীষণ কাঁদায়
বাঁশির মতো রৌদ্র ওঠা ভোর
পরখ করে কচি বুকের জোর
ব্যথার দ্যুতি ধাঁধায়।

শিশু, নরম, যা ছিল খুব কাঁচা
হঠাৎ হলো যুবক সাবালক
বুকের মেঘে পংক্তি তিনেক বক
গুলির শব্দে পণ করলো বাঁচা।

দেহ মনের রোদগুলি কি খায়
পিঁপড়ে? লোভী পিপীলিকার দল!
ডুবে মরবো ঃ প্রাণ যমুনার জল
অকস্মাৎ শুকায়।

সকল নদী এখন ক্রীতদাসী
হায় ক্রীতদাস সমস্ত রাজপথ,
মানুষ আমি ভগ্নমনোরথ
কাকে বলবো ঃ তোমায় ভালোবাসি?

আপনি কর ফাঁকি দিচ্ছেন!
কলকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তির বকেয়া পৌর কর আদায়ের জন্য মেয়র গোবিন্দ দে দিল্লিতে মোরারজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
'স্যার, একটা বন্‌ধ-এ যদি ৫০% ভাগ রেশন কাটা যায় তাহলে দুটো বন্‌ধ হলে কত কাটা যাবে?'
কেরালার 'রেড গার্ড'রা নাম্বুদ্রিপাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে যে তিনি মার্কসবাদী নন।
নিজেরই ছায়া?

দুটো আলোই যথেষ্ট : লাল আর সবুজ। মাঝখানে ঐ যে অ্যাম্বার রঙের আলোটি, তাকে প্রায় সকলেই মনে করে অবান্তর। ঐ আলো জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে যদি আপনি রওনা না দেন, তাহলে পেছন থেকে শুরু হবে এক প্যাঁপোঁ হুটিংয়ের কর্ণভেদী ঐকতান। পুলিস? দিব্যি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার কথা যেন ভাবে।

চোর বাড়িতে ঢুকেছে, হ্যাঁ সংকীর্তন করতে নয় চুরি করতেই। টের পেয়ে আপনি জাপটে ধরেছেন। সে আপনার বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। খোঁজখবর না-নিয়ে বাড়িতে চাকর রেখেছেন। আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার স্ত্রীকে, তার অনুপস্থিতিতে ছেলেমেয়েদের, অন্যান্য-দের অনুপস্থিতিতে আপনার গলাতেই চাকু বসিয়ে সোনাদানা টাকাপয়সা নিয়ে প্রস্থান। খুনখারাপি শহরে এন্তার। খবরের কাগজে প্রায় রোজই থাকে।

সুতরাং, শহরবাসীরা যদি সদাসর্বদা ভ্রূকুঞ্চিত করে থাকেন তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তাদের জগতের বাইরে রয়ে গেছে আরো অনেক। স্মাগ্লিং, চোরাই মাল থেকে [illegible], উঁচু মহলে সোনার ইঁট পাচার হচ্ছে, ঘুষের টাকায় অট্টালিকা উঠছে, দূতাবাসে বিদেশীদের কাণ্ডকর্ম স্মাগ্লিং আর স্পাইং, গভীর রাতের টাকার ভেল্কিবাজী খেলা, মদ মেয়েমানুষ, ড্রাগিং, গাঁজা, ভাং, চরস্। হ্যাঁ, ঠিক, চরস্ নয়তো কী। "হিপি"দের নজর পড়েছে দিল্লির উপর অবশেষে বিদেশী বিদেশিণী হিপ্পিদের। গতকাল দুজন অস্ট্রেলিয়া বাসী ধরা পড়েছেন পালাম বন্দরে। সঙ্গে এক কেজি করে চরস্, যা কি না আজ ইউরোপ আমেরিকায় বিখ্যাত হয়ে গেছে "মারিয়ুনা" নামে। কয়েকদিন আগে একটি আমেরিকান মহিলা ধরা পড়েন যখন বিমানযোগে তিনি পাঠাচ্ছিলেন মারিয়ুনার প্যাকেট। পুলিস আগ্রা থেকে তাকে পাকড়াও করে এনেছে। একটি আমেরিকান যুবকের [illegible] মামলা হল আদালতে।

একজন আমেরিকান [illegible], ভাং, চরস্ [illegible] "এল্-এস্-ডি" খাওয়া-দাওয়ার পর যেন সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। উনি আগে নাকি [illegible] মারিয়ুনা আর এল-এস-ডি [illegible] দিয়ে, তারপর কাপড় রাঙিয়ে একেবারে যোগী হয়ে গেছেন। উনি বেদান্ত দর্শন নিয়ে অধুনা ব্যস্ত অথবা বিভোর। একটি বিদেশী যুবক একেবারে আদালতে ঘোষণা করল এখানে যে, চরস্ খেয়ে (নাকি গাঁজা?) তার আসত একটা অপূর্ব তুরীয়ভাব, তাকে নিয়ে যেত ধ্যানের পথে, ভগবানের সন্ধানে।

আমাদের সাধু সন্ন্যাসীরা ধুনি জ্বেলে আর লম্বা কল্কি নিয়ে যা করে আসছেন শত শত বৎসর, ইউরোপ আমেরিকার বিদ্রোহী যুবক-যুবতীরা অ্যাসিডে [illegible] আবিষ্কার করেছে দিল্লিতে। দেশে [illegible] নেই, ভারতবর্ষে হলে একটু হিমালয়ের দর্শনও পাওয়া যায়, কিছুটা [illegible] [illegible], আর গাঁজা-চরসের [illegible] নেই!

—[illegible] দে সরকার

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমাদের একটা খুব প্রিয় খেলা ছিল। ধাঁধার খেলা। স্কুল ছুটির পর হাত-মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে স্কুলের মাঠে আমরা গ্রীষ্ম বর্ষা কালে ফুটবল আর শীত কালে ক্রিকেট খেলতাম। সেই খেলার শেষে যখন আর পর্যাপ্ত আলো থাকত না, তখন আসন্ন সন্ধ্যার সেই দ্রুত মরে আসা আলোয় মাঠের মধ্যে গোল হয়ে আমাদের ধাঁধার আসর বসত। আবার টারমিনাল বা অ্যানুয়াল পরীক্ষার শেষে যখন অভিভাবকরা আমাদের খানিকটা প্রশ্রয় দিতে রাজী থাকতেন, তখন রাত আটটা বা নটা পর্যন্ত মফস্বল শহরের অপর্যাপ্ত আলোর দরুন স্বচ্ছ অন্ধকারের উপরে নীচে তারা-ভরা আকাশের মধ্যে মিঠে সায়রের ধারে বসে আমরা পরস্পরকে ধাঁধা জিজ্ঞেস করতাম—"পাখি উলটে মাছ হল, বলত নাম কি ?"

আমরা প্রত্যেকেই যে ধাঁধা সমাধান করতে সমান দক্ষ ছিলাম—এমন নয়। বরঞ্চ বলা ভাল আমাদের সেই ধাঁধার আসরে আমরা

সকলেই প্রায় সমান অদক্ষ ছিলাম। শুধু প্রতুল ছাড়া। অতি সাধারণ ছেলে প্রতুল, লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিল না। শুধু অঙ্কে প্রচুর নম্বর পেত। কিন্তু প্রতুল ছিল আমাদের ধাঁধার আসরের মুকুট হীন সম্রাট। ধাঁধা দিতে আর অপরের দেওয়া ধাঁধা সমাধান করতে ওর মত আর কেউ ছিল না। আমরা একটা ধাঁধা শুনে দু' দশ মিনিট এলোপাথাড়ি ভাবতাম, তারপর থই না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে উত্তর শুনবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠতাম। কিন্তু প্রতুলের ছিল আলাদা ধরন। কি রকম একরোখা জেদ ছিল ওর, যে কোনো ধাঁধার উত্তর ও ভেবে বার করবেই। কেউ আগে থেকে উত্তর বলে দিতে গেলে নিজের কানে আঙুল দিত প্র তু ল, ধমকে উঠত—"খবরদার বলবি না। আমি বলছি—", আর বলতও। আমরা হয়ত ধাঁধার উত্তরের দিশা না পেয়ে চুপিসাড়ে জেনে নিয়ে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছি। প্রতুল কিন্তু তখনও ভাবছে একমনে, আমাদের দলের মধ্যে থেকে ও কেমন যেন পৃথক হয়ে রয়েছে, চিন্তার মানসিক প্রক্রিয়ার তীব্রতায় চোখ দুটো লক্ষ্যহীন উজ্জ্বল। তারপর এক সময় ঠিক উত্তরটা বার করে ফেলত প্রতুল। এমন হয়েছে, একটা ধাঁধার উত্তর দু' দিন বা তিন দিন পরে খুঁজে পেয়েছে প্রতুল আর ছুটে এসে সবাইকে শুনিয়ে গেছে। আসলে কোনো একটা ধাঁধার উত্তর খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পেত না সে, সেই ধাঁধাটাকে কেন্দ্র করে প্রতুলের মন সারাক্ষণ ঘুরপাক খেত।

স্কুলের শেষ বছরে আমাদের স্কুলের ইতিহাসের মাস্টার মণ্ডল স্যার একটা ধাঁধা দিয়েছিলেন। ধাঁধাটা ক্রিকেট খেলার উপর। এখন স্পষ্ট মনে নেই, একদল ক্রিকেট খেলোয়াড় কে কখন আউট হয়েছে, কে কার উইকেট পেয়েছে, কে নট আউট ছিল—এই সবের এক মিলিত জটিল ব্যাপার। সেবার শীতে আমাদের মফস্বল শহরে ক্রিকেট নিয়ে খুব মাতামাতি হয়েছিল। আমরাও হঠাৎ এক একজন নিসার অমর সিং গাইকোয়াড় রণজি বনে গিয়ে স্কুলে স্কুলে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের সেই অতি উৎসাহের খেলায় আমরা মাস্টার-মশাইদের বাদ দিতাম না। মাস্টার বনাম ছাত্রদের খেলার প্রসঙ্গেই একদিন ক্লাসে মণ্ডল স্যার হেসে বললেন—"তোমরা ক্রিকেট খেল। ক্রিকেট খেলার একটা ধাঁধার উত্তর দাও ত—" ধাঁধার নাম শুনে স্বভাবতই আমরা সোৎসাহে নড়ে-চড়ে বসলাম। যদিও জানতাম, ধাঁধার জবাব দিয়ে যদি কেউ আমাদের মুখরক্ষা করতে পারে ত প্রতুলই পারবে।

মণ্ডল স্যার আমাদের স্কুলে তখন নতুন এসেছেন। অল্প বয়স—আমাদের দাদাদের মত হবেন। দাদার মতই মিশতেন আমাদের

সঙ্গে শ্রদ্ধার বিনিময়ে অকৃপণ স্নেহ দিয়ে। এই শহরের লোক নন তিনি। চাকরি নিয়ে এসেছিলেন বাইরে থেকে। খেতেন স্কুল হোস্টেলে, কিন্তু থাকতেন একটা ঘর ভাড়া নিয়ে একা। সেই ঘর ভর্তি ছিল কেবল বই। দিবারাত্রই পড়তেন মণ্ডল স্যার। স্কুলে আসা-যাওয়া করতেন সাইকেল রিকশায়। তাও পড়তে পড়তে।

মণ্ডল স্যার একখানা বই বার করে বোর্ডের উপর ধাঁধাটা লিখলেন, তারপর ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন কি করতে হবে। ধাঁধা দেখা মাত্রই আমরা হাল ছেড়ে দিলাম। তাকালাম প্রতুলের দিকে। দেখি ও খুব আগ্রহের সঙ্গে ধাঁধাটা বুঝতে চাইছে।

দু' দিন পরে প্রতুল ধাঁধার উত্তর নিয়ে এল। মণ্ডল স্যার অবাক। বললেন—"তুমি নিজে উত্তর বার করেছ প্রতুল?" প্রতুল সাফল্যের লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল। আমরা সমস্বরে ওর হয়ে জবাব দিলাম—"হ্যাঁ স্যার। প্রতুল খুব ভাল ধাঁধা করতে পারে স্যার।"

একটু চুপ করে থেকে মণ্ডল স্যার বললেন—"আশ্চর্য তো! ভারী আশ্চর্য!" আর কিছু বললেন না মণ্ডল স্যার। শুধু ক্লাস শেষ হলে প্রতুলকে বললেন—"আজকে ছুটির পর বিকেলে আমার ঘরে এস ত প্রতুল।"

এইবার প্রতুল আমাদের কাছে খানিকটা অসামান্য হয়ে উঠল। প্রতুলের গুণপনা মণ্ডল স্যারকে পর্যন্ত মুগ্ধ করেছে—এ বড় সহজ কথা নয়। চুপি চুপি প্রতুলকে শুধোলাম—"হ্যাঁরে প্রতুল, তুই ধাঁধার উত্তর বার করিস কি করে রে?"

প্রতুল হেসে বলল—"কেন, খুব সহজ। আমি নিজেই ধাঁধা হয়ে যাই।"

—"তুই নিজেই ধাঁধা হয়ে যাস। তার মানে?"

—"মানে, আমি নিজেই ব্যাপারটার মধ্যে চলে যাই। মানে, যেমন এই মণ্ডল স্যারের ধাঁধার আমি নিজেই মাঠে নেমে গেলাম, সঙ্গে দশজন প্লেয়ার। আর একটা টিম নামল ব্যাট করতে। খেলা শুরু হল—মানে সবই মনে মনে—কিন্তু ঠিক যেন সত্যি—" থেমে গিয়ে অপ্রতিভ হাসি হাসতে লাগল প্রতুল। ব্যাপারটা আমার কাছে আরো দুর্বোধ্য হয়ে উঠল।

সেদিন ছুটির পর প্রতুল মণ্ডল স্যারের সঙ্গে দেখা করেছিল। মণ্ডল স্যার প্রতুলের মধ্যে কি পেয়েছেন জানি না, তবে প্রায়ই নিজের ঘরে ডেকে পাঠাতে লাগলেন, এবং আস্তে আস্তে প্রতুল আমাদের দলছাড়া হয়ে গেল। আর আমাদের খেলার আসরে আসে না, না ধাঁধার আসরে। মণ্ডল স্যারের ঘরে বসে সেই সময় দুজনে গল্প করে বাড়ি ফেরার সময় স্যারের কাছ থেকে বই নিয়ে ফেরে দু' এক খানা। ক্লাসের শেষ বেঞ্চিতে বসে গোপনে সেই বই শেষ করে প্রতুল মাস্টারদের পড়ানোতে কর্ণপাত না করে। যেহেতু প্রতুল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, তাই হয়ত আমি অভিমানবশতই ওর এই সমস্ত পরিবর্তন দেখেও লক্ষ না করার ভান করলাম। কিন্তু ক্লাসের অন্যান্য ছেলেরা ওকে রেহাই দিল না। তারা প্রতুলকে নানা প্রশ্নে ও নানা বিদ্রূপে জর্জরিত করে তুলল। কিন্তু প্রতুলের গায়ে যেন কিছুই লাগে না। লাজুক হেসে সমস্ত প্রশ্ন এড়িয়ে যায়, পরম ঔদাসীন্যের বর্মে খান খান হয়ে যায় ওদের শাণান অস্ত্র।

আমাদের টেস্ট পরীক্ষার ঠিক পরে একদা সন্ধ্যার পর মিঠে সায়রের পাড়ে আমাদের যথারীতি আড্ডা বসেছিল। নানারকম কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ লক্ষ করলাম কিছুটা দূরে বসে আছে প্রতুল আর মণ্ডল স্যার। [illegible]

[illegible] প্রতুলের [illegible]

সুধীর বলল—"প্রতুলকে কি [illegible] ছেন স্যার! আমাদেরও বলুন।"

[illegible] আমরা একটু আলোচনা চালাচ্ছিলাম। তোমাদের ভাল লাগবে কিনা জানি না।" মাথা নিয়ে সবাই বলে উঠল, "হ্যাঁ স্যার। খুব ভাল লাগবে।"

আমরা সবাই গোল হয়ে মণ্ডল স্যারকে ঘিরে বসলাম। মণ্ডল স্যার আমাদের কাল-পুরুষ আর সপ্তর্ষি মণ্ডল চেনালেন, চেনালেন মৃগশিরা আর কৃত্তিকা নক্ষত্র। তারপর ছায়াপথ দেখিয়ে তার রহস্য বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু আমি বেশ লক্ষ করছিলাম মণ্ডল স্যার ঠিক সহজ আর স্বাভাবিক হতে পারছেন না আমাদের সঙ্গে। কথা বলতে বলতে থমকে যাচ্ছেন মাঝে মাঝে। আর প্রতুল ত যেন মরে গেছে, এত নিঃশব্দ নীরব। আসলে ওদের দুজনের কেউই ওদের একেবারে নিজস্ব পরিমণ্ডলে

দেব। দেখবি ও'র সঙ্গে গল্প করতে কি ভাল লাগবে। কোথা দিয়ে সময় চলে যায় টেরই পাবি না।" একটু থেমে আবার বলল —"তবে দল নিয়ে আসিস না।"

বললাম,—"দরকার নেই আমার মণ্ডল স্যারের সঙ্গে গল্প করার।"

প্রতুল হেসে চুপ করে রইল।

আমিও একটু চুপ করে থেকে তারপর আবার নরম গলায় বললাম—"আচ্ছা বল ত প্রতুল, মণ্ডল স্যারের কাছে তুই কি পেয়েছিস?"

প্রতুল সঙ্গে সঙ্গে বলল,—"মণ্ডল স্যার আমার চোখের পরদা খুলে দিয়েছেন।"

—"পরদা খুলে দিয়েছেন।" অবাক হয়ে বললাম।

—"হুঁ!" রহস্যময় হাসি হেসে উপরে নীচে ঘাড় নাড়ল প্রতুল।

একটু বুঝবার চেষ্টা করলাম ব্যাপারটা। তারপর প্রশ্ন করলাম,—"পরদার ওপাশে কি দেখলি"

প্রতুল বলল,—"ধাঁধা।"

—"ধাঁধা!" এবারে নিছক বোকা মনে হল নিজেকে।

—"হ্যাঁ।" প্রতুল বলল—"তবে ভীষণ ভীষণ শক্ত ধাঁধা। মণ্ডল স্যারের ক্রিকেট খেলার ধাঁধার চেয়েও অনেক অনেক শক্ত।"

প্রতুল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রতুলকে অনেক দূরের অপরিচিত বলে মনে হচ্ছিল। ওর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর সাবধানে শুধোলাম,—"ধাঁধাটা কি?"

প্রতুল হাসল। বলল,—"বলে বোঝান যায় না।"

—"তবে কি করে বোঝা যায়?"

—"অনুভবে।"

—"আমার অনুভব শক্তি নেই, এমন ত নয়।"

প্রতুল কথা বলল না। আমার মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। কেন জানি না চোখ নামিয়ে নিলাম। দু জনেই চুপ করে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। হঠাৎ প্রতুল বলল,—"শুনবি তুই? আচ্ছা শোন—" আবার অখণ্ড নীরবতা। ক্রমে সে নীরবতার মধ্যে প্রতুলের কাঁপা কাঁপা আত্মনির্ভরতাশূন্য কণ্ঠস্বর যেন টাল মাটাল হাঁটিতে শুরু করল—"আচ্ছা তোর কখনও মনে হয় না আমরা—এই মানুষরা কত ছোট, কত অসহায়। এই যে পৃথিবী, বিরাট ব্রহ্মাণ্ড—এত বিরাট যে কোনো কোনো তারা থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লক্ষ বছর লাগে, অথচ আলো চলে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল, এমনি লক্ষ লক্ষ তারা আছে, আবার তাদের কত গ্রহ কত উপগ্রহ—এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে বালির কণার মত ছোট্ট পৃথিবী আর তুলনায় পরমানুর মত ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র মানুষ আমরা—কি ইনসিগ্নিফিকাণ্ট! অথচ আমরা জন্মাই বাঁচি মরি—কেন জন্মাই, কেন বাঁচি, কেনই বা আবার মরি—অথচ এই সব কিছুর মধ্যে কি এক কঠিন নিয়মের শক্ত বাঁধন—যেন একটা ফরমুলায় সব কিছু ঘটে যাচ্ছে, কি সে ফরমুলা, আর এ সবের অর্থ কি, দরকার কি, কেন দরকার, কার দরকার, এ সব কেন? কি—" কথা খুঁজে না পেয়ে থেমে গেল প্রতুল, যেন কোনো বিরাটত্বের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তাকিয়ে দেখলাম প্রতুলের দু চোখে কি কাতরতা, কি অবুঝ অসহায়তা।

অনেকক্ষণ পর আবহাওয়াকে লঘু করার উদ্দেশ্যেই বললাম—"মণ্ডল স্যারের পাল্লায় পড়ে তুই পাগল হয়ে যাবি প্রতুল।"

প্রতুল মৃদু হাসল।

কিন্তু প্রতুল পুরো পাগল হয়ে যাবার আগেই মণ্ডল স্যার স্কুলের চাকরি ছেড়ে আমাদের মফস্বল শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেলেন।

ফাইনাল পরীক্ষা দিলাম। সকলেই পাস করলাম। প্রতুলও। আমার অভিভাবকগণ ঠিক করলেন কলকাতা গিয়ে হোস্টেলে থেকে কলেজে পড়ব। প্রতুলের পড়াশুনোর কিন্তু ওই খানেই ক্ষান্তি। প্রতুলদের বংশানুক্রমিক ব্যবসা। বাজারে অনেকগুলো দোকান আছে। ওর গার্জেনরা বলল: লেখাপড়া ঢের হয়েছে, এবার থেকে প্রতুল বাজারের স্টেশনারী দোকানে বসবে।

চলে গেলাম কলকাতা। প্রতুলের সঙ্গে সম্পর্কের প্রগাঢ়তা স্বাভাবিক ভাবেই কমে এল। গরমের বা পুজোর ছুটিতে যখন বাড়ি ফিরতাম, তখনও কলেজ এবং কলকাতার আলোয় চোখ এত ধাঁধিয়ে থাকত যে ম্লান মফস্বল শহরের পুরোনো বন্ধু প্রতুল চোখেই পড়ত না। কিংবা প্রতুলের বন্ধুত্ব এবং সঙ্গ হারিয়ে আমার একদা দুঃখ এবং অভিমানের দুর্বলতার লজ্জায় যেন ইচ্ছে করেই অবজ্ঞা আর অবহেলা করতাম।

প্রতুল আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল বি এ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি আসার পর। শুনলাম প্রতুল বিয়ে করেছে। যদিও খুব বিস্ময়ের ব্যাপার নয়, কেন না ওদের পরিবারে অল্পবয়েসে বিয়েটাই রেওয়াজ, তবুও ভাবতে অবাক লাগল প্রতুল সেই প্রতুল আজ বিবাহিত। একটি মেয়ের ধরাছোঁয়ার গণ্ডির মধ্যে সর্বদা আবদ্ধ।

একদিন প্রতুলদের বাড়ি গেলাম। আমার পদার্পণে যেন ধন্য হয়ে গেল প্রতুল। বলল—"আয় আয়। হঠাৎ এলি যে! কি মনে করে!—"

কোনোরকম ভূমিকা না করে বললাম—"বউ দেখা।"

প্রতুল সলজ্জ হাসল। বলল,—"দেখবি বই কি। বস। দাঁড়া, ডাকি ওকে—" বেরিয়ে গেল প্রতুল ঘর থেকে। আমি বসে বসে ওর ঘর দেখতে লাগলাম। ছিমছাম সাজিয়েছে ঘরখানাকে। দুই দেয়ালে মুখোমুখি দুটি সুরুচি ক্যালেণ্ডার, ড্রেসিং টেবিলের উপর বাঁধান ফটো প্রতুল আর নিশ্চয়ই প্রতুলের বউ। ছোট তেপয়া টেবিলের উপর ফুলদানিতে গুটি কয়েক বাসি ম্লান রজনীগন্ধা আর ধূপদানিতে ধূপকাঠির অবশিষ্ট চার পাঁচটি কাঠি, তলায় কিছু সাদা সুতোর মত সরু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছাই।

একটু পরেই প্রতুল ঢুকল একটি অনেকখানি ঘোমটা টানা অনিচ্ছুক সলজ্জ বধূকে সামনে ঠেলে দিয়ে—"আরে ধুৎ। চল না! লজ্জা কি ওকে। ও আমার ছোট বেলাকার বন্ধু।—"

আমি কলকাতায় দেখা সেইসব আধুনিকা নিপুনিকা চতুরিকা মেয়েদের একজনের সঙ্গে আসন্ন মুখোমুখির কল্পনায় এতক্ষণ ভিতরে ভিতরে ঘেমে উঠেছিলাম। এখন এই ঘোমটা আর লজ্জার বাহুল্য আমাকে খানিকটা স্বস্তি দিল। বেশ সাহসের সঙ্গে

দু হাত যুক্ত করে বললাম—"নমস্কার বৌদি।"

প্রত্যুত্তরে দুখানা পেলব হাত যুক্ত হল এবং চুড়ির রিনিঠিনি ও অস্ফুট গুঞ্জন কানে এল। অনেক সাধ্য সাধনার পর প্রতুলের বউ কপালের প্রান্ত পর্যন্ত ঘোমটা তুলল এবং শ্যামল সুন্দর একখানা কিশোরী মুখ, কপালে সিঁদুরের টিপ আর সিঁথির সিঁদুরের লাল আভা দেখতে পেলাম। নানা প্রকার রসিকতা করার পর হাসল ও। সন্দেশ্য ও সুছাঁদ দু পাটি সাদা দাঁতের ঔজ্জ্বল্যও চোখে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে প্রতুলের বউ আমার জন্য জল খাবারের ব্যবস্থা করতে উঠে গেল।

প্রতুলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রতুলকে বললাম,—"কি রে প্রতুল, কেমন লাগছে?"

—"কী?"

"বিবাহিত জীবন।"

প্রতুল উত্তর [illegible]

[illegible]

—"বল না।"

প্রতুল [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"... ধাঁধা।"

[illegible]

[illegible]

—"[illegible]

[illegible]

শোনাব।"

বললাম—"[illegible]

বল না, বউ কেমন পেয়েছিস।"

প্রতুল একটু লজ্জিত হল। [illegible] কি বলা যায়।"

—"[illegible] বলা যায় না কেন?"

—"মেয়েদের ঠিক বোঝাই যায় না। কি যে কখন চায়, কেন চায়—" একটু থেমে বলল—"মেয়েদের চরিত্র একটা ধাঁধা।"

হেসে বললাম,—"ধাঁধা যখন, তুই ঠিক সমাধান করে ফেলবি। তুই এমন যা। আর এগিয়ে দেবার দরকার নেই।"

প্রতুল চলে যাচ্ছিল, কি মনে হল, ডেকে বললাম—"এই প্রতুল ধাঁধা দুটোর উত্তর বলে দিয়ে গেলি না!"

প্রতুল ফিরল, হাসল, কিন্তু এগিয়ে এল না। দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল,—"বিয়ের পর বউয়ের কাছ থেকে উত্তর জেনে নিস।"

মেয়েদের চরিত্র যতবড় ধাঁধাই হোক তার সমাধান করতে নিশ্চয়ই প্রতুলের খুব বেশী দিন লাগেনি। কারণ প্রতুল কোনোদিনই এক ধাঁধা সমাধান না করা পর্যন্ত অন্য ধাঁধায় মন দিত না।

সিকস্থ ইয়ারে থাকা কালীন একদা একখানা চিঠি পেলাম বাড়ি থেকে। নানা-প্রকার সংবাদ দান কুশল জ্ঞাপন ও অনুসন্ধানের পর মা একেবারেই গুরুত্বহীন ভাবে খবর দিয়েছেন সপ্তাহ খানেক হল প্রতুল ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে। অনেক অনুসন্ধানেও তার কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি।

একটু অবাক হলাম। প্রতুলের সঙ্গে শেষ দেখার সময় তার চরিত্রে গৃহত্যাগের মত কোনো বৈরাগ্যের ছাপ দেখতে পাইনি। বরঞ্চ মনে হয়েছিল প্রতুল তার স্বচ্ছলতা ও সুশ্রী স্ত্রী নিয়ে সুখী তৃপ্ত এবং সমাপ্ত।

প্রতুল বলল,—"তোর সঙ্গে দেখা করতে যদি না দিন দুয়েক পরেই হোস্টেলে এসে হাজির হত আমার সঙ্গে দেখা করতে। বললাম,—"কিরে কি ব্যাপার!"

প্রতুল বলল,—"তোর সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

—"কিন্তু—" ওর সাদামাটা চেহারা দেখে একটু অবাক হয়ে বললাম—"তুই-তুই নাকি সন্ন্যাসী হয়েছিস?"

হাসল প্রতুল,—"পাগল! সন্ন্যাসী হতে যাব কোন দুঃখে?"

—"তুই নাকি সংসার ছেড়েছিস—"

"সংসার ছাড়লেই লোক সন্ন্যাসী হয় নাকি!"

—"তবে সংসার ছেড়েছিস কেন?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

প্রতুল একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল—"জানি না।"

বুঝলাম প্রতুল বলতে ইতস্তত করছে, অথবা বলবার মত কিছু এখনও দানা বাঁধেনি ওর মনে। খুব সাবধানে কথা না বললে আমার কাছে বলতে এসেও কিছু না বলেই ও চলে যাবে। মৃদু নরম গলায় বললাম—"প্রতুল, তুই কিছু লুকোচ্ছিস আমার কাছ থেকে।"

আমার কণ্ঠস্বরে নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল যা সরাসরি ওর হৃদয় স্পর্শ করল। প্রতুল চোখ তুলল। তাকিয়ে রইল একটু। তারপর বলল,—"শুনবি তুই?"

আমি শুধু সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম।

—"তবে এক কাপ চা খাওয়া।" প্রতুল বলল।

আমি উঠে গিয়ে চা ও কিছু খাবারের হুকুম দিয়ে এলাম। চা আর খাবার এল। প্রতুল গোগ্রাসে খাবার খেল, তারপর নিঃশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল। শেষ চুমুক দিয়ে চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে প্রতুল হঠাৎ বলে উঠল,—"জানিস, উষার বাচ্চা হবে!"

আমি জানতাম না। কিন্তু জানলেও আমি তার সংগে প্রতুলের গৃহত্যাগের যোগসূত্র খুঁজে পেতাম না। বিয়ের পর সব মেয়েদেরই—কারো এক বছর, কারো বা তিন বছর পরে—বাচ্চা হয়। তথাপি আমি চুপ করে রইলাম।

প্রতুল আবার বলল,—"উষার বাচ্চা হবে। জানিস!"

বললাম,—"আর তুই ওকে একলা ফেলে পালিয়ে গেলি!"

—"পালাইনি ত! পালাব কেন?" প্রতুল বলল—"আর একলাও ত নয় উষা। সবাই ত আছে। তা ছাড়া অর্থাভাব নেই—"

—"অর্থটাই কি সব সংসারে!"

প্রতুল আমার কথা শোনেনি। তাই উত্তরও দিল না। তাকিয়ে দেখলাম ওর চোখের দৃষ্টি দূর প্রসারী। বলল—"যে রাত্রে উষা আমাকে খবরটা দিল, সেই রাত্রেই আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম।"

—"কি স্বপ্ন দেখলি?"

—"দেখলাম, আমি যেন ঘুমোচ্ছি আর আমার শিয়রে একটা টেলিফোন ক্রিং ক্রিং ক্রিং করে বেজে যাচ্ছে। আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি উঠে টেলিফোনটা ধরলাম। হ্যালো। কোনো সাড়া নেই। হ্যালো, হ্যালো। তবু কোনো সাড়া নেই। হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। আশ্চর্য, তবুও কেউ সাড়া দিল না। হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো—আমার গলা চিরে গেল, গলার রগ ছিঁড়ে যাবে বুঝি, দু' চোখে রক্ত উঠে এল। তবুও, তবুও কেউ আমার ডাকে সাড়া দিল না। অথচ—অথচ বেশ বুঝতে পারছি লাইন কেটে যায় নি, লাইন আছে, ও প্রান্তে কেউ ধরে আছে ফোন, কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না, কিছুতেই দিচ্ছে না। কেন? কেন?—" প্রতুলের কণ্ঠস্বরে একেবারে খাদে নেমে গেল—"হয়ত, হয়ত তার কানে আমার সেই গলা ফাটানো চীৎকারও এত মৃদু, এত ক্ষীণ, এত আস্তে যে, সে শুনতেই পাচ্ছে না, তাই সে উত্তর দিচ্ছে না। কিন্তু কেউ আছে, নিশ্চয়ই কেউ আছে ফোনের ওই দিকে, নইলে আমাকে ডাকল কে? আর সে সাড়া ত দেবে, নিশ্চয়ই দেবে! নইলে আমাকে ডাকল কেন?—"

হঠাৎ প্রতুল উঠে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি পিছন পিছন গেলাম। দু' বার ডাকলাম। কিন্তু প্রতুল একবারও পিছন না ফিরে হন হন করে গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বুঝলাম প্রতুল পুরো পাগল হয়ে গেছে।

বেশ কয়েক বছর পরে প্রতুলের সঙ্গে আর একবার দেখা হয়েছিল। তখন আমি বিবাহিত। সস্ত্রীক গিয়েছিলাম বাইরে, কোনো এক পাহাড়ী এলাকায়, তীর্থের পথ দেখা ও সূর্যোদয়ের কলাবেচা এক খরচায় সারতে। সেইখানে একটা চায়ের দোকানে রোজ সন্ধ্যায় একখানা শীর্ণ মুখ ও দুটো অত্যুজ্জ্বল চোখ আমার স্মৃতিতে কম্পন তুলত। একদিন দ্বিধাভরে বললাম,—"প্রতুল না!"

প্রতুল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর উজ্জ্বল চোখ দুটোয় পরিচিতির আলো জ্বলল। বলল,—"আরে! তুই!—" তারপর একটু হেসে বলল—"তোকে চেনাই যায় না। খুব মোটা হয়েছিস।"

চব্বিশ ঘণ্টাই সেই পাহাড়ী উচ্চতায়ও আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছিল। আমি রুমাল বার করে মুখটা মুছে নিয়ে বললাম, "তুই এখানে কি করছিস?"

—"[illegible]—" প্রতুল [illegible] চলে যাব।"

—"কোথায়?"

[illegible] করে প্রতুল বলল—"কি জানি!"

বুঝলাম প্রতুল তার গতিবিধি ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে কৌতূহল পছন্দ করছে না। তাই বললাম,—"চল আমার হোটেলে—"

—"কেন?"

—"আমার বউ দেখবি।"

প্রতুল চুপ করে রইল। ও কি ভাবছিল জানি না। হয়ত পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ছিল। একদিন আমাকে ওর বউ দেখিয়েছিল, লাজুক লাজুক মিষ্টি একটি কিশোরী বউ। ধূপদানিতে জ্বলন্ত ধূপকাঠির সুগন্ধ ধোঁয়ার ঊর্ধ্বগামী নীল রেখা। দুজনের সমান সমান অতৃপ্ত বাসনা। প্রতুলের মুখে স্মৃতির ছায়া গাঢ় হয়ে নেমেছে।

আমি আবার বললাম—"চল প্রতুল।"

প্রতুল সুপ্তোত্থিতের মত বলল—"চল"।

আমার বউ নতুন নয়, লাজুক নয়, কিশোরীও নয়। সে প্রতুলকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করল। চা জলখাবার দিল। তারপর 'কিছু মনে করবেন না যেন' বলে মার্কেটিং এ চলে গেল। আমি আর প্রতুল মুখোমুখি বসে রইলাম। অনেকক্ষণ পর আমি বললাম,—"ফোনের ওপার থেকে কোনো সাড়া পেয়েছিস?"

প্রতুল চমকে আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল,—"তোর মনে আছে?"

আমি বললাম,—"আছে।"

প্রতুল ইতস্তত করে বলল—"কিন্তু... সে ত স্বপ্ন।"

—"তুই ত সেই স্বপ্নের সন্ধানেই বেরিয়েছিলি।"

প্রতুল চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ পরে ক্লান্ত কণ্ঠে বলল—"কিন্তু...কিন্তু স্বপ্ন কি ধরা যায়! কেউ কোনোদিন পেরেছে ধরতে!"

আমি চুপ করে রইলাম।

প্রতুলও অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। তারপর তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠস্বর থেমে থেমে চলতে শুরু করল—"তোর মনে আছে, আমরা ছোটবেলা স্কুলে সরলাংক কষতাম। সেই ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ব্রাকেট, ভ্যাংকুলাম আর দশমিক, ভগ্নাংশ কণ্টকিত বিরাট বিরাট সেই সব অংক। মাথা ঠিক রেখে অসীম ধৈর্যে অংকগুলোকে ধাপে ধাপে কষে গিয়ে অবশেষে উত্তর পেতাম—শূন্য। মনে আছে তোর?"

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম।

প্রতুল বলতে লাগল—"আমার মনে হয় এই সৃষ্টিও তেমনি একটা সরলাংক। এর সব কিছু, সূর্য চন্দ্র ধূমকেতু, উল্কা, গ্রহ উপগ্রহ, নক্ষত্র ছায়াপথ তুই আমি কিংবা এই চায়ের পেয়ালাটা প্রতিটি ধুলো বালি সেই অংকের বাঁধনে বাঁধা। যার যা মান মানে ম্যাগনিচুড—সব ঠিক হয়ে আছে আগে থেকে। আর সেই স্থির ম্যাগনিচুড নিয়ে সব কিছু এমন একটা প্যাটার্নের ফাঁদে পড়ে গিয়েছে যার লক্ষ হল সেই ফল—শূন্য। কোনো কিছুর আলাদা কোনো সত্ত্বা নেই, পৃথক কোনো ভূমিকা নেই। এই যে তোর সঙ্গে আমার এই দেখা, কথা বলা কিংবা এই মুহূর্তে আকাশে কোনো একটা উল্কাপাত একটা মানুষের মৃত্যু বা একটা নতুন নক্ষত্রের জন্ম—সব কিছুই সেই অঙ্ক কষার নিয়মে ঘটে যাচ্ছে। হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ বছরে সেই বিরাট বিশাল সরলাংকের হয়ত একটা ধাপ কষা হচ্ছে. যে অংকের শেষ ধাপ হল শূন্য। একেবারে শূন্য। অনাদি অনন্ত পরিব্যাপ্ত মহাশূন্যতা। গ্রহ নেই. নক্ষত্র নেই. দশমিক নেই. আলো নেই. অন্ধকারও নেই. কিছু নেই. কিছু নেই—"কথা শেষ করে যেন হাঁফাতে লাগল প্রতুল। বুঝি ক্লান্তিতেই বুজে এল দু' চোখ। অনেকক্ষণ চোখ বুজে নিথর হয়ে বসে রইল। তারপর যখন আস্তে আস্তে চোখ খুলল প্রতুল, আমি খুব সন্তর্পণে প্রশ্ন করলাম—"কিন্তু প্রতুল. সে অংকটা কষছে কে?"

প্রতুল আমার মুখের দিকে তাকাল। জ্বল জ্বল করে উঠল দু' চোখ। গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলল,—"সময়।"

সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার প্রশ্ন করলাম, "আর অংকটা দিয়েছে কে?"

হঠাৎ যেন প্রতুলের চোখের জ্যোতি ম্লান হয়ে এল। দৃষ্টি নীচের দিকে নেমে গেল। মাথা ঝুঁকে পড়ল সামনে। স্পষ্টতই পরাস্ত পর্যুদস্ত প্রতুল রিক্ত কণ্ঠে বলল —"সে উত্তর এখনও পাইনি। পাব। নিশ্চয়ই পাব—"

প্রতুল যখন আর কোনো কথাই বলতে চাইল না, তখন হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ল। একটু ইতস্তত করে বললাম—"প্রতুল, একটা কথা। হয়ত তোর জানার কোনো প্রয়োজন নেই। তবু বলছি—"

প্রতুল জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল।

বললাম—"একটি ছেলের জন্ম দিয়ে ঊষা মারা গেছে। ছেলেটি বেঁচে আছে। বড় হয়েছে—"

হয়ত ভুল, দেখলাম প্রতুলের চোখে মুখে আনন্দ বিষাদের সহাবস্থান। প্রতুল কিরকম বিহ্বল ভাবে বলে উঠল—"মারা গেছে। ঊষা। ছেলে বেঁচে আছে।"—ক্ষণেক নীরবতার পর বলল—"তবে আর কি! তবে ত আমিও যেতে পারি—" বলতে বলতে দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল প্রতুল।

প্রতুলের সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। আজ আমি প্রৌঢ়। চাকরিতে উন্নতি করেছি। কলকাতার উপকণ্ঠে ছিমছাম দোতলা বাড়ি করেছি। মেয়ের বিয়ে দিয়েছি ডাক্তারের সঙ্গে। ইন্‌জিনিয়ার ছেলেকে পাঠিয়েছি বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রি পাবার জন্য। আর অর্জন করেছি ডিস্‌পেপসিয়া, ব্লাডপ্রেসার ও অনিদ্রা রোগ।

মাঝে মাঝে মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায়। কিছুতেই আর ঘুম আসে না। জানলা দিয়ে আকাশ দেখতে পাই। দেখতে পাই গ্রহ নক্ষত্র ছায়াপথ। রাস্তা দিয়ে পাগলা ঘণ্টি বাজিয়ে দমকল ছুটে যায় আগুনের সন্ধানে। আর তার প্রতিধ্বনিতে আমার মস্তিস্কের কোন প্রত্যন্ত কোণে যেন ঝং-ঝং-ঝং-করে একটা ঘণ্টা বেজেই যায়, বেজেই যায়। হঠাৎ একটা নিবিড় একাকিত্ববোধ, প্রগাঢ় অসহায়তা আমাকে গ্রাস করে ফেলে। আমি যেন আমার পরিবার পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক হয়ে যাই। সহসা আমার মাথা ঘুরে ওঠে। আমার চতুর্দিক নিবিড় অন্ধকারে ছেয়ে যায়, মুছে যায়, আর আমি সেই দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে বৃন্তচ্যুত পুষ্পের ন্যায় অকূল থেকে অকূলে ভেসে ভেসে ভেসে যাই।

আমার ভয় করে। কী—কেন—কোথায়—। কতগুলো অবয়বহীন প্রশ্নহীন অনুভূতি আমার বুকের কোটরে মাথা কুটে মরে। প্রতুল থাকলে হয়ত জেনে নিতে পারতাম।

প্রেম ও প্রেমালাপ

—ইন্দ্রজিৎ

প্রেমের কথা আর প্রেম বিষয়ক কথা এক নয়। একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, অপরটি পুঁথিগত—ইংরেজীতে যাকে বলে অ্যাকাডেমিক। একটিকে বলে প্রেমালাপ, অপরটিকে বলা যায় প্রেমের আলোচনা। প্রথমটির আকর্ষণ গোপনীয়তায়, দ্বিতীয়টির মজলিসিয়ানায়। একজন মানুষ যখন একান্তে আরেকজনের সঙ্গে মন-দেওয়া-নেওয়ার কথা বলে তখন তাকে বলে প্রেমালাপ। সেই একের মুখের কথা যদি দশের কানে যায় তবে আর প্রেমালাপের মান থাকে না। প্রেমালাপ দুজনের, প্রেমের আলোচনা দশ-জনের। দশের আসর না হলে সে আলোচনা জমে না—প্লেটোর প্রেম বিষয়ক Symposium যেমন জমেছিল। তবে একথা নিশ্চিত যে, বিষয় যতই রসালো হোক, অ্যাকাডেমিক আলোচনা শুনবার আগ্রহ বেশী লোকের থাকে না; কিন্তু সুযোগ পেলে প্রেমালাপ লোকে আড়ি পেতেও শুনতে চায়। অবশ্য এরা জানে না যে, সত্যিকারের প্রেমালাপ আড়ি পেতেও শোনা যায় না; কারণ, প্রেমের ভাষা সরব নয়, নীরব। প্রেমের কথা বলতে ভাষার প্রয়োজনই হয় না; নীরব চোখের চাহনি এবং দুই করতল স্পর্শেই মনের সকল কথা সচ্ছন্দে প্রকাশ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের আঁকা এই ছবিটি একবার ভেবে দেখুন—

তোমাতে আমাতে মিলিত নিবিড় একা—
স্থির আনন্দ মৌনমাধুরী ধারা,
মুগ্ধ প্রহর ভরিয়া তোমারে দেখা
তব করতল মোর করতলে হারা।

একে কি আপনারা প্রেমালাপ বলবেন না? আর এই যে প্রেমালাপ, এ কি আড়ি পেতে শোনা যায়? মদনের পুষ্পবাণ আর যাই হোক, শব্দভেদী বাণ নয়। প্রেমালাপের এই মজা—সে আলাপ চোখে বরং দেখা যায় কিন্তু কানে শোনা যায় না।

পশ্চিম দেশীয় পুরাণে প্রেমের দেবতাকে বলা হয়েছে অন্ধ, কিন্তু সে দেবতা যে তার ওপরে আবার বোবা এবং কালা সে কথা কেউ বলেনি। এটা আমার মনগড়া কথা নয়; বোবা কেন বলছি, শুনুন। মন যেখানে কানায় কানায় পূর্ণ, মুখের ভাষা সেখানে স্তব্ধ। শূন্য হৃদয় আর শূন্য কলসী সব সময়েই কলকণ্ঠ। প্রেমিক হৃদয় পূর্ণকুম্ভ, সেই কারণেই সে বোবা, তার মুখে কথা ফোটে না। যে প্রেম মানুষ মুখের ভাষায় প্রকাশ করতে পারে, ধরেই নিতে পারেন সে প্রেম অত্যন্ত অগভীর। আবার প্রেমের দেবতাকে কালা বলেছি এই কারণে যে, প্রেমিক প্রেমিকা একে অন্যের মুখের কথায় সহজে ভোলে না। প্রেমিকা না শোনে ধর্মের কাহিনী। মুখের কথা যতই মিষ্টি হোক, কার্যত প্রমাণ না পেলে প্রেমিকা তা কানেই তোলে না। বলে, থাক, থাক, কাজ নেই সোহাগে, অমন ঢের দেখেছি, ঢের শুনেছি। কাজেই এদের বোবা এবং কালা বললে খুব একটা অন্যায় বলা হয় না।

আমাদের পুরাণে প্রেমের কোন দেবতা নেই, কামের দেবতা আছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য পার্বতীকে দাম্পত্য প্রেমের দেবতা হিসাবে গণ্য করা হয়, বিবাহের পূর্বে গৌরীপূজার রীতি আছে। তাহলেও আমাদের দেশে সাধারণ মতে মদন বা কামই প্রেমের স্থলাভিষিক্ত। আমাদের শাস্ত্রে এই দেবতা অন্ধ নন, তাঁকে বলা হয়েছে অবিবেচক। বলেছে, বামঃ কামো নিকাম নিরঙ্কুশঃ অর্থাৎ কামদেবের কাজকর্ম সবই উল্টাপাল্টা এবং তিনি নিরতিশয় বেপরোয়া। বলা বাহুল্য, এসব নিঃসন্দেহে বিবেচনাহীনের লক্ষণ। প্রেমের দেবতা যে বিবেচনাশক্তি রহিত, একথা পশ্চিম দেশীয়রাও স্বীকার করেছেন। ইংল্যান্ডের প্রাচীন কবি বলেছেন, He that louyth is voyde of all reason অর্থাৎ প্রেমে পড়লে মানুষের বিবেচনাশক্তি থাকে না। আসলে অন্ধ এবং অবিবেচক—এই দুটি কথা সমার্থক। বিবেচনাহীন ব্যক্তিকে কার্যত দৃষ্টিহীন বলেই মনে হয়। কারণ, সকলে যা স্পষ্টত দেখতে পায়, প্রেমিক প্রেমিকারা তা দেখেও দেখে না। প্রেমিকের চোখে রূপহীনাকে রূপবতী মনে হয়, বুদ্ধি-হীনাকে বুদ্ধিমতী। তেমনি প্রেমিকার চোখে গুণহীন ব্যক্তিকেও গুণধর মনে হয়। প্রেমিকের চোখ সব সময়েই এককে আর দেখে। শেক্সপীয়ার যে প্রেমিককে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—Sees Helen's beauty in a brow of Egypt—তাতে ঐ অন্ধতারই ইঙ্গিত আছে। মোহকেই বলে অন্ধতা। প্রেমিক প্রেমিকারা যদি চক্ষুষ্মান হতেন তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রেম তেরাত্তিরও টিকত না। একের চোখে অন্যের স্বরূপ অনায়াসেই ধরা পড়ে যেত। মানুষের রূপ আর স্বরূপ যে এক নয়, সে কথা তারা বোঝে না।

এরা দুজন যে কেবল একে অন্যের সম্পর্কে অন্ধ এমন নয়, সমস্ত চতুষ্পার্শ্ব প্রতিবেশী পরিজন সম্পর্কে অন্ধ। তার প্রমাণ, প্রেমে পড়লে মানুষ এমন বোকার মত ব্যবহার করে, কথা বলে যে, অপরে তাই নিয়ে হাসে কিন্তু তাদের নিজেদের কাছে তা হাস্যকর মনে হয় না। অপরের কাছে নিজেদের যে হাস্যকর করে তুলছে তাও লক্ষ করে না। একজন-আরেকজনকে নিয়ে মগ্ন,

মুগ্ধ—আর কারো কথা ভাববার তাদের সময় নেই। সাধারণ সামাজিক ব্যবহারের একটা ব্যাকরণ আছে, এরা সেই ব্যাকরণ মেনে চলে না। ভালোবাসার ব্যাকরণের নাম মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ। মুগ্ধতা এবং মূঢ়তায় ব্যবধান যৎসামান্য, দুটোই অন্ধতার লক্ষণ। আর প্রেম যে শুধু অন্ধ নয়, বধিরও বটে তার প্রমাণ—প্রেমিক প্রেমিকার অদ্ভুত আচরণ দেখে কত লোক কত কথা বলে কিন্তু এরা নিজেদের নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত যে, লোকের কথা তাদের কানে কখনো প্রবেশ করে না।

অবশ্য লোকে কি বলবে, পরিণামে কি ঘটবে অত সব ভাবতে গেলে আর প্রেমে পড়া যায় না। প্রেমিক মানুষকে একটু বেপরোয়া বোহিসেবী হতেই হয়। ডি এল রায় বলেছেন—তারেই বলে প্রেম, যখন থাকে নাকো ফিউচারের চিন্তা, থাকে নাকো শেম্। কথাটা ফেলনা নয়। ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দ, লজ্জা শরম ইত্যাদির কথা ভাবতে গেলে এ পথে অর্থাৎ প্রেমের কণ্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন। অনেকে প্রেমকে বলেছেন ভীরু স্বভাব। আমি একথা বিশ্বাস করি না। ভীরু প্রেম মাঠে মারা যায় অর্থাৎ গন্তব্য স্থলে গিয়ে পৌঁছোয় না। ও ব্যাপারে ইতস্তত করেছেন কি মরেছেন। প্রেমিকা তৎক্ষণাৎ বুঝে নেবে প্রেমিক প্রবরের মুরোদ কতখানি। এইজন্যেই বলছিলাম প্রেমিক মানুষকে একটু বেপরোয়া হতে হয়। বেপরোয়া হওয়ার আরো কারণ আছে—প্রেমাস্পদার পছন্দ অপছন্দ, মেজাজ ইত্যাদি এবং তাঁর পিতা-মাতার মেজাজ, পছন্দ অপছন্দ এক নাও হতে পারে, সে ক্ষেত্রে গোলযোগের আশংকা থাকবেই। আর যদি পরকীয়া ব্যাপার হয় তা হলে তো অবস্থা আরোই বিপজ্জনক হওয়ার কথা। কাজেই রণাঙ্গনের মত প্রেমাঙ্গনেও বর্ম কুণ্ডল ইত্যাদি ধারণ করে অবতীর্ণ হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ অর্থাৎ পিঠে কুলো বেঁধে এবং কানে তুলো গুঁজে নেওয়াই নিরাপদ। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে দেবতার পুজো করতে গিয়ে মানুষ চক্ষু থেকেও অন্ধ হয়, কর্ণ থেকেও বধির হয় এবং বিদ্যাবুদ্ধি থেকেও বিবেচনাশক্তি রহিত হয়, সে দেবতাকে আমরা দেবতা বলব না অপদেবতা বলব। মানুষ যখন প্রেমে পড়ে এবং অদ্ভুত আচরণ করতে থাকে তখন তার ওপরে কি কোন অপদেবতা ভর করে?

আপনারা ভাবছেন আমি প্রেমের অবমাননা করছি। আমার এক দোষ, গুরু-গম্ভীর বিষয়ের আলোচনা করতে গেলেও পরিহাসের সুর এসে যায়। ওটা এখন মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়েছে। গভীর কথাতেও গাম্ভীর্য রাখতে পারিনে। অমিট রায়ের মতো ইন্দ্রজিতের "জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, ঐ গ্রহটি একটুখানি মুচকি না হেসে মরতেও জানে না।" স্বভাবের দোষ সহজে ছাড়ানো যায় না; নইলে সত্যি বলতে কি, আমি দেবতা অপদেবতা সকলকেই অত্যন্ত সমীহ করে চলি। স্বভাবদোষে বেফাঁস কথা যদি কিছু বলেও থাকি তাহলেও প্রেমের অবমাননা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। সাহিত্য এবং প্রেম—এই দু'এর মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। আমার মতে লেখক মাত্রই প্রেমিক এবং প্রেমিক মাত্রই লেখক। আমি আগে বলেছি যে, প্রেমিক মানুষ স্বভাবত মূক কিন্তু একথাও বলা প্রয়োজন যে, প্রেমিকের লেখনী অতিশয় মুখর। সকলেই জানেন যে, যে মানুষের মুখে কথা ফোটে না সে মানুষও দশ পাতার কমে প্রেমপত্র লেখে না। আমি প্রেমের দেবতাকে শুধু যে ভক্তি করি এমন নয়, ভয়ও করি। কারণ জানি যে, তিনি রুষ্ট হলে আমার লেখনীও আড়ষ্ট হবে। ইংরেজ কবি চসার তাঁর Legende of Goode Women নামক কাব্যের মুখ-বন্ধে বলেছেন, তাঁর অন্যতম কাব্যগ্রন্থে তিনি এক নিষ্ঠাহীনার (বলা বাহুল্য প্রেমের ব্যাপারে) কাহিনী লিপিবদ্ধ করে প্রেমের অবমাননা করেছিলেন, এজন্যে দেবতা স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁকে তিরস্কার করেন। চসার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রেমের গুণকীর্তন করে পূণ্যবতী পতিব্রতা Goode Womenদের কাহিনী অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেন। রসাসক্তির অপরাধে পাছে দেবতা রোষাবিষ্ট হয়ে আমাকেও অভিশাপ দেন, এই ভয়ে আমি স্থির করেছি স্বপ্নাদেশের অপেক্ষা না রেখে অবিলম্বে ভক্তিভরে প্রেমের কিঞ্চিৎ মহিমা কীর্তন করব। কিন্তু তার আগে আরেকটা সত্য কথা কবুল করে নেওয়া প্রয়োজন। আমি লেখক মানুষ, আমার কাছে সব চাইতে বড় দেবতা পাঠক। সর্বাগ্রে তাঁদের মন রক্ষা করে চলতে হয়। দেবতা সম্বন্ধে আমার এই বিশ্বাস আছে যে, তিনি কেবলমাত্র মুখের বাক্য শ্রবণ করে আমার বিচার করবেন না। আমার নিভৃত মনের প্রকৃত খবর তাঁর জানা আছে। দেবতা ভুল বুঝবেন না কিন্তু পাঠক অনায়াসেই ভুল বুঝতে পারেন। কারণ written wordকে তাঁরা অতিমাত্রায় প্রাধান্য দেন। আমার মুখের বাক্য এবং লেখার মন্তব্য যে আমার মনের কথা নাও হতে পারে এ কথা তাঁরা ভাবেন না। আমি মনের কথা লিখি না, মনের মতো কথা লিখি। এ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। মনের কথা হল সত্য কথা আর মনের মতো কথা হল রসের কথা। পাঠকের সঙ্গে আমার রসালাপের সম্পর্ক। রসালাপ হচ্ছে প্রেমালাপের nearest approach. আপনারা গল্পে উপন্যাসে যে প্রেমের কথা পড়েন তাকে বলে প্রেমের সংলাপ। আমি সংলাপ রচনা করি না, আমি রসের আলাপ করি—সংগীতের ওস্তাদ যেমন সুরের আলাপ করেন। ওস্তাদ আর সমঝদারের মধ্যে যে সম্পর্ক, আমার আর পাঠকের মধ্যে সেই সম্পর্ক। এটা প্রেমের সম্পর্ক, কাজেই এ আলাপকে প্রেমালাপও বলা যেতে পারে। তা ছাড়া আমার নিশ্চিত ধারণা আমার ন্যায় আমার সব পাঠকরাও প্রেমিক স্বভাবের মানুষ। প্রেমিক না হলে লেখক রসস্রষ্টা হয় না, আবার রসগ্রাহী হতে হলে পাঠককেও প্রেমিক হতে হয়। কাজেই প্রেম সম্পর্কে কোনপ্রকার অবমাননাকর উক্তি করলে পাঠকরা নিঃসন্দেহে আমার ওপরে রুষ্ট হবেন। এজন্যে বলে নেওয়া ভালো যে, ইতিপূর্বে প্রেমিক প্রেমিকা সম্পর্কে আমি যে সব কটূক্তি উচ্চারণ করেছি তা সমস্তই আপাতদৃষ্টিপ্রসূত। কথাটা একটু বিশ্লেষণ করে বললেই রসজ্ঞ পাঠকের কাছে আমার দোষ ক্ষালন হয়ে যাবে। আপাতদৃষ্টিতে সদ্য-প্রেমে-পড়া মানুষকে বুদ্ধিহীন, বিবেচনাহীন, লজ্জাশরম বিরহিত বলে মনে হয় বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা তা নয়। এরা একান্তভাবে স্বভাবের নিয়মাধীন। সংসারী মানুষ অপরে কি বলবে, কি ভাববে —তাই ভেবে আপন স্বভাবকে অবদমিত করে, তার আচরণ দশের প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্ধারিত হয়। সেই কারণে তার ব্যবহার অস্বাভাবিক এবং কৃত্রিম। অথচ সংসারী মানুষেরা তাদের নিজ আচরণবিধির কষ্টি-পাথরে যাচাই করে প্রেমিকদের আচরণকে বলে অস্বাভাবিক। বাস্তবিকপক্ষে প্রেমিক-দের ব্যবহার যতখানি স্বাভাবিক এমন আর কারো নয়। এরা শিশুর মত সরল; শিশু যেমন একান্তভাবে স্বভাবের অনুশাসন মেনে চলে, এরাও তেমনি। শিশুকে কেউ নির্বোধ বলে না; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ যখন স্বভাবের প্রেরণায় সহজ এবং স্বাভাবিক ব্যবহার করে তখন তাকে আমরা বলি নির্বোধ। সভ্যতার আদর্শ মতে স্বভাবকে যে পরিমাণে দমন করা যায় বুদ্ধির উৎকর্ষ সেই পরিমাণে প্রকাশ পায়। একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ না রাখলে প্রেমিক প্রেমিকার প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হয়।

মনে রাখতে হবে যে প্রেমিক যুগল যে জগতে বাস করেন সে জগৎ আমাদের নিত্য-দিনের অভ্যাসজীর্ণ জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সে জগতে সাময়িকভাবে দুজন মাত্র অধিবাসী—সেখানে সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এই জীবনের কলরব। অনেক কাল আগে দেখা 'কুইন ক্রিস্টিনা' নামক সুপ্রসিদ্ধ ছায়াছবির কথা মনে পড়ছে। রানী ক্রিস্টিনা জনৈক বিদেশী রাজদূতের প্রেমে পড়ে-ছিলেন। উক্ত রাজদূত স্বদেশে প্রত্যাগমন করলে বন্ধুরা কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করে-ছিলেন, ওদেশের জনসংখ্যা কত? ভদ্রলোক তখন প্রেমিকার চিন্তায় মশগুল। অন্য-মনস্কভাবে জবাব দিলেন, দুজন। আপাত-শ্রবণে জবাবটা হাস্যকর মনে হলেও আমি বলব, ভদ্রলোক খুবই সত্য কথা বলেছিলেন।

কারণ তাঁর জগতে অন্য কোন জনপ্রাণীর স্থান ছিল না। আরেকটি কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। প্রেমিকদের ব্যবহারে আমাদের চোখে যা কটু ঠেকে, আমরা যাকে বলি নির্বুদ্ধিতা বা নির্লজ্জতা, তাদের নিজেদের চোখে তার চাইতে মনোরম এবং মনোহর আর কিছু নেই। প্রেমিকের পক্ষে নির্লজ্জতা লজ্জার ব্যাপার নয়। আমাদের প্রেমিকশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়েছে 'নিলাজ', বৈষ্ণব কবিরা বলেছেন 'নিলাজ কানু'। কিন্তু তাই বলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রী এতটুকু নষ্ট হয়নি।

আমি গোড়ার দিকে প্লেটোর Symposium-এর উল্লেখ করেছিলাম। প্লেটো সেখানে প্রেম সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তাতে বলেছেন প্রেমের দেবতা ঠিক দেবতাও নয়, মানুষও নয়—এ দু-এর মাঝখানে তাঁর স্থান। তিনি তাঁকে বলেছেন স্পিরিট, অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী এক স্পিরিট। দেবতা এবং মানুষের মধ্যবর্তী বলে তার মধ্যে উভয়ের গুণ-সন্নিপাত ঘটেছে। বলা যেতে পারে—অর্ধেক মানব তুমি, অর্ধেক দেবতা, সংক্ষেপে নরদেবতা। স্বর্গ-মর্ত্যের সন্ধি-স্থলে তার বাস। প্রেমের অস্তিত্ব না থাকলে দেবতার স্বর্গ এবং মানুষের মর্ত্য সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যেত। প্রেম এই দু-এর মিলন-সেতু রচনা করেছে। কথাগুলো খানিকটা রূপকথার মতো শোনাচ্ছে। বলা বাহুল্য, রূপকের মধ্যেও সত্য থাকে, তবে তাই একমাত্র সত্য নয়। প্লেটো লিখিত সুসমাচারে আমার আস্থা আছে; তাঁর দেওয়া প্রেমের ব্যাখ্যা আমি মেনে নিয়েছি। তা ছাড়া, আমার নিজের ধারণা যে মানুষ প্রেমিক সে নিজেও মর্ত্যবাসী স্পিরিট। সে অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী মানুষ, অতিশয় সূক্ষ্মমনা বলেই তার চলন বলন আচরণ অন্যদের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। তার প্রেয় এবং শ্রেয় সংসারের প্রেয় এবং শ্রেয়র সঙ্গে মেলে না। এইজন্যেই সংসারী মানুষেরা প্রেমিকদের কখনো বলে বোকা, কখনো বলে পাগল। প্রেমিককে প্রেমিকের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হয়; সংসারী, বিষয়ী দৃষ্টি দিয়ে দেখি বলেই তার ব্যবহার আমাদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে।

প্রেমের বিচিত্র গতি, একান্ত সাধারণ জীবনযাত্রার সঙ্গে তার গতির ছন্দ মেলে না। আমরা তাকে বলি অদ্ভুত, বেচারীকে প্রচুর ঠাট্টা বিদ্রূপ সইতে হয়। অমুকে প্রেমে পড়েছে কথাটা এমনভাবে বলি যেন মস্ত বড় একটা কৌতুকের ব্যাপার। তা ছাড়া, এমন একটি ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকে যে, বাছাধন এবার মজাটি বুঝবেন। আমাদের আধুনিক কবি বলেছেন, প্রেমে পতন ছাড়া আর কিছু নেই। সিনিক্যাল উক্তি যাঁদের পছন্দ, তাঁদের কাছে কথাটা ভাল লাগবে। তবে আমার মনে এবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই যে, যে-মানুষ একবার প্রেমে পড়তে পেরেছে, সে সকল পতন থেকে রক্ষা পেয়েছে। কারণ, সে পরম প্রেয় এবং শ্রেয়কে লাভ করেছে। এজন্যে প্রেমিক মানুষকে আমি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। কোন মানুষ যদি দুদিনের জন্যেও কাউকে ভালোবেসে থাকে তো আমি বলব ঐ স্বল্পকালের জন্য he is a better man than he has ever been.

কারণ প্রেমের মত শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতা আর কিছু নেই। প্রেমিক মানুষের মন যেমন স্নিগ্ধ, যেমন নম্র, যেমন মার্জিত, এমন আর কারো নয়। এ ছাড়া আমার মতে, কাউকে ভালোবাসতে পারা এবং কারো ভালোবাসা পাওয়ার জন্য বিশেষ প্রতিভার প্রয়োজন হয়, বেশির ভাগ মানুষেরই সে প্রতিভা থাকে না। এ জন্য প্রেমিক মানুষ মাত্রকেই আমি প্রতিভাবান মানুষ বলে মনে করি।

আফ্রিকার চিঠি

কো বিনাক্রম অর্থাৎ কোবিনাপুর থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে। গ্রামের এক নম্বর কোম্পানীর ক্যাপ্টেন গতায়ু। আজ তাঁর প্রতি শোক প্রকাশ করা হবে। কোবিনাক্রমের মোড়লের ভাগ্নে কোয়েকুর সঙ্গে বহুদিনের আলাপ। কেপকোস্টে তার 'চপ বার' অর্থাৎ রেস্তোরাঁ আছে। খদ্দেরদের একদিন ছুটি দিয়ে সে আমার সাথী হল।

পথে আসতে আসতে কোয়েকুর মুখে কোবিনাক্রমে নিমন্ত্রণের বিশ্লেষণ শুনি। প্রতি ফান্টি গ্রাম ও শহরে এক বা একাধিক আসাফো কোম্পানী আছে। প্রতিটি নাগরিক সাধারণত তার বাবার কোম্পানীতে যোগ দেয়। প্রাচীনকালে যুদ্ধ বাঁধলে এদের নিয়ে গড়া হত সেনাদল। যুদ্ধ শেষে এরা বানাতো ঘরবাড়ি, খুঁড়তো পাতকুয়ো আর সাফ রাখত রাস্তাঘাট। আর এসব কাজ না থাকলে এক কোম্পানী অন্য কোম্পানীর পেছনে লাগত। এবং খুনসুটি ও টিটকারি থেকে প্রায়শ লেগে যেত মারপিট ও দাঙ্গা হাঙ্গামা। অনেকদিন আগে একবার কেপকোস্ট শহরে দুদল কোম্পানীর ভেতর এমন দাঙ্গা হয় যে বহু লোকের প্রাণহানির সঙ্গে শহরের প্রায় অর্ধাংশ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এমন রক্তপাত অন্যত্রও হয়েছে এবং হয়েছে এমন কারণে যা আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে তুচ্ছ বলে মনে হয়। এই সব লড়াইয়ে আসাফো বীরদের শৌর্যবীর্য নিয়ে আসাফো কবিরা গান বেঁধেছে আর আসাফো শিল্পীরা কোম্পানীর নিশানে লিখেছে ফান্টি প্রবাদ, এঁকেছে ছবি।

কোয়েকুর কথা শুনতে শুনতে এসে পড়লাম কোবিনাক্রমে। ছোট্ট গ্রাম, আম-তাল-নারকেল ঘেরা। গ্রামের মাঝখানে খোলা এক জায়গায় জড় হয়েছে জন পঞ্চাশেক লোক। খানিকটা তফাতে একটা হাতল ভাঙ্গা চেয়ারে বসে আছেন কোয়েকুর মামা, এ গ্রামের মোড়ল। তাঁর ডানদিকে একটি ইঁটের গোলাকৃতি ঘর এবং তার পাশে উঁচু কাঠ পোঁতা।

কোয়েকুর বলল, "ওই যে দেখছেন নৌকোর মাস্তুলের মত লম্বা কাঠ, ওই হল পতাকা স্তম্ভ। নাচের সময় ওইখানে কোম্পানীর নিশান উড়বে রঙবেরঙের। আর ওই যে গাছের চারদিকে বাঁশ চিরে বেড়া দিয়েছে ওকে বলে পোসুবান। প্রত্যেক কোম্পানী পোস্টেই আপনি এ জিনিস পাবেন। একে ঘিরে কোম্পানীর মাতব্বরেরা বসবে, ক্যাপ্টেনরা কেন্টে কাপড় কোমরে জড়িয়ে নিশান হাতে নাচবে এর চারদিকে।'

কোয়েকুর কথা শেষ হতে না হতে ড্রাম বেজে উঠল। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি কোম্পানী পোস্টের অদূরে আমগাছের ছায়ায় বেঞ্চি পেতে ছায়ারই মত নিঃশব্দে বসেছিল কোম্পানীর বাজনদারেরা। মাঝখানে যে, তার দু'পায়ের মধ্যে রাখা দু'হাত উঁচু ড্রাম, তার এক হাতে ঢাকের কাঠি অন্য হাতের সঙ্গে তাল রাখছে, ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত আর মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। এর দুপাশে দুজন বাজাচ্ছে গংগং, পেটা লোহার পাতের ওপর লোহার রড দিয়ে তালে তালে পেটানো। আমাদের ঢোলের সঙ্গে কাঁসীর মত ফান্টি ড্রাম আর গংগং হরিহর আত্মা। এ ছাড়া আরও জন আট দশ লোক এদের ঘিরে বসে আছে। এরা হল গায়ক ও 'তালিবাদক'। ড্রাম বাজানো একটু জমে উঠলে এদের মধ্যে দুজন দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে আঙুল নেড়ে গান শুরু করল। আর বাকীরা চোখ বুজিয়ে ঘাড় দুলিয়ে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাততালি দিতে লাগল।

আমি ভাবলাম এ বুঝি এদের কবির লড়াই।

কোয়েকু কিন্তু বলে, 'লড়াই এটা মোটেই নয়। আর লোকগুলোও কিছু পদ্য লেখে না। আসলে এরা একই গান গাইছে। তবে যে গান ধরেছে, তাতে মনে হয় লড়াই লাগল বলে দু'নম্বর কোম্পানীর সঙ্গে।'

জিজ্ঞাসা করি, কটা কোম্পানী আছে এ শহরে?'

কোয়েকু বলে, 'মাত্র দুটো, স্যার। তার জ্বালাতেই মরছি সবাই! ভেবে দেখুন অন্য শহরের কী অবস্থা। আনোমাবুতে আছে চারটি, কেপকোস্টে সাতটা আর এলমিনাতে দশটা।'

হঠাৎ দুম করে বন্দুকের আওয়াজ হল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা। তারপর কয়েকটা একের পর এক। তবে কি লড়াই শুরু হয়ে গেল?

কোয়েকু বলে, 'কিছু ভয় নেই স্যার। আমাদের ক্যাপ্টেনরা ফাঁকা আওয়াজ করছে। বেচু ব্যাটার ভাগ্য ভাল, সাতটা গান শট পেল। ব্যাটা স্বর্গ থেকে নিশ্চয়ই ফিক ফিক করে হাসছে।'

আমি প্রশ্ন করি, 'বেচু কে?'

'আমাদের ক্যাপ্টেন, সেদিন যে মারা গেল। তার জন্যেই তো আজকের আয়োজন, স্যার।'

ঠিক বটে, ক্যাপ্টেন না হলে এত লাগত? এবার বন্দুকধারীরা বারুদের গন্ধ গায়ে মেখে বুক ফুলিয়ে ফিরে এল, যদিও সংখ্যায় তারা মাত্র দু'জন এবং তাদের

হাতে ৪০।৫০ বছর আগেকার গাদা বন্দুক। আবার ড্রাম ও গংগং বেজে ওঠে। বাজনাদারদের সহকারীরা হাততালি দেয়। এবং তৎসহ শূন্যে তিন হাত লাফ দিয়ে, এক হাতে ছ'ফিট লম্বা তিন ফিট চওড়া নিশান ও আর এক হাতে কেপ্টে কাপড় সামলাতে সামলাতে আসাকো নাচ। নাচ উদ্দাম হয়ে উঠলে দু'জন গায়ক উঠে দাঁড়ায় এবং যথারীতি একে অন্যের দিকে আঙুল দেখিয়ে তারস্বরে গান শুরু করে দেয়। যেন গানের মর্ম চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে। কোয়েকুকে সভয়ে প্রশ্ন করি, 'এ গানে মারামারির চান্স নেই তো?'

কোয়েকু বলে, 'নেই আবার? ওরা কী গাইছে জানেন? এ গানটার মর্ম হল 'ক্যাপ্টেন ওসেই, এ টুপিটা কি তোমার?' বলেই কোয়েকু ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে থাকে।

আমি বলি, "এ গানে রসিকতাই বা কোথায় আর দু নম্বর কোম্পানীই বা চটবে কেন?"

কোয়েকু গলা খাটো করে চোখদুটো টোম্যাটোর মত পাকিয়ে বলে, "জানেন না বুঝি? ১৯৫৯ সালে আমরা একবার ওদের অ্যায়সা ধোলাই দিয়েছিলুম যে, ওদের ক্যাপ্টেন কোফি ওসেই তার টুপি ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে আমরা এ গানটা বেঁধেছি।"

মনে পড়ে গেল, এখানকার মোড়ল বলছিলেন বটে এই দাঙ্গার কথা। সেবারও একজন হোমরাচোমরা কেউ মারা যাবার পর তার প্রতি শোকপ্রকাশের জন্য এক নম্বর আসাকো কোম্পানী এমন এক জমায়েতের আয়োজন করে। জমায়েতে নাচ, গান, ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ এবং আকণ্ঠ মদ্যপানের পর এরা যখন শহর প্রদক্ষিণ করছিল, তখন দু নম্বর কোম্পানীর কিছু লোক এদের বাধা দেয়। তাদের বক্তব্য ছিল, দু নম্বরের কোন কোন নিশানের কপিরাইট ছবি এক নম্বরের লোকেরা নিজেদের নিশানে এঁকে লাগিয়েছে। আসাকো মহলে এ হল জবরদস্ত অপরাধ। অতএব লেগে গেল হই হই মারপিট। ফলে কয়েকজন নিহত ও বহু আহত হয় এবং দু নম্বরের শোচনীয় পরাজয়ে এক নম্বরের গায়কেরা বিদ্রূপ করে গান বাঁধে 'ক্যাপ্টেন ওসেই, এ টুপিটা কি তোমার?'

কোয়েকুর উত্তেজনা ও আমার উৎসুক্য সত্ত্বেও কোনিনক্রমে সেদিন মারামারি লাগল না। এক নম্বরের গুলিবিহীন গাদাবন্দুকধারীরা তো সাতটি ফাঁকা আওয়াজ করে লাউয়ের খোলার এমন আপাদমশি অর্থাৎ স্থানীয় 'হাই পাওয়ার' সোমরস সেবনে লেগে গেল যে, কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের একজন লম্বা হয়ে শুয়ে নাক ডাকাতে থাকে। আর ক্যাপ্টেন ওসেই-এর অনুচরেরা দূর থেকে একে মুহুর্মুহু বন্দুকের আওয়াজ ভেবেই হয়ত কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না।

উঠব উঠব মনে করছি, এমন সময় এক বৃষস্কন্ধ এসে হাজির। এর পরনে হাফ প্যাণ্ট, উর্ধ্বাংগে রঙীন চেকনাই কনুইকাটা কামিজ, বাঁ কাঁধের একপাশ বেয়ে ঝলমলে কেপ্টে উঠেছে পরতে পরতে। নাক আর মুখের ফাঁক ভর্তি করে কঙ্গোর জঙ্গলের মত গজিয়েছে পাকানো গোঁফ, তার ছুঁচলো মুখদুটো সুড়সুড়ি দিচ্ছে দেড় ইঞ্চি চওড়া ও গালের মাঝ বরাবর নেমে আসা জুলফিপ্রান্তে। আমি তো ধরে নিয়েছি ওদের সেই ক্যাপ্টেন ওসেই এসে উপস্থিত হয়েছে। কোয়েকু কিন্তু চুপিচুপি বলে, "এই হল টুফুহেনে অর্থাৎ সেনাপতি। সারা গ্রামের দুটো কোম্পানীর কম্যান্ডার। আপনার সঙ্গে করমর্দন করতে চায়।" টুফুহেনে আমার হাত ধরে এমন করমর্দন করল যে, সাত দিন তৈলমর্দনেও তার ব্যথা যায়নি এবং আফ্রিকার চিঠি লিখতে লিখতেও তা টের পাচ্ছি। টুফুহেনের বাজখাঁই চেহারার তুলনায় গলাটা নেহাতই লালিমা পালীয় (পুং)। কলকাতায় থাকলে ভদ্রলোক আধুনিক গানে নাম করতে পারতেন, যদিও গোঁফের জন্যে তাঁকে হয়ত নেপথ্যে 'প্লে-ব্যাক' করেই সন্তুষ্ট থাকতে হত।

মিনমিনে গলায় যতটা উদাত্ত হওয়া সম্ভব ততটা হয়ে টুফুহেনে বলেন, "স্বর্গত ক্যাপ্টেন বেডুর প্রতি যথাযথ শোকপ্রকাশ আমাদের মহত্তম দায়। এ দিনে যাতে মারামারি না বাধে, সেদিকে আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছি। বিশেষত যখন—" (বলে আমার দিকে হাতের চেটো উল্টিয়ে দেখিয়ে) "বিশেষত যখন এই ধান অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকটি আমাদের অতিথি।" আমি আড়চোখে একবার আমার গায়ের রঙের দিকে না দেখে পারি না। ছেলেবেলায় মামাসীরা স্নেহভরে আমার গায়ের রঙকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ আখ্যা দিতেন। টুফুহেনের সম্বোধনে সে ব্যাজস্তুতিও ম্লান হয়ে যাওয়ায় আমার মুখ দিয়ে নিগলিত [illegible] ছাড়া আর কিছু বেরোয় না।

ইতিমধ্যে টুফুহেনের পেছনে আর একটি লোক এসে দাঁড়িয়েছে। এর পরনে দু'ঘরা [illegible] পোশাক হাঁটু পর্যন্ত ঝুলছে, গলায় [illegible] মত মালা, হাতের কব্জিতে রাখীর মত সুতো বাঁধা, [illegible] আর মাথায় [illegible]। [illegible] মিলিয়ে [illegible] ইনি [illegible] কোম্পানীর পুরোহিত।

কোয়েকু গলার স্বর নামিয়ে বলে, "ইনি [illegible] নানা রকম [illegible] পুজো-আচ্চা করেছিলেন।"

আমি জিজ্ঞেস করি, "দাদা মানে তো দাদামশাই, মানে মা'র বাবা?"—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে এ নামে আমরা চীফকেও ডাকি, আর ডেকে থাকি ছোটখাট দেবতাদের। আটা কাকড়াবা মানে ছোট আটা। একজন বড় আটা-ও আছেন, তার পুজো যোগায় দু-নম্বরের শালারা। আমাদের এ দেবতারা হলেন বনজঙ্গলই।"

পুরুতমশাই জানালেন, আয়োজন প্রস্তুত। এবার আমরা তাঁর সঙ্গে গেলেই তিনি দেবতার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য নিবেদন করবেন। কোয়েকু জিভ কেটে বলে, "ভুল হয়ে গেল, সার। আমাদেরও কিছু আনা উচিত ছিল।"

আমি ঈষৎ বিরক্ত হয়ে অভিযোগ করি, "আগে বললেই পারতে, বাগানের কলা আর পেঁপে ছিল—"

"পেঁপে-কলা!!" কোয়েকু আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বোধ হয় যাচাই করে

নেয়, আমি ঠাট্টা করছি কিনা। তারপর গম্ভীর হয়ে বলে, "পেঁপে-কলা আটা কাকড়াবা ছোঁবেন না। শুধু আটা কাকড়াবা কেন, কোন দেবতাই নয়। আনতে হয় হাঁসের ডিম, মোরগের বাচ্চা, আর তৃষ্ণার শান্তি জিন রম্, স্নাপস্ আপার্টেশি, কি নিদেন পক্ষে ফুফুন্সা।" শেষোক্তটির উচ্চারণে তার এমন মুখবিকৃতি হয় যে, আমার বুঝতে বাকি থাকে না, ফুফুন্সা অর্থাৎ তালরসের তাড়িতে দেবতা কেন ভক্তরাও বিশেষ খুশী হবে না।

পুরুতঠাকুরের নেতৃত্বে আমাদের ছোট্ট মিছিলটি বনের মধ্যে পায়ে চলা পথ ধরে যেখানে গিয়ে পৌঁছল সেখানে নারকেল গাছের ছায়ায় দেখা যায় দুটো জলাশয়। বুঝলুম এই হল আটা ভ্রাতৃদ্বয়ের ডেরা। এইখানে পুরুতমশাই প্রথমে একটা পাথরের ওপর ডিম ছুঁড়ে মারলেন আটা কাকড়াবার উদ্দেশে, তারপর বোতল থেকে আপার্টেশি ঢাললেন, সঙ্গে সঙ্গে বললেন মন্ত্র :

"ভগবান, নিয়াক্রোপং, সর্বশক্তিমান,
ধরিত্রীর দেবী : আসাসে এফুআ,
সাগর দেবতা : মেনসা পো,
আর যাঁরা আছেন দেবদেবী,
এবং সর্বোপরি আটা কাকড়াবা,
এই নিন্ আপনাদের পানীয়।"

মন্ত্র নিবেদন শেষ হতে না হতেই ড্রাম বেজে উঠল। এবং পুরুতঠাকুর নারকেল-কাঠির ছোট ঝাঁটা (এটাই তাঁদের দৈবানুগ্রহের প্রতীক) হাতে নাচ শুরু করলেন। প্রথমে টেণ্টে, আটা কাকড়াবার প্রিয় নৃত্য। পরে আসাফো নাচ, কারণ উপলক্ষ আসাফো কোম্পানীর শোকসভা।

নাচ দেখতে দেখতে নারকেল গাছের ছায়া লম্বা হয়ে এল। সূর্য ক্লান্ত হয়ে চলে পড়ল দিগন্তে। পঞ্চমীর চাঁদ মুচকি হেসে হাজির। এবার আমরা চলি গ্রামের দিকে। সেখান থেকে কোবিনাক্রমের মোড়লকে বিদায় জানিয়ে ঘরে ফেরা।

পথে আসতে আসতে কোয়েকুকে বলি, "ক্যাপ্টেন বেডু নিশ্চয়ই খুব জনপ্রিয় ছিল। যা আয়োজন ওরা করেছিল—"

কোয়েকু হা-হা করে হেসে ওঠে।

"বেডু জনপ্রিয়? ব্যাটা হাড়বজ্জাত ছিল। যতদিন বেঁচে ছিল আমাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে। এর গাছের কলা পেড়েছে, তার মুরগীর বাচ্চা মেরে খেয়েছে। কোয়েসি আড়োর বউটাকে তো ওই নষ্ট করল। তবে হ্যাঁ, দু নম্বরের শালাদের শায়েস্তা করতে ওর জুড়ি কেউ ছিল না।"

তারপর কাছে সরে এসে গলা খাটো করে কোয়েকু বলে, "ক্যাপ্টেন ওসেই-এর টুপিটা তো ও-ই কেড়ে নিয়েছিল। হা-হা-হা। হা-হা-হা।"

অংশুমান দত্ত

যেতে গেলে আরতলীতে নেমে খাওয়াই সুবিধে। নইলে অকারণ দূর হয়। আলমোড়া থেকে সাড়ে এগারোটা নাগাদ আরতলীর বাস ছাড়ার কথা। কিন্তু ছাড়ল না। বাস গেছে খারাপ হয়ে। সুতরাং ট্রিপটাকেই ওরা বাতিল করে দিয়েছে।

অপাংশুরা খুব মুশকিলে পড়ল। টিকিট অবধি কাটা হয়ে গেছে। টিকিট খানিক আগেই কেটে রাখতে হয় নইলে বসবার জায়গা পাওয়া যায় না বাস-এ। অপাংশুরাও কেটে রেখেছিল। এখন এ কি ঝামেলা! শেষ মুহূর্তে বলছে বাস অচল।

অথচ এদিকে বাক্স, বিছানা, টিফিন কেরিয়ার, ফ্ল্যাস্ক, ক্যামেরা সব হোটেল থেকে নামিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। হোটেলের ম্যানেজারকে বলে দিয়েছে ওরা তিন দিন থাকবে না। আবার সেখানে গুটিগুটি অপরাধী ছেলের মতো ফিরে যেতেও ইচ্ছে করছিল না। গুমটির কাছে রাখা জিনিসপত্তরের মাঝখানে বসে পড়ল অপাংশু।

সবচেয়ে সামলানো কঠিন হবে কুন্তীকে। ওর অপরিসীম উৎসাহেই বলতে গেলে এই বাইরে আসা। নইলে শক্ত শক্ত দর্শনের বই মুখে করে নিতান্ত ঘরোয়া হয়ে থাকার বদনাম আছে অপাংশুর। লোকে তাকে এর মধ্যেই বুড়ো বলে। অথচ ওর বয়স এই সবে আটত্রিশ। জুলপিতে কয়েকটা চুল পাকা যদি বৃদ্ধত্বের লক্ষণ হয়, তাহলে অপাংশু অবশ্য বুড়ো। তবে হয়তো ওর স্বভাবে কোথাও এক স্থায়ী স্থিরতা আছে। সেটা ওকে অনেক সময় বাধা দেয়। ওদের মতো কারণে-অকারণে চঞ্চল হতে দেয় না। কুন্তীর মতো তো নয়-ই।

কুন্তী আজো আকাশে মেঘ করলে অস্থির হয়ে পড়ে। সিনেমা-আর্টিস্ট মরে গেলে হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে। রাস্তায় একটা কুকুরছানাকে ধুঁকতে দেখলে তাকে কুড়িয়ে নিয়ে আসতেও যেমন তার বাধে না, তেমনি পরের দিন কোন কারণে বিরক্ত হলে 'এক্ষুনি বিদায় কর' বলে অপাংশুকে সে অস্থির করতেও পারে অনায়াসে। হিমালয়ে আসতে তার যত উৎসাহ, কলকাতা থেকে ছোট লাইনের ট্রেনে করে আঁটপুর যেতেও তার ঠিক তেমনি উৎসাহ।

'এখন, কী করবে...কুন্তী?' অপাংশু বলল।

'কিসের?'

'খাওয়ার ব্যাপারে। এত হাঙ্গামা করে যাবে না টিকিট ফেরত দিয়ে দেব?'

কোথায় ছিল ধর্মেন্দ্র, সে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, 'খাট, উই আর গোর কর ইউ!'

সঙ্গে সঙ্গে কুন্তীও বলল, 'হ্যাঁ, এত আয়োজন করে শেষ পর্যন্ত না-যাওয়ার কোন মানে হয়? বরুণ তো গেছে জানতে। নিশ্চয়ই যাবার আর কোন ব্যবস্থা আছে!'

অপাংশু কুন্তীর কথায় কোন জবাব দিল না, ধর্মেন্দ্রকে বলল, 'তোমাদের কি, তোমরা তো নেচে ওঠবার জন্যে তৈরি। ভাব, প্রাণ ভরে ভাব!'

তোমার মাতৃভাষা / অসিত গুপ্ত

অপংশ্ন একটি সিগারেট ধরায়। ধরিয়ে দূরে ভিজে ভিজে পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে। তখনো পাহাড়ের তলায় তলায় মেঘ পুরু ধোঁয়ার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। কোথাও এক খণ্ড মেঘ পাহাড়ের চূড়োর সঙ্গে ফ্রেম করা। যেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুই বন্ধুতে ছবি তুলিয়েছে। আশ্চর্য, আদিতে প্রকৃতি ছিল স্বাভাবিক। এখন কি ভীষণ কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। নাকি মানুষ নিজের মনের মাপেই , সব কিছু বিচার করতে চায় বলে প্রকৃতিকে তার এখন কৃত্রিম ঠেকে?

নইলে পাহাড়ের পাশে এক খণ্ড মেঘের স্থির হয়ে থাকা দেখে অপাংশুর মনেই বা ঐ ফ্রেমের উপমা উদয় হবে কেন!

পুরো ভাত খাওয়ার পর ঘুরে ঘুরে আপেল খাচ্ছিল ইন্দ্রনাথ। ডাওয়ালীর আপেল। কলকাতায় থাকতে বছরে একবার আপেল খাওয়া হয় কিনা সন্দেহ। এখানে সস্তায়, অপর্যাপ্ত আপেল পেয়ে সে প্রাণপণে খেয়ে চলেছে। তার ওপর বিলক্ষণ স্বাস্থ্য-স্বাস্থ্য বাই আছে ওর। স্বাস্থ্য ও আপেলকে সে এখানে বলতে গেলে প্রায় 'রচুয়াল করে ফেলেছে।

ঘুরতে ঘুরতে ইন্দ্রনাথের মনে হল, খাওয়া সম্বন্ধে ওর বোধ হয় কিছু বলা দরকার। আপেলের অখাদ্য অংশটুকু ক্রিকেটের বল ছোড়ার মতো সাঁই করে ছুড়ে দিয়ে (অপাংশু জানে কেন এই ছোড়াছুড়ি! ও যে একদা খেলোয়াড় ছিল সেকথা যখন-তখন প্রমাণ করতে পারলে খুশী, বিশেষ করে কুন্তীর সামনে। সকলের সব কেরামতি যে আপাতত ওই এক ঈশ্বরীর জন্যে তা কি অপাংশু জানে না) সে বলল, 'কিন্তু প্রফেসর, এর অলটারনেটিভ কী? এত তোড়জোড় করে শেষে...'

'চল। বুঝতে পারছি তোমাদের সকলেরই যাবার ইচ্ছে।' অপাংশু বলল।

কুন্তী বলল, আহা, এরকম হবে জানলে সেই লোকটার জীপে চলে গেলেই হত।!' 'সেই লোকটা' মানে উত্তর প্রদেশের এক ধড়সড় অফিসার। জীপ করে আজ সকালে যোগেশ্বর গেছে। যাবার সময় অপাংশুদের নিয়ে যেতে চেয়েছিল। নৈনিতাল থেকে আল-মোড়া আসবার সময় বাস-এ আলাপ।

কিন্তু অপাংশুরা তখন যোগেশ্বরের ফরেস্ট ডাক-বাংলোর কেন্ট দেখছিল। দিন তিনেক ওরা সেখানে থাকতে চায়। সকালে জীপ ছুটিয়ে গিয়ে বিকেলে ফিরে আসতে চায় না।

অপাংশু কুন্তীর দিকে তাকিয়ে হাই তুলল। ওকে পুরোদস্তুর ট্যুরিস্ট-ট্যুরিস্ট দেখাচ্ছে। মাথায় ভেল, চোখে রোদ্দুরের চশমা, দিনমানেও গাঢ় রঙের এক শাড়ি পরেছে, ঠোঁটে পলাশের আভা। নাঃ, সত্যি কুন্তী বিপজ্জনকভাবে আকর্ষণীয়।

স্বামী হিসেবে এর জন্যে অপাংশুর মনে গর্ব ছিল আবার অস্বস্তিও ছিল প্রচুর। অস্বস্তির কারণ আর কিছু নয়। সম্ভবত ওরা দুজন স্বভাবে আলদা বলে। অপাংশু যদি সকাল-সন্ধ্যে হয় তো কুন্তী নিশ্চয়ই দিন-দুপুর। অপাংশু যদি খানিক খোলা, খানিক ভেজানো হয়, তবে কুন্তী হয় হাট করে খোলা নয় বন্ধ করে একেবারে খিল চেপে দেওয়া।

অপাংশুকে তাকাতে দেখে কুন্তী হঠাৎ নিজের শরীর পাতার মতো কাঁপিয়ে তুলল, (অপাংশু এ-ও জানে এ কাঁপুনি তার জন্যে নয়। তার জন্যে কুন্তীর শরীর আজকাল কাঁপে না যে!) তারপর খুব সাধারণভাবে নয়, গলায় একসঙ্গে স্নেহ, অনুরাগ, ফ্লার্ট, সেক্স সব মিশিয়ে অদ্ভুতভাবে বলল, 'তুমি আর আপত্তি করো না প্লীজ। ওখানে না যেতে পারলে আমি মরে যাব!'

অপাংশু ওর এই মাত্রাতিরেকে অবাক হল

না। ওর গলার স্বরে, বলার ধরনেও না। ভুল সময়ে, ভুল জায়গায় কুন্তী অনেকবারই মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছে। ভেবে দেখলে এর মধ্যে হাজারবার জন্মে গেছে কুন্তী। তবু আশ্চর্য ও একইরকম আছে। ওর অভিজ্ঞতায় কিছুমাত্র হেরফের হয়নি।

এইসব দেখে-শুনে অপাংশুর ধারণা হয়েছে, কুন্তী হয়তো নিজেই জানে না, ও ঠিক কী চায়! দুঃখ অথবা আনন্দ কিছুকেই ও উপযুক্তভবে ভোগ করতে পারে না, তার আগেই ও ভেবে ভেবে সারা। নিজেকে সব সময় এক মধুর ভ্রান্তির আস্তর দিয়ে আড়াল করে রাখে। এই আড়ালটুকুই ওর মুক্তি। আসলে এটাও একরকম আবেগের রক্তশূন্যতা বই কিছু নয়।

এই সময় বরুণ এসে গেল। কুমায়ুন বাস সার্ভিসের কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছে সে। ওকে দেখে চার মাথা এক হল।

'কী খবর পেলে, বরুণ?' অপাংশু জিজ্ঞেস করল।

বরুণ বলল, 'আরেক ভাবে যাওয়া যেতে পারে।'

'যেমন?'

'বেলা দেড়টার সময় একটা বাস ছাড়বে...।'

'একটা বাস ছাড়বে তাহলে।' ধর্মেন্দ্র আনন্দে শিস দিল।

'গড বি উইথ আস।' ইন্দ্রনাথ বলল।

কুন্তী কিছু বলল না, কিন্তু আতিশয্যে ইন্দ্রনাথের একখানা হাত চেপে ধরল।

অপাংশু বলল, 'আঃ ওকে তোমরা বলতে দাও। আগে শুনি......।'

'বাসটা পুরোয়ানালায় তোমাকে নামিয়ে দেবে। এই ধর সাড়ে চারটে-পাঁচটা নাগাদ...'

'বেশ, তারপর? হোয়ট নেক্সট?'

'তারপর অফকোর্স হাঁটা। আড়াই মাইল কি পৌনে তিন মাইল তোমাকে হাঁটতে হবে পাহাড়ের ওপর দিয়ে ট্রেক করে...'

ধর্মেন্দ্র উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল, 'ওহ, হোয়ট এ থ্রিল!'

ইন্দ্রনাথ ছড়া কাটল, 'অ্যাবড দ্য হিল...'

কুন্তী হেসে বলল, ‘আমারো মেলানো উচিত ছিল। কিন্তু আমি খাপ্ মেলাতে পারছি না...।’

অপাংশু বিরক্ত হল ওদের আধিক্যে। ‘বরুণ, তুমি ওদের কথায় কান দিও না। কি বলছিলে বল!’

‘এই তো বললুম। এখন তোমরা কি ঠিক করবে কর।’ বলে বরুণ সকলের কাছে সমর্থন খুঁজল।

‘না, না। আসল কথাই তো জানা হল না।’ অপাংশু বাধা দিল। ‘তোমার ওই পুনোয়ানালা না কি, ওখানে পৌঁছুব কখন? তারপর সেখান থেকে...’

‘পুনোয়ানালায় পৌঁছুতে পাঁচটা বাজবে। তারপর ধর, ফরেস্ট ডাক-বাংলোয় পৌঁছুতে পৌঁছুতে সাতটা হবে। ব্যস, আমার আর কোন খবর নেই। নাউ, ইট ইজ আপ টু য়্যু টু ডিসাইড।’

খবরের শেষে বরুণ অপাংশুর পাশে বসে পড়ল ধপাস করে।

আকাশের তখনো মুখ ভার। বোঝা যায়, রোদ্দুরের সঙ্গে মেঘের কোথাও কোথাও ঠান্ডা লড়াই চলেছে। গত রাত্তিরে আলমোড়ায় হঠাৎ বৃষ্টি নেমেছিল। বন্ধ জানলার বাইরে বাতাসের ক্রুদ্ধ তর্জন-গর্জন শুনে কখন যেন ঘুম ভেঙে যায় অপাংশুর। চোখ মেলে সে প্রথমটা কিছুই ঠাহর করতে পারেনি। এক মস্ত কালির গামলা কে যেন সারা ঘরটায় উপুড় করে রেখেছে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সুইচ জ্বালতে গিয়ে সে দেখে বাতি নেই।

তখন টর্চ নিয়ে দরজা খুলে বাইরে আসে। রাস্তার বাতিও নিবে গিয়েছিল। আকাশ, দূরের পাহাড়, লোকালয় কিছুই আলাদা করে চিনে নেওয়া যাচ্ছিল না। মানুষ মরে যাবার পর কালো কাপড় দিয়ে যেমন তার শরীর ঢেকে দেওয়া হয়, অপাংশুর মনে হল, তেমনি করে কেউ যেন একটানা বিশাল, কুচকুচে কালো এক কাপড় দিয়ে বাইরের সব কিছুকে ঢেকে দিয়েছে। কোথাও এতটুকু ফাঁক পর্যন্ত নেই। শুধু মাঝে মাঝে হাউইয়ের মতো বিদ্যুৎ অন্ধকারের সেই বাধ্যতামূলক ঢাকা খুলে মৃত, বিবশ বিশ্ব-চরাচরের মুখখানা দেখিয়ে দিচ্ছে এক একবার। বিদ্যুতের ওরকম ফর্সা আলো অপাংশু কখনো দেখেনি।

আর তার সঙ্গে সে কি হাওয়া! লক্ষ লক্ষ দুর্বোধ্য স্লোগান দিতে দিতে তারা আসছে, যেন কোথায় কি এক সর্বনাশা বিলম্ব বাধিয়ে তুলতে চায়। তবু, তারা ঝড় নয়, হাওয়া। সেই হাওয়ার গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তাকে ঠান্ডা করে বৃষ্টি নামল। শহর কলকাতার লোক অপাংশু। সেখানে বৃষ্টি মানেই যত রকমের দুর্ভোগ। বৃষ্টির সঙ্গে তাই তার আজন্ম বৈরী।

কিন্তু এখানে এই বৃষ্টি, অন্ধকারের অনন্ত রৌদ্র, দূরে তুষারের চূড়াতে চমকে দেওয়া বিদ্যুৎ আর হাওয়ার একটানা মাতামাতি অপাংশুর মতো স্বভাবত ধীর-স্থির লোককে পর্যন্ত বিচলিত করে তুলল। তবু সে চুপচাপ আত্মসমর্পণ করে দাঁড়িয়ে রইল হোটেলের বারান্দায়। যেন কোন অলৌকিক ম্যাজিক দেখছে।

ধর্মেন্দ্র, বরুণ, ইন্দ্রনাথ কুন্তীও এক-এক করে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওরা কথা বলছিল ভীষণ, কথায় কথায় হাসি ভেঙে পড়ছিল, হাওয়া আর বৃষ্টির শব্দের চেয়ে ওদের গলার জোর বেশী কিনা, তাই পরীক্ষা করতে গান গাইছিল অসম্ভব চিৎকার করে। শেষে, না-পেরে ধর্মেন্দ্র প্রকৃতিকে ভ্যাঙাতে লাগল (অপাংশু জানে, এটাও কুন্তীকে আনন্দ দেবার জন্য, কেননা, কুন্তী অকৃপণ হাসছিল)।

অপাংশু ভেবেছিল তার ডায়েরীতে ধরে রাখবে এই রাত্রিকে। কিন্তু যত সাজাতে চাইল মনে মনে, তত যেন সব এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল। বায়োস্কোপের ছবির চেয়ে দ্রুত হারিয়ে যেতে থাকল তার মনের তখনকার মগ্ন অবস্থা। এই রাত্রি, আকাশ, অন্ধকার, অন্ধকারের জঠরে পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় মাথায় বিদ্যুতের শিউরে ওঠা, এই আশ্চর্য হাওয়া আর বৃষ্টি—সব, সব কিছুকে সে কথা দিয়ে,

উপমা দিয়ে, শব্দ দিয়ে, বাক্য দিয়ে বন্ধ করে এক বিরল সাম্রাজ্য বানাতে চাইল।

কিন্তু হল না। তাকে দুর্বল, নিষ্ফল করে রেখে আলমোড়ায় সেই রাত্রি কেবলই কোথায় উধাও হয়ে যেতে থাকল। সাম্রাজ্য বানানো তার হল না, কেবল খালি সিংহাসনের আশপাশ দিয়ে কতকগুলো বিফল হাওয়া খেলা করে বেড়াতে লাগল।

অপাংশু ভাবল, এতকাল ধরে সে শুনে এসেছে যে, শব্দ ও বাক্যের চেয়ে শক্তিশালী আর কিছু নেই? ঈশ্বরের সমান ক্ষমতাবান একটিমাত্র শব্দ। মিথ্যে, সব মিথ্যে। ঈশ্বর মিথ্যে, ঈশ্বর প্রতিম শব্দ মিথ্যে।

অপাংশু বোধ হয় সেই একটিমাত্র মহামূল্য রাত্রির একচ্ছত্র সম্রাট না হয়ে উঠতে পারার দরুন ক্ষোভে, পরিশ্রমে, অক্ষমতায়, লজ্জায় অবুঝ, ছেলেমানুষ হয়ে উঠল। শেষে বিরক্ত হয়ে খানিকটা নিজের মনে, খানিকটা ওদের শোনাবার জন্যে বলল (কেননা, ওরা ভীষণ কথা বলছিল), 'কথা... কথা জিনিসটা কি ইনঅ্যাডিকোয়েট...'

ওর কথাকে লুফে নিল ধর্মেন্দ্র। চিরকালই ধর্মেন্দ্রটা কিরকম যেন আধা-খ্যাঁচড়া, হাফ-মেড ডেন্স। সে বলল, 'কেন? কথা আবার ইনঅ্যাডিকোয়েট হতে যাবে কেন? কথাই তো সব, প্রোফেসর!'

'না, নয়।'

'কেন?'

'কথা দিয়ে কিছু এক্সপ্রেস করা যায় না।'

'তাহলে তুমি বলছ, আমরা সবাই বোবা হয়ে গেলে ভালো? টু বি মিউট ইজ হোলী!'

ধর্মেন্দ্রর কথায় হাসির উৎস খুঁজে পেল কুন্তী। সে ছড়িয়ে ছড়িয়ে, ছিটিয়ে ছিটিয়ে হাসল। ইন্দ্রনাথ বোধ হয় অন্ধকার বারান্দার শেষে বাথরুম খুঁজতে চাইছিল। দূর থেকে তারও হাসি ভেসে এল। অপাংশু হাসি বলেই ধরে নিল সেটাকে। যদিও কুন্তীর কারণে তার গলার ছদ্ম গাম্ভীর্য বেশ টের পাওয়া যাচ্ছিল এবং স্লাট মেশিনের মতো এরকম খ্যাসিঘেসে শব্দ।

অপাংশু ধর্মেন্দ্রর কথার অথবা ঐসব হাসির কোন সরাসরি জবাব দিল না। ফের, আপন মনেই বলল, অনেকটা যেন বাইরের অন্ধকারকে শুনিয়ে শুনিয়ে, 'কথা...রেস উইথ ইউ!'

গত রাত্তিরে নিজের আচরণের কথা ভেবে হাসি পেল অপাংশুর। কিন্তু কুন্তী, ইন্দ্রনাথ, ধর্মেন্দ্র, বরুণ—এদের এখন ঠেকাবে কী করে! ওরা তো যোগেশ্বর যাবে বলে পা বাড়িয়েই আছে। তবু সে দু'-একবার ওজর তুলল। মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে ঐ পাহাড়ের পথে হাঁটার বিপদ, বেলা দেড়টার বাস-এ গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে উতরে যাওয়া— এই সব কথা বলে ওদের নিবৃত্ত করতে চাইল।

কিন্তু প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং সেই খেলার দৌলতে রেলের বর্তমান অফিসার ইন্দ্রনাথ অপাংশুর এই সব অমূলক আশঙ্কাকে ক্রিকেট বলের মতো-ই মেরে বাউন্ডারী পার করে দিল। আর, ধর্মেন্দ্র যদিও কস্মিনকালে খেলোয়াড় নয় তবু মেয়েদের কাছে ওর উৎসাহ বেশী। ও জানে কুন্তী যোগেশ্বর যেতে চায় তাই যাওয়াতেই ওর আগ্রহ।

অপাংশু আগে আগে ভাবত একদা এক-সঙ্গে কলেজে পড়েছে বলে ধর্মেন্দ্রর এত দৌরাত্ম্য সে সহ্য করবে কেন! সময় সময় ওর সঙ্গটাই অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এখন আর রাগ হয় না ওর ওপর। বরঞ্চ মায়া-ই হয়। (ধর্মেন্দ্র) জন্মসূত্রে জুনিয়র। কোথায় যেন ওর স্বভাবে একটা ছোট-ছোট ভাব রয়েই গেছে। এখনো কোর্টে ও ওর বাবার জুনিয়র।

তবু এর মধ্যে বরুণ ভালো। ভাত খাবার পর একটুখানি এঁটোর মতো ওর স্বভাবে মধ্যবিত্ত চালচলন আজো লেগে রয়েছে। ও এখনো কুণ্ঠিত, সংকুচিত হতে জানে। ওর বাবা পুরোহিতের ছেলে বলে ও নিজে ধর্মকর্ম, আচার-গোঁড়ামী এসব চেষ্টা করে এড়িয়ে চলতে চায়, বেশী এড়াতে গিয়ে

মাঝে মাঝে অবশ্য মাত্রা রাখতে পারে না। তখনি হয় ওকে নিয়ে মুশকিল। তখন ব্যস্ত হয়ে পেড়ে প্রমাণ করতে যে, আদতে ওর কিছুতে বিশ্বাস নেই, চাইলে ও সব কিছু করতে পারে। আর, সেটা দেখাবার জন্যেই কিনা কে জানে, ও ওর বাবার বিয়ে দেওয়া বউয়ের সঙ্গে কিছুদিন ধরে আলাদা হয়ে আছে।

কুমায়ুনের বাস যখন ওদের পুনোয়ানালা পেঁাছে দিল তখন বেশ বেলা রয়েছে। ঝকঝক করছে রোদ। কলকাতায় দুপুর তিনটের মতো। অথচ বাজে তখন পাঁচটা। চারপাশে পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝখানে পুনোয়ানালা ছোট্ট একটি লোকালয়।

হরিরাম বলে একটি লোকের সঙ্গে ওদের আলাপ হয়েছিল বাস-এ। সে যোগেশ্বরে থাকে। ওখানকার সরকারী রেস্ট হাউস-এর দারোয়ান। সে অপাংশুদের ভরসা দিয়েছিল, রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে যাবে। তারই সঙ্গে সঙ্গে ওরা পাঁচটি প্রাণী ক্রমশ সমতল ছেড়ে উজ্জ্বল রোদ আর দেওদারের উত্তাল হাওয়ার মাঝখান দিয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগল।

'আমরা বোধ হয় স্বর্গে উঠছি।' ধর্মেন্দ্র বলল।

ইন্দ্রনাথ অপাংশুর দিকে একবার আড়-চোখে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, নানাবিধ অশান্তি পর্বের পর।'

'না, সিনসিয়ারলি। ভেবে দেখ, উই আর ফাইভ। ইনক্লুডিং ওয়ান দ্রৌপদী।'

কুন্তী হাতে একটা গাছের ডাল নিয়ে চড়াই ভাঙছিল। ধর্মেন্দ্রর কথা শুনে টুকরো টুকরো হয়ে হাসতে গিয়ে এক পাথরে বেদম ঠোক্কর খেল। কাছে ছিল ইন্দ্রনাথ, সে ওকে সামলে নিল তাই রক্ষা।

'কিন্তু আমাদের দল থেকে সহদেব বেচারী বাদ পড়েছে।' আসন্ন পতন থেকে সামলে উঠেই কুন্তী কোন অজানা সহদেবের প্রতি সহানুভূতিশীল হল।

'পড়ুক গিয়ে। ও ছেলেটা একেবারে সাইফার। সারা মহাভারত জুড়ে বসে আছে অথচ কিস্সু পার্ট করে নি।' ধর্মেন্দ্র সহদেবকে এক বাক্যে বাতিল করে দেয়।

ইন্দ্রনাথ বলল, 'যা-ই বল ধর্মরাজের পার্ট কিন্তু আমাদের অপাংশু ছাড়া আর কাউকে মানাবে না। আর, আমি কিন্তু অর্জুন, হু-হু বাবা...'

'তবে কি আমি ভীম? আর বরুণ নকুল?'

ধর্মেন্দ্রর কথায় আরেক দফা হাসির হল্লা উঠল।

সব শুনছিল অপাংশু। না শুনতে চেষ্টা

করছিল, তবু কানে আসছিল। বিরক্তি ফেনিয়ে উঠছিল মনে মনে। জায়গা বুঝে ওরা কি ওদের চাপল্য একটু কমাতে পারে না? স্থান পরিবর্তনেও ওদের আচার-আচরণের পরিবর্তন হয় না একটু? চীর আর পাইনের বন থেকে যে শান্ত গন্ধ উঠে আসছে ওরা কি তা পাচ্ছে? ওদের দূষিত, শহুরে নাক আজও তা বহন করার যোগ্য আছে?

এই সময় ইন্দ্রনাথ বলল, 'কিন্তু একটা সমস্যা...সেটা তোমরা ভেবে দেখেছ কী?'

বরুণ বলল, 'আবার কী সমস্যা? তোমাদের কোন রিয়েল সমস্যা আছে বলে তো আমার মনে হয় না!'

'না, কথা হচ্ছে, আমাদের এই স্বর্গারোহণ পর্বে কুকুর কে হবে? য়ু মাস্ট অ্যাডমিট যে এটা একটা ভায়টল প্রব্লেম!'

ধর্মেন্দ্র খপ করে বলল, 'কেন, ওই লোকটা। ও তো সত্যি সত্যি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেফুলি ও কুকুর হতে পারে!'

'শাট আপ, য়ু লোক্যোসস লাউঞ্জি!' অপাংশু আর থাকতে না পেরে চীৎকার করে উঠল। হয়ত অতটা উত্তেজিত হওয়া ওর ঠিক হয় নি কিন্তু ধর্মেন্দ্রটা কী। সাধারণ বুদ্ধি পর্যন্ত নেই!

হরিরাম লোকটি ভারি সরল। সে অপাংশুকে পবিত্র গাছ এবং তার তলায় মহাদেবের পায়ের ছাপ দেখাল, জটায়ুগংগা নদী দেখাল, যোগেশ্বরের মন্দিরের পিছনে নাথযোগীদের সমাধির কথা বলল, মন্দিরের কেয়ারটেকার কেশব দত্তের কথা বলল, সে কত ভক্ত। তার কাছে বড় বড় সাধুসন্তরা আসা-যাওয়া করেন। যারা যায় সকলকে সে ফুলের কথা বলে। ফুলের চারা পাঠিয়ে দিতে বলে। আর বলে সরকারকে অনুরোধ করতে যেন তারা মন্দিরটার একটু যত্ন নেয়।

সত্যি সত্যি সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ ওরা পৌঁছে গেল যোগেশ্বর ফরেস্ট ডাক-বাংলোয়। তখনো আকাশ থেকে দিনের আলো মুছে যায়নি অথচ তারই ওপর দিয়ে সন্ধ্যে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। চারপাশ জুড়ে ঝিমঝিম করে বাজছে এক অদৃশ্য বাজনা। অপাংশুর মনে হল যেন নাড়ীতে নাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ে সেই বাজনা ক্রমশ অবশ করে ফেলছে তাকে। কাছাকাছি কোথাও বোধ হয় ঝরণা আছে, তার অবিরাম শব্দ, শুনতে শুনতে মনে হয় যেন শরীরের ভেতরে সেই শব্দটা সময় ছুঁয়ে চিরস্থায়ী হয়ে গেছে।

না, অপাংশুর আর আফসোস নেই। যোগেশ্বর না এলে হয়তো হিমালয়ে আসলেই তার ব্যর্থ হয়ে যেত। এখন মনে হচ্ছে, নৈনিতাল, আলমোড়া, কৌসানির সঙ্গে তার পরিচয় খুব খোলামেলাভাবে হতে পারে নি। কোথায় যেন একটা পোশাকী জড়তা রয়েই গিয়েছিল। কিন্তু যোগেশ্বরের সঙ্গে সে মুখোমুখি বসতে চায়। আলাপ যদি করতেই হয় তো একেবারে প্রাণে প্রাণে। রহস্যের সব আবরণ খুলে ফেলে। কিন্তু আলমোড়ার সেই একটা রাত্রি।

অপাংশু বসে পড়ল মাটিতে। ডাক-বাংলোটা অনেক উঁচুতে, প্রায় পাহাড়ের মাথায়। মনে হয় একটা মই পেলেই যেন আকাশকে ছোঁয়া যাবে। নীচে রেস্ট্ হাউস, মন্দির, অল্প কয়েকটা দোকানপাট। কাছে এবং দূরে যোগেশ্বরের নির্গাঢ় লোকালয়কে ঘিরে বৃষ্টির ফোঁটার মতো সন্ধ্যা পড়তে আরম্ভ করেছে টিপটিপ করে। ব্যাগপাইপ বাজছে কোথায়। খেতে পায় না, চাকরি পায় না তবু যোগেশ্বরের গাড়োয়ালী ছেলেমেয়ে এমন কি বয়স্ক নর-নারী গাদা বন্দুক ঘাড়ে করে অবিশ্যাকভাবে রাস্তায় রাস্তায় প্যারেড করে বেড়ায়।

প্রচুর হটাহাটি করে খিদে পেয়েছিল খুব। সংগে আনা খাবার খেতে খেতে ধর্মেন্দ্র ওমর খৈয়ামের সেই কবিতাটা আওড়াতে উদ্যোগী হল। একটু নির্জন জায়গা পেলেই অ-কবিরা হামেশা যে কবিতাটি প্রায় নিয়মমাফিক আওড়ে থাকে।

বরুণ বলল, 'ধর্মেন্দ্র এখানে এসেছ বলেই তোমাকে ও -কবিতাটা বলতে হবে না। তার চেয়ে তোমার ল' বুক আওড়ালে বরং সহ্য হবে ধর্মেন্দ্র বলল, 'না, কি লাভলি জায়গা। কবিতা আপনিই এসে যায়, বুঝেছ না?'

বরুণ অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেটা কবিতার দুর্ভাগ্য এবং আমাদের দুর্ভাগ্য, বলাই বাহুল্য।'

কুন্তী হেসে বলল, 'বরুণ তুমি কিন্তু ভীষণ ধর্মেন্দ্রর লেগপুল কর বাপু!' ডাক-বাংলোর দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে একটা পাথর-ফেলা সিঁড়ি খানিক নীচের দিকে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখানে একটা বসবার জায়গা আছে; একটা গোল-ঘর। ইন্দ্রনাথ সেইখানে বসে ছিল। হঠাৎ যেন খুব একটা জরুরী কথা মনে পড়ে গেল তার। সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, অপাংশু তোমাদের ছেলেপুলে হচ্ছে না কেন বল তো?'

অপাংশু হতভম্ব হ'ল। রাগ করা তার হল না। রাগতে রাগতে সময় চলে গেল। সেখান থেকে উঠে আরো দূরে গিয়ে বসল অপাংশু। কুন্তী লজ্জা পেল কি না বোঝা গেল না। 'কিচেনটা একবার দেখে আসি' বলে ভেতরে চলে গেল। জবাব দিল বরুণ।

'ইন্দ্রনাথ, জেনে রেখ, তুমি খুব নুইসেন্স হয়ে পড়ছ!'

'কেন? একটা পার্সোনেল কথা জিজ্ঞেস

করেছি বলে! অপাংশু এবং তার বউয়ের সংগে সম্পর্কটা কী আমাদের এতই কমাল! আমি তা মনে করি না। তা ছাড়া এখানে সাতখুন মাফ।' ইন্দ্রনাথকে নিজের ব্যবহারে এতটুকু অপ্রস্তুত মনে হল না।

'কেন? এখানে সাতখুন মাফ কেন, শুনি?'

'ও বোধ হয় নেচার-এর এই নেকেড অবস্থার কথা বলছে!' ধর্মেন্দ্র বলল। বলতে গিয়ে আবেগে গলা থরথর করে উঠল ওর।

'ঠিক তাই!' ইন্দ্রনাথ সমর্থন করল ধর্মেন্দ্রকে। 'এখানে একটা লিবার্টি, এনরমাস ফ্রীডম-এর ভাব হতে বাধ্য! দেখতে পাচ্ছ না, নেচার এখানে সবরকম ইনহিবিশন থেকে মুক্ত।'

আর থাকতে পারল না অপাংশু। উঠে এসে চীৎকার করে বলল, 'মুক্তির তুমি কী জান? তুমি তো একটা স্লেভ।'

বলেই মনে হল এ কি করছে সে! বন্দোর কপালকে কী এখানেও সংগে আসতেই হবে? কোথাও নিজের স্বভাব থেকে একটুকু রেহাই নেই? হিমালয়ে এসেও না।

ডাক-বাংলোর কেআরটেকারটা চলে গেল। সন্ধ্যে হয়ে গেলে আর সে থাকবে

না। যাবার আগে কুন্তীকে কিচেন, শোবার ব্যবস্থা সব বুঝিয়ে দিয়ে গেল। কাচ-ঢাকা দুটো বাতিও জেবলে দিয়ে গেল। এর ওপর অপাংশুদের সঙ্গে আছে দুটো টর্চ। এই নিয়ে সারা রাত্তির ভয়ংকর অন্ধকারের সঙ্গে যুঝতে হবে।

খানিক পরে সেই প্রত্যাশিত প্রবল প্রতি-পক্ষ এসে গেল। মন্দিরে ঘণ্টা বাজছিল, থেমে গেল। নীচের দোকানপাটে দরজা পড়ে গেল। কাছে এবং দূরে কিংবা পৃথিবীর সর্বত্র, সব ঝিঁঝি এবং আরো নাম-না-জানা পতঙ্গেরা কাড়া-নাকাড়া বাজাতে শুরু করল একটানা। পাহাড়ের পথে পথে শেষ আলো-টুকু মিলিয়ে গেল। সব লোক ফিরে গেল ঘরে।

কুন্তী এসে বলল, 'আমরা একটু আগে আগেই খাওয়া-দাওয়াটা সেরে নিই।'

অপাংশু বলল, 'হ্যাঁ, সেই ভালো।'

ভেতরে কিচেনের দিকে যেতে যেতে অপাংশু শুনল ইন্দ্রনাথ—বরুণ আর ধর্মেন্দ্রকে বলছে, 'অপাংশুটা দিন দিন কিরকম যেন হয়ে যাচ্ছে। কিরকম ইমবে-সাইল মতো। এতটুকু রসকষ নেই। ঠাট্টা অবধি অ্যাকসেপট করতে পারে না।'

অপাংশু কোন কথা বলল না। চুপচাপ খেতে লাগল। এই হাঁপ-ধরা ভাব কাটাবার জন্যে ধর্মেন্দ্র অনেক বেয়াড়া কৌতুক করার চেষ্টা করল। কিন্তু একটাও লক্ষ্যে পৌঁছল না বলতে গেলে। ধার-পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরে এসে বসল অপাংশু। কুন্তী, ধর্মেন্দ্র, বরুণ কাছাকাছি। অপাংশু একটু তফাতে। এতক্ষণ ঠাণ্ডা তবু মোলায়েম ছিল। পুলওভার, কার্ডিগান, চাদরেই ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু এখন, সময় বুঝে ঠাণ্ডা-ও দাঁত বসাল। তবু ভালো, কুন্তী একটা কম্বল এনে জড়িয়ে দিয়ে গেল অপাংশুকে। ধর্মেন্দ্র বলল, 'কুন্তী একটা গান গাও। জমবে ভালো।'

ইন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ বলল, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। গান-ই দরকার এখানে।'

কুন্তী একটা নয়, দুটো নয়, খান পাঁচেক গান গেয়ে তবে থামল। তারপর আর কোন কথা নেই, কাজ নেই।

অন্ধকারটা প্রথম প্রথম জ্যোৎস্নার মতো ঝরে পড়ছিল। তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। পাহাড়, বন-জঙ্গল, খাদখানা সব নিশ্ছিদ্রভাবে ঢেকে এগিয়ে এল। ডাক-বাংলোর সীমানার ঠিক সামনেই ছিল এক মস্ত খাদ আর মুখোমুখি এক পাহাড়। অন্ধকার কোন ব্যবধান রাখল না, সব একাকার করে দিল।

অপাংশুর মনে হল অন্ধকার যেন তার গা দিয়ে, মুখ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। তার ভেতর পর্যন্ত অন্ধকার হয়ে গেছে। শুধু ঝিঁঝি এবং কীট পতঙ্গের শব্দ ছাড়া কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, আর দূরে ঝরনার জলের শব্দ। ঝরনাকে যেন কেউ খুলে দিয়ে 'আসছি' বলে আর আসে নি।

অপাংশুর একটু-ও খারাপ লাগছিল না। এরকম মহৎ অথচ ভয়ংকর রাত্রি সে জীবনে কখনো দেখেনি; হয়তো আর দেখবেও না। কে দেখেছে, অন্ধকারের পায়ের তলায় কীট-পতঙ্গের মতো পৃথিবীকে নিঃশব্দে পড়ে থাকতে! অপাংশু সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাই জ্বালল, তা-ও যেন কালো দেখাল।

ধর্মেন্দ্র আর থাকতে না-পেরে বলল, 'এ যে দেখছি ভেজলি নাইট। একেবারে পৃথিবীর শেষ দিন।'

ওদের কোন কথার উত্তর দেবার ইচ্ছে ছিল না অপাংশুর। তবু, আস্তে আস্তে বলল, 'পৃথিবীর আরম্ভের দিনও বলতে পার। আদিতে এই রকম ছিল। আদিতে বাক্য ছিল না। আদিতে এই অন্ধকার ছিল।'

বরুণ বলল, 'এখন সাড়ে আটটাও বাজে নি দেখছি। এখুনি তো আমরা গুটি গুটি শুতে যাচ্ছি না। কিন্তু আমরা করব কী? সময় যে কাটে না!'

কুন্তী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'চল না, তাস খেলি।'

অপাংশু বলল, 'আচ্ছা বরুণ তোমরা কী! চুপচাপ বসে এনজয় করতে পারছ না। এরকম অভিজ্ঞান আর হবে মনে কর?'

ইন্দ্রনাথ যেন ক্ষেপে উঠল। তার রাগটা অপাংশুর ওপর, না এই নিঃশব্দ জমাট অন্ধকারের ওপর তা বোঝা গেল না। সে বেশ চেঁচিয়ে বলল, অনেকটা দাবির মতো, 'চুপ করে বসে থাকা অসম্ভব। এই রকম মনস্টরাস অন্ধকার, এই আগলি সায়লেন্স এক্ষুণি আমাদের গিলে ফেলবে। বাঁচতে গেলে কথা বলতে হবে। আমাদের কিছু করা দরকার...'

অপাংশু ইচ্ছে করলেই বলতে পারত, কেন তাহলে এখানে থাকবার জন্যে তখন অত নেচে উঠেছিলে! কিন্তু বলল না, বলে লাভ নেই। তার বদলে বলল, 'আমরা এই অন্ধকারেরই ছেলে-মেয়ে। আমাদের জন্মের আগেও এই অন্ধকার ছিল, মৃত্যুতেও থাকবে। জান, তোমার মাতৃভাষা কী? জান?'

ইন্দ্রনাথ বলল, 'রাবিশ!'

ধর্মেন্দ্র বলল, 'কেন! আমার মাতৃভাষা বাংলা। আমাদের সকলকার মাতৃভাষাই বাংলা।'

অপাংশু বলল, 'না, এই নিস্তব্ধতা হচ্ছে তোমার মাতৃভাষা...এই গভীর নিস্তব্ধতা।'

ধর্মেন্দ্রর মাথায় যেন এতক্ষণে ঢুকল ব্যাপারটা। সে বলল, 'ও, তুমি দর্শন আওড়াচ্ছ? তাই বল!'

ইন্দ্রনাথ বলল, 'তুমি একটা স্টুপিড, ইমবেসাইল। এখানে এসে তোমার মাথাটাই বিগড়ে গেছে।'

কুন্তী বলল, 'আঃ, ওর জায়গাটা ভালো লাগছে! তোমরা ওরকম করছ কেন? এস না, আমরা নিজেরা নিজেরা কথা বলি। ও যদি চুপচাপ থাকতে চায়, থাকুক না।'

তখন ধর্মেন্দ্র, বরুণ, ইন্দ্রনাথ, কুন্তী নিজেরা নিজেরা কথা বলতে লাগল। প্রথমে অন্ধকার নিয়ে, বুক-চাপা অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা নিয়ে, তারপর অপাংশুকে উদ্দেশ্য করে, যার উদ্যোক্তা অবশ্য ধর্মেন্দ্র ও ইন্দ্রনাথ; কথা বলতে বলতে ওরা হাসল। হাসতে হাসতে কেউ কুন্তীর হাত, কেউ চুল কেউ আঁচল নিয়ে খেলা করতে লাগল। খুব খেলা করতে লাগল।

আর, অপাংশু সেই বিপুল অন্ধকারের অরণ্যে হাতঘড়ি কিংবা মহাকালের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে স্থির হয়ে বসে রইল।

দেশ

॥ ১৭ ॥

আবার আগের কথায় ফিরে যাই।

১৮৬৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর ডিরেক্টর অ্যাটকিনসন সাহেব, স্কুল ইন্সপেক্টর উড্রো সাহেব আর বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মিস মেরী কার্পেন্টার উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় দেখতে গেলেন। ফিরতি পথে একটা দুর্ঘটনা হল, বিদ্যাসাগরের বগি গাড়ি উল্টে গেল। পড়ে গিয়ে যকৃতে দারুণ আঘাত পেলেন বিদ্যাসাগর।

এই দুর্ঘটনা নিয়ে কবিয়াল ধীরাজ একটি গান বেঁধেছেন:

অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে,
ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে,
করে তুলছে তোলাপাড়া, এবার নাইকো ছাড়াছাড়ি,
মিস কারপেণ্টার সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে।
কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই সবই দেখেছে,
এখন এসে কলকেতাতে (এবার)
বাঙ্গালীদের নে পড়েছে।
উত্তরপাড়া স্কুল যেতে, বড়ই বগড় হলো পথে,
এটকিন্সন উড্রো আর সাগর সঙ্গেতে।
নাড়া চাড়া দিলে ঘোড়া মোড়ের মাথাতে,
গাড়ি উলটে পল্লেন সাগর, অনেক পুণ্যে গেছেন বেঁচে॥

বিদ্যাসাগর সেবার বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু এই দুর্ঘটনার ফলেই তাঁর স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে যায়। শরীর ভেঙে গেছে, কিন্তু সেদিকে তিনি নজর দিলেন না। শরীরের সেই অবস্থা নিয়েও বিদ্যাসাগর দেশের মঙ্গলের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যেতে লাগলেন।

এই দুর্ঘটনার ন বছর আগের কথা।

বিদ্যাসাগর অসাধারণ নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে সরকারী কর্ম করেছেন। কর্তৃপক্ষের সে বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

দক্ষিণ বাঙলার ইন্সপেক্টর অব স্কুলস প্র্যাট সাহেব ছুটি নিয়ে বিলেত চলে গেলেন। আশা করা গিয়েছিল, প্র্যাট সাহেবের ওই শূন্য পদে বিদ্যাসাগরই নিযুক্ত হবেন। হ্যালিডের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এ সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। এ বিষয়ে

মিস মেরী কার্পেণ্টার

১৮৫৭ সালের মে মাসে বিদ্যাসাগর হ্যালিডেকে একখানা চিঠি লিখেছেন।

কিন্তু এই চিঠির আগেই এপ্রিল মাসে হ্যালিডে লজ সাহেবকে ওই শূন্য পদে নিযুক্ত করেছেন। বিদ্যাসাগরের মনে হল, তাঁর প্রতি সুবিচার করা হয়নি। মনে হল, তাঁর মতো একজন দিশী কর্মচারীর পক্ষে অধিক উন্নতি আশা করা নিরর্থক।

গর্ডন ইয়ং তখন ডিরেক্টর। ইয়ং সাহেবের হস্তক্ষেপে বিদ্যাসাগরের কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। সেদিকেও বিদ্যাসাগর অসন্তুষ্ট।

বিদ্যাসাগর অতএব সাব্যস্ত করলেন, সরকারী কর্মে ইস্তফা দেবেন। ১৮৫৭ সালের ২৯ আগস্ট বিদ্যাসাগর ডিরেক্টরকে একখানা চিঠিতে সে কথা জানিয়ে দিলেন। এবং এই চিঠির একটি প্রতিলিপি হ্যালিডেকেও পাঠিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের সংকল্পের কথা জেনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন হ্যালিডে। হ্যালিডে ১৮৫৭ সালের ৩১ আগস্ট একখানা চিঠি লিখলেন বিদ্যাসাগরকে:

"My dear Pandit,—I am really very sorry to hear of your intention. Come and see me on Thursday and tell me why it is that you have come to this determination."

বিদ্যাসাগর চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন, হ্যালিডের তা মনঃপূত নয়। হঠাৎ ইস্তফা না দিতে বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করলেন হ্যালিডে। হ্যালিডের অনুরোধ রাখলেন বিদ্যাসাগর, আরো এক বছর অনিচ্ছায় কাজ চালিয়ে গেলেন।

স্বাস্থ্যও ভালো যাচ্ছে না। ১৮৫৮ সালের ৫ আগস্ট ডিরেক্টরের কাছে ইস্তফা-পত্র পাঠালেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৮ সালের ১৮ আগস্ট ডিরেক্টর আপন মন্তব্য সমেত বিদ্যাসাগরের ইস্তফাপত্রের একটি প্রতিলিপি বাঙলা গবর্নমেন্টের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

বিদ্যাসাগরের স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না, পদত্যাগের সেটি একটি কারণ, কিন্তু সেটি একমাত্র কারণ নয়। আরো দুটি গুরুতর কারণ আছে: উন্নতি সম্পর্কে হতাশা এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ। ছোটো লাট হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের প্রতি অত্যন্ত অমায়িক, কিন্তু শিক্ষা বিভাগের নতুন ডিরেক্টরের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক সুখের নয়।

১৮৫৮ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বাঙলা

গবর্নমেণ্ট বিদ্যাসাগরের পদত্যাগ প্রার্থনা মঞ্জুর করে ডিরেক্টরকে জানাল:

"It is to be regretted that the Pandit should have thought fit to make his retirement somewhat ungraciously, especially as he can have no fair reason for dissatisfaction. You will, however, be good enough to inform him, that he carries with him the acknowledgments of the Government for his long and zealous service in the cause of Native Education."

বাঙলা গবর্নমেণ্টের মন্তব্য নিশ্চয় ন্যায্য নয়। নিশ্চয় অকারণে অসন্তুষ্টভাবে সরকারী কর্ম থেকে বিদায় নেননি বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের মতো মানুষের পক্ষে এই বিদায় গ্রহণের নিশ্চয় যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ছিল।

হ্যালিডে সাহেব একদিন বিদ্যাসাগরকে বলেছেন—আপনি কাজে ইস্তফা দেবেন না। ইস্তফাপত্র ফিরিয়ে নিন। কাজ করুন।

বিদ্যাসাগর বলেছেন—যে কাজ মন দিয়ে করতে পারব না, শুধু টাকার জন্য সে কাজ করতে আমি রাজী নই।

হ্যালিডে বলেছেন—আমি জানি, আপনি সব দানধ্যান করেন, কিছুই রাখেন না। পাঁচ শো টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে খাবেন কী?
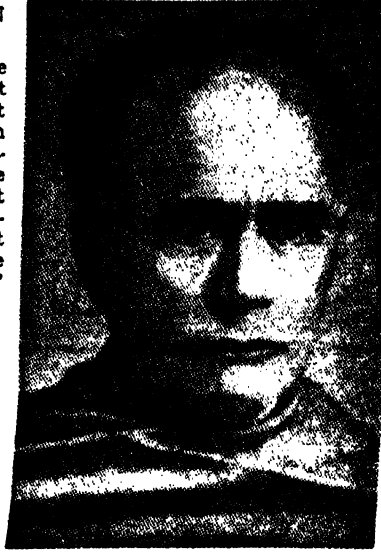
প্রৌঢ় বয়সে বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর বলেছেন—ডাল ভাত।

—তাই বা পাবেন কোত্থেকে?

—এখন দু বেলা খাই, তখন না-হয় এক বেলা খাব। তাও না জোটে, এক দিন অন্তর খাব। তা বলে যে কাজে মন বসছে না, সে কাজ করে আমি টাকা নিতে চাই না।

হ্যাঁ, পাঁচ শো টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৮ সালের ৩ নবেম্বর বিদ্যাসাগর নতুন প্রিন্সিপাল ই বি কাওয়েলকে সংস্কৃত কলেজের দায়িত্ব অর্পণ করে দিলেন।

এখানে বলে রাখা ভালো, সে সময়ে বিদ্যাসাগরের নিজের বই বিক্রির আয় মাসে পাঁচ শো টাকার চেয়ে ঢের বেশী।*

চাকরি ছাড়বার কয়েক বছর বাদে ১৮৬৪ সালের ৪ জুলাই বিদ্যাসাগর বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি মেম্বর নির্বাচিত হয়েছেন।

গবর্নমেণ্টের চাকরি ছাড়বার পরেও গবর্নমেণ্টের বিস্তর উপকার করেছেন বিদ্যাসাগর। নানা সময়ে নানা বিষয়ে গবর্নমেণ্ট বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চেয়েছে, সাহায্য

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, C E Buckland লিখেছেন: "Vidyasagar's monthly benefactions amounted to about Rs. 1,500 and his income from his publications for several years ranged from Rs. 3,000 to Rs. 4,500 a month." (Bengal under the Lieutenant-Governors, vol. II, p. 1085).

চেয়েছে, বিদ্যাসাগর অকাতরে পরামর্শ দিয়েছেন, সম্ভব হলে সাহায্য করেছেন।

কাওয়েল সাহেব স্মৃতি আর বেদান্তের পাঠ বন্ধ করে দিতে চাইলেন সংস্কৃত কলেজে। এই সম্পর্কে এবং সংস্কৃত কলেজের আরো কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে ছোটলাট বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চাইলেন।

১৮৫৯ সালের ১৭ এপ্রিলের একখানা চিঠিতে বিদ্যাসাগর আপন মতামত জানালেন। কিয়দংশ তুলে দিচ্ছি:

"Mr. Cowell appears to take objection to the study of the Smriti and Vedanta in the college. I am sorry that I must differ from him on this point. These branches seem to me to be quite unexceptionable. In Smriti, the treatises in use teach only Civil Law, such as Law of Inheritance, Adoption, etc. The importance of such study is admitted on all hands and it is therefore unnecessary for me to dilate upon it. The Vedanta is one of the systems of Philosophy prevalent in India. It is of a metaphysical character, and I do not think there can be any reasonable objection to its use in the college. Both the branches, as at present taught, are free from objection on religious grounds. In my humble opinion, the discontinuance of these subjects would make the college course a very defective one."

এ-দেশে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের শ্রেষ্ঠ উপায় কী? এ বিষয়ে ছোটলাট গ্রান্ট সাহেব বিদ্যাসাগরের মতামত জানতে চাইলেন। ১৮৫৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন:

"As the best, if not the only practicable means of promoting education in Bengal, the Government should, in my humble opinion, confine itself to the education of the higher classes on a comprehensive scale. By educating one boy in a proper style the Government does more towards the real education of the people, than by teaching a hundred children mere reading, writing and a little of Arithmetic. To educate a whole people is certainly very desirable, but this is a task which, it is doubtful, whether any Government can undertake or fulfil. . . ."

১৮৬৩ সলে একটা কমিটি হল। কমিটির উদ্দেশ্য:

'to consider and report on the extent to which it is expedient to introduce the study of Sanskrit in the collegiate and Zila Schools with reference to prospective changes in the course laid down by the university for the several examinations in Arts'.

গবর্নমেণ্টের অনুরোধে ওই কমিটির একজন সভ্য হলেন বিদ্যাসাগর।

১৮৫৪ সালের ১১ নভেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটা আইন পাস হল। সেই আইনের বলে একজন বিশ্বস্ত সরকারী কর্মচারীর পরিচালনায় আট থেকে ষোল বছর বয়সের নাবালক জমিদারদের একটা আলাদা বাড়িতে একত্র রেখে উপযুক্তভাবে শিখিয়ে-পড়িয়ে তোলার ব্যবস্থা হয়। এজন্য ১৯৫৬ সালের মার্চে কলকাতায়

ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন খোলা হল। ডিরেক্টর হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

প্রথমে ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন খোলা হল চিৎপুরের রাজা নরসিংহের বাগানে। ১৮৬৩ সালের অক্টোবরে সেখান থেকে চলে এল মানিকতলা আপার সার্কুলার রোডে, শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানে।

ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের জন্য চারজন পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছেন। ঠিক হল, প্রত্যেক পরিদর্শক বছরে তিন মাস করে পরিদর্শন করবেন। বিদ্যাসাগর ওই চারজনের একজন।

১৮৬৩ সালের নভেম্বর থেকে বিদ্যাসাগর পরিদর্শন আরম্ভ করেছেন। একাধিক রিপোর্ট দাখিল করেছেন।

ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের ডিরেক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতের মিল হয়নি। খুব সম্ভব সেজন্যেই বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি।

১৮৮০ সালে ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন বন্ধ হয়ে যায়।

হিন্দুদের বহুবিবাহ নিরোধক আইন

প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে রিপোর্ট দাখিল করার ভার গবর্নমেণ্ট একটি কমিটির হাতে দিল। বিদ্যাসাগর সেই কমিটির একজন সদস্য। অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচ্য বিষয়ে বিদ্যাসাগর একমত হতে পারলেন না। বিদ্যাসাগর ১৮৬৭ সালের ২২ জানুয়ারি লিখেছেন:

"I do not concur in the conclusion come to by the other gentlemen of the Committee. I am of opinion that a Declaratory Law might be passed without interfering with that liberty which Hindoos now by law possess in the matter of marriage."

সেণ্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটির সভ্য হওয়ার জন্য বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেছেন অ্যাটকিনসন সাহেব। এ বিষয়ে অ্যাটকিনসন সাহেব ১৮৭৩ সালের ১১ জুলাই বিদ্যাসাগরকে একখানা চিঠি লিখেছেন।

কিন্তু নিজে একজন পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা বলে বিদ্যাসগর ওই কমিটিতে যেতে রাজী হলেন না। বিদ্যাসাগর ১৮৭৩ সালের ১৩ জুলাই অ্যাটকিনসন সাহেবকে লিখেছেন:

"In reply to yours of the 11th instant I beg to inform you that I would have gladly accepted your invitation to serve in the School Book Committee, but on two considerations I feel constrained to decline it. As an author I am directly interested in the decision of the Committee, and I do not therefore think it right to take a part in their deliberations. Besides, I am inclined to think that my presence in the committee may interfere with a free and unreserved discussion of the merits and demerits of the books. I hope you will therefore kindly excuse me if I cannot persuade myself to comply with your request."

১৮৭২ সালের গোড়ার দিকে সংস্কৃত কলেজ থেকে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ বিলুপ্ত করে দেবার প্রস্তাব হল। এ বিষয়ে গবর্নমেণ্ট বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চেয়েছেন। বিদ্যাসাগর ওই প্রস্তাবে সায় দিতে পারলেন না। বিদ্যাসাগরের বিবেচনায় কেবলমাত্র স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য একজন অধ্যাপক প্রয়োজন।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের পরামর্শ গবর্নমেণ্ট শোনেননি। সংস্কৃত কলেজে কেবলমাত্র স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য কোনো অধ্যাপক রইলেন না, দর্শনশাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপকের উপর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনার ভার অর্পিত হল।

সহবাস-সম্মতি-আইন বিল কাউন্সিলে উপস্থিত করার আগে গবর্নমেণ্ট বিদ্যাসাগরের মতামত চেয়েছে। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর ১৮৯১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি, গবর্নমেণ্টকে জানিয়েছেন:

". . . I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his wife has had her first menses. As the majority of girls do not exhibit that symptom before they are thirteen, fourteen or fifteen, the measure I suggest would give larger, more real, and more extensive protection than the Bill. At the same time, such a measure could not be objected to on the ground of interfering with a religious observance. . . .

From every point of view, therefore, the most reasonable course appears to me, to make a law declaring it penal for a man to have intercourse with his wife, before she has her first menses.

Such a law would not only serve the interests of humanity by giving reasonable protection to child-wives, but would, so far from interfering with religious usage, enforce a rule laid down in the Sastras. The punishment, which the Sastras prescribe for violation of the rule, is of a spiritual character and is liable to be disregarded. The religious prohibition would be made more effective, if it was embodied in a penal law. I may be permitted to press this consideration most earnestly on the attention of the Government."

১৮৮০ সালের ১ জানুয়ারি ভারত গবর্নমেণ্ট বিদ্যাসাগরকে 'সি আই ই' উপাধি দিয়েছে।

এ উপাধি নিতে হবে। রাজভবনে যেতে হবে। দরবারী পোশাকে গিয়ে উপাধি নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু সে তো অসম্ভব কথা। বিদ্যাসাগরের পক্ষে অসম্ভব।

গোলমাল এড়াতে হলে দিন কয়েকের জন্য কলকাতার বাইরে গিয়ে থাকা ভালো। তাই বিদ্যাসাগর দিন কয়েকের জন্যে কার্মাটারে চলে গেলেন। উপাধি বিতরণের দরবার শেষ হওয়ার পর আবার কলকাতায় ফিরে এলেন।

দিন কয়েক পরে লাট সাহেবের দপ্তরখানা থেকে একজন বাঙালী কর্মচারী আর একজন চাপরাসী বিদ্যাসাগরের বাড়িতে এসে উপস্থিত। 'সি আই ই'র পদক নিয়ে এসেছে। বিদ্যাসাগর পদকের কাছে যাননি, পদক বিদ্যাসাগরের কাছে চলে এসেছে।

বিদ্যাসাগরের হাতে পদক এল। কিন্তু চাপরাসীটি আর লাট সাহেবের দপ্তরখানার কর্মচারীটি দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে। কাজ মিটে গেছে, তবু দাঁড়িয়ে আছে কেন?

কেননা, বকশিশ মেলেনি। সরকারী পুরস্কার নিয়ে এরা যেখানেই যায়, সেখান থেকেই দরাজ হাতে বকশিশ মেলে। বড়োমানুষদের বাড়িতে নানারকম বকশিশ পেয়েছে; বিদ্যাসাগর এমন কি বকশিশ দিতে পারেন যাতে ওরা খুশী হবে? না, ওদের খুশী করা বোধ করি বিদ্যাসাগরের সাধ্য নয়।

বিদ্যাসাগর ওদের বললেন—আমি একটা কথা বলি, তাতে আমারও সুবিধে, তোমাদের সুবিধে। এই পদকখানা নিয়ে বাজারে কোনো বেনের দোকানে গিয়ে বেচে দাও। যা পাবে, দু-জনে ভাগ করে নিও।

স্বনামধন্য সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাসাগরের নূতন উপাধি' নামে একটি চুটকি লিখেছেন:

"বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজদ্বারে নূতন উপাধি পাইয়াছেন শুনিয়া একজন পল্লীগ্রামের অধ্যাপক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আইসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিলেন—নূতন উপাধিটা কি?

বিদ্যা।—সি আই ই।

অধ্যা।—তাহাতে কি হইল?

বিদ্যা।—ছাই।

অধ্যা।—সাধু! সাধু! রাজার মুখে সকলই শোভা পায়।

তারপর 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধির কথা।

'মহামহোপাধ্যায়' উপাধির প্রস্তাব এল বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর সে উপাধি নিতে রাজী হলেন না। অসুস্থ শরীরের দোহাই দিলেন। বললেন—যা চাপানো আছে তা ফিরিয়ে নিলে রক্ষা পাই। এই অসুস্থ অবস্থায় প্রত্যেক দরবারে যেতে পারব না বলে চিঠি লিখতে আর ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাঠাতে প্রায় ওষ্ঠাগত। (ক্রমশ

Lakmé
ল্যাকমে
ঠিকই দেবে
প্রত্যেকের গায়ের
রঙের মানানসই ফেস পাউডার...ওঁর...ওঁর...ওঁর...ওঁর...ওঁর...ওঁর...ওঁর
এবং আপনারও !
আপনার রঙ ফুটিয়ে তুলবে। উজ্জ্বল কোমল আভায় ভ'রে দেবে। এই দিব্যি হাল্কা পাউডার হাওয়ার মত আলতোভাবে লেগে থাকবে। ল্যাকমে ফেস পাউডার সাত রকমের সূক্ষ্ম বর্ণে পাবেন।
আর সেইসঙ্গে মানানসই ল্যাকমে কম্প্যাক্টও পাবেন
ল্যাকমে
ফেস পাউডার
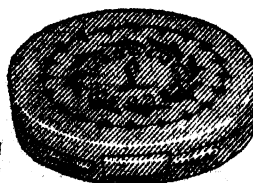
পৃথিবীর বৃহত্তম রেডিও দূরবীনের মডেল
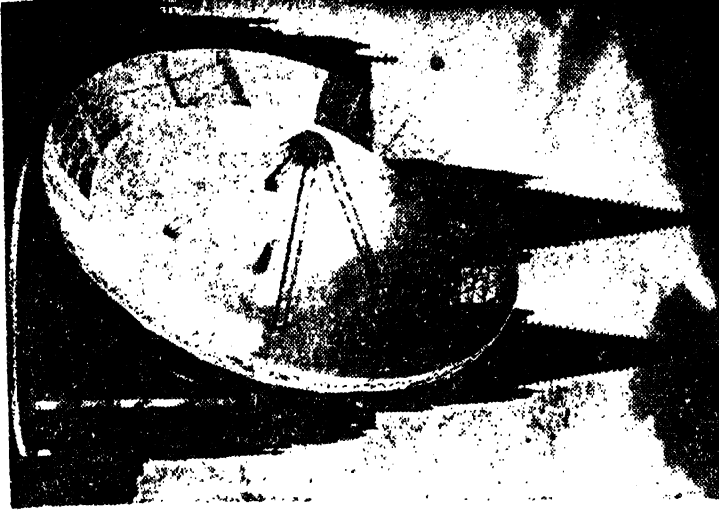
একটি বিশিষ্ট জলচিকিৎসক

পৃথিবীর দেশে দেশে যেসব চিকিৎসার প্রচলন আছে সেগুলির মধ্যে একটি হল জলচিকিৎসা। বহু কাল আগে ডঃ সিগমুণ্ড হান্স নামে এক জার্মান চিকিৎসাবিজ্ঞানী "মানবদেহে বিশুদ্ধ জলের প্রভাব" নামে একখানি বই লেখেন। বইখানি ১৮৪৫ সালে সেবাস্তিয়ান নাইপ নামে এক ধর্মযাজকের হাতে আসে। বইটি আদ্যোপান্ত পড়ে তিনি লেখকের সমস্ত বিধান নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন; যেমন—বরফের মত ঠাণ্ডা জলে স্নান করা, খালি পায়ে শিশিরে ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটা, ডানিয়ুব নদীর তুষারশীতল জলে স্নান করা ইত্যাদি। এই-সব করে তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভাল হয়ে যায়। পরবর্তী কালে তিনি যেখানেই যাজক হিসাবে কাজ করতে গিয়েছেন সেখানেই খুলেছেন একটি করে জলচিকিৎসার কেন্দ্র রোগীদের সুস্থ করে তোলার জন্য।

"যা দেহ সুস্থ রাখে তাই রোগ আরোগ্য করতে সক্ষম"—এই নীতিতে নাইপ বিশ্বাসী ছিলেন। জল ছাড়াও তিনি রোগ সারানোর জন্য আলো, বাতাস ও ব্যায়ামের বিধান দিতেন, আহারবিহারে সংযম রক্ষা করতে বলতেন এবং সভ্যতার সর্বপ্রকার আধিক্য বর্জন করতে বলতেন। ভুইরস হোফেন-এ একটি জলচিকিৎসা কেন্দ্র তাঁরই নাম বহন করে (নাইপ স্পা)। ১৮৯৭ সালের ১৭ই জুন নাইপের মৃত্যু হয়।

কাশি কিসের লক্ষণ ?

ভদ্রমহিলার শুকনো কাশির দমক আর থামে না। কত রকমের চিকিৎসাতে কোন ফলই হয় না। শেষে তিনি এক মনোরোগের চিকিৎসকের কাছে গেলেন নিরুপায় হয়ে। ৬ দিন ১ ঘণ্টা ধরে চিকিৎসার পর তাঁর কাশি সেরে গেল। চিকিৎসকের কাছ থেকে পরে জানা গেল যে, পয়সাকড়ি রোজগারে অক্ষমতাজনিত হতাশা থেকেই সেই কাশির উৎপত্তি এবং কাশিটা একটা সরব প্রতিবাদ মাত্র।

কাশির নানারকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে; যেমন—জোরে কাশি মানে দীর্ঘস্থায়ী নিরাশা, খ্যাকর খ্যাকর কাশি মানে অবিশ্বাসী বা অকর্মণ্য স্বামী কিংবা জাঁদরেল শাশুড়ীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। চিকিৎসকরা বলেন যে, স্বাভাবিক কাশি ও প্রতিবাদের কাশির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সেটা ধরা খুব কঠিন, কিন্তু মানসিক কারণ-জনিত কাশি ধরা গেলে তা সারিয়ে তুলতে দেরি হয় না।

বৃহত্তম রেডিও দূরবীনের পরিকল্পনা

পশ্চিম জার্মানীর বিজ্ঞানীরা এমন এক রেডিও দূরবীন নির্মাণের পরিকল্পনা করেছেন যা হবে পৃথিবীর বৃহত্তম। যন্ত্রটির ব্যাস হবে এক শো মিটার। ফুটবল খেলার মাঠও অত বড় হয় না। যন্ত্রটিতে যে অধিবৃত্তাকার অবতল প্রতিফলক থাকবে তার সাহায্যে মহাকাশের আট বিলিয়ন আলোক-বৎসরের দূরত্বের ধ্বনি ধরা যাবে। এক আলোক-বৎসরের মানে সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার বেগে আলোকরশ্মি এক বছরে যত দূর যাবে ততটা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় এই যান্ত্রিক 'কান' হবে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

যন্ত্রটি চারটি মজবুত দণ্ডের উপর বসানো থাকবে এবং প্রয়োজন হলে সেটিকে স্থানান্তরিত করা যাবে। রেডিও দূরবীনটির ওজন হবে ২৮০০ টন। ম্যাক্স প্ল্যাংক ইন্সটিটিউটের প্রযোজনায় এটি নির্মিত হবে।
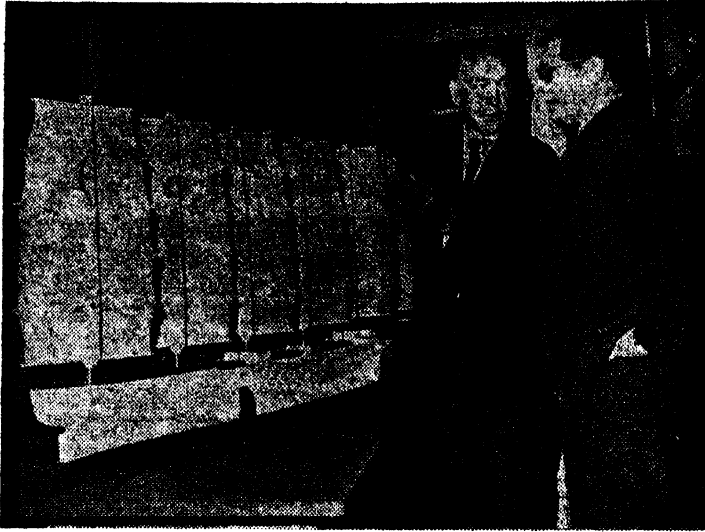
বায়ুচালিত অভিনব জাহাজ

কৃত্রিম হাত

সর্বদেশের বিজ্ঞানীরা এটি ব্যবহার করতে পারবেন।

বায়ুচালিত অভিনব জাহাজ

পশ্চিম জার্মানীতে হালে এক অভিনব বায়ুচালিত জাহাজ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আমরা সবাই জানি যে, বাতাস হচ্ছে সবচেয়ে সস্তা প্রাকৃতিক পরিচালিকা শক্তি। পালের জাহাজের দিন চলে গেলেও হামবুর্গের ইঞ্জিনীয়ার উইলহেলম প্রোলস আলোচ্য পালের জাহাজটি নির্মাণ করতে মনস্থ করেছেন। জাহাজের মডেল ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে গিয়েছে। এই ছয় মাস্তুলের জাহাজটি নির্মাণ করার জন্য মিঃ প্রোলস ১০ বছর মাথা ঘামিয়েছেন। ১৭০০০ টন জাহাজটি কল্পনায় এক বছর ধরে পশ্চিম জার্মানীর বৃহত্তম বন্দর হামবুর্গ থেকে উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল পর্যন্ত যাওয়া আসা করেছে। মিঃ প্রোলস হিসাব করে দেখেছেন যে, সাধারণ মালবাহী জাহাজের তুলনায় এই জাহাজে মালবহনের পড়তা খরচা ফ্রেট টন প্রতি তিন ভাগের এক ভাগ হবে। তা ছাড়া মোটরচালিত জাহাজে যত নাবিক লাগে এই জাহাজে তত লাগবে না। ৬০ মিটার উঁচু মাস্তুলগুলিতে মোট ৯৬০০ বর্গ মিটার পাল থাকবে যা ইচ্ছামত বোতাম টিপে খোলা বা বন্ধ করা যাবে।

কৃত্রিম হাত

পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাংকফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থোপেডিক ক্লিনিকে শিশুদের ব্যবহার্য এই কৃত্রিম অঙ্গটি তৈরি করা হয়েছে। এই শরৎকালে একটি চিকিৎসক সম্মেলনে এটি প্রথম জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করা হবে। কৃত্রিম হাতটি ঠিক হাতের মতই কাজ করে, দেখতেও হাতেরই মত। শিশু তার হাতে দোষ থাকা সত্ত্বেও কৃত্রিম হাতের পিছন দিকের ইলেকট্রো-হাইড্রলিক যন্ত্রটি চালাতে পারবে। আঙুলের ডগায় সংবেদনশীলতার বদলে কাজ করে কতকগুলি বৈদ্যুতিক সংকেত। এই সকল হাতের সাহায্যে শিশু স্বাভাবিকভাবে খেলাধুলা করতে পারে।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

চল্লিশ

বসতে না বসতেই দেখি, এদিক ওদিক থেকে কয়েকজন 'জয়গুরু জয়গুরু' বোলে বেজে ওঠে। এমন কি, ডাগর গায়ক গান থামিয়ে, কপালে হাত ঠেকিয়ে, মাথা নিচু করে আওয়াজ দেয়, 'জয় গুরু, জয় গুরু।' দিয়ে আবার কালো কালো ডাগর চোখ দুটি ঘুরিয়ে হাসে। কাকে এমন সংবর্ধনা, কাকে এত আত্মীস্বরতা দেখানো। পাশে চেয়ে দেখি, আমার প্রৌঢ় সঙ্গীকেই। তিনিও কপালে হাত ঠেকিয়ে সবাইকে সেই বাক্যেই বোল দেন, 'জয় গুরু, জয় গুরু'।

দিয়ে মহাশয় একবার আমার দিকে চেয়ে হাসেন, চোখ ঢুলুঢুলু করে। কথা বলবার অবকাশ পান না, তার আগেই ওঁর পাশে বসা আলখাল্লাধারী কাঁচা-পাকা চুলদাড়ির মাঝখানে পাকা টসটসে মুখে। ঝকঝকে চোখে চেয়ে বলে,, 'ইটি কে বটেগ অচিনবাবু? বিটা নাকি?'

'বিটা?' প্রৌঢ় মহাশয়, চোখ কপালে তুলে তাকান বুড়ো বাউলের দিকে, আবার তাকান আমার দিকে। তারপরে গেরি-মাটিতে ছোপানো থান পরা, হাতে খুঞ্জনি বুন্দার দিকে চেয়ে বলেন, 'অই শোন গ রাধা দিদি, তোমার বুড়ার কথা শোন। একে দেখিয়ে বলে, আমার বিটা নাকি। গোপী দাদার আর তল জ্ঞান নাই দেখছি।'

মহাশয়ের সঙ্গে বুড়ীও ফোকলা দাঁতে হাসে। দুজনেরই নজর ঘুরে ফিরে আমার দিকে। বুড়া বাউল গোপী দাদার ধন্দ যে আমাকে নিয়ে, তা বুঝতে পেরেছি। তার-পরে বুড়ী ভ্রূকুটি কোপে বুড়ার দিকে চায়। যেন যুবী কটাক্ষ করে যুবাকে। বলে 'নতুন দেখলে নাকি অচিনবাবুকে! না বিইয়ে কানাইয়ের মা?'

গোপী বাউলের মুখখানি যেন আঁতুড়ের ছেলে, টুকটুকিয়ে চায়, নজরে গোলমাল। তার রাধার মুখের কথা শুনে প্রায় হইচই করে ওঠে। 'অই অই, জয় গুরু জয় গুরু, ভুলে গেছি, অচিনবাবুর বে থা নাই।

মহাশয় আবার হেসে ওঠেন, যাঁর নাম অচিনবাবু। অচিন, এমন নাম কখনো শুনি নি। তাও কিনা তাঁর সঙ্গে আবার বাউলদের দাদা দিদি পাতানো। ছাতিম-তলার মেলায় এ মানুষটি কে?

ওদিকে গান চলেছে সমান তালে, অচিন-বাবু গলা নামিয়ে বলেন, 'বে থা নাই মানে কিন্তু 'নাই' না গ দাদা।'

বুড়া অমনি দাড়ি কাঁপিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে, ঘাড় দুলিয়ে বলে, 'জয় গুরু জয় গুরু, তাই কখন হয়। 'নাই'-এতে 'হ্যাঁ' বিরাজ করে, যেমন কামেতে প্রেম, অমা-বস্যায় পূর্ণিমা, টানাতে উজান।'

বলে বুড়ো দু চোখ কুঁচকে যেন কী রহস্যের ইশারা করে। অমনি অচিনবাবু একেবারে হাত বাড়িয়ে দেন বুড়ার পায়ের কাছে, বলেন, 'বাহ্ বাহ্, গোপী দাদা, পায়ের ধুলো দাও।'

বুড়া তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে দিয়ে বলে, 'আ ধু-র'ই কী করে বল দিকিনি, এত বড় একটা মানুষ, যখন তখন পায়ে হাত দেয়।'

'এমন কথা বললে যে হাত মানে না। কিন্তু অই বড়মানুষ কথাটা আর ব'লো না, খুব রাগ করব।'

বুড়াও দাড়ি দুলিয়ে হাসে, বলে 'বড়-মানুষ মানে কী আর হোমরাচোমরা

বইলাছি। তুমি হলে বড়মানুষ গ, বারে বলে জাত্ত মানুষ।'

অচিনবাবু চোখ কপালে তুলে, জিভ কেটে হাত কপালে ঠেকান। বলেন, 'আরে বাপ্‌রে বাপ্‌। আর ব'লো না দাদা।'

আর বলে না বুড়া। দেখ, তবু বলে, দুজনাতে চোখে চোখে হাসে, নিশ্চুপে ভাবে। আবার রাধার সঙ্গে চোখাচুখি হতে সেও সাদা কেশের মাথাখানি দোলায়, চোখ ঘোরায়। এ হল রস-রহস্যের কথা, নিজেদের মধ্যে চলে, অপরের ব্যাজ। কামেতে কোথায় প্রেম, অমাবস্যায় পূর্ণিমা আর জোয়ারে উজান, তা তুমি বুঝবে না। তার মধ্যে কোথায় কোন্‌ রসের ধারা খেলে যায়, তা দেখ এদের চোখে মুখে। তার বেশী দেখতে পাবে না।

তা না পাই, আমি বেশী দেখি অচিনবাবুকে। ও'র গায়ে তো আলখাল্লা নেই, গেরুয়া নেই, লম্বা কেশে পাগড়ি নেই। সাজপোশাক, কথাবার্তা, হাতের চুরুটখানিও দেখে মনে হয়, বয়ানা আলাদা। অথচ, এই মানুষদের সঙ্গে এত বোঝা-বুঝি কেমন করে, যেন ভাবের এক ঘরেতেই বসত। কেবল, তা-ই না, চোখে মুখে এমন মুগ্ধতা, যেন ভাবের ঘোরে দোল দোলানো। দেখি, ঠোঁট নেড়ে নেড়ে কী যেন আওড়ান, বোধ হয় বুড়ার সেই কথা-গুলোই। গোরা মুখে রেখায় রেখায় আঁকি-বুকি অনেক। কপালের কাছ থেকে চুল উঠতে উঠতে অনেক পিছনে গিয়েছে, তবু পাতলা ধূসর চুলে, এখনো উলটো টানে, কেমন যেন একটা রূপের ঝলক দিচ্ছে। চোখ দুটি ডাগর, কিঞ্চিৎ ঢুলুঢুলুও বটে, তবে চোখের চারপাশে কালির একটা অস্পষ্ট ছাপ। তার কার্যকারণ বিচারে যেও না, কারণ সব মিলিয়ে এ মুখ দেখে ভোগী সুখী বলতে পারবে না। কেন যেন মনে হয়, এ মুখেও সেই কাঁদন-ভরা হাসির ছিটা লাগানো। নাকি আমার চোখের ধন্দা কে জানে।

আমাকে দেখিয়ে বুড়া আবার পুছ করে, 'তা ইটি কে বইললে না তো।'

'বন্ধু।'

বলে অচিনবাবু আমার দিকে একবার চোখের কোণে তাকিয়ে হাসেন। আবার বলেন, 'অবিশ্যি সময়মত হলে আমার বিটাও এত বড়টিই হত। এত বড় বিটাও তো বন্ধুই হয় বটে, নাকি বল।'

বুড়া বলে, 'নিশ্চয়, তা বটেই ত, বিটা বড় হলে বাপ বিটাতে সমান। আবার মা বিটিতেও তাই।'

বলে বুড়া রাধার দিকে চোখ ঘুরায়, রাধাও চোখ ফিরিয়ে যেন শত শত খড়কের মত রেখায় ভরা মুখখানিতে হাসি ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু গানের সঙ্গে খঞ্জনিতে তাল রাখে ঠিক।

অচিনবাবু আবার বলেন, 'দেখি, দূরে দাঁড়িয়ে গান শুনছেন, আসরে ডেকে নিয়ে এলাম। আমাকে আবার বললেন, আপনাকে চিনতে পারলাম না তো।' আমি বললাম, না চিনলে কি ডেকে নিতে পারি না। এখানে রসিক ডাকে রসিককে।'

'জয় গুরু। ভাল, ভাল বইলেছ। এখানে রসিক ডাকে রসিককে। তা তোমার রসিকের বয়স কাঁচা বটে, চোখ দুখানির ভাব দেখেছ?'

বুড়া আমার দিকে তাকায়, অচিনবাবুও। লজ্জা পেতে গিয়ে একটু অবাক হয়ে চাই। চাইতে গিয়ে চোখ ফেরাতে হয়। অচিনবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলেন, 'দেখি নি আবার, কালো বেড়ালের চোখ গ গোপী-দাদা, কালো বেড়ালের চোখ।' রসকে বুড়া হেসে কেশে একাকার। মুখ দেখ, যেন দুষ্ট ছেলেটা মাথা দুলিয়ে হাসে। বলে, হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ অ বাবা, জয় গুরু জয় গুরু।'

অচিনবাবুও দেখি সেই রকম হাসেন, আর টেরে টেরে তাকান আমার দিকে। আবার বলেন, 'ঠিক বলিনি গোপীদাদা।' 'যথার্থ ভাই যথার্থ। তোমার চখ কি ফাঁকি যায়। আবার দেখ, কেউটে কিলবিলানো চুল থুপি থুপি রয়েছে। কালো বেড়ালের থেকোও যেন সি কালো চিতার কথা মনে আসে, ই কালো চিতায় ধইরলে পরে মাইরবে গ আঠায় ঘা, অ তোর এক কলসীর মর ছিদ্দির বন্ধ কর গা যা।'

অচিনবাবু অমনি আবার হাত বাড়ান, 'বাহ্‌ গোপীদাদা, বাহ্‌।'

'আ থু-র, তোমার হাত সরাও দিকিনি।' বলে ও হাত ধরাধরি করে দুজনে হাসে। রাধা বুড়ীও দেখি আমার দিকে চেয়ে চেয়ে ফোকলা দাঁতে হাসে। এদিকে কানা রইল ঘোলায় পড়ে। না-হয় বয়সে অচিনবাবুর থেকে কাঁচা-ই, কিন্তু চোখের ভাবে কালো

বেড়াল হয়ে গেলাম কেন। কালো চিতার বা মর্ম কী। লজ্জা পেলেও অবাক হয়ে চাই, চেয়ে চেয়ে নিশ্চুপে জিজ্ঞেস করি।

কিন্তু সে জবাব কে দেয়। দু জনেই হাসাহাসি করে, চেয়ে চেয়ে দেখে। অচিন-বাবু আবার বলেন, 'তা হলে ঠিক দেখেছি দাদা।'

'নিশ্চয়।'

'আসতে গিয়ে দেখি,' একেবারে তন্ময় হয়ে শুনছে, আশেপাশে খেয়াল নেই। আবার দেখি, গোকুলের গান শুনতে শুনতে চোখে জল, ঠোঁটে জল।'

'হবেই ত, গোকুলের কথা মনে পইড়াছিল যা।'

অই হে, আবার দেখ দুটির কি দুষ্টু হাসির খিস্‌খিসানি। কিন্তু এমন করে ঘোলায় পড়ে থাকা যায় নাকি! নাকি এত শোনা যায়। জিজ্ঞেস করি, 'কী বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

বুড়া বলে ওঠে, 'বইলছে, "জ্বালিতে, বেড়ালের চখেতে আগুন, এ বেড়াল মানুষ করে খুন।"'

আবার হাসির ঢেউয়ের দোলা। অচিন-বাবু বলেন, 'আর গোপীদাদা বলছে, "এ চিতা রঙে কালো, থাকে কালো, কালাকাল যে মানে না, ঝোপ বুঝে কোপ মারবে যখন, মরবে তখন, মরার কথা জানবে না।"'

আবার হাসি, বুড়া প্রৌঢ়ের কাশি জড়ানো চাপা গলায়। তার পরে বোধ হয় বুড়ার একটু দয়া হয়, বলে 'বুঝলেন না গ রসিক বাবা, অই যিনি বেড়াল, তিনিই চিতা, বাস করেন ব্রজেতে। তা আপনাকে দেখে সি ব্রজের বেড়ালের কথা মনে পড়ে যেছে।'

চোখ ফেরাতে গিয়ে দেখি, অচিনবাবু তাকিয়ে সেই রহস্যে নিবিড় চোখে হাসছেন। বলেন, 'লজ্জা পাবেন না ভায়া, আপনার মধ্যে একটু ভাবের কারবার আছে তাই বলছিলাম আর কী। আসুন, চলবে?'

বলে গরম পাঞ্জাবির পকেট থেকে চুরুট বের করে দেন। কেবল বয়সের বড়ত্বে না, অত বড় জিনিসটা দেখে হঠাৎ হাত বাড়াতে সঙ্কোচ হয়। তাড়াতাড়ি বলি, 'থাক না, আমার কাছে সিগারেট আছে।'

'তা তো থাকবেই, যার যাতে মৌতাত।

তবে নেশাখোরদের একটা বদ স্বভাব কি জানো, নিজের মৌতাত পরকে আস্বাদ করিয়ে সুখ পায়। আপনার যদি ভাল লাগে, তবে একটা নিন।'

অমনি গোপী বাউল আওয়াজ দেয়, 'আমাদিগের অচিনবাবুর তাইতে সুখ।'

ঘাড় দুলিয়ে হাসেন অচিনবাবু, বলেন, 'হ্যাঁ।'

হাত বাড়িয়ে নিই। মন্দ কী, মাঠের এই পৌষের দিনের, খড়ের চালের ছায়ায়, ঠাণ্ডায় জমবে ভাল। মুখের কাছে তুলে ধরতে অচিনবাবু নিজেই দেশলাই জ্বালিয়ে ধরেন। তখন আবার বুড়ো ঘাড় নাড়িয়ে, দাড়ি কাঁপিয়ে হাসে। বলে, 'একটু বেমানান লাগছে বে গ অচিনবাবু, অত বড় জিনিসটা অমন কাঁচা মুখে।'

'সে কি গ গোপীদাদা, নেশাতে হল মনের পোক্তা, এখানে দেখতে শোভার কথা কী।'

'তা বটে, তা বটে।'

দুজনেই চোখে চোখে চেয়ে হাসে। তখন আমি সংকোচে হেসে বলি, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'একটা কেন ভায়া, হাজারটা হোক না, কী কথা?'

'আপনার নামটা অদ্ভুত, এরকমটা এর আগে শুনি নি।'

অচিনবাবু হেসে বলেন, 'অদ্ভুত করেছে লোকে, আসলে আমার নাম হল অচিন্ত্য মজুমদার। ছিলাম অচিন্ত্য, হয়েছি অচিন, তা সে যখন থেকে এই শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছি, তখন থেকেই ওই নাম।'

'ও, আপনি বুঝি এখানেই থাকেন?'

বুলি একটু ভিন্ ধরনের, শুনলে টের পাবে। বলেন, একদা ছিলাম, শিশু থেকে যৌবনে পড়া পর্যন্ত পড়াশোনাটা এখানেই হয়েছিল। বলতে পারেন, গুরুগৃহে যাপন। ছেলেবেলায় এসেছিলাম পাঠ ভবন থেকে, বিদ্যাভবন অর্থাৎ ইউনিভার্সিটির পড়া শেষ করে আর এক জীবনের পথে। এখন যে কোথায় থাকি, ঠিক করে বলাই মুশকিল, আপাতত এসেছি লখনউ থেকে। চাকরি করি সরকারী, বিশ্রাম নেবার কথা তিন বছর আগেই, কর্তারা ছাড়েন নি। তবে সেখানেই থাকি, এ সময়টা এখানে না এসে থাকতে পারি না। আসলে—।'

কথা থামিয়ে চুরুটে বারেক টান দেন, ধোঁয়া ছেড়ে ধোঁয়ার আড়াল থেকে নিজের মনেই হাসেন একটু। কথার খেই ধরে আবার বলেন, 'আসলে প্রথম জীবনে ফিরে ফিরে আসা। মা-হয় বলতে পারেন ওপারেই বসত, এ পারে মাঝে মাঝে ঘুরে যাওয়া। আরো যদি বলেন, তা হলে বলতে হয়, একদা জীবন যৌবন দুই-ই ছিল, সেটা মনে করতে আসা...।'

যেন আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, না বলে শুধু হাসলেন। এবার দেখ মুখের রেখায় ভাঁজে ভাঁজে, কত হিজিবিজি লেখা। গূঢ় ভাষার কত অক্ষর হাসি-হাসি মুখখানিতে কেঁপে কেঁপে যায়। ঢুলুঢুলু চোখের আনমনা দৃষ্টিতে যার ভাষা সে-ই পড়ে, তোমার কাছে দুর্বোধ্য। কেবল এইটুকু মনে হয়, এই হাসির ওপারে কোথায় যেন তারের ওপরে ছড়ের টানে ঢেউ খেলানো সুর বেজে যায়। যেমন সহজেতে অসহজের ঘূর্ণি খেলে। সেখানে অচিনবাবুর অচিন খেলা করে।

ডাগরা বাউল তখন বাঁয়াতে ডুপ্ ডুপ্ শব্দ তুলে কোমর দুলিয়ে গাইছে,

মানুষ ভোবে, মানুষ ভাসে,
মানুষ কাঁদে, মানুষ হাসে,
মানুষ যায়, মানুষ আসে
কেবল কর্ম প্রকাশিতে।
অ ভোলা মন, মানুষে মানুষ আছে...

কয়েকজন জয়গুরু ধ্বনি দিয়ে ওঠে। অচিনবাবু বলেন, এই তো একমাত্র কথা। তা ভায়ার—।'

আবার ঠেক, কথা শেষ করতে পারেন না। ডাগরা বাউল তার আগেই হাঁক দিয়ে ওঠে, 'অই গ অচিনবাবু, অই একখানা চাই কিন্তু।'

বলে দু আঙুল ঠোঁটে ছুঁইয়ে ধূমপানের ভঙ্গি করে। অমনি অচিনবাবু ধমকে ওঠেন, 'দূর, বাউল আবার চুরুট খাবে কী রে। তোরা খাবি গাঁজা।'

অমনি সকলের হাসি। সেখানে অনেক যুবা কবি-সাহিত্যিকেরও ভিড়। দেখলে চিনতে পারবে। সবাই কলম বাগিয়ে ধরে গান লিখে নিচ্ছে। সকলেই হাসাহাসি করে। বুঝতে পারি, এ আসরে অচিনবাবু পালের গোদা। এর মধ্যেই সকলের চেনা মানুষ তিনি। সকলের মুখ দেখলে বুঝতে পারি। বাউলদের তো কথাই নেই। বুড়া বাউলের পায়ে হাত দিতে যান, ছোকরাকে করেন তুই-তোকারি। এ তো ঘরের ঘরী, দলের দলী না হলে হয় না।

ডাগরা বাউল পাগড়ি ঝাঁকিয়ে তাকায় সেই ডাগরী মেয়ের দিকে। বলে, 'অই লাও, শুইনছ গ তোমার অচিনদাদার কথা।'

ডাগরী মুখ ফিরিয়ে টানা-টানা ভুরুতে আরো টানা দিয়ে হাসে অচিনবাবুর দিকে চেয়ে। অচিনবাবু বলেন, 'তা কি মিথ্যা বলেছি নাকি গ বিন্দু।'

মেয়ে একবার তাকায় বাউলের দিকে, আবার অচিনবাবুর দিকে। কালো চোখের তারা ঘুরিয়ে বলে, 'জিগেস করেন ক্যানে, গাঁজা কী বস্তু। কথা আপনি ঠিক বইলেছেন দাদা, বাউল ক্যানে চুরট খাবে।'

ততক্ষণে বাঁয়াতে তাল লেগেছে, একতারাতে বঙ্ বঙ্। পাশের মানুষের দোতারাতেও সুর বেজে ওঠে। ডাগরা আগে বলে, 'তবে গাঁজার কথাই শোনেন, গাঁজাকে ছোট কইরতে পারবেন না গ।'

বলেই যেন ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে সবাইকে ডাক দেয়, আর গায়,

'অ ভাই, এইস প্রেমের গাঁজা খাবে কে।'

প্রথমে অচিনবাবুই হাঁক দিয়ে ওঠেন, 'হরি বোল্! হরি বোল্।'

ডাগরা বাউল এক পাক ঘুরে চোখ আধবোজা করে গায়,

'অ হে, ধইরচে নেশা, ঘুচবে বাসা,
লও আশার ধরমো কলিকে,
অ ভাই এইস প্রেমের গাঁজা খাবে

রাগেরো খরসান দিয়ে
মধুর রসের জল মিশায়ে
গোলাপ ভক্তি নিচে ধুয়ে,
রিপুকে কাট প্রেম-কাটারিতে।'

আবার অচিনবাবু হরিধ্বনি দিয়ে ওঠেন। ডাগর বাউল নাচে ধিতাং তিতাং।

গেয়ে বলে,

'কিন্তুক, কলকের দিও ঠিকরে
লইলে পড়ে যাবে ঠিকরে,
ঠিক ছাড়া হয়ো না ভাই
কাজের কথা বলি তোমাকে।'

অচিনবাবু বলেন, 'বল্ বল্ শুনি।'

ডাগরা চোখ ঘুরিয়ে দু হাতে কলকে ধরার ভঙ্গি করে গায়,

'সাঁপিখানি করে লয়ে
কলকের তলাতে দিয়ে
প্রেমের গাঁজা খাও পিয়ে হে
নিষ্ঠা দম রেখে গুরুরো পায়ে।'

অমনি অচিনবাবু দাঁড়িয়ে উঠে ধ্বনি দেন, 'হরি বোল্ হরি বোল্।'

বলে জামার ঝোলা পকেট থেকে বের করেন কাঠের বাক্স। তার ভিতর থেকে মুঠো করে তোলেন অনেকগুলো চুরুট। হাত বাড়িয়ে বলেন, 'এই নে, এই নে, জবর শুনিয়েছিস।'

সভা শুদ্ধ হাসির লহর। ডাগরী বিন্দু বলে, 'হার মানলেন নাকি গ দাদা।'

'হার মেনেই তো জিতলাম, না হলে কি গান বেরুতো তোর পুরুষের।'

অমনি ডাগরীর চোখের পাতায় লজ্জা, নত করে হাসে। আবার ডাগরার দিকে চায় আড়ে আড়ে।

অচিনবাবু বলেন, 'এবার তোর আর গোকুলের গলায় গান শুনব, ধর।'

ক্রমশ

ভাসমান তরী —বিভূতি চক্রবর্তী

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের প্রদর্শনী

অবনীন্দ্র পরিষদ ও রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটির উদ্যোগে ২৮ আগস্ট সন্ধ্যায় রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের ৯৭তম জন্মোৎসব উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিচিত্রা ভবনে শিল্পগুরুর আঁকা এক চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। খ্যাতনামা ভাস্কর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী তার উদ্বোধন করেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীভূপতি মজুমদার।

অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলার পথ-প্রদর্শক এবং শিক্ষক ও উপদেষ্টা হিসাবে চিত্রকলাক্ষেত্রে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিগত যুগে তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করে নন্দলাল বসু প্রমুখ কয়েকজন সুযোগ্য শিষ্য উত্তরকালে খ্যাতিলাভ করে গুরুর সুনাম ও সম্মান বজায় রাখেন। সবচেয়ে বড় কথা, অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন চিন্তাশীল—তাঁর সুগভীর চিন্তাধারা ও কল্পনা যে কেবলমাত্র চিত্রকলাক্ষেত্র সমৃদ্ধ করেছিল তা নয়—অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেও তার প্রভাব পড়েছিল।

প্রদর্শনীতে যে কয়টি ছবি পেশ করা হয় তার মধ্যে শাহজাহানের মৃত্যু, পুরীতে শ্রীচৈতন্যদেব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি পরিচিত। অধিকাংশ ছবিই জলরঙে ও ওয়াশ প্রথায় আঁকা। সমকালীন চিত্রকলার ধারা ও অঙ্কনরীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাহলেও যুগ সন্ধিক্ষণে যে মহান শিল্পী রঙ ও তুলির সাহায্যে নূতন জগতের সন্ধান দিয়েছিলেন তাঁর নিষ্ঠা, দৃষ্টিভঙ্গী ও অঙ্কনপ্রণালী দেখে এ যুগের শিল্পীবৃন্দও লাভবান হবেন সন্দেহ নেই।

ভাষণ প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ বলেন যে, অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে রঙ ও রেখার সামঞ্জস্য দেখা যায় এবং তুলি যেন তাঁর আদেশ মেনে চলত।

*

শহরের দুই গ্যালারীতে সম্প্রতি তিনজন শিল্পী প্রদর্শনীর আয়োজন করেন—বিমল ব্যানার্জী, বিভূতি চক্রবর্তী ও কুমারী অঞ্জু চৌধুরী।

আলিয়ঁস ফ্রাঁসের গ্যালারীতে ফরাসী কনসাল জেনারেল মঁসিয়ে মাইকেল রেমোভিল শিল্পী বিমল ব্যানার্জীর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। (গত বছরেও এই শিল্পী এক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন)। ফরাসী সরকারের বৃত্তিলাভ করে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য প্যারী যাবার পূর্বে ইনি এই প্রদর্শনীতে ২০ খানি ইনট্যালিও পেশ করেন। ইনট্যালিও কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ বার করা হয়ত কঠিন হবে—তবে পাঠককে বোঝাবার জন্য এটুকু বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে, এচিং গ্রাফিকের অন্য ও এক প্রকারের ছাপ বা প্রতিলিপি। তামা বা দস্তার প্লেটের ওপর গভীর রেখা বা খোদাই (deep biting) ও বিভিন্ন কারু-কার্য খোদাই করে তারই ছাপা প্রতিলিপিই হচ্ছে ইনট্যালিও। অবশ্য প্রণালী জটিল, তবে বলা বাহুল্য যে, আকার ও রচনাক্ষেত্রের (texture) সৌন্দর্যগত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করাই এর প্রধান লক্ষ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আকারের চেয়ে রচনাক্ষেত্রের নানা মারপ্যাঁচের ওপর শিল্পীর নজর পড়ে বেশী; ফলে আকারের প্রাধান্য প্রায় লোপ পায়। সুখের কথা এই শিল্পী এ বিষয়ে সচেতন। ইনি অনুভূতিশীল, এবং কয়েকটি গ্রাফিক কাজ করে তরুণ শিল্পীদের মধ্যে স্থান করে নিয়েছেন। আকার ও রচনাক্ষেত্রের বৈচিত্র্য উভয়ই এ'র বর্তমান কাজে স্থান পেয়েছে।

টাইক্রেল পিস —বিমল ব্যানার্জী

বস্তুত কয়েক ক্ষেত্রে ইনি আকার ও রচনা-ক্ষেত্রের সৌন্দর্য্য সমন্বয়ে কাজের মধ্যে সাধারণ আঁকা ছবি ও গ্রাফিকের সম্মিলিত

রূপটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন—যেমন টাইটেল-'এচ'। গভীর খোদাইয়ের জন্য টাইটেল-'এল' ও টাইটেল-'আর'-এর নাম করা যায়।

শিল্পী বিভূতি চক্রবর্তী বারাণসীর বাসিন্দা। ইনি ১৯৪৭ সালে বারাণসীর সেণ্ট্রাল উইভিং ইনস্টিটিউট থেকে টেক্সটাইল টেকনলজি ও ডিজাইন-এ ডিপ্লোমা লাভ করেন এবং চিত্রাঙ্কন শুরু করেন আরও পাঁচ বছর পরে। শিল্পী যত্নসহকারে ছবি এ'কে গেছেন এবং বিশেষ করে তিনি যে সমকালীন চিত্রকলাধারা বিষয়ে ওয়াকিবহাল সেটা তাঁর কাজ দেখেই বোঝা যায়। এ'র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় আকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে। এই শিল্পী তেলরঙ মাধ্যমে আঁকেন ও এ'র নানা রঙে পূর্ণ পাত্র থেকে ইনি লাল, নীল ও সবুজ রঙই অধিক ব্যবহার করেন। এ'র বৈশিষ্ট্য এই যে, অধিকাংশ ছবিতেই বারাণসীর প্রাচীন ও পরিচিত রূপটুকু ফুটে উঠেছে। বারাণসীর গঙ্গা ও ঘাটের সোপানশ্রেণী, গঙ্গাতীরে বিভিন্ন আকারের পুরাতন ইমারত, ঘাটে বাঁধা নৌকাশ্রেণী অথবা অন্ধকার, অতি পুরাতন সরু ও সর্পিল রেখাজাতীয় বারাণসীর গলি—এক কথায় পবিত্র এই

শহরটির পুরোতন অথচ চিরন্তন রূপটুকু শিল্পী সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। এঁর রচনাপদ্ধতি সমকালীন। কয়েকক্ষেত্রে শিল্পী সম্ভবত পোলক-এর ড্রিপিং প্রণালী অবলম্বন করেছেন। তাই বাস্তবানুগ হলেও অংকনরীতির গুণে কয়েকটি রেখার মায়াজালের মধ্য দিয়ে শিল্পী স্বীয় বক্তব্যটুকু প্রকাশ করেছেন। যেমন, 'সুইংগিং বোটস', 'প্যাটার্ন অব রেন ওয়াটার' ও 'অ্যানাটমি অব লেনস।' কিন্তু মাত্রার অতিরিক্ত পোলক-প্রীতির জন্য আবার রসভংগও ঘটেছে যথা, 'সিটি অব টেম্পলস।' তবে আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে 'একলিপস।' গ্রহণ কবলিত চাঁদের ম্লান আলোকে বারাণসী শহরের ম্রিয়মান রূপটি শিল্পী প্রধানত মভ, ইয়েলো ওকার, নীল ও লাল রঙের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেছেন। অপরাপর ছবির মধ্যে 'এসথেটিক প্যাটার্ন' ও 'ফেস্টিভ প্যাটার্ন' উল্লেখযোগ্য।

কুমারী অঞ্জু চৌধুরীর প্রদর্শনীও আকাডেমির গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত হয়। এটিই শিল্পীর প্রথম প্রদর্শনী এবং এখানে তিনি ছবি ও গ্রাফিকের কয়েকটি নিদর্শন পেশ করেন। অঞ্জু চৌধুরী সরকারী আর্ট কলেজ থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন ও প্রথমে বরোদার শিল্পী এন এস বেন্দ্রে ও পরে কলিকাতায় শিল্পী পরিতোষ সেনের সঙ্গে কাজ করেন। ইনি কমনওয়েলথ বৃত্তিলাভ করেছেন ও শীঘ্রই উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে রওনা হবেন।

এই শিল্পী ও বিভূতি চক্রবর্তীর প্রদর্শনী অ্যাকাডেমি ভবনের পাশাপাশি দুই গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত হয় এবং আশ্চর্যের বিষয় ভিন্ন স্থানের বাসিন্দা হলেও দুই শিল্পীর চিন্তাধারার মধ্যে যেন সামঞ্জস্য দেখা যায়। কুমারী অঞ্জু সমকালীন চিত্রকলাধারা অনুযায়ী রচনারীতি অবলম্বন করলেও মনেপ্রাণে তিনি ভারতীয়। প্রধানত তিনটি বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে তেলরঙ মাধ্যমে এই শিল্পী নানাভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। প্রথম, সৌরাষ্ট্রের এক শ্রেণীর আদিম অধিবাসী, দ্বিতীয় টঙ্গাগাড়ি ও তৃতীয় নানাবিধ পুতুল ও খেলনা। দ্বিতীয় পর্যায়ের নিদর্শনগুলি আমার খুব ভাল লেগেছে। টংগাকে হয়ত ঠিক রথের পর্যায়ে ফেলা যায় না কিন্তু শিল্পীর রূপসন্ধানী মন ও সাবলীল অংকনশৈলীর গুণে পথের অতি সাধারণ টঙ্গাই যেন পুরাকালের সুন্দর ও শৌখীন রথে পরিণত হয়েছে। নানা রঙের মধ্য দিয়ে শিল্পী নানাভাবে এই বিষয়বস্তুটি আঁকবার চেষ্টা করেছেন। তবে 'চেরিয়ট ইন ব্লু' ছবিখানিই যেন সকলকে বেশী আকর্ষণ করে। কেবলমাত্র নীল রঙের কয়েকটি মোটা মোটা আঁচড়—বাস্তবিক এই সুনির্বাচিত রঙ এবং স্বচ্ছ ও

কুলু মিছিল —অঞ্জু চৌধুরী

সাবলীল প্রকাশ-ভংগীমা দেখে যেন রূপকথার রথের কথাই মনে পড়ে যায়। খেলনা ও পুতুলকে ভিত্তি করে শিল্পী যে ছবি এঁকেছেন তার মধ্যে কাঠপুতলী ও পেপার এলিফ্যাণ্ট উল্লেখযোগ্য—দুটির মধ্যেই প্রাচীন লোকচিত্রের প্রভাব দেখা যায়। তবে এই পর্যায়ে 'কুলু ফেস্টিভ্যাল' ও 'কুলু প্রোসেশন' সকলেরই চোখে পড়ে। প্রথমটিতে মাত্র হলদে রঙের ভিতর দিয়েই শিল্পী কুলু ভ্যালীর মেলার আনন্দ ও রূপ ব্যক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি ছবির নাম করা যেতে পারে—'ইয়েলো অরেঞ্জ'। তুলির মাত্র দুই-তিনটি টানের মধ্য দিয়েই শিল্পী যে স্বীয় বক্তব্যটুকু অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করতে পেরেছেন, এ ছবি যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন। গ্রাফিকের মধ্যে উডকাট ও লিনোকাটের কাজ পরিচ্ছন্ন। নিউ ইয়র্ক এশিয়া সোসাইটি থেকে প্রকাশিত "ইন প্রেজ অব কৃষ্ণ" বইখানির জন্য শিল্পী কয়েকটি লিনোকাট চিত্র রচনা করেন। বইখানির একটি কপি প্রদর্শনীতে ছিল এবং যাঁরা ভিতরকার ছবিগুলি দেখেছেন তাঁরাই এই শিল্পীর চিন্তাধারা, অনুভূতি ও সূক্ষ্ম রচনারীতির প্রশংসা করবেন সন্দেহ নেই।

—চিত্রপ্রিয়

সেরা বাছাই-করা কমলালেবুর রসে তৈরী...

REX
ORANGE
SQUASH

আমরা শুধু চমৎকার চমৎকার কমলালেবু-গুলিই বেছে নিই—যেগুলি সূর্যের আলোয় পেকে উঠেছে, দেখতে সোনার বর্ণের মত এবং পরিপূর্ণ রসে-ভরা। তারপরে ওর রস বের ক'রে নিয়ে বিশুদ্ধ আখের চিনির সিরাপ ও অন্যান্য বিশেষ উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরী হয় অতি আরামের পানীয়—রেক্স অরেঞ্জ স্কোয়াশ।

একটি সুন্দর 'প্রিন্সেস' কোস্টার পাবেন, রেক্স বোতলের প্রতি চারটি ঢাকনার বদলে।

কর্ন প্রোডাক্টস্ কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

দিনরাতের খেলা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পনর
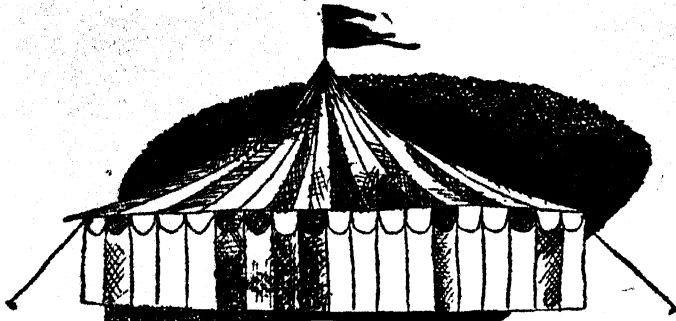
খিদিরপুর থেকে টালিগঞ্জ বেশী দূরে নয়, কিন্তু এই দুই অঞ্চলের প্রভেদ অনেক। এদিকটা পরিচ্ছন্ন, নির্জন। চার পাশ ফাঁকা-ফাঁকা, কাছাকাছি অনেক বড় বড় গাছ। কিছু দূরে দু-তিনটে পুকুরও আছে। রাস্তার ধারেই পাঁচিল ঘেরা বৃহৎ একখণ্ড জমি। পাঁচিলের ওপর রঙীন কাচের ছোট ছোট টুকরো গাঁথা। কোন সার্কাস এখানে আগে আসে নি, জুয়েলই প্রথম।

পাঁচিলের গায়েই দোতলা-তেতলা বাড়ি। বারান্দা থেকে অনেক কৌতূহলী চোখ প্রথম থেকেই সার্কাসের প্রস্তুতি পর্ব দেখছিল। সার্কাসের যাযাবর মানুষরাও কাজের ফাঁকে-ফাঁকে সাধারণ মানুষের সংসার নির্বাহের টুকরো-টুকরো ছবি দেখতে-দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল।

বিশৃঙ্খল অবস্থা গুছিয়ে নিতে বেশী সময় লাগল না। আর কিছু সময় কাজ এগিয়ে যেতে পারত—পুষ্পরাজ বলেছিল, দড়ির সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে ওপরে উঠে ট্র্যাপিজের কাঠের প্ল্যাটফর্ম পরীক্ষা করে দেখবে কিন্তু তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। হারকু সাহেব দুর্ঘটনার আশঙ্কায় রাজি হল না। কেননা এখনো আলোর অনুমতি আসে নি। সম্ভবত কাল বিদ্যুৎ সরবরাহের খবর পাওয়া যাবে।

পরশু থেকে আবার খেলা শুরু হবে জুয়েল সার্কাসের। টালিগঞ্জে প্রথম সন্ধ্যায় প্রথম খেলা ট্র্যাপিজ। কাঠের নতুন রং করা বোর্ড পোঁতা হয়েছে। তিনজন মেয়ে জরীর খাটো পোশাক পরে অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে ট্র্যাপিজের প্ল্যাটফর্মের ওপর, অন্য দিকে ক্যাচার পুষ্পরাজ পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তাকে না দেখেই ঠিক-ঠিক চেহারা এঁকেছে আর্টিস্ট। থ্যাবড়া মুখ, ছোট ছোট চোখ হঠাৎ দেখলে বড় নিষ্ঠুর এক মানুষ বলে মনে হয়।

খেলা না থাকলে মেজাজ ভাল থাকে না হারকু সাহেবের। আলস্যের চাপে ঘুম এসে যায়। ঘুম এলেও ঘুমতে কষ্ট হয় তার, মনে হয় সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—ফাঁকি দিচ্ছে তার সব লোক—কোন কাজ হচ্ছে না।

"এক গিলাস পানি", ঘুমের ঘোরে কথা বলার মতন হঠাৎ এক সময় খুব আস্তে হারকু সাহেব বলে উঠল এবং জল ভরা গেলাসের জন্যে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সামনে।

হারকু সাহেবের গলায় কড়া ঝাঁজ উঠছিল। শুকনো-শুকনো জিব, থুতুও নেই। তার চোখ বন্ধ। তাঁবুর মধ্যে কাঠের একটা চেয়ারে অনেক সময় চুপচাপ বসে-বসে তন্দ্রার মতন মনে হচ্ছিল হারকু সাহেবের। তার বন্ধ চোখের মধ্যে সার্কাসের রিং-এর মতন অনেক ছোট ছোট চক্র ঘুরছিল এবং অসংখ্য হলুদ বিন্দু চিকচিক করে উঠছিল।

হারকু সাহেবের কথা শোনবার কোন মানুষ এখন ছিল না। রাত অনেক। শেষ ট্রাম রাস্তা কাঁপিয়ে চলে গেছে। কোন শব্দ নেই। খুব চুপচাপ। নেশায় আচ্ছন্ন হারকু সাহেব সময়ের খেয়াল না করে তার পিপাসার কথা অন্ধকারের ভিতর প্রকাশ করল।

"এক গিলাস পানি—" আরও পরে বিরক্ত হয়ে মাটিতে পা ঠুকল হারকু সাহেব, চোখ খুলে ছটফট করে উঠল। এবং পরেই যে-হাত সে এখনো বাড়িয়ে রেখেছিল জল ভরা একটা গেলাসের আশায় তা নামিয়ে নিয়ে নেশার ঘোরে হেসে উঠল।

পিঠে ব্যথা, কোমরে ব্যথা। হাত-পা অসাড়। ঘাড়ের ওপর চুল ভিজে-ভিজে, কপালে ঘাম—জলের হাত বুলিয়ে দেয়ার মতন। টেবিলের ওপর কালো কুঁজো, কাচের গেলাস—এসব দেখল হারকু সাহেব, উঠল না—কাঠের চেয়ারে সোজা হয়ে বসল।

কিছু দূরে হারকু সাহেবের নিচু খাট, মশারি টাঙানো। ঝাপসা চোখে তা দেখতে দেখতে তার হঠাৎ নিজের কবরের কথা মনে হল। এবং এখনো ঘুমের আমেজে অবসন্ন হয়ে থাকলেও মশারির মধ্যে ঢোকবার সাহস হল না হারকু সাহেবের। মৃত্যুর একটা অনুভূতি আতঙ্কের মতন তাকে তার তাঁবু থেকে বের করে সার্কাসের জমির বাইরে টালিগঞ্জের বড় রাস্তার ওপর ঠেলে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল।

টালিগঞ্জের বড় রাস্তার ওপর নীল নকশা কাটা ঘরের মধ্যে হারকু সাহেব এক বিখ্যাত পীরের কবর দেখেছিল। চারপাশে অনেক মোমবাতি, ধূপের মিষ্টি গন্ধ। মানুষের ভিড়। বিখ্যাত পীরের উদ্দেশে তারা শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছিল।

তাঁবুর মধ্যে বড় গরম, বড় অন্ধকার। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল হারকু সাহেব, পরে টান মেরে মশারির দড়ি ছিঁড়ে ফেলল এবং আরও পরে জীবন্ত এক পীরের মতন আস্তে আস্তে পা ফেলে তাঁবুর বাইরে এসে কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

অন্ধকার বাইরে কিছু পাতলা, রাস্তার আলোর রেখা ছিটকে এসেছে। এক-একটি তাঁবু সৈনিকের ছাউনির মতন। দূরে-দূরে ঝাউ গাছ নিথর, নিস্পন্দ। হারকু সাহেব মাথা তুলে আকাশ দেখল—তাঁবুর ময়লা কাপড়ের মতন কালো. একটি তারাও নেই।

গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল হারকু সাহেব। হাওয়া উঠেছে। এক-একটা বড় বড় ঝাউ সনসন শব্দ করছে। খুব আস্তে চলতে চলতে দীর্ঘ ঝাউ-এর দিকে চোখ ফেলে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হারকু সাহেব। তার মনে হল কালো বোরখায় মুখ ঢাকা এক মূর্তি সার্কাসের জমির বাইরে কোথাও অবসর যাপনের ইচ্ছায় পা টিপে-টিপে তার পিছন-পিছন আসছে।

হাতির গলায় ছোট ছোট ঘণ্টা টিনির-টিনির করে বেজে উঠল। ঘোড়া ঘরর ঘরর করল কয়েক বার। হারকু সাহেব ভীতুর মতন চারপাশে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

তার কপালের ঘাম রাতের হাওয়ায় শুকিয়ে এসেছে, ঘুমের জড়তাও নেই এখন, শুধু তৃষ্ণায় গলা জ্বলছে। নির্জন আলো-অন্ধকারে দূরে ঝাউ-এর দিকে তাকিয়ে হারকু সাহেব আপন মনে আর একবার বলে উঠল, "বিবি, এক গিলাস পানি পিলাও!"

গেটের কাছে নেপালি দারোয়ান টুলের ওপর বসে-বসে ঢুলছিল, হারকু সাহেবের গলা পেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল, "সেলাম!"

মুহূর্তের চমক সামলে নিল হারকু সাহেব। ঘুম থেকে প্রথম জেগে ওঠার মতন খালি-খালি চোখে কিছু সময় দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে থাকল, "দারোয়ান?"

"জী, সাহাব?"

"বাহার গিয়া কোই?"

"জী, হাঁ।"

দারোয়ান অন্ধকারে লক্ষ করল না, হারকু সাহেব হাসল এবং নরম স্বরে জিজ্ঞেস করল, "কোন?"

"উ মাহুত গিয়া, বাচ্চু গিয়া—"

হারকু সাহেবের কপাল ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে এল। দূর থেকে হাতির দিকে তাকিয়ে সে ভাবল, বড় রোগা হয়ে যাচ্ছে লছমী। তাকে হয়তো ঠিক মতন খেতে দেয় না মাহুত, তার খাবারের পয়সা চুরি করে বাইরে গিয়ে ফুর্তি করে। অন্য সময় হলে দারোয়ানকে গালাগাল করত হারকু সাহেব—মাহুতকে পরে আর কখনো রাতে বাইরে যেতে না দেয়ার কথা বলে দিত।

কিন্তু আজ কিছু বলল না, ঈর্ষার একটা যন্ত্রণা সে মনে মনে অনুভব করছিল। আর কে কে বাইরে গেছে তা জানবার আগ্রহ হচ্ছিল বলে হারকু সাহেব। কিছু পরে আবার মৃদু গলায় দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করল, "আউর কোন গিয়া?"

"উ রাধানাথবাবু গিয়া—"

"উনকো বাত ছোড়, আউর—"

"আউর কোই নেই গিয়া সাব।"

"করালীবাবু?"

দারোয়ান একটু ভেবে বলল, "নেই—"

হারকু সাহেব পীরের কবরের দিকে গভীর রাতে যেতে গিয়ে ইতস্তত করল। গেটের বাইরে পেট্রলপাম্পের নীল আলো স্থির হয়ে

আছে। চিকচিক করছে ট্রাম লাইন। রাস্তার পাশে টালিগঞ্জের খোলা ড্রেনের উৎকট গন্ধ তার নাকে এসে লাগছে।

হারকু সাহেবের সামনে রাস্তার ওধারে আর একটা খুব উঁচু পাঁচিল। বড় বড় গাছের নিচে রেস কোর্সের গেট। শাহন্দ্রো মানুষের স্মৃতির মতন। আশ্চর্য, ড্রেনের গন্ধ ভাল লাগছে হারকু সাহেবের। ঘাড় বেঁকিয়ে সে নোংরা জল দেখল এবং তখন তার আর একবার তৃষ্ণার কথা মনে হল। দারোয়ান তার সামনে না দাঁড়িয়ে থাকলে চান্দু জমিতে পা ঘষে-ঘষে ড্রেনের আরও কাছে চলে যেত হারকু সাহেব—চকচক করে অনেকটা নোংরা জল-খেয়ে নিত।

গেটের ভিতরে চলে এল হারকু সাহেব। নিজের বাইরে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল বলে, এখন রুক্ষ স্বরে দারোয়ানকে আদেশ করল, "আউর কিসিকো বাহার যানে মৎ দেও, ফাটক বনধ করকে ঠিক সে বৈঠো।"

নেপালি দারোয়ান সেলাম ঠুকে বলল "জী সাব।"

আরও পরে কালো আকাশ চিরে সরু এক ফালি চাঁদ উঠছিল। অন্ধকার চোখে সয়ে গেছে হারকু সাহেবের, চাঁদের পাশে আকাশের পরিষ্কার অংশ এই মুহূর্তে তার খারাপ লাগল। সে জানত, দারোয়ান ছাড়া এখন হয় তো আর কেউ জেগে নেই। জায়গা বদলের কঠোর পরিশ্রমে সব মানুষ পরিশ্রান্ত—অঘোরে ঘুমচ্ছে। এখনো হারকু সাহেব আস্তে আস্তে পা ফেলছিল।

অন্ধকার চোখে সয়ে গেলেও নিজের তাঁবুতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবল না হারকু সাহেব। যেসব মানুষ আরামে ঘুমিয়ে আছে সে তাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে চোরের মতন লুকিয়ে-লুকিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। এবং হঠাৎ এক সময় মানুষের গলা পেয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

যেমন ভেবেছিল হারকু সাহেব, তেমন না। সার্কাসের সব মানুষ ঘুমিয়ে নেই। কেউ-কেউ এখনো জেগে আছে। হারকু সাহেব চুপচাপ দাঁড়িয়ে জুয়েল সার্কাসের দুই ক্যাশিয়ার, বাহাদুর আর সহদেবের আলাপ শুনতে থাকল।

"কী বলিস রে বাহাদুর, কাজী?"

"ভাগ, শালা। মারব তোকে।"

"মারবি কেন? কাঞ্চীর সাথে পীরিত আছে তোর? বললি না সেদিন, ও তোর কাকা না মেসোর মেয়ে—"

হারকু সাহেব বাহাদুরের হাই তোলবার শব্দ শুনল। খস খস করে গা চুলকোতে চুলকোতে বিরক্ত হয়ে বলল বাহাদুর, "খবরদার সহদেব, কাঞ্চীর দিকে নজর দিবি তো। ভোজালী দিয়ে গলা কাটব তোর—বুঝলি?"

"কাট না শালা, কাট!" হো-হো করে হেসে উঠল সহদেব, "কাঞ্চী গলায় চাকু মেরে দিয়েছে মাইরি! এ বাহাদুর, আমার বাপের দিব্যি, একরাতে ফুসলে নিয়ে আয় না কাঞ্চীকে—"

"এই, চুপ!"

"তুই বহুৎ হারামি! আচ্ছা ঠিক হ্যায়, আমি টুনি মাসির সাথে সব ব্যবস্থা করে ফেলব।"

"আরে সহদেব, বাত শুন" চড়া গলায় কথা বলল বাহাদুর, "কাঞ্চীর কথা তুই ফের তুলবি তো হারকু সাহেবের কাছে আমি ঠিক লাগাব তোর নামে—"

"যা-না, লাগিয়ে দে। কাঞ্চীকে তবে জবাই করে দেবে হারকু সাহেব। আওরাত দেখলে শালা পাগলার মতন হয়ে যায়। আরে, আওরাতের পীর আছে রে হারকু সাহেব!"

পীরের যে নম্র মেজাজ হারকু সাহেবকে অন্ধকার তাঁবু থেকে বাইরে টেনে এনেছিল, তার সম্পর্কে সহদেবের উক্তি শুনে এখন তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। দাঁতে দাঁত চেপে ছোট একটা তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়েছিল হারকু সাহেব। হুড়মুড় করে সহদেবের তাঁবুতে ঢুকে পড়ে তাকে তার লাথি মারবার ইচ্ছে হচ্ছিল।

কিন্তু সে-ইচ্ছা খুব চেষ্টা করে দমন করল হারকু সাহেব। তার ভয় হচ্ছিল কেউ তাকে দেখে ফেলবে। তাঁবুর দড়ি টপকে সাবধানে সে সামনে এগিয়ে যেতে থাকল। দূরে শেয়াল ডেকে উঠল, গাড়ির তীক্ষ্ন হর্ন বাজল। বাঁক নেয়ার সময় গাড়ির হেড লাইটের আলো ঝলসে উঠল হারকু সাহেবের মুখের ওপর। হাত দিয়ে সে মুখ ঢাকল এবং মনে মনে বলে উঠল, গাড়ি হাঁকাচ্ছে বুদ্ধু! কী দরকার এখন এত জোরে হর্ন বাজাবার! রাস্তায় কোন মানুষ আছে?

এই তাঁবু বোধহয় করালীকান্তর। জোরে জোরে নাক ডাকাচ্ছে বামন ক্লাউন গোপাল। হারকু সাহেব উঁকি মেরে করালীকান্তকে খুঁজল। কিছু দেখা গেল না, বড় অন্ধকার। হারকু সাহেব তাঁবুর ভেতরে ঢুকে আস্তে ডাকল, "করালীবাবু?"

এত সময় ক্লাউন করালীকান্তর কথা মনে ছিল না হারকু সাহেবের, এখন গোপালের নাক ডাকার শব্দ শুনে মনে পড়ল। সন্ধ্যার প্রথম ঝোঁকে হারকু সাহেবের তাঁবুতে গিয়েছিল করালীকান্ত, কিছু সময় ইতস্তত করে ছুটির কথা জানিয়ে ছিল।

"কী কথা বলেন করালীবাবু?" তার কথা স্পষ্ট শুনতে পেলেও উত্তেজনার ঝোঁকে মদের গেলাস খুব শব্দ করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ছিল হারকু সাহেব এবং রুক্ষ গলায় তাকে প্রশ্ন করেছিল।

করালীকান্ত হারকু সাহেবের মুখের দিকে তাকাতে পারে নি, লণ্ঠনের কালো চিমনি দেখতে দেখতে খুব আস্তে বলেছিল, "দিন দু-একের ছুটি চাই হারকু সাহেব—"

"ছুটি? ছুটি কেন লিবেন?"

"একটা চিঠি এল বাড়ি থেকে, বড় বিপদ—"

"কী হল?"

"মেয়েটা রাস্তায় খেলতে বেরিয়েছিল।

পায়ে কাচ ফুটে খুব জ্বর হয়েছে—ধনুষ্টঙ্কার হয়েছে হারকু সাহেব—"

"ছুটি নিয়ে আপনি কী করবেন? মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে হারকু সাহেব বলেছিল, "আপনি ডাক্তার আছেন?"

"আমি বাপ।"

করালীকান্তর উদ্ধত স্বর শুনে হারকু সাহেব চিৎকার করে উঠেছিল, "ওসব বাপ-বেটির ঝুটমুট বাত আমাকে শুনাবেন না করালীবাবু। আপনার বেটির বীমার হয়েছে তো খেলা বন্ধ করে ছুটি দিব আমি আপনাকে?"

"আপনার খুশী।"

"আপনি বিলকুল বুদ্ধু আছেন করালীবাবু—"

"হারকু সাহেব, আমার বয়স হয়েছে," স্বর কাঁপছিল করালীকান্তর, হারকু সাহেবের টেবিল হাত দিয়ে চেপে ধরে সে থেকে থেকে বলেছিল, "ছুটি না দিতে চান না দেবেন—"

টেবিলে থাবড়া মেরে বলে উঠেছিল হারকু সাহেব, "ছুট্টির বাত শুনাতে শরম হল না আপনার? চার-পাঁচটা ক্লাউন আছে আমার সার্কাসে? পরশু রোজ খেলা শুরু—আজ নয়া ক্যাম্পে আপনি আমাকে ছুটির বাত শুনাতে এলেন—" তাকে কথা শেষ করবার সুযোগ দেয়নি করালীকান্ত, তাঁবু থেকে হঠাৎ বাইরে চলে গিয়েছিল।

এত রাতে করালীকান্তর তাঁবুতে তার ছুটি মঞ্জুর করতে আসেনি হারকু সাহেব। তাকে ছুটি দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কেন এসেছে তা সে নিজেই স্পষ্ট করে বুঝতে পারল না। সম্ভবত জীবন্ত এক পীরের মতন প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে তার শ্রদ্ধা পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগছিল বলে সে নিচু হয়ে হাতড়ে-হাতড়ে অন্ধকারে করালীকান্তর ঘুমন্ত দেহ স্পর্শ করবার চেষ্টা করছিল।

হারকু সাহেব আর একবার ডাকল, "করালীবাবু—"

গোপাল ঘুমের ঘোরে হারকু সাহেবের গলার স্বর চিনতে পারল না, বিড়বিড় করে উঠল, "টুনি মাসির তাঁবুতে গেছে গো—"

করালীকান্তর তাঁবু থেকে খুব তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল হারকু সাহেব। গোপালের কথা শুনে তার দুর্বল কতগুলো মুহূর্ত পার হয়ে গিয়েছিল। করালীকান্ত থাকলে কী সে তাকে বলত!

পাঁচিলের গায়ে সংসারী ভদ্র মানুষদের দোতলা-তেতলা বাড়িগুলোও এখন অন্ধকার। হারকু সাহেব সেদিকে তাকাল—দোতলার একটা ঘরে এখনো নীল আলো জ্বলছে, বারান্দায় সরু তারে যে রঙিন শাড়ি শুকোতে দেয়া হয়েছিল তা এখনো আছে। জানলা খোলা। রাস্তার আলোর রেখা গিয়ে পড়েছে জানলার পর্দার ওপর। পর্দা হাওয়ায় দুলছে।

মানুষের সংসারের এত কাছে আর কখনো আসেনি জুয়েল সার্কাস। জীবিকা অন্বেষণের নেশায় দুঃসাহসী মানুষের দল এতদিন তাঁবু ফেলে এসেছে লোকালয় থেকে অনেক দূরে—নদীর ধারে কিম্বা শহরের বাইরে কোন ফাঁকা ময়দানে, শ্মশানের কাছাকাছি।

যেখানে মেলার হৈ চৈ ছিল, তেলেভাজার ঝাঁজ উঠত, বেশ্যার ঘর ছিল। বারান্দার সরু তারে এমন রঙিন শাড়ি, নীল পর্দা—সংসারী মানুষের সুখনিদ্রার এমন

স্পষ্ট ছবি হারকু সাহেব দেখেনি।

গাঁজার উৎকট গন্ধ তার নাকে লাগছে। তিন তাসের জুয়ো খেলা হচ্ছে রেজাক খানের তাঁবুতে। হারকু সাহেব হাঁটছিল খুব আস্তে আস্তে, কোনদিকে যাচ্ছিল তার খেয়াল ছিল না।

"দশ।"

"বিশ।"

"চালিশ।"

"তাস দেখলাও? বাস, মার দিয়া—" কাটা-কাটা গলার স্বর, পয়সার আওয়াজ তাসের খস খস।

আরও পরে যমুনার তাঁবুর ওপর একটা হাত রাখল হারকু সাহেব, সাবধানে কানও ঠেকাল। ফিরে আসে নি রাধানাথবাবু। শিবনাথও আর ঢুকবে না এই তাঁবুতে। হারকু সাহেব হাসল। যমুনার জরীর কাঁচুলির মতন তার হাতে ঠেকছে তাঁবুর নরম কাপড়, এখান থেকে হঠাৎ সরে যাওয়ার ইচ্ছে হল না হারকু সাহেবের।

"কী গো ভীম সিং, মুখে কথা নেই যে?"

"না, টুনি, কথাবার্তা আর ভাল লাগে না। এক-একবার ভাবি সব ছেড়েছুড়ে চলে যাই।"

"তাই যাও না।"

"একবার বাড়ি ঘুরে আসতে চেয়েছিলাম —শুয়োরের বাচ্চাটা যেতে দিল না—"

"কে, হারকু সাহেব?"

"নাম মুখে আনতে নেই, বল শুয়োরের বাচ্চা।"

"অমন অনেক থাকে গো সার্কাসে। ওই যাজার মাস্টারটা—শয়তান! রোজ এসে ঘ্যানর ঘ্যানর করবে আমার কাছে, শাসিয়ে যাবে—"

"কেন?"

"ঘুমন্ত মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যেতে চায় রাউটিতে—"

"কাকে?"

"আগে নজর ছিল শান্তার ওপর। ধমক দিয়ে বলেছি, বাবুর নজর আছে না? চাকরি যাবে তোমার। তা এখন বলে, বেলাকে নিয়ে যাব—আমাকে বলে, ভাম্বুওয়ালী।"

"বাবু—আমাদের মালিক? মালিকানি মানুষ নাকি? বাবুর সুখ দুঃখ বোঝে কিছু!"

মানুষের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা বৃহৎ দলের নিঃসঙ্গ দলপতির মতন হারকু সাহেব নালিশ জানাচ্ছিল জন্তু জানোয়ারের কাছে। বাঘ-সিংহের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে কাতর চোখ মেলে সে মনে মনে বলছিল, করালীকান্ত বোলে আমাকে শুয়ারের বাচ্চা, সহদেব গালি দিল। এ চাঁদনী, এ সুরেষ— ভোলা আউর পান্না, আমার বাত শুনে! আমি তোদের ছাড়ব—সাচ বাত! সব শালাকে ফিনিশ করে দিব—আমার প্রেসটিজ রাখবি! সার্কাসের সব মানুষ শুয়ারের বাচ্চা!

"লছমী", ঘুরে-ঘুরে সব শেষে সামনে এসে দাঁড়াল হারকু সাহেব। করালীকান্তকে যেমন ডেকেছিল, হাতির শুঁড়ে হাত বুলোতে বুলোতে তেমন স্বরে সে আবার আস্তে ডাকল।

অন্ধকারের স্তূপের মতন হয়ে আছে লছমী, হারকু সাহেবের ডাক শুনে জোরে জোরে শুঁড় দোলাল। ঘুঙুরের বোলের মতন তার গলার ঘণ্টা বেজে উঠল, ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুর।

হাতির শুঁড়ি ঠাণ্ডা, কর্কশ। কিন্তু দু হাত দিয়ে তা শক্ত করে ধরেছিল হারকু সাহেব। এক-একবার শুঁড়ের কাছে সে নাক নিয়ে আসছিল, কখনো গাল ঘষছিল, মুখ ঘষছিল। পশুর সঙ্গে এই রকম আচরণ করে মনে মনে সে অদ্ভুত তৃপ্তির স্বাদ পাচ্ছিল।

মৃদু একটা ডাক শুনে হাতির কাছ থেকে কিছু দূরে চমকে সরে এল হারকু সাহেব, পিছন ফিরে লীলাকে দেখল। তার মুখ যন্ত্রণাকাতর, অন্ধকারে হারকু সাহেব স্পষ্ট দেখতে পেল না। নিজের দুর্বলতা লীলার কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে বলে তার মেজাজ অপ্রসন্ন হয়ে উঠছিল।

"কেন উঠে এলি লীলা?"

"এত রাতে হাতির সাথে কী কর হারকু সাহেব?" তাকে বিদ্রূপ করার মতন মুখ নামিয়ে লীলা বলল।

"যা, তাম্বুতে যা!"

লীলা গেল না, দাঁড়িয়ে থাকল। পকেট হাতড়ে সিগ্রেট খুঁজল হারকু সাহেব। পেল না। তাঁবু থেকে বেরোবার সময় সিগ্রেটের প্যাকেট সঙ্গে নিয়ে আসে নি।

লীলা কয়েক মুহূর্ত হারকু সাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকল, পরে বলল,

"ঘুম নেই তোমার চোখে?"

"লীলা, যা।"

"তোমার সাথে আমার কথা ছিল যে হারকু সাহেব—"

"কথা দিনের বেলায় বলবি।"

লীলা হাসল, "দিনের বেলা মানুষ ছেঁকে ধরে যে তোমাকে, তখন কথা হয়!"

হারকু সাহেব আর একবার রূঢ় স্বরে বলে উঠল, "চলে যা লীলা, না যাবি তো আমি তোকে—"

"কী করবে? মারবে? মার না—" লীলা হারকু সাহেবের কাছে এগিয়ে এল, সমস্ত শরীর মেলে দিল তার সামনে।

একটা কড়া কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে ইতস্তত করল হারকু সাহেব। লীলার গা থেকে ধূপের মতন মিষ্টি গন্ধ উঠছিল। হারকু সাহেবের হঠাৎ মনে হল পীরের কবরে মোমবাতির মতন মিটমিট করছে তার দু চোখ। সে বিমূঢ়ের মতন তার তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছিল।

লীলাও যাচ্ছিল তার পিছনে পিছনে। কালো বোরখায় মুখ ঢাকা একটা মূর্তির কথা হারকু সাহেবের আবার মনে পড়ছিল।

ক্রমশ

নিছক গল্প নয়

মেয়েদের নাকি চটপট্ বিয়ে করে ফেলা দরকার, আর ছেলেদের যতদিন সম্ভব বিয়েটা ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই ভাল। এই বলে হা হা করে হাসতে লাগলেন তাপসীদির বাপ। কথাটা প্রথমে অবশ্য বলেছিলেন বার্নার্ড শ'। শ'ও শেষ পর্যন্ত ঠেকাতে আর পারেন নি। বুড়োবয়সে সেবা যত্নের লোভে বিয়ে তাঁকে করতে হয়েছিল।

তাপসীদিকে পৌঁছে দিতে জলপাইগুড়ি এসেছিলেন তিনি। কাজেই কোথাও তিনি ডাক্তার। সাতাশ বছরের এম এ পাশ করা মেয়ের বিয়ে সম্বন্ধে নিতান্ত হতাশ হয়ে রাজী হয়েছেন তাঁকে কাজ করতে দিতে। আজকের কথা তো নয় যে, বিয়ের বিজ্ঞাপনে পর্যন্ত চাকুরে মেয়ের উপার্জনের খবরটা ফলাও করে ছেপে দেওয়া হয়।

মেয়ে স্কুলের হস্টেলের কোনার ঘরখানা পেলেন তাপসীদি। সেখানেই জমতো আমাদের আড্ডা। তাপসী চক্রবর্তী দর্শনের এম এ। শ্যামলা ঘেঁষা গায়ের রং, গভীর কালো প্রশান্ত চোখ দুটি, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ঘন চুলের রাশি মিলে তাপসীদিকে একটা শান্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপে দিয়েছিল। সে রূপে সব রূপসীর মধ্যে মেলে না। এ রূপে পুড়িয়ে মারে না, এ রূপে জ্বালা ধরায় না, এ রূপে প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। তাপসীদি ভাল সেতার বাজাতে পারতেন, রবীন্দ্র সংগীতের গলা ছিল মিষ্টি। সামান্য ছুটি মিললেই উঁচু ক্লাসের মেয়েরা জোর করে গান শুনতো, কৌটো খুলে বাড়ি থেকে আনা খাবার খেত আর তাপসীদি কখনও প্রেমে পড়েছিলেন কি না জানবার জন্য জুলুম করতো। সুন্দরী তাপসী বিয়ে না করে মাস্টারি করছেন শখের খেয়ালে—বড় মেয়েরা বিশ্বাস করতো না।

তাপসীদির ঘরের পরই থাকতেন করুণাদি। করুণাদি কিন্তু ছাত্রী। তাঁর চেয়ে উপরে পড়া মেয়েরাও তাঁকে করুণাদি বলতো। করুণাদির জীবনের কাহিনী বড়ই করুণ। বার বার টাইফয়েড হয়ে তাঁর স্মরণশক্তি প্রায় গেছে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। মোটা কাঁচের চশমা, ঝুঁকে পড়া শরীর, দাঁতগুলি অনেকটা বাইরে থাকে কারণ হল তাঁর মুখের কিছুটা বেঁকে গেছে। তবু করুণাদি মূর্তিমতী করুণা। একই ক্লাসে আছেন বছরের পর বছর তবু পড়ছেন, পড়ে আছেন বোর্ডিং-এ। বাড়ি গিয়েই বা করবেন কি? অভিভাবক বলতে দূরসম্পর্কের কাকা। তিনিই দেন স্কুল আর হস্টেলের খরচা। সেখানেই করুণাদি প্রায় বেঁধেছেন তাঁর ঘর। আজকের মত স্কুলের ভর্তি আর হস্টেলের স্থান নিয়ে দারুণ সংকট ছিল না বলেই করুণাদির আশ্রয় মিলেছিল। কারও জলবসন্ত হাম হলে করুণাদি সেবা করতেন, বড়দিদিমণির রান্নার লোক ছুটি নিলে করুণাদি হাঁড়িও ধরতেন। বই খাতা ক্লাসটাই বরং ছিল উপরন্তু। তাপসীদিকে পেয়ে করুণাদি যেন বর্তে গেলেন। সময় অসময়

দুটো গল্প করতে পারেন, মাথা ধরলে এগিয়ে যেতে পারেন সামান্য একটু উপশমের সংবাহন হয়তো মিলতে পারে, মন খারাপ লাগলে তাপসীদির ঘরের বালিশ ভিজিয়ে কাঁদতেও দ্বিধা হয় না। অন্যরা ঠিক এরকমটি নয়। ওপাশের সুলতাদি তো ঘোরতর সংসারী। শাশুড়ী আর ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে একখানা ঘরে থাকেন। শুনেছি স্বামী বিশেষ কিছু উপার্জন করেন না। মাঝে মধ্যে আসা-যাওয়া করতেন। নিরীহ ভালমানুষ। আসামের কোথাও সামান্য চাকরি আর সামান্য বেতনে পরিবার নিয়ে থাকতে ভরসা নেই। সুলতাদি ভালই মেয়ে, তবু দেখতাম কখনও কখনও নির্বিরোধ, শান্ত স্বামীটির উপর খিটিমিটি করতে। তখনও আমাদের বুঝবার বয়স হয় নি সুলতাদির অভিযোগ। বরং স্বামীটির জন্যই দুঃখ হতো।

বীণাদি সম্বন্ধে সবাই বিরূপ। বীণাদি নাকি কোন বিবাহিত পুরুষের প্রেয়সী। সামনের দুটো দাঁত আধখানা করে ভাঙা, মাথার চুলকটা টেনে ছোট্ট ডালের বড়ির মত খোঁপায় বাঁধা, কালো মোটা সোটা মহিলা কি করে কোন পুরুষের দাম্পত্য বন্ধন কেটে নিয়ে তাঁর পোষমানা পাখিটি বানিয়ে রেখেছেন ভাবলে অবাক লাগতো। বীণাদি এই প্রেমের গরবে মটমট করতেন। ঘরে বসে পান সেজে খেতেন, চা বানাতেন নিজে নিজে। কখনও কারও সঙ্গে বড় একটা মেলামেশা করতেন না।

এই পরিবেশে তাপসীদি এনেছিলেন অদ্ভুত এক নূতনত্ব। সবাই আমরা তাঁর পাশে পাশে ফেরার জন্য পাগল হয়ে থাকতাম। তাঁর কথা, বলার ধরন, হাসি এমনকি ক্লাসের পড়ানো পর্যন্ত আমাদের উপর আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। কাজেই তাপসীদির বিয়ে হবে যখন শুনলাম তখন একটা আনন্দবিষাদে মেশা মনের অবস্থা নিয়ে দিন কাটছিল। আবার তাপসীদির বাবা এলেন। মহাখুশী। এতদিনে তাপসীদি বিয়েতে রাজী হয়েছেন। কি একগুঁয়ে মেয়ে। কোনও ক্রমেই তাকে বিয়েতে বসাতে পারছিলেন না তিনি।

পাত্র সেই জলপাইগুড়িতেই থাকেন। রেলের বড় অফিসার। বিপত্নীক। বছর ছয়েকের একটি ছেলে রেখে প্রথম স্ত্রী মারা গেছেন। দীর্ঘ দিন রোগভোগ করায় শিশুর যত্ন যা কিছু স্বামীর হাতেই তাকে তুলে দিতে হয়েছিল। পিতা পুত্রের সম্পর্ক ছিল বড় সুন্দর। ছেলে বাপের মধ্যে মাকেও খুঁজে পেতে চাইত। দ্বিতীয়বার বিবাহে তাই রঞ্জন চৌধুরীর মন উঠছিল না। যদি সৎমায়ের সংসারে তাঁর ছেলে সাথী না হয়। তাপসীদিকে কোথায় যেন দেখে হঠাৎ মনে ধরে গেল। এমন মেয়েই তাঁর ভাঙ্গা হাটের হারানো সরঞ্জাম সাজিয়ে তুলতে পারবে। প্রস্তাব নিয়ে তাপসীদির বাবা মা ইতস্তত করছিলেন। হাজার হোক দোজবর তো। তার উপর সতীন কাঁটা। কিন্তু কথাটা পাড়তেই তাপসীদি রাজী হয়ে গেলেন। কেন কে জানে।

বীণাদি ভার ভার মুখে মন্তব্য করলেন, 'হবেই তো। রঞ্জন চৌধুরীর চাকরিটা দেখে তাপসীর তপস্যা ঘুচেছে।' সুলতাদির দল ভাবলেন এমন একটা সহায় সরে যাবে। যখন ইচ্ছা তাপসীদির ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দু দণ্ড হাল্কা হবার সুযোগটাও গেল। করুণাদি কিন্তু খুব খুশী। দারুণ উৎসাহে বিয়ের আয়োজনে লেগে গেলেন। ছুটি পেলেই তাপসীদির বাবামার কাছে ঘুরে আসতেন কারণ জামার মাপ, জুতোর নমুনা, গয়না কোনটা থেকেই করুণাদি বাদ যেতে চান না। উৎসবের ক্ষুদ্রতম আয়োজনটুকু পর্যন্ত তারিয়ে তারিয়ে এক অজানা আস্বাদের সুখ নিয়ে নিচ্ছিলেন করুণাদি।

আমরা বিয়েতে যেতে পারিনি কারণ শহর থেকে দূরে যাওয়া অনেকেরই সম্ভব হয়নি। করুণাদি ফিরে এসে বর্ণনা দিলেন।

আর মন ওঠে না। অল্প দিন পরই রঞ্জন চৌধুরী হঠাৎ জলপাইগুড়ি থেকে বদলী হয়ে গেলেন। তাপসীদিকে আর আমরা অনেকদিন দেখিনি। মাঝে মাঝে গুজবের দু'একটা কানে আসতো। যে সুমন্তকে তাপসীদি নিজের ছেলের চেয়েও আপন করে নিতে চেয়েছিলেন সে সুমন্ত তাঁকে মা বলে কোনও দিনই মেনে নিতে পারেনি। একটু একটু করে রঞ্জন চৌধুরীর মনে সে দিয়েছে বিষ ঢেলে। সরল শিশু অন্যায় করতে পারেনা, মিথ্যা বলতে পারেনা এই বিশ্বাসে রঞ্জন চৌধুরীর মনেও ভাঙ্গন ধরেছে তাপসীদির প্রতি। তাপসীদিকে অকারণ নির্যাতন করে নাজেহাল করে তুলে রঞ্জন চৌধুরী তাঁর পিতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রমাণ করতে চান তাও শুনেছি। ছোটখাটো খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া অপমান তাপসীদির নাকি প্রায় গা সওয়া হয়ে গেছে। অত্যাচারের মাত্রা অসহ্য না হলে চুপ করে থাকেন। পাড়াপড়শী, আত্মীয় বন্ধু কারও সহানুভূতি নেই। সবাই বলে এক কথা 'সৎমা বৈ তো নয়!'

শুনে শুনে করুণাদি ছটফট করতেন। কি হবে। তাপসীর ২৩ বেরে। কেন সে এমন করে নিজেকে নিঃশেষ করে দিল। সাহস সংগ্রহ করে করুণাদি একবার তাপসীদিকে দেখবেন বলে যাত্রা করলেন। ফিরে এলেন যখন তখন মুখে তাঁর কে যেন দু পোঁচ কালি ঢেলে দিয়েছে। রঞ্জন চৌধুরী তাঁকে তাপসীদির সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি। সেই রঞ্জন চৌধুরী। যার প্রশস্ত ললাট, প্রশান্ত আনন করুণাদিকে মুগ্ধ করেছিল। চৌধুরী মশায় দুপুর বেলায় কাজে গেলে লুকিয়ে তাপসীদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন করুণাদি। বন্ধ ঘরের জানলার গরাদে মাথা রেখে কথা বলেছিলেন তাপসীদি। সদরে মস্ত বড় তালা! সুমন্তের মন্ত্রণায় রঞ্জন চৌধুরী তাপসীর সঙ্গে এই নির্মম নিষ্ঠুর ব্যবহারের ব্যবস্থা করেছেন। তাপসীর সেই ঢলঢলে রূপ কোথায়, কোথায় সেই পল্লব ঘন গাঢ় গভীর আনত দৃষ্টি। চলনে বলনে কোথায় সেই মাধুর্য, কোথায় গান আর কোথাই বা তার প্রাণ আনন্দ। রুক্ষ দৃষ্টি ভীত, রুক্ষ হাবভাব মলিন বেশবাস অনাহার অনিদ্রায় ক্লান্ত দেহ, শ্রান্ত মন করুণাদিকে কি বললেন যেন ভেবে পেলেন না। দু কথা বলেই এদিক ওদিক চেয়ে দেখেন। যদি সুমন্ত এসে যায় তবে আর স্বামীর হাতে লাঞ্ছনার সীমা থাকবেনা। তাঁর যে কারও সঙ্গে কথা বলাও মানা! ঝর ঝর করে কাঁদতে কাঁদতে করুণাদি কথা কটা বলে হাঁপাতে লাগলেন।

রূপকথার গল্পে শুনেছি সৎমা হয় নিষ্ঠুর, কিন্তু একি! এযে সৎমার সোহাগ, আদর স্নেহের পূর্ণ অঞ্জলি পদাঘাতে লুটিয়ে দিয়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে একটি শিশু। কিছুদিন ব্যাপারটি আলোচনা, সমালোচনায় সকলের মুখে মুখে ফিরলো। অম্ল, তিক্ত কটু কষায় কোনও টিপ্পনীই বাদ গেল না। কথা প্রসঙ্গে কত মন্তব্যই না শুনলাম। আবার দুদিন না যেতেই সবাই ভুলে গেল তাপসী বলে কেউ ছিল। নূতন দিনের নূতনতর সব সংবাদে তলিয়ে গেল তাপসী চৌধুরীর একটি জীবনের মিঠেকড়া চর্চা।

আমার সঙ্গে কিন্তু তাপসীদির দেখা হয়েছিল আরও কয়েক বছর বাদে। রাঁচিতে গিয়েছিলাম বেড়াতে। রাঁচির মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীর হাসপাতালের থিয়েটার। বসে দেখলে বুঝবার উপায় নেই কে রোগী কে রোগী নয়। স্টেজের উপর রোগী ও রোগিণী, দর্শকও তাই। দুচার জন বাইরের নিমন্ত্রিত অতিথি মাত্র। হঠাৎ কান্না শুনে পিছনে তাকিয়ে দেখি একটি শীর্ণকায়া রোগিণী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পাশে শুশ্রূষাকারিণী তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। হাতে একটি কৌটো। তা থেকে চকোলেট বের করে রোগিণী সমানে চিবোচ্ছে। তার দুই কস বেয়ে চকোলেট মিশ্রিত লালা নেমেছে হাতে, মুখে জামায় কাপড়ে। চোখের দৃষ্টি যেন কোন অজানার সন্ধানে ঘুরছে। ভাল করে ঠাহর করে দেখতেই সে মুখ আমার চেনা চেনা ঠেকলো। একটু পরেই কান্না বন্ধ না হওয়াতে রোগিণীর সঙ্গিনী তাকে ধরে তুলে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সবার অলক্ষ্যে আমিও উঠে গেলাম। অন্ধকারে প্রেক্ষাগৃহে যাকে চিনতে পারিনি, বাইরের আলোতে চিনতে কষ্ট হলো না। রোগিণী আমাদের তাপসীদি!

আমাকেও তাপসীদির চিনতে কষ্ট হয় নি। জড়ানো জড়ানো স্বরে বললেন 'ললিতা না তুমি? আচ্ছা সুমন্ত কেমন আছে জানো?'

'এখনও তুমি সুমন্তের কথা বল তাপসীদি?' আমি আর ধৈর্য রাখতে পারিনি বলে বলেই ফেললাম।

তাপসীদি হাসলেন। বিকৃত মস্তিষ্কের ম্লান শুষ্ক হাসি—'আমি যে তার মা!'

শুশ্রূষাকারিণী চুপি চুপি একপাশে ডেকে বললেন সুমন্তর কথা পাড়বেন না। কেঁদে কেঁদে আর সকলকে পাগল করে দেবেন।

শ্রীমতী

আর্থিক অবস্থার দু-একটি দিক

উৎপাদন, বিশেষ করে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের অপ্রতুল সম্প্রসারণ এবং ব্যয়, বিশেষত সরকারী অংশে কয় বছরের সম্যক বৃদ্ধি দেশে দ্রব্যমূল্য স্ফীতির জন্য মূলত দায়ী। সমস্যার সমাধান হিসাবে কেবল মোট উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ালে হবে না, উৎপাদনের গঠনের দিক থেকেও বৃদ্ধির চেষ্টা করা দরকার। ভারতের মতো দেশে মূল্যস্থিতির জন্য শেষোক্ত ব্যাপারটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যোজনা-কালের মূল্যবৃদ্ধির বেশ খানিকটা জীবন-যাত্রার অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং কাঁচা-মালের অনটনের প্রতিফলন। ঐ দুটি পরি-কল্পনায় কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের মধ্যে যে ভারসাম্যের অভাব দেখা দিয়েছে তার সংশোধন দরকার।

মূল্য বৃদ্ধির সমস্যা

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে দ্রব্যমূল্যের যে ক্রমাগত বৃদ্ধি শুরু হয়েছিল, তা ১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৫-৬৬ সাল এই তিন বছরে গুরুতর সমস্যার আকার ধারণ করেছে। গত বারো মাসে খাদ্যমূল্য শতকরা প্রায় ৩৭ ভাগ বেড়েছে। তার ফলে শহর অঞ্চলের বাঁধা আয়ের লোক এবং গ্রামের ছোট চাষী ও জমিহীন শ্রমিকরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে। কেননা, এদের সকলকে বাজারের যোগানের উপর কমবেশী নির্ভর করতে হয়। ঐ শতকরা ৩৭ ভাগ বৃদ্ধি খাদ্য অনটনের প্রতিফলন, সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৯৬৭ সালের যোগান ও চাহিদার মধ্যকার বৈষম্য বা ফাঁক যেখানে প্রায় ৬০ লক্ষ টন, অর্থাৎ শতকরা ৭ ভাগ, সেখানে ঐ অনুপাতের মূল্যস্ফীতির জন্য বড়ো চাষী ও কারবারীগণ কর্তৃক মজুত করার উদ্দেশ্যে শস্যের অপসারণ অনেকখানি দায়ী। খাদ্য-মূল্যের ঊর্ধ্বগামিতা বন্ধ করা এখন প্রাথমিক কর্তব্য। তার জন্য কেবল উৎপাদনের সম্প্রসারণ নয়, বাজারে যোগানের পরিমাণ যাতে বাড়ানো যায় তা দেখতে হবে।

আয় নীতির তাৎপর্য

শ্রমিকদের মজুরী ও দ্রব্যমূল্য দুটোই যে আজ চক্রাকারে বেড়ে চলেছে তা দমন করার উদ্দেশ্যে মূল্য, মজুরী ও লাভ তিনটেকে এখনকার স্তরে অপরিবর্তিত অর্থাৎ সেগুলোর ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি স্থগিত রাখার নীতি অনুমোদনযোগ্য। অবশ্য শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি ঠেকিয়ে রাখার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের স্থিতি অর্জন। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী মূল্যের ক্রমাগত স্ফীতি বন্ধ না করলে অপরি-বর্তিত মজুরী থেকে জীবনযাত্রার আগেকার মান বজায় রাখা দুঃসাধ্য হবে এবং শ্রমিক-দের কর্মক্ষমতা অটুট রাখা যাবে না। সেই রকম, অনটনের সুযোগ নিয়ে ব্যবসা শিল্প লাভ বাড়িয়ে তোলার দিকে যে চেষ্টা করে থাকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয় তার অবশ্যম্ভাবী ফল। যেখানে লাভ উপরের দিকে উঠে চলেছে সেখানে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবী রোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আসলে শ্রমিকদের আয় উৎপাদন ব্যয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ; শিল্পপতিদের অতিরিক্ত লাভ থেকে উপার্জন মূল্যস্ফীতির সহায়ক। যাতে একটি নূতন জীবনযাত্রার মান রক্ষা এবং কাজকর্মে উৎসাহ বজায় রাখা যায় সে রকম একটি সুচিন্তিত আয়নীতির প্রবর্তন সব দিক থেকে বাঞ্ছনীয়। এই আয়নীতি দ্রব্য-মূল্যের স্থিতি অর্জনে মূল্যবান সাহায্য করতে পারে। তখন উৎপাদন ক্ষমতার ক্রমিক উন্নতি যোগানের সম্প্রসারণ ঘটাবে, দ্রব্যমূল্য নিম্নগামী হবে অর্থাৎ টাকার ক্রয়শক্তি যাবে বেড়ে এবং শ্রমিকদের জীবন-যাত্রার প্রকৃত মানের উন্নতির ঘটবে। প্রাগুক্ত নীতির সাফল্য যে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, কর্মী বাহিনী ও শ্রমিক সংঘের পূর্ণ সহ-যোগিতার উপর নির্ভর করবে সে কথা বলাই বাহুল্য। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ সংগঠিত নয় এবং সেখানকার কর্মকাণ্ড আশানুরূপ নিয়ন্ত্রিত নয় বলে ঐ নীতি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং সফল করা দুরূহ হবে।

এদিকে উন্নয়ন, বিশেষ করে আর্থিক ব্যবস্থার অগ্রবর্তী অংশ রেলওয়ের উপর খরচ কমিয়ে দেওয়ায় ইঞ্জিনীয়ারিং-এর মতো শিল্পের উপর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অবশ্য যে অংশগুলিতে কাজকর্মের অবস্থা শিথিল হয়ে পড়েছে, সেখানে সত্যকার মন্দার সম্ভাবনা নেই মনে হয়। বর্তমানে অব্যবহৃত মানুষ ও যন্ত্রপাতি যাতে কাজে লাগানো যায় সেই উদ্দেশ্যে যত্নে নির্বাচিত কয়েকটি অংশে অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ

দরকার। কয়লা, চিনি ও বয়ন বন্দের মতো বিশেষ শিল্পগুলিকে উজ্জীবিত করার জন্য উদারভাবে অর্থসাহায্য বা কর্জ দেওয়ার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই করা হয়েছে।

মূলধন খাটানোর বহর

তা সত্ত্বেও, আর্থিক ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের জন্য মূলধন নিয়োগের সম্ভাবনা, মূল্যবৃদ্ধির বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবত সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। জাতীয় অগ্রাধিকার অনুযায়ী কৃষির উপরই জোর দেওয়া হবে, স্থির হয়েছে। শিল্পের অব্যবহৃত উৎপাদন-ক্ষমতা কাজে লাগানো এবং রপ্তানি বাড়ানোর চেষ্টা করাও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মূলধন খাটানোর বহরের সম্প্রসারণ অর্থ সংগ্রহের অপেক্ষা রাখে। মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে বাজেটের ঘাটতি পূরণ এখন কোনো মতেই অনুমোদন করা যায় না। কর সংগ্রহ এবং সরকারী প্রকল্পগুলি থেকে আগম বৃদ্ধি অর্থসংস্থানের দুটি প্রধান উপায়।

পল্লী অংশের উপর করভার অপেক্ষাকৃত লঘু। মূল্যবৃদ্ধির সময় গ্রামদেশ লাভবান হয়েছে বলে তার পক্ষে মোট বোঝার একটা ন্যায্য অংশ বহন করা সম্ভব। অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক নয় এরকম জমি যারা চাষ করে তাদের কথা ছেড়ে দিলে সম্পন্ন কৃষকদের প্রতি নরম হবার কোনো কারণ নেই। শহর অঞ্চলে জমির কেনাবেচা থেকে যারা প্রভূত ফাটকা লাভ করেছে তাদের উপরও কর বসানো দরকার।

বৈদেশিক সাহায্যের পূর্ণ ব্যবহার

আভ্যন্তরিক অর্থসংগতির মতোই বৈদেশিক সাহায্যের একটি মূল্যবান ভূমিকা আছে। আক্ষেপের বিষয়, বৈদেশিক ঋণ ও অর্থসাহায্যের মোট পরিমাণের ভেতর ১৯৬৭ সালের ১ এপ্রিল পর্যন্ত ১,২৬৯·৫৬ কোটি টাকা কাজে লাগানো হয়নি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যোজনাকালে ভারত বৈদেশিক সাহায্যের যথাক্রমে শতকরা ৫২ এবং ৬৪ ভাগ ব্যবহার করতে পেরেছে। (এই হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী আইন ৪৮০-র অধীন সামগ্রীর আকারে সাহায্য বাদ দেওয়া হয়েছে।) পরিহাসের কথা, এক দিকে আমাদের দেশের অতীতে গৃহীত কর্জ বাবত মূলধন পরিশোধ এবং সুদ দানের বোঝা বেড়ে চলেছে, অন্য দিকে সেই ঋণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অব্যবহৃত রয়েছে। ১৯৬৭ সালের ৩১ মার্চ ভারতের মোট বৈদেশিক ঋণ ছিল ৪,৭৯৭ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৩,০৩০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রার আকারে শোধ করতে হবে।

টাকার বিনিময়মূল্য হ্রাসের পর যাতে অপেক্ষাকৃত উদারভাবে আমদানি করা যায় সেই উদ্দেশ্যে চতুর্থ যোজনার প্রথম বছর অর্থাৎ ১৯৬৬-৬৭ সালে ভারতকে কোনো প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন ৬৭৫ কোটি টাকা অর্থসাহায্য করা হয়। (চলতি বছর—১৯৬৭-৬৮-র জন্য প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত নয় এবং খাদ্য সাহায্য বাবত ৯৭৫ কোটি টাকা সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।) ১৯৬৬-৬৭ সালে ভারত সর্বসমেত ১,২৩৪ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য (প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সাহায্য হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে) পায়, যার ভেতর মাত্র ৬০৩ কোটি টাকা এ পর্যন্ত কাজে লাগানো হয়েছে। এই-সব কারণে সম্প্রতি লোকসভার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি সংগৃহীত ঋণ তাড়াতাড়ি এবং ভালোভাবে ব্যবহার করার উপর জোর দিয়েছে।

শান্তিকুমার ঘোষ

দুই রবীন্দ্রনাথ

বিগত ১৯ শ্রাবণ, ১৩৭৪ সংখ্যার দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী রচিত 'দুই রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ইনি ইহাতে যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, বা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সে সমূহের উপর কোনও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত দ্বিতীয় স্বরূপ ও তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা প্রসঙ্গে লেখকের একটি উক্তি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে চাই। লেখকের মতে, এই দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ "বিদেশ হইতে ভারতীয় কালচারের বিদেশী ফিরিওয়ালা আনিয়া শান্তিনিকেতনে ইউরোপীয় চিড়িয়াখানা স্থাপন" করিয়াছিলেন। আমরা জানি, বিশ্বভারতীকে প্রাচ্য বিদ্যানুশীলনের একটি কেন্দ্রে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ হইতে সিলভাঁ লেভি, বিনটারনিৎস্, লেসনি, স্টেন কনো, তুচ্চি বগদানভ প্রভৃতি সুবিখ্যাত প্রাচ্য বিদ্যাবিদ্ মনীষীবর্গকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ করিয়া অধ্যাপনা ও গবেষণার ভার দিয়াছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই শ্রদ্ধেয় মনীষীবৃন্দের বিপুল কীর্তির সহিত শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পরিচয় আছে কি না, জানি না। কিন্তু ইঁহাদিগকে ভারতবর্ষে আমন্ত্রণ করিয়া ও ভারতীয় পণ্ডিতগণকে ইঁহাদিগের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ দিয়া রবীন্দ্রনাথ এ দেশে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার যে মহোপকার সাধন করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত নাই। এজন্য ভারতবর্ষের প্রাচ্যবিদ্যানুরাগীমাত্রেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ আছেন ও থাকিবেন। এই ইউরোপীয় জ্ঞানিবৃন্দকে 'ভারতীয় কালচারের বিদেশী ফিরিওয়ালা' বলিয়া বর্ণনা করা ও তাঁহাদের আগমনহেতু শান্তিনিকেতন 'ইউরোপীয় চিড়িয়াখানা' বলিয়া বিদ্রূপ করা চরম অ-শালীনতা ও সম্ভবত অজ্ঞতারও পরিচায়ক। দেখিতেছি, চৌধুরী মহাশয় রবীন্দ্রনাথের উপর কোনও কারণে মর্মান্তিক চটিয়াছেন। তাই কেবল রবীন্দ্রনাথ নহেন, তাঁহার বিদেশী অনুরাগিবর্গেরও শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা ভালভাবেই করিয়াছেন! তাঁহার মতে, রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ পশ্চিমের সাহিত্যপ্রীতি নহে—'ফ্যাসনপ্রিয়তার' নিদর্শন; কঁতেস দ্য নোয়াই-এর রবীন্দ্র চিত্রাবলীর উচ্চ প্রশংসা ও প্রচার চেষ্টা 'প্রচ্ছন্ন তামাসা' মাত্র; আর রবীন্দ্রানুরাগী পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ 'ভারতীয় কালচারের বিদেশী ফিরিওয়ালার' দল! কিমাধিকমিতি।

দিলীপকুমার বিশ্বাস
কলকাতা-৩৭

॥ ২ ॥

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর 'দুই রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু নিবেদনের আকাঙ্ক্ষা যে কোন সুস্থ, শিক্ষিত ও ভদ্র বাঙ্গালীর কর্তব্য বলিয়া মনে করি। যদিও প্রবন্ধকার বাঙ্গালী জাতিকে যে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন তাহারা কেহই সভ্য ও সংস্কৃতিবান নহে।

দুই রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কারের প্রবণতা (লেখক 'সত্য' রবীন্দ্রনাথ ও 'অভিনেতা' রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,) নূতন নহে—তাহা বিভিন্ন আলোচকের চিন্তায় বহুরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা এক ধরনের রবীন্দ্রচর্চা। রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠানও এক ধরনের রবীন্দ্রচর্চা এবং রবীন্দ্রনাথকে গালি দেওয়াও একই অর্থে রবীন্দ্রচর্চা। নীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধে 'সত্য' রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করিবার প্রয়াস আছে এবং সেইজন্য তাঁহাকে 'কলিকাতা কমলালয়' হইতে

আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের চাটপথ, বাঙ্গালী চরিত্র, লর্ড হার্ডিং-এর কথার উদ্ধৃতি এবং মেকলের নাম স্মরণ করিতে হইয়াছে। রবীন্দ্র জন্মোৎসবে 'পিবজ নৃপ গণিকার শুভাগমন' হয়। রবীন্দ্রনাথ জন-সমাজে মিশিবার উপযুক্ত ছিলেন না এবং বাজারে গিয়া নিজেকে বিক্রয় করিতে পারিতেন না। ইংরেজী জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তিনি অসত্য ভাষণের দোষে দুষ্ট, 'বিদেশ হইতে ভারতীয় কালচারের বিদেশী ফিরি-ওয়ালা আনিয়া শান্তিনিকেতনে ইউরোপীয় চিড়িয়াখানা স্থাপন' ইত্যাদি বিচিত্র তথ্য এবং রবীন্দ্রনাথ কি কি ভুল করিয়া তাঁহার নিজের এবং বাংলা দেশের কি কি ক্ষতি করিয়াছেন, নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিতর্ক হইতে পারে এবং ব্যক্তি বিশেষের ধারণা বিভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু এই প্রবন্ধের বক্তব্য ভঙ্গীতে এমন এক 'সম্বোধি' আছে, যাহা গ্রহণযোগ্য তো নহেই বরং হাস্যকর ও নিন্দনীয়। লেখক 'সেদিনও বিলাতে নির্জন পাহাড় বন নদীর ধার মাঠ ও গ্রামের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে' ভাবিয়াছেন 'এই যে দেশ, যাহা ঘুমন্ত রাজকন্যার পুরীর মত মায়ামগ্ন তাহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এত উদাসীন কি করিয়া হইলেন?' রবীন্দ্রনাথের এই উদাসীনতা সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত ভ্রমণের পরিচয় অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রাসঙ্গিক যেমনি অপ্রাসঙ্গিক 'ইংরেজী সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা' বর্ণনা। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীদের 'নিন্দার প্রকৃত রূপ ধরিতে পারেন নাই' এবং তিনি নিন্দাকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই কিন্তু লেখকের এই শক্তি আছে—'আমি এই ভুল করি না সুতরাং স্বভাব নিন্দুকের নিন্দাতে স্থির থাকিতে পারি।' নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ প্রায় সমকক্ষ এমনই একটি হাস্যকর বোধ প্রবন্ধের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এই অহংবোধের তাড়নায় নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁহার প্রবন্ধে তাঁহার প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি-গুলি উদ্ধার করিয়াছেন, ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কখনো কখনো কল্পনা করিয়াছেন। (তৎক্ষণাৎ আমার মনে হইল এই যে, রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ভিক্টর হ্যুগোর চিত্র সম্বন্ধে বইখানা দেখিয়াছেন ও ভাবিয়াছেন কবি ভিক্টর হ্যুগো যদি চিত্রকর হইতে পারিলেন আমি কবি রবীন্দ্রনাথও চিত্রকর হইব না কেন?), এমন কি কৌতুকও অনুভব করিয়াছেন এবং বলা বাহুল্য রবীন্দ্র সাহিত্যের অরসিক পাঠকের মত তাঁহার বিপুল সাহিত্যকীর্তি ও দৃষ্টির পরিচয় গ্রহণ করেন নাই। নোবেল পুরস্কার কবির জীবনে ও দেশের ইতিহাসে এক বৃহৎ ঘটনা এবং তাহা যে কবির সাহিত্য-জীবনে এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সত্য আর পরবর্তী রবীন্দ্রনাথ মিথ্যা ইহা নীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পক্ষে অনুভব করা সম্ভব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধার এই বিতর্ক হইতে বানপ্রস্থ গ্রহণের সময় কি এই 'দুই রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধকারের হয় নাই?

মিহিরকুমার দাশ
দিল্লী কলেজ, দিল্লী

॥ ৩ ॥

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত "দুই রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধের লেখক শ্রীনীরদ চৌধুরী সাহিত্যিক এবং বিশেষ করিয়া সাধক হিসাবে যে কত অধম তাহা শ্রীকাজল গুপ্তের পত্র (২৪ ভাদ্রের "দেশ") পাঠ করিয়া সবিশেষ অবগত হইলাম। এইরূপ প্রাণসার, সাহিত্যধর্মী পত্র রবীন্দ্রনাথ তো ছাড়, তাঁহার পরম পূজনীয় পিতৃদেবের পক্ষেও রচনা করা অসম্ভব হইত বলিয়া মনে হয়। প্রকাশে দ্বিধা নাই যে আমারই মত রসিক পাঠকের পক্ষে শুধুমাত্র নাম পড়িয়া পত্রলেখক পুং কিংবা পুরুষ তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয়। তবে পত্রের বিশাল আকার, বিকট প্রকার এবং লেখকের পদবী "গুপ্ত" দেখিয়া মনে হয় যে লেখকের লিঙ্গ (ব্যাকরণার্থে) যাহাই হউক না কেন, সাহিত্য কর্মে তাঁহার পারুষ্য "ধৃতরাষ্ট্রীয়" (ইচ্ছা করিয়াই "শূকর শ্রেণীভুক্ত" বলিলাম না যদিও উপরোক্ত পত্রে গন্ডার, মাকড়শা প্রভৃতি জীবের প্রতি পত্রলেখকের অপার আকর্ষণ বিদ্যমান দেখিলাম।)

অর্বাচীন, দেশবৈরী, ঘোরতর রবীন্দ্র বিদ্বেষী এবং অত্যন্ত ওঁছা ইংরেজীব লেখক শ্রীনীরদ চৌধুরীর মূর্খতার আর একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ এই যে, রবীন্দ্রোত্তরযুগের এবম্প্রকার (শ্রীকাজল গুপ্ত প্রমুখ) পত্রসাহিত্য-চূড়ামণিদের খবর তিনি আদৌ রাখেন না। স্পষ্টই প্রতিয়মান হয় যে "দুই রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে বাঙ্গালীদের চরিত্র-শ্রেণীতে ভেদ অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। শুনিয়াছি প্রায় পঁচিশ/ত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি বঙ্গদেশ হইতে চলিয়া আইসেন। তাই আজিকার বঙ্গ সাহিত্য এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গ সমাজের খোঁজ রাখা তাঁহার মত

স্থূলবুদ্ধি এবং স্বল্পবিদ্যা ব্যক্তির পক্ষে নিরতিশয় অসম্ভব। নহিলে এহেন স্ফুরিতমেধা এবং প্রখরবুদ্ধি পত্রলেখকদের জন্য একটি অতিবিশেষ শ্রেণী তিনি প্রবন্ধে সংরক্ষিত করিলেন না কেন?

যাহা হউক এত বাগাড়ম্বরের পর একটু কাহিনী গাহিবার ইচ্ছা হয়। একদা জীবনানন্দ দাশ নামধেয় এক কবির কবিতা কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়াছিলাম। তাঁহার কোন কবিতায় নিম্নলিখিত পঙক্তিটি আছে ঃ

"সাম্রাজ্যের উত্থানের পতনের
বিবর্ণ সন্তান" (আমার স্মৃতি অত্যন্ত ভোঁতা। কোটেশনে ভুল হইলে পাঠক পাঠিকা ক্ষমা করিবেন)

আমার এক ইংরেজী নবিশ বন্ধু আছেন বয়সে তিনি প্রায় গত যুগের। তিনি "বিবর্ণ সন্তান" বলেন না, বলেন bitter fruits of troubled times" (এই ইংরেজী লাইনটির জন্য শ্রীকাজল গুপ্তের ক্ষমা বিশেষভাবে প্রার্থনীয় কারণ মনে হয় এই ভাষাটি, না জেনার ফলেই হউক কিংবা বেশী জেনার ফলেই হউক, তিনি হয়ত বিশেষ পছন্দ করেন না।)

শ্রীনীরদ চৌধুরী [illegible] তিনি এই "বিবর্ণ সন্তান"দের (bitter fruits) [illegible] চেনেন না। তিনিও কোন [illegible] বিষয় সম্বন্ধিতই হউক না কেন, [illegible] সহযাত্রী হইতেন না।

জনৈক দিল্লীবাসী

॥ ৪ ॥

শ্রীকাজল গুপ্তের [illegible] পড়িয়া যারপর নাই [illegible] "দুই রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধে নীরদ চৌধুরী মহাশয় যে রূপ [illegible] করিয়াছেন, এটি যদি তাঁহার প্রথম সাহিত্য কীর্তি হইত, কোনও পত্রিকাই তাহা [illegible] অযোগ্য [illegible]। কিন্তু কলমবাজী [illegible] তিনি পাকা [illegible] সেহেতু তিনি যাহাই লিখুন না কেন— পাঠক পরম শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করিবে, ইহা মনে করাও প্রচণ্ড পাগলামি।

শ্রীকাজল গুপ্তকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে তাঁহার বক্তব্য এবং "দুই রবীন্দ্রনাথ" পাঠ করিয়া ক্ষুব্ধ পাঠকের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। অনেকেই ইঁহার সহিত একমত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমি শুধু একটি তথ্য পরিবেশন করিতে চাই। "হাড়ে বজ্জাত হারামজাদা" বাঙালীরা নীরদ চৌধুরীমশায়ের যে পূর্ণ সম্মান করিতেছে না বা করিতে পারে না, এটা তো তাঁহার মতে স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু অন্য ভারতীয়ের চোখেও যে তাঁহার আসন কোথায় এই কথাটিও তাঁহার (নীরদবাবুর) জানা দরকার। কিছুদিন পূর্বে হিন্দী ভাষায় বহুল প্রচারিত "ধর্মযুগ" নামক পত্রিকায় নীরদবাবু সম্বন্ধে কিছু লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল, সে লেখা তখন আমাদের ঠিক ভাল লাগে নাই, কারণ লেখাটা প্রাদেশিকতা ভিত্তিক বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু "দুই রবীন্দ্রনাথ" পড়িয়া ধারণা বদলাইয়াছে, শুধু বদলায় নাই, লেখাটির প্রতি সমর্থন বোধ করিতেছি। লেখাটিতে নীরদবাবুর একটি কার্টুন ছবি সহ প্রশ্ন ছিল—"আংরেজ লোগ চলে গয়া লেকিন ইনকো ছোড়কে কিঁউ গয়া?" (চৌধুরীমশায় যে ইংরাজের খয়ের খাঁ এইটিই ঐ লেখার প্রতিপাদ্য ছিল।)

চৌধুরীমশায় নিশ্চয়ই এর জবাব জানেন, কিন্তু বলিবেন না। বলিলেও হয়ত বলিবেন "কলমের ঘায়ে তোমাদের বজ্জাতির ময়লা সাফ করবার জন্যেই রয়ে গেছি—নইলে ওরা তো সাথ ছিলই।"

তা ঠিকই, "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি।" এমন ঘাতসহ নির্বিরোধী দেশ ও জাতি দুনিয়ার কোথাও কি আছে? আমরা আমাদের দেশ, জাতি ও দেশের পরমপূজ্য মনীষিগণের প্রতি এমন কুৎসিত আক্রমণ লেখাও নির্বিবাদে পড়িব, কেউ কেউ অন্তরে জ্বলিব, কেউ কেউ পান চিবাইতে চিবাইতে তারিফ করিব, "বাঃ, বেড়ে লিখেছে তো!" কবিগুরুর একটা উক্তি এই প্রসঙ্গে মিলে নিতান্ত বেমানান হইবে না যে ক্ষুধিত তার কাছে অন্নের একটিমাত্র রূপই দেদীপ্যমান যাকে চর্বণ করে সে গলাধঃকরণ করতে পারে। অন্নের যে অন্য সহস্রবিধ রূপ আছে তা দেখবার [illegible] মানসিক ঐশ্বর্য তার নেই।"

নীরদবাবুর সান্ত্বনা এই যে, এই "দুর্দিনে" [illegible] তিনি একা নন।

শাশ্বতী সান্যাল
[illegible]

॥ ৫ ॥

"দুই রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক রচনায় শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর বক্তব্য একাধারে তাঁর পাণ্ডিত্য, সাহস এবং নির্ভীক বুদ্ধির এক [illegible] নিদর্শন স্থাপন করিয়াছে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলায় রবীন্দ্রনাথের উপর এমন রচনা লিখিবার কাহারো 'হিম্মৎ' এ পর্যন্ত হইয়াছে এমনটি দেখি নাই। মনে হয় তাঁর রচনা লিখিবার পর যখন তাহা মুদ্রিত হইয়া বাংলা দেশের এক অতি বিখ্যাত এবং বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হইবে তখন তাহার সমালোচনা কেমন ধারায় প্রবাহিত হইবে তাহাও তাঁহার জানা ছিল। তথাপি তিনি যাহা উপযুক্ত মনে করিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন। এবং মনে হয় সর্বসাধারণের বিচিত্র চিন্তাধারার প্রকাশ-ভঙ্গী দেখিয়া অলক্ষে মুচকাইয়া হাসিতে-ছেন। রসিক নীরদচন্দ্র মনে হয় 'ব্লাসফেমী' রচনাশৈলীর একান্ত অনুগামী। বাঙালীর

আত্মঅহমিকা যখন তাহাকে অতীতের গৌরবটুকু শুধু বুকে বহন করিয়া প্রতিদিন অন্ধকারের গর্ভে বিলীন করিতেছে এবং প্রতিদিন তাহার অবক্ষয় দ্রুতবেগে বহুগুণিত হইতেছে, তখন তাহার বিরুদ্ধে নীরদচন্দ্র যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা রাগ ও রাগের বশে নস্যাৎ না করিয়া ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সময় আজ সত্যই সমুপস্থিত। মনে হয় এই রচনায় রবীন্দ্রনাথ উপলক্ষ মাত্র, এবং বাঙালীসমাজই তাঁর নিখুঁত সমালোচনার বেশী বিপর্যস্ত। আমাদেরও আজ তাই একান্তভাবে চিন্তা করা উচিত—এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য না মিথ্যা।

যে বাঙালীসমাজ একদিন রবীন্দ্রনাথকে তীক্ষ্ণ বাণে জর্জরিত করিয়া পুনরায় তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর দেবজ্ঞানে পূজা করিয়াছে, আমার মনে হয় যদি কোনদিন এমনটি হয় যে, এই নীরদচন্দ্রই কোনদিন সেই নোবেল পুরস্কার পান (এটির সম্ভাবনা নাই এমনটিও বলা অসম্ভব যদি সাহিত্যে সকল নোবেল প্রাইজপ্রাপ্তদের বিচার করা হয়), দেখা যাইবে—তখন যাহারা আজ তাঁহার প্রতি নিন্দাবাক্য প্রয়োগে এতটুকুও বিমুখ নন, তাঁহারাই তাঁহাকে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে পূজা করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের উপর হাত দেওয়া নীরদচন্দ্রের কীর্তি কিনা জানিনা, তবে দুরন্ত স্পর্ধা। স্পর্ধিত নীরদচন্দ্র ছাড়া পতিত বাঙালীদের বিশেষত এক-চতুর্থাংশ বাঙালীদের (তাঁর হিসাবমত) হাড়ে বজ্জাত এবং হারামজাদা কে বলিতে পারিত? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন এই এক-চতুর্থাংশ বাড়িয়া পূর্ণ "এক" হইয়া ক্রমশ বিলীন হইয়া যায়।

চন্দনা ভাদুড়ী
জামসেদপুর

॥ ৬ ॥

'দুই রবীন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা পড়লাম। লেখক নীরদবাবুকে "নিন্দামুক্ত জ্ঞান"-এর চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবেই হতে হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল জানতে ইচ্ছা হয়।

হঠাৎ ৪২ সংখ্যাতে 'আলোচনা' পড়ে আগ্রহান্বিত হওয়ায় আসল প্রবন্ধ 'দুই রবীন্দ্রনাথ' পড়ি। পড়ে আমার মনে হয়েছে যে প্রবন্ধে 'পাঁচ' অংশের শেষ পর্যন্ত মোটামুটি সামঞ্জস্য রক্ষা ও হৃদয়গ্রাহ্য হয়েছে। কিন্তু 'ছয়' অংশে তাঁর ব্যক্তিগত নিপুণতাকে অত্যধিক তুলনা করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হয়েছে। তাছাড়া যে কোন লোকেরই সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাবান ব্যক্তি মনোবিশ্লেষণে ও আত্মনিয়ন্ত্রণে এতই অপটু ছিলেন। চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ হিসাবে লেখকের মন্তব্য ও যুক্তি আমার মনে হয় অনেক লোকেরই হৃদয়গ্রাহী হবে না।

তবে 'ছয়' অংশে প্রায় অর্ধেকটা এবং ও 'সাত' অংশের সামান্য কিছু বাদ দিয়ে প্রবন্ধটি বিচার করলে দেখা যাবে যে লেখক, রবীন্দ্রনাথকে জনসাধারণের এবং বিশেষ করে বাঙালী সমাজের কাছে অনাড়ম্বরভাবে তুলে দিতে চেয়েছেন রবীন্দ্রভীতি কাটিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় এবং তাঁর এই প্রয়াস কিছুটা নিশ্চয়ই সফল হয়েছে। এটুকু বাদ দিলে পর সংখ্যার সমালোচনায় তাঁকে রবীন্দ্রবিদ্বেষী বলে যেরূপভাবে অভ্যাহিত করা হয়েছে সেরূপ যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

পঙ্কজ বসু
দুর্গাপুর

॥ ৭ ॥

গত ৫ই আগস্ট তারিখের "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর "দুই রবীন্দ্রনাথ" পাঠ করিয়া হতাশ হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ২৬ বৎসর পরে এই ধরনের রচনা প্রকাশের সার্থকতা দেখি না। আশা করিয়াছিলাম লেখক ইহার মধ্যে রবীন্দ্র প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের দ্বৈতরূপ দেখাইবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীনীরদচন্দ্র সেই দুরূহ কার্যে হস্ত প্রয়োগ না করিয়া ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের আচরণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে কটূক্তি ও শ্লেষ প্রয়োগ করাই অধিকতর সহজসাধ্য মনে করিয়াছেন। লেখকের সাহিত্য সমালোচনার ক্ষমতা কত দূর তাহার পরিচয় দিবার প্রচেষ্টা তিনি করেন নাই, কারণ তাহা মননশীলতার পরিচায়ক। গতাসু মহাপুরুষের প্রতি মুখরোচকভাবে কটূক্তি করিতে পারিলে কিছু নূতনত্ব সৃষ্টি করা যাইবে এবং কিছু লঘু প্রকৃতির লোক তাহা উপভোগ করিয়া শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর বলিষ্ঠ মন ও সাহসের তারিফ করিয়া বাহবা দিবে, বোধ হয় এইরূপ মনোভাব হইতেই তাঁহার এই অমূল্য সৃষ্টির জন্ম। রবীন্দ্রনাথ আজও স্মরণীয় হইয়া আছেন এবং চিরদিনই থাকিবেন তাঁহার উৎকৃষ্ট সাহিত্যের জন্য। নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্বে ও পরে কিরূপ মনোভাব ছিল এবং হইয়াছিল, অথবা তিনি কিরূপ আচরণ করিতেন এবং করিয়াছিলেন, তাহা গবেষণার বস্তু কোনদিনই হইতে পারে না, এই কারণে কোন সমালোচকই এ পর্যন্ত এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। উর্বরমস্তিষ্ক শ্রীনীরদচন্দ্র এই মৌলিক গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার অপেক্ষা [illegible] ও সম্মানসূচক পুরস্কার পাইবার দাবি করিতে পারেন।

এই প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সত্য মিথ্যা অথবা যাথার্থ্য সম্বন্ধে তর্ক তুলিয়া আপনাদের পত্রিকার মূল্যবান স্থান অপচয় করিতে চাহি না। আমি শুধু বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি, সত্যই কি এই প্রবন্ধ রচনার কোন প্রয়োজন ছিল? এবং সম্পাদক মহাশয়ের জন্য শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী ইহা লিখিলেও 'দেশ' পত্রিকা কি আজকাল যাহা লেখা যায় তাহাই প্রকাশ করেন—রচনার [illegible] অথবা [illegible] বিচার না করিয়া প্রকাশ করিবার [illegible] করিয়াছেন?

আশায় অপেক্ষা করিয়া [illegible] বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের কবে এই বিচক্ষণ বিচারকের এজলাসে ডাক পড়িবে এবং তাঁহার রায়ের মাধ্যমে তাঁহার অমর লেখনীপ্রসূত মৌলিক গবেষণার রস আস্বাদন করিতে পারিব! নেতাজী সম্বন্ধে Illustrated Weekly-তে প্রকাশিত তাঁহার রচনা পড়িয়াই তাঁহার মৌলিকতা বিষয়ে আমাদের ঔৎসুক্য নিবারণ করিয়াছে।

শ্রীসমর সরকার
কলিকাতা-২৯

অতীতের প্রহরা

সালভাদোর ডালিঃ বাস্তব অবাস্তবে নতুন জগৎ

শিশুকালে আমি হয়তো কোনো অন্ধকারে রাস্তা পার হয়েছিলাম। আমাকে রাত্তিরবেলা বিছানা থেকে কেউ তুলে নিল, আধা ঘুম-চোখে দিদি শার্ট পরিয়ে সোয়েটার গলিয়ে দিল গলায়, অন্ধকারে বাড়ি-ভর্তি বহু লোকজন, কিন্তু ফিসফিস আওয়াজ, যেন সব শরীরগুলো ছায়া হয়ে যেতে চাইছে। বারান্দার ওপর পাশের ঘরের আলোর রেখা এসে পড়েছে, পাশের ঘরে মৃদু গোঙানির মতো কান্নার শব্দ, কিন্তু আমার ঘুম-চোখ, সবই ঝাপসা-ঝাপসা। বারান্দায় ঈষৎ যেন কোলাহল বাড়ল, হঠাৎ সেই গোঙানির আওয়াজ এঞ্জিনের হুইসিলের মতো তীক্ষ্ণভাবে বেজে একদম নিঃশব্দ হয়ে গেল, যে দিদি আমাকে এই ঘরে বুকে চেপে দাঁড়িয়ে সে হঠাৎ আঁকড়ে ধরল আমায় আরো জোরে, ঈষৎ ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ, মৃদু পুজোর মন্ত্রপাঠের মতো হরিধ্বনি—কিছুক্ষণ পরে আমরা গাড়িতে উঠলাম গিয়ে।—কিন্তু আমার সবই ভাসমান ছবির মতো, ঘুম-ঘুম চোখ, গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়লাম কখন।

তারপর বহু বছর কেটে গেল, সেই ঘুম-ঘুম চোখের রাত্রির পরে। বহু দৃশ্য চোখের ওপর ভেসে গেল, বহু মানুষের সঙ্গে দেখা হল, বহু অভিজ্ঞতা; আলো, লোকলস্কর, সানাই-বাজা বাড়ি, অনেক নতুন জায়গা, অনেক আনন্দ, অনেক দুঃখ; দৈর্ঘ্য বাড়ল, বইয়ের অভিজ্ঞতা নিজের অভিজ্ঞতা হল, নিজের অভিজ্ঞতা শুকনো পাতার মতো হারিয়ে গেল কোথায়, তারপর একদিন ঘুমের মধ্যে কী একটা শব্দে চোখ মেলতেই অন্ধকারে ভেসে উঠল অদ্ভুত দৃশ্য—সেই দৃশ্য ছেলেবেলার, সেই রাত্রের—কিন্তু দৃশ্যের বস্তুগুলি বাস্তবের চেয়ে দূরে নয় কিন্তু স্বপ্নের মতো তাদের সর্বাঙ্গীণ শয্যাতে অবাস্তব। দিগন্ত-জোড়া একটা খাট প্রায় আকাশ ছুঁয়েছে, তার ওপর কোনো মৃত শরীর, তার হাত দুটো দু' পাশে ঝুলে পড়েছে, যেন দুটো থাম। নিচে খুব ছোট দেখা একটা গাড়ি, একটা বাড়ির অংশ, বারান্দায় এক ফালি আলো, মাঠের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে একটা লোকের হাত ধরে, চতুর্দিকে আমাদের দ্বিগুণ বড়ো সব সাদা ফুল ছড়িয়ে আছে, কয়েকটা আঙুল ক্যাকটাসের মতো মাটি ফুঁড়ে আকাশের দিকে—এইসব। আসলে অতীতের সেই অভিজ্ঞতা অবচেতন থেকে অন্য বহু অভিজ্ঞতার পানা, স্যাঁতা, কাদা নিয়ে উঠে এসেছে ওপরে। আমি যদি শিল্পী হতুম, এবং এই দৃশ্য আঁকতুম 'শিশুকাল' নাম দিয়ে তা হলে সে ছবি সালভাদোর ডালির চিত্রের সমগোত্রীয় হত। যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অবচেতন মনে চলে যায়, বহু কাল অবচেতনের গুদাম-ঘরে বন্দী থেকে হঠাৎ আরো বহু অভিজ্ঞতার টুকরোকে চুম্বকের মতো টেনে বেরিয়ে আসে একদিন, বাস্তবে বা স্বপ্নে তার যথাযথ চিত্রীকরণই তো সালভাদোর চেয়েছিলেন, এবং অন্যান্য স্যুরিয়ালিস্টরা।

✻

সালভাদোর ডালির জন্ম ১৯০৪-এ হিস্পান দেশের ফিগুয়েরো শহরে। ফিগুয়েরাতেই চিত্রাভ্যাস আরম্ভ করেন, পরে যান মাদ্রিদে। নিতান্ত লক্ষ্মী ছেলের মতো চিত্রকলার ব্যাকরণ অভ্যেস করেন ধ্রুপদী মাস্টার মশাইদের কাছে। মাদ্রিদে থাকাকালেই এই সময় ফ্রয়েড পড়া আরম্ভ করেন, এবং অন্যান্য দার্শনিকদের—সালভাদোরের দর্শন ছাড়া কিছুই পড়তে ভালো লাগত না তখন। এ ছাড়া শিল্প-সমালোচনা পড়ে তিনি

অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠেন কিউবিজম, ফিউচারিজম ইত্যাদিতে—বিশেষত আধিবিদ্যক চিত্রকলার (metaphysical printing) আদর্শ তাঁকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করে। বন্ধুতা হয় গার্সিয়া লরকার সঙ্গে, দুই বন্ধু শিল্প সমস্যা, দার্শনিক তর্ক, পরস্পর প্রশংসা ও সমালোচনা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতেন কাফেতে। লরকা ছবিও আঁকতেন, তবে তাঁর ছবি ছিল স্বাধীন কল্পনার বিমূর্ত প্রকাশ, সালভাদোরের ছবিতে থাকত বস্তু, বাস্তব শরীর নিয়ে আলোকচিত্রের যথার্থ রূপ; কিন্তু অবাস্তব তাদের কম্পোজিশন। সালভাদোরের বাস্তব-অবাস্তবতার ধারণা কাফ্‌কার মতো অনেকটা; একটা মানুষ পোকা হয়ে যেতে পারে এই প্রাথমিক অসম্ভাব্য মেনে নিলে যেমন 'মেটামরফসিস' গল্প মেনে চলে বৈজ্ঞানিক অনুপুঙ্খ। ঠিক-ঠিক যেমন ভাবা যেতে পারে একটি পোকার ক্ষমতা, তার মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, চিত হয়ে গেলে উপড়ে হবার পরিশ্রম, দৃষ্টিশক্তির সীমিতি, সব যথাযথভাবে লিখেছেন কাফ্‌কা—কিন্তু গোড়ার হোঁচটটা সামলাতে হবে, মানুষ এক সকালে হঠাৎ পোকা হয়ে যেতে পারে এই অসম্ভবও অবশ্যম্ভাবীকার্য। ডালি ফিল্মও পরিচালনা করেন কিছু, "লা শিয়েন আঁদালু"-এর "লা'জ দ্যর" কিংবা "লো শিয়্যাঁ" চলচ্চিত্র হিসেবে উৎরেছিল বেশ। ১৯২৫এর বার্সেলোনার প্রদর্শনীতে ডালির ছবি নিয়ে বেশ সাড়া জাগে: সেইখানে অন্যান্যরা সবাই ছিলেন আইবেরিয়ান গোষ্ঠীর, সালভাদোরের ছবির স্বাতন্ত্র্য সেখানে সব দর্শকই লক্ষ করেছিল।

১৯২৮এ ডালি স্যুরিয়ালিজমের আদর্শে ঝোঁকেন। "রক্ত মধুর চেয়েও সুস্বাদু" চিত্র আঁকলেন এই বছর, বার্সেলোনা থেকে বের করলেন "গ্রোক ম্যানিফেস্টো", প্যারিসের স্যুরিয়ালিস্টদের এনে প্রদর্শনী করলেন প্রচুর হইচই ক'রে কাডাকুয়েতে—বিয়ে করলেন পল এল্যুয়ারের স্ত্রী গালাকে—একেবারে প্রবল ঘটনাস্রোত। তাঁর মাথায় এখন বিরাট বিরাট দার্শনিক চিন্তা, প্রকাশ করছেন তা মুক্ত কণ্ঠে, সোচ্চারে, স্বনির্ভরতার দম্ভে; কয়েক দিনে দলের পাণ্ডা হয়ে গেলেন। এই সময়েই "প্যারানইয়াক-ক্রিটিকাল অ্যাক্টি-ভিটি" চিত্রাদর্শ উদ্ভাবন করেন তিনি। প্যারানইয়াক-ক্রিটিকাল অ্যাক্টিভিটি হল তাই "যা মানুষের মনের উত্তেজনার কোষগুলির ঘনীভূতকরণের মাধ্যমে সৃষ্টি করে কোনো চিরন্তন এবং উন্মাদ ছক যার অবয়ব হঠাৎ অবচেতন থেকে উঠে আসা বস্তুপ্রধান দৃশ্য অভিজ্ঞতা।" তিনি জানতেন কীভাবে অবচেতন অভিজ্ঞতাকে, দৃশ্য অভিজ্ঞতাকে, স্মৃতির interpretation বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্যে ক্যানভাসে প্রকাশ করা সম্ভব। ডালি চেয়েছিলেন বাস্তবের একেবারে অন্তর থেকে, আপাত-অবাস্তব নতুন এক বাস্তবতা তুলে আনতে।

ডালি ১৯৩৭এর পর ক্লাসিসিজমে ফিরে যাবার চেষ্টা করেন। এই পর্যায়ে আশ্চর্য ভালো কিছু ছবি এঁকেছেন তিনি, কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারি না, ঠিক কী কারণে তাঁর দরকার হ'ল এই অতীতে গমন। ডালি নিজেও মনে হয় ঠিক নিশ্চিত ছিলেন না এ ব্যাপারে।

১৯৪০এর পর ডালি নিউ ইয়র্ক শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন।

*

'অতীতের প্রহরা' চিত্রটির দিকে এবার চোখ নিবদ্ধ করা যেতে পারে। চিত্রটি ১৯৩১এ আঁকা হয় তেল রঙে, রয়েছে বর্তমানে "ম্যুজিয়াম অব মডার্ন আর্ট", নিউইয়র্কে।

চিত্রটিতে একটি বস্তু আছে, যা ঠিক কী বোঝা যাচ্ছে না (ছবিটি যতবার দেখেছি,

আমি চেষ্টা করেছি ওটার তাৎপর্য বোঝার (কিন্তু এখনো পরিষ্কার হয়নি), সেটা ওই মাঝ-বরাবর মাটিতে প'ড়ে-থাকা বস্তুটি যার ওপরে একটি ঘড়ি ঘোড়ার পিঠের জিনের মত বিস্তৃত। বস্তুটির দিকে তাকিয়ে কখনো মনে হয় কোনো মৃত জন্তু যার পা দুটো ঝরে পড়ার ফলে মুখ থুবড়ে পড়েছে, কখনো মনে হয় বুঝি কোনো মাথা। ছবিটির পরিপূর্ণ অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বলা যায় অবশ্য যে এই বস্তু বা প্রাণ ফুলে-থাকা, নষ্ট গতিহারা, খঞ্জ কোনো সত্তাকে প্রকাশ করছে যা পাহাড়ের প্রাচীরে আটকে গেছে। তিনটি ঘড়িরই মধ্যে দেখুন কেমন নরম-নরম, আঠা-আঠা ভাব—যেন ছিনে জোঁক, ছাড়াতে পারা যায় না, লেপ্টে থাকে। এর বিপরীতে দেখুন কী কঠিন পাহারা, কী ভীষণ স্থির এবং নিঃসঙ্গ: গাছের দিকে চোখ ফেলুন, শুকনো গাছ এও আরেকটি ঘড়ি, সময় বলছে: পাতা ঝরা, পাতা ভরা—গাছ তো সময়ই বলে। অর্থাৎ এ ছবিতে সময় বিষয়ে দুটো দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যাচ্ছে—গাছ, পাহাড়, দূরের সমুদ্র এবং কাঠের ব্লক থেমে থাকা সময়, এবং এই ঘড়িগুলি পিছলে যাওয়া সময়, যার থেকে মধুর ফোঁটার মতো সময় বেরোয় (বাঁদিকে কোণে লালচে গোলকটি দেখুন ব্লকের ওপর, কেমন পিঁপড়ের ঝাঁক তাতে আটকে গেছে)। এখন এই দুই সময় কী? আমার মনে হয়, ডালি ব্যক্তিগত সময়ের সঙ্গে, বাহ্য-সময়ের তফাত করছেন। ব্যক্তিগত সময় টানা যায়, ঘড়ির সময়ের সে অপেক্ষা রাখে না, স্মৃতিতে থেমে থাকে, যেমন গাছ, পাহাড় চিরন্তন স্থবির।

*

ডালি বিষয়ে দু' একটা কেচ্ছা বলা যেতে পারে। উনি তো এখন নিউ ইয়র্কে আছেন, মাঝে মাঝেই স্টান্ট দেন এক একটা। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ডালির নিউ ইয়র্কে, ও'র মুখে শুনেছি, উনি বড় নাকি নিজের কথা বলেন এবং দেখানোপনা আছে বেশ—প্রায়ই টেবিল চাপড়ান, "আমি সালভাদোর ডালি বলছি..." এই জাতীয় চিৎকার করেন।—একবার নাকি কোন ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর ডালিকে এক লক্ষ ডলার দিয়ে বলে শো-কেস সাজিয়ে দিতে, চার মাস পরে দোকানের ওপেনিং ডে সেদিন শো-কেস তৈরী চাই। শো-কেসে পর্দা ফেলা থাকে, বড় বড় পোস্টার বাইরে "Dali at work" জাতীয়, কিন্তু ডালির পাত্তা নেই—পুরো চার মাস কিছু করেননি, এদিকে টাকা নিয়ে নিয়েছেন অ্যাডভান্স। অবশেষে চার মাস কেটে গেল, যেদিন ওপেনিং-ডে সেদিন দোকানওয়ালারা ধরে নিয়ে এল তাঁকে মদের আড্ডা থেকে বহু খুঁজে। সালভাদোরের মুখে বিকার নেই কিন্তু। তিনি বললেন, শো-কেসে একটা বাথটব রাখ, আর কিচ্ছু দরকার নেই, বাকিটা আমি দেখছি। এদিকে বিকেল পাঁচটায় শো-কেস উন্মোচন, তখন মাত্র দশ মিনিট বাকি। দোকানওয়ালারা বলতেও সাহস করে না, একে কিছুটা খেয়ে আছে তার ওপর সালভাদোর ডালি—কিন্তু পাঁচ মিনিটে সাজাবেন কী, এদিকে তো পর্দার আড়াল থেকে সাড়াশব্দও নেই। পাঁচটার ঘণ্টা পড়তেই ডালি বললেন, বাইরের পর্দা উন্মোচন করো, সাজানো শেষ। বহু লোক এদিকে বাইরে ভিড় জমিয়েছে ডালির সাজানো শো-কেস দেখবে বলে, পুলিস আটকাতে পারছে না উৎসাহী জনতা, বহু ভি আই পি উপস্থিত; পাঁচটায় ঘণ্টা বাজতেই সব দৃষ্টি স্থির শো-কেসে—ধীরে পর্দা উঠে গেল। দেখা গেল সালভাদোর ডালি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বাথটবে পা তুলে সিগার খাচ্ছেন। পুলিস বন্ধ করে দেয় শো-কেস সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু দোকানের যা দরকার, বিজ্ঞাপন, তা হয়ে গেল চমৎকার।

শুদ্ধশীল বসু

স্বাধীনতা লাভের ঠিক পরে পরে কিছু কমিউনিসটের মুখে শুনেছিলাম 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়', কুড়ি বছর বাদে আবার শুনলাম, 'পনেরোই আগস্ট আজাদীর দিন নয়।'—না, এই বয়ান কমিউনিস্টদের না, 'ইনসাফ' নামক একটি "নির্ভীক নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক" পত্রের। নির্ভীক তো নিশ্চয়ই, নইলে খাস কলকাতার বুকে বসে এই কাগজ সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রকাশিত হয় কী করে!

ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নামকরা অফিসারেরা শ্যেনদৃষ্টি মেলে সর্বদা নজর রাখছেন কোথায় কী রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ হচ্ছে, কোথায় কোন্ সংবাদপত্র দেশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করছে; কিন্তু কী আশ্চর্য, 'ইনসাফ' নামধারী একটি ভারত-বিরোধী কাগজ সম্পর্কে তাঁদের ভূমিকা মূক-বধিরের।

এই কাগজের কয়েকটি সংখ্যা আমার হাতে এসেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম কাগজটি বোধহয় প্রকাশিত হয় পাকিস্তান থেকে। কিন্তু সন্দেহ হল তার ভারত ও হিন্দু-বিদ্বেষের মাত্রাতিরিক্ততা দেখে। পূর্ব পাকিস্তানের বহু কাগজই এই ব্যাপারে সংযত শালীন; যে দুই একটি ভারত-বিদ্বেষ প্রচার করে, তাদের কণাও 'ইনসাফ' নামধারী "বাংলা সংবাদপত্র-জগতের আজরাইল"-এর চেয়ে কম বিষ ছড়ায়। পরে পাতা উলটে দেখি, পত্রিকাটির প্রকাশস্থল ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের প্রধান প্রাণকেন্দ্র কলকাতা মহানগরী। ঠিকানা—৩০ ইলিয়ট রোড, কলকাতা-১৬, সম্পাদক আহমেদ রশীদ।

রশীদ সাহেবের কাছে জানতে ইচ্ছে করে কোন্ রাষ্ট্রের তিনি নাগরিক? এখানে তাঁর অভিভাবক কে? পাকিস্তানী ডেপুটি হাই-কমিশন? ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব হাসান ইমাম সাহেবের ওকালতি, তিনি যে-ভাবে করছেন, তাতে মনে হয়, 'নিশান-ই-পাকিস্তান' খেতাব অচিরেই তাঁর মিলবে।

দ্বিতীয় বর্ষ ১৮তম সংখ্যার (১৯।৮।৬৭) প্রথম পাতাতেই দেখছি তিনি মোটা মোটা হরফে লিখছেন, "স্তব্ধ কর, গুঁড়িয়ে ফেল, অত্যাচারী আর বর্ণচোরা দুশমনদের চিরতরে বিনাশ কর।" এক্ষেত্রে দুশমন আনন্দবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর। তাদের অপরাধ পাকিস্তানের ডেপুটি হাই-কমিশনারের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। মুসলমান সমাজের তখন কী করা উচিত? খুব সোজা—"হাসান ইমামকে কেন্দ্র করিয়া যে অগ্নিকাণ্ড প্রজ্বলিত হইয়াছে, এই রাজ্যের বহু বিড়ম্বিত মুসলমান সমাজ সেই অগ্নিকুণ্ডেই বর্ণচোরা অত্যাচারীদের নিক্ষেপ করিতে চায়। মুসলমান জনতাকে দৃঢ়মুষ্টি হস্তে আগাইয়া আসিতে হইবে। সাংবাদিকতার নামে উঞ্ছবৃত্তি বরদাশ্‌ত করার ধৈর্য মুসলমানদের আজ আর নাই।" —অতি উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু হাসান ইমাম সাহেবের কী হবে? পত্রিকার বক্তব্য—"হাসান ইমামকে এই রাজ্যের এক কোটি মুসলমানের পক্ষ হইতে মোবারকবাদ"।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, এই সংখ্যারই আর একটি প্রবন্ধের মুখবন্ধ—"স্বাধীনতা দিবস এবার চোরের মত আসিল ও জনগণের অন্তরের সিঁদকাঠি, আনন্দ শিহরন জাগাইতে না পারিয়া জনতার নিকট তাড়া খাইয়া পলাইয়া গেল।" এই পত্রিকারই আরও কিছু বচন উপহার দিই—(১) "পাকিস্তান সরকার কলিকাতার ভাষা ও সংস্কৃতি-ওয়ালাদের দুই গালে থাপ্পড় দিয়া সীমান্ত দরজা না খোলার কঠিন সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিয়াছেন", (২) হাসান ইমাম ও তাঁহার দলবলেরা "পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে বেদম ঠেঙ্গানি দিয়াছেন" (কোথায় লাগে নীরদ চৌধুরী!), (৩) "ভারতের তরফ থেকে কত না হুজুর হুজুর তেল লাগানো মনোভাব দেখানো হচ্ছে পাঠান বাচ্চা চুমড়ানো গোঁফ আইয়ুব খাঁ সাহেবের কাছে, কিন্তু ভবী ভুলবার নয়।"

উদাহরণ আর বাড়াব না, শুধু জানতে ইচ্ছে করে, সামান্য সমালোচনায় চঞ্চল সরকারী কর্তাব্যক্তিরা এই ধরনের রাষ্ট্রদ্রোহী প্রলাপ সহ্য করছেন কী করে? নাকি বাক্-স্বাধীনতার নামে স্বদেশের মুণ্ডপাত এবং শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রশস্তি চলতে পারে?

*

বন্ধু ছুটে এসে বললেন, 'সুসংবাদ আছে।' কী ব্যাপার, এই দুঃসংবাদ কীর্ণ সংসারে সুসংবাদ বলে কিছু আছে নাকি? "আছে, আছে, আছে", বন্ধু বললেন, "রেশনে চালের বরাদ্দ বেড়ে গেল।" তার মানে? —"তার মানে পরিষ্কার", বন্ধুর জবাব, "প্রথমে খবর পেলাম রেশনের চাল অর্ধেক হয়ে পাঁচ শ' গ্রাম থেকে আড়াই শ' গ্রাম হয়ে

যাচ্ছে। সেইভাবেই মনটাকে তৈরি করে রেখেছিলাম; তারপর পাকা খবর এল, আড়াই শ' নয়, মাত্র এক শ' গ্রাম কমছে। তা হলে হিসেবটা কী দাঁড়াল? দেড় শ' গ্রাম বেড়ে গেল।"

"কমল এক শ' গ্রাম আর আপনি বলছেন দেড় শ' গ্রাম বাড়ল। অদ্ভুত সব কথা"—আমি সবিনয়ে বলি।

"মোটেই অদ্ভুত নয়", বন্ধু গম্ভীর মুখে বলেন, "গত কয়েক বছর থেকেই তো এই ব্যাপার চলছে। সরষের তেলের দাম দু টাকা থেকে বেড়ে সাড়ে চার টাকা হল। চারদিকে হায় হায় রব, একদিন হঠাৎ আট আনা কমে দর হল চার টাকা। তৎক্ষণাৎ লোকের মুখে মুখে, কাগজে কাগজে ঘোষণা—'সরষের তেলের দাম কমল।' ডাল, মাছ, চিনি, সবজি; সব কিছুর বেলাতেই এক ব্যাপার। তাই আমি যদি বলি গত হপ্তা থেকে রেশনেও চাল বাড়ল, তাতে আপত্তি করার কী আছে?"

বন্ধুর সরল যুক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তে নাড়তে আমিও এবারে বলি, 'ঠিক কথা, ঠিক কথা।'

—চাণক্য

বোদলেয়ারের জীবনের শেষ কয়েকটি মাস

গত ৩১ আগস্ট বোদলেয়ারের মৃত্যুর এক শো বছর পূর্ণ হলো। এই উপলক্ষে তাঁর কবিতা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার নেই, কেননা আমাদের কাছে বোদলেয়ার একজন পুরোনো ধরনের কবি। এবং পুরোনো কবিদের সম্পর্কে আলোচনার যা হয়, বোদলেয়ার সম্পর্কেও কথা উঠলেই এসে পড়ে সুন্দর ও ক্লেদ, পাপ ও উদ্ধারের প্রশ্ন। কিন্তু এগুলো নিতান্তই "বিষয়," কবিতা নয়। অর্থাৎ বোদলেয়ারের কবিতায় পরিস্ফুট সুন্দর ও অসুন্দরের প্রশ্ন, তাঁর করেসপণ্ডেন্স তত্ত্ব, এগুলো যেন গল্প অথবা প্রবন্ধেও বর্ণিত হতে পারতো, কেননা আলোচনা হয় এগুলো মান্য কিংবা পরিত্যজ্য এই উদ্দেশ্যে। কবিতার কাছে এসব প্রশ্ন এখন অবান্তর হয়ে গেছে।

বরং, মৃত্যুর শতবার্ষিকী, এই উপলক্ষে সেই কবির মৃত্যুর অব্যবহিত আগেকার দিনগুলির কথা মনে করা যাক। পৃথিবীতে সবচেয়ে শোকময় ঘটনা কোনো দুঃখিত বা পরাজিত কবির মৃত্যু। এবং মৃত্যুর আগে তিনি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও পরাজিত হয়েছিলেন। আজন্ম জিদ ত্যাগ করে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে অসহায়ভাবে ধর্মের আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন। এবং সজ্ঞান মস্তিকেও ভাষা ও শব্দ তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল।

১৮৬৬ সালের মার্চ মাস। বোদলেয়ারের বয়েস তখন পঁয়তাল্লিশ। বেলজিয়ামে তখন তিনি এক প্রকার নির্বাসিত। হোটেলের ধার শোধ করতে পারছেন না বলে প্যারিসে চলে আসার উপায় নেই। একদা শৌখিন ড্যাণ্ডি বোদলোয়ারের পোশাক এখন মলিন, চুল কাটার পয়সা নেই বলে মাথায় জট পড়ছে, চিঠি লেখার স্ট্যাম্প কেনারও অর্থাভাব ঘটে। মাঝে মাঝে বৃদ্ধা মায়ের কাছ থেকে সামান্য কিছু টাকা আসে। তখনও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে দান নিতে চান না, আশা করছেন, কোনো প্রকাশক তাঁর গ্রন্থাবলী ছাপতে রাজী হলে টাকা পাবেন। মার্চের শেষ দিকে এক সন্ধ্যায় একজন ফোটোগ্রাফার বন্ধুর সংগে রাত্রির খাবার খেতে বেরিয়েছেন। বন্ধুটি লক্ষ করলেন, সেদিন কবি বিষম অন্যমনস্ক। মাঝে মাঝেই চুপ করে বসে থাকছেন। মদের গ্লাসটি তুলে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন—যেন বুঝতে পারছেন না, ওটা নিয়ে কি করবেন। চোখে মুখে ত্রাশ। ফটোগ্রাফার বন্ধু তাঁর তোলা কবির কয়েকখানা ফটোগ্রাফ দেখালেন। একটু যেন চেতনা ফিরে এলো, বোদলেয়ার তীব্র কণ্ঠে বললেন, নিজের মুখ দেখতে আমার ঘৃণা হয়।—তারপর গ্লাসের পর গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, তিনি কফি কাপের হ্যাণ্ডেল খুঁজে পাচ্ছেন না। হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন, টুপিটা খুঁজে নিয়ে বন্ধুকে বললেন, আচ্ছা চলি, তোমার সংগে আজ সন্ধ্যেবেলা আবার দেখা হচ্ছে।—তখনই রাত্রি প্রায় এগারোটা।

বন্ধুর অদ্ভুত ব্যবহারে বিচলিত হয়ে ফটোগ্রাফার বিপদের আশংকায় ওঁকে আবার খুঁজতে গেলেন। রাত একটায় পাওয়া গেল, একটি পানশালায় একা, খুব বেশী নেশা হয়নি, কিন্তু উদাসীন মুখ। বন্ধু জানতেন কয়েকদিন ধরেই বোদলেয়ারের অত্যন্ত

শরীর খারাপ চলছে, তাই বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে হোটেলে ফিরিয়ে আনলেন। সিঁড়ি দিয়ে বোদলেয়ার একেবারেই উঠতে পারছিলেন না, তাঁকে বহন করে এনে ঘরে শুইয়ে দেওয়া হলো। বন্ধুটি তাঁর জামা কাপড় খুলে দিচ্ছিলেন, হঠাৎ বোদলেয়ার চেঁচিয়ে উঠলেন, চলে যাও! চলে যাও! যাও!

পরদিন সকালে বন্ধুটি আবার এসে দেখলেন, বোদলেয়ার সেইরকমই পুরো পোশাক পরা অবস্থায় শুয়ে আছেন। চোখের দৃষ্টি তীব্র। বোদলেয়ারের শরীরের এক অংশে প্যারালেসিস হয়েছে, কথা বলার ক্ষমতা চলে গেছে।

৩রা এপ্রিল ব্রাসেলস্-এর "ভগ্নাশেষ রাজপথের" একটি হাসপাতালে বোদলেয়ারকে আনা হলো। হাসপাতালটি সন্ন্যাসিনীদের দ্বারা পরিচালিত। যে-বোদলেয়ার যৌবনে চমৎকার কথা বলার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, রেস্টুরেন্টে এবং আড্ডাখানায় যাঁর মুখের সব চমকপ্রদ গল্প শোনার জন্য ভিড় জমতো, তিনি এখন বাক্য রহিত, অতিকষ্টে দুটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করতে পারেন, 'সাক্রে নোম'—(আক্ষরিক অর্থ, পবিত্র নাম, কিন্তু ব্যবহার হয় শপথ বাক্য হিসেবে) এবং ঐ দুটি মাত্র শব্দেই তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভয়, দুঃখ, ক্রোধের প্রকাশ। হাসপাতালের নানুরা কানাঘুষো শুনেছিলেন, ঐ লোকটা শয়তানের উপাসক, ঘৃণ্য এবং এখন ওকে নিশ্চয়ই ভূতে পেয়েছে। তাঁরা ভয়ে ভয়ে দূরে থাকতেন, মুমূর্ষু রোগীর ঠিক মতো সেবা হতো না, যথা সময়ে অন্ন পানীয় জুটতো। বোদলেয়ারের মা এসে পৌঁছোবার পর, হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ ওই রোগীকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন, এবং বোদলেয়ারকে নিয়ে যাবার পর হাঁপ ছেড়ে বেঁচে দয়ার অবতার সন্ন্যাসিনীরা হাঁটু মুড়ে ঈশ্বরের করুণার জন্য প্রার্থনা করলেন, যেখানে বোদলেয়ার শুতেন সেই জায়গাটা পবিত্র করার জন্য গঙ্গা জল (জর্ডনের জল) ছিটিয়ে দেওয়া হলো।

মায়ের সেবায় ও বন্ধুবান্ধবদের যত্নে পরের কয়েকমাস বোদলেয়ার একটু ভালো ছিলেন। কিন্তু শারীরিক পঙ্গুতা সম্পূর্ণ কাটে নি, লেখার ক্ষমতা ফিরে আসে নি, কথাবলার ক্ষমতা ফিরে আসেনি। কখনো অতিকষ্টে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতটা চেপে নামটুকু শুধু সই করতে পারতেন। তাও একবার, একটা দলিলে তাঁকে সই করতে বলা হলে, তিনি কলম হাতে ফাঁকা চোখে তাকিয়েছিলেন। তিনি নিজের নামটাও ভুলে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর লেখা একটা বই এনে, আঙুল দিয়ে তাঁর নামটা দেখিয়ে দেওয়া হয়। তিনি তবু বুঝতে পারেন নি, শেষ পর্যন্ত অপরের কথা শুনে, বানান দেখে দেখে নিজের নামটা কপি করে দেন। কিন্তু মস্তিষ্কের সাবলীলতা মাঝে মাঝে ফিরে আসতো। সেইটাই তাঁর সবচেয়ে যন্ত্রণার সময়। চিন্তা করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু প্রকাশের ক্ষমতা নেই। বন্ধুদের কাছে চোখ দিয়ে কত কি বোঝাতে চাইতেন, কী ঠিক বোঝাতে চাইতেন—তা কেউ জানতে পারে নি। নিজেকে প্রকাশ করতে না পেরে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াতো। একেই বলে সত্যিকারের রক্ত মাংসের খাঁচার বন্দিত্ব। এই খাঁচার মধ্যে আসল মানুষটা তখনও বেঁচে আছে, কিন্তু নিরুদ্ধ দেয়ালের বাইরে আসতে পারছে না।

১৮৬৭ সালের মার্চ মাসের শেষ দিনটিতেই তাঁর সব অসুখ সেরে যাবে—বোদলেয়ারের মনে এই রকম একটা অযৌক্তিক দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল। এপ্রিল থেকে বসন্তের শুরু, শীত পেরিয়ে সেই বসন্তে তিনি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন, এই ছিল আশা। কম্পিত হাতে ক্যালেন্ডারে এপ্রিল মাসের নিচে দাগ দিয়ে রেখেছিলেন। বন্ধু-বান্ধবরা এলে চোখের ইশারায় এপ্রিল মাস দেখাতেন। কোনো কাজের কথা উঠলে তিনি ইঙ্গিতে বোঝাতেন যে এপ্রিল মাসে সেরে উঠে তিনি আবার নিজেই সব কাজের ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু ঐ সময় থেকেই তাঁর অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে থাকে। তখন গভীর বিষাদ ও ক্রোধে তাঁর মন ভরে যায়, প্যারিসের এক নার্সিং হোমের ঘরের জানলার পাশে তিনি চুপ করে বসে থাকতেন, কোলের ওপর রাখা দুটি সাদা বিবর্ণ, অনড় হাত, ছাই রঙা মুখ। সে সময় অন্য কারুকে তিনি দাড়ি কামাতে কিংবা চুল আঁচড়ে দিতে দিতেন না। মাঝে মাঝে কথা বলার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় মুখ চোখ লাল হয়ে উঠতো শুধু, ব্যর্থ হয়ে আবার আচ্ছন্নের মতন পড়ে থাকতেন। বন্ধুরা ও'কে খুশী করার জন্য এডগার অ্যালান পো'র কবিতা পড়ে শোনাতেন, ভাগনারের সংগীত বাজাতেন।

আগস্ট মাসে তিনি সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী, উঠে বসার ক্ষমতা নেই, হাত তোলার ক্ষমতা নেই, কারুর দিকে চেয়ে দেখার ক্ষমতা থাকলেও ইচ্ছে ছিল না সম্ভবত। মৃত্যুর আগের দু' দিন তাঁর কোনো জ্ঞানই ছিল না, চোখ খোলা ছিল, কিন্তু দৃষ্টিহীন। ৪৬ বছরের পুত্র মৃত্যু শয্যায়, তাঁর ৭২ বছরের বুড়ি মা—পাশে নিদ্রাহীন জেগে।

মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে নাকি একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে। তাঁর মায়ের কথা অনুযায়ী, বোদলেয়ার হঠাৎ বিছানায় উঠে বসেন, দৃষ্টি অঙ্গ চালনা ও কথা বলার শক্তি ফিরে পান। আজীবন ঈশ্বর বিরোধী এবং কুখ্যাত 'লে ফ্লর দু মাল'-এর কবি চার্লস বোদলেয়ার শেষ আশীর্বচন শোনার জন্য পাদ্রীকে ডেকে পাঠান এবং সেই পাদ্রীর কাছে স্বীয় পাপের স্বীকারোক্তি করে যান। অর্থাৎ শেষ মুহূর্তে তিনি খাঁটি ক্যাথলিক খৃস্টান হয়েছিলেন। তাঁর মা ছাড়া, এই ঘটনার অবশ্য অন্য কেউ সাক্ষী নেই, কিন্তু এই ব্যাপারের ঠিক পরক্ষণেই ঘরে ঢুকেছিলেন কবির এক বন্ধু শার্ল বুয়ান, তিনি দেখেছিলেন, কবির সারা মুখ উৎফুল্ল, প্রদীপ্ত চক্ষু, তিনি বারবার নিজের শরীরে ক্রুশচিহ্ন আঁকছেন ও বলছেন, সাক্রে নোম, আ, সাক্রে নোম!

এমন ঘটনা সত্যি ঘটে থাকলেও, বলাই বাহুল্য, অনেকেই একজন বিকারগ্রস্ত রোগীর অন্তিম মুহূর্তের এই ব্যবহারের ওপর কোনো গুরুত্ব দেন না।

আগস্ট মাসের শেষ দিনে, মায়ের বাহুতে মাথা রেখে বোদলেয়ারের মৃত্যু হয়। নিদারুণ যন্ত্রণার পর মৃত্যু আসা সত্ত্বেও, তাঁর মৃতমুখে হাসি লেগেছিল, অনেকেই দেখেছে। সেদিন ছিল শনিবার, প্যারিসের অনেকেই শনিবার বেড়াতে যায়, সুতরাং অনেক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিও তাঁর কবর দেবার সময় উপস্থিত থাকতে পারেন নি পরদিন। জনা পঞ্চাশেক লোক গিয়েছিল তাঁর কফিনের সঙ্গে। তাঁর দু একজন বন্ধুর ইচ্ছে ছিল কবরে মাটি দেবার আগে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি এসে কিছু বলেন। মৃত্যুর পরও যাতে কবির সামান্য স্বীকৃতি মেলে। তখন ফ্রান্সে উপস্থিত সবচেয়ে বিখ্যাত লেখক তেওফিল গতিয়ে, কেননা ভিক্টর উগো তখন নির্বাসনে, লামার্তিন অশক্ত। গোতিয়ে-কেই বোদলেয়ার উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর বই 'লে ফ্লর দু মাল'। কিন্তু গোতিয়ে সমাধি অনুষ্ঠানে আসতে রাজী হন নি। স্যাঁৎ বভ্-কেও অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তিনিও শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

সুতরাং বক্তৃতা দিয়েছিলেন প্রিয়বন্ধু বাঁভিল এবং আসেলিনো। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। বক্তাদের কণ্ঠ শোকে অবরুদ্ধ এবং শ্রোতারা বৃষ্টির ছাট থেকে বাঁচার জন্য উদগ্রীব। সুতরাং বক্তৃতা অতি সংক্ষিপ্ত করতে হলো, শেষ হবার আগেই অনেকে ছুটে পালালো। ঝপেঝাপ করে অতি দ্রুত মাটি চাপা দেওয়া হলো কবরে। তারপর সেই জনশূন্য কবরখানায় বহুক্ষণ ঝিরঝির ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে লাগলো।

এক শো বছর পরে আজ সেই রবিবার।

সনাতন পাঠক

উপন্যাস

শেষ দৃশ্য। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। মুকুন্দ পাবলিশার্স্।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শেষ দৃশ্য' উপন্যাসটির আত্মপ্রকাশ নানা দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। অযথা রীতি কিংবা প্রকরণের জটিলতায় না গিয়ে এই উপন্যাসের তরুণ লেখক একাধারে সাহস ও সততার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসটি শুধুমাত্র একজন তরুণ লেখকের উল্লেখযোগ্য রচনা হিসেবেই নয়, জীবনকে গভীরভাবে দেখা এবং উপলব্ধি করার অনন্যসাধারণ দলিল হিসেবে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করবে—এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

উপন্যাসের ঘটনাস্থল বা পরিবেশ একটি শ্মশান, নিকটবর্তী একটি চটান বা ডোমদের বাসস্থান, একটি নদী, দূরবর্তী একটি জঙ্গল। কুশীলব কয়েকজন ডোম-ডোমনী, ঘাটবাবু আর শ্মশানবন্ধুরা। এই পরিবেশ এবং এইসব মানুষদের নিয়ে লিখতে গেলে কেবল মাত্র অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে অগ্রসর হওয়ার বিপদ আছে, কেননা তা রিপোর্টাজ হয়ে যেতে পারে। আবার কেবলমাত্র গল্প রচনা করতে গেলেও জীবনের সত্যমূল্যকে অস্বীকার করা হয়। লেখককে তাই সাধারণ মানুষের অপরিচিত ঐ পরিবেশ এবং ঐ সব মানুষের কথা লিখতে গেলে অতিশয় পরিমিতিবোধ এবং সহৃদয় অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিতে হয়। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সেই দুর্লভ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

উপন্যাসের কেন্দ্র চরিত্র নেলী, বুড়ো এক ডোমের মেয়ে। নেলীর, সঙ্গী দুটো কুকুর যাদের নিয়ে সে শ্মশান থেকে নদীর পাড় সর্বত্র অবাধে ঘুরে বেড়ায়, দিন রাত মানে না, ঝড় জল মানে না, ভয় মানে না। তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে উপন্যাসের কাহিনীচক্র, আর পাশাপাশি তাকে অবলম্বন করেই পরিস্ফুট হয়েছে গেরু ডোম, কৈলাশ, ঘাটবাবু এ সব চরিত্র। কী অসামান্য সেইসব চরিত্রের অলঙ্করণ! আর তার সঙ্গে সঙ্গে নদীর মতো প্রবহমান থেকেছে মানুষের লোভ হিংসা-কাম-ব্যর্থতা জিজীবিষা-সমন্বিত এক মহৎ জীবনবোধ। যারা মৃত মানুষের বিছানাপত্রের ভাগ নিয়ে ঝগড়া করে, চিতা ধোয়ানোর পর পোড়া কয়লার ভিতর থেকে সোনার খোঁজ করে, কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য শবদেহ তুলে নিয়ে কংকাল বেচে দেওয়ার চোরা-কারবার করে—তাদের নিয়ে অতি নাটকীয় উৎকট কিছু করার লোভ সংবরণ করে লেখক বড় ভালবাসায় তাদের প্রাকৃত হৃদয়ের সঙ্গে নিজের হৃদয়টি মিলিয়ে দিয়েছেন, তারপর অনায়াসে তাদের বুকের কথা টেনে এনেছেন কথাশিল্পে। অসামান্য তাঁর গদ্যরীতি এবং শিল্পবোধ, বড় অন্তস্পর্শী তাঁর দ্রষ্টাসত্তা। যে কারণে এই সামান্য উপকরণ বড় অসামান্য কথাবস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এমন স্বতঃস্ফূর্ত, সহৃদয় এবং সত্য উপন্যাসের সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে।

কেবলমাত্র উপন্যাসটির শেষের অংশটুকুতেই লেখক একটা বিচ্ছিন্ন দার্শনিকতা এনেছেন। এটুকুর প্রয়োজন ছিল না। এর আগেই যেখানে বুড়ো ঘাটবাবু জীবনের অতলান্ত বিষ ভাণ্ডের পান অব্যাহত রেখে, ত্রিকালজ্ঞ ভুয়োদর্শীর মতো রামায়ণ মহাভারতকে বালিশের মতো মাথার নীচে রেখে শুয়ে পড়ছেন সেখানেই এই অপরূপ কাহিনীটি স্বাভাবিক এবং সুন্দর পরিণতি লাভ করে শেষ হয়ে গেছে। আশ্চর্য! লেখক কেন তা টের পেলেন না।

বাংলা-সাহিত্যের বৃহত্তর পাঠক সাধারণ এই বইখানি যদি সমাদরে বুকে তুলে নেন তবে তাঁরা বড় লাভবান হবেন। এই তরুণ কথাশিল্পী তাঁদের কাছে এক আশ্চর্য ভয়াল-সুন্দর জগতের দরজা খুলে দেবেন।

শেষ শিখা। শঙ্কুমহারাজ। সাহিত্য, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা বারো। দাম পাঁচ টাকা।

ভ্রমণ-কাহিনী-লেখকের আলোচ্য পুস্তক একখানি উপন্যাস। গ্রন্থকারের মতে এ উপন্যাসের ঘটনাবলীর সঙ্গে বাস্তবতার কোন যোগ নেই—এমন কি এ গ্রন্থের কাল্পনিক পাত্রপাত্রীর সঙ্গে বাস্তব জগতের মানুষেরও কোন মিল নেই। প্রকৃতপক্ষে তা নিছক সত্যিকথা। তা সত্ত্বেও গ্রন্থের যাবতীয় চরিত্র সৃষ্টি এবং সন্নিবেশে লেখকের কিছু কৃতিত্ব আছে। তবে লেখক যদি তার কল্পনার জাল এতটা বিস্তৃত না করে একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে ধরে রাখতেন তা হলে এ উপন্যাসের স্বাদ আরও মধুর হতো। কাল্পনিক গোলাপপুরের রাজবাহাদুরের কন্যা অরুণার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক হলে মানানসই হতো। বরুণ ও প্রতুলের চরিত্র সৃষ্টিতে বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করে। ঠাট বজায়

রাখার জন্য নিষ্কলঙ্ক রাজবাহাদুরের রাজনর্তকী ফুলবাঈয়ের চরিত্র সৃষ্টিতেও লেখকের বাহাদুরি লক্ষণীয়। কুচক্রী লোকের ফাঁদে পা দিয়ে কেমন করে বড় বড় সংসারের পতন ঘটে তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ এ গ্রন্থে মিলবে। লেখকের ভাষা সংযত করার ক্ষমতা থাকলেও কলম সংযত করার নেই। কাজেই কল্পনার দৌড়ে অতিরঞ্জনের ছাপ রয়েছে। তবে মোটের উপর বইখানা সুখপাঠ্য হয়েছে।

৩৭৭।৬৬

জীবনী

বীর সাভারকর। মণি বাগচি। প্রকাশক শ্রীভবেশচন্দ্র বিশ্বাস, শিক্ষা ভারতী, ৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম : পাঁচ টাকা।

বর্তমান গ্রন্থ বিনায়ক দামোদর সাভারকরের সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস। সাভারকর সতের বছর বয়স থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এই মারাঠী যুবক বিলাতে ব্যারিস্টারী পাঠরত অবস্থায় ভারতের স্বাধীনতার জন্য সেখানে বসেই নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁর উদ্যোগে বিলাতেই একটি রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে ওঠে। বিশেষ কোন রাজনৈতিক কারণে সাভারকরের নির্দেশে ১৯০৯ সালে মদনলাল ধিংড়া নামক এক যুবক কার্জন উইলিকে লণ্ডনে হত্যা করেন। সাভারকরের ব্যারিস্টারী পাশ করার পরে বিলাতে বসেই সাভারকর নানাভাবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। এই মারাঠী বিপ্লবীর মধ্যে সারাভারতে বিপ্লববাদের সূচনা দেখে বৃটিশ সরকার তাঁকে চিরজীবনের জন্য কারাগারে রেখে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চান। লণ্ডনে বৃটিশ সরকার সাভারকরের কার্যকলাপের ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে শুরু করেন। ১৯১০ সালে রাজদ্রোহের অভিযোগে লণ্ডনে সাভারকরকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারের জন্য তাঁকে জাহাজযোগে ভারতে পাঠাবার সময় ফরাসীর উপকূলে মার্সাইতে সাময়িকভাবে নোঙর করা জাহাজের শৌচাগারের ছিদ্রপথ দিয়ে তিনি উত্তাল সমুদ্রে সাঁতার কেটে উপকূলে উপস্থিত হন এবং ফরাসী পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। সংগে সংগে জাহাজের সাভারকরের রক্ষীবাহিনী মার্সাই বন্দরে অবতরণ করে সাভারকরকে তাদের হাতে সমর্পণ করার দাবি করেন। ফরাসী সরকার আন্তর্জাতিক নিয়ম লংঘন করে সাভারকরকে বৃটিশের হাতে ছেড়ে দেন।

১৯১০ সালে বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারে সাভারকরের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড এবং তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের আদেশ হয়। এর পর ওই ১৯১০ সালেই স্পেশাল একটি স্পেশাল ট্রাইবুনালে তাঁর রাজদ্রোহের দ্বিতীয় দফা অভিযোগের বিচারে তাঁকে আরও একবার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। দীর্ঘ ২৭ বছর দুই দফা দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করে সাভারকর ১৯৩৭ সালে কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। এই সময়ে ভারতের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সদলবলে সাভারকরের কাছে নেতৃত্বের অনুরোধ নিয়ে উপস্থিত হন। তিনি তখন স্পষ্ট ভাষায় তাঁদের জানালেন যে, কংগ্রেস মুসলিম তোষণনীতি ও অহিংসাবাদের যে ভূমিকা গ্রহণ করে ভ্রান্ত পথে চলেছে তাতে দেশ বিভক্ত এবং নির্বীর্য হয়ে পড়বে। শেষ জীবনে সাভারকর হিন্দু মহাসভার মাধ্যমে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দেশহিতব্রতে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পরলোকগমন করেন। সাভারকরের জীবনীগ্রন্থ সর্বস্তরের লোকের পক্ষে একখানি সত্যিকারের পাঠোপযোগী বই।

২৫৬।৬৭

রক্ততীর্থ। শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী। প্রকাশক ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী। চক্রতীর্থ ১৭ডি।১এ, রানী ব্রাঞ্চ রোড, পাইকপাড়া, কলিকাতা-২ মূল্য দুই টাকা।

বাংলা দেশে বিপ্লববাদের প্রথম পর্যায়ের যে প্রয়াস বালেশ্বর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল এবং তাতে যে পাঁচজন বীর-বিপ্লবী জীবনাহুতি দিয়েছিলেন তার মধ্যে চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস এই পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। চিত্তপ্রিয় পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কোলে মাথা রেখে রণক্ষেত্রেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। নীরেন্দ্র এবং মনোরঞ্জন ফাঁসিকাটে প্রাণ বিসর্জন দেন। এঁদের অন্যতম সহকর্মী, জ্যোতিষ পালের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয় এবং মস্তিষ্কবিকৃত অবস্থায় বহরমপুর পাগলা-গারদে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক এ-সব মহাপ্রাণের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৪৯।৬৭

ইতিহাস

মুর্শিদাবাদ কাহিনী। কমল বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবেশক সেকাল একাল, ৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৯। দাম চার টাকা।

আলোচ্য পুস্তকটি মুর্শিদাবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে নবাব মুর্শিদকুলী জাফর খাঁ সুবে বাংলার দেওয়ান থাকাকালে ঢাকা থেকে মখসুদাবাদ ঐতিবর্তী মুকসুদাবাদে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন এবং এই অঞ্চলের নাম নিজের নামে মুর্শিদাবাদ রেখে এখানে সুবে বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন। মুর্শিদাবাদ ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বকাল থেকে মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের আরম্ভ। যে-সব কারণে মুর্শিদাবাদ ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে সে-সব কারণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই গ্রন্থে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বাংলার গৌরব মুর্শিদাবাদের অতীত কীর্তির মধ্যে নবাবী আমলে তৈরি হাজার-দুয়ারী প্রাসাদ আজও বর্তমান। মুর্শিদাবাদের বহুবিস্তৃত ইতিহাসের রাজনৈতিক দিক ছাড়াও তৎকালীন অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক উন্নতি বিষয়ক ব্যাপার সম্পর্কে মোটামুটি যে-সব তত্ত্ব এই পুস্তকে স্থান লাভ করেছে তাতে এই পুস্তকখানাকে পুরোদস্তুর ইতিহাসই বলা চলে। পরিশিষ্টে মুর্শিদকুলী খাঁ, নবাব আলিবর্দী খাঁ, নবাব নাজিম মীরজাফর এবং এই সব মুসলমান শাসনকর্তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জগৎ শেঠের বংশতালিকা সন্নিবেশিত করার দরুন পুস্তকখানার গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে। পুস্তকখানির ভাষা সাবলীল।

৫৮।৬৭

প্রাপ্তি স্বীকার

খেলাধুলোর গল্প। ফ্রাংক জুপো। অনুবাদ : রাখাল ভট্টাচার্য। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী : ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩.০০।

যজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ সংঘ : ডি ৫২/৪৬ লক্ষ্মীকুণ্ড, বারাণসী। মূল্য ৪.০০।

জাতীয় পুরস্কারের জন্য চিত্র নির্বাচন

আঞ্চলিক আওয়ার্ড কমিটি জাতীয় পুরস্কারের জন্য পূর্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ চিত্র নির্বাচনের কাজ শেষ করেছেন। কমিটির বিচারে শ্রেষ্ঠ তিনটি ছবিই বাংলা। গুণানুক্রমে : নায়ক, ছুটি ও বালিকা বধূ। শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যের পুরস্কারের জন্যও গুণানুক্রমে এই তিনটি ছবি নির্বাচিত। ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষায় শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে চিহ্নিত যথাক্রমে 'মাটির মনিষ' ও 'লটি-ঘটি'। সামাজিক ও জাতীয় আদর্শপ্রণোদিত চিত্র হিসাবে কমিটি দুটি ছবি অনুমোদন করেছেন। গুণানুক্রমেঃ সুভাষচন্দ্র ও গল্প হলেও সত্যি।

আঞ্চলিক আওয়ার্ড কমিটির অনুমোদনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় আওয়ার্ড কমিটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এ-মাসেরই মধ্যভাগে শ্রেষ্ঠ চিত্র নির্বাচন করবেন। সেপ্টেম্বরের শেষভাগে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে।

এ-বছর তেরোটি ভাষার মোট ৭৬টি কাহিনীচিত্র, ৩২টি তথ্যচিত্র, ১৫টি শিক্ষামূলক ছবি, ৬টি এক্সপেরিমেন্টাল বা পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক চিত্র এবং ১০টি শিশুচিত্র প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরিবার পরিকল্পনার ভিত্তিতে তৈরি ছবির জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকলেও এই বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হবার মত কোন ছবি এবার ছিল না। সামাজিক ও জাতীয় আদর্শমূলক ছবির পুরস্কারে জন্য প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল ৪০টি কাহিনীচিত্র। এবং জাতীয় ঐক্য ও ভাবগত সংহতির চিত্র-বিভাগে এবং উচ্চ সাহিত্য-মূল্যসমন্বিত ছায়াছবি-বিভাগে ছিল যথাক্রমে ১০টি ও ২৫টি কাহিনীচিত্র।

চিত্রসমালোচনা

শেকসপীয়ারওয়ালা

ফিল্মের একটি বিশেষ গুণ 'শেকসপীয়ারওয়ালা'তে আছে, যা বাহ্য তথা দৃষ্টিবাহিত। অর্থাৎ 'ভিস্যুয়াল' সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষমতা এখন পরিচালক জেমস আইভরির করায়ত্ত। 'দি হাউসহোল্ডার'-এ, তাঁর প্রথম ছবিতে, যা দেখিনি। ক্যামেরা দিয়ে ফিল্মের ভাষা রচনার কৃতিত্বও 'শেকসপীয়ারওয়ালা'-তে লক্ষণীয়। যথাযথ পরিবেশ ও 'মুড' সৃষ্টির তাগিদে পরিচালককে অনেক দৃশ্য ছবিতে রাখতে হয়েছে। তার মধ্য দিয়ে ভ্রাম্যমাণ শেকসপীয়ার-নাট্যদলের শিল্পী-দের এবং নেতাকে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পেরেছি। মঞ্চাভিনয়ের কায়িক জর্গাপ্রবতার দরুণ তাদের মনের নৈরাশ্য বা 'ফ্রাস্ট্রেশন'-ও পরিচালক বিশ্বাসযোগ্যভাবে দেখাতে পেরেছেন। নাটকের যুগ যে বিগত (একথা মানতে হলে কলকাতা ও পশ্চিম-বাংলার কথা ভুলে যেতে হবে) এবং এ-কালে যে সিনেমারই আধিপত্য তাও পরিচালক ছবিতে এক [illegible] রেখে অনায়াসে দর্শকদের [illegible] দুয়েকটি

মঞ্জু দে'র প্রযোজনা-পরিচালনায় নির্মীয়মান 'শজারুর কাঁটা'-র নায়িকা বাসবী নন্দী।
ফটো—দেশ

বি ডি প্রোডাকশনস্-এর "প্রথম প্রতিশ্রুতি" (পরিচালনা : রবি বসু) ছবিতে নির্মলকুমার

খণ্ড দৃশ্যের ভিতর দিয়ে, কয়েকটি আঁচড়ে তিনি আধুনিক সিনেমা অভিনেত্রীর (বলা বাহুল্য, বোম্বাইয়ের) 'ইমেজ'টি ফুটিয়ে তুলেছেন। এদিক থেকে পরিচালকের বুদ্ধিদীপ্ত ও কল্পনাসিদ্ধ প্রয়োগের প্রশংসা করতেই হয়, ছবিটি অতিমাত্রায় পরিবেশ-প্রধান হতে গিয়ে বেশ কিছুটা মন্থরগতি এবং ক্লান্তিকর হওয়া সত্ত্বেও।

পরিচালক (আর পি ঝাভওয়ালার সংগে কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনার কৃতিত্বও তাঁর) শেকসপীয়ারওয়ালাদের বিশেষ প্রতিভা, এবং মানসিকতা ও হতাশা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যেসব ঘটনা ও দৃশ্য জুড়ে করেছেন তার আস্বাদ নিতে গেলে দর্শকের দুটি সচেতন ও সৌন্দর্যকামী চোখই যথেষ্ট। তার মনটি কিন্তু নিষ্ক্রিয়ই থেকে যায়। কারণ কুড়িয়ে নেবার মত অন্তরঙ্গ মুহূর্ত বিশেষ কিছু মেলে না। অপর দিকে শুধু পরিবেশ, চরিত্র ও 'মুড' বিশ্লেষণের জন্যই এই ছবি নয়। নাট্যদলের মেয়ে লিজি, সিনেমার অভিনেত্রী মঞ্জুলা ও সনজু নামে এক 'রোমিও'কে (নাকি প্লেবয়?) ঘিরে ত্রিকোণ প্রেম এবং তার নাটকীয় পরিণতিও ছবিতে রাখা হয়েছে।

নাট্য দল ও নাটকাভিনয়ের ভিত্তিতেও কিন্তু পরিচালক একটি 'ফিল্ম' তৈরি করতে পেরেছেন (এমন বিষয়বস্তু নিয়ে 'ফিল্ম'ও নাটক হবার কথা)। এবং সিনেমার কাছে পরাজিত রঙ্গমঞ্চের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে ছবির বক্তব্যও ঘটনায় স্বাভাবিক গতিপ্রবাহে সুপ্রতিষ্ঠিত। আসলে ছবির সুন্দর স্বাভাবিক সুরের সংগে বাদ সেধেছে প্রেমের কাহিনী যা আর্টের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ। (যদিও এর কিছু অংশ বাস্তব। পরিচালক ভারতীয় ছবিতেও চুম্বন রেখেছেন। (অবশ্য ইংরেজী ছবি বলেই তা সম্ভব হয়েছে।) রসের মুহূর্ত শিল্প-বিরোধী নয়। অন্তরবাহিরের লাবণ্যের (কখনও রূঢ়তা, যন্ত্রণা বা নির্মম বাস্তবতাও 'থিম' হতে পারে—সেখানেও ভিতর-বাহিরের সামঞ্জস্য দরকার) মধ্য দিয়েই অসামান্য বা শ্রেষ্ঠ আর্টের সৃষ্টি হয়। 'শেকসপীয়ারওয়ালা'-তে ওই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা পূর্ণ হল না।

সত্যজিৎ রায়ের অসাধারণ সংগীতরচনার প্রভাবে ছবিটি যথেষ্ট শিল্পকৌলীন্য লাভ করেছে। সংগীত এক একটি পরিবেশ, ও 'মুড' এবং রঙ্গমঞ্চের ট্র্যাজেডি-র সুরটি প্রকাশ করেছে। দর্শকের মনে সংবেদন জাগিয়েছে। কিন্তু তার বাহ্যরূপ ছবিতে প্রায়শ অনুপস্থিত। এবং শ্রীরায়-কৃত হিন্দীছবির গানের সুর (শুটিংয়ের দৃশ্যে) অবাক করে। অভিনয় সকলেরই ভাল। কেণ্ডেল-রা—জিওফ্রে কেণ্ডেল ও ফেলিসিটি কেণ্ডেল— মঞ্চের বাইরেও সুন্দর চলচ্চিত্রানুগ অভিনয় করেছেন। লিজির ভূমিকায়—শেকসপীয়ারের নাটকের চরিত্রেও— ফেলিসিটি কেণ্ডেলকে ভোলা যায় না। হিন্দী-সিনেমার অভিনেত্রী হিসাবে মধুর জাফরে স্বাভাবিক চরিত্রচিত্রণের জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। শশী কাপুরের সনজু প্রাণবন্ত। পার্শ্বচরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছেন লরা লিডেল, জিম টিজার, উৎপল দত্ত প্রভৃতি।

সুব্রত মিত্রর ফটোগ্রাফি এক কথায় চমৎকার।

মুক্তিপথে মহাশ্বেতা"

বি কে প্রডাকসন্সের 'মহাশ্বেতা' এ-মাসেরই শেষ সপ্তাহে মুক্তি-লাভ করবে। 'জরাসন্ধ' রচিত "মহাশ্বেতার ডায়েরি"-র ভিত্তিতে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু। চিত্র পরিচালনা করেছেন পিনাকী মুখোপাধ্যায়। ছবিখানির বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, অনিল চট্টোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, জহর গাঙ্গুলী, রেণুকা রায়, শমিতা বিশ্বাস, জহর রায়, উৎপল দত্ত, সীতা দে, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, সুখেন দাস, সমরকুমার,

প্রহ্লাদ শর্মা প্রযোজিত পরিচালিত ফিল্ম সংসদের "ওহী লেড়কী"-তে রজনী ও ললিতা চ্যাটার্জি

অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, শিশুশিল্পী সৌমিত্র ও মলয়। সংগীত পরিচালনা করেছেন রাজেন সরকার।

"ছোট্ট জিজ্ঞাসা" চিত্রে পিতা- পুত্র, বিশ্বজিৎ ও প্রসেনজিৎ

চলচ্চিত্রকারের স্মৃতিরক্ষায়

বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার শ্রীবিমল রায়ের চিত্র-প্রযোজনা সংস্থাটি এখন আবার সক্রিয়। এই সংস্থার কর্মপরিচালনার ভার নিয়েছেন স্বর্গত প্রযোজক-পরিচালকের সহধর্মিণী শ্রীমতী মনোবীণা রায়। স্বামীর স্মৃতি-রক্ষার এর চেয়ে প্রকৃষ্টতর কোন উপায় তাঁর জানা নেই। সম্প্রতি কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, তাঁর স্বামীর ছবি সম্পূর্ণ করে তোলার সবরকম ব্যবস্থা হচ্ছে। মৃত্যুর আগে শ্রীরায় 'সাহারা' নামে একটি হিন্দী ছবি তৈরির কাজে হাত দিয়েছিলেন। ধর্মেন্দ্র ও শর্মিলা ঠাকুর এর নায়ক-নায়িকা।

শ্রীমতী রায় জানান, 'সাহারা'র , আশাপূর্ণা দেবীর 'উত্তরায়ণ' অবলম্বনে , শুটিং অবিলম্বেই আরম্ভ হবে। শ্রীমতী রায় বিমল রায় পিকচার্স-এর প্রযোজনায় আর একটি ছবি তৈরি করবেন। ছবিটি পরিচালনা করবেন শ্রীহৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়।

সাংবাদিকদের শ্রীমতী রায় আরও জানান যে, তাঁর স্বামী জীবিত থাকতেই 'দো দুনী চার' (শেকসপীয়ারের 'কমেডি অব এররস' বা বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর ভিত্তিতে) ছবির চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হয়েছিল। এখন ছবিটি সম্পূর্ণ। পরিচালনা করেছেন শ্রীদেবু সেন। ইনি শ্রীরায়ের সহকারী ছিলেন। 'দো দুনী চার'-এর নায়ক-নায়িকা হলেন কিশোরকুমার ও তনুজা। কলকাতায় বাংলা ছবি তৈরির পরিকল্পনাও শ্রীমতী রায়ের আছে।

বি কে প্রোডাকশনস-এর "মহাশ্বেতা" (পরিচালনাঃ পিনাকী মুখোপাধ্যায়) ছবিতে শিশুশিল্পী মলয় ও অঞ্জনা ভৌমিক

ছবির পর ছবি

কলকাতায় তৈরি হিন্দী চিত্র "ওহী লেড়কী" (ফিল্ম সংসার) এ-মাসে মুক্তি পাচ্ছে। প্রহ্লাদ শর্মা ছবিটির প্রযোজক-পরিচালক। বিভিন্ন প্রধান চরিত্রের শিল্পী সুখেন্দু, **ওহী লেড়কী** নাজিমা, বিপিন গুপ্ত, ললিতা চাটার্জি, জহর রায়, বীরেন চ্যাটার্জি প্রভৃতি। ভি বালসারা সংগীত পরিচালনা করেছেন।

রাধারানী পিকচার্স-এর "বালুচরী"-র শুটিং সমাপ্ত। এখন ছবির সম্পাদনা চলছে। অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত এ-ছবির প্রধান চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, **বালুচরী** লিলি চক্রবর্তী, মলিনা দেবী, অজয় গাঙ্গুলী, জ্যোৎস্না, রেণুকা রায়, দীপিকা দাস, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, গঙ্গাপদ বসু, সীতা দে প্রভৃতি। রাজেন সরকার সুরকার।

গীতছন্দমের "হংসমিথুন"-এর মুক্তির সময় এগিয়ে এসেছে। স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন পার্থপ্রতিম চৌধুরী। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেন ছবির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে **হংসমিথুন** অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, জহর রায়, সবিতা বসু প্রভৃতি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিচালনা করেছেন।

নির্মল চৌধুরীর পরিচালনায় "চারণকবি মুকুন্দদাস" ছবির শুটিং প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। সবিতাব্রত দত্ত নাম-ভূমিকার শিল্পী। **চারণকবি মুকুন্দদাস** অল্প বয়সের মুকুন্দ-জীবনী কাহিনী এবং তৎকালীন কালের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের ভিত্তিতে চিত্রনাট্য রচিত।

গত সপ্তাহে প্রায় শতাধিক "একস্ট্রা" নিয়ে ছবির যাত্রাগানের দৃশ্য তোলা হয়। ছবির উদ্দীপক ও অন্যান্য গানের সুর দিয়েছেন সংগীত পরিচালক পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। তৃপ্তি মিত্র, ছায়া দেবী ও জহর গাঙ্গুলী ছবির তিন বিশিষ্ট শিল্পী।

মুক্তি প্রতীক্ষিত বাংলা ছবিগুলির অন্যতম কিনে ইউনিটের "শীলা"। নরেন্দ্রনাথ মিত্রর কাহিনী অবলম্বনে চিত্র পরিচালনা করেছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। এক বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনার ভিত্তিতে কাহিনী রচিত। সাবিত্রী চট্টো-**শীলা** পাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, গীতা দে, সুমন মুখোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, শোভা সেন, শেখর চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু প্রভৃতি ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সংগীত পরিচালনা করেছেন রাজেন সরকার।

মহারাষ্ট্রে সিনেমা ধর্মঘট

মহারাষ্ট্রের সিনেমা অনির্দিষ্ট-কালের জন্য বন্ধ। অতিরিক্ত আমোদ-কর চাপানোর প্রতিবাদে এই ধর্মঘট। মহারাষ্ট্রের অর্থসচিব শ্রী ডি এস দেশাইয়ের সংগে চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতিনিধি দলের সর্বশেষ আলোচনা নিষ্ফল হবার পরই সিনেমা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি শ্রীরোশনলাল মালহোত্রার নেতৃত্বে চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রতিনিধি দল অর্থসচিবের সংগে গত সপ্তাহে আলোচনা করেন। অন্তত ছয় মাসের জন অতিরিক্ত আমোদ-কর প্রবর্তনের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখার জন্য অর্থ-সচিব নাকি চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন করেন। এই প্রস্তাব চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রতিনিধিদের নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। শ্রীদেশাই পরে সাংবাদিকদের বলেন, হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশেই কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু আমার পক্ষে এর বেশী কিছু করা সম্ভব ছিল না।

"কহ্‌ী দিন কহ্‌ী রাত" হিন্দী চিত্রে বিশ্বজিৎ ও স্বপ্না

ব্যারাকপুর ফিল্ম সোসায়েটি

ব্যারাকপুর ফিল্ম সোসায়েটির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা-বার্ষিক উৎসব ১০ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় চম্পা সিনেমায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন শ্রীঅশোককুমার সরকার। গতবারের মত এবারেও গুণীসংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। সোসায়েটি চিত্রপরিচালক তরুণ মজুমদার ও অভিনেত্রী নন্দিনীকে (ছুটি) সংবর্ধনা জ্ঞাপন করবেন।

প্ল্যান মাস্টার

'প্রতিভা' নাট্যগোষ্ঠী এবারে বিমল রায়ের হাসির নাটক "প্ল্যান মাস্টার" নিয়মিত অভিনয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ পর্যায়ের প্রথম অভিনয় হবে আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর সকালে বিশ্বরূপা থিয়েটারে। নাট্যকার-পরিচালক শ্রীরায় নাটকটি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন।

অবনমহলে অবনীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব

প্রতিবারের মত শিশু রংমহল এবারেও অবনীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব সংস্থার নিজস্ব গৃহ—অবনমহলে পালন করেন। এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅন্নদাশংকর রায়। শ্রীরায় তাঁর ভাষণে বলেন যদি অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যে আরও কিছুটা মনোযোগ দিতেন তা হলে বাংলা সাহিত্য আরও বিশেষরূপে সমৃদ্ধ হতে পারত। তিনি আরও বলেন, কী শিল্পে, কী সাহিত্যে নাট্যানুষ্ঠানে অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন অসাধারণ।

এই অনুষ্ঠানে বৈতানিকগোষ্ঠী ও শিশু রংমহল সংগীত পরিবেশন করেন। শিশু রংমহলের "বুড়ো আঙলা" নৃত্যনাট্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ড্রামা ক্লাবের অভিনয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রামা ক্লাবের সক্রিয় উৎসাহের জন্যে নাটকাভিনয় সেখানে একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে। ড্রামা ক্লাব গত সপ্তাহেই আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত জানাতে অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'কন্যকা' নাটক মঞ্চস্থ করেন। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় নাটকাভিনয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সুখ্যাতি ও পুরস্কার অর্জন করেন এবং এবারের পরিবেশনাও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও অভ্যাগতদের বিশেষভাবে আনন্দ দেয়। এই প্রহসনটির অভিনয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় শিল্পিগোষ্ঠী আঙ্গিক নিয়ে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন কিন্তু প্রযোজনাকে আঙ্গিক-প্রধান করে তোলেননি। দুরূহ কয়েকটি চরিত্র রূপায়ণে সুভাষ চট্টোপাধ্যায়, শেখর দত্ত, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা সান্যাল এবং অর্পণা মজুমদার বিশেষ শক্তির পরিচয় দেন। সেদিনের সমাগত দর্শক-বৃন্দের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন সুব্রত চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু বসু, দেবনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, মলয় দাশ, গৌতম ভট্টাচার্য এবং জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়; এ ছাড়া অজিতকুমার অধিকারী, অরুণবন্ধু বিকাশ রায় এবং বাসবী মৈত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। নাটকটি পরিচালনা করেন পঙ্কজ-কুমার সাহা।

"কখনো মেঘ" (অগ্রদূত পরিচালিত) ছবির নায়িকা অঞ্জনা ভৌমিক
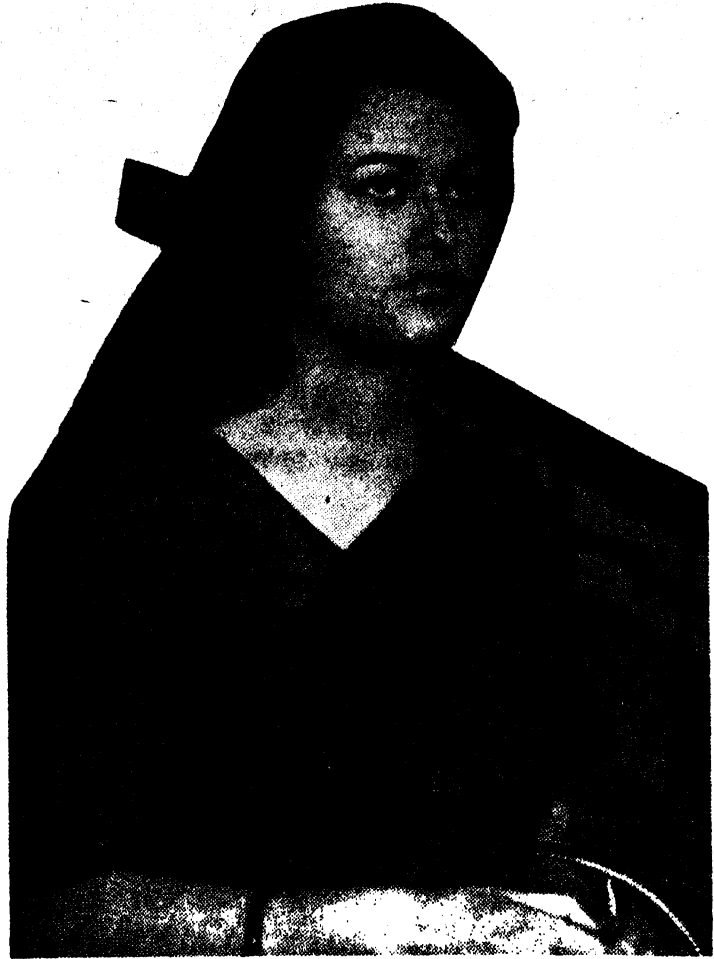
ফিল্মের জন্য পৃথক দপ্তর

চলচ্চিত্রশিল্পের জন্য কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে পৃথক সরকারী দপ্তর গঠনের প্রস্তাব করেছেন ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার নবনির্বাচিত সভাপতি শ্রীরোশনলাল মালহোত্রা। সম্প্রতি তিনি এক সাংবাদিক-সাক্ষাতকারে বলেন, ফিল্মের জন্য আলাদা বিভাগ তৈরি হলে চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতি সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের পরিবর্তন ঘটতে পারে। উদ্দেশ্যপ্রধান চিত্রের প্রযোজনা ও পরিবেশনের জন্য সরকারী আর্থিক সাহায্য অপরিহার্য। বর্তমানে এই ব্যাপারে সরকারী সহযোগিতা নেই বললেই চলে।

শ্রীমালহোত্রা চলচ্চিত্রশিল্পের সংকট-মোচনের উপায় সম্পর্কে বলেন, চলচ্চিত্র-শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী কাঁচা মাল ও অন্যান্য সরঞ্জাম আমদানির ক্ষেত্রে সরকার দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন।

ফেডারেশনের সভাপতি আমোদ-কর বৃদ্ধির কথাও বলেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থের অর্ধেক আমোদ-কর হিসাবে দাবি করার কোন যৌক্তিকতা শ্রীমালহোত্রা বুঝতে পারছেন না।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ফিল্মের স্থান হবে এমন আশা শ্রীমালহোত্রা পোষণ করেন না। কারণ 'প্ল্যানার'-র মনে করেন না যে জাতির উন্নয়নে ফিল্মের কোন ভূমিকা আছে। যদিও, শ্রীমালহোত্রা বিশ্বাস করেন, পরিকল্পনার মাধ্যমেই চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতি ঘটানো উচিত।

সরকারকে সমালোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমালহোত্রা ফিল্ম ইনডাস্ট্রির ভিতরকার গলদের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলে-ছেন, চলচ্চিত্রশিল্পে একতা ও সংহতির অভাব।

ফেডারেশনের নতুন কার্যকরী সমিতি

বোম্বাইয়ে সম্প্রতি কমিটির সভায় শ্রীরোশনলাল মালহোত্রা ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্রী এন কে সাংহি এম পি এবং সেনট্রাল সার্কিট সিনে অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির সভ্য, শ্রী এ এস শ্রীনিবাসন এবং শ্রীঅজিত বসু।

শিশুচিত্র আন্দোলন সমীক্ষা

চিলড্রেনস ফিল্ম সোসায়েটির কার্য-কলাপ এবং এই দেশে শিশুচিত্র আন্দো-লনের ধারা ও কর্মপদ্ধতি সমীক্ষার জন্য পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট এক কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের উপমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপথি। তিনি বলেন, কমিটির চিলড্রেনস ফিল্ম সোসায়েটির যাবতীয় কর্মসূচী এবং চিত্রপ্রযোজনা ও পরিবেশনের সমস্যাগুলিও পরীক্ষা করে দেখবেন। এই কমিটির সভা-পতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্রী কে জি সইয়িদেন (কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের ভূত-পূর্ব সেক্রেটারি)। শ্রী কে সুব্রামনিয়াম, শ্রী কে এ আব্বাস, শ্রীমৃণাল সেন এবং শ্রী কে এল পাসওয়াল অন্যান্য সদস্য।

"গড় নাসিমপুরে" (পরিচালনা : অজিত লাহিড়ী) ছবিতে বোম্বাইয়ের দেব মুখার্জি ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। ফটো—দেশ

বিবিধ প্রসঙ্গ

ব্রিটেনে বাঙালী চিত্র প্রযোজক

ব্রিটেনে চিত্রপ্রযোজনায় ব্রতী হয়েছেন এক তরুণ বাঙালী। তাঁর নাম শ্রীবাচ্চু সেন। 'কেশব' নামে একটি ছবি তিনি তৈরি করছিলেন। সেটি সম্পূর্ণ হয়নি। তারপর শ্রীসেন ব্রিটেনে ইউরোপের ছবি পরিবেশনের কাজে লেগে যান। তাঁর সংস্থার নাম 'সেব্রিকন'। 'লাস্ট ইয়ার ইন মারিয়েনবাদ', 'লোলা', 'ক্লিও ফ্রম ফাইভ টু সেভেন', 'ট্রায়াল অব জোন অব আর্ক' এবং সুইডেনের ছবি তিনি ব্রিটেনে পরিবেশন করেছেন।

এখন তিনি আর শুধু চিত্রপরিবেশকই নন, চিত্রপ্রযোজক হিসাবেও পরিচিত। তাঁর ছবির শুটিং চলছে। সাময়িকভাবে ছবির নাম রাখা হয়েছে 'প্রাইভেট হেল'। সমসাময়িক জীবনের একটি কাহিনী ছবিতে তুলে ধরা হবে। 'প্রাইভেট হেল' ফ্যাশন মডেলিং ও ফটোগ্রাফির ছবি। এই ইনডাস্ট্রি তরুণীদের কী-ভাবে আকৃষ্ট করে ছবিতে তা-ই দেখানো হবে। নর্মান ওয়ারেন ছবির পরিচালক। শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন টনি রাইট, ফ্রান্সের ডেনিয়েল অলিয়ের এবং ইতালির লুসিয়া মাডগনো।

শ্রীসেন এঞ্জিনীয়ার। উচ্চশিক্ষার জন্যই তিনি ব্রিটেনে এসেছিলেন। কিন্তু সিনেমার আকর্ষণ এড়ানো তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। তাঁর মনের উপর সিনেমার প্রভাব পড়ে ছোট বেলায়, নিকট আত্মীয় স্বর্গত শ্রীজ্যোতির্ময় রায় ও শ্রীমতী বিনতা রায়ের সান্নিধ্যে।

চিত্রপরিচালনার অভিজ্ঞতাও শ্রীসেনের আছে। ব্রিটেনের স্টুডিওতে তিনি কিছুকাল কাজ শিখেছেন। পনেরো বছর আগে তিনি ইংলণ্ডে এসেছিলেন। সেই থেকে ওখানেই আছেন।

ফরাসী চলচ্চিত্রাভিনেত্রী জানি আস্টার (৪১) মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তাঁর আমেরিকান বন্ধুও গাড়িতে ছিলেন। তিনিও একই সঙ্গে মারা যান। জানি আস্টর প্রায় ৫০টি ছবিতে অভিনয় করেছেন। তিনিই একমাত্র অভিনেত্রী যাঁর নামে প্যারিসে সিনেমা হল রয়েছে।

শ্যাম চক্রবর্তী পরিচালিত "দুষ্টু প্রজাপতি" চিত্রে তনুজা

অভিনেতা ক্যারি গ্র্যান্টের (৬৩) বিরুদ্ধে তাঁর চতুর্থ স্ত্রী অভিনেত্রী ডায়ান ক্যানন (৩০) বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু করেছেন। শ্রীমতী ক্যানন অভিযোগ করেছেন, তাঁর প্রতি ক্যারি গ্র্যান্টের ব্যবহার নিষ্ঠুর।

ইজরায়েল এবং আরবের সাম্প্রতিক যুদ্ধের উপর হলিউডে একটি ছবি তৈরি হচ্ছে। ছবিটির নাম: 'ইজ তেল আভিভ বার্নিং?' অথবা 'সিকসটি আওয়ারস টু সুয়েজ'।

এডগার অ্যালান পো'র স্ট্রেনজ টেলস-এর ভিত্তিতে তিন অংশে একটি ছবি তৈরি হচ্ছে। তিনজন পরিচালক তিনটি অংশ পরিচালনা করবেন। প্রথমটির দায়িত্ব নিয়েছেন লুই মাল। এর নাম রাখা হয়েছে 'উইলিয়াম উইলসন'। ব্রিজিত বার্দো ও অ্যালেন ডেলন এই অংশের নায়ক-নায়িকা। দ্বিতীয় অংশটি পরিচালনা করবেন রোজার ভাদিম। এতে তাঁর স্ত্রী জেন ফোন্ডা ও রবার্ট হুসেন অভিনয় করবেন। তৃতীয় অংশের পরিচালনার ভার পড়েছে অরসন ওয়েলস-এর উপর।

অভিনেত্রী লীলা নাইডু ('অনুরাধা' ও 'দি হাউসহোল্ডার'-খ্যাত) একটি তথ্যচিত্র প্রযোজনা করেছেন। দুই রীলের ছবিটির নাম 'এ সারটেন চাইল্ডহুড'। এই ছবি শিশুদের নিয়ে—যাদের মানসিক গঠন স্বাভাবিক নয়। ছবিতে দেখানো হয়েছে কীভাবে বিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানীরা এ-ধরণের শিশুদের সারিয়ে তোলেন। একমাত্র আমেদাবাদ ও রাজকোটেই এমন বিদ্যালয় আছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ফিল্ম ইন্সটিটিউটের স্নাতক কুমার সাহানী। চিত্রনাট্যরচনা যুগ্মভাবে করেছেন লীলানাইডু ও শ্রীসাহানী।

অরণ্যদেব ✱ লী ফক

জুনবার আর শীবার পুনর্মিলন ঘটল।
যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলাম
আমার এই সাহসী বন্ধুরাই তোমাকে উদ্ধার করেছেন।

দস্যু-জাহাজের সলিল সমাধি ঘটতে দেরি হল না....

সপ্তদশ শতাব্দীর এক আশ্চর্য কাহিনী .....
লালদাড়ি, তোমাকে আর তোমার সাহসী সঙ্গীদের প্রত্যেককে আমি এক সিন্দুক সোনা দিচ্ছি.....

কলি, তোমাকে আমি প্রাণদণ্ড দিয়েছিলুম। তোমাকেও এক সিন্দুক সোনা দিচ্ছি।
এখন আমি বুঝতে পারছি, যাকে আমরা খাঁচায়, সেই আমাদের খাঁচায়।

তোমার বিয়ের দিনে বরযাত্রী হতে চাই।
৩/২৮

আংটিটা কোথায় রাখলুম?
এই নাও আংটি।

'সোনা-বেলায়, জেড পাথরের সেই বাড়িতে, রাত কাটল নবদম্পতির।'

'শীবা অবশ্য বেশী দিন বাঁচেননি, পরের বছরই তিনি মারা গেলেন।'

সে কী?
না না, এ-গল্প ভাল না!

সাপ্তাহিক সংবাদ

বিহার মন্ত্রিসভার বর্তমান পরিস্থিতি এই সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়। শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ মণ্ডল সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল ত্যাগ করে এবং বিহারের যুক্তফ্রণ্ট থেকে পদত্যাগ করে শোষিত দল গঠন করার পর ২৮ আগস্ট তাঁর দলের ২৫জন সদস্যের নামের তালিকা প্রকাশ করেন। বিধানসভায় ওই পঁচিশজন সদস্য সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল, জনসংঘ এবং পি এস পি দল ত্যাগ করেন। শ্রীমণ্ডল বলেন ১৭২জন সদস্যের সমর্থন নিয়ে শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। এই মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে তেরজন সদস্যের দলত্যাগই যথেষ্ট। অতএব শ্রীমণ্ডল শ্রীসিংহের মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেস এই নতুন কোয়ালিশনে যোগ দিবার সংকল্প করেছেন বলে প্রচারিত হয়। বিহার বিধানসভায় নিজ নিজ দলের শক্তি সম্পর্কে কংগ্রেস-শোষিত দল কোয়ালিশন এবং ক্ষমতাসীন যুক্তফ্রণ্ট পরস্পর-বিরোধী দাবি তুলেছেন। গত ৩১ আগস্ট কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এবং বিহারের শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতা ও রাজ্যের সংসদ সদস্যদের মধ্যে দিল্লিতে আলোচনায় স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, বিহারের যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন ঘটাতে এবং বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদের শোষিত দলকে মন্ত্রিসভা গঠনে মদত দিতে কংগ্রেস প্রস্তুত। বিহার মন্ত্রিসভার পরিস্থিতি এখন অত্যন্ত গোলমেলে।

দেশী সংবাদ

২৮ আগস্ট—খাদ্য সংকট নিয়ে যুক্ত ফ্রণ্টে আবার একটা সংকট দেখা দিয়েছে। ফ্রণ্ট অন্তর্ভুক্ত দুটি দল রেশনের বরাদ্দ হ্রাসের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে "ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার" হুমকি দিয়েছেন এবং মন্ত্রিসভার যে বৈঠকে রেশন কমাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেখানে উপস্থিত দুজন মন্ত্রী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন—"আমরা এই সিদ্ধান্তের বিরোধী।"

পুলিস ও খাদ্য করপোরেশনের কর্মীদের চাল উদ্ধারের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাসী চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্য তাঁদের গণ-কমিটিগুলির সাহায্য নিতে বলা হয়েছে। রাজ্য সরকার মনে করেন কয়েকটি জেলায় বিশেষ করে মেদিনীপুর বর্ধমান, বীরভূম ও কোচবিহারে বহু চাল নানাভাবে লুকনো আছে।

২৯ আগস্ট—যে সব বেসরকারী লোকের কাছে আইনসিদ্ধভাবে সোনার তাল বা বাট আছে, তাঁদের সে সব সোনা ৩১ আগস্টের মধ্যে লাইসেনসপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী বা শোধনাগারের কাছে সরাসরি বিক্রি করে দিতে হবে। কিংবা লাইসেনসপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী অথবা সার্টিফিকেটধারী স্বর্ণকারের কাছে ওই সোনা, অলংকারে রূপান্তরের জন্য দিতে হবে। অর্থমন্ত্রকের এক প্রেস নোটে আজ এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩০ আগস্ট—একটি যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আজ কৃষ্ণনগরে প্রচণ্ড হাঙ্গামা বাধে। এদিন সন্ধ্যা ছটা থেকে আগামীকাল সকাল ছটা পর্যন্ত কারফ্যু জারি করা হয়েছে। সঙ্গে ১৪৪ ধারাও। তার আগে হাঙ্গামা থামাতে পুলিস লাঠি চালায়, কয়েক রাউনড কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। গ্রেফতারের সংখ্যা ২০। বামপন্থীদের অভিযোগ, মঙ্গলবার যুবকটিকে খুন করা হয়েছে এবং কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী এ-ব্যাপারে জড়িত।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গ বাড়িভাড়া আইন সংশোধন করে এক অর্ডিন্যানস জারি করেছেন। ভাড়াটেদের কষ্ট লাঘবের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঠিকা প্রজাদের উচ্ছেদ স্থগিত রাখা সম্পর্কেও রাজ্যপাল ওই দিন অপর একটি অর্ডিন্যানস জারি করেছেন।

৩১ আগস্ট—এ বছর ১ জানুয়ারি ইডেনের ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচে পুলিস বাড়াবাড়ি করেছিল বলে সেন কমিশনের রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে। কমিশনের মতে শ্রীসীতেশ রায়ের উপর হোম গার্ডদের আক্রমণও ছিল বর্বরোচিত। আরও জানা যায় যে, কমিশনের রিপোর্টে ম্যাচ ভণ্ডুল এবং দর্শকদের লাঞ্ছনার জন্য প্রধানত সি-এ-বি ও পুলিসকে দায়ী করা হয়েছে।

দুর্গাপুর প্রজেক্ট সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য গঠিত কমিটির রিপোর্টে উক্ত প্রজেকটের কার্য-পরিচালনায় গুরুতর ক্রটিবিচ্যুতি ধরা পড়ে। রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীসুশীলকুমার ধাড়া আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে ওই রিপোর্ট ও কমিটির বিভিন্ন সুপারিশের কথা উল্লেখ করেন।

১লা সেপটেমবর—মেদিনীপুর জেলার তমলুক, কাঁথি, ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল ও গোপীবল্লভপুরের এক শ্রেণীর প্রাক্তন জমিদার ও বড় জোতদার সরকারকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য প্রায় ৭৫ হাজার একর চাষের জমি পূজা অর্চনার নামে "দেবোত্তর" সম্পত্তি করে রেখেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।

২ সেপটেমবর—আজ পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং চা-বাগিচার অধীনে আবাদযোগ্য সমস্ত পতিত জমির সাময়িক হুকুম দখলের জন্য একটি অর্ডিন্যানস জারি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য, চাষের মরসুমে এই জমিতে খাদ্যশস্য আবাদের ব্যবস্থা করা।

পুজোর মরসুমের মধ্যে এই সেপটেমবর মাসে এখানকার বস্ত্র ব্যবসায়ীরা প্রায় এক কোটি টাকার কাপড়চোপড়ের অর্ডার বাতিল করে দিয়েছেন। বোমবাই, আমেদাবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন মিলের সঙ্গে আগে ওই চুক্তি হয়েছিল। মেকের শালিমার গুদামের এক 'ক্লিয়ারিং এজেনট' একথা জানান।

৩ সেপটেমবর—কাশ্মীরী পণ্ডিত সম্প্রদায় তাঁদের ২১ দিনের পুরনো আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। শ্রীনগরে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর আলোচনান্তে এক বিবৃতিতে আন্দোলন প্রত্যাহার ও তার পরবর্তী কয়েকটি ব্যবস্থার কথা ঘোষিত হয়। শ্রীচ্যবন বলেন, শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার জন্য পরবর্তী ব্যবস্থাগুলি বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

বিদেশী সংবাদ

২৮ আগস্ট—ক্যানটনের মাও-বিরোধীরা গত শনিবার হামপোয়া নৌঘাটিতে কতকগুলি গানবোট ডিনামাইট ফাটিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। আজ স্থানীয় সংবাদপত্রে এ খবর বের হয়। এখন শহরাঞ্চলে মাও-বিরোধীদের প্রাধান্য।

২৯ আগস্ট—সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেনট নাসেরকে গদিচ্যুত করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। ফরাসী সংবাদপত্র 'ল্য মঁদ'-এর কায়রো সংবাদদাতা এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, দেশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

৩০ আগস্ট—ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ: সেনেট প্রস্তুতি কমিটির গোপন বৈঠকের যে বিবরণ আজ প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে জানা যায়, ভিয়েতনামে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে মার্কিন সেনাপতিবৃন্দ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীম্যাকনামারার মধ্যে অনৈক্য রয়েছে।

৩১ আগস্ট—গতকাল মসকো বেতার থেকে চীনে মাওয়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়। বলা হয়, এর ফলে আটদিনব্যাপী রক্তাক্ত লড়াইয়ে শুধু পূর্বাঞ্চলের চেকিয়াং প্রদেশেই নিহত হয়েছে তিন হাজার লোক। আহতের সংখ্যা মৃতের অনেক বেশি এবং পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছে চার হাজার ঘরবাড়ি।

১ সেপটেমবর—প্রবীণ রুশ সাহিত্যিক ইলিয়া এরেনবুরগ গতকাল রাত্রে হৃদরোগে মারা গিয়েছেন। সোভিয়েট লেখক সমিতির কর্মচারীরা আজ এ খবর জানান। এরেনবুরগের বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিন সপ্তাহ আগে এরেনবুরগ হৃদরোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তখন থেকেই তাঁর অবস্থা খারাপের দিকে যায়। ২০ বছর বয়স থেকেই এরেনবুরগের লেখক-জীবনের শুরু হয়। ১৯০৯ সালে তিনি রাজনৈতিক কারণে রাশিয়া থেকে প্যারিসে পালিয়ে আসেন। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করলেও ১৯৪০ পর্যন্ত প্যারিসেই বেশিকাল কাটান। তাঁর স্ত্রী জীবিত।

২ সেপটেমবর—পশ্চিম এশিয়া সংকট সমাধানের উপায় সম্পর্কে প্রেসিডেনট টিটো যে প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন, প্রেসিডেনট জনসন তাতে তেমন উৎসাহ বোধ করছেন না বলে জানা গিয়েছে। আরব রাষ্ট্রগুলির 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব ত্যাগের উপায় কি হতে পারে, সে সম্পর্কে প্রেসিডেনট টিটো নাকি পরিষ্কারভাবে কিছুই বলেননি।

৩ সেপটেমবর—রাষ্ট্রপ্রধান লেফটেনানট জেনারেল এনগুয়েন ভ্যান থিউ দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। থিউয়ের বয়স এখন ৪৪ বৎসর। মোট দশজনকে হারিয়ে তিনি এই সাফল্য অর্জন করেছেন।

সূচীপত্র

যদি মনে করেন, মাথাধরার সব ট্যাবলেটই সমান কাজ করে তবে, আপনি হয়তো এখনো অবেদন ব্যবহার করেননি

আশ্চর্য্যজনক অ্যাপেপযুক্ত
অবেদন

আপনাকে আরো দ্রুত, নিরাপদ,
নিশ্চিত আরাম দেবে

অবেদনে অ্যাপেপ থাকায়, তা ব্যথা-বেদনা দূর করবার বিশেষ শক্তি রাখে।

অ্যাপেপযুক্ত অবেদন মুহূর্তে কাজ শুরু করে, সত্বর আরাম দেয়। এর দরুণ অবেদন অনেক, অনেক বেশী নিরাপদ.. এই মাথাধরার ট্যাবলেট কোনরকম ক্ষতি করে না।

আশ্চর্য্যজনক অ্যাপেপযুক্ত অবেদন মানেই.. আরো দ্রুত, আরো নিরাপদ আরো নিশ্চিত আরাম।

তাই তো, ক্রমেই বেশী সংখ্যায় চিকিৎসকেরা মাথাধরা, দাঁতের ব্যথা, পিঠের ব্যথায়, পেশীর বেদনায়, সর্দি, ফ্লু, কষ্টের দিনগুলিতে, এবং অন্যান্য সব ব্যথা বেদনায় অ্যাপেপযুক্ত অবেদন সেবন করার সুপারিশ করছেন।

মাত্রা : ১ থেকে ২টি ট্যাবলেট
• এন-অ্যাসেটাইল-পি-অ্যামিনোফিনল

SQUIBB

চিহ্নটি ই আর স্কুইব এণ্ড সন্স, ইনকর্পোরেটেড এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক। [illegible] লিমিটেড তার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী।

প্রচ্ছদ : শ্রীবলেন মুখোপাধ্যায়

ভালো
গুঁড়ো
চায়ের
মধ্যে
সেরা

লিপটন হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট চা

দেখতে দেখতে এই চা থেকে আপনি পাবেন কাপের পর কাপ স্বাদে গন্ধে ভরপুর রংদার লিকার। নিজে খান। অতিথি অভ্যাগতদের খাওয়ান। খেয়ে তৃপ্তি। খাইয়ে তৃপ্তি। লিপটন হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট চায়ের জুড়ি নেই।

লিপটন বলতেই ভালো চা

LHGC-4 BEN

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৬
শনিবার ৩০ ভাদ্র ১৩৭৪

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
*
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট: কলিকাতা ১
থেকে শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
*
টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১
*
চাঁদার হার
কলিকাতায়
বার্ষিক ২৫.০০
ষাণ্মাসিক ১২.৫০
ত্রৈমাসিক ৬.২৫

ভারতে
বার্ষিক সডাক ২৭.০০
ষাণ্মাসিক „ ১৪.০০
ত্রৈমাসিক „ ৭.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক ২৭.০০
ষাণ্মাসিক „ ১৪.০০
ত্রৈমাসিক „ ৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)
বার্ষিক সডাক ৪৬.০০
ষাণ্মাসিক „ ২৩.০০
ত্রৈমাসিক „ ১১.৫০

আসাম-অঞ্চলে
(বিমান-ডাকে)
বার্ষিক ৩১.০০
ষাণ্মাসিক ১৬.০০
ত্রৈমাসিক ৮.০০
*
দাম ৫০ পয়সা
আসামে বিমানমাসুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা
*
DESH

Saturday 16 Sept. 1967

শ্রীচাগলার পদত্যাগ

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে শ্রীচাগলা পদত্যাগ করেছেন। তাঁর পদত্যাগের ফলে আমাদের সরকারী শিক্ষানীতি ও ভাষার ব্যাপারে একতরফা সিদ্ধান্তের অবিবেচনা আরও প্রখরভাবে নজরে পড়বার কথা। শ্রীচাগলা পেশাদারী রাজনীতির মানুষ নন, শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাকে নস্যাৎ করার মতন কৃতিত্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বোধ করি বেশির ভাগেরই নেই। তিনি নিজেই ইতিপূর্বে শিক্ষা মন্ত্রকের দায় বয়েছেন। এহেন মানুষ সহজ হাততালির জন্যে পদত্যাগ করেছেন এমন কথা ভাবাই যায় না। উপরন্তু বেশ বোঝা যায়, নিজে শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন শ্রীচাগলা যে সমস্ত সরকারী চাপ ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার কথা মনে রেখেই এবং সাম্প্রতিক শিক্ষা ও ভাষানীতির সিদ্ধান্ত কার্যকর করার উদ্যম দেখে শঙ্কিত, আশাহত হয়েই শেষ পর্যন্ত তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন। শ্রীচাগলা তাঁর পদত্যাগের কারণ দেখাতে গিয়ে কোথাও বিন্দুমাত্র তিক্ততা অথবা দীনতা প্রকাশ করেন নি। স্পষ্টই বলেছেন, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তায় একটিমাত্র সত্য রয়েছে, ভারতের সংহতি। সরকারের শিক্ষানীতি সেই সংহতিকে বিপন্ন করছে।

হিন্দী সম্পর্কে শ্রীচাগলা কোনো বিরূপ তিক্ত অভিমত প্রকাশ করেন নি। বলেছেন, শেষ পর্যন্ত ভারতের ঐক্য হিন্দীই রক্ষা করবে, তবে এখন পর্যন্ত একাজ ইংরেজীই করছে, আর ইংরেজীকে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে হেলা ফেলা করে পাশে সরিয়ে রেখে বা তাকে বাতিল করে আঞ্চলিক ভাষাকে ইংরেজীর স্থলাভিষিক্ত করা অর্থহীন। এতে শিক্ষার মানের ক্রমঅবনতি ঘটবে, ঘটছে। ইংরেজীকে অবহেলা করলে ভারতের শিক্ষা রাজ্যে অন্ধকার নামবে। সংহতিতেও ফাটল ধরবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য গ্রাজুয়েট উৎপাদন করে যাওয়া নয়, বিশ্ববিদ্যালয় কারখানা নয়। অথচ আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদান করা হলে ফল এই হবে যে, গ্রাজুয়েট উৎপাদন হবে যথেষ্ট, প্রকৃত শিক্ষক বা ছাত্র তৈরি হবে না। আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষা-মান অনুন্নত: দেশের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চা নিম্ন স্তরের: এ অবস্থায় আঞ্চলিক ভাষাকে সম্বল করে হাঁটতে গেলে পরিণাম হবে ভয়াবহ।

শ্রীচাগলা তাঁর পদত্যাগপত্রে মাতৃভাষাকে তড়িঘড়ি উচ্চশিক্ষার বাহন করার নানান সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। সেগুলি সঙ্গত, যুক্তিনির্ভর ও স্পষ্টবাদিতায় স্বচ্ছ। কিন্তু তাঁর এই প্রতিবাদ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ণগোচর হয় নি।

খুবই আশ্চর্যের বিষয়, দেশের নানা প্রান্ত থেকে হিন্দীর বিরুদ্ধে ক্রমশই যে বিরূপতা দেখা দিচ্ছে কেন্দ্রীয় হিন্দী অলারা তা অগ্রাহ্য করছেন। শ্রীমোরারজী দেশাই এর একমাত্র উদাহরণ নয়। হিন্দীঅলারা যে গোটা ভারতবর্ষ নয় একথা কি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও ভুলে গেছেন? অথবা তিনি আজ বিপাকে পড়ে বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের হিন্দীঅলাদের ওপর তাঁর আস্থা রাখতে চাইছেন।

জাতীয় শিক্ষানীতির প্রশ্নটি কারও নিজস্ব ঘরের কারবার নয়: এর মধ্যে হিন্দীঅলাদের যতটুকু দাবি ততটুকু দাবি অন্যান্য ভাষাভাষীরও। দেশের শিক্ষা রসাতলে দিয়ে জাতীয় হিন্দী ভাষায় পণ্ডিত হলে আর যারই পেট চলে চলুক শিক্ষিত ব্যক্তির চলবে না। দেশের দুর্গতির অবধি নেই, গরুর গাড়ির মতন শম্বুক গতিতে তার প্রগতির রথ চলছে। আজকের জগতে দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়তে হলে ও শিল্প বিজ্ঞানের প্রসার ঘটাতে গেলে যাদের ওপর ভরসা করতে হবে তাদের মাথায় হিন্দী ঢুকে থাকলে পরিণাম কি হবে শ্রীদেশাই কি ভেবে দেখেছেন? মুটে মজুর মিস্ত্রীর জন্যে হিন্দীকে রাখার প্রশ্ন ওঠে না সেটা থাকবেই: কিন্ত দেশের ভাল বিজ্ঞানী, কৃতি পুরুষ ও প্রযুক্তিবিদকে পেতে হলে কি হিন্দীর স্বারস্থ হওয়া ভাল হবে?

কথাটা ভারতীয় শিক্ষা ও সংহতির, হিন্দীর আধিপত্যের নয়। ভেবে দেখতে হবে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের মান উন্নত করতে গেলে কি করা উচিত এবং মান উন্নত হলে আমরা কি পাব! এরই বিচারে সরকারী শিক্ষানীতি পরিচালিত হওয়া দরকার। সংহতির প্রশ্নেও একই কথা। হিন্দীকে মাথা তুলতে দিলে কি হবে তার কিছুটা ফলাফল তো ইতিমধ্যেই জানা যাচ্ছে। আশঙ্কা হয়, এই ভাষার দ্বন্দ্বেই একদা ভারতীয় সংহতির ফাটল দেখা দেবে। আর ভারতের অনেক দূরদর্শী বার বার সে আশংকা প্রকাশ করছেন।

পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক জীবনে ছয় মাসের ছাপ পড়েছে নানাভাবে। অন্য ভাবে, নূতনভাবে। এই ছয় মাসের জীবনে যেমন বদলে গেছে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস সংগঠনের চেহারা, তেমনি বদলেছে যুক্তফ্রন্টের কাঠামোটা। যুক্তফ্রন্টের কাঠামোটা ভেঙে পড়েনি এই ছয় মাসে এটাই বড় কথা। কারণ, বিগত ছয় মাসের জীবনে যুক্তফ্রন্টকে অনেক ধাক্কা সহ্য করতে হয়েছে এবং বর্তমান চেহারাটা দেখে নিশ্চয় করে বলা যায় না যে, ভবিষ্যতের ধাক্কাগুলো কিভাবে এসে পড়বে।

এই ছয় মাসের জীবনে অনেকগুলো সংকট পেরিয়ে আসতে হয়েছে যুক্তফ্রন্টকে। যদি প্রতিটি সংকট খুঁটিয়ে বিচার করা যায়, দেখা যাবে যুক্তফ্রন্টের শরিকদের রাজনৈতিক লড়াইটাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছে যেখান থেকে পিছন ফিরে তাকাবার কোন অবকাশ থাকবে না, এই লড়াইয়ের আঁচ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা যে করা হচ্ছে না তা নয়। কিন্তু সে প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ কোন ফল এখনও পাওয়া যায়নি।

একটা প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা হয়েছে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীদের আচরণবিধি নির্ধারিত করে। বহু আলোচনার পর এবং বহু উদ্বেগ মুহূর্ত কাটিয়ে এই আচরণবিধি গৃহীত হয়েছে যুক্তফ্রন্ট কমিটির দীর্ঘ অধিবেশনে। এই আচরণবিধি উপলক্ষ করে অনেকের আশংকা ছিল যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটতে পারে। কারণ, এই আচরণবিধি সম্বন্ধে ফ্রন্টের বহু শরিকের মধ্যে তীব্র মতভেদ ছিল।

মতভেদের অবকাশ যে নেই একথা বলা যায় না। কারণ, এটা আজ সর্বজন-স্বীকৃত যে, গণতান্ত্রিক কাঠামোয় বহু পার্টি বা দলের কোয়ালিশনে গঠিত কোন সরকারের রাজনৈতিক চেহারাটা সুস্পষ্ট হবার অবকাশ পায় না। এই অনিশ্চয়তা আরও বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেখানে যুক্তফ্রন্টের মত কোয়ালিশনে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত অত্যন্ত তীব্র। তাই, যুক্তফ্রন্টের কমিটির এক সভায় যখন ভোট নিয়ে স্থির করা হল তপশীলভুক্ত সদস্যকে মন্ত্রিসভায় নেওয়া হবে তখন মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করা হয়। সমালোচনায় যৌক্তিকতা যাই থাক না কেন, সিদ্ধান্তটা যুক্তফ্রন্ট কমিটির এবং সেই সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা ফ্রন্টের প্রতি অনাস্থা প্রকাশেরই নামান্তর মাত্র।

তেমনি মতান্তর ও মনান্তর ঘটেছে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য বেতন কমিশন গঠন নিয়ে। মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ভোটের মাধ্যমে, যা কোন মন্ত্রিসভায় হয় না। সিদ্ধান্তটা ছিল মন্ত্রিসভার এবং যৌথভাবে সরকারের। তবু উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এই সিদ্ধান্তকে লক্ষ করে বললেন, 'আমার ব্যক্তিগত অপমান যা-ই হয়ে থাক না কেন, পার্টির নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে পারি না।' এমনি ব্যক্তিগত অপমানের প্রশ্ন উঠেছিল, যখন খাদ্য নিয়ে মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির তরফ থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের খাদ্যনীতিকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হল। শুধু সমালোচনাই নয়, আওয়াজ তোলা হল খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। অথচ খাদ্য-নীতি নিশ্চয়ই খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের একার নয়। সমগ্রভাবে যুক্তফ্রন্টের এবং মন্ত্রিসভার। খাদ্যনীতি সফল হয়েছে কি না, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। নীতির সমা-লোচনা মুখ্য কথা।

আরও আঘাত এসেছে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়-কুমার মুখার্জির বিরুদ্ধে। প্রকৃতপক্ষে যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রথম দিন থেকে সব-চাইতে বড় যে-প্রশ্নটা দেখা দেয় পশ্চিম বাংলার জনজীবনে, তা আইন ও শৃংখলার প্রশ্ন। পশ্চিম বাংলার জীবনে খাদ্যের পরে আর কোন সমস্যা এত গভীরভাবে দেখা দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে যুক্তফ্রন্ট সরকার যে-দিন গঠিত হয়, তার পরদিন থেকেই শুরু হয় নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন। এই কৃষক আন্দোলনকে যেভাবেই আলোচনা করা যাক না কেন, দেখা যাবে অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি এই হিংসাত্মক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল। ভূমি-নীতির জটিলতা এবং কৃষকের সমস্যা নিশ্চয়ই ছিল এবং আছে; কিন্তু যুক্তফ্রন্টের শরিক হয়ে মার্কসিস্ট কম্যু-নিস্টদের প্রত্যক্ষ সহানুভূতি থাকায় সরকারের প্রচেষ্টাকে ক্ষুণ্ণ করে দিচ্ছিল। তাই, আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবার পর মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিকে তার মতটাকে ভিন্ন আকারে প্রকাশ করতে হয়। সরকারকে সাহায্য করার জন্য, পার্টির ভিতরের সংঘাতকে বাইরে টেনে আনতে হয়। পার্টির নেতৃত্বকে আত্মরক্ষা করার জন্য উগ্রপন্থী মার্কসিস্টদের পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়; কিন্তু নকশালবাড়ির আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত কোন নেতা বা কর্মীকে বহিষ্কার করা হয়নি।

এটাই ছিল মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির স্ট্র্যাটেজী। এটা স্পষ্ট হয়ে যায়, যখন মন্ত্রিসভা নকশালবাড়ি সম্বন্ধে পুলিসকে সক্রিয় হবার জন্য নির্দেশ দেয়। পুলিসের সক্রিয়তার ফলে নকশালবাড়ি আন্দোলন যখন স্তব্ধ হয়, তখনই মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করা হল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জিকে। রাজনৈতিক আন্দোলনও গড়ে তোলা হল মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে, যার ফলে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। প্রকাশ্যভাবে মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানালো—জবাব দিন। স্পষ্টভাবে মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিকে বলতে হল—আমরা যুক্তফ্রন্ট সরকারের নকশালবাড়ি নীতির সঙ্গে জড়িত নই। ফ্রন্টের মধ্যে সংকটকে আরও তীব্র করে দেওয়া হল।

অপর যে-সমস্যা এই ছয় মাসে পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয় এনেছে, তার আধুনিক নাম 'ঘেরাও'। সমগ্রভাবে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে যে-অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, তার প্রভাব থেকে পশ্চিম বাংলার পক্ষে মুক্ত থাকা সম্ভব নয়। কৃষি উৎপাদনের হার যেখানে কমে গিয়েছে, শিল্পের উৎপাদন যেখানে মন্দা, অর্থনৈতিক কাঠামোকে সেখানে সুস্থ রাখা সম্ভব নয়। এই অসুস্থতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দেয় শ্রমিক আন্দোলন। এই আন্দোলন দেখা দেয় ঘেরাও আকারে। ব্যাপকভাবে ঘেরাও-এর ফলে শিল্পোৎপাদন আরও ব্যাহত হয়। আরও বৃদ্ধি পায় অচল অবস্থা। এই ঘেরাও আন্দোলন পশ্চিম বাংলার অর্থ-নৈতিক কাঠামোকে আরও ভঙ্গুর করে তোলে। ফলে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির বিবৃতি থেকে দেখা যায়, প্রায় ৫০ হাজার

শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছে এই ছয় মাসে।

শ্রমমন্ত্রী শ্রী ব্যানার্জির বক্তব্যও খুব স্পষ্ট। তাঁর মতে, বর্তমান সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর কোন কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয়। তাঁরই মত আরও একজন মন্ত্রী এই কথাটা প্রকাশ্যভাবে বলেছেন। তিনি পশ্চিম বাংলার স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর পার্টি আর এস-পি-র কাছে এক রিপোর্ট দাখিল করে বলেন, বর্তমান কাঠামোয় জনসাধারণের কোন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন, পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর পক্ষে মন্ত্রিসভায় না থাকাই যুক্তিযুক্ত। অবশ্য তাঁর পার্টি এ-সুপারিশ গ্রহণ করেনি, কারণ, শ্রী ভট্টাচার্যের পদত্যাগের ফলে যুক্ত ফ্রন্টের ভাঙ্গন ত্বরান্বিত হতে পারে।

যুক্তি যাই থাক, মন্ত্রীদের এই প্রকাশ্য সমালোচনার প্রত্যক্ষ চাপ এসে পড়ে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের উপর। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাকে আরও বৃদ্ধি করা হয়। এই রাজনৈতিক চাপ যেখানে এত তীব্র আকারে দেখা দেয় সেক্ষেত্রে কোন সরকারের পক্ষে কোন জন-সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই পশ্চিম বাংলার প্রতিটি সমস্যা এত তীব্র আকারে দেখা দিচ্ছে। খাদ্যের অনিশ্চয়তার সমাধান সম্ভব নয় বলে, আন্দোলন সৃষ্টি করতে হয়েছে দিল্লিতে মন্ত্রীদের ধরনা আকারে। জনসাধারণের দৃষ্টিকে প্রকৃত সমস্যা থেকে দূরে রাখার জন্যই নিতে হচ্ছে এই সব প্রোগ্রাম,—ধরনা হরতাল, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আন্দোলন। এটা স্ট্র্যাটেজী হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে; কারণ, বিভিন্ন পার্টির রাজনৈতিক স্থিতিকে অনিশ্চিত অবস্থার হাত থেকে বাঁচাবার একটাই পথ খোলা আছে। যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের শরিক হয়েও যুক্ত ফ্রন্টের নীতিগত সিদ্ধান্তকে আক্রমণ করা, সমালোচনা করা। এই সমালোচনা ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছিল, কারণ, সমস্যাগুলোও তীব্র আকার ধারণ করছে।

এই পরিস্থিতি কোন দায়িত্বশীল সরকারের পক্ষেই কাম্য নয়। কারণ, যে-কোন রাজনৈতিক অবস্থাই থাক না কেন, জনসাধারণের দাবি ক্রমাগত সোচ্চারিত হতে বাধ্য। তার ইঙ্গিতও পাওয়া গিয়েছে নবদ্বীপের তীব্র বিক্ষোভের মধ্যে। ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে বজবজে তৈলবাহী ট্রাক আটকে দেবার আন্দোলনের মধ্যে।

সে-কারণে আজ প্রয়োজন হয়েছে এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যার ফলে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন বিভ্রান্তি দেখা দেবার সুযোগ থাকবে না। বিভিন্ন দলের যে-মতবাদই থাক না কেন, মন্ত্রীদের সঠিক আচরণের উপরেই নির্ভর করে সরকারের সক্রিয়তা। ঠিক এই কারণেই যুক্ত ফ্রন্ট কমিটি স্থির করেছে (১) কোনও মন্ত্রী মন্ত্রিসভার কোনও সিদ্ধান্তের প্রকাশ্য সমালোচনা করতে পারবেন না, বলতেও পারবেন না, তিনি মন্ত্রিসভার কোনও সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন কি না। প্রকাশ্যে সব সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে হবে। (২) একজন মন্ত্রীকে আর একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনও কথা বলতে দেওয়া হবে না। এই আচরণবিধি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যে প্রয়োজন হয়েছিল এটাও অনুল্লেখযোগ্য নয়। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মূল কথা : যুক্ত ফ্রন্টের অন্তর্দ্বন্দ্বকে জনসমক্ষ থেকে আড়াল করে রাখা।

কিন্তু এই অন্তর্দ্বন্দ্ব যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস সংগঠনেও আজ দেখা দিয়েছে তীব্র বিরোধ ও দ্বন্দ্ব। এই বিরোধকে প্রশমিত করার জন্য কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিকে ভেঙ্গে দিয়ে নূতন সদস্য নিয়ে গঠিত করতে হয়েছে। কিন্তু দ্বন্দ্বটা কার্যকরী সমিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই বিরোধের মূল কথা : যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে গদিচ্যুত করে কংগ্রেসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা করা হবে কি না। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং তাঁর সমর্থকরা মনে করেন যে, যুক্ত ফ্রন্টের আওতায় এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা এখনই করা উচিত। কিন্তু শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং তাঁর সমর্থকরা এই প্রচেষ্টার ঘোরতর বিরোধী। এই বিরোধ আজ তীব্র আকার ধারণ করেছে।

কারণ, ইতিমধ্যে শ্রী সেনের সমর্থক দলের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা, যাঁরা পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টিরও নেতা, দিল্লিতে কয়েকবার ঘোরাঘুরি করে বিশিষ্ট কয়েকজন কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে পরামর্শও করে গিয়েছেন। এই পরামর্শের ফলে কয়েকটি বিকল্প পন্থারও বিশেষভাবে চিন্তা করা হয়েছে। এক পন্থা : যুক্ত ফ্রন্ট থেকে সদস্য ভাঙ্গিয়ে এনে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করা। কিন্তু পাঁচজন সদস্যকে ভাঙ্গিয়ে আনার পর যুক্ত ফ্রন্ট থেকে যে আন্দোলন সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং যে আওয়াজ তোলা হয়েছিল তার পর এই পন্থার কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া, শ্রীঅতুল্য ঘোষ মনে করেন, এই পন্থার যে-সব সদস্য যুক্ত ফ্রন্ট ছেড়ে চলে আসবেন কংগ্রেসকে তাদেরই প্রাধান্য দিতে হবে নূতন মন্ত্রিসভায়। দ্বিতীয় পন্থা : বাংলা কংগ্রেসের মত বড় একটি দলের পক্ষে থেকে যদি যুক্ত ফ্রন্ট ভেঙ্গে দিয়ে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয় তাহলে সেই মন্ত্রিসভাকে কংগ্রেসের সমর্থন দেওয়া। এতেও আপত্তি জানিয়েছেন শ্রী ঘোষ। কারণ, তাঁর মতে ছোট একটি দলের দ্বারা গঠিত সরকারের সকল সিদ্ধান্ত কংগ্রেসকে মেনে নিতে হবে। সমর্থন করতে হবে। শ্রী ঘোষ মনে করেন, এর একটাই অর্থ হয়, কংগ্রেসের পক্ষে রাজনৈতিক আত্মহত্যা।

এই বিরোধের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ, শ্রীঘোষ মনে করেন, যুক্ত ফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রচেষ্টার ফলে যে অশান্তি দেখা দেবে তা থেকে কংগ্রেস আত্মরক্ষা করতে পারবে না। কাজেই এই প্রচেষ্টাকে বাধা দিতে হলে আজ প্রয়োজন হ'য়েছে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস সংগঠনকে দলগতভাবে নিয়ন্ত্রিত করা। এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কোন দলের হাতে যাবে, তা নির্ধারিত হবে আগামী কংগ্রেস নির্বাচনের সময়। পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের নির্বাচন হবে দু'এক মাসের মধ্যেই। আগেও এই নির্বাচন হয়েছে, কিন্তু প্রতিবারই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই নির্বাচন সম্ভব হয়েছে। এবার এমন কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। কারণ, কংগ্রেসের ক্ষমতা কার হাতে থাকবে সেটাই নির্ধারিত হবে এই নির্বাচনে।

এই ক্ষমতার লড়াইটা আরও তীব্র হ'য়েছে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটি সিদ্ধান্তে। ওয়ার্কিং কমিটি স্থির করেছে যে, কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস সংগঠনের বর্তমান অবস্থাটা যাচাই ক'রে দেখবেন। পশ্চিম বাংলার এই সমীক্ষার ভার প্রথমে দেওয়া হ'য়েছিল শ্রী ইউ এন ডেবরের হাতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল পশ্চিম বাংলায় যাচ্ছেন শ্রীগুলজারীলাল নন্দ। শ্রীনন্দর সঙ্গে শ্রীঅতুল্য ঘোষের সম্পর্কটা যে খুব মধুর নয় এটা আর কারো অবিদিত নেই। কাজেই অনেকের অনুমান শ্রীনন্দর পশ্চিম বাংলায় যাওয়ায় কংগ্রেসের অন্তর্বিরোধ তীব্রতর হবার সুযোগ পাবে।

তাই সমগ্রভাবে বিচার করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, গত ছয় মাসের যুক্ত ফ্রন্টের রাজত্বকালে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক জীবনে শুধু সংশয় নয় সংকট দেখা দিয়েছে। এই সংকটের মূল কথা চরম অনাস্থা। অনাস্থার অনিশ্চয়তা রাজনৈতিক জীবনকে পঙ্গু করে দেবার উপক্রম করেছে। এটাই বিগত ছয় মাসের প্রত্যক্ষ সমীক্ষা।
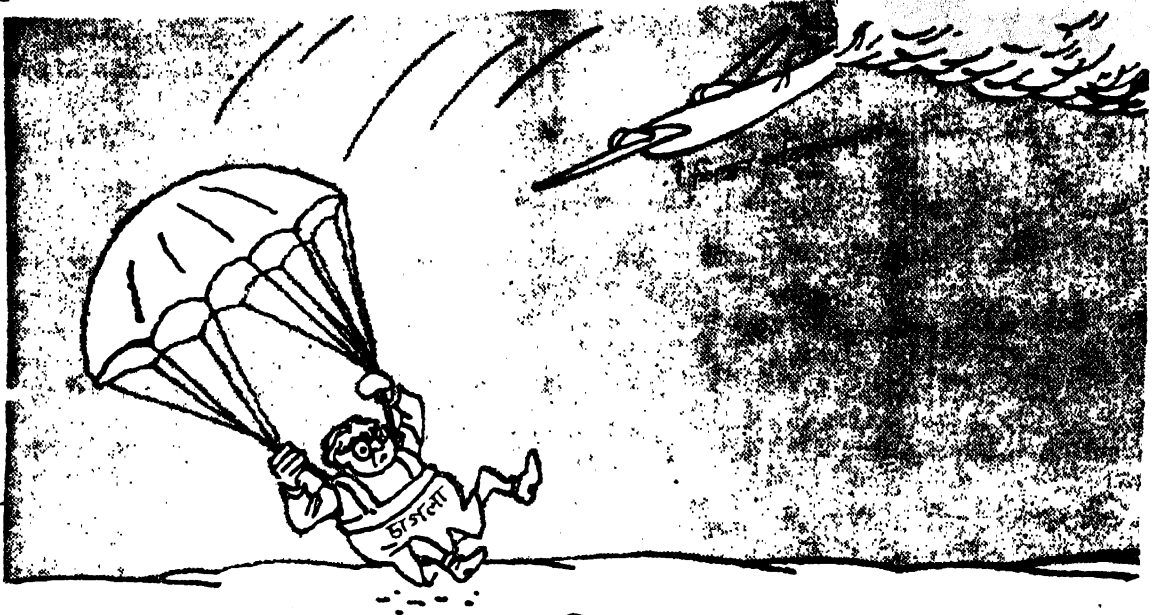
মিঃ চাগলা মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন।

মাদক-বর্জন নীতি সংশোধনের বিরুদ্ধে মোরারজীর কঠোর প্রতিবাদ।

মাদক বর্জন

আরও একটি বাঁধে ভাঙন।

হিন্দী-বিরোধী জনমত

পারমাণবিক প্রশ্ন

পরমাণু বোমার জন্মনিয়ন্ত্রণ চেষ্টায় আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া আপাতত এক মত। চোয়াল-ভাঙা শব্দ-সমষ্টির মারফত একে বলা হয় পারমাণবিক অস্ত্র সম্প্রসারণনিরোধ চুক্তি। চুক্তির খসড়া তৈরি মার্কিন-রুশ উদ্যোগে। এই দুই প্রধান পারমাণবিক শক্তিধর চুক্তিতে সই দিলেই চুক্তি কার্যকর হবে না। জেনিভা-তে ১৭-রাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে খসড়া চুক্তির চুল-চেরা বিচার হবে; তারপর এই ১৭টি রাষ্ট্র যদি চুক্তিতে সই দেয়ও, তবু চুক্তির বাইরে রয়ে যাবে ফ্রান্স এবং কম্যুনিস্ট চীন। এ দুটি রাষ্ট্র জেনিভা-বৈঠকে যোগ দেয় নি; পরমাণুবোমার জন্ম-নিরোধের চুক্তিতে ফ্রান্স বা চীন সই দিতে রাজী নয়। ফ্রান্স আমেরিকার প্রাধান্য মেনে নিতে নারাজ। চীনের মেজাজ তো আরও চড়া, আমেরিকা ও রাশিয়া, দুয়ের উপরেই পিকিং মহা খাপ্পা। আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়া সহযোগিতা করছে, পারমাণবিক অস্ত্রশক্তির বিস্তার বন্ধ করতে চাইছে, সেজন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে চীনের প্রচণ্ড অভিযোগ। মস্কো নাকি ওয়াশিংটনের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া করে দুনিয়ার "বৈপ্লবিক" শক্তিগুলির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। সন্দেহ নেই, চীনের বেপরোয়া বৈপ্লবিক ভঙ্গিতে রাশিয়া কিছুটা বিব্রত এবং সন্ত্রস্ত। চীন পারমাণবিকশক্তিধর হওয়ায় রাশিয়া খুশী হয় নি, অস্বস্তি বোধ করাও অসম্ভব নয়।

পরমাণুবোমার জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা কেবল আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীনকে নিয়ে হলে কথা ছিল না। আপাতত এরাই পারমাণবিক অস্ত্রধর। কিন্তু সারা পৃথিবী এখনও এদের হুকুমে ওঠ-বস করার অবস্থায় পৌঁছয় নি। ওই পাঁচটি পরমাণু-শক্তিধর ছাড়া আরও কয়েকটি দেশ আছে যেমন ইতালি, সুইডেন, ভারতবর্ষ, জাপান, ইজরেল, যারা পরমাণুবোমা তৈরি করতে সক্ষম। এরা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বেশীর ভাগই এখন পর্যন্ত পারমাণবিক-শক্তিহীন অর্থাৎ এসব দেশ পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন-ব্যাপারে এখনও একেবারে নাবালক। অতএব পারমাণবিক মর্যাদার নিরিখে পৃথিবী এখন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) পরমাণু বোমায় বলীয়ান পাঁচটি বৃহৎ শক্তি, (২) পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করে কিন্তু পরমাণু বোমা তৈরি করে না এমন গুটি সাত-আট দেশ, যাদের মধ্যে ভারতবর্ষ, আর (৩) পারমাণবিক শক্তিতে একেবারে নিঃসম্বল দেশগুলি। পরমাণুবোমার জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার তাৎপর্য অতএব এদের সকলের কাছে এক রকম নয়।

পরমাণুবোমার অধিকারী আমেরিকা, রাশিয়া এবং অন্য কোন কোন দেশের যুক্তি: এই সাংঘাতিক অস্ত্রের কারবার সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে না দেওয়াই ভাল, যাদের হাতে এ বোমা আছে কেবল তাদেরই থাকুক। অর্থাৎ আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন যত খুশী পরমাণুবোমা প্রসব করুক, তাতে ক্ষতি নেই; ফ্রান্স ও চীন তো নিয়ন্ত্রণে একেবারেই নারাজ। মোটের পর পারমাণবিক সৌভাগ্যবতীরা বর্ষে বর্ষে বিকতর পরমাণু বোমা প্রসব করতে থাকুন, জেনিভার খসড়া চুক্তি সেক্ষেত্রে 'ক্যাপ' "পিল" কিংবা সাত্ত্বিক মতে আত্মসংযমের বিধান দিচ্ছে না। পরমাণু বোমার জন্মনিয়ন্ত্রণ ও বিস্তার সম্পর্কে যত কড়াকড়ি সব অন্যান্য দেশের বেলায়।

এরকম পারমাণবিক ব্রাহ্মণ-হরিজন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্বভাবতই বহু দেশের আপত্তি। ফ্রান্স ও চীনকে হিসাবের বাইরে ধরলেও, আপত্তি আরও অনেকের। রুমানিয়া কম্যুনিস্টশাসিত দেশ, তবে ইদানীং অনেকটা সোভিয়েট-দল-ছাড়া। জেনিভা-বৈঠকে রুমানিয়াও আপত্তি তুলেছে; ভারত ও অন্য কয়েকটি দেশের আপত্তিও সেই ধরনের। পরমাণু-বোমার জন্মনিরোধ মানে কার্যত কয়েকটি দেশের পারমাণবিক অস্ত্রশক্তির একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখা। সেটা যদি রাখতেও হয়, তবে পারমাণবিক অস্ত্রশক্তিহীন দেশগুলির কয়েকটি দাবি মেনে নিতে হবে—(১) পারমাণবিক অস্ত্রশক্তিহীন দেশগুলির নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি। (মুশকিল কী যে, এ ধরনের প্রতিশ্রুতি বিপদের সময় শেষ পর্যন্ত কাজ দেবে কি না সন্দেহ।) (২) পারমাণবিক শক্তি যে-সব দেশে উৎপাদিত হয় সে সব দেশের পারমাণবিক কাজকর্ম পরিদর্শনের সুযোগ, (৩) পরমাণু-বোমার অধিকারী দেশগুলির পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার ক্রমশ কমিয়ে আনার ব্যবস্থা। এ সমস্ত দাবি পারমাণবিক অস্ত্রশক্তিধররা সহজে মানতে রাজী হবেন মনে হয় না।

ভারতের তরফের আপত্তি এবং তার কারণ সুস্পষ্ট। পরমাণু-বোমা এ দেশে তৈরি করা সম্ভব, অবশ্য অবিলম্বে নয়। যতদিন এ দেশে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন বিদেশের সাহায্যের উপর নির্ভর ততদিন পরমাণু বোমা তৈরি ব্যাপারে ভারতবর্ষ নিজের ইচ্ছামত অগ্রসর হতে পারে না। কারণ এ বিষয়ে বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত চুক্তির নিষেধ খুব পরিষ্কার ও কঠোর। পরমাণু বোমা তৈরি করতে হলে ভারতের নিজের চেষ্টায়, নিজস্ব উপাদানে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের সমস্যা আগে সমাধান করতে হবে। কিন্তু তা বলে পরমাণু বোমা তৈরির অধিকার এবং সংকল্প ভারত ছাড়তে পারে না, পারা উচিত নয়। চীনের পারমাণবিক অস্ত্রশক্তি ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন করছে, এটাই একমাত্র কথা নয়। এশিয়ায় একমাত্র পারমাণবিক অস্ত্রশক্তিধর হওয়ার ফলে চীনের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বেড়েছে, জুলুম জবরদস্তির সুযোগও আরও বেশী পাচ্ছে। কাজেই কেবল রণনৈতিক প্রয়োজনে নয়, রাজনৈতিক কারণেও ভারতের পারমাণবিক অস্ত্রশক্তিধর হওয়া দরকার।

পরমাণু-বোমার জন্মনিয়ন্ত্রণ চুক্তিতে অনেকে ব সকলে (ফ্রান্স ও চীন বাদে) সই দিলেও একটা ফাঁক অন্তত বন্ধ করা খুবই কঠিন। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের যন্ত্র রপ্তানির কারবার বন্ধ করা হচ্ছে না, য়ুরেনিয়াম রপ্তানিও চলবে—অবশ্য সবই পরমাণু-বোমা তৈরি না করার শর্ত মানা করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে। একটিমাত্র পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে যে পরিমাণ প্লুটোনিয়াম তৈরি হয় তা দিয়ে প্রায় পাঁচ শো পরমাণুবোমা তৈরি করা যায়। একমাত্র বাধা, ইতালি কিংবা ভারতের মত দেশের, আইনগত অর্থাৎ চুক্তির শর্ত। প্লুটোনিয়মের ভাণ্ডার স্ফীত, বিস্তৃত হতে থাকলে সে শর্ত ভেঙে পরমাণু-বোমা তৈরির ঝুঁকি কোন কোন দেশ নিতেও পারে।

১১-৯-৬৭

(একটি একাঙ্কিকা)

আকাশের রঙ নীল—একেবারে শরতের নীল। মেঘগুলো হালকা হয়ে গেছে। যদিও দেশে চাল-টাল বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না—কিন্তু শারদীয়-সাহিত্যের দরাজ আয়োজন চলছে। রাঘব বোয়াল থেকে চুনো-পুঁটি লেখক—সবাই ঘাড় গুঁজে পুজো-সাহিত্য রচনা করছেন। বলা অনাবশ্যক,

দেশে থাকতে জানতাম ওটা রবীন্দ্রনাথের ছবি

সুনন্দর লেখার কোনো চাহিদা নেই—এমন কি 'দেশ' পত্রিকার সর্বংসহ সম্পাদকও তাঁর শারদীয়া সংখ্যায় সুনন্দকে দুটো পৃষ্ঠা দিতে রাজী হন নি—বলেছেন, 'আগে নামী লেখক হোন মশাই, তারপর দেখা যাবে।'

নামী লেখক হওয়ার সম্ভাবনা এ জীবনে আছে বলে মনে হচ্ছে না। কাজেই জর্নালের পাতাতেই একটু শারদীয় সাহিত্যের চর্চা করে নিই। একটা নাটিকা লিখে ফেলা যাক। এর বিষয়টা বাস্তব কি কাল্পনিক এ তর্ক অনাবশ্যক। আমার ডিফেন্সে রবীন্দ্রনাথ আছেন—"সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা"—এট্‌সেট্‌রা এট্‌সেট্‌রা।।

প্রথম দৃশ্য

(জম্বুদ্বীপ নামে খ্যাত রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় পর্যটন অফিস। জনাচারেক বিদেশী ও বিদেশিনী—তাঁরা এতদ্দেশ পরিভ্রমণে এসেছেন। তাঁদের জ্ঞান দান করছেন জনৈক পর্যটক বিভাগীয় কর্মচারী)

এক নং বিদেশী ॥ আপনাদের এই তা লি কা য় ডেল্‌হি-বম্‌বে—ক্যাশমীর-জয়পুর-আগ্রা-বেনারস—সব পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু ক্যালকাটার নাম নেই কেন?

কর্মচারী ॥ ক্যালকাটা? ও হো—না-না।

দুই নং ॥ কেন, ক্যালকাটা বলে কি একটা সিটি আপনাদের নেই?

কর্মচারী ॥ হাঁ আছে। কিন্তু ওহো—সে একটা বিভীষিকা। সে একটা দুঃস্বপ্ন।

এক নং ॥ কেন?

কর্মচারী ॥ সে একটা মৃত-নগর। আবর্জনায় পূর্ণ। সেখানে শুধু কলেরার ব্যাক্‌টিরিয়া। সেখানে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। হয়তো মারাও যেতে পারেন।

একজন বিদেশী মহিলা ॥ হে আমার ঈশ্বর, কী ভয়ানক।

এক নং ॥ (জেদের সঙ্গে) তবু আমি সেখানে যেতে চাই। আমি ট্যাগোরের নাম শুনেছি। তিনি সেখানে জন্মেছিলেন।

কর্মচারী ॥ ট্যাগোর? (একটু ভেবে) ও হাঁ-হাঁ, একজন কবি ছিলেন বটে। কিন্তু এখন তাঁর কবিতা কেউ পড়ে না, আমিও পড়িনি। তা ছাড়া তিনি একটা ডেড্‌ ল্যাংগুয়েজে কবিতা লিখেছিলেন, সে ভাষা হিন্দীর একটা শাখা মাত্র। তা বিলুপ্ত এবং গত! তার জন্যে ক্যালকাটা যাওয়ার কোনো দরকার নেই।

মহিলা ॥ না—কোনো দরকার নেই, আমি যাচ্ছি না।

দুই নং ॥ আমিও না।

এক নং ॥ (দু নংয়ের কানে কানে) বুঝছ না— টি-ভির সুবিধে হবে। একটু রিস্‌ক্‌ নেওয়াই যাক্‌ না। (জোরে) আমি যেতে চাই। কোথায় ক্যালকাটা?

কর্মচারী ॥ (হতাশভাবে) বোধ হয় 'নেফা'র সন্নিকটে। কিন্তু যদি যান, আপনার জীবনের জন্যে আমরা দায়ী নই। নোংরা—চতুর্দিক অরণ্যে পরিপূর্ণ। ওহো—ভয়ংকর।

এক নং ॥ মন্দ কি, অ্যাড্‌ভেঞ্চার হবে।

(কর্মচারীর গভীর দীর্ঘশ্বাস)

দ্বিতীয় দৃশ্য

'সেই নোংরা ভয়ংকর ক্যালকাটার উপ-

ঘরের এই আবর্জনার ছবিটা তুলে রাখি
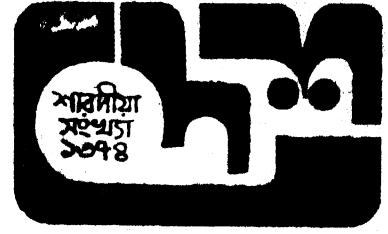
পর্যটন অফিস। পূর্বে পরিচিত দুই পর্যটক উপস্থিত। কর্মচারীর পরিবর্তে এক সুহাসিনী সুরঞ্জিতা তরুণী। তিনি ক্যালকাটার নন। চাকরির দায়ে এই অভিশপ্ত নগরে থাকতে বাধ্য হয়েছেন।)

পর্যটক এক নং ॥ আমরা শুনেছি, ক্যালকাটার চারদিকেই গভীর অরণ্য।

তরুণী ॥ ঠিকই শুনেছেন। এই 'বেঙ্গল' শুধুই জঙ্গলময়। আফ্রিকার মতো। সভ্যতা সংস্কৃতি এখানে কিছুই নেই।

পর্যটক দুই নং ॥ আমরা জঙ্গল দেখতে চাই।

তরুণী ॥ খুব ভালো কথা। কৃশ্‌নোগোরে (কৃষ্ণনগরে) চলে যান। ইহা বেঙ্গালের বৃহত্তম অরণ্য।

এক নং ॥ কৃশ্‌নোগোর? সে কতদূর?

তরুণী ॥ সাত কিংবা আট কিলোমিটার হবে। ট্যাক্সি করেই যেতে পারবেন।

দুই নং ॥ অশেষ ধন্যবাদ, মিস—

তরুণী ॥ (মধুর হেসে) কিছু না—ইহা হয় আমাদের কর্তব্য। তবে সাবধানে যাবেন। বেঙ্গল-টাইগার খুবই ভয়ংকর—জানেন তো?

এক নং ॥ শুনেছি। আচ্ছা, আমরা সতর্ক থাকব।

তৃতীয় দৃশ্য

(একটি প্রতীক্ষমান ট্যাক্সি। দুই পর্যটক আরোহণে উদ্যত। জনৈক এতদ্দেশীয় 'গাইডে'র প্রবেশ।)

গাইড ॥ সুপ্রভাত মহাশয়গণ। আমি আপনাদের সরকার নিয়োজিত পথি-প্রদর্শক।

এক নং ॥ আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে এত আহ্লাদিত! ভালোই হল, আমাদের একটু কৃশ্‌নোগোরের জঙ্গল দেখিয়ে আনুন।

গাইড ॥ (চমকে গিয়ে) কিসের জঙ্গল বললেন?

দুই নং ॥ কৃশ্‌নোগোর। বেঙ্গলের বৃহত্তম অরণ্য। ক্যালকাটা থেকে মাত্র সাত আট কিলোমিটার। (তরুণীর কথাগুলো মুখস্থের মতো আওড়াতে লাগল।) বেঙ্গল-টাইগারে পরিপূর্ণ। আচ্ছা মহাশয়, আপনি কি মনে করেন, আমাদের সঙ্গে রাইফেল থাকা উচিত?

গাইড ॥ (হতচকিত) কৃষ্ণনগরে জঙ্গল? মাথা খারাপ নাকি? সে তো টাউন। তার দূরত্ব একশো কিলোমিটারেরও বেশি। জঙ্গল তো সুন্দরবনে। তার অনেক অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হয়—লঞ্চ যোগাড় করতে হয়—সে তো বিস্তর ঝামেলা।

সুন্দরবনে যেতে পারবেন না, আমার ছবিটাই তুলে রাখুন

এক নং ॥ তবে যে পর্যটন অফিস—

গাইড ॥ তাদের বোধ হয় ভুল হয়েছে।

দুই নং ॥ (চটে) ভুল! এই জন্তুদের লোকগুলো সব [illegible] সব মিথ্যাবাদী। [illegible] আমরা [illegible] না দিলে যেতে পারব না—

গাইড ॥ গাল দেবেন না মহাশয়!

এক নং ॥ গাল! তোমার দেশে থুংকার ফেলি। আর এখানে নয়। ট্যাক্সি-বিমান-বন্দর—

[যবনিকা পতন]

শ্রীমতীর মন

কনা বসু

হকারগুলো চেঁচামেচি করছে। লজেন্স, বিস্কুট থেকে শুরু করে কয়ে ডালা, চিরুনি, এসেন্স পর্যন্ত। প্লাস্টিকের পুতুলওয়ালাও আসছে, আর আসছে কাচের গাড়িতে করে খাবার। চারদিক নিয়ন আলোয় ফর্সা ধবধবে। প্ল্যাটফর্ম লোকে লোকারণ্য অগনিত যাত্রী আর কুলির ভিড়ে। ওর মনে হ'ল যেন চড়কের মেলা। শুধু সং সেজে বেড়ান মহাদেব আর দুর্গারই অভাব। শ্রীমতী হাসল পান-খাওয়া লাল ঠোঁটে। অন্যমনস্ক হয়েছিল অনেকক্ষণ। ওকে ধাক্কা মেরে চলে গেল মালটানা গাড়িটা। শ্রীমতী ঘেন্নায় মরে গেল। কুলির গায়ের ঘাম লেপ্টে গেল শরীরে।

বর্বর! ইতর কোথাকার!

কিন্তু সে ফিক্ করে হেসে পালাল পালটা জবাবের পরিবর্তে। কি বিচ্ছিরি হাসিটা! অশ্লীল ইঙ্গিত ছিল ওর ভুরুতে। রাগে হাড়পিত্তি জ্বলতে লাগল। শ্রীমতীর : বদমাশ কি আর গায়ে লেখা থাকে।

যত রাগ গিয়ে পড়ল দিব্যেন্দুর ওপরে। কেন আসছে না এখনও? পানের বোঁটায় শেষ কামড় মেরে ছুঁড়ে ফেলল সে। বিরক্তিতে ভরে গেল মন। লোকটা কি খয়ের দিতে ভুলে গেল নাকি? বিস্বাদ লাগছে মুখ। চুন খয়েরটা তার আবার বেশী না হলে চলে না কি না।

শ্রীমতী যখন প্রথম পান খেতে শুরু করে, তখন এতটা নেশা ছিল না তার। নেহাত ঠোঁটটাকে লাল না করলে চলত না বলে। লাল ঠোঁট, লাল জিব, চমৎকার লাগত। আয়নার কাছে কতবার দেখত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। তাই তো পশের ঘরের দিদি ঠাট্টা করে বলত, স্বামী সোহাগিনী।

লজ্জা পেত শ্রীমতী। পাশের ঘরের দিদির মুখ বড় খোলা। এতটুকু কিছু বাধে না! হয়ত কথাটা মিথ্যে নয়। স্বামীর ভালবাসা সে তো কম পায়নি। বিয়ের পর প্রথম প্রথম সিঁদুর পরতে গেলে নাকে গড়িয়ে পড়ত। আর পাঁচজন লোকের সামনে তাকে অপ্রস্তুত হতে হয়েছে কতদিন। শ্রীমতী ভাবল, সিঁদুর তো আজও পড়ে নাকে সিঁথিতে পরতে গেলে, কিন্তু দিব্যেন্দু কি আগের মতই আছে? ও যেন কত দূরে সরে গেছে।

ওর মন টনটন করল। ছুঁচের মত বিঁধতে লাগল, আসবার আগের সেই তুচ্ছ ঘটনা। পিন্টুকে একসঙ্গে অত-গুলো টাকা দিতে বারণ করেছিল সে। বিদেশ বিভুঁইয়ে যেতে হচ্ছে টাকার দরকার সেখানে প্রতি পদে পদে। ওকে বরং পরে পাঠালেই চলত। কিন্তু উলটো বুঝলো দিব্যেন্দু। চোখ রাঙিয়ে বলল, তোমার ভাই হলে আর ও কথা বলতে না।

রাগে, দুঃখে ওর মরে যেতে ইচ্ছে করছিল আত্মসম্মানের একটা তীব্র জ্বালায়।

লোক বাড়ছে প্ল্যাটফর্মে। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে মিনিটের ঘর পেরিয়ে। কানে ভেসে আসছে মেয়েলী কণ্ঠের ঘোষণা বাংলা, হিন্দী এবং ইংরেজীতে আর মাত্র দশ মিনিট। কি হ'ল দিব্যেন্দুর! ওর চোখে উদ্বেগের চিহ্ন। অ্যানিমিয়া রুগীর মত ফ্যাকাশে দেখাল মুখটা। চোখ দুটো খুঁজতে লাগল ভিড়ে, গেরুয়া পাঞ্জাবি-পরা মানুষটার দেখা গেল না

তবু। ও তো বলেছিল, ট্যাক্সি থেকে মাল নামিয়ে আসছে একটু পরেই।

শ্রীমতীর বুক ধড়ফড় করছে—কোন বিপদে পড়েনি তো? যে রগচটা মানুষ! নির্ঘাত ট্যাকসিওয়ালার সংগে গোলমাল বাধিয়ে বসেছে। একে নিয়ে আর পারা যায় না। একান্ত অজান্তেই শ্রীমতীর হাত দুটো উঠে এল কপালে। ঢোক গিলতে গিলতে অসহায়ভাবে তাকাল প্ল্যাটফর্মের আর এক মাথায়। ওই তো সে আসছে। বাঁচা গেল।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো দিব্যেন্দু। মেজাজ চড়িয়ে বলল, হাঁ করে দেখছ কি? গাড়িতে উঠতে পারোনি?

কিছুই বলল না শ্রীমতী। স্বামী আর দেওরের সংগে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল কম্পার্টমেন্টের দিকে। কোন কৈফিয়ত কিংবা কথা কাটাকাটি করার মত প্রবৃত্তি তার হ'ল না।

দিব্যেন্দু মাল গুনে দেখল বার কয়েক। খুশী হয়ে বখশিস দিল কুলিকে। আরও একটি টাকা। আর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে বলল, বসে পড়, জায়গা পাবে না কিন্তু এর পর।

শ্রীমতীর মনে হ'ল, বড় রুক্ষ করে বলল তাকে দিব্যেন্দু। কথাটা কি, আর একটু ভিজিয়ে বলা যেত না? ও যেন কেমন হয়ে গেছে। ভাবল, কে এর জন্যে দায়ী? কেউ না। সবই তার কপাল! তবু বুকের ভেতরটা জ্বলতে লাগল। অনেক মুহূর্তের মতই আজও ক্ষমা করতে পারল না স্বামীকে।

হুইসল বাজল। শেষ হুইসল। সি-অফ করতে এসেছিল যারা, সেই পরিচিত মুখগুলো মিলিয়ে গেল জানলা থেকে। দিব্যেন্দুর দায়িত্বের যেন শেষ নেই। পিন্টু বলছে, দাদা, আমি ছুটি পেলেই চলে যাবো তোমার কাছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই কিন্তু সাবধানে থাকিস। টাকার দরকার হলেই লিখিস।

কেঁদে ফেলল ছেলেটা। চমৎকার অভিনয়। শ্রীমতী চোখ সরিয়ে নিল। অতটা বাড়াবাড়ি কি ওর না করলেই চলত না? উদার দাদাটি মাস পয়লায় মনিঅর্ডার করতে নিশ্চয় ভুলতেন না। দিব্যেন্দুর চোখেও জল। অবাক হয়ে গেল শ্রীমতী। তার জন্যে কোনদিন কাঁদতে দেখেনি সে।

বিদঘুটে অন্ধকারের বুকে লাইটের আলো। দূরের শহরতলির আলো। গাড়ির ঝিক্ ঝিক্ শব্দ। একঘেয়ে, বিশ্রী। ডোবা, পুকুর, গাছপালা দেখতে দেখতে কলকাতার জন্যে কান্না পেল শ্রীমতীর! আবার কবে ফিরতে পারবে এখানে? দিব্যেন্দু তো তাকে কিছুই বলেনি।

মাইল পোস্টের তারে পাক-খাওয়া ঘুড়িটা ঝাপট খাচ্ছে প্রচণ্ড বাতাসে। বিদেশ বিভুঁই...কেমন শহর? ......কেমন কোয়ার্টার দেবে কোম্পানি কে জানে! হয়ত হ্যারিকেন জ্বালাতে হবে। লাইট থাকবে না মফস্বল শহরে। ......কত সুখেরই না ছিল কলকাতার সেই ফ্ল্যাট! ফের যখন বদলি করবে এখানে তখন কি আর পাওয়া যাবে অত সস্তার বাড়ি? ...কালী ঘাটের মায়ের মুখ মনে পড়ছে। আসবার আগে পুজো দেওয়া হয়নি। রক্ষে কর মাগো। মঙ্গল কর আমাদের। ফিরে গিয়ে পুজো দেব তোমায়।

শ্রীমতীর মন তোলপাড় করছে স্মৃতি, ব্যথা, ঘটনার ঢেউ। ওর মন কেমন করছে। কিছু ভাল লাগছে না। মহারাজ-ঠাকুর রোডের অনেক পুরনো গলিটা মনে পড়ছে। সুরকিঢালা এবড়ো-খেবড়ো পথ। সবেমাত্র রোলার চালাতে শুরু করেছিল কর্পোরেশন। পাকা রাস্তা হবে! আর কোনদিন জল জমবে না বৃষ্টি পড়লে। সেই পথ দিয়ে যাবে ঘোষাল-দিদি, পুঁটের মা। শ্রীমতীই হাঁটবে না শুধু। ......জলের কুঁজোটা আনা হয়নি ভুলে। ঘোষালগিন্নী হয়ত নিয়ে গেছে কখন। ওই মিনুর মা কি কম সুবিধে-বাদী? ...সর্বনাশ করেছে, পয়সা জমানো মাটির ঘটটা? নিশ্চয় দিব্যেন্দুর স্যুটকেসে। উঃ মাগো, একটা দুটো করে যে অনেক পয়সা জমেছিল ওতে। দিব্যেন্দুর পকেট-মারা খুচরো পয়সা প্রতিদিন ফেলেছে সে ঘটে। ......ওর

ফোকলা যেন মা পড়ে ঠাকুর। ...জেলার হরির লুঠ দেব শনিবারে।

দিব্যেন্দুর কেমন উড়ো-উড়ো ভাব।

আসবার আগে পন্টুর মার চোখ ছলছল করেছিল। দিব্যেন্দুর ভাব-সাবও কি স্বাভাবিক ছিল? তাকে ও যেন এড়িয়ে চলতে চাইছিল।

শ্রীমতীর চোখ জ্বলে উঠল। অন্ধকারে বেড়াল যেমন শিকার খোঁজে। মনে হল, জীবনে কোনদিন যে ক্ষমা করতে পারবে না পন্টুর মাকে।

ঘুম আসছে না ওর। বাড়ির গলি ভেসে উঠল আবার। ......ছাইয়ের গাদায় অযত্নে বেড়ে-ওঠা কুমড়ো গাছ, লংকার চারা। ওসব এখন পন্টুর মাদের।

বন্ধ চোখের অন্ধকারে ভেসে উঠল মিনুর মা, ঘোষালদিদির মুখ। কি করছে সে এই রাত দশটায়? নিশ্চয় আলোচনা করছে তার কথা? যতই হোক, পাঁচ বছর কেটেছে যার সংগে। কোমর বেঁধে ঝগড়া করেছে যদিও, তবু তো বিপদে আপদে ছুটেও এসেছে একে অন্যের। মনে পড়ছে তার, দুপুরের রোদে ছাদের আলসের ভর দিয়ে পাঁচজনের একত্র জটলা। খোশগল্প, হাসাহাসি, ঢলাঢলি। কর্তারা তখন আপিসে। কেউ খোদ বড়-বাবু হয়ে তাঁবেদারী করছেন, কেউ ছোটবাবুর চেয়ারে বসে হাই তুলছেন। কলম পিষছেন। শ্রীমতীর তখন ভাবতে ভালই লাগত এই মেয়ে জন্মটা। ঘরে বসে পায়ের ওপর পা তুলে গল্প কর, পান চিবোও, গড়িয়ে নাও। কিন্তু ও বেচারীদের নাজেহাল হয়ে আপিস ছোটার পালা। ঘোষাল-দিদি এই নিয়েও তো কম ইয়ার্কি করেনি। বলেছে, রোজই কি আর দশটা পাঁচটা আপিস করেন মনে কর? ছুটি-ছাটা কি আর থাকে না? সিনেমা আছে, রেস্টুরেন্ট আছে,তারপর......।

কথা শেষ না করে কি এক ইংগিতে চোখ নাচাত মিনুর মা। কৃত্রিম দীর্ঘ-

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, আমরা তা থেকে বঞ্চিত ভাই!

ওসব ঠাট্টা, মস্করা ভাল লাগত না শ্রীমতীর। সব কথার মানেও ভাল বুঝত না। অস্পষ্ট ধাঁধার মত গোলমেলে লাগত ওদের কথাবার্তা। তবু যোগ দিত ওদের দলে। মানুষগুলোকে খুব মন্দ লাগত না। কতদিন উঠেও এসেছে আসর থেকে কোন একটা কাজের ছুতোয়, এই যা! বিকেলের জলখাবার তো বানানো হয়নি, চলি ভাই দিদি।

চলন্ত ট্রেনে মনে পড়ল সেই ঘোষালগিন্নির মুখ। ও'র ধ্যাবড়ানো সিঁথির সিঁদুর, গলায় কণ্ঠির মালা, বিষ্যুৎবারের নিরিমিষ আহার।...

অমায়িকও ছিল ঘোষালদিদি। এটা ওটা জিনিস দিয়ে প্রায়ই সাহায্য করত তাকে। হয়ত বাজার থেকে নুন আনা হয়নি, কিংবা পাঁচফোড়ন, দিদি পাঠিয়ে দিয়েছে তক্ষুনি। ভাল রান্নাবান্না করলে একলা খেতে পারেনি তাকে ফেলে। সেই মিনুর মার জন্যে মন কেমন করছে। আর ভাড়াটের আবার মানুষ নাকি! সৃষ্টির কাজ নিয়ে যখন হাবুডুবু খেত, তখন তারা আসত পরচর্চা করতে। সব সময় কি ভাল লাগে ওসব? চর্চারও তো একটা সময়-অসময় আছে।

ঝিঁঝি' ধরল পায়ে। টান করে মেলার উপায় নেই তবু। কাদের ট্রাঙ্ক, ঝুড়ির গাদা মেঝেয়। নজর পড়ল দিব্যেন্দুর ওপরে। তোফা ঘুম লাগিয়েছে বাঙ্কে বেডিং পেতে। মানুষটা একবার দেখলও না, তার ঘুমনের জায়গা হ'ল কি না! মাঝে মাঝে খুব স্বার্থপর মনে হয় স্বামীকে। সন্দেহ হয়, দিব্যেন্দু তাকে ভালবাসে কি বাসে না। তার কি এমন কেউ আছে যে ওর মন কেড়ে নিয়েছে? সেদিন তো স্পষ্টই জানতে চেয়েছিল, হ্যাগো, সত্যি করে বলব? তা গায়েই মাখল না সে। ঘর-ফাটানো হাসি হেসে বলল, পাগল নাকি?

ট্রেন দুলছে। দিব্যেন্দু দুলছে। গাড়ি-সুদ্ধ লোক আর শ্রীমতী। কিন্তু ও যতই উড়িয়ে দিক, শ্রীমতী কেন ওকে বিশ্বাস করতে পারছে না? দিব্যেন্দু কেন যেত তবে পুটুর মার ঘরে? বলত, যাই পুটুটার অংক দেখিয়ে দিয়ে আসি, বেচারির বাবা থাকে বিদেশে।

কোনদিন পুটুর মা এসে বলত, ঠাকুরপো, আমার হাতজোড়া ভাই। এই চিঠিটার একটা জবাব লিখে দেবে?

দিব্যেন্দু যেন কেমন গলে যেত। দিনরাত গুম হয়ে থাকা মানুষটার মুখে হাসি ফুটে উঠত।

শ্রীমতীর ভয়-ভয় করত পুটুর মাকে। মুখে কিছু বলতেও পারত না। রান্নাঘরে খুন্তি নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে ডাকত, ওগো! শুঁয়োপোকা ঢুকেছে পিঁড়ির তলায়, শীগগির এসো তো......

খিলখিল করে হেসে উঠেছে শ্রীমতী... স্বামী কাছে এসে দাঁড়াতেই। কি কথা হচ্ছিল পুটুর মার সঙ্গে? আমি শুনতে পাইনে?

ছিঃ ছিঃ! তুমি এত নীচ!

চাপা গর্জনে বলেছে দিব্যেন্দু। তখন শ্রীমতীর মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছে। মাথা তুলে তাকাতে পারেনি অনেকক্ষণ। অনেক রাতে যখন ঘরে গেছে, তখন দিব্যেন্দুর মাথার ত, —নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে সে। শ্রীমতীর প্রবৃত্তি হয়নি ওর পাশে গিয়ে শুতে। যে তাকে শ্রদ্ধা করে না, তাকে ও কিছুতেই ছুঁতে দেবে না। ঘোষাল-

কুকুরের মত স্নেহ নিয়ে টানাটানি করবে কেন? মেঝেয় মাদুর পেতে ও রাত কাটিয়েছে কতদিন। পরদিন আবার সেই নুন-তেলের হিসেব। কথা বলতে ইচ্ছে হয়নি, তবু যতক্ষণ সংসারে আছে, কথা বলতেই হয়েছে এবং হবে।

কত সুখী পাশের ঘরের ঘোষালদিদি। তার রাগ হলে মিনুর বাবা মান ভাঙায়। কত সাধাসাধি করে। মিনুর বাবা ঘর ছেড়ে নড়ে না বিকেলে আপিস থেকে ফিরে। শ্রীমতীর মনে হয়, সে যদি মিনুর মা হতো।

সামনের সীটের মাড়োয়ারীরা পান খেল, জর্দা খেল। খইনি টিপতে বসল কেউ। কেউবা চুরুট। কি সব বলাবলি করে হাসছিল তারা। ওর মনে হ'ল, পাঁচ-মিশেলী ভাষায় কথা বলছে ওরা। মাড়োয়ারী, হিন্দী, হাড়োতী ভাষার সংমিশ্রণ হয়ত। সে তো শুনেছিল দিব্যেন্দুর মুখে, রাজপুতনার লোকেরা নাকি হাড়োতী ভাষায় কথা বলে। ও ডেবডেবে চোখে চেয়েই রইল। কত রকমেরই যে লোক, আর কত রকমেরই তাদের ভাষা। ঘুরে ঘুরে সব দেশ দেখার সাধ হয় শ্রীমতীর। দিব্যেন্দু আগে দূরের প্রলোভন দেখাত। বলত : কাশী নিয়ে যাবে, হরিদ্বার, মথুরা। আর নিয়েছে!

শ্রীমতীর ঘুম এলো চোখে। তন্দ্রার ঘোরে মনে হ'ল, পিন্টুটা কাঁদছে। ওর বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল। পিন্টু কাঁদছে। সত্যি কাঁদছে? অন্তত দাদার জন্যে তো কাঁদবেই। আর বৌদি লোকটাও কি খুব খারাপ তার? দুর্ব্যবহার যদিও সে অনেক করেছে। আহা, মা মরা ছেলেটা! সে আর কোন-দিন খারাপ ব্যবহার করবে না। নাগরা-কোটায় গিয়েই চিঠি লিখবে তাকে। দিব্যেন্দু ওকে আরও ভালবাসুক। ওর সব অভাব পূরণ করুক। শ্রীমতী মোটেই বকবে না তাকে।

ও সন্দেহে তাকিয়ে দেখল ঘুমন্ত স্বামীকে। বেডিংয়ের ওপর থেকে ঢলে পড়েছে মাথা। বেচারীর কষ্ট লাগছে। রাজ্যির জিনিস রয়েছে ওতে। শ্রীমতী কি ওর মাথাটা তুলে নেবে কোলের ওপর? একটু আলতো স্পর্শ, আরাম? না থাক গাড়িসুদ্ধ লোক তাকিয়ে দেখবে বেহায়া স্ত্রীর কাণ্ড। মনে করবে কি?

মা দিব্যেন্দুকে বড় ভালবাসতেন। সে তো বলেছিল, ভায়ের সংসারে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে পড়ে না থেকে তাদের কাছে থাকতে। কিন্তু মা-ই তো আপত্তি করলেন। জামাইয়ের সংসারে থাকা? লোকে বলবে কি?

বাইরে ফুরফুরে বাতাস। এটাই কি বসন্তকাল? সব ঋতুর মধ্যে নাকি এই কালটাই সুন্দর। তাদের বিয়েও তো হয়েছিল এ সময়। এই ফাল্গুনে পুরো হ'ল দশ বছর। ষোলো বছরে বিয়ে হয়েছিল তার। আর আজ ছাব্বিশ। তা হলে দিব্যেন্দুর কত হল'? প্রায় ছত্রিশ। সেকি! ওযে বুড়ো হয়ে গেল!

নিশাচরের মত আকাশে উড়ছে কি এক পাখি। রাত কত হ'ল? বোধ হয় বারোটা। ওদের বিয়ের লগ্নও ছিল এমনি গভীর রাতে। কত দরদ নিয়ে হাত ধরেছিল তার দিব্যেন্দু। ছাদনাতলায় বসে ঘোমটার আড়ালে চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছিল দুজনের। লজ্জায়, আশঙ্কায় ওর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল। কেমন লোক, কে জানে। খানিকটা পরেই বাসরঘরে টের পেয়েছিল, পতি-দেবতাটি খারাপ নয়। তখন দিব্যেন্দুর চোয়াড়ে মুখটাকেও কোমল মনে হল। জোড়াভুরুর নীচে ছোট ছোট চোখ দুটোও সুন্দর।

বিয়ের পরের দিনগুলো। বউবাজারের কানাগলির মধ্যে টেনে তুলল দিব্যেন্দু। স্যাঁতসেঁতে আলো-বাতাসহীন ঘর। প্রথম প্রথম খাপ খাওয়াতে পারত না। পাখি-হাটির মাঠ, ঘাট পুকুরের জন্যে কান্না পেত তার। পাড়াগাঁয়ের খোলা হাওয়ায় যে মানুষ, তার ভাগ্যে বৌবাজার সইবে কেন?

ফাটা শিলিংয়ের মধ্যে দিয়ে জল পড়ত বৃষ্টির রাতে। জলে ভেসে যেত ঘর। বিছানা গুটিয়ে সারারাত বসে থাকত দুজনে। সকালে উনুনে আঁচ দিতে গেলে ভ্যাপসা ধোঁয়ায় ছাড়ত গন্ধ। তবু যেন অভাবকে অভাব বোধ হত না।

সেদিন হারিয়ে গেল কেন? যদি আবার ফিরে আসে, তবে বেশ হয়।

শ্রীমতীর মনে হ'ল, আমি ভাল ঘর চাইনে। বেশী পয়সা চাইনে। যদি দিব্যেন্দুই না আগের মত থাকে!

নিশুতি রাত। সমস্ত কামরা ঘুমে অচৈতন্য। ট্রেনের গতির একটানা শব্দ। শ্রীমতীর মন পাখি হয়ে উড়ে গেল। ও যেন অনেক বছর আগের সেই ঘোমটা-টানা নতুন বউ। নাগরাকাটার নির্জন শহরে দিব্যেন্দুকে একলা করে কাছে পাবে। ওখানেতো তার এত বন্ধু থাকবে না। শ্রীমতী ভাবল, পোড়ারমুখী পল্টুর মা আর নাগাল পাবে না। একরে সে জব্দ।' ওর সারা মন, চেতনায় গভীরে রইল দিব্যেন্দু। ও অপলকে চেয়ে রইল স্বামীর দিকে। ও কি চায় বুঝতে পারল না। এখন গাড়িসুদ্ধ লোক তাকালেও সে চেতনা হারাবে। ও কাউকে দেখতে পাবে না। শ্রীমতী আচ্ছন্নের মত উঠে স্পর্শ করল স্বামীকে। চুলের সেই পুরনো গন্ধ, চোখে হাত ঢেকে ঘুমনোর সেই চেনা ভঙ্গি।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল দিব্যেন্দু, কি ব্যাপার?

শ্রীমতীর কাঁপা কাঁপা স্বর। মোহ কাটেনি তখনও। বলল, সমস্ত রাতটাই তো ঘুমোতে ঘুমোতে যাবে, এসো না একটু গল্প করি?

দিব্যেন্দু ঘুম ঘুম, লাল চোখে তাকাল। বলল, ঠাট্টা করছো?

তারপরই চোখ বুঁজল আবার।

শ্রীমতীর মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করল। ধপ্ করে বসে পড়ল নীচে। বুকের মধ্যেটা শূন্য মনে হল। ও যেন বেঁচে থাকার মানে হারিয়ে ফেলল আবার। কোথায় চলেছে? কিসের আশায়? সুখের? বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। তখন মনে হ'ল বঞ্চক দিব্যেন্দু। ফাঁকির বোঝা কুড়িয়েছে শ্রীমতী। দিব্যেন্দু তাকে কিছু দেয়নি। শুধু শুষ্ক কর্তব্যই করেছে। স্ত্রীকে সমস্যার কথা বলতে আসেনি কোনদিন। তাকে ভাবনার ভাগ দেয়নি। স্ত্রীর মনের দিকে চেয়ে দেখেনি কি চায় সে! তখন ওর মনে পড়তে লাগল কতদিনের কত তুচ্ছ ঘটনা—পিল্টু, পিল্টু, এই টাকাগুলো রাখ্। দেখিস্ তোর বউদি যেন বাজে খরচা না করে।

ঘুম ভাঙল দিব্যেন্দুর। বোধ হয় সিগারেটের নেশায়। গাড়ি থেমেছে কোন এক বড় জংশনে। জিজ্ঞেস করল, চা খাবে? তিনপাহাড় স্টেশনের চা খুব বিখ্যাত।

শ্রীমতী বলল, না।

দিব্যেন্দুর মুখে কোন ভাবান্তর নেই। জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে ডাকল চা-ওয়ালাকে। এক ভাঁড় চা নিঃশেষ করে শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, ট্রেনে চাপলে তুমি তো বেশ জেগে থাকতে পারো?

শ্রীমতী নিরুত্তর।

তুমি তো এই লাইনে এই প্রথম আসছ না! ব্রডগেজের লাইন তো তাই খুব জোর চলছে ট্রেনটা। কাল শিলিগুড়ির পর থেকে শুরু হবে মিটার গেজ।

শ্রীমতী তবু বোবা। ওর কানে বাজছে দিব্যেন্দুর কথা। অবান্তর প্রশ্ন আর প্রগলভতা। কিছু সময় আগের আচরণ থেকে এখন কি তফাত। সে তাকে খুশী করতে চাইছে কেন? ওর খুশিতে তার

কি এসে যায়? সহানুভূতি, দয়া অনেক হয়েছে, আর নয়।

উত্তর না পেয়ে হাই তুলতে তুলতে ঘুমিয়ে পড়ল দিব্যেন্দু। আশ্চর্য! কত কম ওর অনুভূতি!

সামনের সীটের মাড়োয়ারীরা দাবা খেলছে। হাতী, ঘোড়া, কিস্তিমাৎ দিয়া...

শ্রীমতীর চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে দাবার চালে চালে। ...প্রমোসন হ'ল ওর। কত টাকা মাইনে বাড়ল কে জানে! বন্ধুমহল অবশ্য জানাবে। সেখানে নাম কিনবে রেস্তোরাঁয় খাইয়ে। আর সে কিছু চাইলেই বলবে, মনে রেখ তুমি কেরানীর বউ!

কিন্তু নিত্য নতুন ফাইফরমাশ. খাবারের ফিরিস্তি যোগাতে হবে স্ত্রীকে। হয়ত মশলার কৌটোয় মশলা থাকবে না। তেলের টিন ঠন্ ঠন্। তখন অনেক কষ্টে জমানো পয়সার ঘটটাকেও ভাঙতে হবে। স্বামীর বায়নাকে যে সে ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

শ্রীমতী বিপর্যস্ত মন নিয়ে দেখতে লাগল জুয়োচুরির খেলা। কিস্তী মার দিয়া...হ্যাঁ শ্রীমতীও তো অনেক কিস্তী মারতে পারত। রেলের চাকরির মত সুখ আবার আছে নাকি! লোকে তো বলে ভাল হয়। ভালোমানুষ স্বামীটি তার! ঘুষ খায় না। আফিম, মদ, চোরাই মাল পেলে সোজা ধরিয়ে দেয়। আপিসে নাম হয়। এদিকে পয়সার অভাবে সংসারে নানা অসুবিধে হয় যদিও। উদার! মহৎ!

ও জ্বলন্ত চোখে দেখল স্বামীকে। তারপর বাইরের আকাশের তারা দেখতে দেখতে কখন নিবেও গেল।

ট্রেন চলছে ঘটাং ঘটাং। শ্রীমতী ঢুলছে। পুটের মা শাঁখা পরিয়ে দিয়েছিল কালী-ঘাটে। বলেছিল, এসব দরকার। এয়োতির চিহ্ন।

ভোর হয়ে আসছে। পানকৌড়ি বকের সারি খালের জলে। ভোরের নরম বাতাস ঘুমের আমেজ আনছে। ওর ঘুম আসছে। চোখ ভেঙে ঘুম আসছে। ট্রেন চলছে তো চলছেই। এর যেন বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। চারদিকের দৃশ্য, প্রকৃতি সব কেমন অচেনা। তাদের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল দিব্যেন্দু। ও অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখল স্বামীকে। মনে হ'ল, কোনদিন দেখেনি, কোন্ এক অচেনা আগন্তুক যেন।

অকস্মাৎ সংবাদ পাওয়া গেল, বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে সরিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার পদত্যাগপত্র প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গৃহীত হইয়াছে।—"সংবাদটা অকস্মাৎ

পাওয়া গেলেও ব্যাপারটা আকস্মিক নয়; এটা যে অন্তর্বিষয়ক হিন্দী-প্রেম-প্রসূত তা আমরা জানি এবং জানি এতে আঘাত আছে, নেই কো অবহেলা"—বলেন খুড়ো।

পশ্চিমবঙ্গে চূড়ান্ত খাদ্য সংকট দেখা দিয়াছে; এই সময় কেন্দ্রের সাহায্য পাওয়া না গেলে রেশনিং ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইবে এবং বাংলা এক ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হইবে। এই সম্পর্কে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা বারবার দিল্লীতে গিয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু মনে হয়, এই সহজ ব্যাপারটা বোঝাইতে পারেন নাই। সহযাত্রী বলিলেন—"ভবিষ্যৎ আলাপ-আলোচনা হিন্দীতে করে দেখুন তা হলে হয়ত সহজেই বোধগম্য হবে।"

খাদ্য সম্পর্কে সর্বশেষ আলোচনার পর কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম নাকি বলিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্য দেওয়া সম্পর্কে তিনি তাঁর "লেভেল বেস্ট" চেষ্টা করিবেন। সহযাত্রী বলিলেন—"লেভেল ক্রসিং-এর দুর্ঘটনা অনেক সময় ভয়াবহ হয়, এককালীন রেলমন্ত্রী তা নিশ্চয়ই জানেন॥"

সংবাদে শুনিলাম, ১১ সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবিত হরতাল অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। অন্য সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা ভেবে রেখেছিলাম, এক দিনের ছুটিতে কাঁথি গিয়ে আট আনা কিলোতে রুই মাছ কিনে আনন্দ করা যাবে, হরতাল বন্ধের প্রস্তাবে সব ভেস্তে গেল॥"

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম, পশু-পাখিরাও নাকি তাদের খাদ্যের অভ্যাস পরিবর্তন করিতেছে। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু মুশকিল হল, মানুষ আমরা নহি তো মেষ।"

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপর জোর দিয়াছেন।—"কিন্তু অক্ষরজ্ঞান কী ভাষায় হবে সে সম্বন্ধে তিনি কোন জোর দেন নি"—বলেন বিশুখুড়ো।

কলিকাতায় সম্প্রতি ষাঁড়াষাঁড়ির বান আসিয়াছিল।—"কিন্তু সেটা নেহাত জলো বান। রাঁচীতে সম্প্রতি ষাঁড়াষাঁড়ির ভাষা-বানে অনেককেই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

এক সংবাদে প্রকাশ, পুজোর কাপড়ের এক কোটি টাকার অর্ডার বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।—"পুজোর কাপড়ের গোটা অর্ডারটা বাতিল করে দিলে ছাপোষা মানুষরা যা দেবী সর্বভূতেষু বিবস্ত্রে সংস্থিতা বলে নমস্তস্যৈ করতে পারতেন"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

সংবাদে শুনিলাম, যোজনা দফতর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরার তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন

—"শ্রীমতী ইন্দিরা এই দফতরের ভার নিজের হাতে না নিলে ভালো করতেন, অন্তত একজন বেকারের একটা হিল্লে হত॥"

জঙ্গল হইতে মিশ্রসার প্রস্তুতের ব্যবহার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল। শ্যামলাল বলিল—"খুব ভালো কথা; তবে সার প্রস্তুতের কারখানাটা ফুটপাথ বা তার পার্শ্ববর্তী স্থানে স্থাপন করলে অনেক ল্যাঠাই চুকে যায়॥"

জয়পুরে একটি কল্পতরু আবিষ্কৃত হইয়াছে। সংবাদে বলা হয়েছে, এই বৃক্ষটি নাকি পাণ্ডবরা রোপণ করিয়াছিলেন।—"আগামী বন-মহোৎসবে এই বৃক্ষের চারা অভাবে কলম রাজ্যে রাজ্যে

রোপণ করে দিলে অতি সহজেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়"—বলে শ্যামলাল।

প্রোটিনের অভাব এবং অপুষ্টির সমস্যা অবিলম্বে মিটাইতে না পারিলে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের "বামন দশা" প্রাপ্তির আশঙ্কা আছে।—"তাতে কোন ক্ষতি বলে ত মনে হয় না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, কাক খুব বুদ্ধিমান বলেই সকালে উঠে তাকে...খেতে হয়"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

কালিকট হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে কোন পাউরুটির কারখানার মালিককে তাঁর এক মহিলা কর্মীর সঙ্গে ঘেরাও করিয়া শেষ পর্যন্ত ঐ মহিলাকে বিবাহ করিবার জন্য উক্ত মালিককে বাধ্য করা হয়।—"কারখানার মালিকরা অবহিত হোন, লক-আউট চলবে না, ওয়েডলক-এর কথা ভাবুন"—মন্তব্য করেন সহযাত্রী।

শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত বলিয়াছেন—হঠাৎ রেশন কাটা উচিত হয় নাই। সহযাত্রী বলিলেন—"ঠিক বলেছেন, ক্যাচা-ক্যাচা করে মারলেই ঠিক হত॥"

সংবাদে শুনিলাম, মাছের লাইসেন্স খারিজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।—"দামের লাইসেন্স আগেই বাতিল হয়েছিল, এখন আমদানির লাইসেন্সও গেল। অতঃপর মৎস্য ভক্ষণের ওপর লাইসেন্স হলেই আইনের অস্তিত্বের খানিকটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে"—বলে শ্যামলাল।

রেঙ্গুনে একটি দেড় মাসের শিশুর উপর অস্ত্রোপচারের ফলে দেখা গেল, তার গর্ভে একটি শিশু রহিয়াছে।—"এটা যদি শেপ অব থিংস টু কাম হয়ে থাকে তা হলেই তো কর্মচারিত্ব"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

কলকাতার ডায়েরি

কুমারটুলিতে ধুম নেই, শালিমারে কাপড়ের পাহাড়, ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে বাড়তি বোনাসের দাবি, হাওড়া-শেয়ালদায় টিকিট বিক্রির নয়া কাউণ্টার, 'মহা উপন্যাস' সম্বলিত মাসিক-দৈনিকের বিশেষ সংখ্যার বিজ্ঞাপন—সব মিলিয়ে অনবরত কানের কাছে কে যেন জানান দিয়ে যাচ্ছে পুজোর আর দেরি নেই, এক মাসও না।

এখানে কাশফুল ফোটে না, শিউলির সাক্ষাৎও কদাচিৎ, তবু গত কয়দিন থেকেই বাতাসের গতিক যেন অন্য রকম। রোদ মিঠেমিঠে, বাতাসেও পাগলামি। রাতের বেলা ময়দানে কুয়াশার একটু একটু ছায়া এবং সাদা মেঘের ঘষা খেয়ে খেয়ে পোড়া আকাশটাও ঈষৎ নীলচে। অর্থাৎ একদিকে ছুটির বাঁশি বাজতে শুরু করেছে, অন্যদিকে পুজোর ঢাক কাঁধে নেবার জন্যে সারা কলকাতা তৈয়ার। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেরা চাঁদার খাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে, কাপড়ের দোকান আর ছাপাখানার কর্মীরা ইতিমধ্যেই গলদঘর্ম এবং ডেকরেটারের দোকানে বায়না দেওয়া শেষ।

এতো গেল বাইরের দিক। প্রতিবারের মত এবারও কয়েকটি মামুলি কথা শোনার জন্যেও কলকাতাবাসীরা এখন থেকেই তৈয়ার হোন। প্রত্যেকটি কাপড়ের দোকানে ভিড় আর ভিড়, তবু প্রত্যেক দোকানীর মুখে শুনবেন 'এবার তেমন বিক্রি নেই, গতবার যা হয়েছিল, এবারও তা না।—

কেন ?—

"কেন জিজ্ঞেস করছেন কেন বুঝতে পারছি না, লোকে খেতে পাচ্ছে না কাপড় কিনবে কী করে মশাই ?"—

কথাগুলো যেন টেপ রেকরডারের, গত দশ বারো বছর ধরে একই কথা শুনে আসছি এবং হলপ করে বলতে পারি আগামী পুজোর বাজার না আসা পর্যন্ত এ বছরের পুজোর বাজারে মন্দা চলবেই।

দ্বিতীয় মামুলি ব্যাপার হল পুজোর খরচে কৃচ্ছ্রসাধন। যে-কোন বারোয়ারীর পুজোয় যান, শুনবেন সবাই বলছেন—"না মশাই এবারে আমরা খরচ কমাবোই, ভেবেছি মেদিনীপুরের বন্যার্তদের জন্যে কিছু টাকা পাঠাব বাজে খরচ না করে।"

উত্তম প্রস্তাব, এবং এই ধরনের উত্তম প্রস্তাব প্রতিবারই শুনি। কখনও বন্যা, কখনও খরা এদেশে এ সময় প্রতিবারই একটা না একটা অঘটন লেগেই থাকে এবং প্রতিবারেই পুজো কমিটি 'অসটারিটি-কাট'-এর সিদ্ধান্ত নেয়। কিছু টাকা ওই বাবদে যায়ও, কিন্তু প্যাণ্ডেল, জলসা আর জৌলুসের বহর একেবারেই কমে না। চাঁদার হারও বাড়ছে বই কমছে না।

বছর বছর একই জিনিস চলছে। বরং দেশের দুর্দশার কথা ভেবে পুজো কমিটি-গুলো যদি এবারে চাঁদার হার কিছু কমাতেন, তাহলে খাদ্য সমস্যায় জর্জর নগরবাসী কিছুটা 'আসান' পেত। বন্যার্ত বা খরাপীড়িতদের দেখার জন্যে সরকারের ত্রাণ দপ্তর অন্তত আছে, মধ্যবিত্ত নাগরিক-দের দেখার যে কেউ নেই।

*

আমার বন্ধু টম ওকেলো এখন কেনিয়ার সহকারী অর্থমন্ত্রী। বছর পনের আগে অর্থনীতি পড়তে সে যখন এদেশে আসে, স্তম্ভিত হয়েছিল একটি ব্যাপারে; বলেছিল, "তোমাদের রেল এক অসাধারণ ব্যাপার। হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে আমার চক্ষু চড়ক গাছ, ট্রেনের পর ট্রেন আসছে যাচ্ছে, যে লাইনে যেটি যাবার ঠিক সেই লাইনে। এবং গোটা ইণ্ডিয়া জুড়েই এই কাণ্ড চলছে। তাছাড়া ভাড়াও কত শস্তা।"

ওকেলোর পর আর একজন বিদেশীকে দেখলাম ভারতীয় রেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে। ওকেলো না হয় আফরিকার লোক, এই বিদেশী, থুড়ি বিদেশিনীর নিবাস আমেরিকা। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এদেশে আপনার কী সবচেয়ে ভাল লেগেছে ? – তৎক্ষণাৎ জবাব—"ট্রেন।"—

"আপনি বোধ হয় এয়ার কণ্ডিশন কোচে ঘুরেছেন, তাই—।"

"না না-না"—আমার কথা শেষ হবার আগেই বিদেশিনী বললেন, "থার্ড ক্লাস স্লিপারেই আমি চড়েছি। বিশ্বেস করুন,

আপনাদের স্নেহের তুলনা নেই।"

বিদেশিনীর নাম আলেকজানন্দ্রা ক্লোজ, সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন, বয়স তেইশ চব্বিশ। খুব মিশুকে, এবং টুকরো খবর দিতে-নিতে দারুণ আগ্রহ। কেন না একে মার্কিনী তদুপরি সাংবাদিক—হংকংয়ে একটি কাগজের সঙ্গে যুক্ত।

তবে বিদেশী পর্যটকরা যেমন কলকাতার নাম শুনেই ভয় পান, ঘটনাচক্রে এসে পড়লে নাক কুঁচকে থাকেন, শ্রীমতী ক্লোজ তার ব্যতিক্রম। কলকাতা তাঁর ভাল লেগেছে, ভাল লাগে। তিন বছর আগে একবার ঘুরে গেছেন। এবার হংকং থেকে উড়ে চলে যাবার কথা ছিল তানজানিয়া। হঠাৎ প্ল্যান বদলে নেমে পড়েছেন এখানে।

কলকাতা কেন ভাল লাগে? প্রশ্নের জবাবে শ্রীমতী জানালেন, "কলকাতা ভয়ানক জীবন্ত, রাজনীতি নিয়ে খুব মাথা ঘামায়। অথচ জীবন থেকে গান, ছবি, সাহিত্য ছেঁটে ফেলেনি। দুঃখের কথা কী, বিদেশে ভারতীয়রা যেন কলকাতার কথা তুলতে সংকোচ বোধ করে। যেমন করে অতিথির চোখের সামনে থেকে বাড়ির দামাল ছেলেকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা হয়! এটা নিরর্থক লজ্জা।"

আলেকজানন্দ্রা শাড়ি পরে এসেছিলেন আমাদের অফিসে। আমার এক বন্ধুপত্নী এর মূলে। ওই পোশাকে একেবারে অনভ্যস্ত অবশ্য উনি ছিলেন, তা নয়। কিন্তু বাঙালী মেয়ের মত করে শাড়ি আগে কখনও পরেন নি। ওঁর খুব ইচ্ছে ছিল মাটিতে বসে বাড়ির রান্না খাব। আমন্ত্রণ পেয়ে তাই খুশীও হয়েছিলেন। শেষে কিন্তু বন্ধু বন্ধুপত্নী মিলে তাঁকে নিয়ে তুললেন এক হোটেলে।—"এটাও বাঙালী তথা ভারতীয়দের একটা বৃথা লজ্জা। হোটেলে খেয়ে বিদেশীর পেট নিশ্চয় ভরে। কিন্তু মন ফাঁকা থেকে যায়। আমার চেনা অন্য এক ভারতীয় মিসেস্ অমুককে বলেছিলাম, বাড়িতে না খাওয়াও, তো খাইও না, কিন্তু তোমার রান্নাঘর দেখাও। শুনে তিনি মূর্ছা যান আর কী। অথচ দেখলাম, সুন্দর সাজানো কিচেন। গ্যাস রয়েছে, কয়লার উনুন রয়েছে, কেরোসিন স্টোভ রয়েছে। তার উপর আছেন একজন রাঁধুনি। শুনে আমাদের ওকল্যান্ডের যে কোনও গিন্নি হিংসায় জ্বলে যাবেন।"

"ভাল কথা। কলকাতার গোলমালে কষ্ট হয় না?"

"গোলমাল! সে আর কী দেখাচ্ছেন? গোলমাল যদি সত্যি শুনতে চান, টেপ রেকরডার নিয়ে হংকং চলে আসুন। এনি ডে অব্ দ্য উইক!"

*

কলকাতা ময়দানের দুটি চিত্র। পাউরুটির জন্যে মানুষের দীর্ঘ লাইন, পাশেই ভেড়ার পাল। ভেড়ার দলের সামনে অঢেল খাবার, ঘুরছে ফিরছে মুখে তুলছে, ফেলে দিচ্ছে। আশ্চর্য, প্রকৃতির রাজ্যে এখনও খাদ্যের অভাব নেই, সব অঢেল, আর মানুষের রাজ্যেই খাবার নিয়ে যত ঠেলাঠেলি, মারামারি!

—চাণক্য

শিল্প বিকাশর রীতিপ্রকৃতি

শিল্পোন্নয়ন প্রক্রিয়ার কোনো আরম্ভ অথবা শেষ নেই। তবু কোনো কোনো শিল্পোন্নয়ন প্রক্রিয়ার কোনো আরম্ভ অথবা শেষ নেই। তবু কোনো কোনো স্থান অন্যগুলির চাইতে ঐ প্রক্রিয়ার আরম্ভ-বিন্দুর কাছাকাছি। যদিও সব আদিম সমাজে হস্তশিল্প দেখা যায় এবং সেগুলি আধুনিক কারখানাশিল্পের বিকাশের পরও টিকে থাকে, ঐসব শিল্প বৈষয়িক অগ্রগতির অভীষ্ট হতে পারে না। আধুনিক কারখানা বহরের শিল্পোন্নয়নকে সাধারণত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সমার্থক ধরা হয়।

যেসকল দেশে বেসরকারী ব্যবসায়ীরা শিল্পে বেশীর ভাগ মূলধন নিয়োগ করে এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণহীন খোলা বাজারে চাহিদার অধিকাংশ উৎপন্ন হয় সেখানকার শিল্পোন্নয়নে একটা বিশেষ ছাঁদ লক্ষ করা যায়। বেশীর ভাগ অনগ্রসর দেশ এই পর্যায়ে পড়ে। শিল্পবিকাশের সনাতন রীতি-প্রকৃতি হচ্ছে এক দিকে মানুষের চাহিদার সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য এবং অন্য দিকে আভ্যন্তরিক উপাদানরাশি থেকে উৎপাদন করে সমাজের সেই চাহিদা মেটাবার ক্ষমতার প্রতিফলন। মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন পূরণ করার তাগিদে প্রথম শিল্পগুলি যে গড়ে উঠেছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আবশ্যক ভোগ্যসামগ্রী

কোনো দেশ আধুনিক শিল্প-উৎপাদনের স্তরে প্রবেশ করলে সাধারণত তিন রকমের শিল্প গড়ে ওঠে : আবশ্যক ভোগ্যসামগ্রী, নির্মাণকর্মের জন্য মূলধন-দ্রব্য এবং প্রাকৃতিক উপাদান রপ্তানির শিল্প। প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের ভেতর খাদ্য উৎপাদন এবং বয়নশিল্পসমূহ স্বভাবত সবচেয়ে আগে স্থাপিত হয়। ময়দা, চিনি, চা, বনজ তৈল প্রভৃতির কল জনগণের একটা বড়ো অংশের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে থাকে। কাপড়-চোপড়ের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে বয়নশিল্প—সচরাচর প্রথমে সুতো কাটা, পরে কাপড় বোনা এবং বিছানার চাদর, কম্বল, তোয়ালে প্রভৃতি তৈরি করার কারখানা বসানো হয়।

আবশ্যক ভোগ্যসামগ্রীর কোথায় শেষ ধরা হবে এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের কোনখানে আরম্ভ তা বলা সহজ নয়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবশ্যক দ্রব্যের মধ্যে বাইসাইকেল, হ্যারিকেন লণ্ঠন, বৈদ্যুতিক পাখা, রেডিয়োর মতো স্থায়ী ভোগ্যপণ্য আছে। এইসব জিনিসের জন্য চাহিদা স্পষ্টত জাতীয় আয় বণ্টনের উপর নির্ভরশীল। শিল্পোন্নয়নের গোড়ার দিকে দেশের পক্ষে আভ্যন্তরিক শিল্প স্থাপন করে (অর্থাৎ আমদানির উপর নির্ভর না করে) ঐ চাহিদা মেটানো কদাচিৎ সম্ভব। কি ধরনের আবশ্যক ভোগ্যদ্রব্যশিল্প সর্বপ্রথম গড়ে তোলা হবে তা নির্ভর করে দেশের কৃষি ও জলবায়ুর উপর। যেসব দেশে (যেমন ভারতে হয়েছিল) কার্পাস তুলো উৎপন্ন হয়, সেখানে অন্যান্য শিল্পের চাইতে আগে কার্পাসবস্ত্রের কারখানার উদ্ভব হবে।

শিল্পোন্নয়ন ও নির্মাণ-কর্ম

মূলধনদ্রব্যশিল্পের প্রথম পর্যায় হচ্ছে নির্মাণ। উন্নয়ন বলতে রাস্তা, বন্দর, বাসগৃহ থেকে জলসেচ প্রকল্প ও বিমানবন্দর সব রকমের নির্মাণকার্যের সম্প্রসারণ বোঝায়। নির্মাণ-কর্ম থেকে যে চাহিদার উৎপত্তি হয় তা সাধারণত শহর সংক্রান্ত : বস্তুত, শহর অঞ্চলে নির্মাণকার্যের প্রসার ছাড়া উন্নয়ন খুব কম দেখা যায়।

শিল্প বিকাশের শুরুতে আরো এক ধরনের শিল্প গড়ে ওঠে : প্রাকৃতিক উপাদান রপ্তানি করে বিশ্বের বাজারে বিক্রির জন্য শিল্পসমূহ। দৃষ্টান্ত হিসাবে, তৈল, খনিজ পদার্থ এবং কাঠের কথা বলা যেতে পারে। মূলধন ও পরিচালনা-ক্ষমতা বাইরে থেকে এনে ব্যবহার করা যায়। রপ্তানিকারী দেশ

কাজের সংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন, কর থেকে সংগৃহীত আগম হতে লাভবান হয়ে থাকে। ভারতের ক্ষেত্রে এই ধারায় শিল্পের প্রসারের সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ।

সম্প্রসারণের সূত্র

দেখা যাচ্ছে, শিল্পোন্নয়নের গোড়ার দিকে ভোগ্যদ্রব্যশিল্পগুলি কৃষিজাত কাঁচা-মালের মুখাপেক্ষী; মূলধনদ্রব্যশিল্প এবং প্রাকৃতিক উপাদান রপ্তানির শিল্পসমূহ খনিজ প্রভৃতি পদার্থের উপর নির্ভরশীল নৈতিক ও উৎপাদন পদ্ধতির দিক থেকে বর্তমান কারখানাগুলির কাছাকাছি নতুন কলকারখানার ক্রমিক সংযোজন। তৃতীয়ত, উপযুক্ত সময়ে বহিরাগত নতুন শিল্পের উদ্ভব, যার সাধারণ নমুনা হচ্ছে দেশে প্রথম কাগজ তৈরির কল অথবা প্রথম রাসায়নিক সার উৎপাদনের কারখানার জন্ম।

ভালোভাবে নির্বাচিত হলে শেষোক্ত শ্রেণীর প্রকল্পগুলি সোজাসুজি এবং লম্বালম্বি সম্প্রসারণ সূত্র অনুসারে কালক্রমে
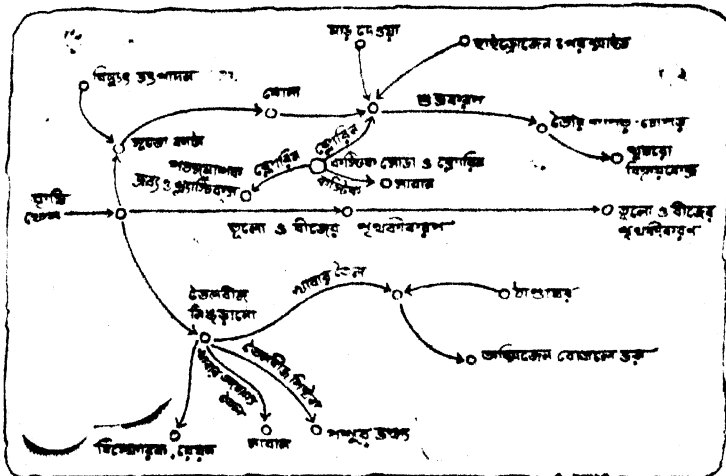
কার্পাস বস্ত্র শিল্পে সামনে ও পিছনের দিকে কাজকর্মের প্রসার

(কাঠ একটা প্রধান ব্যতিক্রম)। শিল্পের সম্প্রসারণ সাধারণত তিন ভাবে হয়ে থাকে। প্রথমত, উপস্থিত কারখানাগুলির সোজা-সুজি সংখ্যা বৃদ্ধি—যেমন দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ সুতো কাটার অথবা চিনি উৎপাদনের কল স্থাপন। দ্বিতীয়ত, অর্থ-আরো শিল্পসমৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে। ভারতের মতো দেশে শিল্পের বিকাশ কি-ভাবে শুরু হয়েছে তা কার্পাসবস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে সামনে ও পিছনের দিকে পর পর গ্রথিত শিকলের আকারে প্রসার থেকে বোঝা যাবে।

শান্তিকুমার ঘোষ

নারী ও নগরী

বিক্রমাদিত্য

নারী এবং নগরী, এই নিয়ে বেয়রুট। মধ্য প্রাচ্যের প্যারী, ঐশ্বর্যের লস ভেগাস, জীবনের ক্লান্তি মেটাবার পান্থশালা।

রূপ এবং রূপা, দুই-ই পাবেন বেয়রুটে। আরব সুন্দরীর মেলা বসেছে রাস্তার দুই প্রান্তে। সেই রূপ আপনার মন ও প্রাণকে দগ্ধ করবে। প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে আপনার মনে হবে যে হুরীর দেশে এসেছেন।

চলুন আমার সঙ্গে বেয়রুটে। বহু দিনের পুরানো বাসিন্দা আমি। শহরের অলি-গলি আমার নখদর্পণে। সবার সঙ্গে আমার পরিচয়, বন্ধুর অন্ত নেই। তাই আমার সঙ্গে আসতে কোন সংকোচ করবেন না।

আকাশের বুক ভেদ করে তীব্র গর্জন করে বোয়িং প্লেন যখন বেয়রুটের বিমান বন্দরে নামল তখন আমি গাইডের ব্যাজ পরে কাস্টমস শেডে আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করছি।

মরহবা—আপনিই বিক্রমাদিত্য? আমি প্রশ্ন করি। আপনার সঙ্গে তো আগে কখনও দেখা হয় নি। তাই বাধ্য হয়ে লজ্জা দ্বিধা ভেঙে আপনাকে এই প্রশ্ন করি। বেয়রুট আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। প্রতি মুহূর্তে প্লেন নামছে-উঠছে। প্লেনের তীব্র গর্জনে আপনার জবাব আমার কানে এসে পৌঁছয় না। কিন্তু আমি ভুল করিনি। কারণ আমি জানি আপনিই বিক্রমাদিত্য। সাহিত্যিক ও জার্নালিস্ট।

'আপনি কুক কোম্পানীর গাইড?' আপনি প্রশ্ন করেন।

'ঠিক ধরেছেন। চলুন আমার সঙ্গে।'

আমার মুখে তখন কথার খই ফুটছে। বলতে থাকি: বেয়রুট। লাভলি সিটি। কী আশ্চর্য! ভিসা করেন নি। ভয় পাবেন না। এক মুহূর্তেই আপনার ভিসা করে দিচ্ছি। দিন পাঁচ লিরা। মানে ভারতীয় দশ টাকা। এখনও ট্রাভেলার্স চেক ভাঙান নি। চিন্তা করবেন না। আপনার বিলে যোগ করে দেবো।

'ভিসা হয়ে গেলো। কোন ঝামেলা নেই। কেউ আপনাকে কোন প্রশ্ন করবে না। তারপর চলুন কাস্টমসে।

মরহবা: আমি কাস্টমস ইনসপেক্টরকে সেলাম ঠুকে বললুম। তারপর আপনার স্যুটকেস দুটোকে কাস্টমস অফিসারের পাশে এগিয়ে দিলুম।

বিক্রমাদিত্য, জার্নালিস্ট। 'আপনি জার্নালিস্ট?' এই কথায় সুনাম সঙ্গে সঙ্গে কাস্টমস অফিসার সচকিত হয়ে ওঠে। কারণ এই যে, বেয়রুট নগরী দেখছেন, এই শহরে পঞ্চাশটি দৈনিক সংবাদপত্র আর হাজারের উপর জার্নালিস্ট। ভাবছেন মাত্র পনেরো লাখ লোকসংখ্যার জন্যে এতোগুলো দৈনিকের প্রয়োজন কিসের? শুনুন, আপনাকে একটি গোপনীয়, অতি গোপনীয় কথা বলছি। খবরদার আপনার দেশবাসীকে, বিশেষ করে আপনার সাংবাদিক ভাইদের এই গোপন কথাটি কখনই বলবেন না। ভাবছেন শুধুমাত্র পঞ্চাশটি সংবাদপত্র এই বেয়রুট নগরীতে?

কী যে বলেন। পঁচাত্তরটি সাপ্তাহিক আর মাসিকের কথা নাই বা বললাম।

যাক, এবার আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এতোগুলো সংবাদপত্রের প্রয়োজন কোথায়, এর পাঠক কোথায়? কিন্তু ভুলবেন না। বেয়রুট হল মধ্যপ্রাচ্যের সুইটজারল্যান্ড। এখানে বিপ্লব হয় না, রাজত্বের অদল-বদল নেই। অশান্তির চিহ্নও দেখতে পাবেন না। আর ছাত্র বা শ্রমিক ধর্মঘট। অসম্ভব। রাস্তার কাফেতে বসে ছাত্ররা মেয়ে বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করছে। আর অফিস ছুটি হয়ে গেলে দল বেঁধে সবাই সিনেমা দেখছে। সবাই চায় শান্তি। আর পুরো শান্তি

বেইরুটের একটি বিপণন কেন্দ্র। আমদানী করা জিনিসই মূলত এখানে বিক্রী হয়। সাইন বোর্ড লেখা ফরাসী ও আরবী ভাষায়

যাছে বলেই এখানে সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতা কি সামান্য স্বাধীনতা! আপনার নামে দুর্নাম অভিযোগ রটলেও কিংবা যদি ব্ল্যাকমেলিং করা হয় তাহলেও আপনি কিছু করতে পারবেন না। কোর্টে যেতে পারেন। কিন্তু কেসের মীমাংসা হতে প্রায় কুড়ি বছর লাগবে। আর কোন জার্নালিস্টের বিরুদ্ধে কেউ রায় দেবে না। কারণ, এখানে জার্নালিস্টের দারুণ প্রতিপত্তি। আপনি হাকিম। কোন জার্নালিস্টের বিরুদ্ধে রায় দিলেন। অমনি অন্যান্য জার্নালিস্টরা হাকিমের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দিলে। বলুন, এর পর আর কোনো হাকিম কি জার্নালিস্টের বিরুদ্ধে রায় দেবে? অসম্ভব। এবার বেরুটের অন্যান্য দেশগুলোর পানে তাকিয়ে দেখুন। সাংবাদিকের কোন স্বাধীনতা নেই। কাগজে কি বেরুবে না বেরুবে সে কথা সরকার বলে দেবে। তাই এই বেরুটে প্রতি দেশের সরকার একটি না একটি কাগজকে পুষছে। আমেরিকা, ইংরেজ, চীন সবারই একটা কাগজ আছে।

নাসেরের বিরুদ্ধে কিছু লিখতে হবে। অমনি এডিটারের তলব হল ইংরেজ দূতাবাসে। ভারতের বিরুদ্ধে একটা কড়া সম্পাদকীয় লিখতে হবে অমনি দামাস্কাস থেকে চীন দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী বেরুটে চলে এল। পরের দিন কাগজের প্রথম পাতার ভারতের বিরুদ্ধে বেশ কড়া একটা সম্পাদকীয় লেখা হল। ভাবছেন কাগজের বিরাট সার্কুলেশন কতো?

কী যে বলেন। দশ কপি, বড়ো জোর কুড়ি কপি ছাপা হল। দশ কপি গেল দামাস্কাসে, পিকিং-এর কর্তাদের জন্যে। ভারতের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় পড়লে ও'রা খুশী হবেন। আর ওঁদের খুশী এবং মর্জির উপর নির্ভর করছে সম্পাদকের এবং মালিকের দক্ষিণা। এলো লণ্ডনের চীনে ব্যাঙ্কের উপর পাঁচশো ডলারের চেক। সামান্য একটা সম্পাদকীয়র জন্যে এতো টাকা! আপনি বিশ্বাস করবেন না। ওদিকে ঐ সম্পাদকীয় পড়ে ভারতীয় রাজদূত তো রেগে কাঁই হয়ে আছেন। প্রেস অ্যাটাশে যতোই বোঝায় যে, কাগজের সার্কুলেশন নেই, বুদ্ধিজীবি মহলে এই কাগজের কোন মূল্য নেই—রাজদূত বিশ্বাস করতে চান না প্রেস অ্যাটাশের কথা। কারণ বেরুটের কোন কাগজে কিছু বেরুলেই, করাচীর সংবাদপত্রে বেশ ফলাও করে প্রকাশিত হবে যে, বেরুটের একটি বিশিষ্ট সংবাদপত্র ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে কী লিখেছে।

ভারতীয় পার্লামেণ্টে আপনার প্রতিনিধি এই সংবাদ দিয়ে বিস্তর প্রশ্ন করবে। তাই রাজদূতের মনে অতো অশান্তি।

স্যার আপনাকে সংবাদপত্রের এবং সংবাদিকদের গোপন সংবাদ দিলাম। এবার চলুন আমার সঙ্গে হোটেলে।

এই নগরে বিস্তর হোটেল। বিশ্বাস করুন বা না করুন, এক টাকার হোটেল থেকে এক হাজার টাকার হোটেল পাবেন মধ্যপ্রাচ্যের লাস ভেগাসে। এক টাকার হোটেল? একথা আপনি কখনই কল্পনা করতে পারবেন না। সারি সারি বিছানা পাতা। মনে হচ্ছে হাসপাতালে বসে আছেন। পাশের বিছানা থেকে কারুর নাসিকা গর্জনে আপনার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। হঠাৎ নাকে এলো এক তীব্র কটু গন্ধ। আপনার বুঝতে অসুবিধে হবে না যে, কেউ হাসিস্ পান করছে। হাসিস্ আর কিছু নয়। সহজ এবং সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলতে পারেন গাঁজা। এই এক টাকার হোটেলে আপনি সব পাবেন। সস্তা দরে গাঁজা, মেয়েমানুষ, বলুন আর কী চাই।

শ্রেষ্ঠ লেখক | শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

নলিনীকান্ত সরকারের

দাদাঠাকুর ৫॥

জীবিত মানুষের জীবনবেদ। পুণ্যশ্লোক ব্রাহ্মণের অপূর্ব জীবনকথা।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মগ্নমৈনাক ৪॥

ব্যোমকেশের উপন্যাস, একটি বড় গল্প ও একটি ছোট গল্পের অমনিবাস

রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের

স্পর্শের প্রভাব ৪৲

চিত্রগুপ্তের রোমাঞ্চক সত্য ঘটনা

যদিদং হৃদয়ং মম ৫৲

তপতী রায়ের

সকালের সাত রং ২॥

নকুল চট্টোপাধ্যায়ের

তিন শতকের কলকাতা ৬৲

২০০ বছরের কলিকাতার সামাজিক ইতিহাস ও ইতিহাসের উপাদান

নবেন্দু ঘোষের উপন্যাস

কায়াহীনের কাহিনী

— পাঁচ টাকা —

বিমল করের

পরবাস (নূতন মুদ্রণ) ৪॥

স্বামী জগন্নাথানন্দের

শ্রীম কথা ১০৲

বিমল মিত্রের

সখী সমাচার ৬৲

॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

পা বাড়ালেই রাস্তা ৫॥ স্বপ্নতনু ৪॥

বাণী রায়ের

সকাল সন্ধ্যা রাত্রি ১০৲ প্রেম ৪৲

মনোজ বসুর

সাজবদল ৫॥ বন কেটে বসত ১০৲

মানবেন্দ্র পালের

দূর থেকে কাছে ৫৷৷৹

মায়া বসুর

কখন অন্যমনে ৬৲

মৈনাকের

বাহুবলয় ৯৲

শান্তা দেবীর

পঞ্চদশী ৫৲

গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের

নূপুরের মতো ৮৲

যোগেশচন্দ্র বাগলের

জাগৃতি ও জাতীয়তা ৪৷৷৹

শশিশেখর বসুর

যা দেখেছি যা শুনেছি ৩॥

(পরশুরামের উপযুক্ত অগ্রজ — প্রতিটি হাস্য রসের খনি)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

নগরপারে রূপনগর

॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল ॥

—আঠারো টাকা—

সুরেশচন্দ্র সাহার

চোরিফুলের দেশে ৪॥

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আলোর অরণ্য ৬॥

সুমথনাথ ঘোষের

নীলাঞ্জনা ৭॥

স্বামী তত্ত্বানন্দের

উপনিষদ কথা ৪॥ তপস্বী ভারত ১০৲

শচীন্দ্রলাল রায়ের

বাবরের আত্মকথা ৫॥

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের

লীলাভূমি ৫৲

প্রভাত দেবসরকারের

মথুরা নগরে ৫॥

সুবেদার সীতারামের

সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে আত্মজীবনী

সিপাহী থেকে সুবেদার ৩৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ ॥ ৩৪-৮৭৯১

এবার চলুন আমার সঙ্গে হাজার টাকার হোটেলে। ফিনিসিয়া, হোটেল স্যাঁ জর্জে। হোটেলের ভিতরে ঢুকলে আপনার মনে হবে যে, আপনি নিউ ইয়র্কের ওয়ালডর্ফ আস্তোরিয়া হোটেলে এসেছেন। এয়ার কণ্ডিশন ঘর, দামী কার্পেট, টেলিভিশন রেডিও সব কিছুই আপনার ঘরে মজুত। বেল টিপুন। অমনি হোটেল বয় এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। 'হুইস্কি অন রকস্' আপনি হুইস্কির অর্ডার দিলেন।

এক-টাকার হোটেলে হাসিস্ পেতে আপনার অসুবিধে হয়নি। পান করতে সঙ্কোচ বোধ করেননি। কিন্তু হাজার টাকার হোটেলে একটু সন্তর্পণে আপনাকে হোটেল বয়কে জিজ্ঞেস করতে হবে, এখানে একটু হাসিস্ মিলবে কী?

এলো হাসিস্, এলো আফিম-কোকেন। সব কিছুই এখানে মিলবে। তারপর অন্যান্য আনুসঙ্গিক। যে জিনিস আপনি এক টাকার হোটেলে অতি সস্তা দরে কিনেছিলেন, সেই সবই বেশ চড়া দরে আপনি এখান থেকে কিনলেন। হাজার হোক দামী কেতাদোরস্ত হোটেল তো। এখানে জিনিসের চাহিদাও যেমনি বেশী, দরও তেমনি চড়া।

এবার বলুন আপনাকে কোথায় নিয়ে যাবো। নাইট ক্লাবে—কাভ দ্য রোয়া, লিডো, ভিনাস বা কাসেনো দ্য লিবাঁতে না কোন স্মাগলিং ডেনে। চলুন এবার আমরা নাইট ক্লাবে যাই। ভিনাস নাইট ক্লাবে। চতুর্দিকে সুন্দরীর ছড়াছড়ি। ভিতরে ঢোকবার জন্যে কোন অ্যাডমিশন ফী দেবার প্রয়োজন নেই। একটা ছোট স্কচ্ হুইস্কির বোতল নিয়ে, বসুন। দাম বেশী নয়, চল্লিশ লিরা বা আশী টাকা। বিক্রমাদিত্য ব্যাচেলার। গার্ল ফ্রেন্ডস নেই। আপনি একা বসে আছেন। অমনি একটি মেয়ে ফিক্ করে হেসে আপনার টেবিলে বসল। মেয়েটি আপনার টেবিলে বসার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সর্বনাশ হয়ে গেল। ঐ যে আশী টাকার স্কচ্ হুইস্কির কথা বললাম, ঐ বোতলের দাম হু-হু করে বেড়ে ডবল হয়ে গেল। অর্থাৎ একশো ষাট টাকা। আপনি মেয়েটিকে নিয়ে মশগুল হয়ে গপ্পো করছেন। আপনার পকেট থেকে যে দ্বিগুণ টাকা বের হয়ে গেল টেরও পেলেন না। রাত্রি তিনটার সময় আপনার কাছে যখন বিল এল, তখন আপনার চক্ষু চড়ক গাছ। কিন্তু তখন টাকা গচ্চা দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এই বিলের থেকে মেয়েটি একটি কমিশন পেল। কুড়ি পার্সেণ্ট অর্থাৎ ষোল লিরা বা বত্রিশ টাকা। যাক এবার যে রূপসী আপনার টেবিলে বসে ড্রিংক করছিল, সেই মেয়েটি হল স্প্যানিশ। সব দেশের মেয়ে এই বেরুটের নাইট ক্লাবে পাবেন। এমনকি ভারতীয় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অবধি। অন্যদিকে ইতালিয়ান বা স্প্যানিশ ব্যাণ্ড বাজছে। মৃদুমন্দ সংগীত। গ্রীক সংগীত। জোরবা দ্য গ্রীকের টিউন। মেয়েটিকে নিয়ে দু-একবার নাচবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু নাচ তেমন জমলো না।

মেদাম মঁশিও বোঁ সোয়ার......তারপর একটা বিরাট বাজনা শুরু হল। প্রথমেই হয়তো স্পানিশ ফ্ল্যামিঙ্গো নাচ দিয়ে শুরু। তারপর একটা কোরাস। চারটি মেয়ে প্রায় নগ্ন দেহ নিয়ে নাচতে এল। আপনি একটু নড়ে-চড়ে বসলেন। হাজার হোক এমনি নৃত্য দেখবার সুযোগ আপনার কখনই কোথাও মিলবে না। শোর শেষ প্রোগ্রাম হল নাদিয়া জামালের নৃত্য।

নাদিয়া জামাল হল মধ্যপ্রাচ্যের বিখ্যাত বেলী ড্যান্সার। এই যে বেলী ড্যানসিং-এর কথা বললুম, এই হল মধ্যপ্রাচ্যের শিল্পকলার একটি বৈশিষ্ট্য। এই নৃত্য আপনার দেহ এবং মনকে চঞ্চল করে তুলবে। শোর শেষে আবার মৃদুমন্দ সংগীত শুরু হল। আপনি নাচের ফ্লোরে গেলেন। এই নৃত্যের সুযোগে বান্ধবীকে দু-একবার চুমু খাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু স্যার, দিস্ ইজ্ মিডল ইস্ট। ভয়-লজ্জা কিছুই করবেন না। এখানে সেন্সর বোর্ড নেই। যা মনে আসে, প্রাণ যা চায় করে যান।

তারপর ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখেন যে, রাত প্রায় তিনটে। নিদ্রায় আপনার চোখ ক্লান্ত। আপনি হোটেলে ফিরে যেতে চান। চলুন আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি। ট্যাক্সীর তো অভাব নেই। তবে কতগুলো ট্যাক্সী ভাড়া করা আছে। অর্থাৎ আগে থেকেই খদ্দের ঠিক করা আছে। বান্ধবীদের নিয়ে কেউ কেউ বাড়িতে যাবে। একটা ট্যাক্সী করলেন। ভাড়া অবশ্য আপনাকে ডবল দিতে হবে। নইলে এই রাত তিনটের সময় আপনাকে কে নিয়ে যাবে।

'গুড মর্নিং স্যার' হোটেলের সামনে এসে আমি আপনার গাড়ির দোর খুলে দিই। বুঝতে আপনার অসুবিধে হয় না যে, আমার অভিপ্রায় কী। বখশিশ; ঠিক ধরেছেন। আপনি বলেন বখশিশ—আমি বলি টিপস। আফ্রিকায় একে বলে ড্যাস। আর পারীতে যান, বলবে পুরবোয়ার। আর যদি ভারতবর্ষে কাউকে জিজ্ঞেস করেন বখশিশ মানে কী? বলবে খুব—স্যর—খুব। মরহবা......আমি বলি।

আমার হাতে একটি পাঁচ লিরার নোট গুঁজে দিলেন আপনি।

মাত্র পাঁচ লিরা। দূর ছাই। অতো বকলাম, সাংবাদিকদের কেচ্ছা করলাম, মেয়েমানুষের গপ্পো করলাম, তার দক্ষিণা মাত্র মিলল পাঁচ লিরা! একেই বলে বরাত। যাক স্যর; আবার কাল আসবো। টেন-অ-ক্লক শার্প। আপনাকে নিয়ে বিপ্লবের সেণ্টার ডোলচাভিটা কফি হাউসে যাবো। গুড মর্নিং স্যার'

আঠারো

মহারাজ রাজবল্লভ সেনের কনিষ্ঠা কন্যার নাম অভয়া। আট বছর বয়সে অভয়ার বিয়ে হল রুপেশ্বর সেন নামে একটি বালকের সংগে। বিয়ের অল্পকাল পরেই রুপেশ্বর মারা গেল।

বিধবা বিবাহ কি অশাস্ত্রীয়? রাজবল্লভের ইচ্ছায়, তাঁর তিনজন দ্বারপণ্ডিত—কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, নীলকণ্ঠ সার্বভৌম এবং কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ—বিধবা বিবাহের সপক্ষে শাস্ত্রবাক্য খুঁজতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা জানালেন: অক্ষতযোনি বিধবাদের পুনর্বিবাহে হিন্দুশাস্ত্রে কোনো নিষেধ নেই।

কিন্তু কেবলমাত্র তিনজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথার উপর নির্ভর করে নিজের বিধবা মেয়ের বিবাহ দেওয়া রাজবল্লভ সংগত বিবেচনা করলেন না। হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করতে হলে, রাজবল্লভ বিবেচনা করলেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের সম্মতি প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের কাছে লোক পাঠালেন রাজবল্লভ। কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা প্রভৃতি নানা অঞ্চল থেকে অনুকূল মত সংগৃহীত হল। তারপর নবদ্বীপ।

নবদ্বীপে তখন অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বাস। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতদের মত না পেলে তখন সব ব্যর্থ। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রিত। রাজবল্লভের সংগে কৃষ্ণচন্দ্রের যথেষ্ট সৌহার্দ্য। রাজবল্লভ আশা করেছেন যে, কৃষ্ণচন্দ্রের সাহায্যে তিনি নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে বিধবা বিবাহের সপক্ষে ব্যবস্থা পাবেন।

নবদ্বীপের পণ্ডিতদের গোপনে ডাকলেন কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁদের মুখে শুনলেন: অক্ষতযোনি বিধবাদের পুনর্বিবাহে হিন্দুশাস্ত্রে কোনো নিষেধ নেই।

কৃষ্ণচন্দ্র তখন আক্ষেপ করে বললেন—আগে জানলে আমিই এই সমাজসংস্কারের কাজে হাত দিতাম। কিন্তু রাজবল্লভের চেষ্টায় বিধবা বিবাহ সমাজে প্রচলিত হয়ে গেলে আমার আর অপমানের সীমা থাকবে না। অতএব আমি অনুরোধ করি, আগামীকাল রাজবল্লভের দূতের সামনে সভায় আমি আপনাদের বারংবার বিধবা বিবাহের পক্ষে মত দিতে বলব, কিন্তু আপনারা কিছুতেই মত দেবেন না।

তাই হল। রাজবল্লভের দূত ম্লানমুখে ফিরে গেল।*

মতান্তরে: "রাজবল্লভের প্রেরিত লোক বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব লইয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদিগকে অন্যান্য ভোজের সহিত একটি গো-বৎসও প্রদান করেন। আগন্তুকগণ এইরূপ অভিনব উপহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, যে বিধবা-বিবাহ বহুকাল যাবৎ অপ্রচলিত আছে, তাহা পুনরায় প্রচলিত হইতে

---

* ডঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন: "Rajaballabh secured the approval of the orthodox Pandits and also the Sastric injunction in favour of widow remarriage, as early as 1756 A.D., and this tradition influenced the views of the social references a century later. The failure of Rajballabh is said to have been mainly due to the opposition of Maharaja Krishnachandra, but of this we have no definite evidence." (Maharaja Rajballabh, p. 91)

পারিলে শাস্ত্রানুসারে গোমাংস ভক্ষণেও আপত্তি হইতে পারে না। রাজবল্লভের লোক এই উত্তর শ্রবণে সাতিশয় লজ্জিত হইল এবং আর বিলম্ব না করিয়া সত্বর-পদে রাজনগরে প্রত্যাগমন করিল।"

ঠিক এই সময়ে কোটার রাজাও বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন।

বাঙলা দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রামমোহন রায়ের 'আত্মীয়-সভায়' বালবৈধব্যের সমস্যা আলোচিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাঙলা দেশে ডিরোজিওর ছাত্ররাও এবিষয়ে আলোচনা করেছেন। তারপর, দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় ল'-কমিশন বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য একটি আইন করার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের আদালতের মতামত চেয়েছে।

১৮৩৭ সালের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় একটি সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে যে, "এতদ্দেশীয় কতিপয় সমৃদ্ধ সুবুদ্ধি লোকেরা পরামর্শ করিয়াছেন এক সভা করিবেন" এবং সেই সভার একটি অভিপ্রায় এই যে, "ব্রাহ্মণদিগের কু-পরামর্শেতে শিশুকালাবধি বিধবার বিবাহ নিষেধ
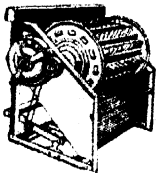
বিরুদ্ধে যে কুসংস্কার হইয়াছে, তাহাও বিনষ্ট করিতে হইবেক।"

১৮৪২ সালের জুলাই মাসে বেঙ্গল স্পেক্টেটর লিখেছেঃ "......একণে হিন্দুজাতীয় বিধবার বিবাহ পুনঃস্থাপনের অন্য কোন শাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইতেছে না।"

যিনি সাহস করে প্রথম বিধবা বিবাহ করবেন, শোনা যায়, মতিলাল শীল ঘোষণা করেছিলেন, তাঁকে তিনি বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬-১৮৪৫) বাঙলা ভাষায় প্রথম অভিধানপ্রণেতা, প্রখ্যাত স্মার্তপণ্ডিত, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য। আরেকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বিদ্যাসাগরের আগেই তিনি বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর, ১৮৪৫ সালের ১১ মার্চের 'Bengal Harkara and India Gazette'-এ প্রকাশিত একটি পত্রের অংশ তুলে দিচ্ছিঃ

"The liberal 'viavustha which he (রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ) recently gave regarding the re-marriage of Hindoo widows, on the application of the Bengal British India Society, should mank him at the head of Hindoo reformers."

অর্থাৎ, বিদ্যাসাগরের আগেও এ দেশে কেউ-কেউ বিধবা বিবাহ সম্পর্কে চিন্তা করেছেন, আলোচনা করেছেন। বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন হওয়ার আগের বাঙলা দেশ এবং বাঙলা দেশের বাইরে দু-এক জায়গায় বিধবা বিবাহের চেষ্টা হয়েছে বটে, কিন্তু কার্যত একটিও বিধবা বিবাহ হয়নি। সফল না হলেও সেসব প্রচেষ্টার অবশ্যই মূল্য আছে।

শশিভূষণ সিংহ বিদ্যাসাগরের আপন গ্রামের মানুষ। শশিভূষণকে ভালোবাসতেন বিদ্যাসাগর। এককালে বিদ্যাসাগরের মুখে অল্পবয়সী একটি বিধবার দুঃখের কাহিনী শুনেছিলেন শশিভূষণ। উত্তরকালে শশিভূষণ বলেছেনঃ

"বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি বাল্য-সহচরী ছিল। সেই সহচরী তাঁহার কোন প্রতিবেশীর কন্যা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। বালিকাটি বাল্যকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সর্বদা থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলিকাতায় পড়িতে আসেন, তখন বালিকার বিবাহ হয়; কিন্তু বিবাহের কয়েক মাস পরে তাহার বৈধব্য ঘটে। বালিকাটি বিধবা হইবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের ছুটিতে বাড়িতে গিয়াছিলেন। বাড়ি যাইলে তিনি প্রত্যেক প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, কে কি খাইল? ইহাই তাঁহার স্বভাব ছিল। এবার গিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার বাল্য-সহচরী কিছু খায় নাই; সেদিন তাহার একাদশী; বিধবাকে খাইতে নাই। এ কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার সংকল্প হইল, বিধবার এ দুঃখ মোচন করিব; যদি বাঁচি, তবে যাহা হয়, একটা করিব। তখন বিদ্যাসাগরের বয়স ১৩।১৪ বৎসর মাত্র হইবে।"

অনেক দিন চলে গেছে তারপর।

দিনের পর দিন ভেবেছেন বিদ্যাসাগর। দিনের পর দিন পুঁথির পাতায়-পাতায় খুঁজেছেন। খুঁজতে-খুঁজতে একদিন পেয়ে গেছেন। আনন্দে বিদ্যাসাগর চিৎকার করে উঠলেন—পেয়েছি, পেয়েছি।

—কী পেয়েছেন?

—যার জন্য এত দিন এত কষ্ট ভোগ করেছি, আজ তা পেয়েছি। আমাদের শাস্ত্রে বিধবাদের বিবাহের বিধি আছে।

একখানা বই লিখলেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু বই লিখেই ছাপালেন না। বাবার কাছে গেলেন। বললেন—দেখুন, আমি শাস্ত্র-টাস্ত্র থেকে প্রমাণ যোগাড় করে বিধবা বিবাহ সমর্থন করে একখানা বই লিখেছি। কিন্তু আপনার অনুমতি না পেলে আমি এ-বই ছাপাতে পারছি না।

ঠাকুরদাস বিদ্যাসাগরকে বললেন—আমি যদি মত না দিই, তুমি তা হলে কী করবে?

বিদ্যাসাগর বললেন—তা হলে আপনি বেঁচে থাকতে আমি এ-বই ছাপাব না। আপনার মৃত্যুর পর, আমার যেমন ইচ্ছা হবে, তেমনি করব।

ঠাকুরদাস বললেন—আচ্ছা, কাল একবার মন দিয়ে বইখানা শুনব। তারপর যা হয় বলব।

পরদিন বিদ্যাসাগর বইখানা বাবাকে পড়ে শোনালেন। বই শুনে ঠাকুরদাস জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি বিশ্বাস করো, যা লিখেছ, তা পুরোপুরি শাস্ত্রের মত?

বিদ্যাসাগর বললেন—হ্যাঁ, তাতে আমার

অন্যোত্ত সন্দেহ নেই।

রাধুম্মলের আর কোনো আপত্তি রইল না।

কিন্তু মা কিছুই জানেন না। এবং মায়ের মত না পেলে তো সব পণ্ড। বিদ্যাসাগর তারপর গেলেন ভগবতী দেবীর কাছে। বললেন—মা, তুই তো শাস্ত্র-টাস্ত্র কিছু বুঝবি না। শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের বিধি আছে, আমি বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে একখানা বই লিখেছি, কিন্তু তোর আপত্তি থাকলে এ বই আমি ছাপাতে পারি না।

ভগবতী দেবী বললেন—আমার একটুও আপত্তি নেই। ঘরের বালাই হয়ে চোখের জলে যাদের দিন কাটে সংসারে তাদের সুখের উপায় করবি এতে আবার আমার আপত্তি। তবে, শোন, কর্তাকে কিছু বলিস না, উনি হয়তো অমত করবেন।

কিন্তু কর্তা তো আগেই মত দিয়েছেন। অতএব কোথাও আর কোনো বাধা-বারণ রইল না।
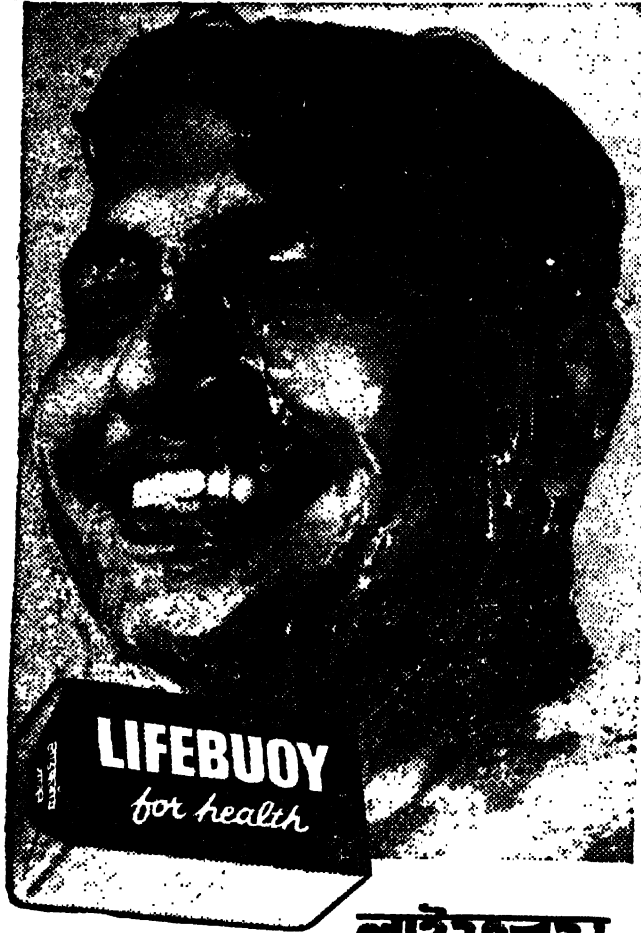
অবশ্য এ বিষয়ে মতান্তর আছে।

বিদ্যাসাগরের সেজোভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "এক দিবস পিতৃদেব ও বিদ্যাসাগর বীরসিংহের বাটীতে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে জননী দেবী একটি বালিকার বৈধব্য উল্লেখ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বলিলেন, তুই এতদিন যে শাস্ত্র পড়লি, তাহাতে বিধবাদের কোন উপায় নাই কি? ইহা শুনিয়া পিতৃদেব বলিলেন, ঈশ্বর! ধর্মশাস্ত্রে বিধবাবিবাহের কি কি ব্যবস্থা আছে? অগ্রজ উত্তর করিলেন, শাস্ত্রে প্রথমত ব্রহ্মচর্য, অভাবে সহমরণ বা বিবাহ। পিতৃদেব বলিলেন, রাজ আজ্ঞায় সহমরণ প্রথা নিবারিত হইয়াছে। কলিতে ব্রহ্মচর্য সহজ নহে, সুতরাং বিবাহই একমাত্র উপায়। অতএব তুমি পুনরায় ভাল করিয়া শাস্ত্র দেখিয়া ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ করিবার জন্য যত্নবান হও। এবং এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে লোকের নিন্দাবাদে বা অপর কোন কারণে পশ্চাৎপদ হইবে না; এমন কি তোমার পিতা মাতা আমরা নিবারণ করিলেও ক্ষান্ত থাকিবে না। পুস্তক প্রচার হইবার অল্পদিন পরে পিতৃদেব কলিকাতায় বহুবাজারে পঞ্চাননতলার বাসায় ডাক্তার নবীনচন্দ্র মিত্র ও অগ্রজের সহিত কথোপকথনে হাস্যবদনে বলিলেন, ঈশ্বর আর তোমাকে আমার শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। ইহা শুনিয়া অগ্রজ সহাস্যমুখে বলিলেন, খরেদরে এক আধ, অর্থাৎ ভাল মন্দ সুখ্যাতি অখ্যাতি দু-ই আছে। পিতৃদেব বলিলেন, যাহা ধরেছ ছেড়ো না, প্রাণ পর্যন্ত স্বীকার করিও। এই অভিপ্রায়েই পূর্বে বীরসিংহের চণ্ডীমণ্ডপে আমরা উভয়েই তোমাকে বলিয়াছিলাম।"

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন: "সাধারণত লোকের একটা ধারণা আছে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতার আগ্রহে এই বিধি প্রচলিত হয়; কিন্তু আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে একটু অন্যরূপ শুনিয়াছি। যখন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, ইহা তিনি স্থির করিয়াছিলেন, তখন একদিন তাঁহার মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'মা, আমি একটা কার্য করতে যাচ্ছি, তাতে তুই কি বলিস? (বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত মাকে "তুই তোকারি" এইভাবে কথা কহিতেন)। আমার বোধ হয় বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আমি তাই বিধবাবিবাহের আইন পাশ করাবার চেষ্টা করব ভাবছি; কিন্তু আগে আমি তোর একটা মত নিতে ইচ্ছা করি। এ কার্য তুই ভাল বলিস কি না?' মা একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'তুই কি ঠিক বুঝেছিস যে বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত?' আমি বলিলাম—'হ্যাঁ। আমি অনেক বিবেচনা করে দেখলাম যে, বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত—

এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না? তখন তিনি বলিলেন, 'তবে আমি তোকে বারণ করি না, তুই এ কার্য করগে যা;— যে যা বলে বলুক।'..."

"বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামে বিদ্যাসাগরের একখানা বই বেরিয়েছে ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে। রচনাটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও (ফাল্গুন, ১৭৭৬ শক) আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত হয়েছে।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "অগ্রজের উক্ত প্রস্তাবের দশ বৎসর পূর্বে, বহুবাজার নিবাসী বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, স্বীয় ভবনে কতকগুলি আত্মীয় লোককে ঐক্য করিয়া, বিধবাবিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

বিদ্যাসাগর লিখেছেন:

"আমার পুস্তক সংকলিত, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবার কিছুদিন পূর্বে, কলিকাতার অন্তঃপাতী পটলডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ দাস, নিজ তনয়ার বৈধব্য দর্শনে দুঃখিত হইয়া, মনে মনে সংকল্প করেন, যদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দেন, পুনরায় কন্যার বিবাহ দিব। তদনুসারে তিনি সচেষ্ট হইয়া বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদক এক ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন। উহাতে কাশীনাথ তর্কালংকার, শ্রীযুক্ত ভবশংকর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, এক্ষণে প্রায় সকলেই বিধবাবিবাহের বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহারা পূর্বেই কি বুঝিয়া, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া, ব্যবস্থাপত্রে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন; আর, এক্ষণেই বা কি বুঝিয়া, বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার নিগূঢ় মর্ম ইঁহারাই বলিতে পারেন।"

সে সময়ে শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রবল প্রতিপত্তি। রাজা রাধাকান্তের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু, বিদ্যাসাগরের বন্ধু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, বলেছেন: "বিধবা বিবাহ

হওয়া উচিত কি না, এই অনুচ্ছেদ পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া, বিদ্যাসাগর আমাদের বাটীতে আসেন। তাঁহার পুস্তিকার সুন্দর লিপিচতুরতা ও তর্ক-প্রখরতা দেখিয়া আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম। আমরা বলিলাম, 'এখন তুমি পুস্তিকা প্রচার করিয়া তোমার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা কর।' বিদ্যাসাগর বলিলেন, যখন এ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন ইহার জন্য প্রাণান্ত পণ জানিও। ইহার জন্য যথাসর্বস্ব দিব। তবে তোমার মাতামহ যদি সহায় হন, তবে এ কার্য অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও সহজে সিদ্ধ হইবে। সমাজে ও রাজদরবারে তাঁহার যেরূপ সম্মান, তিনি সহায় হইলে, সমাজে সহজে আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবে।' আমি বলিলাম, "দাদামহাশয়ের সম্মুখীন হইয়া, একথা বলিতে সাহস হয় না। তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট ভালবাসেন সত্য; তাঁহার নিকট এরূপ সামাজিক কথার উত্থাপন করাকে ধৃষ্টতা মনে করি। তুমি স্বয়ং একখানি পত্র লিখিয়া একখণ্ড পুস্তিকা তাঁহার নিকট প্রেরণ কর।' বিদ্যাসাগর আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পত্র সহ একখণ্ড পুস্তিকা মাতামহ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন। মাতামহ মহাশয় তাঁহার পুস্তিকা পড়িয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকাইয়া বলেন, 'দেখ তুমি যে প্রণালীতে পুস্তিকা লিখিয়াছ, তাহা অতি মনোহর। তবে আমি বিষয়ী লোক, এ সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার করা আমার সাধ্যাতীত এবং অসঙ্গত। একদিন পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া এ সম্বন্ধে বিচার করাইবার ইচ্ছা করি। তুমি যদি সম্মত হও, তাহা হইলে দিন ধার্য করিয়া পণ্ডিত মণ্ডলীকে আহ্বান করি।' বিদ্যাসাগর সম্মত হইলেন। নির্ধারিত দিনে অনেক পণ্ডিত ও বিদ্যাসাগর আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেদিন কোন মীমাংসা হয় নাই বটে; তবে, বিদ্যাসাগরের তর্কপ্রণালীতে মাতামহ মহাশয় পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে একখানি শাল উপহার দিয়াছিলেন।* বিদ্যাসাগরকে পুরস্কৃত হইতে দেখিয়া, তৎকালিক সমাজপতিরা সিদ্ধান্ত করিলেন, রাজা রাধাকান্ত দেব বিধবা-বিবাহ প্রচলনের পক্ষপাতী। একদিন বড়বাজারের গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের প্রধান ব্যক্তি প্রমুখ সমাজপতিরা মাতামহ মহাশয়ের নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'আপনি কি সর্বনাশ করিলেন! আপনি কি হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহরূপে পাপপ্রথার প্রচলন করিতে চাহেন? বিদ্যাসাগরকে পুরস্কৃত করিলেন কেন?' ইহাতে মাতামহ মহাশয় উত্তর দিলেন, 'আমি বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের পক্ষপাতী নহি। আমার তাহাতে অধিকার কি? আমি বিষয়ী লোক, শাস্ত্রসিদ্ধান্তের বা কি জানি। তবে বিদ্যাসাগরের তর্কপ্রণালীতে তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে শাল পুরস্কার দিয়াছিলাম। ভাল, এতৎসম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর সভা করিয়া, আর এক দিন বিচার করাইলেই হইবে।' অতঃপর আমাদের বাড়িতে আর এক দিন পণ্ডিতমণ্ডলীর সভা হইয়াছিল। ঐদিন নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন উপস্থিত ছিলেন। ঐদিনেও বিচারে কিছুই মীমাংসা হয় নাই। বিচার-কালে কেবল একটা গণ্ডগোল হইয়াছিল মাত্র। ঐদিন মাতামহ মহাশয়, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়কে শাল পুরস্কার দিয়াছিলেন। অতঃপর বিদ্যাসাগর বুঝিয়াছিলেন, মাতামহ মহাশয়ের নিকট তিনি কোনরূপ সাহায্য পাইবেন না।...ইহার পর বিদ্যাসাগর আমাদের বাটীতে বড় আসিতেন না। মাতামহ মহাশয় তাঁহার জীবনব্রতের সহায় না হইলেও তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন।"

যা হোক, বিদ্যাসাগরের এই বই হু হু করে বিক্রি হয়ে গেল। সমস্ত দেশে সাড়া পড়ে গেল। লোকের মুখে কেবল ওই বিধবা-বিবাহ নিয়ে আলোচনা। বিদ্যাসাগর লিখে দিয়েছেন, আমাদের শাস্ত্রে বিধবাদের বিবাহের বিধি আছে।

• "বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তক প্রচারিত হইলে, আপামর সাধারণ সর্ববিধ লোকের মধ্যে, বিধবার বিবাহ লইয়া...অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব আন্দোলন হইয়াছিল...। ঐ সময়ে, এক-দিন, হুগলি জিলার অন্তঃপাতী এক গ্রামে পঞ্চায়ত উপলক্ষে দুলিয়া বেহারাদিগের এক জাঁকাল মজলিস হইয়া-

* বার্ধক্যে স্মৃতিহ্রাস জন্য এই শাল উপহারের কথা আনন্দবাবু দত্ত করিয়া বলেন নাই।
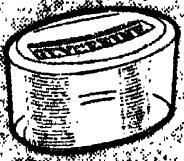
ছিল। পঞ্চায়েতের কার্য শেষ হইবামাত্র, তাহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহের বিচার উপস্থিত হইল। নিজ নিজ বুদ্ধি ও নিজ নিজ বিবেচনা অনুসারে, কেহ ভাল, কেহ মন্দ বলিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বাঁর [illegible] মৌনাবলম্বন ও নিবিষ্ট চিত্তে সমুদয় শ্রবণ পূর্বক, সকলের মতামত অবগত হইয়া কহিল, "আমি বলি, বিধবার বিবাহ যদি হইয়া উঠে, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়; বামন জাতির মেয়ে জাতিতে থাকিবে ত; নতুবা, বামুন কায়েতের মেয়ের মত, মেয়েগুলো পাঁচজাতিয়া হয়ে যাবে, সে কি ভাল'।"

একদল পণ্ডিত বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে কয়েকখানা বই বের করে ফেললেন। তাঁরা বললেন, না, আমাদের শাস্ত্রে বিধবাদের বিবাহের বিধি নেই।

১৮৫৫ সালের অক্টোবরে বিদ্যাসাগর আরেকখানা বই বের করলেন : 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তক।' বিস্তর শাস্ত্র বাক্য উদ্ধার করে প্রমাণ দেখালেন, বিধবা বিবাহ কর্তব্য কর্ম, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত।

সমস্ত দেশে হই-হই পড়ে গেল। কেবল পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা কাটাকাটি নয়, হাটে-বাজারে রাস্তাঘাটে সে সময়ে বিধবা-বিবাহ নিয়ে ছড়ার ছড়াছড়ি। ছড়া, কবিতা, পালাগান। শান্তিপুরের তাঁতিরা তো নতুন একরকম শাড়িই বের করে ফেলল— বিদ্যাসাগর-পেড়ে শাড়ি। বেশি দামে অনেকে ওই বিদ্যাসাগর-পেড়ে শাড়ি কিনেছেন সে সময়ে। ওই শাড়ির পাড়ে একটি গান লেখা আছে :

"সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥
কবে হবে শুভদিন প্রকাশিবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরুবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম,
সধবার সঙ্গে থাকব মোরা মনোমত পতি করে।
এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য-যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই—
আলোচাল কাঁচকলার মুখে দিয়ে ছাই,—
এয়ো হয়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় করে॥"*

আবার এই গানকে ব্যঙ্গ করে আরেক রকম গানও বের করেছে বিপক্ষদল। সেই গানের প্রথম লাইন : "শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররোগী হয়ে।" (ক্রমশ)

* শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যাসাগর জীবন-চরিত'-এ এই গানটির একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পাঠ মুদ্রিত আছে।

নতুন ফর্মুলায় তৈরী গয়া। আপনার
কল্পলোকের মনোমোহিনী ট্যাল্‌কম্‌।
কুয়াশার মত মিহি-মৃদুল,
অন্য যেকোনো ট্যাল্‌কমের চেয়ে
ঢের বেশী সুচারু, ঢের বেশী
লঘুভার।
গয়া-র শিল্পীদের সৃষ্টি
এই মধুগন্ধ পাউডার
আপনাকে সারাদিন সুরভিত
সারাদিন তাজা রাখবে।
ভিনদেশী **ব্ল্যাক রোজ,**
চিরচেনা ফুলেল **গার্ডেনিয়া**
আর মনমাতানো **পাসপোর্ট—**
যেটা ইচ্ছে বেছে নিন।
মনে রাখবেন, তিন রকম পাউডারই
পাবেন নতুন দীর্ঘাকার আধারে।
এগুলি বেশীদিন চলবে।

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিঃ
(ইংলন্ডে সমিতিবদ্ধ)

নতুন দীর্ঘাকার
আধারে
নতুন ফর্মুলায়
মিহি-মৃদুল ট্যাল্‌কম

চিত্রপ্রদর্শনী

নিখিল বিশ্বাসের চিত্র

বর্ষার বর্ষণমুখর কলিকাতার এক সন্ধ্যা। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনের দক্ষিণ দিকের গ্যালারীর দরজা খোলা। ভিতরে প্রবেশ করে দেখি কয়েকজন যুবক স্তূপীকৃত ছবির মধ্য থেকে এক একখানি ছবি পর্যবেক্ষণ করছেন ও অন্য কয়েকজন সেগুলি সবত্নে দেওয়ালের গায়ে সাজিয়ে রাখছেন। ঘরের প্রান্তে বিষণ্ণ মুখে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন এক মহিলা। চক্ষু, দৃষ্টি ছবির ওপর নিবদ্ধ থাকলেও ছবির মধ্য থেকে অনেকগুলি অতি পরিচিত ও একান্ত আপনার কোনও প্রিয়জনের মূর্তিই বুঝি বার বার তাঁর সম্মুখে ভেসে উঠছে—বুঝি শত চেষ্টাতেও চক্ষু আজ বাধা মানছে না। মহিলা শ্রীমতী বীণা বিশ্বাস, স্বর্গত শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের পত্নী। যুবকবৃন্দ নিখিলের গুণগ্রাহী বন্ধু। নিখিলের স্মৃতি রক্ষাকল্পে শ্রীমতী বিশ্বাস স্বামীর বন্ধুদের সহায়তায় তাঁর ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।

গত বৎসর নভেম্বর মাসে মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে নিখিল পরলোকগমন করে। মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছিল নিখিল। ডাক্তারের ঔষধে কোনও উপকার না হওয়ায় তাকে সুখলাল কারনানী হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সকালে। বিকালে তাঁর স্ত্রী ও বন্ধুবর্গ হাসপাতালে যান ও দেখেন সব শেষ—নিখিলের শয্যাস্থানে শুয়ে আছেন অন্য রোগী। নিখিলের এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে তার স্ত্রী ও বন্ধুবর্গের শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন। নিয়তির এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস যে, ঠিক সেই সময়েই জার্মানীতে তার ছবির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

শিল্পী নিখিলকে দেখার সুযোগ হয় দিল্লীতে, তিন বছর আগে, যখন ক্যালকাটা পেইন্টারদের প্রদর্শনী সহ সভ্যদের সঙ্গে তিনি দেখতে যান। বেশ মনে আছে, কলিকাতার এই তরুণ শিল্পীদিগের, বিশেষ করে নিখিলের আঁকা স্কেচ ও ড্রয়িং যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। নিখিল ভারত শিল্প ও চারুকলা সমিতির (AIFACS) গ্যালারীতে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয় ও সেখানেই তার সঙ্গে আলাপ হয়। সেদিনকার অল্প পরিচয়ের মধ্য দিয়ে এই দীর্ঘদেহ শিল্পী ও তার রচনা কর্মের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যের সন্ধান পেয়েছিলাম।

কোনও আর্ট কলেজ থেকে ডিপ্লোমা লাভ করেই যাঁরা আর্টিস্ট, শিক্ষক বা চিত্রকার ক্ষেত্রে প্রবেশ করার মনস্থ করে থাকেন নিখিল সে-শিক্ষালাভও করতে পারেনি, কারণ কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্র মাত্র দুই বছর তার নাম ছিল। অথচ উত্তরকালে নিখিল যে ভাবে, যে রীতিতে ও যে পরিমাণে ছবির পর ছবি এঁকে গেছে কোনও সরকারী শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী তা আঁকতে পেরেছেন কিনা জানি না।

প্রদর্শনীতে তার শেষ ছয় বছরের (১৯৬০—১৯৬৬) রচিত বিভিন্ন ছবির মধ্য থেকে মাত্র ২৩৫খানি ছবি পেশ করা হয়েছিল, অথচ নিখিল প্রায় ৫,০০০ নিদর্শন রেখে গেছে। অ্যাকাডেমির উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব

দিকের চারটি গ্যালারীতে রাখা নিখিলের আঁকা চিত্রসম্ভার দেখে প্রথমেই একটি প্রশ্ন জাগে : কখন ও কিভাবে সে এত ছবি আঁকত?

শ্রীমতী বিশ্বাস বোধ হয় অনুমানে আমার প্রশ্নটি বুঝতে পারলেন। বললেন,—"দেখুন, ওঁর কিন্তু আঁকার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত্রি যখনই ইচ্ছা হত—আঁকতে বসতেন এবং যতক্ষণ খুশী এঁকে যেতেন, খাওয়াদাওয়ার কথা মনে থাকত না।" মহিলা একটি দীর্ঘশ্বাস দমন করে ছবির দিকে উদাসনেত্রে চেয়ে রইলেন। পরে বললেন—"কখনও কখনও গভীর রাত্রে হঠাৎ উঠে আঁকতে বসে যেতেন। শুধু তাই নয়, অনেক সময়ে দেখেছি দুই হাতে পাগলের মত নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছেন এবং দেওয়ালে মাথা ঠুকছেন। ব্যস্ত হয়ে থামাতে গেলে বলতেন—বুঝবে না—তুমি বুঝবে না আমার কি যন্ত্রণা! যা আঁকতে চাই, যা বোঝাতে চাই সেটা যে কি-ছু-তে-ই প্রকাশ করতে পারছি না।"

বর্তমান যুগে প্রধানত যে গুণ থাকলে শিল্পী লক্ষ্মীর কৃপালাভ করেন নিখিল সে গুণ আয়ত্ত করতে শেখেনি। সুতরাং সংসারের দায়িত্ব বহন করার জন্য মিত্র ইনস্টিটিউসনে ড্রয়িং শিক্ষকের চাকরী নিতে হয়েছিল। তার স্ত্রীর কাছে শুনেছি যে প্রথমে নিখিল কিন্তু ছবি বেচতে চাইত না—সবগুলি যেন তার মানসপুত্র—পাখির মত পক্ষপুটে আগলে রেখে দিত। ইদানীং তার ছবির সমঝদারের সংখ্যা বাড়তে শুরু হয়েছিল এবং বিক্রীও হচ্ছিল। কিন্তু তাতেই বা কি? ছবির যথার্থ মূল্য সম্বন্ধে নিখিল কোনওদিন মাথা ঘামায়নি।

"ব্যাপার কি জানেন?" বললেন নিখিলের বন্ধু উৎপল চৌধুরী। "টাকাকড়ির ওপর তার লোভ ছিল না। কেউ হয়ত ৩০০্ টাকায় কোন ছবি কিনে নিলেন। আবার ধার্যমত মূল্য না দিতে পারলে নিখিল অন্যজনকে সমজাতীয় ছবিই ৫০্ টাকায় বেচে দিত যদি জানত যে ছবিখানি তাঁর পছন্দ হয়েছে।" এই প্রসঙ্গে ভদ্রলোক একটি ঘটনার উল্লেখ করলেন। কোনও প্রদর্শনীতে নিখিলের আঁকা একখানি ছবি তাঁর খুব ভাল লাগে। জানতে পেরে নিখিল ছবিখানি তাঁকে দিতে চায়। ছবিখানির মূল্য ধার্য ছিল ৫০০্ টাকা। এ মূল্যে কেনার তাঁর সাধ্য ছিল না অথচ একেবারে বিনামূল্যে ছবিখানি নিতে মন সায় দিচ্ছিল না। কয়েকদিন পরে হঠাৎ একদিন নিখিল এসে হাজির। বন্ধু বেরিয়ে দেখেন রাস্তায় ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। নিখিল ট্যাক্সি ভাড়াটা দিতে বলল—২ টাকা ১০ পয়সা। ভাড়া দেবার পরেই ট্যাক্সির ভিতর থেকে সেই ছবিখানি বার করে বন্ধুর হাতে দিয়ে বলল—এখানা তোমার পছন্দ হয়েছিল—রেখে দাও।" এমন ছোটখাট অনেক ঘটনাই বলছিলেন সেদিন প্রিয় বন্ধুর বিয়োগকাতর শিল্পী বন্ধুবর্গ—প্রকাশ কর্মকার, রথীন
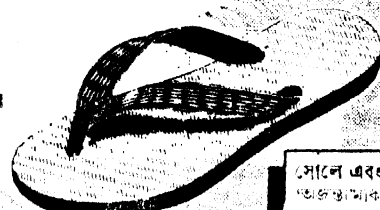
মণ্ডল, রঞ্জন রুদ্র এবং আরও কয়েকজন। সব ঘটনা বলার প্রয়োজন নেই।

নিখিলের ছবির মূল বিষয়বস্তু হল দুটি—দুর্বার গতিবেগ ও তেজ এবং সংগ্রাম। আশ্চর্যের বিষয় তার চরিত্রেও এই দুটি বিশেষত্ব ফুটে উঠেছিল। প্রথমটির প্রকাশ পায় ঘোড়ার ও জন্তুর নানা রূপায়নে। নিখিল ছিল রেনেসাঁ যুগের বিশেষ ভক্ত; সে যুগের প্রাতঃস্মরণীয় শিল্প পণ্ডিতদের রচনাপদ্ধতি নিষ্ঠাসহকারে সে অধ্যয়ন করে। ফলে ঘোড়ার নানা স্কেচ ও ড্রয়িংএর মধ্যে সেই যুগের রচনা বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ নিখুঁত, সুন্দর অঙ্কন চাতুর্য ও বলিষ্ঠতা তথা স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। দ্বিতীয় তার সংগ্রাম চিত্রমালা। বর্তমান যুগের নানা অভাব অভিযোগ অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানবাত্মার যে কাতর ক্রন্দন ধ্বনিত হচ্ছে তারই করুণ সুর ফুটে উঠেছে তার যীশু চিত্রমালা ও অপরাপর বৃহৎ নিদর্শনের মধ্যে (যীশু খৃষ্ট, স্ট্রাগল, ফ্রাস্ট্রেশন)। পূর্ব দিককার গ্যালারীর সবকয়টি ছবিই প্রাচীর চিত্র জাতীয়—দেখে মনে হয় শিল্পী ব্যবহৃত কাগজপটেও যেন এহেন রিক্ত ও বেদনাহত মানবের স্থান সংকুলান হয়নি। জীবন যুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই নূতন জীবনলাভ সম্ভব, এই ছিল নিখিলের মূল বক্তব্য এবং এটাই সে একান্ত বিশ্বাস, সাহস ও বলিষ্ঠ প্রকাশ ভঙ্গীমার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছে। তাই আধুনিক হলেও নিখিলের ছবি যেন রেনেসাঁ যুগের স্বাতন্ত্র্য গুণে বিশাল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

রঙ? হ্যাঁ, রঙ ব্যবহার করেছে নিখিল, তবে প্রথম দিকে। রঙ মনোনয়ন ও রচনা পদ্ধতি দেখে ভ্যান গ ও রেনোয়ার কথা মনে পড়ে। এ শ্রেণীর ছবির মধ্যে বারাণসীর ঘাট উল্লেখযোগ্য। রেখা ও রঙ দুই মাধ্যমে রচিত ঘাটের বিভিন্ন ছবি দেখে নিখিলের অপূর্ব স্কেচ করার ক্ষমতা ও রচনাশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাহলেও দুটি জিনিস বোধ হয় শেষ পর্যন্ত নিখিলের চরিত্র ও অঙ্কনশৈলীর সংগে খাপ খায়নি—রঙ ও ক্যানভাস। বিবর্তন আসে কয়েক বছর পরে। কালো রঙ ও সাধারণ প্যাকিং কাগজের ওপর রচিত হয় ছবির পর ছবি যার মধ্য থেকে শোনা যায় নির্যাতিত মানবের করুণ কাতর আর্তনাদ।

"যথার্থ শিল্পী ছিল নিখিল বিশ্বাস," ছবি দেখতে দেখতে বলে উঠলেন কলিকাতার কৃষ্টি জগতে সুপরিচিত, ম্যাক্সমুলার ভবনের অধিকর্তা ডঃ লিস্নের। "ম্যাক্সমুলার ভবনে তার প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়—সেই সূত্রে তার সংগে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। নিখিলের মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা নিহিত ছিল। তার অকাল মৃত্যুতে সত্যিই আমি মর্মাহত হয়েছি।"

নিখিল বিশ্বাসের কথা বলতে গেলে আর একজন শিল্পীর মূর্তি মনের কোণে জেগে ওঠে—শৈলজ মুখার্জি। শৈলজ নিখিলের মত পরিশ্রমী ছিল না, তবে মেজাজের দিক থেকে বিচার করলে উভয়ের মধ্যে একটি মিল ছিল। স্বীয় বক্তব্যটুকু প্রকাশ করতে না পারলে নিখিল দেওয়ালে মাথা ঠুকত; অনুরূপ ক্ষেত্রে শৈলজকে প্রায় সম্পূর্ণ ছবি একটানে ছিঁড়ে ফেলতে দেখেছি। তবে শৈলজ পরলোকগমন করে ৫৩ বৎসর বয়সে—শিল্পী হিসাবে উন্নতির চরম শিখরে উঠে, খ্যাতিলাভের পরে। নিখিল চলে গেল মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে। খ্যাতিলাভের প্রথম কয়েকটি সোপানে পদার্পণ করার পরেই এ দুঃখ মর্মান্তিক এবং চিত্রকলা জগতের এ ক্ষতি অপূরণীয়।

তাহলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে নিখিলের জীবদ্দশাতেই তার প্রতিভা ও বিরাট ভবিষ্যতের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এবং তা সত্ত্বেও আমাদের দেশের শিল্প সংস্থা বা আর্ট গ্যালারী তাঁকে বৃহত্তর জগতের সংগে পরিচিত করে দেবার কোনও সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা করেনি। ড্রিপিং ও ড্রিবলিং প্রণালীতে রঙ ব্যবহার করে যে জ্যাকসন পোলক সমকালীন "চিত্রকলা" জগতে বিশিষ্ট এক ধারার প্রবর্তন করেন সেই পোলককেও শিল্পী সমাজে স্থান করে নিতে বেগ পেতে হয়েছিল। পেগি গুগেনহিম (Peggy Guggenheim) তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে ১৯৪৩ সালে "আর্ট অব দিস সেঞ্চুরী" গ্যালারীতে এ শিল্পীর প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। শর্ত থাকে যে, শিল্পী প্রতি মাসে ১৫০ ডলার পাবেন তবে বৎসরে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ২৭০০ ডলারের অধিক হলে গুগেনহিম তার এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করবেন। ফলে পোলকের ছবির চাহিদা বেড়ে যায়। ১৯৫৬ সালে মোটর দুর্ঘটনায় শিল্পীর মৃত্যু হবার পরের বছরেই পোলকের আঁকা "অটাম রিদম্" মেট্রোপলিটান মিউজিয়ম ৩,০০০০ ডলারে ক্রয়
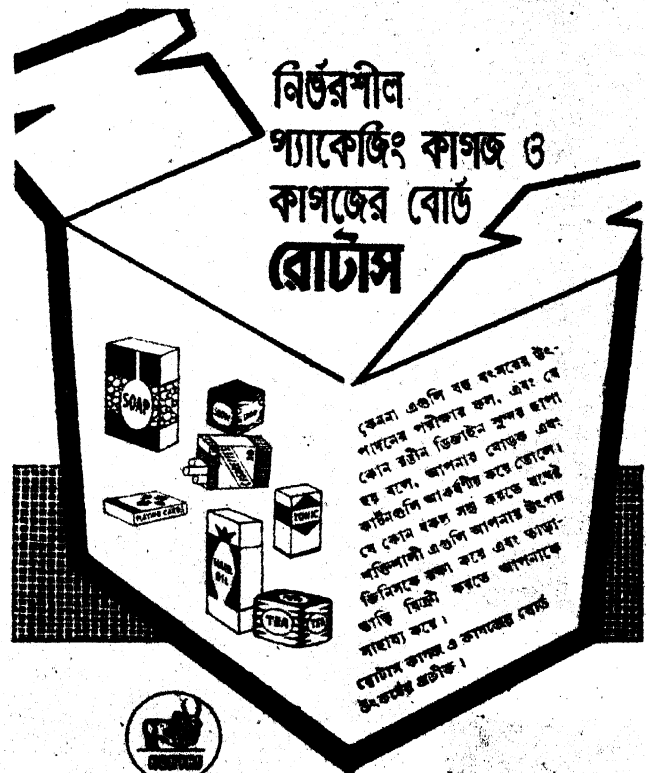
করেন। আমাদের দেশের আর্ট গ্যালারী কেবল কয়েকটি ভিক্টরের মতোই আসার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। বলা বাহুল্য পেশাদার গ্যালারিদের মত বিজ্ঞাপনকারী কোনও মহিলা বা পুরুষ আমাদের দেশে বিরল বললেই চলে। ব্যতিক্রম ছিলেন শিল্পীর দুটি মূল ধনবানদের মালিক স্বর্গীয় ব্রজবাবু। অনেকেই জানেন যে এঁরই পৃষ্ঠপোষকতার জন্য শেষ বয়স পর্যন্ত শৈলজ মুখার্জি তার শিল্পীজীবনটুকু বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল। এহেন কোনও পৃষ্ঠপোষক যদি নিখিলের ছবির সঙ্গে দেশের জনসাধারণকে ব্যাপক-ভাবে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব নিতেন তাহলে নিখিলের অক্লান্ত কঠিন শিল্পী-জীবন অন্য পথে চালিত হত এবং শিল্পীও বোধ হয় শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারত। আশা করি ভারতের বিভিন্ন শহরে নিখিল বিশ্বাসের এই বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করে ললিতকলা অ্যাকাডেমি বা রাজ্য সংস্থা শিল্পী তথা ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করবেন।

—চিত্রপ্রিয়

দিনরাতের খেলা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ষোল
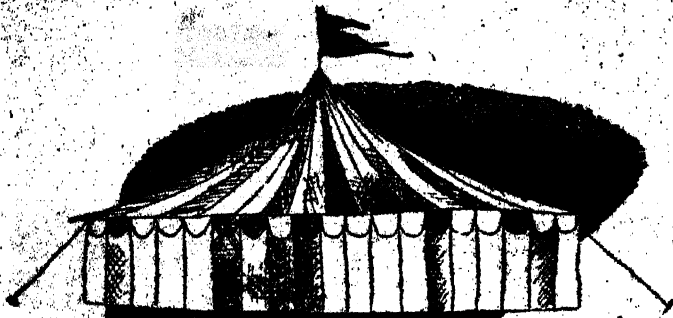
হারকু সাহেবের তাঁবুর মধ্যে অন্ধকার সাপের মতন ফণা তুলে আছে। তার তলায় জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল লীলা। বাইরে হারকু সাহেব তাকে ধমক দিতে পারেনি, লীলা জানত, এখন সে তাকে তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে যেতে বলবে। হারকু সাহেবের শাসন অগ্রাহ্য করে তার সংগে কথা বলবার জন্যে লীলা মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল।

হারকু সাহেবের তাঁবুতে অন্ধকারে এক-একা চলে আসবার ইচ্ছে আজ হঠাৎ হয়নি লীলার। নম্বর শেষ হয়ে যাবার পর শরীরের খাঁজে-খাঁজে বাতের ব্যথার মতন ক্লান্তির এক-একটি আঁচড় লেগে থাকলেও অনেক মধ্যরাতে তার চোখে ঘুমের ঈষৎ কাতরতাও ছিল না। বুকের মধ্যে যন্ত্রণার নিষ্ঠুর পেষণ অনুভব করেছে লীলা। এবং খুব কঠিন একটা খেলা দেখাবার মন নিয়ে নবীনের ফাঁস বড় সন্তর্পণে ছাড়িয়ে সে খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে।

কিছু সময় বিকল একটা যন্ত্রের মতন দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে পা অসাড় হয়ে এসেছে লীলার, তাঁবুর বাইরে যেতে তার সাহস হয়নি। মোজকার মতন অঘোরে ঘুমোচ্ছিল নবীন, মেঘের ডাকের মতন তার নাক থেকে বিশ্রী একটা শব্দ উঠছিল। লীলা ঘুমন্ত নবীনের দেহ দেখেছিল, তার নাক ডাকার শব্দ শুনেছিল এবং কাতর একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার শুয়ে পড়েছিল। দু-হাতে কপাল টিপতে টিপতে জেগে থাকার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছিল লীলা। তার মনে হয়েছিল হারকু সাহেব তার আর কেউ নয়, যে মানুষটা তার পাশে পড়ে আছে মড়ার মতন—সে-ই সব।

গভীর রাতে হারকু সাহেব লীলাকে একা পেলে আগের মতন বুকে চেপে ধরবে না, আদর-সোহাগ করবে না—এখন সে তাকে দেখলে চমকে উঠবে, গালাগাল করবে। লীলার আরও মনে হয়েছিল, রাগের ঝোঁকে দিন রাত বিবেচনা না করেই হারকু সাহেব তাকে আর নবীনকে জুবেলি সার্কাস থেকে নিষ্ঠুরের মতন তাড়িয়ে দেবে। এখান থেকে চলে যাবার ভয় লীলার মনের ইচ্ছাকে এত-দিন দাবিয়ে রেখেছিল—তাই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হারকু সাহেবের তাঁবুতে ঢুকে পড়তে তার সাহস হয়নি।

আজ লীলা হঠাৎ উঠে আসেনি। সার্কাস ছিল না, কিন্তু বড় ক্লান্ত তার শরীর, নির্জীব মন—ফুরিয়ে যাওয়ার মতন। যমুনার তাঁবুতে যাওয়া-আসা শুরু করেছে হারকু সাহেব। মাখামাখি হবে তার সঙ্গে। সে তাকে নতুন-নতুন খেলা শেখাবে, সার্কাস কুইন করে দেবে।

লীলা পিছিয়ে পড়বে আস্তে আস্তে, একটা ভীতু মানুষের বউ সেজে তাকে থাকতে হবে সারা জীবন। যমুনা হাততালি দেবে তাকে দেখে। এসব ভাবতে ভাবতে লীলা জেগে-জেগে জ্বলে যাচ্ছিল। যদি একটাও কঠিন নম্বর জানত নবীন, ভীতু মানুষ না হত তাহলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকত তার জীবনে এবং একদিন এমন পিছিয়ে থাকার বাঁধন থেকে মুক্ত হতে পারত লীলা।

কিন্তু তেমন কোন ঘটনা ঘটবে না, লীলার মুক্তির সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে হারকু সাহেব। হাত দিয়ে জোরে-জোরে কপাল ঠুকছিল লীলা, মনে মনে বলছিল, আমার এমন সর্বনাশ তুমি কেন করলে গো হারকু সাহেব!

দক্ষিণ কলকাতার শহরতলি এখনো হালকা শীতের আমেজে ঝিমঝিম করছিল। বাতাস চলে বেড়াচ্ছিল খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে। সরু চাঁদ বাসি লাউ-এর টুকরোর মতন আকাশে লেগে থাকলেও আলো কিংবা হাওয়া—লীলার তাঁবুতে এসব কিছু ছিল না। শুধু ঝাঁক-ঝাঁক মশা এক সঙ্গে জড়ো হয়ে তার দেহ ফালা-ফালা করে দিতে চাচ্ছিল।

বাঘ-সিংহের ডাকাডাকি, টালিগঞ্জের পুলিশ ফাঁড়িতে থেকে থেকে ডাকাত পড়ার মতন চিৎকার, "এ ভবানী, ডিউটি বদলিকা টাইম হো গিয়া! আ যাও—" লীলার শরীর এসব শুনতে শুনতে লোহার মতন শক্ত হয়ে উঠছিল।

কিছু পরে সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। কুকুর বেড়াল না, একটা মানুষ চলাফেরা করছে। লীলার তাঁবুর পাশেই পায়ের খসখস শব্দ

হল, মানুষের কাশি উঠল। হারকু সাহেবের গলার স্বরের মতন তার পায়ের শব্দও বড় কর্কশ। লীলা চেনে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ পড়ে থেকে সে উঠে বসল। এত রাতে বাইরে কেন ঘোরাঘুরি করে হারকু সাহেব! কার তাঁবুতে যায়? যমুনার তাঁবুতে? যায় না ফিরে আসে?

তাড়াতাড়ি খাট থেকে নামতে গিয়ে লীলার পা লেগে জলের ছোট কুঁজো উল্টে গেল। গলগল করে জল পড়ে যাচ্ছিল, গেলাস গড়িয়ে গেছে আর একদিকে। এসব দেখবার মতন মনের অবস্থা ছিল না লীলার। সে খুব পাতলা একটা ব্লাউজ পরল, শাড়ি বদলে নিল অন্ধকারে, মুখে গলায় পাউডার ঘষল এবং নবীন জেগে আছে কিনা তা জানবার কোন চেষ্টা না করেই বেরিয়ে এল।

তাঁবুর বাইরে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার কালো বোরখার মতন ঝুপ করে পড়ল লীলার উন্মুখ দেহের ওপর। দড়িতে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে যেতে কোন রকমে সে সামলে নিল। অন্ধকারের শাসন গ্রাহ্য না করে চারপাশে উৎসুক দৃষ্টি মেলে দিশাহারার মতন হাঁটছিল লীলা—পাহাড়ে পেশী তুম্বা একটি মানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

এখন আঁধার ঘন। কেউ আমাকে দেখে না। আমি শুধু শুধু এত জামা-কাপড় পরলাম! হারকু সাহেব, আমি আমার উরুর তাপ দিয়ে তোমাকে ঠেলে রাখব। আমার বুক টিপে-টিপে মধু চাখবে না তুমি? ঠোঁট চুষে-চুষে বলবে না, মেরা জান!

অন্ধকারের বেড়াজাল পা দিয়ে ছিঁড়তে ছিঁড়তে আপন মনেই বড় দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল লীলা।

যে খাট কিছু আগে পীরের কবরের মতন মনে হয়েছিল হারকু সাহেবের, তার ওপরেই সে এক পাশ ফিরে পড়ে থাকল। লীলা দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে, তার উপস্থিতি হারকু সাহেবকে আরও অবসন্ন করে তুলছিল এবং মনে মনে খুব কঠোর হয়ে ওঠবার চেষ্টা করলেও সে তাকে চলে যাবার কথা বলতে পারল না।

অনেক সময় চুপচাপ পড়ে থাকল হারকু সাহেব। যে-তৃষ্ণা জোর করে সে ঠেলে রেখেছিল, এখন তা তার গলার ভিতরে আগুনের তাপের মতন খাঁ-খাঁ করে উঠল।

"লীলা, এক গিলাস পানি পিলাও—" আরও পরে হারকু সাহেব খুব আস্তে কথা বলল। লীলার দিকে ফিরে দেখল না সে, কিন্তু পা গুটিয়ে নিয়ে তার খাটে আর একজন মানুষের বসবার জায়গা করে রাখল।

হারকু সাহেবের কোমল স্বর শুনে প্রথম কয়েক মুহূর্ত ভাবিভূতের মতন দাঁড়িয়ে থাকল লীলা। তাঁবুর মধ্যে অন্ধকার এখন ঈষৎ ফিকে, আলোর ক্ষীণ একটা রেখা অল্প অল্প করে ফুটে উঠছে। কিন্তু তাহলেও লীলার চোখ ঝাপসা—সে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না।

কোথায় জল আছে তা জিজ্ঞেস করবার আগেই বালিশের তলা থেকে বড় একটা টর্চ টেনে নিয়ে লীলার মুখের ওপর আলো ফেলে হারকু সাহেব বলল, "টেবিলের উপর—দেখলি?"

মুখের ওপর একটা হাত তুলে টর্চের আলো ঢাকবার চেষ্টা করছিল লীলা, "আলো নিভিয়ে দাও হারকু সাহেব—"

"কেন রে, শরম লাগে?" নিজের পায়ের ওপর আস্তে টর্চের আঘাত করতে করতে হারকু সাহেব লীলাকে বলল। তার স্বরে শেলষের কিছু ঝাঁজ ছিল।

হারকু সাহেবের কথার কোন উত্তর দিল না লীলা। সে পলকে জল গেলাস—এসব দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে তার চোখে ধাঁধা লেগে গিয়েছিল বলে টেবিলের ওপর অনেক জল পড়ল. গেলাস ভরল কি-না অন্ধকারে তা-ও বুঝতে পারল না লীলা।

"আমার রাউটিতে রাতের বেলা তুই কেন এলি?" ঢক ঢক করে জল খাচ্ছিল হারকু সাহেব। জল বড় গরম. তার গলা ভিজলেও তৃষ্ণা মিটল না। খালি গেলাস ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে লীলা বোবার মতন দাঁড়িয়েছিল, হারকু সাহেব তার দিকে গেলাস বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আউর এক গিলাস।"

গেলাস ভরতে অনেক সময় নিচ্ছিল লীলা ঈর্ষা দ্বেষ এবং ব্যর্থতা—এই রকম সব অনুভূতি তাকে কাচের ভাঙা ভাঙা টুকরোর মত খোঁচা দিচ্ছিল। হারকু সাহেবের তাঁবুতে কেন দুঃসাহসী হয়ে সে চলে এসেছে, তা তাকে স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যে সে বড় অস্থির হয়ে উঠছিল।

খালি গেলাস হাতে নিয়ে লীলা ভিজে টেবিলে হাত ঘষল, চুঁয়ে-চুঁয়ে জল পড়ছে। শাড়ি দিয়ে তা মুছে দিতে দিতে দূরে দাঁড়িয়েই লীলা সাহস করে বলল "টেবিল-পিংজের খেলায় তুমি যমুনাকে নিলে, হাসিকে নিলে—আমাকে নিলে না?"

হারকু সাহেব হাসল, "এই কথাটা বলবার জন্যে তোর ঘুম এল না—রাতের বেলা উঠে এলি?"

ভরা গেলাস নিয়ে আস্তে আস্তে হারকু সাহেবের খাটের কাছে আবার এসে দাঁড়াল লীলা; মদ খাওয়ার মতন জলের গেলাসে চুমুক দিতে থাকল হারকু সাহেব। লীলাকে এখন দেখবে না বলেই তার দু চোখ বন্ধ। অন্ধের মত হয়ে থাকলেও লীলার দেহের ঘ্রাণ হারকু সাহেবের মনে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল।

চোখ বন্ধ করে অনেক ওপরে উঠে যাচ্ছিল হারকু সাহেব, ব্যালেন্সের খেলার মতন এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করতে করতে সে খুব ঠাণ্ডা স্বরে বলল, "আমার সার্কাসের সব মানুষের উপর আমার সুবিচার করতে হবে। তুই ব্যাণ্ডেন্স দেখাবি, যমুনা হাসি ট্রাপিজ খেলবে—"

"যমুনা সার্কাস কুইন হয়ে যাবে হারকু সাহেব?" লীলার গলা ধরে এসেছিল, হারকু সাহেবের খাটে বসবার জায়গা থাকলেও হঠাৎ বসে পড়বার সাহস হল না তার।

হারকু সাহেব বলল, "ভাল খেলতে পারলে জরুর হবে।"

লীলা কিছু সময় মুখ নিচু করে থাকল, ঠোঁটে ঠোঁট চাপল। তাঁবু থেকে বেরিয়েই হোঁচট খাবার সময় তার পায়ের আঙুলে খুব লেগেছিল—এখন এক পা দিয়ে আর এক পায়ের আঙুল চাপতে চাপতে সে অভিযোগ করবার মতন বলল, "হারকু সাহেব, একটা ভীতু মানুষের সংগে তুমি যমুনার বিয়ে দিয়ে দেবে?"

লীলার ইঙ্গিত বুঝল হারকু সাহেব। তার কথা শুনে সে চোখ খুলল এবং খালি গেলাস মাটিতে আছড়ে ফেলে উষ্মা প্রকাশ করল, "যমুনা তোর মতন আওরৎ না, তার সাধির ভাবনা সে নিজে ভাববে। আমি কেন তার সাধি দিব?"

"আমার কী দোষ?" নিচু হয়ে গেলাস

খুঁজতে খুঁজতে পরিশ্রান্ত একটা মেয়ের মতন লীলা হাঁপাচ্ছিল, "সেই ছোট বয়েস থেকে তোমাকে দেখছি. তুমি রাতে বাউটিতে ডেকেছ — এসেছি. না আসতে চাইলে তুমি জোর করে ধরে এনেছ—"

হারকু সাহেব ধমক দিয়ে বলল, "তখন সাধ জাগেনি তোর?"

লীলা গেলাস দুহাতে চেপে ধরে হারকু সাহেবের খাটের ওপর তার পায়ের কাছে বসে পড়ে লীলা কাতর স্বরে বলল, "জোর করে একটু ভীতু মানুষের সাথে আমার বিয়ে তুমি কেন দিলে হারকু সাহেব?"

লীলা কথা বলতে বলতে একটা হাত ছড়িয়ে দিয়েছিল হারকু সাহেবের পায়ের ওপর। হারকু সাহেব পা সরিয়ে নিয়ে উঠে বসল। কিছু সময় সে তাঁবুর মধ্যে অশান্ত এবং অধীর হয়ে পায়চারী করল। পরে কাঠের চেয়ারে বসে-বসে লীলাকে দেখে তার মনে যে নেশা জেগে উঠেছিল তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে থাকল।

"হারকু সাহেব—"

"লীলা যা! ফের আমার বাউটিতে আসবি তো—একটুক শরম হল না তোর?"

"আমাকে কেউ দেখেনি।"

"বাঘ সিংহ দেখেছে, হাতি দেখেছে। কেউ না দেখুক, উপরওয়ালা সব দেখল—"

লীলা হারকু সাহেবের নিচু খাটে বসে অন্ধকারে তার দিকে তাকিয়ে হাসল। "তোমার বাউটিতে রাতের বেলা আসা আমার অনেক, ভগবান তা-ও দেখেছে হারকু সাহেব।"

"এসব বলিস না লীলা।" হারকু সাহেব তার কথা শুনে মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠলেও খুব আস্তে বলল, "বাউটিতে যা। নবীন উঠে যেতে পারে। তোকে খুঁজবে— না দেখতে পেলে এদিকে চলে আসবে— তখন কী রকম হবে বল?"

লীলা কাচের গেলাস নিয়ে বুকে জোরে চাপ দিতে দিতে বলল, "তোমার বাউটিতে সে-ও আমাকে রাতের বেলা অনেক দেখেছে হারকু সাহেব। তুমি চেঁচিয়ে তার নাম ধরে ডাকতে আর সে ছুটে সোডার বোতল নিয়ে আসত—তোমার মনে নেই?"

লীলার সাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিল হারকু সাহেব। এত সময় সে মেজাজ ঠিক রেখেছিল, এখন তার আর ধৈর্য থাকল না। তার পায়ের কাছে অনেক খালি সোডার বোতল ছিল, একটা তুলে নিয়ে উঁচু করে ধরল হারকু সাহেব, চিৎকার করে বলল, "আমার বাউটি থেকে তুই যাবার হবি কি-না?"

লীলা নড়ল না, হারকু সাহেবের হাতে সোডার বোতল দেখে হাসল, "আমি অনেক সয়েছি,আর পারি না। তার সাথে আমি থাকতে পারব না হারকু সাহেব।"

"কার সাথে থাকার মতলব তোর?"

"আমি একা থাকব, আমার খেলা নিয়ে থাকব—" গভীর রাতে তৃষ্ণায় লীলারও গলা শুকিয়ে আসছিল, গেলাস হাতে নিয়ে হারকু সাহেবের দিকে টেবিলের কাছে এগিয়ে আসতে আসতে সে আপন মনেই ফিস ফিস করে উঠছিল. "কারুর সাথে আমার থাকার দরকার নেই—"

লীলা বেরিয়ে যাচ্ছে মনে করে কিছু নরম হল হারকু সাহেব, সোডার বোতল নামিয়ে রেখে তাকে দেখতে দেখতে বলল, "এই কথাটা আগে যদি আমাকে বলতিস লীলা, তবে তোর সাধের জন্যে আমাকে মুটমুট ভাবনা করতে হত না—"

হারকু সাহেবের কথা না বুঝে লীলা

বলল, "তাহলে তুমি কেন বললে হারকু সাহেব?"

"কেন বললাম, তুই জানিস না?"

"না।"

"ঝুটে বাত বলবি না লীলা।"

"সাচ্চি, আমি জানি না হারকু সাহেব।"

"তোর মতলব ছিল আমার সঙ্গে সাধি করবার—" লীলা হারকু সাহেবের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, তার একটা হাত সে তুলে নিয়ে হাতির শুঁড়ের মতন এত পরে গালে-মুখে বুলোতে বুলোতে বলল, "সাচ কি-না বল?"

হারকু সাহেবের চোখা প্রশ্নের খুব সহজ উত্তর লীলা এক কথায় দিতে পারত, কিন্তু পরিচিত হাতের স্পর্শে তার গলার স্বর বন্ধ হয়ে এসেছিল। সার্কাসের বাইরের জগতের শাঁখা-সিঁদুরপরা সংসারী মেয়ের মতন কোন সংস্কার না, যে-দুঃসাহসে ভর করে লীলা এখানে এসেছিল হারকু সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে, যত কথা বলবে ভেবেছিল—এখন সব ঝাপসা হয়ে গেছে।

তার সব কথা কেঁচো আর উই পোকার মতন কখনো রক্তবর্ণ, কখনো সাদা হয়ে মনের মধ্যে চলাফেরা করলেও সে মুখ খুলতে পারল না। লীলার মনে হচ্ছিল, ঘূর্ণায়মান এক চক্রের ভিতর দাঁড়িয়ে কোন নতুন খেলা দেখাতে দেখাতে হঠাৎ সে হারকু সাহেবের অন্ধকার তাঁবুর মধ্যে পড়ে গেছে, কেবল এখনো তার মাথার মধ্যে ঘূর্ণনের একটা অস্বাভাবিক অনুভূতি হচ্ছিল।

লীলাকে অনেক সময় স্থির ও নীরব থাকতে দেখে তার হাত নিয়ে খেলা করতে করতে হারকু সহেব বলল, "এক কাহানী শুনবি লীলা?"

লীলা মৃদুস্বরে বলল, "হাঁ।"

"আমি তোর সাধি কেন দিলাম, সেই বাত আমি তোকে শুনাব—" হারকু সাহেব লীলার হাত ছেড়ে দিল, কাঠের হালকা চেয়ারে বসে যত দূর পারল, তত দূর পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ার মতন শরীর বেঁকিয়ে আবার চোখ বন্ধ করে বলল, "সার্কাসের দোসরা আওরতের মতন আমার সাথে তোর যদি শুধু মজা করবার মতলব থাকত, তবে নবীনের সাথে আমি তোর সাধি দিতাম না—সাচ বলছি।"

লীলা অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল, "বার-বার মতলবের কথা তুমি আমাকে বল না হারকু সাহেব। মতলব-টতলব আমার ছিল না—"

"জরুর ছিল। ঝুটে বলিস না লীলা। আমার সাথে তুই মহব্বতের মতলব করেছিলি?"

লীলা পাপ স্বীকার করার মতন ভয়ে-ভয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, "হ্যাঁ। তোমার কথা ছাড়া কারুর কথা ভাবি না—"

"লীলা, চুপ!" হারকু সাহেব লীলার গায়ে আঘাত করে বলল, "আমার জীবনে আওরাত নাই। আওরাত জীবন বিনাশ করে দেয়, কম বয়সের মানুষকে বুড়ো বানিয়ে দেয়—শুনলি? আমার জীবনে এক জুয়েল সার্কাস আছে—ব্যস, আউর কুছ নেই।"

বাইরে গোলমাল হচ্ছিল। মাতাল হয়ে ফিরে এসেছে রাধানাথবাবু। সম্ভবত দারোয়ান তাকে ধরে-ধরে তাঁবুতে নিয়ে যাচ্ছে। রাধানাথবাবু তার সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলছে।

"হাম মাতোয়ালা নেহি হ্যায়। হাম হ্যায় রাজা রাধানাথ সিকদার—মালুম? হাম হ্যায় যমুনাকা বাপ, হাসিকা বাপ। হাম হো যায়গা মোহনলালকা শ্বশুর।"

"এ দারোয়ান, শ্বশুর কিসকা বোলতা সামঝো? জরুকা বাপ। তুমরা জরু হ্যায়? কাপ্তানীনি পাশো, সুপারি খসো, ও দিলকা পিয়ারি—

"হাম হো যায়গা শিবনাথকা—আরে, নেহি নেহি, শিবনাথ বহুৎ বদমাশ। হাম হো যায়গা হারকু সাহেবকা শ্বশুর।

ব্যস, এ জুয়েল সার্কাস হামরা হ্যায়। এই চলা আও, বোতল লে আও। এই, আপ!"

রাধানাথবাবুর সব কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল, লীলা যন্ত্রণাকাতর মুখ তুলে ঠাণ্ডা গলায় বলল, "রাধানাথবাবু কী বলে গেল?"

হারকু সাহেব বিরক্ত হয়ে বলল, "ওসব বাত ছোড়। বড়া আদমী ছিল, আর আউর রেস খেলাকে একদম খতম করে দিল—"

লীলা মাথা নিচু করে বলল, "জানি।"

যেমন করে এসেছিল লীলা, এখন একা-একা আস্তে আস্তে পা ফেলে তেমন করেই আবার ফিরে যাচ্ছিল, যাবার সময় কিছু বলল না। হারকু সাহেব তাকে যেতে দিল না, কথা বলল।

"লীলা এক কাহানী শুনাব তোকে?"

হারকু সাহেবের পাশে এসে পাথরের ঠাণ্ডা মূর্তির মতন স্থির হয়ে থাকল লীলা। রাধানাথবাবুকে তাঁবুতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেছে দারোয়ান। বাঁশের গেট টেনে দেয়ার খরর খরর শব্দ এল। পুলিস ফাঁড়িতে একবার মাত্র ঘণ্টা বাজল। সাড়ে বারোটা কিংবা একটা কি দেড়টা—কত রাত হল কে জানে।

একটা আবেশ দোলা দিয়ে যাচ্ছিল হারকু সাহেবকে। ভিজে কয়লার মতন তার মনে অহঙ্কারও থেকে থেকে দপ দপ করে উঠছিল। আবেশ ও অহঙ্কার আয়ত্ত করে নেয়ার জন্যে সে মাটিতে পা ঘষছিল। লীলার হাত দোলাতে দোলাতে হারকু সাহেব বলে যাচ্ছিল তার জীবনের সুন্দর এবং ভয়ঙ্কর এক কাহিনী।

ক্রমশ

কলার ও কাফ্
সবচেয়ে বেশী ময়লা হয়...

501
SPECIAL

গানের আসর

রবীন্দ্রনাথের নাট্যধর্মী সঙ্গীত

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে যাঁরা কবিতা পাঠ শুনেছেন তাঁরা জানেন তিনি বরাবর ছন্দের গতিকে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে বজায় নাট্যভাব বা সংলাপ যতই থাক না কেন ছন্দের গতিকে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে বজায় রাখতেন। মনে আছে শেষ বর্ষামঙ্গল উৎসবে "আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা"—কবিতাটি খোল সঙ্গতের সঙ্গে পড়ে শুনিয়েছিলেন, ভারি সুন্দর লেগেছিল সেই পাঠভঙ্গী। দীর্ঘ কর্ণ-কুন্তী সংবাদ তাঁর রেকর্ড আছে। সেখানেও দেখা যাবে সংলাপের নাট্যভাব বজায় রেখেও তিনি কবিতার ছন্দটি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অনেকে রবীন্দ্রকাব্যের আবৃত্তিতে ছন্দকে রক্ষা করেন না—কথাগুলিকে গদ্যের মত ভেঙে ভেঙে পাঠ করেন। তাঁরা মনে করেন এতে নাটকীয় ভাব বা আবেদন বিশেষভাবে প্রকাশ পায় কিন্তু এতে আর একটি বৈশিষ্ট্য যে বিশেষ-ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়, সেটি তাঁরা ভেবে দেখেন না। যদি গদ্যের ধারায় পাঠ করাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত তাহলে কবিতার কোন সার্থকতা থাকত না। কাব্য এবং অভিনয় দুটির সমতা রক্ষা করাতেই কবির আনন্দ ছিল। আর একটি জিনিস তিনি সযত্নে পরিহার করতেন, সেটি হচ্ছে অতি নাটকীয়তা বা প্রফেশনাল নটদের বাচন-ভঙ্গী। তাঁর সময়ে থিয়েটারের অভিনেতা-দের একটা কৃত্রিম স্টাইল ছিল আর ছিল অনাবশ্যক আস্ফালন। এ নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করেছেন। বলা বাহুল্য, তাঁর নাট্যধর্মী গীতগুলিতেও তিনি একই রীতি প্রয়োগ করেছেন। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকায় বিভিন্ন রসের অবতারণা করা হয়েছে—অভিনয়ের ব্যাপক সুযোগও এতে আছে কিন্তু সুরে এবং নৃত্যে সর্বত্রই একটা কাব্যের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। নৃত্যনাট্য কোনও জায়গাতে গদ্যভাবাপন্ন হয়নি। একে অধিক নাট্যায়িত করতে গেলেই তা আর রাবীন্দ্রিক আর্ট থাকবে না। মেলডিকে রবীন্দ্রনাথ সব কিছুর উর্ধ্বে রেখেছেন—কোনও কারণেই এর বিচ্যুতি তিনি সহ্য করেন নি। আজকাল রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য বা গীতিনাট্য যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন এই দিকটার কিছু কম লক্ষ রাখা হয় দেখেছি। যাঁরা অনুষ্ঠান করেন তাঁদের যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলছি না, এঁরা সাধারণত ভালই গান, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাট্যধর্মী রচনা সম্বন্ধে অনেক সময় তাঁদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না। ত্রুটি ঘটে পরিচালনার দোষে—আসলে পরিচালকগণ নিজেরাই এ বিষয়ে বেশী চিন্তা করেন নি। আকাশ-বাণীতে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলি যখন নাটকে রূপান্তরিত হয় তখন সংলাপে ঠিক এই ধরনের বিচ্যুতি ঘটে। রাবীন্দ্রিক সংযম বা সংলাপের বিশিষ্ট সুনিয়ন্ত্রিত ধারাটি এই সব কৃত্রিম নাটকে পাওয়া যায় না। এর জন্য অভিনেতারা দায়ী নন—যিনি পরি-চালনা করেন বা নাটকের রূপ দিচ্ছেন তিনিই দায়ী। বস্তুত রবীন্দ্রসংগীতের গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্য বিভাগটি অত্যন্ত কঠিন—কবির চিন্তাধারার সঙ্গে সুগভীর পরিচয় না থাকলে এই সব অনুষ্ঠানে সফল হওয়া সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য বাল্মীকি প্রতিভার কথা এই প্রসঙ্গে স্বতই মনে উদিত হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের রচনা হলেও কাঁচা রচনা নয়। সংগীতের দিক থেকে এটি একটি অতি সার্থক পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষায় আর কেউ এ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছেন বলে জানি না। সম্পূর্ণ নাট্যধর্মী গানগুলিতে রবীন্দ্রনাথ আবার বিভিন্ন রাগ যোগ করেছেন। রাগসংগীতের সেই কাঠামো-টুকু অপ্রকাশিত থাকলেও এই নাটকটি সম্পূর্ণ সার্থক হবে না। অভিনয়, চিত্ত-বৃত্তির বিভিন্ন নিদর্শন, পরিহাস, গাম্ভীর্য, করুণা এগুলির প্রকাশ তো আছেই এর সঙ্গে রয়েছে এর একটি সুললিত গীতধর্মী দিক। এই সবগুলিই ঠিক রাবীন্দ্রিক নিয়মে প্রকাশ পেলে তবেই এই গীতিনাট্যের অনুষ্ঠান সার্থক হয়েছে বলা যাবে। আমরা যে ভাবে আজকাল এই গীতিনাট্যটি

ক্লাসিক প্রেস ॥ ৩/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ॥ ক্লাসিক প্রেস

অনুষ্ঠিত হতে দেখি তাতে বহু দিক থেকেই এর ত্রুটি থেকে যাচ্ছে বলে মনে হয়। গীতিনাট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে একটা আদর্শ ছিল তা অবহেলিত হচ্ছে বলেই আমাদের ধারণা।

সম্প্রতি গ্রামোফোন কোম্পানী "বাল্মীকি প্রতিভা" রেকর্ড করেছেন। রেকর্ডটি উত্তম হতে পারত কিন্তু পরিচালনার ত্রুটিতে এটি বহু স্থানেই সার্থকতা অর্জনে সমর্থ হয়নি। দস্যুদের সংলাপগুলি গাওয়ার একটি বিশেষ ভঙ্গী আছে যাতে লিরিকের ভাবটি সম্পূর্ণ বজায় থাকে অথচ নাট্য অংগটিও ফুটে ওঠে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাগের রূপটিও নাট্যভাবের সংগে গভীর-ভাবে যুক্ত। রেকর্ডটি শুনে মনে হল এই অংশগুলিকে একান্ত প্রহসন হিসাবেই দেখা হয়েছে এবং এর সাঙ্গীতিক সূক্ষ্মতা-গুলিকে আদৌ বোঝবার চেষ্টা করাই হয়নি। দস্যুদের হাসিগুলি রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ ছন্দে প্রকাশ করেছেন যাতে কাব্যের বৈশিষ্ট্য থাকে অথচ হাসির আবেদনটিও পুরোপুরি বজায় থাকে। রেকর্ডে যা শোনা গেল তাতে এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গেল না—সবটাই যেন একটা মাত্রা ছাড়ানো

রসিকতা কেবল দাপট আছে শৃঙ্খলা বা সংযম নেই। এই অংশগুলি যদি অতি নাটকীয়তা বাদ দিয়ে গীতিকলা এবং ছন্দের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে গাওয়া হত তাহলে সহজেই সাফল্য অর্জন করা যেত। বাল্মীকির গানগুলি অতিশয় ম্লান, প্রায় কোনটিই জমেনি। বরঞ্চ মেয়েদের গাওয়া গানগুলি ভাল এবং এঁদের প্রস্তুতিও উন্নততর। সব মিলিয়ে মনে হল এই বাল্মীকি প্রতিভা তাঁদের জন্য যাঁরা বেশ মজা করে কোনও পালাগান শুনতে চান এবং স্থূল প্রহসন উপভোগ করেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের আর্ট যাঁরা এই রেকর্ডে খুঁজবেন তাঁরা বোধ করি হতাশই হবেন।

এ কথা বললাম এই কারণে যে রেকর্ডের ওপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নিত্যনৈমিত্তিক আকাশবাণীর প্রোগ্রাম সকলেই শোনেন এবং বিস্মৃত হন কিন্তু রেকর্ডকে সযত্নে রক্ষা করা হয়। এমন কি অধিকাংশ ব্যক্তি রেকর্ডকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বলে মনে করেন। অনেক প্রতিষ্ঠান (বিশেষ করে কলকাতার বাইরে) হয়ত এই রেকর্ডটিকেই আদর্শ অবলম্বন করে গীতিনাট্যটি মঞ্চস্থ করবেন। প্রসঙ্গত অতি সম্প্রতি "বালিকা বধূ" চিত্রে যোজিত দ্বিজেন্দ্রলালের "আজি এসেছি এসেছি বধূ হে, নিয়ে এই হাসিরূপ গান" এই গানটির কথা মনে পড়ল। সিনেমাতে যে ভাবে গানটিকে প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে হয়ত এক শ্রেণীর দর্শক খুশীই হন কিন্তু নিছক ইয়াকিতে গানটির সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। পুরোনো বেদানা দাসীর রেকর্ডে বা থিয়েটারে যেভাবে এ গানটি গাইতে শোনা গেছে সেটা এর যথার্থরূপ নয়, বরঞ্চ মহা-নিকৃষ্ট। কিন্তু আজকের এই বিদগ্ধ যুগে এইসব অতুলনীয় সৃষ্টিকে নেহাৎ লঘুভাবে প্রয়োগ করাকে সঙ্গীত সংস্কৃতির অধঃপতন বলেই ধরব।

স্বরলিপির সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে আজ যাঁরা ধুন্ধুমার বাঁধিয়েছেন তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি এ প্রশ্ন তুলছি না, কেননা সেটা শোধরানো যায় কিন্তু সমগ্র উপলব্ধিতে যদি দোষ থাকে তাহলেই মারাত্মক। গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিশেষ সঙ্গীতচিন্তা ছিল। সর্বাগ্রে সেই চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। শিল্পীর বা পরিচালকের যদি সেই উপলব্ধি থাকে তাহলে দেখা যাবে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও অনুষ্ঠানটি সার্থক হয়েছে। আর যদি সেটি না থাকে তাহলে স্বরলিপির নিখুঁত অনুসরণও একটা নিষ্প্রাণ আবৃত্তিতে পরিণত হবে। আমাদের গায়ক-গায়িকাদের গলা ভাল, প্রয়োগে তাঁরা অপারগ নন কিন্তু অভাব একটি সর্বাঙ্গীন শিক্ষার যা তাঁদের প্রয়োগবিধির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা এনে দেবে। আজকাল প্রধান

শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার

প্রধান গীতিকারদের গান বা পুরাতন জনপ্রিয় গান সিনেমায় সংযোগ করবার একটা ইচ্ছা দেখা যাচ্ছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সার্থকতাও পরিলক্ষিত হয়, যেমন "ছুটি" চিত্রের "আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা" এবং "জীবন নদীর ওপারে" গান দুটি। এক সময় এই গানগুলির সঙ্গে আমাদের গভীর পরিচয় ছিল, আজ আবার এগুলির রোমান্টিকতা অনুভব করলাম।

ঠিক এইভাবে যদি অপর প্রয়োগগুলিরও প্রশংসা করা যেত তাহলে খুশী হতাম, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা করা যাচ্ছে না। আমরা আশা করি এইসব গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত যাঁরা প্রয়োগ করবেন তাঁদের কর্তৃপক্ষ যেন উপযুক্ত নিষ্ঠা এবং দায়িত্ব নিয়ে এ কার্যে অগ্রসর হন।

শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার

শ্রীমতী সুপ্রভা সরকারকে গত যুগের গায়িকা বলব না। তিনি এখনও গান করেন এবং তা পরম শ্রোতব্য। কিন্তু যাকে বলে প্রোফেশনাল জগৎ সেখান থেকে সরে এসেছেন। যাঁরা কেবল মধ্যগগনের শোভমান গায়ক সমাজকেই জানেন এবং সেখান থেকে অপসারণ করবার পর কোনও গায়ক গায়িকার পরিচয় মনে রাখেন না তাঁদের কাছে তিনি হয়ত বিস্মৃত। কিন্তু স্মৃতির মধুর বেদনা যাঁদের মনকে অধিকার করে রাখে এবং সেই বেদনার মূল্য দিয়েই যাঁরা শিল্পীকে মানসে সঞ্জীবিত রাখেন তাঁদের কাছে সুপ্রভা দেবী তাঁর প্রতিভার গৌরবেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবেই হয়েছে অথচ এই অপরিচিত ব্যক্তিটির কাছে তিনি বহু বিগত ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত একটির পর একটি উল্লেখ করে যেতে লাগলেন কেবল একজনের স্মৃতি তাঁর স্মৃতিতে আলোড়ন এনেছিল বলেই, নইলে সাধারণ ভদ্রতার অতিরিক্ত কিছু তাঁর কাছ থেকে পাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব হত না। আলোচনা প্রসঙ্গে এমন অনেক

কথা উঠেছে যা ব্যক্তিগত, সেগুলি তিনি অপ্রকাশিত থাকবে বলেই বলেছেন কিন্তু স্পষ্টভাবে তাঁর মতামত প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হন নি। স্বল্প আলোচনাতেই বুঝলাম মনোভাব প্রকাশ করবার ব্যাপারে তিনি স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ। কোনও বিদ্বেষ বা তিক্ততা তাঁর অন্তরকে পীড়িত করেনি। সংগীত-জগতে তাঁর অভিজ্ঞতা কম নয় কেননা রংগমঞ্চ ভিন্ন এই জগতের বহু বিভাগই তিনি দেখে আসছেন প্রায় শিশুকাল থেকে এবং যে সময়ের কথা তিনি জানেন তখন এসব বিভাগে এতটা উন্নতি হয়নি বা শিক্ষিত ব্যক্তির সমাগমও খুব কম ছিল।

সুপ্রভা দেবী গান গাইতে আরম্ভ করেন খুবই অল্প বয়স থেকে। তাঁর দেশ আমতায়—শ্বশুরালয় বর্ধমান। বাল্যকালে তাঁকে দুরবস্থার সংগে সংগ্রাম করতে হয়েছে শুনলাম। সিনেমা জগতে যখন তিনি গায়িকা হিসাবে প্রবেশ করেন তখন প্রমথেশ বড়ুয়া ভাস্বর ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছেন। তাঁর স্নেহ তিনি লাভ করেছিলেন। শ্রীমধু বসুর কথাও তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার সংগে বললেন। রাজনর্তকীর গানগুলিতে তিনি সাফল্য লাভ করেছিলেন। সিনেমার সংগে যাঁরা সংশ্লিষ্ট থাকেন তাঁদের সম্বন্ধে নানা কথা শোনা যায় কিন্তু সুপ্রভা দেবী বললেন, তিনি কখনও কোনও অসুবিধা বোধ করেন নি বরঞ্চ সবাইকার সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর গানের সংখ্যা বহু এবং অধিকাংশই হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী থেকে বেরিয়েছে। রাজনর্তকী ছাড়া জীবনমরণ, স্বপ্ন ও সাধনা, রিক্তা প্রভৃতি কয়েকটি ছবির কথা তাঁর বিশেষ করে মনে আছে। ফিল্ম কর্পোরেশনে তিনি ভীষ্মদেবের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। এর জন্যও তিনি গৌরব বোধ করেন। সুরসাগর হিমাংশুকুমার দত্ত সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা অপরিসীম। তাঁর একটি অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল যা আর কারুর মধ্যে দেখা যেত না। কাজী সাহেবের কাছেও তিনি গান তুলেছেন। তাঁর "কাবেরী নদী জলে" গানটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। বস্তুতঃ আজকাল চাপা গলায় প্রায় গুঞ্জরণের মত যাঁরা গান করেন সুপ্রভা দেবী তাঁদের দলে

নন—খোলা গলায় স্পষ্ট উচ্চারণে গান করা তাঁর অভ্যাস। এ ছাড়া তাঁর কণ্ঠে এমন কতকগুলি কাজ আছে যা আজকের গায়িকাদের গলায় আসা শক্ত। এই কারণেই হিমাংশুকুমারের সুরের সূক্ষ্ম কারুকার্য তাঁর গলায় যেমন ফোটে তেমনি কাজী সাহেবের গানের স্বচ্ছ ও উদাত্ত ভাবটিও পরিস্ফুট হয় স্বাভাবিকভাবে। পরবর্তী-কালে তাঁর সংগীত শিক্ষা সম্পর্কে শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী এবং শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করলেন। রবীন্দ্র ভারতী থেকে তিনি ডিপ্লোমা নিয়েছেন এবং বর্তমানে কেয়াতলার টিচার্স ট্রেনিঙ্ কলেজে অধ্যাপিকা হিসাবে নিযুক্ত আছেন।

আজকাল তিনি আর আধুনিক প্রেম সংগীত গাইতে উৎসুক নন। বয়স হয়েছে, প্রেমসংগীত তাঁর গলায় আর মানায় না বললেন। তা ছাড়া আজকালকার হালকা গান তাঁর আদৌ পছন্দ নয়। অবশ্য আধুনিক গানের প্রতি এ তাঁর কটাক্ষ নয়। ভাল আধুনিক রচনা তিনি এখনও গেয়ে থাকেন। কিছুকাল হল সাধারণ আসরে গাওয়া থেকেও নিবৃত্ত হয়েছেন। তাঁর পারিবারিক মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখেই বিশেষ করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু তা বলে একেবারেই বিদায় গ্রহণ করেন নি, বিশিষ্ট অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই গান করেন এবং

শ্রীনন্দকিশোর দাস

রেডিওতেও তিনি নিয়মিত শিল্পী। জনপ্রিয়তা প্রত্যেকেই কামনা করেন, তিনিও একদা করেছেন কিন্তু আজ তিনি তাঁর সংসার, দুই পুত্র, স্বামী পরিজনের কাছে নিজেকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে জনপ্রিয়তার মোহ আর তাঁকে আকৃষ্ট করে না। বললেন, একদিন কিছুক্ষণের জন্যও সংসার থেকে অবসর নিলে মহা গোলমাল বেধে যাবে।

আজও তিনি শিল্পীদের আপনজন। তাঁদের সবাইকার তিনি "দিদি"। সত্যিই তাঁর সংগে পরিচিত হলে আপনা থেকেই দিদি বলতে ইচ্ছে হয়। বয়স নির্বিশেষে এই জাতীয় মহিলারা স্বভাবগুণেই সবাইকার স্নেহশীলা "দিদি" হবার যোগ্যতা অর্জন করেন।

শ্রীনন্দকিশোর দাসের পদাবলী কীর্তন

গত ৩রা সেপ্টেম্বর শ্রীঅশোককুমার সরকার মহাশয়ের বাসভবনে প্রখ্যাত কীর্তন গায়ক শ্রীনন্দকিশোর দাস পদাবলী কীর্তনে মাথুর রূপায়িত করেন। আজকাল যে স্বল্প কয়েকজন কীর্তনের পুরাতন উচ্চ ধারাটি রক্ষা করে আসছেন নন্দকিশোর তাঁদের অন্যতম। এই অনুষ্ঠানে তিনি কীর্তনের কয়েকটি বিশিষ্ট তাল সহযোগে শশীশেখর, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং অপরাপর স্বনামধন্য পদকর্তাদের পদাবলী গেয়ে শোনান। মাথুরের করুণ এবং মধুর রসটি তাঁর অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। নন্দকিশোর কীর্তনের অধ্যাপনা করেন এবং সরকারী সাহায্যে একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করছেন।

সরোদী শ্রীরবি ঘোষ

সম্প্রতি উত্তর কলকাতার একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তরুণ শিল্পী শ্রীরবি ঘোষ সরোদে পূরিয়া ধানেশ্রী বাজিয়ে শোনালেন। জানা গেল, সংগীত সম্পর্কে তিনি শিক্ষালাভ করেছেন পণ্ডিত রবিশংকরের কাছ থেকে। তাঁর হাত মিষ্টি এবং কয়েকটি কাজে দক্ষতার পরিচয়ও পাওয়া গেল। কলকাতায় থাকবার বাসনা থাকলেও কার্যোপলক্ষে তাঁকে দিল্লিতে বাস করতে হচ্ছে। আশা করি দিল্লীতে তিনি নিজ গুণে প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হবেন। এঁর সঙ্গে তবলাসঙ্গত করেন শ্রীমানিক সাধু খাঁ। এঁর বাজনা উপভোগ্য এবং সঙ্গতের রীতি মনোরম। এঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ বলে মনে করি।

—শার্ঙ্গদেব

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

একচল্লিশ

অচিনবাবুর কথা শুনে শ্রোতার দলে আওয়াজ ওঠে, 'সাধু, সাধু, সাধু, সাধু।' কেবল সেইটুকুতেই সব না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যাত্রার পালার মতন জয়ধ্বনি দেয়, 'জয় অচিনদার জয়।' অন্য কেউ বচন দেয়, 'অচিনদা নইলে এসব হয় না।'

এক যুবা বলে ওঠে, 'আমি তো কখন থেকে ভাবছি, অচিনদার আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন।'

অচিনবাবু জবাব দেন, 'কী করি বল। সকালবেলা পুরনো বন্ধুরা অনেকে এলেন। আমি গেলাম কারুর কারুর বাড়িতে। এই দেখাশোনার পালাতেই যা একটু দেরি হয়ে গেল। তাও তো সরকারী বেসরকারী ভি আই পি, একজিবিশনের দ্বারোদ্ঘাটন, ওসব কোন-রকমে কাটিয়ে এসেছি। পৌষ মাসে আসার কারণ ওসব তো নয়। নতুন পুরনোর একটু দেখাশোনা, আর এই আসরটিতে এসে বসা। ওরে, এই তো সবে শুরু, খুব দেরি করিনি।'

বলে আবার আওয়াজ তোলেন, 'ও গোকুল, ও বিন্দু, তোরা ধর গো ত্বরা করে।'

বাদের সঙ্গে যেমন কথা। অচিনবাবুর কথার এদিক ওদিক পাবে না। যেন গানের ভাষায় জানেন। চেনা-শোনাদের মধ্যে এমনি কথা। আমরা যারা অচেনা, তারা এঁদের দিকে চেয়ে খুশী মনে হাসি।

ওদিকে দেখ, বিন্দু কেমন লাজে লাজিয়ে যায়। এ কেমন বাউল প্রকৃতি হে। দেখি, ডাগর চোখের কালো তারায় যেন গৃহস্থের বউবউী বধূ হাসিতে ব্রীড়াময়ী। লালপাড়ের ছোপানো শাড়িতে একটু ঘোমটা টেনে দেয়। তবু, সিঁদুরের টিপ কাঁপিয়ে চোখের কোণ দিয়ে বারেক দেখে অচিনবাবুকে, বারেক, পুরুষ গোকুলকে।

গোকুলেরও সেই দশা। ডাগরা বাউলের আলখাল্লা টান-টান, কোমরে বাঁধন জোর কষা। 'বুকের ছাতি দেখ, যেন লোহায় পেটানো। পেটের কাছে এক ছিটে মাংস নেই। সে একবার বিন্দুর দিকে চেয়ে হাসে, আবার অচিনবাবুর দিকে। দুটিতে বড় লজ্জায় পড়েছে।

তখন বিন্দু বলে, 'আমরা তো পলায়ে যেইছি না, আর সবাইকে বলেন না ক্যানে।'

অচিনবাবু বলেন গোপীদাস বাউলকে, 'এই দেখ তো গোপীদাদা, বাদ যাবে নাকি কেউ, সবাই গাইবে, সবাইকেই বলব। তোরা দুজনে শোনা না একখানা।'

গোপীদাস বলে, 'এতে আবার কথা কী আছে। বইলছেন, গাও।'

আরও কয়েকজন ঘাড় নাড়ে। অচিন-বাবু হঠাৎ আমাকে দেখিয়ে বলেন, 'আমার এই ছোকরা বন্ধুকে তোমাদের গান একটু শোনাতে চাই। গোপীদাদা বললে কিনা, ইটির চোখ নাকি একটু কেমন চিতা-বাঘের মত।'

বুড়া তাড়াতাড়ি দাড়ি কাঁপিয়ে বলে,

আর তুমি যে বইলতুল কালো মেভালের মতন।'

আমি গোকুল বিন্দুর দল সবাই হাসিতে বেজে ওঠে। সবাই, কেউ সোজায়, কেউ তেরছায় চায়। আর আমি ভাবি, ই কি বিপদে ফেলেন গ অচিনবাবু। প্রীতি ও সম্মান বুঝতে পারি, কিন্তু এতটা তার যোগ্য নই। দশজনের সামনে লজ্জায় পড়তে হয়।

অচিনবাবু হাসতে হাসতে আমার পিঠ চাপড়ান, তারপরেই হঠাৎ হেঁকে ওঠেন, না না না, ওরে বিন্দু, তোর ওই চোখে ও চিত। শিকার করিস না। চোখ ফেরা, চোখ ফেরা।'

বিন্দু তৎক্ষণাৎ ঘোমটায় একটু টান দেয়, সলজ্জ হেসে আওয়াজ করে, 'আহ্, কী কথা গ।'

আবার সবাই হাসে। অচিনবাবু হাসেন গোপীদাসের দিকে চেয়ে। যেন বুড়া প্রৌঢ় দুটিতেই স্লেমান বিবি বিটলেমিতে মাতে। অথ আমার শ্রবণে আগুন। মহাশয়ের উপহাসের ধাত বড় কড়া। বড় বেকায়দায় ফেলে দেন।

আসর কিন্তু বেশ জম-জমাট। সবাই খেলায় হাসি হাসে। অচিনবাবু আবার আমার পিঠে চাপড় মেরে গলা নামিয়ে বলেন, 'আবার রাগ-টাগ হচ্ছে না তো।'

এবার আমারও একটু মুখ খুলতে ইচ্ছা করে। বলি, 'রাগ নয়, অনুরাগই বলতে পারেন, তবে বড্ড লজ্জা করছে।'

তিনি দু হাত দিয়ে আমার দু কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন, 'অচ্ছা আচ্ছা। ও ভালো অনুরাগও পেয়েছি। যাক, আর লজ্জা দেব না। কিন্তু ভায়া—'

এই পর্যন্ত বলে গলা আর একটু নামান। কানের কাছে মুখ এনে বলেন, 'বলেছি কিন্তু সত্যি। তোমাতে আমাতে

কথা. বলা গেল, বিন্দুর চোখে চিতা শিকার হয় কি না হয়।'

বলো উঁহু, 'অতবার।'

'হরিবোল!' হাসতে হাসতে তিনি আবার খাঁচে চালতে দেন। ইতিমধ্যে বাজনা বেজে ওঠে। একতারাতে বঙ্‌বঙা, বাঁয়াতে ডুগডুগ। তার ওপরে বাঁ হাতের কব্জিতে গোকুলের ঘুঙুর বাঁধা আছে। সেখান থেকেও শব্দ বাজে, ঝুমঝুমে ঝুমে-ঝুমে।

কিন্তু অচিনবাবু হরিবোল ধ্বনি দিয়ে, সুরের ফেলে ঝাঁকি দিয়ে, ঘাড় কাত করে তাকান বিন্দু-প্রকৃতির দিকে। বিন্দুও দেখি, ঠোঁট টিপে হাসে। চোখের কোণ দিয়ে তাকায় অচিনবাবুর দিকে। এই চোখে চোখে চাওয়া-চাওয়িতে যে কোন রসের ধারা বহে, বুঝতে যদি চাও, মন ধরে এস গিয়ে। প্রাণ সাফ করে এস। তবে, অচিনবাবুর ছোকরা বন্ধুর মনেতে গোল। সে চোখ ফিরিয়ে রাখে, পাছে বিন্দুর তেরছা নজর বিনু ইচ্ছেতেও তার ওপরে হেনে যায়। তাতে শিকার করা হবে কিনা জানি না, পুরুষটা কুঁকড়ে যেতে পারে।

অচিনবাবু আবার হাঁকেন, 'কই গ বিন্দু হাতে যন্তরখানি ধর।'

বিন্দু মুখে জবাব দেয় না, ঠোঁট টিপে হাসে। মুখ না ফিরিয়েই ঘাড় নেড়ে জানায়, ধরবে। তারপরে গোকুলের দিকে চেয়ে দুটিতে হাসাহাসি করে। সেই হাসিরই এক টুকরো বিন্দু আর এক-জনাকে ছুঁড়ে দেয় একটু। সে-ও এক ডাগরা বাউল, সেই দোতারাওয়ালা। গোকুলের থেকে তার বয়স বেশী না। চেহারায় হরে-দরে গোকুলের কাছাকাছি। তবে কি না, তার নয়া গোঁফ-দাড়িতে যেন একটু বেশী চাকন-চিকন। সন্দ লাগে, এ বাউলের চোখেতে যেন একটু কাজলের টান লেগেছে। পাগড়িটি একেবারে চুড়ো হয়ে উঠেছে, প্রায় যেন শিখিপুচ্ছের মত, বেঁকে দাঁড়িয়েছে ছোট একফালি।

বিন্দু তার দিকে চেয়ে হাসতেই সে ঘাড় দুলিয়ে দোতারায় আঙুল বুলায়। সুরের তরঙ্গ বেজে ওঠে। তখন অচিন-বাবু বুড়া গোপীদাসকে জিজ্ঞেস করেন, 'এ বাবাজীটিকে নতুন দেখছি। কার বিটা?'

গোপীদাস বলে, 'আমাদিগের কারু বিটা নয়। ছেলাটো এসেছে পাকিস্তান থেকে, অই কী বলে তোমার গি, উত্তর দেশ থেকে। আমাকে বাবা বাবা বলে, আমিই নিয়ে এসেছি। গত সনের জয়দেবের মেলায় দেখা হয়েছিল। থাকে সেই হুগলির কোথায়, চিঠিপত্তর লেনা দেনা করে। তা ভাবলাম, ইখানেতে একবারটি ঘুরে দেখে যাক, তা-ই নিয়ে এসেছি।

গায় ভাল, বাজায়ও ভাল। বিন্দু গোকুলের সঙ্গেও জয়দেবেতেই চেনাশোনা।'

জয়দেবের মেলা হল কেন্দুবিল্ব গ্রামে, যার ডাক নাম কেঁদুলি। বাউল বলে, 'জয়দেবের মেলা, জয়দেবেতে যাব।' বাউল বলে, 'জয়দেব পরম বাউল—পদ্মাবতী পরমা প্রকৃতি।' 'যে মানুষে গোলাই বিরাজ করে', জয়দেব সে-ই মানুষ। অতএব বল, কেঁদুলি বলে কী কথা হে। বল, জয়দেব জয়দেব। সাধো, পদ্মাবতী। সে-ই দুজনেতে খেলেছে খেলা, মণিপুরে, যেথায়, গোঁসাই গো ঘাট রসের নদী, বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড

জোর, সেই নদীতে প্রাণ খ্যালিলে মানুষ ধরা যায় রে।' জয়দেব সেই নদীতে প্রাণ বেঁধেছিলেন, বাউলের এই বিশ্বাস, পরে জেনেছি।

অচিনবাবু বলেন, বাজনায় যে তাল, সে তো প্রথম থেকেই শুনছি। ভাগি-টঙ্গিও বেশ সুন্দর।'

বুড়ো বলে, 'হাঁ, বয়স কাঁচা কিন্তু মনে মনে বেশ মজে আছে। মনে হয়, ছেল্যাটার ওপর গুরুর কিরপা আছে।'

অচিনবাবু কেবল গুরুর কৃপা দেখেন না। বলেন, 'তবে কিনা গোপীদাদা, তোমার সেই চিতা-চিতা ভাবখানি কিন্তু আছে।'

বুড়ো অমনি হেঁ-হেঁ করে হেসে বলে, 'জয় গুরু, জয় গুরু। তোমার কী কথা হে অচিনবাব।'

তারপরে চোখ ঘুরিয়ে বলে, 'তা সিটিও জানবে, খাঁটি বাউলের ধম্মো গ। চিতা না হলে কি শিকারের সাধন সাধা যায়। সেই গানেতেই তো আছে, চিতা খেয়ে কুম্ভকে, হাঁকোড়ে মদন কুম্ভকে, হাড়েতে দাঁত বসিয়ে রক্ত খায়, ছিটা গন্ধ পাবে না।'

অচিনবাবুও অমনি বুড়োর মতই আওয়াজ দেন, 'জয়গুরু, জয়গুরু।'

বলে দুজনাতে চক্ষে চক্ষে চায় যেন কী এক রসের ধারা আনাগোনা করে। কান পেতে শুনি, চোখ চেয়ে দেখি, কিন্তু ধারা ধরতে পারি না, ভাসতে পারি না। আমার দিকে চেয়ে অচিনবাবু সে কথা বুঝতে পারেন। তা-ই বলেন, ভায়া নিত্য কথার তত্ত্ব ভাবে, বোঝা একটু কঠিন। পরে বুঝিয়ে দেব।'

না বুঝলেও ক্ষতি নেই। অবুঝ বোঝার মধ্যে যে এক ভাবের খেলা আছে, আমি সেই ভাবেতে আছি। যা শুনছি, যা দেখছি, তার মধ্যে গূঢ় রসের ধারা কোথায়, জানি না। মুক্ত রসের মাঝেও এক খেলা খেলছে, আমি তাতেই মজে যাচ্ছি।

অচিনবাবু আবার জিজ্ঞেস করেন, উত্তর দেশের এই বাবাজীটির নাম কী গোপী-দাদা?'

'সোজন।'

অচিনবাবু বলেন, 'সোনারের মতন নাকি? সুজন বল।'

'অই হল আর কী। আমাদিগের কথা ত জান।'

দুজনেই হাসাহাসি করে। অচিনবাবু আবার বলেন, 'তা হলে সুজন বাবাজীর গান শুনতে হয় এর পরে।'

'শুনবা বইকি, গলাখানি যেমন দরাজ, তেমনি মিঠা। তবে, একটু টান আছে, জমুমের টান।'

'উত্তর দেশের টান?'

'হাঁ।'

ওদিকে তখন বাজনা জমে উঠেছে। বিন্দু তার সামনে রাখা ঝোলায় তখন হাত ঢুকিয়েছে। তারপরেই কালো নিটোল একখানি হাত একেবারে মাথার ওপরে তোলে, যেন কাল চিকণ চিকুর হানা কাল নাগিনীর ফণা উঠলো উঁচুতে। হাত ঝাঁকি দিতেই ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে বাজনা। দেখ, তার তালেতে, গেরুয়া ছোপানো জামাখানি সহ যেন অঙ্গের লাবণ্যখানিও বেজে ওঠে। আর সাদা দাঁতের ঝিলিক দিয়ে, কালো তারায় হানে একবার অচিনবাবুকে। অর্থাৎ দেখেন গ অচিনদাদা, যন্ত্র হাতে নিয়েছি।

কিন্তু তাইতে কি আর অচিনবাবুকে হার মানানো যায়। তিনি হেসে উঠে হাঁকেন, 'ওরে মেয়েটা শোন, "প্রেমজ্ঞুরিতে প্রেম বাজে না, প্রেমেতে প্রেম-জুরি বাজে।"

এবার গোকুলই ধ্বনি দিয়ে ওঠে, 'জয়-গুরু, জয় সাঁই।'

তখন আর বিন্দু না বলে পারে না, 'আপনার সঙ্গে কি কথায় পারার যো আছে।'

অচিনবাবু বলেন, 'কাজে পারলেই হবে।'

আবার সেই কথা, কথা কইতে জানলে হয়, কথা ষোল ধারায় বয়। এখানেও সেই কইতে জানার বহা বহি। সবাই স্ফূর্তি মুখে হাসে।

গোকুল গান ধরে দেয়,

'অহে বল না, কেমনে করি শুদ্ধ সহজ
প্রেম সাধন।
আমার প্রেম সাধিতে ফেঁপে উঠে—
ফেঁপে উঠে হে কাম নদীর তুফান,
কেমনে করি শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধন।'

এই পর্যন্ত গেয়ে, কেবল বাজনা বাজতে থাকে। গোকুল নাচে ঘুরে ঘুরে, চোখ ঘুরিয়ে অচিনবাবুর দিকে। তার সঙ্গে গোতারা নিয়ে নাচে উত্তরের সুজন। বিন্দুর মুখে হাসি নেই, কিন্তু কেমন যেন ভাবে

ঢল ঢল। দু'হাত বুকের কাছে নিয়ে, দু-হাতে বাজায় প্রেমজুরি, ঝিপ্ ঝিপ্ ঝিনঝিন্। অচিনবাবু গোকুলের দিকে, আধবোজা চোখে চেয়ে, কেবল যেন এক ভাবের ইশারা করেন।

বিন্দুর গলা বেজে ওঠে। কোকিলের ডাক শুনেছি জঙ্গলে, বেহালায় সুর শুনেছি, উচ্চ চিৎকারে। কোন্‌টি যে তার গলায় ফুটলো, বুঝতে পারি না। কোকিলের কথা আগে মনে আসে। মুখের কাছে যন্ত্র নিয়ে, যান্ত্রিক আওয়াজ না। এ যেন গাছে বসে পাখীর বোল রাগিণীতে ডাক:

'অ ভোলা মন, প্রেম রতন ধন পাওয়ার
আশে
ত্রিবিনার ঘাট বাঁধলাম কবে।'...

সঙ্গে সঙ্গে গোকুল, সেই গলাতে গলা মিলিয়ে দেয়,

'কাম নদীর এক ধাক্কা এসে
হায় হায়, যায় ছাঁদন বাঁধন।
করি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধন।'

এ যেন সাধা গলায় সুর সাধা। গলায় গলায় মিল না কেবল। একবার দেখ, কেমন চোখে চোখে মিল। সুরে টান দিতে গিয়ে, বিন্দুর ভুরু একটু বেঁকে যায়, নজর দূরের দিকে। তারপরে হঠাৎ হঠাৎ মিলে যায় গোকুলের সঙ্গে। বারেক সুজনের সঙ্গে। তার উত্তরিয়া সুজন যেন পেখম খোলা ময়ূর। দোতারা বাজিয়ে, পাক দিয়ে দিয়ে ফেরে গোকুল বিন্দুকে।

সবাই তন্ময় হয়ে শোনে, তালেতে শরীর দুলিয়ে শোনে। লিখনে যারা গান লেখে, তাদের নজর কেড়ে নেয় তিনটিতে, বেচারী-দের কলম চলে না। মন ভেসে যায়, চোখ ভেসে যায় তার আগে আগে। বুড়ো ধ্বনি করে, 'জয়গুরু' আর অচিনবাবু বলে ওঠেন, 'হায় হায় হায়।'

এখন বিন্দু এদিকে ফিরে চায় না। সেই আবার একই সপ্তমের টানায় ধরে,

'মরব কি সে প্রেমের কথা,
কাম হইল প্রেমের লতা'...

গোকুল ধরে,

'কাম ছাড়া প্রেম যেথা সেথা
নাই রে আগমন।'

এবার গোপীদাস আর রাধা প্রকৃতি, দুই বুড়ো বুড়িতে এক সঙ্গে ধ্বনি দিয়ে ওঠে, 'জয় গুরু, জয় গুরু।' আর অচিনবাবুই অবাক করেন বেশী। একেবারে গোকুল বিন্দুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে, ধরতাইয়ে সুর দেন, 'করি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধন।'

তাঁর গান শুনে সকলেরই মাতন লাগে বেশী। গায়ক-গায়িকা দু'জনেই ফিরে তাকায়। কিন্তু যদি ঠিক দেখে থাকি, অচিনবাবুর গোরা মুখে যেন কেমন এক লালের ছোপ ধরে গিয়েছে। চক্ষু ছলছল। সেখানে চোখ ঘোরানো হাসির ঝিলিক আর নেই।

আর আমি দেখি, গায়ক গায়িকা গান করে না শুধু। যেন চোখে চোখে, আর কিছু ভাবে। সেই ভাষাটা বুঝতে পারি না, তা-ই ভাবি, গেরুয়া ছোপানো আলখাল্লা জড়ানো এই বাউল বৈরাগীরা এ কোন্ কথা বলে. 'কাম ছাড়া প্রেম যেথা সেথা, নাই রে আগমন।' অথচ এমন করে বলে, এমন সুরে সুরে, হেসে হেসে, এমন স্পষ্ট করে, যেন কাম, কাম না, প্রেমের আর এক নাম। অধর কথা, ধরতে পারি না, কেবল তানে মানে লয়ে মজে, অবাক হয়ে শুনি, আর মনের মধ্যে কোথায় যেন, এক নাম না জানা সুর বেজে যায়।

বিন্দু আবার ধরে,

'পরম গুরু প্রেম পীরিতি
কাম গুরু হয় নিজ পতি।'...

গোকুল গায়,

'অ ভোলা মনরে আমার, কাম ছাড়া প্রেম
পাই কি গতি
তাই ভাবতেছে লালন।
করি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধন।'...

আবার জয়গুরু জয়গুরু, হরিবোল বেজে ওঠে। অচিনবাবুর গলায় যেন স্বপ্নের আবেশ। বলেন, 'থামিস না গোকুল, আজ মাত করেছিস ভাই। এ গান তোর বাবার মুখে ছাড়া আর শুনি নি।'

আর আমার মনে হয়, জীবনের কী এক অরূপ খেলার আসর এখানে জমেছে।

ক্রমশ

চান্দ্রধূলির চিহ্ন কোথাও নেই

চাঁদ সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য

চান্দ্রধূলি

আর্থার ক্লার্ক নামে এক লেখক এক বিজ্ঞানমূলক উপন্যাস রচনা করেছেন যার নাম "এ ফল্ অফ মুন ডাস্ট্"। বই-খানির এক জায়গায় তিনি লিখছেন:

..."চাঁদের তৃষ্ণাসাগর জলপূর্ণ নয়, ধূলিপূর্ণ। সেইজন্য লোকের কাছে সেটা এত অদ্ভুত ঠেকে, এত আশ্চর্য মনে হয়। ট্যাল্কাম পাউডারের মত সূক্ষ্ম সেই ধূলি সাহারার উত্তপ্ত বালুর চেয়েও শুষ্ক। স্থানীয় বায়ুশূন্য অবস্থায় সেই ধূলি একেবারে তরল পদার্থের মত আচরণ করে। তার মধ্যে কোন কঠিন ভারি জিনিস ফেললে সেটি কোনরকম ছল্কানি সৃষ্টি না করে একেবারে তলিয়ে যায়...।"

লেখকের এই বই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লেখা হলেও চান্দ্রধূলির কল্পনার জন্ম তারও বহু আগে, প্রায় গ্যালিলিওর সময়ে। গ্যালিলিও লক্ষ করেছিলেন যে, চন্দ্রগোলকের কিনারার রং মোটেই গাঢ় নয়, যেটা হত চাঁদ যদি বলের মত দেখতে হত। আসলে আমরা চাঁদকে চ্যাপ্টাই দেখি পিঠের দানাদার চেহারার জন্য।

১৯২৯ সালে প্রথম চাঁদে আগ্নেয়ভস্মের অবস্থিতির কথা বলা হয়। তার ২০ বছর পরে চাঁদের উপর প্রচণ্ড জোরে উল্কাপাত ও সৌরবাতাসের প্রভাবের ফলাফলের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক ভেসেলিংক চান্দ্র-ধূলির কথা কল্পনা করেন। মার্কিন বিজ্ঞানী মিঃ গোল্ড তাঁকে সমর্থন করে বলেন যে, চাঁদের যে সমতল ভূমিগুলিকে সাগর আখ্যা দেওয়া হয় সেগুলি আগ্নেয় ভস্ম বা গলিত ধাতুস্রোতে আচ্ছাদিত নয়, কয়েক কিলো-মিটার পুরু ধুলোয় আবৃত। মিঃ গোল্ডও চান্দ্রধূলির চরম তারল্যের কথা বলেন।

হালে কিন্তু জ্যোতির্বেত্তারা চান্দ্রধূলির অস্তিত্ব স্বীকার করছেন না। সোভিয়েট বিজ্ঞানাচার্য এন কজিরেফ চাঁদের আল্ফন্সো গহ্বরে বাষ্পোদ্গার লক্ষ করার পর চন্দ্রগোলক যে পরিবর্তনের অতীত এই ধারণা আর বলবৎ নেই। চাঁদের ভূপ্রকৃতি গঠিত হয়েছে প্রধানত বাহ্যিক কতকগুলি কারণে। প্রচণ্ড বেগে উল্কাপাতের ফলে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তাই থেকে রূপ নেয় গাঢ় রঙের খনিজ পদার্থ। বিস্ফোরণের ফলে যে সব জিনিস বাষ্পীভূত হয় সেগুলি আবার মাটিতে থিতিয়ে জমা হয় যার ফলে তৈরি হয় ঝামার মত জিনিস। তাই সেগুলিকে বলা হয় আগুনের ঝামা।

চান্দ্রধূলি বলে কোন জিনিসের যে অস্তিত্ব নেই সেটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় বিভিন্ন পার্থিব মহাকাশযানের চাঁদে অবতরণের পর। লুনা-৯ মহাকাশযানের গায়ে চাঁদে নামার পর কোন ধুলো লাগেনি। সেটি নেমেছিল চাঁদের ঝটিকা সাগরে। বিভিন্ন মহাকাশযান চাঁদ থেকে যে সব ছবি টেলিভিশনে পাঠিয়েছে সেগুলিতে কোথাও ধুলোর কোন চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়নি বরং মনে হয়েছে চাঁদের মাটি যেন সিমেন্ট করা জায়গার মত। ৪ মাস পরে সার্ভেয়ার-১ মহাকাশযান চাঁদে নেমে যখন তার জেট-যন্ত্র চালু করে তখনও চাঁদের জমি থেকে কোন ধুলো ওড়েনি। শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, চাঁদের জমির উপরের দিক হচ্ছে ৩।৪ সেন্টিমিটার পুরু সছিদ্র একটি স্তর যার ঘনমান জলের ঘনমানের অর্ধেক এবং বিদ্যুৎ পরিবহণ ক্ষমতা পরবর্তী নিচের

পরিদৃশ্যমান দিকের মানচিত্র

'চান্দ্রভূমি পরীক্ষারত লুনা-১৩
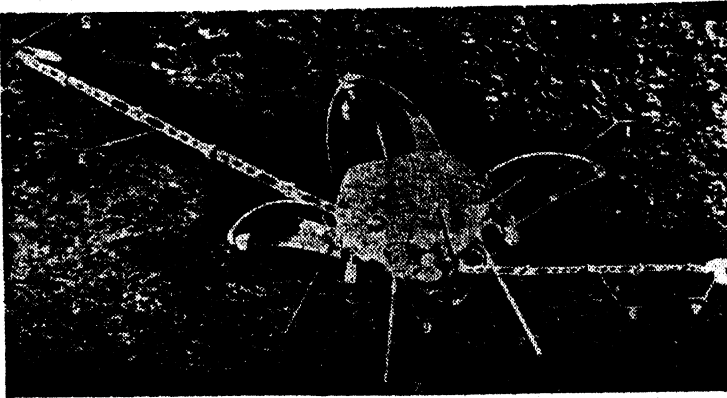
স্তরের দেড় থেকে দুই গুণের মত। নিচের স্তরটির ঘনমান জলের সমতুল্য এবং সেটিও সছিদ্র। তার নিচে হচ্ছে শিলাস্তর।

চাঁদের অদৃশ্য পিঠের কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য

চাঁদের অদৃশ্য ও পরিদৃশ্যমান পিঠের ফটোগ্রাফের মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। অদৃশ্য পিঠে পাহাড়ের সংখ্যা অনেক বেশি এবং সাগরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। তা ছাড়া বড় বড় গহ্বরের সংখ্যাও অদৃশ্য দিকে বেশি। সেই দিকের পূর্বভাগে বহু মালার মত সাজানো গহ্বর আছে। একটি মালার দৈর্ঘ্য হাজার কিলোমিটারেরও বেশি হবে।

এই ধরনের গহ্বরের উৎপত্তি আগ্নেয় ক্রিয়ার ফলে ঘটে থাকতে পারে। প্রতিটি গহ্বরের কিনারা গোল এবং উঁচু ভিতর দিক অবনমিত। কোন কোনটির মধ্যে আবার ত্রিকোণাকার পাহাড় আছে। এ ছাড়া আরো জটিল আকারের গহ্বরও আছে।

চাঁদে তাইহো নামে যে গহ্বর আছে সেটি পৃথিবী থেকে দূরবীণের চোখে দেখা যায়। সেটিকে কেন্দ্র করে কতকগুলি গহ্বরমালা চাকার মত চারিদিকে চলে গিয়েছে। চাঁদের ওপিঠে সেই ধরনের গহ্বর অনেক আছে। গার্দানো ব্রুনো গহ্বরটিও ঐ রকম আর একটি গহ্বর। চাঁদের দুই পিঠের ছবি পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দুই পিঠ একরকম নয়।

চাঁদের পরিদৃশ্যমান দিকে উত্তরের ও দক্ষিণের মহাদেশীয় এলাকার ব্যবচ্ছেদক হচ্ছে সাগর। কিন্তু অদৃশ্য পিঠের চেহারা অন্যরকম। সেখানে এক নাগাড়ে মহাদেশ। সেখানে সাগরগুলি হ্রদের মত চারিদিকে মহাদেশ দিয়ে ঘেরা। ওপিঠের সাগরগুলি গলিত ধাতুস্রোতের দ্বারা প্লাবিত নয়। সেই সাগরগুলিকে বলা হয় 'থ্যালাসয়েড' যার মানে সাগরের মত জায়গা। ওপিঠের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সাগরটির নাম কুইন্স থ্যালাসয়েড যা প্রায় ৪০০ কিলোমিটারের মত চওড়া হবে।

সোভিয়েট চন্দ্রজ্ঞ আলেকজান্দার কাযাকফ বছর কয়েক আগে চাঁদের এপিঠে অমৃত সাগরের কাছে অদ্ভুত ধরনের একটি অবনমিত স্থান লক্ষ করেন যেটি অতীতে সম্ভবত এক বিরাট থ্যালাসয়েড ছিল এবং পরে সেটি গলিত ধাতুস্রোতের দ্বারা প্লাবিত হয়।

চাঁদের পরিদৃশ্যমান পিঠে অনেকগুলি সাগর কাছাকাছি থেকে এক সাগরীয় এলাকা গঠন করেছে। তাই থেকে অনেকে মনে করেন যে, সেই এলাকা চাঁদের অন্য পিঠেও পরিবর্ধিত হয়ে একটি মেখলার মত চাঁদকে পরিবেষ্টন করে ধরেছে, যদিও ওপিঠের সাগরীয় এলাকার অবনমন অনেক কম। এখানে বৈজ্ঞানিকদের মনে উঠেছে অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে এই প্রশ্নটি যে, একই চান্দ্র ভূতাত্ত্বিক যুগে যদি সাগর ও থ্যালাসয়েড-গুলি তৈরি হয়ে থাকে তা হলে পরিদৃশ্যমান পিঠের অবনমিত অঞ্চলগুলি যে ক্ষেত্রে লাভা বা গলিত ধাতুস্রোতে প্লাবিত সে ক্ষেত্রে অদৃশ্য পিঠের অবনমনগুলিতে লাভা নেই কেন?

আর একটি প্রশ্ন চাঁদের দুই পিঠে সাগরের বন্টনে এই অসমতা কেন? এই ব্যাপারের সঙ্গে পৃথিবীর সঙ্গে চাঁদের সম্বন্ধের কি কোন সম্পর্ক আছে? কিন্তু চাঁদের উপর পৃথিবীর জোয়ার-ভাটা শক্তি বা টাইড্যাল ফোর্সের প্রভাব তো দুই পিঠের উপরই পড়ে। তা হলে এই বৈসাদৃশ্য হয় কি করে? সুতরাং কারণটা বাহ্যিক বলে মনে হয় না। কারণটা সম্ভবত চাঁদের ভিতরে অনুসন্ধান করতে হবে যেটা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নয়, চন্দ্র-ভূতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ বা সেলেনোলজিস্টদের। কেউ কেউ বলেন যে, নিজের অক্ষকে কেন্দ্র করে চাঁদের আবর্তনের বেগ কমতে থাকার ফলে অবনমনগুলির সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। কারণ ঐ বেগ হ্রাস চাঁদের গর্ভে নিশ্চয়ই কতকগুলি প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়
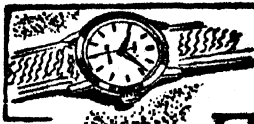
'দুই রবীন্দ্রনাথ'—একটি দৃষ্টি বিভ্রম

'দেশ'-এর পাতায় শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর 'দুই রবীন্দ্রনাথ' পড়লাম। লেখায় চমক আছে, কিছু অসংযত ধমকও। যুক্তি আছে, কিন্তু যুক্তির বলে বক্তব্য প্রবল হয়নি। নীরদবাবু রবীন্দ্রনাথের প্রতি নির্মোহ হতে চেয়ে নির্মম হয়েছেন, ভুল ভাঙতে যেয়ে নিজেই ভুলের জালে জড়িয়ে পড়েছেন এবং সবিনয়েই জানাচ্ছি, নীরদবাবু নিজের মস্তিষ্কের উপরও যেন তেমন সুবিচার করেননি।

নীরদবাবুর ভাষ্যঃ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগে যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখেছি, আচার-আচরণে সেই হচ্ছে সত্যকার রবীন্দ্রনাথ। প্রাইজ পাওয়ার পরে যে রবীন্দ্রনাথকে পেলাম, আচার-আচরণে সে হচ্ছে অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ। আগের দেখা রবীন্দ্রনাথের সংগে এই রবীন্দ্রনাথের বড়ো বেশী মিল নেই। মোটামুটি এই বক্তব্যের সমর্থনেই নীরদবাবু যুক্তি সাজিয়েছেন। একে একে সেগুলির আলোচনায় আসা যাক।

এ কথা স্বীকার্য যে, চলতি অর্থে রবীন্দ্র-পূজা রবীন্দ্রনাথকে বোঝার পক্ষে অন্তরায় বিশেষ। এটাকে যাঁরা প্রশ্রয় দেন, তাঁরা কবির প্রতি সুবিচার করেন না। তবে এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করাটা কিছু সমীচীন নয়। কারণ, "বুদ্ধচৈতন্যাদিতে কালক্রমে দেবত্বারোপ হয়েছে। কালিদাস শুধুই কবি। তথাপি নিস্তার পাননি, কিংবদন্তী তাঁকে বাগ্‌দেবীর সাক্ষাৎ বরপুত্র বানিয়েছে। রবীন্দ্র-চরিতের এরকম পরিণাম হবে, এমন আশঙ্কা করি না। সর্ববিধ অতিকথার বিরুদ্ধে তিনি যা লিখে রেখেছেন, তাই তাঁকে অমানবতা থেকে রক্ষা করবে।" —রাজশেখর বসু।

অন্তর্মুখিনতা রবীন্দ্র-মানসের অন্যতম উপাদান বটে। বালক রবীন্দ্রনাথেও তাঁর এই মনোলক্ষণ অস্পষ্ট ছিল না। উদ্ধৃত পত্রগুলিতে রবীন্দ্র-মানসের এই প্রবণতার সাক্ষ্য রয়েছে। কিন্তু অন্তর্মুখিনতাই কী রবীন্দ্র-মনের একমাত্র লক্ষণ? তাঁর সমগ্র জীবনটার দিকে চোখ ফেরালে কিন্তু এ কথার পুরো সমর্থন মিলবে না। আসলে রবীন্দ্র-মানসে অন্তর্মুখিনতার যে ঝোঁকটা ছিল, মধ্যে মধ্যে সেটা প্রবল হয়ে উঠত। ফলে স্বভাবতই তখন কবি লোক-সান্নিধ্য থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাইতেন। উদ্ধৃত চিঠিগুলি বোধ করি মনের এই রকম নিঃসঙ্গ মুহূর্তেই লেখা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমগ্র মনটাই অন্তর্মুখীন ঝোঁকটার পদতলে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেনি। তাই প্রয়োজনে রবীন্দ্র-মনকে বহির্মুখীন হতেও দেখা যায়। স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান, বিদেশ ভ্রমণ, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি এর প্রমাণ।

নীরদবাবু বলেছেন—রবীন্দ্রনাথ এমনই একক, অন্তর্মুখীন, এমন কী, নিস্বার্থেও কুনো ছিলেন যে, তিনি স্কুলে পড়িতে পারেন নাই। কিন্তু স্কুলে না পড়ার এইটাই যথেষ্ট কারণ নয়। পক্ষান্তরে স্কুলগুলোর একঘেয়ে, নিষ্প্রাণ শিক্ষার প্রতি বালক রবীন্দ্রনাথের মনের বিরূপতা, কৈশোরে মাতৃবিয়োগ, সার্টিফিকেট সংগ্রাহী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অভিভাবক-দের তেমন মোহ না থাকা ও মহর্ষি গৃহে উপযুক্ত শিক্ষার ঢালাও ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রশ্নও এই সূত্রে বিচার্য হওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার বিলাত যান ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে, তখন তাঁর বয়স ১৭ বছর। দ্বিতীয়বার যান ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে। দ্বিতীয়বারের ভ্রমণ ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। নীরদবাবু রবীন্দ্রনাথের উক্তি দিয়েই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ঐকালে রবীন্দ্র-মনে বিলাত সম্পর্কে একটা প্রবল বিরূপতা ছিল। দেশেই তাঁর স্থান, বিদেশে তাঁহার কিছুই নাই, এই বিশ্বাস তাঁহার বদ্ধমূল ছিল।

এখানে একটা জিনিস একটু ভেবে দেখা দরকার। প্রথম বিলাতযাত্রী রবীন্দ্র-

নাথ সদা কৈশোর উত্তীর্ণ এক তরুণ মাত্র। ঐ বয়সে ঘরমুখো টান থাকাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ যখন বেপরোয়া মেজাজের বৈষয়িক উন্নতিকামী তরুণ ছিলেন না। তা ছাড়া, বিদেশী পরিবেশও তখন তাঁকে আকর্ষণ করেনি। দ্বিতীয় বিলাতযাত্রী রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিলাতযাত্রী রবীন্দ্রনাথের চেয়ে পরিণত বটে, কিন্তু দ্বিতীয়বারের ভ্রমণের স্থায়িত্ব তো দশ সপ্তাহ মাত্র। সুতরাং দ্বিতীয় ভ্রমণে বিলাত বা বিলাতী সমাজ সম্পর্কে তাঁর পূর্বের ধারণাটাই বজায় রয়ে গেল, নতুন ধারণা গড়ে ওঠার অবসরই মিলল না। এ ছাড়াও জন্মভূমির দারিদ্র্য ও পরাধীনতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন কোন তরুণের পক্ষে প্রভুদেশের সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য দর্শনে গদগদ হওয়া সম্ভব নয়। বরং উল্টো প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণও অনুরাগের প্রাবল্য ঘটাই স্বাভাবিক। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লেখা উদ্ধৃত পত্রখানির বক্তব্যকে এই আলোকেই বিচার করা দরকার।

ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রায় নীরবতা ও বাঙলা দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে অজস্র মুখরতার কারণ বিদেশী নিসর্গ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উদাসীনতা নয়। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ধাঁচের রোমাণ্টিক প্রকৃতি চেতনাই এর কারণ। তাঁর প্রকৃতি চেতনায় এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় ছড়িয়ে আছে 'ছিন্ন-পত্র'এর পাতায় পাতায়। নিসর্গের বস্তু-নির্ভর সৌন্দর্যের রসটা রবীন্দ্র-মানসে একটা সহজাত ভাবনির্ভর সৌন্দর্যরসে রূপান্তরিত হত। রবীন্দ্রনাথের মনে হত, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর যেন অনেক দিনের চেনাশোনা। প্রকৃতি যেন তাঁর অন্তরঙ্গ আপনজন। আবাল্যপরিচিত নিসর্গের চেনা রূপটাকে অবলম্বন করেই রবীন্দ্র-মানসে ওই বিশেষ ভাবনির্ভর সৌন্দর্যের জন্ম হত। তাই বাঙলা দেশের নিসর্গ-বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ এত সোচ্চার। ইংলণ্ডের নিসর্গ রবীন্দ্রনাথের কাছে আবাল্য পরিচয়ের সম্বন্ধ তো দাবি করতে পারেনি, তাই ইংলণ্ডের নিসর্গ বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের কল্পনাটা তেমনভাবে উদ্দীপিত হয়নি।

"সমস্ত সভ্য সমাজের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে আমি যদি তারই এক কোণে বসে মৌমাছির মতো আপনার মৌচাকটি ভরে ভালবাসা সঞ্চয় করতে পারি, তা হলেই আর কিছু চাইনে"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটিকে নীরদবাবু রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব, একান্ত ও সত্যকার জীবনের মূলমন্ত্র বলে মনে করেন। কিন্তু উদ্ধৃত উক্তিটিতে সে তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না। ওটিকে বড়জোর কবির একদা অনুভূত একটি প্রিয় ইচ্ছা বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বরং তাঁর নিজস্ব জীবন-প্রত্যয় নীচের পত্রাংশটিতে আভাসিত হয়েছেঃ

"......অতিশয় একান্তভাবে নিজের সত্তায় নিগূঢ় মূলে নিবিষ্ট হয়ে থাওয়া আমার চল্‌ল না, যে বিচিত্র সংসারে আমি এসেচি, আপনাকে ভুলে সহজভাবে সেখানে আপনাকে লাভ করতে হবে, এই দিকেই আমাকে ভিতর দিক থেকে ঠেলে পাঠালে। ...বিশ্বে সত্যের যে বিরাট বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা স্থান পেয়েছি, তাকে কোনো আড়াল তুলে খণ্ডিত করলে আত্মাকে খণ্ডিত করা হবে, এই আমার বিশ্বাস। যদি এই বিরাট সমগ্রের মধ্যে সহজ বিহার রক্ষা করে চলতে পারি, তবে নিজের অগোচরে স্বতই পরিণতির পথে এগোতে পারব—ফল যেমন রৌদ্রে বৃষ্টিতে হাওয়ায় আপনিই তার বীজকে পরিণত করে তোলে।" (শ্রীশৈলেশ ঘোষকে ১১-৩-৩১ তারিখে লেখা চিঠি। 'সাধনার রূপ' নামে ১৩৩৮ সালের ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত)। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই দেশী রবীন্দ্রনাথ, নিশ্চয়ই বাঙালী রবীন্দ্র-নাথ। কিন্তু শুধু কী তিনি তাই? আরো একটা পরিচয়ের আয়োজন কী তাঁর মধ্যে ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। তাঁর এই তৃতীয় পরিচয় রূপ পেয়েছিল বিশ্ববোধের মধ্যে। "রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের মত এমন আশ্চর্য-ভাবে বর্ধনশীল ব্যক্তিত্ব অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যেন তিনি বাড়িয়াছেন, নানা জীবনে বাড়িয়া ওঠা একটা প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্বের সত্তাকে কোন একটি বিশেষ কাল পরিধিতে, প্রকাশিত পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে যাওয়া

আর নব বসন্তারম্ভে কিশলয়যুক্ত একটি বৃক্ষকে ফলপুষ্পের সম্ভাবনা বর্জিত একটি কিশলয়-সর্বস্ব উদ্ভিদ বলিয়া বর্ণনা করা একই জিনিস।”—[রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার জাতীয় জীবন—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। বিশ্বভারতী পত্রিকা — বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯]

বিশ্বচেতনা রবীন্দ্রনাথের প্রায় আযৌবন সংগী। যদিও রবীন্দ্রমানসের এক বিশেষ পর্বে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার প্রায় সাত বৎসর পূর্ব হতেই এই চেতনা রবীন্দ্রমনে গভীরতা পেতে শুরু করে। (১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষি বিজ্ঞান পড়ার জন্য আমেরিকা প্রেরণ। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত ভাষণ ‘পূর্ব ও পশ্চিম’) কিন্তু নীরদবাবু রবীন্দ্রনাথের এই পরিচয়টার দিকে একবারও তাকালেন না অথবা ইচ্ছা করেই চোখ বুজে রইলেন। ফলে নোবেল প্রাইজ উত্তর ‘দেশী ও বাঙালী রবীন্দ্রনাথ’-এর আচার আচরণকে তাঁর রবীন্দ্র প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলে মনে হল। অথচ রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধের কথাটা মনে রাখলে এই জটিলতার সৃষ্টি হত না। রবীন্দ্রনাথকে সহজে বুঝাতে পারতেন, বোঝাতেও পারতেন। কিন্তু কবির ব্যক্তিত্বের এই তৃতীয় পরিচয়কে উপেক্ষা করার দরুনই নীরদবাবুকে ‘দুই রবীন্দ্রনাথ’-এর থিয়োরী আমদানি করতে হল। অথচ এই থিয়োরী বাস্তব সত্যের দ্বারা সমর্থিত নয়—সত্যের বিকৃতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

সত্য বটে যুবক রবীন্দ্রনাথের মনের আকাশে বাঙলা ও বাঙালী অনেকটা জায়গা দখল করে রেখেছিল। কিন্তু “মধ্য বয়সের পরে মানুষ হিসাবে বাঙালী মানুষ রবীন্দ্র-নাথের হৃদয়ে বিশেষ করিয়া আকর্ষণের সৃষ্টি করে নাই। যতদিন যাইতে লাগিল, ততই নিখিল মানব যাত্রীর ‘ব্রহ্মকমল’ রূপটি তাঁহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া

হাসিতে লাগিল।" (শশিভূষণ দাশগুপ্ত—রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার জাতীয় জীবন) এর পরেই যে বাঙলা ও বাঙালীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের অবসান ঘটল তা নয়, তবে সে অনুরাগের সংগে যুক্ত হল আরো একটা অনুরাগ—যার নাম 'বিশ্ববোধ'।

বস্তুত রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বের বিবর্তনের এই তৃতীয় ধাপকে উপেক্ষা করার দরুনই দেশী ও বাঙালী রবীন্দ্রনাথ নীরদবাবুর কাছে একটিমাত্র পরিচয়ে প্রাধান্য লাভ করেছে। ফলে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর শান্তিনিকেতনে আয়োজিত অভিনন্দন প্রত্যাখ্যান করে কবি যে ভাষণ দেন, তাতে নীরদবাবু রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য শিষ্টাচারের মোহে অভিভূত হয়েছেন বলে মনে করেছেন। ওই ভাষণে বিলাতে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে কবি যে আভাস দেন, সেটা পূর্বোক্ত বিশ্ববোধের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথকে বিলাতী শিষ্টাচারের মোহের শিকার বলে মনে হবে না। সত্য বলতে কী এই সময় রবীন্দ্রমানসে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন, দেওয়া নেওয়া, পারস্পরিক সদিচ্ছা ও সমাদরতার যে খোলা হাওয়া বইছিল তার কথা মনে রাখলে ওই রকম কোন অভিযোগকে অত্যন্ত অসার বলে মনে হবে।

নোবেল পুরস্কারের মূল্য ও অর্থ বিচারের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দনকারীদের একরকম বোঝালেন ও নিজে বুঝলেন অন্যরকম—নীরদবাবুর এই ইঙ্গিত কী যথেষ্ট টেকসই? মোটেই না। নোবেল প্রাইজের তাৎপর্য বিষয়ে তিনি অভিনন্দনকারীদের যা বলেছিলেন, তার যৌক্তিকতা সব সময়েই স্বীকার্য। কিন্তু নীরদবাবু এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তির আনুপূর্ব বজায় না রেখে উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টাকে কিঞ্চিৎ ঘোলাটে করেছেন। আসলে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দনকারীদের বলেছিলেন—"যাই হোক যে কারণেই হোক, আজ য়ুরোপ আমাকে সম্মানের বরমাল্য দান করেছেন। তার যদি কোন মূল্য থাকে, তবে সে কেবল সেখানকার গুণিজনের রসবোধের মধ্যেই আছে, আমাদের দেশের সংগে তার কোনও সম্বন্ধ নেই, নোবেল প্রাইজের দ্বারা কোনো রচনার গুণ বা রসবৃদ্ধি করতে পারে না।"

ভেঙে দেখলে ভাষণের এই অংশ পাচ্ছিঃ

(ক) য়ুরোপ কবিকে সম্মানিত করেছে
(খ) সম্মানের মূল্যটুকু য়ুরোপীয় গুণীদের রসগ্রাহিতার
(গ) ভারতবর্ষের সংগে সেই মূল্যের কোন প্রকৃত সম্বন্ধ নেই
(ঘ) নিছক পুরস্কারে কোন রচনার রসের হেরফের হয় না

ভাষণের অন্য অংশটার—"আমি সমুদ্রের পূর্ব তীরে বসে যাকে পূজার অঞ্জলি দিয়েছিলাম তিনিই সমুদ্রের পশ্চিম তীরে সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করবার জন্য যে তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করেছিলেন, সে কথা আমি জানতুম না। তাঁর সেই প্রসাদ আমি লাভ করেছি এই আমার সত্যলাভ।"

এই অংশে পাচ্ছিঃ

(ক) গীতাঞ্জলির লেখায় একজনকে বন্দনা করা হয়েছে
(খ) গীতাঞ্জলি লেখা হয়েছিল ভারতবর্ষে
(গ) সম্মান এল য়ুরোপ থেকে
(ঘ) এমনটা হতে পারে কবি সেটা ভাবেননি
(ঙ) কবির সত্যলাভ—গীতাঞ্জলিতে কবি যাঁকে বন্দনা করেছেন তিনি কবিকে বিমুখ করেননি

বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে ভাষণের প্রথম

অংশের মূল সিদ্ধান্ত—নোবেল প্রাইজ গীতাঞ্জলির একটি য়ুরোপীয় স্বীকৃতি।

ভাষণের দ্বিতীয় অংশের মূল সিদ্ধান্ত—গীতাঞ্জলিতে এমন কিছু ছিল, যেটা য়ুরোপীয় স্বীকৃতির কারণ।

অতএব ভাষণের দুই অংশেই নোবেল প্রাইজের মূল্য সম্পর্কে দু রকম ধারণা গড়ার মত কিছু নেই। নীরদবাবুর ইঙ্গিতটা এ ব্যাপারে বেশ কষ্টকল্পিত।

রবীন্দ্রনাথ যেটাকে সত্যলাভ বলেছেন সেটার আসল অর্থটা হচ্ছে গীতাঞ্জলিতে এমন কিছু ছিল যেটা গ্রহণ করতে য়ুরোপের বাধেনি। সেটা যে শুধু সাহিত্য তেমন আভাস কিন্তু তাঁর ভাষণ থেকে পাওয়া যায় না। প্রসংগত রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি মনে পড়েঃ......"যখন বোলপুরে বসে দিনের পর দিন এই গানগুলি একটি একটি করে লিখেছিলুম, তখন কল্পনাও করতে পারতুম না এগুলো সমুদ্রপারে কারও কোন প্রয়োজনে লাগবে। এমন কি আমি নিজে হতবার মনে করেছি এবং তোমাদেরও বলেছি বাংলা ভাষাতেও এগুলো ঠিক সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য নয়—এ কেবলমাত্র আমার নিজের মনের কথা আমারই প্রয়োজনে লেখা—নিতান্তই নিরলংকার। এখন মনে হচ্ছে কেবলমাত্র নিজের জন্য লিখলেই সেটা যথার্থ সকলের জন্যে লেখা হয় এবং অলংকারটা বাদ দিলেই মূল্যটা বেড়ে ওঠে। দেখতে পাচ্ছি, গীতাঞ্জলি তাঁকে অর্পণ দেওয়া হয়েছিল বলেই সকলকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একথা নিয়ে তোমাদের আমি বেশি কিছু বলতে ইচ্ছে করিনে—পাছে তাতে এর মধ্যে কিছু বিকৃতি এসে পড়ে"—(১৭ শ্রাবণ, ১৩১৯, শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের কাছে লেখা।)

রবীন্দ্রনাথের লেখা যে একদিন পশ্চিমের হৃদয় হরণ করেছিল সেটাকে নীরদবাবু ফ্যাশন ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেননি। নীরদবাবুর এই ভাবনায় আসল ব্যাপারটা যতখানি চাপা পড়ে গেছে, ততখানি প্রকাশ পায়নি। পশ্চিমে গীতাঞ্জলির সমাদরে উচ্ছ্বাস থাকলেও আন্তরিকতার কিছু কমতি ছিল না। গীতাঞ্জলি আপন গুণেই সপ্রশংস প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল সেদিন। কিন্তু সেই আলোড়নটা আজ থিতিয়ে গেছে বলেই সেদিনের প্রতিষ্ঠায় ফাঁকি ছিল এমন মনে করার সংগত কোন কারণ নেই। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে জনাদরের জোয়ারে ভাটা পড়ে সহজেই। এক যুগের রচনায় হয়ত অন্য যুগের মন ভরে না। শৈলী, ভাষা, ভাবনা ও প্রকরণের পালাবদলই এর কারণ। উৎকর্ষতার মাপকাঠিতে বইয়ের পরমায়ুর হিসাব সব সময় মেলে না। এককালের অবহেলিত বই হয়ত অন্যকালে আদর পায়। গীতাঞ্জলি একদিন যা লাভ করেছিল সেটাকে গৌণ কারণে ছোট করে দেখায় গৌরব নেই। পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন—দার্শনিক ও মানবমুক্তির অক্লান্ত যোদ্ধাও। কিন্তু এর কোনটাও কী সেদিন সম্ভব ছিল রবীন্দ্রনাথ যদি না তাঁর লেখা ইংরাজিতে অনুবাদ করতেন? যদি না গীতাঞ্জলি প্রকাশ করতেন য়ুরোপে?

রবীন্দ্রনাথ যে নিজের সাহিত্যকৃতির জোরেই নোবেল প্রাইজের যথার্থ হকদার ছিলেন নীরদবাবু সেটা মানেন। তাঁর আপত্তি অন্য জায়গায়। ইয়েটস ও সুইডিশ অ্যাকাডেমি তো বাঙলা জানত না, তবে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সহিত্য সাধনার মূল্যায়ন করলেন কী করে? এর জবাব হচ্ছে—যদি তাঁরা বাঙলা জানতেন তাহলে তাঁরা কবির সাহিত্য বৈচিত্র্যের স্বাদ নিশ্চয়ই ভাল করে পেতেন। কিন্তু কবির সাহিত্য কৌলিন্য ও যোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবার মত যথেষ্ট আভাস তাঁরা অনূদিত গীতাঞ্জলির ছোট পরিসরেই পেয়েছিলেন। গীতাঞ্জলি যে ইয়েটসকে কী গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল, ইয়েটসের লেখা গীতাঞ্জলির ভূমিকাই তার প্রমাণ হয়ে আছে। আর সুইডিশ অ্যাকাডেমি যে কেন গীতাঞ্জলিকে পুরস্কৃত করেন, সে ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যাবে La Prix Nobel গ্রন্থে প্রকাশিত নীচের কয়েকটি লাইনেঃ

The Nobel Prize for Literature. Dr. Harold Hyarne, Emeritus Professor, Chairman of the Swedish Academy Nobel Committee, spoke as follows:

In awarding on this occasion the Nobel Prize for literature to the Anglo-Indian Poet, Rabindranath Tagore, the Academy has found itself in the happy position of being able to accord this recognition to an author, who, conformably to the express wording of Alfred Nobel's last will and Testament has during the current year produced the finest poems of an idealistic tendency.

Poet's work....draws the peoples of the earth closer together along paths of peace, cry and of strife too, to joint and collective responsibilities and that spends its own energies in despatching greetings, and good-wishes wide cast over land and sea."

(দ্রষ্টব্যঃ 'নরওয়ে-সুইডেন-হল্যান্ড : রবীন্দ্রনাথ'—সুভাষ সমাজদার, সাপ্তাহিক বসুমতী, ৩০শে বৈশাখ, ১৩৭২—পৃঃ ৩১৮০।)

বইয়ের কালবর্তীতাই কী লেখকের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার শর্ত হতে পারে? রচনার আকারেই রচয়িতার পরমায়ুর বিচার? নীরদবাবু কিন্তু তাই মনে করেন।

গীতাঞ্জলি আয়তনে নিশ্চয়ই ছোট। কিন্তু একদা গীতাঞ্জলির অবয়বের এই ক্ষীণতাটাতেই বিশেষ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন আঁদ্রে জিদের মত ব্যক্তি। "মহাভারতের ২১৪, ৭৭৮ শ্লোক এবং রামায়ণের ৪৮০০০ শ্লোকের পর গীতাঞ্জলি—আঃ কি আরাম! হায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌলতে ভারতবর্ষকে অবশেষে স্বল্পতাদোষে দোষী হইতে হইল—সেজন্যে আমি তাঁহার নিকট কত না কৃতজ্ঞ! এই যে দৈর্ঘ্যের বদলে মহার্ঘতা, ভাবের বদলে সার—এ পরিবর্তনে আমাদের কত না লাভ! কারণ গীতাঞ্জলির ১০৩টি ক্ষুদ্র কবিতার প্রায় প্রত্যেকটিই যথেষ্ট সারগর্ভ।" (আঁদ্রে জিদের লেখা ইংরাজী গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদের ভূমিকা। সবুজ পত্র ১৩২১, অগ্রহায়ণ। দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৭তে পুনর্মুদ্রিত।) ভাষাগত ইংরেজিয়ানার চুলচেরা বিচারে গীতাঞ্জলির ইংরেজীতে ছিটেফোঁটা খাদ হয়ত কোথাও থাকতে পারে কিন্তু ইংরেজী যাঁর মাতৃভাষা নয়, যাঁর সমগ্র রচনার একটা নগণ্য অংশমাত্র ইংরেজীতে লেখা তাঁর ক্ষেত্রে অন্তত এটা কোন চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর মত উল্লেখ্য অপটুতা নয় এবং এতে গীতাঞ্জলির সামগ্রিক আকর্ষণের তেমন কিছু হানিও ঘটেনি।

কিন্তু অপূর্ণতা যাই থাক ইংরেজী গীতাঞ্জলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সমসাময়িক পশ্চিমকে মুগ্ধ করেছিল। নোবেল প্রাইজে সেই মুগ্ধতার স্বীকৃতি। ইংরেজী ভাষার রচয়িতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ও সেই সূত্রে। কিন্তু গীতাঞ্জলির দৌলতে পাশ্চাত্যে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ কখনও এ রকমটা ভাবেন নি। নীরদবাবু তাঁর এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে কবির কোন স্পষ্ট উক্তিও উদ্ধার করতে পারেননি। শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত ভাষণের যে অংশ থেকে নীরদবাবু এই ধারণাটাকে টেনে এনেছেন সেটা যে বেশ কষ্টকল্পিত সে তো আগেই দেখানো হয়েছে। বস্তুত এ রকম অবাস্তব দাবির কোন ছবি রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতেও ছিল না। প্রসঙ্গত রোটেনস্টাইনের কাছে লেখা একটি পত্রে কবি একবার বলেছিলেন—

"It was not at all necessary for my own reputation that I should have my place in the history of your literature. It was an accident for which you were responsible and possibily most of all Yeats. .... it is never the function of a poet to personally help in the transportation of his poems to an alien form and atmosphere, and be responsible for any unseemly risk that may happen to them." (Men and Memories : William Rothen-Stein). ইংরেজী লিখে পাশ্চাত্যে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার কোন মোহ রবীন্দ্রনাথের ছিল না। বিদেশী ভাষায় নিজের কবিতার স্বকৃত অনুবাদের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা আছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একেবারে অজ্ঞ ছিলেন না।

শুধু নোবেল প্রাইজ নয়, বাঙালী ভদ্রসমাজের নিন্দার অবিরাম অভিঘাতেও রবীন্দ্রনাথের জীবন দ্বিতীয় খাতে বইতে শুরু করেছিল বলে নীরদবাবু মনে করেন। তাঁর ধারণার সমর্থনে নীরদবাবু রবীন্দ্রনাথের চিঠি ও রচনাংশ থেকে যে সব উদাহরণ চয়ন করেছেন তাতে নিন্দার আক্রমণে বিপর্যস্ত রবীন্দ্রনাথের মানসিক ক্লেশ ও বিক্ষোভের পরিচয় আছে এমন কী জন্মান্তরে তাঁর জন্ম যাতে বাঙলা দেশে না হয় এমন উক্তিও রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পথটা কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। নিন্দাটা তাঁর ভাগ্যে কিছু কম জোটে নি। তাঁর মানসিক বিক্ষোভও অস্বাভাবিক কিছু নয়। সকলেই এ সব অল্পবিস্তর জানেন। এখন বিবেচ্য হচ্ছে নিন্দার আক্রমণে অধীর হয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বিদেশমুখীন হয়েছিলেন নীরদবাবুর এই অভিমত কত দূর সত্য। সংশ্লিষ্ট উক্তিগুলি কী স্বাভাবিকভাবে এই রকম একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়? উক্তিগুলিতে রবীন্দ্রনাথকে ভুল বোঝার একটা প্রলোভন আছে সেটা ঠিক। কিন্তু সেই প্রলোভনের প্রশ্রয়ে নীরদবাবু যা বলতে চেয়েছেন সেটা সম্পূর্ণ বেঠিক। গালিগালাজ যতই খেয়ে থাকুন, মন যতই তিতবিরক্ত হোক, স্বদেশের নিভৃত গৃহকোণটিও রবীন্দ্রনাথকে টানত। কানাডা যাওয়ার পথে প্রতিমা দেবীকে একখানি চিঠিতে লেখেন:—"...আমার সঙ্গে পুপের (নন্দিনী দেবীর) এক জায়গায় গভীর মিল আছে—আ মা দে র উভয়েরই মতে শান্তিনিকেতনের মতো জায়গা ভূমণ্ডলে নেই। বউমা শুনে হাসবে, ভাববে মাসখানেক যেতে না যেতেই আমাকে ঘরের টানে

টেনেছে। কথাটা মিথ্যে নয়—তবু কর্তব্য সাধনে বিঘ্ন হবে না।" (২৮ মার্চ—১৯২৯, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭২, ২ সংখ্যা।)

ফেরত যাত্রায় জাপান যাওয়ার পথে আর একখানি পত্রে প্রতিমা দেবীকে লেখেন—... 'জাপান আমার নিজেরও ভাল লাগে, জাপানীদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে—তা হোক্ তবু শরীর মন শান্তিনিকেতনের দিকেই ঝুঁকে থাকে—আর দেশ দেশান্তরে বক্তৃতা করে বেড়াতে ইচ্ছে করে না'।...(১২ মে ১৯২৯, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭২, ২ সংখ্যা) নীরদবাবুর অভিমত মানলে রবীন্দ্রনাথ কখনও এ রকমটা লিখতে পারতেন না। কারণ স্বদেশে গালিগালাজের ভয়টা তো সব সময়ই ছিল।

তাছাড়া নীরদবাবুর এই সিদ্ধান্তটি আরো একটা দিক থেকে অচল। রবীন্দ্রনাথের মনের বিশেষ গড়নটা নীরদবাবু হিসেবের মধ্যে আনেন নি। রুচির পরিশীলতা, তাঁর ভাবানুগ্রাহিতা ও প্রীতিময়ী প্রসন্নতার একটা আশ্চর্য সমন্বয়ে রবীন্দ্রমন গড়ে উঠেছিল। তদুপরি লাজুকতার যে ঈষৎ স্পর্শটুকু ছিল তাতে এ মনের ভিতরের ও বাইরের আচরণে প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য বজায় রাখার সহায় হয়েছিল। কারোর উপর কোন জোর জবরদস্তি হোক সেটা উনি আদপেই চাইতেন না। নিজেকেও এ ব্যাপারে সতর্ক রাখতেন। দুঃখ সইতেন তবু পারতপক্ষে দুঃখ দিতে চাইতেন না। যাঁর মনের গড়নটা এই রকম তিনি আকস্মিক নিন্দার অভিঘাতে সময় সময় বিক্ষুব্ধ হতে পারেন, হয়েছেনও। বিক্ষোভটা মনের একটা সাময়িক লক্ষণ। ওতে চিরকালের মনের ছবি নেই। এক উপসর্গেই রোগের বিচার করলে রুগীর প্রতি অবিচারের আশংকা থাকে। গালিগালাজের ধাক্কায় রবীন্দ্রনাথের সমস্ত মনটার প্রতিক্রিয়া ও তার সার্বিক ফলাফলটাই লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের মনের সামগ্রিক প্রবণতা ও বিশেষত্বের বিচারেও এ কথাটা মেনে নেওয়া শক্ত যে নিন্দার ভয়েই রবীন্দ্রনাথ বিদেশের প্রতি উন্মুখ ও স্বদেশের প্রতি বিমুখ হয়েছিলেন।

নীরদবাবুর মতে বাঙালী সমাজের নিন্দার অভিঘাতে রবীন্দ্রনাথ পরিণামে দেশবাসী সম্পর্কে উদাসীন হয়ে নিজেকে বিদেশীর সমানধর্মী ও বিদেশকে নিজের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র বলে ভাবতে শিখলেন। অথচ বাঙালী ছাড়া অন্য কিছু হওয়ার ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের ছিল না। সুতরাং বিদেশ ও বিদেশীর জন্য তিনি যা করতে আরম্ভ করলেন তার সমস্তটাই কৃত্রিম হয়ে পড়ল এবং এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অভিনেতা ছাড়া অন্য কিছু হওয়ারও উপায় রইল না।

উপরের যুক্তিতে একটা মস্ত অসংগতি আছে। রবীন্দ্রনাথের বিদেশ ও বিদেশী সম্পর্কে যে ভূমিকা ছিল সেটা কখনও তাঁর স্বাদেশিক চেতনাকে সমূলে খর্ব করে গড়ে ওঠেনি। তাঁর যে পরিণামে বাঙালী ছাড়া অন্যকিছু হওয়ার ক্ষমতা ছিল না সেটা নীরদবাবুও মানেন। অতএব এহেন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিদেশ ও বিদেশীকে খুশি করার জন্য কিছু করাটাই সম্ভব ছিল না। যদি সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে এটাও স্বীকার করতে হবে যে তিনি তাঁর ঐ স্বাদেশিক চেতনার সঙ্গে অন্তত কিছুটা অন্যায় আপস করেছিলেন। সবটা করেছিলেন বলা যাচ্ছে না, কারণ নীরদবাবু মনে করেন রবীন্দ্রনাথের ঐ চেতনাটা সক্রিয় ছিল বলেই বিদেশ ও বিদেশী সম্পর্কে স্বদেশে তাঁর ভূমিকাটা শেষ পর্যন্ত কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই রকম গুরুতর ব্যাপারে আংশিক আপস করাটা বাস্তব বিচারে সম্ভব কি না। কথায় বলে একটা অন্যায় আর একটা অন্যায়কে ডেকে আনে। সুতরাং এক্ষেত্রে অন্যায়ের সঙ্গে আপসটা পুরো হয়ে ওঠার সম্ভাবনাই প্রবল। আর সেটাকে ঠেকিয়ে রাখা যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই শক্ত। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তো আরো শক্ত। কারণ রবীন্দ্রনাথও এতটা পোড়-খাওয়া কারবারী বুদ্ধির লোক ছিলেন না যে এ ব্যাপারে অন্যায় আপসের পরিমাপ ও গন্ডিটাকে সতর্কতার সঙ্গে একটা নিরাপদ সীমানায় আটকে রাখবেন। অতএব হয় তিনি স্বাদেশিক চেতনার সঙ্গে অন্যায় আপসটা পুরোপুরি করেছিলেন নয়ত

জানেন না।' (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৯ পৃ.-৬৬৬)।

(৩) রবীন্দ্রনাথের স্বদেশীয় ভক্তেরা ছিল নিছক স্তাবক এবং তাঁদের ভক্তির উপরে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা মাত্র ছিল না, নীরদবাবুর এই ধারণাটি উপযুক্ত প্রমাণাভাবে স্বকপোল-কল্পিত ও উদ্দেশ্যমূলক বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। নীরদবাবু যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ করতেন তো আলোচনার সুযোগ ঘটত। রবীন্দ্রনাথের নিছক স্তাবকতা করেননি অথচ গুণগ্রাহী ভক্তিতে তাঁর শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের এমন ভক্তের সংখ্যা এদেশে কিছুমাত্র বিরল নয়। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথা বলছি। সত্যেন্দ্রনাথের রবীন্দ্র ভক্তি সুবিদিত। কিন্তু ভক্তের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যদি প্রয়োজনীয় শ্রদ্ধাবোধই না থাকবে তবে তিনি কী ভাবে সত্যেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে কবিতা লিখলেন? কেন বললেন?

'বন্ধু, মিলনের দিনে বারম্বার
উৎসবরসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,

আনন্দের দানে ও গ্রহণে।'

... ...

'আশা করি, মর্ত্যজনে ছিল তব যে
যে বিরাট বিশ্ব হাসা, যে স্বচ্ছ সতেজ
সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত
কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্ত্যলোকের দ্বারে—ব্যর্থ নাহি হোক
এ কামনা॥'

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সঞ্চয়িতা
(পৃ—৫৮২—৮৪)

(৪) সম্বোধন হিসাবে 'কবি' চলবে। কিন্তু 'গুরুদেব' কেমন যেন শ্রুতিকটু লাগে বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ যখন প্রচলিত অর্থে গুরু ছিলেন না। তবে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ট মহলে ও তাঁর জীবৎকালে এটা একরকম যা হোক মানিয়ে গেছে। কিন্তু একালে যেন কিছু খাপছাড়া মনে হয় এই সম্বোধন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এসব জানতেন। মাঝে মাঝে এই নিয়ে বিরক্তও হয়েছেন। তবু সম্বোধনের বিড়ম্বনাটুকু স্নেহের অত্যাচার বলেই সয়ে গেছেন।

(৫) বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুদিনের লালিত একটা অন্তরঙ্গ সাধ ও সাধনাকে রূপ দিতে চেয়েছেন। —'যত্র বিশ্ব ভবত্যেক নীড়ম্' যার লক্ষ্য সেটা কোন সহজ কাজ নয়...এবং তার সফলতা সময়সাপেক্ষ। সমবেত উৎসাহ, সাহায্য ও নিষ্ঠাতেই এসব কাজ সফল হতে পারে। দেশবাসীর অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা আশা করেই রবীন্দ্রনাথ একাজে হাত দিয়েছিলেন। সাহায্য হয়ত কিছু জুটেছিল কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা কত অল্প। উদ্দেশ্যের মহত্ত্বেও যে আমরা সহজে বিগলিত হই না স্বভাবগত সেই জড়ত্বই বোধহয় এই মনোভাবের মধ্যে সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথও সেটা জানতেন। তাই ব্রত-উদ্‌যাপনের জন্য অপরিসীম দুঃখ ও লাঞ্ছনাকে বরণ করতেও তিনি পরাঙ্মুখ হননি। সেটা ছিল বিশ্বভারতীকে গড়ে তোলার দিন—স্বভাবতঃই সুখের দিন নয়। বিদেশীরা আগ্রহ নিয়ে সাধ্যমত এগিয়ে এসেছেন। আমরা যে তেমনভাবে সাড়া দিতে পারিনি, এগিয়ে যাইনি—তাতেই তো আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। সেই সময় শ্রীযুক্ত বিড়লার সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যকে যদি কিছু সাহায্য করেই থাকে তাতে তো অগৌরবের কিছুই নেই। নীরদবাবু কী বুঝেছেন জানি না। কিন্তু আমরা জানি মহৎ ব্যয়েই ধনের মর্যাদা।

বিশ্বভারতীর পথ কখনও দেশের আর পাঁচটা আটপৌরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত হওয়া উচিত নয়। আজকের বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে হয়ত অম্লান মাধুর্যে বজায় রাখতে পারেনি। এতে দুঃখের কারণ ঘটলেও হতাশ হওয়াটা কোনো কাজের নয়। চেষ্টা করে বরং সঠিক পথের নিশানাটাই ঠিক রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে সে দায়িত্বটা আমাদেরই। কিন্তু আজকের বিশ্বভারতীকে দেখে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ও অতীত প্রয়াসটাকেই নিষ্ফল ও অসার মনে করাটা মূঢ়তা। আকস্মিক প্লাবনে কী পতঙ্গের আক্রমণে ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলেই কী কৃষক বীজ বুনবেন না? কোনো অশুভ রাত্রে দিল-ওয়ারার শ্বেতমর্মরের ক্ষোদিত বিস্ময় ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ হতে পারে ভেবেই যদি সেটার নির্মাণকার্যে হাত দেওয়া না হত তাহলে বিজ্ঞতা কতটা প্রকাশ পেত জানি না, কিন্তু পৃথিবী একটা যুগ, একটা ইতিহাস, একটা আকাঙ্ক্ষা ও নৈপুণ্যের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হত।

নীরদবাবু কী এমন একজনও পরিণত-বয়স্ক জনহিতব্রতী সামাজিক মানুষের খোঁজ দিতে পারেন যাঁর জীবনে কোন হতাশা, গ্লানি ও তিক্ততা ছিল না? জীবনের অঙ্কটা কিঞ্চিৎ গোলমেলে। শেষ ফলাফলেই সে অঙ্কের হিসেব মেলে না। রবীন্দ্রনাথও মানুষ ছিলেন। হতাশা ও তিক্ততার গ্লানি তকেও সইতে হয়েছে। তাঁর দীর্ঘকালের স্বপ্ন, সাধনা ও প্রত্যয়ে আঘাত লেগেছিল। কামনাসর্বস্ব সভ্যতা আর যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবী তাঁর শান্তি হরণ করেছিল। তবু শেষ পর্যন্ত মানুষকে তিনি অবিশ্বাস করতে পারেননি। বলেছিলেন—'মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকার-হীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক অমরতা নিয়ে কোন সংশয় নেই। কিন্তু বিশ্বমানবতার জন্য যে অক্লান্ত প্রয়াস আমরা তাঁর মধ্যে দেখেছি নানা প্রতিকূলতা ও বিঘ্ন সত্ত্বেও বর্তমান সভ্যতার অন্তর্নিহিত প্রবণতা কী সেই পথেই মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চাইছে না?

ন্যায় ও সত্যের খাতিরেই নীরদবাবুর দুই রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। স্বদেশে ও বিদেশে, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার

আগে ও পরে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে আমাদের কাছে ধরা পড়েছেন সেই তাঁর সত্য ও স্বাভাবিক পরিচয়। ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকে বিশ্বভারতী একটি মনের এক উপলব্ধি থেকে নবতর উপলব্ধির ইতিহাস—রবীন্দ্রনাথের মুখোশ পাল্টানোর নেপথ্য কাহিনী নয়। তাঁর ভাবে ও ভাবনায়, কথায় ও কাজে, লেখায় ও রেখায় আছে সেই ইতিহাসেরই অজস্র প্রমাণ। সযত্ন অনুশীলন এবং সতর্ক বিচারেই কেবল তার মর্ম উদ্ঘাটন সম্ভব। নিঃসঙ্গতা যেমন রবীন্দ্রমনের একটা বৈশিষ্ট্য, বিশ্ববোধও তাই। নেই বললেই সেটা মিথ্যা হয়ে যায় না। রবীন্দ্রমনের এই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যটাকে অস্বীকার করার জন্যই 'দুই রবীন্দ্রনাথ' নামক গোলকধাঁধার উৎপত্তি। বাঙালী রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবোধ ও বিশ্ব-বোধে কোন বিরোধ নেই। এক মনোরম অনুপাতে ওরা মিশে আছে। যে উদ্যোগ, যে পূজার রবীন্দ্রনাথের এই সামগ্রিক পরিচয়কে আবরিত করে সেই উদ্যোগ, সেই পূজা নিশ্চয়ই নিন্দার্হ। কিন্তু নীরদ-বাবু 'অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ' থেকে 'আসল রবীন্দ্রনাথকে' উদ্ধার করার জন্য যে উদার আহ্বান জানিয়েছেন সেটা নিছক হাওয়ার সঙ্গে লড়াই এর সামিল। নীরদবাবু-কথিত 'অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের' কোনো অস্তিত্ব কোনকালেই ছিল না। 'দুই রবীন্দ্রনাথ' আসলে একটি নির্ভেজাল দৃষ্টি-বিভ্রম।

—বিশ্বনাথ সরকার
২৩, ময়ূরমহল লেন, বর্ধমান।

শকুন্তলা দেবী

জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে

সম্প্রতি সাময়িক পত্রের দু-একটিতে বিবাহ সম্বন্ধে নানা আলোচনা দেখলাম। প্রেম করা বিয়ে ভাল না অভিভাবকের আয়োজনে গাঁটছড়ার বন্ধন ধোপে টেকে বেশী, আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে এইটাই বুঝলাম মুখ্য অনুশীলন বা চর্চার ব্যাপার। নানা মতের মাঝে নানা তথ্যের সন্ধান পেলাম সত্য, কিন্তু আমার ঘুরে ফিরে বিয়ে সম্বন্ধে এক অসামান্যার কয়েকটি কথা মনে হচ্ছে। পেশ না করে পারছি না।

বিধাতা পুরুষের হাত-ধরা জন্ম, মৃত্যু বিয়ে এমনটি আর সেরকম অটল বিশ্বাসে ক'জন আর এখন বলেন? ফ্যামিলি প্ল্যানিং থেকে নিয়ে বিচ্ছেদ আইন পর্যন্ত আমাদের সরল সহজ ধারণাগুলো বেশ বদলে দিয়েছে। তবু নারী-পুরুষের মিলিত জীবনযাত্রার একক হিসাবে বিবাহকে এখনও আমরা সামাজিক জীবনে সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় ঘটনা মনে করি। এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল অলৌকিক প্রতিভাময়ী শ্রীমতী শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে। শকুন্তলা দেবীর পরিচয়ের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তিনি আজ বিশ্বের বিস্ময়। গণিত শাস্ত্রে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা সর্বজনবিদিত। দক্ষিণ ভারতে ব্যাঙ্গালোরে সাধারণ সংসারে জন্মে অতি অল্পবয়সে গণিতে মর্ত্যে দুর্লভ অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দেন। পাঁচ বছর বয়সে লম্বা লম্বা সংখ্যা নিয়ে খেলা করতো কচি মেয়েটি যেন গণিত তার ঐশ্বরিক প্রতিভা। পণ্ডিতেরা যেখানে হার মানতেন, সেখানে শিশু শকুন্তলার শুরু। দেশের স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের ডাক এল। কিশোরী বিদুষী জগৎ জয় করে জানিয়ে দিলেন ভারতীয় মেয়ে তার অসাধারণ ক্ষমতা অলঙ্কারের মতই ধারণ করতে পারে। কোথাও এতটুকু অহঙ্কার নেই, নেই জড়তা বা অহমিকা অভিমান। মার্কিন দেশের মানুষ থেকে নিয়ে নাইরোবির খবরের কাগজে পরিবেশন করেছে খবর এই অদ্ভুত মেয়েটির যে কম্পিউটার মেশিনকে হারিয়ে দিয়েছে।

আজ শকুন্তলা দেবীর প্রতিভার কথা বলবো বলে আলোচনা আরম্ভ করিনি। যা সামান্য বললাম, সে কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যে যে, এমন যে মেয়ে, সে বিয়ের বিষয় কি মত পোষণ করে। শকুন্তলার বয়স ২৯। বিবাহ এখনও সে করেনি, কারণ, মন ঠিক করতে পারছে না। জ্ঞানী, গুণী, ধনী, প্রতিপত্তিশালী অনেকে তার পাণিপ্রার্থী হয়েছে, কিন্তু কি যেন একটা দ্বিধা, কি যেন এক সংশয় শকুন্তলাকে পেয়ে বসে। মনের মানুষ সম্বন্ধে কিন্তু তার খুব দারুণ একটা ছক-কাটা অঙ্ক-কষা হিসেব নেই। তবে কিসের বাধা? শকুন্তলা বলে, ওর মা-বাবা নেই। নেই এমন অভিভাবক যে বিচারবুদ্ধি দিয়ে বলে দেবে এই তোমার যোগ্য পাত্র। আর আমি নিজে? যদি মানুষ না চিনতে পারি! জিজ্ঞাসা করলাম, ঐশ্বর্যের প্রতি কি তার আকর্ষণ আছে? —না নেই। তবে মোটামুটিভাবে দিন চলে যায় এতটুকু আশা করি। যদি তোমার স্বামী তোমার প্রতিভার স্বীকৃতি না দেন? —না দিলে আমি ছেড়ে দেবো অঙ্ককষার নেশা। সুখের সংসার গড়তে গিয়ে গণিতের সংখ্যা বাধা হবে, ছি! আমার শখ বা নেশার প্রতি মমতা করে দু-চার দিন এদিক ওদিক যাবার অনুমতি পেলে খুশী হবো, আর যদি তা না পাই, তবে সংসার ছেলেমেয়ে সার করে সারা জীবন সুখে কাটাবো। প্রশ্নের উত্তরগুলো ভাল লাগছিল বলে আরও প্রশ্ন করে চললাম। তোমার স্বামীকেও কি তুমি অসামান্য প্রতিভার আধার হিসাবে চাও?—না, স্বামীকে চাই সহানুভূতিশীল ভাল লোক হিসাবে। সুখে দুঃখে সাথী হিসাবে।
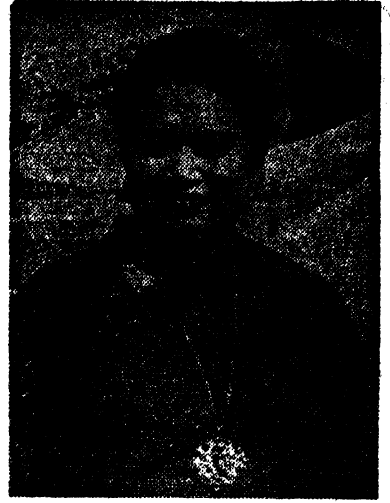
সাধারণ মানুষ জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে। একটি ফ্যামিলি প্ল্যানিং কেন্দ্র

যে পাণ্ডিত্যের ছায়া মনুষ্যত্বকে ঢেকে দেয়, সে পাণ্ডিত্যকে আমার প্রয়োজন নেই। তার পরের প্রশ্নটি আমার প্রতিভাময়ী বান্ধবীটিকে ভাবিয়ে তুললো। স্বামী-স্ত্রীর মিলিত জীবন যেখানে সুখের হয় না, সেখানে দোষ সাধারণত কার বেশী থাকে বলে মনে হয়? — দোষ কার বলা কঠিন। তবে আমার অভিজ্ঞতায় মেয়েরা খুঁটিনাটি নিয়ে বড় বেশী অশান্তি করেন। —তুমি করবে না তো? "কি জানি!"

শকুন্তলার সব কথায় আমার মনে হলো যতই প্রতিভা থাকুক, জগতে যতই সে-প্রতিভায় পরিচিতি মিলুক, মেয়েরা চায় ঘর বাঁধতে। সব ত্যাগ তার জন্য করতে তারা প্রস্তুত। দ্বিতীয়ত, সম্পূর্ণভাবে প্রেম করে, নিজের আকর্ষণের উপর নির্ভর করে বিয়ে করতে এখনও ভারতীয় মেয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। এমন বিয়ে যে হয় না, তা বলতে চাই না, তবে অনেক ক্ষেত্রে মন দেওয়া নেওয়ার পালার সঙ্গে আপন জনের মতামত পেলে ভালই লাগে। বোধ হয় মেয়েরা নিশ্চিন্ত হতে চায়, জানতে চায় তাদের ভুল হয়নি। তারপর অবশ্য বিবাহিত জীবন সুখের হবে কি না হবে, এ নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। বিয়ের যে দারুণ একটা রোম্যান্টিক দিক আছে, তাকে অবলম্বন করেই প্রেম এবং বিবাহোত্তর জীবনে সন্তানের জন্ম ইত্যাদি। তবে বিয়ের সবটাই সেই রোম্যান্স নয়। তার কর্তব্যের দিকটা অবহেলা করার সম্ভাবনা থেকেই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মন-কষাকষির সূত্রপাত। সেটা উভয়ত হতে পারে। স্বামী অবিবেচক হ'তে পারেন আবার সতী-সাধ্বীরা মাঝে মাঝে অবুঝপনার চূড়ান্ত তথাকথিত 'দোষী' অপর পক্ষের কাঁধে চাপিয়ে কেঁদে কেটে অনর্থ করতে পারেন। সে অনর্থ বহু দূর গড়িয়ে যাবার সুযোগ সমাজও আইন করে দিয়েছে বলে অনেক সময় চায়ের পেয়ালায় তুফান ওঠে না এমনও নয়।

এক কথায় বলতে গেলে বিবাহ যদি স্ত্রী-পুরুষের জৈব আকর্ষণের সামাজিক বিশৃঙ্খলা নির্দেশক ছাপ হয়, তবে সেই প্রণয়লীলা দায়িত্ববিহীন নয়। প্রেম-করা বিয়ে বা অভিভাবকের যোগাযোগ করা বন্ধন, দুয়েরই বেলায়ই উত্তরকালের সুখী দম্পতিকে দায়িত্বের দিক ভাবতেই হবে। অর্থনৈতিক দুঃস্থিতি, স্বাস্থ্য বা ধর্ম-সম্বন্ধীয় অস্বীকার, সবই কর্তব্যকে স্মরণ করিয়ে

প্রেম ও অলৌকিক চুক্তি, অর্থাৎ শ্রম বিভাগ অবিবাহিতের মিলিত জীবনের ভিত। এ-জন্যই বিবাহাতীত আকর্ষণে হয়তো মানুষের যথেচ্ছাচারের পথ খোলা থাকে, কিন্তু বিবাহ বন্ধনে কোন দেশের, কোন কালের মানুষ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন নয়। প্রেম ও প্রণয়লীলা তাই বল্গাবিহীন কেবলমাত্র দিবাস্বপ্নে, নাটক-নভেলে অথবা কবিতা বা লোক-কাহিনীতে থাকে। Westermarck বলেছেন, "Marriage is rooted in the family, rather than the family in marriage".

প্রণয়লীলা বিবাহের তুচ্ছ অংগ নয়, তবে সেটাই শেষ নয়। পারিবারিক জীবনের ভিতকে জড়িয়ে বিবাহ বাঁচে। সেই জীবন-যাত্রার নিত্য আনাগোনার দৈনন্দিন ভাবনাগুলো তাই ফেলে দেবার নয়। বিবাহ নূতন জীবনের, নূতন দায়িত্বের এক পরম সন্ধিক্ষণ। পরিচিত পরিবেশকে অতিক্রম করে তার যাত্রা, নবপ্রতিষ্ঠিত বন্ধন তাই অনেক দাবি নিয়ে আসে। সেই দায়িত্বের যাত্রাপথে সন্তানের জন্ম সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। বিশেষ করে মায়ের দায়িত্বের সীমা নেই। শিশুর অসহায় শৈশব পারিবারিক জীবনের প্রয়োজনকে মহত্ব দিয়ে ঘিরে রাখে।

এ-জন্যই শ্রীমতী শকুন্তলার সংগে আলোচনা করে এত ভাল লেগেছিল, বিবাহে সুখ-দুঃখের মাপকাঠি অনেকটাই স্বামী স্ত্রীর হাতে থাকে। তাই এত বিচ্ছেদ, এত বিবাহ, এত মনকষাকষি, এত অন্যায়, অসুখ সত্ত্বেও পণ্ডিতেরা একবাক্যে বলেন, বিবাহিত নারী ও পুরুষ সার্থক জীবন যাপন করে বেশী হয়, দীর্ঘজীবী হয়, মানসিক বিকার ওদের কম হয়। এমনকি, অপরাধীদের সংখ্যায় দেখা গেছে

হয়েছে। গোলাম রসুলের এক বন্ধুর মাধ্যমে বন্দোবস্ত হল এক রাত্রে। আমাকে চোখ বেঁধে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেল একটি ঘরে। বেশ কিছুক্ষণ পরে বোরখা-পরা একজন এসে আদাব করল। 'আপনি যে পরমেশ্বরী, মানে পরভিন্ আখ্তার, কী করে বুঝব', জিজ্ঞেস করি। ইতস্তত করে অবশেষে মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে নিজের পরিচয় দিল। দেখলাম সেই বটে।

পরভিন্ তাকে বলেছে : মাকে সাহায্য করার জন্যে ৭।৮ মাস আগে সুপারবাজারে কাজ নেয়। পড়াশোনা কিছুদূর করেছে, ম্যাট্রিক অবধি নয়। গোলাম রসুল ছিল অন্য এক কাউন্টারে ক্যাশিয়ারবাবু। সেখানেই আলাপ, কিন্তু প্রেমে সে পড়েনি তার সংগে। ইস্লাম ধর্ম নাকি ছোটবেলা থেকে তাকে আকর্ষিত করেছে। একদিন সে কোনো ক্রেতাকে জিজ্ঞেস করে : "আপনি মুফ্তি আজম্ সাহেবের পাত্তা জানেন?" "কোন্ মুফ্তি?" "ঐ যিনি ইস্লাম ধর্মে দীক্ষা দেন"। ক্রেতা উত্তর না দিয়ে চলে যায়। পরে অন্য কারোর কাছ থেকে সে ঠিকানা জোগাড় করে মুফ্তি আজম্ বাহিরুদ্দিন সাহেবের। এবং জুলাই মাসের ২০ তারিখে মুফতি সাহেব তাকে ইস্লামে ধর্মান্তরিত করেন।

পরমেশ্বরীর মা বলেছেন যে, ৪ঠা অগাস্ট তার কন্যা ধর্মান্তরিত হয়েছে এবং সেই-দিনই নাকি গোলাম রসুল তাকে অপহরণ করে এবং বিবাহ করে। সেইদিনই মা পুলিসের কাছে অভিযোগ জানায় এবং নাবালিকা কন্যাকে তার কাছে ফিরিয়ে দিতে বলে।

পরভিনের কথা বিশ্বাসযোগ্য কিনা জানি না। সে শামিমকে বলেছে, তার বিবাহ করার উদ্দেশ্য হল একটি আশ্রয় পাওয়া, কারণ মুসলমান হয়ে মায়ের সংগে আর থাকতে চায় না। গোলাম রসুলের সংগে আলাপ পরিচয় হয়েছে, প্রেম নয়। একদিন একলা পেয়ে সে নিজেই রসুলকে জিজ্ঞেস করে "তুমি আমাকে সাদি করবে?" রসুলের ভয়, বাবা যদি তাকে ত্যাজ্যপুত্র করে। ভয়টা নাকি কেটে যায় যখন পরভিন তাকে "সার্টিফিকেট" দেখাল যে সে সাবালিকা। ডক্টর মাল্লা নাকি একজন সিভিল সার্জন, এবং সে নাকি সার্টিফিকেট দিয়েছে। সুতরাং, অলম্ বিলম্বেন, শুভস্য শীঘ্রম, ২৮শে জুলাই রসুলের এক বন্ধুর বাড়িতে সাদি হয়ে গেল।

এদিকে মা নাকি সব জানতে পেরেছে (পরভিনের মতে)। বিয়ে করে সে রাস্তনা-ওয়ারিতে মায়ের কাছেই থাকতে যায়। মা ও মামা নাকি গালমন্দ করেছে, সুপার-বাজারে যেতে নিষেধ করেছে, এমন কি ঘরে তালাবন্ধ করে রেখেছে। কিন্তু বোকা মেয়ে সে মোটেই নয়। রসুলের জানাশোনা উকিলবাবুকে পাকড়াও করে, আর দু' দিন পরে অতিরিক্ত মুনসেফবাবু পি-এন দিক্ষোর কোর্টে সে এফিডেভিট করে যে সে স্বেচ্ছায় রসুলকে বিয়ে করেছে।

"বাড়িতে ফিরে এলাম। মা ও মামা ভীষণ হইচই করলেন। দু' দিন আমাকে কামরায় তালা দিয়ে রেখে দিলেন", পরভিন বলেছে। একদিন সুযোগ পেয়ে পালিয়ে গেল রসুলের কাছে এবং ঘর ভাড়া করে স্বামী-স্ত্রী বসবাস আরম্ভ করল।

এদিকে শহরে ঝড় আরম্ভ হল। এরা পণ্ডিত সম্প্রদায়ের লোক, এবং সম্প্রদায়ের নেতারা তুললেন প্রতিবাদ পুলিস ও সরকারের বিরুদ্ধে। ব্যাপার হলো কি, মায়ের অভিযোগ পেয়ে পুলিস রসুল মিঞা ও আখ্তার বিবিকে থানায় নিয়ে আসে। জিনাকদল থানায়। মা ও মামা দেখা করে জানল আখ্তার বিবি আর বাড়ি ফিরবে না। রসুলান্ত প্রাণ। থানাদারদের সমস্যা, বিবি সাবালিকা কি না।

মুখ্যমন্ত্রী সাদিক সাহেব আমাদের বললেন যে, মেয়েটিকে প্রথম নেওয়া হল একজন মহিলা ডাক্তারের কাছে। সে পরীক্ষা করে বলল, মেয়েটির বয়স কুড়ি বয়েস হতে পারে, তবে এক্স্রে করে সঠিক বয়েস নির্ধারিত করা উচিত। (এক্স্রেতে নাকি হাড়ের গড়ন দেখে বয়েস মোটামুটি বলা যায়।) রেডিয়োলজিস্ট পরীক্ষা করে ঘোষণা করল, মেয়েটির বয়েস আঠারোর বেশি।

পুলিস কর্তৃপক্ষ ধরে নিল পরমেশ্বরী সাবালিকা, এবং তাকে তারা ছেড়ে দিল। মিঞা-বিবি নিজেদের ঘরে ফিরে গেল। শহরে উঠল প্রতিবাদের তুফান। মায়ের তরফে প্রার্থনা ছিল মেয়েকে কোনো নিরপেক্ষ স্থানে রাখা হোক যদ্দিন তার বয়েসের মামলা শেষ না হয়। পণ্ডিত সম্প্রদায়ের নেতাদেরও তাই ছিল দাবি। কিন্তু পুলিস সাধারণত একটু মাথা-মোটা। তারা কোনো কর্ণপাত করল না, সরকারী কর্তৃপক্ষরাও না।

আমরা মুখ্য সচিব দাস্তেকে প্রশ্ন করে ছিলাম : মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে এতো আকছার হয়ে থাকে যে যদ্দিন মামলা নিষ্পত্তি না হচ্ছে ততদিন সেই মেয়ে নিরপেক্ষ কোনো স্থানে (যথা আশ্রম) থাকবে। এক্ষেত্রে কেন ব্যতিক্রম হলো?

দাস্তে মহাশয়ের বক্তব্য হল এই যে আইনগতভাবে পুলিসের ক্ষমতা অথবা অধিকার আছে তাকে ছেড়ে দিতে যদি তারা প্রমাণ পায় যে মেয়েটি সাবালিকা। উনি পেনাল কোডের ধারা-ফারাও উল্লেখ করলেন। কিন্তু মেয়েকে নিরপেক্ষ স্থানে রাখলে কি বেআইনি হতো? মোটেই নয়। এবং এই সামান্য দিকটা না-দেখার ফলেই কাশ্মীরে এই প্রথম হল সাম্প্রদায়িক হাংগামা। যা কিনা হয়ে যেতো নির্বিঘ্নে, তাই আনল ডেকে অশেষ বিঘ্ন।

বাড়িঘর পুড়ল আগুনে। পোড়া বাড়িতে দেখলাম মেয়েরা ও মায়েরা চোখের জল ফেলছে। তিনজন মারা গেল, শ' দুয়েক লোক আহত হল, প্রধানত পুলিসের লাঠি-চালনায়। সত্যাগ্রহ করে অনেকে গেল জেলে।

কারফিউ অঞ্চলে ঘুরলাম। দেখে দুঃখ হয়। অতো সুন্দর কাশ্মীরে একি ট্র্যাজেডি, একি অসুন্দরের আবির্ভাব। অলিতে-গলিতে বন্দুকধারী পুলিস। সুন্দর সুন্দর ছেলে-মেয়েরা জানালাতে ভিড় করে বসে আছে। গোটা পাড়াটা যেন জেল হয়ে গেছে। তারা বাইরে এসে খেলতে পারে না, কারফিউ। তাদের চোখেমুখে ভয়।

হায় পরমেশ্বরী! হায় আখ্তার বিবি!

খগেন দে সরকার
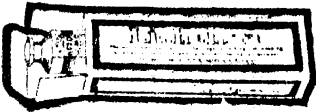
দুই বিশ্বের সেতুবন্ধ : ইলিয়া এরেনবুর্গ

আত্মজীবনীতে এরেনবুর্গ লিখেছেন, পৃথিবীর দুটি শহরকে আমি নিজের বাড়ি মনে করি : মস্কো এবং প্যারিস। বর্তমান সমাজব্যবস্থার এই দুই বিপরীত প্রতীক কেন্দ্রকে একই সঙ্গে ভালোবাসতে পেরেছিলেন—বর্তমান শতাব্দীর রুশ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এরেনবুর্গই একমাত্র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দুর্ভেদ্য কারাপ্রাচীরের আমলের সোভিয়েট রাশিয়ায় তিনিই ছিলেন পশ্চিম জগতের সঙ্গে প্রধান সেতুবন্ধ। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার শিল্পকলা ও সাহিত্য তিনি চিরকাল ভালোবেসেছেন, অন্যদিকে রুশ সমাজতন্ত্র মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছিলেন এবং সময় মতন তার সমালোচনা করতেও ছাড়েন নি।

জীবনের অধিকাংশ কাল তিনি রাশিয়া এবং পশ্চিম ইওরোপে ভাগাভাগি করে কাটিয়েছেন, ফলে তাঁর মধ্যে জন্মেছিল আন্তর্জাতিক মানসিকতা—তাঁর সমস্ত রচনায় এবং দীর্ঘ আত্মজীবনীতে সেই দিকটাই প্রতিফলিত।

এরেনবুর্গের কবি-পরিচয়টি এখন প্রায় বিস্মৃত, ঔপন্যাসিক এবং সাংবাদিক হিসেবেই তিনি প্রসিদ্ধ। কিন্তু জীবন শুরু হয় তৎকালীন রাশিয়ার সাহিত্যিক আবহাওয়া অনুযায়ী প্রতীকী কবিতা দিয়ে। জন্ম ১৮৯১ সালে ধনাঢ্য ইহুদী পরিবারে, কিয়েভ অঞ্চলে। ১৫ বছর বয়েসে, তখন তিনি মস্কোর স্কুলের ছাত্র, বলশেভিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, ফলে জারতন্ত্রের অধীনে কারাবাস। ১৯০৮ সালে তাঁর বাবা-মা তাঁকে প্যারিসে পাঠিয়ে দেন। এখানে এসে তিনি রাজনীতি ভুললেন প্রায়, প্যারিসের বোহেমিয়ান লেখকদের সঙ্গে মিশে কবিতা লিখতে শুরু করলেন। বাড়ি থেকে সামান্য হাত-খরচ আসতো, তা দিয়ে কোনো রকমে গ্রাসাচ্ছাদন। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাধায় তিনি ফরাসী বাহিনীতে সৈনিক হিসেবে যোগ দিতেও গিয়েছিলেন, কিন্তু স্বাস্থ্য খারাপ বলে বাতিল হয়ে যান। এই সময় সাংবাদিকতায় কিছু কিছু হাত পাকান এবং যুদ্ধ-বিরোধী শান্তিবাদী হয়ে যান।

রাশিয়ায় ফিরে এলেন ১৯১৭ সালে এবং তখনকার রুশ বিপ্লব সম্পর্কে ঠিক যেন মনঃস্থির করতে পারেন নি। রাজনীতির বদলে সাহিত্যই তখন তাঁকে বেশী টানছিল, মাথায় একটি উপন্যাসের পরিকল্পনা, এবং মস্কোর তৎকালীন বিশৃঙ্খলায় লেখার অসুবিধে, তাই তিনি ১৯২০ সালের পর আবার প্যারিসে ফিরে আসতে চাইলেন।

কিন্তু ফরাসী সরকার তখন তাঁকে সন্দেহ করছেন, রুশ গুপ্তচর সন্দেহে তাঁকে

ফরাসী দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। তিনি তখন বেলজিয়ামে বসে তাঁর প্রথম বৃহৎ উপন্যাস লিখলেন, "জুলিও জুরেনিটো"—পশ্চিমী সভ্যতা সম্পর্কে একটি বিদ্রূপ-ভাষ্য, কিন্তু পুরোপুরি সাম্যবাদীও নয়।

কিছুদিনের মধ্যেই, লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জনের পর তিনি ফরাসী দেশে ফিরে আসবার অনুমতি পেলেন। এর পর কুড়ি বছর তিনি প্যারিসেই প্রধানত কাটিয়েছেন, মাঝে মাঝে ফিরে গেছেন মস্কোয়—দেশের অবস্থা প্রত্যক্ষ করবার জন্য এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রায় ২০ খানা উপন্যাস লিখেছেন। সেই সব উপন্যাসের বেশীর ভাগই আজকাল বিস্মৃত। অন্যান্য ইওরোপীয় লেখকদের মতন তিনি এই সময় স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়েও মেতে উঠেছিলেন।

প্যারিসের পতনের পর তিনি আবার মস্কোয় ফিরে যেতে বাধ্য হলেন এবং সেখানে বসে লিখলেন তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ উপন্যাস "প্যারিসের পতন"। স্ট্যালিন কোনোদিনই এরেনবুর্গের প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন ছিলেন না, পরবর্তীকালে এরেনবুর্গ স্ট্যালিনের সমালোচনাও করে-ছিলেন নির্মমভাবে। সুতরাং, "প্যারিসের পতন" বইটি যখন লেখা হয়, তখনই স্ট্যালিন ব্যক্তিগত নির্দেশে বইটির প্রকাশ বন্ধ রেখেছিলেন। তখনও জার্মানদের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ-চুক্তি বহাল আছে, এবং এরেনবুর্গের বইতে ফরাসী দেশের জনগণ, প্রতিরোধ বাহিনী প্রভৃতি সম্পর্কে সহানু-ভূতি বেশী এবং জার্মান-বিরোধী মনোভাবই প্রবল।

রুশ-জার্মান সম্পর্কের অবনতি ঘটার পর, ১৯৪১ সালের বসন্তকালে "প্যারিসের পতন" রাশিয়ায় ছাপা হয়ে বেরোয়। এবং জার্মানী যখন রাশিয়া আক্রমণ করে, তখনই এরেনবুর্গ আন্তর্জাতিক সাহিত্যিকের ভূমিকা ছেড়ে দেশের কাজে লেগে যান। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ তাঁকে রাশিয়ার জাতীয় চিন্তানায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। 'প্রাভদা' এবং 'রেড স্টার' পত্রিকায় তিনি প্রায় প্রত্যেকদিন উদ্দীপক রচনা লিখতেন, সেই সমস্ত রচনাগুলি ভাষার তীব্রতা, আবেগ ও স্বাদেশিকতায় উজ্জ্বল। সেই প্রবন্ধগুলি তাঁকে বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দেয়।

যুদ্ধের পর আবার তিনি উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। লিখলেন "ঝড়" খুব সার্থক বলা যায় না। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস 'দি থ' সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন তোলে। এই উপন্যাসে তিনি স্ট্যালিন আমলের বিশদ সমালোচনা করলেন। এই সময় তাঁকে সাহিত্যিকের স্বাধীনতার স্বপক্ষে রাশিয়ায় প্রায় এক মাত্র প্রবক্তা হিসেবে দেখা যায়। শিল্পকলা সম্পর্কে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের ধারণাকে বিদ্রূপ করে তিনি প্রবন্ধভাবে পিকাসো, মাতিস প্রভৃতি শিল্পীর গুণগান করেছেন। ইসাক ব্যাবেল, মারিনা সেভাইভা, বরিস পাস্তেরনাক প্রভৃতি স্বাধীনতাস্পৃহ লেখক-লেখিকাদের পক্ষ সমর্থন করেছেন। এমন কি, ক্রুশ্চেভের জীবিতকালেই তিনি তাঁর সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। আত্ম-জীবনীতে তিনি লিখেছেন, স্টালিন পার্জ"-এর নিন্দে যে ক্রুশ্চেভ করেছেন, সেই ক্রুশ্চেভও একই দোষে দোষী, কেন-না, পার্জ-এর সময় তিনি তো কোনো প্রতি-বাদ করেন নি, বরং সমর্থনই করেছিলেন। এই নিয়ে ক্রুশ্চেভের সঙ্গে তাঁর বাগযুদ্ধও হয়েছিল। এরেনবুর্গের সঙ্গেও তো স্টালিনের মনোমালিন্য ছিল, তা হলে তিনি কি করে পার্জ-এর হাত থেকে বাঁচলেন? পশ্চিমী সভ্যতার দ্বারা পুষ্ট এবং উদারনৈতিক মনোভাব সম্পন্ন এরেন-বুর্গকেই বা স্টালিন কেন ক্ষমা করে-ছিলেন? এর উত্তরে এরেনবুর্গ বলেছেন, ওটা ছিল অনেকটা লটারির মতন, দৈবাৎ তাঁর হাতে লটারি জেতার টিকিট ছিল।

'প্যারিসের পতন' এবং 'ঝড়' উপন্যাসের জন্য তিনি দু'বার স্টালিন পুরস্কার পেয়েছিলেন। প্রথম বইখানি আমে-রিকাতেও বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। লেখক হিসেবে শিল্পের স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য তিনি সারা বিশ্বে সম্মানিত হয়েছিলেন। কিন্তু রাশিয়ার তরুণ মহলে, তাঁকে উদারনৈতিক হিসেবে মেনে নিয়েও এই অভিযোগ করা হয়েছে যে, তিনি সমালোচনা করেছেন, বিদ্রোহ করেছেন, কিন্তু সব সময়ই তা কিছুটা নরম ভাবে। পাস্তেরনাকের মতন তিনি নিজের বিপদের ঝুঁকি কখনো নেন নি। এবং তিনি নিজে ইহুদী, কখনো ইহুদীত্ব অস্বীকার করেন নি, কিন্তু দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের সময় রাশিয়ায় ইহুদীদের ওপর যে অত্যাচার করা হয়েছিল (ইয়েভটুশেংকো যা নিয়ে তীব্র কবিতা লিখেছেন)—সে সম্পর্কে এরেনবুর্গ তীব্র প্রতিবাদ জানাতে সাহস করেন নি।

গত ৩১ অগাস্ট, ৭৬ বছর বয়েসে মস্কোতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সনাতন পাঠক

কবিতা

বিকল্প অরণি। অসীম সোম। নবপত্র প্রকাশন, ৫১ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। দু টাকা।

অন্ধকারের দিনগুলি। চিন্ময় গুহ-ঠাকুরতা। পরিবেশক : মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। আড়াই টাকা।

অন্য বনভূমি। মঞ্জুষ দাশগুপ্ত। বাংলা কবিতা প্রকাশনী, ১৮ পদ্মপুকুর রোড, কলকাতা-২০। তিন টাকা।

দশকের হিসাবে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদের মুখে মাঝে মাঝে এমন কথা শুনতে পাওয়া যায় যে, ষাটের দশকে নাকি প্রতি-শ্রুতিবান তরুণ কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, এই প্রতিতুলনা তথাকথিত পঞ্চাশের দশকের সপক্ষে। কথাটা সর্বাংশে সত্য বলে মানতে ইচ্ছা করে না। একথা ঠিক, গত দশকের কবিদের কয়েকজন একটু অতিরিক্ত উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, প্রেমের কবিতায় দেহের বর্ণনা একটু বেশী জায়গা পেয়েছিল, তাহাও সর্বদা শালীনতার সীমার মধ্যে থাকেনি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের ফিরতে হয়েছে সেই পুরনো চেনা অত্যন্ত লিরিকের বৃত্তের মধ্যেই। তাঁদের যাবতীয় 'কোলাহল তো বারণ হল, এবার কথা কানে-কানে।' সেদিক থেকে ষাটের তরুণ কবিদের মধ্যে পরিস্কার দুটো ভাগ। এক-দল পঞ্চাশের উত্তেজনায় অন্ধ অনুগামী, অর্থাৎ উন্মার্গগামী, আরেকদল এই হৈ-চৈ দেখে যেন বিরক্ত, তাঁরা নিজস্ব মেজাজটি খুঁজে নিতে চাইছেন পরিচ্ছন্ন শান্ত কবিতার মধ্যে।

আলোচ্য তিনজন কবিকে অনায়াসেই এই দ্বিতীয় দলের বলে চেনা যায়। এঁদের তিনজনেরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, রোমান্টিকতা। অসীম সোমের কবিতায় স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। তাঁর স্বগত-কথন :

> অতিরিক্ত অস্তিত্বের মৃতীক সে অক্ষম
> অনুরাগ ছিলো শোঁকা, আজো বয়,
> স্মৃতির প্রবাহ,
> অত্যন্ত অশ্রুগুলি অবসীম হয় অনবধানে
> অনুরাগ অধরায় : জীবনের
> ঘুম ছিঁড়ে।
> দর্পণে বিশীর্ণ মুখ,—আশ্চর্য সে
> প্রতিবিম্ব আমার অচেনা,
> আগুনের ইতিহাস সমাহিত
> ছাইয়ের শরীরে।

একদিকে সমকালের অস্থিরতা, নৈরাশ্য, লোভ, জীবন ও জীবিকার গ্লানি অন্যদিকে সুস্থ জীবনে উত্তরণের আশ্বাস 'বিকল্প অরণি'র অধিকাংশ কবিতার বিষয়। সহজ সুন্দর রূপকল্প নির্মাণে অসীম সোমের দক্ষতা বিশেষ করে চোখে পড়ে।

চিন্ময় গুহঠাকুরতার কবিতার বহিরাঙ্গিক বাঁধুনি বেশ শক্ত, নির্ভুল ছন্দ-মিল, উৎপ্রেক্ষা রূপকের ব্যবহার তাঁর কবিক্ষমতার পরিচায়ক। বৈষ্ণব কবির কবিতার পংক্তি থেকে শুরু করে রবীন্দ্র-নাথ-জীবনানন্দের কবিতার কয়েকটি পংক্তি তিনি সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন। এই দিকটির পথ-প্রদর্শক শ্রীবিষ্ণু দে। বস্তুত, বিষ্ণু দে-র কবিতার পরিমণ্ডলই চিন্ময় গুহঠাকুরতাকে বেশী আকর্ষণ করে বলে মনে হল।

> বাতাসে সহসা ভেসে আসে কোন বাঁশি
> দিলে না এখনো দেখা,
> দিনযামিনীর সঞ্চয় পড়ে থাকে
> দূরে সুবর্ণরেখা।

অথবা

> কৈশোরে তুমি ছিলে না চপলমতি
> সরল বালক ভরা লাস্যে ও হাস্যে
> পশ্চিমে স্তুতি নিন্দার নৈরাশ্যে
> সম্প্রতি বায়ু সুতীব্র খরগতি
> কাব্যের স্রোতে চড়া পড়ে টীকা-ভাষ্যে
> হায় নির্বোধ, অন্তিমে আনো যতি।

চিন্ময়ের এই ধরনের কবিতায় কেমন বিষ্ণু দে-কে মনে পড়ে। তবে এপ্রভাব দোষের নয়। চিন্ময়ের নিজস্ব কণ্ঠস্বর ক্রমশই স্পষ্টতর হয়ে উঠবে—এ আশা করার মতো বহু কবিতা তিনি লিখেছেন।

মঞ্জুষ দাশগুপ্তর 'অন্য বনভূমি'র কবিতাগুলি খুবই আন্তরিক। ইতস্তত বহু উজ্জ্বল পংক্তি তিনি রচনা করেছেন। ছন্দও জানেন। কিন্তু তাঁর কবিতায় কেমন যেন সংহতির অভাব বোধ হয়। ছোট

লিরিকগুলিতে অবশ্য তিনি এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। কিন্তু দীর্ঘ কবিতাগুলি আরও আঁটসাট হলে ভাল হত। মঞ্জুষের শব্দ নির্বাচন সুন্দর, তৎসম শব্দের বাইরে বড় একটা যান না। কিন্তু মুখের বদলে বার বার 'আনন' সর্বত্র সুখকর নয়। অন্য বনভূমি-র শেষ কবিতাটি (জন্মদিন) সংলাপ-কবিতা। এই কবিতাটির দু-একটি অংশ (বিশেষত নারীর উক্তি) চমৎকার।

৩৮।৬৭, ৪২৮।৬৬, ২২১।৬৬

সঙ্গীত

নজরুল সুর সঞ্চয়ন। স্বরলিপি—কাজী অনিরুদ্ধ। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কবির সুযোগ্য পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ত্রিশটি জনপ্রিয় তথা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাব্য-সঙ্গীত প্রকাশ করে সঙ্গীতজগতের একটি বিশেষ অভাব মোচন করেছেন। বর্তমানে নজরুলের গানেও বিকৃতির অভাব নেই। এই কারণে মূল সুরগুলির স্বরলিপি যত শীঘ্র প্রকাশ করা যায়, ততই ভাল। গানগুলির মধ্যে 'মোমের পুতুল', 'চোখ গেল পাখি রে', 'কাবেরী নদী জলে কে গো বালিকা', 'শাওন রাতে', 'বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ' প্রভৃতি একদা বিশেষ পরিচিত ছিল এবং এইসব গানের সুরগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কাজী অনিরুদ্ধ বিশেষ যত্ন নিয়ে নিজে স্বরলিপিগুলি প্রস্তুত করেছেন এবং আরও স্বরলিপি প্রকাশ করবেন, আশ্বাস দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, ভবিষ্যতের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রমাণ এই স্বরলিপিগুলি। অতএব এ কাজে আত্মনিয়োগ করে কবিপুত্র পিতার প্রতি সবচেয়ে বড় কর্তব্য পালন করেছেন এবং দেশবাসীরও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ৪৩৬।৬৬

বাংলার লোকগীতি। শ্রীবুদ্ধদেব রায়। লোকসংস্কৃতি পরিষদ। ৭৯। ১৩বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা-১৪। দু টাকা পঁচিশ পয়সা।

স্বরলিপিকার দীর্ঘকাল ধরে প্রাচীন লোকগীতি সংগ্রহের কাজে লিপ্ত আছেন। এই পুস্তকে মাত্র ষোলটি গানের স্বরলিপি প্রকাশ করা হয়েছে বটে, কিন্তু কাজটি কম আয়াসসাধ্য নয়। বিভিন্ন লোক-সঙ্গীতের যে বিশেষ বিশেষ গায়কী আছে, স্বরলিপিতে তা প্রকাশ করা যে কত কঠিন, তা একমাত্র যাঁরা এই কাজে ব্রতী, তাঁরাই জানেন। ঠিক এইভাবে স্বরলিপির সাহায্যে বাংলার লোকগীতিকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা খুব কমই হয়েছে। পূর্ববঙ্গে বিস্তৃত লোকগীতি লুপ্তির পথে। পশ্চিমবঙ্গের বহু লোকসঙ্গীত প্রচারিত হয় না, এমন কি, ভাল ভাল বাউল গান আজ আর অনেক বাউলেরও জানা নেই। ছোটখাটো লোকসঙ্গীতগুলি আর প্রচারিত নেই বললেই হয়। নাগরিকতার দ্রুত প্রসারের ফলে লোকগীতির বৃহত্তর পরিবর্তন এবং বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। বস্তুত বর্তমান পুরুষের পরে উত্তরাধিকারসূত্রে লোকসঙ্গীতের খুব সামান্য পুঁজিই ভবিষ্যতের জন্য রক্ষিত থাকবে। অতএব লোকগীতির স্বরলিপির গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া উচিত। শ্রীবুদ্ধদেব রায় এই গুরু-দায়িত্ব পালনে অগ্রণী হয়ে আমাদের দেশের লোকসংস্কৃতির একটি বিশেষ ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে রক্ষা করবার জন্য যত্নবান হয়েছেন, এজন্য তিনি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। বইটিতে সংক্ষেপে বিশেষ বিশেষ লোকগীতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং এমন গান নির্বাচন করা হয়েছে, যাকে প্রতিনিধিমূলক বলা যায়। (৮৬।৬৭)

প্রাপ্তি স্বীকার

মন পবনের নাও। প্রণব মিত্র। ক্লাসিক প্রেস : ৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ২·০০।

ভারতীয় ফুটবল। চিরঞ্জীব। জ্ঞানতীর্থ : ১ বিধান সরণী, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩·০০।

কবিয়াল কৈলাস বারুই ও বিদ্যাসুন্দর (যাত্রা)। শ্রীমণীন্দ্রনাথ আশ। বিশ্বমন্দির প্রকাশনী: ৪৪।এ, সাবেহান বাগিচা (ক্লাইভ কলোনী) কলিকাতা-২৮। মূল্য ১·০০।

রূপবতী ভার্যা। শ্রীকণ্ঠ রায়। সারদা প্রকাশনী : ১০।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য ৪·০০।

রূপমঞ্জরী। নরেন্দ্রনাথ মিত্র। সূচীপত্র: ৩৫সি, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য ৩·৫০।

অনুভূতি নক্ষত্র শিশির। সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃতি: ৪৭ কাঁকুড়গাছি রোড, কলিকাতা—৫০। মূল্য ২·০০।

গানে মর্ম শিক্ষা। ডঃ শ্রীপ্রকাশ বসাক। শ্রীমতী সাবিত্রী বসাক : ৪২সি, জীবনকৃষ্ণ মিত্র রোড, কলিকাতা—৩৭। মূল্য ৫·০০।

Kalighat Pots: Annals and Appraisal by Prodyot Ghosh. Artists Society; 190 S. P.

নিউ ওয়েভ ফিল্ম—"নাথিং বাট এ ম্যান" ছবিতে ইভান ডিক্সন ও অ্যাবে ল্যাংকন

নীরব ও মুখর

মার্কিন চলচ্চিত্রের বয়স এখন সত্তর পার হয়ে গিয়েছে।

আমেরিকার ছায়াচিত্রের প্রথম প্রদর্শনীর তারিখ ১৮৯৬ সনের ২৩ এপ্রিল। সেই রাত্রে নিউ ইয়র্ক শহরের কস্টার অ্যান্ড বিয়ালস মিউজিক হল-এ কিছু চলমান ছবির ছায়া পর্দায় প্রক্ষেপ করে দেখানো হয়। প্রদর্শনীটি অল্পক্ষণের। তাতে ছিল সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস, মুষ্টি যুদ্ধ, দুই শিল্পীর "ছাতা-নৃত্য" এই ধরনের কিছু দৃশ্য। সে রাত্রির দর্শকদের চমৎকৃত করে দেবার পক্ষে ওই কয়েকটি টুকরো টুকরো দৃশ্যই যথেষ্ট।

ওই ঘটনার পিছনে ছিল ফ্রান্স, ব্রিটেন আর আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ও কলাকুশলী-দের দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম আর পরীক্ষা। টমাস এডিসন এবং তাঁর সহকারী উইলিয়াম কে এল ডিকসন যে কিনেটোসকোপ পীপ-শো মেশিন তৈরি করেন তার উন্নতিসাধন করতে কলাকুশলীদের অনেক সময় লেগেছে। 'প্রোজেকটর' বস্তুটির আবিষ্কার ১৮৯৫ সনে। আবিষ্কারক : টমাস আরমাট।

১৮৯৬ সনের ২৩ এপ্রিলের প্রদর্শনীটি, বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পর বিচিত্র-অনুষ্ঠানের আসরে আমেরিকার জনসাধারণ "গতিশীল ছবি" দেখবার সুযোগ মাঝে মাঝে পেয়েছেন; এবং যে আসরে সেই সুযোগ সেখানেই দর্শকদের ভিড়।

আমেরিকার দর্শকরা তখন চলমান ছবি দেখার সুখেই সুখী ছিলেন। ছায়াচিত্র পরদায় খানিক নড়া-চড়া করবে—এইটুকু তাঁরা জানতেন আর এর বেশী আশাও তাঁদের ছিল না। ১৯০২ পর্যন্ত এই রকম চলল। ওই বছরেই এডিসনের ক্যামেরাম্যান শ্রীএডুইন পোরটার ছবি দিয়ে গল্প-বলার পরীক্ষা শুরু করেন। ফ্রান্সের কিছু কাজ তাঁকে অনুপ্রেরণা দেয়। সেখানে শ্রীমেলিজ কৃত্রিম দৃশ্য রচনা করে কল্প-কাহিনীর পরিবেশ সৃষ্টি করছিলেন। শ্রীপোরটার আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি সমসাময়িক মার্কিন জীবনের মধ্যেই ছবির উপাদান খুঁজলেন। সত্যিকার ঘটনার খন্ড খন্ড ছবি তুলে, কেটে, তার পর আবার গুছিয়ে বিন্যস্ত করতে থাকলেন। চিত্র-নির্মাণের বিশিষ্ট আঙ্গিক "এডিটিং" বা সম্পাদনার গোড়াপত্তন এইভাবে।

শ্রীপোরটারের প্রথম প্রয়াস "দি লাইফ অব অ্যান আমেরিকান ফায়ারম্যান"। এই চিত্রে কয়েকটি বাস্তব দৃশ্যের সঙ্গে সুপরিকল্পিত কৃত্রিম দৃশ্য বিন্যস্ত। দেখানো হয়, অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে ফায়ারম্যানরা ছুটেছে। অন্য দৃশ্যপর্যায়ে ছিল : আর্ত জননী ও সন্তান একটি ধূমায়মান গৃহের জানালার সামনে মুক্তির অধীর প্রতীক্ষায়। এই অংশে এবং ফায়ার-ম্যানদের দলপতির দুঃসাহসিক ক্রিয়াকর্মে অভিনয়ের ব্যাপার ছিল। বিভিন্ন দৃশ্য ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মত করে সাজিয়ে দ্রুতগতিতে চরম মুহূর্তের সৃষ্টি করা হয়। এই ছবিতেই চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রথম একটি ক্লোজ-আপের ব্যবহার। যে অ্যালারম বক্সে বিপদ-সংকেত ধ্বনিত হচ্ছে সেই বস্তুটিকেই ক্লোজ-আপে দেখানো হয়।

দর্শকরা সেই প্রথম ছবির চরিত্র আর ঘটনার মধ্যে নিজেদের কতকটা হারিয়ে ফেলতে পারলেন। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

শ্রীপোরটার এই টেকনিক কিছু সুষ্ঠুতর-ভাবে ব্যবহার করলেন পরের বছর তাঁর দশ মিনিটের চিত্র "দি গ্রেট ট্রেন রবারি"তে। পরবর্তী তিন বছরে শিকাগো, নিউ ইয়র্ক এবং হলিউডে আরও কিছু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চিত্রভাষা-গঠনের কাজ চলেছে।

গ্রিফিথ পরিচালিত 'দি নিউইয়র্ক হ্যাট' ছবিতে মেরি পিকফোর্ড (১৯১২)

১৯০৭ সনে সিনেমায় যোগ দিলেন ডি ডবলিউ গ্রিফিথ। চলচ্চিত্রের কলারূপে তিনি এনে দিলেন নূতন মাত্রা।

গ্রীফিথ অভিনেতারূপে প্রথমে এসেছিলেন। পরিচালকরূপে তিনি এই নূতন মাধ্যমে শিল্প-সম্ভাবনার সূত্র আবিষ্কার করলেন এবং ক্রমশ তার বিস্তারের পথ প্রশস্ত করতে থাকলেন। তিনি ক্যামেরার কাজে গতি এনে দিলেন। মিডিয়াম-শটের ব্যবহার, ক্লোজ-আপ দৃশ্যের প্রয়োগ, ভাব অনুযায়ী দৃশ্যের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ, নাটকের দাবি অনুসারে আলোকসম্পাত, সংযত অভিনয়—এ সবই গ্রীগ্রিফিথ-উদ্ভাবিত টেকনিকের অন্তর্ভুক্ত। ছবি দিয়ে গল্প বলার শিল্প-কৌশল মূলত তাঁর দান। এবং মোটামুটি ওই কলাকৌশল আজও এক রকম অনুসৃত হয়।

ইউরোপে ইতিমধ্যে দীর্ঘ ছবি তৈরী হচ্ছিল। আমেরিকায় এ কাজ শ্রীগ্রিফিথই শুরু করেন। তাঁর দুটি বিখ্যাত ছবিঃ "দি বারথ্ অব এ নেশন" এবং 'ইনটলারান্স্'। প্রথমটির বিষয়বস্তু ঃ মারকিন গৃহযুদ্ধ ও তার পরবর্তী গঠনমূলক অধ্যায়; দ্বিতীয় চিত্রে চারটি গল্প রূপায়িত। এক ছবিতে ভিন্ন মেজাজের চারটি গল্পের গ্রন্থনায় অসাধারণ শিল্পচাতুর্যের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তবে "ইনটলারান্স্" জনপ্রিয় হয়নি।

আমেরিকার নির্বাক চিত্রযুগ "কমেডির স্বর্ণযুগ"। এই প্রসঙ্গে ম্যাক সেনেটের দান উল্লেখযোগ্য। তাঁর কীস্টোন কমেডিগুলি সেকালের দর্শকদের খুবই আনন্দ দিয়েছে। কৌতুকশিল্পীদের মধ্যে ছিলেনঃ চারলস চ্যাপলিন, বাসটার কীটন, হ্যারি ল্যাংডন

জন ফোর্ড পরিচালিত "দি ম্যান হু শট লিবার্টি ভ্যালেন্স (১৯৬২)

এবং হ্যারলড্ লয়েড। নির্বাক যুগের মারকিন চলচ্চিত্রে লেখক-পরিচালিত টমাস ইন্‌সের দানও ভোলা উচিত নয়। তিনি সহজ, প্রত্যক্ষ ভঙ্গীতে গল্প বলার দিকে জোর দিতেন। বিশ্বাস করতেন গতির ক্ষিপ্রতায়।

"তারকা"-প্রথার প্রচলন হতে দেরি হয়নি। আমেরিকার প্রথম দিকের কয়েকজন বিখ্যাত তারকাঃ মেরি পিকফোরড, গ্লোরিয়া সোয়ানসন, ডগলাস ফেয়ারব্যাংকস, উইলিয়াম এস হারট, টম মিক্স্।

সিসিল বি ডিমিলের কয়েকটি কমেডি চিত্র এবং পরে "দি টেন কম্যান্ডমেন্টস" (১৯২৩) জাতীয় ছবি এবং এ ছাড়া বিভিন্ন রোমান্টিক চিত্র (বিখ্যাত ভালেন্টিনো-অভিনীত) হলিউডের খ্যাতি ক্রমশ বাড়িয়েছে।

পৃথিবীর লোক জানল, হলিউড রোমান্স-চিত্রের উৎপাদক। সেই সঙ্গে চলচ্চিত্রের শিল্পময় উৎকর্ষ কেউ কেউ দানিয়ে হলিউডের পরিকল্পনা লক্ষ করলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ জেমস ক্রুজের এপিক চিত্র "দি কাভারড ওয়াগন", হেনরি কিং-এর মর্মস্পর্শী "টোল এব্‌ল ডেভিড", কিং ভিডরের পরিহাসময়ী "দি ক্রাউড", এরিখ ফন স্ট্রোহিমের বাস্তবানুগ "গ্রীড", লুবিৎশের কৌতুকদীপ্ত "ফরবিডন প্যারাডাইস", "দি ম্যারেজ সারকল" এবং এফ ডবলিউ মুরনোর কাব্যময়ী "সানরাইজ"।

সবাক ছবি

১৯২৭ সনের ৬ অকটোবর নিউ ইয়রক শহরে "দি জাজ-সিংগার" চিত্রের প্রথম প্রদর্শনী। সে ছবির কোন কোনও অংশে সংলাপ এবং সংগীত শোনা গিয়েছে। তারও চোদ্দ মাস আগে "ডন জুয়ান" চিত্রে ধ্বনি-প্রয়োগের চেষ্টা দেখা যায়। প্রথম পূর্ণাঙ্গ ধ্বনি-চিত্র "লাইটস অব নিউ ইয়রক"। এই ছবির প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল, একটি যুগের অবসান হয়েছে, নতুন যুগ সমাগত।

প্রথম দিকে ছবির বাকশক্তি চলচ্চিত্রকার-দের কতকটা মোহগ্রস্ত করে রাখল। ধ্বনিকেই তাঁরা প্রাধান্য দিলেন। সিনেমা মঞ্চ-নাটকের প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়াল। তার একটা কারণ, মাইক তখন স্থানু ছিল, শব্দ-গ্রহণের অসুবিধার জন্য ক্যামেরার গতি-বিধিও অতি মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত। চলচ্চিত্রের মধ্যে যাঁরা শিল্প-সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করে-ছিলেন, সিনেমার এই নূতন মাত্রাটিকে তাঁরা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারলেন না।

তাঁদের অপ্রসন্নতা আর আশঙ্কা দূর হতে কয়েক বছর লাগল। ইতিমধ্যে যান্ত্রিক অসুবিধাগুলি একে একে অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। শব্দ তখন দৃশ্যের পরি-পূরক।

সবাক যুগের প্রথম দিকে কয়েকটি উপভোগ্য সংগীতমুখর চিত্র পাওয়া গেল। ক্রমশ তাৎপর্যপূর্ণ এবং চিন্তামূলক বিষয় নিয়ে ছবি করতে চলচ্চিত্রকাররা উদ্যোগী হয়েছেন। লিউইস মাইল স্টোন উপহার দিলেন "অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস-টারন ফ্রন্ট", উইলিয়াম ওয়েলমান করলেন "দি পাবলিক এনিমি", অরসন ওয়েলস ও জন ফোরড যথাক্রমে "সিটিজেন কেন" ও "দি ইনফরমার"। ইবং লঘু দিকে ফ্র্যাংক কাপরা ও ভ্যান ডাইকের বিশিষ্ট ভঙ্গীর ছবিগুলিও উল্লেখযোগ্য।

চলচ্চিত্র নির্মাণের আসরে ইতিমধ্যে ওয়াল্ট ডিজনী অবতীর্ণ। তাঁর "রূপকথা" নিমেষে জগত জয় করে নিয়েছে। কয়েকটি অল্প দৈর্ঘ্যের ছবির পর তিনি উপহার

"তিন ভুবনের পারে" ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও তনুজা ফটো—দেশ

সত্যজিৎ রায়ের 'চিড়িয়াখানা' ছবির একটি দৃশ্য নেওয়ার আগে কাবুলিওয়ালার মেক-আপ নিচ্ছেন উত্তমকুমার ফটো—দেশ

দিলেন তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের জীবন্ত কার্টুন চিত্র "স্নোহোয়াইট অ্যানড দি সেভেন ডোয়ারফস"। চলচ্চিত্রের এক বিশিষ্ট রূপকার হিসাবে ডিজনীর স্থান সেই ছবিতে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত হয়ে গেল।

ত্রিশ দশকের শেষ আর চল্লিশ দশকের প্রথম ভাগের করেকটি উল্লেখযোগ্য মারকিন চিত্র ঃ "গন উইথ দি উইনড", "হাউ গ্রীন ওয়াজ মাই ভ্যালি", "রেবেকা", "দি লস্ট উইকেন্ড"। যুদ্ধের সময়ের ছবিগুলিতে নূতনত্ব অথবা উৎকর্ষের দিক দিয়ে তেমন বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায় নি। কিন্তু সিনেমার জনপ্রিয়তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ১৯৪৬ সনে আমেরিকায় সিনেমা-দর্শকের সংখ্যা দাঁড়াল সপ্তাহে আট কোটি, কুড়ি লক্ষ।

পঞ্চাশ দশকের শুরুতে আমেরিকার সিনেমা শিল্প সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। দর্শকের সংখ্যা কমতে থাকল। ত্রি-মাত্রিক ছবিও তাদের তেমন আকর্ষণ করতে পারল না। বোঝা গেল, ওখানকার দর্শকরা যা চাইছেন, মারকিন সিনেমা তাদের তা দিতে পারছে না।

এদিকে ওই আমেরিকাতেই তখন অন্য দেশের ছবির প্রচুর সমাদর। ইটালির নিও-রিয়ালিসটদের ছবি, ফ্রানস, সুইডেন, ব্রিটেন এবং জাপানের নতুন পরিচালকদের ছবি দেখে দর্শকরা মুগ্ধ।

মারকিন চলচ্চিত্র-শিল্পকে প্রচণ্ড আঘাত হানল টেলিভিশন। টি-ভি সেটের কল্যাণে যে-আনন্দ বাড়িতে বসে আহরণ করা যায়, অনুরূপ আমোদ পাবার জন্য কে সিনেমার টিকিট কিনবে? চলচ্চিত্র নির্মাতারা চিন্তায় পড়লেন। সমস্যার সমাধানের জন্য সিনেমাকে আরও আকর্ষক করবার চেষ্টা হল। তাই [illegible] ওয়াইড স্ক্রীন, স্টিরিওফোনিক [illegible]

ইত্যাদি পদ্ধতির উদ্ভাবন; পৃথিবীর নানা দেশে গিয়ে দৃশ্যবহুল, জমকালো ছবি তোলার আয়োজন। "অ্যারাউনড দি ওয়ারলড ইন এইটি ডেজ", "হাওয়াই" ইত্যাদি চিত্র দর্শকদের আবার কতকটা সিনেমার দরজায় ফিরিয়ে এনেছে।

প্রধানুগ প্রমোদচিত্রে দর্শকদের মন ভরছে না, এই সহজ সত্যটা চলচ্চিত্র নির্মাতারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাঁরা বুঝেছেন, সিনেমাকে বাঁচাতে হলে শিল্পের পথ আর জীবনের সত্যকে আশ্রয় করতে হবে। নতুন অনুপ্রেরণা আর জীবনবোধ নিয়ে কয়েকজন চলচ্চিত্রকার এই কাজে এগিয়ে এসেছেন। উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁরা পরিচালনা করলেন ঃ "ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটি", "দি ডিফারেনট ওয়ানস", "টু কিল এ মকিং-বারড", "মারটি" ইত্যাদি। সংগীতমুখর চিত্রেও পরিণত রসবোধের ছাপ দেখা গেল ঃ দৃষ্টান্ত ঃ "ওয়েসট সাইড স্টোরি"।

"ওয়েসটারন" ছবি মারকিন দর্শকদের খুবই প্রিয়। এখনকার ওয়েসটারন ছবিও ঠিক আগের মত নিছক উত্তেজনার ব্যাপার নয়। চরিত্রগুলি কেবলমাত্র সৎ আর দুর্বৃত্ত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে না; তাদের মানুষ বলে চেনা যায়, নাটকেও তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। আধুনিক ওয়েসটারন ছবি হিসাবে উল্লেখযোগ্য "হাই নুন" ও "শেন"।

শিল্পবোধ নিয়ে যাঁরা আমেরিকায় ছবি করছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ঃ আরথার পেন (তাঁর "দি মিরাকল ওয়ারকার" চিত্রটি স্মরণীয়), জ্যাক স্মাইট (তাঁর অভিনব গোয়েন্দা চিত্র "হারপার" উল্লেখযোগ্য), সিডনে লুমেট, মারটিন রিট, জন ফ্র্যাংকেন-হাইমার। শেষোক্ত তিন পরিচালক টি-ভি থেকে চিত্রলোকে এসেছেন। মাইকেল রোমার ও বব ইয়াং নতুন যুগের আরও দুই বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার। নিগরো দম্পতিকে নিয়ে বব ইয়াংয়ের "নাথিং বাট এ ম্যান" ছবিটি উচ্চ-প্রশংসিত। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েকে নিয়ে ফ্র্যাংক পেরি আর এলিয়েনরের (স্বামী-স্ত্রী) কাব্যধর্মী "ডেভিড অ্যানড লিজা" একালের আর একটি বিশিষ্ট মারকিন চলচ্চিত্র।

আজকের আমেরিকায় নতুন চিন্তা নিয়ে অনেকে এই শিল্প মাধ্যমে কাজ করবার উৎসাহ বোধ করছেন। বয়সে তরুণ, এ'দের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। জীবনকে এ'রা নতুন চোখে, নিজস্ব বোধের আলোকে দেখেন। আমেরিকার চলচ্চিত্র-কলারূপের ভবিষ্যৎ বহুলাংশে এ'দের হাতে।

"আপনজন"-এর গান রেকর্ডিং—নেপথ্যকণ্ঠশিল্পী শ্যামল মিত্র ও পরিচালক-সুরকার তপন সিংহ . ফটো—[illegible]

বিদেশে "মহানগর"-এর প্রশংসা

সত্যজিৎ রায়ের "মহানগর" আমেরিকায় মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার বিদগ্ধ দর্শক ও সমালোচকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছবিটি সম্পর্কে আলোচনা বেরিয়েছে। "টাইম" সাপ্তাহিকে "মহানগর" সম্বন্ধে যে উক্তি রয়েছে তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, ওই দেশের সমালোচকরা শ্রীরায়ের ছবিকে কতখানি মূল্য দেন। "লাইফ" ম্যাগাজিনে "মহানগর"-এর আলোচনা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। লাইফ-এ প্রতি সপ্তাহে একটি বিশিষ্ট ছবির আলোচনা বেরোয়। ৮ই আগস্টের সংখ্যাতে রিচার্ড শিকেল "মহানগর"-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, জীবন তাঁর (সত্যজিৎ রায়) কাছে—অপুর মধ্যে এবং শ্রীরায়ের আর সব ছবিতে যেমন দেখেছি—যেন খণ্ড খণ্ড বিস্ময়ের সমাবেশ; ক্ষুদ্র চিন্তারাশি থেকে অপ্রত্যাশিত পরিণাম নিয়ত প্রবাহিত। বিস্ময় ও যন্ত্রণা নিয়ে জীবনের পরিণতি, যা সারা ছবিতে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে, এমন এক আর্টের জন্ম দেয় যা দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে 'ট্র্যাজিক'ও নয়, 'কমিক'ও নয়।

"মিস মুখার্জি" (মাধবী মুখোপাধ্যায়, যাঁর চরিত্রচিত্রণের উচ্চ প্রশংসা করেছেন সমালোচক) কেমন করে তার সুরক্ষিত গৃহের বাইরের জগৎ এবং তার সুরক্ষিত সত্তার ভিতরকার শক্তি আবিষ্কার করে তার মধ্যেই ছবিটি সব চাইতে বেশী সূক্ষ্ম ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

"মহানগর"-কে "অসাধারণ আর্ট" হিসাবে বর্ণনা করে সমালোচক তাঁর দীর্ঘ আলোচনার শেষে লিখেছেন,

I have no wish to imply that Mr. Ray is heavy or particularly dogged in pursuit of messages, symbolic or otherwise. He is, instead, a careful, ironic and always specific observer of human character, patiently building his masterworks out of the small gestures, inflections and silences of ordinary life, finding in its pains, problems and victories the stuff of an extraordinary art.

রবীন্দ্রসদনে নাট্যোৎসব : উপরে (বাঁয়ে 'সাজাহান' নাটকে সরযূ দেবী ও নরেশ মিত্র (ডাইনে) "কবি" নাটকে অনুভা গুপ্তা ও তপতী ঘোষ (নিচে বাঁয়ে) "গোরা" নাটকে নিমু ভৌমিক ও গোবিন্দ গাঙ্গুলি এবং (ডাইনে) 'মলুয়া'র একটি দৃশ্য

ফটো—দেশ

রবীন্দ্র সদনে নাট্যোৎসব

এন বি এন্টারপ্রাইজ আয়োজিত চার দিনব্যাপী নাট্যোৎসবের উদ্বোধন হয় ৪ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র-সদনে। উদ্বোধন করেন কলকাতার মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ। প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন শ্রীঅশোককুমার সরকার।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শ্রীগোবিন্দ দে বলেন, কলকাতার অনেক দৈন্য থাকলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই শহর ধনী। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীসরকার আধুনিক নাটকে আঙ্গিকের প্রাধান্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, নাটকে অভিনয় বড়, না আঙ্গিক বড়, তার বিচার করবেন রসজ্ঞ দর্শক। সভাপতি শ্রীসিংহ বাংলার নাট্য আন্দোলনের কথা বলেন।

প্রারম্ভে এন বি এন্টারপ্রাইজ-এর শ্রীনিমু ভৌমিক সকলকে স্বাগত জানান এবং তাঁর সংস্থার লক্ষ্য ও কর্মসূচীর কথা বলেন। উদ্বোধন সংগীত করেন শ্রীমতী জ্যোৎস্না দাশ।

প্রথম দিন অভিনীত হয় মহিলা শিল্পীমহলের 'কবি'। মহিলা শিল্পীদের অভিনয়ে 'কবি' সুখভোগ্য। এর প্রমাণ রসগ্রাহী দর্শকেরা ইতিপূর্বে পেয়েছেন। শিপ্রা মিত্র (নিতাই), অনুভা গুপ্ত (ঠাকুরঝি), মলিনা দেবী (রাজন) ও নীলিমা দাসের (বসন) অপূর্ব অভিনয় এবং অন্যান্য ভূমিকায় গীতশ্রী দেবী, রেণুকা রায়, মিতা চট্টোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী, মঞ্জু দে, গীতা দে, কেতকী দত্ত, তপতী ঘোষ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আশা দেবী প্রভৃতির সুন্দর চরিত্রচিত্রণ নাটকটি সেদিন যেন আরও বেশী উপভোগ্য করে তুলেছিল।

দ্বিতীয় দিন ছিল 'সাজাহান'। নাম-ভূমিকায় নরেশ মিত্র ও জাহানারার চরিত্রে সরযূ দেবী, ঔরঙ্গজেবরূপী মহেন্দ্র গুপ্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (দারা), রবীন মজুমদার (মহম্মদ), জহর গাঙ্গুলি (দিলদার), মিহির ভট্টাচার্য (যশোবন্ত), শিপ্রা মিত্র (পিয়ারা) প্রভৃতির চমৎকার অভিনয়গুণে এই নাট্যপ্রযোজনা (আর্টিস্টস অব বেঙ্গল) দর্শকের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

তৃতীয়দিন শৌভনিক রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' মঞ্চস্থ করেন। নাট্যানুরাগীদের কাছে শৌভনিকের অভিনয়ের কদর যথেষ্ট। শিল্পিদল তাঁদের সুনাম সেদিন অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। প্রধান চরিত্রের রূপ দেন গোপেন মুখোপাধ্যায় (গোরা), নিমু ভৌমিক (বিনয়), গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় (মহিম), অশোক মিত্র (পরেশবাবু), মায়া বসু (শশিমুখী), ছবি চট্টোপাধ্যায় (বরদাসুন্দরী), অলকা বসু (সুচরিতা), জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায় (ললিতা), কৃষ্ণ কুণ্ডু (পানুবাবু) প্রভৃতি। এঁদের অভিনয় চমৎকার।

শেষ দিন ছিল লোকভারতীর 'মলুয়া' ও মণিপুরী নৃত্যকলা মন্দিরের 'শ্যামা'। নির্মলেন্দু চৌধুরী পরিচালিত 'মলুয়া' ইতিপূর্বে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রকৃত গীতিনাট্য বা অপেরা আমাদের দেশে আজকাল দেখা যায় না বললেই চলে। সেদিক থেকে 'মলুয়া' একটি উল্লেখযোগ্য 'এক্সপেরিমেণ্ট'। গীতিনাট্যের সব শিল্পীরাই মনমাতানো গান করেছেন, এবং গানের মধ্য দিয়ে একটি নাটকাহিনীর আস্বাদ দিয়েছেন দর্শকদের। এঁদের অভিনয়ের ক্ষমতাও প্রশংসনীয়। অভিনয়ে ও গানে দর্শকের মন জয় করেছেন বলাই চক্রবর্তী, গীতা চৌধুরী, পূরবী চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রক্ষ, নীরেন্দু চৌধুরী, মঞ্জু ভট্টাচার্য, রীনা সেনগুপ্তা, বিপাশা গোস্বামী, সুকমল বসু, সুনীল দে এবং অন্যান্য প্রায় সব শিল্পী। নির্মলেন্দু চৌধুরী জমিদারের রূপসজ্জায় গান গেয়ে ও চরিত্রানুগ অভিনয় করে দর্শকদের মাতিয়ে রেখেছেন।

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের প্রধান আকর্ষণ শ্যামা ও বজ্রসেনের ভূমিকায় চিত্রা মণ্ডল ও বালকৃষ্ণ মেননের নৃত্য এবং যথাক্রমে সুচিত্রা মিত্র ও চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ওই দুই চরিত্রের গান। চিত্রা মণ্ডলের নৃত্য ও অভিনয় দুই-ই দর্শককে বিশেষ আকৃষ্ট করেছে। তেমনি শুনতে ভাল লেগেছে শ্রীমতী মিত্র ও শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের গান।

মেয়রের খরাত্রাণ তহবিলে টাকা তোলার জন্য অভিনেতৃ সংঘের অনুষ্ঠান

দুর্গতদের সাহায্যে অভিনেতৃ সংঘ ইতিপূর্বে ধানবাদে একটি চিত্তাকর্ষক নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। দুঃস্থের সংকট ত্রাণের জন্য আবার তাঁরা একটি অনুষ্ঠান করবেন ১৮ সেপ্টেম্বর স্টার রঙ্গমঞ্চে। মেয়রের খরাত্রাণ তহবিলে টাকা তোলার জন্যই এই অনুষ্ঠান।

গত বুধবার (৬ সেপ্টেম্বর) অভিনেতৃ সংঘে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক বৈঠকে এই সংবাদ ঘোষণা করে কলকাতার মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে সংঘকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সংঘের পক্ষ থেকে শ্রীঅনুপকুমার বলেন, দুর্গতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করা সংঘের অন্যতম কর্তব্য।

স্টার রঙ্গমঞ্চে ১৮ সেপ্টেম্বর চার ঘণ্টা-ব্যাপী অনুষ্ঠানে অভিনেতৃ সংঘ মঞ্চস্থ করবেন রবীন্দ্রনাথের "শেষ রক্ষা"। এতে অভিনয় করবেন জহর গাঙ্গুলি, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ-কুমার, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, অজয় গাঙ্গুলি, প্রেমাংশু বসু, সুনীল দে, শ্যাম লাহা, নীলিমা দাস,

সুলতা চৌধুরী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, আশা দেবী প্রভৃতি।

এ ছাড়া থাকবে বিচিত্রানুষ্ঠান। তাতে কৌতুক-নাটিকা, কৌতুক-নক্‌শা ও গানের ব্যবস্থা। ভোলা দত্ত রচিত "রজবাবু ও তাঁর ছেলে" কৌতুক-নাটিকাটিতে অভিনয় করবেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ। কৌতুক নক্‌শা উপহার দেবেন জহর রায়। গানের আসরের শিল্পী : শ্যামল মিত্র, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, প্রহ্লাদ বাউল ও রুমা গুহঠাকুরতা।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন উত্তমকুমার। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসনে থাকবেন যথাক্রমে শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ ও শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।

"পলাতক"-এর হিন্দীরূপে তৈরি হচ্ছে—নাম "রাহ্‌গির"; বোম্বাইয়ে গীতাঞ্জলি-চিত্রদীপের এই প্রথম প্রয়াসের গান রেকর্ডিংয়ের অনুষ্ঠানে পরিচালক তরুণ মজুমদার, মান্না দে, সংগীতপরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও গুলজার

বাউল শিল্পী দলের বিদেশ যাত্রা

প্রখ্যাত বাউল সংগীত শিল্পী শ্রীপূর্ণ দাস বাউল এবং তাঁর সহশিল্পীরা বাউল সংগীত পরিবেশনের জন্য আমেরিকা রওনা হয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে গেছেন লক্ষণ দাস বাউল, সুধানন্দ দাস, জীবনকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ দাস এবং শ্রীমতী স্বাগতা চক্রবর্তী। প্রথম অনুষ্ঠান সানফ্রান্সিসকোতে। তারপর নিউ ইয়র্ক এবং অন্যান্য স্থানে। এই সফর দেড় মাস চলবে। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা আমেরিকার স্বনামখ্যাত সংগীতজ্ঞ অ্যালফ্রেড বি গ্রসম্যান।

বি কে প্রোডাকশন্স-এর "মহাশ্বেতা" (পরিচালনা : পিনাকী মুখোপাধ্যায়) ছবিতে অঞ্জনা ভৌমিক

"আপন জন" আরম্ভ হল

তপন সিংহের নতুন ছবি "আপনজন"-এর গান রেকর্ড করা হয়েছে গত শুক্রবার ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে। শ্রীসিংহ ছবির পরিচালক-চিত্রনাট্যকার ও সংগীত পরিচালক। ইন্দ্র মিত্রর কাহিনীর ভিত্তিতে শ্রীসিংহ ছবিটি তৈরি করছেন।

ছবির গান গেয়েছেন শ্যামল মিত্র ও অন্যান্য শিল্পী। 'আপনজন'-এ অভিনয় করবেন নির্মলকুমার, স্বরূপ দত্ত, পার্থ মুখোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল, রবি ঘোষ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। বিশেষ একটি চরিত্রে থাকবেন ছায়া দেবী।

চিত্রনাট্য এবং চরিত্রদের চিন্তায় সমসাময়িক সমস্যার প্রতিফলন দেখা যাবে শোনা যাচ্ছে। নিয়মিত শুটিং শুরু হতে বিলম্ব নেই।

ফ্র্যাঙ্কফুর্ট উৎসবে "পঞ্চশর"

ফিল্ম ক্র্যাফট প্রযোজিত এবং অরূপ গুহঠাকুরতা পরিচালিত "পঞ্চশর" এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এ প্রদর্শিত হচ্ছে। ফ্র্যাঙ্কফুর্টে ২২ অক্টোবর এই উৎসব শুরু হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রক ছবিটি ওই উৎসবের জন্য নির্বাচন করেছেন।

চতুর্মুখের নতুন নাটক

"জনৈকের মৃত্যু"-র পর চতুর্মুখ-গোষ্ঠী আর্থার মিলারের "আফটার দি ফল"-এর ভিত্তিতে রচিত (রচনা : সাধন মৈত্র) "পতনের পর" মঞ্চস্থ করছেন। অসীম চক্রবর্তীর পরিচালনায় মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে নাটকটি ১২ ও ১৭ সেপ্টেম্বর অভিনীত হবে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন চিত্রিতা মণ্ডল, মমতা চট্টোপাধ্যায়, অনুরাধা ভট্টাচার্য, অসীম চক্রবর্তী, শিপ্রা গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

কানাই দত্তের বিদেশ যাত্রা

বিখ্যাত তবলিয়া শ্রীকানাই দত্ত এ মাসের শেষ সপ্তাহে আমেরিকা যাত্রা করছেন। আমেরিকান সোসায়েটি ফর ইস্টার্ন আর্টস-এর (ক্যালিফোর্নিয়া) আমন্ত্রণেই তাঁর এই বিদেশ-সফর।

কানাই দত্ত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে শ্রীদত্ত অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন। তবলা লহরা ও সংগত নিয়েই হবে তাঁর অনুষ্ঠান। তা ছাড়া ২৪টি সংগীত-অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেবেন। ফেরবার পথে তিনি ইউরোপ সফর করবেন।

অরণ্যদেব
লী ফক

এ-গল্পের শেষটা মোটেই ভাল নয়!
কিচ্ছিরি! শীবাং বেঁচে থাকলে বেশ ভাল হত!
তবু, এ তো গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। তারপর কী হল শোন....

'শীবাং শোকে জুনকর মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।'
4/2
'....পাত্রীর নাম নাটালা। শহরের মেয়ে। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হবার পর সে আর শহরে ফিরতে চায়নি!!

'গির্জায় যখন আমার বিয়ে হচ্ছে, তখন জুনকর সেখানে এসে হাজির।'
আজ থেকে তোমরা স্বামী-স্ত্রী হলে।
জুনকর!
তোমার বিয়ে! আমি কি না-এসে পারি?
তোমাদের একটা উপহার দেব। কী উপহার জানো?
তোমরা আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু....

জেড-পাথরের সেই বাড়ি আর সোনা-বেলা আমি তোমাদের দিয়ে দিলুম...
আশ্চর্য এই বেলাভূমি!
সত্যি, নাটালা।
'সেই থেকে প্রতিটি অরণ্যদেব সোনা-বেলায় গিয়ে বিবাহ-নিশা যাপন করছেন।'
যাক, এ তবু গল্পটা ভালভাবে শেষ হল। তা তুমি কবে বিয়ে করবে ওয়াকার-কাকা?
ঠিক কথা, তুমি কবে বিয়ে করবে?
যা যা, এখন ঘুমোতে যা। অনেক রাত হল।
সত্যিই তো, আমি কবে বিয়ে করব?
আগামী সপ্তাহে নতুন কাহিনী
১৬

সাপ্তাহিক সংবাদ

এ সপ্তাহের প্রধান ঘটনা হলো—রাতারাতি ইংরেজী হঠানোর প্রতিবাদে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলার পদত্যাগ। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভার গ্রহণ করেছেন বলে এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে। ভাষার প্রশ্ন তথা সরকারের শিক্ষানীতি নিয়ে মতানৈক্যই তাঁর পদত্যাগের কারণ। তিনি মনে করেন যে, সরকারী শিক্ষানীতিতে দেশের সংহতি বিপন্ন হবে। হিন্দী যে ইংরাজীর স্থলাভিষিক্ত হবে এ-কথা তিনি মানেন। তবে অবাস্তবোচিতভাবে যে সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার মধ্যে না করে ক্রমান্বয়ে এ-কাজ করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ প্রত্যাহার করার জন্য শ্রীচাগলাকে বোঝাবার শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীচাগলা দৃঢ়তার সঙ্গে জানান যে, ভাষানীতিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হবে বলে সরকার যদি ঘোষণা করেন তবেই তিনি পদত্যাগ প্রত্যাহারের কথা পুনর্বিবেচনা করে দেখতে পারেন। শ্রীচাগলা বলেন, সরকারের শিক্ষানীতি শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি আরও বলেন, তাঁর পদত্যাগের সঙ্গে বহির্বিষয়ক নীতির কোন সম্পর্ক নেই। শ্রীচাগলা বোম্বাই-এ সাংবাদিকদের বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে চালু করার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন। বাকি আছে শুধু একথা ঘোষণা করা। ডঃ ত্রিগুণা সেন যে বলেছেন, সরকার এ-বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেন নি একথা সম্পূর্ণ ভুল।

দেশী সংবাদ

৪ সেপ্টেম্বর—ইস্পাত কারখানাগুলি তাদের নীতিতে অটল। তাদের কস্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার যা বলেছেন তার এক পয়সা বেশী কয়লার দাম দিতে তাঁরা নারাজ। তাঁর হিসাব মত বেতন বোর্ডের সুপারিশ কার্যকর করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহনের উদ্দেশ্যে কয়লার দর টন পিছু ৫ টাকা ৩২ পয়সার বেশী বাড়ানো উচিত নয়। এদিকে কয়লা-শিল্প মালিকরা বাড়িয়েছেন ১১ টাকা।

ইউ টি ইউ সি-র সভাপতি শ্রীনিখিল দাস এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীযতীন চক্রবর্তী আজ কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে অভিযোগ করেন, গত ছয় মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কারখানায় ক্লোজারের জন্য প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়েছেন। তাঁদের আরও অভিযোগ শ্রম-বিরোধ আইনের হাত এড়ানোর জন্য বহু মালিক লক-আউট-এর বদলে ক্লোজার ঘোষণা করেছেন এবং শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছেন।

৫ সেপ্টেম্বর—আচরণবিধি চূড়ান্ত করতে গিয়ে আজ নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত করেছেন যে অতঃপর যুক্ত ফ্রন্ট-কমিটি অর্থাৎ সুপার ক্যাবিনেট ফ্রন্ট সরকারকে নির্দেশ দেবেন এবং পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করবেন। ফ্রন্ট সব বড় বড় নীতিগুলি এবং মোটামুটি কর্মসূচী স্থির করে দেবেন; আর সরকার তা কার্যকর করবেন।

কাঁথির বন্যায় এ পর্যন্ত ১৮ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। সরকারী হিসাবে এ সংখ্যা ১০। কম করেও চার লক্ষ লোক আজ বন্যার কবলে। ত্রাণকার্যের জন্য অন্তত ৫০ লক্ষ টাকা দরকার। মেদিনীপুরের জেলা শাসক বলেন, মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

৬ **সেপ্টেম্বর**—রেলমন্ত্রক স্থির করেছেন : **কয়লার মজুত রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে** অত্যাবশ্যক নয় এমন ট্রেন (মেল বা মালবাহী) চলাচল কমিয়ে দেওয়া হবে। বড় কয়লাখনি মালিকদের একাংশ 'অসঙ্গত চড়া দাম' ছাড়া কয়লা বেচতে অস্বীকার করায় এবং গত ছয়দিন ধরে কয়লা সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় এই চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৭ **সেপ্টেম্বর**—আজ রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করতে বসে ফ্রন্টের অধিকাংশ নেতা বলেছেন : আউশ ফসল ভাল হওয়া সত্ত্বেও যখন তা সংগ্রহ করতে পারা যাচ্ছে না, তখন আউশ ফসলের পাঁচটি জেলাকে কর্ডন করা হোক। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির সাধারণ মানুষের তাহলে অনেক উপকার হবে।

ছয়জন বিশিষ্ট শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিদ আজ এক যুক্ত বিবৃতিতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের পরামর্শ না নিয়ে দেশের শিক্ষানীতি রচনার পরিণাম সম্পর্কে ভারত সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন ডঃ সি ডি দেশমুখ, ডঃ এইচ এন কুঞ্জরু, শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, শ্রী এন সি শিব রাও ও ডঃ এ এল মুদালিয়র।

৮ **সেপ্টেম্বর**—তরুণ বাঙ্গালী বিজ্ঞানী শ্রীঅপূর্বকুমার চৌধুরী একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যা রেলপথে যে কোন রকমের দুর্ঘটনা নিবারণ করবে এবং বছরে রেল কর্তৃপক্ষের দুই শত কোটি টাকা বাঁচিয়ে দেবে। পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলপথের কর্তৃপক্ষ আজ এই সংবাদ প্রকাশ করেছেন। গৌহাটি থেকে প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া তা প্রচার করেছেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনৈক মুখপাত্র আজ জানান, গতকাল সিকিম-তিব্বত সীমান্তে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী ও চীনা সৈন্যদের মধ্যে 'ধস্তাধস্তি' হয়। ধস্তাধস্তির সময় চীনারা এক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। সিকিম এলাকায় একটি বেড়া তৈরির ব্যাপারে প্রায় ৬০ **জন চীনা সৈন্য হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করলে** **ভারতীয় জওয়ানরা তার প্রতিরোধ করে। ফলে** হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়।

৯ **সেপ্টেম্বর**—আগামী বছরের খাদ্যনীতি নির্ধারণের আলোচনায় বসে আজ যুক্ত-ফ্রন্ট অর্থাৎ সুপার ক্যাবিনেট মোটামুটি তিনটি জিনিস স্থির করেছেন : (১) বড় চাষীর উদ্বৃত্ত ধানচাল সরকার সংগ্রহ করে নেবেন। (২) ধান-চালের খোলাবাজার যতটা সম্ভব বন্ধ করে দেওয়া হবে। (৩) বড় চাষী ছাড়া গ্রাম ও শহরের সকল মানুষকে খাওয়াবার অর্থাৎ রেশন দেবার দায়িত্ব নেবেন সরকার।

১০ **সেপ্টেম্বর**—কয়লার নতুন হার সম্পর্কে ভারত সরকারের সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়া সাপেক্ষে কয়লাশিল্প রেলওয়েকে গত ২৩ জুলাই-এর নির্ধারিত দরে কয়লা সরবরাহ করতে রাজি হয়েছেন। ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য আগের দরে কয়লা সরবরাহ করা হবে বলে ঠিক হয়েছে।

বিদেশী সংবাদ

৪ **সেপ্টেম্বর**—দক্ষিণ আরব ফেডারেশনের শাসন-কর্তৃত্ব নিয়ে জাতীয়তাবাদী দুটি দলের লড়াই দেশকে গৃহযুদ্ধের কিনারে নিয়ে গিয়েছে। দুই পক্ষে কাল নানা স্থানে জোর সংঘর্ষ চলে। কিন্তু সৈন্যরা হাত গুটিয়ে ছিল। থামাবার চেষ্টা করেনি।

৫ **সেপ্টেম্বর**—লেনিনগ্রাডের প্রধান সংবাদপত্র এই শহরের যানবাহন বিভাগের গ্যারেজগুলিতে ড্রাইভার, কনডাকটর, মেকানিক এমন কি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক ঘুষ এবং দুর্নীতির কথা প্রকাশ করেছেন। রয়টার এই খবর দিচ্ছেন।

৬ **সেপ্টেম্বর**—চীনের সর্ববৃহৎ শিল্পপ্রধান শহর সাংহাইতে প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছে। অজ্ঞাতকুলশীল লোকেরা সামরিক ঘাঁটিগুলিতে ঢুকে পড়ে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেয়। যুগোস্লাভ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'তানযুগ' আজ এই সংবাদ দেন।

৭ **সেপ্টেম্বর**—মালয়েশিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ : বেসরকারী এক সংস্থা প্রতিষ্ঠান মারফৎ সিঙ্গাপুর ভারতকে ২১৬৪০ মেট্রিক টন মিহি চাল (দাম ১৩৬০০০০ পাউণ্ড স্টার্লিং) বিক্রি করেছে। নিজের দেশের চালের ঘাটতি মেটাবার জন্য সিঙ্গাপুর এই চাল মিশর থেকে আমদানি করেছিল। কিন্তু এখন আর প্রয়োজন না থাকায় ভারতকে দিচ্ছে।

৮ **সেপ্টেম্বর**—গণমুক্তি ফৌজ ক্যান্টন শহরে অস্ত্রশস্ত্র বহন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন। চীন থেকে আগত ব্যক্তিদের কথা উদ্ধৃত করে "সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট" আজ এই সংবাদ পরিবেশন করেছেন।

৯ **সেপ্টেম্বর**—টোকিও-র চীনা বাণিজ্য মিশনের জনাকয়েক চীনা কর্মচারী আজ কর্তব্যরত জনৈক জাপানী পুলিসের উপর গায়ের জোর ফলায়, তারপর তাঁকে টেনেহিঁচড়ে নিজেদের অফিসের মধ্যে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে মেট্রোপলিটান পুলিস বাহিনীর সাতজনের একটি দল বাণিজ্য মিশনে ছুটে যান এবং সহকর্মীকে উদ্ধার করেন।

১০ সেপ্টেম্বর—পিকিংএ যে নয়জন জাপানী সংবাদদাতা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে তিনজনের প্রতি বহিষ্কার আদেশ জারি করা হয়েছে এবং জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভিসার মেয়াদ শেষ হলেই দুজনকে এবং অবশিষ্ট একজনকে পাঁচ দিনের মধ্যে চীন ত্যাগ করে চলে যেতে হবে।

সূচীপত্র

ইস্কুলে এবার খুবই খারাপ করেছে!

এখন ওর পড়াশুনোয় মন নেই
—মাথায় কিছু ঢোকে
না। আগে কত চৌকস ছিল।
হয়তো ডাক্তার বাবু
বলতে পারবেন কেন এমন হল।
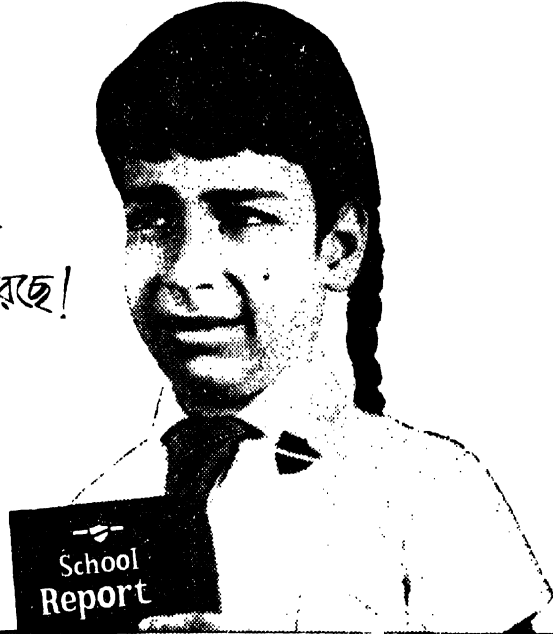
ডাক্তার বাবু
বললেন, "ওর বাড়ন্ত
বয়েসে বাড়তি
শক্তির জন্যে দরকার
অতিরিক্ত পুষ্টি।
আমি বলি,
হরলিক্স খাওয়ান।"

ওর এখন চেহারাই
আলাদা।
ফূর্তিতে যেন ফেটে পড়ছে।
ইস্কুলে যে কোনো
প্রশ্নের টকাটক উত্তর
দেয়। আমার দুর্ভাবনা
ঘুচিয়েছে হরলিক্স।

এখন সবদিকে চৌকস— হরলিক্স খেয়ে!

বাড়ন্ত বয়েসে হরলিক্স-এর তুলনা নেই। দৈনন্দিন খাবারে যথেষ্ট পুষ্টি না থাকায় ছোটদের এই বয়েসে যে হারে শক্তি ক্ষয় হয়, সে-হারে পূরণ হয় না। সেই অভাব মেটায় হরলিক্স—বাড়তি পুষ্টি দেয় আর সঙ্গে সঙ্গে শরীরে শক্তি যোগায়। এর কারণ, প্রকৃতিজাত খাদ্যকে বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় সহজপাচ্য ক'রে হরলিক্স তৈরী হয়। ডাক্তাররা ছোটদের হরলিক্স খেতে বলেন—যাতে তারা গায়ে জোর পায়। বাড়ন্ত বয়েসে হরলিক্সে বাড়তি শক্তি পেয়ে শরীরও ভালো হয়, পড়াশুনো আর খেলাধুলোয় উৎসাহও বাড়ে। ছোটদের দরকার হরলিক্স।

মাখন-না-তোলা দুধের
সঙ্গে গম ও যবের পুষ্টিকর সারাংশ

হরলিক্স

বাড়তি শক্তি যোগায়!

HL.5841A

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীগোপাল দে

বাড়ি...সুন্দর করে...সাজাতে
নতুন, মজবুত দীর্ঘস্থায়ী

Neycer Keramag

BATHROOM FIXTURES

ঝকঝকে...চকচকে...চোখধরা রঙে...মার্জিত একটি স্নিগ্ধভাব। এগুলি আধুনিক বাথরুমের জন্য **নিসার কেরাম্যাগ**-এর সুন্দর ভিট্রিয়স স্যানিটারিওয়ার—ডিজাইন আর স্টাইলে অনেক এগিয়ে আছে।

ওয়াশ-বেসিন আর বিলাতি কায়দার ওয়াটার-ক্লোজেটে যাতে জল উপচে না পড়ে তার ব্যবস্থা আছে। ঝকঝকে শাদা বা মনোহারী রঙে পাবেন। এবং ২৫ রকম টুইন-কলার কম্বিনেশনেও পাওয়া যায়! ওয়াশ-বেসিন, দেশী ও বিলাতি ধরনের ওয়াটার-ক্লোজেট, ইউরিন্যাল, প্যান ও সিংক আমরা তৈরি করি।

ডি জি এস অ্যাণ্ড ডি-এর অনুমোদিত সরবরাহকারক

পশ্চিম জার্মানির কেরাম্যাগ-এর কারিগরী সহযোগিতায় শেষশায়ী অ্যাসোসিয়েট কর্তৃক প্রস্তুত।

নিম্ন ঠিকানায় খোঁজ করুন : স্যানিটারিওয়ার ডিস্ট্রিবিউটর্স
৩১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পুজোর মরসুম

তাপ বিদায় নিয়েছে। বর্ষা বাদলের পালার ওপর এবার যবনিকা পড়া উচিত। কিন্তু অবস্থা গতিক দেখে মনে হচ্ছে, পালার এখনও কিছু বাকি; গতবারের পালা জমে নি বলে এবার হয়ত আসর একটু দীর্ঘ সময় জমিয়ে রাখার ইচ্ছেও রয়েছে। যাই হোক, ভাদ্র বেশ ভরা বর্ষা এনেছে, এমন কি অতিবর্ষণে ক্ষয়ক্ষতিও মন্দ হয় নি, চাষের জমি গেছে জলের তলায়, ঘরবাড়ি মাঠ যেন পুকুরের মধ্যে ডুবে গেছে। বন্যার এই জলের তাণ্ডব এখনও কমে আসে নি, তবে কমে আসার মুখে।

মাস হিসেবে এটা শরৎ, শরতের শেষার্ধ। পুজোর বাজনার আর বড় বিলম্ব নেই। কিন্তু আকাশে বাতাসে শরতের আবির্ভাব এখনও চোখে পড়ছে না তেমন। আকাশ জোড়া জলভরা মেঘ, বৃষ্টি আর বৃষ্টি, সারা রাত বৃষ্টি ঝরে যায়, পথঘাট নদী নালা হয়ে থাকে। তবু এই ঘনবর্ষার মধ্যে অতি সম্প্রতি আকাশের মেঘ ছিঁড়ে শরতের চাউনিটা দেখা গেছে। আশা করছি কয়েকদিনের মধ্যে নীল নির্মল আকাশ, সাদা তুলোট মেঘের ভেলা, ঝকঝকে স্নিগ্ধ সতেজ রোদ নিয়ে বাঙলা দেশের প্রসন্নতম ঋতুটি পুরোপুরি দেখা দেবে।

শরতের আবির্ভাব কিঞ্চিৎ বিলম্বে ঘটলেও পুজোর হাতছানি পড়ে গেছে। পাড়ায় পাড়ায় লালসালুতে সর্বজনীন দুর্গোৎসবের ঘোষণা ঝুলছে, চাঁদার খাতা হাতে পাড়ার গণ্যমান্যের আবির্ভাব ঘটছে দরজায়, দোকানপাট ক্রমেই সরগরম হয়ে আসছে। বাংলাদেশের দুর্গোৎসব তার প্রাণের এমন তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দেয় যেখানে শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও গিরিকন্যাকে অভ্যর্থনার সুর ঠিকই বেজে ওঠে। সেই অভ্যর্থনার সুর যে বেজে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই। শহরের পথেঘাটে বাজার-বিহারী ছেলেমেয়ে গৃহিণীর দল, সন্ধ্যাকালে পথ হাঁটা দায়। চালের দাম কোথায় উঠেছে, বেগুনের কত দর, মাছ সংসারে আসে কি আসে না এ প্রশ্ন এখন অবান্তর, সম্বৎসরের এই দুর্গোৎসবে আত্মীয়জনের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে গৃহস্বামী ব্যাকুল।

আমাদের দুঃখ দৈন্যের জীবনে উৎসবকে উপভোগ করার প্রসন্ন মানসিকতা কমে আসছে। কিন্তু সে-মানসিকতা যে মরে নি তা তো দেখাই যাচ্ছে। শোনা গিয়েছিল এ বছরে মানুষের হাতে এমন অর্থ নেই যাতে পুজোর বাজার জমবে। ব্যাপারীরা বেশ ভয়ে ভয়ে ছিলেন; দোকানে মাল তুলতে সাহস পান নি। কিন্তু পুজোর কাছাকাছি এসে সে-দুশ্চিন্তা যে খানিকটা কমেছে তাতে সন্দেহ নেই। ক্রমশই দোকান পশারের মুখ প্রসন্ন হয়ে আসছে বলেই তো মনে হয়।

একটা কথা অবশ্য স্বীকার করে নেওয়া ভাল, বছর কয়েক আগেও পুজোর সময় যে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেছে, ইদানীং তার অভাব। কারণটা নিশ্চয় অর্থ-নৈতিক। বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় গত কয়েক মাসের মধ্যে যে হারে কলকারখানা বন্ধ ও ছাঁটাই হয়েছে তাতে আমাদের আর্থিক দুর্গতি বেড়েছে। এই অবস্থায় দরিদ্র মানুষের পক্ষে কায়ক্লেশে দুর্গোৎসবের আয়োজন করাও কষ্টকর। গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আরও ভয়াবহ। ক্ষুধার অন্নের জন্যে সেখানকার মানুষের যে হাহাকার তাতে দুর্গোৎসবের অতিসামান্য ব্যবস্থা করাও অনেকের সাধ্যাতীত। শুধু খাদ্য কেন, বস্ত্রের যে মূল্য তাতে সেই দুর্গতদের পক্ষে ছেলেমেয়েদের জন্যে একটি বস্ত্র সংগ্রহও প্রায় দুঃসাধ্য। জানি না, এঁদের কাছে এবারের দুর্গোৎসব কি সান্ত্বনা নিয়ে আসবে।

আনন্দময়ীর আগমনে আজ বাংলার পল্লীকেই সবচেয়ে দুঃস্থ, কাঙালিনী মেয়ে বলে মনে হয়। একদা তার মাঠে মাঠে যত ধানই ধরুক—এখন তার পেট চালাবার মতন ধান নেই। শোনা যায়, অধিকাংশ গ্রামেই দুর্ভিক্ষের অবস্থা চলেছে। নিরন্নের হাহাকার শহরেও শোনা যায়। সরকারী লঙরখানার মুষ্টি ভিক্ষায় যাদের জীবন কাটছে তাদের কাছে এই উৎসব আজ অর্থহীন হবে। তবু যদি সরকারীভাবে এ সময় খাদ্যের কিছুটা সুরাহা সম্ভব হয়, তবে পল্লীর মানুষ উপকৃত হবে। সেটা সম্ভব কি না জানি না।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার, চারপাশে ইদানীং যে বিশৃঙ্খলা ও গোল-যোগ চলছে, পুজোর মুখে তা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের দুঃখের ভার তাতে কমবে। যারা হাটবাজার করে, যারা দোকান দেয়, যারা নিত্য কলম পেশার পর ট্রেন ধরতে ছোটে, কলকারখানায় চাকরি করে—সকলের পক্ষেই এ অবস্থায় শান্তি ও কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ততার প্রয়োজন আছে।
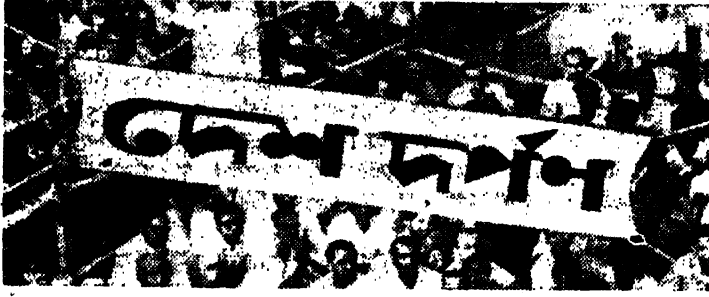
মনে হতে পারে বাংলা কংগ্রেসে হঠাৎ যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। কারণ, ধোঁয়াটা বাইরে থেকে দেখা যায় নি। তবু যাঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের খবরা-খবর রাখেন, তাঁরা জানতেন বাংলা কংগ্রেসের ভিতরের কাঠামোটা বেশ নড়বড়ে হয়ে উঠেছে। ভারত সভা হলে শ্রীহুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বে যেদিন ভারতীয় ক্রান্তি দল সংগঠন নিয়ে একটা বৈঠক হ'য়ে গেল সেদিনই অনুমান করতে অসুবিধা হয়নি যে, বিস্ফোরণটা ঘটবে। এটা এত শীঘ্র ঘটবে হয়ত তা অনুমানের বাইরে ছিল। হয়ত দু' তিন মাস পরে এটা ঘটতে পারত; কিন্তু হঠাৎ ঘটে গেল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জির বিবৃতিতে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখার্জি বাংলা কংগ্রেসের অন্যতম কর্ণধার। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সঙ্গে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের বিচ্ছেদের ফলেই বাংলা কংগ্রেসের জন্ম। শ্রীঅজয় মুখার্জি তার অবিসংবাদী নেতা। বলা বাহুল্য শ্রীহুমায়ুন কবীরের পদমর্যাদাও বাংলা কংগ্রেসে কোন অংশে কম নয়। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীঅজয় মুখার্জি ও শ্রীহুমায়ুন কবীরের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও নেতৃত্বের ফলেই বাংলা কংগ্রেসের নির্বাচনী সাফল্য সম্ভব হয়েছে। সম্ভব হ'য়েছে, কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করা। তবু নির্বাচনের সময় থেকেই শ্রীকবীরের মনে কিছু কিছু বিক্ষোভ জমা হচ্ছিল। যদিও সেটা কখনও তিনি প্রকাশ করেন নি। এটা অজানা ছিল না যে, শ্রীঅজয় মুখার্জির পিছনে ছিল জনসাধারণের অপরিসীম সদিচ্ছা ও শুভেচ্ছা। তাই পশ্চিম বাংলায় যখন যুক্ত ফ্রন্ট গঠিত হ'ল অ-কংগ্রেসী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য, তখন শ্রীঅজয় মুখার্জি ছাড়া অন্য কোন নাম যুক্ত ফ্রন্টের নেতা হিসাবে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি।

যুক্ত ফ্রন্টের সবচাইতে বড় সরিক মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি, তারাই সব চাইতে বড় দল ফ্রন্টের মধ্যে। সে ভিত্তিতে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি যুক্ত ফ্রন্টের নেতৃত্ব দাবি করতে পারত। করে নি। গ্রহণ করেছে শ্রীঅজয় মুখার্জিকে। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে এ-জন্য পার্টি সদস্যদের কাছ থেকে অনেক অনুযোগ শুনতে হ'য়েছে, তবু সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয় নি।

পরবর্তীকালে যুক্ত ফ্রন্টের নেতা হিসাবে এবং পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্রীঅজয় মুখার্জিকে বহু বিরোধিতা, বহু সমালোচনা শুনতে হ'য়েছে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতাদের কাছ থেকে। তবু শ্রীমুখার্জিকে মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে সরিয়ে নূতন মুখ্যমন্ত্রী খুঁজে আনা হয়নি। বরং এ-প্রচেষ্টাটা করা হয়েছে বাংলা কংগ্রেসের ভিতর থেকে। এই প্রচেষ্টা ক্রমশ উৎসাহিত হ'য়েছে বাংলা কংগ্রেসের ভিতর থেকে। অনুমান ক'রে নিতে অসুবিধা হয় নি কোনখান থেকে আসছে এই উৎসাহ।

শ্রীহুমায়ুন কবীর বহুদিন ধ'রে লোকসভার সদস্য। শ্রীকবীর কোনদিনই রাজ্য সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ দেখান নি। তিনি কেন্দ্রনীতি পছন্দ করেন। তাই এবারের নির্বাচনের প্রথম থেকেই তিনি কেন্দ্রনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশেষ কয়েকটি রাজনৈতিক কর্মপন্থা বেছে নিয়েছিলেন। তখন শ্রীঅজয় মুখার্জির সঙ্গে রাজনীতিগত কোন মতভেদ বা বিরোধ দেখা দেয় নি। কারণ, কেন্দ্র ও রাজ্য দুটো পৃথক ক্ষেত্র বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। হয়ত সে-কারণেই এই দুই নেতৃত্বের ভারসাম্যটা বজায় ছিল। কিন্তু এই ভারসাম্যটা নড়ে উঠতে লাগল কয়েকটি ঘটনায়।

নির্বাচনের পরে কেন্দ্রে কংগ্রেসের যে-চেহারাটা দেখা গেল সেটা কোন রাজনৈতিক দলের কাছেই উপেক্ষণীয় নয়। কেন্দ্রে কংগ্রেসের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা অ-কংগ্রেসী দলগুলোর মধ্যে একটা চাঞ্চল্য এনে দিয়েছিল। হয়ত সে-কারণেই নানা গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল কেন্দ্রে কংগ্রেস শাসন সম্বন্ধে। অনুমান করা হ'য়েছিল যে, কেন্দ্রেও বিভিন্ন রাজ্যের মত রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। দেখা দিয়েছে কেন্দ্রে কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অন্তর্বিরোধ। রাজনৈতিক অনুমান অনুসারে কংগ্রেসের হাতে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনভার বেশী দিন না-ও থাকতে পারে। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না। তাই, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে একটা প্রবল প্রচেষ্টা হ'য়েছিল, বিকল্প রাজনৈতিক ব্যবস্থার চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার। বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব হয় নি, প্রধানত বিরোধীদলগুলোর মধ্যে আদর্শগত বিভেদ ছিল বলে।

এই আদর্শগত বিরোধের মধ্যে শ্রীকবীরও ছিলেন। তিনি বিকল্প রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অস্বীকার করেন না, কিন্তু এটা-ও স্বীকার করে নিতে পারেননি যে, বিকল্প রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাত মেলান সম্ভব। তিনি যে রাজনৈতিক দলের নেতা এবং মনোনীত সদস্য হিসাবে লোকসভার সদস্য, সেই বাংলা কংগ্রেসই পশ্চিম বাংলায় কম্যুনিস্ট এবং মার্ক্সিস্ট পন্থী দলগুলোর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে যুক্ত ফ্রন্টের সরিক হিসাবে রাজ্য সরকার পরিচালনার ভার নিয়েছে। কম্যুনিস্টদের সঙ্গে এই সরিকানা, শ্রীকবীরের মতে, স্বীকার করে নিতে হয়েছে স্ট্র্যাটেজী হিসাবে। অন্য কোন কারণে নয়। তাই তিনি দিল্লীতে গঠন করলেন প্রগ্রেসিভ ব্লক যার মধ্যে সম্মিলিত হ'ল বাংলা কংগ্রেস এবং অন্যান্য কয়েকটি অ-কম্যুনিস্ট দলের লোকসভার নির্বাচিত সদস্যরা। শ্রীকবীরের কাছে এটা স্ট্র্যাটেজী ছিল না। ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

সে-উদ্দেশ্য তিনি কখনও অপ্রকাশিত রাখেন নি। তখনও বলেছেন, এবং এখনও শ্রীকবীর বলেন যে, বাংলা কংগ্রেসের মত একটি রাজ্য সংগঠন দিয়ে কোন বৃহৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব নয়। যে-রাজনীতি রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ সে-রাজনীতিকে অবলম্বন করে বেশী দূর যাওয়া যায় না। সমগ্রভাবে জাতীয় প্রগতিতে অংশ গ্রহণ করা তখনই সম্ভব যখন সর্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া যায়। সে-কারণ, শ্রীকবীর আজ স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন যে, বাংলা কংগ্রেসে যোগদান করার সময়েই এই প্রতিষ্ঠানকে সর্ব-ভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলার সোপান হিসাবে তিনি গ্রহণ করবেন। সে-প্রচেষ্টা তিনি প্রথম দিন থেকেই করছিলেন।

ইতিমধ্যে নানা রাজ্যে অ-কংগ্রেসী দল হিসাবে প্রাক্তন কংগ্রেসকর্মী ও নেতাদের দল গড়ে উঠতে লাগল। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে শ্রীকবীর সর্বভারতীয় দল সংগঠন করার কথাটা পাকাপাকি করে নেন। তারই ফলে, পাটনা সম্মেলনে স্থির হয় সর্বভারতীয় ক্রান্তি দল গঠন করা। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন শ্রীঅজয় মুখার্জি। তিনি, পরে দিল্লিতে যে অধিবেশন বসে, তাতেও অংশ

গ্রহণ করে তাঁর শক্তির সমর্থন ব্যক্ত করেন। দিল্লি অধিবেশনে স্থির হয় যে, ভারতীয় ক্রান্তি দল একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং সেই সংগঠনের সংবিধানের চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হবে অক্টোবর মাসে ইন্দোর সম্মেলনে। দলের বিধান রচনার জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, তার প্রধান সদস্য নিঃসন্দেহে শ্রীকবীর।

এরই পরে, শ্রীকবীর বিভিন্ন রাজ্যে ক্রান্তি দলের রাজ্য সংগঠন নিয়ে আলাপ পরামর্শ শুরু করেন। পশ্চিম বাংলায়ও সে প্রচেষ্টাকে জোরদার করবার জন্য কিছুদিন আগে তিনি কলকাতায় আসেন। তাঁর পশ্চিম বাংলায় প্রধান প্রচেষ্টা হিসাবেই ডাকা হয়েছিল ভারত সভা হলের বৈঠক। এই বৈঠকে পশ্চিম বাংলায় ক্রান্তি দলের যে-সংগঠন হবে, তা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা হয় এবং একটি সাংগঠনিক কমিটিও নিয়োগ করা হয়। এই সাংগঠনিক কমিটির মধ্যে শ্রীঅজয় মুখার্জিও ছিলেন। কিন্তু দেখা গেল এ-পর্যন্ত যে কয়টি বৈঠক বসেছে এই কমিটির তার একটিতেও শ্রীঅজয় মুখার্জি যোগদান করেন নি।

ইতিমধ্যে আর একটি প্রচেষ্টা শুরু হয় ক্রান্তি দলের ইন্দোর অধিবেশন সম্বন্ধে। এই অধিবেশনে যোগদানের জন্য বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করার একটা পদ্ধতি গৃহীত হয়। সেই পদ্ধতি অনুসারে পশ্চিম বাংলার সাংগঠনিক কমিটির উপর প্রতিনিধি নির্বাচনের ভার দেওয়া হয়। এই নির্বাচন পদ্ধতিকে উপলক্ষ করেই শ্রীঅজয় মুখার্জি এক বিবৃতিতে ক্রান্তি দলের সাংগঠনিক কমিটির সঙ্গে তাঁর সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছেন। শ্রীঅজয় মুখার্জির মতে, একমাত্র বাংলা কংগ্রেসই পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকারী অন্য কোন কমিটি নয়; কারণ, তিনি মনে করেন যে, বাংলা কংগ্রেসকে ক্রান্তি দলের রাজ্য সংগঠন হিসাবে গণ্য করার কথা পাটনা এবং দিল্লি সম্মেলনে স্বীকৃত হয়েছিল। কাজেই বাংলা কংগ্রেসকে বিলোপ করে আজ তাঁর পক্ষে সাংগঠনিক কমিটিকে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব নয়।। অবশ্য, এর পাল্টা জবাবে শ্রীকবীর বলেছেন যে, বিভিন্ন দল বিভিন্ন রাজ্যে আজ ক্রান্তি দলের সঙ্গে সংযুক্ত হবার জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছে। সে-ক্ষেত্রে একমাত্র বাংলা কংগ্রেসকে ক্রান্তি দলের একমাত্র রাজ্য প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, বাংলা কংগ্রেস সদস্য ছাড়াও অন্যান্য ছোটখাটো দলের মধ্যে আগ্রহ দেখা দিয়েছে ক্রান্তি দলের সদস্য হবার জন্য। সেটা সম্ভব হয় সাংগঠনিক কমিটির মাধ্যমে।

মোট কথা, বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব আজ সম্পূর্ণরূপে দ্বিধাবিভক্ত। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীঅজয় মুখার্জির বিবৃতির পর বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে শ্রীকবীরের রাজনৈতিক সম্পর্কটা ছিন্ন না হওয়াটাই অবাস্তব মনে হবে। তাছাড়া, শ্রীমুখার্জির সঙ্গে শ্রীকবীরের রাজনৈতিক সম্পর্কটা অদূর ভবিষ্যতে যে ছিন্ন হ'ত সেটা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। কারণ, রাজনৈতিক মতা-মতের সংঘর্ষ এই দুই নেতার মধ্যে ক্রমেই তীব্র হচ্ছিল। এটা বোঝা যায়, শ্রীকবীর যখন কয়েকদিন আগে কলকাতায় আসেন। তিনি কলকাতায় এসেছিলেন প্রধানত ক্রান্তি দলের সাংগঠনিক কাজে। কিন্তু কিছু অন্য কথাও হয়েছে তাঁর শ্রীঅজয় মুখার্জির সঙ্গে।

এই আলোচনা অবশ্যই হয়েছিল, পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে। তার ইঙ্গিতও কিছু দিয়েছেন শ্রীকবীর তাঁর এক বিবৃতিতে। শ্রীঅজয় মুখার্জির বিবৃতির উত্তরেই তিনি এই বিবৃতি দিয়েছেন দিল্লিতে। তিনি মনে করেন যে, পশ্চিম বাংলায় বর্তমানে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য মুখ্যত দায়ী কম্যুনিস্টরা। এমনকি, পশ্চিম বাংলায় যে খাদ্যের চরম অবস্থা দেখা দিয়েছে, তার জন্যও তিনি দায়ী করেন কম্যুনিস্টদের। তিনি বলেন, কম্যুনিস্টরা খাদ্য সংগ্রহে বাধা সৃষ্টি করার জন্য আজ খাদ্য সম্বন্ধে এমন চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।

তাঁর অন্য অভিযোগও আছে। এই অভিযোগগুলো প্রধানত তাঁর কাছে এসেছে বাংলা কংগ্রেসের নির্বাচিত সদস্যদের কাছ থেকে। এই অভিযোগগুলো আসছিল বেশ কিছুদিন ধরে। তাঁদের প্রধান অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জির বিরুদ্ধে। তাঁরা মনে করেন যে, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্রীমুখার্জি নিজের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন কম্যুনিস্টদের চাপে। প্রকৃতপক্ষে, কম্যুনিস্টরা আজ শ্রীমুখার্জিকে সরকারী শাসনব্যবস্থার কর্ণধার হিসাবে নিয়ন্ত্রিত করছে। শ্রীমুখার্জি অবশ্য এই সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এমনকি, কয়েকবার, —যেমন সরকারী কর্মচারীদের বেতন কমিশন নিয়োগের ব্যাপারে তিনি প্রত্যক্ষভাবে কম্যুনিস্টদের স্পষ্ট বিরোধিতাও করেছেন, যার ফলে অনেকের ধারণা হয়েছিল হয়ত এই 'ইস্যু'তেই যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে যাবে। তবু বাংলা কংগ্রেসের একদল সদস্য ক্রমশ শ্রীঅজয় মুখার্জির নেতৃত্ব সম্বন্ধে আস্থাহীন হয়ে পড়েছেন।

কারণ, পশ্চিম বাংলার সমগ্র রাজনৈতিক অবস্থাটা ক্রমেই কম্যুনিস্টদের আয়ত্তে চলে যাচ্ছে। শিল্প ক্ষেত্রে এরই ফলে আরজকতা দেখা দিচ্ছে। তাই বাঙলা কংগ্রেসের কিছুসংখ্যক সদস্যের দাবি ছিল মুখ্যমন্ত্রীকে মন্ত্রিসভার কিছু রদবদল ক'রে শাসন-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে হবে। শ্রীঅজয় মুখার্জির পক্ষে অবশ্য এ-দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, কোন পার্টির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিসভা গঠিত হয়নি। পশ্চিম বাংলার কোয়ালিশন সরকারের এটাই বাস্তব চেহারা যে, মন্ত্রিসভা কোন দল বা নেতার কুক্ষিগত নয়। মন্ত্রিসভায় যাঁরা বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি হিসাবে সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জির একক নির্বাচনে আসেননি। বিভিন্ন দলের মনোনয়ন নিয়েই এ'রা মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েছেন। কাজেই, বাঙলা কংগ্রেসের কিছুসংখ্যক সদস্যের দাবি থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জির পক্ষে মন্ত্রিসভায় ইচ্ছামত রদবদল করা সম্ভব নয়।

বাংলা কংগ্রেসের সদস্যেদের মধ্যে এই দাবি বা অসন্তোষও হয়ত শ্রীঅজয় মুখার্জির কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু ক্রান্তি দলের সংবিধানের যে খসড়া রচিত হয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই শ্রীমুখার্জির কাছে উপেক্ষণীয় নয়। এই খসড়া নিয়েই আলোচনা হবে ইন্দোর অধিবেশনে এবং অনুমান ক'রে নিতে অসুবিধা হয় না যে, এটা মোটামুটি বর্তমান আকারেই গৃহীত হবে। এই খসড়ার সূচনায় ভারতীয় ক্রান্তি দলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, গত নির্বাচনের পর থেকেই দেশের রাজনৈতিক অরাজকতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা, সমাজতন্ত্র এবং আন্তর্জাতিক সহনশীলতার প্রকৃত মূল্যের প্রতি জনসাধারণ ক্রমেই আস্থাহীন হয়ে পড়ছে। এই রাজনৈতিক অরাজকতা রোধ করতে হবে এবং জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

খসড়ায় বলা হয়েছে যে, সফল আদর্শগত নেতৃত্বের অভাবেই আজ এই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। এই সফল আদর্শগত নেতৃত্ব দিতে পারে একটি সুষ্ঠু সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। সেই দলের অভাব ঘটেছে বলেই জনজীবনে অসহায় অবস্থা দেখা দিয়েছে এবং এর সুযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ জনসাধারণের সর্বস্তরে ক্ষমতা দখলের জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। এই অবস্থা নিরসন করার জন্যই ভারতীয় ক্রান্তি দলকে সর্বভারতীয় দল হিসাবে সংগঠিত করা হচ্ছে।

আশা করা যায়, এই রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে জনসাধারণ পুনরায় গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা, সমাজতন্ত্র, এবং আন্তর্জাতিক সহনশীলতার প্রতি আস্থাশীল হবার সুযোগ পাবে এবং সামাজিক সুবিচার সু-সংগঠিত করে সৎ ও সুদক্ষ শাসন ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হবে। এই খসড়ার উদ্দেশ্যকে স্মরণ করেই শ্রীকবীর জোর দিয়ে বলেছেন ভারতীয় ক্রান্তি দল একটি অ-কংগ্রেসী, অ-কম্যুনিস্ট গণতান্ত্রিক সর্ব-ভারতীয় সংগঠন হিসাবে গণ্য হবে।

খসড়ার উদ্দেশ্যটা মনে রাখলে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, ক্রান্তি দল কম্যুনিস্ট বিরোধী দল হিসাবে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করবে। এটা স্বীকার করে নিলে, এটাই মনে হবে যে, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জির পক্ষে ভারতীয় ক্রান্তি দলের সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। ভারতীয় ক্রান্তি দলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বাংলা কংগ্রেসকে বিলুপ্ত করলে শ্রীমুখার্জির পক্ষে যুক্ত ফ্রন্টকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। কারণ, ভারতীয় ক্রান্তি দলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মেনে নিলে, ক্রান্তি দলের পক্ষে আর সম্ভব হবে না কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুক্ত ফ্রন্টের সরিক হওয়া। যে-যুক্ত ফ্রন্টের সঙ্গে কম্যুনিস্ট দলগুলো সংযুক্ত থাকবে, তার সঙ্গে ক্রান্তি দলের যোগ থাকাটাই অস্বাভাবিক মনে হবে। সে-অবস্থায় কেবলমাত্র ফ্রন্টের বিলুপ্তি ঘটবে না, সংবিধানগত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু রাখতে হলে, ক্রান্তি দলকে হাত মেলাতে হবে কংগ্রেসের সঙ্গে। ক্রান্তি দলের সদস্য হিসাবেও শ্রীঅজয় মুখার্জির পক্ষে কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা হয়ত সম্ভব না-ও হতে পারে।

এই অবস্থাটা শ্রীঅজয় মুখার্জি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করেন বলেই, আজ আর তাঁর পক্ষে নূতন কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাঁকে আজ তাঁর নিজস্ব সমর্থকদের নিয়েই যুক্ত ফ্রন্টের সরিক বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে থাকতে হবে। হয়ত বাংলা কংগ্রেস থেকে কিছু সদস্য ভারতীয় ক্রান্তি দলে যোগদান করবেন এবং তার ফলে হয়ত যুক্ত ফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লোপ পাবে; কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জিকে যুক্ত ফ্রন্ট ভেঙ্গে দেবার দায়িত্ব বহন করতে হবে না।

তাই শ্রীকবীরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করা শ্রীঅজয় মুখার্জির পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই, ক্রান্তি দলের বিরুদ্ধে প্রথম রাজনৈতিক আঘাতটা দিতে হবে শ্রীঅজয় মুখার্জিকে। তাই এই আকস্মিক বিস্ফোরণ। হয়ত এই বিস্ফোরণ পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক আবর্ত আরও তীব্র করে তুলবে।

চীনের কৌশল

সিকিম তিব্বত সীমান্তে এক দফা গুলী-গোলাবর্ষণ শেষ হল। শেষ না শুরু, সে-কথা কেউই নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন না। চীনের রাষ্ট্রনীতি চালানোর ক্ষমতা এখন যাঁদের হাতে তাঁরা কখন কী করে বসেন তার সাধারণ যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে বার করা দুঃসাধ্য। চীনের ভিতরে হোক, বাইরে হোক, বিরোধের আগুন জ্বালিয়ে রাখাই যেন মাও-পন্থী বিপ্লবের কায়দা। সে-কায়দায় চীনের কোন সুবিধা হচ্ছে মনে হয় না। একমাত্র পাকিস্তান ছাড়া এশিয়ার আর কোন দেশের সঙ্গেই চীনের সদ্ভাব নেই। উত্তর ভিয়েতনাম এবং উত্তর কোরিয়া পর্যন্ত সোভিয়েট-চীন দ্বন্দ্বে চীনের পক্ষে পুরোপুরি সায় দেয় নি। কাম্বোডিয়া কিছুকাল আগে পর্যন্ত ছিল চীনের বিশ্বস্ত বন্ধু; প্রিন্স নরোদম শিহানুক এতদিন আমেরিকা, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, থাইল্যাণ্ডের ব্যবহারে খুবই খাপ্পা ছিলেন। সেই শিহানুকও এখন পিকিং সরকারের জবরদস্তির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। পিকিং চায় কাম্বোডিয়ায় চীন-পন্থীদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেশটাকে পুরোপুরি চীনের তাঁবেদার করতে। প্রিন্স শিহানুক এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। পিকিং-এর হঠকারিতা শেষ পর্যন্ত হয় তো কাম্বোডিয়াকে ঠেলে দেবে মার্কিন অভিভাবকত্বের আওতায়। যেমন দিয়েছে ইন্দোনেশিয়াকে, দিচ্ছে থাইল্যাণ্ডকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নতুন স্বাধীন দেশগুলির বিপদ দুদিক থেকে—হয় চীনের চরণে আশ্রয়, নয় তো চীনের জুলুম থেকে নিষ্কৃতি পেতে মার্কিন মহা-সমাজের সামিল হওয়া।

ভারতবর্ষ বড় দেশ, চীন তাকে সহজে গ্রাস করতে পারে না। এমন কী, পুরো-দস্তুর যুদ্ধেও ভারতবর্ষকে বিপর্যস্ত করা এখন আর সহজ নয়। ১৯৬২ সনের আকস্মিক বিপর্যয় ঘটতে পেরেছিল প্রধানত ভারতের তরফে সামরিক প্রস্তুতির অভাবে। এখন অবস্থা সে-রকম নয়। চীন-পাকিস্তান একযোগে আক্রমণ করলে রণনীতির প্রাথমিক হিসাবে ভারত খুবই বিব্রত হতে পারে বটে। কিন্তু সে-অবস্থায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আলোড়ন ঘটবে প্রচণ্ড, সেটা চীন অথবা পাকিস্তানের অনুকূলে হবে না। কম্যুনিস্ট দুনিয়াতেও এখন আর প্রস্তর-কঠিন ঐক্য নেই, কোন কালে আবার সে-রকম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে মনে হয় না। আমেরিকা যদি কখনও এককভাবে কম্যুনিস্ট চীনের উপর আক্রমণ চালায় তাহলে সোভিয়েট রাশিয়া চীনের পক্ষে দাঁড়ালেও দাঁড়াতে পারে। ভারতের উপর চীন-পাকিস্তান আক্রমণ রাশিয়া বা আমেরিকা কেউই বরদাস্ত করবে না। সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন কোন অঞ্চলের উপরেও চীনের দাবি আছে এবং রাশিয়া, বলা বাহুল্য, সেজন্য খুশী নয়।

রাশিয়া এবং অন্য অনেকের আশা পিকিং-এর মারমুখী কাণ্ডকারখানা আর বেশী দিন নয়, মাও-পন্থীদের দম ফুরিয়ে আসছে, মহা-গুরু মাও সে তুং আর যাই হোক অজরামরবৎ সারা দুনিয়ার রাজনৈতিক ঘড়ির কাঁটা ঘোরানোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারবেন না। সোভিয়েট মহলের বিশ্বাস চীনের রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃত্বের চাল-চরিত্রে কিছুকালের মধ্যে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটবে এবং সে-পরিবর্তন সোভিয়েটের বর্তমান রাজনৈতিক চিন্তা-ধারার সঙ্গে মিলবে। বলশেভিক রাশিয়ায় প্রথম পর্বেও উনপঞ্চাশ বায়ুর প্রবল তাড়না দেখা গিয়েছিল। মাও-পন্থী ক্ষ্যাপামি অবশ্য তার চেয়েও অনর্থকর। আরও মজা, চীনে এই অতি-বিপ্লবী উন্মত্ততা দেখা দিয়েছে কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা দখলের সতেরো বছর পর; রাশিয়ায় অতি-বিপ্লবী বলশেভিক আতিশয্য ঘটেছিল ক্ষমতা দখলের কিছু কাল পরেই।

মাও-পন্থী "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের" ক্রিয়া-কাণ্ডকে রাশিয়ার স্টালিন-যুগের জবরদস্তির সঙ্গে তুলনা করাও সেজন্য যথার্থ নয়। স্টালিন যখন নিজের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁর রাজনৈতিক সংকল্প "একটা দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা" সারা পৃথিবীতে বিপ্লব রপ্তানি, যাকে বলা হয় "চিরস্থায়ী বিপ্লব" স্টালিন ছিলেন সে-কর্মপন্থার প্রবল প্রতিবাদী। "কমিনটার্ন" মারফত আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট ঐক্য, বৈপ্লবিক সংগ্রামের ঠাট অবশ্য একটা ছিল, তবে সে-ঠাট স্টালিন প্রধানত কাজে লাগিয়েছিলেন সোভিয়েট রাশিয়ার নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ দৃঢ় করার সংকল্পে। চীনে কম্যুনিস্ট বিপ্লব ঘটানোর ব্যাপারেও অনেক সময় স্বয়ং মাও সে-তুং স্টালিনের কাছে পাত্তা পান নি। মাও-পন্থীরা এখন অবশ্য কথায় কথায় স্টালিনের দোহাই দেয়। সে অন্য কারণে। স্টালিনোত্তর যুগে রাশিয়ার শাসন ব্যবস্থায়, অর্থনীতি এবং সমাজবিন্যাসে কিছু কিছু নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়েছে। মাও-পন্থীদের এতেই আপত্তি, কারণ এটা স্টালিনের স্বৈরাচারী নায়কত্বের ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুতি। স্টালিন পূজা যদি বরবাদ তাহলে নব অবতার মাও সে তুং দাঁড়ান কী করে? অবশ্য এ-ছাড়া আরও অনেক ঘরোয়া সমস্যার পীড়ন আছে যে জন্য কম্যুনিস্ট চীনের বর্তমান এলো-পাথাড়ি উন্মত্ত আচরণ।

কম্যুনিস্ট চীনের মারমুখী কাণ্ডকারখানার ধাক্কা সবচেয়ে বেশী পড়েছে, প্রতিবেশী ভারতের উপর। চীন কী চায় তা নিয়ে সেজন্য শঙ্কা, সংশয়, জল্পনা-কল্পনা এবং তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই। কম্যুনিস্ট চীন ভারতের প্রত্যক্ষ বিপদ না বিরক্তিকর উপসর্গমাত্র, "থ্রেট", না "নুইসান্স", এ প্রশ্নের সোজাসুজি কোন উত্তর নেই। ১৯৫৯, ১৯৬২ সনের ঘটনা-বলীর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা দেশের লোকের মনে গভীর দাগ কেটে রেখেছে। সেটা কখনই সহজে ভুলবার নয়, ভুলবার সুযোগ চীনা কম্যুনিস্টরাই দিচ্ছে না। হিমালয় সীমান্ত অঞ্চলের বিরোধ তারা জীইয়ে রেখেছে, অকারণ ঠোকাঠুকি করে প্রাণহানি ঘটাচ্ছে, পাকিস্তানের সঙ্গে মিতালিটাও ভারতের পক্ষে শঙ্কাজনক, অন্তত আগের ঘটনাবলী প্রতিনিয়ত সেই শঙ্কা জাগিয়ে রাখছে। ভারতের ভিতরে নানা রকম অশান্তি ঘটানোয় চীনের উৎসাহটাও গোপন নয়। এগুলি নিতান্ত "নুইসান্স" তথা বিরক্তিকর উপসর্গ মনে করা যায় না। ভারতের সঙ্গে বড় রকমের পুরাদস্তুর যুদ্ধ বাধানো পিকিং-এর উদ্দেশ্য না-ও হতে পারে। তবে পুরোদস্তুর যুদ্ধ না বাধিয়েও সীমান্তে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করে, যখন-তখন যেখানে সুবিধা ছোটখাট সংঘর্ষ ঘটিয়ে যুদ্ধের উত্তেজনা জীইয়ে রাখা যায়। চীন তাই করছে। ভারতের পক্ষে সেটা "থ্রেট" অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিপদের চেয়ে কম কী?

১৮।৯।৬৭

উর্দু কবিতা গেয়ে শোনাতে হয়

'স্মরণীয় শারদ-সাহিত্য'

সন্দেহ হচ্ছে, ক্রমাগত লোক চটিয়ে দিচ্ছি। আমার মতি-গতি সম্পর্কে বন্ধুদের কখনো ভরসা ছিল না—এখন তাঁরা হাল ছেড়ে দিচ্ছেন। শত্রুরা (কে কে আছেন বা কী পরিমাণে আছেন ঠিক জানি না) আমার সম্বন্ধে কী ভাবছেন, আমার দিক থেকে সেটা ভাবাই বাহুল্য। তাই সব দিক বিশদভাবে পর্যালোচনা করে ঠিক করেছি—দয়া করে এই জার্নাল যাঁরা এখনো পড়ে থাকেন, এইবারে তাঁদের একটু খুশি করে দেওয়া যাক। ঘুষ দিচ্ছি ভাববেন না—একটা সত্যিকারের ভালো খবরই পৌঁছে দিচ্ছি।

পুজোর বাজার বাংলা সাহিত্যের সোনালী ফসলের কাল। পুজো সাহিত্যের নাম শুনলেই যে-সব 'অ্যান্তেলেকচুয়েল' নাকটাকে কপালের দিকে ঠেলে তুলতে শুরু করেন—আমার মানসিকতা এখনো তাঁদের মতো অতটা উচ্চস্তরে পৌঁছোয়নি। গল্প-কবিতা-উপন্যাস এ সময়ে অজস্র লেখা হয়, লেখকদের ওপর অতি মাত্রায় চাপ পড়ে, কাজেই সব লেখাই একেবারে সাহিত্যের রসে পাকা আঙুরের মতো টসটস করতে থাকবে—এ আশাই বিড়ম্বনা। যেদিন শারদীয় সাহিত্য ছিল না সেদিনও প্রতিটি বাংলা লেখাই যে অমর-কীর্তি হয়ে উঠত—এমন দলিল দাখিল করাও শক্ত। এখন তো দেখছি বাংলা সাহিত্যের অনেক সেরা লেখাই শরতের ফসল—এই সময়টাতেই বুঝি বাঙালী লেখকদের মন নতুন ধানের মতো নতুন শাঁসে ভরে ওঠে।

কিন্তু সাহিত্যের কথা থাক। সুনন্দর মতো কমন ম্যানেরা আর ক'দিন পরেই এবারের শারদীয়া সাহিত্যে নবান্নের স্বাদ পাবে আর ওদিকে সমালোচক আর পণ্ডিতেরা ছুরিতে শান দিতে থাকবেন। সাধারণ পাঠক আর 'অ-সাধারণ' ক্রিটিকেরা নিজেদের মতো তৈরি হতে থাকুন—এর মধ্যে আমার খুশিটুকু আপনাদের কাছে নিবেদন করে ফেলি।

গ্রামোফোনের ডিস্কে বাংলা কাব্য অনুপস্থিত—এ নিয়ে কিছুকাল আগে জার্নালের পাতায় খেদোক্তি করেছিলুম। এবার পুজোর বাজারে উদ্দিষ্টেরা 'দুর্মুখের মুখবন্ধ' করে দিয়েছেন। শারদীয় সাহিত্য কী রূপ নিয়ে এসেছে এখনো জানি না, কিন্তু 'গ্রামোফোন কোম্পানি' নিবেদিত 'বাংলা কবিতা' নামে লং-প্লেয়িং রেকর্ডটি এবারের পুজোর একটি স্মরণীয় সাহিত্য-সম্ভার। অতএব আগের নালিশ সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে এই সৎ কাজটির জন্যে এবার 'গ্রামোফোন কোম্পানি'কে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানানো গেল; আর সেই সংগে ধন্যবাদ জানাচ্ছি 'বাংলা কবিতা'র তরুণ কবি শান্তি লাহিড়ীকেও—যাঁর সম্পাদনায় এবং পরিশ্রমে কাজটি সম্ভবপর হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্র-নাথ, অমিয় চক্রবর্তী এবং সুকান্ত ভট্টা-চার্যের কবিতা আমরা পেয়েছি ক'জন বিশিষ্ট আবৃত্তিকারের মাধ্যমে; আর স্বকণ্ঠে স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আমাদের লাভ দু'দিক থেকে। উঁচু দরের কিছু আবৃত্তির নমুনা যেমন এই রেকর্ডটি থেকে পাওয়া গেল—তেমনি আধুনিক বাংলা কবিতার যাঁরা প্রথম শ্রেণীর শিল্পী, তাঁদের কণ্ঠ, তাঁদের প্রিয় কবিতার নির্বাচন, তাঁদের মেজাজ এবং কবিতা পড়বার নিজস্ব ভঙ্গি

আমরা কবিরা এখন তারকা হলাম, যাকে বলে আর্টিস্ট

—সে সবও এর মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে ধরা রইল। এই রেকর্ডটি গান-বাজনা-নাটকের পাঁচ মিশালী বাক্সে ক্যাবিনেটে গুঁজে রাখবার নয়—আমরা যারা বাংলা সাহিত্যকে ভালোবাসি, এর জায়গা রইল
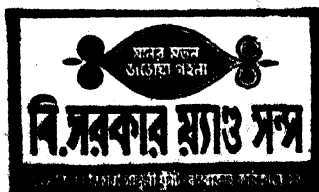
সেই আমাদের বইয়ের শেলফের ভেতর।

আবৃত্তি যাঁরা করেছেন তাঁরা হলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী সব্যসাচী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, শম্ভু মিত্র, সবিতাব্রত দত্ত এবং শান্তি লাহিড়ী। এঁদের মধ্যে প্রথম ছ' জনই অভিনেতা এবং আবৃত্তিকার রূপে স্বনামধন্য; অনুজ কবি অগ্রজের কবিতা কিভাবে পড়তে ভালো-বাসেন, শান্তি লাহিড়ীর আবৃত্তি তার প্রমাণ। সব মিলে 'বাংলা কবিতা' পরম সমাদরে আহরণীয়।

এই রেকর্ড বাংলা কাব্যের একটা ধারা-বাহিক পরিচয় যে বহন করছে তা নয়। একখানি মাত্র রেকর্ডে যে সে কাজ সম্ভব তা-ও নয়। হয়তো কবিতার নির্বাচনও প্রশ্ন তুলবে। কিন্তু এ-সব খুঁটিনাটির চাইতেও এই প্রয়াসটির সার্থকতা অনেক বেশি। একবার যখন বরফ গলল, তখন আশা করব —এইভাবে গ্র্যামোফোন কোম্পানি ধীরে ধীরে বাংলা কাব্যের তুষারপর্ব থেকে এ কালের নবীনতম কলধ্বনিও আমাদের কাছে পৌঁছে দেবেন; আমরা শুনতে পাব লেখকের স্বকণ্ঠে উপন্যাসপাঠ (যেমন ফরাসী রেকর্ডে কামুর 'লেত্রাঁজে'), শুনব বাংলা-সাহিত্যের আরেক সাফল্য : নির্বাচিত ক'টি ছোট গল্প।

এই রেকর্ডটির নেপথ্যে রয়েছে সাহিত্য-প্রীতি, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নয়। হয়তো এর অর্থকরী ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোম্পানি বিশেষ ভরসা রাখেন না। কিন্তু কাব্যপ্রাণ বাঙালীর কাছে এর সমাদর ঘটবে না—এমন আশংকা অন্তত সুনন্দর নেই। সাম্প্রতিক কালের ভেতরে জীবনানন্দ এবং সুধীন্দ্রনাথের দুটি কাব্য-সংগ্রহ যে পরিমাণে জনাদর পেয়েছে, তার সন্ধান জানলে বিক্রয়-গৌরবে গরীয়ান অনেক বাঙালী ঔপন্যাসিকদেরও ঈর্ষার দীর্ঘশ্বাস পড়বে। বাংলা কবিতার পাঠক নেই—এক যুগ আগে এই অনুযোগ করা চলত, কিন্তু আজ আর এ নিয়ে কেউই সংশয় তুলবেন না। আধুনিক সঙ্গীতের নামে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাহিত্য-বর্জিত যে সমস্ত সুরেলা এবং কুস্বর প্রলাপ (মার্জনা চাইব না) রাশি রাশি আবির্ভূত হয়—তাদের শ্রোতা-শ্রোত্রীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চয় থাকবে; কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক'টি ভালো কবিতার হৃদ্য আবৃত্তি এবং প্রথম সারির কবিদের স্বকণ্ঠে কাব্যপাঠ কাব্যপ্রাণ বাঙালী গ্রহণ করবে না —তার রুচি সম্পর্কে এমন নিন্দাবাদ আমি অন্তত স্বীকার করতে রাজী নই।

প্রসংগত আর একটি কথা মনে হল। দেশের সাহিত্যিকদের কণ্ঠ কি একমাত্র ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানেরই ধারণযোগ্য? এ ব্যাপারে ভারতীয় শ্বেত হস্তী আকাদেমিরও কিছু করণীয় নেই কি? তাঁরা তো অনেক "পুরস্কৃত" বস্তুকে প্রভূত আনুকূল্য করেন —সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এই ধরনের কিছুও কি করতে পারেন না? চোখ দিয়ে ছাপার হরফে কবিতা পড়া আর কবির কণ্ঠে সেই একই কবিতায় তাঁর ব্যক্তিত্বটুকু অনুভব করা —এই দুইয়ের ভেতরে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। হয়তো এইসব রেকর্ডের মধ্য দিয়ে সারা ভারতবর্ষের মানুষ মনের দিক থেকে আরো কাছাকাছি আসবেন, বাঙালী যদি হিন্দী গান ভালোবেসে থাকে, ধীরে ধীরে হিন্দী কবিতাও তার কানে অভ্যস্ত হয়ে আসবে; তামিল-তেলেগু হয় তো আমরা বুঝব না, কিন্তু দক্ষিণ সমুদ্রের ঢেউয়ের রোলের মতো দাক্ষিণী কবির স্বরও কি আমাদের মনে ঝংকার তুলবে না? কবিতার অর্থ দু' কথায় বুঝিয়ে দিয়ে পাঠ করলে কি জীবনানন্দ থেকে সুকান্তেরা মরাঠীর মনে স্পন্দিত হয়ে উঠবেন না?

কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে— 'এ শুধু অলস মায়া'—সুনন্দর অপ্‌টিমিস্টিক কল্পলোক। 'দিল্লী হনুজ দূর অস্ত'— এসব ছোট কথা সেখানে গিয়ে পৌঁছোবে না। তার চাইতে আপাতত গ্র্যামোফোন কোম্পানি যা দিয়েছেন তাই আমাদের পরম লাভ। আর একবার তাঁদের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানানো যাক।

আর কৃতজ্ঞতা জানানো যাক কবি-শিল্পী মলয়শঙ্কর দাশগুপ্তকে। রেকর্ডটির জন্যে একটি শোভন রুচিস্নিগ্ধ আবরণী দিয়েছেন তিনি।

কাল-ভূজঙ্গ

নিশি ফিসফিস করে ডাকল, 'সোনামণি, অ সোনামণি।'

সোনামণি কোন উত্তর করল না। মানুষটা বারান্দায় বসে সোনামণিকে ডাকছে। সোনামণি উঠোনে কচু সেদ্ধ করছে। দু' মেয়ে সোনামণির। আঙ্গা বাঙ্গা দুই ছানা-পোনা উনুনের ধারে কচু সেদ্ধ হবার আশায় বসে রয়েছে। উদোম গায়ে বসে আছে। আর অভাব সোনামণির নিত্যদিনের। সারা অঞ্চল জুড়ে খরা আর খরা। বর্ষা নেই। বৃষ্টি হচ্ছে না। বৃষ্টির আশায় মানুষটা বারান্দায় বসে আকাশ দেখছিল। বর্ষা এলেই ফসল ফলবে। ঝোপে-জঙ্গলে শাকপাতা গজাবে। অন্ন নেই পেটে, মানুষের অন্ন না থাকলে মাথা ঠিক থাকে না। সুতরাং নিশির ডাকে সোনামণি বিরক্ত হচ্ছিল।

'কিছু বলছিল মারে সোনামণি', খর গলায় ফের ডেকে উঠল নিশি।

তবু সোনামণি জবাব দিল না। মানুষটা খাবার লোভে অমন করছে।

'আমি কি তুর কেউ হই না রে সোনামণি?'

এবার সোনামণি ক্ষেপে গেল। 'তু আমার ভাতার নিশি।' রাগলে সোনামণির কান্ডজ্ঞান থাকে না। মরদকে ভাতার, আলসে ভাতার অথবা গালাগাল—মরে না কেন, যম কি নেই, হা ঈশ্বর, তুর মুখে আগুন—এ-সব বলে সোনামণি কেমন সুখ পায়। সুখ পেলে তখন কান্ডজ্ঞান থাকে না। হাটুর উপর কাপড় তুলে কটুবাক্য বর্ষণ। বারান্দা থেকে অল্প জ্যোৎস্নায় নিশি টের পেল—সোনামণি এবার হাটুর উপর কাপড় তুলে কটুবাক্য বর্ষণ করবে। ভয়ে নিশির গলা প্রায় কাঠ হয়ে গেল। সে ভয়ে ভয়ে বলল, 'রাগ করিস না সোনামণি। তুকে একটা কথা বললে রাগ করে লিবি না ত!'

'মরণ'—সোনামণি মুখের উপর ঝামটা মারল একটা। মাঠে এখন আগুন জ্বলছে, পেটে আগুন—মানুষটার চোখে আগুন। সোনামণি এই প্রখর খরার দিনে নিশির চোখে আসঙ্গলিপ্সা দেখে ভয় পেয়ে গেল।

'মরণ বলছিস সোনামণি। মরণ বলতে নাই রে। মরণ বললে স্বামীর ঘরে আগুন লাগে। ঢোল বাজায় যে মানুষ, যে মানুষ বাড়ি বাড়ি পুজো-পার্বণে ঢোল বাজায়, কাঁসি বাজায় তারে মরণ বলতে নাই।' তারপর বারান্দা থেকে সন্তর্পণে নেমে খোলা মাঠের দিকে মুখ করে বলল, 'তুই সোনামণি নিশির সঙ্গে মাঠে যাবি। বড় মাঠ। মাঠের দক্ষিণ সামুতে সরকারী খামার। খামারে বাবুরা বীজের ধান্য বুনেছে। সোনামণি রে সোনামণি, কি ধান্য, কি ধান্য!' বলে নিশি একটা ঢোক গিলল। নিশি, যে ঢোল বাজায় পুজো-পার্বণে, যে কাঁসি বাজায় পুজো-পার্বণে, মুচিরাম হিন্দে যার বাপ ছিল, পাঁচ কাঠার জমির উপরে যার ঘর ছিল, যার এখন কিছুই নেই—সব বন্ধক নিয়েছে ভালমানুষের ছা শশী। শশী এখন বাবু, বাবু শশী খামারে এখন দারোয়ানের কাজ করছে।

সোনামণি বলত—'নাগর আমার!'

সেই নাগরের বিয়েতে, কন্যার অন্নপ্রাশনে ঢোল বাজিয়েছে নিশি। পাপ মুছে পুণ্য তুলে দিয়ে এসেছে, আর ধান্যদুর্বা ঢোলের

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপরে নিশি কত মঙ্গলকামনা করেছে শশীর। সেই শশীবাবু দু' গন্ডা টাকায় জমি বন্ধক রেখে সোনামণি সহ নিশিকে বিবাগী করে দিল।

নিশির দুই মেয়ে, অঙ্গি বঙ্গি। ওরাও পুজো-পার্বণে নিশি ঢোল বাজাতে গেলে ছোট গামছা পরে সঙ্গে সঙ্গে যায়। বাপের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি কাঁসি বাজায়। কিন্তু খরা, প্রবল খরা। এখন আর কে কার পাপ মুছে পুণ্য নেয়। তাই অঙ্গি বঙ্গি দুই মেয়ে কচু সেদ্ধ পাতে তুলে খুব তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে।

বোধ হয় দুই মেয়ের তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া দেখেই নিশি আগুন হয়ে উঠেছিল। পেটে আগুন, পিঠে আগুন, সারা মাঠময় শুধু আগুন ছড়িয়ে আছে—ক্ষুধার আগুন। নিশি ক্রমশ ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল—'অ সোনামণি, শুনতে পেচ্ছিস!'

দুই মেয়ের খাওয়া দেখে সহ্য হচ্ছে না মানুষটার। সোনামণিও আগুন হয়ে আছে ভিতরে ভিতরে। সে দাঁত শক্ত করে বলল, 'শুনতে পেছিস নাগর।'

সব শুনতে পেয়েছে, তবে। সে এবার গলে গলে পড়ল। 'অরে সোনামণি, অ সুমি, তবে দে, দুটা খেয়ে লিলে শান্তি পাই।'

'হা আমার মানুষ রে!' বলে সোনামণি কপালে করাঘাত করল। প্রায় বিলাপের মত সুর ধরে বলতে থাকল, 'হায় ছানাপোনা পাখ-পাখালির হয়; গাছের পাতা মাছের মাথা হেথা-হোথা যা মিলে লিয়ে আসে, ছানা-পোনার কষ্টে পাখ-পাখালীর ঘুম থাকে না চোখে—আর তু এক মনুষ্যের ছানা, মেয়ে দুটা খেয়ে লিচ্ছে তর সহ্য হচ্ছে না!'

'অরে সোনামণি, অরে সুমি, তুই এমন করে রেতের বেলা বিলাপ করিস না। বিলাপ করলে মাঠে-ময়দানে মড়ক লেগেছে ভেবে সকলে ছুটে আসবে। আমি এক মানুষ, ঢুলী মানুষ, আমার দুই মেয়ে অঙ্গি বঙ্গি। ঢুলী মানুষের অমঙ্গল বইতে নাই।'

নিশির ইচ্ছা হল, ঘরে ঢুকে ক্ষুধার জ্বালায় ঢোলটা কাঁধে নিয়ে মাঠে নেমে যায়। মেয়ে দুটো কচু কদু সেদ্ধ খাচ্ছে। সোনামণি কাঠের হাতা নিয়ে বসে রয়েছে, ওরা পাতেরটুকু শেষ করে ফেললেই বাকিটুকু ঢেলে দেবে। নিশির ঢোল নিয়ে ছুটতে ইচ্ছা হল মাঠে, তারপর ঢোলের উপর বোল তুলে, ছররা ছুটিয়ে, মাঠে-ময়দানে আগুন ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছা হল। ক্ষুধার আতঙ্কে সোনামণির গলা টিপে ধরতে ইচ্ছা হল।

বড় দুঃসময়। না আছে পুজো, না আছে পার্বণ। দেশের লোক আকালে আকালে গেল। কি করবে, কাকে দোষ দেবে, সে ভেবে পেল না। তা ছাড়া মনে হল, রেগে গিয়ে লাভ নেই। বরং ঠান্ডা মাথায় পেটে হাত রেখে বসা যাক। উঠোনের উপর চুপচাপ বসে থাকলে সোনামণির দয়া হতে পারে। সে সোনামণিকে সেজন্য আর বিরক্ত করল

না। উঠোনের উপর সে হাঁটু গেড়ে বসে থাকল। মনে হল শশীর কথা। শশীর জমির কথা। সরকারী খামারে বীজের জন্য ধান ছড়িয়ে রেখেছে শশী। ধানের কথা মনে পড়তেই নিশির সবটুকু জ্বালা মুহূর্তে উবে গেল। সে এবার গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াল সোনামণির কাছে। 'দে, একটু দে। পেটের জ্বালা নিবারণ করি। দে, দোহাই তুর বাপের সোনামণি, দে একটু দে, পেটের জ্বালা নিবারণ করি। দিলে তুর আয়ু বাড়বে সোনামণি। পুণ্য হবে তুর। সতীলক্ষ্মী হয়ে মরবি।' তারপর খুব কাছে গিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'যাবি তু, যদি যাস তবে সোনার ধান্য তুলে লিব। শশী কাদামাটিতে বীজের ধান্য ছড়িয়েছে। যাবি তু! তু আর আমি দু' পাখিতে সারা রাত ঠুকরে ঠুকরে সব ধান্য তুলে লেব।' সোনামণিকে বড় ভাল মনে হচ্ছে এখন। স্বপন দেখছে যেন। নিশি এবার সুযোগ বুঝে বলে ফেলল, 'দে সোনামণি, দে একটু খাই। খেয়ে পেটের জ্বালা নিবারণ করি।' সংগে সংগে সোনামণি কেমন জেগে গেল। শক্ত হয়ে বসে থাকল। সারা দিনমানে এই কচু সেদ্ধ সম্বল। সে নিশিকে আড়াল দেবার জন্য হাঁড়িটা পেছনের দিকে টেনে নিল।

বড় দুঃসময়। বড় বেহায়া নিশি। সে ঘুরে গিয়ে সামনে বসল। তারপর সেই আগের মত হাত বিছিয়ে বলল, 'আমি ঢুলী মানুষ সোনামণি, আমারে তু ছোট করে লিচ্ছিস। তু আর আমাতে এত ভালবাসা, তু আমারে ছোট করলে ধম্মে সইবে না।'

তখন অংগ ডাকল, 'বাপ।' বংগ ডাকল, 'বাপ।'

তখন সোনামণি টিনের ভাঙা থালায় অবশিষ্ট কচু সেদ্ধ দু' ভাগ করে নিশির পাশে খেতে বসে গেল। 'লে খা। ইবারে কি বুলবি বুল।'

'সোনার ধান্য আছে গ মাঠে।' নিশি কচু সেদ্ধ মুখে আলগা করে দেবার সময় কথাটা বলল। এমন করে বলল, যেন স্বপ্নে দেখা গুপ্তধনের খবর দিচ্ছে।

'কোথায়?'

'শশীর খামারে।' নিশি দুলে দুলে এত বড় খবরটা ভাল করে এবার শোনাল সোনামণিকে।

অংগ বলল, 'আমি যাব বাপ।'

বংগ বলল, 'আমি যাব বাপ।'

'দেখলি ত!'

সোনামণি ঢকঢক করে জল খেল। তারপর এনামেলের তোবড়ানো ঘটিটা পাশে রেখে বলল, 'গেলে কি অধম্মটা হবে শুনি!'

'ধরা পড়ে যাব।'

'চুপি চুপি যাব। কেউ টেরটি পাবে না। ওরা খুঁটে খুঁটে ধান তুলে লিবে।'

অংগ বংগ দুই মেয়ে। সুদিনে দুর্দিনে এই দুই মেয়ে। সুদিনে ফসল কাটা হলে মেয়ে দুটো মাঠময় ঘুরে বেড়ায়। কোন্ মাঠের কোন্ সামুতে ইঁদুরে গর্ত করে ধান চুরি করে নিয়েছে তার খবর বয়ে আনে ঘরে। তখন নিশি আর ঢোল কাঁধে লয় না। মাথায় ফেটি, কাঁধে কোদাল। নিশুতি রাতে দুই মেয়ে সংগ দেয়। সরু হাতে অংগ বংগ দুই মেয়ে গর্তের ভেতর থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ ধান তুলে আনে অথবা ওরা পাহারা দেয়। মাঠময় চোখ সজাগ করে রাখে—বাপ, কে যেন আসে! বাপ, ওটা কি? বাপ কোদালে যেন কি লেগে আছে—অক্ত লেগে আছে। অক্ত বাপ, কিসের অক্ত! ইঁদুরের! তখন হেই হেই করে নিশির চিৎকার, না রে না, ইঁদুর-বাদুড় কিচ্ছু লয়, মা বসুন্ধরার কন্যা মা মনসার বাহন ভুজংগ। কালো রঙের ভুজংগ—চিকচিক করছে, আর মাথাটা দোলাচ্ছে। কিন্তু সেবারে কি হল বাপ। কোদাল মেরে মেরে হয়রান নিশি, কোন্

সুদূরে ইঁদুরে ধান টেনে নামিয়েছে টেরটি পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও ধানের গুচ্ছ নেই একটা। হায় হায়, পরিশ্রম বৃথাই গেল। রাগে দুঃখে গান ভেসে এল নিশির গলায়, সময়ে ওটা সুখের গান ছিল—হায় মা, কে কার তরে চুরি করে হে মা ঈশ্বরী। কিন্তু নেই, ধান গর্তের ভিতর কোথাও নেই—প্রায় মাঠ চষে ফেলেছে নিশি, নিশুতি রাতে অংগি বংগির ভয় ধরে গিয়েছিল, তখন নিশির নজর হক্ করে থেমে গেল। গর্তের মুখে আলিসান ভুজংগ। কালো রঙের ভুজংগ। কোদাল মারলে সামান্য লেজটুকু কাটা যাবে। গোটা শরীর গর্তের ভিতরে। হায় তবে সব যাবে। ভিতরে সোনার ধান্য আছে গ মা জননী। তবে ইবারে কি করি। বলে এক হ্যাঁচকা টান লেজ ধরে। হাত বিশেক দূরে আলিসান ভুজংগটা ভুঁইয়ে পড়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর যায় কোথায়। নিশি দেখল ভুজংগটা ওকে তেড়ে আসছে ঠিক মনে হল সোনামণির মত তেড়ে আসছে। নাকে নথ ছিল সোনামণির, বালির চরে সোনামণি হক করে কাকে কামড়ে দিয়েছিল —বুঝি শশীকে, বুঝি নিশিকে এখন কামড়ায়, নিশি ছুটতে থাকল, ঘুরতে থাকল। নিশি এঁকেবেঁকে চলতে থাকল। আর হাঁকতে থাকল—অংগি বংগি ধান তুলে লে। আমি ভুজংগরে ডাংগায় তুলে আড়াল করে লিচ্ছি। নিশি আলের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে ছুটতে থাকল।

অংগি বংগি নাছোড়বান্দা। ওরা যাবেই। মুগয়াতে বাপ যাবে, সংগে মা সোনামণি যাবে—ওরা যাবে না কেমন করে হয়।

সুতরাং অংগি গেল, বংগি গেল। সংগে মা সোনামণি এক কাপড়ে মাঠে নেমে গেল। কিছু আর সম্বল নেই সোনামণির। এক কাপড়ে, এক আঁচলে ওকে সব সংগ্রহ করে আনতে হয়। নিশি কাঁধে গামছা ফেলে, কোমরে নেংটি এঁটে সকলের আগে আগে চলল। আর গান ধরল, সুখের গান। কে কার তরে চুরি করে হে মা ঈশ্বরী।

গহন মাঠ। দূরে লণ্ঠন নিয়ে শশী খামারে উঠে যাচ্ছে। সে মাঠের ভিতর একটা জাংগা টিন বেঁধে রেখেছে। টিনটা থেকে থেকে বেজে উঠছিল। একটা দড়ি, লম্বা দড়ি মাথার উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে খামারে। শশী থেকে থেকে টিনটা বাজায়। নদী থেকে, বিল থেকে পাখ-পাখালি উড়ে আসার সম্ভাবনা। বীজধান বুনে শশীর চোখে ঘুম নেই। যখন দেশে আকাল, যখন দেশে শস্য মিলছে না—ইঁদুরে-বাদুড়ে শস্য খেয়ে নিতে কতক্ষণ। শশী খামারে বসে এখন শুধু টিন বাজাবে। নিশুতি রাতে শব্দটা বড় ভুতুড়ে মনে হয়—মনে হয়, কেউ যেন মাঠময় আকালের ঘণ্টা বাজাচ্ছে। পাখ-পাখালিরা আকালের ভয়ে আর নদী বিল থেকে উড়তে সাহস পায় না।

ওরা তখন তারকাটার বেড়টা পার হচ্ছিল। ঠিক তখনই টিনটা বেজে উঠল। ঝরঝর করে বেজে উঠল। মাথার উপর দড়িটা অনেক দূরে টেলিগ্রাফের তারের মত চলে গেছে। শশী খামারে বসে দড়ি টানছে। নিশি পায়ের উপর ভর করে দেখাল—'ঐ যে হোথা, ভুঁইয়ে সোনার ধান।'

অংগি বলল, 'কোথা রে বাপ?'

বংগি বলল, 'কুলটিতে?'

নিশি বলল, 'হুই যে, দেখতে পেচ্ছিস না!'

ওরা পা টিপে টিপে হাঁটছিল। শশীর

কেবল কলিকাতার বাজারে যতদিন স্টক থাকবে ততদিন প...।

কলিকাতা অফিসঃ পি-১৬, সি আই টি রোড, স্কীম নং ৫২, কলিকাতা-১৪

দড়ি ওদের মাথার উপর। বীজধানের জমিতে বাঁশের খুঁটি। খুঁটির মাথায় ভাঙা টিনটা ঝুলছে। জ্যোৎস্না ছিল সামান্য। কোথাও একটা পাখি ডেকে ডেকে তেপান্তরে হারিয়ে যাচ্ছে। সোনামণির বড় ভয় করছিল' শশীর ভয়। দড়ি ধরে শশী বসে আছে। ভয়ে সোনামণির বুকটা শুকিয়ে উঠছে। নিশি ফিসফিস করে ডাকল, 'কোন কথা নয় সোনামণি। কথা বললে শশী টের পাবে। ধরা পড়লে জেল হাজতবাস। গেরস্থের ঘরে চুরি নয়, সরকারী ধান্য, বীজধান্য, ধান্য থেকে হেথা হোথা সব পুণ্য উঠবে।'

অঙ্গ ডাকল—'বাপ।'

বঙ্গ ডাকল, 'বাপ।'

আর সঙ্গে সঙ্গে ওরা চারজনই আলের উপর উপুড় হয়ে গেল। টিনটা ঝরঝর করে বাজছে। আকালের ঘণ্টা বাজাচ্ছে শশী। ঘণ্টাটা ক্রমাগত বেজে চলেছে। শশী কি টের পেল—পাখ-পাখালি উড়ে এসে বসেছে। আকালের ঘণ্টাও পরানে ডর ধরাচ্ছে না! যেন শশী শরীরের সমস্ত শক্তি ক্ষয় করে দড়ি টানছিল। যেন প্রাণপণ ঘণ্টাধ্বনি করছিল। ভয়ংকর শব্দটা গ্রাম মাঠ পার হয়ে বিলের দিকে নেমে যাচ্ছে। তখন কে যেন কেবল বলছিল, হুই হোথা নিশি রে, সোনার ধান পড়ে আছে রে! ওরা হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিল। শুধু একটু যেতে পারলেই হয়। ওরা প্রাণপণ হামাগুড়ি দিতে থাকল, গোসাপের মত ওরা হাঁটছে। শুকনো জমি, উত্তাপে সব ঘাস জ্বলে পুড়ে গেছে। ওদের হাঁটু থেকে, কনুই থেকে রক্ত ঝরছিল। ওদের হুঁশ ছিল না, ওরা বীজধানের জমি নাগাল পাবার জন্য অধীর এবং বীজধানের ভুঁই নাগাল পেয়ে নিশি আনন্দে প্রায় কিছুক্ষণ জমিতে হাত রেখে মড়ার মত পড়ে থাকল।

সোনামণি ডেকে উঠল, মানুষটা কতকাল অন্নের মুখ দেখেনি, কতকাল ওরা অন্ন ভোজন করেনি, সোনামণি ভয়ে ডেকে উঠল, 'হেই!' মাথার চুল ধরে টানল। 'হেই, কি হয়েছে তুর!' সোনামণির ভয়, নিশি, দুবলা নিশি এত দূর আসতে গিয়ে ফুসফুসটা জখম করে ফেলেছে। ফুস করে হাওয়া বের হয়ে গেলে আর কি থাকল।

'নিশি। অঃ নিশি।' সোনামণি ফের ডেকে উঠল।

নিশি এবার চোখ মেলে তাকাল এবং খপ করে হাতটা ধরে ফেলল সোনামণির। তারপর ভুঁইয়ের ভিতর, কাদা জমির ভিতর নেমে গেল। ওরা প্রায় চারটা পাখির মত খুঁটে খুঁটে যেন ধান খেতে থাকল। খুঁটে খুঁটে খুব সন্তর্পণে—আলগোছে হাত বাড়িয়ে তুলে আনল ধান। একটা ধান, দুটো ধান, একসঙ্গে পাঁচটা সাতটা ধান তুলতে পারছে না। পাঁচটা সাতটা ধান তুলতে গেলে এক মুঠো কাদা উঠে আসছে। জ্যোৎস্না প্রায় মরে আসছিল। ওরা ধানের চেয়ে কাদা তুলে ফেলছিল বেশী। শশী খামারে বসে দড়ি টানছে ত টানছেই। এক মুহূর্তের জন্য থামছে না। থামলেই ওরা চারটা পাখি ভুঁইয়ের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। হাতে পায়ে কাদা, শরীরে কাদা—সর্ব অঙ্গে কাদা লেগে আছে। চোখ মুখ দেখলে এখন কে নিশি, কে সোনামণি, আর কে অঙ্গি বঙ্গি বোঝা দায়।

ঠিক পাখির মত ওরা এক পা দু পা করে এগুচ্ছিল। কাদার ভিতর হামাগুড়ি দিচ্ছিল। ধান খুঁটে যে যার গামছায় রাখছে। সোনামণি ধান তুলে আঁচলে রাখছে। ধানের সঙ্গে কাদা আর জমি থেকে জল শুষে আঁচলটা ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছে। ধান সামান্য, কাদা-জলে গামছা ভরে গেল নিশির। সে কি করবে ভেবে পেল না। ধীরে ধীরে সোনামণির কাছে বুদ্ধির জন্য উঠে গেল। কাছে গিয়ে দেখল সোনামণি গোসাপের মত কাদা হাতড়াচ্ছে। শরীরে কোন বাস রাখেনি। সোনামণির অঙ্গ ছোলা মুরগীর মত। গোটা শরীরটা ভুঁইয়ে বিছিয়ে রেখেছে। সে তাড়াতাড়ি ধান তুলে নিচ্ছে। কারণ শশীকে বড় ভয় সোনামণির। শশী বড় চেনা মানুষ। কঠিন মানুষ। মনে হতেই দাঁত শক্ত হয়ে গেল সোনামণির। কাপড় হাঁটুর উপর তুলে কটুবাক্য বর্ষণ করতে ইচ্ছা হল। বেইমান শশী, নেমকহারাম শশী। লজ্জা শরম মানুষটার দিন দিন উবে যাচ্ছে। পয়সা হাতে আসতেই শশী দুবেলা ডুগী কিনে দোকানের একটা দখল করে ফেলল। এখন শশী সোনামণিকে তাড়ি খাবার লোভ দেখায়। সোনামণির সোনার দানা চুরির লোভে নিশি বাড়ি না থাকলে শশীর ঘুরঘুর করা বেড়ে যেত। শশী—তুমি গোলাম হে শশী!' সোনামণির চোখে আগুন জ্বলছিল, কিন্তু ভয়ে লুকিয়ে আসছিল, আর সেই এক সিংহের খেলা দেখানো চোখ সোনামণির। সামান্য দূরে অঙ্গি বঙ্গি। সেচের জলে বীজের ধান, সেই ধান তুলে

এদিকেই এগিয়ে আসছে অঙ্গি বঙ্গি। আর সেই মানুষ নিশি, কুঁড়ে মানুষ বসে বসে সোনামণির তামাশা দেখছে। সোনামণি খ্যাক করে উঠল।

নিশি আমতা আমতা করে বলল, 'গামছাটা ভরে গেল সোনামণি। ধান নেবটা কিসে!'

'হা রে আমার মরদ!' সোনামণি ফের দুঃখে দাঁত শক্ত করে ফেলল। এখন রসের সময় নয়। নাচন-কোদনের সময় নয়। এখন শুধু ধান তুলে নেবার সময়। নিশিকে বসে থাকতে দেখে আগুনের মত ওর শরীর জ্বলে উঠছিল। সে কি ভাবল, কি দেখল নিশির, তারপর সহসা নিশির নেংটিটা হ্যাঁচকা টানে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। ঠিক যেন এক ভুজঙ্গ এখন ভুঁইয়ের মধ্যে পড়ে আছে চিত হয়ে।

নিশি বলল, 'হা ল সোনামণি, হা ল তুমি, আমি নিশি, আমি ঢোল বাজাই পূজা-পার্বণে, আমারে তুই উলঙ্গ করে দিলি!'

'মরদের কথা শুনে!' সোনামণি ধান রেখে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে কথা বলল। 'আমার সাধু রে!' সুমি ফের সাঁতার দিল কাদার ভিতর। 'কিছু জানে না মরদ!' খুঁটে খুঁটে কিছু ধান তুলে আনল। 'অঃ আমার গাজনে সন্ন্যাস নিয়েছে রে, জয় মহাদেবের বাচ্চা রে! যা যা ওটা বিছিয়ে যা, পারিস তুলে লেগা!' সোনামণি আর তাকাল না নিশির দিকে। মাথার উপর এখন আর দাঁড়টা নড়ছে না। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। 'শশী তুমি বড় চতুর হে। তুমি নিশিকে টাকা দিয়ে বশ করেছ!' আর তখন চারিদিকে খরা, আগুনের মত ঝিল্লি মাঠময়, গরু বাছুর জলের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। 'আর শশী তুমি বড় চতুর হে। তাড়ির খোঁজে তুমি শশী বন-বাদাড়ে ঘুরঘুর করছিলে!'

নিশি সেদিন বাড়ি ছিল না। অঙ্গি বঙ্গি নিশির সঙ্গে ঢোল বাজাতে চলে গিয়েছিল দূর গাঁয়ে। তখন সোনামণি, একা সোনামণি বন-বাদাড়ে, ঝোপে-জঙ্গলে কচু কন্দ খুঁজে মরছে। তখন হনুমানটা গাছ থেকে লাফ দিয়ে একেবারে সামনে নেমে ভূতের মত পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকল। আর যায় কোথায় সোনামণি। সে ঝোপের ভেতর থেকে বলল, 'অঃ ভালমানুষের ছা, দেখ ত গাছে ওটা কি?' আর যখন লোকটা গাছ দেখতে গিয়ে বলল, কে কোথাও ত কিছু দেখতে পেচ্ছি না রে সোনামণি, কই রে, কি দেখালি তুই, কি দেখাবি তুই আমারে...' তখন সোনামণি তাড়াতাড়ি ঝোপ থেকে বের হবার ফাঁক খুঁজছে। বের হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সব লতাপাতার ঝোপ। কোনরকমে লতাপাতা গা থেকে সরিয়ে মাঠে নেমে যাবার চেষ্টা করছে। এবং বলছে, 'দ্যাখ দ্যাখ গাছের মাথায় পাখি, পাখিটা ডিম পাড়ছে দ্যাখ।' কিন্তু হায়, মানুষটা গাছ দেখছে না, সে সোনামণিকে দেখছে——'আমি বলি, ঝোপের ভিতর কি খচখচ করে, দেখি নিশির বউ সোনামণি।' বলে মুখটা ঝোপের কাছে নিয়ে হা হা করে হেসে উঠল। কথা শুনে সোনামণি বলল, 'অত হাস্য ভাল নয় শশী।' কেমন শুকনো গলায় কথাটা বলল এবং ঝোপের ভিতর একটা পাখি হয়ে বসে থাকল। চীৎকার করতে পারল না। কেউ কোথাও নেই। এই ভর দুপুরে এত বড় মাঠে খরা বলে কেউ নেই। আগুন জ্বলছে মাঠে, শশীর সুদের কথা মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে শশী সেই যেন এক আলিসান ভুজঙ্গ

—হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের ভিতর ঢুকতে চাইছে। সোনামণি বলল, 'অ মা গ!' বলে ফুড়ুত করে মাঠের ভিতর উড়ে যেতেই খপ করে আলিসান ভুজঙ্গটা ওর একটা পা কামড়ে ধরল যেন। 'পাখি গাছে ডিম পাড়ে, বড় বড় ডিম, মুরগীর মত ডিম।' তারপর সোনামণির শরীরের ভিতর কোথাও না কোথাও ডিম আছে, মুরগীর ডিম লুকানো আছে. সোনামণি শরীরে মুরগীর ডিম লুকিয়ে রেখেছে—আর যায় কোথায়, শশী ডিমের জন্য, ডিম বের করার লালসায় ওকে তছনছ করে দিতে গিয়ে দেখল, সোনামণি ওর হাতে কামড় বসিয়ে দিয়েছে।

সোনামণির চোখ দুটো কাল-ভুজঙ্গের মত ফোঁস ফোঁস করছিল তখন। সোনামণির কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। কচু কদু ফেলে সোনামণি একসময় ছুটতে থাকল।

নিশি এখনও পাশে বসে রয়েছে। ওকে সোনামণি টান মেরে উলঙ্গ করে দিল। সে রাগে দুঃখে প্রায় কথা বলতে পারছিল না। সোনামণিকে বড় ভয় তার। তবু কাতর গলায় বলল, 'আমি ঢোল বাজাই, পাপ ফেলে পুণ্য আনি, তু আমারে সোনামণি উলঙ্গ করে দিলি।'

সোনামণি ধান দেখে রসে বশে আছে। ওর সব দুঃখ কষ্ট এই ধান, এত ধান হরণ করে নিয়েছে। সে উল্লাসে প্রায় নীচু গলায় গান ধরে ছিল, 'হায় মা, কে কার তরে চুরি করে হে মা ঈশ্বরী।' তারপর বলল, 'কত সোনার চান্দে পরান কান্দে...অঃ নিশি তু আমারে মেরে ফেল রে!'

কিসে কি কথা হয়, নিশি বোঝে না। সোনামণি এখন প্রায় পাগলের মত হাসছে। কথা বলছে। কথা ত নয়, যেন সুর ধরে চড়ক পুজার দিনে মেলার শুনি মাসীর মত কণ্ঠ খুলে দিয়েছে। বিরক্ত হয়ে নিশি বলল, 'তর পরান এত উথাল-পাথাল করে কেন রে সোনামণি?'

তখনই খামারবাড়িতে কার গলা যেন হেঁকে উঠল, 'ও সামুতে কার গলা পাই হে। এত রাতে কার গলা পাই হে!'

সোনামণি গলা চিনতে পেরে বলল, 'হেই, হেই নিশি, কি বুলছে শুনে লিচ্ছিস।'

'কি বুলছে?'

'বুলছে, কার গলা পাই হে।'

নিশি, দুবলা নিশি তাড়াতাড়ি করে মাথায় পোঁটলা তুলে ছুটতে থাকল। মেয়ে দুটো বাপের পেছনে ছুটতে থাকল। যাবার সময় নিশি বলছিল, বুলেছি না অত হাস্য ভাল লয়।'

'ও সামুতে কে কথা বলে হে? জবাব লেই কেন হে।'

অন্ধকারে মনে হল শশী দানবের মত থপথপ করে খামারবাড়ি থেকে নেমে আসছে। আকালের ঘণ্টা ওর হাতে এখন বাঁধা নেই। অথবা মনে হল, কালো কুচকুচে এক ভুজঙ্গ পাখি ধরার জন্য নেমে আসছে। সে খুব জোরে হাঁকছিল না। কারণ ফাঁদের ভেতরে পাখি ধরা পড়েছে—ও যেন গলা শুনে আকালের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে সব টের পাচ্ছিল। সুতরাং সে চোর চোর বলে জোরে পর্যন্ত চেঁচাল না।

চাঁদের আলোটুকু পর্যন্ত মরে গেছে। নির্দোত রাতের অন্ধকার তেমনি জমাবন্ধ। বিলে সেই এক পাখি এখনও ডাকছে। আর কাদাজলের ভিতর সোনামণির পায়ের শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছিল। সে নিশির সঙ্গে ছুটে যেতে পারল ন। নিশি ছোট্ট এক পুঁটলি মাথায় করে দ্রুত চলে গেল। কিন্তু সোনামণির পুঁটলি ভারি, সে কিছুতেই বোঝাটা মাথায় তুলতে পারল না। দুরে নিশি ছুটছে। অঙ্গ বঙ্গ ছুটছে। সোনামণি মাথায় তুলে নেবার জন্য আরও দুবার চেষ্টা করল। বার বার চেষ্টা করল। বার বারই জলে কাদায় পড়ে যাচ্ছে সোনামণি, পা হড়কে যাচ্ছে, পা শক্ত করে কাদার ভিতর দাঁড়াতে পারছে না। পালাবার জন্য বোঝা নিয়ে কে টানাহ্যাঁচড়া করতে থাকল—টেনে টেনে বোঝাটা ভুঁইয়ের এক পাশে নিয়ে আসার চেষ্টা করল—পারল না। চোখ মুখ ক্রমশ শুকিয়ে আসছে ভয়ে। ক্রমশ সোনামণির হাত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। শশী এখন সেই এক দানবের মত অথবা সেই এক আলিসান ভুজঙ্গ খাব খাব করছে। যেন বড় জৌলুস শশীর, আর হায় সোনামণি সামান্য এক প্রাণ, কাদার ভিতর পাখির মত ধরা পড়ে গেল।

শশী রসিকতা করে যেন হাঁকল, 'সাহস ত বড় কম লয় হে। জবাব দিচ্ছ না ক্যানে!'

সোনামণি বুঝল, এত বড় বোঝা ওর তুলে নেবার ক্ষমতা নেই। বুঝল, এত কষ্টের সংগ্রহ, প্রাণের চেয়েও মূল্যবান পুঁটলিটি ফেলে গেলেও রেহাই পাবে না। এখন ছুটতে গেলেও ধরা পড়ে যাবে।

শশী এখন হাত দশ দুরে দাঁড়িয়ে আছে। সে আর এগুল না। সে বোধ হয় দাঁড়িয়ে পাখিটার তামাশা দেখছিল। কাদার ভিতর হুটোপুটি দেখছিল। শেষে দরাজ গলায় যেন পাখি আর পালাতে পারবে না, এমন এক দরাজ গলায় হাঁকল, 'কে ভুঁইয়ের ভিতর হুটোপুটি করছে হে।'

অন্ধকারে সোনামণি কি করবে ভেবে পেল না। ভয়ে উত্তেজনায় অস্থির সোনামণি। তবু ছুটে একবার দেখতে পারে। এখনও সময় আছে। যখন আর উপায় নেই, শশীই ওর কাল-শশী......ওকে ধরে ফেললে দুবলা নিশিকে নিয়ে পর্যন্ত টানাটানি হবে তখন মাঠের ভিতর দিয়ে ছোটাই ভাল। সে ওর সোনার ধান্য ফেলে ছুটতে থাকল।

'কে আছ হে। দ্যাখ, দ্যাখ, চোর পালাচ্ছে। খামারে চোর পড়েছে।' শশী এই বলে হাসা ছড়াল। তারপর শশী চোর ধরার মত অন্ধকারে সোনামণির পেছনে পেছনে ছুটতে থাকল। সোনামণি আপ্রাণ ছুটছে, অন্ধকারে ছুটছে। তারকাটার বেড়া সামনে। বেড়াটার সামনে সোনামণি পথ পেল না পালাবার। শশী চোরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কিন্তু সোনামণির গা পিছল, কাদাজলে গা পিছল। পাঁকাল মাছের মত সোনামণি শশীর শক্ত বাহু থেকে হড়কে গেল। হড়কে

গিয়ে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য সোনামণি। সোনামণি অন্ধকারে ছুটছে, যেদিকে ভুঁই আছে সেদিকে ছুটছে। সেই অন্ধকার মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে দু হাত উপরে তুলে জনহীন প্রান্তরে শশী চীৎকার করে উঠল, 'তুমি সোনামণি, তুমি জান না আমি শশী, আমি কাল-শশী। তোমাকে আমি ফাঁদে ফেলেছি হে সোনামণি।' ফাঁদের কথা শুনে সোনামণি আর ছুটতে পারল না। হাত পা অসাড় হয়ে গেল। চারিদিকে অন্ধকার, চারিদিকে তার কাঁটার বেড়া আর সেই আকালের ঘণ্টা কে যেন কেবল বাজিয়ে চলছে। 'হা মা ঈশ্বরী আর ছুটতে লারছি।' বলেই সে ভুঁইয়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। জমির পাড়ে দাঁড়িয়ে শশী হা হা করে সেই এক হাস্য ছড়াল। খাকী হাফ-প্যান্ট পরা শশী কাদার ভিতর নেমে গেল। উদোম গায়ে শশী সোনামণিকে সাপটে ধরল। কিন্তু হড়কে যেতেই শুকনো জমি থেকে ধুলো মাটিতে হাত শুকনো করে এল। তারপর ফের কাদার ভিতর নেমে সোনামণিকে মরা মাছের পাখনা ধরে টানার মত একটা হাত টেনে তুলল উপরে। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'আমার ভুঁইয়ে খোলা গায়ে মুরগী ওড়ে, এ কি তাজ্জব হে!' কিন্তু কোন জবাব নেই। কাদার ভিতর মড়ার মত পড়ে আছে সোনামণি। শশী শরীরের ভিতর হাত দিয়ে কি খুঁজল, শেষে হাঁটু গেড়ে পাশে দু হাত রেখে কাদা থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল, বড় পলকা শরীর সোনামণির। সে তাকে কাঁধে তুলে নিল। দূরের মজা দিঘিতে ধুয়ে পাকলে নেবার জন্য শশী হাঁটছিল। দু পা যেতেই সোনামণি কাঁধ থেকে হড়কে নীচে পড়ে গেল। আর শশী শক্ত করে ধরতেই সোনামণি যেন প্রাণ পেয়ে গেল। সে আবার ছুটছে। শশীর শরীর ভারি, সে কাদার ভিতর ছুটতে পারছিল না। সোনামণির পলকা শরীর সে সামান্য আরামে প্রাণ পেয়ে গেল, সে উড়ে উড়ে পাখির মত ভুঁইয়ে খেলা দেখাতে থাকল শশীকে। সে প্রায় উড়ে উড়ে ছুটতে থাকল। সে এই কাদার ভিতর শশীকে ঘুরিয়ে মারছে। সেই যেমন নিশি একদিন এক মাঠে এক ভুজঙ্গ নিয়ে ঘুরে ঘুরে খেলা করছিল, মাঠের ভিতর তেমনি সোনামণি এক ভুজঙ্গ নিয়ে কাদায় ভুঁইয়ে লড়ছে। কিন্তু হায়, এ খেলা বিষম খেলা। ভুজঙ্গ পাখি ধরার জন্য লড়ছে, পাখি প্রাণ বাচানোর জন্য লড়ছে। ফাঁদের ভেতরে পাখি। শুধু ছটফট করা যায়। সোনামণি খেলার শেষ পর্যন্ত হেরে গেল। কারণ পা হড়কে পড়ে গিয়ে সে কাদার ভিতর আটকে গেল। শশীরও তর সইছে না। সে হাঁটু মুড়ে কাদার ভিতর বসেই বলে উঠল, 'খোলা গায়ে মুরগী ওড়ে, হায় কত সুখ রে।'

সোনামণি জবাব দিল না। মরা গোসাপের মত চিত হয়ে পড়ে থাকল।

কারণ এতটুকু শক্তি আর সোনামণির অবশিষ্ট ছিল না। সামান্য যেটুকু শক্তি সে শুধু বিলাপের জন্য, সে নীচে পড়ে শুধু বিলাপ করতে থাকল, হ্যাঁ রে নিশি, তুই আমারে ফাঁদে ফেলে চলে গ্যালি রে! হ্যাঁ রে নিশি, আমার সোনার ধান্য চুরি যায় রে!'

শশী বলল, 'সোনার ধান্য আমার।'

সোনামণি বলল, 'সোনার ধান্য আমার। তু আমার সোনার ধান্য চুরি করে লিচ্ছিস।' বলেই হক করে শশীর গলাটা কামড়ে ধরল। ভালমানুষের ছা শশী মুরগীর মত, জবাই করা মুরগীর মত উঠে দাঁড়াল। দু-তিনটে বড় লাফ দিল কাদার ভুঁইয়ে, পাগলের মত দু হাত উপরে তুলে ঘুরে ঘুরে শেষে এক আলিসান ভুজঙ্গের মত লুটিয়ে পড়ল। সোনামণি, সামান্য এক প্রাণ-পাখি শশীর মত দানবের, যে আকালের ঘণ্টা বাজাত, প্রাণ হরণ করে চলে গেল। তখন থেকে থেকে পাখির ডাকটাও কমে গেছে, থেকে থেকে শশীর হ্যারিকেনটা খামারে দপদপ করে জ্বলছিল, শুধু জ্বলছিল। তেপান্তরের পাখিটা শূন্যে তখন উড়ছিল, ঘুরছিল আর বুঝি বলছিল—আকালের ঘণ্টা কে বাজায় দেখ।
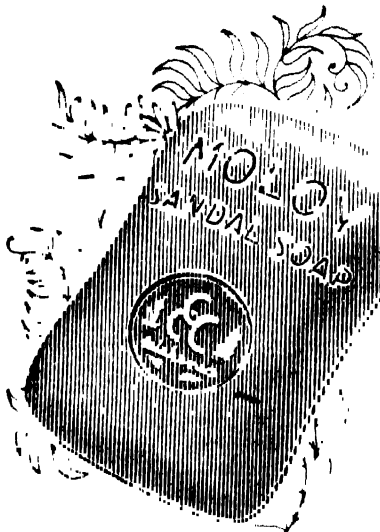
অন্নপূর্ণা

দূর থেকে দেখলাম অন্নপূর্ণাকে। আপন মনে কি যেন সে খুঁটে চলেছে। প্রাসাদোপম সরকারী সৌধ। ঔপনিবেশিক স্থপতির স্বাক্ষর সিঁড়ির সারি উঠে গেছে সোজা সুধা-ধবলিত প্রাসাদ পানে। দুধারে সাজানো পাতাবাহারের টব আর আসন্ন মৌসুমী আয়োজন চন্দ্রমল্লিকা চেয়ে আছে দলে দলে আসা যাওয়ার পথের দিকে। তারই এক কোণে, প্রায় সবার দৃষ্টি এড়িয়ে কি করছে ও? এগিয়ে গেলাম। অন্নপূর্ণাই বটে। সেই ধবধবে সাদা থান, কোঁকড়া কালো চুলের রাশি ঢাকা মাথায় একটু কাপড়, শান্ত স্নিগ্ধ শ্যামলা মেয়েটি বসে বসে নর্দমার দু পাশের আগাছা, শ্যাওলা সাফ করছে। নিঃস্বার্থ পরিশ্রম আর শখের খাটুনি খাটতে দেখেছি অন্নপূর্ণাকে। কিন্তু এখানে তাকে যেন কেমন ম্লান মনে হলো। আমাকে দেখে বিব্রত হয়ে হাতের কাজ ফেলে উঠে দাঁড়ালো। শ্রমের মর্যাদা দেবার প্রয়াসে দু'চারটে কথা বলতে গিয়ে মুখে আটকে গেল। কথাগুলো অন্নপূর্ণার আঁধার মুখকে কেমন যেন বিষাদের ছায়ায় ছেয়ে দিচ্ছিল।

অন্নপূর্ণাকে চিনি আমি অনেকদিন থেকে। কালিঘাটের আদিগঙ্গার এপারে যেখানে সরকারী ছাপাখানার মস্ত লাল বাড়ি তার সামনে দু'চার হাত এগিয়ে ওরা থাকতো। চেতলার বাজারে কি যেন ব্যবসা করতেন ওর স্বামী। দিন চলে যেতো। ছোট ছোট দুটি বাচ্চা কাছেই স্কুলে যেতো। অন্নপূর্ণা আপ্রাণ সেবায় সুন্দর করে রেখেছিল তার নোনা ধরা, প্রায় ভেঙ্গে পড়া ঘরটিকে। সব কাজের ফাঁকে ও আসতো আমাদের মহিলা সমিতিতে। আচার, বড়ি থেকে নিয়ে হাতের সেলাই অনেক কিছুই সে অল্প বিস্তর চর্চা করতো। মাঝে মাঝে মাসিক পত্রিকা আর সমিতির সম্পত্তি দু'চারখানা বই-এর লোভেও দুপুরটা কাটিয়ে যেতো। লাজুক প্রকৃতির মেয়ে। কথা বেশী বলতো না। তবু সবাই তাকে ভাল বাসতো। সেই অন্নপূর্ণাকে সিঁথির সিঁদুর মুছে, সাদা থান পরেও সমিতিতে আসতে দেখেছি। কাতর হ'লে তো চলবে না। শিশুদের ভবিষ্যৎ ভেবে সে বুক বেঁধেছিল।

কথার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে অন্নপূর্ণা নিজেই আমাকে বললো যে, শ্বশুর বাড়ি আর বাপের বাড়ির হিতৈষীরা সবাই তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার উপদেশ দিয়েছেন। দুর্গম পথ, আজকের জীবনযাত্রার যাত্রীকে তাই নির্ভরশীল হবার পরামর্শ তাঁরা দেবেন কি করে? কর্তব্য সম্বন্ধে উক্তি সব শুনে নিয়ে তাই অন্নপূর্ণা পায়ে দাঁড়িয়েছে। লেখাপড়া বেশী কিছুই জানে না। কি করে সে উপার্জন করবে ভেবে দিশেহারা হচ্ছিল। সহৃদয় এক প্রতিবেশী এই কাজের সন্ধানটি দিয়েছেন। তাই নর্দমার পাঁক পরিষ্কার করার পর ঘরে গিয়ে শিশুদের সামান্য কিছু খাবার সে দিতে পারে। বিনা বেতনের স্কুলে তারা ভর্তি হয়েছে। সেই আমাদের সমিতির চালানো পাঠশালা। এত দুঃখেও অন্নপূর্ণা শিশুদের কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেললো। জানেন ওরা কি বলে? শিক্ষয়িত্রীরা শিখিয়েছেন স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হ'লে পুষ্টিকর খাবার খেতে হয়। ময়লা হাতে খাবার ধরতে নেই। বাড়ি গেলে আমার নর্দমা ঘাঁটা হাতকে তাই বার বার ধুতে হয়! কিন্তু পুষ্টিকর খাবার কোথায় পাবো? কোথায় আমার সে ক্ষমতা যে হিসেব করে শিশুর যোগ্য খাদ্য যোগাবো?" এবার তার চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠলো। আচ্ছা আপনারা এ সব শেখান কেন? পাঠশালা পেতেছেন নিরন্ন সংসারেব শিশুদের নিয়ে আর কেন তাদের শেখাচ্ছেন অসম্ভবের হিসাব?

উত্তর দিতে পারলাম না। কেবল কি অন্নপূর্ণার ঘরেই এই সমস্যা? কথায় আর কাজে, শিক্ষায় আর সমস্যায় এমন বিপরীত ব্যবস্থা যে ভাবলে অবাক হ'তে হয়। এগিয়ে যেতে যেতে ভাবলাম আচ্ছা অন্নপূর্ণারা কেন এমন অসহায়? তবু তো সে উপার্জনের কিছু একটা পথ পেয়েছে। এমন অনেক মেয়ে আছে যার এটুকু ব্যবস্থাও নেই। অথচ নিয়ত নিয়তি তাদের নিয়ে যাচ্ছে সর্বহারাদের নির্দিষ্ট পথে। এও কি সমাজের এক বিরাট সমস্যা নয়?

মেয়েদের বেকার সমস্যার কথা বলতে গেলে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের কেউ কেউ হয়তো হেসেই উড়িয়ে দেবেন। যে দেশে পুরুষ বেকার হাহাকার করে ফিরছে সে দেশে আবার মেয়েদের বেকার সমস্যা ভাবতে পারা যায়? কিন্তু ভাবতে যে হবেই। সমস্যা যে ঠিক আর সামাজিক স্তরেও নেই। অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তায় মেয়ে উপার্জনক্ষম না হ'লে কি সাংঘাতিক অবস্থা হ'তে পারে তা বোধ হয় কনের বাবা মাও সব সময় ভাবেন না। আমি কিন্তু ভাল পাত্র পেলে বিয়ে দেবো। মেয়ে আমার পাশ করে কি করবে? কোনাও বা শুনি ম্যাট্রিক পাশ করিয়ে দিয়ে পরম তৃপ্তিতে মা জামাই খুঁজে আনেন। তারপর যদি কোন অঘটন ঘটে যায় তবে কি হবে তাঁরা চিন্তা করেন না। অঘটন না ঘটলেও কটি মধ্যবিত্ত সংসার আর আগের মত একজনের উপার্জনে মা পিসী নিয়ে অবলীলাক্রমে সংসার সাগর পার হ'তে পারে?

আরও একটি বেকারীর বিশেষ কারণ হচ্ছে মেয়েদের গতানুগতিক স্কুল কলেজ ধরে দু একটা পাশ দেবার চেষ্টা। আজকের বাজারে তারও দাম যে কত নেমে গেছে অভিভাবকরা ভাবতে সময় পান না। আশ্চর্যের বিষয় যে এখনও এমন পথ আছে যেখানে মেয়েরা কাজ করতে পারেন পেতে পারেন উপার্জনের পথ। অথচ ঠেলাঠেলি যেখানে বেশী সেখানেই সবাই যেতে চায়।

আমাদের গরীব দেশের বর্তমান অর্থ-

নৈতিক পরিস্থিতিতে অন্নপূর্ণাদের মত মেয়েকে আমরা পথে বসতে দেখি, কারণ আমাদের দূরদর্শিতার অভাব। এমন একটা কাজ যদি তার অধিকারে থাকতো যার উপার্জনক্ষেত্রে মূল্য আছে তবে তাকে পরিবর্তিত অবস্থা সামলে নিতে এমন নাজেহাল হতে হতো না। কাজ করতে আজ কোন মেয়ে না চায়? এমন যে দারুন বিত্তশালী মার্কিন দেশ সেখানেও মেয়েরা গত মহাযুদ্ধে যে একবার স্বাধীন জীবিকার স্বাদ পেয়েছে তারপর তারা এগিয়ে এসেছে, ফিরে আর যায় নি। যুদ্ধের পর ১০,০০০ কর্মী মেয়েকে ইন্টারভিউ করা হয়। শতকরা ৭৫ জন কাজে বহাল থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শতকরা ৮৪জন বলেন তাঁদের উপার্জন যে কেবলমাত্র নিজের উপর খরচ হয়েছে তা নয়। এই উপার্জনে সংসারে অনেক সাহায্য হয়েছে। শতকরা ৫০টি মেয়ে তো বললেন আয়ের অর্ধেক ঘরের খরচে গেছে। ১০০ জনের মধ্যে ১৫জন বললেন তাঁরা তাঁদের সংসারে একমাত্র উপার্জনশীল অংশীদার। চাকরি না করলে চলবে কেন?

এককালে কিন্তু পাশ্চাত্য জগতেও মেয়েদের বাইরের জীবন বড় একটা কেউ সুনজরে দেখতো না। অ্যারিস্টটল্ বলেছিলেন, মেয়েরা হবে আজ্ঞাবহ মাত্র। ফরাসী বীর নেপোলিয়ন সুন্দরী সমাজ ঘুরে ফিরে রায় দিয়েছিলেন, যুক্তি তর্ক করা মেয়েরা কোন কাজের নয়। মেয়েরা হবে সরল বিশ্বাসী। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে হিটলারের নাৎসী শাসন মেয়েদের ঘরের চার দেওয়ালে আটকে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সবই বিফল করে উপার্জনের দিকে মেয়েরা চলেছেন। সবটা শখে নয় যদিও। অবশ্য এর জন্য শিল্পপণ্যোৎপাদী সভ্যতা অনেকটা দায়ী। মেয়েরা শ্রমের বদলে অর্থমূল্য পেয়েছে কলকারখানার যুগেই বেশী। কৃষি ভিত্তিক জীবনে বহুক্ষেত্রে মেয়েরা ঘরে আর পুরুষ বাইরে কাজ করে শ্রম বিভাগের পর্ব সমাধা করতো। তাতে তাদের সুবিধা হতো অনেক।

আমাদের দেশে কলকারখানার বেলায়ও মেয়েরা দু-একটি স্তরেই কাজ করেন। বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সুযোগ বা আগ্রহের অভাবে কাজও সীমাবদ্ধ এবং সুবিধাও সীমাবদ্ধ। তার উপরে সবচেয়ে বড় কথা কলকারখানায় বাঙালী মেয়ে কমই আছেন।

আরও একটি বিষয়ে সমাজ বিশেষ উদাসীন। অবশ্য এ সমস্যা ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে। যাঁরা, বিশেষত যে মহিলাদের অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে উপার্জনের প্রয়োজন হয় তাঁদের উপায় প্রায় নেই বললেই হয়। এমন কোনও ট্রেনিং অনেকের নেই যার কদর সর্বদা থাকবে, লেখাপড়াও হয়তো তেমন করা নেই অথচ কিছু উপার্জন করতে না পারলে বেঁচে থাকা অসম্ভব। বিদেশে loss of income অথবা job status হয় বেশী বয়সের উপার্জনহীন অবস্থার সমস্যা। আমাদের বয়স্ক মেয়েদের বেলায় নেহাত বেঁচে থাকবার মত ব্যবস্থাটুকু হলেই চলে যায়। আজকাল অনেক মহিলা পরিচালিত দর্জীর দোকান হয়েছে। এ ধরনের ব্যবসায় হয়তো অনেক সময় বয়স্ক মহিলাদের সাহায্য করতে পারে। তবে তার জন্যও বিশেষ শিক্ষার তো প্রয়োজন আছেই তার উপর সংগঠনের কাজ সব সময় সবার দ্বারা সম্ভব হয় না। সংগঠন বা organigation বিনা কোনও ব্যবসায় দাঁড়াতে পারে না।

বিদেশে মহিলাদের চাকরি বা অর্থকরী কর্মসংস্থান নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামানো আরম্ভ হয়েছে। আগামী দিনের কর্মসংস্থান হিসাব করে শিক্ষা পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করা যেমন ছেলের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়েছে ঠিক তেমনি মেয়েদের ক্ষেত্রেও। পরিকল্পনা বা প্ল্যানিং-এর পাঁচটি দায়িত্বের মধ্যে কর্মসংস্থানের স্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমের বিত্তশালী দেশগুলিতে গৃহকর্ম জীবিকা হিসাবে নেওয়া মেয়েরা এত কমিয়ে দিয়েছেন যে domestic serviceকে নানা মর্যাদা দিয়ে, নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আকর্ষণীয় করতে সবাই উৎসুক। মেয়েরা সেখানে লন্ড্রি, রেস্টুরেন্ট, হোটেল সৌন্দর্য বা প্রসাধনাগার ইত্যাদিতে প্রচুর কর্মসংস্থান পেতে আরম্ভ করেছেন। ৭০ বৎসর আগে গৃহকর্ম ছিল উপার্জনশীল মেয়ের প্রধান পেশা, আজ বিশেষ শিক্ষিত নন এরকম মেয়েরাও অ্যাপ্রেন্টিস খেটে বা শিক্ষানবিশী করে বিশেষ বিশেষ জীবিকার সন্ধানে যেতে চান। শিক্ষানবিশী করাও যান্ত্রিক সভ্যতার বিশেষ অঙ্গ হয়ে উঠেছে। অথচ শিক্ষানবিশী করার ব্যবস্থা মেয়েদের জন্য আমাদের খুবই কম। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কাজে যোগ দেবার পর শিক্ষা হয়তো [illegible]য়া হয়।

কয়েকটি মহিলাদের উপযুক্ত উপজীবিকাতেও বাঙালী মেয়েদের অভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন ধরুন অফিস সেক্রেটারির কাজ। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্তারা বলেন বাঙালী মেয়েরা লাজুক। সেক্রেটারির কাজে যে চটপটে তৎপরতা প্রয়োজন তা বহু মেয়ের নেই। আমাদের মনে হয় তৎপরতাও প্রশ্ন নয়। এদিকে দৃষ্টি তেমন আসে নি। সিধে রাস্তায় বি এ বা এম এ পাশ করে চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতে মেয়েদের দেখা যায় অথচ এতগুলো বছর নষ্ট না করে অনেক আগেই তাঁরা অন্তত (কেউ কেউ) শর্টহ্যাণ্ড ইত্যাদি শিখে উপার্জনের এই পথটিকে ধরতে পারেন।

বিয়েতে যৌতুক বা জমিদারি দিতে পারুন আর নাই পারুন আজকের বাজারে প্রত্যেক পিতামাতার উচিত মেয়ের উপার্জনক্ষম ভবিষ্যতের চিন্তা করা। সাধারণভাবে স্কুলে বা কলেজে পাঠালেই সে দায়িত্বের শেষ হয় না। স্কুল কলেজের পাঠ উত্তর জীবনে তার কি কাজে লাগবে তা বিশেষভাবে ভাববার কথা। শিক্ষা যদি কাজে না লাগে তাকে জাতীয় অপচয় বলে ধরা

হয়। আমরা বলবো অতদূর যাবার দরকার কি? পারিবারিক অপচয়, ব্যক্তিগত অপচয় হিসাবে সে শিক্ষা কারও কাজে লাগবে না। উচ্চশিক্ষা অথবা বিদ্যার জন্য বিদ্যা এসব দু'একজনের ক্ষেত্রে চলে। সমষ্টিগত জীবনে শিক্ষা উন্নততর উত্তরজীবনের উপায় হওয়ার বাহন। উত্তরকালে অন্নপূর্ণারা আত্মীয়-স্বজনের আশংকার কারণ না হয়ে দাঁড়ান তাই হওয়া দরকার মেয়েদের শিক্ষার গোড়ার কথা। এজন্য সমাজ বা সরকারের যতটা দায়িত্ব, পারিবারিক দায়িত্ব তার চেয়ে কম নয়। কোনও রকম করে মেয়ে পার করলাম এভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার দিন চলে গেছে। অর্থনৈতিক পরিবর্তনে স্বাবলম্বী সুস্থ সাহসী মেয়ে সমাজের সামনে নূতন দিনের ভরসা আনতে পারবে। তাই ছেলেদের শিক্ষার মত করেই ভাবতে হবে মেয়ের ভবিষ্যৎ। দুঃখের বিষয় যে, বহু সংসারে মা-বাপের শত ইচ্ছা সত্ত্বেও সবটা সম্ভব হয় না। এখনও পারিবারিক অর্থনিয়োগের অংক ছেলেদের দাবি আগে। রেষারেষির প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে প্রয়োজন যে প্রায় সমান হয়ে উঠছে।

শ্রীমতী

ভারতের অর্থনীতি

শিল্প উৎপাদনের সমস্যা

এ বছর কৃষি উৎপাদন তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং শিল্পের উৎপাদন খুব অল্প হারে (শতকরা ২½) বেড়েছে। গত বাস্ত মরসুমে ৪০০ কোটি টাকার বেশী অর্থ সম্প্রসারণ ঘটেছিল; সুতরাং অর্থের অভাব আর্থিক ব্যবস্থাকে বিশেষ ব্যাহত করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। বস্তুত, প্রকৃত উপাদানের অনটন মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়।

উৎপাদন-ক্ষমতার ব্যবহার

হিসাব কমিটির একাদশ বিবরণ রাঁচীর ভারী যন্ত্রনির্মাণ কারখানায় অব্যবহৃত উৎপাদন-ক্ষমতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। অগ্রিম কেনার যে আলাপ আলোচনা এখন চলছে তা ধরলেও উৎপাদন-ক্ষমতার শতকরা ৩৫ ভাগ কাজে লাগানো যাবে না মনে হয়। অথচ ঐ কারখানায় ২৭ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সমেত মোট ৪৩ কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ করা হয়েছে। নিযুক্ত মূলধন ছাড়াও ইঞ্জিনীয়ারিং ও অন্য কার্যকুশলতা যে কাজে লাগানো হচ্ছে না, কাজের অভাব থেকে বাধ্যতামূলক আলস্য ও ব্যর্থতাবোধের মানবিক সমস্যার কথা ভুললে চলবে না।

শুধু চাহিদার যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি বলে নয়, দ্রব্যমূল্যস্ফীতি রোধ করার নামে বৈষয়িক উন্নয়নের গতি বর্তমানে যে শ্লথ করা হয়েছে সেটাই এখনকার অবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী। কয়লা, সিমেন্ট এবং অন্যান্য শিল্পের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে না পারার দরুন উৎপাদন পিছিয়ে পড়ছে। অসুবিধা ও সমস্যা দেখা দেওয়া মাত্র দ্রুত পশ্চাদপসরণ শিল্পোন্নয়নের প্রকৃষ্ট পথ নয়। যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলির কাজ শেষ করা এবং সেগুলি যাতে যথাসম্ভব শীঘ্র উৎপাদনক্ষম হয়ে ওঠে তার চেষ্টা করতে হবে।

উৎপাদন ব্যয়ের গুরুত্ব

গত কুড়ি বছর ধরে ভারতীয় শিল্প মূল্যবৃদ্ধির আবহাওয়ায় প্রসারলাভ করেছে। এ যাবৎ বিক্রেতাদের বাজার বজায় থাকায় উৎপাদন-ব্যয় সম্বন্ধে উদাসীনতা দেখানো হয়েছে। এই প্রথম শিল্পপতিরা ক্রেতাদের বাজারের সম্মুখীন হচ্ছে। এতকাল উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য সংরক্ষিত এবং নিশ্চিত বাজার ছিল বলে তাদের কাছে এখনকার এই পরিবর্তন অস্বস্তিকর ঠেকছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির অধীন যে-সব নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে সেগুলির বাজার সংরক্ষিত হওয়ায় উৎপাদন-ব্যয় সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব দেখা দিয়েছে। মূল্যস্ফীতি যখন আর্থিক ব্যবস্থাকে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলছে সে সময় ব্যয় সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। রপ্তানি এবং আমদানির পরিবর্ত উৎপাদন উভয় শিল্পের ভবিষ্যৎ বিকাশের সময় উৎপাদন-খরচের দিকে আরো মনোযোগ দেওয়া দরকার।

শিল্পের সংরক্ষণ

সংরক্ষণের সুবিধা তিন শ্রেণীর শিল্পকে দেওয়া যেতে পারে : অগ্রাধিকার শিল্পসমূহ, যেগুলির ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ আর্থিক ব্যবস্থার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ; আমদানি উদার করার ফলে যেসব শিল্প অধিকতর বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে, এবং শিশু শিল্পগুলি। সত্যকার শিশু শিল্পকে অবশিষ্ট শিল্পসমূহ থেকে আলাদা করতে হলে আকার এবং উৎপাদন-দক্ষতার উন্নতির সম্ভাবনার দিক হতে তাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

সমস্ত শিল্পের জন্য একটা সমান হারে আগল বেঁধে দেওয়া সম্ভবপর নয়। আনুষঙ্গিক ঝুঁকি, অর্থসংগতির প্রয়োজন, মূলধন বাজারের অবস্থা প্রভৃতির উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। সাধারণত সামান্য বাড়বৃদ্ধি শিল্পগুলি নির্ধারিত মূল্যস্তরের ভেতরেই খাপ খাইয়ে নিতে পারবে, আশা করা যায়। কিন্তু পরিচালকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনো বড়ো রকমের ব্যয় বৃদ্ধি ঘটলে, মূল্য বাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। রপ্তানি শিল্পের বিশেষ সমস্যাগুলি, যেমন রপ্তানির জন্য আবশ্যক সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে বহির্বাণিজ্য শুল্ক কমিশন অনুসন্ধান করতে পারে। সেই সঙ্গে, যে-সব শিল্পের উপর থেকে সংরক্ষণ তুলে নেওয়া হয়েছে সেগুলির উপর বেশ কিছু কাল ধরে নজর রাখার প্রয়োজন আছে।

যন্ত্র ও ধাতুদ্রব্য সংক্রান্ত শিল্পে আমরা যে উৎপাদনক্ষমতা নির্মাণ করেছি তার পূর্ণ ব্যবহার আভ্যন্তরিক চাহিদা থেকে সম্ভব নয়। তার জন্য বিদেশের বাজারে বিক্রি করার চেষ্টা করতে হবে। গত দুই দশকের ভেতর এই প্রথম ভারতীয় উৎপাদনকারীদের স্বাভাবিক প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার মুখোমুখি হতে হচ্ছে—উৎপন্ন দ্রব্য এখন বিদেশের বাজারে বিক্রির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা ছাড়া উপায় নেই। দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় এসেছে।

শান্তিকুমার ঘোষ
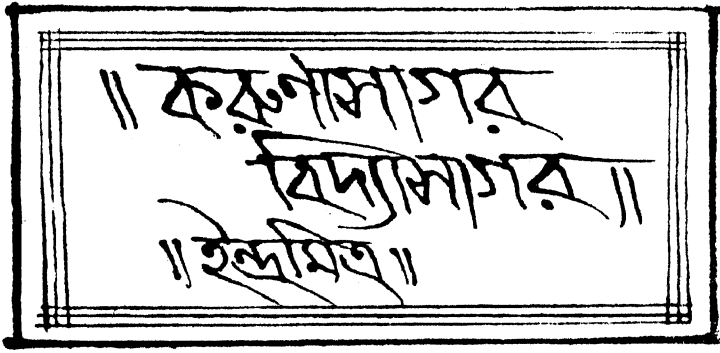
উনিশ

১৭৭৭ শকের চৈত্রে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখেছে : "যাহাতে এ দেশীয় বিধবাগণের দুঃসহ চির বৈধব্য যন্ত্রণা ও চির বৈধব্য নিবন্ধন নানা অবৈধ ব্যাপারের নিবারণ হয়, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কতিপয় বিচক্ষণ বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া সে বিষয়ে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন, বোধ হয় জগদীশ্বর তাঁহার শুভ সংকল্প সিদ্ধ করিবেন।"

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় সভাকবি ধীরাজ বিদ্যাসাগরের নামে একটা গান বেঁধেছে। গানটি, আচার্য কৃষ্ণকমলের মতে রুচিবিগর্হিত, অশ্লীল।

কিন্তু বিদ্যাসাগর ধীরাজকে নিজের বাড়িতে ডাকিয়ে আনতেন। বলতেন—ধীরাজ, একবার সেই গানটা গাও তো। সেই যে, 'বিদ্যেসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে...'

ধীরাজ সকলের সামনে গান ধরত :

বিদ্যেসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে,
পরাশরের ... ... দিয়েছে।

যে যাই বলুক, বিধবাবিবাহের আইন না থাকলে কিছুতেই কিছু হওয়ার নয়। যদি আইনসংগত না হয় কেবল শাস্ত্রসংগত হলে সবই নিষ্ফল। বিদ্যাসাগর তাই ভারত-গবর্নমেন্টের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন ১৮৫৫ সালের ৪ অক্টোবর। প্রায় এক হাজার লোকের স্বাক্ষর আছে সেই আবেদনপত্রে।

কাউন্সিলের অন্যতম সভ্য জে পি গ্রান্ট বিলের খসড়াটি ১৮৫৫ সালের ১৭ নভেম্বর কাউন্সিলে উত্থাপন করলেন। সমর্থন করলেন স্যর জেমস কলভিল।

১৮৫৬ সালের ৯ জানুয়ারি খসড়াটি দ্বিতীয়বার উপস্থাপিত হল।

বিচারের ভার অতঃপর অর্পিত হল একটি সিলেক্ট কমিটির হাতে। সিলেক্ট কমিটিতে রইলেন : স্যর জেমস কলভিল; এলিয়ট; পি ডবলু লিগেট; জে পি গ্রান্ট।

বিধবাবিবাহ আইন যাতে পাশ না হয় সেজন্য, ১৮৫৬ সালের ১৭ মার্চ, একটি আবেদনপত্র দাখিল করলেন রাধাকান্ত দেব। সেই আবেদনপত্রে প্রায় সাঁইত্রিশ হাজার স্বাক্ষর আছে।

সে সময়ে বিধবাবিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে নানা অঞ্চল থেকে ভারত গবর্নমেন্টের কাছে বহু আবেদনপত্র গেছে। সপক্ষের চেয়ে বিপক্ষের আবেদনপত্রের সংখ্যা বেশি। বিধবাবিবাহ আইনের বিপক্ষে যত স্বাক্ষরকারী আছেন আইনের সপক্ষে তত স্বাক্ষরকারী নেই। আরো বিশদ করতে গেলে বলতে হয় তুলনায় সপক্ষে স্বাক্ষরের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প।

১৮৫৬ সালের ৩১ মে সিলেক্ট কমিটি প্রস্তাবিত আইনের পক্ষে মন্তব্য দাখিল করল। ১৮৫৬ সালের ১৯ জুলাই খসড়ার পাণ্ডুলিপি তৃতীয়বার পঠিত হল।

১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়ে গেল। আইনটির নাম : Act XV of 1856, being an Act to remove all legal obstacles to the Marriage of Hindu Widows.

শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরই জয়ী হলেন। কিন্তু বিপক্ষ দলের তখনো আশা, আইন পাস হলেই বিধবাবিবাহ হবে এমন কোনো কথা নেই।

কিন্তু বিপক্ষ দলের আশা পূর্ণ হল না। সত্যি সত্যি বিধবাবিবাহ হল। ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বরের কথা। সেদিনই আইনসম্মত প্রথম বিধবাবিবাহ হল। পাত্রীর নাম কালীমতী দেবী। বয়স দশ বছর। পাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। এই বিয়েতে খরচ হয়েছে প্রায় দশ হাজার টাকা।

বিয়ে হল বিদ্যাসাগরের বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। বাড়ির ঠিকানা

বারো নম্বর সুকিয়া স্ট্রীট। সেদিন সন্ধ্যা-বেলা এই বাড়ির সামনে অসংখ্য মানুষের ভিড়। তিলধারণের জায়গা নেই কোথাও। রাস্তায় পুলিস পাহারা দিচ্ছে। দু হাত অন্তর একেকজন পুলিস। পাছে কোনো গোলমাল হয়, সেজন্য বিদ্যাসাগর আগে থাকতেই পুলিসের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। পথের ভিড় এমন সাংঘাতিক যে, বরের পাল্কি আর এগোতে পারে না। সারা শহর যেন ভেঙে পড়েছে, দেখতে এসেছে আইন-সম্মত প্রথম বিধবাবিবাহের বর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে। এত ভিড় দেখে শ্রীশচন্দ্র বুঝি একটু ভয় পেলেন। তখন বরের পাল্কির দু পাশে দাঁড়ালেন রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত এবং আরো কেউ কেউ। এঁরা সকলেই বিদ্যাসাগরের বন্ধু। বরের পাল্কি এগিয়ে চলল।

বিয়ে হয়ে গেল। বিদ্যাসাগরের জয়জয়কার।

কিশোরীচাঁদ মিত্রের ডায়েরি থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি: '৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৬। অদ্যকার দিন আমার দেশের ইতিবৃত্তে নবযুগের প্রারম্ভ বলিয়া গণ্য হইবে। অদ্য রাত্রি দুই প্রহরের সময় প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হইল।...আমি আহারাদির পর দাদা, শিবচন্দ্র দেব, গোপী ও অন্যান্য বন্ধুগণের সহিত গিয়াছিলাম। বাড়িতে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। নব্যবঙ্গের দল ত ছিলই, তদ্ব্যতীত গবর্ন-মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক এবং বালী ও অন্যান্য স্থানের কয়েকজন পণ্ডিত ও বাঙ্গালার প্রাচীন সম্প্রদায়ের দুই-একজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকল কার্যই নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হইল। পুরাতন শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি অনুসারেই ক্রিয়াটি আচারিত হয়। কন্যার মাতা লক্ষ্মী দেবী কন্যা সম্প্রদান করিলেন। যে ঘরে সম্প্রদান হয় সে ঘরে আমি ও রামগোপাল মাত্র উপস্থিত ছিলাম; পরিবারস্থ ব্যক্তি ভিন্ন আর কেবল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন, যাঁহার অবিশ্রান্ত উৎসাহ এবং অননুকরণীয় বুদ্ধিকুশলতার জন্যই এই শুভ ফল প্রধানতঃ উৎপন্ন হইয়াছে।"

প্রথম বিধবাবিবাহের পরদিনই দ্বিতীয় বিধবাবিবাহ হল। পাত্রের নাম মধুসূদন ঘোষ, পাত্রীর নাম কামিনী।

বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করেছেন বলে একদল লোক বিদ্যাসাগরের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল। বিদ্যাসাগর রাস্তায় বেরোলে চারদিক থেকে লোক এসে তাঁকে ঘিরে ফেলত। কেউ গালাগাল করত, কেউ ঠাট্টা করত, কেউ কেউ মেরে ফেলবার ভয়ও দেখিয়েছে। কিন্তু, না বললেও চলে নিশ্চয়ই, বিদ্যাসাগর কণামাত্র বিচলিত হননি।

একদিন শুনলেন, কলকাতার একজন বড়মানুষ তাঁকে মারবার জন্য লোক লাগিয়েছেন। ভাড়াটে গুণ্ডারা তক্কে তক্কে আছে। সুযোগ পেলেই বিদ্যাসাগরকে মারবে।

বিদ্যাসাগর সটান সেই বড়মানুষের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন একদিন। বড়মানুষটি তখন মোসাহেবদের নিয়ে মশগুল হয়ে আছেন, ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে মার খেয়ে বিদ্যাসাগরের কী দশা হবে সেই তত্ত্বকথায় ব্যস্ত আছেন। এমন সময় বিদ্যাসাগরকে সশরীরে দেখে নির্বাক হয়ে গেলেন সকলে।

কিন্তু বিদ্যাসাগর এখানে এসেছেন কেন?

বিদ্যাসাগর বললেন—শুনলাম, আমাকে মারবার জন্য আপনার ভাড়াটে লোকেরা আহার-নিদ্রা ছেড়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই আমি ভাবলাম, ওদের কষ্ট দেবার দরকার কি, আমি নিজেই যাই। নিজেই চলে

এলাম। এখন আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর পাবেন না।

যে-কোনো সময় বিদ্যাসাগরের দারুণ বিপদ হতে পারে, এ সংবাদ বীরসিংহে ঠাকুরদাসের কানে পেশছল। শ্রীমন্ত নামে একজন জেলে-সর্দারকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন তিনি। রাস্তাঘাটে শ্রীমন্ত সব সময় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। হাতে তার লাঠি। আর লাঠিতে শ্রীমন্ত ওস্তাদ।

একদিন রাত্রে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ থেকে বাসায় ফিরে আসছেন। ঠনঠনের কালীতলায় দেখলেন, কয়েকজন ষণ্ডামার্ক গুণ্ডা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। লক্ষণ ভালো নয়।

একবার শ্রীমন্তকে ডাক দিলেন বিদ্যাসাগর—কই রে ছিরে, সঙ্গে আছিস কি?

পিছন থেকে শ্রীমন্ত বলল—তুমি চলো না। কে আসে যায়, সে আমি দেখব। তুমি চলে যাও। চাকর সঙ্গে আছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ বিধবাবিবাহ করেন দুর্গানারায়ণ বসু ও মদনমোহন বসু। দুজনেই স্বনামধন্য রাজনারায়ণ বসুর ভাই। দুর্গানারায়ণ জেঠতুতো ভাই। মদনমোহন সহোদর।

হ্যাঁ, রাজনারায়ণই, নিজ পরিবারে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করেছেন। দুর্গানারায়ণ যখন বিধবা বিবাহ করতে যাচ্ছিলেন, গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাল্কির ভেতর মুখ দিয়ে বললেন—দুর্গা, তোর মনে এই ছিল, একেবারে মজালি।

হরনারায়ণ দত্ত সে সময়ে মেদিনীপুরে গবর্নমেণ্ট উকিল। তিনি বলেছিলেন—রাজনারায়ণবাবু জানেন না যে, তিনি বাঙলা ঘরে বাস করেন।

অর্থাৎ বাঙলা ঘর অনায়াসে পুড়িয়ে দেওয়া যায়।

জঙ্গল থেকে একটা মোটা লাঠি কেটে নিয়ে এসেছেন রাজনারায়ণ। যদি দাঙ্গা হয় আত্মরক্ষা করতে হবে তো।

বিবাহকালে রাজনারায়ণের মা মথুরায়

ছিলেন। তিনি বাড়িতে থাকলে রাজনারায়ণ বোধ করি দ্ ভাইয়ের বিধবাবিবাহ দিতে পারতেন না। এই বিধবাবিবাহের জন্যে তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হয়েছিলেন। একদিন বলেছিলেন—রাজনারায়ণ. তোর মনে এই ছিল।

রাজনারায়ণের বাড়ি বোড়াল গ্রামে। বোড়ালের লোক সে সময়ে বলেছিল—রাজনারায়ণ বস্ গ্রামে এলে আমরা ইট মারব।

এ কথা শুনে রাজনারায়ণ বলেছিলেন—তা হলে আমি খুশী হব। আমি বাঙালীকে উদাসীন জাতি বলে জানি। এমন ঘটনা হলে আমি বুঝব. এখন বিধবাবিবাহের প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ যেমন প্রবল. বিধবাবিবাহ যখন ভালো মনে করবেন, তখন তার প্রতি তাঁদের অনুরাগও তেমনি প্রবল হবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন পশ্চিমাঞ্চলে। তিনি রাজনারায়ণকে লিখেছেন : "এই বিধবাবিবাহ হইতে যে গরল উত্থিত হইবে, তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে; কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।"

বিদ্যাসাগর একখানা চিঠিতে রাজনারায়ণকে লিখেছেন : "আপনি অসাধারণ সাহস প্রদর্শন পূর্বক বিধবাবিবাহের মঙ্গলার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছেন...। বস্তুত আপনি অতি মহাত্মার কর্ম করিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নানা প্রকারে আপনার মনের যেরূপ ক্লেশ হইতেছে আর কাহাকেও সেরূপ ক্লেশ পাইতে হইতেছে না।"

১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহ হল। তখন কেউ কেউ রটনা করেছেন যে, বিধবা-বিবাহ আইন পাস হয়েছে বলেই এই সিপাহী-বিদ্রোহ হল, আর বিধবাবিবাহ হবে না।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "সন ১২৬৪ সনের অগ্রহায়ণ মাসে অগ্রজ মহাশয় সিসিল বীডন মহোদয়কে বলিয়াছিলেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহ-নিবন্ধন বিধবাবিবাহ কার্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইহা শ্রবণ করিয়া সিসিল বীডন মহোদয় বলিলেন : "যখন আমাদের তরবারির উপর নির্ভর, তখন ভয় করিয়া বিধবাবিবাহ-কার্য স্থগিত রাখা তোমার কর্তব্য নয়।" অনন্তর তাঁহার কথা শুনিয়া পুনর্বার বিধবাবিবাহ দিতে যত্নবান হইলেন।"

১৭৮০ শকের আশ্বিনে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখেছে : "শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের পত্রিকাতে উল্লিখিত হইয়াছিল যে, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে হুগলী জিলার অন্তঃপাতী রামজীবনপুর প্রভৃতি গ্রামে সাতটি বিধবা-বিবাহ নির্বাহ হইয়াছে। পরে ১লা ও ১৭ই ভাদ্রে চন্দ্রকোনা নগরে আর দুইটি বালিকা বিধবা কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ১২ই আষাঢ় অবধি ১৭ই ভাদ্র পর্যন্ত এ অঞ্চল সমুদয়ে নয়টি বিধবার বিবাহ হইয়া গেল। এরূপ স্বল্পকাল মধ্যে এতগুলি বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হওয়া অল্প আহ্লাদের বিষয় নহে। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই যেন তাঁহার প্রসাদাৎ এই শুভকর ব্যাপার এতদ্দেশে অবিলম্বে প্রচলিত হইয়া উঠে।"

আরো অনেক বিধবাবিবাহ হয়েছে, কিন্তু সমস্ত বিধবাবিবাহের বিবরণ উদ্ধার করা দুঃসাধ্য এবং হয়তো আপাতত অনাবশ্যক।

কোনো বাধা-বিপত্তি গ্রাহ্য করেননি বিদ্যাসাগর। মনে-প্রাণে যা ভালো বুঝেছেন, চিরকাল নির্ভয়ে তাই করেছেন। কারো অন্যায় বা ভীরুতা তিনি মুখ বুজে সহ্য করতে পারেননি।

বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে অনেকেই বিদ্যাসাগরকে উৎসাহ দিয়েছেন, সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর বিশ্বাস করেছেন সকলকে, কিন্তু তার ফল ভালো হয়নি। কথা রাখেননি সকলে।

আগেই বলা হয়েছে, আইনসম্মত প্রথম বিধবাবিবাহ করেছেন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। সেই বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানে, শোনা যায়, রমাপ্রসাদ রায় উপস্থিত হতে

রাজী হননি। রমাপ্রসাদ রাজা রামমোহন রায়ের ছেলে। বিদ্যাসাগরের বন্ধু। আগে রমাপ্রসাদ কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি প্রথম বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অনিচ্ছুক কেন?

রমাপ্রসাদ বললেন—আমি তো ভেতরে ভেতরে আছিই। সাহায্যও করব, তবে বিবাহস্থলে না-ই বা গেলাম।

এ তো সাহসীর কথা নয়, ভীরুর কথা। হায়, রাজা রামমোহন রায়ের ছেলের মুখে এই কথা!

রাগে ও বিরক্তিতে বিদ্যাসাগর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। চোখ পড়ল দেয়ালের দিকে। দেয়ালে একখানা ছবি, পরম সাহসী মহাপুরুষের ছবি, রাজা রামমোহনের ছবি। বিদ্যাসাগর ছবিখানার দিকে তাকিয়ে বললেন—ওটা ফেলে দাও, ফেলে দাও।

বিধবাবিবাহ ব্যাপারে যাঁদের কাছে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল, তাঁদের অনেকের কাছেই সাহায্য মেলেনি। কিন্তু একেকটা বিধবাবিবাহে বিস্তর খরচ। উপযুক্ত সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না, অতএব বিদ্যাসাগর ঋণ করে অনেক বিধবাবিবাহের খরচ চালিয়েছেন। ঋণের দায়ে বিদ্যাসাগরের প্রায় সর্বস্বান্ত হবার দশা।

সে সময়ে এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর লিখছেন : "অধিকাংশ ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্য দানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। উত্তরোত্তর এ বিষয়ের ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু আয় ক্রমে খর্ব হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আমি বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। সেইসকল ব্যক্তি অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলে আমাকে এরূপ সঙ্কটে পড়িতে হইত না। কেহ মাসিক, কেহ এককালীন, কেহ বা উভয় এইরূপ নিয়মে অনেকে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কোন হেতু দেখাইয়া, কেহ বা তাহা না করিয়াও দিতেছেন না।...এইরূপে আয়ের অনেক খর্বতা হইয়া আসিয়াছে কিন্তু ব্যয় পূর্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং এই বিষয় উপলক্ষে যে ঋণ হইয়াছে তাহার সহসা পরিশোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক আমি এই ঋণ পরিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতেছি। অন্য উপায়ে তাহা না করিতে পারি, অবশেষে আপন সর্বস্ব বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ করিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।..."

বিধবাবিবাহের দৌলতে বিদ্যাসাগরের তখন বিস্তর ঋণ। বিদ্যাসাগরকে সেই ঋণভার থেকে মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হলেন স্বনামধন্য প্যারীচরণ সরকার।

চাঁদার খাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন প্যারীচরণ। চলে এলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কাছে।

প্রসন্নকুমার চাঁদার খাতায় সই দিলেন না। উপরন্তু, ধর্মবিরোধী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে বলে প্যারীচরণকে দু-কথা শুনিয়ে দিলেন।

সব কথা যথাসময়ে বিদ্যাসাগরের কানে গেল। অপমানিত বোধ করলেন বিদ্যাসাগর। প্যারীচরণ প্রসন্নকুমারের কাছে না গেলে এ অপমানের হাত থেকে বাঁচা যেত। প্যারীচরণের জন্যই এই অপমান হল।

অসন্তুষ্ট হলেন বিদ্যাসাগর। আপন অসন্তুষ্টি জানানোর জন্য একজন ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দিলেন প্যারীচরণের কাছে। ভদ্রলোক প্যারীচরণের বন্ধু, বিদ্যাসাগরেরও বন্ধু।

ভদ্রলোক প্যারীচরণের বাড়িতে এসে পাঁচজনের সামনে প্যারীচরণকে বললেন—বিদ্যাসাগরকে তোমার এরকম অপমান করানো ভারি অন্যায়।

এবং আরো অনেক কথা।

কিছুই বুঝতে পারলেন না প্যারীচরণ। কোথায় অপমান করানো হল বিদ্যাসাগরকে?

ভদ্রলোক আপন বক্তব্য সবিস্তারে বললেন। তখন প্যারীচরণ বুঝতে পারলেন, উপকার করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের অপকার করেছেন তিনি, বিদ্যাসাগরের বিরাগের কারণ হয়েছেন।

প্যারীচরণ সবিনয়ে বললেন—আমি না জেনে অন্যায় কাজ করেছি। সেজন্য যারপরনাই দুঃখিত। বিদ্যাসাগরকে বলবেন, তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন।

বিধবাবিবাহের জন্য বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত নিদারুণ বিপন্ন হয়ে পড়েছেন।

সিসিল বীডন তখন বাঙলা দেশের ছোটলাট। কথায় কথায় বীডন সাহেব একদিন জানতে পারলেন যে, বিদ্যাসাগর বিপন্ন। বীডন সাহেব বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি আবার সরকারী চাকরি নিতে ইচ্ছুক?

বিদ্যাসাগর তখন অনিচ্ছুক।

বছরখানেক বাদে, যা ছিল ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার, তা প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিল। এত দূরে বিপন্ন হয়ে পড়লেন বিদ্যাসাগর যে, আবার সরকারী চাকরি নেবার কথা ভাবতে হল।। একখানা চিঠিতে সিসিল বীডনকে সে কথা জানালেন বিদ্যাসাগর।

তদুত্তরে বীডন সাহেব জানালেন যে, আপাতত বিদ্যাসাগরের উপযুক্ত কোনো কর্মখালি নেই; যা হোক, বিদ্যাসাগরের ইচ্ছার কথা বীডন সাহেব মনে রাখবেন।

দিনের পর দিন চলে গেল। বিদ্যাসাগর কোনো চাকরি পেলেন না। তারপর একদিন কথায় কথায় বিদ্যাসাগর বীডন সাহেবের মুখে শুনলেন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজে একজন সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হবেন। ওই কাজ কি বিদ্যাসাগর পেতে পারেন না? বিদ্যাসাগর প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক হতে রাজী আছেন। কিন্তু য়ুরোপীয় অধ্যাপকদের চেয়ে কম মাইনে

দিলে বিদ্যাসাগর কিছুতেই রাজী হবেন না। বিদ্যাসাগর বিপন্ন, প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের কাজ পেলে ভালো হয়, কিন্তু য়ুরোপীয় অধ্যাপকদের থেকে কম মাইনেয় প্রেসিডেন্সি কলেজে বহাল হয়ে বিদ্যাসাগরের পক্ষে আত্মসম্মান নষ্ট করা অসম্ভব। একখানা চিঠিতে বিদ্যাসাগর বীডন সাহেবকে সব কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন।

বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারলে খুশী হতেন বীডন সাহেব। কিন্তু বীডন সাহেবের বিশ্বাস যে, ভারত-সরকার য়ুরোপীয় অধ্যাপকদের সমান মাইনেতে প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক বহাল করতে রাজী হবে না। যা হোক, বীডন সাহেব বিদ্যাসাগরকে জানিয়ে দিলেন, বিদ্যাসাগরের নামোল্লেখ না করে এ বিষয়ে তিনি এটকিনসন সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে দেখবেন।

বিদ্যাসাগরের ধারণা ছিল, এ বিষয়ে বীডন সাহেবই বুঝি সর্বেসর্বা। জানতে পারলেন, তাঁর ধারণা ভুল। বীডন সাহেবকে নিতান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে বিব্রত করতে চাননি বিদ্যাসাগর, অতএব বিদ্যাসাগর আপন প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলেন, বীডন সাহেবকে অনুরোধ জানালেন যেন তিনি এ ব্যাপারে আর কোনো কষ্টস্বীকার না করেন।

সমস্ত বিষয়টির উপরে এখানেই যবনিকা পড়ল।

বিদ্যাসাগর তখন কলকাতার বাইরে গেছেন। বিধবাবিবাহের জন্য বিদ্যাসাগর ঋণভারে বিপন্ন, অতএব বিদ্যাসাগরের কয়েকজন বন্ধু প্রস্তাব করলেন, দেশবাসী চাঁদা দিয়ে বিদ্যাসাগরকে ঋণমুক্ত করুক। সেই প্রস্তাব ছাপার অক্ষরে কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হল।

কলকাতায় ফিরে এসে বিদ্যাসাগর ব্যাপারটা জানতে পারলেন। এবং সেই মুহূর্তে জনসাধারণকে এ বিষয়ে আপন বক্তব্য জানালেন :

"I take the earliest opportunity to declare distinctly and emphatically that the proposition has emanated wholly without my knowledge, far less with my consent . . . that it has never been my intention to appeal to the public for the liquidation of this debt. . . .

I have thought it proper to publish this statement solely and wholly in the interest of the cause. I do not care what people may think or say of me individually, but I should be extremely sorry to see anything done which, though originating with the best of motives, was calculated to harm the cause I have espoused. If the parties, who have set subscriptions on foot, had confined their efforts to the formation of a Widow Marriage Fund, and had not made allusion to my own liabilities for meeting which, I need hardly repeat, I had not and have not the remotest idea of appealing to the public, I would not have felt it necessary to remonstrate against the agitation. But the national object for which I am laboring has been so much mixed up with me personally that I must protest against the move under notice, and request those gentlemen who have initiated it to desist in their efforts."

মধুসূদন স্মৃতিরত্ন বিদ্যাসাগরের পরম বন্ধু। তিনি একদিন বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা বিদ্যাসাগর, দেশে এত লোক থাকতে তুমি কেন এ কাজে একা এগোলে?

বিদ্যাসাগর বললেন—যখন আরম্ভ করেছিলাম তখন কি আর একা ছিলাম। অনেকে মিলে-মিশে এ কাজে হাত দিয়েছিলাম, কিন্তু যারা মায়ের ব্যাটা তারা চুপে চুপে সরে গেল, মায়ের ছেলে মায়ের কোলে গেল, আর আমি বাপের ব্যাটা, কাজে কাজেই ধরা পড়লাম।

মনে রাখা দরকার, আপন উপার্জন থেকে বিদ্যাসাগর সব ঋণ পরিশোধ করে গেছেন।

বিধবাবিবাহ নিশ্চয়ই কোনো হাসিঠাট্টার ব্যাপার নয়। অন্তত বিদ্যাসাগরের পক্ষে নয়। কিন্তু খাশ বিধবাবিবাহের আসরে বসেও বিদ্যাসাগর বিধবা ও বিবাহ সম্পর্কে রঙ্গ করতে পেরেছেন। বিদ্যাসাগর বলেই পেরেছেন।

এক বিধবা-বিবাহের নেমন্তন্নে গিয়েছেন বিদ্যাসাগর। সেখানে একজন বন্ধুর সাত-আট বছরের একটি মেয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করল।

বিদ্যাসাগর বললেন—বেঁচে থাকো মা। বিয়ে হোক, বিধবা হও, আমি আবার বিয়ে দি।

উপস্থিত সকলে দরাজ গলায় হেসে উঠলেন।

বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে বললেন—আরে, আমার বন্ধুদের মেয়েরা বিধবা না হলে আমি বিয়ে দেব কাদের? (ক্রমশ)

স্কেচ —সুনীল দাশ

স্পাইস-এর উদ্যোগে প্রদর্শনী

সম্প্রতি কলিকাতায় শিল্পী স্মরজিত গুপ্ত, জয়রচাঁদ দাশানি, সুনীল দাশ, প্রহ্লাদ কর্মকার ও সুকুমার দাস প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন।

স্পাইস (SPICE)-এর উদ্যোগে শিল্পী সুনীল দাশের প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয় কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রে। সুনীল দাশের অল্প বয়স এবং পরিশ্রমী, কর্মরত ও দক্ষ শিল্পী হিসাবে তিনি ইতিমধ্যেই সুনাম অর্জন করেছেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইনি নানা স্থানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীতে শিল্পীর গত দশ বৎসরে রচিত বিভিন্ন কাজের নিদর্শন পেশ করা হয়।

কোনও জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী যদি বিভিন্ন জলসায় একই ঘরানার একই রাগ পরিবেশন করেন শ্রোতাদের সেটা সব সময়ে শ্রুতি-মধুর লাগে না। সেই রকম শিল্পী যদি বৎসরে তিন চারটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন চিত্রামোদীদের হয়ত সেগুলি তত ভাল লাগবে না যদি না তাঁরা শিল্পীর কাছ থেকে নতুন কোনও রসের সন্ধান পান। সুনীল দাশ বহু ছবি এঁকেছেন এবং প্রদর্শনীতে যেগুলি পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই ইতিপূর্বে তিনি সকলকে দেখার সুযোগ দিয়েছেন। সুতরাং প্রদর্শনীতে নতুন ছবির সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। তা হলেও গত দশ বৎসরে রচিত চিত্রসম্ভারের মধ্য থেকে নিজস্ব মনোনীত প্রায় ৫০খানি ছবি পেশ করে তিনি সকলকে তাঁর রচনাপদ্ধতির বিবর্তনটুকু বোঝবার সুযোগ দিয়েছেন—তবে একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এ হেন বৃহৎ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা অন্য কোনও বৃহত্তর গ্যালারীতে করলেই উপযুক্ত হত। অবশ্য পরিমিত স্থানের মধ্যে ছবিগুলি যথাযথভাবে রেখে স্পাইস সভাগণ সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন।

শিল্পী হিসাবে সুনীল দাশ সজাগ ও প্রগতিবাদী। স্পেনে থাকাকালীন ঘোড়া ও ষাঁড়ের বিভিন্ন রকমের বলিষ্ঠ স্কেচ মাধ্যমে তিনি প্রতিভার পরিচয় দেন এবং সে স্কেচগুলি সকলেরই মনে আছে। তবে শিল্পী কালের গতির সংগে সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন ও অন্যান্য দেশে যে মাধ্যম ব্যবহৃত হতে শুরু হয় তিনিও তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। বাস্তবিকপক্ষে অল্প শিল্পীই এঁর মত নানা বিচিত্র মাধ্যম নিয়ে রচনাসৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। ফলে, বালি, সিমেন্ট জাতীয় মশলা, কড়ি এমন কি রচনাক্ষেত্রের কোনও কোনও স্থান পুড়িয়েও তার মধ্য থেকে রসের সন্ধান করে গেছেন। তা ছাড়া, তেলরঙ ও কোলেজ মাধ্যম ত আছেই। মুখ্যত সুনীল দাশ বিমূর্ত শিল্পী এবং তাঁর সাম্প্রতিক কাজে সূক্ষ্ম রেখা, চিহ্ন ও প্রতীক ব্যবহার দেখে পাশ্চাত্য শিল্পপণ্ডিতদের, বিশেষভাবে ক্যান্ডিনস্কি ও মিরো-র কথা মনে পড়ে। যেমন ২ ও ২১ নং। সামান্য ছোট ছোট কয়েকটি বৃত্তকে অবলম্বন করে তিনি যে রচনা সৃষ্টি করেছেন (৩৫ ও ৩৬নং) সেগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন গতিবেগের পরিচয় পাওয়া যায়। রচনা দুটি সার্থক। বৃহৎ বোর্ডে তেলরঙে রচিত ছবিগুলি একই শ্রেণীগত—গাঢ় কালোজাতীয় রঙ ও প্রতীক ব্যবহারের জন্য এগুলি সহজেই চোখে পড়ে। অধিকাংশ রচনাতেই তিনি বৃহৎ শূন্যস্থানকে প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং সেই স্থানটুকু কখনও বৃহৎ বৃত্ত, সামান্য কয়েকটি সূক্ষ্ম রেখা, বিন্দু বা চতুষ্কোণ দ্বারা পূর্ণ করে বিভিন্ন আকারের সৃষ্টি করেছেন। রঙ অবশ্য তিনি ব্যবহার করেছেন, তবে দুই একটি ক্ষেত্র ছাড়া সেটি গৌণ—আকারই মুখ্য। অনেক স্থলেই তিনি সুফল লাভ করেছেন, যেমন ৩২ ও ৩৪। বলা বাহুল্য, অনেক অভিজ্ঞ শিল্পীও এহেন রচনা পরিহার করে চলেন—সুতরাং এ হিসাবে এ তরুণ শিল্পী অবশ্যই কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। তবে তেলরঙে ও কোলেজ বা পুড়িয়ে যে সব নতুন রচনা-ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন সেগুলির মধ্যে দুই একটি চোখে পড়লেও

মিছিল —প্রকাশ কর্মকার

(১৬. ২০) প্রকৃতপক্ষে সেগুলিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলাই সমীচীন হবে। তবে এহেন মাধ্যমে পরীক্ষা করে যাওয়ার মধ্যে বিপদও আছে। নূতন মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করা অনেক সময়ে নেশার মত পেয়ে বসে—এগুলির প্রতি শিল্পীর এক স্বাভাবিক দুর্বলতা থাকে—ফলে রসোত্তীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও শিল্পী এগুলি সকলের কাছে পেশ করেন। এই প্রসঙ্গে এক খ্যাতনামা সমালোচক বলেছেন:

"A sinister factor in contemporary art is that an excess of hopeful tolerance for experimental work simply because it is experimental, has brought too much trash into public exhibitions under impressive auspices ...... Trashy art, whether it is painting, music, literature .... may be exciting, and the public's first question about an exhibition is beginning to be not whether the art is good, but whether it is stimulating."

আসল কথা এ শিল্পীর কল্পনা ও চিন্তাশক্তি আছে, শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ়, নিষ্ঠা অক্লান্ত এবং বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করার ক্ষমতাও অসীম। কিন্তু তবুও যেন এত বিভিন্ন ও বিচিত্র কাজের মধ্যেও তিনি তাঁর নিজস্ব কোনও পথের সন্ধান এখনও পাননি। স্বভাবতই মনে হয়, বুঝি সবই দেখলাম—এর পরে কি? অন্যের কথা যাক। সুনীল দাশ প্রতিভাবান ও তরুণ। আমার স্থির বিশ্বাস আচিরে তিনি তাঁর একান্ত নিজস্ব ও বিশিষ্ট পথারেখার সন্ধান পাবেন ও সেই পথ অনুসরণ করে শিল্পীমহলে শীর্ষস্থান অধিকার করবেন।

প্রকাশ কর্মকারের চিত্র প্রদর্শনী

শিল্পী প্রকাশ কর্মকারের প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয় আর্টিস্ট অ্যান্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে। তরুণ শিল্পীদের মধ্যে প্রকাশ কর্মকার সুপরিচিত। উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য এই শিল্পী ফরাসী সরকারের বৃত্তিলাভ করে সম্প্রতি প্যারী রওনা হয়েছেন। বিদেশে যাবার পূর্বে শিল্পী তাঁর সাম্প্রতিককালের কয়েকটি রচনা ও গ্রাফিকের নিদর্শন পেশ করেন।

যাঁরা ইতিপূর্বে এ শিল্পীর কাজ দেখেছেন তাঁরা এ'র রচনা দেখে বুঝতে পারবেন যে, শিল্পী বিষয়বস্তু ও রচনারীতি উভয় ক্ষেত্রেই নূতন চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন। একদিকে যেমন বর্তমান, বিকৃত সমাজ ও অসহায় মানবের আর্তনাদ শুনে তিনি বিচলিত হয়েছেন, অন্যদিকে আবার সংগীতের সুমিষ্ট ঝঙ্কারধ্বনিতেও তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে 'প্রোসেশন' ও 'ফিয়ার' ছবি দুটির নাম করা যেতে পারে। একটিতে যন্ত্রণাকাতর মানুষের মুখে ফুটে উঠেছে কাতর ক্রন্দনরেখা, যেন প্রাচীন যুগের মানুষকে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়—অপরটিতে নীল ও সবুজ রঙ মাধ্যমে আঁকা কোনও চতুষ্পদ জন্তুর আতঙ্ক প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে 'রাগ বসন্ত'র নাম করা যায়। প্রকাশ কর্মকার আধুনিক রীতিতে ছবি আঁকেন তবে অঙ্কন তথা রঙ ব্যবহার প্রণালী সুন্দর। পৃষ্ঠভূমিটুকু কোন বিশেষ রঙে ভরিয়ে ফেলে শিল্পী নানাভাবে ও নানা আকারের রেখা দ্বারা সমগ্র রচনাক্ষেত্রটি আচ্ছন্ন করে ফেলেন। অনেক ছবিতে তাই রঙীন কাচের (Stained Glass) কারুকার্য ফুটে উঠেছে। শুধু তাই নয়, এর রঙের পাত্রও অনেক স্থলে যেন হঠাৎ রামধনুর রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে ফলে আলোকপাতে দুই একটি ছবি রঙমশালের মত ঝলমল করে ওঠে। এই প্রসঙ্গে 'রাগ বসন্ত' উল্লেখযোগ্য। নীল ও হলদে রঙের সুকৌশল ব্যবহারের ফলে ছবিটির মধ্যে এই রাগের অন্তর্নিহিত সুরটুকু যেন বেজে উঠেছে। শিল্পীর কয়েকটি ছোট কাজও ভাল লাগে। এগুলি প্রায় একই রীতিতে রচিত—অর্থাৎ গাঢ় রঙ ও ব্রাশের সুকল্পিত কয়েকটি মোটা টানের মধ্য দিয়েই শিল্পী বক্তব্যটুকু প্রকাশ করেছেন—যেমন 'দি নাইট' ও 'ডকইয়ার্ড'।

প্রকাশ কর্মকারের গ্রাফিকের কাজ সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছন্ন। প্রথমেই 'সিটি' ছবিখানি চোখে পড়ে। কেন্দ্রস্থল থেকে শুরু করে শহরের বিরাট ইমারতশ্রেণী কিভাবে কুণ্ডলীকৃত সর্পের মত বৃত্তাকারে বৃহত্তর পরিধি পর্যন্ত অধিকার করে বসে সেটাই শিল্পী বোঝাতে চেয়েছেন। অন্যান্য ছবির মধ্যে রিলিভো প্রথায় রচিত 'ইনগ্রেভড্ সোল' ও 'রেড বার্ড' উল্লেখযোগ্য।

শিল্পী সুরজিত গুপ্ত, জয়ারচাঁদ দশানি ও সুকুমার দাসের প্রদর্শনীর আলোচনা আগামী সংখ্যায় করব।

—চিত্রপ্রিয়

দিনরাতের খেলা
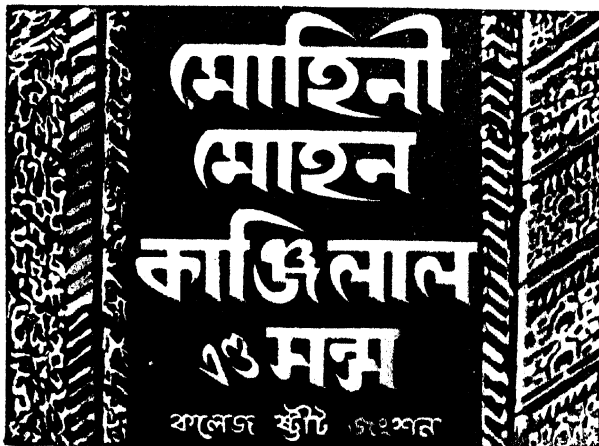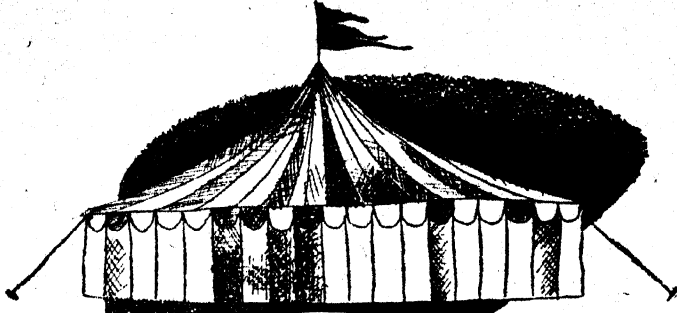
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সতর

'লীলা, তুই বাহার যা! বাঘ সিংহর খাঁচার কাছে আঁধারের ভিতর দেয়ালের পিছে দেখ্‌ ভদ্দর মানুষের কোঠীতে আওরাতের শাড়ি তারের উপ্পর ঝুলে, নীল এক বাত্তি জ্বলে ঘরের ভিতরে। ভদ্দর মানুষ বিবিকে পাশে লিয়ে আরামে ঘুম যায়!

হাততালির জন্যে যে মানুষ পাগলার মতন হয়ে গেল, বিবির পাশে সে এমন চুপচাপ ঘুমোতে পারে না। সে-মানুষ তার বিবিকে মারভার করে রাস্তায় চিং হয়ে শুয়ে যায়, মন মন পাথর ভাঙে বুকের উপ্পর। সব লোক তাজ্জব বনে যায়। সে-মানুষ পাবলিকের গোলাম, আওরাত তাকে ফিনিশ করতে পারে, বল?

এক আওরাতের বাত শুন, লীলা। সেই রকম আওরাত কোন সার্কাসে নাই—সারা দুনিয়ায় নাই। তার আঁখ দেখলে পাথর বনে যাবে পীর-পয়গম্বর, এক পা-ও চলতে পারবে না। তার আঁখের ভিতর দুনিয়া নাচে। এ লীলা শুন্‌, সে আওরাত আমার বিবি ছিল।

আমি ঘরে না ফেরা তক আমার বিবি কোন খানা মুখে নিত না, ঘুম যেতে পারত না। চুপচাপ আশমানের দিকে দেখে উপ্পর-ওয়ালার নাম নিত—আমার ঘরে ফিরবার টাইম কখন হবে! আমি দূরে-দূরে গাঁয়ে খেলা দেখলাতাম। কোনদিন ফিরতাম, কোনদিন না। তখন আমার বিবির আঁখ থেকে পানি গিরত।

যেদিন-যেদিন আমার হাড্ডিতে চোট লাগত, বহুৎ দরদ হত বুকের ভিতর, সেদিন-সেদিন উ বিবি গরম তেল লাগিয়ে দিত সারা রাত। আর রোয়ে-রোয়ে আমাকে শুনাত, এ কাম বহুৎ খারাপ! এ কাম ছোড় দেও। জীবন খতম হবে জলদি।

এসব বাত বিবি শুনাত যখন, অনেক রাগ হত আমার বুঝলি? আমি বিবিকে জোর ঠেলা মেরে দূরে হটাতাম, কেয়া কাম বাতলাও? দোসরা কোই কাম মালুম হ্যায়?

বিবি শুনাত, তোমার বাপ-দাদা যে কাম করত সে-কাম অনেক ভাল আছে—

মেজাজ বিলকুল বিগড়ে যেত আমার, লীলা জানিস? আমি শালা বাপ-দাদার মতন মাথায় ফলের টুকরি লিয়ে রাস্তায়-রাস্তায় চিল্লাব, আম চাই, এপ্পেল চাই—কেলা পেয়ারা আংগুর চাই? বিবির আমাকে ফিনিশ করে দিবার মতলব। আপনার সুবিস্থার জন্যে বিবি আমাকে ঘরের ভিতর আটক রাখতে চায়।

শুন্‌ লীলা, আমিও বেয়াকুফের মতন কাম করতাম। বিবির ভাবনা আমাকে জলদি-জলদি ঘরে লিয়ে আসত—সারা দিল থাকত বিবির উপ্পর। ভদ্দর মানুষের মতন আমারও কখন-কখন ইচ্ছা হত বিবির সাথে চুপচাপ শুয়ে জীবন কাটাবার। ঝুটমুট হাততালির দরকার নাই।

শুন্‌ লীলা, বিবি আউর হাততালি,

মহব্বত আউর নাম একসাথে থাকবে না। ভাবনা একটাই রাখতে হবে, তা বিবির ভাবনা হোক, কি খেলার ভাবনা হোক। যে-মানুষ ডবল ভাবনা ভাববে, তার জীবন ফিনিশ।

আমি বড় দুবলা হয়ে গেলাম। দূরে-দূরে গাঁয়ে গেলে বিবির আঁখ থেকে পানি গিরবে, বিবি খানাপিনা করবে না, ঘুমাবে না। ভেড়ুয়া বনে যেতে আমি নারাজ। আমার ভেগে যাবার মতলব হল। হাততালির আওয়াজ বিনা জীবন বরবাদ।

একদিন বড় চোট লাগল বুকে, একটা হাড্ডি ভেঙে যাবার মতন। পুরা তিনদিন খেল বনধ। আমি ঘরের ভিতর পড়ে আছি, আউর বিবি আমাকে দেখছে সারা দিন—সারারাত।

শুনু লীলা শুনু, সে-বিবিকে আমি মারডার করে দিলাম। যদি মারডার না করে দিতাম তবে খেল খতম হয়ে যেত আমার। কলের চুপড়ি মাথায় দিয়ে রাস্তায়-রাস্তায় চিল্লাতে হত—তার আঁখের ভিতর এমন যাদু ছিল।

চারদিনের দিন আমার হাড্ডি বিলকুল ঠিক। আমি গাঁঠরি উঠালাম, বাহার যাবার জন্যে তৈয়ার হলাম। এক সার্কাসের মালিকের সাথে বাতচিত হয়েছিল, তার সামনে খেলা দেখলাতে হবে। মালিক খুশ হলে তার কোম্পানীতে আমার নোকরি হবে।

বিবি হাত টেনে রাখল আমার। বাহার যেতে দিবে না। আমার তবিয়ৎ ঠিক নাই। বাহার গেলে ফের চোট লাগবে। বিবি বলে, কসম আমার, বাহার যাবে না, শুয়ে থাকতে হবে আউর বহুৎ দিন।

আমি বাহার যাবার জন্যে পাগল, বিবি যেতে দিতে নারাজ। আমি জোর করে হাত ছুটিয়ে নিলাম, ধাক্কা মারলাম বিবিকে। সে ফের আমার গায়ের উপর পড়ল। বুঝলি লীলা, মেজাজ বড় গরম হয়ে গেল আমার। বিবিকে মারডার করবার মতলব হল। আমি তার গলা পাগলার মতন ধরলাম। বাহার চলে গেলাম।

নোকরি হল আমার এম্পায়ার সার্কাসে। রাতের বেলা ওয়াপাশ এলাম ঘরে। কোন মানুষ জানল না। বিবির লাস পড়েছিল। আঁধারে ডর লাগল আমার। মন বড় নরম হল, দুখ জাগল। আমি চিল্লাচিল্লি করে লোক ডাকলাম। পুলিসকে এজাহার দিলাম, কে মারডার করল সাহেব আমার বিবিকে?

শুনু লীলা, লাস কাটা ঘরে আমার বিবিকে ফের কাটল মানুষ। একটা বাচ্চা ছিল তার পেটের ভিতর। আমি দেখলাম। আমাকে পুলিস খালাস দিল তিন হপ্তা পরে। কে মারডার করল তার ইনকোয়ারি চলতে লাগল—আজও ইনকোয়ারি চলছে মালুম!"

লীলা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হারকু সাহেবের কাহিনী শুনছিল। এখনো তার চোখ বন্ধ। তার স্বর কখনো নিচু, কখনো খুব উঁচু—চিৎকার করার মতন।

কথা বলবার সময় হারকু সাহেবের গলা থেকে হাঁপাবার মতন শব্দ উঠছিল। লীলার তাকে আর এক গেলাস জল খাওয়াবার ইচ্ছে হচ্ছিল কিন্তু হারকু সাহেব খুব শক্ত করে তার হাত ধরে রেখেছিল, সে তা ছাড়াতে পারল না।

হারকু সাহেব চোখ খুলল আরও পরে, মুখ তুলে লীলার দিকে তাকিয়ে অল্প হাসল, "কী রে লীলা, ডর লাগে?"

"না।"

"যে আওরাত আমার ভাবনা করবে, আমাকে দুবলা করবে, ভেড়ুয়া বানাবার তালে থাকবে, আমি তাকে ফিনিশ করে দিব জরুর।"

অন্যমনস্কের মতন লীলা হঠাৎ বলল, "আর এক গেলাস জল তোমাকে দেব হারকু সাহেব?"

তার কথার উত্তর দিল না হারকু সাহেব, চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে আবার খাটের কাছে এল, থেমে থেমে বলল, "লীলা, করিমপুর ক্যাম্পে আমি তোকে মারডার করবার মতলব করেছিলাম—"

লীলা দূরে থেকেই হারকু সাহেবের কথা শুনে বলে উঠল, "আমি ডর পাই না—"

কয়েক মুহূর্ত সে চুপ করে থাকল, হারকু সাহেবের খালি চেয়ারে এখন তার বসে পড়বার ইচ্ছে হলেও লীলা বসল না, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমাকে খুন করবার ইচ্ছে তোমার কেন হল হারকু সাহেব?"

"জানিস না?"

"না।"

হারকু সাহেবের শিগগির ঘুম আসবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তাহলেও একটা বড় হাই তুলে বালিশে মাথা রেখে সে পা টান-টান করল। কিছু পরে বলল, "লীলা শুন, এখানে আয়। তুই আমার বিবির মতন ভাবনা শুরু করলি। আমি তোকে নিয়ে মজা মারতে লাগলাম—"

লীলা দু-হাতে মুখ চেপে বেদনার একটা শীতল প্রবাহ রোধ করবার চেষ্টা করতে-করতে কাতর স্বরে ডেকে উঠল, "হারকু সাহেব—"

"ইয়াদ আছে?"

"হ্যাঁ।"

হারকু সাহেব বলল, "জুয়েল সার্কাস জাহান্নামে যেতে বসল, তুই আমাকে যাদু করলি। জীবনে আওরাত ঘুষল তো বাস, সব কাম গেল। তোকে মারডার করবার মতলব তখন হল আমার।"

"করলেই তো হত, করলে না কেন?" লীলার বুকের মধ্যে, মাথার মধ্যে তার শরীরের সর্বত্র যন্ত্রণার প্রবল চাপ পড়ছিল বলে অন্ধকারে তাঁবুর কাপড় দেখতে দেখতে সে স্বগতোক্তির মতন খুব আস্তে বলল।

হারকু সাহেব খাটের ওপর এপাশ-ওপাশ করতে করতে দড়ি ছেঁড়া মশারি নিয়ে খেলতে থাকল কিছু সময়, পরে পা গুটিয়ে আবার লীলার বসবার জায়গা করে তাকে ডাকল এবং তার গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে বলল, "আমি তোকে মারডার করে দিতাম জরুর। শুন্ লীলা, একরাতে—যেদিন শেষ খেলা হয়ে গেল করিমপুর ক্যাম্পে তোকে রাউটিতে ডাকলাম—বহুৎ পিয়েছিলাম সেদিন—ইয়াদ আছে?"

"কী জানি!"

হা-হা করে হেসে উঠল হারকু সাহেব, "ঝুট বলিস। জরুর ইয়াদ আছে। সেদিন নবীনের সাথে তোর সাধির বাত পাক্কা হল—"

এত সময় কথা কম বলছিল লীলা, হারকু সাহেবের তাঁবুতে একা-একা এসেছে বলে একটা ভীতিও ছিল তার মনে, হঠাৎ সব মুছে গেল। হারকু সাহেবের একটা পা অবলম্বনের মতন দু-হাতে চেপে ধরে সে ধরা গলায় বলে উঠল, "হারকু সাহেব, আমি এসব শুনতে তোমার কাছে এত রাতে আসি নি, ও মানুষের সাথে আমি থাকতে পারব না—"

হারকু সাহেব যেন লীলার কথা শুনতে পায় নি এমন ভাবে বলল, "এক বাত শুন্ লীলা, তুই যদি নবীনকে সাধি করতে নারাজ হতিস—আঁখের পানি ফেলে ফের আমার মেজাজ গড়বড় করে দিতিস তবে আমি তোকে মারডার করে দিতাম জরুর।"

"এখন পার না?"

হারকু সাহেব লীলার ইচ্ছার কথা শুনে হাসল, "না, তোর সাধি হবার পর আমি ফের ফ্রী আদমী হয়ে গেলাম। এখন আমার কী দরকার শুধু শুধু তোকে ফিনিশ করবার—"

হারকু সাহেবের ঘাড়ে টর্চের চাপ পড়ছিল বলে সে তা একটু সরিয়ে রেখে বলল, "তবে হাঁ, করিমপুর ক্যাম্পে আমার বালিশের তলে খুব বড়া একটা ছুরি ছিল, রেজাক খানের রাউটিতে নিমকের বস্তা ভি ছিল। মাহুত আউর রেজাক খান রাতের বেলা চুপে চুপে কবরের মতন গাড্ডা বানিয়ে দিত— নিমক লাগিয়ে তোর লাস সেইখানে মাট্টি চাপা দিয়ে দিলে বাস, তামাম শোধ হয়ে যেত। কোন মানুষ ছিল না সেদিন লীলা, ইয়াদ আছে? সব গেছিল রাত ভোর যাত্রা শুনবার লিয়ে। পরের দিন আমরা ভেগে যেতাম নয়া ক্যাম্পে। তোর লাসের

পাঞ্জা পুলিসের বাপ ভি পেতে পারত না—শুনলি?"

লীলা হাসল, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "তোমার সব কথা ঠিক না, আমাকে তুমি খুন করতে পারতে না হারকু সাহেব—"

"ঝুট বলছি আমি? জরুর, আমি তৈয়ার ছিলাম—"

"না, তুমি পারতে না", লীলা হারকু সাহেবের বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে টর্চটা নিল, ফস করে আলো ফেলল তার মুখে, ঠাণ্ডা টর্চ গালে ঘষতে ঘষতে কিছু পরে বলল, "জুয়েল সার্কাসে আমার মতন মেয়ে আর ছিল তখন, আমাকে খুন করে ফেললে লোকসান হয়ে যেত না কোম্পানীর?"

হারকু সাহেব লীলাকে কাছে টানল, তার হাত থেকে টর্চ নিয়ে সে-ও লীলার মতন কয়েক মুহূর্তের জন্যে আলো জেলে বলল, "আরে সো বাত আমার খেয়াল ছিল বলে না আমি নবীনের সাথে তোর সাধি পাক্কা করে রাখলাম।"

হারকু সাহেবের টর্চের জোরালো আলো লীলার উন্মুখ দেহের ওপর উছলে উঠলেও এখন সে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল না।

মিনতির মতন তাকে তা নিভিয়ে দিতেও বলল না। লীলা হারকু সাহেবকে ভয় দেখাবার জন্যে শুকনো গলায় বলল, "বিয়ে দাও আর না-ই দাও, মাইরি বলছি হারকু সাহেব, এমন করে আর চলবে না। তোমার মুখের ওপর কথা বলি নি, ভয় হয়েছিল তাই রাজী হয়েছিলাম, এবার আমি একসিডেন করে মরে যাব—" সে হারকু সাহেবের বুকের ওপর পড়ে কাঁদল।

"এই লীলা, উঠ! কী বলিস রাতের বেলা, ছি-ছি! ওসব কথা মুখে আনা ঠিক না। পরশুদিন টালিগঞ্জে খেলা শুরু হবে, আজ তুই একসিডেনের ভাবনা ভাবিস?"

"হারকু সাহেব, আমি একলা থাকব। তার সাথে থাকলে আমার খেলা পড়ে যাবে—"

লীলার পাশে আর বেশী সময় থাকতে সাহস হচ্ছিল না হারকু সাহেবের। বাইরে হাওয়া উঠেছে। তাঁবু খসখস করে উঠছে মানুষের পায়ের শব্দের মতন। হারকু সাহেবের দেহে লীলার মিষ্টি গন্ধ একটা তাপ সঞ্চারিত করে দিচ্ছিল বলে সে তার কাছ থেকে কিছু দূরে সরে গিয়ে ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলল, "তুই ঝুটমুট ভাবনা করিস লীলা। খুব অল্পদিনের ভিতর নবীন বিলকুল নয়া আদমী হয়ে যাবে দেখিস—"

"না হারকু সাহেব, তা হবে না।"

"হাঁ, জরুর নয়া আদমী হবে। সে বাঘের খেলা দেখলাবে, জুয়েল সার্কাসের রিং মাস্টার হবে—" হারকু সাহেব লীলাকে ভোলাবার জন্যে বলল, "এক নয়া নম্বর তুই করবি?"

"কী?"

হারকু সাহেব লীলাকে একা তার খাটের ওপর বসিয়ে টেবিলের কাছে এসে নিজেই গেলাস হাতে নিল, কুজো থেকে জল ঢালল না, লীলার দিকে ফিরে বলল, "নবীন যখন বাঘের খেলা দেখলাবে, শুনো লীলা, তুই ভি যাবি তার সাথে রিং-এর ভিতর। সুরযের দুই পা-ও কাঁধের উপর উঠাবি—"

হারকু সাহেব গেলাস টেবিলের ওপর রেখে হাত জড়িয়ে ধরার মতন করে বলল, "এই রকম করে তুই বেড় দিবি সুরযকে, তার মুখে মুখ লাগিয়ে চুমা খাবি—বাস্ তাজ্জব বনে যাবে পাবলিক। বল লীলা, এ নয়া নম্বর তুই দেখলাতে রাজী আছিস?"

লীলা করুণ একটা নিশ্বাস ফেলে চুপচাপ বসে থাকল কয়েক মুহূর্ত, কিছু পরে শাড়ির এক প্রান্ত তুলে চোখ মুছতে মুছতে খুব নিচু স্বরে বলল, "না।"

"নয়া নম্বর করতে নারাজ? তোর কী হল লীলা?"

লীলা খাট থেকে নেমে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "ভীতু মানুষের সাথে থেকে বাঘের মুখে চুমু খাওয়ার কথা ভাবব কেমন করে হারকু সাহেব!"

"তুই বহুৎ চালাক লীলা। এখন যা রাউটিতে।"

"আমি আবার আসব।"

"না"। মনের সব কোমল বৃত্তি যা রাতের অন্ধকারে ফুলের মতন হারকু সাহেবের মনে ফুটে উঠেছিল, যা তাকে কাতর এবং অবসন্ন করে রেখেছিল এত সময়, তা এখন বাসি হয়ে এসেছে, সে অন্য মানুষের সঙ্গে যেমন কঠোর স্বরে কথা বলে এত পরে হঠাৎ লীলাকেও তেমন বলল, "নিকাল যা লীলা, আমার রাউটিতে রাতের বেলা একেলা কভি আসবি না! আমার হুকুম!"

চোখ মুছে ফেললেও মুখ থমথম করছিল লীলার। এতদিন ধরে হারকু সাহেবের তাঁবুতে রাতে চলে আসবার কথা সে কেন ভেবেছিল তার কারণ এখন লীলার কাছে আরও অস্পষ্ট হয়ে উঠল এবং বুকের মধ্যে যন্ত্রণার চাপ সে আরও অনেক বেশী করে অনুভব করতে থাকল।

আস্তে আস্তে হারকু সাহেবের তাঁবু থেকে চলে যাচ্ছিল লীলা। একা-একা জল খাচ্ছে হারকু সাহেব—লীলা তার শব্দ শুনল। কিন্তু সে বাইরে যাওয়ার আগেই হারকু সাহেব খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলে তার পাশে এসে দাঁড়াল এবং কানের কাছে মুখ এনে চাপা স্বরে বলল, "থাম!"

খাটের ওপর থেকে টর্চ তুলে আনল হারকু সাহেব। বাতাসের শব্দ না, পা ঘষে-ঘষে মানুষ চলাফেরা করছে তার তাঁবুর বাইরেই। কিছু আগে হারকু সাহেবের মনে হয়েছিল কারা যেন কথা বলছে। নতুন জায়গা চোর কিনা কে জানে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লীলা। খুব সতর্ক হারকু সাহেব। সে-ও চুপ। টর্চ হাতে এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার পায়ের শব্দ পেলেই তাঁবুর পর্দা তুলে চোরের মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলে তাকে ধরবে।

তাঁবুর প্রবেশ পথের মুখেই দাঁড়িয়ে আছে লীলা, বেরিয়ে যেতে পারছে না।

আশঙ্কায় তার শরীর হিম হয়ে এসেছে। আরও আগে চলে গেলেই ভাল হত। এখন মানুষের সামনে পড়লে সব জানাজানি হয়ে যাবে। বড় অস্বস্তি হচ্ছিল লীলার।

যেদিকে দাঁড়িয়েছিল লীলা, কিছু পরে সেদিকে আবার পায়ের শব্দ হল। ইতস্তত করল না হারকু সাহেব, গ্রাক করে তাঁবুর পর্দা তুলে বাইরে এল—তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুজন মানুষ। টর্চ হাতে থাকলেও তা জ্বালবার দরকার হল না, অন্ধকারেই তাদের চিনতে পারল হারকু সাহেব।

কেউ কোন কথা বলল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল কিছু সময়। রঘুনাথের মুখ মাটির দিকে, বড় গম্ভীর। তার পাশেই ছিল শিবনাথ, সে তাকিয়েছিল হারকু সাহেবের তাঁবুর দিকে, ভেতরে উঁকি মারবার চেষ্টা করছিল।

হঠাৎ হারকু সাহেবের খেয়াল হল এমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা শোভন নয়। লীলা এখনো আছে তার তাঁবুতে। হারকু সাহেব তাকে ডাকে নি, সে নিজেই এসেছে—এ কথাটা লীলাকে বলতে হবে বাবুর সামনে।

বাবু ঘুম থেকে একা-একা উঠে আসে নি তার তাঁবুতে। হারকু সাহেব বুঝল, সব লক্ষ করছিল শিবনাথ এবং তাকে জব্দ করবার জন্যে এত রাতে বাবুকে ডেকে নিয়ে এসেছে।

হারকু সাহেব বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে নেবার জন্যে কাশির শব্দ করে রঘুনাথকে জিজ্ঞেস করল, "বাবু, এত রাতে? কী খবর?"

"না না, কিছু না—" রঘুনাথ বিরস মুখে বলল, "ঘুম হল না আপনার হারকু সাহেব?"

"হত বাবু", শিবনাথের দিকে পলকের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ফেলে হারকু সাহেব বলল, "লীলা এসে পড়ল—"

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই কয়েক পা এগিয়ে গেল শিবনাথ, তাঁবুর ভেতরে তাকিয়ে বলল, "সে এখনো আছে বাবু।"

রঘুনাথ হারকু সাহেবকে জিজ্ঞেস করল, "নবীনের বউ এত রাতে আপনার রাউটিতে কেন এল হারকু সাহেব?"

"আসুন বাবু, ভিতরে আসুন—" হারকু সাহেব এখন টর্চ জ্বেলে আলো দেখাল রঘুনাথকে, "সেকথাটা নবীনের বউ আপনাকে শুনিয়ে দিবে—" শিবনাথের ওপর একটা তীব্র আক্রোশ হারকু সাহেবকে উত্তেজিত করে তুললেও সব দিক ভেবে সে তাকেও ডাকল, "আসুন শিববাবু।"

হারকু সাহেবের টর্চের আলো কাঁপছিল ছায়াছবির মতন। লীলা তা দেখল একটা ঘোরের মধ্যে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে ছিল সে, মৃত্যুভয়ে অবসন্ন একটা মানুষের মতন তার চেতনা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। সকলের সামনে দিয়ে এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যাবার ইচ্ছে হলেও সে এক পা-ও নড়তে পারল না।

হারকু সাহেব লীলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে শক্ত করে টর্চ চেপে ধরে ঠাণ্ডা গলায় বলল, "আমার রাউটিতে তোকে আমি ডাকলাম?"

"না-না—"

"শুনলেন বাবু?" হারকু সাহেব লীলার পা থেকে মাথা অবধি টর্চের আলো খেলিয়ে নিয়ে আবার বলল, "বাবু পুছে কেন এলি তুই?"

রঘুনাথ বিব্রত হয়ে বলল, "থাক থাক, আমার শুনার দরকার নাই, চলেন শিববাবু—"

শিবনাথ বলল, "বাবু, নিজের চোখে সব দেখলেন তো?"

লীলা কেন এল সেকথা আমি পিছে আপনাকে বলব বাবু", হারকু সাহেব শিবনাথের মুখের ওপর টর্চ ফেলে কঠিন স্বরে বলল, "শিববাবু, পরশু রোজ পয়লা শো, নয়া ক্যাম্প—এত রাত তক্ আমাকে পাহারা দিয়ে ভবিষৎ খারাপ করবেন না।"

"পাহারা দেয়ার দরকার ছিল হারকু সাহেব, আমাদের মাথার ওপর কেমন মানুষ বসে আছে তা বাবু জানবে না?"

"হাঁ, জরুর জানবে।"

আজ কারুর সংগে তর্ক গোলমাল করবার ইচ্ছে ছিল না হারকু সাহেবের। পরশুদিন

এ অঞ্চলে জুয়েল সার্কাসের প্রথম শো—লীলা শিবনাথ দুজনেই আর্টিস্ট, তাদের এখন শান্ত ও সুস্থ থাকা দরকার।

এসব বিবেচনা করে হারকু সাহেব বলল, "বাবু যা বলবে তা-ই হবে। লেকিন পয়লা শো মারডার করবেন না আপনি শিববাবু, আমি হাত জোড় করে বলছি।"

রঘুনাথ দাসের মুখ এখনো বড় গম্ভীর, সে আর একবার বলল, "শিববাবু চলেন—"

"লীলা, যা—" হারকু সাহেব খুব আস্তে বলল।

রঘুনাথ আর শিবনাথ চলে যাবার আগেই হারকু সাহেবের তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল লীলা।

এখনো আগের মতন অন্ধকার, ঠাণ্ডা হাওয়া খেলছে। এখন বাইরের অন্ধকার লীলার দেহ বোরখার মতন ঢেকে দিতে পারল না। মার খাওয়া একটা মানুষ যেমন করে হাঁটে তেমন খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটছিল লীলা। তার মনে হচ্ছিল হারকু সাহেবের টর্চের চেয়েও জোরালো আলো চারদিক থেকে তার ওপর পড়ছে এবং অনেক লোকের সামনে দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে উলংগ হয়ে। তারা তাকে দেখে হাসছে, বিদ্রূপ করছে, থুতু ছিটোচ্ছে। এসব মনে হলেও তাড়াতাড়ি পা চালাবার মতন জোর এখন লীলার ছিল না।

কোন সাংঘাতিক অপরাধ করে পালিয়ে আসা একটা কয়েদীর মতন নিজের তাঁবুতে ফিরেও লীলা সুস্থ হতে পারল না। তৃষ্ণায় তার গলা জ্বলছে, কুঁজো উল্টে আছে পায়ের কাছে—তার জন্যে আর জলও ছিল না।

"যেখানে ছিলে, রাতটা কাটিয়ে আসতে পারলে না সেখানে?" মশারির মধ্যে থেকে তেতো-তেতো স্বরে লীলাকে আরও দুর্বল করে তুলল নবীন।

লীলা কোন কথা বলল না, খাটে গড়িয়ে পড়ে অন্য পাশ ফিরল। সে জানত উত্তর না পেলেও আরও অনেক বেশী বকবে নবীন। লীলা চুপচাপ পড়ে থাকল।

"কোথায় গেছিলে?"

"কেন?"

"একটু লজ্জা নেই তোমার?"

লীলা ছটফট করতে করতে খুব জোরে নবীনকে ধমক দেয়ার মতন বলল, "চুপ!"

নবীন থামল না, উত্তেজিত হয়ে মশারি টেনে তুলল, "কাল ঘাড় ধরে নিয়ে যাব বাবুর কাছে, তোমাকে জুতোর বাড়ি মারব, শালাকে খুন করব—"

লীলা আরও জোরে বলল, "চুপ!"

নবীন আর যা-যা বলছিল সেসব শুনলেও লীলা চুপ থাকল। তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল এখন। লীলার মনে হচ্ছিল রঘুনাথ নবীনের গলা পেয়ে হারকু সাহেব আর শিবনাথের সংগে এদিকেই আসছে।

ক্রমশ
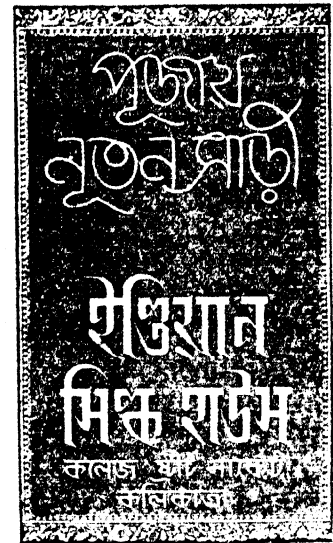
ছোটদের
বাড়ন্ত পায়ের জন্য
হাটুক, ছুটুক, খেলুক—ছোটদের বাড়ন্ত
পায়ে সব সময়ই চাই বাটার
এই নমনীয়, সুচারু, ফিটফাট জুতো।
প্রত্যেকটিতে চমৎকার প্রশস্ত ঘের—টেঁকসই,
মোলায়েম, পায়ের বেড়ে-ওঠার
অবাধ পরিসর। মজবুত তলি,
আরামপ্রদ গোড়ালি।
বাড়ন্ত পায়ের চাহিদা মেটাতে
অতিরিক্ত নমনীয়।
ছোটদের জন্যই তৈরি।
আরামে আর আত্মবিশ্বাসে
হেঁটে বেড়াতে ঠিক যেমনটি চাই।
Bata
শর্মিলা ২.৯৫
ডলি ৮.৫০
বালক ৮.৫০
ক্যাম্প ডার্বি ৪.৭৫
বুটি ৮.৯৫
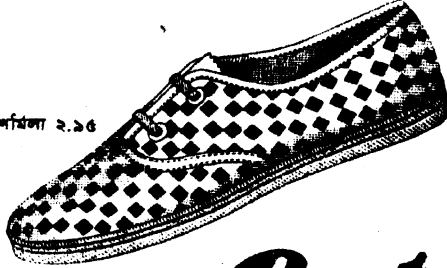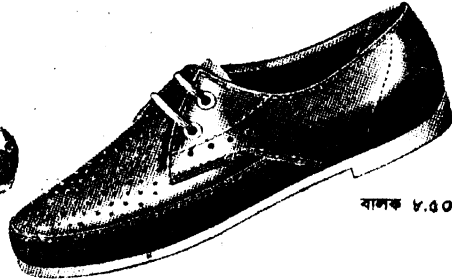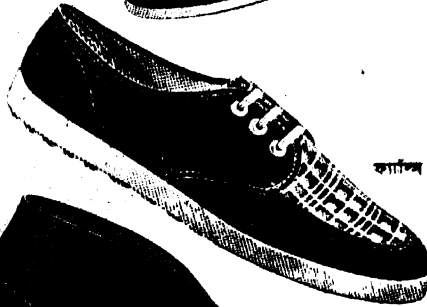
এক অতিমহাদেশের হৃত অংশ

ভূমণ্ডলের বিবর্তন সম্পর্কে একটি তত্ত্ব আছে যাতে বলা হয়েছে যে, সুদূর অতীতে পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরগুলির অবস্থান এখনকার মত ছিল না। তখন ছিল লরেশিয়া ও গণ্ডোয়ানা নামে দুটি

নিমজ্জিত ক্ষুদ্র মহাদেশ

অতিমহাদেশ। পরে সেই দুটি খণ্ডিত হয়ে যাওয়ার পর খণ্ডগুলি পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলে আজকের মহাদেশগুলি নিজস্ব আকার পরিগ্রহ করে। এই তত্ত্বটি নিয়ে দীর্ঘকালযাবৎ বহু বাদানুবাদ চলে আসছে।

হালে মার্কিন বাণিজ্য দপ্তরের বিজ্ঞানী ডঃ রবার্ট ডিৎজ প্রস্তাব করেছেন যে, অতলান্তিক ও ভারত মহাসাগরের গর্ভে সন্ধান করলে সম্ভবত একাধিক ছোট ছোট মহাদেশের হদিস মিলতে পারে যেগুলি হচ্ছে একটি অতিকায় মহাদেশের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র খণ্ড। ডঃ ডিৎজ বলেন যে, ১৫ কোটি বছর আগে সেই অতিকায় ভূখণ্ডে ভাঙন ধরেছিল যার ফলে দক্ষিণ গোলার্ধের মহাদেশগুলি এবং ভারতবর্ষের উদ্ভব হয়। মহাসাগরগর্ভে অনুসন্ধান করে যদি সেই হৃত নিমজ্জিত ভূখণ্ডগুলির সন্ধান মেলে তাহলে মস্ত বড় এক রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।

আর একটি তত্ত্ব অনুসারে অতীতে পৃথিবীতে স্থলভাগ একটিই ছিল যার নাম প্যানজিয়া। কিন্তু ডঃ ডিৎজ সেই তত্ত্বে বিশ্বাসী নন, কারণ তাঁর মতে উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল ও আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের রূপরেখার মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও দুই জায়গার শিলাস্তরের মধ্যে সাদৃশ্য নেই। সুতরাং তাঁর মতে উত্তর গোলার্ধে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়া মিলিয়ে ছিল লরেশিয়া এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ছিল গণ্ডোয়ানা, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, মাডাগাস্কার, আন্টার্টিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত নিয়ে।

ডঃ ডিৎজ আশা করেন যে, সিচেলিস দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে গণ্ডোয়ানার এক বা একাধিক বিচ্ছিন্ন খণ্ডের সন্ধান মিলতে পারে এবং ঐরকম খণ্ড আরো থাকা সম্ভব।

অর্বিটার-৫

আমেরিকার অর্বিটার-৫ মহাকাশযান চাঁদের রাজ্যে গিয়ে যে সব কাজ করবে তার একটি হলো চাঁদের দুই পিঠের মানচিত্র সম্পূর্ণতর করা। অর্বিটার সিরীজে এটিই হবে শেষ পর্ব। অর্বিটার-৫ মহাকাশযানের এই মানচিত্ররচনাকারী ক্যামেরা কোপার্নিকাস, হিপার্কাস, আরিস্টার্কাস এবং টাইচো গহ্বরগুলির ছবি নেবে। তা ছাড়া চাঁদের অদৃশ্য দিকের শতকরা ১৫ ভাগের চিত্রগ্রহণ শেষ করবে। এর আগেকার চারটি অর্বিটার এ পর্যন্ত শতকরা ৬০ ভাগের উপর কাজ শেষ করেছে।

বিকিরণ ও অদৃশ্য শত্রু

সোভিয়েট চিকিৎসা বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির গামেলিয়া মহামারী ও জীবাণুবিদ্যা ইন্সটিটিউটে বিকিরণের সাহায্যে নির্বিজাণুকরণ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়ে থাকে। আমরা জানি তাপের সাহায্যেও নির্বিজাণুকরণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তাপ ব্যবহার করা যায় না। উদাহরণ-স্বরূপ পেনিসিলিন প্রভৃতি অ্যান্টিবায়ো-টিক্সের, রক্তের বিকল্পের, এবং প্ল্যাস্টিক্সের জিনিসের নাম করা যেতে পারে। এগুলির
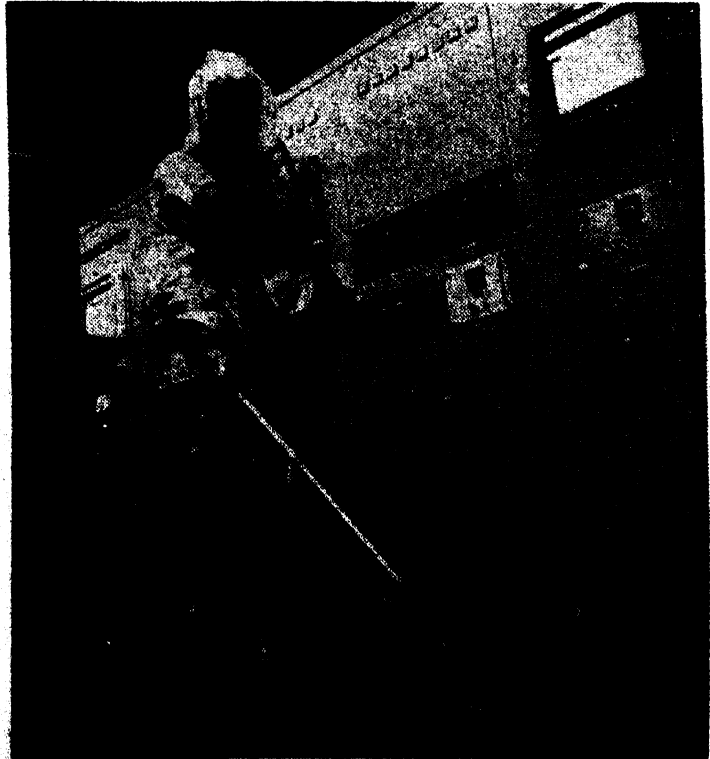
সিমিকর মেকানিক পরমাণু-গবেষণাকেন্দ্রের কর্মস্থলের সর্বত্র কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য তদারক করে থাকেন

গরমে ক্ষতি হয়। সেইজন্য বিকিরণ ছাড়া এগুলির নির্বীজাণুকরণের কোন উপায় নেই। শুধু তাই নয় বিকিরণের একটি সুবিধা এই যে, প্যাক্ করা যন্ত্রপাতি ইত্যাদিও বিকিরণের দ্বারা নির্বীজাণু করা যায়।

চা উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র

সোভিয়েট ইউনিয়নে আজ ৩০—৩৫ বছর যাবৎ চা গাছের উন্নতি নিয়ে গবেষণা হয়ে আসছে। গবেষণার প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে জর্জিয়া। সেখানকার আনাসেউলি নামক গ্রামে ৩৫ বছর আগে চা ও লেবুজাতীয় গাছ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল। সেই গ্রামে আজ গড়ে উঠেছে বিরাট এক চা ও লেবু গবেষণা কেন্দ্র। হালে সেখানকার পরীক্ষামূলক চা বাগানে চায়ের ফলন শতকরা ৩০—৩৫ ভাগ বাড়ানো গিয়েছে। উপযুক্ত সার ব্যবহার করে প্রতি হেক্টার (৭½ বিঘা) থেকে ১৫ টন করে চা পাতা উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

শান্তির স্বার্থে পরমাণু গবেষণা

লাটভিয়ার রাজধানী রিগা থেকে ১০।১২

অর্বিটার—৫-এর সঙ্গে যুক্ত ক্যামেরাটি পরীক্ষা করে দেখছেন জনৈক কুশলী

মাইল দূরে অবস্থিত সালাস্পিলস্ শহরে শান্তির স্বার্থে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের জন্য একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে যেখানে লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও এস্তোনিয়া এই তিনটি বাল্টিক সোভিয়েট রাজ্যের পরমাণুবিজ্ঞানীরা কাজ করেন।

কেন্দ্রের ৮ মিটার উঁচু রিয়্যাক্টারটির অ্যালুমিনিয়াম নির্মিত পাত্রটি (যার মধ্যে পাতিত জল থাকে) দুই মিটার পুরু রিইনফোর্সড্ কংক্রীটের চাদরে মোড়া। তার ভিতর দিয়ে তেজস্ক্রিয়া বাইরে আসতে পারে না। ঐ যন্ত্রে প্রচুর নিউট্রন ও গামা রশ্মি উৎপন্ন হয়। তাতে ১ বর্গসেন্টিমিটার জায়গার মধ্যে সেকেণ্ডে ১০ হাজার কোটি নিউট্রন যাতায়াত করে। আর যন্ত্রটিতে উৎপন্ন গামা রশ্মির বিকিরণক্ষমতা ৩৫০ কিলো রেডিয়ামের সমান। সেখানকার বৈজ্ঞানিকরা বিভিন্ন লোহচৌম্বক ও লৌহ-ঘটিত বস্তুর উপর নিউট্রন ও গামা রশ্মির প্রভাব পরীক্ষা করেন এবং নিউট্রন-বিকিরণের সাহায্যে গাছের বংশগতি ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মগুলি ইচ্ছামত দিকে পরিবর্তন সম্পর্কে গবেষণা করেন।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

৪০,০০০দর্শকের এজাদল—উপরে জ্বলছে "Flames of friendship"—"বন্ধুত্বের দীপশিখা" বাঁ পাশেই উড়ছে ভারতের তিনরঙা পতাকা
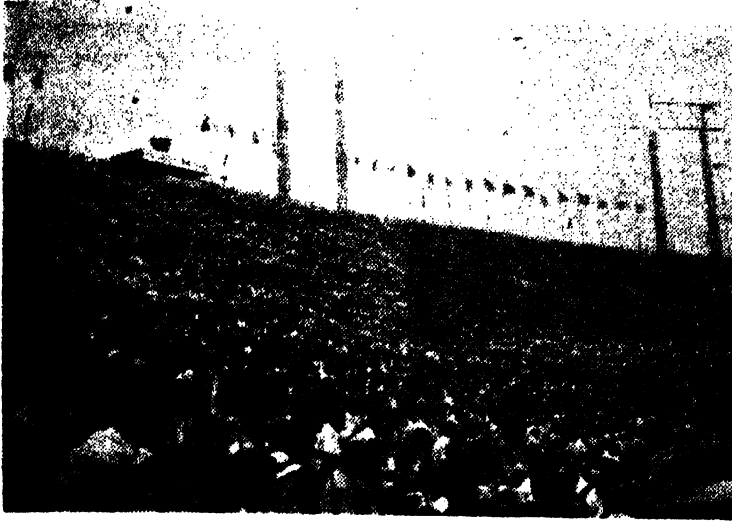
টোকিওর চিঠি

অনেকদিন আগে পর্দায় একটা ছবি দেখেছিলাম "বাড়ি থেকে পালিয়ে।" ছোট ছেলেটা বাড়ি থেকে পালাল অনেক ঘুরল, শেষে বাড়ি এসে মা-এর কোলে মুখ গুঁজল। মা জিজ্ঞাসা করল—"কী রে কোনটা ভাল লাগল? বাইরেটা না বাড়িটা।" ছোট্ট ছেলেটা উত্তর দিল "বাড়িটাই ভাল।" বেশ কিছুদিন পর টোকিও থেকে দেশে ফিরে আমারও সেই কথাটাই মনে হয়েছিল। প্রাচুর্যে ভরা একটা দেশ থেকে গিয়ে দেখেছিলাম বিতৃষ্ণায় ভরা অসংখ্য মানুষের মিছিল। কাজে-অকাজে ঘুরে বেড়ান একদল মানুষ। সবকিছুই হচ্ছে—কাজ এগুচ্ছে না। বিদেশ থেকে ফিরে সব কথার মাঝে সদ্য-প্রত্যাগত দেশী মানুষের বিদেশী তুলনায় চাটুকারী আমাদের হয়ত কিছুটা পেয়ে বসেছিল। তবু কেন জানি মনে হয়েছিল দেশের এই দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ এরাই আমার আপনার, এদের মধ্যেই আমারও সত্তাকার সত্তা খুঁজে পাবে নিজের সত্তাকে। কাজের তাগাদায় আবার ফিরে আসতে হলো জাপানে।

ভাবছি কোনটা জানাব আপনাদের। অনেকদিন পরে কাগজ-কলম এক জায়গায় হচ্ছে। এই তো এখানেও অসংখ্য মানুষ এগিয়ে চলেছে। মানুষের ভিড়—টোকিও না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না যে কলকাতা কত ক্ষুদ্র। তবে চাপাচাপি অতটা নয়। সুবিধা অনেক। ট্রেন আছে, মাটির নীচের সাব-ওয়ে আছে, বাস আছে, তার উপর আছে ট্রাম। যেখানেই উঠুন, যতদূরেই যান ট্রামের ভাড়া এক। অবশ্য ট্রামই হচ্ছে এখানকার সবচেয়ে ধীর গতির বাহন। কই, এরাও তো চলেছে। কোথাও চোখে পড়বে না কেউ কারুর সঙ্গে অহেতুক ঝগড়া করছে। কারুর গায়ে বেশী চাপ লাগল, একটা বিকৃত মুখের কটুক্তিও কারোর ওপর বর্ষিত হচ্ছে না। অযথা কেউ কোন অপরের বিতর্ক নিজের ঘাড়ে টেনে নিয়ে একটা ঘোঁট পাকাচ্ছে না। যে যার মতন উঠল, স্যাণ্ডউইচের মত চেপ্টে গেল। কি ছেলে কি মেয়ে। তার ভিতরেই যদি একটু জায়গা পেল একটা খবরের কাগজ বা বই মুখের সামনে ধরল। নয়ত চোখ বন্ধ করে ঘুমুতে শুরু করল। আমি এমন অনেক দেখেছি সাব-ওয়ে স্টেশনে। গাড়ি আসছে প্রত্যেক তিন মিনিট অন্তর, সেখানেও কেউ কেউ চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। গাড়িতে উঠেই কেউ চোখ বন্ধ করবে, কিন্তু—ঠিক জায়গায় এসে চোখ খুলে যাবে। কই কোথাও এতটুকু চিৎকার-চেঁচামেচি নেই। সদ্য দেশ থেকে এসে এটা বড়ই চোখে পড়ছে। হয়ত কয়েকদিন পর মনে হবে এইটাই তো স্বাভাবিক।

আর যখন যেখানে যেতে চাইছি ঠিক চলেছি। আমি এবার দেশে উত্তর এবং দক্ষিণ ভারত মিলিয়ে অন্তত পঞ্চাশ বারের উপর ট্রেনে চেপেছি। বিশ্বাস করুন, দুর্ভাগ্যবশত এমন একদিনও পাই নি যেদিন ট্রেন ঠিক সময় নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছেছে। কিন্তু এখানে ঘড়ি দেখে ট্রেনে চাপবার দরকার নেই, ট্রেন দেখে ঘড়ি মিলিয়ে নিতে পারেন। হনসু আইল্যাণ্ড থেকে যদি হোক্কাইদো যান (কতকটা আমাদের আজকের ফারাক্কা দিয়ে উত্তরবঙ্গ যাবার মত) ট্রেনে চাপুন, সমুদ্র পার হন প্রায় দুই ঘণ্টা, তারপর আবার ট্রেন ধরুন, কিন্তু আপনি পাবেন না সময়ের এতটুকু এদিক-ওদিক। হনসু থেকে হোক্কাইদো যাবার নূতন টানেল হচ্ছে সমুদ্রের নীচ দিয়ে। লম্বায় ২৭ মাইল। এইটাই হবে পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ টানেল।
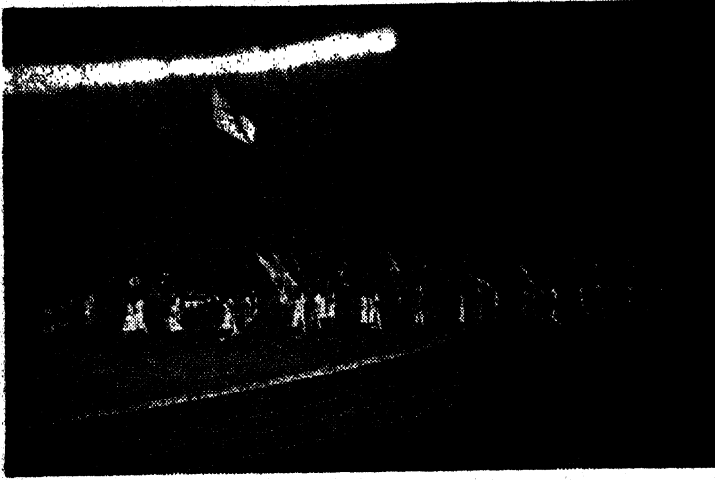
২৫০টি College থেকে ৫০০ জন ছেলেমেয়ে নিজেদের পতাকা হাতে প্রবেশ করছে Stadiumএ—Universiade-এর শেষ দিনকে স্বাগত জানাতে

স্টীমারে পার হবেন, দেখবেন সেখানে বসবার জায়গা তো আছেই তার উপর ছোট ছোট ঘর আছে শোবার বা বিশ্রামের। কেউ জায়গা নিয়ে মারামারি করছে না। নেই কোন ঝগড়া। এইটায় নিয়ম।

এবার দেশে দেখে এলাম 'ঘেরাও' পর্ব। 'ঘেরাও'-এর সপক্ষে এবং বিপক্ষে বহু যুক্তি শুনলাম। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল এদের দেশের 'ঘেরাও' পদ্ধতি। আমার এক বন্ধু একটা মাঝারি ধরনের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। কর্মচারীরা মনে করে, আমাদের বেশী খাটিয়ে কম পয়সা দিচ্ছে। মালিক মনে করে, ওরা কম খেটে বেশী পয়সা নিচ্ছে। ছেলেটি ওদের ইউনিয়নের একজন মাতব্বর ব্যক্তি। হঠাৎ দেখি ও হাতের সঙ্গে একটা কালো "ব্যাজ" লাগিয়ে ঘুরছে। তাতে জাপানীতে লেখা আছে—"আমাদের দাবি মানতে হবে" বা এই রকম কিছু, জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার?

বলল—আমাদের দাবি পাঠান হয়েছে মালিক পক্ষের কাছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—"কি, কোন আশা আছে?"

—"নিশ্চয়ই তারা কিছুটা অন্তত বিবেচনা করবে।"

বললাম—"তোমরা কাজ বন্ধ করে দাও, দেখবে আপনিই দেবে।" আমার দেশীয় মনোবৃত্তি হঠাৎ প্রকাশ করে ফেললাম।

বলল কি জানেন—"পাগল নাকি, কাজের কেন ক্ষতি করব। সে ক্ষতি তো আমাদেরই, আমাদের দেশের। জান, আমরা একদিন কাজ না করলে যে ক্ষতি হবে—তাতে আমাদের মত মাঝারি ধরনের প্রতিষ্ঠান অনেক টাকা লোকসান দেবে, নূতন খরিদ্দারদের কাছে খারাপ নাম কিনবে। তার উপর আমাদের বোনাস-এর সময় তো আমাদেরই ফল ভোগ করতে হবে।" আর কিছু বললাম না। কয়দিন পর শুনিয়ে গেল যে ওদের

ডিরেক্টর ওদের একজনকে ডেকে বলেছে ব্যাজগুলো খুলে ফেলতে। কারণ ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে যারা বাইরে থেকে অফিসে দেখা করতে আসছে তাদের কাছে উপর-ওয়ালাদের বদনাম হচ্ছে। দেখলাম বেশ আনন্দ কিন্তু সুরাহা কিছুই হচ্ছে না। কয়েকদিন পরেই বছর শেষ। সুতরাং যা বলবার বা দেবার, এখনই দিতে হবে। তাই তারা একটু উত্তেজিত। একদিন ইতিমধ্যে এরা সকলে আধ ঘণ্টা পরে কাজ শুরু করে। এইটাই এখানে চরম ধর্মঘটের নমুনা। ওপরওয়ালারা ওদের ডেকে তারপর একটা আপস নিষ্পত্তিতে এসেছেন। ছেলেটি হাসতে হাসতে এল। বললাম "কি, পেলে সব?"

বলল—"Two parallel lines never meet, আমরাও ছাড়লাম কিছু, ওরাও ছাড়ল। Anyway we are happy with reasonable reasons, এটাই আসল কথা।"

এখানে ট্রেন ধর্মঘটেও দেখেছি সেই 'ব্যাজ' পরে ঘুরছে। হয়ত পনের দিন আগে বলা হল অমুকদিন সমস্ত ট্রেনই চলবে তবে এক ঘণ্টা পর। তারপর আবার সেই চলমান জীবনযাত্রা। এদের দাবি আছে। কিন্তু তার উপরে একটা উদ্দেশ্য আছে—জনসাধারণ বা যাদের জন্য আমার কাজ তাঁরা যেন অসুবিধায় না পড়েন। আর একদিকে এদের মাথার উপরেও যাঁরা আছেন তাঁদের দৃষ্টি এবং মান সম্মান বোধেরও একটা সীমা রেখা আছে যেটা কেউই চায় না পার হয়ে যাক। এরা সব সময় ভেবে দেখে যে সামান্য মান-সম্মান আর জেদের বশে যেন একটা বড় ক্ষতি বা একটা বড় অসুবিধা এসে না পড়ে। হঠাৎ "ঘেরাও" থেকে যদি এমন একটা সুস্থ এবং সাবলীল দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর এসে পড়ি তাহলে চোখে তো একটু লাগবেই। এদের মত, তোমার কাজের ভিতর যেমন তোমার স্বার্থ লুকিয়ে আছে; তেমনি তোমার কাজ বন্ধ করবার ভিতর আর একজনকে জব্দ করবার চাইতে নিজের স্বার্থ-হানির সম্ভাবনাও কি খুব কম? আমাকে একজন ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিল "তবে আমাদের কি সত্যই কোন পথ আছে ঘেরাও ছাড়া, অবশ্যই আজকের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে?" উত্তর দিতে পারি নি।

নূতন খবরের ভিতর হচ্ছে ইউনি-ভার্সিয়াড। গত ৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ১৯৬৭ সালের আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার হোম-যজ্ঞ শেষ হল। এবারে কয়েকটা দেশ রাজনৈতিক কারণে যোগদান করেনি। উত্তর কোরিয়াকে কি নামে সম্বোধন করা উচিত তাই নিয়ে কথা উঠেছিল। বয়কট করে কম্যুনিস্ট দেশগুলি। কিন্তু তবুও শেষদিন যখন দেখলাম দলে দলে ছেলেমেয়েরা জাতি ধর্ম দেশ কাল পাত্র ভুলে গিয়ে একে অপরের হাত ধরে উদ্দামতায়

সামনে ছুটে চলেছেন B. Farrel—সকলের অনুমান ধূলিসাৎ করে দিলেন France-এর G. Meyer, শেষ মুহূর্তে এগিয়ে এলেন ঠিক Farrel-এর পেছন থেকে

উচ্ছল হয়ে উঠল তখন ভীষণ ভাল লাগল। সেই মুহূর্তে সকলে ভুলে গেল কে এসেছিল কে আসেনি।

এর ভিতর সব থেকে কৃতিত্বের পরিচয় দিল আমেরিকার সাঁতারুর দল। তেরটা বিশ্ব-রেকর্ড তারা অতিক্রম করল। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে কি কঠিন অনুশীলন তারা করছে আর সেইভাবে এগিয়ে চলেছে। জাপান অবশ্য এশিয়ান প্রতিযোগিতায় যতো সফলতা দেখাতে পেরেছিল এখানে কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে।

তবুও বিশেষ নয়। সোনার মেডেল

ঘরে তুলেছে একুশটা, সতেরটা রৌপ্য পদক আর ব্রোঞ্জ মেডেল ছাব্বিশটা। সেখানে আমেরিকা পেয়েছে সোনার পদক বত্রিশটা, রৌপ্য পদক তেইশটা আর ব্রোঞ্জ ছয়টা। শেষ দিন সব থেকে আকর্ষণীয় ছিল পাঁচ হাজার মিটার দৌড়। প্রথমত জাপানের বিশ্ববিদ্যা-লয়ের রেকর্ড সৃষ্টিকারী দৌড়বীর সাওয়াকি ছুটে চলেছেন অসংখ্য জাপানী ছেলেমেয়ের আকাশ ফাটান উৎসাহের সামনে, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছেন ভ্যান আর্তুর নেলসন। শেষ সময়ের কিছু আগে পর্যন্তও নেলসন এগিয়ে আছেন। অশেষ উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছে এক লক্ষ দর্শক। কেউ কেউ মন্তব্যও করছে "তবে কি সাওয়াকি-সান পারল না?" এ জিজ্ঞাসা সমস্ত জাপানীর চোখেমুখে। পাশেই বসে-ছিল আমার বন্ধু অশোক। বলল "দেখছ না সাওয়াকি-সান কেমন হাসতে হাসতে ছুটে চলেছে—নিশ্চয়ই একটা কিছু করবে। দর্শকদের শুধু একটু উৎকণ্ঠায় রেখেছে।" আর মাত্র দশ মিটার বাকি। নেলসন সমস্ত মুখ বিকৃত করে প্রাণপনে ছুটে চলেছেন। এতটা পথ পিছনে রেখে এসেছেন, শেষ পর্যন্ত কি হেরে যাবেন? নিজেকে নেলসন-

এর ভিতর স্থান করে নিয়ে ভাববার চেষ্টা করেছি শেষ মুহূর্তটা ওইটুকুই তো দর্শকের সব থেকে বড় পাওনা—সমস্ত আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান তার উপর। তখনও সাওয়াকি-সান-এর সেই স্বল্প হাসি। সমস্ত দর্শকের উৎসুক দৃষ্টি তার উপর। হঠাৎ দেখি বড় বড় পা ফেলে প্রায় গজ দশেক এগিয়ে গেছে সাওয়াকি-সান। মুখে জ্বলছে সেই হাসি—"ভয় নেই, তোমাদের আশা পূর্ণ করছি।" ফিতেটা ছুঁয়েই শেষ করলেন না। একবার সমস্ত স্টেডিয়াম ছুটে বেড়ালেন দর্শকদের গা ঘেঁষে। প্রাণ ভরে অভিনন্দন জানাল সমস্ত জাপান। সেদিন সার্থক হল সাওয়াকি-সান-এর সাধনা।

আর দেখলাম ২০০ মিটারের বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী আমেরিকার টোমি স্মিথ-এর দৌড়ের কি সাবলীল ভঙ্গি। সঙ্গে দৌড়লেন এক সময়ের স্বনামধন্য দৌড়বীর ইটালীর বেরুটী। একটি মেয়ে যে একটা দেশের পক্ষে কতখানি সে পরিচয় দিলেন ফ্রান্স-এর জি মেয়ার। আগের দিন দেখলাম ২০০ মিটার-এ সম্ভাবনাময় প্রতিযোগিনী আমেরিকার বি ফ্যারেলকে পিছনে ফেলে হঠাৎ মাথা এগিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত অবাক হয়ে দেখলাম প্রথম থেকে একই গতিতে নিজেকে টেনে এনে কিভাবে ২৩·৮ সেকেণ্ডে দৌড় শেষ করলেন। ·১ সেকেণ্ডে পিছনে পড়ে রইলেন আমেরিকার ফ্যারেল। আর পরের দিন মেয়ার রীলে রেসে মেয়েদের ভিতর সবথেকে পিছনে থাকা ফ্রান্সকে টেনে সামনে নিয়ে এলেন অদ্ভুত তড়িৎ গতিতে, যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। প্রথম হচ্ছিল জাপান; বুঝতেই পারছেন কি গগনভেদী চিৎকার। শেষ সময় হঠাৎ সকলে চুপ হয়ে গেল। চোখের সামনে ও কে ছুটে চলেছে সকলকে ফেলে। সে জি মেয়ার।

সবথেকে মনে হল সত্যই কী সাধনার প্রয়োজন আজকের এই কৃতিত্বের জন্য। আমাদের দেশ থেকেও এসেছিলেন তিনজন যুবক এবং দুজন মেয়ে দৌড়বীর। শেষ দিনের ফাইন্যাল-এর কয়েকটা বিভাগে হরপালকে দেখাও গেল। বলা বাহুল্য সব কয়টাতেই সব শেষে শেষ করলেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শেষ আশ্বাস "জয়ী হওয়ায় প্রধান উদ্দেশ্য নয়, যোগদানই বড় কথা।" একজন রসিক ভারতীয় ভদ্রলোক সেদিন বললেন, "এদের পাশে আমাদের ছেলে-মেয়েদের দেখে কি মনে হয় জান? এরা কেউ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে অ্যাথলেট হয় না। হঠাৎ হয়ত আমরা কেউ জোরে ছুটতে আরম্ভ করলাম, বা হঠাৎ হয়ত বেশী লাফিয়ে ফেললাম তখন আশেপাশের লোকে উৎসাহ দেয় আরও জোরে আরও জোরে। সেই থেকেই হয়ে যায় অ্যাথলেট।" সত্যই এদের সাবলীল ভঙ্গি দেখে মনে হয় এই সাধনার ভিতর একটা কতবড় বৈজ্ঞানিক উপায় আছে। যাকে কেন্দ্র করে গড়ে না উঠলে বা, অনুশীলন না করলে কোনদিনই এদের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠব না। কতদিন আর "শুধু যোগদানের" আশ্বাস নিয়ে থাকব—জিতবেও তো হবে একদিন।

শেষ দিনের রাত্রের অলোকোজ্জ্বল সমারোহ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আর মুগ্ধ করেছিল ওলিম্পিক স্টেডিয়াম-এর ব্যবস্থাপনা। সত্যই যে দেশের এমন আয়োজন আছে, এমন আয়োজন করা সম্ভব তাদেরই শুধু সাজে। তা না হলে বুঝি এমন সুন্দর একটা অনুষ্ঠান প্রাণ পেত না।

ক্রাউন প্রিন্স আকিহিতো এবং প্রিন্সেস মিচিকো শেষ দিন উপস্থিত ছিলেন। উজ্জ্বল আকাশের নীচে তাঁরা জানালেন সমস্ত দেশের ক্রীড়া প্রতিযোগিদের তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। প্রথমে পাঁচ শ জন ছাত্র-ছাত্রী ২৫০টি কলেজ থেকে এগিয়ে এল তাদের নিজস্ব পতাকা নিয়ে। তারপর প্রবেশ করল সমস্ত প্রতিযোগিরা নিজেদের পতাকা হাতে করে। ভারতের পতাকাও সেখানে বিদ্যমান। তারপর তারা হারিয়ে গেল একে অপরের ভিতর। সে এক অদ্ভুত প্রাণ খোলা আনন্দ। মশাল জ্বালল জাপানী ছেলেমেয়েরা। সব মিলিয়ে সেই এক শ' হাজার দর্শকও হারিয়ে গেল তাদের মাঝে।

কোরিয়ার মেয়েরা তাদের দেশের "Chogori" আর "Chima"য় সমস্ত মাঠটাকে আরও রঙীন করে তুলেছিল। আমেরিকার ছেলেরা পরেছিল জাপানী দেশের পোশাক। এর ভিতর ইটালীয়ান একজন প্রতিযোগীর বিবাহও হয়ে গেল এই উপলক্ষে। এই সবের দিকে তাকিয়ে ভুলে যেতে হয়, এখানেও "ক্ষমতার দ্বন্দ্ব", তারই একপাশে আজও পৃথিবীতে একে অপরের সাথে জড়িয়ে আছে। আর এক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে—যার পরিসমাপ্তি "ক্ষয় ও ক্ষতি।" এই প্রসঙ্গে এখানকার একটা পত্রিকা সুন্দর লিখেছে:

"....It impressed on the minds of those present an everlasting sense of friendship of the youths who look towards a brighter 21st century. তারপর Universiade-এর পতাকা International Federation University Sports-এর President Primo Nebiolo-কে দেওয়া হলো। তিনি আবার পতাকা তুলে দিলেন Austria-র H. Kert, President of
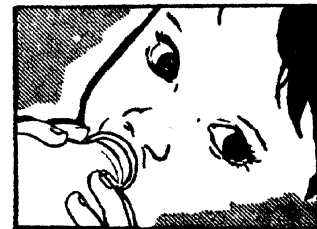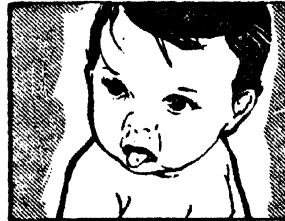
the Students Athletic Association এর হাতে। অস্ট্রিয়া ভার নিয়েছে আগামী শীতকালীন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ক্রীড়াপ্রতিযোগীদের মিলনের।

এর পর মহাসমারোহে 'Flames of Friendship' বা 'বন্ধুত্বের দীপশিখা' সমাপ্তির রেখা টানল দীর্ঘ নয়দিন প্রজ্জ্বলিত হবার পর।

'SAYONARA' জানাল ১০৮৪ জন প্রতিযোগী ৩৪টি দেশের তাদের 'Athlets Village', 'Yoyogi' থেকে।

এর এত সবের জন্য জাপানকে কম খেসারত দিতে হয়নি। প্রতি দিনে এরা লোকসান দিয়েছে ৫৫,০০০ ডলার। কারণ দর্শকসংখ্যা আশানুরূপ নয়। অনেকে বলছেন সোভিয়েতের খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ, তার সঙ্গে আরও ছয়টা দেশের ক্রীড়াবিদদের যোগদান না করা এর মুখ্য কারণ। টিকিট ছাপান হয়েছিল ৬৭৪,০৭৪। তার মধ্যে বিক্রি হয়েছিল ৩৬২,৫০০। মাত্র ৪২·৩% টিকিটের দাম উঠে এসেছে। জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় সব থেকে বেশী দর্শক সমাগম হয়েছিল। সেখানকার ৯৭·০% ভাগ টিকিটই শেষ হয়ে যায়। বাস্কেট বল-এ ৮০ ভাগ আর সব থেকে কম দর্শক হয় 'যুদো'-তে, মাত্র ৩২·? ভাগ। এদের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ৮০,০০০ লোকের বসবার ব্যবস্থা আছে। হিসাব করে সব মিলিয়ে দেখা গেছে ১৩,০০০ প্রতিদিন আসেনি। মনে হয় টেলিভিশনও দর্শক কম হবার আর একটা কারণ। অনেকেই টেলিভিশনের মাধ্যমে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছেন। Athlets-Village তৈরি হয়েছিল ২২০০ জনের জন্য। কিন্তু এসেছেন প্রায় অর্ধেক। ভেবে দেখলাম দেশের মেরুদণ্ডের কতখানি জোর থাকলে এতটা সম্ভব। এদের এক কর্মকর্তা সবথেকে বড় কথা বলেছেন "Universiade wasn't expected to make money."

আজকের শেষে একটা কথা জানাই। শিল্পী মাত্রই গুণীজন। আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, হয়ত সকলের সঙ্গে চাক্ষুষ বা মৌখিক পরিচয় হয় না, সম্ভবও নয় সব ক্ষেত্রে। তবুও তাঁদের শিল্পকে ভালবাসতে গিয়ে তাঁরাও আমাদের আদরের হয়ে ওঠেনি। মনে হয় বড় আপনার। মানুষ আপনার মনে করলেই আব্দার শুরু করে। আর গুণীজনকে এ আব্দার রাখতেও হয়। না রাখলে আমাদের অহেতুক যুক্তিহীন অভিমান হয়। এমনই একটা অহেতুক যুক্তিহীন অভিমান এবার এসে কয়েকজন বাঙালী এবং ভারতীয়ের মাঝে দেখলাম। দেশে থাকতেই শুনেছিলাম এখানে শ্রীযুক্ত হেমন্ত মুখোপাধ্যায় দেশে ফেরবার পথে টোকিও হয়ে যাবেন। এমন একজন বাঙালী এখানে নেই যার ঘরে ওঁর রেকর্ড না পাবেন। এমন একটা দিনও টোকিওতে আমার কাটে না যেদিন একটা না একটা গান ওঁর শুনেছি। কেউ কেউ জাপানী বন্ধু-মহলেও বেশ গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন "দেখবে আমাদের গানে কত দরদ।" কারণ শ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আসছেন। এসে জিজ্ঞাসা করলাম "কলকাতার কাগজে পড়লাম উনি লন্ডনে যে রকম খাতির সম্মান পেয়েছেন কোথাও নাকি তা পাননি?" উত্তরে একজন বললেন, "দেখ আমরা কয়েকজন পৃথিবীর এক কোণায় পড়ে আছি। হয়ত আমাদের দাবি নেই — পরিচয় নেই তবুও একটু আব্দার করবারও কি অধিকার নেই — কাছে পেয়ে একদিন রান্না করে খাওয়াতে চাইলেও কি দোষের? বুঝলাম বাঙালী বউ-এর কোথায় আঘাত লেগেছে। গৃহস্থ-ঘরের আটপৌরে বাঙালী বউ এরা ওই একটা বিষয়ে খুবই সচেতন "রান্না করে খাওয়ানোতে।" আর আজকের জাপানের অনুকম্পার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ভারতীয় হিসাবে যদি কয়েকজন আলী-আকবর, রবিশঙ্কর, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে তুলে ধরতে না পারি তবে আর কি পারব। আছেই বা কি? হয়ত কথা উঠবে এ বিষয়ে তো আমরাও সচেষ্ট হতে পারি। ভারতের ভিতরেই যখন অমন একটা অবস্থা তখন ভারতের বাইরে বসে কি সব সময় সব কিছু সম্ভব? তাই অনুরোধ রইলো রবাহুত হয়েও যদি কেউ এ পথ দিয়ে পাড়ি জমান হয়ত অনেক অসুবিধা অনেক ক্লান্তি এসে জড়ো হবে। তবুও সেইসব গুণীজনের কাছে একান্ত অনুরোধ, এক পাশে পড়ে থাকা গুটিকয়েক ভাই বোনের আব্দার যেন রাখবার চেষ্টা করেন।
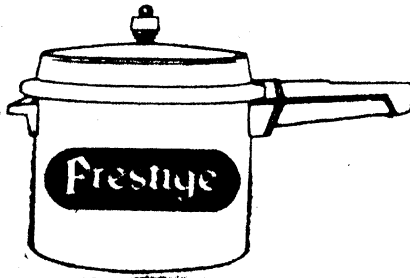
বিকাশ বিশ্বাস

১ম পুরস্কার-প্রত্যেকটি ২,০০০ টাকা :

৫ থেকে ৭ বছর
বিকিন কিরন শেঠ, বোম্বাই

৮ থেকে ১০ বছর
বিভূতি চন্দ্রবদন শুক্লা, বোম্বাই

১১ থেকে ১৩ বছর
মঙ্গলা পাণ্ডুরঙ কুবড়ে, বোম্বাই

২য় পুরস্কার প্রত্যেকটি, ১,০০০ টাকা

৫ থেকে ৭ বছর
নারায়ণ শ্রীরাম, বোম্বাই

৮ থেকে ১০ বছর
কাদম্বরী কৈলাশনাথ সবনীশ, পুনা

১১ থেকে ১৩ বছর
অজয় গুপ্ত, নয়াদিল্লী

৭০টি সান্ত্বনা-পুরস্কার প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা ক'রে! জিতেছেন :—

৫ থেকে ৭ বছর (২৫টি পুরস্কার)—কোমলী রূপচন্দ কোঠারী, বোম্বাই; দেবাশিস বসু চৌধুরী, কোলকাতা; সি.এস শ্রীনিবাসন, নয়াদিল্লী; সৌম্য-রায়, উজ্জয়িন; সুরজিৎ দাশগুপ্ত, নয়াদিল্লী; জয়ন্ত-দীপ চক্রবর্ত্তী, কোলকাতা; রাধারাণী সেন, বোম্বাই; রম্যা এস. দ্রাভিড, বোম্বাই; রোমি মিস্ত্রি, বোম্বাই; অমিতাভ ঝা, বোম্বাই; সুনীতা বিষ্ণু চাপোলকার, বোম্বাই; পুনম মাকর, নয়াদিল্লী; নিখিলা সেন্নাত্তুরাই, রাজকোট; সঞ্জয় আগরওয়াল, মোরাদাবাদ; সুধীর কুমার ভট্টাচার্য্য, হাওড়া; জি সাবিত্রী, মাদ্রাজ; বেহুলা চৌধুরী, নয়াদিল্লী; মরিয়ম কুরু-ভিল্লা, মাদ্রাজ; চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ গোখলে, উল্হাস-নগর; সঞ্জয় সুড, নয়াদিল্লী; নন্দিতা নিরঞ্জন রাভল, বোম্বাই; পরাগ বসু, বোম্বাই; টি. রঘুনন্দন, মাদ্রাজ; শ্রীপ্রকাশ বেন্নুর দত্তাত্রেয়, বোম্বাই; সুমিতা দত্ত, কোলকাতা।

৮ থেকে ১০ বছর (২৫টি পুরস্কার)—কুমকুম মজুমদার, কোলকাতা; বিজয় লক্ষ্মণরাও দহিতুলে, বোম্বাই; অনিলকুমার বিষ্ণু চাপোলকার, বোম্বাই; মিলনকুমার ভট্টাচার্য্য, কোলকাতা, সি ডি. এন. প্রসাদ, পুনা; অমীতা মধুসূদন ধড়কালে, পুনা; সি. এডুজ যুবরাজ, মাদ্রাজ; রজনীকান্ত সেনয়, ম্যাঙ্গালোর; ইয়াসমিন রেহমানসাহ হায়দ্রাবাদ; কিরণবালা সিন্হা, উজ্জয়িন; রামচন্দ্র, ম্যাঙ্গালোর; জোন পৈসলি, বোম্বাই; অমিতাভ রাতুরি, বারা-ণসী; কে.এ. ইকবাল, এর্নাকুলাম; অঞ্জলী কুমার, কোলকাতা; অঞ্জন ভট্টাচার্য্য, রাচী; মিঠুয়া ত্রিপাঠী, কোলকাতা; গুলসন জেমি উমরিগর, বোম্বাই, অঞ্জলী সিং মাদ্রাজ, মহিমা বর্ম্মা, লক্ষ্ণৌ; মধুমিতা বসু, নয়াদিল্লী; অনুপ কুণ্ডু, নয়া দিল্লী; দীনেশকুমার ছাত্রা, নাগপুর; পুর্ণিমা রায়চাদ ধোলাকিয়া, জুনাগড়; অনিল রাজারাম কুলকার্ণী, সাঙ্গলী।

১১থেকে ১৩ বছর (২০টি পুরস্কার)—মালি রাজেন্দ্র বসন্তরাও, বোম্বাই; বীনা বাবুভাই প্যাটেল, আমেদাবাদ; সনৎ গাঙ্গুলী, হাওড়া; চন্দনা খান, কোলকাতা; সিন্ধু জালান, কোলকাতা; আশা দুর্লভভাই মিস্ত্রি, বোম্বাই; ভরত জগন্নাথ কালে, নাগপুর; অপরাজিতা মণ্ডল, হাওড়া; গৌরীধর, কোচবিহার; দেবেশ বর্ম্মা, ইন্দোর; সুধাকর যশোবন্ত পাটাড়ে, বোম্বাই; শোভা রাজারাম কুলকর্ণী, সাঙ্গলী; মধুরানী প্রমোদ দেশপাণ্ডে, কোলকাতা; ঊষা মানিকম, নয়াদিল্লী; সরোশ গার্ড, বোম্বাই; উলরিক স্নিডনার, বোম্বাই; মঞ্জুরানী, নয়াদিল্লী; তেজেন্দ্র সিং ঠাকুর, পাটিয়ালা; সুনীল কুমার দত্ত, কোটা; সুজিত কুমার মুখার্জী, কোলকাতা।

অভিনন্দন! সারা ভারত থেকে হাজার হাজার কলিনস ব্যবহারকারী কলিনস-ছবি-রঙ-করার প্রতিযোগিতায় ভাগ নিয়েছিলেন। সবচেয়ে সুন্দর-ভাবে রঙকরা ছবিগুলো বাছাই করার দায়িত্ব বহন করেন :— শ্রী নিশিম ইজেকেল, কলা-সমালোচক, কুমারী প্রফুল্ল যোশী, প্রখ্যাত শিল্পী, শ্রীমতী মারী পিণ্টো, আর্ট ডাইরেক্টর এডভার-টাইজিং এণ্ড সেলস্ প্রমোশন কোম্পানী বোম্বাই, শ্রী জাহাঙ্গীর সবাওয়ালা, আধুনিক চিত্রকার আর শ্রীমতী নিশা ডাকুনিয়া, ইংরেজী সাহিত্যের লেকচারার, সেণ্ট জেভিয়াস কলেজ বোম্বাই।

আর এই নিন শুভাকাঙ্খীর এক সুপরামর্শ : সকালে ও রাত্রে কলিনস ব্যবহার ক'রে বেশ পরিচ্ছন্ন আর ঝরঝরে বোধ করুন। তাতে সঙ্গী-দের মাঝে পাবেন আরও বেশী আত্মবিশ্বাস... আরও মজা!

ঝরঝরে সতেজ নিশ্বাস! ঝকঝকে উজ্জ্বল দাঁত

■ বা: Kolynos

লাভজনক
ক্রয়!
স্টক ফুরিয়ে যাবার আগে
৬৫ পয়সা দামের
সুন্দর প্লাস্টিকের গেলাস
এখন মাত্র ১০ পয়সায়
এই টিনের
ভেতরে পাবেন।
Cadbury's
Bournvita
DEAL FOOD DRI
ENGTH AND VIG
BARGAIN OFFER!
Attractive Plastic Tumbler Inside!
PAY ONLY 10p. EXTRA!
Bournvita
FOR STRENGTH AND VIGOUR
এই লেবেল দেখে
নিতে ভুলবেন না
শক্তি ও
উৎসাহের জন্য—
ক্যাডবেরিজ
বোর্নভিটা!

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

বিয়াল্লিশ

অরূপ খেলার আসর তো আর এমনি এমনি জমে না। ভাবের ভাবী না হলে কি ভাব জমে! রস না থাকলে, কী পিয়ে আর রসিক হে। এখানে গায়ক-গায়িকা আর শ্রোতায় মিলে অরূপ খেলা জমেছে। ছাতিমতলার মেলায় এখানে, বাউল আসরে, সকলের ভাব লেগেছে। যারা গায়, তাদের। যারা শোনে, তাদেরও।

ভূমি বিনে গাছ জন্মে না। দেহ বিনে প্রাণের আশ্রয় নেই। এখানে তেমনি, শ্রোতা মাতায় গায়ক-গায়িকাকে, তারা মাতায় শ্রোতাদের। গোকুল-বিন্দু একের পর এক গান গেয়ে যায়। তৎক্ষণে গোপীদাস একজনাকে ডেকে একটু ছিলিম সাজাতে বলে।

গোকুল-বিন্দুর গানের সব হিসাব দিই এত আমার স্মৃতিশক্তি নেই। তবু স্মৃতি ঘেঁটে দু' এক কলি স্মরণ না করে পারি না। যেমন :

'সে ফুল মিলতে পারে
মালীর বাগানে
আমার গোঁসাই বই
আর কে জানে।'

স্মৃতি কি কেবল কথার স্মরণে। দর্শনের পটে আঁকা পড়ে রয়েছে যা, স্মরণ সেই কারণেও। বিন্দু যখন এই কলি কয়টি গেয়েছিল, তখন সে গোকুলের দিকে চেয়ে হেসেছিল। আর গোকুল কেমন ঘাড় বাঁকিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে, ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে বলেছিল,

'সে ফুলে যায় না ভ্রমর
গন্ধে অমর
দগ্ধ ভ্রমরী সনে।'...

কথার মর্ম বোঝা দায়, নর-নারীর ভাবের মর্ম বুঝি। মনে হয়েছিল যেন চোখের সামনে ইশারায় ইশারায় কথা কয় ডাগর-ডাগরী। কথা বুঝতে পারি না, তবে দুয়ের মাঝে যে এক পরম লেনা-দেনা চলছিল তা বুঝতে পারি। বাউল বৈরাগী বুঝি না, দেখেছিলাম, গোকুলের চোখে-মুখের ভাবেতে পুরুষ, হাতে-পায়ে ভঙ্গিতে পুরুষ। আর বিন্দু এক মেয়ে। কখনো লাজে লাজানো ডাগর চোখের পাতা ভারী। হাসি চাপতে গিয়ে প্রেমজুরি দুখানি মুখের সামনে এনে মুখ আড়াল করা।

কেবল কী তা-ই! সুজয় মাঝে মাঝে দোতারা সহ নিচু হয়ে দু' এক কথা কী যেন বলছিল বিন্দুর কানের কাছে। তখন শ্যামাঙ্গিনীর মুখখানি রক্তছটায় ঝলকায়নি। লজ্জাদ্যুতির রঙ সে মুখে আলাদা। একবার তো প্রেমজুরি তুলে বিন্দু সুজয়কে মারের ভঙ্গি করেছিল। মনে আছে তখন গোকুল ভিন্ন গানের ভিন্ন কথায় আওয়াজ দিচ্ছিল,

'অ ভোলা মন, রতির ঠিক না হইয়িলে
সতীর কিরপা হবে না।
রতির ঘরে পতি বাঁধা,
একবার খুঁজে দেখ না।'

ওদিকে যখন এই চলেছে, তখন দেখ অচিনবাবুকে। ক্ষ্যাপা বাউল আর কাকে বলে! কেবল যে গলা ছেড়ে ধ্বনি তা না, মাঝে মাঝে যেন ভাবের রসে ডুব ডুবানো।

এদিকে হাতে হাতে কলকে ঘোরে, 'আর ভাই, কে খাবি প্রেমের গাঁজা।' গোপীদাস আমাকে কলকেটি দেখিয়ে ড্যাবডেবে চোখে ইশারা করে, চলবে নাকি। টুকুস ইচ্ছা যে না হয় তা বলতে পারি না। তার আগেই অচিনবাবু হাত তুলে গোপীদাসের হাঁটুতে চাপড় মারেন, 'আর চিতা মজিও না।'

পর পর পাঁচখানা গানের পর গোকুল-বিন্দু থামে। রাতের পোষালী শীতেও দেখ বিন্দুর শ্যামা মুখে ঘামের বিন্দু। গোকুলের পাগড়ির নিচে দিয়ে ঘাম ঝরে।

কিন্তু থামবার যো কোথায়। অচিনবাবু সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ তোলেন, 'এবার সুজয় ধর, তোমার গান শুনব।'

এখানে সবাই ধনী, কিন্তু কৃপণ না। সুজয় দোতারার তারে আঙুল থামায় না। সে অচিনবাবুর দিকে ফিরে মাথা নিচু করে দোতারাটাই কপালে ঠেকায়, নমস্কার। প্রণাম। অচিনবাবু বলেন, 'জয় গুরু।'

'তবে, সুজয় কিন্তু একলা।'

বলতে বলতে সুজয় হাসে। বিন্দুর দিকে তেরছে চায়। বিন্দু সঙ্গে সঙ্গে প্রেমজুরির

দেখিয়ে ঘাড় কাত করে বলে, 'তাল দেব।'

গোকুল বলে, 'আমিও দেব ধর ক্যানে।'

আবার শোন, অচিনবাবুও বলেন, 'জানা পদ হলে ধরতাইও দেব।'

সুজয় আবার তেমনি করে নমস্কার করে। আসর দেখে বোঝা যায়, সবাই মজে আছে। আগের থেকে লোক বেড়েছে অনেক। এমন কি, শহরের হ্যাট কোট রঙ-মাখাদের ভিড়ও লেগেছে। বায়স্কোপের তারা ফেলে বাউলের আসরে। জয় গুরু, জয় গুরু।

সুজয় দোতারায় সুর তোলে, কিন্তু তার সব তাল যেন বিন্দুর প্রেমজুরিতে। বিন্দু থেকে চোখ সরে না তার। কেন হে, হোথা কি সিন্ধুর অশেষ নাকি। প্রায় অন্তর্যামীর মত অচিনবাবু আমার গায়ে একটু ঠেলা দিয়ে সুজয়কে দেখিয়ে হাসেন। বিন্দু দেখে, দেখে দেখে হাসে আর বারে বারেই গোকুলের দিকে চায়। গোকুলও মিটিমিটি হাসে, ঘাড় দোলায়।

সুজয়ের গলা একটু মোটা, একটু বেশী মেঠো মেঠো, যেন বাতাসে দোলা উদাসী। অথচ গলার কাজে, ঢেউ দোলানিতে কেমন একটা অনায়াসের হালকা ভঙ্গি। দুয়ে মিলে যেন একটা ঘর-বাহিরের খেলা। যে উদাসী

চলে যায় তেপান্তরের বুকে, ডাক দিয়ে যায় সে ঘরের আঙিনায়। সে গান ধরে,

'মেয়েকে না চিনতে পেরে
ঘটল বিষম দায়
মেয়ে সর্বনাশী জগৎ ডুবায়
মেয়ে ভজতে পারলে পারে যাওয়া যায়।'

এবার প্রথম আওয়াজ ওঠে গোকুলের গলায়, 'বলিহারি গোঁসাই।'

ধ্বনি দিতে গোপীদাস বাদ থাকে না, অচিনবাবুও না। শ্রোতা-শ্রোত্রীদের মধ্যেও যেন কেমন একটা ঢেউ খেলে যায়। অনেকেই আরো এগিয়ে আসতে চায়। আমি ভাবি সুজয় বাউল বেছে বেছে গান ধরেছে মনোহরণ। সে গান কোথায় যায়, বচন দেয় কোথায়। এ যেন পালা জমে ওঠে।

সুজয় নাচতে জানে ভাল। দোতারা টেনে নামিয়েছে কোমরের কাছে, বেঁকে বেঁকে ঘোরে। বেশী লাফালাফি করে না। অচিনবাবুর দিকে ফিরে বলে, 'পদ কি জানা আছে বাবু গোঁসাইয়ের?'

অচিনবাবু চোখে একটু ইশারা করে বলেন, 'না। তোমার কাছে শিখব।'

সুজয়ের আবার নমস্কার। তারপরে বিন্দুকে একবার দেখে আবার গান ধরে,

'মেয়ে যাকে পর্শ করে
পাঁজরাকে ঝাঁজরা করে
(যেমন) কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরে।
মন মন রে—মেয়ে কটাক্ষ বাণ হানে যারে
তার—মাথার মণি খসে যায়।
মেয়েকে না চিনতে পেরে,
ঘটল বিষম দায়।'

এবার গোপীদাসের গলা সব থেকে জোর শোনা যায়, 'জয় সোজয়, জয় সোজয়।'

সুজয়ের আবার নমস্কার। কিন্তু বাউল সোজাসুজি কটাক্ষ হানে বিন্দুকে আর ঘাড় নাচিয়ে নাচিয়ে যেন পুছ করে কিছু।

বিন্দু হাসতে গিয়ে চোখ মেলায় গোকুলের সঙ্গে। গোকুল হাসে ঢুলুঢুলু চোখে।

অচিনবাবু গলা নিচু করে আমাকে বলেন, 'ব্যাটা জবর চিত্তা বলে মনে হচ্ছে। কী রকম বুঝছ ভায়া?'

অচিনবাবু অনেকক্ষণ থেকেই আর আপনিতেই নেই। অথচ এখনো আমার নাম-পরিচয় কিছুই জানেন না। অবিশ্যি তার দরকারই বা কী। 'এখানে রসিক ডাকে রসিককে।' নাম-পরিচয়ের প্রয়োজন কী। বলি, 'চমৎকার।'

'কোন দিক দিয়ে?'

প্রশ্ন একটু জটিল লাগে। তবু সহজ জবাব দিই, 'যেদিক দিয়েই বলুন।'

'বেশ বলেছ, বেশ বলেছ ভায়া।'

ওদিকে সুজয় আবার ধরেছে,

'সেই ভয়েতে স্বয়ং শঙ্কর
রাখলেন মেয়ে বুকের ওপর
ওরে ভাই—জয়দেব আদি নব রসিক—আর
ছয় গোস্বামী
মাতল মেয়ের সাধনায়।
...ঘটল বিষম দায়।'...

এবার গোপীদাস অচিনবাবুর থেকেও, আর এক নতুন গলা জোরে বেজে ওঠে, 'ও অচিনদা, এবার এদের ছাড়ুন, এখন আর নয়।'

অচিনবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ফিরে তাকাই। দেখি, গেরুয়া পাঞ্জাবির ওপর সাদা পশমী চাদর জড়ানো চশমা চোখে মাঝ-বয়সী ব্যক্তি। আসরের ভিড় ঠেলে একেবারে আমাদের কাছাকাছি।

অচিনবাবু প্রথম নজরে যেন চিনতে পারেন না। তারপরে বলে ওঠেন, 'ওহো, তুমি? কেন, কী ব্যাপার?'

আগন্তুক ব্যক্তি বলেন, 'গোপীদাসদের কয়েকজনকে আজ আমার ওখানে খেতে বলেছি। বেলা তো অনেক হল।'

'কই, সে কথা তো গোপীদাদা একবারও বলেনি।'

বলে অচিনবাবু তাকান গোপীদাসের দিকে। রাধা বুদ্ধা বলে, 'ভুলে যেছে গ।'

আগন্তুক ব্যক্তি তখন ডাক দিয়ে তাড়া দিচ্ছেন, 'কই, গোকুলদাস, সুজয়দাস, চলুন চলুন, অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

আসর মাত করা যেমন কথা আছে তেমনি আসর পাত করাও কথা হয়। সেরকম ব্যাপারই ঘটে। যে কজন নিমন্ত্রিত উঠে দাঁড়ায় তাদের মধ্যে আসল লোকেরা সবাই রয়েছে। গোপীদাস, রাধা, গোকুল, বিন্দু, সুজয়। তাদের সঙ্গে আরো দুজন। তার মানে সবাই, বাকী কেউ নেই।

অচিনবাবু মুখখানি বিকৃত করে বলেন, 'এই তোমাদের শান্তিনিকেতনের লোকদের দোষ। দিলে তো আসরটা মাটি করে।'

ইতিমধ্যে আসর ভাঙতে আরম্ভ করেছে। বিন্দু কাছে এসে বলে, 'কানে গ অচিনদাদা, নিজের কি ভোজন সেবন নাই।'

'আরে ভোজন সেবন তো নিত্যি তিরিশ দিন আছে রে বাপু। এ জিনিস তো নেই।'

গোপীদাস বলে, 'এই তো যাব আর আসব, সেখানে গিয়ে তো বসে থাকব না।'

তখন আগন্তুক হেসে বলেন, 'আপনিও চলুন না অচিনদা।'

'নাঃ, ও তোমাদের শান্তিনিকেতনী ভাব আমার ভাল লাগে না। আসলে তো নিয়ে গিয়ে খান পঞ্চাশ গান লিখে নেবে এদের কাছ থেকে।'

আগন্তুক আবার হেসে বলেন, 'দাদা নিজেও তা-ই, শান্তিনিকেতনের বাইরে না।'

তবু বিফলমনোরথ ভাব যায় না। অচিনবাবু বলেন, 'আমার কথা বাদ দাও, সরকারী আমলা, এখন ঘাটে পা বাড়িয়ে বসে আছি।'

আগন্তুকের সঙ্গে নিমন্ত্রিতেরা রওনা দেয়। বিন্দু তখনো অচিনবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে। বলে, 'ও বেলা দেখা হবে তো?'

অচিনবাবু বলেন, 'নিশ্চয়ই। আমার এই

ভায়ার সঙ্গে তোদের আলাপ করিয়ে দেব, আর এখন দুজনে আলাপ করব।'

বিন্দু আমার দিকে চায়। চোখের দিকে চেয়ে, 'আমাদের গান গোঁসাইয়ের ভাল লেগেছে তো?'

অচিনবাবু অমনি চোখ পাকিয়ে বলেন, 'অ বাবা, ভায়াকে আমার একেবারে গোঁসাই?'

বিন্দুর ডাগর 'চোখের চাহনি' আর গোঁসাই শব্দে আমারও শ্রবণে একটু ঝলক লেগে গিয়েছিল। চোখে মুখে কতটা নিজে দেখতে পাইনি।

আমার জবাবের আগেই বিন্দু আবার বলে, 'গোঁসাই গোঁসাই লাগছে কি না!'

'বুঝেছি, তার মানেই চিতা।'

বিন্দু আর একবার তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসে। আমি বলি, 'খুব ভাল লেগেছে।'

অচিনবাবু বলেন, 'আচ্ছা যা এখন, ও বেলাতে হবে।'

বিন্দু ওর শরীরের লাবণ্যে ঢেউ তুলে চলে যায়। অচিনবাবু বলেন, 'চল ভায়া, এবার তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করা যাক।'

(ক্রমশ)
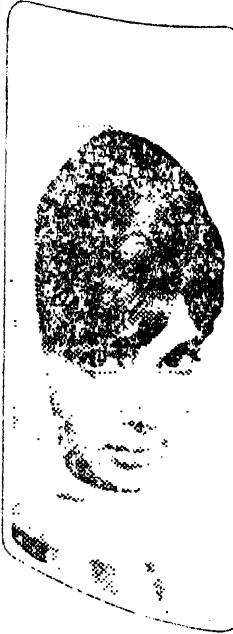
কলকাতার ডায়েরি

হ্যাঁগো আঙুরলতা, এতকাল ছিল কোথা?'—ছিল কাশ্মীরে, আফগানিস্থানে ইরানে; সেখান থেকে ছিটকে এসে তারই একটি আস্তানা পেতেছে কলকাতা শহরের বুকে।

যে-শহরে হঠাৎ কোথাও একটা পলাশ কিংবা শেফালী, গাছ দেখলে থমকে দাঁড়াই, সেই শহরের প্রায় পথের ধারেই একটি আঙুর গাছের সাক্ষাৎ পেয়ে আমি সেদিন যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত।

বছর দুই আগেও ১৩৮ সুরেন ব্যানার্জি রোডে কলকাতা পুলিসের অশ্বারোহী বাহিনীর সদর দফতরের প্রাঙ্গণে শুধু মরসুমী ফুলের চাষ হত। এখন সেখানে ঠাঁই নিয়েছে দুটি আঙুর গাছ। চারধারে কালো কালো লতাপাতার ছাউনি, আর তারই ভিতর থোকা থোকা আঙুর।

চৌরঙ্গি পাড়ায় এখন অন্যতম দর্শনীয় বস্তু এই আঙুর গাছ। কয়েকদিন আগে লোহার রেলিং টপকে কয়েকটি বাচ্চা ছেলে প্রাঙ্গণে ঢুকেছিল. কিন্তু 'আঙুর ফল টক' এই ঘোষণা করে পালিয়ে এসেছে। কেননা আঙুরের জন্যে লোভ থাকলে কী হবে 'গ্রেফতারের' ভয়ও যে রয়েছে।

গাছ দুটোর মালিক অশ্বারোহী পুলিস বাহিনীর অফিসার মিস্টার লুসটন। ওগুলোকে তিনি নজরবন্দী করে রেখেছেন, লোহার রেলিংয়ে ওরা এখন চটঘেরা। তাই সাবধান, কলকাতার ডায়েরির পাঠকেরা যেন বিনিপয়সার আঙুর পেতে প্রলুব্ধ না হোন। আঙুর টক না মিষ্টি সে প্রশ্ন পরে তার আগে জানা দরকার পুলিসের লাঠির গুঁতো যে আদৌ মিষ্টি নয়।

*

গ্রামোফোন কোম্পানিকে ধন্যবাদ. ধন্যবাদ প্রযোজক শান্তি লাহিড়ীকেও। বাংলা দেশের জীবিত ও মৃত কয়েকজন কবির কিছু কবিতার রেকর্ড জনসাধারণকে এবার পুজোয় তাঁরা উপহার দিয়েছেন। তার মধ্যে কিছু কবিদের স্বকণ্ঠের, কিছু অন্যের আবৃত্তি।

এই উদ্যম প্রশংসনীয়, তবে তার সঙ্গে একটা 'কিন্তু' রয়েছে। এই ধরনের লংপ্লেয়িং রেকর্ড বাংলা দেশে এই প্রথম অথচ শোনামাত্র মনে হয়, কবি এবং কবিতা বাছাইয়ে কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। আবার কোন কোন কবির প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্বও যেন রয়েছে।

যেমন রবীন্দ্রনাথের কবিতা মাত্র একটি, নজরুলেরও তাই, জীবনানন্দ, সুধীন দত্ত, প্রমুখের দুটি বা তিনটি। জীবনানন্দের কবিতা আবৃত্তি প্রথমে করলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তারপর আরও কয়েকজন কবিকে ডিঙিয়ে আবার শম্ভু মিত্র। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের, এমনকি আকাশবাণী মারফত জীবনানন্দ সুধীন দত্তের স্বকণ্ঠ-আবৃত্তি পাওয়া সম্ভব সত্ত্বেও তাদের নিজেদের গলা শোনানো হয় নি। অমিয় চক্রবর্তী সম্প্রতি এসেছিলেন কলকাতায়, এমনকি দূর বসটন থেকে টেপ রেকর্ডারে তাঁর নিজের আবৃত্তি পাওয়া অসাধ্য ছিল না. তবু ব্যবস্থা হয় নি। রবীন্দ্রনাথ থেকে সুকান্ত—কবিদের সাজানো হয়েছে বয়সের বিচারে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কবি নয়. কবিতা নয়. আবৃত্তিকারকে প্রাধান্য দিয়ে ধারাবাহিকতা রাখার চেষ্টা হয় নি।

তাছাড়া আর একটি বক্তব্য আছে। রবীন্দ্রনাথের আছে সোনার তরী. কবিতাটি বহু-বিতর্কিত, কিন্তু ওই একটিতে রবীন্দ্রনাথের

প্রতি সুবিচার করা যায় কিনা, তা নিয়ে আবার বিতর্ক চলতে পারে। প্রসঙ্গত স্মরণ করিয়ে দিই এই কবিতাটিই গ্রামোফোন কোম্পানিতে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল আগে নিজে রেকর্ড করেছিলেন। যদি সোনার-তরী-র উপর এত নজর, তখন সেটি উদ্ধার করে জুড়ে দেওয়া হয় নি কেন?

আর একটি কথা জানাবার আছে, রেকর্ডটি আদৌ প্রতিনিধিত্বমূলক হয় নি। কেননা সত্যেন দত্ত, মোহিতলাল এবং যতীন সেনগুপ্তকে বাদ দিলে কবিতা সংকলন অসম্পূর্ণ থাকে। এক্ষেত্রে তাই হয়েছে। সুকান্ত ভট্টাচার্য আছেন, উত্তম; কিন্তু গুণের আর প্রভাবের বিচারে চল্লিশ এবং পঞ্চাশের আরও দু'-চারজন কবিকে নিশ্চয়ই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল।

সব শেষে বলি, কয়েকজন খ্যাতনামা আবৃত্তিকার থাকা সত্ত্বেও তাঁদের তুলনায় কবিদের—প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ—নিজেদের আবৃত্তি ঢের ঢের ভাল হয়েছে।

শুনলাম গ্রামোফোন কোম্পানি, এই ধরনের আরও কয়েকখানি রেকর্ড বার করবেন। সম্পাদনা ও নির্বাচনের ব্যাপারে যেন ভবিষ্যতে তাঁরা আর একটু যত্নবান হোন।

*

অনেকদিন আগে প্রস্তাব দিয়েছিলাম চৌরঙ্গি রোড আর লোয়ার সারকুলার রোডের মোড়ে যে চমৎকার পুকুর রয়েছে, সেটিকে সংস্কার করে নগরবাসীর বিনোদনের ব্যবস্থা হোক। সেখানে ছুটবে রঙীন পালতোলা ছোট্ট নৌকো, থাকবে ভাসমান রেস্তোরাঁ বাজবে ব্যান্ড।

সুসংবাদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুকুরটিকে ঘষামাজা করে একটি বিনোদন-কেন্দ্রে পরিণত করার কথা ভাবছেন। হলফ করে বলতে পারি, তথ্যকেন্দ্র, সৈনিকভবন, রবীন্দ্র-সদন, একাডেমি অব ফাইন আর্টস, সেণ্ট-পলস ক্যাথিড্রাল এবং প্রস্তাবিত শিশু গ্রন্থাগার ও শিশু জাদুঘরে ঘেরা এই জায়গাটি ভবিষ্যতে শহরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠবে। এখন অবশ্য প্রার্থনা, প্রস্তাবটি দ্রুত কার্যকর হোক।

*

পুর, নগর, গঞ্জ—এই তিনটি শব্দ জুড়ে আমরা কত জায়গার নামকরণ করেছি। যে-ক'টি 'লেজুড়' দিয়ে নতুন নতুন স্থানের নাম আমাদের কাছে পরিচিত হয়েছে, তার মধ্যে এই তিনটিই প্রধান। তাছাড়া আবাদ, গাঁ, দহ, ডাঙা, গড়, পাড়া ইত্যাদি আরও কতকগুলো সিরিজ রয়েছে।

শুধু তাই নয়, বাংলা দেশের জেলায় জেলায় আবার অন্য রকমের এক একটি সিরিজ গ্রামের নামে চলে। যেমন বীরভূমে 'সেরান্দি সিরিজ'—হাটসেরান্দি, গোপ্তা-সেরান্দি। সিলেট কাছাড় ত্রিপুরায় তেমনি রয়েছে 'উড়' এবং 'কান্দি' সিরিজ—কুলাউড়া, ভাড়াউড়া, আখাউড়া ইত্যাদি এবং পাথরকান্দি, মান্দারকান্দি, হাইলাকান্দি ইত্যাদি।

এই বিষয় নিয়ে বিশেষ কোন আলোচনা আজও হয় নি; যদি কোন উৎসাহী এই স্থান নাম মাহাত্ম্য নিয়ে অগ্রণী হন, তাহলে অনেক নতুন তথ্য জানা যেতে পারে।

তত্ত্ব কথা থাক, আসল কথায় ফিরে আসি। স্বাধীনতালাভের পর উদ্বাস্তু-উপনিবেশগুলির কল্যাণে পশ্চিমবঙ্গে গঞ্জ নয়, পুর নয়, নগর-এর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে অসংখ্য। রিফিউজি কলোনিগুলি নগরে নগরে ভর্তি। হোক ঘিঞ্জি বাড়ি, থাক খোলা নর্দমা, সরু রাস্তা, তবু তারা নেতাজী নগর, গান্ধীনগর, নেহরু নগর, সুচেতা নগর, প্যাটেল নগর ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার মধ্যে আবার নেতাজীর নাম ব্যবহারই বেশি। সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু আশ্চর্য লাগে, গান্ধী বা প্যাটেলের নাম দেখে। নামকরণে নাকি কলোনি প্রতিষ্ঠার সময় উদ্বাস্তু পাড়ায় গান্ধীবাদীর সংখ্যা এত কম ছিল না?

*

বালিব্রিজের নাম বিবেকানন্দ ব্রিজ মুখে মুখে চালু হয়ে গিয়েছে, কিন্তু হাওড়া পুল? যতদূর মনে পড়ে কবে যেন সরকারীভাবে ওটার নামকরণ হয়েছিল রবীন্দ্রসেতু। চলেনি। বোধ হয় চলবেও না সুতরাং কর্তাব্যক্তিদের কাছে অনুরোধ প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে অন্য কারও নামে দিন কিংবা সরকারীভাবে ওই হাওড়া পুলই বহাল থাকুক।

—চাণক্য

'মার্কিন চিত্রকলার' প্রাক্‌কালে মার্সেল দ্যুশম্প

মাঝে শুধু আটলান্টিকের ব্যবচ্ছেদ; তা ছাড়া মৌল তফাত আর কী রয়েছে? আমি মার্কিন দেশের কথা বলছি; ইউরোপের শিল্প-সাহিত্য, সেই দেশের মানুষ, সেই দেশের ভাষা, এ-সব মিলিয়ে, নতুনভাবে মিলে, মার্কিন দেশ। ইউরোপের ঐতিহ্যই আমেরিকার ঐতিহ্য—অতএব কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক যখন চিত্রকলা ইউরোপে এই শতকে এসে বহুমুখী চঞ্চলা যুবতীর রূপ নিয়েছে তখন সে বিষয়ে মার্কিনীরা কী ভাবছে। আমরা মার্সেল দ্যুশম্পের সঙ্গে আটলান্টিক পার হতে পারি, কিন্তু তার আগে এই শিল্পী বিষয়ে কিছুটা জেনে নেওয়া যাক।

মার্সেল দ্যুশম্প জন্মেছিলেন ১৮৮৭ সালে ফরাসী দেশের ব্লাঁভিলে। নোটারি পিতার ছ' সন্তান, চারজনই তার মধ্যে ছবি আঁকে। মার্সেল দ্যুশম্প, জাক ভিয়, সুজান দ্যুশম্প, এই তিনজন চিত্রশিল্পী; দ্যুশম্প ভিয় নামে আরেক ভাই, সে ভাস্কর।

মার্সেল দ্যুশম্প লোকটা একটু পাগলাটে। শিল্পী-সাহিত্যিকদের একটা টাইপ-পাগলামো থাকে, যেগুলো এখন আমাদের কাছে দেখানোপনা বলে ঠেকে, ঠিক সেই ধরনের ব্যাপার কিন্তু নয় দ্যুশম্পের, বরঞ্চ তার পাগলামো আসছে অতীব নির্বিকার স্বভাব থেকে। খুব নির্বিকার মুখে তিনি টিনে করে ফরাসী বাতাস নিয়ে যাচ্ছেন আমেরিকায়, ছবিতে মোনা-লিসার মুখে গোঁফ জুড়ে দিলেন, সবই খুব ঠাণ্ডা-ভাবে করে চলেছেন, "সমাজে বিশ্বাস করি না, ভেঙে দেব সব" এই জাতীয় চিৎকার নেই।

স্যাঁৎ জেনেভিয়েভ লাইব্রেরিতে যৌবনে কাজ নেন দ্যুশম্প। কাজ আসলে বসে থাকার, তা ছাড়া খুব বড় কাজ নয় বলে দায়-দায়িত্ব নেই, মাঝে মাঝে কামাই করলে অসুবিধে নেই। ১৯০৮ থেকে ১৯১০ তিনি কিছু ইম্প্রেশনিস্টদের ধরনে ছবি আঁকেন—হঠাৎ এতদিন পরে ইম্প্রেশনিস্টদের মত ছবি আঁকায় অনেকেই অবাক হয়—ওঁর উত্তর 'না, এই একটু দেখলুম ওরা কেমন-ভাবে এসব রঙের খেলা খেলত।' ১৯১১তে তাঁর প্রথম মৌলিক ছবি প্রকাশিত হল 'A propos de petite socur'। ফর্ম ভাঙার ব্যাপার ১৯১২তে আরো প্রকটভাবে দৃশ্য হল বিখ্যাত ছবি 'Nude descending the stair-case' চিত্রে। ১৯১৩তে নিউ ইয়র্কের আর্মারি প্রদর্শনীতে এই ছবি রেখেছিলেন তিনি, ম্যানহাটনের তরুণদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল চিত্রটি নিয়ে। মার্সেল দ্যুশম্প বিখ্যাত হয়ে গেলেন রাতারাতি। কোনো এক সমালোচক ছবিটি বিষয়ে লিখলেন,

'The canvas is an explosion in a shingle factory'.

মার্সেল দ্যুশম্প 'Nude descending a stair-case' আঁকার পরে বহু মার্কিন যুবক তাঁর কাছে ছবি আঁকার পাঠ নিতে আরম্ভ করে—দ্যুশম্প ছাত্র আঁকিয়েই পেট চালাতেন, শুনেছি মাত্র দু' ডলার ছিল তাঁর এক ঘণ্টা পাঠ দেওয়ার জরিমানা। এই সময় বিখ্যাত চিত্রকর পিকাবিয়ার সঙ্গে দ্যুশম্পের যোগাযোগ হয়, এবং কিছু দিনের মধ্যেই গভীর বন্ধুতা। এই দুই চিত্রকর দাদাইজমের সূচনা করেন।

১৯১৫ থেকে ১৯২৩ খুব আরাম করে প্রচুর সময় নিয়ে দ্যুশম্প এক বিরাট ছবি আঁকেন, ক্যানভাসের দৈর্ঘ্যই বার নয় ফুট। ক্যানভাস বলা ভুল হল, চিত্রটি আঁকা হয়েছে স্বচ্ছ এক কাঁচের পাতের ওপর, আঠা দিয়ে তার ওপর মেরে দেওয়া হয়েছে রঙিন টিনের কুচি। ছবিটির নাম "The Bride Stripped Bare by Her Bachelors"। ছবিটিকে "mystical-mechanical epic of desire" বলে বহু সমালোচক বর্ণনা করেছেন। চিত্রটি হাতের কাছে না থাকায় মুদ্রিত করা যাচ্ছে না—মোটামুটি হয়তো এইভাবে বর্ণনা করা যায় যে, ক্যানভাসের প্রতিপাদ্য একটি নববধূ; আকাশ থেকে যেন ঝুলে আছে, চতুর্দিকে

ন্যুড ডিসেনডিং দ স্টেয়ার-কেস

তার কুমারবৃন্দ। এদের মধ্যে ন'জন লাল পোশাক পরে ঋজুভাবে উপস্থিত—পুরুত, বর্ম পরা সৈনিক, পুলিস, সেপাই, বার-বয়, দোকানী, স্টেশনমাস্টার এই দলে উপস্থিত।

সমস্ত জিনিসটা যেন একটা মহাশূন্যো নৃত্যের মত ঝঙ্কার নিয়ে উপস্থিত। আঁদ্রে ব্রেত' এই ছবিটি বিষয়ে বলেছিলেন. "human bone seen by one from another planet, who cant make head or tail of it."

এই চিত্র আঁকার পর দ্যুশম্পের খ্যাতি হয় পৃথিবী-জোড়া, কিন্তু তাঁর কোনো বিকার নেই। ছবি আঁকা বন্ধ করে দিয়েছেন, কেননা দাবা খেলতে তুলি চালাবার চেয়ে নাকি অনেক বেশী আনন্দ।

একমাত্র আধুনিক শিল্পী যিনি পুনরাবৃত্তির দোষে দুষ্ট নন। কুড়িটি ক্যানভাস এবং গ্লাস-প্যানেল যেগুলো তাঁর সবচেয়ে প্রিয় চিত্র সবই ফিলাডেলফিয়ার রয়েছে। তাঁর কাছে সমস্ত জগৎ-জোড়া শিল্প ছড়ানো, শিল্পীর একটু হাতের ছোঁয়ায় বোতল কিংবা ভাঙা কাঁচও শিল্প হয়ে উঠতে পারে।

দ্যুশম্পের ছবির উদাহরণস্বরূপ 'Nude descending the stair-case' মুদ্রিত হল।

শুদ্ধশীল বসু

ট্রামে বাসে
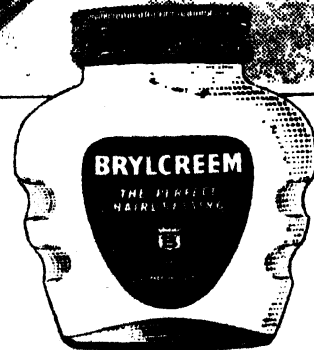
কলিকাতা হাই কোর্ট ঘেরাও প্রসঙ্গে—'হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী **শ্রীঅজয়কুমার** মুখার্জি মহাশয় বলিয়াছেন, হাই কোর্টের পবিত্রতা রক্ষা করিতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিশু খুড়ো বলিলেন—"হ্যাঁ, গঙ্গা কাছেই। এখন কিঞ্চিৎ বারি সংগ্রহ; সিঞ্চন এবং অপবিত্র পবিত্রো বা বলার অপেক্ষা মাত্র!!"

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান নাকি তাঁদের সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত এক সভায় ঘোড়দৌড় উঠাইয়া দিয়া ঘোড়দৌড়ের মাঠে একটি আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। সহযাত্রী বলিলেন—"অতি উত্তম প্রস্তাব। তবে আরো উত্তম হত, যদি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াগুলিকে দিয়ে জঞ্জাল অপসারণের গাড়ি টানার প্রস্তাব নিতেন; জঞ্জাল সাফের গাড়িগুলি সম্পর্কে যা শুনছি তাতে মনে হয়, ঘোড়াই বুঝি একমাত্র সমাধানের পথ!!"

জনৈক পত্রপ্রেরক প্রতি পাড়ায় একটি করিয়া পুজো (দুর্গাপুজো) অনুষ্ঠানের আবেদন জানিয়েছেন।—"কিন্তু তিনি ঢাকী, পুরুত, লরি এবং বিশেষ করে মাইকওয়ালাদের কথাটা ভেবে দেখেন নি এবং হয়ত ঘেরাও সম্পর্কেও তাঁর সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নেই। সুতরাং ঘা কর কেন খুঁচিয়ে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

উপাচার্য সম্মেলনে আঞ্চলিক ভাষাকেই শিক্ষার বাহন বলিয়া স্বীকৃতিদান (অবশ্যই আপাততঃ) করা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত ঘোষণা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ইংরেজীকে একটি বিশেষ "গিফট" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (ধন্যবাদ) এবং উহাকে "প্রিজার্ভ" করার কথাও বলিয়াছেন। খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু এই সংরক্ষণ জাদুঘরে হবে, না চিড়িয়াখানায় হবে তা তিনি বলেন নি!!"

খাদ্যসংকট সুরাহায় যুক্ত ফ্রন্ট অর্থাৎ সুপার ক্যাবিনেট তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন : (১) বড় চাষীর উদ্বৃত্ত ধানচাল সংগ্রহ; (২) খোলাবাজার যথাসম্ভব বন্ধ; (৩) রেশনের প্রসার।—"খাদ্যসমস্যা সম্পাদ্যের অপূর্ব উপাদান, সেন্ট পারসেন্ট মার্ক, বিশ্বাস না হয় গণ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কশীট আনিয়ে দেখুন!!"—এই মন্তব্যও বিশু খুড়োর।

হাওড়া স্টেশনে সাম্প্রতিক যাত্রী-তাণ্ডবের সময় কে বা কাহারা নাকি প্রেস ফটোগ্রাফারদের উপরেও লাঠি চালাইয়াছে।—"কিন্তু আমরা বলব, এতে
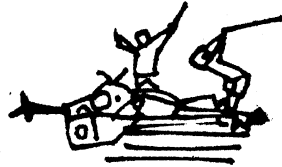
নিজেদেরই ক্ষতি করলেন তাঁরা। ফটোগ্রাফার উপস্থিত না থাকলে এমন মহা-সংগ্রামগুলি পরবর্তী যুগে বেপাত্তা হয়ে যাবে যে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

সামরিক বুটের তলায় ক্যান্টন"—একটি সংবাদ-শিরোনামা। শ্যামলাল বহুদিন-বিস্মৃত একটি গানের চরণ শুনাইল—"ডু ইউ নো ডেপুটিবাবু, আওয়ার হেড ফিরিঙ্গীর বুটের তলে" এবং বলিল—"চীনে হয়ত্ত যবনিকাপাত সমাসন্ন!"

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি মহাশয় নাকি বলিয়াছেন যে, পাঁউরুটি লইয়া কালোবাজারি সত্যই লজ্জার কথা।—"কিন্তু মন্ত্রী মশাই এই

আপ্তবাক্যটি নিশ্চয় শুনেছেন—ঘৃণা, লজ্জা, ভয়—এই তিন থাকতে নয়"—মন্তব্য করেন অনৈক সহযাত্রী।

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, **পূর্ব** পাকিস্তানে মুসলমানদের **পক্ষে মদ্য-পান** নিষিদ্ধ করিয়া আবগারী আইন সংশোধন করা হইয়াছে। **সহযাত্রী জড়িত** কণ্ঠে সংক্ষেপে বলিলেন—"**এইবার হাঁদ** ছেলের কিছু হয়।"

অন্য একটি সংবাদ-শিরোনামা—'অবিরাম গোলাবর্ষণের পর চীনারা ক্লান্ত'। সহযাত্রী বলিলেন—"হান্টার কমিটির সামনে মাইকেল ওডায়ারের সাক্ষ্যের কথা মনে পড়ছে; তিনি জালিয়ানাবাগে গুলি-চালনা প্রসঙ্গে সদম্ভে বলেছিলেন, গুলি তিনি আরো চালাতেন কিন্তু বুলেট ফুরিয়ে যাওয়ায় তা পারেন নি। চীনাদের ক্লান্ত হওয়ার কারণ কি বুলেট ফুরিয়ে যাওয়া?"

খনি-মালিকরা রেলকে আগের দরে কয়লা দিতে রাজী হইয়াছেন।—"খুব ভালো কথা। কিন্তু কথাটা কয়লার বলেই শত ধোতেন কথাটা মনে না করে পারছি নে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

এক সংবাদে শুনিলাম, জাপানে নাকি নেকটাই-এর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হইয়া গিয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা 'মেরা জুতা হ্যায় জাপানী' বলে জাপানী নীতি গ্রহণ করেছি বটে কিন্তু নেকটাই সংহার-নীতি নেমে নিতে পারছি নে, বরং
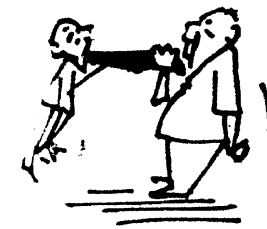
তাকে মর্যাদা দেবার জন্য তার নামকরণ করেছি 'কণ্ঠলেঙ্গটি'—সংস্কৃত লিঙ্গপট্টম শব্দ দ্রষ্টব্য, বোধগম্য না হলে চেপে যান!!"

একটি চাঞ্চল্যকর (অবশ্য এই বিশেষণ আজকাল অর্থহীন) সংবাদে শুনিলাম, গত তিন বৎসরের মধ্যে আলি-পুরস্থ গ্রন্থশালা হইতে প্রায় সাত শত পুস্তক নিখোঁজ। বিশু খুড়ো বলিলেন—"গ্রন্থ চুরি (যদি তা-ই হয়ে থাকে) জাতীয় কলঙ্ক, অপরাধীকে সাদামাটা বাংলায় বলা যায় "চোর", কিন্তু গ্রন্থগুলি যথাস্থানে রেখে শুধু তার বিষয়বস্তুগুলিকে বেমালুম আত্মসাৎ করা ভালো, এবং যে তা করে তার একটা পোশাকী নামও আছে, অর্থাৎ কুম্ভীলক!!"

সারাদিন স্নিগ্ধ ও ঝরঝরে রাখবে…
পণ্ড্‌স
ড্রিমফ্লাওয়ার
ট্যাল্‌ক
পণ্ড্‌স ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক বাড়ির ছেলেবুড়ো সবাই বছরে বারোমাসই মাখতে পারবেন। শরীর জুড়োয়, মন তাজা রাখে…যেমন মোলায়েম, তেমনি আরামদায়ক…প্রচণ্ড গরমে, ভ্যাপসা আবহাওয়ায় ঘাম শুষে নিতে অদ্বিতীয়। পণ্ড্‌স ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক ব্যবহার করুন, এর মিষ্টি গন্ধ বহুক্ষণ গায়ে লেগে থাকবে…সারাদিন শরীর-মন ঝরঝরে রাখবে।
Pond's
Dreamflower talc
Dreamflower talc
সব পরিবারের পক্ষেই
সুলভ সুন্দর
সুবাসিত ট্যাল্‌ক
চীজব্রো-পণ্ড্‌স ইন্‌ক
(সীমাবদ্ধ দায়ে যুক্তরাষ্ট্রে সমিতিবদ্ধ)

সাম্যবাদ ও প্রগতির পথ

॥ ১ ॥
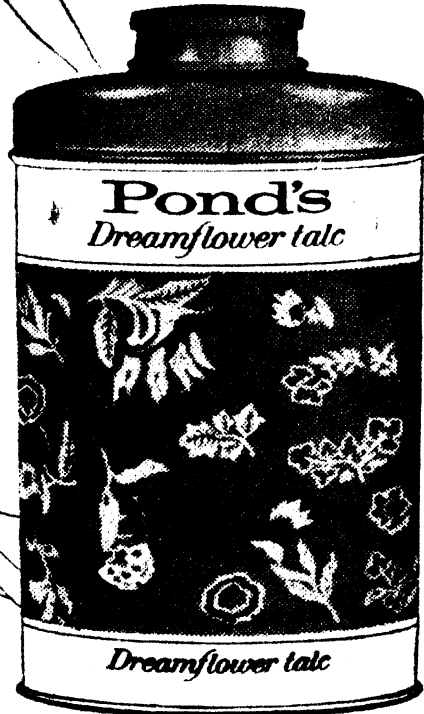
গত ১২ আগস্টের সংখ্যায় শ্রীঅম্লান দত্ত মহাশয়ের 'সাম্যবাদ ও প্রগতির পথ' শীর্ষক প্রবন্ধটি সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন আছে। অ-মার্ক্সবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি যা বলেছেন, মার্ক্সবাদীর পক্ষ থেকে তার ভ্রান্তিগুলির প্রতিবাদ জানানো কর্তব্য। শ্রীদত্তের বিরুদ্ধে বক্তব্যগুলি নীচে লিখিত হল।

(১) তিনি সাম্যবাদ ও প্রগতির পথ সম্পর্কে কিছুই বলেন নি, শুধু অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির দৃষ্টিভঙ্গীতে ধনতন্ত্রের সংগে সমাজতন্ত্রের একটা তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, ধনতন্ত্রের প্রতি অহেতুক পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে। এবং সেই পক্ষপাতটিকে ঢাকা দিতে প্রথমেই একটি উলটো ধরনের উক্তি করে রেখেছেন—"ব্যক্তিগতভাবে আমি সাম্যবাদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল।" যেন এই স্বীকারোক্তিই তাঁকে ধনতন্ত্রের প্রতি নির্বিচার পক্ষপাতের ছাড়পত্র দিতে পারে। তুলনার ক্ষেত্রে যেখানে ধনতন্ত্রের ত্রুটিগুলির কথা নিজেই তুলেছেন, সেখানে সেগুলিকে অত্যন্ত লঘুভাবে দেখে এড়িয়ে গেছেন, কিন্তু যেখানে সমাজতন্ত্রের ত্রুটির কথা বলেছেন সেগুলিকে প্রয়োজন-অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং এমন ভাব দেখিয়েছেন যেন এই ত্রুটিগুলি অনপনেয়, এবং এর থেকে মুক্তির আশা একেবারে নেই।

(২) তিনি লিখেছেন : "যে সব যুক্তি সাম্যবাদকে ধনতন্ত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে পারে, সে যুক্তিগুলি প্রায়ই অভ্রান্ত নয়।" মনে রাখা ভাল, পৃথিবীতে কোন মতবাদই সম্পূর্ণভাবে অভ্রান্ত নয়—কাজেই এই সব "প্রায়ই অভ্রান্ত নয়" গোছের অস্পষ্ট কথা থেকে সরে এসে সত্যিকার কোন্‌খানে কতটা ভ্রান্তি তাই দেখানোই শ্রীদত্তের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। এই "প্রায়ই অভ্রান্ত নয়" ধরনের কথা তাঁর প্রবন্ধটিতে ছেয়ে আছে। যেমন ধরুন, শ্রীদত্তের মন্তব্য : "ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত মুনাফা হয়, অতএব এটা মন্দ, এবং সমাজতন্ত্রে সমাজের হিত চাওয়া হয়, অতএব ওটা ভাল—এই 'নীতিসর্বস্ব' চিন্তার ওপর একান্ত নির্ভর করে কোন যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা বেশী দূর সম্ভব নয়।" এখানেও সেই "বেশী দূর সম্ভব নয়"—কিন্তু কতদূর সম্ভব সে কথার কিছু নির্দেশ নেই। কিন্তু তুলনামূলকভাবে একটির পক্ষে যুক্তি যদি অন্যটির চেয়ে কিছু বেশীও যৌক্তিক প্রমাণিত হয়, তা' হলেই প্রথমটির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়—এই সাধারণ সত্য কি শ্রীদত্ত জানেন না? তবে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে দ্বিধা কেন? দ্বিতীয়ত, লক্ষ করুন ওই "নীতিসর্বস্ব" কথাটি। যেহেতু সত্যই ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত মুনাফা বনাম সমাজতন্ত্রের সামাজিক হিত—এই দুয়ের মধ্যে বাস্তবিকই একটা অবিসম্বাদী মানবিক নীতি আছে—সেইহেতু কি সেটাকে 'নীতিসর্বস্বতা'র দোহাই দিয়ে আড়াল করা হল? পরবর্তী লাইনগুলিতে তিনি 'জীবনের প্রবলতম প্রবৃত্তি স্বার্থবোধ'-এর কথা বলে ধনতন্ত্রে ব্যক্তিগত মুনাফার সীমাহীন লোভ ও সমাজতান্ত্রিক দেশে এই স্বার্থবোধের সীমাবদ্ধ প্রয়োগ (যেমন ইদানীং কালে রাশিয়ায় প্রোঃ লিবারম্যান প্রচারিত Profit motive-এর প্রয়োগ ইত্যাদি) এ দু'টোকে এক করে কি করে দেখলেন, তা' বোঝা দুষ্কর। বিশ্বের তাবৎ সৎ মার্ক্সবাদী জানেন, এই দুরপনেয় ও অপ্রতিরোধ্য জৈবিক প্রবৃত্তি স্বার্থবোধকে আদর্শ সমাজতন্ত্রে কিভাবে সার্বিক জনহিতে লাগানো যায়, সে নিশ্চয় একটা সমস্যা, যার যথার্থ সমাধান এখনো হয়নি।

কিন্তু সমাজতন্ত্রের এই মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মানুষের যুগ-যুগান্তরের জৈবিক অপ্রতিরোধ্য প্রবৃত্তিটির ঠিকমত প্রয়োগ সম্ভব হয়নি বলেই ধনতন্ত্রে এর অমানবিক প্রয়োগ ও কুফল আবার নতুন করে ভাবতে হবে, এতে কি আড়ালে ধনতন্ত্রকে একটু বেশী প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না?

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, এই জৈবিক অপ্রতিরোধ্য "স্বার্থবোধে"র সম্পূর্ণ বিলোপ সম্পর্কে মার্ক্সবাদীর ধারণাটা কি। এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধানই সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে কঠিন সমস্যা, এবং কতদিনে এটা সম্ভব তার সম্পর্কে লেনিনের উক্তি স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন:

"We do not know how quickly and in what succession they will wither away, but we know that they will wither away in due time (Lenin: State and Revolution. Page 83, of Moscow publication). এবং এটি সম্ভব—সমাজতন্ত্রের প্রথম পর্যায়ে নয়, দ্বিতীয় পর্যায়ে—সোস্যালিজম থেকে কম্যুনিজমের উত্তরণ পর্বে, যে আর একটা যুগান্তর কালের ব্যাপার।

(৩) ধনতন্ত্রের কয়েকটি মারাত্মক ত্রুটি সম্পর্কে শ্রীদত্ত এমন একটা নিস্পৃহ ভব দেখাচ্ছেন, যাতে তাঁকে ধনতন্ত্রের একজন সমর্থক বলেই মনে হয়। যেমন ধরা যাক, বেকার ও দারিদ্র্য সমস্যা। শ্রীদত্তের মতে, "প্রাগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমস্যাটা অবশ্য আর আগের মত তীব্র নেই।" শ্রীদত্ত কি জানেন না, প্রেসিডেন্ট কেনেডি প্রেসিডেন্ট হবার পর ঘোষণা করেন আমেরিকার এই বেকার ও দারিদ্র্যের সমস্যার বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ, এবং তখন তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখিত হয় বেকারের সংখ্যা সাড়ে চার মিলিয়ন? শ্রীদত্ত কি জানেন, প্রেসিডেন্ট কেনেডি কতটুকু সফল হয়েছিলেন? তাঁর মৃত্যুর সময় বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মোট পাঁচ মিলিয়ন, আগের চেয়ে আরো পাঁচ লক্ষ বেশী, কম নয়। আবার প্রেসিডেন্ট জনসন ঘোষণা করলেন জেহাদ। ফল কি দাঁড়াল—নিগ্রোদের সীমাহীন দারিদ্র্য ও বেকারী—তার ফলে ঘটল আগুন-জ্বালা বিক্ষোভ শহরে শহরে, এমন কি হোয়াইট হাউসের এক মাইলের মধ্যে, শতাব্দী কালের মধ্যে যা আর হয়নি। এই কিছুদিন আগেও নিগ্রোদের মূল সমস্যা নিয়ে যে সব মূল্যবান প্রবন্ধ বিশ্বের তাবৎ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তাতে যে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের বীভৎস চেহারা সব বেরিয়ে পড়েছে—শ্রীদত্ত কি সে সব ধামা চাপা দিয়ে বলতে চান, "প্রাগসর ধনতান্ত্রিক দেশে সমস্যাটা আজ আর তত তীব্র নেই?" যুদ্ধোত্তর কালের সেই চোখ-ধাঁধানো উন্নতির পরই আজ আবার পশ্চিম জার্মানীতে কি আর্থিক সংকট দেখা যাচ্ছে না, সেখানেও কি দলে দলে বেকার তৈরি হচ্ছে না? আর ইংল্যাণ্ডের হতশ্রী অবস্থাটা?

আর একটি উদাহরণ: শ্রীদত্ত এমন একটা ভাব দেখিয়েছেন, যেন মার্ক্সবাদীরা বলে জাতীয় নিম্ন আয়ের দুর্বল অবস্থাতে আয়ের সমবণ্টন করাটাই একমাত্র মার্ক্সীয় নীতি। আসল সত্য সম্পূর্ণ অন্য। মার্ক্স বা লেনিন কখনো এ কথা বলেন নি যে, জাতীয় আয়ের উন্নতি না করেই শুধু সমবণ্টন কর। বরং ও-দুটোই হাত ধরাধরি করে চলবে—এই সত্যেই মার্ক্সবাদীর বিশ্বাস। সুতরাং শ্রীদত্ত "মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দারিদ্র্যে টেনে নামিয়ে সমতা আনার" ভয় দেখিয়েছেন মার্ক্সবাদী নেতৃত্ব সম্পর্কে। তার পরও তিনি ভয় দেখাচ্ছেন: বলছেন, "সেই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রগতির কথা ভাববার বা বলবার মত লোক বড় অবশিষ্ট থাকবে না।" হায়, শ্রীদত্ত, তব, তদানীন্তন সেই দরিদ্রতর রুশ দেশে সেই নিম্নতম দরিদ্রতম জাতীয় আয়ের অবস্থাতেও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তথাপি সেদিন সে দেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রগতির কথা ভাববার ও বলবার মত মানুষ ছিলেন। উদাহরণ দেব? ছিলেন গর্কী, মায়কভস্কি, সলোকভ, এরেনবুর্গ-এর মত সাহিত্যিক, ছিলেন অসংখ্য রুশ বৈজ্ঞানিক, যাঁরা আজ সোভিয়েত বিজ্ঞানের স্রষ্টা, ছিলেন স্তানিস্লাভস্কির মত নব নাট্য-

আন্দোলনের স্রষ্টারা, ছিলেন আইসেনস্টাইনের মত চলচ্চিত্রশিল্পের জন্মদাতা। আর ছিলেন অসংখ্য শিক্ষাবিদ্, যাঁদের কাজকর্ম ও সাফল্যের কথা রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'র পাতায় পাতায় লেখা আছে। সুতরাং?

(৪) মূলত সমাবাদের দোষ সন্ধানেই তিনি ব্যস্ত। কিন্তু দোষগুলি যে যুগ যুগ ধরে মানুষের অসাম্যের মধ্যে লালিত হয়েছে, সুতরাং সেগুলি সরতেও যে যুগান্তরকাল লাগা স্বাভাবিক—এটা তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কেননা তাহলে ধনতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রের পাশে আসন দেবেন কি করে?

সমাজতন্ত্রের রূপায়ণের একটা অবস্থায় আমলাতন্ত্র মাথা তোলে—হ্যাঁ নিশ্চয় তোলে। এবং এই আমলাতন্ত্রের বিনাশ ছাড়া সার্থক সমাজতন্ত্র সম্ভব নয় —মার্ক্সবাদী তা' জানেন। যদিও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর এই আমলাতন্ত্র-এর আবির্ভাব, তাই এই আমলাতন্ত্রের বিনাশ সম্পর্কে প্রাথমিক মার্ক্সবাদীদের তত্ত্বে এর গুরুত্ব তেমন দেওয়া হয়নি ঠিকই, কিন্তু পরবর্তী মার্ক্সবাদীরা এর সম্পর্কে অনেক বেশী সচেতন। তাই তাঁরা এ কথা বলেছেন, এই আমলাতন্ত্রকে শেষ করার জন্য আর একটি দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা। এই বিপ্লব অবশ্যই অন্য ধরনের বিপ্লব, ঠিক আর্থিক বিপ্লব নয়, বরং বলা চলে নৈতিক বিপ্লব। এমন একটা বিপ্লব, যাতে করে যাঁরা বেশ কিছুকাল উপর স্তরে থেকে থেকে নূতন সমাজব্যবস্থার মধ্যেই আবার একটা "উঁচু শ্রেণী" কায়েম করতে চান—তাঁদের আবার নাড়া দেওয়া। হয়ত আবার নূতন করে সন্ধান। মার্ক্সবাদের সম্প্রসারণে এই "দ্বিতীয় বিপ্লবের" প্রয়োজনীয়তা খুব ভাল করে আজ বোঝা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে বলেই মাও-সে-তুং'এর Revolution is a constant process—এই তত্ত্ব গুরুত্ব পেয়েছে। তবু মোটামুটি বলা চলে এই দ্বিতীয় বিপ্লব এখনো শুরু হয়নি, হয়ত শুরু হবার প্রয়োজনটুকু শুরু হয়েছে—এতটুকুই বলা চলে। সুতরাং আমলাতন্ত্রের সমস্যায় সামাবাদ মরণ-রোগ দেখা গেছে—এ কথা বলার কোন প্রয়োজন দেখা যায়নি।

(৫) এই প্রসঙ্গে সমাজতন্ত্র রূপান্তরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্পর্কে শ্রীদত্ত একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। শ্রীদত্তের মতে, "হিংসাত্মক বিপ্লবের পথে যে-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে মানুষ এমন কোন অলৌকিক আনন্দের অধিকারী হয় না, যাতে করে গৃহযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ও তিক্ততার পূরণ হয়।" আমরাও বলি, অলৌকিক কোন আনন্দ সৃষ্টি হয় না। কিন্তু শ্রীদত্ত ভাল ভাবেই জানেন সমাজতন্ত্রীকরণ ও বিপ্লবের বিষয়টি নিশ্চয় কোন অ্যাসথেটিকস্-এর আওতায় পড়ে না, সুতরাং শুধু অলৌকিক আনন্দের প্রশ্নতেই এটার নিষ্পত্তি হয় না। ব্যাপারটা প্রয়োজনের, বাঁচার তাগিদের, মরণান্তিক প্রয়োজনের—সুতরাং অলৌকিক আনন্দ সৃষ্টি না হলেও বিপ্লব যদি তার মূল উদ্দেশ্য সফল করে, তবেই তার সার্থকতা। 'অলৌকিক আনন্দ' সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরে এলেও ক্ষতি নেই। এবং সমাজতন্ত্র যেহেতু যুগান্তরের শৃংখল থেকে মুক্তি ঘোষণা করে, তখন আনন্দ তো নিশ্চয় আছে। মুক্তির আনন্দ। লেখক বলছেন, "গণতন্ত্রের পথ যতদিন খোলা থাকবে ততদিন সেই পথই শ্রেয়।" নিশ্চয়ই—কোন মার্ক্সবাদী এ কথা অস্বীকার করে না, কিন্তু শ্রীদত্তকে প্রশ্ন করি,

যিনি রুশ দেশের মাত্র পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের মধ্যেই সমাজতন্ত্রের সব ভবিষ্যতের প্রমাণ দিয়ে গেছেন, তিনি গত এক হাজার বছরের ইতিহাসের মধ্যেও একটি মাত্র ঘটনার প্রমাণ দিয়ে দেখান তো কোথাও সমাজতন্ত্র তথাকথিত গণতন্ত্রের পথে হয়েছে কি না? না হলে কেন হয় নি? এই উত্তর দিতে গেলেই তথাকথিত গণতন্ত্রের মুখোশ খুলে পড়বে। তবু বলব, হ্যাঁ শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পথ খোলা থাকলে, হিংসাত্মক পথ নিশ্চয়ই পরিহার্য।

(৬) লেখক পঞ্চাশ বছরের নিরিখে বিচার করে দেখেছেন "সমাজতান্ত্রিক উপায়েও সমাজ অনিন্দ্যসুন্দর হবে না—"। আমরাও তাঁর সঙ্গে একমত, বরং আরো বলব, পঞ্চাশ বছর কেন, আরো পঞ্চাশ বছরেও সমাজতান্ত্রিক উপায়ে সমাজ অনিন্দ্যসুন্দর হবে না। তবে এখানেই আমাদের বক্তব্যের শেষ নয়. আমরা বিশ্বাস করি আরো পঞ্চাশ বছরে কিন্তু তা সম্ভব হবে, নয়তো আরো এক শতাব্দী পরেও। লক্ষণীয় যে, এই প্রসঙ্গে, তিনি আবার সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্র কথাটি পাশাপাশি রেখেছেন। (মূল প্রবন্ধ দেখুন) বার্ট্রান্ড রাসেল মহাশয়ও সেই বহু বছর আগে, এমন কি লেনিনের জীবিতকালের মধ্যেই সাম্যবাদের বিরুদ্ধে একটি বই লিখেছিলেন—Practice and Theory of Bolshevism. তাতে অনেক যুক্তি ছিল সাম্যবাদের বিরুদ্ধে, রুশ বিপ্লবের বিরুদ্ধে। সাম্যবাদের সমালোচনা করলেও তিনি কিন্তু তার সঙ্গে ধনতন্ত্রকে পাশাপাশি আসন দেওয়ার যুক্তি গ্রহণ করেন নি। বরং মুখবন্ধে স্পষ্টই জানিয়েছিলেন, আর যাই হোক, মানবিক ও স্বাভাবিক কারণেই ধনতন্ত্র অকেজো ও অচল হয়ে গেছে, ধনতন্ত্র তার শেষ মৃত্যুর ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীঅম্লান দত্ত যদি এটুকু করতেন, তবে তাঁর বক্তব্য অম্লান থাকত।

(৭) পরিশেষে জানাচ্ছি, মার্ক্স ভগবান নন, মার্ক্স একেবারে অভ্রান্ত নন, মার্ক্সবাদী সেটা জানেন। জানেন বলেই মার্ক্সের নব নব ব্যাখ্যা হচ্ছে ও হয়েছে—আজ তাই মার্ক্সবাদের নূতন নামই হয়েছে মার্ক্সবাদ—লেনিনবাদ। মার্ক্সবাদ কোন স্থির অচঞ্চল পরমব্রহ্ম গোছের বস্তু নয়, মার্ক্সবাদ একটা ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানসিদ্ধ সম্প্রসারণশীল, পরিবর্তনশীল তত্ত্ব। তার দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে রাশিয়ায়, ইউরোপে, ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে, এশিয়ার দেশে দেশে, চীনে, ভিয়েতনামে—নব নব পরীক্ষা নিরীক্ষা ওলট পালটের মধ্যে তার অগ্রগতি কখনো ব্যাহত হয়েছে, কখনো তীব্র হয়েছে—কিন্তু কোন মুহূর্তেই থেমে থাকেনি। নব নব পরিস্থিতিতে মার্ক্সবাদের ঐতিহাসিক সত্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, নব নব সংযোজন, পরিবর্ধন এমন কি পরিবর্জনও চলছে। সুতরাং বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশে, প্রথম প্রচেষ্টা বলে যেখানে ভুল বেশি হওয়া স্বাভাবিক (যেমন স্ট্যালিনীয় ভুল)—সেখানকার মাত্র পঞ্চাশ বছরের নিরিখে এই রকম একটা পৃথিবীব্যাপী সম্প্রসারণশীল গতিময় এবং যুগান্তকারী কালের পটভূমি যার বিষয়বস্তু, সেই মার্ক্সবাদের চরম বিচার সম্ভব নয়। এর জন্য গোটা পৃথিবীর দিকে এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকাতেই হবে। ততখানি ধৈর্য মার্ক্সবাদীর আছে।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
বাঁকুড়া

॥ ২ ॥

অধ্যাপক অম্লান দত্তের 'সাম্যবাদ ও প্রগতির পথ' সুচিন্তিত প্রবন্ধটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। দেশের এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির দরুন আমরা যখন এক বিভ্রান্তিকর সময়ের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি, ঠিক তেমনি সময়ে অধ্যাপক দত্তের সত্যভাষণ আশার আলো দেখিয়েছে। অধুনা সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের কোন সমালোচনা করাটা, তা যতই খোলা মন নিয়ে করা হোক না কেন, বেশ সাহসের দরকার। কেন না বাজারে এ কথা চালু যে আধুনিকতার এবং প্রগতিবাদিতার প্রধান এবং প্রথম সোপান নাকি সাম্যবাদে বিশ্বাসী হওয়া। শুধু বিশ্বাসেই যথেষ্ট নয়। সাম্যবাদ যে সর্বযুগের সর্বরোগহর আশ্চর্য এক ধন্বন্তরি দাওয়াই নয়—এ কথা

পাশের লোককেও বলা নিরাপদ নয় 'পাতি বুর্জোয়া', 'মার্কিন দালাল' বা 'সি আই এ'র চর আখ্যা লাভ অবশ্যম্ভাবী। আজকে সাম্যবাদী হওয়াটা মিনি স্কার্টের মতই একটা ফ্যাশান। 'ধনতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী উভয় ব্যবস্থাতেই দোষ ত্রুটি আছে' অথবা "কোনো 'বৈজ্ঞানিক' পন্থাতেই পৃথিবীতে স্বর্গ স্থাপনা করা যাবে না"—এ সব সুযুক্তিপূর্ণ সত্যভাষণ কোনো সমাজতন্ত্রবাদী বা সাম্যবাদী মেনে নেবে না। কেন না এই সব কল্পনাই তাঁদের আদর্শগত বিশ্বাস। স্বভাব নিয়মে তাঁরা প্রতিবাদ তুলবেনই। কারণ আজকের এই সদা-পরিবর্তনশীল নৈর্ব্যক্তিক সমাজ-সংসারে একটা স্থির বিশ্বাস বা ধ্রুব আদর্শের বড়ই অভাব। সুতরাং তাঁদের সেই বিশ্বাসে আঘাত করলেই তাঁরা রুষ্ট হবেন বইকি। আর তাছাড়া যেখানে বিশ্বাসের প্রশ্ন সেখানে যুক্তি তর্ক অচল। 'আমার বিশ্বাস অমুকবাবা বা তমুকঠাকুর দেবতা সুতরাং তিনি তো অভ্রান্ত'—এ বিশ্বাস কে যুক্তি তর্কেও হঠান যাবে না। যেমন সাম্যবাদীর কাছে সাম্যবাদ 'বেদ' বা 'কোরানে'র মতই অভ্রান্ত। কোনো সময় এ প্রশ্ন মনে জাগে না শত বা সহস্র বছর আগের মানুষ আজকের মানুষের মত জ্ঞানী হতে পারে না—সভ্যতার ইতিহাস তাই সাক্ষ্য দেয়। আসলে আমরা অনেক পড়ি, অনেক জানি কিন্তু শিখি না। সুতরাং এ কথা বলা বাহুল্য যে, অধ্যাপক দত্তের সত্য-ভাষণে সাম্যবাদীরা কর্ণপাত করবেন না।

আমার অর্থনীতির বা রাজনীতির জ্ঞান নিতান্ত সীমিত কারণ আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। কিন্তু তাহলেও আমি আমার সাম্যবাদী বন্ধুদের কিছুতেই বোঝাতে পারি না যে ধনতন্ত্রবাদ বলে কোনো তত্ত্ব কেউ কোনো দিন প্রচার করে নি। সভ্যতার অগ্রগতির সংগে, সমাজের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়েই পুঁজিপতি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। যুগে যুগে তার চেহারা, গতি প্রকৃতি পালটে গেছে বা যাচ্ছে। এই গতি-শীলতাই ধনতন্ত্রের সঞ্জীবনীশক্তি। অন্তত ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয়। ব্যক্তি মালিকানা যেহেতু পুঁজিপতি সমাজব্যবস্থার মূল, সেই হেতু বিষময় এটা মনে করার কি যুক্তি আছে? ব্যক্তি মালিকানা বাদ দিলে সমাজের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানকে বাদ দেওয়া হবে। ব্যক্তি মালিকানা বিলোপ করলে ব্যক্তি থাকে না। আর ব্যক্তির প্রয়োজনেই সমাজ সৃষ্টি হয়েছে, গঠিত হয়েছে রাষ্ট্র। সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যক্তি কখনো নয়। কিন্তু সাম্যবাদে ব্যক্তিকে বিসর্জন দিয়ে রাষ্ট্রকে অমিতশক্তিশালী ভগবানে পর্যবসিত করে কি কোনো লাভ হয়েছে? ব্যক্তি মালিকানার বিলোপ ঘটালে যে অসাধারণ শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের আবির্ভাব হবে তাতো আমরা

সাম্প্রতিক কালের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর উদাহরণে দেখতে পাই। শুধু তাই নয় সেই রকম সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য থাকাটাই অপরাধ। 'Mass Society-তে সাধারণ মানুষ বড়ই নিপীড়িত, নির্যাতিত এবং অসহায়। Purging করে বা Cultural revolution-এ আমলা বদলান যেতে পারে কিন্তু আমলাতন্ত্রের বিলোপ সাধন অসম্ভব। যে সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি ব্যক্তি হিসাবে নির্বাসিত Psychic isolation ব্যক্তির ওপর জগদ্দল পাথরের মত বুকে চেপে বসে, সে সমাজ ব্যবস্থা মানুষ কোনোদিনও গ্রহণ করবে না। জোর করে চাপিয়ে দিলে হয় মানুষ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে নইলে সমাজ আপনা-আপনি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। গত পঞ্চাশ বছরের সাম্যবাদের ইতিহাস তাই বলে।

ধনতন্ত্র ঠিক সেই নিয়মে পরিবর্তিত হয়েছে। মার্কস সাহেবের আমলের ধনতন্ত্র আর আজকের ধনতন্ত্রের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। Democratic Welfare State সেই সাক্ষ্য বহন করে না কি? অথচ ধনতন্ত্র যে এতখানি আপোস করতে পারে এ ধারণা মার্কস সাহেবের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

বিধান ঘোষ
বালি, হাওড়া

লেখকের বক্তব্য

আমার প্রবন্ধের কয়েকটি অংশ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সংক্ষেপে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, ছিন্ন ছিন্ন কয়েকটি উত্তরে সন্দেহ নিরসনও হয় না। সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে; তারপর পাঠক নিজ মত নিজেই স্থির করবেন।

প্রবন্ধে আমি লিখেছি : "গত অর্ধ শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কম্যুনিজম বলতে আজ আমরা কার্যত দুটি স্বতন্ত্র বস্তু বুঝি। একদিকে কম্যুনিজম অনুন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবার একটা বৈপ্লবিক পথ। অন্যদিকে শিল্পোন্নয়নেরও ওটা একটা বিকল্প পদ্ধতি।" কোনো কোনো পাঠক এতে আপত্তি তুলেছেন। কথাটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

কম্যুনিজম তত্ত্ব অথবা আদর্শের দিক থেকে কী সেটা এখানে প্রশ্ন নয়, "কার্যত" কী সেটাই প্রশ্ন। মার্ক্স ভেবেছিলেন যে, ধনতন্ত্রের বিবর্তনের ফলে সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠবে। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মজুর শ্রেণীর সংখ্যা ও সংহতি বৃদ্ধি পাবে; অথচ ধনতন্ত্রের অভিশাপে মজুর শ্রেণীর অবস্থার কোনোই উন্নতি হবে না। অন্যদিকে আর্থিক ক্ষমতা ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হবে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর হাতে। দ্বন্দ্বটা তীব্রতম হবে অপেক্ষাকৃত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে। বিশেষ কারণে মার্ক্স ও এঙ্গেলস জার্মানীতে বিপ্লবের আশু সম্ভাবনা দেখেছিলেন। কম্যুনিস্ট ইস্তাহারে তাঁরা লিখেছিলেন :

"The communists turn their attention chiefly to Germany .... because the bourgeois revolution in Germany will be but the prelude to an immediately following proletarian revolution."

কিন্তু প্রথম কম্যুনিস্ট বিপ্লব ঘটল অনুন্নত রুশ দেশে। লেনিন অবশ্য এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন ঘটনাটা মেনে নিতে হবে। ঘটনা এই যে গত অর্ধ শতাব্দীতে কোনো উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে কম্যুনিস্ট বিপ্লব সাধিত হয় নি; ১৯১৭ সালের রুশ দেশের মতো ১৯৪৯ সালের চীনও আর্থিকভাবে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশ। (চেকোস্লোভাকিয়ার কথা আমি ধরছি না; রুশ লাল

ফৌজের সমর্থন ছাড়া কম্যুনিস্ট দল ওখানে ক্ষমতায় আসতে পারতেন না।) অতএব মার্কসীয় আদি তত্ত্ব যে-কথাই বলুক না কেন "কার্যত" কম্যুনিজম অনুন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করবার একটা বৈপ্লবিক পথ। অবশ্য অনুন্নত দেশ মাত্রেই যে এই বৈপ্লবিক পদ্ধতিটি সফল হবে এমনও নয়।

দ্বিতীয় কথাটিও একই সূত্রে এসে যায়। মার্কসীয় তত্ত্বের দিক থেকে সাম্যবাদী সমাজ ধনতন্ত্রের বিকল্প ব্যবস্থা নয়, বরং ধনতন্ত্রের পরবর্তী উন্নততর সমাজব্যবস্থা। ফরাসী দেশে শ্রমিক বিপ্লব বারবার ব্যর্থ হবার পর মার্ক্সের এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, ধনতান্ত্রিক সমাজের আওতায় উৎপাদিকা শক্তির যথাসম্ভব উন্নতি সম্পূর্ণ হলে তবেই ধনতন্ত্রের অবসান ঘটবে। তার আগে নয়। ধনতান্ত্রিক বিকাশের যেখানে শেষ সাম্যবাদী ব্যবস্থার সেখানে শুরু। কিন্তু আবারও তত্ত্বের সঙ্গে ঘটনার অসামঞ্জস্য লক্ষণীয়। আজকের জার্মানীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। যুদ্ধোত্তর যুগে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীতে পাশাপাশি সাম্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে আর্থিক উন্নতি ঘটেছে; উভয় ব্যবস্থাতেই উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ হচ্ছে। এ অবস্থায় কম্যুনিস্ট পথকে ধনতন্ত্রের পরবর্তী উন্নততর আর্থিক ব্যবস্থা আখ্যা না দিয়ে বরং উন্নতির একটা বিকল্প পথ হিসাবে দেখলেই ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে।

১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লব যদি ব্যর্থ হত তবুও রুশ দেশের আর্থিক উন্নতি বন্ধ হয়ে যেত না। কম্যুনিস্ট বিপ্লব ছাড়াই যেমন জাপান ও জার্মানীতে শিল্পোন্নয়ন ঘটেছে রুশ দেশেও আশা করা যায় তেমনই উন্নতি সম্ভব হত। এই অর্থেই আমি বলেছি যে, কম্যুনিজম কার্যত শিল্পোন্নয়নের একটি বিকল্প পদ্ধতি।

শিল্পোন্নয়নের বিভিন্ন পথের তুলনামূলক আলোচনায় আমি ধনতন্ত্রের দোষগুলি অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি, আর সাম্যবাদী সমাজের সমস্যাগুলি কিছুটা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছি। এর কারণ সহজ। ধনতন্ত্রের দোষত্রুটি আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে জানি; এ বিষয়ে আমাদের মিথ্যা মোহ নেই, কাজেই উল্লেখ মাত্রই ব্যাপারটা সাধারণত বোধগম্য হয়। কিন্তু সাম্যবাদী সমাজ আমাদের দূরের জিনিস; এ বিষয়ে অনেকের ধারণা অতিরঞ্জিত। তাই ভ্রম সংশোধনে খানিকটা ব্যাখ্যা আবশ্যক।

মুশকিল এই যে, মার্ক্সীয় দর্শন এ ব্যাপারে ভ্রমটাকেই দীর্ঘায়ু করতে ব্যস্ত। তা নইলে এ কথাটা আজ দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে, ধনতন্ত্র ধ্বংস না হলে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সম্ভব নয় এই আদি মার্ক্সীয় সিদ্ধান্ত ভুল। এর বিপক্ষে সাক্ষ্য পশ্চিম

থেকে দূর প্রাচ্যে জাপান পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। প্রাগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। উনিশ শ' তিরিশের যুগের তুলনায় তার পরবর্তী যুগে আর্থিক সংকটের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে; বেকারের সংখ্যা ঐ তুলনায় আজ কম; সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রসারও লক্ষণীয়। উপনিবেশ হাতছাড়া হওয়া সত্ত্বেও ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড, জার্মানী, জাপান ইত্যাদি দেশে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান আজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের তুলনায় অনেকখানি উন্নত। আজকের পৃথিবীকে বুঝতে হলে এসব কথা ভুললে চলবে না। এরই পাশে পাশে অবশ্য এমন বহু ঘটনা ঘটছে যাতে আমরা স্বভাবতই ব্যথিত অথবা ক্রুদ্ধ। মার্কিন দেশে নিগ্রোরা আজও লাঞ্ছিত। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের আজও অবসান ঘটে নি; বরং হত্যা ও ধ্বংসের নব নব কৌশল উদ্ভাবিত হচ্ছে। কিন্তু এখানেও নতুন চিন্তা প্রয়োজন। যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে পুরনো মার্ক্সীয় ধারণাকে পিষ্ট করেই ইতিহাসের রথ চলেছে। চীনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধটা কি বাজার নিয়ে?

ধনতান্ত্রিক দেশগুলি সম্বন্ধে যেমন মার্ক্সের অতি ঘোর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয় নি, বিপ্লবোত্তর সাম্যবাদী সমাজ সম্বন্ধেও তেমনই মার্ক্সীয় আকাশ-চুম্বী প্রত্যাশা বহু পরিমাণে ব্যর্থ হয়েছে। স্তালিনী অত্যাচারের বিভীষিকা পঞ্চাশ বছর আগের মার্ক্সবাদীর দুঃস্বপ্নেরও অতীত ছিল। বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্যের ধ্বনির পাশে আজ চীন ও সোভিয়েত দেশের উগ্র কলহ কেমন ব্যঙ্গের মতো শোনায়। তবু মোহ সহজে ভাঙে না। পৃথিবীকে শত্রু ও মিত্র, অতি মন্দ ও অতি ভালো, এই দুই ভাগে ভাগ করে দেখলে আমাদের এক জাতীয় প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হয় বটে; কিন্তু এতে সমাজে হিংসা ও দ্বন্দ্ব একটা মিথ্যা বিশ্বাসে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। এটাই বিপদের কথা।

সোভিয়েত দেশের কৃতিত্ব অস্বীকার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বিজ্ঞানের চর্চায়, সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থায়, সোভিয়েত দেশের কাছে আমাদের বহু শিক্ষণীয় বস্তু আছে। কিন্তু একদেশ-দর্শিতার প্রয়োজন কি? শিক্ষার প্রসারে ও বিজ্ঞানের চর্চায় জাপানের কৃতিত্ব কিছু কম নয়। সাধারণের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থায় পশ্চিম ইয়োরোপের কয়েকটি দেশের উদাহরণও উল্লেখযোগ্য। তবু সোভিয়েত দেশকে তার বিশেষ কৃতিত্বের জন্য প্রশংসা করি। উনিশ শতকের রুশ দেশেও প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকের অভাব ছিল না; কিন্তু বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত দেশে বিজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগ-সাধনের ব্যাপক চেষ্টার প্রশংসা করব উচ্চকণ্ঠে। স্তালিনী অত্যাচারের দুর্দিনেও সোভিয়েত সরকার শিক্ষার ব্যাপারে অর্থ-ব্যয়ে কার্পণ্য করেন নি। শিল্পী, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকদের ভিতর যাঁরা রাষ্ট্রের আস্থা-ভাজন তাঁদের সাধারণ শ্রমিকের তুলনায় অনেকটা উচ্চ আয়ের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ধীরে ধীরে সোভিয়েত দেশে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার অধিকারও উন্মুক্ত হচ্ছে, এটাই আশার কথা।

আজ থেকে শতবর্ষ পরে সমাজের চিত্র কি হবে তা এই মুহূর্তে কল্পনা করাও কঠিন। কিন্তু একটা বিরাট আর্থিক সংকটের ভিতর উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সহসা অপমৃত্যু ঘটবে এই নাটকীয় প্রত্যাশা সত্য হবার সম্ভাবনা কম। বরং ক্রমপরিবর্তনের লক্ষণই আজ সুস্পষ্ট। সোভিয়েত দেশ ও উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলির বিভিন্ন গুণের সমন্বয় সম্ভবত দেখা যাবে এই শতাব্দীর শেষে বহু সমাজে, যদি-না পরমাণুবোমার আঘাতে সভ্যতা ততদিনে বিকলাঙ্গ হয়। চীন ও ভারতের মতো কৃষিপ্রধান ও জনবহুল অঞ্চলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশে, বর্তমান শতাব্দীর শেষেও সম্ভবত জনসংখ্যার অন্যূন অর্ধাংশ গ্রামেই বাস করবেন। এই সব সমাজের সেদিক থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক, যেমন মার্ক্স-এঙ্গেলসের নাগরিক মানসিকতার তুলনায় গান্ধী ও মাওয়ের চিন্তায় গ্রামের স্পর্শ আমাদের একটা স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। পৃথিবীর গ্রামীণ সমাজের পুনর্গঠনে আমরা পথের নির্দেশ পেতে পারি একদিকে বিজ্ঞান ও অন্যদিকে গান্ধীজীর অহিংস জীবনদর্শনের সমন্বয়ে।

তত্ত্বের চেয়ে আদর্শ বড়। সাম্যবাদী তত্ত্বের চেয়েও স্বাধীনতা ও প্রগতির আদর্শ বড়। ভারতের বর্তমান অবস্থায় গৃহযুদ্ধের পথে সাম্যবাদী আদর্শ অথবা অন্য কোনো আদর্শেই পৌঁছা যাবে না। এ কথাটা জানাতে গিয়ে যদি কাউকে ক্রুদ্ধ করে থাকি সেজন্য আমি দুঃখিত।

অম্লান দত্ত
কলকাতা-৫০

হঠাৎ সঙ্গীন মুহূর্তে টর্চের দরকার হয়ে পড়ে

'এভারেডী' টর্চ রোজই আপনার কাজে লাগবে

টর্চ যে কত দরকারী জিনিস তা সবাই বোঝেন (আপনি তো বটেই), কিন্তু কেমায় ঝামেলা ক'জনই বা পোয়াতে চান। তা ব'লে আপনি কিন্তু ভুলবেন না— রোজই কেনা চাই।

এভারেডী

টর্চ • ব্যাটারী • বাল্ব

ইউনিয়ন কারবাইড ইণ্ডিয়া লিমিটেড

দিল্লির ডায়েরি

বাঙলার মার্চেণ্ট অব ভেনিস। যাকে কণ্ঠাভেদে আমসত্ত্ব? সেদিন আমাদের আইফ্যাকস্ মঞ্চে ওটি দাঁড় করালেন কারোলবাগ বঙ্গীয় সংসদের তরফে নিজেদের সভ্য-সভ্যার আনলেন আমাদের সামনে প্রাচীন ভেনিসের দিনের একটা অধ্যায় পোশাকে-পরিচ্ছদে সেটিংয়ে, অভিনয়ে সংগীতে। সমস্ত দিক দিয়ে তাদের নতুন প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়, একচোখো সমালোচকরা যাই বলুন না কেন।

কারোলবাগ হল বাঙালী ও মাদ্রাজীদের এলাকা, এবং দিল্লিতে এই প্রতিষ্ঠানটি সংস্কৃতি ও সামাজিক কার্যকলাপে আজ অন্যতম স্থান অধিকার করেছে, কয়েকজনের আন্তরিক পরিশ্রমে এবং বহুজনের পৃষ্ঠপোষকতায়। আজ হয়তো অনেকেরই মনে পড়ে না সেই ১৯৫৮ সনের ডিসেম্বর মাসের একটি শীত-পড়া দিনের কথা, যেদিন কয়েকজন যুবক একটি গ্যারাজে বসে স্থাপিত করলেন শিশু সংসদকে, নেতৃত্ব নিয়েছিলেন ভোলা বানার্জি আর শম্ভু মুখার্জি। গত ন' বছরে সংসদ বেড়েছে অনেক দিকে, আজ নেতৃত্ব নিয়েছেন বহুজন-পরিচিত ও অক্লান্ত কর্মী অবনী লাহিড়ী।

নাটক করাটাই এদের একমাত্র কার্য নয়। এদিকে সংসদের খেয়াল প্রথম থেকেই। কৃষ্টি ক্ষেত্রে নাটক করাটা নিন্দার্হ মোটেই নয়। আমরা ভুলবো না যে এমনি অ্যামেচার নাটক-করা থেকেই এসেছে এমন একটা সাংস্কৃতিক অধ্যায় যেখানে বাঙালী শৌখীন অভিনয় আজ তাদেরকে ভারতের নাট্যশিল্পের প্রথম শ্রেণীতে অধিষ্ঠিত করেছে। কলকাতার তো বটেই, রাজধানীর বাঙালী ছেলে-মেয়েরাও খুব পেছনে পড়ে নেই। ১৯৫৯ সনের বাঙলা দেশে প্লাবন-ত্রাণে সাহায্য করা (সংসদ তুলেছিল সেদিন চার হাজার টাকা) এবং ১৯৬১-তে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনে বঙ্গীয় সংসদ সমাজ ও সংস্কৃতিকে উচ্চ স্থান দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল কাজে।

অন্যান্য কাজকর্ম তো আছেই। উপরন্তু নতুন হয়েছে একটি শিশুদের বিদ্যালয়, নাম তার শিশু ভারতী (শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ত্রিগুণা সেন গত আগস্ট মাসে উদ্বোধন করলেন), একটি লাইব্রেরি, একটি গেস্ট হাউস। দুর্গোৎসব হয়, সেই উপলক্ষে এরা বের করেন বেশ উচ্চমানের একটি পত্রিকা, যার নাম "অজন্তা", আছে বাৎসরিক মেলা (এবার হবে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে), পিকনিক, পর্যটন, গানবাজনা, থিয়েটার, সাহিত্য সভা ইত্যাদি।

তাই অবাক হইনি যে মার্চেণ্ট অব ভেনিসে যিনি পোর্শিয়া হয়েছেন, অতসী সেন, তিনি হলেন শিশু ভারতীর একজন শিক্ষিকা, অবনী লাহিড়ীর স্ত্রী মায়া লাহিড়ী হলেন ইস্কুলের অধ্যক্ষা। তিন বছর আগে জয়া রায় এবং তুলসী-মঞ্জুরী রায় শিশুদের নিয়ে একটা বিদ্যালয় খোলেন, নার্সারি আর কেজি। গত বৎসর সংসদ হাতে নিয়ে তৈরি করল শিশু ভারতী।

শিশু ভারতীর মেয়েরা নাচ-গানে

গত আগস্ট মাসে শিশু ভারতীর উদ্বোধনের পরে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ত্রিগুণা সেন একটি শিশু ছাত্রীকে আদর করছেন

ছাত্রছাত্রী এখন ৫৫ জন। বাঙালী ছেলে-মেয়েকে একেবারে গোড়া থেকে বাঙলার নিজস্ব ঐতিহ্যের আবহাওয়ায় শিক্ষা দেওয়াটাই শিশু ভারতীর উদ্দেশ্য। "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" থেকে ঠাকুমার ঝুলি, কি অবন ঠাকুর, আমরা চাই আমাদের শিশুরা বাঙলার ঐতিহ্যের স্রোতধারা থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। প্রবাসে ঐ সমস্যাটা আমাদের অত্যন্ত বড়, বললেন একজন মুখপাত্র। এরা বিদ্যালয়টির জন্যে নিজস্ব একটি বাড়ির জন্যে চেষ্টা আরম্ভ করেছেন।

উনি জানালেন যে, সংসদ একটি কোচিং ক্লাসও খুলেছে উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের জন্যে। সংসদ সভ্যরা নিজেরাই পড়ান। ফিজিকস্, অংক, ইংরিজী এবং বাঙলা। বেতন ১০ টাকা মাসে। শিশু ভারতীর শিক্ষিকারাও শিক্ষাদানকে সমাজসেবা হিসেবেই নিয়েছেন। অধ্যক্ষ এবং ডক্টর নীরোদরতন সেনের স্ত্রী কোনো টাকা পয়সা নেন না, বাকি পাঁচজন নেন মাত্র ৬৫্ টাকা মাসে। একটি বেয়ারা, একটি আয়া। নাচগানের একজন শিক্ষক রাখা হবে।

পুরোনো বাড়িতে একটি লাইব্রেরি, দু'টি ঘরে প্রায় ২,২০০ বাঙলা বই, ১৩টি পত্রিকা ইত্যাদি। রোজ গড়পরতায় ৪০জন পাঠক বই নিতে আসেন। ছোটদের লাইব্রেরী এখন শিশু ভারতীর অন্তর্গত।

নিচেরতলায় শিশু ভারতী, উপরে গেস্ট হাউস, নাম হল সংসদ সদন। অনেক সভ্যরা বদলি হওয়ায় বাইরে চলে যেতে হয়, কলকাতা কি অন্য স্থানে। (কলকাতায় তাঁরা সংসদের একটি শাখা স্থাপন করেছেন কিছুদিন আগে) বাইরের সভ্যরা এলে থাকার জায়গা পায় না। এই ভাবনা থেকেই ঐ গেস্ট হাউসের গোড়াপত্তন। একুনে পাঁচটি কামরার ১১টি সিট্। স্থানীয় সভ্যদের ২৫জন একশো টাকা করে দিয়ে গত জুলাই মাস থেকে চালু করেছেন এই সংসদ সদন। পাঁচটি সিট্ রাখা আছে সাময়িক বাসের জন্যে, যাঁরা আসেন চার-ছ' দিন কি অমনি সময়ের জন্যে; খাওয়া-থাকা ১০ টাকা রোজ। কালিবাড়িতে স্থান না-পেলে অনেকে সংসদ সদনেও আসেন। ওয়াই-এম-সিয়ের মতো তাদের সভ্য হতে হয়।

আপনাদের খরচপত্র কী করে চলে? জিজ্ঞেস করলাম। মুখপাত্র লাহিড়ী মশায়, যিনি এখন সভাপতি, বললেন, প্রধানত ডোনেশন আর মেলা থেকে যে টাকা ওঠে। গত বৎসরে সারাদিনের ওই মেলা উৎসব থেকে এঁরা পেয়েছেন প্রায় তিন হাজার টাকা।

বঙ্গীয় সংসদ বেশ উচ্চমানের প্রতিষ্ঠান। সার্থক করে তোলার পেছনে নিশ্চয়ই আছে সেবাপরায়ণতা। "আপনারা নেতৃত্বে কারা কারা আছেন?" [illegible] সম্বন্ধে। বললেন: কাকে বাদ দিয়ে কার কথা বলি। যুবক কর্মীরা আমাদের প্রাণস্বরূপ। তারা অফিসে কাজ করে, আবার সংসদের কাজে প্রাণ-পাত করে। আমরা তো আছিই। ধরুন, সহ সভাপতি দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ ব্যানার্জি কোষাধ্যক্ষ আই বি মুখার্জি ও এস-এন সান্যাল, আরো আমাদের এন-জি রায়, সুপ্রিয় ধর, রবীন গুপ্ত, ভোলানাথ ব্যানার্জী। আমাদের পুরোনো সভাপতিরা: বসন্তকুমার চ্যাটার্জি, ষষ্ঠীকুমার মুখার্জি, রঞ্জিৎকুমার রায়, প্রহ্লাদ রায়; প্রাক্তন সচিবদের ভিতর টি-কে চক্রবর্তী, শম্ভু মুখার্জি, সুখেন গুপ্ত, ভোলানাথ ব্যানার্জি। আরো নাম চান?—সুখেন বোস, শংকর দাস, সুধীর ব্যানার্জি, রথীন সরকার মৃদুল দাশগুপ্ত, কল্যাণ সেন, চুনী রায় চৌধুরী, এল-কে মুখার্জি।

অনেক নাটক এঁরা মঞ্চস্থ করেছেন—সংক্রান্তি, ছারপোকা, আন্ডার-সেক্রেটারি, লম্বকর্ণ, কবয়ঃ, শাস্তি এবং মার্চেন্ট অব্ ভেনিস্। প্রফেসর প্রতাপ সেন (স্থানীয় আই-আই-টির) তাঁর ৩০ বৎসরের নাট্য-মঞ্চ অভিজ্ঞতা নিয়ে এ বিষয়ে সংসদকে প্রচুর সহায়তা করে আসছেন। মার্চেন্ট অব্ ভেনিসের সেটিং নিয়ে অনেক পড়াশোনা আলোচনা করে দাঁড়া করিয়েছিলেন তাঁর চমৎকার সেটিং এবার। বইটি বাঙলায় অতি স্বচ্ছ এবং উপযুক্ত অনুবাদ করেছেন সংসদের সংস্কৃতি-শাখা সচিব চিত্ত মিত্র। নোয়াখালির কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা থেকে রিফিউজি, তার ভয়াবহতার স্মৃতি-ভার হয়তো এখনো তাঁর মনে। সংসদের সাহিত্য আসরে তাঁর অনস্বীকার্য স্থান।

শাইলকের ভূমিকায় বিনয় রায় (রাশিয়ান ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক) সমস্ত নাটকে প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং সার্থকভাবে সামনে এনেছেন শাইলকের অন্তর্দ্বন্দ্ব, শাইলকের দ্বি-ব্যক্তিত্ব, তার দুঃখ-ক্ষোভ, অত্যাচারিত অপমানিত জাতীয় প্রাণ এবং প্রতিহিংসা।

পোর্শিয়া অতসী সেন, নেরিস্সা কৃষ্ণা লাহিড়ী। অ্যান্তোনিয়ো প্রভাস মুখার্জি, বাস্সানিও দেব চ্যাটার্জি। সকলেই ভাল অভিনয় করেছেন। লন্সেলট্ গোব্বো নিতাই চ্যাটার্জি খুব হাসিয়েছে—বারবার মনে হচ্ছিল মঞ্চে সে আরো আসুক। বৃদ্ধ পিতা গোব্বো হয়েছিলেন সুখেন বোস, অতি চমৎকার সেজেছিলেন।

পোশাক-পরিচ্ছদ ডিজাইন করেছেন ন্যাশন্যাল ড্রামা স্কুলের প্রধান শ্রীআলকাজির পত্নী। অনেক বইপত্র ও প্রামাণ্য ছবি ঘেঁটে উনি সার্থকভাবে সংসদকে দিয়েছেন সহায়তা। (কয়েকজন অভিনেতা তাঁদের জুতোর দিকে মন দেন নি। পরিচ্ছদ পুরোনো কালের, জুতো এ-কালের। কয়েকজনের মাথার চুলও তাই, সাম্প্রতিক।)

পরিচালনা দিয়েছেন চিত্ত মিত্র নিজে। মনে হয় রিহার্স্যাল একটু কম হয়েছে। ইউরোপীয় শাস্ত্রীয় সংগীত থেকে বেছে বেছে আবহসংগীত (টেপ্ রেকর্ড) সৃষ্টির পেছনে ছিল জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের হাত।

বঙ্গীয় সংসদের কল্যাণ কামনায় দিল্লি-বাসীদের ভিতর আমিও রইলাম।

খগেন দে সরকার

বাংলা ভাষার গবেষক এডোয়ার্ড ডিমক

গত পর কয়েক বছর এই অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় আসছেন এডোয়ার্ড সি ডিমক, জুনিয়ার। কলকাতায় তাঁর অনেক বন্ধু, বন্ধুরা অনেকেই তাঁকে মিঃ ডিমক-এর বদলে শুধু নাম ধরে এডোয়ার্ড ডাকেন, অনেকে আরও সংক্ষেপে এড্। কলকাতার অনেক অধ্যাপক, গবেষক ও লেখকের কাছে অতি পরিচিত এই এড্। কেউ কেউ বলেন, শুধু গবেষণা ও কাজের জন্যই নয়, নিছক আড্ডার লোভেই এডোয়ার্ড ডিমক বারবার কলকাতায় ঘুরে আসেন।

তামাটে রঙের দাড়িতে মুখ ছাওয়া, কথা বলেন খুব আস্তে, হাসির সময় সারা মুখখানি প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, কিন্তু প্রায়শই সে হাসি নিঃশব্দ। শরীরের মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর একজোড়া প্রসন্ন বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। একই সঙ্গে এরকম শান্ত ও চটপটে মানুষ ক্বচিৎ দেখা যায়। ডিমক সেই জাতের মানুষ, যাঁরা নিজেরা কিছু বলার চেয়ে অপরের কথা শোনায় বেশী ধৈর্যশীল, কাজে যতখানি অধ্যবসায়, প্রচারে তার সামান্যও নয়।

এডোয়ার্ড ডিমক শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার ভাষা-সাহিত্য কেন্দ্রের পরিচালক। নানা ভাষায় তাঁর উৎসাহ—বিশেষত বাংলা ভাষা নিয়ে গত কয়েক বছরে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন—বাংলা ভাষা সম্পর্কে আগ্রহী বিদেশীদের মধ্যে ইদানীং তিনি সর্বাগ্রগণ্য।

ডিমকের প্রথম বই আমার চোখে পড়ে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের একটি সম্পাদিত অনুবাদ, 'থীফ অব লাভ'। কোনো বিদেশী পুস্তকের দোকানে প্রথম দর্শনে একটি চমকে-ওঠার মতন বই। মলাটে বাংলা অক্ষরের প্রতিলিপি ছাপা। অনুবাদও অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। তিনি অনুবাদ করেছেন নিজের মাতৃভাষায়—বাংলা ভাষায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিয়ে—সুতরাং বাংলাদেশের কাব্য-কাহিনীটি অবিকৃত থেকেও ইংরেজীতে মৌলিক সৃষ্টির রূপ নিয়েছে।

এডোয়ার্ড ডিমকের বেশী আগ্রহ বৈষ্ণব ও বাউলদের সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে। এদেশে এসে তিনি বাংলাদেশের বাউল ও বৈষ্ণবদের সাধনা কেন্দ্রগুলোও ঘুরে যান। এঁদের নিয়ে তিনি অনেকগুলি রচনা প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই, 'লুকোনো চাঁদের জায়গা'। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই, "বাংলার শ্রেষ্ঠ বাউল—রবীন্দ্রনাথ" এবং "বাংলা ভাষার উপক্রমণিকা"। শেষোক্ত বইটি বাংলা শিখতে ইচ্ছুক বিদেশীদের পক্ষে অপরিহার্য।

ডিমক এখন যে-কাজটি নিয়ে ব্যস্ত আছেন, সেইটিই সবচেয়ে বিস্ময়কর। তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজের "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" ইংরেজীতে অনুবাদ শুরু করেছেন। ওই বিশাল এবং দুরূহ বইটি সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের ছাত্র, অধ্যাপক বা ভক্ত বৈষ্ণবদের প্রচুর উৎসাহ থাকলেও সাধারণ পাঠকদের বেশ একটু শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ই রয়েছে। ইচ্ছে থাকলেও ওর সম্পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করা অনেকের পক্ষে সাধ্যাতীত। আমরা ছাত্রাবস্থায় ওই গ্রন্থ আয়ত্ত করতে গিয়ে কতবার যে বালিশের বদলে ওই গ্রন্থেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছি—সে সব স্মৃতি এখনও আছে। ওই রকম বইখানি—পৃথিবীর অপর প্রান্তে বসে কেউ আয়ত্ত ও ভাষান্তরিত করতে শুরু করছেন—ভাবলেও রোমাঞ্চ হয়।

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, বুধবার, 'বেঙ্গলি লিটারেচর' পত্রিকার কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এডোয়ার্ড ডিমককে একটি সম্বর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন সতীকান্ত গুহ। 'বেঙ্গলি লিটারেচর' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীআশিস সান্যাল উপস্থিত কবি ও লেখকদের সঙ্গে ডিমকের পরিচয় করিয়ে দেন। একটি সাজানো ঘরে সবাই ডিমককে ঘিরে বসেছিলেন। সেখানেও, চরিত্র অনুযায়ী নিজে কিছু বলার চেয়ে শুনছিলেনই বেশী। বাংলা ভাষার প্রতি ডিমকের আগ্রহ ও অনলস পরিশ্রমের জন্য অনেকেই তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানান। অনুবাদের যৌক্তিকতা কিংবা সার্থকতার সীমা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। কবিতার অনুবাদ কতখানি সম্ভব—যে-কোনো অনুবাদের আলোচনায় এ প্রশ্ন তো অবধারিত। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন জগন্নাথ চক্রবর্তী, সতীকান্ত গুহ, গোপাল ভৌমিক, দক্ষিণারঞ্জন বসু, পল ওপস্টাড, শুদ্ধশীল বসু প্রভৃতি। বলাই বাহুল্য, এ প্রশ্নে সব সময় ভিন্নমত থাকবেই, শেষ দিনও শেষ পর্যন্ত তা ছিল। যদিও এ কথা ঠিক, ডিমক যে ধরনের অনুবাদ করছেন—তার সার্থকতা সম্বন্ধে ভিন্নমতের সম্ভাবনা নেই—তিনি অনুবাদ করছেন মধ্যযুগীয় সাহিত্য, যার মধ্যে কবিত্ব বা সূক্ষ্মতার প্রশ্ন তেমন জাগ্রত নয়, কাহিনী অংশ বা সারাংশই প্রধান—এবং তা যে-কোনো ভাষাতেই উপভোগ করা সম্ভব।

সনাতন পাঠক

উপন্যাস

দেশদ্রোহী। অসীম রায়। সুবর্ণরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ইদানীং কালের অনেকানেক সাহিত্যিকের মতো জনপ্রিয়তায় অসীম রায় কোন আলোড়ন ঘটাতে পারেন নি। তাঁর প্রতিষ্ঠার পটভূমি বড়ই নির্জন, আদৌ করতালি-মুখরিত নয়। তথাপি, স্বীকার করতেই হয়, উপন্যাসে তিনি একজন স্বপ্রতিষ্ঠ শিল্পী। 'দেশদ্রোহী' তাঁর নবতম উপন্যাস, আয়তনে ক্ষুদ্র, কিন্তু বিষয়ের দিকে গুরুত্বের।

গত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় এক বাঙালী সাহিত্যিকের দ্বিধাদ্বন্দ্বময় মানসিক বিবর্তনের কাহিনী 'দেশদ্রোহী'। ভবানী-প্রসাদ অনুমান-বহির্ভূত কেউ নন। জন-প্রিয়তা ও বাণিজ্যিক সাফল্য তাঁকে এক ধরনের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, যে-প্রতিষ্ঠার অসারতা সম্পর্কে তিনি নিজেও সচেতন। কিন্তু, যতই অর্থহীন হোক, এই প্রতিষ্ঠা স্থিত রাখার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করতে হয় তাঁকে—কারণ, ব্যক্তিগত জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি সবই এর উপর নির্ভরশীল। মাঝে মাঝে বিবেকের দংশন অনুভব করেন ঠিকই, কিন্তু, নিরাপত্তার ভয়ে পরক্ষণেই গুটিয়ে নেন নিজেকে। তখন আবার শুরু হয় তাঁর নানা জারিজুরি—সাহিত্যিক সত্তার সংগে যে-সবের সামান্যতম সম্পর্কও নেই—বিপুলায়তন উপন্যাসের জন্য রগরগে ও অবাস্তব কাহিনীর অনুসন্ধান, প্রকাশক তোষণ, চলচ্চিত্রে কাহিনী গছাবার চেষ্টা বা 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভের জন্য হাহাকার।

এ হেন ভবানীপ্রসাদ যুদ্ধের টানাপোড়েনে যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেন। সংবাদপত্রের রিপোর্ট এবং কলকাতা ও ঢাকা রেডিওর বিষোদ্গার অসম্ভব বিচলিত করে তাঁকে—যে-ভাষায় তিনি সাহিত্যচর্চা করেন, সেই ভাষারূপের জঘন্য পরিবর্তনে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। মনে হয়, দেশপ্রেমের নামে উভয় দিকেই চলেছে নৃশংস ও অশ্লীল উল্লাস। এ-সবই অলীক, তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির গালভরা বিজ্ঞাপনের মতই মিথ্যা। বিচলিতভাবে তিনি বেরিয়ে পড়েন সেই দেশ-এর সন্ধানে, স্নিগ্ধ শ্যামলিমু যে-দেশ তার রক্ত ও স্মৃতির ভিতর স্পন্দমান।

অসীম রায় তাঁর সংযমী ভাষার মাধ্যমে এই অন্তর্মুখী কাহিনীর গভীরে প্রবেশ করেছেন, এবং সার্থকতার সংগেই। যদিও সীমান্ত প্রহরীর গুলিতে ভবানীপ্রসাদের অতর্কিত মৃত্যু কিছুটা নাটকীয়; ভবানী-প্রসাদের চরিত্রের ধারাবাহিক কদর্যতার সংগে ঠিক মেলে না। এই সামান্য আপত্তি বাদ দিলে, 'দেশদ্রোহী' একটি উচ্চমানের উপন্যাস হিসেবে অভিনন্দনযোগ্য।

৩২৮।৬৭

জয়জয়ন্তী। ধনঞ্জয় বৈরাগী। প্রকাশ ভবন। ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলি-কাতা-১২। চার টাকা।

আমাদের চারপাশে সাধারণত যে ধরনের সহজ স্বাভাবিক সুস্থ লোকজন দেখি, দীপক মজুমদার তাদের দলে পড়ে না। বনের হিংস্র পশু ও নানা জাতীয় পাখি পোষে সে। থাকে দার্জিলিঙে। পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। বাবাও খুব স্বাভাবিক ছিলেন না, মা-র মৃত্যুও অস্বাভাবিক। দীপকের ধারণা, পশু-পাখি পোষার মত মানুষও পোষা যায়। পারি-বারিক বন্ধু ডাঃ ভাদুড়ী দীপকের সংগে আলাপ করিয়ে দেন মণিমালা নামে একটি মেয়ের। মণিমালা কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত, আসন্ন মৃত্যুর কথা জেনেও দীপক তাকে বিয়ে করে। কিন্তু তার অস্বাভাবিকতা দাম্পত্যজীবনকে বিষময় করে তুললো। পরিণামে, মণিমালার আত্মহুতি। শেষ পর্যন্ত দীপক তার ভুল বুঝতে পেরেছে।

ধনঞ্জয় বৈরাগী নাটক লেখেন বলেই বোধ হয় সমস্ত ঘটনাই কেমন নাটকীয়। মুশকিল এই যে, উপন্যাসে নাট্যকেপনা অচল। তবে টানা গল্পের জন্য যাঁরা বই খোঁজেন তাঁদের

এ-নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। তাঁরা যা চান, তা নিশ্চয়ই আছে। নাহলে, এই ধরনের উপন্যাস বাঁচে কী করে।

১২৭/৬৭

প্রবন্ধ

বাংলা নাটকে ট্র্যাজেডি। অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন লাহা। ডি লাইট বুক কোং, ১৭৩/৩ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। ৬·৫০।

ট্র্যাজেডির স্বরূপ ও সংজ্ঞার্থ, বাংলা নাটকে ট্র্যাজেডির স্থান, বাংলা ট্র্যাজেডির কালানুক্রমিক ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত সুন্দর আলোচনা রয়েছে এই গ্রন্থটিতে। দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র প্রভৃতি নাট্যকাররচিত ট্র্যাজেডির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন লেখক। সমকালীন নাট্যকারদের মধ্যে একমাত্র 'বনফুল'ই স্থান পেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আরও দু-একজনকে অন্তর্ভুক্ত করলে ভাল হত। অধ্যাপক লাহার আলোচনাপদ্ধতিটি সবল, যুক্তিপূর্ণ এবং বিশ্লেষণাত্মক। সাধারণ পাঠকরাও সে কারণে বইটি পড়ে আনন্দ পাবেন।

১৪৪/৬৭

সঙ্গীত

সঙ্গীত ও সাধনা। শ্রীসুধীরকুমার দত্ত। শ্রীমতী সরযূ দত্ত। বিবিরহাট, চন্দননগর। চার টাকা।

পুস্তকটি ছাত্রদের জন্য রচিত। রাগ-সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রেখে সরলভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞের সংক্ষিপ্ত জীবনীও গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। বইটি ছাত্রসমাজের বিশেষ উপকারে আসবে।

পত্রিকা

বালার্ক। সম্পাদক : ভরতচন্দ্র রায়। ৮, দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৩। মূল্য ০·৫০ পয়সা।

'জাতির হৃত-সুস্থতাকে তার ভাষা-শিল্প-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে আবার ফিরিয়ে এনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা'র উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক সংস্থা 'আমরা সকলের' মুখপত্র এই পত্রিকা। আকৃতি ও প্রকৃতিতে আর পাঁচটি লিটল ম্যাগাজীনেরই অনুসৃতি। প্রকাশিত প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্পের মধ্যে অবশ্য একটা মান রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে।

কালি-কলম। সম্পাদক : বিমল মিত্র। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। প্রতি সংখ্যা ০·৬০ পয়সা।

বাংলা সাহিত্যের প্রগতিতে যে ক'টি সাহিত্য পত্রিকার নাম স্মরণীয় তার মধ্যে পড়ে 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম'। দুখানি পত্রিকাই বহুদিন হল গতায়ু হয়েছে। আলোচ্য পত্রিকাখানির সঙ্গে আগেকার 'কালি-কলম'-এর সম্পর্ক নেই, তবে উদ্দেশ্য এক—প্রতিভাবান নতুন লেখকদের উৎসাহ দান। এই প্রথম সংখ্যাখানিতেই সম্পাদক, সুখ্যাত কথা-সাহিত্যিক বিমল মিত্র সাহিত্য-সাময়িক হিসেবে বেশ একটা নতুন রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। পত্রিকাখানির বৈশিষ্ট্য সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের খুশী করবে। এ সংখ্যায় বিমল মিত্র ও জরাসন্ধ দুটি উপন্যাস আরম্ভ করেছেন। এ ছাড়া আছে পুলিনবিহারী সেনের রবীন্দ্র গ্রন্থ-পঞ্জী। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, যজ্ঞেশ্বর রায়, পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র সরকার ও আশিষ মজুমদার।

মধ্যাহ্ন। সম্পাদক : শৈলেন্দ্রনাথ বসু ও সুখেন্দু ভট্টাচার্য। ৬৮ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ০·৭৫ পয়সা।

'লিটল ম্যাগাজিন' হিসেবে আলোচ্য পত্রিকাখানি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এবং আলোচনা সম্ভারে পত্রিকাখানি সমৃদ্ধ।

Motoring Guide। গুডইয়ার জনসংযোগ বিভাগ।

ছুটিতে মোটরে চড়ে যাঁরা বেড়াতে যেতে চান তাঁদের কাছে এই পুস্তিকাখানি বিশেষ কাজে লাগবে। তোপচাঁচি, শান্তিনিকেতন ও মাসনজোরের বিস্তৃত বিবরণ, রাস্তার ম্যাপ এতে আছে। আর আছে টুকিটাকি নির্দেশ যা মোটরযাত্রীদের কাছে অপরিহার্য।

প্রাপ্তি স্বীকার

চন্দন মল্লিকা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। সাহিত্য প্রকাশন ঃ ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·০০।

স্বর্গ কাশ্মীর। ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র লাইব্রেরীঃ ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৬·০০।

শান্তনু। যজ্ঞেশ্বর রায়। প্রান্তিকঃ ২৪, হেমচন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-২৩। মূল্য ৫·০০।

তুমি কেমন আছো। বুদ্ধদেব বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৬·০০।

মিতুল নামে পুতুলটি। শৈলেন ঘোষ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডঃ ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·০০।

অর্ঘ্য। দেবী মল্লিক। মল্লিকানন্দঃ ৩-এ, নন্দরাম সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৫।

কবিয়াল কৈলাস বারুই ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রা। শ্রীমণীন্দ্রনাথ আশ। বিশ্ব মন্দির প্রকাশনীঃ ৪৪।এ, সাহেবান বাগিচা (ক্লাইভ কলোনী), কলিকাতা-২৮। মূল্য ১·০০।

লোহা থেকে ইস্পাত। সুনীল ঘোষাল। দেয়ালী প্রকাশনী ঃ ৯৭।২, ব্রাহ্ম সমাজ রোড, কলিকাতা-৩৪। মূল্য ৫·০০।
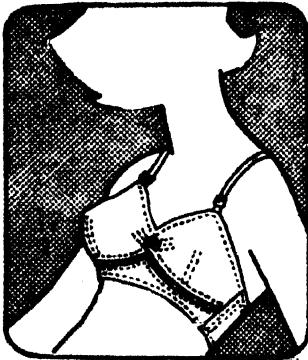
প্রার্থনা গীতি। সংকলকঃ সুনীল দত্ত। শেফালি দত্তঃ ব্লক ২৩, ফ্ল্যাট ২৪৭, লেক ভিউ রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্য ০·৭৫ পয়সা।

দর্শন কী ও কেন ॥ মনোরঞ্জন রায়। অন্নপূর্ণা প্রকাশনী ঃ ১/২ জ্যাকসন লেন, কলিকাতা-১। মূল্য ১·৫০।

বাঙলায় শ্রীগীত গোবিন্দ ॥ শ্রীমহাদেব গোস্বামী। শ্রীমাধবচরণ লাহা ঃ ২২৩ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ১·০০।

লাভের ব্যবসা। কে ঘোষ। গ্রন্থগৃহ ঃ ৮এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·৫০।

Towards A Better Life. Publications Divisions: Old Secretariat, Delhi-6. Price Rs. 2.00.

সহজ কিস্তিতে ট্রানসিস্টর

মাসিক ৩০, টাকা কিস্তিতে অভংগুরে প্লাস্টিক ক্যাবিনেটে 'ন্যাশনাল' পোর্টেবল ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড ট্রানসিস্টর নিন। আবেদন করুন:
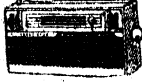
GAGSON AGENCIES (DC-88),
P. B. 1212,
929 Kuchapati Ram,
Sitaram Bazar, Delhi-6.

১৯৬৭-তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে

আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ; আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ; একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
Raj Jyotishi (D.C)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

উত্তর বাংলার একমাত্র সাহিত্য ত্রৈমাসিক

ত্রিবৃত্ত

সম্পাদনা: রণজিৎ দেব

● শারদ সংখ্যার আংশিক লেখক ●

প্রবন্ধ/ সুধীর করণ, অমিয়ভূষণ মজুমদার, অলোক রায়, প্রফুল্ল দত্ত। **গল্প/** শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বাসুদেব দেব, অজয় গুপ্ত, জয়ন্তী দেবী মজুমদার, কৃষ্ণেন্দু দে, অতীন্দ্র বর্মণ, শক্তিপদ চট্টোঃ, রণজিৎ দেব। **কবিতা/** প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, তারাপদ রায়, সুশীল রায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার, শিবশম্ভু পাল, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, শান্তি লাহিড়ী, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, মণ্টু বসাক, অরুণেশ ঘোষ, পিযূষ মিত্র, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক সরকার, মদনমোহন বিশ্বাস।

● যোগাযোগ ঠিকানা ●

সম্পাদক, ত্রিবৃত্ত / দেবকুটীর / ১, ত্রিবৃত্ত সরণী / কুচবিহার।

[এই সংখ্যার দামঃ ১·৫০ পঃ]

(সি এম-২৪৪৭)

প্রসাদ

শারদীয় সংখ্যা মহালয়ার আগেই বেরুচ্ছে

দাম: সাড়ে তিন টাকা ● সডাক: চার টাকা দশ পয়সা

— পাঁচটি উপন্যাস —

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

"গণনা"—ভাগ্য-বিড়ম্বনার এক নাটকীয় কাহিনী

সমরেশ বসুর

"সাঁকো"—এ-যুগের এক বিচিত্র প্রেমের কাহিনী

আশাপূর্ণা দেবীর

"জালিকাটা রোদ"—আমাদের পারিবারিক জীবনের এক জীবন্ত আলেখ্য

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

"শুক শারী"—এক লোমহর্ষক হত্যা। কিরীটি রায়ের আশ্চর্য রহস্যভেদ

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর

"ক্ষুর"—'বিষ'(-এর) পর আর একখানি রোমাঞ্চকর রহস্য-কাহিনী

— এগারোটি গল্প —

বিমল মিত্র ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
গজেন্দ্র মিত্র ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
বিমল কর ॥ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
মহাশ্বেতা দেবী ॥ বারীন্দ্রনাথ দাশ
দিব্যেন্দু পালিত ॥ শিবরাম চক্রবর্তী
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

— চারটি রম্যরচনা —

জহর রায় ॥ চিত্রগুপ্ত
দেবনারায়ণ গুপ্ত ॥ বিমল রায়চৌধুরী

— এছাড়া —

পরিচিতি ॥ নিয়মিত ফিচার ॥ সিনেমার ছবি ॥ কার্টুন

— প্রকাশক —

প্রসাদ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন

৪২, ইণ্ডিয়ান মীরার স্ট্রীট। কলকাতা-১৩। ফোন: ২৪-৩১৮৪

রঙ্গজগৎ

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার
বাংলার জয়

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। বাংলার মর্যাদা এবারেও অক্ষুন্ন। ১৯৬৬ সনের শ্রেষ্ঠ

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক প্রাপ্ত তিসরী কসম-এর পরিচালক বাসু ভট্টাচার্য ফটো—দেশ

ভারতীয় কাহিনীচিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছে বাসু ভট্টাচার্য পরিচালিত "তিসরী কসম"। বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এ ছবিটিকেই গত বছরের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্র রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। কেন্দ্রীয় অ্যাওয়ার্ড কমিটির মতে "নায়ক"-এর চিত্রনাট্য শ্রেষ্ঠ। সত্যজিৎ রায় এ ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকারের পুরস্কার পেয়েছেন।

এ ছাড়াও তিনটি বিভাগে বাংলার ছবি শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন করেছে। পশ্চিম বাংলার ট্যুরিজম বিভাগ প্রযোজিত এবং বংশীচন্দ্র গুপ্ত পরিচালিত "গ্লিম্পসেস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল" শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছে। অরুন্ধতী দেবীর "ছুটি" উচ্চ সাহিত্য-মূল্যের ছবির বিভাগে শ্রেষ্ঠ চিত্রের পুরস্কার পেয়েছে। জাতীয় ঐক্য ও ভাবগত সংহতিব্যঞ্জক চিত্রের পুরস্কার লাভ করেছে পীযূষ বসু পরিচালিত "সুভাষচন্দ্র"।

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক ছাড়াও "তিসরী কসম"-এর প্রযোজকের প্রাপ্য ২০,০০০ টাকা। পরিচালক শ্রীভট্টাচার্য পাবেন ১০,০০০ টাকা। "তিসরী কসম" প্রযোজনা করেন পরলোকগত গীতিকার শৈলেন্দ্র। "গ্লিম্পসেস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল"-এর পুরস্কার হিসাবে পশ্চিম বাংলার ট্যুরিজম বিভাগের প্রাপ্য ৫,০০০ টাকা। পরিচালক বংশীচন্দ্র গুপ্ত পাবেন ২,৫০০ টাকা।

শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকারের সর্বভারতীয় পুরস্কার হিসাবে সত্যজিৎ রায় পাবেন ২,৫০০ টাকা। ছুটি-র প্রযোজক নেপাল দত্ত পাবেন ১০,০০০ টাকা। পরিচালিকা অরুন্ধতী দেবীর প্রাপ্য ৫,০০০ টাকা। সুভাষচন্দ্র ছবির প্রযোজক এ কে ব্যানার্জি এবং পরিচালক যথাক্রমে ১০,০০০ এবং ৫,০০০ টাকা পাবেন।

এবারের প্রতিযোগিতার ফলাফল যে বাংলা ও বাঙালীর পক্ষে গৌরবজনক তা বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। গত চৌদ্দ বছরে বাংলা ছবি সাতবার রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক অর্জন করেছে। পথের পাঁচালি, কাবুলিওয়ালা, সাগর সংগমে, অপুর সংসার,

গ্লিমসেস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ছবির পরিচালক বংশীচন্দ্র গুপ্ত ফটো—দেশ

শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকারের পুরস্কারে ভূষিত সত্যজিৎ রায় ফটো—দেশ

ভগিনী নিবেদিতা, দাদাঠাকুর ও চারুলতা রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক প্রাপ্ত সাতটি ছবি। হিন্দী চিত্র পেয়েছে পাঁচবার (মির্জা গালিব, দো আঁখে বারাহ হাত, অনুরাধা, শেহর ঔর সপনা ও তিসরী কসম)। পাঁচটি হিন্দী ছবির দুটির পরিচালক বাঙালী—হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় ও বাসু ভট্টাচার্য। দক্ষিণ ভারতের ছবি (রামু কারিয়াত পরিচালিত "চেম্মিন") স্বর্ণপদক একবার লাভ করেছে। মারাঠী চিত্রও একবার (পি কে আত্রে পরিচালিত "শ্যামচি আই")। সারা ভারতে একমাত্র সত্যজিৎ রায়ের ছবিই তিনবার রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক জয় করেছে। এই গৌরব আর কোনও চিত্রপরিচালক অর্জন করতে পারেন নি।

এ বছর নানা বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তাতে বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠত্ব আরও বিশেষভাবে প্রমাণিত হল। ইতিপূর্বে বাংলা ছবি সর্বোচ্চ পুরস্কার (রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক) অধিকবার পেয়েছে। এবার অন্যান্য পুরস্কারের দরুন নানা বিভাগে বাংলা ছবির উৎকর্ষ সর্বভারতীয় সম্মান ও স্বীকৃতি পেল। তবে অবশ্য জাতীয় পুরস্কার-নীতি (এ বছর থেকে যার প্রবর্তন) সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। উদ্দেশ্যধর্মী, বক্তব্যপ্রধান ও শিক্ষামূলক ছবির জন্য আলাদা পুরস্কারের ব্যবস্থা অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু পরীক্ষামূলক বা এক্সপেরিমেণ্টাল চিত্র এবং উচ্চ সাহিত্য-মূল্য সমন্বিত ছবির জন্য পৃথক বিভাগের আবশ্যকতা বোঝা গেল না। শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র হিসাবে যে ছবি সর্বোচ্চ পুরস্কার রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পায়

সুভাষচন্দ্র-র পরিচালক পীযূষ বসু
ফটো—দেশ

সে ছবি কি এক্সপেরিমেণ্টাল কিংবা সাহিত্য-মূল্যসমন্বিত হতে পারে না? সরকারী মতে পরীক্ষামূলক ছবির সংজ্ঞা হয়ত অন্যরূপ। অন্তত আমরা যা বুঝি তা নয়। কিন্তু সাহিত্য-মূল্য ব্যতীত একটি ছবি বরাবর শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র বলে বিবেচিত হতে পারে? তবে সাহিত্য-মূল্যের জন্য আলাদা পুরস্কারের ব্যবস্থা কেন? এবং এই শ্রেণীর ছবির পুরস্কার ব্যবস্থায় কাহিনীকার কি উপেক্ষিত নন? অবশ্য ছবিতে সাহিত্যমূল্য অটুট রাখা পরিচালকেরই কাজ। কিন্তু গুণের উৎস কি মূল রচনা নয়? প্রযোজক-পরিচালক ছাড়াও এ ক্ষেত্রে কাহিনীকারের জন্য কোন পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা যায় কিনা সরকার তা ভেবে দেখতে পারেন।

অন্যান্য পুরস্কার

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "নায়ক" ১৯৬৬ সনের শ্রেষ্ঠ বাংলা চিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক পেয়েছে। বছরের শ্রেষ্ঠ ওড়িয়া ও অসমীয়া ছবি যথাক্রমে মৃণাল সেন-কৃত "মাটির মনিষ" ও ভূপেন হাজারিকার "লটি-ঘটি"। শ্রেষ্ঠ হিন্দী চিত্র "অনুপমা" (হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত)। অনুরূপ পুরস্কারে ভূষিত তামিল চিত্র "রামু", তেলুগু ছবি "রাঙ্গুলো রাতনম", কানাড়া ছবি "সন্ধ্যারাগ", মালয়ালম চিত্র "কুনজলি মরক্কর" এবং মারাঠী ছবি "পবনকণ্ঠাচা ধোনদি"।

সামাজিক এবং জাতীয় আদর্শব্যঞ্জক ছবির বিভাগে শ্রেষ্ঠ চিত্র—"ইরুটিনটে আত্মাবু" (মালয়ালম); শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র—চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসায়েটি প্রযোজিত "জ্যায়সে কো ত্যায়সা" (যেমন কর্ম তেমনি ফল)। ছবি দুটির প্রযোজক ও পরিচালক যথাক্রমে পাবেন ১০,০০০ ও ৫,০০০ টাকার নগদ পুরস্কার। এ ছাড়া "জ্যায়সে কো ত্যায়সা" শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র হিসাবে প্রধান-মন্ত্রীর স্বর্ণপদকের অধিকারী। উক্ত ছবি দুটির পরিচালকদ্বয় হলেন যথাক্রমে পি ভাস্করন ও এম ভি কুনটে।

শিক্ষামূলক ছবির বিভাগে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত ফিল্মস ডিভিসন প্রযোজিত "প্যাডি ঃ হাই ইলডিং ভ্যারায়েটিজ"। ছবিটির প্রযোজক ও পরিচালক পাবেন যথাক্রমে ৫,০০০ ও ২,৫০০ টাকা। বছরের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষামূলক ছবি "হোমো স্যাপেন্স"; এটিও ফিল্মস ডিভিসনের তোলা। এ ছবির প্রযোজক এবং পরিচালকও যথাক্রমে ৫,০০০ ও ২,৫০০ টাকা পাবেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন জি কে গোখেল।

আগামী সপ্তাহে

চিড়িয়াখানা, মহাশ্বেতা ও দুষ্টু প্রজাপতি

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "চিড়িয়াখানা" (স্টার প্রোডাকশন্স) আগামী সপ্তাহে রাধা, পূর্ণ, অরুণা ও শহরতলির অন্যান্য চিত্রগৃহে আসছে। শ্রীরায়ের এই প্রথম ক্রাইম ছবিতে ডিটেকটিভ ব্যোমকেশের চরিত্রে (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী) অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার। এ ছাড়া আছেন সুশীল মজুমদার, কণিকা মজুমদার, গীতালি রায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ চক্রবর্তী, অশোক-কুমার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, প্রসাদ মুখো-পাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, সুবীরা রায়, নীলোৎপল দে প্রভৃতি। শ্রীরায় সংগীত পরিচালক।

"মহাশ্বেতা" ছবিতে নায়িকা সাবিত্রী রায়কে দেখা যাবে

সাহিত্যমূল্যের জন্য পুরস্কৃত ছুটি-র পরিচালিকা অরুন্ধতী দেবী ফটো—দেশ

বি কে প্রোডাকশন্সের নবতম নিবেদন 'মহাশ্বেতা' আগামী শুক্রবার থেকে 'উত্তরা', 'পূরবী', 'উজ্জ্বলা' ও শহরতলির অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। জরাসন্ধ রচিত 'মহাশ্বেতার ডাইরী' অবলম্বনে ছবিটি তৈরী হয়েছে। পিনাকী মুখো-পাধ্যায় এ ছবির পরিচালক। সুর সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করেছেন রাজেন সরকার। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, অনিল চট্টোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, শমিতা বিশ্বাস, গীতা দে, রেণুকা রায়, জহর গাঙ্গুলী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, উৎপল দত্ত, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ললিত চিত্রমের দুষ্টু প্রজাপতি ছবিটিও আগামী সপ্তাহে মিনার, বিজলী, ছবিঘর ও অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে। শ্যাম চক্রবর্তী পরিচালিত এবং বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত কাহিনী অবলম্বনে তৈরী এ ছবির বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন কিশোর-কুমার, তনুজা, সবিতা চ্যাটার্জি, তরুণ-কুমার, কেষ্ট মুখার্জি, পদ্মা দেবী, ভারতী দেবী, সুরেখা পণ্ডিত, তন্দ্রিমা ভাদুড়ি, অসীমকুমার প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ব্যারাকপুর ফিল্ম সোসায়েটির অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত দুই শিল্পী : পার্থ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিনী

ফটো—দেশ

ব্যারাকপুর ফিল্ম সোসায়েটির অনুষ্ঠানে শিল্পী সংবর্ধনা

ব্যারাকপুর ফিল্ম সোসায়েটির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা-বার্ষিক উৎসবে "ছুটি"-র নায়িকা নন্দিনী এবং "অতিথি" ও "বালিকা বধূ" খ্যাত পার্থ মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সোসায়েটি গত বছর প্রবীণ অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কলাকুশলীদের সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। এবার তাঁরা নতুন প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিলেন।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅশোক-কুমার সরকার। তিনি তাঁর ভাষণে সিনেমার জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, এই শিল্পমাধ্যমটিকে আর্ট সৃষ্টির প্রয়োজনে নিয়োগ করতে হবে। শুধু ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্যই যেন ছবি তৈরী না হয়। ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলন এ ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে। প্রারম্ভে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। পরিশেষে সোসায়েটির সভাপতি শ্রী এস সি কেলে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য সময়োচিত ভাষণ দেন।

সংবর্ধিত দুই শিল্পীর হাতে মানপত্র ও অন্যান্য উপহারদ্রব্য তুলে দেন শ্রীঅশোক-কুমার সরকার। মানপত্র পাঠ করেন শ্রীমিন্টু দাশগুপ্ত। সংবর্ধনার উত্তরে অভিনেত্রী নন্দিনী বলেন, একটি মাত্র ছবিতে অভিনয় করে দর্শকদের শুভেচ্ছা ও প্রীতি আমি পেয়েছি—সেটাই আমার পক্ষে বিরাট সৌভাগ্য। পার্থ মুখোপাধ্যায়ও রসিকজনের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা বলেন।

সাহায্য প্রদর্শনী

"এন্টনি ফিরিঙ্গি"

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের (পূর্ব-নাম শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান) সাহায্যকল্পে প্রাচী সিনেমায় রাত্রি সাড়ে আটটায় নতুন বাংলা ছবি "এন্টনি ফিরিঙ্গি"-র এক বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত তিন দশক ধরে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান জন-সাধারণের সেবা করে আসছেন।

হাসপাতালে চার শত 'বেড' রয়েছে। তা ছাড়া ১২টি ইনডোর ও ১৪টি আউটডোর বিভাগ রয়েছে। চার শত 'বেড'-এর মধ্যে ১৪০টি গরীব ও দুস্থদের জন্য নির্দিষ্ট। দেশের সাম্প্রতিক আর্থিক সংকটের দরুন এই প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে। দাতব্য চিকিৎসার দরুন ব্যয় অনেক বেড়েছে। হাসপাতাল তিন লক্ষ টাকার ঘাটতিতে চলছে।

ঘাটতি পূরণের জন্যই "এন্টনি ফিরিঙ্গি"-র বিশেষ প্রদর্শনী। এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছেন প্রাচীর স্বত্বাধিকারী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু। ছবিটি সাধারণে মুক্তিলাভের আগেই এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। টিকিটের হার ৫০ টাকা থেকে ৩ টাকা।

বোম্বাইয়ে চারণ কবি মুকুন্দ দাসের জন্মজয়ন্তী

এবার ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর বোম্বাইয়ের চার্চ গেটে "ইন্ডিয়ান মার্চেণ্ট চেম্বার" হলে বাংলার চারণ কবি মুকুন্দ দাসের দুই দিনব্যাপী জন্মোৎসব (৯০তম) উদ্‌যাপিত হবে। এই উপলক্ষে দু' দিন স্বদেশী সংগীতের আয়োজন করা হয়েছে: রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ, কান্তকবি, নজরুল ও মুকুন্দ দাসের স্বদেশী গানের আসরে বিশিষ্ট শিল্পীরা যোগ দেবেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করবেন কলকাতার সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী হিরন্ময়ানন্দ। এই উৎসব সাফল্য-মণ্ডিত করবার জন্য স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে, সভাপতি হলেন প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক শ্রীশচীনদেব বর্মন। সাংবাদিক সলিল ঘোষ হয়েছেন সম্পাদক।

চারণ কবি মুকুন্দ দাস

রঙ্গবাণীর প্রযোজনায় প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চে "চারণ কবি মুকুন্দ দাস"-এর নিয়মিত অভিনয় শুরু হচ্ছে ১লা অক্টোবর। নাটক রচনা করেছেন মন্মথ রায়। অর্ধেন্দু মুখো-পাধ্যায় নাটকটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে-ছেন। সংগীত পরিচালক হলেন অনিল বাগচী।

নামভূমিকায় অভিনয় করবেন অলক বাগচী। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদানের জন্যে এখন পর্যন্ত যাঁরা মনোনীত হয়েছেন তাঁরা হলেন ভারতী দেবী (মঞ্চে এই প্রথম), অজয় গাঙ্গুলী, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মলয়া সরকার, অমর মল্লিক (মঞ্চে সর্বপ্রথম),

"পিঞ্জরের কাঁটা" (প্রযোজনা পরিচালনা মঞ্জু দে) চিত্রে শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও পাহাড়ী সান্যাল

ফটো—দেশ

চিন্ময় রায়, রত্না দাস, দীপক মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

চেক চলচ্চিত্র উৎসব

'সিনে সেণ্ট্রাল, কলকাতা'র উদ্যোগে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর সরলা রায় মেমোরিয়াল কমিউনিটি হলে চারটি চেক চলচ্চিত্র 'অন দি রোপ', 'নেল অব দি বেয়ারফ্যুটেড', 'এডার ইয়াং ম্যান' ও 'ইনটিমেট লাইটিং' দেখানো হচ্ছে। এ ছাড়া সংস্থার উদ্যোগে এ মাসের শেষের দিকে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের চারটি ছবি— 'উওম্যান হেটার', 'আদাম'স অ্যাপল', 'সফট হ্যান্ডস' ও 'থ্রি থিভস' প্রদর্শিত হবে।

ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট ১৯, ২০, ২১ ও ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে যথাক্রমে 'ইনটিমেট লাইটিং', 'অন দি রোপ', 'নেল ফর দি বেয়ারফ্যুটেড' ও 'এডার ইয়ংম্যান' ছবিগুলির প্রদর্শনের আয়োজন করেছেন।

"কখনো মেঘ" (পরিচালনা : অগ্রদূত) ছবিতে অঞ্জনা ভৌমিক ও উত্তমকুমার

চম্পাবতী বেদেনী

সম্প্রতি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে অভিনীত হল 'মহুয়া' শিল্পিগোষ্ঠীর দ্বিতীয় নৃত্যনাট্য "চম্পাবতী বেদেনী"। বাংলার লোকগাথা অবলম্বন এই নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত। এর লোকগাথা সংগ্রহ ও সুষ্ঠু পরিবেশনার কৃতিত্ব মানসী পাল ও শ্রীনীলরতন কাইয়ার।

নৃত্য ও আবহসংগীত পরিচালনায় ছিলেন যথাক্রমে দিলীপ বিশ্বাস ও কুমারকিশোর ভট্টাচার্য। নৃত্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অনিমেষ বক্সী। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সবিতা বিশ্বাস, মণ্টু সরকার, পার্ল ভট্টাচার্য, মৈত্রালি পাল, কবিতা সেন, পামেলা নন্দী, সুদীপ্তা সিংহ ও প্রদ্যোত সেন।

সংগীতে মানসী পাল ছাড়াও কৃতিত্বের দাবি রাখেন প্রণতি ভট্টাচার্য, শ্যামল রায়, প্রবীর পাল, আরতি বর্মন, প্রতিমা মল্লিক, যতীন রায়, পার্থ পাল ও নীলরতন কাইয়া। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থনা অনুষ্ঠানের আর এক আকর্ষণ।

সংগীতচক্রের শাপমোচন

মহালয়ার দিন সকাল সাড়ে নটায় সঙ্গীতচক্রে "শাপমোচন" নৃত্যনাট্যটি পরিবেশিত হবে বসুশ্রী সিনেমায়। সঙ্গীতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (অরুণেশ্বর), সুচিত্রা মিত্র (কমলিকা), সুমিত্রা সেন, ধীরেন বসু, নৃত্যে জয়শ্রী লাহিড়ী, অনাদিপ্রসাদ ও গ্রন্থনায় কাজী সব্যসাচী প্রমুখ শিল্পীরা যোগ দেবেন। নৃত্যনাট্যটি পরিচালনার দায়িত্ব ধীরেন বসুর।

পরলোকে অরুণাভ মজুমদার

তরুণ মূকাভিনেতা শ্রীঅরুণাভ মজুমদার গত রবিবার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে পরলোকগমন করেছেন। পাঁচ মাস আগে মোটর দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতররূপে আহত হন। ওই দুর্ঘটনায়ই গায়ক শ্রীমলয় মুখোপাধ্যায় ও আরও দুজন শিল্পী মারা গিয়েছিলেন। দুর্ঘটনার পর শ্রীমজুমদারকে প্রথমে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল ও পরে শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালে আনা হয়। গত পাঁচ মাস যাবত তাঁর চিকিৎসা চলে। শ্রীমজুমদার দুর্ঘটনার দরুণ বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তবে মৃত্যুর আগে তাঁর জ্ঞান ফিরেছিল। সকলের সংগে আকার-ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করতেন।

মূকাভিনেতা হিসাবে অল্পকালের মধ্যেই শ্রীমজুমদার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর স্বভাব ছিল অমায়িক। মূকাভিনয় আমাদের দেশে সবে শুরু হয়েছে বলা চলে। শিল্পীর অকালমৃত্যু এই অভিনয়ের ক্ষেত্রে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ২৭।

শিল্পীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি হাসপাতালে ও বালি শ্মশানে গিয়েছিলেন। তাঁর পিতা-মাতা জীবিত।

অরুণাভ মজুমদার

দক্ষিণীর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব

আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর, রবিবার সন্ধ্যা সাতটায় 'ত্যাগরাজ হলে' দক্ষিণীর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ভাষণ দেবেন এবং স্নাতকদের যোগ্যতাপত্র বিতরণ করবেন। উৎসবে রবীন্দ্রসংগীতের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হবে।

সাংস্কৃতিকী

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস হলে দক্ষিণ কলিকাতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "নৃত্যের তালে তালে"র তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসের সাংস্কৃতিক উৎসব সম্প্রতি উদ্‌যাপিত হয়।

প্রথম দিনে আনন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত ও সুর সংযোজিত "ফ্লাওয়ারল্যান্ড" ইংরেজী নৃত্যনাট্য এবং মীরা দাশগুপ্ত পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়।

দ্বিতীয় দিনে ছিল আনন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত ও সুর সংযোজিত "ইউনিভার্সাল ব্রাদার হুড" ব্যালে ও রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য। এই নৃত্যনাট্য দুটি পরিচালনা করেন মীরা দাশগুপ্ত।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ ও তাদের দেশের নাচ ও গান নিয়ে লেখা নূতন ধরনের এই ব্যালেতে স্কেটিংএর উপর মোমবাতি নিয়ে রাশিয়ান ব্যালের দৃশ্য, পাঞ্জাবের ভাঙ্গরা নাচের দৃশ্য এবং রাখীবন্ধনের দৃশ্যটি ভোলবার নয়। "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্যে অর্জুন, চিত্রাঙ্গদা (সুরূপা ও কুরূপা) এবং মদনের নৃত্যাংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য)।

শেষ দিনের অনুষ্ঠানে উচ্চাঙ্গ নৃত্য অবলম্বনে নৃত্যরঙ্গ পরিবেশিত হয়। নৃত্যরঙ্গের সমস্ত নৃত্যই, বিশেষত সমবেত কথক নৃত্য সকলের প্রশংসা লাভ করে।

এই সমস্ত নৃত্যনাট্যই মীরা দাশগুপ্তের নৃত্য পরিচালনা ও পরিকল্পনায় অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীঅনিমেষ বসু সকলকে স্বাগত অভিনন্দন জানান। কণ্ঠ সংগীতে ছিলেন সুপ্রীতি ঘোষ, পিণ্টু ভট্টাচার্য, কেয়া চৌধুরী প্রতিমা সাহা, প্রশান্ত ভট্টাচার্য ও প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা। গ্রন্থনায় ছিলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

"অপরিচিতা" (পরিচালনা : সলিল দত্ত) ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেন ফটো—দেশ

সেন্সরের পর ছবির কিছু অংশ বাদ গেছে। এবং ছবিটি প্রাপ্তবয়স্ক দর্শকের জন্য চিহ্নিত। এ মাসে ব্রিটেনে ছবিটি মুক্তি পেয়েছে।

ব্রিজিত বার্দোর অন্য মত

ব্রিজিত বার্দো এখন আর বিবসনা হতে চান না। সিনেমার পর্দায় তাঁর নিরাবরণ দেহ আগে কখনও সখনও দেখা গেছে। অতি সহজেই তিনি 'সেক্স সিমবল' হয়ে উঠেছিলেন। সেই সাধ এখন আর তাঁর নেই। কিন্তু 'টু উইকস ইন সেপ্টেম্বর' ছবির বেলায় অন্যথা হয়ে গেল। ছবির একটি 'বেড-রুম' দৃশ্যে তাঁর অঙ্গবাস রাখার উপায় ছিল না। পরিচালকের নির্দেশক্রমে বার্দো এবং লরেন্ত তারজিয়েফ উভয়কেই নগ্নদেহে ওই দৃশ্যে অভিনয় করতে হয়েছে।

ছবিটি এক ফরাসী "মডেল গার্ল"কে নিয়ে—যার অন্তরে দুই প্রেমের দ্বন্দ্ব। মডেল ভালবাসে দুজনকে—ফ্রান্সের ছেলে বন্ধুকে এবং অপর এক পুরুষকে। শেষের জনকে ভালবাসতে গিয়ে মডেল আবিষ্কার করে যে ওরা পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে।

পরিচালক সার্জি বুরগুইগন বলেন, ওই ছবি দুজনকে নিয়ে যারা পরস্পরকে ভালবাসে। কিন্তু তাদের প্রেম প্রবৃত্তিতাড়িত। তারা মন, দেহ ও আত্মার দিক থেকে পরস্পরের জন্য নিজেদের সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যখন প্রবৃত্তি নিঃশেষ হয় তারা যেন তখন দুটি অপরিচির দেহ। তাদের সম্পর্কের মধ্যে এমন কিছু নেই যা কুৎসিত বা অসুস্থ। কেউ কারো কাছে মিথ্যা বলে না। প্রবৃত্তি নিয়ে তাদের কোন ভণিতা নেই। "এটাই তাৎপর্যপূর্ণ। এবং আমার মনে হয় সারা ছবিতে একটা পবিত্রতা রয়েছে।

এই হচ্ছে পরিচালকের অভিমত। বাকি অভিমত লরেন্ত ব্রিজিত বার্দো ও সেন্সরের।

লরেন্ত বলেন, সাধারণত নগ্নদেহে অভিনয় করতে আমি অভ্যস্ত নই। এই ছবির কথা আলাদা। বার্দো বলেন, "বিবস্ত্রা হয়ে অনেক ভূমিকাতেই আমি আগে অভিনয় করেছি। এখন শুধু ওই সব ভূমিকাতেই অনাবরণ দেহে অভিনয় করব যা সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ। পরিচালক আমাকে বললেন, ছবির জন্য এর দরকার ছিল। তাই আমি রাজী হয়েছি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

উত্তর প্রদেশ সরকার পরিবার পরিকল্পনার উপর একটি কাহিনীচিত্র প্রযোজনা করেছেন। ছবিটির নাম 'আয়ে মেরে বাচ্চে'। জন্মনিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এই ছবির বিষয়বস্তু নয়। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সামাজিক দায়িত্ববোধ বিকাশের অনুকূল কাহিনী নিয়ে ছবিটি তৈরি। সুরেশ নিগম ছবিটি পরিচালনা করেছেন। সংগীতপরিচালনা করেছেন সলিল চৌধুরী।

মধ্যপ্রদেশের বিধান পরিষদের সদস্য শ্রীরমেশ দুবে বোম্বাইয়ের "কাল সুবা" হিন্দী চিত্রে একটি বিশেষ ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। শ্রীদুবে সম্প্রতি কংগ্রেস ছেড়ে জনসঙ্ঘ দলে যোগ দিয়েছেন। ইতিপূর্বে কলকাতায় পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে শ্রীদুবে একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। একটি ছবি নাকি আজও মুক্তি পায় নি, অপরটি সম্পূর্ণ হয় নি। সিনেমায় অভিনয় করলেও শ্রীদুবে বিধান পরিষদে থাকবেন।

প্রযোজক-পরিচালক এইচ এস রাওয়েল "সংঘর্ষ"-এর পর শরৎচন্দ্রের "পণ্ডিত মশাই" কাহিনীর চিত্ররূপ দেবেন বলে জানা গেল। গীতিকার গুলজার ছবিটির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করছেন।

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত "তিন অধ্যায়" ছবিতে উত্তমকুমার।

অরণ্যদেব ★ লী ফক

নতুন গল্প
অরণ্যদেবের গায়ে দশটা বাঘের জোর।
দুর্জনেরা তাঁকে যমের মত ভয় পায়।
অরণ্যদেবের মৃত্যু নেই, তিনি অমর।
তিনি আছেন বলেই আমরা শান্তিতে আছি

কী জানি।
অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়াকার-কাকা ★

সমুদ্র আর অরণ্যের মধ্যবর্তী এলাকায় গড়ে উঠছে নতুন শহর, নতুন সভ্যতা...

অরণ্যের গভীরে কিন্তু কিছুই আজও পালটায়নি.....

অরণ্যের ওদিকে মরুভূমি। প্রাচীন মঙ্গলের রাজারা সেখানে আজও অখণ্ড প্রতাপে রাজত্ব চালাচ্ছেন!
4/9

অবসর যাপনের জন্য আছে সুরা, আছে নর্তকী.....
সাবাশ!

মাঝে-মাঝে তাঁরা বিদেশে ছুটি কাটাতে যান.....
চমৎকার!

দিন কয়েক বাদে আবার দেশে ফেরেন!
প্রাণদণ্ড!
দয়া করুন!

এক-জায়গায় অবশ্য তাঁরা জব্দ.....
এখানে শিকার করতে পারব না কেন? কার হুকুম?
অরণ্যদেবের!
১

সিকিম সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী সেনাদলের সঙ্গে চীনা টহলদার সৈন্যদের গুরুতর সংঘর্ষ বর্তমান সপ্তাহের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চীনা টহলদার সৈন্যেরা যাতে সিকিমে ঢুকে পড়তে না পারে সেজন্য ভারতের তরফ থেকে সিকিম সীমান্তে ১৩ হাজার ফিট উচ্চে নাথু-লায় একটি কাঁটাতারের বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। গত ১০ সেপটেম্বর চীনা টহলদার সেনারা উক্ত বেড়া ডিঙিয়ে ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করে এবং কিছুক্ষণ অবস্থানের পর চলে যায়। কিন্তু ১১ সেপটেম্বর সোমবার চীনা টহলদার সৈন্যেরা ভারতীয় ঘাটি আক্রমণ করলে উভয়পক্ষে প্রথমে গোলা-গুলি এবং পরে কামানের লড়াই শুরু হয়। একাদিক্রমে ৩৩ ঘণ্টা লড়াইয়ে উভয়পক্ষেরই কিছু কিছু সৈন্য হতাহত হয়েছে। তবে তার সঠিক সংখ্যা এখনও জানতে পারা যায় নি। ১৩ সেপটেম্বর গোলাগুলি বর্ষণ বন্ধ থাকে। ১৪ সেপটেম্বর আবার নতুন করে সংঘর্ষ আরম্ভ হলে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীরা তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেন। তার পরে আর কোন নতুন ঘটনা ঘটেনি। রণাঙ্গন এখন শান্ত আছে।

দেশী সংবাদ

১১ সেপটেম্বর—আজ হাওড়া এবং শিয়ালদহ দুই রেল স্টেশনেই পৃথক দুটি কারণে হাঙ্গামা বাধে। সকালের দিকে হাওড়ার ঘটনায় রেল পুলিস গুলি চালায় এবং শিয়ালদহে ছোঁড়া হয় কাঁদানে গ্যাস। অনিয়মিত ট্রেন চলাচলের দরুন যাত্রী বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে হাওড়ায় সংঘটিত ঘটনাটি ছিল গুরুতর। শিয়ালদহের ঘটনা চাল চোরাই চালান নিয়ে।

আজ উপাচার্য সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী উভয়েই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার বাহন করতেই হবে এবং এই পরিবর্তন দ্রুততা ও সতর্কতার সঙ্গে আনতে হবে।

১২ সেপটেম্বর—গতকাল থেকে নয়াদিল্লীতে উপাচার্যদের যে তিন দিনব্যাপী সম্মেলন চলছে তাতে মোটামুটিভাবে সকলেই একমত হয়েছেন যে বিভিন্ন স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষার বাহনকে ইংরেজী থেকে আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরিত করা সম্পর্কে কোন বাঁধাধরা পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত নয়।

লখনৌ-এর সংবাদে প্রকাশ : গত শুক্রবার মানক সাগর বাঁধ ভেঙে যাওয়ার দরুন ও সন্নিকটস্থ জীবজন্তু ছাড়াও অন্ততপক্ষে এক হাজার লোকের জীবনহানি ঘটেছে বলে ও সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০ কোটি টাকার মত।

১৩ সেপটেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার ধারণা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রতিক হাঙ্গামা যেসব হাঙ্গামা হচ্ছে তার পিছনে উগ্রপন্থী কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেসী চক্রান্ত থাকলেও সাধারণ ও অর্থনৈতিক কারণগুলি প্রাধান্য লাভ করছে। একদল সমাজবিরোধী মন্ত্রিসভা তাই আজকের বৈঠকেই অবিলম্বে এদের ব্যাপকভাবে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিশন সম্প্রতি বিহার সরকারের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করেছেন, তাতে বলেছেন বলে জানা গিয়াছে যে "বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এত খারাপ যে তা বলা যায় না। এর ভিতরে এত রকম দুর্নীতি আছে যে "একে আর বিশ্ববিদ্যালয় বলা চলে না।

১৪ সেপটেম্বর—আজ এক দিকে যখন এক মধ্যাহ্ন ভোজের অনুষ্ঠানে অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের উপস্থিতিতে রাজ্যের দুজন মন্ত্রিসহ ১৬ জন এম এল এ নিজেদের ক্রান্তি দলের সদস্য বলে ঘোষণা করেছেন অন্য দিকে তখনই বাংলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এক বিবৃতিতে বলেছেন "পশ্চিমবঙ্গে ক্রান্তি দলের সংগঠন কমিটি গঠনের ও আহ্বায়ক নিয়োগের অধিকার কে দিল আমার জানা নেই। আমি মনে করি—একমাত্র বাংলা কংগ্রেস (যখন ক্রান্তি দলে সরকারীভাবে যোগ দেবে) ছাড়া আর কারো এ অধিকার নেই। আমি জানি না কেন কৌশলে আমার নাম এই সংগঠন কমিটির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।......এই সংগঠন কমিটির সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নেই।

১৫ সেপটেম্বর—কাঁথিতে রাজ্যের খাদ্য-মন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের "বিরুদ্ধে" বাম কমিউনিস্ট পার্টি যে বিক্ষোভ মিছিল আয়োজন করেছিলেন আজ তা নিয়ে কলকাতায় যুক্তফ্রন্টে এক সংকট দেখা দিয়েছে। এদিন এক দিকে যখন ডঃ ঘোষ জানিয়ে দিয়েছেন যে বাম কমিউনিস্ট নেতৃত্ব তাঁদের দলের সদস্যদের ওই আচরণের নিন্দা না করলে তিনি ফ্রন্টের পরিষদের বৈঠকে যোগ দেবেন না; অন্য দিকে তখনই বাম কমিউনিস্টরা জানিয়েছেন কাঁথিতে তাঁদের দলের নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার না করা হলে ওই ঘটনা সম্পর্কে তাঁরা একটি কথাও বলবেন না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্রামকর্মী ও ট্রাম মজুরদের মূল বেতন ও ভাতার হার বাড়াতে স্বীকৃত হয়েছেন। এদিন ট্রামকর্মীদের যুক্ত কমিটি ট্রাম মজুদুর পঞ্চায়েত ও ট্রাম এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা পরিবহণমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা করেন।

১৬ সেপটেম্বর—বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আজ এক মধ্যাহ্ন ভোজে মিলিত হয়েছিলেন। দুজনে বহুক্ষণ রাজ্যের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পশ্চিমবঙ্গের শাসন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে জানা গেল। এই গুরুত্বপূর্ণ মধ্যাহ্ন ভোজের আমন্ত্রণ করেছিলেন তৃতীয় এক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

অত্যাবশ্যক পণ্য আইন লঙ্ঘনকারীদের কঠোর দণ্ডদানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি আজ একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন। নতুন অর্ডিন্যান্সে কোন কোন অপরাধের জন্য কারাদণ্ডের মেয়াদ ৩ থেকে ৫ বছর করা হয়েছে। সমস্ত অপরাধই দণ্ডযোগ্য এবং জামিনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১৭ সেপটেম্বর—সরকার আজ রবির বণ্টন ও মূল্যের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মূল্যের নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করলে হয়ত দাম হ্রাস পেয়ে একটা মানে আসবে—এই ধারণা থেকেই উক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বিনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে ট্রেডপক্ষ ও সরকারের মধ্যে একটা ভদ্রলোকের চুক্তিও আছে।

বিদেশী সংবাদ

১১ সেপটেম্বর—সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট নুরেদ্দিন আল আটাসি গদিচ্যুত ও বন্দী হয়েছেন। খবরটি প্রচার করেছেন ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কোম্পানি। তাঁরা নাকি রাষ্ট্রপুঞ্জের সূত্রে খবরটি পেয়েছেন। আটাসি ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬-তে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

১২ সেপটেম্বর—ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই গতকাল ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ডীন রাস্ক-এর সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে চীন-সিকিম সীমান্তের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন।

১৩ সেপটেম্বর—কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক আজ এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন—জনসাধারণ তাঁকে না চীনাপন্থী-দের চান তা নির্ধারণের জন্য আগামী বছরের গোড়ায় কম্বোডিয়ায় গণভোট হবে। প্রিন্স সিহানুক চীনাপন্থী দুজন মন্ত্রীকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন।

১৪ সেপটেম্বর—ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই গতকাল মার্কিন সরকারের আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার পরিচালক শ্রীউইলিয়াম গড ও প্রতিরক্ষা সচিব শ্রীরবার্ট ম্যাকনামারার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। শ্রীগডের সঙ্গে আলোচনায় চলতি বছরে মার্কিন উন্নয়ন সাহায্যের বর্তমান হার বজায় রাখার ব্যাপারে শ্রীদেশাই বিশেষ ভরসা পাননি।

১৫ সেপটেম্বর—ইন্দোনেশিয়া আজ চীনের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করে। পিকিং সরকারের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ, পিকিং-এর ইন্দোনেশীয় কূটনীতিকদের রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে না।

১৬ সেপটেম্বর—ইন্দোনেশিয়ার বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীআদম মালিক আজ বলেন, পিকিংয়ে ইন্দোনেশীয় কূটনীতিকরা একটি গুদাম ঘরে একবস্ত্রে আশ্রয় নিয়েছেন এবং ভারত ও যুগোশ্লাভিয়ার দূতাবাস থেকে পাঠানো খাদ্য খেয়ে তাঁরা বেঁচে আছেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত ইন্দোনেশীয় দূতাবাসের পাশেই এই গুদামঘর।

১৭ সেপটেম্বর—ক্যান্টনে হাজার হাজার মাও-বিরোধী জমায়েত হচ্ছে মনে হচ্ছে এটা একটা বড় যুদ্ধের প্রস্তুতি। ক্যান্টন থেকে ফেরা লোকদের উক্তি উদ্ধৃত করে হংকং স্ট্যান্ডার্ড এই খবর দিয়েছে। পত্রিকাটিতে আরও বলা হয়েছে, মাও-বিরোধীরা ক্যান্টন শহরের এক অংশে জোর কামানের গোলা ছোঁড়ে।

শরতের আনন্দধারায়
মারফি
রেডিও ও ট্রান্‌জিস্‌টর
মধুর সুরে বাজে

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

শারদীয়া সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ তিনটি উপন্যাস

মোগল সম্রাটের বেগমমহলে গুলজারী বাঈকে নিয়ে একদিন যে তুমুল

বিমল মিত্র

আলোচনা, আলোড়ন হয়েছিল তা ইতিহাসের পাতায় আজ চাপা পড়ে গেছে। আজ আর সাধারণ মানুষের স্মরণে নেই, তার পরিচর্যা প্রভৃতি নিয়ে বেগম মহলে চিন্তার অন্ত ছিল না। একালের শক্তিধর কথাশিল্পীর কলমে সে-কাহিনী প্রাণবন্ত হয়েছে। পড়তে পড়তে পাঠক মোগল যুগে ফিরে যাবেন, গুলজারী বাঈকে সামনাসামনি প্রত্যক্ষ করবেন।

গুলজারী বাঈ

এবার অনেকগুলো শারদীয়া সংখ্যায় সমরেশ বসুর উপন্যাস আপনারা

সমরেশ বসু

পড়তে পাবেন কিন্তু সাজঘরে যে উপন্যাসটি প্রকাশিত হচ্ছে সে সম্পর্কে সম্পাদক দ্বিধাহীনভাবে বলছেন অনেক দিন বাদে সমরেশবাবু এত সুন্দরভাবে এত বলিষ্ঠভাবে যৌবনের গান গেয়েছেন।

যৌবন

'সেই রাত্রে অজিতা দেবীও একটা খুন করে বসলেন।' যবনিকার আগে

আশাপূর্ণা দেবী

উপন্যাসের শুরুতেই লেখিকা অজিতা দেবীকে দিয়ে আর একটা খুন করালেন। অজিতা দেবীর মত এক বিশিষ্ট মহিলা যিনি ছেলে-বৌ-জামাইকে নিয়ে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই দিন কাটাচ্ছিলেন হঠাৎ কোন দিক থেকে ঝড় উঠল, বাজ পড়ল, ভেঙ্গে চুরে সব তছনছ হয়ে গেল। সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।

যবনিকার আগে

এবং শারদীয়া সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

হারেমের কাহিনী

তুর্কী হারেমের অভ্যন্তরের নির্ভরযোগ্য তথ্য একমাত্র ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব। ভারতবর্ষের প্রতিটি সম্ভাব্য জায়গায় তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোন তথ্য সংগ্রহ করতে না পেরে শ্রীপান্থ, অবশেষে লণ্ডনে গিয়ে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসে প্রামাণ্য তথ্য ও চিত্রাবলী সংগ্রহ করেছেন। অন্যান্য কোন কোন পত্রিকায় এই হারেম সম্পর্কে কিছু কল্পনাপ্রসূত রচনা প্রকাশিত হতে পারে কিন্তু বুদ্ধিমান পাঠকরা নিজেরাই বেছে নেবেন।

শ্রীপান্থ

ক্ষিতীশ সরকার সম্পাদিত

শারদীয়া সংখ্যা মহালয়ার আগে প্রকাশিত হচ্ছে

দাম চার টাকা

এই সংখ্যার আরও একটি সাড়া জাগানো আকর্ষণ

সাগরময় ঘোষের

ঘর হতে যার আঙিনা বাহির

লেখক সম্প্রতি কিছুকালের জন্য আমেরিকা গিয়েছিলেন, তিনি সেখানে যা কিছু দেখেছেন তার সামান্যই তাঁর মনে ছাপ রেখেছে। তবে যেসব ঘটনা তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তা পাঠক-পাঠিকাদেরও মুগ্ধ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এক মার্কিন তরুণীর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনায় উন্মত্ত হয়ে আত্মাহুতির নিদারুণ বাস্তব কাহিনী তুলে ধরেছেন তিনি এই সংখ্যায়।

এছাড়া এই সংখ্যায় চারটি সুন্দর গল্প লিখেছেন :

রমাপদ চৌধুরী
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ইন্দ্রমিত্র
বুদ্ধদেব গুহ

এবং অন্যান্য নানাবিধ বিভাগীয় রচনা, চিত্র-তারকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কার্টুন ও প্রচুর সিনেমার ছবি ও রঙীন ছবি

সাজঘর । কলিকাতা-৯ । ৩৪-৯৫৯৩

প্রচ্ছদ : শ্রীঅলোক ধর

গত সপ্তাহে দেশ-এর প্রচ্ছদপটের শিল্পী শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়। ভ্রমক্রমে অন্য নাম প্রকাশিত হয়েছিল।

স্থানীয় এজেন্ট:
পি. পি. অ্যান্ড কোম্পানী, ফ্ল্যাট নং ৬ ব্লক নং ই. ১৫, বেচুলাল রোড, কলিকাতা-১৪। ক্যাশ রসিদ এনট্রি ফরম এবং লিটকুইজ উইকলী নিন।

LitQuiZ No. 23

Rs. 26,000

FIRST PRIZE **Rs. 13,000**

RUNNERS-UP UP TO 4 ERRORS **Rs. 7,000** | MINIQUIZ UP TO 2 ERRORS **Rs. 5,000**

FAMINE RELIEF FUND: **Rs. 1,000**

—২৩ লিটকুইজের সরকারী ভর্তি ফর্ম—

ADDRESS

LITQUIZ NO. 23. ALANKAR, BALARAM ST., BOMBAY-7 (WB)

দ্রষ্টব্য:—(১) প্রত্যেক কলমে, আপনার বাতিলকরা শব্দটি কালি দিয়ে কেটে দিন, (২) আপনি যদি শুধুমাত্র একটি কুপন পাঠান, তাহলে দ্বিতীয় কুপনটি বাতিল করে দিন, (৩) আপনি যদি মানি অর্ডারযোগে এনট্রি ফী পাঠান, তাহলে এই এনট্রি ফর্মের সঙ্গে, ডাকঘর থেকে পাওয়া মানি অর্ডার রসিদটি **অবশ্যই** পাঠাবেন। মানি অর্ডার রসিদ ছাড়া এনট্রি বাতিল করা হবে। (৪) আই-পি-ও ক্রস করবেন না। লিটকুইজ নং - ২৩ বোম্বাই - ৭ এর টাকা পাঠান।

1	Re. 1		2	Re. 1	
1	BEAUTY	UNITY	1	BEAUTY	UNITY
2	DUTY	HUMANITY	2	DUTY	HUMANITY
3	EDUCATION	RELIGION	3	EDUCATION	RELIGION
4	EQUALITY	LIBERTY	4	EQUALITY	LIBERTY
5	EQUITY	HARMONY	5	EQUITY	HARMONY
6	FEARFUL	RESENTFUL	6	FEARFUL	RESENTFUL
7	HELPLESS	RECKLESS	7	HELPLESS	RECKLESS
8	IDEALS	IDEAS	8	IDEALS	IDEAS
9	IGNORANCE	INTOLERANCE	9	IGNORANCE	INTOLERANCE
10	IRRELIGIOUS	IRRESPONSIBLE	10	IRRELIGIOUS	IRRESPONSIBLE
11	LIFE	NATURE	11	LIFE	NATURE
12	POTENTIALLY	TRULY	12	POTENTIALLY	TRULY
13	PURITY	TRANQUILLITY	13	PURITY	TRANQUILLITY
14	RESPECT	REST	14	RESPECT	REST
15	SELFLESSNESS	TRUTHFULNESS	15	SELFLESSNESS	TRUTHFULNESS
16	UNEASY	UNHAPPY	16	UNEASY	UNHAPPY
17	UNSTEADY	UNWORTHY	17	UNSTEADY	UNWORTHY

SEND THESE 2 COUPONS & ENTER MiNiQuiZ FREE

MiniQuiZ

10 CLUES FREE COUPON NO. 23

BEAUTY	UNITY	IDEALS	IDEAS
DUTY	HUMANITY	LIFE	NATURE
EQUALITY	LIBERTY	RESPECT	REST
FEARFUL	RESENTFUL	UNEASY	UNHAPPY
HELPLESS	RECKLESS	UNSTEADY	UNWORTHY

২৩ দেশ

এই কুইজে যোগদান করবার জন্য আমি নিয়ম ও সর্তাবলী পালন করতে রাজী এবং প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার চূড়ান্তভাবে ও আইনতঃ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করলাম। প্রত্যেক কুপনের জন্য ভর্তি ফী: ১্ টাকা। এই সম্পূর্ণ ফর্মের (২ কুপনের) জন্য ভর্তি ফী: ২্ টাকা। আমি এম-ও রসিদ/আই-পি-ও/লিটকুইজ ক্যাশ রসিদ/প্রাইজ কার্ড ও তার নম্বর..................পাঠালাম।

CAPITAL LETTERS

NAME ....

ADDRESS ....

....

এখানে কাটুন ও এই পুরো ফর্মটি পাঠান—

অনুবাদ:

লিটকুইজ নং ২৩-এর ১৭টি সূত্র হিন্দি, উর্দু, মারাঠী, গুজরাটি, তামিল, বাংলা, কানাড়া, মালয়ালাম এবং সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এইসব অনুবাদের কপি নামমাত্র মূল্যে আমাদের এজেন্টদের কাছে পাওয়া যাবে। যে সব প্রতিযোগী আমাদের অফিস থেকে সরাসরি চান, তাঁদের যে ভাষার অনুবাদ প্রয়োজন, তা লেখে করে মাত্র ২০ পয়সা পাঠাতে হবে।

আগামী সপ্তাহের দেশ পত্রিকায় বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হবে।

বন্ধের শেষ তারিখ

ডাকে প্রেরিত সকল প্রবেশপত্র: ১২-১০-৬৭

ভারতজ্যোতিতে সমাধান: ১৫-১০-৬৭

আপনি আপনার প্রবেশপত্র পাঠাইতে পারেন বুধবার, ১১-১০-৬৭ তারিখে, কিন্তু উহা **এক্সপ্রেস ডেলিভারীতে** পাঠান।

সমাধান ফেরৎ পাইবার জন্য আপনার প্রবেশপত্রসহ নিজ ঠিকানা লিখিত ৬ পয়সার পোষ্টকার্ড পাঠান।

১্ টাকা পাঠান এবং **লিটকুইজ উইকলির** ৫টি সংখ্যা লাভ করুন।

17 CLUES

1. The art of Ajanta unfolds the secret of the **Beauty|Unity** of all existence.
2. It is love for **Duty|Humanity** which makes one forget one's self.
3. No **Education|Religion** is of real value without a philosophy of life.
4. Political **Equality|Liberty**, without social and economic equality, becomes a farce.
5. Religious freedom and social **Equity|Harmony** are, in fact, the two foundations on which the secularity of the Indian State is based.
6. If we really have faith in God and in His infinite power and goodness, we can never feel **Fearful|Resentful** about anything.
7. In our weakness we are, no doubt, often quite **Helpless|Reckless**.
8. People do not embrace new **Ideals|Ideas** all at once.
9. Why is there so much persecution if God is one? Because of the **Ignorance|Intolerance** of His believers.
10. The modern man is **Irreligious|Irresponsible**, seeking pleasure for selfish purposes.
11. Most certainly we do want facts and not fiction to solve the enigma of **Life|Nature**.
12. Every one of us is like God, eternal, immortal, and **Potentially|Truly** divine.
13. Inner **Purity|Tranquillity** is achieved by complete self-abnegation, as by it we free ourselves from all selfish and personal desires.
14. There is no **Respect|Rest** for slaves.
15. Simplicity is the highest stage of **Selflessness|Truthfulness** and is a sublime trait.
16. It is a tragedy that the more advanced is a state the more insecure and **Uneasy|Unhappy** are its people.
17. Iswara the ever pure and ever bright is ever and everywhere present but cannot be properly reflected in our minds if they are impure or **Unsteady|Unworthy**.

দ্রষ্টব্য:—ওপরের ধাঁধাগুলি বিভিন্ন লেখকের লেখা থেকে নেওয়া কয়েকটি প্রশ্ন। এগুলি সব সম্পূর্ণ বাক্য ও নিজস্ব সম্পূর্ণ অর্থ বহন করে। লেখক/প্রবন্ধকারের নাম ও তাঁহাদের রচনার নাম সরকারীভাবে সমাধানের সঙ্গে লিটকুইজ উইকলিতে প্রকাশ করা হবে।

আনন্দপ্রদ
অনুপম সুযোগ
ন্যাশনাল
একো
রেডিও কিনুন।
Kleertone
ক্লিয়ারটোন
সাজসরঞ্জাম কিনে
১০% বিশেষ বাটা লাভ করুন

পি টি-১৫০৩ ৯ ট্রান্সিসটার ও
ডায়োড্স্ ৩ ব্যাণ্ডের। ৩৬৫টাকা।
এম বি টি-১৫০৪
১৩ ট্রান্সিসটার ও ডায়োড্স্
৪ ব্যাণ্ডের। এ.সি/ব্যাটারী। ৫৪১টাকা।
ইউ-১৫১৩ ৫ বাব, ৩ ব্যাণ্ডের। এসি/ডিসি
২৯৮টাকা
ইউ-৮১৯ ৫ বাব, ৩ ব্যাণ্ডের এসি/ডিসি
৩০৩টাকা।
এ-১৫১২ ৬ বাব। ৩ ব্যাণ্ডের এসি।
৩৬৫টাকা।
এ-১৫১৪ ৬ বাব। ৪ ব্যাণ্ডের। এসি।
৪১৫টাকা
এ-৭৮৬ ৬ বাব। ৪ ব্যাণ্ডের। এসি।
৬৬৮টাকা।
বিটি-১৫০০ ৯ ট্রান্সিসটার আর ডায়োড্স্
৩ ব্যাণ্ডের। ব্যাটারী। ৩২৮টাকা।
বি টি-১৫০৬ ৯ ট্রান্সিসটার আর
ডায়োড্স্ ৩ ব্যাণ্ডের। ব্যাটারী।
৪১৫টাকা।
আজই কিনুন ন্যাশানাল একো। আর কিনুন ক্লীয়ারটোনের সাজ সরঞ্জাম।
পরেরটিতে, শতকরা ১০ ভাগ কম দামে কেনার বিশেষ সুবিধা পাবেন।
ইস্ত্রি ১৭.৫০ পঃ
ও তার বেশী
টোস্টার ৩৪.০০
ও তার বেশী
কেটলী ৪৪.০০
ও তার বেশী
কফি পারকোলেটার ৭০.০০
হট প্লাটস ১২৫.০০
ও তার বেশী
ঘড়ি ৬২.০০
ও তার বেশী
টি ট্রলী ৯৫.০০
বেকিং ওভেন ৮৫.০০
মিক্সার কাম
গ্রাইণ্ডার ১৯৫.০০
এমনি আরও
অনেক।
(দাম-উৎপাদন শুল্ক সমেত। সব কর অতিরিক্ত)
আজই আপনার ন্যাশনাল-একো ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
GRA
জেনারেল রেডিও এণ্ড এপলায়েন্সেস লিমিটেড।
বোম্বাই - কলিকাতা - মাদ্রাজ - দিল্লী - বাঙ্গালোর - সেকেন্দ্রাবাদ - পাটনা
LPE Aivars NE 460 BN

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৮
শনিবার ১৩ আশ্বিন, ১৩৭৪

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট: কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষান্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষান্মাসিক ,,	১৪.০০
ত্রৈমাসিক ,,	৭.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষান্মাসিক ,,	১৪.০০
ত্রৈমাসিক ,,	৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪৬.০০
ষান্মাসিক ,,	২৩.০০
ত্রৈমাসিক ,,	১১.৫০

আসাম-অঞ্চলে
(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১.০০
ষান্মাসিক	১৬.০০
ত্রৈমাসিক	৮.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাসুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 30 Sept. 1967

পশ্চিম বাংলায় আইন ও শৃঙ্খলা

পশ্চিম বাংলায় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় শোচনীয় ব্যর্থতা দেখা যাচ্ছে বলে একটি অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগটি একেবারে নতুন নয়, কয়েক মাস ধরেই নানাভাবে প্রশ্নটিকে তুলে ধরা হয়েছে। ইতিপূর্বে পালটা যুক্তি দেখিয়ে বলা হয়েছিল, প্রতিক্রিয়াশীল এবং কায়েমী স্বার্থের লোকরা অ-কংগ্রেসী পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অপদস্থ করার জন্যে এই গুজব সৃষ্টি করেছে। যদি এই অভিযোগটি নিতান্ত গুজব হত তাহলে এ সম্পর্কে আমাদের বলার কিছু ছিল না। কিন্তু তা নয়, পশ্চিম বাংলার আইন শৃঙ্খলা সম্বন্ধে চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

সংবাদে জানা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন পশ্চিমবঙ্গের আইন ও শৃঙ্খলার অবনতিতে খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ-বিষয়ে তাঁকে যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে। শ্রীমুখোপাধ্যায়ও নাকি ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। শ্রীচ্যবন শৃঙ্খলা রক্ষা সম্পর্কিত বিষয়টি গুরুতর মনে করেন, এদিকে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার প্রচার-মন্ত্রী শ্রীলাহিড়ী শ্রীচ্যবনের অভিযোগ সম্পর্কে পালটা একটা জবাব দিয়েছেন। জবাবে তাঁর যুক্তি দাঁড়িয়েছে, খাদ্যাভাবের জন্যেই যত গণ্ডগোল, কেন্দ্র ঠিকমতন খাদ্য সরবরাহ করলে রাজ্যের অশান্তি বাড়ত না।

শ্রীলাহিড়ীর যুক্তি যে সম্পূর্ণ অসার এমন কথা আমরা বলব না, কিন্তু কেবলমাত্র খাদ্যাভাবই একটি রাজ্যের বেশ কিছু মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল করতে পারে কি? চালের জন্যে ট্রেন আটক বুঝি, কিন্তু ইদানীং কলকাতা, শহরতলী, শিল্পাঞ্চলে ব্যাপকভাবে রাহাজানি, ডাকাতি, মারপিট, খুনের সংখ্যা কেন বাড়ে? কলকাতারই বহু অঞ্চলে চুরি ও ছিনতাই কী পরিমাণ বেড়েছে আমরা তো তা কানেই শুনছি। যদি চুরি, রাহাজানি, ছিনতাইয়ের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তবে তার প্রাবল্য দেখা দেবে কেন?

শুধু মাত্র খাদ্য সমস্যাকে মুখের সামনে তুলে ধরা এই উচ্ছৃঙ্খলতার কোনো কৈফিয়ত হতে পারে না। গত কয়েক মাসে বারোটিরও বেশী রাজনৈতিক খুন হয়েছে, রাজনৈতিক হাঙ্গামা ঘটেছে অনেকগুলি, মারপিটও প্রায় কুড়িটি। এর অধিকাংশই কলকাতা ও শহরতলীতে ঘটেছে। গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্টে আরও জানা যায় কোনো একটি উগ্র রাজনৈতিক দলই অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছে।

সম্প্রতি সংসদ সদস্য শ্রীপ্রেমচাঁদ ভার্মা নয়াদিল্লিতে বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ একটি ভয়ংকর আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছে—যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। পশ্চিম বাংলার সম্পর্কে তাঁর এই ধারণার কারণ, তিনি এবং কিছু সংসদ সদস্য সরকারী একটি গুদাম পর্যবেক্ষণ করতে যান, হুগলী নদীতে তাঁদের স্টীমার ছাড়ার সময় অন্য একটি স্টীমার এসে থামে এবং শ'খানেক যাত্রী গালি-গালাজ, চিৎকার করতে শুরু করে, জুতো ছোঁড়ে, শাসায়। এই ঘটনার কারণ সামান্য, আগত স্টীমারটিকে জেটিতে ভেড়াতে হলে অন্য স্টীমারটিকে (সদস্যরা যাতে ছিলেন) ছেড়ে না দিয়ে উপায় ছিল না। জনতার ক্রোধ, কেন তাদের স্টীমার আগে জেটিতে ভেড়ানো হবে না। শ্রী ভার্মা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, পশ্চিম বাংলায় সরকার শুধু নামেই আছেন, সমাজবিরোধী এবং গুণ্ডারা সেখানে রাজত্ব করছে।

আমাদের ক্ষোভ, পশ্চিম বাংলা সম্পর্কে এই ধারণা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের হচ্ছে না, দেশের অন্যান্য জায়গাতেও সাধারণ মানুষের মনে একটি ভীতির সঞ্চার ঘটছে। এ'রা সকলেই মনে করছেন, পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলেছে, এবং সরকার পুলিসকে নিষ্ক্রিয় করে স্বৈরাচারের সুযোগ দিচ্ছেন। আশা করি, এ ধারণা আমাদের রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করছে না।

বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গে আপাতত একটা উচ্ছৃঙ্খলতার সময় যাচ্ছে। সে উচ্ছৃঙ্খলতার সবটাই রাজনৈতিক নয়, সামাজিকও। মানুষের মনে ভয় ও সন্ত্রাস জাগছে। অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ বেড়ে যাচ্ছে। যে সব সমাজবিরোধীরা এক সময় প্রশ্রয় পেয়েছে, যাদের সাহায্যে হাঙ্গামা ও উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটানো হয়েছে তারাই যে দুর্দিনে স্বৈরাচারী হয়ে উঠছে না একথা কি কেউ জোর করে বলতে পারে। খাদ্যাভাবের জন্যে আন্দোলন হতে পারে, ট্রেন আটকও স্বীকার করলাম, কিন্তু এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটার কোনো কারণ নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আশা করি, সমস্যাটির জটিলতা ও ভয়ঙ্করতা অনুভব করবেন।

রাজনৈতিক মহলের ধারনা, পশ্চিম-বাংলার রাজনীতিটা হঠাৎ একটা মোড় নেবার মুখে এসে পড়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে যুক্তফ্রণ্টের ভিতরে বাইরে একটা অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছিল। এবং কোন কোন মহলে এ-জন্য যে অস্বস্তি ছিল না, তা নয়। কিন্তু এটা বেশী দেখা দিয়েছিল পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে। প্রদেশ কংগ্রেসের একাংশের মধ্যে ক্রমশঃই একটা অধৈর্যের ভাব ফুটে উঠছিল। তেমনি ছিল অপরাংশে অধৈর্যের বিরোধিতা। এই পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়েছেন শ্রীগুল-জারীলাল নন্দ।

শ্রীনন্দর উপর ভার ছিল বিহার ও পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ ছিল, কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা বিভিন্ন রাজ্যে সেখানকার কংগ্রেস রাজনীতি ও সংগঠনের অবস্থাটা তদন্ত ক'রে দেখবেন এবং বিশেষভাবে লক্ষ্য করবেন রাজ্যের শ্রমিক আন্দোলনের গতি বা প্রগতি। যে-কয়জন নেতার উপর এই কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল, তাদের কোন সময়ই এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ভার দেওয়া হয়নি যার ফলে প্রদেশ কংগ্রেসের সংগঠন বা নেতৃত্ব কোনভাবে ক্ষুন্ন বা পরিবর্তিত হ'তে পারে। এই সব কংগ্রেস নেতাদের উপর নির্দেশ ছিল রিপোর্ট দাখিল করা, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে।

তবু কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে শ্রীনন্দ সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণা করলেন পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস কমিটিকে বাতিল ক'রে দিয়ে একটা এড হক কমিটি গঠন করা হবে। অবশ্য এই এড হক কমিটি কাদের নিয়ে গঠিত হ'বে বা হ'তে পারে তা তিনি জানাননি। দিল্লী থেকে জানান হ'বে। শ্রীনন্দ সাংবাদিক সম্মেলনে এসেছিলেন তাঁর বিবৃতি লিপিবদ্ধ ক'রে এবং এসেই যে-কথাটা তিনি সাংবাদিকদের বললেন, তার মূল কথা হ'ল তাঁর বিবৃতির কোন অংশ বা ঘোষণা সম্বন্ধে কোনরকম প্রশ্ন করা চলবে না। কারণ, তিনি উত্তর দেবেন না। তিনি নিশ্চয়ই অনুমান ক'রেছিলেন যে, তাঁর ঘোষণা সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন উঠতে পারে এবং প্রশ্ন ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ, সিদ্ধান্তটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সে-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ৎ বা যুক্তি দিতে রাজী নন।

এমনকি, একথাটাও তিনি বলতে রাজী ছিলেন না যে, এই সিদ্ধান্ত তাঁকে ঘোষণা করার অনুমতি কে দিয়েছেন। কারণ, ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবার কোন ইঙ্গিত ছিল না। তিনি শুধু যেটুকু বলেছিলেন, তা থেকে এটাই বুঝে নিতে হবে যে, দিল্লীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা-বার্তা বলার পরেই তিনি এ-সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারছেন। স্বভাবতঃই, তিনি দিল্লীতে এমন এক নেতার সঙ্গে কথা বলেছেন, যাঁর সম্মতি বা অনুমতি উপেক্ষণীয় নয়। জানা গিয়েছে, দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলার পরই শ্রীনন্দ তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

কথা ছিল, রবিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল দশটায় শ্রীনন্দ সাংবাদিকদের কাছে এই ঘোষণা করবেন। অবশ্য প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসৌরেণ মিশ্র সকাল দশটাতেও জানতেন না যে শ্রীনন্দ সাংবাদিক-দের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কংগ্রেস ভবনে। পরে অবশ্য জানা গেল শ্রীনন্দ সাংবাদিক সম্মেলন বিকেল তিনটা পর্যন্ত স্থগিত রেখে-ছেন। শ্রীনন্দকে সাংবাদিক সম্মেলন স্থগিত রাখতে হ'য়েছিল এই কারণে যে, তখন পর্যন্ত দিল্লী থেকে কোন কথা জানতে পারেন নি। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীসাদিক আলীর সঙ্গে কথা বলে শ্রীনন্দ খুব উৎসাহ বোধ করেননি; কারণ, শ্রীসাদিক আলীর পক্ষে কোনরূপ মতামত দেওয়া সম্ভব ছিল না। একমাত্র কংগ্রেস সভা-পতি শ্রীকামরাজ অনুমতি দেবার অধিকারী। কিন্তু শ্রীনন্দ জানতেন কাজটা সহজ হ'বে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বললে এবং সে-কারণে, শ্রীনন্দকে অপেক্ষা করতে হ'য়েছিল রবিবার বিকাল পর্যন্ত। শ্রীমতী গান্ধী দিল্লী ফেরার পরেই শ্রীনন্দ তাঁর সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রধান-মন্ত্রীর অনুমতি পেয়েছিলেন।

এটা নিশ্চয়ই শ্রীনন্দর জানা ছিল যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর অনুমতি পাওয়া গেলে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজের সম্মতি পেতে অসুবিধা হবে না; কারণ, শ্রীমতী গান্ধী ও শ্রীকামরাজের মধ্যে যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল কিছুদিন আগে সেটা আপাততঃ স্থগিত আছে। কথাটা উঠেছে দিল্লীতে যে, শ্রীকামরাজকে কংগ্রেসের সভা-পতি হিসাবে পুনর্নির্বাচিত করা হোক। এটারই সুযোগ নিয়েছেন শ্রীনন্দ এবং শ্রীমতী গান্ধীও। শ্রীকামরাজকে পুনর্নির্বা-চিত হ'তে হ'লে তাঁকে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্ব সম্বন্ধে চুপ ক'রে থাকাই কমিচীন হ'বে এবং প্রয়োজন হ'বে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বকে স্তব্ধ করা।

যে-ভাবেই পর্যালোচনা করা যাক না কেন শ্রীঅতুল্য ঘোষের নেতৃত্ব দিল্লীতে কংগ্রেসের উচ্চ মহলের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এটা সম্ভব হয় যখন পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস নেতৃত্বকে ক্ষুন্ন করা যায়। গত নির্বাচনের পর পশ্চিম বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের মধ্যে একটা পরিবর্তন আনা হয়েছে সত্যি; কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না যে, নেতৃত্বের ভারটা শ্রীঅতুল্য ঘোষের হাত থেকে সরে যায়নি। সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া, প্রদেশ কংগ্রেসের নির্বাচনও আসন্ন এবং শ্রী ঘোষের বিরোধী পক্ষ থেকে ক্রমাগত আওয়াজ উঠছিল, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ভেঙে এড-হক কমিটি গঠন করা হোক নির্বাচনের আগে। নির্বাচনে বিরোধী পক্ষের সাফল্য সম্বন্ধে হয়ত সন্দেহ ছিল, তাই কথাটা উঠেছিল প্রদেশ কংগ্রেসের এক মহল থেকে।

এই মহলের সঙ্গে যে-সব নেতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত, তাঁরা বেশ কিছু-দিন চেষ্টা করছিলেন যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন ঘটাবার জন্য। তাঁদের বক্তব্য, শ্রীঅজয় মুখার্জিকে যুক্তফ্রণ্টের কম্যুনিস্ট প্রভাব

থেকে মুক্ত করে অ-কম্যুনিস্ট বিকল্প সরকারের মুখ্যমন্ত্রী করা। কিন্তু এ-পক্ষের ধারণা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জির পক্ষে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলান তখনই সম্ভব, যখন প্রদেশ কংগ্রেসের জন্য একটি এড-হক কমিটি গঠন করে শ্রী ঘোষের নেতৃত্বকে খর্ব করা যায়। শ্রী মুখার্জি যখন কংগ্রেসের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেন, তখন এই এড-হক কমিটির দাবি তিনি করেছিলেন দিল্লীতে কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে। তখন অবশ্য রাজনৈতিক কারণে এ-দাবি দিল্লীর নেতৃত্বের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। আজ রাজনৈতিক প্রয়োজনেই তা গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে।

তাই শ্রীনন্দ পশ্চিম বাংলায় আসার আগেই প্রায় ঠিক করে এসেছিলেন যে, পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের জন্য একটি এড-হক কমিটি গঠন করার কথা। প্রথম থেকেই কথাটা আলোচনা করেছিলেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে। তখন অবশ্য শ্রী সেন কথাটা খুব খোলা মনে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে উত্তর কলকাতায় যে ভোজসভার বৈঠক বসে, সেখানেই রাজনৈতিক অবস্থাটা ঘুরে যায় এবং এড-হকের প্রস্তাবটা পাকাপাকি হয়ে যায়। এই বৈঠকে এটাই বোঝাপড়া হয় যে, এড-হক কমিটি গঠন করলে শ্রীঅজয় মুখার্জির পক্ষে যুক্তফ্রন্টের সংস্রব ত্যাগ করে কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে রাজী হতেও পারেন। একটা দিনও স্থির হয়। ধরে নেওয়া হয় ১ অক্টোবর এই নূতন কোয়ালিশন নিয়ে কাজ শুরু করা সম্ভব হতে পারে। তা ছাড়া, এড-হক কমিটি করলে কংগ্রেস নির্বাচনের কথাটা মুলতুবি রাখা যায়। শ্রীঘোষের নেতৃত্বকেও দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়। শ্রী সেন সম্মতি দিলেন।

এই দুটো উদ্দেশ্যই ছিল শ্রীনন্দর। তাই শ্রী সেনের সম্মতি পাবার পর শ্রীনন্দর পক্ষে এড-হক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে কোন বাধা রইল না। শ্রীঅতুল্য ঘোষ এর বিরোধিতা করে বলেছেন: শ্রীনন্দ এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। কিন্তু শ্রীনন্দ জানতেন যে, শ্রী ঘোষ এ-সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেন না। মেনে নেবেন না। শ্রীনন্দ যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন, তা অসফল হয়নি। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের মর্যাদার প্রশ্ন নিয়ে যে কথাটা উঠেছিল, তা সফল হবে কিনা এখনই তা বলা সম্ভব নয়।

নির্বাচনের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীনন্দ এসেছিলেন কলকাতায়। তিনি এসেছিলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস সংগঠনের অবস্থাটা খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করতে। নির্বাচনের পর থেকেই এটা প্রচার করা হয়েছে যে, কংগ্রেসের রাজনৈতিক মর্যাদা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং এ-জন্য দায়ী করা হচ্ছে এমন সব কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে যাঁরা পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের কর্ণধার ছিলেন। স্বভাবতই এই আক্রমণটা এসেছে শ্রীঅতুল্য ঘোষের বিরুদ্ধে। এই রাজনৈতিক আক্রমণকে প্রশমিত করার জনাই যে কার্যকরী সমিতির হাতে প্রদেশ কংগ্রেসের ভার ছিল, তার সদস্যরা পদত্যাগ করেন এবং নূতন সমিতি গঠিত হয়। তবু রাজনৈতিক আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ বন্ধ হয়নি দুটো কারণে।

প্রথম কারণ, প্রদেশ কংগ্রেসের মধ্যে একদল নেতা ও কর্মী মনে করেন যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হটিয়ে দিয়ে কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার গঠন করা উচিত। এঁদের নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং তাঁর সমর্থকরা মনে করেন যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের অযোগ্যতার ফলে আজ সারা পশ্চিম বাংলায় তীব্র অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে জনজীবনে। এই অনিশ্চয়তা দূর করতে হলে, যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কম্যুনিস্টদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে বিকল্প অ-কম্যুনিস্ট সরকার গঠন করা উচিত। এটা কংগ্রেস কোয়ালিশনের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। শ্রী সেনের এই যুক্তির তীব্র বিরোধিতা জানিয়েছেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ। শ্রী ঘোষ মনে করেন, এই প্রচেষ্টার ফলে কংগ্রেসের রাজনৈতিক মর্যাদা আরও বেশী ক্ষুণ্ণ হবে। কারণ, তাঁর মতে এটা অস্বীকার্য যে, গত নির্বাচনে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও কংগ্রেসই পশ্চিম বাংলা বিধান সভায় বৃহত্তম দল। কোয়ালিশন করতে গেলে এই বৃহত্তম দলকে সংখ্যালঘিষ্ঠ অ-কংগ্রেসী সদস্যদের বা দলের রাজনৈতিক এবং সরকারের নেতৃত্ব তুলে দিয়ে মর্যাদা খোয়াতে হবে।

দ্বিতীয় কারণ, পশ্চিম বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের নির্বাচন হবার কথা ঘোষিত হয়েছে। এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসের কার্যভার যে দলের হাতে যাবে, তারাই ভবিষ্যৎ নীতি ও পন্থা নির্ধারণ করবে।

প্রধানত এই দুটো কারণকে উপলক্ষ করেই শ্রীনন্দ এসেছিলেন কলকাতায়। অবশ্য এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, শ্রীনন্দর সঙ্গে শ্রীঅতুল্য ঘোষের সম্পর্কটা অনেক দিন ধরেই মধুর নয়।

হয়ত এরই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীনন্দকে কলকাতায় শুনতে হয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণ। তাঁকে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপের ফলেই পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বেশী। পশ্চিম বাংলায় শ্রমিক আন্দোলন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ কংগ্রেস সংগঠনের প্রতি আস্থাশীল নিজস্ব কোন কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন পশ্চিম বাংলায় নেই। ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পশ্চিম বাংলা শাখার ভার শ্রীকালী মুখার্জির হাতে। শ্রী মুখার্জি আজ কংগ্রেসবিরোধী রাজনৈতিক সংস্থা সংগঠনে ব্যস্ত। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তেমনি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং বিশেষভাবে শ্রীনন্দ নিজে বেশী অমর্যাদা দেখিয়েছেন পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি খাদ্য আন্দোলনের সময় হস্তক্ষেপ করে। শ্রীনন্দ মনে করেন, এই প্রতি-আক্রমণকে জোরদার করা হয়েছে প্রকৃত সাংগঠনিক প্রশ্নকে এড়িয়ে যাবার জন্য।

রাজনৈতিক লড়াইয়ে আক্রমণের বিকল্প প্রতি-আক্রমণ থাকবেই। পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের সাংগঠনিক প্রশ্ন নিয়ে এবং এড-হক সিদ্ধান্ত মাত্র নিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কি সিদ্ধান্ত নেবেন, তা অনুমান করা হয়ত অসম্ভব নয়। কিন্তু অনস্বীকার্য যে, শ্রীনন্দর কলকাতা মিশন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে নূতন এক আলোকে তুলে ধরেছে। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষেও এটা উপেক্ষা করা সম্ভব না-ও হতে পারে। তবে এড-হকের প্রস্তাব যদি পরোক্ষভাবে যুক্তফ্রন্টকে কোনভাবে ক্ষুণ্ণ করে, তা হলে সে-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে স্বাগত জানাবে কম্যুনিস্ট পক্ষ। কংগ্রেস নয়।

শ্রীনন্দ কলকাতায় এসেছিলেন কংগ্রেস সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত সংগ্রহ করতে।
বহুর মধ্যে একের প্রকাশ।
বর্ষার মরসুমে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় সারা ভারতে একটা কিছু করার জন্য কবির সাহেব বদ্ধপরিকর।
কবির-দল
বাংলার দ্বিধাগ্রস্ত হ্যামলেট!
যুক্তফ্রন্ট থাকবে কি থাকবে না— সেটাই প্রশ্ন।
অজয়

প্রকাশিত হয়েছে

● গ ল্প লি খে ছে ন ●

অন্নদাশংকর রায়
নরেন্দ্রনাথ মিত্র
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রতিভা বসু
প্রমথনাথ বিশী
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়
বিমল কর
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবোধকুমার সান্যালের

জয়া

● চিরতারুণ্যের সাধক প্রবোধকুমারের অনবদ্য প্রেমের উপন্যাস ●

● প্র ব ন্ধ লি খে ছে ন ●

বঙ্কিমচন্দ্র সেন
দিলীপ সরকার
বীরেন্দ্রনাথ সরকার
সত্যজিৎ রায়
এস. এন. সরকার
সেবাব্রত গুপ্ত

● র ঙি ন চি ত্র ●

শ্রীশ্রীদুর্গা (প্রাচীন পট)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নিখিল বিশ্বাস
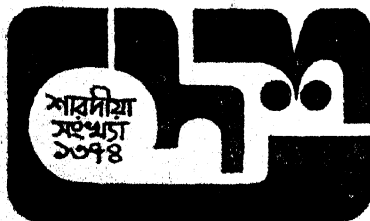
প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর

মহাস্থবির জাতক

● বিখ্যাত আত্মকাহিনীর অপ্রকাশিত শেষ পর্ব ●

● বি শে ষ র চ না ●

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

চিঠি

● রবীন্দ্র-নিন্দুকদের প্রতি কবির মনোভাব এই অমূল্য চিঠিতে অভিব্যক্ত ●

●

বুদ্ধদেব বসুর

কলকাতার ইলেকট্রা

● পূর্ণাঙ্গ নাটক ●

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

ছিদ্র

● উপন্যাসোপম বড়গল্প ●

●

দাম ঃ প্রতি সংখ্যা ৩·৫০
রেজিস্ট্রি ডাকে (ভারতে) ৪·৩০
আসামে বিমান-ডাকে ৪·৭৪
বহির্ভারতে জাহাজ-ডাকে ৫·০৬

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

ঘুণপোকা

● প্রতিভাবান তরুণ লেখকের সর্বপ্রথম অথচ শক্তিশালী উপন্যাস ●

প্রকাশিত হয়েছে

● ক বি তা লি খে ছে ন ●

আশা দেবী
উমা দেবী
কবিতা সিংহ
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
কেতকী কুশারী ডাইসন
জগন্নাথ চক্রবর্তী
জ্যোতির্ময় দত্ত
তারাপদ রায়
দিনেশ দাস
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সমরেশ বসুর

প্রজাপতি

● 'বিবর'-এর চেয়েও অনেক—অনেক চাঞ্চল্যকর উপন্যাস ●

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
বিষ্ণু দে
রাজলক্ষ্মী দেবী
শংকর চট্টোপাধ্যায়
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিকুমার ঘোষ
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সুশীল রায়
হরপ্রসাদ মিত্র

বৈদেশিকী

জ্বপিটার কমপ্লেক্স

"ঈডিপাস-কমপ্লেক্সের" নাম ফ্রয়েডীয় সাহিত্যিকদের হাতের গ্বণে অনেকেরই জানা। "জ্বপিটার-কমপ্লেক্স" একেবারে নতুন কথা: চাল্ব করেছেন ব্রিটিশ পরমাণ্ব-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ব্ল্যাকেট। জ্বপিটার হলেন প্রাচীন গ্রীক প্বরাণের দেবরাজ, আমাদের ইন্দ্রতুল্য· কারণ দেবরাজ জ্বপিটারও বজ্রধর। এ য্বগের বজ্র বোমা ছাড়া আর কী? সেই বোমার রাজা আমেরিকা। দেবরাজকে লোকে যেমন ভয়ভক্তি করে—করতেই হয়, না করলে ম্বশকিল বিস্তর—তেমনই আবার স্বযোগ পেলে ঠাট্টাতামাশা করতেও ছাড়ে না। মার্কিন মহাশক্তিধরকে নিয়ে ব্রিটিশ পরমাণ্ব বিজ্ঞানী ব্ল্যাকেট যে মশকরা করবেন সেটা আর আশ্চর্য কী! ক্ষমতা যাদের কম ঐশ্বর্যে ঘাটতি তাদের চোখ টাটায় ক্ষমতাধর ভাগ্যমন্তের প্রতাপ দেখে। এটা অবশ্য ভণিতাই, আসল কথা, আমেরিকা কেবল বোমার জোরে য্বদ্ধ এবং শান্তির সমস্যার ফয়সালা করতে চাইছে, অধ্যাপক ব্ল্যাকেটের এই নালিশ। তাঁর মতে মার্কিন ব্রহ্মাস্ত্রধররা "জ্বপিটার-কমপ্লেক্সে" ভুগছেন। ব্যাপারটা অবশ্য অত সহজ নয়। "বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী সে কি সহজ গান?" —মার্কিন মহলেও সংশয়, বজ্র-বাঁশীর গানটা সোজা নয়, যাদের ম্বগ্ধ হওয়া উচিত তারা প্রায়ই বিষম খ্বত খ্বত করছে; আর জ্বপিটারের নিরন্তর বজ্রাঘাতে যাদের ছিন্নভিন্ন নিশ্চিহ্ন হওয়া উচিত তারাও, কী ম্বশকিল, একেবারে ঘায়েল হচ্ছে না। দেবরাজ জ্বপিটারের আমলে কি রক্তবীজের বংশ ছিল? একালের জ্বপিটারের বজ্র যেন এই প্রশ্নটার ঠিক উত্তর এখনও খ্বঁজে পাচ্ছে না।

মার্কিন ব্রহ্মাস্ত্রধরের সমস্যাটা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। দেবরাজ জ্বপিটার তাঁর খ্বশীমত বজ্র নিক্ষেপ করতে পারতেন: প্রেসিডেন্ট জনসন নন জ্বপিটারের মত প্রশ্নাতীত সর্বশক্তিমান। তাঁর ইলেকশান আছে· প্রতিপক্ষ আছে, বাঘা বাঘা দ্বর্ম্বখ সেনেটাররা আছেন; বেয়াড়া ছোকরাদের "লাভ-ইন" "টীচ-ইনের" উৎপাতও কম নয়, তারপর নিগ্রোদের বেকায়দা প্রশ্ন, যে স্বাধীনতা মার্কিন গণতন্ত্রে তাদের কাছে সহজলভ্য নয়, সে স্বাধীনতা ভিয়েতনামে রপ্তানিতে তাদের গরজ কিসে! মার্কিন জ্বপিটার তাই অসীম শক্তিধর হ'য়েও বজ্রশক্তি প্রয়োগ ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত। 'পেন্টাগন' মানে মার্কিন সমরনায়কদের সদর দপ্তর অনায়াসে স্বাধীন দ্বনিয়াকে কম্যুনিস্ট বিপদ থেকে পরিত্রাণ করতে পারে; জ্বপিটার কমপ্লেক্সের এই দিকটা যথার্থ। কিন্তু বোমাবর্ষণের পাল্লা বাড়াতে গেলেই চারদিক থেকে রব ওঠে, "সংহর! সংহর!" একালের জ্বপিটার কমপ্লেক্সের ভিতরে ওই আর এক প্যাঁচ; প্বরাণের দেবরাজ জ্বপিটার ওসব ক্ষ্বদ্র হৃদয়দৌর্বল্যে পীড়িত, বিব্রত, বিভ্রান্ত হননি।

ভিয়েতনামের য্বদ্ধ আমেরিকা অনেক আগেই শেষ করে ফেলতে পারত। নানা রকম আপত্তি, খ্বতখ্বতানি, সংকোচ য্বদ্ধ পরিচালনায় বাধা ঘটাচ্ছে, তাই বোমার রাজা হয়েও আমেরিকা হেস্তনেস্ত করতে পারছে না। মার্কিন সমরবিশেষজ্ঞরা বলছেন, জ্বৎসইভাবে সারা উত্তর ভিয়েতনামের সর্বত্র বোমাবর্ষণ সমানে কিছ্বকাল চালাতে পারলেই সব ল্যাঠা মিটে যায়। কিন্তু সেটি চালানো যাচ্ছে না। হাইফং বন্দরে বোমা ফেলতে হবে সাবধানে, কারণ কী জানি যদি সোভিয়েট জাহাজ জখম হয়; উত্তর ভিয়েতনামের উত্তর সীমান্ত বরাবর বোমা ফেলাতেও শতেক বিধিনিষেধ, কারণ কী জানি কম্যুনিস্ট চীন যদি ক্ষেপে যায়!

কোন কোন মার্কিন সেনেটার স্পষ্টই অসন্তুষ্ট; পেন্টাগনের মত তাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস বোমা, আরও বোমাই পরিত্রাণের একমাত্র পন্থা। সংকল্প যখন স্বাধীন দ্বনিয়াকে রক্ষা, তখন সোভিয়েট রাশিয়া কি কম্যুনিস্ট চীনের মেজাজ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কী? রাশিয়া এবং চীনও তো স্বাধীন দ্বনিয়ার বন্ধ্ব নয়। রাশিয়া এখন আবার উত্তর ভিয়েতনামকে আরও হাতিয়ার সরবরাহ করবে জানিয়ে দিয়েছে। জ্বপিটারের বজ্রকে গ্রাহ্য করে না, এত স্পর্ধা কার? সেনেটার গোল্ডওয়াটার তো অনেক কাল আগেই বলেছিলেন, উত্তর ভিয়েতনামের বেয়াদবি শায়েস্তা করতে হলে রাশিয়া এবং চীনকেও হাতে-কলমে সমঝিয়ে দেওয়া চাই মার্কিন জ্বপিটারের বজ্র কারো বেয়াদবীই বরদাস্ত করবে না। কিন্তু তাতেই আবার কোন কোন মার্কিন রাজনৈতিক মহলের বিষম আপত্তি। রাজনীতির নানা রকম প্যাঁচে তাই মার্কিন জ্বপিটারের রণনীতি আড়ষ্ট। অধ্যাপক গ্যালব্রেথ সোরগোল তুলেছেন· পেন্টাগনের মতলবটা মারাত্মক, ভিয়েতনামে য্বদ্ধের অচল অবস্থায় জট ছাড়িয়ে উঠতে পেন্টাগন চায়, য্বদ্ধকে চীন, এবং দরকার হলে রাশিয়া পর্যন্ত· বিস্তৃত করতে। বাকুর সোভিয়েট তেলের খনি ঘায়েল না করলে উত্তর ভিয়েতনামের তেল কমবে কী করে? ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ ধ্বংস না করলে রাশিয়া থেকে চীন দিয়ে উত্তর ভিয়েতনামে রসদপত্র আমদানি বন্ধ হয় কী করে? মার্কিন জ্বপিটারের বজ্র এ সবই করতে সক্ষম, তবে তা করতে হলে চাই প্বরোদস্তুর তৃতীয় মহায্বদ্ধ।

অধ্যাপক ব্ল্যাকেট যাই বল্বন, মার্কিন জ্বপিটার-কমপ্লেক্স এখনই অতদ্বর গড়ায় নি। আপাতত মার্কিন প্রতিরক্ষা-সচিব ম্যাকনামারার সা ব ধা নী ব্যবস্থা—দ্বই ভিয়েতনামের মাঝে ১৭ অক্ষরেখা বরাবর একটা ইলেকট্রনিক ম্যাজিনো লাইন নির্মাণের উদ্যোগ। জার্মেনীকে ঠেকানোর জন্য ফ্রান্স গড়েছিল ম্যাজিনো লাইন, শেষ পর্যন্ত টেঁকেনি, কারণ এই রক্ষাবন্ধনীর পাশেই মস্ত ফাঁক ছিল বেলজিয়াম। ভিয়েতনামের ৪৭ মাইল ম্যাজিনো লাইনের পাশে লাওসের ফাঁক দিয়ে উত্তর ভিয়েতনামের রক্তবীজরা কিলবিল করে আসতে পারে। তবে লাওসকে স্বাধীন দ্বনিয়ার আর একটা শান্তি স্তম্ভ করে নিতে বিশেষ বাধা হবে না। ম্যাকনামারার হিসাবী মাথার স্বনাম খ্বব, কিন্তু এক্ষেত্রেও মার্কিন রাজনৈতিক মহলে বাগ্বড়া দেওয়ার লোকের অভাব নেই। তারা বলছে উত্তর ভিয়েতনামের রক্তবীজরা এই ম্যাজিনো লাইন গলিয়েই আসতে থাকবে, আপাতত নগদ লাভ কেবল ইলেক-ট্রনিকস কোম্পানিগ্বলির। য্বদ্ধ এবং প্রতিরক্ষার আয়োজন মানেই কলকারখানার শ্রীবৃদ্ধি, বিজ্ঞানের উন্নতি। ইলেকট্রনিক্স কোম্পানিগ্বলির পোয়া বারো। ১৯৭০ সন নাগাদ চীন যদি ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করেই ফেলে তবে আমেরিকাকে রক্ষার জন্য চাই "নাইক-এক্স" নামে জটিল রেডার-ছত্র, সে বাবদ ইলেকট্রনিক্স কোম্পানিরা আপাতত পাচ্ছে প্রায় চার হাজার কোটি টাকার কন্ট্রাক্ট। দেবরাজ জ্বপিটারের নিজের কোন ভয় ভাবনা ছিল না; একালের মার্কিন জ্বপিটারের ম্বকুটে অস্বস্তির ছায়া! শ্বধ্ব কি অস্বস্তিই? /

২৫।৭।৬৭

সুনন্দর জার্নাল

'জুভেনাইল ডিলিংকোয়েন্সি'

জুভেনাইল ডিলিংকোয়েন্সি—এর বাংলা অনুবাদ কী হবে? তারুণ্যসুলভ অপরাধ? নাকি আর একটু সহজ ভাষায় বলা যাবে 'বালকোচিত বাঁদরামো?' একটা লাগসই পরিভাষা নিশ্চয় আছে, কিন্তু
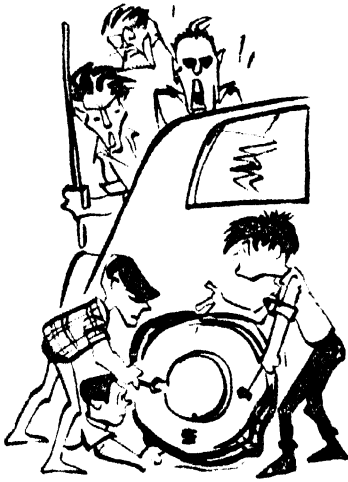
ধর্মঘটের সময় চাকার হাওয়া বের করার ট্রেনিং পায় দাদাদের কাছ থেকে

হাতের কাছে ঠিক এই মুহূর্তে সেটা খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু জুভেনাইল ডিলিংকোয়েন্সি শব্দ দুটোই যখন চালু, তখন ওদেরই আপাতত ব্যবহার করা যাক। আশা করি, আমার এই দাস-মনোভবের জন্য আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন।

সম্প্রতি কাগজে দেখলুম বর্মা গভর্নমেন্ট এই সমস্যার সমাধানের জন্য অনেকগুলো কার্যকরী পরিকল্পনা হাতে নেবার কথা ভাবছেন। এই ডিলিংকোয়েন্টদের বিবিধ কার্যক্রম—যথা দাঁড়ানো মোটর গাড়ির চাকা থেকে হাওয়া বের করে দেওয়ার কৌতুক, অকারণ পুলকে ঢিল মেরে কাচের শার্সি চুরমার করার আনন্দ, নিরীহ পথচারীকে খেলাচ্ছলে বেদম প্রহার, অশ্লীলতা, রোমিও বৃত্তি, সিনেমার পয়সার প্রয়োজনে—কিন্তু তালিকা আর বাড়াতে চাই না; বর্মার মতো আমাদের অবস্থা বোধ হয় এখনো অতটা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেনি—কিন্তু শিরঃপীড়াটি ভারতবর্ষেরও আছে এবং এতদ্দেশীয় ডিলিংকোয়েন্টদের আরো ক'টি আইডিয়া সাপ্লাই করা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না।

এই সামাজিক অবক্ষয়টির কারণ অনেকগুলো। পারিবারিক অমনোযোগিতা, অশিক্ষা আর কুশিক্ষা, অর্থনৈতিক সংকট, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা, বাজে বই-পত্রিকা বাজে ফিল্ম। তা ছাড়া অল্প বয়সের এক ধরনের র‍্যাডিডো তো আছেই। বর্মীয় পরিসংখ্যান থেকে আর একটি তথ্যও বিশেষ দ্রষ্টব্য—বিত্তবান পরিবারের ছেলেদের ডিলিংকোয়েন্সি আরো মারাত্মক ধরনের হাতে প্রচুর পয়সা পাওয়ার ফলে তাদের মর্কটবৃত্তি আরো দুঃসহ হয়ে ওঠে।

এ সবের প্রতীকারের জন্যে আমাদের দেশেও একটা সর্বাত্মক কর্মোদ্যম গড়ে ওঠা উচিত। আমাদের নেতারা, শিক্ষাবিদেরা, সমাজ বিজ্ঞানীরা অপরাধ বিশারদেরা এবং জনসাধারণ মিলিতভাবে এই উদ্যমটি জাগিয়ে তুলবেন—এ দাবি নিশ্চয় করা যেতে পারে। শিকড়েই যদি পচন ধরে তা হলে দেশ বা জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর কোনো ভবিষ্যদ্বাণীরই দরকার হয় না।

কিন্তু আমার মনে আর একটা প্রশ্ন জাগছে। 'জুভেনাইল'-এর সীমা[illegible] পর্যন্ত? পাঁচ থেকে সতেরো? সতেরো পর্যন্তই থাক, কারণ আঠারোয় পা দিলেই বোধ হয় আমরা আর নাবালক-নাবালিকা নই—মেন অ্যান্ড উইমেন। তবু পণ্ডিতেরা কখনো কখনো ওতেই খুশি হন না। মনে পড়ছে কী একটা উপলক্ষে এমার্সন লিখেছিলেন—'অল্ চিল্ড্রেন ফ্রম সিক্স্
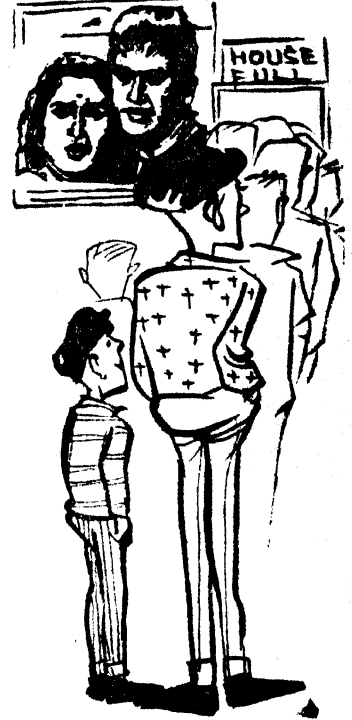
স্কুল পালিয়ে সিনেমার ট্রেনিং হয় গৃহশিক্ষকের কাছে

টু সিক্স্টি'—অতএব 'জুভেনাইল'কে আরো খানিক ফ্লেক্সিব্ল্ করা চলে—এবং ডিলিংকোয়েন্সি'র সীমাটাও তা হলে সেইভাবে বিস্তৃত করা যায়। আমাদের এই সব ট্রপিক্যাল আবহাওয়ায় নাকি আমরা কিঞ্চিৎ অকালেই পরিপক্কতা লাভ করি, কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে তথ্যটি বোধ হয় 'উইদাউট এ গ্রেন্ অব সল্ট' গলাধঃকরণ করা উচিত নয়।

বলতে পারছি না, কী কারণে আমার মনে কয়েকটা ঘটনা সার দিয়ে এসে দাঁড়াচ্ছে। আমি 'অবাধ জ্ঞানান্বেষণ' ধারায় তার দুটো একটা নিবেদন করে যাই। এর সঙ্গে ডিলিংকোয়েন্সির কোনো সম্পর্ক আছে কি না, মনস্তাত্ত্বিকেরাই সেটা বিচার করুন :

(১) কিছুদিন আগে এক বন্ধুর গাড়িতে চেপে চলেছিলুম। উলটো দিক থেকে

ফ্যাসানের ট্রেনিং পায় মায়ের কাছে

উল্কার মতো এল এক ট্যাক্সি, সমস্ত ট্র্যাফিক রুল্‌স্‌কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আমাদের গাড়িতে ধাক্কা দিয়ে, একটা মাড-গার্ড আর একটা আলোকে চুরমার করে তেমনি বীরবিক্রমে, অবিচলিত চিত্তে চলে গেল। অদূরেই ট্র্যাফিক পুলিস ছিল, ট্যাক্সির নম্বরটা নিয়ে বললে, 'থানায় ডায়েরি করুন।'

যাওয়া হল থানায়। বুশ শার্ট এবং ট্রাউজার-পরা জনৈক ভদ্র ব্যক্তি—তাঁর পদমর্যাদা ঠিক জানা গেল না—প্রায় সুখহাস্যে জানালেন: 'অঃ, ট্যাক্সি? ও এ রকম মেরেই থাকে।'

"মেরেই থাকে? কোনো আইন নেই সেজন্যে? আমার গাড়ির যে ক্ষতি হল—'

তিনি বিদ্রূপ করে বললেন, 'থানায় ডাইরি করলে কি আমরা আপনার গাড়ি রিপেয়ার করে দেব? আমরা না-ছোড়বান্দা, অগত্যা ডাইরি একটা তাঁদের নিতেই হল। অভিজ্ঞ ড্রাইভার এতক্ষণ গম্ভীর হয়েছিল, ফেরার পথে শুধু বললে, 'মিথ্যেই সময় নষ্ট করলেন, ট্যাক্সির সংগে ওদের অন্য বন্দোবস্ত থাকে।'

(২) ট্যাক্সির সূত্রেই মনে পড়ল, ওই বস্তুটি ধরবার জন্যে মেয়েদের নিয়ে পথে দাঁড়িয়ে ছিলুম। অদূরে ধাবমান একটিকে দেখে—বেশ খানিক দৌড়ে সেটিকে থামালুম। কিন্তু হঠাৎ কোত্থেকে বেশ সুবেশধারী একটি ভদ্রলোক উল্টো ধার থেকে ধাঁ করে তাতে উঠে পড়ে বললেন, 'অমুক কলেজ।' তাঁকে নিয়ে গাড়ি চলে গেল। মনে হল, প্রোফেসার-ট্রোফেসার হবেন।

(৩) দোকানে ঢুকে বাচ্চাদের জন্যে গরম জামা বাছাই করছিলুম। একটি বেশ পছন্দ হয়েছিল, এই সময় বাইরে মোটর থামিয়ে একজোড়া মাননীয় দম্পতি ঢুকলেন। মহিলাটি এসে প্রথমেই ম্যানিকিয়োর করা আঙুলে আমাদের বাছাই জামাটি তুলে নিলেন, আমাদের দেখতেও পেলেন না, জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কত?' সংগে সংগে ভদ্রলোকের পকেট থেকে পেট-মোটা একটা মানি-ব্যাগ বেরিয়ে এল। জামা নিয়ে তাঁরা চলে গেলেন এবং একটি অপসৃত চুরুটের ধোঁয়ার ভেতরে আমরা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলুম।

(৪) অধ্যাপক জিজ্ঞাসু ছাত্রটিকে বললেন, 'অত রেফারেন্স্‌ বই পড়ে কী করবে, বেশির ভাগই কিছু হয়নি। আমার লেটেস্ট্‌ বইটা দেখো, তাতেই কাজ হয়ে যাবে।'

ছাত্রটি একটু সাহসী। বলেই ফেলল: 'আপনার বইটা সব কভার করে না স্যার, তা ছাড়া আমি দেখলুম, ওতে বোধ হয় কিছু—মানে কিছু ব্যাক-ডেটেড্‌ থিয়োরী আর ভুল ডেটা—'

অধ্যাপক সংক্ষেপে বললেন, 'অ—অ।'

কিন্তু পরীক্ষার খাতা তাঁর হাতেই ছিল। অতএব—

(৫) তিনি আমাদের সকলকে ডেকে বললেন, 'দুর্নীতি বন্ধ করুন। চালের চোরা-চালান রুখে দিন। নিজেরা যদি ভেতর থেকে সৎ হয়ে উঠতে না পারেন, তা হলে দেশের জন্যে কোনো কাজই করতে পারবেন না।'

তিনি রেশন এরিয়ায় থাকেন। তাই ফেরবার সময় গাড়ির ক্যারিয়ারে আধ মণ মিহি চাল নিয়ে গেলেন।

কিন্তু সর্বনাশ—এ আমি করছি কী! নিজেকেও তো দেখি বাদ দিতে পারছি না!

না—না, এ-সব বিপজ্জনক চিন্তা করা ঠিক নয়। আসুন—সকলে মিলে পাঁচ থেকে সতেরো বছরের ডিলিংকোয়েন্ট্‌দের জন্যে মাথা ঘামাতে থাকি।

রাঁচী সংবাদ

মাননীয় "দেশ" সম্পাদক মহাশয়,

সমীপেষু,

'সুনন্দর জার্নালে' যে 'রাঁচী সংবাদ' বেরিয়েছিল, তা নিয়ে কয়েকটি দীর্ঘ চিঠি পেয়েছি। সেই চিঠিগুলির প্রকাশ এবং সে সম্পর্কে বাদ-প্রতিবাদের অবকাশ ঘটলে, সন্দেহ হচ্ছে, এমন কিছু মত ও তিক্ততার সৃষ্টি হবে—যা সাম্প্রদায়িকতার মতো স্পর্শাতুর ব্যাপারে আদৌ শোভন নয়। একজন আবার উর্দুর ভাষাগত জটিলতা ও লিপিগত কাঠিন্যের প্রশ্নও তুলেছেন—তাঁর সংগে আমি একমত নই—কিন্তু তা নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করতে হয় এবং সম্ভবত 'দেশ' পত্রিকা তার জায়গা নয়।

যে-সব প্রত্যক্ষদর্শী জানাচ্ছেন যে রাঁচীর দাঙ্গার জন্যে "উগ্র" হিন্দীপন্থীরা দায়ী নন, তাঁদের কাছে স্বীকার করছি যে আমি স্থানীয় সংবাদগুলোর ওপরেই অনেকটা ভিত্তি করেছি এবং 'এক ধরনের' (বলা অবশ্যই অহেতুক যে সমগ্র হিন্দী ভাষীরা নন) অত্যুৎসাহীদের মনোভাবও আমার চিন্তার ভেতরে ছিল। যদি এই ব্যাপারে হিন্দী ভাষীদের কোনো ভূমিকাই না থাকে, তা হলে তাঁদের দুঃখ দেওয়ার জন্যে আমি দুঃখিত এবং যে-সব সাম্প্রদায়িকতাবাদী আর দেশদ্রোহী এই কুৎসিত কাণ্ডের জন্যে দায়ী—আশা করব সরকার ও জনসাধারণ মিলিতভাবে তাদের মূলোচ্ছেদ করতে অগ্রসর হবেন। নমস্কারান্তে। —সুনন্দ

বেশ কিছুক্ষণ হ'ল আমার ঘুম ভেঙেগেছে এবং আমি এই সময়টুকু সমস্ত শরীর গুটিয়ে নিয়ে, অনেকটা তে-মাথা বুড়ীর মত, ঘুমের আমেজটাকে জিইয়ে রাখতে চাইছিলাম। আচার খাওয়ার পর জিভটাকে চকচক্ শব্দে নাড়াচাড়া করতে যেমনটি লাগে।

এখন এই সকালে মেঝেতে পাতা বিছানায় শুয়ে আমি সারা ঘরে ছড়ানো কাগজ, একটা মাটির ভাঁড়ে উপচে-পড়া সিগারেটের টুকরো ও আমার বালিশের পাশে গোড়ালি সাদা-হওয়া এক পাটি জুতো আবিষ্কার করে ঈষৎ বিরক্ত হলাম। এবার আমি উঠবো। রাত্রে নগ্ন হয়ে শোয়া স্বাস্থ্যপ্রদ মনে করায় এখন লেপের আড়ালে প্যান্টটা গলিয়ে নিয়ে থার্মোমিটারের মত টুথব্রাশ মুখে পুরে একতলায় নামবো। দরজা খোলার আগে আমার দশ ইঞ্চি এবং প্রায় অস্বচ্ছ আয়নায় মুখটা একবার বুলিয়ে চোখের শ্রী ফিরিয়ে নেব। কারণ, আমি জানি, এ সময় নীচের কলতলায় কয়েকটি মেয়ে ব্যস্ত থাকবেই। এ বাড়ীর বাসিন্দে মেয়েরা সুন্দরী কি। হলেও তাদের প্রতি কোন দুর্বলতা আমার নেই; তথাপি পিচুটি-চোখে কোন মহিলার মুখোমুখি হওয়া আমি 'ক্রাইম' মনে
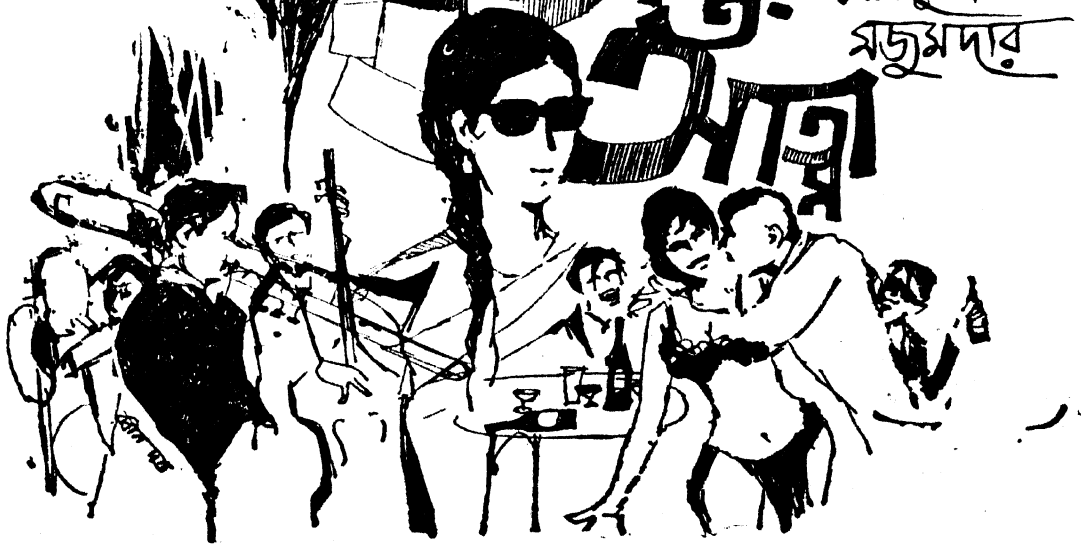
করি। কলতলায় নামলেই চাক ঘিরে থাকা মৌমাছির মত কল আঁকড়ে থাকা মেয়েগুলো আলগা হবে এবং ইত্যবসরে আমি সুড়ুত করে কর্মটি সেরে নিই। এই সময় নিয়মিত দুটি বাক্য শ্রবণ করি—'আজ বড় তাড়াতাড়ি উঠলেন যে!' অথবা, 'আজ অনেক বেলা হয়ে গেছে কিন্তু।' এক টুকরো প্রণামী হাসি চটকাতে চটকাতে যখন ওপরে উঠে আসি তখন তলপেটে ঈষৎ চাপ অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও কোন বাথরুম খালি না থাকায় আমাকে জামা গলিয়ে 'ভালো আছেন মাসীমা' গোছের মুখ করে পাড়ার চায়ের দোকানে ছুটতে হয়। আমার প্রাত্যহিক খরচের একটা বাজেট থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সেটি মেনে চললেও প্রায়শই তা অতিক্রম করে যাই। কারণ, যে-কোন সময় যে-কোন 'মহিলার সঙ্গে আলাপ' হলে ইত্যাদির জন্যে কিছু খরচ আমার হয়ই। আমি, একটি সরকারী অফিসে মাঝারী চাকরি করলেও কর্তৃপক্ষ আমার ইতিহাসে রাজনীতির গন্ধ খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত। যদিচ তাঁরা সন্দেহের কাঁটাকে লালন করতে বদ্ধপরিকর এবং আমি নিশ্চিত আনন্দে নিয়মিত মাইনে নিয়ে যাচ্ছি।

সম্পূর্ণ টিপটপ না হয়ে পথে বের হই না আমি। মাথার টেরি থেকে জুতোর টো আমার ঝকঝকে থাকবেই। ঘণ্টাখানেকের ব্যবধানে সিগারেট কেনার সময় পানের দোকানের আয়নায় কোদাল চালানোর মত চুলে কয়েকটা কোপ মারি চিরুনি দিয়ে। দ্বিতীয়টির জন্য আমাকে ট্রাম-বাসে উঠতে হয়। কারণ, প্রকাশ্যে পকেটের রুমালে জুতোর টো মোছা—সে একটা বিশ্রী ব্যাপার। ট্রামে উঠে ইচ্ছে করে রুমালটাকে পায়ের কাছে ফেলে দিই। এবং সেটাকে ওঠাবার ভঙ্গী করে নিপুণ হাতে টো পালিশ করে নিই। রুমালটির দুটো ভাজ আছে। একটিতে মুখ মুছি, অন্যটিতে জুতো।

যেদিন প্রথম ডিপার্টমেণ্টে ঢুকেছিলাম সেদিন খুব গম্ভীর হয়ে কথা বলেছিলাম। কারণ, জেনেছিলাম যে, আমার অফিসাররাও আমার ডিগ্রীর কাছাকাছি যান নি। বস্তুত 'এম এ পাস' শব্দ দুটো কাগজ পাকিয়ে কানে সুড়সুড়ি নেবার মত আমার কাছে আরামদায়ক ছিল। আমার পাশের সহকর্মী আমার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিল আমার ডিগ্রীর খবর পেয়ে। 'দাদা এখানে আর ক-দিন থাকবেন!' ইত্যাদি স্তুতি সে করেছে প্রচুর। কিন্তু যেদিন শুনলো আমার এম-এ'র সাবজেক্ট কি ছিল সেদিন থেকেই লোকটা ইয়ার-দোস্তের মত 'আবে শালা' বলতে শুরু করলো। আমার খুব সন্দেহ, লোকটা কলেজেই ঢোকে নি। ফলত, এখন আমি নিজেকে গ্র্যাজুয়েট বলি পরিচয়-প্রসঙ্গে। বাংলায় এম-এ বলা মানে দেশী আয়নায় নিজের তিনরকম মুখ দেখা এ সত্য জেনেছি মজ্জায় মজ্জায়।

অত্যন্ত দ্রুত আমি স্নান সেরে নিই। কারণ, এই বারোয়ারী স্নানঘরটা যেমন অন্ধকার তেমনি নোংরা। মেয়েদের মাথার চুল থেকে সাবানের ফেনা সর্বদা জলে ভাসে। বেশীক্ষণ গায়ে জল না ঢাললে আরশুলার আদর খেতে হবে সর্বাঙ্গে। এই গা ঘিনঘিন ভাবটা এড়াবার জন্য আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে স্নান শুরু করি। শুকনো গামছা দিয়ে ধরে মাঝে মাঝে

কয়েকটা টান দিয়ে নিই। অনেকটা ট্রলি গাড়ির বেগ কমে এলে পেছন থেকে ঠেলার মতন।

সকাল বেলায়ই আমি খুব অসহায় বোধ করি। কারণ, এখন কোন বন্ধুকে পাওয়া যাবে না। যে যার বস্-এর কাছে বশংবদ। তবু চৌরাস্তায় এসে একটা সিগারেট ধরালাম প্রাত্যহিক অভ্যাসে। এখন মেয়েদের স্কুল ছুটি হয়েছে। বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বত্রিশ দাঁতে পান চিবুনোর মত ডাঁটো মেয়েগুলোকে দেখি। কতক মুখ আমার চেনা হয়ে গেছে। এবং এক সময় হঠাৎই বাসে প্রচণ্ড ভিড় লক্ষ্য করে উদ্বুদ্ধ [illegible] হয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। মেয়েদের পেছনে হাঁটার উত্তাপ সর্বাঙ্গে নিয়ে আমি এক বন্ধুর দোকানে ঢুকে পড়লাম। সুহৃদের [illegible] [illegible]। ওর [illegible] [illegible] এটা। রেডিও [illegible] [illegible] [illegible] নামেন। এ সবই সুহৃদ সম্ভব। উনিশশো পাড়ায় একদা ঘোরাঘুরি করেছিল, বাবার হুকুমে সেটা স্থগিত থাকলেও বর্তমানে নবনাট্য করছে। নাটক মঞ্চস্থ হবে কিনা ঠিক নেই, কিন্তু রিহার্সাল নিয়ে চলেছে। ফলতঃ সদস্যরা অনিয়মিত হচ্ছে নিয়মিত। আমাকে দেখেই সুহৃদ ওদের কানা দারোয়ানটাকে এক ভাঁড় চায়ের হুকুম দিয়েই পাশ থেকে এক দিস্তে কাগজ টেনে আনলো। 'দ্যাখ্ অনিমেষ, একটায় যা ট্রিটমেন্ট করেছি না—অনেকটা পিকচারা-ইজড্। জানিস্ [illegible] [illegible] [illegible] আছে নাটকেও [illegible] আনাকি। আই অ্যাম দ্য ফার্স্ট ম্যান, ফার্স্ট [illegible] [illegible]—'

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হাই তুলে বললাম, 'ওটা গর্ডন ক্রেগ করেছে।' চোয়াল ঝুলিয়ে হতাশ গলায় সুহৃদ বললো 'গর্ডন করেছে!' যেন গর্ডন আমাদেরই আর এক বন্ধু। ওর হাতটো যেভাবে মুঠো হলো তাতে গর্ডন ক্রেগ সামনে থাকলে একটা কিছু হয়ে যেত। তাড়াতাড়ি সামলে নিলাম—'রবার্ট লুইস তো সেইরকমই লিখেছেন। বৃথাই সুহৃদ, এই নাটক কাউকে দিয়ে [illegible] হবে না। তার চেয়ে ফিল্মের দিকে—' আসলে সুহৃদকে বধ করতে হলে এইসব নাম [illegible] হবে এটা আমি জানতাম। এসব নিয়ে ও পড়াশুনো করে তা আমি জানি। নাম দুটো আমার মুখে শোনার পর ও একটা ফিল্টার টিপ্ বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'নাঃ ডকুমেন্টারী করবো। হাতের দুয়ের মামলা তো। ষোলো মিনিটে ট্যালেন্ট দেখিয়ে দেব। বিন্দুতে সিন্ধু।'

'ডকুমেন্টারির চেয়ে ফিচার ফিল্ম বেটার। তবে নেহাতই যদি করিস তবে ইন্দিরা গান্ধীর ওপর কর। 'প্রিয়দর্শিনী' নাম দে। গভর্নমেণ্ট কিনে নেবে।'

এবং আমরা এই সব কথাবার্তা বলে গেলাম বারোটা অবধি। এবং গত দু বছরের মত আমাদের আলোচনার কোন সিদ্ধান্ত হবে না। আমরা যখন কথা বলি, সুহৃদ ও আমি একটা ছবি করবো, সিরিয়স হয়েই বলি। সেই মুহূর্তে আমরা কেউ স্মরণে আনি না যে, নাটকের জন্য একজন অভিনেত্রী পঞ্চাশ টাকা পারিশ্রমিক চেয়েছিলেন এবং তা সাধ্যাতীত ছিল বলে আমরা রিহার্সাল বন্ধ রেখেছি। এই সময় চলচ্চিত্রের যাবতীয় খুঁটিনাটি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। একসময় আমি উঠে পড়লাম। আমি ও সুহৃদ কেউই আলোচনার সিদ্ধান্ত নিয়ে মাথা ঘামালাম না।

এই সময় আমি দ্বিপ্রাহরিক আহার গ্রহণ করি। এ ব্যাপারে সাধারণত পাঞ্জাবী [illegible] আমার পছন্দ। কারণ বাঙালী [illegible] [illegible] অপরিচ্ছন্নতা এবং ভাত [illegible] [illegible] ডাল দু আনা ইত্যাদি দ্রুত নামতার মত কানের কাছে চেঁচানো হয় বলে আহার গ্রহণে বিঘ্ন ঘটে।

এসব ব্যাপারের বাইরে আমি নিভৃতে পকেটের সঙ্গে বোঝাপড়া করি। অল্প পয়সায় রুটি সহযোগে তড়কা অত্যন্ত উপাদেয়—পাঞ্জাবী হোটেলে ঢোকার পেছনে এ আমার অন্যতম যুক্তি। বস্তুত পেঁয়াজ ও লেবুর রস সহযোগে তড়কা খেতে খেতে আমি মাংসের আঘ্রাণ পাই। অবশ্যই স্বীকার করবো দিনের মধ্যে দু'বার, খাবার সময়, বহু যোজন দূরে অবস্থানকারী আমার পিতামাতার মুখ স্মরণ হয়। অন্যথায় আমি নিজেকে ভালবাসি বা 'আত্মকেন্দ্রিক' এই বিশেষণ অস্বীকার করি না। তা ছাড়া বিচিত্র হিন্দী ভাষা শেখার অন্যতম জায়গা পাঞ্জাবী হোটেল এবং স্বীকারে লজ্জা নেই, আমি শিক্ষানবিস।

বেশ একটা পরিতৃপ্তির ঢোঁকুর তুলে আমি ট্রামে উঠলাম। সাধারণত, যেসব ট্রামের পেছন দিকে দরজা থাকে সেগুলো আমি পরিহার করি। স্বচ্ছন্দ হয়ে থাকা যায় না। বরং পেট-কাটা ট্রামের দরজায় দাঁড়ানো বেশ আরামদায়ক। জয়ন্ত, আমার এক বিরাটকায় বন্ধু পেশ করেছিল, প্রথমটি পুরুষ ও দ্বিতীয়টি স্ত্রী ট্রাম। এবং আমার পক্ষে স্ত্রীজাতির প্রতি অনুরাগ দেখানো স্বাভাবিক। ট্রামে উঠেই আমার চোখ উজ্জ্বল হল। মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে রাস্তায় নজর দিতেই দ্বিধামুক্ত হলাম। যদিও ওর চোখে কালো চশমা, কিন্তু ফাঁপানো চুল আর খাটো ব্লাউজের সঙ্গে সাদা ঝোলানো ব্যাগটা আমি দেখতে পেয়েছিলাম। এই মেয়েটির সঙ্গে আমি কখনো কথা বলি নি, কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমি একলা নই। ক্রমশ স্থির করে ফেললাম আজ আলাপ করবোই। এবং কিভাবে কথা বলবো তার একটা ফরমুলা আমার আছে। যেমন মেয়েটির সামনে গিয়েই একটু অবাক ও চিন্তিত চোখে বলবো, 'মাফ করবেন, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে —কোথায় থাকেন বলুন তো?' সাধারণত এই প্রশ্নের উত্তরে যে-কোন মেয়েই বলবে, 'কেন, আপনার কি দরকার?' তখন কাঁধ দুটো বেশ প্রশস্ত করে ঈষৎ লজ্জা ও বিব্রত ভঙ্গীতে বলতে হবে, 'না, তেমন কিছু নয়, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি খুব চেনা। অবশ্য মানুষেরই ভুল হয়।' এর পরে চোখ রাখতে হবে মেয়েটির চোখে। প্রশ্রয়ের আভাস পেলে ভরা পালে কথার নৌকো ছুটবে। নইলে কেতাদুরস্ত ইংরেজী ভদ্রতা।

নিউ সিনেমার সামনে মেয়েটি নামতেই আমি ট্রাম ছেড়ে দিলাম। ঠিক এই মুহূর্তে আমার একটা আশংকা ছিল—হয়তো এর কোন ব্যক্তিগত বন্ধু অপেক্ষা করছে কোথাও। মেয়েটি মার্কেটের রাস্তায় এগোতে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম সহসা। তাড়াতে মেয়েটিকে ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে নির্জনতম একটা জায়গায় দাঁড়ালাম। মেয়েটি অন্যমনে হাঁটছে। হাঁটবার সময় ঊর্ধ্বাঙ্গের ও নিম্নাঙ্গের আন্দোলন আমার শিরায় শিরায় রোমাঞ্চ জাগাচ্ছিল। কাছাকাছি হতেই এগিয়ে গেলাম, মাথাটা বেঁকিয়ে ঈষৎ অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে (সম্প্রতি কোন ছবিতে নায়ককে এভাবে হাঁটতে দেখেছিলাম)। হঠাৎই সব এলোমেলো হয়ে গেল এবং আমি সব ফরমুলা ভুলে দু হাত জোড় করে ঈষৎ হেসে বললাম, 'নমস্কার, আপনাকে আমি অনেকবার দেখেছি, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

মেয়েটি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো এবং দীর্ঘ নরম ঘাড় বেঁকিয়ে আমাকে দেখলো। তারপর আলতো করে উচ্চারণ, 'কেন বলুন তো?'

এ প্রশ্নটাই মারাত্মক। আমি চোখ বুজে পরক্ষণেই হেসে ছোট্ট শ্রাগ করে বললাম, 'আলাপ করতে ইচ্ছে হলো খুব।'

'কি হবে আলাপ করে?' মেয়েটির দৃষ্টি আমাকে মাপছে। আমি বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে বললাম, 'জানি না, তবে এক একটা ইচ্ছেকে চেপে রাখা যায় না তাই।'

'ও!'

'আমি নিখিল রায়। কাস্টমসে আছি।' এখান থেকেই আমি আমার ফরমুলায় এসে গেলাম। কখনোই আসল নাম ও অফিস আমি কাউকে বলি না। 'আপনি তো এদিকেই যাবেন?'

মেয়েটি হাসলো, 'হ্যাঁ।' আমরা এগুলাম। কথা নেই কিছু। অস্বস্তি হচ্ছে। মেয়েটির পরিচিত কেউ এসে পড়লে অপ্রীতিকর হবে। গলায় কৌতুক নিয়ে বললাম, 'কারো সঙ্গে অ্যাপয়ন্টমেণ্ট আছে বুঝি?'

'আছে। টেলারের সঙ্গে। আমার কয়েকটা জামা ফিট করতে দিয়েছি, আজ ট্রায়াল ডেট্।'

এর পর আমরা কথা বললাম। যে-কেউ এ মুহূর্তে আমাদের অন্তরঙ্গ ভাববে। অফ্ ডিউটিতে সিনেমা দেখার উদ্দেশ্যে এ পাড়ায় আমার আগমন—জানালাম। আসলে মেয়েটি সিনেমায় আসুক এ আমি চাইছিলাম।

'এই যে আমার শপ্।' মেয়েটি বাঁ চোখে আমাকে দেখলো। তাড়াতাড়ি জোড়া

দিলাম, 'আমি কি অপেক্ষা করবো?' ভেতরে ঢোকার আগে মেয়েটি বললো, 'আচ্ছা।'

এটি একটি ফরাসী দর্জীর দোকান। বিরাট বিরাট গাড়িতে বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা আসছে অনবরত। তাদের ব্লাউজের চেহারা দেখে আবার জয়ন্তকে মনে পড়লো। মার্কেট ঘুরতে ঘুরতে একদিন ক্রিসমাসে জয়ন্ত বলেছিলো: 'বালিশের ঢাকনা, লেপের ওয়াড় যেমন আছে, তেমনি এই ব্লাউজগুলো দেহের ঢাকনা। মাপে মাপে তৈরী।'

তিনটে সিগারেট শেষ হলে মেয়েটি বেরুলো। পাশাপাশি কয়েক পা হেঁটে সমস্যায় পড়া গেছে, এমন ভঙ্গিতে বললাম, 'অথ গন্তব্য কোথায়?'

মণিবন্ধে বাঁধা ছোট্ট বড় ঘড়িটা দেখলো সে। 'আমাকে তিনটের মধ্যে বাড়ি ফিরতেই হবে।' অর্থাৎ এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আমি পাবো। কৃতার্থ ভঙ্গিতে বলি, 'ওঃ, অনেক দেরি আছে। চলুন কোথাও জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাক।' 'জমিয়ে আড্ডা' শব্দ দুটো আমি ইচ্ছে করেই বললাম। কারণ এতে আমার সরলতা ও নির্লোভিতা প্রকাশ পাবে। তা ছাড়া মেয়েটি যদি কলেজ-য়ুনিভার্সিটির ছাত্রী হয়, তা হলে আমার মেজাজের সঙ্গে একটা সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে খুশী হবে। কফি-হাউসে অনেক মেয়েকে শব্দ দুটো ব্যবহার করতে শুনেছি।

'কোথায় আড্ডা দেবেন, এ রোদ্দুরে?' আকাশ দেখলো সে।

'চলুন কোথাও বসা যাক।' আমি নরম হলাম। ক্রমশ আমি একটা বার রেস্তোরাঁর নাম বলে গেলাম এবং সে নাকচ করে গেল। হয় তার কোন আত্মীয় নিয়মিত সেখানে আসেন অথবা সে পরিচিত। শেষ পর্যন্ত যে দোকানে আমরা প্রবেশ করলাম সেটি সাহেবপাড়ায় অবস্থিত নয় এবং আমার দীর্ঘকালের বাসনায় ছিল। সেই স্বল্পালোক শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অভিজাত কক্ষের কোনায় সোফায় বসে মেনু হাতড়ে হাতড়ে যে পানীয়ের হুকুম দিলাম তার বিনিময়ে আমার চার বেলার মিল খাওয়া হয়ে যেত। 'বেশী কিছু খেতে পারবো না, এই মাত্র লাঞ্চ সেরেছি আমি, আপনি?' বলার সময় তড়কার ঢেঁকুর উঠলো যেন। আমি জানতাম, যে-কোন মেয়েরই একবার অর্ডার দেওয়া হয়ে গেলে মুখ ফুটে অন্য খাবার চাইবে না। এবং এই সময় মনে মনে এই বাড়তি খরচটুকু আগামী সাত দিনের বাজেট থেকে কিভাবে পুষিয়ে নেব তার একটা খসড়া করে নিলাম অতি দ্রুত।

এখন পর্যন্ত মেয়েটির নাম আমি জানতে চাইনি; কারণ, আমি চাইছিলাম, মেয়েটি বুঝুক, আমি ঠিক লাইনের ছেলে নই। 'লাইন' বলতে আমি লোভী, কামুক এবং ইতর কিছু মানুষ যে পথগুলিতে আনাগোনা করে, সেই পথগুলির কথা বলছি। এ ছাড়া আরও একটা কারণ এই যে, আমি মেয়েটির বিরাট চ্যাপটা সাদা চামড়ার ঝোলানো ব্যাগটার গায়ের খোপে গোঁজা সাদা কাগজে লেটারিং করা নাম, 'দময়ন্তী গুপ্ত, বি এ (অনার্স)' দেখতে পেয়েছিলাম। এবং এই বিশ্ব-চরাচরে প্রথম কোন স্ত্রীলোককে হাত-ব্যাগের শরীরে নিজের নাম ও ডিগ্রীর খবর লিখতে দেখে পুলকিত হলাম।

সোফায় মাথা এলিয়ে মেয়েটি বসেছিল। আমি ওর স্ফীত উর্ধাংশে ইচ্ছে করেই চোখ রাখছিলাম না। কারণ, আমি জানি, মেয়েরা এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন এবং আমাকে এ ব্যাপারে উদাসীন দেখলে সে ক্রমশ আমার ওপর আস্থাশীল হবে।

'রেস্টুরেন্টটা খুব ডেকোরেটিভ।' মেয়েটি দেয়াল দেখছিলো।

'সাহেবপাড়ার সঙ্গে আমাদের উত্তর কলকাতার পার্থক্য এখানেই।' সুন্দর করে বললাম আমি। দুটো ভ্রু এক করে মেয়েটি বললো 'আপনি নর্থে থাকেন?'

'শ্যামবাজারে।'

'আচ্ছা—!' এমন আলতো স্বরে শব্দটা সে উচ্চারণ করলো যে, ওর ঠোঁট একটুও কাঁপলো না, 'আমি বিডন স্ট্রীটে।'

'তা হলে বেথুনে পড়েছেন?' আমরা ক্রমশ সিঁড়িভাঙ্গা অঙ্কের মত ধাপে ধাপে নামছিলাম। আমি খুব কাছাকাছি বসে আইসক্রীম খেতে খেতে মেয়েটি সম্পর্কে

ওয়াকিবহাল হলাম। আমার অনেক কিছু শখ হচ্ছিলো কিন্তু আমি কোন উৎসাহ দেখাচ্ছিলাম না। হঠাৎই লক্ষ করলাম আমাদের বিপরীত কোণে দুটি মারোয়াড়ী ছেলে মেয়েটি সম্পর্কে আলোচনা করছে বিশ্রী ভঙ্গীতে। আমি উত্তেজিত হলাম। মাথা নীচু করে মেয়েটির কানের কাছে মৃদু স্বরে বললাম, 'ঐ কোণের ছোকরা-গুলোকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।' স্প্রীং-এর মত মাথা ঘুরিয়ে কোণের দিকে তাকালো মেয়েটি। তারপর সমস্ত মুখের পেশী শিথিল করে লাফিয়ে উঠলো, 'হ্যালো ম্যান! হা ডু য়ু ডু?' লাট্টুর মত শরীর ঘুরিয়ে মারোয়াড়ী-টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল সে। কয়েক মুহূর্ত নির্বিকার ভূমা দর্শন করলাম। বিলটা পে করতেই বাঁ চোখে ঝাঁকুনি দিয়ে মেয়েটি ডাকলো, ওকে চেনেন না? ওমপ্রকাশ—টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ন! উঃ, কদ্দিন পরে তোমার সাইট্ পেলাম প্রকাশ!' ওরা আমাকে লক্ষ করছিলো না। পায়ে পায়ে কখন দরজার কাছাকাছি চলে এসে গেছি নিজেই টের পাই নি। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষের বাইরে এসে এক ঝলক আগুনের তাপ নিলাম সর্বাঙ্গে। সেয়ানে সেয়ানে পাঞ্জা কষে পরাজিত সম্রাটের মত প্রচণ্ড রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে মনে হল, লক্ষ লক্ষ সিসিফাস তো জন্মাচ্ছে তবু সূর্যের তেজ একটুও কমছে না। শালা!

কয়েক শো টাকার বাজী হেরে যাওয়ার মত মেজাজ নিয়ে হাঁটছিলাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলা দরকার। যদিও শেষ দিন কথা বলার সময় আমি ভেবেছিলাম আর আসবো না। ইনি বাংলা দেশের তথাকথিত সম্মানিত ও পদস্থ ব্যক্তি। এঁকে দেখে আমার মিশরের প্রাচীন রাজা ফারাওদের চেহারা মনে পড়ে। আমার কর্তৃপক্ষ যে রাজনীতির গন্ধ আমার চরিত্রে পেয়েছেন বলে শুনেছি তার সঙ্গে চৌদ্দপুরুষের আমার সম্পর্ক ছিল না। অতএব এই মিথ্যে অভিযোগকে মিথ্যে প্রমাণ করতে আমাকে লাট্টুর মত ঘুরতে হচ্ছে। আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি সৎ। শ্রীরামচন্দ্রকে যদি বলা যায়—'ওহে বাপু, তুমি প্রমাণ করো তো দেখি দশরথ তোমার বাপ ছিলো?' [illegible] ভদ্রলোকের সমস্যা নিশ্চয়ই আমার চাইতে কোনোও কম হতো না। [illegible] এই [illegible] আমাকে তার সামনে রোজ দাঁড়াতে হচ্ছে সমানে।

লালদিঘির কাছাকাছি আসতেই [illegible]

[illegible]

বদলের চাপে চতুর্দিক ঝাপছে কিনা!

'কোথায় চললো?' মল্লিকদা [illegible] চেঁচিয়েছেন, 'চলো! দাদার বাড়ী এসেছে দার্জিলিং থেকে। [illegible]'

'না মল্লিকদা, একটু ব্যস্ত এখন।' বিব্রত আমি।

'অল রাইট। রাত সাড়ে নটায় কফি হাউসে এসো।' এক মুহূর্ত আর অপব্যয় করলেন না মল্লিকদা। ট্যাক্সির জন্য হাত তুলে ছুটলেন রাস্তার ওধারে।

সিংহদুয়ারে অনেক কথা খরচ করে অনুমতি যদিও মিললো ভিতরে যাবার, মধ্যদুয়ার একগ্রন্থ অদারীকতে কঠোর হলো। ক্রমশ যখন সেই আকাঙ্ক্ষিত দেবতাটির সামনে এসে দাঁড়ালাম ঠিক তখনই লাল আলো জ্বলে উঠলো।

শুনেছিলাম, এই মাত্র একজন বিখ্যাত মহিলা অন্তর্বর্তী হয়েছেন। তাকিয়ে দেখলাম অপেক্ষা করার ছোট্ট ঘরে তিনজন পুরুষ ও জন ছয়েক মহিলা কাগজ পড়ছেন। একটি অজস্র ছাপার ভুল ও কালি চুপসানো খবরের কাগজ টেনে নিয়ে সোফায় বসতেই কানে সুড়সুড়ি দেবার মত আরামদায়ক কিছু সংলাপ ভেসে এলো, 'আমি সাধারণত স্লিভলেস পরি না, তবে যেখানে যেমন— শুনেছি ইনি অত্যন্ত আপ-টু-ডেট।' সংগে সংগে সোডার বোতল খোলার মত শব্দ হলো, 'ইয়ং ম্যান অব সেভেনটি। আমাকে এখনও 'এসো খুকী' বলেন। ও'র একটা লাইসেন্স আজ দেবেন বলেছেন। আফটার অল্ ত্রিশ বছরের সম্পর্ক।' মুহূর্তে আমার মনে হলো, আমি দেবদর্শনে এসেছি এবং অপ্সরাবৃন্দের কাকলি শুনছি।

অনেক অপেক্ষার শেষে মুখোমুখী হলাম। দু'পা টেবিলের নীচে চালান করে স্ফীত ভুঁড়ি নামী সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবিতে ঢেকে শ্রীফারুকে বসে আছেন। ভদ্রলোকের গায়ের চামড়া অসম্ভব রকমের ফরসা। পেছনের দেওয়ালের সর্বাংগ জুড়ে জাতির জনকের পার্শ্বমূর্তীয় ছবি আছে। নীল পর্দা দিয়ে ঘরের একটা দিক ঘেরা। ওখানে ইনি বিশ্রাম করেন। একটা টাইপ-করা চিঠি হাতে নিয়ে চশমার ফাঁকে তাকালেন তিনি, 'চাকরিটা এখনও আছে?'

গলায় আমার এতো কফ্ ছিল জানতাম না। কোনমতে বললাম, 'হ্যাঁ, তবে ওয়ার্নিং দিয়েছে। আমাকে স্যর আপনি বাঁচান। আমি কোনদিন রাজনীতি করি নি। স্যর এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে অভিযোগ। আমার ঠাকুরদাকে তো আপনি চেনেন। মনে সেই লিয়াকত আলির আমলে, যখন উত্তর বাংলার সাঁওতাল শ্রমিকদের উনি যখন মুসলমান বলে প্রচার করছিলেন তখন আপনাকে আমার ঠাকুরদা ঐ ব্যাপারের বিরুদ্ধে অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করে-ছিলেন। আমরা কেউ রাজনীতি করি নি স্যর।'

আমার কথায় কোন আঁচড় পড়লো না মেদগঠিত শ্রীফারুকের মুখে। বাঁ হাত বাড়িয়ে টেলিফোন তুলে অপারেটারকে বললেন হোম ডিপার্টমেণ্টকে লাইনটা দিতে। আমার শিরদাঁড়ায় একটা আনন্দ ছটফট করছিল। এমন সময় এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে টেবিল থেকে কয়েকটা কাগজ তুলে আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন। নাকটা কুঁচকে শ্রীফারুকে বললেন, 'এর কেসটা নিয়ে একটা কিছু করার জন্য হোম ডিপার্টমেণ্টে ফোন করছি। কি বলো?'

'কি কেস স্যর?'

'রাজনীতি করেছে বলে চাকরি যাচ্ছে। আমার ডিস্ট্রিক্টের ছেলে।'

'সে কি স্যর! আপনি ডিপার্টমেণ্টে ফোন

ফোন করবেন? আপনার একটা স্ট্যাটাস আছে তো! আপনি বরং এর কাছ থেকে একটা দরখাস্ত নিয়ে হোম মিনিস্টারকে ফরোয়ার্ড করে দিতে পারেন।'

সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতটা রিসিভার তুলে আনলো এবং শ্রীফারুক অপারেটারকে জানিয়ে দিলেন হোম ডিপার্টমেন্টকে দরকার নেই। তারপর টেবিলে রাখা প্রতীক্ষিতদের ভিজিটিং কার্ডগুলো তুলে নিয়ে বাছতে বাছতে বললেন, 'তা হলে একটা দরখাস্ত লিখে দিয়ে যেও। আমি ফরোয়ার্ড করে দেব। আচ্ছা—।' ভদ্রলোকের ঘাড় নাড়ার পর আমার দাঁড়িয়ে থাকার পেছনে যুক্তি নেই। কিন্তু আমার হঠাৎ ইচ্ছে করলো ভদ্রলোককে প্রণাম করতে। ছেলেবেলায় প্রথম ঠাকুর বিসর্জন দেখে গুরুজনদের প্রণাম করার জন্যে যেমন একটা ইচ্ছের আবেগ বুকে ছটফট করতো ঠিক তেমনি। বিরাট চন্দ্রাকার টেবিলের তলায় পা দুটো খুঁজতে লাগলাম ব্যাকুল দৃষ্টিতে। শ্রীফারুক তাকাতেই বলে ফেললাম গাঢ় স্বরে, 'আপনাকে স্যার প্রণাম করবো।'

'ঠিক আছে, যান।' পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোক ভেটকি মাছের মত মুখ করে আমার ইচ্ছেটাকে চুরমার করে দিলেন। পায়ে পায়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আঃ। কি হালকা লাগছে নিজেকে। বিরাট ঐতিহাসিক বারান্দা, চওড়া কাঠের সিঁড়ি, প্রেস রিপোর্টার, পুলিস ইত্যাদিকে আদৌ লক্ষ না করে আমি জুতোর টোতে হাঁটতে হাঁটতে কয়েকটা শিস দিয়ে নিলাম। আপাতত পৃথিবীতে কোন সমস্যা নেই।

বাইরে প্রচুর আলো। দুপুর গড়িয়ে চলেছে। ডালহৌসির ছুটি হতে বেশী দেরি নেই। গর্ভবতী মেয়ের নবম প্রহরের অস্বস্তি-ভাব চারদিকে। এবার আমার সময় রুটিনে বাঁধা। ট্রামে ঝুলে সোজা চলে এলাম কলেজ স্ট্রীট বাজারের সেই বই-এর দোকানে। সুবোধদা এবং পঁচিশ থেকে পঞ্চান্ন কয়েকজন নানাবয়সী মানুষ রোজ দোকানটার পেছন দিকে জমা হই। দু ঘণ্টা ধরে টানা সাহিত্য চলে। আমি কনিষ্ঠতম। কথা বলার অধিকার তাই কম। সুবোধদাই বলেন। বিখ্যাত এক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত উনি, বাকী সবাই এপাশে ওপাশে লেখেন।

আমাকে দেখেই সুবোধদা চোখ বন্ধ করে কিছু ভেবে নিয়েই আকর্ণ হেসে মাথা দোলালেন, 'তোমার গল্পটা পড়লাম। সেন্টেন্স কন্সট্রাকসনে নজর দাও। কথা বলা আর লেখা এক জিনিস নয়।'

এসব কথায় আমি খুব বিব্রত বোধ করি। এবং সব চেয়ে বাঁচোয়া যে, কোন বিষয়ের আলোচনা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এখানে সুবোধদাই সমালোচক, আমরা তাঁর কথায় ডিটো দিই। আসলে আমাদের মধ্যে একটা রেষারেষি আছে সুবোধদার করুণা পাবার। সেই বিখ্যাত কাগজে লেখা ছাপাবার রাস্তাটা আয়াসসাধ্য। সুবোধদার করুণা-প্রাপ্তির লোভ আমাদের আছে।

সন্ধ্যে ঘন হবার পর বেরিয়ে পড়লাম। এত মানুষের চলাফেরা, এই ভিড় দেখে আমার ক্রমশ বিরক্তি বাড়ছিলো। এখন আমি এক জায়গায় ফোন করতে পারি। আমার সমস্ত পাপ ও পাপহীনতার একমাত্র শরিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি।

'আমি বলছি।'

'কলেজ স্ট্রীট থেকে করছো?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন আছ?'

'ভালো।'

'ডান হাতের ব্যথাটা সেরে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'ক'টা সিগারেট খেয়েছ?'

'জানি না।'

'তুমি আমার কথা একটুও শোন না। কিছু বলছো না যে!'

'কি বলবো?'

'বেশী সিগারেট খাবে না, বেশী ঘুরবে না; কেমন?'

'আচ্ছা।'

'কাল ফোন করবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'পরশু?'

'হ্যাঁ।'

'আমার জন্যে তোমাকে—'

'রাখছি।'

'কাল করবে তো?'

হ্যাঁ।'

একটা কৌপালেনার শব্দ কানে আসতে না আসতেই রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। ঠিক এই ক'টি মুহূর্তে, সারাদিনের এই সময়-টুকু আমি সৎ, আমার বুকের ভেতর কোন ছলনা নেই, করমূলো নেই। আসলে মুখোশের তলার দগদগে ঘা ভরা মুখে ওষুধ লাগাবার সময় এটা। প্রতিদিনের ফোনের সময়—আমার শান্তির সময়। একটা বাইশ বছরের যৌবন ওদিকে সর্বাঙ্গ শুকিয়ে বিছানায় লেপ্টে আছে, থাকবে সারা জীবন। শুধু দুটো হাত আর মুখ ছাড়া সর্বাঙ্গ নিথর। ক্রমশ হয়তো ফুরিয়ে যাবে সেটুকু, আর কোন হাত প্রতিদিন হয়তো অপেক্ষা করবে না রিসিভারটা তুলে নিতে এবং আমি গির্জার স্বীকারোক্তির পরের তৃপ্তির স্বাদ আর পাবো না। আমার ভালবাসা, আমার কান্না, আমার শান্তি—এই সময়টুকুতে—কয়েকটি সংলাপের উদ্যানে।

দরজা ঠেলতেই মনে হলো আমি নরকে এলাম। বিরাট হল-ঘরে অগুনতি টেবিল ঘিরে অসংখ্য নারীপুরুষ, মদের গ্লাস, সিগারেটের ধোঁয়া আর চিৎকারের মধ্যে পথ করে সেই ব্যালকনিতে উঠেই মল্লিকদাকে দেখতে পেলাম। সর্বাঙ্গ চেয়ারে এলিয়ে বসে রয়েছেন। টেবিলে গ্লাসের তলায় চাপা দেওয়া বিলের সংখ্যায় বুঝতে পারলাম বেশ কয়েক পেগ হয়ে গেছে। জায়গাটা বেশ নির্জন। যদিও নীচের মেয়েদের অশ্লীল হাসি আর তাদের শরীর জড়িয়ে ধরে মাতাল পুরুষদের চীৎকার এখানে আসে, সেসব দৃশ্যও স্পষ্ট দেখা যায় এখান থেকে কিন্তু ওপরে ওদের ভিড় কম।

'এতো দেরি হলো যে।' মল্লিকদার গলার স্বর বেশ জড়ানো। উত্তরে শুধু হাসলাম। 'লক্ষ্য রাখো তো, ঐ নীচের কোনার থামটার পাশে নিগ্রোটার সঙ্গে বসেছে ডরোথী। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি খাচ্ছে ও? রাম, না হুইস্কী?'

এখান থেকে সাদা চোখেই বোঝা মুশকিল। তবু গ্লাসের আয়তনে বোঝা গেল বিয়ার। শুনেই মল্লিকদা লাল ছোপ ধরা দাঁতে হাসলেন, 'গুড্। জানো, ডরোথী খুব ভাল মেয়ে। ওর বাবা বললেন, ও নাকি স্কুলে ফার্স্ট হতো। কি খাবে?'

'আজ থাক।'

'না, কিছু বলি। কেন খাবে না?'

'এমনি।'

মল্লিকদা একবার ভাল করে দেখার চেষ্টা করে একটু হাসলেন। 'গুড্। জানো, তোমার বউদিকে আজ দেখে বুঝলাম দ্যাট ম্যান ইজ গোয়িং স্ট্রং।'

'মানে?'

'শী ইজ এক্সপেক্টিং হার থার্ড ইস্যু।'

বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না। মল্লিকদা গ্লাসটা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন, 'লেটস্ গো। ব—য়!'

মল্লিকদার পেছন পেছন নীচে নামছিলাম। সিঁড়ির মুখটায় প্রচণ্ড হইচই হচ্ছে। একটি ছাইমাথা মাগুরমাছের মত মেয়ে দুই যুবকের মধ্যে একটি টইটম্বুর পেগ গ্লাস নিয়ে মাথাটি পেছনে অনেকটা বেঁকিয়ে দ্রুত তালে নাচছে। ওর সামনে একটি অ্যাংলো টেকো, প্রচণ্ড মোটা, বুড়ো ছুঁচোর মত মুখ করে গ্লাস থেকে চুমুক দেবার চেষ্টা করছে সমস্ত শরীর দুলিয়ে। কয়েকটা অ্যাংলো ছোকরা রক্ত গরম করা সুর বাজাচ্ছে উৎসাহ দিতে। ভিড়ের মধ্যে একটু দাঁড়াতেই দেখলাম টেকো ঠোঁট দিয়ে গ্লাসটা তুলে নিয়েছে এবং মেয়েটিকে একটা লম্বা গ্লাস ভর্তি বিয়ার এক ছুটে এনে দিলো। সবাই চিৎকার করল আনন্দে। মেয়েটি বিয়ার দেখে কান-ফাটানো খিস্তি করলো বুড়োটার উদ্দেশে। আমরা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম। হঠাৎই মেয়েটি খিস্তি থামিয়ে গ্লাস-ভর্তি বিয়ার ছুঁড়ে দিলো আমার শরীরে। এবং দোলের দিনের শিশুসুলভ চাপল্যে হাততালি দিতে লাগলো দাঁত বের করে। আচমকা সমস্ত শরীর বিয়ারে ভিজে যেতে আমি চিৎকার করে উঠলাম। সমবেত জনতার উল্লাসের মধ্যে মল্লিকদা আমায় বাইরে টেনে এনে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'ডোন্ট ওরি। এখানে এখানে এসে না খেয়ে বেরোনোটা অত্যন্ত অভদ্রতা। ভগবান তাই তোমার শরীরে কিছু চালান করিয়ে দিলেন। থ্যাংকস্।'

পাড়ার কাছাকাছি আসতেই ওদের সংগে দেখা হলো। আড্ডা শেষ করে ফিরছে। আমি কাছে যেতেই সুহৃদ চেঁচিয়ে উঠলো; 'ক' পেগ টেনেছ গুরু! দেশী, না জাহাজী? 'জয়ন্ত আমার মুখ বুক শুঁকে চাপা আফসোসে যেন ফেটে পড়লো, 'সুখে আছিস রে! রেগুলার মাল টানছিস! আর আমি শালা তিন হপ্তা—।' এবং আমি হঠাৎ এইসব কথা শুনতে শুনতে মাতালের মত কথা বলতে শুরু করলাম। ওদের সিদ্ধান্ত সঠিক রাখতে এই গভীর রাতে কয়েকটি যুবকের বুকে ঈর্ষা ঢুকিয়ে ইচ্ছে করে বেতালে হাটতে শুরু করলাম। আহা, কি আনন্দ!

সমস্ত বাড়ি অন্ধকার। এখন গভীর রাত। চোরের মত পা টিপে টিপে, একটুও শব্দ না করে তালা খুললাম। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতে ইচ্ছে হলো না। আমি এখন এসেছি এটা এ বাড়ির কাউকে জানাতে ইচ্ছে হচ্ছিলো না আমার। এই রাত্রে যখন এ বাড়ীর সবাই গভীর ঘুমে অচেতন, যখন অন্ধকার-চোয়ানো বাতাসে বেশ একটা ঠাণ্ডা আমেজ আসছে তখন আমার জামা থেকে উপচে-পড়া বিয়ারের গন্ধে মাথা ভার-ভার করতে লাগলো। জামা খুলতে গিয়ে মনে হলো কিছু একটা পড়ে গেল পকেট থেকে। অথচ আলো জ্বালার ইচ্ছে হচ্ছিলো না কিছুতেই। এই অন্ধকার মেঝের পাতা বিছানায় শরীর এলিয়ে এবার ঘুম। সারা রাতের জন্য ঘুম।

কিন্তু বিছানায় শুয়েও অস্বস্তি ভাবটা কাটলো না। আমার পাশ থেকে বিয়ারের গন্ধ আসছে। অথচ জামাটা আমি ঐ কোনায় ছুঁড়ে ফেলেছি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি আলো জ্বালালাম। পোস্টকার্ডটা কুড়িয়ে নিতেই আমার সমস্ত শরীর যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে আসতে লাগলো। গতকাল থেকেই বুকপকেটে পোস্টকার্ডটা ছিল। এখন আমার হাতে-ধরা পোস্টকার্ড থেকে ভুরভুর করে বিয়ারের গন্ধ আসছে। সম্পূর্ণ ভেজা। চিঠিটার লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে—পড়া যাচ্ছে না কোন শব্দ। অথচ কোন্ অলৌকিকতায় শেষ শব্দগুলো বেঁচে থেকে আমার সকল ইচ্ছাকে একটা ভাঁড়ের পোশাক পরিয়ে দিল জানি না, কিন্তু দু' চোখ বন্ধ করলে এই বুক কী ভরাট মনে হয়, শব্দগুলো বাজে : 'ভাল থেকো। ইতি, আশীর্বাদিকা, তোমার মা।'

এক অপরিচিতা মৃতার স্মরণে

বুঝেও বুঝিনি, তাকে নিয়ে গেলো নিঃশব্দে যখন
রৌদ্রে আর মসৃণ নিয়মে লিপ্ত উজ্জ্বল বিকেলে :
বাহকেরা, লব্ধজ্ঞান, সৌম্য, যেন অলোকলক্ষণ,
চলেছে বিনম্র, মৃদু, প্রায় যেন বাতাসে পা ফেলে।

(রাসবিহারী অ্যাভিনিউ শব্দ, যান, দোকানে দৈনিক :
পথ ছেড়ে ব্যস্ততা দাঁড়ায় স'রে, কখনো বা তাকায় পথিক।)

এবং দু-চারজন অনুগামী মন্থর মোটরে :
কিছুটা বিস্মিত, মুগ্ধ—যেন কোনো অদম্য ডাকাত
সব দৃষ্টি, সব দৃশ্য, লুঠ ক'রে নিয়েছে হঠাৎ,
রেখে গেছে আশ্চর্য আঁধার শুধু চক্ষুর কোটরে।

(আশ্চর্য আঁধার—না কি অন্য এক আকাশের জ্যোতি ?
রঙিন খেলেনা সব ভেঙে দিয়ে, কেউ বুঝি পৌঁছলো সম্প্রতি।)

আর আমি, লেখা ছেড়ে, বারান্দায় শব্দের সন্ধানী,
তাকে দেখেছিলাম মিনিট দুই—মানিনি, সে মৃতা;
মৃতা নয়—যৌবনপ্রতিমা, নারী, হৃদয়শ্লাঘিনী,
যেন স্বপ্নে-দেখা কোনো চিরন্তনী সম্ভাব্য বনিতা।

সুন্দর, সংহৃত, শান্ত—নারীত্বের আদিম স্বভাবে
সম্রত সূর্যের দিকে ঊর্ধ্বমুখ—উন্মুক্ত, নিষ্কল,
যেন ধীর, বিশাল গ্রীষ্মের যত্নে এইমাত্র পেকে-ওঠা ফল,

নিংড়ে নিয়ে মাটির সমর্থ রস, ঋতুর নির্যাস,
পার হ'য়ে অবিশ্বাসী অপেক্ষার ভঙ্গুর উচ্ছ্বাস,
হ'লো সে চরম, পূর্ণ। এইবার খ'সে প'ড়ে যাবে।

এমিল নোল্ডের আঁকা 'লেমন অর্চার্ড'

এমিল নোল্ডে
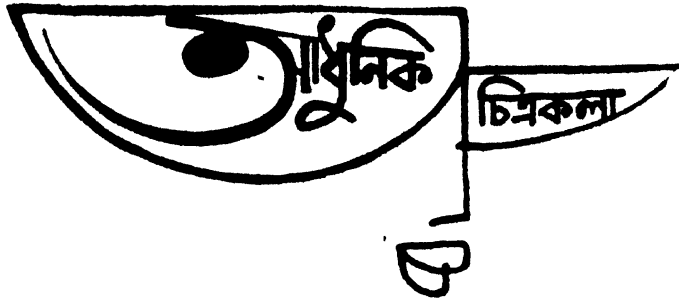
য়ুরোপের চিত্রজগতের সফর সেরে ভেবেছিলুম দু'-এক সংখ্যা মার্কিন ছবিতে কী হচ্ছে তার খবর নেব, এবং এবার মার্কিন দেশেই যাবার কথা ছিল, কিন্তু কী ভাগ্য শেষ মুহূর্তে হঠাৎ খেয়াল হল এমিল নোল্ডের ছবি বিষয়েই আমার কিছু বলা হয় নি। আসলে নেমন্তন্নের লিস্ট করতে গিয়ে যেমন যহুদূরস্থিত আত্মীয়ের নাম আমরা ভুলি না, কিন্তু যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে বসে লিস্টি করছি তার নামই পিছলে বেরিয়ে যায় মন থেকে, সেরকম হয়েছে ব্যাপারটা। আমার এই টেবিলের সামনেই নোল্ডের একটি ছবি রয়েছে, রোজ সেটি দেখি, সেটা দেখতে-দেখতেই গোইয়া থেকে পিকাসো বিষয়ে লিখেছি, কতবার লেখার মাঝে কলম থামিয়ে মনে হয়েছে যাঁর বিষয়ে লিখছি তাঁর বিষয়ে এবার না লিখে নোল্ডের এই ছবিটা বিষয়ে লেখা কত ভালো হত, কিন্তু এমনই মজা, এই সদা উপস্থিত আমার প্রিয় চিত্রকরকেই আমি বেমালুম ভুলে ইউরোপ ছেড়ে মার্কিন দেশে চলে যাচ্ছিলুম। কিন্তু কী ভাগ্য, শেষ মুহূর্তে হঠাৎ খেয়াল হল।

এমিল নোল্ডে ভারতবর্ষে অতি পরিচিত শিল্পী নন। আসলে আমাদের কাছে চিত্র-কলা বলতেই ধারণা হয় ফরাসী দেশ, সে দেশেই ছবি আঁকা হয়; জার্মানী বা রাশিয়া, মার্কিন দেশ বা হল্যাণ্ড, সেসব দেশের কথা জানবার প্রয়োজন নেই। এবং সেই জন্যেই চিত্রকরের ছবি আমাদের মনে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি এবং লাল জামার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আড্ডা বললেই মনে পড়ে মঁমার্ত, চিত্রশালা হলেই লুভ্র।—একথা ঠিকই উনিশ-শতকী ইউরোপে শিল্পের রাজধানী ছিল প্যারিস, কিন্তু বিশ শতকে মুনিখ প্যারিসের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কান্ডিনস্কি, পল ক্লে, মণ্ড্রিয়ান, শাগাল, মিরো, মুঙ্খ, ডালি, জলেনস্কি, নোল্ডে ককশকা, বেকম্যান, ফ্রানৎস মার্ক, হেরম্যান গ্রোস, কেউই ফরাসী নন, পিকাসোর কথা তো ছেড়েই দিলাম। এবং দেখা যাবে ওপরের তালিকায় কয়েকজন হিস্পানী চিত্রকর ছাড়া প্রায় অনেকেই বড় হয়েছেন শিল্পী হিসেবে মুনিখে। প্রসঙ্গ মনে করি ব্লু-রাইটের আন্দোলন এই জর্মন দেশেরই অবদান।—যাই হ'ক এমিল নোল্ডের কথায় ফিরে আসি, এই শিল্পী বহু বিখ্যাতজয়ী নন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর ছবি খুব ভালোবাসি।

নোল্ডের ছবির কথায় ফিরে আসার আগে সামান্য পরিচিতি-তথ্য পরিষ্কার করে দেওয়া যেতে পারে।

ঠিক একশো বছর আগে জার্মানদেশের শ্লেসভিগ নামক শহরে নোল্ডের জন্ম হয়। এমিল হানসেন নোল্ডে পুরো নাম—তাঁর সুন্দর নাম। অল্প বয়সেই হানসেন বুঝেছিলেন তাঁর বেঁচে থাকবার একমাত্র নির্ভর ছবি—আর্থিক, আত্মিক, শারীরিক সমস্ত দিক থেকেই। অল্প বয়স থেকেই তাঁর ড্রয়িঙের হাত এত পাকা ছিল যে বহু ছাত্র তাঁর কাছে ড্রয়িঙের কাজ শেখার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল।—মুনিখ, প্যারিস এবং কোপেনহাগেন এই তিন জায়গায় নোল্ডে চিত্রকলার পাঠ নেন—প্রথম দিককার ছবিতে তাঁর বর্ণপ্রেম লক্ষণীয়; ১৯০৩-৪ পর্যন্ত নোল্ডেকে ইম্প্রেশনিস্টই বলা চলে। কিন্তু রঙ ক্যানভাসকে যদি শুধু রাঙান করবার জন্যই ব্যবহৃত হয় তাহলে সে ছবি মহৎ ছবি হতে পারে না, ইম্প্রেশনিস্টরা মহৎ শিল্পী নন যে-কারণে—নোল্ডে ক্রমশ সে কথা বুঝেছিলেন, তাই ১৯০৪-এর পরে

গভীর পরিণতি দেখা গেল এই শিল্পীর ক্যানভাসে। রঙ, রেখা, বিষয় কেউ অন্য থেকে আলাদা নয়, ছবিটির অন্তর্লীন আত্মার আবশ্যক উপাদান। আমরা যে নোল্ডেকে চিনি তিনি এই ১৯০৪-এর পরেই উদ্ভূত হন।

শুধু স্টাইলের দিক থেকেই যে তাঁর বদল হল তা নয়। অদ্ভুতভাবে লক্ষ করা গেল তাঁর ক্যানভাসে, যার বিষয় আগে প্রধানত ছিল প্রাকৃতিক দৃশ্য, এখন অদ্ভুত-ভাবে সেখানে আঁকা হচ্ছে স্বপ্ন থেকে উঠে আসা অবাস্তব সব শরীর, বিস্ময়কর এবং ভয়াবহ সব ফর্ম।—১৯০৬ সালে নোল্ডে "ব্রুকে" সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দেন কিন্তু অমিশুক ও লাজুক ছিলেন বলে দলের মধ্যে বেশীদিন রইলেন না। ১৯০৮-এর পর থেকে নোল্ডের ছবি সম্পূর্ণ শিল্প স্বাতন্ত্র্য লাভ করল, রঙ এতদিন মৃদুভাবে ছবির বিষয় নিয়ে গান করত তাঁর ক্যানভাসে, এখন তা তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বরে পরিণত হল। কিছু ধর্মীয় বিষয় নিয়ে ছবি এঁকেছিলেন এই সময়ে; বিরাট ক্যানভাস, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ। উইলিয়াম ব্লেকের মত নিজস্ব পুরাণ তৈরি করেছেন তিনি—নিজের পৃথিবী তৈরি করে নিয়েছেন—সেখানে আছে মুখোশ, বুনো অপদেবতা, দামি মসলিন, ছেলেবেলার গান, পরদেশের মূর্তি, অদ্ভুত সব আরো অনেক গল্প। ১৯১৩-১৪ নাগাদ নোল্ডে বিখ্যাত এক এথ্‌নোলজিকাল ভ্রমণে বেরোন—রাশিয়া, চীন দেশ, জাপান, পলিনেসিয়া এই সুযোগে তাঁর দেখা হয়েছিল।—ফিরে এলে তখন নাৎসি জার্মানী, নোল্ডে নাৎসিদের দ্বারা এতটা উৎপীড়িত হন যে একটা সময়ে তাঁর ছবি আঁকা বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

*

জ্যাজ বাজনার সঙ্গে নোল্ডের ছবির কোথায় যেন মিল রয়েছে—একটা কফির দোকানে বসে জ্যাজ শুনতে শুনতে এই কথাটা আমার মনে হয়েছিল একবার। জ্যাজ বাজনা শুনলে আমাদের ভেতরে এক ধরনের শিহরণ আসে, সেই শিহরণ শরীরে সঞ্চারিত হয়, সমস্ত শরীর বাজনার অংশ হয়ে গিয়ে এক উন্মাদ ঘোরের মধ্যে অজান্তে নিয়ে ফেলে আমাদের, আমরা শরীর দিয়ে সংগীত অনুভব করার জন্য ক্রমশ ফিরে যাই সভ্যতার শৈশবের জঙ্গলের কোনো আগুনের ধারে, কোনো অপদেবতাকে ঘিরে প্রাচীন পুজো হচ্ছে যেখানে—যে জগতে ভয়, হিংস্রতা, মৃত্যু, অন্ধকার; যে অরণ্যে রাত্রিদিন নিশ্চয়তা, হিংস্র পশু বর্বর মানুষের মাংস ছিঁড়ে নিচ্ছে, হাঁ-করা বিরাট ফুল শুষে নিচ্ছে পশু; সেরকম কোনো জগতে চলে যাই আমরা—এক অন্ধকার বিপজ্জনক জগতে শরীর নিয়ে একা বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা হয়।—নোল্ডের ছবির মধ্যেও এই অভিজ্ঞতা লুকিয়ে রয়েছে। উজ্জ্বল অথচ ভয়াল তাঁর বর্ণব্যবহার, মোটা বুরুশে আঁকা মানুষের মুখোশ-পরা বর্বর মানুষের চিত্র, ঘূর্ণায়মান গতি, বিকট হাসির মধ্যে মৃত্যুভয়, বিরাট নাইট-ক্লাবের ভিড়ে শ্বাপদসংকুল অরণ্যের অনিশ্চয়তা, নির্জনতা—নোল্ডের ছবির মধ্যে আমরা আসলে সমস্ত সভ্যতার বুজরুকিটা ধরে ফেলি। আসলে আমরা সমানই একা, সমানই শরীর নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই, সমানই নিষ্ঠুর, সভ্যতার ছেলে-বেলার অরণ্যের মানুষের মতো। জীবনানন্দর 'রাত্রি' কবিতার যে উপলব্ধি সেই উপলব্ধি রয়েছে নোল্ডের ছবির মধ্যে—

"নগরীর মহৎ রাত্রি তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মত, তবুও জন্তুগুলো
অনুপূর্ব অতিবৈতনিক
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।"

নোল্ডের ছবির উদাহরণ হিসেবে ১৯৩৩-এ আঁকা তাঁর "লেমন অর্চার্ড" চিত্রটি প্রকাশ করছি। চিত্রটিতে রঙের ভূমিকাই প্রধান, মুখভঙ্গিও লক্ষণীয়।

শুদ্ধশীল বসু

কলকাতার ডায়েরি

এক সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বললেন, কিছুদিন ডুব মেরে থাকব ভাবছি। প্রশ্নের যন্ত্রণায় কারও বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। যেখানেই যাই এক প্রশ্ন —'ভিতরের খবর কী?' কেউ কেউ আর এক ধাপ এগিয়ে জিগগেস করেন—'পুজোর আগেই কি কিছু ঘটছে?' সবারই ধারণা আমরা সব-জান্তা, ভিতরের খবর অনেক কিছু জানি অথচ কাগজে কিছু লিখি না, সুতরাং মুখে মুখে যদি বলে দিই পশ্চিমবঙ্গে সরকার বদল হচ্ছে কি না তাহলে তিনি বড় কৃতার্থ হোন।—'আচ্ছা নতুন মুখ্যমন্ত্রী কে হচ্ছেন বলুন তো? নাকি অজয়বাবুই থেকে যাবেন? নাকি এই মন্ত্রিসভারই চালিয়ে যাবে?'

'হরেক রকম প্রশ্ন',— সাংবাদিক বন্ধুটি বললেন—'এবং শুনলে অবাক হবেন সেদিন যুক্ত ফ্রনটেরই একজন মাতব্বর ব্যক্তি আমার কাছে জানতে চাইলেন, নতুন কোয়ালিশন সরকার হচ্ছে কিনা। মহা বিপদে পড়েছি মশাই, যেখানেই যাচ্ছি, সেখানেই শুধু মন্ত্রিসভা নিয়ে আলোচনা। আমি নিজেই কিছুই জানি না, অথচ আমার কাছেই পাকা খবরটা জেনে নিতে চান সবাই।'

সত্যিই তাই, পুজোর মুখে মুখে এই কলকাতা শহরে বোনাস, শাড়ি আর প্যানডেলের মতই সমানভাবে উচ্চারিত হচ্ছে মন্ত্রিসভা অদল বদলের কথা। চারদিকে রাজনৈতিক তৎপরতা, প্রকাশ্য, গোপন একের পর এক বৈঠক, নানা ধরনের গুজব —সব মিলিয়ে আসর জমে উঠেছে ভাল। কেউ বলছেন ফ্রনট মন্ত্রিসভার আর তিনদিন বাকি, কেউ বলছেন সাতাশ ঘণ্টা, কেউ আবার মুচকি হেসে এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন আসল ক্ষণটা কেবল তারই জানা—তিন দিনও নয়, সাতাশ ঘণ্টাও নয় অন্য একটা কিছু।

সম্ভাব্য অসংখ্য 'ক্ষণ' কিন্তু একের পর এক পেরিয়ে গিয়েছে, গুজববাজদের মুখে ছাই দিয়ে যুক্ত ফ্রন্ট যুক্তই আছে।

*

পঞ্চাশের মন্বন্তরে চালের মণ যখন চল্লিশ টাকা, সবাই মাথা চাপড়েছিলেন। এখন একশ টাকা মণে চাল পেলে বলতে শোনা যায়, 'সস্তায় পেলাম, তাই কিছু কিনে রাখলাম।'

পঁচিশ বছর আগেকার কথা আপাতত মুলতুবি থাক, গত বছরের হিসেব নিলেও চমকে যেতে হয়—সব জিনিসের দামে আসমান-জমিন ফারাক। এক মধ্যবিত্ত গৃহিণীর পুরোনো হিসেবের খাতা সেদিন হাতে এসেছিল, গত দশ বছরের বাজার হিসেব দেখে ভাল করেই টের পেলাম দাম ধাপে ধাপে কী হারে বেড়েছে।

ঠিক পাঁচ বছর আগেকার (১৯৬২ সালের অকটোবর) একটি হিসেব তুলে ধরছি।

পোনা এক সের—তিন টাকা, সিদ্ধ চাউল ৩০ সের—২২ টাকা ৫০ পয়সা, আতপ চাউল সাড়ে সাত সের—৬ টাকা ৫৬ পয়সা, চিনি ৫ সের—সাড়ে পাঁচ টাকা চিড়া সওয়া সের—১ টাকা ১৯ পয়সা, পেঁয়াজ সওয়া সের ৪৪ পয়সা, মুগ সওয়া সের—৯৪ পয়সা, মুশুরি আড়াই সের—২ টাকা ১২ পয়সা, খেসারি আড়াই পো—৩৪ পয়সা, কলাই আড়াই পো—৬৫ পয়সা, ময়দা আড়াই পো ৩৪ পয়সা, সরষে তেল চার কিলো—১৩ টাকা, নুন সওয়া সের—১৫ পয়সা, মুড়ি—একপো—৩১ পয়সা, কেরোসিন সওয়া দুই সের—১ টাকা, ঘুটে ৬০০—২ টাকা ২৫ পয়সা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তালিকা আর বাড়াব না এবং এখনকার হিসেবও দেব না, আপনারা মিলিয়ে নিন।

*

'হের হের অবনীর রঙ্গ, গগনের করে তপোভঙ্গ, হাসির সমরে তার মৌন রহে না আর—।' অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র—তিন শিল্পী ভাইয়ের ছবি একসঙ্গে তাঁর গানে বেঁধে রেখেছেন খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথ। সেই তিন ভাইয়ের সর্বজ্যেষ্ঠের শতবার্ষিকী সম্প্রতি উদ্‌যাপিত হল কলকাতায়। গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ছবির প্রদর্শনীও চলেছে রবীন্দ্রভারতী এবং একাডেমি অব ফাইন আর্টসের বাড়িতে।

গগনেন্দ্রনাথের কারটুন কিংবা তাঁর চৈতন্য বিষয়ক বা হিমালয় দৃশ্যাবলী, বিমূর্ত চিত্রাবলী বাংলা দেশের চিত্রশৈলীকে কতখানি সমৃদ্ধ করেছে, সেকথা কারও অজানা নয়, কিন্তু কেউ কি জানেন, সে-যুগের এক লাটসাহেবকে গড়গড়ায় তামাক খাওয়া তিনি-ই শিখিয়েছিলেন? বিড়ি এবং গাঁজার চলন আজকাল বিদেশে কিছু কিছু চালু হচ্ছে বটে ফ্যাশানের খাতিরে, তবু এখনও শুনতে পাইনি অম্বুরি তামাক চালান যাচ্ছে বিদেশীমুদ্রা আদায় করতে।

গগনেন্দ্রনাথ কিন্তু অসাধ্য সাধন করেছিলেন অনেক বছর আগেই। লর্ড ও লেডি কারমাইকেলের সঙ্গে ছিল তাঁর বন্ধুত্ব। লাটসাহেব-লাটসাহেবানী দুজনেই ছিলেন তাঁর গুণের সমঝদার। প্রায়ই আসতেন ঠাকুরবাড়িতে ছবি দেখতে, গল্প করতে। কিছুদিন পর অবস্থা গেল পালটে। লাটসাহেবের আগমন হতে লাগল নিত্য এবং কারণও হল অন্য। গগনেন্দ্রনাথ তাঁকে তামাকের নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন। তামাকের টানে লর্ড কারমাইকেল রোজ এসে গড়গড়া নিয়ে বসেন এবং 'গুড়ুক গুড়ুক' করার ফাঁকে ফাঁকে শিল্পচর্চা ও মুড়ি খাওয়া চলে।

হ্যাঁ, তামাকের সঙ্গে মুড়ি খাওয়াও শিখেছিলেন লাটসাহেব। শোনা যায় তিনি মুড়ির এমন ভক্ত হয়ে পড়েন যে, দেশে ফিরেও গগনেন্দ্রনাথকে চিঠি লিখতেন পারসেল করে বিলেতে মুড়ি পাঠাতে।

গগনেন্দ্রনাথ নাকি একবার পাঠিয়েছিলেনও।

*

মুড়ির সঙ্গে লাটসাহেবের নাম জুড়ে দেওয়াতে ভয় হচ্ছে মুড়ির দাম না আবার বেড়ে যায়। যে-মুড়ি উপর মহলে এখন অপাংক্তেয়, সেই মুড়ি যদি 'আন্ডা'-বেকন,' 'চিকেন স্যান্ডউইচের' জায়গা দখল করে, তাহলে বেচারা মধ্যবিত্তের অবস্থা আরও কাহিল, দাম রি-ডবল হয়ে যাবে।

এমনিতেই অবশ্য মুড়ি-মিছরি প্রায় সমান-দর এবং সংবাদপত্রে 'মুড়ির চেয়ে আপেল শস্তা' এই খবর বের হওয়ার পর থেকে ঘরে ঘরে এখন আপেল দেখা যাচ্ছে। সকালের টিফিনে আপেল, বিকেলের টিফিনে আপেল, এমন কি ঠাকুরভোগেও কলাবাতাসার বদলে আপেল।

'রুটি নেই তো কেক খায় না কেন'—এই উক্তি এককালে ছিল নিষ্ঠুর রসিকতা, কিন্তু ইদানীং যদি কেউ মুড়ির বদলে আপেল কেনার বিধান দেন, তাহলে তা না নিষ্ঠুরতা, না রসিকতা; সৎ পরামর্শ বলে সবাই মেনে নেবে।

অবশ্য এ কথা যদি আগের সরকারের আমলে কেউ বলতেন তাহলে তাকে আমরা নিশ্চয়ই 'দালাল' বলতাম।

—চাণক্য

কুড়ি

১২৭৭ সালের শ্রাবণের 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'হিন্দু বিধবা' নামক একটি রচনা থেকে কিয়দংশ তুলে দিচ্ছি : "বিধবা কুলহিতৈষী পণ্ডিতবর বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাগণের বিবাহের জন্য কায়মন ও অর্থ দিয়া যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ফল দ্বারা আমরা যত দূরে বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে হিন্দু সমাজের বর্তমান আচার ব্যবহার প্রণালী থাকিতে ইহা সফল হইবার আশা নাই। সাধারণ লোকে যুক্তিও বুঝে না, শাস্ত্রও বুঝে না, দেশাচার ও মোটামুটি একটা সংস্কার ধরিয়া কার্য করে। তাহারা বিধবার বিবাহ শুনিলে মহাপাপ বলিয়া বিজাতীয় ঘৃণা প্রদর্শন করে। এ প্রকারে বিবাহিত দম্পতি সাধারণের চক্ষুশূল, বিদ্বেষ ও বিদ্রূপের পাত্র হইয়া কি প্রকারে সমাজে বাস করিতে পারে?..."

শোনা গেল বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবা-বিবাহ করবেন।

১২৭৭ সালের ২৪ আষাঢ় শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন একখানা চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন : "কৃষ্ণনগরের কন্যা ভবসুন্দরীকে গত রবিবার কলিকাতা পাঠাইয়াছি, বোধ করি তাঁহারা পঁহুছিয়া থাকিবেন। পরম্পরায় শুনিতেছি নারায়ণ বাবাজীউ কৃষ্ণনগরের কন্যা ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিবেন, ইহা আমি বিশেষরূপে অবগত নহি। আমি কন্যাকে মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছি, মহাশয় কর্তা, আপনি কন্যাকে যে পাত্রে দিবেন আর তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই আর নারায়ণের মাতা আমাকে বৃথা দোষ দেন, নারায়ণ ছেলেমানুষ নয় যে, আমি ভুলাইয়াছি। কৃষ্ণনগরের কন্যার বিষয় মহাশয়ের যেরূপ অভিলাষ হয় তাহাই করিবেন, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথা বলিবার নাই। যদি নারায়ণের বিবাহ হয় তাহা হইলে জননী দেবীকে কেন পত্র পাঠাইয়া লইয়া যান, জননী দেবীর বিধবাবিবাহে বিশেষ যত্ন আছে।"

কেউ কেউ বলত, পরের বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে পরের ছেলের জাতি মজিয়ে সমাজ-সংস্কার করা সহজ কাজ, পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে বিদ্যাসাগর নাম কিনছেন। কিন্তু সে অভিযোগের উপায় বুঝি আর থাকে না। জানাজানি হয়ে গেছে, বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবা-বিবাহ করবেন।

১২৭৭ সালের ২১ শ্রাবণ শম্ভুচন্দ্র আরেকখানা চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন : "...নারায়ণ বাবাজীউ বিধবা-বিবাহ করিবেন—দেশে প্রচার হইয়াছে; এই নিমিত্ত আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ও কুটুম্বগণ আমাকে বিশেষ অনুরোধ করায় মহাশয়কে লিখিতেছি। ইঁহারা বলেন, আরো ২।৪ বৎসর নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিতে ক্ষান্ত থাকুক, পরে যদি বিধবাবিবাহ করাই শ্রেয়ঃকল্প হয় তাহা হইলে ৭।৮ বৎসরের অর্থাৎ অক্ষতযোনি কন্যার সহিত বিবাহ হইলে ভাল দেখায় ও শাস্ত্রসম্মত হয়। আর ইঁহারা আমাকে বলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় অপরের বিবাহ দিউন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, নারায়ণের বিধবাবিবাহ দিলে আমরা আর তোমাদের সহিত আহার ব্যবহার করিতে পারি এমন বোধ হয় না; কারণ, তোমাদের সহিত আমরা আহার ব্যবহার করিলে সমাজে রহিত হইব আর নানা গোলযোগ উপস্থিত হইবে অর্থাৎ আমাদের পুত্রকন্যার বিবাহ হওয়া দুষ্কর হইবে। এই কারণেই নারায়ণের বিবাহ দিতে ক্ষান্ত হইতে বলিতেছি। এতাবৎকাল মহাশয়দের অনুগত ও আশ্রিত থাকিয়া অতঃপর আমাদের কি দশা ঘটিবে—স্থানান্তরে যাইলে আমাদিগকে কেহ হুঁকো দিবে না ও উপহাস করিবেক। ইঁহারা নারায়ণকে ক্ষান্ত করিবার জন্য আমাকে কলিকাতা যাইতে বলেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, অগ্রে অগ্রজ মহাশয়কে পত্র লিখি, তিনি যেরূপ আদেশ করেন পরে আপনাদিগকে জানাইব। এমতস্থলে যাহা কর্তব্য হয় করিবেন ও নারায়ণ বাবাজীউকে আমার প্রণয়সম্ভাষণ ও আশীর্বাদ জানাইবেন...।"

আত্মীয়-কুটুম্বের ভয়ে বিদ্যাসাগর কি নিরস্ত হবেন? অসম্ভব কথা।

১২৭৭ সালের ২৭ শ্রাবণ নারায়ণচন্দ্র বিধবাবিবাহ করলেন। পাত্রীর নাম ভবসুন্দরী। বিবাহ হল কালীচরণ ঘোষের বাড়িতে।

বিবাহরাত্রে বিদ্যাসাগরের কোনো আত্মীয় স্ত্রীলোক বরকন্যা বরণ করতে রাজী হলেন না। তারানাথ তর্কবাচস্পতি তখন বাড়িতে গিয়ে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এলেন, তারানাথের স্ত্রী বরকন্যা বরণ করলেন।

১২৭৭ সালের ৩১ শ্রাবণ বিদ্যাসাগর শম্ভুচন্দ্রকে একখানা চিঠি লিখেছেন। অসামান্য চিঠি। আদ্যন্ত উদ্ধার করি:

শ্রীশ্রীহরিশরণং

শুভাশিষঃসন্তু—

২৭শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে, এই সংবাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।

ইতিপূর্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম, সে বিধবাবিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা আমার পক্ষে কোনও মতে উচিত কর্ম হইত না। আমি বিধবা-বিবাহের প্রবর্তক, আমরা উদ্‌যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী-বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র

বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে তাহার পথ করিয়াছে। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সংকুচিত হইব না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, সমাজের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে নারায়ণের সহিত আহার ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সেজন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবে, এরূপ বোধ হয় না এবং আমিও তজ্জন্য বিরূপ বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায়, এরূপ বিষয়ে সকলেই স্বতন্ত্রেচ্ছ; অস্মদীয় ইচ্ছার অনুবর্তী বা অনুরোধের বশবর্তী হইয়া চলা কাহারও উচিত নহে। ইতি ৩১শে শ্রাবণ।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ।"

বিধবাবিবাহ ব্যাপারেও বিদ্যাসাগর প্রবঞ্চিত হয়েছেন। বিধবাবিবাহের নামে কেউ কেউ বহুবিবাহ করেছেন, একের পর আরেক বিধবাকে বিবাহ করেছেন। আগে বিদ্যাসাগর কল্পনাও করতে পারেননি যে, এমন কান্ড কেউ করতে পারে। পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগর অতএব কোনো কোনো বিধবাবিবাহে একখানা অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে নিতেন।

প্রথম দিকে বিধবাবিবাহ বিষয়ে যে উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, ক্রমশ তা স্তিমিত হয়ে এসেছে। বিধবাবিবাহ বিষয়ে শিক্ষিত যুবকদের ঔদাসীন্য ও শৈথিল্য দেখে কেউ কেউ এককালে আক্ষেপ করেছেন।

১২৮৩ সালের শ্রাবণের 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'বিধবাবিবাহ' নামক একটি রচনার অংশ বিশেষ তুলে দিচ্ছি:

"বিধবাবিবাহের প্রস্তাব যখন প্রথম বঙ্গসমাজে অবতারিত হয়, তখন অনেক শিক্ষিত যুবক সাহসী হইয়া বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। দুই একজন বিবাহও করিয়াছিলেন। তখন বিধবা কন্যা পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। তখন জনক জননী কন্যার বিবাহ দিতে অগ্রসর ছিলেন না। তখন

তাহাদিগের এ সংস্কারে তেমন আস্থা ছিল না। তখন বিধবাগণ নিজেই তত প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু আজি দশাধিক বৎসরে, দশ শত বৎসরের কাজ হইয়া গিয়াছে। লোকের প্রবৃত্তি ও ভাব অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। দুঃখ ও প্রয়োজন কুসংস্কারকে দূরীকৃত করিয়াছে। আজি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে সমাজ ঠিক বিপরীত ভাবে অবস্থিত। পূর্বে কন্যা প্রস্তুত ছিল না, বর প্রস্তুত; এখন কন্যা অগ্রসারিণী, বর পশ্চাৎগামী হইতেছেন।...

"...শিক্ষিত যুবকগণকে আর একবার উত্তেজনাবাক্যে সম্বোধন করিতেছি, কেন তাহারা বিধবাবিবাহ বিষয়ে এত উদাসীন ও শিথিলযত্ন হইলেন? তাঁহারা নিঃসহায়া অবলা বিধবাগণের জন্য কি দুঃখিত নহেন? তাঁহাদিগের কি কর্তব্য নয়, সেই দুঃখ মোচন করেন? তবে তাঁহাদিগের সুশিক্ষার কি ফল হইল? তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া এ বিষয়ে পুনরায় উদ্যোগী হউন, অবশ্য কৃতকার্য হইবেন। সমাজ তাঁহাদিগের দ্বারা যদি উন্নত না হইল, তবে আর কাহাদিগের নিকট হইতে সে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? সকলে দৃঢ়ব্রত হইয়া আর একবার প্রাণপণ চেষ্টায় সমাজের উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হউন, দেখিবেন এক্ষণে পথ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। কারণ, আমরা দেখিয়া আসিতেছি, অধুনা দশ বৎসরে দশ শত বৎসরের কাজ হইয়া যাইতেছে।"

ছোটোলাট স্যর রিচার্ড টেম্পলের আমলে বিদ্যাসাগর গবর্নমেণ্টের কাছ থেকে একখানা সম্মানপত্র পেয়েছেন। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের নেতা বিদ্যাসাগর, এই নেতার আন্তরিকতায় গবর্নমেণ্ট নিঃসন্দেহ, ভারতবর্ষের প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবেও বিদ্যাসাগরের মর্যাদা স্বীকার করেছে গবর্নমেণ্ট। তাই এই মানপত্র।

জীবনের শেষ পর্বেও বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ বিষয়ে আপন কল্যাণহস্ত প্রসারিত রেখেছেন। ১৮৯০ সালের মার্চ মাসে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' লিখেছে: "শ্রীহট্টে বালবিধবাদিগের বিবাহ সম্পাদনার্থ এক সভা হইয়াছে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।..."

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিধবাবিবাহ বন্ধ হয়ে যায়নি। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর প্রায় এক যুগ পরে ১৩১২ সালের বৈশাখে 'ভারতী' মন্তব্য করেছে: "অনেকের ধারণা, বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ শুধু বিধিবদ্ধ হইয়া আছে, কার্যতঃ হিন্দুসমাজে এই সংস্কারের সঙ্গে কোনরূপে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। বিধবাবিবাহ প্রকৃতপক্ষে হিন্দুসমাজে ক্রমশঃ শক্তি-সঞ্চয় করিয়া পুষ্টিলাভ করিতেছে।"

মন্তব্য সহ গত সাড়ে তিন বছরের বিধবা-বিবাহের একটি তালিকাও আছে। তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে ওই সাড়ে তিন বছরে সাকুল্যে একাশিটি বিধবাবিবাহ হয়েছে। বলা দরকার, এই তালিকাটি সর্বভারতীয়। "এই তালিকার সকল বিবাহগুলিই স্বজাতি ও স্ববর্ণের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।"

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, বহুবিবাহ রহিত করার জন্য বিদ্যাসাগরের আগেও কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনো চেষ্টাই সফল হয় নি।

১৭৭৭ শকের চৈত্রে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশিত 'বহুবিবাহ' নামক একটি রচনায় বহুবিবাহের মতো ভয়ানক কুপ্রথাতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। রচনাটির শেষাংশ তুলে দিচ্ছি: "এমত ভয়ানক কুপ্রথাতি এই দণ্ডেই দেশ হইতে

দূর করা বিধেয় কি না? রাজনিয়ম, রাজদণ্ড প্রভৃতি এ কুপদ্ধতি নিবারণ করিবার অনেকানেক উপায় আছে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা নিবারিত হইলে আমাদিগের দেশের আর কি মহত্ত্ব রহিল এবং দেশস্থ লোকেরই বা কি মুখ উজ্জ্বল হইল? যাহা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে, কখনই মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে, যে বিষয় কোন অংশেই ভদ্র সমাজের শ্রবণযোগ্য নহে এবং যাহা প্রচলিত থাকাতে সহস্র সহস্র অনিষ্ট ভিন্ন অন্য কোন ফল নাই এবং রহিত করিলে অশেষ প্রকার উপকার ব্যতীত কোন হানি নাই, তথাপি কি জন্য আমরা লিপ্ত থাকিয়া বৃথা দুর্নামের ভাগী হই, লোকের নিকট নিন্দনীয় ও ঈশ্বরের নিকট পাপভাজন হই ও আপনাদিগের পরমার্থপথে কণ্টক প্রদান করি। ইহা রহিত করা কিছু বহু আয়াস কি বহু ব্যয়সাধ্য নহে, কেবল পরস্পর আপনারা সকলে মনোযোগী হইলেই এইক্ষণে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে। অতএব এক্ষণে দেশস্থ মহাত্মাদিগের সমীপে বিনীতভাবে আমাদিগের এই নিবেদন যে, অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে তাঁহারা কিঞ্চিৎ মনোযোগী হউন, আর বিলম্ব করা কোন মতেই শ্রেয় নহে।"

১৮৫৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ রহিত করার জন্য লেজিস্লেটিভের কাছে আবেদনপত্র দাখিল করেছেন।

একটি ঘটনা আছে।

বিদ্যাসাগর তখন বীরসিংহে।

দুপুরবেলা খেতে গিয়েছেন বাড়ির মধ্যে, দেখলেন নতুন অচেনা মহিলারা বসে আছেন। একজনের বয়স পঁচিশ বছর, আরেকজনের আন্দাজ তিন বছর।

বিদ্যাসাগর মাকে জিজ্ঞেস করলেন—মা! এঁরা কে? এখানে বসে আছেন কেন?

বিদ্যাসাগরের মা বললেন এঁরা মা আর মেয়ে। তোমার বাল্যকালের গুরুমশায়ের প্রথমা স্ত্রী আর তাঁর মেয়ে। তোমাকে এঁদের দুঃখের কথা বলার জন্য এঁরা এখানে বসে আছেন।

বাল্যকালের গুরুমশায়কে বিদ্যাসাগর আট টাকা মাসহারা দেন। তা ছাড়া বীরসিংহে একটা চাকরি দিয়েছেন তাঁকে।

গুরুমশায় ভঙ্গ কুলীন। পাঁচ-ছটি বিয়ে করেছেন। কিন্তু কোনো স্ত্রীকেই গুরুমশায় বাড়িতে এনে রাখতে পারেন না। গুরু-মশায়ের বাড়িতে থাকেন তাঁর দুটি বোন আর ভাগ্নে-ভাগ্নীরা। যা উপার্জন করেন গুরুমশায়, সবই দু বোনের হাতে দেন। দু বোনই অত্যন্ত দুর্বৃত্তা, প্রখরা। কোনো স্ত্রীকে যদি গুরুমশায় কখনো নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন, বোনেরা তার জিনিস-পত্র রেখে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। বোনদের ভয় করেন গুরুমশায়। নিজে অত্যন্ত ভদ্রলোক বলে তিনি কোনো বোনকে সাহস করে কিছু বলতে পারেন না।

গুরুমশায়ের প্রথমা স্ত্রী আর তাঁর মেয়ে এসেছেন বিদ্যাসাগরের কাছে। দুঃখের কথা বলতে।

মেয়েটির বিয়ে হয়েছে। কুলীনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। কিন্তু সেই কুলীন তো এই একটিমাত্র বিয়ে করেনি। প্রায় চল্লিশটি বিয়ে করেছে। যে শ্বশুরবাড়ি থেকে খোরাকির টাকা পাওয়া যায়, কেবলমাত্র সেই শ্বশুরের মেয়েকেই ওই জামাই নিজের বাড়িতে রাখে। এঁদের কাছ থেকে কণামাত্র পাবার আশা নেই, অতএব জামাই এই মেয়েটিকে কখনো নিয়ে যায় না। বছরের মধ্যে একবার জামাইকে আনতে গেলে দশ টাকা খরচ লাগে। গুরুমশায়ের প্রথমা স্ত্রীর দশ টাকা খরচ করার সাধ্য নেই। কুলীন জামাইয়ের বউকে খেতে-পরতে দেবার কথা নয়। এই মেয়েটি অতএব মায়ের কাছেই থাকে।

বাপের বাড়িতে জীবন কাটাচ্ছেন গুরু-মশায়ের স্ত্রী। কষ্টে-সৃষ্টে দিন যাচ্ছে। একটি ছেলেই সংসার চালায়। এখন ছেলেটি বলছে—আমি তোমাদের দুজনকে ভাত-কাপড় দিতে পারব না।

গুরুমশায়ের প্রথমা স্ত্রী ছেলেকে বলেছেন—বল কি বাবা? তুমি এমন বললে আমরা কোথায় যাই।

ছেলে বলল—তুমি মা। তোমাকে না হয় খেতে দিতে পারি, কিন্তু বোনকে খেতে দিতে পারব না।

—কুলীনের স্ত্রী চিরকাল ভাইয়ের বাড়িতেই থাকে।

—যা হোক, তোমাকেই শুধু খেতে দেব। তুমি ওর বন্দোবস্ত কর।

মা রাগ করে বললেন—তুমি খেতে দেবে না, তবে কি প্রসন্ন বেশ্যা হয়ে যাবে?

মেয়েটির নাম প্রসন্নময়ী।
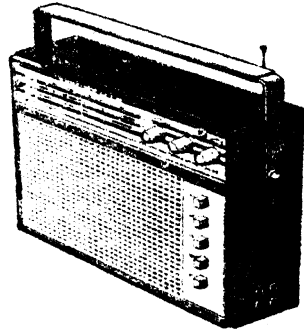
প্রসন্নময়ীর ভাই বলল—ওর যা ইচ্ছা তাই করুক।

এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে ছেলের মনান্তর হল। চতুর্দিক অন্ধকার দেখলেন প্রসন্নময়ীর মা।

শুনলেন, মাসতুতো ভাইয়ের বাড়িতে একটি পাচিকার দরকার। প্রসন্নময়ীকে নিয়ে মাসতুতো ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, আগেই সে বাড়িতে পাচিকা বহাল হয়ে গিয়েছে।

মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাওয়া যায়, কী করা যায়।

মনে পড়ে গেল, কাছাকাছি একটা গ্রামে চট্টোপাধ্যায়ের আরেক স্ত্রীর বাড়ি। তাঁর ছেলে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বিলক্ষণ সম্পত্তি করেছেন। ভালো ছেলে। হয়তো বিমাতাকে সে তাড়িয়ে দেবে না। হয়তো বিমাতার মেয়েকেও সে খেতে-পরতে দেবে।

সেই ছেলেটির কাছে গিয়ে সব বললেন প্রসন্নময়ীর মা, ছেলেটির হাত ধরে কাঁদতে লাগলেন। সত্যিই ভালো ছেলে। বিমাতা বলে সে অযত্ন করল না। বলল—মা, যতদিন তোমরা দু'জনে বেঁচে থাকবে, ততদিন আমি তোমাদের খেতে-পরতে দেব।

ভালো। সুখের কথা।

কিন্তু ছেলে ভালো হলে কি হবে, বাড়ির মেয়েরা সেরকম নয়। মেয়েরা প্রায়ই বলে —এ আপদ আবার কোত্থেকে এল।

অবস্থা এমন হয়ে উঠল যে, প্রসন্নময়ী আর তার মায়ের আর ও বাড়িতে থাকা অসম্ভব। সতীনের ছেলেকে সব কথা জানালেন প্রসন্নময়ীর মা।

শুনে ছেলে বলল—আগেই আমি সব জানতে পেরেছি। বাড়ির মেয়েদের শাসন করলে ওরা তোমাদের সঙ্গে আরো খারাপ ব্যবহার করবে। এই অবস্থায় তোমাদের এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো। তোমাদের খাওয়া-পরা বাবত আমি মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করতে পারি।

নিরুপায় হয়ে সে-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। এলেন স্বামীর কাছে। বিদ্যাসাগরের বাল্যকালের গুরুমশায় চট্টোপাধ্যায়ের কাছে।

কিন্তু সেখানে কোনো সুবিধা হল না। বোনেদের পরামর্শে চট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন—তোমাদের এখানে থাকা হবে না। তোমাদের খেতে-পরতে দিতে পারব না।

তা হলে কী করব, কোথায় যাব।

গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক তখন বললেন —তোমরা বিদ্যাসাগরের কাছে যাও। বিদ্যাসাগর কাল বাড়িতে এসেছেন। বিদ্যাসাগর পরম দয়ালু।

তাই এঁরা বিদ্যাসাগরের কাছে এসেছেন। প্রসন্নময়ীর মা বললেন—তুমি আমাদের যা হোক একটা উপায় করে দাও।

মা আর মেয়ের দুঃখে বিদ্যাসাগর কাঁদতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে প্রসন্নময়ীর মাকে আশ্বাস দিয়ে বিদ্যাসাগর গেলেন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। চট্টোপাধ্যায়কে বললেন—আপনার ব্যবহার দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি। কেমন করে আপনি নিজের স্ত্রী আর মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছেন। আপনি ওঁদের বাড়িতে রাখবেন কিনা, জানতে ইচ্ছা করি।

বিদ্যাসাগরের ভাবভঙ্গি দেখে গুরুমশায় ভয় পেলেন। বললেন—তুমি এখন বাড়ি যাও। আমি ঘরে দুই বোনের সঙ্গে বুঝে-শুনে পরে তোমার কাছে যাচ্ছি।

সন্ধ্যাবেলা এলেন তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে। বললেন—যদি তুমি ওদের হিসেবে মাসে মাসে আলাদা কিছু টাকা দিতে রাজী হও, তা হলে আমি ওদের বাড়িতে রাখতে পারি। নইলে আমার বোনেরা ওদের বাড়িতে রাখতে রাজী হবে না।

ওদের হিসেবে মাসে মাসে চার টাকা করে দিতে রাজী হলেন বিদ্যাসাগর। তিন মাসের জন্যে বারো টাকা তক্ষুনি দিয়ে দিলেন। বললেন—এইভাবে তিন মাসের টাকা আগাম পাবেন। এ ছাড়া এঁদের কাপড় দেবার ভার আমার উপর রইল।

ওদের ছ' মাসের কাপড় বিদ্যাসাগর গুরুমশায়ের হাতে দিয়ে দিলেন।

স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে গুরুমশাই নিজের বাড়িতে চলে গেলেন। মাসে মাসে বিদ্যাসাগর এঁদের জন্য আরো চার টাকা দেবেন, গুরুমশায়ের বোনেদের তাই আর কোনো আপত্তি রইল না।

হিসেবমতো টাকা দিয়ে যাচ্ছেন বিদ্যাসাগর। মাস কয়েক পরে কলকাতা থেকে বীরসিংহে এসে প্রসন্নময়ী আর তাঁর মায়ের খোঁজ নিলেন।

ওঁরা কোথায়?

বোনেদের কথায় গুরুমশায় ওদের তাড়িয়ে দিয়েছেন।

ওদের জন্য মাসে মাসে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে নতুন মাসহারা পাওয়া যাচ্ছে, তবু ওদের তাড়ানো হল কেন? গুরুমশায়ের বোনেরা ভেবেছিল: বিদ্যাসাগরের দেওয়া নতুন মাসহারা পুরনো মাসহারার শামিল হয়ে গেছে, কোনো কারণেই আর সেটা বন্ধ হওয়ার নয়।

নিরুপায় হয়ে মা-মেয়ে কলকাতায় চলে গেছেন।

"কন্যাটি সুশ্রী ও বয়স্থা, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, এবং জননীর সহিত স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছে।"

১৮৬৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ রহিত করার জন্য দ্বিতীয়বার গবর্নমেণ্টের কাছে আবেদনপত্র দাখিল করেছেন।

১২৭৭ সালের শ্রাবণে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' লিখেছে : "এ দেশে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বহুবিবাহ কুপ্রথা এইবার বোধ হয় উঠিবে। লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নামে এক কুলীন ছয় বিবাহ করেন, কৃষ্ণমণি নামে তাঁহার এক স্ত্রী খোরপোষের দাবিতে নালিশ করিয়া মাসিক ১৫ টাকা ডিক্রি পান। জজ নর্মান সাহেবের নিকট এই বিষয়ের আপীল হইলে লক্ষ্মীনারায়ণ বলেন, "হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কুলীনকে স্ত্রীর ভরণপোষণ করিতে হয় না। আমার ছয় ছয় স্ত্রী, আমি কি প্রকারে প্রতিপালন করিব?" জজ সাহেব বলিলেন, "তুমি যদি খাওয়াইতে না পারিবে তবে বিবাহ করিলে কেন? এক্ষণে জেলে যাও। প্রত্যহ চার আনা করিয়া খোরাকি পাইবে।" দুর্ভাগ্য, ব্রাহ্মণকে জেলে যাইতে হইল!"

বহুবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রথম বই বেরিয়েছে ১৮৭১ সালের ১০ আগস্ট। বইখানার নাম : 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার।' ওই বইখানা থেকে দু-একটি অংশ উদ্ধৃত করি :

"যেসকল হতভাগ্য কন্যা স্বকৃতভঙ্গ অথবা দুপুরুষিয়া পাত্রে অর্পিতা হয়েন, তাঁহারা যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে বাস করেন। বিবাহকর্তা মহাপুরুষেরা কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া কন্যাকর্তার কুলরক্ষা অথবা বংশের গৌরববৃদ্ধি করেন, এইমাত্র। সিদ্ধান্ত করা আছে, বিবাহকর্তাকে বিবাহিতা স্ত্রীর তত্ত্বাবধানের অথবা ভরণপোষণের ভারবহন করিতে হইবেক না। সুতরাং কুলীনমহিলারা নামমাত্রে বিবাহিতা হইয়া বিধবা কন্যার ন্যায় যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে কালযাপন করেন। স্বামিসহবাস-সৌভাগ্য বিধাতা তাঁহাদের অদৃষ্টে লিখেন নাই; এবং তাঁহারাও সে প্রত্যাশা করেন না। কন্যাপক্ষীয়েরা সবিশেষ চেষ্টা পাইলে কুলীন জামাতা শ্বশুরালয়ে আসিয়া দুই-চারি দিন অবস্থিতি করেন; কিন্তু সেবা ও বিদায়ের ত্রুটি হইলে এ জন্মে আর শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করেন না।

কোনও কারণে কুলীন মহিলার গর্ভসঞ্চার হইলে তাহার পরিপাকার্থে কন্যাপক্ষীয়দিগকে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া জামাতার আনয়ন। তিনি আসিয়া দুই-এক দিন শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া প্রস্থান করেন। ঐ গর্ভ তৎসহযোগসম্ভূত বলিয়া পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়, জামাতার আনয়নে কৃতকার্য হইতে না পারিলে ব্যাভিচারসহচরী ভ্রূণহত্যাদেবীর আরাধনা। এ অবস্থায় এতদ্ব্যতিরিক্ত নিস্তারের আর পথ নাই। তৃতীয় উপায় অতি সহজ, অতি নির্দোষ ও সাতিশয় কৌতুকজনক। তাহাতে অর্থব্যয়ও নাই, এবং ভ্রূণহত্যাদেবীর উপাসনাও করিতে হয় না। কন্যার জননী, অথবা বাটীর অপর গৃহিণী একটি ছেলে কোলে করিয়া পাড়ায় বেড়াইতে যান, এবং একে একে প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া দেখ মা, দেখ বোন, অথবা দেখ বাছা, এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ করেন, অনেক দিনের পর কাল রাত্রিতে জামাই আসিয়াছিলেন; হঠাৎ আসিলেন, রাত্রিকাল, কোথা কি পাব; ভাল করিয়া খাওয়াতে পারি নাই; অনেক বলিলাম, এক বেলা থাকিয়া খাওয়া-দাওয়া করিয়া যাও; তিনি কিছুতেই রহিলেন না; বলিলেন, আজ কোনও মতে থাকিতে পারিব না; সন্ধ্যার পরেই অমুক গ্রামের মজুমদারের বাটীতে একটা বিবাহ করিতে হইবেক; পরে, অমুক দিন অমুক গ্রামের হালদারদের বাটীতেও বিবাহের কথা আছে, সেখানেও যাইতে হইবেক। যদি সুবিধা হয়, আসিবার সময় এই দিক দিয়া যাইব। এই বলিয়া ভোর ভোর চলিয়া গেলেন। স্বর্ণকে বলিয়াছিলাম, ত্রিপুরা ও কামিনীকে ডাকিয়া আন, তারা জামায়ের সঙ্গে খানিক আমোদ-আহ্লাদ করিবে। একলা যেতে পারিব না বলিয়া ছুঁড়ী কোনও মতেই এল না। এই বলিয়া সেই দুই কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, এবার জামাই এলে মা তোমরা যাস ইত্যাদি। এইরূপে পাড়ার বাড়ি বাড়ি বেড়াইয়া জামাতার আগমনবার্তা কীর্তন করেন। পরে স্বর্ণমঞ্জরীর গর্ভসঞ্চার প্রচার হইলে ঐ গর্ভ জামাতৃকৃত বলিয়া পরিগণিত হয়।"
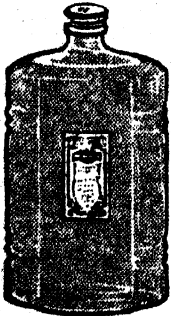
"কুলীনভগিনী ও কুলীনভাগিনেয়ীদের বড় দুর্গতি। তাহাদিগকে পিত্রালয়ে ও মাতুলালয়ে থাকিয়া পাচিকা ও পরিচারিকা উভয়ের কর্ম নির্বাহ করিতে হয়। পিতা যতদিন জীবিত থাকেন, কুলীন মহিলার ততদিন নিতান্ত দুরবস্থা ঘটে না। তদীয় দেহান্তরের পর ভ্রাতারা সংসারের কর্তা হইলে তাঁহারা অতিশয় অপদস্থ হন। প্রখরা ও মুখরা ভ্রাতৃভার্যারা তাঁহাদের উপর যার-পরনাই অত্যাচার করে। প্রাতঃকালে নিদ্রা-ভঙ্গ, রাত্রিতে নিদ্রাগমন, এ উভয়ের অন্তর্বর্তী দীর্ঘ কাল উৎকট পরিশ্রম সহকারে সংসারের সমস্ত কার্য নির্বাহ করিয়াও তাঁহারা সুশীলা ভ্রাতৃভার্যাদের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন না। তাহারা সর্বদাই তাঁহাদের উপর খড়্গহস্ত। তাঁহাদের অশ্রুপাতের বিশ্রাম নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না। অনেক সময় লাঞ্ছনা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে তাঁহারা আপন অদৃষ্টের দোষ কীর্তন ও কৌলীন্যপ্রথার গুণকীর্তন করিয়া থাকেন; এবং পৃথিবীর মধ্যে কোথাও স্থান থাকিলে চলিয়া যাইতাম, আর ও বাড়িতে মাথা গলাইতাম না, এইরূপ বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া মনের আক্ষেপ মিটান। উত্তরসাধকের সংযোগ ঘটিলে অনেকানেক বয়স্থা কুলীন মহিলা ও কুলীনদুহিতা, যন্ত্রণাময় পিত্রালয় ও মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া বারাঙ্গণাবৃত্তি অবলম্বন করেন।

"ফলতঃ কুলীন মহিলা ও কুলীন তনয়া-দিগের যন্ত্রণার পরিসীমা নাই।...... পৃথিবীর কোনও প্রদেশে স্ত্রীজাতির ঈদৃশী দুরবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না।...স্বামিগৃহবাস, স্বামিসহবাস, স্বামিদত্ত গ্রাসাচ্ছাদন কুলীনকন্যাদের স্বপ্নের অগোচর।

"এ দেশের ভঙ্গকুলীনদের মত পাষণ্ড ও পাতকী ভূমণ্ডলে নাই। তাঁহারা দয়া, ধর্ম, চক্ষুলজ্জা ও লোকলজ্জায় একেবারে বর্জিত। তাঁহাদের চরিত্র অতি বিচিত্র। চরিত্র বিষয়ে তাঁহাদের উপমা দিবার স্থল নাই। তাঁহারাই তাঁহাদের একমাত্র উপমাস্থল।—কোনও অতিপ্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা মহাশয়! আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকল স্থানে যাওয়া হয় কি। তিনি অম্লান মুখে উত্তর করিলেন, যেখানে ভিজিট (১) পাই, সেইখানে যাই।—গত দুর্ভিক্ষের সময় একজন ভঙ্গকুলীন অনেকগুলি বিবাহ করেন। তিনি লোকের নিকট আস্ফালন করিয়াছিলেন, এই দুর্ভিক্ষে কত লোক অন্নাভাবে মারা পড়িয়াছে, কিন্তু আমি কিছুই টের পাই নাই; বিবাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছি।—গ্রামে বারোয়ারিপূজার উদ্যোগ হইতেছে, ঐ বিষয়ে চাঁদা দিবার জন্য কোন ভঙ্গকুলীনকে-পীড়াপীড়ি করাতে তিনি চাঁদার টাকা সংগ্রহের জন্য একটি বিবাহ করিলেন।—বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণের উপযুক্ত অর্থ লইয়া গেলে কোন ভঙ্গকুলীন দয়া করিয়া তাহাকে আপন আবাসে অবস্থিতি করিতে অনুমতি প্রদান করেন; কিন্তু সেই অর্থ নিঃশেষ হইলেই তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।...বহুকাল স্বামীর মুখ দেখেন নাই; তথাপি কোনও ভঙ্গকুলীনের ভার্যা ভাগ্যক্রমে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। ব্যভিচারিণী কন্যাকে গৃহে রাখিলে জ্ঞাতি-বর্গের নিকট অপদস্থ ও সমাজচ্যুত হইতে হয়, এজন্য তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা পরামর্শ স্থির হইলে তাহার হিতৈষী আত্মীয় এই সর্বনাশ নিবারণের অন্য কোনও উপায় করিতে না পারিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া তদীয় স্বামীকে আনাইলেন। এই মহাপুরুষ অর্থলাভে চরিতার্থ হইয়া সর্ব-সমক্ষে স্বীকার করিলেন, রত্নমঞ্জরীর গর্ভ আমার সহযোগে সম্ভূত হইয়াছে।"

"বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে অশেষ প্রকারে হিন্দুসমাজের অনিষ্ট ঘটিতেছে। সহস্র সহস্র বিবাহিতা নারী যারপরনাই

---

(১) ডাক্তারেরা চিকিৎসা করিতে গেলে, তাঁহাদিগকে যাহা দিতে হয়, এ দেশের সাধারণ লোকে তাহাকে ভিজিট (visit) বলে।

যন্ত্রণাভোগ করিতেছেন। ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। দেশের লোকের যত্নে ও চেষ্টায় ইহার প্রতিকার হওয়া কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। সম্ভাবনা থাকিলে তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকিত না।...বস্তুতঃ রাজশাসন দ্বারা এই নৃশংস প্রথার উচ্ছেদ হইলে সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল ঘটিবেক, তাহার কোনও হেতু বা সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না।...আমাদের ক্ষমতা গবর্নমেণ্টের হস্তে দেওয়া উচিত নয়, এ কথা বলা বালকতা প্রদর্শন মাত্র। আমাদের ক্ষমতা কোথায়। ক্ষমতা থাকিলে ঈদৃশ বিষয়ে গবর্নমেণ্টের নিকটে যাওয়া কদাচ উচিত ও আবশ্যক হইত না; আমরা নিজেই সমাজের সংশোধনকার্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম। ইচ্ছা নাই, চেষ্টা নাই, ক্ষমতা নাই, সুতরাং সমাজের দোষ সংশোধন করিতে পারিবেন না; কিন্তু তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিলে অপমানবোধ বা সর্বনাশজ্ঞান করিবেন, এরূপ লোকের সংখ্যা বোধ করি অধিক নহে; এবং অধিক না হইলেই দেশের ও সমাজের মঙ্গল।"

ক্রমশ

মোক্ষলাভের পথে —জওয়ারচাঁদ দাশানি

সম্প্রতি কলিকাতায় শিল্পী স্মরজিৎ গুপ্ত, জয়ারচাঁদ দাশানি, সুকুমার দাস, বারীন দে ও রাজ বর্মা প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। এ ছাড়া ক্যানভাস শিল্পী গোষ্ঠী তাঁদের প্রথম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

স্মরজিৎ গুপ্ত মোনালিসা গ্যালারীতে মোট ১১ খানি নিদর্শন পেশ করেন। তার মধ্যে চারখানি গ্রাফিক ও তিনখানি প্রতিকৃতি। এই শিল্পী মুখ্যত বাস্তবধর্মী

সারেংগী বাদক —স্মরজিৎ গুপ্ত

—জলরঙ ও প্যাস্টেল মাধ্যমেই অধিকাংশ কাজ করেছেন। ইনি যে প্রাথমিক অংকন-কার্য যত্নসহকারে শিক্ষা করেছেন সেটা এ'র কাজ দেখেই বোঝা যায়। প্রতিকৃতিগুলি প্রশংসার যোগ্য। তবে আপাতদৃষ্টিতে এ'র রচনা ভাল লাগলেও বাস্তবানুগ রীতি ও দৃষ্টিকোণ যেন যুগের অনুপযোগী বলে মনে হয়। ছবির মধ্যে 'ড্রিম' উল্লেখযোগ্য। গ্রাফিক মাধ্যমে বোধ হয় এই শিল্পী স্বীয় বক্তব্যটুকু অধিক প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করতে পারেন। বিশেষভাবে 'সারেংগী বাদক' ও 'ক্যাকটাস'-এর নাম এই প্রসংগে করা যেতে পারে।

জয়ারচাঁদ দাশানির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে। এই শিল্পী শান্তিনিকেতন কলাভবনে শিক্ষালাভ করেন এবং বর্তমানে সেখানে জৈনধর্ম সম্বন্ধীয় চিত্রকলা বিষয়ে গবেষণা করছেন। কলিকাতায় এটি তাঁর দ্বিতীয় প্রদর্শনী। জৈন ধর্মের মতবাদ, বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন উপাখ্যান তিনি বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। প্রথাগত চিত্র ও দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে খোদাইকরা ভাস্কর্যশিল্প এই শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করে—ফলে এ'র ছবিতে মন্দির ভাস্কর্য কলার ছাপ দেখা যায়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সব স্থলে ইনি কিন্তু নকল করেন নি, অনেক স্থলেই প্রথাগত রীতির সংগে পাশ্চাত্ত্য রীতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। ফলে কয়েকটি ছবি প্রকাশ ভংগিমার দিক থেকে মনুমেন্টাল রিয়ালিজমের অন্তর্গত হয়েছে এবং বৃহৎ আয়তনের মধ্য থেকে ছবিগুলি যেন দর্শকদের আকর্ষণ করে। যেমন 'দি গ্রেট অফারিং' ও 'টুওয়ার্ডস স্যালভেশন'। দ্বিতীয়টিতে সন্দেহদগ্ধ ও নির্যাতিত মানবজাতির অসহায় অবস্থাটুকু শিল্পী অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শিল্পীর অন্য কয়েকটি কাজ আবার বাস্তবধর্মী প্রাচীরচিত্র জাতীয় —দেখে অনেকের সারনাথ মূলগন্ধকুঠি-বিহারে খ্যাতনামা জাপানী শিল্পী কোয়েংসু নোসু রচিত বুদ্ধ জীবনালেখ্যর কথা মনে পড়বে। এই প্রসঙ্গে 'ড্রিম অব রাজিমাতি' উল্লেখযোগ্য।

ক্যানভাস শিল্পী সম্প্রদায় বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার গ্যালারীতে তাঁদের প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রথম অনুষ্ঠানে সাতজন
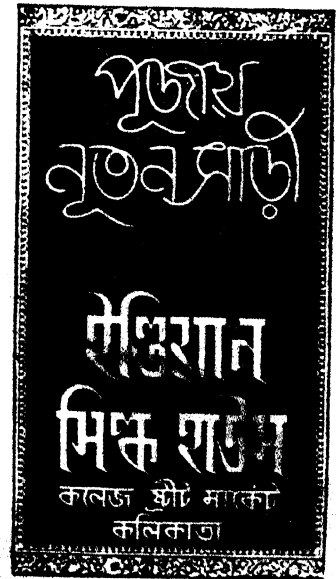
শিল্পী ও দুজন ভাস্কর মোট ৩৬টি নিদর্শন পেশ করেন। এই সংস্থার সব সভ্যই তরুণ এবং অনেকেই সম্প্রতি শিক্ষা-লাভ সমাপ্ত করেছেন। অতএব প্রায় সকলের কাজেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহলেও কাজগুলি দেখে বোঝা যায় যে সকলেই বেশ নিষ্ঠাসহকারে আপন আপন রুচি ও মাধ্যমে রচনা করেছেন। এ'দের মধ্যে অধিকাংশই আধুনিক ও বিমূর্ত রীতির পক্ষপাতী. তাহলেও আকারবোধ ও রঙ বিন্যাসের জন্য আলোক ভট্টাচার্য (কম্পোজিশন-১), বরেন বোস (কম্পোজিশন-১৬), বলাই কর্মকার (রেন্ট) ও অশোক বিশ্বাস (বৃক্ষ-১)-এর নাম করা যায়। পরিমল দত্ত রায়ের 'আসাম-সি' উল্লেখযোগ্য। তবে এ কথা সত্য যে প্রদর্শনীতে ভাস্কর্য বিভাগের মান অধিকতর উন্নত ছিল। সুধীর ধর ও মানিক তালুকদার উভয়েরই গঠন কার্যে রুচি ও প্রগতির পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে মানিক তালুকদার মাত্র কাঠ ও পেরেক মাধ্যমে সত্যই যেন সাবলীল এক কাব্যছন্দের সৃষ্টি করেছেন (ফরম নং ২)। এই সঙ্গে সুধীর ধরের কম্পোজিশন ১ ও ২ সকলের দৃষ্টি

খণ্ডিত —বারীন দে

আকর্ষণ করে। অদূর ভবিষ্যতে এই দুইজন তরুণ ভাস্করের নূতন গঠন নিদর্শন দেখার আশা রাখি।

শিল্পী সুকুমার দাসের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে। এই শিল্পী ২৮খানি ছবি পেশ করেন এবং সব কয়টিই গত কয়েক মাসের মধ্যে আঁকা।

সুকুমার দাস সাধারণত জল রঙ মাধ্যমে আঁকেন, যদিও তেল রঙে আঁকা কয়েকটি নিদর্শন ছিল। বিষয়বস্তু ও অংকনরীতি উভয় দিক থেকেই তিনি যেন মধ্যপথ অবলম্বন করেছেন—অর্থাৎ একদিকে যেমন কয়েকটি বিমূর্ত রচনা করেছেন অন্যদিকে আবার সেই রকম রিয়ালিস্টিক প্রথায় বিশেষ কোনও বিষয়বস্তুকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রাথমিক আকারভিত্তিক অথবা

নির্বাক —রাজবর্মা

অধিকাংশ বিমূর্ত রচনাতেই কোন মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায় না (৫, ২৫, ১৮, ১২ নং)। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর ভাষা অস্পষ্ট—যেমন 'দি রেড সিটি'। ছবির মধ্য দিয়ে শিল্পী যা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন দর্শকের পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব হয়নি। তবে এ শিল্পীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অলংকারপ্রিয়তা। বিভিন্ন রঙে পৃষ্ঠভূমি ভরিয়ে ফেলে তার ওপর কয়েকটি—সম্ভবত তুলির পশ্চাৎ ভাগ দ্বারা—আঁচড় টেনে শিল্পী ছবিতে অতি সরল ও সংক্ষিপ্ত অলংকার বৈচিত্র্য আরোপ করার চেষ্টা করেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলতা লাভও করেছেন—যেমন, পিকক ও স্টিল লাইফ। ছবি দুখানি সকলেরই চোখে পড়ে। অন্যান্য ছবির মধ্যে ১৮নং উল্লেখযোগ্য।

ওয়েস্ট বেংগল আর্টিস্টস্ ইউনিয়নের উদ্যোগে শিল্পী বারীন দে-র প্রদর্শনীর আয়োজন হয় দক্ষিণ কলিকাতার মোনালিসা গ্যালারীতে। এ-শিল্পী নিয়মিতভাবে কোন আর্ট স্কুলে শিক্ষালাভ করেননি। ছবি এঁর ভাল লাগত দেখতে এবং আঁকতেও। তাই শেষ পর্য এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারের পেশা ত্যাগ করে ইনি এখন অংকন কাজেই আত্মনিয়োগ করেছেন। সুতরাং এক হিসাবে এখনই এঁর কাজে পেশাদার শিল্পীর বৈশিষ্ট্য বা মুন্সীয়ানা আশা করা সমীচীন হবে না। তবে এ কথা বলা চলে যে, এঁর কাজের মধ্যে নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় কথা, শিল্পী নিজের পরিমিত ক্ষেত্রটুকুর বিষয়ে সচেতন এবং প্রদর্শনীতে মাত্র আটখানি নিদর্শন রেখে সুরুচি ও বিচারবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

এ-শিল্পী নীরব ও নিরুত্তাপ রঙের পক্ষপাতী। তেলরঙে রচিত কয়েকটি ছবিতে যেন গাম্ভীর্য ও সমাহিত ভাবের ছাপ পাওয়া যায়। দুই-একটি প্রথাগত ইংরাজী প্রাকৃতিক দৃশ্যের পটভূমিতে আঁকা, যদিও সেই রীতির সঙ্গে তিনি আধুনিক মাধ্যমের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন—যেমন 'এ ড্রিম' পৃষ্ঠভূমিতে কয়েকটি প্রতীক জাতীয় বিভিন্ন রঙের আঁচড়ের সঙ্গে বাঁদিক ও পটভূমিতে কালি ব্যবহার করার ফলে ছবিখানি যেন অলীক স্বপ্নেরই রূপ ধারণ করেছে। কয়েকটিতে শিল্পী চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন—যেমন 'মিরেজ'। প্রধানত লাল ও হলদে রঙের মধ্য দিয়ে তিনি মরীচিকার মিথ্যা মায়াজাল বিস্তার করেছেন। অন্যান্য ছবির মধ্যে ২নং ও ৭নং উল্লেখযোগ্য।

শিল্পী রাজ বর্মা প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে। রাজ বর্মার বয়স অল্প; ইনি ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেণ্টে একজন শিক্ষার্থী—সুতরাং ইনিও বিধিবদ্ধভাবে কোন আর্ট স্কুলে শিক্ষালাভ করেননি—তবে ছবি আঁকার প্রতি এঁর ঝোঁক ছিল এবং গত ২।৩ বছর যাবৎ ছবি আঁকছেন। ইনি তেলরঙ ও প্যাস্টেল মাধ্যমে কাজ করেন, তবে এঁর রচনার মধ্যে বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট রীতির সন্ধান পাওয়া যায় না। কয়েকটি প্রথাগত কাজের নিদর্শন দেখে মনে হয়, প্রাথমিক অংকন কাজে ইনি একেবারে অপটু নন। (২৪ ও ৬নং)। ইনি বিমূর্ত রচনারও চেষ্টা করেছেন—প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে হয়ত কয়েকটি মন্দ লাগে না—যেমন ৫ ও ২৩নং। তবে প্যাস্টেলের ছবির মধ্য দিয়েই এ-শিল্পীর অংকনশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় (৩১, ৩২ ও ২৬নং)। ড্রয়িংয়ের মধ্যে একটি ছোট্ট কাজ বিশেষভাবে চোখে পড়ে (২৮নং)। হতভাগ্য সদ্য বিধবা এক

ময়ূরীর মর্মান্তিক বেদনা ও অসহায় অবস্থা এ-শিল্পী কয়েকটি রেখা মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। অপরাপর ছবির মধ্যে ১১ ও ১(এ)-র নাম করা যেতে পারে।

*

ভাস্করদের কাজ করার সুবিধার জন্য সম্প্রতি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস কর্তৃপক্ষ একটি স্টুডিওর উদ্বোধন করেন। নানা মাধ্যমে যাতে ভাস্কর-শিল্পীগণ কাজ করতে পারেন সে-জন্য স্টুডিওর ভিতরে যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, ছোট হলেও এটি ভাস্করশিল্পীদের এক প্রধান অসুবিধা দূর করবে।

*

সম্প্রতি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। মহাজাতি সদন, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয় ও অন্যান্য স্থলে আহূত সভায় শিল্পীর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী আর্ট কলেজে শিল্পীর চিত্র-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। এছাড়া অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর স্থায়ী গ্যালারীতে রক্ষিত গগনেন্দ্রনাথের আঁকা কয়েকখানি ছবিও সর্বসাধারণকে দেখবার সুযোগ দেওয়া হয়। বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শিত গগনেন্দ্রনাথের ছবির সমগ্রভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব আগামী সংখ্যায়।

—চিত্রপ্রিয়

RB/FC/B/222

আপনি
নিজেকে
লাবণ্যের দ্বারা
ঘিরে রাখুন

'হাকোবা' - মার্কে শিল্পনৈপুণ্য বিশিষ্ট কাপড়ের "ট্রেডমার্ক", প্রস্তুতকারক:– ক্যানো করপোরেশন লিমিটেড, ১৬, এপলো ষ্ট্রীট, ফোর্ট, বোম্বাই-১

প্রধান ডিলারগণ :

বিমলকুমার শিউকুমার, ১৮০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ * রাধাকৃষ্ণ কাপুর, ২৬ মদনমোহন বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭ * রামস্বরূপ অ্যান্ড কম্পানি, ১৭ নূরমল লোহিয়া লেন, ৩য় তল, কলিকাতা-৭

আলা-টাও পর্বতে ভ্রমণরত আলমা আটার স্কুল নং-৪'এর ছাত্ররা
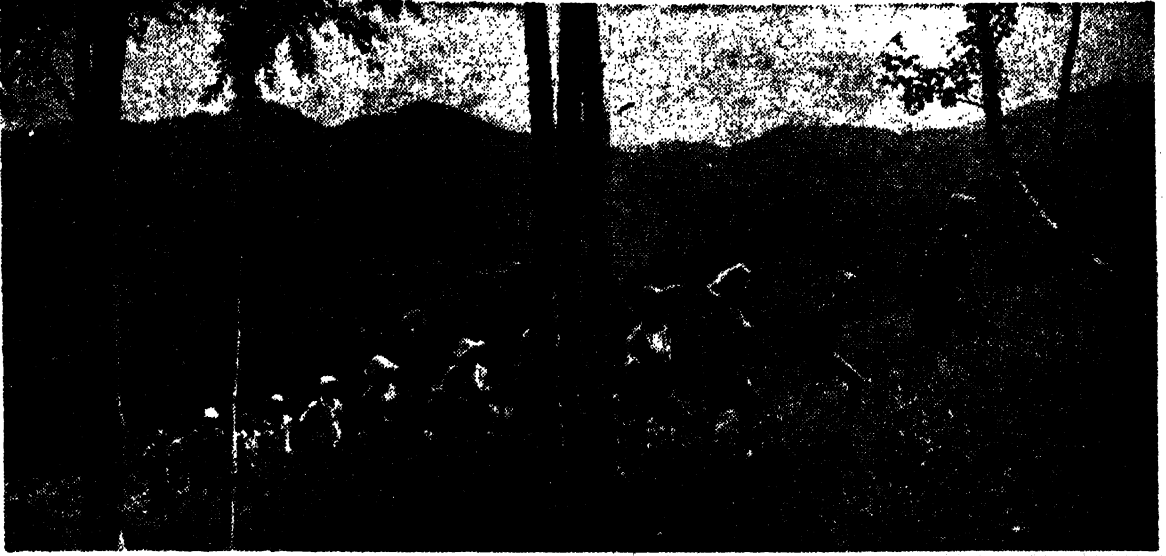
মধ্য গ্রীষ্মে মস্কোর মধ্যাঞ্চলে যদি হঠাৎ হাজারো রকমের মিনি-স্কার্ট মেয়ের মজা দেখা যায় তবে তার কারণ আর কিছুই নয় সময়টা মধ্য গ্রীষ্ম। মস্কো পশ্চিমী হয়ে উঠেছে বলে ধরার কারণ নেই, বরং পশ্চিমই এসেছে মস্কোয়। মনে পড়ছে, সম্ভবত সার্ত্রের কোনো একটি চরিত্র এই বলে খেদ করেছিল যে লোকে প্যারিস দেখতে আসে এমন সময় যখন আসল প্যারিসীয়রা সবাই প্যারিস ছেড়ে চলে গেছে। কথাটা বোধ হয় ইউরোপের আরো আরো অনেক শহর সম্পর্কেই খাটে কিন্তু বিশেষ করে খাটে মস্কোর বেলায়। গরম পড়তেই সর্বাগ্রে অদৃশ্য হয় শিশুরা। রাস্তার ট্রাফিক থামিয়ে ভেঁপু বাজিয়ে নিশান উড়িয়ে তখন দিনের পর দিন চলতে থাকে পাইয়োনিয়রদের বাসের মিছিল— শহরের বাইরে নানান পাইয়োনিয়র ছাউনিতে তিন মাস বনযাপন একটা মহা উৎসব তাদের কাছে। অতঃপর দাদা-দিদিরাও কোমর বাঁধে। সমুদ্রতীর ও পাহাড়-তলির প্রায় পাঁচশ স্বাস্থ্যশহরের সবকটি স্যানাটোরিয়ম ও আরাম-কুটির এবং সারধানী, স্বাস্থ্যলোভী বা কৃতকর্মা পুরুষে ভরে উঠলেও তরুণদল সাধারণত ছুটি কাটানোর যে পন্থাটা পছন্দ করে সেটাকে এরা বলে 'দিকি' বা বা বুনো। তার অর্থ, কোনোক্রমে টিকিট কেটে উঠে পড়ো, গিয়ে নামো, হোটেলের অপেক্ষায় না থেকে স্থানীয় গৃহস্থ বাড়িতে ঘরে হোক, বারান্দায় হোক, আঙিনায় হোক; পারলে একটি ক্যাম্প খাট ভাড়া নাও, না পারলে কিছু একটা ভেবে বার করো, তারপর টো-টো করে ঘোরো সারা দিন, পঞ্চাশ বার সমুদ্রে ঝাঁপ দাও, ভেজা গায়ে চিত হয়ে থাকো বালির ওপর, দু ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে দু মুঠো খাবার জোটাও, তারপর সন্ধ্যে ঘন হয়ে এলে ঘনিষ্ঠ কাউকে নিয়ে গান ধরো। বা কাছের ট্যুরিস্ট কেন্দ্রে বিনা আমন্ত্রণে গিয়ে যোগ দাও নাচে।

কর্মসূত্রে বাকি যারা মস্কো ছাড়তে পারল না, তাদের জন্যে আছে 'ডাচা' অর্থাৎ পল্লীভবন বা বাগানবাড়ি। অন্নবস্ত্রের মতো এটাকেও এখানে ধরা হয় প্রায় একটা প্রাথমিক প্রয়োজন হিসাবে। প্রতি নাগরিক পিছু কুড়ি বর্গ মিটার শহরে বাসা এবং দশবর্গ মিটার পল্লীভবন এবং তদুপরি পরিবার পিছু ৩০০ বর্গ মিটার বাগান জমি— এ হিসেবটা এখনো পর্যন্ত ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের স্তরে থাকলেও আমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি সেখানকার মধ্য আয় ও নিম্ন মধ্য আয়ের এমন কাউকে কদাচিৎ দেখেছি যে তার নিজের অথবা ভাড়া করা 'ডাচায়' গরম না কাটায়। আর মাধুর্যে এ পল্লীভবন সমুদ্র পাহাড়ের উত্তেজনার কাছেও হার মানবার নয়। লম্বা লম্বা শাল-গাছগুলোর গুঁড়ি যদি হত রুপোলী সাদা, পাতাগুলো যদি হত ঝিলমিলে সবুজ, মোট বাড়িগুলো যদি রঙীন কাঠের খেলনার মতো, তাহলে বীরভূমের কোনো কোনো সাঁওতালী গ্রাম দেখে হয়ত আন্দাজ করা যেত বার্চ বনের কোলে রুশী পল্লী-ভবন অত আদরের কেন।

সে আদর এ বছর আরো বেড়েছে ফিন-ল্যাণ্ডীয় কুটির সমেত নতুন 'ডাচা' জমি

মস্কো স্কুল-৩১ সংলগ্ন ট্যুরিস্ট ক্যাম্পের সদস্যদের পদযাত্রা

বিদের এক ঢালাও প্রকল্পের জনাই শুধু নয়, প্রায় সর্বত্রই পঞ্চদিবসী সপ্তাহ প্রবর্তন চালু হয়ে আসার ফলে। কাজের মোট ঘণ্টা অবশ্য কমে নি—মোটামুটি ৪১ ঘণ্টা, কিন্তু রুশ বিপ্লবের অর্ধশতকী বার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির থিসিসে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সে অনুসারে মস্কোয় ইতিমধ্যেই প্রায় সমস্ত কল-কারখানায় লোকে আজকাল খাটছে সপ্তাহে পাঁচদিন। ফলে দু' দিন ছুটিয়ে ছুটি, তাই ছোটো ডাচায়।

এ সবের ফলেও যদি গরমের মস্কো গরমের পুকুরের মতো এখনো শুকিয়ে খাঁ খাঁ করে না উঠে থাকে তবে তার কারণ তার তিনটে বড়ো বড়ো বিমান বন্দর আর গোটা ছয়েক বড়ো বড়ো রেল স্টেশন দিয়ে যত লোক বন্যাবেগে নিঃসৃত হয়ে যায় হু হু করে, প্রায় ঠিক তত ট্যুরিস্টই আবার ঠিক ওই স্টেশনগুলো দিয়েই ঢোকে। সঠিক হিসাব না জানলেও শুনেছি এবার সফর-কারীর সংখ্যা গত বছরের দ্বিগুণ। মস্কোর কেন্দ্রে অচেনা কারো সঙ্গে কথা বলতে হলে আগে ভেবে নিতে হয়, রুশীতে বলব, নাকি ইংরেজিতে, নাকি অন্য কিছু?

এবারকার লোক সমাগমের এত হিড়িক অবিশ্যি বিপ্লবের পঞ্চাশত্তম জয়ন্তীর জন্য। এমনিতেই একটা না একটা মেলা উৎসব প্রদর্শনী মস্কোয় লেগেই থাকে, এবার তার সঙ্গে আরো কিছু ধুমধাম যে যোগ হবে তা বলাই বাহুল্য। বিখ্যাত বলশয় গরমে তার দরজা বন্ধ করলেও যবনিকা তুলে এগিয়ে আসছে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সংস্কৃতি দল।

পালা করে নিজেদের নাচ গান কাব্য সঙ্গীতের পসরা দেখিয়ে গেল জর্জীয়, আর্মেনীয়, উজবেক, বেলোরুশী; আজার-বাইজানীরা। যারা এখনো দেখায়নি, একে একে তাদের উৎসব আসছে। সূত্রটা এক—বিপ্লবকে ঘিরে বিভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যসম্ভার ও ঐক্যবোধ। মানেশ চকের বিরাট প্রদর্শনী হলটা আর খালি থাকার ফুরসত পাচ্ছে না। ফোটো শিল্পীরা তাঁদের পঞ্চাশ বছরের ফোটোগ্রাফ দেখানো শেষ করতেই চিত্রশিল্পীরা তাঁদের পঞ্চাশ বছর শুরু করেছেন।

অন্যদিকে চলেছে নানান রকমের আন্তর্জাতিক আসর। প্রকাশন কলার এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী খুলল সকোলনিক পার্কে, প্রধানত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মুদ্রণশৈলী ও প্রকাশ-পারিপাট্যের নমুনা হিসাবে কুড়ি হাজার বই। সেটা মিটতে না মিটতেই পঞ্চম আন্তর্জাতিক ফিল্ম উৎসবে মস্কো জমজমাট। সাতাত্তরটি দেশ থেকে আটশ'র বেশি অতিথি। মস্কো হোটেলের সামনে অটল জনতার উৎসুক ফিসফাস। অটোগ্রাফের কাড়াকাড়ি। সেই সঙ্গে পঞ্চাশ বছরের সেরা সোভিয়েত ফিল্মের এক পশ্চাৎ-প্রেক্ষিত প্রদর্শনী। এ উৎসবের অন্যান্য সব নগদ বিদায়ের কথা ছেড়ে দিলেও শুধু এইটুকুর জন্যেও আন্তর্জাতিক ফিল্ম প্রেস সংগঠনের জুরির সভাপতি ইতালীয় ফিল্ম সমা-লোচক লিনো মিচিমিচে একটি ডিপ্লোমা দিয়ে অকুণ্ঠে বলতে পারলেন, পঞ্চাশ বছরে সোভিয়েত সিনেমা যা সাধন করেছে, তার প্রতি বিশ্বের ফিল্ম সমা-লোচকদের শ্রদ্ধা ও সমীহের একটি সামান্য প্রতীক এটি।'

পর্দার দিকে চেয়ে থাকা যখন ফুরুল, তখন মাটির দিকে চোখ নামাতেই দেখা

গেল গোর্কি পার্কের নদীতীর হয়ে উঠেছে এক অপ্রাকৃত চারণভূমি। মেজ-গোরমাশ-৬৭ আসর জমিয়েছে সেখানে—অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের আন্তর্জাতিক যান যন্ত্র প্রদর্শনী। কিন্তু জাগতিক ও জগৎ-বহির্ভূত যত রকম পোকামাকড়ের অমানবিক কৃতিত্ব লক্ষগুণ বাড়িয়ে তোলা এইসব গলা-বাড়ানো, নাক-নামানো, দাঁত-বাগানো, পিঠ-ফোলানো ফিকির-গুলো কী আর করতে পারতো যখন শুধু মস্কোর নয়, সম্ভবত দুনিয়ার সব চোখ উঠে গেছে আকাশে। পঞ্চাশ বছরের জয়ন্তীতে কিছু একটা দেখব-দেখব করে যত ট্যুরিস্ট এ গ্রীষ্মে ক্যামেরা ঝুলিয়ে ঘুরপাক খেয়েছে অথচ জানত না ঠিক কোন্ জিনিসটা দেখা যাবে, তাদের সেই না-দেখাটা অবশেষে চমক দিলে দোমো-দেদভো বিমানক্ষেত্রের আকাশে। দিনটা ছিল ঠিক বিমান উৎসবে যেমনটি চাই। বিশ্বের বৃহত্তম লম্বা মেয়াদী ভারবাহী ২৫০ টনী বিমান আন-২২-এর আগেই দেখা মিলেছিল প্যারিস প্রদর্শনীতে। ১৮৬ আসনের ইল-৬২ ইত্যাদির কথা আগেই শোনা গিয়েছিল। এবার দেখা গেল দৌড় না দিয়েই বিমান লম্ব রেখায় সোজা উঠছে আকাশে। সুপারসনিক দানবগুলো স্টার্ট নিচ্ছে প্রায় রকেটের মতো। আমেরিকাকে টেক্কা দিয়ে সুইং-উয়িং ফাইটারগুলো ডানা মুড়ে এই হয়ে উঠছে লম্বাটে ত্রিভুজ, গতি যাতে সর্বোচ্চ; এই আবার ডানা মেলে তৈরি হচ্ছে সহজে নামা কি দূরপাল্লা ওড়ার জন্যে। তীক্ষ্ম গতিশক্তির সঙ্গে তুমুল নমনীয়তা।

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক চাঞ্চল্যটা যদি ইতিমধ্যে খানিকটা বাসি লাগে, তা হলে সত্যিই চমকে দেব কি আমাদের নির্বিজ্ঞান মনকে? বলব কি, মস্কোয় ঠিক এই মুহূর্তে /যেখানে সবচেয়ে বেশি লোক ভিড় করছে, সে জায়গা দুটো আর কিছুই নয় আন্তর্জাতিক পোশাক প্রদর্শনী এবং আন্তর্জাতিক ফ্যাশান উৎসব? হাঁ, বিপ্লবের দেশে। পঞ্চাশ জয়ন্তীর বছরেই। মস্কোর কবরী-শিল্পীরা ও বছর প্যারিস থেকে পুরস্কার জিতে এনেছিল, বেশ-শিল্পীরাও কি পিছিয়ে থাকবে? হাঁটুর ওপর ছয় ইঞ্চি উঁচু মিনি স্কার্ট এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় হাঁটুর নিচে ছয় ইঞ্চি নামা ম্যাকস্ স্কার্ট যারা দেখাতে এসেছে, তাদের সামনে কেনই বা কিছু দেখাবার থাকবে

না মস্কো মডেলিয়ারদের? মনে হয় যেন প্রায় এমনিধারা একটা সুর ফুটেছিল সেই রুশ মেয়েটির গলায় যে প্রদর্শনীর অনাড়ম্বর ভারতীয় স্টলটায় আরও কী যেন খুঁজেছিল, রোদ-পোড়া রোগা ফরাসী মেয়েদের রঙ-করা চোখের দিকে চেয়েছিল বিনা বিদ্রূপে, হাঙ্গেরী, ডেনমার্ক

সোভিয়েট ইউনিয়নে বেড়াবার অঞ্চল বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে

ইতালীয় অথবা জার্মান স্টলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নকশা এঁকে নিয়েছিল নানা ফ্যাশনের, জাপানদের উদ্ভাবনের উচ্ছলতা ও উজ্জ্বলতায় মুগ্ধ হয়েছিল এবং তা সত্ত্বেও বলেছিল, ‘আমার মতে, সোভিয়েত প্যাভিলিয়ন অদ্বিতীয় না হলেও অন্তত দ্বিতীয়।’ মেয়েটি আদৌ ফ্যাশন-বিরোধী নয়। ঠোঁটে রং, পায়ে হিল এবং চুলে শোভা নিয়ে কোনো নারী রাস্তায় বেরুলে তাকে নিগৃহীত হতে হবে, এমন আমলে পৌঁছবার জন্য তার কোনো আগ্রহ নেই। এবং না থাকলে কীই-বা বলা যাবে, যখন বিপ্লব করলেও এরা অনায়াসে গর্কিকে ছাড়াও কদর করতে পারে কোনো রূপ-রঞ্জন রবীন্দ্রনাথ বা তাদের নিজেদের মৃদুভাষী চেখভকে, যাঁর এ কথাটা প্রায় প্রতিটি তরুণ-তরুণীর মুখস্থ: “মানুষের হওয়া চাই সবই সুন্দর, তার মুখাবয়ব, তার সজ্জা, তার অন্তর, তার চিন্তা।”

পুচ্ছাংশ: এদের পঞ্চাশ বছরের সঙ্গে এবার আমাদেরও একটা বার্ষিকী মিলেছিল, স্বাধীনতার কুড়ি বছর। স্বভাবতই ঘটা করে ভারতের প্রতি শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্ব কামনার নানা অনুষ্ঠান ও ভারতাগত সংস্কৃতি দলের সফরান্তে একদিন হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল: ‘ননীবাবু? আমি জসিমুদ্দিন বলছি।’

কয়েক মুহূর্ত লাগল সামলাতে। জসিমুদ্দিন? কবি জসিমুদ্দিন? পূর্ব-পাকিস্তানের? ছেলেবেলায় পাঠ্যপুস্তকে যাঁর কবিতা পড়ে বড়ো হয়েছি, যিনি একদা কলকাতায় থাকলেও কদাচ আমার দেখেননি?

ভুলে গিয়েছিলাম যে, বছরটা পাকি-স্তানেরও কুড়ি বছর, এবং......এবং যে বাঙালীদের দেশে সাক্ষাৎ এত অসম্ভব, তাদের এমন আলাপ কি আর কোথাও হতে পারত?

টেলিফোনের ওপাশ থেকে ভেসে এল: ‘একটু ডাল-ভাত খাওয়াতে পারেন?’

ননী ভৌমিক

২রা সেপটেম্বর

চেষ্টা করছিল পুষ্পরাজ। লেখাপড়া বেশী-দূর করেনি সে, লিখতে লিখতে অনেক কাটাকুটি করছিল, দু-তিনটে চিঠি অর্ধেক লিখে ছিঁড়ে ফেলে প্যাড কলম—সব সরিয়ে রেখে উষার দিকে তাকিয়ে তামিল বলার মতন উচ্চারণে ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে জিজ্ঞেস করল, "তবিয়ৎ ঠিক নেই হ্যায়?"

উষা তার যন্ত্রণাকাতর মুখ প্রসন্ন করে তোলবার খুব চেষ্টা করতে-করতে হাসল, "থোড়াসে চোট লাগ গিয়া কাল—"

"কেয়া হুয়া? কাল কুছ নেই বোলা?"

"নেই নেই, জাস্তি কুছ নেই—" মনে মনে বাংলার অশুদ্ধ হিন্দী তর্জমা করতে করতে উষা উঠে বসে বলল, "উ কিশোরী বহুৎ খোকা ছোকরী হ্যায় না, উসকো সামান দেনেকো টাইমমে হামরা পেটমে থোড়াসে চোট লাগ গিয়া—"

"পেটমে?" বিরক্তির কয়েকটা রেখায় মুখ বিশ্রীরকম তেতো-তেতো হয়ে উঠল পুষ্প-রাজের। বিচলিত হয়ে সে উষার পাশে এসে দাঁড়াল, ইতস্তত না করে রুঢ় হাতে তার পেটের কাপড় সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ক মাহিনা হুয়া?"

লজ্জার একটা আভা ছড়িয়ে গেল উষার মুখে। তাড়াতাড়ি পেটের কাপড় নামিয়ে সে বাইরে তাকিয়ে দেখল কাছাকাছি কোন মানুষ আছে কি-না। পরে মাথা নিচু করে পায়ের আঙুল দেখতে-দেখতে আস্তে বলল, "তিন মাহিনা—"

ঠোঁটে আঙুল ঘষতে ঘষতে কবে উষার প্রসব বেদনা উঠবে তার হিসেব করে নিল পুষ্পরাজ এবং আবার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে কোলের ওপর চিঠি লেখার প্যাড তুলে নিয়ে বলল, "টাইম বহুৎ কম! আউর কেতনা দিন নম্বর করনে সেকেগা তুম!"

হঠাৎ পুষ্পরাজের অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠার কী কারণ উষা বুঝল না। কোন অপরাধ না করলেও অন্যায় কাজ করার মতন একটা গ্লানি তার গলার ভেতরে ফেনিয়ে উঠছিল বলে সে তার পা দেখতে দেখতেই অস্ফুট স্বরে বলল, "লড়কা হোনেকা দিন তক হাম নম্বর করেগা।"

পুষ্পরাজ চিঠি লিখতে গিয়েও লিখতে পারল না, উষার কথা শুনে কলম দিয়ে কাগজের ওপর খসখস আঁচড় কাটতে কাটতে মোমের আলো নিবিয়ে ফেলার মতন ফুৎকারের ছোট একটা শব্দ উচ্চারণ করল, "ফুঃ!" পরে উষার পেটের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বলল, "কেয়া বলতা তুম বেকার বাত! আউর দু-এক মহিনা বাদ কোম্পানী ছুট্টি দে দেগা তুমরা, নম্বর করনে নেই দেগা—" সে একটু চুপ করে থেকে অসহায়ের মতন কলম কামড়ে ধরল, "কেয়া হোগা তব? রুপেয়া কা বহুৎ দরকার!"

পুষ্পরাজের হেঁয়ালীর মতন কথার অর্থ

উষা বুঝতে পারল না। পেটের কোন ভার এখন অনুভব না করলেও, তার মন ভারী হয়ে উঠল—মুখও বিবর্ণ। বাইরে তাজা রোদ খেলছে, পুষ্পরাজের পিছনে তাঁবুর অপরিচ্ছন্ন কাপড়ের ওপর জ্যোতির মতন এক ফালি রোদ নেচে উঠছে। উষার গরম লাগছিল।

সে পুষ্পরাজের দুর্বোধ্য আশঙ্কা দূর করবার জন্যে আপন মনে কথা বলার মতন বলল, "রুপেয়া কা আউর কেয়া দরকার? হিঁয়া দো আদমী যো মিলকা—"

পুষ্পরাজ উষাকে বাধা দিয়ে রূঢ় স্বরে বলল, "বহুৎ দরকার। তুমরা নম্বর বনধ্ হো যায়গা, হাসপাতালমে যানে পড়ে গা", সে তাকে সব কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে ঘন ঘন হাত নেড়ে কথা বলছিল, "লড়কা হোনেকা বাদ আউর দো-তিন মহিনা কাম নেই করনে সেকেগা তুম, চুপচাপ শো যানে পড়েগা—এক আয়া ভি রাখনে পড়েগা তব—"

বাইরে ফাল্গুনের হালকা রোদ খেললেও এখন ভিজে বাতাস গায়ে লাগার মতন অনুভূতি হচ্ছিল উষার। সে তার মা-বাবা আর ভাইবোনদের কথা ভাবতে ভাবতে পুষ্পরাজের দুর্ভাবনা দূর করবার জন্যে বলল, "আয়াকা কুছ দরকার নেই। হামরা মা আকে বাচ্চা কো দেখে গা—"

পুষ্পরাজ বলল, "নেই আয়গা।"

"কাহে?"

পুষ্পরাজের একটা মনগড়া বিশ্বাস ছিল উষার মা-বাবা কিম্বা তার কোন আত্মীয়-পরিজন তার সঙ্গে উষাকে দেখলে সুখী হবে না— তাদের সম্পর্কও স্বীকার করে নেবে না। কুন্দনলাল তাদের বাড়ির লোকের মতন। উষার সঙ্গে সে যতই দুর্ব্যবহার করুক, তার মা-বাবা তা অন্যায় বলে মনে করতে পারেনি এবং তার ওপর আরও অনেক বেশী নির্ভর করতে চেয়েছিল। উষার ছোট দু বোন বেবি আর ডলির কোহিনুর সার্কাসে কুন্দনলালের ট্রুপেই এসে থাকবার কথা ছিল—সেকথা উষাই অনেকবার শুনিয়েছে পুষ্পরাজকে।

এসব কথা মনে এলেও এখন উষাকে কিছু বলতে ভাল লাগছিল না পুষ্পরাজের। সে সব চাপা দিয়ে অন্য কথা বলল, "আউর কেয়ারফুল হোকে নম্বর কর। অ্যাক্সিডেন্ট হোনেসে থানে নেই মিলে গা!"

"আরে, হাম কেয়া করে গা? হিঁয়াকা মাস্টার ভি আচ্ছা নেই হ্যায়। কুছ ট্রেনিং নেই দিয়া কিশোরীকো—"

পুষ্পরাজ আবার চিঠি লিখতে শুরু করেছিল, লিখতে লিখতেই উষা থামবার আগে হঠাৎ বলে উঠল, "কুন্দনলাল ভি একদম বুদ্ধু! কেয়া ট্রেনিং দিয়া তুমরা? জুতি পালিশ করনে আউর খানা পাকানে শিখলায়া। শালা বদমাশ!"

ছিঁড়ে ভিজে ওঠার মতন মুখ উষার।

আগেকার কথা সে মনে করতে চায় না। মাঝে মাঝে এমন কাটা-কাটা কথা এখনো তাকে কেন শোনায় পুষ্পরাজ, সে বুঝতে পারে না। শরীরের সব যন্ত্রণা আয়ত্ত করে নিয়ে ঊষা উঠে দাঁড়াল, উনুনের কাছে গিয়ে দেখল রান্না কতদূর হয়েছে। একটা পোড়া-পোড়া গন্ধ লাগছিল তার নাকে। তরকারি পুড়ছে। তাড়াতাড়ি কড়ায় জল ঢালবার সময় আগুনের তাপ ঊষার মুখে লাগল। পোড়া তরকারিই সে খাওয়াবে আজ পুষ্পরাজকে—প্রমাণ করবার চেষ্টা করবে যে কুন্দনলাল তাকে কিছুই শেখবার সুযোগ দেয় নি—রান্নাও না।

পুষ্পরাজের কথা যে ঊষার মনে লেগেছিল তা না ভেবেই সে কড়া মাস্টারের মতন আবার বলল, "ব্যালান্স বহুৎ পুরান। খেলা, তুমরা গলাতি কা লিয়ে পেটমে চোট লাগা। দোসরা কা কসুর মাত্ বলো—সামঝে। ?"

ঊষা কোন প্রতিবাদ করল না, পুষ্পরাজের কথার উত্তরও দিল না। তার ভিজে চোখ হঠাৎ পুষ্পরাজ দেখলেও কিছু বুঝতে পারবে না বলে সে ফোড়ন দিয়ে পিছন ফিরে অনেক সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

কুন্দনলালের কাছে অত্যাচার সহ্য করে কয়েকটা বছর যেমন করেই কাটাক ঊষা, সেখানে তার নিজেকে কখনো এমন নিঃসঙ্গ মনে হয় নি। সুখ আর দুঃখ এই সব অনুভূতির প্রভেদ তার কাছে ছিল না। তার দুঃখ-যন্ত্রণাকে সুখের মতন মনে করে হয় তো সে জীবন কাটিয়ে দিতে পারত যদি না পুষ্পরাজ দুঃসাহসী হয়ে উঠে ভিন্ন আর এক ঋতুর স্বাদ জোর করে তার মনের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিত।

পুষ্পরাজ কিছু পরে আবার বলল, "ব্যালান্স বাচ্চালোগকা নম্বর। কুছ ক্রেডিট নেই হ্যায় উসমে। কমলা সার্কাসমে এক ছোকরী থা। তুমরা মাফিক—নেই, তুমরা সে থোড়া দুবলা। বহুৎ খপসুরৎ " সে কী খেলা দেখাত তা ঊষাকে বলল পুষ্পরাজ।

ঊষা যেমন বাঁশের ওপর ছোট মেয়েকে তুলে ব্যালেন্সের খেলা দেখায় তেমন কমলা সার্কাসের সেই মেয়ে চালক আর মোটর বাইক সুদ্ধ মরণ গ্লোব তুলে নিত। গ্লোবের ভিতর শব্দ করে ঘুরত, ছোট মোটর বাইক, যে চালাত সে-ও একটি ছোট মেয়ে। দুর্ঘটনা ঘটেনি একদিনও। অবাক হয়ে গেছে দর্শক।

পুষ্পরাজের কথা শুনে মনে মনে খুব অবাক হয়ে গেলেও ঊষা মুখে কিছু প্রকাশ না করে বলল, "আচ্ছা মাস্টার হোনেসে সব কোই সব নম্বর করনে শেখতা। হাম বহুৎ জলদি-জলদি ট্রাপিজ শিখা নেই ?"

নিজের প্রশংসা শুনে পুষ্পরাজ কিছু প্রসন্ন হয়ে বলল, "ই সার্কাস মে জাস্তি দিন খেলনেসে সব বিলকুল ভুল যায়গা। সব নম্বর পুরানা। ট্রাপিজ ভি সিঙ্গল, ই লোগ ক্রশ ট্রাপিজ কভি নেহি করে গা। মালিককা রুপেয়া জাস্তি নেই হ্যায়।"

পুষ্পরাজের নরম স্বর শুনে তার মন বুঝল ঊষা, এখন তার দিকে ফিরে আস্তে বলল, "কেয়া করে গা!"

"হিঁয়াসে ভাগনে পড়েগা—" জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করতে করতে উঠে দাঁড়াল পুষ্পরাজ, লুঙ্গির মতন করে সে ধুতি পরেছিল, তা আরও শক্ত করে বেঁধে নিল, একটা শার্ট পরে বলল, "তুম্‌রা পেট সে বাচ্চা আকে সব গড়বড় কর দিয়া না—"

"হাম কেয়া করে গা!"

"চুপ যাও, কিস্‌সিকো ভি মৎ বোলো", পায়ে চটি গলাতে গলাতে পুষ্পরাজ বলল, "হাম বাহার যাতা, থোরা বাদ ওয়াপাশ আয়গা।"

"কাঁহা, রাধানাথবাবুকা রাউটিমে ?"

পুষ্পরাজ বাইরে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, চোখ কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল উষার দিকে। পরে ভারী গলায় বলল, "নেই, হাম বাজার যায়গা।"

পুষ্পরাজ বেরিয়ে যাবার পর একদিকে কাত হয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকল উষা। বেলা বাড়ছে। অনেক কাজ তার। সময় বড় কম। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই ম্যাটিনি শো-এর জন্যে তৈরী হতে হবে। মাঝে মাঝে ফাল্গুনের হাওয়ার ঝলক পুষ্পরাজের অর্ধেক লেখা চিঠির ছেঁড়া টুকরো এদিক থেকে ওদিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, পা-টিপে-টিপে মানুষের আসার মতন শব্দ হচ্ছিল। স্নেহের একটা অনুভূতি এখন বড় কোমল করে তুলেছিল উষার মন। লুকিয়ে-লুকিয়ে নিজের পেটে হাত বুলোতে বুলোতে কাগজের শব্দ শুনে সে হঠাৎ তা সরিয়ে নিচ্ছিল—বাইরে তাকিয়ে দেখছিল কেউ এদিকে আসছে কি না।

উষা জানে বেশী দেরী করবে না পুষ্পরাজ, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। কাল রাতেই তার মদের বোতল খালি হয়ে গিয়েছিল। আজ কাছাকাছি কোন দোকানে সে নতুন বোতল কিনতে বেরিয়েছে।

ছেঁড়া কাগজের শব্দ না, আর কিছু পরে উষা এত সময় যাদের কথা ভাবছিল তারাই এসে দাঁড়াল তার সামনে। উষার তাঁবু চিনিয়ে দেয়ার জন্যে হারকু সাহেব নিজেই এসেছে তার মা আর বোনদের সঙ্গে।

হারকু সাহেব হেসে বলল, "এনারা বহুৎ দূরে থেকে আপনার সাথে মিলতে এসেছেন, খানাপিনা না করে এখান থেকে যাবেন না। বসুন, মা বসুন। বস খুকুরা। বাজার মাস্টার ঠিক টাইমে খানা ভেজবে।"

হারকু সাহেবকে দেখে মাথায় অল্প ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়িয়েছিল উষা, তার কথা শুনে মৃদুস্বরে বলল, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি যা-হয় করব—"

"না, তার কুছ দরকার নাই," হারকু সাহেব উষার পেটের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখেই বলল, "আপনার তবিয়ৎ ঠিক না, বেশী কাম করলে খেলা মারডার হয়ে যেতে পারে। আপনি চুপচাপ রেস্ট করবেন।"

হারকু সাহেবের কথা শুনে প্রথম কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল উষা। তার হাত-পা বুক—সব কনকন করে উঠেছিল। বেবী আর ডলি বসে পড়েছে খাটের ওপর, পা নাচিয়ে নাচিয়ে দিদিকে দেখছে। উষার সিঁথিতে সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা। বেবী আর ডলি তাদের জামাই-বাবুকে দেখবার জন্যে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল।

হারকু সাহেব চলে যেতেই ঘোমটা খসে পড়ল মনোরমার। বাস থেকে নেমেই রাস্তার দোকান থেকে দুটো পান কিনে একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়েছিল মনোরমা, এখন একদিকে দাঁড়িয়ে তা চিবোচ্ছিল। তার মুখ শুকনো, দৃষ্টিও অপ্রসন্ন। মনোরমাও পুষ্পরাজের অপেক্ষা করছিল।

"বস মা", কিছু পরে উষা বলল, "কেমন করে এলে এখানে, কে বলে দিল?"

"সুন্দরমবাবুর কাছে গেছিলাম, সে-ই বলল।"

উষা ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোহিনুরে গেছিলে নাকি?"

"যাব না?" মনোরমা বেবী ডলিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ধপ করে উষার নিচু খাটিয়ার ওপর বসে পড়ে বলল, "এদের রাখবার কথা ছিল না তোর কাছে? এদের নিয়েই তো গেছিলাম—"

"আগে কেউ খবর দেয় নি তোমাদের?"

"দিছিল, বিশ্বাস হয় নি।"

উষা বিরক্তি প্রকাশ করে একটু জোরে বলে উঠল, "কেন?"

মনোরমা চুপ করে থাকল কিছু সময়, জাবর কাটার মতন ঘসঘস করে পান চিবোল। একটু পরে সে জিজ্ঞেস করল, "পুষ্পরাজ কই?"

"নেই, বেরিয়েছে।"

"দেশে গেছে নাকি?" একটা সন্দেহ ফুটে উঠেছিল মনোরমার চোখে। তার মনে হচ্ছিল উষা সব কথা ভাঙছে না তার কাছে, পুষ্পরাজের দোষ ঢাকবার জন্যে অনেক কথা লুকিয়ে যাচ্ছে।

মনোরমার কথা বলবার ধরন দেখে রেগে উঠল উষা, রুক্ষ স্বরে বলল, "দেশে যাবে কেন? নতুন চাকরি নিল না এ সার্কাসে? এই দেখ না তার সব জিনিসপত্তর—" একটু চুপ করে থেকে সে গলা নামিয়ে বলল, "দেশে গেলে তো আমিও যেতাম সাথে—"

উষা পুষ্পরাজের সঙ্গে কোহিনুর সার্কাস ছেড়ে চলে এসেছে শুনে প্রথম থেকেই অসন্তুষ্ট হয়েছিল তার মা-বাবা। টাকা-পয়সার বড় অসুবিধা। অনেকদিন কিছুই পাঠায় নি উষা। তার বাবার শরীর খুবই খারাপ। ছোট দু মেয়ের খরচ আর কিছুতেই চালান যাচ্ছে না।

মনোরমা এসব কথা শুনিয়ে উষাকে বকাবকি করতে এসেছিল। হয় সে টাকা দিক সংসার খরচের, না দিতে পারলে বেবি আর ডলিকে রাখুক তার কাছে—তাদের খাওয়াক, খেলা শেখাক, যা খুশী করুক।

সেসব কথা প্রথমেই উষাকে বলল না মনোরমা। পুষ্পরাজের সঙ্গে কোহিনুর ছেড়ে এসে সে যে খুব ভুল কাজ করেছে

তা তাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "আর মানুষ ছিল না? পুষ্পরাজের মতন মানুষ হয়—" ইচ্ছে করলেই যেন আবার পুরনো জায়গায় উষাকে ফিরিয়ে নেয়া যায় এমন মুখের ভাব করে কথা বলে যাচ্ছিল তার মা, "পুষ্পরাজের তিন-চারটে বউ আছে না? তোর সাথে সে কতদিন থাকবে? তোকে ফেলে একদিন পালিয়ে যাবে দেখিস—কী করবি তখন?"

মাকে অনেক দিন পরে দেখল উষা। সে ভেবেছিল মনোরমা তার নতুন জীবনের দিকে তাকে দেখতে পেয়ে মিষ্টি করে কথা বলবে প্রথম দিন, উষাও খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তাদের সংসারের সব খবর জেনে নেবে, বাবার কথা জিজ্ঞেস করবে। এবং একটু আগে পুষ্পরাজের সঙ্গে কথা বলবার সময় যে ব্যথা জমে উঠেছিল তার মনে, তাকে বিষন্ন করে তুলেছিল—সেসব ভুলিয়ে দেবে মনোরমা।

কিন্তু উষা আর স্থির থাকতে পারল না, এখানকার কোন মানুষ তার কথা শুনছে কি-না তা না ভেবেই তর্ক করার মতন মনোরমাকে খুব জোরে বলে উঠল, "কে তোমাকে বলেছে যে তার তিন-চারটে বউ আছে?"

উষার মেজাজ দেখে চুপ থাকল না মনোরমা। সে-ও জোরে বলল, "বলবে আবার কে? সার্কাসের সব লোক তো এ কথা জানে। কেরালা না কোথায় তার ছেলে-মেয়ে বউ নেই, বল?"

"চুপ, আস্তে—" উষার নাক থেকে সাপের মতন হিস হিস শব্দ উঠছিল, "তার একটা বউ থাক, দশটা বউ থাক, তা দিয়ে তোমার কী দরকার?"

"ও মা, দরকার নেই? বলিস কী রে উষা—" মনোরমা পান চিবোতে চিবোতে গালে একটা আঙুল ছুঁইয়ে বলল, "তোর সব টাকা-পয়সা মেরে দিয়ে সে তার বউ-গুলোকে পাঠাবে না? তাহলে তুই আমাদের দিবি কী? আমাদের পয়সার দরকার নেই?"

"তোমাদের দিইনি পয়সা?"

"কতদিন দিস নি বল তো? তোর বাপের কথা ভাবিস, বোনগুলোর কথা ভাবিস?" মনোরমা বেবীর হাত টেনে তাকে দাঁড় করাল, পিছনের দিকে ফ্রক তুলে তার জাঙিয়া দেখিয়ে বলল, "দেখ ছেঁড়া প্যান্ট পরে ঘোরে মেয়েটা। একটা ভাল জামা নেই জুতো নেই, কিচ্ছু নেই—"

"না থাক, আমি কী করব?"

"করবি না মানে?" উষার উত্তেজিত চোখ দেখতে দেখতে মনোরমাও উত্তেজনার ঘোরে বলল, "কারুর কথা ভাববি না তুই?"

"তোমরা কেউ ভেবেছিলে আমার কথা? কোহিনুর থেকে বেরিয়ে কোথায় গেলাম, কী করলাম—কতদিন কাজ ছিল না, পরের ঘাড়ে পড়েছিলাম—রাখ সে-খবর?"

মনোরমা হঠাৎ শান্ত স্বরে বলল, "কুন্দন কত সুখে রেখেছিল তোকে, নিজের পায়ে কুড়ুল মারবি তো কে কী করবে বল?"

"কারুর কিছু করার দরকার নেই। তোমরা এলে কেন এখানে? আমি গেছিলাম তোমাদের কাছে?"

মাথা হঠাৎ গরম হয়ে উঠেছিল মনোরমার। পুষ্পরাজের হাতে পড়ে উষা কষ্ট পাবে বলেই সে প্রথম থেকে তাকে সতর্ক করে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু ফল হল উল্টো। উষা রেগে গেছে। তার রাগ কখন পড়বে মনোরমা জানে না। সে রেগে থাকলে আসল প্রয়োজনের কথা মনোরমা বলতে পারবে না। বড় অভাব সংসারে, এখান থেকে শুধু হাতে বাড়ি ফিরে যাওয়া চলবে না মনোরমার।

"ওরে উষা", কিছু পরে মনোরমা থেমে থেমে বলল, "যাক, যা হবার তা তো হয়ে গেছে, একটু বুঝে শুনে চলিস। তোর টাকা তোর কাছেই রাখবি, বুঝলি?"

"এসব কথা তুমি আমাকে শোনাতে এলে নাকি মা?"

"না রে", মনোরমা শুকনো হেসে বলল, "তোর এখানে আসতে-যেতে প্রায় দু-টাকা খরচ। শুধু কথা শোনাবার জন্যে পয়সা খরচ করে কেউ এত দূরে আসে, বল?"

"তবে?"

"বুঝিস না?"

উষা বলল, "টাকা আমার নেই।"

মনোরমা মুখে এখন ঝাঁজের কোন প্রকাশ ছিল না, তার মনে ভাল-মন্দর কোন প্রভেদও ছিল না। ঈষৎ কাতর হয়ে সে বলল, "ওকথা বললে চলে নাকি রে উষা—"

"সত্যি বলছি মা, টাকা নেই।"

"মনে কিছু করিস না মা—" যেসব কথা শুভাকাঙ্ক্ষীনীর মতন রাগের ঝোঁকে অল্প আগে উষাকে শুনিয়েছিল মনোরমা এখন তা একেবারে ভুলিয়ে দেয়ার জন্যে খুব মিষ্টি করে বলল, "বড় অশান্তি, বড় অভাব। কখন কী বলি খেয়াল থাকে না। মেয়ে দুটোকে জিজ্ঞেস কর, খিদে পেয়েছে বললেই ওদের মারি। খেতে দিতে পারি

না—" কিছু সময় খালি চোখে উষার দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল মনোরমা, পরে একটু ইতস্তত করে বলল, "ওদের তোর এখানে রেখে যাব বলে নিয়ে এসেছি—"

উষা চমকে উঠল, পুষ্পরাজের মেজাজের কথা ভাবতে ভাবতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "না-না, এখানে না—"

"ওরা না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবে, তুই রাখবি না?"

"এখন না মা। আমি ওর সাথে কথা বলে পরে বলব।"

মনোরমা খাটের ওপর পা তুলে ভাল করে বসল। উষার কথা শুনে আবার মাথার মধ্যে একটা চাপ অনুভব করছিল সে। নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করতে করতে মনোরমা বলল, "এলাম যখন, তখন আমিই না-হয় সব খুলে বলি পুষ্পরাজকে, সে কখন ফিরবে রে?"

উষার ইচ্ছে ছিল না যে আজই মনোরমার সঙ্গে পুষ্পরাজের দেখা হয়। উষাকে যেমন বলল মনোরমা পুষ্পরাজের কথা, তেমন হঠাৎ যদি তাকেও বলে তাহলে সে যে চুপ-চাপ সহ্য করবে না, উষা তা জানে। তার মা পরে যতই নরম স্বরে কথা বলুক, সংসারের দুঃখ-অভাবের কথা বলে বেবী ডলিকে এখানে রেখে যাবার চেষ্টা করুক, উষা এখনো তার ওপর অপ্রসন্ন হয়েই ছিল।

সে বলল, "তার ফিরতে দেরী হবে। তোমরা এখন যাও। তাকে আমি যা-হয় বলবোখন।"

"তাড়িয়ে দিচ্ছিস?"

মনোরমার কথাই এই রকম, উষা ভাবল, নিজের স্বার্থসিদ্ধি না হলে মানুষকে সে শুধু খোঁটা মারবার চেষ্টা করে। তাকে এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেয়ার জন্যে সে বিরক্ত হয়ে বলল, "এটা নতুন জায়গা, সব নতুন মানুষ। এখানে কাঁদুনি গেয়ে লাভ নেই—"

মনোরমা বলল, "তোর অনেক বদল হয়েছে, কী বলিস তুই আমাকে? এমন জানলে আসতাম না এতদূরে!"

উষা মনোরমার কথা শুনল না, তার সাদা রঙের ব্যাগ ট্রাঙ্কের ওপর থেকে তুলে দু-টাকার একটা নোট বের করে বলল, "এই নাও।"

"দু-টাকায় কী হবে রে, আর কিছু দে!"

"এখন যাও মা, আর নেই।"

অপ্রসন্ন মুখে মনোরমা দু-টাকার নোট উষার হাত থেকে নিয়ে বলল, "যাব কী রে খাওয়ার কথা বলল যে!"

"বলুক, বললেই খেতে হবে! রাজী হলে কেন তুমি?" উষার আশঙ্কা হচ্ছিল এখুনি এসে পড়বে পুষ্পরাজ আর তার মা বেবী ডলিকে রেখে যাবে এখানে—তাদের দেখতে আসবে প্রায়ই। এবং ওরা উষা আর পুষ্পরাজের সব কথা জেনে ফেলবে। সে তার মাকে কিছুই আর বলতে চায় না এখন।

মনোরমা আর বেবী ডলিকে এক রকম জোর করে ঠেলে তুলে দিল উষা। তাদের তার অচেনার মতন মনে হচ্ছিল, একেবারেই ভাল লাগছিল না। তাকে দেখতে, তার খবর নিতে এতদিন পরে আসে নি মনোরমা—কাজ গুছিয়ে নিতে এসেছিল।

উষা জানে, মনোরমা আবার আসবে। কিন্তু তার কোনরকম সাহায্য সে তাকে করতে পারবে না। ঠিকই বলেছে পুষ্পরাজ, আর কিছু পরে অনেক টাকার দরকার হবে উষার। কে তাকে দেবে তখন! কে তাকে দেখবে!

বড় দেরী করছে পুষ্পরাজ। কে জানে সে রাধানাথবাবুর তাঁবুতে বসে মদ খাচ্ছে কি-না। নিঃসঙ্গ একটা মানুষের মতন উঁচু ট্রাঙ্কের ওপর একটা হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল উষা। তার হাতের কাছেই দেয়ালের একটা বাঁধানো ছবি ছিল, কোলে যীশু। পুষ্পরাজ নম্বর করতে যাবার আগে এই ছবির সামনে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে কিছু সময়।

এখন উষাও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল। তার চোখ খোলাই, শুধু একটা হাত পেটের কাছে এসে পড়েছিল। মনোরমার কথা ভাবছিল উষা। একটু ভুল বলছে সে। তিন-চারটে নয়, একটাই বউ আছে পুষ্পরাজের—তার ছেলেমেয়েও আছে।

উষা পুষ্পরাজের খাটের ওপর তার অর্ধেক লেখা চিঠি দেখল। পুষ্পরাজের মাতৃভাষায় লেখা। ছেঁড়া কাগজের কয়েকটা টুকরোও উড়ে এসেছিল উষার পায়ের কাছে। সে নিচু হয়ে সব তুলে নিল, মরা পোকার মতন কালো-কালো অক্ষর লেখাগুলো এলোমেলো, দুর্বোধ্য। বাংলায় লেখা হলেও একটি বর্ণও চিনতে পারত না উষা। অক্ষর পরিচয় তার হয় নি।

মাঝে মাঝে এমন কাটাকুটি করে বড় বড় চিঠি লেখে পুষ্পরাজ। উষাকে বলে, কোহিনুরের মালিককে তাদের পাওনা টাকার তাগাদা দেয়। আজ উষার মনে হল তা ঠিক না। মিথ্যা কথা বলে পুষ্পরাজ। সে এই রকম চিঠি লেখে তার বউকে। কী লেখে তা জানবার একটা উৎকট আগ্রহ জাগল উষার। ব্লাউজ ফাঁক করে সে চিঠির ছেঁড়া সব টুকরো বুকের মধ্যে ফেলল, একটা কাগজে মুড়িয়ে প্যাডও হাতে নিল। এবং এক মুহূর্তও ইতস্তত না করে রাঘবনের তাঁবুতে যাবার জন্যে বাইরে এল।

নলিনী কিছু-কিছু লেখাপড়া জানে। প্র্যাকটিস শেষ করে ফিরে এসেছে রাঘবনের ট্রুপের ছেলেমেয়ে। উষা দূর থেকেই তাদের গলা পাচ্ছিল।

ক্রমশ

রুদ্রবীণা এবং ভারতীয় রবাব

সরোদ, রবাবের কথায় রুদ্রবীণার কথা মনে পড়ল। অনেক দিন থেকে শুনে আসছি রুদ্রবীণাই নাকি আমাদের প্রাচীন রবাব। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির কাছ থেকেও এটা শুনেছি। কিন্তু সরোদের মত এক্ষেত্রেও জিজ্ঞাসা করে কোনও সদুত্তর পাইনি। বিশ্বাস থাকলেও অনেকেই এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখেন নি। সত্যি—এসব বিষয়ে আলোচনা এত কম হয়! বাদকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে কিন্তু বাজনা সম্বন্ধে কৌতূহল এতটুকুও বাড়ে নি। মিউজিয়ামের বাদ্যযন্ত্রের প্রদর্শনী দেখেও হতাশ হতে হল কারণ কোনও প্রশ্নের সদুত্তরই এখান থেকেও মেলে না এবং মিলবে এমন লক্ষণও দেখি না। তবু এ-বই ও-বই নেড়েচেড়ে দেখি যদি আসল যন্ত্রটি কিরকম ছিল তার একটা ধারণা পাওয়া যায়।

রুদ্রবীণা এক সময় বাংলাদেশেও কিছুটা প্রচলিত ছিল। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে এর উল্লেখ দেখা যায়।

রুদ্রবীণা কাঁপিলাস বাজে সপ্তস্বরা।
উপাঙ্গ রবাব করতাল ঝাঁঝরা॥

এখানে লক্ষণীয় এই যে, রুদ্রবীণা আর রবাবকে আলাদা করে বলা হয়েছে। অতএব দুই যন্ত্র এক নয়। অবশ্য জয়ানন্দ বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে অথরিটি নন, তাহলেও একটা পাকা সূত্র নিশ্চয়ই ছিল যেখান থেকে এই নামগুলি আহরণ করা হয়েছে। যাই হোক, শাস্ত্রীয় অথরিটি অনুসারে বলা যায়—রুদ্রবীণা এবং রবাবের তফাত অনেকখানি। তবে কি করে এই কিম্বদন্তীর উৎপত্তি হল যে দুটি এক ধরনের যন্ত্র? কারণ অবশ্য খানিকটা আছে—সেই প্রসঙ্গে আসছি।

রুদ্রবীণা যে খুব প্রাচীন বীণা এমন মনে হয় না। প্রাচীন শাস্ত্রে এর উল্লেখ দেখা যায় না, এমনকি সঙ্গীতরত্নাকরেও এর কথা বলা হয়নি। সোমনাথ যখন এই বীণার বর্ণনা দেন তখন ষোড়শ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। নারায়ণ এরও পরে এই বীণার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন এবং সবশেষে বর্ণনা দিয়েছেন অহোবল। যদিচ তাঁর বর্ণনা দুর্বোধ্যই বলতে হবে। অবশ্য বর্ণনা যত প্রাঞ্জলই হোক না কেন একটা যন্ত্র চোখের সামনে না দেখলে তার সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করা যায় না। এ ছাড়া কয়েকটি শব্দ আছে যার স্পষ্ট অর্থ নির্ণয় করা কঠিন। এগুলি পারিভাষিক শব্দ—বড় বড় অভিধানেও পাওয়া যায় না। লিপিকারের প্রমাদও জায়গায় জায়গায় বিভ্রান্তি ঘটায়। এত অসুবিধার মধ্যে অনুমান যে যথার্থ হবে এমন কথা কোনক্রমেই বলা যায় না।

সোমনাথ এবং নারায়ণ উভয়ের বর্ণনা অনুসারেই এই বীণাটি লম্বায় সাড়ে তিন ফুটের কিছু বেশী তো কম নয়। এর দণ্ডটি ফাঁপা। এতটা ফাঁপা যে তাতে বুড়ো আঙুলের অগ্রভাগ বেশ ঘোরানো যায়। দণ্ডের উভয় দিকে দুটি কাঁসার bridge (সওয়ারী) থাকত। নারায়ণ একে "সম্বরক" বলছেন। সোমনাথ একটি সওয়ারীর কথা বলেছেন যেটি ওপরের দিকে থাকতো। প্রচলিত ভাষায় একে বলা হত "মেঢ়ক।" ওপরের দিকে ইঞ্চি চার-পাঁচেক ছেড়ে দিয়ে তির্যক্‌ভাবে একটি কান বসান হত যাতে মূলতন্ত্রীটি বেষ্টিত থাকত। এ ছাড়া একটি লোহার তার এবং দুটি শ্রুতি তন্ত্রীও এই বীণায় যোজনার কথা বলেছেন নারায়ণ। অতএব আরও তিনটি কান নিশ্চয়ই ছিল। এই তারগুলি অচলশঙ্কুর ভিতর দিয়ে যেত অথবা নারায়ণ বর্ণিত সম্বরকের ওপর দিয়ে যেত।

সম্বরকটি ছিল প্রায় দু ইঞ্চি উঁচু এবং ছয়ের অ[illegible] অর্থাৎ অর্ধবৃত্তাকার। প্রথম সম্বরক বা [illegible]ঢ়কের অল্প পরেই নিচের দিকে একটি তুম্ব (লাউ) যোজনা করা হত। এই তুম্ব থেকে প্রায় আঠাশ ইঞ্চি দূরে আর একটি তুম্ব স্থাপন করা হত। দূরত্ব সম্বন্ধে নারায়ণের সঙ্গে সোমনাথের কিছু মতভেদ আছে। দুটি তুম্বই বেশ উঁচু এবং বৃহদাকারের ছিল—চওড়ায় এক ফুটেরও বেশী হবে। দণ্ডের অপর মুখে ককুভ সংযুক্ত হত। "ককুভ" হচ্ছে বীণার একটি আলাদা অঙ্গ যেটিকে মূলদণ্ডের সঙ্গে আটকে দেওয়া হত। এর ওপরে থাকত আসল পত্রিকা যার ওপর দিয়ে তারগুলো এসে মুখে আবদ্ধ থাকত। নারায়ণের মতে ককুভটি ত্রিশির-বিশিষ্ট ছিল। উর্দ্ধশিরে লৌহপত্রিকাটি অবস্থিত থাকত যার ওপর দিয়ে মূল তন্ত্রীটি বিস্তৃত হত এবং তার পরে লৌহতারটি প্রলম্বিত হত। দক্ষিণ শিরের ওপর দিয়ে যেত দুটি শ্রুতিতন্ত্রী। ককুভটির দুপাশ একটু ঢালু হত। সোমনাথের মতে এই ককুভটি চার ইঞ্চি দীর্ঘ ছিল। নারায়ণ বলছেন এই বীণায় আঠারোটি পর্দা থাকত। এর মধ্যে আটটি বড় এবং দশটি ক্ষুদ্র। পর্দাগুলি একটি আলাদা কাঠের প্লেটের ওপর বসান হত। এই প্লেটকে বলা হত পদিকা। বীণা দণ্ডের প্রায় চব্বিশ ইঞ্চি অংশ চেঁছে ফেলে এই প্লেটটিকে বসান হত। বড় পর্দাগুলি নিচের দিকে থাকত আর ছোটগুলি থাকত ওপর দিকে। পর্দাগুলি "রাগস্বর" অনুসারে স্থাপন করা হত। এগুলি লোহার তৈরি ছিল বলে মনে হয় এবং এক ইঞ্চি পরিমাণ উঁচু হত।

এই ছিল সেকালের রুদ্রবীণা। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে বীণাদণ্ডের যে অংশটি বাজাবার জন্য ব্যবহৃত হত সেটি নিচের দিকে মোটা হত এবং ক্রমে ওপরের দিকে সরু হয়ে আসত। [illegible]ম না হলে নিচের আটটি পর্দা বড় এ[illegible]ওপরের দশটি পর্দা ক্ষুদ্র হবার কোন কারণ দেখা যায় না। রবাবের দণ্ডটিও এই রকম ছিল বলেই রুদ্রবীণাকে রবাবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অহোবল স্পষ্টই বলেছেন—মেরুস্থান্বষ্টমাংশেন স্থৌল্যং স্যাদুত্তরোত্তরম্। কিন্তু এই বীণার কোন অংশই চামড়ায় ছাওয়া নয় এবং চর্মাবৃত অংশের ওপরেও এর পত্রিকা স্থাপিত নেই যা রবাবের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ভারতীয় রবাবে পর্দার ব্যবহারও ছিল না। ককুভসহ এর আকৃতি বীণারই মত। নারায়ণ বিশেষভাবে বলেছেন যে, দাক্ষিণাত্যেই এই বীণাবাদনের উপদেশ পাওয়া যায়। এই দাক্ষিণাত্য সম্ভবত হায়দারাবাদ অঞ্চল যা তখনকার দিনে দক্ষিণ বলে পরিচিত ছিল। এতে জোয়ারীর জন্য পাতলা বাঁশের ছিলে বা পট্টসূত্রও লাগান হত। অতএব দেখা যাচ্ছে যে রবাবের সঙ্গে আকৃতিগত সামান্য একটু মিল ছিল এবং সেই থেকেই কল্পনা করা হয়েছে যে রুদ্রবীণা হচ্ছে ভারতীয় রবাব।

রেকর্ড সঙ্গীত

পুরোনো উৎকৃষ্ট গ্রামোফোন রেকর্ড আবার নতুন করে প্রচলিত করবার অনুরোধ জানিয়ে অনেকে চিঠি লিখছেন। অনেকে তালিকা করেও পাঠিয়েছেন। বিষয়টি গ্রামোফোন কোম্পানীর বিবেচ্য। আমরা একটি পত্র প্রকাশ করে বিষয়টির প্রতি গ্রামোফোন কোম্পানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এর পর পত্রলেখকদের আমরা যথাস্থানে আবেদন জানাতে অনুরোধ করছি। অবশ্য গ্রামোফোন কোম্পানী যদি প্ল্যান করে এরকম একটি আয়োজন করেন তাহলে খুবই ভাল হয়।

—শার্ঙ্গদেব

পারমাণবিক বোমা তৈরির প্রস্তাব

এ বছর ১৭ জুন সকালবেলা চীন সাফল্যের সঙ্গে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এই নিয়ে তার ছ'বার পরীক্ষা করা হল। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ঐ পরীক্ষায় বিমানে করে বেশ উচ্চতা থেকে বিস্ফোরক ফেলা হয়েছে।

কোনো দেশের পক্ষে পারমাণবিক শক্তি হতে গেলে কেবল পারমাণবিক বিস্ফোরক সংগ্রহ করাই যথেষ্ট নয়। যুদ্ধ বাধলে যাতে সেগুলো ব্যবহার করা যায় অথবা ব্যবহার করার ভয় দেখানো সম্ভব হয়, অবশ্যই তার বন্দোবস্ত করা দরকার। অন্য কথায়, নিক্ষেপের একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলা চাই। বিস্ফোরক প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাজে আসবে, যদি সেগুলি ইচ্ছামতো পরিমাণে এবং দরকারী মুহূর্তে শত্রুপক্ষের লক্ষ্যস্থলে নিক্ষেপ করতে পারা যায়। রাসায়নিক বিস্ফোরকের মতো, পারমাণবিক বোমার ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য।

নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা

পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপ দু ভাবে অর্থাৎ বোমারু বিমান এবং রকেটদ্বারা সম্ভব। বোমারু বিমান শব্দের চাইতে বেশি অথবা কম দ্রুতগামী এবং চালকবিশিষ্ট অথবা চালকবিহীন হতে পারে। সেইরকম রকেট কোনো স্থিতিশীল ভিত্তিভূমি (যেমন ক্ষেপণাস্ত্র বা মিসাইল ক্ষেত্রের বেলা) থেকে অথবা তা চলমান কোনো ভিত্তিস্থল—যেমন চলন্ত ডুবোজাহাজ—থেকে ভাসানো যায়। যেসব দেশ চলমান ভিত্তিভূমি থেকে দূরবিহারী ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগের বন্দোবস্ত করেছে বা করতে যাচ্ছে সেখানে উন্নত ও জটিল নিক্ষেপ ব্যবস্থা গড়া হয়েছে বা হতে চলেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে পোলারিস মিসাইল বয় পারমাণবিক শক্তি-চালিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেসব সাবমেরিন আছে সেগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভারতকে পারমাণবিক শক্তি হতে গেলে এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরগুলি অতিক্রম করতে হবে। সম্ভাব্য শত্রুদের দিক থেকে আশঙ্কার কারণ আছে কিনা, অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে কি ধরনের নিক্ষেপ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় এবং আমাদের প্রয়োজন এবং কারিগরী কুশলতা অনুসারে একটা শক্তিশালী বিমানপোত শিল্প অথবা ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্প কোনটা সমীচীন হবে—এ-সব নির্ধারণের সমস্যা আছে।

ভারতের পরিস্থিতি

পারমাণবিক বাহিনীর জন্য আবশ্যক কোনো নিক্ষেপ ব্যবস্থা ভারতের নেই। আমাদের দেশের বোমারু বিমানবাহিনী ব্রিটিশ ক্যানবেরা জাতের হালকা বোমারু বিমান দিয়ে গড়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, ১৯৫০ সালের শেষ দিকে যখন ব্রিটিশ বোমাগুলির ওজন ও আকার ছোট করা হল, সে সময় প্রাগুক্ত বিমানপোতকে পারমাণবিক আঘাত করার ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল।

ক্যানবেরা বহন করবে এভাবে যদি ভারতে পারমাণবিক অস্ত্র উদ্ভাবন করা যায় তা হলেও সে অস্ত্র চীনের নগরগুলিতে পৌছাতে পারবে না। ঐ অস্ত্র যুদ্ধার্থে চালনা করতে হলে কেবল হিমালয়ের গিরিপথগুলিতে বোমাবর্ষণ অথবা চীনের বিমানবন্দরে হানা দেওয়া যাবে। কিন্তু এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া যত খারাপই হোক, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এরকম মারণাস্ত্র ব্যবহার মনে হয় অকল্পনীয়।

ভরসার কথা, ভারতে একটি বিমানপোত শিল্প গড়ে তোলা গেছে; সেখানে ব্রিটিশ ও রাশিয়ান ধরনের উড়োজাহাজসমূহ তৈরী হয়েছে। ব্রিটিশ ইঞ্জিন ব্যবহার করে দুই-জেটওয়ালা একটি বোমারু বিমান—মারুৎ—ভারত উদ্ভাবন করছে। তার একটা শব্দাতিরেকী সংস্করণ মিশরীয় জেট নিয়ে তৈরি করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। মারুৎ তৈরির পর, আশা করা যায়, ভারত সরকার আরেকটি বৃহৎ প্রকল্প হাতে নেবে। এস্ ভগবন্তমের মতে, তা (বিদেশী ইঞ্জিন পাওয়া গেলে) বোমারু বিমান অথবা ক্ষেপণাস্ত্র হতে পারে। এ পর্যন্ত ভারতে যে-সব খুব উচ্চতার রকেট ছাড়া হয়েছে সেগুলি যোগাড় হয়েছে বাইরের দেশসমূহ থেকে।

লণ্ডনের ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৬৬-৬৭ সালের সামরিক ভারসাম্য থেকে জানা যায় যে, ভারতীয় বিমানবাহিনী লঘু বোমারু বিমান-বহর, ক্যানবেরা, যোদ্ধা বোমারু বিমান-বহর, ভ্যাম্পায়ার এবং কয়েকটি অন্য ধরনের বিমানপোত নিয়ে গঠিত। এগুলির পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপের ক্ষমতা হয় খুব সামান্য আছে কিংবা আদৌ নেই।

বৈষয়িক উন্নয়নের উপর প্রতিক্রিয়া

পারমাণবিক অস্ত্র এবং তার জন্য আসবাব লকট তৈরির খরচ প্রকৃতপক্ষে অত্যধিক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলির বেলা, উপকরণসমূহ ও উপাদানরাশি বৈষয়িক অগ্রগতি থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে ঐ কাজে লাগাতে হবে। পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন করা হবে কিনা এ সিদ্ধান্ত কোনো বিশেষ সময়ের বৈষয়িক, নৈতিক সামরিক এবং কারিগরী বিদ্যা সংক্রান্ত পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। সন্দেহ নেই, শেষ পর্যন্ত সেটা হবে একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

দেখা যাচ্ছে, নিক্ষেপের উপযুক্ত ব্যবস্থা ছাড়া বোমা উৎপাদন কোনোভাবেই প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করবে না। পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সপক্ষে সিদ্ধান্ত নিলে শত্রুপক্ষের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাবার বন্দোবস্ত থাকা চাই। একটা সত্যকার কার্যকর পারমাণবিক অস্ত্রাগার গড়ে তোলা যে কি বিপুল ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার সে কথা না বললেও চলে।

শান্তিকুমার ঘোষ

মাত্র ৭ দিনেই...

মুখখানি হলো ফুটফুটে সুন্দর ও কমনীয় !

কী বিবর্ণ...লাবণ্যহীন মুখ ঃ বছরের সবচেয়ে জমকালো পার্টীর আর মাত্র ৭ দিন বাকী। কার্ড পেয়ে আমি তো খুশীতে ডগমগ ...কিন্তু হলে কি হবে...মুখের যা ছিরি... শুকনো ফ্যাকাসে...কী করা যায় এখন...

প্রথম বার ক্রীম মাখতেই ঃ মনে পড়ল পণ্ডস-এর '৭ দিনে রূপ-লাবণ্য' ফিরিয়ে আনার কথা। এক সপ্তাহ ধ'রে রোজ রাত্তিরে শুবার ক'রে পণ্ডস কোল্ড ক্রীম মুখে মাখলাম। প্রথম বার মাখতেই ওপরকার ময়লা ও মেক্‌আপ উঠে গেল।

দ্বিতীয় বার মাখার পর ঃ এই দ্বিতীয় বারের ক্রীমেই রূপ-লাবণ্য ফোটে. সাবান-জলের নাগালের বাইরে লোমকূপের গভীরে লুকানো ময়লা এবার বেরিয়ে আসে।

৭ দিন পরে ঃ পার্টীটা দারুণ জমেছিল। দেখলাম লোকে মুগ্ধ হয়ে আমাকে দেখছে...এমনি সুন্দর কমনীয় দেখাচ্ছিল মুখখানি। পণ্ডস-এর '৭ দিনে রূপ-লাবণ্য' ফিরিয়ে আনার নিয়ম মেনে আশ্চর্য কাজ হয়েছে। মাত্র ৭ দিনে মুখশ্রী ফিরেছে...হয়ে উঠেছে লাবণ্যে ভরা স্নিগ্ধ-কোমল।

কোল্ড ক্রীম
বিশ্বের বহুবিক্রীত মুখশ্রী
পরিষ্কারক ক্রীম

বিনামূল্যে '7 Days to Beauty' পুস্তিকার জন্য ১৫ পয়সার ডাকটিকিট সহ চিঠি লিখুন ঃ
ঠিকানা—পোঃ বক্স ১৩১৭, বোম্বাই-১

চীজব্রো-পণ্ডস ইন্‌ক (সীমিত দায়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

তেতাল্লিশ

শূন্য বাউল আসর ছেড়ে বাইরে এসে আলাপের প্রথম ধ্বনি, 'ভায়ার কি চা কফি কিছু চলবে?'

বলি, 'আপত্তি নেই।'

'চল তা হলে, নিরিবিলি দেখে বসা যাক।'

মেলায় কোথায় নিরিবিলি পাওয়া যায় জানি না। তবু পাওয়া যায়। কেতা-কায়দার দোকানে না গেলে নিরিবিলিও মেলে। অচিনবাবু তাই উত্তরে যান না; দক্ষিণে পদক্ষেপ করেন। কয়েক পা গিয়েই এক দোকানে ঢোকেন। কফির কথা বলে আসন নিয়ে বসে আলাপের দ্বিতীয় ধ্বনি, 'ভায়ার নামটি কী?'

নাম বলি। কী যেন বলতে গিয়ে তাঁর ভুরু কুঁচকে যায়। নজর সজাগ করে চোখে চোখ রাখেন। গোরা মুখখানি জোড়া। হিজিবিজি রেখায় জিজ্ঞাসা। বলেন, 'মানে?'

নামের মানে জানা থাকলেও মানে বলতে হবে কেন জানি না। তার দরকারও হয় না। তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি সেই লেখক নাকি?'

এই প্রশ্নে বড় ব্যাজ। ওটা একটা মোট কথা। তাই নিয়ে আলাপের ইচ্ছা নেই। জবাব দিই, 'ওই আর কী।'

'ওই আর কী মানে? তুমি তো বড় পাজী ছেলে হে! এতক্ষণ কথাটা বলো নি।'

এ কি যেচে বলার কথা! হেসে বলি, 'জিজ্ঞেস করেন নি-তো, তা-ই বলা হয় নি।'

'থামো হে ছোকরা।'

প্রায় ধমক দিয়ে মুখের দিকে তাকান। দেখি ওঁর চোখে কৌতুকের ঝিকিমিকি, তার সঙ্গে একটু বিস্ময়ের ঝিলিক। বলেন, 'তা-ই তো বলি, চিন্তা-চিন্তা কি আর এমনি মনে হয়েছে। দূরে দাঁড়িয়ে গান শোনার লক্ষণ দেখেই বুঝেছিলাম রসিক-রসিক ভাব। এখন তো দেখছি, বিন্দুর কথাই ঠিক, অ্যাঁ? খাঁটি গোঁসাই একেবারে। আরে. বলবে তো।'

বলেই আমার কাঁধে এক চাপড়। এবার হেসে-খুশে বাক্কেন, 'বাহ্, এ না হলে আর দৈব। ঠিক মানুষটিই ধরেছি।'

ঘাড় বাড়িয়ে আরো বলেন এই অধমের রচিত তুচ্ছ দুই চারি কেতাবের নাম। মনে মনে বলি, 'বড় ব্যাজ, বড় ব্যাজ!' জীবনের পাতায় পাতায় ফিরছি। কী কারণে, কিসের সন্ধানে, তা জানি না। শুধু এইটুকু জানি, এ পাতা পরম পাতা, বইয়ের পাতা না। কে লিখছেন বসে এই পাতা, সে লেখকের নাম জানি না। জগৎ প্রকৃতি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে এখন সেই পরম পাতা পাঠ চলছে। কাগজের পাতার কথা থাক। সেখানে আমার ভিন পরিচয়। আমি যে কত দুর্বল, অক্ষম, আতুর, কাগজের পাতায় কেবল তারই লিখন। সেথায় আপনাকে না চেনার কান্নাকাটি। সেথায়. হতে চাওয়ার বিড়ম্বনা।

আজ যখন পরমের পাতায় ফিরি, তখন সে পাতার কথা থাক। কিন্তু শোনে কে। অচিনবাবু আওয়াজ দিয়েই চলেন। তুচ্ছ কথাই উচ্চে ভাবেন। গৌরব দান করে গরব করেন। বলেন, 'চমৎকার। ঠিক মানুষটিই মিলেছে। নাও. এবার কফি খাও। কিন্তু হ্যাঁ হে, তুমি তুমি করছি বলে কিছু মনে করছ না তো।'

'বড় আনন্দ পাচ্ছি।'

আবার আমার ঘাড় ধরে ঝাঁকানি দেন। বলেন, 'ছোঁড়া একেবারে রামপেসাদে। তা উঠেছ কোথায়?'

বন্ধুর নাম বলি। পুরো উচ্চারণ করার আগেই বেজে ওঠেন, 'ও, আচ্ছা, ওদের বাড়িতে উঠেছ। ভেবেছিলাম, সকালবেলাই ও বাড়িতে একবার ঢু' মেরে আসি। তা

আর হয়ে উঠল না। তুমি গিয়ে বলো, অচিনদার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তা হলেই বুঝবে।'

সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। ছাতিমতলায় ঘরে ঘরে তাঁর আসর যে বেশ জমজমাট বাউলের আসরে কথাবার্তাতেই তা বুঝতে পেরেছিলাম। বলি, 'নিশ্চয়ই বলব।'

অচিনবাবু নিজের মনেই আমার বন্ধু বন্ধুপত্নী সম্পর্কে বলেন, 'বড় ভাল ছেলে-মেয়ে দুটি।'

এমনভাবে বলেন, যেন আমার বন্ধু দম্পতি সত্যি ওঁর কাছে দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। আবার জিজ্ঞেস করেন, 'আগে এসেছ কখনো?'

'না।'

'এই প্রথম? তা হলে খুবই ভাল লাগবে।'

বলতে বলতে অচিনবাবু অন্যমনস্ক হন। বাইরের লোকের ভিড়ে দৃষ্টি মেলে দেন। কিন্তু বুঝতে পারি, লোক দেখেন না। অন্য কিছু, বোধ হয় নিজেকেই দেখেন। তখন জিজ্ঞেস করি, 'এখানকার সঙ্গে আপনার অনেকদিনের সম্পর্ক, না?'

চোখ ফিরিয়ে চেয়ে হাসেন। বলেন, 'আর

কোথাকার সংগে সম্পর্ক আছে বল। তবে গোলমালটা তো জীবনে আগাগোড়াই। অসম্পর্কের দরজায় দরজায় ফিরছি, সম্পর্কের দরজাটাও এখন বন্ধ হয়ে গেছে বলে মনে হয়, এই আর কী।'

শোনায় সহজ, কিন্তু তেমন সহজ কথা নয় যেন। বলে হেসে একটা চুরুট ধরান। ধরিয়ে আবার বলেন, 'তবে তাতে খুব একটা দুঃখ লাগে না। এ শান্তিনিকেতনের সংগে সম্পর্ক আর কতটুকু। এখন সবই অচেনা। চেনা যারা আছে, তাদের সকলেরই বয়স হয়েছে, অবসর নিয়েছে। ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনী সব মিলিয়ে আমার সংগে এমন একটা মস্ত ফারাক যে, তারা তাদের অচিনকে চিনতেই পারে না। তাদের কাছে শান্তিনিকেতন হয়ে গেছে আদর্শ-জীবিকা-গৃহস্থজীবনের মিলমিশ মাখামাখি করা এক জায়গা। আমার ঘর নেই, গৃহস্থও নই : তোমাদের ভাষায় আমাকে কী বলা যাবে, কনফার্মড ব্যাচেলর?'

বলে হাসেন। নিবু নিবু চুরুটে টান দিয়ে দিয়ে ধোঁয়া বের করে আবার বলেন, 'কনফার্মড কিনা বলতে পারব না, তবে ব্যাচেলর।'

হেসে আমার চোখের দিকে তাকান। ও'র বড় ফাঁদের চোখে একটু লাজের আভাস। সেখানে কেবল যে কৌতুকের ঝিলিক তা বলতে পারি না। সেই যে কাঁদন-ভরা হাসির কথা বলেছি, কেবলই যেন সেইরকম লাগে। এই চোখের আলোর ওপারে কী যেন ছল-ছল টলটল করে।

কফির পাত্রে চুমুক দিয়ে নিজেই আবার বলেন, 'কাউকে একটু পেলে কথা বলতে ইচ্ছা করে খুব। মেতে থাকতে ভাল লাগে। কেমন ভাল লাগে, কাদের ভাল লাগে, একটু আগে নিজের চোখেই দেখলে। ওখানে সাহস করে মুখ খুলতে পারি, হাসতে পারি, হাসাতে পারি। সবাই যতটুকু চায়, যতক্ষণ, তারপরে যে অগাধ সময়, তখন তো একেবারেই একলা। তাই বলছিলাম, কাউকে পেলে কথা বলতে ইচ্ছা করে খুব। কিন্তু বলতে চাইলেই বা শুনছে কে। ভাটা পড়া রক্তের কথা, তিন কাল পেরিয়ে যাওয়া মানুষের কথা কি কেউ শুনতে চায়?'

'আমার শুনতে ইচ্ছা করে।'

অচিনবাবু চোখ তুলে হাসেন। আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বলেন, 'ধন্যবাদ ভায়া, ধন্যবাদ। তা ছাড়া তুমি তো শুনতে চাইবেই। যে শোনে সে-ই তো শোনায়। তোমাকে বোধহয় একটু বুঝতে পারি। মানে তুমি ব্যক্তিটিকে না, সত্তাটিকে।'

শুনি আর আমার মনের কোথায় যেন একটা অবাকের তীর বিঁধে টনটনিয়ে যায়। একটা উদ্বেগ তার সংগে। ভাবি এ মানুষের যেন মাটিতে পা নেই। এ মানুষের পাখাও নেই ওড়বার। এ মানুষ আছেন কোথায়। কোন সংসারের অচিন পথে ছুটে বেড়াচ্ছেন।

নিজেই আবার বলেন, 'সেইজন্যেই বলছিলাম, অন্য সব পরিচয় বাদ দিই, সরকারী চাকরির জোয়াল প্রায় সারা জীবনই কাঁধে রয়েছে, আজও ছাড়াতে পারি নি, তবু আসলে বোধ হয় আমি একটা মস্ত বাউণ্ডুলে। কেন তা বলতে পারি নে। সকলের ভাগ্যে তো সব কিছু হয় না। আমার আর সজ্জন বন্ধুর মত আমি হতে পারি নি। সেটা আমারই দুর্ভাগ্য। এখন তাদের দিকে তাকিয়ে দেখি, তারা এক রাজ্যে, আমি আর এক। তারা ফিরে চায় না, তাদের সময় বা ইচ্ছা কোনটাই নেই। আমি দূর থেকে, বলতে পারো, অনেকটা অবাক হাবাগোবা ছেলের মত হাঁ করে তাদের দিকে চেয়ে থাকি।'

বলতে বলতে আমার চোখে চোখ পড়তে থমকে যান। যেন হঠাৎ লজ্জা পেয়েই হেসে নিবন্ত চুরুটে আগুন জ্বালেন। আর আমার যেন বুকে নিশ্বাস আটকায়। যত অস্পষ্ট কথাই হোক, সেই অবাক হাবাগোবা হাঁ করে চেয়ে থাকা ছেলেটাকে আমি যেন দেখতে পাই। আমি দেখতে পাচ্ছি, সংসারের

যে সীমানায় সেই ছেলেটি যেতে চেয়েছিল, অথচ যাওয়া হয় নি, সেই দিকে সে চেয়ে আছে। চোখে তার করুণ আর্ত দৃষ্টি। বুকে তার অচিন পানীয়ের তৃষ্ণা মাথা কুটে মরে। কিন্তু তার চুল হয়ে গিয়েছে ধূসর মুখে পড়েছে হাজার হিজিবিজি রেখা। এখন সে চুরুট মুখে নিয়ে কেবলই আগুন জ্বালে, নেবে আবার আগুন জ্বালে।

জানতে ইচ্ছা করে, কেন। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সংকোচ হয়। পাছে এমন কোথাও হাত পড়ে যায়, যেখানে সামান্য স্পর্শে বিষের ব্যথা লাগে বা আগুন জ্বলে যায়।

জিজ্ঞেস করেন, 'ভায়াকে বিরক্ত করছি না তো।'

তাড়াতাড়ি বলি, 'মোটেই না।'

বলেন, সেইজন্যেই বলি আর কি—তখন বলছিলাম না, বছরে একবারটি এখানে এ সময়ে না এসে পারি না। আসলে ঘুরে ফিরে নিজেকেই দেখতে আসা। জীবনে প্রথম চাকরির তাও এখানেই করেছি। সামান্য কিছুকাল, তারপরেই বাইরে চলে গেছলাম। মনে হয় জীবনের আসলটা সব এখানেই পড়ে আছে, তা-ই একটু ঘাঁটতে আসা।'

বলে হাসতে হাসতে পানীয়ের পাত্রে চুমুক দেন। বুঝতে পারি, প্রসঙ্গ বদলাতে চান। তা-ই বলেন, 'এবার তোমার কথা বল।'

আমার কিছু বলবার নেই, কেবল শোনবার। অচিনকে চিনবার সাধ আমার। বলি, 'আমার কোন কথা নেই।'

'সবই তো লিখে বল, তা-ই না?'

বাউল আসরের দরাজ হাসি বাজে আবার। বলি, 'তাও তো বলতে পারি না। চেষ্টা করি মাত্র।'

উনি বলেন, 'তা হলেই হবে।'

জিজ্ঞেস করি, 'কতকাল আগে এসেছিলেন এখানে?'

'হিসাব করে বলা মুশকিল। সাল তারিখ নিজেরই মনে নেই। ইজেরের ওপরে একখানি জামা গায়ে দিয়ে এসেছিলাম। নিয়মমাফিক হাতেখড়িটা দেশের বাড়িতে পণ্ডিত মশাইকে দিয়েই করানো হয়েছিল। বিদ্যালয় বলতে শান্তিনিকেতনকেই চিনি। বিদ্যালয়ের পাঠ শুরু এখানেই। তবে আবার বলি, এই শান্তিনিকেতনে না। তখন এখন অমিল বিস্তর।'

হঠাৎ আমার চোখের সামনে একটি মূর্তি ভেসে ওঠে। মাথায় চুল, মুখে দাড়ি, গায়ে আলাখাল্লার মত জামা, শালবীথির রৌদ্র-ছায়ায় দাঁড়ানো এক ছবি। বলি, 'আপনারা তো তাঁর সময়ের লোক, মানে রবীন্দ্রনাথের?'

'নিশ্চয়ই। আমরা গুরুদেবের ছাত্র।'

বলতে গিয়ে যেন ওঁর মুখে ঝলক লেগে যায়। বলেন, 'আমরা তাঁর কাছে পড়েছি, তাঁকে দেখেছি, আমরা যে সব সময়ে তাঁর কাছে কাছে রয়েছি, এটা কখনো ভুলতে পারতাম না। আর সেই অহংকারটাও কোনদিন গেল না। হ্যাঁ, অহংকারই বলতে পারো।'

তাতে তুমি যা খুশি তা-ই ভাবো, অচিনবাবু সজোরে চুরুট টানেন। আর আমার কাছে এই মানুষই যেন এক বিস্ময় হয়ে ওঠে। বাঙলা দেশের সে-ই যে একদল ছেলেমেয়ে, যাদের মুখ ফিরেছে আজ পশ্চিমে, মুখে অস্তছটার রক্তাভা, ঠিক সেই দল আর ফিরে আসবে না। আমার সামনে যিনি বসে, তিনি সেই দলেরই একজন।

আবার বলেন, 'তবে বুঝতেই পারছ, তাঁকে আমরা আর কতটুকু পেতাম। বিশ্ব-জোড়া লোকের ভিড়, নিজের কাজের শেষ নেই, তাঁকে কতটুকু ধরা যায়। তবু সে আর এক শান্তিনিকেতন। আজ দেখছ বোতাম টিপলে বাতি জ্বলে, কল ঘোরালে জল পড়ে, চারদিকে আলোয় ভরা। মস্ত বড় বোলপুর স্টেশন, মেলাই গাড়ি যাতায়াত করছে, স্রোতের মত লোক আসছে, মোটর-গাড়ি সাইকেল-রিকশা ছোটাছুটি করছে। মনে আছে বাবা এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। ছোট্ট একটা গ্রামের স্টেশন, নিঝুম, ভিড় গোলমাল নেই। এক গাছতলার ছায়ায় গুটিকয় গরুর গাড়ি ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। দড়িতে বাঁধা বলদগুলো ল্যাজ নাড়িয়ে মাছি তাড়াচ্ছে, খড় চিবুচ্ছে। আর কোন যানবাহন নেই, সেই একটি গরুর গাড়ি ভাড়া করেই বাবা নিয়ে এসেছিলেন। সন্ধ্যা হলে কেরোসিন তেলের আলো। এখনকার চোখে মনে হবে, অন্ধকার। প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডেকে যায়, ঝিঁঝির ডাক

শান্তিনিকেতনের সেই প্রকৃতিকে অন্যরকম লাগছো।'...

বলেন, আর দেখি একটি মানুষ কোথায় ফিরে যান। যেন তাঁর মুখের হিজিবিজি রেখা মুছে যায়, চুলের ধূসরতা মুছে যায়। যেন তাঁর মুখে স্বপ্নের ছায়া, তাঁর গলায় স্বপ্নের সুর। আমি সেই সুরের কল্পনায় আর এক শান্তিনিকেতনকে দেখি।

অচিনবাবু আবার সেই স্বপ্নের ওপার থেকেই সেই সুরে ভাবেন, '"আলোর নাচন পাতায় পাতায়, তাই তো তাক লেগেছিল।" লাগে নি কেবল, তখন "বেসেছিলেম ভাল।"'

সহসা তাঁর মুখে যেন রক্ত ছুটে এল। কেবল মুখে না, চোখেও। থমকে গিয়ে নিচু মুখে কী যেন ভাবেন এক মুহূর্ত। তারপরে একেবারে যুবকের মত সোজা দাঁড়িয়ে বলেন, 'আর নয় ভায়া, চল বেরুই।'

আমার মনে হল, কোথায় যেন কী এক সুর বেজে উঠেছিল। সহসা সে বাঁক নিয়ে যায় অন্য পথে, শব্দহীনে হারিয়ে যায়। আমি ও'র মুখ থেকে চোখ সরাতে পারি না। উনি পকেটে হাত দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আবার ডাকেন, 'ওঠ হে।'

বলি, 'তা উঠছি, কিন্তু মনে হল বাউল আসরের মতই এ আসরটিও ভেঙে গেল আচমকা।' অচিনবাবু হো হো করে হাসেন। বলেন, 'তা-ই নাকি?'

বলে হঠাৎ নিচু হয়ে স্বর নামিয়ে বলেন, 'তবে একবার যখন বেজেছে, পরেও বাজবে। ও বেলা বাউল আসরও আবার বসবে, তোমার সঙ্গে দেখাও হবে। চল, একটু মেলা ঘুরে বেড়াই।'

তিনি পকেট থেকে পয়সা বের করেন। আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলি, 'না না, আপনি কেন, আমি দিচ্ছি।'

'থামো হে ছোকরা। তুমি আমাকে ডেকেছ, না আমি তোমাকে?'

'আপনি।'

'তবে?'

বলে পয়সা মিটিয়ে দেন। বাইরে আসি, তখনো অচিনবাবুর পদক্ষেপ দক্ষিণেই। জিজ্ঞেস করি, 'ওদিকেও কি মেলা আছে?'

'আরে আসল মেলা তো ওদিকেই হে।'

মিথ্যা না। ছাতিমতলায় যে মেলাটা দেখে ভেবেছিলাম, দেখলাম এদিকে সে-ই মেলা। এখানে অন্য পসার, অন্য পসারী পসারিনী। এখানে বাঙলা দেশের সেই চির-চেনা শিল্পীরা নিজেদের শিল্প সাজিয়ে বসেছে। যাদের নাম কামার, কুমোর, ছুতোর। এখানে পাবে কোদাল কাস্তে শাবল কাটারি বঁটি জাঁতি কুরুনি। এখানে পাবে হাঁড়ি কলসী মালসা, ছাপের পুতুল, মানতের ঘোড়া। এখানে পাবে কাঠের তৈরী দরজা, শিক বসানো জানালা, মাঠে জল দেবার সেঁউতি দোঙা। বর্ষায় মাঠে কাজ করবার জন্যে মাথা ঢাকার টোকা, হুঁকো, কলকে, মায় চাঁছাছোলা চৌকিও।

এ আর এক মেলা। এখানে ক্রেতা-ক্রেত্রীও তাই আলাদা। গ্রামীণ মাঠের মানুষ, ভিন্ন গৃহস্থী। ধান কাটা শেষ, নবান্ন হয়ে গেছে, এখন পাখিরা ঘর বানাবার কুটোকাটির খোঁজে। বাসা গোছাবার জিনিসপত্রের সন্ধানে।

ছাতিমতলার মেলায় সব আছে। এই তো সেই মেলা, চিরদিনের মেলা। মেলা তো কেবল কেনা না। ঘরের বাইরে চরণ খানি, সব এক ঠাঁই হয়ে দূর দূর থেকে এসে কেনাকাটা করে আবার দূরদূরান্তে চলে যাবে।

এই তো সেই মেলা, নাগরদোলা, ম্যাজিকের খেলার তাঁবু, সার্কাসের পশু, জঙ্গলের মানুষ খাওয়া, এক মানুষের তিন মাথা আগুন-জ্বালানো মেয়ে, যার গায়ে কাঠি ছোঁয়ালেই চিকচিক করে ফুলকি জ্বলে ওঠে।

শুধু কি তা-ই, ওই দেখ না, গ্রামের বালারা কেমন করে চুড়িওয়ালীকে ঘিরে ধরেছে। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, সাজাও সাজাও আমাকে, সাজাও গো। ওই তো কপালের টিপ, পাথরের আঙটি, ফুলেল তেল, তরল আলতা, পতি-সোহাগী সিঁদুর।

কিন্তু রোদ যেন অনেক চড়া হয়ে গিয়েছে। হাতের ঘড়ি তুলে দেখতে গিয়ে চোখ কপালে ওঠে। ছি ছি ছি, বেলা তিনটে!

থমকে দাঁড়াতে দেখে অচিনবাবু হাঁকেন, 'কী হল?'

'তিনটে বাজে!'

'তা কী হয়েছে?'

'বন্ধু বসে থাকবেন কিনা জানি না, খাবার কথাই ভুলে গেছি।'

'বাঃ, চমৎকার! আর আমি ভাবছি, তুমি বুঝি খেয়ে-দেয়েই বেরিয়েছ।'

তারপরে হেসে বলেন, 'তবে এসেছ তো মেলায়। ঘাবড়াবার কী আছে? চল, না-হয় মেলাতেই খাবে।'

আমি বলি, 'সেটা হয় না। একবার যাওয়া দরকার।'

'তবে চল, তোমাকে দিয়েই আসি।'

দুজনেই উত্তরের দিকে ফিরি। ফিরতে গিয়েই হঠাৎ একটা চেনা মুখ যেন ঝলকে ওঠে। এগিয়ে যাবার জন্যে দু পা বাড়িয়েও আর একজন মুখোমুখি থমকে দাঁড়ায়। চোখ থেকে চোখ সরায় না। তার অবাক মুখে হাসি ফুটিফুটি করে। তার সঙ্গে আরো কয়েক সঙ্গী ও সঙ্গিনী। অতএব তাদেরও দাঁড়াতে হয়, অচেনা চোখে তাকায়।

কয়েকটি মুহূর্ত মনের অন্ধকারে ঝিলিক খেলে যায়। আমি বলি, 'আপনি ঝিনি—?'

'চিনতে পারলেন? কিন্তু ঝিনি না, কারণ চিঠিতে তাই লিখেছিলাম, জবাব পাওয়া যায় নি। যদিও কথা দিয়েছিলেন। আমার নাম অলকা চক্রবর্তী।'

হাসির চেয়ে ওর মুখে ভার বেশী। আমি যেন কেমন থতিয়ে যাই, বিব্রত লাগে। তবু হাসি। আর অচিনবাবু বলেন, 'চলি ভায়া, বাউল আসরে দেখা হবে। তবে বেলা কিন্তু অনেক।'

ক্রমশ

একটি কুপন, যাতে
বাঁচবে ৩৫ পয়সা
যদি সিনথল টয়লেট
পাউডার কেনেন

প্রত্যেকটি দুর্গন্ধনাশক ও ত্বক উজ্জ্বলকারী
সিনথল সাবানের মোড়কের মধ্যে
একটি বিশেষ কুপন আছে আর সিনথল টয়লেট পাউডারের
যে কোন একটি কৌটো (লার্জ, ফ্যামিলি বা
ইকনমি সাইজ) কেনবার সময় এই কুপন দিয়ে
আপনার ৩৫ পয়সা সাশ্রয় হবে।

প্রিয় সুরভিভরা সিনথল সাবান ও টয়লেট পাউডারে
রয়েছে বিশেষ সৌন্দর্য্য উপাদান জি-১১ (হেক্সাক্লোরোফিন)

সিনথল সাবান অনেকদিন
টেঁকে এবং ব্যবহারে খরচ কম হয়।

**সিনথল টয়লেট পাউডার মেখে নিশ্চিন্তভাবে সারাদিন
তাজা ও ঝরঝরে বোধ করুন এবং ৩৫ পয়সা সাশ্রয় করুন।**

INTERPUB GC/ 7 BN

পরিমাপ বিজ্ঞান ও প্রগতি

মোটরগাড়ী, রকেট ও ওষুধের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে, কোথাও কোন মিল নেই। কিন্তু তা নয়, একটি বিষয়ে অন্তত মিল আছে—সেই বিষয়টি হচ্ছে নিখুঁত ও নির্ভুল পরিমাপ। গাড়ী বলুন বা রকেট বলুন, সেগুলি বিভিন্ন যন্ত্রাংশ নির্মিত হয় বিভিন্ন কল-কারখানায়, বহু দূরত্বের ব্যবধানে সেগুলির অবস্থিতি। কিন্তু যে-কোন গাড়ী বা রকেটে সেগুলি মাপে মাপে খাপে খাপে যথাস্থানে বসে যাওয়া চাই, যা মাপ নির্ভুল না হলে সম্ভব হয় না। তেমনি ধরুন ওষুধ বা টিকার কথা। সেগুলি বিভিন্ন উপাদানের এতটুকু কম বা বেশী থাকলেই বিপদ। কম থাকলে ওষুধে কাজ হবে না, বেশী হলে রোগ বেড়ে যেতে পারে। এখানেও সেই নির্ভুল মাপের প্রশ্ন।

সত্যি বলতে কি, পরিমাপের দ্বারাই জড়-জগৎ মানুষের বোধগম্য হয় এবং বস্তুত সভ্যতার অগ্রগতি মানুষের পরিমাপ-দক্ষতার উন্নতির সংগে চলেছে তাল মিলিয়ে। তার মধ্যে সময় পরিমাপ করাটা আদিম কাল থেকে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শুধু মানুষ কেন, প্রতিটি জীবনের ক্রিয়াকলাপের সংগে পরিমাপের সম্পর্ক আছে। বহু শতাব্দী ধরে মানুষ পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতিকে সময়ের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে এসেছে। প্রাচীনেরা দিনকে ১২ ঘণ্টা ও রাত্রিকে ১২ ঘণ্টায় ভাগ করতেন। সারা বছর দিন ও রাত্রির মেয়াদ যে সমান থাকে না তা নিয়ে তাঁরা তত মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কিছু অনুসন্ধিৎসু লোক ছিলেন যাঁরা মহাগগনের দিকে তাকিয়ে সময় মাপবার আরো ভাল মানদণ্ডের কথা চিন্তা করতেন। তাঁরা শেষে পৃথিবীর আহ্নিক গতিবেগকেই সেইরকম মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেন। কারণ, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, আকাশে সূর্যের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিতির ভিত্তিতে সময় হিসাব করলে জ্যোতিষের সমস্ত ঘটনা ঠিকমত ব্যাখ্যা করা যায় না।

কিন্তু কিছুকাল যাবৎ বৈজ্ঞানিকরা পৃথিবীর আহ্নিক গতিবেগকে সময়ের সেরা মানদণ্ড হিসাবে আর গ্রহণ করতে পারছেন না। তাঁরা দেখেছেন যে, বিভিন্ন গ্রহের গতিবেগ, যেমন পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদের, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর, বৃহস্পতির চারিদিকে তার চাঁদগুলির গতিবেগের মধ্যে সঙ্গতির অভাব আছে, যদি পৃথিবীর আহ্নিক গতির পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির বিচার করা যায়। কিন্তু অসঙ্গতিটি সর্বক্ষেত্রেই এক রকম। তা হলে পৃথিবীর ঘোরার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা অসঙ্গতি থাকা উচিত। কিন্তু তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে, পেণ্ডুলামের বা ইলেকট্রিক ঘড়ির চেয়ে পৃথিবীর আহ্নিক গতি ঘড়ি হিসাবে ভাল। কিন্তু আরো নিখুঁত ঘড়ি কি তৈরি করা যায় না? পাওয়া যায় এবং সে হচ্ছে পারমাণবিক ঘড়ি, যার সূত্রপাত হয় ১৯৬৪ সালে। সেই ঘড়ি অনুসারে এক সেকেণ্ড সময় হচ্ছে একটি সিসিয়াম পরমাণুর ৯১৯২৬৩১৭৭০ বার কাঁপনের জন্য যে অন্তর্বর্তী সময় লাগে তার সমান। পৃথিবীর আবর্তন-বেগের ভিত্তিতে এক সেকেণ্ড সময়ের পরিমাপ করার রেওয়াজ ছিল এতদিন। কিন্তু পারমাণবিক ঘড়ি হিসাবে সেকেণ্ডের পরিমাপ আরো নিখুঁত হবে। মার্কিন ন্যাশনাল ব্যুরো অব স্ট্যাণ্ডার্ডস এইরকম দুটি ঘড়ি তৈরি করেছেন, যে দুটির মধ্যে সময়ের তফাত হবে ১০০০০০ কোটি ভাগের ৬ ভাগ। তার মানে ৫০০০ বছরে একটি ঘড়ি মাত্র ১ মিনিট পেছিয়ে যাবে অন্যটির তুলনায়। এখন এর চেয়েও নিখুঁত পারমাণবিক ঘড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে; কারণ, মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবিধির, কিছু পরমাণু-কণিকার ভাঙ্গনে কত সময় লাগে তার হিসাবের ব্যাপারে ঐরকম আরো নিখুঁত ঘড়ি চাই। ঐসব পরমাণু কণিকার জীবন-কাল সেকেণ্ডের শত কোটি ভাগেরও কম। সেই জীবনকাল মাপবার জন্য এমন ঘড়ি চাই যা ৩ কোটি বছরে এক সেকেণ্ডের বেশী এগিয়ে বা পেছিয়ে যাবে না।

দৈর্ঘ্যের দশমিক মানদণ্ড হচ্ছে মিটার, যার জন্ম হয়েছিল আজ থেকে ২০০ বছর আগে ফরাসী অ্যাকাডেমীতে। ভূগোলের ভিত্তিতে এ দশমিক পরিমাপের ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ১৮২৭ সালে ফরাসী বৈজ্ঞানিক জ্যাক বাবিনে প্রস্তাব করেন, আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যের আরো নিখুঁত মানদণ্ড হতে পারে। তারপর বিংশ শতকে বিজ্ঞানাচার্য মাইকেলসন্ সেই প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়িত করার রাস্তা দেখান। কিন্তু সেটি কার্যকরী হতে আরো বহু সময় লাগে। ১৯৬০ সালে একাদশ ওজন ও পরিমাপ কংগ্রেসে মিটারের নতুন সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয় যে, মিটার হচ্ছে ক্রিপটন-৪৬ পরমাণুর বিশিষ্ট রূপান্তরের ফলে যে আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উৎপত্তি হয় তারই ১৬৫০৭৬৩·৭৩টি মিলে হয় ১ মিটার।

যে যন্ত্রে আলোক তরঙ্গের দ্বারা নিখুঁত পরিমাপ-কার্য করা হয় তার নাম ইণ্টারফেরোমিটার। কিন্তু মেসার যন্ত্রের সেই আলোক কয়েক সেণ্টিমিটারের বেশী মাপবার কাজের উপযুক্ত নয়। তার চেয়ে বেশী দৈর্ঘ্য (যেমন ১০০ মিটার) মাপবার জন্য চাই লেসার যন্ত্রের আলো।

এইসব অদ্ভুত কলাকৌশল দেখে শুনে মনে হয় যে, মানুষ এমন এক সীমাহীন মাপবার ফিতা হাতে পেয়েছে, যার প্রতি মিটার লক্ষ লক্ষ ভাগে দাগ দিয়ে ভাগ করা আছে, যা মেশিন টুল শিল্পে এবং অন্যান্য বহু ব্যাপারে আনবে এক বৈপ্লবিক যুগান্তর। ভূকম্পনের প্রাক্কালে ভূত্বকের নড়ন-চড়ন পর্যন্ত হয়ত এইসব যন্ত্র দিয়ে মাপা যাবে। এখন আলোকতরঙ্গের সাহায্যে ১০ কোটি ভাগের ১ ভাগ পর্যন্ত মাপা সম্ভব হচ্ছে অর্থাৎ ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে ১ মিলিমিটার পর্যন্ত।

দৈর্ঘ্য, ওজন, সময় ও তাপ এই চারিটিই হচ্ছে মাপবার প্রধানতম বিষয়।

ওজন বা চাপ মাপবার প্রশ্নটি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে মহাজাগতিক অভিযানের সঙ্গেও জড়িত। আমেরিকায় একটি ৯৯ ফুট উঁচু হাইড্রলিক মেশিন নির্মিত হয়েছে, যা ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড পর্যন্ত চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এই যন্ত্রের সাহায্যে রকেটের গতিচাপ মাপা যেতে পারে। ভাবী মানুষবাহী স্যাটার্ন-৫ রকেটের চাপ পরীক্ষার জন্য ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড চাপ দিতে পারে এমন যন্ত্র নির্মাণ করা হচ্ছে।

তাপের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। হাজার হাজার ডিগ্রী থেকে আরম্ভ করে শূন্য ডিগ্রী ফারেনহাইটের ৪৫৯ ডিগ্রী নিচে (অ্যাব্‌সোলিউট জিরো) পর্যন্ত তাপমাত্রার প্রতি ডিগ্রীকে বহু অংশে ভাগ করা সম্ভব হয়েছে।

কারখানা-শিল্পে ইলেকট্রন রশ্মির বিকিরণের সাহায্যে প্লাস্টিকের জিনিস নিখুঁত করা, রবার ভল্‌কানাইজ করা, ওষুধপত্র নির্বীজাণু করা, খাদ্য সংরক্ষণ করা এবং ঢালাই ধাতুর মধ্যে খুঁত বার করা হয়। এখানেও মাপের প্রশ্ন রয়েছে; কারণ, বিকিরণের পরিমাণ কম বা বেশী হলে ঠিক ফল পাওয়া যায় না।

পরিমাপ-কৌশল বহু কালের পুরানো হলেও আধুনিক পরিমাপবিজ্ঞান বা মেট্রোলজির বয়েস খুব বেশী নয়। এই বিজ্ঞানে আছে যুক্তি, আছে প্রচলিত ধারা এবং এই দুটির মধ্যেকার বৈসাদৃশ্য। আদর্শ লক্ষ্য ও বাস্তব সম্ভাব্যতা এবং তত্ত্ব ও প্রয়োগ এই দুটি দিকই এর মধ্যে প্রতিফলিত। পরিমাপবিজ্ঞানের ছাত্রকে বুঝতে হবে যে, তার সারবস্তু হচ্ছে এই যে, মাপ জোক কোন সময়েই একেবারে ষোল আনা নিখুঁত হতে পারে না, তবে নিখুঁতের খুব কাছাকাছি যেতে পারে।

মহাকাশে গ্রহ-গ্রহান্তর বিজয়ের যুগে মেট্রোলজির গুরুত্ব অসাধারণ। তা ছাড়া আমাদের আধুনিক সমাজও এই পরিমাপ-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। জামাকাপড় তৈরি বলুন, বিমানপথে, রেলে বা জাহাজে ভ্রমণের নিরাপত্তা বলুন, এমন কি শহরের রাস্তার মোড়ে মোড়ে সংকেত-সূচক লাল-নীল-হলদে আলোগুলি বলুন সবই তো হিসাব ও পরিমাপের উপর নির্ভরশীল।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

বিদেশী বিদুষীদের সঙ্গে দু'চার মিনিট

নীলনয়না নীল পোশাকে হোটেলের অভ্যর্থনা-কক্ষে বসেছিলেন। ঢুকেই তাঁকে দেখে মনে হলো, যাঁদের খুঁজতে এসেছি তাঁদেরই একজন হবেন। অন্তর্জাতিক ফেডারেশন অফ ইউনিভার্সিটি উইমেনের পরিচালক সমিতির মিটিং বসেছিল নতুন দিল্লিতে। এক্সিকিউটিভ বা কার্যকরী সমিতির সভ্যরা সেই মিটিং সেরে কলকাতায় দিন দুই কাটিয়ে ফিরছেন তেহরান হয়ে যে-যার দেশে। ইরানী সমিতির সঙ্গেও কিছু কাজ আছে বলে এই প্রোগ্রাম। ভারতবর্ষে আসবার আগে এঁরা করাচীতে একটি আলোচনা-সভায় যোগ দিয়ে এসেছেন। আলোচনা-সভা বা সেমিনার আহবান করেছিলেন পাকিস্তানের স্নাতক সমিতি বা ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেনের মেয়েরা। যাঁর সঙ্গে দেখা হলো দরজায় প্রবেশ করেই তিনি ফিনল্যান্ডবাসিনী। পেশা দন্ত-চিকিৎসা। নাম লিন্ডগ্রেন। কুমারী। নিজের দেশের প্রতিনিধি হিসাবে এসেছেন সভায় যোগদান করতে। সামান্য আলাপেই ফিনিশ মেয়েদের কথা তুললেন। সেখানে দন্ত-চিকিৎসা নাকি মেয়েদের পরম প্রিয় বৃত্তি। শতকরা ৮০টি ডেন্টিস্ট মহিলা। কুমারী লিন্ডগ্রেনের মতে দন্ত চিকিৎসা যে-কোন দেশের মেয়ের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত পেশা, কারণ ঘর-সংসার সামলিয়ে, ছেলেমেয়ের তত্ত্বাবধান করেও অনায়াসে দন্ত-চিকিৎসা করা যায়। ঘরেই যদি রোগী দেখার ব্যবস্থা থাকে, তবে বাইরে যাবার প্রশ্ন বড় একটা আসে না। ফিনল্যান্ডে বহু মহিলা ডেন্টিস্ট স্কুল বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করেন। তাতে দিনের কিছু সময় মাত্র যায়। ঘরের গৃহিণীর সংসারের কাজের ক্ষতি হয় না। ফিনিশ মেয়েদের কথা বলতে বলতেই কুমারী লিন্ডগ্রেন বললেন, তুমি আমাদের লীডারের সঙ্গে দেখা করবে না? লীডারের নাম কুমারী আমন্ড। ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জীব-বিদ্যায় স্নাতক। বয়স হয়েছে, তবু অবসর

পশ্চিমবাংলার এ্যাসোসিয়েশন-এর অভ্যর্থনা আয়োজনে উপবিষ্ট : বাঁ থেকে ডাইনে শ্রীমতী প্যাসিডে (গ্রীস), শ্রীমতী সিনিয়র, শ্রীমতী আমন্ড (সাংস্কৃতিক সংযোগ এর ভারপ্রাপ্ত সভ্য), শ্রীমতী গীতা বসু (ইউনিভার্সিটি উইমেন্স এ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবাংলার সভাপতি), প্রোফেসর ডগলাস (ক্যানাডা), শ্রীমতী ম্যাকেঞ্জি হোয়াইট (গ্রেট ব্রিটেন), শ্রীমতী লিন্ডগ্রেন (ফিনল্যান্ড)। দাঁড়িয়ে : শ্রীমতী জয়া জয়বন্ত, শ্রীমতী ইংসেই (নরওয়ে) শ্রীমতী চিত্রা ঘোষ এ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী, অঞ্জলি সরকার শ্রীমতী দেব্রুজ (বেলজিয়াম) জয়া পিলে, লীলা মুখার্জি

সেওরা জীবনটুকুও নানা কাজে লাগিয়ে রেখেছেন।

কুমারী আমণ্ডের ঘরে পৌঁছে দেখি সেখানে আর একটি মহিলা প্রতিনিধিও রয়েছেন। কুমারী ম্যাকেঞ্জি হোয়াইট। ব্রিটিশ ফেডারেশনের প্রতিনিধিত্ব করছেন। স্কটল্যাণ্ডবাসিনী শ্রীমতী হোয়াইট Y W C A-র কর্মী। অল্পক্ষণ পরেই ওঁদের স্বেচ্ছাসেবক অভিমুখী বিমানের উদ্দেশ্যে ছুটতে হবে। তাই ঘরময় ছড়ানো জিনিস গুটিয়ে নিতে নিতে গল্প করে চললেন। পাকিস্তানের মহিলাদের দেখে আশ্চর্য হয়েছেন খুব। যে-সমাজে সেদিন পর্যন্ত পরদা প্রথা প্রচলিত ছিল, সেই সমাজের মেয়েরা অভাবনীয় সচেতনতায় এগিয়ে চলবার চেষ্টা করে চলেছে। ঢাকা থেকে একটি মেয়ে এসেছিল আলোচনা-সভায় তার গবেষণামূলক রচনা নিয়ে। বিষয় ছিল মেয়েদের কার্যকরী শিক্ষা বা টেকনিক্যাল এডুকেশন। বেশ গুছিয়ে সে তার বক্তব্য সমর্থনযোগ্য যুক্তি দিয়েছিল। মেয়েরা কেন এখনও পেশা পছন্দ করে সেইভাবে শিক্ষা গ্রহণ করছে না, এই ছিল আসল কথা। উদাহরণস্বরূপ মেয়েটি কমার্শিয়াল আর্ট ইত্যাদির কথা তুলেছিল। বড় শিল্পী হতে হবে এমন নয়। আধুনিক জীবনের বহু ক্ষেত্রে পণ্য-পরিবেশনে যে আর্ট দরকার হয়, তার শিক্ষা শিল্পীমন মেয়েরা নিশ্চয় নিতে পারেন। আরও একটু দূর পর্যন্ত দেখলে বলা যায়, সৌন্দর্যবোধকে তারা সব পর্যায়ে ছড়িয়ে দেবার শিক্ষা পেলে জীবিকার সুযোগের অভাব হবে না। প্যাকিং একটি অত্যন্ত অবহেলিত বিষয় অথচ পণ্যকে সুন্দর করে তুলতে প্যাকিং বিশেষ প্রয়োজনীয় শিল্প। বড় বড় প্রতিষ্ঠানে, পণ্যকে সাজিয়ে তুলবার শিল্প নিশ্চয় সমাদরে গৃহীত হবে।

কুমারী আমণ্ড ও কুমারী হোয়াইট দুজনেই বললেন, কলকাতায় তাঁরা যে সব মহিলাদের আতিথ্যের সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের যোগ্যতা এবং কৃষ্টি তাঁদের মনে গভীর ছাপ রেখেছে। ইলিয়ট রোডস্থ অল বেঙ্গল উইমেনস্ ইউনিয়ন হোম বাঙালী মহিলা সমাজের পরম কৃতিত্বের নিদর্শন। এমন প্রতিষ্ঠান বহু সংস্থার আদর্শ হিসাবে গণ্য হলে ভারতীয় মহিলা সমাজের দুঃখভার অনেকাংশে লাঘব হবে সন্দেহ নেই। মিস্ ম্যাকেঞ্জি হোয়াইট Y W C A-র সঙ্গে যুক্ত বলে কর্মী মেয়েদের বাসস্থানের ব্যবস্থার কথা তাঁর বেশী মনে হয়। কলকাতার মহিলা স্নাতক সমিতির একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী ইলা সেনগুপ্তের সঙ্গে নাকি এবিষয় তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। যত মেয়েরা জীবিকার দিকে এগিয়ে আসছেন নিরাপদ, সুস্থ পরিবেশের বাস-ব্যবস্থা ততই প্রয়োজন হয়ে উঠছে। আমাদের এখানেও জীবিকাসন্ধানী মেয়েদের বাসস্থানের ব্যবস্থা কিছু কিছু হয়েছে কিন্তু ক্ষেত্র এত বড় যে, আরও বহুল প্রসারের প্রয়োজন।

শ্রীমতী আমণ্ড আমাদের সকলের মতই বিবাহিত, সংসারী মেয়েদের জীবিকার সুযোগ পাওয়ার পক্ষপাতী। বিশেষত যে-সব শিক্ষিত মায়েদের সন্তান অনেকটা আত্মনির্ভর হয়ে গেছে বা স্কুল-কলেজে যাচ্ছে, তাঁরা তাঁদের অধীত বিদ্যার ব্যবহার করবেন আশা করা যায়। এ-জন্য ফেডারেশন একটি নূতন পরিকল্পনা সবেমাত্র গ্রহণ করেছেন। ব্রিটেনে তার কিছু কাজও আরম্ভ হয়েছে। বয়স্ক মেয়েদের জন্য Refresher Course বা শিক্ষাকে ঝালিয়ে নেবার ব্যবস্থা। ধরুন বিয়ের পর বিশ-বাইশ বছর কোনও মহিলা কেবলমাত্র গৃহকর্ম ও সন্তান পালন করেছেন। তাঁর হয়তো শিক্ষয়িত্রী হবার শিক্ষা ছিল। বিশ বছর পরে সংসারের দায়িত্ব কিছু হালকা হলে হয়তো আবার বাইরের কর্ম-জীবনে ফিরে যেতে চান। কিন্তু এতদিনে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে, হয়তো তিনি নিজেও অধীত বিদ্যার সঙ্গে সংযোগবিহীন হয়েছেন। এসব মেয়েদের জন্য একবার ঝালিয়ে নেবার ব্যবস্থা স্নাতক সমিতির চমৎকার পরিকল্পনা। প্রথম নাকি সায়েন্স টিচারের Refresher Course দিয়ে পরিকল্পনার প্রসারের পত্তন হয়। সায়েন্স আজ এগিয়ে গেছে অনেক। সংসারী মেয়েরা সবাই কিছু সে অগ্রগতির সঙ্গে যোগ রাখেননি। বিজ্ঞানের এই Refresher Course-এর ফলে বহু বয়স্ক মেয়ে নূতন করে তাঁদের পুরোনো বৃত্তিতে ফিরেছেন। বয়স্ক মেয়ে মাত্র নয়, কুমারী আমণ্ড বললেন, আজকাল বেশ কয়েক বছর ধরে পাশ্চাত্ত্য দেশে ছেলেমেয়েরা ঝটপট বিয়ে করে বসে। হাইস্কুলে পড়তে পড়তে প্রণয়, তারপর ঘর পাতার ঘটা পশ্চিম মুল্লুকের আর দশটা নেশার মত একটি নূতন ধারা হয়েছে। এসব বিয়ে স্থায়ী অনেক ক্ষেত্রে হয় না। তখন জীবিকার সন্ধান মেয়েদের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। তাদের পথ-নির্দেশেও ফেডারেশন-এর দায়িত্ব নেওয়া দরকার। বাংলা দেশে University Women's Association বেশ তৎপর হয়ে উঠেছেন। বছর কয়েক আগে যে প্রায়-সুপ্ত সমিতি মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে সভা করে, একটু আলোচনার আয়োজন করে চালিয়ে দিতেন, তার কর্মতালিকায় নানা নূতনের সংযোগ হচ্ছে। এ-জনাই ভরসা পাচ্ছি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে যে, আমাদের দেশে জীবিকাসন্ধানী মেয়েদের অবস্থা আরও অনেক বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করার দাবি রাখে। তাঁদের প্রয়োজন প্রায় বেঁচে থাকার অধিকারের মত। এ ধরনের Refresher Course-এর আয়োজন করলে বহু মেয়ের উপকার হবে; বিশেষত বয়স্ক মেয়েরা আবার নূতন করে সাহস ও আত্মবিশ্বাস সংগ্রহ করলে ও কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সহজে পাবে। স্নাতক সমিতিগুলি যদি এবিষয় কেবলমাত্র বড় শহরে নিজেদের কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ না রেখে, শহরের বাইরে তাঁদের সীমাকে প্রসারিত করতে পারতেন তবে কত কল্যাণ হতো বলাই যায় না। অবশ্য কাজটা কঠিন আর দু-চার দিনে হবার মত নয়। বিদেশ থেকে প্রতিনিধিরা এলে যে-সব মেয়েরা তাঁদের আদর-আপ্যায়ন করেন, নিজেদের শিক্ষা সুযোগ, সচ্ছলতা সৌন্দর্যবোধ দিয়ে তাঁদের আনন্দ দিতে পারেন, তাঁরা যে এই বিশাল দেশের সব মেয়ের প্রতিনিধি নন, এ কথা যেন আমরা না ভুলি। কাজেই আপাতত এই সৌভাগ্য-পরা শহরবাসিনীরা নিজেরাই যেন দূরের মেয়েদের প্রতি দায়িত্বভার মনে রাখেন এই আমাদের প্রার্থনা।

এবার শারদীয়ায়

শুনেছি কুমোরটুলির কারিগররা পর্যন্ত কেউ কেউ দেবীর কুঞ্চিত কেশদামের বদলে মাথায় চাপিয়েছেন ফরাসী ছাঁদের খোঁপা! ভিখারী শিবের ঘরণী তো রাজ-রাজেশ্বরী মা অন্নপূর্ণা। অন্নবিহীন বাঙালী কি তাই শোধ করে তাঁকেও ভিখারী সাজিয়েছে? চেয়ে-আনা চিকুর-চর্চা দিয়ে সাজিয়েছে ভুবনমোহিনীকে। ভাবতে ভাবতে মনে হল, পরের আগে পুজোর ভাবনাসীন ফ্যাশনের ধারাও তো প্রায় তাই হয়ে চলেছে। বিদগ্ধজনে বলেন, ফ্যাশন হচ্ছে পণ্য বিক্রেতার চমকপ্রদ চাতুরী মাত্র! ফাঁদে পা দিলেই ঝামেলা। আমাদের দেশে অবশ্য সাজসজ্জার নিয়ম-কানুন অত চোখধাঁধানো এখনও হয় নি। তবু লক্ষ করলাম শারদীয় সম্ভারে অনেক পরিবর্তন। বিভাগীয় বিপণির শাড়ি বিভাগে শৈল মাসিমাকে দেখলাম সাবধানে বাজার করছেন। প্রথম মেয়ের বিয়ে হয়েছে। তার প্রথম পুজোর তত্ত্ব। কুটুম্ববাড়িতে মান দেখাতে হবে, তবেই তো মান বজায় থাকবে। নিয়ন আলোর তলায় 'টেরিকট' কৃত্রিম তন্তুর ঝলমলে বেনারসী নমুনা, তার গায়ে স্টেনলেস স্টীলের জরির বুটা মাসিমার বেশ মনে ধরলো। 'সোনা রুপোর কাজ করা বেনারসীর তো আর যুগ নেই' দোকানী বুঝিয়ে দিল। দাম বেশী নয়। ৬০।৬৫ টাকা হলে জাঁকালো একখানা

ট্রামে বাসে

ভারত ও সিংহল একই সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী, বলিয়াছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। বিশু-খুড়ো বলিলেন—"হয়ত তাই। কিন্তু যে-সংস্কৃতিক বিপ্লবের উত্তরাধিকারের জন্য ভারতের কোথাও কোথাও কয়েক নম্বর মামলা দায়েরের আয়োজন চলছে, সেই সংস্কৃতির ধারক হয়ত সিংহল হতে চাইবে না!!"

সংবাদে প্রকাশ, রাজস্থানে প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষক নাকি ভিক্ষাবৃত্তি করার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন।—"অত্যন্ত আনন্দ এবং গর্বের কথা। কিন্তু প্রকাশ থাকে, বৈদেশিক এড্—সে খাদ্যাদ্য অর্থ বা যা-কিছু হোক—নিশ্চয়ই ভিক্ষার

আওতায় পড়ে না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

বিলাতের লিবারেল পার্টির নেতা, "রাজনীতিকরা জাহান্নামে যাক" শ্লোগান লইয়া নির্বাচনী প্রচার অভিযানে বাহির হইয়াছেন। সহযাত্রী গল্প শুনাইলেন, একটি ছোট্ট গল্প: পাদ্রীসাহেব বক্তৃতা দিচ্ছেন, যারা মদ খায়, পাপ করে তারা নরকে যাইবে। তখন একজন শ্রোতা প্রশ্ন করলেন—আর যারা ঘোড়দৌড়ে? পাদ্রী বললেন—ঘোড়-দৌড়ে পাপ করে, সে নরকে যাইবে। শ্রোতার দ্বিতীয় প্রশ্ন: আর গোলাপ অপবাদে? পাদ্রী বললেন—সে-ও নরকে যাইবে। শ্রোতা তখন বললেন—তা হইলে তো নরকই গুলজার, স্বর্গে যাইয়া করবে কি হালায়। সহযাত্রী গল্প শেষে বলিলেন—"সব রাজনীতিক জাহান্নামে গেলে তো জাহান্নামই গুলজার।"

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, নাগাদিগকে চীনের সঙ্গে ফ্লার্টিং বন্ধ করার পরামর্শ দিয়াছেন। শ্যামলাল অন্য প্রসঙ্গ টানিয়া বলিল—কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আপাতত বিবাহ স্থগিতের পরামর্শ দিয়েছেন, সুতরাং ফ্লার্টিং ছাড়া গতি কি!!"

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলিয়াছেন—বেয়নেট দেখাইয়া কাহারও কোন ভাষা শিখিতে বাধ্য করা যায় না। সহযাত্রী

বলিলেন—"তা যায় না, তবে অন্যদের বিদ্বেষ, বক্তৃতা আর বিবৃতি দিয়ে শেখানো যায়।"

উত্তর কানাডা হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে কোন এক সংস্থার কর্মীরা নাকি ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনটির বেশি সন্তান হইলে তাঁহারা আর বেতন বৃদ্ধির দাবি জানাইবেন না। সহযাত্রী বলিলেন—"কিন্তু অন্য কোন সংস্থার অন্য কর্মীরা হয়ত বেতন সম্পর্কে কোনরূপ জোর জুলুম না করে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিটি জোড়া নীতি পালন করে যাবেন!!"

সেনেটর রবার্ট কেনেডি নাকি বলিয়াছেন যে, কোরিয়ার যুদ্ধে এবং ভিয়েৎনামের যুদ্ধে মোট নিহতের সংখ্যার চেয়ে অধিকসংখ্যক আমেরিকান প্রতি বছর সিগারেট খাইয়া মরে।—"এ বাণীর একমাত্র অর্থ নির্ভেজাল গাঁজা, যার সম্পর্কে অজ্ঞাতনামা কবি বলেছেন, এক ছিলিমে যেমন-তেমন দুই ছিলিমে ভালো, তিন ছিলিমে উজির-নাজির চার ছিলিমে রাজা"—সহযাত্রী সুর সংযোগেই মন্তব্য শেষ করিলেন।

বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে কোন এক অনুষ্ঠানে সমবেত চিত্র তারকাদের দর্শনার্থী জনতাকে সামলাইতে না পারিয়া পুলিস শেষ পর্যন্ত কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছে।—"হয়ত তার প্রয়োজন ছিল না; চিত্র তারকাদর্শন-বঞ্চিতদের কান্নার জন্য গ্যাসের প্রয়োজন হয় না, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন"—বলে শ্যামলাল।

কলিকাতায় সম্প্রতি গগন ঠাকুর মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদযাপিত হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আমরা উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাই। কিন্তু প্রসঙ্গত এই কথাটিও বলব, রবীন্দ্র নাটকের একচ্ছত্র 'রাজা' গগনেন্দ্রনাথের কথা কেউ বলেন নি। রবীন্দ্রনাথ যোগ্য রাজার সন্ধান পেয়েছিলেন, এখনো চোখের সামনে ভাসে সেই রাজোচিত চেহারা; চলনে বলনে রাজেন্দ্রপ্রভায় নাট্যমঞ্চ জমজমাট হয়ে উঠত।"

একটি বৈদেশিক সংবাদে প্রকাশ, কোন এক ভদ্রলোক তাঁর খাদ্যের ৯৮ ভাগ মাটি আর মাত্র দুই ভাগ রাসায়নিক পদার্থ খাইয়া নাকি দিব্য বাঁচিয়া আছেন। এইবার গল্প শুনাইল শ্যামলাল: জামাই শ্বশুর-বাড়ি এসেছেন। তিনি স্বভাবে মুখচোরা; মা বলে দিলেন, শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিস, শ্বশুর মশাইর সঙ্গে দু' একটা কথা বলিস, নইলে নিন্দে হবে। ছেলে খাওয়া-দাওয়ার কথা নিয়ে শ্বশুরবাড়ি এল। একদিন সন্ধ্যায় শ্বশুর মশাইর সঙ্গে বসে আছে। কথা বলার ইচ্ছেও আছে, কিন্তু কথা আর খুঁজে পাচ্ছে না। অনেক ভেবে চিন্তে একবার জিজ্ঞেস করল—শ্বশুর মশাই, আপনি কি বিয়ে করেছেন? প্রশ্ন শুনে শ্বশুরের চোখ ছানাবড়া। যা-হোক, মনের ভাব চেপে বললেন—তা আমি বিয়ে না করলে তুমি কী করে বিয়ে করলে বাবা। ভুল বুঝে জামাই চুপ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ভেবে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল: আচ্ছা, নদী গভীর বটে কিন্তু তার পাড় যে অত উঁচু হয়, এই মাটি কোথায় গেল? সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর জবাব দিলেন—এমাটির অনেক খেয়েছেন তোমার বাবা আর বাকী অনেক খেয়েছি আমি। গল্প শেষে শ্যামলাল বলিল—মাটি খেকো ভদ্রলোকের দেশপ্রেম লক্ষ্মীলাভ হোক, অনেক মাটি আমরা দিয়ে দিয়ে দিশেহারা হচ্ছি, আর মাটি খাওয়ার সাধ নেই।

আপাতত বিবাহ স্থগিতের পরামর্শ সম্পর্কে সহযাত্রী বলিলেন—"আমাদের কিন্তু 'আপাতত' কথাটি সঠিক

বোধগম্য হয় নি। স্থগিত দীর্ঘমেয়াদী হলে যে একদিন গাইতে হবে—'এখন আমার বেলা নাহি আর, বহিব একাকী বিরহের ভার'—এবং তারপর বনং ব্রজেৎ না করলেও মনে যে আর মনের তলানিটুকুও থাকবে না।"

তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ, ভারতের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি পয়সা দিলেই ডিগ্রি পাওয়া যায়। সহযাত্রী বলিলেন—"এডুকেশন মেড ইজি!!"

শৌভনিক প্রযোজিত গোরা নাটকের একটি বিশেষ মুহূর্তে গোরা (গোপেন মুখোপাধ্যায়) ও আনন্দময়ী (মায়া সেনগুপ্তা)

দিল্লির ডায়েরি

সনটা ছিল ১৯৬৬, তারিখ ২২শে মে। কলকাতার ১২৩ নম্বরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডে একটা আগুন। আট মিনিটের আগুনে একটি গোটা থিয়েটার তার সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে ছাই। কিন্তু সোনা পুড়ে যেমন খাঁটি হয়, জনপ্রিয় নাট্য-প্রতিষ্ঠান "শৌভনিক"ও আরো জোরদার, আরো জনপ্রিয়, আরো খাঁটি হয়ে বেরিয়ে এসেছে ঐ আগুন থেকে।

এরা দলবল নিয়ে এলেন রাজধানীতে; রাখলেন তাদের তিনটি নাটক এখানকার সুধীজনের সামনে; পেয়েছেন অকুণ্ঠ অভিনন্দন তাদের কাছ থেকে যারা বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির উচিত সমাদর দিতে জানেন, যাদের মনেও লুকিয়ে থাকে শিল্পী, আর যে-মনকে শৌভনিকের অভিনেতা অভিনেত্রীরা নাড়াচাড়া দিয়ে শিল্পী-মানুষটার ঢাকনাটা সাময়িকভাবে খুলে দেয়। এবং অভিনন্দন তো তাই—শৌভনিক শিল্পীরা সাধারণ শ্রোতাকেও অজান্তে অবচেতনে শিল্পী করে তোলে।

কলকাতার লোকেরা তাদের নাটক অনেক দেখেছেন সেই ১২৩ নম্বর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডে মুক্ত অঙ্গনে, যা একদিন পুড়ে হয়েছিল ছাই আর যে ছাই-এর উপর আবার দাঁড়িয়েছে সেই একই মুক্ত অঙ্গন। এখানে একটি ক্লাব আছে, নাম "যাযাবর গোষ্ঠী"। তাদের প্রচেষ্টাতেই শৌভনিক এল এই প্রথম। তিনটি নাটক এবং ইন্দ্রজিৎ, অমতুল্য পুত্রঃ এবং গোরা। যাযাবর গোষ্ঠী আমাদের ধন্যবাদের পাত্র, কেননা তারা আমাদের সুযোগ দিলেন কলকাতার সেরা নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম একটির অভিনয় ও নতুন নাট্যমঞ্চশৈলী দেখার। আমরা অকুণ্ঠচিত্তে আবার বলি নাটকগুলো আমাদের খুব ভাল লেগেছে, তথাকথিত সমালোচকরা (পেশাদার) যাই বলুন না কেন।

কথাটা যখন উঠলই আরো একটু বলা ভাল। একমাত্র এই দিল্লিতেই আমি প্রথম দেখলাম যে নাটকের ভাষা (তা বাঙলাই হোক, কি মারাঠী হোক), বিন্দুমাত্র না-জেনেও এখানকার ইংরিজি সংবাদপত্রে নাট্য-সমালোচকরা ছাপার অক্ষরে তাদের অতি মূল্যবান বাণী-সম্বলিত উপদেশামৃত-বিচ্ছুরিত সমালোচনা বের করে আসছেন এবং সম্পাদকরা বেমালুম তা হজম করে আসছেন। ধরুন আমি ইংরিজি ভাষার কিছুই জানিনা, আমি শেক্সপীয়রের নাটকের "সমালোচনা" করলাম। কোনো ইংরিজি খবরের কাগজ ছাপবে? অথচ বাঙলা ভাষা যে ব্যক্তি পড়তে জানে না, বলতে পারে না, বোঝে না, কোথায় তার চারুময়তা, তার পক্ষে কী করে সম্ভব নাটক সমালোচনা করার? ওটা তো প্যান্টোমাইম দেখে সমালোচনা করার মতো? ধরুন জন্মবধির সমালোচনা করল রবিশংকরের অথবা ইয়েহুদি মেনুহিনের। অথচ বাঙলা নাটকের বেলায় এই অদ্ভুত জিনিসটি হয়ে আসছে এখানকার একটি বাদ দিয়ে সমস্ত ইংরিজি সংবাদপত্রে। পৃথিবীর আর কোথাও এমনটি হয় কিনা আমার জানা নেই। (অবশ্য তারা প্রতিবাদপত্র ছাপান, এবং কয়েক দিন আগে একটি কাগজে বাঙলায় মার্চেন্ট অব ভেনিস নাটকের "আমাদের নাট্য সমালোচক দ্বারা" যে-অপরূপ এবং নির্বোধ সমালোচনা বেরিয়েছিল, সেই কাগজে তার প্রতিবাদ বেরিয়েছে সাইজে দশ গুণেরও অধিক।)

শৌভনিক প্রযোজিত অমৃতস্য পুত্রাঃ নাটকের একটি দৃশ্যে, কৃষ্ণ কুণ্ডু (সনাতন), গোবিন্দ গাঙ্গুলী (সজ্জন) ও মানব মুখার্জি (পুঃ ইন্সপেক্টর)

অথচ হিন্দী নাটকের বেলায় তা হয় না; তামিলভাষীরা তার সমালোচক হন না।

শৌভনিকের জন্ম পয়লা মে, ১৯৫৭ সনে। পুরোনো আই পি টি-এ থেকে আসা নিমু ভৌমিক, সুধাংশু মণ্ডল, গোবিন্দ গাঙ্গুলী ইত্যাদির ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। তারপর থেকে তাঁদের বৃদ্ধিসাধন হয়েছে, গোটা বাঙলায় নাম করেছেন, এবং নাট্য-শিল্পে নতুন অধ্যায় এনেছেন, যেমন এনেছেন কলকাতার আরো কয়েকটি অপেশাদারী নাট্য গোষ্ঠীর, যারা পেশাদারী সম্প্রদায়দের নাকে তুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেছে পথিকৃৎ হিসেবে। শৌভনিকের মস্ত অবদান তাদের গণরঙ্গমহল আন্দোলনে, অর্থাৎ খুব খরচপত্র না-করেও যাতে শিল্পী-মন বাঙালীরা নাটক দেখতে পারে এবং নতুন নতুন পরীক্ষামূলক পদক্ষেপেও মননশীল অংশীদার হতে পারে নাট্যকার ও নাট্য-শিল্পীদের সঙ্গে।

শৌভনিকের নিজের কথায় : "গতানু-গতিকতার পথ পরিত্যাগ করে বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার তাগিদে আমাদের গণরঙ্গমহল অভিযান। এতে অত্যন্ত সুলভে সর্বশ্রেণীর দর্শকের কাছে থিয়েটারের দ্বার অবারিত করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই পরীক্ষামূলক প্রয়াসে এক সঙ্গে হাজার দর্শককে মুক্তঅঙ্গনে আনন্দরস পরিবেশন করা গেছে এবং যাচ্ছে। আমাদের মঞ্চ-ব্যবস্থায় অনাড়ম্বর পরিবেশে নাট্য-প্রযোজনার ফলে শতাব্দী দর্শক ও অভিনেতার মধ্যকার অচল অনড় ব্যবধান ঘুচে গেছে।" ভাইস প্রেসিডেন্ট নিমু ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণ কুণ্ডু (কলকাতা পৌর সংস্থার কাউন্সিলর), দেবাশিস দাশগুপ্ত, গোবিন্দ গাঙ্গুলি—এদের সঙ্গে কথা বলে মনে হল তাদের আদর্শের সততা হীরের মতো খাঁটি, ঐ আগুনে পোড়া সোনার মতো খাঁটি।

শৌখীন দলে যা হয়। অনেকেই অপিসের কেরানী, যেমন, সুধাংশু মণ্ডল, গোপাল সান্যাল, পিন্টু বসু, দিলীপ দাস, বিমল ব্যানার্জি, চিনু দাস, শিবু মজুমদার, গোপেন মুখার্জি, বীরেশ্বর মিত্র ইত্যাদি। দুয়েকজন ব্যবসায়ী। অন্যরা চাকুরিজীবী। ওয়ার্কিং মেম্বর, যারা শৌভনিক পরিচালনা করেন, তারা হলেন ১৬জন, সহকারী সভ্য ৩৫জন, পেট্রন ৫।৬জন, যাদের ভিতর আছেন কলকাতার মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে (সভাপতি), নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীঅজিত দত্ত (বর্তমান অ্যাডভোকেট জেনারেল), ডক্টর ত্রিগুণা সেন (শিক্ষামন্ত্রী), ডক্টর সাধন ভট্টাচার্য, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিজয় ব্যানার্জি, কমল মিত্র এবং মন্মথ রায়।

একজন সভ্য বললেন : "জানেন তো অপিসের কাজ করি নামমাত্র। ওই খাতায় নাম সই। প্রাণটা থাকে থিয়েটারে, রিহার্সালে, ভূমিকায়। তা না হলে কী করে চলে বলুন। অপিসের বন্ধুরাও মেনে নেয়, কেউ হয়তো কাজটা করেও দিল।"

সভ্যাদের ভিতর আছেন জোৎস্না ব্যানার্জি, ইন্দু চ্যাটার্জি, মায়া বসু, সৌমিত্রা চৌধুরী, মায়া সেনগুপ্তা, ছবি চ্যাটার্জি ও মঞ্জু দাশগুপ্তা। আমার ব্যক্তি-গত ধারণা যে, শৌভনিক অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে দুর্বল। নিমু ভৌমিক বললেন, অপেশাদারী সভ্যাদের পাওয়া মুশকিল। তাদের অনেকে অর্থের জন্যে অন্য জায়গায় অভিনয় করেন, ফলে মুক্ত অঙ্গনে প্রতি সপ্তাহে তিনদিন (বিষ্যুৎ, শনি ও রবিবার) নিয়মিত তারা আসতে

পারেন না। সেজন্যার মতো টাকা পয়সা নেই সংস্থার। সুতরাং—।

ঠিক। অপেশাদারী অনেক গোষ্ঠীরাই এ কথা বললেন। সেদিন নান্দিকারও তাই বললেন। কিন্তু চেষ্টা করা উচিত যাতে অভিনেতা অভিনেত্রী সকলেই কিছু কিছু অর্থ পান। কীভাবে হতে পারে সেই মাথা ব্যথা কার্যকরী সমিতির। সাংবাদিক, লেখক, চিত্রশিল্পী কেউ সাধারণত পয়সা ছাড়া কাজ করেন না (কেনই বা করবেন?)। অপেশাদার নাট্যশিল্পীরা বা কেন পাবে না, বিশেষত যখন তারা একটা বৈশিষ্ট্য অর্জনের পর্যায় উন্নীত হন নিজেদের অভিনয় শিল্পের দৌলতে?

শৌভনিকের স্মরণীয় অধ্যায় মুক্ত অঙ্গন পুড়ে যাওয়ার পর। কলকাতার সমস্ত নাট্যগোষ্ঠী, নামকরা শিল্পীরা, সকলে এগিয়ে এসেছেন তাদের সহায়তায়। তারা রাস্তায় নেমে পয়সা তুলে তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। অভিনয় করে টাকা দিয়েছেন। জনসাধারণ অপূর্ব সহানুভূতি দেখিয়েছেন। "ওই তো আমাদের মূলধন", বললেন কৃষ্ণ কুণ্ডু। "আমরা কতো কৃতজ্ঞ! বাঙলার বাইরে থেকেও এসেছে সাহায্য। আমরা একমাসের ভিতর আবার দাঁড়া করিয়েছি আমাদের মুক্ত অঙ্গন থিয়েটার। জানেন, "বহুরূপী" ছাড়া মুক্ত অঙ্গনে থিয়েটার করেনি এমন অপেশাদারী দল নেই।"

শৌভনিকের অবস্থান গণরঙ্গমহলে আর রবীন্দ্রনাথের নাটককে জনপ্রিয় করায়, প্রথম গণরঙ্গমহলে ১৯৫৮-তে, ডি-এন্ মিত্র স্কোয়ারে। হল গর্কির "মা", দ্বিতীয় মহীপাল ও মৃচ্ছকটিকা। দ্বিতীয়বারে এদের সঙ্গে যোগ হল ইবসেনের "ঘোস্ট", এবং "মা-হিংসা"। তৃতীয়বারে (১৯৬০) আরো যোগ হল সপ্তাহব্যাপী নাট্যমেলায় "কল্যাণ", "ফানুস" ও "গোরা"।

এরাই প্রথম আরম্ভ করলেন রবীন্দ্র-নাট্যোৎসব ১৯৬১-তে শতবার্ষিকী উপলক্ষে, নিমু ভৌমিক বললেন : "আমাদের গর্ব আমরা রবীন্দ্রনাটক জনপ্রিয় করতে পেরেছি। আমরা সেই সব নাটক নিয়ে গেছি জামসেদপুর, রুড়কেল্লা, পাটনা, লখনৌ, এবার দিল্লি। গোরা, রাজা, রাজা ও রানী, বাঁশরী, মুক্তির উপায়, শেষ রক্ষা, ঘরে বাইরে, তাসের দেশ, আমরা সব মঞ্চস্থ করেছি। কে বলে আমাদের জনসাধারণ রবীন্দ্রনাথ বোঝে না? তারা বোঝে তারা ভালবাসে।"

চাট্টিখানি কথা নয়। শৌভনিক "গোরা" করেছে ২০০ রজনী, যা নয় তাই (ফানুস) ২০০, ললনা ১০০, তাসের দেশ ৫০, ঝাঁসীর রানী ১০০, ওথেলো ৮৫, শেষ রক্ষা ১৫০, ঘরে বাইরে ১৬, মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস ২৫ রাত্রি হয়েছে। সাধু! সাধু!! নতুন নাটক কী করবেন?" "নতুন? আমরা ভাবছি, আলোচনা করছি। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ', হয়তো 'মুদ্রারাক্ষস'। ভাবছি।" "মেঘনাদবধ কি গদ্যে না ঐ অমিত্রাক্ষর ছন্দে?" "ঐ মূল ছন্দে"। "সাধু! সার্থক হোক আপনাদের প্রচেষ্টা।"

নিমু ভৌমিক : "আমরা এখানকার যাযাবর গোষ্ঠীকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা আমাদের এনেছেন আপনাদের মধ্যে।" ঠিক কথা। আমরাও তাদের দিই সাধুবাদ। এদের ঠিকানা ৭৪ নম্বর দরিয়াগঞ্জ, কিন্তু তারা জড়ো হন দূরে লোদি রোডের মাঠে। সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জি আর সম্পাদক বাসব মুখার্জি, সভ্যসংখ্যা ২২। একাংক নাটকে পুরস্কার পেয়েছে যাযাবর ১৯৬৪ সনে কালিবাড়ির প্রতিযোগিতায়, অভিনয়ে পেয়েছেন তাদের দিলীপ বোস। দক্ষিণীর প্রতিযোগিতাতেও এরা হয়েছেন পুরস্কৃত। গত বৎসর লখনৌতে পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতায় এরা পেয়েছেন পুরস্কার (শ্রেষ্ঠ উপস্থাপনে)। নাটক ছিল "ক্যাম্প থ্রি"। এবারকার নাট্যোৎসবে তাদের শুভেচ্ছা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি এবং স্বনামধন্য সত্যজিৎ রায়।

খগেন দে সরকার

কাঁটা তারের লড়াই

অজিতকুমার দাশ

সবশেষে নাথুলা গিরিবর্ত্মে কাঁটা তারের লড়াই শেষ হ'ল।

শুরু হয়েছিল ১১ই সেপ্টেম্বর ভোর পাঁচটা নাগাদ; শেষ হল' ১৪ই-এর শেষ বেলায়। যেমন অকারণে বা অতি তুচ্ছ কারণে চীনা সৈন্যরা হঠাৎ প্রায় অপ্রত্যাশিত-ভাবেই আক্রমণ আরম্ভ করেছিল, তেমনি আকস্মিকভাবেই ওদের কামানের গর্জন থেমে গেল।

"অকারণ" বা তুচ্ছ কারণ সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা দরকার। ১৯৬২ সালে যখন প্রথম ভারত চীনা আক্রমণের সম্মুখীন হয় তখন চীনারা বলেছিল, ভারত-তিব্বত সীমান্তের সীমারেখা টেনে দেওয়া ম্যাক-মোহন লাইন ওরা মানে না। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান লড়াইএর শেষের দিকে চীনারা যখন সিকিম সীমান্তে সৈন্য সমা-বেশ করিয়ে আক্রমণের হুমকি দেয়, তখনও ওরা একটা মিথ্যা অভিযোগ করে বলে যে, তিব্বতের মধ্যে খানিকটা ঢুকে গিয়ে নাকি সিকিম সীমান্তে ভারতীয় প্রহরী সৈন্যর দল দুএকটা ছোটখাটো ঘাঁটি গেঁথে ফেলেছিল। পরে হুমকির শেষ প্রহরের শেষে নিজেরাই আবার বলে, ভারতীয়রা নাকি তাদের ঘাঁটি-গুলি তুলে নিয়ে এসেছে।

এবার কিন্তু চীনারা সীমান্ত বিরোধের ধুয়ো তোলেনি। বরং পিকিং রেডিও বলেছে, "সিকিমের সঙ্গে সীমান্ত-রেখা নিয়ে আমাদের কোনও দ্বন্দ্ব নেই।" তবুও যুদ্ধটা লাগল কেন?—ঝগড়া করতে হ'লে, মারামারি করতে হ'লে সব সময় কারণের দরকার হয় না। "কি মশাই ধাক্কা দিলেন কেন" এইটুকুই যথেষ্ট।—এক্ষেত্রেও তাই। হয়তো আরেকটু বেশী।

সিকিমের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে নাথুলা গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়েই বরাবর ভারত-তিব্বত যাতায়াতের পথ ছিল। প্রথমে ছিল পাহাড়ের গা বেয়ে খচ্চর চলার পথ। পরে ভারতীয়রা সেটাকে বাড়িয়ে গ্যাংটক-নাথুলা রোড তৈরি করে। ১৯৫৮ সালে নেহরু অনেক সমারোহের মধ্যে এই পথ উন্মুক্ত করেন এবং সেই দিনই প্রথম যাত্রীর দলে এই পথে নাথুলার ভেতর দিয়ে তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা পেরিয়ে ভূটান সফরে যান। ৩৫ মাইল দীর্ঘ এই পথ। ৬,০০০ ফুট উচ্চতা থেকে গ্যাংটকে এর আরম্ভ, ১৪,৫০০ ফুট উঁচু নাথুলাতে শেষ।।

ভারত-চীন সম্পর্কের অবনতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সিকিম-তিব্বত সীমান্ত বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু সপ্তাহে একবার ডাক চলাচল হয়। তবু ভারত বা তিব্বতে প্রবেশ-পথ হিসাবে সিকিম-তিব্বত সীমান্তে নাথুলার একটি বিশেষ স্থান আছে। এবং ভারতীয় ও চীনা রক্ষী বাহিনী—দুদলই দিনরাত ওটা পাহারা দেয়।

কিছুদিন ধরেই ভারতীয়রা লক্ষ করছিল সীমান্তে টহল দিতে দিতে হঠাৎ হঠাৎ চীনারা সিকিমে ঢুকে পড়ে। তাড়া করলেই আবার ফিরে চলে যায়। থেকে যায় না। থাকতে আসে না। হয়তো এদিকে কি হচ্ছে দেখে যেতে বা চট করে ছবি তুলে নিয়ে "ধর ধর" করবার আগেই চলে যায়। এটা বিরক্তিকর হলেও আমরা কিছু করিনি। তারপর দেখা গেল চীনারা ওদের বেসব বাংকার বা বালির বস্তা দিয়ে তৈরি অবস্থান ঘাঁটিগুলি নাথুলার ঠিক গায়ে লাগা তার চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছে, আমরাও তখন ভাবলাম, তবে আমরাও এবার নাথুলার মুখে সীমান্ত রেখা বরাবর একটি কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে দি। কোনও পক্ষের সীমান্তরক্ষীরা যেন ভুল করেও অন্যের সীমানায় ঢুকে না পড়ে।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যখন কাঁটা-তারগুলি লাগান হ'তে থাকে. চীনারা ছুটে তারের কাছে আসে, ভীষণ চটে যায়। —তার লাগানতেই ওদের আপত্তি। এতদিন বেশ তো ছিল। হঠাৎ তারের দরকার হ'ল কেন। অনেকটা এই ধরনের। সিকিমের মহারাজা আমাকে ঘটনাটির বিবরণ দেবার সময়—সেদিনের না-খুলো সীমান্তে প্রথমে চীনাদের নীরব অথচ ক্রুদ্ধ হাত-পা নাড়া যা দেখালেন. তাতে বলা যায় বোবা চটে গেলে যেমন হয় এ-ও তাই। —তবু সীমান্ত-রেখা চুলচেরা মেনে কাঁটাতারের লাইন চলল। এমনি সময় ৮ সেপ্টেম্বর মহারাজা তাঁর কয়েকজনকে পাঠালেন ওই তার-বরাবর দড়ি দিয়ে বাঁধা এক সার সাদা প্রার্থনার পতাকা উড়িয়ে দিতে। উদ্দেশ্য ছিল খুবই সুন্দর। সীমান্ত-রেখার বন্ধন পেরিয়ে যে হাওয়া সিকিম ও তিব্বতের মধ্যে উড়ে বেড়ায়—তারই সঙ্গে উড়ুক শাশ্বত শান্তি মৈত্রীর প্রার্থনার বাণীতে চিহ্নিত ওই সাদা পতাকাগুলি।

চীনারা ওটাকে আরও বাড়াবাড়ি মনে করল। পতাকা ওড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই একদল চীনা তীব্র প্রতিবাদে কাঁটাতারের কাছে সঙ্গীন উঁচিয়ে ছুটে এল। আমাদের রক্ষীবাহিনীর একজন সমান তালে তারের এদিক থেকে সঙ্গীন তুলে দাঁড়াল—খবরদার।

কাঁটাতারের এপারে ওপারে মাত্র কয়েক ফুটের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে মুখোমুখী একটি চীনা সৈন্য ও একটি ভারতীয় জওয়ান। —একজনের মুখে কুৎসিত রূপের প্রকাশ। আমাদের জওয়ানটির মুখে অনমনীয় দৃঢ়তা, নির্ভীক সংযত সাহসিকতার এক অসামান্য সমাবেশ।

এই ছবিটি কল্পনায় দেখিনি। যখন এই ঘটনাটি ঘটে, রাজার এক অনুচর· তিনি খুব ভাল ফটোগ্রাফারও বটে; ওই মুহূর্তে ক্যামেরাটা ক্লিক করেন। ইউনাইটেড প্রেস ইণ্টারন্যাশনালের মারফত দেশী-বিদেশী সংবাদপত্রে পরিবেশনের জন্য এই ছবিটা আমি সংগ্রহ করেছি। এমন ছবি আর হয় না। ছবি বোঝেন. এমন যাঁরাই এটা দেখেছেন. তাঁরাই বলেছেন, এটাকে "Picture of Year" বা বছরের সেরা ছবি বলা চলে।*

যাক্। কাঁটাতার লাগান চলল· কিন্তু চীনারা পতাকা ওড়াতে দিল না। ওদের দিক থেকে হাত বাড়িয়ে টেনে নামিয়ে দিল। দু' দলে ধাক্কাধাক্কি চলল। কিন্তু গুলি-গোলা বিনিময় শুরু হ'ল না। ওরা ছুঁড়ল না—অতএব আমাদের ছোঁড়ার কথাই ওঠে না। —আর তা ছাড়া. আমাদের সৈন্যদের ওপর কড়া নির্দেশ আছে ওপরওয়ালাদের আদেশ না পেলে কখনই গুলি করবে না।

এই সংঘর্ষের খবর প্রথম রেডিওতে শুনেই মনে হয়েছিল· এবারে হয়তো লাগবে। কোনও কুখ্যাত গুণ্ডা যদি কাউকে অকারণ ধাক্কা দেয়, তাহার সঙ্গত কারণ আছে যে সে মারামারির ছুতো খুঁজছে।

লাগলও। তবে ৮ নয়, ১৬ সেপ্টেম্বর। খুব জোরে। ৫টা আন্দাজ কিছু নিরস্ত্র ভারতীয় জওয়ান কাঁটাতার লাগাচ্ছিল। হঠাৎ কিছু চীনা ছুটে এসে বাধা দিল। আমাদের কর্মীরা তখন সবাই কাজ ফেলে ছুটে এসে বোঝাতে গেল· কেন বাগ করছ। আমরা তো সীমান্ত-রেখা মেনেই তার টানছি। মাঝখানে কাঁটাতার। ওদিক দুটিকয়েক [illegible] চীনা সৈন্য· এদিকে সংখ্যায় আরও কিছু বেশী আমাদের কর্মীরা। কারিগর বা মিস্ত্রী বললেই বোধ হয় ঠিক হবে।

হঠাৎ চীনা কামান গর্জে উঠল। [illegible] চীনা—ভারতীয় [illegible] এল।

---

* [illegible]

ভারত-চীন সংঘর্ষের নাথু-লা সীমান্তে জোয়ানদের সংগে আলোচনারত সিকিমের রাজা চোগিয়াল

কিছু বুঝতে পারার আগেই ওই দলের সবই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কাঁটাতারের ওপারে জনচারেক চীনা। এপারে জন চোদ্দ ভারতীয়। হিমালয়ের তুষারের শীতল শুভ্রতার বুকে পড়ল এবারের যুদ্ধের প্রথম ভারতীয় শহীদ জওয়ানদের রক্তাপ্লুত স্বাক্ষর।—যুক্তিহীন নির্মম নির্লজ্জ বর্বরতার বিরুদ্ধে একান্ত নিরীহ নিরস্ত্র কয়েকজনের নীরব নির্ভীক প্রতিবাদ।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। একান্ত বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি ব্যবধানটা ছিল মাত্র সাড়ে তিন মিনিট। তারপরেই প্রতিবাদে গর্জে উঠল ভারতীয়দের কামান। সিকিম সীমান্তে শুরু হ'ল চীন-ভারত যুদ্ধ।

প্রতিবাদ কথাটা ব্যবহার ঠিক হয়নি। "প্রত্যুত্তর" বললে ঠিক হবে। কারণ, এই কয় দিনের যুদ্ধে আমরা নিজেরা একবারের জন্যও স্বেচ্ছায় প্রথমে গুলি বা গোলা ছুঁড়িনি। ওদের আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিয়েছি। গ্যাংটকে অবস্থিত ভারতীয় পলিটিক্যাল অফিসার শ্রী মেনেনের মতে "They opened up, and we returned the fire." ওরা মারলেই আমরা তার প্রত্যুত্তর দিয়েছি। সিকিমের মহারাজা আমায় বলেছেন, "We returned the first fire within minutes, then within seconds." প্রথমবারের আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিতে আমাদের কয়েক মিনিট লেগেছিল। পরেকার ব্যবধানগুলি ছিল মাত্র কয়েক সেকেন্ডের।

যুদ্ধের শক্তির বিবরণ দিয়ে লেখাটা দীর্ঘ করব না। তবে লক্ষ্যণীয়, এই যুদ্ধে চীনারা প্রথম মর্টার ব্যবহার করে। পাহাড়-পর্বতের আড়াল থেকে চূড়ার ওপর দিয়ে এপারে গোলা এসে পড়ে। ১৩ই সকালের পর গোলাগুলির তীব্রতা খুব বেড়ে যায়। ১২ ভারত প্রস্তাব করেছিল। ১৪ সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে অন্তত সাময়িক যুদ্ধবিরতি হোক। দু' পক্ষের সেনাদলের নেতারা সীমান্তে একত্র হয়ে আলোচনা। বিচার করে দেখুক সত্যিই সংঘর্ষের কোনও কারণ এমন কি ছোটখাটো উস্কানিও ঘটেছে কিনা। চীনা সরকার এর উত্তর দেননি। কিন্তু চীনা রেডিও প্রস্তাবটিকে "প্রতারণা" বা 'ধোঁকা' দেবার ভারতীয় চেষ্টা বলে বর্ণনা করেছে। আমরা উত্তরের অপেক্ষা না করেই ১৪ তারিখ থেকে আমাদের "প্রত্যুত্তরমূলক" গোলাগুলিও কমাতে কমাতে ক্রমে একেবারেই বন্ধ করে দি। আমাদের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গ্রহণ না করলেও—আমাদের নীরবতার বেশ কিছু পরে চীনারাও গোলাগুলি বন্ধ করে দেয়।

১৫-এর পরে আর যুদ্ধ হয়নি। এ লেখাটা লিখছি ২১। এখন বলা চলে সিকিম সীমান্তে শান্তি না হলেও শান্তভাব ফিরে এসেছে। কাঁটাতার নিজের অস্তিত্ব পূর্ণমাত্রায় অক্ষুন্ন রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যার এপারে ওপারে পুরোনো ধরনের চীনা ও ভারতীয় সীমান্ত প্রহরী দলের টহল চলেছে মাত্র কয়েক গজের ব্যবধানে। এ ওর দিকে তাকাচ্ছে। চীনারা তো হাসি জানেই না। আমাদের জওয়ানদের সেই সপ্রতিভ হাসি-হাসি ভাবটিও মিলিয়ে গেছে।

যে জওয়ানরা এ কয়দিনের সংগ্রামে আত্মদান করেছেন, তাঁদের আপনার জনরা—স্ত্রী, পুত্র-কন্যা মা-বাবা ভাই-বোন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব—শুধু সান্ত্বনা পাওয়া নয়, সত্যিকারের গর্ব

অনুভব করতে পারেন এই ভেবে যে, নেফা সীমান্তে চাপা-পড়া ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর শৌর্যের অতি প্রাচীন ঐতিহ্যকে এঁরা পুনরুদ্ধার করে এনে দিয়েছেন। একান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দেশরক্ষার কর্তব্যে প্রায় মরিয়া হয়ে যাঁরা সেই সময় যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ-নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ে গিয়েছিলেন, যেন দেখতে পাচ্ছি সেই নেফার শহীদদের কাছে নাথু-লার বীররা গিয়ে বলছেন, "দেখলে তো ভুলি নাই।"

গভীর দুঃখের কথা, এই সমস্ত বীর জওয়ানদের যুদ্ধরত বীরত্বের কাহিনী আমরা সংবাদ-সেবীরা বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে কেবল টুকরো টুকরো-ভাবে যোগাড় করেছি; অনেক কষ্টে যোগাড় করা—লুকিয়ে তোলা বা লুকিয়ে রাখা ছবির মধ্যে এই বীরত্বের প্রতিফলন পেয়েছি।

কিন্তু অতি-সাবধানী, অতি-বিনয়ী অদ্ভুত এক সরকারী প্রচার-নীতির জন্য কোন রিপোর্টার, প্রেস-ফটোগ্রাফার, নিউজ ফিল্ম ক্যামেরাম্যানকে এবার লড়াই-এর জায়গায় যেতে দেওয়া হয়নি। যুদ্ধের সময় নয়। যুদ্ধের পরের অনেক দিনও নয়। —অথচ চীনারা নিজেদের খুশিমত প্রথম দিন, আচম্কিতে নিজেদের লোকজনদের সঙ্গে "ফ্রেঞ্চ" বাদে ও মাদের নিরস্ত্র দলটিকে ওরা শেষ করে দেয়। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই সব কটা দেহ চীনা ও ভারতীয় দুই-ই ওরা ওদের দিকে টেনে নিয়ে যায়। —পরে অবস্থা শান্ত হলে যখন উভয় পক্ষের সম্মতিতে ভারতীয় মৃতদেহগুলি আমরা আনতে যাই, তখন চীনারা প্রচুর ফটো ও মুভি ফিল্ম তোলে। ওই ফটোই ওরা প্রকাশ করেছে তিব্বতের মধ্যে ভারতীয়দের অনধিকার প্রবেশের প্রমাণস্বরূপ।

শিলিগুড়িতে এসে শুনলাম, কিছু চীনাপন্থী ভারতীয় কম্যুনিস্ট বলছে, "যেমন ঢুকতে গিয়েছিলাম, ওরা মজা টের পাইয়ে দিয়েছে।"

১৯৬২ সালে ঠিক সংঘর্ষের সময় না হলেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের যুদ্ধ-প্রান্তরে যেতে দেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ও সাংবাদিক ফটোগ্রাফার গিয়েছিলেন। এবার কেন অন্য নিয়ম। কোনও কোনও মহলে শুনেছি, ভারত সরকার "Wanted to play it down!" ব্যাপারটাকে কম করে দেখাতে চেয়েছিল। দেশব্যাপী একটা পানিক বা ত্রাসের সঞ্চার হোক, তা চান না। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে বিপজ্জনক নয়, এমন ছবি—যা সরকার অবশ্যই দেখে দেবেন—তা দিতেও এত বাধা? দেশের এতগুলি জওয়ান দেশের যুদ্ধের, ভিয়েৎনামের ইসরায়েলের ছবি দিনের পর দিন ছাপা হবে। অথচ দেশে যখন যুদ্ধ লাগবে, তা যত সাময়িক বা সীমিতই হোক, সময়মত তার ছবি ছাপা হবে না? রিপোর্টার, ফটোগ্রাফাররা গ্যাংটকে অপেক্ষা করে করে হাত কামড়ে মরবে। ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে!

এই ব্যর্থতার মধ্যেও অতি কষ্টে আমি কয়েকটি ছবি যোগাড় করেছিলাম। কাট-ছাঁট করে যাতে আমাদের সামরিক প্রস্তুতির কোনও খবর বা ইংগিতও ধরা না পড়ে, তেমনিভাবে একজন অতি দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্তা ব্যক্তিকে দেখিয়ে ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কয়েকটি ছবি ইউ পি আই-এর মারফত সংবাদপত্রে ব্যবহারের জন্য পাঠিয়েছিলাম। এ রকম যুদ্ধের ঐ প্রথম প্রকাশিত ছবি। ছবিতে সরকারী বা বে-সরকারী কেউ আপত্তির কিছু দেখেননি। তবু সরকারী ছবি বিলি-ব্যবস্থার বাইরে, কিছু আগে এই ছবি ছাড়বার জন্য আমি কোনও কোনও মহলের বিরাগভাজন হয়েছি। এই 'স্কুপের' জন্য অবশ্য অনেক বন্ধু অভিনন্দনও জানিয়েছেন। এ ছাড়াও নাথু-লাতে ভারতীয় সৈন্য মারমুখী সংগীন-তোলা চীনা-সৈন্যের সামনে বুক চিতিয়ে সমান তালে সংগীন তুলে দাঁড়িয়ে আছে—সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তের ছবি এবং চীনারা যুদ্ধ-বিরোধিত সিকিম মহারাজার ওড়ান সাদা প্রার্থনা-পতাকা দেখে রেগে গেছে—সেইটি এবং আরও কয়েকটি ছবি প্রকাশের অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছি। এই লেখার সময় পর্যন্ত জানি না কি হয়েছে।

যাক। নাথু-লার যুদ্ধ থেমেছে। এ কথা ঠিকই, এই যুদ্ধের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। কোনও পক্ষই—চীনা বা ভারতীয়—সীমান্ত-রেখা অতিক্রম করতে চায়নি। এক কথায় এটাকে বলা যায়, "Static War" স্থিতিশীল যুদ্ধ। যতই গুলিগোলা বর্ষণ করুক, কোনও পক্ষই যেন চরম যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটুক, ওটাকে শুধু সিকিমে নয়, একান্তভাবে নাথু-লার এপারে ওপারে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। যেমন আকস্মিকভাবে শুরু হয়েছিল, ঠিক ততটা না হলেও খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই শেষ হয়েছে। চীনারা আমাদের যুদ্ধবিরতির অনুরোধকে ধোঁকা বলুক আর যাই বলুক, যুদ্ধ-বিরতি সরকারীভাবে না মানলেও শর্ত-হীনভাবেই নীরবে যুদ্ধের বিরতি ঘটিয়েছে। আমরা শুধু অনুরোধই করিনি, শক্তিমানের সহনশীলতা নিয়ে কিছু আগে থেকেই প্রত্যুত্তর দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তার সুফল পেয়েছি। এবার শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহতের হিসাবে নয়, ন্যায় নীতির ক্ষেত্রেও আমরা জিতেছি। সীমিত যুদ্ধের হলেও এর মূল্য অনেক।

এক বসন্তের স্তবক

অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে এ বছর চারখানি বাংলা কবিতার বই বেরিয়েছে চারজন অত্যন্ত শক্তিমান এবং ধ্রুব কবিতার স্রষ্টা কবির। শঙ্খ ঘোষের 'নিহিত পাতাল ছায়া', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর 'নিষিদ্ধ কোজাগরী', আলোক সরকারের 'অন্ধকার উৎসব', শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'সোনার মাছি খুন করেছি'। এ'দের সকলেরই বয়েস, যতদূর জানি, তিরিশের বেশী এবং চল্লিশের কম। সূক্ষ্ম সময়ের বিচারে এ'রা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিতায় তৃতীয় ধারার সৃষ্টি করেছেন এবং সেই ধারার চারটি দিকের এ'রা সমর্থ সাধক প্রতিনিধি—এবং বিশদভাবে বলতে গেলে, রবীন্দ্রপরবর্তী কবিতায় সামগ্রিক আসরেই এ'দের বিশিষ্ট স্থান অবিসম্বাদী। সেই কারণে বাংলা কবিতার দিক থেকে এ বছরটি অতীব উল্লেখযোগ্য।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি চতুর্থ কবিতার বই, আলোক সরকারের তৃতীয় এবং শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর দ্বিতীয়। জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি—সে বিচারে এ'রা চারজন সেই বিরল কবিদের মধ্যে এবং কবি হিসেবে যে হেতু কেউ কারুর চেয়ে বড় হয় না, ছোট হয় না—সুতরাং এ'দেরও পরস্পরের সঙ্গে কোনো তুলনা বা বিচার চলে না। বরং বলা যায়, নিজস্ব শব্দ ও চক্ষু ব্যবহারে এ'রা বাংলা কবিতায় ইদানীং চারটি ধারার সৃষ্টি করেছেন।

'দিনগুলি রাতগুলি' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতা নিয়ে শঙ্খ ঘোষের বাংলা সাহিত্যে যথার্থ প্রথম আগমন। কিন্তু এখন তাঁর অধিকাংশ কবিতাই খুব সংক্ষিপ্ত। শব্দের তীক্ষ্ম বা কর্কশ রূপ পরিহার করে, শব্দের মৃদু দীপ্তি ও দাহ ফুটিয়ে তোলার দিকেই তাঁর বেশী মনোযোগ। যেমন মাঠের মধ্যে একটা বিশাল বটগাছ, ডালপালা সমেত—দিনের আলোর জীবনে সেই গাছ প্রবল ও সামগ্রিক, কিন্তু কিছু পরিমাণে অবান্তর। কিন্তু জ্যোৎস্না রাত্রে সেই গাছের আয়তন ঠিকই থাকে, কিন্তু তার প্রয়োজনীয় উদ্ভাসিত অংশগুলি শুধু চোখে পড়ে—সব মিলিয়ে একটি সত্য ও রহস্যময় অস্তিত্ব। বাংলা ভাষায় আমরা এতকাল শুনে এসেছি, সত্য দিবালোকের মতন স্পষ্ট, কিন্তু শঙ্খ ঘোষের কবিতায় আমাদের উপলব্ধি হয় যে, সত্যও রহস্যময়। তাঁর শব্দ নির্বাচনের এই দুর্লভ সাধনা। শঙ্খ ঘোষের অনুভূতি এবং তার প্রকাশ—কখনো সমসাময়িক জীবনকে বাদ দিয়ে নয়, অতি রোমান্টিকতা তাঁকে আচ্ছন্ন করেনি, কিন্তু তাঁর উপলব্ধি বা লক্ষ্যবস্তু কখনো আংশিক নয়, সর্বত্রই সমগ্র। যেমন, তাঁর একটি কবিতার নাম, 'কিউ'। আরম্ভ এইভাবে, 'একটু এগোও একটু এগোও/তখন থেকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি একটু এগোও—' স্পষ্ট দেখতে পাই, র‍্যাশনের দোকানে, দুধারে কাউন্টারে বা রুটির লাইনে, পোস্টাফিসে কিউতে দাঁড়িয়ে আছেন কবি। কিন্তু এই দাঁড়িয়ে থাকাও আংশিক, দাঁড়িয়ে থেকেও কবির আত্মা এসব ছাড়িয়ে যায়, এসব তুচ্ছতা ও গ্লানির ওপর দিয়ে ভেসে যায় কবির ঈষৎ বিক্ষুব্ধ গ্লানির ঔদাসীন্য, তখন এক সামগ্রিক অস্তিত্বের কাছে আবেদন জানাতে হয়ঃ

জলের সঙ্গে স্রোতের সামনে
মুখের সঙ্গে আলোর সামনে
মানুষ মাছি অন্ধকার একটু নড়ুক চড়ুক

একটু এগোও, বিসর্পিনী, একটু এগোও...

ঠিক এই রকমই সামগ্রিক বিষয়ের কবিতা আরও আছে, 'ভিড়', 'রাস্তা' 'বাড়ি', 'ঘর'—ইত্যাদি। কিন্তু একথাও বলা দরকার, শঙ্খ ঘোষ কোনো দর্শন প্রচার করতে চান না—তিনি কবিতাই লিখছেন, কবিতাকে দর্শনভারে ক্লিষ্ট করেন নি। তাঁর কাবতার ব্যাখ্যা না করে, বরং দু' একটি উদাহরণ রাখি :

হীরার ঝলকে চোখ সরে আসে
সফল দিগন্ত হতে, হায় বর্ণপ্রভা,
এখন দুপুরবেলা, গভীরে কী তপ্ত জল
এখন আমার
বাড়ির পিছনে অধিকার।
(যাবার মতো নই)

লোকে তো কোথাও যাবে, তাই আসি,
এমন কিছু নয়
নিহিত পাতাল ছায়া ভরে ছিল আকাশ
পরিধি।
কিছু তো দেখবে লোকে, তাই দেখি,
ফসলের সীমা,
বুকের গেরুয়া জল, দ্বাদশীতে সব গ্রাম
মিলেমিশে যায় জেগে ওঠে রাত।
(সুন্দর)

শঙ্খ ঘোষের কবিতাগুলিকে গল্পহীন চিত্রকলার সমধর্মী মনে হয়।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কবিতা পড়লে মনে হয় তিনি একই সঙ্গে স্বাভাবিকরূপে ঐতিহ্য সম্মত এবং বিদ্রোহী। তাঁর প্রতিভার দীপ্তি এমনই তীব্র ও গরিমাময় যে এদেশ বিদেশের কোনো লেখক বা স্কুলের প্রভাব তাঁর ওপর পড়া সম্ভব নয়, প্রায় বালক বয়স থেকেই তিনি নিজস্ব-কীর্তি চিহ্নিত। কিন্তু বেদ-পুরাণ-উপনিষদ এবং বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলীভূষিত যে বাংলা সাহিত্য, মাইকেলের দার্ঢ্য ও রবীন্দ্রনাথের কমনীয়তা এইসব কিছু মন্থন করে উঠে এসেছে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কাব্যরীতি; এই নদী-প্রান্তর অরণ্য মেখলা খাঁটি বাংলা দেশের সুঘ্রাণ তাঁর কবিতায়। এমন বুদ্ধি মনীষা ও আবেগের সংমিশ্রণের উদাহরণও যে-কোন ভাষায় দুর্লভ। তাঁকে বিদ্রোহী মনে হয় এই কারণে যে, তিনি ঈশ্বর বিষয়ে নিরন্তর প্রশ্নের সম্মুখীন। কবি, নারী ও ঈশ্বরের মধ্যে একটি জটিল ত্রিকোণ প্রেমের খেলা চলছে, এখানে, আহত অভিমানী কবি ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন, শুধু দ্রষ্টা নয়, সৌন্দর্য সৃষ্টির কার্যে তিনি দ্বিতীয় ঈশ্বর হয়ে ওঠার জন্য বিদ্রোহী। বস্তুত, ঈশ্বরকে বাঁচিয়ে রাখার অমোঘ মন্ত্রও তিনি আপন শরীরের মতন তুলে ধরেছেন, 'এই দ্যাখো করপুটে একটু গণ্ডূষ বিশ্বাসের জল, তুমি পান করো, আমি জল না খেয়ে মরবো।' এবং :

যতক্ষণ না তোমার মুখের পাশে আমার মুখ
এক মুখোশের তলে
রাখতে পারি, গ্রন্থিঝিনুক সূর্যচন্দ্র মানুষ
ছড়াই খেলাচ্ছলে!

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কবিতার প্রধান গুণ, তাঁর কবিতায় প্রতিটি শব্দ খনিজ মণির মতন দীপ্তিমান। এত বেশী ভোকাবুলারি আর কেউ ব্যবহার করেন না —এইজন্য একঘেয়েমি বা পুনরুক্তি তাঁর কবিতায় অজ্ঞাত। বাংলা বিশেষণ ও ক্রিয়াপদগুলির যে অবধারিত দুর্বলতা আছে, তার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তিনি যখন যেমন, সংস্কৃত থেকে শুরু করে গ্রামবাসের কথা ভাষা, সাঁওতালী কিংবা আরকেইক বাংলা কিছুরই প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেন না। তাঁর যে-কোনো কবিতা যে-কোনো বিষয় নিয়েই লেখা হোক, তা সর্বাঙ্গসুন্দর গতিশীল ও কবিত্বময় হয়ে ওঠে। ছন্দ কুশলতায় তিনি সমসাময়িকদের বহুদূরে ছাড়িয়ে যে-কোনো প্রবীণের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর উপমা বা ছবির আকস্মিকতা সেগুলিকে অবিস্মরণীয় করে তোলে। যেমন : 'বরবটির খেত ঘুরে রামনাথ বিশ্বাস রোদ্দুর',—'মহিষের পিঠে চড়ে ঈষৎ-শিশুটি/ঝুঁটি নেড়ে আকাশকে বকে দিয়েছিল';—'পাশের বাগানে কার্পাস ফুল হো-হো করে হেসে ওঠে', কিংবা :

'এই শোনো, হাত ছাড়ো,
মা আছেন পাশের ঘরেই...
...ঈশ্বর ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছেন,
হাত ছাড়ো;
সমস্ত নিসর্গ আজ মুখরিত
সাজ্জাদ হোসেন
সানাই বাজিয়ে সব বলে দিচ্ছেন
বিধাতাকে।'

আলোক সরকারের কবিতার মধ্যে একটি নিরবচ্ছিন্ন সাধনা বা ধ্যানের ছবি আছে। অন্যান্য কবিরা যখন আত্ম-

প্রকাশার্থে ছন্দ মিল ও ভাষার জন্য খোঁজাখুঁজি করছেন. এই কবি তখনও ধীর ও অচঞ্চল। তাঁর কবিতার গঠন-ভঙ্গী প্রায় প্রথম থেকেই এ পর্যন্ত এক প্রকার, শান্ত রসই তাঁর সঞ্চারীভাব। প্রবহমান পয়ারই তাঁর একমাত্র বাহন, মাঝে মাঝে তারও চটুলতা বা নিজস্ব বেগ রোধ করার জন্য তাকে তিনি ভেঙে ভেঙে দেন। এক আন্তরিক গভীরতায় তাঁর কবিতাগুলি সমুজ্জ্বল। শুধু ছন্দ-মিল নয়, তাঁর ব্যবহৃত শব্দের সংখ্যাও তিনি ক্রমশ কমিয়ে আনছেন. যেন মনে হয়, তিনি পূর্বোক্ত সাধনার পূর্ণতায় অবাঞ্ছিত, অপ্রয়োজনীয় শব্দগুলি ছেঁটে ফেলছেন মন্ত্রের মতন ঘন ও অমোঘ করে তুলতে চাইছেন কবিতাকে। কয়েকটি মূল শব্দ বারবার তাঁর কবিতায় ঘুরে ফিরে এসে এক সংকেতময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। বিশেষণ বা উপমার বদলে এদের ব্যবহার তাঁর অপরূপ নিপুণতা। যেমন 'সুন্দর, পোড়াও কেন লাল ... ঘরে এ শুধু তোমার অকারণ প্রতিশোধ' "উত্তর দিকের লাল প্রাসাদের মাথার উপর স্থির কালো মেঘ
পাতায় পাতায় মুখ-ফেরানোর মতো
নীল আলো।"

অলোক সরকার তাঁর কবিতায় লাইনগুলির নিজস্ব অর্থ বা সংযোগের দায়িত্বেও আগ্রহী নন, এমন কি তাঁর উপমা বা রূপকল্পগুলিও আলাদাভাবে সৌন্দর্য-বিলাসী নয় তার সমগ্র কবিতা একটি নির্মাণ, একটি অস্তিত্ব। সমাপ্ত হবার পরই কবিতাটি যেন প্রাণ পায়, যে রকম মানুষ, পাখি বা প্রাণীর মতোই একটি আলাদা সৃষ্টি, তার জীবন ও মৃত্যু তার আপন করায়ত্ত, নিজের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ। এই কবিতার মধ্যে সমাজ, সংসার, সমসাময়িকতা, কবির জীবন ইত্যাদি প্রতিফলিত করাবার কোনো উদ্দেশ্যই নেই, এসব কিছুর ঊর্ধ্বে শব্দ ও চিত্রের শিল্পই এর অভীষ্ট। যেমন এই বই-এর নাম কবিতায় সূচিত হয়েছেঃ

"একটি প্রদীপ এসে অন্য একটি
প্রদীপের শিখা
জ্বালিয়ে দিলো। অন্ধকার মাঠের উপরে
তারপর
সমস্ত আকাশভরা তারা, সমস্ত বাগান
ভরা ফুল
সমস্ত নদীর ব্যাপ্ত সম্মিলনে উপক্রমণিকা
সাজালো সমগ্র ছন্দে।"...

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় সেই প্রধান গুণ দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে কবিতা হয়ে যায়। এইজন্যই এই কবির বিষয় তাঁর বিষয়কে ছাড়িয়ে সঙ্গীতময়তায় উত্তীর্ণ নিয়ে বাছাবাছি নেই, শব্দ নিয়ে বিন্দুমাত্র ছুঁৎমার্গ নেই, নিজের জীবন থেকে যে-শব্দ, যে-অর্থ আপন বেগে বেরিয়ে আসে তার ধ্বনিটিকে শ্রবণ ও হৃদয় পর্যন্ত বাজিয়ে সরাসরি কবিতায় স্থান দেন। শুধু শব্দই যেন যথেষ্ট নয়, এই জন্য তিনি কবিতার প্রায় প্রতিটি শব্দে তাঁর প্রাণবিন্দু পর্যন্ত মিশিয়ে দেন, তাঁর অস্থির, তীব্র অভিমানী প্রাণের চিহ্ন তাঁর কবিতায় অনির্বাণ দীপ্তি পায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতন প্রাণবন্ত কবিতা বাংলায় ক্বচিৎ লেখা হয়েছে। তাঁর কবিতার প্রতিটি লাইন বন্যার স্রোতের মতন দুর্বার, স্বর্গ কিংবা পাতাল সব জায়গা থেকে স্রোতের টানে ছুটে আসে শব্দ, কবিতাগুলি স্মৃতির মধ্যে বাসা বেঁধে সঙ্গীতের অমরত্ব পায়।

"সারা শরীর জুড়ে তোমার বিষ-পিঁপড়ে
ছড়িয়ে দিলুম—
আস্তে, যেমন জামরুলে, ঐ নীল
ভিজোনো গাছের ছালে
ছড়িয়ে দিলুম যেমন চাষা ছড়িয়েছিল
পরশু বীজ
শস্যে ভরে যায় শস্য ওঠে
তোমার শস্য শরীর ভরে
কুড়িয়ে নিয়ে হঠাৎ কেন বিষ পিঁপড়ে
ছড়িয়ে দিলুম—
কারণ ছিল?"

কিংবা 'চেনো নাকি শীতের রাতের ঐ পাহারাদারের মতো তুমি চেনো বনের হরিণ/তুফান এক্সপ্রেসে চড়ে চলে যাও এমা ইস্টিশানে/ফেরৎ পাবে না ভাগ্য, শালিয়াড়ি/...স্নানের অর্থই হলো বিসর্জন, সর্বস্ব ধুয়ে যাওয়া।'

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা কোনো নিয়মের মধ্যে পড়ে না, কোনো বাঁধাধরা অর্থের দাসত্ব করে না, তাঁর কবিতায় আলো মানেই উদ্ভাসন নয়, অন্ধকার মানেই নয় কলঙ্ক বা গ্লানি, সন্ধ্যাবেলা মানে নয় সভ্যতার সায়াহ্ন, সমস্ত শব্দেরই প্রাথমিক যোগ্যতায় বিচার হয়—তারা আগের ও পরের শব্দটির মাঝখানে ঠিক বসবার যোগ্য কিনা। মহৎ কবিতার এই গুণ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় সব সময় উপস্থিত। তা বলে তাঁর কবিতা নিছক অ্যাবস্ট্রাক্টও নয়, প্রসাদ গুণ ও শব্দের মহিমা ছাড়াও তাঁর কবিতাকে বলা যায় স্বীকারোক্তিমূলক, প্রতিটি কবিতায় তিনি নিজের পাপ-পুণ্য, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের কথায় নিজের জীবনকে ভেঙে ভেঙে বলে যাচ্ছেন।

"ও দোলমঞ্চ, তুমি আমায় সব শেখালে
ছেড়ে যাওয়ার
ভাষায় ভারী, মন্ত্রে বাঁধা—
শূন্যহাতে ফিরে পাবার
কিছুই কি নেই? ও দোলমঞ্চ,
তুমি আমায় সব শেখালে।"

সনাতন পাঠক

আন্তর্জাতিক রাজনীতি

সাউথ ইস্ট এশিয়া। শ্রীসুধাংশুবিমল মুখার্জি। দি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বুক মার্ট। ৫৫, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৯। দাম উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এলাকা হিসাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার আগেই ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েৎনামের স্বাধীনতার জন্য রাষ্ট্রসংঘ ও অন্যত্র চেষ্টা করেছে। পরবর্তীকালে ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের পাশেই থেকেছে। দু' বছর আগে সেই ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবার মত অবস্থা হয়েছিল। ব্রহ্মদেশ থেকেও ভারতীয়দের বিদায় দেওয়া হয়েছে। মালয়েশিয়া একবার ১৯৬২ সালে এবং পরে ১৯৬৫ সালে ভারতের 'প্রকৃত বন্ধু' হিসাবে কাজ করেছে। এই দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগও দীর্ঘদিনের। অজস্র ভারতীয় এইসব দেশে স্থায়ীভাবে বাস করে। ভারতীয় ভাষা তামিল এখনও সিংগাপুরের অন্যতম সরকারী ভাষা, গত আগস্ট মাস পর্যন্ত মালয়েশিয়ারও অন্যতম সরকারী ভাষা ছিল। এসব সত্ত্বেও ঐ-দেশে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে খুব কম লোকেরই সুস্পষ্ট ধারণা আছে। ইউরোপ-আমেরিকা সম্পর্কে আমরা যত বেশী জানি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সেই পরিমাণে কম। প্রতিবেশী দেশগুলি সম্পর্কে এত অজ্ঞতা নিয়ে কোন দেশের পররাষ্ট্র নীতি সফল হতে পারেনি, আমাদেরও হয়নি। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় আঠারোটি অধ্যায়ে এশিয়ার এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের সমস্যা এবং ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করে আমাদের অজ্ঞতা কিছুটা দূর করার চেষ্টা করেছেন।

লেখক প্রথমেই ব্রুনেই, ব্রহ্মদেশ, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, লাওস, ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড, উত্তর ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও পর্তুগীজ অধিকৃত টিমর দ্বীপের লোকসংখ্যা ও অর্থনীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। বালি দ্বীপের অধিবাসীরা এখনও হিন্দু বলেই লেখক একটি পৃথক অধ্যায়ে ঐ দ্বীপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখানকার হিন্দুরা অবশ্য মূর্তি-পূজা করে না, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য ও শূদ্র—চারটি জাত থাকলেও বিয়ে ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোন পার্থক্য মেনে চলে না বা বাছ-বিচার করে না। তবে ব্রাহ্মণেরা গরুর মাংস খায় না। পুস্তকে এই এলাকার বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে যে-কোন আলোচনায় ভারত ও চীন এবং ঐসব দেশে বসবাসকারী ভারতীয় ও চীনাদের কথা উঠতে বাধ্য এবং লেখক এইসব সমস্যা ভাল করেই তুলে ধরেছেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের সাধারণত সম্মানের চোখে দেখা হয় না। ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিংগাপুরে বসবাসকারী ভারতীয়েরা কেরানী ও শ্রমিকের কাজ করে থাকে। সুমাত্রাতেও কিছু ভারতীয় শ্রমিক আছে। এরা স্থানীয় মজুরি কম রাখতে সাহায্য করে এবং এরা না থাকলে স্থানীয় লোকেরা ঐসব কাজ পেতো। সিংগাপুর ও মালয়ে চেটিয়ার মহাজনেরা খুবই নিন্দিত। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অন্যত্র তো বটেই ইন্দোনেশিয়াতেও ধনী এবং সব টাকা বিলাস-ব্যসনে খরচ করে, জনসেবার জন্যও কিছু ব্যয় করে না। এই-সব এলাকার অধিবাসীরা জাপানী অত্যাচারের কথা আজও ভোলেনি এবং ভারতের স্বাধীনতা লীগ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে স্থানীয় ভারতীয়দের সহযোগিতা ভারতের জনপ্রিয়তা অর্জনের পথে একটি বড় বাধা (পৃঃ ৪১)।

ইন্দোনেশিয়ার পট-পরিবর্তন হলেও দুই বৎসর আগে লেখা ভারতের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার খারাপ সম্পর্কের কারণ আজও সত্য। ইন্দোনেশিয়া অতীত কালে তো বটেই, সাম্প্রতিক কালেও নিজেদের স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে ভারতের সাহায্য পেয়েছে। সাধারণ ভারতীয় ও ভারতীয় কূটনৈতিকেরা ভারতের অবদানের কথা বারবার বলে থাকেন। ভারতের অবদান একতরফা হওয়ায় ইন্দোনেশিয়া এসব কথা শুনতে চায় না। কোন আমেরিকান যদি ভারতীয়দের গম দিয়ে বাঁচাবার কথা বারবার বলে, তা শুনতে কোন ভারতীয়েরই ভাল লাগার কথা নয়। ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে এ-কথা আরও বেশী প্রযোজ্য। দুটি দেশ প্রায় একই সময়ে স্বাধীন হলেও যে-সময়ে ইন্দোনেশিয়ার দারিদ্র্য বেড়েছে, সেই সময়ে ভারতে নূতন নূতন শিল্প গড়ে উঠেছে। এ-কথা মনে করে সাধারণ ইন্দোনেশীয়েরা অসুখী বোধ করত। ইন্দোনেশিয়া ভারতের কোন অর্থনৈতিক সাহায্যও পায়নি। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও দর্শন সম্পর্কে বক্তৃতার জন্য মাঝে মাঝে ভারতীয় পণ্ডিত পাঠানো হয়েছে, কিন্তু আধুনিক ভারত সম্পর্কে জানাবার কোন ব্যবস্থা হয়নি। ইন্দোনেশীয় অধ্যাপকেরাও কখনও ভারতে নিমন্ত্রিত হননি। ভারত সরকার বৎসরে যে তিনটি ছাত্রের বৃত্তি দিয়ে থাকেন, তার একটি স্থানীয় ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের ছেলেদের জন্য নির্দিষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বই উপহার দেওয়া হয়, তা তারা পড়ে না বা পড়তে পারে না। ভারতের প্রচার ব্যবস্থা ও ভারতীয় দূতাবাসগুলির কাজকর্ম যে খুবই নৈরাশ্যজনক, সে-কথাও লেখক বহুবার উল্লেখ করেছেন। ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে যে-সব কথা বলা হয়েছে এই অঞ্চলের অন্য দেশগুলি সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য। জিজ্ঞাসু পাঠক ও রাজনীতিবিদরা এ বইটি পড়লে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির দুর্বলতার একটি দিক ভালভাবে জানতে পারবেন।

ইন্দোনেশিয়ার মত ব্রহ্মদেশও একদিন ভারতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। ব্রহ্মদেশে ভারত ও ভারতীয়দের সম্পর্কে ধারণা জানতে স্বভাবতই কৌতূহল হয়, কিন্তু এখানে তা আলোচিত হয়নি। থাইল্যান্ড সম্পর্কে একটি ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে (পৃঃ ১৮)। ওদেশে এখনও কোন নিয়মতান্ত্রিক শাসন চালু হয়নি, এবং রাজা নামেই রাজা।

প্রাপ্তি স্বীকার

যুগস্রষ্টা মার্টিন লুথার। সুবোধবিকাশ দত্ত। সুসমাচার সাহিত্য ভাণ্ডার ঃ ১১/১ মিশন রো, কলিকাতা-১। মূল্য ২·৫০।

School Dictionary (Beng.-Eng.)—by P. K. Bhattacharya. Sreenath Library: 15 Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12. Price: 2.50.

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা। অনুলেখন ও সম্পাদনা ঃ শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি ঃ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৮·০০।

লী ফক

কার হুকুমে এখানে শিকার করা বন্ধ?
অরণ্যদেবের। এখানে পশু মারা চলবে না!

অরণ্যদেবকে আমরা মানি না! এগিয়ে চল!
আমাদের নিজেদের লোকেরাই আর এগোতে চাইছে না —

অরণ্যদেবকে তোমরা মানিস কেন?

রাজাদের সঙ্গে অরণ্যদেবের সংঘর্ষের সূচনা।
আজ আমি ফিরে যাচ্ছি বটে, কিন্তু এর শোধ আমি নেব।
রাজা খেপে গেছে রে!

ওয়াম্বেসিরি প্রজারা খাজনা বন্ধ করে দিয়েছে। তারা বলছে, খাজনা আদায়ের অধিকার আপনার নেই।
কী? গোটা বছর ধরে খাজনা দিচ্ছে তারা।

আর তো সহ্য হয় না। খাজনা বন্ধ!
অরণ্যদেবের দাপটে রাজাদের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে--- যুকনরাজের প্রাসাদে চলছে তাদের শলা-পরামর্শ।
এবারে শিকারও বন্ধ হল ...
দাস-ব্যবসা বন্ধ .....
4/16

মাত্র তিন বছর আগেও মুকুর-রাজারে কত রূপসী মেয়ে বেচাকেনা চলত। তাও বন্ধ।

মুকুর-রাজার এই অরণ্যদেবই ধ্বংস করেছে। আমাদের সমস্ত আনন্দই ও ধ্বংস করতে চায়।
এসো এখন খেলা দেখা যাক। সিংহের সঙ্গে মানুষের লড়াই।

খেলা দেখতে ভাল লাগছে না যুকনরাজ। বলুন, কী করে আমাদের এই শত্রুটিকে জব্দ করা যায়?

বলছি। একটা উপায় আছে।
কী? কী উপায়?
আগামীসপ্তাহে: চক্রান্ত ২

তপন সিংহের "আপনজন" : নির্মলকুমার ও স্মিতা সান্যাল। ফটো: দেশ

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব

লণ্ডনের দি সানডে টাইমস-এর চিত্র-সমালোচক সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, ফেস্টিভ্যাল কোন অভিনবত্ব দেখাতে পারেনি। সাহিত্য, গ্রীক ট্র্যাজেডি, কামু ও সার্ত্রে থেকে বেশীর ভাগ ফিল্মের বিষয়বস্তু নেওয়া। যুদ্ধভিত্তিক রাজনীতিও আছে। ভেনিস উৎসব মারফৎ যাতে আমরা অভ্যস্ত। 'ফ্রয়েডিয়ান ইমেজ' তো আছেই। আজকাল আমরা সবাই বুঝি 'ফ্রয়েডিয়ান কেস-বুক'।

গোদার, ভিসকন্তি, প্যাসোলিনি ও বুনুয়েলের ছবি (সব কয়টি রঙিন) সম্পর্কে দর্শকের আগ্রহ ছিল বেশী। দি সানডে টাইমস-এর সমালোচক ডিলিস পাওয়েল বলেছেন, গোদার সোজাসুজি গল্প বলে আমাদের অবাক করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি La Chinoise-এ তা করেননি। বরঞ্চ তাঁর স্টাইল টেলিভিশন-ডকুমেণ্টারী পদ্ধতিরই চরম প্রকাশ—যাতে হেডিং, ইণ্টারভিউ এবং রাজনৈতিক বক্তব্য বা আদর্শ বেশী, আইজেনস্টিন তাঁর ছবিতে যা ছড়িয়ে রাখতেন।

একদল তরুণ রাশিয়া ও পশ্চিমের প্রতিক্রিয়াশীল কম্যুনিজম-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মাওয়ের মতবাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। সমালোচক বলেছেন, গোদার রাজনীতি-সচেতন তরুণ মনের 'নন-কনফরমিস্ট' মুডটি প্রকাশ করছেন সুন্দরভাবে। গোদারের ছবিটি বিশেষ জুরী পুরস্কার পেয়েছে।

ভিসকন্তির ছবিতেও নন-কনফরমিজম। তাঁর L'Etranger-এর নায়ক মাস্ত্রোয়ানি। তিনি ছবিতে কামুর অ্যাণ্টি-হিরো। নিজের সমাজের প্রতি নায়ক উদাসীন। অকারণে সে নরহত্যা করে, এবং জীবন নিয়ে যে সে খেলা করে তার মূলে ক্রাইম নয়, সামাজিক রীতিনীতির প্রতি উপেক্ষা। ছবিটি সমালোচককে নিরাশ করেছে। প্যাসোলিনির Oedipus Rex দেখেও সমালোচক সন্তুষ্ট নন।

বুনুয়েলের ছবি দেখে ডিলিস পাওয়েল কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, অন্য বড় পরিচালকদের ছবি বেশী পরিমাণে নিরাশ করেছে বলেই হয়ত বুনুয়েলের Belle de Jour ভাল লেগেছে। একজন বিবাহিতা অবস্থাপন্না মহিলাকে নিয়ে এই ছবি। পতিতালয়ে তিনি দিনের শেষভাগ কাটান। ছবিটি সম্পর্কে পাওয়েল বলেন, Images, at once elegant and comic, of sexual fantasies; ......this director sets his mark on his work.

ভেনিস উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য পুরস্কৃত Ljubisa Samardzic তাঁর অভিনীত ছবির নাম Jutro। অ্যাক ক্ল্যাটনের ছবিতে ডার্ক বেগার্ডের অভিনয়ও স্মরণীয় বলে পাওয়েল উল্লেখ করেছেন।

আগামী সপ্তাহে "এণ্টনী ফিরিঙ্গি"

এণ্টনি কবিয়াল ফিরিঙ্গি হয়েও বাংলা দেশকে ভালবেসেছিলেন। তাঁর গানে বাংলা দেশ একদিন মেতে উঠেছিল। প্রেমিক-কবিয়ালের জীবনকাহিনী নিয়েই "এণ্টনি ফিরিঙ্গি" ছবি, আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। বি এন রায় প্রযোজিত এ ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার। নায়িকার চরিত্রে আছেন তনুজা। অন্যান্য ভূমিকায় অসিতবরণ, ললিতা চ্যাটার্জি, ছায়া দেবী, রুমা গুহঠাকুরতা, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তরুণকুমার, জীবেন বসু প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। "এণ্টনি ফিরিঙ্গি" রচনা ও পরিচালনা করেছেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করেছেন অনিল বাগচী।

কলকাতায় নির্মীয়মাণ দুসরী মুলাকাত-এ (পরিচালনা : শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়) বোম্বাইয়ের অভিনেত্রী শবনম। ফটো—দেশ

"এণ্টনি ফিরিঙ্গি" : উত্তমকুমার ও তনুজা —আগামী সপ্তাহে ছবিটি মুক্তি পাবে।
ফটো—দেশ

পাদপ্রদীপের আলোয়

নান্দীকারের "যখন একা"

নান্দীকারের নতুন নাটক অভিনয়ের সংবাদ প্রচারের সংগে সংগেই নাট্যদর্শকদের ঔৎসুক্য বাড়ে। অনেকেই প্রথম অভিনয় দেখবার জন্য ব্যস্ত হন। তাঁরা জানেন. নান্দীকার তাঁদের বঞ্চিত করবেন না। দর্শকদের অবস্থা নান্দীকার-গোষ্ঠী অতি অল্পকালের মধ্যেই অর্জন করেছেন। নান্দীকার জাদু জানেন। বিদেশী নাটক তাঁদের নাট্যপ্রযোজনার ভিত্তি হলেও তা মূলের চেয়েও যেন মৌলিক। সংখ্যাত নাট্য-গোষ্ঠীর সর্বাধুনিক উপহার "যখন একা" (আরনলড ওয়েসকারের নাটক অবলম্বনে)।

প্রথমেই বলি, এক্সপেরিমেণ্ট হিসাবে "যখন একা" স্মরণীয় হবে। মঞ্চের সংগে বাস্তবের অনতিক্রমনীয় ব্যবধান ঘোচাতে নান্দীকার বদ্ধপরিকর। সিনেমার অনেক যন্ত্র আছে, উপকরণ রয়েছে, নেপথ্যে কাজ করবার অবকাশও প্রচুর। পর্দায় তাই, চেষ্টা করলে, বাস্তবের লক্ষণ ফুটিয়ে তোলা যায়। মঞ্চের সীমায় তা অনেক সময় সম্ভব নয়। তা-ছাড়া কন-ভেনশনের কাঁটার বেড়া তো আছেই। নান্দীকার দুঃসাধ্যকে সহজ করেছেন. প্রচলিত রীতি ভেঙেচুরে নিম্নবিত্তের পরিবেশ, ঘরদোর, চালচলন প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ও মানসিকতার বাস্তব রূপটি "যখন একা"-তে বিশ্বাসযোগ্যভাবে দেখিয়েছেন। এবং এর জন্য বিশেষ কোন কৃত্রিম টেকনিক বা বিবিধ আঙ্গিক উপকরণের প্রয়োজন হয়নি। মঞ্চ প্রায় নিরাভরণ। তারই মধ্যে গরীবের ঘরে যখন যা ঘটে সেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ কিছু ঘটনা নিয়েই বাস্তবের প্রতিচ্ছবি ও পরিমণ্ডল। চরিত্রগুলিও তাদের কথাবার্তায়, আচার-আচরণে নিখুঁত। নাট্যপরিচালক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অদ্ভুত সজাগ মন ও গভীর কল্পনাবোধ এবং পরিকল্পনার ক্ষমতা নাটকের প্রতি দৃশ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। সাউণ্ড-এফেক্ট দিয়ে (যেমন কলঘরে মুখ ধোয় বা জল ঢালার শব্দ অথবা ভাঙা ভাঙা গান) কিংবা সংলাপের ভিতর দিয়ে নাটকের চরিত্রদের জীবননির্বাহ এবং মানসিক গোত্রপরিচয় পরিচালক অতি সহজেই দর্শকদের জানাতে পেরেছেন। তবে এফেক্ট সাউণ্ড অথবা আপাত-অপ্রয়োজনীয় কিছু ঘরোয়া ঘটনার মাধ্যমে বাস্তবের প্রতি-ফলন 'সিনেমাটিক' হয়ে পড়েছে কিনা সে-প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে। যদিও তা নাটকের সাম্রাজ্যে উৎপাতের সৃষ্টি করেনি। বরঞ্চ সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে, নাটক পরিচালনায় অজিতেশ বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রায়-অতুলনীয় কৃতিত্ব দেখালেন।

নাট্যবস্তু মূলত বুদ্ধির রাজ্যে উপনীত। 'ইনটেলেকচুয়াল, বলা যেতে পারে। এই নাটকের প্রধান চরিত্রের (তাকে নায়িকা বলা যায়) সমস্যা হৃদয় কিংবা আবেগের নয়, উপলব্ধির। নিজের উপলব্ধি অন্যের কাছে ব্যক্ত করার সমস্যা তার কাছে আরও বড়, আরও কঠিন। স্ববিরোধী, আত্মপ্রবঞ্চক, এবং পরে পলাতক এক যুবকের কাছে নায়িকা মুক্তকণ্ঠে আত্মভাবনা প্রকাশের প্রেরণা পেয়েছে। কিন্তু নিজের ভাষা খুঁজে পায়নি। প্রেমিকের ভাষাতেই সে কথা বলেছে। যখন সে একা, প্রেমাস্পদ যখন ভীরুর মত পালিয়ে গেছে তখনই সে নিজের কথা আপনমনে বলতে পেরেছে। একটি আঘাতে এতদিনের চিন্তাকণা যেন তাহার মধ্য দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে এল।

'কম্যুনিকেশন' বা ভাববিনিময়, একটি মনের সংগে অপর মনের সেতু রচনা এবং নিজের সংগে বিশ্বভুবনের সহমর্মিতা সৃষ্টির সমস্যায় মানুষ বহুদিন যাবত পীড়িত। সে তর্ক করতে পারে না, চিন্তার উত্তরণে

এ-সপ্তাহের নতুন ছবি "দুষ্টু প্রজাপতি"-র (পরিচালনা : শ্যাম চক্রবর্তী) নায়িকা তনুজা

পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "মহাশ্বেতা" এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক ও অনিল চট্টোপাধ্যায়।
ফটো—দেশ

প্রত্যহের জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারে না। আলোচ্য নাটকে এই বুদ্ধিগত সংকটেরই আভাস। প্রেমের কাহিনী (যেখানে প্রেমিকের অস্তিত্ব আছে উপস্থিতি নেই) উপলক্ষ মাত্র। আর যত সব কিছু পরিস্থিতি ও ঘটনা তা যেন উপরি পাওনা। রুদ্রপ্রসাদ সেনের বুদ্ধিদীপ্ত নাট্যরচনার ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। অবশ্য সামান্য খুঁতও এতে আছে।

বলা বাহুল্য, কথার সমস্যা নিয়ে যে নাটক তা কথাসর্বস্ব হতে বাধ্য। কথার মাত্রা বেশী বলে ক্ষোভ নেই। কিন্তু নায়িকার চেতনার সংকট বোঝা গেলেও তার কথার অর্থ সর্বত্র স্পষ্ট নয়। তা-ছাড়া ভাবাস্ফুরণের পর্বটিও যেন বেশী নাটকীয়।

তিলে তিলে গড়ে ওঠা একটি সুন্দর প্রস্তুতি কেমন যেন অর্থহীন বক্তব্যসর্বস্বতায় পর্যবসিত। এর আগেও বক্তব্য ছিল। সেখানে কম্যুনিকেশন-এর আতিশয্য দেখা যায়নি। বলার বিষয় নাট্যঘটনায় সম্পৃক্ত।

নান্দীকারের শিল্পীদের অভিনয়ের শক্তির পরিচয় নতুন করে দেবার কিছু নেই। রুদ্রপ্রসাদের চরিত্রসৃষ্টি অসাধারণ। আরও বিস্মিত করে বৃদ্ধের চরিত্রে অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়। মঞ্জু ভট্টাচর্যের অতি নিপুণ, স্বাভাবিক চরিত্রাভিনয়ও ভোলবার নয়। নায়িকা চরিত্রের বিশ্লেষণ শেলী পালের অভিনয় নিখুঁত না হলেও এই কঠিন চরিত্রাংকণের পরীক্ষায় শিল্পী রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। হাল্কা মুহূর্তে তিনি সুন্দর অভিনয় করেছেন। দীপালি চক্রবর্তী, কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল ভট্টাচার্য, রণজিৎ ঘোষ প্রভৃতির অভিনয় মনোজ্ঞ।

পারবে না এদের সঙ্গে

চতুরঙ্গ-গোষ্ঠীর নতুন নাট্যপ্রযোজনা "পারবে না এদের সংগে" সুখভোগ্য তো নিশ্চয়ই। তার চেয়েও বড় কথা, এই কমেডি নাটকে রংগের সংগে ব্যংগ তথা সমসাময়িক কালের একটি চিত্র চমৎকার অংকিত। একালের 'ম্যামন ওয়ারশিপ' বা অর্থের ভজনার কাছে জীবনের আর সব মূল্যবোধ কত তুচ্ছ তা-ই একটি অবাঙালী পরিবারকে কেন্দ্র করে নাটকে বিশ্লেষিত। বিশেষ কোন সমাজের উপর কটাক্ষপাত এই নাটকের উদ্দেশ্য নয়। নাটকের শেঠজী কিংবা শেঠগিন্নী মূলত এ-যুগের অর্থলোভী চরিত্রেরই প্রতিকল্প। অর্থলাভের প্রতিবন্ধক সব কিছুই তাদের কাছে পরিত্যাজ্য। বিবেক তো তুচ্ছ। যদি আরও কিছু থাকে তা-ও বিসর্জন দিতে ওরা রাজী।

সুন্দর এই নাটকটি রচনা করে গিয়েছিলেন সতীনাথ ভাদুড়ি। এতে শ্লেষ আছে, বিদ্বেষ নেই। একাধিক চরিত্র-বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম আঁচড়ে নৈতিক অবক্ষয়ের একটি চিত্র এতে পরিস্ফুট। অথচ সব কিছু ঘটেছে রংগরসের ভিতর দিয়ে। নাটক দেখার কালে হাসতে হাসতে দম আটকে আসে। নিজের কলংকের কাহিনী বিক্রি করে শেঠজীর অর্থোপার্জনের চেষ্টা কিংবা গোপনে স্বামীর কেচ্ছার বই পাচার করে শেঠগিন্নীর টাকা রোজগারের কৌশল সত্যিই উপভোগ্য। নাটক-পরিবর্ধন ও নাট্যপরিচালনার দায়িত্ব বরুণ দাশগুপ্ত কৃতিত্বের সংগে সম্পন্ন করেছেন। অল্প উপকরণের মধ্যে, ছোট-খাটো দৃশ্যে ও স্বাভাবিক বেশভূষার মধ্য দিয়ে তিনি একটি বিশেষ পরিবেশ রচনার ক্ষমতা দেখিয়েছেন। নাটকটিও বেশ গতিসম্পন্ন।

নাটকের অন্যতম প্রধান গুণ অভিনয়। সকলের চরিত্রচিত্রণই মুগ্ধ হয়ে দেখবার মত। তাঁদের মধ্যে গীতা প্রধানের (শেঠগিন্নী) অভিনয় শ্রেষ্ঠ। অতি উঁচুদরের অভিনয় তাঁর। অন্যান্য শিল্পী হলেন সুজন সেনগুপ্ত, অনিমেষ চক্রবর্তী, সুধাময় গৌতম, ধীরাজ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ সেনগুপ্ত ও জয়শ্রী কর। পার্শ্বচরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন সলিল সেন,

অর্ধেন্দু সেনগুপ্ত, প্রভাস মান্না, রণজিৎ সাঁতরা, রাজেশ্বর পালধি, ব্রজেন সরকার, সুবিমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বিশ্বরূপায় "আগন্তুক"

দ্বৈত চরিত্রে তরুণ রায়, শেরপা মেয়ের রূপসজ্জায় দীপান্বিতা রায়, হোটেলের নর্তকীর বেশে সুলতা চৌধুরী এবং হোটেল ম্যানেজার রূপে রবীন মজুমদারকে দেখতে পাওয়া যাবে বিশ্বরূপায় নতুন নাটক আগন্তুক-এ। এই নাটক রহস্যঘন, সীমান্ত-অঞ্চল এর পটভূমি। পার্বত্য অঞ্চলের হোটেলে গোপন তথ্য পাচারের চাঞ্চল্যকর কাহিনী এই 'আগন্তুক'। নাটকটি রচনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও ধনঞ্জয় বৈরাগী। ভি বালসারা আবহসুর রচনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

রঙমহলে 'ছায়া নায়িকা'

রঙমহলে যে নতুন নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে তার নাম "ছায়া নায়িকা"। পার্থপ্রতিম চৌধুরী রচিত রহস্য প্রধান এই নাটকের বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, ইন্দিরা দাস, দীপিকা দাস, সরযূ দেবী এবং নাট্যকার পার্থপ্রতিম চৌধুরী। ২ অক্টোবার থেকে প্রতি বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার এবং ছুটির দিনে নাটকটি অভিনীত হবে।

"অন্ধজনে দেহ আলো"

সাংস্কৃতিক সংস্থা "ইন্দ্রধনু"র ষোড়শ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হচ্ছে ৩রা অক্টোবর, গোখেল মেমোরিয়াল হলে। এই উপলক্ষে একটি বিচিত্রানুষ্ঠান সহ সংস্থার সভ্যবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত হবে একটি বিচিত্র নাটক "অন্ধজনে দেহ আলো"। অনুষ্ঠান শুরু সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায়। এই নাটকের নিয়মিত অভিনয়ের পরিকল্পনা ইন্দ্রধনুর সভ্যদের রয়েছে। নাট্য পরিচালক হলেন প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়।

দক্ষিণীর সমাবর্তন উৎসব

মনে-প্রাণে রবীন্দ্রসংগীত বিলাসী হয়েও রবীন্দ্রনাথ ও দীনেন্দ্রনাথের শিক্ষায় দেশ-বিদেশের সকল রকম গান ভালবাসতে পেরেছি। গত রবিবার দক্ষিণীর সমাবর্তন উৎসবে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ এই কথা বলেন। স্নাতকদের উদ্দেশে শ্রীঘোষ বলেন, গুরুদেবের গান নিয়ে ক্ষতিকর জাতিভেদের গর্বে তোমরা মেতো না। রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে অন্য কোন সংগীতের বিরোধ নেই।

সমাবর্তন ভাষণের পর শ্রীঘোষ "অন্ত্য" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শতাধিক শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞানপত্র ও কৃতিত্বপত্র বিতরণ করেন। নৃত্যকলার অন্ত্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তিনজন শিক্ষার্থীকেও কৃতিত্বপত্র দেওয়া হয়।

এই উপলক্ষে সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় রবীন্দ্র-সংগীত আসর বসে। পরিচ্ছন্ন ও রুচিসম্পন্ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ত্যাগরাজ হলে। তত্ত্বাবধান করেন দক্ষিণীর কর্মাধ্যক্ষ শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা।

পশ্চিমবঙ্গ সংগীতশিল্পী সংসদ

পশ্চিমবঙ্গের সংগীতশিল্পীদের একটি নিজস্ব সংস্থা গড়ে উঠেছে। নাম ঃ পশ্চিমবঙ্গ সংগীতশিল্পী সংসদ। এই সংস্থায় রয়েছেন যন্ত্রসংগীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, সুরকার, মূকাভিনেতা, গীতিকার, কৌতুকাভিনেতা, সংগীতশিক্ষক এবং সংশিষ্ট সব শিল্পী।

মেয়রের খরাত্রাণ ভাণ্ডারের জন্য স্টারে অভিনেতৃ সংঘ অভিনীত "শেষরক্ষা" নাটকে নীলিমা দাস ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

মেয়রের খরাত্রাণ তহবিলের সাহায্যার্থে স্টার থিয়েটারে অভিনেতৃ সংঘের নাটকাভিনয় এবং একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়—অনুষ্ঠানে উপস্থিত কয়েকজন শিল্পী: অজিত চট্টোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, নন্দিনী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলি, প্রেমাংশু বসু ও উত্তমকুমার। ফটো—দেশ

সংসদ নবজাতক। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই সংস্থা সংগীতশিল্পীদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছেন। গত শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থার মুখপাত্র শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায় তাঁদের বক্তব্য পাঠ করেন। বিবৃতিতে সংসদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কর্মপন্থার উল্লেখ রয়েছে। সম্মেলনে সংস্থার তরফ থেকে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র, শ্রীমানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ও শ্রীদ্বিজেন চৌধুরী সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। শ্রীমানবেন্দ্র বলেন, সর্বাগ্রে দুস্থ শিল্পীদের সাহায্য এবং সংসদের কার্যনির্বাহের জন্য একটি "ফান্ড" চাই। পরে আমরা অন্যান্য সমস্যার কথা ভাবব।

শিল্পীদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, জলসা বা বিচিত্রানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যাঁদের জীবিকা তাঁদের নিয়েই এই সংসদ। এই কারণে সংগীতশিল্পী সংসদে মূকাভিনেতা, কৌতুকাভিনেতা বা নৃত্যশিল্পীরাও থাকতে পারেন।

সংসদের সভাসংখ্যা বর্তমানে দুই শতেরও বেশী। ইতিমধ্যে এই সংসদ শিল্পীদের মধ্যে নিরাপত্তার আশা জাগিয়ে তুলেছেন বলে সংসদ মনে করেন। পরলোকগত মূকাভিনেতা শ্রীঅরুণাভ মজুমদারের চিকিৎসার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থার মূলেও সংসদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সংসদ সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি এই কারণে তাঁদের কৃতজ্ঞতার কথা বলেন।

শিল্পীদের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগিয়ে তোলা এবং বিভিন্ন স্তরের শিল্পীদের স্বার্থরক্ষার দায়িত্বের কথাই সংসদ বিশেষভাবে ভাবছেন। তাঁদের আশু পরিকল্পনার মধ্যে লাইব্রেরি গঠন, নিজস্ব গৃহনির্মাণ, দেশ-বিদেশের সংগীতচর্চা সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা, নতুন প্রতিভা বিকাশের সুযোগদান, বন্যা, খরা ও অন্যান্য জাতীয় সংকটত্রাণে আত্মনিয়োগ, রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে সংগীতশিল্পের অনুশীলন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অতীতেও সংগীত-শিল্পীদের সংস্থা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু নানা কারণে তা দীর্ঘায়ু হতে পারেনি। সংসদ আশা করেন, অতীতের শিক্ষা তাঁরা সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পেরেছেন। বর্তমান সংসদকে চিরস্থায়ী করে রাখার দৃঢ় সংকল্প শিল্পীরা সেদিন ঘোষণা করেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীঅরুণাভের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সংসদের কার্যনির্বাহক কমিটি ঃ **সভাপতি** শ্রীদ্বিজেন চৌধুরী, **সহ সভাপতি** শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্না দে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; **সাধারণ সম্পাদিকা** শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র; **যুগ্ম সম্পাদক** শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বনাথ সোম; **কোষাধ্যক্ষ** শ্রীশৈলেন মুখোপাধ্যায়। **সভ্যবৃন্দ ঃ** শ্রীবেচু দত্ত, শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরী, শ্রীমানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামল মিত্র, শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমূল্য সান্ন্যাল, শ্রীশীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী নির্মলা মিশ্র, শ্রীদ্বিপেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীবুবাই বিশ্বাস, শ্রীভানু গাঙ্গুলী, শ্রীকল্যাণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামল গুপ্ত, শ্রীমৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরবিন সরকার, শ্রীঅরুণ বসু।

অমলাশংকরের আমেরিকা সফরের অভিজ্ঞতা

আমেরিকায় নৃত্যের আধুনিকতম এক্সপেরিমেণ্ট দেখেছি। একালের রূঢ় বাস্তবের নির্মম প্রতিচ্ছবি। সমসাময়িক যন্ত্রণা ও সমস্যার বিশ্লেষণ। টেকনিক ও নৃত্যভঙ্গি অদ্ভুত। আর্টের চিরন্তন সৌন্দর্য ও আবেদনের সপক্ষে আমি। মার্স কানিংহামের নাচ দেখে মুগ্ধ হলেও আধুনিক নৃত্যচর্চার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার মনে সংশয় জেগেছে। গত সপ্তাহে সাংবাদিকদের কাছে আমেরিকা সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে শ্রীমতী অমলাশংকর এই মন্তব্য করেন। আমেরিকার তরুণদের মধ্যে প্রাচ্যের "মিস্টিসিজম" সম্পর্কে যে কৌতূহল জেগেছে এবং সামগ্রিকভাবে যে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে সে-বিষয়ে শ্রীমতীশংকর বলেন, ব্যবহারিক জীবনে যা-কিছু পাবার তারা পেয়েছে। ঐহিক প্রাচুর্যের মধ্যে প্রার্থিত বস্তু বলতে তাদের সামনে আর কিছু নেই। তাদের অনুসন্ধান এখন তাই অন্তর্মুখী। পরমার্থই বোধ হয় তাদের কাম্য। কী-ভাবে তা পেতে হয় সেটুকুই তাদের জানা বাকি!

প্রসঙ্গত শ্রীমতীশংকর এক আমেরিকান তরুণের সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথা বলেন। হিপির মতই ওই তরুণের বেশবাস। সে ভারতের ধর্ম সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখে। গীতা, উপনিষদ, মহাভারত ও রামায়ণ তার নিত্যপাঠ্য।

শ্রীমতী শংকরের কথার মধ্য দিয়ে আমেরিকার বর্তমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্রটি ফুটে উঠেছিল। তিনি বলেন, ভারতের নৃত্য ও সংগীতের প্রতি আমেরিকার অনুরাগ যেন বেড়েই চলেছে। তিনি এই প্রসঙ্গে ওইদেশে শ্রীরবিশংকরের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করেন।

সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ শ্রীমতীশংকর পাঁচ সপ্তাহব্যাপী আমেরিকা সফরের পর কলকাতায় ফিরে এসেছেন। আমেরিকান সরকারের আমন্ত্রণে ওই দেশের নৃত্যকলা অনুশীলন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের জন্যই তিনি বিদেশ যাত্রা করেছিলেন. এবারের সফরকালে তিনি আমেরিকার বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও নৃত্য সমালোচকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন, অনেক নৃত্য বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। কোন একটি প্রতিষ্ঠানে তাঁকে নাচের ক্লাশও নিতে হয়েছিল। তিনি ওইসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রগাঢ় নিষ্ঠার কথা বলেন।

আমেরিকার চিরায়ত নৃত্যকলার যে অবলুপ্তি ঘটেনি সে কথাও শ্রীমতী শংকর বলেছেন। প্রসঙ্গত তিনি কনেকটিকাট নৃত্য বিদ্যালয়ে হোসে লিমনের "দি মুরস পাভান"-এর কথা বলেন। এটি ওথেলোর ব্যালেরূপ, যা দেখে তিনি অভিভূত।

আমেরিকার কনেকটিকাট স্কুল অব ড্যান্সএ নাচের ক্লাশ নেন অমলাশঙ্কর

আমেরিকার "হারকেনেস স্কুল অব ব্যালে"-র ছাত্রী শ্রীমতী সালি ট্রামেল (২০) শ্রীমতী অমলার সঙ্গে কলকাতায় এসেছেন। শ্রীমতী শঙ্করের প্রতিষ্ঠানে নাচ শেখাই তাঁর উদ্দেশ্য। এক বছর তিনি এদেশে থাকবেন। শ্রীমতী ট্রামেল সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, চোখের সামনে যা ঘটছে তা প্রকাশ করাই আধুনিক আমেরিকান নাচের লক্ষ্য। চিরন্তনকে এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

শ্রীমতী ট্রামেলকে ছাত্রীরূপে পেয়ে এবং তাঁর একাগ্রতা দেখে শ্রীমতী শঙ্কর খুশি। শ্রীমতী ট্রামেলের কথা উল্লেখ করে শ্রীমতী শঙ্কর বলেন, আমেরিকার তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা ভারতীয় নৃত্যের প্রতি অনুরক্ত।

আগামী বছরেও শ্রীমতী শঙ্কর আমেরিকা যেতে পারেন। তবে একা নয়, স্কুলের কিছু ছাত্রী নিয়ে। "আমেরিকাকে কিছু দেবার আছে আমাদের, ওখান থেকে নেবার বস্তুও কম নয়", শ্রীমতী শঙ্কর বললেন।

'বি-এফ-জে এ' এর শোকসভা

সাংবাদিক শৈলেন রায় ও সুধীরেন্দ্র সান্যালের মৃত্যুতে বেংগল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর সভারা আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে গত ১৮ সেপ্টেম্বর এক শোক-সভার আয়োজন করেন। সংস্থার সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার একটি শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন এবং বি-এফ-জে-এ'এর পরলোকগত দুই সভ্যের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। প্রারম্ভে শৈলেন রায় ও সুধীরেন্দ্র সান্যালের চারিত্রিক গুণাবলী এবং কর্ম-জীবন সম্পর্কে বলেন শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ।

ছবির পর ছবি

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে হিন্দুস্থান ফিল্মস লিমিটেডের "ছিন্নপত্র" তৈরি হচ্ছে। গত সপ্তাহে ছবির মহরৎ সম্পন্ন হয়। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির পরিচালক। উত্তমকুমার ও তনুজা নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন নচিকেতা ঘোষ।

নিউ ফেজ-এর "মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ" ছবির শুটিং ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে আরম্ভ হয়েছে। স্বরচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন পিনাকভূষণ। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করবেন অরুণ মুখোপাধ্যায়। সুপর্ণা দেবনাথ প্রধান স্ত্রীচরিত্রের শিল্পী। মলিনা দেবী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, পাহাড়ী সান্যাল, অনুভা গুপ্ত, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায় প্রভৃতি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করবেন। রথীন ঘোষ সংগীত পরিচালক।

সাপ্তাহিক সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রনট সরকারের খাদ্যনীতি এ সপ্তাহের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। যুক্তফ্রন্ট কমিটি অর্থাৎ সুপার ক্যাবিনেট আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গে ধান-চালের পাইকারী ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে সরকারের হাতে তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন। রাজ্যে পূর্ণ এবং আংশিক রেশন যতটা সম্ভব সম্প্রসারণের সিদ্ধান্তও হয়েছে এই সঙ্গে। খাদ্যনীতি সম্পর্কে ফ্রনটের অন্যান্য সিদ্ধান্ত : ধানচালের খুচরা ব্যবসা যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করা হবে; মফস্বলের ঘাটতি চাষী এবং সাধারণ মানুষকেও আংশিক রেশনের আওতায় আনা হবে; অঞ্চল ভিত্তিতে উৎপাদনের গড় হিসাব করে লেভি ধরা হবে; সেচ অঞ্চলে ৬ একর জমির মালিককে লেভি দিতে হবেনা; অন্যান্যদের খোরাকি বাবদ মাথা পিছু ৯ মণ এবং চাষের খরচ ও বীজের জন্য একর পিছু ৩ মণ ছাড় দেওয়া হবে। ধান সংগ্রহের সরকারী দর (উৎকর্ষ অনুযায়ী) মণ করা ২১, ২২ ও ২৩ টাকা। যিনি সময়মত লেভির পাওনা মিটিয়ে দেবেন তিনি মণ করা ২ টাকা বাড়তি পাবেন। দারিদ্র্যের তাড়নায় যাঁরা ধান বেচেন সরকার তাঁদেরও বাড়তি টাকাটা দেবেন। দারিদ্র্যের তাড়নায় যাঁরা ধান বেচবেন সরকার তাঁদেরও বাড়তি টাকাটা দেবেন। খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অনুপস্থিতিতেই ২১ সেপটেমবর বৃহস্পতিবার ফ্রনটের বৈঠকে এই খাদ্য-নীতি অনুমোদিত হয়। এ নিয়ে অবশ্য ভোটাভুটি হয়েছে।

দেশী সংবাদ

১৮ সেপটেমবর—আজ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে চারদিক থেকে সহস্র সহস্র লোকের গণ-মিছিল কলকাতায় মহাকরণ অভিযান করেন। মুখ্য দাবি রেশন অঞ্চলে মাথাপিছু দু' কিলো এবং পল্লী অঞ্চলে আঠারোশ' গ্রাম খাদ্য চাই, চাই আইন-শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

মোটা রকমের মূলধনী পণ্য আমদানী প্রয়োজন এমন সব শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে সমান অংশীদারিত্বে সহযোগিতা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন বৈদেশিক সহযোগিতা সম্পর্কিত রামস্বামী মুদালিয়র কমিটি।

১৯ সেপটেমবর—কংগ্রেস হাইকমানডের প্রতিনিধি শ্রীগুলজারিলাল নন্দ আজ কলকাতা এসে পৌঁছেছেন। এই রাজনৈতিক মিশনে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছেই তিনি রাজ্যের কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এবং খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সঙ্গেও কথা বলবেন।

২০ সেপটেমবর—কংগ্রেস হাই কম্যানড, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং নন্দ-বিরোধী সমালোচনা নিয়ে আজ রাজ্যের কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। শ্রীগুলজারিলাল নন্দের সঙ্গে এইদিনের বৈঠকে কয়েকজন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা পূর্বদিন শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় যে অভিযোগ এনেছিলেন, তার তীব্র সমালোচনা করেন। অনেকে আবার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে সমর্থন জানান। স্বয়ং নন্দজীও শ্রীমুখার্জীর বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

২১ সেপটেমবর—বুধবার গভীর রাত্রি পর্যন্ত দক্ষিণ কলকাতায় অনুষ্ঠিত যুক্তফ্রন্টের কম্যুনিস্টদের শরিকদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের বিবরণ শুনে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মন্তব্য করেছেন : যুক্ত ফ্রন্ট সরকার এবারও ফাঁড়াটা কাটিয়ে উঠতে পারল। ওই বৈঠকে [illegible] ছয়টি দলের পাঁচটির পক্ষ থেকেই জানানো হয়েছে, তাঁরা এখনই কোন মতে যুক্তফ্রনট সরকারের পতন চান না।

২২ সেপটেমবর—নন্দজী পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দিয়ে অ্যাডহক কমিটি গঠনের পক্ষে। কংগ্রেস হাই কমানডের প্রতিনিধি হিসাবে প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা ও কর্মীর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীনন্দ অ্যাডহক কমিটির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের একটা বিরাট অংশ অ্যাডহক কমিটির বিরোধী।

২৩ সেপটেমবর—কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্য সরবরাহের যে বরাদ্দ আছে আগামী বছর তা শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করার একটি প্রস্তাব নাকি কেন্দ্রীয় সরকারী মহলে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতে ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং আসন্ন মুখ্য ও খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলনে এই রকমের কোন প্রস্তাব উঠলে রাজ্য সরকার তা কিছুতেই মেনে নেবেন না। বরং আগামী বছর রাজ্যের যা ঘাটতি হবে কেন্দ্রকে তার সবখানি পূরণ করার দৃঢ় দাবি জানাবেন।

সভাস্থলে ছাত্র বিক্ষোভের ফলে আজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের সভা ভেঙে যায়। সভারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে মিছিলকারী ছাত্ররা দ্বারভাঙ্গা হলে ঢুকে মাইক্রোফোনে যে যার দাবি জানাতে থাকেন। প্রচণ্ড হইচই ঠেলাঠেলি এবং ধর্না ও পাল্টা ধর্নার মধ্যে উপাচার্য সভা মুলতবী ঘোষণা করে চলে যাওয়ার পথে ঘেরাও হন। পনের মিনিট পরে তিনি ছাড়া পান।

২৪ সেপটেমবর—আজ কংগ্রেস হাই-কম্যানডের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রীগুলজারিলাল নন্দ সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন—বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দিয়ে একটি অ্যাড-হক কমিটি গঠন করা হবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেন, অ্যাড-হক কমিটি গঠনের সুপারিশের তিনি কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের মতে এই অ্যাড-হক কমিটি রাজ্যের কংগ্রেস সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে।

বিদেশী সংবাদ

[illegible] পদার্থ বিজ্ঞানের [illegible] সৃষ্টিকারী স্যার [illegible] পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যু-কালে তাঁর বয়স হয়েছিল [illegible] বছর। কিছুদিন [illegible] তিনি অসুস্থ ছিলেন। যুদ্ধোত্তরকালে ব্রিটেনে পরমাণু শক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর দান অসামান্য।

পরমাণুকে ভেঙে গুঁড়ো করে দিতে পারলে যে প্রচুর শক্তি বেরিয়ে আসতে পারে তা বিজ্ঞানীদের জানা থাকলেও কি করে তা ভাঙতে হবে তার পন্থা বের করলেন তরুণ বিজ্ঞানী জন কক্‌রফট ও ডঃ ওয়ালটন ১৯৩২ সালে। এর ফলে ক্রমশ এসে গেল আণবিক চুল্লী, আণবিক বোমা, আণবিক বিদ্যুৎ এবং অসংখ্য কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

১৯ সেপটেমবর—ভারত ও সিংহলের প্রধানমন্ত্রিদ্বয়—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও শ্রীডাডলি সেনানায়ক পরস্পরের মধ্যে আলোচনা কালে ১৯৬৪ সালের ভারত-সিংহল চুক্তি সর্বতোভাবে কার্যকর করতে সম্মত হয়েছেন। এই বিষয়টি আজ কলম্বোতে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল।

২০ সেপটেমবর—গতকাল রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের ২২তম উদ্বোধনী অধিবেশনে তিনটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটে। যথা এই প্রথমবার একটি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের (রুমানিয়া) প্রতিনিধির ১১২—১ ভোটে পরের বছরের জন্য সভাপতি নির্বাচন, (২) বিদায়ী সভাপতি আফগান রাষ্ট্রদূত আবদুল রহমান পাজওয়াক কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের কর্মনীতির কঠোর সমালোচনা আর (৩) শুরুতেই কিউবার প্রতিনিধি কর্তৃক সভাত্যাগ আর ওই ঘটনা উপলক্ষ করে রুশ ও মার্কিন প্রতিনিধির মধ্যে উক্তি বাদানুবাদ।

২১ সেপটেমবর—চীনা কমিউনিস্ট নেতা মাও সে-তুং তাঁর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শুদ্ধি-যজ্ঞে মোট পঞ্চাশ লক্ষ পার্টি ও সরকারী কর্মী, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক ও কৃষককে আহুতি দিয়েছেন—তাঁদের অনেকে নিহত, অনেকে অভিযুক্ত ও দল-বহিষ্কৃত হয়েছেন।

২২ সেপটেমবর—যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া, ব্রিটেন ও ফ্রানস—এই চারটি বৃহৎ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-মন্ত্রীরা আগামী মঙ্গলবার সেক্রেটারী জেনারেল উ থানটের আয়োজিত এক ভোজসভায় মিলিত হতে রাজি হয়েছেন। ওতে আলোচ্য বিষয় হলো বিশ্বের তাবৎ সমস্যা।

২৩ সেপটেমবর—সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ ঘোষণা করেছে যে, মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে উত্তর ভিয়েতনামকে সাহায্য করার জন্য তারা সম্প্রতি বিনামূল্যে ক্ষেপণাস্ত্র, কামান ও অন্যান্য সমর সম্ভার পাঠাচ্ছে। রয়টার এ খবর দিয়েছেন।

২৪ সেপটেমবর—নির্ভরযোগ্য মহল থেকে পাওয়া সংবাদে প্রকাশ, মাও-পন্থী ও তাঁদের বিরোধীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মূল কেন্দ্র এখন ক্যানটন। ক্যানটনের দৈনিক পত্রিকা কুয়াংচোং হুং-বু সম্প্রতি রেড গার্ড কনভয়ের উপর বিরোধী দলের অতর্কিত আক্রমণের এক চাঞ্চল্যকর বিবরণ 'ক্যানটনে চরম বিপদাশঙ্কা' এই শিরোনামা দিয়ে প্রকাশ করেছে।

নতুন!

'ইকনমি প্যাকে' টিনোপাল

এখন টিনোপাল এই নতুন 'ইকনমি প্যাকেও' পাওয়া যায়—এতে কাপড়চোপড় ধবধবে সাদা করে তুলতে আগের চেয়ে খরচ হয় অনেক কম। আজই কিনুন। এক প্যাকেট চলে বহুদিন—আর বাঁচতিও অনেক। বাড়ীর সকলের জামাকাপড় সবসময় টিনোপাল দিয়ে ধবধবে সাদা ক'রে তুলুন—এই বৈজ্ঞানিক উপায়ে। সিকি চামচেই এক বালতি কাপড় হয় সাদা ঝকঝকে।

টিনোপাল সাদা ক'রতে সবের সেরা।

তিন রকমের প্যাকেট থেকে পছন্দমত বেছে নিন :

এক বালতির এক প্যাকেট

রেগুলার প্যাক

নতুন ইকনমি প্যাক

® টিনোপাল, জে. আর. গায়গী এস্‌. এ., বাল, সুইজারল্যাণ্ড এর রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক।

সুহৃদ গায়গী লিমিটেড, পোঃ আঃ বক্স ৯৬৫ বোম্বাই-১ বি আর

shilpi sgt 87a/67 bn

সূচীপত্র

সূচীপত্র

আশ্চর্য টেঁকসই....
আর যেমনি নরম তেমনি মোলায়েম
অপরূপ সুন্দর বিলাসবহুল বোকেন বিছানার চাদর। বাছাই-করা তুলো থেকে তৈরী সেরা সুতোয় এমনভাবে বোনা যে যেমনি আরাম দেয়, তেমনি অনেকদিন চলে। চাদরের মুড়ি নিখুঁতভাবে সেলাই করা। প্লেন, ডোরাকাটা বা নানান নকশায় পাবেন। (চাদরের সঙ্গে মানানসই তোয়ালেও আছে।)
বিশ্ববিখ্যাত বোকেন চাদরে আপনার শোবার ঘরের শোভা বাড়বে, আর বাড়বে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য। বোকেন চাদরের আদর-মাখানো নরম ছোঁয়ায় দুচোখে নেমে আসবে আরামের ঘুম। আজই বোকেন চাদর কিনুন।
বোম্বে ডাইং
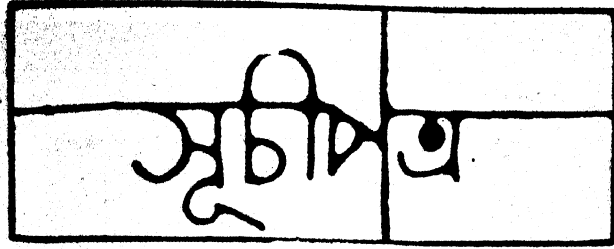
প্রচ্ছদঃ শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রম সংশোধন : ২৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত প্রচ্ছদের শিল্পী শ্রীসুধীর বৈরাগী। ভুলক্রমে অন্য নাম মুদ্রিত হয়।

ডিস্ট্রিবিউটর: (১) প্যারি অ্যাণ্ড কোং লিঃ, ৩২ চৌরঙ্গী, কলিকাতা-১৬

ডিলারসমূহ: (১) ফুলচাঁদ ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোং নায়ক ভবন, পোঃ অঃ শিলিগুড়ি, (২) কমার্শিয়াল অ্যাণ্ড এঞ্জিনিয়ারিং কর্পরেশন প্রভিনসিয়াল রোড, বাঁকুড়া (৩) নাগ অ্যাণ্ড কোং, নরেশ কুটির, পোঃ অঃ বহরমপুর (জেলা মুর্শিদাবাদ), (৪) মিডাস ফুয়েল ইনজেকসন কোং, উষাগ্রাম, জি টি রোড (ইস্ট), আসানসোল, (৫) বেহানি ব্রাদার্স, রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ পোঃ অঃ মালদহ (৬) ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া মেশিনারি কোং, জি টি রোড, গোপালবাগের নিকট, চন্দননগর এবং ১০ ক্যানিং স্ট্রীট কলিকাতা, (৭) রাজকিষেণ রাধাকিষেণ মিত্র অ্যাণ্ড কোং, ব্যারাকপুর বারাসত রোড, নোয়াপাড়া রেলওয়ে গেটের নিকট, পোঃ বারাসত, পি-৪০ মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা।

আনন্দময়ীর আগমনে

শারদ প্রভাতে শেফালী সুরোভিত বাতাসের মৃদুগন্ধের মধ্যে আবার সেই পরিচিত বোধনের বাজনাটি বেজে উঠেছে : বৎসরান্তে আনন্দময়ী আসছেন। এক সময় তাঁর আসার বেলাটি আগমনীগানে মুখরিত হ'ত, বাউল-বৈরাগীর একতারায় গান উঠত : গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল উমা মা আমার এসেছে; গ্রাম্য ঢাকীর বাজনা মাঠে ঘাটে তাঁর আগমনের সংবাদটি ছড়িয়ে দিত; বাংলার আকাশ বাতাস ফলফুল শুভ্রশ্যামল রূপে অভ্যর্থনা করত আনন্দময়ীকে। শুধু পল্লীতে পল্লীতে নয়, শহরের বাবুদের বাসাতেও কলের গানে আগমনীগান বাজত : আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে।

আজও সেই শান্তস্নিগ্ধ শারদ প্রভাতটি আসে, শেফালী গন্ধের সুবাস পাই, আনন্দময়ীর আগমনের বার্তা বয়ে যায়, তবু অনুভব করি যেন, শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাওয়ার সে আনন্দ আর নেই। কেন নেই সে-প্রশ্নের আলোচনা এ প্রসঙ্গে অবান্তর হবে; তবু এ দুর্গোৎসব, বাঙালীর সমাজজীবনের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় উৎসব, এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যেন কোন সুদূর অতীত থেকে প্রবাহের মতন ভেসে আসছে, একে বর্জন করা বা উপেক্ষা করার সাধ্য আমাদের নেই।

কে যেন বলেছিলেন, বাঙালীর দুর্গোৎসবের দুটি চেহারা : একটি সামাজিক বা পারিবারিক, অন্যটি ধর্মীয়। যে দিকটি সামাজিক ও পারিবারিক সেখানে দুর্গা দুর্গা নয়, উমা, মা মেনকার কন্যা, স্বামীগৃহ থেকে বৎসরান্তে মাত্র কয়েকটি দিনের জন্যে পিত্রালয়ে আসেন। অর্থাৎ এই চিত্রটি পারিবারিক মিলনের। বাঙালী সমাজ-জীবনেও এই ভাবটি দুর্গোৎসবের সঙ্গে জড়িত ছিল, প্রবাসী মাত্রেই স্বগৃহে ফিরে যেত, মিলন ঘটত সংসারের সকলের সাথে। আজকের দিনে অবশ্য এই মিলনচিত্রটি নানাভাবে খণ্ডিত হয়েছে, তবু তার রেশ থেকে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দুর্গোৎসব সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা যথার্থ—এ হ'ল জীবন্ত কুসুমে সজ্জা,—'কেহ বা আপনি পরে, কেহ বা পরায় পরে, যে যাহারে ভালবাসে সে তারে সাজায়।'

দুর্গোৎসবের দ্বিতীয় চিত্রটি হ'ল ধর্মীয় যেখানে দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী দুর্গতিনাশিনী, সর্বমঙ্গলা; এই দুর্গার ধ্যানমূর্তিতে রয়েছে অশুভকে বিনাশ করার ধ্যান, সেই জননীকে আহ্বান—যিনি জীবনের পাপ-তাপ দুঃখ-দুর্গতি বিনাশ করবেন।

শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা মত দুর্গার আগমন নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন অবশ্য সাধারণ মানুষের নেই। তাতে কিছু বড় আসে-যায় না। বাঙালী তার হৃদয় দিয়ে দুর্গোৎ-সবের পারিবারিক চিত্রটিই যেন গ্রহণ করেছে। সারা বছরের মধ্যে এই ক'টি দিন তার দুঃখদৈন্যগ্লানির মধ্যে কিঞ্চিৎ বিস্মৃতি, সামান্য শান্তি। দুঃখ দৈন্যের সংসারে, অভাব অক্ষমতার মধ্যেও যেমন পিতৃগৃহে প্রবাসী কন্যার সাদর অভ্যর্থনা ঘটে থাকে বৎসরান্তে আমাদের অভ্যর্থনাও সেই রকম আনন্দময়।

বর্তমান বছরে, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে কিছু বলা বাহুল্যমাত্র। আমাদের দুর্গতি আমরা সবাই অনুভব করি। অন্ন বস্ত্র, আশ্রয়ের এত হাহাকারের মধ্যে যে-দুর্গার আগমন ঘটছে তাঁকে আনন্দময়ী বলে মনে হয় না। বরং সন্দেহ হয় এই নিরানন্দের মধ্যে দেবী দুর্গার আগমন যেন অস্বস্তিকর। তবু দুঃখের মধ্যেও তাঁর অভ্যর্থনার সাড়া না জেগেছে কোথায়! পাড়ায় পাড়ায় দুর্গামণ্ডপের সামিয়ানা টাঙানো হয়ে গেছে জামাকাপড়ের দোকানে ভিড় যথেষ্ট, ভ্রমণবিলাসীর দল এ হেন অবস্থাতেও দেশের টিকিটের জন্য ধরনা দিচ্ছেন। আর এরই মধ্যে বোধনের বাজনাটি বেজে উঠেছে মণ্ডপে প্রতিমা। ধূপ-ধুনায় দেবীর আরাধনা কিছু কম হবার কোনো কারণ দেখছি না। তবে উৎসবের চেহারাটি এবারে বেশ কিছু ম্লান; অন্নহীন বস্ত্রহীনের বেদনা আমাদের অভিভূত না করে পারে না। অথচ এই মালিন্যের মধ্যেও উৎসবটি প্রসন্ন সূর্যোদয়ের মতন ফুটে উঠেছে। সেই পুরাতন সহাস্য স্ফূর্ত মূর্তিটি না থাক, ম্লান বিষণ্ণ মূর্তিটি রয়েছে।

দুর্গোৎসবের এই দিনগুলিতে আমরা সকলের মুখের মালিন্য ঘোচাব এমন সাধ্য নেই, কিন্তু কামনা করি শত দুঃখ কষ্ট দৈন্যের মধ্যেও উৎসবের ক'টি দিন নির্বিঘ্ন হোক, সুখের হোক।
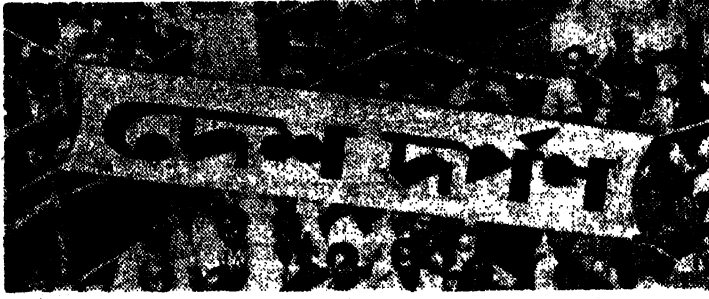
নন্দাজীর কথায়, শ্রীকামরাজ অ্যাড হক প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন। শ্রীকামরাজ নিজে এরকম কোন প্রকাশ্য উক্তি অবশ্য করেন নি। তিনি মাদ্রাজে সাংবাদিকদের বলেছেন, নন্দাজীকে জিজ্ঞেস করুন তিনিই সব বলবেন। এমন কি নন্দাজীর জবানীটা যে কংগ্রেস সভাপতিরও বক্তব্য তা-ও শ্রীকামরাজ বলেন নি। বরং পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসের যে অ্যাড হক কমিটির নাম নন্দাজী কংগ্রেস সভাপতির কাছে পেশ করেছেন সে তালিকা শ্রীকামরাজ দিল্লি ফিরে পরীক্ষা করে মতামত দেবেন। অনুমান করা যায়, তিনি দিল্লিতে ফিরে এসে অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে শ্রীঅতুল্য ঘোষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য একটা আগ্রহ দেখিয়েছেন। এমন কি, শ্রীকামরাজ ৩ অক্টোবরের আগে দিল্লি ফেরার কোন আগ্রহ দেখান নি।

আগ্রহটা পুরোপুরি এসেছে শ্রীনন্দার কাছ থেকে। অনেক তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও এবং বহু আবেদন জানাবার পরেও শ্রীকামরাজ অ্যাড হক প্রস্তাব সম্বন্ধে তেমন কোন বিশেষ ঔৎসুক্য দেখান নি। হয়ত এ কারণেই শ্রীনন্দা ছুটে গেলেন মাদ্রাজে। এই আগ্রহটা অনেকের কাছে বিসদৃশ ঠেকেছে। কারণ, অ্যাড হক প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য যদি পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসকে সক্রিয় করাই হয়, তা হলে এত ব্যস্ততা দেখাবার প্রয়োজনটা অত্যন্ত খাপছাড়া মনে হবে। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, শ্রীনন্দা যখন অ্যাড হক-এর প্রস্তাব করেন, তখন কংগ্রেসের বাইরেও একটা তাড়া ছিল। কাজেই অ্যাড হক-এর ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন।

অ্যাড হক প্রস্তাবের একটা দিক অবশ্য শ্রীহুমায়ুন কবীর অনেকটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তিনি দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে যে বিবৃতি দিয়েছেন তার মূল কথা, ভারতীয় ক্রান্তি দলের সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন হওয়া অসম্ভব নয়। হয়ত পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্টকে লক্ষ্য করেই কথাটা বলেছিলেন এবং হয়ত তাঁর বিবৃতির মধ্যে এটাই স্পষ্ট হবার সুযোগ ছিল যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের পরিবর্তে ক্রান্তি দল ও কংগ্রেসের মধ্যে কোয়ালিশন হতে পারে এবং মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারে। পশ্চিমবাংলায় ক্রান্তি দলের উল্লেখ করলে বাংলা কংগ্রেসকেই বোঝায় এবং বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে যে যুক্তফ্রন্টের বিকল্প সরকারের চিন্তা করা হচ্ছিল, সে কথাটারই ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছিলেন শ্রীকবীর।

তিনি অবশ্য পরে তাঁর বিবৃতির সংশোধন করে বলেছেন যে, এটা তাঁর মানসিক রাজনৈতিক চিন্তা ছাড়া অন্য কিছুই নয়; কারণ, বিভিন্ন রাজ্যেই বিভিন্ন দলের মধ্যে এবং কংগ্রেসের মধ্যেও কোয়ালিশন সম্বন্ধে আলোচনা চলছে। শ্রীকবীরের এই সংশোধনের অর্থ যা-ই হোক না কেন, রাজনৈতিক চিন্তা হিসাবেও ক্রান্তি দল ও কংগ্রেসের মধ্যে কোয়ালিশন হবার সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নেওয়াও অভিনব মনে হবে। কারণ, দু' সপ্তাহ আগেও শ্রীকবীর তাঁর কংগ্রেস-বিরোধিতাকে গোপন করার কোন চেষ্টা করেন নি। বরং এ কথাটাই শ্রীকবীর বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ইন্দোর বৈঠকে ক্রান্তি দলের সংগঠন ও বিধিবিধান গৃহীত হবার পরই তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটাবার জন্য।

বিজ্ঞপ্তি

'পূজার ছুটি উপলক্ষে আগামী ১৪ অক্টোবর 'দেশ' প্রকাশিত হইবে না। পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হইবে ২১ অক্টোবর।

সম্পাদক দেশ

কেন্দ্রে কংগ্রেসের পতন ঘটাবার নিশ্চয় একটা পরিকল্পনাও ছিল। সে পরিকল্পনার প্রথম সোপান ছিল ইন্দোরে ভারতীয় ক্রান্তি দল গঠন করা। সেই পরিকল্পনা অনুসারে তিনি বিভিন্ন রাজ্যে ক্রান্তি দলের সাংগঠনিক কমিটি গঠন করেছিলেন, যার ভিত্তিতে পরবর্তী ক্রান্তি দলে রাজ্য সংগঠন গড়ে উঠবে। পশ্চিমবাংলায়ও তিনি এমনি একটা সাংগঠনিক কমিটি গঠন করেছিলেন এবং সে কমিটির ভার ছিল শ্রীকালী মুখার্জির হাতে। এই কমিটিকে ভার দেওয়া হয়েছিল পশ্চিমবাংলা থেকে ইন্দোর অধিবেশনের প্রতিনিধি নির্বাচন করা। এই কমিটিতে ছিলেন শ্রীঅজয় মুখার্জি।

কিন্তু শ্রীঅজয় মুখার্জি এই সাংগঠনিক কমিটিকে কোন মতে মেনে নিতে পারেন নি। তার প্রধান কারণ, ক্রান্তি দলের সাংগঠনিক কমিটির ভার যাঁদের হাতে ছিল তাঁদের মেনে নিলে পশ্চিমবাংলায় বাংলা কংগ্রেসের অস্তিত্ব এবং স্বভাবতই তাঁর নেতৃত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। আরও বিপন্ন হবার সুযোগ দেখা দেয় বাংলা কংগ্রেসের কিছু সদস্য ক্রান্তি দলের সাংগঠনিক কমিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রান্তি দলে যোগ দেবার কথাটা জানিয়ে দেবার পর। তাই শ্রীঅজয় মুখার্জিকে ক্রান্তি দলের সাংগঠনিক কমিটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়। বিবৃতি দিয়ে তিনি শ্রীকবীরের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ প্রকাশ করে দেন।

আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন। ইদানীং কালে শ্রীঅজয় মুখার্জির মুখ্যমন্ত্রীত্ব সম্বন্ধে নানা মহলে গুঞ্জন উঠছিল। বাংলা কংগ্রেস মহলে বেশী করে। এমনও একটা কথা উঠেছিল যে শ্রীঅজয় মুখার্জির কোন বিকল্প আছে কিনা। নেতৃত্বের প্রশ্নে স্বভাবতই কিছু নাম শোনা যায়, এবং একটা নাম ছিল শ্রীহুমায়ুন কবীর। কিন্তু শ্রীকবীর মুখ্যমন্ত্রীত্ব সম্বন্ধে যে বিশেষ উৎসাহী নন এ-কথাটা হয়ত শ্রীঅজয় মুখার্জি ভাল করে জানতেন না। হয়ত সে-কারণে, তাঁকে শ্রীকবীরের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধে নামতে হয়েছিল।

শ্রীঅজয় মুখার্জির রাজনৈতিক চেহারাটা মনে রাখলে এটা বোঝা যাবে যে, এই প্রকাশ্য বিরোধ শ্রীকবীর বা ক্রান্তি দলের পক্ষে খুব সহনশীল নয়। এটা উপলব্ধি করেই ক্রান্তি দলের সর্বভারতীয় সাংগঠনিক কমিটির নেতা শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ দিল্লিতে একটা জরুরী সভা ডাকেন অবস্থাটা আলোচনা করার জন্য। সর্বভারতীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের পরেই ডাকা হয়েছিল এই সভা। ইতিমধ্যে এ কথাটাও শ্রীনন্দা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসের জন্য অ্যাড হক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটাও অজানা ছিল না যে, কংগ্রেসের অ্যাড হক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তের পিছনে অন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। প্রকাশ্যেই জল্পনা-কল্পনা চলছিল যুক্তফ্রন্ট সম্বন্ধে। কথাটা তখনই রটে গিয়েছিল যে, অ্যাড হক কমিটি গঠিত হলেই শ্রীঅজয় মুখার্জি যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে কংগ্রেস দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অ-কম্যুনিস্ট মন্ত্রিসভা গঠন করবেন।

এটা অজানা ছিল না বলেই দিল্লির বৈঠকে শ্রীঅজয় মুখার্জির পক্ষে বিশেষ

কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। অ্যাড হক-এর খাঁড়াটা অত্যন্ত নিষ্করুণভাবে ঝুলছিল শ্রীকবীরের সামনে। তাই বিরোধ এবং বিবাদটা আপাতত মিটমাট হয়ে গেল। মিটমাট হল শ্রীঅজয় মুখার্জির শর্তে। বাংলা কংগ্রেস ক্রান্তি দলের রাজ্য সংগঠন বলে স্বীকৃতি পেল। ফলে বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে যে ভাঙনের মুখটা দেখা দিয়েছিল সেটা আপাতত মিলিয়ে গেল। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে শ্রীমুখার্জির দলগত শক্তি অটুট রইল। অপর দলের সঙ্গে এবং বিশেষ করে কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া করার আর কোন অসুবিধা থাকল না।

এটাও অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, শ্রীহুমায়ুন কবীরের কাছে শ্রীনন্দার অ্যাড হক প্রস্তাবের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা অজানা ছিল না। ইতিহাসটাও। প্রথম যখন শ্রীনন্দার কাছ থেকে অ্যাড হক-এর প্রস্তাবটা পশ্চিমবাংলা কংগ্রেস নেতাদের কাছে আসে তখন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু তার পরেই শ্রীসেন তাঁর মতটা বদলে ফেলেন। এমন কি শ্রীঅতুল্য ঘোষকে তিনি জানিয়েছিলেন যে, ২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যদি পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসে অ্যাড হক কমিটি বসিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে শ্রীঅজয় মুখার্জি যুক্তফ্রণ্ট থেকে পদত্যাগ করে অ-কম্যুনিস্ট কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করতে রাজী আছেন। শ্রীসেন মনে করেন যে, শ্রীঅজয় মুখার্জিকে কম্যুনিস্টদের হাত থেকে মুক্ত করতে হলে এ ছাড়া অন্য পথ নেই। তাই অ্যাড হক প্রস্তাবকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ অবশ্য রাজী হন নি। কারণ, অ্যাড হক-এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তাঁর সন্দেহ ছিল। যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে ভেঙে দিয়ে কংগ্রেসের আওতায় বিকল্প সরকার গঠনে তাঁর আপত্তি আছে। এতে যে শুধু জনসাধারণের অশান্তি বৃদ্ধি পাবে তা-ই নয়, কংগ্রেসের মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে এবং কম্যুনিস্টদের হাতে রাজনৈতিক সুযোগ তুলে দেওয়া হবে। তবু তিনি বলেছিলেন যে, দেশের স্বার্থ যদি এই পন্থায় অটুট রাখা যায়, তা হলে তিনি পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অ্যাড হক-এর প্রস্তাব আনতে রাজী আছেন। তবে দুটো শর্ত থাকবে : এক, কংগ্রেসের এই প্রস্তাব এবং শ্রীঅজয় মুখার্জির পদত্যাগপত্র দুটোই একই সঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হবে। দুই, শ্রীনন্দা এই অ্যাড হক প্রস্তাব নিয়ে কোন রকম মাথা ঘামাতে পারবেন না। দুটি শর্তই অবশ্য শ্রীসেন বা তাঁর সমর্থকদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি এবং শ্রীঘোষও তাঁর বিরোধিতা তুলে নেন নি।

শ্রীকবীরের কাছে এটাও অজানা ছিল না যে, শ্রীঅজয় মুখার্জির রাজনীতির সঙ্গে শ্রীনন্দার অ্যাড হক প্রস্তাবের কোন সম্পর্ক ছিল না। সেটা জানতেন বলেই, তাঁকে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করে নিতে হয়েছে। তাঁকে বলতে হয়েছে যে, ক্রান্তি দল এবং কংগ্রেসের মধ্যে কোয়ালিশন সম্ভব।

এই কোয়ালিশনের সম্ভাব্য ধারণা ভবিষ্যতে নতুন কোন পরিবর্তন আনবে কি না তা এখনই অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে এটা আপাতত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, শ্রীনন্দার অ্যাড হক প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি এবং মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট-দের কাছে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সুযোগ এনে দিয়েছে। শ্রীমুখার্জি যেমন তাঁর বাংলা কংগ্রেসকে জোরদার করে নিয়েছেন তেমনি চূড়ান্তভাবে পশ্চিম-বাংলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক দুর্বলতাকে জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিয়েছেন। এক বছর আগে শ্রীঅজয় মুখার্জিকে কংগ্রেস ছেড়ে যেতে হয়েছিল এক অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে। দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতির কাছে অনেক ধর্না দিয়েছিলেন পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসে অ্যাড হক কমিটি গঠন করার জন্য। স্মারক-লিপি দিয়ে দাবি করেছিলেন যে, পশ্চিম-বাংলা কংগ্রেসকে দলগত নেতৃত্ব থেকে মুক্ত করা হোক অ্যাড হক কমিটি গঠন করে। তাঁর আবেদন ব্যর্থ হয়েছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল, যে প্রস্তাবের প্রথম স্বাক্ষরকারী ছিলেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। তারপর শ্রীমুখার্জির সাক্ষাৎ হয়েছে শ্রীসেনের সঙ্গে আরামবাগ নির্বাচন কেন্দ্রে। পরাজিত করেছেন মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীসেনকে।

এর পরেই এল শ্রীনন্দার অ্যাড হক প্রস্তাব, যে অ্যাড হক দাবি করেছিলেন শ্রীমুখার্জি এক বছর আগে। এ রাজনৈতিক সুযোগ শ্রীমুখার্জির পক্ষে নষ্ট করা সম্ভব ছিল না। কারণ, তিনি জানতেন, এই অ্যাড হক কমিটি দিয়ে পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসের মধ্যে ধস নামিয়ে দেওয়া সম্ভব। তাঁর হিসাবে ভুল হয়নি। ধস-খাওয়া কংগ্রেসকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে শ্রীমুখার্জি তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তিকে অনেকাংশে বৃদ্ধি করে নিয়েছেন।

এই রাজনৈতিক মর্যাদা তিনি কতটা অক্ষুন্ন রাখতে পারবেন, তা নির্ভর করবে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের সঙ্গে বোঝাপড়ার উপর। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে তাঁর রাজনৈতিক মনোভাব বেশ কিছুদিন ধরেই পরিবর্তিত হচ্ছিল। নানা বিষয়ে এবং বিশেষ করে রাজ্যের আইন ও শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে যুক্তফ্রণ্টের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি যে সব সিদ্ধান্ত এবং ব্যবস্থা নিয়েছিলেন বা নেবার চেষ্টা করেছিলেন বহু ক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছে মার্ক্সিস্ট কম্যু-নিস্টরা। বহুবার তাঁকে মার্ক্সিস্ট কম্যু-নিস্টদের কাছে শুনতে হয়েছে 'জবাব দিন'। বার বার তাঁর কাছে কৈফিয়ত দাবি করা হয়েছে, সভা-সমিতি করে তাঁর সমালোচনা করা হয়েছে। তাই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের সঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁর বোঝাপড়ার প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু এই বোঝাপড়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি কতটা সুবিধা করে নিতে পারবেন তা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না। তবে শ্রীনন্দা অ্যাড হক-এর বোঝাটা পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসের উপর চাপিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক সুযোগ এনে দিয়েছেন কম্যুনিস্টদের হাতে। ধস নেমে যাওয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের রাজনৈতিক আক্রমণটা তীব্রতর করতে এতটুকু অসুবিধা হবে না। সে আক্রমণ কংগ্রেসের পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ যে নেই তা বলা যায় না।

ক্রুশ বহনকারী
অ্যাড হক কমিটি

ছড়া : আমেরিকা

দীপক মজুমদার

কোকাকোলা হ্যামবার্গার দুপুর-সকাল
চকচকে সোনালী আমেরিকা
বিপুল অঙ্কের মধ্যে ঈশ্বর রাখাল
কৃষ্ণসখী শ্যামলী গায়িকা।

অনিঃশেষ যন্ত্রপণ্য, দক্ষ শ্রমব্যয়
পাখির পালক আমেরিকা
একালের চাঁদ সদাগর ধন্দমার না'য়
স্বপ্নগর্ভ রাতের নায়িকা।

তীক্ষ্ণ জ্ঞানের কেন্দ্র, রুক্ষ রাস্তাঘাট
দাম্ভিক নায়ক আমেরিকা
তাজ্জব উদ্ভট রাজা স্ফীত রাজ্যপাট
খেলেন তাণ্ডব প্রহেলিকা।

এরই মধ্যে ঘুরে বেড়ায় পক্ষধর প্রাণ
বিনম্র সহজ আমেরিকা
ক্লান্তিহীন ক্ষুধমন আত্মানুসন্ধান
উদাসীন, মানুষ ও একা।

জল

রত্নেশ্বর হাজরা

দেখলেই তৃষ্ণার্ত হবো এমনি একটা অভ্যাস আমার
অনেক দিনের—কোন্ দিকে হাত পাতবো
মনে থাকে না —
দূরে থাকলে ব্যথা লাগে কম
হাড়গোড় নরম রক্তমাংসের সর্বত্রও
সমান যন্ত্রণা নয়।

গভীর নিচে অনেক পর্বতশৃঙ্গের মালিক তাই
তোমাকে ধনী বলতে পারি
উঠোন আছে বলে
ছেলেবেলার চাঁদের মতো দৌলত —
কিন্তু বিষুবরেখার আড়ালে আমার ছায়া
বা তাপ ঘন হয় না —
সবচেয়ে দূরের সমুদ্রে
জাহাজডুবি হয় কদাচিৎ।

না দেখেও তৃষ্ণার্ত হতে পারি — কিন্তু
তেমন রোদ ওঠে না একদিনও —
দূরে থাকলে ব্যথা লাগে কম
অথচ দেখলেই তৃষ্ণার্ত হবো এমনি একটা অভ্যাস আমার
অনেক দিনের।

ছেলেবেলার লালকোট

ভাস্কর চক্রবর্তী

তোমার কাচের চোখ তুমি শরীর বেঁকিয়ে ভিতর-ছায়ায় শুয়ে থাকো।
ঘোর অন্ধকার কেঁপে ওঠে
ও সূর্য সামনে থেকে পিছনের দিকে ঢলে পড়ে। আমার ছেলেবেলার
লালকোট নিয়ে তুমি চলে গেছ, সেই থেকে
আমি কোমর পর্যন্ত শরীর ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে দীর্ঘকাল বসে আছি
ও জলের আয়নায় চেয়ে দেখছি আমার মুখ—এ মুখ আমার নয়
তুমি ফিরিয়ে দাও আমার লালকোট আমি সুখী মানুষের মতো ফের
ফুটপাত থেকে অন্য ফুটপাতে হেঁটে যাবো।

তুমি অন্ধকারে হেসে উঠে যেই আঙুল হেলাও, আঙুলের থেকে যেন
সাতটা পায়রা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে দূরে আকাশের
দিকে উড়ে যায়।
তোমার শরীর থেকে আমার চোখের তেত্রিশটা মণি শুধু ঝরে পড়ে
আমি নই সার্কাসের ম্যাজিকওয়ালা হলুদ ছোপ সমেত
দাঁত নিয়ে হো হো করে হেসে উঠবো, অথবা খুব জোরে প্যাডেল ঘুরিয়ে
তোমার ঘাড় চেপে ধরবো। কারখানার পাশে
আমি বহুদিন শুয়ে আছি
রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে ল্যাম্পপোস্ট ঘাড় কাত করে যেন চেয়ে থাকে, তুমি
আমার ছেলেবেলার লালকোট নিয়ে চলে গেছ
তুমি ফিরিয়ে দাও আমার লালকোট আমি সুখী মানুষের মতো ফের
ফুটপাত থেকে অন্য ফুটপাতে হেঁটে যাবো।

লিটকুইজ নং ২৩

১৭টি সূত্রের অনুবাদ

১। অজন্তার শিল্প সম্পূর্ণ অস্তিত্বের **সৌন্দর্য/ঐক্যের** রহস্যকে উদ্ঘাটিত করে দেয়।

২। **কর্তব্য/মানবতার** প্রতি ভালবাসা এমন একটি জিনিস যা মানুষকে আপনভোলা করে দেয়।

৩। জীবনের দর্শন ছাড়া **শিক্ষা/ধর্মের** কোন প্রকৃত মূল্য নেই।

৪। সামাজিক এবং আর্থিক সাম্য ছাড়া রাজনৈতিক **সাম্য/স্বাধীনতা** একটি প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়।

৫। ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা যার উপর নির্ভর করে, বাস্তবিকপক্ষে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সামাজিক **ন্যায়পরায়ণতা/ঐক্য** হ'ল সেই দুটি স্তম্ভমূলে।

৬। আমরা যদি সত্যসত্যই ভগবানে এবং তাঁর অসীম **ক্ষমতায়** ও সংগুণের প্রতি বিশ্বাস রাখি তাহলে কখনই কোন বিষয়ে আমরা **ভীত/ক্রুদ্ধ** হতে পারি না।

৭। আমরা আমাদের দুর্বলতার জন্য নিঃসন্দেহে কোন কোন সময়ে চরম **অসহায়/দুঃসাহসী** হয়ে পড়ি।

৮। মানুষ একই সঙ্গে অনেকগুলি **আদর্শ/ভাবধারা**-র অনুরাগী হয় না।

৯। যদি ভগবান এক, তাহলে অত নির্যাতন কেন? এর কারণ তাঁর ভক্তদের **অজ্ঞানতা/অসহিষ্ণুতা**।

১০। আধুনিক মানুষ **অধার্মিক/দায়িত্বহীন**। সে নিজের স্বার্থ ও আনন্দ খোঁজে।

১১। **জীবন/প্রকৃতির** রহস্যের সমাধানের জন্য আমরা নিশ্চয় চাই তথ্য এবং বানান কথা চাই না।

১২। আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরস্বরূপ, শাশ্বত, অমর এবং **প্রাজ্ঞ/যথাযথ** স্বর্গীয়।

১৩। অন্তরের **পবিত্রতা/প্রশান্তি** সম্পূর্ণ আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়েই অর্জন করা যায়, কারণ এর মাধ্যমেই আমরা সবরকম স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিগত বাসনা থেকেই নিজেদের মুক্ত করি।

১৪। দাসের **সম্মান/বিশ্রাম** নেই।

১৫। **স্বার্থহীনতা / সত্যবাদিতা**-র সর্বোচ্চ স্তর হ'ল সরলতা এবং এটি একটি মহৎ গুণ।

১৬। এটা দুঃখের বিষয় যে, যে রাষ্ট্র যত বেশী উন্নত, সেই রাষ্ট্রের জনসাধারণ ততই বেশী **অধীর/অসন্তুষ্ট**।

১৭। ঈশ্বর, যিনি চির আনন্দময়, চিরজ্যোতির্ময়, তিনি সর্বস্থানে সর্বসময়ে বিরাজমান, কিন্তু আমাদের মনে তাঁর রূপের প্রতিফলন হতে পারে না, যদি সেই মন হয় অপবিত্র অথবা **অস্থির/অযোগ্য**।

(এনট্রি ফরমের জন্য অন্যত্র দেখুন)

সুনন্দর জার্নাল

‘এবারের শরতে’

তা হলে আরো একবার শারদোৎসবের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

অবশ্য উৎসবের দিনগুলো কেমন কাটবে ঠিক বলা যাচ্ছে না। কারণ মাথার ওপরে আশ্বিনের নীল একবার দেখা দিয়েই উধাও হয়েছে, সোনালী রোদের খবর মিলছে না; কলকাতার আকাশে নীলকণ্ঠ ওড়ে না, কিন্তু চনা পায়রার ঝাঁকও কোথাও মুখ লুকিয়ে বসে আছে। মেঘে অন্ধকার আকাশ, দক্ষিণের সাগরে বায়ুতরঙ্গে এখনো নিম্ন চাপ, এখনো বৃষ্টি—কখনো ঝিরঝির করে, কখনো প্রবল ধারায়: আমার জানলা থেকে দেখা শামগাছগুলোর মাথায় এখনো ঝড়ের হাওয়া লুটোপুটি খেয়ে চলেছে। রেডিয়োতে সেদিনও শুনছিলুম বর্ষা-বিদায়ের সেই গান —“বাদলধারা হল সারা”; কিন্তু বাদলের বিদায় নেবার কোনো গরজ আছে মনে হচ্ছে না—এখন যেন নতুন করে ‘খ্যাপা শ্রাবণ’ ছুটে এসেছে ‘আশ্বিনের আঙিনায়।’ ভরা ক্ষেতের কানে কানে তার কথা বলা শেষ হয় নি, নতুন ধানের বুকের বেদনা এখনো থামল না। এবার সময়ের হিসেব ভোলা বর্ষা আশ্বিনকে বিমর্ষ করে রেখেছে।

ওদিকে মেদিনীপুর-বিহারে এখনো টলমল করছে বন্যার জল; অকাল-বৃষ্টির অতি-দাক্ষিণ্য এক মুঠো দুঃখের অন্নকেও ভাসিয়ে নিতে চলেছে। এবারের শারদোৎসব আমাদের কান্না দিয়েই ভরা রইল কিনা—জানি না।

একটা মুক্তির পথ ছিল আমাদের—সেই শরতের হাতছানিতে ছুটে বেরিয়ে পড়া; সেই ট্যুরিস্টদের নব বেশে দিগ্বিজয়ে যাত্রা। শহরের দুঃখ-ধান্দা-ধুলো-ধোঁয়া—রাশি রাশি কাজ আর অকাজ, সব পেছনে ফেলে মাঠ-নদী-কাশফুল-পাহাড়-শাল বন— উজ্জ্বল আলো-অম্লান রাত্রির ভেতর দিয়ে, ট্রেনের চাকার সঙ্গে সঙ্গে পাখির মতো ডানা মেলে দেওয়া। রথ এবারেও তৈরী—শেয়ালদা-হাওড়ায় এবারও ডাক-দিচ্ছে কালকা মেল—মাদ্রাজ মেল—দুন এক্সপ্রেস—পাঠানকোট এক্সপ্রেস। কিন্তু অন্যবারের মতো স্টেশনের কোলাহল ছাপিয়ে সেই রহস্যময়ী ঘোষিকার কণ্ঠস্বর, সেই গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টার শব্দ, এঞ্জিনের সেই বাঁশির আওয়াজ—বৈদ্যুতিক না বাষ্পীয় যা-ই হোক—আমাদের রক্তে আর তেমন করে দোলা দিচ্ছে না। আমাদের মুক্তির সেই নীল দিগন্তগুলো দুশ্চিন্তা আর অনিশ্চয়তায় আজকের এই অকাল-বৃষ্টির আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে।

ট্রেনের ভাড়া? সে তো নিশ্চয়। একদার প্রথম শ্রেণীর ভাড়া আজ তৃতীয় শ্রেণীর পাল্লায় নেমে এসেছে। তা-ও না হয় চেষ্টা করা যেত, কিন্তু আজকের [illegible] সঙ্গে সামঞ্জস্য করে—নিজেদের না-ই হোক ছেলে-মেয়েদের জন্যেও কিছু জামা-কাপড় কেনবার হিসেব সেরে—ছুটির আকাশের জন্যে কোনো উদ্বৃত্ত পাথেয় অন্তত মধ্যবিত্ত সুনন্দ খুঁজে পাচ্ছে না। এবার এই মেঘে ঢাকা [illegible] কলকাতায় বসে, জলে-কাদায় একাকার পথের দিকে তাকিয়ে ডাল হ্রদ আর গুলমার্গের স্বপ্ন দেখা; এখন দক্ষিণ থেকে মাঝে মাঝে ছুটে-আসা ভিজে হাওয়াতেই সমুদ্রের স্বাদ; এখন চলন্ত রিকশার ঠুনঠুন আওয়াজ থেকে মাদুরাই মন্দিরের ঘণ্টার

নিখরচায় দেশ ভ্রমণ

শব্দ; এখন ঘুম ভাঙা রাতে রেলওয়ে সাইডিং থেকে মালগাড়ির শান্টিংয়ের হুইসেল থেকে ভেবে নেওয়া—এই ঘর এই খাট একটা চলন্ত ট্রেনের কামরা: রাজপুতানার শুকনো মাঠের ভেতর দিয়ে হু-হু করে ছুটে চলেছে।

তা হলে দূর দূরেই রইল। মোর ভালো
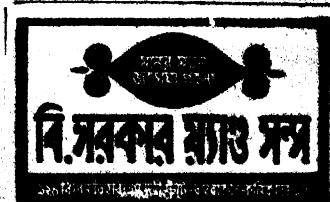
নাই আছি এক ঠাঁই—' এ-কথা আমাদের ভোলবারও উপায় নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে আছি, অধ্যাপক বন্ধু তার চুরুটের ধোঁয়া আমার দিকেই ছেড়ে দিয়ে বললে, 'তা হলে কাছাকাছিই যাও।'

'কোথায় ?'

'বাংলা দেশের গ্রামেই। সেও তো দেখবার। শুধু বাইরেই চোখ মেলে আছো, "দুয়ার হইতে অদূরে" ধানের শিষে যে শিশির-বিন্দু দুলছে, তা-ও কি কম ?'

একুশ-বাইশ বছর আগেও সে কথা মনে করিয়ে দেবার দরকার হত না। সেই পূর্ব বাংলার স্টিমার, তারপরে নৌকো। খালের জলে সারা রাত চলতি প্রশ্ন : 'কোন্ গ্রামের নৌকো ?' লগির শব্দ, দাঁড়ের আওয়াজ। চলতি নৌকোয় পুজোয় কেনা নতুন গ্রামোফোনে নতুন রেকর্ডের সুর। হাসি-হল্লা-তাস পেটানো। কারা আবার চলেছে পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে। 'ভরার নৌকোয় চাল-কুমড়ো, আক আর পাঁটার সম্ভার। জলের কোলে নেমে-আসা বেতবন, হিজল গাছের নিকষ কালো ছায়া। অচেনা কোন্ গ্রাম থেকে এই রাতেও ঢাকের আওয়াজ—পুজোর বাজনায় মহল্লা দিচ্ছে ঢুলীরা ভোরের আলো ফুটতে থাকির ঘাট। চণ্ডীমণ্ডপে রঙ পড়ছে প্রতিমার।

'ও আমার দেশের মাটি—'

একুশ-বাইশ বছর আগেও গ্রামের কথা মনে করিয়ে দেবার দরকার ছিল না। কিন্তু আজ ?

বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কোন্ গ্রামে যাব ?'

'চেনা-শোনা কেউ যেখানে আছে এমন জায়গায়। ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্লাউডস'—

উচ্ছ্বাস থামিয়ে দিয়ে বললুম, 'সেখানে গিয়ে খাব কী ? এখানে তো তবু রেশন আছে।'

'মডিফায়েড রেশন—'

বাধা দিয়ে বললুম, 'বোকা না। জানো, সেদিনও আমার এক বন্ধু তাদের বর্ধমানের গ্রামে নেমন্তন্ন করেই পরের চিঠিতেই তা উইদড্র করেছে? লিখেছে—এখন একদম চাল নেই ভাই, পরে এসো ?'

একটু চুপ করে থাকল অধ্যাপক। তারপর বললে, 'তা হলে অন্তত বাঙালীর সেই সব চিরকালের ফেভারিট-স্পট—মধুপুর-জশিডি-শিমুলতলা—'

সাংবাদিক বন্ধু এতক্ষণ সামনে থেকে খবরের কাগজটা নামিয়ে রেখে বললে 'হুঁ, যাও না? জামা-কাপড় পর্যন্ত রেখে আসতে হবে।'

'মানে ?'

'মানে চোর-ডাকাত। এদিকে লোকে খেতে পাচ্ছে না, ওদিকে শালবীথি-মহুয়াবনের ভেতরে ফাঁকা বাড়িতে বসে তোমরা-ড্যাণ্ডিরা —মুর্গী আর দুধ খাবে, ওদের পক্ষে এটা সহ্য করা শক্ত। গত বছরেও পুজোর সময় এ-রকম কতগুলো কেস—'

কিন্তু সেই সব রোমহর্ষক বিবরণ শুরু হওয়ার আগেই চতুর্থ বন্ধুর প্রবেশ।

'উতকামণ্ডের টিকিট করেছিলুম—রিফাণ্ড করিয়ে আনলুম।'

'কেন হে ?'

'কাল মামা এসেছেন ভুবনেশ্বর থেকে—রাস্তায় চৌদ্দ ঘণ্টা ট্রেন আটক। বেঘোরে মরব ?'

তা হলে শারদোৎসবে এই বিষয় কলকাতাই ভালো। একটি রুপোলী রেখাও তো দেখছি। একশো গ্রাম করে রেশন বাড়বে!

"বিশপ ব্লুগ্রামের কৈফিয়ত"

সরোজ আচার্য

মুখবন্ধঃ—বাংলা কাব্যসাহিত্যের ভাবমণ্ডলে ঈশ্বর, জন্মান্তর, বিদেহী আত্মা ইত্যাদি ধর্মীয় দিব্য সত্যের অস্তিত্ব প্রশ্নাতীত। অন্তত রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাই। রবীন্দ্রনাথ ভগবৎ-প্রেমী, ঈশ্বর-পিপাসু, ঈশ্বরের সান্নিধ্য তাঁর অনুভূত, উপলব্ধ। অন্য অনেকের চিন্তায়, কল্পনায় ঈশ্বর এবং অলৌকিক প্রেরণাগুলি বহুপ্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের ধারাবাহী। ঈশ্বর সেসব ক্ষেত্রে ঠিক স্বকীয় অনুভূতি বা উপলব্ধিসঞ্জাত নয়, গৃহীত তত্ত্ব কি আজন্ম-লালিত সংস্কারমাত্র। ঈশ্বর, সৃষ্টি, স্থিতি, বিশ্ববিধানের স্বরূপ ও তাৎপর্য, এগুলি বাংলা কাব্যসাহিত্যে, কেবল কাব্যসাহিত্যে কেন, গোটা বাংলা সাহিত্যেই, বিশেষ কোনও সংশয়, জিজ্ঞাসা অথবা বিশ্বাসসংকটের ছাপ রাখেনি। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের কিছু কবিতায় অনেকে সংশয় ও জিজ্ঞাসার বেদনা লক্ষ্য করেছেন। সে সংশয় ও যন্ত্রণা একটা বিশেষ অবস্থা-সম্ভূত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের, বুদ্ধদেব বসুর কোন কোন কবিতায় ঈশ্বর সম্পর্কে বিদ্রোহের ভঙ্গি দেখা যায়। সেটা ভঙ্গিই, বয়ঃসন্ধিকালের স্বল্প-স্থায়ী প্রবলতা, পরিচিত ভাব-বৃত্তের বাঁধন কাটিয়ে প্রবল আত্মঘোষণার ঝোঁক। বরং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য জগতের সনাতন বিশ্ববিধানের সার্থকতা সম্পর্কে শ্লেষ বিদ্রূপ সংশয় ও জিজ্ঞাসা অনেক বেশী নিষ্ঠাবান, [illegible] চিন্তাশ্রয়ী। এর আগের যুগে [illegible] [illegible] [illegible] কবিতা ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধানের প্রতি শ্লেষ ও ব্যঙ্গে ভরপুর। তবু প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে এইসব কবিদের কোন মৌলবিরোধ ঘটেছে মনে করা যায় না।

এক কথায়, ধর্মবিশ্বাসের সংকট, সে সংকটের পীড়নে আর্ত জিজ্ঞাসা এবং তারপর সে জিজ্ঞাসার কোন না কোনরকম আধ্যাত্মিক সমাধান সন্ধান—১৭ শতক থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে যার অসংখ্য নিদর্শন, তেমন বাংলা কবিতা খুঁজে পাওয়া কঠিন।

শাস্ত্রীয় বিশ্বাস যুক্তিগত কতখানি তার সত্যাসত্য বিচারযোগ্য কিনা, সৃষ্টি-তত্ত্বের রহস্য ব্যাখ্যায় বেদ বাইবেল ইত্যাদি শিরোধার্য, না বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষালব্ধ জ্ঞানই গ্রাহ্য, এসব তত্ত্ব ও তর্ক কবিতায় সোজাসুজি আসবার কথা নয়। কিন্তু কবিচিত্ত এসব চিন্তা দ্বারা আলোড়িত হতে পারে; প্রাচীন গ্রীক রোমক কবিদের হয়েছে, রেনেসাঁর যুগ থেকে বহু ইংরেজী ফরাসী কবিরাও জগৎ-কারণ ব্যাপারে প্রশ্নাকুল হয়েছেন। ভিক্টোরীয় ইংরেজী কাব্য-লোকের দুই দিকপাল টেনিসন ও রবার্ট ব্রাউনিং। সমসাময়িককালের বিজ্ঞান চিন্তা ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে তাবদ্বন্দ্বে তাঁরাও আন্দোলিত হয়েছেন। তবে রবার্ট ব্রাউনিং সামান্যই, খৃষ্টীয় ধর্ম-তত্ত্বের সত্যাসত্য নিয়ে তিনি কখনও কোনও গভীর অধ্যাত্ম-সংকটে পড়েননি। তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস, ভগবৎপ্রেম ছিল খৃষ্টীয় ধর্মসংঘের মতই একেবারে শক্ত পাথরের গাঁথুনী। সেই ব্রাউনিংএর ক্ষেত্রেও আছে বিশ্বাস অবিশ্বাসের, অলৌকিক ধর্মীয়-সংস্কার ও যুক্তিবাদী সংশয়ের চমৎকার বর্ণনা ব্যঞ্জনা, চতুর শ্লেষাশ্রিত সমালোচনা।

ব্রাউনিং কাব্যে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসেরই জয়, তবে সংশয়ও একেবারে অগ্রাহ্য অস্পৃশ্য নয়। "বিশপ ব্লুগ্রামস্ অ্যাপলজি" এই শ্রেণীর একটা ভাবসমৃদ্ধ কবিতা, বাংলায় যার সমতুল বা সমশ্রেণীর কোন কবিতা দেখা যায় না। বাঙ্গালী মনীষী বা বুদ্ধিজীবীরাই বা কয়জন শাস্ত্রীয় ধর্মতত্ত্বের যুক্তিবাদী বিচার বিশ্লেষণ করেন? করা অবশ্য নানা কারণে অসুবিধাজনকও।

এখানে "বিশপ ব্লুগ্রামের কৈফিয়ত" ব্রাউনিং-এর ওই কবিতাটির সংক্ষেপিত স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। ব্রাউনিং-এর এই বিশপ ব্লুগ্রাম চরিত্রে কিছু অতিরঞ্জন আছে, তাঁর সময়ের একজন বিখ্যাত রোমান ক্যাথলিক যাজকশ্রেষ্ঠকে ব্রাউনিং বাঁকা চোখে দেখেছেন এবং ব্যঙ্গের তুলি দিয়ে এঁকেছেন। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের মূল সত্য প্রতিপাদনে ব্রাউনিং অটল।

আর এক গ্লাস চলবে না? বেশ তবে চেয়ার দুটো টেনে নিয়ে কথাবার্তা চলুক এবার। আমার কিন্তু শেষবারের মত এক গ্লাস, ঠান্ডা। চুণের ভাটির মত গরম এই গীর্জা, দীর্ঘ ভোগরাগ অনুষ্ঠানে ধকল কম সইতে হয় না। তবে সে বাবদ ওরা দক্ষিণাও দেয়, প্রচুরই দিয়ে থাকে।

কথাটা এখন তোলা যাক। তুমি, গিগাডিবস্, তাচ্ছিল্য করো আমাকে। না, না, আমি তাতে দোষ ধরছি না। আমি তো বলেই রেখেছি, দুজনে ডিনার সেরে সত্যের অরুণোদয় দেখব এক সঙ্গে। ভালমত ভোগের পরই তো গ্লাসের কিনারায় সত্যের দেখা মেলে, দেহ যখন পরিতৃপ্ত, গোলমাল করে না, তখনই তো আত্মা কিছুটা মুক্ত।

এই ঠিক সময়।

এখন বলি, গিগাডিবস্, তুমি, আমাকে তাচ্ছিল্য করো, তাতে কী আসে যায়, আমি এও জানি, আমার পদবী, আমার সেবক দল, বিষয়সম্পদ, এসব তুমিও তারিফ করো। এই যে আমার পাশে একবার বসতে পেরেছ, এটা মোক্ষম কাজে লাগাবে তুমি। অনেক, অনেক কাল পরে বিশপের কথা কেউ যখন তুলবে, আমার নাম করবে, তক্ষুনি তুমি বলতে পারবে, "ব্লুগ্রাম? তাঁকে আমি চিনতাম বৈকি! একরাতে ডিনার খেয়েছি তাঁর সঙ্গে, মাত্র দুজনে, আমি আর তিনি। বেশ চালাক লোক, ডিনারের পর মদটাও ছিল খাসা; দুজনে আলাপ জমেছিল চমৎকার। মন্দলোক ছিলেন না ব্লুগ্রাম, আমার দু একটা লেখার তারিফ করেছিলেন। ও'দের ধর্মের বুজরুকিতে মনে মনে তাঁর সায় ছিল না —কথাটা প্রায় বলেই ফেলেছিলেন আমাকে। আদতে ওটা তাঁর ব্যবসামাত্র, আমি ঠিক বলতে পারি ব্লুগ্রামও মাঝে মাঝে সংশয়ী হয়েছেন। নৈলে তাঁকে সত্যিই আমার ভাল লেগেছিল কেন?" আর কথা নয়, এবার শোধবোধ, তোমার কথা তুমি বলেছ, এবার পালা আমার।

আমার ওপর তোমার অশ্রদ্ধা, এইটে হল প্রথম কথা। তোমার জীবনের আদর্শ বিশপের জীবনের নয়। তুমি বিশপ হতে চাইবে না, গ্যেটে হতে পারলে খুশী; কিংবা বোনাপার্টি, কী তার চেয়ে নিচু থাকে, শখের বুদ্ধিজীবী কাউন্ট দ্যরজে। আমার আদর্শ ও পথে নয়। কথার কথা ধরো, যদি ওরা আমাকে 'পোপের' পদে বসায় তাহলে আমার চূড়ান্তে পৌঁছে গেলাম আমি। তুমি বলছ, অবিশ্বাসী পোপ চলতে পারে না। ঠিক সেই ছেলেভুলানো গল্পের মত, কোন এক অভিনেতা যমের পার্ট করছিল, অভিনয় শেষে সাজ-ঘরে ফিরতেই স্বয়ং যমরাজ তাকে টেনে নিলেন। তেমনই ঈশ্বরও অকস্মাৎ 'পোপ'কে ধরে জানতে চাইতে পারেন, এসব সাজ-পোষাকের মানে কী, কার ভূমিকাতেই বা এ অভিনয়? নিজে যা তুমি ঠিক তাই হও, সোজাসুজি, খাঁটি, স্বরাট।

এরপর তুমি বলবে, তোমার সাদাসিধে জীবনাদর্শের তুলনায় আমার আদর্শটা কিছু না। তোমার আদর্শ কিন্তু একরত্তিও তুমি পূরণ করতে পারবে না। আমি অনেক কিছু, তুমি কিছুই না। তুমি সবটা পেতে চাও, আমি পেতে চাই কেবল অনেকখানি—এখানে তোমার কাছে আমার হার।

না, বন্ধু, হার নয়, কেন নয়, বলি শোনো। তোমার, আমার, প্রত্যেকেরই সমস্যা—জীবনে সবচেয়ে শ্রেয় কী তার কল্পনা নয়, সমস্যা হল, জীবনে কী সম্ভব আর সেটা কতখানি আমাদের সাধ্যের মধ্যে। জীবনের সোজাসুজি নিয়মগুলি না মেনে মন-গড়া ছক সাজানো কাজের কথা নয়; মূর্খের স্বর্গ-গড়া নিরর্থক, পারো যদি রোমকে সুন্দর করো, স্বর্গ গড়ো লণ্ডনকেই।
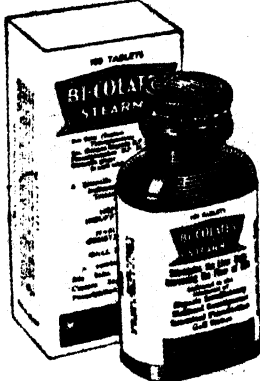
একটা উপমা। এই পৃথিবীর মহাসাগর আমরা জলদস্যুরা পাড়ি দিচ্ছি; প্রত্যেকের জীবন এক একটা ছোট্ট কেবিন ঘর; সবচেয়ে ভালোটাও বড় নয়, সবচেয়ে খারাপটায় জন্যই রাখার মত ঠাঁই। ধরো ছমাসের সমুদ্রযাত্রা। কী করে তৈরী হওয়া? তুমি ডাঙার মানুষ জাহাজে এলে ডাঙার সুখ-সুবিধামত মালপত্র নিয়ে—পর্দা একখানা চমৎকার; পিয়ানোটাও দরকার, বালজাকের উপন্যাস সব এক শেলফ ভরতি পঞ্চাশখণ্ড, অদ্ভুত অক্ষরে ছাপা ক্ষুদে ক্ষুদে গ্রীক বইও; চলুক এই মত, আরও চলুক কিন্তু এবার কাপ্তেন হাজির যে, নাক সিঁটকে হাঁক দিলেন, "ছর বর্গফুট"! তোমার সব মালপত্র খারিজ; তুমি রিক্ত। এবার আমার ক্যাবিনে উঁকি দাও, সব জাহাজ-মাফিক জিনিসপত্র ফিটফাট। বেশ, মানছি তবু তোমার শিল্পমর্জির প্রমাণ দিয়েছ তুমি, আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারো বৈকি। এবার ধরো, আমরা দুজনেই সংসার পথের যাত্রী। আমার এই বিশপের সাজ পোষাক। নিন্দা করবে? দোষ কোথায়? তুমিও কেন বিশপ হবে না?

দিব্যধর্মে তুমি বিশ্বাস করো না, করতে পারো না, স্পষ্ট, সুনিশ্চিত, চূড়ান্ত, সর্বতোভাবে বিশ্বাস করো না, করতে পারো না—এই তো তোমার কথা! তুমি চাও ধর্মতত্ত্ব আগাগোড়া ঝাড়াবাছা ধোলাই করা হোক। আর তোমার ধারণা আমিও যখন নির্বোধ নই তখন আমার পক্ষে ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাস রাখা খুবই শক্ত। আমি কিন্তু জানি আসল মুশকিলগুলো কোথায়, সমাধান আমার জানা নেই। তবু সমাধানের আশা কখনও ছাড়ব না। তবু ধরে নেওয়া যাক, আমরা দুজনেই অবিশ্বাসী, সংশয়ী। তাতে কী লাভ? আগে বিশ্বাস মাঝে মাঝে হোঁচট খেত সংশয়ে, আর এখন সংশয়কে নাড়া দেয় বিশ্বাস। সংশয়কে পাহারা দিয়ে রাখা যাবে কী করে, সেই হবে সমস্যা। ঠিক যখন কিনা আমরা নিরাপদ, সুনিশ্চিত, তখনই হঠাৎ সূর্যাস্তের স্পর্শ, কোনও ফুল থেকে ভেসে-আসা ইঙ্গিত, কারো মৃত্যু, ইউরিপিডিসের নাটকের দু এক স্তবক—এই, এতেই পঞ্চাশ রকমের আশা আশঙ্কা মনের দরজায় ধাক্কা দেবে। দল বেঁধে ঢুকে পড়ে হাত ধরাধরি করে অদ্ভুত বৃত্তাকারে নাচ শুরু করে দেবে,

সেই সে—পুরনো পাঁচিলে আবার সমাসীন মহা-জিজ্ঞাসার প্রাচীন প্রতিমা, তার চার পাশ ঘিরে। আমরা চেয়ে রইব অসহায়-ভাবে, জেগে উঠবে পুরনো অনিশ্চয়তা সব, সেই দুরূহ প্রশ্ন—মঙ্গলময় ঈশ্বর, তিনি ইচ্ছা করলে কী না করতে পারেন, অথবা তিনি যদি পারতেন তবে কী না করতেন। তাহলে বিশ্বাস ছেড়ে সংশয়কে সার করে আমরা পাচ্ছি কী? সংশয়ীর জীবনে বিশ্বাসের আনাগোনা। এর আগে ছিল বিশ্বাসীর জীবনে সংশয়ের চকিত চমক। আগে বলতাম শতরঞ্চের ছকটা সাদা, এখন বলছি কালো—এই যা তফাৎ।

তুমি বলছ, "সেটা আগের তুলনায় এমন কিছু খারাপ নয়; আপনি, বিশপ ব্রুগ্রাম, সংশয়কে বাতিল করেছেন, আমি করছি বিশ্বাসকে—সুতরাং স্বীকার করুন না কেন, আপনার মত আমারটাও ঠিক।"

"না, বন্ধু, না, বিশ্বাস অবিশ্বাস মানুষের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিলে দুই-ই সমান বটে, কিন্তু সে মানুষ তো ওই ক্যাবিন যাত্রী—এই পৃথিবীর জীবনের মাপে গড়া। জীবনের গতিপথ সবটাই নির্দেশ করে যে বিশ্বাস অবিশ্বাস। এই যে পৃথিবী সে

আমার যা তোমার পছন্দ নয়। এ পৃথিবী ঠিক যেমনটি আমি তাকেই মেনে নেই, আমি জানি কী ধরনের জীবন আমার পছন্দ, সে জীবন আমার যা কিছু ভাল তাকে ফুটিয়ে তোলে, শক্তি দেয়, শান্তি দেয়, দেয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। বিশ্বাস আমার জাগ্রত জীবন; মাঝে মাঝে ঘুম, স্বপ্নও আছে বৈকি। তবে জাগরণটাই মূল কথা। প্রভাতের বিশ্বাসের কাছে কোথায় লাগে মধ্যরাত্রির সংশয়! তুমিও স্বীকার না করে পারবে না; বিশ্বাস করাই শ্রেয়তম, যদি সেটা আমাদের সাধ্য হয়। আমার কর্তব্য নিজেকে নতুন করে গড়া নয়, ঈশ্বর যেমনটি গড়েছেন তারই চূড়ান্ত সদগতি করা।

তবু তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করতে পারো না, এই তো। বেশ, বলো তুমি কী শ্রদ্ধা করো, কে তোমার আদর্শ মানুষ? তুমি চাও আমরা নেপোলিয়ন হই। নেপোলিয়ন হই, আর সেই সংগে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী? কী সর্বনাশ? লোকটা যে উন্মাদ! পৃথিবীর কী সেই কল্যাণ যার জন্য তুমি স্বচ্ছন্দে লক্ষ মানুষকে কামানের গোলায় উড়িয়ে দিতে চাও? সে কল্যাণ তুমি আমি কেউই দেখতে পাই না, দেখি লক্ষ লক্ষ মানুষের ছিন্নভিন্ন দেহ। অতএব স্বীকার করো ঈশ্বরে অবিশ্বাসও ভুল হতে পারে; শেষ বিচার, পরকাল থাকবার সামান্য সম্ভাবনা অন্ততঃ আছে। সামান্যতম সম্ভাবনাও যদি থাকে, মেনে নাও তবে নেপোলিয়ন হতে সাহস নেই আমার। যদি সংশয়ই সত্য, এই ইহজীবনই সর্বস্ব হয় তবু নেপোলিয়ন আমি হব না কখনই।

বেশ তবে কবি হওয়া? লিখব হ্যামলেট, ওথেলো, গড়ে তুলব নিজেরই জগৎ, যাতে বিশ্বাস অবিশ্বাস কোনটারই ঝুঁকি নেই। সে আমার কর্ম নয়, এই হল প্রথম কথা! তুমি বলছ, তবু চেষ্টা করুন, চেষ্টাই যথেষ্ট, সিদ্ধি হোক বা না হোক, জীবনকে মহৎ করবে অভীষ্ট, সেক্সপীয়র হওয়ার প্রয়াস, বাকীটা ছেড়ে দিন ভাগ্যকে। আমাকে বোকা বুঝানো যাবে না, আমি যা তাই থাকতে চাই। আমি যদি সেক্সপীয়রই হবে এখন আমি যা আছি তা হতে চেষ্টা করেছি কেন? আর সেক্সপীয়র যদি না থাকে আমার মধ্যে তাহলে অনন্ত চেষ্টাতেই কি হতে পারব সেক্সপীয়র? তোমাকে শুধাই, সেক্সপীয়র আর আমি, দুজনের জীবন কে বেশী পেয়েছে? তিনি অনেক কল্পনা করেছেন, আমি পেয়েছি কিছু। তিনি বলতে পারেন, "আমার মানস-সম্পদের কাছে, তোমার ওই পৃথিবীর দাম কানাকড়িও না, আমি ওকে চাইনে না।" তা যদি বলেন তিনি, তাহলে তুলে নেব আমার মামলা। কিন্তু সেক্সপীয়র কি তাই বলেন? তাঁর জীবনের দিকে তাকাও; সেক্সপীয়র গেলেন তাঁর কল্পনালোকের চূড়া, রং-ঝলমল প্রাসাদ সব পিছনে ফেলে স্ট্র্যাটফোর্ড শহরে সবচেয়ে ফিটফাট বাড়ি গড়তে। সেক্সপীয়র জাহির করেছেন সংসার রঙ্গমঞ্চে আড়ম্বর; তাঁরই সৃষ্টি প্যান্ডালফ সুন্দরী মিলান নগরীর কার্ডিনাল, আমার ভূমিকা যার মত। সেক্সপীয়র যদি প্যান্ডালফ হতেন তিনি কি সে ভূমিকা ছেড়ে শুরু করতেন নাটক লেখা? পৃথিবীর যা শ্রেষ্ঠ বস্তু তা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠবস্তু ছাড়া আর কীই বা হতে পারে! আমার অবস্থাটা তাহলে খারাপ কোথায়? সেক্সপীয়র আর আমি, দুজনে চেয়েছি একই প্রকার জিনিস। আমি যা চাই তাই পেয়েছি; আর সেক্সপীয়র, আমার চেয়ে অনেক বেশী গুণী; তিনিও বলতে পারেন যা চেয়েছেন পেয়েছেন। কিন্তু পুরোপুরি নয়; সুযোগ যদি হত সেক্সপীয়রও ছাড়তেন না আমি যা পেয়েছি। দুজনের একই খেলা, দুজনে বল ছুঁড়েছি তিনি আমার চেয়েও উঁচুতে, আমার চেয়ে নিপুণভাবে, কিন্তু তিনি বল ছুঁড়েছেন তাঁর মাথা-সমান উঁচু বেড়ার দিকে তাক করে; তাঁর প্রাপ্তি তাই স্ট্র্যাটফোর্ডের বাড়ি, মর্যাদায় কুল-চিহ্ন আর পদায় ভূস্বামীদের কলাও কারবার। আমি উপভোগ করছি স্বর্গীয় সৌরভ; আর কুল পরিচয়ে আমি রাণী এলিজ-

জাবেথের জাতি। সেক্সপীয়রকেই শুধাও, এই জীবনটাই যদি সব তাহলে এ খেলায় কার জিত?

বিশ্বাসকে মেনে নাও তাহলে এসব যুক্তি-তর্কই গুঁড়িয়ে যায়। নিষ্ঠাই শ্রেষ্ঠ; আগুন আর প্রাণশক্তি এই-ই সব, জড়পিণ্ডে কিছুই নেই। অদ্ভুত অসম্ভব স্বপ্ন সাধ; কি ঐশী প্রেরণা, যাই হোক না কেন, জিনিস একই। বিশ্বাসের আগুন একবার উদ্দীপ্ত হলে আমাদের আর সব কিছুই তখন কেবল সে আগুনকে ফুটিয়ে তোলার জন্য। নেতি নেতি করে করে পাব কী আমি? বরফ তো আগুন ধরায় না।

তুমি বলছ, আমি যখন সত্যিই বিশ্বাস করি না, তখন খুঁতখুঁতে বিশ্বাস দিয়ে কাজ কী। হয় পূর্ণ, নিটোল বিশ্বাস, না-হয় বিশ্বাস বরবাদ। ধীরে, বন্ধু, ধীরে, ওতে আমার আপত্তি। আগে তুমি স্বীকার করো বিশ্বাসের দরকার আছে, আমি তোমাকে সন্ধান দেব বিশ্বাসের। তুমি বিশ্বাস চাও, আমি তোমাকে সংশয় দেখাচ্ছি বিশ্বাস যে আছে সেটা প্রমাণের জন্যই। যত বেশী সংশয়, বিশ্বাস তত বেশী শক্তিমান, যদি সংশয়কে বিশ্বাস জয় করতে পারে। পারে যে, কী করে জানলাম আমি? জানলাম জীবন থেকে, জীবনকে আমাদের মনোমত গড়বার স্বাধীন ইচ্ছা থেকে যে ইচ্ছা ভগবানেরই দান। সেই ভাব, সেই অনুভব; সেই প্রেম যা পাওয়ার জন্য, প্রকাশের জন্য ঈশ্বর-ইচ্ছার মানুষের প্রয়াস, তাকেই বলি বিশ্বাস। নিষ্প্রাণ তত্ত্ব-শাস্ত্রের বৃথাই নির্দেশ তোমাদের,—তুচ্ছ করো সেই সহজাত স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা যা উন্মুখ করে প্রেমকে। নিজেকে সন্ধান, ঈশ্বরকে সন্ধান—এ ছাড়া আর কী! বিশ্বাস যদি কামনা করো, সেই তো যথেষ্ট বিশ্বাস।

নিখাদ বিশ্বাস, ষোল আনা খাঁটি বিশ্বাস? তুমি জানো না সে কী জিনিষ তুমি চাইছ? সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বভূতে বিদ্যমান ঈশ্বর—তাঁর প্রতি একেবারে অনাবৃত, খাপখোলা বিশ্বাস—সেরকম বিশ্বাস কোন সচেতন জীবই সইতে পারে না যে, তার ইন্দ্রিয়কে দগ্ধ করে ভয়ঙ্কর। তাকে দর্শন কোন রক্তমাংসের জীবই সাহস করবে না। কেউ কেউ ভাবে, এই সৃষ্টিজগৎ তাকে প্রতিভাত করার উদ্দেশ্যেই; আমি বলি, যতটা সাধ্য তাকে গোপন করার জন্য; ঠিক সেইজন্যই তো মহা-মন্দ বিরাজ-মান—তার কাজ আমাদের ঘিরে থাকা, আমাদের প্রাণ, আমাদের ছোট্ট শিশির-বিন্দুকে, সেই দর্শন থেকে আড়াল রাখা আমরা যতক্ষণ না সে-দর্শনের পীড়ন সইতে পারি। আমার কাছে বিশ্বাস মানেই নিরন্তর সংশয়, দেবদূত মাইকেলের পায়ের তলে বশীভূত সাপের মতন। আমি বলি, সংশয় আরও, আরও বিশ্বাসের কারণ হোক।

তুমি বলবে, এক সময়ে সেই মধ্যযুগে ছেলেবুড়ো সকলেই নির্বোধের মত সবকিছু বিশ্বাস করত। সৃষ্টিবিজ্ঞান ভূ-বিদ্যা, জাতিবিজ্ঞান, সব মুছে ফেলে তোমাকে যদি দুশো বছর পেছিয়ে নিয়ে যাই, বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের সামনাসামনি রাখি, কোন পথিক তখন যদি এসে শেষ খবর শোনায় —আরারাট পাহাড়ের চূড়োয় সে দেখে এসেছে নোয়ার নৌকো—তখন সেইরকম হলে, তোমাকেই শুধাই, কী ভাবতে তুমি, কী করতে? অন্যেরা তখন যা অনুভব করেছে ঠিক তাই।

মানুষের নিজেরই মধ্যে যখন সংগ্রাম শুরু হয় তখনই তার কিছু যায়। তখনই আমার জাগরণ, বিবর্তন। সংগ্রাম ছেড়ে [illegible] জীবন, ভাবী জীবন না জানা পর্যন্ত আমার বিবর্তন [illegible] কখনও। এই তো আমার, [illegible] পাতায় আলো-[illegible] রহস্য স্পর্শে এখন [illegible]

গোষ্ঠ, যা নিয়ে লোকে বিস্তর মাথা ঘামিয়েছে এক সময় শুদ্ধচিত্তেই। নির্বুদ্ধিতার লজ্জা লোকে এখন কাটিয়ে উঠেছে। অত-তাই নিউম্যান বলেছেন, প্রকৃতির নিয়ম কেন মানবে না [illegible] অনুজ্ঞাকে—কুমারী মেরীর প্রসবের ব্যাপার? আমি বলি বিশ্বাসকে পীড়ন করো; বুক চাপড়ে, নতজানু হয়ে বল আমরা, "এ অসম্ভব, তবু এই হতে হবে। আমি অভাজন, আমার 'পোপের' গুরুর) সঙ্গে তর্ক করবার কে? এ-সব ছোট ছোট জিনিস যে মহৎ জিনিস ঘুলিয়ে দেয়।" এ যুক্তি অনেক ভালো, তোমাদের যান্ত্রিক দর্শন ঈশ্বরকে যে-কসুর খালাস দেয় এ যুক্তি দেখিয়ে, তার চাইতে ভালোই!

তুমি বলবে, প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস অতটা অচল হয়নি, লোকে এখনও বিশ্বাস করে। ঠিক বটে, কিন্তু কারা? কোথায়? রাজা বাম্বা-র তীর্থযাত্রীর দল বিশ্বাসে দীপ্ত, শুনে থাকি; কিন্তু এরা, এদের মধ্যে কে আছে এমন ভক্তিমন্ত যে বিশ্বাস করে, ঈশ্বর তার ওপর সতত নজর রাখছেন: আগুন দগ্ধ করে, বৃষ্টি সিক্ত করে, এটা সে যেভাবে বিশ্বাস করে ঈশ্বরের সতত দৃষ্টিতেও কি ঠিক তেমনই তার বিশ্বাস? না, না, সে হাসবে, আগুন-বৃষ্টির নিয়ম যে নিজেরাই কাজ করে। মোট কথা, ঠিক, আমার সংশয় বিরাট, বিশ্বাস বিরাটতর: আমার সেই ঢের। আমি পড়েছি অনেক, দেখেছি অনেক, অভিজ্ঞতাও অনেক, তবু মরে গেলেও আমি বলব না, আমার সন্দেহ নেপ্‌ল্‌সে সন্ত জানুয়ারিয়াসের শুকনো রক্ত তরল হওয়ার অলৌকিক কান্ডটা মিথ্যাও হতে পারে। তোমার পরামর্শ আমার উচিত আমার বিশ্বাসকে ঝাড়-পোঁছ করে এই সব জঞ্জালগুলো অন্তত বিদায় করা। আমি তা করব না, মানে, একটাও আমি ফেলে দিতে পারব না। বিশ্বাস পরিশোধনের কথা বলছ, কিন্তু একবার শুরু করলে তার কোন শেষ যে দেখতে পাইনে। একটা ছাঁটলেই, তারপর দেখি আর দুটো আরও বড়, কাটতে কাটতে কাটবার শেষ নেই। এ-সব পবিত্র বস্তুর ওপর খোদকারী, পরীক্ষা নিরীক্ষা? সাহস কোথায়, আমার হাত চোখ, হৃদয় বুদ্ধির কারও ওপর ভরসা নেই।

এই কাটাকুটির কাজটা তোমার পছন্দসই, তাতে তুমি ভয়ের কিছু দেখ না। কিন্তু আমার দুটি প্রতিজ্ঞা-শব্দ—বিশ্বাসের শিকলটার শেষপ্রান্ত আমরা শক্ত মুঠিতে ধরে রেখেছি, তাতেই দুর্দান্ত, অন্ধ জনসমষ্টিকে বশে রাখবার সুবিধা। এই মুঠি আঁট হল কি আলগা হল তার ওপরই নির্ভর করছে আমরা প্রভু, না তারা আমাদের [illegible] বাইরে, মুক্ত। জানি তুমি [illegible] আমার জীবনভঙ্গি কী [illegible], কী [illegible]; আরামবিলাস আমার [illegible], [illegible] আসন-পীড়াপীড়িও আমার,

আর সেই ক্যাবিনের উপ[illegible]ই তুষ্ট। ঠিক কথা, এই পৃথিবীর জন্যই আমার কাজ, আমার কথা, আমার জীবনচর্যা, এ পৃথিবী তাই চায়। জন্মান্তরে নতুন জগতের নতুন নিয়ম নতুন দাবি, সে-সবও আমি মানব, তারই শ্রেষ্ঠ প্রতিশ্রুতি এই পৃথিবীর নিয়ম দাবি আমায় মেনে চলায়। এ পৃথিবীর জীবন নষ্ট করা কেন, যখন এর সদ্ব্যবহারেই ভাবী-জীবন হতে পারে আরও সুনিবিড়।

তুমি বলবে, সংশয় যখন আছেই, তখন যেটুকু সত্য বলে জানি ঠিক সেইটুকু ধরে চলি না কেন? তোমার জীবনাদর্শটা কাজে লাগিয়ে দেখাও দেখি। দিব্য সত্যকে বিধ্বস্ত করেছ, এখন হোক তোমার স্বভাবধর্মের পরীক্ষা। নীতিবিধান বাতিল; অসত্যকথন, নিধন, অপহরণের সব নিষেধ নির্মূল, নাস্তিক পুরোহিত হতেও বাধা নেই। তবু রয়ে যাবে সেই অন্ধ, সহজাত প্রবণতা, যাদের ওপর যুক্তি খাটে না, সেগুলি তুমি বাতিল করতে সাহস করো না। সেগুলির শাসন তুমি চলতে দেবেই। তবেই দ্যাখো, তুমিও আমার মত গোলাম, মিথ্যাবাদী, ভীরু, ভণ্ড, তফাৎ শুধু এই, তোমার কোন পুরস্কার প্রাপ্তির আশা নেই। আমিও আমার সহজাত প্রেরণায় চালিত: আমি ঈশ্বরকে চাই, তারই জন্য আমি সৃষ্ট, তাঁর সঙ্গে আমার সোজাসুজি সম্পর্ক চাই, সেই-ভাবেই আমার জীবন। তোমার সাহস নেই তোমার জীবনাদর্শ মত চলবার। মানুষ তো দেবতা নয়, আদতে পশুই। সবটা আমরা দেখতে পাই না, কিছুটা দেখতে পারি। তবে মিথ্যা বলবার দরকার কী? আমি বলি, আমি সবটাই দেখি, দিব্যি দিয়ে বলি খুঁটিনাটি সব, সবকিছু দেখছি। আমি যদি জোর দিয়ে না বলি তাহলে যে লোকে সন্দেহ করবে আমার [illegible] দেখতে পারি কিনা।

আমাকে দ্যাখো, তোমার ডবল বয়স আমার। তোমার বয়সে আমিও উপভোগ করেছি অনেক কিছু, যা তুমি আরও কুড়ি বছরেও পাবে না। তোমার আমার দেহমন প্রায় একই রকম। সত্যি তুমি চাও না আমার বিশপের পদ, আমার প্রতিপত্তি, আমার আড়ম্বর? তুমিও বুড়ো হবে একদিন, তখন কোথায় পাবে সে-সব উপচার যা আমি প্রতিদিন পেয়ে থাকি ঘণ্টায় ঘণ্টায়—রূপসী রমণীরা, প্রণয়ীরা যাদের পায়ে গড়ায়, তারা আমার কোল-কুকুরের লোম কেটে নিয়ে ব্রুচের শোভা বাড়ায়, ডিউকরা ধরণা দেয় আমার অঙ্গুরী চুম্বনের জন্য, এমন আরও কত কী' ধরো, আমরা দুজনেই আজ এই রাতে যদি মারা যাই, আমার লাভের হিসাব তো এই-সব, জীবন দিয়েছে আমাকে এসব ফল। আর তুমি? তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান তো আজ এই আমার সঙ্গে ডিনার আর বিদায়ের আগে বন্ধুত্বের চিহ্ন এই যে শেষ গ্লাস তোমাকে ঢেলে দিচ্ছি তাই। এরই বড়াই করে বেড়াবে তুমি সারাজীবন। তবু আছে, এমন সব মানুষও আছে যারা আমার অনেক ওপরে—আদর্শ-পাগল যে-মানুষ, যে-কবির সমগ্র সত্তা তার কবিতাটিতে, যে-রাষ্ট্রবিদ যুদ্ধনিরোধে উদ্যোগী, যে-শিল্পীর ধর্ম তার শিল্প, এরাই অগ্নি-ধর, এদের ছোঁয়ায় সবকিছু দীপ্ত প্রাণবন্ত; এদের কাছে আমি পরাজিত। আর তুমি গিগাডিবস্, কাগজের কলমবাজ, যাও না, লেখ গিয়ে চটকদার নক্সা, "ব্লুগ্রাম কিংবা খেয়ালীর গুপ্ত-কথা," করো গিয়ে যত খুশী নিন্দা কেচ্ছা আমার; এও জানি তাচ্ছিল্য আমাকে তুমি আর কক্ষনো করতে পারবে না।

আদি কেরেস্তান কেষ্ট পাল

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

সাহেবদের কাছে আগেকার মত আর সে খাতির নেই কেষ্ট পালের। এই শ্রীরামপুর শহরে আরও লোক ছিল, প্রচারও সাহেবরা কম করেনি; কই, প্রথম কেরেস্তান হ'তে কেষ্ট পাল ছাড়া আর কেউ ত' এগিয়ে আসেনি। সেদিনকার কথা সাহেবরা এরই মধ্যে ভুলে গেল! এখনও যা মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয় কেষ্ট পালের।

মামেই ঘোষপাড়ার কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরু; গুরুগিরি করে পেট ভরে না। তাইতেই ত' হাতুড়ি বাটালি তুরপুন করাতের বাক্স ঘাড়ে ক'রে ছুতোরের কাজ করতে হত কেষ্টপালের। সেকালে দিনেমার শ্রীরামপুরের খুব বোলবোলা, ব্যবসা-বাণিজ্য চাকরি-উমেদারি ভালমন্দ নানা ধান্দায় দিশী বিদেশী বহু লোক বাস করছে সেখানে। নতুন বাড়ির কাজ, পুরনো বাড়ির জানলা দরজা মেরামতি লেগেই আছে। সুতরাং চন্দননগরের বাস তুলে দিয়ে শ্রীরামপুরে এসে পাকাপাকিভাবে বাস করছিল কেষ্ট পাল। হাতের কাজ ভালো, ডাকতও সবাই। কিন্তু দিশী বাড়িওলাদের হাত দিয়ে পয়সা গলতে চায় না, সবেতেই দরাদরি। সাহেব-সুবোর, বিশেষ ক'রে মিশনারীরা এসে ইস্তক বাজার বেশ ভাল হয়েছে, ওরা কাজ ভাল চায়, ভাল কাজের ভাল মজুরি দেয়। ইচ্ছে হয় রোজ নাও, ইচ্ছে হয় ফুরোনে কর।

এই কাজের সূত্রেই মিশনে নিয়মিত যাতায়াত করত কেষ্ট পাল, বেশ আলাপ-সালাপও হয়েছিল মিশনারীদের সঙ্গে। সাহেবদের নামও জেনে গিয়েছিল—মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ফিলিকস্‌। সবচেয়ে ভাল লেগেছিল কেরী সাহেবকে। আস্তে আস্তে মিষ্টি ক'রে কথা বলত, ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারত। সাহেবের কথা বুঝতে একটুও কষ্ট হত না কেষ্ট পালের।

এক একদিন কেষ্ট পাল হয়ত কাঠকাটা যন্তরপাতি ছড়িয়ে কাজ করছে, কেরী সাহেব এসে পাশে বসল, এ কথা সে-কথার পরে যীশু খ্রীষ্টের মহিমার কথা বলতে লাগল। এসব কথা নাকি বাইবেলে আছে, সাহেব বাংলায় লিখবে, বই ছাপাবে। বলেছিল, যারা ক্রেশ্চান হবে তারা হবে সাহেবদের ভাই, মিশন তাদের কাজ দেবে, বাড়ি দেবে, সুখে থাকবে। সেসব শুনে শুনেই মোহিত হয়ে গিয়েছিল কেষ্ট পাল, বলেছিল, 'আমি ক্রেশ্চান হব।' শুনে কেরী সাহেব সকলের মধ্যে ... হয়েছিল তাকে। ডেকে পাঠিয়েছিল মার্শম্যান সাহেবকে। একে একে মিশনের সবাই এসে জড়ো হয়েছিল। সবাই মিলে

জোর দিয়েছিল, কেষ্ট পালকে মাঝখানে দাঁড়িয়ে খাইয়েছিল।

কথাটা চাউর হতে দেরি হয়নি। সেদিনের কথা মনে হলে এখনও বুকের মধ্যে ঢিব্‌ঢিব্‌ করে কেষ্ট পালের। হাজার দুয়েক লোক জড়ো হয়েছিল তার বাড়ির সামনে। কেউ এসেছে মাহেশ চাতরা গ্রাম থেকে, কেউ সেওড়াফুলি থেকে, কেউ আবার কোন্নগর থেকে। সবাই চীৎকার ক'রে গালিগালাজ করেছিল কেষ্ট পালকে। তারপর ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল দিনেমার গভর্নর কর্নেল বাই-এর কুঠিতে। সাহেব নিজে খ্রীস্টান, মিশনারীদের মস্ত মুরুব্বি, সুতরাং মারমুখো জনতাকে খেদিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কেষ্ট পাল বাড়ি ফিরে দেখেছিল তার দরজায় দু'জন সিপাই পাহারা দিচ্ছে।

সেদিন নিজেকে মস্ত মানুষ মনে হয়েছিল কেষ্ট পালের।

কেরেস্তান হওয়ার দিনও সে কী এলাহি কাণ্ড! গঙ্গার ধার থেকে মিশন পর্যন্ত রাস্তার মোড়ে মোড়ে সিপাই সান্ত্রী পাহারা, রাস্তার দু'ধারে পিলপিল করছে ছেলে-বুড়ো মেয়ে-মদ্দ। তার মধ্য দিয়ে কেষ্ট পাল আর ফিলিকস্‌ কেরীকে, বেন ডাইনে বাঁয়ে দুই ছেলে এমনিভাবে, গঙ্গা স্নান করিয়ে এনে দীক্ষিত করেছিল কেরী সাহেব।

পরে যারা কেরেস্তান হয়েছে তাদের আর এমন কী কৃতিত্ব! কেষ্ট পালের দেখাদেখি কাজকম্মের লোভে মিশনে এসে কেরেস্তানদের খাতায় নাম লিখিয়েছে। উত্তরপাড়া-কোন্নগর থেকে সেওড়াফুলি পর্যন্ত লোক-জানাজানিও হয়নি, সিপাই দিয়ে কাউকে আগলে রাখতেও হয়নি। সাহেবরা সব জানে, সব বোঝে, তবু ইচ্ছে ক'রে মুড়িমুড়কির এক দর করে রেখেছে।

কেষ্ট পালকে যীশুর মহিমা প্রচারের কাজে নিযুক্ত করেছে কেরী সাহেব। গোকুল অনেক পরে কেরেস্তান হয়েছে, তাকেও ঐ একই কাজে লাগিয়েছে। বেতন দুজনেরই এক। কেষ্ট পাল একবার মৃদু আপত্তি করেছিল, কেরী সাহেবও মৃদু হেসে বলেছিল, 'যীশুর রাজ্যে মানুষে মানুষে ভেদ নেই। এতদ্দেশীয় খ্রীস্টানদের জন্য আমাদের বেতন-হার এক,—নিজ গ্রামে থেকে প্রচারকার্য

করলে মাসিক ছয় টাকা, আর মফস্বলে গেলে মাসিক বার টাকা।'

নতুন কেরেস্তান হওয়ার সংবাদে আর তেমন চঞ্চল হয় না শ্রীরামপুর। বাঙ্গা হয়েছে তাদের প্রতি আক্রোশটাও যেন একটু একটু করে কমে আসছে। মাহেশের জায়গার গায়ে খানিকটা জমি কিনে সেখানে বাঙালী খ্রীষ্টানদের জন্যে ঘরবাড়ি করে দিয়েছে ক্যাপটেন উইক্‌স্। এখন থেকে ওদের আলাদা সমাজ, আলাদা সংসারবিবেক। কেষ্ট পালের স্ত্রী রাসমণি, মেয়ে আনন্দময়ীও কেরেস্তান হয়েছে। হ'লে কী হবে, মাহেশের রথ দেখতে যাওয়া চাই। কেষ্ট পাল মিশনের বেতনভুক প্রচারক, তাই একদিন একটু আপত্তি করেছিল, 'রথের মেলায় গেলে সাহেবরা যদি দেখে ফেলে?'

আনন্দময়ী প্রায় কেঁদে ফেলেছিল, বলেছিল, 'বা রে! কেরেস্তান হয়েছি বলে মাহেশের রথ দেখতে যাব না?'

মেয়েকে সমর্থন করেছিল রাসমণি, 'অত হলেও আমরা ত' হিন্দু কেরেস্তান।' বলেই কোন্ প্রতিবেশী কেরেস্তান গতবার চড়ক দেখতে গিয়েছিল, কার লুকিয়ে লুকিয়ে শনি সত্যনারায়ণের ব্রতপাঠ করে, ইত্যাদি বৃত্তান্ত প্রকাশ করেছিল সে।

কেষ্ট পাল বলেছিল, 'চুপ চুপ। গোকুলের মাগ্ শুনতে পাবে।'

গোকুলের স্ত্রী কমলমণিকে বড় ভয় কেষ্ট পালের। জল-অচল ছোট জাতের মেয়ে কেরেস্তান হয়েই কেষ্ট পালের সমান হতে চায়! গোকুল একদিন কেষ্ট পালের দাওয়ায় বসে এক ঘটি জল চেয়ে খেয়েছিল, আল-গোছেই খেয়েছিল, তবু ঘটিটা না মেজে ঘরে তোলেনি রাসমণি। জানতে পেরে তা নিয়ে কী ঝগড়াটাই না করেছিল কমলমণি। তাতায়কে লাগিয়ে লাগিয়ে কেরী সাহেবের কানেও তুলেছিল কথাটা। সেই থেকে দু বাড়ির মুখ দেখাদেখি বন্ধ। কিন্তু বেড়ার আড়ালে সর্বক্ষণ আড়ি পেতেই আছে কমলমণি। মাহেশের রথে যাওয়ার কথা শুনলে কেরেস্তান-সমাজে ঢি ঢি পড়ে যাবে।

'তুমি থাম!' মুখ নাড়া দিয়েছিল রাসমণি। কমলমণির উদ্দেশে ঠেস দিয়ে বলেছিল, 'কে কত ধোয়া তুলসীপাতা তা আর আমার জানতে বাকী নেই। কেরেস্তান মাগীমিন্সেরা কত ঠ্যাকারই জানে! কেউ দেখি গির্জা থেকে ফিরে গোবর খায়, কাপড়ে গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে তবে চৌকাঠ পেরোয়। কেউ কেউ আবার 'রুসে' সিঁদুর চন্দন লেপে ফুল-বিল্বপত্তর দেয়! মাহেশের রথ দেখতে যাবো, বেশ করবো, কোন্ ভাতারখাকীর কী!'

এক রকম জেদ করেই কমলমণির উঠোনের ওপর দিয়ে মাহেশের দিকে হেঁটে গিয়ে-ছিল রাসমণি, আর তার পেছন পেছন আনন্দময়ী।

মিশনের মেমসাহেবদের কাছ থেকে সাজ-গোজ করতে শিখেছে আনন্দময়ী। পুরো হাতা সেমিজ পরেছে, গোড়ালি পর্যন্ত ঢেকে ফরাসডাঙার ডুরে শাড়ী পরেছে, কপালে কাচপোকার টিপ দিয়েছে। বেসম দিয়ে মাজা হাতে বেলোয়ারী কাচের চুড়ি হাঁটিতে হাঁটিতে মাঝে মাঝে নেড়েচেড়ে দেখছে।

মেলা দেখতে গিয়ে দেখা হয়ে গেল কৃষ্ণপ্রসাদের সঙ্গে। কৃষ্ণপ্রসাদই প্রথম দেখে-ছিল, ডাকল, 'কে, আনন্দময়ী না?'

সুন্দরবনের দিকে বাড়ি কৃষ্ণপ্রসাদের। কেরী সাহেব প্রথম দিকে সুন্দরবনে গিয়েছিল জমি-আবাদ করতে, তাইতেই সাহেবের সঙ্গে আলাপ। সম্প্রতি শ্রীরামপুরে এসেছে, মিশনে যাতায়াত করছে। কেষ্ট পালের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল কেরী সাহেব। কেরী সাহেবের বড় ছেলে ফিলিক্সও ছিল সেখানে, দিশী মতে ফিলিক্স কেরী কেষ্ট পালের গুরুভাই, সেই সুবাদে কৃষ্ণপ্রসাদকে ফিলিক্সের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে গিয়ে ধমক খেয়েছিল কেষ্ট পাল। বেশী কথা না বাড়িয়ে কৃষ্ণ-প্রসাদকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল, ওর কাছে সুখদুখের কথা বলে হালকা হতে চেয়েছিল কেষ্ট পাল।

সেদিন আনন্দময়ীকে কিন্তু এত সুন্দর লাগেনি। আজ আর চোখ ফেরাতে পারে না কৃষ্ণপ্রসাদ। রাসমণিকে দেখেই সংবিৎ ফিরে আসে কৃষ্ণপ্রসাদের, আত্মীয়তার সুর এনে বলে, 'কী বউঠান, মেলা দেখতে এসেছেন বুঝি?' একবার এদিক ওদিক চোখ ঘুরিয়ে বলে, 'পাল মশায়কে দেখছি না যে?'

কেষ্ট পাল আসেনি শুনে মনে মনে খুশীই হল কৃষ্ণপ্রসাদ। আনন্দময়ীর পাশা-পাশি ঘুরলো মেলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। পাঁপরভাজা কিনল, কিনে দিল কেষ্টনগরের পুতুল। শেষে সন্ধ্যে নাগাদ ওদের বাড়ি পৌঁছে দিল কৃষ্ণপ্রসাদ। রাসমণি ইচ্ছে করেই বসতে বলল না। বামুনের ছেলে, একটু জলটল খেতে দিতেও বিস্তর ঝামেলা। ও না হয় এসব মানে না, তাই বলে রাসমণি ত' আর জেনে-শুনে ছোঁয়াছুঁয়ির পাপ করতে পারে না। শত হলেও ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ কৃষ্ণপ্রসাদ কেরেস্তান হচ্ছে, এই সংবাদেও আর আগের মত চাঞ্চল্য দেখা গেল না। শুধু কেরেস্তান-পাড়ায় একটু শোরগোল উঠলো, একটু মুখরোচক রটনায় কানাঘুষোও শোনা গেল। কেষ্ট পালের সোমত্ত মেয়েটা কী বেহায়া বাবা!

দীক্ষিত হবার আগে গলার পইতে খুলে রেভারেন্ড মিস্টার ওয়ার্ডের হাতে দিল কৃষ্ণ-প্রসাদ। ওয়ার্ড সাহেবের তখন কী উল্লাস! গির্জার উপস্থিত ব্যক্তিদের দিকে প্রসারিত হাতে পইতেগাছা তুলে দেখালেন, বললেন, 'এই উপবীত, এ জিনিস রোমের কোন গির্জাতেও নেই।'

এক বাঙালী কেরেস্তান চাপা গলায় কেষ্ট পালকে বলেছিল, 'থাকবে কী করে! রোমে কি বামুন আছে?'

ওদিনকার অনুষ্ঠানে সব বাঙালী খ্রীষ্টানদেরই নিমন্ত্রণ করেছিল মিশনারীরা। কেরী সাহেব জাননগরে গিয়ে ঘরে ঘরে বলে এসেছিল। বলেছিল পিয়ুকে, বলেছিল ষাট বছরের বৃদ্ধ পীতাম্বর সিংহকেও। সপরি-বারে এসেছে কেষ্ট পাল, শুধু সাহেব বলেছে বলে নয়, কৃষ্ণপ্রসাদ নিজে গিয়ে বলে এসেছে তাদের।

গোকুল আর কমলমণি বসেছে পাশা-পাশি। কমলমণি আনন্দময়ীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'জাত ত' গেছে অনেক দিন, ও পইতে থাকলেই বা কী, গেলেই বা কী!'

গোকুল বলে, 'বামুনের ছেলে, কিছু একটা মতলব আছে বাবা!'

আনন্দময়ী সব কথা শোনেনি, যা শুনেছে তারও উত্তর করেনি, সারাক্ষণ একদৃষ্টে চেয়েছিল কৃষ্ণপ্রসাদের দিকে।

হিন্দু মুসলমান, কেরেস্তান হয়েছে, উপবীতবর্জন অনুষ্ঠানে সে ভারি খুশী হয়েছে। কৃষ্ণপ্রসাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কাল আমার বাড়িতে আপনার নেমন্তন্ন রইল।'

কৃষ্ণপ্রসাদ রাজী। পীতাম্বর সিংহ আড়ালে বলল, 'হ্যা হ্যা! কেরেস্তান হয়েছে বলে বামুনের ছেলে মেলেচ্ছর অন্ন গ্রহণ করবে!'

কৃষ্ণপ্রসাদ-আনন্দময়ীর বিয়ে, প্রথম বাঙালী কেরেস্তানদের মধ্যে বিয়ে, দেখতে বেশ ভিড় হয়েছিল জাননগরে। গাত্রহরিদ্রা, স্ত্রী-আচার, কুসুমডিঙে ইত্যাদি সমেত একরকম হিন্দু মতেই বিবাহ নিষ্পন্ন হয়ে-ছিল। কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত এই কেরেস্তান-বিবাহে মন্ত্র পড়াতে রাজী হননি। সুতরাং পৌরোহিত্য করেছিল কেরী সাহেব। যথাসাধ্য শোধন করে নিয়েছিল নেটিভ আচারের দোষ। এসেছিল মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ক্যাপটেন উইক্স্। আসনপিঁড়ি করে বসে পঙ্‌ক্তিভোজে নানা হাস্যরস ও কৌতুকের সৃষ্টি করেছিল। গোকুল মাটির পাত্রে করে আহার্য পরিবেশন করেছে নিমন্ত্রিতদের। বসরে সঙের গান গেয়ে শুনিয়েছে কমলমণি। দাঁতে সুপারি কেটে তারই একখণ্ড কৌতুকচ্ছলে মুখে পুরে দিয়েছে কৃষ্ণপ্রসাদের। বড় জাতের বড়াই রাসমণির।

কুসুমডিঙের পরে নবদম্পতিকে নিয়ে সাহেবরা গিয়েছিল গির্জায় প্রার্থনা করতে। শোভাযাত্রায় যেতে যেতে কেষ্ট পালের মনটা আবার গৌরবে ভরে উঠেছে, সাহেবদের কাছে আবার কদর বাড়ছে তার। না, আদি কেরেস্তান কেষ্ট পাল ঠকেনি। শুনেছে, ওয়ার্ড সাহেব তার জীবনী লিখছে, কৃষ্ণ পালের জীবনী। লিখছে লিখুক, কিন্তু ওয়ার্ড সাহেব আর তাকে কতটুকু চিনেছে! চিনলে সংশয়-দ্বন্দ্ব-বেদনার কথায় ভরে যেত সে জীবনী।

অনেক দিন পরে রাসমণিকে বলেছিল কেষ্ট পাল, 'কেরেস্তান না হলে কী বামুনের ঘরে মেয়ে দিতে পারতাম?'

খুশী-খুশী ভাব রাসমণিরও। বলেছিল, 'মিছিমিছি জামাই আমাদের পইতেটা ছেড়ে দিল।'

কেষ্ট পাল হেসে বলেছিল, 'চেনা বামুনের পইতের দরকার কী।'
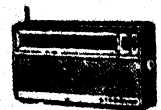
সংবাদে শুনিলাম, চীনে মাও সে তুঙ-এর মুখ (অবশ্যই "শ্রী" পূর্ব) নিঃসৃত বাণীকেই একমাত্র সত্য বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"হয়ত সেই সত্যের সূত্র ধরেই আমাদের দেশে অনেকে সত্যমেব জয়তে উচ্চারণ করছেন।।"

শ্রী গুলজারিলাল নন্দ কংগ্রেসে অ্যাড-হক কমিটি সংগঠনের জন্য সম্প্রতি কলিকাতা আসিয়াছিলেন। —"এতৎপ্রসঙ্গে পরবর্তী যে-যে সংবাদ

শোনা গেল, তাতে মনে হল অকাল বলেই হয়ত নন্দোৎসব তেমন জমজমাট হয়নি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

এবার পূজায় মাইক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই পুলিসী নোটিস সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"ফি বারেই তা হয়, এতে কেন নূতনত্ব নেই। কিন্তু তাতে ফল কিছুই হয় না আর হবেই বা কী করে, মাইক-বিবর্জিত পূজোতে যে অঙ্গহানি হয়, এ কথাটা পুলিস একবারও চণ্ডীর পাতা খুলে দেখেননি।।"

বাজারে গুজব এবার পূজো বাজার খুব মন্দা, ব্যবসায়ীরা সকলেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। —"কিন্তু চাঁদার (চাঁদনী নয়) বাজার

এবং পুজো-সংখ্যার ঢাকীদের বাজারের খবর মন্দা নয় বলেই ত শুনেছি"—বলেন খুড়ো।

হরিণঘাটার দুগ্ধ বণ্টন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়াছে এবং অনেকেই পাঞ্জাব, বিহার হইতে ভাল জাতের গাভী আনা হইতেছে না বলিয়া অ্যানিমেল হাজবেনড্রির বিভাগকে দোষারোপ করিতেছেন। শ্যামলাল বলিল—"পাঞ্জাব-বিহার কেন, অস্ট্রেলিয়া থেকে ভালো জাতের গাই এনেও কোন ফল হয়নি; একবারে কামধেনুর অসাধ্য অবস্থা যেখানে, সেখানে মুলতানী কেন, হাইড্রেনটি গাইও ফেল মারবে। তবে আমাদের মনে হয়, অ্যানিমেল হাজবেন-ড্রির বদলে ওয়াইফারি করলে হয়ত কিছুটা ফল আশা করা যেতে পারে।।"

এক সংবাদে প্রকাশ, মশা মারার তেলেও নাকি ভেজালের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। —"তাতে নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই, মশা মারার বিকল্প অস্ত্র কামানে ভেজালের কথা আমরা এখনো শুনিনি"—বলেন সহযাত্রী।

আই এফ এ শীল্ডের সেমি-ফাইন্যালে বি এন আর দল ইস্ট বেঙ্গল-এর কাছে পাঁচ গোলের ব্যবধানে হারিয়া যায়। সবাই বলাবলি করিতেছেন, বি এন আর—
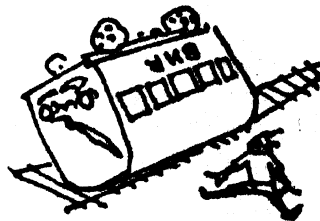
এত গোলে কোন দিন কাহারও কাছে হারে নাই। ক্রীড়ারসিক সহযাত্রী সংক্ষেপে বলিলেন—"আর একটি রেল দুর্ঘটনা।"

পূজা প্রসঙ্গে আমাদের অন্য এক সহযাত্রী কোথা হইতে একটি সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পরিবেশন করিলেন, বলিলেন: "দশভূজার দশ প্রহরণের মধ্যে এবার দুটি নূতন সংযোজন হয়েছে একটি 'ঘেরাও', অন্যটি 'বন্ধ'; বিশ্বাস করা না করা আপনাদের ইচ্ছা।"

ওয়াশিংটন হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেল, সেখানে সরকার নাকি মূষিক নিধনের জন্য চার কোটি ডলার ব্যয় করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। —"কিন্তু তার চেয়ে মার্জারকুল বৃদ্ধি মানসে বাগবাজারের ব্যবস্থা করলে হয়ত ভালো হত; নিধন না হলেও মার্জার-মূষিকের শান্তিযুদ্ধ ও কিছুদিন চলত" —বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

মূষিক প্রসঙ্গে সহযাত্রী একটি মজার গল্প শুনাইলেন, বলিলেন: —"বাঁড়ুজ্যে তামাক সেবন করছেন এবং চাটুজ্যে তাম্রকূট পিয়াসী হয়ে কাছেই ধন হয়ে বসেছেন। ফুরুৎ ফুরুৎ টানের পর বাঁড়ুজ্যে এক একটা সুখ টান দেন, আর শেষ হয়েছে মনে করে চাটুজ্যে হাত বাড়ান। কিন্তু আবার চলে বাঁড়ুজ্যের ফুরুৎ ফুরুৎ। আর একবার হাত বাড়াবার পর বাঁড়ুজ্যে বললেন, কিহে চাটুজ্যে বারবার বেড়ালের মতো থাবা মেলছ কেন? চাটুজ্যে বললেন, ভেবে-ছিলাম ইঁদুর, এখন দেখছি নেহাত ছুঁচো।"

আগন্তুক পর্যটকদের জন্য দিল্লীতে পুষ্প উৎসবের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। বিশু খুড়ো বলিলেন—"খুব ভালো ব্যবস্থাই করা হয়েছে। তবে আমরা আশা করছি, সেই উৎসবে চীন হইতে শত পুষ্প' জাতীয় কোন পুষ্প আহরণ করে আনা হবে না।।"

গৌহাটি হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, সেখান হইতে আট মাইল দূরে একটি বন্য হস্তীর দলে নাকি কয়েকটি শ্বেত হস্তী দেখা গিয়াছে। অতঃপর সেখানে শ্বেত হস্তী সন্ধানের তোড়জোড় চলিতেছে। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু আমরা ত জানতাম, শ্বেত হস্তী দিল্লির কাছে ভিতের জঙ্গলেই ঘোরাফেরা করে, যদিও হাতী ধরার জন্য খেদা তৈরির ব্যবস্থার কথা আমরা শুনিনি।।"

আমাদের অনেক সহযাত্রী বলিতে লাগিলেন—"দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে নাগরিকদের উৎকণ্ঠার অন্ত নেই; কিন্তু আজ ক'দিন থেকে যে 'মাল'-মূল্য বৃদ্ধির দরুন বাজারের হাল কাহিল, সে সম্বন্ধে কেউ উচ্চবাচ্য করছেন না। বৃহস্পতিকে সিক্ত দিবস করায় আশ্বাস ত গেলই, মাঝখান থেকে 'মাল'-মূল্য বৃদ্ধিতে মালদারদের নাভিশ্বাস। দেখছি ঢেঁক-চাঁদই টিঁকে গেলেন, মরবে বার্নিশখেকো চাঁদুরা।।"

শিল্ড খেলা শেষ হইতে চলিল কিন্তু ক্যালকাটা স্টেডিয়াম সম্পর্কে এবারে কেহ মুখ খুলিলেন না। খুড়ো বলিলেন—"বোধহয় ঘোড়দৌড় উঠে যাওয়া সাপেক্ষে তাঁরা বিষয়ে স্থগিত রেখেছেন।।"

কোনো ভাবে ছবি
তুলতে পারবেন

একুশ

১২৭৮ সালের আশ্বিনে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' লিখেছেঃ "বহু বিবাহ নিবারণের আপত্তিকারীগণের আপত্তি খণ্ডন করিয়া সম্প্রতি সুবিখ্যাত বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। যাঁহারা বহুবিবাহকে শাস্ত্র-সিদ্ধ বলেন, শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদিগের আপত্তি যে ভ্রমমূলক তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বামাকুলের পরম হিতৈষী বন্ধু। বঙ্গীয় অবলাগণের দুরবস্থা দর্শনে তাঁহার দয়ার্দ্র চিত্ত স্বভাবতঃ ব্যথিত হয়। দুঃখিনী বঙ্গাবলাগণের দুঃখ দূর করণে তিনি বহুকালাবধি শ্রম ও যত্ন করিয়া আসিতেছেন। অবলাদের বিষয় এই, এত দিন তাঁহার যে যত্ন ও শ্রম অতি অল্প সংখ্যক লোক আদর করিয়াছেন, এখন অনেক কৃতবিদ্য লোকের নিকট তাহা আদরণীয় হইতেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে, তাঁহার পূর্বসহচর কয়েকটী পণ্ডিত তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।"

উল্লিখিত পূর্বসহচরদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তারানাথ তর্কবাচস্পতির নাম। গবর্নমেন্টের কাছে বহুবিবাহ রহিত করার জন্য আবেদনপত্রে তারানাথ স্বাক্ষর করেছেন অথচ বহুবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের রচনার প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিবাদ করে বই লিখেছেন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি বলেছেন—বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা; শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হলেও এই প্রথা থেকে জগতের নানারকম অনিষ্ট হচ্ছে এবং আমাদের সমাজের তত দূর বল নেই যে, সমাজ থেকে এই কুপ্রথার উচ্ছেদ করে। এই কারণে রাজদ্বারে আবেদনসময়ে ওই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করি। কিন্তু তা বলে বহুবিবাহ যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তা আমি বলতে পারি না।

আর তারানাথ তর্কবাচস্পতি সম্পর্কে [illegible] বিষয়ে বিদ্যাসাগর লিখেছেনঃ [illegible] রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, কিন্তু সর্বশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছেন। তিনি যে ধর্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী নহেন, এবং কখনও রীতিমত ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই, তদীয় পুস্তক তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি যেসকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তৎসমুদয়ই অপসিদ্ধান্ত।"

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাও বহুবিবাহের বিরোধী। কিন্তু আইন করে গবর্নমেন্ট বহুবিবাহ বন্ধ করুক, এ প্রস্তাবে 'সোমপ্রকাশের সমর্থন নেই; কেননা, সামাজিক বিষয়ে গবর্নমেন্টের হস্তক্ষেপ, 'সোমপ্রকাশের বিবেচনায়, অবাঞ্ছনীয়। 'সোমপ্রকাশের প্রস্তাব যে, বহুবিবাহের উপর ট্যাক্স বসিয়ে গবর্নমেন্ট কৌশলে বহুবিবাহ বন্ধ করুক।

এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর, ১৮৭১ সালের ২৩ আগস্ট, 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদককে একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা প্রকাশিত হয়েছে ১৮৭১ সালের ২৮ আগস্টের 'সোমপ্রকাশ'এ। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছিঃ

" ...রাজবিধি দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণপ্রার্থীদের উদ্দেশ্য এই, এই লজ্জাকর, ঘৃণাকর, অনর্থকর, অধর্মকর, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্তিকর বহুবিবাহকাণ্ড রহিত হইয়া যায়, এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া তাহারা রাজবিধি দ্বারা তৎসাধনার্থ উদ্যোগ করিয়াছেন।......

"যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড অশেষ দোষের আস্পদ, তাহা আপনি সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া থাকেন এবং এই নৃশংস প্রথার নিবারণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তাহা অংগীকার করেন; কেবল তদর্থে রাজবিধি প্রার্থনা করিতে সম্মত নহেন, কারণ তাহা হইলে রাজাকে সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হয়। কিন্তু রাজা বহুবিবাহের উপর গুরুতর কর নির্ধারণ করিয়া' কৌশলক্রমে তাহা রহিত করুন, অনায়াসে এই প্রস্তাব করিতেছেন এবং এই প্রস্তাবটি সর্বাংশে নির্দোষ কল্যোপধায়ক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই, বহুবিবাহ বিষয়ে গুরুতর

কর নির্ধারণ করিলে রাজার কি সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে না? কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে কেবল সামাজিক বিষয়ে নয়, ধর্ম বিষয়েও হস্তক্ষেপ করা হইবেক; কারণ স্ত্রী বন্ধ্যা বা অন্যবিধ দোষ যুক্ত হইলে শাস্ত্রকারেরা পুনরায় বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন। বহুবিবাহের উপরে গুরুতর কর নির্ধারিত হইলে নিঃস্ব ব্যক্তির ঐ বিধি প্রতিপালনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। বলিতে কি আপনকার এই প্রস্তাবটি সমুচিত বিবেচনাপূর্বক করা হয় নাই।......"

১৮৭২ সালের ২৮ মার্চ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখেছেঃ 'বহুবিবাহ নিবারণের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঢাকায় যাইবেন। বিক্রমপুরে বহু কুলীনের বাস। সম্ভবত এ বিষয়ে মতামত ... স্বপক্ষে ও বিপক্ষে উভয় মতই প্রবল। বিপক্ষবাদীদের মতে—বিদেশী রাজার সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপের অর্থ স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি। ইংরেজ গবর্নমেণ্ট আমাদের সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে অনেক সময় সাহায্য চাহিলে গবর্নমেণ্ট নিজ প্রতিজ্ঞা অনুসারে কাজ না করিলে কেন দোষ করিবেন না।......"

বহুবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তক 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক।' প্রকাশিত হল ১৮৭৩ সালের ১ এপ্রিল।

এই পুস্তকের তীব্র সমালোচনা করলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এ বাংলা ১২৮০ সনের আষাঢ়। সুদীর্ঘ রচনাটির শেষাংশে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেনঃ

"যে কয়টি কথা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি।

১। বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা; যিনি তাহার বিরোধী তিনিই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন।

২। বহুবিবাহ এ দেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে; অল্পদিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।

৩। এ কথা যদিও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তথাপি ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া কোন ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে না।

৪। আমাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থ, আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা স্থির হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই।

৫। যে শাস্ত্রীয় বিচারে ভদ্রলোকের বর্জনীয় ভাষার অনুশীলন হয়, তাহা পরিহার্য।

উপসংহারকালে, আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, দেশহিতৈষী, এবং সুলেখক, ইহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট অনেক ঋণে বদ্ধ। এ কথা যদি আমরা বিস্মৃত হই তবে আমরা কৃতঘ্ন। আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহা কর্তব্যানুরোধেই লিখিয়াছি। তিনি যদি কর্তব্যানুরোধে বহুবিবাহের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে আমাদের এ কথা সহজে বুঝিবেন।"

১৮৭৩ সালের ২৬ জুন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখেছেঃ

"বহুবিবাহ সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের মতামতকে আমরা সমর্থন করি।......বহুবিবাহ দিন দিন বৃদ্ধি হয়ে সমাজকে পাপে
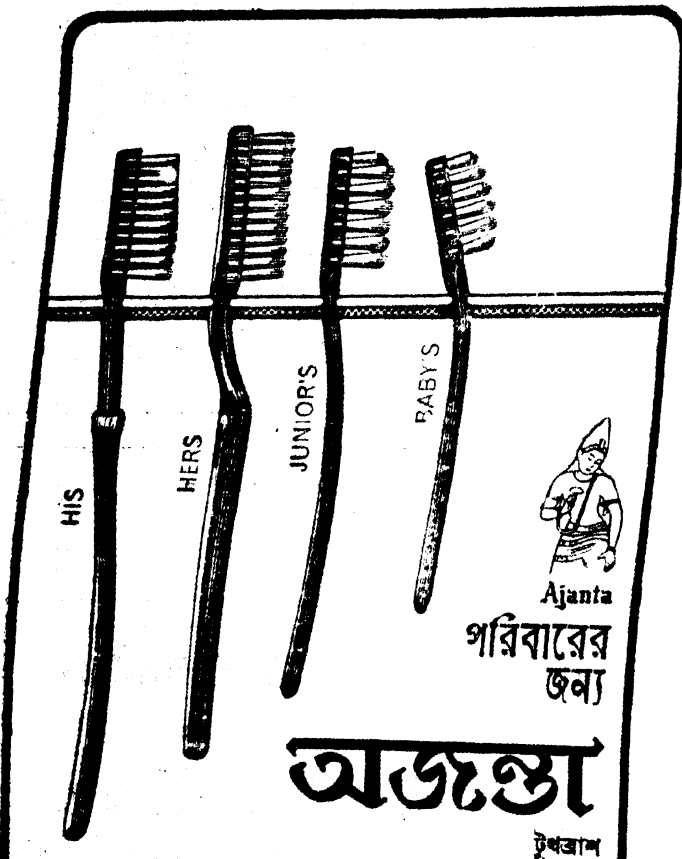
কলুষিত করলেও তাকে উঠিয়ে দেবার জন্যে আমরা রাজব্যবস্থার প্রার্থী হতাম না। আমাদের বিশ্বাস, ধর্ম বা সামাজিক বিষয়ে রাজা, বিশেষত বিদেশী রাজার হস্তক্ষেপ রাজনীতিবিরুদ্ধ।

"বঙ্গদর্শন বিদ্যাসাগর মশাই সম্বন্ধে যে লিখেছেন তা পাঠ করে আমরা দুঃখিত হলাম। শাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকলেও শাস্ত্র-বচন দ্বারা কোন ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা কপটাচার নয়। বিদ্যাসাগর মশাই শাস্ত্রবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে অথবা তাঁর মতে শাস্ত্রের পোষকতা আছে এটা গবর্নমেণ্টকে দেখাবার জন্যে তিনি পুস্তক রচনা করে-ছিলেন। ধর্মশাস্ত্রে তাঁর বিশ্বাস অবিশ্বাসের সংগে তাঁর পুস্তকের কোন সম্বন্ধ নেই। অতএব তিনি মনে একরূপ বিশ্বাস করে লোককে আর এক কথা জানিয়ে কপটাচারী হতেন না। দ্বিতীয়তঃ আমরা স্বীকার করি যে, তিনি তাঁর প্রতিবাদীদের সংগে বিচারে তত শান্ত ভাব দেখাননি। আমাদের অনুমান পুস্তক প্রকাশের পর সেজন্য তিনি দুঃখিত হয়ে থাকবেন। বঙ্গদর্শনে এ সম্বন্ধে এতটা না লিখে শুধু তার উল্লেখমাত্র করলেই যথেষ্ট হত। বিদ্যাসাগর মশাই দেশপূজ্য ব্যক্তি; তাঁর কোন ভ্রান্তি দেখলে আমরা দুঃখিত হয়ে তাঁকে বড় জোর দেখিয়ে দিতে পারি, সেজন্যে তাঁকে ছলে কৌশলে লম্বা লম্বা উপদেশ দিতে পারি না।"

অত্যন্ত স্বাভাবিক, বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র সমালোচনায় বিদ্যাসাগর কিছু বিরক্ত হয়ে-ছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র ওই প্রবন্ধ বিদ্যা-সাগরের জীবদ্দশায় পুনর্মুদ্রিত করেননি।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ১৮৯২ সালে প্রকাশিত হল বঙ্কিমচন্দ্রের "বিবিধ প্রবন্ধ। দ্বিতীয় ভাগ।" এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র বহু-বিবাহবিষয়ক প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করলেন। কিন্তু প্রবন্ধটি অখন্ড পুনর্মুদ্রিত করেননি। 'বিবিধ প্রবন্ধ। দ্বিতীয় ভাগে'র অন্তর্ভুক্ত আলোচ্য প্রবন্ধের আরম্ভে বঙ্কিমচন্দ্র নিবেদন করেছেন: "স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবর্তিত বহু-বিবাহবিষয়ক আন্দোলনের সময়ে বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু তীব্র সমালোচনায় আমি কর্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন। তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনর্মুদ্রিত করি নাই। এই আন্দোলন ভ্রান্তিজনিত, ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। অতএব বিদ্যাসাগর মহা-শয়ের জীবদ্দশায় ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া দ্বিতীয়বার তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে আমি ইচ্ছা করি নাই। এক্ষণে তিনি অনুরক্তি বিরক্তির অতীত। তথাপি দেশস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং আমিও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, এজন্য ইহা এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত করার ঔচিত্য বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি। বিচার করিয়া যে অংশে সেই তীব্র সমালোচনা ছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়াছি। কোন না কোন দিন কথাটা উঠিবে, দোষ তাঁহার, না আমার। সুবিচার জন্য প্রবন্ধটির প্রথমাংশ পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইচ্ছা ছিল যে, এ সময়ে উহা পুনর্মুদ্রিত করিব না, কিন্তু তাহা না করিলে আমার জীবদ্দশায় উহা আর পুনর্মুদ্রিত হইবে কি না সন্দেহ। উহা বিলুপ্ত করাও অবৈধ; কেননা, ভাল হউক, মন্দ হউক, উহা আমাদের দেশে আধুনিক সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসের অংশ হইয়া পড়িয়াছে —উহার দ্বারাই বহুবিবাহ বিষয়ক আন্দো-লন নির্বাপিত হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি।......"

বিশ বছর পরে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে একজন বহুবিবাহকারী কুলীন ভারি বিপদে পড়েছিলেন।

শ্বশুরবাড়িটা ঠিক চিনে ওঠা যাচ্ছে না। এই বাড়িটাই কি? বাড়ির সামনে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, কুলীন ভদ্রলোক তাঁকে বললেন—মা গো! বিশ্বনাথ বাড়ুরী মশায়ের বাড়িতে কোন পথে যাব? প্রায় বিশ বছর আগে একবার সেই বাড়িতে এসেছিলাম। যাদের ছোটো ছেলেমেয়ে দেখে গিয়েছিলাম এতদিনে নিশ্চয় তাদেরও ছেলে-মেয়ে হয়ে গেছে। আমার স্মরণ হয় যেন এই বাড়িখানার মতো, সেই বাড়িখানারও উত্তর দিকে একখানা সুপুরিবাগান ছিল।

মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন—সেই বাড়িতে আপনার কী দরকার?

—আমি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেছি।

শুনে মহিলাটি ম্লানমুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চকিতে বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখেই কুলীন ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন, সর্বনাশ, নিজের বউকে 'মা গো' বলে সম্বোধন করে ফেলেছেন। লজ্জায় সেখান থেকে প্রস্থান করলেন কুলীন ভদ্রলোক।

ঘটনাটা ওই কুলীন ভদ্রলোকের মুখেই শুনেছেন রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। এবং রাসবিহারী তখনই একটি গান রচনা করে শোনালেন:

"বহুদিন পরে এসেছি
চিনি না শ্বশুরবাড়ী,
কোন পথে যাইব মা গো
বিশ্বনাথ বাড়ুরীর বাড়ী॥

যারা ছিল ছেলেপিলে,
তাদের হল ছেলেপিলে,
বিয়ে করে গেলেম ফেলে,
বয়ে গেল বছর কুড়ি॥
বাড়ীঘর তাঁর নাহি চিনি (কেবল)
শ্বশুরের নামটি জানি,
উত্তরেতে বাগানখানি
সুপারি সব সারি সারি॥

দ্বিজ রাসবিহারী বলে
আর ত হাসি রাখতে নারি।
তুমি যারে মা বলিলে
সে বটে তোমারি নারী॥"

বহুবিবাহ নিবারণ প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে বিক্রমপুরের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নাম এসে পড়ে।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

"আমি ফুলিয়ার মুখোটী বিষ্ণু ঠাকুরের বংশোদ্ভব। এবং কাঁচাদিয়ার কুলাচার্য মহামান্য বৈদ্যনাথ বিদ্যাভূষণ ঘটক মহাশয়ের দৌহিত্র। পিতৃকুল বহুবিবাহ করিয়া প্রতিপালন হইতেছেন। মাতৃকুল বর্তমান কৌলীন্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। আত্ম-ভাতৃ মহাশয় অনেকে বহুবিবাহ করাইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়াছেন। অধিক
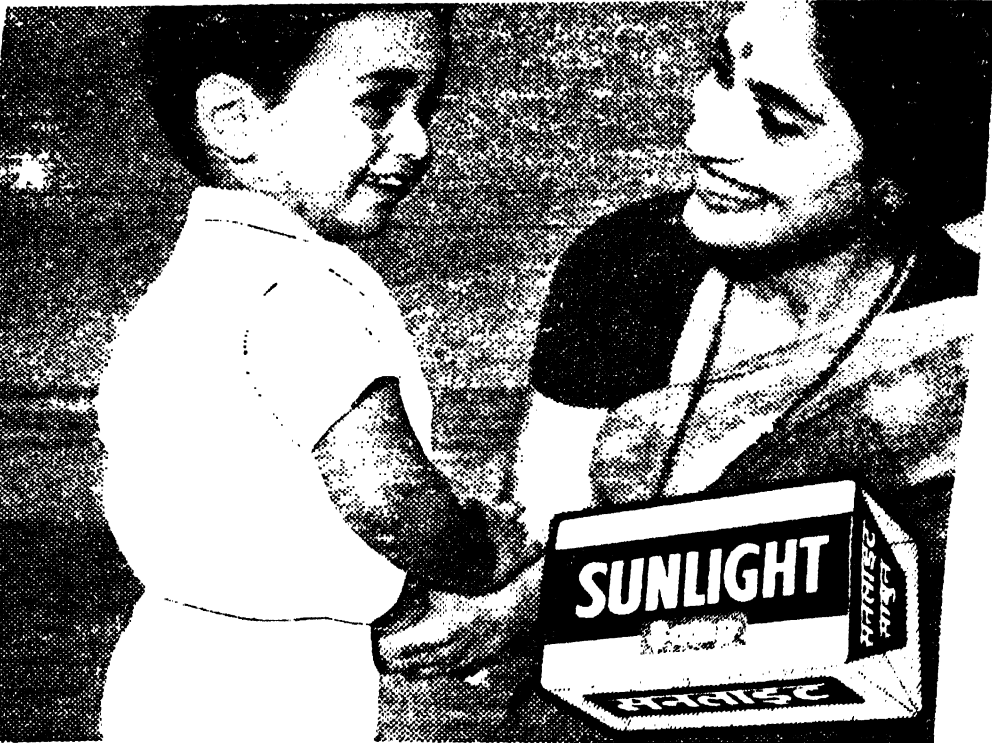
টাকা প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।"

বহুবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে কোনো সরকারী আইন পাশ হয়নি। সার্থক না হলেও এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার মূল্য অম্লান হয়ে আছে।

বিদ্যাসাগর প্রমাণ করেছেন, আমাদের শাস্ত্রে বিধবাবিবাহের বিধি আছে এবং বহুবিবাহের বিধি নেই। আগেই বলা হয়েছে, বিধবাবিবাহ এবং বহুবিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর সাকুল্যে চারখানা বই লিখেছেন।

অনেক পণ্ডিত একমত হতে পারেননি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। কয়েকজন পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের লেখার প্রতিবাদ করেছেন। সেসব প্রতিবাদের উত্তরে বেনামীতে পাঁচখানা বই বেরিয়েছেঃ 'অতি অল্প হইল'; 'আবার অতি অল্প হল'; 'ব্রজবিলাস'; 'বিধবাবিবাহ ও যশোহর-হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভা'; 'রত্নপরীক্ষা'।

এখানে বলা দরকার, দ্বিতীয় সংস্করণে 'বিধবাবিবাহ ও যশোধর-হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা'র নতুন নাম হয়েছে। নতুন নাম : 'বিনয় পত্রিকা'।

যা হোক, 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', এবং 'ব্রজবিলাসে'র লেখক কে? ওই বই তিনখানায় লেখকের নাম লেখা আছে : 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য'।

'বিধবাবিবাহ ও যশোহর-হিন্দু-ধর্মরক্ষিণী সভা'র লেখক?—'কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ'।

'রত্নপরীক্ষা'র লেখক? 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য'।

কিন্তু 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য', 'কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ' কিংবা 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য' তো আর সত্যি সত্যি কোনো লেখকের নাম হতে পারে না। নিশ্চয়ই ওই বই পাঁচখানা কেউ বেনামীতে লিখেছেন।

কার এই কাণ্ড? কে লিখেছেন বেনামীতে?

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যাচ্ছে: আর কেউ নন, স্বয়ং বিদ্যাসাগরই বেনামীতে এই পাঁচখানা বই লিখেছেন।

অগাধ অপার শাস্ত্রজ্ঞান ছাড়া এমন পাঁচখানা বই লেখা চলে না। মজলিসী মেজাজে, হাল্কা চালে লেখা। রঙ্গরসে ভর্তি। সোনার সঙ্গে যেমন সোহাগা, শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে তেমনি এসেছে রঙ্গরস।

'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস' ও 'রত্নপরীক্ষা' থেকে কয়েকটি হাস্যরসের অংশ তুলে দিচ্ছি।

"খুড় পৃথিবীর কাহাকেও মানুষ জ্ঞান করেন না। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, সংস্কৃতবিদ্যা কেবল তাঁর পেটেই অন্তঃসলিলা বহিতেছে। [illegible] অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়াছেন, বটে, কিন্তু সংস্কৃত বিদ্যা নিরতিশয় দুষ্পাক দ্রব্য, হজম করিতে পারেন নাই; [illegible] ও উদ্গার [illegible] যে [illegible] সমস্ত দেশ [illegible]।"

[illegible]

হইয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। আমাদের সমাজে, গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে, ব্রজবিলাস লিখিয়া, কোন পাপে লিপ্ত হইয়াছি, বলিতে পারি না।"

"কোনও বিখ্যাত অধ্যাপকের চৌপাড়ীতে দশ বার বৎসর থাকিয়া...এক ব্যক্তি সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি পাঠ সমাপ্ত করিয়া, স্বগ্রামে আসিলে, গ্রামস্থ ভদ্রলোকে, অনেক ব্যয় করিয়া, চৌপাড়ী ঘর প্রস্তুত করিয়া দিলেন, এবং ছাত্রদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তাঁহাকে অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত করিলেন। তাঁহাদের এত করিবার উদ্দেশ্য এই যে [illegible] অধ্যাপক রহিলেন, ব্যবস্থার জন্য অন্য স্থানে যাইতে হইবেক না। [illegible] তাঁর কাছে ব্যবস্থা চাহিলে, তিনি পুঁথি হাতড়াইয়া, হয় ব্যবস্থা দিতে পারিতেন না, নয় উল্টা ব্যবস্থা দিয়া দিতেন। গ্রামস্থ লোকে, বিরক্ত হইয়া তাঁর অধ্যাপকের নিকটে গেলেন, এবং সবিশেষ সমস্ত জানাইয়া, এই অনুযোগ করিতে লাগিলেন, বিদ্যালঙ্কারকে আপনি কি পড়াইয়াছেন; তাঁর কিছু মাত্র বিদ্যা জন্মিয়াছে, আমাদের এরূপ বোধ হয় না।

এই অনুযোগ শুনিয়া, অধ্যাপক ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, মনে কর, তোমরা অন্ধকার ভাঁড়ারে, তাড়াতাড়ি, নানা দ্রব্য-সামগ্রী আনিয়া ফেলিয়াছ; আলো দেওয়া হয় নাই, ও যে স্থানে যে দ্রব্য রাখা উচিত, সে ব্যবস্থা করা হয় নাই; এ অবস্থায়, কোনও একটা দ্রব্য শীঘ্র বাহির করিয়া আনিতে বলিলে, হয় তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহা দিতে পারিবে না, নয় একটা উল্টা দ্রব্য আনিয়া দিবে। সেইরূপ বিদ্যালঙ্কারও তাড়াতাড়ি অনেক বিদ্যা পেটে পুরিয়া লইয়া গিয়াছেন, এখনও সব সাজান হয় নাই। যতদিন সাজান না হইতেছে, ততদিন এইরূপ হইবেক; সাজান হইলে, আর কোনও গোলযোগ থাকিবেক না।"

"এক বড় মানুষের কতকগুলি উমেদার ছিলেন। আহার প্রস্তুত হইলে বাবু অন্দরবাটীর গৃহে গিয়া আহার করিতে বসিলেন; উমেদারেরাও সঙ্গে সঙ্গে তথায় গিয়া বাবুরে আহার দেখিতে লাগিলেন। নূতন পটোল উঠিয়াছে; পটোল দিয়া মাছের ঝোল করিয়াছে। বাবু দুই চারিখানা পটোল খাইয়া বলিলেন, পটোল অতি অখদ্য তরকারি; ঝোলে দিয়া ঝোলটাই খারাপ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া উমেদারেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, কি অন্যায়! আপনকার ঝোলে পটোল!! পটোল ত ভদ্রলোকের খাদ্য নয়। কিন্তু ঝোলে যতগুলি পটোল ছিল, বাবু ক্রমে ক্রমে সকলগুলিই খাইলেন, এবং বলিলেন, দেখ, পটোলটা তরকারি বড় মন্দ নয়।

তখন উমেদারেরা কহিলেন, পটোল তরকারির রাজা; পোড়ান, ভাজুন, সন্তলয় দেন, ডালনায় দেন, চড়চড়িতে দেন, ঝোলে দেন, ছোকায় দেন, দম্ করুন, কালিয়া করুন, সকলেই উপাদেয় হয়; বলিতে কি, এমন উৎকৃষ্ট তরকারি আর নাই। বাবু কহিলেন, তোমরা ত বেশ লোক; যেই আমি বলিলাম, পটোল ভাল তরকারি নয়, অমনি তোমরা পটোলকে নরকে দিলে; যেই আমি বলিলাম, পটোল বড় মন্দ তরকারি নয়, অমনি তোমরা পটোলকে স্বর্গে তুলিলে। উমেদারেরা কহিলেন, মহাশয়, আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন; আমরা ঝোলেরও উমেদার নই, পটোলেরও উমেদার নাই, উমেদার আপনকার; আপনি যাহাতে খুশী থাকেন, তাহাই আমাদের সর্বপ্রযত্নে কর্তব্য। এই উত্তর শুনিয়া বাবু নিরুত্তর হইলেন।"

"এক গ্রামে দুই বিদ্যাবাগীশ থাকিতেন। ইঁহারা দুই সহোদর। জ্যেষ্ঠ নৈয়ায়িক, কনিষ্ঠ স্মার্ত। একদিন, এক ব্যক্তি ব্যবস্থা জানিতে গিয়াছিলেন। স্মার্ত বিদ্যাবাগীশ বাটীতে নাই শুনিয়া তিনি

চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া নৈয়ায়িক বিদ্যাবাগীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্যে আসিয়াছ? তিনি কহিলেন, আমার একটি তিন বৎসরের দৌহিত্র মরিয়াছে; তাহাকে পুঁতিব বা পোড়াইব, ইহার ব্যবস্থা জানিতে আসিয়াছি। নৈয়ায়িক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, তাহাকে পুঁতিয়া ফেল। সে ব্যক্তি জানিতেন, তিন বৎসরের ছেলেকে পোড়াইতে হয়, পুঁতিতে হয় না; তথাপি সন্দেহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে পুঁতিতে হইবে, এই ব্যবস্থা শুনিয়া তিনি সন্দিগ্ধ মনে ফিরিয়া যাইতেছেন; এমন সময়ে, পথিমধ্যে, স্মার্তের সহিত সাক্ষাৎ হইলে জিজ্ঞাসিলেন, পুঁতিব, না পোড়াইব? তিনি পোড়াইতে বলিলেন। তখন সে ব্যক্তি কহিলেন, তবে বড় মহাশয় পুঁতিতে বলিলেন কেন। স্মার্ত জ্যেষ্ঠের মান রক্ষার জন্য কহিলেন, তিনি পরিহাস করিয়াছেন। অনন্তর তিনি বাটীতে গিয়া, জ্যেষ্ঠকে কহিলেন, কি বুঝিয়া আপনি এমন ব্যবস্থা দিলেন: পোড়াইবার স্থলে পুঁতিতে বলা অতি অন্যায় হইয়াছে। নৈয়ায়িক কহিলেন, আমি, অনেক বিবেচনা করিয়াই, পুঁতিতে বলিয়াছি। পুঁতিয়া রাখিলে, যদি পোড়াইবার দরকার হয়, তুলিয়া পোড়াইতে পারিবেক, কিন্তু যদি পোড়াইতে বলিতাম, তখন পোড়াইয়া ফেলিলে, যদি পুঁতিবার দরকার হইত, তখন কোথায় পাইত।"

"এক বিদ্যাবাগীশ, কোনও বিষয়ে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহাকে সর্বস্ব দিব। এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া, বিদ্যাবাগীশের ব্রাহ্মণী, নিরতিশয় ব্যাকুলা হইয়া কাতর বচনে কহিলেন, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওরূপ সর্বনাশিয়া প্রতিজ্ঞা করিও না; এখনই কেহ বুঝাইয়া দিয়া সর্বস্ব লইয়া যাইবেক, ছেলেগুলি খাইতে না পাইয়া মারা পড়িবেক। তখন বিদ্যাবাগীশ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আরে হাবি, তুই সেজন্যে ভাবিস কেন; আমি যদি না বুঝি, কার বাপের সাধ্য আমাকে বুঝায়।"

. . . .

"আমি এ স্থলে, শ্রীমান ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে নদিয়ার চাঁদ বলিলাম। কিন্তু শ্রীমতী যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা দেবী, ইতিপূর্বে শ্রীমান ভুবনমোহন বিদ্যারত্নকে নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ বলিয়াছেন। উভয়েই বিদ্যারত্ন উপাধিধারী, উভয়েই স্ব স্ব বিষয়ে সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য, বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়ও উভয়ের একই ধরনের। সুতরাং উভয়েই নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য পাত্র, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু এ পর্যন্ত এক সময়ে দুই চাঁদ দেখা যায় নাই। সুতরাং একজন বই দুজনের নদিয়ার চাঁদ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একজন একবারে বঞ্চিত হইবেন, সেটাও ভাল দেখায় না; এবং ঐ উপলক্ষে, দুজনে হুড়াহুড়ি ও গুঁতাগুঁতি করিয়া মরিবেন, সেটাও ভাল দেখায় না। এজন্য আমার বিবেচনায় সমাংশ করিয়া দুজনকেই এক এক অর্ধচন্দ্র দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করা উচিত।"

"কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার এক ভদ্রসন্তান বেয়াড়া ইয়ার হইয়াছিলেন। তিনি একবারে উচ্ছন্ন যাইতেছেন ভাবিয়া তাঁহার গুরুদেব উপদেশ দিয়া তাঁহাকে দুরস্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। 'তোমার কি নরকে যাইবার ভয় নাই', গুরুদেব এই কথা বলিলে, সেই সুবোধ, সুশীল, বিনয়ী ভদ্রসন্তান কহিয়াছিলেন, 'আপনি দেখুন, যত প্রবলপ্রতাপ রাজারাজড়া, সব নরকে যাইবেন; যত ধনে মানে পূর্ণ বড় লোক, সব নরকে যাইবেন; যত দিলদরিয়া, ভুখড় ইয়ার, সব নরকে যাইবেন; যত মৃদুভাষিণী, চারুহাসিনী বারবিলাসিনী, সব নরকে যাইবেন; স্বর্গে যাইবার মধ্যে কেবল আপনাদের মত টিকিকাটা বিদ্যাবাগীশের পাল। সুতরাং অতঃপর নরকই গুলজার; এবং নরকে যাওয়াই সর্বাংশে বাঞ্ছনীয়।"

"কিছুকাল পূর্বে, এই পরম পবিত্র গৌড়দেশে, কৃষ্ণহরি শিরোমণি নামে এক সুপণ্ডিত অতি প্রসিদ্ধ কথক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিতেন, সকলেই মোহিত হইতেন। এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী, প্রত্যহ, তাঁহার কথা শুনিতে যাইতেন। কথা শুনিয়া এত মোহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি অবাধে সন্ধ্যার পর, তাঁহার বাসায় গিয়া, তদীয় পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া অবশেষে ঐ বিধবা রমণী গুণমণি শিরোমণি মহাশয়ের প্রকৃত সেবাদাসী হইয়া পড়িলেন।

একদিন, শিরোমণি মহাশয়, ব্যাসাসনে আসীন হইয়া, স্ত্রীজাতির ব্যভিচার বিষয়ে অশেষবিধ দোষ কীর্তন করিয়া পরিশেষে কহিয়াছিলেন, 'যে নারী পরপুরুষে উপগতা হয়, নরকে গিয়া, তাহাকে, অনন্ত কাল, যৎপরোনাস্তি শাস্তিভোগ করিতে হয়। নরকে এক লৌহময় শাল্মলী বৃক্ষ আছে। তাহার স্কন্ধদেশ; অতি তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ কণ্টকে পরিপূর্ণ। যমদূতেরা, ব্যভিচারিণীকে সেই ভয়ংকর শাল্মলী বৃক্ষের নিকটে লইয়া গিয়া বলে, তুমি জীবদ্দশায় প্রাণাধিকপ্রিয় উপপতিকে, নিরতিশয় প্রেমভরে যেরূপ গাঢ় আলিঙ্গন করিতে; এক্ষণে, এই শাল্মলী বৃক্ষকে, উপপতি ভাবিয়া, সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গন-

দাস কর। সে ভয়ে অগ্রসর হইতে না পারিলে, যমদূতেরা, যথাবিহিত প্রহার ও যথোচিত তিরস্কার করিয়া বলপূর্বক তাহাকে আলিঙ্গন করায়; তাহার সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়; অবিশ্রান্ত শোণিত স্রাব হইতে থাকে; সে, যাতনায় অস্থির ও মৃতপ্রায় হইয়া আর্ত করুণ স্বরে, বিলাপ পরিতাপ ও অনুতাপ করিতে থাকে। এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া কোন স্ত্রীলোকেরই, অকিঞ্চিৎকর, ক্ষণিক সুখের অভিলাষে, পরপুরুষে উপগতা হওয়া উচিত নহে ইত্যাদি।

ব্যভিচারিণীর ভয়ানক শাস্তিভোগবৃত্তান্ত শ্রবণে, কথকচূড়ামণি শিরোমণি মহাশয়ের সেবাদাসী, ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যাহা করিয়াছি, তাহার আর চারা নাই; অতঃপর, আর আমি প্রাণান্তেও, পরপুরুষে উপগতা হইব না'। সেদিন, সন্ধ্যার পর, তিনি, পূর্বাপর শিরোমণি মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইয়া, যথাবৎ আর আর পরিচর্যা করিলেন; কিন্তু, অন্যান্য দিবসের মত, তাঁহার চরণসেবার জন্য, যথাসময়ে, তদীয় শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন না।

শিরোমণি মহাশয়, কিয়ৎক্ষণ, অপেক্ষা করিলেন; অবশেষে, বিলম্ব দর্শনে, অধৈর্য হইয়া, তাঁহার নামগ্রহণ পূর্বক, বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেবাদাসী, গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন; এবং, গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, গলদশ্রু লোচনে, শোকাকুল বচনে কহিলেন, 'প্রভো! কৃপা করিয়া, আমায় ক্ষমা করুন। শিমুল গাছের উপাখ্যান শুনিয়া, আমি ভয়ে মরিয়া রহিয়াছি; আপনকার চরণসেবা করিতে, আর আমার, কোনও মতে, প্রবৃত্তি বা সাহস হইতেছে না। না জানিয়া যাহা করিয়াছি, তাহা হইতে কেমন করিয়া নিস্তার পাইব, সেই ভাবনায় অস্থির হইয়াছি'।

সেবাদাসীর কথা শুনিয়া, পণ্ডিতচূড়ামণি শিরোমণি মহাশয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; এবং, দ্বারদেশে আসিয়া, সেবাদাসীর হস্তে ধরিয়া, সহাস্য মুখে কহিলেন, 'অরে পাগলি! তুমি এই ভয়ে আজ শয্যায় যাইতেছ না? অস্মরা, পূর্বাপর, যেরূপ বলিয়া আসিতেছি, আজও সেইরূপ বলিয়াছি। শিমুল গাছ, পূর্বে, ঐরূপ ভয়ঙ্কর ছিল, যথার্থ বটে; কিন্তু শরীরের ঘর্ষণে ঘর্ষণে, লৌহময় কণ্টকসকল ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে, শিমুল গাছ তেল হইয়া গিয়াছে; এখন, আলিঙ্গন করিলে, সর্ব শরীর শীতল ও পুলকিত হয়'। এই বলিয়া, অভয়প্রদান ও প্রলোভনপ্রদর্শনপূর্বক, শয্যায় লইয়া গিয়া, গুণমণি শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে, পূর্ববৎ, চরণসেবায় প্রবৃত্ত করিলেন।"

ক্রমশ

হঠাৎ সঙ্গীন মুহূর্তে টর্চের দরকার হয়ে পড়ে

'এভারেডী' টর্চ রোজই আপনার কাজে লাগবে

টর্চ যে কত দরকারী জিনিস তা সবাই বোঝেন (আপনি তো বটেই), কিন্তু কেনার ঝামেলা ক'জনই বা পোয়াতে চান। তা ব'লে, আপনি কিন্তু ভুলবেন না—আজই কেনা চাই।

টর্চ • ব্যাটারী • বাল্ব

ইউনিয়ন কারবাইড ইণ্ডিয়া লিমিটেড

জাপানী সাহিত্যে একটি উজ্জ্বল নাম

জাপানী সাহিত্যে একটি নাম "ইউকিও মিসিমা"। রাস্তায় যে-কোন লোককে জিজ্ঞাসা করুন ওই নাম—সে গভীর আবেগের সঙ্গে বলবে, "মিসিমা-সান্?" যেন কত আপনার। বিশেষত আজকের যুব সম্প্রদায়ের কাছে 'মিসিমা-সান্' ধ্যানের পুতুল। রবীন্দ্রনাথ ভাবলেই যেমন আমাদের মানসপটে এমন একটি ব্যক্তিত্বের ছবি ভেসে ওঠে, যাঁকে শুধু পূজা করা যায়, তেমনই ইউকিও মিসিমা এ দেশের যুব সম্প্রদায়ের কাছে পূজনীয় ব্যক্তিত্ব।

ভারত সরকারের নিমন্ত্রণে তিনি যাচ্ছেন ভারতবর্ষে। কলকাতায় উপস্থিত থাকবেন অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে। এমন একটি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে দেখা করে কিছু লিখবার জন্য গোবিন্দ (শ্রীগোবিন্দকিশোর ঘোষ) আমায় দেশে ফিরবার পথে টোকিওতে তাগাদা দিয়ে গেলেন তখন একটু ভয় ভয় করছিল বইকি। তার উপর আমেরিকায় তাঁর বইগুলো ইতিমধ্যেই অনুবাদ হয়ে গেছে। এমনকি একটা বইও বাংলা থেকে বার করে গোবিন্দ আমায় দেখালেন। দু-একজনকে আমার অভিপ্রায় জানানোতে তারা আমায় কিছুটা ভাবনায় ফেলে দিলেন। কয়েকজন হোমড়া-চোমড়া-কে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য ধরেও ছিলাম। সকলেরই একমত, "It is rather impossible, but you can try for an interview"।

এমনই দোদুল্যমান অবস্থায় আমি তাঁর টেলিফোন নম্বর ভারতীয় দূতাবাস থেকে যোগাড় করে ফেললাম। দু-একদিন টেলিফোনে চেষ্টা করে প্রথমত টেলিফোনের জন্য একটা নির্দিষ্ট দিন ও সময় পেয়ে গেলাম। সঠিক দিনে সঠিক সময়ে তাঁকে ফোন-এ পেয়েও গেলাম। ভয়ে ভয়েই বলে ফেললাম আমার উদ্দেশ্য। বুঝলাম একটু ভাবছেন। তারপর খুব ভদ্র ভাবে বললেন—"দেখুন, আমি সত্যই খুব ব্যস্ত, তার উপর বাইরে চলে যেতে হচ্ছে। যদি আপনাকে একটা দিন ও সময় দিই, আপনার পক্ষে কি খুব অসুবিধা হবে? সেদিন এক ঘণ্টা সময় আপনাকে দেব।" নিজের ডায়রি না দেখেই রাজী হয়ে গেলাম। বললেন আট দিন পর ঠিক আড়াইটার সময় ফরেন প্রেস ক্লাব-এর লবিতে তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। হঠাৎ হকচকিয়ে গিয়েছিলাম একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির অমন সহজ ও সরল ভাবে একজন অপরিচিত অখ্যাত

ইউকিও মিসিমা

লোকের ডাকে সাড়া দেওয়াতে। আমি তখন যেন দিগ্বিজয় করে ফেলেছি। ডায়রির বইয়ে সময় ও তারিখটা লিখে নিয়ে নিজেই নিজের ভিতর হারিয়ে গেলাম; সত্যই আমি সৌভাগ্যবান। দিন পেলাম ঠিক আট দিন পর। ভেবেছিলাম এতদিন পর মনে থাকবে তো? যাঁরা আমার প্রথমে একটু নিরুৎসাহই করেছিলেন তাঁদের বলাতে প্রথমত আশ্চর্যই হলেন, তারপর কি ভেবেছিলেন জানি না।

বহু প্রতীক্ষিত সেই দিনটাতে দুরু দুরু বক্ষে হাজির হলাম ফরেন প্রেস ক্লাবের দরজায়। পুরনো ভাবনাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ভাবলাম এতদিন পর মনে থাকলে হয়। ঠিক আড়াইটায় করিডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে বেশীর ভাগই বিদেশী সাংবাদিক। সামনের উঁচু কাউণ্টারের ওপাশে দাঁড়ান লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম

"এখানে কি মিস্টার ইউকিও মিসিমা এসেছেন?" ভাবলাম বাইরে যে রকম বৃষ্টি হচ্ছে হয়ত গেল সব মাটি হয়ে।

আমার ঠিক পরেই ঢুকলেন একজন জাপানী ভদ্রলোক। অপেক্ষা করছিলেন আমার জিজ্ঞাসা শেষ হলেই তিনি তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করবেন। আমার কথায় ফিরে তাকালেন—"Are you Mr. Biswas? Mishima my name, glad to meet you". হাত বাড়িয়ে দিলেন।

সেই প্রথম দেখলাম তাঁকে। ছোট ছোট করে সামুরাই কায়দায় ছাঁটা চুল। উন্নত ললাট। চোখের মণি একটু কটা, তার ভিতর থেকে বের হয়ে আসছে তীক্ষ্ণ চাউনি। যেন মনে হচ্ছে আমার সবটা দেখতে পাচ্ছেন। কোন জড়তা নেই সে চাউনিতে, চিন্তার সঙ্গে ভাবপ্রকাশের নেই কোন দ্বন্দ্ব, নেই স্থান কাল পাত্রের বিচার। প্রায় জোড়া চওড়া ভুরু, চাপা নাকের নীচে মোটা বলিষ্ঠ ঠোঁট। তার সঙ্গে একটু তোলা থুতনিতে আত্মপ্রত্যয়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট। ছিপছিপে ছোটখাটো মানুষটা। পাঁচ ফুট তিন কি চার ইঞ্চি লম্বা। মজবুত গঠন। কোন মেদ নেই শরীরে। সাজ-পোশাকের ভাঁজে ভাঁজে শৌখিনতার ছাপ। সরু করে কাটা প্যান্ট। হঠাৎ দেখলে ঢোলাই মনে হবে। তবে তাতেই তাঁকে আরও স্মার্ট
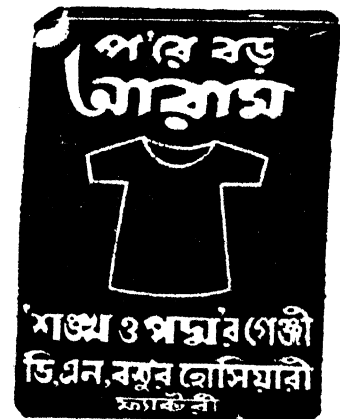
করেছে। ছ‍্ঁচলো জ‍ুতো। বয়স মনে হবে সবে প‍ূর্ণ যৌবন পার হয়ে একটা অপার সৌম্যতায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন। যেহেতু 'আমি লেখক' আমায় আত্মভোলা হতে হবে, এমন কোন কথা নেই।

বিশ্বাস করুন সমস্ত ভয় আমার মুহূর্তে উবে গেল ওঁর ওই চোখ ছোট করে গাল ভর্তি হাসিটা দেখে। মনে হল এও যেন আমার মতনই একজন মানুষ। কই, কোনো ব্যতিক্রম দেখছি না তো! তখনও ও'র উষ্ণ হাত আমার হাতে। বললেন— "দাঁড়ান, একটা মেসেজ দিয়ে রাখি।"

আমরা দ‍ুজনে কার্পেট পাতা সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রেস ক্লাব-এর এন্টারটেনিং ঘরে ঢ‍ুকলাম। সেখানে অনেক বিদেশী এবং স্বদেশী সাংবাদিকের ভিড়। যে যার নিজের আলোচনায় ব্যস্ত, তারই মধ্যে মিসিমা আমায় এক কোণে টেনে নিয়ে বসলেন। একজন লোক ডাকতে এল। উঠে আমায় বললেন, "প্লীজ এক্সকিউজ মী", আমি ততক্ষণ ঘ‍ুরে ঘ‍ুরে দেখতে শ‍ুরু করেছি দেওয়ালে ঝোলানো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ফটোগ্রাফ। জাপানে কোন ব‍ৃহৎ ব্যক্তির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছ‍ু অ্যাপয়েন্ট-

মেণ্ট-এর সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকে ফরেন প্রেস ক্লাব-এর আমন্ত্রণও রক্ষা করতে হয়। ফরেন প্রেস ক্লাব-এর পক্ষ থেকে যাঁদের সম্মান দেওয়া হয়েছে তাঁদেরই ছবি সেখানে। জন ফস্টার ডালেস, রবার্ট কেনেডি, ফুলব্রাইট থেকে শুরু করে পৃথিবীর বহু দেশের প্রেসিডেণ্ট, প্রাইম মিনিস্টার, সাহিত্যিক, দার্শনিক, সমালোচক, কবি—কে নেই। নিজের নিজের জগতে সকলে এক একজন দিক্‌পাল। তার ভিতরেই আর একটি ছবি স্থান পেয়েছে "Honour to Yukio Mishima", যাঁর নাম গত বৎসর নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব উঠেছিল, যিনি এই মুহূর্তে বসে আছেন আমার পাশে।

বেয়ারা এগিয়ে এল। বাধা দিলেন আমার কিছু বলতে। "Two Gin-Tonic, please", ও'র মুখ থেকে শুনে চলে গেল বেয়ারা। দেখলাম কি স্বদেশী কি বিদেশী যিনিই ঢুকছেন ঘরে সকলেই ওঁকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

শুরু হল আমার জিজ্ঞাসা। জীবনে এই আমার প্রথম জিজ্ঞাসাবাদ। প্রথমেই বলে রাখা ভাল তিনি কখন ওঠেন, কি খেতে ভালবাসেন এমন কোন প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করিনি। তাছাড়া সময়ও তাঁর নেই। এমন কিছু জানতে চেষ্টা করেছি যাতে করে তাঁর মননশীলতার কিছুটা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি।

নাম YUKIO MISHIMA। বয়স বিয়াল্লিশ। জন্ম ১৯২৫ সাল, সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারে। এখন স্ত্রী, দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে নিজের সংসার। মেয়ে বড়, ছেলে ছোট। বলেই বললেন—ছেলে বড় দুষ্টু। বুঝলাম হাজার কাজের ভিতরেও সব পিতার মতনই তাঁর একটা স্নেহশীল মন সব সময় কাজ করছে।

জাপানের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে টোকিও। সারা জাপানের বাছাই করা ছেলেদেরই স্থান এখানে। টোকিও বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭ সালে ইংরেজী সাহিত্যের উপর গ্র্যাজুয়েশন কোর্স শেষ করেন। বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভের কোন তাড়া মানসিক দিক থেকে বা সামাজিক দিক থেকে অনুভব করেন নি। অবশ্যই বিদেশকে চোখ দিয়ে দেখে জানবার কৌতূহল তাঁর সব থেকে বেশী। তিনি মনে করেন যে আজকের জাপানে বিদেশ থেকে ডিগ্রী এনে কোন বিশেষ সুবিধা আশা করা বা অহেতুক যোগ্যতার বড়াই করবার কোন যুক্তি নেই। কোন মতেই কোন বিশেষ কারণ ছাড়া শুধু পয়সা এবং সুযোগ আছে বলেই বিদেশে পড়াশোনা করতে যেতে হবে, এমন কোন যুক্তির তিনি বিরোধী। হয়তো উনিশ দশকের প্রথমে এরকম একটা ভাবধারা জাপানে ছিল। কিন্তু আজ মূল্যহীন। বাইরের অহেতুক বিদ্যার ভড়ং-কে স্বীকৃতি দিতে সকলেই নারাজ। তা না হলে আজকে এখানের ক্রাউন প্রিন্স-এর ছেলে সকলের সঙ্গে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুলে যায়। এর চাইতে বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে। তাঁদের কি সুযোগ-সুবিধার অভাব? একথা উল্লেখ করে বললেন—"তবেই না আমরা তাঁদের ভালবাসছি।" আমি শুধু ভাবলাম আমাদের কথা। কি হবে তা শুনিয়ে। সকলেই সেটা জানি। সুযোগে আমিও হয়ত আমাদের ব্যতিক্রম হব না।

ছোটবেলা থেকেই উনি সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত। সেই ছোটবেলায় জ্ঞান হয়ে থেকে ঠাকুমার কোলে মাথা দিয়ে যে ছেলেটা এক মনে গল্প শুনত, তখন কে জানত উত্তরকালে সেই হবে এমন এক যুগান্তকারী সৃষ্টির অধিকারী। পুরনো দিনের সেই সব ইতিকথা ঠাকুমার মুখে শুনে শুনেই তাঁর গল্পের প্রতি একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগে। সেই অনুভূতিই তাঁকে কাল্পনিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত করতে সহায়তা করে। উত্তরকালে তাঁর কল্পনাই একটু একটু করে রূপ নিতে থাকে নানান জীবন জিজ্ঞাসায়। মিশিমার মতে যে দেশে রূপ কথার গল্প নেই, যে দেশের শিশু সেই সব গল্প শোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের মনে সৃষ্টি হতে পারে না কোন নতুন ভাবধারায়, উত্তরকালে যা হয়ে ওঠে 'দর্শন'। ঠাকুমার মুখে শুধু গল্পই শুনতেন না, ওই বয়সেই তখন দু-একটা গল্প তৈরী করে ঠাকুমাকে শোনাচ্ছেন। ধীর উৎসাহে ঠাকুমা শুনতেন। তিনিই প্রথম বুঝতে পারেন ও'র প্রথম কল্পনা শক্তির প্রকাশ। ওঁর ঠাকুমার উৎসাহই ওঁর সাহিত্য জীবনে প্রবেশের সব থেকে বড় প্রেরণা। তখনই ও'র ঠাকুমা বলেছিলেন "দেখিস তুই বড় হয়ে লেখক হবি।"

সেই থেকেই উৎসাহ। মাত্র ১৩ বছর বয়সে প্রথম স্কুল ম্যাগাজিনে বার হয় তাঁর লেখা। এইভাবেই এগিয়ে চলতে থাকে ওঁর ছোট কাঁচা হাতের সাহিত্য সাধনা। সাহিত্য সাধনা বলতে শুধুই ছোট গল্প। ১৯ বছর

বয়সে তিনি মনে করেন তাঁর ছোট কয়েকটি গল্প নিয়ে একটি বই ছাপাবেন। তখন পৃথিবীর বুকে ঝড় উঠেছে। সকলেই ব্যস্ত। কোন প্রকাশকই এই খুদে উঠতি লেখকের বই ছাপাতে রাজী হচ্ছে না। উনিও নাছোড়-বান্দা। ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রকাশকের দরজায় দরজায়। অবশেষে একজন রাজী হলেন। সেই প্রথম মাত্র উনিশ বছর বয়সে, ১৯৪৪ সালে। ছাপার অক্ষরে বই হয়ে বার হ'ল তাঁর লেখা "Blooming Forest"। আজ যখন তাঁর বই ছাপাবার জন্য জাপান কেন, আমেরিকার প্রকাশকদের মাঝে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় তখন তিনি আপন মনে ভাবেন সেদিনের কথা। সুখের বিষয় তাঁর "ব্লুমিং ফরেস্ট" অল্প কয়েকদিনের ভিতরেই শেষ হয়ে যায়।

এর পর তিনি বিভিন্ন সাহিত্যিকের বই মনযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করেন। গভীর-ভাবে অনুভব করবার চেষ্টা করেন তাঁদের যুক্তি আর চিন্তাধারা। তার ভিতর প্রথম যুদ্ধোত্তর কালের লেখক Raymond Radignet-এর লেখাই তাঁকে সব থেকে আকর্ষণ করে। সেই সূত্র ধরেই তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন জাপানের ক্লাসিকস সাহিত্যের দিকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তিনি কিছুটা দূর্বহ-গম করেছেন। সে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন যে, তাঁর মতে কৈশোরই হচ্ছে মানুষের জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সময়। সেই সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনন্দ, দুঃখ, শোক, ভয়-ভীতি, ভালবাসা, প্রীতি, মায়া, মমতা পৃথিবীর যাবতীয় অভিজ্ঞতা কিশোর মনকে সবথেকে বেশী নাড়া দেয়—গুরুত্ব যাই হোক্‌না কেন। তাঁর কৈশোর কেটেছে এমন একটা সময়ে যখন সমস্ত পৃথিবীর বুকে জ্বলে উঠেছে দাবা-নল। জাপান ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই দাবা-নলে। অদ্ভুত শোনাল তাঁর গলা—"আমি আজও ভাবতে পারি না যে পৃথিবীতে এমন কোন কিছু আছে যার পেছনে লুকিয়ে

...ছে কোন স্থিতি। মনে হয় সবই যেন ...ভঙ্গুর। কোন এক অদৃশ্য শক্তির বলে ...ব যেন প্রলয়ের দিকে ছুটে চলেছে। ...দিন দেখেছি ধ্বংস আর হনন। ধ্বংসের ...প দেখতে দেখতে ভুলে গিয়েছিলাম যে ...থিবীতে কোন 'গড়বার' রূপ থাকতে ...রে। জাগতিক চেতনার সেদিনের সেই ...ংসের রূপ আমার মজ্জায় মজ্জায় দানা ...ধে গেল। মনে হ'তে লাগল আমার মান-...ক চেতনার এক বিরাট পরিবর্তন আসছে ...ত একটা Mental Revolution। ...বতেই পারছিলাম না ধ্বংস ছাড়া কিছু ...ছে। বর্তমানটাই সব, ভবিষ্যৎ বলে যেন ...ছুই নেই। তখন যে কৈশোর। চাক্ষুষ ...রিচয়টাই শুধু সত্য। যুগ্ধ থেমে গেল। ...বলাম একি হ'ল? এখন কি হবে? লোকে ...তন করে গড়তে শুরু করল, মনে হচ্ছে ...গল কালকেই তো এগুলো আবার ভেঙে ...তে পারে। তাহলে কি কল্যাণ সুন্দর বলে ...থিবীতে কিছুই নেই? সেদিনের ছোট ...টা দিশাহারা হয়ে খুঁজতে শুরু করল, ...র বুঝি সে পেয়েও গেল।" হাসতে ...সতে আবার বললেন—"তা হচ্ছে আমার ...থা, আমার সৃষ্টি। যা স্থায়ী, স্থিতি-...ল। যার কোন ধ্বংস নেই। খুঁজে পেলাম ...মার চিরন্তনকে।" সামনের বাড়িটা দেখিয়ে ...লেন—"এই যে দেখুন বাড়িটা এত যত্ন ...র তৈরি করছে, আমি বিশ্বাস করতে ...র না এর স্থায়িত্ব আছে। হয়ত আমার ... তবুও সেদিনের স্মৃতি দিয়ে যে মনটা ...ী তাকে ভুলতে পারি কই?"

...থম লেখা শুরু করেন প্রেমের গল্প ...। চুটকি প্রেমের কাহিনী। নাম কেনার ...ত তাড়াতাড়ি প্রবেশের অধিকার। ...াই সেখানেও তাঁর প্রতিভার বিকাশ দেখা ... তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আসে ...সক পরিবর্তন। তিনি শুরু করেন ...রর ভিতরে ঢুকতে। লেখার গণ্ডিকে ...ও বাড়িয়ে তোলেন। যে চোখ শুধু ... দিয়ে ঘেরা ছিল, তা নেমে এল বাস্ত-...উপর। তিনি শুরু করলেন বাস্তবের ...দুঃখ চেতনাকে মানুষের সামনে তুলে ...। নানান জটিল জীবন জিজ্ঞাসাকে ...ভাবে ফুটিয়ে তুলতে। তার ভিতর ... পছন্দ করলেন সেই সব চরিত্র যা ...ব বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করে একটা ...রণ কিছু করে বসে। কিছুদিন আগে ... যান এখানকার সাংস্কৃতিক পীঠস্থান ...টো শহরে। অদ্ভুত একটা ঘটনা তাঁকে ...ণ করে। সুন্দর মন্দির। সেখানে রোজ ...র ভক্তির প্রদীপ জ্বলে। ধূপের গন্ধ ...ক পরিপূর্ণ পুণ্যের রূপ নেয়। মনে ...ঈপ্সিত স্বয়ং সেখানে। এমনই এক ...রর দেব পূজারী এক মূর্তিমান ...। সৌম্য শান্ত এই যুবক পাঠ নিচ্ছেন ...আর ভালবাসায়। অমন সুন্দর মূর্তির ...তাকিয়ে হয়ত গৃহী ফেলবে দীর্ঘ-শ্বাস। কিন্তু সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে তাঁর সমস্ত সাধনা সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সে নিজে হাতে আগুনে জ্বালাল অত সাধের মন্দিরে। সকলে দেখল, একদিন যে ছিল সকলের ভক্তির উৎস সে সেই লেলিহান শিখার সামনে দাঁড়িয়ে অট্টহাস্য হাসছে। এইখানেই মিসিমার চিন্তাধারা ব্যাহত হ'ল। তিনি যেন কোথায় একটা কি খুঁজে পেলেন। এদিক ওদিক থেকে তিনি যেটুকু মাল মশলা যোগাড় করলেন তার থেকে নিজের কল্পনায় রাঙিয়ে সৃষ্টি করলেন—"টেম্পল অফ দি গোল্ডেন প্যাভি-লিয়ন", যা সবথেকে যশ ও অর্থ তাঁর জীবনে এনেছে। এর ভিতর দেখাবার চেষ্টা করলেন কিভাবে সেই যুবক যাজক একটু একটু করে অনুভব করল তার মানসিক পরিবর্তন আর সেই পরিবর্তনের ছেদ টানল এক অদ্ভুত সমাপ্তিতে।

এমনই তাঁর আর একটি সৃষ্টি "আফটার দি ব্যাঙ্কোয়েট"। কোনো এক রাজনৈতিক নেতা নির্বাচিত হলেন কোনো একটি দলের পক্ষে টোকিও শহরের গভর্ণর-এর সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তিনি সেই সূত্রে ভালবাসলেন এক অতি সাধারণ দোকানী মেয়েকে। বিয়েও করে ফেললেন। তাঁর প্রচার কার্যে মেয়েটি তার যথাসর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করল তাঁকে নির্বাচিত করতে। কিন্তু সবচেষ্টা বিফল হ'ল। তিনি হেরে গেলেন সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। ঠিক তার পরেই এক অস্বাভাবিক কারণে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল। এই ঘটনা থেকে তিনি তুলে ধরলেন অদ্ভুত এক নূতন ধরনের মনস্তা-ত্বিক বিশ্লেষণ। এই সূত্রে তিনি উল্লেখ করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোস্ট মাস্টার' কাহিনীর কথা। এই গল্পটি তাঁর মনে অদ্ভুতভাবে রেখাপাত করেছে। উনি ভাবতেই পারতেন না এর আগে যে এত ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর এত সুন্দর সূক্ষ্ম একটা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ লুকিয়ে থাকতে পারে।

এমনই করে ভিড় করল অনেক কল্পনা অনেক চরিত্র অনেক কথা। এই ভাবেই সরে এলেন বাস্তব ঘটনার দিকে। ছোটগল্প লিখলেন সমাজের অনেক নীচের স্তরকে কেন্দ্র করে। এখানে তিনি সরাসরিই জানা-লেন যে মোঁপাসাকে কেন্দ্র করেই তাঁর গল্পের কাঠামো তৈরী করতে চেষ্টা করেছেন।

এখন তিনি শুরু করেছেন এক নূতন বৃহত্তর উপন্যাস "ওশন অফ হারভেস্ট"। ইচ্ছা আছে চার খণ্ডে এই উপন্যাস শেষ করবেন। এদের প্রত্যেক নায়কই বিশ বৎসরের আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। যদিও এক নায়কের সংগে আর এক নায়কের কোন সম্পর্ক থাকবে না তবুও ঘটনার পরি-প্রেক্ষিতে একে অপরের সংগে যুক্ত থাকবে। এই চার নায়কের বিশ বৎসরের জীবনের সমস্ত মানসিক বৃত্তিগুলিই ফুটে উঠবে তাঁর লেখায়। অবশ্যই চারপাশে ঘিরে

থাকবে সমাজের সকল স্তরের সকল বয়সের চরিত্রগ‍ুলি।

তিনি মনে করেন যে লিখবার জন্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন যথেষ্ট থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বললেন,—"যেমন ধর‍ুন না প্রত্যেকেই জীবনে একটা উপন্যাস লিখতে পারেন। সেটা তাঁর নিজের জীবন। কিন্তু একাধিক লিখতে গেলেই নিতে হবে কল্পনার আশ্রয়। তখন কিছ‍ু কল্পনা আসবেও। নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে নানান রং। যা দেখেছি, শ‍ুনেছি, ব‍ুঝেছি। প‍ৃথিবীতে এমন বহ‍ু স‍ৃষ্টি আছে যা কাল্পনিক আর তার জন্য স্রষ্টাকে কোন দিনই মিথ্যাবাদী নাম কিনতে হয়নি। লেখককে ন‍ূতন ন‍ূতন চিন্তাধারা স‍ৃষ্টি করতে হবে অতি ছোট ঘটনা থেকে, তাকে কল্পনায় রাঙিয়ে, তুলে ধরতে হবে সকলের সামনে। তাতেই আছে বাহাদ‍ুরি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে ন‍ূতন ন‍ূতন র‍ূপ দেবে আর তা হতে হবে য‍ুগধর্মী। তবেই স্রষ্টার স‍ৃষ্টি পাবে স্বীকৃতি।" গল্প শোনালেন—এক ফরাসী লেখিকা তাঁর রাতের খাবার টেবিলে ছোট ছেলের সঙ্গে তর্ক করছিলেন।
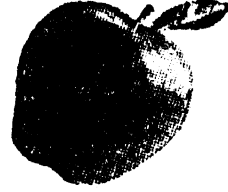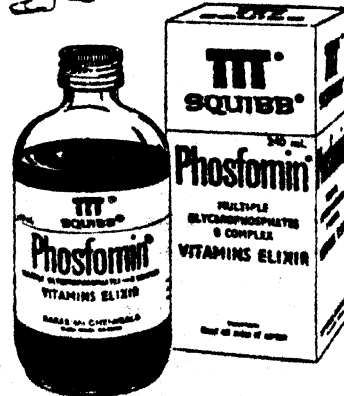
ছোট ছেলে হঠাৎ বাবা-র সম্বন্ধে একটা উক্তি করল। সেই ছোট্ট উক্তিটিকে কেন্দ্র করে ফরাসী মহিলা হঠাৎ একটা বিরাট কিছুর সন্ধান পেলেন। তার থেকেই তাঁর এক অমর সৃষ্টি তৈরি হল। তাতে দেখালেন পিতা-পুত্রের অদ্ভুত এক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

বললেন—"এমনই হতে হবে লেখককে। যা পাঁচজনে খুঁজে পাবে না, লেখককে তা পেতে হবে। পেলে তখন সকলে ভাববে, আরে এতো আমাদেরই কথা ও কাহিনী।"

তাঁর সৃষ্টির ভিতর যেগুলো সাহিত্যে সবথেকে স্বীকৃতি পেয়েছে

১ সাউন্ড অফ ওয়েভস
২ কনফেশন অফ এ মাস্ক্
৩ দি টেম্পল অফ দি গোল্ডেন প্যাভিলিয়ান
৪ আফটার দি ব্যাংকুয়েট
৫ দি সেইলার হু ফেল ফ্রম গ্রেস উইথ দি সী

ছোটগল্প

১ দি ডেথ ইন মিড-সামার

নাটক

১ ফাইভ মডার্ন "নো" প্লেজ
২ মাদাম দ্য সাদ

তিনি মনে করেন, আজও তাঁর মনের মত কিছু সৃষ্টি করতে পারেন নি। এই সব বইয়ের ভিতর অবশ্য যশ ও অর্থ সবথেকে বেশী পেয়েছেন "দি টেম্পল অফ দি গোল্ডেন প্যাভিলিয়ান" থেকে। ফেলে আসা সৃষ্টি আমাদের কাছে যতই সমাদর পাক, তিনি সেগুলোর কোনই গুরুত্ব দেন না। তাঁর মন যেন কিছু না পাওয়া, না শোনানো বাণীতে ভরপুর। তাই দিয়ে যেতে চান কালকে যা তিনি এই মুহূর্তে জানেন না—বা পরমুহূর্তের ভাবনাতে স্থান পাবে। সেই আশায় তিনি ভেবে চলেছেন প্রতিটি মুহূর্ত। হয়ত তাঁর বয়সের সংগে সংগে চিন্তাধারাও পাল্টে যাবে। যেটা আজকে সত্যি ভাবছেন কালকে না-ও ভাবতে পারেন।

জাপানের আধুনিক সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে জানালেন যে এখনও জাপানী সাহিত্যে বিশেষ কোন নূতন ধারা আসেনি। হয়ত আজকের দিনে অনেক যুগোপযোগী জনপ্রিয় লেখককে পাওয়া যাবে। কিন্তু এমন কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না যা পরবর্তী যুগের মানুষের মনেও কোন গভীর রেখা টানতে পারে।

টমাস মান হচ্ছেন তাঁর সব থেকে প্রিয় লেখক। আজকের পৃথিবীর আশেপাশে যেসব রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে চলেছে সেসব এড়িয়েই চললেন। ভিয়েৎনাম সম্বন্ধে অভিমত চাইলে হাসতে হাসতেই বললেন Very difficult question", বুঝলাম আমার প্রশ্ন করাই ভুল হয়েছে। কিন্তু ও বিশ্ব যুদ্ধ সম্বন্ধে অদ্ভুত একটা মন্তব্য করলেন—"এর অনেক দিক আছে। ভাল-মন্দ দুইই একটা বিশ্ব যুদ্ধে আছে।

তবে আমাকে যেটা সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে সেটা কি জানেন? চল্লিশ বছরের ইংরেজ, আমেরিকান, আর জাপানী বা আরও অনেক দেশবাসীকে পাশাপাশি রেখে বিচার করুন, দেখবেন তাদের জীবন যন্ত্রণা তো বটেই, চিন্তাধারারও কি বিপুল পার্থক্য। কিন্তু আজকে ষোল বছরের কয়েকজন কিশোরকে, সে হয়ত আমেরিকান, জাপানী বা পৃথিবীর সভ্যতার আলো গেছে এমন যে কোন কোণ থেকেই ধরে নিয়ে আসুন—দেখবেন তাদের চিন্তাধারার অনেক মিল আছে। এতেই বুঝতে পারছি আমরা আস্তে আস্তে একে অপরের অনেক কাছাকাছি আসছি, আরও আসব।"

জাপানের নূতন উঠতি যুব সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে বললেন। অনেকেই মনে করছে জাপান পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার দিকে ভীষণভাবে ঝুঁকেছে। এতে অবশ্যই ভুল নেই। এমন কি আমেরিকার নকলে এখানের শিনজুকু অঞ্চলে "Hippies" সম্প্রদায়ও দেখা দিয়েছে—যারা দিনের পর দিন রাস্তায় কাটাচ্ছে কি ছেলে কি মেয়ে। তিনি মনে করেন না এসবের স্থায়িত্ব খুব বেশী. জাপানের পুরোন ইতিহাস জাবর কাটলে দেখা যাবে এরা চিরকালই একটু বেশী পরিমাণে অনুভূতিশীল। মনের গভীরতা হয়ত একটু কম, তাই চঞ্চল। তাঁতের মাকুর মতন তারা এ-প্রান্ত আর একবার ওপ্রান্ত করছে। যখন যেদিকে যাচ্ছে তার শেষ ছুঁয়ে আসছে। বলা যেতে পারে একসট্রিমিস্ট। একদিন জাপান বহিরাগত বৌদ্ধ ধর্মকে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করল। দিকে দিকে গড়ে উঠলো বৌদ্ধমূর্তি আর মঠ। পাশ্চাত্ত্যের হাওয়ায় তা কোথায় উড়ে গেল। বৌদ্ধমূর্তি আজ বুঝি শুধু turist attraction। আজ বৌদ্ধ ধর্ম আধুনিক জাপানের মানুষের মনে শুধু স্মৃতির খোরাক।

কিন্তু তিনি মনে করেন যে প্রত্যেক জাপানীর অবচেতন মনে একটা ভাবধারা বয়ে চলেছে যা এশিয়ার নিজস্ব ভাবধারার একটি শাখা। তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে কোনদিনই পারবে না। দেখা যাবে একদিন আবার তারা ফিরে আসছে পুরাতনের দিকে। এটা অবশ্যই তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি। বৈজ্ঞানিক কোন বিশ্লেষণ নেই।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম "আপনি কি মনে করেন প্রত্যেক জাতির ভিতর একটা "spiritual bindings" বা আধ্যাত্মিক বন্ধনের কোন প্রয়োজন আছে।"

"অবশ্যই—তবে তার প্রকাশ খুব বেশীও ভাল নয় আবার আমাদের আজকের মতন সব ছেড়ে দেবার ভাণ করাও ভাল নয়।"

"আজকের জাপানের আর্থিক ও বৈষয়িক উন্নতি এত হয়েও কেন এশিয়ার নেতৃত্ব পাচ্ছে না?" এই প্রশ্নের উত্তরে সেই পুরোন কথাই টেনে এনে বললেন "এই দেখ না জাপানের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সংগে সংগে কত economics growth ও এসে গেছে। সমস্ত জাপান আজ ইয়োরোপ আর আমেরিকাকে চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ইচ্ছা করলে এশীয় দেশগুলোও তাদের সংগে টেক্কা দিতে পারে, তাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু কই এশিয়ার নেতৃত্ব তো পাচ্ছে না। কারণ আমাদের সব তাতেই যেন একটা ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি এসে গেছে। যত দিন যাচ্ছে ততই মানসিক বৃত্তিগুলো হারিয়ে ফেলছি।"

বললাম—"এই লিডারশিপ না পাওয়ার কারণ কি?"

কি বললেন জানেন? "It is open to all, we have no definite Philosophy at present" অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। নিজের দেশে বসে একজন বিদেশীর সামনে এত বড় সত্য কথা বলতে এই প্রথম একজন জাপানীকে দেখলাম। কত সাবলীল সেই প্রকাশ ভঙ্গি। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল। সত্যকে এরা প্রকাশ করতে ভয় পান না, লজ্জা পান না।

ভারত সরকারের আমন্ত্রণে উনি ভারতের দিকে পাড়ি জমাচ্ছেন ২৬ সেপ্টেম্বর। বিশেষ কোন বাঁধাধরা উদ্দেশ্য নেই। বললেন—"দেখি আগে যাই তো। ভারতের জীবন স্রোতে গা ভাসাতে চাই। যদিও খুব সামান্য সময়: যা ভাল লাগবে তুলে নেব, তাকে জানবার চেষ্টা করব। যা ভাল না লাগবে তা ভুলে যাবো। কি হবে বিশেষ কিছুকে মনে স্থান দিয়ে।" অনেক ব্যবসায়ী জাপানীকে দেখেছি যাবার আগেই জিজ্ঞাসা করেন অনেক নোংরা খবর। তারপর যত রাস্তার নোংরা আর আবর্জনা, সমাজের কলঙ্ক যে তুলে আনে নিজের মনে—ক্যামেরার ছবিতে। ভাবলাম কত তফাত।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অগাধ শ্রদ্ধা। যদিও জানালেন খুব একটা কিছু জানা নেই। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই উনি বিশেষ কিছুই জানেন না। প্রথমত ভারতের ভাবধারা, সংস্কৃতি, ধর্ম যা এদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে সবই এঁরা পেয়েছেন চীনের মাধ্যমে। অনেক সময় অনেক কিছু বিকৃত হয়েছে। ফলে ভারত সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা পোষণ করেছেন। আজ সকলেই উৎসাহী ভারত আর জাপানের যে-কোন পরিচিতি যেন সরাসরি সম্ভব হয়। ১৯৪৫ সাল থেকেই সংস্কৃত থেকে অনেক কিছু অনুবাদ হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এই ধরনের প্রচেষ্টার উপর ওঁর যথেষ্ট আগ্রহ।

ভারত এবং জাপান কোন সূত্রে একে অপরের কাছাকাছি আসতে পারে এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন—"আমার এ বিষয়ে সঠিক কোন ধারণা নেই। তবে একে অপরকে যত বেশী জানবার সুযোগ পাবে ততই পরস্পর কাছাকাছি আসবে। যে কোন সূত্রেই তা হতে পারে। আমি এ বিষয়ে অবশ্যই জানবার চেষ্টা করব কোনটা সব থেকে সহজ এবং সরল পথ। তবে আমার মনে হয় যদি ভারতের চিন্তাধারা দর্শনের সংগে জাপানের বাস্তবতা কর্মপটুতা যোগ হয় তাহলে আমরা পৃথিবীকে এক নূতন পথ দেখাতে পারব।"

ভারতের যে সকল সমস্যা উনি কাগজে পড়েন তার ভিতর জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করলেন। কিন্তু ওঁর মতে আমরা আমাদের জনসংখ্যা ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছি না। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আগে জাপানের জনসংখ্যাও তৎকালীন শাসকবর্গের উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। সেই সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে তারা ভেবেছিল দেশের সীমানা বৃদ্ধি। প্রয়োজন হয়েছিল মাঞ্চুরিয়া, মালয়-এশিয়ার। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজবার সংগে সংগে। ফল হয়েছিল একেবারে উল্টো। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে তারা চল্লিশ মিলিয়ন দেশবাসীকে হারাল। সমস্যার সমাধান হল অনেক চোখের জলে। রক্তের মাশুল দিয়ে বুঝল যে তাদের ধারণা কত ভুল। নূতন সাজে জাপান সাজতে শুরু করল। কারিগরী বৃত্তিকে সম্বল করে এগিয়ে গিয়ে দেখল, আরও লোকবল দরকার।

আজ জাপান চাইছে আরও মানুষ।

জওহরলাল নেহেরু সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা। অনেক বিষয়ে কেনেডির সংগে তুলনা করলেন। বললেন যে, নেহেরুর গুণগুলো শুধু ছিল খুব কম রাজনীতিবিদের ভিতরেই তা দেখা যায়। সব থেকে জোর দিলেন—"তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব।"

পথের পাঁচালী দেখেছেন কয়েকবার। গল্পের গতি তাঁকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করে। সত্যজিত রায়ের কথা বললেন। 'পথের পাঁচালীর' ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে প্রভূত প্রশংসা শুনলাম।

এক বিরাট ব্যক্তিত্ব লেখক মিশিমা। জাপানের Japanese—KEN-DO বা তলোয়ার খেলায় ইনি একজন বিরাট লোক। আজকে তিনি পুরো মাত্রায় লেখক।

"—বলতে পারেন আমি আজ একজন প্রোফেশনাল লেখক। তবে পাশ করবার পর আট মাস ফিনান্স বিভাগের কাজ করেছি।" কিন্তু ওই অল্প কদিন বাঁধাধরা জীবন। তারপর মুক্ত। মনে হয় উনি লেখক না হলেও তলোয়ার-যুদ্ধে উনি টেলিভিশন-এর মাধ্যমে প্রভূত যশ ও অর্থ রোজগার করতে পারতেন। এখন উনি 4th grade sowrd fighter-এ ছাড়াও উনি 'Karate'-এও পারদর্শী।

এক ঘণ্টার নাম করে আড়াই ঘণ্টা সময় ওঁর সংগে কাটালাম। বললেন যে উনি জাপানের জাতীয় ন্যাটাশালার একজন সভ্য। সেখানে যেতে হবে। শেষে বলে গেলেন—"আমি ভাল ইংরাজী বলতে পারি না—আমার সঠিক চিন্তাধারা হয়ত ব্যাহত হল তার জন্য ক্ষমা চাইছি।" বলা বাহুল্য উনি যে কোন ভারতীয় বা জাপানীর চাইতে ভাল ইংরেজী বলেন।

দুজনেই দুজনকে 'সায়োনারা' জানালাম।

বিকাশ বিশ্বাস
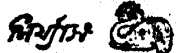
দৌড় ঝাঁপ,
লাথি লাফ, চিৎপটাং
ছেলেমেয়েদের
যে-কোনো দুরন্তপনায়
সমানে পাল্লা দেবে
স্কুলে আর খেলার মাঠে, প্রতিদিনকার হাঁটা-চলার
ঠিক যেমনটি চাই, সেইভাবেই তৈরি বাটার
ছোটোদের জুতো। ফিটফাট, শোভন
স্টাইল, নরম চামড়ার প্রশস্ত ঘের,
আঙুল মেলার অবাধ পরিসর। মজবুত তলি,
আর গোড়ালিও তেমনি—লাগসই, আরামপ্রদ,
আশ্চর্য টেঁকসই। বাটার ছোটোদের জুতোর
বৈশিষ্ট্যটাই এই। আপনার ছেলেমেয়েদের
সঙ্গে নিয়ে বাটার দোকানে আসুন,
মাপমতো ঠিক জোড়াটি আমরাই বেছে দেব।
আজই আসুন, এই জুতোগুলোর
চাহিদা খুব বেশি।
Bata

দিনরাতের খেলা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

উনিশ

জুবেল সার্কাস ছেড়ে চলে যাবার সময় হয়ে এসেছে নলিনীর। হয়তো এই ক্যাম্পেই হঠাৎ একদিন এসে পড়বে তার বাবা—রাঘবনের সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে। এ সব কথা ভাবতে ভাবতে কয়েকদিন থেকে বড় বিমর্ষ হয়ে আছে নলিনী।

রাঘবনের ট্রুপের প্রথম মেয়ে সে, পরে এসে শ্রীধরন। তারপর হেমলতা। সব শেষে রেবতী আর আমিনা। রাঘবন দর্জির মতন মেরেছে নলিনীকে, না খেতে দিয়ে শাস্তি দিয়েছে অনেকদিন—তাহলেও এই ট্রুপের ওপর বড় মায়া তার। এখন একে চলে যাবার কথা মনে হলেই নলিনীর মন খারাপ হয়ে যায়।

এক ঝুড়ি বাসি কমলা লেবুর মতন ...বির মধ্যে ঠাসাঠাসি করেছিল রাঘবনের ...পের ছেলেমেয়েরা। এখন তাদের চুল রুক্ষ, শুকনো মুখ, হাতে-পায়ে ধুলো লেগে আছে। প্র্যাকটিসের পরেও ক্লান্তির কোন চিহ্ন নেই তাদের শরীরে। খুব খিদে পেলেও না খেয়ে খেয়ে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, সে কথা কেউ উচ্চারণ করবে না—শুধু ম্লান চোখে তাকিয়ে থাকবে নলিনীর দিকে, রান্না শেষ হওয়ার আশায় বসে থাকবে।

রান্নার আয়োজন করছে নলিনী। সকলের জন্য খুব অল্প চাল তাকে বের করে দেয় রাঘবন। পেট ভরুক আর না ভরুক, সে যাকে যতটুকু দেবে তা-ই খেয়ে থাকতে হবে। রাঘবন কারুর ওপর অসন্তুষ্ট হলে খাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে বলে উঠবে, "আজ তোর খাওয়া বন্ধ।"

ময়লা জামা-কাপড় একটা বালতির মধ্যে জড়ো করছে হেমলতা। শ্রীধরন রাঘবনের কালো ভারী জুতোয় কালি লাগিয়ে জোরে জোরে ব্রাশ করছে। আমিনা আর রেবতীর বেলা কম, প্র্যাকটিস করে তাঁবুতে ফিরে এসেও রাঘবনের হুকুম মতন ছোট ছোট বল হাতে নিয়ে তারা জাগলিং করে যাচ্ছে।

"এ নলিনী", একটা চিঠি পড়তে পড়তে কড়া স্বরে রাঘবন বলল, "তোর বাপকে আজ লিখে দিলাম, নিয়ে যাক তোকে। আমি নতুন মেয়ে নিয়ে আসব।"

"আমি যাব না মাস্টার।"

"না, যাবি না", মুখ বিকৃত করে চিঠিটা পকেটে রাখতে রাখতে রাঘবন বলল, "তোর বাপকে চিনিস না তুই? খালি টাকা আর টাকা! টাকা ছাড়া সে আর কিছু জানে নাকি?"

মশলার একটা কৌটো খুলতে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল নলিনী। তার দাঁত বড় সুন্দর। নকলের মতন। কথা বলবার সময় নলিনীর দাঁত ঝকমক করে উঠল, "মাস্টার, তুমি বাবাকে টাকা পাঠাও না?"

"জানিস না তুই?" এত সময় আস্তে কথা বলছিল রাঘবন, এখন চিৎকার করে উঠল, "যখনই চায় তখনই পাঠাই।"

"তবে আমাকে নিয়ে যেতে চায় কেন?" নলিনী মুখ নামিয়ে ধরা গলায় বলল "নতুন সার্কাসে একা একা আমি কাজ করব না।"

"নতুন সার্কাসে তোকে দিয়ে মজা বুঝুক তোর বাবা! আমিও দেখব কে কত টাকা দেয়!"

"বাবা এলে আমি বলব, আমি যাব না।"

রাঘবন শুকনো হাসল, পরে রুক্ষ স্বরে বলল, "মাসে তিরিশ টাকা দিতে চাইলাম, রাজী হল না তোর বাপ। বলে, মেয়ে বড়

হয়েছে, দেখতে ভাল, তিন চারটে নম্বর করে—আড়াই শো টাকা না দিলে মেয়েকে রাখব না তোমার ট্রুপে—"

নলিনী বাধা দিয়ে বলল, "তুমি যা-ই দাও মাস্টার, তুমি আমাকে খেলা শিখিয়েছ, মেয়ের মতন করে রেখেছ—"

"সে সব কথা বুঝবে তোর বাপ?" আমিনার হাত থেকে একটা বল পড়ে গিয়েছিল, তা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে এসেছিল রাঘবনের পায়ের কাছে। সে আমিনার গালে জোরে একটা চড় মেরে নলিনীর দিকে ফিরে বলল, "তোর খাওয়ার খরচ নেই? জামাকাপড়ের খরচ নেই? আমিও দেখব তিরিশ টাকার বেশী কোথা থেকে পায় তোর বাপ! হুঃ, আড়াই শো টাকা!"

নলিনীর কাছে তিরিশ টাকা যা, আড়াই শো টাকাও তা-ই। যেখানেই তাকে নিয়ে যাক তার বাবা, সে খুশী হবে না। রাঘবন তাকে যত কম খেতে দিক, এখানে সে খেতে পায়। অন্য জায়গায় এমন খাওয়া জুটবে কিনা, তা সে জানে না। তা ছাড়া এখানে সকলেই তাকে ভালবাসে। হেমলতা শ্রীধরন আমিনা রেবতী তার আপনার লোকের মতন। এদের ছেড়ে, এই সার্কাস ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবলেই মুখ শুকিয়ে আসে নলিনীর।

রাঘবন বলল, "আমি ডাকঘরে যাচ্ছি। এই যে, তোর বাপের চিঠি আজ ছাড়ব।"

"না, মাস্টার!"

"চুপ নলিনী", রাঘবন ধমক দিয়ে বলল, "তোর বাপ এলে যা-হয় বলবি। তোদেরও চিনি আমি। সব সমান বদমাশ। বাপের সামনে মুখে কথা ফোটে কি না আমিও দেখব।"

নলিনী খুব করুণ করে বলল, "আচ্ছা।"

যত কথা এখন রাঘবনের সঙ্গে বলল নলিনী, তত কথা বলবার সাহস আর কারুর নেই। নলিনীরও আগে ছিল না, এখন চলে যাবার কথা ওঠে বলেই তার সাহস বেড়েছে। রাঘবন পোস্ট অফিসে বেরিয়ে যাবার পর কারুর সঙ্গে আর কথা বলল না নলিনী, চুপচাপ রান্না করতে থাকল। আমিনা আর রেবতীর হাতে বল নাচছে। ঘষ ঘষ করে জুতো ব্রাশ করছে শ্রীধরন। হেমলতা তার বালতি হাতে তুলে বাইরে যেতে গিয়েও গেল না, নলিনীর পাশে এসে বলল, "আমাকে কবে আমার বাবা নিয়ে যাবে, জানি না। নলিনী, তুই যেতে চাস না কেন?"

নলিনী আস্তে মাথা নেড়ে বলল, "মাস্টারকে দেখতে পাব না, তোদের কাউকে দেখতে পাব না, কোথায় যাব!"

"মা-বাবার কাছে থাকবি, তোর ভাই-বোনদের দেখবি।"

নলিনী রান্না করতে করতে হাসল, "বাড়িতে রাখবার জন্যে বাবা আমাদের নিয়ে যাবে নাকি ভাবছিস? কেন দিয়েছে সার্কাসে জানিস না? বাড়িতে খাওয়া নেই রে হেম!"

এত সময় হেমলতার শুধু তার বাড়ির কথা মনে হচ্ছিল, অভাবের জন্যে তাকে যে সার্কাসে আসতে হয়েছে তা সে ভুলে গিয়েছিল। এখন আবার সব মনে হল হেমলতার। সে একটা নিশ্বাস ফেলে পলকে একবার শ্রীধরনকে দেখে নিল।

এ সময় রাঘবনের ট্রুপের ছেলেমেয়েরা কিছু অসাবধান, হালকা কথা বলে হাসা-হাসি করে। আজ হেমলতার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল শ্রীধরন। খিদিরপুরে ক্যাম্পে তার সঙ্গে শেষবার সে কথা বলেছে, শ্রীধরন অনেকবার চেষ্টা করলেও মুখ ঘুরিয়ে সরে গেছে হেমলতা—একটাও কথা বলে নি।

রাঘবনের জুতো পালিশ করবার পরে শ্রীধরন নিচু হয়ে দেখল চকচকে চামড়ায় মুখ দেখা যায় কিনা, তারপর হেমলতার কাছে এসে বলল, "এ হেম, আয়না চাই?"

হেমলতা শ্রীধরনের কথার উত্তর দিল না, সে বেরিয়ে যাচ্ছিল—ইতস্তত করল না শ্রীধরন, জুতো খাটের তলায় ঠেলে দিয়ে তার হাত থেকে বালতি কেড়ে নিয়ে বলল, "আমার কথা শুনতে পাস না?"

"নলিনী", হেমলতা চিৎকার করে উঠল, "ওকে বল আমার বালতি দিয়ে দিতে।"

"দেব না, যাঃ!"
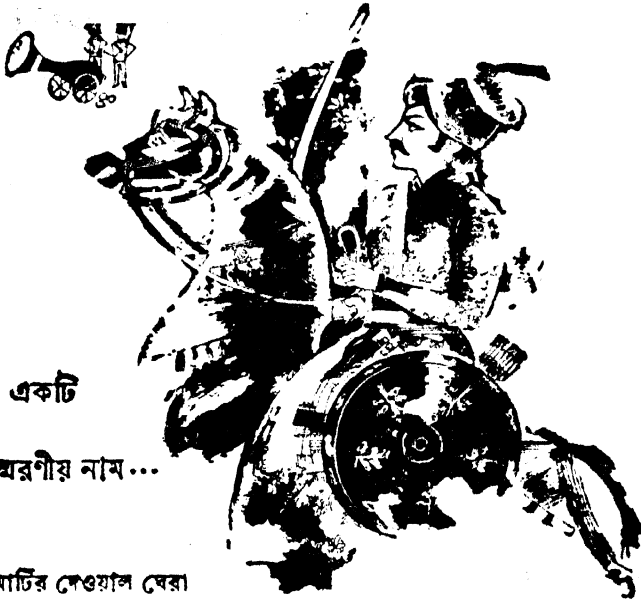
"আমার কাজের দেরী হয়ে যাচ্ছে মাস্টার আমাকে বকবে—"

শ্রীধরন হঠাৎ স্বর নামিয়ে নিল। হেমলতার বালতি ছেড়ে দিয়ে তার একটা হাত শক্ত করে ধরে বলল, "হেম জানস, তুই আমার সংগে কতদিন কথা বলিস নি?"

হেমলতা কিছু বলবার আগেই রান্না করতে করতে নলিনী বলল, "কেন তুই ওকে মার খাওয়ালি? খিদিরপুরের ক্যাম্প ওর নামে মাস্টারের কাছে লাগিয়েছিলি, মনে নেই?"

হেমলতার হাত ছেড়ে দিল শ্রীধরন, বিমূঢ় হয়ে গেল। সবই মনে আছে শ্রীধরনের। কিন্তু হঠাৎ তার কী হয়েছিল সেদিন তা সে স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না। রাঘবনের কাছে সে অনেক মার খেয়েছে, অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে—মার খাওয়ার ভয় তার খুব বেশী নেই। খিদিরপুরের ক্যাম্প থেকে চলে আসবার দিন যেখানে তাদের থেকে বলে গিয়েছিল রাঘবন সেখান থেকে প্রজাপতি ধরবার জন্য তাকে কিছু দূরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল হেমলতা। রাঘবন তাদের ঠিক জায়গায় দেখতে না পেয়ে খুব রেগে গিয়েছিল। শ্রীধরন হঠাৎ তাকে বলে দিয়েছিল, সে জায়গা ছেড়ে যায় নি, হেমলতা তাকে অন্য দিকে যেতে বলেছিল।

হেমলতার দিকে এখন তাকাতে পারল না শ্রীধরন, নলিনীর দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে সে স্বীকার করল, "নলিনী, আমি হেমের নামে মাস্টারের কাছে লাগাই নি, তুই বিশ্বাস কর। আমার মুখ থেকে সত্যি কথাটা হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল—"

হেমলতা রেগে বলে উঠল, "কী সত্যি কথা? তুই চুপ করে থাকলেই পারতিস—"

"হেম!"

"তোর সংগে আমি কথা বলব না, কখনো না। তুই ভীতু, তুই আবার আমাকে মার খাওয়াবি—"

"না হেম, এবার থেকে আমি নিজে মার খাব—তুই দেখিস", শ্রীধরন একটু চুপ করে থেকে বলল, "সেদিন আমি যদি জানতাম মাস্টার তোকে অত জোরে মারবে—"

"না, জানতিস না? মাস্টার কখনো আস্তে মারে?"

হেমলতা অনেকদিন পর আজ আবার শ্রীধরনের সংগে কথা বলছে বলে তার স্বরে একটা আবেগ থরথর করে উঠছিল। রাঘবন শ্রীধরনকেও যে হেমলতার চেয়ে বেশী জোরে অনেকবার মেরেছে তা তাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে সে বলল, "হেম, তুই কথা বলিস না বলে মন ঠিক নেই আমার, খেলায় রোজ ভুলে হয়ে যায়, মাস্টার কত মারে, দেখতে পাস না?"

"বেশ করে।"

"বলবি তো। আমি মার খেলে তোর মজা লাগে, না?"

শ্রীধরন হেমলতার বালতি ওপরে তুলে পরেই আবার খুব জোরে তা নিচে ফেলল।

"তোর মজা লাগে, তুই ভীতু!"

শ্রীধরন খুব জোরে বলল, "না। হেম, মাস্টার আমাকে মরুক, মারতে মারতে মেরে ফেলুক—আমি তোর নাম আর কখনো করব না, তুই দেখিস!"

শ্রীধরন যত জোর দিয়েই বলুক, তার কথা বিশ্বাস করতে পারল না হেমলতা। অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল তার দিকে, তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করে হাসল। তারপর বালতি তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বাইরে কলের কাছে গেল।

শ্রীধরন ভাবছিল সে-ও যাবে কি না তার সংগে সংগে। কলের কাছে এখন কেউ নেই, রোদও না। চার পাশ ছায়ায় ভরে গেছে। পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলল শ্রীধরন। তার হাতে জুতোর কালি লেগে আছে। সে হাত সামনে মেলে কলের দিকে যাচ্ছিল। হেমলতা কিছু জিজ্ঞেস করলে সে তাকে তার কালি লাগা হাত দেখিয়ে বলবে, তার সংগে কথা বলবার জন্যে আসে নি—হাতের ময়লা ধুয়ে ফেলতে সেও কলের কাছে এসেছে।

নলিনীর সব কাজ খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। অল্প রান্না, শুধু ডাল ভাত—ডালের মধ্যে লংকা পেঁয়াজ আর দু-একটা আলু। রাঘবন থাকলে মাঝে মাঝে বেশী করে নুন ছিটিয়ে দেয়—ছেলেমেয়েরা কম খায় তাহলে—ওবেলার জন্যে কিছু বাঁচিয়ে রাখা যায়।

এখনো হাতে বল নাচাচ্ছে আমিনা আর রেবতী। তাদের দিকে তাকিয়ে হাসল নলিনী। রাঘবন না ফিরে আসা অবধি তারা

থামতে পারবে না; খেতেও পাবে না কেউ— যাকে যেমন ইচ্ছে ভাত কিংবা রুটি খেতে দেবে রাঘবন।

"নলিনী", কিছু পরে বাইরে দাঁড়িয়ে ঊষা ডাকল। ভেতরে ঢুকতে ইতস্তত করছিল সে, রাঘবন থাকলে ঢুকত না— নলিনীকে ডেকে দিয়ে যেত তার ভাবুতে।

নলিনী ঊষাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল, তার ডাক শুনে বাইরে এসে হেসে বলল, "কী?"

"মাস্টার কই?"

"ডাকঘরে গেছে। এখুনি আসবে। কিছু দরকার আছে?"

"না না", খুব মিষ্টি করে হাসল ঊষা। তার বুকের মধ্যে পুষ্পরাজের চিঠির ছেঁড়া টুকরোগুলো খচখচ করে উঠছিল, তা অনুভব করতে করতে সে বলল, "দরকার আমার তোমার সাথে।"

"কী দরকার?"

কিছু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ঊষা, অল্প কাত হয়ে গেটের দিকে তাকিয়ে দেখল পুষ্পরাজ ফিরে আসছে কিনা। পরে খুব নিচু স্বরে নলিনীকে বলল, "কিছু কাজ আছে তোমার এখন?"

"না।"
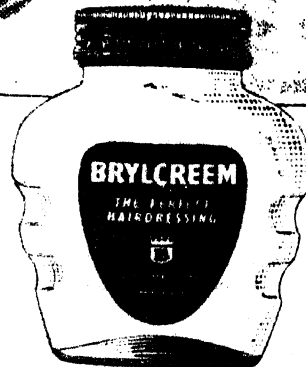
"আমার রাউটিতে যাবে?"

নলিনী হেসে মাথা নাড়ল, "না, মাস্টার এসে পড়লে বকবে", এখন রান্না হয়ে গেছে, বাইরে যেতে পারে না নলিনী। সে না থাকলে মুঠো মুঠো ভাত চুরি করে খাবে রেবতী আর আমিনা। খাবার সময় কম ভাত দেখলে রাঘবন তাকেই বকবে। এসব কথা ভেবে খুব ইচ্ছে করলেও নলিনী উষার তাঁবুতে যেতে পারল না।

এখনো ইতস্তত করছিল উষা। তার ভয় হচ্ছিল, লজ্জা হচ্ছিল। একবার ভাবল কাকে কী লিখেছে পুষ্পরাজ সে সব তার জানবার দরকার নেই, চুপচাপ আবার তাঁবুতে ফিরে গেলেই হয়। হয়তো এখন ফিরে এসেছে পুষ্পরাজ, কে জানে!

কিন্তু কৌতূহল বেশী সময় দমন করে রাখতে পারল না উষা, রাঘবনের তাঁবুর ভেতরে ঢুকে নলিনীকে জিজ্ঞেস করল, "লেখাপড়া জান নলিনী, পড়তে পার?"

"আমার ভাষা পড়তে পারি।"

চিঠি লেখার যে প্যাড কাগজে লুকিয়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল উষা তা নলিনীর হাতে দিয়ে বলল, "এতে কী লেখা?"

"এ তো আমার ভাষা।"

উষা অধীর হয়ে বলল, "কী লেখা আছে, পড়না?"

প্রথমে অস্ফুট চিৎকার আনন্দের পুষ্প-রাজের চিঠি পড়ল নলিনী, পরে উষার দিকে তাকিয়ে বলল, "পড়ব?"

"হ্যাঁ। কাকে লিখেছে, সার্কাসের মালিককে?"

"না না", নলিনী হাসল, "কে লিখেছে চিঠি?"

উষার আর অপেক্ষা করবার ধৈর্য ছিল না, সেও নলিনীর পাশে দাঁড়িয়ে প্যাডের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "পড়।"

চিঠি শেষ হয় নি। আরও অনেক লিখবে পুষ্পরাজ। কিন্তু আর কিছু জানবার দরকার নেই উষার। অসমাপ্ত চিঠি থেকে যেটুকু জানতে পারল তা-ই অনেক। সব শুনে গেছে নলিনী। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল উষার। আগে যদি সে জানতে পারত এসব কথা পুষ্পরাজ লিখেছে বউকে তাহলে উষা আসত না নলিনীর কাছে। এখন কেমন করে এখান থেকে নিজের তাঁবুতে ফিরে যাবে তা ভাবতে পারছিল না বলেই সে জড়ের মতন দাঁড়িয়ে রইল।

"চেল্লাপেট্টা অর্থাৎ প্রিয়তমা—এক-একটি শব্দের অর্থ উষাকে বুঝিয়ে পুষ্পরাজের লেখা চিঠি পড়ে দিয়েছে নলিনী। পুষ্পরাজ তার বউকে লিখেছে, খুব গোল-মালের মধ্যে ছিলাম, অনেকদিন তোমাকে টাকা পাঠান হয়নি। খুব ভাবনা করছ নাকি? আমি ভাল আছি। ভাবনা কর না।

একটা বোকা মেয়ের জন্যে আমাকে কোহিনূর সার্কাস ছাড়তে হয়েছে। এখন আমি তার দেখাশোনা করছি। কুন্দনলাল নামে একটা বদমাশ লোকের সঙ্গে উষা থাকত। একদিন সে তাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। তখন কুন্দনের সঙ্গে খুব ঝগড়া হয় আমার। উষার পেটে বাচ্চা আছে। কোথায় যাবে বেচারী। আমি তাকে ট্রাপিজ শিখিয়ে-ছিলাম বলে সে আমার কাছে এসে খুব কান্নাকাটি করে। এখন জুয়েল সার্কাসে উষা আমার ট্রুপেই আছে। সে যা মাইনে পাবে সবই আমার। আমি এখন থেকে বেশী টাকা পাঠাব তোমাদের। উষার দেখাশোনা আর বেশী দিন করব না। তার দল একটু ঠিক হলেই তাকে তাড়িয়ে দেব—

চিঠির প্যাড আবার কাগজে মুড়িয়ে নিতে উষার অনেক সময় লাগল। সব জেনে গেছে নলিনী তাহলেও তার দিকে তাকিয়ে হেসে উষা, খুব হাসতে বলল, "সব মিথ্যা।"

নলিনী বলল, "তোমার বাচ্চা হবে নাকি?"

"দূর, না।"

কিছুদূরে কলের কাছে জল ছিটিয়ে-ছিটিয়ে খেলা করছে হেমলতা আর শ্রীধরন। ওদের ঝগড়া একেবারেই মিটে গেছে। তাদের দেখতে দেখতে নলিনী ভাবল উষার চিঠি পড়ে দিয়ে সে ভুল করেছে, তাকে সব কথা না বুঝিয়ে দিলেই হত।

উষা আর একটাও কথা বলল না নলিনীর সঙ্গে, কোনদিকে তাকিয়ে দেখল না, দিনের আলোয় চলতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। পেটে বড় যন্ত্রণা, মাথাও ঘুরছে। চিঠি লেখার প্যাডটা গরম লোহার মতন তার হাতে লাগছে। উষা নিজের তাঁবুতে ফিরে এল।

তারও আগে ফিরে এসেছিল পুষ্পরাজ। উষা দেখল বিছানা বালিশ উল্টে সে তন্ন-তন্ন করে চিঠি লেখার প্যাড খুঁজছে। উষা এখন সেটা লুকিয়ে রাখবার কোন চেষ্টা করল না, পুষ্পরাজের দিকে তা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এই নেও।"

পুষ্পরাজ উষার হাত থেকে প্যাড কেড়ে নিয়ে আগে দেখল তার চিঠি ঠিক আছে কি-না, পরে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল "কাঁহা গিয়াথা?"

উষা তাকিয়েছিল পুষ্পরাজের দিকে। তার দৃষ্টিতে ব্যথা ছিল, ঝাঁজ ছিল এবং একটা অবিশ্বাস তার দেহকে ট্রাপিজের মতন শূন্যে দুলিয়ে দিচ্ছিল। মিথ্যা কথা বলবার আগে সে এক মুহূর্তও ইতস্তত করল না, পুষ্পরাজের কথার উত্তরে বেশ স্পষ্ট করেই বলল, "যমুনাকা রাউটিমে গিয়াথা।"

"হামরা প্যাড লেগিয়া কেঁও?"

"হামকো চিট্টি লিখনে কা লিয়ে—" একবার যখন মিথ্যা কথা বলতে পেরেছে পুষ্পরাজকে তখন আবার বলতে বাধল না উষার এবং দরকার হলে সে আরও বলবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থেকে।

পণ্ড্স
ড্রীমফ্লাওয়ার
ফেস পাউডার
আপনাকে দেবে
ফুলের
মতো
রমণীয় মুখশ্রী
পণ্ড্স ড্রীমফ্লাওয়ার ফেস পাউডার সারা মুখে ফোটায় সুষম লাবণ্য…ছোটখাট খুঁতগুলো আড়াল করে…এবং কোথাও থেবড়ে থাকে না! আপনার স্বাভাবিক মুখের রঙ আরো মনোরম করে তুলতে চমৎকার রকমারি রঙে পাবেন।
চীজব্রো-পণ্ড্স ইন্‌ক্
(সীমিত দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)
P-5769

বিখ্যাত এয়ারশিপ হিন্ডেনবুর্গ হিলিয়াম গ্যাসে পূর্ণ করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ঐ গ্যাসের অভাবে হাইড্রোজেন ব্যবহার করার ফলেই জাহাজটি পুড়ে যায়

...াওয়াই জাহাজের কি ভবিষ্যৎ আছে?

...রোপ্লেনকেও হাওয়াই জাহাজ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আমি এরোপ্লেনের বলছি না, বলছি যুদ্ধের আগেকার ...লিনগুলির কথা। কয়েকটি দুর্ঘটনা ...পর জেপিলিন নির্মাণ বন্ধ করে ... হয়। সে আজ প্রায় ৩০ বছর ...গেল। কিন্তু আজও এমন কিছু ...রা আছেন যাঁদের মতে জেপিলিন ... উড়োজাহাজের দিন ফুরোয়নি এবং ...ধরনে সেগুলি পুনরুজ্জীবিত করা ...পারে। তাঁরা মনে করেন যে, গঠনে ...কোন ত্রুটি না থাকে এবং জাহাজে ...শ ভাসাবার জন্য হাইড্রোজেনের ...র্তে যদি হিলিয়াম গ্যাস ব্যবহার করা ...া হলে সেই হাওয়াই জাহাজ (এয়ার ...) অন্য যে-কোন উড়োজাহাজের চেয়ে নিরাপদ হবে। যে-কোন কারণে ...গ্যাস যদি বেরিয়েও যায় বা ইঞ্জিন ... কাজ না করে তবু ঐ জাহাজ ...র চেয়ে সামান্য ভারি বলে খুব ধীরে ...ব আস্তে আস্তে মাটিতে এসে পড়বে ...যাত্রীদের প্রাণ যাবে না।

...য়াই জাহাজে এ পর্যন্ত যতগুলি দুর্ঘটনা ঘটেছে তার অধিকাংশই ঘটেছে হয় গঠনে গলদের জন্য, না হয় হাইড্রোজেন জ্বলে যাবার জন্য কিংবা ঐ দুটি কারণই একসঙ্গে ঘটার জন্য।

আজকালকার বড় বড় জেটচালিত এরোপ্লেনগুলির ওঠানামার জন্য দরকার হয় বিরাট লম্বা পথ (রান্‌ওয়ে)। সেই-জন্য গত ২০ বছর যাবৎ গবেষণা চলে আসছে সেগুলি হেলিকপ্টারের মত সোজাসুজি ওঠানো-নামানোর জন্য। কিন্তু তার জন্য খরচ হবে বিপুল পরিমাণ ইন্ধন। সেই ইন্ধন আর পাওয়ার প্ল্যান্টের ওজন মিলিয়ে জাহাজের একের তিন ভাগ ওজন হবে। আর বিমান যত বড় হবে ততই ইন্ধন লাগবে বেশী যার বেশ কিছুটা অংশ হবে অপচয়।

কিন্তু হাওয়াই জাহাজে এই ব্যাপার ঘটবে না; কারণ, হাওয়াই জাহাজ যতটা হাওয়া সরাবে সেই অনুপাতে সে উপরের দিকে উঠবে। জাহাজের ব্যাস যদি দ্বিগুণ করা যায় তা হলে চার গুণ উপরে উঠবে এবং সেই সঙ্গে দৈর্ঘ্যও যদি দ্বিগুণ করা যায় তা হলে উঠবে আট গুণ। তারপর পাওয়ারের দিক থেকেও এয়ার শিপে সুবিধা। এরোপ্লেনে প্রতি ১২০ পাউণ্ডের জন্য লাগে ১ অশ্বশক্তি। তার মানে ৩৩৫০০০ পাউণ্ড ওজনের একটি ডিসি-১০ বিমানের মাটি থেকে আকাশে ওঠবার জন্য লাগছে ৪০০০০ অশ্বশক্তি, যে ক্ষেত্রে ৭৬০০০০ পাউণ্ড ওজনের একটি হাওয়াই জাহাজের লাগবে মাত্র ৬০০০ অশ্বশক্তি।

এয়ার শিপগুলি নিরাপদ নয় এই ধারণা ঠিক নয়। হাইড্রোজেন-পূর্ণ এয়ার শিপ-গুলি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিমান-মারা কামান বা আগুনে বুলেট দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া গিয়েছিল বলেই এই ভুল ধারণার উৎপত্তি। যুদ্ধের পরেও ঐ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যত বিপদের মূলে হচ্ছে হাইড্রোজেন। এটা ঠিক যে, হাইড্রোজেন হচ্ছে সবচেয়ে হাল্কা পদার্থ। কিন্তু তেমনি গ্যাসটি সহজেই জ্বলে ওঠে। হাল্কা ওজনের দিক থেকে হাইড্রোজেনের পরেই হিলিয়ামের স্থান এবং এই গ্যাসটি অন্য কোন পদার্থের সঙ্গে মিশে জ্বলে যেতে পারে না। সুতরাং
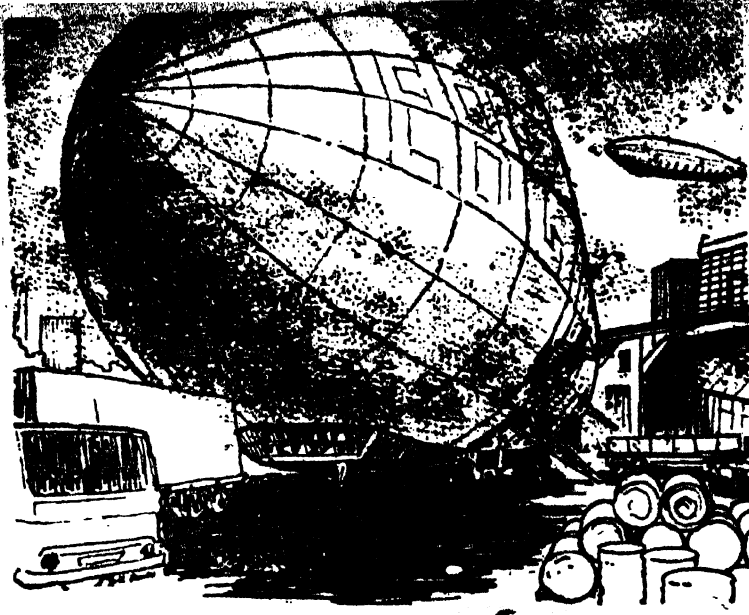
মালবাহী এয়ারশিপের একটি নক্সা

হাইড্রোজেনের বদলে এয়ার শিপে হিলিয়াম ব্যবহার করলে বিপদের সম্ভাবনা অনেকটা কেটে যায়।

ইউরেনিয়াম ও অন্যান্য ভারি পদার্থের তেজস্ক্রিয় পতন থেকেই হিলিয়ামের উৎপত্তি হয় এবং গ্যাসটি সর্বদাই ভূত্বকে উৎপন্ন হয়ে আবহমণ্ডলে গিয়ে মিশছে। অবশ্য সবটাই আবহমণ্ডলে চলে যেতে পারে না, কিছুটা ভূস্তরের মধ্যে গর্তের মধ্যে আটকা পড়ে যায়। সেই গ্যাসটা বার করে নিয়ে আমরা কাজে লাগাতে পারি। আবহমণ্ডলে হিলিয়ামের মাত্রা বেশী নয়—১০ লক্ষ ঘন ফুট বায়ুতে হিলিয়াম থাকে মাত্র ১৮ ঘন ফুটের মত। সুতরাং গ্যাসটি নিকাশ করার খরচ পড়ে যায় প্রতি ঘন ফুটে ১ শিলিং ৩ পেন্সের মত অর্থাৎ ১০ লক্ষ ঘন ফুটে ৫০ হাজার পাউণ্ডের মত। যুদ্ধের আগে হিলিয়ামের সবচেয়ে বড় উৎস ছিল আমেরিকায়। তার পরে ব্রিটিশ অক্সিজেন কোম্পানী এবং আরো দুটি কোম্পানী মিলে সাস্কাচেওয়ান নামে এক জায়গায় প্রচুর হিলিয়ামের সন্ধান পেয়ে সেখানে ক্যানেডিয়ান হিলিয়াম কোম্পানী নামে এক প্রতিষ্ঠান খুলেছেন, যেখান থেকে অনেক কম পড়তা খরচায় হাওয়াই জাহাজের জন্য হিলিয়াম সরবরাহ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

সমুদ্রের ধারে ৬০ ডিগ্রী ফারেনহাইটে ১০০০ ঘন ফুট শুকনো বাতাসের ওজন ৭৬·৩৬ পাউণ্ড; সে ক্ষেত্রে হিলিয়ামের ওজন হচ্ছে ১০·৫৪ পাউণ্ড। তার মানে হিলিয়ামের হাজার ঘন ফুটের উত্তোলন-ক্ষমতা হচ্ছে ৭৬·৩৬—১০·৫৪=৬৫·৮২ পাউণ্ড। তারপর ক্রমশ উপরে উঠবার সময় এয়ার শিপের গ্যাস কোষগুলি ক্রমশ ফেঁপে উঠতে থাকে, যার ফলে জাহাজটি আরো উপরে উঠতে থাকে। তা ছাড়া ঐ গ্যাস গরম করবার যদি ব্যবস্থা থাকে (পারিপার্শ্বিক হাওয়ার চেয়ে বেশী গরম) তা হলে সেই গ্যাস আরো ফুলে ফেঁপে উঠে আরো বেশী বায়ু সরিয়ে দিতে থাকবে। এ ক্ষেত্রে কোন-ভাবেই যাতে গ্যাস বার হয়ে যেতে না পারে তার জন্য গ্যাস কোষের উপযুক্ত আবরণ চাই, যা কোন সংশ্লেষিত পদার্থ বা কোন মজবুত প্ল্যাস্টিকের তৈরি হতে পারে।

বজ্রপাত, ঝড়বাত্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে এয়ার শিপের জ্বলে বা ভেঙে যাবার সম্ভাবনা, এই একটি ধারণা আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বলা যায় যে, হাওয়াই জাহাজে হিলিয়াম ব্যবহার করলে বজ্রপাতেও জাহাজ জ্বলে যাবে না। কারণ, হিলিয়াম একটি অদাহ্য গ্যাস। তা ছাড়া এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে যে, বজ্রপাতের বিদ্যুৎ ধাতব কাঠামোর মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়ে ইঞ্জিনের গ্যাস বেরোবার নল দিয়ে বার হয়ে গিয়েছে। ঝড়, টাইফুন এবং ঘূর্ণিবাত্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে গ্রাফ জেপেলিনকে বহুবার, সম্মুখীন হতে হয়েছে বৃষ্টি ও তুষারপাতের। কিন্তু তাতে জাহাজটির কোন ক্ষতি হয়নি। গ্রাফ জেপেলিনের খোল তুলার মজবুত কাপড়ে মোড়া ছিল বলে তাতে বরফ জমা হতে পারত না, যেমন জমা হয় এরোপ্লেনের ডানায়। তা ছাড়া উত্তর মেরু অঞ্চলে হাওয়ার ঘনত্ব খুব বেশী বলে সেখানে জেপেলিনের উপরে উঠবার খুব সুবিধা।

[illegible] কার এয়ার শিপগুলোর [illegible] ছিল এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাতেও ত্রুটি ছিল। তাই নতুন ধরনের ডিজাইন করা হচ্ছে। ম্যাসাচুসেটস্-এর বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ফ্রান্সিস মর্স এয়ার শিপে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের প্রস্তাব করেছেন এবং সেইমত 'প্র্যাট অ্যাণ্ড হুইটনি' ও জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী দুটি রিঅ্যাক্টর তৈরি করেছেন।

৭৬০০০০ পাউণ্ড উত্তোলন-ক্ষমতা এবং তার জন্য ৬০০০ অশ্বশক্তির প্রয়োজন হলে যে রিঅ্যাক্টরের প্রয়োজন হবে, আবরণ সমেত তার ওজন ১২০০০০ পাউণ্ডের বেশী হবে না। সেই জায়গায় একটি ডিসি-১০ বিমানের ৪০০০০ অশ্বশক্তি চাহিদার জন্য যে রিঅ্যাক্টর লাগবে, আবরণ সমেত তার ওজন হবে ২৫০০০০ পাউণ্ডের মত অর্থাৎ এত বেশী যে, বিমানটি আকাশে উঠতেই পারবে না। আচার্য মর্স বলছেন যে, পরমাণু শক্তিচালিত একটি এয়ার শিপ নির্মাণ করতে খরচ হবে ১০ লক্ষ পাউণ্ডের মত এবং বছর চারেকের মধ্যে সেটি তৈরি করে ফেলা যেতে পারে। ইন্ধনের খরচ এত কম যে, ঐ খরচ উঠে আসতে মোটেই দেরি হবে না।

আপাতত হাওয়াই জাহাজের জন্য পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর নির্মাণে যদি কিছু অসুবিধা থাকে তা হলে ব্রিটেনে নির্মিত 'নেপিয়ার নোম্যাড' নামে যে গ্যাস-টারবাইন যৌগিক ইঞ্জিন আছে তাও উত্তোলনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেই ইঞ্জিন মাটি থেকে আকাশে ওঠবার সময় ৩০০০ অশ্বশক্তি উৎপন্ন করতে পারে যা মালবাহী হাওয়াই জাহাজের পক্ষে যথেষ্ট।

বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে, ভবিষ্যতের বড় মালবাহী হাওয়াই জাহাজের দৈর্ঘ্য হবে তার ব্যাসের ৫ গুণ এবং আয়তন হবে হিণ্ডেনবুর্গের দ্বিগুণ অর্থাৎ বৃহত্তম ব্যাস ১৯০ ফুট এবং দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০০ ফুটের মত। চারটি নেপিয়ার নোম্যাড ইঞ্জিনের সাহায্যে সেটি ৩০০০ ফুট উপর দিয়ে ঘণ্টায় ১১০ থেকে ১১৫ মাইল বেগে উড়ে যেতে পারবে। সেই জাহাজের ৪৪০ টন গ্যাস যতটা জায়গা নেবে তা বাদ দিয়েও মালপত্র, নাবিক ইত্যাদির জন্য জায়গা থাকবে ১০ লক্ষ ঘন ফুট।

বর্তমানে মালবাহী সামুদ্রিক জাহাজ ও মালবাহী এরোপ্লেনের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে এই ধরনের এয়ার শিপ চালু হলে সেই ব্যবধান আর থাকবে না। শুধু তাই নয়, সোজাসুজি মালপত্র নিয়ে যে-কোন জায়গায় সরাসরি নেমে পড়তে পারবে। সেজন্য কোন লম্বা রানওয়ের প্রয়োজন হবে না।

[illegible] চট্টোপাধ্যায়

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

চুয়াল্লিশ

দিক ওদিক, দু' দিক মিলিয়ে হঠাৎ
কেমন ধাঁধায় পড়ে যাই। এদিকে
ণ একজন চোখের ছিলায় টান দিয়ে
চযোগে ভাবে, পোশাকী নাম শোনার,
দিকে তখন অচিনবাবু হাত তুলে
নকা বিদায় নেন। না বলে পারি না,
পনি চললেন ?'

তক্ষণে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছেন।
তাকিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, জয়গুরু জয়-
। ও বেলা দেখা হয়।'

লতে বলতে চলে যান। যাবার আগে
য়—থুড়ি, 'আমার নাম অলকা
র্তী'—সেই অলকার দিকে একবার
হেসে যান। মনে হয়, ওঁর বড়
দর কাঁদে একটু দুষ্টু ছেলের ঝলকানি।
একটু ইশারার ঝিলিক।

ন্তু এদিকে দৃষ্টিবন্ধনে আছি।
চক্রবর্তী চোখ নামায় নি। ফিরে
য়ে দেখি, ওহে, এ দৃষ্টির নাম কী,
জানি না। বিব্রত লজ্জায় হাসতে
অপরাধ করেছি, সন্দেহ নেই।
ই চিঠি আমার চোখের সামনে ভাসছে।
সুরটা এমনি, 'শ্রদ্ধাস্পদেষু, আশা
ভুলে যাননি। তথাপি প্রথমেই নিজের
বলি, আমার নাম ঝিনি, ওরফে
চক্রবর্তী, পিতার নাম শ্রীব্রজনারায়ণ
র্তী, আমাদের দেখা হয়েছিল...'

ালা পরিবার জলবাসে যে নাগরিকাকে
ছিলাম, সেই নাগরিকাই। চোখের
া টুলি এখন হাতে। ব্যাগ ঝুলছে,
দাঁড়িয়ে কনুইয়ের কাছে। চুলে
পড়ে বাঁধুনি নেই, এলো খোঁপায়

জড়ানো রুক্ষ চুলের চূর্ণ কপালে, গালের
কাছে। তাতে রাতের রাঙা ধুলোর
আভাস। রাঙা ধুলো নেই ক্যাণ্ডলা।
নাগরিকার সারা গায়ে মুখে ছড়িয়ে আছে,
তাই কাজল এখন বাসী লাগে, ঠোঁটের আর
কপালের হালকা রাঙা রঙও কেমন বাসী-
বাসী। ঠিক যেন গোধূলির আকাশের
মত রঙ, রেশমী শাড়িতেও সেই ভাব।
নিরাভরণ তেমনি, কেবল সোনার শিকলিতে
জড়ানো ঘড়িটা ছাড়া।

কিন্তু দৃষ্টিতে যত নালিশ থাক, ভুরু
বেঁকে থাকুক, সঙ্গে প্যারো লোক আছে,
নাগরিকা সেই কথাটা ভোলে নাকি।
তাদের চোখে কৌতূহল, ভুরুতে অবাক
বাঁকানি। অতএব অপরাধে হাসা যায়।
হেসে কবুল করি, 'হ্যাঁ, চিঠিটা পেয়েছিলাম,
মানে—।'

কথা শেষ করা যায় না। কাছাকাছি
থেকেই নিচু করে অলকা ভাবে, 'থাক,
আপনার এই হাসি আর কথা থেকে
আপনাকে বোঝা যাবে না।'

গলা তুলে বলে, 'আপনার সঙ্গে আমার
বন্ধুদের আলাপ করিয়ে দিই। ইনি
সুপর্ণাদি, অধ্যাপিকা; লিলি ঘোষ, আমার
বন্ধু; রাধা চ্যাটার্জি, বন্ধু; নীরেন
হালদার, আমাদের নীরেনদা, ইস্কুলের
হেডমাস্টার; শুভেন্দু ব্যানার্জি, বন্ধু।'

সকলের পরিচয় দিয়ে অলকা আমার
পরিচয় দেয়। নমস্কার বিনিময়, একটু
হাসি। সকলেই জানান, অলকার মুখে
তাঁরা আমার কথা আগেই শুনেছেন। সেটা
এমন কিছু বলবার কথা না। কেবল
ভাবেন না শুভেন্দু ব্যানার্জি—বন্ধু। কিন্তু

তারপরে যে প্রসঙ্গ উঠতে যায় বড় ব্যাজ
ব্যাজ। তবু সাহিত্যের কথা শুনতে হয়,
বলতে হয় দু এক কথা। জিজ্ঞেস করি,
'কোথায় উঠেছেন ?'

নীরেনদা বলেন, 'এই তো কাছেই,
দক্ষিণ পল্লীর এক বাড়িতে আমরা উঠেছি।
আপনি কোথায় ?'

বলি, 'দিকের কথা বলতে গেলে তো
পশ্চিম পল্লী বলতে হয়।'

সুপর্ণাদি বলেন, 'তার মানে, আশ্রমের
দিকে।'

নীরেনদা ভারী মানুষ, মাথা-জোড়া
টাক। খদ্দরের গেরুয়া পাঞ্জাবির ওপরে
গরম আলোয়ান। কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ।
সুপর্ণাদি রোগা রোগা, বয়স—অনুমানে
বলি, চল্লিশের কাছে। রাধা, লিলি তাদের
বান্ধবীর বয়সী, পোশাকে-আশাকে তিন-
জনেরই মিল কাছাকাছি। সুপর্ণাদি,
সেই অনুপাতে ছিমছাম, গম্ভীর।
শুভেন্দু পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাহেব।
চুলেতে ঢেউ-খেলানো সামনে, চোখের
কালো ঠুলি একবারও খোলেনি। সরু
কালো গোঁফ জোড়াটি যেন তলোয়ারের মত
ধারালো। লম্বা, সুঠাম, সুন্দরকান্তি
যুবা। এখন রোদের তাপে কোট উঠেছে
হাতে। সাপের মত মসৃণ তার কণ্ঠলেগুটি,
রঙেতে বাহার। তার বুকে ঝিলিক হানে
জড়োয়া কাঁটা।

নীরেনদা বলেন, 'আমরা এসেছি এক
বন্ধুর খালি বাড়িতে। তা চলুন না,
আমাদের বাড়িটা দেখে আসবেন, এই তো
কাছেই। এখান থেকে দু মিনিট।'

আমন্ত্রণে নিরুপায়। সূর্য চলেছে
অনেক ঢালুতে। তাড়াতাড়ি বলি, 'পরে
আসব।'

'ও কথাটা বলবেন না।'

কথার পিঠেই ঠেক। অলকা ভাবে।
চেয়ে দেখি, হালকা রঙা টিপখানি বারেক
কেঁপে যায়। ঈষৎ বক্রতা সেই রঙের
ঠোঁটে। বলে, 'জানলেন না কার বাড়ি,
কোন বাড়ি, পরে আসতে পারবেন তো ?'

এ যেন ঠিক অলকা না, ঝিনি ঝিনি
লাগে। একটু রোষ-রোষ ভাব, চোখের

তারায় কিঞ্চিৎ খর টানের ঝিলিক। দর্শন পড়া মেয়ে, এ দার্শনিকাকে তুমি এত সহজে বচনে মেরে যাবে, তা হয় না। দর্শন হল বুদ্ধিসিন্ধু।

তখন রাধা চ্যাটার্জি তার ঘাড়ছাঁটা চুলেতে ঝটকা মেরে বলে, 'ও, তার মানে না আসবার ফিকির করেছেন?'

অলকা তাড়াতাড়ি জবাব দেয়। 'অমন কথা বলিস নে, কথা তো দিয়ে যাচ্ছেন, পরে আসবেন বলে।'

আর লিলি বলে, 'তারপরে আর দোষও দেওয়া যাবে না, কারণ বাড়িঘরের ঠিকানাই তো ও'র জানা নেই।'

নীরেনদা হা হা করে হেসে ওঠেন। সুপর্ণাদিও। লিলি রাধাও খিলখিলিয়ে বাজে। অলকা না। শুভেন্দুর গম্ভীর মুখে ঈষৎ হাসি খেলে।

সুপর্ণাদি বলেন, 'তোমরা সবাই মিলে ওঁকে এরকম করলে হবে কেন।'

তাড়াতাড়ি জুড়ে দিই, 'বাড়ির ঠিকানা তো আমি জিজ্ঞাসা করতামই।'

'আর সেটাই হতো ঠিক যে, তারপরেও আপনার আসবার অবকাশ হতো না।'

অলকার কথা শুনে লিলি রাধাই আবার বেজে ওঠে। নীরেনদাও। তিনি বলেন, 'কিন্তু যাই বল, এ অসময়ে ওঁকে নিয়ে
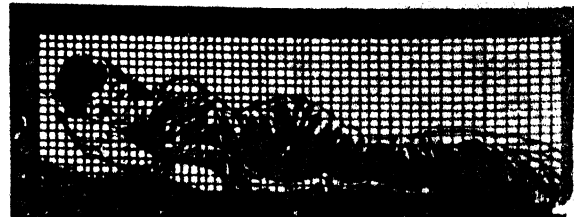
যাবে, বেলাও অনেক হয়েছে। আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?'

প্রায় অসহায়ের মত বলি, 'না। আর আমি তো বন্ধুর বাড়িতে এসেছি। ওঁরা এবার হয়তো একটু ভাবছেন।'

তখন সুপর্ণাদি নিজেই দক্ষিণ পল্লীর বাসার ঠিকানা দিয়ে বলেন, 'তা হলে আর এখন কিছু বলব না; কিন্তু আসা চাই।'

রাধা বলে ওঠে, 'আমরাও খাওয়াতে পারতাম আপনাকে।'

আমি বলি, 'তোলা রইল।'

'সত্যি, কথা শুনলে একটুও অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না।'

অলকার এ কথাতেও হাসি বেজে ওঠে। সে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'আপনারা এগোন সুপর্ণাদি, আমি আসছি।'

সবাই একটু ঠেক খায়, আমিও। নীরেনদা বলেন, 'বুঝলুম এবার, এদের ঘাঁটানো কি চাট্টিখানি কথা। কথা দিয়ে কথা না রাখা!'

বলে হেসে চলতে চলতে আবার বলেন, 'তবে ঝিলি, বেশী দেরি কোরো না। তুমি না, ওঁরও করিও না।'

একে একে নমস্কার বিনিময়। নীরেনবাবুদের দল চলে যায়। রাধা আর লিলি দু একবার ফিরে ফিরে চায়, হাসে।

অলকা বলে, 'আপনাকে দাঁড় করিয়ে রাখব না, চলুন এগিয়ে দিয়ে আসি।'

অবাক হয়ে বলি, 'কোথায়?'

'যেখানে উঠেছেন, সেখানেই।'

'কেন মিছিমিছি এত বেলায়, অত দূরে—'

'মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি, আপনার খুব খিদে পেয়েছে।'

'আপনার পায় নি?'

অলকা ঘাড় ফিরিয়ে চোখ তোলে। ওর চোখে যেন ঘনিয়ে আসা ছায়া, অথচ কোণে ঝিলিক দেয়। বলে, 'পেয়েছে। তবু ছেলেদের পাওয়ার সঙ্গে, মেয়েদের একটু তফাত আছে। কষ্ট হবে না।'

ই দ্যাখ হে, কলকেত্তার বিদ্যাদিগ্‌গজ মেয়ে কেমন কথা বলে। রাঙা ধুলোর মাখামাখি, নাগরিকাকে কেমন যেন বৈরাগিনী দেখায়। মুখখানিও শুকু-শুকু। মেয়েদের সহ্যশক্তি বেশী জানি, তবু আমাকে এতখানি পথ পৌঁছে দিয়ে, আবার একলা ফিরবে, দুপুরের প্রাণে, তা-ই বা সহ্য হয় কোথায়। বলি, 'মনে হচ্ছে, অনেকক্ষণ বেরিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, সেই সকালে। কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম শ্রীনিকেতনে।'

'খুব পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে।'

'আপনার থেকে বেশী নয়।'

অগত্যা নিজেকে যখন দেখতে পাচ্ছি না। চুপ না হেসে পারি না। আর একজনের তারী মুখে হাসি-হাসি ভাব, কিন্তু হাসি নেই। অতএব, এই চলাতে ঠেক দিতে হলে যে প্রস্তাব দিতে হয়, তা-ই দিই, 'তা হলে, আমরা কোথায় বসি।'

'কোথায়?'

'কোন চা-কফিখানায়।'

অলকার চোখের তারায় বিঁধিয়ে দেখার ধার। জিজ্ঞাসা আর খোঁজাখুঁজি। বলে, 'খিদের জন্য কষ্ট হবে না?'

এবার বাত দিতে ছাড়ি না, 'বিশ্বাস করলে বলতে পারি, মেয়েদের থেকে বেশী না।'

'কিন্তু না-খাওয়া লোকের সঙ্গে বসে কথা বলতে, মেয়েদের বড় অস্বস্তি।'

'ছেলেদেরও।'

অলকার ছায়া ঘনানো, অথচ খর তারায় এবার যেন একটু তরঙ্গ চলকে ওঠে। আবছা রাঙা ঠোঁট দুটো টিপে রাখে। হাসি বড় বেইমান যে। বলে, 'কিন্তু একটু কথা ছিল যে।'

'শুনতে চাইছি তো।'

'রাগকে বড় ভয় লাগে।'

'কার রাগকে?'

'যারই হোক, রাগ রাগই।'

'আমারও ভয় লাগে।'

আবার ঠোঁটে ঠোঁটে টিপুনি। বেইমান, ছড়িয়ে পড়িস না ঠোঁট ভাসিয়ে। বলে, 'রাগ করছেন না তো?'

ঘাড় নেড়ে বলি, 'আমি করিনি।'

অলকা আবার চোখের দিকে চায়। চোখে তার সেই খোঁজাখুঁজির বিঁধ বেঁধানো। বলে, 'হয়তো অল্প আলাপে, একটু বেশী দাবি হচ্ছে।'

সত্যি কি, এত মাপজোকের বিচার আছে তোমার মনে। বরং, চিঠির কথা মনে করে, তখন থেকে মনে মনে থতিয়ে আছি। বলি, 'আমার তা মনে হয়নি।'

'তা ছাড়া, আপনার খিদে বাদ দিলেও বন্ধুরা অপেক্ষা করবেন।'

'অপেক্ষার থেকেও, একটু চিন্তা করবেন হয়তো। সেটা পরে সামলে নেওয়া যাবে।'

'তবে কোথায় বসবেন চলুন।'

বেশী দূরে যাবার দরকার ছিল না। পা বাড়ালেই সরাইখানা। অচিনবাবুর সঙ্গে যেখানে বসেছিলাম, সেই নিরিবিলিতেই যাই। কফি চেয়ে, বসি। অলকা বলে, 'শুধু কফি এত বেলায়? একটু খাবার নিলে হত।'

'আপনি খাবেন?'

'না, এখন আর আমার এসব শুকনো খাবার ভাল লাগছে না। আপনি খান।'

'আমার সত্যি ইচ্ছে করছে না।'

অলকা আবার চোখের দিকে তাকায়। টেবিলের উলটো দিকে বসে, হঠাৎ খুব খেয়াল হয়, গোধূলি-রঙ রেশমী শাড়ি বুকের থেকে কিনার নিয়েছে। আর তাপর করে কাটা দুপুর-রঙ জামায় তার লজ্জা শিউরে যায়। আঁচল ঘুরিয়ে টেনে দেয় বুকে। চোখের পলক নত হয়।

আমি জিজ্ঞেস করি, 'আপনার বাবা কেমন আছেন? আর—।'

কথা শেষ হবার আগেই, অলকার টানা চোখে অবাক চমক খেলে। বলে, 'আপনার মনে আছে তাঁদের কথা?'

এবার অবাক চমক আমার। বলি, 'সে কি, মনে থাকবে না কেন?'

অলকা একটু হাসে। এ সেই বেইমান হাসি না, একটু ছায়া বিধুর। বলে, 'এতক্ষণ

কিছু বলেন নি তো, তাই ভাবলাম, ভুলে গেছেন। তাঁরা কিন্তু আপনার কথা বলেন।'

আর একবার বিব্রত হয়ে পড়ি, অপরাধী মনে হয় নিজেকে। তাঁদের কথা হয়তো প্রথমেই নিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। কিন্তু, ওহে, টুকুস সময়ও তো চাই। নানা আন কথাতেই যে সময় চলে গিয়েছে। আমি বলি, 'প্রমাণ দিতে পারব না হয়তো, কিন্তু আপনার বাবাকে আমি ভুলি নি। আপনার মাকেও না।'

অলকার নজরে বাঁক লেগে যায়, চোখ তুলে চায়। যেন কিছু জিজ্ঞেস করে। তারপরে আবার ঠোঁট টিপে চোখ নামিয়ে নেয়। বলে, 'অবিশ্যি, জানি না, ব্রজনারায়ণ চক্রবর্তীর মত লোক কেমন করে এত মুগ্ধ হন। প্রায়ই বলেন, "ছেলেটি বড় ভাল।" আর মা বলে, "একটু গুমোর নেই।" দুজনেরই দোষ, আপনাকে বেশ মনে আছে।'

আমার চোখের সামনে সেই মুখখানি ভাসে। যাঁর মাথায় দু-চার গাছি খাড়া-খাড়া সিঁড়িতে মত চুল, নকল দাঁতে ঢেউ খেলানো ভ্রূকুটি মুখে রোখারোখা ভাব। কিন্তু চোখে ঢাকা কাচের ওপারে যাঁর, যেন বিটলে হাসি চিকচিক করে। তাঁর পাশে, কপালে

সিঁথের সিঁদুরে জগজগানো সধবা। প্রাচীন নাকচাবিতে ঝলক দিয়ে যিনি রঞ্জনারায়ণকে হানেন। নোনা গাঙের বুকে ভেসে যাওয়া, ফিরে আসা, তার মাঝে অনেক কথা মনে পড়ে যায়।

প্রতিজ্ঞা করে তাঁদের কথা মনে রাখিনি। মন স্বভাবেধ স্রোতে তাঁরা আছেন। বলি, 'তাঁদের মত ভাল নই, কিন্তু মনে আছে।'

'মিথ্যুক বলব না আপনাকে।'

বলেই অলকার ঠোঁটের কোণে যেন হাসিতেই একটু ধার খেলে যায়। আবার বলে, 'ওঁরা প্রায়ই বলেন, আপনাকে কেন একটা চিঠি দিয়ে খবর নিই না। আমি বলি, "শীগ্গিরই নেব।"'

যেন মুখে আমার ধারালো ধারে কোপ লেগে যায়। এবার ভাবা হে কথার কারিগর। কয়েক পলক চোখ ফেরাতে ভুলে যাই। অলকা হাসে। হাসিতে রেশমী আঁচল ঝরে যায়। বলে, 'একটু মিথ্যে কথা বলেছি। ভেবেছিলাম, জবাব পেলে তাঁদের জানাব। আপনিই বলুন, না জানিয়ে ভাল করিনি?'

ইতিমধ্যে কফি এসে যায়। বেইমান আমার হাসিও। লজ্জাতেও সে মুখে ফোটে। বলি, 'না, মানে—?'

'কফি খান?'

'হ্যাঁ।'

ধরা পড়া চোর যেন তাতেই মুক্তি পায়। তবে এত সহজে না। অলকা আবার বলে, 'আপনার হাসি দেখলে কথা শুনলে ঠিক কিছু বোঝা যায় না, তা-ই আবার জিজ্ঞেস করি, সত্যি চিঠিটা পেয়েছিলেন, নাকি চাপা দেবার জন্যে বললেন।'

মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি বলি, 'না, না, সত্যি পেয়েছি।'

'তবে জবাব দিলেন না কেন?'

কেন দিইনি। সচ্ বল হে, পথ চলার লোক। তোমার কি কেবল মুখের কথা! কাজের কথায় নেই? কিন্তু কাকে সাক্ষী মানব, নিজেকে ছাড়া। সেখানে তো এক কথা, জবাব দেবার কথা ভাবতে ভাবতেই দিন চলে গেছে! কারণে না, অকারণেই জবাব দেওয়া হয়নি।'

অলকা কফির পাত্রে চুমুক দিয়ে যেন সরস হয়ে ওঠে। ওর শ্যাম চিকণ মুখে এখন যেন, রোদ চলকানো গাঙের টলটলানি। বলে, 'আমি বলব?'

ওর মুখের দিকে তাকাই। অলকা বলে, 'আমার বাবা-মাকে মনে রাখলেও আমাকে মনে রাখতে পারেন নি, তাই জবাব দিতেও পারেন নি, এই তো?'

'না, না, আপনি—।'

'কিন্তু আমার মনে ছিল, চিঠিতেই তার প্রমাণ।'

'নিশ্চয়ই।'

ওহে, এ কি ডাকিনী দার্শনিকা গো! চোখ, তার চোখের তারা কৌতুকে আর বিদ্রূপে নিবিড়। তাড়াতাড়ি বলতে যাই, 'তাকে আমার মনে ছিল।' তার আগেই গুম্ফি থেকে ছুরি আসে, বলে, 'অনেক চিঠি পান, তা-ই জবাব দিতে ক্লান্তি, না?'

'না না, তাও নয়।'

'তবে—তবে কি—?'

হঠাৎ অলকার গলার স্বর বদলে যায়। যেন স্বর, গলা থেকে বুকে নেমে যায়। মুখের হাসি উধাও। শ্যাম চিকণ রাঙা ধুলো মাথা, চূর্ণ চূর্ণ চুল ছড়ানো মুখের ভাব বদলে যায়। নিচু স্বরে বলে, 'আমার চিঠিটা আপনার খুব খারাপ লেগেছিল?'

অলকার মুখের দিকে তাকাই। কথা বলতে কয়েক মুহূর্ত দেরি হয়ে যায়। অলকাই আবার বলে, 'হয়তো ফিলজফি পড়তে গিয়ে, আপনাদের মত লোককে চিঠি লিখতে শিখিনি। বাবা-মায়ের মত তাঁদের মেয়েটিও হয়তো—হয়তো মুগ্ধ হয়েছিল, তা-ই কী লিখতে কী লিখেছি, না জেনে কাব্য করেছি—।'

'অলকা দেবী।'

সেজন্যে ক্ষমা করবেন। আজ আপনাকে এমন আচমকা দেখেছি যে, সবটাই আমার আচমকা হয়ে গেল, সেজন্যেও ক্ষমা চাই।'

অলকা উঠে দাঁড়ায়, মুখ তার অন্য দিকে ফেরানো। উঠে দাঁড়াতে ভুলে যাই, কথা বলতে ভুলে যাই। ব্যক্তি ও পরিবেশ বিশেষে সামান্য যে কত অসামান্য হয়ে উঠতে পারে, জেনেও জানি নি। সত্যিই তো, কত চিঠিরই জবাব দেওয়া ঘটে না। নিজেও কত জবাব পাই না। কিন্তু পথ চলার লেনাদেনায় এমন পরিস্থিতি হয়নি।

বুঝতে পারি, অলকা ব্যাগ থেকে রুমাল নিয়ে ঝাপসা চোখ পরিষ্কার করে। আরো কয়েক মুহূর্ত পরে, মুখ না ফিরিয়েই বলে, 'এমন কিছু কথা নয়। এটুকু বলার জন্যে আপনাকে কষ্ট দিলাম। হয়তো পরে লজ্জা করবে, তবু—?'

কথা শেষ না করে সে ফেরে। মুখে টেনে আনা হাসির ছটা, কিন্তু চোখ ভেজা-ভেজা রাঙা। বলে, 'আর দেরি করাবো না, চলি। পরসাটা—।'

'আমি দেব, কিন্তু অলকা দেবী—?'

'না, না, তখন অমনি করে বলেছিলাম বলে সত্যি অলকা চক্রবর্তী নই। আমি ঝিনি-ই।'

'শুনুন ঝিনি—?'

ঝিনি হেসে ওঠে সত্যি। বলে, 'সত্যি কী অদ্ভুত যে কথা না আপনার। কিন্তু এখন কিছুই শুনব না। ও বেলা আসব।'

বলে সে চলে যায় সরাইখানার বাইরে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতেও ভুলে যাই, ওবেলা সে কোথায় আসবে। হয়তো ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না, কিন্তু আমার কিছু বলার ছিল।

ঝিনি মোড় বেঁকে যাবার আগে আর একবার ফিরে চায়। হাসে, দেখে মনে হয় নীল আকাশে রোদের মতই। তারপর হারিয়ে যায়। ক্রমশঃ

চিত্রপ্রদর্শনী

গগনেন্দ্রনাথের শিল্পধারা

আকাশের বুকে স্বচ্ছ, সুন্দর পূর্ণিমার চাঁদ। জোৎস্নার স্নিগ্ধ রূপালী আলোকধারা পুষ্পবৃষ্টির মত চারিদিকে ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে। আকাশের একপাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে শুভ্র, সুন্দর মেঘের পাহাড় এবং সেই পাহাড় শ্রেণীর উপর দিয়েই পক্ষীরাজ ঘোড়ার চড়ে তীর বেগে উড়ে চলেছেন তরুণ রূপবান রাজপুত্র—হাতে তাঁর উন্মুক্ত তরবারি, মুখে উল্লাসের চিহ্ন। রাজপুত্র চলেছেন মায়াপুরীর সন্ধানে, বিরাটকায় দৈত্য যেখানে অপরূপ সুন্দরী এক রাজকন্যাকে বন্দিনী করে রেখেছে......

মনে আছে, ছেলেবেলায় এহেন রূপকথা শুনে সারা চিত্ত যেন উদাস হয়ে যেত। রাত্রে চোখে ঘুম আসত না—কেমন সে

[illegible] —গগনেন্দ্রনাথ

মায়াপুরী, কিভাবেই বা রাজপুত্র সেখানে যাবেন ও কখন সেই রাজকুমারীর দেখা পাবেন, এই কথা ভাবতে ভাবতেই অবশ্য এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। তা হলেও, রাত্রে অনেক সময়েই মায়াপুরীর সন্ধানে, আকাশের দিকে চেয়ে থাকতাম, সারা চিত্ত যেন ব্যাকুল হয়ে উঠত। বেশ মনে আছে, অবশেষে একদিন সেই মায়াপুরী [illegible] ব [illegible] আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলাম। বলা বাহুল্য, আবিষ্কার করেছিলাম কোনও মাসিক পত্রিকার পাতায়—একখানি ছবির মধ্যে। তখন বয়স অল্প, ছবির কিছুই বুঝতাম না। তা হলেও এক অট্টালিকা, ছোট-বড় নানা খিলান, দীর্ঘ সর্পিল সোপানশ্রেণী তার ওপর নীল রঙ ও আলোকচ্ছটা—সব মিলে মনের মধ্যে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। যেন ঝাড়-লণ্ঠনের কয়েকটি ঝুলন্ত ত্রিকোণ কাচ অথবা বেলোয়ারি কাচের কয়েকটি চুড়ির গুচ্ছ—সূর্য রশ্মি-রেখার স্পর্শে একেবারে ঝলমল করে উঠেছে। ছবিখানির নাম মনে নেই, তবে এটা মনে আছে যে, সেটি ছিল গগনেন্দ্র ঠাকুরের আঁকা। তাঁর মৃত্যুর পরে সুদীর্ঘ ২৯ বৎসর কেটে গেছে। কিন্তু আজ বলতে দ্বিধা নেই যে দেশের অন্য কোনও শিল্পীর কাছ থেকে গগনেন্দ্রনাথের ছবির মত কোনও রচনা নিদর্শন পাইনি।

সম্প্রতি কলিকাতার এই মহান শিল্পীর জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হয়ে গেল। যে কয়টি সংস্থা শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করে, তার মধ্যে গগনেন্দ্রনাথ জন্ম-শতবার্ষিকী কমিটি, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস, ললিতকলা অ্যাকাডেমি, রাজ্য ললিতকলা অ্যাকাডেমি ও সরকারী আর্ট কলেজের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম সংস্থার উদ্যোগে মহাজাতি সদন, রবীন্দ্র ভারতী ও অবন মহলে তিনটি সভার অনুষ্ঠান হয় ও এগুলির উদ্বোধন করেন যথাক্রমে বাংলার রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর, শ্রীদেবী-প্রসাদ রায়চৌধুরী ও শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। যাঁরা শিল্পীজীবন ও প্রতিভা বিষয়ে আলোচনা করেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচিন্তামণি কর ও ক্ষিতীশ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। শিল্পীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তিনটি বিভিন্ন স্থানে গগনেন্দ্রনাথের চিত্র-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে, এটি আয়োজিত হয় রাজ্য ললিতকলা অ্যাকাডেমির উদ্যোগে। দ্বিতীয়, সরকারী আর্ট কলেজে, শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে ও ললিতকলা অ্যাকাডেমি ও সরকারী আর্ট কলেজের সহায়ে [illegible] এটির অনুষ্ঠান হয় আর্ট কলেজ গ্যালারীতে। তৃতীয়, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস

ভোরের গান —গগনেন্দ্রনাথ

গ্যালারীতে। এখানে রাখা গগনেন্দ্রনাথ অংকিত কয়েকখানি ছবি সাধারণের জন্য

পেশ করা হয়। এ ছাড়া অন্য মহলেও গগনেন্দ্রনাথের কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্র রাখা হয়। ব্যঙ্গচিত্র সহ প্রদর্শনীগুলিতে গগনেন্দ্রনাথ অঙ্কিত প্রায় ৩০০ শত ছবির নিদর্শন পেশ করা হয়েছিল। সুতরাং সংস্থাগুলি যে শিল্পীর বিভিন্ন সময়ে আঁকা বিভিন্ন রসের ছবি জনসাধারণকে দেখবার সুযোগ দিয়েছেন, সে-জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। তবে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা পৃথকভাবে তিন স্থানে না করে এক স্থানে করলেই দর্শকদের পক্ষে সুবিধা হত বেশী, বিশেষ করে যখন একই ছবির একাধিক নিদর্শন ছিল (যেমন 'সাত ভাই চম্পা')। যাই হোক, চিত্র মনোনয়ন ও সজ্জাপদ্ধতির দিক থেকে আর্ট কলেজে আয়োজিত প্রদর্শনীই অধিক উপভোগ্য হয়েছিল।

গগনেন্দ্রনাথ বহু ছবি এঁকে গেছেন এবং সবগুলি এখন এ দেশে নেই। যেগুলির সন্ধান আমরা পাই, সেইগুলি দেখে তাঁর রচনাসম্ভারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, কালি-কলম-তুলিতে আঁকা কাক ও তদানীন্তন খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের প্রতিকৃতি; দ্বিতীয়, জলরঙে ওয়াশ প্রথায় রচিত শ্রীচৈতন্যচরিত মালা, হিমালয়শ্রেণী ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি; তৃতীয়, কিউবিস্টিক বা চতুষ্কোণ রীতিতে আঁকা বিভিন্ন একরঙ ও রঙীন চিত্রমালা ও চতুর্থ, কালিতুলি ও রঙ মাধ্যমে আঁকা নানা ব্যঙ্গচিত্র (কার্টুন)।

প্রথমেই একটি কথা বলা প্রয়োজন। মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীচিন্তামণি কর বলেছিলেন যে, সাংস্কৃতিক অবদানের দিক থেকে গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ—ঠাকুরবাড়ির এই তিন জ্যোতিষ্ককে পৃথক করে দেখা চলে না। কথাটি ঠিকই। তবে মনে হয়, চিত্রকলা ক্ষেত্রে গগনেন্দ্রনাথের ছিল নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য। একই বাড়িতে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ চিত্ররচনায় ব্যাপৃত থাকতেন। অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুত্থান করেন এবং তাঁরই পথ অবলম্বন করে তাঁর কয়েকজন শিষ্যও পরে খ্যাতিলাভ করেন। কিন্তু গগনেন্দ্রনাথ শুধু স্রষ্টা ছিলেন না, তিনি ছিলেন দ্রষ্টা—সুদূর ভবিষ্যতে দেশে যে নূতন চিত্ররচনারীতির সূত্রপাত হবে সেট তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই উপলব্ধি করে-ছিলেন এবং তারই পূর্বাভাস দেন তিনি তাঁ চতুষ্কোণ জাতীয় রচনাবলীতে। শিল্পক্ষেত্রে তাঁর কোনও প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিল না সত্য কিন্তু আধুনিক চিত্রকলাধারার তিনিই যে
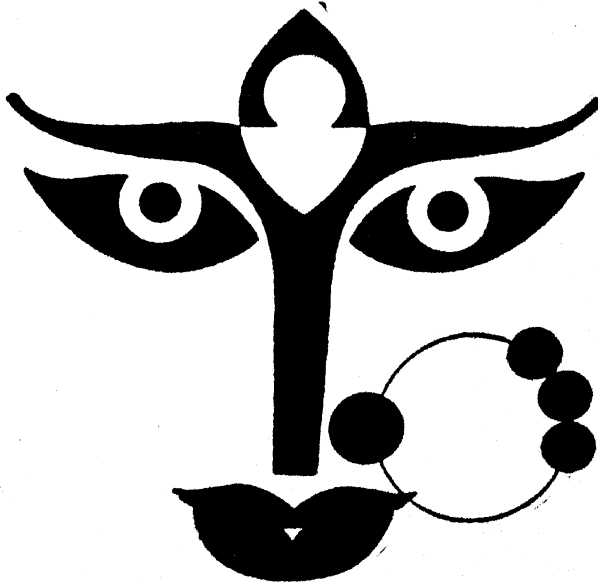
[illegible] [illegible] সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এদেশে আধুনিক রচনারীতির তিনিই পথিকৃৎ।

প্রথম পর্যায়ের ছবিগুলি জাপানী প্রথায় রচিত। জাপানী শিল্পী টাইকান ও হিশিদা কিছুকাল ঠাকুরবাড়িতে অবস্থান করেন ও তাঁদের অঙ্কনধারায় প্রভাবিত হয়ে শিল্পী কাকের নানা ছবি আঁকেন। প্রথাগতভাবে আঁকা এ শ্রেণীর ছবির সঙ্গে আমরা পরিচিত। জলরঙে আঁকা নিদর্শন থাকলেও প্রতিকৃতির অধিকাংশই কালি মাধ্যমে তুলি দ্বারা রচিত এবং কালি ও রঙের অদ্ভুত স্তরভেদের (টোনাল ভ্যারিয়েশন) জন্য সেগুলি অনবদ্য। অধিকাংশ প্রতিকৃতি আকাডেমি ভবনে দেখা যায়—এগুলি সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আঁকা। দ্বিতীয় পর্যায়ের, অর্থাৎ ওয়াশ প্রথায় আঁকা শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের বিভিন্ন পরিচ্ছেদ বা হিমালয় শ্রেণীর ছবির বৈশিষ্ট্য হ'ল অন্তর্নিহিত রস, পারিপার্শ্বিকতা ও সজীবতা। সূর্য অস্ত গেছে, ম্লান আভায় পশ্চিম আকাশ ছেয়ে গেছে ও তন্দ্রাহত চোখের মত চারিদিকে আসন্ন সন্ধ্যার কালো যবনিকা নেমে আসছে; অথবা কোনও শিলাখণ্ডের ওপর ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে কয়েকটি গাছ যেন সগর্বে সজাগ প্রহরীর মত স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ঘনায়মান বা ঘনীভূত অন্ধকারেরও যে একটি নিজস্ব রূপ আছে এবং সমগ্র চেতনা দ্বারা সে এই বিরাট রূপ অনুভব করতে হয় সেটা মহান শিল্পীর হিমালয় শ্রেণী ও অন্যান্য কয়েকটি নিসর্গ দৃশ্য দেখলেই বোঝা যায়। বাস্তবিক, কালো-রঙ ও জলরঙে স্তরভেদ সৃষ্টি করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল গগনেন্দ্রনাথের। এই প্রসঙ্গে আর্ট কলেজে প্রদর্শনীভুক্ত কুরুক্ষেত্র ছবি-খানির কথা মনে পড়ে। কেবলমাত্র নীল রঙেরই বিভিন্ন স্তর রচনা করে যে রসের সমুদ্র সৃষ্টি করা যায় ছবিখানি তারই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শ্রীচৈতন্যচরিতমালার ছবিগুলির, বিশেষ করে গৃহত্যাগের মধ্য দিয়ে অন্ত-র্নিহিত বেদনার সুরটুকু বেজে ওঠে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শনীভুক্ত শ্রীচৈতন্য-দেবের বিভিন্ন ছবি উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় পর্যায়ের ছবির আলোচনা করার পূর্বে একটি কথা মনে রাখা উচিত। বিদেশী শিল্পীদের কাছ থেকে উৎপ্রেরণা লাভ করে অথবা ঝাড়লণ্ঠনের ত্রিকোণ কাচে সূর্যরশ্মির প্রতিফলন দেখে গগনেন্দ্রনাথ চতুষ্কোণ রীতির সূত্রপাত করেন সে বিষয়ে বিচার করা এখন অবান্তর। তবে একথা ঠিক যে, চতুষ্কোণ রচনা পদ্ধতির ভাবটুকু তাঁর মনে লাগলেও প্রচলিত ধারাটির ওপর তিনি নির্ভর করেন নি। একই সময়ে একই বস্তুকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখে তারই রূপনির্দেশ করা হ'ল প্রধানত কিউবিজম বা চতুষ্কোণ রচনারীতির উদ্দেশ্য। সেদিক থেকে বিচার করলে গগনেন্দ্রনাথের রচনা এ পর্যায়ে পড়ে না। প্রকৃত কথা এই যে, পাশ্চাত্য ভাবধারাটুকু অবলম্বন করে জ্যামিতিক আকার মাধ্যমে তিনি নূতন আকার ভিত্তিক রচনার প্রবর্তন করেছেন মাত্র, তার বেশী নয়। লক্ষ করার বিষয় যে এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আলোকের গুরুত্বটুকু প্রকাশ করেছেন। বাড়ির মধ্যে কয়েকজন মহিলা বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে এক স্থানে কথা বলছেন, খিলানের মধ্য দিয়ে রৌদ্রের আভা এসে তাঁদের মুখের ওপর পড়েছে ও ঘরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষাকৃত অন্ধকারে ঢেকে আছে; অথবা কোনও অট্টালিকার দীর্ঘ সোপানশ্রেণী সরী-সৃপের মতো বেঁকে উপরে উঠে কোনও স্থানে বিলীন হয়ে গেছে এবং তারই দুই পাশের কয়েকটি থামের নানা অংশ ও রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে সূর্যালোক নানা রেখায় বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে; আবার কোথাও বা পুরনারীদল নবদম্পতীকে সমাদরে পুষ্পচন্দনে বরণ করে অভ্যর্থনা করছেন, শুভ্র ও শুভ্র আলোকস্পর্শে নবদম্পতীর লজ্জাবনত মুখ দু'খানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—এক কথায় শুভ্র, সুন্দর ও পবিত্র আলোকবন্যার সৃষ্টি করাই ছিল গগনেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। কখনও বা এই আলোক প্রবল বন্যার উচ্ছ্বাসে রচনা-ক্ষেত্রের বিশিষ্ট কোনও স্থান একেবারে প্লাবিত করে দিয়েছে; আবার কখনও অন্য কোনও ক্ষেত্রে প্রদীপ শিখার মতই এই আলোকধারা স্নিগ্ধ ও কাব্যময় হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, স্তরভেদে এই আলোকধারা বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি। যাঁরাই যত্নসহকারে গগনেন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর ছবি, বিশেষ করে আর্ট কলেজ প্রদর্শনীতে দেখেছেন তাঁরাই আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন। এ জাতীয় রচনায় আকারের স্থান হয়ত আছে তবে সেটা গৌণ, মুখ্য হ'ল আলোকসম্পাত—তাই অধিকাংশ রচনার মধ্যেই আলোকধারা যেন উন্মুক্ত বাতাসের মত স্বাধীন ও সাবলীলভাবে বিচরণ করছে। প্রথমেই বলেছি, কয়েকটি রচনা দেখে রূপকথা মনে পড়ে। এখানে গগনেন্দ্রনাথ অবশ্যই রঙের আশ্রয় নিয়েছেন এবং অধিকাংশ স্থলেই সেটি নীল রঙ। চতুষ্কোণ রচনা, নীল রঙ ও তার ওপর আলোকপ্লাবন—এক কথায় শিল্পী যেন মায়ারাজ্যের পর মায়ারাজ্যের সৃষ্টি করে গেছেন। শুধু তাই নয়, পরিমিত আকার-ভিত্তিক রচনা, কবিসুলভ কল্পনা ও রঙ-বিন্যাস এবং আলোকসম্পাতের ফলে কয়েকটি ছবি স্থাপত্যশিল্পের পর্যায়ে পড়ে গেছে (স্টোরি টেলার—আর্ট কলেজ প্রদর্শনী)। রবীন্দ্র-ভারতী প্রদর্শনীভুক্ত 'সিটি ইন নাইট' বোধ হয় আজও যে কোনও

[illegible] অব এ ওয়াইফ

বিচিত্র পরিণয় বন্ধন

[illegible]

আধুনিক চিত্রপ্রদর্শনীতে স্থান পাবার যোগ্য।

গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্রগুলি সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ওপর তাঁর কশাঘাত। ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ এ শ্রেণীর চিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠেনি। এ জাতীয় ছবির ভেতর দিয়ে গগনেন্দ্রনাথের দেশপ্রেম, সমাজচেতনা ও উদার চিন্তাধারারই পরিচয় পাওয়া যায়। বহু প্রশংসিত "৬৪০০০, টাকা"-তে তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকেও কশাঘাত করতে পশ্চাদপদ হননি। যে কালে তিনি ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন সেই সময়ের কথা বিচার করলে রচনার মধ্য দিয়ে শিল্পীর সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়।

জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনেকেই নানা সভায় গগনেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন ও তাঁর শিল্পপ্রতিভা বিষয়ে নানা ভাবে আলোচনাও করেছেন। তবুও আমার মনে হয় একটি কারণে ভারতের শিল্পকলা তথা শিল্পী ও দেশবাসী তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী: গগনেন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি ও তাঁর কিউবিস্টিক রচনার চিরন্তন আবেদন। ১৯০৮ সালে তাঁর পঞ্চলোকগমনের

ইমেজ-৩ —পরিতোষ সেন

র থেকে আজ পর্যন্ত চিত্রকলাধারার বহু রিবর্তন হয়েছে এবং নূতন মাধ্যম ও রীতিকের সৃষ্টি হয়েছে। তা সত্ত্বেও গগনেন্দ্রনাথের রচনা আজও সগর্বে পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ শিল্পীর রচনার পাশে স্থান পাবার যোগ্য—কারণ তাঁর রচনাবলী স্থান ও কালের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়—তাই তাঁর ছবির আবেদন চিরন্তন। এবং শিল্পী হিসাবে দেশবাসীর নিকট এটাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

গগনেন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী কমিটি ও অন্যান্য সংস্থাকে অনুরোধ করি তাঁরা যেন অবশ্যই দিল্লি, বোম্বাই ও মাদ্রাজেও গগনেন্দ্রনাথের চিত্রসম্ভারের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

পরিতোষ সেনের চিত্র

সম্প্রতি শিল্পী পরিতোষ সেন তাঁর প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন আকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে। শিল্পী হিসাবে পরিতোষ সেন এ দেশে সুপরিচিত অতএব তাঁর সম্বন্ধে নূতন কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রদর্শনীতে শিল্পী মোট ১৩ খানি ছবি পেশ করেন। সবই তেলরঙে রচিত।

বৃহৎ ক্যানভাস ও পাত্রপূর্ণ নানা রঙ—কাজ দেখে মনে হয় পরিতোষ সেনের কাছে বুঝি দুটিই অপরিহার্য। বস্তুত রঙ, বিশেষ করে সোচ্চার ও মুখর নানা রঙের মাধ্যমেই এই শিল্পী স্বীয় বক্তব্যটুকু প্রকাশ করতে চেয়েছেন। আকার অবশ্য আছে তবে সেটা গৌণ। বৃহৎ ক্যানভাসগুলিতে রঙের মাধ্যমেই বিভিন্ন ভঙ্গীর এক একটি মূর্তির আভাস পাওয়া যায়। মনে হয় শিল্পী যেন অতি সহজে ও অবলীলাক্রমে এক রঙের পাশে অপর রঙ ব্যবহার করে গেছেন এবং তারই ফলে এক একটি ছবির মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে এক একটি মূর্তির অস্পষ্ট রূপ। অনেক সময়ে মনে হয় বুঝি শিল্পীর এই রঙের খেলার মধ্য থেকেই শিল্পীর অজ্ঞাতেই মূর্তির রূপ ফুটে উঠেছে। সকলেই জানেন যে রঙ, তুলি ও ছুরি—এই তিন বস্তুর ওপর সম্পূর্ণ দখল না থাকলে এ জাতীয় রচনা সৃষ্টি করা যায় না। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—ইমেজ নং ৫। প্রধানত নীল ও হলদে রঙের মাধ্যমে শিল্পী একটি মূর্তির সামান্যতম পরিচয় দিয়েছেন এবং অঙ্কনরীতি ও রঙের স্বরভেদের দিক থেকে বিচার করলে ঐটুকুই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। কয়েকটি ছোট ছবি, বিশেষভাবে ইমেজ নং ১০ চোখে পড়ে। এটিতে যেন রঙের নানা ছাপের মধ্য দিয়ে একটি মুখের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। তবে একথাও ঠিক যে মাত্রাতিরিক্ত রঙ ব্যবহারের ফলে দুই-একটি স্থলে ছবির ভাষা যেন অস্পষ্ট থেকে গেছে। প্রতিকৃতিটি সুন্দর—রচনারীতির মধ্য দিয়ে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

—চিত্রপ্রিয়

ফাদার ভ্যান-এর সঙ্গে শারলি ম্যাকলেন

শহর থেকে সতেরো মাইল দূরে ডায়মণ্ডহারবার রোড বরাবর গঙ্গারামপুর, সেখানে অনাথ ছেলেদের আশ্রম বয়েজ টাউন, এবার কলকাতায় এসে এই আশ্রমের সঙ্গেই জড়িয়ে পড়লেন হলিউডের অভিনেত্রী শারলি ম্যাকলেন।

ম্যাকলেন কলকাতায় এসেছেন আগেও শাড়িপরা তাঁর ছবি ছাপা হয়েছে মার্কিনী কাগজে, এবারে তাঁকে দেখা গেল অন্য ভূমিকায় অভিনেত্রী নন, লোকরঞ্জনী নন,—দয়াময়ী সেবিকা। গ্র্যাণ্ড হোটেলের ২০৪ নম্বর ঘরে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "না, না, আমার কথা নয়, বয়েজ টাউনের কথা সবাইকে বলুন, এমনটি আর কোথাও দেখিনি।"

লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করি, তার আগে বয়েজ টাউনের কথা আমি তেমন জানতাম না। মাদার টেরেসা-র কাজের কথা অনেক জানি, কিন্তু কলকাতার অনতিদূরে যে আর একজন প্রচারবিমুখ সেবাব্রতী নিরলস দয়া বিলিয়ে চলেছেন, সে খবর ম্যাকলেনের কাছ থেকেই প্রথম জানা গেল।

আশ্রম চালান ফাদার ভ্যান, সিংহলের লোক, স্বল্পভাষী আদর্শবাদী। পথের ছেলে, এমন কি ডাস্টবিন থেকেও শিশুদের এনে আশ্রয় দিয়েছেন তাঁর বয়েজ টাউনে। হঠাৎ এক আসরে ফাদার ভ্যান-এর সঙ্গে পরিচয় হয় শারলি ম্যাকলেনের। ফাদার তাঁকে নিয়ে যান গঙ্গারামপুরে। ম্যাকলেন বলেন, "আমি চাই সবাই এগিয়ে আসুন আশ্রমের সাহায্যে, যা পারেন টাকা দিন, আমিও দিয়ে যাব, আশ্রম আরও বড় হোক, ফাদারের স্বপ্ন সফল হোক।"

বয়েজ টাউনের সাহায্যেই ম্যাকলেন প্রিন্সেসে সেদিন আয়োজন করেছিলেন 'অ্যান ইভনিং উইথ ফিল্ম স্টারস।' দেব আনন্দ আর সন্ধ্যা রায় ছাড়া উল্লেখযোগ্য কেউ সাড়া দেননি, তবু কিছু টাকা উঠেছে, তাই যাবে সেই অনাথ আশ্রমে।

গ্র্যাণ্ড হোটেলে ম্যাকলেনের এ পাশে দেব আনন্দ, ও পাশে ফাদার ভ্যান। ম্যাকলেনের পরনে জমকালো কালো পোশাক, গলায় হীরের হার। তাঁর কথায়ও

কলকাতার ডায়েরি

ধার হীরার, প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব সপ্রতিভ।

বছর তিন আগে এসেছিলেন কলকাতায়। আবার কেন জানতে চাইলে চোখ নাচিয়ে উত্তর দেন, "বাঃ রে, যে শহরকে আমি ভালবাসি, সেখানে বারবার আসা দোষের নাকি? তা ছাড়া এখানে আমার অনেক বন্ধু রয়েছে যে।"

তিনি বলেন, "তিন বছরে কলকাতা পালটেছে অনেক, এবারে যেন মিছিলের সংখ্যা একটু বেশী। সেদিন কংগ্রেসের মিছিল দেখতে বেরিয়েছিলাম। সত্যি কী সিসফুল!"

—"তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু দেব আনন্দের সঙ্গে বোম্বাই রওনা হবার আগে ম্যাকলে

লাইটহাউস মিনিয়েচারে দেখেছেন ফিল্ম ডিভিশনের তোলা অনেকগুলো ডকুমেন্টারি, দেখেছেন সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তোলা 'গ্লিম্পসেস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল'।

ছবিগুলো দেখে তিনি দারুণ খুশী। রবীন্দ্রনাথের নাম আগেই জানতেন, পরিচয় পেয়ে আরও জানার আগ্রহ বেড়েছে। বিদায় নেবার আগে প্রতিশ্রুতি দিলেন আবার আসবেন, আরও ভাল করে এই শহরকে জানবেন। কিন্তু "দোহাই আপনাদের, বয়েজ টাউনকে সাহায্য করার কথা ভুলবেন না, প্লীজ।"

*

শান্তিপাড়া, ডিব্রুগড় থেকে শাঁজেলিজে, প্যারিস কত দূর? প্রশ্নটার ত্বরিত জবাব পাবেন শিল্পী শক্তি বর্মণের কাছে। আসামের ওই ছোট শহর থেকে কলকাতা এসেছিলেন কলেজে পড়তে। মা-বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়র বা নিদেনপক্ষে অধ্যাপক হয়। ছেলের চোখে ছিল "রূপের স্বপন, রঙ ছিল উড়ো ছাব আঁকিবার"। ভেবেছিল আচার্য নন্দলালের কাছে পাঠ নেবে। ঘটনাচক্রে ছাত্র হল সরকারী আর্ট কলেজের।

তারপর কালাপানির ওপারে। শিল্পের নন্দনবন প্যারিস। ১৯৫৬ থেকে সেখনেই রয়ে গেছে শক্তি বর্মণ। অস্থায়ী তাঁবু কবে যেন পাকাবাড়ি হয়ে জীবনটাকে শিকড় পরিয়ে দিয়েছে।

বিখ্যাত 'একল দে বোজারতস্'-এর সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে। ঘুরেছে ইতালি, গ্রীস, স্পেন, মরক্কো, মিশর, সিংহল, জারমানি। ছবি দেখেছে আর ছবি এঁকেছে। বাস? নিশ্চয়ই না। আঁকা ছবি রসিকজনকে ডেকে দেখিয়েছে। প্রদর্শনী হয়েছে সর্বত্র। প্যারিসের দাঁত-ভাঙা সব নামী সালঁয়; রুয়েঁ, আমিয়েনস, লণ্ডন, নয়া দিল্লি, কলকাতার হরেক স্টুডিওতে। আমেরিকায় শক্তি যাননি। কিন্তু তাঁর ছবি গেছে। সমালোচকদের মুক্তকণ্ঠের প্রশংসাও কম জোটেনি। ল্য মঁদ তাঁকে বলেছেন 'প্রাচ্যের মাতিস', জুরনাল দ্য লামাতুয়র দ্যারৎ লিখেছেন, তার ছোট্ট কাজও যেন "এ ভেরিটেবল ট্রিটিজ অব পেইনটিং"।

এই 'পোড়া দেশকে' শক্তি ভোলেননি। সুযোগ পেলেই চলে আসেন। কলকাতায় সাত দিন থাকব বলে সাত সপ্তাহ কাটিয়ে যান। এখানে হাওয়া সর্বদাই ইনকিলাবী আওয়াজ তুলছে, শক্তি তা বিশ্বাস করেন না। তিনি যে শুনতে পান চারুকলার চর্চা হচ্ছে কফি হাউসের তর্কসভাতেও। অপ্রত্যাশিতভাবে প্রদর্শনীর আসরে অচেনা

কত নিম

সহজেই প্রশ্ন করে বসে! সাধারণ মধ্যবিত্ত দর্শক তার নাগালের বাইরে দাম-ফেলা ছবির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থেকে করুণ মুখে বাড়ি ফিরে যায়। প্যারিস তো নিশ্চয়ই পিয়ারী। কিন্তু কলকাতাও কলকাতা। এত দুঃখেও চোখ তার জ্যোতি হারায়নি। শক্তির স্ত্রী বিদেশিনী এবং শিল্পী। কলকাতায় তাঁরও ছবির প্রদর্শনী হয়েছে। তিনিও কলকাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের ছোট একটি ঘরে শক্তি বর্মণের ছবির প্রদর্শনী চলছিল। পয়লা অক্টোবর শেষ হয়ে গেল।

*

আমাদের নতুন পৌর কমিশনারের সুবুদ্ধির তারিফ করি। দিনক্ষণ দেখে তিনি কাজের ভার নিয়েছেন। প্রসাদী বেলপাতা কাগজে ঠেকিয়ে প্রথম দস্তখত দিয়েছেন, এবং ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে কমিশনারের চেয়ারে বসেছেন। তা ছাড়া তাঁর হাতের আঙুলেও পলা গোমেদ ইত্যাদি অনিষ্টদূরকারী নানাপ্রকার পাথরের শোভা।

পৌর কমিশনার শ্রীদুলালগোপাল মুখার্জির জ্যোতিষের প্রতি বিশ্বাস নতুন দায়িত্ব গ্রহণের প্রাক্কালে বেড়েছে কিনা ঠিক জানি না, তবে অনুমান করি, অতীতের সব জাঁদরেল জাঁদরেল কমিশনারের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করেই বোধ হয় তিনি জ্যোতিষ এবং ভগবান-সহায় হয়েছেন। কিন্তু আমার ধারণা, পলা-গোমেদেরও সাধ্য নেই সুরেন ব্যানার্জি রোডের লাল বাড়িটার ঘাড়ে যে জগদ্দল পাথর বসে আছে, তাকে নড়ায়।

তা ছাড়া আর একটি মুশকিল আছে। হঠাৎ যদি কোন জরুরী কাজে কমিশনারের তলব পড়ে, যেখানে তাঁর উপস্থিতি ছাড়া সর্বনাশ ঘটার সমূহ সম্ভাবনা এবং ঠিক সেদিনই যদি ত্র্যহস্পর্শ বা মঘা নক্ষত্র থাকে, তা হলে তিনি কী করবেন?

ইদানীং পঞ্জিকার বেশির ভাগ তারিখই তো কু-দিন, শুভক্ষণের অপেক্ষায় থাকলে আরও অশুভ ব্যাপার ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। তবে হ্যাঁ, শহরের যা হাল, ভবিতব্যের হাতেই তাকে একমাত্র ছেড়ে দেওয়া যায় এবং সেদিক থেকে বিচার করলে কমিশনার মশায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও দুর্গানাম জপ করতে করতে বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দেব।

—চাণক্য

এক বছরের অভিজ্ঞতা

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক বিবরণ অনুসারে আর্থিক ব্যবস্থায় ভারসাম্যের যে অভাব দেখা দিয়েছে, তার সংশোধনের জন্য আমাদের কয়েক বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা করে যেতে হবে। কেবল স্থিতি অর্জন নয় আভ্যন্তরিক মূলধন নিয়োগ এবং রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রে বৃহত্তর উদ্যমের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলা দরকার। তৃতীয় যোজনার শেষ তিন বছর আর্থিক ব্যবস্থায় যে চাপ ও টান দেখা দিয়েছিল, তা চতুর্থ পরিকল্পনার গোড়ার বছরে (১৯৬৬-৬৭) তীব্র হয়ে ওঠে। পর পর চার বছর মূল্য পরিস্থিতি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার একটা বড়ো কারণ হল, ১৯৬৪-৬৫ সালের স্তর থেকে কৃষি উৎপাদন শতকরা ১৪ ভাগ কমে গেছে। সেই সঙ্গে আমদানিলব্ধ কাঁচামালের অভাবে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি শ্লথ হয়ে পড়েছে। কৃষিক্ষেত্রে কাজকর্ম সন্তোষজনক হয়নি বলে কৃষি-ভিত্তিক রপ্তানির পরিমাণ কমে গেছে। আভ্যন্তরিক অনটন দূর করার জন্য খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল বেশী আমদানি করতে হয়েছে। সারা বছরে বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণ ১৫ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার হ্রাস (আগের বছরের ২৫ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারের তুলনায়) পেয়েছে। রপ্তানির বেশীর ভাগ হ্রাস ঘটেছে পাটশিল্পদ্রব্য, চা, কার্পাস বস্ত্র, কারখানায় উৎপন্ন নয় এমন তামাকের মতো কয়েকটি প্রধান সামগ্রীর জন্য। আমদানির অনুমতি পাওয়ার পর তা কাজে লাগাতে দেরি হওয়ায় এবং কয়েকটি শিল্পে মন্দার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় আমদানি কমে গেছে।

টাকার যোগান

উৎপাদনের অবস্থা যেখানে সন্তোষজনক নয়, সেখানে আবার টাকাকড়ির যোগান আরও (যদিও ১৯৬৫-৬৬ সালের চাইতে কম গতিতে) বেড়েছে। এর মূল কারণ হচ্ছে বাজেটের ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি কর্তৃক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা থেকে কর্জ গ্রহণ। বেসরকারী অংশ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ ১৯৬৫-৬৬ সালের চাইতে বেশী নিয়েছে। মোট চাহিদা ও যোগানের মধ্যকার বৈষম্য বেড়ে গেছে এবং তা প্রতিফলিত হয়েছে দ্রব্যমূল্যের স্ফীতিতে। সামগ্রী মূল্য ও জীবনযাত্রা-নির্বাহের ব্যয় বৃদ্ধির ফলে আবার মজুরী ও বেতন কিছু বাড়িয়ে দেবার দরকার হয়েছে এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সরকারগুলির বাজেট সমস্যা কঠিন হয়েছে।

আর্থিক অবস্থার অবনতি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির আগম কমিয়ে আনার জন্য দায়ী। অন্য দিকে ব্যয় বেড়ে গেছে প্রধানত খাদ্য ও সার বাবদ অর্থসাহায্য, প্রাগুক্ত দ্রব্যগুলির অধিকতর আমদানি এবং অনটনক্লিষ্ট অঞ্চলসমূহে সাহায্যদানের কারণে। কয়েকটি রাজ্য সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে অতিরিক্ত অগ্রিম নিয়েছে এবং ১৯৬৭-র মার্চ পর্যন্ত হিসাবের বছরে কেন্দ্রকে রাজ্য সরকারগুলিকে মোট ১০৮ কোটি টাকা দিতে হয়েছে। এমনতর অবস্থার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। অবশ্য এখনকার জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে যখন ঘাটতি পরিহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, সে সময় টাকাকড়ি নিয়ন্ত্রণ নীতির ক্ষেত্রে নির্বাচনমূলকভাবে কড়াকড়ি শিথিল করা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত সঞ্চয় কতখানি পাওয়া যাবে, তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে।

১৯৬৫-৬৬ সালের হারের চাইতে কম হলেও ১৯৬৬-৬৭ সালে অর্থ-সম্প্রসারণের হার প্রকৃত উৎপাদন বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশী ছিল। ১৯৬৬-৬৭ সালে টাকার যোগান ৩০৭ কোটি টাকা, অর্থাৎ শতকরা ৬·৬ ভাগ (১৯৬৫-৬৬ সালের শতকরা ১০·৬ ভাগের তুলনায়) বেড়েছিল।

মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়া

এদিকে দেখা গেল ১৯৬৬-৬৭ সালে মূলধন বাজারে কাজকর্ম খুব কমে গেছে। মূল্যের ক্রমাগত বৃদ্ধির দরুন এবং প্রকৃত সম্পত্তি, মূল্যবান ধাতু প্রভৃতি সম্পদে সঞ্চয় নিয়োজিত হওয়ায় মূলধন বাজারে অর্থের যোগান হ্রাস পেয়েছে। একই সঙ্গে, মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে প্রকল্পগুলির মূলধন খরচ বেড়ে গেছে।

১৯৬৬ সালের জুন মাসে টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের দরুন আপেক্ষিক মূল্য, ব্যয় ও মূলধন নিয়োগের ধারার যে পরিবর্তনগুলি করতে হয়েছে, তা আরও কঠিন কাজ হয়ে পড়েছে একাধিক কারণে। পর পর দু' বছর খরা কৃষি উৎপাদন কমিয়ে দেওয়ায় দ্রব্যমূল্য ক্রমবর্ধমান এবং মজুরী প্রভৃতি বাড়াবার জন্য চাপ দেখা দিয়েছে। কাঁচামালের অনটন, আমদানির খরচ বৃদ্ধি, মূলধন নিয়োগের শ্লথ হার, এ সবই কয়েকটি মৌল ও মূলধন দ্রব্য শিল্পে মন্দার আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির গতিবেগ হ্রাসের একটা ফল হচ্ছে কাজকর্মে শিথিল অবস্থার সঞ্চার। আর্থিক ব্যবস্থা আগে বেশী মাত্রায় উত্তপ্ত হয়েছিল বলে নতুন পরিস্থিতিকে খানিকটা তার সংশোধন হিসাবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু যোগানের অনটন সমস্যাকে জটিল করেছে, সে-কারণে যাতে শিথিল অবস্থা ছড়িয়ে না পড়ে অথবা গভীর না হয়, তা দেখা উচিত। না হলে, মূলধন নিয়োগ ও বৈষয়িক অগ্রগতির দীর্ঘকালীন সম্ভাবনা বিপন্ন হবে।

রপ্তানির সমস্যা

বর্তমানে যে মন্দার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তা কাটিয়ে উঠতে হলে কাজের যোগান ও উৎপাদনের সঙ্কোচন নয়, দ্রব্যমূল্য হ্রাস ও রপ্তানি বাজারের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। মূল্যস্ফীতি সমস্যা নিরসনের জন্য যোগান ও চাহিদা উভয় দিক থেকে চেষ্টা করতে হবে। খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার গড়ে তুলতে কিছু মূলধন লাগবে। ঘাটতি পূরণের জন্য মুদ্রাস্ফীতি পরিহার করার নীতির তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, বাজেট সংক্রান্ত ব্যয় সামগ্রিক চাহিদাকে প্রভাবান্বিত করার ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে। খাদ্যশস্য ও কৃষিজাত কাঁচামালের দাম নীচের দিকে কিছুটা না কমালে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস দ্বারা বিদেশের বাজারে ভারতীয় রপ্তানির প্রতিযোগিতা-শক্তি বাড়ানো যাবে না। রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি রপ্তানির ক্ষেত্রে অগ্রগতির অন্যতম পূর্বশর্ত।

দেশে একটা বৃহৎ ও সংরক্ষিত আভ্যন্তরিক বাজার ছিল বলে রপ্তানি বাড়াবার ইচ্ছা এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, উৎকর্ষ বৃদ্ধি, বিদেশের বাজারে সুনাম অর্জন এবং সেখানকার ক্রেতাদের পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে অনুসন্ধানের দিকে সত্যকার চেষ্টা দেখা যায়নি। যেখানে

উৎপাদন মন্দগতিতে বেড়েছে এবং মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা উন্নয়ন-সংক্রান্ত ব্যয়ের সম্প্রসারণ ক্রয়ক্ষমতার ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, সেখানে আভ্যন্তরিক বাজারের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে।

ভারতের মতো দেশে মূলধন খাটানো হয়েছে, সেই সব নতুন শিল্প অথবা পুরানো কল-কারখানার সম্প্রসারণে যেগুলির উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য বাজার আছে (আমদানির বহর যার নির্দেশক)। পরিকল্পনাগুলির অধীন ইস্পাত, সিমেন্ট, কলকব্জা, সাইকেল, বৈদ্যুতিক দ্রব্য প্রভৃতি তৈরি হয়েছে এবং সেই সব সামগ্রী দেশের ভিতর ব্যবহার বা ভোগ করা হয়েছে। গোড়ার দিকে বিপুল মূলধন নিয়োগ এবং নির্মিত উৎপাদন-ক্ষমতার অল্প ব্যবহার উৎপাদন ব্যয় এত বাড়িয়ে দিয়েছে যে, আন্তর্জাতিক বাজারে অগ্রসর দেশগুলির দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারা যায়নি। এইসব অসুবিধা ও সমস্যার দরুন পরিকল্পনামূলক উন্নয়নের অঙ্গ হিসেবে নতুন রপ্তানি শিল্প গড়ে তোলার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

শান্তিকুমার ঘোষ

...কার ছবি—বস্তিবাড়ি
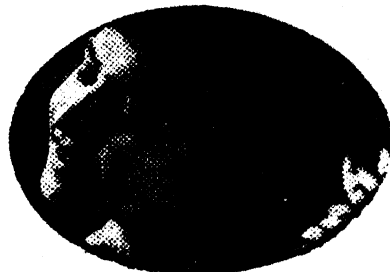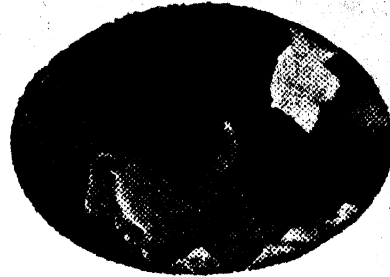
দিল্লির ডায়েরি

একজন বাঙালী চিত্রশিল্পী। বয়েস আজ পঞ্চাশের কোঠার ওপারে। জীবন সংগ্রামের ঝড়-ঝাপটা, আঘাত মুখে-চোখে রেখে গেছে তাদের ছাপ। কিন্তু সমস্ত বাধাবিঘ্ন ইনি জয় করেছেন নিজের শিল্পপ্রেমের দুর্বার বলে. শুধু তাদের জয় করেননি, শিল্প প্রতিভায় নিজেকে আজ উন্মুক্তও করেছেন।

নাম তাঁর বিমল দাশগুপ্ত, বর্তমানে দিল্লির কলেজ অব আর্টস-এ অধ্যাপক। ইনি সেই ধরনের শিল্পী নন যাঁরা নিজের ঢাক অন্যদের কাঠি দিয়ে খুব জোরে বাজাতে পারেন, কিম্বা দেদার পয়সা খরচ করে, ককটেল পার্টি দিয়ে পেশাদারী চাকরীদের খুশি করে কাজ হাসিল করেন, অথবা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মশায়দের আত্মীয়তা অথবা স্বজনতার খাতিরে নামের বাজারে জেল্লা নিয়ে পসার জমাতে পারেন। তাঁদের অনেককেই চিনি। কিন্তু বিমলবাবু একেবারে উল্টো। চুপচাপ মানুষ, নিজের কাজ নিয়ে মেতে আছেন, নিজের পরিবার-সংসার দেখছেন, বাদবাকি সময়ে রঙ-তুলি-ক্যানভাসের জগতে আত্মমগ্ন।

তাই এবার এঁর পরিচিতি আনছি। শচীনদা বলতেন, "হ্যাঁ, এঁদের খুঁজে বের করো, তাঁদের কথা অন্যদের জানাও। এঁরাই তো খাঁটি শিল্পী।" "শচীনদা, তা ঠিক; কিন্তু শতাব্দীর এই কালে গায়ক-বাদকদের থাকতে হয় ইমপ্রেজারিয়ো, ছবি আঁকিয়েদের থাকতে 'গ্যালারি'-ওয়ালা এবং আর্টডিলারস। দিনকাল বদলে গেছে"।

সবই সত্য, যেমন সত্য বিমলবাবুর শিল্পপ্রেম। তাঁর আঁকা ছবি আপনার ভাল লাগে কি না লাগে, তা আপনার একান্ত নিজস্ব, কিন্তু যে কঠিন রাস্তা হেঁটে উনি উঠে এসেছেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আদর্শে, যে শিল্পের মন্দিরে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন দুঃখ-দারিদ্র্যের কণ্টক-বন অবহেলা করে, তাও একান্ত সত্য। মতি-বাগের এক কোনায় তাঁর বাসা; তার একটি কোনায় নিজের স্টুডিয়ো। গিয়ে দেখুন তাঁর ছবি, তেলরঙের ছবি, যার রঙের ভিতরেই যেন শিল্পের হাতছানি, যেমন থাকে সূর্য ও মেঘের জগতে, গাছপালা-পাহাড়-নদীর জগতে।

প্রায় নির্বাস্তব ছবি, কিন্তু মনে হয় তাতে নৈরাজ্যবাদ নেই। মিশ্র রঙ, কেউ কটকট করে আপনার চোখের দিকে চেয়ে থাকে না, অথবা ভেল্কিবাজি করে আপনাকে আমোদিত করতে চায় না। নিজেকে আর্থিক দিকে নিঃস্ব করেও উনি এঁকে গেছেন ছবি, কিনতে হয়েছে দামি রঙ, তুলি ক্যানভাস। তাঁর হাতে আর আঙুলে প্রায় ২০।২৫ বছরের অভিজ্ঞতা।

"জানেন, আমার মনের ভিতরে, এই বুকের কাছে কোথাও যেন জমাট হয়ে থাকে অনেক রঙের মেলা, রঙেদের বাসা, বস্তুদের নকশা, আলোছায়ার খেলা। তাদের নাম জানি না। কিন্তু মনের অভ্যন্তরে কোথায় যেন প্রকাশের বেদনা, প্রকাশিত না হওয়ার বেদনা। যখন তুলি নিয়ে বসি, তারা যেন মুক্তি পেয়ে আসে আমার হাতে, আঙুলে, রঙে আর নকশায়। তারা শুধু আসে আর আসে দল বেঁধে, আসে মুক্তির আনন্দে। জানি না কোথায় করেছিলাম শুরু, কার মুখাকার নৈর্ব্যক্তিক অবয়বের কথা স্মরণে। যারা ভিড় করে এল, তারাই পরিচালিত করল আমার তুলি-রঙ, তারাই যেন আঁকল ছবি। আমি তো নিমিত্ত মাত্র"। বললেন বিমলবাবু।

শুনলাম। জানলাম, প্রতি শিল্পীর চলে এই বেদনা, কি প্রকাশিত কি অপ্রকাশিত। যিনি সুর রচনা করেন তাঁর বুকে স্বরের বোঝা, যিনি গল্প লেখেন তাঁর মনে চরিত্র আর কথার হাট-বাজার। একবার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবার জমে সেইসব অদৃশ্য বাঁজানুদের ভিড়, তাদের আবার আদেশ 'আমাদের মুক্তি দাও।' এই হয়তো শিল্পী মন, মানসিকতা, তার অবচেতন অস্তিত্বের প্রস্ফুটন।

এই বিমলবাবুর সঙ্গে কোথায় মিল সেই বালকের যার জন্ম হয়েছিল বিক্রম-পুরের একটি গ্রামে, যে বহরমপুর থেকে ম্যাট্রিক দিয়ে, বাড়ির পুরাতন ভৃত্যের কাছে টাকা ধার করে বাবার সঙ্গে দেখা করে তাকে রাজি করাল, "আমি ছবি আঁকা শিখব।" দরিদ্র পরিবারে সেদিন ওটা ছিল বিলাসিতা, অকর্মণ্যতা। কিন্তু পিতা সম্মতি দিলেন। উনি কাজ করতেন দিল্লিতে আরক্ষা বিভাগে। সেদিন আলাপ হলো। সৌম্য শান্ত চেহারা। বললেন, "আপনাদের 'দেশ' কাগজ পড়ি, আমার খুব প্রিয়।"

তখন স্বনামধন্য মুকুল দে মহাশয় ছিলেন কলকাতা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁর এবং শিল্পী বসন্ত গাঙ্গুলীর অধীনে ১৯৪১ সনে হাতেখড়ি বিমলের। পৃথিবী-জোড়া যুদ্ধ তখন তাণ্ডব লীলায় মত্ত। কলকাতায় জাপানী বোমা। চোখের জল ফেলে বিমল কাজ নিল দিল্লিতে আরক্ষা বিভাগে।

"ঐ তো থাকতাম জগুবাবুর বাজারের এক পাইস হোটেলে। আমার সঙ্গে তখন ছিল সত্যেন ঘোষাল (নাম করা শিল্পী এখন), আদিনাথ মুখার্জি (ইনিও নাম করেছিলেন শিল্পী হিসেবে, মারা গেছেন সুদূর ইতালীতে) আর সত্যনারায়ণ

মুখার্জি, এখন পাটনা আর্ট কলেজের অধ্যাপক। বাড়ি থেকে মাসে পেতাম ১৫ টাকা। জানেন, এমন সময় গেছে যে তুলি রঙ কেনার পয়সা আমার ছিল না। ছিল মাত্র একটি পেনসিল। তাই নিয়ে এ'কে গেছি স্কেচ দিনের পর দিন। একদিন মাস্টার মশাই কিছু জল-রঙ দিলেন। মাতালের মতো ছবি এ'কে এনে তাঁকে দেখালাম। উনি সেদিন খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।" বলে বিমল দাশগুপ্ত তাঁর শোবার ঘরের খাটে বসেন, সামনে দাঁড়া করানো তাঁর অনেক তেল রঙের কাজ, মনোরম, মন-হারানো, স্রেফ সুন্দর।

হ্যাঁ সেই দিল্লির কথা। একদিন মেজর হাকসলে বিমলের আঁকা জলরঙের ছবি দেখে অবাক। "তুমি তো কেরানী, ছবি আঁকো? কী সাংঘাতিক! অতো ভাল ছবি! দাঁড়াও, দেখি কী করতে পারি।" মেজর সায়েব হিং-টিং-ছট করে বিমলকে সহকারী আর্ট ডাইরেক্টর করে দিল কলকাতার তদানিন্তন ফৌজী ম্যাগাজিন "ভিকটরি"-তে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গরা তাকে সইতে নারাজ। "বছরের ভিতরে ছেড়ে ছিলাম। শপথ নিলাম, ইংরাজদের অধীনে আর কাজ নেবো না। উপোস করলেও।" আবার দিল্লি শহর। চাঁদনি চকের কোনো জায়গায়, বাজারী ছবি এ'কে জীবন ধারণ করা। ধূমিমলের রামবাবু তাঁর প্রতিভাকে চিনেছিলেন। বললেন, "এসো, আমার ছোট্ট গ্যালারির ভার নাও, দুয়েকটা ছবিও আঁকো।" তাইতেই শুরু। বিমলের হাত ছিল জলরঙে। তার আগে শুধু স্কেচে। বলল, "কী জানেন, যদি

এখনকার ছবি—"রাজস্থান ল্যান্ডস্কেপ"

কোনো একটা ক্ষেত্রে হাত পাকানো যায়, তাহলে অন্য জায়গায় আর অসুবিধে হয় না। স্কেচ থেকে এলাম জলরঙে। প্রায় ১০।১৫ বৎসর। কতোভাবে ব্যবহার করলাম জলরঙ, কলা সমালোচকরা আমার কাজ উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা করল। দেখলাম, জল রঙের একটা সীমা আছে। আমার মন ভরল না। তাই নিলাম তেল রঙ আজ থেকে সাত বছর আগে। পেলাম অপূর্ব সুযোগ, ভাবিয়াং। কতো রঙ, কতো রঙের মহিমা, না আমি তাবার প্রকাশ করতে পারি না। রঙেরা যেন আমার খেলনা। তাদের নিয়ে আমার খেলা। শিল্প খেলা। তাই জল রঙ থেকে এলাম তেল রঙে। কিন্তু আমি বরাবর রয়ে গেলাম ল্যাণ্ডস্কেপ আর্টিস্ট।"

ঠিক। নৈসর্গিক জগতের রূপ—আলো, অবয়ব, রঙ আর নকশা—বিমলকে এখনো করছে প্রতিভাত। সে একান্ত ল্যাণ্ডস্কেপিস্ট। তাই ভাঙাচোরা আকৃতি, নতুন রঙে নতুন আকৃতি, নির্বাস্তব অর্ধবাস্তব আকৃতি আজকার বিমলের কাজে। সুন্দর কাজে, ঠিক যেমন সুন্দর দেরাদুন উপত্যকার সূর্যাস্ত।

ধূমিমল থেকে একটা প্রচার ক্ষেত্রে, তারপর আবার ভারত সরকারে, স্বাধীন ভারতে। কিন্তু ডিপ্লোমা না থাকলে ভারত সরকারের স্থায়ী কাজ হয় না। সুতরাং ১৩৫১ সনে কলকাতার আর্ট কলেজে স্পেশ্যাল পরীক্ষা দিয়ে বিমল পেল ফার্স্ট ক্লাস।

প্রথম একক প্রদর্শনী ১৯৫৫ সনে, ৫৭ সনে কলকাতায়। তারপর থেকে অনেক অনেক প্রদর্শনী আর পুরস্কার। অনেকবার। দিল্লির আর্ট কলেজে এলেন ১৯৬৩ সনে। কিন্তু তার আগে হল একটা মস্ত পরিবর্তন। সাত বছর আগে স্কলারশিপ পেয়ে গেলেন ইউরোপে, দেখলেন নতুন কাজ, নতুন রঙ, নতুন শিল্প। "ফিরে এসে দেখলাম জল রঙে আমার প্রকাশ আর হয় না। নিলাম তেল রঙ। পেলাম এক নতুন জগত, নতুন ধারা। তাকে নিয়ে আছি এখনো। জানেন, কতো কিছু হয় এই তেল রঙে, অনেক অনেক। আমি জল রঙে সব কিছু জেনেছি বলেই আজ তেল রঙে পেয়েছি প্রকাশের নতুন রকম। অনেক অনেক", উনি বলেন, খাটের উপর পা দুটো জড়ো করে।

ভারত সরকারের পাকা চাকরি হল, কেননা ডিপ্লোমা এবার পাওয়া গেছে। তোমার ছবি চুলোয় যাক, ডিপ্লোমা তো আছে, ব্যস! এল অনেক পুরস্কার। জাতীয় পুরস্কার ১৯৫৬-তে। আরো অনেক। অনেক প্রদর্শনী, দেশে বিদেশে, বার্লিন, ওয়ার্শ, ব্রেজিল, নিউইয়র্ক, লন্ডন, অনেক জায়গায়। বিমলের মাথা ঘোরেনি।

তারপর? "এই তো, আমি দিল্লির আর্ট কলেজে মাস্টার। ছেলেদের তৈরি করছি। তারা বড় হোক, শিল্পী হোক, মহৎ হোক। এইতো চাই", বললেন বিমল দাশগুপ্ত।

খগেন দে সরকার

স্বপ্নের
জালে
বোনা
বিনীর
খাঁটি সিল্কের শাড়ী

"আয়ুর্বেদীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সারকথা"

বিগত ২।৯।৬৭ (১৬ ভাদ্র, ১৩৭৪) তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাশংকর সেন মহাশয় উপরিলিখিত প্রবন্ধটির উপর যে আলোচনা করেছেন তা পড়ে আনন্দ লাভ করলাম। সেই সঙ্গে কিছু উৎসাহ। তিনি প্রবন্ধটিতে যে অসম্পূর্ণতা লক্ষ করেছেন, যে সব বিষয়ে তিনি তথ্য সরবরাহ করেছেন, সেগুলি সবিনয়ে স্বীকার ও গ্রহণ করলাম। তবে, দুএকটি কথা এই প্রসঙ্গে পাঠকদের নিবেদন করতে ইচ্ছা করি। উক্ত প্রবন্ধটি একক ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। সে বিষয়ে যথেষ্ট আভাস অবশ্য প্রবন্ধটিতে দেওয়া ছিল না, সত্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, আয়ুর্বেদের বিশ্বজনীন মত-পথ, ধ্যান-ধারণা, সামাজিক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সর্বদিক সম্পর্কে ধারাবাহিক-ভাবে লিখিত একটি রচনামালার ভূমিকা-স্বরূপ উক্ত প্রবন্ধটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত। যে সকল অসম্পূর্ণতার উল্লেখ শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় করেছেন, সেগুলি সম্পর্কে পরবর্তী রচনাসমূহে আলোচনা করা আছে, এবং যেগুলির বিষয়ে হয় নাই, সেগুলি যথাযথভাবে ভবিষ্যতে করা হবে, ইচ্ছা আছে। "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" ১৯৬৬, নভেম্বর, একাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার লিখিত "রোগোৎপত্তি সম্পর্কে আয়ুর্বেদের ধারণা" নামক প্রবন্ধে শারীরিক ও মানসিক রোগের বিষয়ে আলোচনা আছে।

যাই হোক, তাঁর আলোচনার উপসংহারে "ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতি বা নিজস্ব ধারা বিসর্জন না দেন" বলে শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের প্রতি যে আবেদন জানিয়েছেন, সেই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। বস্তুতঃ-পক্ষে, বায়ু, পিত্ত, ও কফ নামক ত্রিদোষ এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক ত্রিগুণ সংক্রান্ত যে তত্ত্ব দুটির উপর আয়ুর্বেদের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত, সেই তত্ত্ব দুটি আধুনিক কলা-কৌশলের সাহায্যে কিভাবে প্রমাণ করা সম্ভব সেই বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়ে আলোচনার জন্য প্রধানত উক্ত রচনামালাটির অবতারণা করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে, আয়ুর্বেদীয় দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ তা সর্বাগ্রে বিবেচ্য; তারপর আয়ুর্বেদের উদ্দেশ্য— সামাজিক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক প্রভৃতি বিষয়ও জ্ঞাতব্য। কিভাবে রোগ উৎপত্তি ও কিভাবে রোগ প্রতিকার করা হয় সেই সম্পর্কে আয়ুর্বেদের ধারণা কি এই সব বিষয়ও আলোচনা পর পর করা হয়েছে। এই পটভূমিতে তত্ত্ব দুটির প্রমাণের সম্ভাবনা ইঙ্গিত, ও সর্বশেষে "ভবরোগ" বা বর্তমান সভ্যতার সংকটে আয়ুর্বেদের কিছু করণীয় আছে কি না, ইত্যাদি বিষয়ও আলোচনা আছে।

সর্বোপরিদেশে যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজে নিযুক্ত থাকায় আয়ুর্বেদের বিষয়ে আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়। সেই সূত্রে আয়ুর্বেদ সম্পর্কে অতি সামান্য কিছু পড়াশুনা করে এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালীর সাফল্যের কিছু কিছু ফল প্রত্যক্ষ করে ... বললেই সব বলা হয় না। আমার এমন বিশ্বাস জন্মেছে যে, উক্ত তত্ত্ব দুটি আধুনিক বিজ্ঞানীদের গ্রহণযোগ্য ভাবে উপস্থিত করা সম্ভব। একদিন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, প্রাচীন ভারতীয় সাংখ্য দর্শনের উপলব্ধ সত্য, 'গাছের প্রাণ আছে, চেতনা, সুখ-দুঃখ বোধ আছে' সে কথা বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞানীদের নিকট আধুনিক বিজ্ঞানেরই কলাকৌশলে প্রমাণ করেছিলেন। আমার দৃঢ় প্রত্যয় হচ্ছে যে, আয়ুর্বেদের অন্তর্নিহিত সত্য ঐ তত্ত্ব দুটিতে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ঠিক সেইভাবে তা প্রমাণ করা সম্ভব। সেইভাবে প্রমাণ হলে, জীব-বিজ্ঞানে (Life Sciences) মৌলিক অবদান রাখাও সম্ভব হবে। জানি না, কে সেই সৌভাগ্যবান পুরুষ—তিনি ভারতবাসী কি ভিন্ন দেশী লোক যিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মত বিশ্বজোড়া সম্মান লাভ করবেন! তবে, ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস, এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই সকল সুধী বাঙালীজনেরও যে, তিনি ভারতবাসী ও বাঙালী হলেই আমাদের আনন্দ ও গৌরবের কারণ বেশী-ভাবে সৃষ্টি হবে।

এই বিষয়ে যদি সহৃদয় পাঠকগণ আরও কিছু নূতন আলোকপাত করেন তো বিশেষ বাধিত থাকব।

মাধবেন্দ্রনাথ পাল
কলিকাতা-৪

কবিতার রেকর্ড প্রসঙ্গ

গ্রামোফোন কোম্পানীর এবারের অভিনব পূজোপহার কবিতার রেকর্ড সম্বন্ধে সাপ্তাহিক দেশ (৬ই আশ্বিন, ১৩৭৪) পত্রিকার পাতায় দুই লেখকের বিপরীত মতামত পড়ে বিস্মিত হয়েছি। অবশ্য মতামতের কিছুটা পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক কারণ শ্রদ্ধেয় সুনন্দ দেখেছেন মরমী সমজদারের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আর শ্রীচাণক্য বিচার করেছেন কঠোর সমালোচকের চুলচেরা বিচার বুদ্ধির সূক্ষ্ম নিক্তিতে। কিন্তু পার্থক্যটা এতই বেশী যে আশঙ্কা করছি সমালোচনার ভিত্তিতে যারা রেকর্ড কিনতে প্রয়াসী হন তারা কিছুটা ফাঁপরে পড়বেন। এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার আছে। কলকাতার ডায়েরির পাতায় রেকর্ডটি সম্বন্ধে চাণক্যের প্রধান আপত্তি এই যে, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের কবিতা মাত্র একটি করে রয়েছে অথচ জীবনানন্দ, সুধীন দত্ত প্রমুখের দুটি বা তিনটি। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের কবিতা বাংলা দেশের ঘরে ঘরেই আছে; তুলনায় জীবনানন্দ সুধীন দত্ত প্রমুখের অনেকাংশে কম। আমার তো মনে হয় এ ব্যাপারে গ্রামোফোন কোম্পানী যথেষ্ট দায়িত্বের পরিচয় দিতে পেরেছেন।

চাণক্যের দ্বিতীয় আপত্তি হচ্ছে যে রেকর্ডটি আদৌ প্রতিনিধিত্বমূলক হয়নি। বাংলা দেশে প্রথম শ্রেণীর কবির সংখ্যা কম নয়—সেক্ষেত্রে একটা মাত্র রেকর্ডে সব কবিরই কবিতা স্থান পাবে—এমন আশা করা অনুচিত; চাণক্য বোধ হয় একটু ধৈর্য সহকারে পরবর্তী রেকর্ডের জন্য অপেক্ষা করতে পারতেন।

তৃতীয়তঃ তিনি বলেছেন যে, যে সব কবি স্বকণ্ঠে আবৃত্তি করেছেন তাদের আবৃত্তি খ্যাতনামা আবৃত্তিকারদের তুলনায় ঢের ঢের ভাল হয়েছে। ব্যাপারটা কবিদের প্রশস্তি এবং আবৃত্তিকার তথা গ্রামোফোন কোম্পানীর নিন্দা হল কিনা ঠিক বোঝা গেল না।

সবশেষে বলি, রেকর্ড কোম্পানীর এই অভিনব প্রচেষ্টার সবেমাত্র অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে। অল্প-স্বল্প ত্রুটির চাইতেও এই প্রয়াসটির সার্থকতা অনেক বেশী। তাড়াহুড়ো সমালোচনার ঝড় উঠিয়ে তাদের এই সযত্ন প্রয়াসটির অপমৃত্যু ঘটানো বোধ হয় ঠিক নয়।

শ্রীশেখর মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-৪

কিশোর-কিশোরীর জীবন

কিশোর জীবনের বর্ণনা প্রায় সমস্ত লেখকই কোনো না কোনো সময় লিখতে প্রলুব্ধ হন। পরিণত বয়সে পেঁছে ফেলে-আসা কৈশোরকালের জন্য প্রায় সব মানুষেরই দীর্ঘশ্বাস পড়ে, লেখকদের বর্ণনায় সেই স্মৃতিমন্থনেরই রূপ চোখে পড়ে। স্মৃতি অনেক কিছু ছেঁকে নেয় সুতরাং কৈশোরের কবিত্বময় সরলতাই লেখকদের বেশী মনে থাকে, সেই বয়সের পরিবর্তনের দারুণ ঝঞ্ঝা, বিবেকবোধের অহরহ পরিবর্তন, পাপ ও নিষিদ্ধের আস্বাদ—এগুলো সাধারণত বর্জিত হয় লেখকদের রচনায়, কিছুটা থাকলেও তা অত্যন্ত নরম ও আবেগময় হয়ে আসে। কৈশোরের কৌতুক ও আবিষ্কার স্পৃহাটাই সাহিত্যে বেশী ফোটে, ভয়ংকর বন্যময় সম্পূর্ণ ছবি অনেকেই আর ফিরে মনে পড়াতে চান না।

সম্প্রতি দু'খানা বিদেশী বই চোখে পড়লো, একখানি কিশোর থেকে পুরুষে উত্তীর্ণ হবার যথাযথ কাহিনী, অন্যটি কিশোরীর জীবন। দু'টি বই-এরই সাহিত্যমূল্য অনস্বীকার্য। দু'টোই উপন্যাসের আকারে আত্মজীবন-ধর্মী।

প্রথম বইটি মূলে স্প্যানিশ ভাষায়, কিছুকাল আগে ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। একটি মিলিটারি আকাডেমির নবীন সৈনিকদের জীবন নিয়ে লেখা এই উপন্যাসটির নাম, "দি টাইম অব দি হিরো", লেখক মারিও ভারগাস লোসা। বইটি ১৯৬২ সালের শ্রেষ্ঠ স্প্যানিশ উপন্যাস হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে যে লিওনসিও প্রাদো মিলিটারি আকাডেমির কথা লেখক নাম করে উল্লেখ করেছেন, অবিকল সেই নামের একটি আকাডেমি সেখানে আছে। বইটা বেরোবার পর সেখানে এই বই-এর কপি সাড়ম্বরে পোড়ানো হয়।

সহজে নরম বা সহনীয় না করে লেখক যথাযথভাবে কিশোরদের পুরুষ হবার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই মিলিটারি আকাডেমিতে পেরুর নানা অঞ্চল থেকে ক্যাডেটরা এসে ভর্তি হয়। আকাডেমিটিকে একটি পুরুষ গড়ার কারখানার রূপক হিসেবে ভাবা যায়। বাপ-মায়েরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার জন্য এখানে পাঠান, সমাজে বিচ্ছু ছেলেদের যেমন বোর্ডিং-এ পাঠানো হয়।

নতুন ছেলেদের ক্যাপটেন প্রথমেই এই উপদেশ শুনিয়ে দেন : "সেনাবাহিনীতে এসে তোমাদের প্রথমেই যা শিখতে হবে তা হচ্ছে খাঁটি পুরুষমানুষ হয়ে ওঠা। পুরুষমানুষেরা কি করে? তারা সিগারেট টানে, মদ খায়, জুয়া খেলে, মেয়েমানুষ... কিন্তু শুনে রাখো, কোনো ক্যাডেটকে যদি এর একটিও করতে দেখা যায়, তবে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু যে সব ছেলে সত্যিই পুরুষমানুষ হবার যোগ্য, তারা ওর সবই করে, কিন্তু ধরা পড়ে না। এখন দেখা যাক!"

শুরু হলো খেলা, পুরুষ হবার খেলা। "পুরুষ" হওয়া মানে কি, আমি যা চাই তা যে-কোনো উপায়ে পাবার চেষ্টা। চুরি, বদমাইশী, জোচ্চুরি, ভণ্ডামি এই সব শেখা। যে দুর্বল তার ওপর উৎপীড়ন অত্যাচার করা এবং যে অধিকতর সবল তার তোষামুদি। ক্যাডেটদের মধ্যে গড়ে ওঠে একটি দল—যারা এই খেলায় সবচেয়ে উৎসাহী। সেই দল বা "দি সার্কল"-এর নেতা হয়ে ওঠে সেই ছেলেটি, যে একসময় ছিল সবচেয়ে ভীরু আর মুখচোরা। নেতার নাম জাগুয়ার। যাকে সবাই মিলে অত্যাচার করে সুখ পায়, সেই চরিত্রটির নাম দি শ্লেভ। আর একটি চরিত্র, বলা যায় মুখ্য চরিত্র, একজন কবি, পয়সা উপার্জনের জন্য যে ক্যাডেটদের মধ্যে রগরগে যৌন গল্প ছড়ায়। এইভাবে সে অন্যদের এগিয়ে দেয় বিষাক্ত প্রাপ্তবয়স্কতার দিকে। উত্তর-মেরু কিংবা দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারকদের মতো উত্তেজনায় কাঁচা কিশোরেরা যৌনতার নানান বিকৃতির দীক্ষা নেয়।

প্রতীচ্য অর্থে "পুরুষ" হওয়ার ব্যাপারকে লেখক মারিও লোসা তাঁর শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বাস্তব করেছেন।

অপর বইটির নাম 'দি ইউনিকর্ন গার্ল'—লেখিকা ক্যারোলিন গ্লীন—লেখিকার বয়েস এখন উনিশ, অর্থাৎ তিনি নিজেই সদ্য কিশোরীত্ব পার হয়েছেন। খুব কম বয়েসেই ক্যারোলিন গ্লীন খ্যাতিপ্রাপ্তা — এবং ভবিষ্যতে একজন প্রথম শ্রেণীর

উপন্যাসিকের সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর মধ্যে। এই উপন্যাসখানি তাঁর তৃতীয় বই. তাঁর প্রথম বই 'ডোনট নক্ দি করনারস অফ' বেরিয়েছিল তাঁর ১৫ বছর বয়েসে এবং তখনই যথেষ্ট সাড়া তুলেছিল।

কিশোর বয়েসেই ভালো গদ্য লেখার হাত কদাচিৎ দেখা যায় বলেই কিশোর বয়েসের হুবহু চিত্র সাহিত্যে এত কম। ক্যারোলীন গ্লীনের সার্থকতা এইখানেই। তিনি তাঁর নিজের জীবনের কথা বা অনতি-অতীতের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই বই-এর নায়িকা একটি ১৩ বছরের মেয়ে। এবং গার্ল গাইডদের একটি গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পে তার কিছুদিন কাটানোই এ বই-এর কাহিনী-অংশ। দু' সপ্তাহের জন্য একটি দ্বীপে ক্যাম্প হয়েছে—বনে-জঙ্গলে হুড়োহুড়ি করছে কচি মেয়েরা, বিশৃংখলা, অসঙ্গতি চতুর্দিকে। একটি ১৩ বছরের কল্পনাপ্রবণ মেয়ের জগৎ বড় মধুর, বিষণ্ণ। এ জগতে সে নিঃসঙ্গ। তার শরীরে পবিত্রতার গুরুভার। একজন সঙ্গী খুঁজতে গিয়ে সে শুধু নিজেকেই খোঁজে। ক্যাম্পের উচ্ছৃংখল জীবনে সে দিশেহারা হয়ে যায়, সে আরও নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠে। সে কল্পনা করে যেন একটা শিংওয়ালা ছাগল (ইউনিকর্ন) সব সময় তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। এই ইউনিকর্ন কুমারীত্বের প্রতীক। সেই ১৩ বছরের মেয়ে বন্ধু খুঁজতে পারে, সে যে এখনও অক্ষত কুমারী—এ-যুগে এটাই তার গর্ব, বৈশিষ্ট্য ও নিঃসঙ্গতা।

উনিশ বছরের মেয়ের লেখা এই বইখানা ভারি চমৎকার।

সনাতন পাঠক

পারমাণবিক যুদ্ধ : আলোচনা

সিকিউরিটি ইন দি মিসাইল এজ। জে. কে. রায়। এলায়েড পাবলিশার্স। ১৭ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩। দাম দশ টাকা।

কম্যুনিস্ট চীন কর্তৃক স্বীয় প্রচেষ্টায় হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের পর পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের যুগে ভারতের প্রতিরক্ষার সমস্যা আগের চেয়ে অনেক বেশী জটিল আকার ধারণ করেছে। বর্তমান গ্রন্থে লেখক চারিটি অধ্যায়ে পারমাণবিক যুদ্ধের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি ও ভবিষ্যতে ভারতের বিপদের কথা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র মজুতের দিক থেকে বর্তমান পৃথিবীতে রাশিয়া ও আমেরিকা—এই দুটি সুপার পাওয়ার তৈরী হয়েছে। দুটি দেশের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে কে বেশি শক্তিশালী, সে প্রশ্ন আজ অবান্তর। কেননা, দুটি দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে দুই দেশের জনসংখ্যা, শহর, কলকারখানা প্রভৃতির কতটা অবশিষ্ট থাকবে তা কেউই বলতে পারেন না। এজন্য পারমাণবিক যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যই অন্যভাবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার চেষ্টা হচ্ছে। লেখক দ্বিতীয় অধ্যায়ে সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণ, আংশিক নিরস্ত্রীকরণ, নিরস্ত্র প্রতিরোধ, একক নিরস্ত্রীকরণ, একক উদ্যোগ পারস্পরিক উদ্যোগ ও সীমাবদ্ধ যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। রাশিয়া ও আমেরিকা পারমাণবিক যুদ্ধ এড়াবার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন হলেও অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে তদন্ত কৌশল সম্পর্কেই একমত হতে পারছে না। অন্যান্য দেশও সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণে রাজী হবে বলে মনে হয় না। এ-অবস্থায় রাশিয়া ও আমেরিকার পক্ষে সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণে রাজী হওয়া অসম্ভব। আংশিক নিরস্ত্রীকরণের ফলে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র পুরোপুরি নষ্ট করা যাবে না। এবং নষ্ট করা গেলেও গোপনে বা প্রকাশ্যে ঐ অস্ত্রের উৎপাদন চালু রাখা সম্ভব হবে। লেখকের মতে আংশিক নিরস্ত্রীকরণ বরং নিরাপত্তার অভাব আরও বাড়িয়ে দেবে। নিরস্ত্র প্রতিরোধকারীরা অবশ্য ধরেই নেন, দেশটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অধীনে চলে গিয়েছে। কারণ কোন দেশের প্রতিরক্ষার কথা বিবেচনা করার সময় নিরস্ত্র প্রতিরোধের কথা ভাবাই যায় না। একক নিরস্ত্রীকরণের ফলেও অপর দেশ কর্তৃক আক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। অস্ত্র প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত দেশগুলিতে সামরিক গোষ্ঠীর আধিপত্য বৃদ্ধির আশংকাতেও অনেকে একক নিরস্ত্রীকরণের কথা বলে থাকেন। কিন্তু পারমাণবিক যুদ্ধের মতই একক নিরস্ত্রীকরণ নিয়েও কোন দেশের পক্ষে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত নয়। কারণ প্রথমটিতে গোটা মানবসমাজের ধ্বংস হতে পারে, দ্বিতীয়টিতে পরীক্ষায় নিযুক্ত দেশটি ধ্বংস হতে পারে—এইভাবে স্বাধীনতা হারানোর মধ্যে কোন গর্ব বা নৈতিক জয় আছে বলে মনে হয় না। একই কারণে একক উদ্যোগের দাবিও সমর্থনযোগ্য নয়। শত্রুপক্ষ আক্রমণ করবে একথা মনে করে কোন দেশ প্রথম পারমাণবিক যুদ্ধ আরম্ভ করতে পারে। এই অস্ত্রের অধিকারীর সংখ্যা যত বাড়বে, অনুমান ও আশংকাকারীর সংখ্যাও সেই পরিমাণে বাড়বে এবং ভুল করে প্রথম আক্রমণের সম্ভাবনাও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে। এই দিক থেকে বেশী রাষ্ট্রের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র মজুত থাকলে এই অস্ত্রের ব্যবহার বাড়বার সম্ভাবনাই বেশী মনে হয়। লেখক অবশ্য এই ধরনের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে বেসরকারী অধিবাসীদের বড় বড় শহর থেকে অন্যত্র অপসারণ ও বোমার আক্রমণের বিরুদ্ধে আশ্রয় নিবাস স্থাপনের প্রস্তাবও আলোচনা করেছেন। কিন্তু বিরুদ্ধ রাষ্ট্রের ক্ষতির পরিমাণ কম হওয়ার সম্ভাবনার কথা জেনেও আক্রমণের ভয়ে ভীত দেশ প্রয়োজন হলে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ রাখবে বলে মনে হয় না।

আপাতত বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ না হলেও সীমাবদ্ধ যুদ্ধকে কিন্তু বিদায় দেওয়া সম্ভব হয় নি। কোরিয়া, ইন্দোচীন, পশ্চিম-এশিয়া বা ভিয়েতনামের যুদ্ধে বৃহৎ শক্তি দুটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে কম বেশী জড়িত হলেও সামগ্রিকভাবে জড়িয়ে পড়েনি, তাতে অন্তত বিশ্বযুদ্ধ বিলম্বিত হচ্ছে। এই ধরনের সীমাবদ্ধ যুদ্ধকে বৃহৎ শক্তির ক্ষমতালোভী মনোবৃত্তির প্রকাশ বলে অভিহিত করা হলে সীমাবদ্ধ যুদ্ধের এলাকার স্থানীয় গোষ্ঠীর পরস্পর-বিরোধিতার কথা [illegible] যাওয়া হয়। অথচ এই ধরনের গোষ্ঠীর অস্তিত্বের জন্য কেবল সীমাবদ্ধ যুদ্ধ নয়, ঠাণ্ডা-লড়াইও চালু থাকে। পশ্চিম-এশিয়ার যুদ্ধে আরব ও ইজরাইলদের সম্পর্ক এবং ইয়েমেনের যুদ্ধে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র ও সৌদি আরব সমর্থিত দুটি গোষ্ঠীর কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী দেশের সংখ্যা বাড়লে যুদ্ধের আশংকা বৃদ্ধি পায় ঠিকই কিন্তু কেবল বৃহৎ দুটি দেশ এই অস্ত্রের অধিকারী হলে তৃতীয় রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে। লেখক কিউবার কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৬২ সনে রাশিয়া আমেরিকার সংগে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চায় নি বলে কিউবা থেকে পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার নিজের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এখানে বৃহৎ শক্তি

দুটির নিজ নিজ দেশের স্বার্থ বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। কাজেই ভবিষ্যতে নিজের দেশের স্বার্থে তৃতীয় রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বিসর্জনের ব্যবস্থা করতে এদের না-ও আটকাতে পারে। লেখক প্রধানত এই যুক্তিতেই ভারতে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনের কথা বলেছেন। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর ভারতবর্ষকে দাম দিয়ে কেনা অস্ত্রের সরবরাহও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ইন্দোচীনের যুদ্ধে প্রধানত আমেরিকা অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ায় ফরাসীরা দিয়েন বিয়েন ফুতে পরাজিত হয়। ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য কোন দেশ গ্যারান্টি দিলেও ভারতের জন্য নিজের দেশে পারমাণবিক বোমার আক্রমণের ঝুঁকি নেবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া কম্যুনিস্ট চীন নূতন অস্ত্রের অধিকারী হওয়ায় আমেরিকা ভিয়েতনামের যুদ্ধের মারফত চীনের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় আসতে চায়। আমেরিকার এই চেষ্টা সম্ভব হলে ভবিষ্যতে চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতকে একাই দাঁড়াতে হবে।

চীন ও পাকিস্তানের শত্রুতার কথা ভেবেই লেখক পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনের ব্যাপারে ভারতবর্ষকে উদ্যোগী হতে বলেছেন। লেখক বিভিন্ন তথ্য উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, বৃহৎ শক্তিগুলি পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনের খরচ অনেক বেশী পড়ে বলে অনেক অসত্য প্রচার করেছে। চীন প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করে যে-খরচে পারমাণবিক বোমা তৈরি করেছে, ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে তার চেয়ে অনেক কম খরচে ঐ বোমা তৈরি করতে পারবেন। বোমা তৈরির জন্য বছরে ১০০ কোটি টাকা ও বোমা-নিক্ষেপ ও অন্যান্য ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য বছরে ১০০ কোটি খরচ করলেই চলবে। আর এই বাবদে টাকা খরচ করলে শিল্পোন্নয়ন যে ব্যাহত হয় না, চীনের ঘটনাই তো তার প্রমাণ। কিন্তু পারমাণবিক বোমা ছাড়াও চীন ধ্বংসাত্মক কাজে উৎসাহ দিয়ে প্রতিবেশী দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল করতে পারে, লেখক অবশ্য তা উল্লেখ করেন নি। অথচ ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বর্তমানে এই অস্ত্রই বেশী প্রয়োগ করছে। দেশে যে-সময়ে পারমাণবিক বোমা তৈরি নিয়ে বিতর্ক চলছে সেই সময়ে এমন একটি বইয়ের সত্যিই প্রয়োজন ছিল।

(২৬৭।৬৭)

গল্পগ্রন্থ

রাতের সূর্যমূর্তি। সুনীল দাশ। মানস প্রকাশনী। ৪১।১ হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলিকাতা-১২। দাম ২·৫০ পয়সা।

নতুন লেখক সুনীল দাশের বিগত চার বছরের ফলশ্রুতি তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'রাতের সূর্যমূর্তি।' আঙ্গিক নির্ভর সাতটি গল্পের মধ্যে মননশীলতার পরিচয় মেলে, প্রাণের স্পর্শও কম নয়। 'শোক' গল্পে, নায়ক রাধানাথের স্ত্রী বিয়োগে 'কাঁদতে না পারার শোকে' কাঁদার ব্যঞ্জনাটি যেমন লক্ষণীয়, 'জন গণেশ' গল্পের ব্যঙ্গও তেমনই প্রখর, বেদনাদায়ক। শিরোনামের গল্প, 'রাতের সূর্যমূর্তি' যতখানি সোচ্চার ততখানি বাঙ্ময় হয়ে ওঠেনি।

শারদ সাহিত্য

আগামী। সম্পাদনা : কৃষ্ণা দত্ত ও প্রসূন বসু। ১৯ ডাঃ শরৎ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্য ৩·০০।

ছোটদের জন্য প্রকাশিত শারদীয়া সংকলন হিসেবে 'আগামী' রচনা ও আঙ্গিক সৌষ্ঠবে একটি আকর্ষণীয় প্রকাশন বলে গণ্য হবার যোগ্য। এর লেখকদের মধ্যে আছেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, মিহির সেন, খাজা আহম্মদ আব্বাস, মণীন্দ্র রায়, সুধীর করণ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। গল্প, কবিতা, অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ছাড়া ম্যাজিক এবং খেলাধূলো সম্পর্কিত সরস রচনাবলী ছোটদের মন রাখবে আশা করা যায়।

কালি ও কলম। সম্পাদক : বিমল মিত্র। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১·০০।

শারদীয়া বিশেষ সংখ্যা অবশ্য নয়, তবে নবপর্যায়ে প্রকাশিত পত্রিকাখানি সুপাঠ্য রচনার গুণে বিশেষ সংখ্যার সম্মানের উপযোগী। এ সংখ্যায় গল্প লিখেছেন সমরেশ বসু, ওঙ্কার গুপ্ত, বারীন্দ্রনাথ দাস ও দুর্গাদাস ভট্ট। কবিতা লিখেছেন দিনেশ দাশ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আধুনিক কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন গোপাল হালদার। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ এবং পুলিনবিহারী সেন সংকলিত রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী সংখ্যাটির মূল্য বাড়িয়েছে। বিমল মিত্র ও জরাসন্ধের ধারাবাহিক উপন্যাস এবং যজ্ঞেশ্বর রায় রচিত পিরানদেলো সম্পর্কিত ধারাবাহিক আলোচনাও এ সংখ্যায় আছে।

প্রাপ্তি স্বীকার

শ্রীম-দর্শন (১ম ভাগ)। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য ৫·০০।

সংক্ষিপ্ত আত্মকথা। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। সম্পাদনা : শ্রীরঘুনাথ মাইতি। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি : ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·০০।

আত্মকথা। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। অনুবাদ : শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ। গান্ধী স্মারক নিধি : ১৪ রিভারসাইড রোড, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা। মূল্য ১২·০০।

শশী কবি। ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। সচীপত্র : ৩৫সি সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯। মূল্য ৩·০০।

বনতুলসীর বন। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। নির্মল বুক এজেন্সী : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ২·৫০।

প্রিয়তমা। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য রূপা : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ৩·০০।

পঞ্চকন্যা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্তম : ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩·০০।

রঙ্গজগৎ

শার্লি ম্যাকলেন ফটো—দেশ

কলকাতায় শার্লি ম্যাকলেন

কলকাতায় হলিউড অভিনেত্রী শার্লি ম্যাকলেন কাটিয়ে গেলেন প্রায় পনেরো দিন। ছুটি পেয়ে তিনি বেড়াতে এসেছিলেন। কলকাতায় এসে স্টুডিওতে যাওয়া, শুটিং দেখা, এখানকার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংগে দেখা-সাক্ষাৎ—শার্লির পক্ষে এ-সব কাজই হয়ত ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি জড়িয়ে পড়লেন জনহিতকর কাজে। "বাধ্য হয়ে, না স্বেচ্ছায়?"—প্রশ্ন করেছিলাম শার্লিকে। "স্বেচ্ছায় বইকি, এবং সানন্দে", জবাব দিলেন শার্লি।

হোটেলে শার্লির ঘরে বসে যখন তাঁর সংগে কথা হচ্ছিল তখন আরও দুজন ফিল্ম স্টার উপস্থিত ছিলেন। বোম্বাইয়ের দেব আনন্দ ও কলকাতার সন্ধ্যা রায়। সন্ধ্যা রায়ের সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে সিঁদুরের টিপ। সকলেরই তা নজরে পড়েছিল। শার্লিরও। সন্ধ্যা রায় জানালেন, সেটা শুটিং-এর মেক-আপ। শুটিং সেরেই তিনি সোজা চলে এসেছেন গ্র্যান্ডে, শার্লির আমন্ত্রণে।

শার্লি ফিল্ম স্টারদের ডেকেছিলেন "অ্যান ইভনিং উইথ ফিল্ম স্টারস" শো'র জন্য। অনাথ আশ্রম "বয়েজ টাউনে'র জন্য টাকা তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। শার্লি জানালেন, রাজ কাপুর কিছুতেই আসতে পারলেন না। কাজে আটকে পড়েছেন।

বছর তিন আগেও শার্লি কলকাতায় এসেছিলেন। এই শহরকে ভালবেসে ফেলেছেন শার্লি। তার প্রমাণ পেলাম পরের দিন লাইটহাউস মিনিয়েচারে। ওই দিনই সন্ধ্যায় তাঁর বোম্বাই যাবার কথা। রওনা হবার আগে বিকেলে বংশীচন্দ্র গুপ্তের "গ্লিমপসেস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল" এবং সত্যজিৎ রায়ের "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" দেখলেন। সকালে দেখেছেন ফিল্মস ডিভিশনের আরও কিছু ছবি। পরম উৎসাহ ও কৌতূহল নিয়ে তিনি ছবিগুলি দেখছিলেন। দেব আনন্দ তাঁর সংগেই ছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁদের দুয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম। "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" ছবিটি শার্লি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। সত্যজিৎ রায়ের প্রতি শার্লির খুব শ্রদ্ধা। হঠাৎ দেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এলিয়েন' ছবির সংগীত পরিচালকও কি সত্যজিৎ রায়? বললাম, হ্যাঁ, সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি ও পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও সব খবর মন দিয়ে শুনলেন শার্লি। "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" ছবিতে কবিকণ্ঠে "তবু মনে রেখো" গান শুনে শার্লি স্তব্ধ।

ভারতবর্ষকে ভালভাবে জানার গভীর আগ্রহ শার্লির মধ্যে দেখে ভাল লাগল। কাহিনীচিত্র ছেড়ে ডকুমেন্টারি ছবি দেখার জন্য তাই অভিনেত্রী এত উৎসুক। শার্লি এখন কোন ছবিতে কাজ করছেন, নতুন ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন করার আগেই তিনি বললেন, "আমার ওই পরিচয় ভুলে যান। এখন আমার ফিল্ম বা অভিনয়ের কথা নয়।" এই ধরনের প্রশ্নের জবাব তাঁকে হামেশাই দিতে হচ্ছে। নিজের দেশে এবং অন্যত্র। ভারতবর্ষে বেড়াতে আসা নয়, যেন পালিয়ে আসা। অভিনেত্রী-জীবনকে ভুলে থাকা। শার্লির কথা শুনে তাই মনে হল। তবু শার্লির রেহাই নেই। বয়েজ টাউনের অনাথ ছেলেদের দেখে বুঝি অভিনেত্রী স্থির থাকতে পারলেন না। ওদের কল্যাণে কিছু করার জন্য ব্যস্ত হলেন। তাই "ইভনিং উইথ ফিল্ম স্টারস।" ইচ্ছা না থাকলেও শার্লিকে লাইমলাইট-এ আসতে হল। "আমার কথা কিছু লিখবেন না। লিখতেই যদি হয়, বয়েজ টাউনের অসহায় ছেলেদের কথা বলুন। ওদের সাহায্য করুন"। কথাগুলি বলার সময় শার্লির দুটি চোখ যেন ছলছল।

ফটো—দেশ

কাদার ভয়াল, শার্লি ম্যাকলেন, দেব আনন্দ ও সন্ধ্যা রায়

সত্যজিৎ রায়ের 'চিড়িয়াখানা'য় কণিকা মজুমদার, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, গীতালি রায় ও উত্তমকুমার—(নীচে) প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
ফটো—দেশ

চিত্র-সমালোচনা

চিড়িয়াখানা

"চিড়িয়াখানা" শুধুই ক্রাইম ছবি নয়, সত্যজিৎ রায়ের ছবি। অর্থাৎ ক্রাইম এ-ছবিতে উপলক্ষ মাত্র, যার ভিত্তিতে একটি বিশেষ পরিবেশ ও কয়েকটি চরিত্র নিয়ে শ্রীরায়ের আর এক নতুন এক্সপেরিমেণ্ট। "চিড়িয়াখানা"য় তাঁর বিশ্লেষণের বস্তু গুটি কয়েক বিকৃত, অসুস্থ মন। দূষিত মানসিকতার আবর্তেও সত্যজিৎ রায়ের সেই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাই, যা মুহূর্তের আচরণের আঁচড়ে কিংবা সংলাপের রঙে একটি চরিত্রের পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করে। "চিড়িয়াখানা"য় তিনি ক্রাইম ছবির চিরাচরিত কনভেনশন ভেঙেছেন, সেটা বড় কথা নয়। শ্রীরায়ের কাছে তাই আশা করেছিলাম। পাপ-রহস্য উদ্ঘাটনের পর্বে পর্বে তিনি যে-ভাবে মনুষ্যাদপথ, অস্বাভাবিক মানুষদের কেটে-চিরে দেখিয়ে দিয়েছেন, তাদের নিচের জগতের দরজা খুলে দিয়েছেন, তা-ই বিস্ময়ের বস্তু। অসুন্দরের ছবি শ্রীরায়ের ফিল্মে আগে দেখিনি, জীবনের কুৎসিত রূপটিও আগে ফোটেনি। দেখা গেল, জীবনের দুই বিপরীত মেরুর চিত্র আঁকার সমান শক্তি তিনি রাখেন। সেদিক থেকে "চিড়িয়াখানা" শ্রীরায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

ক্রাইম ছবির নিয়মমাফিক কোন দুর্ভেদ্য রহস্যের ইঙ্গিত বা ভয়াল মুহূর্ত দিকে "চিড়িয়াখানা"র সূত্রপাত নয়। দর্শকে তিনি গোড়াতে কিংবা শেষে সিনেমার প্র অনুযায়ী কোন অবাস্তব ভয়ঙ্কর জগে টেনে নিয়ে আসেন নি। আরম্ভে ডিটেকটি ব্যোমকেশ ও তার সহকারীর দৈনন্দি জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা। ক্রেডিট টাইটেলে সঙ্গে ব্যোমকেশের ঘরের আনাচে-কানা ক্যামেরার প্যানিং—ডিটেকটিভ যে-ভা ঘরের সব কিছু খুঁটিয়ে দেখেন। নেপথে ব্যোমকেশের কণ্ঠস্বর—টেলিফোনে বলে 'আমি ব্যোমকেশ বক্সী বলছি'।

প্রথমে হত্যাকাণ্ড দেখিয়ে তিনি রহস্যে জাল ফেলেন নি। অর্থাৎ ক্রাইম ছবি শুরুতেই রোমহর্ষক নরহত্যা দে রোমাঞ্চিত হতে যাঁরা অভ্যস্ত রহস্যের কার্য-কারণ-সম্বন্ধ রহিত সমাধ

যাঁরা সন্তুষ্ট, "চিড়িয়াখানা" তাঁদের নতুন অভিজ্ঞতা দেবে। সাসপেন্স এ ছবিতেও আছে। কে খুনী জানবার ব্যগ্রতা দর্শকের মনে স্বভাবতই জাগে। সেক্ষেত্রে পরিচালক দর্শকের বুদ্ধিকে বিশ্রামের অবকাশ দেন নি। চোখ-কান সজাগ রেখে পুরো ছবিটা নিবিষ্ট মনে দেখতে হয়। দর্শক কখন অজান্তে ব্যোমকেশের সংগে পাপের সূত্র আবিষ্কারের কাজে লেগে যান তা নিজেই হয়ত টের পান না। এই বুদ্ধিগত উত্তেজনার মধ্যেই ছবি দেখার সুখ। পাপকাণ্ড তিনি বড় করে দেখান নি। পাপের ... বা ডিটেকশন-ই প্রধানরূপে দেখিয়েছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ-কাহিনী (যার ভিত্তিতে এই ছবি) পাঠের যা আনন্দ, ছবিতে তা পুরো মাত্রায় ...। এবং পাওনা আরও অনেক বেশী।

সেটা পেয়েছি সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনার ...। তাঁর নিজস্ব ফিল্ম-রীতির অনেক ...শটাই ছবিতে আছে। যেমন, পাপসূত্র অনুসন্ধানের প্রয়োজনে পুরনো বাংলা ...র একটি দৃশ্যের প্রোজেকশন। এই ...শ্যের সেটে ও গানে এবং পাত্র-পাত্রীর বেশভূষার মধ্যে পরিচালকের অদ্ভুত কল্পনা-...র পরিচয় পাই। প্রসঙ্গত বলি, তাঁর ... রচনা ও সুরারোপও মুগ্ধ করেছে। রহস্যঘন ভীতিজনক মুহূর্ত তিনি ...নুগতিক রীতিতে তৈরি করেন নি সত্য। ...তু গোলাপ কলোনির প্রতিষ্ঠাতা খুন ...র রাত্রির কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত ...ং কলোনির বিভিন্ন বাসিন্দাদের নৈশ ...কলাপের ভিতর দিয়ে রুদ্ধশ্বাস সাসপেন্সের আমেজ মেলে। এই দৃশ্যের ...নায়তা পরিচালক গড়ে তুলেছেন প্রধানত ক্যামেরা ও "এডিটিং"-এর সাহায্যে। প্রয়োগ-...শলটি সাধারণ নয়। এই প্রসঙ্গে সৌমেন্দু রায়ের ক্যামেরার কাজ ও দুলাল ...র চিত্রসম্পাদনার অসাধারণত্বও স্বীকার ...তে হয়— সারা ছবিতেই যার প্রমাণ।

অপরাধের সূত্র আবিষ্কারের পদ্ধতি বা ...ডাকশন প্রোসেস" সর্বক্ষণই দর্শককে ...হেলী করে রাখে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ...মকেশের কাজ (দুটি ছদ্মবেশ সত্ত্বেও) ...ও চমকপ্রদ হতে পারত। আতঙ্ক ও ...ংসতার প্রথাসিদ্ধ উপকরণ পরিচালক ...র না করলেও ক্রাইম ছবি হিসাবে ...ড়য়াখানা'য় রোমাঞ্চের আয়োজন হয়ত একটু বেশী থাকতে পারত। কিন্তু ক্ষতি সহজেই পুষিয়ে নেওয়া যায় ...তে অবাক হবার মত আরও অনেক কিছু ...। পরিচালনার ছোটখাটো কাজও ... করার মত। মুখ-বাঁধা অবস্থায় ...কেশের হাতে বন্দিনী হয়েও অ্যাংলো-...য়ান মেয়েটি দূরের মিউজিকের সংগে ...চাচ্ছে। কিংবা ব্যোমকেশের হাতে সাপ। ... এই ব্যঞ্জনাময় প্রয়োগ আর একটু ...হলেও চলত। পুরো একটা কলোনি

"এন্টনি ফিরিঙ্গি" : উত্তমকুমার—এ সপ্তাহে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে ফটো দেশ

তৈরি করে কাহিনীর পটভূমি রচনার কৃতিত্বই বা কম কী। এ কাজে শিল্পনির্দেশক বংশীচন্দ্র গুপ্তকে ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। আসল কথা, ছবিতে সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টিভঙ্গির বা পরিচালন-রীতির এবং শিল্পবোধের এমন কতগুলি লক্ষণ রয়েছে, যার আকর্ষণ মূলে বিষয়বস্তু ক্রাইমের চেয়েও বেশী। এবং সেই সংগে সংশয়ও মনে জাগে, পরিচালকের মেজাজ বুঝি ক্রাইম ছবির জন্য নয়। তবু তিনি বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তির বলে দেখিয়ে দিলেন, হিচককের পথে না গিয়েও ক্রাইম ছবি করা যায় এবং তাতে আরও কিছু সম্পদ থাকতে পারে। আমাদের বড় লাভ "চিড়িয়াখানা"য় সত্যজিৎ রায়কে আমরা হারাইনি। বরং সত্যজিৎ প্রতিভার দিগন্ত বিস্তারে দেখলাম।

ব্যোমকেশের চরিত্রে উত্তমকুমারের অভিনয় বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। তাঁর কথা বলার ভঙ্গি, জেরার ধরন এবং এক কথায় "স্মার্টনেস" উত্তমকুমারের বিশেষ চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতার এক নতুন নিদর্শন। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয়ের গুণে যাঁরা ছবিটিকে প্রাণবন্ত এবং চিত্রনাট্য সার্থক করে তুলেছে তাঁদের মধ্যে সুশীল মজুমদার, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, কণিকা মজুমদার, গীতালি রায়, জহর গাঙ্গুলী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষাল ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় সর্বাগ্রে প্রশংসনীয়। নতু

বিবিধ চরিত্রে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়ের অদ্ভুত স্বাভাবিক অভিনয় (বিশেষ করে ব্যোমকেশের জেরার সময়) ভোলা যায় না। নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, সুবীরা রায়, নীলোৎপল দে প্রভৃতি পার্শ্বচরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন।

ছবির 'এফেক্ট সাউন্ড' কোন কোন জায়গায় (যেমন হত্যাকারীর আগমনের মুহূর্তে) গায়ে শিহরণ জাগায়। সংগীত পরিচালক হিসাবে সত্যজিৎ রায়ের বৈশিষ্ট্য এ ছবিতেও অক্ষুণ্ণ

দুষ্টু প্রজাপতি

কমেডির স্বার্থে অযৌক্তিক ও অবাস্তব ঘটনা দেখানো দোষের নয়। কিন্তু তার সুযোগে 'সীরিয়াস' রোমান্টিক নাটক তৈরি করতে গেলে পুরো ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য ও অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে। "দুষ্টু প্রজাপতি" (ললিত চিত্রম) ছবিতে এই বিভ্রাট ঘটেছে। হয়ত তা ইচ্ছাকৃত। কারণ দর্শককে যে-কোন প্রকারে আমোদ দেওয়াই পরিচালক শ্যাম চক্রবর্তীর উদ্দেশ্য। এবং কিশোরকুমার যেহেতু ছবির নায়ক তাই বোম্বাই কমেডির নানা উপকরণও (যেমন অকারণে ছদ্মবেশ ধারণ) ছবিতে প্রযুক্ত। কিশোরকুমার নায়িকা তনুজাকে দেখার পরেই প্রেমে পড়েছে। ক্রমশ নাকি তা মানসিক রোগে দাঁড়ায়। বিশেষ ক্ষণে মেয়ে মাত্রই তার চোখের সামনে তনুজার রূপ ধরে দাঁড়ায়। এই উদ্ভট পরিস্থিতি উপলক্ষে করেই প্রেমের উপাখ্যানে বিষাদযোগ, নায়িকার অভিমান ও বিরহ। আবার ক্রাইমের উপকরণ এবং খলনায়কও ছবিতে আছে, যার শিকার নায়িকা। ওই খলচরিত্রের (অসীমকুমার) সঙ্গেই নায়িকার বিয়ে হয়ে যাচ্ছিল প্রায়। বিয়ের আসরে নায়ক ও তার বন্ধু (তরুণকুমার) পুলিশের বেশে হাজির। আসল পুলিশের আগমনের আগে তারা এসেছে রঙ্গরস উপহার দেবার জন্য।

নিজের বাড়ি হতে বিতাড়িত হয়ে নায়িকা যেভাবে এক ধনী দম্পতির পরমাত্মীয় হয়ে উঠেছে তা-ও রূপকথার বিষয়। নায়িকার বিয়ের দিনেও তার নিজের আত্মীয়ের দেখা নেই। যাই হোক, কাহিনীর (মূল রচনা ঃ বিধায়ক ভট্টাচার্য) নানাবিধ বৈসাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করে লাভ নেই। বোম্বাই-ধরনের এই প্রমোদ-চিত্র এবং কিশোরকুমারের কমিক গান ও অঙ্গভঙ্গি দেখে দর্শক কতখানি মজা পাবেন তা বিচার্য। তবু বলি, পরিচালক শ্যাম চক্রবর্তী তাঁর সুষ্ঠু প্রয়োগ-কর্মের অনেক কিছু প্রমাণ ছবিতে রেখেছেন। এবং প্রাণভরে হাসবার মত কিছু সূক্ষ্ম কৌতুকমুহূর্ত সত্যিই ছবিতে আছে এবং তা পরিচালকের কল্পনাবোধের জন্যই সম্পূর্ণ সম্ভব হয়েছে। তাঁর পরিচালনার গুণ দেখে মনে হয় তিনি ভাল গল্প নিয়ে আরও অনেক ভাল ছবি করতে পারতেন।

কৃত্রিম কাহিনীর মধ্যেও অতি সুন্দর অভিনয় করেছেন তনুজা। তাঁর চরিত্র বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবু অভিনয়ের গুণে তনুজাকে ভাল লাগে। তাঁর বাংলা উচ্চারণও স্বাভাবিক। ছবিতে মনোজ্ঞ অভিনয় করেছেন কেষ্ট মুখার্জি ও ভারতী দেবী (বড়লোকের বাড়ির চাকর ও ঝিয়ের রূপসজ্জায়)। নায়কের বন্ধু তরুণকুমার এবং সবিতা চ্যাটার্জি (সহ-নায়িকা) বেশ সপ্রতিভ।

কিশোরকুমারের কৌতুকাভিনয় যা তাই। রোমান্টিক নায়ক হিসাবে তাঁকে ভাল লাগে না। পদ্মা দেবী, অসীমকুমার ও চন্দ্রা ভাদুড়ির চরিত্র সুঅভিনীত।

সংগীতপরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও কিশোরকুমারের গান শুনতে ভাল লাগে। হেমন্তকুমারের একটি গান হিট করতে পারে।

গান (চিরসুন্দের নওল কিশোর, ছন্দে ছন্দে নাচে নন্দদুলাল, বাজে মৃদঙ্গ বীণা ও বৃন্দাবনধন নবঘনশ্যাম), কানন দেবীর গাওয়া চারখানি রবীন্দ্রসংগীত (আজ সবার রঙে, তার বিদায় বেলার, আমার হৃদয় তোমার ও তোমার সুরের ধারায়) এবং এনায়েত খানের সেতার পরিবেশন করা হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী ও কানন দেবীর যে গান এবং এনায়েত খানের যে বাজনা একদা সারা দেশ মাতিয়ে তুলেছিল, আজ আবার তা নতুন রেকর্ডে পেয়ে সংগীত-রসিকরা যে আনন্দে আত্মহারা হবেন তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

আধুনিক গানের রেকর্ডও মেগাফোন বের করেছেন। গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে রয়েছেন তিনজন ফিল্ম-স্টার। বিশ্বজিৎ, বাসবী নন্দী ও ললিতা চ্যাটার্জি। এটা "স্টান্ট" নয়। বিশ্বজিৎ ও বাসবী নন্দী আগেও তাঁদের গান গাওয়ার ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। আবার তার প্রমাণ দিলেন। ললিতা চ্যাটার্জিও গেয়েছেন ভাল। রমা গুহ-ঠাকুরতার আধুনিক গান জনপ্রিয় হবে। দিলীপ রায়ের কণ্ঠে দুটি রবীন্দ্রসংগীত সুগীত। বিষ্ণুপদ দাসের লোকসংগীতও চমৎকার। পি সি সরকার তাঁর ইন্দ্রজালের কিছু রহস্য রকর্ডে উপহার দিয়েছেন। এক-স্টেনডেড প্লে রেকর্ডে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আবৃত্তি করেছেন রবীন্দ্রনাথের চারখানি কবিতা (বন্দী বীর, হঠাৎ দেখা, ঝড়ের খেয়া ও রূপনারায়ণের কূলে)। বটুক নন্দী গীটারে নজরুল ও অতুলপ্রসাদের গান, সুরসাগরের একটি গান এবং বাণীকুমারের গানের সুর অতি সুন্দর বাজিয়েছেন (৪৫ আর পি এম রেকর্ডে)। এই রেকর্ডটি শ্রোতারা লুফে নেবেন। ৭৮ আর পি এম রেকর্ডে তিনি বাজিয়েছেন হিন্দী ফিল্মের গানের সুর। কার্তিককুমার ও বসন্তকুমারের দুটি কৌতুকগীতিও আছে। মেগাফোন রেকর্ডের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ জহর রায়ের কৌতুক-নকশা — ত্রিশূলে বনাম হুইসেল। শুনতে আরম্ভ করলে হাসি আর থামে না।

মেগাফোনের পুজো রেকর্ডে আধুনিক গান গেয়েছেন বিশ্বজিৎ

ভারতী রেকর্ডস

ভারতীর পুজো রেকর্ডে দরদভরা কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন সমর গুপ্ত (প্রাণ চায় চক্ষু না চায় ও কাছে যবে ছিল), রেবা ঘোষ (আমি যখন ছিলেম অন্ধ ও তুমি এপার ওপার কর) এবং সুকান্তি হাজরা (বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল ও আমার দোসর যে জন)। রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী হিসাবে এঁদের তিনজনকেই বিশেষ স্বীকৃতি দেবার সময় এসেছে। রেবা ঘোষের গাওয়া 'আমি যখন ছিলেম অন্ধ' চমৎকার। বিমান মুখোপাধ্যায় (ভক্তিগীতি) ও লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তীর (পল্লীগীতি) গানও মন্দ নয়। ইলেকট্রিক গীটারে হিন্দী ছায়াছবির গানের সুর বাজিয়েছেন জগন্নাথ ধর।

(সি ৪৬১৪)

অরণ্যদেব লী ফক

তুমি বুনো জন্তু বিক্রি করো, তাই না?
হ্যাঁ যুকনরাজ। বাঘ, সিংহ সব কিছু বিক্রি করি।

শুনেছি, সিংহের চাইতে সিংহীরাই নাকি শিকারে বেশী পটু। সত্যি?
হ্যাঁ, মহারাজ।

বেশ, তাহলে জোয়ান দেখে চারটি সিংহী আমাকে এনে দাও।
?

শুরু হলো ফাঁদ পেতে সিংহী ধরার কাজ।
এটা এই গর্তের মধ্যেই পড়ে থাক।
এটা সিংহ। রাজা শুধু সিংহী চান।
এটাকে তাহলে কী করব?

সিংহীগুলোকে দিনের-পর-দিন তালিম দেওয়া হতে লাগল .....
এগুলোর উপরে আমার ছাপ দেগে দাও।
তাই হবে যুকনরাজ।
4/23

এত টাকা দিয়ে সিংহী কিনে সেগুলিকে যুকনরাজ আবার কিনা ছেড়ে দিতে হুকুম দিলেন। ব্যাপার কী?
কী জানি। রাজা-মহারাজাদের খেয়াল। আমরা তার কী বুঝব?

সপ্তাহ কয়েকের মধ্যেই অরণ্যে এক নতুন সন্ত্রাস!
সিংহ!

সিংহ! সিংহ! পালাও!

অরণ্যদেবের গুহার কাছে...
অরণ্যদেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই, এখুনি!
?!

একপাল মানুষ-খেকো সিংহ আমাদের গ্রামে হানা দিয়েছে! বাঁচান!
?!
যুকনরাজের চক্রান্ত।
৩

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের বর্তমান সংগঠনকে ভেঙ্গে অ্যাড হক কমিটি গঠনের পরবর্তী পরিস্থিতি বর্তমান সপ্তাহের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। বাংলার কংগ্রেস সংগঠনের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ শ্রীগুলজারিলাল নন্দকে গত সপ্তাহে বাংলায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি কংগ্রেস সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের বর্তমান সংগঠনকে ভেঙ্গে একটা অ্যাড হক কমিটি গঠনই এক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। বাংলা কংগ্রেসের শ্রীবিজয় সিং নাহার, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি প্রভৃতি কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী এই ব্যাপারে শ্রীনন্দজীকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। পরে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত শ্রীনন্দজীর প্রচেষ্টা আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন। কিন্তু শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রমুখ কংগ্রেসের ক্ষমতাধিষ্ঠিত গোষ্ঠী এই প্রয়াসকে কোনমতেই সমর্থন করেন নি। উপরন্তু তাঁরা প্রচার করেন যে, এই অ্যাড হক কমিটি গঠনের অন্তরালে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করার একটা রাজনৈতিক অপকৌশল রয়েছে। পক্ষান্তরে শ্রীনন্দজী বলেন যে, কংগ্রেস সংগঠনকে শুদ্ধি এবং শক্তিশালীকরণ তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ শ্রীনন্দার এই প্রচেষ্টাকে আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছেন বলে প্রকাশ। ৩ অক্টোবর শ্রীকামরাজ দিল্লি ফিরে এসে এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন বলে আশা করা যায়।

দেশী সংবাদ

২৫ সেপটেম্বর—কলকাতার ট্যাকসি-চালকরা কলকাতার পথঘাটের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবাদ জানাবার জন্য আজ সকাল প্রায় আটটা নাগাদ চৌরঙ্গী এলাকায় ছয় শতাধিক ট্যাকসি রাজপথে রেখে চলে যান। ফলে ওই অঞ্চলে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বাস-গুলি অন্য পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এর জের হাওড়া পর্যন্ত চলে। বেলা সাড়ে বারটার পর অবশ্য আবার ট্যাকসি চলতে শুরু করে।

বেলগাছিয়া সেনট্রাল ডেয়ারিতে হঠাৎ ধর্মঘট এবং ঘেরাও-এর ফলে আগামী কাল বৃহত্তর কলকাতায় সরকারী দুধ পাওয়ার আশা কম। এদিন সোমবার—বিকালেও বিভিন্ন হাসপাতাল, বিদ্যালয় ও মিলক ডিপোগুলিতে দুধ সরবরাহ বন্ধ ছিল। সরকারী দুধের কারড-হোলডারদের সংখ্যা ২ লক্ষ ৪০ হাজার।

২৬ সেপটেম্বর—আজ নয়াদিল্লিতে ১৯৬৭-৬৮ সালের খাদ্যনীতি সম্পর্কে মুখ্য-মন্ত্রীদের সম্মেলন আরম্ভ হয়েছে। তাঁরা বর্তমান খাদ্যনীতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চান নি। তাঁরা খাদ্যশস্য চলাচলের উপর বর্তমান আঞ্চলিক বিধিনিষেধ অক্ষুণ্ণ রাখার ও ৭০ লক্ষ টন খারিপ শস্য সংগ্রহের লক্ষ্যসীমায় পৌঁছানোর জন্য অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ যতটা সম্ভব বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন।

চলতি মাসে পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রের প্রতিশ্রুত খাদ্য সরবরাহ বিপুল ঘাটতির দিকে। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে বলেন, পশ্চিমবঙ্গকে ৯৫ হাজার টন চাল ও ৯৫ হাজার টন গম কেন্দ্র সরবরাহ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যত এ পর্যন্ত ১০ হাজার টন চাল ও ৬০ হাজার টন গম দিয়েছেন।

২৭ সেপটেম্বর—খাদ্য সম্পর্কে নয়াদিল্লিতে দুদিনব্যাপী মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলন শেষে দেখা গেল আমদানী করা খাদ্যশস্যের জন্য ভরতুকির প্রশ্নে সম্মেলন দ্বিমত। একপক্ষের সুপারিশ—ভরতুকি বন্ধ করে সেই অর্থ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাজ্যগুলিকে দেওয়া হোক। অপর পক্ষের বক্তব্য—ভরতুকি বন্ধ করলে সমাজের দরিদ্র শ্রেণী, বিশেষ করে ঘাটতি রাজ্যগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ আমদানী করা গম ও মাইলোই এদের প্রধান সম্বল।

২৮ সেপটেম্বর—গতকাল রাত ৩টা ২০ মিনিটে আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে সলসালাবাড়ি স্টেশনের কাছে ডাউন আসাম মেল লাইনচ্যুত হয়। ফলে ঘটনাস্থলেই ১৩ জন মারা যান, আহত হন ৩৯ জন। ডিব্রুগড় থেকে হাজার দুই যাত্রি নিয়ে ট্রেনটি বারাউনি যাচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিব বলেন যে, এই ট্রেন দুর্ঘটনার পিছনে নাশকতামূলক কাজ আছে বলে সন্দেহ করবার কারণ আছে।

যুক্ত ফ্রন্ট সরকাররা টিমে তালে চলেছেন বলে ভারতের কমিউনিসট পারটির কেন্দ্রীয় কার্য-নির্বাহক কমিটি আজ মত প্রকাশ করেছেন। মারকসবাদী কমিউনিসট দল অন্য দলগুলির সঙ্গে গণ আন্দোলনে সামিল হচ্ছে না। মাদরাজের ডি এম কে সরকার বহুক্ষেত্রে সন্তোষজনক কাজ করেছেন। ইহাও উক্ত কমিটিরই মতামত।

২৯ সেপটেম্বর—জয় ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এবং অন্যান্যরা 'ঘেরাও' এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রচারিত ২৭ মারচ ও ২২ জুন (১৯৬৭) তারিখের দুটি বিজ্ঞপ্তির চ্যালেঞ্জ করে যে আবেদন করেছিল সে সম্পর্কে শুনানির জন্য কলকাতা হাইকোরটের প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে গঠিত স্পেশালবেনচ এই আবেদন-কারীদের প্রাপ্ত রুল বহাল রাখেন।

৩০ সেপটেম্বর—শ্রী এম সি চাগলা 'বার'-এ সদস্যদের কাছে আইন ব্যবস্থাকে ইংরাজীর মাধ্যমেই ধরে রাখার জন্য আবেদন জানান। তা না হলে আইনজীবীরা নিজেদের রাজ্যেই আবদ্ধ এবং সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে থাকবেন। শ্রীচাগলা ভাষার প্রশ্নেই সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

কলকাতা হাইকোরটের প্রধান বিচারপতি শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ ঘেরাও সংক্রান্ত মামলায় যে রায় দেন, তাতে ঘেরাওকে বেআইনী ঘোষণা করে বলেছেন, এ ব্যাপারে পুলিসকে নির্দেশ দেওয়ার কোন এক্তিয়ার শ্রমমন্ত্রীর ছিল না।

১ অকটোবর—আজ সকালে চীনারা নাথুলার সাড়ে তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে চো-লায় ভারতীয় সেনাদের লক্ষ্য করে গুলি-গোলাবর্ষণ করতে আরম্ভ করলে সিকিম-তিব্বত সীমান্ত আবার সজীব হয়ে ওঠে। চো-লায় চীনাদের গুলির উত্তরে ভারতীয় জওয়ানরা গুলি চালাতে আরম্ভ করেন। উভয়পক্ষেই হতাহত হয়েছে। ভারতীয় পক্ষে ক'জন হতাহত হয়েছে, তা জানা যায়নি।

বিদেশী সংবাদ

২৫ সেপটেম্বর—আজ রিও ডি জেনেরোতে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল এবং বিশ্ব ব্যাংকের বার্ষিক বৈঠকে বক্তারা জোরালো যুক্তি দিয়ে এ-কথাটাই বলেন যে, শিল্পোন্নত দেশগুলির উচিত উন্নতিকামী দেশগুলির উন্নয়নে সাহায্য দানের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং ওই সব দেশকে তাদের বাজারে প্রবেশাধিকার দেওয়া

২৬ সেপটেম্বর—তিব্বতে রোজ মারপিট, খুন-জখম করে প্রতিদ্বন্দ্বী চীনা রেড গারডরা দেশটাকে এক রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছেন। এ কথা বলেছেন দলাই লামার ভাই গিয়ালো থানডুপ।

২৭ সেপটেম্বর—মসকোতে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুবের আলোচনায় মতান্তর দেখা দেওয়ায় আলোচনার জন্য আরও সময় দিতে তাঁর সফরসূচী আজ বদলানো হয়। অস্ত্র সরবরাহের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। মসকোর কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, আয়ুব চান রাশিয়া ভারতকে অস্ত্র দেওয়া বন্ধ করুক। নয়তো পাকিস্তানকেও সোভিয়েট অস্ত্র দেওয়া হোক।

২৮ সেপটেম্বর—১৯৭৫ সাল পর্যন্ত রাশিয়া পাকিস্তানকে বৈষয়িক সাহায্য দেবে। আজ ক্রেমলিনে আয়োজিত নৈশ ভোজসভায় বক্তৃতাকালে প্রেঃ আয়ুব খাঁ এই কথা বলেন। তবে ভারতকে অস্ত্র সাহায্য দেওয়ার বিরুদ্ধে তিনি পরোক্ষে রাশিয়ার সমালোচনা করতে ছাড়েন না।

২৯ সেপটেম্বর— কমিউনিসট-বিরোধী পত্রিকা সিং তাওয়ে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, কমিউনিসট চীনের প্রেসিডেন্ট শ্রীলিউ শাও চি জাতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক বেতার ভাষণে বলেন, তিনি চেয়ারম্যান মাও-কে ক্ষমতাচ্যুত করার সঙ্কল্প নিয়েছেন।

৩০ সেপটেম্বর—কমিউনিসট চীনে আগামীকাল যে অষ্টাদশ বিপ্লব দিবস অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তদুপলক্ষে পিকিং-এ সব দেয়াল চেঁছে ধুয়ে সাফ করে ফেলা হয়েছে, লালরক্ষীদের দেয়াল পত্রিকা বা পোস্টারগুলির চিহ্নমাত্র নেই। টোকিও থেকে পি টি আই, এ-খবর জানাচ্ছেন।

১ অকটোবর—কয়েকশত ইন্দোনেশীয় তরুণ ছাত্র জাকরতার চীনা দূতাবাসে অভিযান চালায়। আজ ছিল ইন্দোনেশিয়ার ব্যর্থ কমিউনিসট অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী। দূতাবাস ভবনের সামনে প্রহরারত সৈন্য ও পুলিসদের হটিয়ে দিয়ে গেট খুলে তাঁরা দূতাবাস প্রাঙ্গণে ঢোকে

চুল উঠে যাওয়ার জন্য বিব্রত?

আজ থেকে সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চুলের পুনর্জীবন ফিরিয়ে আনুন

বিপদের এই সব সঙ্কেত অবহেলা করবেন না।

চুল উঠে যাওয়া। মাথার তালুতে চুলকানি। নির্জীব শুকনো চুল। এই সব লক্ষণ থেকেই বুঝা যায় যে আপনার চুল বেড়ে ওঠার জন্য যে জীবনদায়ী খাদ্যের প্রয়োজন তার অভাব হচ্ছে। এর ফলে অকালে আপনার মাথায় টাক পড়তে পারে। তাই এই সব লক্ষণ দেখা দিলেই বুঝতে হবে আপনার চাই—সিলভিক্রিন—যেটি চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য।

সিলভিক্রিন কি ভাবে কাজ করে?

চুলের গঠনের জন্য যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, প্রকৃতি তা জোগায়। একমাত্র সিলভিক্রিনেই রয়েছে সেইসব অ্যামিনো অ্যাসিডের মূলতত্ত্বের নির্যাস। এটি চুলের গোড়ায় গিয়ে তাকে খাদ্য জোগায় ও শক্তিশালী করে তোলে ও সুস্থ চুল বেড়ে ওঠায় সাহায্য করে।

ব্যবহার-বিধি

প্রত্যহ ৩ মিনিট করে মাথার তালুতে পিওর সিলভিক্রিন মালিশ করুন। চুলের অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চলুন। একবার চুলের স্বাস্থ্য ফিরে এলে তাকে অটুট রাখবার জন্য নিয়মিত ভাবে সিলভিক্রিন হেয়ারড্রেসিং মাখুন—এটি পিওর সিলভিক্রিন মেশানো একটি অয়েল বেস্।

বিনামূল্যে 'অল অ্যাবাউট হেয়ার' শীর্ষক পুস্তিকার জন্য এই ঠিকানায় লিখুন—ডিপার্টমেন্ট D-7, পোস্টবক্স ৭২৭, বোম্বাই-১।

সিলভিক্রিন উৎপাদন পুরুষ ও মহিলা সকলেরই ব্যবহার উপযোগী।

LPE-Aiyars S. 1 BEN

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

Lacto Calamine

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

M/s. Chemdyes Trading Co.
Distributors wanted for

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৫০
শনিবার, ৩ কার্তিক, ১৩৭৪

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫·০০
ষাণ্মাসিক	১২·৫০
ত্রৈমাসিক	৬·২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭·০০
ষাণ্মাসিক ,,	১৪·০০
ত্রৈমাসিক ,,	৭·০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭·০০
ষাণ্মাসিক ,,	১৪·০০
ত্রৈমাসিক ,,	৭·০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪৬·০০
ষাণ্মাসিক ,,	২৩·০০
ত্রৈমাসিক ,,	১১·৫০

আসাম-অঞ্চলে
(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১·০০
ষাণ্মাসিক	১৬·০০
ত্রৈমাসিক	৮·০০

*

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH

Saturday, 21 Oct., 1967

দুর্গোৎসবের পর

দুর্গোৎসবের পালা ফুরোলো। মাত্র কয়েকটি দিনের জন্যে যাঁর আগমন তাঁর বিসর্জন ঘটেছে। দেবীর আরাধনা যে যথাসাধ্য এ বঙ্গভূমিতে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, তবু হয়ত দ্বিধা জাগে দুর্গতিনাশিনী কি প্রসন্ন হলেন? কে জানে! বিজয়ার এই শুভ মুহূর্তে আমরা আমাদের সকল লেখক, পাঠক, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই, সর্বজনের শুভ ও মঙ্গল কামনা করি।

এবারে দুর্গোৎসবের প্রারম্ভপর্ব তেমন আনন্দদায়ক ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল, বা বলা যাক অনিশ্চিত। রাজনৈতিক অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যে কোনো সময় একটা পালা-বদল ঘটতে পারে, এবং ঘটলে কোনো কোনো অবস্থায় একটা বড় রকমের গণ্ডগোল হতে পারে, তার জন্যে মুখ্যমন্ত্রীকে নানা সতর্কতাও অবলম্বন করতে হয়েছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দুর্যোগটা আপাতত কেটে গেছে, অন্তত আংশিক, নিকট ভবিষ্যতে কি হবে তা জোর করে বলা যায় না। এই রাজনৈতিক গোলযোগের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে শাসক-রূপটি ফুটে উঠেছে তার প্রশংসা করা মুশকিল, এবং শরিকদের মধ্যে যে ধরনের বিভেদ দেখা গেছে তাতে সন্দেহ হয়, সরকারী রাজনৈতিক ঐক্য বস্তুটি টি‍ঁকে থাকার মতন জোরদার কি না! সবচেয়ে মজার কথা, এই রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমরা কিছু দলীয় রাজনীতির চমকপ্রদ খেলা দেখে চক্ষু সার্থক করতে পারলাম।

অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিস্তারিত বলে লাভ নেই, সামগ্রিকভাবে এ-বৎসরটি অন্য বৎসরের তুলনায় শুধু দুর্বৎসর নয়, অবিশ্বাস্য রকমের দুর্গতির সময়। সাধারণ মানুষের হাতে বাড়তি পয়সা কিছুমাত্র নেই, সুখ-আহ্লাদ করার মতন সৌভাগ্য খুবই কম ব্যক্তির হয়েছে। দিন রোজগার করে যাঁরা খান তাঁদের অবস্থা ভয়াবহ। বেকারজনের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে, কলকরখানা নিত্যই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, শ্রমিক-অসন্তোষ ও মালিক-শ্রমিক বিরোধ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে, রাজ্যের শিল্প উৎপাদন ক্রমশই একটা ঢিমেতালের অবস্থায় এসেছে এবং কমে আসছে। এ অবস্থায় রাজ্যের সুখশান্তি শৃঙ্খলা টিঁকিয়ে রাখা মুশকিল। যুক্তফ্রণ্টের যাঁরা সমর্থক ছিলেন, মনে মনে তাঁদের আশংকা ঘটছে এবং একটা নৈরাশ্যের ভাব দানা বেঁধে উঠছে। বস্তুত, সাধারণ মানুষ, রাজনীতির সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়, তাঁদের ধারণা হয়েছে : যুক্তফ্রণ্ট সরকারী ক্ষমতা হাতে নিয়ে যে যাঁর দলীয় স্বার্থ যতটা পারেন রক্ষা করছেন—সর্বজনের কথা ভাবছেন না।

চারপাশের অবস্থা দেখে সন্দেহ হয়, সাধারণ মানুষ যতটা সম্ভব সময় দিয়েছেন যুক্তফ্রণ্টকে, পাঁচ টাকা কিলো চালের দর উঠেছে—তবু নীরবে সহ্য করেছেন; কিন্তু এই অবস্থা আর বেশিদিন চললে যুক্তফ্রণ্টের প্রতি সহানুভূতি-পূর্ণ মনোভাব আর থাকবে না। এমন পরিস্থিতিতে এই রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা আরও ঘোরালো এবং আমাদের নিশ্চয়তাবোধ অধিকতর বিপন্ন হবে।

আমরা অনুমান করি, আগামী শীতের প্রারম্ভে এ-রাজ্যে আবার একটা উত্তেজনাপ্রদ রাজনৈতিক খেলা দেখতে পাব। কেননা বাইরে বাইরে আপাতত যতই একটা শান্ত ভাব সৃষ্টি করা হোক, ভেতরে ভেতরে তুষের আগুন জ্বলছে, কেউ জোর করে বলতে পারে না সেই আগুন ভবিষ্যতে কি রূপ নেবে। যাই হোক, দুর্গাপুজোর মুখে মুখে যে ধরনের অনিশ্চয়তা ও উদ্বিগ্নতা দেখা দিয়েছিল, তা সাময়িকভাবে শান্ত হওয়ায় আমরা নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছি। শত হলেও বাঙালীর সম্বৎসরের এই প্রিয় উৎসবটি নষ্ট হলে এই দুর্গতির মধ্যেও মানুষের মনের কিঞ্চিৎ প্রসন্নতাও নষ্ট হত।

পরলোকে ডঃ লোহিয়া

সোস্যালিস্ট নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার মৃত্যুতে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে একটি উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত জ্যোতিষ্ক চিরতরে নির্বাপিত হল। ডঃ লোহিয়া ছিলেন পণ্ডিত ও বিদগ্ধ মানুষ কিন্তু মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন সমাজ-তন্ত্রে বিশ্বাসী এক বিপ্লবী। ভারতকে সমাজতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে আমরণ সংগ্রাম করে গিয়েছেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে লোকসভা একজন নির্ভীক ও অপ্রিয় সত্যভাষী দেশনায়ককে হারালেন, আমরা হারালাম মানব-প্রেমী দরদী দেশসেবককে।
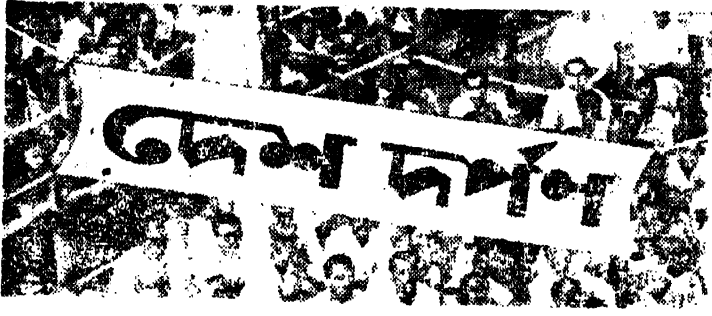
ফাঁড়াটা শেষ পর্যন্ত কেটে গেল। এবং ভালয় ভালয়। সাতদিন আগেও মনে হয়নি তা। সাতদিন আগেও আশংকা ছিল, রাজনৈতিক মেঘটা হয়ত দুর্যোগের আকারে দেখা দেবে। এমনি আচ্ছন্ন করে দেবে পুজোর রোশনাই। আপাততঃ কেটে গেছে মেঘটা। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ফলে যুক্তফ্রন্টের চেহারাটা আপাততঃ অক্ষত অবস্থায় বেঁচে গিয়েছে। কিন্তু রেশটা আছে এবং মনে না করার কোন হেতু নেই যে, এর জেরটা সহজে শেষ হয়ে যাবে।

এটা বোঝা যায়, দিল্লীতে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর সভায় আলোচনা থেকে। এই সভায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছিল পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা। মোটামুটিভাবে এই আলোচনায় দুটো বক্তব্য পলিট ব্যুরোর পক্ষ থেকে রাখা হয়েছে। এক, যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাবার চেষ্টা করলে এবং মালিক ও [illegible] পক্ষ থেকে চক্রান্ত [illegible] দুই, [illegible] মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হলে যার ফলে পার্টিকে যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

দ্বিতীয় বক্তব্যটা নিঃসন্দেহে আশ্বস্তকর। কারণ, অনেকের মনেই আশংকা ছিল যে, শ্রীঅজয় মুখার্জির পদত্যাগের পালা চুকে গেলেও মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে পাল্টা আক্রমণ আসতে হয়ত দেরি হবে না। কিন্তু মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মাদুরাই প্রস্তাব যাঁরা খুঁটিয়ে আলোচনা করে দেখেছেন, তাঁদের ধারণা অবশ্য অন্যরূপ ছিল। মাদুরাই প্রস্তাবেও যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে চক্রান্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এই চক্রান্তের আক্রমণ থেকে যুক্তফ্রন্টকে বাঁচাবার দায়িত্ব বিশেষ-ভাবে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির। একথাও বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন বিষয়ে এবং সমস্যা সম্বন্ধে পার্টির বক্তব্য নিশ্চয়ই যুক্তফ্রন্টের সামনে রাখা হবে এবং সে-বক্তব্য ফ্রন্টের সকল সরিকের গ্রহণযোগ্য করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হবে। কিন্তু প্রধান কর্তব্য হবে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাঁচিয়ে রাখা এবং ফ্রন্টের শক্তি বৃদ্ধি করা ১৮ দফা প্রতিশ্রুতি পালন করার জন্য। মাদুরাই প্রস্তাব তাই পার্টির রাজনৈতিক বক্তব্যকে বেশ স্পষ্ট করে দিয়েছে এবং এ-কথাটা মনে রাখলে, পলিট ব্যুরোর দিল্লী সিদ্ধান্তের মধ্যে নূতন কোন বক্তব্য বা ইঙ্গিত পাওয়া যাবে না। এমন কি, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি সম্বন্ধে কোন সমালোচনা জনসমক্ষে রাখা হয়নি।

এই কথাটা পরিষ্কারভাবে জানা থাকলে, প্রথম বক্তব্যকে অবাস্তব মনে হবে না। প্রথম বক্তব্যর এটাই বাস্তব রূপ যে, যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে চক্রান্ত জোরদার করা হলে তাকে সর্বশক্তি দিয়ে রোধ করা হবে। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মতে, ১৮ দফা প্রতিশ্রুতি দেবার পর যুক্তফ্রন্টের কোন সরিক বা সদস্যকে ফ্রন্ট থেকে সরে দাঁড়াতে হলে আগে জনসাধারণের রায় গ্রহণ করতে হবে। এটা সম্ভব হতে পারে অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের মাধ্যমে। অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের কথাটি একটু ঝোঁক দিয়েই বলা হয়েছে; কারণ, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ক্রমেই পশ্চিম বাংলার অবস্থা জটিলতর করে তুলছে।

পার্টির পক্ষ থেকে না বলা হলেও, এটা আজ অজানা নেই যে, রাজনৈতিক অবস্থা জটিলতর হবার চিহ্নগুলো ক্রমেই পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক মহলে অনুমান করা হয়েছে, আমন ধানের ফসল তোলার সময় এই জটিলতা হয়ত আরও তীব্র হবার সুযোগ পাবে। ফসল তোলার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কম্যুনিস্ট সমর্থিত কিষাণ সভার পক্ষ থেকে এবং বিশেষ করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়নের কলকাতা সম্মেলনে। নক্সালবাড়ী এবং সোনারপুর অঞ্চলে কিষাণ আন্দোলনের ছোট বড় মহড়া ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। তবু এই মহড়ার কয়েকটি রাজনৈতিক অসুবিধা ছিল। নক্সালবাড়ীর জন্য মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিকে যুক্তফ্রন্টের সরিক হিসাবে বেশ কিছু অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনেক অভিযোগও শুনতে হয়েছে নক্সালবাড়ী ও সোনারপুর আন্দোলনকে সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে।

এই অস্বস্তিকর অবস্থা অনেকটা এড়িয়ে যাওয়া যায়, যদি কম্যুনিস্ট পার্টি দুটোর ফসল তোলার দিনে আগামী কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে পরোক্ষ সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়। কিষাণ সভার সংগঠন এখনও তেমন জোরদার করা সম্ভব হয়নি। কারণ, কিষাণ সভার ভিতরে দুই কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা সংশ্লিষ্ট আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে বিভেদ অত্যন্ত ব্যাপক। তাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়নকে আগামী ফসল কাটার দিনের প্রতিশ্রুত আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। বি পি টি ইউ সি-র মধ্যেও যে দুই কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই তা নয়। তবু একটা সমঝোতা সম্ভব হয়েছে কলকাতা সম্মেলনে। এই সমঝোতার প্রয়োজন ছিল। কারণ কলকাতা সম্মেলনের মূল শ্লোগান ছিল: শ্রমিক আন্দোলনকে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত কর। বি পি টি ইউ সি প্রধানতঃ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান সংস্থা। তবু বি পি টি ইউ সি এবং কিষাণ সভাকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

ফসল কাটার দিনে যে, কৃষক আন্দোলন হবে, তার মূল দাবি হবে এক কণা শস্যও জোতদারের গোলায় উঠবে না। উঠতে দেওয়া হবে না। ফসল তোলার চেষ্টা নিশ্চয় হবে এবং তা হবে বলেই আজ অনুমান করা হচ্ছে যে, ফসল তোলা নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেবে। এই বিরোধের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। সে-অবস্থার সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের সরিক হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত হওয়া হয়ত বাঞ্ছনীয় না-ও হতে পারে। তা ছাড়া, আরও একটা বড় কারণ দেখা দিয়েছে। এটা দেখা দিয়েছে যুক্তফ্রন্টের আগামী বছরের খাদ্যনীতি সম্বন্ধে।

আগামী বছরের খাদ্যনীতি যেভাবেই চূড়ান্তরূপ নিক না কেন, নীতিকে সফল করতে হলে খাদ্য সংগ্রহ অভিযানকে সব চাইতে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমান বৎসরের খাদ্য সম্বন্ধে পশ্চিম বাংলার জন-সাধারণের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার ফলে আজ তার যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে খাদ্য সংগ্রহকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কত টন খাদ্য সংগ্রহ করা হবে সেটা তর্কের বিষয় হতে পারে; কিন্তু বিপুল পরিমাণে যে সংগ্রহ করতে হবে এটা অনস্বীকার্য। এত

ব্যাপক সংগ্রহ অভিযানকে সফল করতে হলে সর্বাধিক প্রয়োজন যুক্তফ্রন্টের সকল শরিকের দ্বিধাহীন সহযোগিতা। কিন্তু সে সহযোগিতা সকল শরিকের এবং বিশেষ করে কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে কিনা সে-সম্বন্ধে শুধু দ্বিধা নয় একটা উদ্বেগও দেখা দিয়েছে।

বর্তমানে চালের দর যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে তাকে নামিয়ে আনা সম্ভব কিনা সেটা নির্ভর করে যে দামে কৃষকের কাছ থেকে ধান বা চাল সংগ্রহ করা হবে। বর্তমানে যে সরকারী মূল্য ধার্য করা আছে তা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সর্বোচ্চ। তবু চালের খোলা বাজারে দরের তুলনায় অনেক কম। এই উচ্চদর শহরবাসীর পক্ষে হয়ত অসহনীয়; কিন্তু কৃষকের কাছে অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। তাই ইতিমধ্যেই আওয়াজ উঠেছে ধান সংগ্রহ করার জন্য সরকারী মূল্য বৃদ্ধি করতে হবে। এই আওয়াজ ক্রমে দাবির আকারে দেখা দিচ্ছে। কার্ড ছাপিয়ে কৃষকের সই বা টিপ ছাপ দিয়ে খাদ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠান হচ্ছে ধানের মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য। কোন রাজনৈতিক দল এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত আছে কিনা স্পষ্ট জানা নেই, কিন্তু একটা সন্দেহ ক্রমেই বদ্ধমূল হয়ে উঠছে।

সরকারী মহলের ধারণা, আগামী ফসল সংগ্রহ করা দুরূহ হয়ে উঠবে। কারণ, যুক্তফ্রন্টের কম্যুনিস্ট শরিকরা ইতিমধ্যেই কৃষকের মধ্যে ধানের সংগ্রহমূল্য নিয়ে একটা বিক্ষোভ ছড়িয়ে দিচ্ছে। কৃষকদের কাছে এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে যে, ন্যায্য মূল্য না পেলে এক কণা শস্যও যেন তারা হাতছাড়া না করে। কৃষকদের ন্যায্য মূল্য দিতে হলে বর্তমানে খোলা বাজারে যে দর আছে তার কাছাকাছি নিয়ে আসতে হয়। কিন্তু সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধি রাজ্য সরকারের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে না, সর্বভারতীয় দর যেভাবে স্থির করা হবে তার উপরেও নির্ভরশীল। এটা ঠিক যে, সর্বভারতীয় নীতিকে সম্মান দেখাতে গেলে সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে কি না সন্দেহ। তাছাড়া, সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধি করলে, রেশনিং এলাকায় যে দর বাঁধা আছে তাকে প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি করতে হয়; কারণ, সাবসিডি দিয়ে, অর্থাৎ সরকারী কোষ থেকে মোটা অংকের টাকা ব্যয় করে শহরবাসীদের খাওয়াবার নীতি যাই থাক যুক্তি থাকে না। সেটা নিতান্তই অসম্ভব হবে, বিশেষ করে বর্তমানে রাজ্যের বাজেটের অবস্থা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। আয়ের অংক বৃদ্ধি না করে ব্যয়ের অংক ইতিমধ্যেই অত্যন্ত অবাস্তবভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর উপর ধানের সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধি করে সাবসিডির অংক আরও বৃদ্ধি করার একমাত্র অর্থ হবে উটের পিঠ ভেঙে দেওয়া।

সে-পর্যায়ে যাবে কি না বলা দুষ্কর। কিন্তু সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধি করা বর্তমান অবস্থায় অসম্ভব হবে। এটা উপলব্ধি করলে রাজ্য সরকারের পক্ষে ধানের সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। তা যদি না হয়, তাহলে ধান সংগ্রহ অভিযানকে ব্যর্থ করে দেবার সকলরকম চেষ্টা চলবে সেটা সহজেই অনুমেয়। এই ব্যর্থতা এনে দেবার কাজে যারা সহায়তা করবে তাদের মধ্যে কম্যুনিস্টরা যে থাকবে এটা নিঃসন্দেহ। কম্যুনিস্টরা যুক্তফ্রন্টের বড় শরিক; কাজেই যুক্তফ্রন্ট সরকার কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে কতটা কঠোর হতে পারবে তা অনুমান করা সম্ভব নয়।

কাজেই আগামী দুই বা তিন মাসের মধ্যেই পশ্চিম বাংলা নূতন ফসল নিয়ে এক প্রচণ্ড বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়াবে। এই বিপর্যয়কে সরকারী যন্ত্র দিয়ে রোধ করা সম্ভব নয়। হয়ত সম্ভব হতে পারে রাজনৈতিক প্রতিরোধ দিয়ে। কিন্তু সে জন্য যে পরিমাণ রাজনৈতিক সংগঠন প্রয়োজন তা অন্য কোন দলের আছে কি না সন্দেহ। হয়ত কংগ্রেসের আছে। কিন্তু কংগ্রেস সংগঠন আজ এক নূতন অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। পূজোর আগে যে রাজনৈতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল, তার জন্য কংগ্রেস অনেকাংশে দায়ী। বলা চলে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের যে নেতৃত্বের পুরোভাগে আছেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সে নেতৃত্ব। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বানচাল করবার প্রচেষ্টা করার অধিকার রাজনৈতিক দল হিসাবে নিশ্চয়ই কংগ্রেসের আছে; কিন্তু সে প্রচেষ্টা সংগঠনকে ক্ষুণ্ণ করলে নিশ্চয়ই সে-সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। যে প্রচেষ্টা হয়েছিল, তার ফলে আজ দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হয়ে জনসাধারণের রাজনৈতিক মানদণ্ডে অনেকটা নেমে গিয়েছে।

এমনি একটা অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্যই হয়ত কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজকে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হয়েছে, যে ঘোষণার ফলে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটি বাতিল হয়ে গিয়েছে এবং তার জায়গায় একটি ছোট সাত সদস্য বিশিষ্ট অ্যাড হক কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছে। অত্যন্ত স্পষ্ট কারণেই শ্রীকামরাজ শ্রীগুলজারীলাল নন্দের ব্যাপকতর অ্যাড হক প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। শ্রীনন্দ যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার মূল কথা ছিল পশ্চিম বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে ভেঙে দিয়ে একটি বড়রকমের অ্যাড হক কমিটি গঠন করা এবং এই প্রথা বিভিন্ন স্তরের কংগ্রেস সংগঠনের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা। শ্রীনন্দ এটাও চেয়েছিলেন যে, কংগ্রেসের আগামী সংগঠনের নির্বাচনও বন্ধ করে দেওয়া হোক। তাঁর প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল, এই অ্যাড হক কমিটি গঠন করে শ্রীঅজয় মুখার্জিকে কম্যুনিস্টদের হাত থেকে উদ্ধার করা এবং রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যাপারে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করা।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ শ্রীনন্দের কোন যুক্তিই গ্রহণ করেননি। কারণ, দেখা যাচ্ছে তিনি যে রায় দিয়েছেন তাতে কার্যকরী সমিতি বাতিল হয়েছে বটে; কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি অক্ষুণ্ণ আছে। তাছাড়া, শ্রীনন্দ যে কংগ্রেস সংগঠন নির্বাচন বাতিল করে দেবার কথা বলেছিলেন, তা-ও তিনি গ্রহণ করেননি। অর্থাৎ নির্বাচন হবে এবং যতদিন নবনির্বাচিত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কার্যকরী কমিটি গঠন না করছে ততদিন এই অ্যাড হক কমিটি কংগ্রেসের কাজ পরিচালনা করবে। স্বভাবতই শ্রীকামরাজ কংগ্রেসের বর্তমান সংগঠনের মূলে কোন আঘাত করেননি। তিনি এমন একটা স্বল্প মেয়াদী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যার মুখ্য উদ্দেশ্য সংগঠনের নির্বাচনকে প্রাধান্য দেওয়া। এই প্রাধান্য দেবার ফলে কংগ্রেসের সংগঠন কতটা শক্তিশালী করা সম্ভব হবে তা এখনই অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু এটা বোঝা যায়, কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন মহলেও রাজনৈতিক সংগঠনের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে বেশী। কারণ, যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার একটাই রাজনৈতিক পরিণতি হওয়া সম্ভব; সেটা, কম্যুনিস্টদের আগামী ফসলের আন্দোলনকে তীব্রতর করে দেওয়া। সে আন্দোলনকে সংযত করা সম্ভব যদি যুক্তফ্রন্ট সরকারের উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার ইচ্ছার মধ্যে কোন ফাঁকি না থাকে। সেটা আরও সম্ভব হতে পারে কংগ্রেসের সংগঠনকে রাজনৈতিক পথে পরিচালিত করা। মনে হয়, শ্রীকামরাজ এই পথটাই বেছে নিয়েছেন।

পূজার উপহার
অ্যাড হক কমিটি

পরিক্রমা

ছুটির হাওয়ায় খুশীর আমেজে অনেক **ভারী ভারী সমস্যা,** উদ্বেগজনক পরিস্থিতি **ইত্যাদি ইত্যাদি কয়েকটি** দিন অন্তত জীর্ণ-**পাতার মত টেবিল থেকে** খসে পড়েছিল। **সভ্যতার ভবিষ্যৎ,** যুদ্ধ, শান্তি, চীন, **পাকিস্তান,** ভিয়েতনাম, আরব-ইহুদী বিরোধ, **এবং এমন** আরও কত কী নিয়ে **ভাবনার ঘুড়ি ওড়ানো** মুলতুবী থাকায় এই **লেখকের এবং** 'বৈদেশিকীর' পাঠকদেরও **অস্বস্তি ঘটেনি।** পৃথিবীর কাজকর্ম থেমে **থাকেনি; পৃথিবীর** হালচাল বিশেষ কিছু **বদলায়ওনি। পনেরোদিন** আগে আর পনের-দিন **পরে তফাৎ** কোনও জায়গায় বড় একটা **ঘটেনি।** দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রনেতাদের **বক্তৃতা** বিবৃতি **আশ্বাস** আবেদন ইত্যাদির বয়ান, **ভাবভঙ্গি** সুর সব কিছুই আগের মত **ফিটফাট, ছাপমারা,** ওজনকরা। **শ্রীমোরারজি** দেশাই **কতকগুলি** দেশে সফর করে **ফিরেছেন,** বিদেশ থেকে কোথায় কত কী **প্রাপ্তির আশা** তার একটা ছবি মোটামুটি পাওয়া গেছে। **শ্রীমতী** ইন্দিরা গান্ধী গেছেন অন্য একটি এলাকায় সফরে; সেখানেও **মৈত্রী সহযোগিতা** ইত্যাদির মন্ত্র-পাঠ এবং বিনিময়ে সাহায্যলাভের জন্য আলাপ-আলোচনা। ও-পক্ষের প্রেসিডেন্ট **আয়ুব রাশিয়া** ঘুরে এসেছেন। মস্কোর **কাছ থেকে কী পেয়েছেন,** পেতে পারেন **এবং কী পান নি** সে-সব নিয়ে নয়াদিল্লির **কূটনীতিকরাও** জল্পনা চালিয়েছেন। **আন্তর্জাতিক রাজনীতির** এই এক খেলা: **যে-সব দেশের** সাধ বিস্তর, সাধ্য সামান্য তাদের **ক্রমাগত** চেষ্টা কে কাকে ডিঙিয়ে **আমেরিকা, রাশিয়ার** সঙ্গে বেশী খাতির **জমাতে পারে;** সুয়োরানী দুয়োরানীর **রূপকথার শেষ** নেই, মাঝে মাঝে চমৎকার **উলটপালটও ঘটে যায়** আন্তর্জাতিক প্রণয় **লীলায়।**

দ্বন্দ্ব-মিলনের অভিনয় আরও জমজমাট **ভিয়েতনামকে** নিয়ে। প্রধান ভূমিকায় **প্রেসিডেন্ট লীন্ডন** জনসনের তুলনা নেই। **দেশ-বিদেশের** পরামর্শদাতারা ইদানীং তাঁকে **যে-ভাবে ঘেরাও** করেছেন তাতে মার্কিন **প্রেসিডেন্টের উপর** কিছুটা অনুকম্পা অনুভব করা অসঙ্গত নয়। "নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ, এই তোর রুদ্রের প্রসাদ!", প্রেসিডেন্ট **জনসনের ব্রতপালনের পরিণাম** প্রায় তাই। ও-**পক্ষের প্রেসিডেন্ট ডঃ হো** চি-মিনের সাড়াশব্দ নাই। **জনসন-বিরোধী-**দের সমস্বরে সোচ্চার দাবি—**উত্তর** ভিয়েত-নামে বোমাবর্ষণ বন্ধ হোক। সে **না হয়** বন্ধ হল, কিন্তু তারপর? ডঃ হো চি-মিন কি আলাপ-আলোচনায় বসবেন? অতএব প্রেসিডেন্ট জনসনের যুক্তি, উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ করলে ভিয়েৎকং গেরিলাদের পোয়া বারো, স্বাধীন দুনিয়ার সমূহ বিপত্তি এবং এশিয়ায় আমেরিকার প্রতিপত্তিনাশ। কাজেই এ-যুদ্ধ সহজে **থামবার** নয়।

এ-যুদ্ধ চলতে থাকলে আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার বোঝাপড়ার চেষ্টার গতি **কী হবে** সে-ও এক প্রশ্ন। রাশিয়া তার প্রতিরক্ষা বাজেটের বরাদ্দ বাড়িয়েছে, স্কুলের **ছাত্রদের** পর্যন্ত সমরশিক্ষার ব্যবস্থা করেছে সম্প্রতি। দুই মহাশক্তি আমেরিকা এবং রাশিয়া; সামগ্রিক অস্ত্রশক্তি এবং **আক্রমণ ক্ষমতা** এখন পর্যন্ত আমেরিকারই **বেশী।** রাশিয়ার স্থল সৈন্যবাহিনী বিপুল ও প্রচণ্ড শক্তি-শালী। কিন্তু সেটা ইউরোপে মাত্র কাজে লাগতে পারে। বিমানবহর, নৌবাহিনী এবং পারমাণবিক অস্ত্রে আমেরিকাই অগ্রণী। তাছাড়া ইয়ুরোপ, এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকায় **বাছা বাছা** জায়গায় মার্কিন বিমান **এবং নৌঘাটি।** **আরব-ইজরায়েলী** যুদ্ধে যে-কারণে রুশ বিমান **এবং** নৌবহরের **প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ** অসম্ভব **হয়েছিল। ভূমধ্য** দরিয়ায় রুশ নৌবহর **সন্তর্পণে** চলাফেরা করতে পারে, **কিন্তু ধারে কাছে** তার এমন কোন আশ্রয় বা ঘাটি নেই যেখানে রুশ জাহাজ দরকার মত **তেলরসদপত্র** সংগ্রহ, মেরামতী **কাজ** চালাতে পারে। তারপর কৃষ্ণসাগর থেকে রুশনৌবহরের ভূমধ্য দরিয়ায় যাওয়া-আসাও স্বচ্ছন্দ নয়, তুর্কী ও গ্রীসের অনুমতি সাপেক্ষ। উপরন্তু এই দুই দেশেই আছে মার্কিন ঘাটি। রুশ বিমান বহরেরও সেইরকম পশ্চিম এশিয়ায় চলাচল অসুবিধা-জনক।

উত্তর ভিয়েতনামের **পক্ষে** সরাসরি যুদ্ধে নামায় রাশিয়ার **এখন পর্যন্ত** কোনও উৎসাহ দেখা যায়নি। তার একটা কারণ **সম্ভবত** রুশ-চীন বিরোধ। তাছাড়া খাস **মার্কিন মুলুকেই প্রেসিডেন্ট লীন্ডন জনসনের** যুদ্ধ-নীতির বিরুদ্ধে **প্রবল অসন্তোষ; তাই** রুশ নেতারা হয়তো আশা **করেন, এ-যুদ্ধ** আমেরিকা আর খুব বেশীদিন **চালাবে না। কেবল** মার্কিন মুলুকেই **বা কেন, দক্ষিণ ভিয়েতনামেও** যুদ্ধ সম্পর্কে **বিরক্তি ও ক্লান্তির লক্ষণ স্পষ্ট।** দক্ষিণ **ভিয়েতনামের** সাড়ে সাত লাখ সৈন্য, মার্কিন **বিশেষজ্ঞরাই নালিশ করছেন,** ভিয়েতনামী **সৈনারা যুদ্ধের প্রায় সব** ঝুঁকি বেচারা **মার্কিন সৈন্যদের কাঁধে চাপিয়ে** রেখেছে। যে-কারণে **মার্কিন সমরদপ্তর কর্তারা** ধরে নিয়েছেন, **এ-যুদ্ধ** মার্কিন সৈন্যদেরই চালিয়ে **যেতে হবে** অন্তত আরও বছর পাঁচেক; **কাজেই পাঁচ লক্ষ মার্কিন** সৈন্যের কাজ **নয়, কমপক্ষে** দশ **লক্ষ মার্কিন** সৈন্য ভিয়েতনামে **মোতায়েন** রাখা চাই।

স্বাধীন দুনিয়ার অনেকে**ও এখন আর** ব্যাপারটা পছন্দ করতে **পারছেন না।** কম্যুনিস্ট চীনের সামরিক **শক্তি এবং মতলব সম্পর্কে** তাই নতুন সুরের **কথা** শোনা **যাচ্ছে।** মালয়েশিয়ার **প্রধানমন্ত্রী টেঙ্কু** আবদুল **রহমান** বলছেন, **মালয়েশিয়াকে চীন** আক্রমণ **করবার কোনও আশঙ্কা নেই, কারণ** নাকি চীনের নৌবহর নামমাত্র। **আর** পৃথিবীর বৃহত্তম নৌবহরের **মালিক আমে-**রিকার **সপ্তম নৌবহর তো চীনের দরজার** গোড়ায় **সর্বদা** টহল দিচ্ছেই। **বিশেষজ্ঞরা** উপরন্তু ভরসা দিচ্ছেন, পৃথিবীর **তৃতীয়** মহাশক্তি হিসেবে এখন **জাপানের আবির্ভাব** আসন্ন, আমেরিকা ও **জাপানের মধ্যে** সদ্ভাব এবং সহযোগিতার **অভাবও নেই।** স্বাধীন দুনিয়ার এই দুই **শক্তিস্তম্ভ পাশা-**পাশি দাঁড়ালে রাশিয়া **অথবা চীন কারো** সাধ্য নেই পূর্ব এশিয়ায় বড় **রকমের যুদ্ধ** বাধানোর। রাশিয়া **ও চীনের মধ্যে** পুনর্মিলনের সম্ভাবনাও **আপাতত দেখা** যায় না। রুশ নেতারা **অন্য কম্যুনিস্ট** দেশগুলিকেও এক জোট করতে **পারছেন না।**

নভেম্বর বিপ্লবের ৫০ **বৎসর পূর্তি** উপলক্ষে মস্কোয় কম্যুনিস্ট **মহাসম্মেলনের** আমন্ত্রণে মাত্র সাতটি কম্যুনিস্ট দেশ সাড়া দিয়েছে, বাকী সাতটি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে। কম্যুনিস্ট দুনিয়া **অতএব** রাশিয়া এবং চীনের পক্ষে **সমান সমান** ভাগাভাগি। স্বাধীন দুনিয়া**র অকম্যুনিস্ট** দেশগুলির মধ্যেও মতবিরোধ আছে, তবে মার্কিন মহাশক্তির নেতৃত্বটা **মোটের পর** অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

১৬।১০।৬৭

কা ত্বদন্যা

মণীশ ঘটক

সংকটময় দুর্গম আজ নিপতিত সন্তান,
ব্যর্থ সর্ব পুরুষকার নাহিক পরিত্রাণ॥
মসী-ঘন ঘোর মেঘমালা ওই ঘিরেছে চতুর্দিক,
ভয়ে সন্ত্রাসে নির্জিত জীব, অন্ধ, দৃষ্টিহারা;
কোন অজ্ঞেয় শক্তির দিকে তাকায় নির্নিমিখ
কে হবে সহায় এ দুঃসময়ে ভাঙিবে বন্ধ কারা!

পুত্র যখন সকাতরে ডাকে মাতা কি রহিবে স্থির,
স্খলিতবসনা এলায়িতকেশ। আসিবে না
ছুটে পাশে?
দুর্গতে বুকে ধরিবে না দৃঢ় বন্ধনে সুনিবিড়,
ও দুটি চরণ করিলে স্মরণ, শরণ পাইবে না সে?

বিশ্বাসে তার হৃদয় পূর্ণ লক্ষ্য তাহার স্থির,
সাড়া দাও তার আহ্বানে, করো তাহারে স্ব-নির্ভর,
দাও দাও তারে নির্মলবোধ, প্রজ্ঞা শুভমতির
দূরে থাক ভয় দুঃখ অভাব, দিক্ হোক ভাস্বর॥

তবে কেন

কৃতী সোম

এখনো সূর্যকে দেখি অনর্গল আগুন ছড়ায়
সন্ধ্যায় চাঁদকে দেখি অকৃপণ রুপোলী মায়ায়
প্রত্যহ ফুলকে দেখি ধীরে ধীরে দলগুলি মেলে
ওপরে আকাশ দেখি ভরপুর সুনিবিড় নীলে।

পাশাপাশি অন্য দৃশ্য, লোভ-ক্ষোভ-দুঃখ-কান্নাভরা
বুভুক্ষা-মৃত্যু-মহামারী সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরা
অনেক সরণী জুড়ে শশব্যস্ত মানুষের দল
অন্ধকারে পেতে চায় অনুক্ষণ আকাঙ্ক্ষার ফল।

আমি নষ্ট ক্ষণে বসে প্রতিদিন দ্বৈতদৃশ্য দেখি।
শস্যের আবেগে হায় মনের প্রান্তর ভরে, এ কি!
বরফের মত যদি নিরুত্তাপ গুঁড়ো হয়ে যাই।
আলো-রূপে-গন্ধে-দৃশ্যে তবে কেন নিজেকে হারাই!

ইহুদি মেনুয়িনকে অনুরোধ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ওর ভ্রান্ত আঙুলগুলি ধরে কে থামাবে! ইহুদি মেনুয়িন আপনি কি একবার
পার্ক স্ট্রীটের এই পানশালায় এসে বলে যাবেন যে
বাখের "ডাবল কনসার্টো" কখনই "ই-মেজরে" বাজানো উচিত নয়।
বাজালে পঞ্চমুখী আসক্তির ওপারে যে নদী—তার সূর্যোদয়, সাদা পালে আর
ফিরে আসবে না: এবং আমিও তুখোড় ওই জনতাবধূর
শরণার্থী স্তন কিংবা মাংস শ্রোণীদেশের আড়ালে যে অশ্রুজল
এখন ফক্সট্রট নাচছে তাকে অতগুলি শেয়ালের মধ্যে বলতেই পারবো না
—মা-জননী "ডি-মাইনর" ছাড়া বাখ কেন শুধু শুধু সংগীতের স্বর্গ ছেড়ে
এই আত্মবিস্মরণের পাতক প্রতিযোগিতায় নামতে হবেন রাজী!
আপনি রমণী (শিল্পীরা শুনেছি একমাত্র বাধ্য রমণীর) আপনিই একটু বুঝিয়ে বলুন
আমি তো গাহন চেয়ে নদীকে টানতে টানতে প্রিন্সেপ ঘাটের কলকাতায় এনে
তার ঢেউ কেড়ে, হাতের গ্লাসের মতো বান্ধব দর্পণে মুখ দেখবার চেষ্টা করে
এখন নিজের কাছে একা বসে আছি। শ্মশানে শবদাহের পর যেমন বিরহ
শুনোমেধা সং বসে থাকে।
কিন্তু...কিন্তু ভায়োলিন হাতে থাকলেই কি
সংগীতের মতো নিশ্বাসের সমার্থবোধক ভালবাসা নিয়ে বাণিজ্য মানায়? না, না,
তবে আর না, আর না..."উইল য়ু স্টপ ইট ইমিডিয়েটলি?" না হ'লে
হৃৎপিণ্ডের লাল থেকেও টাটকা এই নেশা-ভরতি গ্লাস
তোমার মাথায় আমি চুরমার ভাঙবো বাদক।

মিশুক রক্তের সঙ্গে নেশা, নেশার সঙ্গে যে অন্ধকার
আমার গানের গলা চেপে ধরে কোনো সমুদ্রসিদ্ধান্ত সুর উঠতে দিচ্ছে না, সেই
আদ্যোপান্ত অন্ধকারে কেবল তোমাকে, শুধু তোমাকেই সহ্য করা সম্ভব ইহুদি মেনুয়িন।
(হোটেল-ম্যানেজারের কণ্ঠ: "হলের সমস্ত আলো
এক্ষুনি নিবিয়ে দাও, পুলিসকে টেলিফোন কর।")
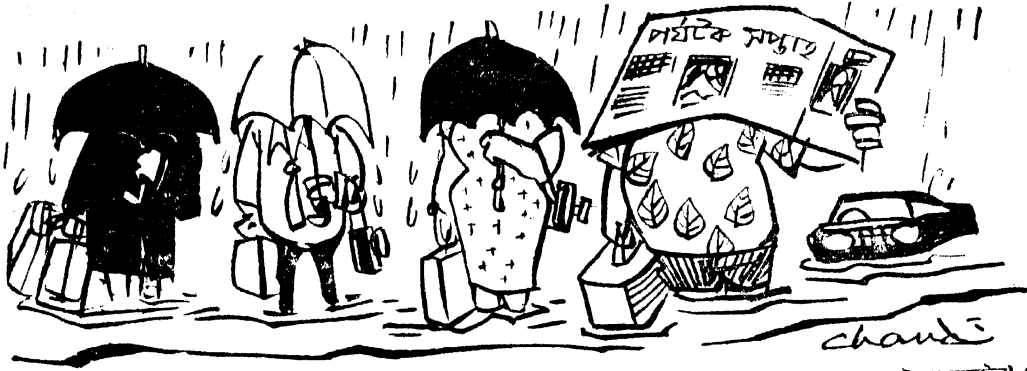
সুনন্দর জার্নাল

'শরদোৎসব—ঋণশোধ'

বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ নিন।

এই জার্নাল যখন আপনাদের হাতে গিয়ে পৌঁছুবে তখন আপনারা অনেকেই ছুটির খুশিতে দিকে দিকে বেরিয়ে পড়েছেন। পাহাড়ে সমুদ্রে শাল-মহুয়ার বনে, প্রাচীন দুর্গে, মন্দির কিংবা ধ্বংসাবশেষের সামনে আপনাদের অনেকেই প্রতিদিনের দুঃখ-ব্যথা-তুচ্ছতাকে ভুলতে পেরেছেন। কিন্তু সুনন্দর মতো যাদের জন্যে ছুটির বাঁশি নীল গগনে আর বাজল না, তাঁরাও, এই 'দুঃস্বপ্নের শহর' কলকাতায় (বিদেশীর দৃষ্টিতে যা সেই ভয়ংকর কবিতা' দ্য সিটি অভ ড্রেডফুল নাইটস্'-কে মনে পড়ায়) আশা করি 'ক্ষণিকের মুঠি'-ও ভরে নিতে পেরেছেন। তাঁদের জন্যেও এই শহরে এসেছে পুজোর কটি সজল ও নীলোজ্জ্বল দিন, এসেছে কুয়াশার একটুখানি ছায়ার স্নেহ-জড়ানো তারাদের রাত। তারপর বিজয়ার বিষণ্ণ সুরের সঙ্গে প্রসন্ন প্রিয়-সম্ভাষণ অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও সকলের দুঃখ-ব্যথা-হতাশা-বিচ্ছেদকে ভুলিয়ে দিয়েছে। আপনাদের এই আনন্দে সুনন্দর প্রীতিটুকুও নিবেদন করা রইল।

আমি কিন্তু লিখতে বসেছি পুজোর ঢাক অথবা মাইক নিনাদিত হওয়ার আগেই—ইংরেজিতে যাকে বলে 'ইন অ্যান্টিসিপেশ্যন।' এখনো জানি না, পুজোর আকাশ আবার মেঘে ভারী হয়ে উঠবে কিনা, আবার কোনো নিষ্ঠুর অকাল-বর্ষণ আমাদের চোখের জলের ধারাকে প্লাবনে বইয়ে নেবে কিনা। তবু মনে হচ্ছে, আকাশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছে—পুজোর দিন-গুলো এবারে আর বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। অতএব আশা করছি, বিজয়া সম্পর্কে আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়ে উঠবে।

আজ—এই জার্নাল লেখবার সময়, পুজোর আরো দু-তিনটি দিন বাকী আছে। দেখছি কোথাও প্যাণ্ডাল প্রায় শেষ হয়ে এল, কোথাও বা বাঁশের কাঠামো বাঁধা হচ্ছে। কিন্তু কই, অন্যান্য বারের মতো এ বছর তো তেমন করে সুর লাগছে না। শুধু স্টল-আলো-করা শারদীয়া সংখ্যার সাতরঙা প্রচ্ছদেই পুজোর সাজি ভরেছে, আর কোথাও তো সেই অ্যামেজটুকু পাওয়া যাচ্ছে না।

দুঃখ তো আমাদের অনেককাল ধরেই। এবার হয়তো কৃপণ রেশন আর দুর্মূল্য দুর্লভ চালের দৌলতে তার পরিমাণ আর একটু বেড়েছে। কিন্তু আমরা তো তিল-

'মহাষ্টমীর দিনে গঙ্গাস্নানটা এখানেই সেরে নিচ্ছিলাম'

তিল দুঃখে প্রায় নীলকণ্ঠ, ভার বইতে বইতে বোঝার ওজনের তর-তম প্রায় ভুলতে বসেছি। রুটি এখন আমাদের স্বীকৃত সুখাদ্য, মাছের জন্যে আর আমাদের
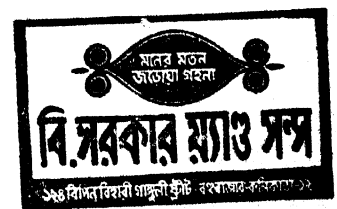
দীর্ঘশ্বাস পড়ে না, প্রতিদিনের জীবন-যাত্রায় কী পাই না তার হিসেব মেলাতেও ক্লান্তি আসে। তা হলে পুজোর আনুষ্ঠানিক আনন্দটুকু এবার এতখানি ম্লান হয়ে এল কেন?

সন্দেহ হচ্ছে, বারোয়ারী পুজোর সংখ্যা যেন কমে এসেছে—অন্তত আমাদের পাড়ায়, আশে পাশে সেইরকমই তো দেখতে পাচ্ছি। এমন কি 'সার্বজনীন' লেখা লাল শালুও যেন তেমন করে পথ আলো করে দাঁড়াচ্ছে না—শালুর দামও কি খুব বেড়ে গেছে? এবং কী আশ্চর্য, এই পুজোর বাজারেও কলেজ স্ট্রীটে ভীড় ঠেলে এগিয়ে যাওয়া চলে, কাপড়ের দোকানে ঢুকে এখনো বসবার চেয়ার পাওয়া যায়!

দুটো জামা তৈরী করাবার দরকার ছিল। প্রতি বছর জানি, পুজোর পনেরো দিন আগেই সব অর্ডার নেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এবারে উলটো অভিজ্ঞতা হল।

'দুটো পাঞ্জাবির অর্ডার নেবেন?'

'কেন নেব না?'

'তিন চারদিনের মধ্যে ডেলিভারি দিতে পারবেন?'

'নিশ্চয় পারব।'

প্রথমটা বিশ্বাস হতে চায়নি। কিন্তু দোকানদারদের মুখের দিকে তাকিয়ে আর সন্দেহ থাকে না এরপর। সত্যি কথা, পুজোর বাজার জমেনি। এমন কি ফ্রন্ট-পাথের সস্তা জামা-কাপড়েও মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত মেয়েদের ভিড় লাগেনি।

দিনযাত্রার সমস্যা? পুজোয় খুশি হয়ে খরচ করবার মতো উদ্বৃত্তের অভাব? হয়তো। কিন্তু তাই কি সব?

ভয় করে—আসল অভাবটা দেখা দিয়েছে মনের ভেতর। সেখানে সব সৌকুমার্য সব স্নিগ্ধতা, সব বিশ্বাস যেন শুকিয়ে আসছে একটু একটু করে। আমরা কঠিন, নীরস, নিরুত্তেজ হয়ে উঠছি। আমাদের সেই অবসাদ এসে আচ্ছন্ন করছে—যা নিঃশব্দ মৃত্যু, যা নিপুণ অবক্ষয়, যা দিনের পর দিন আমাদের স্নায়ুকে আঘাত করতে করতে শেষ পর্যন্ত নিশ্চেত করে দেয়, তারপর একটা অতল-কালো শূন্যতার গুহার মধ্যে আমরা ডুবে যেতে থাকি।

এবারের পুজোয় কি সেই নিঃশব্দ মৃত্যুর সংক্রমণ অনুভব করা যাচ্ছে? আমাদের জীবনের শীর্ণ মুকুলেও এতদিন যে দু এক বিন্দু মধু টলমল করত, আজ কি তা নিঃশেষে শুকিয়ে গেল!

ভাবতে খারাপ লাগে, তার চাইতেও বড়ো কথা—ভয় করে।

পথ দিয়ে একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে চলেছে, তাদের কলধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আমাদের চিন্তা-চেতনায় এই মৃত্যু আমরা কি পারমাণবিক অভিশাপের মতো রেখে যাব তাদের জন্যেই? সেই অলক্ষ্য মারণ-রশ্মি তাদেরও অকালে জীর্ণ করে আনবে, শুকিয়ে আনবে, তারা হাসি ভুলবে, আনন্দ ভুলবে, গান ভুলে যাবে? তিক্ততা আর বিদ্বেষ আর মৃত্যুবোধের মধ্যে তাদের সব প্রেরণা। সব উদ্দীপন, সব উজ্জীবন শুকনো পাতার মতো ঝরে পড়তে থাকবে?

মন মানতে চায় না।

আবার কোথাও আলো জ্বলবে, নিশ্চয় জ্বলবে। আবার আমরা প্রাণের উৎসকে নতুন করে জাগিয়ে তুলব। আবার বিশ্বাসে, কৃতার্থতায়, শক্তিতে আমরা অন্যতর ইতিহাসের দিকে এগিয়ে যাব।

জানি না, কথাগুলো আপনাদের কাছে নিছক একরাশ আবেগের মতো শোনাচ্ছে কিনা। কিন্তু এই নিরুৎসব উৎসবের পটভূমিকায় এ ছাড়া আর কিছুই অজ মনে আসছে না।

আমি আশা রাখি, আর এক উজ্জ্বল শারদোৎসব আসবে আমাদের জন্যে। রবীন্দ্রনাথ এই দিনে ঋণ শোধের কথা বলেছিলেন। হয়তো সে ঋণ বাকী আছে বলেই এমন করে দুঃখের দায় বইতে হচ্ছে আমাদের।

তবু শোধ আমাদের করতেই হবে। আমাদের উত্তরকালের জন্যেই॥

জন ডগলাস ককক্রফট

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান কালের বিজ্ঞান সভ্যতার অগ্রগতির মূলে যে কয়জন বিজ্ঞানীর অসামান্য অবদানের কথা মানুষ চিরকাল কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে স্যার জন ডগলাস ককক্রফট তাঁদের অন্যতম।

কেলডার নদীর তীরে ইয়র্কশায়ারের ছোট একটি গ্রাম—নাম তার টডমরডেন। ১৮৯৭ সালের ২৭শে মে এই গ্রামেই জন ডগলাস ককক্রফট-এর জন্ম হয়। প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে তিনি, তাঁর পরিবার কয়েকপুরুষ ধরে কাপড়ের উৎপাদনে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ককক্রফট স্কুলের শিক্ষালাভ করেন টডমরডেন সেকেন্ডারী স্কুলে। পারিবারিক ব্যবসার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ছিল না, তাই স্কুল থেকে পাশ করে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন।

সেটা ১৯১৪ সাল—প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা উঠলো বেজে। দেশের ডাকে ককক্রফটকে পড়াশুনো ছেড়ে যুদ্ধের কাজে যোগ দিতে হলো। সৈন্য বিভাগে যোগ দেবার বয়স তখনও তাঁর হয়নি, তাই প্রথম দিকে তিনি কিছুদিন Y M C A-এর সঙ্গে কাজ করেন এবং বয়স হলে গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগ দেন। এই বাহিনীর সঙ্গে তাঁকে ফ্রান্সে যেতে হয়।

যুদ্ধ শেষ হলে ককক্রফট আবার ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এলেন, এবার মনের আশা ইঞ্জিনীয়ার হবেন। যথারীতি পাঠ নিয়ে হলেন একজন পুরোদস্তুর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার, যোগ দিলেন ভিকার্স ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানীতে। জীবনে প্রতিষ্ঠা এলো কিন্তু মনের শান্তি কোথায়? যে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী তিনি, তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধারণ একজন যন্ত্রবিদের জীবনে বোধহয় সম্ভব নয়। তিনি আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এলেন, এবার কেমব্রিজে গণিত শিক্ষা করতে। ১৯২৪ সালে গণিতে ট্রাইপস নিয়ে তিনি সসম্মানে পাশ করলেন।

বিজ্ঞানী ককক্রফটের অসামান্য কর্মজীবন এবার শুরু হলো। তিনি কাভেনডিস গবেষণাগারে যোগ দিয়ে গ্রহণ করলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের শিষ্যত্ব। ক্যাভেনডিস গবেষণাগারে যোগদানের পরেই তাঁর জীবনে আর এক দিক দিয়ে আসে এক নতুন প্রেরণা। ১৯২৫ সালে ইউনিস এলিজাবেথ ক্রেবট্রির সঙ্গে জন ডগলাস ককক্রফট-এর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। তাঁর সমগ্র বিজ্ঞানী কর্মজীবনে স্ত্রীর অসাধারণ উৎসাহ ও সহানুভূতি এক নতুন অনুপ্রেরণার সঞ্চার ঘটিয়েছিলো।

যে অবদানের জন্য বিজ্ঞানী ককক্রফট বিশ্ববন্দিত তা ঘটেছিলো ১৯৩২ সালে।

জন ডগলাস ককক্রফট

অর্থাৎ কেমব্রিজ থেকে পাশ করার মাত্র ৮ বছরের মধ্যেই তিনি মানব সমাজকে এই মহান গবেষণার সাফল্য উপহার দিয়েছিলেন। ককক্রফটের অবদানের কথা আলোচনা করতে গেলে, গুরু রাদারফোর্ডের আবিষ্কারের কথাও ভূমিকা হিসাবে সামান্য একটু বলতে হয়।

বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডই প্রথম আমাদের পরমাণু কাঠামোর চিত্রটির ধারণা দেন। তিনি জানান পরমাণু কেন্দ্রটি পজিটিভ এবং এর চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে নেগেটিভ ইলেকট্রন। পরমাণুর আয়তনের তুলনায় কেন্দ্রটি খুবই ক্ষুদ্র, কিন্তু ভরের অধিকাংশই কেন্দ্রের মধ্যেই আছে।

পরমাণু কেন্দ্র নিয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা করে রাদারফোর্ডই দেখান যে, পরমাণুকেন্দ্র দিয়ে পরমাণুকেন্দ্রকে আঘাত করে পরমাণুর রূপান্তর ঘটানো সম্ভব। তিনি নাইট্রোজেন পরমাণু কেন্দ্রকে হিলিয়াম পরমাণু কেন্দ্র দ্বারা আঘাত করে নাইট্রোজেন পরমাণুকে অক্সিজেনের পরমাণুতে রূপান্তরিত করেন। এটি ঘটেছিলো ১৯১৯ সালে এবং এর দ্বারাই সর্বপ্রথম প্রমাণিত হলো যে, বাহ্যিক পদ্ধতিতে এক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর অন্য মৌলিকের পরমাণুতে রূপান্তরকরণ সম্ভব। রাদারফোর্ড এই পরীক্ষার জন্য হিলিয়াম পরমাণু কেন্দ্রের প্রাকৃতিক উৎস রেডিয়াম ব্যবহার করেছিলেন।

পরমাণুর অন্য পরমাণুতে রূপান্তরণই রাদারফোর্ডের মন্ত্রশিষ্য ককক্রফটের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিলো। ককক্রফট এই রূপান্তরণ প্রক্রিয়াটা মানুষের আয়ত্বের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন, এটাই তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব। তিনিই সর্বপ্রথম সম্পূর্ণভাবে নিজের আয়ত্বাধীনে রেখে পরমাণুকেন্দ্রিক রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন। এই অসামান্য গবেষণায় তাঁর সহযোগী কর্মী ছিলেন বিজ্ঞানী আরনেস্ট ওয়ালটন। কৃত্রিমভাবে অতীব দ্রুতগামী পরমাণু কেন্দ্রের উৎপাদনের জন্য বিশেষ যন্ত্র নির্মাণ করার কৃতিত্ব ছিলো বিজ্ঞানী ওয়ালটনের।

১৯৩২ সালে ককক্রফট এবং ওয়ালটন সর্বপ্রথম প্রচণ্ড শক্তিপূর্ণ ত্বরিত প্রোটনের দ্বারা লিথিয়াম পরমাণুকেন্দ্রকে বিদীর্ণ করেন। তাঁরা প্রমাণ করেন যে, এই সংঘাতে লিথিয়াম পরমাণুটি বিদীর্ণ হয়ে দুইটি হিলিয়াম পরমাণুর সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানকালের হিসাবটা হলো—

লিথিয়াম	৭.০১৩০
প্রোটন	১.০০৭৫
	৮.০২০৫
সৃষ্টি হচ্ছে ২টি হিলিয়াম	৮.০০২৬
ভর কমছে	০.০১৮০

এখন এই সংঘাত প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ শক্তি ছাড়া আছে তার জন্য যে পরিমাণ ভর কমা উচিত তাহলো ০.০১৮৪ ভর একক। কমে যাওয়ার হিসাবের সঙ্গে পরীক্ষামূলক ফলাফল ঠিকই মিলে গেছে।*

এর পরে বিজ্ঞানীদ্বয় বোরন, কার্বন ইত্যাদি অন্যান্য পরমাণু কেন্দ্রেও এইরূপ সংঘাত প্রক্রিয়ার দ্বারা রূপান্তর ঘটান। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই মহান অবদানের জন্য জন ডগলাস ককক্রফট এবং আরনেস্ট ওয়ালটনকে যুগ্মভাবে পদার্থ বিজ্ঞানে

* অবশ্য সেই সময় লিথিয়ামের ভর জানা ছিল ৭.০১০৪ ভর একক। সুতরাং হিসাবে তখন সামান্য গরমিল হচ্ছিল। পরে বিজ্ঞানী বেইনব্রিজ লিথিয়ামের ভর ৭.০১৩০ নির্ধারিত করেন। লিথিয়ামের ভরের মান ককক্রফটের নোবেল পুরস্কার গ্রহণকালীন বক্তৃতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

১৯৫১ সালের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

১৯৩৪ সালে ককক্রফট রয়াল সোসাইটির কেমব্রিজের মন্ড ল্যাবরেটরীর ভার গ্রহণ করেন।

কয়েক বছরের মধ্যেই শুরু হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, বিজ্ঞানী ককক্রফটের কাছে আবার এলো কর্তব্যের আহ্বান। তিনি যুদ্ধের চাকরি নিলেন; কিন্তু এবার আর গোলন্দাজ বাহিনীতে নয়। তাঁকে সরবরাহমন্ত্রকের বিজ্ঞান গবেষণা বিভাগের সহকারী পরিচালক নিযুক্ত করা হলো। জর্মনদের আকাশ পথে আক্রমণের ভীতিতে তখন বৃটেন বিব্রত: ককক্রফটের কাজ হলো রাডারের সাহায্যে তটভূমি রক্ষাসাধন পদ্ধতিকে কিভাবে সুসংবদ্ধ করা যায় তার গবেষণা করা। কিছুদিন পরে তিনি আকাশ নিরাপত্তা সংস্থার গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন।

১৯৪৪ সালে কানাডা থেকে ডাক এলো। কানাডায় এখন নতুন পারমাণবিক শক্তি গবেষণা পরিষদ স্থাপিত হয়েছে। এর পরিচালনার ভার নেবার মতো উপযুক্ত লোক সেই সময় কানাডায় ছিল না বললেই চলে। ককক্রফট এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। সেই সময় তিনি মাত্র ২ বছর কানাডায় ছিলেন এবং তাঁর পরিচালনায় পরিষদের চক রিভার ল্যাবরেটরীজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের রীতিমতো উন্নতি ঘটেছিলো। ১৯৪৬ সালে হারওয়েলে বৃটেনের পারমাণবিক শক্তি গবেষণা সংস্থার পরিচালক হয়ে তিনি আবার স্বদেশে ফিরে আসেন। হারওয়েলে ফিরে এসে তিনি আণবিক চুল্লী থেকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। এ বিষয়ে তাঁর গবেষণার অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানী ককক্রফট জীবনে অজস্র সম্মান পেয়েছেন। যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদ তিনি অধিকার করেছিলেন তার সম্মানও কম নয়। তিনি বিলাতের ফিজিক্যাল সোসাইটি এবং ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েসন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অফ সায়ান্সের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ক্যানবেরাতে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের পদও তিনি ভূষিত করেছিলেন। দেশ-বিদেশের বহু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রীতে ভূষিত করে সমাদর জানিয়েছিলেন।

একজন প্রতিভাবান ও বিশিষ্ট লেখক হিসাবেও বিজ্ঞানী ককক্রফটের প্রতিষ্ঠা কম ছিলো না। পৃথিবীর নানা পত্র-পত্রিকায় শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সমাজজীবন বিষয়ক তাঁর আলোচনামূলক প্রবন্ধগুলি বৃটেন ও অন্যান্য দেশের চিন্তাজগতে যথেষ্ট আলোড়ন এনেছিল। যুদ্ধোত্তরকালে বৃটেনের শিক্ষা ও বিজ্ঞান গবেষণার প্রগতির মূলে এই বিজ্ঞানীর অবদান স্মরণযোগ্য। রাজনীতি থেকেও তিনি দূরে ছিলেন না, বিলাতের লিবারেল পার্টির তিনি একজন বিশেষ মূল্যবান সদস্য ছিলেন।

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর কেমব্রিজে তাঁর নিজের গৃহে পরমাণু কেন্দ্রিক পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যতম স্রষ্টা স্যার জন ডগলাস ককক্রফট পরলোকগমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে একটি অসামান্য কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটলো।

শান্তি কুমার মিত্র

ঘুম ভাঙতেই বিমলেশের চোখ গিয়ে পড়লো পাশের টালিঘরের নিমগাছটার দিকে। কচি কচি পাতা হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। একটা চড়ুই না বাবুই একবার এ ডালে বসছে, আবার তখুনি ফুরুর করে উড়ে গিয়ে একেবারে শির-ডালে। খুব মজা পেয়েছে।

ভোর ভোর ঘুম ভেঙে গেছে। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। কেমন যেন খুব ভালো লাগছে। একতলার ঘর। নোনা-ধরা দেওয়াল। জানলাটা নড়বড়ে। অন্য দিন কতই না বিরক্তি নিয়ে ঘুম ভেঙে ওঠে। আজ আর সেসব কিছু মনে হচ্ছে না। ঘরের ওধারটায় তাকায়। ইস্, ছেলেটা ঘাড় গুঁজে ঘুমুচ্ছে। বইটা পর্যন্ত খোলা। না, টেবিল ল্যাম্পটা নিবিয়েই শুয়েছে। কোণের দিকে কুঁজোটা কাত হয়ে পড়ে। জল পড়ে থাকলেও শুকিয়ে গেছে। বিমলেশ মনে মনে হাসে, এই খাবার জল ধরা নিয়ে সেদিন কী ছেলেমানুষিই না করেছিল সে।

ছেলেমানুষিই বটে! তা ছাড়া আর কী। সব মনে পড়ছে। দিনটা ছিল শনিবার। বেশ লাগসই টিপস নিয়ে ট্রিবল টোট ধরেছিল। দূর, লাগলো না। ওদিনই অফিসেও একটা ভুলের জন্য পাঁচ কথা শুনতে হয়েছে। তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে রাত্রে ফিরেছে। ভাবতে ভাবতে হেসে ফেলে, বাবুর সেদিন যা মেজাজখানা ছিল। সত্যি, অন্যায় হয়ে গিয়েছিল। ও তো দুখের ছেলে। কতই বা বয়স হবে। বিমলদার কাছে থাকলে ঝক্কি ঝামেলা কম পোহাতে হবে বলেই না এ মেসে অনেক কাকুতিমিনতি করে সীট করে নিয়েছে। সামনেই চার্টার্ড অ্যাকাউণ্টেন্সি পরীক্ষা।

রাগ, না চণ্ডাল। মুখে যা এসেছে, তাই বলেছে, নবাব, এক কুঁজো জল ধরে রাখতে গতর ওঠে না। পড়ছেন তো মাথা কিনে রেখেছেন। রতন কেমন অবাক হয়ে তাকিয়েছে। তারপরই উঠে কুঁজোটা নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। বিমলেশ সটান গিয়ে শুয়ে পড়েছে। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। রতন জল নিয়ে এসে ডেকেছে, বিমলদা, বিমলদা। হাঁ, মনে আছে, মুখ ভেংচিয়ে উঠেছিল, তোর চোদ্দপুরুষের দাদা। শালা। ছেলেটা কাঁদো কাঁদো হয়ে পড়েছিল। না, তখন অত দেখেনি। এখন মনে পড়ছে, নিশ্চয়ই রাত্রে খুব কেঁদেছিল ও। সেদিন কি আর পড়াশোনা করতে পেরেছিল?

এই মুহূর্তে তারও কান্না পাচ্ছে। কিন্তু এ যেন অন্য রকম কান্না। কেমন মায়া লাগে। আবার রতনের দিকে চোখ গিয়ে পড়ে। কণ্ঠাটা বেরিয়ে পড়েছে। মেয়েলী মুখ। জানলার দিকে চোখ ফেরাতেও সেই নিম-গাছ। গাছটার কি চুম্বকশক্তি আছে? মনে করতে চেষ্টা করে, মাসখানেকও হয় নি, ডালগুলো খাঁ খাঁ করছিল। একটা কালো কাক বসে কা-কা করে ডাকছে। যেমন যমের

মত দেখতে, দাঁড়কাক নিশ্চয়ই। ইস্, নিম-গাছটা কী নির্লজ্জ। নির্লজ্জ শব্দটা মনে পড়ায় বিমলেশ খুশী হলো। ক'দিনের মধ্যেই উনি আবার যৌবন-সাজে সেজেছেন। কী চলানি।

না, আর নয়। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে বিমলেশ। ব্রাশ, পেস্ট নিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। তারপর আস্তে আস্তে কুঁজোটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। ফিরে দেখে রতন উঠে বসেছে। তার চোখে এখনো ঘুম কাটে নি। জলভর্তি কুঁজোটা রেখে বিমলেশ ডাকে, নে, ওঠ, মুখ ধুয়ে আয়। রতন অবাক হয়ে গেছে। সেদিনের পর এই প্রথম বিমলদা তার সঙ্গে কথা বললো। তাও রাগের কথা নয়। বিমলেশ তাড়া দেয়, আমি চা বলে আসছি, মুখ ধুয়ে নে। বলেই চটিটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে গেল। আর কু-মিনিটের মধ্যেই এক ঠোঙা গরম জিলিপি নিয়ে ফিরে এল। [illegible] চা দিয়ে গেছে। রতন [illegible] পরে বেরুলো [illegible]।

আয় চা খাই, জিলিপি খেলো, বিমলেশ গুছিয়ে বসে রতনকে ডাকে। রতন একটু দ্বিধা ইতস্তত করে। আবার তাড়া খায়, গরম গরম আনলাম, মুচমুচে করছে, ভালো লাগবে দেখ। রতন মৃদু হাসে, বিমলদা জিলিপি খেতে খুব ভালোবাসে, তাই জিলিপি এনেছে তার জিলিপি। ওও জিলিপি খেতে আরম্ভ করে। বিমলেশ যেন তারিয়ে তারিয়ে খায়। রতন এবার একটু শব্দ করে হেসে ফেলে। হাসছিস যে, বিমলেশ ধমক দেয়। রতনও সহজ, তোমার জিলিপি খাওয়া দেখছি।"

হুঃ, গম্ভীর হবার ভান করে বিমলেশ। পর মুহূর্তেই যেন জরুরী কথা মনে পড়ে গেছে, বলে ওঠে, 'রতন, আজ আর কলকাতায় থাকছি না। তুই খুব মন দিয়ে পড়। সারা দিন পড়বি। বেরুবি না। [illegible] তোমার কাজেকর্মও রইলো না। [illegible] বলেই উঠে দাঁড়ায়। আর একবার জানলা দিয়ে নিমগাছটার দিকে তাকায়। চড়ুই [illegible] বাবুইটা উড়ে গেছে। যাক্, খুব [illegible] নিল। না, আর নয়। আজ বড় পালাই পালাই ইচ্ছে হচ্ছে। একটু ফাঁকাতে [illegible] হবে। সারা মনে কেবল একটা সংকল্প, আর কোন [illegible] নয়। [illegible] দেখা। কলকাতা থেকে বেরুতে না পারে ঠিক কোন সময়ে তাদের [illegible] হাজির হবে বসে। পথে দাঁড়িয়েই [illegible] ফেলে, আজ নিজেকেই বিশ্বাস নেই। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? হঠাৎ মনে পড়ে গেল অবনীশের কথা। কলেজে পড়ার সময় গভীর বন্ধুত্ব ছিল। কবার ওদের দেশের বাড়িতে গেছেও। অবশ্য যোগাযোগটা এখন ক্ষীণই। না, অবনীশ অনেকবারই টেনেছে

চণ্টা করেছে। ও-ই এড়িয়ে গেছে অবনীশ ভালো চাকরি করে। গ্রাম থেকেই ডেলি-প্যাসেঞ্জার। চেহারাটা নাদুসনুদুস। কতদিন বলেছে, 'একদিন আর না। লীলাকে কত বলেছি তোর কথা।' শালা বিয়ে করেছে, একটি ছেলে, একটি মেয়ে। বিমলেশ অবনীশের কাকুতিমিনতি শুনেছে, আর মনে মনে হেসেছে, 'দূর, ঘী দুধ আর আদর খেয়ে খেয়ে তো তুই ফুরিয়ে গিয়েছিস। তার কাছে গিয়ে কী হবে, গুডি গুডি চালোমানুষ, টাইপ, শকচ শুনলে আঁতকে উঠবি। অবশ্য কথাগুলো অবনীশকে বলে নি, বরং বলেছে, 'দেখিস, ঠিক যাবো। বাবা মামায় ওই দিনক্ষণ দেখে, বলে কয়ে যাওয়া পোষায় না। দেখবি হঠাৎ একদিন চলে যাবো। তবেই তো বলতে পারবো, তোর নমন্তস্ম সিনসিয়ার, না অল বোগাস।' অবনীশ যা বোঝবার বুঝেছে, তবু মুখে বলেছে, 'বেশ, তাই যাস। তোর সব গল্প লীলা জানে, অনু জানে।' অনু অর্থাৎ অণিমা, অবনীশের বোন। বি এ পাস করে পাশের গাঁয়ে শিক্ষিকা হয়েছে।

বিমলেশের আজ সকাল থেকেই উল্টো-যাত্রা। অবনীশের গাঁ তাকে চুম্বকের মত টেনে নিয়ে চললো। হাওড়া ময়দান থেকে মার্টিন ট্রেন ধরে যখন গাঁয়ের স্টেশনে গিয়ে নেমেছে, বিমলেশ নিজেই অবাক। বেশ হবে, অবনীশ আশ্চর্য হয়ে যাবে। অবনীশের রাঙা দিদিমা কি এখনো বেঁচে আছেন? অনেক দিন হলো জিজ্ঞেসও করা হয় নি। দুধে-আলতা রং, ঠিক প্রতিমার মত দেখতে। মনে আছে, তার চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, 'মানুষ হোস বাবা।' মনটা হঠাৎ বিষন্ন হয়ে পড়ে। আদর সে জীবনে পায় নি। মেস-লাইফ তার কবে থেকে শুরু তা হিসেব করলে রীতিমত একটা বড় যোগফল হয়ে যায়। সেবার বিজয়া দশমীর দিন রাঙা দিদি-মাকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন, 'অবি আর তুই দুজন খুব বড় হবি। কত লোক নাম করবে। সবাই এসে বলবে, তোমার বিমুকে লিখে দাও না গো।'

দূরে ছাই, ও সব আর ভেবে কী হবে। তবু ভাবে। রাঙা দিদিমা যদি বেঁচে থাকেন আর তেমনি করে চিবুক ধরে আদর করে বলেন, 'বিমু, তুমি কী করছো?' না এলেই ভালো হতো। যাঃ বাবা, এত ভয়ই বা কিসের। তার দাড়ি যা কড়া, চিবুকে হাত দিলে রাঙা দিদিমার হাতই কেটে যাবে। বিমলেশ স্টেশন থেকে পথ হাঁটছে। কড়া দাড়ির কথাটা মনে হতেই মজা লাগে। অবনীশ-গিন্নী কেমন দেখতে? বার দুই বাচ্চা হবার পর কি আর জেল্লা আছে? মনে মনে একচোট হেসে নেয় বিমলেশ। ও সব ফারক্কিবাজি তাকে কাবু করতে পারে নি। একবার মেসের পাড়াতুতো দাদা খুব ঝোলাঝুলি করেছিল ওর ক্লাস নাইনে পড়া বোনটিকে পড়াবার

জন্য। না, না করেও ওর মনটা একটু ভিজে-ছিল। হঠাৎ একদিন মাঠ থেকে বেরুতেই সামনাসামনি দেখা। তারপর সেই যে দাদা পাশ কাটালেন, আর ভুল করেও কোন দিন সে কথা পাড়েন নি। সেসব কথা মনে হলে এখনো হাসি পায়।

রোদটা বেশ চনচনে হয়েছে। বিমলেশ মেন সড়কটা ছেড়ে গাঁয়ের পথ ধরে। পথঘাট অনেক বদলে গিয়েছে। তবু কিছু কিছু পুরোনো চিহ্নও রয়েছে বইকি। তা ছাড়া পথে লোককে জিজ্ঞেস করেও নিয়েছে। আরে ঐ তো সেই ভাঙা শিবমন্দিরটা। না, এখন ভাঙা বলে সাধ্য কার। বাবা ভাং খেয়েও বেশ ঘর গুছিয়ে নিয়েছে দেখছি। মন্দিরকে বাঁয়ে রেখে বিমলেশ এবার দ্রুত পা চালায়। আবার খুব ভালো লাগতে থাকে। অবনীশ তাকে দেখে কেমন মুখটা করবে। আচ্ছা বিপদ, সে তো আর কমিনিট পরেই মালুম হবে। মাথা থেকে যেন সব ঝেড়ে ফেলার জন্য মাথা নাড়ে। ঠিক গাঁয়ে ঢোকার মুখে সিগারেট ধরায়। কী জানি বাবা, রাঙা দিদিমা থাকলে একটু মন্দ তো করতেই হবে।

এই তো সদরবাড়ি। কিছুটা চিকনচাকন হয়েছে। বাঃ, বেশ খোকাটি তো। এ কার খোকা, অবনীশের? 'ও খোকা, শোন শোন', বিমলেশ হাত বাড়ায়। খোকা অচেনা লোক দেখে অবাক হয়ে তাকায়। কটা মুহূর্ত। তারপরই থপথপ করে এগিয়ে আসে 'টুমি কে?'

'আমি, আমি', বিমলেশ কী বলবে ভেবে পায় না, হেসে ফেলে। ঠিক সেই সময়ে অবনীশ বেরিয়ে আসে। স্নান করতে চলেছে। খালি গা, কাঁধে গামছা। মাথায় তেল ঘষছে। ও-ও অবাক, 'আরে আরে তুই।' সারা মুখে খুশি উপচে পড়ে। তেল-তেল মুখে হাসি, সে দেখবার মত। বিমলেশও খুব খুশী। আর এই সময় খোকা টলতে টলতে এগিয়ে এসে বিমলের কাপড় ধরে, 'টুমি কে?' মনে হচ্ছে খোকাও মজা পেয়েছে। তবে একটু অভিমানাহতও। বিমলেশ ওর দিকে মনোযোগ দিতে দিতে হঠাৎ তার বাব্বার দিকে চেয়ে হাসছে, অভিমান হবে বইকি। কোঁচার কাপড় ধরে তখনো টানে, 'টুমি কে।' অবনীশ এগিয়ে এসে খোকাকে ধরে, 'জেঠু, জেঠু।' খোকা ঘাড় নাড়ে, জেঠু পছন্দ নয়, 'না, বাব্বা। বাব্বা।' অবনীশ, বিমলেশ দুজনেই হেসে ফেলে। টুপ করে খোকাকে কোলে তুলে নেয় বিমলেশ, 'না, বাব্বা।' খোকা এবার খুশী। একবার অবনীশের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলে বাব্বা, আর একবার বিমলেশের বুকে মুখ লুকিয়ে বলে বাব্বা। খুব মজা পেয়েছে।

'আয়, আয়' বলে অবনীশ বিমলেশকে নিয়ে সদর পেরিয়ে অন্দরে ঢোকে, ডাক পাড়ে, এই দেখো কে এসেছে। অণিমা ছুটে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। হয়তো অন্য কাউকে দেখবে ভেবেছিল, দাদার সঙ্গে অপরিচিতকে দেখে লজ্জা পায়। অবনীশ হইহই করে, 'আরে এ বিমল। তুই তো দেখেছিস। অবশ্য তখন তুই ছোট।' বিমলেশও একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল সামলে নেয়, 'তুমি তো অনু। তখন আম কুড়িয়ে এনে আমাদের কত খাইয়েছো।' এবার অনুও একটু হাসে। স্মিত হাসি অভ্যর্থনার হাসি।

অবনীশ-গৃহিণীও আসেন। সকন্যা। কন্যা মঞ্জু, বছর আট বয়েস। ফুটফুটে মেয়ে। লীলা হাত তুলে নমস্কার করেন, মৃদু স্বরে বলেন, 'আসুন, ঠাকুরপো।'

বিমলেশ ওরই মধ্যে ভেবে নেয়, না অবনীশ বাড়িয়ে বলে নি। এ বাড়িতে সে একেবারে অনালোচিত নয়।

এদিকটারই রং আলাদা, চেহারা ভিন্ন। আদরে, আপ্যায়নে, আন্তরিকতায়, খোকার

দুষ্টুমিতে, মঞ্জুর পুতুলের গল্প শোনানোয় কখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল এসে পড়ে। ও আর অবনীশ শিউলিতলায় গিয়ে বসে। চাটাই বিছানো, খোকা কোণটা ধরে টানাটানি করছে। মঞ্জু ধমকাচ্ছে, 'টুটু, পিসীমণিকে বলে দেবো।

বিমলেশ বিকেলের পড়ন্ত রোদের মতই একটু যেন বিষণ্ণ। অবনীশের খুশির কিন্তু কুলকিনারা নেই। জমি, গোয়াল, গ্রাম পঞ্চায়েত, পাঁচালী বলার মত সব বলে যাচ্ছে। বিমলেশ ওর দিকেই মুখ করে বসে, কিন্তু আসলে এখন আর কিছু শুনছে না। অনেকগুলো বছর মাড়িয়ে সেই পুরোনো দিনে চলে গিয়েছে ওর মন। রাঙা দিদিমা বছর চার হলো স্বর্গে গেছেন। শেষ বয়সে চোখে ছানি পড়েছিল, কিছু দেখতে পেতেন না। দুধে-আলতা রং ছিল বলে রাঙা দিদিমা। অবনীশের মা তাঁর একমাত্র মেয়ে। বিধবা হবার পর মেয়ের কাছেই এসেছিলেন। সেই থেকেই পাড়া-প্রতিবেশী সকলেরই রাঙা দিদিমা। বাংলা পড়াশোনা খুব ভালো ছিল, কিছু সংস্কৃতও জানতেন। এসব কথা বিমলেশ আগেই শুনেছিল। আজ হঠাৎ সেসব মনে পড়ছে। অনু চা আর আলুভাজা মুড়ি নারকোল-নাড়ু নিয়ে এল, 'খান বিমলদা।' অনুর মুখের আদলটা ঠিক রাঙা দিদিমার মত নয়? রংটাও? চকিতে বিমলেশের বিস্মরণ ঘটে যায়। মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। অনু ততক্ষণ চলে গেছে। হঠাৎ অবনীশকে জিজ্ঞেস করে বসে, 'বোনের বিয়ে দিবি না?'

অবনীশ থতমত খেয়ে যায়। এক মিনিটও নয়, হেসে বলে, 'বাঃ, বিয়ে দেবো বইকি। তা কী আর করবো বল। ওরই স্কুলের ইংরাজীর টিচার, তাকেই ওর পছন্দ। আমিও মত দিয়েছি। ছেলেটি অবশ্য খুবই ভালো। বয়সও কম। দুজনে মানাবে ভালো।'

বিমলেশ চায়ে চুমুক দেয়। কেমন বিস্বাদ লাগে। অবনীশ অনর্গল বলে চলে, 'রাঙা দিদিমারও খুব পছন্দ ছিল হীরেনকে। ভাবছি, আসছে জ্যৈষ্ঠ মাসেই ওদের বিয়েটা সেরে ফেলবো। কী দরকার বাবা, মুখ ফুটে হয়তো বলতে পারছে না। অফিসে কিছু ধার হবে, এই যা। তা হোক।' একটু স্বর নামিয়ে বলে, 'তুই তো ও সব সাধ বুঝোল না।' বলেই হো হো করে হেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বিমলেশের মাথায় রাগ চড়ে যায়। মুঠোয় মুড়ি তুলেছিল, মুঠি চেপে মুড়িগুলো গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে ফেলতে থাকে। অবনীশের হাসির চেয়েও জোরে হেসে ওঠে, 'তোফা, তোফা, বেশ আছি বাবা।' খোকা, মঞ্জু অবাক হয়ে বাবা ও জেঠুর দিকে তাকায়। লীলা বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে উঁকি মারেন।

সব পালাই একসময় ভাঙে। এ পালাও ভাঙলো। সন্ধ্যা হয়েছে। শাঁখ বাজে। বিমলেশ সকলের কাছ থেকেই বিদায় নেয়। লীলা মৃদুভাষিণী, বলেন, 'আবার আসবেন ঠাকুরপো।' অনু কিছু বলে না, বউদির পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। মঞ্জু জেঠুকে তার পুতুলের বিয়েতে নেমন্তন্ন জানায়, বার বার বলে 'এসো কিন্তু।' খোকা তার বোল ভোলে নি, ডাকে, 'বাব্বা।' অবনীশ স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। ছোট লাইনের লাস্ট ট্রেন, ঢিমেতালে চলে। বিমলেশ অসাড় হয়ে বসে থাকে। সব কিছু তার ওলটপালট হয়ে গেছে। একটা আক্রোশ, কান্না মেশামেশি করে তার বুকে ঠেলে উঠতে থাকে।

.।

মেসের ঘরে যখন পৌঁছোয়, রাত বারোটা। রতন পড়ছে। রাসবিহারী অর্থাৎ রাস্‌, দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। 'না, খাবো না' বিমলেশের চড়া গলার আওয়াজে রতন মুখ তুলে তাকায়। তবু রাসু দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ বিমলেশ ঘুরে দাঁড়িয়ে রেগে যায় 'বলছি তো খাব না।' রতন ভয়ে ভয়ে বলে 'ওর বউয়ের অসুখ খবর এসেছে, টাকার জন্য যেতে পারছে না। ম্যানেজারবাবু টাকা দিতে পারবেন না জানিয়ে দিয়েছেন।'

'তা আমি কী করবো?' বিমলেশ চীৎকার

করে ওঠে, 'শালা, কার বউয়ের অসুখ, কার বোনের বিয়ে, তা আমার কী।' পরমুহূর্তেই তেমনি স-চীৎকারে ডেকে ওঠে, 'রাসু।' বাবুর মেজাজ দেখে রাসবিহারী একটু আড়াল হলেও কাছেই ছিল, এগিয়ে আসে। 'নে শালা, যা আছে তুই নিয়ে যা। জুয়োড়ীর আবার জমা।' বুক-পকেট থেকে তিনখানা দশ টাকার নোট তুলে ছুঁড়ে দেয়। রাসবিহারী সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে চলে যায়।

জামা কাপড় ছেড়ে শুতে গিয়ে খোলা জানলাটার দিকে নজর পড়ে। বাইরে অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। দড়াম করে পাল্লা দুটো ঠেলে দেয়। একটা ক' ক' আওয়াজ ওঠে। নিজের মনেই কৈফিয়ত দেয়, 'ভোরে হিম আসে।' রতন সকালের মতই অবাক হয়ে গেছে। ভাবে, বলবে কিনা, আষাঢ় সবে তো শুরু, এখন হিম কোথায়। বলে না, বই নাড়াচাড়া করে।

বিমলেশের সকালে দেখা নিমগাছটার কথা মনে পড়ে। মনের সব আক্রোশ গিয়ে পড়ে গাছটার ওপর। শুয়ে শুয়ে মনে মনে গর্জায়, 'দূর শালা। ওটা বেশ্যা। বছর বছর খোলস পাল্টাচ্ছে। বাহার! লজ্জা নেই। শালার ভগবানও হয়েছে, গাছ-গাছড়াকেও বছর বছর যৌবন দিচ্ছে, আর শালা মানুষ, একবার বয়স ফসকেছে তো আর চারা নেই। বাস মিস করলে শালা পরের বাস আসে। শালা মানুষ কেবল বুড়িয়ে যাচ্ছে।'

রতন আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ বন্ধ জানলাটা ঘেঁষে চৌকির ওপর একটা কাতরানি আর বোবা কান্না শুনতে থাকে।

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

পঁয়তাল্লিশ

ঝিনির মুখের নীল আকাশে রোদের ঝলক দেখলেও আমার ভিতরটা ঝলকায় না। সেখানে তখনও বিনা মেঘে ঝড়ে বাড়ি-খাওয়া ঠেক চমক। মুখ থুবড়ে পড়া হকচকানি। দিকে দিকে আঁধার, নজর চলে না, শ্রবণও অবশ। কী ঘটে গেল কিছু বুঝতে পারি না যেন। কেবল চোখের সামনে একটি মেয়ে, এখনো যেন পুরো চেনা না। যেন দূরকালের চেনা-চেনা। তার স্বভাব থেকে উপচে-পড়া কিছু আচরণ। আর কিছু কথা। যে কথার সম্যক উপলব্ধি এই মুহূর্তে নেই।

সরাইখানার লোক এসে খালি কফির পাত্র তুলে নিয়ে যায়। সেটুকু বাহ্যজ্ঞান ছিল। পয়সা মিটিয়ে বাইরে এসে মেলার মধ্য দিয়ে বন্ধুর বাড়ির দিকে এগোই। কিন্তু কিছু কিছু কথা নিঃশব্দে আমার শ্রবণে বাজতেই থাকে। 'হয়তো ফিলজফি পড়তে গিয়ে আপনার মত লোককে...' কেমন করে মানবে হে। এমন কথা কি মেনে নেওয়া যায়। বিশ্ব-সংসারে চলতে গিয়ে রীতির কাছা অনেক এঁটেছি। তাতে আসল রূপের খোলতাই কিছু হয় নি। ভিতরখানি ভরা তো এক আটপৌরে প্রাণে। বিদুষীর কথা মানব কেমন করে।

আরো কথা বাজে, 'বাবা-মায়ের মত তাঁদের মেয়েটিও হয়তো—হয়তো, মুগ্ধ হয়েছিল, তাই কী লিখতে কী লিখেছি না জেনে কাব্য করেছি।' না, না, বড় ব্যাজ বড় অস্বস্তি, ভারি বাধা লাগে। বিদুষী বহুত দূরে, কারুকেই এমন অসম্মানের অহঙ্কার নেই। তার চেয়েও বেশী ঝিনির গলার স্বর ডুবে যাওয়া বুকের ভিতরে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা।

না, না, নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বাঁচি না। ধিক্কার পথ-চলাকে। ধিক্কার মনকে। ঝিনির কাছে এমন অপরাধ কখন, কবে থেকে করে বসে আছি। তারপরে, '...সত্যি অলকা চক্রবর্তী নই। আমি ঝিনি-ই।' নিশ্চয়ই। সে অলকা চক্রবর্তীর মত দাঁড়ায় নি এসে। যায় নি। ঝিনির মত সব কিছু। সে ঝিনি, সন্দেহ নেই। তবু সব মিলিয়ে আমার মনের কোথায় ঠেক খেয়ে যায়। এক অবাক অবুঝ সুর বেজে যায়। তার সঙ্গে নিজের অন্যায়বোধের কাঁটাটা খচখচিয়ে ওঠে। হাতিমতলার মেলায় এ কি লাগে বিষম গোল!

কিন্তু দৃষ্টিতে, স্বরে, কথায় এত যে নালিশ, সব কি সত্যি? মেলার লোক দেখি না, মেলা দিয়ে হেঁটে যাই। এক বিদুষীর মুখ ভাসে, তার ওপর দিয়ে খেলে যায় অনেক হিজিবিজি অক্ষর। অক্ষরগুলো পড়তে চেষ্টা করি, তাই স্মৃতি দিয়ে নজর করি। তবু স্মৃতির নজরে সব দেখতে পাই এমন না। স্মৃতির চোখে তত ধার নেই। কালির লেখা মাঝে মাঝে ঢেউ দিয়ে ওঠে।

'...দেখছি, দৈব বলে একটা জিনিস সত্যি সত্যি আছে। নইলে আপনাকে তো নতুন করে বলার কিছু নেই, দক্ষিণের নদী-নালায় ছড়ানো সেই অঞ্চলটা প্রাচীনকালে আর্যরা বরাবরই পরিহার করেছেন। মুঘল সরকারের কাছে সুন্দরবনের এলাকা ছিল "দোজাখ্"। মানে—নরক। কাউকে নির্বাসন দিতে হলে সেখানে পাঠানো হত। এখন সেখানেই সোনা ফলছে। তবু আমাদের ঘমের স্বারও তো দক্ষিণেই শুনতে পাই। আর সেই পথে দক্ষিণে লঞ্চে করে গোসাবায় যেতে যেতে যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ভাবতেই পারি নি। সেইজন্যেই অবাক লেগেছে বেশী। আপনার সঙ্গে দেখা হবার কথা কোন পত্রিকার অফিসে। কোন প্রকাশকের ঘরে। অথচ আপনিও সেই-রকম। একটি কাপড়ের কোণ কোলের কাছে নিয়ে কথা বলতে বলতে চলেছেন এক ফকির দরবেশের সঙ্গে। তার সঙ্গে হাসছেন, কথা বলছেন, গান শুনছেন। আমি তো প্রথমটায় ভেবেছিলাম আপনিও বোধ হয় আমাদের মত আত্মীয়-বাড়ির যাত্রী, নয় তো—বিদেশ থেকে গৃহগামী।...আশা করি ভুল বোঝবার কোন কারণ নেই, সত্যি কিন্তু ভেবেছিলাম আপনি সেই অঞ্চলেরই অধিবাসী। হয়তো কলকাতায় চাকরি করেন, দেশের বাড়িতে একটু দেখা করতে যাচ্ছেন। কিংবা, সেই অঞ্চলের কোন ইস্কুল-মাস্টার হবেন। নিদেন কোন মনোহারী দোকানের মালিক। ধান-চালের কারবারীদের সঙ্গে ঠিক মেলানো যায় না, তা নইলে বোধ হয় তাও ভাবতাম।...

'তারপরে যখন জানাজানি হল, আ ছি ছি, আমি তো মনে মনেই জিব কেটে-ছিলাম। কী যে লজ্জা করছিল না। তার

ওপরে বাবার ওইরকম কথাবার্তা!...আচ্ছা, বাবাকে আপনার কেমন লেগেছে? ও-রকম মন্দর হয়? আপনি তো সংসারে কত লোক দেখেছেন, আমার বাবার মত একটা লোক দেখেছেন?...

'আচ্ছা, সেসব কথা থাক এখন, যতই অবাক হই আর লজ্জা পাই, মনে মনে এত খুশী হয়েছিলাম। আমি মনে মনে কল্পনা করতাম, গোঁফ-দাড়ি না থাক, আপনি একটা মস্ত দশাসই বয়স্ক লোক! তার পরিবর্তে দেখলাম একেবারে অন্য মানুষ! যাই বলুন, অতোটা তা বলে ভাবি নি। আপনার লেখার সঙ্গে চেহারার একটুও মিল নেই। পরে মায়ের সঙ্গে এই নিয়ে আমার কথা হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা মা-মেয়ে একমত। মাও তো আপনার বই পড়েছেন। মায়ের ভাষায় আপনি হলেন, "ও তো একরত্তি ছেলে!"...

'...আর ওভাবে আপনাকে দেখতে পেয়ে ভালই হয়েছিল। আপনি যেন একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন।'...

কী বিড়ম্বনা হে, এমনি অনেক কথা ঝিনি লিখেছিল। এই যে চোখের কুলায় ভাসে নাগরিকাটির মুখ। অথচ যেন নাগরিকা না, বড় আটপৌরে কথার ভাবে, হাসে সটান সটান, সোজা সোজা, চাপা-স্মৃতির চোখে আরো দেখি অনেক অক্ষর চাপিতে নেই। যা মনে আসে তা-ই ভাবে। তরঙ্গিয়া ওঠে এই মুখের ওপর।

'...ভাগ্যিস, একটু নমস্কার, দুটো কথা, একটি নামসই, এইটুকুর মধ্য দিয়েই পরিচয়ের শুরু আর আলাপের শেষ হয় নি। তা হলে কী বিশ্রী হত বলুন তো? সেখানে আপনি তখন অন্য মানুষ। আপনি বুঝি প্রায়ই এরকম বেরিয়ে পড়েন? আপনার কী মজা! আমিও যদি পারতাম! আমার খুব ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে এমনি বেরিয়ে পড়ি। আপনাকে দেখে যেমন মনে হচ্ছিল, সেই নদী, ভেড়ী, বাঁধ, দিগ্‌বিসারি ধানক্ষেত, মিঠে রোদ ঝরা আকাশ, সব কিছুর মধ্যে আপনি যেন ডুবে গিয়েছেন, অন্য এক রাজ্যে চলে গিয়েছেন, কোথাও আপনার কোন বাঁধা নেই, আমারও খুব ইচ্ছে করে সব কিছু থেকে এমনি করে ছুটে যাই। কিন্তু সংসারটা আমাদের সে অধিকার দেয় নি...বাবা তো খালি সেই কথাটাই বলেন, "অচেনা অজানা জায়গায় ওরকম একটা মুসলমান ফকিরের সঙ্গে ছেলেটা বরে গেল কী করে? প্রাণে একটু ভয় ডর নেই?" সত্যি, আমিও ভাবি, আপনার কী একটু ভয় হল না? বিশেষ করে বাদা অঞ্চলকে লোকে এমনিতেই ভয় পায়। খুন-ডাকাতি তো ওসব জায়গায় লেগেই আছে।...এসব কি কেবল লেখার রসদ সংগ্রহের জন্যে? নাকি মন মানে না তা-ই? আমার কিন্তু মনে হয়েছিল, আপনি মনের তাগিদেই গিয়েছিলেন।

'...রাগ করছেন না তো, এত কথা লিখছি বলে। আপনার সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে আপনি রাগ করবেন না। তা-ই এত কথা লিখছি। ওভাবে আপনাকে দেখে আলাপ হয়ে মনে হল, আপনাকে আসল রূপে দেখা গেল। সব থেকে ভাল লেগেছে আরো আপনার সঙ্গীটির জন্যে। ভারী আশ্চর্য, অমন তো কতই আমরা পথে-ঘাটে দেখি তা বলে কি সঙ্গী করে নিই নাকি! ওটাই বোধ হয় আপনাদের বিশেষত্ব। আপনার গাজীকে আমার খুব ভাল লেগেছে। গান আরো ভাল লেগেছে আর সেইজন্যে ত র কাছে আ

ওইরকম গান আমি আর কখনো শুনি নি। আপনার জন্যেই সেটা সম্ভব হয়েছিল।...

'.....বাবার তো সবটাতেই বাড়াবাড়ি। আসলে কী জানেন, গাজীর গান বাবারও খুব ভাল লেগেছিল। গাজী লোকটাকেও বাবার খুব ভাল লেগেছিল। ভাল না লাগলে বাবা কারুর সঙ্গে ওরকম করে অত কথা বলেন না। তবে, আমার বাবার সম্বন্ধে কিছু ভাল লাগে না। তা-ই ভাবি, আপনি কী জাদু জানেন, জানি না, আমার বাবা তো একেবারে মুগ্ধ। নইলে, আমার বাবার কথা ভুলেও যখন তিনি উচ্চারণ করেন না, আপনাকে অবলীলায় সব বলে ফেললেন! বাইরের কোন লোকের কাছে বাবাকে অত আর্ত আর করুণ হয়ে উঠতে কখনো দেখিনি। আর আমরা মা-মেয়েই বা কী। আপনার সামনে চোখের জলটুকু চাপতে পারলাম না। আপনি দেখছি, লোক সুবিধের নন!'.....

তাইতে বড় অবাক মানি এখনো। ঝিনির সঙ্গে আমার দুবার দেখা। সেই দক্ষিণের গাঙের বুকে, আর এই হাটের ছাতিমতলার মেলায়। দুবারেই চোখের জল দেখতে হল। কেন হে, বিদেশীর বুক আকাশে কেবল কি মেঘ ছড়ানো নাকি। খালি সে ঝরে। তবু মনের বচন, লিখনে দেখি, নাগরিকার বয়ানে ভাবে;

• ...সত্যি, আপনাকে এখন হিংসেই হচ্ছে। বাবা মা দুজনেই, দেখছি, আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাবার কোন বন্ধুবান্ধব এলেই, আপনার প্রসঙ্গ একবার উঠবেই। বলেন, 'ভারী ভাল ছেলে।' শুনে হাসবেন না যেন, বাবা বলেন, 'একেই বলে কবি আর শিল্পী।' আমি যদি বলি, 'বাবা, উনি কবি নন, গদ্য-লেখক।' তা হলেই বাবা বলবেন, 'ওই হল, কবি আর লেখক একই কথা। দেখেই বোঝা যায়, রসিক ছেলে, সব বোঝে-টোঝে। তোদের ওই ছোকরাদের মত মাথায় এক রাশ উড়ু উড়ু চুল, ঘরের মধ্যে ম্যানম্যান প্যানপ্যান করছে, তা নয়।' বাবার বাবাকে কিছু বোঝানো যায় না। বাবার কথাবার্তা এইরকম। এর থেকেই বুঝে নিতে হবে। তবে, সেই এক কথা অচেনা অজানা বাদার হাটে গঞ্জে ওভাবে রাত কাটিয়ে দেওয়াটা কিছুতেই ওঁর ভাল লাগছে না। আমার মায়েরও সেই কথা। জানি না, আপনার মা বাবা দুজনেই আছেন কিনা, আছেন বলেই মনে করি। তাঁরা হয়তো আপনাকে চেনেন, বোঝেন, তাই ভয় পান না। আমার মা-বাবার খুব ভয়। আপনি বলে নয়, অন্য কোন ছেলেকে ভাল লেগে গেলে ওঁরা তাকেও এভাবেই বলতেন। আমার মা তো বলছেন, আপনি নাকি খুব মিশুকে মিষ্টি ছেলে, একটুও গায়ের অহংকার নেই। বুঝতেই পারছেন, আপনি আর এখন এঁদের কাছে বাইরের পোশাকী পরিচয়ে নেই।......

'......হ্যাঁ, আমিও তাই বলতে চাই। [illegible] কিছুতে অধিকার যদি নাও থাকে, না-হয় কেবল বাঙালী সাধারণ মেয়ে হিসাবেই [illegible]ছি, রাত-বিরেতে অমন দূরে অজানা জায়গায় না-হয় না-ই কাটালেন। বিপদ-আপদের কথা কিছুই তো বলা যায় না।...

'......রোজই জিজ্ঞেস করছেন, আপনাকে কোন চিঠিপত্র দিয়েছি কিনা। বাবা মা দুজনেই। সাধ করে কি আর এত দিন লিখতে বসিনি! দেখছেন তো, কত বড় চিঠি হয়ে গেল। হয়তো আপনার পড়বার ধৈর্যও থাকবে না। তবু, একটু কষ্ট করে পড়বেন। আপনার প্রতি অবিশ্বাস আমার একটুও নেই, তবু বাবা-মাকে বললাম না যে, আপনাকে চিঠি লিখছি। ধরুন, কোন কারণে আপনি হয়তো জবাব দিলেন না, না আপনি হয়তো বাইরে কোথাও চলে গিয়েছেন। তা হলে আমি এঁদের কাছে বড় বেকায়দায় পড়ে যাব। আর কিছুই না, এঁদের বয়স হয়ে গিয়েছে, আর আপনাকে খুব ভাল লেগেছে। জবাব না পেলে মনে মনে কষ্ট পাবেন। তাই ভাবছি, আপনার জবাব এলে, সেটাই এঁদের হাতে তুলে দেব।

'......না, আমন্ত্রণটা কেবল মায়ের নয়, বাবার এবং আমারও। একদিন আসুন না আমাদের বাড়িতে। কলকাতা থেকে খুব বেশী দূরে তো থাকেন না। যাতায়াতও আপনার নিয়মিত। এলে সবাই খুব খুশী হবেন। আমাদের বাড়ির ছাদ থেকে আদি গঙ্গা দেখা যায়। সব মিলিয়ে আমাদের এখানকার ছবিটা আপনার খুব শহুরে লাগবে না। আপনি যেখানে থাকেন, বোধ হয় সেখানকার সঙ্গে কিছু মিল খুঁজে পাবেন।......

'......না, আর বিরক্ত করব না। জবাবের প্রত্যাশায় রইলাম। ইতিতে পোশাকী নামটা
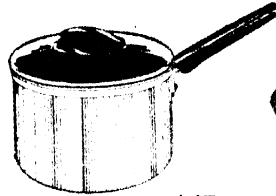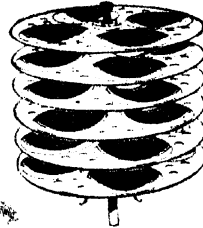
লিখতে চাই নে, এখন সেটা অর্থহীন লাগছে। নমস্কার নেবেন। ইতি—ঝিনি'

কখন যেন মোড় নিয়ে আশ্রমের সীমানায় ঢুকেছি। মেলা পেরিয়ে এসেছি নিরালায়। কিন্তু চলতে গিয়ে যেন ঠেক খেয়ে যাই। স্মৃতির চোখে এত লেখা স্পষ্ট দেখতে পাই, তবু তার জবাব কেন দিইনি। একে কেবল অবিচার বলো না। বল, অন্যায়। বল অসহবত। বল, অশালীনতা।

তবু, এই কি তোমার জবাব হে?

নিজেকে পিছু করে বাঁ দিকে মোড় নিতে যাই বন্ধুর বাড়ির পথে। আমার মন টানে ডাইনে। দৃষ্টি চলে যায় আমলকির সারি পেরিয়ে ছাতিমের ঝাড়ে। আর দেখ, সহসা যেন আমার মনের এত জিজ্ঞাসাবাদের অনু-কারে একটি আলোর ঝিলিক হেনে যায়। জবাব আমার ভিতরে ভাবে, এক উদাসী হাসিতে। অবিচার অন্যায় অসহবত অশালীন কিছু না। জানি, ব্রজনারায়ণ চক্রবর্তী একজন স্নেহে উপচানো বাবা। চোখের ওপারে অগাধ কান্না থমকে থাকা দিশেহারা চোখে চেয়ে থাকা এক মা তাঁর গৃহিণী। বড় ভাগ্য হে, তাঁদের ভালবাসা

পেয়েছিলাম। আর কিছু প্রীতি, এক মুখবতী বিদুষীর।

জীবনে জোয়ার কত আসে, ভাটার কত নামে। পলির স্তরে থেকে যায় অনেক কিছু। হারায় না। সেখানে প্রকৃতি তার আপন হাতে কাজ করে যায়। এই যাওয়া-আসার কূলে পলি ছানব না। হাত দিয়ে ঘাঁটব না। যা কিছু সব আমার দুই কূলের মৃত্তিকায় থাক। সেই তো জীবনের নিয়ম। নিরন্তরে চলি হে, যাওয়া-আসার অশেষে। যা পেয়েছি, তাই নিয়েছি। যা গিয়েছে, তা যাবে। চলাচলের এই নিয়মে কেউ যেন ঠেক না খেয়ে থাকি।

একদিন ব্রজনারায়ণ আর তদীয় গৃহিণীর মন চলাচলের পলিতে তুমিও ঢাকা পড়ে যাবে। ঝিনিরও তাই। আজকের রাগ অভিমান কান্নাটা কিছু না। চলাচলের খেয়ায় মোড় বাঁকাবাঁকি নেই। এখন যে জোয়ারের ভরাভরি, তা-ই উপচার। যদি নিষ্ঠুরতা মনে হয় তবে বল, তবু এই-ই তো সত্যি।

জীবনের পুছ-জবাব অন্যখানে অন্য সুরে ব্রহ্মাণ্ডের তালে বাজছে। সেথায় লেখা-লেখির কারণ অকারণ। অতএব আপনা বারে চল।

বাগানের দরজায় হাত দিয়েছি কি না দিয়েছি, বন্ধুর উদ্বিগ্ন স্বর বেজে ওঠে, 'এখুনি যাচ্ছিলাম মেলায় হারানো মানুষের খোঁজ করা অফিসে। সেখানে কিছু না হলে সোজা থানায়। ব্যাপার কী?'

লজ্জিত হয়ে পড়ি। বিব্রত হয়ে বলি, 'একটু দেরি হয়ে গেল।'

'একটু? সর্বনাশ! আপনার একটু আর বেশী কাকে বলে জানি না। বেলা চারটে বেজে গেল!'

তাড়াতাড়ি অচিনবাবুর নাম করি। বন্ধু তৎক্ষণাৎ উদ্বেগে হেসে বলেন, 'আরো সর্বনাশ। অচিনদার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে যে এর মধ্যে আসতে পেরেছেন, তা-ই যথেষ্ট। তা হলে "একটু দেরি"-ই বলতে হবে।'

কিন্তু বন্ধুর বাড়ি নিঝুম। গৃহিণী অতিথি কাউকেই দেখি না। জিজ্ঞেস করতে বলেন, 'সবাই মেলায় চলে গেছেন। গৃহিণী আপনার দায়িত্ব আমাকে দিয়ে গেছেন। তাঁরাও বোধ হয় আপনাকে খুঁজছেন।'

আরো লজ্জিত হয়ে পড়ি। বন্ধু সেদিকে তাকিয়েই দেখেন না। বলেন, 'আসুন, খাওয়াটা সেরে নিন। দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই চোকে নি।'

'তা চোকে নি, তবে একটু স্নানটা সেরে আসি।'

'মাথা খারাপ নাকি আপনার! এই শীতের অবেলায় এখন চান? আর এই দেশে? একটু হাতে মুখে জল দিয়ে আসুন, তার বেশী নয়।'

দিয়ে নির্দেশ পরামর্শ না। শীতের স্থানে যেটুকু সুখ, তার সময় চলে গিয়েছে সূর্যের ঢল খাওয়া আকাশের ঢলুতে। অতএব হাতে মুখে জল দেওয়াই সাব্যস্ত।

বন্ধু বললেন, 'কপাল আপনার খারাপ। একে খিচুড়ি, তরকারি আর মাত্র লবাত। তাও এখন ঠাণ্ডা।'

তা হোক, ক্ষতি নেই। কিন্তু লবাত আবার কী। জিজ্ঞেস করি, 'লবাতটা কী?'

'মিঠাই। খেজুরি গুড়ের পাটালি, তার নাম লবাত।'

চোখেও দেখা হল। নলেন কিনা জানি না, তবে পাটালি। রঙটা একটু বা কালো মানুষের গায়ের মত। কিন্তু তার আগে অবাক মানি মহাপ্রাণীটির কাতরতায়। ই কী দ্যাখ হে, ঠাণ্ডা খিচুড়ি তরকারি পেয়েও মহাপ্রাণীটির রসনায় কী সুখ! কোথায় ছিল জঠরের এত বুভুক্ষা, জানতে পারিনি। বন্ধুর দুঃখ প্রকাশ মিছে। এর নামই মহাপ্রাণী, তাকে তৃপ্ত করি পরম পরিতোষে।

বন্ধুকে দেখে মনে হয়, বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত। তাঁকে বলি, 'আপনি গিয়ে দলে যোগ দিন।'
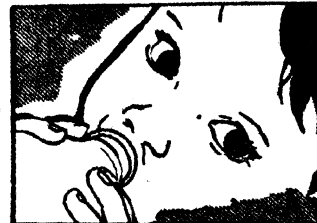
'আর আপনি? এখন বেরোবেন না?'

'একটু বিশ্রাম করতে চাই।'

'উচিত। অচিনদার কাছ থেকে এসে এবার সেটা খুবই উচিত। তা হলে, বিশ্রামের পর এখানেই চা খেয়ে আপনি বেরোবেন। আমরা তা হলে কোথায় থাকব আপনার জন্যে?'

'যেখানেই হোক, মেলাতেই। খুঁজে বের করে নেব।'

বন্ধু মনে মনে পা বাড়িয়ে ছিলেন। ভৃত্যকে আমার ভার দিয়ে মেলায় দৌড় দিলেন। আর তাঁকে আটকে রাখার জন্যে মনে মনে নিজেকেই হাসি।

খাওয়া শেষ হতে না হতেই, মনে হয়, রাঢ়ের আকাশে আঁধার নেমে আসে। বিশ্রাম করতে গিয়ে একটু তন্দ্রার ঘোর লাগে। সেটুকু ভেঙে যাবার পর দেখি ঘরে আলো, বাইরে অন্ধকার। ঘরের কোণে ঝিঁঝি ডাকে, দূরে মেলায় মানুষ। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে বেরোই। বাউল আসর আমার গন্তব্য।

সেখানে যখন পৌঁছুই, দেখতে পাই, স্বয়ং গোপীদাস আসরে। একতারা হাতে, আর কিছু নেই। ভাঙা-ভাঙা গলায় গাইছে,

যেজন প্রেমের ভাব জানে না,
তার সঙ্গে কিসের লেনাদেনা।'.....

হঠাৎ মনে হয়, গানটা যেন জানা-জানা। শোনা-শোনা। কোথায় শুনেছি। ভাবতে ভাবতেই চোখের সামনে গাজীর মুখ ভেসে ওঠে। আর দেখি, গোপীদাস আমাকে দেখে ঘাড় দুলিয়ে ডাকে। চোখের ইশারা করে এক দিকে। ইশারায় লক্ষ্য লক্ষ করে দেখি, কী অবাক হে, অচিনবাবু বসে আছেন আসরের সামনে। তাঁর পাশে শ্রীমতী অলকা—মা, ঝিনি চক্রবর্তী।

(ক্রমশ)

বাইশ

কেবল কলমের লেখায় নয়, মুখের কথায়ও বিদ্যাসাগর নিপুণ রঙ্গ-ব্যঙ্গ করতে পারেন।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন : "বিদ্যাসাগরকে সকলেই দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়াই জানেন; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার কথাবার্তায় হাসি-তামাসার কি একটি অদ্ভুত শক্তি ছিল।"

একটু-আধটু সংস্কৃত ভাষা শিখেই কেউ-কেউ নিজেকে দিগ্‌গজ ভাবে, সংস্কৃতে কথাবার্তা কইতে আরম্ভ করে। সে সব একেবারেই পছন্দ করেন না বিদ্যাসাগর।

একদিন একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতজী সংস্কৃতে কথা বলতে লাগলেন। আর বিদ্যাসাগর সব কথার জবাব দিতে লাগলেন হিন্দীতে।

ভুল সংস্কৃত বলছেন কিন্তু পণ্ডিতজী। পাশেই বসেছিলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। পণ্ডিতজীর সঙ্গে কথা কইতে কইতে এক ফাঁকে বিদ্যাসাগর কৃষ্ণকমলকে বললেন—এদিকে কথায় কথায় কোষ্ঠশুদ্ধি হচ্ছে, তবুও হিন্দী বলা হবে না।

একটি এম-এ পাস ছোকরা বিদ্যাসাগরের কাছে মাস্টারি চাইতে এসেছে। ছোকরা দিব্যি লম্বা চুল রেখেছে। বিদ্যাসাগর বললেন—আরে, তোকে মাস্টারি দেব কি। তুই মেয়েমানুষ কি পুরুষমানুষ আগে বিবেচনা করে বুঝি।

একজন পণ্ডিত এসে উদয় হয়েছেন। পণ্ডিত বলে খুব গর্ব তাঁর। চতুর্দিকে তিনি পাণ্ডিত্য জাহির করে বেড়ান

তিনি বললেন—কলকাতার পণ্ডিতেরা আমাকে 'ঠাকুরদাদা' বলে ডাকে।

বিদ্যাসাগর বলে উঠলেন — আমি জেঠামশায়ের উপরে আর উঠতে পারি না।

বিদ্যাসাগরের কাছে একজন বামুন এসেছে। কিছু ভিক্ষে চাইতে এসেছে। বলল—মশায়, বড়ো দুরাবস্থা।

'দুরাবস্থা' কথাটা ভুল। র-এর পর া হবে না; অর্থাৎ, আকার হবে না। আকার বদলাতে হবে। অকার করতে হবে। নির্ভুল করতে হলে 'দুরবস্থা' বলতে হবে।

বিদ্যাসাগর বললেন—আকার বদলে এসো।

বিদ্যাসাগরের কথার ভুল অর্থ করল বামুনটি। ভাবল, তাকে বুঝি সাজ-পোশাক বদলে আসতে বলা হচ্ছে। তাই করল সে। পোশাক-আশাক বদলে এল। এসে সেই এক কথা—মশায়, বড়ো দুরাবস্থা।

যতদিন আসছে, ওই 'দুরাবস্থা' বলছে, আর বিদ্যাসাগরের মুখে শুনে যাচ্ছে—আকার বদলে এসো।

শেষ পর্যন্ত রামসর্বস্ব পণ্ডিতের কাছে গেল ওই বামুন। প্রত্যেকবার আকার বদলে গিয়েও কেন বিদ্যাসাগরের মুখে একই কথা শুনতে হচ্ছে?

রামসর্বস্ব বুঝিয়ে দিলেন, ওই 'দুরাবস্থা' বলার জন্যই এমন হচ্ছে। বলে দিলেন—'দুরবস্থা' বলতে হবে।

এবার আর বামুনটি ভুল করল না। বিদ্যাসাগরকে এসে বলল মশায়, আমার বড়ো দুরবস্থা।

বিদ্যাসাগর বললেন—তুমি আকার বদলেছ, এবার তোমার কথা শুনব।

রামকৃষ্ণ লাহিড়ী খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। মস্ত কুলীনের বংশ, সেদিকে খুব মান-মর্যাদা। রামকৃষ্ণের দু-গাছা পৈতে—একটা হরিণের চামড়ার, আরেকটা সুতোর।

রামকৃষ্ণ লাহিড়ী খুব বিখ্যাত কেউ নন, কিন্তু তাঁর এক ছেলে স্বনামধন্য। রামতনু লাহিড়ী।

রামতনু ব্রাহ্ম হয়ে গেলেন।

ব্রাহ্ম হয়েছেন যখন গলায় একগাছা পৈতে টাঙিয়ে রাখার কোনো অর্থ হয় না। অন্তত রামতনুর সেই রকম বিশ্বাস। অতএব তিনি পৈতে ফেলে দেবেন। রামতনুর বাবা বারংবার বারণ করলেন। কিন্তু বারণ শোনে কে। পৈতের অসারত্ব নিয়ে তিনি বাবার সঙ্গে তর্ক করতে লাগলেন। তারপর কাশী গিয়ে রামতনু পৈতেটি ফেলে দিয়ে এলেন। শোনা যায়, বাবা বিশ্বেশ্বরের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছেন।

ফিরে এসে আর পৈত্রিক বাড়িতে জায়গা হল না। রামতনুকে আলাদা বাড়িতে থাকতে হল।

তা হোক, কিন্তু একগাছি পৈতে গলায় রাখলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত? বাবার কথায় পৈতেগাছা গলায় রাখলে কী এমন ক্ষতি হত?

পৈতের উপর রামতনুর তন্তুমাত্র বিশ্বাস নেই। তাই তিনি ও-বস্তু গলায় রাখতে পারেন নি। বলেছেন—আমার Conviction-এর বিরুদ্ধে আমি কাজ করতে পারি না।

একেবারেই পারেন না? পারেন বইকি।

রামতনু লাহিড়ী একদিন বিদ্যাসাগরকে বললেন—ওহে, আমাকে একটি রাঁধুনি বামুন যোগাড় করে দিতে পারো?

বিদ্যাসাগর বললেন—কেন হে, আবার

বামুনের দরকার কি? বাবুর্চি-খানসামা হলেই তো চলে।

—হ্যাঁ, আমার কোনো আপত্তি নেই—রামতনু আস্তে-সুস্থে বললেন—কিন্তু বাড়ির ভেতরে যে বামুন ছাড়া চলে না।

বিদ্যাসাগর হাসলেন। বললেন—বাপের কথায় পৈতেগাছটি রাখতে পারলে না; এখন পরিবারের কথায় বামুন খুঁজতে বেরিয়েছ!

এ কথার আর জবাব নেই। রামতনু লাহিড়ী অগত্যা মাথা চুলকোতে লাগলেন।

বড়োমানুষের বাড়িতে নেমন্তন্ন। অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক এসেছেন। তাঁদের মধ্যে দুজন স্বনামধন্য মানুষ আছেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর দীনবন্ধু মিত্র।

বড়োমানুষের বাড়িতে নেমন্তন্ন, অতএব ভুরিভোজনের বন্দোবস্ত। রকমারি খাবার-দাবার তৈরি হচ্ছে। প্রায় সব রান্নাই হয়ে গেছে, আর আধঘণ্টা খানেক সময় পেলেই সব নিখুঁত হয়ে যাবে।

কিন্তু বড়ো বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে। দেরি দেখে কেউ কেউ কেটে পড়বার চেষ্টা শুরু করলেন।

তা এটা খুব দুঃখের কথা। যাঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই দুঃখের কথা।

নিরুপায় হয়ে তিনি এসে বিদ্যাসাগরকে ধরলেন। বললেন—আপনি যদি দয়া করে কোনো রকমে ভদ্রলোকদের আধঘণ্টা আটকে রাখতে পারেন।

গায়ের জোরে আটকে রাখার কথা নয় নিশ্চয়ই। গল্পের জোরে আটকে রাখার কথা।

বিদ্যাসাগর গল্প আরম্ভ করলেন :

"একদিন একজন লোক তার বন্ধুকে গিয়ে বললেন, 'ভাই, আমি বিষম অন্যমনস্ক। সেদিন কী করেছি, জানো? সামান্য কাগজ মনে করে সেদিন একখানা হাজার টাকার নোট ছিঁড়ে ফেলেছিলাম, ছেঁড়া নোট দিয়ে কান চুলকোচ্ছিলাম। ভাগ্যিস আমার স্ত্রীর চোখে পড়েছিল ব্যাপারটা, তাই শেষরক্ষা হল, নয়তো হাজারটি টাকা লোকসান হত।'

কিন্তু বন্ধুও কম যান না। তিনি বললেন, 'আর ভাই, অন্যমনস্কতার কথা আর বলো না। অন্যমনস্কতার জ্বালায় জ্বলে মরছি। সেদিন রাত্রে একগাছা লাঠি নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। বাড়িতে ফিরে মনের ভুলে খাওয়া-দাওয়া না করে সটান শোবার ঘরে চলে গেছি। তারপর কী হল শোনো, কোথায় লাঠিগাছা ঘরের কোণে রেখে আমি বিছানায় শোবো, তার বদলে কিনা, লাঠিগাছাকে বিছানায় শুইয়ে আমি নিজে সারা রাত ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভোরবেলা আমার স্ত্রীর চোখে পড়ল সব, তিনি আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন, লাঠিগাছাকে ঘরের কোণায় রেখে দিলেন। ভাগ্যিস ভোরবেলা আমার স্ত্রীর চোখে পড়েছিল, তাই খানিকক্ষণ অন্তত ঘুমোতে পেলাম। নয়তো আমাকে না ঘুমিয়ে ঠায় ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে হত।'

বিপুল হাস্যরোল।

এবার দীনবন্ধু মিত্রের পালা। দীনবন্ধুও একটি গল্প বললেন। বিপুল হাস্যরোল।

আসর জমে উঠেছে। গল্পে মশগুল হয়ে আছেন সকলে। ওদিকে রান্নাবান্না শেষ হয়ে গেছে, আসন পড়েছে, কিন্তু সেদিকে যেন কারো কোন গরজ নেই। গল্প শুনেই যেন সকলের পেট ভরবে। গল্পের আসর ছেড়ে কেউ আর উঠতে চান না।

বাড়ির যিনি কর্তা, তিনি পড়লেন আরেক বিপদে। হাতজোড় করে তিনি বিদ্যাসাগরকে বললেন—মশাই, এক বিপদ থেকে বাঁচিয়ে আপনি দেখছি আমাকে আরেক বিপদে ফেললেন। সব খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে, কেউ আর খেতে যাচ্ছেন না, সকলেই গল্পে মজে আছেন। দয়া করে গল্প বন্ধ করুন।

সহাস্যমুখে বিদ্যাসাগর গল্প বন্ধ করলেন। হাসতে হাসতে খেতে গেলেন সকলে।

অনেকক্ষণ বাদে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে একজন সাব-জজ সাহেবের দেখা। কথায় কথায় জানা গেল, সাব-জজ সাহেব বুড়ো বয়সে দু নম্বর বিয়ে করেছেন। হ্যাঁ, প্রথম পক্ষের বউ মারা গেছেন। সাব-জজ সাহেব ঘর খালি রাখেন নি। বুড়ো বয়সে দ্বিতীয়কে ঘরে এনেছেন।

খবর শুনে বিদ্যাসাগর সাব-জজ সাহেবকে বললেন—তবে তো তোমার স্বর্গের দোর একেবারেই খোলা হে।

চমকে উঠবার মতো কথা। দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে স্বর্গলাভ অবশ্যম্ভাবী, এমন কথা ভূ-ভারতে কেউ কখনো শোনে নি। সাব-জজ সাহেবও শোনেন নি নিশ্চয়ই।

সাব-জজ সাহেব বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করলেন—সে কী রকম, মশায়?

বিদ্যাসাগর তখন সবিস্তারে বললেন :

"শোনো।

মরণের পর সকলেই স্বর্গের দরজায় হুড়োহুড়ি করে। দারোয়ান প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করে—তুমি পৃথিবীতে কী কাজ করে এসেছ শুনি?

যে যেমন কাজ করে এসেছে, সে তেমনি বলে। কেউ পুণ্য করে এসেছে, কেউ পাপ করে এসেছে। যে পুণ্য করে এসেছে, সে স্বর্গে ঢুকে যায়। যে পুণ্য করে আসেনি, হিসেব কষে তাকে নরকে পাঠানো হয়।

এখন দারোয়ানের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে একজন একটু মুশকিলে পড়েছেন। পৃথিবীতে হান বিশেষ কোনো পাপ বা পুণ্য করে আসেননি। এঁকে নিয়ে এখন কী করা।

কথায় কথায় স্বর্গের দারোয়ান জানতে পারল, ইনি বুড়ো বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন। তখন দারোয়ান বলল—তুমি এক্ষুণি স্বর্গে ঢুকতে পারো। পৃথিবীতেই তোমার নরকভোগ হয়ে গিয়েছে।"

বিদ্যাসাগরের 'উপক্রমণিকা'তে শব্দরূপের উদাহরণে 'নর' শব্দ ছিল। পরে বিদ্যাসাগর 'নর' তুলে দিয়ে 'গজ' বসালেন। 'নরে'র বদলে 'গজ' কেন? সেই কথাই একদিন সুরেশ সমাজপতি জিজ্ঞেস করল।

সুরেশের ভাইয়ের নাম যতীশ। এরা বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র।

বিদ্যাসাগর সুরেশকে বললেন—আগে ভেবেছিলাম, তোরা দু-ভাই নর; এখন দেখছি, তোরা দুটি গজ। তাই 'নর' তুলে 'গজ' করে দিলাম।

এককালে বেথুন স্কুল কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন বিদ্যাসাগর। অনেক সাহেব সেই কমিটির মেম্বর ছিলেন।

সে সময়ে হেডমিস্ট্রেস ছিলেন একজন মেমসাহেব। কে জানে কেন, মেমসাহেব স্কুলের একজন পণ্ডিতের উপর খুব চটে গেলেন। পণ্ডিতের নামে কমিটির কাছে নালিশ করলেন মেমসাহেব। পণ্ডিতের এই দোষ, পণ্ডিতের ওই দোষ, পণ্ডিতকে বরখাস্ত করা হোক।

তদন্তের ভার পড়ল বিদ্যাসাগরের উপর। বিশেষ খোঁজ-খবর নিয়ে বিদ্যাসাগর জানতে পারলেন পণ্ডিতের কোনো দোষ নেই।

দোষ থাক আর না-থাক, মেমসাহেব নালিশ করেছেন যখন বিচার হবে বইকি। বিচারের জন্য কমিটির বৈঠক বসল। সাহেব মেম্বরেরা আছেন, বিদ্যাসাগরও আছেন।

সেই বৈঠকে বিদ্যাসাগর বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন—পণ্ডিতের কোনো দোষ নেই।

কিন্তু কমিটির কয়েকজন মেম্বরই সাহেব। সাহেবেরা ভাবলেন, পণ্ডিতকে যদি একেবারে নির্দোষ বলে ছেড়ে দেওয়া হয় তো মেমসাহেবের মান থাকে না। সাহেবেরা তাই বললেন—তবে না-হয় দু'-এক মাসের জন্য পণ্ডিতকে সাসপেণ্ড করা যাক। কেমন, বিদ্যাসাগর তুমি কি বলো?

বিদ্যাসাগর একটি চতুর উত্তর দিলেন—"Yes, do it, if you think some sacrifice is necessary to appease her."

অর্থাৎ—আচ্ছা, কিছু বলিদান না করলে দেবী যদি তুষ্ট না হন তো তাই করো।

বিদ্যাসাগরের ছোটো ভাইয়ের নাম ঈশানচন্দ্র, ছেলের নাম নারায়ণচন্দ্র।

বিদ্যাসাগরের বাবা খুব ভালোবাসতেন ঈশান আর নারায়ণকে। এত ভালোবাসতেন যে, ওরা দু'জন বলতে গেলে অন্যের শাসনের বাইরে।

বিদ্যাসাগর একদিন বাবাকে বললেন—আপনি না নিরামিষাশী? আপনাকে কে নিরামিষাশী বলে? আপনি দু'টি বেলা ঈশান আর নারায়ণের মাথা খাচ্ছেন। তবুও আপনি নিরামিষাশী!

বিদ্যাসাগর একটা ভোজন-সমিতির সভ্য। মাত্র ন'-দশজন সভ্য ওই সমিতিতে। সভ্যেরা দলবেঁধে মাঝে মাঝে হঠাৎ একেক স্বজন-বান্ধবের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে আমোদ করে খাওয়া-দাওয়া করতেন।

একবার জাঁকালো গোছের খাওয়া-দাওয়া করে সমিতির একজন সভ্যের পেটের অসুখ হল। কেউ কেউ বললেন—এ'র পেটের দোষ আছে, এ'কে আর সভ্য রাখা চলবে না, এ'কে ভোজন-সমিতি থেকে খারিজ করে দিতে হবে।

বিদ্যাসাগর আপত্তি করে বললেন—না হে, ও'কে খারিজ করলে অধর্ম হবে। খেয়ে যে প্রাণ দিতে পর্যন্ত রাজি, তাকে বিদায় করে দিলে কাকে নিয়ে থাকবে?

কৃষ্ণদাস পালকে সুপুরুষ বলা চলে না। দ্বারকানাথ মিত্রকেও না। কিন্তু এই দু'জনের মধ্যে তুলনায় কার চেহারা বেশি বিশ্রী? বিদ্যাসাগর কী বলেন?

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাইরের ঘরে একদিন গল্প-গুজব হচ্ছে। সেখানে আছেন বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস পাল, দ্বারকানাথ মিত্র এবং আরো অনেকে।

কে একজন লোক জানালায় উঁকি দিচ্ছে। বারংবার উঁকি দিচ্ছে কেন?

লোকটিকে ডেকে আনা হল। ঘরের মধ্যে এসে মাথা নিচু করে জড়োসড়ো হয়ে রইল সে।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—বাপু, অত উঁকিঝুঁকি মারছিলে কেন?

ভয়ে ভয়ে সে বলল—জজ দ্বারিক মিত্তির এসেছেন শুনে তাঁকে দেখবার জন্য উঁকি মারছিলাম।

বিদ্যাসাগর বললেন—দেখবার জন্য উঁকি মারবার দরকার কি? এঁকে চেনো?

বলে কৃষ্ণদাসকে দেখালেন। তারপর বললেন—এঁর নাম কৃষ্ণদাস পাল। এখানে এঁর চেয়ে যেটি সুন্দর সেটিই দ্বারিক মিত্তির।

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন: "(অঘোরনাথ) শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বর্ষার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের Diabetis-এর প্রকোপ বাড়িত। নীচের ঘরে তাঁর দৌহিত্ররা ও আর কেহ কেহ ছিল। তিনি প্রস্রাব করিতে যাইবার সময় দৌহিত্রদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি শালারা এখন কি ভাল লাগে"? এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। প্রস্রাবের পর ফিরিবার পথে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের-বংশীর (বিনোদ বাবুকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্ দেখি এখন কি ভাল লাগে"? বিনোদ বড় রসিক ছিল, উত্তর দিল, "ঠাকুরদাদা যা ভাল লাগে তা ত তোমার নাই, আমারও এখানে নাই। যা ভাল লাগে তা পাবার উপায় নাই।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাহাকে ১০টা টাকা দিয়া বলিলেন, "যা শালা, এখুনি শ্বশুর বাটী যা, তোর বিরহ লেগেছে। এক্ষুণি যা, নইলে ট্রেন পাবি না"।"

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মাকে একবার একটা আশ্চর্য সুন্দর কথা বলেছেন বিদ্যাসাগর। সে ঘটনা বলতে গেলে দুঃখের কথা থেকে আরম্ভ করতে হয়। মজার কথা আছে ঘটনার একেবারে শেষের দিকে।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগরের বন্ধু। কিন্তু সেই বন্ধুত্ব চিরকাল রইল না। কয়েকটি জটিল কারণে বিদ্যাসাগর মদনমোহনের উপর বিরূপ হলেন। বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন।

কিছুকাল পর মদনমোহন মারা গেলেন।

মদনমোহনের মা তখনো বেঁচে আছেন। তিনি বিল্বগ্রামে থাকেন। মদনমোহনের মৃত্যুর কিছুকাল পর বিল্বগ্রাম থেকে দিন কয়েকের জন্য কলকাতায় এলেন তিনি। উপযুক্ত ছেলে মারা গেছে, তিনি শোকে-দুঃখে কাতর। কেঁদে আকুল।

দু-তিনদিন পর বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—তর্কালঙ্কার আপনার কী রকম ব্যবস্থা করে গিয়েছেন?

তিনি বললেন—মদন আমার কোনো ব্যবস্থা করে যায় নি। আমার দিন চলার কোনো উপায় নেই। তাই তোমার কাছে এসেছি। যদি তুমি দয়া করে খেতে-পরতে দাও, তবেই আমার রক্ষা। নয়তো আমাকে না খেয়ে মরতে হবে।

মদনমোহনের মা কাঁদতে লাগলেন।

বিদ্যাসাগর কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বিশ্বস্তসূত্রে বিদ্যাসাগর শুনেছেন, তর্কালংকার বিস্তর টাকাকড়ি রেখে গিয়েছেন। অথচ তাঁর মাকে কিনা ভাত-কাপড়ের জন্য অন্যের কাছে ভিক্ষে করতে হচ্ছে!

যা হোক, কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মদনমোহনের মা বললেন—মাস মাস দশ টাকা পেলে আমার চলে যায়।

খাওয়া পরার অভাবে, রোগে-শোকে মদনমোহনের মায়ের শরীর অত্যন্ত কাহিল হয়েছে। যেন কয়েকখানা শুকনো হাড়। তারপর, আবার চোখের অসুখ। চোখে ভালো দেখতে পান না।

মদনমোহনের মা বললেন—শরীর যদি আমার সুস্থ থাকত, চোখে যদি আমার অসুখ না থাকত, তাহলে পাঁচ টাকাতেই আমার চলে যেত। কিন্তু শরীর আর চোখের যা দশা, একটি বামুনের মেয়ে না রাখলে কিছুতেই আমার চলবে না। আমার এখন যে-রকম অবস্থা, বেশী দিন আমি বাঁচব না। বেশী দিন তোমাকে আমার ভার বইতে হবে না।

বিদ্যাসাগর মাসে মাসে দশ টাকা দিতে রাজী হলেন। মাসে মাসে দশ টাকা পাঠাতে লাগলেন মদনমোহনের মাকে। বিল্বগ্রামের ঠিকানায়।

কিছুদিন পর মদনমোহনের মা আবার কলকাতায় এলেন। বিদ্যাসাগরকে বললেন—বাবা! তুমি আমার ভাত-কাপড়ের কষ্ট দূর করেছ। আরেক বিপদে পড়ে আবার তোমায় জ্বালাতন করতে এসেছি।

কিন্তু এ বিপদে বিদ্যাসাগর কিছু করতে পারেন না। কেননা, এ বিপদ ঘটছে একেবারে তাঁদের আপন সংসারে। নিতান্ত আপনাআপনির মধ্যে। সংসারে বসে তাঁকে নানারকম গঞ্জনা সইতে হচ্ছে, অপমান সইতে হচ্ছে।

বিদ্যাসাগর বললেন—মা! এ ব্যাপারে তো আমার কিছু করার সাধ্য নেই। আপনার মুখে যা শুনলাম, আপনার আর সংসারে থাকার দরকার কি। আমার বিবেচনায়, কাশীতে গিয়ে বাস করাই আপনার পক্ষে সবচেয়ে ভালো। আমার বাবা কাশীতে আছেন। আপনি যদি মত করেন তো আপনাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিই, আমার বাবা আপনার বাসা ঠিক করে দেবেন, সব সময় দেখাশোনা করবেন। তাঁর কাছে মাসে মাসে আপনি দশ টাকা পাবেন। যা শুনি, মাসে দশ টাকায় সেখানে সচ্ছন্দে চলে যাবে।

তিনি রাজী হলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে কাশীতে পাঠিয়ে দিলেন।

কাশীতে গিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর শরীর ভালো হয়ে গেল। চেহারা এমন বদলে গেল, এমন হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গেল যে, বছরখানেক বাদে কাশীতে গিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁকে চিনতে পারলেন না। সত্যি সত্যি চিনতে পারলেন না।

তিনি নিজেই তখন বিদ্যাসাগরকে বললেন—বাবা! তুমি আমাকে চিনতে পারলে না, আমি মদনের মা।

খানিকক্ষণ ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন বিদ্যাসাগর। চিনতে পারলেন। তারপর বললেন—আপনি জুয়োচুরি করে আমাকে বিলক্ষণ ঠকিয়েছেন!

জুয়োচুরি! শুনে মদনের মা একটু ভয় পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন—বাবা! আমি কী জুয়োচুরি করেছি?

বিদ্যাসাগর বললেন—শুকনো হাড় আর কানা চোখ দেখিয়ে আপনি বলেছিলেন, 'আমার যা অবস্থা, তাতে আমি বেশী দিন বাঁচব না, বেশী দিন তোমাকে আমার ভার বইতে হবে না'। কিন্তু এখন যা দেখছি, তাতে অন্তত আরো বিশ বছর আপনি বাঁচবেন। আগে যদি বুঝতে পারতাম, আমি আপনাকে মাসে মাসে দশ টাকা দিতে রাজী হতাম না।

না, ভয় পাওয়ার মত কথা নয়, হেসে ওঠার মত কথা। মদনমোহনের মা হাসতে লাগলেন।

ক্রমশ
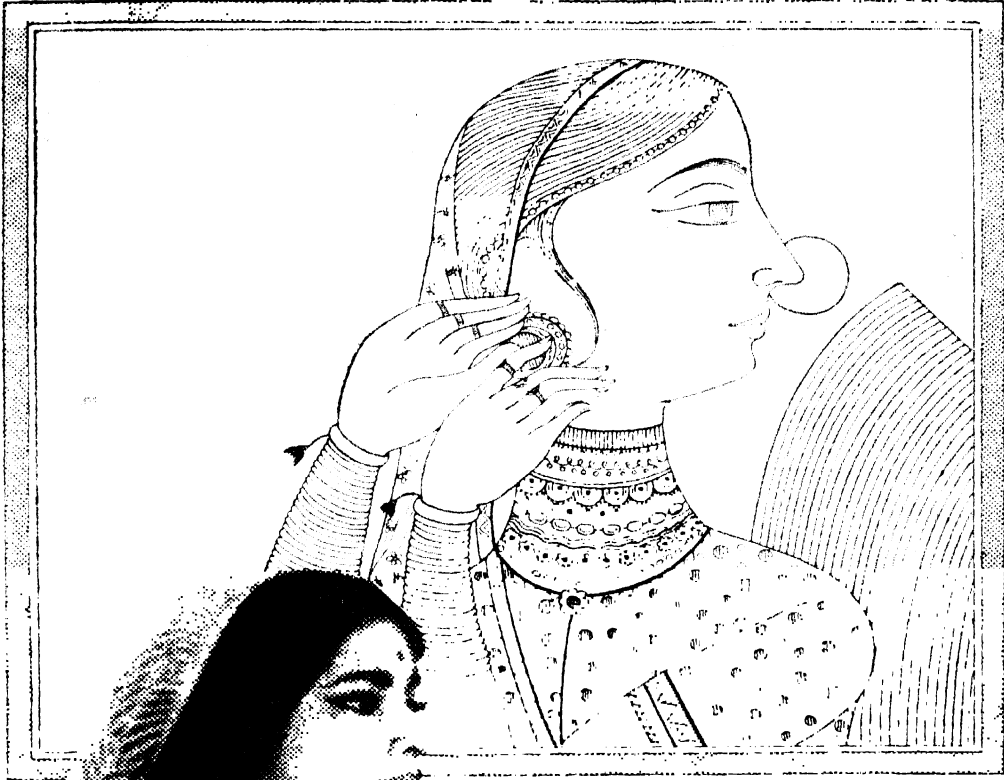
অতীতের
সুষমামণ্ডিত ঐতিহ্যের
স্বাক্ষরবাহী
মফতলাল
গ্রুপ
২ × ২ ভয়েল এবং লেনো
'টেরিন' কটন, 'টেবিলাইজড'
এবং 'মার্সিনাইজড' কোয়ালিটি

সারিডন 'রোশ'

খান...

যন্ত্রণা দূর হবে

...আর বেশ ঝরঝরে লাগবে!

সারিডনের বিশেষত্ব এইখানে। সুষম ফর্মুলায় তৈরী ব'লে যেমন ব্যথা কমায় তেমনি আনুষঙ্গিক অস্বস্তিও দূর করে, তার ওপর শরীরটাকে চাঙ্গা ক'রে স্ফূর্তির ভাব আনে। ব্যস, তাতেই কাজ হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ আপনি আবার মাথা খাটাতে পারেন...কাজে লেগে যেতে পারেন...অথবা সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আনন্দ করতে পারেন। একটিমাত্র সারিডন ব্যথা কমায়, আরাম দেয় আর স্ফূর্তি আনে। সব সময় হাতের কাছে রাখুন। ছোটদের দরকার মাত্র সিকি থেকে অর্ধেক ট্যাবলেট।

মাথাধরা, দাঁতের যন্ত্রণা,
গায়ের ব্যথা অথবা
মাসিকের কষ্ট দূর করবে
একটিমাত্র সারিডন।

'রোশ'-এর জিনিস
একমাত্র পরিবেশক: ভলটাস লিমিটেড

I.VT.5626A.

আগ্নেয়গিরি ও ভূমণ্ডলের অন্তস্তল

ভূত্বকের ঠিক নিচেকার স্তরকে বলা হয় ম্যান্ট্‌ল্‌। আমরা বাংলায় তাকে অন্তচ্ছদ বলতে পারি। ভূমণ্ডলের সেই অন্তচ্ছদের চরিত্র ও গঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার দিকে হালে বৈজ্ঞানিকরা দৃষ্টিপাত করছেন কারণ সেই অধ্যয়ন অনুশীলনের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁরা সাগর মহাসাগরের
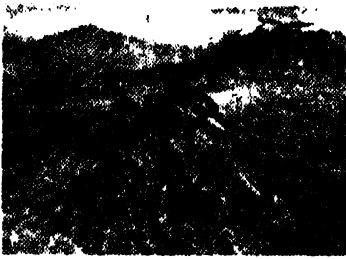
কিলিমানজারোর কিবো শিখরে হিমবাহ দেখা যাচ্ছে। বাকি দুটি হচ্ছে মাওয়েন্‌জি ও মেরু

অববাহিকা ও সাগর গর্ভের শৈলশিরা ও ফাটলগুলি অনুধাবন করছেন সেই উদ্দেশ্য নিয়ে।

কিন্তু ওই ধরনের শৈলশিরা ও উপত্যকার ভূমণ্ডলের স্থলভাগেও কোন অভাব নেই এবং সেগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি। যে সুদীর্ঘ শৈলশিরা-উপত্যকার বিষয়ে বৈজ্ঞানিকরা সবচেয়ে বেশি অবহিত সেটি রয়েছে পূর্ব আফ্রিকায় এবং সেটি উত্তর দিকে গিয়ে লোহিত সাগর ও মৃত সাগরের ভিতরে চলে গিয়েছে। অন্যান্য শৈলশিরার মত পূর্ব আফ্রিকার এই শৈলশিরাটিও আগ্নেয়গৈরিক ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রকৃত পক্ষে কিলিমানজারো থেকে মেরু শিখর পর্যন্ত জায়গার মধ্যে রয়েছে শুধু আফ্রিকা কেন, পৃথিবীর বৃহত্তম ৭টি আগ্নেয়গিরি। সেগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে কিবো শৈল-শিরার উহুরু শিখর যার উচ্চতা ১৯৩৪০ ফুট। কিলিমানজারো তিনটি প্রকাণ্ড পর্বত শিখরের সমষ্টি (যেমন ধরুন আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘা)—শিরা (১৩০০০ ফুট), কিবো (১৯৩৪০ ফুট) এবং মাওয়েন্‌জি (১৬৮৯৬ ফুট)। এ ছাড়াও ঐ সমষ্টির মধ্যে রয়েছে তিনেক পরাশ্রয়ী ছোট ছোট চূড়া। গোটা সমষ্টিটি পশ্চিম থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে ৫০ মাইল এবং পূব থেকে দক্ষিণ-পূবে গিয়েছে ৩০ মাইল। মেরু পাহাড়ের নিচের দিকের বেড় হচ্ছে ১৯ মাইলের মত। এই আগ্নেয়গিরিগুলি অধ্যয়ন করার সার্থকতা আছে নানা দিক থেকে।

পৃথিবীর গঠন ও উপাদান সম্পর্কে মানুষ যেটুকু জানে তা নেহাতই সামান্য। অবশ্য কিছু কিছু প্রত্যক্ষ নমুনা খনি বা গর্তের মধ্যে থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলির গভীরতা কতটুকু? মাত্র কয়েক কিলোমিটারের বেশি নয়। কখনো কখনো শিলা মাটি ফুঁড়ে ওঠে কখনো বা ভূমির অবক্ষয় হয় এবং সেই সব ক্ষেত্রে যেসব নমুনা পাওয়া যায় সেগুলিও ভূত্বকের এলাকার মধ্যে মাত্র ৮।১০ কিলোমিটার নিচে তৈরি। 'আল্পাইন' জাতীয় কোন কোন ওইরকম উপরে উঠে আসা শিলাকে বহু ভূতাত্ত্বিক অন্তচ্ছদের উপরের দিকের স্তরের জিনিস বলে মনে করেন। কিন্তু সমস্ত আগ্নেয়-শিলাই হয় ভূত্বকের নিচের দিকে না হয় অন্তচ্ছদের উপরের দিকে গলিত 'ম্যাগমা'র কঠিনীভবনের দ্বারা তৈরি হয়। সুতরাং কিলিমানজারো ও মেরু থেকে যে ৫ হাজার ঘন কিলোমিটার গলিত ধাতুস্রোত বা লাভা উদ্গীর্ণ হয়েছে সেগুলির কিছুটা অন্তত

কিলিমান্‌জারোর চূড়ার তুষার ক্রমশ গলে ঝড়ে পড়ছে

অন্তচ্ছদের উপরের স্তর থেকে এসে থাকতে পারে।

এই ধরনের বিরাট আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার কিভাবে ঘটে এবং ভূগর্ভ থেকে শিলা ও লাভা কিসের জোরে এত উপরে উৎক্ষিপ্ত হয় সেটা ভাববার বিষয়। ভূগর্ভের গভীরে যে গলিত ধাতুস্রোত আছে ভূত্বকের কঠিনীভূত ধাতু বা শিলার ঘনমান তার চেয়ে

বিমান থেকে কিবো চূড়ার দৃশ্য

অনেক বেশী হবে নিশ্চয়ই। সুতরাং সেই কঠিন ভূত্বকের চাপে তরল জিনিসগুলি উপর দিকে থামের মত ঠেলে ওঠে। কিলিমানজারোর ক্ষেত্রে আমরা যদি ধরে নিই যে, ভূত্বকের মেঝেতে ঐ ধরনের তরলীকরণের ব্যাপার চলেছে তাহলে সেখানে কঠিন ভূত্বকের চাপে ঐ তরল পদার্থ বা 'ম্যাগমা' ভূত্বকের উপরে ৪০·২৪ কিলোমিটার পর্যন্ত ঠেলে উঠতে পারে অর্থাৎ সমুদ্র থেকে ১৮০০০ ফুট উপর পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে মেরু, শিরা ও মাওয়েনজির কোন অবক্ষয় ঘটার আগে মূল উচ্চতা ঐ রকমই ছিল। কিবোর উচ্চতা আরো ১৫০০ ফুট বেশী এবং সেটি ক্ষারধর্মী লাভায় পরিপূর্ণ এবং ঐ জায়গাটুকুর ঘনত্ব বাকি পাহাড়ের চেয়ে কিছু কম। তাই মনে হয় ঐ বাড়তি উচ্চতার উপাদান তৈরি হয়েছে কিছুটা উপরের স্তরে।

যে জায়গাটায় ভূত্বক ও ম্যান্টলের সীমানা পরস্পরের সঙ্গে মিশেছে সেখান থেকে যে ম্যাগমা খোয়া যায় তার একটা ক্ষতিপূরণ হওয়া চাই বলে সেই জায়গায় ভূত্বক ম্যাগমা চেম্বারের মধ্যে কিছুটা বসে যায়। এই থেকে ৪টি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়:—

(১) ১০ হাজার বর্গ কিলোমিটার পরিমিত কিলিমানজারো এলাকা ভূত্বকের মধ্যে কিছু অদল বদল হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

(২) আগ্নেয় জিনিসগুলি অবক্ষয়িত জায়গার উপর জমা হতে হতে পাহাড়ের চেহারা বদলে দেয় এবং পাহাড়ের ভিতর কিছু কিছু ধস্ নামতে থাকে।

(৩) এই বিরাট আগ্নেয়গিরিগুলিকে খাড়া করে ধরে রাখবার ক্ষমতা যদি ভূত্বকের থাকে এবং উৎক্ষিপ্ত বস্তুগুলির শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য চার পাশ থেকে ম্যাগমা স্রোত যদি বয়ে আসে তাহলে সেই জায়গার ভর এত বেড়ে যাবে যে, সেখানকার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মধ্যে গরমিল দেখা দেবে।

(৪) কিলিমানজারোর প্রধান আগ্নেয়গিরিগুলি থেকে আগ্নেয়শিলা উদ্গিরণের মাত্রা কম বলে বোঝা যায় যে, উদ্গিরণের ব্যাপারে সম্প্রসারণশীল গ্যাসের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত কম।

১০ লক্ষ থেকে ১ কোটি বছর আগে (প্লিয়ো-প্লিস্টোসিন যুগ) আফ্রিকা মহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা কি রকম ছিল কিলিমানজারো পরীক্ষা তার উপর আলোক পাত করতে পারে। লাভা স্তর মাপা, জীবাশ্মের অস্তিত্ব পরীক্ষা ইত্যাদির দ্বারা অনেক কিছু জানা যেতে পারে। যেমন ধরুন কিবোর আগ্নেয় বস্তুগুলির ঘনত্ব ১০০০০ ফুট। তারপর বিষুবরেখা থেকে মাত্র ৩ ডিগ্রী দক্ষিণে হওয়া সত্ত্বেও কিবোর শিখর বরফে ঢাকা থাকে এবং আরো ৪টি জায়গায় হিমবাহের অস্তিত্ব আছে। এগুলি নিশ্চয় সেই সময়ে স্থানীয় আবহের অবনতির প্রমাণ এবং ইউরোপীয় হিমবাহ যুগের সংগে এর সম্পর্ক থাকতে পারে।

আগ্নেয়গিরির সংগে মানুষের সম্পর্ক আছে। আগ্নেয়গিরির ঢালু ও নীচের জমি খুব উর্বরা হয়ে থাকে। কিলিমানজারোর দক্ষিণে ও পশ্চিমে বিরাট আবাদ আছে কফি, শিশাল, পাইরেথ্রাম প্রভৃতি গাছের এবং সেখানে বসবাস করে দশ লক্ষাধিক লোক। সুতরাং সেখানে যদি হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয় তাহলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সামান্য হবে না। কিবো ও মেরু পাহাড় থেকে ক্রমাগতই বাষ্প বার হচ্ছে এবং গন্ধক জমা হচ্ছে। তবে ঐ লক্ষণগুলি আগ্নেয়গিরির বার্ধক্যের বলেই বাঁচোয়া। তবুও এমন কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না যে, সেগুলি থেকে অগ্ন্যুৎপাত একেবারেই অসম্ভব। অবশ্য কিবো থেকে জনবসতির দূরত্ব ২০ কিলোমিটারের মত। সেদিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা কিছু কম, যদিও একবারকার অগ্ন্যুৎপাতের সময় একটি লাভা স্রোত মোশি শহর পার হয়ে ৩৫ কিলোমিটার পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। মেরু পাহাড়ের আগ্নেয়ভস্মের বিস্তৃতি ২৫০০ বর্গ কিলোমিটার। এই আগ্নেয়ভস্ম চাষবাসের পক্ষে খুবই অনিষ্টকর। তবে ১৯১০ সালের মেরু পাহাড় মোটামুটি সুপ্ত অবস্থায় আছে।

কিবো, মাওয়েনজি ও মেরু এই তিনটি পাহাড়েরই চূড়া ও আগ্নেয়গহ্বর একাধিক বার ধসে পড়ে কাদাজল প্রবাহিত করেছে যার ফলে তৈরি হয়েছে কতকগুলি হ্রদের মত জলাশয়, সেই সব হ্রদের জল সেচের কাজে লাগানো যায় কিনা তাই নিয়ে এখন পরীক্ষা চলছে।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

স্টকহলমের চিঠি

রবিবার ৩রা সেপ্টেম্বর ভোর পাঁচটায় সুইডেনের ইতিহাসে নিঃশব্দে এক আন্দোলন ঘটে গেল। বহু বছরের তোড়-জোড় ও উদ্যোগের পর ঠিক ঐ দিন ঐ সময়ে সুইডিশদের সংকল্প রূপ পেল। অর্থাৎ চিরকাল তাদের গাড়িগুলি রাস্তার বাঁয়ে চলার পর ঐ দিন থেকে রাস্তার ডানদিকে চলতে শুরু করল। এ দেশে লোকসংখ্যার প্রায় সমান সংখ্যক গাড়ি থাকায় এই ঘটনাটিকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। এটা শুধু যে ঐতিহাসিক ঘটনা তাই নয়, সুইডেনের যানবাহন চলাচলের উৎকর্ষ সাধনের পথে এই সোপানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে এমন একটি পরিবর্তন চালিত করা মুখের কথা নয়, অনেক হিসাব করেই এই রকম দুঃসাহসিক কাজের ঝুঁকি নেওয়া যায়। মানুষ যতই চেষ্টা করুক, তবু তার চির-কালের অভ্যাসকে এক দিনেই ভুলে যেতে পারে না। চিরকাল যারা রাস্তার বাঁদিকে গাড়ি চালিয়ে এসেছে, তাদের পক্ষে হঠাৎ ঠিক তার উল্টোটা করা খুব অসুবিধার বিষয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিবর্তীর ফলেই মানুষের মন চালিত হয়ে থাকে। যতই সুব্যবস্থা করা হোক না কেন, মানুষের মন পরিচালনা করার ক্ষমতা কোনও অভিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞের নেই।

সুইডিশরা গত ২৩০ বছর ধরে বাঁহাতি গাড়ি চালিয়ে এসেছে। তখন অবশ্য গাড়ি মানে বোঝাত ঘোড়ার গাড়ি। সাইকেলের যুগেও এখানে সকলে রাস্তার বাঁধার ঘেঁষেই সাইকেল চালিয়েছে। মোটরগাড়ি প্রচলন এ শতাব্দীতেই হয়েছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বেশি মোটরগাড়ি দেখাও যেত না। যখন প্রথম গাড়ির চল হয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি ডানদিকে গাড়ি চালাতে শুরু করে এবং ১৯৩৬ পর্যন্ত বাঁদিকে গাড়ি চালাবার পর আস্ট্রিয়াও গাড়ি বাঁদিকের পরিবর্তে ডান-দিকে চালাবার ব্যবস্থা করল। ফলে সেই সময় থেকে সুইডেন ছাড়া ইউরোপের কণ্টিনেণ্টে আর সব দেশেই ডানহাতে যান-বাহন চলাচলের ব্যবস্থা ছিল। যুদ্ধোত্তর কালে যখন সব দেশগুলিতেই গাড়ির সংখ্যা বাড়ল, তখন অন্যান্য দেশগুলি ধীরে ধীরে ডানদিকে গাড়ি চালানতেই অভ্যস্থ হল। তখন থেকেই সুইডিশরা তাদের বাঁয়ে চালিত যানবাহন নিয়ে এক সমস্যায় পড়ল। যত সময় যায়, তত গাড়ির সংখ্যা বাড়তে থাকে, আর সেই সঙ্গে যানবাহন চলাচলের সমস্যাও। তখনও কিন্তু সুইডিশরা কিছুতেই এত বড় ঝুঁকি নিতে মনস্থির করতে পারে না।

১৯৫৫ সালে সুইডেনে এ বিষয়ে গণভোট নেওয়া হয়, তখন শতকরা ৮৩ জন বাঁয়ে গাড়ি চালানতেই সম্মতি জানায়। এর ফলে রাস্তার কোনদিকে যানবাহন চলাচল হবে, তা স্থির হতে আরও কিছুদিন দেরি হয়।

শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ সালে সুইডিশ পার্লামেণ্ট ঠিক করল যে, সুইডেনেও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের মত ডানহাতি গাড়ি চলাই যুক্তিযুক্ত হবে এবং এই পরি-বর্তনটিকে যত তাড়াতাড়ি রূপ দেওয়া যায়, ততই ভাল। তখন ঠিক হল যে, পাঁচ বছর পর অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে এই পরিবর্তনটিকে রূপ দিতেই হবে। অবশ্য ইউরোপের আর সকল দেশে ডানদিকে গাড়ি চালান হচ্ছে বলেই যে সুইডেনকেও সেই পথে চলতে হবে, তার কোনও অর্থ ছিল না। এই পরি-বর্তনের বিশেষ কারণ ছিল মোটর চালকদের সুখসুবিধার দিকে নজর দেওয়া। ইউরোপের সব দেশেই পরস্পর দেশের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদির আদান-প্রদান হয়। যেমন নরওয়ে থেকে মাছ, ডেনমার্ক থেকে মাংস, মাখন ইত্যাদি স্পেনে বা ইতালীতে যায়, ও দক্ষিণ ইউরোপ থেকে ফল সবজি ও ফুল উত্তর ইউরোপে চালান আসে—এইভাবে এরা পরস্পরের অভাব পূর্ণ করে। এইসব আদান প্রদান হয় বিরাট লরিগুলির দ্বারা। লরি
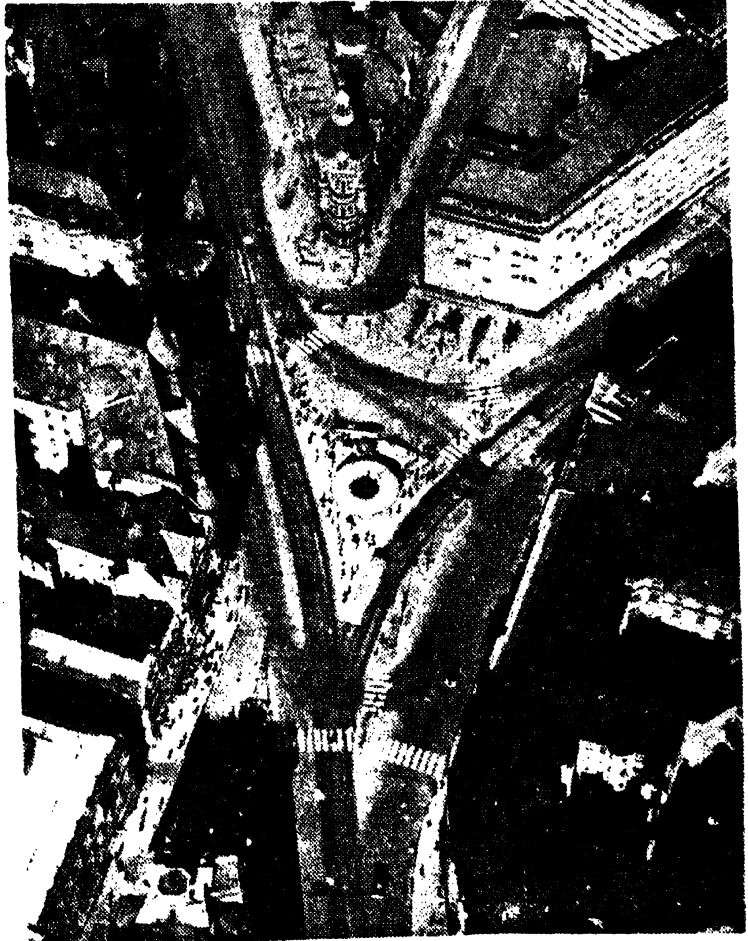
২রা সেপ্টেম্বর দুপুর বেলা স্টকহলম শহরের ঠিক ম... ...ন, আকাশ থেকে তোলা ছবি—শুধু কয়েকটা পুলিশের গাড়ী রাস্তায় রয়েছে
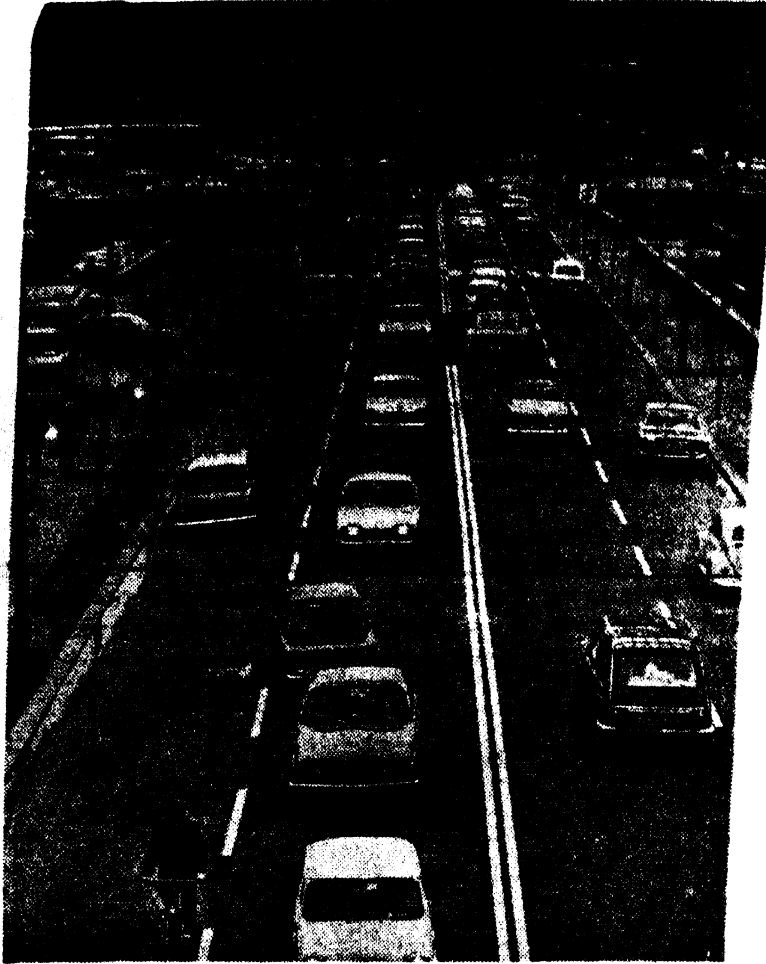
ডানদিকে চলার প্রথম দিনে বড় রাস্তার অবস্থা। সকলেই প্রথম দিনে নতুন প্রথায় গাড়ী চালনার জন্য উদ্‌গ্রীব

বোঝাই করা জিনিসপত্র ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি চলে যায়। সব জায়গাতেই এক নিয়ম, ডানদিকে গাড়ি চালানো। শুধু মাত্র সুইডেনের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে গেলেই অসুবিধায় পড়তে হয় তাদের। কেবল রাস্তার যে উল্টো দিকে চলতে হয় তাই না, তাদের গাড়িগুলিও এমনভাবে তৈরি অর্থাৎ ড্রাইভারের স্থান গাড়ির বাঁদিকে। যার ফলে উল্টো দিকে গাড়ি চালানও অসুবিধা। ইউরোপীয় পরিব্রাজকদেরও ঐ একই সমস্যা। সুইডিশরাও যখন ইউরোপের অন্যান্য দেশে যায়, তখন তাদের একই অসুবিধায় পড়তে হয়। অনভ্যাসের জন্যে বিদেশে গিয়ে তারা বহু-বারই দুর্ঘটনায় পড়ে বা কম করে অপ্রস্তুতে ত ঘটেই। সুইডেনে গাড়ি যা তৈরি হয়, তাতেও আন্তর্ইউরোপীয় গাড়ি চালনার সুবিধার দিকে নজর রেখেই ব্যবস্থা করা হয় অর্থাৎ যাতে ড্রাইভার গাড়ির বাঁদিকে বসায়, ডানহাতি গাড়ি চালাতে অস্বস্তি-বোধ না করে। কাজেই সুইডিশরা স্বদেশে তৈরি গাড়ি স্বদেশে চালাতে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হত। শুধু গত বছরেই নাকি ৪০০০ সুইডিশ গাড়ি বিদেশে ও ২৫০০ বিদেশী গাড়ি এদেশে দুর্ঘটনায় পড়েছে। আলাদা আলাদা গাড়ি চালানর নিয়ম থাকাই নাকি এর প্রধান কারণ। সব দেশে ট্রাফিক এক নিয়মে চললে দুর্ঘটনায় সম্ভাবনা অনেক কম। এই নানাবিধ কারণে সুইডেনে শেষ পর্যন্ত রাস্তার ডানদিকে গাড়ি চালানর ব্যবস্থা করা হল।

ইউরোপের সব দেশে ডানদিকে গাড়ি চলার প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড, মাল্টা, সাইপ্রাস ও আইসল্যান্ডে এখনও বাঁয়ে গাড়ি চালনই নিয়ম। এসবগুলিই দ্বীপ হওয়ায় ইউরোপীয় কন্টিনেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের জলপথেই রাখতে হয়। কাজেই তাদের নিজেদের দেশে পৃথক নিয়মানুযায়ী গাড়ি চালালে তাদের বিশেষ অসুবিধার কারণ ঘটে না। এ সত্ত্বেও আইসল্যান্ড, অন্যান্য স্কান্ডিনেভিয়ান দেশের দৃষ্টান্ত অনুসারে আগামী এপ্রিল মাসে ডানহাতি গাড়ি চালানর ব্যবস্থা করা স্থির করেছে। অবশ্য আইসল্যান্ড খুবই দুরগম্য দেশ ও সেখানের জনসংখ্যা নেহাত নগণ্য। তাই সেখানে নতুন নিয়ম চালু করায় যেমন অসুবিধাও নেই, তেমন সেখানে পরিবর্তন হলে ইউরোপের অন্যান্য দেশে তার কোনও প্রভাবও পড়বে না। এখন ইউরোপের মুখ্য দেশগুলির মধ্যে শুধু গ্রেট ব্রিটেনই এই নিয়মের বাইরে পড়ে রইল। সেখানেও যে সরকার এদিকে নজর দেয়নি তা নয়, কিন্তু সেখানে গাড়ি চালানোর নিয়ম একেবারে বদলে দিতে গেলে সুইডেনের চেয়ে অনেক বেশী অসুবিধা প্রকাশ পাবে। গ্রেটব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডে সব গাড়িই বাঁয়ে চালানোর জন্যে তৈরি, যেখানে ড্রাইভারের স্থান গাড়ির ডানদিকে। নতুন নিয়ম চালু করতে গেলে, পুরোনো সব গাড়ি একেবারে বাতিল করে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সব গাড়ি গড়তে হবে। এতে আর্থিক অপচয় অসম্ভব বেশী হবে, এবং বলতে গেলে প্রায় অকারণেই। এই জন্যে হয়ত ব্রিটেনে কোনও দিনই গাড়ি চালানোর নিয়ম পাল্টানো হবে না। ইউরোপের বাইরে ভারত, পাকিস্তান, লঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, মালয়, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া,
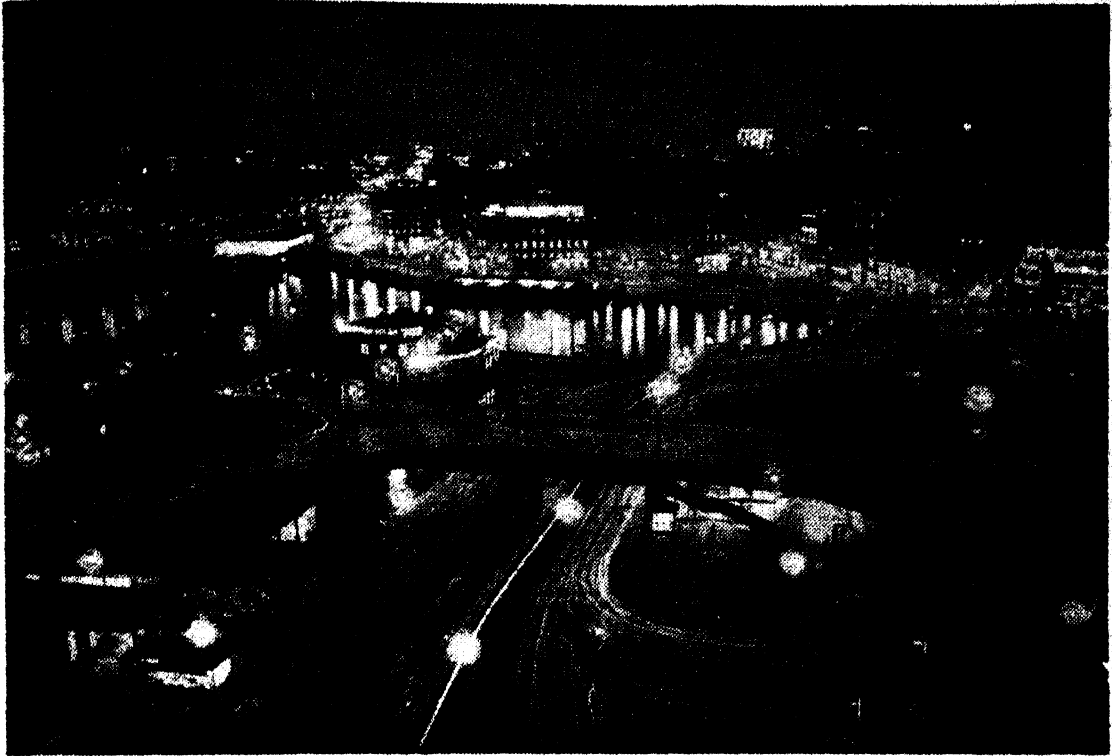
যানবাহনবিহীন নৈশ স্টকহল্মের একটি দৃশ্য যানবাহন চলাচলের সুবিধার জন্যে বিবিধ স্তরে তৈরী রাস্তা চোখে পড়বে

নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুদান, নাইজিরিয়া, এবং পূর্ব আফ্রিকার প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে বাঁয়ে গাড়ি চালানোর ব্যবস্থা রয়েছে। যদিও এই দেশগুলির মধ্যে কয়েকটিতে এই প্রথা পরিবর্তনের জল্পনাকল্পনা চলছে, তবে এ কাজ এতই জটিল ও বিশেষ করে প্রচণ্ড ব্যয়সাপেক্ষ যে, হয়ত পুরানো নিয়ম পাল্টাবার পথে বহু বিঘ্নই উপস্থিত হবে।

সুইডেনে মাত্র পাঁচ বছর আগে পাকা-পাকিভাবে রাইটহ্যান্ড ট্রাফিকের ব্যবস্থা স্থির হলেও এর জল্পনাকল্পনা চলছিল গত চল্লিশ বছর ধরে, শুধু মনস্থির করতেই সময় অনেক লেগেছে। নানা বাধাবিপত্তি এড়িয়ে এরা নতুন নিয়মের ব্যবস্থা করেছে। এই নিয়ম কার্যকরী করতে সুইডেনে খরচ হয়েছে অজস্র। প্রায় প্রতিটি রাস্তার অনেক পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংস্করণ করতে হয়েছে। প্রতিটি বাস স্টপ ও ট্রাফিক আইল্যান্ড নতুন করে গড়তে হয়েছে, চৌরাস্তার মোড়গুলিতে নতুন করে ট্রাফিক আলো বসাতে হয়েছে। সুইডিশ জনপদের (প্রায় ২ লক্ষ কিলোমিটার) প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ ট্রাফিক নির্দেশের চিহ্নগুলির পরিবর্তন করতে হয়েছে। যুদ্ধের পরেই এই সব পরিবর্তন যদি করা হত, তা হলে অনেক কম খরচের ওপর দিয়ে যেত। ১৯৪৩ সালে আনুমানিক ব্যয় ছিল ১৬ মিলিয়ন ক্রাউন। ১৯৪৬ সালে ২৭ মিলিয়ন ক্রাউনে হয়ে যেত। ১৯৫৯ সালে হলে নাকি ২১৫ মিলিয়ন ক্রাউনের বেশী খরচ পড়ত না। এখন সবসুদ্ধ খরচ হয়েছে ৬৫০ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রাউন—প্রায় ১০০ কোটি টাকা। এ ছাড়া আলাদা খরচ হয়েছে সব নতুন বাস তৈয়ারিতে। আগের বাসগুলিতে যাত্রীদের ওঠা-নামার পথ ছিল, বাসের বাঁদিকে, এখন নতুন বাসগুলিতে সব দরজা-গুলি বাসের ডানদিকে। ট্রাম চলায় অন্যান্য যানবাহনের বিশেষ অসুবিধা হয় বলে গথেনবার্গ ছাড়া সুইডেনে আর সব জায়গায় ট্রাম তুলে দেওয়া হয়েছে। তার বদলে নতুন আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন চালু করতে হয়েছে। এর ওপর আবার ২০ লক্ষ সুইডিশ গাড়ির মালিকদের নিজস্ব খরচ হয়েছে, প্রতিটি গাড়ির জন্যে ১০০ টাকা করে—ডানদিকে চালানোর জন্য সিমেট্রিকাল হেড-লাইটস্ বসাতে গিয়ে। অবশ্য সুইডিশ জনসাধারণ যে নিজের গাড়ির ওপর ১০০ টাকা খরচ করেই পার পেয়েছে তা কিন্তু নয়। নতুন প্রথা প্রচলনার্থে সরকারের ব্যয় সহন করতে হয়েছে সকলকেই। যাদের যাদের গাড়ি আছে, তাদের সকলকেই গত তিন বছর ধরে ১৫০ টাকা করে অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হয়েছে। যাদের অনিচ্ছায় এ প্রথা প্রচলিত হয়েছে, তাদের অবস্থা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

এ বছর সুইডিশ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ভাগ্যে গরমের ছুটি কম জুটল। যেদিন স্কুল খোলার কথা, তার এক সপ্তাহ আগে স্কুলগুলি খুলে গেল। এবং সেই সপ্তাহটিতে সব ক্লাসেরই একমাত্র পাঠ্য বিষয় ছিল "H"। এদেশে গত এক বছরে এই "H"-এর আগমনের প্রস্তুতি চলছিল। যখনই সুইডিশ মানুষে খবরের কাগজ

খুলেছে, রেডিও শুনেছে, কি টেলিভিশান দেখেছে, তখনই তাকে "H"-এর কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। দিয়াশলায়ের বাক্সে, পুরুষ ও মহিলাদের জামা কাপড়ে ডাক টিকিটে, দুধের বাক্সে এক ছাপ—'H'। H হচ্ছে "HOGER" অর্থাৎ ডানদিকের সংক্ষিপ্তকরণ। গত কয়েক মাসে এত বেশী H-এর কথা শোনা গেছে যে, সুইডিশদের ডানদিকে গাড়ি চালানর কথা ভোলা উচিত নয়। তবু তাদের মনে পড়িয়ে দেওয়ার জন্যে রাস্তায় রাস্তায় 'H' চিহ্নের ছড়াছড়ি। ছোট বড় 'H' চিহ্ন পেট্রোল স্টেশনগুলি থেকে বিলি করা হয়েছে গাড়ির মালিকদের কাছে। এই 'H'গুলি গাড়ির ভেতরে বাইরে, দরজায় জানালায় সেঁটে রাইট হ্যান্ড ড্রাইভিং-এর কথা মনে রাখা হচ্ছে। অনেক সুইডিশরা একটু বাড়াবাড়ি করে তাদের ঘড়িগুলি বাঁ হাতের বদলে ডান হাতে পরতে শুরু করেছেন এবং কারো সঙ্গে দেখা হলে, সম্বোধনে 'HOGER' বলা প্রচলিত করেছে।

অবশ্য নতুন নিয়ম সড়গড় করাতে কেবল জনসাধারণের ওপরই জোর দেওয়া হয়নি। সুইডেনে রাইট হ্যান্ড ট্রাফিক চালু করার
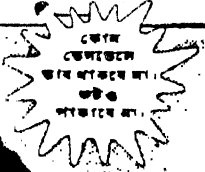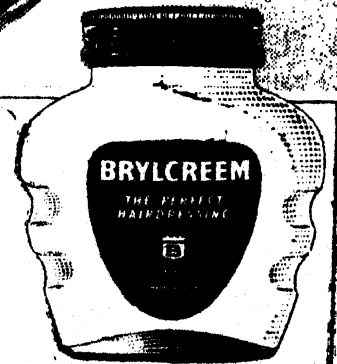
নিমিত্তে এক কমিশন গঠিত হয়েছিল। এ কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নানাভাবে নতুন নিয়ম চালু করার সুব্যবস্থা করা। রাস্তা ঘাটের নতুন রূপ দেওয়া ছাড়া, তাদের কাজ ছিল জনসাধারণের কাছে এই নতুন ব্যবস্থার বার্তা প্রচার করা। এই উদ্দেশ্যে তারা রেডিও, টেলিভিশান ও সংবাদপত্র সমূহের কাছে প্রচুর সহযোগিতা পেয়েছে। নানা ভাষায়, নানাভাবে 'HOGER' বার্তা প্রচার হয়েছে। তবে তাতেই যে সকলের কাছে 'HOGER' সংবাদ পেঁছাবে তারও কোনও স্থিরতা ছিল না। অনেকে হয়ত এমনও আছে যারা রেডিও কখনও শোনেনা, টেলিভিশান দেখার সুযোগ পায় না বা কাগজ পড়ার সময় পায় না। এ ছাড়া আছে অনেক মানুষ যারা সুইডেনের উত্তরে জন-প্রাণী বিহীন অঞ্চলে বাস করে। তাদের কাছে পৃথিবীর খুব কম খবরই পেঁছায়। অথচ তারা এ খবর না পেলেও বিপদ। এ ধরনের ঘটনা এড়াবার জন্যে 'HOGER' ট্রাফিক কমিশন থেকে বিবিধ ভাষায় পুস্তিকা ছাপান হয়েছিল, তাতে নতুন ব্যবস্থার সব নিয়মাবলী দেওয়া ছিল। ১৯৩৬ সালে যখন অস্ট্রিয়াতে রাইট হ্যান্ড ট্রাফিক চালু হয় তখন এক পাতার এক ইস্তাহারে, নাকি সব নিয়মাবলীর প্রচার হয়েছিল। কিন্তু সুইডেনে শুধু সুইডিশ নয়, বিশ্বের নানা দেশের মানুষ বাস করে বা কাজে কর্মে, ভ্রমণে আসে। কাজেই তাদের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই পুস্তিকাটি সুইডিশ, ইংরাজী, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, স্প্যানিশ, টার্কিশ, গ্রীক, ফিনিশ ইত্যাদি ভাষায় বেরিয়েছিল। প্রত্যেক বাড়ি বাড়িতে গিয়ে এগুলি বিলি করার ভার ছিল কমিশনের ওপর। এ ছাড়া বহু জায়গায় বৃদ্ধ বা অসুস্থ মানুষের কাছে গিয়ে সব কথা বুঝিয়ে বলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হাসপাতালগুলিতে রুগীদের কাছে, এবং স্কুলে শিশুদের কাছে নতুন ব্যবস্থার সংবাদ পেঁছেছিল।

এসব কাজ ৩রা সেপ্টেম্বরের আগেই সেরে ফেলতে হয়েছিল। রাস্তাঘাট সব নতুন করে গড়ে, নতুন ট্রাফিক চিহ্ন ও আলো রাস্তার ডানদিকে বসানর ব্যবস্থা সব আগে থেকেই করা হয়েছিল। ৩রা সেপ্টেম্বরের আগে পর্যন্ত সব কালো আবরণে ঢাকা ছিল, তাই শেষ দিনকতক খুব বেশী তাড়াহুড়ো করে কাজ সারতে হয় নি। ট্যাক্সি ও বাস ড্রাইভারদের জন্যে ক্লাস খোলা হয়েছিল— নতুন নিয়ম পালনে যাতে তাদের কিছুমাত্র ভুল না হয়। বিশেষকরে স্টকহল্‌ম ও অন্যান্য কয়েকটি বড় বড় শহরের রূপ একেবারে পাল্টে গেছে। শুধু রাস্তার উলটো দিকে চলতে হয় তাই না, নানা জায়গায় পুরান রাস্তাগুলি রাতারাতি উধাও হয়ে গেছে। যে রাস্তাগুলিতে আগে ঢোকা যেত, সেগুলি

দিবসের প্রস্তুতির জন্যে রাস্তার নতুন পথনির্দেশক চিহ্নগুলি, ৩রা সেপ্টেম্বরের ভোর অবধি কাল আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে

সব নানা জায়গায় one way করা হয়েছে। তাই শহরের সব এলাকা কারো নখদর্পণে থাকলেও, গন্তব্য স্থানে যে সহজেই পেঁছান যায় তা নয়, তাই বাস ও ট্যাক্সি ড্রাইভারদের ট্রেনিং-এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। ট্যাক্সি ড্রাইভারদের চিন্তা ছিল যে তাদের ব্যবসায়ে হয়ত এই সব নতুন নিয়মের ফলে কিছু ভাটা পড়বে। কারণ যেখানে শহরবাসীরা দশ ক্রাউন ভাড়ায় পেঁছে যেত সেখানে এখন পেঁছাতে হয়ত ডবল ভাড়া দিতে হচ্ছে। নানা রাস্তা এড়িয়ে নানা রাস্তা ঘুরে যেতে গিয়ে ট্যাক্সির মিটারে খুব তাড়াতাড়ি অনেক ক্রাউনের হিসেব উঠছে। তাই ট্যাক্সি ড্রাইভাররা নতুন ব্যবস্থায় খুব যে সন্তুষ্ট ছিল তা নয়। তবু তারই মধ্যে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, কিছু বেশী লাভের ওপর দিয়েই। সুইডিশদের আর্থিক অবস্থা ভাল ও তারা কৃপণতাও করে না সাধারণত, তাই বেশী ভাড়া দিতে হলেও, অধিকাংশ লোক আজও আগের মতই ট্যাক্সির শুভানুধ্যায়ী।

৩রা সেপ্টেম্বর এ পরিবর্তন চালু করারও বিশেষ কারণ ছিল। ঐ সময়ে সব সুইডিশরাই গরমের ছুটি বাইরে কাটিয়ে ঘরে ফিরে আসে। পরিচিত পরিবেশে নতুন নিয়মে গাড়ি চালান অনেক সুবিধা। তা ছাড়া ঐ দিন ছিল রবিবার—রাস্তায় ঘাটে সাধারণ পক্ষে গাড়ি খুব কম চলে, কাজে পেঁছানর জন্যে কারো তাড়াও থাকে না, তাই ধীরে সুস্থে নতুন নিয়মের সম্মুখীন হওয়ার বেশী সম্ভাবনা রবিবারেই। এর ওপর ৩রা সেপ্টেম্বর ছিল ঐ মাসের প্রথম রবিবার—তখন সাধারণত জলহাওয়া ভাল থাকে, খুব তাড়াতাড়ি আঁধার নামে না, বরফে রাস্তা পিছল হতেও মাস তিন চার দেরি থাকে, তাই শীতকালীন আবহাওয়ার মধ্যে চালাবার আগে, গাড়ি চালকরা রাইট হ্যান্ড ট্রাফিকে ধাতস্থ হতে অনেক সময় পায়। এই সব কারণে ওরা সেপ্টেম্বর 'H' দিবস, হিসাবে শ্রেষ্ঠ দিন বলে মনোনীত করেছিল। সারা সুইডেনেই ৩রা সেপ্টেম্বরের প্রায় ১০।১২ দিন আগেই রাইট হ্যান্ড ট্রাফিকের কাজ মোটামুটি সারা হয়ে গিয়েছিল। শেষ কয়েকদিন শুধু সব কাজ সম্পূর্ণ করা বা তৈয়ারিতে কোনও রকম ভুল বা ত্রুটি থাকলে তার শোধন করাই বাকি ছিল। সারা দেশে এ উদ্দেশ্যে যেভাবে একযোগে কাজ করবার জন্যে, বিভিন্ন অংশের সুব্যবস্থা ও গঠন করা হয়েছিল, তার ফলে ৩রা সেপ্টেম্বর, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি নির্বিঘ্নে চালু করা সম্ভব হয়েছে। 'হোগার' ট্রাফিক কমিশন থেকেও সেদিন পর্যন্ত সকলেই এ বিষয়ে অনিশ্চিত ও সন্দিহান ছিল। তবে এখন প্রায় ১৫ দিন হল এই পরিবর্তনটি কাজে পরিণত করা হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত এর ফলে অতিরিক্ত বেশী দুর্ঘটনার কোনও খবর পাওয়া যায় নি।

৩রা সেপ্টেম্বর যানবাহনের সুষ্ঠু সঞ্চালনের জন্যে অবশ্য বহু ব্যবস্থাই করা হয়েছিল। সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য স্বেচ্ছা-সেবক জনসাধারণকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করেছে। স্কুলের ছেলে মেয়ে, সাধারণ গৃহিণীরা ও বৃদ্ধ পেনশনপ্রাপ্ত মনুষ্যরা পর্যন্ত সেদিন স্বেচ্ছায় ট্রাফিক পুলিসের সহযোগিতা করেছে। গাড়ির চালকদের সেদিন ২৪ ঘন্টা হেডলাইট জ্বালিয়ে ড্রাইভ করতে উপদেশ দিয়েছিল পুলিস। তা ছাড়া প্রায় ১ মাস ধরে, বাজারের মধ্যে ঘন্টায় ২৫ মাইলের বেশী স্পীডে গাড়ি চালান মানা আছে এর ফলে যদিও নানা ছোটখাট দুর্ঘটনা সেদিন ঘটেছে, সেগুলি খুব কমের ওপর দিয়েই গেছে। সুইডিশ ড্রাইভারদের রাইট হ্যান্ড ট্রাফিকে অভ্যস্ত করার জন্যে, যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে বেশ কিছুদিন এই কম স্পীডে গাড়ি চালানর নিয়ম জারি থাকবে। রাইট হ্যান্ড ট্রাফিক কর্মীদের শেষদিন সব কাজ সারার সুবিধার জন্যে ৩রা সেপ্টেম্বর রাত ১টা থেকে ভোর ৬টা অবধি সারা সুইডেনে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। শুধু কয়েকটি

'জেব্রা ক্রসিং' এর কাছে ছেলে মেয়েদের রাস্তা পার হতে সাহায্য করছে একটি স্কুলের ছাত্রী

জরুরী গাড়ি, যেমন পুলিসের গাড়ি, ট্যাক্সি, অ্যাম্বুলেন্স বা ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এবং সাধারণ রুটে বাস চলাচলের বিশেষ অনুমতি ছিল। কয়েকটি প্রাইভেট গাড়িও বিশেষ বিশেষ কারণে অনুমতি পেয়েছিল। তবে এ সব গাড়িগুলিকেও ভোর ৪-৫০ মিনিটে দাঁড়াতে বাধ্য করা হয়েছিল তার কিছুক্ষণ বাদেই সেগুলি রাস্তার বাঁধার থেকে ডান-দিকে এনে ৫টা বাজার অপেক্ষায় ড্রাইভাররা বসেছিল। ঐ দশ মিনিট সারা দেশের গাড়ি সম্পূর্ণ নিশ্চল ছিল—সে অবস্থা এদেশে কোনও দিনও কেউ দেখেনি। ঠিক ভোর ৫টার সময়, সব গাড়িগুলি রাস্তার ডান পাশ ধরেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হল। এবং সেই সঙ্গে চালু হল সুইডেনে রাইট হ্যান্ড ট্রাফিক।

অন্যান্য সব যানবাহনকে ভোর ৬টা অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছিল এবং যাদের সাধারণত রবিবারে খুব ভোরে ওঠার অভ্যাস নেই, তারাও ভোর ৬টায় উঠে সেদিন গাড়ি নিয়ে বার হয়েছে। অবশ্য বড় বড় শহর-গুলিতে অত জোরে বার হওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি, কারণ সেখানে ঢোকা আরও অনেকক্ষণ বন্ধ ছিল। গথেনবার্গে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয় ২রা সেপ্টেম্বর দুপুর ৩টের সময় ও খোলা হয় ৩রা সেপ্টেম্বর দুপুর ৩টের। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা সেখানে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। স্টকহলমে ট্রাফিক বন্ধ ছিল শনিবার ২রা সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর দুপুর ৩টে পর্যন্ত। বহু স্টকহলম বাসীর অভিযোগ ছিল সে রাত্রে তাদের ঘুম হয়নি। চিরকাল গাড়ি চলার মৃদু গুঞ্জনে তারা ঘুমিয়ে পড়ে। সে রাত্রে স্টকহলমে এমন একটা নিস্তব্ধ, নিঝুম, থমথমে ভাব ছিল যে, তাতে ঘুম আসা নাকি একেবারেই অসম্ভব ছিল। অনেক স্টকহলমবাসী কিন্তু আবার সেদিন খুবই সুখী হয়েছে, কারণ তারা নির্ভয়ে নির্বিকারে বাজারের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। গাড়ির দিকে সর্বদা নজর রেখে গাড়ি চালানোর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। সেই অবস্থার থেকে সেদিন সকলে রেহাই পেয়েছে। স্টকহলম বাজারে সেদিন পাখির গান শোনা গেছে, সেটাও কম কথা নয়। স্টকহলমবাসীরা গাড়ি বিহীন শহরের স্বাদ পেয়ে, এখন মাসে অন্তত একটি করে গাড়ি হীন দিনের বায়না ধরেছে। তবে সেটা অবশ্য বায়নাই থেকে যাবে।

নানা দেশ থেকে সাংবাদিকরা এই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে এসেছিল। তাদের জন্যে পার্লামেণ্ট হাউসে প্রেসরুমের ব্যবস্থা হয়েছিল। ইংল্যান্ড থেকে ট্রাফিক স্পেশালিস্টরা এসেছিল এই পরিবর্তন কি করে কার্যকরী করা হয়, তাই নিরীক্ষণ করতে। যদি সুইডেনে এটা সফল হয় তবেই তারা হয়ত চেষ্টা করবে। সুইডেনে যে রকম নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে এ কাজ সম্পন্ন হল, তাতে এর প্রারম্ভিক সফলতার বিষয়ে বোধ হয় কারো কোনও সন্দেহ নেই। তবে এখন ১ মাসও পূর্ণ হয়নি, এ নিয়ম চালু হয়েছে। কাজেই এখনই এর সফলতার বিষয়ে এর বেশী কিছু বলা চলে না। কিন্তু সকলে মিলে একটা কাজ হাতে নিয়ে সে উদ্দেশ্যে খাটলে যে তার পথে কোনও বাধা এসে দাঁড়ায় না, তার উদাহরণ সুইডেনে রাইট হ্যান্ড ট্রাফিক কার্যকরী করার মধ্যেই রয়েছে। সকলে একমত না হলেও, যখন এ সংকল্প করা হয়েছে, তখন সকলেই একই পথে চলেছে। এখনও সকলে 'হোগার' ট্রাফিক কমিশনের পরামর্শ পালন করে যাচ্ছে এবং সে পরামর্শ হল—"রাইট হ্যান্ড ট্রাফিকে সকলে হাসিমুখে চলুন, এ ক্ষেত্রে আমরা সকলেই শিক্ষানবীস।" *

শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত

* ছবিগুলি সুইডিশ 'হোগার' ট্রাফিক কমিশনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

আপনার নিশ্বাসই কি আপনার অদৃশ্য শত্রু ? এই সহজ পরীক্ষাতেই জানতে পারবেনঃ

বন্ধুরা যা বলবে না, আপনার নিজের হাত তা বলে দেবে। সুতরাং নিজের ও প্রিয়জনের নিশ্বাস কলিনস ক্লোরোফিলে প্রীতিকর করুন।

হাতের মুঠো খুলে মুখের কাছে ধরুন। তারপর চেটোর ওপর বেশ জোরে নিশ্বাস ফেলে সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়ে শ্বাস নিন। এবার কলিনস ক্লোরোফিল টুথপেষ্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করুন। চেটোর ওপর আবার শ্বাস ফেলে দেখুন। এখন কত ঝরঝরে, প্রীতিকর লাগছে। আর শুধু এখনই না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনার নিশ্বাস এমন প্রীতিকর থাকবে। তাই আপনার দরকার কলিনস ক্লোরোফিল টুথপেষ্ট।

কলিনস ক্লোরোফিল আপনার জন্য কেন এত প্রয়োজনীয় ?

ক্লোরোফিল প্রকৃতিদত্ত এক কার্যকরী দুর্গন্ধনাশক যা কচি সবুজ পাতা থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিষ্কাশন করতে হয়। কলিনসের ক্লোরোফিল মুখের মধ্যে খাদ্যকণার দুর্গন্ধকর ব্যাক্টেরিয়া বা জীবাণু নষ্ট করে আর ধূমপানের দরুন মুখের বাসী গন্ধ দূর ক'রে লোকলজ্জার হাত থেকে মুখ রক্ষা করে।

ফেনাদার সবুজ কলিনস ক্লোরোফিলে রোজ দাঁত ব্রাশ করলে ঝরঝরে প্রীতিকর হবে আপনার নিশ্বাস। ফলে সকলের সঙ্গে নির্ভাবনায় মিশতে পারবেন। তাই আজই আপনার বাড়ীতে আনুন কলিনস ক্লোরোফিল।

লার্জ, জায়েন্ট আর কিং— ৩ সাইজেই পাবেন।

বা:... কলিনস ক্লোরোফিল

বাংলার তাঁতের শাড়ি—সব রকম সাজেই সমান সুরুচির পরিচয় (ফটো : রেফিউজি হ্যান্ডিক্রাফ্‌ট্‌স)

মন্দা বাজারও যেখানে মন্দ নয়

প্রত্যেক বছরই পুজোর আগে মহিলা পরিচালিত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান-গুলি নিজেদের শিল্পসম্ভার সাধারণের সামনে পেশ করেন। এবারেও ব্যতিক্রম হয় নি। সবচেয়ে সুখের কথা এমন মন্দা বাজারেও এঁদের বেচাকেনা মন্দ হয়নি। প্রথমেই ধরুন অল ইন্ডিয়া উইমেন্‌স কনফারেন্সের প্রদর্শনী ও বিক্রয় আয়োজনের কথা। ৮নং বেথুন রোডে তাঁদের উত্তর কলকাতা শাখা এমনি সময় স্বীয় শিল্প কেন্দ্রের সংগ্রহ সবার সামনে নিয়ে আসেন। ছোটখাটো হাতের কাজ থেকে নিয়ে শাড়ি জামা সব কিছুই থাকে। এতে যে কেবলমাত্র দু'চারটি স্বল্পবিত্ত সংসারের সাহায্য হয় তা নয়, প্রত্যেকে সমাজকল্যাণ সম্বন্ধে সচেতন হবার সুযোগ পান। এবারে প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছিলেন মেয়র গোবিন্দ দে মহাশয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সমাজকল্যাণ পরিষদের চেয়ারম্যান ডাঃ সরলা ঘোষ ছিলেন প্রধান অতিথি। অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের উত্তর কলকাতা শাখার সেক্রেটারী শ্রীমতী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় বলছিলেন যে, হাতের কাজ করা শাড়ির উপর আকর্ষণ বিশেষ করে লক্ষ করবার মত ছিল। ছুঁচের কাজের ফুলতোলা শাড়ির অন্যান্য ছোটখাটো জিনিসের চেয়ে দাম বেশী ছিল। কাজেই এই আকর্ষণে বোঝা যায় পরহিতকল্পে দু'চার টাকা খরচা করে যাবার জন্য ক্রেতা আসেন নি। সত্যই শিল্পকেন্দ্রের মান উত্তরোত্তর উন্নত হয়ে চলেছে।

এস্‌প্ল্যানেডে অবস্থিত রেফিউজি হ্যান্ডিক্রাফ্‌টসে অবশ্য ম্যানেজার কুমারী কৃষ্ণা গুপ্ত আফসোস করে বলছিলেন, এবারে যত হইহল্লা হট্টগোল ধর্মঘট সবই যাচ্ছে ঠিক তাঁদের দোকানের সামনে। খদ্দের বেচারারা ভয়ে কত সময় মনের ইচ্ছা মনে রেখে ফিরে যাচ্ছেন তার সীমা নেই। তবু যা বিক্রি হয়েছে নেহাত ফেলে দেবার মত নয়। এত হাঙ্গামার ব্যূহ ভেদ করে জনসাধারণ তাঁদের রকমারি তাঁতের শাড়ি আর জামাকাপড়, বটুয়া, টুকিটাকির খদ্দের আসে যায়। বিক্রি যে কম হল তাও হিসেবে মনে হয় না। তবে সেক্রেটারি শ্রীমতী দত্তরায় বলছিলেন যে, তাঁতিদের এবার চরম দুর্দশা। বিশেষত উদ্বাস্তু তন্তুবায় তো একেবারে অসহায়। তাই স্টক করেছেন প্রচুর যাতে তাঁতিদের এ অসময়ে কিছু হাতে আসে। সেই স্টক হিসাবে বিক্রি যথেষ্ট নয়। অন্যান্য বারের চেয়ে মাল যে বেশী, কাজেই অনুপাতে ধরলে এখনও আলমারির পর আলমারি ঠাসা শাড়ি জমা রয়েছে। উদ্বাস্তু-দের পুনর্বসতি হবার আগেই এমন আর্থিক বিপর্যয়ের পালা আসবে কে জানত?

রেফিউজি হ্যান্ডিক্রাফ্‌টসের প্রদর্শনীর নিমন্ত্রণে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত ধর্মবীর। গতবারে দেখলাম কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়কে, তার আগে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু। এবারেও তেমন কেউ এলেই বোধ হয় মানাতো ভাল। শাড়ির হাটে, সুন্দরীসমাজের সাজসজ্জার উপকরণের বাজারে মহিলাদেরই মানায়!

হ্যান্ডিক্র্যাফ্‌টসের সংগ্রহ এবং দাম দুই-ই ভাল। এবার ছোট ছেলেমেয়েদের কাটা কাপড়ের জামার দিকে নজরটা এঁরা ভাল

করে দিয়েছেন। আগেও অল্পবিস্তর দেখেছি। তবে এতটা নয় এবং এত রকমারি নমুনার সমাবেশ ছিল না। টাঙ্গাইল শাড়ি সস্তা চান, দামী চান প্রচুর রয়েছে। যার যেমন পছন্দ, যে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ক্রয় ভাগ্যবানই হউক পছন্দমত মিলবেই কিছু না কিছু।

সয়োজনলিনী প্রতিষ্ঠানের প্রদর্শনী হয়েছিল বালিগঞ্জে, ম্যাক্সমুলার ভবনে। এ'দের উৎসাহী কর্মীর অভাব নেই। তাই প্রত্যেক আয়োজন সুন্দর হয়। ছাপা শাড়ি থেকে নিয়ে বাজার করবার ব্যাগটি পর্যন্ত একটু নূতনত্বের সন্ধান দেয়। বাজারের পাঁচটা জিনিস ভরে, অনায়াসে চলাফেরা করা যায় এমন থলির প্রচলন সুন্দরীসমাজে বেশী দিন হয়নি। বর্তমান পরিস্থিতিতে তার প্রয়োজন কিন্তু প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে হেরফের যা একটু বৈশিষ্ট্য বেশ লাগলো দেখে। ব্লক ছাপা শাড়িগুলিও সুন্দর। তবে ছাপার নমুনায় আরও একটু নূতনত্ব আনলে মন্দ হয় না। অলংকরণের ঢংটি অনেকদিন একইভাবে রয়েছে। সয়োজনলিনীর শিল্পকেন্দ্রে কুলো, ডালা, কলসী, পিঁড়ি সবই বিশেষ বৈশিষ্ট্য-

পূর্ণ হয় বলেই. শাড়ির বেলায় আরও বৌনষ্ঠী আশা করি।

খয়েরোরিয়া কলকাতার কাছেই একটি গ্রাম। এখানে Y. W. C. A একটি শিল্পসংস্থা চালাচ্ছেন গ্রামের মেয়েদের জন্য। সম্প্রতি দিন দুই ধরে এঁদের হাতের কাজের প্রদর্শনী এবং বিক্রি হয়েছে। পুজোর আগের কেনাকাটার মরসুম এঁরাও ধরে নিতে চেয়েছেন।

এ ছাড়া ছোট ছোট সমিতি ইত্যাদিও মৌসুমী সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেকের সফলতার সংবাদ আমরা জানি না ঠিকই. কিন্তু মোটামুটি হিসাবে বলা যায় এখনও বাঙালীর মনে কোথায় যেন সহানুভূতি ও সৌন্দর্য উপলব্ধির ধারা বয়ে চলেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিপর্যস্ত মানুষের মন একেবারে শুকিয়ে যায়নি। আগামীদিন কি রূপে নিয়ে আসবে আমাদের সম্পূর্ণ অজানা তবে সমাজকল্যাণকামী প্রতিষ্ঠানের মূল উৎস অব্যাহত থাকবে আশা করা যায়। এক একটি সংস্থার সংগে যে কত শত লোকের সুখদুঃখ গভীরভাবে যুক্ত তা ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়। সবার পক্ষে সেই সুখ দুঃখের সম্ভবমত অংশ নেওয়া। অসম্ভবের পর্যায়ে নেই বা গেলাম।

শিশু কবে থেকে শিখতে আরম্ভ করে?

আধুনিক শিশুমনস্তাত্ত্বিকরা তো বলেন শিশু জন্মের পর থেকেই শেখে। শেখে তার পারিপার্শ্বিক থেকে, আর পাঁচজনের তার প্রতি ব্যবহার থেকে. হাসি কান্না. আনন্দ, উৎসব সবই নাকি একেবারে দোলনায় দোলখাওয়া শিশুকেও প্রভাবিত করে। কিছুদিন আগে লাইফ পত্রিকায় পড়েছিলাম তেহেরানে নাকি কোন অনাথ আশ্রমে শিশুরা কেউ কেউ দুবছরে বসতে শেখেনি. চার বছরে হাঁটতে শেখেনি। তার কারণ কিন্তু স্বাস্থ্যগত কোনও দুর্বলতা বা অভাব. খুঁত, ত্রুটি, অপূর্ণতা নয়। নিরানন্দ অনাথ আশ্রমের পারিপার্শ্বিক তাদের দমিয়ে দিয়েছে। এজন্য মধ্যবিত্ত সংসারে. বিশেষ করে যে সংসারে মা বাবা দাদা দিদি শিশুদের জন্য সময় দিতে পারেন সে সংসারের ছোট শিশুর মানসিক বিকাশ হয় চটপট করে। বিদেশে স্কুলের হিসাব নিয়ে দেখা গেছে দারিদ্র্যক্লিষ্ট ঘর থেকে যে বাচ্চারা আসে তারা অনেকে অন্য বাচ্চাদের থেকে পিছিয়ে থাকে। অবশ্য সকলেই নয়। কর্মক্লান্ত মাকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করলে মায়ের হয়তো মিষ্টিমুখে উত্তর দেবার আগ্রহ থাকে না। বাপের দেখা পাওয়াই ভার। তাই শিশুরা হয় একটু পিছিয়ে পড়ার দল। আবার ধনী সংসারের বেলায় যে বলা যায় শিশু আপনজনের আদর আহ্লাদ ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে শশীকলার মত বাড়তে থাকে তাও নয়। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় বিত্তবান সমাজ ছেলেমেয়েকে সময় দেন কতটুকু? পার্টি, নাচের মজলিস, পান ভোজনের ফাঁকে কোন মা হয়তো বিবেকের দংশনে শিশুর সঙ্গে দিনের ঘড়িধরা এতটুকু সময় কাটান, কোন কোন মার সেটুকুও হয়ে ওঠে না। গৃহভৃত্য আর মাইনে করা গভর্নেসের আওতায় শিশুমন কত সময় যে বিকৃত ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে কেউ খবর রাখে না। খবর পাওয়া যায় তখন, যখন সান্ধ্য আসর জমিয়ে কিশোর কিশোরী বিকৃত আনন্দের সন্ধানে যায়, এল. এস. ডি বা মারিয়ুয়ানা যোগাড় করে আনে।

ছোট্ট শিশু রং দেখে নেচে ওঠে, বাজনা শুনে কলকল খলখল করে সবটা কিন্তু উপেক্ষা করার নয়। রঙ্গীন সুন্দর পরিবেশ তাকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দেয়। মনস্তাত্ত্বিকরা আরও বলেন যে কচি বয়সে শিশুরা সুযোগ পেলে যা এখন বেশী বয়সের শিক্ষা তাও বুঝে নিতে পারে। তাতে তার অধীত বিদ্যা কারও চেয়ে কম হবে না। কাজেই পরিবেশ ও সুযোগ শিশুজীবনের মস্ত সম্বল। একথা ঠিক নয় যে চার পাঁচ বছর বয়সের আগে শিশু শিক্ষালাভ শুরু করবে না। অবশ্য এসব অতি আধুনিক মতবাদ। এমত এখনও সবার স্বীকৃতি পায়নি। তাছাড়া আরও বড় কথা হলো শিশুর মানসিক বিকাশে আরও পাঁচটা জিনিসের যে বিশেষ প্রয়োজন আছে সেকথা ভুললে চলবে না। কম্পিউটারের মত গণিতের যোগ জানা অথবা কাব্য থেকে গড়গড় করে আবৃত্তি করাই জীবনের সর্বশেষ লক্ষ্য নয়। সহানুভূতি, ভালবাসা, সত্যমিথ্যার বিচার, কর্তব্য সচেতনতা, পরোপকার করবার প্রেরণা ইত্যাদি সব সদগুণের শুরু হয় শৈশবে। সে শৈশবটাই আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক টেনে পিছনে নিয়ে যেতে চাইছেন। একেবারে জন্মের প্রথম লগ্ন থেকে নিয়ে যাকে অসহায় বোধশক্তিহীন মনে হয় সে যে চেতনার একটি সক্রিয় স্ফুলিঙ্গ একথাই বার বার মা-বাবাকে জানিয়ে দিতে চান তাঁরা।

চার পাঁচ মাস বয়সের শিশুকে লক্ষ করেছেন কি? উজ্জ্বল আলোয় তাদের দৃষ্টি কেমন হয়? ঘরে ঝগড়াঝাঁটি হলে তারা কেমন মিইয়ে যায়, কলহ, বচসা, বিবাদে তাদের হাসি শুকিয়ে আসে, উপেক্ষায় তারা নেতিয়ে পড়ে, আদরে সোহাগে কেমন ঝলমল করে, কেমন করে তারা মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর কেমন করে সুখসুবিধার সংবাদ জানিয়ে দেয় সবই লক্ষণীয়। তখন তাকে তার যোগ্য সুযোগ দিয়ে যে তার মানসিক বিকাশে সাহায্য হবে এ আর আশ্চর্য কথা নয়। লাল রং দেখে যদি শিশু আকৃষ্ট হয় তবে অস্বীকার করা চলে না যে রং-এর প্রভাব তার নূতন দেখা জগতকে সুন্দরতর করতে চায়। ঘুমপাড়ানি গানে যদি সে ঘুমিয়ে যায়, মায়ের স্পর্শে যদি সে নিশ্চিন্ত হয় তবে তার প্রতিক্রিয়া বা সাড়া দেয়ার যে একটা বিশেষ মূল্য আছে মানতে হবে। অসুবিধা হচ্ছে যে শিশুর সাড়া দেয়াকে বড়রা সব সময় বুঝতে পারে না। অথবা সে অসহায় বলে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা মাথা ঘামাই না।

দোলনা থেকে শিশু বসতে শেখে হামাগুড়ি দেয়, আস্তে আস্তে হাঁটতে শেখে, চঞ্চলচরণে ছুটে বেড়ায়। ক্রমবিকাশের প্রত্যেকটি ধাপে তার পারিপার্শ্বিক যেন সুন্দর হয়, সার্থক হয়। সাধ্যমত সুযোগে যেন সে যথাযোগ্য বিকাশে বঞ্চিত না হয় তা দেখা মায়ের অবশ্য কর্তব্য।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের কথা বলে এবার শেষ করতে চাই। সন্তানপালনে মনোযোগী মা একজন প্রতিপদে হিসেব করে শিশুর দেখাশুনো করেন। কোথাও ত্রুটি না থাকে এই তাঁর উদ্দেশ্য। শিশুর বছর দুই বয়সে তিনি মনস্তাত্ত্বিকের পরামর্শ নিতে গেলেন। এতদিন তো শিশু জড়বৎ ছিল। তার শারীরিক সুস্থতা নিয়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। এবার শিশু স্বাধীনজীবনের প্রথম অনুভূতিতে প্রবেশ করবে। মনস্তাত্ত্বিকের উপদেশে তাকে, তার ভবিষ্যতকে সার্থক করতে হবে এই ইচ্ছা ব্যগ্র, ব্যাকুল মায়ের। মনস্তাত্ত্বিক কিন্তু মাকে বললেন, "you are two years too late" শরীরের মত মনের স্বাস্থ্যের যত্নও জীবনের শুরু থেকেই আরম্ভ করতে হয়।

টুকিটাকি

চা ভিজানো জলে ডিম সিদ্ধ করলে অনেকদিন পর্যন্ত সেই সিদ্ধ ডিম টাটকা থাকে। দূরের রাস্তায় খাবার নিতে হলে এইভাবে ডিম সিদ্ধ করে খোসাসমেত নিয়ে যাওয়া চলে।

সাধারণ কাঁচের গ্লাসে ফুটন্ত জল ঢাললে অনেক সময় ফেটে যায়। এমন কি ফুটে এসে কাঁচের টুকরো ক্ষতিও করতে পারে। একটি চামচ গ্লাসে রেখে জল ঢালবেন; তাতে অনেকটা তাপ চামচ টেনে নেবে ও কাঁচ ফাটবার ভয় থাকবে না।

জামাকাপড়ে হঠাৎ দাগ লাগলে হাতের কাছে যদি আর কিছুই না থাকে তবে দাগের উপর জল লাগালে পরে সুবিধামত ব্যবস্থা করলে সহজে দাগ উঠে যায়। যেক্ষেত্রে একেবারে উঠবে না সেক্ষেত্রেও হাল্‌কা হবে দাগ। কালি লাগলে লেবুর রসে সহজে দাগ যায়। কিন্তু ধরুন লেবুও সব সময় থাকে না। কালি লাগা কাপড় জলে ভিজিয়ে পরে প্রয়োজন বুঝে অন্য কিছু প্রয়োগ করা চলে।

আজকাল যাঁদের বাড়িতে রেফ্রিজারেটর আছে তাঁদের কেউ কেউ একসঙ্গে ২।৪ দিনের মত বাজার করেন। Deep Freeze থাকলে তো কথাই নেই, এমনকি সাধারণ রেফ্রিজারেটরে খাবার জিনিস যত্ন করে গুছিয়ে বেশ কয়েকদিন রাখা যায়। গৃহিণী-দের একটু কষ্ট করতে হবে। বাজার এলেই যেমন তেমনভাবে রেফ্রিজারেটারে রাখলে বেশী দিন জিনিস টাটকা থাকবে না।

প্রথম কথা জিনিসগুলি ধুয়ে তো তুলবেন কিন্তু তোয়ালে বা ঝাড়ন দিয়ে একটু চেপে জল শুকিয়ে রাখবেন। শাক বিশেষ করে পালং শাক যদি খবরের কাগজে মুড়ে রাখেন তবে দেখবেন কত ভাল থাকে। খবরের কাগজ অতিরিক্ত জলীয় অংশ টেনে নেবে আর শাক নেতিয়ে বা হেজে যাবে না।

মাছ, মাংস রাখতে দেখবেন যেন শুকনো থাকে। সম্ভব স্থলে মাছ বা মাংস দৈনন্দিন ব্যবহারের হিসাবে আলাদা করে নিয়ে যদি সেলোফিনের ব্যাগে ভরে সাজান তবে একটি প্যাকেট একদিন বের করলে অন্য-গুলি ঘাটাঘাটি করতে হবে না। সংরক্ষণের জন্য ঘাটাঘাটি না করা বিশেষ দরকার।

কাঁচালঙ্কা ইত্যাদি ছোটখাটো নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস সব জিনিসের মধ্যে মিশিয়ে না রেখে আলাদা করে রাখলে কাজেরও সুবিধা হয়। সময়মত পেতে অসুবিধা থাকে না আর সামান্য একটি জিনিস খুঁজতে বাকি সব ঘাটতে হয় না।

সবচেয়ে বড় কথা রেফ্রিজারেটর পরিষ্কার রাখা। বরফের ট্রেতে অতিরিক্ত বরফ এলো-মেলো অপরিষ্কার রেফ্রিজারেটরে খাদ্য সংরক্ষিত রাখা কঠিন।

শ্রীমতী

দিনরাতের খেলা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

দুই

দু একদিন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কিছু-কিছু চেয়ার খালি ছিল, গ্যালারিতেও জায়গা পড়ে ছিল অনেক, সব টিকিট বিক্রি হয় নি। হতাশ হয়েছিল রঘুনাথ। শিবনাথের ওপর আরও রেগে গিয়েছিল হারকু সাহেব। এত কাছাকাছি ক্যাম্প করলে লোকসান তো হবেই। খিদিরপুর থেকে টালিগঞ্জে আসবার কী দরকার ছিল! যদি এ ক্যাম্পে লোকসান হয় তাহলে শিবনাথের জন্যেই হবে। এখানে আসবার জন্যে তারই উৎসাহ ছিল সব চেয়ে বেশী।

এসব কথা তুলে রঘুনাথের সঙ্গে একটা আলোচনা করবার সুযোগ খুঁজছিল হারকু সাহেব—নিজের দোষ কাটিয়ে সে-রাতের অপমানের শোধ নিতে চাচ্ছিল সকলের সামনে শিবনাথকে অপদস্থ করে।

কিন্তু সুযোগ এল না। মানুষ আসতে লাগল হু-হু করে। একসঙ্গে এত রকমের মানুষ আর কখনো দেখেনি জুয়েল সার্কাসের খেলোয়াড়রা। সুন্দর, বিচিত্র এক একটি মুখ। দামী এসেন্সের গন্ধ। খোঁপার বাহার। কত রকমের শাড়ির ঝলমলানি! খেলা দেখাবার সময় খেলোয়াড়রা চারপাশে তাকিয়ে নেয়, তৃপ্তির একটা রেশ নতুন উৎসাহ সঞ্চার করে তাদের মনে। আরও বেশী সময় নিয়ে খেলা দেখাবার ইচ্ছায় তারা নিখুঁত নম্বর করে।

এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশী টাকা আর কোন ক্যাম্পে তুলতে পারে নি রঘুনাথ দাস। টালিগঞ্জের জমি নেয়া হয়েছে মাত্র এক মাসের জন্যে। মনে মনে লাভের হিসেব করতে করতে রঘুনাথ ভাবল, এখানে জুয়েল সার্কাস তিন-চার মাস থাকলেও ভীড় কমবে না।

চাঁদনী আর সুরেশের বাকি টাকা কাল সন্ধ্যায় শোধ করে দেয়া হয়েছে। আর যত ধার আছে তা-ও কিছু কিছু মিটিয়েছে রঘুনাথ। তার মনে বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে এই ক্যাম্পেই ভারী ঋণের বোঝা অনেক হালকা হয়ে যাবে। তিন মাসের জন্যে এখন এ জমি পাওয়া যাবে কি না রঘুনাথ জানে না, পাওয়া গেলে তার সব ধার সে শোধ করে দিতে পারবে।

জুয়েল সার্কাসের মালিক রঘুনাথ, সে খেলোয়াড় নয়। শুধু হাততালি শুনে তার মন ভরে না। লোকসান হলে যেমন তাকে চড়া সুদ দিয়ে টাকা ধার করে রোজকার খরচ মেটাতে হয় তেমন লাভ হলে সার্কাস আরও বড় করে তোলবার কথাও তাকে ভাবতে হয়। স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের জন্যে কিছু কিছু সঞ্চয়ের কথাও তার মনে হয়। লিলুয়ার বাড়িতে আরও দু-একটা ঘর সময় থাকতে থাকতে তুলতে হবে—ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে।

টালিগঞ্জের ক্যাম্পে দু-চারদিন কেটে যাওয়ার পর একা একা বিমর্ষ হয়ে বসে থাকবার কথা নয় রঘুনাথের। যদিও সে সিল্কের পাঞ্জাবি পরেছে, দামী ধুতি লুটিয়ে পড়েছে তার নতুন লাল চটির ওপর, তাহলেও রঘুনাথের শিরা বড় দুর্বল। ভীত অস্থির চিত্ত একটা মানুষের মতন ঘন ঘন সিগ্রেটে টান দিয়ে সে যেন শক্তি সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল।

রঘুনাথের তাঁবু এখন খালি। আজ খুব ভোরে যশোদা ছেলেমেয়েদের নিয়ে লিলুয়ার চলে গেছে। সার্কাসের গাড়ি নিয়ে সুবল-বাবু তাদের পৌঁছে দিতে গেছে—এখনো ফিরে আসে নি। রঘুনাথ জানে, যশোদা শিগগির আর কোন ক্যাম্পে আসবে না—তার দাদা কৈলাসকে লিলুয়ার বাড়িতে ডেকে রঘুনাথের নিন্দে করবে এবং হঠাৎ এক রাতে তাকে জোর করে পাঠিয়ে দেবে এই ক্যাম্পে—রঘুনাথের তাঁবুতে কোন মেয়ে আছে কি-না তা জানবার জন্যে।

কয়েকদিন থেকেই রঘুনাথের সঙ্গে খুব ঝগড়া করছিল যশোদা। সে-রাতে শিবনাথ এসে কয়েকবার আস্তে ডেকেছিল রঘুনাথকে—ওর ঘুম ভাঙিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল হারকু সাহেবের তাঁবুতে। যশোদা সব শুনেছিল, সব দেখেছিল। শিবনাথের সঙ্গে রঘুনাথ যখন কিছু দূরে চলে গেল তখন আস্তে আস্তে যশোদাও বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। অন্ধকারে এবং ঘুম চোখে স্পষ্ট করে কিছু না দেখতে পেলেও সে দেখেছিল হারকু সাহেবের তাঁবু থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

যা বোঝবার তা বুঝে নিয়েছিল যশোদা। তাঁবুতে ফিরে পাগলের মতন ঘুমন্ত ছেলে-মেয়েদের টেনে-টেনে দূরে সরিয়ে দিয়ে সে অপেক্ষা করছিল রঘুনাথের। এবং সে ফিরে

আসতেই তাকে শুতে দিল না যশোদা, তার জায়গায় বসে জোরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, "কোথায় যাওয়া হয়েছিল, শুনি?"

মধ্যরাতে যশোদার গলার স্বর বড় তীক্ষ্ণ, তা ভেসে যাচ্ছিল অনেক দূরে অবধি। সন্ত্রস্ত এবং বিরক্ত হয়ে যথাসম্ভব আস্তে রঘুনাথ বলল, "চুপ যশো—"

"উঃ, হুমকি মারা হচ্ছে", যশোদা মাথা দোলাতে-দোলাতে উঠে দাঁড়াল, রঘুনাথের কাছে এসে আরও জোরে কথা বলল, "আমাকে গেরাহ্যি কর না, আমার চোখের উপর অন্যের রাউটিতে মেয়েমানুষ আনিয়ে ফুর্তি মার—এত বুকের পাটা!"

নিজের ক্ষমতা, এমন কি তার অস্তিত্বের কথাও ভুলে যাচ্ছিল রঘুনাথ। অনেক রাতে যশোদার সামনে দাঁড়িয়ে তার নিজেকে ছোট একটা পোকার মতন মনে হচ্ছিল, যশোদা যেন তাকে তার ভারী পায়ের চাপে শেষ করে দিতে পারে।

অন্তিম মুহূর্তে মানুষের গলা থেকে যেমন কাতর স্বর ওঠে তেমন করে রঘুনাথ বলল, "ঝুট বাত আমাকে শুনাবে না। যা খুশি হবে তা বলবে না—"

"বলব না মানে? একটু লাজ হল না তোমার? মনে ভেবেছিলে আমি নাক ডাকিয়ে ঘুম মারছি, না?"

রঘুনাথ মেজাজ খারাপ না করে স্থির স্বরে বলল, "তুমি মেয়েমানুষ, লাজ তোমার থাকবার দরকার। আমার সার্কাসের কাজ অনেক, সবের ভিতর তুমি নাক ঢুকাবে না—"

রঘুনাথের কথা শেষ হওয়ার আগেই যশোদা বলে উঠল, "মাঝ রাতে অন্যের রাউটিতে মেয়েমানুষের সাথে কী কাজ তোমার বুঝি না আমি?"

"চুপ যশো, চুপ! আমাকে শিবনাথ ডেকে নিল না?" যশোদার সঙ্গে সে রাতে সব কথা আলোচনা করবার ইচ্ছে ছিল না রঘুনাথের এবং সে জানে যে এমন মানুষ যশোদা, সব ভেঙে বললেও সে তার কথা বিশ্বাস না করে আরও বেশী চিৎকার করবে।

"কেন ডাকল তোমাকে?" যশোদা বলল, "আগে থেকে ব্যবস্থা না থাকলে এত রাতে মালিকের ঘুম ভাঙাবার সাহস হয় তার?"

"এসব কথা আমাকে শুনাবে না—" অল্প অল্প বিরক্ত হচ্ছিল রঘুনাথ, যশোদার শাসন সে সহ্য করতে পারছিল না, গলার স্বর কিছু তুলে রঘুনাথ বলল, "সব কথা আমি তোমাকে শুনাব না—শুনাতে পারি না—"

"আমি কানা? ঘাস খাই?"

"চুপ থাক যশো, রাত অনেক হল।"

"ওসব ফুটানি আমার কাছে মারবে না", যশোদার গলা হঠাৎ ভারী হয়ে এল, কাঁদবার ভঙ্গী করে সে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে বলল, "ও দাদা, একবার এসে দেখে যাও, কার হাতে তুলে দিলে আমাকে!"

রঘুনাথের ভয় হচ্ছিল, কাছাকাছি তাঁবু থেকে হঠাৎ কেউ বোধ হয় ছুটে আসবে। কিন্তু ভীতির সঙ্গে সঙ্গে একটা বিদ্বেষও তার মনকে আচ্ছন্ন করে তুলছিল। দুর্নামকে সে ভয় করে। সার্কাসের প্রত্যেক মানুষ—তারা নিজেরা যেমনই হোক, শুধু মালিক বলে রঘুনাথকে সমীহ করে না, তাকে শ্রদ্ধা করে চরিত্রবান বলে। সে কথা সব সময় মনে থাকে রঘুনাথের এবং যশোদা যখন সন্দেহ করে তখন একটা যন্ত্রণাদায়ক অনুতাপ তাকে অলস ও অকর্মণ্যের মতন করে তোলে। তার নিজের সার্কাসের মানুষের সামনে বার হতে লজ্জা হয় রঘুনাথের। সংসারের সব দায়িত্ব মুখ বুজে এতদিন পালন করে এলেও এখন এক-একবার সব ভেঙেচুরে আবার নিঃসঙ্গ জীবন
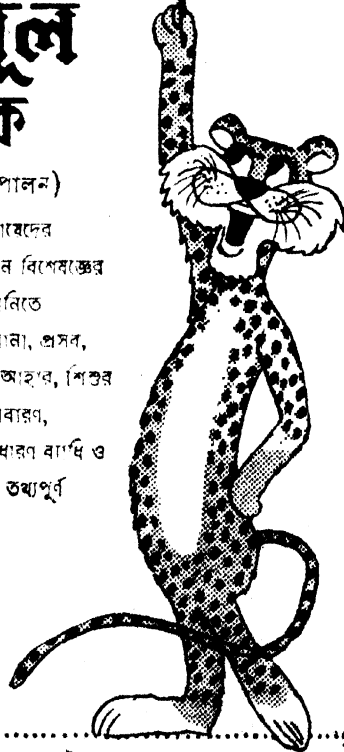
যাপন করতে চায় সে। এবং তার আরও মনে হয়, উখড়ার মেলায় জীবন শেষ হয়ে গেলেই ভাল হত।

এত কথা মনে এল বলে যশোদার কথা শুনে রঘুনাথ হঠাৎ ক্ষিপ্তের মতন বলে ফেলল, "কৈলাসবাবুর সাথে দেখা হলে তাকে আমিও সেই রকম বলব—কার সাথে সাদি দিল আমার!"

"কী, আমি খারাপ?"

"না, আমিই খারাপ", ভিতরে ভিতরে অধীর হয়ে উঠেছিল রঘুনাথ, এখন কিছু না ভেবে রাগের ঝোঁকে বলল, "তোমার সাথে থাকলে কোন মানুষ ভাল থাকতে পারে না। তোমার দাদা আমাকে বাঁচিয়ে দিল বটে—আর তুমি শেষ করে দিলে। খুব হল। আমার আর বাঁচবার দরকার নাই।"

"উঃ", এখন কান্নার অনুভূতি শুকিয়ে গিয়েছিল যশোদার। তার গলা থেকে বিদ্রূপের দ্রুত একটা শব্দ ছুটে এল। রঘুনাথের পাশে আর শোবে না বলে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল যশোদা, কিছু পরে বিকৃত স্বরে বলতে থাকল, "দাদার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার বেলা খুব যে বাঁচবার সাধ হয়েছিল! এখন আমি পথের কাঁটা, হাড় জ্বালাচ্ছি তোমার, না?"

"চুপ যশো, চুপ—" রঘুনাথের গলায় তুকা ঠেলে উঠেছিল বলে সে শুকনো স্বরে থেমে থেমে বলল, "তোমার জন্যে আমি ঘর বানিয়ে দিলাম, তুমি সেখানে থাকবে। সার্কাসের তাম্বুতে এসে আমার মেজাজ এই রকম খারাপ করবে না।"

"কী বললে?" অন্ধকারে রঘুনাথের মুখ ঝাপসা দেখালেও যশোদা বেড়ালের মতন মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, "এত বড় কথা তুমি বলতে পারলে আমাকে—তাড়িয়ে দেবার কথা বললে?"

কিছু নরম হয়ে রঘুনাথ বলল, "তুমি আমার দুর্নাম করবে কেন?"

"উঃ, বাবু বদমাশি করবেন, আমাকে একা ফেলে রাউটির বাইরে যাবেন আর আমি মুখ বুজে থাকব! বেশ, তোমার মতন মানুষের সাথে থাকার দরকার নাই আমার। ছোট মেয়েটার জ্বর না হলে কাল ভোরেই চলে যেতাম—"

সে রাতে আর কোন কথা বলেনি রঘুনাথ। যশোদা আরও অনেক কিছু বলে গেলেও সে ঘুমবার ভাণ করে পড়েছিল। তাকে সে জোর করে আটকাবে না, সে চাক লিলুয়ায় ফিরে। বয়েস বাড়ছে রঘুনাথের, ধৈর্যও কমে আসছে। এখন অনেক কাজ তার, অনেক দায়িত্ব। যশোদা কাছে থাকলে তার কথা শুনে বড় দুর্বল হয়ে পড়ে রঘুনাথ, তার মাথার মধ্যে অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা হয়—অসুস্থ মানুষের মতন সে বার এদিক থেকে ওদিক, কোন কাজে মন দিতে পারে না।

সে রাতের পর যশোদা একটাও কথা বলে

নে রঘুনাথের সংগে। কথায় কথায় হাত চালিয়েছে ছেলেমেয়েদের ওপর, তাদের লক্ষ্য করে চিৎকার করে উঠেছে। কোম্পানীর মেয়েদের তার সংসারের কোন কাজ করতে দেয় নি—বকাবকি করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

রঘুনাথও এ ক'দিন কোন চেষ্টা করেনি যশোদার সংগে কথা বলবার। মনের মধ্যে তার পৌরুষকে সযত্নে লালন করে সে নীরব ছিল। এবং যশোদার সংগে দূরত্ব রক্ষা করার প্রয়াস তার শিরা অনেকাংশে নিস্তেজ করে রাখলেও টালিগঞ্জের ক্যাম্প আশাতিরিক্ত অর্থলাভের আনন্দ মনে মনে উপভোগ করে সে একা-একাই তা সবল করে তোলবার ইচ্ছায় আরও কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিল।

আজ খুব ভোরে জিনিসপত্র গোছগাছ করতে শুরু করে দিয়েছিল যশোদা এবং রঘুনাথের সংগে কথা না বলে কৌশল করে

তাকে লিলুয়ায় যাবার কথা জানিয়ে দিয়েছিল কেননা গাড়ির দরকার। সুবলবাবু কিংবা আর কেউ সঙ্গে গেলে ভাল হয়—ছেলেমেয়েদের দিয়ে সেকথাও রঘুনাথকে বলিয়েছিল যশোদা।

যশোদার যাবার আয়োজন দেখে তাঁবু থেকে আজ একবারও বাইরে যায়নি রঘুনাথ, তার পাশে পাশে ফিরছিল। যশোদা তাকে কিছু না বললেও প্রথম থেকেই বুঝেছিল রঘুনাথ, আজ সে চলে যাবে। এক-একজন ছেলেমেয়েকে কোলে তুলে আদর করছিল রঘুনাথ।

এক সময় ঝগড়া মিটিয়ে সম্পর্ক সহজ করে নেওয়ার ইচ্ছায় যশোদার পাশে দাঁড়িয়ে রঘুনাথ বলল, "সময় এখন বড় ভাল যশো, অজগরকে আমার প্রণাম দিবে।"

যশোদা ঝনঝন করে থালাবাসন একটা বেতের ঝুড়ির মধ্যে ফেলল, আপন মনেই মাথা দোলাল এবং বাইরে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কী বলল, রঘুনাথ বুঝল না।

"কী বল যশো?"

চাবির গোছা আঁচলে শক্ত করে বাঁধছিল যশোদা, বাঁধা হয়ে গেলেও সে তা টেনে টেনে দেখে এক ধরনের উত্তেজনা প্রকাশ করছিল। এখান থেকে চলে যাবার জন্যে যশোদা বড় অস্থির হয়ে উঠেছিল। তার মুখ তিক্ত, কঠিন—সেখানে কোমলতার কোন আভাস ছিল না। রঘুনাথের গলার স্বর যশোদার চেহারা আরও নীরস করে তুলল এবং সে একদিকে ঘাড় হেলিয়ে গাড়ির আওয়াজ শোনবার চেষ্টা করে বোবার মতন হয়ে থাকল।

রঘুনাথ হাসল, "আমি যাব তোমার সাথে?"

গাড়ির শব্দ হচ্ছিল। দূরে থেকে একবার হর্ন বাজাল সুবলবাবু। অনন্ত দুটো বড় ভাঁড়ে চা নিয়ে এসেছিল, রঘুনাথ তা খালি করে দিয়েছে। যশোদা খায়নি। তার চায়ের ভাঁড় থেকে পাতলা ধোঁয়া উঠছিল।

রঘুনাথ অপ্রস্তুতের মতন আবার বলল, "তোমার চা পড়ে থাকল যশো, খেলে না?" সে সাবধানে গরম ভাঁড় যশোদার মুখের সামনে এনে বলল, "চা খাও।"

এখনো কথা বলে নি যশোদা, হাতের ঝাপটায় ভাঁড় ফেলে দিয়েছিল। গরম চা পড়েছিল রঘুনাথের হাতে, তা হলেও সে যন্ত্রণার একটা শব্দ উচ্চারণ করে নি, হাসতে হাসতেই বলেছিল, "এমন চুপচাপ চলে যাবে? দোষ আমার কী হল যশো?"

যশোদার বাক্স বিছানা গাড়িতে তুলে দেওয়ার জন্যে এক-একবার অনন্ত আসছিল —এক-একটা জিনিস পলকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। সুবলবাবু এসে রঘুনাথের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গেল। সূর্য উঠেছে, এখনো রোদ এসে না পৌঁছলেও বড় বড় গাছের পাতা ঝিকমিক করছে। ভিজে ভিজে ঘাস। রঘুনাথ বাইরে তাকিয়ে এসব দেখল।

"যশো?"

তাঁবুতে এখন কেউ নেই, চলে যাবার আগে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল যশোদা, মড় মড় করে চায়ের ভাঁড় পা দিয়ে ভাঙতে ভাঙতে চারপোলের বড় তাঁবুর দিকে তাকিয়ে অভিশাপ দেওয়ার মতন চেপে চেপে বলল, "আগুন জ্বলে যাবে।"

খুব আস্তে কথা বলেছিল যশোদা, সব শুনতে পেল না রঘুনাথ। কিন্তু অশুভ একটা ইঙ্গিতের ছায়া ফুটে উঠেছিল যশোদার চোখে। ধর্মভীরু এবং সংস্কারে বিশ্বাসী রঘুনাথ তা দেখে আতঙ্কিত হয়ে যশোদার খুব কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "যশো, কী কথা বললে?"

এখনো যশোদা রঘুনাথের দিকে দেখল না, চারপোলের তাঁবুর দিকেই যেন পাথরের চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকল। রঘুনাথের মনে হল তার সে চোখ থেকে একটা দুঃসহ তেজ ঠিকরে পড়ছে। যশোদার এমন শান্ত এবং হিংস্র মূর্তি কখনো দেখেনি রঘুনাথ।

সে ব্যাকুল হয়ে ছেলেমানুষের মতন বলে উঠল, "এ যশো, ওই তাম্বুর কী গলতি হল? ওই দিকে তুমি এই রকম করে দেখবে কেন?"

এত পরে রঘুনাথের সঙ্গে খুব স্পষ্ট করে কথা বলল যশোদা। এখনো তার পাথরের মতন চোখ বড় তাঁবুর দিকে, পায়ের নিচে মাটির ভাঁড়, মড়মড় করছে—সেই আওয়াজ যশোদার গলার স্বরের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে তাল রাখছিল।

কথা বলতে বলতে কোমরে দু হাত রেখেছিল যশোদা, অভ্যাসমতন মাথা দোলাতে দোলাতে বলছিল, "আগুন জ্বলে যাবে! সব ছারখার হয়ে যাবে—"

রঘুনাথ বাধা দিয়ে বলল, "যশো!"

যশোদা থামল না। কিছু না ভেবে কোন-দিকে না তাকিয়ে যে তীক্ষ্ণ ও কর্কশ স্বরে বলল, "এত অধর্ম ভগবান সইবে না—কখনো না। যার টাকায় প্রাণ বাঁচল তার কোন দাম যে দেয় না—"

রঘুনাথ অজস্র মানুষের জীবন ভিক্ষা করার মতন যশোদার হাত ধরবার চেষ্টা করে খুব নরম গলায় বলল, "আমাকে তুমি তোমার খুশীমতন গালাগাল কর যশো, আমি সব মেনে নেব—কিন্তু আগ লাগার কথা তুমি কেন বলবে? আমার সার্কাস জ্বলে গেলে কত মানুষ বেকার হয়ে যাবে—তাদের জন্যে প্রাণ কাঁদিল না তোমার! এ যশো, আমার চার পোলের তাম্বুর দিকে আঁখ রাখবে না তুমি, আঁখ ফিরাও—"

যশোদা ঘোমটা টানল। রঘুনাথের মিনতির মতন কাতর স্বর শুনে কোন পরিবর্তন হল না তার মুখের। সে গাড়িতে এসে বসল। রঘুনাথও এসেছিল তার পেছন পেছন। যশোদা তার দিকে দেখল না, ঘোমটা আরও টেনে ছোট মেয়েকে কোলে নিয়ে মুখ নামিয়ে থাকল।

সার্কাসের গাড়ি যশোদাকে নিয়ে লিলুয়ার চলে যাবার পর চারপোলের তাঁবুর কাছে কিছু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল রঘুনাথ। ভোরের ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। ট্রাম-বাস চলতে শুরু করেছে। প্র্যাকটিসের জন্যে তাঁবুর মধ্যে এর মধ্যেই এসেছে কেউ-কেউ। রঘুনাথ পায়ের দুপ দুপ শব্দ শুনল, মাথা তুলে আকাশ দেখল এবং মনে মনে বলল, ভগবান আমার মনে কোন পাপ নেই। তুমি সব জান। যশোদা শুধু শুধু আমাকে সন্দেহ করে জুয়েল সার্কাসকে অভিশাপ দিয়ে গেল! হে ভগবান, তার কথা যেন মিথ্যা হয়—আমার জুয়েল সার্কাস যেন ঠিক থাকে।

এত সকালে ওঠে না রঘুনাথ। কিন্তু যশোদা চলে যাবার পর সে আর ঘুমতে পারল না, শুয়ে-শুয়ে ছটফট করল কিছু সময়। তার চোখেমুখে উদ্বেগ ও উত্তেজনা ফুটে উঠেছিল। তারও লিলুয়ায় ছুটে যাবার ইচ্ছে হল। যশোদাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে নয়, পুণ্যবান অজগরের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াতে পারলে যশোদার অভিশাপ কেটে যেত ঠিক।

অভ্যাস না থাকলেও সকালবেলা স্নান সেরে নিল রঘুনাথ, সিল্কের পাঞ্জাবি পরে ছোট ছোট সোনার বোতাম গাঁথল—যদি সম্ভব হয় আজই কয়েক ঘণ্টার জন্যে সে-ও লিলুয়া ঘুরে আসবে। তাঁবুতে একা-একা বসে গাড়ির অপেক্ষা করছিল রঘুনাথ।

শিবনাথ তার কাছে এল আরও অনেক পরে। সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তাকে দেখতে পেয়ে ডাকল রঘুনাথ। একা-একা বসে থাকতে ভাল লাগছিল না তার। শিবনাথের বদলে

অন্য কাউকে দেখলেও এখন রঘুনাথ কাছে ডাকত। এখন নতুন ক্যাম্পের নানা আলোচনা করে সে তার মনের ভার লাঘব করতে চাচ্ছিল।

"এই সকাল বেলা কোথা যান শিববাবু?" রঘুনাথ তার বিমর্ষ ভাব কাটিয়ে ওঠবার জন্যে জোর করে হাসল।

শিবনাথও হাসল। রঘুনাথের পাশে আর একটা খালি চেয়ার ছিল, হাত দিয়ে তা কাছে করল শিবনাথ, "ক্ষিধে পেয়ে গেছে, কিছু খেয়ে আসি—"

"আরে বসুন শিববাবু, এখানে আমি আনাব খাবার—" রঘুনাথ জোরে ডাকল, "অনন্ত, এ অনন্ত—আরে বাচ্চু, ইধর আও—" দুজনের জন্যে চা আর জিলিপি সিঙাড়া আনতে বলে সে বলল, "আপনার তো খুব নাম হল শিববাবু এই ক্যাম্পে, জোর হাত তালি পেলেন—"

শিবনাথ ঘষ ঘষ করে গলা চুলকোতে চুলকোতে হালকা স্বরে বলল, "কোন ক্যাম্পে হাত তালি আমি পাইনি বাবু?"

"ঠিক বাত। কিন্তু এই ক্যাম্পে মানুষের মুখ দেখলেন? বড় বড় লোক, ভদ্র মানুষ সব। রাস্তার উপর কত গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল কাল—"

শিবনাথ বলল, "দেখেছি। পাড়াটা ভদ্রলোকের তো। অনেক সাহেব-মেমও সার্কাস দেখতে এসেছিল।"

"হাঁ-হাঁ, দেখলাম। ক্যাম্পের জন্যে এইবার খুব ভাল জায়গা ঠিক করলেন আপনি!"

"যে যেমন মানুষ, সে তেমন জায়গা ঠিক করবে তো—" সামনে ঝুঁকে পড়ে এক পায়ের ওপর আর এক পা রাখল শিবনাথ, হারকু সাহেবকে খোঁচা মারবার সুযোগ পেয়ে বলল, "আমাদের মাথার ওপর এমন একজন মানুষকে আপনি রাখলেন বাবু যে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেই জানে না।"

"আমি সব জানি শিববাবু!"

"তা এবার একটা কিছু করুন, হাতে-হাতে লোকটার বদমাশি প্রমাণ করে দিলাম তো—" কথা বলতে বলতে গলার স্বর তুলছিল শিবনাথ, "কেন, আমি সার্কাস চালাতে পারি না? আমার ওপর বিশ্বাস নেই আপনার?"

"আছে, শিববাবু আছে—" রঘুনাথ হেসে বলল, "আপনি আমার পয়লা নম্বরের আর্টিস্ট, আপনার উপর আস্থা থাকবে না আমার?"

"তবে ও লোকের নিচে আমাকে রাখলেন কেন?"

"আপনি সকলের উপরে আছেন শিববাবু—" রঘুনাথ তার কাঁধে হাত রেখে বলল, "ঘাবড়াবেন না।"

"না বাবু, আমি ঘাবড়াই না", শিবনাথ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আপনি যার-তার কথা বিশ্বাস করে আমাকে ছুটি দিতে চান—"

রঘুনাথ শিবনাথের হাত ধরে বলল, "চুপ, শিববাবু, চুপ। এইসব কথা শুনলে আমার মন বড় বিগড়ে যায়। মানুষ ভুল করে তো বটে!"

রঘুনাথকে তাহলেও আঘাত করবার সুযোগ হারিয়ে যেতে দিল না শিবনাথ, হাসতে-হাসতেই বলল, "লীলাকে কার রাউটিতে রাতের বেলা দেখলেন? সেই মানুষকে ছুটি দেয়ার কথা আপনি ভাবলেন না?"

বাচ্চু চা আর জিলিপি-সিঙাড়া নিয়ে এসেছিল, কাঠের একটা ছোট গোল টেবিল শিবনাথের দিকে এগিয়ে দিতে-দিতে রঘুনাথ বলল, "সেই রকম মানুষের মতন আপনি আপনাকে ভাববেন না শিববাবু, আপনার সঙ্গে তার ডিফারেন্স বহুৎ। আপনি লিখাপড়া জানা ভদ্দর লোক—"

"সেই জন্যেই তো দুঃখ হয়—"

"না না, ঝুটমুট দুঃখের কোন কারণ নাই—" রঘুনাথ বলল, "মিঠাই খেয়ে নিন শিববাবু।"

একটা সিঙাড়া হাতে তুলে নিয়েছিল শিবনাথ, তা মুখের কাছে এনে সে বলল, "ফের যদি আপনার কাছে মিছে কথা লাগিয়ে ও আমাকে অপমান করে তাহলে আমি ঠিক বলছি বাবু, আমি ওর সব দাঁত খুলে নেব—"

"না না, আপনার নামে সে আর কিছু বলবে না।"

থেকে থেকে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল শিবনাথ—হুস হুস শব্দ হচ্ছিল। চা আর খাবার খেতে খেতে সে হঠাৎ অন্যমনস্কের মতন হয়ে গেল। যমুনার সঙ্গে অনেকদিন কথা হয় নি তার। এই ক্যাম্পে আসবার পর সে-ও তাকে একদিনও ডাকে নি। চা খেতে-খেতে শিবনাথ ভাবল, আজ সে একবার যাবে রাধানাথবাবুর তাঁবুতে—যমুনার খবর নেবে।

"বাবু?" চায়ের কাপ হাতে কিছু পরে শিবনাথ খুব আস্তে ডাকল।

"বলেন শিববাবু?"

"আপনি আমার ওপর সেদিন অত রাগ করেছিলেন কেন? সে কী লাগিয়েছিল আপনার কাছে?"

রঘুনাথ বলল, "সেই কথা আপনি এখনো কেন মনে রাখছেন শিববাবু? আমি পরে সব বুঝতে পারলাম—আমারও বড় কষ্ট হল!"

রঘুনাথের দিকে তাকিয়ে শিবনাথ বলল, "আমার জীবনে পাপ নেই, অন্যায় নেই, আমি পরের বউকে রাতের বেলা রাউটিতে ধরে আনি না। বাবু, আপনি যা শুনেছেন—"

শিবনাথকে বাধা দিয়ে অনুনয় করল রঘুনাথ, "চুপ থাকবেন শিববাবু, সেসব কথা ভুলে যাবেন।"

শিবনাথের গলার স্বর নেমে এল, নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ আপন মনেই ফিসফিস করে উঠল, "বাবু, আমি যমুনাকে বিয়ে করব—"

রঘুনাথ শিবনাথের পিঠে জোরে-জোরে থাবড়া মেরে হা-হা করে হাসল, "বড় ভাল কথা শুনালেন শিববাবু! এই কথাটা আগে শুনলে কোন গোলমাল হত না, সব মানুষকে আমি চুপ থাকতে বলতাম—" কথা বলতে বলতে নিজেই চুপ হয়ে গেল রঘুনাথ, আঙুল তুলে ইশারা করল শিবনাথকে।

শিবনাথ বাইরে তাকিয়ে দেখল হারকু সাহেব রাধানাথবাবু আর যমুনাকে সঙ্গে নিয়ে রঘুনাথের তাঁবুর কাছে এসে পড়েছে।

ক্রমশ

॥ বাংলা সাহিত্যের অসামান্য লেখক ও অসাধারণ বই ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি ৯, তালপাতার পুঁথি ১৫, কিরীটী রায় ১০, ঝড় ১০, অপারেশন ৭॥০ অরণ্য ৬॥০ অস্তি ভাগীরথী তীরে ৭॥০ ধূসর গোধূলি ৫, উত্তরফাল্গুনী ৭, কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৭॥০ কালো ভ্রমর ৫॥০ ঐ ২য় ৫॥০ কালো-হাত ৬, ঘুম নেই ৫, নীলতারা ৫, ধূপশিখা ৫, নূপুর ৪, নিশিপদ্ম ৫, বেলাভূমি ৮॥০ মধুমিতা ৫॥০ মুখোশ ৫॥০ মায়ামৃগ ৩, রাতের রজনীগন্ধা ৫, হীরা চুনি পান্না ৫, উল্কা ৩, চক্র ৩, ছিন্নপত্র ৫, বহুত মিনতি ১০, পিয়া মুখচন্দা ৪॥০ বহ্নিশিখা ৮, মল্লার ৪, লালুভুলু ৪॥০ হাসপাতাল ৭॥০ রাত্রি শেষ ৩ বাদশা ৫, শ্রাবণী ৬, মায়ামৃগ ৬,

প্রবোধকুমার সান্যাল

নগরে অনেক রাত (যন্ত্রস্থ) উত্তর হিমালয় চরিত ১১, তিন কন্যার ঘর ৭, কাঁচকাটা হীরে ৭॥০ মহাপ্রস্থানের পথে ৬, আঁকাবাঁকা ৪, আগ্নেয়গিরি ২॥০ উত্তরকাল ৫ জলকল্লোল ৫॥০ বৃক্ষ ৭॥০ নদ ও নদী ৬, মন-সঙ্গিনী ৩॥০ বিবাগী ভ্রমর ৭॥০ বেলোয়ারী ৭, শ্রেষ্ঠ-গল্প ৫, ছোঃ মহাপ্রস্থানের পথে ৩, মধুচাঁদের মাস ২৮০

প্রমথনাথ বিশী

বঙ্কিম সরণী ১০, লালকেল্লা ১৪, রবীন্দ্র সরণী ১০, অনেক আগে অনেক দূরে ৪॥০ কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥০ গল্প পঞ্চাশৎ ৮, নিকৃষ্ট গল্প ৫, মাইকেল মধু-সূদন ৪॥০ রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ (দুই খণ্ড একত্রে) ১০, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ৫, চিত্রচরিত ৮ বিচিত্র উপল ৫ প্রাচীন আসামী হইতে ৪, হংসমিথুনে ২, প্রাচীন পারসিক হইতে (যন্ত্রস্থ)

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ১ম—৭, ২য়—৭,

প্রশান্ত চৌধুরী

কান পেতে শুনি ৫, নদী থেকে সাগরে ৮॥০ ঘণ্টা-কণ্টক ৪, ডাকো নতুন নামে ৪, আলোকের বন্দরে ৪॥০

প্রফুল্ল রায়

পূর্বপার্বতী ১২, মুক্তো ৫, নাগমতী ৭, তটিনী তরঙ্গে ৪॥০ প্রথম তারার আলো ১০, কিন্নরী ৪॥০ আলোছায়াময় ৮॥০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পরমাত্মীয়া ৫॥০ কাঞ্চনময়ী ৬, দূরের মিছিল ৫,

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমের যাত্রী ৫॥০ ভারত সংস্কৃতি ৫॥০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পা বাড়ালেই রাস্তা ৫॥০ স্বপ্নতন ৪॥০ বেনামী বন্দর ২,

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গাদপি গরীয়সী ১ম ৫, ২য় ৫॥০ ৩য় ৬, দোল-গোবিন্দের কড়চা ৬, কথাচিত্র ৩, ক্ষণ অন্তঃপুরিকা ২॥০ গল্পপঞ্চাশৎ ৯, নয়ান বৌ ৬, মিলনান্তক ৪॥০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথের পাঁচালী ৬॥০ অপরাজিত ৯, ইছামতী ৮, বিভূতি-বিচিত্রা ১২॥০ আরণ্যক ৬, অভিযাত্রিক ৫॥০ আদর্শ হিন্দু হোটেল ৪॥০ ঐ নাটক ২, উৎকর্ণ ৪, কিন্নর দল ৩, কুশলপাহাড়ী ৫, গল্পপঞ্চাশৎ ৯, দেবযান ৬, মুখোশ ও মুখশ্রী ৩॥০ মেঘমল্লার ৪, যাত্রাবদল ২॥০ শ্রেষ্ঠগল্প ৫, অথৈ জল ৫॥০ অরণ্য মর্মর ৭, অনুবর্তন ৬, লবটুলিয়ার কাহিনী ৩, অশনি সংকেত ৪॥০ অনুসন্ধান ৩, ছায়াছবি ৩,

বিমল কর

যাদুকর ৫॥০ খোয়াই ৩, পান্থশালা ৩॥০ জীবনায়ন ৫, পরবাস ৪॥০ সীমারেখা ৪॥০

বিমল মিত্র

সখী সমাচার ৬, একক দশক শতক ১৪, বেনারসী ৫॥০ কড়ি দিয়ে কিনলাম ৩০, শ্রেষ্ঠগল্প ৫, তিন ছয় নয় ৬॥০

মনোজ বসু

বন কেটে বসত ১০, গল্পপঞ্চাশৎ ১০, সাজবদল ৫॥০

মহাশ্বেতা দেবী

বায়স্কোপের বাক্স ৬, সন্ধ্যার কুয়াশা ৫॥০ অজানা ৪॥০ আঁধারমাণিক ১২॥০

শঙ্কু মহারাজ

নীলদুর্গম ৬॥০ পঞ্চপ্রয়াগ ৫, বিগলিতকরুণা জাহ্নবী-যমুনা (৭ম মুদ্রণ) ৭, গহন গিরি কন্দরে ৬, গিরিকান্তার ৯,

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমান শ্রীমতী ৭, নিবেদনমিদং ৭,

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

পূর্বাচল ১১, উপকূল ৩, চন্দনবাঈ ৫, তরঙ্গের পর ৫, মেঘ ও মৃত্তিকা ৫, শহরে বন্দরে ৪॥০ নায়িকার মন ৪॥০ ক্লান্ত বিহঙ্গী ১১,

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২, ৩৪-৮৭৯১

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার
ব্যথা-বেদনা তাড়াতাড়ি দূর করবার আধুনিক উপায়

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে !

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা: 'অ্যাসপ্রো' রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায় !

মাইক্রোফাইণ্ড বলতে কি বোঝায় ? মাইক্রোফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'তে মেশানো হয়, তা ৩০ গুণ বেশী সূক্ষ্ম করা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। এর ফলে বেদনা নাশ করবার শক্তি দ্বিগুণেরও বেশী সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

মুহূর্তের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যায়—অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে : নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র ব্যথা দূর করবার সক্রিয় উপাদানটি অতি সহজেই এবং খুবই শীঘ্র শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেইজন্যেই মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে দেয় এবং তার ফল অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

অতি সহজেই আপনি খেতে পারেন : নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আপনি যেভাবে খুশী খেতে পারেন—শুকনো, জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস জল বা যে কোনো গরম পানীয়ের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত প্রকারের যন্ত্রণায় নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' খাবেন : ব্যথা-বেদনা • মাথাধরা • গা-ব্যথা • দাঁতব্যথা • গাঁটে বেদনা • জ্বর-জ্বর-ভাব • ফ্লু ডেঙ্গু জ্বর • গলাব্যথা।

মাত্রা : প্রাপ্তবয়স্ক : দুইটি ট্যাবলেট। প্রয়োজন হলে আবার খাবেন। শিশুদের জন্য : একটি ট্যাবলেট বা আপনার ডাক্তারের নির্দেশমত।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' কিভাবে কাজ করে দেখুন
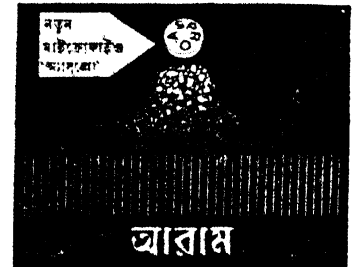
ট্যাবলেটের কণাগুলির আকার যত বড় হয়, ততই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে দেরী হয়—আপনার আরাম পেতেও সময় লাগে।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোফাইণ্ড হওয়ার ফলে নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র প্রতিটি ট্যাবলেটে প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। তাই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে-সঙ্গে মিশে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি ব্যথার উপশম হয়।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার সর্বাধুনিক উপায়।
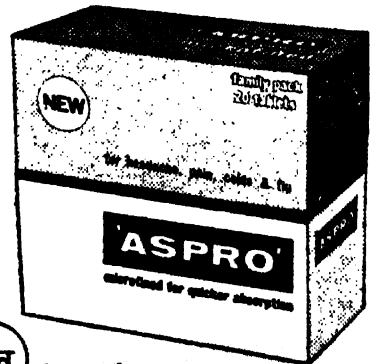
শার্ঙ্গদেব

সবারে করি আহ্বান:

ষোলো, সতেরো বছর হল আমরা সঙ্গীতের সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার অবতারণা করেছিলাম। কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল কিন্তু একথা আজ স্বীকৃত হয়েছে যে, বাংলায় সঙ্গীতকে সমগ্রভাবে অবলম্বন করা ব্যতীত শিক্ষায় পূর্ণতা সম্ভব নয়। যে শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা যত অধিক সে শিক্ষায় কূপমণ্ডুকতা তত ভয়াবহ। কী সাহিত্য, কী সঙ্গীত, কী বিজ্ঞান—সব ক্ষেত্রেই একটি বিষয় আর একটি বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শিক্ষার গতি জ্ঞানের উন্মুক্ত পথ ধরেই অগ্রসর হয়। যখনই সে কোনও অন্ধগলিতে এসে অবরুদ্ধ হয় তখনই তার সঞ্চরণ সীমিত হয়ে থাকে—সঞ্চরণকারী ওই নির্দিষ্ট পথটুকুতে পরিভ্রমণ করেই ক্লান্ত হয়। সঙ্গীত সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তা করেন তাঁরা নিশ্চয়ই কামনা করেননা যে সঙ্গীতের তীর্থযাত্রী একটি শৈলপথে এসে আবদ্ধ হয়ে যাবে, তাঁরা নিরন্তর এই কামনা করেন যে, এই জ্ঞানমার্গীরা জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে সেখান থেকে আলোকিত দিক্‌সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন, তাঁরা বিশ্বকে নিরীক্ষণ করবেন, তাঁরা অখণ্ডকে উপলব্ধি করবেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন এই পথের যাত্রী। বাংলার এবং ভারতের সংগীতকে সমগ্রভাবে আত্মসাৎ করেই তিনি তাঁর সংগীতের মধুকোষ রচনা করেছিলেন। তাঁর অনুসন্ধিৎসা কোথাও অবজ্ঞায় কলুষিত বা ব্যাহত হয়নি।

এই সঙ্গে বোধ করি আজ আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে এই যে, চলমান সংগীত সম্বন্ধে আমাদের একটি শ্রদ্ধার ভাব থাকা দরকার। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বা সভা-সমিতিতে একটা উন্নাসিক দম্ভের সঙ্গে আধুনিক কাব্যসংগীতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হচ্ছে। এতে শিক্ষিতের গৌরব প্রকাশ পায় না। এমনিভাবে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে উপহাস বর্ষিত হয়েছিল। একদা এমনিভাবেই কবিগান বা পাঁচালী সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দেখা গেল সেই উপহাসকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে সেদিনকার কবিতার পরীক্ষা-নিরীক্ষাই আজ সাহিত্যসমাজে স্বীকৃত এবং সেদিনকার অবজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করে আজ কবিয়ালদের রচনা থিসিসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী কি কোনদিন কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে, এণ্টনি ফিরিঙ্গির জীবনচরিত নিয়ে ভবিষ্যতে নাটক তৈরি হবে বিদগ্ধ দর্শকের জন্য? পাঁচালীকে যাঁরা নিরন্তর ঘৃণা করে এসেছিলেন তাঁরা কি ভাবতে পেরেছিলেন যে, আজকে সেদিনকার সামাজিক আবর্জনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা-পরিকল্পনায় স্থান পাবে? অতএব সংগীতের ক্ষেত্রে আমাদের একটা নিরাসক্ত দৃষ্টি থাকা দরকার। আজকে যা সৃষ্ট হচ্ছে তার কিছু না-কিছু যথার্থ রস বলে গণ্য হবেই—তার কিছু না-কিছু সংগীতশিল্পে সার্থকতার স্বাক্ষর রেখে যাবেই—ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দিয়ে এসেছে এতকাল। আজকে যা রচিত হচ্ছে তার সত্যটা যাচাই করা দরকার। সমালোচনার আপত্তি নেই, কিন্তু তা যেন শ্রেয়বুদ্ধি থেকে বর্জিত না হয়।

সম্প্রতি প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত প্রতিষ্ঠান দক্ষিণীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ যে ভাষণ দিয়েছেন, তাতে যথার্থ শিল্পীর উদার সমদর্শিতার পরিচয় পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ নিজে সংগীত সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করতেন তার পরিচয়ও তিনি তাঁর ভাষণে দিয়েছেন। সংগীত-জগতে যে ভেদবুদ্ধি রসিক-সমাজকে ক্লিষ্ট করছে এই ভাষণ তাঁদের মনে উৎসাহ সঞ্চার করবে। দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়ায় বর্ধিত হয়ে কবিগুরুর সংগীতচিন্তার একটা মূল্যবান দিকের ওপর তিনি যে আলোকপাত করেছেন তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সংগীতের ক্ষেত্রে কোনও সঙ্কীর্ণতা যেন শিক্ষাকে বা চিন্তাকে আবিল না করে এবং আমরা আশা করব, রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী যেন যথার্থই গাইতে পারেন—"সবারে করি আহ্বান"। শান্তিদেবের ভাষণটি উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গ শেষ করি।

"আমি মনেপ্রাণে রবীন্দ্রসংগীতবিলাসী। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন জানিনা, অন্যের রচিত গানও আমার শুনতে ভাল লাগে। বাংলাদেশ ও ভারতের নানা প্রদেশের নানা স্তরের মানব-সমাজের গান শুনেছি। ভারতের বাইরে যে ক'টি দেশে যেতে পেরেছি সেখানেও গানবাজনা শুনেছি আগ্রহের সঙ্গে। সাধ্যমত শেখবার চেষ্টাও করেছিলাম। সবেতেই পেয়েছি প্রচুর আনন্দ, সবই আমার মনকে টেনেছে। গানের ভাষা বুঝিনি, তবুও শুনে ক্লান্তি বোধ করিনি। বাংলাদেশের নানা প্রকার গানের তো কথাই নেই। পরে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে যে, সংগীত মাত্রেই এরূপ আন্তরিক টান আমার মধ্যে জন্ম নিল কি করে?

"শিশু বয়স থেকে আমি শান্তিনিকেতনবাসী। আমার শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও যৌবন কেটেছে পুরোপুরি গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথের সংগীত-জীবনের আওতায়। যখন থেকে সুরে সামান্য একটু চেঁচাতে সমর্থ হয়েছি তখন থেকেই গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথের গান শুনেছি এবং গানের দলে বসে আপন আনন্দে বড়দের সঙ্গে গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্র-সংগীত গাইতে চেষ্টা করেছি। সেই থেকে একটানা, আমার এই ৫৭ বৎসরের জীবনে পৌঁছেও এ গান আমার শোনা ও গাওয়ার

শেষ হয়নি। আজও শুনেছি, আজও গেয়ে চলেছি। এইভাবে আমার জীবনের অধিকাংশ সময় কেটে গেল গুরুদেবের গানের একটি প্রাণবান আবহাওয়ার মধ্যে। তবুও অন্যের গান আমার ভাল লেগেছে, মন কখনো বিমুখ হয় নি।

"এর কারণ খুঁজতে গিয়ে আমি যা বুঝেছি তা বলি। আমার নিজের বিশ্বাস, গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথের সংগীত-জীবনই আমার অজান্তে আমার মধ্যে এইরূপ একটি সংগীত-প্রেম বা ভালবাসার উদ্রেক করতে সাহায্য করেছে। কিভাবে তা সম্ভব হল তার উত্তর পেতে হলে এ'দের উভয়েরই জীবনের একটি দিকের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এ'দের দুজনের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থেকে, এ'দের সংগীত-জীবনের ভাণ্ডারে সংগৃহীত নানা প্রকার গানের যে পরিচয় আমি পেয়েছিলাম, তার কথাই আমি বলতে চাই।

"গুরুদেব নিজে অন্যদের ও অন্য ভাষায় রচিত কত রকমের গান যে জানতেন সে খবর আজকাল খুব কম লোকেই জানে। বাংলাদেশের নানা স্তরের গান, নানা প্রকার হিন্দী গান ও বহু বিদেশী গান গুরুদেব ভাল করেই জানতেন এবং তা গেয়েও শোনাতে পারতেন। তাঁর এই গানের ভাণ্ডারে ভালমন্দের কোন বাছ-বিচার ছিল না। আমি নিজের কানে তাঁরই কণ্ঠে এর অনেক গানই শুনেছি। গুরুদেবের গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথও ছিলেন গুরুদেবেরই মত একজন সংগীতপ্রেমী। এদিক থেকে তিনি ছিলেন গুরুদেবেরই উপযুক্ত শিষ্য। তিনিও জানতেন বহু রকমের গান। দেশী বা বিদেশী বলে কিছুই বাদ দেননি তিনি। আজও মনে পড়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গানগুলি দিনেন্দ্রনাথ কি রকম নিপুণতার সঙ্গে, অভিনয়ের ভঙ্গিতে গেয়ে শান্তিনিকেতনে আমাদের মত বালকদের তো বটেই, বয়স্ক ও বৃদ্ধদেরও মুগ্ধ করে রাখতেন।

"১৯৩০ সালে যেবার আমি প্রথম গুরুদেবের নির্দেশে, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে দক্ষিণ ভারতে যাই, তখন তিনি বারে বারে বলে দিয়েছিলেন সেখানকার লোকসংগীতও যেন এই সুযোগে আমি শেখবার চেষ্টা করি। পরিচয়পত্রে তার উল্লেখও ছিল। গুরুদেবের জীবিতকালে তাঁরই নির্দেশে ভারতের অন্য প্রদেশে বা ভারতের বাইরে আমি যখনই কোথাও গেছি, যাবার আগে সেই একই কথা তিনি আমাকে বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিতেন।

"সংগীতের প্রতি এই রকমের একটি উদার মনোভাবের পরিচয় তাঁদের সংগীতের জীবন থেকে আমি পেয়েছিলাম—এবং সেই আদর্শে উদ্বোধিত করার জন্যে দেশ ও বিদেশের নানা প্রকার গানের সঙ্গে পরিচয়ের পথে আমাকে গুরুদেবই ঠেলে দিয়েছিলেন। বাংলার লোকসংগীতের প্রতি যে সামান্য জ্ঞান ও ভালবাসা আমার মনে জেগেছে তা একমাত্র তাঁরই প্রেরণায় ও আগ্রহে।

"তোমরা যারা গুরুদেবের গানের শিক্ষা সমাপন করে আজকের এই সমাবর্তনে উপাধি নিতে যাচ্ছ, তারা গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথের জীবনের এ-দিকটির কথা সর্বদাই মনে রেখো। রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে যে অন্য কোন সংগীতের বিরোধ নেই, এ কথাটা তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। জাতিভেদের গর্বে ভারতের হিন্দুসমাজের যে প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল, গুরুদেবের গান নিয়ে সেইরূপ ক্ষতিকর জাতিভেদের গর্বে তোমরা মেতো না। তাতে তোমাদেরও ক্ষতি, গুরুদেবের গানের নামেও কলঙ্ক দেওয়া হবে। গুরুদেবের গানের মর্মে পৌঁছতে চেষ্টা কোরো। তাতে গুরুদেবের মত সর্বগ্রাসী এক প্রেমের বিকাশে তোমরা উদ্বোধিত হয়ে সব সংগীতকেই নিজের বলে মনে করতে পারবে এবং তখনই রবীন্দ্রসংগীত রসের গম্ভীরে তোমাদের প্রবেশের অধিকার

দুই রবীন্দ্রনাথ

'দেশ' পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। সম্প্রতি শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর "দুই রবীন্দ্রনাথ" নামক একটি তথাকথিত উত্তেজক ও মসলাদার প্রবন্ধ পড়েছি, তার বক্তব্য ও মন্তব্য Chain reaction হিসাবে যে তুমুল কোলাহলের সৃষ্টি করেছে, সেগুলিও অনুধ্যানের চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রানুরাগী বহু শিক্ষিত মন (যাঁরা স্বভাবত 'দুর্জন পরশ্রীকাতর ঈর্ষাপরায়ণ অনিষ্টকারী' নন এবং সহজ বাংলায় তাঁদের কি বলা হয় শালীনতার দরুন সে শব্দ-নিচয়গুলির আর পুনরুক্তি করলাম না) যে তিক্ত ও বিরক্ত হয়েছেন তার উক্ত ও নিরুক্ত প্রমাণ অনুমান শুধু 'দেশ' পত্রিকায় পাচ্ছি নয়, নানা সভা-সমিতিতে, আলাপ-আলোচনায়, বৈঠকে বাসরে ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকাতেও পাচ্ছি। অবশ্য শিল্পরসের মূল্যবিচারে ব্যক্তিগত রাগানুরাগ কোন পক্ষেই শুচিকর বা রুচিকর নয়, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মত একজন বিরাট সংস্কৃতিবান পুরুষকে কেন্দ্র করে। যতই আমরা নিজেদের বিবেকবান স্পষ্টবক্তা বা অপ্রিয় সত্যবাদী বলে সদম্ভে ঘোষণা করি বা নিন্দাস্তুতিস্তুল্যমৌনী হবার চেষ্টা করি, ততই আমাদের দায়িত্ব বৃদ্ধি হয়, সে নিন্দা স্বভাব-নিন্দুকের হোক, ভক্ত দলের গদগদ ভাষণেই নিমজ্জিত থাক বা নিক্তির ওজনে জ্ঞানীগুণীবিদ্বজ্জনের বি চা র শা লা র সুচিন্তিত বিবেচনাতেই পর্যবসিত হোক।

রবীন্দ্রনাথ মূলত বাংলার কবি, বাঙালীর কবি সেখানে তাঁর চিরন্তন আসন, এ কথা তো আদি ও অকৃত্রিম এবং আমাদের মনো-মন্দিরে রবীন্দ্রমূর্তির শতকরা বারো আনা সেই বাঙালী রবীন্দ্রনাথের সুর, গান, ছন্দ, জীবনবেদনা, রসচেতনা নিয়ে। কিন্তু এটাও অবিসম্বাদী সত্য যে, এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ আরো কিছু। বাঙালীর কাছে আরো কয়েকটি "ইমেজ" রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়ে গেছেন। তিনি ভারত-ভাগ্য বিধাতাদের একজন, তার জন-গণ-মন অধিনায়ক, তার ঊনবিংশ শতাব্দীর সাধনার উত্তরসাধক আর তিনি "বিশ্বকবি" যেখানে তিনি স্রষ্টা দ্রষ্টা, ঋষি বা জুডিয়ার প্রফেটের মত একজন বা অন্তত চিন্তানায়ক সাধক, মিস্টিক, মরমী। জগৎকবি সভায় মোরা তোমার করি গর্ব—এটা শুধু কবিশিষ্যের নিছক উচ্ছ্বাস নয় বাঙালীর মনের কথা। পশ্চিম যদি আজ তাঁকে কবি হিসাবে থার্ড ক্লাস, সাহিত্যিক হিসাবে সেকেণ্ড ক্লাস বলে, তা হলেও বাঙালীর কাছে আজি হতে শতবর্ষ পরেও রবীন্দ্রনাথের এই ভাবমূর্তি মুছে যাবে কিনা সন্দেহ। কালের যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ এখন ইতিহাস। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতির হলো লয় বা ইংলণ্ড, আমেরিকা, ক্যানাডা, জার্মানী, ফিনল্যাণ্ড এমন কি জুলুল্যাণ্ড রবীন্দ্র-নাথকে অস্বীকার করলে তাতে ঐতিহাসিকতার দিকে কতটুকু যায় আসে। বাঙালীর মনে সেই এককালীন আদরের দুলালের ছবি যদি থাকে সেটা তো মিথ্যা নয়। যুগে যুগে রূপরুচি শিল্পনীতির নিক্তিতে কবিকৃতিতে নূতন করে মূল্যায়ন হয়। কিন্তু সেইটেই যে সত্যিকারের, চিরকালের মূল্যায়ন তাই বা কে বললে। তা ছাড়া কবি-পরিণতির নানা দিক আছে এমন কি অনুবাদেও। রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলিতে উজ্জ্বল শ্রী না থাকলেও সে এক নূতন সৃষ্টি, অনুবাদ নয়, পাত্রান্তরে, গোত্রান্তরে, ভাবান্তরে শুধু কুহকটা মুছে গেছে, প্রগলভা নায়িকা ধীরা।

তথ্য ও অনুসন্ধান-নির্ভর নিজের মতামত অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করবার অধিকার সকলেরই আছে, থাকা উচিত, এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই, কিন্তু বলার ভঙ্গীর মধ্যে একটা অতিরিক্ত আত্ম-সচেতন মনোভাব যেন ফুটে না ওঠে, শ্রদ্ধার অভাব যেন না ঘটে। শ্রদ্ধৎস্বসৌম্য,—শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং—জানি এ সব সেকালের কথা, কিন্তু একালেও এর কিছু মূল্য নেই, এ কথা যাঁরা মনে করেন, তাঁরা ভ্রান্ত। অবশ্য প্রকৃত শ্রদ্ধা গদগদ প্রশস্তি নয়, তার একটি প্রকাশ বচগুপ্তি, বাক্যসংযম।

লেখকের মূল বক্তব্যের সুর অপ্রীতিকর হলেও কয়েকটি মন্তব্য "অযৌক্তিকং" নয়। তবে দিঙনাগানাং পথি পরিহরন্' চলাই যুক্তিযুক্ত।

(১) বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়া একটা অপ্রত্যাশিত সমাদর।

(২) সেই এককালীন আদরের ফলে ও অন্ধভক্তির মোহে আমরা রবীন্দ্র-পূজার সৃষ্টি করিয়াছি, সেটা প্রায় শাস্ত্রীয় বিধানের কোঠায় পড়িয়াছে।

(৩) পঁচিশে বৈশাখের উৎসবে আতিশয্য এসেছে এবং "অজ্ঞ-নৃপ-পণ্ডিতের" শুভা-গমনে ধন্য।

(৪) রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনায় একটা ভাব-গদগদ সম্মোহের বাড়াবাড়ি ফুটেছে।

(৫) রবীন্দ্রনাথের মন বিরূপ সমা-লোচনায় অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিল এবং স্বজাতির নানা নিন্দাকটূক্তিতে বিব্রত হয়ে উঠেছিল। যেমন আনন্দ-বিদায়ের ঘটনা।

(৬) রবীন্দ্রনাথকে দিয়া শেষ পর্যন্ত বিস্ময়কবীর পার্ট প্লে করাইয়া গেলেন রবীন্দ্র-ভক্তরা। কবিও তদ্ভাবভাবিত হয়েছিলেন।

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ভিক্টর হ্যুগোর অক্ষম অনুকরণে চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা শুরু করলেন বৃদ্ধবয়সে, এই ধরনের একটা ভ্রান্ত ধারণাও লেখকের আছে যার সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই অনেকে উত্তর দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে (ক) শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবীকে লিখিত একখানি চিঠি (৩০শে আষাঢ়, ১৩০০—ছিন্নপত্রাবলী); (খ) শ্রদ্ধেয় জগদীশ বসুকে *লিখিত চিঠি ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০০—চিঠিপত্র ৬, পৃঃ ৭ ও (গ) জীবনস্মৃতিতে কবির নিজের উক্তি* (র, র. সপ্তদশ খণ্ড, পৃঃ ৪২৭) উল্লেখযোগ্য। লেখক হয়ত বলবেন যে, বৃদ্ধবয়সে কবির এটা একটি হাস্যকর প্রচেষ্টা। এ বিষয়ে মতামত দেবার অধিকার বিশেষজ্ঞদের। অনেকেই রবীন্দ্র-চিত্রাঙ্কনের মধ্যে রবীন্দ্রমানসের এক নূতন শিল্পসম্ভাবনার প্রয়াস দেখেছিলেন—তাঁর রুদ্ধ অভীপ্সার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, কষ্টের বিকৃত জ্ঞানকে তুচ্ছ করে যা তার কাব্যের সুষমার চাপা পড়েছিল অবচেতনে। অমৃত-শেরগিলের বা অবনীন্দ্রনাথের বা নন্দলালের প্রশংসাপত্র উদ্ধৃত নাই করলাম।

একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, আমরা অনেকেই কৈশোরে যৌবনে তাঁর সমকালীন, ফলে অল্প বয়স থেকেই Rabindra-conditioned হয়ে আছি—ফলং ছত্রভঙ্গং, বেশীর ভাগ লোকই ভক্ত বনে গেছি, দু'-একজন চেষ্টা করেছি জোর গলায়, নতুন রীতিতে আঙ্গিকে ভাঙা গলায় কীর্তন ধরতে যে আমরা নতুন, আমরা আলাদা, আমরা বিচিত্র, আমরা বোদ্ধা। যতই না কেন বিদগ্ধবুদ্ধি জাহির করি, বিচার-বিশ্লেষণের বড়াই করি, subjective-objective co-relation *বলে চেঁচাই, মনগড়া থিয়োরী ভাঙি আর গড়ি,* বোদ্লেয়ার আরাগঁ, মায়াকফস্কীর কথা বলি বা এলিয়ট স্পেন্ডার কামু হেমিংওয়ের লেখা আওড়াই শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধেয় বিষ্ণু দে কর্তৃক উদ্ধৃত একটি ক্যানাডিয়ান ছড়ার কথা মনে পড়ে—

There was a young lady named Bright
Who walked faster than light
She started one day
In the relative way
And came back the previous night

আমাদের হয়েছে একটা অপূর্ব ব্যক্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ—উন্নাসিক বুদ্ধিজীবি বলবেন—এ দেশটা এমনই অদ্ভুত সৌলিউকস্, এমনই বিচিত্র যে এর আকাশে-বাতাসে কর্তাভজার দেশ। প্রতি বৎসরই এবং এই সেই দিন জন্মবার্ষিকীতে হই হুল্লোড়, মাইকে অমায়িক বক্তৃতা, সারগর্ভ ভাষণ, আলোচনা, গান, নাচ; প্রশস্তির ঝড় বইলো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রুচি, তাঁর ধ্যান, তাঁর অনুভূতি, তাঁর সৌন্দর্যচেতনা, তাঁর মানবিক মূল্যবোধ, তাঁর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, তাঁর দৃপ্তভঙ্গী, তাঁর অনমনীয় ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে কতটুকু পাঠ আমরা নিলাম, তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর নিষ্ঠা, তাঁর বেদনাবোধ, তাঁর সৌন্দর্যানুভূতি তাঁর সুন্দর সরল সর্বসিদ্ধিদায়িনী ভাব, তাঁর বিশিষ্ট চেতনাকে দেখলাম না, দেখলাম শুধু অভিনেতাকে?

মূল প্রশ্নে ফিরে আসা যাক—"নোবেল প্রাইজ তাঁহাকে যে কারণেই দেওয়া হোক, সাহিত্যিক কীর্তির জন্য দেওয়া হয় নাই, এই সোজা কথাটা রবীন্দ্রনাথ কেন উপলব্ধি করেন নাই, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি না।" সাহিত্যিক কীর্তির জন্য পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার বিশ্ববরেণ্য মনস্বীরা যা পেয়ে থাকেন, সেটি সাহিত্যিক গুণের জন্য নয়, অন্য কারণে রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হইল, এইটেই যদি সরল সত্য হয়, তবে যাঁরা

দিয়াছেন, তাঁরা অভিনেতা না রবীন্দ্রনাথ? —বিশেষ করে যখন নোবেল প্রাইজ পাবার পূর্বেই যে বইটির জন্য তিনি ঐ পুরস্কার পেলেন, সেটি নানাভাবে অভিনন্দিত হয়েছে গুণীসমাজের কাছে। সে সমাদর কি মিথ্যা ছিল? অবশ্য পুরস্কার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সারা পশ্চিম দেশ হইহই করে উঠেছিল—সে কী, ধলার দেশের প্রাইজ এ কোন্ কালোমানিক পেলে, কেন, কে এই রবীন্দ্রনাথ, কেন আনাতোল ফ্রান্স, হার্ডী পেলেন না, কেন টলস্টয়, জোরে, স্ট্রীন্ড-বার্গকে পূর্বে বাদ দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি অজস্র প্রশ্ন। এইসব বিতণ্ডামূলক প্রশ্নোত্তর ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীর তৎকালীন দৈনিক সাময়িকী পত্রিকায়, প্রবন্ধে, সন্দর্ভে, সমালোচনায়। কিছুটা সংকলন আছে এরনসনের—Rabindranath through Western Eyes নামক পুস্তকে। তার দুটি অধ্যায় "Poetic Justice" ও Occidental Misgivings এবং Appendix B-তে উল্লিখিত নানা ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপঞ্জীর বিরাট লিস্টটি সবাইকে দেখতে অনুরোধ করি। কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি (স্থানাভাবে অনুবাদ দিলাম না)।

It is first time that the Nobel Prize has gone to any one who is not what we call "White". It will take time, of course for us to accomodate ourselves to the idea that anyone called Rabindranath Tagore should receive a world prize for literature (Have we not been told that the East and the West shall never meet?). The name has a curious sound. The first time we saw it in print it did not seem real (The Globe, Toronto, Canada 16.6.14).

Has the award of the prize been due to the exotic Buddhistic fashion or has England's policy in India been perhaps in favour of the crowning of the Bengali poet? This will remain the secret of the judges in Stockholm (New Free Press, Vienna Nov. 1913).

এমনকি ঐ সময়েই লেখা হয়েছে: **'any one of us could write such stuff ad libitum; but nobody should be deceived into thinking it good English, good poetry, good sense or good ethics (New Age, London 20.11.1913).**

আসলে কনজারভেটিভ ইংরাজ তার সাহিত্যে এই intrusionকে ক্ষমা করেনি। জর্জ সান্তায়ানা, ল্যাফকাডিয়ো হার্ন, যোশেফ কনরাড প্রভৃতি লেখকরা অতিকষ্টে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, এমন কি খাস মার্কিন মুলুকের সাহিত্যিক কবিরা যেমন এডগার অ্যালান পো, ওয়াল্ট হুইটম্যান, এমন কি এমারসন, থুরো পর্যন্ত বহু দেরিতে স্বীকৃতি পান। রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা "কেল্টিক" করে দিলেন, দেখলেন সেখানে একটা 'subtle underflow' 'a sense of life', or psalm like cadence, এই পর্যন্ত। ১৯১৬ সালের Cambridge History of English Literature Vol. XIV—Anglo-Indian Literature অধ্যায়ে নোবেল প্রাইজ পাওয়া ইংরাজী গীতাঞ্জলির কোন উল্লেখ নেই। অধ্যায়টি অন্য বিষয়ে কুখ্যাত অধ্যাপক ওটেন কর্তৃক লিখিত হয়। ঐ বৎসরই বিখ্যাত সাহিত্যিক ডি এইচ লরেন্স (২৪-৫-১৬) এক পত্রে লিখছেন— This wretched worship of Tagore-attitude is disgusting প্রায় সমকালেই বিখ্যাত পত্রিকা Guardian বলছেন— the cult of Tagore is becoming a nuisance. প্রতীচ্য সভ্যতাকে প্রাচ্যের বেনোজল গ্রাস করবে নাকি? (Massi's Defence of the West পড়ুন)। রবীন্দ্রনাথ—versifier quasi philosopher and believer in the superiority of Hindus (পৃ ৮৮)। গোরা সম্বন্ধে মত হোল—that awful book। শোপেনহায়রের যুগ থেকে, কিপলিং ও থিয়োসফিস্টদের কাল পর্যন্ত ভারতবাসীরা হয় মহাত্মা, যোগী না-হয় কালা ও কুলি। রবীন্দ্রনাথের অবদান ছিল তাঁর খ্রীষ্টসুলভ চেহারা, সৌম্য মূর্তি, যার কথা ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, যখন তিনি বালক এবং রবীন্দ্রনাথ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে দেখা করতে যান লণ্ডনে—১৯১২ সালে। আমরা পড়ি অন্যত্র—

During his residence in London, it was a lesson in irony to watch his meditative figure and his face as harmless as a dove while he sat in unruffled silence among the flickering tongues of distinguished people who had never meditated in their lives but no doubt combined the wisdom of the serpent with its other qualities (The Nation, London 25.10.13) ভুললে চলবে না, ইউরোপে তখন রাসপুটিন, গুর্জিয়েব যুগ চলছে। কয়েক বৎসর পরে Darmstadt-এ কাউন্ট কেইসারলিং রবীন্দ্রনাথকে প্রায় দ্বিতীয় খ্রীষ্টাবতারে পরিণত করেছিলেন। এমন কি ব্যাভেরিয়ান আল্পস-এর শৈলশিখরে এক Sermon on the Mount ও দিয়েছিলেন তিনি। আরও দশ বছর পরে খ্রীষ্ট সংক্রান্ত Passion play দেখতে ওবারামগাওতে তিনি উপস্থিত হন অতিথি হিসাবে, যখন Child. নামক বিখ্যাত কবিতা লেখেন।

কিন্তু যে সভায় রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী

কবিতা প্রথম পাঠ করে শোনান ইয়েটস্, কবি মুখবন্ধে পড়লেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রোটেনস্টাইন, আর্নেস্ট রীস, অ্যালিস মেনেল, হেনরি নেভিনসন, এজরা পাউন্ড, মে সিনক্লেয়ার চার্লস ট্রেভেলিয়ান, স্টপফোর্ড এ ব্রুক, সি এফ অ্যান্ড্রুজ প্রভৃতি সাহিত্য-রসিক ব্যক্তিরা। চুপ করে শুনে গেলেন তাঁরা—বিশেষ কিছু বললেন না—স্পর্শকাতর কবি মুখবন্ধে পড়লেন। সেদিন রাতে হ্যাম্পস্টেড হিথের জ্যোৎস্নাস্নাত মাঠের উপর দিয়ে যেতে যেতে অ্যান্ড্রুজের (তখনও তিনি রবীন্দ্রভক্ত নন) কেবলই মনে হতে লাগলো—এ কী আশ্চর্য কবিতা শুনে এলেন তিনি—(হেনরি নেভিনসন ছিলেন তাঁর সাক্ষী)।

জগৎ পারাবারের তীরে ছেলেরা করে মেলা
on the sea shore of endless worlds children meet.

আমেরিকাতেও দেখি যে নোবেল প্রাইজ পাবার পূর্বেই তিনি নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হচ্ছেন বক্তৃতা দিতে—বিশ্বের একজন মনীষী সুধী হিসাবে—ড্যান মুডীর বৈঠকখানায় বসছে কবিতার আসর, রচেস্টারের আন্তর্জাতিক সভায় দিচ্ছেন Race Conflict সম্বন্ধে বক্তৃতা, হার্ভার্ডে বক্তৃতা দিলেন। ১৯১৬ সালে (নোবেল প্রাইজ পাবার পর) Seattle Post Intelligence -এ Eugene Bauke বলে একজন অধ্যাপক লিখছেন—**Those who dwell in the belief that the Hindu thinker is a suppressed soul who is content to voice misty dreams, will be well his illusioned if they hear this vigorous logician, seer, prophet .... he strikes hard—**

লরেন্স বিনিয়ন কবির সম্বর্ধনায় একটি গান লেখেন এবং সেটি গান Sybil thorndike (শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ১৩২৭, শ্রাবণ)। ফ্রান্সে Antour du Monde-এর আমন্ত্রণে অধ্যাপক Le Brun যিনি Gardner অনুবাদ করেছিলেন; তিনি বলেন, রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার এমনই সুমিষ্ট ফল যে, তিনি ভাবী সহধর্মিনীর সহিত প্রেমে পড়ে যান।

এর পরের যুগ প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতক। ইংলণ্ডের মনে-মনে অস্বীকৃতি সত্ত্বেও ফ্রান্সে রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্যিক বলেই স্বীকৃত—আন্দ্রে জিদের গীতাঞ্জলি বা ম্যাডলিন রোলার 'চতুরঙ্গ' ফরাসী চিন্তাবিদ্‌দের কাছে আদৃত হয়েছিল—অনেকে বলেন ইংরাজী গীতাঞ্জলির চেয়ে এর সাহিত্য ব্যঞ্জনা ঢের বেশী। শুধু আন্দ্রে জিদ নয় কাউণ্টেস নোয়ালিস রোমাঁ রোলাঁ পল ভ্যালেরি তাকে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ্ বলে স্বীকৃতি দিলেন। ইংরাজ কোনদিন কবির নাইটহুড ত্যাগ বরদাস্ত করেনি। তারপর পরাজিত জার্মানীর পালা। লণ্ডনের ডেলি নিউজ লিখছেন (৩-৬-১৯২১)—**"Scenes of frenzied worship In the rush for seats many girl students fainted and were trampled on by the crowd.** বিশ লক্ষ পাউণ্ড কাগজের অর্ডার যায় আমেরিকায় ত্রিশ লক্ষ বই ছাপার জন্য (**The Mall, Birmingham 2.9.21**) ৮ লক্ষ বই বিক্রি হয়ে যায় তিন মাসে। লণ্ডন টাইমসের মত কাগজও বিভ্রান্ত **"It is perhaps politically typical in Germany today that one of the best read authors is the Indian Tagore, whose mystic dulness**

appeals as a kind of anodyne (Sunday Times London 18.9.21).

তখন রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি তুঙ্গী—ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়ান, সুইডিশ, স্প্যানিশ, চেক, রাশিয়ান, পর্তুগীজ, যুগোশ্লাভ ল্যাটভিয়ান এস্থোনিয়ান, ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি ভাষায় হিব্রু, ঞিডিশ, ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হচ্ছে তাঁর লেখা। রাশিয়ান ভাষায় নূতন করে রবীন্দ্রনাথের লেখা এই সেদিনেও রূপান্তরিত হয়েছে। ত্রিশ লক্ষ পুস্তক বিতরিত হয়েছে শতবার্ষিকী উপলক্ষে—রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক নন, এইজন্য না অন্য কারণে। ইংরাজী অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ হয়তো অনেকের কাছে গ্রাহ্য হন নাই—কিন্তু ইংরাজী ভাষা ছাড়া কি রবীন্দ্রনাথকে জানবার জন্য অন্য ইউরোপীয় ভাষা নেই। —অধ্যাপক লেসনির উপযুক্ত ছাত্র Dusan Zbavital বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত এবং এই সেদিনও রবীন্দ্র-সাহিত্য-সম্ভারকে চেক্-সমাজে উপহার দিয়েছেন। আচার্য লৌত্ত, উইনটারনিজ, লেসনি কি ভারতীয় কালচারের ফিরিওয়ালা। টুচ্চির নাম করলাম না, কারণ, মুসোলিনীর সঙ্গে বিপর্যয়ের ও রোমার সঙ্গে বাদানুবাদের অধ্যায়ে তিনি জড়িত আছেন। কি প্রমাণে বলা হলো যে, শান্তিনিকেতনে ইউরোপীয় চিড়িয়াখানা স্থাপন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন কবি। সোভিয়েট রাশিয়ার কথা তুললাম না, কারণ, এ-যুগে আজও সেখানে রবীন্দ্র-প্রীতি অদ্ভুত এবং এখনি বলা হবে যে, ওটা রাজনীতির রেজিমেণ্টেশন। রাশিয়ার চিঠি সোভিয়েট-প্রশস্তি হলেও সাহিত্য। প্রি-লেনিন যুগ থেকেই রবীন্দ্র-বৈজয়ন্তীর যাত্রা, কি লেনিন যুগ, কি স্তালিন যুগ, কি পোস্ট-স্তালিন যুগ—রবীন্দ্রনাথের জয়ধ্বজা আজও উড়ছে। কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধের কথা ছেড়েও যদি দিই, রবীন্দ্র-সুর বহু রাশিয়ান Composersকে অনুপ্রাণিত করেছে যেমন, Alexander Dzegelenok বা Mikhail Ippalitiv Ivanov। মহাচীনেও ১৯২৪ সালে রবীন্দ্র-সম্বর্ধনায় উপাধি দেওয়া হলো—মেঘমন্দ্রিত প্রভাত (চু-চেন-তান)। জাপানেও তিনি ও তাঁর সাহিত্য আদৃত, যদিও ন্যাশনালিজমের বন্যার ভৌগোলিক অপদেবতার কথা তিনি বলেছিলেন।

এ কথা স্বীকার্য যে, ইংলণ্ডে ও অন্যত্র তাঁর কবি-খ্যাতির অবনতি ঘটে তাঁর জীবদ্দশাতেই, ক্রমশ তিনি ভারতীয় প্রফেট্ বা Dreamer বলেই গণ্য হন। বার্নার্ড শ' কথা কইছেন, রবীন্দ্রনাথ ধ্যানমগ্ন, এ ধরনের উক্তি আমরা শুনেছি। মুসোলিনী, রোমা, রবীন্দ্রনাথ ঘটনাটিও তার ইউরোপীয় খ্যাতিকে ম্লান করে। তবু ১৯২৭ সালেও দেখি যে, ইউরোপের একটি রাজ্য সরকার শেকস্পীয়র ও অস্কার ওয়াইল্ডের সঙ্গে তাঁর পুস্তক-গুলি 'Proscribe' করেন Anti-Social বা 'Immoral' বলে। ১৯৩৭ সালে নাজী প্রভাবের বিশিষ্ট দিনেও জার্মানীতে রবীন্দ্র-প্রভাব কিছুটা ছিল নিশ্চয়ই, তা না হলে স্বয়ং গোয়েবলস্ রবীন্দ্রনাথের নাম করে তাঁকে ধিক্কার জানান। খাস ইংলণ্ডেও অক্সফোর্ডে তিনি "হিবার্ট লেকচারস্" দিয়েছেন বিশ্ব-মনীষী হিসাবেই এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দেশিকোত্তম উপাধি দেন সাহিত্য-কৃতিত্বের জন্য, কারণ, তিনি ছিলেন **"most dear to all the muses".**

এ কথা অবশ্য সত্য যে, আজ খাস ইংরাজী ভাষাভাষী দেশে, অর্থাৎ ইংলণ্ডে, আমেরিকায়, কানাডায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোন উচ্ছ্বাস নেই, তাঁর সম্বন্ধে আজকের সুধীদের ধারণাও অস্পষ্ট (ইংরাজীতে রবীন্দ্রনাথ—বুদ্ধদেব বসু দেশ, মাঘ ১৩৭২) এবং এটাও ঠিক যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের অক্ষম ইংরাজী অনুবাদ তার

একটি কারণ। যদিও বুদ্ধদেববাবুর মতে, অনুবাদগুলির ইংরাজী অনেক সময়ই কৌতুকাবহ এবং অনেক সময়ে An insult to the Original, যেমন পতিতা —A lover's Gift), তবু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ইংরাজী গীতাঞ্জলি এক আশাতীত বিস্ময়কর ব্যাপার। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর কালে ভারতের বাইরে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা হয়েছিল, কতটা সফল হয়েছে জানি না, অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়া বা চেকোস্লোভাকিয়া ছ ড়' মার্কিন কবি রবার্ট ফ্রস্ট বলেই বসলেন, ***"It is fine to hear that he's (Tagore) still a living force in India (Nov. 1961)*** রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুবাদের কথা বলতে পারি না, কিন্তু তাঁর নিজের ইংরাজী সৃষ্টি বৃহৎ বা মহৎ না হলেও ইউরোপের কাব্য-চেতনায় সে যুগে এক নূতন অনুভব ও রীতি এনে দিয়েছিল। বাংলা রবীন্দ্রনাথ আজও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লিরিক কবি।

এই প্রসঙ্গে লেখকের অন্য পুস্তকের মতামত নিয়ে আলোচনা হয়তো ঠিক

অতুল বসুর গত ৫০ বছরে আঁকা ছবির প্রদর্শনী

১৯১৮ সালের কথা। কলিকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করে এক তরুণ যুবক অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে কর্মজীবনের পথে পদক্ষেপ করলেন। সম্বলের মধ্যে রঙ ও তুলি, আত্মবিশ্বাস ও মনে ক্ষীণ অথচ অদম্য এক আশা—লন্ডন রয়াল আকাডেমি অব আর্টস-এ উচ্চশিক্ষা লাভ করা। কিন্তু সে আশা সত্যই সুদূর-পরাহত—কারণ তাঁর না আছে অর্থ না আছে ধনী কোনও পৃষ্ঠপোষকের সংগে জানাশোনা। দেখতে দেখতে চারটি বৎসর কেটে গেল। শেষে তাঁর বড় ভাই বললেন—আশু মুকুজ্যের সংগে দেখা কর। আশু মুকুজ্যে—অর্থাৎ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। যুবক প্রথমে নিরুৎসাহ হলেন, পরে সাহস সঞ্চয় করে তাঁর সংগে দেখা করতে গেলেন। দেখা হল, উদ্দেশ্যও বললেন। অন্য একদিন আসার আদেশ হল। আশুতোষ স্নানের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন—চারকোল মাধ্যমে যুবক অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর প্রতিকৃতি স্কেচ করে ফেললেন।

দেখে আশুতোষ খুবই খুশী। পিঠ চাপড়ে প্রশ্ন করলেন—কি চাস? I want to see through, উত্তর দিলেন যুবক। পরের ঘটনা আশাতীত। আশুতোষ যুবককে গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি দিয়ে ইংলন্ড পাঠিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। যুবকের নাম অতুল বসু। যে ছবিখানি এঁকে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তিলাভ করলেন, সেটিও অনেকের পরিচিত—পবিত্র উপবীত রেখাসহ নগ্নগাত্র তেজোদীপ্ত আশুতোষের সেই প্রতিকৃতিখানি 'বেংগল টাইগার' নামে খ্যাত। সম্প্রতি আকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর উদ্যোগে আকাডেমির পূর্ব ও দক্ষিণদিকের গ্যালারীতে তাঁর গত ৫০ বছরে (১৯১৬—১৯৬৬) আঁকা বিভিন্ন প্রতিকৃতি ও ড্রয়িংএর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ এবং সেই সূত্রে আকাডেমিতেই শ্রদ্ধেয় শিল্পী অতুল বসুর সংগে কথা হচ্ছিল।

"স্যর আশুতোষের যখন মৃত্যু হয় আমি তখন বিলাতে", বললেন অতুল বসু। "কাগজে সংবাদ পড়ে আমি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ি। ও'র স্কেচের একটি ফটোগ্রাফ আমার কাছে ছিল—সেটা নিয়ে London Times অফিসে যাই—পরের দিনের কাগজে সে ছবি তাঁরা ছেপেছিলেন।" কথা শেষ করে নিজের আঁকা ছবিগুলির দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তিনি।

অতুল বসু মুখ্যত প্রতিকৃতি শিল্পী। তাঁর ড্রয়িং ও প্রতিকৃতির নিদর্শন বিচার করার পূর্বে তাঁর সমসাময়িক যুগের কথা প্রথমেই মনে রাখা উচিত। প্রথাগতভাবে

যু রোকেত —ডেসমন্ড ডইগ

নিসর্গ ও বিষয়বস্তু আঁকাই ছিল তদানীন্তন চিত্রকলার ধারা। শিল্পী অতুল বসুর বৈশিষ্ট্য তিনি প্রতিকৃতি চিত্রণ বেছে নেন ও প্রতিকৃতি অংকনেই স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দেন।

দীর্ঘ শিল্পীজীবনে অতুল বসু বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রতিকৃতি এ'কেছেন—কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন লন্ডন রয়াল আকাডেমি অব আর্টস, রাষ্ট্রপতি ভবন, লোকসভা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও কলিকাতা বিধানসভায় রক্ষিত আছে। সুতরাং সেগুলি প্রদর্শনীতে আনা সম্ভব হয়নি। তাহলেও বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত মোট ১৭৫খানি ড্রয়িং ও প্রতিকৃতির নমুনা প্রদর্শনীতে পেশ করা হয়। তার মধ্যে কয়েকখানি শিল্পী ইতিপূর্বে আকাডেমির স্থায়ী গ্যালারীতে দান করেছেন। অংকনকালের ক্রমানুসারে রাখার ফলে শিল্পীর বিবর্তনশীল মানস ও অংকনরীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

শিল্পীর ছাত্রাবস্থার কাজ থেকেই প্রাথমিক অংকনবিদ্যায় প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায়। ছোট ছোট নানা ড্রয়িং দেখে বোঝা যায় যে, শিল্পী পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে প্রাথমিক বিদ্যাটুকু আয়ত্ত করেন। বস্তুত কয়েকটি ড্রয়িং-এ গ্রাফিকের সূক্ষ্ম কাজের পরিচয় পাই। শুধু তাই নয়, মানবদেহের বিভিন্ন অবয়ব ও তাদের সমষ্টিগত রূপ বিশ্লেষণ করার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখা যায় এই শিল্পীর বিভিন্ন ড্রয়িং-এর মধ্যে। যেমন বেগার ওম্যান, মজদুর রমণী, ফিমেল ফিগার ইত্যাদি। চেহারার সাদৃশ্য ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যটুকু ফুটে উঠলেই প্রতিকৃতি রচনা হয়ে ওঠে সার্থক ও সুন্দর। সেদিক থেকে বিচার করলে অতুল বসুর সমকক্ষ প্রতিকৃতি শিল্পী খুব কমই আছেন। বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতির মধ্য দিয়ে পুরুষ সিংহের যে রূপটুকু শিল্পী ব্যক্ত করেছেন, তার তুলনা নেই। অন্যান্য প্রতিকৃতির মধ্যে ডাঃ বিধান রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ ও বিশেষ করে ১৯২২ ও সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে ১৯৬২ সালে আঁকা শিল্পীর নিজের দুইখানি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রতিকৃতি অপূর্ব। দুখানির মধ্য দিয়েই বয়সোচিত বিশেষত্বটুকু ফুটে উঠেছে। টিবেটান টিটবিট ও নরেন বসুর প্রতিকৃতিও উল্লেখযোগ্য—প্রতিকৃতি হিসাবে শিল্পীর কাছেও এ দুখানি মূল্যবান।

ডেসমন্ড ডইগের ছবি

ডেসমন্ড ডইগও সম্প্রতি আকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। সাংবাদিক হলেও ডেসমন্ড ডইগ শিল্পী হিসাবেও সুপরিচিত—স্থানীয় এক ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্রে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত তাঁর স্কেচ অনেকেই দেখেছেন। প্রদর্শনীতে শিল্পী কালি কলম তুলির স্কেচ ও তেলরঙে আঁকা ছবির নিদর্শন পেশ করেন।

ডেসমন্ড ডইগ যে কেবল কলম চালনা করেন না, তুলি চালনাতেও তিনি সুপটু সেটা তাঁর কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের বিভিন্ন স্কেচ দেখে বোঝা যায়। শিল্পী বিদেশী হলেও এদেশের অতীত ঐতিহ্য ও বিশেষ করে ইতিহাসের অনুরক্ত। তাই স্কেচ বুকসহ ইতিহাস প্রসিদ্ধ নানা স্থানে তিনি ঘুরেছেন এবং যে মন্দির ও সৌধ ভাল লেগেছে সেটিই সযত্নে কালি কলম তুলি মাধ্যমে এ'কে নিয়েছেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ শিল্পী কলিকাতার বহু পুরাতন ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নানা সৌধ,

গির্জা ও মসজিদের স্কেচ করেন। এগুলি বাস্তবধর্মী ও এর মধ্যে অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছে। তা হলেও পুরাতন টাউন হল, নাখোদা মসজিদ, বর্ধমান রাজপ্রাসাদ ও নিউ মার্কেট ফুলের স্টল উল্লেখযোগ্য। অপরাপর স্কেচের মধ্যে বুদ্ধ গয়া ও পুরীর মন্দির চোখে পড়ে।
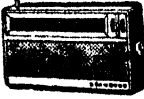
তেলরঙে আঁকা ছবির মধ্য দিয়ে কিন্তু শিল্পীর অন্য পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে সোচ্চার মুখর ও উজ্জ্বল, বিশেষ করে লাল রঙ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যেন শিল্পীর তরুণ মনের সন্ধান পাই, অপরদিকে কয়েকটি বিমূর্ত রচনায় তাঁর প্রগতিবাদী অঙ্কনরীতির পরিচয় পাই। বিশেষ করে অতি সরলভাবে আঁকা কয়েকটি প্রতিকৃতি রঙ মনোনয়ন ও ব্যবহার গুণে সহজেই চোখে পড়ে—যেমন আনা ও জয়। চারিত্রগত বৈশিষ্ট্যের জন্য তিব্বতীর নির্দশন উল্লেখযোগ্য। বিমূর্ত রচনার মধ্যে সূর্য মন্দিরের নাম করা যেতে পারে। সুপরিকল্পিতভাবে বিভক্ত শূন্য স্থানকে ভিত্তি করে কয়েকটি অর্ধবস্ত্র সহযোগে শিল্পী সূর্য মন্দিরের রূপটুকু প্রকাশ করেছেন। তবে এ শ্রেণীর সব কয়টি নিদর্শনই রসোত্তীর্ণ হয়নি। যথা একস্টেটিক রেড। রচনা, নীল ও লাল রঙ ব্যবহার ও বৃত্তাকার ব্রাশের টান বা আঁচড়ের মধ্য দিয়ে সুসম্বন্ধ সমষ্টিগত রূপের পরিবর্তে যেন বিচ্ছিন্নতার শিথিল রূপই ফুটে উঠেছে।

বরদা উকিল

গত ২রা অকটোবর দিল্লী উইলিংডন নার্সিং হোম-এ অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্রাফটস সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যান বরদা উকিল পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের শিল্পজগতের যে ক্ষতি হল, তা সহজে পূরণ হবে না।

শিল্পী পরিবারে শিল্পী ভ্রাতাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা কর্মঠ ও উৎসাহী এবং সংগঠন করার শক্তিও ছিল তাঁর। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষভাগে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সারদা উকিলসহ তিনি দিল্লী যান ও সেখানে বসবাস করতে শুরু করেন এবং চিত্রকলা প্রচার ও প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সারদা উকিল আর্ট স্কুল স্থাপনা করেন সম্ভবত ১৯২৬ সালে। বস্তুত এই স্কুল স্থাপন করে তিনিই স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে চিত্রকলাপ্রীতি জাগিয়ে দেন। অতঃপর দেশ ও বিদেশের রসিক সমাজ, বিশেষ করে ধনী সম্প্রদায়ের কাছে খ্যাতনামা ভারতীয় শিল্পীবৃন্দ রচিত চিত্রসম্ভারের পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে তিনি তদানীন্তন ইংরাজী শাসকবর্গ থেকে শুরু করে দেশের স্বাধীন নৃপতিদের সঙ্গে যোগাযোগ ও মেলামেশা করেন এবং এইভাবে বহু শিল্পীকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেন। ১৯৩১ সালে তিনিই লণ্ডন ও প্যারী শহরে প্রথম ভারতীয় চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।

তবে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি—দিল্লীর রফি মার্গ-এ অবস্থিত অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্রাফটস সোসাইটি AIFACS। নিজের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম এবং কয়েকজন শিল্পীর সক্রিয় সহযোগিতায় তিনি ১৯৩০ সালে এই সংস্থাটি স্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গে শিল্পী অনিল রায় চৌধুরী, নগেন ভট্টাচার্য, ডি বদ্রী, সুশীল সরকার, কৃষ্ণ চৈতন্য, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও অপর কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমান বিরাট সৌধ ও প্রেক্ষাগারও তাঁরই একান্ত চেষ্টায় গড়ে ওঠে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় জমি ও অর্থ তিনিই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আদায় করেন, কিস্তিহারে শোধ দেবার শর্তে। চিত্রকলা বিষয়ক ষান্মাসিক "রূপলেখা" পত্রিকাখানিও তিনি ফাইন আর্টস সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রকাশ করতে শুরু করেন ১৯৩০ সালে।

শিল্পকলার সেবা ও শিল্পীদের সাহায্য করাই ছিল বরদাবাবুর জীবনের ব্রত। চিত্রকলা সম্বন্ধীয় নানা কমিটির সভ্য হিসাবে তিনি ভারতের বহু শিল্পীকে কাজ ও অর্থোপার্জনের সুযোগ দিয়েছেন। শিল্পীদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন। ফাইন আর্টস সোসাইটির স্থায়ী গ্যালারীর জন্য তিনি খ্যাতনামা বহু শিল্পীর ছবি সংগ্রহ করেছিলেন। অসুস্থ থাকাকালীন হাসপাতালের শূন্য দেওয়াল তাঁর চিত্তকে পীড়িত করে তোলে। আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধববিচ্ছিন্ন রোগীদের যন্ত্রণাকাতর মুখে হাসি ফোটাবার জন্য তিনি হাসপাতালের ঘরে ঘরে ছবি রাখার ব্যবস্থা করেন এবং সুপরিচিত শিল্পীদের আঁকা ৪০।৫০খানি ছবি পাঠিয়ে দেন। বলা বাহুল্য, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞতা সহকারে এই দান গ্রহণ করেন।

আগেই বলেছি সংগঠন করার শক্তি ছিল তাঁর অসীম। তাই ললিতকলা আকাডেমি স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকেই সচিবের দায়িত্বপূর্ণ পদ অধিকার করতে অনুরোধ করেন এবং তিনিও তা গ্রহণ করেন।

দীর্ঘদেহ বরদাবাবুর চেহারা ও চালচলনের মধ্যে আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যেত। তিনি লোকজন ভালবাসতেন; শিল্পী ও বন্ধুবর্গ পরিবৃত হয়ে গল্প করা ছিল তাঁর নেশা। ফাইন আর্টস সোসাইটির পুরাতন সভ্য হিসাবে দীর্ঘকাল তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলাম। অনেক কথা মনে পড়ে, সব কথা বলার স্থানও নেই। তবে একথা অবশ্যই বলব যে, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পজগতের এক বিশিষ্ট যুগের অবসান হয়ে গেল। দেশের শিল্পীদের সঙ্গে আমিও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

—চিত্রপ্রিয়

ট্রামে-বাসে'র যাত্রীদের বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ জানাইতেছি এবং এই সঙ্গে এই কথাটাও তাঁহাদের জানাইতেছি যে, এই অপরিহার্য কার্য সম্পাদনে খুড়ো শ্যামলাল-সহযাত্রী সঙ্ঘও খুব প্রীত হইয়াছেন কেন না আলিঙ্গনাদি অন্তে অন্তত একটা দালাদারের খরচও আমাদের হয় নাই এবং আশা করি আপনারাও প্রীত হইবেন এই মনে করিয়া যে অনুরূপ খরচ হইতে আপনারাও অব্যাহতি পাইলেন।

পূজার আগে কয়েকদিন ধরিয়া সকলের মুখে মুখে শুধু শুনিয়াছি যুক্তফ্রণ্ট গেল গেল গেল। ক'দিন পরেই আবার সকলের নাসারন্ধ্র নিঃসৃত স্বস্তির নিশ্বাস আসিয়া গায় লাগিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিশু খুড়ো একটা গল্প শুনাইলেন, বলিলেন: "অজ পাড়াগাঁয়ের জমিদার তাঁর প্রজাদের খাওয়াবার জন্য লুচির ব্যবস্থা করলেন এবং লুচি তৈরির জন্য কলকাতা থেকে কারিগর আনালেন। ঘটনাটা বহুদিন আগের। গাঁয়ের দরিদ্র চাষীরা কোন দিন লুচি খায়নি, লুচি কী করে তৈরি হয় তা-ও তারা কোনদিন দেখেনি। যথা দিনে সবাই এসে জিয়ানদারকে ঘিরে দাঁড়ালেন লুচি তৈরি দেখতে। গরম ঘি-এর কড়াতে লেচিগুলো ছেড়ে দেওয়ার পর যখন দেখা গেল লেচি ঘি-য়ে ডুবে গেল তখন চাষীদের বুড়ো মোড়ল চীৎকার করে উঠল—ওরে সব্বোনাশ হয়ে গেলরে, লুচি ডুবে গেল। সকলের মুখেই তখন নৈরাশ্যের ছাপ। খানিক বাদেই যখন লেচিগুলো গরম ঘি-তে ভাজা হয়ে ওপরে ভেসে উঠল তখন বুড়ো আবার সহাসে চীৎকার করে উঠলেন—ওরে, ভয় নেই, লুচি ভেসেছে।" গল্প শেষ করিয়া বিশু খুড়ো বলিলেন—"যুক্তফ্রণ্টের ডুবে যাওয়া এবং ভেসে ওঠার খবর শুনে অনেকদিন পর লুচির গল্প মনে পড়ল।"

সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিম জারমানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্ত উদ্যোগে এক শ্রেণীর নূতন ধরনের ট্যাঙ্ক তৈয়ার করা হইয়াছে, সেইগুলি জলে ডুব দিয়া নদীর এক পাড় হইতে অন্য পাড়ে চলিয়া যাইতে পারে। সহযাত্রী বলিলেন—"ডুবে ডুবে জল খাওয়ার জন্য চীনও এক ধরনের ট্যাঙ্ক আবিষ্কার করেছে, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন।"

একটি সংবাদে শুনিলাম খাদ্যনীতি সম্পর্কে ফ্রণ্ট, মন্ত্রিসভা এবং অফিসারে নাকি মতভেদ হইয়াছে।—"আশ্চর্য কিছু নয়, রুচি বিভিন্ন হতে বাধ্য, সন্দেশ ফেলে অনেককে গপগপ শুঁটকি গিলতেও দেখা গেছে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ সর্বভারতীয় চাকরি সম্পর্কে সুপারিশক্রমে বলা হইয়াছে যে, চাকুরিয়াদের যে-অঞ্চলে পাঠান হইবে সেখানকার ভাষা তাঁহাদের জানা দরকার। সহযাত্রী বলিলেন—"অন্য সব প্রচারের মাধ্যম ছেড়ে দিয়ে অহিন্দীভাষীদের হিন্দীভাষী অঞ্চলে পাইকিরি হারে চাকরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করুন, হিন্দী আপনা থেকেই শেখা হয়ে যাবে।"

শ্রীহুমায়ুন কবির নাকি বলিয়াছেন,—পশ্চিমবঙ্গে কার্যত কোন সরকার নাই। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু শ্রীকবির জানেন, বাজার সরকার নিশ্চয়ই আছে; অবশ্য অ-কবির শ্রেণীর গেরস্তরা নিজেরাই বাজার সরকার!!"

উদ্ভিদবিদরা অটোয়াতে নাকি একটি প্রাগৈতিহাসিক ফুল আবিষ্কার করিয়াছেন।—"প্রাগৈতিহাসিক ফুল চীনে আবিষ্কৃত হয়েছে বহু আগেই, একটি নয়, শতে শতে"—বলেন বিশু খুড়ো।

ফিলিপিনে নাকি গোঁফ রাখা নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারি করা হইয়াছে। সহযাত্রী সুকুমার রায়ের কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন—"গোঁফকে বলিস আমার তোমার, গোঁফ কি কারো কেনা গোঁফের তুমি গোঁফের আমি তাই দিয়ে যায় চেনা"—এবং বলিলেন "গোঁফ না থাকলে যে সত্যি চেনা দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে, যেমন হয়েছে স্যার আশুতোষের বেলায়, সিনেমার পোস্টারে-পোস্টারে স্মৃতিস্তম্ভটি তো গেছেই, আর ক'দিন বাদে গোঁফটি ঢাকা পড়লেই 'সরস্বতী' অতলে তলিয়ে যাবেন!!"

আন্তর্জাতিক টুরিস্ট সপ্তাহে ভারতে 'বিশুষ্ক দিবস' থাকিবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আমাদের এক সহযাত্রী জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"ফলং পান-দা দেবী সুরা পূর্ণা বসুন্ধরা!! বুঝিলাম এটা বিজয়ার সিদ্ধির ধকল।

Jai
BEAUTY SOAP

আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে ঘরোয়া আলোচনায় ইউকিও মিশিমা

কলকাতার ডায়েরি

আসল নাম কিমিতাকে হিরকা, কিন্তু সবাই চেনেন ইউকিও মিশিমা বলে, শেষের নামেই তিনি বই লেখেন।

মিশিমার নাম প্রথম জানতে পারি গত বছর লাইফ ম্যাগাজিনে তাঁর সম্বন্ধে একটি চিত্র-সমাচার পড়ে এবং সেই বছরই আবার ওই নাম শুনি নোবেল পুরস্কারের অন্যতম প্রার্থীরূপে।

কেবল নামই, আর কিছুই জানা ছিল না তাঁর সম্পর্কে; পরে জানলাম মিশিমা আধুনিক জাপানের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। তাঁর লেখা 'স্বর্ণমণ্ডপ', 'তরঙ্গধ্বনি', 'নিষিদ্ধ আনন্দ' প্রভৃতি বই যেমন দুঃসাহসী, তেমন রসোত্তীর্ণ। জাপানের ঘরে ঘরে তাঁর বই, মুখে মুখে তাঁর নাম।

সেই মিশিমা সম্প্রতি এসেছিলেন ভারত দর্শনে, ঘুরতে ঘুরতে কলকাতায়। বছর বিয়াল্লিশ বয়স, কদম ছাঁট চুল, ঠোঁটে সব সময় হাসি, ইংরেজি বলেন চমৎকার। ছিলেন বড় সরকারী চাকুরে, সব ছেড়েছুড়ে এখন শুধু সাহিত্যসেবী। ঘুরেছেন প্রচুর, পড়েছেন তারও বেশি, বিশেষভাবে আকৃষ্ট ফরাসী মনোবিকলন রীতিতে।

মিশিমা কলকাতায় এসে প্রথম আসর বসান ভারত-জাপান মৈত্রী সমিতি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে। সেখানে সমবেত হন বাংলা দেশের তরুণ-প্রবীণ কয়েকজন লেখক। সেখানে নয়, মিশিমার সঙ্গে আমার পরিচয় আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে এক ঘরোয়া আসরে। আমার মত দু'চারজন অ-সাহিত্যিক ছাড়াও এই আসরে ছিলেন বাংলা দেশের নামকরা কয়েকজন কথাশিল্পী ও কবি। দু দেশের সাহিত্যধারা কোন্ ধরনে কেমন চলছে তাই ছিল আলোচনার বিষয়।

মিশিমা জানালেন, তাঁর নিজের লেখার রীতি।—"প্রথমে দৃশ্য আর পটভূমি বেছে নিই, পরে প্লটটাকে সেই পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করি। বিষয় যা খুশী। খবরের কাগজ থেকেও উপাদান পাই, এমন কি পুলিশ রিপোর্টও প্লটের সন্ধান দেয়।"

চারখণ্ডে বিরাট উপন্যাস রচনায় এখন ব্যস্ত আছেন মিশিমা। প্রথম খণ্ড শেষ, দ্বিতীয় খণ্ডের উপাদান সংগ্রহ করতে আরও লাগবে পাঁচ বছর। উপন্যাসের বিষয় জন্মান্তরবাদ।

জন্মান্তরবাদের প্রসঙ্গে মিশিমা বললেন কাশীতে তাঁর অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা। বারাণসীর মহাশ্মশান তাঁর কাছে ভয়াবহ মনে হয়নি। গঙ্গার ঘাট, আর উদার আকাশের মাঝখানে চিতার আগুন দেখে বরং মনে হয়েছে এইতো স্বাভাবিক, মৃত্যুর পর আমাদের সকলের তো ওই একই পরিণতি। মিশিমা ভারতে এসে দেখেছেন ভারতীয় নাচ, শুনেছেন সেতার, ঘুরেছেন ঔরঙ্গাবাদ, জয়পুর, অজন্টা ইলোরা, কিন্তু বারাণসীর তুলনা নেই।

কলকাতায় এসে কালীঘাটেও গিয়েছেন, সেখানে দেখেছেন পশুবলি, আর দেখেছেন দুর্গোৎসব। কাশীর শ্মশানের পর

আর একটি তাঁর অবিস্মরণীয় স্মৃতি কলকাতার এই দুর্গা প্রতিমা।

মিশিমা দিন কয় কলকাতায় কাটিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছেন। এই সফরে তিনি কতখানি লাভবান হয়েছেন তিনিই জানেন, আমাদের লাভ তাঁরই দৌলতে আমরা কিঞ্চিৎ পূর্বমুখী হলাম। অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের চেষ্টায় শিল্পকলার ক্ষেত্রে আমরা একবার হাত বাড়িয়েছিলাম চীন-জাপানের দিকে, কিন্তু সাহিত্যের বেলায় আমরা বরাবরই পশ্চিমের প্রত্যাশী। ইংল্যানডে-আমেরিকায়, জারমানি-ফ্রানসে, সাহিত্যশৈলী নিয়ে যা ঘটছে সবই আমাদের নখদর্পণে, কিন্তু চীন-জাপান কিংবা ইনদোনেশিয়া কোরিয়ার কোন খবরই আমরা রাখি না। জাপানী লেখক বলতে চিনি একমাত্র নোগুচিকে আর জানি কিছু হাইকু কবিতা, কিন্তু তাছাড়াও যে আরও অনেক শক্তিধর সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেছেন জাপানে সেই সংবাদ বাংলা দেশে অজানা।

দীর্ঘকাল আগে জাপানী মনীষী কাউণ্ট ওকাকুরা এদেশে এসে স্বদেশমন্ত্রে প্রথম দীক্ষিত করেছিলেন আমাদের, প্রভাবিত করেছিলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের; আশা করব ওকাকুরার দেশের লোক মিশিমার সংগে আমাদের পরিচয়ও এদেশের সাহিত্য রসিকদের শুধু পশ্চিমমুখোই রাখবে না, পূবের সংগে যোগসূত্র রচনার পথ প্রশস্ত করবে।

*

"তাই মনে রঙ ধরে সুগন্ধে ঘনায় রবীন্দ্র সংগীতে / নন্দিত জীবনের

সুচিত্রা মিত্র

নির্ভীক অজস্র রঙে ফুল ফোটে / সার্থক জন্মের মাগো শিকড় ছড়ায় বাহিরে ও ঘরে/সর্বত্র বাস্তব/অলৌকিক বাগানে অন্দরে অন্ধকারে পাথরে কাদায় ভিজে/অন্তরে অন্তরে গানে গানে মাটিতে কাঁকরে জীবনের ভিতে।"

অনেকদিন আগে লেখা বিষ্ণু দে'র একটি কবিতার অংশ। কবিতার প্রেরণা রবীন্দ্র সংগীত—সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে, সেই সুচিত্রা মিত্র যাঁর সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অনেক আগে লিখেছিলেন, "সে পৌঁছেছে রবীন্দ্র সংগীতে সিদ্ধির চরম বিন্দুতে। তার ছন্দোজ্ঞানও অসামান্য। মেয়েরা সচরাচর তালে খাটো হয়, কিন্তু সুচিত্রা নিখুঁত; মনে হয় দিনেন্দ্রনাথ বুঝি ফিরে এলেন।"

রবীন্দ্র সংগীত আমার প্রিয়, সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে হয় প্রিয়তর, তাই বিষ্ণু দে এবং ধূর্জটি মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে আমার সায় তো আছেই, আছে বাংলা দেশের আরও অনেকের। এবং তাঁরা সবাই খুশী হন রবীন্দ্র সংগীত পরিষদ শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন শুনে। পূজার আগে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানটিতে কবি কন্যা শ্রীযুক্তা মীরা দেবী থেকে শুরু করে বাংলা দেশের বহু গুনীজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন; ছিলেন সর্বস্তরের রবীন্দ্র সংগীতানুরাগী। রবীন্দ্র সংগীত পরিষদকে ধন্যবাদ, তাঁরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন।

—চাণক্য

শিল্পে আধুনিকতা ১

আমরা গত দেড় বছর ধারাবাহিকভাবে উনিশ শতক এবং বিশ শতকের চিত্রকরদের চিন্তাধারা, জীবনযাপন এবং শিল্পকীর্তির সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছি। এ পর্যায়ে আর অধিক বলবার প্রয়োজন নেই। মোটামুটি প্রথম আলাপের সামান্য পরিচয় হয়তো সম্ভব হয়েছে ইউরোপের চিত্রজগতের সঙ্গে, এবং সেটুকুই এই রচনাগুলির উদ্দেশ্য ছিল। অনেক বিশদভাবে, অনেক অনেক বিশদভাবে, আলোচনা আরো হওয়া দরকার সন্দেহ নেই, কিন্তু যে-দেশে অরিজিনাল ছবি নেই, এমনকি প্রিন্টও পাওয়া যায় না, ছবির বইয়ে হাত দিতে দামের কথা ভেবে, আমাদের কথা তো বাদ দিলাম, সচ্ছল বণিকও ছিটকে দূরে সরে যাবেন, সে দেশে আশা করা যায় না প্রথমেই সাধারণ মানুষ উৎসাহী হবে বিশদ আলোচনায়; উৎসাহী হলেও উদাহরণের অভাবে তার কাছে সবই অর্থহীন ঠেকবে সন্দেহ নেই; এমতাবস্থায় সিঁড়ির ধাপ অনুসারে চলাই শ্রেয়—এবং "আধুনিক চিত্রকলা" এই সোপান শ্রেণীর প্রথম ধাপ।

আসলে আরেকটাও অসুবিধা আছে। ইউরোপের সাহিত্য যেমন তার আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত ক্রমশ বর্ধমান, এবং এই মহীরুহের প্রতিটি ডাল, প্রতিটি পাতা, প্রতিটি শিরা ধরে বেয়ে আসা যায় শিকড়ে, কখনো এই গাছের বেড়ে ওঠায় ছেদ পড়ে নি, ঠিক তেমনি তার শিল্প উৎস থেকে বেরিয়ে বহু শাখানদীর জন্ম দিতে দিতে এখনো বইছে, উৎসের সঙ্গে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় নি, কোনো ঋতুতে কোনোদিন খাত শুকোয়নি, এক ধারাবাহিক ইতিহাসের মতো তার প্রবাহ। ভারতবর্ষেও উৎস ঠিক একই রকম প্রচুর ছিল, কিন্তু সাহিত্যের নদী বয়ে আসতে পারলেও, চিত্রকলা বয়ে-বার পথে শুকিয়েছে; খরা মাটিতে নিস্ফলা কেটেছে তার অনেকদিন। আমাদের দেশের ধ্রুপদী যুগের পর চিত্রকলা খণ্ড খণ্ড, খাড়ি উচ্ছ্বাস, অচেতন শিল্প হয়ে থেকে গেছে। তাই এই শতকে এসে সাহিত্যের বন্যায় যেমন কালিজাতে বাপঠাকুরের জোর আসে, ছবির ব্যাপারে তেমনি গুটিয়ে যাই আমরা —পৈতৃক ভিটে পড়ে গেছে, খেতের লুটিয়েছে ধুলোয়, বহু দূরে ছিটকে পড়েছি, একবার মনে হয় পুরোনো ভিটে আঁকড়ে ধরি, একবার ভাবি গ্রাম-বাংলায় মেঠো হব, কখনো বা 'ধুস' বলে ইচ্ছে হয় 'চল বিলেতে'। সাহিত্য পথিমধ্যে কখনো মরুভূমিতে পড়েনি বলে আমাদের জীবনের সঙ্গে সে প্রবহমান —রক্তের অন্তস্থলে সে খেলা করে, অচেতনভাবে কবিতা মনে পড়ে, পিঠ টান করে বিদেশী সাহিত্য পড়ি—কিন্তু ছবি আমাদের মন থেকে দূরে সরে গেছে, নিজের ছবি বলে কিছু আর নেই, সাধারণ মানুষের শরীরের এই শিল্পমাধ্যমের সেলগুলো মৃত। —তাই বিদেশী চিত্রকলা বিষয়ে এতদিন আলোচনায় কখনো আমার সমালোচনার ছুঁচ আর কাঁচির খেলা দেখানোর ইচ্ছে হয়নি; কোটেশন, রেফারেন্স, টেকনিকাল টার্ম ব্যবহার করে মানুষের জীবন থেকে সরিয়ে নেবার দরকার বোধ করিনি—সামান্য গল্পচ্ছলে, মৃদুভাবে স্পর্শ করেছি শিল্পীদের, যাতে করে স্বামী অফিস গেলে সংসারী গৃহিণীর পড়তে পড়তে কৌতূহল জাগাতে পারে "আশ্চর্য তো এই মার্দিলিয়ানি নামে লোকটা!"

✻

"আধুনিক চিত্রকলা" বলতে আমি কি বুঝেছি সেটা বোধ হয় জানানো উচিত। পিকাসো কেন আধুনিক, রেমব্রান্ট কেন নন? আধুনিকতা অর্থ কি তাহলে সমকালীন? বর্তমান?—এই সব প্রশ্নের উত্থাপন করা বোধ হয় প্রয়োজন।—আধুনিকতা কথাটা ক্লিওপেট্রার চরিত্রের মতোই পিছল আসলে, অতএব তাকে ধরতে গিয়ে আমি এই আলোচনায় বহুবার পিছলে পড়ব, পাঠক আমাকে সাহায্য করবেন।

আধুনিক বলতে আমি সমকালীন বুঝি না। তা বুঝলে খুবই বিপদ, মেয়েদের প্রতি বছরের বেশবিন্যাসের মতো তাহলে প্রতি বছর, প্রতি মাসে শিল্পকে বদলাতে হবে—১৯৬০-এর ছবি ১৯৬১তে হয়ে উঠবে জাংক, হাস্যকর। সাহিত্য বা চিত্রকলা যেহেতু ফ্যাশান নয়, সেহেতু তার কাছে সত্যি বলতে "আধুনিক", "পুরোনো ধরন", "সমকালীন" এসব প্রশ্ন বড় নয়, আসল প্রশ্ন শিল্প হয়েছে বা হয়নি। আমি শিল্পের অমরতা না হলেও দীর্ঘ জীবনে বিশ্বাসী—খাদ্য, সেক্স, দুঃখ, রাগ এসবের মতোই চিরন্তন এবং সত্য তা। ভালো কবিতা চিরদিনই ভালো কবিতা, ভালো ছবি চিরদিনই ভালো ছবি। তবে এক ধরনের খারাপ শিল্প আছে যা সমসময়ের কয়েকটি বিশেষ অবস্থাকে নাড়া দিয়ে আকর্ষণীয় হয়—সেগুলোর ভালোত্ব কিংবা শিল্পত্ব অস্থায়ী। এই ধরনের শিল্পীরা অনেকটা বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যায়। তবে সর্বদা তাদের সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ সাহিত্যের ইতিহাসে যুগ-চিন্তাধারাকে তারা রক্ষা করে থাকেন। এই ধরনের শিল্পীদের নির্দিষ্ট করার জন্যই বোধ হয় "ষাটের কবি", "চল্লিশের গল্প লেখক" এই জাতীয় অনেক মার্কা বেরিয়েছে।

আধুনিকতার প্রশ্নে ফিরে আসি। শিল্পের একটা দিক ফর্ম এবং আরেকটি বিষয়। ফর্মের আধুনিকতা সম্ভব, মানুষের যেমন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে বহু নতুন অংক জানা হয়ে গেছে, তেমনি ফর্মেও

তো অংক, সেই অংকের পরিবর্তন সম্ভব, এমনকি হয়তো উন্নতিও। ফর্মের উন্নতি বা প্রগতি লক্ষ্য করেছিলেন স্বয়ং আরিস্টটল, তিনি ট্র্যাজেডিকে আধুনিক এবং এপিকের চেয়ে উন্নততর ফর্ম বলে স্বীকৃতি দেন। অতএব ফর্মের আধুনিকতা বিজ্ঞানের আধুনিকতার মতোই আবিষ্কার এবং অনুসন্ধান নির্ভর। কিন্তু শিল্প তো শুধু ফর্ম নয়, নয় ফর্ম ও বিষয়ের যৌগিক মিশ্রণ; শিল্প হল এই দুয়ের এক সম্পূর্ণ মৌলিক মিশ্রণ; অর্থাৎ দুয়ে মিলে এক, এক হলে কখনো আলাদা হবে না। অতএব শিল্পে বৈজ্ঞানিক ভাবে আধুনিকতা আরোপ করা খুব শক্ত। তা ছাড়া বিষয় তো বদলায় না শিল্পের, ফর্ম বদলায়। এবং সেই জন্যই আমাদের ফর্মের দিকে ঝুঁকতে হবে আধুনিক বা পুরোনো সেই বিচার নিরূপণ করতে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সাহিত্যের বা ছবির মধ্যে অংকের দিকটার আলোচনা করলেই একমাত্র 'আধুনিকতা' নিরূপণ করা সম্ভব। যদি আমরা এই প্রশ্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি তাহলে অতীতের সাহিত্যের সঙ্গে আজকের সাহিত্যের এক গভীর যোগসূত্র পাব, যেমন পাওয়া যায় আইনস্টাইনের সঙ্গে নিউটনের, নিউটনের সঙ্গে আরিস্টটলের। নিউটন যেমন আরিস্টটল থেকে যে-অংক আরম্ভ হল তারই একটি সোপান, এবং এই সোপান ধরেই আইনস্টাইন, এবং আজকের দু' বছরের যে শিশু-আইনস্টাইন সেও এই একই অংকে একটি ধাপ যোগ করবে, তেমনি সাহিত্যে জীবনানন্দ বা ইয়েট্স হোমার থেকে যে-অংক আরম্ভ হয়েছে তারই একটি ধাপ এবং প্রত্যেকেরই গুরুত্ব সম্পূর্ণ দৃষ্টি-কোণ থেকে সমান এবং মূল্যবান। অতএব দেখা যাচ্ছে আধুনিকতা হল অবিলম্ব-পূর্ববর্তী যে-ধাপ তারই এক নামান্তর। কিন্তু এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে এই সিঁড়ি সম্পূর্ণ ফর্মের দিক থেকে রচিত হল এবং ফর্ম তখনই চিরন্তন হয় যখন তা মহাশিল্পের মধ্য দিয়ে আসে। অতএব মহাশিল্পই একমাত্র আধুনিক হতে পারে, বুদ্ধদেবের মত 'সমকালীন' নয় তা।

শুদ্ধশীল বসু

রপ্তানি সমস্যা

মুদ্রা মূল্য হ্রাসের যা ছিল অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য সেই রপ্তানির সম্প্রসারণ কার্যক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। বিনিময় মূল্য পরিবর্তনের পরবর্তী বারো মাসে জুন ১৯৬৬ থেকে মে ১৯৬৭। ভারতের রপ্তানি শতকরা ১১ ভাগ কমে গেছে। আক্ষেপের কথা টাকার মূল্য হ্রাসের পর উদারভাবে উৎসাহ দেওয়া সত্ত্বেও অগ্রাধিকার শিল্পগুলি রপ্তানি বাড়াবার দিকে সচেষ্ট হয়নি। আমদানিও একই সময়ের ভেতর শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস পায়। সমগ্র পরিমাণের দিক থেকে রপ্তানির চাইতে আমদানির হ্রাস অপেক্ষাকৃত তীব্র হওয়ায় ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের বেশ খানিকটা উন্নতি ঘটে।

১৯৬৫-৬৬ সালের ৫ কোটি ১০ লক্ষ ডলার লাভের তুলনায় ১৯৬৬-৬৭ সালে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণের ১১ কোটি ৮০ লক্ষ ডলারে ক্ষয় হয়েছে। বর্তমান বছরের প্রথম চার মাসে সংরক্ষণ ৪ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার কমে গেছে।

শিল্পদ্রব্য রপ্তানির বহর

১৯৬৬-৬৭ সালে ইঞ্জিনীয়ারিং রাসায়নিক ও প্লাস্টিক দ্রব্য তৈরির শিল্পগুলির রপ্তানি মোটামুটি আগের বছরের স্তরেই ছিল। উদারভাবে লাইসেন্স দান, রপ্তানির জন্য নগদ টাকা সাহায্য এবং রপ্তানি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক মূল্যে লোহা ও ইস্পাত যোগান সত্ত্বেও এটা ঘটেছে।

জুন ১৯৬৬ এবং মে ১৯৬৭র ভেতর পাট দ্রব্য রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১১৬,৭০০ টন কমে যায়। টাকার বিনিময় মূল্য পরিবর্তন এবং সে সময় বিশ্বের বাজারে পাট দ্রব্যের দাম পড়ে যাওয়ায় ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন আরো বেশী হ্রাস পায়। পাকিস্তানের তীব্রতর প্রতিযোগিতার ফলে বিদেশের বাজারে ভারতীয় পাটদ্রব্যের চাহিদা বেশ হ্রাস পেয়েছে। পাকিস্তানে সস্তা দরে উৎকৃষ্ট জাতের কাঁচা পাট পাওয়া যায় বলে ভারতীয় শিল্প বেশী অভিজ্ঞতা ও উন্নত কলাকৌশলজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।

১৯৬৭ সনের জানুয়ারী থেকে জুন এই ছ মাসে ভারতের কার্পাস বস্ত্র ১৯৬৬ সালের একই সময়ের তুলনায় তীব্র রকম কমে আসে। সব ধরনের কার্পাস দ্রব্য রপ্তানি থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আয় শতকরা ২৯·৪ ভাগ হ্রাস পায়। উৎপাদন ব্যয় অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় ভারতীয় কার্পাস শিল্প দ্রব্য বিদেশের বেশীর ভাগ বাজারে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারছে না ঃ হংকং, পাকিস্তান, চীন, পর্তুগাল, স্পেন ও জাপানের মতো দেশ থেকে প্রতিযোগিতা বেড়ে গেছে।

ভারত কিছু দূর পর্যন্ত শিল্পোন্নত এবং তার শিল্প ব্যবস্থার দ্রুত বৈচিত্র্যকরণ হয়ে থাকলেও আমাদের রপ্তানির বেশীর ভাগ প্রাথমিক দ্রব্য যেমন চা, আকরীয় ধাতু, কাঁচা তুলো, তামাক অথবা সরল শিল্পসামগ্রী, যেমন পাট ও কার্পাস বস্ত্র, চামড়ার শিল্পদ্রব্য, তৈল ও তৈলপিষ্টক। আমাদের প্রধান ক্রেতারা হচ্ছে পশ্চিম য়ুরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা, পূর্ব য়ুরোপ এবং এশিয়া দূরপ্রাচ্যের ও আফ্রিকার দেশসমূহ। জাপানকে বাদ দিলে এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে খুব অল্প রপ্তানি করা হয়ে থাকে। এই দেশগুলির বেশীর ভাগ ভারতের প্রায় সমান উন্নয়নের স্তরে থাকায় আমাদের রপ্তানির বাজার হতে পারেনি।

সমৃদ্ধ দেশগুলির ভূমিকা

যুক্তরাজ্য, পশ্চিম য়ুরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, লাটিন আমেরিকা, রাশিয়া, পূর্ব য়ুরোপ ও জাপানের মতো শিল্পোন্নত এবং দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলি কেবল আমাদের রপ্তানির পথ খুলে দিতে পারে। এইসব দেশের সংগে বাণিজ্যের প্রসার ব্যাহত হচ্ছে সাধারণ বাজার গঠন এবং সমুদয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বাড়াবাড়ি রকমের প্রয়াসের মতো বাধানিষেধমূলক নীতি দ্বারা। নূতন ব্যয়ের উৎপাদন থেকে অব্যাহতি হবার জন্য যে সময় শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যকার শুল্ক-প্রাচীর ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, সে সময় বেশ খানিকটা প্রাকৃতিক সুবিধা আছে এরকম উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে জিনিসপত্র অগ্রসর দেশগুলিতে প্রবেশ করতে না দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। তা ছাড়া প্রাথমিক দ্রব্যমূল্যের ভীষণ ওঠা-নামার ফলে অনগ্রসর দেশগুলির (যাদের প্রধান রপ্তানি হচ্ছে প্রাথমিক দ্রব্য) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে কম লাভ হয়ে থাকে।

ভারতীয় টাকায় বাণিজ্য

তৃতীয় যোজনার প্রথম বছরে (১৯৬১-৬২) রপ্তানির মোট মূল্য স্বাভাবিক সীমা ৬৫০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে ৬৬০ কোটি টাকা হয়; তারপর বেড়ে গিয়ে ১৯৬৪-৬৫ সালে ৮১৬ কোটি টাকায় পৌঁছায় এবং পরের বছর সামান্য কমে ৮০৬ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ঐ বৃদ্ধির বেশীর ভাগই হচ্ছে ভারতীয় টাকা দেওয়া চলে এমন দেশগুলির সংগে বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ফল; পূর্ব য়ুরোপের দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানি ১৯৬০-৬১ সালে প্রায় ৫০ কোটি বেড়ে ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৫৭ কোটি টাকা হয়েছে। প্রাগুক্ত রপ্তানিকে আমাদের রপ্তানির বর্তমান স্তরের একটা বড়ো কারণ বলা যেতে পারে। অবশ্য তার ফলে টাকা দেওয়া চলে এরকম অঞ্চল থেকে ক্রয়ের উপর দেশ উত্তরোত্তর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। ইচ্ছামতো খরচ করা যায় এমন বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের উদ্দেশ্যে যে রপ্তানি তার সম্প্রসারণের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয়নি।

পূর্ব য়ুরোপ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য তাড়াতাড়ি কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে এবং শিল্পোন্নয়নের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম আমদানি করা গেছে। অন্যান্য দেশগুলি অবশ্য তাদের আমদানি উদার করেনি যাতে ভারত তার কেনাকাটা বাবত পাওনা মেটাতে পারে। যে ব্যবস্থায় ভারতীয় টাকা দেওয়া গেছে সেখানে বাণিজ্য ও সাহায্য পরস্পর সম্পূরক হয়ে উঠেছিল। ভারতকে প্রদত্ত অল্প ও মাঝারি মেয়াদের অর্থ সাহায্য পরিশোধ করাও সহজ হয়েছিল। ভারতীয় টাকা দেওয়া চলে বলে দীর্ঘ সময়ে বিস্তৃত প্রকৃত আকারে জিনিসপত্রের এরকম বিনিময় সম্ভবপর হয়েছে।

প্রাগুক্ত ব্যবস্থার অসুবিধা হল ভারতীয় টাকায় বাণিজ্যে মূল্যস্তর বিশ্ব-বাণিজ্যের অবশিষ্ট অংশের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ভারতীয় দ্রব্য চলতি আভ্যন্তরিক মূল্যে কেনা হয় বলে ভারতীয় উৎপাদনকারীদের প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের মুখোমুখি হতে হয় না অথবা বিক্রির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন না করলেও চলে। যে দেশে উৎপাদন-ব্যয় সম্বন্ধে চেতনা এবং বিদেশে বিক্রির জন্য উদযোগের অভাব, সেখানে ভারতীয় টাকায় বাণিজ্যের সুবিধা স্বভাবত আত্মতুষ্টির ভাব সঞ্চার করেছে।

শান্তিকুমার ঘোষ

সাহিত্য সংবাদ

আঁদ্রে মোরোয়া

আঁদ্রে মোরোয়া সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে জাঁ পল সার্ত্র প্রথম লাইনেই লিখেছিলেন, 'মঁসিয়ো মোরোয়া আর যাই হোন, আর্টিস্ট নন।' বড় নিষ্ঠুর সত্য এই মন্তব্য। মোরোয়া, যিনি গত ১৯৩৮ সাল থেকে অ্যাকাদেমি ফ্রাঁসে-র সদস্য, যিনি ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রায় সব কটা সম্মানজনক পদবী ও পদক পেয়েছেন, বহু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্য-কীর্তির জন্য সম্মানিত ডকটরেট দেওয়া হয়েছে যাঁকে সেই মোরোয়াকেও সাহিত্যশিল্পী বলা যায় না? সাহিত্যের বিচার এমনই নির্মম। আজীবন নিজেকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছেন, আরোহণ করেছিলেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে, পেয়েছিলেন প্রভূত বিত্ত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিচয় রইলো এই, কয়েকখানি সুখপাঠ্য জীবনীর লেখক।

তাঁর জীবনী গ্রন্থগুলির দোষগুণ আমরা পরে আলোচনা করছি, তার আগে মোরোয়ার শিল্প পরিচয় নিয়ে দু' একটি কথা বলা যেতে পারে। জীবনীগুলি ছাড়াও মোরোয়া অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছিলেন। সে-সব উপন্যাস কোথায় হারিয়ে গেছে আজ! সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর সম্বন্ধে লিখতে গেলে এখন লেখা হয়, ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে তিনি কয়েকখানা চমৎকার জীবনী লিখেছেন, যেমন, লইলা অথবা জর্জ সাঁদ-এর জীবন, অলিম্পিয়া অথবা ভিকটর হ্যুগোর জীবন, দুমা ত্রয়ী এবং স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং-এর জীবন। এর মাঝখানে তিনি অবশ্য দু-তিনখানা উপন্যাসও লিখেছিলেন। কি নাম সেগুলোর? দু'খানা না তিনখানা?

উপন্যাস লেখার এই ব্যর্থতার গূঢ় কারণটিও বেশ মজার। আঁদ্রে মোরোয়ার অধিকাংশ উপন্যাসই আত্মজীবনী-মূলক। উপন্যাসের আকারে যেখানে তিনি নিজের জীবনের কথা বলতে চেয়েছেন, সেখানে তিনি ব্যর্থ। আশ্চর্য, সেই লেখকই পরের জীবনী কি মনোরমভাবে ফোটাতে পেরেছেন। শিল্পী হিসেবে এখানেই তাঁর অসার্থকতা—যে-লেখক নিজের জীবনের উপলব্ধিগুলি গভীর ও অকপটভাবে ব্যক্ত করতে না পারেন, তাঁর রচনা কৃত্রিম ও চপল হতে বাধ্য। মোরোয়া এই কৃত্রিমতার শিকার। তাঁর সবচেয়ে পরিচিত উপন্যাস বেয়ারনার কিসনে (১৯২৬)—স্পষ্টত আত্মজীবনীমূলক—কিন্তু সেটা স্পষ্টত শিল্পের ভান, ভেতরে কোনো সারবস্তু নেই।

উপন্যাস লিখে ব্যর্থ হতে গিয়েই জীবনী লেখক আঁদ্রে মোরোয়ার জন্ম। ১৯১৯ সালে তাঁর একখানি উপন্যাস

আঁদ্রে মোরোয়া

প্রকাশিত হয়েছিল, 'নি আঁজ নি বেস্ত'—এই উপন্যাসটি শেলীর জীবন অবলম্বনে কল্পনাশ্রয়ী লেখা। উপন্যাসটি যৎপরনাস্তি ব্যর্থ হলো, কেউ পড়লো না। তখন তিনি তার মালমশলা ঢেলে সাজালেন, উপন্যাসের খোলস ছাড়িয়ে জীবনী হিসেবেই সেটাকে আবার প্রকাশ করলেন ১৯২৩ সালে। নাম দিলেন 'এরিয়েল'। সে বছরেই সেটার ইংরেজী অনুবাদ বেরুলো। ফ্রান্স-ইংলণ্ড-আমেরিকায় সে বই লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হতে লাগলো, অবিলম্বে মোরোয়া জনপ্রিয়তায় ফ্রান্সের লেখকদের প্রথম সারিতে অধিষ্ঠিত হলেন। তারপর শুরু হলো তাঁর জয়যাত্রা।

আঁদ্রে মোরোয়ার জন্ম ১৮৮৫-র জুলাই মাসে। ইহুদী পরিবারের সন্তান, আসল নাম এমিল সলোমন উইলহেল্ম হেরজগ—এ নাম পরিত্যাগ করে সাহিত্য ক্ষেত্রে ছদ্মনামেই পরিচিত হয়েছেন। আলজাস অঞ্চলে ওঁদের পরিবারের ছিল পশমের ব্যবসা, শিক্ষা সমাপ্ত করে মোরোয়া সেখানেই নিযুক্ত ছিলেন। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধে তাঁর ডাক পড়লো। ব্রিটিশ নবম স্কটিশ ডিভিশনে তিনি যোগাযোগ অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হলেন। ইংরেজ চরিত্র সম্পর্কে তিনি তখনই প্রথম উৎসুক হন—এবং যুদ্ধের পর প্রকাশিত হলো তাঁর মজার রচনা "কর্নেল ব্রামবল-এর নৈঃশব্দ্য" ইংরেজ চরিত্রের বিশ্লেষণ হিসেবে রচনাটি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে জনপ্রিয় হয়েছিল। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এই জাতের আরও দু'খানি বই লিখলেন। তারপর শেলীর জীবনী।

পর পর প্রকাশিত হতে লাগলো তাঁর অন্যান্য জীবনী গ্রন্থ: ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলি, বায়রন, টুর্গেনিভ, ভলটেয়ার, ডিকেন্স, শাতুব্রিয়াঁ প্রভৃতি।

জীবনী ছাড়া ইতিহাস সম্পর্কেও বই লিখেছেন অনেকগুলি। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস, ফ্রান্সের ইতিহাস, ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার ইতিহাস সবগুলিই গল্পচ্ছলে সরসভাবে লেখা, জনপ্রিয় হবার সর্বগুণসম্পন্ন। কিছুটা বিশ্লেষণধর্মী রচনা 'সম্রাট এডোয়ার্ড এবং তাঁর সময়' এবং এ বছর প্রকাশিত তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ 'প্রুস্ত থেকে কামু পর্যন্ত'।

যাই হোক, জীবনী গ্রন্থগুলিকে সর্বস্তরের পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার কৃতিত্ব অবশ্য তাঁর প্রাপ্য। প্রচুর ইতিহাস ঘাটাঘাটির পরিশ্রম করেছেন তিনি এবং উচিত সম্মান ও অর্থও পেয়েছেন যথোচিত। ইংলণ্ড আমেরিকায় তাঁর জনপ্রিয়তা কখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি—ইংরেজী জগৎ সম্পর্কে ফরাসীদের অনীহার অপবাদ তিনি অনেকখানি দূর করেছেন। একমাত্র ১৯৪০ এর ঘটনায় ফরাসীরা তাঁর প্রতি কিছুটা অভিমান করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি লণ্ডন বেতারে প্রচারকের কাজ নিয়েছিলেন। সরস লেখার মতন কথক হিসেবেও তাঁর অসামান্য গুণ ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের পতনের পর যখন অধিকাংশ ফরাসী লেখক-বুদ্ধিজীবীরা প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন—তখন মোরোয়া আমেরিকায় বিশ্রাম নিতে যান। এই ঘটনা তাঁর বহু স্বদেশবাসীকে ক্ষুণ্ণ করে। যাই হোক, ১৯৪৩-এ তিনি আবার আফ্রিকায় এসে যুদ্ধে যোগ দেবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এই সময়েই তিনি তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশ করেছিলেন, যার নাম, 'কোনো মানুষই সুখী নয়'।

৮২ বছর বয়সে, গত ৯ অকটোবর প্যারিসে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সনাতন পাঠক

শারদ সাহিত্য

সাহিত্য ও সংস্কৃতি। সম্পাদক ঃ সতীশকুমার বসু। চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ ঃ ১০ হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য ২·৫০।

তথ্য ও তত্ত্বমূলক বিবিধ রচনার সমাবেশে যথার্থ সংস্কৃতিসম্পন্ন পত্রিকা হিসেবে 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' এবারের শারদীয়া সংখ্যায় তার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সংগ্রহ করে রাখবার মতো যে কতিপয় পত্রিকা নজরে পড়ে আলোচ্য সংখ্যাখানি তাদের অন্যতম। এ সংখ্যার লেখকদের মধ্যে আছেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, অমিয়কুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রথীন্দ্রনাথ রায়, সুখময় মুখোপাধ্যায়, দেবকুমার চক্রবর্তী, দীপেন্দু চক্রবর্তী, প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, চিত্তরঞ্জন রায়, হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়, কণিকা সিংহ প্রভৃতি।

সাহিত্যতীর্থ। সম্পাদক ঃ রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। সাহিত্য তীর্থ ঃ ৬৭ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ২·০০।

সাহিত্যের সেবায় উৎসর্গীকৃত পত্রিকা হিসেবে 'সাহিত্য তীর্থ' সুধীজনকে পরিতুষ্ট করবে। প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প নাটিকা ও রসরচনা প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগেই বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের রচনা এই চতুর্দশ বার্ষিকী সংখ্যাখানিকে একটি মূল্যবান সংকলনে পরিণত করেছে।

অন্তঃপুরী। সম্পাদিকা ঃ আরতি সেন। ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·০০।

সাজে ও রচনা সম্ভারে একটি পরিচ্ছন্ন প্রকাশন হিসেবে এই শারদীয় বার্ষিকখানি সমাদর লাভ করবে। এ সংখ্যায় বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে আছেন ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, আশা দেবী, মনোজ বসু, নচিকেতা ভরদ্বাজ, সৈয়দ হোসেন হালিম, পরিজিত রায় প্রভৃতি। কটি ছোট গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা এবং একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস সংখ্যাখানির মর্যাদা রক্ষা করেছে।

ইমন। সম্পাদক ঃ অমিতাভ বসু। বলাকা সাংস্কৃতিক চক্র ঃ ১৩০/২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য ২·০০।

কৃষ্ণ ধর ও বাণী বসুর দুটি প্রবন্ধ ছাড়াও রাউনিংকে লেখা কীটসের কয়েকটি পত্রের অনুবাদ, মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও রাম বসু রচিত দুটি কাব্যনাট্য এবং পাঁচিশটি কবিতা আলোচ্য সংখ্যাখানির সম্পদ। কবিতা রচয়িতাদের মধ্যে আছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুশীল রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, শান্তিকুমার ঘোষ, মানস রায়চৌধুরী, রমেন্দ্র দেশমুখ্য প্রভৃতি।

শ্রীমতী। সম্পাদিকা ঃ শ্রীমতী আভা পাকড়াশী। ২৯ ওয়াটারলু স্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য ৩·৫০।

পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এবারের শারদীয়া সংখ্যাখানি রচনা সম্ভারে এবং অঙ্গিক সৌষ্ঠবে অধিকতর আকর্ষণীয়। এ সংখ্যায় উপন্যাস আখ্যায়িত চারটি বড়গল্প লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু ও জনমেজয়। সজনীকান্ত দাস ও নজরুল সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেন যথাক্রমে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। গল্প লেখকদের মধ্যে আছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর আশাপূর্ণা দেবী শিবরাম [illegible] মুখোপাধ্যায়, [illegible] ঘোষ, [illegible] প্রভৃতি। কবিতা [illegible] মণীন্দ্র রায়, [illegible] সরকার, [illegible] সেন, [illegible] প্রভৃতির কবিতা আছে। চারটি নিবন্ধ লিখেছেন [illegible] এ ছাড়া রম্যরচনা এবং অন্যান্য নিয়মিত বিভাগও অন্তর্ভুক্ত।

রঙ বেরঙ। সম্পাদক ঃ সুজিতকুমার নাগ। পম্পা পাবলিসিটি ঃ ৯৭ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·০০।

ছোটদের জন্য প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখা গল্পের একটি সুসম্পূর্ণ সংকলন। ছোটদের ভাল লাগবে নানা ধরনের গল্প থাকায়। লেখকদের মধ্যে আছেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত নরেন্দ্র দেব, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুখলতা রাও, শিবরাম চক্রবর্তী, বিমল মিত্র, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, বুদ্ধদেব বসু, মনোজ বসু, স্বপনবুড়ো, প্রমথনাথ বিশী, বনফুল, লীলা মজুমদার, জরাসন্ধ, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, সতীকুমার নাগ প্রভৃতি।

স্বরবর্ণ। সম্পাদক ঃ সমর বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮/১ শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য ১·৫০।

অতি-খ্যাত লেখকদের দ্বারা রচিত না হলেও 'স্বরবর্ণ'র শারদীয়া সংখ্যার প্রবন্ধ, কবিতা গল্প ও আলোচনার মধ্যে বেশ পুষ্ট সাহিত্যরসের আস্বাদ পাওয়া যায়। রচনাবলী সুপাঠ্য। সংখ্যাখানি প্রকৃত রসিকজনের ভাল লাগবে আশা করা যায়।

একতা। সম্পাদক ঃ অবু ঘটক। ১০৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, বহরমপুর। মূল্য ১·০০।

আকৃতি ও পৃষ্ঠা সংখ্যায় ছোট্ট হলেও গুণের দিক থেকে পত্রিকাখানি সুধীজনকে খুশি করার মতো একটি প্রকৃত সাহিত্য পত্রিকা। আলোচ্য শারদ সংকলনে লেখক তালিকায় আছেন মণীশ ঘটক, মানস রায়চৌধুরী, সামসুল হক, আনন্দ বাগচী, মহাশ্বেতা দেবী, অসিত গুপ্ত, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটক, বিমল বসু প্রভৃতি।

পরিচয়। সম্পাদক ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ২·৭৫।

'পরিচয়'-এর আলোচ্য সংখ্যাখানির বৈশিষ্ট্য, এতে শুধু ছোট গল্পই প্রকাশ করা হয়েছে। লেখকদের মধ্যে আছেন গোপাল হালদার, মহাশ্বেতা দেবী, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, অমল দাশগুপ্ত মিহির সেন, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যুবনাশ্ব আশুতোষ সরকার, দেবেশ রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরজিৎ বসু, প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায় গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনটি অনুবাদ গল্পও আছে—ওড়িয়া থেকে ভগবতীচরণ পাণিগ্রাহীর একটি, উর্দু থেকে কৃষণ চন্দরের একটি এবং অপরটি হিন্দী থেকে অমৃত রায়ের একটি গল্প। সংখ্যাখানি অবশ্যই সংগ্রহ করে রাখার মতো।

এষা। সম্পাদক ঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ। ১ যদু

ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা-২৬। মূল্য ২·০০।

প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্পের সমাবেশে আলোচ্য সংখ্যাখানি একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন। প্রমথ চৌধুরী ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি রচনার পুনর্মুদ্রণ ছাড়া এতে প্রবন্ধ লিখেছেন অন্নদাশংকর রায়, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নারায়ণ চৌধুরী। গল্প লেখকদের মধ্যে আছেন বনফুল, আশাপূর্ণা দেবী, অমল দাশগুপ্ত, আশা দেবী ও সত্যপ্রিয় ঘোষ। কবিতা লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, উমা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কবিরুল ইসলাম, নবনীতা সেন, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, মার্গারেট চ্যাটার্জী, জগদীশ ভট্টাচার্য এবং আরো কতকজন সুপরিচিত কবি। চেখভ, ভ্লাদিমির বেগোমোলক ও কৃষণ চন্দরের তিনটি গল্পের অনুবাদও এই সংখ্যার আকর্ষণ।

শুকসারী। সম্পাদকঃ মিহির আচার্য। ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৪। মূল্য ২·০০।

নিছক গল্পের সম্ভারে পরিপুষ্ট এই সংখ্যাখানি পত্রিকার ভিড়ের মধ্যেও দৃষ্টিতে পড়বে। জার্মান লেখক হাইনরিশ ব্যোল-এর একটি গল্পের অনুবাদ ছাড়া সবই মৌলিক রচনা। লেখকদের মধ্যে আছেন সম্পাদক স্বয়ং এবং রণজিৎ ভট্টাচার্য, বাসুদেব দেব, শান্তি দত্ত, ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখ আবদুল জব্বার, তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, অশোককুমার সেনগুপ্ত, অজিত চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র গুহ, উৎপল চক্রবর্তী, অসিত ঘোষ, অজিত মুখোপাধ্যায় ও খগেন্দ্র দত্ত।

স্বস্তিকা। সম্পাদক : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৭।১বি বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ২·০০।

প্রবন্ধ, গল্প, রম্যরচনা ইত্যাদির সহযোগে অন্য পাঁচটা পত্রিকার মতোই ছকে বাঁধা এই বিশেষ সংখ্যা। লেখকদের মধ্যে আছেন ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মাধবরাও গোলওয়ালকর, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ, চণ্ডী লাহিড়ী, শ্রীবিরূপাক্ষ প্রভৃতি।

নরনারী। সম্পাদকঃ সুবোধ মিত্র। ৭ নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·০০।

মুখ্যত চিকিৎসা ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ক এই জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকাখানির শারদীয়া সংখ্যাটি পাঠকদের সমাদর লাভ করবে। সুসম্পাদিত সংখ্যাখানিতে প্রবন্ধ লিখেছেন অন্নদাশংকর রায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, যজ্ঞেশ্বর রায় ও জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়। গল্প লিখেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু, সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখেছেন মোহন মিত্র। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের রসরচনাও উপভোগ্য। এছাড়া চিকিৎসা ও মনস্তত্ত্ববিভাগেও প্রাপ্তবয়স্কদের জ্ঞানার্জনের উপযোগী বিবিধ রচনা আছে।

সোনার কাঠি। সম্পাদকঃ সুকুমার রায়। দাম ২·৫০।

ছোটদের একটি নতুন মাসিক পত্রিকা "সোনার কাঠি"। এই শারদীয়া বিশেষ সংখ্যাটিই এর প্রথম সংখ্যা। সুনির্মল বসু, স্বপনবুড়ো, শিবরাম চক্রবর্তী, গোলাম মোস্তাফা, আশাপূর্ণা দেবী, অমিতাভ চৌধুরী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, মতি নন্দী, চিরঞ্জীব প্রভৃতি নামকরা লেখকদের লেখায় ভরা এ সংখ্যাটি। তার সঙ্গে আছে চণ্ডী লাহিড়ীর কার্টুন, মজার অংক, সুন্দর কটি ছবি এবং আরও অনেক কিছু। ভালো কাগজে রঙিন কালিতে ছাপা, প্রচুর ইলাস্ট্রেশনে ভরতি এবং চমৎকার একটি প্রচ্ছদে মোড়া এই সংখ্যাটি ছোটদের একটি আকর্ষণের বস্তু নিঃসন্দেহে।

অরণ্যদেব লী ফক

এতটা পথ এলাম, কিন্তু একটি মানুষও চোখে পড়ল না। এখানে কেউ কাজ করছিল; মোষ ফেলে রেখে সে পালিয়েছে।
গ্রামের মধ্যে লুকিয়ে আছে সবাই। সিংহের ভয়ে বাইরে বেরোচ্ছে না।

কেমন যেন একটা দম-আটকানো থমথমে আবহাওয়া!

খুকনরাজের প্রাসাদে ---
খুকনরাজ, তুমি ভাবছ, মানুষখেকো সিংহটাই অরণ্যদেবের ঘাড় মটকে দেবে, তাই না?
আজ্ঞে, ঘাড় মটকে দিলে তো আসল মজাটাই মাটি হয়ে গেল।

ছলে-বলে-কৌশলে অরণ্যদেবকে আমি এই প্রাসাদে নিয়ে আসতে চাইছি। এখানে আমরা স্বচক্ষে তার মৃত্যু দেখব। কী বলো হে বারুনা?
ঠিক বলেছেন, মহারাজ।
?

খুকনরাজের চক্রান্তের কথা অরণ্যদেব জানেন না। তিনি এগিয়ে চলেছেন ----
একটা সিংহ মরে পড়ে আছে!
5/7

এতক্ষণ পর্যন্ত একটা মানুষও দেখতে পাইনি। সবাই ভয়ে কাঁটা।

অরণ্যদেব!
ব্যাপার কী? এরা ঘন্টা পিটছে কেন?
তোমরা কি সিংহ দেখেছ?

সাধারণ সিংহ নয়, অরণ্যদেব, সেগুলি ভূত-সিংহ!
তাদের গায়ের উপরে এই রক্তের ছাপ রয়েছে!
?

সিংহ আসছে!
ফটক বন্ধ করো!
সবাই ভিতরে এসো!
!
ক্রমশ

প্রামাণিক চিত্রকারদের প্রতি

ব্যক্তিগত প্রয়াসে যাঁরা তথ্যচিত্র নির্মাণে ব্রতী, সরকার তাঁদের সহায় হবেন। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রী কে কে শাহ এই সদিচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, টেলিভিশনের যুগে . অল্পদৈর্ঘ্যের চিত্রের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। তা ছাড়া, বিদেশীরা ভারতীয় জীবনের উপর তৈরী তথ্যচিত্র দেখে ভারতবর্ষকে বিশেষভাবে জানবার সুযোগ পান। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী প্রামাণিক চিত্র-নির্মাতাদের আর একটি উপদেশ দেন। তিনি বলেন তাঁরা যেন প্রথমে কাহিনীচিত্র নির্মাণে সিদ্ধহস্ত হন। তা হলে প্রামাণিক চিত্র তৈরির কাজেও তাঁরা বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে পারবেন। প্রামাণিক চিত্র আরও ঘনবদ্ধ ও সার্থক হবে।

চিত্র-সমালোচনা

মহাশ্বেতা

বছরের পর বছর সিনেমার যে নাটক দেখে দর্শকেরা অভ্যস্ত অথচ অতিষ্ঠ নন, এবং যে ধরনের মেলোড্রামা পেয়ে, চোখের জল ফেলে আমোদপিপাসুরা সন্তুষ্ট, মহাশ্বেতা-য় (বি কে প্রোডাকশন্স) তা-ই সযত্নে উপস্থাপিত। নায়িকাপ্রধান কাহিনী (জরাসন্ধ রচিত), নায়িকার নাম মহাশ্বেতা। স্বভাবে চরিত্রে সতীত্বে সে যথাবিহিত আদর্শস্থানীয়া। স্বামীর অকালমৃত্যুর পর বিধবা মহাশ্বেতার নাটকীয় গল্প তার বারো বছরের ছেলেকে নিয়ে, যে মায়ের অপমান ও লাঞ্ছনা দেখে মুহূর্তের উত্তেজনায় দুশ্চরিত্র কাকাকে খুন করেছে (পিস্তলের গুলিতে)। বালক আদালতে অপরাধ স্বীকার করলেও এর প্রকৃত কারণ ব্যক্ত করেনি। অর্থাৎ মায়ের অপমানের কথা মুখ ফুটে বলা তার পক্ষে অসম্ভব। একমাত্র সিনেমায়ই বোধ হয় (নাকি মূলে গল্পেও তাই?) বারো বছরের ছেলে সরলভাবে সব কথা না বলে এই গভীর সুবিবেচনার পরিচয় দিতে পারে। [illegible] কাহিনী। অতএব জেলখানা এবং পর্যন্ত দয়ালু রাজ্যপাল বালকের দণ্ড লাঘবের ব্যবস্থা করেছেন। মাতা-পুত্রের উপাখ্যান, বলা বাহুল্য, অতিনাটকীয় আবেগে সিঞ্চিত। এই অংশে দর্শকের চোখ

পুরীতে নাবিক প্রোডাকশন্সের "দিবারাত্রির কাব্য" ছবির (পরিচালনা : নারায়ণ চক্রবর্তী ও বিমল ভৌমিক) বহির্দৃশ্য তোলা হয়—ছবিতে বসন্ত চৌধুরী ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

সজল হয়। মহাশ্বেতার দুরদৃষ্টের ঘটনা ছবির শুরু থেকেই। জমিদারপুত্র বিপত্নীক সতীনাথ তার ছোট ভাই রতিনাথের সঙ্গে মহাশ্বেতার বিয়ে ঠিক করে। রতিনাথের চরিত্র সংশোধনের জন্যই সতীনাথের এই ব্যবস্থা। বিয়ের লগ্নেই মহাশ্বেতাকে পলায়ন এবং ওই রাত্রে মহাশ্বেতার পিতৃ-বিয়োগের পরই মেলোড্রামার আসল সূত্রপাত। এ-হেন কাহিনীর মাধ্যমে দর্শককে যতখানি আবেগসুখ দেওয়া সম্ভব পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায় তা দিয়েছেন। উপরিপাওনা হিসাবে রয়েছে তাঁর সুষ্ঠু প্রয়োগকর্ম।

পরে মহাশ্বেতা কেমন করে সতীনাথ-গৃহিণী হল সে অন্য কাহিনী। আকস্মিক ঘটনার যোগাযোগ এ ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সতীনাথ কেমন করে তারই বাড়িতে দিনের পর দিন রতিনাথ এবং তার শাশুড়ী ও মামাশ্বশুরের অসদাচরণ ও খলতা সহ্য করল তা ভাবতে অবাক লাগে। এ যেন অনেকটা হিন্দী ছবির মত। দুরাচারীর অত্যাচার যত চরমে ওঠে সচ্চরিত্রের সহ্যশক্তি তত বাড়ে। বাংলা ছবির পক্ষে "মহাশ্বেতা"-র বৈমাত্রেয় ভাইয়ের দুর্ব্যবহার ও শঠতার মাত্রা যেন একটু বেশী। পরিচালক এ বিষয়ে আরও সচেতন থাকতে পারতেন। চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তিনি কিছুটা উদাসীন। নির্মল নামক যুবককে (মহাশ্বেতার অগ্রজপ্রতিম) বিপ্লবী ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী রূপে কেন দেখানো হল তার তাৎপর্য বোঝা গেল না। ফাঁক যাই থাকুক, পরিচালক সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শককে (নাট্যসুখ যাঁদের প্রধানত কাম্য) তাঁদের চাহিদার শর্তে একটি সুখভোগ্য ছবি উপহার দিয়েছেন। ছবিটি সুসংবদ্ধ। কনভেনশন অনুযায়ী পরিচালক একটি পরিচ্ছন্ন ছবি তৈরি করেছেন। কল্পনাশক্তি দেখিয়েছেন শিশুশিল্পী মলয়কে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে। রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহারেও পরিচালকের রসবোধের পরিচয় মেলে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ। নামভূমিকায় অঞ্জনা ভৌমিকের চরিত্রচিত্রণ সংযত, কখনও সংবেদনশীল। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে যথাযোগ্য অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, শমিতা বিশ্বাস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, মলিনা দেবী, উৎপল দত্ত, কিশোর শিল্পী সৌমিত্র প্রভৃতি।

সংগীত পরিচালক রাজেন সরকার আবহ-সুর ভালই রচনা করেছেন। এর ব্যবহার স্বল্প হতে পারত। শান্তিনিকেতনের বালক-বালিকাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য পাতুলনাচের সঙ্গে (রঘু গোস্বামীর পাপেট শো সুন্দর)। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গান না থাকলেই শোভন হত।

এণ্টনি ফিরিঙ্গি

কিংবদন্তী এবং কল্পনার ভিত্তিতে "এণ্টনি ফিরিঙ্গি"-র (বি এন রায়

"বাঘিনী" (পরিচালনা : বিজয় বসু) ছবিতে সন্ধ্যা রায় ফটো—দেশ

ললিতা চ্যাটার্জি, তরুণকুমার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অসীমকুমার, রুমা গুহ-ঠাকুরতা প্রভৃতি অন্যান্য ভূমিকায় ভাল অভিনয় করেছেন।

বিজয় ঘোষের ফটোগ্রাফি মন্দ নয়। কলা-কৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ নিম্নস্তরের।

ছবির পর ছবি

আর ডি বনসালের প্রযোজনায় "চৈতালি" ও "আঁধার সূর্য" ছবি দুটির কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

চৈতালি ও আঁধার সূর্য

"চৈতালি"-র নায়ক-নায়িকা উত্তমকুমার ও তনুজা। শচীন দেববর্মনের সংগীত পরিচালনায় ছবির গান আগেই রেকর্ড করা হয়েছে। "আঁধার সূর্য"-তে নায়ক-নায়িকার চরিত্রে দুজন নতুন শিল্পীকে দেখা যাবে। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, দীপ্তি রায়, ছায়া দেবী প্রভৃতি। সম্প্রতি রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনায় ছবির কিছু গান রেকর্ড করা হয়েছে। গেয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সুধীর মুখোপাধ্যায় দুটি ছবিরই পরিচালক।

লালবাঈ

জয়শঙ্কর প্রোডাকশন্স-এর প্রযোজনায় নির্মীয়মাণ রমাপদ চৌধুরীর "লালবাঈ" চিত্রের নামভূমিকায় অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন বোম্বাইয়ের অভিনেত্রী শবনম। চন্দ্রপ্রভার চরিত্রের শিল্পী সাবিত্রী এসেছিলেন। তাঁকে নিয়ে পরিচালক নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ আর সি

অদ্বিতীয়া

প্রোডাকশন্স-এর 'অদ্বিতীয়া'র কিছু দৃশ্য গ্রহণ করেছেন। ডেইজি ইরানীর নৃত্যই ছিল প্রধান। ছবিতে তিনি এক বাঈজির ভূমিকায় অভিনয় করছেন। সর্বেন্দ্র ও মাধবী মুখোপাধ্যায় 'অদ্বিতীয়া'র নায়ক-নায়িকা। বিকাশ রায়, লিলি চক্রবর্তী, দিলীপ রায় প্রভৃতি ছবির বিশিষ্ট শিল্পী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংগীতপরিচালক।

"এহি লেড়কী"র পর প্রযোজক-পরিচালক প্রহ্লাদ শর্মা আর একটি হিন্দী চিত্রের শুটিং আরম্ভ করেছেন।

মর্যাদা

ছবির নাম সাময়িকভাবে রাখা হয়েছে "মর্যাদা"। ছবিটি হবে কালারে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

মিত্র প্রোডাকশন্স-এর "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন"-এর মহরৎ সম্পন্ন হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। চিত্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। অনিল চট্টোপাধ্যায় নাম-ভূমিকার শিল্পী। বাসন্তী দেবীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন লিলি চক্রবর্তী। বিপ্লবী অরবিন্দের রূপসজ্জায় দেখা যাবে নির্মল চট্টোপাধ্যায়কে।

পুজোর রেকর্ড

প্রথমেই বলি, এবারকার এইচ-এম-ভি ও কলম্বিয়ার পুজো রেকর্ডের গান গতবারের চেয়ে ভাল। তা ছাড়া, এ বছরের রেকর্ডে বৈচিত্র্যও বেশী। এবং শিল্পী-তালিকাটিও বড়। শচীন দেববর্মণ, কিশোরকুমার, আশা ভোঁসলে ও লতা মুঙ্গেশকার গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে রয়েছেন। পুজোর গানের সুররচনা রাহুল দেববর্মণের সম্ভবত এই প্রথম।

এইচ-এম-ভি ও কলম্বিয়ার গায়কদের মধ্যে অনেকেই সুররচনা করে থাকেন। একাধিক শিল্পী সংগীত পরিচালক হিসাবেও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁদের কয়েকজনের

উপর এবার নিজেদের গানের সুররচনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। এর ফল শুভা-শুভমিশ্রিত। অন্তত কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পীর কাছ থেকে আশানুরূপ গান পাইনি। জানি না, তাঁদের কেউ কেউ আবার হাল্কা ও অনেকটা পশ্চিমী ঢঙের গান এবং চড়া পর্দার অর্কেস্ট্রাই চেয়েছিলেন কিনা। যাই হোক, অনেক কিছুই আধুনিক গানের পর্যায়ে ফেলে (টুইস্ট-এর ধাত কিংবা বিলিতী সুরের রকমারিও বাদ যায় না) অ-সুররসিক 'ফ্যান'দের মাতানো যায়। গানও কিছুকালের জন্য বেশ চলে। কিন্তু এই জনপ্রিয়তা চিরকালীন হতে পারে না। পুরনো আমলের অনেক সুন্দর গান আজও আমাদের শুনতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বিলিতী প্রসাদ বেশী দিন মুখে রোচে কি? তবে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয় সত্যি। সেদিক থেকে আধুনিক গান নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা দোষের নয়, যেখানে আমাদের রাগ-রাগিণীর সঙ্গে পশ্চিমী সুরের সংমিশ্রণ। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি গানে ("আহা না রয় না বাঁধা রয় না") এই এক্সপেরিমেন্ট লক্ষ করলাম। যদিও বেশীদিন বেঁচে থাকে সেইসব গান যাতে সুরের মাধুর্য বেশী, মানুষের চিরন্তন আবেগকে যে গান দোলা দেয়। এ দিক থেকে এবারের পূজো রেকর্ডের কয়েকটি গান শ্রোতাদের মন অতি সহজেই জয় করবে। যেমন, শচীন দেববর্মণের "অসময়ে বাজাও বাঁশি", মানবেন্দ্রর "সে তো নাম ধরে কোনদিন", লতা মঙ্গেশকারের "কে যাবি আয়", কিশোরকুমারের "একদিন পাখী উড়ে যাবে" মান্না দে'র "তুমি আঁধার দেখ", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "চোখে যদি জল করে টলমল", সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের "ওরে মন আবার কেন আর তোরে সাধা", আশা ভোঁসলের "যখন আকাশটা কালো হয়" প্রভৃতি। কথার অর্থ এই নয় যে, জনপ্রিয় হবার মত (ইংরেজীতে যাকে বলে 'হিট' করা) গান আর নেই। আরও অনেক আছে। মহিলা শিল্পীদের মধ্যে উৎপলা সেন, আরতি মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা বসু, সবিতা চৌধুরী, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, সুমন কল্যাণপুর প্রভৃতির গাওয়া গান শ্রোতাদের কাছে প্রতিবারের মতন জনপ্রিয় হবে। হয়তো আরও বেশী। কারণ, এ'দের প্রায় প্রত্যেককে দিয়েই সুরকাররা নতুন ধরনের গান গাওয়াবার চেষ্টা করেছেন। তবে একাধিক সুরকার সম্ভবত বুঝতে পারেননি, কার গলায় কী ধরনের গান শ্রোতারা বেশী পছন্দ করবেন। অথবা একালের সংখ্যা-গরিষ্ঠ শ্রোতার রুচির কাছেই তাঁরা নতি স্বীকার করেছেন। নির্মলা মিশ্রকে দিয়ে "কখন যে প্রজাপতি" না গাওয়ালেই বুঝি ভাল হত। যদিও শিল্পীর অপর গানটি সত্যিই সুন্দর। ইলা বসু বিদেশী ঢঙের গান গাইতে পারেন। তাঁর দুটি গানই সুগীত। ভ্রান্তি গায়কের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। শ্যামল মিত্র ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গানের কথাই বলছি। এবং মান্না দে'র কণ্ঠে "রিম ঝিম ঝিম বৃষ্টি" গানটি। এই গানগুলির খদ্দেরের অভাব হবে বলছি না। হয়তো বেশীই জুটবে। শ্যামল মিত্রর "কি নামে ডেকে" এবং সতীনাথের "সুন্দরী ছলনা"র সুরের মধ্যে যদিও বাংলা গানের রস আছে তবুও বহু দিন মন ভরে শোনার মত মধুর গান তাঁদের দিয়ে গাওয়ানো যেত। তা ছাড়া, বিশেষ করে শ্যামল মিত্র ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে পশ্চিমী জাতের গান মানায়ও না। এবং মান্না দে'র কণ্ঠে ভাবগম্ভীর বাংলা গান বোধ হয় বেশী ভাল লাগে।

চিত্রপ্রদর্শকের বদান্যতা : আলমবাজারের নারায়ণী সিনেমার সংস্কার সাধনের পর দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবে সিনেমার মালিক শ্রীচাঁদমোহন সাহার তরফ থেকে পৌরপ্রধান শ্রীগোবিন্দ দে'র হাতে মেয়র ত্রাণ-ভাণ্ডারের জন্য ৫০০০ টাকা দেওয়া হয়—তা ছাড়া শ্রী সাহা ঘোষণা করেন যে, প্রতি বছর সিনেমার লভ্যাংশের চতুর্থ ভাগ জনশিক্ষা অথবা চিকিৎসার জন্য দান করা হবে। ফটো—দেশ

"দুরন্ত চড়াই" (জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত) ছবিতে দিলীপ রায় ও সবিতা চ্যাটার্জি

গোড়াতেই বলেছি, শ্রোতাদের প্রাপ্তি-যোগ এবার বেশ ভাল। কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও। সুখশ্রাব্য গানের আর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিই। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের "দূরে দূরে থেকো না", তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "এই জানালা দিয়ে তাকিয়ে কারে" ও "না না বাসনে পাখী", দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের "আহা, যৌবন-তরঙ্গে" এবং মৃণাল চক্রবর্তীর "তুমি যে আশা-নদী" ও "কত দিন যে খুঁজে গেলাম"। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের দুটি গানই

"তিন ভুবনের পারে" (পরিচালনা : আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও তনুজা ফটো—দেশ

রাগাশ্রয়ী, একটি ঠুংরি-জাতীয় (মহুয়ার চেয়ে আরও মিষ্টি)। গাওয়া এবং সুর-রচনা (রতু মুখোপাধ্যায় কৃত) উভয় কারণেই গান দুটি সংগীতরসিকদের কদর পাবে। মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সংলাপ-সমেত দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গানের রেকর্ড সম্ভবত খুব বেশী বিক্রি হবে। সেদিক থেকে প্রযোজকের পরিকল্পনা সফল হতেও পারে। গানে সংলাপের ব্যবহার নতুন নয়। জগন্ময় মিত্র গানের সঙ্গে সংলাপ নিজেই বলেছেন। শ্রোতার মনে এর প্রভাব বেশী। আলোচ্য গানে অচেনা-অজানা কোন মেয়ের গলায় সংলাপ উচ্চারিত হলে তা শ্রোতার মনের উপর হয়ত আরও বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারত। নাম-করা ফিল্ম স্টারের মুখে সংলাপ অনেকেই "স্টাণ্ট" ভাবতে পারেন। মাধবীর মুখের সংলাপ গতানুগতিক—এ ধরনের কথা ছায়াছবিতে প্রায়ই শোনা যায়। তবে গান গাওয়া নিয়ে কিছু বলবার নেই। রোমান্টিক ভাব যদি কিছু ফুটে উঠে থাকে তা সুরে ও গাওয়ার গুণে। নতুবা গানে "লক্ষ্মী প্যাঁচা", "কয়লা পড়েছে চোখে" কথাগুলি খুবেই "অ্যান-রোমান্টিক"। অপেক্ষাকৃত তরুণ ও নতুন শিল্পীদের মধ্যে অরুণ দত্ত, পিণ্টু ভট্টাচার্য, সাধন মৈত্র (লোক-সংগীত) ও অমল মুখোপাধ্যায়ের গান ভাল লাগল। এ'রা প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে অরুণ দত্ত ও পিণ্টু ভট্টাচার্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলেই মনে হয়। বনশ্রী সেনগুপ্তের দুটি গানই ভাল লাগল।

কীর্তন ও পল্লীসংগীত গেয়েছেন যথা-ক্রমে ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মলেন্দু কীর্তন গেয়েছেন শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়। চণ্ডীদাস ও অশ্বিনীকুমার দত্তর গান। এই দুটি রেকর্ডই ঘরে রাখবার মত। সলিল চৌধুরীর সুরে গেয়েছেন নির্মলেন্দু। একটি দ্বৈতসংগীত নির্মলেন্দু ও সবিতা চৌধুরী। প্রসঙ্গত বলি, এ বছর অধিক-সংখ্যক গানের সুররচনার দায়িত্ব নিয়েছেন সলিল চৌধুরী, নচিকেতা ঘোষ ও সুধীন দাশগুপ্ত। বেশী গানের সুর দিতে গিয়ে তাঁরা নিঃশেষ হয়েছেন বলা চলে না। যদিও দুটি একটি গানে পুনরুক্ত সুর ও ধরন আবার দেখা গেছে। যেমন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের "যদি নাম ধরে ডাকি"। এ ধরনের সুর সলিল চৌধুরী আগেও দিয়েছেন। আশা ভোঁসলে ও সুমন কল্যাণপুরের গানের সুরারোপের জন্য মান্না দে প্রশংসা পাবেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর গানের সুররচনার কালে রবীন্দ্রসংগীতের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। রবীন্দ্রসংগীতের ঢঙ "চোখে যদি জল করে টলমল"-এ স্পষ্ট। ফলে গানের সুরের মৌলিকত্ব কমেছে। অবশ্য এই কারণে গানটি শুনতে ভালও লাগে।

এক কথায় বলতে গেলে, ফিল্মী গানের রীতি তথা বিলিতী "রিদম" ও "নোট" এবারকার পুজো রেকর্ডের বেশ কিছু গানে লক্ষণীয়। এক একটি রেকর্ড যখন চড়া অর্কেস্ট্রায় শুরু হয় তখন মনে হয়, এই বুঝি ফিল্মের কোন দৃশ্য শুরু হল। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র তো নেই বললেই চলে। একটি-দুটি গানে, ভাগ্য ভাল, সেতারের আওয়াজ শুনেছি। যেমন, প্রতিমা বন্দ্যো-পাধ্যায়ের "তোমার দেওয়া অঙ্গুরীয়"-তে। যদিও প্রতিমাকে দিয়ে সুধীন দাশগুপ্ত পারতেন। হিন্দী ফিল্মের গানের ঢঙ সত্ত্বেও কোন কোন শিল্পীর মুখে কয়েকটি গান ভাল লেগেছে। যেমন আরতি মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে গাওয়ানো "যদি আকাশ হত আঁখি"। মৃণাল চক্রবর্তীকে দিয়ে সুরকার শ্রীদাশগুপ্ত অবশ্য ভাল গান করিয়েছেন। উৎপলা সেনের গান কি "টুপ টুপ টুপ টুপ"? অবশ্য শ্রীমতী সেনের গলায় "জোনাকী দীপ জ্বালো আলো" গানটি বেশ মিষ্টি লেগেছে। প্রবীর মজুমদার, অভিজিৎ, হিমাংশু বিশ্বাস, অনল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আর যাঁরা আধুনিক গানের সুর করেছেন তাঁরাও অল্প-বিস্তর এই দোষে দোষী। সুরকারেরা কিছু গান করেছেন মনে দোলা লাগানো মেলোডিতে, কিছু গান বিলিতী ও দেশী মেলোডি মিশিয়ে এবং কিছু একেবারেই বিলিতী তথা ফিল্মী রীতিতে। এই শেষের শ্রেণীর গান নিয়েই আপত্তি। আধুনিক বাংলা গানের উন্নতির নানা এক্সপেরিমেণ্টের পরিচয় পুজো রেকর্ডে থাকবে, তাই আমরা আশা করি। আধুনিক বাংলা গানের মর্যাদা ও ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব পুজো রেকর্ডের প্রযোজকদের, যাতে আধুনিক বাংলা গান বিলাতের উচ্ছিষ্ট হিসাবে রুচিবান শ্রোতাদের নিন্দার বস্তু না হয়। আধুনিক বাংলা গান যে কাব্যসংগীত, সুর ও সুন্দর কথার সমন্বয়ে মধুময় হতে পারে, তার প্রমাণ করার দায়িত্ব অনেক পরিমাণে গ্রামোফোন কোম্পানির উপর নির্ভর করে।

গানের রচনা সাধারণভাবে গতবারের চেয়ে ভাল। তবে গানের কথা আরও কাব্য-ধর্মী হতে পারত। সুখের কথা, মুকুল দত্তের কিছু ভাল গান এবার রয়েছে। "কাঁদে কেন মন", "তীরের থেকে অনেক দূরে", "জীবনের হাট থেকে প্রাণের বাসর-ঘর" প্রভৃতি। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানও বেশ ভাল। যেমন, "না বলে এসেছি তা বলে ভেবো না", "তুমি আঁধার দেখ", "যখন আকাশটা কালো" ইত্যাদি। প্রশংসনীয় গান সলিল চৌধুরী (সুনয়নী, সুনয়নী, ব'লো না ভুলিতে ব'লো না) এবং সুধীন দাশ-গুপ্তও (বলেছিলে হবে দেখা, কতদিন যে খুঁজে গেলাম) লিখেছেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের "জোনাকী দীপ জ্বালো আলো" গানটি বেশ। যদিও "সাতরঙা রামধনু", "মন-ময়ূরী", "রিনিঝিনি চিনি চিনি" ইত্যাদি বহুব্যবহৃত শব্দ বা কথা বাদ যায়নি। অন্য দিকে যেমন পুলক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের গানে "লজ্জা জড়ানো", "খাতার পাতা" এবং "রিম ঝিম ঝিম"। এই সব কথাই তো পুরনো। মুকুল দত্তের গানে "নাম ধরে ডাকা"-র ব্যাপারটা বেশী। অর্থাৎ বহুপ্রচলিত শব্দ কিংবা একই "এক্সপ্রেশন"-

সাপ্তাহিক সংবাদ

সোস্যালিসট নেতা এবং লোকসভার সদস্য ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার মৃত্যু বর্তমান সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১১ অকটোবর বুধবার রাত্রে ৫৭ বৎসর বয়সে নয়াদিল্লির উইলিংডন নারসিং হোমে ডঃ লোহিয়ার মৃত্যু হয়। প্রোসটেট গ্ল্যানড বেড়েছে বলে গত

৩০ সেপটেমবর তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। ডঃ লোহিয়া উত্তর প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বোমবাই, বেনারস ও কলকাতায় পড়াশোনা শেষ করে জারমানীতে চলে যান এবং বারলিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডকটরেট লাভ করেন। ডঃ লোহিয়া ছিলেন জন্মবিপ্লবী। জারমানী থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলে অন্যতম নেতা হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৩৫ সালে ডঃ লোহিয়া নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈদেশিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়। ১৯৫৪ সালে তিনি পি এস পি-র জেনারেল সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ সালে ডঃ লোহিয়া সোসালিসট পারটি অব ইনডিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অনেক রাজনৈতিক গ্রন্থের লেখক। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র ভারতব্যাপী গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

দেশী সংবাদ

৯ অকটোবর—জম্মু ও কাশ্মীরের উরি অঞ্চলে আজ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী বিনা প্ররোচনায় ভারতীয় টহলদার বাহিনীর উপর গুলি চালায়। আজ সকাল ৮টা ২০ মিনিট নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানীরা যুদ্ধবিরতি সীমারেখার পাকিস্তানী এলাকায় নির্মিত ঘাটিগুলি থেকে গুলি চালায়।

মণিপুরের নতুন যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা আগামী ১৩ অকটোবর শপথ গ্রহণ করবেন। ভাবী মুখ্যমন্ত্রী থাম্বয়ো সিং নয়াদিল্লিতে আজ একথা বলেন। তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর মন্ত্রিসভায় থাকবেন ৫ জন মন্ত্রী। তাঁকে নিয়ে ৪ জন প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য মন্ত্রিপদ পাবেন।

১০ অকটোবর—সেপটেমবর মাসের গোড়ার দিকের বিধ্বংসী প্লাবনের পর স্মরণকালের মধ্যে ওড়িশার বৃহত্তম বিপর্যয় সমুদ্রোপকূলবর্তী কটক ও বালেশ্বর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নেমে এসেছে। সব সংবাদ আসেনি মুগাম অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি। আজ বিকালে ৭০ মাইল জুড়ে এক প্রলয়ঙ্কর ঝড় বয়ে গিয়েছে।

দুই চীন সম্পর্কে উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের মন্তব্য নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রকের জনৈক মুখপাত্র যে বিবৃতি দিয়েছেন, আজ কংগ্রেস সংসদীয় দলের সদস্যগণ সে প্রসঙ্গে সর্বসম্মতিক্রমে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের ইচ্ছা—তাঁদের এই তীব্র মনোভাব শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে জানিয়ে এ ব্যাপার দেখার জন্য অনুরোধ করা।

১২ অকটোবর—সাম্প্রতিক ওড়িশার ঘূর্ণিবাত্যার পরে কটক জেলার এরসামা ও বালেশ্বর জেলার চাঁদবালির মধ্যবর্তী এলাকার অভ্যন্তরভাগে এখন পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন করা হয়নি। তবে নির্ভরযোগ্য বে-সরকারী সূত্র থেকে পাওয়া খবরে বলা হয়েছে যে, মৃত্যু সংখ্যা 'দুই হাজার' কম হবে না।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কর্মসমিতির পরিবর্তে যে সাতজন সদস্যের নতুন (অ্যাড হক) কর্মসমিতি নিয়োগ করেছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন তার অন্যতম। অন্যান্য সদস্যরা হলেন:—শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীবিজয় সিং নাহার, অধ্যাপক [illegible], ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ ও শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায়।

১৩ অকটোবর—আজ [illegible] দুটি মিছিলের সামনে পথের উপর দুর্গাপ্রতিমা [illegible] দুই দল [illegible] মধ্যে এক মারাত্মক সংঘর্ষের ফলে একজন নিহত এবং [illegible] আহত হন। হাঙ্গামা দমনে পুলিস গুলি ও লাঠি চালায়। ওই রাতেই পরিস্থিতি পুলিশের আয়ত্তে আসে।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পলিট-ব্যুরো [illegible] সাংবাদিক সম্মেলনে [illegible] বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, [illegible]

১৪ অকটোবর—পশ্চিমবঙ্গের [illegible] যে [illegible] দেখা দিয়েছে, তা [illegible] উদ্দেশ্যে আজ উদ্যোগ [illegible] হয়েছে। রাইটার্স বিলডিংসে মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং সার বীরেন মুখার্জির মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালে গিয়ে শ্রমমন্ত্রী [illegible] সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

উত্তর প্রদেশের সংযুক্ত বিধায়ক দল সরকারের সাত জন মন্ত্রী। এরা এস এস পি ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। আগামীকাল পদত্যাগ করবেন বলে নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গেল। আজ এই দুই দলের নেতাদের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৫ অকটোবর—আজ বাংলা কংগ্রেস [illegible] শর্ত সাপেক্ষে [illegible] দলে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। [illegible] শর্ত হলো বাংলা কংগ্রেস [illegible] শাখারূপে গণ্য করতে হবে।

সপ্তাহতিনেক পরেই আমন ধান কাটা শুরু হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় জেলা শাসকদের কাছে এক চিঠি দিয়ে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার মত গুরুত্ব দিয়ে ধান চাল সংগ্রহের জন্য 'কঠোর ব্যবস্থা' অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ২৫ ও ২৬ অকটোবর কলকাতায় জেলা শাসকদের বৈঠকও ডাকা হয়েছে।

বিদেশী সংবাদ

৯ অকটোবর—ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লরড এটলি গতকাল লনডনের ওয়েসট মিনিসটার হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন।

নিদ্রিত অবস্থাতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। ১৯৪৫ সালে উইনসটন চারচিলের রক্ষণশীল দলকে পরাজিত করে শ্রমিক দল ক্ষমতা দখল করেন এবং দলের নেতা ক্লিমেনট এটলি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। লরড এটলির প্রধানমন্ত্রিত্বকালেই ভারত, পাকিস্তান ব্রহ্মদেশ ও সিংহল স্বাধীনতা লাভ করে।

১০ অকটোবর—ইন্দোনেশীয় সরকার আজ কমিউনিসট চীনের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক সাময়িকভাবে ছিন্ন করেছেন বলে ঘোষণা করেছেন। ১৮ বছরের ইতিহাসে এটি কমিউনিসট চীনের অন্যতম শোচনীয় কূটনৈতিক পরাজয়।

১১ অকটোবর—ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ—উত্তর ভিয়েতনামে বিনাশর্তে বোমাবর্ষণ বিরতি আর জেনিভা চুক্তি অনুযায়ী ওই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ভারত ও পোল্যানডের প্রধানমন্ত্রিদ্বয় এক যৌথ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তবে [illegible] উত্তেজনার অবসান ঘটানো নয়—শুধু মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধের কথাই বলা হয়েছে।

১২ অকটোবর—লনডন থেকে সাইপ্রাস যাওয়ার পথে একখানি বৃটিশ কমেট জেট বিমান ভূমধ্যসাগরে পড়ে ধ্বংস হয়েছে। এই বিমানে যাত্রী ও বিমান কর্মচারিগণ সহ মোট ৬৬ জন আরোহী ছিলেন। তাঁদের কেউই জীবিত নেই। বিমানখানি রোডস ও সাইপ্রাসের মধ্যবর্তী সমুদ্রে ভগ্নমগ্ন হয়।

১৪ অকটোবর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গতকাল অপরাহ্নে বেলগ্রেড থেকে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায় এসে পৌঁছলে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন। সংবর্ধনা সভায় শ্রীমতী গান্ধী উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নিজেদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ভার ভিয়েতনামবাসীদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের বিতর্ককালে এক পাকিস্তান ছাড়া মাত্র একটি দেশই কাশ্মীরের উল্লেখ করেছে, সে দেশটি হলো তুরস্ক। অন্য ১০৮টি দেশের মধ্যে কেউই কাশ্মীর সমস্যার উল্লেখ করেনি।

১৫ অকটোবর—ইজরায়েল সেনাবাহিনী অধিকৃত আরবভূমি ছেড়ে না গেলেও প্রেসিডেনট নাসের আরব-ইজরায়েল বিরোধ মীমাংসার জন্য ইজরায়েলের সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত। তবে শ্রী নাসের বলেছেন, এই আলোচনা রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যস্থতায় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আরো বই পড়ুন

* আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি *

প্রতিষ্ঠা সপ্তাহঃ

১৫ই-২২শে নভেম্বর '৬৭

কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস, জীবনী, ভ্রমণ, সাহিত্য ও সমালোচনা এবং কিশোরদের উপযোগী নানা ধরনের গ্রন্থের প্রদর্শনী

আমাদের প্রকাশনার যাবতীয় পুস্তকের উপর

ক্রেতা-সাধারণ ও পুস্তক-বিক্রেতাগণের জন্য বিশেষ কমিশন

ক্রেতা-সাধারণ ১০%

পুস্তক-বিক্রেতাগণ ও পাঠাগারসমূহ ৫%

(অতিরিক্ত)
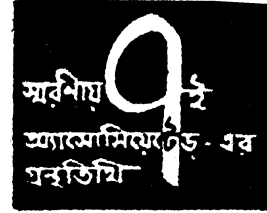
সদ্য প্রকাশিত

পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্রের

বহু চিত্রশোভিত ছোটদের ছড়ার বই

চাঁদ তারা জোনাকীরা ৩·৫০

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

রাজার কুমার ৩·০০

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের

কিশোরের কালিদাস ৪·০০

সুনীলকুমার নাগ-এর উপন্যাস

মনের আলোয় দেখা ৫·০০

[কাহিনী পরিবেশনের নূতনতর পদ্ধতি, বলিষ্ঠ চরিত্র-চিত্রণে, লেখকের চিন্তা ও আদর্শবাদ—সবকিছু মিলেই সাহিত্যে নূতন দিগন্তের সূচনা করেছে।]

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

যখন তরঙ্গ ৭·০০

আশাপূর্ণা দেবীর

কাঁচ পুঁতি হীরে

[নয় টাকা]

'বনফুল'-এর উপন্যাস

মানসপুর ৬·০০

তীর্থের কাক ৫·০০

অজিতকৃষ্ণ বসুর (অ-কৃ-ব)

প্রজ্ঞাপারমিতা ১০·০০

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

(সি ৪২৮৫)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীগোপাল দে

লিটকুইজ নং ২৪, ১৭টি সূত্রের অনুবাদ

১। এমন ব্যক্তি কোথায় আছেন যিনি রক্তাপ্লুত পায়ে আগুন নিয়ে খেলা করতে বা উন্মত্ততার পথে পা বাড়াতে চাইবেন শুধুমাত্র **মনোরঞ্জন/প্রায়শ্চিত্ত**-র জন্য!

২। যে সমস্ত মানুষ বহির্বিশ্বে অনেক কিছু **হতে/পেতে** চান, তাঁরা কখন **অন্তর্দর্শী** হতে পারেন না।

৩। মানুষের মধ্যেও ঈশ্বরের মত আচরণ করবার **ধৃষ্টতা/সামর্থ্য** রয়েছে।

৪। মানবমন প্রীতিপূর্ণ ভালবাসা পেতে চায় এবং নিরুত্তাপ **জিজ্ঞাসা/শত্রুতা**-র দরুন প্রত্যাখ্যাত হয়।

৫। মানুষ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই কাজ করে, এ কথা নিশ্চয় করে বলার অর্থ মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার প্রতি এবং **নিয়তি/মনুষ্যত্ব**-র প্রতি মানুষের বিশ্বাসের অভাবকেই প্রতিপন্ন করা।

৬। আপনি যদি একযোগে জীবন এবং **মুক্তি/জ্ঞান** অর্জন করতে চান, তাহলে একমাত্র ঈশ্বরই আপনাকে তা দিতে পারেন এবং সৃষ্টিমধ্যে আর কেউই তা দিতে পারেন না।

৭। যদি কোন কিছু জীবনকে **গৌরবান্বিত/সমর্থন** করে, তা হ'ল উদারতা, মহত্ত্ব।

৮। বাস্তব জীবনে একজন সত্যিকারের ধার্মিক ব্যক্তির কাজকর্মের বৈশিষ্ট্য হ'ল সততা, দক্ষতা এবং **সুসংগতি/বিনম্রতা**।

৯। যিনি সর্বজীবের মধ্যে নিজেকে এবং সর্বজীবকে নিজের মধ্যে প্রকাশমান দেখেন, এমন ব্যক্তি কি করে অন্যকে ঘৃণা/আঘাত করতে অথবা শোষণ করতে পারেন!

১০। স্বাতন্ত্র্যপ্রেম, স্বদেশভক্তি **মানবতা/সমাজের** জন্য ত্যাগ ভাবনা এই সব হ'ল প্রেরণাদায়ী আদর্শ।

১১। চিন্তার সাধনের জন্য এবং সামাজিক এবং **নৈতিক/রাষ্ট্রীয়** উন্নতির ক্ষেত্রে ভাষা অপরিহার্য।

১২। আমাদের সকলের প্রাণ **ক্ষুধার্ত** পিপাসার্ত এবং **আকাঙ্ক্ষী/ক্লান্ত**।

১৩। কোন বিষয়ে সত্যকে উপলব্ধি করতে হলে, মানুষকে অবশ্যই মহান **কবি/সাধক**-দের দিকে চোখ ফেরাতে হবে। সাধারণ নশ্বর মানুষের চেয়ে তাঁদের দৃষ্টি সুদূর প্রসারিত এবং উত্তম।

১৪। যেহেতু মানুষ **বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন/সামাজিক** জীবন, তাঁকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে দেশের ব্যাপারে তাঁর অবদান বুদ্ধিদৃপ্ত হয়।

১৫। আমাদের মধ্যে তেমন কিছু নেই মূল্যের বিচারে যেটি **দিব্য/শ্রেষ্ঠ** এবং যে অধিকারবলে আমরা মোক্ষলাভের দাবী করতে পারি।

১৬। (ঈশ্বরীয়) অনুগ্রহ যদি হয় **অপ্রত্যাশিত/অপ্রার্থিত** তাহ'লে তা আরো মাধুর্যময় হয়।

১৭। সমস্ত ধর্মেরই **মূল্য/গুণ** একই।

আপনার ট্র্যানজিস্টর রেডিও চালাবার সেরা ব্যাটারী...

এভারেডী 'এনারজাইজার' ব্যাটারী

—ট্র্যানজিস্টরের জন্যেই বিশেষভাবে তৈরী

এভারেডী 'এনারজাইজার' প্যাক ব্যাটারী :

- লীক-নিরোধক, আপনার সেটের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।
- সুস্পষ্ট অবিকল আওয়াজ হবে।
- ঢের বেশী টিকবে, চলতি খরচ কম হবে।
- উল্টো ক'রে প্লাগ লাগাবার ভয় এড়াবার জন্যে ভিন্ন ধরনের সকেট—রেডিওর বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা এতে অটুট থাকে।

যেকোনো ধরণের ট্র্যানজিস্টর রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার ও রেডিওগ্রামের উপযোগী এভারেডী 'এনারজাইজার' প্যাক ব্যাটারী পাবেন। দোকানদারকে বললেই আপনার সেটের উপযোগী সঠিক ব্যাটারী পেয়ে যাবেন।

এবং পাবেন
নং ২৮৬ (৯ ভো) টা. ১০.৭৫
নং ২৭৬-পি (৯ ভো) টা. ৬.[illegible]
নং ২৭৫ (৬ ভো) টা. ৫.৫০
নং ২৭৩ (৬ ভো) টা. ১০.[illegible]
ট্যাক্স স্বতন্ত্র

দেশের সর্বত্র সব সময় পাবেন।

প্রকাশিত হল

দাম ৬·০০

বঙ্গসাহিত্যে রূপদর্শীর এক মোক্ষম অবদান গপ্পো। (গপ্পো = গল্প+গপ্প।) এ-হেন সরস এবং উপাদেয় বস্তু বঙ্গসাহিত্যের পাঠকেরা যে আর কখনও চাখবার সুযোগ পাননি—এ কথা হলফ করে বলা যায়।

ব্রজদা ওরফে ব্রজরাজ কারফর্মা যেন বর্তমানের হৃতমান বাঙালী জাতির মুখর প্রতীক—অতীত গৌরবের স্মৃতিতে যে কূপের ব্যাঙের মত সর্বদা স্ফীত, অথচ অতীত মর্যাদা ফিরে পাওয়া যার সাধ্যাতীত; ফলত্: সামর্থ্যহীন হামবড়াই মুখসর্বস্বতা এবং অতিশয়কথন — এমন এক অতি-আত্মাভিমানী পঙ্গুতা, প্রতি পদে পদে যা নিজেকে অন্যের কাছে হাস্যাস্পদ করে তোলে, তার এক আশ্চর্য নিখুঁত রূপায়ণ ঘটেছে ব্রজদার মধ্যে। . . . .

রূপদর্শীর

সমুদয় 'ব্রজদা'-কাহিনীর একত্র সংকলন

ব্রজদার গপ্প-সমগ্র

[illegible] সব বঙ্গকৌতুকের অন্তরালে বুক-মোচড়ানো করুণ দীর্ঘশ্বাস [illegible] সুকৌশলে প্রচ্ছন্ন রাখার নৈপুণ্য একমাত্র রূপদর্শীতেই সম্ভব—[illegible] যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন।

এ-যাবৎ রচিত ব্রজদার সমুদয় গপ্পো-সম্ভার এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—তার মধ্যে এমন কয়েকটি গপ্পোও আছে, যেগুলি ইতিপূর্বে কোনও [illegible] অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং পরেও কখনও হবে না, যেহেতু [illegible] সিদ্ধান্ত নিয়েছেন [illegible] সমক্ষে পুনরায় উপস্থিত করবেন না।

বুদ্ধদেব বসুর

তুমি কেমন আছো

কাহিনী-সংকলন ॥ সদ্য প্রকাশিত ॥ দাম ৬·০০

বিমল করের

পূর্ণ অপূর্ণ

উপন্যাস ॥ সম্প্রতি প্রকাশিত ॥ দাম ১০·০০

মনোজ বসুর

সেতুবন্ধ

উপন্যাস ॥ সম্প্রতি প্রকাশিত ॥ দাম ১২·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সূর্যসাক্ষী

উপন্যাস ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ১৪·০০

সমরেশ বসুর

ফেরাই

উপন্যাস ॥ তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৩·০০

সমরেশ বসুর

দুই অরণ্য

উপন্যাস ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলকাতা ৯

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৫১
শনিবার ১০ কার্তিক ১৩৭৪

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৪৩ ৫৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়
বার্ষিক ২৫·০০
ষান্মাসিক ১২·৫০
ত্রৈমাসিক ৬·২৫
[illegible]
বার্ষিক সডাক [illegible]
ষান্মাসিক [illegible]
ত্রৈমাসিক [illegible]
পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক ২৭·০০
ষান্মাসিক [illegible]
ত্রৈমাসিক [illegible]
[illegible]
(জাহাজ-ডাকে)
বার্ষিক সডাক ৪৬·০০
ষান্মাসিক ২৩·০০
ত্রৈমাসিক ১১·৫০
আন্দামান-আফ্রিকা
(বিমান-ডাকে)
বার্ষিক ৩১·০০
ষান্মাসিক ১৬·০০
ত্রৈমাসিক ৮·০০

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাসুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH

Saturday 28 Oct 1967

শুকতারা আঁখি মেলি চায়

সৌরমণ্ডলে পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী যে তারাটি অনাদি অতীত কাল ধরে রহস্যের অবগুণ্ঠনে নিজেকে আড়াল করে রেখেছিল, দিবাবসানে যে সন্ধ্যা-তারা পশ্চিমাকাশ থেকে বিদায় নেয় পূর্বাকাশে ভোরের আলোয় জাগবার জন্যে, তাকে নিয়ে কবি কল্পনার শেষ নেই। হাজার হাজার বছর ধরে লোকগাথা, পুরাকাহিনী যাকে নিয়ে রচিত হয়েছে, রহস্যোদ্ঘাটনে অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানীরা যাকে নিয়ে এতকাল বহু গবেষণা করে এসেছে, সকালের সেই শুকতারা এবার বুঝি তার রহস্যের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে তাকালো। এই শুভদৃষ্টি সোভিয়েৎ রাশিয়ার বিজ্ঞান প্রতিভার জন্যই সম্ভব হয়েছে।

আড়াই কোটি মাইলেরও বেশী দূর থেকে এই শুক্রগ্রহ নামে যে শুকতারা আমাদের প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় উজ্জ্বল হাসি দিয়ে অভিবাদন জানিয়েছে গত বুধবার, ১৮ই অক্টোবর, সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের পাঠানো মহাকাশযান ভেনাস ৪ তারই গায়ে ধীর ও মন্থর অবতরণের পর একে একে রহস্য উন্মোচনী বার্তা পৃথিবীর বুকে পাঠাচ্ছে।

এতকাল এই তারা নিজের চারিদিকে ঘন মেঘের আবরণ রচনা করে রেখেছিল বলে বিজ্ঞানীদের শক্তিশালী দূরবীণ যন্ত্র তার রহস্য ভেদ করতে পারে নি। অজানাকে জানা এবং অজেয়কে জয় করার দুর্মর বাসনা মানুষকে সর্বদা নিত্য-নূতন অভিযানে প্রবৃদ্ধ করেছে; শুকতারার রহস্য উদ্ঘাটনেও মানুষের সেই দুরন্ত আকাঙ্ক্ষাই আজ তাকে সাফল্যের গৌরব এনে দিয়েছে। ভেনাস ৪-এর এই সাফল্য সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের অনন্য কীর্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর। ব্রিটেনের জড্রেল ব্যাঙ্ক মানমন্দিরের বিখ্যাত মহাকাশ-বিজ্ঞানী স্যার বার্নার্ড লোভেল সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের এই সাফল্যে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার এটি দ্বিতীয় সাফল্য। দশ বৎসর পূর্বে, ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর, মহাশূন্যে স্পুটনিক পাঠিয়ে বিজ্ঞান-জগতে একটি নূতন দিগন্তের সন্ধান এনে দিয়েছিল, তার দু মাস পরেই মার্কিন বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে অভিযান শুরু করে। এবারেও শুক্রগ্রহ লক্ষ্য করে মার্কিন বিজ্ঞানীরা মেরিনা ৫-কে মহাশূন্যে পাঠিয়েছে। মার্কিন বিজ্ঞানীদের সাফল্য স্বীকার করে নিয়েও এ-কথা নিশ্চয় বলা যায় যে, মহাকাশ অভিযানে প্রথম সাফল্যের গৌরব সোভিয়েট রাশিয়ার। ভেনাস ৪ শুক্রগ্রহ পর্যবেক্ষণ করে যা-কিছু তথ্য পাঠাবে সোভিয়েট রাশিয়া চায় তা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের প্রয়োজনে লাগুক। তথ্যকে গোপন রেখে এক-চেটিয়া সাফল্যে তাঁরা উৎসাহী নন।

১২৯ দিন ধরে আড়াই কোটি মাইল ভ্রমণের পর ভেনাস ৪ শুক্রগ্রহে অবতরণ করল। এই অসাধ্যসাধন অকস্মাৎ ঘটেনি, অনেক পরিশ্রম ও ক্ষতির মূল্য দিয়ে এই সাফল্য অর্জন করেছে সোভিয়েট বিজ্ঞানী। শুক্রগ্রহে অবতরণ নিয়ে দীর্ঘকাল ধরেই সোভিয়েৎ ও মার্কিনী মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে চেষ্টার অন্ত ছিল না। ইতিপূর্বে এঁদেরই পাঠানো আরেকটি উপগ্রহ শুক্রে অবতরণ করতে গিয়ে মাধ্যাকর্ষণের টানে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছিল। মার্কিন বিজ্ঞানীরাও পিছিয়ে নেই। ১৯৬২ সালে মেরিনা-২ শুক্রগ্রহের পাশ দিয়ে ঘুরে এসে কিছু সংবাদ জানিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। তবে মেরিনা-২ সেবারে শুক্রগ্রহ সম্পর্কে যে-সব তথ্য এনেছিল ভেনাস-৪ সে-তথ্যকে খণ্ডন করে নূতন তথ্য পাঠাচ্ছে। মেরিনা-২ খবর পাঠিয়েছিল যে শুক্রগ্রহে তাপমাত্রা ৮০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট কিন্তু ভেনাস-৪ খবর পাঠিয়েছে শুক্রগ্রহের দেহের উত্তাপ ১০২ ডিগ্রী থেকে ৫৩৬ ডিগ্রীর মধ্যে ওঠা-নামা করে। বায়ুচাপ সম্পর্কে মেরিনা-র পর্যবেক্ষণ ছিল পৃথিবীর বায়ুচাপের তুলনায় ১০ থেকে ২০ গুণ, কিন্তু ভেনাস-৪ বলছে শুক্রগ্রহের বায়ুচাপ পৃথিবীর সমান থেকে ১৫ গুণ। ভেনাস-৪ আরেকটি তথ্য জানিয়েছে যে শুক্রের বায়ুমণ্ডলের প্রায় সবটাই কার্বন ডাই-অক্সাইডে ভরা। ভেনাস-৪ প্রেরিত এই দুটি তথ্য থেকে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে শুক্রগ্রহে মানুষের মত প্রাণী থাকার সম্ভাবনা নেই। মানুষের মতো প্রাণী না থাকলেও শুক্রগ্রহ একেবারেই নিষ্প্রাণ এ-কথা মহাকাশবিজ্ঞানীরা এখনো জোর দিয়ে বলছেন না। আশা করব ভেনাস-৪ ক্রমশ এই রহস্যেরও উন্মোচন করবে।

এক সম্পাদকীয় উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। এই সম্পাদকীয়র পটভূমি অবশ্যই পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি। বিশেষ ক'রে গত ২ অক্টোবরের ঘটনা স্মরণ ক'রেই এই সম্পাদকীয় লেখা হ'য়েছে। এই সম্পাদকীয়র মূল কথা "গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনকে" পুলিশ দিয়ে "চূর্ণ করার অভিযানে স্বেচ্ছায় অংশীদার" হ'য়েও শ্রীঅজয় মুখার্জির মন পাওয়া যায়নি। তাই "যেন তেন প্রকারেন যুক্ত ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা রক্ষার নামে দাসখতে তাঁরা সই করে দিয়েছেন।"

মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এই লম্বা অভিযোগের ফিরিস্তি দাখিল করেছে উগ্রপন্থী কম্যুনিস্টদের পক্ষ থেকে। কিন্তু এই অভিযোগের পিছনে একটা উদ্দেশ্যও আছে। সেটা প্রায় স্বীকৃতির আকারে বলা হ'য়েছে এই সম্পাদকীয়র শেষের দিকে। "গণবিপ্লবী সংগ্রাম" গড়ে তুলতে হ'লে এবং "শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে" কৃষক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে হলে "এই নয়া-সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধেও সমানভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।" উদ্দেশ্যটা এখানে স্পষ্ট। যে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের হাত থেকে পার্টির নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেবার সংকল্প করা হ'য়েছে সেই নেতৃত্বকে জনসমক্ষে খর্ব ক'রে উগ্রপন্থীদের চেহারাটা নূতন নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করাই এর উদ্দেশ্য। তাই সংঘর্ষকে নূতন পথে পরিচালিত ক'রে তীব্র ক'রে তোলাই এই সম্পাদকীয়র প্রধান বক্তব্য।

এর বক্তব্যও হয়ত খুব নূতন নয়। কারণ উগ্রপন্থীদের যখন মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে বহিস্কৃত করা হয় তখন থেকেই অত্যন্ত প্রকাশ্যভাবে শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার প্রভৃতি মার্ক্সিস্ট নেতাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু নূতন করে রাজনৈতিক নেতৃত্বের চেহারাটা তুলে ধরা হয়ত প্রয়োজন হ'য়েছে। বিশেষ কারণটাও অনুমান করা যায় পশ্চিম বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক চেহারাটা সামনে রাখলে। একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হ'য়েছে নেতৃত্ব নিয়ে। কোন দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে আজ এই নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ নেই। যুক্তফ্রণ্টের ঘরে বাইরে এই দ্বন্দ্ব প্রতিদিন তীব্র হ'চ্ছে। হয়ত বর্তমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এজন্য অনেকটা দায়ী; অথবা হয়ত, একটা আগামী দিনের ঝড়ের সংকেত সত্যিই দেখা দিয়েছে পশ্চিম বাংলার ঈশান কোণে।

এ ইঙ্গিতটা বিশেষ ক'রে এসেছে মার্ক্সিস্টদের কাছ থেকে, সহজ কথায় যাদের বলা হয় 'নক্সালবাড়িওয়ালা'। এই নক্সালবাড়িওয়ালাদের মহল থেকে কিছুদিন থেকে একটা প্রচেষ্টা চলেছে মাও সে-তুং-এর প্রতিকৃতিটা জনসমক্ষে তুলে ধরা। মাও সে-তুং-এর নেতৃত্ব দানা বেঁধে ওঠে সোভিয়েট রাশিয়ার ব্যক্তি পূজার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার পর থেকেই। আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে রাশিয়ার নেতৃত্বের পাল্টা নেতৃত্ব গড়ে তোলাই ছিল এই প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই পাল্টা নেতৃত্বকে জোরদার করতে প্রয়োজন হ'য়েছিল মাও সে-তুং-এর ব্যক্তিত্বকে উঁচু ধাপে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সেই ব্যক্তিগত নেতৃত্বকে নিরঙ্কুশ করার জন্য প্রয়োজন হ'য়েছে 'রেড গার্ড' তৈরী করা।

এই দুটো কাজই পুরোদমে চালাবার চেষ্টা হ'চ্ছে বিশেষ ক'রে পশ্চিম বাংলায়। আজ কলকাতার চারপাশে চোখ মেলে তাকালে দেখা যায় ছোটবড় দল যাদের মুখে মাও সে-তুং-এর ধ্বনি, মাও সে-তুং-বুলি, হাতে মাও সে-তুং-এর প্রতিকৃতি। এক ধরনের ব্যক্তিপূজাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচণ্ড চেষ্টা চলেছে উগ্রপন্থীদের মহল থেকে। এই মাও মার্কা ব্যক্তিপূজার প্রতিনিধি হিসাবে নেতৃত্বের সামনে রাখার চেষ্টা হ'চ্ছে শ্রীকানু সান্যাল, খোকন মজুমদার, চারু মজুমদারের নাম। এই নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'চ্ছে আগামী কৃষক বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি। যুক্তফ্রণ্ট সরকারের মনে নিশ্চয়ই একটা আত্মসন্তুষ্টির ভাব আছে যে, গত কয়েক মাসে শ্রীজঙ্গল সাঁওতালের মত নেতা এবং সম্রাট মাঝানী বহু কৃষক নেতা বা আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করে নক্সালবাড়ির কৃষক বিপ্লবকে [illegible] করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই [illegible] কারণ [illegible] হয়ে আছে। কিন্তু এ [illegible] নিশ্চয়ই যুক্তফ্রণ্ট সরকারের অজানা নেই যে, এই সুপ্ত অবস্থা যে কোনদিন ধান পাকার মুখে জেগে পড়তে পারে। শ্রীকানু সান্যাল এবং তাঁর অনুগামী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব অটুট সেই একথা মনে করা নিশ্চয় ভুল হবে। মাঠের ধান যখন পাকবে, ফসল তোলার দিন যখন আসবে তখন নক্সালবাড়ি আবার মুখর হ'য়ে উঠতে পারে এ আশঙ্কা আজ আর অমূলক নয়।

অত্যন্ত স্থির বিশ্বাসে নির্ভর করেই উগ্রপন্থীদের পক্ষ থেকে প্রচার করা হচ্ছে "আসন্ন কৃষি বিপ্লবের জোয়ারের" কথা। প্রকাশ্যভাবেই আক্রমণ করা হচ্ছে শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের নেতৃত্বকে। শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের উক্তি উল্লেখ ক'রে বলা হ'য়েছে যে, "তাঁর সরকার কংগ্রেসী সরকারের মতই কৃষক স্বার্থ বিরোধী"। উগ্রপন্থীদের ধারণা যে এ'রা যদি চুপচাপ হন তাহলে "গণআন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য বিপ্লবীর মুখোশ তাদের একান্ত প্রয়োজন"। উগ্রপন্থীরা নিজেদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এই কথাটাই বোঝাতে চাইছেন যে, শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার বা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত "বিপ্লবীর মুখোশ" পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এটা এক নেতৃত্বের আক্রমণ অপর নেতৃত্বের প্রতি। তাই শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার বা শ্রীজ্যোতি বসু তাঁদের নেতৃত্বের সংকট সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। শ্রীকোঙারও এটা অনুমান করেন যে, আগামী ফসল তোলার দিনে কৃষক আন্দোলন একটা নূতন রূপ নেবে। সেটা যে-ভাবেই দেখা দিক শ্রীকোঙারের কৃষক সভার নেতৃত্বকে আঘাত দেবেই। তাই তিনি দুটো বড় প্রকল্পে হাত দিয়েছেন। একটা ভূমি সংস্কারকে ত্বরান্বিত করা এবং দ্বিতীয়, বর্গাদারকে ফসলের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়টা নিয়েই শ্রীকোঙার তাড়া দিয়েছেন সব চাইতে বেশী। তাই জেলা শাসকদের কাছে নির্দেশ পাঠাচ্ছেন কিভাবে ফসলের বণ্টন করা হবে। ভাগ হবে ভাগচাষীদের ৬০ আর জোতদার বা মালিকের ৪০। তবু তিনি জানেন, "এক কণা ফসলও জোতদারকে দেব না" এই আন্দোলন ঠেকান যাবে না এবং বিরোধ উঠবেই। সে বিরোধের সংখ্যা খুব কম যে হবে না এটা অনুমান করতে অসুবিধা নেই। তাই বিরোধের ধান সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ 'পঞ্চায়েতী গোলা' সৃষ্টি করা। বিরোধের ধান পঞ্চায়েতী গোলায় উঠবে

এবং এই [illegible] প্রয়োজন অনুভাবে [illegible] হবে। [illegible] গোলা কবুল [illegible] আগেও শোনা গিয়েছে এ কথাটা [illegible] শোনা গিয়েছে উগ্রপন্থীদের মহল থেকে—"সব ধান পঞ্চায়েতী খামারে মজুত কর।" তাই শ্রীকোঙার সেই পঞ্চায়েতী খামারকে প্রাধান্য দিয়েছেন অত্যন্ত বেশী। উগ্রপন্থীদের স্লোগানগুলোকে ম্লান করে দেবার জন্য।

তবু মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব খুব নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। উগ্রপন্থীদের "বিপ্লবের জোয়ার" বাঁধ ভাঙতে দেরি করবে না যে মুহূর্তে প্রতিআঘাত আসবে জোতদার মজুতদারদের কাছ থেকে। প্রতিআঘাত যে আসবে না এমন প্রতিশ্রুতি কোথাও নেই। সোনারপুরে, নক্সালবাড়ীতে যে কৃষক আন্দোলনকে রুখাও করে দেখানো হয়েছিল কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে সংগঠিত কৃষক সভার এবং উগ্রপন্থীদের পক্ষ থেকে, সেই আন্দোলনেই অত্যন্ত সুসংগঠিত প্রতিআক্রমণের আভাস দেখা দিয়েছিল। নক্সালবাড়ি এলাকায় প্রতি আক্রমণের ফলে কৃষক প্রাণ হারিয়েছে সে নজিরও আছে। সোনারপুর এলাকায় যুক্ত ফ্রন্টের এক শরিকের পক্ষ থেকে যে প্রতিআঘাত আসছিল তা-ও অবিদিত নেই। কাজেই অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে ফসল তোলার সময় এই প্রতি আঘাত আসতে পারে প্রচণ্ডবেগে। হয়ত এটা অনুমান করেই শ্রীকোঙার আহ্বান জানিয়েছেন গ্রামে গ্রামে কৃষক সভার "জঙ্গী সংগঠন" গড়ে তোলার জন্য। এই জঙ্গী সংগঠন কতটা জঙ্গীরূপ ধারণ করবে বা করতে পারে তা বড় কথা নয়। বড় কথা কৃষক সভার 'জঙ্গী সংগঠন' গড়ে তোলা। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের কথায় জোতদার মহাজনদের দুর্ধর্ষ-আক্রমণের সামনে ফসল ও জমির লড়াইয়ে সরকারকে ও গণতান্ত্রিক জনগণকে গরীব চাষী ও ভাগচাষীর পাশে দাঁড়াতে হবে। এটাই শ্রীকোঙার ও তাঁর পার্টির বড় কথা। কারণ, নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝড়টা কেবলমাত্র উগ্রপন্থী বা যুক্ত ফ্রন্টের অন্য কোন মহল থেকেই আসছে না। কৃষক সংগঠনের মধ্য থেকেই আসবার সূচনা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে।

এই নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস পাওয়া গিয়েছে নিখিল ভারত কিষাণ সভার ভিতরে। নিখিল ভারত কৃষাণ সভার মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বই বড় অংশ জুড়ে আছে। ছোট অংশটা আছে তাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির হাতে। কিষাণ সভার সর্বোচ্চ সংগঠন নিখিল ভারত কিষাণ কমিটি। এই কমিটির সভাপতি শ্রী এ কে গোপালন এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীজগজীৎ সিং লয়ালপুরী। দুজনেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট। এই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বহুবার আঘাত এসেছে; কিন্তু তা [illegible] কারণ [illegible]। যদি [illegible] কম্যুনিস্ট আন্দোলন বহুদিন আগেই দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এবার বিশেষ কারণেই ভারতীয় কিষাণ সভায় সংকট দেখা দিয়েছে। এই সংকট দেখা দিয়েছে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে। আটচল্লিশজন সদস্য কিষাণ কমিটির সভা আহ্বান করেছেন এবং ইতিমধ্যেই শ্রীএ কে গোপালন বলেছেন এই সভা হবে বে-আইনী।

তবু এই সভা ডাকা হয়েছে ৪৮জন কম্যুনিস্টদের পক্ষ থেকে। এঁরা ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত। এঁদের প্রধান বক্তব্য বহুদিন ধরে কিষাণ কমিটির সভা ডাকা হয়নি এবং ইতিমধ্যেই মার্ক্সিস্ট নেতৃত্বের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছে যে, কিষাণ কমিটির প্রকৃতপক্ষে কোন প্রয়োজন নেই; কিষাণ সভাই যথেষ্ট। কম্যুনিস্ট সদস্যরা তা স্বীকার করেন না, এবং মনে করেন যে, অনৈক্যের ভয় দেখিয়ে সমগ্র কিষাণ সভার সংগঠন কব্জা করাই এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই তাঁরা আলোচনা করতে চান জোরদার গণ-আন্দোলন এবং কৃষক সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত সংগঠন প্রস্তুত করার বিষয়ে। তাঁরা এটাই চান যে, নিখিল ভারত কিষাণ সভার নেতৃত্বেই এই আগামী কৃষক সংগ্রাম পরিচালনা করা হোক। অর্থাৎ কম্যুনিস্ট-দের নেতৃত্বকে স্বীকার করে নিয়ে।

মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টরা এটাই চাইছেন না। কম্যুনিস্টদের পক্ষ থেকে ডাঃ জেড এ আহমেদ যে বক্তব্য রেখেছেন তা খণ্ডন করে শ্রীএ কে গোপালন বলেছেন যে, কম্যুনিস্ট সদস্যরা এটা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, আগামী জানুয়ারী মাসে পশ্চিম বাংলায় সর্বভারতীয় কিষাণ সম্মেলন বসবে। সে-সম্মেলনেই কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করতে কোন অসুবিধা হবে না। কাজেই এ অবস্থায় কিষাণ কমিটির সভা আহ্বান করার অর্থই হবে কিষাণ সভাকে ভেঙে নূতন এক কিষাণ সংগঠন গড়ে তোলা।

হয়ত তাই। কিন্তু এটাও অস্পষ্ট নয় যে, জানুয়ারী মাসে পশ্চিম বাংলায় সর্ব-ভারতীয় কিষাণ সম্মেলন ডাকার পিছনে রাজনৈতিক যুক্তি নিশ্চয়ই আছে। শ্রীগোপালনের পার্টি স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছে এবং তারা সংগ্রাম ও সংগঠনের পথেই যাবার জন্য উৎসুক হয়ে আছে। স্বভাবতই পশ্চিম বাংলায় কৃষক আন্দোলনের মধ্যে যে রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তা উপেক্ষা করা যায় না। এই রাজনৈতিক চিন্তাধারার কথাটা সামনে রাখলে পশ্চিম বাংলায় কিষাণ সম্মেলন ডাকার অর্থটাও স্পষ্ট হয়ে যায়। এই সম্মেলনে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বটাই সামনে থাকবে। তা যদি থাকে তাহলে পশ্চিম বাংলায় যে কিষাণ আন্দোলন "বিপ্লবের জোয়ারে" গা ভাসিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে তার নেতৃত্বের বড় অংশীদার হবে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টরা। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে কিষাণ আন্দোলনের নেতৃত্বটা কব্জা করা প্রয়োজন হয়েছে। তাই [illegible] কিষাণ সভার নেতৃত্বের প্রশ্ন তুলেছে কম্যুনিস্টরা, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরা। এই সংযুক্ত নেতৃত্বকে বিযুক্ত করে দেখান সম্ভব হলেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের পক্ষে সম্ভব হবে উগ্রপন্থীদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা।

আরও সম্ভব হবে যদি মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের হাতে পশ্চিম বাংলা সরকারের যন্ত্রটা অনেকাংশে নির্ভরশীল হয়। এটাও উগ্রপন্থীদের চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তর হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। কারণ, একদিকে যেমন উগ্রপন্থীরা সোচ্চারিত করে তুলছে "কেবলমাত্র মাও সে-তুঙের চিন্তাধারাই বিপ্লবকে সফল করতে পারে" অপরদিকে তেমনি মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের মাদুরাই দলিল সামনে রাখা হয়েছে। এই মাদুরাই দলিল পড়লে এটাই মনে হবে যে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট নেতারা যাঁরা শ্রীঅজয় মুখার্জির মন্ত্রিসভায় আছেন, সরকারী প্রশাসনের উপর তাঁদের প্রতিপত্তি বহুদূর প্রসারিত। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জিও জানেন; মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না বলেই পশ্চিম বাংলার প্রশাসন যন্ত্র এক অচলায়তনের মধ্যে ডুবে গিয়েছে। ইচ্ছে করলেও তিনি এই প্রশাসন যন্ত্রকে তাঁর নিজের ইচ্ছামত সক্রিয় করতে পারবেন না; যেমন ইচ্ছে করলেও তিনি আজ যুক্ত ফ্রন্ট সরকার ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেন না। তাই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে জমির ও ফসলের লড়াইয়ে সরকারকে কৃষকের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীসুন্দরাইয়া বলেছেন, পার্টির সকল সদস্যকে পরিষদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। শ্রীজ্যোতি বসুও বলেছেন, যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের আওতায় মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন করা হোক।

অবশ্যই রাজনৈতিক মোকাবিলার জন্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই প্রয়োজন হয়েছে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে বাঁচিয়ে রাখা; প্রয়োজন হয়েছে পরিষদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করা।

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহের ঘটনাবলী সম্পর্কে অজয়বাবুর বক্তব্য জ্যোতি বসুর পছন্দ হয় নি।
অজয়বাবুর বিবৃতি
পূজা উপহার
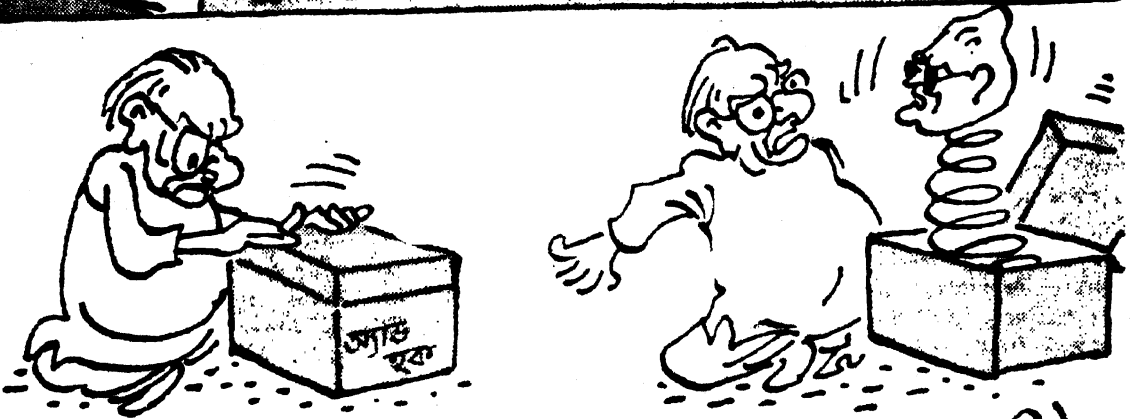
তারপর কী?

বিক্ষোভ, পাল্টা বিক্ষোভে ভিয়েতনাম পরিস্থিতির সহজে উলটপালট ঘটতে পারে না। প্রেসিডেণ্ট জনসন জানেন তাঁর ভিয়েতনাম নীতি মার্কিন সেনেটের ডেমক্র্যাট, রিপাবলিকান দুই দলের অধিকাংশ সদস্যই সমর্থন করেন। জনসনের সমালোচকরা সংখ্যালঘিষ্ঠ; ভিয়েতনাম যুদ্ধের তাড়াতাড়ি যাহোক একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য অবশ্য তাগিদ আসছে নানা দিক থেকে। যুদ্ধ শেষ হচ্ছে না বলেই মার্কিন জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ, যার ফলে প্রেসিডেণ্ট জনসনের জনপ্রিয়তা নাকি পড়তির মুখে। জনসন-নীতির সমালোচকদের যুক্তির জোর ওইটুকু। উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ করার দাবিতে জনসন-নীতির সমালোচকরাও সকলে একমত নন। বরঞ্চ কোন কোন মহলের অভিযোগ, বোমাবর্ষণ ব্যাপারে নানারকম বাছ বিচার, বিধিনিষেধ থাকবার ফলেই উত্তর ভিয়েত-নাম এবং ভিয়েতকং গেরিলাদের পরাজিত করা সম্ভব হচ্ছে না। উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে আপত্তি ও প্রতি-বাদের কারণ সম্ভবত দুরকম। একটা কারণ কূটনৈতিক, যার যুক্তি হল উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ হলে ডঃ হো চি মিন আপস মীমাংসার কথাবার্তা শুরু করতে রাজী হতে পারেন। এ যুক্তিটা এখন আবার তুলেছেন ভারতবর্ষ সমেত রাষ্ট্রপুঞ্জের আরও অনেক সদস্য। মার্কিন বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দ্বিতীয় কারণ সম্ভবত মানবিক; সেখানে যুক্তি হল ছোট একটি দেশের উপর পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তির ক্রমাগত প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ খুবই শোকাবহ ব্যাপার। সামরিক বিচারে অবশ্যই এ-যুক্তি একেবারে অচল।

ডঃ হো চি মিন চান ভিয়েতনাম থেকে মার্কিনী তথা সমস্ত বিদেশী সৈন্যসামন্ত অপসারণ। জনসন-নীতির কোন কোন মার্কিন সমালোচকরাও প্রায় এরকম কথা বলছেন। তাঁদের মতে ভিয়েতনামের ব্যাপারে জড়িত থাকার আমেরিকার বাস্তবিকপক্ষে কোন স্বার্থ বা প্রয়োজন নেই। প্রেসিডেণ্ট জনসন অবশ্যই এ-যুক্তি মানতে পারেন না; অধিকাংশ মার্কিন সেনেটরও ভিয়েতনামকে ছেড়ে আসবার কথা কল্পনা করতে পারেন না। প্রেসিডেণ্ট জনসন এবং তাঁর সামরিক ও কূটনৈতিক পরামর্শদাতাদের দৃঢ় বিশ্বাস ভিয়েতনামের ভালোমন্দের সংগে আমেরিকার নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। তারপর আমেরিকার আন্ত-র্জাতিক ভূমিকা; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হোক, লাতিন আমেরিকা হোক, পৃথিবীর যেখানেই কম্যুনিস্ট প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা সেখানেই স্বাধীন দুনিয়ার নিরাপত্তারক্ষা আমেরিকার দায়িত্ব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সে-দায়িত্ব পালনে আমেরিকা প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এখন ভিয়েতনাম থেকে আমেরিকা সরে গেলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিভ্রাট দেখা দিতে পারে।

মার্কিন সৈন্যবাহিনীর ভিয়েতনাম ছেড়ে আসা মানে গোটা দেশটা ডঃ হো চি মিনের দলবলের হাতে তুলে দেওয়া। এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আপত্তি ছাড়া আমেরিকার তরফে অন্য আপত্তিও থাকতে পারে। খাস চীন ভূখণ্ডে কুয়োমিনতাং গভর্ণমেণ্টকে টিকিয়ে রাখবার জন্য আমেরিকা অকৃপণ অর্থ এবং অস্ত্রসাহায্য দিয়েছিল। যে কারণেই হোক সে-বিপুল প্রয়াস ব্যর্থ হয়। কিন্তু আমেরিকা আশ্রিত বৎসল, বিপদের সময় বন্ধুকে একেবারে পথে বসানো কোনদিনই আমেরিকানদের রুচি নয়। দুদুটি মহা-যুদ্ধে ইওরোপের বন্ধুদের বিপদে আমেরিকা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে, চরম ঝুঁকি নিয়েছে। খাস চীনে বিপর্যয়ের পরেও মার্শাল চিয়াং কাইশেক এবং কুয়োমিনতাং গভর্ণমেণ্টকে আমেরিকা একেবারে ঝেড়ে ফেলবার কথা ভাবতে পারে নি। ফরমোজায় মার্শাল চিয়াং-কাইশেককে নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত করে আমেরিকা বিশ্বস্ত বন্ধুর কর্তব্য পালন করেছে। এখন ভিয়েতনাম যদি সত্যিই ছেড়ে আসবার কথা ওঠে তাহলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহযোগী থিউ, কী প্রভৃতি রাষ্ট্রনেতা এবং তাঁদের সমর্থকদের কী গতি হবে? চীনের বিপর্যয়ের পর তবু না হয় হাতের কাছে ফরমোজা ছিল যেখানে কুয়োমিনতাং বন্ধু-দের নিরাপদে বসিয়ে দিতে আমেরিকার কোন অসুবিধা হয়নি। দক্ষিণ ভিয়েতনাম ছেড়ে এলে হাতের কাছে এমন একটা দ্বীপ কোথায় যেখানে প্রেসিডেণ্ট থিউ, কী এবং তাঁদের সমর্থকদের নিরাপদে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? ভিয়েতনাম যুদ্ধের অনিশ্চিত পরিণতি ব্যাপারে মার্কিন আশ্রিত-বাৎসল্যও একটা মর্মস্পর্শী সমস্যা।

ভিয়েতনামের যুদ্ধে মার্কিন নিগ্রোরা প্রশংসনীয় বীরত্বপূর্ণ অংশ নিচ্ছে। আমেরিকার বিক্ষুব্ধ নিগ্রোরা তা নিয়েও বর্ণবৈষম্যের ধুয়া তুলেছে। মার্কিন-নিগ্রো সৈন্যরা ভিয়েতনাম রণাঙ্গনে অবশ্যই শ্বেতাঙ্গ মার্কিন সৈন্যদের সংগে সমান সুবিধা ও সম্মানভোগী। কিন্তু স্বদেশে এরা বর্ণবৈষম্যের নানারকম বিধিনিষেধে বিড়ম্বিত, অবহেলিত। বিক্ষুব্ধ নিগ্রোদের ধুয়া তাই ভিয়েতনামে প্রাণ দেওয়া এবং নেওয়ায় কঠিন মূল্য দিয়ে মার্কিন-নিগ্রো-সৈন্যরা সাময়িকভাবে মাত্র সমান মর্যাদা পাচ্ছে। ভিয়েতনামের যুদ্ধ থেমে গেলে এই মার্কিন নিগ্রো সৈন্যরা স্বদেশে ফিরে এলে তখন তাদের অবস্থা কী হবে? ভিয়েতনাম-যুদ্ধের একটা গৌণ অঙ্গ হিসেবে মার্কিন নিগ্রোদের মেজাজ মতিগতিও এই এক নতুন সমস্যার ইংগিত দিচ্ছে। জনসন-নীতির কোন কোন সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন, নিউইয়র্কের হারলেমে লস এঞ্জেলেসের ওয়াট এলাকায় এবং এমন আরও অনেক জায়গায় নিগ্রোরা যে মার্কিন সংবিধানমত সমান অধিকার, সুযোগ-সুবিধায় বঞ্চিত তার সমূহ প্রতিকারকল্পে ডঃ হো চি মিনের ভিয়েতকংরা আমেরিকায় হাজির হলে সেটা কেমন হবে? এ-সব অবশ্য বিদ্বেষপ্রণোদিত কূটতর্ক, উড়ো কথামাত্র।

তবে ভিয়েতনামের কী হবে তার চেয়ে কঠিন প্রশ্ন ভিয়েতনামের পর আর কী? কোন সমস্যা নেই, বিরোধ-সংঘর্ষ নেই, যুদ্ধ-বিগ্রহ নেই এমন নিরীহ নিরামিষ পৃথিবীর কথা কল্পনা করতে পারাই অসম্ভব। এই পর্যন্ত ভাবতে পারা সম্ভব যে, প্রেসিডেণ্ট লিণ্ডন জনসন, কী চেয়ার-ম্যান মাও সে তুং যে যাঁর পথ ধরেই চলুন না কেন, সেটাই একমাত্র পথ নয়; তাঁদের নিজ নিজ নেতৃত্ব অভ্রান্ত, অক্ষয়, অব্যয় হতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাসের অনেক ভালোমন্দ দুঃখদুর্গতির মধ্যে এইটি একমাত্র সত্য যে আন্তর্জাতিক দৃশ্যপট পরিবেশ চিরস্থির নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং কম্যুনিস্ট চীনে অস্থিরতার চিহ্ন সুস্পষ্ট; ভিয়েতনামের পরে কী, এই প্রশ্নের মত প্রেসিডেণ্ট জনসন, চেয়ারম্যান মাও-এর পরে কী, সে-প্রশ্নও এখন নিতান্ত মনগড়া নয়।

২৩।১০।৬৭

বাসা বদল

আনন্দ বাগচী

ঝাকলার কাঁটাডালে নখরচিহ্নিত গোল চাঁদ
হাওয়ার শীৎকারে কাঁপে, ভ্রষ্ট, ধৃত, নষ্ট গোপনতা
সমস্ত আকাশ জুড়ে শেষ প্রহরের অন্ধকার।

নাগরদোলায় দুলছে রাশিচক্র বিস্ফারিত মহাশূন্য
সমুদ্র সফেন ছায়াপথ,
বিচ্ছুরিত আয়নায় দিগন্ত বদলায় সারা বেলা
দৃশ্য সরে দৃশ্যান্তরে, মঞ্চের নিরালা
এরই মধ্যে বাসা বদল এরই মধ্যে বিবাহ সংসার
হেঁট মুণ্ডে ফিরে যাচ্ছি একা
প্রণয়-ভাবনা আর প্রজনন, বাস স্টপে দাঁড়িয়ে
শেষবার রুমাল নাড়া, নিছক ভদ্রতাবোধে
বুকে হেঁটে বহু কায়ক্লেশে
জন্মান্তরে আসা।

বেতের ফলের মত মৃত হিম চোখের তারকা,
কাঁটায় কাঁটায় থেমে আছে বন্ধ ঘড়ি
এইরূপ পৃথিবীর বিশুদ্ধ তামাসা
কারেন্সি নোটের মত প্রেমপত্র, কানামাছি সুখ।
কুঠারে লুটায় গাছ, বৃক্ষছায়া হেলে পড়ে,
কামুক দর্পণে,
আদুল পুকুরে যেন মধ্যাহ্নের তপ্ত শ্রোণীভার:
এরই মধ্যে বাসা বদল, এরই মধ্যে বিবাহ সংসার॥

সাঁকো সেতুর নীচে

দেবারতি মিত্র

সান্ধ্য, হেলানো ম্লান সেতুটির ঠিক নীচে
নিঃস্রোত নৌকোয় দূরে চেয়ে বসে আছি, আমি
তীর থেকে বিশীর্ণ বাদামী গাছ
ভগ্ন দৃষ্টি, নিরন্তর চোখের উপর
পাতার ছায়ার জাল বাঁধে;
সামনে প্রান্তর—
জরাজীর্ণ ময়ূরপাখার মত
বিচ্ছিন্ন দুর্বল শব্দে ভারাক্রান্ত
অন্তিম বিষাদে ভেসে যায়।

সন্ধ্যা আরও নিঃস্ব হয়,
অবিবৃত জলে সারি সারি দীর্ঘ আলো
বিস্তৃত উজ্জ্বলভাবে ডুবছে ক্রমশঃ
আমি এ জীবন থেকে সরে যাব,
হাত রাখো আমার মাথায়
আমাকে তোমার কাছে ডেকে নাও
ছায়াবৃত অন্ধকারে অশব্দ ঢেউ-এর মত
ভেঙে ফেলো এই সন্ধ্যাবেলা।
ও মুখ ফেরালে কেন,
সমুদ্যত ভূমিকম্প তোমার দু চোখে –
নিজেও শতধা হল এত অবসাদে,
রঙিন পাথরকুচি সাজানো দেওয়াল,
আমি কি বধির স্তব্ধ অটুট প্রাসাদে?

রায়ডাক ফরেস্ট

শক্তিব্রত ঘোষ

পিঠে ঘড়ি বেঁধে হেঁটে যাচ্ছিলাম রায়ডাকে, কেউ
ফিস ফিস কানাকানি করে যাচ্ছে গাছের পাতায়,
অক্টোবরী নীলের হাওয়ায় :
মানুষের মত নাকি দেখাচ্ছে আমায়।

তারপর সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গেল :
পাখি আর শ্যামগ্রীবা শালগাছ, জলপানরত
হরিণেরা, ঘরকুণো জাগ্রত শামুক, সদ্যোজাত
পার্বতী প্রভাতও।

আমি কোন ধর্মমন্দিরে যাচ্ছিলাম না : কোন
সবুজ উপন্যাসের লেখকের চেয়ে ঢের মনোযোগহীন,
পিঠে ছিল পাহাড়ী স্টেশনে দেখা কুলিদের স্মৃতির ওজন;

আমি কোন বিপ্লবে যাচ্ছিলাম না : কোন
গোলাবাড়িতে বন্দুক দিতে যাওয়ার চেয়েও নিরুদ্দাম,
বুকে ছিল হাড়-কাটা অন্ধকারে গুহাহিত স্বর্গত ললাট;

পিঠে ঘড়ি বেঁধে হেঁটে যাচ্ছিলাম রায়ডাকে, কারা
স্তব্ধ হলো দ্রুত তাল ফিস্ ফিস্ কানাকানি শুনে,
বাদুড়ের আরো ঘুম, আশ্বিন নবমীবিদ্ধ চঞ্চলহীন;
(মানুষের মত নাকি দেখাচ্ছে আমায়, সনাতন
সদ্যোজাত জ্ঞান, সেই স্বর্গীয় উদ্যানগত দিন।)

একই অঙ্গে এত রূপ দেখিনি আগে
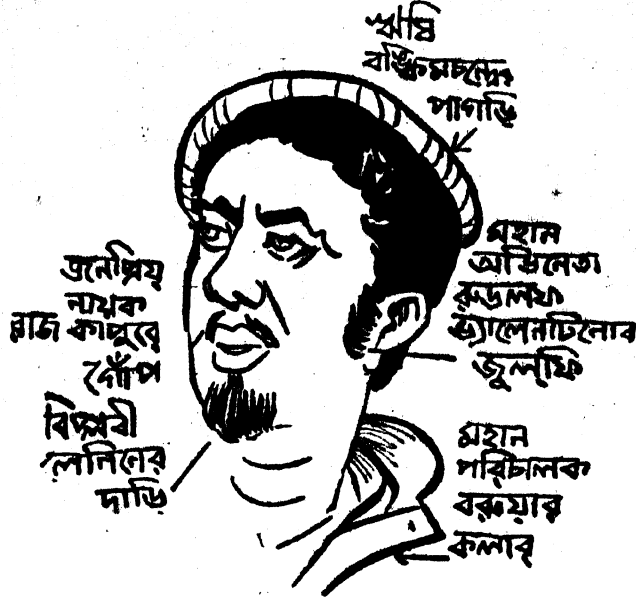
সুনন্দর জার্নাল

‘জনৈক বাঙালী প্রসঙ্গে’

দেশ’-এর পাতায় একটি বাংলা ছায়াচিত্রের সমালোচনা পড়ে ছাড়া-ছাড়া কতগুলো চিন্তা মনে জাগল। ছবিটি আমি এখনো দেখিনি। তবে একই বিষয় নিয়ে একটি মঞ্চসফল নাটক দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে। ছবি এবং নাটকের গুণাগুণ নিয়ে বিচার-বিতর্ক করুন চিত্র আর মঞ্চরসিকেরা, আমি অন্য কথা ভাবছি।

বাংলা নাটকে কিংবা ফিল্মে ইয়োরোপীয় চরিত্রের আমদানি হলেই আমার কেমন বিষম লাগে। তাদের বেশ-বাসের ঐতিহাসিকতা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই—সে তো ড্রেসার আর প্রোডাকশ্যান ম্যানেজারের অবদান, উনিশ শতাব্দীর ইংরিজী কোট-প্যান্ট, ক্রস-বেল্ট, ক্রেপের খানিকটা লাল চুল আর হাতে-মুখে মোটামুটি একপ্রস্থ সাদা পেন্ট চাপাতে পারলেই আমাদের কল্পনাকে অবলীলাক্রমে পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া চলে। আমাদের ভাবনায় পর্তুগীজ ভাস্কো-দা-গামা, স্প্যানীয় ফার্দিনান্দ, ফরাসী লালী, ইংরেজ ক্লাইভ—সব্বাই-ই সাহেব, অতএব একই ‘মেক-আপে’ ‘নীল-দর্পণে’র রোগ সাহেব আর সেনাপতি কার্ভালোর কাজ চলে যায়—বাড়তির মধ্যে কার্ভালোকে একখানা তলোয়ার ঝুলিয়ে নিতে হয়।

তা হোক—সেজন্যে আমাদের মনঃক্ষোভ নেই। অভিনয় উত্তেজক হলেই আমরা সোৎসাহে করতালি দিয়ে থাকি, পুলকিত চিত্তে বাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু ইয়োরোপীয় চরিত্রের মুখে ‘হাম-টোম’—‘কেয়া বোল্‌টা হ্যায়’, ‘মাই গড’, ‘জলডি কেল্লাকো ডেলায়র করো’—এইসব শুনলেই আমার মাথার ভেতরে কি রকম তালগোল পাকিয়ে যায়। মনে করুন, পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে পর্তুগীজেরা দক্ষিণ পশ্চিম ভারতবর্ষে এসে হানা দিয়েছিল, তারা কোন অনৈসর্গিক উপায়ে ভাঙা ইংরিজী বলতে থাকবে—হিন্দীই বা বলতে থাকবে কোন্ ঐশ্বরিক শক্তিতে এবং কী কারণে? তার ওপরে

গঃ বর্গ’? ওটি উচ্চারণ করবার জন্যে লাতিন-গোষ্ঠীর লালী-কার্ভালোকে সারা-জীবন ধরেই জিভে শান দিতে হবে যে। ইয়োরোপীয় মাত্রেই যে ইংরেজ নয়—এ কাণ্ডজ্ঞান আমাদের জন্মাবে কবে?

কিন্তু এ সব পাণ্ডিত্য থাক। বাংলা দেশ আর বাঙালীর খুব আপনজন এণ্টনি ফিরিঙ্গি কবিয়ালের কথাই ধরুন না। এই জল-মাটিরই একজন হয়ে গিয়ে, প্রাণখোলা গলায় কবি গান গেয়ে, ‘কৃষ্টে আর খ্রীস্টে’ ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে এণ্টনি আমাদের সাহিত্যে আর ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছেন।

এণ্টনির পরিচয় কিংবদন্তী আর লোকশ্রুতির ওপরে নির্ভরশীল। খুব সম্ভব জাতে পর্তুগীজ। রাজনারায়ণ বসু তাঁকে ফরাসী বলেছেন, কিন্তু বোধ হয় তা নয়—তা হলে নামটা আঁতোয়ান গোছের কিছু হত। যতদূর জানা যাচ্ছে, তাঁরা অন্তত তিনপুরুষ ধরে বাংলা দেশবাসী; তাঁর ঠাকুর্দা ছিলেন সাবর্ণ-চৌধুরীদের

রোমের পাদ্রী রোমাপুরী ব্রাহ্মণে পরিণত হয়েছিল

কর্মচারী। একবার লালদীঘিতে সাবর্ণ-চৌধুরীদের দোলের সময় কেল্লার একদল ইংরেজ সৈন্য এসে যখন হামলা আরম্ভ করে—তখন এণ্টনির ঠাকুর্দা লাঠিপেটা করে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সে কাহিনীও আমরা পড়েছি। তা হলে এণ্টনিরা তিন পুরুষ ধরে বাঙালী-ঘেঁষা, বাংলা দেশের ভাষা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের নিবিড় সংযোগ।

ভারতবর্ষে পর্তুগীজ উপনিবেশের ইতিহাস সামান্য আলোচনা করলেই তার

কিন্তু বিদেশী জোশে পড়ে—আর মধ্যে [illegible] নিমেনীদের মিলবে না। মস্তটা খাঁচার ঘিরেছিলেন কালিকটার সেই নিজেদের [illegible] আদর্শবাদে। তাঁর মতো নীতির ব্যবস্থা ব্যর্থ হই থাক, আলবুকার্ক বুঝেছিলেন—এ দেশে স্থায়ী হতে গেলে পর্তুগীজদের ভারতীয় হতে হবে. বিয়ে-থা করে পাকাপাকি ঘর-সংসার করতে হবে এখানে। ইংরেজ কলোনিস্ট. ব্যবসায়ী বা রাজপুরুষদের মতো ভোগ-বিলাসের সঙ্গিনী জুটিয়ে, কতগুলো অপজাতকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়ে, এ দেশের নদীতে-সমুদ্রে পায়ের কাদা মুছে, জাহাজে ওঠা ঠিক তাদের কল্পনায় ছিল না।

তাদের বাস্তু-বাঁধবার স্বপ্ন কতটা সফল হয়েছিল, তার প্রমাণের জন্যে গোয়া পর্যন্ত দৌড়োতে হবে না, নিম্ন বাংলার বরিশাল-নোয়াখালিতে আজও বাঙালী পর্তুগীজদের দেখা মিলবে। সিবাস্তিয়ান গঞ্জালেসের মতো দুর্ধর্ষ হার্মাদের বংশধরেরাও আজ নিরীহ মেষপালক হয়ে পূর্ব বাংলায় [illegible] ঠেকেছে, নিখুঁত বাঙাল-ভাষায় কথা বলছে। অর্থাৎ [illegible] [illegible] উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশকে আপন করে নেওয়ার একটা সহজ প্রবণতা তাদের ছিলই—ইংরেজের মতো [illegible] আর উন্নাসিকতা (অবশ্য কেরী-হেয়ার-অ্যাডামসকে আমরা নিশ্চয় ভুলব না) তারা পোষণ করত না।

অতএব কবিওলা এন্টনি ফিরিঙ্গিকে আমরা আকস্মিকভাবে পাই না। তাঁর কথা মনে হলেই দেখি, ঠাকুর্দার সঙ্গে তিনি ছেলেবেলায় বাঙালীর পুজো-মণ্ডপে ঘুরছেন, বাংলার উৎসব-অনুষ্ঠান দেখছেন, বাংলায় কথা বলছেন (সাবর্ণ-চৌধুরীদের কর্মচারীও নিশ্চয়ই ভালো বাংলাই বলতেন); বাঙালীর ভালো-মন্দ একই সঙ্গে আত্মস্থ করে নিয়েছেন। এই দেশের মানুষের সঙ্গে মিশে যেমন কবিগানে গলা মিলিয়েছেন, তেমনি গাঁজার কলকেতেও
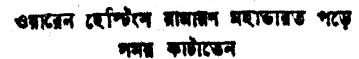
ওয়ারেন হেস্টিংস রামায়ণ মহাভারত পড়ে সময় কাটাতেন

টান দিয়েছেন। আর—খুব সম্ভব 'ঠাকুরে সিংয়ের বাপের জামাই' হওয়ার আগেই 'কুর্তি-টুপি'ও বিদায় করেছেন।

একটি বাঙালী বিধবাকে বিয়ে করেছিলেন—এমন অনেক বিধবাই তো হিন্দু-সমাজের বাইরে বেরিয়ে এসে মুক্তি এবং মর্যাদা পেয়েছিলেন সেদিন। পর্তুগীজ মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তাতো স্বাভাবিক বটেই, এ ব্যাপারে পরম নির্বিকার হিন্দু-সমাজের কোনো পেয়ালাতেও বিশেষ তুফান উঠেছিল কিনা সন্দেহ। আসলে এন্টনি বাঙালী ছিলেন, বাঙালী বিয়ে করেছিলেন, প্রাণ খুলে বাংলা ভাষায় গান গেয়েছিলেন। যে বাংলা দেশে সত্যনারায়ণ অতি সহজে সত্যপীর হয়ে যেতে পারেন, শ্যাম-শ্যামার ব্যবধান যে মাটিতে লুপ্ত হয়ে যায়, যেখানে বৈষ্ণব মতে দুর্গাপুজো হতে পারে—সেই সমদৃষ্টির দেশে এন্টনিও স্বাভাবিকভাবেই ধর্মীয় সংকীর্ণতার সীমা পেরিয়ে গিয়েছিলেন।
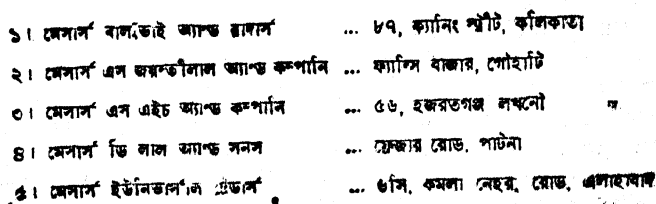
আমার আপত্তি এন্টনির ভাঙা-বাংলা বলাতে, তাঁকে আধখানা 'সাহেব' সাজানোতে, একটা ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে দেখানোতে। একজন বিদেশী কেমন করে নিজের অভ্যাস-পরিবেশ ছেড়ে ক্রমশ আমাদের আত্মীয় হয়ে উঠছেন, নাটকে কিংবা চলচ্চিত্রে এই ব্যাপারটি দেখলে আমাদের বাঙালী সেন্টিমেন্ট উৎসাহিত হয়, আমাদের ভ্যানিটি স্ফীত হয়ে ওঠে। এ আত্মশ্লাঘা ভালোই। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, যিনি স্বভাবতই বাঙালী, তাকে নতুন করে বাঙালীত্ব দেবার কোনো সার্থকতা আছে কি? এবং সে কাজটাকে কি ঐতিহাসিক বলা উচিত?

রামমনোহর

সত্যব্রত সেন

কতবার তাঁকে ছেড়ে চলে এসেছি। পারি নি. সে এসে বারবার ডেকে নিয়ে গেছে। অসাকান্ত কারুরই বেশী দিন সইতো না। আমার দীর্ঘ দিনের অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু এবার চলে গেল।

ইংরেজী ১৯৩৪ সাল। কলুটোলার মোড় থেকে খোলা দোতলা বাসে চড়েছি, যাব শ্যামবাজার। হ্যারিসন রোডের কাছে খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যাঁর সঙ্গে আমার আত্মীয়তাও ছিল, দাঁড়িয়ে রয়েছেন অন্য একটি সমবয়সী ছেলের সঙ্গে। আমাকে ডেকে নামালেন। বললেন, তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, ইনি রামমনোহর লোহিয়া। সদ্য এসেছেন জার্মানী থেকে, তোর সঙ্গে স্বভাবের মিল পাবি। তোরা দুজনাই [illegible]। [illegible] দিয়ে দি।

তারই [illegible] [illegible] [illegible] ও দুটি [illegible]। [illegible] দিলেন আমার [illegible]। তিনি তখন [illegible] করতেন কলকাতার কোন সরকারী অফিসে। তাঁর মন ছিল [illegible]। [illegible] দিন খোলা [illegible] খুবই [illegible] আমার জীবনে। আমার [illegible] [illegible] আমি [illegible]

অমূল্য দাদা বলে। এর সামান্য কয়েকদিন পর অমূল্য দাদা মারা গেলেন, কতকটা আকস্মিকভাবে—বেরিবেরি রোগে।

রামমনোহর একদিন সন্ধ্যায় এল আমার মেসে—৭১নং মির্জাপুর স্ট্রীটে দোতলার কোণের ঘরে। এই বাড়িটির একটি পলিটিক্যাল ঐতিহ্য ছিল। তৎকালীন পুলিস কমিশনার সাহেবকে আসতে হোত নিজে এই বাড়ি সার্চ করতে। আমার অবশ্য অতশত জানা ছিল না। রাম-মনোহরকে দেওয়া গেল মৃত্যুর সংবাদ। খানিকটা চুপ করে বসে রইল, কিছুই না বলে হঠাৎ চলেও গেল। আধঘণ্টার মধ্যে একটি ১৮ ইঞ্চি এ্যাটাচি কেস হাতে নিয়ে এল। বললে, তোমার ঘরখানা আমার খুবই পছন্দ, আমি এখানেই থাকবো। [illegible] একটানা দেড় বছর।

অ্যাটাচির মধ্যে কয়েকখানা বই ও সামান্য টুকিটাকি জিনিস। কাপড় বা বিছানার কোন বালাই ছিল না। আমারও সামান্যই ছিল। তাই ভাগ করে নেওয়া গেল। আমার পাশের ঘরে থাকতেন শ্রীহেরম্বলাল চক্রবর্তী। তারই তত্ত্বাবধানে ও [illegible] সম্পাদনায় সেখান থেকে [illegible] "স্বাধীনতা" নামে [illegible] পত্রিকা।

ভাবি ধরে দৈনন্দিন ঢাকার "জয়শ্রী" পত্রিকার লেখা, ছাপা ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহের চেষ্টায়। অবসর সময়ে চাকরীর চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছিলাম। সন্ধ্যায় প্রতিদিন একটি আড্ডা জমতো,—নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির ২৫।৩০ জন কর্মী এসে জড়ো হোত। অনেক রাত অবধি সে আড্ডা চলতো। দেশের স্বাধীনতাই একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল। রামমনোহর এসেই সে আড্ডাকে আরও প্রাণবন্ত করে তুললে। ছাত্র সমিতির সভ্যদের সঙ্গে রামমনোহরের আগে থেকেই পরিচয় ছিল। ১৯৩৪-এর ১ই সেপ্টেম্বর প্রথম বাংলা কংগ্রেস সোসালিস্ট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন শ্রীঅমর রায়। জয়প্রকাশজী ও ডাঃ লোহিয়া এই কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতেই বাংলা পার্টির পরিচালক সমিতি গঠিত হয়। সভ্যগণ—অতুল বসু ও অজয় মুখার্জি (যুগ্ম-সম্পাদক), অশ্বিনী গুপ্ত, ডাঃ লোহিয়া, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, শৈলেন মিত্র, যতীশ মুখার্জি, মণি ব্যানার্জি, গুণেন্দু মজুমদার, মনোরঞ্জন গুহ, চুনী ঠাকুর, শৈলেশ [illegible], অমিয় [illegible], [illegible] সিং, মহাদেব প্রসাদ পাঠক, [illegible] মুখার্জি, অমিয় মুখার্জি, বিভূতি ঘোষ, আর সি [illegible], [illegible], আবদুল হালিম ও অমরেন্দ্র রায়। ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ সালে রামমনোহর ও এ বি এস এ গ্রুপের সহযোগিতায় "কংগ্রেস সোসালিস্ট" কলিকাতায় প্রথম প্রকাশিত হয়। রামমনোহরই ছিল এর সম্পাদক। পরে এই পত্রিকা সর্বভারতীয় কংগ্রেস সোসালিস্ট দলের মুখপত্র হয় এবং কয়েক সপ্তাহ এখান থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতার শেষ সংখ্যা ১০ম—১০ই মার্চ ১৯৩৫ সাল।

'৩৪' ৩৫-এর বাংলা দেশের রাজনীতি খানিকটা ঝিমে তালে চলছিল। ছাত্র আন্দোলনেও ওপর থেকে ও জমাটভিতের থেকে তখন বিনা বিচারে বন্দী হয়ে রয়েছে নানা জায়গায়। এদের ছাড়া অনেকে আবার কারাদণ্ডেও জেল খাটছিল। সরকারী নির্মম নিপীড়ন মনে হচ্ছিল খানিকটা যেন ফলপ্রসূ হয়েছে। সবারই যেমন ভীত এবং ঝিমিয়ে যাওয়া ভাব। জেলখানার বাইরে যাঁরা ছিল, তাঁরা তখন পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

আমার বড় বোন ও ছোট ভাই তখন বিনা বিচারে বন্দী। রাজনীতির সঙ্গে আমার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না—আজও নেই। আমি চাকরি পাচ্ছিলাম না, তাই বড় বোনের ফেলে যাওয়া কাজ "জয়শ্রী"কে সাহায্য করছিলাম। খানিকটা রামমনোহরের উৎসাহে বাংলাদেশে আবার

আরম্ভ হোল সভা ও মিছিল। লোক বেশী হোত না। ৫০ জন হলে আমরা মনে করতাম grand success। সমস্ত রাত আলোচনা ও তর্ক হয়েছে বহুদিন। সেই ঘরেই কিছুদিন পর অন্যান্য বামপন্থীদের আনাগোনা ও পরে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টিতে যোগদান।

১৯৩৫-এর গোড়ার দিকে আমাকে একবার ঢাকা যেতে হয়েছিল মার অসুখের সংবাদ পেয়ে। আমার যাবার পরদিনই রামমনোহরও গিয়েছিল সেখানে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে সে প্রায় ৯০ মিনিট ধরে চমৎকার ইংরেজীতে বক্তৃতা দিল। বিষয়—আগামী দশ বছরের

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি। সমাজবাদের অবশ্যম্ভাবী অগ্রগতিই সেই বক্তৃতায় সে প্রমাণ করেছিল। সভাপতিত্ব করেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিষয়ের অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তৃতার প্রারম্ভে তাঁকে বক্তার পরিচয় দিতে একটু কুণ্ঠিত মনে হয়েছিল। কিন্তু বক্তৃতার শেষে তাঁর অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ আমার আজও মনে রয়েছে।

রামমনোহরের স্বভাবের আর একটা দিকও এখানে বোলবো। ঢাকা স্টেশনে নেমে ওর হাতে একটি পয়সাও ছিল না। একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে প্রথমে ও আমার বাসায় যায়। সেখানে আমি ছিলাম না, খবর নিয়ে ও চলে আসে বিশ্ববিদ্যালয়ে। একটি ছেলে এসে ওঁকে আমার কাছে পেঁাছে দেয়। আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম গাড়ি ভাড়া কে দিল? ও ছেলেটির দিকে হাত দেখাল, বললো, মোটে ১১ আনা। ছেলেটি শুধু হাসছিল। কপর্দকহীন অবস্থায় এভাবে চলে আসাটা আমি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিনি অনুমান করেই ও হেসে বললো, যারে, পয়সা তো আমার কাছে শেয়ালদা স্টেশনে টিকিট কাটার পরই ছিল না। আর অপ্রসন্ন থাকা গেল না, ওকে কিছু খাবার দিতে হবে সেই বাস্তবে। স্বর্গীয় অধ্যাপক জ্ঞান ঘোষ মহাশয়ের সহৃদয়তায় দুই বন্ধু আবার ফিরে এলাম কলকাতায়।

পয়সাকড়ি সম্পর্কে বরাবরই সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। কাজের পয়সা যদি বা জুটতো, খাওয়া দাওয়া ও কাপড় চোপড়ের পয়সা বড় একটা থাকতো না। মাসের প্রথম ১০ দিনের মধ্যে মেসের খাওয়া বন্ধ হয়ে যেতো। সময়মত পয়সা না দিলে ওরাই বা কি করে খাবার জোগাবে। পয়সার অভাবে সর্বদিন পাইস হোটেলে বসেও খাওয়া হোত না। নিচের তলায় যতীনের চা—এক পয়সায় হাফ কাপ—তাও দেনা জমে গেল একমাসে ৩৮ টাকা। এমনও হয়েছে, সমস্ত দিন অনাহারের পর পাশের ফেভারিট কেবিন-এ চা, ডিম ভাজা ও রুটি খেয়েছি—পরে অবশ্য একজনকে বসে থাকতে হোত, অন্যজন বন্ধু সংগ্রহ করতে বেরুতো।

দুপুরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, কতক্ষণে ট্রামের মধ্যদিনের কনসেশন আরম্ভ হবে। দুই পয়সায় এসপ্লানেড থেকে বালীগঞ্জ স্টেশন। আমার ছোটবেলার একটি গল্প ও শুনতে ভালবাসতো। আমার বয়স যখন দশ কি এগারো, আমার এক মামার সঙ্গে যাচ্ছিলাম ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, ভীড় প্রচণ্ড। আমার বয়স তখন ১৮।১৯, কলকাতায় ছাত্র। বোধ হয় খানিকটা সম্ভ্রম জাগাবার জন্যই বলেছিলেন, আজ তোকে যদিও তৃতীয় শ্রেণীতেই নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু তুই যদি কখনো কলকাতায়

আমি মনের আনন্দে তৈরী করে রাখছি রামমনোহরের রাজনৈতিক বিস্ফোরক, যদি কখনো কা কাজে লাগে।

'৪৭-এর ১৫ই আগস্ট। সারারাত বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হোল। সে রাত ১২টা থেকে ভোর ৪টের মধ্যে নয় জায়গায় বক্তৃতা দিল এই শহরেই। তার মধ্যে সম্পূর্ণ বাংলাতে তিন জায়গায়। তার মন তখন অত্যন্ত অশান্ত। বারবার আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিচ্ছে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন আমি যেন কিছুতেই না ভুলে যাই।

'৪৭-এর সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে আমি দিল্লী ছিলাম। গান্ধীজির প্রার্থনা সভায় রোজই যেতাম। তাঁর জন্মদিনের প্রার্থনা সভা কখনো ভুলতে পারবো না। বলেছিলেন, "আজ আমার জন্মদিন, নানা জায়গা থেকে শুভেচ্ছার বাণী আমার কাছে পৌঁছেছে। সবাই আমার দীর্ঘ জীবন কামনা করেছে। আমার কিন্তু আর এক মুহূর্তও বাঁচবার পথ নেই।" রামমনোহরও তখন দিল্লীতে, আলাদা জায়গায়। দুপুর থেকে শ্রী এম ও মাথাই একটি গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, 'ডাঃ লোহিয়া কই? তাঁকে রাত্তিরের খাবার টেবিলে ধরে না নিয়ে যেতে পারলে আমার চাকুরী থাকবে না যে।" শ্রীমাথাই তখন প্রধানমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী আর আমার বন্ধু প্রায়ই প্রধানমন্ত্রীর একমাত্র অতিথি, রাত্তিরে খাওয়ার সময়। নেহরুজী ইংরেজরা যেভাবে রাজ্য-চালিয়ে গেছে, ঠিক সেইভাবে রাজ্য চালানোতে বাহাদুরী বলে মনে করছেন। গান্ধীজীর সেটা পছন্দ নয়। রামমনোহর সে সময় সম্পূর্ণ গান্ধীজীর দিকে। Senior I C S-এর কোন নামই সে শুনতে পারতো না। তাঁর ধারণা ছিল, এ'রাই নেহরুজীর সঙ্গে গান্ধীজীর বিরোধের মূল কারণ।

তারপর এল দিল্লীতে মুসলমান নিধন যজ্ঞ। গান্ধীজী ছিলেন না। ছুটে চলে গেলেন দিল্লী। সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাপাতে চাইলেন নেহরুজীর ওপর। তখনও রামমনোহর প্রতি সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একত্রে খাচ্ছে। একদিন গান্ধীজীর প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে ফেললেন প্রধানমন্ত্রী। রামমনোহর আমাকে বলেছে, "নেহরুজীর সঙ্গে আমার বহুদিনের সম্পর্ক। এমন সময় অনেক গেছে, যখন দুজনেই দুজনকে অনেক কড়া কথা বলেছি। সেদিন অনেকক্ষণ ধরে তাঁর কথা শোনার পর আমি শুধু বলেছিলাম, এটা মেনে নিচ্ছি, আপনার হাত ছিল না, এটাও সত্যি গান্ধীজী বুড়োই হয়েছেন, কিন্তু আপনাকেও মানতে হবে যে, অনেক মুসলমান তো মারা গিয়েছে। আপনি তাঁকে দুঃখিত করবেন না, আপনাকে অন্য জাতের লোক (বেওকুফ) বানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ চটে উঠলেন, এ মেজাজ আগে কখনো দেখিনি। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। অদ্ভুত অবস্থায় আস্তে বেরিয়ে আসতে হল।"

নেহরুজীর সঙ্গে আর কখনো রামমনোহর দেখা করেনি। সমাজবাদীগণ কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসার পর কেউ কেউ নেহরুজীর সঙ্গে দেখা করতেন. ও শুধু হেসেছে। বলেছে—যাঁর কাছ থেকে কিছু আশা করার নেই, কেন যে লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যায়. সেটা আমি বুঝি না।

'৬২ সালে রিণিদি (মিসেস অরুণা আসফ আলী) একবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন ও'কে ধরে নিয়ে যাবার জন্য। প্রধানমন্ত্রী তখন অসুস্থ—এবং সেটাই অজুহাত হিসেবে দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন। রামমনোহর বারবার একই কথা বলেছিল, "আমার দেশের সমাজবাদ যে লোকটি পিছিয়ে দিয়েছে, আমি কখনো তার সঙ্গে দেখা করতে যাব না"। আমি ছিলাম সেদিন তার সঙ্গে। খানিকটা পরে সে আমাকে বলেছিল, "তুমি একবার যাও না ইন্দিরার কাছে। সে ইচ্ছে করলেই তার বাবাকে দিয়ে একটি কাজ করিয়ে নিতে পারে। মৃত্যুর আগে তিন একর অথবা তার কম জমি যে-সব চাষীদের রয়েছে, তাদের খাজনা উনি মকুব করে দিয়ে যান। অন্তত কয়েক কোটি লোকের কিছুটা সুরাহা হবে। এটাই হোক ও'র জীবনে একমাত্র সমাজবাদ।"

'৪৬ থেকে ও'র মৃত্যু পর্যন্ত আমার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ছিল। বিহার, রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশের বহু জায়গায় আমি ও'র সঙ্গে ঘুরেছি। শুধু একটি কথা, দেশের এই দারিদ্র্য দূর করতে হবে। আমি তাকে নিয়ে তর্ক তুলেছি, একই উত্তর পেয়েছি, "উত্তর ভারতে চাষীদের যে দারিদ্র্য, তা তোমার কল্পনারও বাইরে। ইংরেজী না হটাতে পারলে ওদের ওপর আমলাতন্ত্র যে শোষণ নীতি চালাচ্ছে, আমি তা বন্ধ করতে পারবো না।" কখনো বা বলছে, "তুমি কিছুই বুঝতে পারছো না—এই দারিদ্র্য বারবার দেশকে পরাধীন করেছে। এটা দূর না হলে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।"

"এই দেশে সত্যিকারের সমাজবাদ এলে তুমি দেখে নিও, পাকিস্তানের জনগণ আমাদের দিকে চাইবে—আমাদের অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন সফল হয়ে উঠবে। তুমি তো কথা দিয়েছিলে, এই স্বপ্ন দেখা কখনো ভুলবে না।"

"কোন রকম ব্যক্তিগত সম্পত্তির লোভ নেই, এমন লোক কি কখনো পাব না, যারা নিজ পরিশ্রমে ধন উৎপাদন করবে

আর নিজের অবশ্য প্রয়োজন মিটিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। জানো, আমি সেদিন পার্লামেন্টে মন্ত্রীদের দিকে হাত দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে, মন্ত্রী থাকাকালীন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাড়াওনি। ও'রা সবাই এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। যিনি ও'দের মধ্যে প্রবীণ, তিনি শুধু মাথা নিচু করে রেখেছিলেন। উত্তর কেউ দিলেন না।"

"পার্লামেন্টে যাঁরা ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন, তুমি তো কোনদিন তা শোননি। যদি শুনতে তোমাকে দুই কানে আঙুল দিয়ে বসে থাকতে হত। কী উচ্চারণ, কী-ইবা বচনবিন্যাস—অপূর্ব। এ'দের লজ্জা-সরমের কোন বালাই নেই।"

কত দিনের বন্ধুত্ব, কখনো এ'কে কোন ভোগের সামগ্রী কিনতে দেখিনি। বহুবার বিদেশে গিয়েছে, একখানা বিদেশী ব্লেডও আনেনি। নিজেকে রেখেছে দরিদ্র বানিয়ে, লড়াই চালিয়ে গিয়েছে তাদেরই একজন হয়ে। সত্য-ভাষণের একটা দায়িত্ব রয়েছে, সেটা সে মেনে নিয়েছিল। তার দারিদ্র্যের সাধনা সেই জিনিসেরই অঙ্গ। মৃত্যুর সঙ্গে যখন শেষ লড়াই করছে, তখন মাঝে মাঝে সামান্য সময়ের জন্য জ্ঞান ফিরে পেত। একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখে তার বিছানার চারপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অনেক ডাক্তার। তখনও তাঁর মুখে হাসি, বলেছিল, "তোমরা এত জন ডাক্তার একজন রোগীকে দেখতে এসেছো। অথচ জানো, সমস্ত জীবন ডাক্তারের নাগাল পায় না আমার দেশে, এমন লোকের সংখ্যা কয়েক কোটি।"

যাঁরা এতদিন তাঁকে পাগল বলতো আজ দেখতে পাচ্ছি তাঁরাই তাঁকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছে। অনেক প্রশংসাবাদও নাকি বেরিয়েছে, আমি পড়িনি। '৩৪—'৩৫ সালের কংগ্রেস সোস্যালিস্ট আমার কাছে রয়েছে, তাঁর আধুনিক কালের সব লেখা, তার রয়েছে তাঁর কত কথার স্মৃতি। তাঁর লেখার কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করে দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু হয়নি। বাঙালীকে কী ভালবাসাই না সে বাসতো। অনেক কিছু আশাও ছিল তাঁর মনে। জীবনের বিভিন্ন সময়ে বাংলা দেশকে কেন্দ্র করে নানারকমের প্রকাশ সে করেছিল—কিছুই টিকলো না।

এই তো সেদিন এসেছিল কলকাতায়। তাকে অনুযোগ জানিয়েছিলাম "তুমি এখন আগের মত আস না কেন।" উত্তর পেয়েছি, "তুমি তো জান, বাংলা দেশ আমার কত প্রিয়। আমি অর্থনীতির ছাত্র,—তুমি জান, রমেশ দত্ত মশাই ও বিনয় সরকার মশাই-এর পর আর কোনো অর্থনীতিবিদ্ হয়নি। আমি তাঁদের কাছে কত কৃতজ্ঞ। এটা হোল রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষের দেশ। এঁদের জাতীয়তাবাদ আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এঁদের কাছেই আমি শিখেছি বিশ্ব-জনীনতা। আজ বাঙালীর সে দৃষ্টিভঙ্গী কই। আজকের দিনে বাঙালী ইনটেলেক-চুয়েল, তারা তো চেয়ে রয়েছে কেউ আমেরিকার দিকে, কেউ বা রাশিয়ার দিকে। আবার শুনতে পাই, চীন দেশের পানেও নাকি কেউ কেউ তাকাচ্ছে। তোমার মাস্টার মশাই (অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু)কে বাদ দাও। আমাকে কেউই চান না।" আমি নিরুত্তর রইলাম।

আজ রামমনোহরের মৃত্যুতে আমি অনুভব করছি স্বজন-বিয়োগ-ব্যথা।

ভাঙা খাঁচার চারপাশে

মিহির মুখোপাধ্যায়

আমাদের চারপাশে বিকেলের আলো। আসলে শীতের সন্ধ্যা। হাতঘড়িতে দেখলুম, চারটে বাজে। লাল ধুলোর পথ। ধুলোর মধ্যে মধ্যে অভ্রখন্ড শেষ বেলার রোদে চিকচিক করছে। পথের পাশে একটা দুটো শাল, মহুয়া, বাবলা গাছ। আমার একটু আগে আগে ছই-ঢাকা মোষের গাড়িটা যাচ্ছে। মেজদি একবার বলেছিল—তপু, তুই গাড়িতে উঠে আয়। আমি আপত্তি করেছিলুম। এই সুন্দর বিকেলে সম্পূর্ণ অচেনা এই পথে হাঁটতে ভাল লাগছিল আমার। কাল দুপুরেও ভাবতে পারিনি, আজ এমন সময় শাল মহুয়া বনের কাছাকাছি এরকম একটি সুন্দর পথ ধরে হাঁটতে হবে আমায়। নিয়মমতো নিশ্চিন্ত মনে অফিসের কাজ করছিলুম।

বেলা একটা নাগাদ বেয়ারা বৃন্দাবন এসে বললো—বাবু, আপনার ফোন ডাকছে। এটি বৃন্দাবনের পেটেন্ট কথা—ফোন ডাকছে। এ নিয়ে আমরা হাসাহাসি করি। বন্ধুরা কেউ ডেকেছে ভেবে ধীরে-সুস্থে উঠে গেলুম। বড়বাবু ঘনশ্যাম হালদারের টেবিলে টেলিফোন। ফোন তুলেই মেজদির গলা শুনতে পেলুম—হ্যালো তপু, অফিসে ছুটি নিয়ে এক্ষুনি চলে আয়।

—কেন, কি হয়েছে?

—খুব বিপদ, পরে সব বলবো, তুই চলে আয় তাড়াতাড়ি, ছেড়ে দিচ্ছি। খট্ করে ফোন ছাড়ার শব্দ পেলুম। কিছু বুঝতে পারছি না। কয়েকদিন আগে জামাইবাবু ব্যবসার কাজে বাইরে গেছেন। মধ্যে মধ্যে ওরকম যান। সাত-আট দিন পর পর ফেরেন। বরাবর যেমন থাকতে হয়, তেমনি বুড়ী শাশুড়ী, পুরনো চাকর নাথু আর তিনু-পিনুকে নিয়ে বাড়িতে রয়েছে মেজদি।

তবে কি জামাইবাবুর কোন খারাপ খবর এল?

ঘনশ্যামবাবুর কাছ থেকে ছুটি পাওয়া মুশকিল। মেজদিদের বাগান থেকে কলম্ব লেবুর চারা এনে দেবার কথা দিয়ে অনেক কষ্টে ছুটি আদায় করলুম। বছর দুই হ'ল বাঁশদ্রোণীতে বাড়ি করেছেন জামাইবাবু। একতলা ছিমছাম বাড়ি। সামনে খানিকটা ঘাস-জমি, ফুলবাগান, পাতাবাহারের বেড়া, গেটের উপর মাধবীলতা। বাড়ির পেছনে শাকসবজির আর ফলের বাগান।

বেলা তিনটে নাগাদ পৌঁছুলাম। দরজা খুলে দিল নাথুরাম। শোবার ঘরে মেজদি তখন মাঝারি গোছের একটা স্যুটকেস গোছাচ্ছিল।

আমাকে দেখে বললো—তুই এসে পড়েছিস, বাঁচলুম, না হলে আমাকে একাই যেতে হ'ত।

—কি হয়েছে, কোথায় যেতে হবে?

—সব কথা পরে বলবো, তুই নাথুর সংগে হোল্ড-অলটা গুছিয়ে নে তো। ছোটবেলা থেকেই এই স্বভাব মেজদির।

ভয়ানক জেদী। মনে মনে যা একবার ঠিক করে ফেলবে, তা থেকে আর নড়বে না, কেউ নড়াতে পারবে না। একজনের মতো ছোট একটা বিছানা বাঁধা হ'ল। মেজদি বললো—তোর জামাইবাবুর একটা গরম কোট গায়ে দিয়ে নে, ওদিকটায় বেশ শীত হবে হয়তো।

—আমরা যাচ্ছি কোথায়, কত দূর হবে—

—গেলেই দেখতে পাবি, এত ব্যস্ত কেন? ঘরের ওদিকে মস্ত আয়না-বসানো আলমারির পাল্লা খুলে গরম কোট বার করতে করতে জবাব দিল মেজদি—জায়গাটা আমারও অচেনা, তবে পরশু কিংবা পরের দিন ফিরতে পারবো মনে হয়।

—সে কি, আমার অফিসে যে কামাই—

—দু' দিনের কামাইতে কিছু হবে না, মেডিক্যাল লিভ নিবি। ঠাণ্ডা কঠিন গলা মেজদির। যুক্তিতর্কে কোন লাভ নেই। অতএব আর কথা না বাড়িয়ে জামাইবাবুর গরম কোট গায়ে চাপালুম। মানুষ-প্রমাণ আয়নার সামনে একটু ঘুরে ফিরে দেখে নিলুম। মোটামুটি মানানসই হয়েছে। মেজদি ততক্ষণে চিঠি লিখতে বসেছে, লিখতে লিখতে ডাক দিল—নাথু, দাদাবাবুকে চা দিয়ে যাও।

আপাততঃ আমার কিছু করণীয় নেই। পাশের ঘরে বসে বিলিতী পত্রিকার পাতা ওলটাতে লাগলুম। একটু পরে নাথু চা আনলো। মেজদিও দুখানি চিঠি হাতে করে এ ঘরে এলো। নাথুর হাতে খামে আঁটা চিঠি দিয়ে বললো—যদি তোমার বাবুজী কাল ফিরে আসেন, তবে এই চিঠি তাঁকে দেবে, আর এই চিঠিখানা আমার মাকে দিয়ে আসবে, বলবে তপুদাদা আমার সঙ্গে গেছে, আমি সব লিখে দিয়েছি, তার আগে তিনু-পিনুকে স্কুল থেকে নিয়ে আসবে, হাতমুখ ধোয়াবে, জলখাবার দেবে, তারপর আমার মায়ের কাছে চিঠি নিয়ে যাবে, এই রাখো তোমার বাসভাড়া—নাথুর হাতে পয়সা দিতে দিতে বললো—এখন যাও, তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ধরে আনো।

মেজদির শাশুড়ি চোখে কম দেখেন। তাঁর সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি হয় না।

ছেলের বউকে তিনি ভালও বাসেন, তবে ভয় করেন বোধ হয় একটু বেশী।

যাবার আগে তাঁকে প্রণাম করে বললো মেজদি—মা, আমি একটু কলকাতার বাইরে যাচ্ছি, আমার এক আত্মীয়ের খুব অসুখ।

—ছেলেমেয়ে নেবে না, দুটো দুধের একলাই যাচ্ছো নাকি?

—না, তপু আমার সঙ্গে যাবে, ওকে অফিস থেকে এনেছি।

—কবে ফিরবে?

—পরশু, আপনি তিনু-পিনুকে দেখবেন। আর কোন কথা জিজ্ঞেস করার [illegible] কে দিয়ে [illegible]

মেজদি। হাতব্যাগ থেকে একশো টাকার একটা নোট বার করে আমার হাতে দিয়ে বললো—টাকাটা রাখ, দুখানা সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট কাটবি।

বাইরে গাড়ির শব্দ হ'ল। নাথু ট্যাক্সি ডেকে এনেছে। আমি তখন কলকাতার বাইরে কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ আত্মীয় আছেন মনে মনে খুঁজে দেখছিলুম।

বড় মাসীমা বহরমপুরে, ছোট মামা জব্বলপুরে, জ্যাঠতুতো এক দাদা আছেন বোম্বাইতে, বড় মামা মালদহে, ছোট কাকা গৌহাটি।

ট্যাক্সি ছুটল। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর পাশ ঘুরে সোজা উত্তরে।

কোথায় যাচ্ছি, কাকে দেখতে যাচ্ছি—এসব প্রশ্ন মনে এলেও মুখে আনলুম না। হয়তো ধমক শুনতে হবে। দু-চারবার পাশে তাকালুম। শান্ত কঠিন মুখে সামনে তাকিয়ে রয়েছে মেজদি।

টালিগঞ্জ রেল-ব্রিজের নীচে দিয়ে হুস করে বেরিয়ে এলুম। ডাইনে রবীন্দ্র সরোবর এক পলক চোখে পড়ল। বাঁয়ে সাদার্ন মার্কেট, তারপর ডাইনে সাদার্ন এভিনিউ, রাসবিহারীর মোড়, কালীঘাট পার্ক ট্রাম-ডিপো—হাজরা রোডের কাছে এসে ট্রাফিক জ্যাম এড়াবার জন্য বাঁয়ে ঘুরে হরিশ মুখার্জি রোড ধরে আবার উত্তরে ছুটল ট্যাক্সি। সামনে ময়দান, রেড রোড।

মেজদির কথা কানে এলো—অসিতবাবুকে তোর মনে আছে?

আমি চমকে চোখ ফেরালুম। শান্ত মুখে সোজা সামনে তাকিয়ে আছে মেজদি। এখন যেমন মোষের গাড়ির পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পাচ্ছি মেজদির মুখের পাশে আলো পড়েছে। আমাদের পেছনে পশ্চিমের আকাশ। কালও ঠিক এমন সময় রেড রোড ধরে গাড়ি ছুটেছিল; বিকেলের আলো পড়েছিল মেজদির ফর্সা মুখে। পশ্চিমের আকাশ আর শেষ বেলার সূর্য ছিল আমাদের বাঁ পাশে, গঙ্গার ওপারে। আমাদের তিন ভাইবোনের মধ্যে মেজদি সবচেয়ে ফর্সা। মেমসায়েবদের মতো চোখের রঙ, চুলের রঙ পর্যন্ত বাদামী। মেজদির সেই ফর্সা মুখে টিকলো নাকের ডান পাশে ছোট্ট একটা লাল তিল। ময়দানের পাশে ট্যাক্সি ছুটছিল।

মেজদির মুখে অল্প অল্প সিঁদুরের রঙ। মনে হ'ল, প্রাণপণে কোন উত্তেজনা চেপে শান্ত চোখে সামনে তাকিয়ে যতটা সম্ভব সহজভাবে কথা বলার চেষ্টা করছে —কি রে ভুলে গেছিস, রমা বউদির ভাই—

আমি আমতা আমতা করে বললুম—অসিতবাবু, মানে, আমাদের সেই সিতুদা—

হ্যাঁ, তিনি। মাথা নেড়ে সায় দিল মেজদি—তাঁর খুব অসুখ।

আমি [illegible]

রইলুম। আবার কুড়ি বছর পরে অসিতবাবুর কথা মনে পড়ল, মেজদির মুখে তার নাম শুনলুম। যে নাম আমাদের পরিবারে নিষিদ্ধ ছিল। যে নাম মুখে আনলে ছোট কাকা আমার পিঠের চামড়া তুলে দেবেন বলে শাসিয়েছিলেন। বছর কুড়ি আগে মেজদি আর অসিতবাবুর সম্পর্ক নিয়ে আমাদের পরিবারের সেই রক্ষণশীল পরিধির মধ্যে যে ঝড়, যে তিক্ততার তুফান উঠেছিল এতদিন পরে আমার রক্তের মধ্যে, আমার বুকের মধ্যে, আমার স্মৃতির মধ্যে আবার যেন সেই আলোড়ন অনুভব করলুম। হাওড়া ব্রিজের মুখে আমাদের ট্যাক্সি তখন সাবধানে আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল। সামনে একটা দোতলা বাস। তার সামনে পর পর দুখানি ট্রাম। আমি জিজ্ঞেস করলুম—তুমি তাঁর খবর পেলে কোথায়?

—আজ সকালে রমা-বউদি এসেছিলেন, ও'রা ঢাকুরিয়ায় বাসা করে আছেন। উনি মধ্যে মধ্যে আমার এখানে আসেন, আমিও কয়েকবার গেছি ও'দের বাসায়—

মনে আছে, এই রমা-বউদির বাড়িতে যাওয়া আমাদের বন্ধ হয়েছিল।

মায়ের হুকুম। আমি কিংবা মেজদি কেউ আর ও'দের বাড়ি যেতে পারবো না। অথচ ওরা আমাদের তিনপুরুষের প্রতিবেশী। সরু সুরকির রাস্তায় মুখোমুখি বাড়ি। আমাদের ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের দোতলার জানালার সঙ্গে কথা বলা যেত। রমা-বউদির শ্বশুর নিবারণ মিত্র ছিলেন ডাকসাইটে মোক্তার। অনেক টাকা-কড়ি, জায়গা-জমি, বিষয়-আশয় করেছিলেন। তাঁর বড় ছেলে ধীরেনবাবুকে আমরা বড়দা ডাকতুম। পাড়ার সকলের বড়দা তিনি। সেই সূত্রে রমা-বউদি। বড়দা নাকি আইন পাস করেছিলেন। কিন্তু ওকালতি করতে দেখিনি কখনো। পাড়ার ফুটবল ক্লাব, লাইব্রেরী, থিয়েটার, ভোটাভুটি ইত্যাদি নিয়েই ভয়ানক ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর ফুটবল ক্লাবে আমিও খেলেছি।

খেলতুম রাইট-হাফে। কোন বড় খেলার আগে ডেকে বলতেন—তপু, ওদের লেফট-আউটের খেলা দেখেছিস তো, খুব সাবধান, কিছুতে বেরোতে দিবি না, পায়ে পায়ে আঠার মতো লেগে থাকবি।

ট্যাক্সি তখন হাওড়া ব্রিজের উপর উঠে এসেছে। দু পাশে অপরাহ্নের গঙ্গা। আমাদের ছোটবেলার সেই মহকুমা শহর। যার এক পাশে এমনি একটা নদী ছিল।

কিন্তু সেই নদীর কিনারায় এত কল-কারখানা, বড় বড় বাড়ি কিংবা মানুষের এত অন্ত ভিড় ছিল না। সেই নদীর দু পাশে নারকেল-সুপুরির সারি আর সবুজ ধানের ক্ষেত আর কাশফুলের সমারোহ। সন্ধ্যায় নদীর জলে একটি দুটি জেলে-ডিঙির [illegible]

জনারা যেন্তে বাঁদর আজির পরলার সোঁকো যত পনে টেনে টেনে আস্তে আস্তে।

আমি বললন্ম—এতকাল পরে সিতুদা কি তোমাকে চিনতে পারবেন?

—কেন পারবেন না' এতক্ষণে মেজদির ঠোঁটের কোণে এক ফোঁটা হাসি দেখলন্ম—বছর দনুই আগে রমা-বউদির মেয়ে টনুনুর বিয়ের সময় দেখা হয়েছিল, তা ছাড়া আমি অনেকবার চিঠি লিখেছি, উনিও জবাব দিয়েছেন।

মেজদি এখন একটি সংসারের সর্বময়ী। দনুই ছেলের মা, স্বাধীন সাবালিকা। অসিতবাবনুর কাছে চিঠি লেখার জন্য কেউ আর তাকে কিছনু বলবে না, বলতে পারবে না। পারেন শনুধনু জামাইবাবনু। নিজের ব্যবসার কাছেই ব্যস্ত থাকেন সব সময়। তিনি হয়তো জানেন না। কিংবা হয়তো জানেন। কিন্তু মেজদির বাপের বাড়ির প্রতিবেশী রমা-বউদির ছোট ভাই-এর কাছে চিঠি লেখাটা বোধ হয় আপত্তিকর মনে করেননি তিনি। মেজদি তাঁকে কি বনুঝিয়েছে কে জানে। অথচ এই চিঠি লেখা নিয়েই তুমনুল কান্ড শনুরনু হয়েছিল।

অসিতবাবনুর কাছে লেখা মেজদির একখানি চিঠি ধরা পড়েছিল।

কুড়ি বছর আগের সেই দনুপনুরের ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে আমার। মেজদির বয়স তখন সতেরোর ঘরে। সে বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। আমি ক্লাস নাইনে উঠেছি। স্কুলে গ্রীষ্মের ছনুটি। দোতলার সিঁড়ির পাশে একটা ছোট ঘর ছিল। কদাচিৎ ব্যবহৃত হত। একটা তক্তাপোশ, একটা পনুরনো কাঠের আলমারি আর গোটা দনুই টিনের তোরঙ্গ ছাড়া অন্য কিছনু ছিল না সেখানে।

ছোট কাকা আর মা মেজদিকে নিয়ে সেই ঘরে ঢনুকলেন। ভেতর থেকে দরজা ভেজিয়ে দিলেন। ওপাশে বারান্দার দিকে দনুটো জানালা ছিল। একটা বন্ধ, একটা খোলা। আমি প্রায় বেড়ালের মত নিঃশব্দে সেই বন্ধ জানালার পাশে এসে খড়খড়ি একটনু ফাঁক করে ভেতরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করলন্ম।

আমার দিকে পেছন ফিরে তক্তাপোশে বসেছিলেন মা। সামনে গোঁজ হয়ে বেপরোয়া ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে মেজদি। ফর্সা মনুখ লাল। কালো রঙের ছাপা শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়ানো, এক পিঠ বাদামী চুলের রাশ।

কিছনু পেছনে দরজা আগলে ছোট কাকা। মায়ের হাতে একখানি কাগজ। মেজদির সেই চিঠিটা পড়ছিলেন তিনি। হঠাৎ মনুখ তুলে গর্জন করে উঠলেন—তোর লজ্জা করে না, বামনুনের ঘরের আইবনুড়ো ে মস্ত মেয়ে, পাড়ার একটা কায়েত ছেলের কাছে এমন চিঠি লিখতে তোর লজ্জা হল না, গলায় দড়ি জোটে না, কেন লিখেছিস বল, তোকে আজ মেরেই ফেলব। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন, মেজদির চুলের মনুঠি ধরে

বার কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—বল, কেন লিখেছিস বল—

আমার মা মোটাসোটা মানুষ। অল্পেতেই হাঁপিয়ে পড়েন। আবার তক্তাপোশে বসে কিছুক্ষণ হাঁসফাঁস করে করে চিঠিটা পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে মন্তব্য করলেন—কি লেখার ছিরি! আপনি আমার জীবনের ধ্রুবতারা, ছিঃ ছিঃ! মুখ তুলে আবার ধমক—হারামজাদী, জীবনের ধ্রুবতারার মানে জানিস তুই, এসব কথা শিখলি কোথায়—

মায়ের ধারণা কিছু ভুল ছিল। পাড়ার পাঠাগার থেকে আনা নাটক-নভেলের কল্যাণে আমাদের শেখার কিছু বাকি ছিল না। আমি বই নিয়ে আসতুম। তারপর দু' ভাইবোন ছাতের চিলেকোঠার ছায়ায় বসে গোগ্রাসে গিলতুম।

এক এক দুপুরে এক একটি উপন্যাস শেষ। জীবনের ধ্রুবতারা তো সামান্য কথা, আরো অনেক ভালো ভালো উপমা আমাদের কণ্ঠস্থ ছিল। মেজদি আবার বাছা বাছা জায়গা একটা খাতায় টুকে রাখতো। সেসব থেকেই হয়তো খানিকটা তুলে দিয়েছিল। একে চার পাতার চিঠি, তায় মেজদির ঠাস-বুনুনি লেখা। এমন লেখা পড়ে মায়ের অন্তত চমৎকৃত হওয়া উচিত ছিল। আমি জানালার পাশে দেয়ালের সঙ্গে লেপটে এক একবার উঁকি দিয়ে এক পলক দেখে নিচ্ছি। এবার ছোট কাকার গম্ভীর গলা কানে এল। উঁকি দিয়ে দেখলুম ছোট কাকা সামনে এসে মেজদির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলছেন—মীরা, মুখ তুলে তাকাও, আমার কথার জবাব দাও—

কঠিন মুখে সোজাসুজি তাকাল মেজদি। ছোট কাকার গম্ভীর গলা শুনলে আমরা কেন্নোর মত গুটিয়ে যেতুম। কিন্তু মেজদি তখন যেন বেপরোয়া। ভয়-ডরের লেশমাত্র নেই।

ছোট কাকা জিজ্ঞেস করলেন—অসিত তোমার কাছে কখনো চিঠি লিখেছে?

মেজদি চোখ নামাল, মুখ নিচু করল। মা বললেন—নিশ্চয়ই লিখেছে, ওর চিঠির প্রথমেই আছে দেখ না, এই যে, আপনার চিঠি পেয়ে ভাল লাগলো। তারপর ধমকের সুরে—কোথায় সে চিঠি বল—

ছোট কাকাও একই সুরে সঙ্গে সঙ্গে বললেন—কই, সে চিঠি কোথায় রেখেছ, বার করে দাও।

হঠাৎ যেন ফণা তুলে ফুঁসে উঠল মেজদি—না, দেব না, আমার চিঠি আমি কাউকে দেবো না।

ছোট কাকা পর্যন্ত কেমন হকচকিয়ে গেলেন।

চেঁচিয়ে উঠলেন—বাঃ বড় তেজ দেখ মেয়ের, নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার! তারপর বড়দাদু উদ্দেশে—উনি এসে দেখুন, ওর আদুরী মেয়ে আশকারা পেয়ে পেয়ে কোথায় উঠেছে। ছোট কাকা এবার ক্ষেপে গেলেন। ঘরের কোণে একটা পুরনো ভাঙা ছাতা ছিল। তার বাঁট খুলে এনে সপাসপ কয়েক ঘা দিলেন। মেজদি নিশ্চল, তেমনি বেপরোয়া ভঙ্গী। চোখ পাকিয়ে ছোট কাকার দিকে তাকিয়ে রইল। এবার মা উঠলেন। চুলের মুঠি ধরে দেয়ালের সঙ্গে বার কয়েক কপালটা ঠুকে দিতে দিতে বললেন—তুই মর, মর—

আমি তখন ভয় পেয়ে পালিয়ে আসছিলুম।

আমাদের চারপাশে অল্প অল্প কুয়াশায় মধ্যে বিকেলের আলো দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। সামনে আরো কিছুটা পথ। রেল-স্টেশনের নামটি সুন্দর—নামকুম।

আজ খুব সকালে এখানে পৌঁছেছি। তখনো শীতের আকাশে আবছায়া অন্ধকার ছিল। বাসে চেপে কিছু দূরে আসতে হয়েছিল। জায়গাটা একটা কাঠ-গুদাম। কয়েকটা বড় বড় কাঠ-কাটা করাত। একপাশে লম্বা টালি-ঢাকা কাঠের ঘর। সামনে টানা বারান্দা। ততক্ষণে বেশ চনমনে রোদ উঠেছে। একটি দেহাতী ছেলে বারান্দায় বসে বালতি-উনুন ধরাচ্ছিল। মেজদি আগে আগে, হাতে সুটকেস, আমার কাঁধে বিছানা। স্টেশনে কুলি পেয়েছিলুম। এখানে বাস থেকে নেমে কাছাকাছি কাউকে পাই নি। কাঠ-গোলাটা অবশ্য রাস্তার কাছেই। আমাদের দেখে দেহাতী ছেলেটি বারান্দা থেকে নেমে এল। মেজদি তাকে অসিতবাবুর খোঁজ জিজ্ঞেস করতেই মাথা দুলিয়ে জবাব দিল—বোস-বাবু, তার তো খুব বিমার আছে, ইধার আসুন। বলতে বলতে বিছানা আর সুটকেস নিজের মাথায় তুলে নিল।

মেজদি জিজ্ঞেস করল—তোমার নাম কি?

—হামার নাম বিরজু।

দু'ধাপ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে একবুক উঁচু কাঠের বারান্দায় উঠে এলুম। গোটা তিনেক ছোট ছোট কুঠুরি পেরিয়ে একেবারে কোণের দিকে একটা বন্ধ দরজায় সামনে সুটকেস বিছানা নামাল বিরজু। মেজদি দরজা ঠেলে ভেতরে গেল। আমি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম। কাঠগোলার চারদিকে বড় বড় শাল মহুয়ার বন। দূরে দূরে দু'-চারটি পলাশ, শিমুল। এমন একটা নির্জন বুনো জায়গায় কাঠ-গোলায় গোমস্তার কাজ নিয়ে পড়ে থাকার অর্থ কী? অথচ শুনেছিলুম, ভাল ছাত্র ছিলেন সিতুদা।

তখন জাপানী বোমার ভয়। কলকাতা ছেড়ে দলে দলে পালাচ্ছে মানুষ।

আজকাল শোনা "রিফিউজি" শব্দটির মত সে সময় একটি নতুন ইংরেজী শব্দ খুব চালু হয়েছিল—"ইভাকুয়ি"। কলকাতা খালি করে যারা ছোটখাট মফস্বল শহর কিংবা গাঁয়ের দিকে পালাচ্ছিল, সেই ইভাকুয়িদের দলের সঙ্গে অসিতবাবুও আমাদের মহকুমা শহরে এলেন তাঁর দিদির কাছে। মা বেঁচে নেই। বাবা দ্বিতীয় পক্ষের সংসার নিয়ে মধ্যপ্রদেশের কোথায় যেন থাকতেন, চাকরি করতেন। সিতুদা বরাবর কলকাতার হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেছেন। বি-এ পাস করার পর ভগিনীপতি অর্থাৎ আমাদের বড়দার পরামর্শে আইন শেখার কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু পড়াশোনা মুলতুবি রেখে জাপানী বোমার ভয়ে পালিয়ে আসতে হল। ভালই হয়েছিল। আমাদের ক্লাব, লাইব্রেরী আর থিয়েটারের মহলা যেন সিতুদার জন্য নতুন উৎসাহ পেল। আমাদের ছোটবেলার সেই নদীর চরে শীতের দুপুরে চড়ুইভাতির আনন্দ যেন আরো জমজমাট হয়ে উঠল। কলকাতার মানুষ শুনলেই আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতুম। কলকাতা ছিল আমাদের কাছে এক স্বপ্নের শহর। সেই শহরের এক উজ্জ্বল যুবক। তার মার্জিত উচ্চারণ, তার মিষ্টি আলাপ, সহৃদয় ব্যবহার, প্রাণখোলা হাসি আমাদের যে মুগ্ধ করবে, আকৃষ্ট করবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অল্প দিনেই আমাদের আপনা হয়ে উঠেছিল।

তপু, এদিকে আয়। মেজদির ডাক শুনে মুখ ফেরালুম। মনে হল, বহু দূর থেকে যেন ডাক দিল মেজদি। বহু বছরের ওপার হতে।

আমি, মেজদি আর সিতুদা আবার কাছা-কাছি এসেছি। যেমন কাছাকাছি থাকতুম আমরা। রমা-বউদিদের বাড়ির দোতলার ছাতে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসত। বাড়ির পেছনে মস্ত জামগাছের ডালপাতার অন্ধকার থেকে চুপিচুপি চাঁদ উঠত।

কোন কোন দিন খুব চাপা সুরে গান ধরত মেজদি—ওই মালতী লতা দোলে। বউদি এসরাজ নিয়ে বসতেন। সুর মেলাতে মেলাতে বলতেন—মীরা, গলা ছেড়ে গাও, এখানে কেউ কিছু বলবে না।

সিতুদাও সায় দিতেন—এসরাজের সুরই তো শুনছি, গান যে চাপা পড়ে গেল।

—যান, আমি গাইবো না। হঠাৎ থেমে যেত মেজদি। একটু সাধ্য-সাধনায় পর আবার শুরু করত, আস্তে আস্তে গলা খুলত।

সেইসব দিনরাত্রির স্মৃতির ভেতর থেকে আমি আবার মেজদির ডাক শুনতে পেলুম—এই তপু, এদিকে আয়—

একটা পুরনো খাটিয়ার উপর ময়লা বিছানার সঙ্গে যেন মিশে গেছেন অসিত-বাবু। গায়ে একটা ডুরেযারডের কম্বল। রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখ। কাঁচাপাকা চুল। ভাঙা গাল, কোটরে চোখ, শুধু খাঁড়ার মত নাকটি আরো প্রকট হয়ে আছে। একটু সামনে ঝুঁকে বসলো মেজদি—তাকিয়ে দেখুন, তপু এসেছে। তারপর আমাকে লক্ষ করে—তুই এখানে এসে বোস।

খাটিয়ার পাশে একটা বেতের মোড়ায় বসলুম। অসিতবাবু তাকালেন। কপালে

অল্প অল্প ঘাম। একটু হাসলেন। আস্তে আস্তে বললেন—কি আশ্চর্য, কত বড় হয়ে গেছ। তোমরা এসেছ, কি আশ্চর্য।

মেজদি আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে দিল। লক্ষ করলুম, ওর মধ্যেই ঘরের কাজে হাত দিয়েছে সে। বিরক্ত সুরে একবার বললো—ইস, ঘরদোর এত নোংরা কেন! বিরজু, রোগীর ঘর কি এত নোংরা করে রাখতে হয়?

বিপন্ন বিরজু বললো—হামি কি জানে—

—জল গরম হল কিনা দেখ। সকালে কি খান উনি, কি খেতে দিচ্ছ তোমরা?

—দুধ-সাবু—

—তা হলে আর দাঁড়িয়ে থেকো না. দুধ নিয়ে এসো, খাবার আগে গরম জল দিয়ে যেও। কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঝাড়ামোছার কাজ শুরু করেছে মেজদি। আমার হাতে একটা থার্মোমিটার দিয়ে বললো—জ্বর আছে কিনা দেখ তো।

আমি সিতুদার একখানি হাত ধরে বসে ছিলুম। পাখির পালকের মত শুকনো ক্ষীণ হাত। রক্তহীন ফ্যাকাশে। লম্বা লম্বা আঙুল। কবি বা শিল্পীর মত হাতের গড়ন। বৃহস্পতির ক্ষেত্রটি উঁচু। অনেক সূক্ষ্ম সরু সরু রেখা। হাতের চেটো কেমন ভেজা-ভেজা। ঘাম হচ্ছে। মেজদি তার কপালটা মুছিয়ে দিল। থার্মোমিটারে দেখলুম, আটানব্বই পয়েন্ট দুই। আমি জিজ্ঞেস করলুম—আপনার কি হয়েছে?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। এখানে ভাল ডাক্তার নেই, একজন আছেন স্টেশনের কাছে থাকেন, তিনি প্রথমে বললেন প্লুরিসি, পরে বললেন বোধ হয় থাইসিস, তারপর বললেন রক্তশূন্যতা, খারাপ জাতের অ্যানিমিয়া। বলতে বলতে হাঁপিয়ে পড়লেন সিতুদা।

—থাক, আর কথা বলবেন না। বাধা দিল মেজদি—আপনাকে আমরা কলকাতা নিয়ে যাব, ভাল ডাক্তার দেখাব, ভাল হয়ে যাবেন।

—তোমরা আমাকে কলকাতা নিয়ে যাবে! থেমে থেমে বললেন অসিতবাবু—এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছ, আশ্চর্য! বলতে বলতে একটু হাসলেন—বৃথা চেষ্টা মীরা, আমি আর বাঁচবো না।

—চুপ করুন তো, আপনার তেমন কিছু হয় নি। কাউকে আগে খবর দেননি বলেই এই ভোগান্তি হল। নিন, এই গরম জলটা মুখে নিয়ে কুলকুচো করুন। উঠে বসতে পারবেন? ওপু, একটু ধর দেখি। মেজদি যেন দশ হাতে কাজ করছিল। সিতুদার মাথা ধুইয়ে দিল। গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে ওর মধ্যেই যতটা সম্ভব গা-হাত-পা মোছাল। আমাদের বিছানা থেকে আরো দুটো বালিশ বের করে সিতুদার পিঠের দিকে পর পর উঁচু করে দিল। উনি ঠেস দিয়ে বসলেন।

পাশের ঘরে সদানন্দের সাড়াশব্দ পাচ্ছিলাম। ইঁদারায় জল তোলার শব্দ। কাঠ-গোলার কর্মচারীরা দিনের আয়োজন শুরু করেছে। তাদের কেউ কেউ দরজার কাছে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল। হয়তো ভেতরে আসতো। মেজদি তাদের মিষ্টি কথায় বিদেয় করল। সিতুদা কিছু সুস্থ বোধ করছিলেন। খোলা জানালা দিয়ে নরম উষ্ণ রোদ পড়েছে বিছানার পায়ের দিকে।

কুয়াশা নেই। আকাশে আকাশে প্রসন্ন সকালের আলো। প্রথম বিস্ময় আর বিষণ্ণতার পর অনেকটা সহজ হয়েছি আমরা। সিতুদার ডান হাতখানি তখনো আমার দুই হাতের মধ্যে রয়েছে। খাটিয়ার পাশে বেতের মোড়ায় বসে আছি। বসে বসে মেজদির নিপুণ হাতের কাজ দেখছি। মধ্যে মধ্যে দু-একটা হালকা হাসির কথাও হচ্ছিল। যেমন, সিতুদার মাথা আঁচড়ে দেবার সময় বললো মেজদি—এ মা, আপনার চুল সব পেকে গেছে!

—পাকবে না, বয়স কম হল নাকি!

—ইস, কত আর বয়স হবে আপনার?

—তোমার চেয়ে অন্তত ছ'-সাত বছরের বড় আমি।

—তাতে চুল পাকার মত বয়স প্রমাণ হয় না।

—প্রথম আলাপের সময় তোমার বয়স ছিল সতেরো কি আঠারো, এখন হিসেব করে দেখ।

—থামুন মশাই, মেয়েদের বয়স হিসেব করে কোন কথা বলবেন না।

—ভুল হল, দুঃখিত।

—খুব হয়েছে, এই দুধটুকু খেয়ে নিন তো।

দুধ খাবার পর হাসি-হাসি মুখে আবার বললেন সিতুদা—সেই বয়সেই কি রকম পাকা মেয়ে ছিলে তুমি, মনে আছে?

—ছিঃ, ওপুর সামনে—মেজদি চোখ পাকাল।

—ওহো, ভুল হয়েছে। তাড়াতাড়ি চোখ

বুজলেন। বালাটা এগিয়ে দিলেন বাদিকে। ঠোঁটে এক কোটা হাসি। বিরজু বালতি-ভর্তি জল নিয়ে পাশেই বারান্দার কোণে রেখেছে। উনুনে জল গরম হচ্ছে। কথা বলতে বলতে একবার বাইরে যাচ্ছে মেজদি আবার ভেতরে আসছে। খুঁজে খুঁজে চাল-ডাল, চা-চিনি, তেল-নুন-মশলার হাঁড়ি কৌটো সব বার করেছে। এলোমেলো অগোছাল হয়ে ছিল। পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখল।

—সব গুছিয়ে রাখলুম, আপনি ভাল হয়ে আবার যখন ফিরে আসবেন, তখন আর কোন অসুবিধে হবে না। বলতে বলতে আমার হাতে এক কাপ চা এনে দিল। নিজে আরেক কাপ নিয়ে বসল দরজার কাছে পুরনো খবরের কাগজ পেতে। সামনেই উনুনে কি একটা চাপানো হয়েছে। কাল সারা রাত ট্রেনে কেটেছে। অথচ মেজদির চোখে মুখে রাত জাগার কোন চিহ্ন নেই, কোন ক্লান্তির ছাপ নেই। বরং মনে হচ্ছিল, মেজদির চলাফেরা কথাবার্তার মধ্যে একটা চাপা খুশির ভাব ফুটে উঠেছে। এই কয়েক ঘণ্টার ঘর এমন করে, এমন-সুন্দর করে সাজিয়ে রাখছে যেন আমরা বেশ কিছু দিন থাকব এখানে। অথচ আজ শেষ দুপুরেই রওনা হতে হবে।

সেই কথাই জিজ্ঞেস করল—কলকাতার গাড়ি কটার রে, তপু?

—সন্ধে ছটায়।

—তিনটে নাগাদ রওনা হবো, কি বলিস?

অসিতবাবু চোখ খুলে আস্তে আস্তে বললেন—তোমরা কিছু খেলে না?

—আমরা চা খেলাম। কাছে গেল মেজদি—খিচুড়ি চাপিয়েছি, বিরজুকে পাঠিয়েছি আলু আর সাবু আনতে, একটু পরে আপনাকে দুধ-সাবু দেব, আমাদের জন্য আলুভাজা, খিচুড়ি—

—তোমাদের বড় কষ্ট হল।

—আপনি চুপ করুন তো, আমাদের জন্য ভাবতে হবে না।

—ভেবে আর কি করতে পারবো বল, এখন সব ভাবনা তোমার উপর ছেড়ে দিয়েছি।

—ঠিক বলছেন তো! মেজদি সামনে ঝুঁকে সিতুদার কপালে হাত রেখে বললো—মনে থাকে যেন, এখন থেকে সব ভাবনার ভার আমার। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বললো—তপু, একটা গাড়ি যোগাড় করতে হবে, নয়তো এই রোগী নিয়ে যাব কি করে?

—আমাকে নিয়ে যাবেই তোমরা?

—নিয়ে যাবার জন্যই তো এসেছি।

—এখন কটা বেজেছে?

আমি হাতঘড়ি দেখে বললুম—সাড়ে দশটা।

—এগারোটার সময় ম্যানেজারবাবু আসবেন, এই বারান্দার ওই দিকে শেষের ঘরটা তাঁর অফিস, তাঁকে বলো, গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবেন। এতটা কথা একসঙ্গে বলে যেন ক্লান্তিতে চোখ বুজলেন সিতুদা।

বিরজু ফিরে এল আলু আর সাবু নিয়ে। মেজদি আবার কাজে হাত দিল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রান্না শেষ হল। সিতুদা এক কাপ দুধ-সাবু খেলেন। মেজদি কুয়োতলায় গেল। যাবার আগে বলে গেল—তপু, বোস। আমি চান করে আসি, তারপর তুই যাবি।

বলার কোন দরকার ছিল না। আমি তো ঘরে আসার পর থেকেই ঠায় বসে আছি, বিছানার পাশে। সিতুদার ডান হাতখানি আমার দুই হাতের মধ্যে। উনি চোখ বুজে আছেন। এক একবার তাকাচ্ছেন।

—মীরা, মীরা কোথায়?

—মেজদি স্নান করতে গেল, কিছু চাই আপনার?

—না? আবার চোখ বুজলেন। একটু সময় পরে—তপু, আমার শিয়রে তোশকের নিচে ট্রাঙ্কের চাবিটা ছিল, দেখ তো।

দেখলুম। তারপর সিতুদার কথামতো ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে একটা ছোট চামড়ার অ্যাটাচি-কেস বার করে এনে খাটের পাশে বসলুম। উনি আবার চোখ বুজেছিলেন। বললুম—সিতুদা, এনেছি।

—হ্যাঁ, এবার খোল। সিতুদা তাকালেন। খুলে দেখলুম, লাল ফিতে-বাঁধা এক তাড়া চিঠি। কুড়ি-বাইশখানা হবে। মেজদির হাতের লেখা। উপরেই একটি পোস্টকার্ড সাইজের ফটো। মেজদির কুমারী বয়সের ছবি। ছাদের কার্নিসের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। খোলা চুল, ডুরে শাড়ি, গায়ে সেই পুরনো ফ্যাশনের ঘটি-হাতা ব্লাউজ। কুড়ি-একুশ বছরের আগের ফোটো। একটু বিবর্ণ হয়ে গেছে। রমা-বউদিদের বাড়ির ছাদে কোন এক দুপুরে সিতুদাই বোধ হয় তুলে-ছিলেন ফটোটা।

অ্যাটাচির মধ্যে আরো ছিল, এক জোড়া সোনার বালা, এক ছড়া বিছেহার, একটা রুপোর সিঁদুরকৌটো। সিতুদা বললেন—এগুলি আমার মায়ের জিনিস।

ভেজা কাপড় সপসপ করে ঘরে এল মেজদি। কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা চলে গেল ঘরের এক কোণে, যেখানে দড়ির সঙ্গে বিছানার চাদর ঝুলিয়ে আড়াল করা হয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে সামনে এসে দাঁড়াল। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। দুধে-রঙ তাঁতের শাড়ি, টকটকে লাল পাড়। পাড়ের পাশে পাশে সোনালী কারুকাজ। গরদের ব্লাউজ। কপালে আধুলির মত সিঁদুরের টিপ। একপিঠ এলো চুলের প্রান্তে গিঁট দেওয়া। প্রথম কথা আমাকে—তপু, তুই চান করে আয়, আমি বসছি। তোর হাতে ওটা কি? বলতে বলতে ফটোটা তুলে নিল, এক পলক দেখে বললো—ওমা, এটা পেলি কোথায়?

—এই অ্যাটাচির মধ্যে ছিল।

আমার জবাব শুনে সিতুদাকে লক্ষ্য করে বললো—আপনি রেখে দিয়েছিলেন, আমি তো ভুলেই গেছি।

অসিতবাবু চোখ বুজে ছিলেন। চোখ বুজেই বললেন—এই ছবিটা দেখলেই তোমার সেই বয়সের চেহারা, চলাফেরা, কথা-বলার ধরন, সব যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ভেবে দেখ, ক্যামেরার কী আশ্চর্য সাহস, সময়কে ধরে রাখতে চায়, কী অদ্ভুত ক্ষমতা, প্রতিটি মুহূর্তকে ধরে রাখতে পারে। ঠিক উলটো স্বভাব ঘড়ির। একটু থেমে আবার বললেন—ঘড়ি অবিরাম কি বলে জানো?

—কি বলে?

—যাই, যাই, যাই, যাই—

আমরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলুম। মেজদি খাটিয়ার কিনারায় আলগোছে বসে ছিল। আমি মেঝের মোড়ায়। বারান্দায় পায়ের শব্দ। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে খবর দিল বিরজু—ম্যানেজারবাবু আসিয়েছেন।

—কই, কোথায়? ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালুম, মেজদিও সঙ্গে সঙ্গে। আমাদের ব্যস্ততা দেখেই বোধ হয় একগাল হাসলো বিরজু—আপিস-ঘরমে আছেন।

—তাই বলো; আচ্ছা, যাচ্ছি আমরা। বলতে বলতে মেজদি চিঠির বান্ডিল আর ফটোটা নিজের হাত-ব্যাগের মধ্যে রাখল। অ্যাটাচি কেসটা আবার ট্রাঙ্কে রেখে চাবি বন্ধ করে দিল। বললো—চাবিটা তুই রাখ তপু, এখন চল ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি। ওঁকে বলে গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।

ম্যানেজারবাবুই গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। মধ্যবয়সী অমায়িক ভদ্রলোক। অবাঙালী, কিন্তু বাংলা বলেন চমৎকার। কাঠ-গোলার দুটি ট্রাক আছে। একটি অ্যাকসিডেন্টে অচল। আর একটি গেছে টাটানগর মাল পৌঁছে দিতে। অতএব, মোষের গাড়ির ব্যবস্থা হল। আমরা যখন স্টেশনে পৌঁছুলাম, তখন সাড়ে পাঁচটা। আমাদের খুচরো কিছু মালপত্তর নিয়ে বিরজু আগেই স্টেশনে এসেছিল। ম্যানেজার-বাবু আরো দুজন লোক আর একটি স্ট্রেচারও যোগাড় করে দিয়েছিলেন। একটু অপেক্ষার পরই গাড়ি এসে পড়ল। সময় কম। তাড়াহুড়ো করে ছোট একটা সেকেন্ড ক্লাস কামরায় উঠলুম বটে, কিন্তু ভেতরের অবস্থা সুবিধের নয়। দু পাশে দুটো গদিমোড়া লম্বা সিট। ডান পাশে তিনজন আর বাঁ-পাশের সিটে দুজন বসে আছেন। আমাদের অবস্থা দেখে, মেজদির অনুনয় শুনে বাঁ ধারের দুজন উঠলেন। একজন সোজা উপরের বাঙ্কে উঠে গেলেন। আগেই বিছানা পাতা ছিল। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। দ্বিতীয় জন উলটো দিকের সিটে তিনজনের সঙ্গে ঠাসাঠাসি করে বসলেন। মাঝখানে সিতুদাকে স্ট্রেচার থেকে বিছানা শুদ্ধ তুলে সিটে শোয়ানো হল। বাঁদি

থামল। স্ট্রেচার নিয়ে ম্যানেজারবাবুর সেই লোক দু'জন নামতে না নামতেই গাড়ি নড়ে উঠল। সবার শেষে চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল বিরজু। অত ব্যস্ততার মধ্যেও মেজদির খেয়াল ছিল। একটা পাঁচ টাকার নোট তাড়াতাড়ি দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল—মিষ্টি খাস, বিরজু!

নুনোর উপরই নোটটা লুফে নিয়ে একগাল হাসল বিরজু। ওর গোলগাল কালো মুখে ঝকঝকে দাঁতের হাসিটা দেখতে দেখতে পেছনে চলে গেল।

এবার গাড়ির ভেতরের অবস্থাটা ভাল-ভাবে দেখার সুযোগ হল। সিতুদার শিয়রে জানালা ঘেঁষে বসেছে মেজদি। যে দু'জন আমাদের জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের দ্বিতীয়জনকে আমি ভদ্রতা করে বললুম—আপনাদের কষ্ট হল—

—কিছু না, কিছু না। আমি মুরি জংশনে নেমে যাব। ভদ্রলোকের পাশে অন্য তিনজনের মধ্যে দুজন একখানি খবরের কাগজ ভাগ-ভাগি করে পড়ছিলেন। তৃতীয়জন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছিলেন আমাদের। রোগা চেহারা, কোট-প্যান্ট-টাই, চোখে চশমা। জিজ্ঞেস করলেন আপনারা কত দূরে যাবেন? ভদ্রলোকের চাউনিটা আমার ভাল লাগছিল না; জবাব দিলুম—কলকাতা যাব।

—এঁর চিকিৎসার জন্যে যাচ্ছেন বুঝি? হাত দিয়ে রোগীকে দেখালেন—কি অসুখ? গাড়ির শব্দের জন্য উঁচু গলায় জবাব দিতে হল—কি অসুখ জানি না, জানার জন্যই যাচ্ছি। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বসার জায়গা খুঁজলুম। তারপর সিতুদার পায়ের কাছে তাঁর স্টিলের ট্রাঙ্কটার উপর বসলুম। গাড়ি ছুটেছে। পরের স্টেশন ভাঁতিশিলওয়া।

সিতুদার পায়ের রঙ ফ্যাকাশে। কেমন ফোলা-ফোলা। রক্তহীন আঙুল। কম্বল দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিলুম। আমার হাতে থার্মোমিটার দিল মেজদি। সকালে কিংবা দুপুরের দিকে যতটা দুশ্চিন্তা লাগছিল এখন আর তেমন নেই। কেমন অবসন্নের মত চোখ বুজে আছেন। কপালে হাত দিয়ে দেখলুম। বেশ জ্বর। থার্মো-মিটারে দেখলুম, এক শো দুই পয়েন্ট চার। কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কি করবো বুঝতে পারছি না।

গাড়ি ভাঁতিশিলওয়া এল। একটু থেমে আবার ছুটল। মেজদি আমাকে জলের বোতলটা দিতে বললো। একটা হুকের সঙ্গে ঝোলানো ছিল বোতলটা। দিলাম।

চামচে করে অল্প অল্প জল খেলেন সিতুদা। ভেজা রুমাল দিয়ে কপাল মুছিয়ে দিল মেজদি, মুখ নিচু করে জিজ্ঞেস করল—আর জল খাবেন?

বিড়বিড় করে কি যেন বললেন সিতুদা। জ্বরের ঘোরে কেমন আচ্ছন্নের মতো হয়ে পড়েছেন। মেজদির ডান পাশে কাচের জানালা। জানালার বাইরে শীত, কুয়াশা, মেটে-মেটে জ্যোৎস্না। গাড়ি ছুটছে। এক দমে ছুটে এর পর থামবে মুরি জংশন। সিতুদার কপালে জলপটি দিয়েছে মেজদি। ছোট্ট হাতপাখাটি নেড়ে অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে। বরফ দিতে পারলে বোধ হয় ভাল হত। মুরি জংশনে গাড়ি দাঁড়াবে মিনিট পনেরো। বরফের খোঁজ করব তখন। মেজদিকে বললুম সে কথা। ঠায় বসে আছি। কাল সারা রাতও বসেই কেটেছিল। গাড়ির দোলায় ঝিমুনি ধরেছে। ট্রাঙ্কের উপর বসে মাথা নিচু করে বসে বসে ঝিমুচ্ছি। কিছু সময় পরে হঠাৎ সিতুদার কথা কানে যেতে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি, বিড়বিড় করে কি সব বলছেন আর মেজদি কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে।

জিজ্ঞেস করলুম—কি বলছেন?

—বুঝতে পারছি না। মুখ তুলে বললো মেজদি। শিয়রের দিকে একটু সরে সামনে ঝুঁকে শোনার চেষ্টা করলুম। গাড়ির শব্দে কিছু শোনা যাচ্ছে না। কয়েকটা বিচ্ছিন্ন কথা কানে এল। সিতুদা বিড়বিড় করে বলছেন—শালকাঠের দর কত......রেল কোম্পানীর টেন্ডার...নোটিস...। ভুল বকছেন। ডাকলুম—সিতুদা, ও সিতুদা।

—অাঁ—অাঁ। ঘোলাটে চোখ মেলে তাকালেন একবার। মেজদি জলপটি বদলে দিল। জ্বর উঠছে। আবার থার্মোমিটার দেখলুম, এক শো তিন। কি করব বুঝতে পারছি না। মুরি জংশন। তাড়াতাড়ি নামলুম। সেই ভদ্রলোকও সঙ্গে সঙ্গে নামলেন একটা সুটকেস হাতে করে। তাঁকেই জিজ্ঞেস করলুম—এখানে কোথায় বরফ পাব, বলতে পারেন?

—আসুন আমার সঙ্গে।

ভদ্রলোকের চেষ্টায় সামান্য কিছু বরফ যোগাড় হল। রুমালে বেঁধে আনলুম।

এক শিখ-দম্পতি উঠেছেন। সঙ্গে কোলের বাচ্চা। বেডিং, সুটকেস, একটা বেতের বাক্স। সেই চশমা-পরা রোগা চেহারার ভদ্রলোক উঠে গেছেন উপরের বাঙ্কে। যে দুজন ভাগাভাগি করে কাগজ পড়ছিলেন, তাঁরা পাতা বদল করেছেন। তারপর শিখ ভদ্রলোক বসেছেন। একটা ইংরেজী বই-এর পাতা ওলটাচ্ছেন। তাঁর পাশে তরুণী স্ত্রী। সুন্দরী মায়ের কোলে ফুটফুটে বাচ্চা ঘুমিয়ে আছে।

গাড়ি ছাড়ল। রাত আটটা বেজে পাঁচ মিনিট। মেজদি তোয়ালের মধ্যে বরফ জড়িয়ে সিতুদার মাথায় দিয়েছে। এর পরের স্টপ—তোরানুস্। ছোট স্টেশন। পৌঁছবে আটটা একুশ মিনিটে। আবার আগের জায়গায় বসলুম। ঝিমুনি ধরেছে। বসে বসে দুই হাঁটুর উপর মাথা গুঁজে ঝিমুচ্ছি। কেমন তন্দ্রার মধ্যে গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে শুনতে মনে হল যেন স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্নের মধ্যে যেন খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে। আমরা ছাদে বসে আছি। রমা-বউদি যেন এসরাজে ছড় টানছেন, টেনে টেনে একটা দীর্ঘ বিলম্বিত বিরহ সুর তুলছেন। সামনেই মাদুরে টান-টান হয়ে শুয়ে আছেন সিতুদা, মাথার নীচে ভাঁজকরা হাত, শুয়ে শুয়ে পা নাচাচ্ছেন। পাশেই বসে আছে মেজদি। সেই কিশোরী মীরা। ডুরে শাড়ি, কুঁচি-হাতা ব্লাউজ। হঠাৎ মেজদি যেন আমাকে আঙুলের খোঁচা দিল—এই তপু, ওঠ। চমকে সোজা হয়ে বসলুম, আবার মেজদির কথা কানে এল—তপু, একবার দেখ তো। তাড়াতাড়ি উঠে শিয়রের কাছে দাঁড়ালুম। সিতুদা যেন শান্তভাবে ঘুমুচ্ছেন।

ডাকলুম—সিতুদা ও সিতুদা।

কোন সাড়া নেই।

মেজদি নিচু স্বরে বললো—একটু আগে থেকেই আর সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।

তারপর একটু থেমে ফিসফিস করে—বোধ হয় হার্টফেল করেছে।

—অ্যাঁ! আমি আঁতকে উঠলুম—সর্বনাশ, এখন কি হবে!

কঠিন চোখে তাকাল মেজদি, চাপা সুরে বললো—ভয় পাস নে, ছটফট করিস নে। ঠাণ্ডা হয়ে বোস, একটু আড়াল করে বোস।

কিন্তু বসবো কি করে, মাথার মধ্যে রেল-গাড়ির সহস্র চাকা ঘুরছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে যাচ্ছে। রেল কোম্পানীর নিয়ম যতদূর জানি, কোন যাত্রী মারা গেলে তৎক্ষণাৎ পরবর্তী স্টেশনে মৃতদেহ নামিয়ে দেওয়া হবে। প্যাসেঞ্জার গাড়ি কোন মৃতদেহ বহন করবে না।

মৃতদেহ নেবার আলাদা নিয়ম, পুরো 'বগি' বোধ হয় 'বুক' করতে হয়। অনেক ঝামেলা, অনেক সময় আর টাকার ব্যাপার। কোনরকমে টলতে টলতে বাথরুমে এলুম। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিলুম। রুমালে মুখ মুছে হাতঘড়ি দেখলুম। আটটা পঞ্চাশ। ঝিমুনির মধ্যে আরো দুটো স্টেশন পার হয়ে এসেছি। সামনে তিরুলদি। পৌঁছবে আটটা চুয়ান্ন। এখন এই শীতের রাতে যদি আমাদের তিরুলদি নামিয়ে দেয়। তবে কি উপায় হবে! বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখি, শান্তভাবে বসে আছে মেজদি। সিতুদার কপালে জলপটি বদলে দিচ্ছে। যেন ঘুমন্ত রোগীর সেবা করছে। মুহূর্তে মেজদির মতলব পরিষ্কার হল। আমাদের আচরণে কোনরকম ভয়, ব্যস্ততা, উদ্বেগ প্রকাশ করা চলবে না। কেন সামান্য সন্দেহ কারো না হয়। এইভাবেই আইনকে ফাঁকি দিতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। গাড়ি তিরুলদি এল, ছাড়ল। আমি স্টিলের ট্রাঙ্কটা সিতুদার শিয়রের কাছে টেনে নিয়ে সহযাত্রীদের দিকে পেছন ফিরে বসেছি। যতটা সম্ভব আড়াল করে বসেছি বটে, কিন্তু ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। অস্বস্তি আর ভয়। আমার পেছনে চারজন যাত্রী সজাগ। উপরের দুই বাঙ্কে ঘুমুচ্ছেন দুজন। এঁদের যে কেউ যদি টের পান, যদি আপত্তি করেন, তাহলেই বিপদ। পরের স্টেশন চাণ্ডিল। সেখানেই যদি ধরা পড়ি একদম! যদি নামিয়ে দেয় আমাদের! আশ্চর্য দেখলুম মেজদিকে। শক্ত হয়ে বসে আছে। সিতুদার কপালে জলপটি বদলে দিচ্ছে, ছোট হাতপাখাটি নেড়ে আস্তে আস্তে হাওয়া করছে। যেন শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন সিতুদা। ডাক দিলেই যেন তাকাবেন, একটু হেসে হয়তো বলবেন—তপু, তোমরা আমাকে কলকাতা নিয়ে যাচ্ছ, কি আশ্চর্য।

মেজদি ঠায় বসে মাথা নাড়ছে। এক একবার ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে আমার দিকে। আমার ভীত সন্ত্রস্ত ভাব দেখে বিরক্ত হচ্ছিল। বুঝতে পারছি সব, কিন্তু কিছুতেই সহজ হতে পারছি না। ভীষণ ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল, এই রাতের রেলগাড়ির শত শত নিশ্চিন্ত যাত্রীকে ফাঁকি দিয়ে আমরা যেন চোরাই চালান নিয়ে যাচ্ছি। গাড়ি চাণ্ডিল ছাড়াল। রাত দশটা। সামনে একটা ছোট স্টেশন—কান্দারা। তারপর টাটানগর। বাচ্চা ছেলেটা হঠাৎ কেঁদে উঠল। চমকে চোখ ফেরালুম। পাঞ্জাবী মহিলাটি স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজেছিলেন। তাড়াতাড়ি সজাগ হয়ে বাচ্চার মুখে চুষি-কাঠি দিলেন। শান্ত হয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল বাচ্চাটি। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের কিন্তু কোনদিকে দৃষ্টি নেই। বইয়ের মধ্যে ডুবে আছেন তিনি। তারপরের ভদ্রলোক মোটাসোটা, মাথায় মস্ত টাক। কোলের উপর খবরের কাগজখানা ভাঁজ করে রেখেছেন। তারপরের জন পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সিগারেট ফুঁকছেন।

আমাদের দিকে কারো তেমন লক্ষ্য নেই দেখে আশ্বস্ত হলুম। আমার চোখের

পাল্লা কেমন ভার-ভার। কপালের ডান পাশ টিপটিপ করছে। চোখের সামনে হুকের সঙ্গে ঝোলানো জলের বোতলটা ঘড়ির পেন্ডুলামের মত ধীরে ধীরে দুলেছে।

গাড়ি চাঁপদানি এলো। রাত দশটা চল্লিশ। শিখ-দম্পতি নেমে গেলেন।

নতুন কোন যাত্রী আর উঠল না। আমি কিছুটা হালকা মনে দরজা বন্ধ করার জন্য সবে উঠে দাঁড়িয়েছি। পরক্ষণেই যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠলুম। কালো কোট, মাথায় তকমা-আঁটা টুপি। নিভুল ভঙ্গীতে রেল-কোম্পানীর টিকিট-পরীক্ষক উঠলেন। হৃদ্‌পিণ্ড যেন লাফিয়ে উঠল। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পেটার শব্দ। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত মেজদির দিকে তাকালুম।

ভুরু কুঁচকে চোখের ইঙ্গিতে আমাকে বসতে বললো মেজদি। আমার হাতে পায়ে যেন জোর নেই। অসহায়ের মতো ধপ করে আবার বসে পড়লুম। চেকার সাহেব ওপাশের ভদ্রলোকের টিকিট দেখলেন। বাঙ্কের উপর ঘুমন্ত যাত্রী দুজনকে তুলে টিকিট চাইলেন। সবার শেষে আমার দিকে হাত বাড়ালেন। আমি কলের পুতুলের মত কোটের ভেতরের পকেট থেকে টিকিট বার করে তাঁর হাতে দিলুম। টিকিট পাঞ্চ করতে করতে মেজদির দিকে এক পলক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—উনি কি অসুস্থ? হয়তো আমার ভুল। মনে হল অবিশ্বাস আর সন্দেহের সুরে।

জবাব দিল মেজদি—হ্যাঁ, খুবই অসুস্থ, এইমাত্র একটু ঘুমিয়েছেন।

—ও, আচ্ছা। দরজাটা টেনে দিয়ে নেমে গেলেন চেকার সাহেব। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সবসুদ্ধ বোধ হয় দশ-বারো মিনিট। অথচ মনে হচ্ছিল যেন ঘণ্টাখানেক পর সহজভাবে দম ফেলার সুযোগ পেলুম। গাড়ি চলতে শুরু করল। টাক-মাথা ভদ্রলোক উঠে দরজাটা ভেতর থেকে 'লক' করে দিলেন। বড় বাতিটা নেবালেন। অল্প জোরের একটা আলো জ্বলতে লাগল। দুই হাঁটুর উপর হাত জড়ো করে মাথা রেখে আমি ঝিমুতে লাগলুম। কতক্ষণ এভাবে ছিলুম, খেয়াল নেই। হঠাৎ ঠান্ডা হাওয়া আর মেজদির নাড়াচড়ার শব্দে তন্দ্রা ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি কাচের পাল্লাটা তুলে দিয়েছে মেজদি। হাতব্যাগের ভেতর থেকে সেই চিঠির বাণ্ডিলটা বার করেছে। তারপর এক একখানা চিঠি দলা পাকিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিচ্ছে। বাইরে ম্লান জ্যোৎস্না। গাছগাছালির ভিড় দেখে বুঝলুম—বাংলা দেশ। রাত প্রায় দুটো। সামনে খড়্গপুর। সব চিঠি ফুরিয়ে যাবার পর নিজের কিশোরী কালের সেই ফটোটা বার করল মেজদি। কামরার অনুজ্জ্বল আলোয় একবার দেখল, তারপর কুচিকুচি করে বাইরে জ্যোৎস্নায় ভাসিয়ে দিল। পাল্লাটা নামাল। তারপর কাচের সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে সেই নিঝুম রাত্রির ধাবমান শীতল শূন্যতার দিকে তাকিয়ে রইল।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছুলোম ভোর সাড়ে পাঁচটায়। আমি দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ছিলুম। প্রথমেই আমাদের সেই বড়দা অর্থাৎ ধীরেনবাবুর লম্বা চওড়া চেহারাটা চোখে পড়ল। গলাবন্ধ কোট, মাফলার, হাতে সিগারেট। মুখ উঁচু করে, উদ্বিগ্ন চোখে প্রতিটি কামরা লক্ষ করছিলেন। পাশে রমা-বউদি। তারপর তাঁদের বড় ছেলে সুকুমার, মেজ ছেলে, কি যেন নাম, আরো দু'-চারজন আত্মীয়-বান্ধব। ও'রাই ধরাধরি করে সিতুদাকে নামাল। রমা-বউদি ভাইকে জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। অপরিচিত যাত্রীর মত একপাশে দাঁড়িয়ে রইলুম আমরা। মেজদির দিকে কেউ ফিরেও তাকাল না। অথচ মেজদিই রমা-বউদিকে স্টেশনে আসতে বলেছিল। সিতুদার কোন আত্মীয়ই নাকি অত দূর থেকে এমন রোগীকে কলকাতা নিয়ে আসার ঝুঁকি নিতে রাজী হয়নি। অথচ মেজদিকে কেউ একটা ধন্যবাদের কথাও বললো না। এখন বাংলা দেশের সমাজ, সংসার, আত্মীয়স্বজনের ভিড়। এখানে মেজদির কোন পরিচয় নেই। প্রতিবেশী-সূত্রে যেটুকু পরিচয় ছিল, তাও খুব স্বস্তিকর নয়। তার স্মৃতিও খুব সুখের নয়। সামাজিক নিয়মে সিতুদার শেষ কাজের অধিকার তাঁর ভাগ্নেদের, সমাগত স্বজনবন্ধুর। তারাই কিছু ফুল আনল; বাঁশের খাটিয়া নিয়ে এল। তারপর একটা ছোটখাট ভিড় পেছনে নিয়ে প্লাটফর্ম ছেড়ে চলে গেল।

মেজদি ফাঁকা চোখে সিতুদার যাবার পথের দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল। তারপর সেদিকে চোখ রেখেই আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে বললো—চল্‌ তপু, আমরা বাড়ি যাই।

ট্যাক্সিতে উঠলুম। মেজদি পেছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজল। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পর একটু চোখ বোজার অবসর পেল। আমাদের দু'পাশে আবার সেই গঙ্গা। ওপারে উঁচু উঁচু বাড়ির মাথায় ভোরের রোদ। হাত ঘড়িটা দেখলুম কখন বন্ধ হয়ে আছে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলুম—ক'টা বাজল? জবাব পেলুম—সাতটা। ঘড়ির কাঁটা মেলালুম, চাবি দিলুম। তারপর একবার কানের কাছে তুলে শুনলুম—টিক, টিক, টিক, টিক। মনে হল যেন অবিরাম বলছে—যাই, যাই, যাই—

তেইশ

নতুন চরিত্র, নতুন সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন বিদ্যাসাগর। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন: "তিনি (বিদ্যাসাগর) প্রতীচ্য সভ্যতার সকল বিভাগই সমুচিতরূপে অনুশীলন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতীচ্য জগৎ হইতে যে কিছু জীবনের আদর্শ পাইয়াছিলেন, তাহা প্রাচ্যভাব ও প্রাচ্য-জীবনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা করিতেন; প্রাচ্য প্রীতি, ভক্তির উপরে প্রতীচ্য কর্মশীলতা স্থাপন করিবার প্রয়াস করিতেন। ......বিদ্যাসাগর মহাশয় মানব-চরিত্রের আদর্শে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সমাবেশ করিয়া নবচরিত্র ও নবসমাজ গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন।"

শিক্ষা ছাড়া নতুন চরিত্র, নতুন সমাজ গড়ে তোলা যায় না। বিদ্যাসাগর সারা জীবন এ দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কাজ করেছেন। সরকারী কর্মচারী হিসেবেও করেছেন, স্বাধীনভাবেও করেছেন। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগর যা করেছেন, তার কোনো তুলনা নেই।

সংস্কৃত বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী বিদ্যাকে তিনিই মিলিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের পোশাক-আশাক নতুন নয়, নতুন তাঁর মন-বুদ্ধি, নতুন তাঁর ক্রিয়াকর্ম। নতুন এবং সফল। তা যদি না হত তো এই বিদ্যাসম্মিলনের কাজ তিনি করতেন না, এ ভার তিনি নিতেন না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"এই বিদ্যাসম্মিলনের ভার নিয়েছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁর বাইরের ব্যবহার বেশ-ভূষা প্রাচীন, কিন্তু যাঁর অন্তর চির-নবীন। স্বদেশের পরিচ্ছদ গ্রহণ করে তিনি (বিদ্যাসাগর) বিদেশের বিদ্যাকে আতিথ্যে বরণ করতে পেরেছিলেন এইটেই বড় রমণীয় হয়েছিল।......

তিনি নবীন ছিলেন এবং চিরযৌবনের অভিষেক লাভ করে বলশালী হয়েছিলেন। তাঁর এই নবীনতাই আমার কাছে সবচেয়ে পূজনীয়, কারণ তিনি আমাদের দেশে চলবার পথ প্রস্তুত করে গেছেন।"

সরকারী চাকরি ছেড়ে দেবার পর বিদ্যাসাগরের একটা মস্ত কীর্তি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন। মেট্রোপলিটনের ইতিবৃত্ত বলার আগে এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে দুটো গল্প বলা যেতে পারে। বিদ্যাসাগরের নিজের মুখের গল্প।

একবার দিন কয়েকের জন্য লক্ষ্ণৌ গিয়েছেন বিদ্যাসাগর। সেখানে পূর্ণচন্দ্র নামে একজন বাঙালী বললেন—বিদ্যাসাগর মশায়, আপনি তো কলকাতা ইউনিভার্সিটির সিনিয়র ফেলো। ইউনিভার্সিটির যে ছেলেটা সেকেন্ড ক্লাস থেকে বের হয়ে যায়, সেও লেখে I has; যে এল এ পাস করে, সেও লেখে I has; যে বি এ পাস করে, সেও লেখে I has; যে এম এ পাশ করে, সেও লেখে I has; আচ্ছা, এটা কেন হয় বলুন দেখি।

উত্তরে বিদ্যাসাগর পূর্ণচন্দ্রকে কয়েকটা গুলিখোরের গল্প শুনিয়েছেন। শেষ গুলিখোরের গল্পে পূর্ণচন্দ্রের কথার জবাব আছে।

গল্পের শেষ গুলিখোর বলছে—আমার বাড়ি ফরাসডাঙা। বাড়ি গিয়ে দেখি কোথাও ঘর-টর নেই, গাছপালা নেই, কিছু নেই, কেবল মাঠ, কেবল মাঠ, সব মাঠ হয়ে গেছে। ছিরামপুর থেকে চুঁচুড়া পর্যন্ত সব ধু-ধু করছে মাঠ। আর দেখি ছিরামপুরের গঙ্গার ধার থেকে একটা সুড়ঙ্গ। একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে পালে-পালে-পালে গোরু যাচ্ছে আরেকটা সুড়ঙ্গ দিয়ে গাড়ি গাড়ি-গাড়ি আক যাচ্ছে। এত গোরু এত আক মাটির ভেতর কোথায় যায় কিছুই বুঝতে পারলাম না। বিস্তর খোঁজ-টোঁজ করে বুঝলাম, মাটির ভেতরে কল আছে, কলের একপোটা মুখ তারকেশ্বরের কাছে গিয়ে বেরিয়েছে; একেকটা মুখ থেকে একেক রকম মিঠাই বেরোচ্ছে—কোনোটা থেকে মাতাবি, কোনোটা থেকে মনোহরা, কোনোটা থেকে কাঁচাগোল্লা, কোনোটা থেকে রসগোল্লা, কোনোটা থেকে ছানাবড়া, কোনোটা থেকে পান্তুয়া। কিন্তু ভাই, খেয়ে দেখ, সবই একরকম তার। এক পাকের তৈরী কিনা!

গল্প শেষ করে বিদ্যাসাগর বললেন—তাই বলি পূর্ণচন্দ্র, আমাদের যেসব ছেলে আছে, তাদের কাছ থেকে আমরা মাইনে নিই,

পাঠশালা ফি নিই, একজামিনেশন ফি নিই, নিয়ে কলের দোর খুলি। বলে দিই, এখানে মাস্টার আছে, এখানে পণ্ডিত আছে, এখানে বই আছে, এখানে বেঞ্চি আছে, এখানে চেয়ার আছে, এখানে কালি-কলম দোয়াত-পেন্সিল সবই আছে। বলে তাদের কলের ভেতর ফেলে চাবি ঘুরিয়ে দিই। কিছুকাল পরে কলে তৈরী হয়ে তারা কেউ সেকেণ্ড ক্লাস দিয়ে, কেউ এন্ট্রেন্স হয়ে, কেউ এল এ হয়ে, কেউ বি এ হয়ে, কেউ বা এম এ হয়ে বেরোয়। কিন্তু সবাই লেখে I has; এক পাকের তৈরী কিনা।

তারপর পূর্ণচন্দ্রের আরো একটি প্রশ্ন আছে—আচ্ছা, আপনারা তো ছেলেদের কাছ থেকে মাইনে নেন, নানারকম ফি নেন; বই, কাগজ, খাতাপত্র, ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স, রঙের বাক্স এসব কেনান। কিন্তু তাদের শেখান কী, দেন কী?

নিজস্ব ভঙ্গিতে একটি অপূর্ব উত্তর দিয়েছেন বিদ্যাসাগর:

"পূর্ণবাবু, আপনি কখনো আমাদের দেশে যাননি। মধ্যে মাঝে বন্যায় আমাদের দেশের ঘরবাড়ি, মাঠ-ঘাট, ক্ষেত-খামার, বাগান-বাগিচা সব জলে জলময় হয়ে যায়। সব তো জলে জলময়, যারা গ্রাম থেকে ঘাটালে যাবে, তাদের উপায় কি। তারা মনের আটকালে রাস্তাটা এঁচে নেয়, তারপর সেই রাস্তায় চলতে থাকে। পায়ের তেলো জলে ডুবে যায়। ডাঙাজমি দেখা যায় না। কোথাও হাঁটুজল, কোথাও কোমরজল। জল ভেঙে ভেঙে প্রায় চার ক্রোশ রাস্তা পার হয়ে এলে তবে একটা বাঁশের টং চোখে পড়ে। টঙে একখানা মই লাগানো, টঙের মাথায় ঘাট-মাঝি মশাই বসে আছেন।

অনেক কষ্টে টঙের কাছে এসে কেউ হয়তো ঘাটমাঝিকে বলল—মাঝি, আমায় পার করে দাও।

ঘাটমাঝি বলল—মশাই, আপনি উপরে আসুন।

মশাই উপরে এলে ঘাটমাঝি বলল—পারের কড়ি রাখুন। অন্য সময় যা রাখেন, এখন তার আটগুণ রাখতে হবে।

এ সময়ে ঘাটমাঝির কথার উপর আর কথা চলে না। ঘাটমাঝির কথামতো গুনে-গেঁথে কড়ি রাখতে হল।

তখন ঘাটমাঝি বলল—ওই দেখুন নৌকো আছে। নৌকোয় বোটে আছে, দাঁড় আছে, হাল আছে, লগি নেই। বন্যার নদীতে লগি দিয়ে থই পাওয়া যায় না। আপনি বোটে বাইতে বাইতে ওই ওপারে চলে যান। ওপারে যে টঙ দেখছেন, ওর কাছে নৌকো রেখে যেখানে ইচ্ছা চলে যান।

পূর্ণবাবু, আমরা ওই ঘাটমাঝির মতো টঙ বেঁধে বসে আছি। ছেলেরা পড়তে এলে তাদের কাছ থেকে নানারকম ফি আদায় করে বলি—ওই স্কুল আছে, বেঞ্চি আছে, চেয়ার আছে, মাস্টার আছে, পণ্ডিত আছে, কাগজ কলম বই কিনে পড় গে। মাসে মাসে আমার এখানে ফি-টি দিয়ে যেয়ো।"

১৮৫৯ সালে কয়েকজন ভদ্রলোক শঙ্কর ঘোষ লেনে একটা ইস্কুল খুললেন—'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল'। মাস কয়েক পর ওই ইস্কুলটি চালানোর জন্য বিদ্যাসাগরের সাহায্য চাইলেন তাঁরা। বিদ্যাসাগর রাজী হলেন। একটা কমিটি হল। ১৮৬১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সেই কমিটিই 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' চালিয়েছে।

কিছুকাল পরে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' পরিচালনার ভার পড়ল ছ-জনের উপর। সেই ছ-জনের নাম: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রামগোপাল ঘোষ,

রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর, হীরালাল শীল। নতুন কমিটি হল। বিদ্যাসাগর সেক্রেটারি হলেন।

১৮৬৪ সালের গোড়া থেকে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নাম আর রইল না; নতুন নাম হল—'হিন্দু মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন'।

ছ-জনের উপর ইনস্টিটিউশন পরিচালনার ভার; তাঁদের মধ্যে তিনজন ইনস্টিটিউশনের সম্পর্ক ছেড়ে দিলেন, একজন ১৮৬৬ সালে মারা গেলেন, আরেকজনের মৃত্যু হল ১৮৬৮ সালে। ফলে ইনস্টিটিউশন পরিচালনার সমস্ত ভার পড়ল একা বিদ্যাসাগরের উপর।

১৮৭২ সালের জানুআরি মাসে বিদ্যাসাগর দ্বারকানাথ মিত্র আর কৃষ্ণদাস পালকে নিয়ে একটা কমিটি করলেন। মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে ছাত্রেরা যাতে বি এ পর্যন্ত পড়তে পারে সেজন্য আবেদন করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে।

মেট্রোপলিটনে বি-এ পর্যন্ত ক্লাস খোলার অনুমতি দিল না বিশ্ববিদ্যালয়। ফার্স্ট আর্টস পর্যন্ত পড়ার অনুমতি দিল।

১৮৭২ সালের ২৮ ফেব্রুআরি 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "এতদিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনটি কলেজে পরিণত হইল।...... দেশীয়দিগের দ্বারা স্বাধীনভাবে প্রথম এই কলেজ স্থাপিত হইল।......"

১৮৭৩ সালের ২ জানুআরি 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখছে: "আগামী মাস হইতে বিদ্যাসাগরের স্কুলে ফার্স্ট আর্ট ক্লাস খোলা হইবে। ছাত্রদের বেতন পাঁচ টাকার পরিবর্তে চার টাকা করিলে স্কুল কর্তৃপক্ষের অধিক উপকারের সম্ভাবনা ছিল। ইহার বন্দোবস্ত এখনো যদিও অজ্ঞাত তবে ইহা যে উত্তমরূপে চলিবে এরূপ প্রত্যাশা করি।"

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "মেট্রপলিটান বিদ্যালয়কে তিনি (বিদ্যাসাগর) যে একাকী সর্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন—ইহাতে বিদ্যাসাগরের কেবল লোকহিতৈষা ও অধ্যবসায় নহে, তাঁহার সজাগ ও সহজ কর্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। এই বুদ্ধিই যথার্থ পুরুষের বুদ্ধি—এই বুদ্ধি সুদূরসম্ভবপর কাল্পনিক বাধাবিঘ্ন ও ফলাফলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে না; এই বুদ্ধি, কেবল সূক্ষ্মভাবে নহে, প্রত্যুত প্রশস্তভাবে সমগ্রভাবে কর্ম ও কর্মক্ষেত্রে আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া, দ্বিধা বিসর্জন দিয়া, মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার মর্মস্থল আক্রমণ করিয়া, বীরের মতো কাজ করিয়া যায়। এই সবল কর্মবুদ্ধি বাঙালির মধ্যে বিরল।"

সে সময়ে সাহেবেরা বিদ্যাসাগরকে বলেছেন—এখনো বাঙালীদের ইংরেজী কলেজ চালানোর ক্ষমতা হয়নি। সাহেব অধ্যাপক ছাড়া ইংরেজী কলেজ চালানো অসম্ভব।

ভারতবর্ষে বিদ্যাসাগরই প্রথম সাহেব অধ্যাপক না নিয়ে ইংরেজী কলেজ খুলেছেন।

ই সি বেলি একদিন বললেন—বিদ্যাসাগর! কেমন করে তুমি নিজের কলেজ চালাবে। ইংরেজের সাহায্য ছাড়া ইংরেজী কলেজ চলতে পারে না।

বিদ্যাসাগর বললেন—ছাত্রদের ইংরেজী বিদ্যা না শেখাতে পারলেও পাস করাতে পারব, এ কথা নিশ্চয় জানবেন।

বিদ্যাসাগর বাড়িয়ে বলেন নি। সত্যি-সত্যি, মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে ১৮৭৪ সালে ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষার ফল ভালো হল।

১৮৭৪ সালের এফ এ পরীক্ষায় মেট্রোপলিটনের ছাত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু চমৎকার ফল করলেন। পরীক্ষার ফল যখন বেরোয়, বিদ্যাসাগর তখন কলকাতায় ছিলেন না, কার্মাটারে ছিলেন। ফল বেরিয়েছে দেখে বিদ্যাসাগর সঙ্গে সঙ্গে কার্মাটার থেকে কলকাতায় চলে এলেন। সটান গিয়ে উঠলেন এমপুকুরে, যোগেন্দ্রচন্দ্রের বাড়িতে। যোগেন্দ্রচন্দ্রকে বললেন—কি রে, ভয় পেয়েছিলি যে!.. তুই আমার বাড়ি যাস।

তারপর যোগেন্দ্রচন্দ্র এলেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে। নিজের লাইব্রেরি থেকে বিদ্যাসাগর এক খণ্ড সুন্দর করে বাঁধানো "ওয়েভার্লি উপন্যাসাবলী" উপহার দিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্রকে। নিজের হাতে লিখে দিলেন:

Awarded to Jogindra Chandra Bose at the close of his brilliant career as a student in the Metropolitan Institution.

Iswarachandra Sarma
8th January, 1875

এই কলেজের প্রথম বছরের পরীক্ষাতেই এমন সুফল হল যে, সকলে অবাক হয়ে গেলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সাটক্লিফ সাহেব বললেন—Pandit has done wonders.

অর্থাৎ, পণ্ডিত আশ্চর্য কাণ্ড করেছেন।

শংকর ঘোষ লেনে তখন মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের নতুন বাড়ি উঠছে। চতুর্দিকে বালি আর মাটির ঢিবি. বিকেলের দিকে কয়েকটি ছেলে নতুন বাড়ির প্রাঙ্গণে খেলাধুলোয় মত্ত। বিদ্যাসাগর মিস্ত্রীদের কাজকর্ম দেখাশোনা করতে এসেছেন। হঠাৎ ছেলেদের ডেকে বললেন—চ, চীনে মিস্ত্রীরা কেমন কাঠের কাজ করছে দেখি

ঘরে ঘরে অনেকক্ষণ ধরে নিজে সব দেখলেন, ছেলেদের দেখালেন। প্রশ্ন করলেন—মিস্ত্রীরা কেমন কাজ করছে রে?

ছেলেরা সমস্বরে বলল—ভালো।

—কোথায় ভালো, কেন ভালো, বল দেখি।

তারপর নিজেই বিদ্যাসাগর বুঝিয়ে বললেন—অতগুলো লোক একসঙ্গে কাজ করছে, কাউকে কারুর সঙ্গে কথা বলতে দেখলি? কেউ অপরের কাছে যন্ত্র ধার চাইছে? একেই বলে ভালো কাজের লোক, বুঝলি? তিন-চার গুণ বেশি পয়সা দিয়ে তাই এদের রেখেছি।

১৮৮৭ সালের জানুআরিতে মেট্রোপলিটন কলেজ নতুন বাড়িতে এল। প্রিন্সিপাল একদিন বিদ্যাসাগরকে বললেন—কলকাতার সমস্ত বড়লোক এবং লাটসাহেবকে নেমন্তন্ন করে কলেজের এই নতুন বাড়িতে একটা উৎসব করলে ভালো হয়।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—উৎসব করতে কত খরচ পড়বে?

—চার-পাঁচ শো টাকা পড়বে।

বিদ্যাসাগর বললেন—ওই টাকায় গরিব ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করে দাও।

সেই ব্যবস্থাই হল। ক্রমশ
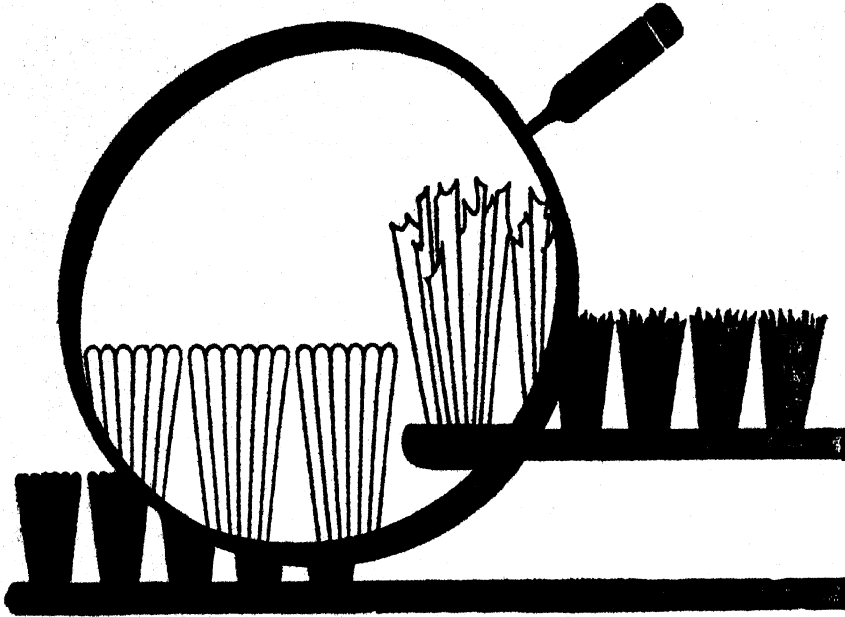
বিশ্ব বিজ্ঞান

মহাজাগতিক এক্স রশ্মির উৎস সন্ধানে

এক্স রশ্মির জ্যোতির্বিদ্যার বয়েস খুবই কম—বছর পাঁচেক হবে। তার আগে কেউ ভাবতেও পারেননি যে, ঐরকম কোন বিজ্ঞানের শাখা গজিয়ে উঠবে। আজ কিন্তু বছর পনেরো আগেকার রেডিও জ্যোতির্বিদ্যার মত এক্স রশ্মির জ্যোতির্বিদ্যা

এরিয়্যালগুলির উপর ঢাকনা লাগানো হচ্ছে

বিরাট সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সম্মুখীন। মহাবিশ্বের জ্যোতির্বিদ্যার উৎস সন্ধানের জন্য ব্রিটেনে 'স্কাইলার্ক' নামে এক নতুন রকেট উদ্ভাবিত হয়েছে যা ১৪০ থেকে ২৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত উপরে উঠতে পারে। সেটি শুধু এক্স রশ্মি কেন, অতি-বেগুনী রশ্মিও পরীক্ষা করবে একেবারে নিখুঁতভাবে। হালে লিস্টার শহরে নির্মিত এই তিনটি অক্ষবিশিষ্ট যন্ত্রটি রশ্মি পরীক্ষার জন্য দুই হানড্রেডওয়েট মাল নিয়ে উমেরা থেকে মহাকাশে উড়ে গিয়ে সূর্যের ছটামুকুটের মধ্যে কিছু নতুন উপাদান আবিষ্কার করে। এখানে নিখুঁততাটাই হচ্ছে আসল কথা এবং সেই দিক থেকে ব্রিটিশ 'স্কাইলার্ক' খুবই সুনাম অর্জন করেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি আধুনিক শাখার সাফল্য নির্ভর করে এই নিখুঁততার উপর।

মহাশূন্যে সূর্য এবং যেসব বহু রহস্যময় জিনিসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সেগুলি সব সময় একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে তাদের অস্তিত্বের সংকেত পাঠায় না। অত্যুচ্চ তাপ ও শক্তিসম্পন্ন জিনিসগুলি তাদের অস্তিত্বের সংকেত গোটা তড়িচ্চৌম্বক বর্ণচ্ছত্রে ছড়িয়ে পড়ে। আবার এমন জিনিসও আছে আর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সহজে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের আবরণ ভেদ করতে পারে না। সেইজন্য সেগুলি আমরা দেখতে বা শুনতে পাই না। তাই রেডিও জ্যোতির্বিদ্যার একটি প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছে যে, আকাশের বিভিন্ন এমন কতকগুলি রেডিওর উৎস আছে যেগুলি পরিদৃশ্যমান নয়। সেইসব উৎসের রেডিও রশ্মি কয়েক মিলিমিটার ভেদ করে যেতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর আবহমণ্ডলের ঘনত্ব ১ মিটার। সেইজন্য সূর্য থেকে যে অতি-বেগুনী রশ্মি আসে তারও অতি সামান্য ভাগ আবহমণ্ডলের বর্ম ভেদ করে পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে পারে। এই আমাদের বাঁচোয়া। তা না হলে সমস্ত অতি-বেগুনী রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছলে কবে আমরা মরে ভূত হয়ে যেতাম। সুতরাং সূর্যের পুরো তড়িচ্চৌম্বক শক্তি

এরিয়্যালগুলি লাগানো হচ্ছে

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার মেরু থেকে স্কাইলার্ক আকাশে উঠে যাচ্ছে
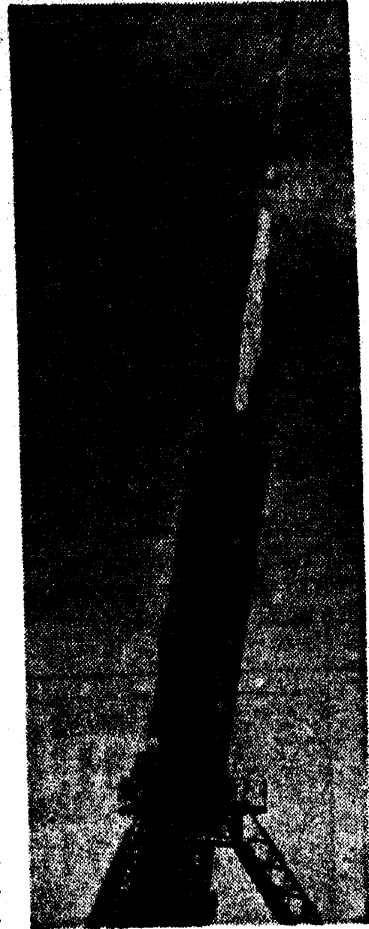
যদি দেখতে বুঝতে হয় বা এক্স রশ্মির মহাবিশ্বের রহস্য যদি জানতে হয়, তাহলে সেগুলি পরীক্ষা করার যন্ত্রপাতি আবহমণ্ডলের বাইরে নিয়ে যাওয়া চাই।

ঐ ধরনের প্রথম পরীক্ষা করা হয় ১৯৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তখনই জানা যায় যে, সূর্য এবং তার মত অগণিত নক্ষত্রকে পৃথিবী থেকে যেরকম দেখায় সেগুলি মোটেই সেরকম নয়। যেমন বলা যায় যে, সূর্যের পরিদৃশ্যমান বিকিরণের মাত্রা হচ্ছে ৬০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। ঐ তাপমাত্রায় এক্স রশ্মি নিঃসরণ যেটুকু হবে তা নগণ্য বলা যেতে পারে। আসলে কিন্তু সূর্য থেকে এক্স রশ্মি আসে তার পরিমাণ অনেক বেশী। সুতরাং প্রশ্ন উঠছে সূর্যের কোন্‌খানে সেই বাড়তি রশ্মি তৈরী হচ্ছে এবং কোন্‌খান থেকেই বা আসছে। এবং জবাব দিয়েছে 'স্কাইলার্ক'। আজ জানা গিয়েছে,

[illegible] এক্স রশ্মি বিকীর্ণ হয় সূর্যের [illegible] ১৫ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। সেখানে [illegible] থেকে এই অসম্ভব রকমের উত্তাপের সৃষ্টি।

এক্স রে বর্ণচ্ছত্র আলোক এবং অতি-বেগুনী রশ্মির বর্ণচ্ছত্রের মত জ্যোতি-বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার হতে পারে; কারণ, প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক জিনিস নিঃসরণে (এমিশন) অনন্য। কোন জিনিসের তাপমাত্রা বাড়ালে ইলেকট্রনগুলি পরমাণু-কেন্দ্রীণ থেকে বার হয়ে আসে, তার নিঃসরণ রেখা স্থানান্তরিত হয়। এই আয়নিত অবস্থা দ্রব্যবিশেষের তাপমাত্রা, অস্তিত্ব ও অন্যান্য ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে নানা তথ্য পরিবেশন করে। এখানের নিভুঁলতার গুরুত্ব খুব বেশী। সেইজন্য এক্স রশ্মি বা অতি-বেগুনী রশ্মির অনুশীলনের ক্ষেত্রে পরীক্ষার যন্ত্রটির সৌর ছটামুকুটের ঠিক জায়গার দিক টিপ করা চাই। সে ক্ষেত্রে এতটুকু ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটলে হিসাবে ভুল হয়ে যাবে।

ভিতরের টেলিমেট্রি ও অন্যান্য বিষয়ের যন্ত্র বসানো হচ্ছে

এক্স রশ্মির উৎসটা যদি ঠিকভাবে জানা যায় তাহলে তখন পৃথিবী থেকে চৌম্বক পরীক্ষা ও "পিন্‌হোল ক্যামেরায়" তোলা [illegible] এক্স রশ্মির [illegible] সাহায্যে [illegible] জানা যাবে। এইভাবে [illegible] করে জানা গিয়েছে যে, সূর্যের এক্স রশ্মি বিকিরণের প্রধানতম কেন্দ্র হচ্ছে সূর্যপৃষ্ঠ থেকে ৪০০ কিলোমিটার উপরে। আরো জানা গিয়েছে যে, সূর্যমুকুটের মধ্যেও অপেক্ষাকৃত কম বা অপেক্ষাকৃত বেশী গরম জায়গা আছে এবং সেই তাপমাত্রা নির্ভর করে সূর্যের আলোকমণ্ডলের জায়গা-বিশেষের ঔজ্জ্বল্যের মাত্রার উপর। ঠাণ্ডা ও গরম জায়গাগুলির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও আছে এবং সবচেয়ে উত্তপ্ত জায়গা-গুলির তাপমাত্রা ৫০ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হতে পারে। আগেকার দিনেই এই অত্যুত্তপ্ত জায়গাগুলির এলাকা খুব বড় বলে মনে করা হত। এখন জানা গিয়েছে, সেগুলি সূর্যের ব্যাসের ৩০ ভাগের এক ভাগের বেশী বড় নয়।

মহাশূন্যে দূর-দূরান্তরে এক্স রশ্মির উৎসের সন্ধান পাওয়ার ফলে বিজ্ঞানীদের মনে বহু প্রশ্ন উঠেছে। গত দুই বছরে এইরকম ১২টি এক্স রশ্মির উৎসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তার একটি কর্কট নীহারিকার সঙ্গে জড়িত।

আশ্চর্যের কথা এই যে, এক্স রশ্মি খুব তাড়াতাড়ি শোষিত হওয়া সত্ত্বেও কি করে এত দূরে আমাদের এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। তাই বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ঐসব রশ্মি-উৎসগুলি বিকিরণশক্তিতে আমাদের সূর্যের বিকিরণশক্তির চেয়েও বহু লক্ষ গুণ শক্তিশালী। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে দক্ষিণ আকাশে ব্রিটেন মহাশূন্যে এমন সব যন্ত্র পাঠিয়ে এক্স রশ্মির দূরবিন্দু পরীক্ষা করবে যে, মহাকাশে জ্যোতি-বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্র হিসাবে কাজ করতে পারবে।

কাজটা অবশ্য মোটেই সহজ নয়। কারণ, পরীক্ষা করার জিনিসগুলির অবস্থিতি সূর্যের চেয়ে বহুগুণ দূরে অবস্থিত। যন্ত্র যত সূক্ষ্ম হবে, যত জটিল হবে, সেটিকে ঠিক জায়গায় নিশানা করা হবে তত কঠিন। তবুও এ কথা বলা অন্যায় হবে না যে, স্কাইলার্ক ঐ কাজের উপযুক্ত, যদিও মহাশূন্যের মান ও মানদণ্ডে যন্ত্রটি নেহাতই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। কিন্তু তবু সূর্যের অদৃশ্য অংশ এবং এক্স ও গামা রশ্মির অদৃশ্য উৎসগুলি পরীক্ষা করার এমন নিখুঁত যন্ত্র আর কোথাও তৈরী হয়েছে কিনা সন্দেহ।

স্কাইলার্কের মত ছোট যন্ত্র তৈরি করতে খরচও কম অথচ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে করে বিজ্ঞানের প্রগতি সুনিশ্চিত করবে।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

বড়মা

যাস্ত্র মরোয়া নাকি মরণকে চেয়েছিলেন কর্মশীল জীবনে হঠাৎ আসা অতিথির মত। লিখবার টেবিলে বসে, একটি শব্দের দুটি অক্ষর লেখা হয়েছে আর দুটির দিকে কলম এগিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় শ্যামসমান অতল কৃষ্ণ গভীরে চেতনায় অপ্রত্যাশিত, ত্বরিত সমাপ্তি শেষ যবনিকা টেনে দেবে এই ছিল তাঁর প্রার্থনা। ঠিক এত সহজ হয়নি তাঁর জীবনাবসান তবু যা হয়েছিল তাও সকলের ভাগ্যে হয় না। আশি বছরের উপর বয়স, শেষ দিন পর্যন্ত হাতের কলম নিরস্ত হয়নি। স্বর্গীয়া হেমলতা ঠাকুরের জীবনাবসানও প্রায় সক্রিয় জীবনের সুন্দর সমাপ্তির মত এসেছে সেদিন। ৪ঠা অকটোবর, ১৭ই আশ্বিন ৯৫ বছর বয়সে পুরীতে তাঁর দেহান্ত হয়েছে। কয়েকদিন মাত্র অসুস্থ ছিলেন সত্য কিন্তু পঁচা-নব্বইতে পা দিয়েও মাথার চুল ছিল কালো, চশমা লাগতো না লেখাপড়া করতে আর সবচেয়ে বড় কথা ছিল তাঁর স্মরণশক্তি। যখন শরীর নড়ছে না তখনও মাথা ঝকঝকে পরিষ্কার। শেষদিনের দিনসাতেক আগেও পুত্রসম সৌম্য ঠাকুর যখন তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন পুরীতে, প্রত্যেকের নাম ধরে আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞাসা করেছেন প্রিয়জনের কুশলপ্রশ্ন। অফুরন্ত গল্প, কবিতা আবৃত্তি। অদ্ভুত স্মরণশক্তিসম্পন্না এই অসামান্যাকে শেষ সময়ের কাছেও উজ্জ্বল করে রেখেছিল। দীপ্তিময়ী বৃদ্ধা বড়মাকে আদর করে সৌম্যদা বলেছিলেন, "তুমি তো খুকু। তোমার চুল কালো, চোখে চশমা লাগে না। তোমার আগে আমি গিয়ে ওপারে ব্যবস্থা করে রাখবো।" বড়মা হেসে উড়িয়ে দিয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যেন সৌম্যদা তাঁর মুখাগ্নি করেন। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হলো। সপ্তাহ না ঘুরতে সৌম্যদা গেলেন অন্ত্যেষ্টি করতে। আজকে বড়মা সম্বন্ধে যেটুকু সংগ্রহ আপনাদের কাছে পেশ করছি, তারও অনেকটাই তাঁর মুখে শোনা।

ষোল বছর বয়সে হেমলতা দেবী ঠাকুর পরিবারের বিরাট সংসারে প্রবেশ করেছিলেন মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ হিসাবে। ১১৬ জনের বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার। দীপেন্দ্রনাথের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর হেমলতাকে তিনি বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর দুই সন্তান দীনেন্দ্রনাথ ও নলিনীকে এই নূতন মা স্নেহভালবাসায় পূর্ণ করে তুলেছিলেন। তার চেয়েও বেশী পূর্ণ করেছিলেন আত্মভোলা, দার্শনিক শ্বশুরটিকে। তাঁর সমস্ত ভার নববধূকে নূতন জীবনে নূতন দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। হেমলতার সার্থক জীবনের কাহিনীর অনেকটা জুড়ে আছে মহর্ষির এই প্রতিভাবান অথচ শিশুর মত সরল ছেলেকে দিয়ে।

হেমলতা জোড়াসাঁকোর সংসারে এসে যেদিন দাঁড়ালেন, মহর্ষি দুটি আকবরী মোহর দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন 'তুমি আমার গুরুবংশের মেয়ে (হেমলতা দেবী রাজা রামমোহনের বংশের মেয়ে) জান তো। তুমি সমস্ত উপনিষদ ভাল করে পড়বে এই আমার ইচ্ছা।' আদি ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য হেমচন্দ্রকে ভার দিলেন কিশোরী বধূটিকে উপনিষদ পড়াবার। হেমলতা দেবী অল্প দিনে শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করেছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ আর তত্ত্বজ্ঞানে ডুবে যাওয়া শ্বশুরটিকে তাই তাঁর বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয়নি। খাওয়া দাওয়া থেকে লেখাপড়ার সময়ও দ্বিজেন্দ্রনাথের বৌমা না হলে চলতো না। যে স্বপ্নপ্রয়াণের

নব্বই বৎসর বয়সে জন্মদিনে বড়মা—হেমলতা দেবী

[illegible] শান্তিনিকেতনে গেলেন [illegible]
[illegible] হেমলতা। অবশ্য
[illegible] দৃষ্টি সর্বদা থাকবেই। এই
মনীশ্বরের [illegible] সংসারে ছিল এক
বিশিষ্ট [illegible]। সেবক, সেক্রেটারী,
বন্ধু, সবই ছিল সে। বিহারের কোন
গ্রামের থেকে ১২।১৩ বছর বয়সে সে
পাখা টানবার কাজে এসে ভর্তি হ'য়েছিল।
তারপর আস্তে আস্তে সব প্রিয়জনের সেরা
হ'য়েছিল। আজও ৮৫ বছরের মনীশ্বর
শান্তিনিকেতনে আছে। তার ছেলে-
মেয়েরা দ্বিজেন্দ্রনাথের কোলে পিঠে যত
চড়েছে, সৌম্যদা বলেন যে তাঁরাও
ততটা সৌভাগ্যের অধিকারী হননি।
মনীশ্বরের ছেলেমেয়ের নামগুলি পর্যন্ত
দ্বিজেন্দ্রনাথের দেওয়া। তার বড় মেয়ের
নাম সেবন্তী—সংস্কৃতে যার মানে সাদা
গোলাপ। এমন নাম আর কেই বা রাখতে
পারতো! নীচু বাংলার কাছে কুঁড়ে ঘরে
থাকতো এই সংসারটি। সেই ঘরের নাম
পরে রবীন্দ্রনাথ রেখেছিলেন "দ্বিজবিরাম।"
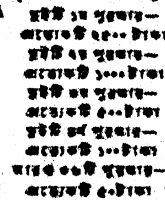
দ্বিজবিরামে কিন্তু আনন্দ আর হাসির, স্নেহ আর ভালবাসার বিরাম ছিল না। একদিন হেমলতা দেবী মোচার ঘণ্ট রেঁধেছেন। শ্বশুর মশায় তো খেয়েই হাঁকলেন—বড় বৌমাকে ডাকো! মাথাঘষা দিয়ে কি মোচার ঘণ্ট রান্না হয়? মাথাঘষা মানে অবশ্য গরম মশলা। বড় বৌমা আসতেই তাঁর বাবা মশায় বললেন, "এ কি করেছ? আমার কাকিমা তো কই গরমমশলা দিতেন না মোচার ঘণ্টে। বড় বৌমা বললেন, আপনার কাকিমার রান্না তো আমি দেখিনি, কি করে জানবো তাঁর রান্নার পদ্ধতি। ঠিকই তো। এমন পাগলামি করে দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজেই কৌতুকে হেসে উঠলেন হা হা করে। হাসিতে, আলোতে, গল্পে জমে উঠলো আসর। আবার শুধু কি এইটুকুতেই শেষ? একদিন বৌমার আবার ডাক পড়লো। ঘিয়ে তোমরা লুচি ভাজ কেন? কি অপব্যয়। জলে ভাজলেই তো ভাল হয়। হেমলতা দেবী হাসলেন। বাবামশাই, জলে যে ময়দা সব কাদা হ'য়ে

[illegible] আবার সেই হাসি ফুটে। শিশুরা যে হাসি হাসে ঠিক তেমনটি ছিল তার প্রাণ। তাই উত্তর জীবনে অত শত শিশুর ভার নিয়ে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিতে পেরেছিলেন হেমলতা।

বিশ্বভারতীর শিশু বিভাগের ভার প্রথম নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পত্নী [illegible]। [illegible] আনন্দের সবটুকু [illegible] শিশুদের জন্য রান্না করতেন নিজে হাতে, যত্নআত্তি সেবা সবই নিজে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর চিন্তার কারণ হ'লো কি করে এই বিরাট দায়িত্বভার চলবে? হেমলতা দেবী তখন এগিয়ে এলেন। সৌম্যদা বললেন, তখন থেকে তাঁদের বড়মা শান্তি-[illegible] বড়মা অনায়াসে [illegible]। বড়মা না হ'লে শিশুদের চলে না, শিশুরা [illegible] আবার না সেখানে বড়মার চলে না।

সরোজনলিনী নারী মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের পত্তন, পরিচালনা সবের সঙ্গে দীর্ঘদিন হেমলতা দেবী ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন অনেকদিন। হেমলতা দেবীর লেখা কবিতার বই '[illegible]' ও 'অকল্পিতা' তাঁর অল্প বয়সের রচনা। অকল্পিতা নামটি দ্বিজেন্দ্রনাথের দেওয়া। পুরীতে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতাব্দী উৎসবে সৌম্যদা, ডাঃ কালিদাস নাগ প্রভৃতি গিয়েছিলেন। সে সময় সৌম্য ঠাকুরের অনুরোধে হেমলতা দেবী উৎসবে মাত্র যোগদানই করেন নি, বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। '৬১ সাল বহু বেশী দিনের কথা নয়। প্রায় নব্বই বছর বয়সে পর পর দু'দিন উৎসবে যোগ দেওয়া এমন কি বক্তৃতা দেওয়ায় তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রকাশ ছিল। এই অফুরন্ত প্রাণশক্তি দিয়েই তিনি পুরীর বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম গড়েছিলেন। বসন্তকুমারী ছিলেন স্যার প্রভুল চ্যাটার্জির সহধর্মিণী, আই এন এ খ্যাত জেনারেল চ্যাটার্জির মা। এই পরিবারের অর্থ সাহায্যে, হেমলতা ঠাকুরের অপরিসীম নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতায় এমন একটি মহিলা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো যা সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের পরম নিশ্চিন্ত নির্ভর ও আশ্রয় হয়েছিল। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় যেসব মেয়েরা খরকুটোর মত ভেসে যেতো তাদের অনেকে দাঁড়াতে পেরেছিল বসন্তকুমারী আশ্রমের সহায্যে। বসন্তকুমারী আশ্রমে এসে বড়মার বড়ত্ব আরও বেড়ে গেল। প্রথম ছিলেন ঘরের বড় মা, পরে শান্তিনিকেতনের শিশুদের বড়মা। এবার হলেন দেশজোড়া লোকের বড়মা। সবার বড়মা হয়েছিলেন বলে অসহায় নারী সমাজের মুখ চেয়ে যে কাজে তিনি নেমেছিলেন তার জন্য আপনজনের মত করে নানা অপ্রত্যাশিত কোণ থেকে অর্থ সাহায্য আসতে আরম্ভ করেছিল। যে প্রতিষ্ঠানে সবার বড়মা তার জন্য সবাই সব করতে পারে।

বড়মার পিতৃকুল যে ভারতবর্ষের নবজন্মের জন্মদাতা রাজা রামমোহনের বংশ সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। পিতা ললিতমোহন দ্বিজেন্দ্রনাথের পরম বন্ধু ছিলেন। কেবল সেই সখ্যসূত্রে হেমলতা যে এসেছিলেন ঠাকুর পরিবারে তা নয়, পুত্র মোহিনীমোহনের সংগে দ্বিজেন্দ্রনাথের কন্যা সরোজাদেবীর বিবাহ হয়। সে বিবাহের কনে দেখার গল্পও মজার। ললিতমোহন বললেন, কই হে তোমার মেয়ে একবার দেখি। ইজার কামিজ পরা, টিকি ঝোলানো সরোজা দেবী কোথায় হৈ হৈ করে খেলা করছিলেন। তাঁকে ডেকে আনা হলো। হয়ে গেল সেদিনের মেয়ে দেখা! মোহিনীমোহনরা অনেকগুলি ভাই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রজনীমোহন বিবাহ করেছিলেন সুনয়নী দেবীকে। রজনীমোহনের পুত্র মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি বড়মা প্রথম জীবন থেকেই নারীর মর্যাদা ও অধিকারের জন্য সব রকম চেষ্টার ত্রুটি করতেন না। মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় বলছিলেন তাঁদের বড় পিশি সুশীলতা দেবীর ছেলের পৈতে হয় শান্তিনিকেতনে। সে সময় সুশীলতা দেবী নাকি বিশ্বভারতীতে মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলতেন। হেমলতা দেবী তাঁর যুক্তি দিয়ে দিদিকে মেয়েদের শিক্ষা ও সুযোগ সুবিধার সার্থকতা বোঝাবার চেষ্টা করতেন। তবুও যখন সুশীলতা দেবী বুঝতেন না তখন তুমুল তর্ক ও বাকযুদ্ধ চলতো। বালক মনোমোহন আর কিছু বুঝতেন না তবে এটুকু আজও মনে পড়ে যে হেমলতা দেবীর মন নারী সমাজের নানা উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যাগ্র থাকতো। একই পরিবেশে জন্ম, অথচ সুশীলতা দেবী যা আপত্তির চোখে দেখতেন, বড়মা তাই উত্তরকালের আশার আলো মনে করতেন।

সে যুগের সেদিনের স্মৃতি ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসবে কিন্তু হেমলতা ঠাকুর ভারতবর্ষের, বিশেষত বাঙালী মেয়েদের জন্য যা করেছেন তা কোনদিন ভুলবার নয়। যে ঠাকুর পরিবার বাংলা দেশের ইতিহাস রচনা করেছে, যাদের ঘিরে সংস্কৃতি গড়েছে সব দিক দিয়ে তারই একটা দিকের ইতিহাস হেমলতা দেবী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি। ঘরকে সম্পূর্ণ করে যে মেয়েরা বাইরেও আলো দিতে পারে তার তাঁরা প্রতীক! কাজেই সৌম্যদা যখন বললেন হেমলতা দেবীর সঙ্গে জোড়াসাঁকোর পুরোনো দিনের শেষ চিহ্ন মিলিয়ে গেল, তখন আমার মনে হচ্ছিল তাঁর মত প্রতিভাবান পুরুষের এমন বিশ্বাস কেন? ঘরের বড়মা যেমন দশের বড়মা, দেশের বড়মা হয়েছিলেন, তেমনই এই ভাস্বতী মহিলার জীবন সব মেয়ের মধ্যে ধারা হয়ে বয়ে যাবে। সেই ধারায় জীবন্ত থাকবে সেদিনের সব ছোটবড় প্রত্যয়। ভুলে যাবার উপায় নেই, শেষ হবার সাধন এঁরা সাধেন নি। এই তো আজকের আশা। না হলে আমরা কি নিয়ে বাঁচতাম?

শ্রীমতী

ক্যানাডার চিঠি

শুধু ভৌগোলিক অর্থে প্রতিবেশীই নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্তরঙ্গতার পরিপ্রেক্ষিতে ক্যানাডা স্পষ্টতই যুক্তরাষ্ট্রের আত্মীয় হিসেবে বিবেচ্য। এই আত্মীয়তা, বলাই বাহুল্য, সমানে সমানে নয়। বিশেষত ক্যানাডার বস্ত্রশিল্প ও অর্থনীতি অনেকাংশেই মার্কিন বাণিজ্যনির্ভর। ক্যানাডার যন্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনের শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ মার্কিন শিল্পপতিদের করায়ত্ত; ধাতু ও খনিজ শিল্পের শতকরা পঞ্চাশভাগ এবং তেল, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি উৎপাদনেরও শতকরা ছেষট্টিভাগ মার্কিন মূলধনের অয়ত্তে। এ ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র ক্যানাডার বিভিন্ন কাঁচা মাল ও যুদ্ধসামগ্রীর প্রধানতম ক্রেতা। শুধুমাত্র ভিয়েৎনামের যুদ্ধবাবদেই ধাতু, রাসায়নিক পদার্থ, যন্ত্রপাতি ও মারণাস্ত্র বিক্রি করে ক্যানাডা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বছরে তিরিশ কোটি ডলার উপার্জন করে। স্বভাবতই এই 'রক্তাক্ত' অর্থোপার্জন এদেশের বহু লোকের বিবেক-বোধকেই বিশেষ ভাবে পীড়িত করে থাকে। ভিয়েৎনামে বিশুদ্ধ মার্কিন পৈশাচিকতা ও তাণ্ডব যখন সারা পৃথিবীর মানুষকে বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ করে তুলছে, মার্কিন দেশের অভ্যন্তরেও যে অমানুষিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন ক্রমবর্ধমান, ক্যানাডায় সব স্তরের মানুষের বিবেকই যে অংশত তাতে সাড়া দেবে এটা কিছু অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু এতকাল যা ক্ষোভের বিক্ষিপ্ত প্রকাশে ও প্রতিবাদের অস্পষ্ট উচ্চারণে সীমিত ছিলো, গত এক বছরের মধ্যে সেই প্রতিক্রিয়া ত্বড়িৎগতিতে সংগঠিত প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্ট আকার নিয়েছে। এ দেশের প্রথাগত রাজনৈতিক নির্লিপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ প্রায় চমকপ্রদ মনে হয়। বিবেক ও দায়িত্ববোধ যে-জনমতের ভিত্তি এদেশে সেই ব্যাপক জনমত গঠনে প্রাথমিক স্তরে যাঁদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'স্টার উইকলি' ও 'টরোন্টো স্টার' পত্রিকা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ধারাবাহিক প্রবন্ধ ও সংবাদ-সমীক্ষার মাধ্যমে 'স্টার উইকলি' পত্রিকায় ভিয়েৎনামে মার্কিন যুদ্ধের স্বরূপ বর্ণনা করে এ যুদ্ধে ক্যানাডা সরকারের ভূমিকা ও নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। ভিয়েৎনামে নিক্ষিপ্ত বোমার অবিশ্বাস্য পরিমাণ, নাপাম, 'লেজি ডগ' ইত্যাদি বিশুদ্ধ নরহত্যার আধুনিক উপায়ের যথেচ্ছ ব্যবহার, স্কুল-হাসপাতাল সহ শহরে-গ্রামে সাধারণ নাগরিকদের উপর নির্বিচার আক্রমণ, প্রায় তিন লক্ষ ভিয়েৎনামী শিশু ও পাঁচ লক্ষ নাগরিক নারী-পুরুষের হত্যা, রাসায়নিক উপায়ে খাদ্যশস্য ও ক্ষেতখামার সম্পূর্ণ বিনষ্ট করা, সমস্ত রকম আন্তর্জাতিক আইন ও শর্ত লঙ্ঘন করে বিষাক্ত গ্যাসের প্রয়োগ, এমন কি মারাত্মক রোগজীবাণু ছাড়িয়ে মড়ক ও মহামারী সৃষ্টি করার আনুপূর্বিক বিবরণ তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে উপস্থাপিত করে এই পত্রিকা এ-দেশের স্বভাবত আত্মকেন্দ্রিক জনসমাজের চেতনা ও বোধের শিকড়সুদ্ধ ধরে নাড়া দেয়। এই সঙ্গে 'টরোন্টো স্টার' পত্রিকাও ক্যানাডা সরকারের নৈঃশব্দ্য ও নিস্পৃহতার কৈফিয়ত দাবি করে এবং অভিমত প্রকাশ করে যে, "by our silence we have become partners in a crime against humanity".

ক্যানাডা সরকারের পরনির্ভর নীতি, বলাই বাহুল্য, এত সহজে পরিবর্তিত হবার নয়। কী কারণে ক্যানাডার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েৎনাম নীতির বিরোধিতা, এমন কি সমালোচনা করা সম্ভব নয় তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী লেস্টার পিয়ারসন বিশেষ প্রাঞ্জল ভাষায় মন্তব্য করেছেন :

"We can't ignore the fact that a first result of any open breach with the United States over Viet-nam would be a more critical examination by Washington of certain aspects of our relation-ship from which we get great benefit....It's not a very comfor-ting thought but, when you have 60 per cent or so of your trade with one country, you are in a position of considerable economic dependence".

কিন্তু ক্যানাডার মানুষ ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই কৈফিয়তের বিরুদ্ধে উত্তরোত্তর বিতৃষ্ণা জ্ঞাপন করছে। এ আন্দোলনে, বলাই বাহুল্য, ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের ভূমিকাই মুখ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ক্যানাডার বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষত অণ্টারিও, ক্যুবেক, ব্রিটিশ কলাম্বিয়া ও অ্যালবার্টায় গত কয়েক বছর ধরে ছাত্র সম্প্রদায়ের উদ্যোগে ধীরে ধীরে একাধিক সমাজতান্ত্রিক সংস্থা গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া, এদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল, 'ন্যাশনাল

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ছাত্রবিভাগটি প্রায় পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত। এ সব সত্ত্বেও রাজনীতি, বিশেষ করে বামপন্থী রাজনীতি বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তির সংখ্যা এ দেশে নিতান্তই নগণ্য। 'ভিয়েৎনাম যুদ্ধ'-বিরোধী আন্দোলন শুধুমাত্র এ-সম্প্রদায়ের মাথাব্যথা হলে স্বভাবতই তার আকৃতি বিশেষ সীমাবদ্ধ হতো। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মতো এ দেশেও রাজনীতি বিষয়ে অনুৎসাহী সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে তথাকথিত "শান্তিবাদী", "উদারপন্থী" ও বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক অংশ গ্রহণের ফলে এ-দেশে ভিয়েৎনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ক্রমশই বিশেষ বিস্তৃত ও প্রবল হয়ে উঠছে। ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমিতির উদ্যোগে 'ভিয়েৎনাম ডে কমিটি' গঠিত হওয়ার পর থেকে সারা কানাডায় প্রায় পঁচিশটি যুদ্ধবিরোধী ছাত্র সংস্থা গড়ে উঠেছে এবং টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবাদ কমিটির আহ্বানে বিভিন্ন আন্দোলন-প্রস্তুতিকে ঐক্যবদ্ধ করে 'স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন টু এনড্ দা ওয়র ইন ভিয়েৎনাম' সংগঠিত হয়েছে। গত মার্চ মাসে এক বিশাল অধিবেশনে ভ্যাঙ্কুভার থেকে হ্যালিফ্যাক্স পর্যন্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবাদ কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে টরোন্টোতে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। টরোন্টোর 'ইয়ং সোশ্যালিস্ট ফোরাম' এই সংস্থার অন্যতম উদ্যোক্তা। সম্প্রতি হাই-স্কুলের ছাত্ররাও যুদ্ধবিরোধী সংগঠনের মাধ্যমে এই সংস্থার কার্যসূচীতে অংশ গ্রহণ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী একুশে অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রে এবং পৃথিবীর অন্যত্র যে ব্যাপক প্রতিবাদ দিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে, কানাডার যুবসমাজও সে-প্রস্তুতির অংশ গ্রহণকারী।

কানাডার যুবসমাজেরও এই আন্দোলনে এ দেশে নবাগত বিপুলসংখ্যক মার্কিন ছাত্র

ও [illegible] অথবা গোণ অংশের ভূমিকা বিশেষ প্রশংসনীয়। এটা স্পষ্টত অনুভব করা যায় যে, প্রতিবাদ মিছিল, সভা, বক্তৃতা, সত্যাগ্রহ ইত্যাদি যে-কোনো প্রয়াসেই এঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এ দেশে ব্যাপকতর জনমত গঠনের বিশেষ সহায়ক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গত তিন-চার বছর ধরে বহু মার্কিন নাগরিক যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে ক্যানাডায় এসে বসতি করেছেন। মার্কিন দেশের ক্রমবর্ধমান নীতিহীনতা ও যুদ্ধবাজ সামাজিক কাঠামোর বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ এই জনস্রোতের অধিকাংশই এদেশে স্থায়ীভাবে বাস করতে ইচ্ছুক। শুধুমাত্র ১৯৬৬ সালেই মোট ১৭,৫১৪ জন মার্কিন নাগরিক ক্যানাডায় আবাসিক হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, ১৯৬৭ সালে আগত জনসংখ্যার হার আরও বেশি। আগত জনসংখ্যার মুখ্য অংশই সেই সব মার্কিন যুবক যুক্তরাষ্ট্রে যারা 'ড্রাফ্‌ট্‌ ডজার' হিসেবে অভিহিত। (এদেশে, অন্তত ছাত্রসমাজের মধ্যে এরা 'ড্রাফ্‌ট রেসিস্টারস' অথবা 'ড্রাফ্‌ট অবজেকটরস' হিসেবেই পরিচিত) 'ড্রাফ্‌ট্‌' নামক এই আইন দ্বারা মার্কিন সমাজের সমস্ত কাঠামো আজ বিশেষভাবে আক্রান্ত। যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত 'র‍্যামসার্টস' পত্রিকার মতে : "No other institution outside marriage has influenced our society the way draft has. Were it to end today, its effects would be with us for at least two generations". ভিয়েৎনামে মার্কিন জেনারেলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে ক্রমশই এই আইনের বাহু বহুধাবিস্তৃত হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে দুটি ধারার পরিবর্তন করে আঠেরো থেকে কুড়ি বছর বয়স্ক তরুণদের এই আইনের মুখ্য শিকার করা হবে। এরা যেহেতু ভোটাধিকার বঞ্চিত, সেহেতু নিরাপদ হিসেবে বিবেচিত। এ ছাড়া, একটি ন্যূনতম শিক্ষার মান না থাকলে নির্বাচন করা হবে না এই প্রস্তাবও সম্প্রতি নাকচ করা হচ্ছে; যুদ্ধ ক্ষেত্রের শিক্ষাই সম্ভবত যথেষ্ট বলে ধার্য হয়েছে। যাই হোক, নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি জমানোই 'ড্রাফ্‌ট' এড়ানোর একমাত্র উপায় হিসেবে ব্যবহৃত নয়। নেভি, মেরিনস, এয়ার ফোর্স অথবা কোস্টগার্ডে যোগ দিয়ে অথবা এফ বি আই কিম্বা সি আই এ-র তালিকাভুক্ত হয়েও ড্রাফ্‌ট এড়ানো সম্ভব। এ ছাড়া, 'ড্রাফ্‌ট বোর্ড সাইকিয়াট্রিস্ট' দ্বারা পরীক্ষিত হবার আগে অনেকেই অন্যান্য ডাক্তারের সহযোগিতায় বিভিন্ন মানসিক অসুস্থতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ উপস্থাপিত করে। (প্রসঙ্গত, 'সাইকিয়াট্রিক ইন্টারভিয়ু'তে একজন আঠেরো-উনিশ বছরের তরুণকে কী ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তার একটা নমুনা দেওয়া যেতে পারে : 'যদি হঠাৎ কেউ তোমার বাড়িতে জোর করে ঢুকে তোমার গর্ভবতী মাকে (অথবা বোনকে) বলাৎকার করে এবং গর্ভপাত ঘটায় তাহলে তোমার কী প্রতিক্রিয়া হবে?") উপরোক্ত উপায় ছাড়াও সাক্ষ্যপ্রমাণ সহযোগে নিজেকে সমকামী বলে চিহ্নিত করা, কৃত্রিম উপায়ে রক্তচাপ কমানো অথবা বাড়ানো, নিয়মিত কাল-ভর্তি সিগারেট টেনে ফুসফুসে দাগ তৈরি করা, এল-এস-ডি অথবা অন্য ড্রাগে আচ্ছন্ন হয়ে পরীক্ষার জন্যে হাজিরা দেওয়া, এমন কি স্বেচ্ছায় যৌনরোগ বাধানো ইত্যাদি বহু ব্যবহৃত উপায় সমূহ তো আছেই। ফলত, র‍্যামপার্টস পত্রিকার ভাষায়, "the scenes of Induction Examination centres are beginning to approach the greatest show on Earth".

অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে ক্যানাডায় যে যুবকেরা পাড়ি জমাচ্ছে তাদের অধিকাংশকেই সোজাসুজি পলাতক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যেন তেন প্রকারেণ ড্রাফ্‌ট এড়িয়ে নিশ্চিত ও নিরাপত্তাই এদের অন্বিষ্ট। কোনো যুদ্ধবিরোধী আদর্শবাদ ও নীতিগত বোধ দ্বারা এরা উদ্বুদ্ধ নয়। এদের বাদ দিলেও একটা বৃহৎ অংশ থেকে যায় ব্যক্তিগত স্বার্থ যাদের কাছে বিবেচ্য নয়; যারা বস্তুতই আদর্শগত কারণে ভিয়েৎনামে মার্কিন ভূমিকার প্রবল বিরোধী এবং নীতিগত প্রশ্ন ও বিবেকই যাদের দেশ পরিত্যাগে অনুপ্রাণিত করেছে। অবশ্য দেশত্যাগ করে প্রতিবাদ জানানোর এই পন্থা যুদ্ধবিরোধী ও "নব-বামপন্থী" সমস্ত গোষ্ঠী দ্বারা সমর্থিত নয়। দু-ধরনের বিপরীত মতামতে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। এক দলের মতে, দেশত্যাগ করে শুধু সমস্যা এড়ানোই সম্ভব, সমস্যার সম্মুখীন হওয়া নয়: এবং সে-অর্থে এ উপায় নিতান্তই স্বার্থপর ও পলাতক মনোবৃত্তির পরিচায়ক। বরং মার্কিন সমাজের ভিতরে থেকে এই যুদ্ধবাজ সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করার সংগ্রামে নিয়োজিত হওয়াই একমাত্র অর্থপূর্ণ উপায়। অন্য দলের মতে, ভিতরে থেকে সংগ্রামের জন্য যে ব্যাপক প্রস্তুতি ও সক্ষম সংস্থা প্রয়োজন তা এখনও অনুপস্থিত; ফলত এ ধরনের সংগ্রামের ভবিষ্যৎ মার্কিন দেশে এখনও বিশেষ আশাপ্রদ নয়। বরং বিপুল সংখ্যক লোকের দেশত্যাগ অথবা 'মাস্‌ মাইগ্রেশন' যে প্রতিবাদকে প্রতিফলিত করে তার সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।

যাই হোক, ক্যানাডার অধিকাংশ লোক, বিশেষত যুবসমাজ, মত বা উদ্দেশ্য নির্বিশেষে সব মার্কিন 'ড্রাফট রেসিস্টারে'র প্রতিই সপ্রশংস সহানুভূতি, সমর্থন, এমন কি সম্ভ্রম প্রদর্শনে দ্বিধাহীন। শোনা যায়, টরোণ্টোর কাফেতে মেয়েদের কাছে নিজেদের কদর বাড়ানোর জন্য অনেক ক্যানেডিয়ান যুবক নিজেদের মার্কিন 'ড্রাফ্‌ট রেসিস্টারস' হিসেবে পরিচিত করে।

ক্যানাডার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে মার্কিন ছাত্র-অধ্যাপকদের এই ক্রমবর্ধমান প্রবাহের ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া কী বলা মুশকিল। সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন দেশ থেকে ক্যানাডাগামী গাড়িতে কোনো যুবক থাকলে সম্প্রতি মার্কিন সীমান্তরক্ষীরা কোনো-না-কোনো অজুহাতে গাড়ি আটক করে 'ড্রাফ্‌ট কার্ড" দাবি করে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ও জিজ্ঞাসাবাদ করার নামে তাকে হয়রানি করে। র‍্যামপার্টস পত্রিকার সপ্রশ্ন মন্তব্য "another Berlin wall ?"

উপসংহারে একটা কথা বলা প্রয়োজন। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে, এমন কি আমেরিকা মহাদেশের সর্বত্র, ভিয়েৎনামে মার্কিন বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, দলমতনির্বিশেষে বিবেকবান মানুষদের কণ্ঠ একযোগে প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠেছে।

—সত্রাজিৎ দত্ত

দিনরাতের খেলা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এক

আজ খুব সকালে হারকুসাহেব রাধানাথবাবুর তাঁবুতে গিয়েছিল। হাওয়া সিরসির করে উঠেছিল। ভোরের আলো ভিজে, স্যাঁতস্যাঁতে। পাঁচিলের ওপাশে একতলা-দোতলা বাড়ি থেকে ধোঁয়ার ঘন কুণ্ডলী পাকিয়ে হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। কোথাও পাখি দেখতে পাচ্ছিল না হারকু সাহেব, রাস্তার বড় বড় গাছের পাতার ভিতরে কিচিরমিচির রব উঠেছিল।

রাধানাথবাবুর ঘুম তখনো ভাঙেনি। বাইরে দাঁড়িয়ে হারকুসাহেব উঁকি দিয়ে তালি-দেওয়া নোংরা মশারি দেখল। রাধানাথবাবুর একটা হাত ঝুলে পড়ে প্রায় মাটি ছুঁয়েছে। উপুড় হয়ে শুয়েছিল রাধানাথবাবু—হঠাৎ দেখলে মড়ার মতন মনে হয়। হাসি আর যমুনা প্র্যাকটিসের পোশাক পরে নিচ্ছিল, হারকুসাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা-ও দেখল।

ভোরের পাতলা আলো, হালকা হাওয়া ঘুমের অনুভূতি এনে দিচ্ছিল হারকু সাহেবকে। এখন তার মেজাজ ঠাণ্ডা কিন্তু শরীর বড় যন্ত্রণা-কাতর—ভারী চোখ, গলা শুকনো, চোখাচোখা করতে গেলেই কপালে টান পড়ছে। এখন তার কোন কাজ নেই, ইচ্ছে করলে অনেক সময় সে ঘুমিয়ে নিতে পারত।

হারকুসাহেব ঘুমোতে পারল না। ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাইরে বেরিয়ে আসবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল এবং কিছু পরেই এসে দাঁড়াল রাধানাথবাবুর তাঁবুর সামনে। আরও আগে থেকে রঘুনাথের তাঁবুর দিকে লক্ষ রাখছিল হারকু সাহেব। সার্কাসের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। হারকু সাহেব যশোদাকে চলে যেতে দেখল।

কাল রাতেও ঘুম হয়নি হারকু সাহেবের। প্রথমে নবীনকে খুব বকাবকি করে সে। পরে রেজাক খান আর বাজারমাস্টার শ্যামসুন্দরের সঙ্গে অনেক সময় কাটায়। তারা চলে যাবার পর হারকু সাহেব এত হিংস্র এবং নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল যে ঘুমনো সম্ভব ছিল না।

সে রাতের সব ঘটনা জোর করে চাপা দিয়ে রাখলেও প্রতিশোধ নেবার একটা উৎকট ইচ্ছা হারকু সাহেবকে ভিতরে ভিতরে বড় অস্থির করে তুলেছিল। বস্তুত, তার সার্কাস জীবনের এতদিনের মধ্যে মালিকের সামনে এমন চূড়ান্তভাবে অপমানিত হওয়ার কথা সে কল্পনা করতে পারে নি। সে রাতে শিবনাথ তাকে মুখের ওপর লাথি মেরে গেছে। হারকু সাহেব পাল্টা আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল।

যেদিন উষার মা এসেছিল সেদিন এ সব কথা তোলবার ইচ্ছে থাকলেও রঘুনাথের তাঁবুর কাছে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গিয়েছিল হারকু সাহেব। তার মনে হয়েছিল নিজের রাগ হিংসা মান-অপমান, এমন কি আত্মসম্মান নিয়েও কথা বলবার সময় এখন নয়। হারকু সাহেবের কাছে তার নিজের চেয়ে অনেক বড় জুয়েল সার্কাস। সুদিন এসেছে টালিগঞ্জ ক্যাম্পে, লাভের অঙ্ক বাড়ছে প্রত্যেক দিন এবং প্রসন্ন হয়ে উঠেছে রঘুনাথের মেজাজ। হয়ত সে-রাতের কথা তার মনেও নেই। হারকু সাহেব ইতস্তত করল, যশোদার গলার স্বর শুনল। তারপর এক সময় সোজা ফিরে গেল তার নিজের তাঁবুতে, শুয়ে থাকল।

তবে আর অপেক্ষা করা চলে না কেননা, রঘুনাথের সঙ্গে বড় মাখামাখি হয়েছে শিবনাথের। তার স্পর্ধা এতদূর বেড়েছে যে, হারকু সাহেবকে দেখলে সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, অন্যদিকে তাকিয়ে হুস হুস করে সিগ্রেটের ধোঁয়া ছাড়ে, কথা বলে না। হারকু সাহেব দু-একবার তার সঙ্গে দরকারী কথা বলতে গিয়েছিল, সে উত্তর দেয়নি, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

রঘুনাথের প্রিয়পাত্র হলেও শিবনাথকে

সাহেব যমুনা আর রাধানাথবাবুকে নিয়ে রঙ্গমঞ্চের সামনে দাঁড়াবে।

লীলার দুঃসাহসের জন্যে, তাকে শাস্তি দেওয়া দরকার। সে ব্যবস্থা হারকু সাহেব নিজেই করবে। এখন না। আর কিছু সময় যাক। শেষ হোক টালিগঞ্জের খেলা। হারকু সাহেব কাউকে বলবে রাতের অন্ধকারে হঠাৎ চুপে চুপে লীলাকে প্রচণ্ড আঘাত করে তাকে পঙ্গু করে দিতে, পরে তাকে তাড়িয়ে দেবে—নবীনকেও।

কিন্তু আজ সকালেই যমুনার কাছে আসত না হারকু সাহেব। লাভের অংক আরও বাড়িয়ে তোলবার জন্যে সে নিজে প্রসন্ন হয়ে থাকত, সার্কাসের সব মানুষকে খুশী রেখে পরিবেশ সহজ এবং আরও সুন্দর করে তোলবার চেষ্টা করত—এখন সে-ই তার একমাত্র কাজ। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও আক্রোশের জন্যে ভাবনায় ভাবনায় সারা রাত না ঘুমিয়ে এত ভোরে বাইরে বেরিয়ে আসবার মানুষ হারকু সাহেব নয়।

কিন্তু কাল সন্ধ্যায় শিবনাথ তাকে আবার খোঁচা মেরেছে। সার্কাস চলছিল তখন। এক-একটি নম্বরের পর হাততালির তুমুল আওয়াজ হচ্ছিল। চারপাশে অসংখ্য মানুষের তৃপ্ত মুখের দিকে দিকে তাকিয়ে সাফল্যের অদ্ভুত একটা স্বাদ হারকু সাহেব আবছা অন্ধকার স্বল্প পরিসর জায়গায় দাঁড়িয়ে আপন মনেই অনুভব করছিল এবং আত্ম-তৃপ্তিতে সে এত বেশী আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল যে, তার খেয়াল ছিল না সে তন্ময় হয়ে লীলার খেলা দেখছে।

ভিন্ন কোন প্রদেশের মেয়ের মতন দেখাচ্ছিল লীলাকে। সুর্মা টানা বড় বড় চোখ। উরুর আভা উছলে উঠছিল। তার উদ্ধত বুকের ওপর হলুদ কাঁচুলির জরী মুক্তোর মতন ঝিকমিক করছিল। অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী হাসছিল লীলা—পায়ের তলায় বল নিয়ে এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছিল রঙীন একটা মাছের মতন। তাকে দেখতে দেখতে হারকু সাহেব ভাবছিল এমন মেয়ে কোন সার্কাসে আছে! মানুষ পাগল হবে, মাতাল হবে—বার বার আসবে বল ড্যান্স নম্বর দেখতে। আরও কিছু পরে অতর্কিত কোন মুহূর্তে হারকু সাহেবের মুখ থেকে প্রশংসার অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হল, "বাঃ, বাঃ!"

এবং ঠিক তখন সিগ্রেটের এক ঝলক ধোঁয়া এসে পড়ল হারকু সাহেবের মুখের ওপর, তার গলার ভিতর সুড় সুড় করে উঠল, কাশি এল। পকেট থেকে রুমাল টেনে মুখ ফিরিয়ে কাশতে গিয়ে হারকু সাহেব তার কাছেই শিবনাথকে দেখল। ক্রুর এবং বিদ্রূপের দৃষ্টি শিবনাথের। হারকু সাহেবের মনে হয়েছিল সে ইচ্ছে করেই তার মুখের ওপর সিগ্রেটের ধোঁয়া ছেড়েছে।

কাশতে গিয়েও কাশল না হারকু সাহেব, জোরে গালে রুমাল চাপল এবং যথাসম্ভব স্থির থাকবার চেষ্টা করে শিবনাথের কাছে এগিয়ে এসে শুকনো গলায় বলল, "আপনি এখন এখানে এলেন?"

অচেনা একটা মানুষের মতন কয়েক মুহূর্ত হারকু সাহেবের পা থেকে মাথা অবধি দেখল শিবনাথ, ছাই ঝাড়ল এবং দাঁতে সিগ্রেট চেপে কৈফিয়ত চাওয়ার জন্যে বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, "আমার খুশী!"

"শিববাবু, ঝুটমুট আঁখ দেখলাবেন না, আমার বাত শুনেন। আপনি আর্টিস্ট লোক, আপনাকে পাবলিক চিনে। এখানে এই রকম ঘুরাফিরা করলে মানুষের কাছে আপনার প্রেসটিজ কম হয়ে যাবে—"

ঠোঁট দিয়ে জ্বলন্ত সিগ্রেট নাচিয়ে শিবনাথ লীলার দিকে আঙুল দেখিয়ে রূঢ় স্বরে বলল, "আপনি যাকে দেখছেন, তাকে দেখুন—ওই যে। আমাকে দেখবেন না—" সে গলা আরও তুলে বলল, "আপনার খুশী হলে আমার নামে বাবুর কাছে লাগাবেন—বুঝলেন?"

হারকু সাহেব জানে না এর পরেও সে কেমন করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রঙীন মাছের মতন লীলার দেহ তখন ঝাপসা, হারকু সাহেব চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ার মতন হাততালি পড়ছিল, জলের ভয়ে মানুষ যেমন করে ছুটে পালায় তেমন করে বাইরে বেরিয়ে এল হারকু সাহেব। আসবার সময় সুবলবাবুর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ক্ষিপ্তের মতন চিৎকার করে বলল, "আভি নবীনকে আমার রাউটিতে ভেজবেন।"

যে মেজাজ এত সময় দমন করে রেখেছিল হারকু সাহেব, নিজের তাঁবুতে ফিরে আসবার পর তা একটা লাগাম ছেঁড়া তেজী ঘোড়ার মতন যেখানে-সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। সে জলের গেলাস ছুঁড়ে ফেলল দূরে, লাথি মেরে চেয়ার উল্টে দিল এবং দু হাত পিছনে ঝুলিয়ে এদিক থেকে ওদিকে যেতে যেতে আপন মনেই বলে যাচ্ছিল, "আমাকে আঁখ দেখলাবে তুমি! শালা, কুত্তির বাচ্চা! আমি টালিগঞ্জ ক্যাম্পে গোর বানাব তোমার। যমুনা জুতি লাগাবে

তোমার মুখে" আমার নাম জে, হারকুলিস!"

সুবলবাবুর কাছ থেকে খবর পেয়ে নবীন এসেছিল অল্প পরেই এবং হারকু সাহেবের চলাফেরা দেখে তাকে তার পুরোপুরি মাতাল বলেই মনে হচ্ছিল। তাঁবুর ভিতরে ঢুকে চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়েছিল নবীন। হারকু সাহেব তাকে কেন ডেকেছে সে কথা হঠাৎ জিজ্ঞেস করবার সাহস তার ছিল না।

হারকু সাহেব নবীনকে দেখে তার ওপর নেকড়ের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার জামা চেপে ধরে তাকে পিছনে ঠেলে নিয়ে গেল, গালে চড় মারল, পেটে ঘুঁষি মারল, তার পায়ে ও পিঠে লাথি চালাল এবং এলোমেলো ভাষায় খুনী মতন বলতে থাকল, "শালা তুই মরদ না আওরাত? তোর বিবি রাতের বেলা আমার রাউটিতে রোশ্নির মতন [illegible] আর তুই চুপচাপ থাকলি? বেওকুফ!"

হারকু সাহেব এতদিন পর হঠাৎ নবীনকে সে এমন করে মারতে পারে তা সে ভাবতে পারেনি। মার খাওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিল না নবীন। হারকু সাহেবের হাত ও পায়ের ধাক্কায় সে মাটিতে গড়িয়ে পড়েছিল। রিং মাস্টার মদনমোহনের সঙ্গে আজকাল বাঘের খেলার সময় নবীনকেও রিং-এ যেতে হয় বলে সে-ও প্যান্ট শার্ট পরেছিল। পড়ে গিয়ে গায়ে ধুলো লেগেছিল তার। নবীন প্যান্ট শার্টে ময়লা দাগ দেখল। তা হলেও স্থির হয়ে থাকল সে, হাত নেড়ে ধুলো-বালি ঝেড়ে ফেলবার কোন চেষ্টা করল না।

কিছু পরে উঠে দাঁড়িয়ে বড় করুণ চোখে হারকু সাহেবের দিকে নবীন তাকিয়ে থাকল। তার গলায় খুব জোরে হারকু সাহেবের শক্ত আঙুলের চাপ পড়েছিল। গাল জ্বলছে, হাতে-পায়েও লেগেছে। কিন্তু তা হলেও এখনো মার খাওয়ার ভয় ছিল না নবীনের। তার মনে হচ্ছিল খুব লাগলেও মার খেয়ে সে যেন অনেক সুস্থ হয়ে উঠেছে—তার মাথা থেকে অস্বাভাবিক একটা ভার হঠাৎ নেমে গেছে।

মনে মনে অনেক হালকা হয়ে উঠলেও হারকু সাহেবের এমন নির্দয় হয়ে ওঠার কারণ খুঁজে পেল না নবীন। কোন কথা না বললেও তার দৃষ্টিতে ক্লান্ত একটা জিজ্ঞাসা স্থির হয়েছিল। নবীন জানতে চাচ্ছিল কী সে করেছে যার জন্যে হারকু সাহেব তাকে চোরের মতন মারল। যে চেয়ার লাথি মেরে উল্টে ফেলে দিয়েছিল হারকু সাহেব তা আবার ঠিক করে রাখবার ইচ্ছে হচ্ছিল নবীনের।

হারকু সাহেব আবার নবীনের কাছে এসে চিৎকার করে বলল, "একটু শরম হল না তোর? তোর বিবি রাতের বেলা বাহার জাগবে আর তুই নাক ডাকাবি?"

নবীন মুখ নামিয়ে থাকল। আরও পরে আঙুলের শব্দ করে সে তার প্যান্টের ধুলো ঝেড়ে বলল, "হারকু সাহেব, আমি জেগে-ছিলাম, আমি সব জানি—"

হারকু সাহেবের শক্ত হাত আবার নবীনের গালে পড়ল। এখন গালে হাত বুলোতে থাকল সে, কিছু দূরে সরে গেল। সার্কাস রিং-এ তখন জাদুকের খেলা হচ্ছিল। গীটারে একটা বিলম্বিত সুর তুলেছিল মোহনলাল। থেকে থেকে মদন-মোহনের চাবুকের শব্দও উঠছিল, চটাস—চটাস।

হারকু সাহেব বলল, "আমি কেন লাথি দিলাম তোর? বিবিকে রাতের বেলা আমার রাউটিতে ভেজবার জন্যে?"

নবীনের স্বরে নালিশ করার আভাস ছিল। সে হারকু সাহেবের দিকে দেখল

না, বাইরে তাকিয়ে মদনমোহনের চাবুকের আওয়াজ শুনতে শুনতে বলল, "লীলা, আমার কথা মানে না—"

"এটা মরদের বাত হল?" যে চেয়ার উল্টে গিয়েছিল, তার ওপর আর একটা লাথি চালাল হারকু সাহেব, "আওরাত মরদের বাত মানে না! তুই শালা জেনানা আছিস? বিবিকে লাথি লাগিয়ে সিধা বানাতে পারিস না?"

নবীন অসহায়ের মতন একটা কাতর নিশ্বাস ছেড়ে খুব নিচু গলায় বলল, "হারকু সাহেব, আমি তাকে অনেক বকেছি, অনেক মেরেছি—সে সিধা হবে না—"

"চোপ রও! আওরাতের মতন বাত আমার সামনে বলবি না। ফের যদি লীলা আমার রাওটিতে আসে—আমার প্রেসটিজ শালা শিবনাথের কাছে আউর বাবুর কাছে বিলকুল ফিনিশ করে দেয় তবে তোদের নোকরি আমি খতম করে দিব—"

প্রহারের ব্যথার মধ্যে, এত দুঃখ আর অশান্তির মধ্যে ভবিষ্যতের একটা উজ্জ্বল ইঙ্গিত কাঁপছিল নবীনের মনে—সে রিং মাস্টার হবে। এবং এখন চাকরি যাওয়ার আশঙ্কায় নবীন ব্যাকুল হয়ে বলল, "আমার দোষ নেই হারকু সাহেব, লীলার জন্যে আমাকে বেকার বানাবেন না।"

"সব দোষ তোর", হারকু সাহেব নবীনকে এক ঝটকায় দূরে ঠেলে দিয়ে মাতালের মতন বলল, "আমার বিবি এমন রেণ্ডির মতন হলে আমি তাকে মারডার করে দিতাম জরুর।"

নবীনের চোখ ঠাণ্ডা, মুখ বিবর্ণ। মার খেয়ে তার সব ভয় ভেঙে গিয়েছিল বলে এখন সে লীলার পক্ষ নিয়েই কথা বলল, "লীলার ওসব ভয় নেই হারকু সাহেব।"

নবীনের কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল হারকু সাহেব, আপন মনে পায়চারি করল কিছু সময় এবং পরে নবীনের কাছে এসে চাপা স্বরে বলল, "এমন বিবিকে মারডার করতে পারিস না তুই?"

"না।"

"কেন, বল?"

কিছু সময় ইতস্তত করল নবীন। হারকু সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না সে, মাথা নিচু করে মাটিতে পা ঘষতে ঘষতে অভিযোগ করবার মতন বলল, "তার কী দোষ?"

"দোষ নাই? কী তুই বলিস নবীন? একজনের বিবি দোসরা মরদের কাছে রাতের বেলা চুপেচাপে এলে ধরম থাকে তার? লীলা রেণ্ডির মতন কাজ করল আর তুই এখনো বলিস তার কোন দোষ নাই? শালা উজবুক!"

নবীন মাথা তুলল এবং হারকু সাহেবের মুখ থেকে বারবার লীলার সম্পর্কে একই কথা শুনেছে বলে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল, "লীলাকে রেণ্ডি বলবেন না হারকু সাহেব।"

"তবে কী বলব রে শালা?"

নবীন জানত হারকু সাহেব তাকে আবার মারবে কিন্তু মনে মনে সে লীলার ওপর এখন অদ্ভুত একটা আকর্ষণ অনুভব করছিল বলে সাহস করে স্পষ্ট বলল, "লীলা আমাকে বিয়ে করতে চায় নি, আপনি জোরাজারি করেছিলেন—"

হারকু সাহেব নবীনকে ধমক দিয়ে বলে উঠল, "চুপ থাক! আমার যা খুশী হল আমি তা করলাম। এখন তাকে যদি তোর মতন বেয়াকুফ শায়েস্তা করতে না পারে—"

নবীন ভাঙা-ভাঙা স্বরে এখনো লীলার দোষ কাটিয়ে নেবার জন্যে বলল, "আমার ওপর লীলার কোন টান নেই। হারকু সাহেব, সে আমাকে ভালবাসে না—"

"গাড়ির চাকার তলে পড়ে মর শালা—" হারকু সাহেব নবীনের ঘাড়ে হাত রেখে তাকে তাঁবুর বাইরে ঠেলে দিয়ে বলল, "নিজের বিবিকে মানাতে পারিস না, তুই বাঘ মানাবি কী রকম করে বল?"

নবীন শুকনো হেসে বলল, "বাঘ আমি ঠিক মানাব হারকু সাহেব, দেখে নেবেন—"

"নিকাল যা!"

নবীন হারকুসাহেবকে আঘাত করবার কোন চেষ্টা করে নি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে মার খেয়েছে। হারকু সাহেব জানে সে যার ওপর যত খুশী অত্যাচার করুক না কেন, একমাত্র শিবনাথ ছাড়া তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস আর কারুর নেই। কিন্তু নবীন চলে যাবার পর হারকু সাহেব প্রহার-জর্জরিত মানুষের মতন একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা অনুভব করছিল এবং তার মনে হচ্ছিল অনেক সময় সে আর বাইরে যার হতে পারবে না। সে বসতে পারছিল না, চলাফেরা করতে পারছিল না এবং তার স্নায়ু-শিরা আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে এলেও হারকু সাহেব শুয়ে পড়বার কথাও কল্পনা করতে পারল না।

এখন, আজ রাতেই এমন একটা কিছু করা দরকার যা হারকু সাহেবকে আবার সুস্থ ও সবল করে তুলবে। নবীনের মন

মেয়েমানুষের মতন নরম। লীলা তাকে মানে না—মানবে না। তাকে ডেকে ভুল করেছে হারকু সাহেব। নবীন লীলাকে প্রশ্রয় দেয়, তাকে শাসন করবার ক্ষমতা তার নেই। ইচ্ছে করেই সে-রাতে সে লীলাকে হারকু সাহেবের কাছে ঠেলে দিয়েছিল কিনা কে জানে! এসব কথা ভাবতে ভাবতে হারকু সাহেবের মন জ্বলতে লাগল এবং সে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে ফিমোতে থাকল।

আর একটু পরেই বাঘের খেলা হবে, মদনমোহনের সঙ্গে রিং-এ চলে যাবে নবীন। লীলা তাঁবুতে একা, হয়তো এখন বিশ্রাম করছে। দু হাত মুঠো করে মুখের সামনে তুলে আনল হারকু সাহেব, লীলাকে শাস্তি দিতে হবে।

কিন্তু কেমন করে? নবীন সব জানে, সে কিছু করবে না। হারকু সাহেব নিজে কিছু করতে গেলেই এখন কথা উঠবে। শিবনাথ হাসবে, রঘুনাথ আরও অসন্তুষ্ট হবে তার ওপর। হারকু সাহেব ধরা পড়ে যাবে, অপদস্থ হবে। তাঁবুর মধ্যে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে হিংস্র জানোয়ারের মতন হয়ে উঠল হারকু সাহেব। ক্রমশ

তেলরঙ —সুধীর খাস্তগীর

পূজার পূর্বে কলিকাতায় অনেকগুলি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়, তার মধ্যে শিল্পী সুধীর খাস্তগীর, দিল্লী শিল্পী চক্র, শিল্পী অমিতাভ ব্যানার্জি, গোপাল ঘোষ ও শান্তি বর্মণ-এর প্রদর্শনী উল্লেখযোগ্য।

সুধীর খাস্তগীরের শিল্পকর্মের প্রদর্শনী

শ্রীসুধীর খাস্তগীর মহাশয়ের ৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার-এর কর্তৃপক্ষ নিজেদের গ্যালারীতে তাঁর ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। সুধীর খাস্তগীর শান্তিনিকেতন কলাভবনে আচার্য নন্দলালের কাছে শিক্ষালাভ করেন ও পরে একাধারে শিল্পী, ভাস্কর ও কয়েকটি পরিচিত শিল্পী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রদর্শনীতে তাঁর দীর্ঘ শিল্পী জীবনে রচিত বিভিন্ন ছবি ও কয়েকটি ভাস্কর্যের নিদর্শন পেশ করা হয়েছিল।

অধিকাংশ ছবিই বিষয়বস্তুমূলক ও জলরঙ ও প্যাস্টেল মাধ্যমে আঁকা। সাঁওতাল পরগনার বালুকাময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও শীর্ণ, সর্পিল নদীরেখা, নগ্নগাত্র সাঁওতাল বালকবালিকা অথবা স্নিগ্ধ, শ্যামল বৃক্ষছায়াতল—এক কথায় সাঁওতাল পরগনা ও শান্তিনিকেতন অঞ্চলের বিভিন্ন পরিচিত দৃশ্যই শিল্পীর পুরাতন ছবির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। এগুলি ভারতীয় প্রথায় রচিত ও বাস্তবানুগ। তবে অ্যাংকর ছবিখানি ভিন্ন গোত্রের। ব্রাশের আঁচড়ের মধ্য দিয়ে রূপায়িত এই ছবিখানি দেখে ভ্যান গ'র একখানি বিখ্যাত ছবির কথা মনে পড়ে যায়। প্রথাগত রীতিতে আঁকলেও পরে শিল্পীর মনোভাবের পরিবর্তন সহজেই চোখে পড়ে। পরবর্তী যুগের রচনার মধ্যে তিনি এক দুর্বার গতিবেগ সঞ্চার করার চেষ্টা করেন এবং সেগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর নিজস্ব, চিন্তাধারা, বলিষ্ঠ গতিবেগ ও প্রকাশ-ভঙ্গিমার পরিচয় পাই। নর্তক-নর্তকীর চিত্রমালা এই পর্যায়ে পড়ে—যেমন ড্রামার, সিমফনি। শিল্পীর ভাস্কর্য প্রতিভার সংগেও এককালে দেশবাসী পরিচিত ছিলেন, তবে দুঃখের বিষয় প্রদর্শনীতে ভাস্কর্যের নিদর্শন বেশী ছিল না। তাহলেও প্রথাগত গঠন নিদর্শন হিসাবে ড্রামার রেস্টসপেকসান ও ছাকলিং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অপরাপর ছবির মধ্যে নর্তকী (তেলরঙ), পলাশ গাছ ও টয়লেট উল্লেখযোগ্য।

শিল্পী চক্র আয়োজিত প্রদর্শনী

শিল্পী চক্র দিল্লীর একটি পুরাতন সংস্থা এবং এই সংস্থার অনেক সভ্যই এখন কৃতী শিল্পী হিসাবে পরিচিত। সংস্থার পক্ষ থেকে এক পুরাতন সভ্য ও পরিচিত শিল্পী শ্রীমতী জয়া আপ্পাস্বামী ২০ জন সভ্যের ২১ খানি নিদর্শন অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে পেশ করেন। কলিকাতায় দিল্লী শিল্পী চক্রের এই প্রথম প্রদর্শনী। তাহলেও অনেক দিন পরে দিল্লীর এই সংস্থার সভ্যদের সাম্প্রতিক কাজ দেখে বিশেষ খুশী হতে পারিনি। হয়ত মনোনয়ন কাজটুকু আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে প্রদর্শনীর মান উন্নততর হত। অবশ্য কয়েকজনের ছবি উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই।

ওই সংস্থার সব সভ্যই বিমূর্ত রীতির পক্ষপাতী। প্রথমেই চোখে পড়ে জীবন আডালজা-র 'ফ্লোটিং ফর্মস'। প্রধানত লাল রঙকে ভিত্তি করে শিল্পী কয়েকটি সরল আকারের সৃষ্টি করেছেন। শূন্যস্থানে সুবিন্যস্তভাবে রাখার জন্য সমগ্র ছবিখানি মনে গভীর রেখাপাত করে।

[illegible] —অমিতাভ ব্যানার্জি

প্রতীক ও চিহ্নসম্বলিত স্বামীনাথনের ছবিতে কানডিনস্কির প্রভাব দেখা যায়। বিরাট শূন্যোস্থানের পটভূমিকায় আঁকা মাত্র একটি মূর্তির মধ্য দিয়ে রাজেশ মেহরা প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। প্রতীক অবশ্য আর এক শিল্পীও ব্যবহার করেছেন —যেমন আর কে ধাওয়ান। এগুলি অসম্বদ্ধভাবে স্থাপন করার ফলে এঁর কাজ অনেকের চোখে পড়ে (সাসপেণ্ডেড ফর্মস)। জয়া আপ্পাস্বামী সরলতার পক্ষপাতী—স্বকীয় চিন্তাধারা ও সরল প্রকাশভঙ্গিমার জন্য তাঁর ছবি সকলের ভাল লাগে। অপরাপর শিল্পীদের মধ্যে অম্বাদাস ও আর কে ভাটনগরের নাম উল্লেখযোগ্য।

অমিতাভ ব্যানার্জীর চিত্র

শিল্পী অমিতাভ ব্যানার্জির প্রদর্শনীর আয়োজন হয় কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রে। ইনি কলিকতা আর্ট কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে গত ১৬ বৎসর যাবৎ ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের দপ্তরে শিল্পী হিসাবে কাজ করছেন এবং সেই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেই এই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। সম্প্রতি শিল্পী আমেরিকা [illegible] যে বিভিন্ন রূপ দেখেছেন তাই তিনি ছবির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন।

এই শিল্পীর কাজ পরিচ্ছন্ন ও মনে হয়, প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন—অর্থাৎ অল্প সময়ের মধ্যে এই গনতান্ত্রিক দেশের যেটুকু দেখতে পেরেছেন সেটুকুই খুব সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করেছেন। জল ও তেলরঙ উভয় মাধ্যমেই এঁর সমান দক্ষতা এবং উভয় ক্ষেত্রেই এঁর ভাষা সুস্পষ্ট। তেলরঙের নিদর্শনগুলিতে আমেরিকার চিত্রকলার প্রভাব দেখা যায়। প্রথম পর্যায়ের ফিলিং, উইন্টার, বুল ও বিশেষভাবে পরিপ্রেক্ষিতের দিক থেকে উইণ্ডো ক্লিনার-এর নাম করা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমেরিকার বিভিন্ন শহরের দৃশ্যাবলী, গগনচুম্বী সুবৃহৎ অট্টালিকাশ্রেণী (ফিফথ্ অ্যাভিনিউ ও ডেরেক), বিশেষ করে ব্রিজ, উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ছবিখানি সুন্দর—স্বল্প কয়েকটি রঙের আঁচড়ের ভিতর দিয়ে শিল্পী একটি দীর্ঘ সেতুর গুরুগম্ভীর রূপের পরিচয় দিয়েছেন। অধিকাংশ স্থলেই স্বল্প রেখা ও রঙের মায়াজালের মধ্য দিয়ে শিল্পী তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ হিসাবে আরলিংটন সিমেটারি, বাস্কেটবল প্লেয়ারস ও ফল-এর উল্লেখ করা যায়।

গোপাল ঘোষের চিত্র-প্রদর্শনী

শিল্পী গোপাল ঘোষের প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয় শিল্পায়ন আর্টিস্টস সোসাইটির উদ্যোগে নিজ গ্যালারীতে। শিল্পমহলে শিল্পায়ন একটি সুপরিচিত নাম—চিত্রকলার বিভিন্ন বিষয়ে নানা গবেষণা ও মৌলিক পুস্তিকা প্রকাশ করে এই সংস্থা সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তবে এই প্রদর্শনী বিষয়ে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। শিল্পী হিসাবে গোপাল ঘোষ খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি লাভ করেছেন, অতএব তাঁর সম্বন্ধে নূতন কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁর ছবির একটা আকর্ষণ আছে তাই তাঁর প্রদর্শনী হলেই রসিকজন আগ্রহ সহকারে দেখতে যান। কিন্তু জানি না, এ প্রদর্শনীর ছবিগুলি কে মনোনীত করেছিলেন—শিল্পায়ন সংস্থা অথবা স্বয়ং শিল্পী? যিনিই করে থাকুন না কেন মনোনয়ন ঠিক হয়নি। প্রদর্শনীতে শিল্পীর সাম্প্রতিক কাজের অধিক নিদর্শন দেখা যায়নি—শুধু তাই নয়, প্রদর্শনীভুক্ত জলরঙের কয়েকটি ছবি ৮।১০ বৎসর পূর্বে আঁকা। যে সুক্ষ্ম, সংক্ষিপ্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও স্কেচের জন্য শিল্পী দেশে সুপরিচিত হয়ে [illegible] পরিচয় প্রদর্শনীতে আমরা পাইনি। তাছাড়া একখানি ছোট ঘরে [illegible]

মুখ —শক্তি বর্মণ

তুলনায় অধিক সংখ্যক ছবি রেখে ছবি ও শিল্পীর প্রতি অবিচার করা হয়েছিল। প্রদর্শনীতে জলরঙে আঁকা কয়েকটি পাখি ও প্যাস্টেলের কাজ দেখলাম—খুবই সুন্দর সন্দেহ নেই। হলদে রঙকে ভিত্তি করে রচিত একখানি ছোট নিসর্গ দৃশ্য সত্যই অপূর্ব লাগল। ছবিখানি শিল্পীর স্বকীয়তার গুণে সমুজ্জ্বল: দেশেরই এক পরিচিত অঞ্চল—ভাষা সংক্ষিপ্ত অথচ বক্তব্যটুকু সুস্পষ্ট। দুঃখের বিষয় শিল্পীর আপন বৈশিষ্ট্যে স্বাক্ষরিত এ ধরনের ছবির অধিক নিদর্শন প্রদর্শনীতে আমরা পাইনি। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে শিল্পীর কয়েকটি সাম্প্রতিক কাজ দেখার সুযোগ পাব।

শক্তি বর্মণের শিল্পকর্ম

শিল্পী শক্তি বর্মণ তরুণ। গত দশ বৎসর যাবৎ ইনি প্যারী শহরে বসবাস করছেন, তবে অবসর পেলেই দেশে ঘুরে যান।। প্যারী ও ইউরোপের অন্যান্য শহরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে ইনি সুনাম অর্জন করেছেন। কলিকাতায় এটি তাঁর চতুর্থ প্রদর্শনী এবং এর অনুষ্ঠান হয় অ্যাকাডেমি ভবনে। শক্তি বর্মণের ছবিতে প্রথমেই চোখে পড়ে একটি বিশিষ্ট অঙ্কনরীতি। এই অঙ্কনরীতি ও অভিনব প্রকাশভঙ্গিমার জন্য এই শিল্পীর আঁকা ছবির মধ্যে এক পৃথক সত্তার সন্ধান পাওয়া যায়।

এই শিল্পী তেল ও জলরঙ উভয়ই ব্যবহার করেন। সাদা শূন্যস্থানের পটভূমিকায় শিল্পী জলরঙ মাধ্যমে কয়েকটি ছবির মালা সৃষ্টি করে গেছেন যার প্রধান আকর্ষণ হল রচনাক্ষেত্রের সূক্ষ্ম কারুকার্য। অবশ্য অঙ্কন ক্ষেত্রের এহেন কারুকার্য আধুনিক চিত্রকলার একটি বিশেষ অঙ্গ এবং অনেক শিল্পীই আজ এই রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। তাহলেও শক্তি বর্মণ ছোট পরিমিত রচনাক্ষেত্রটি অন্যভাবে লালিত্যময় করার চেষ্টা করেছেন। প্রধানত কালো ও গ্রে রঙের নানা স্তরভেদ সৃষ্টি ক'রে শিল্পী তার মধ্য থেকে কয়েকটি সরল মূর্তির রূপ ফোটাবার প্রয়াস পেয়েছেন। স্বচ্ছ কাচের উপর ছবি এঁকে সঙ্গে সঙ্গে কাগজে প্রতিলিপি তুলে নিলেও অনেক সময়ে রচনাক্ষেত্রের এহেন কারুকার্যের ছাপ পাওয়া যায়। পরে তুলি ও রেখা সহযোগে জটিল ও সূক্ষ্মতর কারুকার্যেরও সৃষ্টি করা যায়। সূক্ষ্ম, কৃত্রিম (বা অকৃত্রিম) রেখাজাল বা রঙপূর্ণ ছোট পরিমিত স্থান অথবা কোনও ক্ষেত্রে উভয়ের সংমিশ্রণে এহেন রচনা যেন গ্রাফিক শিল্প পর্যায়ে পড়ে। তাহলেও এ শ্রেণীর ছবির একটু নূতনত্ব আছে এবং এর রসগ্রহণ করাও অনুভূতিসাপেক্ষ, কারণ এ ছবির জেলি বা স্পঞ্জ জাতীয় একপ্রকার তরলতা আছে যেটা দেখা মাত্রই অনুভব করা যায়, যেমন ড্রিম, থ্রি ওয়াইজ উওমেন আন্ডার দি ট্রী। তেলরঙের ছবির মধ্যে প্রথমেই 'হেড' (মুণ্ড) চোখে পড়ে। পুরাতন যুগের মানব মুখের সরলতাকে অবলম্বন করে নানা কারুকার্যের মধ্য দিয়ে শিল্পী এই ছবিটিতে এক বিশেষ রূপদান করেছেন। বৃহৎ তেলরঙের ছবিগুলি যেন অনেকটা প্রাচীর চিত্র জাতীয়—সূক্ষ্ম ও স্থূলে রেখা সমন্বিত রঙীন কারুকার্যের জন্য এগুলি অনেকেরই ভাল লাগে—তার উপর রঙের স্তরভেদ ত আছেই। এই পর্যায়ে সার্কাস ও সমারসলট-এর নাম করা যায়। কয়েকস্থলে খ্যাতনামা কোনও ফরাসী শিল্পীর প্রভাব দেখা গেলেও শক্তি বর্মণ প্রতিভাবান শিল্পী এবং আশা করি অবসরমত দেশে এসে তিনি দেশবাসীকে তাঁর নূতন চিত্রসম্ভার দেখবার সুযোগ দেবেন।

—চিত্রপ্রিয়
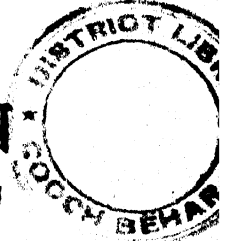
কোথায় পাবো তারে

কালকূট

ছেচল্লিশ
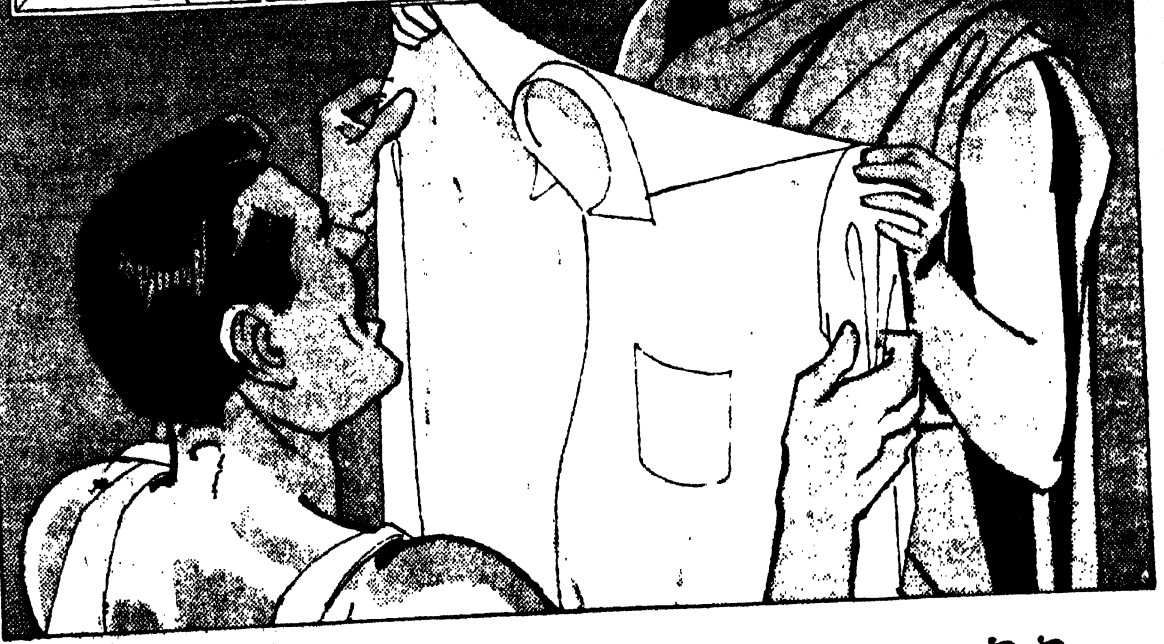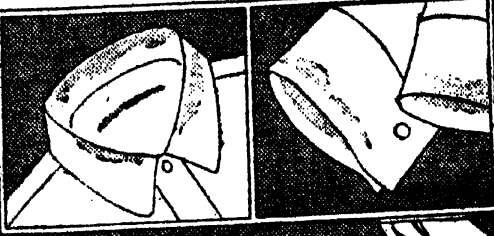
একা ঝিনি না, তাদের গোটা দলটাই অচিনবাবুকে ঘিরে বসে আছে। কী ভাবে, কোন পন্থায় আলাপ পরিচয়, সে চিন্তা বৃথা। মেলার মানুষ, মেলায় আলাপ, সেটা এক কথা। এখানে সবাই সবার চেনা। আলাপ করে নিলেই হল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আসল কথা আলাদা। এখানে অচিনবাবুর খেলা। ও বেলা বিদায় নেবার আগে ঝিনি আর ঝিনির দলকে এক লহমায় দেখে রেখেছিলেন। আসরে তাদের দেখতে পেয়ে কাছে ডেকে নিতে তাঁর দেরি হয়নি।

দেখছি, তাঁর এক পাশেতে ঝিনি, আর এক পাশেতে রাধা। পিছন ঘেঁষে মাস্টার-মশাই নীরেনদা। সুপর্ণাদি লিলি শুভেন্দু কাছাকাছি, সামনাসামনি, ঘিরে বসে আছে। গোপীদাসের চোখের ঘূর্ণিতে অনেকেরই নজর পড়ে আমার দিকে। নীরেনদাই হাত তোলেন আগে। তারপরেই রাধা। ঝিনির সঙ্গে চোখাচোখির অবকাশেই দেখি অচিনবাবুর মুখ এগিয়ে যায় তার কানের কাছে। কী যেন বলেন। তৎক্ষণাৎ ঝিনির মুখ লাজে লাজানো। দৃষ্টি নামিয়ে মুখ ফেরায়। গোপীদাস তখন একতারাটা তুলেই আমাকে ডাকে। আর তার রাধা বন্ধা প্রকৃতিটি ভাঙা ভাঙা চড়া সুরে গাইছে,

'দ্যাখ, উল্লুকের হয় উরধো লয়ান
সে দ্যাখে না সূর্য্যের কিরাণ।'

গোপীদাস তখনই তার বুড়া শরীর-[illegible] পাক [illegible] ফাঁশি-[illegible] [illegible] গলায় [illegible] দেয়,

"আর পিঁপড়েতে পায় চিনির মম",
রসিক হয়িলে যাবে জানা
যেজন প্রেমের ভাব জানে না
তার সঙ্গে কিসের লেনা দেনা।'.

ওদিকে, আসরে, গোকুলের পাশে বিন্দ তাদের পাশে সুজয়। কেউ চুপ করে ব নেই। গোপীদাসের গানের সঙ্গে গো র তার ডুগিতে আর ঘুঙুরে তাল দিয়ে চলেছে। বিন্দু বাজায় প্রেমজুরি। সুজয়ের দোতারার তারে তরঙ্গ খেলে যায়।

আমি তৎক্ষণে আসরের দাওয়ায় উঠে জায়গা নেবার ফিকির করি। অচিনবাবু এতক্ষণে হাত তুলে ডাকেন, 'এদিকে এস হে। পথ চেয়ে আর কাল গুনে এতক্ষণে দেখা পাওয়া গেল।'

ইতিমধ্যে গানটা শেষ হয়। গোপীদাস আসরের মাঝখান থেকেই বলে, 'একটু ঠাঁই কারে দাও, বাবাজী বইসবে কুথা?'

অচিনবাবু ধমকের সুরে বলেন, 'বড় যে দরদ দেখি বাবাজীর ওপর।'

গোপীদাস তেমনি বড় বড় লাল চোখ দুটি ঘুরিয়ে বলে, 'তুমার' থেকে বেশী লয়।'

বলে আমার দিকে ফিরে চোখের পাতা নাচায়। অচিনবাবু আর সে কথার জবাব না দিয়ে সরে বসে জায়গা করবার চেষ্টা করেন। বলেন, 'দেখি ভাই অলকা, সবাই একটু সরে সরে বসি।'

অই হে, এর মধ্যে 'ভাই অলকা' হয়ে গিয়েছে। তা নইলে আর অচিনবাবু কেন। কিন্তু আমার সংকোচ লাগে। বলি, আপনারা বসুন, আমি এদিকেই বসছি।'

'আজ্ঞে না। মজিয়ে মজিয়ে এখন ফারাকে ফারাকে থাকবে, তা হবে না। গুটি গুটি চলে এস দিকিনি এখানে।'

এই হল অচিনবাবুর কথা। আরো দশজনা আছেন। এ মানুষকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। বচন কোথা থেকে কোথায় যাবে, বলা যায় না। ওদিকে নীরেনদা, সুপর্ণাদি, রাধা লিলি ঝিনিতেও হাসাহাসি লেগেছে। শুভেন্দুর মুখেও হাসি। তার চেয়েও সকৌতুক চোখে যেন অবাক ভাবটাই বেশী। কয়েকজনকে পেরিয়ে কোনরকমে অচিনবাবুর পাশে গিয়ে বসি। আমার এক পাশে রাধা, এক পাশে

নীরেনদা বলেন, 'তা-ই চল।'

আমি অচিনবাবুকে জিজ্ঞেস করি, 'আপনিও যাবেন?'

জবাব আসে ঝিনির কাছ থেকে, 'হ্যাঁ। আপনিও তো রয়েছেন আমাদের সঙ্গে।'

এক পলকের জন্যে ঝিনির ও-বেলার মুখ আমার মনে পড়ে যায়। আর মনে পড়ে যায় ওর কথা, 'ও-বেলা আসব।' ও তা হলে যাউল আসরে আসবার কথাই বলেছিল। এখন ওর চোখে ক্ষোভের ছাপ নেই। অভিযোগের ছায়া নেই। চোখ-ভাসানো জলের বদলে যে হাসিটি ফুটে আছে, তাতে একটা লজ্জা-মাখানো লুকোচুরির ভাব। বোধ হয় ও-বেলাতে ওর নিজের কথা ভেবেই ভাবান্তর।

এদিকে অচিনবাবু ঝিনির কথায় আওয়াজ দেন, 'সে কথা আবার বলতে হবে নাকি। আমাদের সঙ্গে ছাড়া ও যাবে কোথায়।'

লিলি বলে ওঠে, 'বলা যায় না। অন্যত্র যাবার কথা থাকতে পারে।'

'আছে নাকি হে?'

অচিনবাবু যেন থমকে যাজেন। বলি, 'না, কোথাও যাবার নেই!'

এ সময়ে হঠাৎ সবাইকে যেন একটু সচকিত করে দিয়ে শুভেন্দু তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। সুপর্ণাদি ডেকে ওঠেন 'শুভেন্দু।'

শুভেন্দু যেন শুনতে পায় না। দাওয়া থেকে নেমে পড়ে সে। সুপর্ণাদি যেন অবাক হয়ে তাকান ঝিনির দিকে। রাধা লিলি চোখাচোখি করে। ঝিনিই এবার ডাক দিয়ে ওঠে, 'শুভেন্দু।'

শুভেন্দু ফিরে দাঁড়ায়। তার মুখ গম্ভীর, কেমন একটা অনিচ্ছার বিরাগ ভাব। ফিরে বলে, 'বল।'

ঝিনি জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'বাড়ি।'

'কেন?'

'ভাল লাগছে না।'

নীরেনদা তাড়াতাড়ি উদ্বেগে জিজ্ঞেস করেন, 'শরীর খারাপ করেছে নাকি?'

'হ্যাঁ, শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না। আমি চলি।'

বিশেষ কারুর দিকেই না তাকিয়ে কোনরকমে একবার ঝিনির সঙ্গে চোখা-চোখি করেই সে ফিরে যায়। কয়েক মুহূর্ত সকলেই একটু ঠেক খায়। সকলেই একবার ঝিনির মুখের দিকে চায়। ঝিনিও যেন একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে। উচ্চারণ করে, 'আশ্চর্য!'

নীরেনদা বলেন, 'একটু মেজাজী ছেলে তো।'

ঝিনি বলে, 'কিন্তু সেটা এখানে কেন?'

অচিনবাবু এতক্ষণ হাতের চুরুটটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ বলেন, 'আমি অবিশ্যি কিছুই জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, সংসারটাই এরকম। সে যে কেবল সুরে বাজে, তা নয়। বেসুরেও বাজে।'

তাঁর বলার ধরনে সকলের মুখেই কিঞ্চিৎ হাসি দেখা দেয়। ঝিনির মুখে একটু রাঙা ছোপের আভাস লাগে। নীরেনদা বলে ওঠেন, 'ঠিক, খুব ঠিক কথা।'

অচিনবাবু আবার বলেন, 'বেঠিকের তো কিছু নেই নীরেনবাবু, এ আমরা সবাই জানি। আরো জানি, সুরে আর কতটুকু বাজে। বেসুরের মধ্যেই তো বেশী চলছি। তা আমি বলছিলাম, শুভেন্দু-বাবুর এ ব্যাপারে যদি কিছু বিহিত করা যায়, সেটা করা যেতে পারে।'

আবার সবাই চুপ। বিহিতের সন্ধান যেন কারুর জানা নেই। আমি ঝিনির দিকে তাকাই। কেন জানি না, আমার মনে একটু সন্দেহ, বিহিতের খোঁজ ওর জানা আছে। ঝিনির ডাকে শুভেন্দুর ফিরে দাঁড়ানো, যাবার আগে, একবার তাকিয়ে যাওয়া, কোথায় যেন একটা খেই ধরিয়ে দেয়। ঝিনিও হঠাৎ চোখ তোলে। চোখাচোখি হতে আবার ওর মুখে একটু ছোপ ধরে যায়। দূরের দিকে চেয়ে বলে, 'বিহিত করার কিছু আছে বলে মনে হয় না আমার। লিলি একবার যাবি নাকি?'

লিলি অবাক হয়ে বলে, 'কোথায়? শুভেন্দুদাকে ডাকতে? অসম্ভব, আমি পারব না ভাই।'

রাধা বলে, 'তোর তো সম্পর্কে দাদা।'

'তা হোক। তোদের তো বন্ধু।'

ঝিনি বলে ওঠে, 'এত কথার কী দরকার। আমরা যেমন যাচ্ছিলাম, তেমনি যাই না কেন।'

নীরেনদা বলেন, হ্যাঁ, সেই ভাল। চল আমরা যাই। আমি বরং একবার ঘুরে আসি বাড়ি থেকে। তোমরা কাছে-পিঠেই থেকো।'

নীরেনদা চলে যান। অচিনবাবু হাত বাড়িয়ে সবাইকে সামনে এগোবার ইঙ্গিত করে বলেন, 'অগত্যা। মাস্টার মশাই যা ভাল বুঝেছেন, ঠিকই বুঝেছেন।'

ঝিনি রাধা লিলি আর সুপর্ণাদিদের দলটা একটু এগিয়ে এগিয়ে চলে। বুঝতে পারি, ওদের মধ্যে শুভেন্দুর বিষয়ে আলোচনা চলছে। আমি অচিনবাবুর সঙ্গে একটু পিছনে পিছনে। বলতে ইচ্ছা করে, মন গুণে ধন না, পথ গুণে ধন। পথের কোথায় যে কোন মোড় কোন বাঁকে ফেরে, কোথায় তার কতখানি আঁকা বাঁকা বন্ধুর, কত ভাঙাচোরা কোন্‌খানে, কে জানে। তার কোন কোন সামানায় অন্ধকার জমাট, কোথায় আলো কতটুকু, না চললে তার হদিস মেলে না। তবু বলতে গেলে এই ভাবি, ঠেক না খেয়ে চলে যাব। স্বচ্ছ জলে ডুব দেব, ঘোলায় পড়ব না। ভাঙা-

সোজা এড়িয়ে যাব, আঁকাবাঁকায় যাব না। আলো রেখে নিশেন করব, অন্ধকারে যাব না।
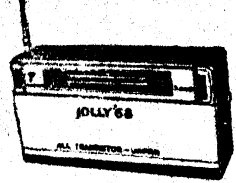
এইটি তোমার বাসনা। সংসারে সহজ পথ দেখলে কবে। তোমার মন, আর পথের মেজাজ আলাদা। পথ তো কেবল মৃত্তিকার বুকে দাগ-কাটা জায়গা না। এ পথের আর এক নাম জীবন-চলাচলের সড়ক। তাই মেঘ এসে চুপি দেয় মনে। বিমর্ষ লাগে, ভার বোধ হয়। আর এই হাওয়া-বন্ধ গুমোটের মধ্যে দূরে চিকুরে যেন জিজ্ঞাসার ঝিলিক হানে, 'কেন, কেন।'

তার চেয়ে নিজেকে নিয়ে মোড় ফিরি। এবার না-হয় সঙ্গ বদলাই। এত লোক, এত কথা, এত হাসি, এত বাতি। ওই সীমানায় যাই। এ পথে গুমোট। পথের গুমোট পথেই থাক। আমি আর ফিরে অন্য তরঙ্গে, অন্য মানুষের ঠিকানায়।

ভাবতে ভাবতেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। আঁচলবাবুও দাঁড়ান। অবাক না হয়ে সহজ গলাতেই বলেন, 'ভুল করো না হে। সংসারে সব রকমেই চলতে হয়, এটা তোমাকে বোঝাবার কিছু নেই। চল, চল।'

ক্রমশ

রপ্তানি সম্বন্ধে আরো

মুদ্রামূল্য হ্রাসের পরবর্তী বারো মাসে ভারতের মোট রপ্তানি শতকরা ১১ ভাগ কমে গেছে। উদার ভিত্তিতে আমদানি করার অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও ৫৯টি অগ্রাধিকার শিল্প রপ্তানি সম্প্রসারণে বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারেনি। ১৯৬৬-৬৭ সালে একা ইঞ্জিনীয়ারিং, রাসায়নিক ও সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলিকে কাজ চালাবার জন্য ৩৫০ কোটি টাকা আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ সময়ের ভেতর এই অংশ মাত্র ৯০ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য (যার মধ্যে শুধু চামড়া ও চামড়ার দ্রব্য ছিল ৬৫ কোটি টাকার) রপ্তানি করেছে। ৫৯টি অগ্রাধিকার শিল্প দেশের মোট শিল্প উৎপাদনের শতকরা ৭৫ ভাগের জন্য দায়ী হওয়া সত্ত্বেও এটা ঘটেছে।

অবনতির কারণ

আগের বছরের তুলনায়, জুন ১৯৬৬—মে ১৯৬৭ এই সময়ের ভেতর চিরাচরিত দ্রব্য রপ্তানিরও তীব্র হ্রাস ঘটে। পাট শিল্প দ্রব্য, চা, (তাঁত ও কলে তৈরি) কার্পাস বস্ত্র, চিনি, তৈলপিণ্ডক, মশলা, তামাক, বনজ তৈল প্রভৃতি থেকে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন কমে আসে। সময়মত বৃষ্টি না হওয়া তার জন্য অংশত দায়ী। ১৯৬৬-৬৭ সালে রপ্তানি থেকে আয় কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হল পাট দ্রব্য, চা, কফি, চিনি, তৈলপিণ্ডক, গোলমরিচ, লোহা ও খনিজ ম্যাঙ্গানিজের মতো কয়েকটি চিরাচরিত সামগ্রী হতে সংগৃহীত একক প্রতি মূল্য হ্রাস। সব চেয়ে হ্রাস ঘটেছে কফির ক্ষেত্রে—গত বছর বেশি কফি রপ্তানি করা সত্ত্বেও ১৯৬৫-৬৬ সালের চাইতে উপার্জন কম হয়েছে।

টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের পরের বছর পৃথিবীর সব অঞ্চলগুলিতে ভারতের রপ্তানি কমে আসে। রপ্তানি হ্রাস এসিয়া ও দূর প্রাচ্য অঞ্চলে সবচেয়ে কম (শতকরা ২·৮) এবং আফ্রিকায় সব চাইতে বেশী (শতকরা প্রায় ২৬ ভাগ) হয়েছে। প্রথমোক্ত অঞ্চলে রপ্তানির অপেক্ষাকৃত অল্প হ্রাস মূলত জাপানে ভারতীয় রপ্তানির শতকরা ২১ ভাগ বৃদ্ধি এবং (বাণিজ্য চুক্তির ফলে) ইন্দোনেশিয়ায় রপ্তানির দ্বিগুণ সম্প্রসারণ এই দুটোর প্রতিফলন। জাপান ভারতীয় লোহা ও ইস্পাত, মাছ, কাঁচা তুলো প্রভৃতি কিনেছে বলে সে দেশে রপ্তানি বেড়েছে। আফ্রিকায় রপ্তানি কমে যাওয়ার কারণ হল গত বছর সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রপুঞ্জে তীব্র রকম (শতকরা প্রায় ৭ ভাগ) এবং কেনিয়ায় কিছু পরিমাণ রপ্তানি হ্রাস।

বিভিন্ন অঞ্চলের গুরুত্ব

অন্য অঞ্চলগুলির মধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি শতকরা ১২·৪ ভাগ কমে আসে: পাট দ্রব্য, চিনি, জুতো, খনিজ ম্যাঙ্গানিজ, মূল্যবান পাথর প্রভৃতি রপ্তানি থেকে উপার্জন হ্রাস পেয়েছে। কানাডা ভারতীয় পাট দ্রব্য ও চিনি কম কেনে: ফলে রপ্তানি শতকরা ১০·৫ ভাগ হ্রাস পায়। যুক্তরাজ্যে ভারতের রপ্তানি শতকরা ১৩ ভাগ কমে গেছে: চা, পাট দ্রব্য, কার্পাস বস্ত্র, তামাক, তৈলপিণ্ডক ও চিনি থেকে সংগৃহীত মূল্য হ্রাস পায়। টাকা দেওয়া চলে এরকম অঞ্চলগুলির মধ্যে, সোভিয়েট রাশিয়ায় ভারতের রপ্তানি শতকরা প্রায় ২০ ভাগ কমেছে চা, পাটদ্রব্য, তামাক, চামড়া, জুতো, তৈলপিণ্ডক প্রভৃতির রপ্তানি হ্রাসের দরুন। চেকোস্লোভাকিয়ায় ভারতের খনিজ দ্রব্য, পাট সামগ্রী ও মশলা রপ্তানি শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ বেড়ে যায়: তা না হলে সমগ্র অঞ্চলে রপ্তানি আরো কমে যেতো।

মুদ্রামূল্য হ্রাসের পরের বছর অবশ্য কয়েকটি দ্রব্য রপ্তানির সম্প্রসারণ দেখা যায়। সবচেয়ে বেশী বেড়েছে লোহা ও ইস্পাত, চামড়া ও চামড়ার দ্রব্য, মাছ ও মাছের দ্রব্য। এই ধারা থেকে বোঝা যায় যে, রপ্তানির বৈচিত্র্যকরণ দ্বারা দেশের উপার্জন বাড়ানো সম্ভব।

অনেক শিল্প এখন শিথিল আভ্যন্তরিক চাহিদার সম্মুখীন হয়ে বিদেশের বাজারের প্রতি মনোযোগ দেবে আশা করা যায়। এতদিন যোগানের অনটন ও অতিরিক্ত চাহিদা বজায় থাকায় উৎপাদনকারীরা উৎপাদন ব্যয় কমাবার দিকে বিশেষ চেষ্টা করেনি। এখন উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, উৎকর্ষ বৃদ্ধি, বিদেশের বাজারে সুনাম অর্জন এবং সেখানকার ক্রেতাদের পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে অনুসন্ধানের দিকে লক্ষ্যকার চেষ্টা দেখা যাবে মনে হয়।

অদৃশ্য রপ্তানি: পর্যটন

দৃশ্য অথবা সামগ্রী রপ্তানি ছাড়াও, দেশের অদৃশ্য রপ্তানি বাড়িয়ে তোলার অন্যতম উৎস হচ্ছে পর্যটন। ভারতের মতো দেশে আন্তর্জাতিক পর্যটনের সম্ভাবনা বলতে গেলে, বিপুল। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, তার নিসর্গশোভার বৈচিত্র্য, বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তার আকর্ষণকে বিদেশী পর্যটকের কাছে প্রায় অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। পৃথিবীর পর্যটকদের মাত্র ১/৫৩ ভাগ পেয়ে থাকে এসিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার বিশাল অঞ্চল: ঐ অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে আবার ভারতের স্থান তৃতীয়—জাপান ও হংকংয়ের নীচে। সম্প্রতি কয়েক বছরে ইটালী, ফ্রান্স, স্পেন, গ্রীস, সুইটজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশ যে রকম পর্যটন বাণিজ্যে সাফল্য লাভ করেছে, ভারত সেই দৃষ্টান্তগুলি অনুসরণ করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন বহুগুণ বাড়াতে পারে। যুক্তরাজ্যের মতো দেশে পর্যটনের উপর প্রতি পাউণ্ড ব্যয় থেকে ১০০ পাউণ্ড আগম হয়: ইটালীতে পর্যটনের উপর এক লিরা খরচ হতে ৭৫ লিরা উপার্জন করা যায়।

সম্প্রতি কয়েক বছরে পর্যটনের গুরুত্ব বেড়ে গেছে। গত এক দশকে ভারতে বিদেশী ভ্রমণকারীদের সংখ্যা প্রায় ছগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে—১৯৫১ সালে প্রায় ২০,০০০ থেকে ১৯৬০ সালে ১২৩,০০০-এ দাঁড়িয়েছে। পর্যটন থেকে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন প্রায় ৪ কোটি টাকা হতে বেড়ে প্রায় ২০ কোটি টাকা হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে পর্যটকদের জন্য বড়ো বড়ো কেন্দ্রে বাসস্থান, যানবাহন ও আমোদ-প্রমোদের সুবিধা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছিল। কেন্দ্রগুলিকে যুক্ত করার জন্য রাস্তা নির্মাণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্বিতীয় যোজনার মতো, তৃতীয় পরিকল্পনার সময় বাসস্থান ও পরিবহণের সুবিধা বাড়িয়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু পর্যটনের ক্রমবর্ধমান চাহিদার অনুপাতে দেশে নতুন হোটেল নির্মাণ এবং পুরানো হোটেলগুলির সংস্কার ও হোটেল শিল্পের যথেষ্ট সম্প্রসারণ হয়নি। উন্নতি সাধনের জন্য হোটেল শিল্পকে ঋণ দিয়ে সাহায্য করার কথা হচ্ছে। চতুর্থ যোজনাকালে ভারত পর্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক সরকারী অংশের বড়ো বড়ো পরিভ্রমণ

কেন্দ্রগুলিতে আটটি হোটেল নির্মাণ করা হবে, স্থির হয়েছে।

ভ্রমণ বাড়াতে হলে দুভাবে মূলধন নিয়োগ করতে হবে। একদিকে বিদেশী পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন পরিভ্রমণ স্থানে স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা সৃষ্টি করা দরকার. অন্যদিকে দেশের লোক যাতে ছুটির সময় ভ্রমণে উৎসাহিত হয় তার জন্য ভালো ও ব্যাপক ব্যবস্থা করা উচিত। যাতে প্রদর্শকদের সাহায্য পাওয়া যায় এবং শুল্ক বা মাশুল আদায়ের ব্যবস্থা আপত্তি বা অভিযোগের কারণ না হয়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ রাখলে ভালো হয়। উপযুক্ত প্রচারের যে একটি মূল্যবান ভূমিকা আছে সে কথা ভুললে চলবে না। আলাদা ও বিচ্ছিন্নভাবে উন্নতির চেষ্টা না করে পর্যটনের ক্ষেত্রে একটা জাতীয় সুসংহত পরিকল্পনা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। পর্যটনকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একটা রপ্তানি শিল্প হিসাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

শান্তিকুমার ঘোষ

দুই রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনীরদচন্দ্রের সাম্প্রতিক লেখাগুলো পড়ে আমার মনে হয়, লেখক সমালোচকদের বিদ্রূপ মন্তব্যে বিচলিত হয়েছেন। 'দুই রবীন্দ্রনাথ'-এ যে 'জ্ঞান'-এর উল্লেখ আছে, তা যদি দৃঢ়মূল হত, তবে অনেক অবান্তর উক্তি প্রবন্ধটিতে থাকত না।

হালে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ভারত সম্পর্কে আগ্রহশীল লোকের সাক্ষাৎ প্রায় প্রত্যেক দেশেই পাওয়া যায়। নীরদচন্দ্রের লেখার সঙ্গে পরিচিত অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে পাশ্চাত্যে। লেখকের রচনাশৈলী এবং পাণ্ডিত্যের প্রশংসা অনেক শুনেছি কিন্তু লেখা থেকে যে নীরদচন্দ্রের ছবি পাওয়া যায় তার প্রশংসা শুনিনি কখনও।

বাঙালীদের সম্বন্ধে নিরদচন্দ্র অনেক রূঢ় কথা বলেছেন। বাংলার বা ভারতের সীমা যারা অতিক্রম করেছেন, তাঁরা বাঙালী চরিত্রের অসঙ্গতি সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল। নিশ্চয়ই বাঙালীদের চৈতন্য উদয়ের আশায় লেখক আঘাত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টার প্রকাশ যেভাবে হচ্ছে, তাতে একটা কথা সুস্পষ্ট—তিনি নিজে এখনও পুরোপুরিই বাঙালী।

লেখকের শালীনতাবোধ সম্বন্ধে কেন প্রশ্ন উঠছে, জানি না। 'দেশে'র পাতায় যারা লেখকের শালীনতাবোধ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁরা নিজেরাই ত অনেক অশালীন কথা বলেছেন। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে শালীনতাবোধের অভাব এত সুপ্রকট যে কাউকে অশালীন বলা নিরর্থক।

এবার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। যদি মেনে নিই নীরদচন্দ্রের রবীন্দ্রদর্শন অন্ধের হস্তিদর্শনের মত, তবে আমার একটি প্রশ্ন থাকবে—দিনের আলোয় দৈনন্দিন পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে খালি চোখে রবীন্দ্রনাথকে ক'জন দেখেছেন?

সুবীর সরকার
কলিকাতা-১৬।

২

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর লেখা 'দুই রবীন্দ্রনাথ' আর তার স্রোতের টানে টেনে আনা বাদানুবাদ গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলাম।

বেশ ভাল লাগছিল এই বাদ-বিসংবাদ এই চিঠি-চাপাটি। এ সম্বন্ধে এত কথা বলা হয়েছে আর এত বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বলা হয়েছে, যে আমার তরফ থেকে এই বাক্‌যুদ্ধের আখড়ায় নাবার খুব একটা উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। তাছাড়া পত্রলেখকদের মধ্যে বেশ কিছু মহারথী এবং অনেকেই অতিরথী এবং আমি মোটেই চারুবাক নই, কেবল একটি পরম অনুগত, অল্পে তুষ্ট, সুবোধ বালক।

আজকের এই অতি অনিচ্ছাকৃত শর-সংযোজন নীরদবাবুর পক্ষেও নয়, বিপক্ষেও নয়; কিছু চিন্তাশীল, বিচক্ষণ, সাহিত্যানুরাগী পত্রলেখকদের প্রতি একটি বিনীত নিবেদন।

নীরদবাবুর শক্তিশেল রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পৌঁছেছে কিনা জানি না, তবে ধরাধামে আমার মত অনেক লক্ষ্মণকেই যে ধরাশায়ী করেছে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। এর আবর্তে অনেক পরস্পর-বিরোধী মতামতকে যে টেনে আনবে তা অনিবার্য এবং একেবারেই কটূক্তি এড়িয়ে গিয়ে কোনো মতামতকে সজোরে প্রকাশ করাও বোধহয় সকলের পক্ষে, সব সময়, সম্ভব নয়।

তাই কিছু শালীন কটূক্তি আমার ধারণা ক্ষমার্হ।

গত কয়েক সংখ্যা দেশে লক্ষ করছি যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই শালীন অশালীনের মধ্যের সীমারেখাটাকে বিপজ্জনক ভাবে এগিয়ে নিয়ে আসছেন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, ২রা ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীকাজল গুপ্ত এবং তার জবাবে ২৩শে ভাদ্র সংখ্যায় জনৈক দিল্লীবাসীর চিঠি।

জনৈক দিল্লীবাসী লিখেছেন, "ইচ্ছা করিয়াই শূকর শ্রেণীভুক্ত বলিলাম না।" কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য উনি আর কিভাবে বলবেন?

আমার ধারণা সাহিত্যে এই ধরণের মন্তব্য ঘৃণ্য মনোবৃত্তির পরিচায়ক এবং দুর্বলের অস্ত্র; যারা বুদ্ধিমান এবং রুচিবান তারা এ ধরনের কটূক্তি বাদ দিয়েও নিজের বক্তব্য অক্লেশে সুধী পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে পারেন।

পার্থসারথি বসু
হেস্টিংস।

৩

'দুই রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে ৪৫ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীসমর সরকার লিখিত পত্রখানির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহার জিজ্ঞাসা—"সস্তার বাহাদুরীর জন্য শ্রীনীরদ চৌধুরী ইহা লিখিলেও "দেশ" পত্রিকা কি আজকাল যাহা লেখা যায় তাহাই প্রকাশ করেন—?" আমাদের অনেকেরই এই

জিজ্ঞাসা। কে এক নীরদ চৌধুরী কি লিখে বিদেশের কি পুরস্কার পাইয়াছেন বলিয়া যাহা লিখিবে তাহাই বেদবাক্য হইবে, তাহা পড়িতে পাইলে আমরা পাঠক-সমাজ ধন্য হইয়া যাইব, আপনাদের এই মানসিক দৈন্য কেন? দেশের প্রাণপুরুষের এই অবমাননার জন্য আপনারাও কম দায়ী নহেন।

সমরবাবু পত্রের উপসংহারে যে মন্তব্য করিয়াছেন সে সম্বন্ধেও আপনাদের সতর্ক থাকিতে অনুরোধ করি—কারণ এই জ্ঞানপাপীর অকরণীয় কিছু নাই।

অশ্বিনীকুমার মিত্র
মায়ঘারিটা।

৪

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর 'দুই রবীন্দ্রনাথ' প্রকাশের জন্য দেশ পত্রিকায় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ। চৌধুরীবাবু তাঁহার 'অটোবায়োগ্রাফী অফ অ্যান আন-নোন ইণ্ডিয়ান' প্রভৃতি পুস্তকে বাঙ্গালী তথা ভারতীয়দের সম্বন্ধে বহু মিথ্যা কুৎসা লিখেছেন। তিনি বাঙ্গালী গৃহিনীদের চোরের সমপর্যায়ে নিতেও কার্পণ্য করেন নি। এসব লিখে তিনি এক জাতীয় ইংরেজের প্রচুর বাহবা কুড়িয়েছেন। যেহেতু ইংরেজরা তাঁর প্রশংসা করেছে, তাই তথাকথিত একদল শিক্ষিত (!) ভারতীয় শ্রীচৌধুরীর সমালোচনাকে অত্যধিক মূল্য দিয়ে আসছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, বাঙ্গালী পাঠকদের ভিতর বাজীমাৎ করতে গিয়ে তাঁর স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে পড়েছে।

স্বজাতি সম্বন্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনা-কারী লোকদিগকে কোন প্রকারেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। 'দুই রবীন্দ্রনাথ'-এর উপর এতগুলো চিঠি প্রকাশ করে শ্রীচৌধুরীর মতবাদের গুরুত্ব কি অন্যভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয় নাই? শ্রীকাজল গুপ্তের একটা চিঠিই কি যথেষ্ট ছিল না? শ্রীচৌধুরীর মত লোকের মতামতের মূল্য বাড়ানো দেশ ও জাতির পক্ষে ক্ষতিকর, দেশ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ কি তা' ভেবে দেখেছেন।

যাদব ভট্টাচার্য
শিলচর।

৫

মানবসভ্যতার ইতিহাসের মত সাহিত্যের ইতিহাসেও এক একটি যুগ পুনরাবৃত্তি হয়। 'দুই রবীন্দ্রনাথ' রচনার লেখক নীরদচন্দ্রের বক্তব্যে তাই আশ্চর্য বোধ করি নাই। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সময়েই রবীন্দ্রবিদ্বেষ তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছিল আমরা জানি। 'নবজীবন' পত্রিকার সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যখানিকে 'কাব্যি' বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন এবং কালীপ্রসন্ন 'মিঠে ও কড়া' নামে এই কাব্যের একটি Parody রচনা করিয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিগণও বিভিন্ন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে প্রতি মাসেই কিছু না কিছু উদ্ধত মন্তব্য প্রয়োগ করিতে ছাড়িতেন না।

আজ আবার সেই রবীন্দ্রবিদ্বেষ ধূম উদ্গীরণ করিতেছে। 'পরনিন্দা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকসুলভ বিজ্ঞতার অতি সূক্ষ্মভাবে সুকৌশলে সমকালীন সমালোচকদের প্রতি তীব্র শ্লেষ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বিদ্বেষমূলক নিন্দা সংসারে আছে ইহা স্বীকার করিয়া তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, "এরূপ নিন্দা যাহার স্বভাবসিদ্ধ সেই দুর্ভাগাকে যেন দয়া করিতে পারি।"

এই পুনরুক্তির প্রয়োজন এইজন্য যে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে নীরদচন্দ্রের উক্তিতে যুক্তির তীক্ষ্ণতা অপেক্ষা একটি বিদ্বেষের সুরই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম যুগে রবীন্দ্রবিদ্বেষের কারণ ছিল কবির কাব্যকে ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারা আর এই যুগে রবীন্দ্রবিদ্বেষের কারণ রবীন্দ্রনাথের বিপুল খ্যাতি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা। ইহাকে ধূলায় লুণ্ঠিত করিতে হইলে সত্যিকার যুক্তির প্রয়োজন। একদেশ-দর্শী কয়েকটি যুক্তি দেখাইয়া সাধারণ রবীন্দ্রপরিচিত ব্যক্তির নিকট অথবা সাম্প্রদায়িক বিকারগ্রস্ত মানুষের নিকট বাহবা মিলিতে পারে কিন্তু প্রকৃত রবীন্দ্রানুরাগীদের প্রতারণা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের সহিত দেশবাসীর যোগ যে কৃত্রিম ছিল না তাহা তাঁহার অসংখ্য ছোটগল্প ও 'পল্লীপ্রকৃতি'র প্রবন্ধাবলীই একমাত্র প্রমাণ নহে, তাঁহার আদর্শানুযায়ী সৃষ্ট 'শ্রীনিকেতন' আজও তাহার প্রমাণ হিসাবে বর্তে।

লেখক ১৮৯০ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত কবির একটি চিঠি হইতে উদ্ধৃতি দিয়া প্রমাণ করতে চাহিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ লোকজনের ভিড়কে ভয় করিতেন এবং তিনি "জনসমাজে মিশিবার উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন না।" এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য উক্তির ভিতর শুধুমাত্র প্রবাসী (বৈশাখ, ১৩৪৭) হইতে একটি উক্তি তুলিয়া দিয়া আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিব—"আমার যে নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে। আজ বললে অহংকারের মত শোনাবে, তবু বলব আমাদের দেশের খুব অল্প লেখকই এই রসবোধের চোখে বাংলাদেশকে দেখেছেন। আমার রচনাতে পল্লীপরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে, কোনো বাঁধা বুলি দিয়ে তার সত্যতাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। সেই পল্লীর প্রতি যে একটা আনন্দময় আকর্ষণ আমার যৌবনের মুখে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল আজও তা যায় নি।" জনসমাজে মিশিবার যিনি অনুপযুক্ত বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গতার পরিচয়কে প্রকাশ করিবার এতখানি দৃঢ়তা আসে কোথা হইতে?

আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়
তেজপুর।

সম্পাদকের বক্তব্য

'দুই রবীন্দ্রনাথ' প্রসঙ্গে শতাধিক চিঠি এসেছে। প্রতিবাদই বেশী, সমর্থনের সংখ্যা সে তুলনায় নগণ্য। স্থানাভাব হেতু সব চিঠি প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তা ছাড়া বক্তব্যের পুনরুক্তি পাঠকদের কাছে ক্লান্তিকর মনে হবে। সুধী পাঠক ও সক্রিয় পত্রলেখকদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এই জন্যে যে, দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত বিতর্কমূলক রচনা সম্পর্কে সর্বদাই তাঁদের সোচ্চার প্রতিক্রিয়া আমাদের সচেতন রাখে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বৎসর শারদীয়া দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের পত্রটি শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত তাঁর স্বর্গত পিতা নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের সংগ্রহ থেকে আমাদের দিয়েছেন। রবীন্দ্র-নিন্দার বিরুদ্ধে জনৈক পাঠকের প্রশ্নোত্তরে লিখিত এই পত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হল:

"......লেখকের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য যদি সত্য হয় তবে তিনি সত্য ফল পাইবেন। যদি না হয় তবে দেশসুদ্ধ লোকে তাঁকে বাহবা দিলেও তাঁর লেখা অমর হইবে না।...... কে দলিত হইবে এবং কে আদৃত হইবে তার ভার মহাকাল নিজের হাতে লইয়াছেন, তাঁর উপরে নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করিতে পারেন।..... যাঁরা আমাকে কবি প্রমাণ করিতে ব্যস্ত এবং যাঁরা কোমর বাঁধিয়া তার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত উভয়েই এমন প্রহসন অভিনয় করেন যার হাস্যকরতা বুঝিবার মত বুদ্ধি তাঁহাদের নাই। এই সমস্ত সাহিত্যিক গ্রাম্যতা ও দীনতা যাঁদের রুচিকর তাঁরা আনন্দে থাকুন, তাঁদের ভোগের সামগ্রীর কোনদিন অভাব হইবে না। ইঁহাদের হাতে মার খাওয়াই আমার সৌভাগ্য—"

এর পর 'দুই রবীন্দ্রনাথ' সম্পর্কে আর আলোচনা প্রকাশ নিতান্তই অর্থহীন। এখানেই এ-প্রসঙ্গের যবনিকা টেনে দেওয়া হল।

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর

আপনাদের পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে যে "করুণাসাগর বিদ্যাসাগর" প্রকাশিত হচ্ছে, যুগপৎ আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে তা পড়ছি। কীর্তিমান মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর প্রতিভাবান লেখক ইন্দ্রমিত্রের লেখনীতে সজীব মূর্তি নিয়ে ফুটে উঠেছেন।

এই রচনাটিতে লেখক বিদ্যাসাগর-জীবনের নানা তথ্যের বিস্তারিত এবং সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন। তা ছাড়া, লেখক হিসাবেও ইন্দ্রমিত্রের ক্ষমতা এবং তাঁর গবেষণার ওপর আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তাই আমাদের পক্ষে এ প্রত্যাশা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে যতগুলো গ্রন্থ এতাবৎকাল প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে ইন্দ্রমিত্রের গ্রন্থই সর্বাপেক্ষা যুক্তিনির্ভর ও প্রামাণ্য-রূপে সমাদৃত হবে।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনীমূলক অপর কয়েকটি পুস্তকের তথ্যে এবং ইন্দ্রমিত্রের পরিবেশিত তথ্যে এমন কিছু অসঙ্গতি দেখেছি, যার ফলে আমার এই বক্তব্য প্রকাশ না করে পারলাম না। আমার বক্তব্য বিষয় ব্যক্ত করার পূর্বে স্পষ্টভাবে এটা স্বীকার করা প্রয়োজন যে, আমি এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন যে-আলোচ্য জীবনকথায় লেখক যে সমস্ত তথ্যের অবতারণা করে থাকেন, তা তিনি যথাযোগ্য প্রমাণ পেয়েই করেন এবং স্বকীয় বুদ্ধি ও চিন্তার আলোকে তা বিচারও করে থাকেন। এবং লেখকের গবেষণার ওপর আস্থার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এসব সত্ত্বেও আমি কতগুলো তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেগুলো সম্পর্কে লেখক ইন্দ্রমিত্রের মতটিই সঠিক প্রমাণিত হলে খুশী হবো। তবুও, কোন সাধারণ তথ্যগত বা সংখ্যাগত প্রমাদ সকলেরই হতে পারে; তাই, অন্তত আর কিছুর জন্য না হোক, তথ্যগুলোকে আরেকবার যাচাই করে দেখার জন্যও আমি সবিনয়ে আমার বক্তব্য নিবেদন করছি।

১। দেশ-এর ১০৭৮ পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন যে, বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে পিতা এবং পদুমলাই যখন হাঁটাপথে বীরসিংহ থেকে কলকাতা যাচ্ছিলেন, তখন তাঁদের সঙ্গে যে চাকর ছিল, তার নাম ছিল আনন্দরাম গুটি। অথচ বিদ্যাসাগরের আর একটি জীবনীতে পাচ্ছি, ঐ চাকরের নাম ছিল শ্রীরাম। ২। বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য বিদ্যাসাগর যে আবেদনপত্র দাখিল করেছিলেন, ইন্দ্রমিত্রের তথ্যানুযায়ী তার স্বাক্ষর সংখ্যা এক হাজার এবং বিরুদ্ধ পক্ষে রাজা রাধাকান্ত দেবের আবেদনপত্রের ঐ সংখ্যা সাঁইত্রিশ হাজার (পৃঃ ৭৬৫)। অথচ শ্রীচন্দ্রশেখর জানা রচিত "মহামানব বিদ্যাসাগর" পুস্তক অনুযায়ী ঐ দুটি সংখ্যা যথাক্রমে পঁচিশ হাজার এবং দশ হাজার। শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী লিখিত "মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর" বইটিতেও এ মতের সমর্থন পাচ্ছি। ৩। ৩২ সংখ্যা দেশ-এর ৬৬০ পৃষ্ঠায় লেখক অনেক কিংবদন্তি ও জনশ্রুতিপূর্ণ বিদ্যাসাগরের যে ঘটনা শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভাষাতে উদ্ধৃত করেছেন, সেই ঘটনারই একটু অন্যরকম বর্ণনা পাচ্ছি শ্রীচন্দ্রশেখর জানার পুস্তকে। সেটি এরকমঃ মেদিনীপুরের কোন গ্রামের

শিক্ষিত লোকেরা তাঁদের এক সংস্কৃতি সভায় বহু গণ্যমান্য লোককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সভাপতিত্ব করবার জন্য বিদ্যাসাগরও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সভার দিন উক্ত ফিটবাবুটি স্টেশনে নেমে "কুলী কুলী" বলে চেঁচাতে লাগলেন এবং বিদ্যাসাগর এসে যথারীতি তাঁর সুটকেস তুলে নিয়ে চলতে লাগলেন। ফিটবাবুটি নিজের গন্তব্য স্থানের সামনে এসে কুলীকে পয়সা দিতে গেলেন। বিদ্যাসাগর বললেন, "থাক, এর জন্য আবার পয়সার দরকার হবে?" বলে তিনি চলে গেলেন। পরে সংস্কৃতি সভায় গিয়ে ঐ ফিটবাবুটি সভাপতিরূপে মাল্যভূষিত কুলীকে দেখে সব বুঝতে পারেন এবং পরে বিদ্যাসাগরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন।

৪। ১২৮৭ পৃষ্ঠার 'ইন্দ্রমিত্র' শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধির ভাষার বিল ঠিক দেওয়ার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা' থেকে জানা যাচ্ছে যে, সে সময় উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরদাস ও কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। অথচ বিদ্যাসাগরের অপর একটি জীবনকথা অনুযায়ী ঐ দুজন হচ্ছেন ঠাকুরদাস ও জগদ্দুর্লভ সিংহ।

৫। "দেশ"-এর ৩৯ পৃষ্ঠায় লেখক বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন, কিভাবে রবার্ট কস্টের অনুরোধে বিদ্যাসাগর তাঁকে শ্লোক লিখে দিয়েছিলেন। এর বেশী আর কোন উল্লেখ ওখানে নেই। কিন্তু শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতীর পুস্তকে রয়েছে যে শ্লোক পেয়ে প্রীত হয়ে কস্ট সাহেব বিদ্যাসাগরকে দুশো টাকা পুরস্কার দেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তা' গ্রহণ না করে সংস্কৃত কলেজের ছেলেদের রচনা প্রতিযোগিতার জন্য দান করেন। ঘটনাটি যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে তা' উল্লেখ করা অবশ্য প্রয়োজন। কারণ এটিকে বাদ দিলে বিদ্যাসাগরের চরিত্র বর্ণনার একটি দিক অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

৬। ঈশ্বরচন্দ্রের একাধিক জীবনচরিতে পড়লাম যে বেদান্ত শ্রেণী থেকে ন্যায় ও দর্শন শ্রেণীতে প্রবেশলাভ করবার পর এক বৎসর অধ্যয়ন করে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র যে একশো টাকা এবং সর্বোৎকৃষ্ট রচনা লিখে যে একশো টাকা পান, তা' তিনি ঋণশোধ করবার জন্য বাবার হাতে দেন। ন্যায় ও দর্শন শ্রেণীতে পড়বার সময় দু মাসের জন্য ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতের পদ শূন্য হওয়ায় সেই কাজ করে ঈশ্বরচন্দ্র পান আশী টাকা। এই টাকা পিতাকে তিনি দিয়েছিলেন তীর্থ করবার জন্য।

এর মধ্যে শুধু প্রথমের দু' শো টাকা পাওয়ার কথাই 'ইন্দ্রমিত্রে'র রচনায় রয়েছে, এ ছাড়া আর কিছু নেই।

৭। 'ইন্দ্রমিত্র' তাঁর রচনায় ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত এবং সম্পর্কিত [illegible]—এ রকম বহু তথ্যের বিস্তারিত ও সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের কোন ঘটনায় বিস্তারিত বিবরণ কখনোই এই জীবনকথায় অনাবশ্যক বা বাহুল্য বিবেচিত হতে পারে না। অথচ বিদ্যাসাগর-জীবনের কিছু ঘটনা এই রচনায় অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। যেমন—ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় বিধান সংগ্রহের ব্যাপারটি। এটি খুবই সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে (৪৬ সংখ্যা "দেশ" পৃঃ ৬৬৩)। অথচ কি অমানুষিক পরিশ্রম করে বিদ্যাসাগর এই সাধনায় রত হয়েছিলেন তা' না বললে বোঝাই যাবে না, যে দুঃখীদের দুর্গতি মোচনকে তিনি কতটা গুরুত্ব দিতেন।

কলেজের কাজ শেষ করে সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে অপরাহ্ন থেকে শুরু করে সারারাত্রি বিদ্যাসাগর গ্রন্থকীটের মত নানা শাস্ত্র ঘাঁটতেন এবং বাড়ী গিয়ে খাবার খেয়ে আসবার সময় পর্যন্ত তিনি পেতেন না। তাঁর বন্ধু শ্যামবাবুর নিকটবর্তী বাড়ি থেকে তাঁর জন্য প্রত্যহ ঐ লাইব্রেরীতে জলখাবার আসতো।

এ সম্পর্কে আরও উল্লেখনীয় যে, শাস্ত্র-সাগর মন্থন করে যে শ্লোকটি পেয়ে বিদ্যাসাগর "পেয়েছি পেয়েছি" বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, সেটি "পরাশর সংহিতা"য়ঃ

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ
পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো
বিধীয়তে॥

এই রকম ঘটনা সংক্ষেপ এবং তার ফলে প্রয়োজনীয় তথ্য বাদ পড়ার দৃষ্টান্ত আরও কিছু দেওয়া যায়, কিন্তু আপাতত নিষ্প্রয়োজনবোধে নিবৃত্ত হলাম।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত নানা বিভ্রান্তি ও সংশয় নিরসন করলে লেখক পাঠকজনের ধন্যবাদার্হ হবেন। 'ইন্দ্রমিত্রে'র রচনা আমার ভাল লেগেছে বলেই এগুলো উল্লেখ করলাম। পরিশেষে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্যে ছেদ টানছি।

অলকরঞ্জন বসু চৌধুরী
জামসেদপুর-১।

জন্মনিয়ন্ত্রণ

গত ১২ই আগস্ট, ১৯৬৭ সনের 'দেশ' সাপ্তাহিকীতে শ্রীশান্তিকুমার ঘোষের ভারতীয় অর্থনীতি বিভাগে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে যুক্তি পড়ে আমার নিজস্ব কতকগুলি মতামত ব্যক্ত করছি।

শ্রী ঘোষ মহাশয় বলেছেন যে, কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে সমাজে পারমার্থিক ভিত্তির চাইতে বস্তুতান্ত্রিক আচরণের উপর জোর দেওয়ার আশঙ্কা আছে। যদিও এটা তার নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত, তবু এটা বলা চলে যে, ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় একটু বস্তুতান্ত্রিক আচরণের দিকে ঝোঁক না দিলে নিকট ভবিষ্যতের দৈনন্দিন জীবন খুব একটা সুখপ্রদ হবে বলে আশা করা যায় না। বস্তুতান্ত্রিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে পারমার্থিক ভিত্তিকে জোরালো করা যায় বলে মনে হয় না। বস্তুতন্ত্রকে অস্বীকার করে পারমার্থিক ভিত্তির উন্নতি যে সম্ভব নয় তার দৃষ্টান্ত পেতে হয়ত আমাদের দেশের বাইরে যেতে হবে না।

শ্রী ঘোষ মহাশয় আরও বলেছেন যে, জন্মনিরোধ ব্যাপকভাবে গৃহীত হলে পরিবারের ভিত্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তাতে অবাধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জেগে উঠবে এবং দায়িত্ব এড়াবার ঝোঁক দেখা দেবে বলে ভয় হয়। আমার মনে হয় শ্রী ঘোষ মহাশয় একটি স্ববিরোধী কথা বলেছেন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সেখানেই আসতে পারে যেখানে কারুর নিজের প্রতি প্রবল দায়িত্ববোধ থাকে। পরের উপর নির্ভরশীল হলে ক্রমশ দায়িত্ব বোধের প্রখরতা হ্রাস পায়। আমাদের দেশের যৌথ পরিবারে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। এতে অকর্মণ্যতা বাড়ে বই কমে না। এ দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রখরতা সত্ত্বেও দায়িত্ব এড়াবার দৃষ্টান্ত খুবই কম। বরং এর ফলে প্রত্যেক নাগরিককে অনেক বেশী দায়িত্বশীল করে তুলতে পারে।

শ্রী ঘোষ মহাশয় আরও বলেছেন যে, দারিদ্র্যের মধ্যে উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়। এ রকম ধারণা তিনি কিভাবে এবং কোত্থেকে পেলেন আমার তা জানতে ইচ্ছে হয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি দারিদ্র্য প্রতিভা বিকাশের একটি মস্ত বড় বাধা। আমি নিজে দেখেছি প্রচুর মেধাবী ছেলে অর্থের অভাবে পড়াশুনা চালাতে অক্ষম হয়েছে। আমাকে নিজেকে প্রচুর কষ্টের মধ্যে বড় হতে হয়েছে। ধনীর ঘরে প্রতিভা বিকাশের যে সুযোগ আছে দরিদ্রের ঘরে তা নেই। শ্রীঘোষ মহাশয়ের এরকম উক্তি সত্যি অতি অদ্ভুত। তিনি আরও বলেছেন জীবন-যাত্রার মান উন্নত হওয়ার সাথে সাথে পরিবার ছোট হয়ে আসে। তিনি যে এর কি কারণ সে সম্বন্ধে বিশেষ ভেবে দেখার অবকাশ পান নি। যে সব পরিবার আকারে ছোট তাদের প্রায় সকলেরই জীবনযাত্রার মান সাধারণের তুলনায় উঁচুতে। যদিও বাইরে থেকে এ দুটো জিনিসের খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দেখা যায়, এর পেছনে কি কারণ আছে সেটা ভেবে দেখার মত। পরিবারের আকার বড় হলে জীবনযাত্রার মান নেমে আসবে এই ভয়ে পরিবার ছোট রাখার সচেতনতা দেখা দেয়। তার জন্য এ সব পরিবারে কোন না কোন উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবহারই হয়ে আসছে। এ সব ব্যাপার আমাদের দেশে একেবারেই আলোচনা হয় না, তাই এ সব তথ্য সঠিকভাবে কেউই জানেন না। জীবনযাত্রার মান উন্নত হলেই যে

পরিবার ছোট হয়ে আসে না তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ দেশের ক্যাথলিক পরিবারগুলি। এ দেশের জীবনযাত্রার মান যে খুব উঁচু সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। তবুও ক্যাথলিক পরিবারগুলি কেন এত আকারে বড় তার কারণ হল ক্যাথলিক ধর্মে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ নিষেধ। এ দেশে যে সাধারণত ব্যাপকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে সেটা কারুরই অজানা নয়।

ইউরোপে জন্মনিয়ন্ত্রণের উৎসাহ দারিদ্র্য থেকে আসে কি এই উক্তিটির কতটা বাস্তব ভিত্তি আছে তা সঠিক করে বলা শক্ত। ইউরোপের জীবনযাত্রার মান বহুদিন থেকেই উঁচু। তা ছাড়া যে কোন দেশের সন্তান-উৎপাদন-উর্বরতা বহুলভাবে সে দেশের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। তাই ইউরোপে যা দেখা গেছে তা যে আমাদের দেশের পক্ষে প্রযোজ্য হবে তা কি ঠিক করে বলা যায়? এ ধরনের উক্তিতে সাধারণ লোকের মনে এক রকম মিথ্যে ধারণা গড়ে উঠতে পারে যার হয়ত সত্যিকারের বাস্তব ভিত্তি নেই। এ সব ব্যাপারে যথেষ্ট আলোচনার অবকাশ আছে। কোনরকম সঠিক উক্তি করাটা বোধ হয় ঠিক নয়।

ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে যুক্তির পরিবর্তে যদি শ্রী ঘোষ মহাশয় জন্মনিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে যুক্তি সম্বন্ধে কিছু লিখতেন সেটা অনেক বেশী সময়োপযোগী হতে পারত। ভারত-বর্ষের বর্তমান অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি বেশী হচ্ছে। দেশের বর্তমান জীবন-যাত্রার মান খুবই নীচু। তাই সেটাকে উঁচুতে আনতে হলে জনসংখ্যার স্ফীতি রোধ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। জীবনযাত্রার মান উন্নত না হলে লোকের হয়ত স্বেচ্ছায় জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করার উপায় সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়বে, কিন্তু তার আগে জীবনযাত্রার মান উন্নত করা দরকার। যতদিন না তা হচ্ছে ততদিন আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ আকর্ষণীয় করা দরকার এবং তার জন্য সরকারের এবং শিক্ষিত জনসাধারণের আয়ত্তে যা কিছু করণীয় তাই করা উচিত।

দিলীপ গুহ
নিউইয়র্ক

রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী

২রা ভাদ্র, ১৩৭৪ (বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ৪২) 'দেশ' পত্রিকার "চিত্রপ্রদর্শনী" বিভাগে শ্রীচিত্রপ্রিয় মহাশয়ের লিখিত "রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত চিত্রের প্রদর্শনী" নিবন্ধটি পড়ে সবিশেষ আনন্দলাভ করেছি; এই ধরনের সুচিন্তিত চিত্তাকর্ষক নিবন্ধের জন্য লেখক শ্রীচিত্রপ্রিয় মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সংগীতগুলির পরেই রবীন্দ্র প্রতিভার বিশেষ বিকাশ হিসাবে তাঁর চিত্রগুলির স্থান। রবীন্দ্র সাহিত্য ও সংগীত দেশবাসীর নিকট যেমন অমিত পরিচয় লাভ করেছে, সেই তুলনায় রবীন্দ্রচিত্রকলার বিকাশ অত্যল্প। লেখক বলেছেন, "কবি অঙ্কিত বিভিন্ন চিত্রাবলী ও তার রচনা পদ্ধতি বিষয়ে কোথাও কোনও নিয়মিত ও গভীরভাবে আলোচনা হয়েছে বলে শুনিনি"। —এই কথা অতীব সত্য; বর্তমানে রবীন্দ্র-চিত্রপ্রদর্শনী এবং উক্ত বিষয়ে সুগভীর আলোচনাও শোনা যায় না। জানি না, রবীন্দ্র-প্রতিভা-প্রসূত এই সমুন্নত শাখাটির প্রতি দেশবাসীর কেন এত অজ্ঞতা, এত অবহেলা?

রবীন্দ্রনাথ চিত্র রচনা আরম্ভ করেন পরিণত বয়সে। ১৯৩০ সালে প্যারী শহরে সর্বপ্রথম তাঁর চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। পরে সেই প্রদর্শনী ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ চিত্ররচনার জন্য সর্বপ্রথম বিদেশ থেকেই সুখ্যাতি লাভ করেন। স্বদেশে এই চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় কবির তিরোধানের দশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৩১ সালে। এর পর সুদীর্ঘ ২৪ বৎসর পরে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের পরিচালনায় দিল্লিতে নিখিল ভারত শিল্প ও চারুকলা সমিতি হলে রবীন্দ্রনাথের এক মনোজ্ঞ চিত্র-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। —এই থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, রবীন্দ্র-নাথের চিত্রকলার প্রতি দেশবাসীর যথার্থ অনুরাগের অভাব।

রবীন্দ্রনাথ জীবনে মোট প্রায় আড়াই হাজার চিত্র এঁকেছেন; তন্মধ্যে তিন ভাগের দুই ভাগই মানুষের চিত্র। এই চিত্রগুলিকে মোটামুটিভাবে সাত-আট ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন—

(১) বাস্তব। (২) ভীষণ মূর্তি। (৩) আলঙ্কারিক অলঙ্করণ। (৪) জ্যামিতিক আকারের অনুকরণে অঙ্কিত মূর্তি। (৫) মানুষের প্রতিকৃতি। (৬) মুখোশ। (৭) নিজের প্রতিকৃতি। (৮) নাটকীয়। রবীন্দ্র-নাথের এই সমস্ত অনিন্দ্যসুন্দর চিত্রগুলি দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। তাঁর শিল্পের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। শুধুমাত্র কালি-কলমের সূক্ষ্ম ও বক্ররেখার সাহায্যে প্রতিকৃতির মধ্য দিয়ে কিভাবে একটা মনোভাব ও চরিত্রগত বিশিষ্ট রূপটুকু প্রকাশ করা যায়; তার সুন্দর নির্দশন আমরা রবীন্দ্রনাথের চিত্রগুলির মধ্যে পাই।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন—"আমি যা আঁকি তা মনের অগোচরে ইচ্ছে করে আঁকা বা আঁকতে চাওয়া, তার একটা রূপ দেওয়া—তা আমার দ্বারা হয় না। হিজিবিজি কাটতে কাটতে একটা কিছু রূপ নিয়ে যায় আমার আঁকা। একে কি আর্টিস্ট বলে। তোমরা আমার স্তুতিবাক্যে ভোলাও। দেখ না—কতকগুলো মাথামুণ্ডই আঁকলুম। কোনটার গোঁফ আছে, কোনটার নেই, কোনোটা বেঁকে আছে, কোনোটা অদ্ভুত—এর কি কোন মানে আছে?"

—রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছেমত কাগজে হিজিবিজি কাটতেন এবং পরে ঐ হিজিবিজি থেকে একটা সুন্দর ছবি উদ্ধার করতেন। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্যান্য বিখ্যাত চিত্র-শিল্পীর বিরাট বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রের ভাব ও বিষয়বস্তুগুলি নিয়ে বর্তমান চিত্রজগতে এক বিরাট বিস্ময় ও আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। আশা করি, রবীন্দ্র-সাহিত্য ও সঙ্গীতের মত রবীন্দ্র চিত্রকলাও একদিন প্রভূত জনপ্রিয়তা এবং যথার্থ সমাদর লাভ করবে।

অশোককুমার নিয়োগী
উত্তরপাড়া

এখনও দাগ লুকোতে হয় ?
ডিয়ারবর্ন মারকোলাইজড ওয়াক্স্ সবরকম দাগ নিশ্চিহ্ন করে
Dearborn
ডিয়ারবর্ন মারকোলাইজড ওয়াক্স্
এম. জি. সাহানী এণ্ড কোং (দিল্লী) প্রাঃ লিঃ
কনট প্লেস, নিউ দিল্লী-১

মুখোশের অন্তরালে

আশা দেবী

জীবনে সব চেয়ে বেশী পাওয়া আর সব চেয়ে বেশী হারানোর দুর্ভাগ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী শিল্পী জাঁ-বাপতিস্ত গ্রোজের মতো বুঝি আর কারো হয়নি।

আজ চিত্রকলার ইতিহাসে গ্রোজের নাম একটি অনুচ্ছেদও কিনা সন্দেহ। কিন্তু একদিন খ্যাতির তুঙ্গশিখরে উঠেছিলেন তিনি। প্রতিটি অভিজাত ফরাসী, প্রত্যেক চিত্ররসিক পর্যটকের অবশ্যদর্শনীয় ছিল গ্রোজের স্টুডিয়ো—মিউজি দু লুভর অথবা নোৎরদামের মতোই প্রবল ছিল তাঁর ছবির আকর্ষণ। অর্থ আসতো বন্যার মতো। অথচ ১৮০৫ সালে—মৃত্যুর আগে, উনআশি বছরের দরিদ্র, জীর্ণ, নৈরাশ্যে কাতর গ্রোজ তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, "আমার শেষ যাত্রার একমাত্র সঙ্গী থাকবে তুমিই, যেমন ভিখারীর কুকুর উপস্থিত থাকে তার প্রভুর অন্তিম-যাত্রায়।"

অথচ, এমন অধঃপতন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

অমিতব্যয়ী ছিলেন? না—তা নয়। উচ্ছৃঙ্খল জীবন? না, তা-ও নয়। ইতালীর শিল্পী আন্দ্রেয়া-দেল-সার্তোর মতই এই অভিশাপ তাঁর জীবনে এনেছিলেন তাঁরই স্ত্রী। এবং আন্দ্রেয়ার মতই অসীম বিশ্বাস আর ভালোবাসা নিয়ে এই স্ত্রীর মুখই তাঁর আজও বিখ্যাত কটি ছবিতে তিনি সরলতা আর পবিত্রতায় উজ্জ্বল করে রেখেছেন।

কিংবা কবি গ্যেয়টের জীবনে ফ্রেডারিকার অশ্রুসম্পাতের মত রোমের সেই প্রত্যাখ্যাত সুন্দরী ডিউক-কন্যার চোখের জলই বুঝি তাঁকে এমনভাবে ব্যর্থ করে দিল!

ইতালী সেদিন শিল্পীর স্বর্গলোক—পৃথিবীর যত চিত্রশিক্ষার্থীর তীর্থ, তাদের গুরুগৃহ। তাই তরুণ জাঁ-বাপতিস্ত গ্রোজও রোমে এসেছিলেন তাঁর পাঠ নিতে। সঙ্গে একটি পরিচয়পত্র—বিখ্যাত ধনী দ্যুকো দেল আর'-এর কাছে।

'দ্যুকা'—অর্থাৎ 'অর'-এর ডিউক অসামান্য চিত্ররসিক এবং উদারহৃদয়। তিনি কেবল গ্রোজের জন্য সব ব্যবস্থাই করে দিলেন না, তার অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্যের একটা উপায়ও করে দিলেন। সে কাজ আর কিছু নয়, ডিউকের সুন্দরী আদুরে মেয়েটিকে ড্রইং শেখানোর ভারও পড়ল গ্রোজের উপর।

এল প্রেম।

গ্রোজের দিক থেকে হয়তো দুর্বলই ছিল, মেয়েটি যেন পাগল হয়ে গেল। 'আমাকে নিয়ে চল এখান থেকে—যেখানে খুশি নিয়ে চলো। বাবা রাগ করবেন, করুন—তাঁর একটি পয়সাও আমি চাই না। দিদিমা প্রচুর সম্পত্তি দিয়েছেন আমাকে, তাতেই আমাদের চলে যাবে।'

গ্রোজ দোটানায় পড়লেন। এক দিকে ভালোবাসা আর এক দিকে বিশ্বাসঘাতকতা। এমন হিতৈষী—এমন সহৃদয় ডিউককে এইভাবে বঞ্চনা করবেন তিনি? তা ছাড়া দীন দরিদ্র তিনি, ডিউক-কন্যাকে গ্রহণ করবার শক্তিই কি তাঁর আছে।

অন্তর-যন্ত্রণায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে কাপুরুষের মত পালালেন গ্রোজ। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে মেয়েটি আর একজনের সংসার করতে চলে গেল। আর মনোযন্ত্রণায় দীর্ঘদিন অসুস্থ থেকে, বেদনার বোঝা বয়ে গ্রোজ ফিরে এলেন প্যারীতে।

শিল্পী-জীবনে সুদিন আসতে সময় লাগল না। ধীরে ধীরে খ্যাতির পথে এগোতে লাগলেন গ্রোজ। তাঁর শিশু-কিশোর চিত্রগুলো চারদিকে চাঞ্চল্য জাগাল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে দ্বিতীয় কোনো নারীর কথা ভাবতেও পারলেন না তিনি। তারপর একদা দুর্ভাগ্যের দ্যূতি হয়ে এল সেই মেয়ে—আন্ বাবুতি যার নাম।

এক বইওয়ালার মেয়ে সে। দোকানে কেনা-বেচা করছিল। গ্রোজ সেখানে একদিন ঢুকে পড়ে একখানি বিশেষ ধরনের বই কিনতে চাইলেন। বই-এর নাম শুনে মেয়েটির গাল রাঙা হয়ে উঠল।

—ছি ছি, এসব বই কেন পড়েন?

—বইটা ভালো নয় বুঝি?

—না—খুব খারাপ। মেয়েটির মুখে লজ্জার হাসি ফুটল এক টুকরো, চোখ নেমে এল।

গ্রোজ ভালো করে চেয়ে দেখলেন মেয়েটির দিকে। খুব ছেলেমানুষ নয়—বয়স ত্রিশের ঘরে পৌঁছেছে। কিন্তু যেমন সুন্দর তার মুখ, তেমনি আশ্চর্য লাবণ্য

নারী ও কপোত

সেই মুখে। তার সরল গভীর চোখের তারায় কিশোরীর পবিত্রতা।

সেই শুরু। তারপর থেকে গ্রোজের নিয়মিত যাতায়াত চলল সেই দোকানে। আনকে যে তিনি ঠিক ভালোবেসেছিলেন, তা নয়। শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে সে সৌন্দর্য আর পবিত্রতা এই মেয়েটির মুখে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তারই আকর্ষণে গ্রোজ দোকানটিতে আসা-যাওয়া করতেন।

গ্রোজের পরিচয় গোপন ছিল না। তাঁর খ্যাতিও অজানা ছিল না আনের। তার কালো চোখের আড়ালে যে গভীর অন্ধকার লুকিয়ে ছিল, তার সুন্দর মুখের প্রচ্ছদ-পটের গোপনে যে লোভ আর স্বার্থবুদ্ধি নেকড়ের মত গুঁড়ি মেরে বসে ছিল—এইবার অন্ধকার থেকে সেই জন্তুটা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল।

পরিকল্পনাটি চমৎকার।

আন্ একদিন এক জোড়া নতুন নকল হীরের দুল কিনে ফেলল। সেই দুল কানে পরে যখন সে দোকানে কিংবা পথে ঘাটে দেখা দিল, তখন চেনা আধ-চেনা সকলের মনে একটি কথাই জেগে উঠলো।

: গ্রোজ দিয়েছেন, তাই না?

আন নির্বাক। তার গাল রাঙা।

: ভালোবাসেন বুঝি?

আন তবুও নীরব। কিন্তু সে নীরবতা এমনই তাৎপর্যময় যে, বুঝতে আর কারো বাকী থাকে না।

তারপর চারিদিকে রটে গেল, আন বাবুতির সঙ্গে শিল্পী গ্রোজের রোমান্স নিবিড় হয়ে উঠেছে।

গ্রোজ কিছুই জানতেন না এসব। তাঁর ছবির বাজার-দর বাড়ছে, চারদিক থেকে আসছে দারুণ সমাদর। নিজের আনন্দে কাজ করেই চলেছেন তিনি। আনকে ভালো লাগে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। এর অতিরিক্ত একটি কথাও তিনি ভাবেন নি।

তারপর এক সন্ধ্যায় তাঁর দরজায় পাগলের মতো করাঘাত পড়ল। ঝিকে সঙ্গে নিয়ে হানা দিয়েছে আন। বিস্মিত হওয়ারও সময় পেলেন না গ্রোজ। তার আগেই আন আছড়ে পড়লো তাঁর পায়ে।

: ক্ষমা করো, আমায় দয়া করো।

: কী—কী হয়েছে আন? কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

: বলো আমায় পায়ে ঠেলবে না? আন বাবুতির 'সরল পবিত্র' চোখ দিয়ে মুক্তোর বিন্দু নেমে এলো।

বিচলিত হয়ে গ্রোজ বললেন, আমার যথাসাধ্য করবো তোমার জন্য। কী হয়েছে—খুলে বলো সবটা।

অদূরে দাঁড়িয়ে আনের ঝি নিঃশব্দ কৌতুকে এই অভিনয় দেখতে লাগলো।

: আমি অন্যায় করেছি। অত্যন্ত অন্যায় করেছি। তোমাকে ভালোবেসে সবার কাছে মিথ্যে বলেছি। বিশ্বাস করো, সে শুধু তোমার প্রতি আমার অন্ধ ভালোবাসার জন্যেই করতে হয়েছে। সবার কাছে বলেছি আমার প্রেমে পাগল তুমি। এই হীরের দুল জোড়া তুমিই আমাকে উপহার দিয়েছ। এখন সবাই তোমাকে আমাকে জড়িয়ে কুৎসা রটনা করছে। নানা অপমানজনক কথা বলতেও ছাড়ছে না। তুমি আমাকে বাঁচাও—বিয়ে করো। আনের চোখের জলে গ্রোজের পা দুখানা যেন ধুয়ে যেতে লাগলো।

: ওঠো আন, কী হচ্ছে! বিব্রত, বিভ্রান্ত গ্রোজ বললেন, বেশ—তুমি যা চাইছো তাই হবে। কিন্তু আমি তো মনের দিক থেকে একটুও প্রস্তুত নই। ভাবছি—

: না—না, ভেবো না। এবার থেকে সমস্ত ভাবনার ভার আমার হাতে তুলে দাও।

বিয়ে হয়ে গেল। আর আনের দিক থেকেও বলা উচিত, বিয়ের পর আট বছর খুব সুখেই কাটলো গ্রোজের। আনকে নিয়ে পাগল গ্রোজ ছবির পর ছবি আঁকতে লাগলেন। 'গোয়ালিনী', 'ভাঙ্গা পাত্র', 'নারী ও কপোত'—আরো অনেক। প্রতিটি ছবিতেই রূপলক্ষ্মীর মতো আনের সরল সুন্দর মুখ ফুটে উঠতে লাগলো। ছবিগুলো টাকা এবং খ্যাতি দু' হাতে আনতে লাগলো। গ্রোজের স্টুডিয়ো প্যারীর সমস্ত অভিজাত নর-নারীর আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ালো। বিদেশীরা ফ্রান্সে এলেই ছুটে আসতেন তাঁর ছবি দেখতে। আকাদামির সদস্যপদও পেলেন গ্রোজ এই সময়ে।

তিনটি ছেলেমেয়ের মধ্যে একটিকে হারিয়েও তাঁরা হাসি মুখেই দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে আত্মার অন্ধকার মাথা তুলতে লাগলো আনের ভেতরে। চরিত্রে সে যেমন বিলাসিনী, তেমনি লোভী; তার ওপর মনের দিক থেকেও সে বহুবল্লভা। অর্থপিশাচী, দুশ্চরিত্রা আন একটির পর একটি প্রেমিক এনে ঘরে ঢোকাতে লাগলো। যৌবন যত চলে পড়ে, ততই যেন নাগিনী গর্জায় তার রক্তে।

মেয়েরা বড় হয়েছে, তাদের শিক্ষা দেওয়া দরকার, স্কুলে ভর্তি করাও প্রয়োজন। আন একেবারে উদাসিনী এ বিষয়ে। হাজার বললেও কোন কথায় কান দেয় না। অগত্যা গ্রোজ নিজেই গিয়ে কনভেণ্টে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে এলেন ওদের। কিন্তু দেখা শোনার সময় কই আনের? একদিন যখন গ্রোজ মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, ছোট মেয়েটি বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে বললো : "এক বছর সাত দিন হয়ে গেল, মা আমাদের এক দিনও দেখতে এলেন না।"

এতদিন কাজ আর টাকার মধ্যে অচেতন হয়ে ছিলেন গ্রোজ। আনের এই ক্রমবিকাশ কিছুই বুঝতে পারেন নি অথবা বুঝেও বোঝেন নি। বুঝতে যখন শুরু করলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

নানা দিক থেকে নানা কথা কানে আসিতে দিন দিন গ্রোজ চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

বন্ধুরা বললেন : এত টাকা রোজগার করো অথচ তোমার পরনে ছেঁড়া পোশাক কেন? টাকাগুলো কোথায় যায় হে? একটু খোঁজও করতে পার না?

: তাই তো! গ্রোজ চিন্তিত হলেন। ঘরে কি আছে খবর নিতে হচ্ছে এবার। সত্যিই তো, এত টাকা আসে তবু আনের খাঁই মেটে না কেন?

: আন, টাকাকড়ি কী আমাদের আছে, আমি সেটা জানতে চাই। এত যে রোজগার করি—

: বন্ধুরা কানে মন্ত্র দিয়েছে? আনের সুন্দর মুখ বিকৃত হলো : টাকা-কড়ির ব্যাপারে তোমার তো নাক গলাবার দরকার নেই। তুমি শিল্পী, হিসেব-নিকেশের তুমি কি জানো? ওসব আমি রাখবো। হিসেব সব ঠিক আছে।

: তা বললে তো চলবে না। টাকাপয়সার খবর আমি—

: চুপ করো তো। তোমার কাছে টাকা-পয়সার কোনো কৈফিয়ত আমি দেব না। আন দুম দুম করে পা ফেলে চলে গেল।

শিল্পী গ্রোজ বুঝলেন কোন স্ত্রীরই এই মূর্তি স্বাভাবিক নয়। টাকাপয়সা নিয়ে সে উদ্দাম জীবন-যাপন করছে এটা তিনি আগেই সন্দেহ করছিলেন, এবার নিঃসন্দেহ হলেন।

তাঁকে সবাই ভালোবাসে। প্রতিবেশীরা তাঁকে সতর্ক করে দেয় আন সম্পর্কে। বন্ধুরা সাবধান করে দেয় টাকাপয়সা সম্পর্কে। নিরুপায় গ্রোজ শুধু অসহায় দৃষ্টি মেলে ভাবেন : এখন কী করা যায়? টাকার ওপর লক্ষ্য রাখতে গেলে ঘরে আগুন লাগাবে। আন তাঁকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

এইভাবে অশান্তি ফেনিয়ে তুললে ছবি তিনি আঁকবেন কী করে? বিখ্যাত গঁকুরদের "অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী শিল্পীদের" ইতিহাসে গ্রোজের পারিবারিক অবস্থার যে ভয়াবহ ছবি আছে তা যেন অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। একটি নারী পুরুষের জীবনকে যে এমন বিষাক্ত করে তুলতে পারে, তা ধারণাও করা যায় না।

এক ছাত্র এলেন তাঁর কাছে ছবি আঁকা শেখবার জন্যে। ছেলেটি বেশ সুদর্শন।

কিছুদিন পরেই এক বন্ধু বললেন : তোমার ছবির মডেল যে স্ত্রী, যাকে তুমি তোমার শিল্পের ভেতর দিয়ে অমর করে রাখলে, তার খবর রাখো কি?

চমকে গ্রোজ বললেন : কী হয়েছে?

: সে তো তোমার ছাত্রের সঙ্গে—

: ছিঃ ছিঃ, এমন কথা মুখেও এনো না।

: আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, নিজের চোখ দুটো একটু খুলে রেখো তা হলেই দেখতে পাবে।

ঃ বেশ—আমি যতক্ষণ না স্বচক্ষে দেখছি ততক্ষণ কিছুই বিশ্বাস করবো না।

দেখলেন গ্রোজ। চমৎকার প্রেমের নাটক চলছে আন এবং তাঁর ছাত্রের মধ্যে। তাঁকে দেখে দুজনেই চমকে সরে গেল। এমন অস্বাভাবিক অবস্থায় যে তিনি আনকে দেখতে পাবেন, কখনও ধারণাও করতে পারেন নি। মনটা অশ্রদ্ধা আর বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। গ্রোজ সরে এলেন—বুঝলেন পায়ের তলার মাটি তাঁর সত্যিই টলে উঠেছে।

এইবার এক অবিশ্বাস থেকে আর এক অবিশ্বাস জেগে উঠলো। খ্যাতি প্রতিপত্তি তাঁর যথেষ্ট হয়েছে; অজস্র ছবি বিক্রি হয়, অর্থও তাঁর অনেক জমা হওয়া উচিত। কিন্তু তিনি অনুভব করছেন ফুটো পাত্রের জলের মত সেসব কোথায় চলে যাচ্ছে। তিনি যেন দিন দিন কপর্দকশূন্য হয়ে যাচ্ছেন।

ঃ আন, আমি যে এত রোজগার করলাম সেসব টাকা কোথায় গেল? টাকার অভাব তো হবার কথা নয়।

মাথা নিচু করে হাত কচলাতে লাগলো আন। যেন লজ্জায় সে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়।

ঃ ব্যাপার কী বলো তো? টাকা ছাড়া তো আর চলছে না।

আরো নির্বাক, আরো সরলতার মূর্তির মত তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন আন।

চিৎকার করে উঠলেন গ্রোজ ঃ কী ব্যাপার জানাতেই হবে তোমাকে।

ঃ আমি সমস্ত টাকা একটা জাহাজ কোম্পানীর ব্যবসায় লাগিয়েছিলাম, জাহাজ ডুবে সে কোম্পানী ফেল পড়েছে। তোমার সব টাকা নষ্ট হয়েছে। ওরা আমাকে ঠকিয়েছে।

ঃ কোথায় তার কাগজপত্র? কী নাম সে কোম্পানীর? জাহাজের কী নাম? কোন্‌খানে ডুবলো?

ঃ কিছুই মনে নেই। সেসব কাগজপত্র সব হারিয়ে গেছে। ভালোমানুষ পেয়ে ওরা আমাকে ঠকিয়েছে।

ঃ ঠকিয়েছে? তোমাকে? এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো গ্রোজের ঃ তোমার মত ঠককে কে ঠকাবে? ঠকিয়েছ তুমি আমাকেই। সর্বস্বান্ত করে পথে বসালে? পথের ভিখারী করে ছাড়লে আমায়?

আন কাঁদতে লাগলো।

এবার আর বুঝতে বাকী রইল না যে, তাঁর স্ত্রী তাঁকে দিন দিন নিঃস্ব করে দিচ্ছে। অসাধারণ উচ্ছৃঙ্খল, অমিতব্যয়ী, লোভী এই মহিলা একটি আশ্চর্য চরিত্র। এমন সচরাচর দেখা যায় না।

এদিকে সংসার আর চলে না। আন বলে ঃ ছবি আঁকো, পয়সা হবে। আর প্রাণের দায়ে ছবি আঁকেন গ্রোজ।

মানসিক অশান্তি আর যন্ত্রণায় দিন দিন [illegible] হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর আর কত ভালো হয় না। এই যন্ত্রণার ফলেই আকাদামির নিয়ম অনুযায়ী মহৎ বিষয়ের উপর ছবি এঁকে নিজের সদস্যপদকে প্রতিষ্ঠিত করবার যে রীতি আছে, সেই চিত্রটি তাঁর ব্যর্থ হয়ে গেল। আট বছর সময় লেগেছিল ছবিটা আঁকতে, কিন্তু বিচারকেরা ছবিটিকে ছাড়পত্র দিলেন না। পূর্ববর্তী সার্থক শিল্পকলাগুলোর জন্যে গ্রোজের সদস্যপদ খারিজ হলো না। কিন্তু আকাদামির প্রধান শিল্পীদের পর্যায়ভুক্ত হবার এবং আনুষঙ্গিক সব সুবিধা লাভ করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। অপমানে লজ্জায় গ্রোজ জ্বলে গেলেন। আকাদামির সম্পর্ক ছাড়লেন। বিভিন্ন সালোতে ছবির একজিবিশন চলতে লাগলো। টাকা আর জনপ্রিয়তা তখনো তাঁর নষ্ট হয় নি। কিন্তু যন্ত্রণার চিতা জ্বালিয়ে রাখলো আন—আর তিলে তিলে পুড়তে লাগলেন গ্রোজ।

বন্ধুর ছেলের বয়স পনেরো ষোলো। ছবি আঁকার হাত ভালো। বন্ধু ধরে পড়লেন ঃ তুমি যদি একটু সাহায্য করো তা হলে আমার ছেলেটা ভবিষ্যতে দাঁড়াতে পারে। বন্ধুবৎসল গ্রোজ বললেন ঃ এ আর বেশী কী? পাঠিয়ে দিয়ো।

ছেলেটি এলো। কিন্তু কি করে যেন আনের পাপচক্রে জড়িয়ে পড়লো সে। আনের বয়েস তখন পঞ্চাশ। তাঁর ছেলের বয়সী এই তরুণটি নির্বোধ ছিল না। বৃদ্ধার তরুণী সাজবার প্রয়াস এবং একে ঠকাবার পন্থা সে সহজেই বুঝতে পারলো। আনের কাছ থেকে মোটা টাকা মেরে নিয়ে সে হাওয়া হলো।

আন ছাড়বার পাত্র নয়। কোন বিষয়ে কখনও সে লজ্জিতও হতে জানে না। সে বাপকে ধরে বসলো ঃ ছেলে টাকা মেরেছে। আইনত বাবাকেই তা শোধ করতে হবে। নইলে সে অন্য ব্যবস্থা—

অসাধারণ সৎ এবং ভালো মানুষ গ্রোজের বন্ধু। সব শুনে তিনি লজ্জায় বিবর্ণ হয়ে গেলেন।

ঃ এত টাকা আপনি এতটুকু ছেলের হাতে দিলেন কেন? এমন বিশ্বাস করা আপনার উচিত হয় নি। আমি তাকে আমার বন্ধুর কাছে ছবি আঁকা শিখতে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু গলা বন্ধ হয়ে গেল ভদ্রলোকের। খানিকটা আত্মস্থ হয়ে বললেন ঃ বেশ, আমি শোধ করবো। যদি আমার জীবদ্দশায় শোধ না হয়, আমি ব্যবস্থা করে রাখছি, আমার মৃত্যুর পর আমার সব সম্পত্তি বেচেও এই ঋণ শোধ হবে। আপনার কিছু চিন্তা নেই।

কিন্তু আর সহ্য হলো না গ্রোজের। বুকটা ভেঙে গেছে যেন। এদিকে বাড়িতে সব সময় অপরিচিত পুরুষ আসছে, তারা কে জিজ্ঞেস করলেই আনের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে যায়।

একদিন একটি লোক গ্রোজকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই দরজা থেকে সরিয়ে তার বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

গ্রোজ একবার তাকালেন ঃ কে আপনি?

ঃ আপনার স্ত্রীর বন্ধু।

ঃ কই, আপনাকে তো আমি চিনি না।

ঃ তার কোন প্রয়োজন নেই—সরুন, পথ ছাড়ুন।

ঃ আমার বাড়ি যে আসবে এবং আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবে—সে আমার পরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ঃ দরকার হয় না। বলেই সে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল।

সহ্য খুব বেশী হয়ে গেছে। তার ফলেই আনের এতো বাড়াবাড়ি। ওর সঙ্গে একটু বোঝাপড়া হওয়া দরকার।

ফলে প্রচণ্ড ঝগড়া। সামান্য একটু ছোঁয়াতেই সেই সরলতার মুখোশ খসে পড়লো। প্রচণ্ড দুর্মুখ এবং নির্লজ্জ আন যা মুখে এলো তাই বলে অপমান করলো গ্রোজকে।

ঃ আমার যাকে খুশি তাকে ঘরে আনব। যা খুশি তাই করবো, তোমার তাতে কি? পরিষ্কার গলায় সে ঘোষণা করলো।

ঃ আমার স্ত্রী তুমি, যা খুশি করতে পারো না।

ঃ নিশ্চয়ই পারি। তুমি কি করতে পার।

ঃ মিথ্যে প্রবঞ্চনায় ভুলিয়ে বিয়ে করেছো। তোমার ওই ফুলের মতো সরল মুখ যে পিশাচীর মতো ভয়ঙ্কর তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

ঃ ভাবো নি? আমি তোমাকে ভাবাবো।

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে গ্রোজ ভাবতে লাগলেন ঃ না, আর সহ্য হয় না। সব কিছুরই একটা সীমা আছে। ডাইভোর্স ছাড়া আর উপায় নেই। হঠাৎ মাঝরাতে একটা প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। দেখলেন, হাতে একটা ভারী ফুলদানি নিয়ে তাঁর মাথা লক্ষ্য করে ছোঁড়বার জন্যে উদ্যত হয়েছে আন।

এক লাফে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন ঃ এ কি—এ কি—

ঃ চুপ—একেবারে চুপ করো। একটু যদি শব্দ করো, আমি চিৎকার করে পাড়া মাথায় করবো যে, তুমি মাঝরাতে আমার গলা টিপে মারতে চাইছিলে।

তবু কিছুদিন ধৈর্য ধরেছিলেন গ্রোজ। কিন্তু আন যেন তাঁকে খুন করবার সুযোগ খোঁজে। তা ছাড়া এ বয়েসেও সে বাড়িতে প্রেমিক এনে কদর্য কাণ্ড ঘটিয়ে চলে, তা সহ্য করবার শক্তি ঈশ্বরেরও থাকতে পারে না।

নিরুপায় হয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের মকদ্দমা করলেন গ্রোজ। স্বেচ্ছায় সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন সমান অংশে আনকে। তবু আনের শান্তি নেই, কেন এতটুকুও গ্রোজ নিজের জীবনধারণের জন্য রাখলেন। তার

অভিযোগ, গ্রোজ টাকা রাখবার কে? সবই তো তার।

গ্রোজের কথা যাঁরাই আলোচনা করেছেন তাঁরাই তাঁর এই ভাগ্যশনির কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর দেহে তাঁর নেমে এসেছে ব্যাধি, নেমে এসেছে অবসাদ, এসেছে মৃত্যুর কালো ছায়া।

দেখা দিল ফরাসী বিপ্লব। সেই বিপ্লবে অভিজাত-তন্ত্রের সঙ্গে গ্রোজেরও সমাপ্তি হলো। নতুন কালের মন আর তাঁর ছবি চায় না। এক গৌরবহীন বার্ধক্যে, পরিপূর্ণ নিঃস্বতায় গ্রোজ মৃত্যুর মধ্যে হারিয়ে গেলেন।

কে দায়ী তার জন্যে, মাদাম গ্রোজ? না ডিউক-নন্দিনীর অভিশাপ? কে বলবে?

আন বাবুত্তির অপরূপ মুখশ্রীতে উজ্জ্বল একটি ছবি ছেপে দেওয়া হলো এই সঙ্গে। দুটি কপোত নিয়ে শান্তিময়ী কিশোরীর মতো বসে আছেন মাদাম গ্রোজ। ছবিটি আঁকবার সময় গ্রোজ কি কল্পনাও করতে পেরেছিলেন তাঁর জীবনের কি নিষ্ঠুর রসিকতা এর মধ্যে দিয়ে অমর হয়ে রইলো!

চিত্রকলায় আধুনিকতা : ২

খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকে ১৯ শতকের শেষ অবধি চিত্রকলা, বৃহত্তর অর্থে দৃশ্য শিল্প, যে রুদ্ধ দ্বারে বন্দী ছিল, তা হঠাৎ বিশ শতকে উন্মোচিত হয়েছে। আজকের আলোচনার প্রতিপাদ্য এই। চিত্রকলার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে আমরা বেঁচে আছি এ কথা উপলব্ধি করবার জন্য ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের শরণাপন্ন হবার প্রয়োজন নেই—নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে বিষয়টা বিশ্লেষণ করলেই কারণগুলো স্পষ্ট হবে।

গ্রীক নাটকে মঞ্চে তীব্র আবেগের দৃশ্য দেখানো হ'তো না। ঈডিপাস যখন স্বহস্তে নিজের চোখ উপড়ে নিলেন, হিপোলিট যখন গুঁড়িয়ে গেলেন নিজের রথের তলায় অশ্বখুরে পিষ্ট হয়ে, কিংবা উন্মাদিনী মিডিয়া আপন সন্তানদের কোতল করলেন, সেসব মঞ্চে আমরা দেখতে পেলুম না, কোনো দূত বা কোরাস দীর্ঘ বিবরণী দিল তার এসে। এবং এইসব উত্তুঙ্গতারের দৃশ্য কখনো নাটকের কথোপ-কথনের মাধ্যমে বর্ণিত হ'ত না, দেবভাষার কবিতার মাধ্যমে তা শোনানো হত।

আপাতত নাটকগুলো পড়ে মনে হতে পারে এই শৈলি নিতান্তই কনভেনশন, কবিরা তৈরি করেছেন তাদের কবির প্রতিভার অনুশীলন হিসেবে। কিন্তু সব সময়ে লিখিত আরিস্টটলের 'পোয়েটিকস'-এ, যেখানে লেখক এইসব নাটকের মধ্য দিয়ে শিল্পের রসতত্ত্ব আলোচনা করেছেন, দেখা যায় এই কনভেনশনের পেছনে গভীর মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য রয়েছে। তাৎপর্যটি কী বিশ্লেষণ করলেন প্রথম হোরাস, এবং তাকে অনুসরণ করে রেনেসাঁস তাত্ত্বিকরা এবং পরবর্তী যুগে ফরাসী নিও-ক্লাসিসিস্ট বোয়ালো, লেসিং প্রভৃতি।

আরিস্টোটল বলেছিলেন, শিল্পকলা (সাধারণ অর্থে) হ'ল প্রকৃতির প্রতিবিম্ব। কিন্তু প্রকৃতিকে কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই, শিল্প এই অনুকরণকে রূপ দেয়ে বলে, প্রকৃতি তার কাছে বশবর্তী। (প্রকৃতি বলতে যে আরিস্টোটল বিভূতিভূষণ বা ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত শুধু ফুল, পাখি আর শিশু বুঝছেন না সেটা বলবার দরকার নেই।) প্রকৃতি অর্থ বাস্তব, যা কিছু জন্মায়, হয়, তাই—সে মনুষ্য আবেগও হতে পারে, ঈডিপাসের চোখ উপড়ে নেওয়া এই বিশেষ কর্মটিও হতে পারে। এখন শিল্পের প্রথম কর্তব্য হল প্রকৃতি বা বাস্তবকে সম-আবেগমণ্ডিতভাবে প্রকাশ করা। কিন্তু আরিস্টোটল বলছেন, প্রকৃতিতে এমন উত্তুঙ্গতারের এবং উল্টোদিকে এমন মৃদু অনুরণনের আবেগ রয়েছে যেটা সব শিল্পমাধ্যমের পক্ষে ধরা সম্ভব নয়। ধরতে চেষ্টা করার ধৃষ্টতা হাস্যকর হবে যেমন হাস্যকর হয় আমার উঁচুপর্দায় বা খুব খাদে গান গাইবার চেষ্টা।

অর্থাৎ প্রকৃতির আবেগের স্কেল যদি এক থেকে একশো হয় তাহ'লে এক এক শিল্পমাধ্যম এক এক গাইয়ের মত তার একটি অংশ প্রতিবিম্বিত করতে সক্ষম। আরিস্টোটল বলছেন, সঙ্গীত এই স্কেলের সর্বাপেক্ষা জমি আয়ত্তে আনতে সক্ষম কারণ সকল শিল্পমাধ্যমের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতীক-নির্ভর তা, তারপর কবিতা, তারপর দৃশ্য শিল্প।

কবিতা বা সঙ্গীতের সঙ্গে চিত্রকলার সবচেয়ে বড় তফাত হ'ল একটি সময়পট-নির্ভর (sequence intime আরেকটি পরিসরপট-নির্ভর (sequence in space)। বাস্তবধর্মী শিল্প যেহেতু বিশাল প্রকৃতিকে স্বল্প পরিসরে যথার্থ রূপে দেবার চেষ্টা করে; অর্থাৎ প্রকৃতিকে প্রতীক মাধ্যমে রূপান্তরিত না করে সাধারণ অনুকরণের চেষ্টা তার; সেহেতু তার ভূমি বা বিচরণ ক্ষেত্র স্বল্প পরিসর হেতু সীমাবদ্ধ। কিন্তু কবিতা এবং সঙ্গীত প্রতীক নির্ভর, এবং তার কাজ ঠিক আতস কাচের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলোকে কেন্দ্রীভূত করে অগ্নি উৎপাদনের মত। অর্থাৎ কবিতা এবং সঙ্গীত প্রতীকের সাহায্যে তাদের পরিধির অতিক্রম করছে যেটা চিত্রকলার পক্ষে সম্ভব নয়। এবং এই কারণেই আরিস্টটল থেকে হোরাস, হোরাস থেকে বোয়ালো এবং লেসিং পর্যন্ত, এমন কি তৎপরবর্তী যুগেও চিত্রকলাকে দুর্বলতম শিল্প-মাধ্যম বলা হয়েছে। এ কথা ভুললে চলবে না চিত্রকলা তাদের কাছে ছিল বাস্তবের যথাযথ অনুকরণ মাত্র।

কিন্তু এই ধারণা এক্সপ্রেশনিস্ট পরবর্তী যুগ অপ্রমাণ করেছেন। বিশ শতকে এসে শিল্প আবিষ্কার করেছে এতদিন সে শুধু সীমিত চক্রের গণ্ডিতে আটকে ছিল, এখন প্রয়োজন দ্বার উন্মোচনের। প্রয়োজন মাধ্যমের ক্রান্তি, কবিতার প্রতীকের মত চিত্রকলার প্রতীক নির্মাণ। ভাবতে হাসি পায়, ইম্প্রেশনিস্টরা অচেতনভাবে এই সীমিত উপলব্ধি ক'রে বড় বড় ক্যানভাস আঁকতেন, যেন পরিসর বাড়লে শিল্পের পরিধি বাড়বে। তৎপরবর্তী যুগও অচেতনভাবে উপলব্ধি করে তা, কিন্তু তারাও বড় ভুল পথে চালিত হলেন—সাহিত্যের প্রতীক চিত্রকলায় আরোপ করে এক্সপ্রেশনিস্টরা ব্যর্থ হয়ে ফিরলেন। এই উপলব্ধি কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা বিবেচিত হ'ল শিল্পীদের কাছে ক্রমশ, অতএব সম্পূর্ণ নাকচ করার দরকার হ'ল বাস্তবতাকে; চিত্র-কলার নতুন ভাষা তৈরি করা এখন অবশ্য মান্য।

এই নতুন ভাষা হ'ল 'বিমূর্ত শিল্প', বিশ শতকের অবদান। খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকে ১৯ শতকের শেষ অবধি চিত্রকলা, বৃহত্তর অর্থে দৃশ্যশিল্প, যে রুদ্ধদ্বারে বন্দী ছিল, এই শতকে তা হঠাৎ উন্মোচিত হয়েছে—এটা বোধ হয় আর খুব ভুল কথা নয়।

'আধুনিক চিত্রকলা' পর্যায় এইখানেই শেষ হ'ল।

শুদ্ধশীল বসু

২৫,০০০ টাকা জিতুন

একটি ১ম পুরস্কার ১০,০০০ টাকা
দুটি ২য় পুরস্কার গোদরেজ রেফ্রিজারেটর
তিনটি ৩য় পুরস্কার গোদরেজ [illegible]
দুটি ৪র্থ পুরস্কার ফিলিপস্‌ ট্রানজিস্টর
৩০০টি সান্ত্বনা পুরস্কার—একটি করে পাইলট পেন সেট

আপনি কি গোদরেজ স্যাণ্ডল লাকশারি সাবান "চিত্রতারকাদের নাম বলা" প্রতিযোগিতায় ইতিমধ্যে যোগদান করেছেন? যদি না করে থাকেন, তবে দেরী না করে স্থানীয় ডীলারের কাছ থেকে প্রবেশপত্র চেয়ে নিন এবং আজই সেটি পূরণ করে পাঠিয়ে দিন।

গোদরেজ স্যাণ্ডল লাকশারি সাবান
"চিত্রতারকাদের নাম বলা"
প্রতিযোগিতায় যোগদানের
শেষ তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৭।

বাংলা গদ্যের প্যারাগ্রাফ

"এ কী!
এ কী অবিশ্বাস্য!
এ কী সাংঘাতিক!
এ কী করে সম্ভব হলো?"

এই চারটি লাইন গত শতাব্দীর কোনো বাংলা থিয়েটারের বিজ্ঞাপন নয়, ১৯৬৭ সালের পূজো সংখ্যার একটি উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত। পূজো সংখ্যাগুলির সাহিত্য মূল্য নিয়ে কোনোরূপ আলোচনা থেকে নিবৃত্ত হচ্ছি। বাংলা গদ্যের প্যারাগ্রাফ সাজাবার যে নতুন ধরণের সম্প্রীতি চোখে পড়ছে সে সম্পর্কে দু' চারটি কথা বলতে চাই।

পুজো সংখ্যাগুলি বেলুনের বাতাস এবং ধূমকেতুর মতন প্রাকৃতিক ঘটনা হয়ে গেছে, কিনতে হয় না, চুরি করতে হয় না, শুধু আপনা আপনিই আসে। বেরিবেরি রোগীর মতন বিসদৃশ চেহারার বহু পূজো সংখ্যা উইপোকা ও আরশোলার হাতের কাছে কোনোরকমে এসেছে। আমারও এসেছিল এবং কৌতূহলবশত প্রায় সবগুলিই পড়ে দেখেছি। একটা অবাক জিনিস লক্ষ করলুম। আগে যে শুনেছিলুম, অধিকাংশ পত্রিকাতেই নাকি ১২/১৪ পাতার গল্পকে উপন্যাস বলে চালানো হয়—সেটা দেখা গেল সত্যি নয়। অধিকাংশ উপন্যাসই ৭০/৮০ পাতার। কিন্তু ভালো করে পড়তে গিয়ে বোঝা যায়, এর মধ্যেও কারচুপি আছে। ছেলেবেলায় ব্যাকরণ পণ্ডিতমশাই যত জোরে আমাদের কান টানতেন, অনেক জনপ্রিয় লেখক-লেখিকাই তাঁদের গল্পকে তার চেয়ে অনেক বেশী টেনে বাড়িয়েছেন, বেশী ফোলাবার পর শেষ পর্যন্ত বেলুন ফেটে একেবারে চুপসোনো। কাহিনী সম্পর্কেও না হয় মন্তব্য নাই করলুম, কিন্তু যেটুকু এক পাতায় লেখা যায়—তাও লাইন ভেঙে ভেঙে তিন পাতায় সাজানো। লেখক না প্রকাশক—কে এর জন্য দায়ী, তা ঠিক জানি না। কিন্তু যে-সব লেখকদের এই রকম লাইন ভাঙা সিঁড়ি ভাঙা রচনা—তাঁরা কেউই এর কোনো প্রতিবাদ করেন নি, সুতরাং আমরা আপাতত লেখকদেরই দায়ী করবো।

যতদূর জানি, এই লাইন ভাঙার কারচুপি প্রথম শুরু করেন যাবতীয় কুসাহিত্যের সম্রাট নীহাররঞ্জন গুপ্ত। বড়ই দুঃখের বিষয়, অনেক সত্যিকারের ভালো লেখক-লেখিকাও এখন এ পথে পা বাড়িয়েছেন। এখানে স্পষ্ট করে বলা দরকার, এর মধ্যে কোনো নতুন স্টাইল বা বিশেষত্ব ফোটাবার চেষ্টা নেই, একমাত্র উদ্দেশ্য পাতা বাড়িয়ে পাঠকদের ঠকানো। খাদ্য এবং রাজনীতিতে এখন যে ভেজাল চলছে তারই পরিপূরক এই সাহিত্যের ভেজাল। বই-এর আকার অনুযায়ী তার দাম হয়, দু' শো' পাতার একখানা বই-এর দাম অন্তত ছ' টাকা, এত দাম দিয়ে বই কেনার সামর্থ্য আজকাল খুব কম লোকেরই আছে, তারপরও যদি জানা যায়, দু' শো পাতার বইখানা আসলে এক শো' কি দেড় শো' পাতা হওয়া উচিত ছিল আসলে, তখন পাঠক হিসেবে আমাদের একদিন না একদিন প্রতিবাদ করতেই হবে। আমাদের দেশে কাগজের অভাব, ক্রয় ক্ষমতা কম, অথচ এখনই বেশী মোটা মোটা বই বেরুচ্ছে। সব মোটা লোকের মধ্যেই একজন রোগা লোক ঘুমিয়ে থাকে—সম্ভবত জেমস থারবার এ কথা বলেছেন, সেই অনুসারে বলা যায়, এই সব মোটা বইয়ের মধ্যে আসল বইটা খুবই রোগা। উদাহরণ দিচ্ছি :

একটি মাত্র যাতায়াতের পথ।
কুড়ি পঁচিশটা ঘর।
ঘরে ঘরে সব ভাড়াটে।

এই অকিঞ্চিৎকর কথাগুলিকে তিনটে আলাদা লাইনে সাজাবার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? জোচ্চুরি ছাড়া? প্যারাগ্রাফ সাজাবার

কি কোনো সামান্যতম আদর্শও নেই? প্যারাগ্রাফের অতি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা এই : A distinct section of a 'chapter dealing with a particular point. অথচ :

তা বটে।

তা ফেলা যায় না বটে।

সেই কথাই ভাবে সবাই।

পর পর এই তিনটি বাক্যকে তিনটি আলাদা লাইনে সাজাবার কি আলাদা আলাদা পয়েন্ট আছে, ভেবে আমরা পাঠকরা হতবুদ্ধি হয়ে যাই। আধুনিক কবিতাও এত দুর্বোধ্য নয়। আরও উদাহরণ দিচ্ছি :

সুরূপার পিছে পিছে সবাই নেমে এলো।

নাঃ মাত্রই ট্যাক্সি মিললো না।

এই দুটি বাক্যও আলাদা প্যারাগ্রাফে সাজানো হয়েছে। উদাহরণগুলি আমি হাতের সামনের যে-কোনো পত্রিকা থেকে নামকরাদের লেখা থেকে তুলে দিচ্ছি। বর্ণনার এ রকম প্যারাগ্রাফ সাজাবার তো কোনো যুক্তিই নেই। তার ওপর আছে সংলাপ। বাংলায় সংলাপ পর পর আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদে লেখাই রীতি হয়েছে—সুতরাং, আজকালকার গল্প-উপন্যাসে সংলাপের বাহুল্য। নায়ক অফিসে বেরুচ্ছে—এর বর্ণনা দিতে হলে বঙ্কিমচন্দ্র লিখতেন, 'নিশানাথ আদালতের বেশভূষায় সজ্জিত হইতে লাগিলেন।' রবীন্দ্রনাথ লিখতেন, 'নিশানাথ মাথায় শামলা এঁটে তৈরী হলেন, তারপর ধীর পদক্ষেপে বৈঠ-দালান পেরিয়ে রৌদ্র ঝলসিত দেউড়ির সামনে এসে জুড়ি গাড়িতে চাপলেন।' শরৎচন্দ্র হলে লিখতেন, 'নিশানাথ কাছারিতে যাইবার জন্য যাত্রা করিয়াও কী মনে করিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। মায়ের পূজার ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া চক্ষু মুদিয়া গৃহ দেবতাকে প্রণাম করিলেন।' ঠিক এই ঘটনাটিই এবারের পূজা সংখ্যার একটি লেখা থেকে তুলে দিচ্ছি :

—দাদাবাবু, বেরুচ্ছেন।

—হুঁ।

—আপিসে যাচ্ছেন?

—হুঁ।

—আজ আপিস আছে বুঝি?

—বাঃ, অফিস থাকবে না? আজ কী বার?

—শুক্রবার।

—তবে?

—কালো জুতোটা এনে দেবো?

—না, আজ এই খয়েরিটাই পড়বো...

ইত্যাকার এক পৃষ্ঠা। গোয়েন্দা গল্প নয়, সীরিয়াস ভঙ্গির উপন্যাস, এবং সমগ্র উপন্যাসে কোথাও শুক্রবার কিংবা কালো জুতো খয়েরি জুতোর কোনো তাৎপর্য নেই। একটি পৃষ্ঠা বৃদ্ধিই এর সিদ্ধি।

বাংলায় সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের সদ্য রচিত একটি উপন্যাস থেকে কিছু উদাহরণ এখানে তুলে দিচ্ছি। শুধু প্যারাগ্রাফ ভাঙা আর সংলাপের সিঁড়িই নয়, এর সঙ্গে আছে পুনরুক্তি। একই দৃশ্য বা ঘটনা তিন জায়গায় বলা। সাম্প্রতিক লেখা থেকে একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি :

নানী বেগম সাহেবা এসে ডাকলে—মুমতাজ—

—কি নানীজী।

—ফিরিঙ্গি হেকিম এসেছিল?

—হ্যাঁ নানীজী।

—দাওয়াই দিয়েছে?

মুমতাজ বললে—দাওয়াই পাঠিয়ে দেবে বলে গেছে।

—কি বললে দেখে ফিরিঙ্গি হাকিম?

এই পুরো সংলাপ অংশটিই সম্পূর্ণ অবান্তর এবং অর্থহীন, কারণ, এর বেশ কয়েক পাতা আগেই আমরা জেনে গেছি যে ফিরিঙ্গি ডাক্তার এসেছিল এবং সে দেখে কী কী বলে গেছে, তা কিছুই আমাদের জানতে বাকি নেই। এখন পরে যদি অন্য কেউ এসে আবার জিজ্ঞেস করে সেই কথা—তবে কি পাঠককেও তা আবার শোনাতে হবে? শুধু তাই নয়, ফিরিঙ্গি ডাক্তার ফিরে গিয়ে বন্ধুদের কাছে বর্ণনা করছে সে কি দেখে এলো—সেখানেও আবার সবিস্তার লেখা হয়েছে, ঐ একই ঘটনা।

একটা গল্প শুনেছিলুম একজন বিদেশী লেখক সম্পর্কে। অনেক ইংরেজ লেখক লেখার শব্দ সংখ্যা অনুযায়ী টাকা পান। সেই রকম একজন লেখক একটা উপন্যাস লিখে প্রকাশককে দিলেন। শব্দ সংখ্যা গুণে দেখা গেল, তাঁর প্রাপ্য হয় পাঁচ শো পাউন্ড। কিন্তু লেখকের বিশেষ দরকার এক হাজার পাউন্ড। তিনি প্রকাশককে বললেন, আমার পাণ্ডুলিপিটা একটু ফেরত দিন, কিছু বদলাতে হবে। আগামী সোমবার আবার নিয়ে আসবো। বাড়ি গিয়ে লেখক তাঁর উপন্যাসের নায়ককে তোতলা করে দিলেন।

পুজো সংখ্যার অনেক লেখা পড়ে মনে হলো, পাত্র-পাত্রীরা তোতলা না হোক জড়-ভরত প্রায়। এক একটা কথা দু' তিনবার করে না বললে মাথাতেই ঢোকে না। নাকি লেখকদের ধারণা, পাঠকরাই জড় ভরত?

*

এবার সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন গোয়াটেমালার লেখক মিগুয়েল আসতুরিয়াস। একটি কথা অকপটে স্বীকার করি, আমরা এই লেখকের কোনো রচনা সম্পর্কে একেবারেই পরিচিত নই। আশা করা যায় বিদেশী পত্র-পত্রিকায় এঁর সম্পর্কে নানা রচনা এখন বেরুতে শুরু করবে, এবং সেইগুলো হাতে পেয়ে নিয়ে আমরাও অবিলম্বে এই লেখক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবো।

[illegible] পাঠক

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ১৯৬৭

নকুল চট্টোপাধ্যায়

সুইডিশ একাডেমী অব লেটারস ঘোষণা করেছেন যে, এ বছর সাহিত্যের জন্য স্প্যানিস-আমেরিকান কবি ও ঔপন্যাসিক মিঃ মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল আস্তুরিয়াসকে নোবেল-পুরস্কারে ভূষিত করা হল। একাডেমী লেখককে এই সম্মানে ভূষিত করেছেন:

"..for his highly coloured writings rooted in a national individuality and Indian traditions."

পুরস্কারের সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯শে অক্টোবর স্টকহলম থেকে। কোন কোন সংবাদপত্র এ পুরস্কারকে মিঃ আস্তুরিয়াসের 'জন্মদিনের উপহার' বলে অভিহিত করেছেন। এই পুরস্কারকে জন্মদিনের উপহার বলে গণ্য করা হবে কিনা সে সম্পর্কে দ্বিমত আছে। কারণ, আলোচ্য লেখকের জন্মদিন (স্প্যানিশ এনসাইক্লোপেডিয়া অনুযায়ী) হচ্ছে ১০ই অক্টোবর ১৮৯৯; ১৯শে অক্টোবর নয়। মিঃ আস্তুরিয়াস বর্তমানে ৬৮ বৎসর পূর্ণ করে ৬৯ বৎসরে পদার্পণ করেছেন।

মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল আস্তুরিয়াস আধুনিক স্প্যানিশ-আমেরিকান সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় লেখক। তাঁর রচনায় গুয়াতেমালার ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজ, আচার-ব্যবহার, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা—সমস্তই জীবন্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সমালোচকের ভাষায়—

"All that defines a generation's countenance and content is found in the individual work—style, structural form, themes, the human condition, and anguish of an era"—

এক কথায় যুগযন্ত্রণার অভিপ্রকাশ ঘটেছে আস্তুরিয়াসের সাহিত্যে।

মিঃ আস্তুরিয়াস সেন্ট্রাল-আমেরিকার গুয়াতেমালার কবি ও ঔপন্যাসিক। গুয়াতেমালার আঞ্চলিক ভাষা ও স্প্যানিশ ভাষায় তাঁর সমান দক্ষতা। সাহিত্যিক জীবন শুরু করেছিলেন গীতিকবি হিসেবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে এবং সমাজের দুঃখ, দুর্দশা, দৈন্য এবং হাহাকার তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছিল উপন্যাস লিখতে। তাই কবিতা ছেড়ে তিনি উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। উপন্যাস বলেই যে তা একান্ত গদ্যময় রচনা তিনি সৃষ্টি করলেন এমন নয়। তাঁর উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে হবে যেন কোন সমাজের দুঃখ, দুর্দশা ও শোষণের কাহিনীই কাব্যের মাধ্যমে পাঠককে শোনান হচ্ছে। আস্তুরিয়াসের উপন্যাস সামাজিক শোষণ ও অত্যাচারেরই জীবন্ত প্রতিবাদ।

কোন কোন সমালোচক মিঃ আস্তুরিয়াসকে 'পলিটিক্যাল নভেলিস্ট' বলেও অভিহিত করেছেন। কারণ হিসেবে তাঁরা বলেছেন:

The constant themes of his novels are political dictatorship (Estrada, Cabrera, Ubico, and others) and the abuses of the North American Corporation, the United Fruit Company".

প্রসংগত বলা যায় যে, বর্তমানে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—রাজনৈতিক সমস্যা তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়বস্তু হলেও তাঁকে পলিটিক্যাল 'নভেলিস্ট' বলা হবে কিনা—এই বিষয়টি তর্ক-সাপেক্ষ বলেই মনে হয়।

আস্তুরিয়াস লেখাপড়া করেছেন গুয়াতেমালা ও প্যারীতে। নৃতত্ত্ব ও প্রাচীন সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ইতিহাস বিষয়ে তিনি যথেষ্ট পড়াশোনা করেছেন। প্যারীতে থাকাকালীন তিনি যখন 'মায়া-সভ্যতা' সম্পর্কে বিশেষ গবেষণায় রত সেই সময়েই তিনি রহস্যময় 'মায়া-সভ্যতা'র গভীর তত্ত্ববহুল কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত "লিজেন্ডস অব গুয়াতেমালা" গ্রন্থে। গ্রন্থটি গুয়াতেমালার অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনেরই রূপায়ণ। সাহিত্য-সমালোচক Carleton Beals তাঁর "Roots of Latin American Literature" প্রবন্ধে লিখেছেন—

"Latin American Literature stems from a richer, more intricate heritage than is available in nearly any other part of the globe"

তিনি আরও লিখেছেন যে,

"Guatemalan Spanish is encrusted with Maya-Quiche expressions'.

আস্তুরিয়াসের রচনা উক্ত বৈশিষ্ট্যেরই জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

তিনি যে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন তার নাম—

"Poesia. Sien de alondra", 1949 [Poetry, Palse of the Skylark] কাব্যসংকলন এবং

"Ejercicias poeticas en forma de soneto sobre temas de Horacio, 1951 [Poetical exercises in the form of sonnet on themes from Horace]. প্রথম কাব্যগ্রন্থটিতে কবিমনের রুচির পরিবর্তন, গ্রাম্য-জীবনের চিত্র, খণ্ড খণ্ড চিন্তাধারা ও মাতৃভাষার প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণের নজির আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে কবিমনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে বলে সমালোচকরা মনে করেন না। এই বইটি পড়ে অনেকে তাঁকে "poet of minor tone" বলেও আখ্যায়িত করেছেন। তবে সমালোচকরা যে সর্বদাই নির্ভুল সমালোচনা করেন এমন কথা আমরা মনে করি না।

লেখককে যশস্বী করেছে তাঁর উপন্যাস। যে উপন্যাসটি আস্তুরিয়াসকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করেছে সেটি হচ্ছে "মিঃ প্রেসিডেন্ট", ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি "শ্রেষ্ঠ বিদেশী গ্রন্থের পুরস্কার" অর্থাৎ "French Prize for the best foreign book" এই আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে। পরবর্তীকালে ঠিক বারো বছর পর ১৯৬২-৬৩ সালে গুয়াতেমালার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে এই উপন্যাসটি "উইলিয়ম ফকনার ফাউণ্ডেশন ল্যাটিন আমেরিকান নভেল অ্যাওয়ার্ড"—পুরস্কারও পান। এই পুরস্কার সেই সমস্ত উপন্যাসকেই দেওয়া হয় যা ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়নি। পুরস্কার-কমিটির একটি বৈশিষ্ট্যও আছে। এই পুরস্কার-কমিটির জুরীদের বয়স কোনক্রমেই ৩৫ বৎসরের বেশী নয়। আর প্রত্যেকেই সমসাময়িক লেখক বা সমালোচক। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে,

"... Youngsters are best able to evaluate the work of their contemporaries, none of the judges will be older than 35 years".

"মিঃ প্রেসিডেন্ট" উপন্যাসটি দুষ্ট-ব্যাধিগ্রস্ত আমেরিকার অর্থাৎ গুয়াতেমালারই প্রতিচ্ছবি। স্বৈরতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র সম্পর্কে লেখকের মানসিক ভীতিরই নিখুঁত ছবি আঁকা হয়েছে এই উপন্যাসে। হয়ত উপন্যাসটি লেখার সময় এসট্রাডা ক্যাবেরেরার কথা তাঁর মনে হয়েছিল কিন্তু এটি কোন ডিক্টেটারের জীবনী নয়। ডিক্টেটরশিপের প্রতি শ্লেষই প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাসটিতে। সরকার বা শাসনযন্ত্রের অমনোযোগিতার ফলে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ব্যাধির সংক্রামণ ঘটে এবং যার ফলে সামাজিক জীবদের বাধ্য হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি ও পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয় বা যা মাতাল হয়ে উচ্ছৃংখল জীবনযাপন করতে প্ররোচিত করে সেই সরকারী শাসন-ব্যবস্থার প্রতিই তিনি এই উপন্যাসে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। লেখক শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে প্রতিটি ঘটনা এমন জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, পাঠকদের মনেও সরকারী শাসনযন্ত্র বা শাসকগোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণা ও দ্বেষের সঞ্চার করতে বাধ্য। লেখক সামাজিক ঘটনাকে তাঁর কল্পনাশক্তির সাহায্যে এমন একটা রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন যে, উপন্যাস শেষে পাঠকের মন ভরে ওঠে। উপন্যাসের ভাষা সহজ সরল কিন্তু স্থানবিশেষে আলংকারিক ভাষা ব্যবহারেও লেখক কার্পণ্য করেননি। গল্পকে ঠিক গল্পের মতই পাঠকদের কাছে পৌঁছাবার জন্যে ঔপন্যাসিকের কোন ত্রুটিই এখানে পাওয়া যাবে না। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে পাঠক নিজেই নায়ক হয়ে পড়েন।

আস্তুরিয়াসের "Hombres de maiz", 1949 [Men of Corn] হচ্ছে গল্পগ্রন্থ। এই গল্পগ্রন্থে যারা নিজেদের উদরান্নের সংস্থানের জন্যেই চাষবাস করছে তাদের সংগে যারা মুনাফার জন্য কৃষিকাজ করছে এবং যার ফলে ভূমির উর্বরতাশক্তি বা উৎপাদন-শক্তি নষ্ট হচ্ছে এই দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, সাধারণ মানুষ ও বিত্তশালী মানুষের মধ্যে যে শ্রেণী-সংগ্রাম চলে আসছে তারই কাহিনী তিনি এখানে পরিবেশন করেছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খ্যাতিমান অনেক সাহিত্যিকই যেমন "ত্রি-বর্গ" উপন্যাস লিখেছেন তেমনি আস্তুরিয়াসও ট্রিলজি বা ত্রিবর্গ উপন্যাস লিখেছেন। লেখকের ট্রিলজির প্রথম অংশটি "Viento fuerte", 1950 [strong wind], দ্বিতীয়টি "Papa Verde", 1954 [Green pope] এবং তৃতীয়টি "Los ojos de los enterrados", 1960 [The eyes of the interred] নামে প্রকাশিত হয়েছে। এই ত্রিবর্গ উপন্যাসে গল্পের চেয়ে সমাজতত্ত্বই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। উপন্যাসের উদ্দেশ্য আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী লোলুপতা ও চিন্তাধারার প্রতিবাদ। তত্ত্বের ভারে গল্পাংশ ক্ষুণ্ণ হলেও লেখক তার কাব্যপ্রতিভা ও ভাষার সাহায্যে সে দোষ ঢেকে দিয়েছেন।

ত্রিবর্গ উপন্যাস লিখতে লিখতে তিনি আরেকটি গল্পের বই লিখেছেন। সেটি হচ্ছে "Week-end en guatemala" 1956 [Week-end in guatemala] এটি লেখকের রাজনৈতিক চিন্তাধারারই ফল।

১৯৬১ সালে "El Alhajadito", [The Little jeweled Boy] গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। শৈশবের সুখময়, নির্মল স্বর্গীয় ভাবসম্পন্ন জীবনের কথাই এখানে বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থে লেখকের কল্পনাশক্তির চরম বিকাশ ঘটেছে। এটি কাব্যের চেয়েও সুখপাঠ্য।

আস্তুরিয়াস উপন্যাস ও কাব্যগ্রন্থই শুধু লেখেননি। ভ্রমণ-গ্রন্থকার হিসেবে "Bolvia : an undiscovered Land", 1961 গ্রন্থটিও লিখেছেন। বইটি ছবিতে ভরা।

ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালী হিসেবে আমাদের বিশেষ গর্বিত ও আনন্দিত হবার মতও তিনি একটি কাজ করেছেন। শ্রীভবানী ভট্টাচার্য বাঙালী লেখক। তাঁর ইংরেজী উপন্যাস "He who rides a tiger" গ্রন্থটি তিনি ভ্রমণ-অনুবাদক হিসেবে অনুবাদ করেছেন। বইটির টাইটেল হচ্ছে "El que cabalga un tigre" (novela Hindu)

কিউবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ-সাহিত্য পুরস্কারের নাম "Casa de Las Americas"। স্প্যানিশ ভাষার প্রতিষ্ঠিত লেখকরাই হচ্ছেন এই পুরস্কার কমিটির জুরী। মিগুয়েল আঙ্গেল আস্তুরিয়া এই কমিটির একজন সম্মানিত সভ্য বা জুরী। আস্তুরিয়াস শুধু যে তাঁর সাহিত্য কীর্তির জন্য সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন তা নয়। সামাজিক ব্যাধি দূর করার প্রচেষ্টায় তাঁর পরিশ্রমের শেষ নেই। তাই বোধ হয় বলা হয়েছে যে,

"At any rate, alongside the artist constantly goes the great fighter, so necessary in his country and in all America".

আমরা আস্তুরিয়াসকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানাই।

বর্ধমান। মূল্য ১·৫০।

বর্ধমানের সংস্কৃতি সংস্থা বৈঠকী সংঘের এই মুখপত্রখানি সুখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ। এর লেখক-তালিকায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য নামগুলি হচ্ছে : কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রেজাউল করিম, শৈলবালা ঘোষজায়া, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অজিত ভট্টাচার্য, বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত, আবদুল গণি খান প্রভৃতি।

বিচিত্রা। সম্পাদক : নলিনীকুমার চক্রবর্তী, সুব্রত রাহা ও জীবন ভৌমিক। ৬৫ তর্ক সিদ্ধান্ত লেন, বালি, হাওড়া। মূল্য ২·০০।

সুপাঠ্য রচনা এবং আঙ্গিক সৌষ্ঠবে 'বিচিত্রা' সাহিত্যরসিকদের পরিতৃপ্ত করার মত একটি প্রকাশন। প্রবন্ধ, কবিতা, ছোট গল্প ও পথ-নাটিকা—সব কটিরই বিষয়-বস্তু নির্বাচন ও পরিবেশনে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। এই নিজস্বতার জন্যই সংখ্যাখানি সমাদর পাবার যোগ্য।

যষ্টিমধু। সম্পাদক : কুমারেশ ঘোষ। ৪৫।এ গড়পার রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·০০।

'যষ্টিমধু'র এই বার্ষিক সংখ্যাখানি প্রতিবারের মত এবারও একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। দেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবার পরিবেশিত হয়েছে শুধু এমন সব হাসির গল্প যা পড়ে হাসবার সঙ্গে পাঠকের চিন্তাকেও সচেতন করে তোলে। লেখকদের ব্যক্তিগত জীবনে সংঘটিত সত্যিকার হাসির ঘটনা গল্পচ্ছলে পরিবেশিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে আছে বহু কার্টুন যা ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে বর্তমান জীবনধারার নানা দিকের প্রতি দৃষ্টি সজাগ করে তোলে। বহু লেখকের মধ্যে বিশেষভাবে নাম-করা যাঁরা তাঁরা হলেন বনফুল, মন্মথ রায়, আশাপূর্ণা দেবী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নরেন্দ্র দেব, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ভবানী মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, বোম্মানা বিশ্বনাথন, সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রভৃতি। কার্টুন আঁকিয়েদের মধ্যে আছেন ওমিও, অগুস্ত, চিত্ত, কান্তিতুবার, সুকুমার, শতদল, শৈল চক্রবর্তী, কাজি, সুধীর প্রভৃতি।

সবুজ কলি। সম্পাদক : উৎপল হোমরায়। ২বি রামকৃষ্ণ বাগচী লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ০·৫০।

ছোটদের মনোরঞ্জন করার উপযোগী গল্প, রূপকথা, জীবনী ও কবিতা এতে লিখেছেন মৌমাছি, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, ভৈরবপ্রসাদ হালদার, শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দদুলাল সরকার, প্রভাসরঞ্জন দে, সত্যব্রত বসু এবং আরো অনেকে। একেবারে শিশুদের জন্যও একটি স্বতন্ত্র বিভাগ এতে সংযোজিত। পত্রিকাখানি ছোটদের ভাল লাগবে।

শ্রীচরণেষু। সম্পাদক : শ্রীননীগোপাল দত্ত। ৪বি রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৫। মূল্য ০·৩৭ পয়সা।

ছোটদের এই পত্রিকাখানির আলোচ্য পূজা সংখ্যাখানি পূর্বাপূর্ব বছরের চেয়ে রচনসম্ভারে অধিকতর আকর্ষক করার চেষ্টা হয়েছে। বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে আছেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কুমারেশ ঘোষ, স্বপন বুড়ো, বোম্মানা বিশ্বনাথন, গোপাল ভৌমিক, অমিয়ভূষণ গুপ্ত, অতীন মজুমদার, প্রভাকর মাঝি, নির্মলেন্দু গৌতম, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, শান্তশীল দাশ প্রভৃতি।

ব্যায়ামচর্চা—সম্পাদক : হারাধন চক্রবর্তী। দাম ২·০০।

ব্যায়াম ও খেলাধুলার পত্রিকা "ব্যায়ামচর্চা"র এবারের শারদীয়া সংখ্যাটি অনেকগুলি সুলিখিত রচনায় সমৃদ্ধ। এ রচনাগুলি ব্যায়াম ও খেলাধুলায় আগ্রহীদের তৃপ্ত করবে—বিশেষ করে রাধাশ্যাম সাহা, বীরেন বসু, তাপস ভট্টাচার্য, মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপদ গোস্বামী ক্যাপ্টেন ভূপেশ কর্মকার প্রভৃতির রচনাগুলি। প্রবন্ধ ছাড়াও নাম-করা খেলোয়াড় ও ব্যায়ামবিদদের অজস্র ছবিও এ সংখ্যাটির অন্যতম আকর্ষণ।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান। সম্পাদক : গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। দাম ২·৫০।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" সম্ভবত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণের জ্ঞান বিজ্ঞান-সম্পর্কিত একমাত্র পত্রিকা। এ পত্রিকাটি দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে বিজ্ঞান-বিষয়ক নানারকম প্রবন্ধ সহজ ভাষায় সাধারণের উপযোগী করে প্রকাশ করে অনুসন্ধিৎসু সাধারণের কৌতূহল মিটিয়ে আসছে; সঙ্গে সঙ্গে তাদের জ্ঞানস্পৃহাও তৃপ্ত করছে।

"জ্ঞান ও বিজ্ঞান"-এর এ বছরের শারদীয়া সংখ্যাটিতে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রিয়দারঞ্জন রায়, সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, রমেশ দাশ প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা লিখেছেন। এঁদের লেখাগুলি ছাড়াও আরও অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ এ সংখ্যায় রয়েছে। এ ছাড়া ছোটদের জন্যে অর্থাৎ কিশোরদের জন্যেও বিশেষভাবে রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ এ সংখ্যাটিকে ছোটদের কাছেও আকর্ষণীয় করে তুলবে।

রাঙামাটি—সম্পাদক : সুধীরকুমার অধিকারী। ন্যাশনাল প্রেস, জি টি রোড, বর্ধমান। মূল্য এক টাকা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্ধমান শাখার মুখপত্র—এই শারদ সংকলনখানি বহু কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, জীবনী এবং নাটিকা ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ। রচনাগুলি বেশ উপভোগ্য হয়েছে। মফস্বল শহরের এই সংকলনে যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন—সুবোধ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক গোপেশচন্দ্র দত্ত, প্রফুল্লকুমার অধিকারী, নীলা কর, কবি কুমুদ কিংকর, মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু, দীপ্তি মুখোপাধ্যায়, অজিত ভট্টাচার্য, তারাকুমার মিশ্র, নকুলচন্দ্র দত্ত, শেখর সেনগুপ্ত, পারুল দে এবং অধ্যাপক অমূল্য সেন প্রভৃতি।

মাটি ও মানুষ—সম্পাদক : শশধর রায়। যতীন্দ্র ভবন, নবপল্লী, বারাসত, ২৪ পরগণা। মূল্য ১·৫০ মাত্র।

দক্ষিণারঞ্জন বসু, জগদানন্দ বাজপেয়ী, শান্তিকুমার মিত্র, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্বতী মুখোপাধ্যায়, দুর্গাপদ ঘোষ ও শশধর রায়ের সুরচিত প্রবন্ধ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, তপন দাশ, মনোরঞ্জন রায় প্রভৃতির গল্প এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বটকৃষ্ণ দাশ, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, মঞ্জু মিত্র, নচিকেতা ভরদ্বাজ, সুনন্দা বসু প্রভৃতির কবিতা এই শারদীয়া সংখ্যাখানিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। রচনাগুলি পাঠোপযোগী।

নানা রঙের সন্ধ্যা

[সংগীত সমালোচক]

সদারঙ্ ও সুরদাস—পুজোর মুখে পর পর দুটি সংগীত সম্মেলনের দৌলতে কলকাতার গানবাজনার আসর বেশ জমে উঠেছিল। বড় ছোট গাইয়ে-বাজিয়ের দাক্ষিণ্যে রসিক শ্রোতাদের প্রত্যাশার ডালি কতখানি ভরেছে, তার হিসাব নেবার আগে একটি কথা বলা প্রয়োজন। হাজার দুঃখ, দৈন্য, মালিন্য, বিশৃঙ্খলা কলকাতার সব সৌন্দর্য কেড়ে নিতে পারে না। শহরের

ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ

অনেক মূর্তির সব ক'টি ত্রুটি, কর্কশ বা রুক্ষ নয়। প্রাণের দিব্য বিভাও মাঝে মাঝে পরিস্ফুট হয়। গানের আসর যত দিন কলকাতায় পাতা থাকবে, ততদিন আশা ফুরবে না।

সেপ্টেম্বরের ২০ থেকে ২৪, পাঁচ দিনের সদারঙ্ সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রসদনে। প্রতিষ্ঠানের এটি ছিল চতুর্দশ অধিবেশন। প্রধানত প্রখ্যাত শিল্পীদেরই এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মোটামুটিভাবে বলা যায়, তাঁরা সেই সুযোগের অমর্যাদা করেননি। প্রায় প্রত্যেকেই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন উপস্থিত রসিকজনকে তৃপ্তি দিতে। সবাই সর্বাংশে সফলও হননি। কিন্তু অন্তত সংগীতের ক্ষেত্রে সেটাই শেষ কথা নয়। আন্তরিক প্রয়াসটাই বড়। সদারঙ্ কর্তৃপক্ষ এ কৃতিত্ব অনায়াসেই দাবি করতে পারেন যে, তাঁদের শিল্পীরা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

কণ্ঠসংগীতের আলোচনায় আমরা প্রথমেই নাম করব ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁর। বয়েস এবং অসুস্থতার সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে আজও যে এই রসিক পুরুষ আসরে এসে বসেন, এটাই পরম বিস্ময়ের। অবশ্য আজও তাঁর গান শ্রোতাকে গভীর আনন্দ দিতে পারে, দেয়। তিনি প্রথমে গাইলেন 'ছায়া' পরে 'দেশ'। প্রথমটি বেশী জমে উঠেছিল। যদিও সবচেয়ে মনে দাগ ফেলে সেই চিরপরিচিত, অথচ গাইবার গুণে নিত্যনূতন 'আয়ে না বালম'। সরগমের অংশে ক্রমাগত বিভিন্ন পর্দায় গলা বুলিয়ে বুলিয়ে তিনি প্রেক্ষাগৃহকে চকিত করে তোলেন।

ওস্তাদ আমীর খাঁ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধীরতা ও ধ্যান দিয়ে গান জমিয়ে তোলেন। তাঁর অনুরাগীর পরিধি ক্রমবর্ধমান। এ কথাও অবশ্য প্রায়ই শোনা যায় যে, তাঁর গানে একঘেয়েমির ছায়াপাত ঘটছে। শ্রোতার মন দুলে ওঠে না, নেচে ওঠে না। শুধু অবোধ শ্রোতারা এ কথা বললে অবশ্য আলোচনার কথাই উঠত না। অনেকেও কেউ কেউ বলছেন। কথা হচ্ছে, সবাই যে ছন্দের উপর সমান গুরুত্ব দেবেন, এটা আশা করা ঠিক নয়। আমীর খাঁ বিরাট শিল্পী, কিন্তু তাঁর গলার রেন্‌জ্‌ কিছু সীমায়িত। এই অসুবিধা সত্ত্বেও অথবা সেইজন্যেই তিনি যে রাস্তা বেছে নিয়েছেন তা ভেবে-চিন্তে। গানের চেয়ে সপ্তক বড় হতে পারে না, এ বিশ্বাসও তাঁর স্থির। আসরে ইনি পরিবেশন করেন মেঘ, মালকোষ, বৈরাগী, ছায়ানট। শেষোক্ত গানটিই সবচেয়ে

ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁ

উৎরেছে। হারমোনিয়মে এঁর সংগে সহযোগিতা করেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ।

ওস্তাদ মুনওয়ার খানের বেহাগ সংগীত। বৃদ্ধ পিতার সংগে এঁর গলা মেলানোতেও অত্যন্ত কুশলতার পরিচয় ছিল। অবশ্য এঁর গানে আর একটু মাধুর্যরস শ্রোতারা আশা করবেন। কিরানা ঘরানার মিষ্টতা ফিরোজ দস্তুরের গানে পাওয়া গেছে। দুই রাত্রির আসরে ইনি পরিবেশন করেন মারুবেহাগ, দরবারী ও বসন্ত। শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল ধ্রুপদে পুরিয়া রাগ গেয়ে শোনান। গম্ভীর, সুন্দর কণ্ঠ।

মহিলা শিল্পীদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম

মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

করব শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পুরিয়া ধানেশ্রী রাগে গাওয়া তাঁর খেয়াল শ্রোতাদের অনাবিল আনন্দ দিয়েছে। বিস্তার এবং তানের অংশ বিশেষ করে। মিশ্র খাম্বাজে বসানো ঠুংরীটি মোটামুটি। যথারীতি শ্রুতিসুখকর গান মিলেছে শ্রীমতী মালবিকা কাননের কাছ থেকে। তাঁর পুরিয়া কল্যাণ ও জৈং কল্যাণ, দুটিই ভাল হয়েছে। শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়কের খেয়াল গান এবারও যথারীতি বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। তাঁর যোগেশ্বরী (স্ব-সৃষ্ট) কারও খুব ভাল লেগেছে, কারও আদপেই লাগেনি। তাঁর গান আরও একটু সুন্দরভাবে সাজানো হলে, তারসপ্তকে হঠাৎ গলা একটু কম তুললে এবং সর্বোপরি পরিচিত-প্রচলিত রাগ মাঝে মাঝে পূর্ণভাবে পরিবেশন করলে বোধ হয় সবাই খুশী হবেন। তাঁর ভজন গান চমৎকার হয়েছে। শ্রীমতী গিরিজা দেবী মারবা রাগে খেয়াল ও পরে

একটি ঠুংরী গেয়ে শ্রোতাদের আনন্দ দেন।

দুটি আসরে অনেকগুলি রাগের অবতারণা করেন ওস্তাদ বিলায়েত খান। প্রথম আসরে ইমনি এবং শংকরা যত জমেছিল, দ্বিতীয় রাত্রে স্বসৃষ্ট 'বিহঙ্গিনী' ততটা মজা দিতে পারেনি। ইমরত খাঁর ইমন কল্যাণ ও দুর্গা মন্দ হয়নি। রইস খাঁ বাজিয়ে শোনান রসকল্যাণ। তৈরী হাত। আলাপের অংশে কিছু অবিন্যাস লক্ষ করা গেছে। এই তিনজন কৃতী সেতারবাদক ছাড়া সম্মেলনে ছাপ ফেলেন সরোদিয়া আমজাদ আলি। তাঁর 'ঝিনঝোটি' অপূর্ব। মন্দকোষও ভাল হয়েছে। নীয়াম হুসেনের সানাই তেমন জমেনি।

নাচের আসরে আসেন শ্রীমতী মিনতি মিশ্র। তাঁর ভারতনাট্যম ও ওড়িশী, দুই-ই ভাল লেগেছে। শ্রীমতী অমলাশংকরের পরিচালনায় 'উদয়শংকর ইণ্ডিয়া কালচারাল সেণ্টার'-এর ছাত্রীরা পর পর কয়েকটি নাচ পরিবেশন করেন। মান সর্বদা খুব উঁচু হয়নি। তবে সব মিলিয়ে উপভোগ্য। স্বয়ং শ্রীমতী শংকর মঞ্চে এসে দর্শকদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন।

কলকাতার তবলিয়াদের অন্ত সারা ভারত জুড়ে সুনাম। সর্বশ্রী কেরামত খান, কানাই দত্ত, শ্যামল বসু বিশ্বনাথ বসু এবং অতিথি পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ সম্মেলনকে সফল হয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। সারেঙ্গীতে সহযোগিতা করেন শ্রীলক্ষণ খান।

সনন্দা পট্টনায়ক

সুরদাস সংগীত সম্মেলন

সেপ্টেম্বরের ২৯, ৩০ এবং অক্টোবরের ১, ২—এই চার দিনের অধিবেশন হয়ে গেল ভবানীপুরের ইন্দিরা সিনেমা হলে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, আলোচ্য দুটি সম্মেলনই গতবার হয়েছিল মহাজাতি সদনে। আসরগুলির দক্ষিণায়নে উত্তর কলকাতার রসিকদের কিছু অসুবিধা হয়তো হয়ে থাকবে। যদিচ এই অভিযোগ দক্ষিণীরাও অন্যান্যবার করেছেন। বড় বড় আসরগুলি যদি কয়েকটি উত্তরে, কয়েকটি দক্ষিণে হয়, তবে উভয় পক্ষেরই লাভ সমান হবে।

সুরদাসের সর্বপ্রধান শিল্পীরা ছিলেন ওস্তাদ আমীর খাঁ, সংগীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী, পণ্ডিত ভীমসেন যোশী ও পণ্ডিত বিনায়ক রাও পট্টবর্ধন। তাছাড়া ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ, পণ্ডিত নারায়ণ রাও যোশী, সরোদবাদক শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় ও তরুণ আমজাদ আলিও ছিলেন। বেশ কয়েক বছর বাদে ওস্তাদ আবদুল হালিম জাফর খানের আগমনেও বিলক্ষণ সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

বিনায়ক রাও পট্টবর্ধনের বয়স সত্তর পেরিয়েছে। কিন্তু শুধু সেই বিচারেই নয়, সর্বতোভাবে ভাল গেয়েছেন বৃদ্ধ ওস্তাদ। কৌশিক কানাড়া রাগে তাঁর খেয়াল সুন্দর। কিন্তু আসরকে বিশেষ আনন্দ দেয় তাঁর 'সাগর' রাগের পরিবেশন। তিনি পূর্বাহ্ণেই জানিয়ে দেন এটি তাঁর সৃষ্ট নতুন কোনো রাগও নয় বা প্রচলিত অর্থে রাগমালাও নয়। মোট আটটি রাগকে পাশাপাশি রেখে কাউকে খর্ব না করে, অসম্ভব কুশলতার সঙ্গে তিনি গান গড়ে তোলেন। এবং ফলটা বাস্তবিকও হয়নি আদপেই। শ্রোতাদের অনুরোধে একটি সুরদাসী ভজনও গেয়ে শোনান তিনি।

প্রবীণ গায়ক তারাপদ চক্রবর্তীর পূর্বেকার সেই প্রাণপ্রাবল্য এখন আর কেউ তাঁর গানে পাবার আশা করেন না। কিন্তু অতি চমৎকার গেয়েছেন তিনি মালকোষ, শ্রোতাদের মন ভরিয়ে দিয়েছেন। আমীর খাঁর গান এই সম্মেলনে এত জমেনি। তিনি শোনান যোগগড়া, বেহাগ ও কলাবতী। পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর গাওয়া টোড়ী মন্দ হয়নি। তাঁর গান দিয়েই সম্মেলনের সমাপ্তি সূচিত হয়। পণ্ডিত নারায়ণ রাও যোশী মারু-বেহাগ ও ঠুংরী গেয়ে তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ তাঁর কয়েকজন ছাত্র (এঁদের মধ্যে শ্যামল বসুও ছিলেন) এবং কয়েকটি তবলার সাহায্যে পরিবেশন করেন 'ছন্দতরঙ্গ'—বিভিন্ন তালে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের কম্পোজিশন। সম্মেলনের এটি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। আমজাদ আলি খাঁর দরবারী ভালই হয়েছে। তবে এদিন তিনি পুরো প্রত্যাশা মেটাননি। যদিও যত্ন ও চেষ্টার কিছু শিথিলতা ছিল না। দুটি আসরে [illegible]বেহাগ বাজিয়ে শোনান বাহাদুর খাঁ এবং শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়। খাঁ সাহেবের আলাপের অংশ খুবই ভাল হয়েছে। সমানভাবে শ্যামবাবুর বাদন পরিচ্ছন্ন। সেতারে সম্মেলনের একমাত্র শিল্পী হিসাবে আবদুল হালিম জাফর খাঁর উপর যে গুরুদায়িত্ব পড়েছিল, তা তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। তিনি বাজান নটভৈরব।

শ্রীবীরেশ রায়ের 'যোগ' আমাদের খুব আনন্দ দিয়েছে। তাঁর বিস্তারের কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তানের অংশ সেই তুলনায় কিছু দুর্বল। শ্রীমতী শিপ্রা বসু গত বছর সুরদাস সম্মেলনে গেয়ে নাম করেছিলেন। এবার 'ললিতা' পরিবেশন করে তিনি সে সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। শ্রীমতী আরতি বাগচী প্রথমে গেয়েছেন 'মালকোষ' ও পরে ঠুংরী। খেয়াল গানে মালকোষের রাগরূপ যোগ্যতার সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন, কিন্তু কণ্ঠস্বর তিনসপ্তকের পক্ষে সাবলীল না থাকায় রাগের উদাত্ত ভাব ধরা দেয়নি। তাঁর কণ্ঠে ঠুংরী খুবই জমজমাট লেগেছিল।

শ্রীমতী বন্দনা সেনের নৃত্যানুষ্ঠান এবার দর্শকদের প্রত্যাশা পূর্ণ করেনি। ইনি অবশ্যই প্রতিভাবতী। কিন্তু আর একটু স্থৈর্য ও কল্পনা যুক্ত হলে অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর হবে। শ্রীমতী লিপিকা গুপ্তের নাচ, বিশেষত বর্ণম অংশ উপভোগ্য হয়েছে। শেষ দু দিনের আসরে ওস্তাদ সগীরুদ্দিন খাঁর সারেঙ্গী সহযোগিতা নতুন করে প্রমাণ করল যে, এই বিভাগে তাঁর জুড়ি আর কেউ নেই।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেনের হাত থেকে চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কার নিচ্ছেন বাসু ভট্টাচার্য, এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবির শিল্পীদের মধ্যে রাজকাপুর, ওয়াহীদা রেহমান ও নন্দিনী স্মারক উপহার গ্রহণ করছেন।

রঙ্গজগৎ
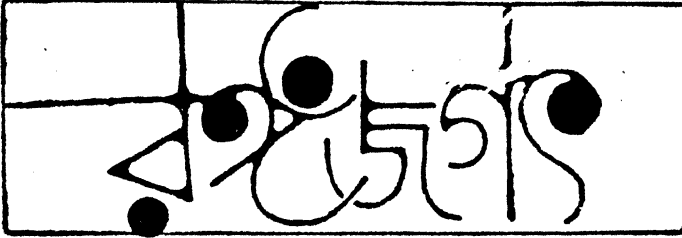
জাতীয় পুরস্কারের নানা বিভাগ

চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেল। এবার পুরস্কারের সংখ্যা বেশী। কারণ, বিভাগও অনেক। পুরস্কারবিজেতাদের অনেকেই কিন্তু এই বিভাজন পছন্দ করেন নি। দিল্লীতে সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে শ্রীসত্যজিৎ রায় এই আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, পুরস্কার নানা ভাগে ভাগ করার ফলে "প্রোপাগাণ্ডা"-র উপাদান ছবিতে ঢুকে যেতে পারে। বিশেষ করে এইসব পুরস্কার পাবার আকাঙ্ক্ষা যাঁদের থাকবে তাঁদের ছবিতে প্রোপাগাণ্ডা থাকাই স্বাভাবিক। তিনি আরও বলেন, কোন বিশেষ বিভাগে গণ্য হবার উদ্দেশ্য থাকলে সার্থক ছবি তৈরি হতে পারে না।

শ্রীরায় অবশ্য সাধারণভাবে এবারের পুরস্কার বিতরণের প্রশংসা করেন। এবং বলেন, "তিসরী কসম"-এর মত "সাউণ্ড" ছবিকে পুরস্কার দিয়ে সরকার ভাল কাজই করেছেন। এটা একটা ভাল "ইনসেনটিভ"। চিত্রনাট্যের জন্য আলাদা পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকায় শ্রীরায় সন্তুষ্ট। কারণ, চিত্রনাট্য এতকাল অবহেলিত ছিল।

"তিসরী কসম"-এর পরিচালক শ্রীবাসু ভট্টাচার্য পরিষ্কারই বলে দিয়েছেন, বিভিন্ন বিভাগের পার্থক্য স্পষ্ট নয় ("নট প্রপারলি ডিফাইনড")। বিভিন্ন "ক্যাটিগরি"-র বা বিভাগের কী শর্ত তা দেখে চলচ্চিত্রকার ছবি তৈরি করতে পারেন না। চিত্র পরিচালক ছবি করেন নিজের ভাবনা ও সমস্যা প্রকাশের জন্য। "শ্রেষ্ঠ ছবি শুধুই শ্রেষ্ঠ ছবি, এর কোন সংজ্ঞা নেই", শ্রীভট্টাচার্য এই মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর উপর ছবির জাতীয় পুরস্কার পাবার কোন অর্থ নেই। এই পুরস্কার স্বাস্থ্য-দপ্তরের দেওয়া উচিত।

পুরস্কার-প্রাপ্ত মালয়ালাম ছবির পরিচালক শ্রী পি ভাস্করন অনেকটা এই ধরনেরই মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, নানা বিভাগের ব্যাপারটি অস্পষ্ট, এবং চিত্র-নির্মাতাদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

দেখা যাচ্ছে, জাতীয় পুরস্কারের জন্য চলচ্চিত্রের শ্রেণীবিভাগ চিত্র পরিচালকদের সমর্থন পায় নি। এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে অসুবিধা কোথায় তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। বছরের শ্রেষ্ঠ কাহিনী-চিত্রের সঙ্গে (স্বর্ণপদক বিজয়ী) 'সাহিত্য-মূল্য সমন্বিত শ্রেষ্ঠ' ছবি কিংবা শ্রেষ্ঠ এক্সপেরিমেন্টাল চিত্রের (দুই বিভাগের জন্য আলাদা পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে) পার্থক্য নিরূপণ সব ক্ষেত্রে মোটেই সহজ নয়। এ ব্যাপারে চিত্রনির্মাতাদের মনে বিভ্রান্তি জাগাতে পারে বলে যে আশঙ্কা পুরস্কার-বিজেতারা প্রকাশ করেছেন তাও অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আরও বড় বিপদের কথা এই, বিভিন্ন বিভাগের পুরস্কারের দরুন চলচ্চিত্রকে প্রচারধর্মী বা উদ্দেশ্যধর্মী করে তোলার আগ্রহ বেশী প্রকাশ পেতে পারে। আর্টের ক্ষতির সম্ভাবনা সেইখানেই।

জর্জ সাদুল

বিখ্যাত ফরাসী চলচ্চিত্র-ঐতিহাসিক ও সমালোচক জর্জ সাদুল সম্প্রতি পরলোক-গমন করেছেন। কলকাতার চলচ্চিত্ররসিকদের কাছে ঘটনাটি স্বজনবিয়োগের মতই শোক-বহ। কারণ, জর্জ সাদুল কলকাতায় থাকা-কালীন অনেককেই আত্মীয় করে নিয়ে-

জর্জ সাদুল

ছিলেন। অনেক বাংলা ছবি তিনি দেখেছেন, চলচ্চিত্র নিয়ে চিত্রপরিচালক ও সমালোচকদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, এই শহর ঘুরে বেড়িয়েছেন, হিন্দুর বাড়ির বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, এখানকার শিল্পী ও কলাকুশলীদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং বাংলা দেশ ও বাংলা ছবিকে ভালবেসেছেন।

১৯৬৫ সনে ভারতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের বিচারকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্যরূপে তিনি ভারতে আসেন। ওই সময়েই তিনি কিছুকাল কলকাতায় অবস্থান করেন। জর্জ সাদুলের নাম সারা বিশ্বের চিত্রসমালোচক ও চিত্ররসিকদের কাছে সুপরিচিত, কলকাতার চলচ্চিত্রানুরাগীদেরও অজানা ছিল না। তাঁর লেখা 'হিস্ট্রি অব দি সিনেমা' বহুপঠিত।

সাদুলের কাছে এ-দেশের চিত্ররসিকরা আরও একটি বিশেষ কারণে কৃতজ্ঞ। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' যখন কান উৎসবে প্রদর্শিত হয়, তখন, শোনা যায়, একাধিক বিচারক এবং অধিকাংশ সমালোচক ছবিটি দেখার আগ্রহই প্রকাশ করতে চাননি। অন্যদের সঙ্গে সাদুলই 'পথের পাঁচালী'-র আশ্চর্য গুণের কথা সকলকে জানান। সত্যজিৎ-প্রতিভার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি তথা বিশ্ব-চলচ্চিত্রের মানচিত্রে ভারতের স্থানলাভের মূলে সাদুলের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল।

কলকাতায় অবস্থানকালে জর্জ সাদুল ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পান। বাংলা দেশের চলচ্চিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা সাদুল চিত্রব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জেনে নেন। চলচ্চিত্রের ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণ করার জন্যই তিনি জ্ঞান আহরণে উদ্যোগী হন। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও জ্ঞানের আদান-প্রদানের সেই মুহূর্তগুলি ভোলবার নয়। জ্ঞানপিপাসু, নিরহংকার, উদার ও একজন সৎ ব্যক্তিরূপে সাদুলের স্মৃতি তাঁর কলকাতার বন্ধুদের মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

সুধীর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় প্রযোজক আর ডি বনসালের "আঁধার সূর্য"-র সুটিং আরম্ভ হয়েছে—একটি দৃশ্যে শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও রিনা ঘোষ।

ফটো দেশ

চিত্র-সমালোচনা

উপকার

'জয় কিষাণ, জয় জওয়ান'—এই শ্লোগান-প্রেরণায় একটি কাহিনীচিত্র তৈরির সদিচ্ছা ... অভিনেতা মনোজকুমারের মনে জেগেছিল। ফলস্বরূপ আমরা পেলাম 'উপকার' (বিশাল পিকচার্স)। এবং মনোজকুমারকেও চিত্রপরিচালকের ভূমিকায় দেখলাম। কাহিনীও তাঁর রচনা। নায়কের নাম ভারত। নামকরণ নিরর্থক নয়। ভারত নামক নায়ক যেন বর্তমান ভারতীয় আদর্শেরই প্রতীক। সে প্রথমে কিষাণ, পরে জওয়ান। বিশ রীল-এর ছবিতে ভারতের বাল্যজীবন, কিষাণজীবন, জওয়ানজীবন, এবং তার প্রেমের ঘটনা তো আছেই। তৎসঙ্গে মেলোড্রামা (দুটি সহোদরের বিচ্ছেদ) ও খলনায়ক ও কুচক্রী দলের পাপাচার এবং হিন্দী চিত্রের নিয়মিত দর্শকদের যাবতীয় ঈপ্সিত উপকরণ (যথা, সেক্স, বিলিতী নাচগান) চিত্রনাট্যে সংযুক্ত।

বলা বাহুল্য, বহুবিধ ব্যাপারের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে উচ্চ মানবীয় আদর্শ ও দেশাত্মবোধ। লোকশিক্ষার জন্য এ ধরনের ছবির প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। তবে বাস্তবধর্মী কাহিনীর ভিতর দিয়েই উদ্দেশ্য সার্থক হতে পারে। এ ছবির কাহিনী ও চরিত্র-চিত্রণে বাস্তবের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া কঠিন। যারা ভাল, তারা খুব ভাল, মন্দরা অতি মন্দ। স্বাভাবিকতার ধারে-কাছে কেউ না। ভুল বুঝতে হবে বলেই যেন আদর্শবাদী বড় ভাইকে ছোট ভাই ভুল বুঝে গিয়েছে।

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত "আলেয়ার আলো" ছবিতে মঞ্জু দে ও রাধামোহন ভট্টাচার্য।

ভুল ভাঙ্গার সময় যখন হয়েছে, তখনও আড়ি পেতে শোনা সামান্য কথাতেই তার ভুল ভেঙেছে। সেই বরাবরের অবিশ্বাস নিয়ম। অপর দিকে খলচরিত্রের খুন করার নেশা কিছুতেই কাটে না।

গতানুগতিক সব বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে পরিচালক-অভিনেতা-কাহিনীকার মনোজকুমার বারবার আদর্শের কথা বলেছেন, সোচ্চারে বক্তব্য (শুধু সংলাপে নয়, গানেও) শুনিয়েছেন, নেতাদের ছবি দেখিয়েছেন এবং জওহরলাল নেহরুর প্রতিমূর্তিতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন। আধুনিক ভারতের সব রকম সমস্যার কথাই ছবিতে আছে। খাদ্যসমস্যাও বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। চোরাকারবারীর পাপকর্মও বাদ যায়নি। এবং পরিচালক সেই সাবেকী ত্রুটিও এড়াতে পারেননি। অর্থাৎ বলবার বিষয় বেশী করে বারবার বলা। এক কথায়, যা পরিমিতির অভাব।

নবকেতনের "জুয়েল থিফ" ছবিতে দেব আনন্দ ও ফরিয়াল।

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত অপ্সরা ফিল্মস-এর "তিন অধ্যায়" ছবিতে সুপ্রিয়া চৌধুরী

তা ছাড়া, আদর্শভিত্তিক চিত্র করতে গিয়ে হাল্কা প্রমোদের এত সব উপাদান কেন? যৌন উপকরণেরই বা কী প্রয়োজন? যুক্তির দিক থেকে বলবার কিছু নেই। আদর্শভ্রষ্ট অনুজের ক্রিয়াকলাপ দেখাবার জন্যই এ-সব রাখা হয়েছে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য কি সত্যই অস্পষ্ট?

তবে পরিচালক হিসাবে যে মনোজকুমার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তা স্বীকার করতে হবে। কৃত্রিম কাহিনীর চিত্রনাট্যে অনেক কিছু অপ্রয়োজনীয় ঘটনা ও চরিত্র সাজাতে গিয়ে তিনি মোটেই বেসামাল হননি। যাত্রার দলের বিবেকের মত একজন আদর্শনিষ্ঠ পঙ্গু (প্রাণ অভিনীত) সমানে অকারণে ঘুরে-ফিরে বেড়িয়েছে। তাকে শেষ সময়ে দুর্বৃত্ত-সন্ধানে কাজে লাগানো হয়েছে। ছবিতে যুদ্ধের দৃশ্যও (বিদেশীর ভারত আক্রমণ) সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত। মনোজকুমারের প্রয়োগ-কর্মের প্রশংসা করতেই হয়। ইংরেজীতে যাকে বলি 'এক্জিকিউশন', তা চমৎকার। বিভিন্ন শটে সুন্দর। এবং দৃশ্যের ঘটনাবিন্যাসেও (নায়ক মনোজকুমার ও নায়িকা আশা পারেখের মধ্যে) পরিচালক যথেষ্ট রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তথাকথিত হিন্দী চিত্রের রীতি এ ক্ষেত্রে অনুসৃত নয়, একটি-দুটি মুহূর্তের সংলাপ সত্যিই ভাল। 'উপকার' হিন্দী চলচ্চিত্রের একটি উপকারই করেছে। মনোজকুমারকে পরিচালকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

অভিনয় মোটামুটি সকলেরই ভাল। বিশেষ করে কামিনী কৌশলের (নায়ক-জননী)। কল্যাণজী-আনন্দজী সুরারোপিত গানগুলি সুখশ্রাব্য। কলাকৌশলের কাজও উঁচুদরের।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত সংখ্যা 'মহাশ্বেতা' ছবির সমালোচনায় শেষ অংশে আমরা এ কথাই বলতে চেয়েছি—শান্তিনিকেতনের পরিবেশে রবীন্দ্রসংগীত থাকলেই শোভন হত। আলাদাভাবে বিচার করলে "পাপেট শোর" জন্যে লেখা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গানটি সার্থক।

সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবি

সত্যজিৎ রায়ের "দি এলিয়েন" ছবিতে জনৈক আমেরিকানের চরিত্রে হলিউড শিল্পী জেমস কোবার্ন অভিনয় করবেন। সম্প্রতি লণ্ডনে কোবার্নের সঙ্গে শ্রীরায়ের কথাবার্তা পাকা হয়। "ফ্লিণ্ট"-সিরিজ-খ্যাত কোবার্ন "দি এলিয়েন"-এর গল্প ও চিত্রনাট্যই যে শুধু পছন্দ করেছেন তা নয়, শ্রীরায়ের ছবিতে অভিনয় করার আগ্রহ তাঁর অপরিসীম। পিটার সেলার্সও ছবির একজন বিশিষ্ট শিল্পী। রঙিন চিত্র "দি এলিয়েন"-এর শুটিং বাংলা দেশেই হবে। 'প্রোসেসিং', স্পেশাল এফেক্ট ইত্যাদি কাজ লণ্ডনে হবে। ছবির প্রায় ষাট ভাগ সংলাপ ইংরেজী। বাংলা সংলাপও আছে, বাঙালী চরিত্রের মুখে।

"দি এলিয়েন"-এর আগে শ্রীরায় "গুপী গায়েন বাঘা বায়েন" ছবিটি শেষ করবেন। এই ডিসেম্বরেই শুটিং আরম্ভ হবার কথা। 'ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট'-এ "গুপী গায়েন..." তৈরি হবে। গানগুলি রেকর্ড করা হয়েছে। তবে হিন্দীতেও গান রেকর্ড করার কথা হচ্ছে। কারণ পরে ছবিটি হিন্দীতে "ডাব" করা হতে পারে। হিন্দীতে "ডাবিং"-এর কোন অসুবিধা হবে না। "গুপী গায়েন..." ছবিতে সংলাপ থাকবে খুবই সামান্য। মূকাভিনয়ই হবে প্রধান। রাজস্থানে ছবির
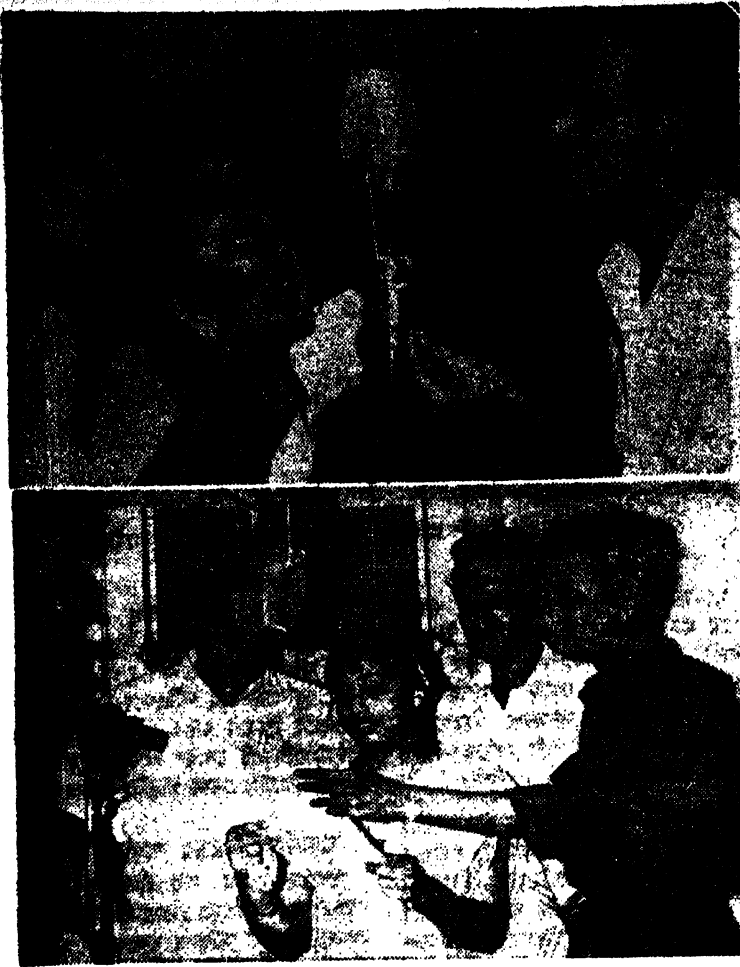
"অজপার" হিন্দীচিত্রের অসমীয়া চিত্রর‌ূপে ভুপেন হাজারিকার সঙ্গীতপরিচালনায় গান গাইছেন শ্যামল মিত্র ও ইলা বস‌ু (নীচে) "সেই রুপু সেই রঙ" ছবির গান রেকর্ডিং : কণ্ঠশিল্পী আরতি ম‌ুখোপাধ্যায়, সলিল মিত্র, পরিচালক মণ্ট‌ু গাঙ্গুলি ও চিত্রনাট্যকার সুনীল ম‌ুখোপাধ্যায়।

আউটডোর শ‌ুটিং হবে। ইনডোর শ‌ুটিং কলকাতা এবং বোম্বাই উভয় শহরেই হবার কথা। বড় সেট তৈরি করতে হবে বলেই শ্রীরায় কিছ‌ু ইনডোর শ‌ুটিং বোম্বাই-এ করতে চান। ছবির শিল্পিদলের প‌ুরোভাগে থাকবেন রবি ঘোষ ও তপন চট্টোপাধ্যায়। শ্রীরায় নিজেই "গ‌ুপী গায়েন..." প্রযোজনা করবেন।

"গ‌ুপী গায়েন..." শেষ করে তিনি "অশনি সংকেত"-এর (বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত) কাজে হাত দিতে পারেন। তারপর "দি এলিয়েন"।

এম ওয়াই সি'র অন‌ুষ্ঠান

এম-ওয়াই-সি (প্রাক্তন ন্যাশনাল ইয়‌ুথ কয়ার) সংস্থা গত ৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে একটি মনোজ্ঞ অন‌ুষ্ঠানের মাধ্যমে গীতিকবি ও স‌ুরকার সলিল চৌধ‌ুরীর গান পরিবেশন করেন। শ্রীচৌধ‌ুরীর উপস্থিতিতে এই অন‌ুষ্ঠানে প্রায় ৫০ জন শিল্পী কয়ার পদ্ধতিতে সমবেতভাবে কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করেন, যাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন হেমন্ত ম‌ুখোপাধ্যায়, স‌ুচিত্রা মিত্র, শ্যামল মিত্র, দ্বিজেন ম‌ুখোপাধ্যায়, সবিতা চৌধ‌ুরী, নির্মলেন্দ‌ু চৌধ‌ুরী, প্রবীর মজ‌ুমদার, অমর রায় প্রভৃতি। সলিল চৌধ‌ুরীর গানের উপর রচিত কয়েকটি স‌ুপ্রয‌ুক্ত ন‌ৃত্য ছাড়াও তিনটি বিখ্যাত ব্যালে, যথা 'পাল্কীর গান', 'রানার' ও 'ঘ‌ুমেওয়ালে সিপাহী' ও পরিবেশিত হয়। ন‌ৃত্য পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় ছিলেন অসিত চট্টোপাধ্যায়; তবে রানার' ন‌ৃত্যনাট্যটির পরিকল্পনা ও পরিবেশনের কৃতিত্ব শম্ভু ভট্টাচার্যের। সমগ্র অন‌ুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তর‌ুণকুমার বস‌ু এবং গ্রন্থনায় ছিলেন জ্ঞানেশ ম‌ুখোপাধ্যায়।

ভ্রম-সংশোধন

গত সংখ্যায় প‌ুজোর রেকর্ডের আলোচনায় "দ‌ূরে দ‌ূরে থেকো না" গানটির রচয়িতা হিসাবে ভ্রমক্রমে স‌ুনীলবরনের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। গানটি লিখেছেন শ্যামল গ‌ুপ্ত।

সমালোচনায় লেখা হয়েছিল রাহ‌ুল দেববর্মনের স‌ুরারোপ এই প্রথম। দ‌ুইজন পত্রদাতা (শ্রীশৈলেন কুণ্ডু ও শ্রীতপন রাউত, আসানসোল) জানাচ্ছেন, তিনি ১৯৬৫ সনে লতা মঙ্গেশকারের প‌ুজোর গানের স‌ুর দিয়েছেন।

জয়শংকর প্রোডাকশনস-এর "লালবাঈ" (পরিচালনা : চিত্ত বসু) ছবির নামভূমিকার শিল্পী শবনম।

ছবির পর ছবি

রাধারানী পিকচার্সের 'বালুচরী' অবিলম্বেই মুক্তি পাবে। আশাপূর্ণা দেবীর বালুচরী কাহিনী অবলম্বনে **বালুচরী** ছবিটি পরিচালনা করেছেন অজিত গাঙ্গুলি। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, লিলি চক্রবর্তী, মলিনা দেবী, জহর রায়, গঙ্গাপদ বসু, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, অজয় গাঙ্গুলি প্রভৃতি ছবির মুখ্য চরিত্রের শিল্পী। রাজেন সরকার সংগীতপরিচালক।

সরকার প্রোডাকশনস-এর 'অজানা শপথ' নভেম্বরের মাঝামাঝি মুক্তি পাবে বলে আশা করা যায়। সলিল সেন **অজানা শপথ** স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, সোমেন চক্রবর্তী, ছায়া দেবী, জহর রায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শাতকর্ণির 'পিয়ারীলাল বাজ'

বিমল করের বিখ্যাত গল্পের নাট্যরূপ **'পিয়ারীলাল বাজ'** এবার মঞ্চে অভিনীত হতে চলেছে। আগামী তেইশে অক্টোবর, সোমবার, সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় মিনার্ভার মঞ্চে **শাতকর্ণি** গোষ্ঠী তাঁদের নিয়মিত অভিনয়ের উদ্বোধন করবেন। কয়লাখনি এলাকায় একটি ক্রিশ্চান ফুটবল খেলোয়াড়ের প্রেম ও প্রেমহীনতা নাটকটির বিষয়বস্তু। হরেন মল্লিকের নাট্যরূপ ও পরিচালনায় কয়েকটি মুখ্য চরিত্রে থাকবেন সুব্রত ভট্টাচার্য, তারাপদ গাঙ্গুলি, কিশলয় সরকার, রেবা কুণ্ডু, সন্ধ্যা সর্বজ্ঞ এবং মূল ভূমিকায় সমরেশ মজুমদার।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ক্যামিলট ছবিতে নায়িকা ভ্যানেসা রেডগ্রেভকে বিয়ের দৃশ্যে (রাজা আর্থারের সঙ্গে) যে পোশাকটিতে দেখা যাবে সেটি তৈরি করতে দুই মাস সময় লেগেছে। তেরোজন মহিলা মিলে পোশাকটি তৈরি

ওয়াল্ট ডিজনের সম্মানে আমেরিকায় তাঁর ছবি সমেত ডাকটিকিট বের করা হচ্ছে বলে সংবাদে প্রকাশ। এই ডাকটিকিট বের করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পোস্ট-মাস্টার জেনারেল এবং অন্যান্য সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল।

শার্লি টেমপলের রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামানোর ব্যাপারটা হলিউডের অনেকেরই মনঃপূত নয়। যাঁরা শিল্পী হিসাবে শার্লিকে ভালবেসেছিলেন এবং আজও স্নেহ করেন তাঁরা অনেকটা নিরাশ হয়েছেন। সম্প্রতি শার্লি প্রেসিডেন্ট জনসনের সমালোচনা করেছেন। এতে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, এ বিষয়ে শার্লি কী-ই বা জানে। জনৈক হলিউড অভিনেতা বলেছেন, "শার্লির হাতে যদি সময় থাকে তবে সে যেন আর একটা ছবি করে। কিন্তু রাজনীতি থেকে যেন দূরে থাকে।

ব্রিজিত বার্দো তাঁর ভূতপূর্ব স্বামী চিত্র পরিচালক রোজার ভাদিমের ছবিতে আবার অভিনয় করছেন। ভাদিমই বার্দোকে সিনেমার পর্দার "সেক্স কিটেন" রূপে প্রথম উপস্থিত করেছিলেন। ভাদিমের যে ছবিতে বার্দো অভিনয় করবেন তার নাম "বারবারিল্লা"।

অরণ্যদেব ✫ লী ফক
মানুষ-খেকো!
ভূত-সিংহ!
ভিতরে এসো!
ফটক বন্ধ করো!
ভিতরে আসুন অরণ্যদেব!
সবাই ভিতরে এসো!
মানুষ-খেকোরা আসছে!
ফটক বন্ধ করে দাও!
উনি মানুষ-খেকোদের দিকেই ছুটে যাচ্ছেন!
?!
ঘোড়া ছুটিয়ে একটা লোককে আসতে দেখে সিংহীগুলি একটু থমকে দাঁড়াল.....
অরণ্যদেবের ঘোড়া অকুতোভয়ে ঢুকে পড়ল সিংহ-যূথের মধ্যে।
নিমেষে গর্জে উঠল অরণ্যদেবের রিভলবার। এক-একটা বুলেটে এক-একটা সিংহী!
কয়েকটা ধরাশায়ী হতেই অন্যগুলি ঘাসের জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ল!
ব্যাপার দেখে গ্রামবাসীরা আনন্দে আত্মহারা.....
অরণ্যদেব! অরণ্যদেব!
৬